"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

অমৃত

১৯ বর্ষ ১ম সংখ্যা
২০ বৈশাখ, ১৩৮৬
4, May 1979.

আগামী সংখ্যা

নববর্ষ

প্রসঙ্গ : আয়ুর্বেদ

স্বাধীনতার পর তিরিশ বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো যে আমরা চিন্তা ও জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে পুরোপুরি স্বাধীন হতে পেরেছি তা বলা যায় না। পাশ্চাত্যের সবই ভালো, এবং দেশী জিনিস সবই অকেজো, এই ধরনের একটি হীনমন্যতার ভাব আমাদের আচার-আচরণে অনেক সময়েই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা থেকে ভারতের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তাতেও তার নতুন প্রমাণ মিলল। ঐ সংস্থা জানিয়েছে, ভারতের বহু যুগ ধরে পরীক্ষিত ওষধি ও চিকিৎসাদ্রব্যই ভারতীয় পরিবেশের পক্ষে বেশি অনুকূল। এবং তাতে সুফলও পাওয়া সম্ভব অনেক বেশি।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঠিক কী ভিত্তিতে তাদের ঐ সিদ্ধান্তে এসেছেন তা অবিশ্যি জানা যায় নি এখনো। সিদ্ধান্তটি ঘোষণার আগে তাঁরা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার বিষয়ে গবেষণা করেছেন কিনা তা অজানা থেকে গেছে। কিন্তু সে যাই হোক এক দায়িত্বশীল সংস্থার পক্ষ থেকে প্রচারিত ঐ মত যে বিশেষভাবেই অনুধাবন করার মতো তাতে সন্দেহ নেই।

গোড়াতেই একথা জেনে রাখা ভালো যে, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা আর টোটকা চিকিৎসা এক নয়। আয়ুর্বেদও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতি। তবে আধুনিককালে এই পদ্ধতির ওষধি ইত্যাদি নিয়ে নতুন ধরনের গবেষণায় তেমন প্রসার ঘটেনি। ফলে এই চিকিৎসা অনেকক্ষেত্রেই হয়তো কালোপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি। তার প্রধান কারণ আমাদের ভূতপূর্ব বিদেশী শাসককুলের উদাসীনতা, এবং কোনো কোনো সময়ে বিরুদ্ধতাও। অন্য কারণ, আমাদের পরানুকরণ-প্রিয়তা।

কিন্তু নানারকম অসুবিধা ও বাধা সত্ত্বেও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা এখনো অচল হয়ে যায়নি দেশে। ঐ চিকিৎসায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায় বলেই জনসাধারণের এক ব্যাপক অংশের মধ্যে তার প্রতি আস্থা এখনো অবিচলিত রয়েছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মন্তব্যের পর যদি আয়ুর্বেদীয় গবেষণার দিকে নজর দেন সরকার, এই চিকিৎসা-পদ্ধতি হয়তো আরো নানাদিক থেকেই সমকালীন প্রয়োজনের উপযোগী হয়ে উঠবে।

সাহিত্য ইত্যাদি .

রবীন্দ্র-চর্চার কথা

আশ্বিন মানেই যেমন দুর্গোৎসব আর পৌষ মানে নবান্ন, বৈশাখ মানেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ। সারা মাস জুড়েই রবীন্দ্র-উৎসব। আর তার উপকরণও জুগিয়ে দিয়ে গেছেন কবি নিজেই। ফলে গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর মতো রবীন্দ্রনাথেরই গান আর নাটকের ডালি সাজিয়ে রবীন্দ্র-বন্দনার রেওয়াজ এখন সর্বজন-গৃহীত।

কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা জানেন, চিরকাল ঠিক এরকম ছিল না। নোবেল পুরস্কার পান কবি বাহান্ন বছর বয়সে। সে সময় কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনে করে একদল মানীগুণী মানুষ শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাতে। রবীন্দ্রনাথ অবিশ্যি সে উপলক্ষে বেশ একটু নরম-গরম কথা বলে অভিমান প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সে অন্য কথা। আসল কথা হল কলকাতা থেকে যে ভদ্রলোকেরা কবিকে মাল্যদান করতে গিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মাইনরিটি। শিক্ষিত বাঙালিদের এক বিপুল মেজোরিটির কাছেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তখন দূরশ্রুত নাম। তাঁকে তাঁরা আপন করে নিতে পারেন নি।

অবিশ্যি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগেও রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সেটা ঘটেছিল কবির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে। কিন্তু সেও ছিল নেহাতই প্রান্তিক ব্যাপার। হৃদয় তো নয়ই, মাথার মধ্যেও শিক্ষিত বাঙালিরা তখনো পর্যন্ত কবিকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করেন নি। অর্ধশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত সাধারণ লোকের কাছে কবি ছিলেন একেবারেই বাইরের মানুষ।

আর আজ? সমস্ত পুজোর আগে যেমন গণেশ পুজো, সমস্ত অনুষ্ঠানেরই শুরুতে তেমনি রবীন্দ্রসঙ্গীত। ভারতীয় উপমহাদেশের দু-দুটো রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতও পেয়েছি আমরা তাঁর কাছ থেকেই। নববর্ষ থেকে বন মহোৎসব হল-কর্ষণ থেকে পুরস্কার বিতরণ জন্মদিন থেকে বিবাহ বার্ষিকী, এমন কি মৃত্যুদিনেও আজ রবীন্দ্রনাথের গান। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আমাদের জীবনযাত্রাই অচল।

এই অবস্থা বলা বাহুল্য একদিনে আসে নি। সময় লেগেছে। রবীন্দ্র-অস্তিত্বের প্রথম তরঙ্গ এসে বাঙালির মনকে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে, তাঁর সত্তর বছরের জন্মদিনে। আমার তখন নাবালক বয়স। মনে থাকবার কথা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় তরঙ্গ, তাকে তরঙ্গ না বলে ধাক্কাই বলা উচিত, যেটা ঘটেছিল কবির আশী বছর বয়সে, তার অভিঘাত আমার স্পষ্টই মনে আছে। বাঙালির জীবনে সেই ধরনের আলোড়ন আর মাত্র একবারই ঘটেছিল, কবির মৃত্যুর পর। যা ঘটেছিল তাঁর একাশী বছর বয়সে। কাজেই আশী থেকে একাশী, এই দুটি বছর ধরে অজস্র রচনায় আলোচিত হতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ। তখনই তিনি হয়ে উঠলেন আজকের রবীন্দ্রনাথ। যে রবীন্দ্রনাথ শুধু রথ নন, সারথীও।

'৪০—৪১ সালে অনেক রকম পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে লেখা বেরোয়। কয়েকটি পত্রিকায় বেরিয়েছিল বিশেষ সংখ্যা। তার মধ্যে 'পরিচয়' আর 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের কথাই আমার বেশি করে মনে পড়ছে। কারণ প্রথমত আমি ছিলাম ঐ দুটি বৃত্তেরই লেখক। আর দ্বিতীয়ত, দুটি কাগজের সূত্রপাতেই ছিল ঈষৎ রবীন্দ্র-বিরোধিতা, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা মোলায়েম হয়ে এলেও রবীন্দ্রোত্তর যুগের চেতনা সঞ্চার করার দিকে দুটি কাগজেরই দৃষ্টি ছিল তখনো পর্যন্ত খুবই সতর্ক। কাজেই এধরনের কাগজের রবীন্দ্র-বন্দনা যে বেশ একটু উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য।

অন্য অনেকের মধ্যে লক্ষ্য পড়ার মতো লেখা হয়েছিল পরিচয়-সম্পাদক সুধীন্দ্র দত্তের। সে লেখা পরে 'স্বাগত'-এ [illegible] পেয়েছে। কাজেই প্রতিপাদ্য কী ছিল ব[illegible] দরকার নেই। কিন্তু একটি কথা তবু উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। সুধীনবাবু ঐ রচনায় একবার রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে তাঁর ঐ লেখাটিকে বলেছিলেন, 'গঙ্গাজলে গঙ্গা-পুজো'। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যা দিয়েছেন, তাই দিয়েই তাঁকে নন্দিত করা। তার মানে, স্পষ্টভাবে স্বীকার করা যে রবীন্দ্রোত্তর চিন্তাধারাও আসলে রবীন্দ্রনাথেরই ফলশ্রুতি। যদিও ঐ সময়েরই কাছাকাছি কালে বিষ্ণু দে 'কেন লিখি' নামক পুস্তিকায় লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য-ধারায় সমুদ্রগামী নদী নন, বিশাল এক মনোরম হ্রদ মাত্র। (বিষ্ণুবাবু অবিশ্যি পরবর্তীকালে এ মত পাল্টে পুরোপুরি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।)

তা যাক, এসব হল ডিটেল-এর কথা। 'পরিচয়' ও কবিতা'র অন্য লেখার মধ্যে মনে আছে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখের লেখা। শিল্পী যামিনী রায় পরিচয়ের ঐ সংখ্যাতেই লিখেছিলেন কিনা মনে নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবির বিষয়ে কাছাকাছি সময়েই তিনি একবার লিখেছিলেন। সে লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন, এবং যামিনী রায়কে চিঠি দিয়ে তা জানিয়েও-ছিলেন। বলতে গেলে প্রায় আপ্লুতই হয়ে পড়েছিলেন কবি যামিনী রায়ের প্রশংসা ও সমর্থন পেয়ে। চিঠির মধ্যে সে কৃতজ্ঞতার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

পরিচয়ের আরো একটি লে[illegible] দৃষ্টি কেড়েছিল রবীন্দ্রনাথের। আমাদের বন্ধু কবি হরপ্রসাদ মিত্রের গল্পগুচ্ছের ওপর লেখাটি পড়ে তৃপ্তি বোধ করেছিলেন তিনি। চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, ঐ গল্পগুলোর বিষয়ে কারোই যখন লক্ষ্য পড়ে না, সকলে প্রায় ভুলেই যাচ্ছিল গুগুলোকে সেই সময়ে হরপ্রসাদের ঐ লেখায় নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বাঙালি পাঠকদের। শিল্পে ও বক্তব্যে গল্পগুলো যে একেবারেই নতুন, একথা দেরিতে হলেও সহৃদয় ব্যক্তিরা বুঝতে পারছেন, এতে কবি স্বস্তি বোধ করছেন। বলা বাহুল্য, তরুণ হরপ্রসাদের পক্ষে কবির এই আশীর্বাদ ছিল খুব একটি ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য।

[illegible]

হারানো বই

কলকাতায় 'কালাচাঁদ শেঠ অ্যান্ড কোং' নামে একটি ব্যবসায়ী সংস্থা ছিল। যার নামের সাইনবোর্ড শহরের কোন রাস্তায় এখন নেই। থাকবেই বা কি করে? সে হল ১৮৩৯ সালের কথা। অন্যতম শেয়ার হোল্ডার প্যারীচাঁদ মিত্র। নিমতলার প্রসিদ্ধ মিত্র পরিবারের ছেলে। বাবা রামনারায়ণ কোম্পানির কাগজের ব্যবসা করতেন। আর ছিলেন রামমোহনের বন্ধু। তার ছোট দুই ছেলে প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ ছিলেন সেকালের শিক্ষিত সমাজে সুখ্যাত। 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের জন্য প্যারীচাঁদ বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন। কিন্তু ১৮৫৫ সালে তার ব্যবসায়ী সংস্থা 'প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যান্ড সন্স' বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রচুর পয়সা করেছিলেন ব্যবসায়। এই ব্যবসায়ী মানুষটি ১৮৩৬ সালে দি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর সাব-লাইব্রেরিয়ান হন। ১৮৪৮ সালে হন লাইব্রেরিয়ান।

প্যারীচাঁদের 'এ বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ অফ ডেভিড হেয়ার ১৮৭৭ সালে ডালহৌসি স্কোয়ারের ডব্লু নিউম্যান অ্যান্ড কোম্পানি থেকে বেরিয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮+১৩৯+৩৭= =১৮৪। হেয়ার সাহেবের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন প্যারীচাঁদ। প্যারীচাঁদের জন্ম ১৮১৪ সালে। ১৮২৭ সালে হিন্দু কলেজ-এর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ডিরোজিওর কাছে পড়েছিলেন। তখন হেয়ার কলকাতার শিক্ষাজগতে বিশিষ্ট মানুষ। তার সংস্পর্শে এসে প্যারীচাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। হেয়ারের মৃত্যুর পর, তার স্মৃতি-রক্ষার জন্য যেসব কমিটি হয়েছিল, তার অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন প্যারীচাঁদ। প্যারীচাঁদ হেয়ার সাহেবের সুদীর্ঘ জীবনকথা লিখতে বেশ কিছুকাল সময় নিয়েছিলেন। নিজের জানা, দেখা ও সংগ্রহ করা বিপুল তথ্যকে সাজিয়ে একশ বছরেরও আগে তিনি লিখেছিলেন এই বই। পরবর্তীকালে এমন কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে, যার ভিত্তিতে প্যারীচাঁদের দুএকটি বক্তব্য ভ্রান্ত প্রমাণ হলেও, সমকালীন বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের প্রামাণ্য দলিল হেয়ারের এই জীবনী। ১৮৭৮এ প্যারীচাঁদ আবার হেয়ারের জীবনী বাংলায় লিখলেন। মাত্র ২৬ পাতার বই। সম্প্রতি একটি বাঙলা প্রবন্ধ সংগ্রহে পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ ছাপা হয়েছে। মূল ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ১৯৬৪ সালে ছাপা হয়েছিল। মূলগ্রন্থ অনুবাদ করেন ব্রজদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সুশীলকুমার গুপ্ত সম্পাদনা করেন। সুদীর্ঘ ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সহ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৪+২৪ মোট ৩১৮। এই বইখানিও ছাপা নেই।

ডেভিড হেয়ার কলকাতায় আসেন [illegible]

BIOGRAPHICAL SKETCH

DAVID HARE

[illegible] MITTRA

CALCUTTA

বছর। হেয়ার কলকাতা আসার ছয় বছর আগে, ১৭৯৪ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম। রামমোহন হেয়ার থেকে বয়সে তিন বছরের বড় ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৭৭২ সালে। রাজা রাধাকান্তের জন্ম ১৭৮৩ সালে। হেয়ার রামমোহন, দ্বারকানাথ, রাধাকান্ত—এই চার-জন মানুষের জন্মকালীন হিসাব আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির বিকাশ পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ।

ঘড়ির ব্যবসা করতে কলকাতায় এলেন হেয়ার। চুটিয়ে ব্যবসা চালিয়ে, ১৮২০ সালে সেই ব্যবসা ছেড়ে দিলেন সহকারীকে। এই কুড়ি বছরে হেয়ার কলকাতায় বহু জমি-জমা করেছিলেন। এরই মধ্যে বাংলায় শিক্ষা-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রবেশ ঘটেছে হেয়ারের। তাঁর পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় সুপ্রিমকোর্টের বিচার-পতি স্যার হাইড ইস্টের বাড়িতে। গরানহাটায় ৩০৪ চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে ১৮১৭ সালে ২০ জানুয়ারি কুড়ি জন ছাত্র নিয়ে খোলা হয় হিন্দু কলেজ। হেয়ারের উদ্যোগে এ বছরের ৪ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি। আর কলকাতা স্কুল সোসাইটির আবির্ভাব ১৮১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর। দেশীয় সম্পাদক ছিলেন রাধাকান্ত দেব। শ্রীরামপুর মিশনের কেরী সাহেবও যুক্ত ছিলেন এর সঙ্গে। ১৮২৩ সালে পটল-ডাঙ্গায় যে ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হল, তার সামান্য ব্যয় বহন করত কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, বাকি ব্যয় হেয়ার বহন করতেন। এবছরই তিনি কলিকাতা স্কুল সোসাইটির স্থায়ী য়ুরোপীয় সম্পাদক হন। সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের বাড়ি তৈরি করতে ১৮২৫ সালে হেয়ার জমি দিলেন কম দামে।

১৮৩৫ সালে কলকাতায় হল মেডিক্যাল কলেজ। সেখানেও হেয়ার। প্রথমে সম্পাদক, পরে কলেজ কাউন্সিলের অবৈতনিক সম্পাদক। একসময় মাসিক চারশ টাকা বেতনে কলেজের সেক্রেটারিও হয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টায় ১৮৩৮ সালে ১ এপ্রিল কলেজে কুড়িটি বেডের হাসপাতাল ও আউটডোর খোলা হয়। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা ১৮৩৮ সালের ১২ মার্চ প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞানোপার্জিকা সভা। হেয়ার হলেন তার অনারারি ভিজিটর। হিন্দু কলেজের শিশু বিভাগকে ১৮৩৯ সালে আলাদা করে নিয়ে নাম দেওয়া হয় বাংলা পাঠশালা। হেয়ার ঐ পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ১৪ জুন। সরকার ১৮৪০ সালে তাঁকে কোর্ট অফ রিকোয়েস্টের তৃতীয় কমিশনার করেছিল। হেয়ার কলকাতায় মারা যান ১৮৪২ সালের ১ জুন।

সাধারণভাবে এটা বিদেশী হেয়ার সাহেবের জীবন। অ্যাবারডিনের ঘড়ি ব্যবসায়ীর ছেলের জীবনটা কিন্তু খুব সাধারণ সরল ছিল না। স্কুল বুক ও স্কুল সোসাইটির কাজ করতে গিয়ে, এক অনন্ত দারিদ্র্যে হাবুডুবু খাওয়া সমাজকে দেখলেন। যাদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে সিমলা, আরপুলি আর পটলডাঙ্গায় পাঠশালা খুললেন। আরপুলির পাঠশালা হেয়ার নিজের খরচেই চালাতেন। যেসব বাবা-মা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে অক্ষম, সেসব ছেলে এখানে পড়তে আসত। সিমলার পাঠশালা ছিল হেয়ারের নিজস্ব। পটলডাঙ্গার পাঠশালা হেয়ার ও স্কুল সোসাইটির মিলিত খরচে চলত।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারেও তাঁর উৎসাহ কম ছিল না। শিক্ষার মাধ্যম কেবল ইংরেজি নয়, মাতৃ-ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন হেয়ার। প্রাথমিক স্তরের বই লেখার জন্য পন্ডিত নিয়োগও করেছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন পাঠশালা বা স্কুলে ঘুরে বেড়াতেন। মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কৃত করতেন। হেয়ারের আরপুলি পাঠশালা বন্ধ হয়ে যায় ১৮৩৩-৩৪ সালে। কারণ, স্কুল সোসাইটির আর্থিক সংকট। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তখন কলকাতা ও শহরতলীতে বেশ-কিছু স্কুল করেছে। হেয়ার ও সব স্কুল পরিদর্শনে যেতেন। আর পটলডাঙ্গা পাঠ-শালা চালাতে থাকেন। সরকার মাসে ৫০০ টাকা দিত। বাকি খরচ ছিল হেয়ারের। এটি ছিল অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই পাঠশালারই পরে নাম হয় হেয়ার স্কুল।

শিক্ষা জগতের এই অবিস্মরণীয় মানুষটি কিন্তু বাঙালীর সামগ্রিক জীবন ধারার সঙ্গেও জড়িয়ে ছিলেন। জোর করে বিদেশে কুলি [illegible] বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকে শুরু ক[illegible]দপত্রের স্বাধীনতা, আইন সংশোধ[illegible]ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয় বিদ্বৎসমাজ ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।

[illegible] চৌধুরী

সাহিত্যের নেপথ্যে

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

সবে প্রকাশনা ব্যবসায় নামা এক আনকোরা প্রকাশক সেদিন 'উদভ্রান্ত প্রেম' বইখানা খুঁজছিলেন। রি-প্রিন্ট করবেন। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। রয়্যালটির ব্যারিকেড সম্ভবত এড়ানো যাবে। ব্যবসার দিক থেকে এই লোভজনক আশ্বাসে উৎফুল্ল হচ্ছিলেন প্রকাশক। বছর কয়েক বইপাড়ার বীভৎস গ্রন্থাবলী হাওয়া তো এই আশ্বাসেরই ফল-ফসল।

তো যে আশ্বাসই হোক না কেন এই সংবাদে আমরা মাঝে মাঝেই কিছু কিছু অপ্রকাশিত বই আবার ছাপার হরফে হাতে পেয়েছি। গ্রন্থাবলী বা পুনর্মুদ্রণের হাওয়ায় আমাদের লাভের ঘরে কখনই শূন্য অঙ্ক জমা পড়ে নি। 'উদভ্রান্ত প্রেমে'র খবরেও তাই উৎসাহিত হয়েছি। যাই হোক প্রকাশকের প্ল্যান প্রোগ্রাম যদি ঠিক-ঠাক থাকে তবে ছাপা হরফে 'উদভ্রান্ত প্রেম' আবার নতুন করে কাছে পাব।

পড়ুয়া অবস্থাতেই চন্দ্রশেখরের প্রথম বিয়ে হয় মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের কাছাকাছি দেবীপুর গ্রামে। দেবীপুরের দেবী চন্দ্রশেখরের জীবনে বেশি দিন থাকেন নি। তাঁদের একটিমাত্র পুত্রসন্তানও দু'বছর বয়সেই মারা গিয়েছিল। এই প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরই উদভ্রান্ত চন্দ্রশেখর লালবাগ-মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে বসে তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'উদভ্রান্ত প্রেম' লেখেন। এই 'উদভ্রান্ত প্রেম'ই চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়কে আজও অমর করে রেখেছে।

তো সেই চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদভ্রান্ত প্রেম' নিয়ে প্রকাশক মশাই যখন বেশ আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন তখন একটা কথা মনে হচ্ছিল, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের তো আরও কিছু সাহিত্য কর্ম ছিল বলে জানি, সেগুলোর খবর কী?

বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল আর রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর আইন পরীক্ষা দিয়ে চন্দ্রশেখর বি-এল ডিগ্রী পেয়ে যান। আইন ব্যবসা শুরু করলেন বহরমপুর জজ আদালতে। কিন্তু উদাসীন স্বভাবের চন্দ্রশেখর ওকালতিতে মোটেই সুবিধা করতে পারলেন না। বহরমপুর ছেড়ে চন্দ্রশেখর তখন চললেন কলকাতা হাইকোর্টে। সেখানেও সুবিধা হল না। আর্থিক অনটন সামাল দিতে চন্দ্রশেখর তখন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এস্টেটে ম্যানেজারের চাকরি নিলেন। চন্দ্রশেখরের আর্থিক দুরবস্থার কথা লোকমুখে পৌঁছে গেল কাশিমবাজার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কানে। মহারাজা তৎপর হলেন। চন্দ্রশেখরের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন বহরমপুরে।
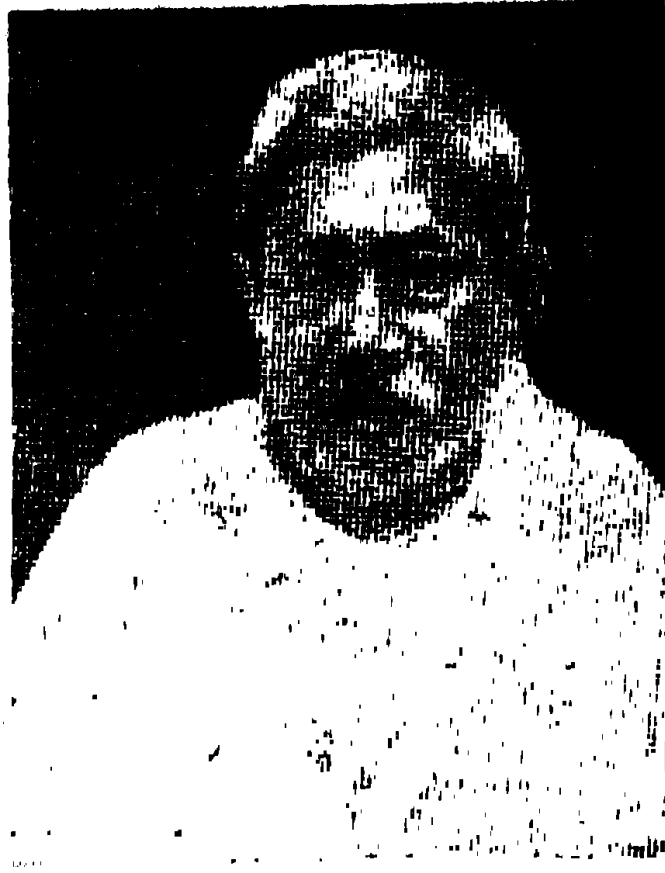
ঐ সময় মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর ব্যবস্থাপনায় 'উপাসনা' পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। সম্পাদনার দায়িত্ব নেন চন্দ্রশেখর। আইন ব্যবসা, এস্টেটের ম্যানেজারী ছেড়ে চন্দ্রশেখর তখন পুরোপুরি মহারাজ-আশ্রিত। মাসিক বৃত্তি পঞ্চাশ টাকা। 'উপাসনার' সম্পাদনায় বড় বেশি ব্যস্ত থাকায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের কলমে প্রত্যাশা অনুযায়ী লেখা 'উপাসনায়' দেখা যায় নি। তবে 'উপাসনা'র সমালোচনা অংশটিতে চন্দ্রশেখর নিজেই কলম ধরতেন। সমালোচনায় চন্দ্রশেখরের কলম তখন রীতিমত নাম করেছিল। 'মাসিক সমালোচক' নামে একটি কাগজও সে সময় বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের পাকা হাতের সম্পাদনায় সমালোচনার ঐ মাসিকটিও পাণ্ডিত্য মানুষের নজর টেনেছিল। প্রায় শেষ জীবনে 'বিবাহের উৎপত্তি ও ইতিহাস' নামে যে গবেষণামূলক প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন তার অনেকখানিই 'উপাসনায়' বেরিয়েছিল। প্রবন্ধটি অবশ্য চন্দ্রশেখর শেষ করে যেতে পারেন নি। পণ্ডিতমহল এ প্রবন্ধটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেকে বলেছেন প্রবন্ধটি পুরো লেখা হলে, বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ হতে পারত।

পড়ুয়া বয়সেই চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যে বইখানা লিখেছিলেন তার নাম 'মসলা বাঁধা কাগজ' সে বইখানার কোন হদিশই এখন পাওয়া যায় না। অথচ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও 'মসলা বাঁধা কাগজ'-এর রীতিমত প্রশংসা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অবিশ্যি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত চন্দ্রশেখরের 'সতীদাহ' প্রবন্ধটিরও অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'লেখকের লিপিচাতুর্যে মুগ্ধ হইয়াছি'।

নরনারীর প্রকৃতি, অধিকার ভেদ আর স্বাতন্ত্র্যবাদ নিয়ে চন্দ্রশেখর তাঁর দ্বিতীয় বইখানায় আলোচনা করেছিলেন। বইখানার নাম ছিল 'কুঞ্জলতার মনের কথা'। এখন আর সে বইখানারও হদিশ মেলে না। এরপরই সম্ভবত প্রকাশিত হয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সেই সাড়া জাগানো বই 'উদভ্রান্ত প্রেম'। যে উদভ্রান্ত প্রেমের জন্যে সাহিত্য সমাজে তাঁর এত নামডাক।

প্রকাশক মহাশয়ের 'উদভ্রান্ত প্রেম' নিয়ে খোঁজখবরে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের কথা আবার নতুন করে মনে এল। চন্দ্রশেখর তো শুধু 'উদভ্রান্ত প্রেম'ই নন, তাঁর সাহিত্যের ফল-ফসল তো আরও কিছু রয়েছে। 'স্ত্রী চরিত্র' এবং 'সারস্বত কুঞ্জ' নামে যে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলিও আজ প্রায় নির্বাসনে।

লেখকের শ্রেষ্ঠ বইখানি আবার নতুন করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ায় একটা অন্য ধরনের স্যাটিসফ্যাকশন অবশ্যই আছে। আর তারই ফাঁকে সন্তোষজনক ব্যবসায়িক আশ্বাসও। অথচ সেই লেখকেরই যে রচনাগুলি আজ প্রায় অন্ধকারে, আলোয় এলে রি-ভ্যালুড হবার সুযোগ থাকত আধুনিক পাঠকের বিচারে সেদিকেও একটু মনোযোগী হলে ভাল হত না কি? প্রকাশনা নিছক একটা ব্যবসা একথা তাঁরাও স্বীকার করেন [illegible]ও করি না। ব্যাপক অর্থে ব্যবসা [illegible] বলতে যা বোঝায় পুস্তক প্রকাশন [illegible] সে খাতায় নাম লেখাতে পারে না। আর পারে না বলেই আমাদেরও প্রত্যাশা থেকে যায়। উদভ্রান্ত প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাই চন্দ্রশেখরে আগ্রহী নবীন প্রকাশকটিকে আরও কিছু [illegible] বলি। 'মসলা বাঁধা কাগজ'খানা একবার খুঁজে দেখতে বলি। পাওয়া গেলে আমাদের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া সম[illegible] কিনা একবার ভেবে দেখতে বলি। এমনি 'কুঞ্জলতার মনের কথা', 'স্ত্রী চরিত্র', 'সারস্বত-কুঞ্জ' সবগুলোই একবার খোঁজাখুঁজি হক না।

এমনি শুধু চন্দ্রশেখরই নন অনেকেরই 'কুঞ্জলতার মনের কথা' আজ অব্যক্ত। প্রকাশকরা শ্রেষ্ঠ বইগুলি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার আনন্দের সঙ্গে আরও অনেক বাড়তি আনন্দ পাবেন যদি সেই লেখকেরই হারিয়ে যাওয়া বইগুলি ফিরিয়ে এনে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারেন। সেই হারানো ঝাঁপির সংগ্রহগুলো আধুনিক পাঠকের কাছে সিঁদুরমাখানো মোহরও তো হতে পারে?

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ

রামানুজ রায়

ভেষজ শিল্পের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, রামানুজ রায়কে তাঁরা বিলক্ষণ চেনেন। দুর্দান্ত স্মার্ট, বলিষ্ঠ এবং শার্প চেহারার এই ভদ্রলোক দে'জ মেডিক্যালের মার্কেটিং ম্যানেজার। স্বপ্ন ছিল, ওষুধের ব্যবসা করবেন। অর্থাভাব তাই হয়নি। তখন স্থির করলেন, এই শিল্পের ওয়ান অফ দ্য লিডার হবেন। নির্দ্বিধায় বলা যায়—হয়েছেন। খাটতে পারেন। না হলে একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ থেকে আজ যেখানে উঠেছেন—সেটা সম্ভব হত না। এম-এসসি এবং ল' পড়তে পড়তে একটি বিদেশী কোম্পানীতে ঢুকেছিলেন ছাপ্পান্ন সালে। সাতান্ন সাল থেকে পরপর তিন বছর ভারতের শ্রেষ্ঠ মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের দুর্লভ সম্মান। ষাট সালে হসপিটাল রিপ্রেজেন্টেশনের দায়িত্ব, একষট্টিতে সেল এক্সিকিউটিভ। পরের বছরই ঐ বিদেশী কোম্পানী ছেড়ে অনেক কম মাইনেতে যোগ দিলেন দে'জ মেডিক্যালে—সেলস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে। কারণ এটা বাঙালী প্রতিষ্ঠান। ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিতে পাইওনীয়ার হলেও, ঐ সময়ে ধুঁকতে বসেছিল। বলাবাহুল্য, পুনর্জীবনে রামানুজ রায়ের অবদান অনেকখানি।

যতদিন যাচ্ছে, মানুষের সমস্যা বাড়ছে, মানুষ আরো সচেতন হচ্ছে—আবিষ্কৃত হচ্ছে মার্কেটিং-এর সব নতুন নতুন পদ্ধতি। রামানুজবাবু যা-কিছু শিখেছেন, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়, কাজ করতে গিয়ে ঠেকে শেখা। এতে ভীষণ সময় যায়। তাই ভারতের মত গরীব দেশেও, ম্যানেজমেন্ট স্কুলের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে দেবার জন্যে ঐসব স্কুলে মাঝেমাঝে পড়াতে যান—বিনা স্বার্থে। কথা শুনিয়ে যেমন, তেমনই ব্যাডমিন্টন খেলা দেখিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। শিশুদের জন্যেও ভাবেন, তাই নিজেকে নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রেখেছেন।

সতীশচন্দ্র নস্কর

এমারজেন্সীর সময়ও ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে, খবরগুলো প্রকাশ করা হয়নি—বললেন শিয়ালদা স্টেশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সতীশচন্দ্র নস্কর। রেলওয়েতে আছেন তেইশ বছর। ট্রান্সপোর্টেশন এ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে ঢুকেছিলেন। তারপর ইয়ার্ড-মাস্টার, কেবিন মাস্টার, সেকশান কন্ট্রোলার, স্টেশনমাস্টার হয়ে এখন, ব্যস্ততা ও লোক-চলাচলের সংখ্যাগত দিক থেকে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এই স্টেশনের সুপারিনটেন্ডেন্ট। মাত্র কয়েক মাস হল দায়িত্ব হাতে এসেছে। এরই মধ্যে কয়েকদিন আগেকার সেই ধুন্ধুমার কাণ্ড, ভয়, ছুটোছুটি, লুঠ, গুলি—মৃত্যু। প্রসঙ্গক্রমে বললেন, সব সময়েই সব জায়গায় কিছু না কিছু মিসক্রিয়্যান্ট সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। না হলে দেখুন না, হকারদের সব মালপত্তর লুঠ হল। তাছাড়া যাত্রীদেরও তো ধৈর্য বলে একটা বস্তু আছে! এরপর সতীশবাবু অনিয়মিত ট্রেন চলাচলের কারণগুলি একের পর এক বললেন—মেইনটেনেন্সের প্রয়োজনীয় জিনিস নেই, হরদম ওভারহেড-এ নোটেশন (লোডশেডিং), ই এম ইউ গাড়ী এইট হর্স পাওয়ারে চলে, কিন্তু কার্যত সবগুলো সক্রিয় নয়—তাই গাড়ী লেট, মাত্র নটা প্লাটফরম—একটা গাড়ী খারাপ হলেই চেইন রিয়্যাকশন শুরু হয়ে যায়, এসব ছাড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের গাফিলতি একটা বড় কারণ। কিন্তু এমারজেন্সীতে? তখন চাকরির ভয় ছিল, আন্ডার রুলপালশন কাজ করতে হত, এখন সবার মধ্যেই ঢিলেমি এসে গেছে। তার ওপরওয়ালা এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন। নতুন দুটো প্ল্যাটফরম হচ্ছে, বগি জুড়ে যাত্রী-সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। নর্থ, মেইন, সাউথ-সব মিলিয়ে রোজ ৪৭২টি ট্রেন এবং আট লক্ষেরও বেশী মানুষ যাতায়াত করেন। এসব কিছুর দায়িত্বই চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক সতীশবাবুর ওপর। তাই বামনঘাটা গ্রামের বাড়ি ছেড়ে সব সময় স্টেশনেই থাকতে হয়। এখানেই কোয়ার্টার।

পরিমল মজুমদার

ইনরেকোর মার্কেটিং ম্যানেজার পরিমল মজুমদারের সঙ্গে কথা বললেই, সত্যজিৎ রায়ের সাম্প্রতিক রহস্য উপন্যাসের মহেশ চৌধুরীর কথা মনে আসে। মহেশবাবু কথার খেলা তৈরী করতে ভালবাসেন। দিদিকে ডাকেন জোড়া মৌমাছি বলে, কৈলাশকে বলেন হোয়্যার ইজ দা ডেডবডি। প্রায় কথায়ই হিউমার করার আশ্চর্য ক্ষমতা পরিমলবাবুর। কর্মজীবন শুরু সাধারণ এক রেডিও সেলসম্যান হিসেবে। শিক্ষাগত যোগ্যতাও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। 'না মশাই ব্যাকিংও ছিল না, যা কিছু হয়েছি বাই ডিন্ট অফ সিনসিয়ার লেবার।' কাজ-পাগল মানুষ। কাজ থাকলে ভীষণ খুশী, না থাকলে ছটফট করেন। যেমন এখন। ভীষণ চাহিদা। কোম্পানী দু-দুটো নতুন প্রেসরেকর্ড করতে চলেছে—অথচ লোডশেডিং-এ কাজ কমতে কমতে ওয়ানফোর্থ। নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম—সম্পূর্ণ ভারতীয় টাকায়, লেবার, এবং ম্যানেজমেন্টে পরিচালিত বছর দুই বয়সী এই কোম্পানীটিকে এগিয়ে যেতে ইনি অনেকটা সাহায্য করেছেন। রেকর্ড কোম্পানীতে কাজ করেন, কিন্তু রেকর্ডের গান শুনতে তেমন আগ্রহী নন। গানের জলসায়ও বড় একটা যান না।' বরং ফাঁকা মাঠে কোনো গ্রাম্যমানুষের গলায় ফোকসং—সুপার্ব।' অবসরে নৌকায় চাপেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সৌখিন বাবুদের মত ভাউলে পানসি চেপে বাবুগিরিতে গা ভাসানো নয়—'পূর্ব বাংলার মানুষ। এখান থেকে ওখানে যেতেই নৌকা চাপতে হত। ওসব দিনের কথা ভুলতে পারি না।' এক্সিকিউটিভ র‍্যাঙ্কে কাজ করেন, অথচ বাড়ির রূপটাই অফিসে অক্ষুণ্ণ। এ নিয়ে কথাও ওঠে। 'কিন্তু কি করব, সকালে দোকান করে সন্ধ্যায় সিরাজের জামা পড়তে পারি না।' আজকের শিল্পী, রেকর্ডের বাজার ইত্যাদি নিয়ে এক প্রস্থ কথা সেরে ওঠার মুখেই, একজন কর্মচারি এসে বলল, 'স্যার মাড্রাস পেন হাউস থেকে এই কলমটা কিনলাম।' পরিমলবাবু সিরিয়াস ভঙ্গীতে কলমটি নাড়াচাড়া করে বললেন, 'মাদ্রাজী দোকানের কলমে বাংলা লেখা যাবে তো?'

জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস স্মরণে

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

বেদব্যাস বৈদ্য

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে এদেশের মানুষের পরিচয় সুদীর্ঘ দিনের। এই সেদিনও ভারতবর্ষ ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদানত। দেশের মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর আন্দোলন করে ভারতবর্ষের মানুষকে কম অত্যাচার, উৎপীড়ন আর নিপীড়ন সহ্য করতে হয়নি। এ যুগের তরুণ অথবা যুবকদের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন একটা নতুন সংগ্রামের ডাক বলে মনে হলেও, চল্লিশোর্ধ মানুষের কাছে তা নতুন নয়। কেননা, তাদের স্মৃতিপটে নিশ্চয়ই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রতার চিত্র এখনও সুস্পষ্ট। রাসবিহারী বসু অথবা সুভাষচন্দ্রের আপোসহীন সংগ্রামের ইতিহাস মূলত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনেরই ইতিহাস। সম্প্রতি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক নতুন আন্দোলন দানা বাঁধছে। বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্নভাবে এধরনের স্লোগান এতদিন শোনা গেছে; কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত হয়েছে বলে মনে হয় না।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জালিয়ানওয়ালাবাগে হিংস্র আক্রমণের কলঙ্কচিহ্ন এখনও জ্বলজ্বল করছে। পাঞ্জাবের ঐ ঐতিহাসিক অঞ্চলে প্রায় ষাট বছর আগে বৃটিশসেনা কুখ্যাত ডায়ার সাহেবের অগণতান্ত্রিক হুমকির তোয়াক্কা না করে হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষ ঐ বাগে সমবেত হয়েছিল। উদ্ধত উত্তেজিত ডায়ার সাহেব তাতে রুষ্ট হলেন। হয়তো বুঝলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঐ জমায়েত একটা প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। সাম্রাজ্যবাদের দম্ভপ্রতীক ডায়ার সাহেবের মাথায় খুন চাপল। তার নীল চোখ ক্রোধে লাল হল। তারপর নিরস্ত্র নিরীহ শান্তিপূর্ণ স্বাধীনতাকামী মানুষগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সশস্ত্র সেনাবাহিনী নিয়ে। তার নির্দেশে জালিনওয়ালাবাগের অবরুদ্ধ চত্বরে নির্বিচারে চলল রাইফেল-মেশিনগানের গুলী। কয়েক মিনিট-এর মধ্যে পনেরশ ষাট রাউন্ড গুলী মুক্তিকামী কয়েকশ' মানুষের জীবন ছিনিয়ে নিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই দম্ভ আর হিংস্রতায় সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঢেউ উঠল। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তামাম ভারতের প্রতিটি মানুষ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মানসিকতার ভিতর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীশক্তির আসল রূপ দেখতে পেয়ে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ান।

সাম্রাজ্যবাদের কাপুরুযোচিত আক্রমণ এবং মুক্তিকামী মানুষের বীরোচিত মৃত্যুর স্মৃতি নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ এখন এক ইতিহাস। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক তীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ অতএব তারপর থেকেই ভারতবাসীর কাছে এক জীবন্ত প্রেরণা। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের বৃটিশশক্তি কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করল। তার মাত্র দু' মাসের মাথায় বেদনাহত ক্ষুব্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট খেতাব' বর্জন করে বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে লিখলেন : হতভাগ্য জনগণকে নৃশংসভাবে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, প্রাচীন ও আধুনিক কোন সভ্য শাসন ব্যবস্থায় তার কোন তুলনা নেই। সরকারী সম্মানের প্রতীক (নাইট খেতাব) আজ জাতীয় অসম্মানের মধ্যে আমাদের লজ্জাকেই প্রকট করে তুলছে। তথাকথিত নগণ্যতার অপরাধে আমার যে দেশবাসীকে অসহ্য অপমান সহ্য করতে হচ্ছে, সমস্ত বিশেষ সম্মান বর্জিত হয়ে তাদেরই পাশে আমি দাঁড়াতে চাই...

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ক্রমে দানা বাঁধল। পরের বছর ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল। সারা দেশের প্রতিনিধিরা এসে জড়ো হলেন। সকলের চোখে-মুখে ক্ষোভ আর প্রতিবাদের আগুন। গান্ধীজী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, শুধুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেই আন্দোলন শেষ হবে না। তার জন্য চাই দীর্ঘস্থায়ী সক্রিয় সংগ্রাম। তিনি প্রস্তাব করলেন, বিদেশী পণ্য বর্জন করো, বিদেশী শাসকদের সঙ্গে চাই সর্বতোভাবে অসহযোগ।...

বলা বাহুল্য, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাস্রোত ক্রমে বিভিন্ন খাতে বইতে লাগল। আর দেশব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনও ধাপে ধাপে এগিয়ে চলল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের দিবসকে স্মরণ করতে এ-বছর দুর্গাপুরের লাল ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়েছিল। সমাবেশে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের মানুষের পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণী এবং সাঁওতাল উপজাতি শ্রেণীর মানুষের ভীড় অনেকেরই চোখে পড়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে পাঞ্জাবের আকালী দলনেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসুরজিৎ সিং বারনালার উপস্থিতিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। পাঞ্জাবের ভগৎ সিং আর বাংলার ক্ষুদিরামের মৃত্যু-জয়ের ভিতর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির উত্থানের কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পাশে বসেছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের প্রবীণ মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল। তিনি এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটির অন্যতম হোতা। তাঁদের সঙ্গে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন নকশাল নেতা ও বিধায়ক শ্রীসন্তোষ রাণা, আক পাংচারখ্যাত ডাঃ বিজয় বসু, আর এস পি নেতা ও বিধানসভা সদস্য শ্রীনিখিল দাস প্রমুখ। নকশাল নেতা শ্রীঅসীম চ্যাটার্জি সহ আরও বহু নবীন-প্রবীণ বিপ্লবী এই আন্দোলনের সামিল হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই সমাবেশ রাজনৈতিক মহলের দৃষ্টি এড়ায়নি।

নতুন পর্যায়ে এই জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস পালন করা হচ্ছে ১৯৭৫ সাল থেকে। শ্রীদেবরঞ্জন সেন এর একজন নীরব সংগঠক। জরুরী অবস্থার দিনেও তাঁরা এই দিবসের স্মরণে সভা সমাবেশ [illegible]ছেন। এঁদের উদ্দেশ্য, একটি রাজনৈতিক পোস্টারেই ব্যক্ত বলা চলে। তাতে বলা হয়েছে : সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক সাহায্যের শৃঙ্খল চূর্ণ করে ভারতীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত করো।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পুরানো আন্দোলনের নতুন ধারা সম্পর্কে শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডলের বক্তব্য, দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মুক্তি আসেনি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের কৌশল বদল করেছে মাত্র। রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে তারা অর্থনৈতিক অধীনতার বন্ধনে উন্নতিশীল দেশগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার চেষ্টা করছেন। অতএব সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরায়নি, বরং বেড়েছে।

২৪-৪-৭৯

মহাকরণের হেপাটাইটিস্

শ্যাম মল্লিক

সেদিন মহাকরণে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। এর সঙ্গে চারিদিকে একটা আতঙ্ক। কি ব্যাপার? না মহাকরণে পানীয় জল খেয়ে এক মহিলা কর্মীর মৃত্যু ঘটেছে এবং কয়েকজন অফিসারসহ ২৫ জন অসুস্থ। তার মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। রোগটির নাম হেপাটাইটিস। যে মহিলার মৃত্যু হয়েছে নাম তার কৃষ্ণা হাইত, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের একজন কর্মচারী। তারিখটা ১৬ এপ্রিল, দিনটা বুধবার। ঐ দিনই মহাকরণ-এর দুগ্ধ দপ্তরের রেকর্ড রুমে এক অগ্নিকাণ্ডে অনেক ফাইলপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কৃষ্ণা হাইতের মৃত্যুর সংবাদও ঐ দিনই মহাকরণে আসে। পরে এটা ছড়িয়ে পড়ে বৃহস্পতিবার দিন অর্থাৎ ১৭ এপ্রিল সকাল ১০টায় কর্মচারীরা অফিসে এসে দেখেন সব কলের মুখে বোর্ড লাগানো : তাতে এক সাবধানবাণী জল খাবেন না। আমলারা, মন্ত্রীরা হতবাক। উদ্বিগ্ন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী উদ্বেগজনক ঐ বার্তাটি নিয়ে হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে। শ্রীবসু অবিলম্বে জলের ট্যাঙ্কে ব্লিচিং পাউডার এবং ক্লোরিন দেবার নির্দেশ দিলেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জলের নমুনা পরীক্ষা করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হল।

মহাকরণে একশ্রেণীর অফিসার আছেন যাঁরা বাড়ি থেকে লাঞ্চটা নিয়ে আসেন। তার সঙ্গে বোতলে করে পানীয় জলটাও আনেন। ওঁরা মহাকরণের জলটল টাচ করেন না। মন্ত্রীরা প্রায় সকলেই সাদাসিধে। ওদের ওসব বালাই নেই। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের 'খানা' আসতো বাড়ি থেকে। ফ্রিজের পানীয় জল ঐ বেলতলা থেকেই। জ্যোতিবাবুর ওসব কোন ব্যাপারই নেই। যাই হোক প্রচণ্ড তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটলেও কোন কর্মচারী ঐদিন মহাকরণের পানীয় জল স্পর্শ করলেন না। মায় চা পর্যন্ত খেলেন না। শুক্রবার অর্থাৎ ২০ এপ্রিল পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী মহাকরণে এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বললেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছ থেকে তিনি যে রিপোর্ট পেয়েছেন তাতে বলা হয়েছে মোট ছটা বড় ট্যাঙ্কের মধ্যে পাঁচটার জল 'একসেলেন্ট', একটার জল 'স্যাটিসফ্যাক্টরি'।

তিনি বললেন, জলের ট্যাঙ্কে মরা বেড়াল পাওয়া গেছে বলে যে খবর বেরিয়েছে তা অসত্য। এই রিপোর্টের সঙ্গে একটা 'অবজারভেশন' ছিল সেটা অবশ্য যতীনবাবু সাংবাদিকদের কাছে চেপে যান।

ঐ অবজারভেশনে বলা হয়েছে 'হেপাটাইটিসের প্রথম কেস ধরা পড়ে ৩ এপ্রিল। অর্থাৎ তার দু-তিন সপ্তাহ আগে 'ব্যাকটিরিয়া ফর্ম' করেছিল, সুতরাং ঐ সময় জল দূষিত হয়ে থাকতে পারে। অথচ যতীনবাবু বলছেন মহাকরণের জল থেকে কিছু হয়নি। বাইরের জল খেয়ে ঐ অসুখ হয়েছে। উল্লেখ্য, যারা ঐ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই একই দপ্তরের কর্মী। বাইরে তারা নিশ্চয়ই একই অঞ্চলে বা পাড়ায় বাস করেন না। সুতরাং বাইরের জল খেয়ে হয়েছে এই যুক্তি ধোপে টেকে না। মার্চ মাসের জলতো আর ট্যাঙ্কে নেই।

যতীনবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন মহাকরণে অনেক বেড়াল বাস করে। কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা মুখ্যসচিব অমিয়কুমার সেনের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, জলের ট্যাঙ্কে মরা বেড়াল পড়েছিল। এখন ওটা ধামা চাপা দেবার চেষ্টা চলছে। কয়েক দিন আগে যতীনবাবু কেয়ারটেকারকে ডেকে বলেছেন, মশাই বেড়াল-টেড়াল হাটান। কেয়ারটেকার মহাশয় একজন কর্মীকে বেড়াল-সুমারী নিতে বলেছেন। কয়েকজন কর্মী অবশ্য বলেছেন, মহাকরণের অনেক জায়গায় বড় বড় ইঁদুর আছে তাদের নিধনের জন্য কিছু বেড়াল থাকা দরকার।

যাইহোক জলের ট্যাঙ্কে মরা বেড়ালের ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে যতীনবাবু একটা তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। সেটা বেড়ালের চেয়ে আরো চাঞ্চল্যকর। তথ্যটা হল রাজ্য প্রশাসনের সদর দপ্তর ঐ মহাকরণে বাইরের প্রায় এক হাজার লোক রোজ রাত্রি কাটায়। এদের মধ্যে রিকসাওয়ালা, ফলওয়ালা এবং ফুচকাওয়ালাও আছে। ফুটপাথের দু-একজন গণৎকারও ওখানে থাকেন। তাদের খাঁচা এবং পাখিও থাকে। যতীনবাবু নিজেই বলেছেন, যারা অবৈধভাবে মহাকরণে রাত কাটায় তাদের কিছু কিছু দক্ষিণাও দিতে হয়। দারোয়ান, পাম্পম্যান এবং কেয়ারটেকারের লোকজন তো থাকার কথা। এই কাণ্ড অনেকদিন থেকে চলে আসছে। দু বছর আগে এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশ পূর্ত দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন ঠিক হয়েছিল মহাকরণে যাদের রাতে থাকতে হয় তাদেরকে বিশেষ পাশ দেওয়া হবে। চেকিং-এর জন্য অতিরিক্ত স্টাফও মঞ্জুর করা হয়।

কিন্তু অদ্যাবধি কোন পাশ ইস্যু করা হয়নি। মহাকরণে বাইরের লোকের রাত্রি কাটানোর ব্যাপারে যতীনবাবু মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে একটা রিপোর্টও পেশ করেছেন। এই রিপোর্ট পাবার পরই মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিশেষ পাশ ইস্যু করার নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যাপক চেকিং-এর জন্য পুলিশকেও কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাইরের লোক ধরতে গিয়ে আর এক দৃশ্য দেখে যতীনবাবুর চোখ তো ছানাবড়া। মহাকরণ যেন এক 'সুপার মার্কেট'। ওখানে সুটিং-সার্টিং থেকে সব কিছু কিনতে পাওয়া যায়। ছোটখাট চায়ের দোকানের সংখ্যা প্রায় পাঁচ-ছশো। কি খেতে চান বলুন সব পাবেন : মোগলাই পরটা বিরিয়ানি, মুরগীর ঠ্যাং, কালিয়া-কোপ্তা সবই মহাকরণের বিভিন্ন অলিন্দে পাওয়া যায়। চপ কাটলেট তো আছেই। আর মিষ্টি কত যে তার পদ তা বলা যাবে না। সন্দেশ, রসগোল্লা, দই, পায়েস, পানতুয়া থেকে শুরু করে ক্ষীরের চপ, মালপোয়া এবং নারকেল নাড়ু পর্যন্ত—পাওয়া যায়। হাত বাড়ালেই পান বিড়ি সিগারেটের দোকান। প্রশ্ন উঠেছে এরা কারা। উত্তর পাওয়া গেছে—সবই বাইরের লোক। কিন্তু গেটে গেটে এত পুলিশ থাকা সত্ত্বেও ওরা ঢোকে কি করে? এ প্রশ্নের উত্তর মেলে নি। এমনও জানা গেল কোন কোন অফিসারের আরদালিও পান বিড়ি সিগারেট ও কলা বেচে টু পাইস কামাচ্ছে।

১৯৬৯ সালে একবার ঐসব দোকান-গুলো ভেঙেগ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পরে আবার সব গজিয়ে ওঠে। ঐসব দোকান যারা করেছে তারা সবই গরীব লোক, কিন্তু প্রশ্নটা হল অন্য। মহাকরণটা কি আর পাঁচ সাতটা সাধারণ অফিসের মত। খবর নিয়ে জানলাম একশ্রেণীর দারোয়ান ঐ দোকান-দারদের কাছ থেকে 'টোল'ও আদায় করে। প্রোটেকটেড প্লেসে এই ধরনের কারবার একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবে এটাও ঠিক মহাকরণের প্রায় সাত হাজার কর্মচারীর জন্য প্রয়োজনীয় রেস্তোরাও নেই। যে দু-একটা ক্যান্টিন আছে সেখানে চারটে না বাজতে বাজতে 'মাল শেষ'। ঐসব দোকান ভাঙবার আগে পূর্ত দপ্তরকে সমস্ত প্রশ্নটা ভাবতে হবে।

রবি অনুরাগের স্বীকৃতি

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

অমিতাভ চৌধুরী বা অ চৌ এখন আমার খুব কাছের মানুষ। প্রায় প্রতিদিনই ওঁর সঙ্গে আজকাল আমার দেখা হয়, গুল-গপ্প আড্ডা যেমন হয়, তেমনি হয় সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়েও কচকচি। একই সংবাদপত্রে একই সঙ্গে চাকরি করি বলে ওঁকে আজকাল আমার খুব কাছ থেকে নানানভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে। পাঁচ সাত বছর আগেও ঠিক এমনটি ছিল না। তখনও আমি অমিতাভ চৌধুরীকেই জানতাম, কিন্তু অ চৌকে জানতাম না। আর তখনকার সেই অমিতাভ চৌধুরী ছিলেন রবরবা' ছড়া লিখিয়ে, আর সেই অমিতাভ চৌধুরীর হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রজগৎ নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থও তখন বেরিয়ে গেছে। উনি অবশ্য এখনো ছড়ার জগতে সম্রাট হয়েই আছেন, রবীন্দ্র পরিমণ্ডলকে সাধারণ মানুষের কাছে আরো অনেকগুলি গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে পৌঁছেও দিয়েছেন। আজ উনি স্বকীয় সাহিত্যকীর্তির মূল্য হিসেবেই যুগান্তর পত্রিকা আয়োজিত শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। সংবাদটা জানতে পেরে আরো অনেকের মতো আমিও খুব খুশি হয়েছি। আমার ভাল লাগার কারণ, প্রদত্ত পুরস্কারের বিচারক হিসেবে যদি আমাকেই বসিয়ে দেওয়া হত তাহলে ঐ নামটাই প্রথমে আমার মনে আসত।

কিন্তু অ চৌ নামে যে লোকটার সঙ্গে এর আগে আমার পরিচয় ছিল না, সেই লোকটার কথা কিছু বলা দরকার। লোকটা আসলে ভারি মজার। সংবাদপত্রের জগতে ওঁর জুড়ি মেলা ভার। যেমন তীক্ষ্ণ রসবোধ আর বুদ্ধি, তেমনি জগৎ জ্ঞান আর ধারালো উপস্থিত আচরণ। আমরা জানি, রোজই দেখছি একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কেমন দ্রুত ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার জনপ্রিয়তাকে। কেমন করে সর্বজনপ্রিয় করে তুলছেন।

তবু একথা ঠিক, যদি মনে করি, সংবাদপত্রই ওর ধ্যান জ্ঞান তাহলেও বড় ঠকে যেতে হয়। কলকাতার ফুটবল মাঠ থেকে শুরু করে উর্দু কবির মুশায়রা কিংবা হিঞ্চে শাক খাওয়ার উপকারিতা কিংবা টুসু কি ভাদু কোন একটাতেও ওঁর সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। সব বিষয়েই একজন কারো এমন আগ্রহ বড় একটা দেখা যায় না। তাই আজকাল ভারি মজা লাগে লোকটার সঙ্গে মিশে। আরো অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি সাহিত্য সম্পর্কে ওঁর কী প্রচণ্ড আকর্ষণ। হালের লিটল ম্যাগাজিনটির প্রতিও থাকে ওঁর শ্যেন দৃষ্টি। কি কি লিখছেন, কেমন লিখছেন নষ্ট করে উনি বলে যেতে পারেন। আর রবীন্দ্রনাথ কিংবা শান্তি নিকেতন নিয়ে তো কথাই নেই। ছিলেন শান্তি নিকেতনের ছাত্র, রবীন্দ্র অনুরাগ থাকাই স্বাভাবিক।

অমিতাভ চৌধুরী

কিন্তু আদৌ গোঁড়া নন। দৃষ্টিভঙ্গি খুব পরিষ্কার, জিরাফেও আছেন, জেব্রাতেও আছেন।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সংযোজন

আমাদেরই জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও জহরলাল স্বর্গত হয়েছেন। এঁদের কর্মজীবনই আমাদের দেশের ইতিহাস। এত মানুষের মাথার মণির কথা বলতে বা লিখতে গিয়ে আমরা তাই রূপকথার বিশ্বাস আরোপ করে বসে থাকি।

তাই এঁদের মণীষী, ঋষি, মহর্ষি করে বসে থাকি। এঁরাও যে মানুষ ছিলেন সে কথা ভুলে যাই। আমাদেরই চোখের সামনে রসিক মন নিয়ে মহামানুষের মানুষ রূপটি তুলে ধরতে রতী হন অমিতাভ চৌধুরী। বিষয় : রবীন্দ্রনাথ।

অস্তাচলের সময় সূর্য সবচেয়ে রূপময়। সুদূর চা-বাগান থেকে এক বালক শান্তিনিকেতনে পড়তে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরেই। তখনও বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সাহায্যপুষ্ট নয়। জগদ্বিখ্যাত মানুষজন খড়ের ঘরে থাকেন। বেতন একশো টাকার নিচে।

তখনকার ছাত্র, শিক্ষক, মানুষজন ঘরবাড়ি ও বইপত্রের সঙ্গে ছাত্র অমিতাভ একেবারে মিশে যান। তাই পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বের মানুষ রূপটি তুলে ধরার জন্য তিনি লিখতে পারেন—'রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা', 'রবি অনুরাগিণী', 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের অসুখ-বিসুখ' এবং 'কবি' ও 'সন্ন্যাসী'।

রবীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছেন প্রায় চল্লিশ বছর হল। তিনি কতখানি মানুষ ছিলেন, দোষে গুণে ভালবাসা, ঈর্ষায়, তার শল্যচিকিৎসাকে ধারালো কলমে তিনি বারবার ভাগ করে দেখিয়েছেন।

জীবিকায় একটি দৈনিকের সমাচার সম্পাদক, বয়সে পঞ্চাশ উত্তীর্ণ সদা-যুবক। সর্বদাই একটি জাগ্রত মনের অধিকারী শ্রীচৌধুরী এবার তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি-স্বরূপ আর একজন সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের নাম জড়িত শিশিরকুমার পুরস্কার পেয়েছেন।

সুমথনাথ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুমথনাথ যে কোন দিন সাহিত্যিক হবেন, প্রথম বয়সে তা তিনি বোধ হয় একবারও ভাবেন নি। কিন্তু দুই বন্ধু মিলে যখন 'বিজয়' নামে সাপ্তাহিক পত্র বার করেন —সাহিত্য-কাম-শিল্পকলা বিষয়ক — তখন একদিন ছাপাখানার তাগিদে একটি অসম্পূর্ণ গল্প সম্পূর্ণ করতে হয় এবং সেটি উৎরেও যায়। এই গল্পের লেখকের নাম দেওয়া হয়েছিল সংযুক্ত দেব দুজনের মিলিত রচনা বলেই সংযুক্ত।

এরপর ঘটনাচক্রে সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে পড়েন। কবি শেখর কালিদাস রায়ের বাড়িতে প্রতি রবিবার যে সাহিত্যিক আড্ডা বসত 'রসচক্র' নামে, যাতে একদা শরৎচন্দ্র প্রমুখ সব শ্রেষ্ঠ লেখকই আসতেন—সুমথনাথ সে আড্ডার নিয়মিত আড্ডাধারী হয়ে ওঠেন। 'বিজয়ে'র জন্য বহু সাহিত্যিকদের বাড়িতে যেতে হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হবে এও স্বাভাবিক। কিছু কিছু বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে এই পত্রিকার মারফৎই।

এরপর, কতকটা সাহিত্যের সঙ্গে নিয়ত যুক্ত থাকতে পারবেন এই আশা ও আগ্রহেই দুই বন্ধু মিলে পুস্তক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তবু তখনও সাহিত্যের নেশা যাকে বলে তা ঠিক পেয়ে বসেনি। কিন্তু ১৯৩৪।৩৫ সালে সেকালের বিখ্যাত 'গল্প লহরী' ও 'যমুনা' মাসিকের স্বনামধন্য ...দক এবং খ্যাতনামা লেখক ফণীন্দ্রনাথ পাল—শরৎচন্দ্রের আবিষ্কারক বলেও যাঁকে অভিহিত করা হত, তিনি ওঁদের পাড়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। ওখানে তাঁর কিছু অনুরাগী জুটে যাবে তাও স্বাভাবিক। তাঁদেরই আগ্রহে আবার নতুনভাবে নবকলেবরে 'যমুনা' প্রকাশ শুরু হয়। সুমথবাবু প্রথমে তাঁর জন্য বিশিষ্ট লেখকদের রচনা সংগ্রহেই উৎসাহী ছিলেন—ক্রমে সম্পাদকের চাপে একটি গল্পও লিখে ফেলেন—'জটিলতা' নামে। গল্পটি প্রকাশমাত্রই সাহিত্যানুরাগী মহলে সাড়া পড়ে যায়—স্বয়ং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বহু বিদগ্ধজন ও খ্যাতনামা লেখক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

সমথনাথ ঘোষ

এইবার নেশা লাগে। সৃষ্টির নেশা। খ্যাতির নেশা।

ধীরে ধীরে আরও কয়েকটি গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—এবং সেগুলিও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রশংসা ও অভিনন্দন লাভ করে।

এরপর প্রকাশিত হয় ন্যাশনাল লিটারেচার নামে এক মারোয়াড়ী প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সুদূরের পিয়াসী'। এটিকে উপন্যাসও বলা চলে, ভ্রমণকাহিনীও। এই বইটিও খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বেশ কয়েকটি সংস্করণ হয়ে যায়।

অতঃপর সমথবাবুর প্রথম মেজর ওয়ার্ক 'বাঁকাস্রোত' উপন্যাস 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে তাঁকে বাংলা ভাষায় অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিকরূপে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত করে।

এরপর তিনি আরও বেশ কতকগুলি বই লেখেন এবং তা যথেষ্ট সমাদৃতও হয়। কয়েকটি কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে সে জগতেও তার একটি বিশিষ্ট মর্যাদা এনে দেয়। তার মধ্যে 'মা ও ছেলে'র সাফল্য চলচ্চিত্র জগতে এক ইতিহাস রচনা ও নূতন রেকর্ড স্থাপন করে। তার ফলে তিনি ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স-এর জন্য অনেকগুলি চিত্রকাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেন।

মধ্যে কিছুকাল পারিবারিক কারণে সমথবাবুর লেখনী মন্থর হয়ে পড়েছিল, ইদানীং আবার নূতন উদ্যমে লিখতে আরম্ভ করেছেন। সাম্প্রতিক কালের রচনার মধ্যে 'বনরাজি নীলা' ও 'মরণের পরে' প্রভৃত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সমথনাথ স্বনামে এবং বহু বেনামে বিস্তর শিশু ও কিশোর পাঠ্যগ্রন্থ লিখেছেন।

তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে বাঁকাস্রোত, জটিলতা, সর্বংসহা, প্রহরী, বাঁশীওলা, জায়া ও জননী, সুদূরের পিয়াসী, পরপূর্বা, শ্রেষ্ঠ গল্প, জলধি তরঙ্গে মনবিনিময়, বাগলতা, নীলাঞ্জনা, রোশনাই, সোহাগরাত, মেঘভাঙ্গা রোদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য পুরস্কার

অমৃতবাজার যুগান্তর অমৃতের দেওয়া মতিলাল স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন কথাসাহিত্যিক সমথনাথ ঘোষ।

মৌচাকের দেওয়া সুধীরচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পেলেন উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক শৈব্যা পুস্তকালয়ের দেওয়া রঞ্জিত স্মৃতি পুরস্কার মরণোত্তর পেলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রসাদ পুরস্কার পেয়েছেন কবিতার জন্য সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, নাটকের জন্য দেবাশিস মজুমদার।
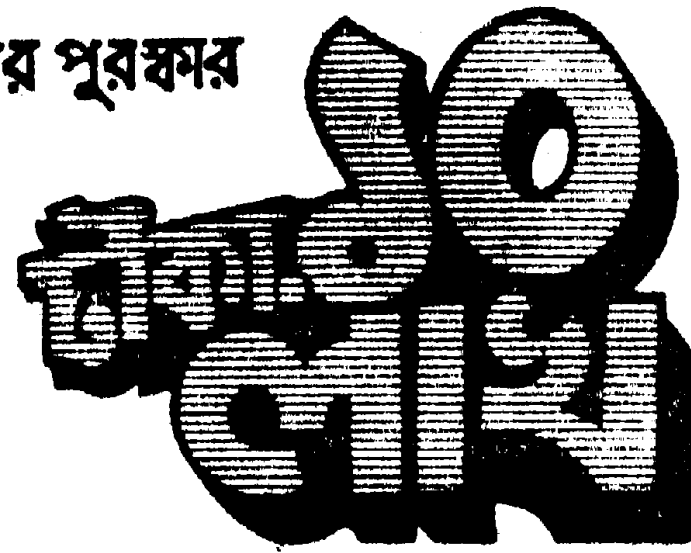
চিঠিপত্র

অপাঠ্যও নয়, সুখপাঠ্যও নয়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাওয়া গাড়ী' সম্পূর্ণ হয়েছে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি সমালোচনাও দেখলাম। উপন্যাসটি বৃহদায়তন হবে অনুমান করি। ভাল মন্দ মিশিয়ে উপন্যাসটি এক ধরনের। অপাঠ্য বলা চলে না। আবার সুখপাঠ্যও নয়। উপন্যাসটির ড্রেসিংএর প্রয়োজন। বহু চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন লেখক, কিন্তু তার মধ্যে সবগুলোই যে গল্পের ধারা সংরক্ষণে প্রয়োজন এমন বলা চলে না। অনেক চরিত্রই অবাঞ্ছিত, আবার অনেক প্রয়োজনীয় চরিত্রও হঠাৎ হারিয়ে গেছে। যেমন দিলীপের পুত্রবধূ। রবির চরিত্র ফোটাতে মালবিকা অনেক সাহায্য করতে পারতো।

শেষ ক'টি চরিত্রের কথাই বলি-- নায়ক দিলীপ বসু একটি বলিষ্ঠ সৃষ্টি। শুধু কর্মক্ষুধা ও কিছু একটা গড়ার নেশায় যারা পাগল এমন চরিত্র আজকের লেখকদের লেখনীতে বিরল।

রবির চরিত্র বিপরীত। ওর নেশা ভাঙনের। যা আজকের তারুণ্যের আদর্শ। ধ্বংসের ভিতর দিয়ে ওরা চায় নতুন সৃষ্টি—পুরাতনকে পরিহার করে। তাই পিতাপুত্রে মুখোমুখি হয়েছে সেই চিরন্তন সমস্যার মোকাবিলায়—ভাঙা ও গড়া, একক ও যৌথ প্রচেষ্টা, —কোনটা বড় সে প্রশ্নের সমাধানে। কিন্তু প্রশ্নের মীমাংসা হয় নি শেষ পর্যন্ত।

এবার রানীর কথায় আসা যাক। প্রৌঢ়া রানীর পদস্খলন হয়তো অনেকের অপছন্দ। এটাকে রুচি বিগর্হিত বলতে অনেকেই সংকোচ বোধ করেন নি। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে তা মনে হলেও জীবন-নাট্যে এই পদস্খলন স্বাভাবিক। অসম্ভবকে নিয়েই তো গল্প। মামুলী জীবন নিয়ে যে-গল্প তা মানুষের চিন্তার খোরাক মেটাতে সক্ষম নয়। মানুষের সুখ দৈন্য নিয়ে তার প্রতি সহানুভূতি জানানো যেতে পারে কিন্তু তার বেশী নয়। জীবন নাটকের শুরু সেইখানেই যেখানে আছে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা।

রাণীর ক্ষেত্রে সেই ইচ্ছার প্রয়োগ জীবন নাটককে প্রাণবন্ত করেছে। পুত্রবতী নারীর অন্তরে যে অতৃপ্ত কামনার শিখা ছিল গোপনে সেটাই জেগে উঠে বিপর্যয় ঘটিয়েছে বিগত দিনের প্রেমিক প্রবোধকে অবলম্বন করে। তবু স্বীকার করতে হবে স্ত্রী ও মায়ের কর্তব্য থেকে রাণী বিচ্যুত হয়নি। দিলীপের অর্জিত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা রেখে নিউ আলিপুর ছেড়ে চন্ডীতলার দীনহীন অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে পড়ে থাকাটা অস্বাভাবিক বোধ হলেও এর ভেতর দেখতে পাই একটা নৈতিক দায়িত্ব ও স্বামীর প্রতি ভালবাসার আভাস।

রাণীর আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তার কারণ নারী সুলভ লজ্জা। স্বামীর কাছে, পুত্র, কন্যা ও নাতির কাছে পদস্খলনের কোন কৈফিয়ৎ নেই। রবির কাছে তার অবস্থা গোপন ছিল না—ধরা পড়ে গিয়েছিল। প্রবোধের ওপর রবির আক্রোশ ও তাকে হত্যা করতে যাওয়ার মধ্যে ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে রাণী মুক্ত করতে পারতো আপনাকে। সে ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু তাতে রবিকে নিয়ে যে সমস্যা তার সমাধান হতো না। রবির ছেলে ছিল আর এক সমস্যা। কিন্তু রবি যখন তার ছেলেকে নিয়ে যেতে চাইলো তখন রাণীর পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। সমস্যার কচকচিতে না গিয়ে লেখক গল্পের স্বাভাবিক ধারায় গ্রাম্য পরিবেশ বজায় রেখে অতিমাত্রায় কুইনাইন খাইয়ে জলের তৃষ্ণায় জলে ডুবিয়ে আত্মহত্যার সুযোগ দিলেন।

শেষ চরিত্রটি কালু ঘোষ। গোড়ায় মনে হয়েছিল ওটা দিলীপের বিবেক। কালু ঘোষ 'সিমবলিক' রূপ নিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটা আর সিমবলিক রইল না। কালু ঘোষ—কালু ঘোষ একটি সম্পূর্ণ চরিত্র। এই ধরনের ভূতুড়ে চরিত্রের সংযোজন মনে করিয়ে দেয় নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী সেলমা লাগেরলফের রচনা। —অমূল্য মিত্র, ১৪ শম্ভুনাথ দাস লেন কলকাতা—৫০

সম্পাদককে ধন্যবাদ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের দীর্ঘ সেই আকর্ষণীয় উপন্যাস হাওয়া গাড়ি শেষ হওয়ায় এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সোনার হরিণ নেই অকস্মাৎ বন্ধ হওয়ায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তেই পড়ার কিছু নেই বলে ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সংখ্যার অমৃততে অসীম চক্রবর্তীর বড় গল্প নিঃসঙ্গ যোদ্ধা পড়ে আশ্চর্য হইয়াছি।

যদিও লেখকের দর্শনের সঙ্গে আমি একমত নহি তবুও এত স্বচ্ছ সাবলীল সমসাময়িক রাজনীতি ও সমাজ সচেতন লেখা সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রসঙ্গত শৈবাল মিত্রর তরণী পাহাড়ে বসন্ত উপন্যাস ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাওয়া গাড়ি উপন্যাসের রবি চরিত্রের কথাও মনে পড়ছে।

ইদানিং বৃদ্ধ হয়েছি। আমাদের প্রথম যৌবনের স্বাধীনতা সংগ্রামের জ্বলন্ত দিনগুলির কথা কেন জানি না নিঃসঙ্গ যোদ্ধা পড়ে আর একবার চকিতে মনে পড়ে গেল। এই রকম বলিষ্ঠ রচনা প্রকাশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মিশন পাড়া, রহড়া চব্বিশ পরগণা।

ভাষা ঝরঝরে রুচি নিকৃষ্ট

'হাওয়া গাড়ীর' অশান্ত ঘূর্ণি হাওয়ায় আমরা যখন দিকভ্রান্ত, এক

কালের গানের মাস্টারের কাছে রাণীর আত্মসমর্পন ও শেষে আত্মহত্যা. রবির পিতৃঋণ শোধ করার অপূর্ব মহিমা আর পুত্রস্নেহ এবং দেশপ্রেমের জ্বলন্ত নির্দশনে আমরা যখন হতবাক ও স্তম্ভিত, 'অমৃতের' সম্পাদক আমাদের উপহার দিলেন একটি উদ্ভিন্ন যৌবনা বাঙ্গালী মেয়েকে এবং তার বিষাদ. বিচ্ছিন্নতা এবং স্বীকারকতি। মেয়েটির নাম শকুন্তলা। একটা চমকপ্রদ পার্ণোগ্রাফির ধাক্কা সামলাবার আগেই আর একটা পর্ণোগ্রাফি আমাদের পরিবেশন করা হল।

শুধু যৌনতৃপ্তি ছাড়া আকবরের কাছে শকুন্তলা আর কি পেয়েছে? একজন ধর্ষণকারীর কাছে দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মসমর্পণ করা একটি শিক্ষিতা অধ্যাপক কন্যার পক্ষে শোভন অথবা স্বাভাবিক কি? লেখাপড়া জানা ভদ্রঘরের মেয়ের রুচি যে এত নিকৃষ্ট একথা আগে জানা ছিল না বজ্রাতের সঙ্গে দেহমন দেওয়া নেওয়ার মূলে ছিল বিয়ের আশা। এক্ষেত্রে সে আশা বা ইচ্ছে শকুন্তলার মনে একবারও উঁকি দেয় নি। তবে কি মনে করতে হবে প্রত্যাখ্যানের অপমান তাকে করেছে উদভ্রান্ত এবং পুরুষ জাতির প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্যই সে দেহদান করেছে আকবরকে? বিরহ-বিধুরা বলে শকুন্তলাকে মনে করতে বাধছে।

ভাবছি অল্পবয়সী বাঙ্গালী মেয়েরা শকুন্তলার প্রভাবে পড়লে যে সব ছারখার হয়ে যাবে। ভাবছি একজন হিন্দু বাঙ্গালী মহিলার পক্ষে কেমন করে এমন একটি নারী চরিত্র সৃষ্টিকরা সম্ভব হল যে সমাজ. ধর্ম. শিক্ষা ও সংস্কৃতি জলাঞ্জলি দিয়ে পতঙ্গের মত কাম-বহ্নিতে এমন করে মরণ-ঝাঁপ দিতে পারল?

উপসংহারে বলতে চাই কঙ্কাবতীর গল্পে বার্ণাড শ'র আরমস অ্যান্ড দি ম্যানের প্রথম অংকের কিছু ছাপ পড়েছে। রায়ণার শয়ন ঘরের আগন্তুককে সে চকোলেট খাওয়ার কারণ সে ক্ষুধার্ত শকুন্তলা খাওয়ায় বিস্কুট ও খিচুড়ি। ব্লান্টশীল বা আকবর কেহই ধরা পড়ার ভয়ে নায়িকাকে ঘরের বাইরে যেতে দেয় না। দুই নায়িকাই প্রথম দর্শনে মুগ্ধ, দুজনেই নায়ককে আড়াল করে রাখে যাতে তার উপস্থিতি অন্য কেউ জানতে না পারে। যাওয়ার সময় আকবর শকুন্তলার ছবিটি সঙ্গে নিয়ে যায়, নিজে দেখবে. 'ইয়ারদের' দেখাবে এবং একটি রাত্রির মধুর অভিজ্ঞতার বোধ হয় কখন কখন ও মনে করবে। শয়ের নায়কের কিন্তু রায়ণার ছবির প্রতি কোন লোভ নেই। তার অজ্ঞাতসারে রায়নাই তার নিজের ছবি চকোলেট ক্রীম সৈনিকের পকেটে রেখে দেয়। তাছাড়া রায়ণা বা ব্লান্টশীল এক শয্যায় রাত্রিযাপন করে না। রায়না সংযত সুরুচিসম্পন্না. ব্লান্টশীলকে এক রাত্রের সঙ্গী হিসাবে সে পেতে চায় না পেতে চায় এবং পরে পায়ও জীবন-সঙ্গী হিসাবে। শ'র নাটক স্বাস্থ্যপ্রদ, তার নায়ক নায়িকা সংযমী, সংবেদনশীল জীবন নিয়ে তারা জুয়া খেলে না. করে না ছিনিমিনি। কিন্তু কঙ্কাবতীর নায়ক-নায়িকা? বিকৃতরুচি, অসংযমী, ছাড়া তাদের আর কোন পরিচয় আছে কি? লেখার শৈলী সুন্দর, ভাষা ঝরঝরে ও ইঙ্গিতবহ কিন্তু রুচি নিকৃষ্ট।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রিডার. বিভাগীয় প্রধান (ইংরেজী) ক্রাইষ্ট কলেজ, কটক।

ভেজাল চালাচ্ছেন

আমি অনেকদিন থেকে 'অমৃত' রস ভান্ডারের নিয়মিত কাষ্টমার। আপনাদের কোম্পানীর অমৃত রস পান করে ভালই আছি। আপনাদের দয়ায় সপ্তাহে সপ্তাহে রস ভান্ডার লুটে পুটে খেয়ে স্বাস্থ্য যেমন হয়েছে—শরীরে শক্তি পাচ্ছি আগের চেয়ে ঢের বেশী। বুঝতে পারছি আপনাদের রস ভান্ডারের রস ছাড়া আমার স্বাস্থ্য ও শরীর ঠিক থাকবে না। কারণ সপ্তাহটা কিছুতেই যেতে চায় না। আশুবাবু এবং খুচরো বাবুদের প্রেরিত রসে আপনার 'রস ভান্ডারের' যে কতটুকু উন্নতি হয়েছে তা নিজে না খেলে কিছুতেই বুঝতে পারবেন না। বিশেষ করে আশুবাবুর রস আমাকে চুম্বকের মত সারা সপ্তাহটা টানে।

কিন্তু আমি গত কয়েক সংখ্যা থেকে বুঝতে পারছি আপনাদের প্রেরিত রসে রীতিমত ভেজাল মাল চালাচ্ছেন। গোপনে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম ত্রিভুবন নিবাসী হাওয়া গাড়ির পাইলট মিস্টার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নাকি আমার এই সঞ্জীবনী রসে প্রেতাত্মা হয়ে ভেজাল চালাচ্ছেন। আমার ভয় হচ্ছে যদি শ্যামলবাবু 'অমৃত' রস ভাণ্ডারকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেন তবে তো রস না পেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। তাই আপনাদের অমৃত রস ভাণ্ডার কোম্পানীর কাছে আমার অনুরোধ দয়া করে আমার কথাটা একটু চিন্তা করবেন।

নীলকন্ঠ রানাডে চক্রালয় কামাক্ষ্যাগুড়ি।

নেকচাঁদের চাঁদের হাট

বাসুকিনাথ দাস

চণ্ডীগড়। ফরাসী স্থপতি লা কর্বুসিয়রের হাতে গড়া সুন্দরী চণ্ডীগড়। এর এক প্রান্তে 'সুখ্না লেক'—বিরাট, বিশাল। সুখ্না লেকের কাছেই, শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে, চোখে পড়বে সারি সারি মোটা মোটা থামে গড়া বিস্তীর্ণ প্রাচীর—যেন কোন সুদূর অতীতের পরিত্যক্ত কেল্লা। মনে হবে প্রাচীরের ওপারেই পাওয়া যাবে মোগল আমলের আমেজ। কিন্তু একটু কাছে এলেই সে ভুল ভেঙে যাবে। নজরে পড়বে বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'রক গার্ডেন'—সুন্দরী চণ্ডীগড়ের সুন্দরতম উপহার—মনোরম উদ্যান। না, এ উদ্যানে গোলাপের স্থান নেই—কোন বিকশিত মঞ্জরী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না—এ বাগান শুধু পাথরের বাগান—যে পাথর কথা বলে,—যাদের দিকে তাকালে মনে হয় ওরা যেন কতকালের চেনা—কত পরিচিত।

দু' সপ্তাহের হিমাচল প্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকা ভ্রমণে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল এই 'রক গার্ডেন'। চম্বা থেকে অমৃতসরের পথে, বাসের এক সহযাত্রীর কাছে সংবাদ পেলাম চণ্ডীগড়ের এই 'রক গার্ডেনের'। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, চণ্ডীগড় তিলোত্তমা, কিন্তু তার 'রক গার্ডেন' হাজার হাজার চণ্ডীগড়ের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। যাঁরা এই বাগান দেখেছেন, তাঁরা এর সৌন্দর্য বর্ণনা করার ভাষা খুঁজে না পেয়ে হয় নীরব হয়ে গেছেন, নয়ত বা সংক্ষেপে শুধু বলেছেন, 'অপূর্ব, অতুলনীয় সৃষ্টি'। কেউ কেউ আর কিছু ভেবে না পেয়ে অসংকোচে বলেছেন, 'পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য'। সত্যি 'রক গার্ডেন' দেখার পর মনে হয়, তাঁরা কেউই অত্যুক্তি করেননি,—নিঃসন্দেহে বলা যায়, পৃথিবীর শিল্প সংগ্রহশালায় এ এক অভূতপূর্ব সংযোজন।

মোগলাই সম্পদ আর হাজার হাজার শিল্পীর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে 'তাজমহল'—লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে তৈরী হয়েছে 'ডিজনীল্যান্ড'—যা মানুষকে বিস্মিত করে দেয়—কিন্তু এক সাধারণ মানুষের একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা এই 'রক গার্ডেন' মানুষকে করে নির্বাক। কে এই সাধারণ মানুষটি? এ বাগানের ইতিহাস কি? হাজার প্রশ্ন জাগবে যে কোন কৌতূহলী দর্শকের মনে।

এই 'রক গার্ডেন' আবিষ্কারের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে ছোট্ট একটি ঘটনা, যেমন ছোট্ট ঘটনা লুকিয়ে রয়েছে 'অজন্তা' আবিষ্কারের পিছনে। কোন এক শিকারী মৃগয়ায় গিয়ে পালিয়ে যাওয়া হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে ঢুকে পড়েছিলেন এক গভীর জঙ্গলে—সেখানে তিনি হরিণটাকে পাননি ঠিকই, কিন্তু পেয়েছিলেন এক স্বর্ণমৃগের সন্ধান—অজন্তা গুহা।

আজ চণ্ডীগড়ের যেখানে প্রায় তিন একর জমি নিয়ে এই 'রক গার্ডেন'—মাত্র বছর দুই আগেও সে জায়গাটা ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জংগলের এক সীমানা বরাবর পড়ে ছিল সারি সারি হাজার হাজার খালি পিচের ড্রাম। তাই ড্রামেরও ধার থেকে জঙ্গলটা সাধারণ মানুষের নজর এড়িয়ে চলেছে বছরের পর বছর। চণ্ডীগড় তৈরীর কাজ শুরু হয় ১৯৫১ সালের শেষের দিকে। মাইলের পর মাইল তৈরী হয়েছে চওড়া চওড়া চকচকে ঝকঝকে রাস্তা, তৈরী হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে সুন্দর সুবিশাল 'রোজ্ গার্ডেন',—তার আকাশচুম্বী ফোয়ারা, মাথা তুলেছে অভিনব হাইকোর্ট অট্টালিকা। এর সৌন্দর্য বাড়িয়েছে ক্যাকটাস বাগান আর সুবিশাল 'সুখনা লেক'। এর একুশ বছরের জীবনে, অর্থাৎ ১৯৭২ সালের শেষ পর্যন্ত কোন মানুষ জানতো না এর কোহিনূরের কথা—এর 'রক গার্ডেনের' কোন সংবাদ।

শহরকে সুন্দর করলেই হয় না, স্বাস্থ্যকর করে তুলতে হবে। মশাকে ধ্বংস করতে হবে—ম্যালেরিয়াকে বন্ধ করতে হবে। তাই 'অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া পার্টি' পুরোদমে কাজ করে চলেছেন। মিঃ এস কে শর্মা, অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর, হেলথ সার্ভিস (ম্যালেরিয়া) স্বয়ং সদলে মশা তাড়ানোর জন্যে ঢুকে পড়লেন ঐ পরিত্যক্ত জঙ্গলে, ১৯৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী। তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, জঙ্গলের মধ্যে পাথর সাজানো উঁচু একটা জায়গা, যেন কোন রাজসিংহাসন; তিনি আরও অবাক হয়ে দেখতে পেলেন, জঙ্গলের মধ্যে এক মধ্যবয়সী মানুষ—যার পরনে 'আণ্ডারওয়্যার'—ছোট বড় পাথরের টুকরো নিয়ে সাজিয়ে সাজিয়ে রাখছে। মিঃ শর্মা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন তার পরিচয়। ভদ্রলোক সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, 'আমি নেকচাঁদ—আমি পাথর সংগ্রহ করি, নদীর ধার থেকে, পাহাড়ের গা থেকে, আর তাদের সাজিয়ে রাখি বিশেষ ভাবে।

মিঃ শর্মা সত্যি অভিভূত হয়ে গেলেন পাথরগুলো দেখে। এক একটি পাথর এক একটি সুন্দর সুন্দর মূর্তি—কিন্তু এ মূর্তি কোন শিল্পীর ছেনীর পরশে তৈরী হয়নি,—হাজার হাজার বছর ধরে, রোদে, জলে আর বাতাসে তৈরী হয়েছে প্রকৃতির শিল্পশালায়। নেকচাঁদের শিল্পী চোখ তাদের আবিষ্কার করেছে বছরের পর বছর। একটা দুটো পাথর নয়, ১৫।২০ হাজার পাথর শিল্পী সংগ্রহ করেছেন প্রকৃতির কোল থেকে, সাধারণ

মানুষের দৃষ্টির পরশ বাঁচিয়ে তাদের সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন এই জঙ্গলে।

মিঃ শর্মা বুঝতে পারলেন, এ সাধারণ মানুষ নয়, এক মার্তশিল্পী।

এই জঙ্গলই আজ রূপ নিয়েছে 'রক গার্ডেনে': এর স্রষ্টার নাম শ্রীনেকচাঁদ সাইনী—যার কথা বলে বলব। এর আবিষ্কারক মিঃ শর্মা। কিন্তু বিশ্বের দরবারে একে তুলে ধরেছেন আর এক শিল্পী,—ডঃ এম এস রণধাওয়া পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার। কিন্তু এটাই শ্রীরণধাওয়ার একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি একাধারে শিল্পী, লেখক বৈজ্ঞানিক, জীববিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদ। এঁর শিল্পীমন চণ্ডীগড়কে সুন্দর করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। ইনি তখন ছিলেন চণ্ডীগড়ের 'ল্যাণ্ড স্কেপ কমিটির' চেয়ারম্যান। চণ্ডীগড়ের মিউজিয়াম, রোজ গার্ডেন এঁরই গোলাপী কল্পনার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। জনবসতিহীন পরিত্যক্ত জঙ্গলের মধ্যে, নেকচাঁদের সংগ্রহশালা দেখে মিঃ শর্মা শুধু মুগ্ধ হননি, বুঝেছিলেন, এ শিল্পীকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে হবে—আর তা করতে পারেন শুধু ডাঃ রণধাওয়া। মিঃ শর্মা তাই নেকচাঁদকে পরামর্শ দিলেন, ডাঃ রণধাওয়াকে তাঁর সংগ্রহশালা পরিদর্শন করার জন্য নিমন্ত্রণ করতে।

মিঃ শর্মা জানতেন, কিছুদিনের মধ্যে ঐ জঙ্গল পরিষ্কার করা হবে—কারণ, ওটা যে মশাদের সুন্দর স্বাস্থ্যনিবাস—সুন্দরী চণ্ডীগড়ের কলঙ্ক। তিনি এও আশঙ্কা করেছিলেন, সাধারণের অগোচরে দীর্ঘ এগার বছর ধরে যে সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে, তা হয়ত শীঘ্রই বুলডজারের মৃদু পরশেই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

মিঃ শর্মার আশঙ্কা অমূলক নয়,—এ কথা বুঝতে দেরী হয়নি শিল্পী নেকচাঁদের। তিনি কোনদিন যশ চাননি, অর্থ চাননি, শিল্পীর আসনে নিজের প্রতিষ্ঠা চাননি, কিন্তু তাঁর শিল্পপ্রেমিক মন বুলডজারের তলায় তাঁর সংগ্রহ ধূলিসাৎ হওয়ার কল্পনায় সত্যি আতঙ্কিত হয়েছিল। তিনি ডাঃ রণধাওয়াকে নিমন্ত্রণ করলেন জঙ্গলে। ব্যস্ত মানুষ রণধাওয়া। প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেননি, নেকচাঁদ কি দেখাতে চান তাঁকে। কি এমন জিনিস লুকিয়ে থাকতে পারে জঙ্গলে। তাই নিমন্ত্রণ পাওয়ার বেশ কিছুদিন পর ১৯৭৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর তিনি সত্যি সত্যি নেকচাঁদের সংগ্রহশালায় উপস্থিত হলেন। মুগ্ধ হলেন ডাঃ রণধাওয়া। শিল্পীকে চিনতে শিল্পীর চোখ ভুল করেনি। তন্ময় হয়ে পুরো তিনঘণ্টা কাটালেন তিনি: এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি 'চণ্ডীগড় ল্যাণ্ডস্কেপ কমিটি'-র মিটিংএ, নেকচাঁদের সংগ্রহশালাকে [illegible] ণের কাছে তুলে ধরার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ [illegible] ণ করলেন। সভাপতির সুপারিশ ব্যর্থ হবার নয়। কার থেে [illegible] জনীয় অর্থ ব্যয় করা হল, জঙ্গলকে পরিষ্কার করে, এই সংগ্রহশালাকে যথাযথভাবে গড়ে, জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য। সাজানোর পুরো পরিকল্পনার ভার ও অধিকার রইল, এর স্রষ্টা শিল্পী নেকচাঁদের ওপর। ১৯৭৬ সালের ২৬ জানুয়ারী, এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন, হাজার হাজার চণ্ডীগড়বাসী বিমুগ্ধ, স্তম্ভিত, বিস্মিত হয়ে দেখেছিল, আকাশের চাঁদ বুঝি ধরা দিয়েছে নেকচাঁদের বাগানে।

শুধু অপূর্ব শিল্পশোভা নয়, চণ্ডীগড়বাসীর বিস্ময়ের আরও একটা কারণ ছিল। একার প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে এই বিশাল রক গার্ডেন—কে সেই মানুষটি? নেকচাঁদ সাইনী? অনেকে এ কথা যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না। কেমন করে বিশ্বাস করবেন তাঁরা?, এই মানুষটাকে যে তাঁরা দিনের পর দিন দেখেছেন কুলিদের দিয়ে চণ্ডীগড়ের রাস্তা তৈরী করাতে। সাধারণ একজন রোড ইন্সপেক্টর—সে আবার শিল্পী হল কবে? কেউ কেউ বলল, 'আরে ও তো একটা আধপাগলা ভিখারী—কতদিন কত লোক দেখেছে, ডাস্টবিন থেকে লোকের ফেলে দেওয়া কাঁচের বাসন, ভাঙা বেসিন, পায়খানার ভাঙা প্যান, কাঁচের ভাঙা চুড়ি, জংধরা সাইকেলের ফ্রেম, ছেঁড়া টায়ার সংগ্রহ করছে। কিন্তু বিশ্বাস করতে বাধ্য হল, ঐ রোড ইন্সপেক্টর,—ঐ পাগলা ভিখারীই শিল্পী নেকচাঁদ। বিশ্বাস না করে উপায় নেই। তারা অবাক হয়ে দেখলো, বাগানের ঐ জলকুণ্ডটা,—ওটা পাথরের তৈরী নয়, ওটা যে সাইকেলের ভাঙা ফ্রেমে কংক্রিট জমিয়ে তৈরী করা। তারা আবিষ্কার করলো, ভাঙা রঙীন কাঁচের চুড়িগুলো কেমন সুন্দর ময়ূরে পরিণত হয়েছে। আরে, দারোয়ানের মূর্তিটার সারা গা-টা যে কোকাকোলার ছিপি দিয়ে তৈরী। পায়খানার ভাঙা প্যান, ভাঙা বেসিন, কাঁচের প্লেট দিয়ে কি সুন্দরভাবে তৈরী হয়েছে রাজসিংহাসন, রাজবাড়ীর দেওয়াল! দর্শকরা আরও বিস্মিত হয়ে গেল যখন তারা দেখল, একটা বিরাট দেওয়াল শুধু ভাঙা ইলেকট্রিক সুইচ দিয়ে তৈরী। তাদের ভুল ভাঙলো শিল্পীকে চিনতে তাদের আর দেরী হল না। তাদের কৌতূহলী মন ছুটে চলল শিল্পীর অতীত ইতিহাসের দিকে।

অবিভক্ত ভারতের পশ্চিম প্রান্তে শিয়ালকোট জেলার বেরিয়ান কালানএ ১৯২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর এই মহান শিল্পীর জন্ম। ভারত ভাগ হয়ে গেলে তাঁর জন্মভূমি হয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তান। ওখানের জি এম মাঙ্গারি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেন। বাবা ভকিলা রাম ছিলেন একজন কৃষক,—তাই আর লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি তাঁকে। ১৯৪৭ সালে উনি চলে এলেন ভারতে। ১৯৫০ সালের ১০ অক্টোবর চণ্ডীগড় শহর প্রকল্পে যোগ দিলেন, একজন রোড ইন্সপেক্টর হিসাবে। পেশায় ইন্সপেক্টর, নেশায় শিল্পী। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুটির দিনে তিনি সাইকেলটা নিয়ে চলে যেতেন শিবালিক পাহাড়ের ধার ধরে। তার শিল্পী চোখ আবিষ্কার করতো কত রকমের ছোট বড় পাথর। এক একটা পাথরের এক এক রকম চেহারা। কোনটা দেখলে মনে হবে মা ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করছে, কোন পাথর প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমনিবেদনের প্রতিমূর্তি,—যেন খাজুরাহো মন্দিরের গা থেকে খুলে এনে কেউ ফেলে গেছে! শিল্পীর দৃষ্টি পড়লো একটা বিরাট সাপের দিকে,—না, ওটা জ্যান্ত নয়, মরা নয়, মানুষের তৈরী নয়,—একটা পাথর হাজার হাজার বছর ধরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রকৃতির খেয়ালে কি চমৎকার সরীসৃপের রূপ নিয়েছে। একটা বেশ বড় পাথর মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। ওটাকে তুলে মনের মত করে একটু খাড়া করে নিলেন নেকচাঁদ—ঠিক যেন একটা বিরাট হাতির মাথা,—ঐ চোখ, ঐ শুঁড়! প্রকৃতির খেয়াল দেখে মনে মনে তন্ময় হয়ে যান শিল্পী। ইচ্ছা করে গাড়ী বোঝাই করে সব তুলে নিয়ে আসেন। কিন্তু টাকা কোথা? সংসারী মানুষ তিনি। ঘরে দুই মেয়ে। নিজের সামান্য চাকরী। কিন্তু অর্থের অভাব শিল্পীকে দমিয়ে দিতে পারে না। প্রকৃতির এসব অমূল্য সম্পদ কেমন করে তিনি ফেলে রেখে যাবেন। সাইকেলের পিছনে চাপিয়ে কোন মতে নিয়ে আসেন। কিন্তু রাখবেন কোথা? পাকিস্তানের উদ্বাস্তু নেকচাঁদের স্থান-স্বাচ্ছন্দ্য কোথা? সরকারী গুদামের (পি ডবল্যু ডি) একপাশে জমা হতে থাকে তাঁর শিল্পসংগ্রহ। গুদামের কোদাল, বেলচা, গাঁইতি, রাস্তা তৈরীর আরও কত সাজসরঞ্জামের সঙ্গে এই মহান সংগ্রহের এক অপূর্ব সহাবস্থান চলে বেশ কিছুদিন। রাস্তা এগিয়ে যায়—গুদামেরও জায়গা বদলায়—শিল্পীর কাজ বাড়ে। চণ্ডীগড়ের সেক্টর ২৬ থেকে গুদাম চলে যায় সেক্টর ১২-তে। বাধ্য হয়ে সংগ্রহশালাকেও সরিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাঁকে। শেষে ১৯৬৪ সালে গুদাম চলে আসে সুখনা লেকের কাছে,

জঙ্গলের পাশে। মাইলের পর মাইল তৈরী হয় রাস্তা—পিচের হাজার হাজার ড্রাম হয় খালি—সেগুলো অযত্নে পড়ে থাকে জঙ্গলে একধারে। এতদিনে শিল্পী খুঁজে পান তাঁর মনোমত একটি নিভৃত সংগ্রহশালা। কাজের দিন সকলটা, আর ছুটির পুরো দিনগুলোই কেটে যায় এই পাথর সংগ্রহের কাজে। শুধু সংগ্রহ করলেই হবে না, সেগুলি সযত্নে সাজাতে হবে। এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন কমলা দেবী—তাঁর স্ত্রী। গভীর রাত পর্যন্ত দুজনে বাগান তৈরীর কাজ চালিয়ে যান।

কিন্তু গভীর জঙ্গলে আলো কোথা? ভিতরে যাদের এত আগুন, সামান্য আলোর অভাবে কি তা অন্ধকার হয়ে যাবে—কাজ থামিয়ে দিতে হবে? পাথর সংগ্রহ বন্ধ রেখে শিল্পী সংগ্রহ করতে থাকেন সাইকেলের ফেলে দেওয়া ছেঁড়া টায়ার, বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ। তাই জ্বালিয়েই আলোর অভাব মেটে।

জঙ্গলে রাত কাটাতে হলে একটা ছোট্ট ঘর, একটা আশ্রয় দরকার, যেখানে বসে শিল্পী নিজেকে এককভাবে পাবেন। ছেঁড়া ত্রিপল, সিমেন্টের বস্তা দিয়ে তৈরী করে নিলেন ছোট্ট একটা ঘর। সে ঘর আজও রয়েছে—তবে সাধারণ দর্শকের জন্য তার দরজা বন্ধ—কারণ, মাটির কাঁচা পথ দিয়ে যেতে হয় ঐ ঘরে—হাজার হাজার মানুষের পায়ের চাপে তা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে—অথচ রাস্তাটাকে পাকা করে দিলে তার সরল সহজ স্বাভাবিক রূপটি চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে। এ ঘর শিল্পীর আশ্রম।

সরকারী সহযোগিতায় নেকচাঁদ উৎসাহ পেলেন। তাঁর সংগ্রহ একত্র করে সাজালেন মনের মত করে। পিচের যে খালি ড্রামগুলো এতদিন ধরে তাঁকে জনসাধারণের কৌতূহলী দৃষ্টির পরশ থেকে বাঁচিয়েছিল সেগুলোকেই কাজে লাগালেন রক গার্ডেনের দেওয়াল তৈরীর কাজে। শিল্পীর পরিকল্পনার এই সামান্য স্থূল অংশটি দেখলেই দর্শককে অবাক হয়ে যেতে হবে। গোল গোল ড্রাম একটার উপর একটা এবং পাশাপাশি সাজানো হল। তাদের পিচ-কালো গায়ে লাগানো হল সিমেন্টের আস্তরণ—যা একটু দূরে থেকে দেখলেই মনে হবে বিরাট বিরাট সারি সারি, গোল গোল, মোটা মোটা স্তম্ভ দিয়ে গড়া যেন কোনও দুর্গ-প্রাচীর।

এই বাগানের প্রবেশপথটাও বেশ মজার। সমস্ত বাগানটাকে মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগটা প্রকৃতির কোল থেকে কুড়িয়ে আনা বিভিন্ন পাথর দিয়ে সাজানো। আর, বাকি অর্ধেক ফেলে দেওয়া বিভিন্ন জিনিস, যেমন, কাঁচের চুড়ি, কোকাকোলার ছিপি, ভাঙা বেসিন, কাপ প্লেট, পায়খানার প্যান, ভাঙা সুইচ, সাইকেলের ফ্রেম, মাটির গেলাস, ভাঁড়, কলসী, ভাঙা লোহার বালতি, মগ, থালা, লোহার চেন, ভাঙা বিগুল, কাঁচের গুলি, [illegible] ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস দিয়ে তৈরী, বিভিন্ন মূর্তি—মানুষের আর জীবজন্তুর। এসব প্রতিকৃতি শিল্পী নিজে তৈরী করেছেন। যদিও এর কোনটাই, এককভাবে নিখুঁত বলা যায় না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে অর্থবহ ও মনোমুগ্ধকর। ইচ্ছা করে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে সেগুলোর দিকে।

সমস্ত রক গার্ডেনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে দেখতে গেলে সবই খুব ভাল লাগবে ঠিকই, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে একটু খাপছাড়া বলে মনে হতে পারে। এটিকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করতে গেলে, শিল্পীর কল্পনাসূত্রের একটু সাহায্য নিতে হবে।

শিল্পী নেকচাঁদের রক গার্ডেন তৈরির পরিকল্পনা ছিল না। বিভিন্ন পাথর সংগ্রহ ছিল তাঁর বাল্যকালের সখ। সেই সখের বশবর্তী হয়েই তিনি বছরের পর বছর ধরে ঐসব সংগ্রহ করে জমা করে রাখছিলেন ঐ জঙ্গলে। এসময় একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর বর্তমান সংগ্রহশালা,—এই জঙ্গল, যেন কোন এক মোগল বাদশার পরিত্যক্ত রাজধানী। সে রাজধানীর চারিধার যেন সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা,—হাজার হাজার মণিমুক্তা খচিত সুদৃশ্য প্রাসাদে মনোরম ঐ রাজধানী,—তিনি দেখতে পেলেন তার রাজসিংহাসন,—তাঁর কানে ভেসে এল সেই রাজরূপাপুষ্ট বিভিন্ন বাদকদের যন্ত্রসঙ্গীত। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবের চেয়ে সত্য হয়ে ফুটে উঠলো তাঁর সামনে। মণিমুক্তার অভাব তিনি ঘোচালেন পরিত্যক্ত, অব্যবহার্য, তুচ্ছ, ভগ্ন, নগণ্য বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে। তিনি সমস্ত জঙ্গলটাকে রূপ দিতে চাইলেন অতীতের কোন এক কাল্পনিক বাদশার রাজ্য ও বাদশাহী প্রাসাদের রূপে। আরম্ভ হল তাঁর প্রাসাদ গড়ার সাধনা। এক অশরীরী আত্মার অলৌকিক উপস্থিতি কোন অসাবধান মুহূর্তে শিল্পীর মনে ক্ষণিকের আতঙ্ক সৃষ্টি করলেও, শিল্পীকে তাঁর এই সাধনা থেকে বিরত করতে পারেনি। নিজের কল্পনার রাজ্যে নেকচাঁদ তাঁর কর্মক্লান্ত দিনে ক্ষণিকের অবসরে বিচরণ করেছেন স্বাধীনভাবে। 'রক গার্ডেন' তাঁর স্বপ্নের তাঁর কল্পনার জীবন্ত রূপ।

এই জন্যই সমস্ত 'রক গার্ডেন'টি দেখলে মনে হয় যেন একটা অতীতের মোগল রাজপ্রাসাদ। বাগানের প্রবেশপথে তিনটি পাথরের ভারসাম্য রক্ষা করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এরা যেন প্রাসাদের প্রহরী। সরু আঁকাবাঁকা পাথরের নুড়ি বিছানো রাস্তা চলে গেছে একটা ছোট্ট কুটিরের দিকে। ঐ পথে হাঁটতে হাঁটতে দুপাশে নজরে পড়বে বিভিন্ন পাথর বিভিন্ন ভাবে সাজানো—এগুলি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই বিভিন্ন প্রতিকৃতির রূপ নিয়েছে। এদের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতেই হবে। রাজ-বাড়ীতে ঢুকতে গেলে একটু অবাক না হয়ে উপায় কি? এগুলো দেখলে মনে হবে নিশ্চয় কোন শিল্পীর তৈরী। কিন্তু শিল্পী নেকচাঁদ খোদার উপর খোদকারি করেন নি, যেমন পেয়েছেন তেমনটি বসিয়েছেন। কিন্তু অবাক লাগে সত্যি তাই হয় নাকি? ঐ যে ভারতের মানচিত্রটা একটা পাথরের গায়ে—ওটা কি ছেনি দিয়ে তৈরী নয়? 'রাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি'—ওটাও প্রকৃতির কোলে আপনি-ই তৈরী হয়েছে? তিমি মাছের মুখটা নিশ্চয় স্বাভাবিক ভাবে তৈরী নয়—একটু আধটু নিশ্চয় ছেনি চালাতে হয়েছে। এরকম হাজার হাজার সন্দেহ জাগবে মনে। এই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সরু পথ ধরে আর একটু এগিয়ে গেলেই রাজদরবার ধাপে ধাপে উঠে গেছে—বিরাট বিশাল। এমনি করে যেতে যেতে দেখা যাবে বেগমদের স্নান করার জায়গা,—হারেম। সেখানে পর্দার বাহার দেখলে অবাক হতে হবে। উনুনে আঁচ দেবার যে গুল, সেরকম হাজার হাজার গুলকে ফুটো করে গেঁথে গেঁথে দড়ি দিয়ে ঝোলানো। শিল্পী নেকচাঁদের কল্পনার রাজ্যে এই সবই নাকি অমূল্য হীরে জহরত। বাগানের এক অংশ থেকে আর এক অংশে যেতে গেলে মনে হবে যেন এক গুহা থেকে আর এক গুহায় ঢুকছি। প্রত্যেকটি প্রবেশপথ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হঠাৎ দেখা [illegible], রাজ্যের সঙ্গীত সভা—কত লোক কত রকমের বাজনা নিয়ে বাজাচ্ছে। এইসব মূর্তিগুলো বিভিন্ন পরিত্যক্ত বস্তু দিয়ে তৈরী। এইসব ঘরের দেওয়াল দেখার মত—কোথাও সারি সারি টিউবলাইট, কোথাও ভাঙা বাল্ব, কোথাও ভাঙা সুইচ ইত্যাদি দিয়ে দেওয়াল তৈরী। রাজ্যের মধ্যে যেমন শয়তানের আড্ডাও দেখান হয়েছে, তেমনি রামরাজ্যের অনুকরণে বাঘ হরিণের একসঙ্গে জল খাওয়া, অর্থাৎ হিংসা ও অহিংসার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানও দেখানো হয়েছে। শিল্পী যেখানে যা পেয়েছেন তাই কুড়িয়ে এনে সাজিয়েছেন—একটা মরা খেজুর গাছের গুঁড়ি এমন ভাবে সাজিয়ে রেখেছেন যা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে হয়। তারই পাশে ঝুলছে কতকগুলো পুরানো লোহার শিকল,—একপাশে রাখা ভাঙা বিগুল সব মিলিয়ে একটা স্বাভাবিক রূপ ফুটে উঠেছে।

শিল্পী নেকচাঁদের এই কল্পনার রাজ্যে ঢুকলে বেরিয়ে আসা খুবই শক্ত। ভাষায় বর্ণনা করার সাধ্য কারও হবে না।

যতদূর মনে হয়, পৃথিবীতে এই জাতীয় 'রক গার্ডেন' আর একটাও নেই। অবশ্য কেউ কেউ হয়ত বলবেন, রাশিয়ার ডঃ ডি, ইনটাসের 'রক গার্ডেন' বা কিউতে রয়েল বোটানিক গার্ডেন পৃথিবীর রক গার্ডেনের তালিকায় বেশ উচ্চ আসনে। কিন্তু ঐসব রক গার্ডেনের থেকে নেকচাঁদের রক গার্ডেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং নেকচাঁদের 'রক গার্ডেন' পৃথিবীর অদ্বিতীয় অনবদ্য সৃষ্টি। এই মতামতকে যথাযতভাবে উপলব্ধি করতে গেলে 'রক গার্ডেনে'র সংজ্ঞা জানা একান্ত প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞরা পৃথিবীতে যতরকমের বাগান আছে, সে-গুলিকে মোটামুটি ন' ভাগে ভাগ করেছেন,—

(১) 'আরবোরেটা' : এ জাতীয় বাগানের উদ্দেশ্য গাছ-পালা দিয়ে সযত্নে একটা জংলী ভাব ফুটিয়ে তোলা। (২) পার্ক গার্ডেন, (৩) ফুলের বাগান, (৪) জলের বাগান, (৫) রুফ গার্ডেন (৬) হারব গার্ডেন, (৭) সুগন্ধী বাগান, (৮) সব্জী বাগান, (৯) 'রক গার্ডেন'।

বিশেষজ্ঞদের মতে, 'রক গার্ডেনের' উদ্দেশ্য হল, যেসব উদ্ভিদ পাথুরে জমিতে, পাহাড়ের ফাটলে বেশ সুন্দরভাবে জন্মাতে ও বেঁচে থাকতে পারে, সেইসব উদ্ভিদ বা গাছপালা সংগ্রহ করে বাগান তৈরী করা। এর জন্য প্রথমেই সেই পরিবেশ তৈরী করতে হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে বেছে ছোট বড় বিভিন্ন পাথর সংগ্রহ করে জমিতে রাখতে হয়। এইসব পাথর বালি পাথর বা চুণা পাথর জাতীয় হয়। গ্রেনাইট পাথর এত শক্ত যে, রক গার্ডেন তৈরীর ব্যাপারে একেবারেই অযোগ্য। পাথরগুলোকে আগে এলোমেলো করে সাজাতে হবে। তারপর গাছের প্রকৃতি অনুসারে কোনটাকে রোদে, কোনটাকে ছায়ায়, কোনটাকে আধো আলো আধো ছায়ায়, কোনটাকে পাথরের ফাটলে লাগাতে হয়। পাথরগুলোকে অবশ্য এমনভাবে বসাতে হবে যাতে প্রয়োজনে তার উপর চাপলে যেন টলে না যায়। সৌন্দর্য বাড়াতে ও স্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে তুলতে অনেক সময় ছোট ছোট পাথরও এলোমেলো ভাবে সাজানো হয়। অর্থাৎ সযত্নে একটা অযত্নের ভাব ফুটিয়ে তোলা।

রাশিয়ার ডাঃ ইনটাসের 'রক গার্ডেন'ও এইভাবে তৈরী। তিনি বিরাট বিরাট পাথরের খণ্ড এবং ছোট পাথরের টুকরো পাহাড়ের গায়ের প্রাকৃতিক জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে স্বাভাবিক পাথুরে জমি তৈরী করেছেন—তারপর জমির প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন গাছপালা লাগিয়েছেন। সুতরাং সহজেই বোঝা যাচ্ছে এইসব 'রক গার্ডেনে' গাছপালা একান্ত প্রয়োজনীয়। পাথরগুলোর মধ্যেও কোন শিল্পের নিদর্শন থাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আলোচ্য 'রক গার্ডেন' একেবারে ভিন্নভাবে তৈরী করা হয়েছে। এখানে গাছ গৌণ,—পাথরগুলি তাদের শিল্পমাধুর্যে ও অভিনবত্বে উদ্যানটিকে রমণীয় করে তুলেছে। সুতরাং প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসারে এর 'রক গার্ডেন' নামকরণ সার্থক হয়নি। কারণ, নাম অনুসারে রক গার্ডেনের দলে একে ফেললে এর প্রতি অবিচার করা হয়, এর সঠিক মূল্যায়ণ করা সম্ভব হয় না। এতে সাজিয়ে রাখা পাথরগুলি এলোমেলোভাবে তুলে আনা নয়,—এর পাথর-গুলি পাথুরে জমির পরিবেশ সৃষ্টি করতে কাজে লাগানো হয়নি, এর প্রতিটি পাথর আপন বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটিকে অনবদ্য শিল্পের মর্যাদা দেওয়া যায়, অথচ প্রতিটিই স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতির হাতে তৈরী। খেয়ালী প্রকৃতির শিল্প-শালায় এরকম কত শিল্পই না সৃষ্টি হচ্ছে!

নেকচাঁদের 'রক গার্ডেন' এক কল্পনার রাজ্য থেকে আর এক কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যায়। এ যেন এক শিল্পীর চোখে আর এক শিল্পীর প্রকাশ। সেই শিল্পী কতভাবেই না তার শিল্পকলার পরিচয় দেয়। মনে আছে, একবার সাহিত্যিক তারাশঙ্করের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তাঁর সখ ছিল বিভিন্ন গাছের ডাল, যা বিভিন্ন প্রতিকৃতির রূপ নিয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতিতে জন্মেছে, তাদের সংগ্রহ করা। সেখানে অবশ্য মাঝে মাঝে একটু ছুরি বা বাটালি চালাতে হয়েছে। কিন্তু নেকচাঁদের সংগ্রহ করা পাথরগুলো একেবারে অকৃত্রিম। হয়ত কোন কোন পাথরে সামান্য খোদাই-এর অভাবে কোন প্রতিকৃতিকে একটু অসমাপ্ত বলে মনে হবে,—কিন্তু তার জন্য তার সমগ্র রূপটি বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না,—বরং কিছু রেখার অভাব সেটিকে আরও শিল্পোত্তীর্ণ করে তুলেছে। সেগুলি দেখে তাই মনে হয়।

আবার, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে বিজ্ঞানের মাপে থেকে দেখলে সত্যি প্রশ্ন জাগবে, কেমন করে এক একটি পাথর প্রকৃতির খেয়ালে এমন রূপ নিল। স্বাভাবিকভাবে ক্ষয় পেতে পেতে ভারতের মানচিত্র তৈরি হয়ে যাওয়া, বা রাণী ভিক্টোরিয়ার মুখের আদল তৈরি হওয়া কেমন করে সম্ভব হল। এর উত্তরে শুধু সম্ভাবনাবাদের কথাই বলা যায়। যে কথা চিন্তা করে বৈজ্ঞানিক জেমস জীনস বলেছিলেন, একটা বানরকে দিনের পর দিন টাইপ-রাইটার যন্ত্র দিয়ে ইচ্ছামত টাইপ করতে বসিয়ে দিলে, একদিন একটা চতুর্দশপদী কবিতাও ছাপা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। ঠিক এইভাবেই প্রকৃতির বুকে ঐ পাথরগুলো এক একটা মূর্তির রূপ ধারণ করেছে। নেকচাঁদের কৃতিত্ব শিল্পীর চোখ দিয়ে সেগুলো খুঁজে বের করা।

সমঝদার মানুষ শিল্পীর সৃষ্টির কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে তার স্বীকৃতি দিতে চায়। নেকচাঁদ সরকারীভাবে স্বীকৃতি পেলেন ১৯৭৭ সালের ২৬ জানুয়ারী, যেদিন চীফ কমিশনার টি, এন, চতুর্বেদী তাঁর হাতে তুলে দিলেন একটি পাঁচ হাজার টাকার চেক—সরকারী পুরস্কার। এ ছাড়াও, 'দিলগীর' পুরস্কার এবং পাঞ্জাব ললিতকলা একাডেমীর পুরস্কার নেকচাঁদকে চিরন্তন রীতিতে সাধারণ মানুষের কাছে শিল্পীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু জাত-শিল্পী নেকচাঁদ এসব পুরস্কারের অনেক ঊর্ধ্বে, তা যে কোন সত্যিকারের শিল্প-প্রেমিকই 'রক গার্ডেনে' ঢুকলেই অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পৃথিবীর বুকে ঐরকম হাজার হাজার পাথর হয়ত ছড়িয়ে আছে। অনেক শিল্পীই হয়ত নেকচাঁদের অনুকরণে আরও দু-চারটে 'রক গার্ডেন' তৈরি করবেন—কিন্তু মৌলিকতার শিল্পী নেকচাঁদের নাম চিরদিনই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

আলোকচিত্র : দীপক দাস

পিতৃতর্পণ

[illegible] মিত্র—

অনুতাপ মিশে আছে তাই স্মৃতি এমন উজ্জ্বল।
তোমার প্রথম সত্তা এই দেশ
অন্ধকূপ থেকে
চালিয়ে দিয়েছে শূন্যে কয়েক শিকড়
শিখর ছুঁয়ে যেমন পার্বত্য পথে
সঙ্গীহীন মানুষকে কাছে ডেকে আনে।

এখন উঠেছি যাঁকে বহু বাধা নিঃস্বতার ভরে,
দেখছি স্রোতের জলে তোমার মুখের মূর্তি
প্রতীকের চেয়ে স্পষ্ট গাঢ়
সেই প্রতিচ্ছায়া ভেঙে
অঙ্কুর ফোয়ারা, একফোঁটা শুক্রবিন্দু
ওষধি গাছের পাতা বেড়ে উঠছি,
লম্বা শুকনো জীবনে এখনো আমি টেনে নিচ্ছি রস।

তোমাকে করেছি শূন্য, ফোঁপরার মতো পড়ে ছিলে।
হাসিকান্না বাড়িঘর হালকা কাঁচ
পড়ে ভেঙে যায়।
পুরুষের কাটার জুতোর ঘায়ে
মাথা লাল হয়ে গেলে তাই
অঝোরে গড়ালো রক্ত
[illegible] দিয়ে [illegible] দিই।

সুখী হও

[illegible]

তোমরা এখন যেখানে আছ
সেটা পৃথিবীর বাইরের একটা জায়গা।
পুরোনো দিনের সেই কথা লেখা আছে, ছাপাকল ছেপে গেছে সব,
তবু কিছু কিছু মনে পড়ে, মনে পড়ে আজো। মনে পড়ে
অনেক পোকার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিলো, কাগজে তাদের কেউ কেউ
বন বন করে কলম চালাতো, কেউ কেউ ছিলো ফিল্ম-পাগল পোকা,
তারা উড়ে বেড়াতো বাতাসে।

পোকাদের নিয়ে বিরাট একটা পরিকল্পনা
ছিলো আমার। একদিন আয়নায় দেখলাম
আমারও নাকের ভেতর থেকে দুটো লম্বা চুল শুঁড়ের মতন
বড় হয়ে উঠছে, নড়ছে। আর এমন সময় তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল।
একটু একটু করে তুমি আমাকে ভালবাসছো, একদিন
তোমার নরম ঠোঁট চেপে ধরতে গিয়ে বুঝতে পারলাম
একটু একটু করে আমিও....। তখন
সাঁই—সাঁই করে ঘুরছিলো ওই পৃথিবী, ছিটকে

এলাম আমরা। ওগো পোকারা,
বেঁচে থাকো, ভালো থেকো এবং সুখী হও।

মুহূর্ত

প্রতিমা রায়

আবির ছড়িয়ে যায়, সারা আকাশ জুড়ে—
উন্মত্ত নিতম্বের পাশে কেটে বসান অন্ধকার পাথর
বিস্ফারিত স্তনের গায়ে ঊর্ধ্বমুখী টুকরো উরু
ছিন্নমুণ্ড কিছুদূরে, পাশাপাশি দোল খায় উদর
বেড়ে যায় কমে আসে
লুটোপুটি সবকটি শরীর, অবাধ্য আবির ধোঁয়ায়।

অতঃপর—
ওৎপেতে খেলা করে লোভের চোখ
তীক্ষ্ণ নখর যুক্ত দুই বাহু দুধারে ছড়িয়ে
পৈশাচিক লোলিহান ক্ষুধায় নেমে আসে রসনা,
অপদেবতার মত, বিবাক্ত হয় [illegible] মুহূর্ত।

দখল

শচীন দাশ

জানলা দিয়েই দৃশ্যটা চোখে পড়ল শর্মিলার। শর্মিলা তখনো ঘর ছেড়ে বেরোয়নি। ঘুম থেকে উঠে খানিকটা হাই তুলে জানলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর সেই সময়েই চোখে পড়ল টিলা থেকে হাত ধরাধরি করে ওরা দুজনে নেমে আসছে। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেনি শর্মিলা। চোখে ঝাপসা লেগেছিল। চোখদুটো করকর করে জ্বলছিল। তাছাড়া কালরাতেও ঠিকমত ঘুম হয়নি। এক একবার চোখের পাতা দুটো বুজে যায়, একটু তন্দ্রামত আসে, আবার তখুনি জেগে যায়। এমনি করতে করতে এরি মধ্যেই আবার নানা হিজিবিজি স্বপ্ন! একটা সাপ, মাথার ভেতরে গাছপালা, সাপটা পাকিয়ে পাকিয়ে দেহের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। শর্মিলা চমকে উঠেছিল। ভোরের দিকে আর চোখের পাতা দুটো এক হয়নি। বিছানায় শুয়ে শুয়েই ছটফট করেছিল। একটু পরে বিছানা থেকে নেমে জানলার পাশে এসে দাঁড়াতেই দেখেছিল ওরা দুজনে নেমে আসছে।

মুহূর্তেই মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে গিয়েছিল শর্মিলার। ঘেন্নায় চোখমুখ কুঁচকেও উঠেছিল। আশ্চর্য! এরি মধ্যে সাতসকালে বেরিয়ে পড়েছে ওরা। আদিখ্যেতা আর কাকে বলে! শর্মিলা ভাবল, নিশ্চয়ই আরও আগে বেরিয়েছিল, তারপর হাসতে হাসতে, কথা বলতে বলতে, গায়ে গা লাগিয়ে এই এখুনি ওরা ফিরে আসছে।

জানলা দিয়ে দেখতে গিয়েও মুখটা ঘুরিয়ে নিল শর্মিলা। পর্দাটা টেনে দিল। তারপর দড়াম করে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের ভেতরে ফিরে আসতেই কানে এল বাইরে গেটটা খুলে যাচ্ছে তারপরেই সিঁড়িতে জোড়া পায়ের শব্দ। শব্দটা ক্রমশ উপরে উঠে আসছে।

শর্মিলা সরে এল। চট করে তোয়ালেটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে কলটা ছেড়ে দিয়েই জোরে জোরে চোখেমুখে জল ছিটিয়ে দিল। এই নিয়ে আজ তিনদিন। পরপর তিন তিনটে রাত শর্মিলা জেগে আছে। একটুও ঘুম নেই।

ঘুম থাকব কি করে। সারাদিন তবু কলেজের সহকর্মী আর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেই কাটিয়ে দেয়, কিন্তু সন্ধের পরে এতবড় ফাঁকা বাড়িটায় কেমন ভয় ভয় লাগে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে শর্মিলার। মনে হয় বাড়িটা যেন, ছাদটা বুঝি নিচে নেমে আসতে আসতে এক সময় ওর বুকের উপরে চেপে বসবে। অথচ দু'দিন আগেও এত ভয় ছিল না ওর। তখন ঊর্মিলা ছিল। ঊর্মিলার সাহচর্য ছিল। কিন্তু আজ দু'দিন হয়ে গেল ঊর্মিলাও কাছে নেই। কাল অবশ্য এসেছে। এসেছে—তবে একা নয়। সঙ্গে অনুতোষও আছে।

আশ্চর্য! শর্মিলা ভাবল, ভাবতে ভাবতেই ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল, শাঁকা ঠোঁটের ফাঁকে একফোঁটা ক্রূর হাসি। ঊর্মিলা অনুতোষকে বিয়ে করবে এটা কি কোনদিন মনে হয়েছিল শর্মিলার একবারও মনে

হয়নি। ভাবেওনি সে। অবাক হয়েছিল যেদিন দুম করে এসে শর্মিলা সামনে দাঁড়িয়ে উর্মিলা জানিয়েছিল অনুতোষকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সে।

অবাক হয়েছিল, চমকে উঠেছিল, বলতে গেলে একরকম কাঠের পুতুলের মতই অনেকক্ষণ যেন নিষ্প্রাণ দাঁড়িয়েছিল শর্মিলা। মনে মনে ভেবেছিল, অনুতোষকে কি করে পছন্দ করে বসল উর্মিলা। কি আছে কি ওর মধ্যে? না হয় পড়ায় ভাল, ভাল করে কথা বলে, দেখতেও খারাপ নয়, কিন্তু তাই বলে অনুতাষকে বিয়ে করবে? অনুতোষ যে বয়সে অনেক বড়, তারওপর উর্মিলার শিক্ষক—! শর্মিলা ভাবল, আর অনুতোষই বা কেমন! একটি অল্পবয়সের মোহ আর আবেগকে এভাবে প্রশ্রয় দিল? কি জানি দিনকাল পাল্টে গেছে, মূল্যবোধ ভেঙে গেছে, আজকাল বুঝি সবই সম্ভব!

সেদিন, সেই মুহূর্তে আর কোনরকম আপত্তি করেনি শর্মিলা। করবে কি, শর্মিলা জানে আপত্তি করলেও কেউ শোনার নেই, মেয়ে তার শুনবে না। তাই চুপচাপ মেনে নিয়েছিল। মেনে নিতেই হয়েছিল। না হলে—

ছরছর করে ঘাড়ের ওপরে খানিকটা জল ঢেলে দিল শর্মিলা। ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত যেন আগুনের মত জ্বলছে। কান দুটো গরম। কপালের দু'পাশের রগ দুটোও লাফাচ্ছে।

হাতের আঙ্গুল দিয়ে রগ দুটো চেপে ধরল শর্মিলা। তারপরে ছেড়ে দিতেই চোখে পড়ল বাথরুমের আয়নার ওর মুখ ভেসে উঠেছে। মুখ আর চোখ। চোখের নিচে হালকা কালির প্রলেপ। গালের হনুদুটো একটু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু রঙটা এখনও মরেনি। এই চল্লিশে এসে এখনও ধবধবে শাদা রঙ। ঠিক শাদা নয়, শাদার সঙ্গে একটু যেন ফিকে গোলাপীও মেশানো আছে। এছাড়া লম্বা হাঁটু পর্যন্ত ছড়ানো চুল কুচকুচে কালো রঙের। এই চুলগুলোই একটু যত্ন নিয়ে বেঁধেটেঁধে, একটু সেজেগুজে বেরোলে শর্মিলা এখনও মেয়েকে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এমন কি দুজনে একসঙ্গে বেরোলে মেয়ের তুলনায় মাকেই লোকে বেশী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

দেখবেই—দেখবে না কেন? শর্মিলা যে তাকিয়ে দেখার মত। দেখে ও দেখিয়ে তারিফ করার মত। শর্মিলা যেন বাগানের ফুল। ফুল হয়ে ফোটার মত। অন্তত না হলেও হাজারটা গোলাপের রূপ শুষে নিয়েই যেন শর্মিলা ফুটেছিল। একথা কি শর্মিলা জানে না? শর্মিলা জানে। জানে উর্মিলাও। জানত দীপক ব্যানার্জী। না হলে মাইনিং ইঞ্জিনীয়র দীপক ব্যানার্জীর মত অমন কাঠ-খোট্টা লোকটাও রাতারাতি কি করে পাল্টে যাবে? শর্মিলা ভাবে। ভাবতে গেলেই ভাবতে ভাবতে সেকালদিনগুলোর কথা ভীষণ [illegible]

মনে পড়ে। কিন্তু মনে করতে চায় না। মনে পড়লেই বুকের ভেতরে কি যেন একটা শক্ত ঢেলা পাকিয়ে গলার কাছাকাছি এসে আটকে যায়।

যেন সেইরকমই কিছু একটা হচ্ছিল। কি যেন একটা শক্তমত গলার কাছাকাছি এসে দলা পাকিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল শর্মিলা। খুট করে একটা শব্দ তুলে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেই বাইরে তাকাল। বাইরে এখন ফাল্গুনের পাতলা রোদ। রোদটা ইতিমধ্যেই সোনালী থেকে শাদা হতে হতে ঘরের মেঝেতে এসে ছড়িয়ে পড়েছে। আর একটু পরেই জানলা দিয়ে লাফিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়বে। আর তারপরেই ওর দাপটের চোটে মাঠঘাট জ্বলবে। এরিমধ্যে কেমন গরম পড়তে শুরু করেছে।

মাথাটা মুছতে মুছতে শর্মিলা এগোল। কিন্তু দু'পা যেতেই থমকে দাঁড়াতে হল। ও ঘর থেকে একটা শব্দ উঠছে না? খিল খিল করে কারা হাসছে। হাসিটা আচমকা ভেঙে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ যেন থেমে গেল। তারপরেই খসখস, চুড়ির ঠিনঠিন শব্দ। ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। দু'একটা ফিসফিসে কথার স্বর।

শর্মিলার মাথাটা আবার গরম হয়ে উঠল। চোখের কোণে ক্রূর হাসি। হাসিটা একমুহূর্ত থেকে মিলিয়ে যেতেই হঠাৎ যেন জোরে ডেকে উঠল শর্মিলা, উর্মি—উর্মিলা—

সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটাও পাল্টে গেল। ও ঘর থেকে পড়িমরি করে ছুটে এল যে মেয়েটি তারই নাম উর্মিলা। সিঁথিতে সদ্য সিঁদুরের দাগ। চোখমুখে লাবণ্যের ঢেউ।

মাথা নিচু করে উর্মিলা বলল, কি বলছ কি মা?

—রাধু বোধহয় আজ দেরী করেই আসবে। সেইরকমই বলছিল কাল। তাই বলছি চায়ের জলটা তুই চাপিয়ে দে। আমি আসছি এখুনি পুজোটা সেরে।

স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকেই এই পুজোর ঘরটা বেছে নিয়েছে শর্মিলা। বেছে নিয়েছিল শুধু পুজো করবে বলে নয়। মনের শান্তি ফিরিয়ে আনবে বলে। না হলে শর্মিলার পুজোর ঘরে ত্রেতিশ কোটি দেবতার তিনটিও নেই। আছে একটি—তাও সে যে কী সেটা চট করে বোঝা যায় না। আসলে ওরই সামনে বসে ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করতে করতে শর্মিলা নিজের মধ্যে নিজেকেই ফিরে পায়। না হলে পুজোটুজো কি শর্মিলা কোনদিন করেছে? ও কি জানে এসব?

জানবে কি করে? জানার সুযোগও ছিল না। শর্মিলাদের বাড়িতে পুজোটুজো নিয়ে এত বাড়াবাড়ি ছিল না। বাবা চির-কালই নাস্তিক। তাই বাবার মুখে ঠাকুর দেবতার নাম কোনদিন শোনেনি শর্মিলা। এক ছিল মা—আর ঘরে মা'র নিজস্ব একটা লক্ষ্মীর পট ছিল। তারই সামনে সন্ধ্যেবেলা

ধূপধুনো প্রদীপ জ্বালিয়ে মনে মনে কি সব যেন বলে যেত মা। ওই পর্যন্তই এর বেশী কিছু ছিল না। কাজেই এ হেন বাড়িতে শর্মিলার পুজোটুজো শেখার প্রশ্নই ওঠে না। জীবনের একুশটা বছর ধরে প্রচণ্ড উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে স্কুল-কলেজ-য়ুনিভার্সিটির গণ্ডী পার হয়ে যেই না একটু থিতু হয়ে বসতে চলেছে সেই সময়ে প্রায় আচমকাই বিয়ে হয়ে গেল ওর। বাবার পছন্দ হয়েছিল ছেলেটিকে। তিনকুলে ওর কেউ নেই। তাছাড়া মাইনিং ইঞ্জিনীয়র। ভাল উপার্জন আছে। নাম যশও আছে। আর দেখতেও যেন রাজপুত্র—যেমন রঙ তেমনি নাকমুখ দেহের গড়ন।

শর্মিলাও আপত্তি করেনি। শুধু একটু সময় চেয়েছিল। কিন্তু মাইনিং ইঞ্জিনীয়র দীপক যে ততদিনে ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। মাত্র দু'দিন দেখেছে। একদিন সামান্য কথাবার্তাও হয়েছিল। তাতেই অমন কাঠখোট্টা লোকটা রাতারাতি পাল্টে গেল। পরে একমাসের মধ্যেই চটপট শর্মিলাকে বিয়ে করে কলকাতা থেকে কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়েছিল।

কিন্তু সেই ফেরাই শেষ ফেরা। মাত্র তিনমাসের ভেতরেই এক খনি দুর্ঘটনায় মারা গেল দীপক ব্যানার্জী। ততদিনে শর্মিলা সন্তানসম্ভবা। তারই ভেতরে প্রচণ্ড একটা ঝড় এসে যেন আছড়ে আছড়ে ভেঙেচুরে দুমড়ে মুচড়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল ওকে।

কলকাতা থেকে শর্মিলার বাবা এসে-ছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও শর্মিলাকে ফিরিয়ে নিতে পারেন নি শিশিরবাবু। শর্মিলার এক কথা, এই তিনধড়িয়া ছেড়ে অন্য কোথায় যাবে না সে। এখানেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

সত্যিই তাই। স্বামীর মৃত্যুর পরে নিজেই চেষ্টাচরিত্র করে স্থানীয় একটা কলেজে একজনের বদলী হিসেবে ঢুকেছিল শর্মিলা। কিন্তু ওর ব্যবহার ও পড়ানোর গুণে কলেজ কর্তৃপক্ষ ওকে পারমানেন্ট করে নেয়। ততদিনে দীপকের অফিস থেকে টাকাপয়সা পেয়ে শর্মিলা কলেজ থেকে একটু দূরেই একটা বাড়ি করেছে। উর্মিকেও মানুষ করেছে। শর্মিলার স্নেহের ছায়ায় ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি উর্মিলা ওর বাবা নেই, তাই অভাবে আর অযত্নে মানুষ হচ্ছে। তাছাড়া মাত্র একুশ থেকেই নিঃসঙ্গ শর্মিলার ওই মেয়েটি ছাড়া কে-ই বা আছে? আর সেই মেয়েই সেদিন নিজের পছন্দমত ছেলে বিয়ে করে চলে গেল।

শর্মিলা উঠে পড়ল। কিন্তু ঠাকুর ঘর থেকে বেরোতে গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল ওকে—বাইরের বারান্দায় উর্মিলা দাঁড়িয়ে। হাতে চায়ের কাপ। সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুতোষ হাসছে।

হঠাৎ, হঠাৎ-ই যেন উনিশ বছর আগের একটি দৃশ্য স্মৃতি থেকে উঠে এসে ভীরের

মত বিঁধে গেল শর্মিলার চোখে। কী একটা কাজে খনি থেকে ফিরে আসতে দীপকের দেরী হচ্ছিল। প্রথম প্রথম তেমন ভাবেনি। ভাবতে শুরু করল রাত আটটার পর থেকে। কোনদিন তো এত দেরী করে না ও। তবে! তবে কি হল? খনিতে কোন অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো? কিন্তু অ্যাক্‌সিডেন্ট হলে তো সাইরেন শোনা যেত। খবরও একটা এসে পৌঁছত। সেবার নাকি খনির ছাদ ধ্বসে পড়ায় কয়েকজন শ্রমিক মারা যায়। তাতেই সারারাত আর বাড়িতে ফিরতে পারেনি দীপক। তখন বিয়ে করেনি, সংসারীও হয়নি। কাজেই বাড়িতে ফেরা না-ফেরা এক কথা। কিন্তু এখন তো রীতিমত বিয়ে করে ঘরে একটা বউ এনে তুলেছে কাজেই বাড়িতে না ফিরে আসার কথা নয়। তবে এত দেরী হচ্ছে কেন?

ভাবতে ভাবতে খেয়াল ছিল না শর্মিলার। হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়েই দেখে পেছন থেকে বিনা ভূমিকায় আচমকা ওকে এসে জড়িয়ে ধরেছে দীপক। কখন যে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়িয়েছে, এসেই তারপর জড়িয়ে ধরেছে একটুও বুঝতে পারেনি ও। বুঝতে পেরেই আনন্দ আর আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। চোখ থেকে এক ফোঁটা জলও বুঝি বেরিয়ে এসেছিল শর্মিলার।

হঠাৎ চমকে উঠল শর্মিলা। চিন্তাটা ছিঁড়ে খান-খান হয়ে গেল। চোখে পড়ল, হাসতে হাসতে হাসি বন্ধ করেই কপট রাগে এখন এগিয়ে যাচ্ছে অনুতোষ, তারপর ঊর্মিলার চিবুক ছুঁয়ে আদর করতে যেতেই মুহূর্তে কি যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল শর্মিলার চোখে। গলা খাকারি দিয়ে ডেকে উঠল শর্মিলা, কি হল কি ঊর্মি তোকে যে বললাম—

আচমকা ঊর্মিলার হাত থেকে কাপটা নড়ে উঠেই থেমে গেল। আর একটু হলেই ভেঙেছিল আর কি? তাড়াতাড়ি কাপটা রেখে অনুতোষকে একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে ভেঙিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েই দেখে অদূরে শর্মিলা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে।

শর্মিলা বলল, একটুও বুদ্ধি নেই নাকি তোর? নাকি এটুকু শিক্ষাও দিইনি আমি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—চায়ের সঙ্গে একটা বিস্কিটও দিলি না তুই!

—বিস্কিট ও খায় না মা।

—তাই বলে শুধু চা। খালি পেটে চা খাওয়া কি ভাল?

—তবে যাই; দেখি এখনও বোধহয় চায়ে মুখ দেয়নি। বলতে না বলতেই উঠে পড়ছিল ঊর্মিলা। কিন্তু শর্মিলাই বাধা দিল, থাক। অনেক হয়েছে। এখন আর না গেলেও চলবে। তার চেয়ে বরং এখন আমাকে একটু হেল্প কর। তাড়াতাড়ি জলখাবারটা অন্তত বানিয়ে ফেলি। আশ্চর্য! রাধুটা তো এত দেরী করে না কোন দিন। সকাল সকালই ফিরে আসে।

—কি হয়েছে কি রাধুর? ঊর্মিলা জিজ্ঞেস করল।

—কি আর হবে। ঝোপড়াতে গেছে। মরদটা নাকি তিন দিন পরে ফিরেছে। একটু বোঝাপড়া করেই ফিরে আসবে।

—ওদের বোঝাপড়া মানে তো মারামারি কাটাকাটি। দেখ, আদৌ ফেরে কিনা।

—ফিরবে ফিরবে। পেটে টান ধরলে সবাই নিরাপত্তা চায়। এই ফিরল বলে।

কিন্তু সারা সকালেও ফিরে এল না রাধু। রাধু ফিরল সেই বিকেলেরও পরে। ততক্ষণে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মার সঙ্গে থেকে মাকে সংসারের কাজে সাহায্য করতে হয়েছে ঊর্মিলার। আর ফাঁকা ঘরে শুয়ে বই পড়ে পড়ে আর সিগারেট খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে অনুতোষ। এর মধ্যে যে কতবার ঊর্মিলার ইচ্ছে হয়েছে একবার, শুধু একটিবারের জন্য অনুতোষকে দেখে আসতে, ইচ্ছে হয়েছে ওর সঙ্গে একটু কথা বলে আসতে। কিন্তু যতবারই উঠতে গেছে
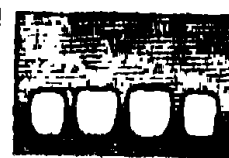
উর্মিলা বাধা দিয়েছে। কোন না কোন কাজে কায়দা করে ওকে আটকে দিয়েছে। উর্মিলা বুঝতে পারেনি। এক-একবার মার মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে ভেবেছে, মা কেন এমন করছে? মা কি চায়? অনুতোষকে বিয়ে করেছে বলে কি মা দুঃখ পেয়েছে? কিন্তু বিয়ের আগে তো একবারও প্রকাশ করেনি! বরং ভেবে দেখতে বলেছে, উর্মিলা ঠিক করছে কিনা? শুধু উর্মিলাই নয়, অনু-তোষকেও ডেকে বলেছে। কিন্তু দুজনে দুজনের পক্ষেই কথা বলে গেছে। তাই শর্মিলাও আর আপত্তি করেনি। তবে এখন কেন এমন করছে? উর্মিলার ইচ্ছে হয়েছিল দু-একবার, বলে ফেলে। বলে, 'মা একটু আসছি আমি?' কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড একটা লজ্জা এসেই আঁকড়ে ধরেছে ওকে। লজ্জার অবশ্য কিছু ছিল না। তবে ভেবেছে চিরদিনের মতই তো চলে গেছে, একটা দিন মা চাইছে বরং মাকেই সাহায্য করি, একটু পরেই তো দেখা হবে।

কিন্তু সকাল গড়িয়ে দুপুর। দুপুরেও শর্মিলার তেমনি ব্যস্ততা। 'উর্মি এটা কর—ওটা এনে দে না—'। সঙ্গে সঙ্গে উর্মিও করেছে। শুনেছে শর্মিলার কথা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যেন উর্মিলা অস্থির। দেহের প্রতিটি রোমকূপে যেন কামনার ঢেউ। শিরায় শিরায় রক্তের ভেতরে কিসের চাঞ্চল্য।

দুপুরে অনুতোষকে একাই খেতে দিল শর্মিলা। উর্মিকে বলল, তুই আমার সঙ্গে খেতে বসিস উর্মি। ডাইনিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শর্মিলা নিজে তদারকি করেছে। আর একটি একটি করে সব রান্না নিয়ে এসে অনুতোষের চারপাশে বসিয়ে দিয়েছে উর্মিলা। তবু অনুতোষকে একান্ত করে পেয়ে কথা বলার সুযোগ হয়নি।

অনুতোষ অবশ্য বলেছে, অনুযোগ করেছে উর্মিলাকে, এত খাদ্য জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু শর্মিলাই সে-গুলো কাটিয়ে দিয়েছে, খাও—খাও—কাল তো অনেক রাত করে এসেছো। কিছুই করতে পারিনি। আজ এটুকু না খেলে চলবে কি করে? তাছাড়া উর্মি আর আমি সারা সকাল ধরে তৈরী করেছি এসব—

অনুতোষ আর কথা বলেনি। আস্তে ধীরে সব খেয়ে নিয়েই উঠে পড়েছিল। পরে ঘরে গিয়ে যখন একটা সিগারেট ধরিয়ে সকালের মতই আবার সেই বই নিয়ে বইয়ের ভেতরেই ডুবে গেছে সেই সময়েই শুধু একবারের জন্য আসতে পেরেছিল উর্মিলা। একটু সুপুরী, কিছু ভাজা মশলা দিয়ে যাবার আগে ফিসফিস করে বলেও গিয়ে-ছিল, দুপুরে খাওয়ার পরেই আসছে সে।

কিন্তু সেই দুপুরটা গড়িয়ে গড়িয়ে এখন বিকেল। তিন ধাড়িয়ার মাঠ-ঘাট, টিলা আর অনেকটা দূরের জংগল এখন পড়ন্ত রোদে একটু একটু করে হাঁপ ফেলে বেঁচে উঠছে। আর একটু পরেই ঝিরঝির করে হাওয়া দেবে। রুক্ষ লাল মাটির প্রান্তরটা শীতল হতে শুরু করবে। তারও পরে আকাশে উঠবে চাঁদ। জোছনা গড়িয়ে পড়বে জঙ্গলের ভেতরে।

সারা দুপুরে একবারও আসতে পারে নি উর্মিলা। অপেক্ষা করে করে একসময় কখন যেন বই হাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে অনুতোষ। তারপর যখন উঠেছে সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন। চারপাশে ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। দুপুরের সেই প্রচণ্ড গরমটাও নেই। বুকের ভেতরে কেমন একটা অপরাহ্নের ক্লান্তি।

সেই ক্লান্তি নিয়েই উঠতে যাচ্ছিল অনুতোষ, ঠিক সেই সময়ে এসে শর্মিলা ঢুকল, বাব্বা ঘুমোতে পারও বটে। এত ঘুমিও না। আমি এসে দু'বার দেখে গেলাম। উর্মি তো বার তিনেক এসে ডেকে ফিরে গেছে।

চমকে ওঠারই কথা। তবু চমকাল না উর্মিলা। অবাক হয়েই ভাবল, কি বলছে কি মা ওকে! কই উর্মিলা তো একবারও এ-ঘরে আসার সুযোগ পায়নি। বরং শর্মিলাই ও-ঘরে বসে বসে, নানা কথা বলে ওকে কাছে ডেকে বসিয়ে রেখেছিল। শেষকালে কলেজের পরীক্ষার খাতার নম্বরগুলো ঠিক দিয়েছে কিনা দেখে দিতে বলল।

একদিকে রাগ আর উত্তেজনা, আর একদিকে কামনা মদির একটা দেহ, সব মিলিয়ে উর্মিলার ভেতরে ভেতরে থরথর করে কাঁপুনি শুরু হল। কিন্তু একটু পরেই ভাবল, আবার থাক না আর তো দুটো মাত্র দিন। তারপরেই তিনধাড়িয়া থেকে চলে যাবে কলকাতায়। অনুতোষের সংসারে। সেখানেই শুরু হবে উর্মিলার সংসার—নতুন জীবন। এসব তুচ্ছ ছোটখাট ব্যাপার-গুলো তখন মনেই থাকবে না। কিন্তু কই আজ সারাদিন কিংবা কাল রাতেও তো ওর কাছে এমন অনর্গল মিথ্যে কথা বলেনি মা। তবে কি—

পায়ে শব্দ তুলে শর্মিলা চলে গেল। নিচে যেন কাদের কথাবার্তা ভেসে আসছে। কারা যেন চাপা গলায় কথা বলছে। কে? কারা কথা বলছে ওখানে? উর্মি—উর্মিলা—দ্যাখ তো কে এল? নাকি রাধু ফিরে এসে এখানেও আবার কারও সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করল। এই রাধু—রাধুয়া—আ—

রাধু নয়, রাস্তা দিয়ে কথা বলতে বলতে কারা অনেক দূরে চলে গেল। তিনধাড়িয়ার বুকে এখন ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। আস্তে আস্তে রাত বাড়ছে।

সেই রাতটাই বাড়তে বাড়তে দশটা পেরিয়ে যেতে উর্মিলা চঞ্চল হয়ে উঠল। মুখে কিছু বলতে পারছে না তবে ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে। শিরায় শিরায় যেন রক্তের নাচানাচি। অনু-অনুতোষ—। অনু-তোষের কাছে গেলেই সেই নাচন যেন প্রলয় হয়ে দেখা দেবে। উর্মি তো তাই চায়। সে তো চায় তার এই কুড়ি বছরের সময়টাকে অনুতোষ তার বুকে ফেলে মন্থন করুক। ওকে পিষে ফেলে তার শিরা-উপশিরা থেকে রস শুষে নিক। কিন্তু শর্মিলা না ভেতরে গেলে যেতে পারছে না সে। শর্মিলা না ঘুমোলে গেলে বোধহয় যেতেও পারবে না সে। এক-একবার এগিয়ে যায়, সামনে গিয়ে কথাও বলে ফেলে, ঠিক তখুনি কোন না কোন কাজে ওর ডাক পড়ে। সারাটা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই চলছে। একবারও ঠিকমত অনুতোষের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। যদিও বা এতক্ষণে একটু সুযোগ হল তাও সেই থেকেই পুজোর ঘরে ঢুকে বসে আছে শর্মিলা। প্রায় ঘন্টাখানেক হতে চলল এখনও বেরোবার নাম নেই। অথচ শর্মিলাকে বেরিয়ে ওদের ঘরের ভেতর দিয়েই যেতে হবে। এই একটাই দরজা। তার ওপর শর্মিলার খাওয়া-টাওয়া হয়নি এখনো। এ-বেলা দুজনে দুদিকে নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে—ওদিকে, জানলার সামনে দাঁড়িয়ে উর্মিলা আর এদিকে বই হাতে সোফার ওপরে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছে অনুতোষ। নিচে বারকয়েক পায়চারিও করেছে। আসলে অনুতোষের ইচ্ছে ছিল না বিয়ের পরে পরেই এখানে এসে থাকার। একবারে সোজা কলকাতায় গিয়ে ওঠার ইচ্ছে ছিল। সেখানে কদিন রেস্ট নিয়ে এখানে ওখানে বেড়িয়ে নতুন চাকরিতে জয়েন করবে ভেবেছিল। কিন্তু সব ব্যাপারটাই ঘুরিয়ে দিল শর্মিলা। বলল, বিয়ে করেছো যখন যাবেই। তাছাড়া চাকরিও পেয়েছো কল-কাতায়--কাজেই তোমাকে কি আর ধরে রাখা যাবে। তাই বলছিলাম যাবার আগে না হয় দিন তিনেক এখানে থেকে যাও।

আপত্তি করেনি আর অনুতোষ। তাছাড়া উর্মির দিকেও তাকাতে হয়েছিল। মাকে ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যাবে তাই একটু সময় নিয়ে দু'দিন থেকে যাওয়াই ঠিক করল। কিন্তু একি! এ কি রকম ব্যবহার! মনে মনে চটে গিয়েছিল অনুতোষ। বিরক্ত হয়েছিল। এমনকি শেষকালে এরকম অধৈর্য হয়েই বলে ফেলেছিল, নাহ আর নয়। তোমার মার এখানে আর কোন দিন আসছি না আমি। আমাকে বোধহয় সহ্য করতে পারছেন না উনি। শত হলেও আমি ওঁনার শিক্ষক ছিলাম তো—

—প্লীজ চেঁচিও না--সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে অনুতোষের মুখ চেপে ধরেছে উর্মিলা, প্লীজ আর একটু ওয়েট কর। মার কানে গেলে দুঃখ পাবে মা।

—না না দুঃখ টুঃখ নয়—এটা রীতিমত অবজ্ঞা। অ্যাভয়েডিং টেনডেন্সি—এতক্ষণে অনুতোষও যেন ছটফট করে উঠেছে। ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা। আর যেন পারবে না সে।

ওদিকে সত্যিই আর পারছিল না শর্মিলা। মনটা বারবার পেছনে চলে যাচ্ছে। কে যেন চুম্বকের মতই টেনে টেনে ওর মনটাকে ক্রমশ অনেকটা দূরে নিয়ে চলে গেল।

অনু-অনুতোষ। এই একটা নামই তখন

কলেজের চারপাশে গুণগুণ করত। নতুন এসেছে ছেলেটি। বাড়ি কলকাতায়। অসম্ভব রেজাল্ট আর সুন্দর সুপুরুষ একটি চেহারা নিয়েই একদিন এসে উঠল তিনধড়িয়ার কলেজে। আর দুদিন পড়াতে পড়াতেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়মন সব জয় করে নিয়েছে অনুতোষ। শুধু ছাত্র-ছাত্রীরাই নয় ইংরেজীর অধ্যাপিকা শর্মিলা ব্যানার্জীও কি চমকে ওঠেনি?

অবাক হয়েছিল শর্মিলা। চমকেও উঠেছিল। মনে হয়েছিল, অনেক অনেক দিন পরে তার হৃদয়সমুদ্রে ঢেউ উঠেছে। স্বামীর মৃত্যুর পরে এ পর্যন্ত কোন পুরুষের সঙ্গেই ভাল করে কথা বলতে পারেনি। ভয় হয়েছিল। তাছাড়া ইচ্ছেও হয়নি। কি বলবে কি শর্মিলা? কি-ই-বা বলার আছে? ঊর্মিলা আর কলেজ এই নিয়েই কাটিয়ে দিচ্ছিল কোন রকমে। কিন্তু হঠাৎ সে সময়ে ঝড় উঠল। মনের দরিয়া তোলপাড় করে আকাশ সমান ঢেউ উঠল। সেই ঢেউয়ে অনুতোষের নামটা বারবার ধাক্কা খেতে খেতে এক সময় স্থির হয়ে গেল। মনে মনে কেন জানি না অনুতোষকে কখন পছন্দ করে বসল শর্মিলা।

কিন্তু মৃণাঙ্করেও বুঝতে দিল না। কাকপক্ষীও টের পেল না। অনুতোষকে ডাকে, সমানে বসে কথা বলে, বাড়িতে ডেকে নিয়েও খাওয়ায়, এমনকি অনুতোষকে নিয়ে কলেজের কাজেই এখানে ওখানে যায় তবু কেউ বলতে পারে না, বুঝতেও পারে না কেউ শর্মিলার দুর্বলতা আছে।

আসলে দুর্বলতাও নয়, অনুতোষকে শেষ পর্যন্ত ভালবেসে ফেলল শর্মিলা। কিন্তু তবুও শর্মিলা সংযত। শান্ত এবং স্থির। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে মন, প্রকাশ করার জন্য ছটফট করেছে তবুও শর্মিলা অনুতোষকে জানায় নি। একএকদিন রাতে অসম্ভব চঞ্চল হয়ে পড়েছে, শিরায় শিরায় যেন রক্ত নেচে বেড়িয়েছে, ইচ্ছে হয়েছে অনুতোষের কাছে ছুটে যেতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংযমের বেড়াজাল এসে চারপাশে ঘিরে ধরেছে। এমন কি মধ্যরাতে উঠে মনের কামনাকে দমন করার জন্য মগের পর মগ জল মাথায় ঢেলেছে। ঢেলে ঢেলে সারা শরীরটা ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। কিন্তু এতকরেও তবু থাকতে পারে নি শর্মিলা। শেষ পর্যন্ত ঊর্মিকে পড়াবার জন্য বাড়িতেই অনুতোষকে নিয়ে এল। ভেবেছিল, এবার হয়ত আর বলতে হবে না। নিজে থেকেই এবার বলবে অনুতোষ। তাছাড়া শর্মিলার ধারণা, অনুতোষও পারছে না এভাবে। শুধু একটু বলার অপেক্ষা।

অবশেষে কথাই বলে ফেলল অনুতোষ। বলল, তবে শর্মিলাকে নয়। ঊর্মিলা, [illegible] বিয়ে করতে চায় সে।

—অনু—অনুতোষ। কি বলছ কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বলতে গিয়েও সেদিন বলতে পারেনি শর্মিলা। হঠাৎ স্থির হয়ে থেমে গিয়েছিল। মুহূর্তেই ওর তরল নরম মনটা যেন এক অসম্ভব আঘাতে নিরেট পাথর হয়ে গিয়েছিল। কোন কথাই আর বলেনি। বলতেও পারেনি। শুধু নীরবে মেনে নিয়েছিল। মেনে নিতেই হয়েছিল। আর তারপরেই মাস ঘুরতে না ঘুরতেই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের বিয়েটা দিয়ে দিল শর্মিলা।

হঠাৎ কী একটা শব্দে চমকে উঠল শর্মিলা। ভাবতে ভাবতে এতক্ষণ কখন যে রাত দশটা বেজে গেছে সে খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল মেঘের গুরু গুরু শব্দে।

ঠাকুর ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল শর্মিলা। কিন্তু খেয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই রাত এগারটা বেজে গেল। ততক্ষণে গুরু গুরু শব্দটা বেড়েছে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আকাশটাকে কে যেন চৌচির করে দিচ্ছে।

ঘরের লাইটটা নিভিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতেই শর্মিলার চোখে পড়ল তিনধরিয়ার আকাশে মেঘ। মেঘ জমে উঠেছে। একটু আগেও জোছনা ছিল। এখন জোছনাটোছনা মরে গিয়ে আকাশে ঘন কালো মেঘ। কেমন একটা গুমোট ভাব চারপাশে। বাতাসটা বন্ধ হয়ে এসেছে। হয়ত আবার শোঁ শোঁ করে শুরু হবে। তারপরই নামবে বৃষ্টি।

আকাশের দিকে তাকাতে গিয়েই চোখদুটো বড় বড় করে জ্বলে উঠল শর্মিলার। ভেতরে জোরাল হাওয়ায় ঘরের পর্দাগুলো উড়ছে। ধুলো উড়ছে শাদা হয়ে। হঠাৎ শর্মিলা চোখে হাত দিল। আজও বোধহয় সারাটা রাত জেগে কাটিয়ে দিতে হবে। আর তার মধ্যেই যত হিজিবিজি স্বপ্ন। একটা সাপ, মাথার ভেতরে গাছপালা, সাপটা পাকিয়ে পাকিয়ে দেহের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। শর্মিলা ভয় পেল। কিন্তু চিৎকার করার আগেই বুকের ভেতরে যেন যন্ত্রনা শুরু হয়েছে। কতকাল, আর কতদিন এভাবে এই জীবনটা বয়ে বেড়াবে শর্মিলা। সকাল থেকে উঠেই এক কাজ এক নিয়ম, তারওপর বাড়িতে

ফিরে এলেও ফাঁকা বাড়িটা যে ওর বুকের ভেতরে চেপে বসে। কান্না পেয়ে যায় তখন শর্মিলার।

শর্মিলা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কিন্তু কেঁদে উঠতে গিয়েও আচমকা কি দেখে যেন চমকে উঠল। কান্না বন্ধ হয়ে গেল ওর। সামনে কাঁচের জানলায় ওপরে একজোড়া নারী-পুরুষের ছায়া। কিন্তু এখানে? প্রথমটায় চমকে উঠেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল শর্মিলা। তারপরেই বুকের ভেতর চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠল। চোয়াল কঠিন, দুই ভুরুর মাঝখানে আলপিনের মত রেখা জেগে উঠেছে। মন [illegible] অভিজ্ঞতা থেকেই শর্মিলা জানে এবার নারী এগিয়ে আসবে আর পুরুষটি তাকে ধরে নেবে।

মেয়েটি এগিয়ে গেল। শর্মিলার দু-চোখে দাউ দাউ করে আগুনের শিখা উঠছে। হিংস্র শ্বাপদের মত দুটো চোখ। দেহটা কাঁপছে থর থর করে। আর সারা মুখে যেন রাগ—রাগ ছিটকে পড়ছে।

মেয়েটি এতক্ষণে হাত তুলে দিল। পুরুষটি এবার এগিয়ে যাচ্ছে। বুঝি এইবার—

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড এক হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল শর্মিলা। ঝাঁপিয়ে নয়, নিজের ঘরটা পার হয়ে বাইরের বারান্দায় এসেই দৌড়ে গিয়ে দরজার ওপরে ধাক্কা দিল প্রথমে, তারপরেই ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার গলায় ডেকে উঠল এই ঊর্মি—ঊর্মি—দরজাটা খোল মা একবার, আমার শরীরটা কেমন করছে।—ঊর্মিলা—

কিন্তু ঊর্মিলা কোথায়! [illegible] ততক্ষণে একটা কামনারাদির দেহ হঠাৎ যেন ফুঁসে উঠেছে। থরথরিয়ে কাঁপছে তার দেহটা।

যেন সেই কাঁপুন নিয়েই উঠল সে। কাঁপতে কাঁপতেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এবার যেন জোরে করেই দরজাটা খুলে ফেলবে সে। খুলেই এক [illegible] [illegible] হবে।

ভালবাসার আমত্বত্ব চর

সেলিনা হোসেন

সন্ধ্যায় মোষগুলো গোয়ালে বাঁধতে এলে মেজাজ খারাপ হয় জলিলের। এই ঘরে ফেরাটা বড্ড বিচ্ছিরি ব্যাপার। যার ঘর নেই তার সবটাই ঘর। শুধু মোষগুলোর জন্যে ওকে ফিরতে হয়। তার চাইতে ঐ বাসড়া জমিটা অনেক ভাল। অনাবাদী জমির কুটকুটে ঘাস ওর শরীরের লোমের মত। ছ্যাঁদা দিয়ে বাতাস ঢোকায়। কুটকুট করে খাঁমিয়ে রাখে জলিলের কলজে। তখন সারা শরীরে আগুনের আঁচ টের পায় ও। শীতের সকালের নাড়া-জ্বালানো আগুন নয়। একদম কড়কড়ে। ভাজা ভাজা আগুন। তখন ঐ উটকো-মুখো পতিত জমি জলিলের জীবনে ভরা জোয়ার হয়। হুড়হুড় করে ঘোলা জল ঢুকতে দেয় ও। আর মোষগুলোর মত লোভ মৈশনা ক্ষেতের দিকে। জলিল সইতে পারে না। ক্ষেত মানে ফলন। ফলন সম্ভাবনার। ক্ষেত মানে ফসল। ফসল ভরাপেট মানুষের মত। সুখী। আদুরে। ঢুলঢুলু। তাই শস্যভরা ক্ষেত জলিলের দু'চোখের বিষ। ইচ্ছে করে মাড়িয়ে দেয়। সুযোগ পেলে মোষ ছেড়ে দিয়ে এক অংশ সাফ করে ফেলে। গায়ের ঝাল মেটায়। কার উপর মেটায় তা নিজেও বুঝতে পারে না। তখন কালাচরণের মারমুখী বৌটার মত অবিশ্রান্ত গালাগাল ওর দু'কান ভরে বাজে।

সন্ধ্যায় গোয়ালে ধোঁয়া দেবার সময় যেমন চোখ জ্বলে, সেরকম একটা জ্বালা বুকেও। মশা তাড়াতে তাড়াতে আপনমনে গজ্ গজ্ করে জলিল। সে সুযোগে জ্বালাটা আনুরি হয়। থকথকে আঁধারের ভুশমাগী। জ্বালার নাম মামাবাড়ি। সে কারণে মামাবাড়ির ঝকঝকে দাঁত বের-করা ভাতের থালা লাথি দিয়ে ফেলে একদিকে চলে যেতে ইচ্ছে করে। মামার সম্পর্কটা মোষের কালো পিঠের মত। রোঁয়া ওঠা। খাবড়া খাবড়া দাগে ভরা। সমান কিছুতেই হয় না। তেমন হারামি মামাতো ভাই-গুলোও। ওদের দশাটা মোষের মতই দেখে জলিলকে। আগাছা বাছার কায়দায় উপড়ে ফেলতে পারলে বাঁচে। লোকলজ্জা, সমাজ, বোনের মুখ ইত্যাদি কারণে পারে না। তাই জলিলকে [illegible] লাঠিয়ার উঁচিয়ে কাজ করিয়ে নেয় [illegible] আপত্তি নেই ওর। সারাদিন খাটতে পারে। হাসিমুখেই পারে। তার বদলে চাই একটু আদর সোহাগের কথা, একটু ভালোবাসার ঠাণ্ডা মিচছির পানি। শালা সেটা দিতেও ওদের বুক বেচাল হয়। যেন এক কানি জমি গেল আর কি! ঘরে ফিরলেই গালমন্দ ছোট-খাটো ত্রুটিতে প্রহার। কত আর সহ্য হয়!

মাঝে মাঝে মামার ওপর রাগ হয় জলিলের।

আপন মামা তাও এটুকু দরদ নাই। নসীব মন্দ অইলে এমুনই অয়। কিন্তু, পরক্ষণে সে রাগ নিজের ওপর এসে গড়ায়। যার বাপ থাইকা নাই, মা থাইকা নাই, তার আবার মামা কে? তিন বেলা ভাত খায় এইতো বেশি।

থ্যাবড়া হাত থড়াস করে উরুর ওপর মারে। ডাঁসা মশা একটা রক্ত খেয়ে শেষ করলো। গোয়ালে মোষগুলো নড়াচড়া করে। শুয়ে শুয়ে সে শব্দ শোনে জলিল। ভাবে, উঠে গিয়ে ওদের গা চুলকিয়ে দেবে। একটু হাত বুলোলে জলিলের মুখের কাছে নাক নিয়ে আসে। একদম শান্ত হয়ে থাকে। তখন কি যে ভালো লাগে। জীবনটাকে আর জলের নিচের পতিত ময়লা মনে হয় না।

গভীর নিঃশ্বাস বাতাস হয়ে বয়ে যায়। গোয়ালটা হয় উজান গাঙ। ওদের অস্থিরতা বাড়তেই উঠে পড়ে জলিল। ধুত, মোষের গা চুলকোনই ভালো। ঘুম না আসা বড় বিশ্রী। মোষগুলোর কথা চিন্তা করে জলিল বিড়বিড়িয়ে মশার গুষ্ঠী নিপাত করে। এ্যাই, তোরা সবুর কর, মুই আইয়া পড়ছি।

ঝাঁপ উঠিয়ে নিঃশব্দে ঢোকে জলিল। শুর সাড়া পেয়ে ওদের মুখে চপ্‌চপ্‌ শব্দ হয়। জলিল সকলের গায়ে হাত বুলোয়। কালো শরীরগুলো অন্ধকারে মিলেমিশে আছে। তবুও চিনতে কষ্ট হয় না। শরীরে হাত দিলে ঠিক টের পায় কোনটা কে? পারুল, জুটান, জোবান, জবা। সব জলিলের দেয়া নাম। তোগো বেবাক লোম মোর চেনা। জলিল ঘন করে শ্বাস নেয়। দুর্গন্ধভরা গোয়ালটা মাথায় ঝিম ধরায়। মশার গুঞ্জন এখন কম। তবু কামড়ের শেষ নেই। জলিলকেও অস্থির করে। একমুঠি বিচালী বিছিয়ে পারুলের গলা জড়িয়ে ঘাড়ের ওপর মাথা রাখে ও। মনে মনে ডাকে, আয়, ঘুম আয়। সকালে মামা উঠে ওকে বারান্দায় না দেখলে হৈ চৈ করবে। মুয়াজ্জিনের আজানের মত সুরেলা গালাগাল ছড়িয়ে দেবে চারদিকে। তারপর যখন ওকে গোয়ালে দেখবে তখন মনে মনে খুশি হলেও প্রকাশ্যে গাল দেবে।

মোইষ একটা। যেমুন মোইষের মতন চেহারা তেমুন আচার-আচরণ। কেউ মোইষের লগে রাইত কাডায়, জন্মেও দেহি নাই। বাপ-দাদা চোদ্দগুষ্টির বাইরে অইছে এইডা।

জলিল উত্তর দেবে না। গামছা কাঁধে পুকুরঘাটে যাবে। তারপর এক থালা পান্তা খেয়ে মোষ চরানোর দায়িত্ব পালন। এইতো ওর রুটিন। জলিল অন্ধকারে মশা তাড়াতে তাড়াতে অকস্মা শব্দ করে হেসে ওঠে, মামা আপনে ঠিকই কন। মুই মোইষ ছাড়া আর কি। মোইষ হইতেই মোর ভাল লাগে। তাও যদি আপনাগো আদর সোহাগ এট্টু পাইতাম।

রাতের কত সময় যানে না ও। নুর, জেনেই বা কি হবে! আজ বুঝি ঘুমটা জলিলের আর আসবে না। মশার কামড় গা-সওয়া হয়ে গেছে। পারুল জিভ দিয়ে একবার গালটা চেটে দিয়েছে। তুই মোর বৌ। পিঠে মাথা ঘষতে ঘষতে জলিল বিড়বিড় করে কথাটা বলে। তুই মোর আমতুতু বৌ। কপালে একটা আঁঠালী ঠেকে। এই পোকাগুলো মোষের রক্ত চুষে খায়। জলিল হাতের আন্দাজে আঁঠালীটা উঠিয়ে দাবে ছুঁড়ে মারে। পারুল ওর প্রিয় মোষ। আর প্রিয় মানেই আমতুতু। জলিলের সোহাগ। পারুলের শরীরে চমৎকার কান্তি আছে। মোর মামা একটা আঁকাড়া চাষা। কেবল মেজাজ। কেবল গরগরানি। কই তেমন না। জলিল পারুলের সারা শরীরে হাত বুলোয়। পারুল কান দোলায়। জানান দেয়, আমিও জেগে আছি। তোর জন্যে আমারও ভালোবাসা। তুইও আমার আমতুতু। মোর মামা ম্যালা জমির মালিক। মোর মামা অইল আইলা-রাজা। বুজজো পারু, ঐ জমিতে মোর ভাগও আছে। মোরে দ্যায় না। মুইতো হিসাব বুজি না। যহন হিসাব পামু তোরে নিয়া হেইখানে যামু গিয়া। মুই ঘাস লাগামু, তুই খাবি। ক্যাবল খাবি আর বকুনা বাছুর দিবি। বকনা বাছুর। তোরে দিয়া হাল বাওয়াইতে মোর ভালো লাগে না। এই জন্যে তো কই মোর মামাডা মানুষ না। ঐ যে কিনা কয় একদম ভেউড়া শিয়াল।

জলিলের চোখ বুঁজে আসে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও স্বপ্ন দেখে ভাগে জমি পেয়ে গেছে। সেটা ও দখল নিয়েছে। সবুজ ঘাসে অদরকদর সে জমি। পারুল নিশ্চিন্তে ঘাস চিবুচ্ছে। জলিল আলের ওপর শুয়ে আছে। পারুলের খাওয়া দেখছে। বুকটা টনটন। গর্বে, আনন্দে। পারুলের চকচকে মোটা শিঙে ঝিঙে বসে আছে। জলিলের কানের কাছ দিয়ে উত্তরালি বয়। উত্তর দিক থেকে শাঁই করে এসে কানে ঢুকে যায়। ঠান্ডা, হিম। জলিলের কলজে কামড়ে ধরে। তখন মনে হয় জমির জন্যে মামা ওকে ছাড়বে না। জমিটুকু নিজের নামে লিখিয়ে নিতে পারলেই ওকে তাড়িয়ে দেবে। করপ.. করপ. .করপ...কিসের যেন শব্দ। থামতেই চায় না। মাথা ঝিম ধরে থাকে। কবপ... করপ...করপ...করপ। আঃ কিসের শব্দ। আলের ওপর শুয়ে থেকে জলিল থুপো থুপো ঘাসের গুচ্ছ আঁকড়ে ধরে। পরক্ষণে ও অবাক হয়ে দেখে শব্দটা পারুলের ঘাস চিবোনোর। ও কিছুতেই ঠিকমত চিবুতে পারছে না। তাই বিচিত্র শব্দ। করপ...করপ...কবপ। জমিডা আর রাখতে পারলাম নারে পারুল, মামা ঐডা নিবই নিব। য্যামনেই হোক নিব। ছাড়ব না।

ঘুম ভেঙে যায় ওর। বুকটা থোতাবোতা হয়ে থাকে। কেমন যেন কষ্ট। কপা কপা ব্যাথা। থেকে থেকে গাঁক করে ওঠে। কখনো মোষের লোমের মত কুঁকড়িয়ে যায়। উশমকুশম ঘরের আবহাওয়া। চনা-নাদিতে একাকার। নাকে ঝাঁঝালো গন্ধ ঢোকে। জলিল তবুও ওঠে না। তেমনি-ভাবেই বসে থাকে। হিসেব করে কার্তিকের।

কার্তিকের এখনো দুমাস বাকী। ঘাস খাওয়াবার জন্য মোষ নিয়ে চরে যেতে হয় কার্তিকে। চারমাস থেকে আবার চৈত্রে ফেরা। এসময় এদিকে একদম ঘাস থাকেনা। মোষগুলো শুকিয়ে কাঠ কাঠ হয়। তখন চরে নিয়ে ওদের নাদুস নুদুস বানাতে হয়। গত বছর অসুখ ছিল বলে যেতে পারেনি। এ বছর যাবে। মন মান ঠিক করে ফেলে আর আসবেনা। ওখানে থেকে যাবে। ভীষণ জব্দ হবে মামা। বুঝবে তার সংসারে জলিলের প্রয়োজন আছে কিনা। বুকে প্রচন্ড অভিমান। এতক্ষণে টের পায় ব্যাথাটা অভিমানের। ব্যাঙের মত লাফায়। তারপর উবু হয়ে বসে। তখনই একটা চাপ লাগে। ভাগিস এ এলাকায় বাঘ হয়না। জলিল মনে মনে ফুর্তি পেলো। নইলে এমন এক-দলমোষ নিয়ে কিছুতেই বের হতে পারত না। বের হতে পারলেই শান্তি। তখন সমগ্র চর অঞ্চলে নিজেকে রাজার মত লাগে। মোষগুলো ওর প্রজা। রাজত্বে অনাবিল শান্তি। অযথা হৈচৈ নেই।

সবচেয়ে বয়সী মোষটা অস্থির হয়ে উঠেছে। এমনিতে ওটা বড় বেশি একগুঁয়ে। সামলাতে কষ্ট হয়। পেছনের পা দিয়ে শূন্যে লাথি ছুঁড়ছে। অর্থাৎ দরজা খোল। বাইরে যাব। বাইরে এখন উজলা প্রহর রোদ না উঠলেও চকমকে আলো চারদিকে। অগত্যা জলিলকে উঠতে হয়। ওদের বের করতে হয়। বাইরে এনে ভুঁষির গামলা মুখের কাছে রাখতে হয়।

মামী পান্তা তৈরী করে রেখেছে। পান্তা আর মরিচ পোড়া। মামী ওকে খাওয়াটা ঠিকমত দেয়। এই ব্যাপারে গাফিলতি করেনা। জলিল গপাগপ খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। গরু-মোষ হাঁটার সরু আটলায় এসে বিড়ি বের করে একটা। পুকুরঘাটে ময়নাকে দেখে এসেছে। উবু হয়ে মুখ ধুচ্ছে। বয়সে জলিলের বড়। পায়ে একটা খুঁত আছে বেশি টাকা-পয়সা খরচ করলে বিয়ে হয়ে যায়। অথচ ঐ খরচের ভয়ে মামা এগুচ্ছে না। ওকে খুঁটির বুড়ি বানাচ্ছে। জলিলের মেজাজটা চন করে উঠে। সাধেই বলে মামাটা মানুষ না। থু করে একদলা থুথু ফেলে ও। কাউয়াবিবি লতার ওপর ধক্ করে পড়ে দলাটা। আঃ লতাটার গায়ে সি সুন্দর লাল লাল ফুল ধরে আছে। কেনো মিছেমিছি থুথু ফেললো? জলিলের মন খারাপ হয়ে গেলো। ফুলগুলো অযত্নে ফুটে আছে। কেউ ওদিকে চায়না মামী বলে, ময়না ছনন কপালী। বর জুটবেনা। মিথ্যে কথা। ইচছে থাকলেই জুটবে। সে ইচছে ওদের নেই। ঘরে বসে মুখে ঠুঁটি দিয়ে রাখলে কি মেয়ের বিয়ে হবে? জলিল রাগের চোটে ধড়াম করে কাঁটাঝোপে লাথি বসিয়ে দেয়। ময়নাবু মুই তোমার বিয়া দিমু। ঠিক কইলাম। দেইখো এটটুও মিছা না। হাওলাদারের পেয়াডা তো কয় মুই দুই কানি জমি লেইখা দিলে তোমারে বিয়া করবে। মুই দিমু ময়নাবু। কেবল তুমি মোরে এটটু ভালোবাসা দিও। তুমিতো সগীর দফিরের মত না। ওরাতো শয়তান কেবল মোরে মারতে চায়। ওরা মোর ভাই না। জলিল হাঁটতে হাঁটতে বিড়ি টানার কথা ভুলে যায়। মোষগুলো এদিক ওদিক চলে গেছে। আবার ওদের জড়ো করে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। কাল থেকে বয়সী [illegible] হালে জুড়বে ওরা। তাহলে কদিন [illegible] একটু আরাম পাওয়া যাবে। [illegible] পারুল-টাকে বড্ড জ্বালায়। [illegible] দিকে এগোয় ও। পরিত্যক্ত জমিতে ঘাসের [illegible] হয়। সেগুলোর জন্যে [illegible] লোভ। ও জায়গাটা জলিলের [illegible]। শুকনো। ঘন পাতায় ছায়া ছায়া। মোষ ছেড়ে

নিশ্চিন্তে চোখ বুজে শুয়ে থাকা যায়। বর্ষায় মাঝামাঝি হলে হবে কি, কদিন থেকে একদম বৃষ্টি নেই। খরা খড়াড়া দিন। ভ্যাপসা গরম শরীর পোড়ায়। কাদা এখনো শুকোয়নি। পা দেবে যায়। কোথাও থকথকে ঘাটঘাটালি। মোষগুলো দুধারের কালিকদম ঘাস মুখে নিয়ে চিবুতে চিবুতে চলেছে। গগলাডিং—গগলাডিং—গগলাডিং। পাখি ডাকে একটা। জলিল থমকে দাঁড়ায়। না, পাখিটা দেখা যাচ্ছেনা। কেবল ডাক শোনা যায়। পাখিটা ওর প্রিয়। মোষ চরাবার সময়টাতে ঐ ডাকটা শোনা চাই। নইলে ভালো লাগে না। দূরের কাপিলা গাছের মাথায় হয়তো থাকতে পারে। ডাকটা আস্তে আস্তে সরে যায়। জলিল আর দাঁড়ায় না। মাথার মধ্যে শব্দটা বাজতে থাকে। গগলাডিং—গগলাডিং—গগলাডিং। ময়নাবু তুমি ভাইবো না। মুই ঠিক তোমার বিয়া দিমু। গগলাডিং—ময়নাবু এবার তোমার শ্বশুরবাড়ি অইব। গগলাডিং—ময়নাবু তোমার চাঁদ উজালা পোলা অইব। তুমি মোর মার মত অইয়ো না ময়নাবু। পোয়া থুইয়া আর কারো সংসারে যাইয়ো না। তাইলে পোয়ার বড় কষ্ট অয়। দুনিয়ায় তার আর কেউ থাহে না। বাতাসে ভাসা কুটার মত অইয়া যায়।

জলিলের চোখটা চিকচিকিয়ে ওঠে।

আজ আর দুপুরে খেতে যাবার কথা মনে থাকে না জলিলের। পেট ভরে বুতিজাম চিবোয়। এবড়োখেবড়ো মাঠটায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। অল্প খাওয়ার অভ্যেস হয়ে গেছে ওর। খাওয়ার প্রতি কোন টান অনুভব করে না। ঘুরতে ঘুরতে ভোবনের কাছে এসে দাঁড়ায়। জলিলের বুকটা আর্দ্র হয়ে যায়। মোষটা একটু বিলাসী। আইয়াশ করতে ভালোবাসে। একদম অলস। আড়ে আড়ে শুধু জবার দিকে চায়। জবাটার বয়স বেশি না। সে তুলনায় বেশ নাদুসনুদুস হয়ে বাড়ছে। দেখতে আদর আদর লাগে। এজন্যে জোবানটার খেয়াল পড়েছে জবার দিকে। জলিলের হাসি পায়। ব্যাটা মরদ হচ্ছে। ভুটানের শরীরটা ভালো না। কিছুতেই গতর ফেরে না। হাড়গোড় বেরিয়ে থাকে। তেমনি মেজাজের রাজা। যাকে তাকে গুঁতোতে চায়। কেবল জলিলের সামনে একদম সুবোধ। যেন নটে গাছটি ও মুড়োতে জানে না। কখন পারুল এসে পাশে দাঁড়িয়েছে টের পায় না। পারুল আস্তে করে শিং ঘষে জলিলের পিঠে। জলিল গলা জড়িয়ে ধরে। গন্ধ নেয়। তুই মোর আমতুত্ বৌ। আঁঠালী বেছে দেয়। চকচকে শিং কামড়ায়। পারুল আদরে নিশ্চুপ থাকে। দূরে ভুটানের পিঠে কালো ঝিঙে লেজ নাড়ায়। ও কিছু বলে না। বিরক্তও হয় না। হেলেদুলে এপাশ-ওপাশ চলে। বাসুড়ের গোটা পরিবেশটা জলিলের চোখে ছবির বইয়ের মত উল্টে যায় : আঃ কি আনন্দ! এটাই ওর শোবার ঘর, কাচারি, রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর, পুকুরঘাট পাতদুয়ার। ওর গোটা সংসার। চারদিকে ধানের পালা। অড্ডাম্বিন ধান মাড়াইয়ের উৎসব। এর মাঝে পারুল কেবল বকনা বাছুর বিয়োয়। এখান থেকে ও আর কাথাও যাবে না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। মোষগুলো এক জায়গায় জড় হয়েছে। বিশ্রাম নিচ্ছে। ওদেরও বাবার তাড়া নেই। বয়সী মোষটা একদম শান্ত। যেন সারাদিন মাঠের কাজ করে এসে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছে। জলিল মিলিয়ে দেখলো ঐ মোষটা ওর বাপের মত। গোয়ার্তুমি আর জেদ ছাড়া জীবনের আর কোন সম্বল নেই। গড়া জিনিস ভেঙে দিতে ভালোবাসে। এপর্যন্ত সাতটা বিয়ে করেছে। একটাও রাখতে পারে নি। যেজন্যে বাপের সঙ্গে ওর থাকা হোল না। বাপের সংসার বিছুটির মত। জ্বালা ছাড়া আনন্দ নেই। অথচ বাবা, জলিল বুঝতে চায় উত্তাপ, ছায়া ঠাণ্ডা জল। কেবল কথার নয়। দৃষ্টির। দৃষ্টি বুনিয়ে দেবে গভীরতা কতটুকু। কিন্তু আদরে উত্তাপের বদলে জলিল পেয়েছে গনগণা তাপ। বয়সী মোষটা আজ ওর দিকে কেমন করে যেন তাকাচ্ছে। বোবা ভাবা প্রকাশের বেদনায় অসাড়। জলিলের শরীর কমন করে। প্রবল আবেগে কেঁপে যায়। বাবা—আমার বাবা। ও গলা জড়িয়ে ধরে। গরম শ্বাস মুখের ওপর পায়। কোন কিছুই আর ভালা লাগে না। বুকের ভেতর গগলাডিং। বয়সী মোষের শ্বাসে ঘাসমা গন্ধ। আটাশ বছরের ফেলে আসা চরাচর সে গন্ধে ম ম করে। মনে হয় বয়সের প্রত্যেকটা বছর যেন ছোট্ট মোষের বাচ্চা হয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে ওর দিকে ছুটে আসছে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। কারো যাবার কোন তাড়া নেই। ভুটান শুন্যে পা ছোঁড়ে না। অন্যদিন ওকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আজ নিঝুম। জাবর কাটে আর মাঝে মাঝে মশা তাড়ায়। জলিলের শরীরে আমেজী আবহাওয়া। মৃদুমন্দ। এভাবে শুয়ে থাকাটাই জীবনের লক্ষ্য। মাঝে মাঝে ঘাসের পোকার ডাক সরব হয়। আবার কমে যায়। জলিল ঠিক করে ফেলে আজ ও আর বাড়িতে ফিরবে না। ঐ ঝিঁ ঝিঁ শব্দ বুকে নিয়ে সারারাত এই মাঠে শুয়ে থাকবে। পেটের ভেতর চিনচিনায়। বুতিজামের রেশ অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। ও আমল দেয় না। চোখ বুজে আসে। মনে মনে হাওলাদারের ছেলের পাশে ঘোমটা মাথায় ময়নাকে বসিয়ে দৃশ্যটা কল্পনা করে। চমৎকার মানাবে। মনে মনে পুলকিত হয়। অনেকগুলো বছর ময়না বড় নিঃসঙ্গ কাটিয়েছে। এবারও ময়নার শরীরের মালিকানা আরেকজনের হাতে তুলে দেবে। তাতে ওর কোন সুখ নেই। ময়নার সুখ। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে জলিল।

মামাতো ভাই সগীরের একটা লাথি কোমরের কাছাকাছি পড়তেই ঘুমটা ছুটে যায়। ঘুম-জড়ানো চোখটা টান টান করার আগেই আরেকটা। গাঁক করে ওঠে। সেই সঙ্গে দু'কান ভরে বাজে মামার অশ্রাব্য গালাগাল। ওরা ওকে খুঁজতে বেরিয়েছে। ভুটান শিং বাঁকিয়ে তেড়ে ওঠে। সগীর সরে যায়। সেই ফাঁকে জলিল উঠে দাঁড়ায়। একটা কথাও বলে না। মামার গালাগাল ওর কানে ঢোকে না। শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে। পুরো সংসারটা জাহান্নাম করে দিয়ে ওরা চার-পাঁচজন মোষের দঙ্গলটা তাড়িয়ে নিয়ে যায়। অগত্যা জলিলকেও পিছু পিছু হাঁটতে হয়। পারুল মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়। ডাক ছাড়ে। সগীরের লাঠির ঘায়ে আবার চলতে শুরু করে। জলিল বোঝে পারুল ওকেই খোঁজে। আঁধার তেমন নিবিড় নয়। তবুও হাঁটতে কষ্ট হয়। রাত হয়তো খুব বেশি হয় নি। মামা একটানা বকে চলেছে। এই সংসারে ওকে দিয়ে যে কিছু হয় না বারবার সেটা বলে। বরং ও ঘাড়ের বোঝা। নামাতে পারলেই বাঁচে। জলিল কথা বলবে না বলে ঠিক করেছে।

পেটের ভেতর থেকে কেবল চুকো ঢেকুর ওঠে। বুকে জ্বালা, গলার কাছে জ্বালা। দুদিন পর ময়নাকে কারা যেন দেখে গেল। তাদেরও অনেক দাবী। মামা গোমড়া মুখে চুপ করে থাকে। মামী গুনগুনিয়ে কাঁদে। জলিলেরা ইচ্ছে করে চীৎকার করে মামাকে গালাগাল করতে। সে-রাতের ঘটনার পর ওরা ওকে মোষ ছাড়া আর কিছু ভাবে না। জলিলের মনে হয় ওর নিজের ভেতরে একটা মোষের রাগ অনবরত টগবগায়। দু শিং-এ সবকিছু তছনছ করে দেবার আকাঙ্ক্ষা। দুপুরে ময়না পুকুরঘাটে বসে থাকে। জলের বুকে নিজের ছবি দেখে। চুলের গোছা পিঠের ওপর।

ময়না বু?

কিরে?

ময়না ওর দিকে না তাকিয়ে উত্তর দেয়।

একডা কতা—

ক'না?

মোর দিকে চাও?

কি?

ময়না একটু অবাক হয়। এ সংসারে জলিলের কোন দাম নেই। ওর সঙ্গে ভালো করে কেউ কথা বলে না। ও নিজেও প্রায় চুপচাপই থাকে। আজ যেন জলিলের কণ্ঠ অন্যরকম। কর্তৃত্বের সুর আছে।

কি কিছু কছু না যে?

তোমার কারে পছন্দ অয় ময়নাবু? হাওলাদারের পোলা না পরশু যে [illegible] হৈলো—

জলিল?

তোমার পায়ে ধরি, রাইগো না ময়নাবু। মুই তোমার বিয়া দিমু।

জলিল?

একদম হাচা কতা। মোর যে তিন কানি জমি আছে মুই হেইডা তোমার নামে লেইখা দিমু। কতা কও ময়নাবু?

ময়না চুপ। শ্বাস নিতেও কষ্ট। জলিল আজ ওর পিতার ভূমিকায়। যার এক পয়সার দাম নেই এ সংসারে। ময়নার চোখ দিয়ে টপটপ পানি পড়ে।

কাইদো না ময়নাবু। খালি তোমার মতটা কও। আর বেবাক কাম মোর।

মুই জানি না। মোর কাছে বেবাক সমান।

জলিল থমকে যায়। তাইতো ময়নার তো কোন পছন্দ অপছন্দ নেই। যদি জোটে না,

তার আবার বাছ-বিচার কি? জলিলের মেকেল রাগ পানি হয়ে যায়। বুকটা তোলপাড় করে। এ সংসারে ওর চাইতে ময়নার অবস্থা আরো খারাপ। ময়নার সমস্ত আবেগ ফুলেফেঁপে ওঠে কিছুতেই কান্না থামতে চায় না। অপদার্থ, অবহেলিত ফুফাতো ভাইটিকে আজ পিতার চেয়েও সম্মানিত মনে হচ্ছে। এক মুহূর্তে নিজ পিতাকে বড় বেশি ম্লান, বিবর্ণ মনে হয়। যে ভূমিকা তার ছিল, সেখান থেকে তিনি অনেক দূরে সরে গেছেন—সে ভূমিকা নিয়ে জলিল আজ সদম্ভে দাঁড়িয়ে।

তবু তোমার একডা মত দাও ময়না'বু।

মুই কিছু জানি না। তুই যা কবি মুই তাতে রাজী।

ময়না জলিলের সামনে থেকে পালিয়ে যায়।

গর্বে আনন্দে জলিলের কলজেটা প্রসারিত হয়ে যায়। আঃ কি শান্তি! আজ ও ময়নার পিতার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। সব মতামত গ্রহণ করার ক্ষমতা ওর। মামা একটি শব্দও করতে পারে না। তিনকানি জমি এ সংসারের মুখের ওপর প্রচণ্ড থাপ্পড়। বছর বছর মামার গোলায় ধান ওঠার চাইতে, ঐ জমির বদলে ময়নার সংসার। জলিলের ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করে।

শেষ পর্যন্ত হাওলাদারের ছেলেকেই পছন্দ হয় জলিলের। জমিজমা একটু কম থাকলেও ব্যবহারের দিক থেকে চমৎকার। আদব-কায়দা জানে। ময়নার সংগে মানাবে। কথাটা ঘোষণা করার সংগে সংগে পুরো সংসারের চেহারাটা পাল্টে যায় ওর সামনে। মামা গুম হয়ে থাকে। বিকল্পে কোনও প্রস্তাবও নেই। মামাতো ভায়েরা সমীহ করে। মামী পান্তাভাতে মরিচ-পোড়া না দিয়ে ডিম ভেজে দেয়। জলিল খেতে পারে না। পাতের পাশে ডিম ফেলে রেখে মরিচ দিয়ে খেয়েই চলে যায়। ময়না ওর সামনে আসতে পারে না। সকলের বুকে যন্ত্রণা চৈ-চৈ করে। কেবল জলিল নির্লিপ্ত, উদাসীন। ভয়ানক হালকা লাগে নিজেকে। মোষের গলা জড়িয়ে ধরে গান গাইতে গাইতে বাসুড়ে যায়। আশে-পাশের লোকজন অবাক হয়ে ওর গলা-ছাড়া গান শোনে। কোন দিন গানের কথা ভাবতে পারেনি জলিল।

একদিন মামা ডেকে বলে, জমি রেজিস্টি করার আগে ভালো কইরা ভাইবা দ্যাখ জলিল।

মুই আপনের মতো অত ভালামন্দ বুজি না।

তিনকানি জমি কম না।

আর ময়না'বু? হের কতা ভাবেন না! কপালে থাইকলে একদিন বিয়া অইব।

ঐ কপাল লইয়া বইয়া থাইকলে ময়না'বুর জীবন আন্ধার।

মামা কথা বলে না। জলিলের ইচ্ছে করে মুখের ওপর একদলা থু-থু দেয়। তিনকানি জমি নিজের দখলে রাখার কি আকাঙ্ক্ষা! ময়নার চাইতে জমির দরদই তার কাছে বেশি। ও আর কথা না বলে বেরিয়ে আসে। মামার কাছে থাকলে একদিন ঐ জমি হয়তো ওর দখলে আসতে পারে। কিন্তু সে ইচ্ছে নেই। ও চরেই চলে যাবে।

জমিটা লিখে দেবার সময় একটুও খারাপ লাগেনি জলিলের। বরং টিপসইয়ের সময় আঙ্গুলটা দাবিয়ে রেখেছিল অনেকক্ষণ। ভারমুক্ত মনে হয়েছিল নিজেকে। জীবনের কোথাও কোন বন্ধন নেই। ঐ তিনকানি জমি ছিল শেষ আকর্ষণ। এবার ও নির্বিবাদে চরে যাবে। বিয়ের দিন ও ইচ্ছে করে সবাইকে এড়িয়ে ছিল। হঠাৎ করে সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে যায়। যে যে ভূমিকা সে পালন করেছে তার জন্যে এখন আর মনে কোন গর্ব নেই। সব পানসে। লাল শাড়িতে ময়নাকে কেমন লাগছে তাও দেখতে ইচ্ছে করে না। মোষের গলা জড়িয়ে শুয়ে ছিল। এবং সে রাতে বয়সী মোষটা কেবলই ওর গা চেটেছে। গরম নিঃশ্বাসের হলকা বইয়ে দিয়েছিল। কত ভালোবাসা সে উত্তাপে!

এ সংসারে এখন ওর সম্মানজনক স্থান কায়েম হয়েছে। সেই সূত্রে মামা একদিন বলে ফেললেন, চরে যাওনের লাগি একজন কামলা ঠিক করি। তোর যাওনের কাম নাই।

জলিল বিস্মিত হয়, ক্যান?

না, চরে তো ম্যালা কষ্ট। খাওনদাওনের ঠিক নাই।

মুই যামু। মাইনষের হাত ছাইড়া দিলে মোইষগুলানের কষ্ট অইব। মামা আর কথা বলে না। জলিল জানে মামা চায় ও-ই যাক। শুধু মুখে আলহা দরদ। তবু জমি লিখে না দিলে এটুকুও বলত না। যাকগে, এসব ভেবে লাভ নেই। চলে যাবার জন্যে এখন ওর মনের টাটা অবস্থা। পারলে উড়েই চলে যায়।

কার্তিকের মাঝামাঝি এক উজানি পহরে জলিল রওনা হয়ে যায়। সূর্য ওঠেনি। দশটা মোষ আজ বেশ চঞ্চল। চলায় ফূর্তি-ভাব। ভুটানের গলায় ও একটা ছোট ঘুঙুর বেঁধেছে। ওটা টুংটাং বাজে। মামা পিছু পিছু অনেক দূর এসেছিল। অনেক উপদেশ দিচ্ছিল। কিভাবে মোষের যত্ন নিতে হবে ঘুরেফিরে সেসব কথাই বলছিল। জলিল মাঝে মাঝ মোষের গতি নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে সেসব কথা উপেক্ষা করছিল। ঝাপুর ঝুপুর ছাতিম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মামা যখন বিদায় নিল তখন ও ফুশ্ করে একটা নিঃশ্বাস উড়িয়ে দিল বাতাসে। ভুটানের ঘুঙুরটাকে মনে হোল ছোট্ট টুনটুনি। কেবলই টিরক-টিরক শব্দে ওদের সংগ দিচ্ছে। রোদ ওঠার আগে অনেকদূরে পোঁছে যাবে জলিল। তালতলী পোঁছতে পোঁছতে সেই সন্ধ্যা। আজ কোনক্রমেই পথের চিন্তা ওকে কাবু করে না। বয়সী মোষটা সবার আগে যাচ্ছে। ওটার দিকে তাকিয়ে জলিল নিজের মধ্যে শক্তি পায়। মাঝে মাঝে পারুল এসে পাশে পাশে হাঁটে। আবার সামনে চলে যায়। পাশ থেকে ঘাস মুখে ওঠায়। চিবুতে চিবুতে চলে। জলিল আবেগে কেঁপে যায়। ওরা কেমন করে বোঝে জলিলের মনের কথা। যে কথা মামা মামী ময়না সগীর দবির কেউ কখনো বোঝেনি। আসলে এটাই ভালোবাসা: ভালোবাসার আমতুতু চর। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় সেই অলৌকিক অনুভূতিতে। যার জন্যে বুকটা দশ হাত বেড়ে ওঠে। নদীতে জাগা চরের মতো। তখন সেখানে টুপটাপ ঝরে জীবনের রোদ-বালি: বয়সী মোষটা কখনো থমকে দাঁড়ায়। জলিল হাতের লাঠি উঁচিয়ে জানান দেয় মুই পিছে পিছে আছি। ডর নাই। ইদানীং বয়সী মোষটা আচরণে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। জলিলের প্রতি তার ব্যবহার পিতার মতো। আগলে রাখতে চায়। অবোধ চোখের ভাষায় গভীর চাউনি। জলিলের ভবঘুরে মনটা সে চাউনিতে আটকে থাকে। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা কমে যায়।

সামনে বিষখালি নদী ছপছপ বয়। নদীর কানায় কানায় চলে ওরা। বর্ষা শেষ। নদীর যৌবন টাপেটোপা ভরা। বুকটা ঠিক এমনি হচ্ছে। নদীর মত ফুলছে। ও নিজেও বুঝতে পারছে না যে ওকি হচ্ছে। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। ঘিমশানি গরম। তার শরীরের ভেতর থেকে, ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। ওদের হাঁটার গতি মন্থর হয়ে গেছে। এবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম দরকার। ছায়াছন্ন জায়গা দেখে থামে জলিল। হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। মোষগুলো কুঁড়িতে গিয়ে নামে। অল্প পানি। তবু ওতেই ওদের আনন্দ। জলিল চিঁড়ে-মুড়ির পোটলা খুলে বসে। চিবুতে ভালো লাগে না। দূরের ঝোপে ঝুটকুলি ওড়ে। ওর চোখে তালতলীর স্বপ্ন ঘনিয়ে ওঠে। ওখানে গিয়ে নলিপাতা দিয়ে ঘর বাঁধবে ও। তার-পর নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন। সে জীবন ওর সামনে রূপে-রঙে ভরে উঠবে। বুজতো পারলে মোর আর ভাবনা কি! অহন ক্যাবল ডড বাইচা থাকা। মামার কইলজার ওপর ডড গুলী মারা। তোগোরে লইয়া মুই আর ফিরুম না। তালতলীর চরে ডড ঘর বাঁধুম। বৌ একটা যোগাড় করুম। এক্কেবারে ডড বৌ।

সন্ধ্যার কিছু আগে তালতলীতে পৌঁছে যায় ওরা। ছোটখাটো বাহিনী। জলিলের বুকের মধ্যে ডিলিক ডিলিক। কোন ক্লান্তি নেই। ঠোশা ঠোশা ঘাসের দামে মুখ ডুবিয়ে একদম বুঁদ হয়ে যায় মোষগুলো। বহুদিন এমন কাঁচা ঘাস ওরা চোখে দেখেনি। চার-দিক নীরব, নিথর। দূরে দূরে চাষীদের ভাওল ঘর। শোঁ শোঁ বাতাস বয়। মৃদু কাঁপিয়ে যায়। যদিও শীত এখনো জাঁকিয়ে আসেনি। রাতে মোষগুলো বাইরে বেঁধে চাষীদের একজনের সঙ্গে শুয়ে পড়ে জলিল। নিবিড় ঘুম ভরপেট ভাত খাওয়া মানুষের মতো পরিতৃপ্ত করে দেয় ওকে।

চারদিকে ঘুরেফিরে মন ভরে যায় জলিলের। সবুজের প্রাচুর্য যেন মাটি ফুঁড়ে চড়চড়িয়ে বেড়ে উঠেছে। কোথাও তিরতিরা জলের নালা। পার হতে গেলে পা আটকে যায়। যেন বলে, একটু দাঁড়াও। দুটো কথা বল। ছোট্ট তলাপুটপুটি পাখিটি মাথার ওপর দিয়ে ঘোরে। ছায়া পড়ে গায়ে, মাথায়, পায়ে। যেন ভাব জমাতে চায়। ফরমানি লতা কেবলই পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষায় থাকে। কার সঙ্গে কথ বলবে জলিল? এত ভালবাসা সইবে না। সইবে না। চোখে পানি এসে যায়। মা ভালোবাসেনি, বাবা ফিরে চায়নি। মামা-মামীর অবজ্ঞা আর উপেক্ষা গলার মালা। অথচ এরা কারা ওকে ভালবাসতে আসে। কেন এত সোহাগ জানায়। এই নিঝুম পরি-বেশ জলিলের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তোলে। শোঁ শোঁ বাতাসের দিকে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও। নদীর ছলা-ছলাৎ থমথমা যৌবনের মতো। শরীরের কিনারে আকর্ষণ করে। ভুটান এখানে এসে সবচেয়ে খুশি। দৌড়ে দৌড়ে জলিলের কাছে আসে। টুংটাং শব্দসহ জিভটা বের করে দেয়। শিং-এর গুঁতো মারে আলতো করে। পারুল একটু গম্ভীর হয়েছে। শরীর ভার। ওর বিয়োনোর এখনো মাস তিনেক বাকী। মাঝে মাঝে ঘাস খাওয়া ভুলে গিয়ে কেমন উদাস চোখে চেয়ে থাকে। পারুল প্রথম মা হবে। যেন দূরের দিকে তাকিয়ে সে গৌরব-ময় বেদনা অনুভব করে। জলিল পেটের ওপর হাত রাখলে বাচ্চাটার নড়াচড়া টের পায়। এত আনন্দ ও কোথায় রাখবে?

দুপুরে কটকট্যা ঝালে রাঁধা কাঁটা-পাতাশী মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে বাইরে এসে টানটান শুয়ে থাকে। এখন আর কোথাও কোন ব্যাথাট্যাথা নেই। কটকট্যা ঝালে বুক জ্বলে না। সব সাফসুফ। মনটা উদোম চর। এলোপাথাড়ি বাতাসের দাপাদাপি কেবল। গা ভাসিয়ে আয়েশ করা।

দুদিন ধরে আকাশের অবস্থা ভাল না। ঝুপো ঝুপো মেঘ কখনো লম্বা রোঁয়া-মেলা শুঁয়োপোকার মতো হয়ে যায়। তখন ঝির-ঝির বৃষ্টি নামে। লক্ষণটা ভাল মনে হয় না জলিলের। আবহাওয়াওটা কিসের টানে চঞ্চল, জলিল বোঝে। কড়াত করে গর্জে যায় আকাশের এ-পাশ থেকে ও-পাশ। মোষগুলো মুখ উঠিয়ে ডাক ছাড়ে। বাতাসে গন্ধ শোঁকে। রাতে শুয়ে শুয়ে বুমকুলির ডাক শোনে। মনটা খচখচ করে। কুটকুট শব্দটা জলিলের বুকে চাবুকের মতো লাগে। ভাল লাগে না। সমুদ্র ফুলছে। নলিপাতার ঘর দুলে ওঠে।

রিমঝিম বৃষ্টি কাল থেকে একটানা। মেঘের ভারে আকাশ কুঁদো হয়ে গেছে। সারা দিন ভিজে ভিজে ঘাস কেটে মোষগুলোকে দিয়েছে ও। বাথান থেকে আর বের করেনি। খুঁটিগুলো শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে। বয়সী মোষটা চুপচাপ। ঘাসই মুখে তোলে না। পারুলেরও একই অবস্থা। জলিল ওর পিঠে হাত বুলোয়—খা, মনু খা। নিজের লাইগা না খাইলে প্যাডেরটার লাইগা খা। কিন্তু পারুল নির্বিকার। ওর দিকে একবার ফিরেও চায় না। যেন অভিমান, কে বলেছে ভিজে ভিজে ঘাস আনতে? আমি খাব না। ভুটান গবগবিয়ে খায়। জলিলের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকায়। মাথা নাড়ে।

নিজের আস্তানায় ফিরে শুকনো গামছা দিয়ে মাথা মোছে। মাথা ভার। সর্দি ঝরছে। ঘুরেফিরে একটা কথাই মনে হয় যে সমুদ্র ফুলছে। পারুলের পেটের মতো মাসের হিসেবে নয়, মিনিটের হিসেবে ফুলছে। খাবার মতো কিছু ঘরে নেই। অগত্যা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুম আসে না। ভীষণ অস্বস্তি। বহুদিন পর জলিল যেন সেই শব্দটা শুনতে পায়। কপর...... কপর...... কপর...... কপর। কারা আসছে? কাদের পায়ের শব্দ? একবার উঠে বসে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। কৈ না! কোন শব্দ নেই। জ্বর এসেছে। মাথা ভীষন গরম। আবার শুয়ে পড়ে। শুলেই সে শব্দটা হয়। কপর......কপর...... কপর......কপর।

মাঝরাতে সমুদ্রের ডাকটা ঠিক শুনতে পায় ও। কলকলিয়ে ছুটে আসছে। চরে ছিপছিপানি পানির নালায় এখন স্রোত। ভরে উঠেছে। বাতাসে তালপাতার চালের অবস্থা কাহিল। আর দু-এক ধাক্কায় উড়ে যাবে। মোষগুলো ডাকছে। জলিল কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে ওঠে। হাঁটু পানি হয়ে গেছে। আর সময় নেই। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে সবগুলো মোষের খুঁটি খুলে দেয়। পারুলের পেটের সঙ্গে ওর মুখটা লাগে। জলিলের কান্না পায়। বয়সী মোষটা পরিচিত ডাক ছাড়ে। এই ভঙ্গীতে ও জলিলকে খোঁজে। কিন্তু আজ আর জলিল ওর কাছে যেতে পারে না। আস্তে আস্তে ডাকটা দূরে চলে যায়। জলিল বোঝে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। টিকতে পারছে না। জলিলের বুকটা ভেঙে গুঁড়িয় যায়। জলোচ্ছ্বাসের চাইতেও দ্বিগুণ বেগে ওর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। দশটা মোষের খুঁটি খুলতে হাঁফিয়ে যায় ও। খুঁজে পেতেই কষ্ট। সমস্ত চরাচরে কবাকবা অন্ধকার। থৈথৈ পানি ছাড়া আর কিছু নেই। একদিকে গরম স্রোত। অন্য-দিকে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। জলিল দিশেহারা হয়ে যায়। হাতের কাছে কিছু নেই। কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখা যায় না। ভাসতে ভাসতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ চোখের সামনে একাকার হয়ে যায়। কিছুতেই মনে রাখতে পারে না ও।

পরদিন যখন জ্ঞান ফেরে জায়গাটা চিনতে পারে না জলিল। মগজে নেশা নেশা ভাব। যতদূর চোখ যায় সব ধোঁয়াটে। জনশূন্য নিথুয়া পাথার। সব অপরিচিত। নতুন। কেমন লোনা গন্ধে ভরা। বুক ভরে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বুকের মধ্যে চৈ-চৈ শব্দ। এ শব্দও আর কোন দিন শোনেনি। জলিল অবাক হয়ে উঠে বসে। প্রাণপণে পাখি খোঁজে। না কোথাও নেই। নানা ভাবনায় ও আক্রান্ত হয়। অথচ কোন কিছুই ঠিকমত ভাবা হয় না। প্রত্যেকটা ভাবনা পাড় ভেঙে ভেসে যায়। জলিলের বুকটা ফোঁসে। উলঙ্গ শরীরে শিরশিরে অনু-ভূতি। কোন মোষের কথা ওর মনে হয় না। এই নিঃসীম প্রান্তর ওকে ব্যাকুল করে তোলে। জলিল নতুন চরের বুক থেকে থাবলে থাবলে মাটি ওঠায়। সোঁদালো গন্ধ পাগল করে দেয়। মাথার ওপর কিসের ছায়া? গাংটিটির। এতক্ষণে একটা পাখি দেখছে ও। তখনই জলিলের মগজে হুলু-ধ্বনি হয়। ও উঠে দাঁড়ায়।

চারদিকে থেকে কারা যেন উলু দিচ্ছে। হাজার হাজার পাখি। হাজার হাজার মোষ চড়চড়িয়ে বেড়েওঠা ঘাসের পান্তর মাড়িয়ে ছুটে আসছে।

উরুরুরু... ...উরুরুরু... ...উরুরুরু।

সেই হুলুধ্বনি সম্বল করে চরের ফুটফুটা মাটির বুকে দৌড়ুতে থাকে জলিল। ▭

মুকুন্দ দাসের বিচার

পুলকেশ দে সরকার

আজও হঠাৎ মনে পড়লে বহু-মেডেল আন্দোলিত সেই বিশাল বপু বলিষ্ঠ-কণ্ঠ উষ্ণীষ-শোভিত মূর্তিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মাইক নেই, মঞ্চ নেই, মদন-মোহনবাড়ির বিরাট চত্বরে তেমনি বৃহদায়তন সামিয়ানার নীচে বহুসহস্র লোকের একপাশে পথ কেটে আসছেন যাত্রার আসরে—"সাবধান! সাবধান! (আবারও) সাবধান! আসিছে নামিয়া ন্যায়েরই দণ্ড, রৌদ্র-দীপ্ত মূর্তিমান!' ততক্ষণে আসরে এসে গেছেন। একবার পশ্চিমে একবার উত্তরে একবার পুবে, আর-একবার দক্ষিণে।

কিশোর তরুণ আমরা রোমাঞ্চিত হতাম, অতসহস্র লোকের মধ্যে কিছুমাত্র গুঞ্জন নেই, পরিপূর্ণ নিস্তব্ধ সম্মোহিত নিস্তরঙ্গ শ্রোতৃবৃন্দের কানে, মর্মে, হৃদয়ে একটি প্রতিধ্বনি।

মুকুন্দ দাস তখন এক কিম্বদন্তী। কোচবিহার দেশীয় রাজ্য। স্বদেশী প্রচারের চারণ, বিদেশী বর্জনের প্রবক্তা, ইংরাজ রাজরোষে লাঞ্ছিত—নায়েব আহিলকার নগেন রায়চৌধুরী দুঃসাহসে তাঁকেই আনলেন। রাসমেলায় কি বছর যাত্রা দল আসে, নানা রংঢংয়ের, নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এ কী! সাদামাটা পোষাক, সামান্য গল্প অবলম্বনে গান আর গান, মাতিয়ে দিয়ে গেলেন।

উত্তপ্ত বিদ্রোহী বাংলার অগ্নুত্তাপ স্পর্শ করেছে এ রাজ্যকেও। রাজা ছিলেন উদারচরিত, নাচগানের যাত্রার বদলে স্বদেশী যাত্রা তাঁর মনকে বিরূপ করেনি। মুকুন্দ দাস নতুন এক স্বাদে তরুণ সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করে গেলেন।

সমগ্র বাংলার একালটাই ছিল বর্তমান প্রজন্মের পক্ষে কল্পনাতীত। সেকাল শপথের কাল, ত্যাগব্রতের কাল, স্বদেশী-দ্রব্য গ্রহণ বিদেশী বর্জনের কাল। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের, রক্তঋণ শোধের দেশমাতৃকা বন্দনায় বন্দেমাতরমের, রবীন্দ্র-অরবিন্দের রাখীবন্ধনের কাল, বিপ্লবীদের প্রাণ নেওয়া দেওয়ার অবিস্মরণীয় যুগ, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন আরও আরও রক্তস্রোত।

এমনি এককালের গতিস্রোতে ঈশানের পুঞ্জ মেঘ। মুকুন্দ দাস ও তাঁর যাত্রাদলের চারজন সঙ্গী ১০০ টাকা করে জামানতে মুচলেকাবদ্ধ হতে বাধ্য হলেন। রাষ্ট্রদ্রোহের গুরু অভিযোগ। শুনানি হবে ২৫ জানুয়ারি ১৯০৯।(১)

বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ব বাংলা বর্তমান 'বাংলাদেশের' প্রথম বৃটিশ সংস্করণ। পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ। মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার গর্বে ও হিন্দু স্বাদেশিকতা খর্বে কার্জনী কূটচক্র। কিন্তু আজকের মতো পররাষ্ট্র নয়। তাই, হিন্দুরাও তেজে বীর্যে মুসলিম-ইংরেজ আঁতাতের সমকক্ষ। সেই তেজস্বিতার এক প্রতীক অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং তাঁর যোগ্য শিষ্য যজ্ঞেশ্বর, না, চারণকবি মুকুন্দ দাস। অশ্বিনীকুমার রাজরোষে নির্বাসিত, মুকুন্দ স্থান থেকে স্থানান্তরে বিতাড়িত। অবশেষে মুচলেকাবদ্ধ। সিডিসানের খড়্গ এল নেমে। যে-মামলার কথা বলছি এটি দ্বিতীয়। প্রথম মামলা হয়েছিল তাঁর 'মাতৃপূজা গান'-এর লেখক হিসেবে। কারাদণ্ড হয়েছিল এক বছর। তাঁর ভাই ছিলেন প্রকাশক। তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল ন' মাস।(২)

এবার যে মামলা সে তাঁর বইয়ের গানগুলো গাইবার জন্য। রচনাও তাঁর। নতুন অভিযোগের এই হল উপকরণ বা কারণ। স্থান বরিশাল। ২৯ জানুয়ারি। সরকার-পক্ষে (৩) বাবু রাজেন্দ্র ব্যানার্জি, মুকুন্দ

---

(১) বর্তমান লেখক তখন মাতৃগর্ভে। ছ'দিন পর ১ ফেব্রুয়ারি উত্তপ্ত বাংলার 'পৃথিবীকে' চেয়ে দেখলাম। তারপর, স্কুলের ছাত্র আমি, স্বদেশীযাত্রার নায়ক মুকুন্দ দাসকে দেখলাম। পুরোনো পত্রিকার পাতায় সত্তর বয়সোর্ধে সেই মামলা পুনরাবিষ্কার করলাম।

(২) দুর্ভাগ্যবশত প্রথম মামলা ও দণ্ডের তারিখ পাইনি।

(৩) তখন সরকারপক্ষকে বলা হত 'ক্রাউন', মানে ইংলন্ডেশ্বর ও ভারত-সম্রাট।

হয়েন পক্ষে বরিশালের বাবু যাদবচন্দ্র রায়, বাবু বিপিনবিহারী গুহ এবং ভোলার নবীনচন্দ্র দাস ও শরৎচন্দ্র সেন।(৪)

ফরিয়াদীপক্ষ (অর্থাৎ সরকার) তাঁদের কিছু সাক্ষীর জবানবন্দী নিলেন। হয়ে গেলে মুকুন্দ দাসের উকিলেরা সরকারী অনুবাদককে আবার হাজির করবার প্রার্থনা জানালেন। অনুবাদে ভুল রয়ে গেছে।

শুনানি ৮ ফেব্রুয়ারি অবধি মুলতুবি রইল। আদালত মুকুন্দ দাস প্রমুখকে ৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে খরচাপাতি জমা দিতে বললেন।

মামলা শেষ হল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ২০ ফেব্রুয়ারি 'বরিশাল হিতৈষী' উদ্ধৃত করে খবর দিলেন, প্রখ্যাত স্বদেশী যাত্রা-দলের মালিক মুকুন্দ দাসের বিরুদ্ধে মামলা শেষ হল শনিবার। অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডসন মুকুন্দ দাসকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। সাজা দিলেন দু' বছর সশ্রম কারাবাস, অর্থদণ্ড দিলেন ৩০০ টাকা।(৫)

১৯০৮ হতে পারে না, মামলা হয়েছে ১৯০৯-এ। এপ্রিলে নয়, ফেব্রুয়ারিতে। মনে হয়, 'বরিশাল হিতৈষি' সমকালীন বা কনকারেন্ট শব্দটি খেয়াল করেন নি। কিন্তু জরিমানা?—তা ডসনের রায়ে নেই। আপীল খারিজ হয়েছে, পরিবর্তন কিছু হয়নি।

মিঃ ডসনের রায়

মিঃ ডসন কি রায় দিয়েছিলেন মুকুন্দ দাসের বিরুদ্ধে? ১৯০৯-এর মার্চ, মঙ্গলবার 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' সেই রায় প্রকাশিত হয়। তাতে ডসন বলেছেন :

'মুকুন্দের মাতৃপূজাগান' শীর্ষক একখানি গানের বই বরিশালের আদর্শ প্রেস থেকে প্রকাশ অথবা প্রকাশের ব্যবস্থা করার দায়ে নিবারণচন্দ্র মুখার্জি ও মুকুন্দ দাস ওরফে যজ্ঞেশ্বর দে-কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ক ও ১৫৩ক ধারামতে(৬) অভিযুক্ত করার জন্য বরিশালের সিনিয়র কোর্ট রিপোর্টার নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের এক আবেদন প্রাদেশিক সরকার ১৯০৮-এর ২৮ ডিসেম্বর মঞ্জুর করেন। বিধিমতো সংশ্লিষ্ট বইয়ের একখানি কপি এবং ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে ৯ মে মুদ্রাকর হিসেবে নিবারণচন্দ্রের ঘোষণাপত্র (ডিক্লারেশন) ও দাখিল করা হয়েছে। ১৯০৮-এর ২৪ ডিসেম্বর, একই ব্যাপারে মুকুন্দর ভাই রমেশচন্দ্র ওরফে রমেশচন্দ্র দে-কেও অভিযুক্ত করার জন্য এবং যাতে দুজনের মামলা একই সঙ্গে হতে পারে সেজন্যও ফরিয়াদী-পক্ষের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। মামলাটির শুনানি আমার পূর্বতন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে চলছিল এবং অভিযোগপত্র (চার্জ-শীট) প্রণয়নের মুখে এসে পড়েছিল। কিন্তু হয়নি। পাছে এই নিয়ে ফৌজদারি কার্য বিধির ৩৫০ ধারামতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় এজন্য আমি একেবারে নতুন করে শুনানি আরম্ভ করি।

মামলা রুজুর জন্য সরকারের মুখ্য-সচিব-স্বাক্ষরিত মঞ্জুরীপত্রটিও (স্যাংসন) পেশ করা হয়েছে এবং সে দুটি যথাক্রমে ক ও ক১ নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। বইটি ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তর থেকে পাওয়া গেছে। নিবারণ যে ঐ দপ্তরে মুদ্রাকরের প্রমাণপত্র দাখিল করেছিলেন তাও এই আদালতে 'খ' ও 'গ' নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করা আছে। নিদর্শনগুলো গ্রহণ ও দাখিলের কথা বলেছেন কোর্ট সাব-ইন্সপেক-টর নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের কেরানী সুখরঞ্জন সাহা। এঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে ১নং ও ২নং ফরিয়াদী সাক্ষী। সাহার তত্ত্বাবধানেই থাকে মুদ্রাকরের ছাপানো বই, আর মুদ্রাকরের ঘোষণা-পত্র। বইখানি যে বরিশালের 'আদর্শ' প্রেসে ছাপানো হয়েছে তার আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে ৫নং সাক্ষী নন্দকুমার দাসের সাক্ষ্যে। নন্দকুমার ঐ প্রেসের কম্পোজিটারও বটে, হিসেব রক্ষকও বটে। এই সাক্ষী হিসেবের বইগুলোও দেখিয়ে দিয়েছেন। তল্লাসীর সময় পুলিশ ঐ হিসেবের বই হস্তগত করে। এই সাক্ষী আরও জানিয়েছেন যে, রমেশ-বাবু বই মুদ্রণে যখন যেভাবে বলেছেন তখন সেভাবে বই মুদ্রণ ও প্রকাশনে খরচপাতি হয়েছে। লেনদেনের রসিদও আছে। মুদ্রাকরের ঘোষণাপত্রে যে ইংরেজি লেখাগুলো আছে সেগুলো তাঁরই, তিনিই ওগুলো পূরণ করেছেন। স্বাক্ষর করেছেন নিবারণ-বাবু। এই তাঁর স্বাক্ষর।

বরিশালের কার্যভারপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর অনাদিনাথ ঘোষ হচ্ছেন ৪নং সাক্ষী। তিনি বলেছেন, গত ১৩ নভেম্বর তিনি মুকুন্দ দাসের বাড়ি তল্লাসী করে-ছিলেন। ওটা হয়েছিল, মুকুন্দ দাসের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৮ ধারা-মতে যে আদেশ হয়েছিল সেই সূত্রে(৭)। তল্লাসীর ফলে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পাওয়া গেছল ১৪ কপি 'মাতৃপূজা গান'। এগুলো দাখিল করা হয়েছে এবং ৭নং নিদর্শনরূপে চিহ্নিত আছে। সবশেষে ৬নং সাক্ষী আবু মহম্মদ ফজলুল বাসিত বলে-ছেন, যে-নৌকোয় মুকুন্দ দাস তাঁর যাত্রাদল নিয়ে চলাফেরা করতেন তা তিনি তল্লাসী করেন। নৌকোটা তখন এ জেলারই মেহান্দি-গঞ্জ থানা এলাকার মেঘনা নদীতে ছিল। তালিকাভুক্ত নানা জিনিসের মধ্যে ছিল এক-কপি 'মাতৃপূজা গান', আর তার নাট্যরূপের পাণ্ডুলিপি।

এইসব তথ্যের সমর্থনে ৭নং সাক্ষী, পেস্কার বরদাপ্রসন্ন বসু যেসব জিনিস পেশ করেছেন তার মধ্যে তিনজন বিচারাধীন বন্দীর পৃথক পৃথক বিবৃতি, ম্যাজিস্ট্রেটের নথিপত্র এবং পেস্কার নিজে বাংলায় যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা। বিচারাধীন নিবারণের ইংরেজি ও বাংলা বিবৃতি যথা-ক্রমে ১৫ ও ১৫ক নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমার পূর্বতন ম্যাজিস্ট্রেট নিবারণের যে স্বীকারোক্তি নথিবদ্ধ করেছেন তা ১৭নং নিদর্শনরূপে চিহ্নিত আছে। এতে নিবারণ স্বীকার করেছেন যে, সংশ্লিষ্ট বইটির মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য তিনিই দায়ী, তিনিই মুদ্রাকররূপে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। রমেশচন্দ্র দাসের নির্দেশ মতো এবং রমেশবাবুর অর্থব্যয়ে ঐ বই তিনি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেছেন। এই সংক্রান্ত যা কিছু হিসেবের বইয়ে তা, ৫নং সাক্ষী নন্দকুমার দাস লিখেছেন। আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিগগেস করলে তিনি ওসব তাঁরই লেখা বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁকে সেগুলো পড়ে শোনানো

---

(৪) সেকালে ব্যারিস্টার ছাড়া আর সবাইকে বলা হত বাবু। ব্যারিস্টার মিঃ, জজেরা মিঃ, সাহেবরা মিঃ।

(৫) এই দণ্ড সম্পর্কে কিছু মতান্তর দেখছি। খোদ ম্যাজিস্ট্রেট ডসনের রায়ে আছে, তিনি প্রতি অভিযোগ পিছু এক বছর করে দণ্ড দিয়েছেন এবং বলেছেন সব কারাদণ্ড হবে সমকালীন, অর্থাৎ একসঙ্গে চলবে, মানে, এক বছর। 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান'-এ আছে তিন বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়, পৃঃ ৪১৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'ভারত কোষ'-এ আছে : '১৯০৮ খৃঃ এপ্রিল মাসে তিন বৎসর কারাদণ্ড ও তিনশত টাকা জরিমানার শাস্তিসহ দিল্লী জেলে প্রেরিত হন।' পৃঃ ৩৪৩, ৫ম খণ্ড

(৬) **১২৪ক ধারার মর্ম :** ভাষণে, লেখায় বা দর্শনীয়রূপে কোন কিছু দৃষ্টিগোচরে এনে ভারতে আইনবিধিমতে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি বিদ্বেষ অথবা ঘৃণা সৃষ্টি বা সৃষ্টির চেষ্টা কিংবা সরকারের প্রতি অসন্তোষ সঞ্চার বা সঞ্চারের চেষ্টা এই ধারামতে অপরাধ। এই অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (প্রাকস্বাধীনতাকালে ছিল দ্বীপা-ন্তর), এবং তার সঙ্গে জরিমানাও যোগ হতে পারে, অথবা তিন বছর সশ্রম কারা-দণ্ড, তার সঙ্গে জরিমানা, অথবা শুধু জরিমানা। স্বাধীনোত্তরকালে এই আইন নেই।

১৫৩ক : ধর্ম, জাতি, ভাষা ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি এবং সমভাব ক্ষুণ্ণকর কোন কাজ, তা লেখায় বলনে বা কোন প্রকার দর্শনীয়রূপে হতে পারে। এজন্য তিন বছর কারাদণ্ড বা অর্থ-দণ্ড অথবা দুটোই হতে পারে।

(৭) **১০৮ ধারা :** রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক বিষয় প্রচারকদের সদাচরণের প্রতিশ্রুতিতে মুচ-লেকাবদ্ধ করা। জিম্মাদারসহ অথবা জিম্মা-দারী ছাড়া। অনধিক এক বছরের মধ্যে কতদিনের জন্য তা ম্যাজিস্ট্রেট স্থির করে দেন।

হয়েছিল, শুনে তিনি বলেছেন, এর অতিরিক্ত তাঁর কিছু বলার নেই।

আমার পূর্বতন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রমেশ স্বীকার করেছেন, তাঁর দাদা মুকুন্দ দাসের নির্দেশমতোই তিনি 'আদর্শ' প্রেস থেকে ঐ বই ছেপে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই স্বীকারোক্তি নথিভুক্ত আছে।' তিনি বলেছেন, দাদা তাকে যশোর থেকে এমনিতর কিন্তু এর চাইতে ছোট একটা সংকলন, আর তারই সংগে আরও কিছু হাতে-লেখা গান পাঠিয়েছিলেন এবং বলে-ছিলেন, সব মিলিয়ে একটা গোটা সংকলন ছাপতে দিতে। রমেশ বলেছেন, দাদা মানি-অর্ডারে যে টাকা পাঠিয়েছিলেন তাই থেকে তিনি প্রেসের পাওনা মিটিয়েছেন। বইটি প্রকাশিত হবার পর যাঁরা তাদের বাড়িতে ঐ বই কিনতে এসেছিলেন তাঁদের কাছে কয়েক কপি তিনি বেচেছেনও।

রমেশ আমার পূর্বতন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা ঠিকই আছে বলে মেনে নিয়েছেন। আমি তাঁকে জিগগেস করতে আমার কাছেও তিনি অনুরূপ বিবৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে এ ব্যাপারে তাঁর আর কিছু বলবার নেই।

মুকুন্দ দাসের কথা

আমার পূর্বতন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মুকুন্দ দাস এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি রমেশের কথার সত্যতা মেনে নিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে, তিনি রমেশকে একটা ছাপা বই ও তার সঙ্গে নতুন কিছু লেখাও পাঠিয়েছিলেন। তিনি রমেশকে বলেছিলেন ওগুলো ছাপবার ব্যবস্থা করতে। পরিষ্কার স্বীকার করেছেন, এর প্রকাশনার দায়-দায়িত্ব তাঁরই। তিনি অবশ্য একথাও বলেছেন যে, মুদ্রাকরের ঘোষণাপত্রে মুদ্রাকর বলে যাঁর নাম ছাপা হয়েছে—অর্থাৎ রমেশচন্দ্র দাস তিনি আর এক ব্যক্তি তাঁরই অনুরোধে বইখানি ছাপা হয়েছে তাঁর ভাইয়ের নাম নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট এই কথার ওপর মন্তব্য করলেন, স্পষ্টতই একথা বলার অভিপ্রায় হচ্ছে, রমেশ যে আমার পূর্বতন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এবং আমার কাছেও বলতে চেয়েছেন যে তাঁর নাম রমেশচন্দ্র দে, রমেশচন্দ্র দাস নয় এই কথাটি প্রতিপন্ন করা। কিন্তু আমি ৫নং ফরিয়াদী সাক্ষী নন্দকুমার দাসের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করার কোন হেতু দেখছিনে। নন্দকুমারই ঘোষণা-পত্রটি পূরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিচারাধীন রমেশই নিজে বলেছিলেন তাঁর নাম রমেশচন্দ্র দাস এবং সেইমতোই ঘোষণাপত্রটি পূরণ করা হয়েছে।

মুকুন্দের ভাইয়ের পিতার নামও [illegible] দে (অর্থাৎ মুকুন্দের পিতার নামে); মুকুন্দের আসল নাম [illegible] [illegible]। যদি যজ্ঞেশ্বর দে নিজেকে [illegible] দাস নামে পরিচিত হতে চেয়ে [illegible], ভাই [illegible] [illegible] পরিচয় [illegible]

ইচ্ছা হয়ে থাকতে পারে! কিছু অসম্ভব নয়। তা যাই হোক না কেন, এই মামলার দিক থেকে এই বিবরটি অপ্রাসঙ্গিক যে, ঘোষণাপত্রে যে নাম তা বিচারাধীনদের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ব্যক্তিরই নাম—না—তিনি আর কেউ। বিশেষ যখন বিচারাধীন রমেশ স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন ও মেনে নিয়েছেন যে বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব সরাসরি তাঁরই। খুঁটিনাটি বিচারে যদি অন্য কোন রমেশ এর প্রকাশক হয়েও থাকেন, তবু এ বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই যে, এই রমেশ ছাড়া আর কেউ প্রকাশকের কার্য সম্পাদন করেননি।

যে অভিযোগপত্র (চার্জসীট) প্রণয়ন করা হয়েছে তা 'মুকুন্দের মাতৃপূজা গান' বইটির চারটি গানকে ভিত্তি করে। এগুলো কি ধরনের গান আমি একটু পরেই তা বিশ্লেষণ করছি। আপাতত বলছি, নিবারণ-চন্দ্র মুখার্জির বিরুদ্ধে ভাঃ দঃ বিধির ১২৪-ক ধারামতে যে অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে তার ভিত্তি ৫ ও ১৪নং গান। আর, ১৫৩-ক ধারামতে যে অভি-যোগ দাঁড় করানো হয়েছে তার ভিত্তি ৮ ও ৪৮ গান। ধারাগুলোর মর্ম বুঝিয়ে দেওয়া হলে নিবারণ অপরাধ স্বীকার স্বীকার করলেন। আর দুজনের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে যথাক্রমে ১২৪-ক ও ১৫৩-ক ধারামতে এবং ১২৪-ক ও ১১৪-ক ধারা-মতে (৮)।

এঁদের মধ্যে একজন অনুপস্থিত, আর একজন রমেশ। রমেশের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি ৫নং ও ১৪নং এবং ৮নং ও ৪৮নং গান। প্রথম দুটি ১২৪-ক ধারামতে। এঁরা নিজেদের নির্দোষ বলেন। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে সাক্ষ্যসাবুদও উপস্থিত করেননি।

এখন বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, ঐ চারটি গান এমন ধরনের কিনা যার জন্য এসব অভিযোগ আনা যেতে পারে। গানগুলোর মধ্যে এমন ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত কিনা যা এদেশের সরকারের প্রতি বিরূপ ভাব সৃষ্টি করে অথবা অসন্তোষ সঞ্চার করাতে মহামান্য সম্রাটের প্রজাবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক বৈরীভাব অথবা শ্রেণীবিদ্বেষ জাগ্রত করতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রেণী দুটি—এক ইউরোপীয় দুই এদেশীয় ভারতীয়।

সমগ্র বইখানির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন সরকারের সহকারী অনুবাদক পশ্মিণীভূষণ রুদ্র (২নং ফরিয়াদী সাক্ষী)। তিনি বলেছেন, তিনি সর্বতো-ভাবে শব্দানুগ অনুবাদ করেছেন এবং তাঁর পক্ষে যতটা সাধ্যায়ত্ত ততটাই শুদ্ধ হয়েছে। দুটি নগণ্য এবং একেবারেই গুরুত্বহীন প্রমাদ আছে, তা অনুবাদক তাঁর সাক্ষ্যে উল্লেখও করেছেন। অনুবাদের শুদ্ধতা

অশুদ্ধতা নিয়ে বিচারাধীন ব্যক্তিরাও কোন প্রশ্ন তোলেননি। অনুবাদকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মর্যাদার কথা মনে রাখলে অনুবাদের যথার্থ সম্পর্কে সংশয় উদ্রেকের কোন হেতু নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, আমি প্রথম ৫নং ও ১৪নং গান দুটো নিচ্ছি। ৫নং গানটির সূচনা 'ভয় কি মরণে' কথা কয়টি দিয়ে; বাকি কথাগুলোরও অনুবাদ আছে (কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তা পড়লেন না)। এই ভাবোচ্ছ্বাসিত অংশের একটাই মাত্র অর্থ হতে পারে এবং তা হল সরকারী 'দানবে'র বিরুদ্ধে বঙ্গবাসীদের প্রকাশ্য বিদ্রোহে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানানো।

চৌদ্দ নম্বর গানটির অনুবাদ এই রকমঃ ওগো বিদেশি! তোমার হুমকিকে কে গ্রাহ্য করে? (আমার) দেহ তোমার অধীন বটে মন তো অধীন নয়। সে মুক্ত স্বাধীন। আমার হাত বাঁধতে পারো, পা বাঁধতে পারো, চরম হলে কারাবন্দী করতে পারো। কিন্তু তুমি কি এতই শক্তিমান যে, আমাদের মন বদলে দেবে? যেসব জিনিস তোমরা (মূল শব্দটি 'তোরা') দাও তা দেখতেই বাহার, কিন্তু সেগুলো পচা আপেলের মতো, বাইরেটা সুন্দর ভেতরটা কালো। তোমাদের দেশের আয়না, খেলনা ঠুনকো, সামান্য চাপও সইতে পারে না। মন চায় না ওসব ছাইভস্ম; মন ডুবেছে স্বদেশী জিনিসে। (শেষ পংক্তিটির অনুবাদ ও পাঠ বাদ)

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, কথা তোলা যেতে পারে যে, এতো নিছক স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য আহ্বান মাত্র। কার্যত তাই। স্বদেশী শিল্প সমর্থন বৈধ ও সম্মানজনক। তা প্রচারের তো একটা ধারা বা পদ্ধতি আছে। কিন্তু এহেন প্রচারের ধারা বা পদ্ধতি বৈধ নয়। এ গানের আরম্ভ ও শেষের উদ্দেশ্য বা মর্ম সম্পর্কে কোন ভ্রান্তির অবকাশ নেই। বিদেশী বলতে এখানে বৃটিশ সরকারকেই বোঝাচ্ছে এবং তাঁদের উদ্দেশেই এই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। জবরদস্তি বিদেশী বর্জনের চেষ্টায় এদেশীয় ভারতীয়দের মনোবল বিকল হতে পারে, সত্য তাদের কিছুতেই পাওয়া যাবে না। এই ক্ষেত্রে সরকারের সংগত ক্রিয়া-কলাপের বিরুদ্ধে বৈরীভাব ও ঘৃণা সৃষ্টিই গানটির সুস্পষ্ট লক্ষ্য; আইন-বিরোধী বয়কটওয়ালাদের নিরস্ত করতে সরকার যেসব উপায় অবলম্বন করছেন তার বিরুদ্ধে অবিবেচিত প্রতিরোধ ও ঘৃণা জাগিয়ে তোলাই এই আহ্বানের লক্ষ্য। গান দুটির প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, এগুলো যে শ্রোতাদের মনে কি ভাব উদ্রেক করার অভিপ্রায়ে গাওয়া সে সম্বন্ধেও মতান্তরের অবকাশ নেই।

এবার আমি ৮ ও ৪৮নং গান দুটির প্রসঙ্গে আসব। ফরিয়াদে এ দুটিকে ইউরোপীয় ও এদেশীয়দের মধ্যে শত্রুতা

---

(৮) ১১৪ ধারাঃ কোন অপরাধ [illegible] উপস্থিত থেকে সহায়তা বা [illegible]

দাগিয়ে তোলার সুস্পষ্ট আবেদন আছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। ৮নং গানটি এই রকম: ও বাবু, মরণ হলে কি তুমি তোমার অবস্থাটা বুঝবে? (এখানে কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে) আগে খেতে সোনার থালায় এখন শ্লীলের বাসনেই খুশি। তোমার মত বোকা আর একটিও মিলবে না। তুমি আতর ছেড়ে পামেটম ধরেছ, তাইতেই তো ওরা তোমায় 'ব্রুট' 'ননসেন্স' 'ফুলিস' (সাধে কি বলে?)। 'ছিল ধান গোলা ভরা শ্বেত ইঁদুরে করল সারা।' বাবু, একবার চশমাটা খুলে তাকাও চারদিকে! (কিছু অংশ বাদ) পাগলের কথা ধর, সখেচ্ছ চলা সংযত কর। ইংরেজি কায়দা ছাড়, ধরণ ছাড়। সুখ যদি চাও 'মাতরম' বল ডঙ্কা বাজাও, যেন জেগে ওঠে সব ভাই মুকুন্দ ডুবে যাক তাঁর ভালবাসার জলে। (৯)

ম্যাজিস্ট্রেট বলেন এখানে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এসব গান, বই অথবা বক্তৃতায় ইংরেজি কায়দা, ধারণ-ধারণ বাঙ্গালিদের মানায় না একথাই বলতে চাওয়া হয়েছে, ওসব ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে, কিন্তু এমনভাবে বলা হয়েছে সহসা আপত্তি তোলা যায় না। কিন্তু হিতবাক্যের সুরে স্পষ্টতই এমন অভিব্যক্তি ঘটেছে যার লক্ষ্য ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ, শত্রুতা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক করা। শব্দসমষ্টিতে ঘৃণার ইঙ্গিত নিঃসংশয়, তার ওপর যে উক্তির সূচনায় আছে, 'জানেন কি রূপটি বাবু, কৌশলে...নিলে গেছেন' এর মধ্যে যে কটাক্ষ তাই ১৫৩-ক ধারার আওতায় ফেলানোর পক্ষে যথেষ্ট।

শেষ কথা ৭৮নং গান। গানটা এই রকম: (বাদ) এর জনসম্পদ ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে পৃথিবীর আর কোন দেশেরই তুলনা হয় না। (বাদ) দেশের তাঁতি দুবেলা দু মুঠো ভাতও পায় না। শস্য, মটর, গম, ধান এদেশে থাকে না, বিদেশে চালান যায়। ..যখন দেশে মুসলিমরাজ ছিল, দেশের সম্পদ দেশেই থাকত এবং প্রজারা সুখে ছিল। টাকায় তখন আট মণ ধান বিকোত, আর এখন টাকায় আট সের চালও মেলে না।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, অর্থনৈতিক সমস্যার এই জাতীয় অনিষ্টকর প্রচার স্বল্পশিক্ষিতদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে তোলে; তা [illegible] পারে না যে এসব কথা সত্যে অপলাপ মাত্র। এছাড়া উদ্ধৃত উক্তির সামগ্রিক সুরের অভিপ্রায়ই ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ ও বৈরীভাব সঞ্চার (নাম না বললেও লক্ষ্য সুস্পষ্ট)।...'দেশের টাকা লুটিয়ে নিয়েছে' শব্দসমষ্টি কী অর্থ প্রকাশ করে? এর চাইতে আর কি কঠোরতর শব্দ ব্যবহার করা যায়? বলা হয়েছে আজকের দুঃখ-দুর্গতির মূলে ওরা।

সুতরাং আমার অভিমত এই যে, এই চারটি গান (যা বইয়ের সামান্য সারাংশ মাত্র, বইয়ে ৫৩টি গান আছে এবং তার অনেকই এই চারটি গানের অনুরূপ)। কি ভাবাবেগে কি তার প্রকাশে শ্রোতার চিত্তে এদেশে আইনমাতাবেক প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ঘৃণা ও অসন্তোষ সঞ্চার করে এবং মহামান্য সম্রাটের প্রজাবৃন্দের মধ্যে ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে এদেশীয় ভারতীয়দের মনে বৈরীভাব ও বিদ্বেষ জাগ্রত করে। ফলে এই সব প্রকাশের মূলে যেসব ব্যক্তি দায়ী তাঁরা ভাঃ দঃ বিধির ১২৪-ক ও ১৫৩-ক ধারার আওতায় পড়েন। অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনে সম্ভাব্য এই এক যুক্তি থাকতে পারে যে, এঁরা বইয়ের বিষয় বস্তু সম্পর্কে অথবা ঐ গানগুলো যে লোকের কোন বিরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে তৎ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন।

কিন্তু নিবারণ এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেননি, পক্ষান্তরে অপরাধ স্বীকার করেছেন, তিনি শুধু এই ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেছেন যে, গানগুলো রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক নয়। আমি যে কারণ দেখিয়েছি তাতে তাঁর এই বক্তব্য গ্রাহ্য নয়। বইয়ে কি ধরণের গান আছে তা যে তিনি জানতেন, এ প্রশ্নাতীত, গানগুলো যে তিনিই সংকলন করেছিলেন তা তো তিনি স্বীকারই করেছেন, সংকলক হিসেবেই তাঁর নাম, এবং ঐ বইয়ের গানগুলো প্রকাশ্যে গেয়েওছেন।

রমেশ অবিশ্যি স্পষ্টাস্পষ্টি একথা বলেননি যে তিনি বইয়ের বিষয় বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন কিন্তু একথা বলতে চেয়েছেন যে তিনি শুধু পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে দাদা মুকুন্দ ও মুদ্রাকর নিবারণের মাঝখানে সংযোগ রক্ষক বা বাহকের কাজ করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বিপরীত কোন সাক্ষ্যের অভাব, ৫নং ফরিয়াদী সাক্ষীর জবানবন্দীতে প্রকাশ রমেশ প্রমাদশুদ্ধির জন্য প্রুফ-সিট নিয়ে যেতেন, যদিও সুস্পষ্ট বলতে পারেননি যে, রমেশই নিজে প্রুফ দেখতেন কিনা। তবে প্রেসের সঙ্গে তাঁর যে কাজ এবং মুকুন্দের সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ তা থেকে এটাই ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে তিনি বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল ছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট উপসংহারে বললেন: সুতরাং আমি নিবারণচন্দ্র মুখার্জিকে তাঁর নিজের কথামতই ১২৪-ক ও ১৫৩-ক ধারামতে দোষী সাব্যস্ত করছি। তিনি সম্প্রতি আরও একটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন কার্যত একই তথ্যের ভিত্তিতে একই অভিযোগে। আমি মনে করি, যে কারণে এখন জেল খাটছেন, আইনে বর্তমান মামলা তা থেকে পৃথক অতএব একটা নামমাত্র দণ্ড দিলেই চলে যাবে। আমি তাঁকে প্রত্যেক ধারামতে এক-দিন করে সশ্রম কারাদণ্ড দিলাম, তা চলতি দণ্ডের সঙ্গেই রইল এবং চলতি দণ্ডের শেষে তা খাটতে হবে।

আমি রমেশচন্দ্র দাসকে ১২৪-ক ও ১১৪ ধারামতে দোষী সাব্যস্ত করছি, কিন্তু তিনি এই প্রকাশনার ব্যাপারে মূল নায়েন নয় বলে আমি তাঁকে প্রত্যেক অভিযোগ বাবদ মাত্র ন' মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড দিচ্ছি, দুটি দণ্ডই সমকালীন হবে।

আমি মুকুন্দ দাসকে ওরফে যজ্ঞেশ্বর দেকেও ১০৯ ধারাসহ ১২৪-ক এবং ১০৯ ধারাসহ ১৫৩-ক ধারামতে দোষী সাব্যস্ত করছি। (১০) সাক্ষ্য-সাবুদ ও তাঁর নিজস্ব বিবৃতিতে এটি পরিষ্কার যে তিনিই এই বই প্রণয়নে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। আরও পরিষ্কার তাঁরই প্রয়োজনের জন্য তিনি এসব করেছেন এবং এসব গান তিনি গেয়ে থাকেন। প্রত্যেক ধারাপিছু এক বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিচ্ছি, সব দণ্ডই একসঙ্গে চলবে।

(স্বাঃ) ভি ডসন
এডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট
২৮-১-০৯

আপীলের ফল

মুকুন্দ দাস ১৫৩-ক ধারার অভিযোগ ও দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করেছিলেন। বরিশাল থেকে ১১ মার্চ খবর এল জেলা ও দায়রা জজ মিঃ কার্গিল তা খারিজ করে দিয়েছেন।

মুকুন্দ দাসের জন্ম ১৮৭৮, মৃত্যু ১৯৩৪। আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণা অন্তর্গত বানারী গ্রাম। আবাল্য পিতা-মাতার সঙ্গে বরিশালবাসী। রামানন্দ অবধূত হরিবোলানন্দের কাছে দীক্ষালাভ ও মুকুন্দ দাস নাম গ্রহণ। মূল নাম যজ্ঞেশ্বর দে। পিতার নাম গুরুদয়াল দে। শতবর্ষ পূর্তিতে [illegible] প্রণাম। লেখকের মত অনেকের [illegible] স্বদেশী আন্দোলনে পরবর্তী [illegible] ক্রিয়াকলাপে প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাই অবিস্মরণীয়।

---

(৯) দুর্ভাগ্যবশত মূল গানগুলো জোগাড় করতে পারিনি। এগুলো ইংরেজির অনুবাদ। —লেখক

(১০) ১০৯ ধারা, ভাঃ দঃ বিধিমতে: কোন অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা বা প্ররোচনা।

ঐ ফৌঃ কাঃ বিধিমতে: ভবঘুরে সন্দেহভাজন ব্যক্তির সদাচরণের প্রতি-শ্রুতিকে মুচলেকাবন্ধ করা

বিদ্যাসাগর

কৃষ্ণকমল

ছাত্র বনাম বিদ্যাসাগর

স্বপন ঘোষ

কলকাতার বুকে উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে যখন বুলবুলির লড়াই, পায়রার লড়াই, বাচখেলা, নৌকাবিহার, বাইজী নাচ, প্রভৃতি চলতো, ঠিক সেই সময় শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে সারা কলকাতা আন্দোলনে মুখর হয়ে উঠেছিল। কোঁৎ-এর পজেটিভ দর্শন প্রভাব বিস্তার করেছিল শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র গভীর আগ্রহ নিয়ে এই দর্শনের প্রতিক্রিয়া কলকাতায় কেমনভাবে ঘটছে তা লক্ষ্য করতেন। বিদ্যাসাগরের জীবন দর্শনকে এই কোঁৎ ফিলজফি অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী, দ্বারকনাথ মিত্র, যোগেশচন্দ্র ঘোষ রামকমল ভট্টাচার্য এই দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ৯২ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন (১৮৪০—১৯৩২) এবং এই দর্শনের দ্বারা তিনি সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করেন। এই দর্শনের মূল তত্ত্ব সমস্ত রকম ঈশ্বর চিন্তা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, অলৌকিক ব্যাপার, পরলোক তত্ত্ব সমস্ত কিছুকে বর্জন করা। মানববাদকেই ঊর্ধে তুলে ধরা। শ্রমজীবী মানুষদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া, মদ্যপান না করা বিশেষ আন্তর্জাতিক পাঠ্যসূচী ও শ্রেষ্ঠ মানুষদের নামে সপ্তাহে ও মাসের নাম প্রচলন করা। বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা পতিত জমি উৎপাদন করা, মরুভূমিতে ফসল ফলানোর ব্যাপক পরিকল্পনা। বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় এই দর্শনের অনেকখানি তিনি বাস্তবে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কৃষ্ণকমল সারা জীবন এই দর্শনকে সামনে রেখে নিজের জীবনকে চালিত করেছিলেন।

সম্ভবত উনিশ শতকে কলকাতার জীবন ও সংস্কৃতির অনেক কিছু বিদ্যাসাগর ও কৃষ্ণকমল দেখেছিলেন। যদিও বিদ্যাসাগরের চাইতে কৃষ্ণকমল প্রায় ২০ বছরের ছোট। তবুও বিদ্যাসাগর এই প্রিয় ছাত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ থাকতেন। দুজনের মধ্যে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বিদ্যাসাগর চাইতেন কৃষ্ণকমল ডাক্তারি পড়ে একজন বড় ডাক্তার হয়ে সমাজ জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করুক। কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধার ভাব দেখালেও বিদ্যাসাগরের সব কথা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। এজন্যই দুজনের মানসিক সংঘাত চলেছিল দীর্ঘকাল।

কিন্তু ছাত্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এত উৎকণ্ঠার কারণ কী? অনুসন্ধানে জানা যায় কৃষ্ণকমল ১৮৬১ সাল পর্যন্ত (এখন যেখানে বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিসের উত্তরে) দর্জিপাড়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে থাকতেন। সেই সময় কলকাতার পথঘাটের অবস্থা যে কি ছিল সংবাদ প্রভাকরের (১৫ ২ ১২৬৪ ইং ১৮৫৭) সম্পাদকীয়তে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে 'বেশ্যারা ইচ্ছানুসারে সকল স্থানে বাস করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়াতে আরো মন্দ হইয়াছে তাহাতে অনেক সুপথ পরিহার পূর্বক তাহাদিগের কুহক চক্রে পতিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞ লোক মাত্রেই অন্তকরণে ভয় জন্মিয়াছে, এমন পল্লীপথ বা গলি নাই যেস্থানে বারবিলাসিনীদিগের আবাস স্থান দৃষ্টি গোচর না হয়।'

কিশোর কৃষ্ণকমল যেখানে থাকতেন তার আশেপাশে তখন বেশ্যাদের ঘাঁটি। তাই বিদ্যাসাগর এতো সজাগ থাকতেন প্রিয় ছাত্র সম্বন্ধে। কিন্তু কৃষ্ণকমল ১৭ বছর বয়সে এই রকম কোন (বেশ্যা না হলেও) এক নারীর পাল্লায় পড়েছিলেন তাঁর প্রমাণ রয়েছে, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সুরবালা কবিতায়। এই কবিতার ছত্রে ছত্রে কিশোর কৃষ্ণকমলের প্রেমের রাগিণী অনুরণিত হয়েছে। ৩০ বছর বয়সেও অপর একটি মহিলার সঙ্গে কৃষ্ণকমলের যোগাযোগ হয়। তাঁর নাম প্রমোদাসুন্দরী। তার প্রমাণ রয়েছে কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী চরিত্রে। বিদ্যাসাগর অনেক চেষ্টা করেছিলেন কৃষ্ণকমলকে ফেরাতে। কিছুতেই কিছু সম্ভব হল না। দীর্ঘ ৯২ বছর বেঁচে থেকে কৃষ্ণকমল বাগবাগানে এক রক্ষিতার ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিরাট প্রতিভা ধাপে ধাপে কোন রসাতলে চলে গেল তা ভেবে অবাক হতে হয়। ১৭ বছরের কিশোর কৃষ্ণকমল সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন জানালেন বিচিত্রবীর্য কাহিনীর মধ্যে দিয়ে। আমেরিকার দাস বিদ্রোহের প্রতিও পরোক্ষে সমর্থন জানালেন। ফরাসী বিপ্লবের কথাও বলেছেন।

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের কাছে কৃষ্ণকমলের শিক্ষা শুরু। বৃদ্ধ বয়সে নিজের স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে পাতার পর পাতা বিদ্যাসাগরের কথাই কৃষ্ণকমল বলেছেন। বিপিনবিহারী গুপ্ত এই সব কথাকে লিপিবদ্ধ করে পুরাতন প্রসংগ নাম দিয়ে বই প্রকাশ করেন। কৃষ্ণকমল তখন বেঁচে ছিলেন। বাংলা ১৩২৯ ৬ই শ্রাবণ এই বই প্রকাশ হলে সমাজ-

জীবনে একটা আলোড়ন শুরু হয়। বিদ্যাসাগরের নিন্দা ও সমালোচনা অনেকে করেছে। কিন্তু ছাপার অক্ষরে প্রথম করলেন কৃষ্ণকমল। অবশ্য বিদ্যাসাগরের প্রশংসা চৌদ্দ আনা, দু আনার মতো নিন্দা করেছেন। সেই দু আনাই আজকে আমাদের দারুণভাবে ভাবিয়ে তোলে। প্রথমে প্রশংসার দিকে। ৭০ বছর বয়সে ইং ১৯১০ সালে কৃষ্ণকমল তাঁর স্মৃতি কথায় বলেছেন সেই ঘরটি কি বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বক্ষে করিয়া এখনো দন্ডায়মান নাই? তাঁহারই ঘরের সম্মুখে যে মাটি কোদাল দিয়া কাটিয়া তথায় কুস্তির আখড়া করিয়াছিলেন পবিত্র মাটি মস্তকে করিয়া একটু লইয়া আসিবে কি? সেখানে এখন মাটি আছে তো। না সমস্ত জায়গাটা কঠিন পাষাণবৎ সান বাঁধান হইয়াছে? সেই মাটি মাখো, মাটি মাখো গ্রীক পুরানের অসুরের মতো সেই মাটি স্পর্শ করিলেই নবীন বলে বলীয়ান হইবে। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই। অথচ মনে বড় দম্ভ ছিল যে তাঁহাকে চিনিতে আমার বাকী নাই' সত্তর বছর বয়সে বিদ্যাসাগর স্মৃতি কথা বলতে গিয়ে সর্বপ্রথম তিনি এই কথাগুলি উচ্চারণ করেছেন। বাংলায় নবজাগরণকে বুঝতে গেলে বিদ্যাসাগর ছাড়া কোন উপায় নেই।

তাই তিনি উনিশ শতকের নবজাগরণকে বিদ্যাসাগরের মাটি মাখার মধ্য দিয়ে এমনি করেই ব্যক্ত করেছেন। কতো দুঃখ কত অনুশোচনার কথা কৃষ্ণকমলের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। কৃষ্ণকমল বলেছেন, 'বিদ্যাসাগরকে আমি যত ঘনিষ্ঠভাবে জানি তেমন আর কেহ জানে না ইহা আমি স্পর্ধার সহিত বলিতে পারি। এই কথাগুলির মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে তার দ্বারা এটা বুঝতে পারা যায় বিদ্যাসাগরের অনেক কথা অনেক কিছু কৃষ্ণকমল জানতেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি ছয় বছর বয়স থেকে দেখছেন তাঁর কাছে মানুষ হয়েছেন, তাই বিদ্যাসাগরের জীবন দর্শনকে তিনি উপলব্ধি করেছেন। নিজের স্মৃতি কথায় কৃষ্ণকমল বলেছেন, তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়াছি। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন, আসবাববিহীন ক্ষুদ্র কক্ষটিতে কেদারায় হেলান দিয়া একখানি বহি হাতে করিয়া বিদ্যাসাগর নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছেন কলেজ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম, কত ছোট, বড় কথা লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতাম তামকুট সেবন করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন সটকা নল লাগাইয়া নহে, হুঁকা চব্বিশ ঘন্টাই তাঁহার হাতে থাকিত। তিনি নস্য লইতেন' বিদ্যাসাগরের কত্তো খুঁটিনাটি বিষয় কৃষ্ণকমল নজর রাখতেন এই সমস্ত কথাগুলি থেকেই বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণকমল বলে চলেছেন বিদ্যাসাগরের চটি জুতোর কথা শুনিয়াছ তিনি চটিজুতা ব্যতীত আর কিছু পায়ে দিতেন না তাহাকে কখনও খড়ম পায়ে দিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না কখনও কখনও তিনি সখ করিয়া তালতলার চটি বিলাতি বার্ণিশের মত ঝকঝকে কালো করিয়া বুরুষ করিয়া লইতেন, এই চটিজুতা পায়ে দিয়া তিনি খুব হাটিতে পারিতেন।।

উনিশ শতকের কলকাতার সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে কৃষ্ণকমল বলেছেন বিদ্যাসাগরের কথা বলিতে ছিলাম। উজ্জ্বল মধুর ও রূপ সংমিশ্রন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ মহারথীগণের সহিত যখন তিনি একাকী শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার সেই যোদ্ধাবেশ আমার মনে পড়ে। আবার যখন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হইল সেখানে তিনি মাইকেল মধুকে লইয়া রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার সে অবস্থাও আমার বেশ স্মরণ হয়। বিদ্যাসাগর ঊর্মিসংকুল তরঙ্গভঙ্গ ভীষন বাত্যাবিক্ষুব্ধ প্রবাহে একটি স্বচ্ছ সলিলা কলস্বনা স্রোতস্বিনী ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এমনি করে আর কেউ কি বলতে পেরেছেন বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে পাতার পর পাতা কতো প্রশংসা বিদ্যাসাগরের কতো উক্তি কৃষ্ণকমল উদ্ধৃতি দিয়ে চলে গেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর এই প্রিয় ছাত্রকে কতো ভালবাসতেন, কতো খোঁজখবর রাখতেন সেকথা বারে বারে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন কৃষ্ণকমল।

কোন কোন ব্যাপারে প্রচন্ড আঘাত করেছেন বিদ্যাসাগরকে সেই কথাগুলি বলতে গিয়ে অনুশোচনায় বারে বারে দগ্ধ হয়েছেন কৃষ্ণকমল। ১৮ই ভাদ্র ১৩৩৩ ইং ১৯২৬ সালে ৮৬ বছর বয়সে তাঁর স্মৃতি কথায় সর্বশেষ পর্যায়ে যে কথাগুলি বলেছিলেন সেই কথাগুলি কিন্তু কৃষ্ণকমলের জীবিত অবস্থায় বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯১৩ সালে বই আকারে যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে কিন্তু এই কথাগুলি নেই, যে কথাগুলি আমি নীচে উদ্ধৃতি দেব।

বিদ্যাভারতী সংস্করণে ৬ শ্রাবণ ১৩৭৩ ইং ১৯৬৬ সালে বিশু মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বিপিনবিহারী গুপ্তের পুরাতন প্রসঙ্গ ছাপা হয়। সম্পাদকীয় নোটে বিশুবাবু বলেছেন (১) আর্যবর্ত মাঘ ১৩২০, (২) মানসী ও মর্ম্মবাণী আশ্বিন ১৩৩৩ (৩) মানসী ও মর্ম্মবাণী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, (৪) মানসী ও মর্ম্মবাণী আষাঢ় ১৩৩৮-এ কৃষ্ণকমলের স্মৃতি কথা বিপিনবিহারী গুপ্তের কলমের মধ্য থেকে বেরোয়। অর্থাৎ সমস্ত স্মৃতি কথা কৃষ্ণকমল বলে গেছেন মুখে, লিখেছেন বিপিনবিহারী গুপ্ত। সঙ্গে সঙ্গে বিপিনবিহারী গুপ্ত কিছু কিছু প্রশ্ন করেও অনেক কথাই বার করেছেন। কৃষ্ণকমল মারা যাবার চার বছর বাদে ১৯৩৬ সালে ৬১ বছর বয়সে বিপিনবিহারী গুপ্ত মারা যান। অসাধারণ এই বই, নবজাগরণকে জানতে ও বুঝতে হলে এই বই ছাড়া কোন উপায় নেই। কৃষ্ণকমল বলেছেন (এই নতুন বিদ্যাভারতী সংস্করণে) 'বিদ্যাসাগরের সহিত ভবিষ্যতে আমার অপ্রণয়ের কথা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। তিনি নিজেই ভাবিয়া ছিলেন আমি তাহাকে অবজ্ঞা করিলাম কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। ১৮৬২ সালে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হই। কি কুক্ষণে আমি অল্পকাল পরেই তাঁহার বিরাগভাজন হইলাম যখনই মনে হয় তখনই আমি লাঞ্ছিত ও অনুতপ্ত হই। প্রভাতকুমারের সিন্দুরকৌটো পড়িয়াছ? প্রভাত দেখছি মনোগ্যামিষ্ট নয়। ও প্লটটা কি প্রভাত আমার জীবন কাহিনী হইতে পাইয়াছে? পাইল কোথা হইতে? কিন্তু যাহাই হউক সিন্দুর কৌটায় মিঃ বোসের প্রশংসা আমি করি না। আমার অসংযত চিত্তবৃত্তি কিসের নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছিল? পরিণীত শিক্ষিত যুবক কেন দারান্তর গ্রহণের জন্য আত্মহারা হইল? আমার সম্বন্ধে চারিদিকে অনেক কথা রটিল, শেষে বিদ্যাসাগর একদিন আমায় বলছেন—আমার বন্ধু বান্ধব আমার কি বলে জানিস? তুই আমার কথা শুনিস চিরকাল তুই আমার বাধ্য আমি যদি তোকে এই বিয়ে করতে বারণ করি তাহলে তুই শুনবি? আমার কথা আমি অম্লান বদনে উত্তর দিলাম—আপনি কেন তাদের বলেন না যে আমি আপনার কথা না শুনিতে পারি, আমি আপনার অবাধ্য।

তিনি আর কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, আমি তাহাকে অবজ্ঞা করিলাম। কিন্তু এই ঘটনার পরে আমি বার বার বলিয়া আসিতেছি—বিদ্যাসাগর বন্ধুর মত, উপদেষ্টার মত সোজা কথা বলিয়াছিলাম, বাস্তবিক সমস্ত দোষ, সমস্ত ভুল আমারই।'

৮৭ বছর বয়সে রামবাগানে কৃষ্ণকমল এই স্মৃতিকথা যখন বলেছিলেন সেই সময় পাঁচকড়িদা সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি না আজ আর জানবার কোন উপায় নেই, কিন্তু আমি যখন প্রথম অপ্রকাশিত কৃষ্ণকমল লিখি সেই সময় এই তথ্য আমার হাতে আসেনি। কিন্তু কেনাডিয়ান গবেষক জেরালডউইন হ্যানকক ফরবিস কি করে এই তথ্য দেখে ভুল করে লিখেছিলেন পজিটিভজম ইন বেঙ্গল বইতে যে কৃষ্ণকমল দুবার বিয়ে করেছেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই ব্যাপারে দারুণ মনোমালিন্য হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণকমল দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন নি। অথচ কে এই মহিলা যাকে বিয়ে করবার জন্যে ১৮৬১ সালে কৃষ্ণকমল পাগল হয়েছিলেন? অনেক অনুসন্ধান করেও আমি তাঁর কোন হদিস করতে পারিনি। অপ্রকাশিত কৃষ্ণকমল প্রবন্ধে

আমি এক জায়গায় একটু ভুল করেছি সেটি আমি সংশোধন করে দিলাম। প্রমোদাসুন্দরীকে কৃষ্ণকমল রক্ষিতা রেখেছিলেন ১৮৭২ সালের পর। সুতরাং একে নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়নি। আর প্রমোদাসুন্দরীকে বিয়ে করবার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। আসলে বিদ্যাভারতী সংস্করণের এই বইটি তখন আমার হাতে না আসার ফলে এই ভুলটি অনিচ্ছাকৃত ভাবে হয়েছে।

যাইহোক, বৃদ্ধ বয়সে যে নাতনী কৃষ্ণকমলের কাছে থাকতেন সেই মহিলাও কয়েক মাস আগে মারা গেছেন। কেশব সেন স্ট্রীটে এই নাতনী থাকতেন। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তথ্য আমি পেয়েছি। কেউ বলেন এই মহিলা খৃষ্টান, কেউ বলেন ব্রাহ্ম, কেউ বলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের কেউ। কোন হদিস পাইনি। ১৭ বছর বয়সে ১৮৫৭ সালে যে মহিলাকে নিয়ে কৃষ্ণকমল পালিয়ে গিয়েছিলেন তারও কোন হদিস করতে পারিনি। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে এই বিয়ে বন্ধ করতে পেরেছিলেন সে তথ্য আমি পেয়েছি। সর্বশক্তি দিয়ে বিদ্যাসাগর এই বিয়ে আটকে দিয়েছিলেন। ফয়বেস যে ভুল করে গেলেন তার বইতে এর দ্বারা যে কতো ক্ষতি হলো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অনুসন্ধানে জানা গেছে পার্জাটিজনম নিয়ে এখন কয়েকজন গবেষণা করছেন, নিশ্চয়ই তাঁরা ফয়বেসের এই বইটি পড়ে সিদ্ধান্ত নেবেন, তাই এই ভুল সংশোধন করে দিলাম, এবং আমি নিজেও যে ভুল করেছি তাও সংশোধন করলাম।

অনুমান করা যায় ১৮৫৭ সালে কৃষ্ণকমলের পালিয়ে যাওয়া বিদ্যাসাগর গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন। তাই ১৮৬২ সালে দ্বিতীয়বার--এই বিয়ে করতে যাওয়া বিদ্যাসাগর তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দেবার ফলে কৃষ্ণকমলের বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন। তবে আমার অনুমান জানি না হয়তো ভুল হতেও পারে, কৃষ্ণকমলের পিতা ও পিতামহ যে বাড়িতে ঠাকুরপুজো করতেন সেই বসাক বাড়ি আমি খুঁজে বার করেছি। ১৪।৩এ, শোভারাম বসাক স্ট্রীটে এই বাড়িটির এখন অনেক পরিবর্তন হলেও সেই যুগে ১৮৩৬ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণকমলের বাবা যে এই বাড়িতে পুরোহিতের কাজ করতেন তার প্রমাণ পেয়েছি। শোভারাম বসাকদের বংশধরদের এই বাড়িতেই অনুমান করা যায় কৃষ্ণকমল আসতেন মাসিক নির্ধারিত বৃত্তি নেবার জন্যে। এবং এইখানেই কোন রহস্য লুকিয়ে আছে. এই রহস্যের হদিস একজন দিতে পারতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য কয়েক মাস আগে তিনি মারা গেছেন, কৃষ্ণকমলের সব চাইতে প্রিয় নাতনী হেমাঙ্গিনী দেবী।

বিদ্যাসাগর একবারেই সহ্য করতে পারতেন না কৃষ্ণকমলের এই বহেমিয়ান চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু মাঝে মাঝে হাওড়ায় কৃষ্ণকমলের নতুন বাসায় যেখানে প্রমোদাসুন্দরীকে রেখেছিলেন, সেখানে যেতেন, আইনের পরামর্শ ছাড়াও এই প্রমোদাসুন্দরীকে বঙ্কিম 'রোহিণী' চরিত্রে রূপান্তর করলেন। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন, কৃষ্ণকমল বিরাট ডাক্তার হবে, তা হলো না দেখে এবং কৃষ্ণকমলের এই অবনতি দেখে মনে মনে কতো যে বিরক্ত হয়েছিলেন তা আজ আর জানবার কোন উপায় নেই। ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে দুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ বই লিখে কৃষ্ণকমল বিচিত্রবীর্য আখ্যান কাহিনী লেখেন। এই পাণ্ডুলিপিটা তিনি বিদ্যাসাগরকে পড়তে দিয়েছিলেন। এই আখ্যান কাহিনীর মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় ছিল যা প্রকাশ হলে কৃষ্ণকমলের বিপদ হতে পারে বলে বিদ্যাসাগর মাস তিনেক পরে ফেরৎ দিয়ে বলেছিলেন যে তার এখন পড়বার সময় নেই। কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। নিজের স্মৃতিকথায় কৃষ্ণকমল বলেছেন 'ষোল সতের বৎসর বয়সে 'দুরাকাঙ্খের বৃথা ভ্রমণ' নামক একখানি পুস্তক আমি রচনা করিয়াছিলাম, সেইটির উল্লেখ করিয়া এই কবিতার গোড়াপত্তন করিলাম :

যৌবনের রক্তজোরে হইয়া উন্মাদ
লিখেছিনু গল্প এক দুরাকাঙ্খ নাম
পাগল বলিয়া তাহে কেহ দিল গালি
বুঝিতে পারি না বলি কেহ দিল আলি
বালিশতা বলি উপহাস করে কেহ
কেহ বা তাহারে কহে অশ্লীলের গেহ।

অনেক বড় কবিতা। এই কবিতায় কৃষ্ণকমল কঠোরভাবে সেই সময় বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করেছিলেন। এই দুইটি বইয়ের সংক্ষিপ্তসার তুলে দিলাম—

এক উদ্‌ভ্রান্ত যুবক অনেক আশা নিয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যের একজন নামকরা লেখক হবার বাসনা ছিল, কিন্তু কিছুই যখন হলো না তখন একটি ফরাসি জাহাজে করে হাইদরের রাজ্যে যদি কিছু উন্নতি করা যায় তারি চেষ্টায় যুবক রওনা হয়ে জাহাজে ১৭ বছরের এক ফরাসী বিবাহিতা যুবতীর সঙ্গে প্রথম দর্শনেই প্রেম বিনিময় হয়, প্রচণ্ড ঝড়ে এই যুবতী জুলিয়াকে নিয়ে যুবক জাহাজের মাস্তুলে গভীর রাত্রিতে প্রেম নিবেদনে ব্যস্ত সেই সময় জাহাজ থেকে জুলিয়া সমুদ্রে পড়ে যায়। যুবক জাহাজ ডোববার সম্ভাবনা দেখে. যে ছোট বোটটি জাহাজের সঙ্গে বাঁধা থাকতো তাতে চেপে বসে সবার অলক্ষ্যে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিল। নির্জন এক দ্বীপের মতন জায়গায় সেইখানে কমলাদি নামে এক যুবতীর সঙ্গে মিলিত সেই যুবতীর সর্বনাশ করে পালিয়ে যায়। যুবক এবার হাইদরের রাজ্যে নিজ ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে সেনাপতি হবার যোগ্যতা অর্জন করে ইংরাজ সরকারের বিরাগভাজন হয়ে পড়লো। ইংরাজ সরকার দেখলো এই যুবককে দমন করতে না পারলে হাইদার রাজ্য গ্রহণ করা যাবে না। যুবকও বুঝতে পারলো ইংরাজরা তাকে এখানে টিকতে দেবে না, সেই অনুমান করে যুবক আবার নিরুদ্দেশ হলো। এই যুবককে ধরবার জন্যে ইংরেজরা অনেক চেষ্টা করলো। ত্রিরিশ জন অনুচর নিয়ে যুবক যখন মলোয়ায় উপস্থিত হলো, ইংরেজরা এটা জানতে পেরে যুবককে তাদের হাতে দেবার জনে অনুরোধ করলে, মারহাট্টা রাজা তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ করল। যুবক এর পর স্থির করে, কোনক্রমে যদি মালয়ার রাজকুমারীকে বিয়ে করতে পারে তবে এই রাজ্যের সমস্ত সৈন্যদলকে দিয়ে ইংরেজদের এই দেশ থেকে বিতাড়ন করা যাবে, যুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে। যুবক বুঝতে পেরেছিল মারহাট্টা রাজকুমারী তাকে মনে মনে ভালবাসে। যুবক তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে রাত্রির অন্ধকারে জানলা দিয়ে চোরের মতন রাজকুমারীর কাছে উপস্থিত হলে, রাজকুমারী তীব্র ভর্ৎসনা করে যুবককে 'বহিষ্কৃত' করে দিল।

উদ্‌ভ্রান্ত যুবক গভীর বনের মধ্যে এক বাঘের মুখে পড়ে সেখানে পুলিন্দ নামক এক উপজাতির সহায়তায় জীবন ফিরে পায়। পুলিন্দ উপজাতিদের একটি বিরাট দলের সঙ্গে যুবকের পরিচয় হয়। বেশ কিছুকাল থাকবার পর দলপতির সুনজরে পড়ে তার কন্যাকে বিয়ে করবার মনস্থ করে, যুবক বুঝতে পারে অন্য এক পুলিন্দ যুবক এই দলপতি কন্যাকে ভালবাসে, বাধ্য হয়ে যুবক সেই স্থান থেকে আবার পালিয়ে যায়।

অবশেষে পরিয়া নামক স্থানে এক উপজাতিদের সঙ্গে যুবক মিলিত হয়ে জানতে পারে এই পরিয়াদের দেখলে উচ্চবর্ণের লোকেরা মেরে ফেলে দেয়। সমাধিস্থলে যে সমস্ত খাবার প্রেতদের দেয় সেই খাবার পরিয়ারা খেয়ে থাকে, যুবক এও বুঝতে পারল ও জানতে পারল, এই বৃদ্ধ পরিয়া ও তার জারজ কন্যা ছাড়া এই নির্জন বনে তাদের আর কেউ নেই। অবশেষে যুবক এই জারজ কন্যাকে বিয়ে করে জীবনের স্থিতি ও স্থায়িত্ব খুঁজে পায়।

অসাধারণ এই উপন্যাস ১৮৫৭ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে কেমন করে লিখলেন কৃষ্ণকমল? কাহিনীর মধ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইংরেজদের কৃষ্ণকমল কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। গল্পের নায়ক যেমন ইংরেজদের সঙ্গে আপোষ করেন নি, এবং যার ফলে নায়ক একরূপ নির্বাসিতভাবে নির্জন বনের মধ্যে পরিয়া জাতের জারজ কন্যাকে বিয়ে করে জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেল। ব্যক্তিগত জীবনেও কৃষ্ণকমল ইংরেজদের সহ্য করতে পারতেন না। ইংরেজ আমাদের দেশ অধিকার করে আছে এটা মেনে নিতে পারতেন না।

১৮৬২ সালে কৃষ্ণকমলের বিচিত্রবীর্য প্রকাশিত হয়। নিজের স্মৃতি কথায় কৃষ্ণ-

কমল বলেছেন, 'পুস্তকখানি আমি সতের আঠোর বৎসর বয়সে রচনা করি। কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর ছাপান হয় নাই।' এই কাহিনীতে সিপাই বিদ্রোহের একটি রূপক কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত বাঙালীর হীন বৃটিশ তোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন কৃষ্ণকমল। সেই যুগে নবজাগরণের হোতারা সিপাই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বৃটিশ সরকারকে সমর্থন করেছিলেন। সতের বছরের কৃষ্ণকমল কিন্তু এই বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনেও কৃষ্ণকমল আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিপিনবিহারী গুপ্ত কেউ কৃষ্ণকমলের সম্পূর্ণ রূপটি তুলে ধরতে পারেননি। বিশু মুখোপাধ্যায়ও ১৯৬৬ সালে পুরাতন প্রসঙ্গ বইটি নতুন করে অনেক তথ্য ও টীকা দিয়ে ছেপেছিলেন, কিন্তু তিনিও কৃষ্ণকমলের সম্পূর্ণ রূপটি ধরতে পারেননি।

বিদ্যাসাগর কেমন করে এই লেখাকে সমর্থন করবেন। তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না কৃষ্ণকমলের হয়ে কোন সমর্থন বা সাহায্য করা।

কৃষ্ণকমল নাস্তিক ছিলেন। কোঁৎ-এর পজেটিভ দর্শনে বিশ্বাসী তাই সমাজচেতনার প্রশ্নে দর্শনের প্রশ্নে তিনি কোন আপোষ করেননি। বিদ্যাসাগরকে এখানে তিনি নির্মমভাবে সমালোচনা করেছেন। তার জন্য কোন অনুতাপ করেননি। নবজাগরণ না হবার মূলে শহরের জমিদার শ্রেণী যাদের কিছু ব্যবসা ইংরেজ সরকারের সাহায্যে গড়ে উঠেছে, এটা কৃষ্ণকমল বুঝতে পেরেছিলেন তাই বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করে তিনি বলেছেন—"বিদ্যাসাগরের সর্বতোমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্য গঠনে কি প্রকার বিকাশ পাইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি: কিন্তু এই সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার রাজতক্তের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে. একথা কল্পনা করিতেও পারিতেন না" কতো মৃদু এবং তীক্ষ্মবান নিক্ষেপ করেছেন দৃঢ়তার সংগে। বৃদ্ধ বয়সে এই কথাগুলি বলতে কোন কুণ্ঠিত বা অনুশোচনা বোধ করেননি।

নবজাগরণের প্রাণপুরুষ মাইকেল মধুসূদনকে কৃষ্ণকমল অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এই মাইকেলকে বিদ্যাসাগর কতো সাহায্য করেছেন একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু কৃষ্ণকমল অন্যরকম কথা বলেছেন "বিদ্যাসাগর মাইকেলের লেখা পছন্দ করিতেন না। ব্ল্যাংক ভার্স তাঁহার একেবারে অসহ্য। তিনি ক্যারিকেচার করিতেন— তিলোত্তমা বলে ওহে ওন দেবরাজ তোমার সংগেতে আমি কোথায় যাইব" কৃষ্ণকমল আরও বলেছেন "বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রকে পছন্দ করিতেন না। ম্যাটার সম্বন্ধে স্টাইলের সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করিতেন না; কিন্তু ম্যানার সম্বন্ধে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিল" কৃষ্ণকমল আরও বলেছেন "আমি তো আগেই বলিয়াছি বিদ্যাসাগরের ঐ একটা প্রধান দোষ ছিল তাহার ন্যারোনেস তাঁহার 'বিগটেরি তাহার একান্ত 'বামুন পন্ডিত' ভাব। এক হিসাবে ক্যাথোলিসিটি তাঁহার ছিল না যে তাহার প্রদর্শিত পথ না লইল, তিনি তাহাকে নগণ্য মনে করিলেন: যে তাঁহার অনবরত গর্জিত বাষ্পাকুলিত লোচনের মত ভাষার প্রয়োগ না করিল তাহারি উপর তিনি খড়্গ হস্ত"।

সংস্কৃত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল কৃষ্ণকমলের। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের ও ভাষার আলোতে বাংলা ভাষার নতুন দিগন্ত উন্মোচন হতে পারে বলে কৃষ্ণকমলের মনে একটা দৃঢ়প্রত্যয় ছিল। উনিশ শতকের কলকাতার সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়াকে কিছুতেই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ইংরেজি ভাষার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। ইংরেজি ভাষাই পৃথিবীর জ্ঞান ভাড়ারের দ্বারকে খুলে দিতে পারে বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ইংরেজ আমাদের দেশ অধিকার করে আছে. আমরা পরাধীন এটা কৃষ্ণকমল সহ্য করতে পারতেন না। তাই কলকাতায় শিক্ষিত মানুষদের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষদের ইংরেজ তোষণ দেখে ঘৃণায় সিউরে উঠেছিলেন কৃষ্ণকমল। বিদ্যাসাগরের প্রতি এখানে তিনি আগুনের গোলা ছুড়েছেন "বিদ্যাসাগরের প্রতি এই যে ভক্তি, ইহার একমাত্র কারণ, সে তাহার চরিত্রের উৎকর্ষ তাহা নহে। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি বিশেষ কারণ আছে— যাহা উল্লেখ করিলে আমাদের সমগ্র বাঙালীর চরিত্রগত একটি দোষ প্রকটিত হইয়া পড়িবে। যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, সে সময় এটা বেশ বুঝিতে পারা যাইত—"সাহেবদের কাছে" বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি খাতির পাইয়াছিলেন "মুৎসুদ্দি শ্রেণীর প্রতি বিদ্যাসাগরের কিরূপ মনোভাব ছিল, এবং এই ব্যবসায়ী জমিদার" শ্রেণীরা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কিরূপ মেলামেশা করতেন, সেই ছবিও কৃষ্ণকমল দিয়েছেন। কৃষ্ণকমল বলেছেন "সেকালে সমস্ত বড়লোক বিদ্যাসাগরের অনুগত ছিল। পাইকপাড়ার রাজারা তাঁহার কথায় উঠিতেন, বসিতেন, তাঁহার কথায় কোনও সিকিউরিটি না লইয়া তাঁহারা এক ব্যক্তিকে তিন লক্ষ টাকা কর্জ দিয়াছিলেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের যখন টাকার দরকার হইল, তখন টাকার অভাব রাজাদের নিকট জ্ঞাপন করিলেন, তাহারা বলিলেন—আপনার টাকার দরকার হইতে পারে একথা পূর্বে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে কিছু রাখিতাম। নগদ টাকা সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। সাহিত্যের দিক দিয়া যদি দেখ, তা হইলে দেখিতে পাইবে যে, এই পাইকপাড়ার রাজারা মাইকেল মধুসূদনের প্রথম ও প্রধান প্যাট্রন ছিলেন, তাহাদের রাজবাটিতে শর্মিষ্ঠা প্রথম অভিনীত হয়"।

এখানে কৃষ্ণকমল সমাজচেতনার প্রশ্নে নির্মম হয়েছেন। এই নির্মমতা বিদ্যাসাগরের প্রতি চরম আকার কেন ধারণ করেছিল তা বোঝা শক্ত. কারণ এই সমস্ত কথাই তিনি বৃদ্ধ বয়সে বলেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর, অন্তত ১৫।২০ বছর পরে। সুতরাং অনুমান করা যায় কোন রাগের বশে. এই সমস্ত কথা বলেন নি। ধীরে, চিন্তা করে, দিনের পর দিন এই সমস্ত কথা কেন তিনি বলেছেন, একি ব্যক্তিগত আক্রোশ? মনে হয়, তা নয়। যদিও ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন কৃষ্ণকমলের উক্তি পড়ে অনুধাবন করলে তার থেকে বিদ্যাসাগরের দোষে আবিষ্কার করা যায় না... হয়তো এর মধ্যে কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রচেষ্টা দেখেছিলেন যাতে তাঁর ঈর্ষাহুতার ছোঁয়াচ লেগেছে কৃষ্ণকমল সম্পর্কে দীর্ঘদিন অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে আমি এসেছি, যে সময় ও যে পরিবেশে এই সমস্ত কথা তিনি বলেছিলেন তাতে ঈর্ষার কোন কারণ থাকতে পারে না। রামবাগানে এক নির্দিষ্ট জায়গায় কৃষ্ণকমল এই সমস্ত কথা বলেছেন. সুতরাং এখানে ঈর্ষার কোন ক্ষেত্র নেই। আসলে যা মনে হয়েছে উনিশ শতকের আর বিশ শতকের সেতুবন্ধন রচনা করে দিয়ে কৃষ্ণকমল এইটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে সামন্তবাদী কালচার আমাদের সমস্ত কিছুকে গ্রাস করেছে। ইংরেজরা একে সমর্থন করেছেন, আর নব্য উঠতি শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত লোকেরা ইংরেজদের সমর্থন করছেন। এটাই কৃষ্ণকমলের দুঃখ, আর আক্ষেপ। তাই কৃষ্ণকমল বলেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহের দোষ নহে পাইকপাড়ার রাজাদের দোষ নহে। দোষ দিতে হয় সমস্ত বাঙালী জাতিকে দাও মিসেস বেশন্ত হিন্দুয়ানির ব্যাখ্যা করিলেন, বাঙালী গর্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিবি যখন হিন্দুর তীর্থস্থানে, হিন্দু কলেজ স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, হিন্দু রাজন্যবর্গ টাকা ঢালিয়া দিল. প্রকাণ্ড কলেজ স্থাপিত হইল. এই যে ভাব. ইহা আমাদের জাতীয় অবনতির একটা অপরিহার্য প্রসব।"

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

একজন বন্ধু এদের একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও বটে বললেন, 'কিন্তু শাস্ত্র মতে বিয়ে হয়েছিল কুশন্ডিকাকান্ড সে পুরোহিত এখনও আছেন। ওরা অনায়াসেই দাবী করতে পারে।

মোহনও এবার একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন, নরেশ একেবারেই উড়িয়ে দিলেন. তিনি বড় বৌদির একটু বেশী আশ্রিত ছিলেন চিরদিনই। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সময় বন্ধুদের কাছে বড়মানুষী দেখাতে গোপনে অনেকবার অনেক টাকা নিয়েছেন—ভবানী সম্বন্ধে তাই তার জাতক্রোধ পারলে তাকে আর তার ছেলেমেয়েদের সকলকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দিতেন তিনি রূঢ় কন্ঠে বললেন, 'দাবী থাকেতো মামলা করুক। আদালত যদি বলে দিতে অবশ্যই দেব। নাবালকের সম্পত্তি আমরা তো তার গোমস্তা মাত্র। তবে আপনাদের তো জানার কথা দাদা তাঁর স্ত্রীর নামে যথাসর্বস্ব লিখে দিয়ে গেছেন মায় এই কাপড়ের কল মামলায় যদি কিছু পাওয়া যায় সেও কনকের—যতই মামলা করুক—টাকা একটাও আদায় করতে পারবে না। বরং যদি মামলা-মকন্দমায় না যায়—দাদার কুকর্ম ভেবে কিছু কিছু খোরপোশের মতো দিতে পারি—যত দিন না ছেলেরা সাবালক হয়ে ওঠে।

বন্ধুরা অপমানিত বোধ করে চলে এলেন। তাঁরা বললেন, মামলা করো আমরা আছি সাক্ষী দোব।

ভবানী ম্লান মুখে কপাল চাপড়ায়। আমাও তার ফুরিয়ে গেছে বোধ হয়, কম দিন তো কাঁদছে না। সেই বাপ মারা যাবার পর থেকেই তো শুরু হয়েছে। সে বললো, কি দিয়ে মামলা করব বলুন! দিল্লি থেকে ফিরে এসে সংসার খরচের টাকা দেবার কথা এ মাসের। যেদিন এই খবর এল বাড়িতে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে পঞ্চাশটা টাকাও ছিল কিনা সন্দেহ। এখনও তো দেনাতেই চলছে আগেকার হিসেবে চলছে তাই কেউ উচ্চবাচ্য করেনি এ পর্যন্ত। বাড়িওলা অনেক দুঃখু জানিয়ে তিন-চারবার গলা খাঁকারি দিয়ে জানিয়ে গেছেন, এ মাসেই তার টেকস দেবার কথা। সম্বলের মধ্যে কখানা গয়না তাও ঝুড়ি ভর্তি কিছু নয় ওব যখন যা খেয়াল হয়েছে নিজেই দিয়েছেন— আমি তো কখনও চাইনি। এ বেচে সংসার চালাব না এদের ভাতের চিন্তা করব?

কেবল ছোট ভাই মহেশের—সে নাকি বলেছিল দাদাদের, যখন বিষয়ের ভাগ এক পয়সা পাবে না জানাই, তখন স্বীকৃতিটা দিতে দোষ কি? বিয়ে হয়েছিল, ভাল ব্রাহ্মণের মেয়ে পালটি ঘর—এতো আমরা সবাই জানি। ছেলেগুলোর কথা ভাব একবার, তাদের জীবনটা কি দাঁড়াবে? বৌদি নিজে বলেছিলেন,—ওদের খবর দিয়েছ তো? একসঙ্গে ঘাট করা তো উচিত—সে কথাটা মনে করে দ্যাখো।

নরেশ কঠিন কণ্ঠে বলল, 'বৌদির সর্বভূতে দয়া ছিল, তিনি দেবী, আমরা দেবতা নই। ও বিয়ের কথা আমরা জানিও না, জানতে চাইও না। আর তুমি যা জান না, তা নিয়ে মাথা ঘামাও কেন? এতটা বয়স হল, বিয়ে থা করেছ—না শিখলে কোন পেশা, না নিলে একটা চাকরি। দাদার ব্যবসাটাও তো বুঝে নিতে পারতে। এধারে তো শুনছি ব্যবসার নাম করে হনটে হনটে বেড়াও রাতদিন, রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরো না। মুরদ থাকে তো ঐ বৌদির হয়ে মামলা চালাও না!'

সে বেচারার তখন নিজেরই টিকে ধরাতে জামিন লাগে এমন অবস্থা—সে চুপ করে গেল। হয়ত অনেক সদিচ্ছা আর উচ্চাশা ছিল কিন্তু চিরদিনের 'খরচে', সে রোজগার যে করে না তা নয়, তবে যা আয় হয় দুহাতে উড়িয়ে দেয়। একবার কিছু টাকা করেছিল—আবু হোসেনের মতো দুদিনের নবাবীতে উড়িয়ে দিয়ে এখন পথের ভিখিরী।

গুজরমল এসেছিল একদিন চুপি চুপি ভবানীর সঙ্গে দেখা করতে।

বলেছিল, 'আপনি আমার হয়ে সাক্ষী দেবেন বলুন. আমি আপনার বায়না করা ঐ কাসারিপাড়ার বাড়ি এখনই কিনিয়ে দিচ্ছি। আমি নগদ টাকা আপনার হাতে এনে দোব, সে টাকা কোথা থেকে এসেছে কেউ জানবে না, আপনি বাড়িওলাকে দেবেন আপনার জমানো টাকা হিসেবে। আপনি মামলা করুন, বড় উকিল লাগিয়ে দিচ্ছি, মামলা চুক্তি করে দুতিন হাজার যা চায় তাও দিয়ে দেব, আমাকে সাক্ষী মানবেন, আমি আপনার হয়ে সাক্ষী দেব।'

তাতে গুজরমলের লোকসান হত না, কেন না তখন 'মিল'এর এমন অবস্থা—ছ আনা অংশেই দেড়-দু লাখ টাকা পাওনা হবে কনকের।

ভবানী কিন্তু দৃঢ়স্বরে ঘাড় নাড়লে, 'না, সে আমি পারব না।'

যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হল গুজরমল। সে তার নিজের মানসিক গঠন অনুযায়ী ভেবে নিয়ে বলল, 'আপনি কি আরও কিছু বেশি চান? বেশ, কত চান বলুন, ও-বাড়ি ছাড়াও আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিচ্ছি।'

ভবানী বিরক্ত হয়ে উঠল, 'আপনি অত টাকার লোভ দেখাচ্ছেন কেন? এক লাখ টাকা দিলেও আমি ঐটুকু ছেলের সর্বনাশ করতে পারব না।'

আরও অবাক হয়ে যায় গুজরমল 'ও তো আপনার সতীনপো, ওর জন্যে আপনি নিজের ছেলেদের সর্বনাশ করবেন?'

ভবানী বলে, 'তাঁর বড় ছেলে, তিনি খুব ভালবাসতেন, একই সঙ্গে অমন বাবা-মা গেল বেচারার, একই বয়েসে। তার প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করলে তিনি স্বর্গে থেকেও দুঃখ পাবেন। তাছাড়া ওর মা যাকে আপনি সতীন বলছেন, তিনি সবপ্রথম বলেছিলেন, ও-বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলতে, তিনি বোনের মতো কাছে রাখবেন, এ-বিয়ে সকলকে মানতে বাধ্য করবেন। না, এ আমি পারব না, মাপ করবেন।'

। ২৪ ।

অভিভূত হয়ে শোনে বিনু। কোন কোন কথা তখনই বোঝে না হয়ত কিন্তু বেশির ভাগই বোঝে, এ-ধরনের ব্যাপারে ওর মনটা বাল্যকাল থেকেই—অকাল পরিপক্ক।

শোনে, জিজ্ঞাসা করে করে অনেক বেশি তথ্য জেনে নেয়, যা বামুনমা আগে বলতে ভুলে গিছলেন। বামুনমা এমনিই সব গুছিয়ে বলতে পারেন না, আগের কথা পরে. পরের কথা আগে বলেন, সেগুলোও ঠিব করে নিতে হয় ওকে। নামেরও গোলমাল হয়ে যায়। কোন কোন অংশে যে ফাঁক থেকে যায় গল্পের—নিজের কল্পনা দিয়ে সেটা পূর্ণ করে নেয়।

অভিভূত হয় এইজন্যে যে, বামুনম

যতই গল্পের ছলে বলুন, আর একজনের গল্প করে—এটা যে ওদেরই পূর্ব ইতিহাস ওদের কালের কথা—সেটা খানিকটা শোনার পরই বুঝে নিয়েছিল। মনমোহন মুখুজ্যেই মহেশ, ভবানী মহামায়া। ওর কাকা রাধাপ্রসাদ ডাক্তার, অনাদিপ্রসাদ ইঞ্জিনীয়ার—এ-তথ্যটা কাশীতে ছোটকাকা যাওয়ার সময় যার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা থেকেই জেনেছিল। বাবুলালও, গল্পের মধ্যে মোহন তার রাধাপ্রসাদ অনেকবার গুলিয়ে ফেলেছিলেন, সত্যটা বুঝেই সেটা ধরিয়ে দেয়নি বিনু।

এত বড় বংশ তাদের, অদের বাপ এমন মহান, এমন অক্লান্তকর্মী ভদ্র দিলখোলা মানুষ ছিলেন।

অভিভূত হয় এই ভেবেই আরও, সেই সত্যটাই—অবিশ্বাস্য, অপ্রকাশিত এই তথ্যের বেদনা ও আনন্দ তাকে যেন নেশায় ডুবিয়ে রাখে।

তাদের মতো অভাগা কে! ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই, বিনুর তো তখন বোঝার বয়স হয়নি—এমন বাবা, এমন মা—কল্পপ্রভাও তাদের মা, দেবী মা হারান। আর এমন সব লোক তাদের আত্মীয়—সত্যকার আত্মীয়, রক্তের সম্বন্ধে—তা সত্ত্বেও পরিচয় দিতে পারছে না—হয়ত পারবেও না কোনদিন। ভাবতে গেলেই কান্না আসে, যার সঙ্গে চোখাচোখি হবার সম্ভাবনা এড়িয়ে চলে। চোখে চোখ পড়লেই হয়ত কেঁদে ফেলবে সে।

ক'দিন সে যেন এই ইতিহাসের মধ্যেই বাস করে। এই কাহিনীর অনুবর্তন করে—প্রতিটি তথ্যের, প্রতিটি ঘটনার। একটা ঘোরের মধ্যে কাটে তার দিনরাত, তার ভাবনা। মহামায়া বুঝতে পারেন না ব্যাপারটা। হঠাৎ কী হল ওর। কোথাও থেকে কি বড় রকম কোন আঘাত পেয়েছে? ইস্কুলে কি কিছু করে ফেলেছে লজ্জা পাবার মতো?—দাদার কাছে বকুনি খাবে বলে এমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? কেবলই নির্জনতা খোঁজে কেন? এক জায়গায় বসে হয় বাইরের কলাগাছ বা আমগাছের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, নয়তো একখানা বই খুলে বসে থাকে কিন্তু চোখটা সেখানে থাকলেও দৃষ্টি বা মনটা নেই, তা একটু দেখলেই বোঝা যায়।

শেষে একদিন বিনু নিজেই থাকতে পারে না আর। মার কাছে শুয়ে রাত্রে বলে, মা—ঐ যে আর. পি. মুখুজ্যে ডাক্তার—খুব নাম হয়েছে আজকাল, উনি—উনি আমার মেজ কাকা হন?

চমকে ওঠেন মহামায়া।

কথা কইতে দেরি হয়—কী উত্তর দেবেন তখনই ভেবে পান না। শেষে পাল্টা প্রশ্ন করেন: কে বলেছে রে তোকে।

বামুনদি?

লজ্জায় বালিশের খাঁজে মুখ গোঁজে বিনু।

বামুনদি বলতে বারণ করেছিলেন বার বার, লজ্জা সেই জন্যেই। যদি আবার বকেন বামুন মাকে?

লজ্জিত হন মহামায়াও।

একটু ভয়ও পান। কতটা কি বলেছেন বামুনদি এইটুকু ছেলেকে তার ঠিক কি?

আস্তে আস্তে বলেন: আর কি বলেছে রে?

সে কথার জবাব দেয় না বিনু। একটু পরে শুধু বলে বেশ করেছ মা। খুব ভাল করেছ—ঐ বারোয়াড়ীটার হয়ে সাক্ষী দিতে রাজী হও নি। স্বর্গ থেকে বাবা মনে দুঃখ পেতেন। কীই বা হত ঐ কটা টাকার? আমরা মানুষ হয়ে ঢের বেশী টাকা তোমাকে রোজগার করে দেব!

মহামায়ার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মাথার গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেন, বাঁচালি তুই আমায়। আমি নিশ্চিন্ত হলুম। কেবলই মনে হত ভুল করলুম কিনা তোদের বঞ্চিত করলুম কিনা। বিশেষ এই যে কষ্ট করছে খোকা—কেবলই ঐ কথাটা মনের মধ্যে খচ-খচ করে।...তাই কর, তোরা বড় হয়ে বাপের নাম উজ্জ্বল কর—দরকার নেই কটা টাকার জন্যে ছোট-লোক বৃত্তি করে। টাকাও চাই না আমি তোদের। মানুষ হ, বড় হ,—তাতেই আমার শান্তি, তাঁর ঋণ শোধ হবে তাতে।

তবু অনেকদিন পর্যন্ত আসল কথাটা পাড়তে পারে না বিনু। ওর খুব ইচ্ছা করে এই কাকাদের একদিন দেখে। নাই বা পরিচয় দিল, দূরে থেকেই একটা ছুতো করে দেখে আসে যদি? দোষ কি?

মনে হয় কাউকে কিছু না বলে একদিন ইস্কুল থেকে বেরিয়ে একাই গিয়ে দেখে আসে। অন্তত একজনকে, অক্তারকাকাকে।

কিন্তু সাহসও হয় না ঠিক।

পথ চেনে না যে! কোথা দিয়ে কোন্ ট্রামে যেতে হয়, কোথায় নামতে হয় কিছুই জানে না।

কাকে বলবে?

মা হয়ত রাগ করবেন, বকবেন। যেতে দেবেন না খুব সম্ভব।

হয়ত বামুনমাকে সুদ্ধ বকবেন। এইসব ওর মাথায় ঢুকিয়েছেন বলে।

শেষ পর্যন্ত থাকতেও পারে না, তবু আর সংকোচ ঘোচে না।

কোনমতে সাহস সঞ্চয় করে বলেই ফেলে মাকে, 'আচ্ছা মা, একদিন গিয়ে কাকাদের সঙ্গে দেখা করলে কি হয়? না হয়, তেমন যদি বোঝো, পরিচয় না-ই দিলুম। কোন ছুতোয় একদিন এমনিই দেখে আসি? মেজকাকা তো ডাক্তার, বৈঠকখানার সঙ্গে রুগী দেখেন শুনেছি। তাঁকে তো বাইরে থেকেই দেখা যেতে পারে।....এক সেজকাকা, তা তাঁরও বাড়িতে ঐ কাছেই—কোন ছুতোয় দেখে দোষ কি।

কিন্তু সব ভয় উড়িয়ে দেন মহামায়া।

বলেন, না না, ভয় কেন। এমনিই দেখা করতে পারিস। সে কিছু বলবে না। তোরা কত বড় হয়েছিস, কি পড়ছিস না পড়ছিস তাঁরা সব খবর রাখেন।

তারপর একটু কি ভেবে বলেন, 'দেখি বড় খোকাকে বলে একবার। তোর যখন এত ইচ্ছে। সে আবার কী বলে তার মতামত হবে তবে তো—'

রাজেন প্রথমটায় রাজি হয়নি। একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছিল কথাটা, 'সে আবার কি। নিজে থেকে সেধে গিয়ে—। ধোৎ'

কিন্তু তখন মনে হয় মহামায়ারই যেন ঔৎসুক্য ও কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠেছে। তিনিই বললেন, তা একবার যা না। কখনও তো যাস নি। বিনু পাগলা, কিন্তু এক একটা কথা ঠিক বলে। যাওয়া-আসায় সম্পর্কটা সহজ হয়ে আসে অনেক ক্ষেত্রে।

শেষ পর্যন্ত একটা উপলক্ষ এসে যায়।

সামনে পুজো, তার মানে বিজয়া।

উত্তম সুযোগ।

মহামায়া রাজেনকে বলেন, 'এই তো ভাল একটা উপলক্ষ। এতদিন এখানে থাকতিস না, সে একটা কথা ছিল। এখন বলতে গেলে এক বছরেই—। বিজয়াতে গিয়ে প্রণাম করে আয় না ওদের।'

তবু রাজেন খানিক ইতস্তত করে। বলে, 'সে আবার কি বলবেন তাঁরা। কি ভাববেন কে জানে! তাছাড়া আমাকে তো চেনেনও না। নিজেরা কাকার কাছে গিয়ে পরিচয় দেওয়া—সে বড় বিশ্রী। লজ্জা করে। হয়ত একগাদা লোক থাকবে—বাইরের লোক—।'

ইদানীং মহামায়ার আগের সে অবিচলিত ইচ্ছা ও নির্বিকার ভাব যেন চলে গেছে। এখন একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

তিনি বকে ওঠেন, 'দ্যাখ তোর যা চেহারা—তোদের গুষ্টি কেটে বসানো। তুই গিয়ে দাঁড়ালে আর পরিচয় দিতে হবে না যদি হয়—ফিরে চলে আসিস।'

অগত্যা রাজেনকে রাজী হতে হয়।

তবে বিজয়ার দিন সে কিছুতেই যাবে না, আগেই সাফ বলে দিয়েছিল।

পরের দিনও গেল না রাজেন। তার পরের দিন রবিবার—একটু বেলাবেলি বেরিয়ে সাড়ে তিনটে নাগাদ গিয়ে হাজির হল রাধাপ্রসাদের গোয়াবাগানের বাড়িতে।

রাধাপ্রসাদ এখন অন্য বাড়িতে একটা ডিসপেন্সারী করেছেন, সেইখানেই রোগী দেখেন। বাইরের বড় ঘরটা বৈঠকখানা হিসেবেই ব্যবহার হয়। ওরা গিয়ে কড়া নাড়তেই চাকর বেরিয়ে এল, 'কাকে চাই?'

রাজেন নিজের নাম বলল, মুখোপাধ্যায় পদবীটাকে একটু বেশী জোর

দিয়ে। তারপর বলল, 'বলগে যাও তারা প্রণাম করতে এসেছে।'

ভেতর থেকে ফিরে এসে সেই লোকটিই বাইরের ঘরের দোর খুলে দিল। বলল, 'বসুন আপনারা, ডাক্তারবাবু আসবেন এখুনি।'

রাধাপ্রসাদ অবশ্য একটু 'পরেই নামলেন। হাতে খবরের কাগজ।

ভাবলেশহীন গম্ভীর মুখ। নীরবেই প্রণাম নিলেন। কোলাকুলি করার কোন চেষ্টাও করলেন না। শুধু একটি শব্দ—'বসো.' বলে নিজেই একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসে কাগজটা মুখের সামনে মেলে ধরে পড়তে লাগলেন।

তারপর আবার কি ভেবে কাগজখানা নামিয়ে রেখে আপন মনেই বসে শূন্যে একটা আঙুল ঘুরিয়ে যেন কিছু লেখার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বিনুর মনে হল নিজের নামটাই সই করে যাচ্ছেন অনবরত।

একটু পরে আর একটি ছোকরা চাকর দুটো বড় থালায় চারটে করে ছোট আকারের মিষ্টি—দুটো রসগোল্লা ও দুটো সন্দেশ—দু পয়সা দামের—এনে সামনে রেখে চলে গেল। আর একজন এল দু গ্লাস জল নিয়ে।

নীরবেই খেল ওরা। অপমানে বিনুর কানমাথা গরম হয়ে উঠেছে তখন, কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা দেখা দিয়েছে।

রাজেন কেমন অবিচলিত স্থিরভাবে বসে খেয়ে যাচ্ছে! দেখে বেশ একটু অবাকই হয়ে গেল বিনু। এর মধ্যেই এক-চমক মনে হল, দাদা বোধহয় বাবার স্বভাব পেয়েছে। কিছুতেই বিচলিত হয় না। অন্তত যা শুনেছে সে সকলের মুখ থেকে, সম্প্রতি বামুনমার গল্প থেকেও!

মিষ্টি খাওয়া শেষ হলে রাজেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে আসি আমরা।'

'এসো' বলে রাধাপ্রসাদও উঠে দাঁড়ালেন।

বিনু তখনও পর্যন্ত আশা করছিল ওদের একবার ভেতরে যেতে বলবেন কি সঙ্গে নিয়ে যাবেন কাকীমার সঙ্গে দেখা করাতে। অন্তত ওদের ভাইবোনদেরও ডাকবেন।

সেদিক দিয়েই গেলেন না রাধাপ্রসাদ, ওরা থাকতেই বরং ভেতরবাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

রাজেন এবার মরীয়া হয়েই বলে ফেলল, 'সেজকাকার বাড়িটা এই কাছেই, না? ভীম ঘোষ লেন—না কি?'

রাধাপ্রসাদ ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'সেখানে যাবার দরকার নেই—সে পছন্দ করে না।'

বিজয়া সম্ভাষণাদি পছন্দ করেন না-না ওদের. অনাবশ্যক বোধেই তা আর বললেন না।

লজ্জায় অপমানে বিনুর চোখ ঝাপসা হয়ে গিছল, সে পথ চলছিল কতকটা অন্ধের মতো।

দাদার কি অবস্থা ও লক্ষ্য করে নি, করার মতো শক্তিও ছিল না। শুধু এইটুকু বোধ ছিল—সে সোজাসুজিই হাঁটছে—বেশ সহজভাবে। ঘাড় হেঁট করে, কতকটা আন্দাজে আন্দাজে, তার পা লক্ষ্য করেই যেতে লাগল বিনু।

একটুখানি যেতেই—হঠাৎ প্রায় অপরিচিত অথচ যেন ঠিক একেবারে পুরো অজানাও নয়—এমন একটা গলার ডাক কানে এসে পৌঁছল। 'আরে, রাজেন, না?... এই যে ইন্দ্রজিৎও আছ দেখছি। এদিকে কোথায় গিছলে? মেজদার বাড়ি? বিজয়ার প্রণাম করতে বুঝি? হায় হায়—আর লোক পেলে না!'

এতক্ষণে একটা সহজ আন্তরিক ধরনের কথা কানে গেল। এতক্ষণ যে বুকচাপা ভাবটা বোধ করছিল, সেটা কেটে গেল নিমেষে। উৎসুক সাগ্রহে চেয়ে দেখল, তারাপ্রসাদ না কেবু।

আসলে তারাপ্রসাদ ওদের ন' কাকাই, এখন ছোটয় দাঁড়িয়েছেন। শক্তিপ্রসাদ বলে ও'র পরে একটা ভাই হয়েছিল, সে ফার্স্ট-ক্লাসে পড়তে পড়তে ট্রামচাপা পড়ে মারা যায়।

এ তথ্যটা সম্প্রতি মার মুখে শুনেছে ও।

এবার তাড়াতাড়ি কোনমতে এদের আড়ালে চোখটা মুছে নিয়ে ভাল করে চাইল বিনু।

উজ্জ্বল প্রশান্ত মুখ। নির্মল হাসি। আন্তরিকতা শুধু কণ্ঠস্বরে নয়—দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

কে বলবে যে এই লোকটা লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়ে দেউলে খাতায় নাম লিখিয়েছে।

তারাপ্রসাদ সস্নেহে এক হাত রাজেনের আর এক হাত বিনুর কাঁধে দিয়ে বললেন 'তারপর? কেমন আছ সব? তা হঠাৎ যে মেজদাকে প্রণাম করতে গেলে? এ বুদ্ধি কে দিলে তোমাদের? খেজুর গাছে শণ ঘষতে যাওয়া! বৌদি বলেছেন বুঝি?'

রাজেনের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তারাপ্রসাদকে দেখে, এতক্ষণ বিরূপতাটা কঠোর চেষ্টায় চেপে রেখেছিল—এখন যেন একটা মুক্তির স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। বলল, 'এই যে ইনি! ইনি কাকাদের দেখবার জন্যে মরে যাচ্ছিলেন একেবারে; এ'র জেদেই আসতে হল আরও। নইলে একাই বোধহয় চলে আসত!'

'তা হয়।' তারাপ্রসাদ সস্নেহে বিনুর কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললেন, 'আপনার লোককে দেখতে ইচ্ছে হয় বৈকি। আপনার তো বটেই, খুবই আপনার। রক্তের সম্পর্কে আপন। এমন আপন লোককে জীবনে একবারও দেখলুম না, পরিচয় পর্যন্ত হল না—এ একটা ক্ষোভ মনে জাগা স্বাভাবিক।'......

তারপর দুজনকেই প্রবলভাবে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, তা বেশ হয়েছে। চলো এখন আমার ওখানে চলো।...বেশী-দূর নয়। এই কাছেই হরি ঘোষ স্ট্রীটে। হরি ঘোষের গোয়াল—কথাটা শুনেছ তো? সেই হরি ঘোষের নামেই রাস্তা!'

রাজেন বললে, 'তা আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? এদিকে?'

'আমিও ঐ কম্মই করতে যাচ্ছিলুম, মেজদা আর মেজবৌদিকে পেন্নাম করতে। কাছাকাছি আছি, যেতে তো হয় একবার, কী বলো। যাওয়া উচিত। কালই যাওয়া উচিত ছিল—তা, আর ভাল লাগল না। সে যাক গে, তোমরা এখন আমার ওখানে চলো।'

'তা ওখানে যাবেন না? মেজ—আপনার মেজদার কাছে?'

বিনুই প্রশ্ন করে মেজকাকা বলতে গিছল আগে, কিন্তু ইচ্ছা হল না সম্পর্কটা উচ্চারণ করতে, সামলে নিল নিজেকে।

তারাপ্রসাদ বুঝলেন। একটু হেসে ওর কাঁধে আবারও একটা চাপ দিয়ে বললেন, 'ছিঃ বাবা, তিনি যে ব্যবহারই করে থাকুন—তবু তিনি গুরুজন। ওভাবে কি বলে।'

বিনু ও'র স্নেহেই বোধহয় একটু জোর পেয়েছে। বলল 'না, কি জানি, ঐ সম্পর্কটা আমরা উচ্চারণ করলে যদি তিনি অসন্তুষ্ট হন, ধৃষ্টতা ভাবেন।'

'বাঃ, এই যে বেশ কথা বলতেও জানো দেখছি। এইরকমই চাই, কথার পৃষ্ঠে ঠিক কথা বলা—ঠিক জবাবটি দেওয়া—অবশ্য অসভ্যতা কি বাচালতা নয়—আসল স্মার্টনেস। হাউ এভার, সে হবেখন। দশমী থেকে ত্রয়োদশীতে পৌঁচেছে, চতুর্দশী হলেও কোন ক্ষতি হবে না। আমি না গেলেই বোধহয় মেজদা খুশী হবেন বেশী। তাঁর ভয়—যদিও এখনও পর্যন্ত চাইনি কোনদিন—আমি তাঁর কাছে সাহায্য চাইব। সে হবেই এখন, সন্ধ্যেবেলা কি রাত্তিরেও সারা চলতে পারে। যখন হোক একবার 'প্রেজেন্ট স্যার' করে গেলেই হল। সম্পর্ক তুলে দিয়েছি একেবারে—এমন কথা না বলতে পারেন।'

তিনি ওদের প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে গেলেন।

হরি ঘোষ স্ট্রীটটাই একটু বড় গোছের গলি, তা থেকে একটা আরও সরু গলি বেরিয়েছে তার মধ্যে একটা বাড়ির একতলা নিয়ে আছেন ও'রা।

খান তিনেক ঘর। পুরনো সেকালের বাড়ি, কিছুদিন আগেই চুনকাম হয়েছে···

সেটা দেওয়ালের ওপর দিকে চাইলে বোঝা যায়. নিচেটা নোনা ধরে বালির পলেস্তারা বেরিয়ে আছে, কোথাও বা ইঁট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ঘরে ঢুকতেই যেটা চোখে পড়ে—ওপরতলার পাইখানার মোটা মলটা এঘরের দেওয়াল বেয়ে নেমে এসেছে, তবে সবটা নয় এই রক্ষা, মধ্যপথেই আবার দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে গেছে।

এই ঘর, বাসা। আসবাবপত্রও বিশেষ নেই বললেই চলে। মেঝের বিছানা, তার চাদর ওয়াড় জরাজীর্ণ গেছের—একটারও অবস্থা ভাল এমন চোখে পড়ল না। ঘরে সাবান দিয়ে কাচা হয় খুব সম্ভব, ছাদে যাবার অধিকার না থাকায় ঘরেই শুকোনো—লালচে ছোপ পড়ে গেছে। দড়ির আলনায় কাপড় জামা ঝোলানো, তারাপ্রসাদের একটা পাঞ্জাবী দেওয়ালের হুকে ঝুলছে।

বিছানারই একদিক থেকে কতকগুলো বালিশ সরিয়ে ওদের বসতে বললেন কমলা-কাকীমা।

শ্যামবর্ণের ওপর ভারী সুন্দর শ্রী একটি, হাসিখুশী স্নেহময় মানুষ। এত ভাগ্যবিপর্যয়—এখন তো সম্পূর্ণ নিরাভরণা শাঁখা ছাড়া কিছুই নেই. স্বামীর অনাচার অবহেলা, মদ বেশ্যাসক্তি কিছুই তো বাকী ছিল না—কিন্তু মুখে তার জন্য কোন ক্ষোভ দুঃখ বা অভিমানের চিহ্ন নেই, মুখের প্রসন্নতা নষ্ট হয়নি এতটুকুও।

আরও যেটা বিনু লক্ষ্য করল—অল্প-ক্ষণই ছিল ওরা, তার মধ্যেই চোখে পড়েছে তার—স্বামীর দিকে কাকীমার সদাসতর্ক দৃষ্টি, তাঁর সুখসুবিধা আনন্দ কিসে হয় সে সম্বন্ধে সদাসচেতন। এর পরেও ওরা এসেছে ছোটকাকার বাড়ি, এ বাড়ি ছেড়ে শেষে বাড়ি বদলাতে বদলাতে দমদম পর্যন্ত পিছু হটতে হয়েছে তারাপ্রসাদকে—কাকীমার মুখে হাসি ছাড়া কিছু দেখে নি।

ওরা অবশ্য খুব অল্পক্ষণে ছাড়া পেল না।

কাকা তখনই হাতীবাগান বাজার থেকে মাছ নিয়ে এলেন, কাকীমাকে হুকুম করলেন, 'মাছের তরকারী আর পরোটা করে দাও, পেট ভরে খেয়ে যাবে ওরা।'

রাজেন একটু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কাকার এক ধমকে চুপ করে যেতে হল।

ছেলেমেয়েগুলি ভারী শান্ত আর ভদ্র। এমনভাবে কথা কইতে লাগল যাতে মনে হয় এ পরিচয় অল্প এই ক মিনিটের নয়—আজন্ম তারা একই বাড়িতে মানুষ। তারাও বলতে লাগল সবাই মিলে, 'খেয়ে যান না, কী হয়েছে!'

তারাপ্রসাদ ওদের ঠিকানা জেনে নিলেন, বললেন, 'শিগগিরই একদিন যাবো। আমিও ঐসব মামলা মকদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম, তোরা যে কাশী থেকে কবে এলি কোথায় ছিলি—এসব খোঁজ খবরই নিতে পারিনি। মেজদা জানেন অবশ্য ওঁকে একদিন জিজ্ঞাসাও করেছিলুম, বললেন, 'কী জানি সে খাতায় লেখা আছে। অন্য একদিন এসো, খুঁজে দেখব।' সঙ্গে সঙ্গে উপদেশও দিলেন, 'ওদের কোন যথার্থ উপকার যখন করতে পারবে না—মিছিমিছি যোগাযোগ রেখেই বা লাভ কি?'

তারাপ্রসাদ এলেন সত্যিসত্যিই ছ-সাত দিন পরেই।

এখানের ঠিকানা খুঁজে বার করা খুব সহজ কাজ নয়—একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়েছিলেন বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে, খুঁজে খুঁজে জিগ্যেস করে করে এসে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়েছে। আট আনা ভাড়া এক টাকাতে রফা করতে হল।

নিয়মমতো একটু মিষ্টি আনতেও ভুল হয়নি তেমনি ভক্তিভরে প্রণামও প্রণামও করল মহামায়াকে।

মহামায়া একটু ফল কেটে দিলেন, আর শরবৎ। আর কিছুই ছিল না ঘরে দেবার মতো, কে-ই বা আনতে যায়। খাবারের দোকান সব অনেক দূরে। তবু বামুনদি বুদ্ধি করে দুটি মুড়ি মেখে দিলেন তেল দিয়ে, উঠোন খুঁজে একটা কাঁচা লঙ্কাও সংগ্রহ করলেন—অনুপান হিসেবে।

কেবু এতেই বেশী খুশী। তবে এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, 'আপনারা বুঝি এখনও চা ধরেননি? ধরে দেখুন গরিবের এমন বন্ধু আর নেই। একাধারে খাদ্য আর পানীয়—দুইই। খুব খিদে পেয়েছে এক কাপ চা খান—আর খিদে থাকবে না।'

হাসলেন মহামায়া। বললেন, 'অত বক্তৃতা কেন, খেতে ইচ্ছে করছে? বিনু গেছে আনতে। আমাদের এই পাশের বাড়ির এঁরা সিমলেয় থাকতেন এককালে—খুব চা-খোর। কেউ বললেই করে দেন, সেই উপলক্ষে নিজেদেরও একটু বাড়তি খাওয়া হয়ে যায়। তবে খুব ভাল চা হবে না হয়ত, ওদের অবস্থা এখন খুব পড়ে গেছে।'

'আর ভাল চা! আমরাও ওসব শৌখিনতা ভুলে গেছি অনেককাল। ছটা প্রাণীর ভাত যোগানোই মুশকিল হয়ে উঠেছে,

ভাল চা কিনব কোথা থেকে। এক পয়সার প্যাকেট আসে এক একদিন মুদির দোকান থেকে।'

'তা মহামায়া খুব সঙ্কোচের সঙ্গে প্রশ্ন করেন, 'অন্য আর কোন ব্যবসা টাবসা দেখবে হচ্ছে না?'

'নাঃ। বদনাম একটা রটে গেছে তো, কেউ পয়সা ধার করতে চায় না। ঐ টুক-টাক করছি, উঞ্ছবৃত্তি যাকে বলে। তবে কি জানেন— বাঁধা কোন আয় তো নেই, হঠাৎ হয়ত শ' তিনেক কি শ' চারেক টাকা হাতে এল, তারপর আবার দুমাস একটা পয়সার মুখ দেখা গেল না। বাড়িভাড়াই ষাট টাকা, তারপর খাওয়া-পরা, বিছানা মাদুর ধোপা-নাপিত—কী নেই! আর, জানেন তো, আমি চিরদিনই একটু খরচে—হাতে টাকা এলেই হাত চুলকোয় খরচা করার জন্যে।'

মহামায়া একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ছেলেমেয়েগুলোর পড়াশুনোর কি করছ? সেদিকটা নজর রেখো। বিজনেস টিজনেস করো আর যা-ই করো—ওটার অবহেলা করো না।'

'সেইখানেই তো অসুবিধে হয়ে পড়েছে একটু। মেয়েদুলোকে দিয়েছি ঐ কাছেই—সিউ ইস্কুলে। বড় ছেলেটারই কিছু হচ্ছে না। সেজদা আশিস্যি বলেছিলেন—ওঁর কাইন্ডালি—ওঁর কাছে রাখতে, ওর পড়াশুনোর সব ভার তিনি নিতে রাজী আছেন। মনে করছি এবার তা-ই দোব, আর তো কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।'

সে তো ভালো কথাই ভাই। এতদিন দাওনি কেন? মহামায়া বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে পড়াশুনোর একবার ধাক্কা পড়ে গেলে আর এগোতে চায় না।

কি, জানেন—সেজদা, সেজদা কেন ছোড়দা বলাই উচিত—আমাকে মানুষ বলে মনে করেন না। তা বললেও ঠিক বলা হয় না, আমাকে অমানুষ বলে মনে করেন। কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়, তবু—ছেলেটা থাকবে—ওঁকেও বলতে ঐ কথাটাই তাকে শোনাবেন, তুলনা দিয়ে বলবেন, 'কেন বাপের মতো হলো না'। সেটা ভাবতে বড় খারাপ লাগে। ছেলেটার আরও খারাপ লাগবে, লাগতে বাধ্য।...কিন্তু করবই বা কি! ছেলেটার ইহকাল পরকাল নষ্ট হতে বসেছে। যদি লেখা-পড়াটা ওর হয় সেই লাভ। না হয় সেবা করতে শিখবে।'

তারাপ্রসাদের মুখ থেকে অনেক খবরও পাওয়া গেল। যা এতদিন অন্য ভাইরা কেউ বলেন নি।

মজলায় এদের কিছু হয়েছে, কমল দু' লাখ টাকা পেয়েছে গুরুজনদের কাছ থেকে। লাইফ ইনসিওরেন্সের পঞ্চাশ হাজার টাকাও পাওয়া গেছে। কমল নাকি কী সব ব্যবসা-টাবসার কথা ভাবছে। কি ভাবছে তা এঁরা জানেন না। কারও সঙ্গে পরামর্শ করে না। কিছু বন্ধুবান্ধব জুটেছে তাদের সঙ্গেই যত কিছু পরামর্শ।

রাধাপ্রসাদ নাকি শেষ অবধি রাজেনদের কথা বলতে গিয়েছেন, বলেছিলেন, ছোট-খাটো একটা বাড়ি শহরতলীর দিকে, পাঁচ-ছ' হাজারের মধ্যে কিনে দিতে। কমল রাজী হয়নি। শুধু এদের খরচের যে টাকাটা তখনও পর্যন্ত রাধাপ্রসাদ দিচ্ছিলেন, সেটা তারপর থেকে এই কয়েক মাস কমলই দিচ্ছে। এখন সত্তর টাকা করে দেয়—তাও দুবারে—সেটাও একশো করার কথা তারাপ্রসাদ বলতে গিছল, সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছে—'ভেবে দেখি' সে ভেবে দেখা যে আজও হয়ে ওঠেনি, তা বলাই বাহুল্য।

সব খবর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রাজেনের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'আমি অমানুষ হই আর যাই হই, ভগবানে বিশ্বাস করি, আমি বলছি তোমাদের উন্নতি হবেই। মানুষ হয়ে একদিন দাঁড়াবেই তোমরা। ওর চেয়ে অনেক ভাল বাড়ি করবে। ও অহেন্দার দান না দিয়েছে ভালই করেছে।'

তারাপ্রসাদ আসবার দিনও বামুন-মা বেশ ভাল ছিলেন। মুড়ি মেখে দেন তিনিই, নিজে থেকে। লোকটার মন বুঝে। পাশের বাড়িতে বিনুকে পাঠিয়ে চা আনবার ব্যবস্থাও তিনিই করেন।

কেবল আসলে আনন্দও যেমন হয়েছিল এদের সব খবর পেয়ে, তেমনি একটা সুতীব্র আঘাতও পেয়েছিলেন। কমল কিছুই দিল না, সত্যি সত্যিই কোন দিন কিছু দেবে না—এ উনি ভাবতেই পারেন নি। এত দিন সমস্ত বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সত্যের আওতা থেকে বাঁচিয়ে মনের গভীর গহনে একটি আশা লালন করছিলেন- কতকটা হয়ত নিজের অগোচরেই—একদিন এরা সবটা না হোক কিছু প্রাপ্য পাবেই। সেই আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

'এদের বাপের ধনে এরা একেবারে বঞ্চিত হল! শুনলুম তো তিন লাখ টাকার ওপর পেয়েছে। প্রাণে ধরে কিছুই দিতে পারল না। তিন লাখ টাকার সুদ কত! এক মাসের সুদ দিলেও তো এদের একটা এইসব জায়গায় কি নারকেলডাঙ্গা বেলেঘাটার দিকে কোথাও মাথা গোঁজার মতো যায়গা হয়ে যেত! অথচ মনমোহন মুখুজ্জের প্রাণ ছিল এই ছেলেমেয়ে তিনটে—তা কি ওর কাকারা জানে না, কারুর মুখে শোনে নি? একটু বিনুকে কি আদর করতেন! সেরায়ই বলতেন এদের আমি বড় হলেই বিলেতে পাঠিয়ে দেবে, ঐখানেই পড়াশুনো করবে।'

এই ধরনের কথা শুরু হলে আর থামে না। আপন মনেই গজগজ করে যান।

মহামায়া মৃদু তিরস্কার করেন মধ্যে মধ্যে ওসব কথা থাকনা বামুনদি, বলে তো কোন লাভ হবে না, মিছিমিছি শুনলে এদের আরও মন খারাপ লাগবে। কাটাঘায়ে নুনের ছিটে!

বারবার এই ধরনের অনুযোগ বামুনদি শেষ পর্যন্ত চুপ করে যান বটে, কিন্তু—পরে মনে হত মহামায়ার—এমনভাবে চুপ না করলেই ভাল হত।

কেন না, দু-তিন দিন পরে গজগজ করা বন্ধ হতে কেমন যেন গুম্ হয়ে গেলেন। কারও সঙ্গে কথা বলেন না, খেতেও চান না। বাড়া ভাত পড়ে থাকে, উনি রোদে বসে থাকেন—হাঁটু মুড়ে উবু হয়ে কলার মতো—ঘন্টার পর ঘন্টা।

এমনি আট-দশ দিন কাটার পর জ্বর এল।

অনেক দিন আর জ্বর-টর আসেনি, মহামায়া একটু উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। তবে পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলাকে জানাতে তিনি আশ্বাস দিলেন, 'ও কিছু নয়, এই তো নতুন হিমের সময়—দ্যাখো গে যাও ঘর ঘর জ্বর হচ্ছে। একটু আদা দিয়ে চা করে পাঠিয়ে দিচ্ছি বেশ গরম গরম খাইয়ে দাও, আর জলটল না ঘাটে বেশী সেদিকে নজর রেখো।'

দিন তিনেক পর জ্বরটা একটু কমল কিন্তু বামুনদি উল্টো কথা বললেন, 'ওরে বড়খোকা, তুই একবার গিয়ে আমার বোনের বাড়ি খবর দিয়ে আয় বাবা একটু। যা বাবা যেমন করে হোক সময় করে, কলেজ কামাই হয় হোক!—আমার আর দেরি নেই, ছুটি এসে গেছে—মিছিমিছি, তোরা ছেলেমানুষ আতান্তরে পড়বি কেন!'

মহামায়া বলেন, 'ও কি কথা গা। তুমি যে ছেলেমানুষ হয়ে গেলে একেবারে। সামান্য জ্বর, এই তো কমেও গেল— তার মধ্যে একেবারে আতান্তরে পড়বার মতো কি হল?'

কেমন এক রকমের ক্ষীণ অথচ দৃঢ়স্বরে বামুনদি বলেন, 'যা বলছি ঠিকই বলছি। এখান মলে এদেরই সব করত হবে, খরচ-অন্তর তো বটেই, একগাদা টাকা লাগবে—তাছাড়া কে-ই বা এ ঝিক্কি করবে, করতে তো ঐ এক বড়খোকা। ...না না, তুই কাল সকালেই চলে যা, বাবা, এসে যেন ওরা আমাকে নিয়ে যায়। বোনের কাছে আমি একটা বিছে হার রেখে দিয়েছি অনেককাল থেকে, হাজার দুঃখেও হাত দিইনি। কথাই আছে মরার পর ছাদ্দশান্তি যা লাগবে ঐ থেকেই করবে। বোনপোই মুখে আগুন দেবেখন। এখানে বড়খোকা দিলে ওকে একটা পিণ্ডি দিতে হবে। কোথা থেকে করবে তাই শুনি!'

অগত্যা ভোরে উঠেই রাজেনকে যেতে হল। বোনপো আপিসের ফেরৎ যখন এল তখন একেবারেই ঝিমিয়ে পড়েছেন বামুনদি।

বোনপোর ডাকে যেন অনেক চেষ্টায় চোখ মেলে বললেন, 'ঐ যে কি ট্যাকসিগাড়ী না কি হয়েছে আজকাল, এখুনি একটা ডেকে আন, আমাকে নিয়ে চল। তোর হাতের জল আর আগুন খাবো—কত দিন থেকে টেঁকে আছি। তুইও তো বাঙ্গালী। আর দেরি করিসনি। তুই একা পারবিনি, বড়খোকাও চলুক দশটা না সাড়ে দশটায় গাড়ি আছে বলিস তোরা, তাতেই ফিরে আসবেখন!'

ক্রমশঃ

"নিখুঁত পরিষ্কার"

অথচ
হুইলের
দাম বেশী নয়

আগেকার দিনে বাড়ীর সকলের
কাপড়চোপড় সাবান দিয়েই
ধুতাম। কিন্তু কাপড় যেন
কিছুতেই তেমন পরিষ্কার হত না।

তারপর, সাবানের দামে যে সব
ডিটারজেন্ট বার পাওয়া যায়
তাই ব্যবহার করে দেখলাম...
তাতেও ভাল পরিষ্কার হল না।

এখন আমি হুইল পেয়েছি। সবুজ
ডিটারজেন্ট বার। এতে দারুণ ফেনা
হয়...আর টেকেও বেশী...আর
সাবানের চেয়ে কত বেশী কাপড় যে
ধোয়...তাও নিখুঁত পরিষ্কার করে।

Wheel
GREEN DETERGENT BAR
হুইল

হুইল

দারুন ধোলাই শক্তি- চড়া দাম থেকে মুক্তি!

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। সাতচল্লিশ ।।

বাপী গাড়ি চালাচ্ছে। পাশে ঊর্মিলা। স্টিয়ারিং হাতে বাপীর সামনের দিকে গম্ভীর মনোযোগ। ঊর্মিলা আড়ে আড়ে দেখছে তাকে। একটু বাদে আধা-আধি ঘুরেই বসল। ভুরুতে পলকা ভ্রুকুটি। আট-ঘাট বেঁধে প্রস্তুত হবার মতো করে বলল, তাহলে কি দাঁড়াল?

—কি আর, তোমার দেখার ইচ্ছে ছিল, দেখা হল।

ঊর্মিলারও গম্ভীর হবার চেষ্টা। সামান্য মাথা নাড়ল। —হ্যাঁ, দারুণ দেখা হল। প্রথমে মিষ্টি দেখলাম। তারপর মিষ্টির চোখ দিয়ে তোমাকে দেখলাম, শেষে তোমার চোখ দিয়ে মিষ্টিকে দেখলাম। এত দেখার ধাক্কায় এখন আমি খাবি খাচ্ছি, আর ভাবছি এ-সময় মায়ের বেঁচে থাকার খুব দরকার ছিল।

মায়ের কথায় বাপী একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিল তাকে। —এ-সময়ে মানে?

—মানে বুঝতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে? মা ছাড়া কে আর তোমাকে চুলের ঝুঁটি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে বানারজুলির মাটিতে পা দুটো পুঁতে রাখতে পারত?

বিবেকের কাঁটা ফোটাতে চায় ভেবে বাপীর ভিতরটা উষ্ণ হয়ে উঠল। তবু নির্লিপ্ত সুরেই জিগ্যেস করল, তোমার খুব ভাবনা হচ্ছে?

—খুব। সম্ভব হলে বিজয়কে বলে যাওয়া ক্যানসেল করতাম। ...একদিন কি ভাবছিলাম জানো?

ভিড়ের রাস্তা। বাপী মুখ ফেরালো না। উৎকর্ণ একটু।

—ভাবছিলাম... এই মিষ্টি-হারা হয়ে বানারজুলিতে ফিরে সেই রাতে ক্ষেপে গিয়ে আমাকে যে তুমি একেবারে শেষ করে দাও নি সেটা নেহাত মায়ের পুণ্যির জোর। মিষ্টি তোমার চোখে কত মিষ্টি সেটা আজ বোঝা গেল। কিন্তু আমার মায়ের মতো অত পুণ্যির জোর তার স্বামী বেচারার আছে?

ধরা পড়ে বাপীরও মুখোশ খুলছে। ঠোঁটের ফাঁকে ক্রুর হাসির ঝিলিক। —নেই মনে হল?

—খুব। থাকলে মিষ্টি আরো ঢের সহজে তোমাকে বরদাস্ত করতে পারত। নয় তো ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারত। তার বদলে শ্যাম আর কুল দুই নিয়ে বেচারী কেবল জ্বলছে মনে হল।

বিশ্লেষণ শুনে কান জুড়লো। মা গায়ত্রী রাই, তোমার মেয়ের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। ভিতরে পরিতুষ্ট আরো। মেয়েটা ভালবাসতে জানে বলেই ভালবাসার অনেক চেহারাও অনায়াসে মনে দাগ কাটে। তবু গায়ত্রী রাইয়ের মেয়েকে আর বাড়তে দেওয়া নিরাপদ ভাবছে না। তাই সামনে মনোযোগ আর চেষ্টায় গম্ভীর।

—বাজে বোকো না।

—বাজে বকা হল? ঊর্মিলার গলা চড়ল একটু। —ওর বরকে তুমি একলা হোটেলে নিয়ে গিয়ে এনটারটেন করো কোন মতলবে—উদারতা দেখাও না বুকে ছুরি বসাও?

সামনে ট্রাফিকের লাল আলো জ্বলে উঠেছে বাপীর সেদিকে খেয়াল নেই। একটা ক্রুদ্ধ ডাক শুনে আচমকা ব্রেক কষে গাড়ি থামালো। অদূরের পুলিশটা চেঁচিয়ে উঠেছে আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির নম্বর নেবার জন্য নোট বইটাও হাতে উঠেছে। তাড়াতাড়ি গাড়িটা ব্যাক করে বাপী দাগের এ-ধারে নিয়ে এলো। রুষ্ট পুলিশের দিকে চেয়ে এমন করে হাসল যেন লজ্জায় তারই মাথা কাটা যাচ্ছে। আশপাশের গাড়ি থেকেও অনেকে দেখছে।

ছদ্ম রাগে ঊর্মিলার দিকে ফিরে বাপী চোখ পাকালো। —তুমি মুখ বন্ধ করবে না এর পর লোক চাপা দেব?

কিন্তু [illegible]

চোখ দুটো হঠাৎ প্রচন্ড রকমের ধাক্কা খেল একটা। ঊর্মিলার ও-পাশ ঘেঁষে রং-চটা একটা ছোট অস্টিন গাড়ি দাঁড়িয়ে। তার চালকের বিস্ফারিত দুই চোখ এই গাড়ির দিকে। তার পাশে যে বসে সেই মহিলারও। স্থান-কাল ভুলে দুজনেই তারা ঝুঁকে বাপীকে দেখছে, ক্রিম রঙের ঝকঝকে বিলিতি গাড়ি দেখছে আর ঊর্মিলাকে দেখছে।

অস্টিনের চালকের আসনে বসে মণিদার পাশের বাড়ির কনট্রাকটর সন্তু চৌধুরী। তার পাশে মণিদার বউ গৌরী বউদি।

...সন্তু চৌধুরীর স্টিয়ারিং-ধরা ডান হাতের পুষ্ট কব্জিতে সেই মস্ত সোনার ঘড়ি। দু হাতের আঙুলে সেই রকম ঝকঝকে সাদা আর নীল পাথরের আংটি। পরনে ট্রাউজার, গায়ে সিল্কের শার্ট। শার্টে হীরের বোতাম। ফর্সা রং বটে, মুখশ্রী আগেও সুন্দর ছিল না। ছটা বছর বয়েস বাড়ার দরুন কিনা জানে না, দেখা মাত্র এই সাজসজ্জার মানুষটাকে বাপীর আগের থেকেও খারাপ লাগল।

আগে লাল আলো খেয়াল না করে পুলিশের ধমক খেয়েছে। এখন আবার সবুজ আলোয় থেমে আছে দেখে পুলিশ হাঁক দিল। পিছনের দাঁড়ানো গাড়িগুলো হর্ন দিচ্ছে। পাশের অস্টিনও ততক্ষণে বিশ গজ এগিয়ে গেছে। রাস্তাটা পেরিয়ে বাপী গাড়ির স্পিড চড়াতে গিয়েও ব্রেকেই পা রাখল। সামনের অস্টিন ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গৌরী বউদি নামছে।

নিজের গাড়ি বাপী হাত দশেক পিছনে দাঁড় করালো। সামনের অস্টিন ওর জন্যে দাঁড়িয়ে গেছে বুঝতে অসুবিধে হল না। গৌরী বউদি শুধু নয় সন্তু চৌধুরীও নেমেছে। স্টার্ট বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ইশারায় ঊর্মিলাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে বাপীও হাসি-হাসি মুখে নেমে এলো।

গৌরী বউদির পরনে হালকা নীল দামী শাড়ি। গায়ের শামলা রঙের সঙ্গে মানায় না এমন কটকটে শাড়ি বা ব্লাউস আগেও পরত না। তবে প্রসাধনের পরিপাট্য আগের থেকে কিছু বেড়েছে মনে হল। তা সত্ত্বেও বয়েসের দাগ আগের থেকেও স্পষ্ট। কাছে আসার ফাঁকে বাপী হিসেব করে নিয়েছে।...সেদিন আঠাশ ছিল, এখন চৌত্রিশ। আঠাশে ধারালো কথাবার্তা আর তার থেকেও বেশি ধারালো মেজাজের ফাঁকে যে রসের দাক্ষিণ্য উকিঝুঁকি দিত, এখন তাতেও টান ধরেছে মনে হয়।

[illegible] ধাক্কায় সন্তু চৌধুরীর [illegible]

আগের থেকেও দিল-খোলা হাসি মুখে। কাছে আসতে এক হাত কাঁধের ওপর তুলে দিয়ে বলল, আমরা তাহলে ভুল দেখি নি দাদার—অ্যাঁ?

বাপীও হাসি মুখে মাথা নাড়ল। ভুল দেখে নি। তোয়াক্কের সুরে বলল, সন্তুদা আবার কবে ভুল দেখেছে।

এই সন্তু চৌধুরীই একদিন ওর চেহারাখানা 'ডিসেপটিভ' বলেছিল বাপী ভোলে নি। ভদ্রলোক আবার হাসল এক দফা। —তোমার বউদি তো দেখেও বিশ্বাস করতে পারে নি, তাই গাড়ি থামিয়ে নামলাম। কথার ফাঁকে আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে নিল একবার। —বিশ্বাস করা শক্তই অবশ্য...সেই তুমি পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে এই তুমি! কি ব্যাপার বলো দেখি ভায়া, চাকরিতে তো এত বরাত খোলে না—ব্যবসা?

বাপী তেমনি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিল।

সন্তু চৌধুরী ওর ঝকঝকে বিলিতি গাড়িটা আর একবার দেখে নিল। একই সঙ্গে ঊর্মিলাকেও। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যবসা? কলকাতাতেই?

জবাবে কোটের ভিতরের পকেট থেকে মোটা ব্যাগটা বাপীর হাতে উঠে এলো। আইভরি ফিনিশড কার্ড বার করে তার হাতে দিল। ফ্ল্যাট নেবার পর এ কার্ড নতুন করা হয়েছে। ব্যবসার নাম মালিকের নাম বাড়ির ঠিকানা ফোন নম্বর সবই এতে ফলাও করে ছাপা আছে।

কার্ডটা উল্টে-পাল্টে দেখে সন্তু চৌধুরী সেটা গৌরী বউদির দিকে এগিয়ে দিল। হাতে নিয়ে গৌরী বউদিও চোখ বোলালো। বাপীর এখন অন্তত 'ডেসেপটিভ' মুখ তাতে নিজেরও সন্দেহ নেই। বুকের তলায় খুশির ঢেউ, বাইরে নিরীহ লজ্জা-লজ্জা মুখ।

তরল স্বীকৃতির সুরে সন্তু চৌধুরী বলল, তোমার সঙ্গে সেই পাল্লায় হারার পরেই আমার মনে হয়েছিল তুমি কালে-দিনে কিছু একটা হবে—নাও ইট আর রিয়েলি সাম-বডি! সত্যি গ্র্যান্ড সারপ্রাইজ দাদার—

গৌরী বউদিকে একবার দেখে নিয়ে সন্তু চৌধুরী আবার বাপীর দিকে তাকালো। খুব মজাদার কিছু মনে পড়েছে যেন। —তোমার বউদির সঙ্গে একটাও কথা বলছ না কি ব্যাপার! চওড়া কপালের তুলনায় ছোট-ছোট দুই চোখে কৌতুক উপচে উঠল। জবাবের অপেক্ষা না রেখে তরল উচ্ছ্বাসে নিজেই মুখর আবার। —আমি ভায়া সব-কিছু স্পোর্টিংলি নিয়ে থাকি বুঝলে? সেদিক থেকে আমি এভার গ্রীন অ্যান্ড এভারইয়ং। হুট করে তুমি ঘর-ছাড়া হতে আমি তোমার হয়েই এক হাত লড়েছিলাম কিনা জিগেস করে দেখো!

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কয়েক সপ্তাহ 'সোনার হরিণ নেই' লিখতে পারেন নি। এজন্য আমরা দুঃখিত। বর্তমান সংখ্যা থেকেই আবার নিয়মিত ছাপা হবে।

বেশ গলা ছেড়ে হেসে উঠল সন্তু চৌধুরী। বাপীর হাসি-ছোঁয়া নিরীহ দু' চোখ এখন গৌরী বউদির মুখের ওপর। চকিত থতমত্ভাবটুকু দৃষ্টি এড়ালো না। তার ঘর-ছাড়া হবার ব্যাপারটাকে এই লোকের কাছে গৌরী বউদি যে নিজের কদর বাড়ানোর মতো করেই বিস্তার করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাগ দূরে থাক বাপীর মজাই লাগছে।

সামলে নিয়ে বিরক্তির ভ্রূকুটি জোরালো করে তুলল গৌরী বউদি। ঝাঁঝালো গলায় বলল, ছেলে মানুষের সঙ্গে কি ইয়ারকি হচ্ছে! ছ' বছর আগের সেই মেজাজেই বাপীর দিকে ফিরল। —মস্ত মানুষ হয়েছ দেখতে পাচ্ছি, গরিব দাদার বাড়ির রাস্তা আর মনে নেই নিশ্চয়ই?

বাপী অম্লানবদনে জবাব দিল, নিশ্চয় আছে। হুকুম চালেই [illegible] পারি।

গৌরী বউদি অপলক চেয়ে একটু। তারপর খুব [illegible] গলায় বলল, আমার হুকুম করার দিন গেছে, ইচ্ছে হলে যেও একদিন...বাচ্চু এখনো তার বাপী কাকাকে ভোলে নি।

সাদা কথা ক'টার অর্থ কেন যেন খুব প্রাঞ্জল ঠেকল না বাপীর কানে। গৌরী বউদির রাগ বিরাগ বা ঠেস ঠিসারার সঙ্গে গলার এই সুর মেলে না। কিন্তু বাচ্চুর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা নির্দয় হয়ে উঠতে চাইল।... বছর সাতেক বয়েস ছিল তখন ছেলেটার, এখন বছর তের হবে। এই বয়সে বাপী অনেক জানত অনেক বুঝত, অনেক কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতো। আর, তখন বলত, মেয়ে পুরুষের ভাল-বাসাবাসির ব্যাপারে মানুষে জানোয়ারে কোনো তফাৎ নেই। এই গৌরী বউদি আর মণিদা বানারজুলি বেড়াতে আসার ফলে বাপীর চোখের সামনে রহস্যের শেষ পর্দাটুকুও ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার হয়ে গেছল। ...আজ নিজের ছেলে মায়ের এই অভিসার কি চোখে দেখছে? কি ভাবছে?

গৌরী বউদির দৃষ্টি আবার পিছনের গাড়ি অর্থাৎ ঊর্মিলার দিকে। সন্তু চৌধুরীও ঘন ঘন ওদিকেই তাকাচ্ছিল। চাপা আগ্রহ নিয়ে এবারে বাপীর দিকে ফিরল। —মেয়েটি কে... বাঙালী মনে হচ্ছে না তো?

বাঙালী নয়।

—তোমার বউ?

বাপী চট করে গৌরী বউদির মুখখানা দেখে নিল একবার। ঠোঁটের ফাঁকে সরস হাসি। সন্তু চৌধুরীর দিকে ফিরে জবাব দিল, আমার নয়, অন্য এক ভদ্রলোকের বউ।

গৌরী বউদি তাড়াতাড়ি নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। নিরাপদ ব্যবধান বুঝে সন্তু চৌধুরী চাপা আনন্দে গলা ঃ করে বলল, কংগ্র্যাচুলেশনস! তোমাকে দেখে খুব আনন্দ হল ভায়া... ফাঁক পেলে তোমার বাড়ি যাব'খন একদিন।

ভুল বোঝার ইন্ধন বাপী নিজেই জুগিয়েছে। ওই হাসি মুখের ভোল পাল্টে দেবার জন্য হাত দুটো নিশপিশ করে উঠল এখন। ওদিক থেকে গৌরী বউদির নীরব ঝাঁঝালো তাড়া খেয়ে ব্যস্ত পায়ে সন্তু চৌধুরী তার গাড়ির দিকে এগোল।

নিজের জায়গায় ফিরে গাড়িতে স্টার্ট দিতেই ঊর্মিলা ধমকে উঠল, মেয়েছেলে দেখলেই অমন আটকে যাও কেন—বসে আছি তো বসেই আছি।

সামনের গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। বাপী ধীরে সুস্থে চালাচ্ছে।

ঊর্মিলা আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে দেখে ভদ্রলোক আর মহিলা দু'জনেই খুব অবাক মনে হল...কে?

সামনে চোখ রেখে বাপী এবার গম্ভীর মুখে জবাব দিল, মহিলা আমার জ্যাঠতুতো দাদার বউ। ভদ্রলোক তাঁর প্রেমিক।

ঊর্মিলার চাউনি উৎসুক। ঠিক বিশ্বাস হল না। তরল সুরেই আবার জিগেস করল, তোমার আর মিষ্টির মতো?

বাপী ভিতরে ভিতরে ধাক্কা খেল এক-প্রস্থ। গৌরী বউদির সঙ্গে সন্তু চৌধুরীর সম্পর্কটা কোন দিন নোংরামির উর্ধ্বে মনে হয়নি বাপীর। তাই জবাবও অকরুণ। —বিজয় আর ফুটফুটে একটা ছেলেকে ফেলে তোমার অন্য লোকের ঘর করার মতো।

ঊর্মিলা বুঝল। সঙ্গে সঙ্গে নাক মুখ কুঁচকে বলে উঠল, কি বিচ্ছিরি! একটু বাদেই উৎসুক আবার। এই জন্যেই তোমার ওপর মহিলাকে একটুও খুশি মনে হল না।...কিন্তু ও'রা আমাকে অমন ঘন ঘন দেখছিলেন কেন—আর শেষে ভদ্রলোক কি বলছিলেন তোমাকে?

বাপী শেষেরটুকুর জবাব দিল। বলল, আমিও অন্যের বউয়ের সঙ্গে আনন্দ করে বেড়াচ্ছি ধরে নিয়ে ভদ্রলোক আমাকে কংগ্র্যাচুলেট করছিলেন।

ঊর্মিলা বাপীর কাঁধে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে নিজে সোজা হয়ে বসল।

বাপী বিমনা। মিষ্টির অফিস থেকে যে মেজাজ নিয়ে বেরিয়েছিল তার সবটা কেটে গেছে। ছটা বছর জুড়ে মণিদার ছেলে বাচ্চুর মুখখানা ভাবতে [illegible]

করল। পারা গেল না। সাত বছরের সেই দুষ্টু কচি মুখখানা চোখে ভাসছে।

বুকের তলায় অবাঞ্ছিত মোচড় পড়ছে একটা। ...মিষ্টির কোলেও আজ যদি একটা বাচ্চা থাকত বাপী কি করত? অসহিষ্ণু আক্রোশে চিন্তাটা মগজ থেকে ছিঁড়ে সরাতে চেষ্টা করল। পারল না। ভিতরের কেউ বরাবর যা করে, তাই করছে। ওকে বিচারের মুখে এনে দাঁড় করাচ্ছে। জিগ্যেস করছে, সন্তু চৌধুরীর সঙ্গে তফাৎ কোথায়? তফাৎ কতটুকু?

ওই অদৃশ্য বিচারকের মুন্ডুপাত করতে চেয়ে বাপী মনে মনেই ঝাঁঝালো জবাব দিল, তফাৎ ঢের, তফাৎ অনেক,—মিলন আর ব্যাভিচারে যত তফাৎ—ততো।

কিন্তু ক্ষোভে আর আক্রোশে ওই একজনকে কেন্দ্র করে নিজের ভিতরটাও সময় সময় কত ব্যাভিচারী হয়ে ওঠে বাপী জানে। বিবেকের এই দ্বন্দ্ব থেকেও নিজেকে খালাস করার তাড়না। জীবনের শুরু থেকে সমস্ত সত্তা দিয়ে যার ওপর দখল নিয়ে বসে আছে তারই হাতে মার খাচ্ছে মনে হলে বাসনার আগুন শিরায় শিরায় জ্বলে ওঠে সত্যি কথাই। সম্ভব গ্রাস করেই তখন তাকে আবার সেই দখলের অন্তঃপুরে টেনে এনে বসাতে চায়। ব্যাভিচার শেষ কথা নয়। এক দরজায় মা খেলে ব্যাভিচার সতের দরজায় হানা দিয়ে বেড়ায়। মিষ্টি আর অসিত চ্যাটার্জীর সম্পর্কটাকেও মিলন ভাবতে রাজি নয় বাপী তরফদার। তার চোখে এও ব্যাভিচার। তাই এত দাহ, এত যন্ত্রণা। যাকে পেয়েছে, চোখ কান বুজে মিষ্টি তাকেই দোসর ভাবতে চাইছে। বাপীর মুখের ওপর সেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

...যদি সত্যি হয়, বাপীর যদি ভুল হয়ে থাকে, আর কারো বিচারের দরকার হবে না। বাপীর নিজের বিবেকই তাকে বেতের ঘায়ে দূরে সরিয়ে নেবে।

বিদেশে পাড়ি দেবার খানিক আগে ঊর্মিলা আবার না বুঝে এই বিবেকের ওপরেই আঁচড় কেটে বসল একটু। বাপী এয়ারপোর্টে এসেছে ওদের তুলে দিতে। অকারণ ব্যস্ততায় বিজয় মেহেরা এদিক-ওদিক টহল দিচ্ছে, ঊর্মিলা একটা সোফায় চুপচাপ বসে। অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। মন খারাপ। বাপীকেও সামনে বসিয়ে রেখেছে।

মন বাপীরও ভালো না। গায়ত্রী রাইয়ের এই মেয়ে কত কাছের, আজ এত দূরে চলে যাচ্ছে বলেই আরো বেশি অনুভব করছে। তবু নিজে হালকা হবার আর ওকে হালকা করার জন্যে টিপ্পনীর সুরে বলল, অত মন খারাপের কি হল, গিয়ে তো দু'দিন বাদেই ভুলে যাবে।

ঊর্মিলা সোজা হয়ে বসল একটু। চোখে পলক পড়ছে না। বলল, বাপী, তোমাকে ফেলে আমার সত্যি যেতে ইচ্ছে করছে না।

বাপী ঘাড় ফিরিয়ে বিজয়কে খুঁজল। অদূরে দাঁড়িয়ে সে মালের ওজন দেখছে। বাপী এদিক ফিরল আবার।—ডাকব?

—ডাকো, বয়েই গেল। আমি কেন বলছি তুমি বেশ ভালোই জানো। তার থেকে এখানকার পাট তুলে দিয়ে বানারজুলি চলে যাও না বাপু, আমি নিশ্চিন্ত হই—

বাপী হাসছে মিটি-মিটি। —গেলাম। তারপর?

—তারপর আবার কি। সেখানে আবু রব্বানী আছে, সে তোমাকে পাহাড়ের মত-উঁচু-মাথা প্রাণের বন্ধু ভাবে—যতদিন না দেখাশুনার অন্য লোক ঘরে আসছে, সে দেখবে। ধমকে উঠল, হাসছ কেন?

—হাসছি না। ভাবছি।...বিজয়কে বাতিল করে তোমাকেই যদি আটকে ফেলতাম, তুমি কি করতে?

—তোমার মাথা কাটতাম।

—যে আসবে সে-ও তাই করবে না কি করে বুঝলে?

—কেন করবে? যে আসবে তারও যে একজন বিজয় থাকবে তার কি মানে?

—কিন্তু যার কাছে আসবে তার কেউ আছে জানলে?

রাগত সুরে ঊর্মিলা বলে উঠল, কে আছে? কোথায় আছে? সব চুকেবুকে গেছে যখন, ঘটা করে জানানোর দরকারটা কি?

বাপীও গম্ভীর এবার।—সব চুকেবুকে গেছে যখন তোমারই বা আমাকে নিয়ে এত দুর্ভাবনার কারণটা কি?...তুমি নিজেই বলো আমি কক্ষনো কোনো ছোট কাজ করতে পারি না—সে-বিশ্বাস এখন আর নেই তাহলে?

ঊর্মিলার মুখে আর কথা জোগালো না। চেয়ে আছে। চোখ দুটো বেশি চিক-চিক করছে। এবারে তাকে একটু আশ্বাস দেবার মতো করে বাপী বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, চুকেবুকে যদি গিয়ে থাকে, তাহলে সব ফুরিয়েই গেল! গেছে কিনা তাতে আমার যেমন সন্দেহ, তোমারও তেমনি। এর মধ্যে ছোট কাজ, বড় কাজ কিছু নেই, সুযোগ পেলে এর ফয়সলা আমি করব, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর এই ইচ্ছেটাকে তুমি সাদা চোখে দেখতে পারছ না বলেই অশান্তি ভোগ করছ! সব ঝুলি মেরে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাতাস সাঁতরে চলে যাও।

বাপী আবার হাসছে বটে, কিন্তু খুব কাছের একজন অনেক দূরে চলে যাচ্ছে এটুকু অনুভব না করে পারছে না। মাইকে যাত্রীদের সিকিউরিটির দিকে এগোতে বলা হল। ওদিক থেকে বি[illegible] হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলো

আরো আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ওদের এরোপ্লেন আকাশে উড়তে দেখা গেল। অন্ধকারে এরোপ্লেন ঠিক দেখা গেল না। সগর্জনে একটা বড় আলো দেখতে দেখতে ছোট হয়ে গেল, তারপর আর দেখা গেল না।

ঘড়িতে রাত পৌনে দশটা। ফাঁকা রাস্তায় বাপী বেগে গাড়ি চালিয়ে আসছে। গাড়ি সার্কুলার রোডে পড়তেই মাস্টার-মশাইয়ের কথা মনে হল। ঊর্মিলার ওখানে ছোটাছুটিতে আর কাজের ঝক্কিতে দু'দিনের মধ্যে একটা খবরও নেওয়া হয়নি। তার আগেও ভালো কিছু দেখেনি। ভদ্রলোক এখন নিশ্চিন্তে খুব নিশ্চিত কোনো দিকে পা বাড়িয়েছেন সেটুকু আরো স্পষ্ট।

এত রাতে উনি জেগে নেই হয়তো। কুমুর জেগে থাকা সম্ভব। বাড়ির কাছের একটা লাইব্রেরিতে নাম লিখিয়েছে। ছোকরা চাকরটাকে দিয়ে বই আনায়। বাবার বিছানার পাশে বসে রাত জেগে বই পড়ে। বাপী যখনই যায়, লাইব্রেরির ছাপ-মারা একটা-না-একটা বই চোখে পড়ে। ছোকরা চাকরটা একদিন বই বদলে এনে তার সামনেই হেসে-হেসে বুড়ো বাবুকে অর্থাৎ মাস্টারমশাইকে বলছিল, লাইব্রেরির লোক নাকি ঠাট্টা করেছে, তার দিদিমণি এই রেটে পড়লে শিগগীরই লাইব্রেরি ফাঁক হয়ে যাবে। কুমকুম লজ্জা পেয়েছে। মাস্টারমশাই মেয়ের রাত জেগে বই পড়ার কথা বলে-ছিলেন। বাপীর মনে হয়েছে, সময়ে ঘুম এরই মধ্যে এই মেয়ের অভ্যস্ত হওয়ার কথা নয়।

যাবে কি যাবে না, দ্বিধা। আবার তক্ষুনি তা নাকচ করার ঝোঁক। গাড়ির স্পিড আরো চড়ল।

যা আশা করেছিল, তাই। দুটো ঘরেই আলো জ্বলছে। নিঃশব্দে গাড়ি থামিয়ে নেমে এলো। ঘরের দরজা বন্ধ। মাস্টার-মশায়ের ঘরের দরজায় কয়েকটা মৃদু টোকা দিতে কুমকুম দরজা খুলে দিল।

—বাপীদা...এত রাতে তুমি।

বাপী তক্ষুনি লক্ষ্য করল। বিস্ময়ের আঁচড়ে মেকি কিছু ধরা পড়ল না। ভেতর কারো কত তাড়াতাড়ি বদলায় বাপীর ধারণা নেই। এই মেয়ের কাছে অন্তত এটুকু রাত বেশি রাত হল কি করে।

—আলো জ্বলছে দেখে নামলাম।....কেমন?

—একরকমই। ঘুমোচ্ছে এখন, এসো....

ওর সঙ্গে নিঃশব্দে বাপী শয্যার কাছে এলো। বুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। দাড়ি সত্ত্বেও মাস্টারমশায়ের মুখ দু'দিন আগের থেকে বেশি ফোলা মনে হল বাপীর। চাদর টেনে দেখতে গেলে ঘুম ভাঙার সম্ভাবনা। সে চেষ্টা না করে পাশের ঘরে এলো। ছোকরা চাকরটা মেঝেতে মাদুর পেতে শোবার তোড়জোড় করছিল। বাপীকে দেখে তাড়া-তাড়ি মাদুর গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল।

কুমকুম ব্যস্ত হয়ে বলল, বোসো বাপীদা, এক পেয়ালা চা করে আনি ?

—এত রাতে আর চা না। চেয়ার টেনে বসল।—এর মধ্যে ডাক্তার দেখে গেছে ? মুখ তো আরো ফোলা মনে হল।

—আমারও মনে হয়েছে। বাপী লক্ষ্য করছে, দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও ভেঙে পড়ার মেয়ে নয়। বলল, সকালে ডাক্তারকে ফোন করেছিলাম, শুনেও তিনি তো এই ওষুধই চালিয়ে যেতে বললেন....। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মতো দেখা গেল একটু, বলল, দু'দিন আপনি, বাবা নিজেকে ছেড়ে তোমার জন্যে বেশি ব্যস্ত।....এদিকে অন্য কাজে গিয়েছিলে বুঝি ?

—একজনকে এয়ারপোর্টে তুলে দিয়ে ফিরছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই—

বাপী চিন্তা না করেই দু'জনের বদলে একজনকে বলেছে। তার ফলে এমন একটা প্রশ্ন শুনবে কল্পনার মধ্যে ছিল না। কুমকুমের চাউনি হঠাৎ উৎসুক একটু। বলে ফেলল, বউদি কোথাও গেলেন ?

শোনামাত্র বাপীর ভিতরে নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ। প্রথমেই রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়ের অন্তরঙ্গ কলাকলা কিছু কিনা বোঝার চেষ্টা। সে-রকম অন্যটা মনে হল না। তবু পাশ কাটিয়ে জবাব দিল, না, অন্য কেউ। সোজা চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ তোমার এ-কথা মনে হল ?

আমতা আমতা করে কুমকুম বলল, শুনলে তুমি রাগ করবে না তো বাপীদা ?

বাপীর সন্দিগ্ধ চাউনি ওর মুখের ওপরে আরো স্থির একটু। —আমি রাগ করব এমন কি কথা তুমি বলতে পারো ?

গলার স্বরে হঠাৎ উষ্ণ আমেজ কেন কুমকুম তাই বুঝে উঠল না। বিমর্ষ অথচ মিষ্ট সুরে বলল, তা না....আমি কেমন মেয়ে জানি, তবু বাবা তোমার কাছে কতখানি, নিজের চোখে দেখছি বলে বোঝাই খুব আশা হয়, বউদিও হয়তো তোমার সঙ্গে এসে বাবাকে একবারটি দেখে যাবেন। এখন বুঝছি আমার জন্যেই সেখানে আসছেন না....

এই মুখ দেখে আর এই কথা শুনে বাপীই বিমূঢ় হঠাৎ। তারপরেই চকিতে মনে পড়ল কিছু। এবারে গলার স্বরও নরম।— বউদি বলে কেউ কোথাও আছে তুমি ধরে নিলে কি করে ?

সঙ্গে সঙ্গে কুমকুমও হকচকিয়ে গেল। —সেদিন যে তোমার গাড়িতে তোমার পাশে....বউদি নয় ?

হ্যাঁ বাপীরও সেই সন্ধ্যার কথাটাই মনে পড়েছিল; তার পাশে সেই একজনকে দেখে কুমকুম যা ভেবে বসে আছে, তা-ও ভাবতে ভালো লাগছে। এমনকি মেয়েটার এই ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখখানাও এখন ভালো লাগছে। ঠোঁটের প্রচ্ছন্ন হাসি চোখে জমা হচ্ছে। খুব হালকা করে জবাব দিল, এখন পর্যন্ত নয়।

এর পরেও মেয়েটার বিমূঢ় মুখে [illegible] আঁচড় পড়েছে দেখল। কেন পড়েছে তা-ও আঁচ করতে পারে।....সেই সন্ধ্যায় গাড়িতে তার পাশে বসার আগেই মিষ্টি শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিয়েছিল। ওকে সজাগ রাখার আর তফাতে রাখার সংকল্প বোঝানোর জন্যেই শাড়ির আঁচল মাথার ওপর দিয়ে বুকের আর একদিকে টেনে এনেছিল। ...কুমকুমের এ-রকম ভুল হতেই পারে।

বাপী উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গও বাতিল। —আর রাত করব না, তুমি যাও। ....টাকা আছে তো হাতে ?

মেয়েটার কমনীয় মুখে কৃতজ্ঞতা উপছে উঠল। বলল, অনেক আছে।

—ঠিক আছে। ....ডাক্তারকে কাল আমিই না হয় ফোন করে দেবখন একবার এসে দেখে যাক। পারি তো একেবারে ধরেই নিয়ে আসব—

কুমু এমন চেয়ে রইল যে, বাপী তার পরেও থমকে দাঁড়াল। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আরো কিছু ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে।— বাপীদা আর কত করবে তুমি আমাদের জন্য—আর কত করবে ?

এই ব্যাপারটাই বাপীর চোখে বা কানে সয় না।....আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে রেশমাকে মনে পড়ল। সেই সাপ-ধরা মেয়েটার কিছু ধারালো স্ফুলিঙ্গ হঠাৎ এর মধ্যেও আশা করছে কেন, জানে না। ঝাপটা-মারা গোছের গলার স্বর। —বাজে বোকো না তোমার জন্যে কিছু করা হলে তখন ঋণ শোধের কথা ভেবো, বাপীদা কাউকে দয়া করে কিছু করে না, তখন মনে রাখতে চেষ্টা কোরো।

কুমকুম থতোমতো খেয়ে চেয়ে আছে। অবাকও।

নির্জন রাস্তায় গাড়ির স্পিডের কাঁটা পঞ্চাশের দাগ ছুঁয়েছে। ....সব চুকেবুকে গেছে ভাবে না বলেই ঊর্মিলার দুশ্চিন্তা। ভালবাসার চেহারা ওই মেয়ে চেনে। মিষ্টির ওখান থেকে বেরিয়ে টিপ্পনী কেটেছিল, শ্যাম আর কুল দুই নিয়ে জোয়ারী কেবল জ্বলছে মনে হল। বাপী তাই বিশ্বাস করেছে, করে জোর পেয়েছে। আজও প্লেনে ওঠার আগে ঊর্মিলা হার মেনে ওর গো বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। তারপর কুমকুমের কথা শুনেও কান দুটো লোভাতুর হয়ে উঠেছিল। শিকারে বেরিয়ে সেই সন্ধ্যায় কুমকুম গাড়িতে বাপীর পাশে যাকে দেখেছিল, তাকে তার বউ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি। বউদি নয় শুনে অবাক হয়েছে। আর বাপীর জবাব শুনেও মেয়েটা হকচকিয়ে গেছে। বাপী বলেছে, এখন পর্যন্ত নয় :

....মাথায় ঘোমটা তোলা কারো বউ এখন পর্যন্ত তার বউ নয় শুনলে অবাক হবারই কথা।

রণে আর প্রণয়ে নীতির বালাই রাখতে নেই। শয়তানকেও কাছে ডাকতে বাধা নেই। ও-কথার পর কুমকুমের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎই শয়তানের কিছু ইশারা মনের পাতাল ফুঁড়ে সামনে ধেয়ে আসতে চেয়েছে। তাই কুমকুমের পরের উচ্ছ্বাসটুকু বাপী বরদাস্ত করতে চায়নি। বরং সর্বনাশের দড়ির ওপর হেসে খেলে নেচে বেড়াতে পারে এমন মেয়ে রেশমাকে মনে পড়ছে।

কেন মনে পড়েছে বাপী এখন আর সেটা তলিয়ে দেখতে রাজি নয়। ভাবতে রাজি নয়। তাহলে নিজেরই কোনো অসাবহ চেহারা ধরা পড়ার আশঙ্কা। ইচ্ছেটাকে বাপী চার চাকার তলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটিয়েছে। (ক্রমশ)

পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

॥ ৩ ॥

আস্তে আস্তে নদীর তীরে চলে আসে দীপঙ্কর আর নির্মল মজুমদার। দীপঙ্কর চুপচাপ, কি যেন লুকিয়ে রেখেছে নির্মলবাবু রহস্য উন্মোচন করছে না। কেন এই ভোরবেলা তুলে আনল ঘুম থেকে। শুধু কি প্রাতঃভ্রমণ। বিশ্বাস হয় না। তাহলে অত তাড়া দিচ্ছিল কেন মজুমদার।

নদীটা সাপের মত বেঁকে গেছে। সারা গায়ে বালি। বালি ভাসানদী, শুধু এপারের কাছে তিরতিরে এক হাঁটু জল। পাহাড়ী নদীর এইরকম হাল হয়। এই ভোরে নদীটাকে অদ্ভুত ছিমছাম পবিত্র মনে হচ্ছে। বাতাস অঢেল। শীতের আমেজ আছে। বালির গা বেয়ে দূরে কুয়াশা জমেছে। ওপারটা গাছগাছালিতে ঢাকা। শুধু মাঝেমধ্যে কোথাও ক্ষেত। সবুজের ইশারা। গম বোনা হয়েছে।

—ভোরবেলা এখানটা খুব ভাল লাগে। মজুমদার হাসে।

—সেইজন্য কি ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে এলেন, ভাল আপনার লাগতে পারে, অন্যজনের তো নাও লাগতে পারে।

দীপঙ্কর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে নির্মল মজুমদারের উপর।

নির্মলবাবু অপ্রতিভ হয়ে হাসে। হাসিতে শব্দ হয় না। চোখমুখ কুঁচকে যায়: দীপঙ্কর দেখে ভদ্রলোকের মাথার চুল অনেক পাতলা হয়ে গেছে। সমস্ত চোখমুখে কঠিন চিন্তার ছাপ। মাথার ভিতরের চিন্তা অশান্তি বাইরে এসে দেখা দিয়েছে। গায়ের রং একসময় ভালই ছিল, এখন তামাটে হয়ে গেছে।

—কাল ওপারে বহুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, যদি একটা খবর পেতাম আমি, তাহলে নিশ্চয় অত কষ্ট হত না।

কথা এগোয় না। নির্মলবাবু চুপচাপ থাকতে চাইছেন। এইভাবে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। যে নদী দেখার তা দেখা হয়ে গেছে। প্রথম দেখাটাই সুন্দর, তারপর সব একঘেয়ে।

—চলুন। দীপঙ্কর নির্মলবাবুর কাঁধে হাত দেয়।

—একটু দাঁড়ান। নির্মলবাবু আস্তে আস্তে বলেন, চোখমুখ বিষাদে ভরা। এরপরই হঠাৎ নির্মলবাবু দীপঙ্করের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ান। 'ঐ দেখুন।'

—কি? দীপঙ্কর অবাক হয়ে নির্মলবাবুকে দেখে।

—পশ্চিম দিকে তাকান। মজুমদার ফিসফিসিয়ে বলেন।

কংসাবতীর তীরে উঁচু টিলার মত জায়গাটায় দুজন দাঁড়িয়ে। দীপঙ্কর নির্মল মজুমদারের চোখ বরাবর তাকায়। মন্দিরটা স্পষ্ট দেখা যায়। নদীর এধারটা গাছপালা শূন্য। লম্বাটে শস্যহীন মাঠ পড়ে আছে। মাঠ বেয়ে লাল শাড়ি পরে কে যেন আসছে। হাওয়ায় আঁচল উড়ছে।

—গুহরাজবংশের শেষ রাজকন্যা। নির্মল মজুমদার ফিসফিস করে, যেন কেউ শুনতে না পায়। এই মাঠ এই নদী বাতাস গাছগাছালি কেউ যেন জানতে না পারে এইজন্য এতটা আসা।

কালো চুল বিছিয়ে টানটান একটি নারী মূর্তি নদীর দিকে চেয়ে স্থির। নির্মল মজুমদার অপলক তাকিয়ে আছে। দীপংকর দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না। কেমন সম্মোহনী মূর্তি। দীপংকর কয়েক মুহূর্ত পরেই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নদীর দিকে প্রসারিত করে দেয়। নদী পার হয়ে কে যেন আসছে। পুরুষ মানুষ। এই ভোরে আদুল গা, কোমরে একটা কাপড়।

—গুহিরাম! দীপংকরের উচ্চারণে নির্মলবাবু চমকে যান।

ওদিকের নারী মূর্তি সরে যাচ্ছে। পায়ে পায়ে মাঠ পেরিয়ে চলে যাচ্ছে রাজবাড়ির দিকে। নির্মল মজুমদার বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে সেদিকে।

—এত ভোরে গুহিরাম কোথায় গিয়েছিল?

দীপংকরের প্রশ্নে মজুমদার চোখ ফেরায়, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওর।

—কাল বললাম না, ও না থাকলে বড় বিপদে পড়ে যেতাম, সে যাক, এই জন্যে ঘুম ভাঙিয়েছেন আপনি?

—হ্যাঁ মানে....। মজুমদার আমতা আমতা করতে থাকেন।

—আপনার হয়েছে কি? দীপংকর নির্মল মজুমদারের চোখে চোখ রাখে।

নির্মলবাবু মাথা ঝাঁকাতে থাকেন। চোখের পাতা পড়ছে শুধু। মুখে বিব্রত হাসি। আস্তে আস্তে পা বাড়িয়েছেন।

—আমার যা হওয়ার হয়েছে, চলে যাচ্ছি মশাই। মজুমদার বিড়বিড় করেন।

গুহিরাম দুজন বাবুকে একসঙ্গে দেখে বিস্মিত। বিস্ময় আর আনন্দ ঝলমল করছে ওর চোখমুখে। শক্তসমর্থ দীর্ঘ মিশকালো দেহ। সে মাথা নত করে দাঁড়ায়। দুটো হাত জোড় করা। দীপংকরকে সে কাল চিনেছে আর নির্মল মজুমদারকে চেনে আগে থেকেই।

—গুহিরাম এত ভোরে কোথায় গিয়েছিল?

—নদীর ওপারেই ওর ঘর, রজনী সাউয়ের বাড়ির বাঁধা মজুর।

—রজনী সাউকে কাল দেখেছি, কেমন লোক?

—অবস্থা বেশ ভাল, জমিজমা আছে, একটা সারের দোকান-কাম-মুদিখানা, সুদের কারবারও করে।

রজনীর জমিগুলো অক্ষত আছে? দীপংকর প্রশ্ন করে।

না।

—গুহিরাম আছে দখলকারের ভিতরে।

—না, লোকটা হাবা, মনিব বলতে অজ্ঞান।

কাল সন্ধ্যায় দীপংকর রজনীকান্তকে দেখেছে। গুহিরামকে আড্ডা লাগাচ্ছিল বাস-স্ট্যান্ডে।

—চলুন ফিরি।

দীপংকর এগিয়ে গুহিরামের পিঠে হাত দেয়। নির্মলবাবু এগিয়েছে। গুহিরাম সরে যায়। নমস্কার করে জোরে হাঁটতে থাকে। দু হাতে তালি বাজাচ্ছে।

সূর্য চকচকে রূপোর গোলা হয়ে গেছে। রোদ ছড়িয়ে গেছে নদীর বালিতে। বালি চকচক করছে। এখানে এখন বেলা বাড়লে রোদ্র তেজীয়ান হয়ে ওঠে।

এখানকার মূল ব্যাপারটা আহজে কি? সব বোঝা যাচ্ছে না। ধোঁয়াটে ব্যাপার। সমস্ত রায়তের জমি দখল হয়ে গেছে। এবার কেউ ধান কাটতে পারেনি। এক শ্রেণীর লোক ধান কেটে নিয়েছে। পুলিশ নীরব হয়ে আছে। প্রথমে বাধা দিতে গিয়েছিল, পারেনি। রক্তক্ষয়ের সম্ভাবনা ছিল প্রখর। অনেক জীবন নষ্ট হত। আর তাতে সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপক শান্তিভঙ্গের আশংকা দেখা দিয়েছিল। সকলে দাবি করছে, জমিগুলো তাদের। রায়তি স্বত্ব দিয়ে দাও, নয়তো ভাগচাষী হিসেবে নাম লিখিয়ে দাও। ভাগচাষী হলে তিন-চতুর্থাংশ ফসল তারা ঘরে তুলতে পারবে। ভাগচাষী হিসেবে ডিম্যাণ্ডের স্বপক্ষে যুক্তিও রাখতে পারছে না। তবুও সংকল্পে অটল।

নির্মল মজুমদার পুরোপুরি পাজ্‌লড্ হয়ে গেছে তদন্তে গিয়ে। শেষে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে রিপোর্ট করে ওপরে। তার ফলে দীপংকরের আসা ও মজুমদারের ট্রান্সফার হওয়া। মূল কারণটা খুঁজে বার করতে হবে। অর্গানাইজড্ মাস মিথ্যে কথা বলতে পারে, কিন্তু ইনডিভিজুয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তো সত্যি কথা বেরিয়ে আসে। এখানে আসল সত্যটা বার করা যাচ্ছে না।

কাল সন্ধ্যের সময় রজনীকান্ত নদীর পাড়ে বাস-স্ট্যান্ডে একজন অল্পবয়সী ছোকরাবাবুকে দেখেছিল। একেবারে ভাল

…লের কল্পনা। তাকে কখনো সে কল্পনা করতে দেখেনি। প্রথমে মনে হয়েছিল কথা বলে। …নের ভিতরেও অনেকবার চোখাচোখি হয়েছিল, কিন্তু হতচ্ছাড়া মানুষটার কাছে …থায় আগুন এমন উঠে গিয়েছিল যে, কথা …লা হয়নি। কি ব্যাপারে এল লোকটা?

আজ ভোর হতেই রজনীকান্ত বেরিয়ে পড়েছে। ভোরবেলা হয়ত বেরোত না, কিন্তু বেরোতেই হল। ঘুম ভেঙে বাইরে আসতেই বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। কষ্ট বাস্তুর লাগোয়া ধান কাটা মাঠ দেখে। কি ধানই না হয়েছিল। ঘরে উঠেছে সামান্য। রজনীকান্ত পায়ে পায়ে এগিয়ে ন্যাড়া ক্ষেতের ভিতরে দাঁড়ায়। পায়ে শক্ত মাটি ফুটছে। ধানের গোড়াগুলো হ্যা-হ্যা করে হাসছে তার দিকে চেয়ে। যেন বলছে, এ-বছর তোমার হইনি, আর কোনদিন হব না। তোমার ঘরে আর যাব না। রজনীকান্তর মনে হয় এই জমি তার হয়। এখানে পা রাখার অধিকার ক্রমশঃ খর্ব হয়ে যাচ্ছে। এখানকার জমি, কাঁসাই-এর ধারের জমি সব বেদখল হয়ে গেছে। তারা কেউ জন্মেও জমির ধারে যায় না, তবুও সব ধান কেটে নিয়েছে। দয়া করে সামান্য ভাগ দিয়েছে। বলেছে, হয় লিখে দাও বারো আনা জমি, নতুবা সব জমির ভাগচাষী হিসেবে স্বীকার করে নেও। মহা ফাঁপরে পড়েছে রজনীকান্ত। যারা জীবনে জমির ধার ঘেঁষে না, লাঙ্গল মারতে জানে না ভালভাবে। তারা যদি জমিতে লাঙ্গল ফেলে তবে জমির হালটা কি হবে? তার দু'-পুরুষও জমিগুলো ভোগ করতে পারল না।

অবস্থা না হয় এখন ভাল। কিন্তু এই রকম রমরমা তো চিরকাল ছিল না। আস্তে আস্তে বিত্তবান হতে হয়েছে, জমির ইতিহাস তো মাত্র বিশ-বাইশ বছরের। তখন রজনীকান্তর বাবা বেঁচে। সে পঁচিশ বছরের …গড়াই যুবক।

উপরের গ্রহ-নক্ষত্রই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। রজনীকান্ত কলকাতা থেকে পার্সেলে দুখানা হস্তরেখার বই এনেছে। একখানা কিরোর, অন্যটা ভৃগুর। নানান-ভাবে বিচার করেছে নিজেকে। কিন্তু কোন অমঙ্গলের চিহ্ন খুঁজে পায়নি। মীন রাশির সময় এখন সবচেয়ে ভাল, তার উপরে লগ্ন বৃশ্চিক। গ্রহ-নক্ষত্র বলছে, কলকাতা থেকে আনা বই বলছে রজনীকান্তর সময় এখন ভাল, কিন্তু এটা কি সত্যিই ভাল সময়! রজনীকান্ত বুঝতে পারে না।

তবুও রজনীকান্তর আশা আছে এখনো। গ্রহ-নক্ষত্র যখন বলছে সময় ভাল, তখন নিশ্চয় কিছু একটা হবে। নিশ্চিত কিছু একটা হবে। সেই আশাতেই রজনীকান্ত দিন গুনছে। সপ্তাহে দুবার নির্মলবাবুর কাছে যায়। লোকটাকে সে বোঝে না কিছুতেই। ইদানীং আরো বোঝা যাচ্ছে না। একেবারেই না।

কাল বিকেলে যে মানুষটি এসেছে, সে নির্মলবাবুর কাছেই গেছে। সে-খবর রজনীকান্ত রাতেই পেয়েছে। নির্মলবাবুর বদলীর …শুনেছিল, এবার বোধহয় সেটা সত্যি হয়ে গেল। বাঁচা গেল। আজ রজনীকান্তর প্রথম কাজ নতুন মানুষটার সঙ্গে আলাপ করা। একেবারে পায়ে পড়ে যাবে, তবু যদি কিছু হয়। নতুন মানুষটি এমন একটা রিপোর্ট লিখুন না যা এইসব হতচ্ছাড়া বদ লোকগুলোর বিপক্ষে যায়। আর ওদের নেতা অম্বুজাক্ষ বারিকও যেন শেষ হয়। সেই রিপোর্ট দিলেই রজনীকান্ত সুস্থ হয়ে যাবে। রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশ এসে জমির দখল ফিরিয়ে দেবে। অম্বুজাক্ষ জেলে ঢুকবে।

যেদিন জমির সব ধান কাটা হয়ে গেল, সেদিন রজনীকান্তর মাথা ঠিক রাখা খুব কষ্টের হয়েছিল। কলাবনি জুড়ে জনা পঞ্চাশ লোকের হৈ-হৈ। বাড়িতে তার পিসিমার শ্বাস উঠল। জমির শোকে বুড়ি যায়-যায়।

—বাবা সব ধান গেল? বুড়ি কেঁদে ওঠে।

রজনীকান্ত থমথমে হয়ে বসে থাকে।

—বাবা ঘরের লক্ষ্মী গেল। বুড়ি বিড়-বিড় করে।

—না পিসিমা ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—এবার তো ধান উঠলো না ঘরে।

—উঠবে, সব ধান ওরা ফেরত দেবে বলেছে।

বুড়ি চোখ পিট-পিট করে। চোখ দিয়ে জল গড়ায়। তাহলে সব ধান নিয়ে গেছে কেটে। একথা তো জানা ছিল না তার। এ যে কলির শেষ। পাপে দেশ ছারখার হয়ে যাবে। ছোটলোকগুলোর ভয়ে ভদ্রলোক কেঁপে মরে। ঘরে বন্দুক থাকতেও কাজে লাগে না।

পিসিমা শোকে তিনদিন বিছানায় পড়ে থাকল। তারপর আর রক্ষা হল না। ধানের শোকে বুড়ি দেহ রাখল। রজনী পিসির মাথায় বসে অনেক বুঝিয়েছে। কিছু হয়নি। বুড়ি মিথ্যে সেজেক বাক্যে ভোলার মানুষ নয়। আশী বছর ধরে জগত দেখেছে। মানুষের মুখ দেখলে তার ভিতরের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে পারে। রজনীকান্ত পিসিমার মাথায় বসে অনেক বুঝিয়েছে, কিছু করতে পারল না। নির্মলবাবু তার পিসিমাকে মারল। রাগ নির্মলবাবুর উপরেই। কেননা, সরকারি লোক ভদ্রলোক, ভদ্রলোক ভদ্র-লোকের কথায় ওঠে-বসে এটাই তো নিয়ম। সে-নিয়ম রক্ষা হল না। নির্মলবাবু গরীব-গুরবো, এককালে রাজার লেঠেল যারা ছিল, তাদের কথা শুনল।

এই ঘটনায় রজনীকান্ত আরো বিপন্ন হয়ে পড়ল। ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে লাগল। করার কিছু নেই। নির্মল মজুমদার বুঝবে কি করে জমির মায়া। এক মাসের ভিতরে নানা পাপের চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল। লক্ষ্মী তার ঘর ছেড়েছে। নতুন বাছুরটা মাঠে মরে থাকল, সারাদিন খবর পায়নি বাছুরটার। সন্ধ্যায় খবর এল। তখন সব শেষ। রজনীকান্ত গিয়ে নির্মল মজুমদারের হাত ধরে কেঁদে উঠল, 'আমার বংশ শেষ হয়ে যাবে, আপনি রক্ষা করুন।'

লোকে তখন কি যেন বলতে আরম্ভ করেছে। এসব ভড়ং। এত কাল ভোগ করলে, এখন দু-দশ বিঘে গরীব মানুষগুলোকে দাও। তারাও তো রাজার জন্য একদিন রক্ত ঝরিয়েছে। এখন বউ-ছেলে-মেয়ে বিক্রি করে পেট চালাবে নাকি!

লোকের তো জমি যাচ্ছে না। দশ পুরুষ ভোগ করে রাজবংশের জমি হাপিশ

সালে খাস হলো। সরকার জমিদারি নিয়ে নিল। তাতে ও-রাজবংশের কি যায়-আসে। লক্ষ্মীনারায়ণজীউ দেবতার নামে দুশো বিঘে জমি রয়ে গেল। সিন্ধ দেবোত্তর। রাজবংশের প্রতিষ্ঠা থেকে রয়েছে এখানে। রাজার জমি গেল ভোগ করে। আর ভোগই যা কি! একেবারে রাজার মত। ঐ বিশাল প্রাসাদ হলো। গল্পের বই, উপন্যাসের রাজা-বাদশার মত জীবনযাপন করতে লাগলেন রাজবংশের মানুষ। ছিলেন ব্রাহ্মণ হলেন চণ্ডাল—ঢালাও টাকা, ঢালাও মদ-মেয়ে-মানুষ।

আর রজনীকান্ত! ঐ রাজবংশের পতন থেকেই তার উত্থান। ছাপ্পান্ন সালের পর থেকেই তার সমৃদ্ধি। তাই এই বিশ-বাইশ বছরে শেষ হয়ে যাবে। একটা মন্দির গড়ার ইচ্ছে ছিল কলাবনিতে। শিবের মন্দির। আর নিজের দোতলা বসতবাড়িটাও ভেঙে একেবারে কলকাতার স্টাইলে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছে ছিল কেন, ইচ্ছে আছে ষোল আনা, একটু রাজার মত থাকা, বিলিতি মদ আর যদি সম্ভব হয়—একটা মেয়েমানুষ রক্ষিতা রেখে দেবে। বউ ছাড়া আর একটা মেয়েমানুষ না রাখলে গাঁয়ে সম্মান বাড়ে না।

সমৃদ্ধি একটু একটু করে হচ্ছিল। যে লোকগুলো জমি দখল করে নিয়েছে, তাদের ঘরের মেয়েই রজনীকান্তর ঘরে এসেছে রাত অন্ধকারে। বিশ টাকায় এক রাত। ঢালাও ফুর্তি। আর ক'দিনেই সব বদলে গেল। মেয়েমানুষগুলোও লাঠি তুলেছে।

অথচ সে কোনদিন ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে! একদিনও নয়। বরং একবার পুলিন খামনি বিজয় পাহাড় ওদের বাঁচিয়েছে। সে-কথা লোকগুলো ভুলে গেছে। ছোটলোক বলেই ভুলে গেছে। দশ বছরে একদিনও সে-ঘটনা কাউকে বলেনি। এইবার জমি দখল হয়ে গেলে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে নির্মলবাবুকে সব বলে দিয়েছে। কিন্তু ঘটনা এমন, ও-কথা এখন বলে কোন কাজ হল না। লোকগুলো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, 'তুমুদের ভয় দেখাচ্ছ বাবু, ধান কাটছিলাম, বেশ করি-ছিলাম, সিই ধান বিকোয়ে ফুর্তি মারাই-ছিলাম ঝাড়গাঁয় হাঁ।'

রজনীকান্ত বেরোবে এই ভোরে তা বউ ভাবতেও পারেনি। কি যে হল মানুষটার বুঝতে পারে না। তার ভয় হয় লোকটা যতক্ষণ না বাড়ি ফেরে। কোথায় কি কাণ্ড করে বসে। এবার ধান কাটার পর লোকটার কাজেকর্মে মন বসছে না।

—চা খেয়ে যাবে না। সতী ডাকে।

—না।

—যাচ্ছ কোথায়?

—মেয়েমানুষের দরকার কি?

সতী চুপ করে থাকার মত বউ নয়। এই বছর পাঁয়ত্রিশে পাঁচটা ছেলেমেয়ের মা। একটাও মরেনি। সবক'টা বেঁচেবর্তে আছে। তার আসার পর এ-বাড়ির যাবতীয় সমৃদ্ধি। স্বামীর কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

—দরকার আছে, যা জিজ্ঞেস করছি উত্তর দাও। বউ ক্ষেপলে রজনীকান্তর দিন খারাপ যায়, সে নরম হয়ে যায়।

—মাঠে গিইছিলাম বউ।

—সে তো দেখেছি।

—একটা ধানও ঘরে ওঠেনি।

—সে আর নতুন কথা কি?

—বুকটা কেমন করে উঠল ন্যাড়া মাঠ দেখে।

—এভাবে হা-হুতাশ করলে তো দিন চলবে না, লোকগুলোর জন্য পিসি মরুক, এখন কি আমি মরব?

—একথা কেন?

—যা আরম্ভ করেছ তুমি।

কথার ভিতরে রজনীকান্ত ইস্ত্রি-করা ধুতি-শার্ট পরে। পকেটে নেয় ভর্তি সিগারেটের প্যাকেট ' লাইটার। রুমালে আতর লাগায়, গোঁফেও একটু ছুঁইয়ে দেয়। কাল রাত্তে বসে বসে পাকা গোঁফ আর চুলে কালো রঙ লাগিয়েছে, এখন বেশ সুপুরুষ লাগছে তাকে। বয়স অনেক কমে গেছে। বউয়ের দিকে চেয়ে সে হাসে।

—জমিগুলো উদ্ধার করতে হবে না?

—হবে।

—তাই যাচ্ছি।

—কোথায়?

—নতুন এক অফিসার এসেছে, নির্মলবাবু বদলী হয়ে যাচ্ছে, নতুন লোকটার সঙ্গে আলাপ করতে হবে না।

সতী এবার চুপ করে থাকে। তারপর টিপ করে স্বামীকে একটা পেন্নাম ঠুকে দেয়, 'যদি কটু কথা বলে থাকি নিও না, মন জলের মত করে যাও।'

রজনী গোঁফের ফাঁকে হাসে, 'চা দোকান থেকে খেয়ে নেব।'

—তাড়াতাড়ি ফিরো।

—কাজ মিটিয়ে ফিরব, সেই মামলার দলিলটা দাও।

—আজ তো আলাপ করতে যাচ্ছ, দলিলে কি হবে?

—সব সঙ্গে রাখতে হয়, কি জানি কখন কোনটা দরকার লাগে।

সতী আলমারি থেকে দলিলটা বার করে দেয়। রজনীকান্ত তার ফোলিও ব্যাগটায় সেটা ভরে নেয়। তারপর বেরিয়ে পড়ে। জমিগুলো সব উদ্ধার করতেই হবে। অম্বুজাক্ষকে জেলে ঢোকাতে হবে, নাহলে তার মানবজন্ম বৃথা। জীবনে যে-কাজে হাত দিয়েছে, তাতেই সোনা। হার মানার লোক নয় রজনীকান্ত সাউ, আইনে না হলে বন্দুক ধরবে। সবক'টা লোক যদি ভাগচাষী হিসেবে নাম লিখিয়ে নেয় তো আইন রজনীকান্তকে কলা দেখাবে। ভাগচাষীর সব মাপ। তারপর আইন তো তাকে জোতদার আখ্যাও দেবে, জোতের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। নিজে হাতে লাঙল ধরে না। এখন বন্দুক ধরতে হবে। এই রকম অপমানিত হয়ে বেঁচে থাকা যায় না, তার চেয়ে গুলি করে কয়েকটা লাশ ফেলে নিজের মাথায় বন্দুকের নল ছোঁয়ানো ভাল। অর বন্দুকের জন্য এ-তল্লাটের অনেকেই ডরে। সে-ঘটনা তো এখনো লোকগুলো ভোলেনি।

সেই সাতষট্টি সালের কথা। পাক্কা এগারো বছর হল। ধান কাটার সময় অঘ্রাণের আরম্ভ। কোথাও ধান কাটা আরম্ভ হয়েছে, কোথাও হয়নি। কোন কোন জমির ধান দু-দশদিন বাদে পেকে কাটার মত হয়ে যাবে। অল্প শীত নেমেছে। বেলা পড়তেই কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যেতে আরম্ভ করে। লোকের গায়ে শীতবস্ত্র উঠতে আরম্ভ করেছে।

এই রকম এক বিকেলে একটা কামিন এসে খবর দিল, রাতে বাবুর জমির ধান কাটা হবে, সে পথে আসতে আসতে শুনেছে। রজনীকান্ত চমকে উঠল। ধান দু'দিন বাদেই পেকে যাবে, সারা বছরের ফসল। তাছাড়া এবার ফলনও হয়েছে ভাল। এখন যদি আধ-পাকা ধানে মানুষে হাঙ্গামা করে, তাহলে উপায়! কলাবনির দক্ষিণ পুবে লম্বা একটা সোত জমি, একেবারে একনম্বরি মাটি। ধারোপায় জোড়া জমির নাম। কোন কোন কালে এই নামাল সোতের মধ্যে জমি ছিল ধারো সাঁওতাল নামে কারোর। এখন ধারো সাঁওতালের চিহ্ন নেই, অনেক বার হাত-ফেরৎ হয়ে রজনীকান্তর কপালে চাঁদ হয়ে ফুটেছে। ধারোপায় জোড়া এ অঞ্চলের সকলের ঈর্ষার মত জমি। রজনীকান্ত তার ভাই সুধাময়কে সন্ধ্যে হতে পাঠিয়ে দেয় জমিতে, বলল, তুই সন্ধ্যে জাগ, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, দশটা বাজলে যাব, হাঙ্গামা রাত বেশি হলেই হয়।

রাত দশটার পর ভাই ফিরে আসতে সে এগোল। পায়ে জুতো নেই পাছে শব্দ হয়। ঘন করে শীত নামছে। আকাশে ঝুলে আছে এক দুর্বল আধ-খাওয়া চাঁদ। রজনী পকেটে ছোট তিন ব্যাটারীর টর্চটা নিয়ে নেয়, নতুন ব্যাটারি, হাতে বন্দুক। পা পা করে এগোয়। মাঠে কুয়াশায় তখন ফসলের গন্ধ।

ধারোপায় জোড়া সোত জমির ধার দিয়ে লম্বা বাঁধের রাস্তা কুসমাড় হয়ে জঙ্গলে মিশে গেছে ফরেস্ট রোডের সঙ্গে। বাঁধের অন্য দিকে সদ্য ধান কাটা মাঠ। মাঠ ধরে গুঁড়ি মেরে রজনীকান্ত বন্দুক ধরে এগোয়। বাঁধে উঠতে ভয় পায়, কেননা তাহলে ওরা দেখতে পাবে। স্বল্প জ্যোৎস্না চোখ হয়ে উঠেছিল বাঘের মত। টর্চ জ্বালানো হচ্ছে না। তারপর এক সময় রজনীকান্ত দাঁড়ায়। বাঁধের অপর পারে ধারোপায় জোড়া। আরো দূরে রাজবাড়ি, তার ওপারে কাঁসাই নদী।

একটু পরেই বেশ কয়েকটা ছায়া উঠে আসে বাঁধের উপর। রজনীকান্ত স্পষ্ট দেখে বাঁকের দুদিকে কাটা ধান বাঁধা রয়েছে। মুহূর্তে তার মাথার ভিতর আগুন জ্বলে ওঠে। টর্চটা যায় জ্বলে প্রত্যেকটা মানুষের মুখে মারতে আলো করে।

—সব চুপ করে দাঁড়া, নাহলে এ গুলিতে এক একটা লাশ পড়বে। রজনীকান্ত হুঙ্কার দিয়ে ওঠে।
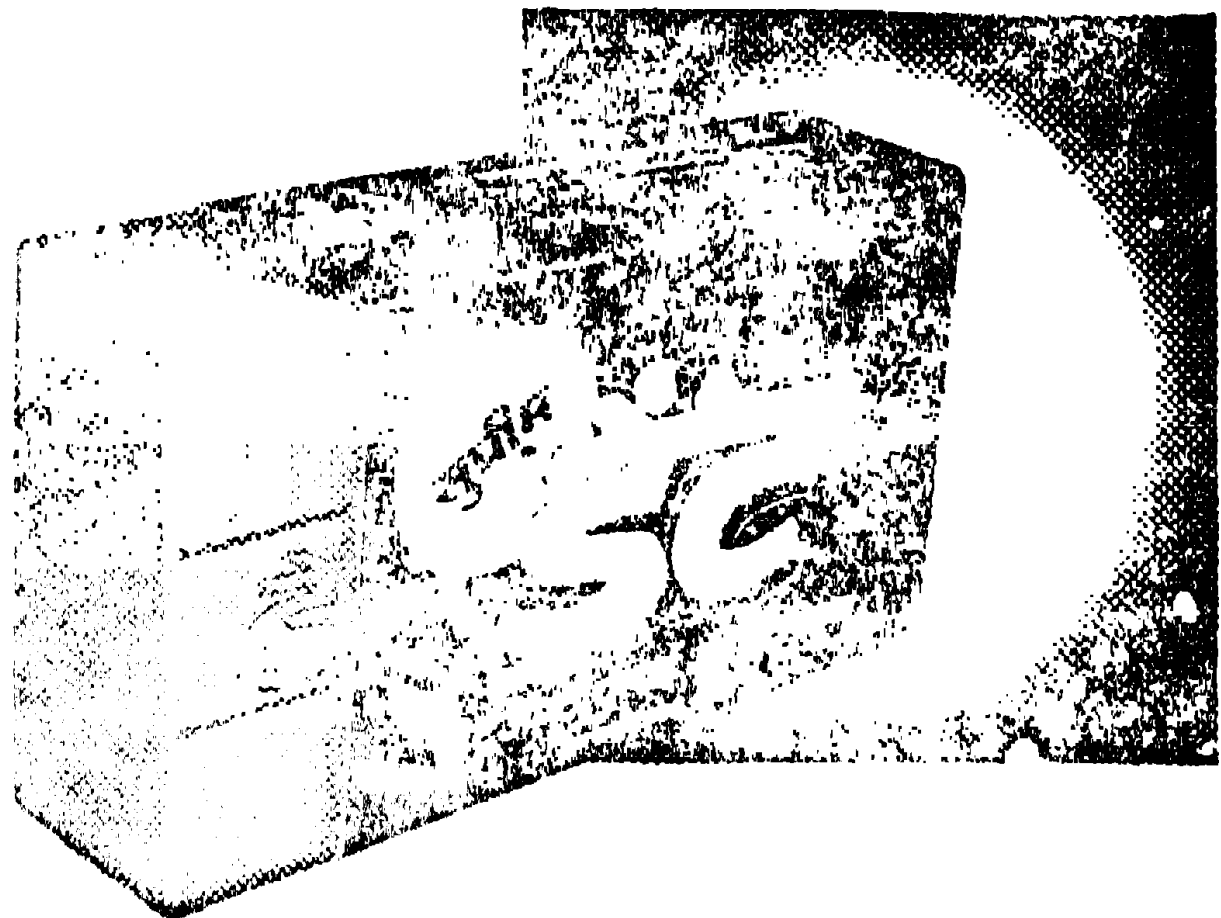
সে গুনে দেখে দশটা লোক। তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বন্দুকটা নাচায়, 'ধান মাটিতে রাখ।'

সকলে বাঁকশুদ্ধ ধান মাটিতে রাখে। রজনীকান্ত দেখে শীতের ভিতরে পায় ল্যাংটা মানুষগুলোর হাত-পা ভয়ে কাঁপছে। মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

—ধান রেখে পালা; সব কটাকে চিনে রেখেছি, শেষ করে দোব এক একটা গুলিতে।

লোকগুলো ধান রেখে পড়িমরি করে জ্যোৎস্না-কুয়াশায় আল বেয়ে উধাও হয়ে যায়। সব খাঁ খাঁ করতে থাকে। রজনীকান্ত আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। বুকের ভিতরটা কেমন করছে। কাঁচা ধানে কাস্তে মারল! সে এক গোছা ধানের শীষ ছিঁড়ে নিয়ে টর্চ দিয়ে দেখতে থাকে। শিশিরভেজা ধানের রূপ চেনা যাচ্ছে না। সবে দুধ জমে চাল হতে শুরু করেছে। এ ধান তার তো! রজনীকান্ত ধানের শীষ নিয়ে দৌড়ে ঘরে ফেরে। বুড়ি পিসিমার রাতে ঘুম হয়না। ধললেই হয়। বাতের ব্যাথায় আর অন্যান্য বয়সকালের রোগে বুড়ি বড়ই কাতর।

বুড়ির মাথার হেরিকেনটার দম কমানো। রজনীকান্ত ঘরে ঢুকে আলোটা উস্কে দেয়। তারপর বুড়িকে ডাকে। একডাকে বুড়ি জেগে যায়।

—কি হল ডাকিস কেন?

রজনীকান্ত আলোটা বুড়ির সামনে নিয়ে গিয়ে তার সামনে ধানের শীষ মেলে ধরে।

—দেখতো পিসিমা, মন্দ মানুষে ধান কেটেছে, এই ধান, ধারোপায় জোড়া থেকে উঠে এল লোকগুলো, এ ধান কি আমাদের?

ধানে বুড়ির খুব মায়া। ধানের কথা শুনেই চমকে উঠে বসে, বাতের ব্যথা কোথায় চলে যায়। ফসলের গন্ধ বুড়ির বয়স পনেরো বছর কমিয়ে দেয়। বুড়ি ঝাপসা চোখে ধান পরীক্ষা করতে থাকে। নেড়ে-চেড়ে দেখে। চোখের খুব কাছে নিয়ে আসে। হেরিকেনের আলো অপতুল মনে হয় রজনীকান্তের। সে টর্চটা জ্বলায়। বুড়ির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আস্তে, এতক্ষণ কাঁচা ধানের শোক লেগেছিল বুড়ির চোখ-মুখে।

কাঁপা গলায় বুড়ি বলে, নারে রোজনী, এ ধান মোদের নয়, ধারো পায় জোড়ায় সীতাশাল দিয়া হইছিল, ই ধান তো রূপশাল গো।

—সীতাশাল দেয়া হয়েছিল তোমার মনে আছে?

—মোর মনে থাকবে না, কোন জমিতে কি ধান দেয়া হয়েছে সব গড়গড় করে বলতে পারি, কোন ধান কবে পাকবে তা-ও বলতে পারি।

—তুমি ঠিক বলছ?

হাঁ হাঁ, তু ভাল মনে যা।

—এ ধান রূপশাল তো?

—বলছি তো হাঁ, তু পাগল করে দিবি নাকি?

—রূপশাল তো আসনবনির জমিনে দেয়া হয়েছে ওরা কি আসনবনি থেকে ধান কেটে আনল? রজনীকান্ত বিড় বিড় করে।

—না তা নয়, অপর মানুষের ধান কাটিছে, মোদের নয়।

বুড়ি আবার উঠে বসে, তু ই ধান ওদের সুরাই দে, কষ্ট করে এই ঠান্ডায় কাটিছে, নইলে অমঙ্গল হবে, যাহ্।

বুড়ি শুয়ে পড়ে। বাতের ব্যথাটা যেন আবার চাগাড় দিয়ে ওঠে। রজনীকান্ত আলোটা কমিয়ে দিয়ে ধান নিয়ে বেরোয়। ধান কাটা মানুষগুলোর একটা ওর পিছনে পিছনে এসেছিল, কি করে রজনীকান্ত তাই দেখতে, যদি পুলিশে খবর দেয়।

রজনীকান্ত হাঁটার বেগ বাড়িয়েছে। পালাতে চায়, পালাতে গিয়ে গোবরে পা ফেলে একেবারে ধরাশায়ী। রজনীকান্ত তাকে তুলে ধরে।

—এই পুলিন আর সবাইকে ডাক।

পুলিন অন্ধকারে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।

—সব ধান নিয়ে যা, ও-ধান আমার জমির নয়।

—সে তো আমরা জানি বাবু, তুমি শুধু মাথা গরম করলে।

পুলিন অন্ধকারে দৌড়ে মিশে যায়। এরপর দিন পনেরো ঐ লোকগুলো তার সামনে আসেনি। রজনীকান্ত পরদিন ধান কাটার খবর শুনেছিল। রাম মাইতির জমি সাফ হয়ে গেছে। পাহারাদারকে বেঁধে রেখেছিল ওরা। রূপশাল ধান। রজনীকান্ত মুখের বাক্যটি সরায়নি। বলেনি কারা ধান কেটেছে।

॥ ৪ ॥

রজনীকান্ত হাঁটার বেগ বাড়িয়েছে। নতুন ছোকরা অফিসারটির সঙ্গে ভাব জমাতে হবে। একটা ভুল হয়ে গেল, পুরোনো কিছু খাজনার রসিদ ছিল, সেগুলো বাড়িতে ফেলে এসেছে ও। নিয়ে আসলে ভাল হত। মোকদ্দমার কাগজ, দলিলপত্র, খাজনার রসিদ সব দেখিয়ে প্রমাণ করবে জমি তার।

কয়েক পা এগোতেই দেখে গুহিরাম আসছে। দুটো হাতে তালি বাজাতে বাজাতে গুহিরাম মাথা দুলোচ্ছে। গলায় বিকৃত এক শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। রজনীকান্ত তার বিখ্যাত গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'বেটার সূর্য ডুবলে কি আসা হবে?'

গুহিরাম নিস্পন্দ, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। হাতের তালি মাথার দুলুনি মাঝপথে থেমে গেছে। সে চোখ বড় করে রজনীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

—সব শালা ফাঁকিবাজ হয়ে গেছে অন্যদিন হলে দেখাতাম।

রজনীকান্ত বিড় বিড় করে হাঁটতে থাকে বাজারের দিকে। যাবে রাজবাড়ি। দিন সত্যিই বদল হয়ে যাচ্ছে। না হলে এই গুহিরামকে কি সে এখন ছেড়ে কথা বলত, দু-চারটে চড়চাপড় মানুষগুলোকে ভর সকালে না মারলে মন ভাল থাকে না। দশ-এগার বছর আগেই তো বন্দুকে টোটা ভরে দশটা লোককে শীতের রাতে বাঁধের উপর উঠ-বস করিয়েছে। কাটা ধান কেড়ে নিয়ে আবার ফেরতও দিয়েছে। এবার কোন জমি যে কার তা বোঝা যাচ্ছে না। তার মজুর একবার হাল মারলে, ল্যাংটাগুলো মেরেছে তিনবার হাল। ধান নিয়ে গেছে তাদের ঘরে। কথা কাটাকাটি হয়েছে অম্বুজাক্ষর সঙ্গে, লাঠালাঠির উপক্রম হয়েছে, কিন্তু রজনীকান্ত বন্দুক বার করতে চেষ্টা করেছে। সতী বাধা দিয়েছে।

মেয়েমানুষের বুদ্ধির কাছে সব নস্যি। সতী কোমর বেঁধে তার সামনে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়েছে, খবরদার বন্দুক বের করোনা।

—কেন?

সেইদিন আর এইদিন এক নয়

শেষ মুহূর্তে রজনীকান্ত রাগ সম্বরণ করেছে। সতী কানে ফুসমন্তর ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন বন্দুক বার করলে রজনীর চিহ্ন থাকবে না। ল্যাংটা মানুষগুলো হাতে চকমকি পাথর নিয়ে ঘুরছে, ক্ষেপলে পাথর ঘষে দেবে। সব পুড়ে ভোঁ ভাঁ। এবারে রজনীকান্ত বন্দুক বার করলে ওরা ছেড়ে কথা বলতো না। ওরাও বন্দুক জোগাড় করেছে, তাছাড়া টাঙ্গি বর্শা। তার জীবন থাকত না। জমির চেয়ে জীবন বড়। জীবন থাকলেই তো জমি ভোগ করা যাবে। তবুও তার ভিতরটা হাসফাস করে। বার্মিংহাম টোটা আর বন্দুক নিয়ে সে ঘরের ভিতরে ছটফট করে।

আসলে মানুষের ভিতরটা পুড়ে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে। হিংসা ছাড়া মানুষের আর কোন সম্বল নেই। আমার হয়েছে তোমার হয়নি, তোমার ভিতরটা জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। ছোট লোকগুলোর সাধ্য কি তার পিছনে লাগে। ওদের মাথায় অত প্যাঁচপোচ খেলেনা। ভাত ছড়ালে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে। পিছন থেকে কলকাঠি নড়েছে হারামজাদা অম্বুজাক্ষ বারিক। রাজার জমি সে কিনেছে, অম্বুজাক্ষর পরিবার কিনতে পারেনি তাই লোক নিয়ে দল পাকিয়ে তার সর্বনাশ করছে। ধুয়ো তুলেছে রাজার জমি যারা কিনেছে সব খাস হয়ে যাবে, দখল কর। রজনীর দুটো চোখ ধকধক করতে থাকে।

এ তল্লাটে সব জমি প্রহরাজ রাজাদের। তারাই বিক্রি করেছে জমি খাস হয়ে যাওয়ার আগে যে যেমন পেরেছে কিনেছে। সেই থেকে রজনীকান্তর বাবা প্রমথ সাউয়ের রমরমা, প্রমথ থেকে রজনীর। তাতেই অম্বুজাক্ষর রাগ।

রজনীকান্তর মাথা থেকে পায়ে গড়িয়ে যাচ্ছে রোদ। সূর্য আকাশ হামলে অনেকটা উপরে উঠেছে। ঘাসের শিশির জ্বলতে জ্বলতে নিভে যাচ্ছে। দূরে কাঁসাইয়ের বালিয়াড়ি দেখা যাচ্ছে।

বাজারের মুখে যেতেই দেখে খবর সঠিক। কালকের সেই ছোকরা সায়েব নির্মলবাবুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে অজয়ের দোকানে। ছোকরা বাবুটিকে দেখতে বেশ। রোগা ছিপছিপে, টুকটুকে ফর্সা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, লতার মত দুলে যাচ্ছে। মুখে খই ফুটছে। চশমাটা খুলছে আবার পরছে। রজনীকান্ত হাত দিয়ে কলপ মারা চুলগুলোকে ঠিক করে। রুমাল দিয়ে

মুখ মোছে। তারি মুখে হাসি নিয়ে আসে কিন্তুর, তারপর এগিয়ে যায়।

—হে' হে' সার ভাল আছেন ?

নির্মল মজুমদার তাকাল, ভোরসক্কালে এসে হাজির।

—কি ব্যাপার যাচ্ছেন কোথায় ?

—না কোথাও না, সকালে জমিগুলোকে দেখে বড় দুঃখ হল, তাই আপনার কাছে এলাম-হে-হে। রজনী হাত কচলাতে থাকে। দীপঙ্কর রজনীকান্তর আপাদমস্তক জরীপ করছিল। একেবারে দেহের অভ্যন্তরে চোখ ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। এই সেই মানুষ, গুহিরামের মনিব। কাল দেখে মনে হয়েছিল খুব রাসভারি লোক, আজ এখন ইম্প্রেশন্ বদলে যাচ্ছে। এতো প্রয়োজনে সব কিছু করতে পারে। এত বিনয়ের কি আছে ?

এতক্ষণে রজনীকান্ত পকেট থেকে বার করেছে সিগারেটের-এর প্যাকেট আর লাইটার। খুলে ধরেছে মজুমদারের সামনে।

—সার এনাকে তো চিনলাম না,

রজনীকান্ত কালকের দেখাটা সম্পূর্ণ গোপন করে। এই জন্য যে কালকে তার কিছু দায়িত্ব ছিল এই নতুন অফিসারটির প্রতি। তাকে আপ্যায়ন করা উচিত ছিল, তার পৌঁছানর ব্যবস্থা করা উচিত ছিল সে সব সে করেনি। করলে ভাল হত। অফিসার বাবুটি তার উপর কৃতজ্ঞ থাকত। যে কোন উপায়ে এদের উপকার করতে পারা একটা ভাল কৌশল।

—সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে পুরুন তারপর কথা বলছি।

মজুমদার একটু গম্ভীর।

—কেন নিন না। রজনী হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

আর নয়। রজনীকান্ত ঝট করে ব্যাপারটা বুঝে ফেলে পকেটে ভরে নেয় প্যাকেটটা। তারপরই পকেট থেকে বার করে এলাচদানা, নিন সার। দীপঙ্করের দিকে বাড়িয়ে ধরেছে হাতটা।

দীপঙ্কর নির্মল মজুমদারের দিকে তাকায়, ইনি কে? ওহ্ কাল আপনাকে দেখেছি মনে হচ্ছে নদীর ওপারে বিকেলেন বাসে এলেন না, মজুরটাকে তাড়া দিচ্ছিলেন। চিনে রেখেছে। রজনীকান্ত অপ্রতিভ হয়ে যায়, ঠিক ধরেছেন সার। রজনীকান্ত এলাচদানা শুদ্ধ হাত পকেটে ভরে নেয়।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে রজনীকান্তকে দেখছিল। কাল চুলগুলো, গোঁফটা কাঁচা-পাকা দেখছিল না। আজ যেসব কালো। তাহলে কি অন্য লোক।

মজুমদার হাসছে হঠাৎ, আরে মশাই চা খাবেন ?

না, হ্যাঁ। রজনীকান্ত বিড়বিড় করে।

—তা চুলে আবার রং লাগিয়েছেন ?

হে হে হে, রজনীকান্ত হাত কচলাতে থাকে, সার ইনি কি আপনার বদলে এলেন এখানে ?

—হ্যাঁ।

—বাহ্ বেশ বেশ তা এলেন যখন দেখুন আমাদের কষ্ট, তা সারের ঘর কোথায় ?

—নেই। দীপঙ্কর হাসতে হাসতে জবাব দেয়।

—সে কি ? রজনীকান্তর চোখ-মুখে কপট বিস্ময়।

—হ্যাঁ মশাই।

দীপঙ্কর দেখে প্রৌঢ়ত্বের কাছে পৌঁছে মানুষটা চুলে কলপ লাগিয়ে আয়রনকরা ধুতি-শার্ট পরে চকচকে পাম্প শু লাগিয়ে এই সক্কালে এসে হাজির হয়েছে। কাজ উদ্ধারে নিশ্চয়। রজনীকান্ত সাউয়ের অনেক খবর সে পেয়েছে নির্মল মজুমদারের কাছ থেকে নদীর ধার থেকে ফেরার পথে। কাজ উদ্ধার করতে হলে চেহারা একটা ব্যাপার তাহলে !

—তা আপনি কোথাও যাচ্ছেন নাকি রজনীবাবু। নির্মল মজুমদার প্রশ্ন করে।

—না ইনার সঙ্গে দিখা করতে এলাম।

—বাব্বা তার জন্য এত ড্রেস, আতর লাগিয়েছেন, এখন তো বরের পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়া যায় আপনাকে।

—তা যায়। রজনীকান্ত নিজের জামা-কাপড়ের দিকে চেয়ে বলে।

—তা এই নতুন সায়েবের সঙ্গে কি দরকার ?

—না কিছু না, কাল আসতে কষ্ট হল কিনা, তা আমি তো গুহিরামকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিলাম। রজনী ঝড়ের মত বলে।

—ও আপনি রেখে এসেছিলেন ওকে। দীপঙ্কর সহাস্যে প্রশ্ন করে।

—কেন ও বলেনি, ব্যবস্থা করেনি আপনার ?

—বলবে কি করে, বোবা মানুষ তো।

—হে হে তা বটে, বড় ভুল হয়ে গেছে, আর ঐ বোবা বলেই পার পেয়ে যায় বেটা, আসলে খুব চতুর।

দীপঙ্কর একদৃষ্টিতে রজনীকান্তকে দেখছিল। আর কথা বলছিল না। দূরের মোরাম রাস্তা বেয়ে একটা সাইকেল আস-ছিল। নির্মল মজুমদার ঘাড় উঁচু করে দেখতে থাকে। দীপঙ্করও দেখে।

—কে ?

—ডাক্তার বোস, তফাবনির হেলথ সেন্টারের ইনচার্জ, বোধহয় রাজবাড়িতে যাচ্ছেন। মজুমদার জবাব দেয়।

সাইকেলটা এধারে ঘুরেছে। রজনীকান্ত এখনো হাত কচলে দীপঙ্কর বা মজুমদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

—রজনীবাবু পরে কথা হবে, এখন ঘরে যাই।

—আমিও যাই চলুন না।

—না, নির্মল একটু কঠোর।

মুহূর্তে রজনীকান্তর চোখ জ্বলে উঠে নিভে গেল। তারপর সে মুখে পুরোন হাসি এনে হাত জোড় করে নমস্কার জানাল, একটু ঝাড়গ্রাম যাব সার, পরে দেখা করবো।

সাইকেলটা এসে ভস করে নেমে গেল। সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক নামলেন। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। সাদাশার্ট আর ডীপ নেভিব্লু রংয়ের প্যান্টপরা। ভদ্রলোক নেমেই চিৎকার করে করে ওঠেন।

—কেমন আছেন মিঃ মজুমদার ?

—একরকম, রাজগৃহে গমন করছেন ?

—হ্যাঁ চালুন, ওদিক যাবেন তো।

ওরা দুজন ডাক্তারের সঙ্গে এগোয়। দীপঙ্করের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়। রাজ-বাড়ি থেকে কল এসেছে, রাজকন্যের অসুখ।

—অসুখ! দীপঙ্করের চোখেমুখে বিস্ময়।

—কেন আবক হলেন, রাজারাজড়ার অসুখ হয় না, তার উপর এখন যখন রাজত্ব নেই।

—না আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

—কি ?

—সক্কালে নদীর ধার থেকে ফিরতে দেখলাম আপনাদের রাজকন্যাকে।

ডাক্তার একটু থতমত খেয়ে আবার সপ্রতিভ, ওনাদের অসুখের জাত আমাদের থেকে একটু আলাদা, রোগ নির্ণয়ে বড় কষ্ট।

—তবু আপনার সুযোগ আছে, ডাক্তার-মানুষ। দীপঙ্কর রসিকতা করে। ডাক্তার হো হো করে হাসতে হাসতে সাইকেল ধরে এগোয়।

ক্রমশঃ ওরা রাজবাড়ির দরজায়। ভোরের সেই থমথমে বাড়িটা কোন অলৌকিক উপায়ে জেগে উঠেছে। চাকর-বাকর ছুটোছুটি করছে। লনে অফিসের স্টাফরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবকটা চোখ নতুন মানুষ দীপঙ্কর চৌধুরীকে বিদ্ধ করছে।

—যাবেন নাকি? ডাক্তার নিস্পৃহভাবে মজুমদারকে জিজ্ঞেস করে।

—না। নির্মল মজুমদার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছে।

—আপনি? দীপঙ্করের দিকে ডাক্তার তাকায়।

দীপঙ্কর চুপ করে যায়। যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, গেলে হত। ইচ্ছাশক্তি টানছে ওদিকে। অথচ নির্মলবাবু না করেছে, কি করে যাওয়া যাবে? দীপঙ্কর নির্মল মজুমদারের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়, জিজ্ঞেস করছে যেন, যাবেন না কেন?

নির্মল মজুমদার ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে।

—আপনি চলুন না। ডাক্তার বোধহয় বুঝতে পেরেছে দীপঙ্করের মনের ইচ্ছেটা। হাতটা ধরেছে। সাইকেলটা বারান্দায় স্ট্যাণ্ড করিয়ে দিয়েছে। দীপঙ্কর নির্মলের দিকে তাকায় আবার।

নির্মল মজুমদার সহজ হয়ে ওঠে, আপনি যান, আমি ঘরে যাই, চলে যেতে হবে, গোছগাছ আছে।

দীপঙ্কর হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কাল রাতে সেই ক্রস্তপদের অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া আজ ভোরের আলোয় দূরের মন্দির থেকে কাঁসাই-এর তীর বেয়ে হেঁটে আসা সেই অলৌকিক রমনীকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। বুকের ভিতরটায় দম মেরে যাচ্ছে। দীপঙ্কর আস্তে আস্তে এগোয় ডাক্তারের পিছনে। উত্তেজনা লাগছে। সে সিগারেট ধরায়, নতুন দেশলাইয়ের একটা কাঠি নষ্ট হয়।

(চলবে)

সামনে চড়াই

অজয় বসু

গোটা দেশ ছেঁকে মনোনীত একত্রিশজন খেলোয়াড়ের মধ্য থেকে ঝাড়াই বাছাই করে মোট ষোলজনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ইংলণ্ডগামী নির্বাচিত এই দলটির দিকে তাকালে নতুন মুখের সমাবেশ বড় একটা চোখে পড়ে না। জমাট ভিড় যেন পুরনো প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেটারদের ঘিরেই। নতুন সামর্থের ওপর ভরসা রাখাই প্রগতির লক্ষণ। আফশোষের কথা, নির্বাচকমণ্ডলী প্রগতি শব্দটির যথার্থ মূল্য ধরে দিতে চান নি। নতুন বোতলে পুরনো পানীয় ঢেলে তাঁরা বুঝি ভাবের ঘরে চুরিই করতে চেয়েছেন।

নির্বাচন কোন কালেই সর্বসম্মত হয় না। পায় না সর্বজনের অনুমোদনের আনুকূল্য। নির্বাচকদের কাজ বড়ই কঠিন। তবু আশা করা যায় যে, তাঁরা একটা নির্দিষ্ট নীতি মেনে চলবেন। ভারতীয় ক্রিকেটের নির্বাচকমণ্ডলী ইংলণ্ডগামী দল বেছে নেওয়ার সময় কোন অঘোষিত নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছেন জানি না। শুধু জানি যে তাঁদের অনুসৃত নীতিতে নবীনেরা উপকৃত হতে পারেন নি। নতুনদের নিয়ে নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার মত মনের পুঁজিও তাঁদের ছিল না।

ষোলজনের দলে নতুন বলতে নামমাত্র একজন—সুরিন্দর খান্না। যশপাল শর্মাও তেমন নতুন নন। যেহেতু ভারতীয় দলের সদস্য হিসেবে তিনি একবার বিদেশ ঘুরে এসেছেন। যদিও টেস্টে খেলতে তিনি এখনও ডাক পান নি। যজুবেন্দ্র সিংকে কী নতুন খেলোয়াড় বলা যায়? তিনি আগে বিদেশ সফরের সুযোগ পান নি বটে। তবে বছর দুয়েক আগে টেস্ট খেলার মাঠে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু গত দু বছরে স্বদেশের মাঠে প্রথম সারির ক্রিকেটে তিনি এমন কিছুই করতে পারেন নি যা মনে থাকার মত। এবং যার মূল্যায়নে জাতীয় দলে তাঁর অন্তর্ভুক্তির বিষয় সমর্থন করা যায়।

উইকেটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অসাধারণ তৎপরতায় ফিল্ডিং করায় ওস্তাদ বটে যজুবেন্দ্র। কিন্তু শুধু ফিল্ডিংয়ের জোরে কে কবে কোন দলের জাতীয় ক্রিকেট দলে ঠাঁই করে নিতে পেরেছেন। অমন জাত ফিল্ডসম্যান একনাথ সোলকারকে দলে নেওয়ার সময় নির্বাচকেরা তাঁর ব্যাটিং সামর্থ ঝালাই করে নিতেন। যজুবেন্দ্র ভাগ্যবান। তাঁর বেলায় ব্যাটিং দক্ষতার চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করা হয় নি। হলে দেখা যেত যে সাম্প্রতিক কালে ব্যাট হাতে তিনি এমন কিছুই করতে পারেন নি যা উল্লেখযোগ্য!

ভাল ফিল্ডিং করতে পারেন বলে নরসিমা রাওয়েরও তো নাম আছে। কালীচরণের দলের বিরুদ্ধে টেস্টে তাঁকে খেলানোও হয়েছে। মাস কয়েক অতিক্রান্ত হতে না হতেই নির্বাচকেরা নরসিমার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে বিস্মৃতির অতল থেকে কুড়িয়ে আনলেন যজুবেন্দ্রকে। যজুবেন্দ্র যদি এমন অপরিহার্য হন তাহলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে তাঁকে খেলতে ডাকা হয় নি কেন? এবং কেনই বা ষোলজনের দলে ঠাঁই পাওয়ার মত যোগ্যতা যাদের নেই সেই নরসিমা রাও ও ধীরাজ পারসানাকে কালীচরণের দলের বিরুদ্ধে খেলতে ডাকা হয়েছিল? এসব প্রশ্নের জবাব কী? কেই বা এর জবাব দেবে?

উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসেবে সুরিন্দর খান্নার দলভুক্তিতে সবাই খুশি। খান্না উইকেটরক্ষণে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাতে না পারুন, ব্যাটটিকে বাগিয়ে ধরার সম্প্রতি তিনি যে যোগ্যতা, দক্ষতা দেখিয়েছেন তা অসাধারণ বৈকি। এখানে-ওখানে শত রান করার পর রণজি ট্রফির ফাইনালে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করেই খান্না নির্বাচকদের রায় তাঁর অনুকূলে টেনে এনেছেন। তিনি তাঁর প্রাপ্য পুরস্কারই পেয়েছেন। শুধু ব্যাটিংয়ের জোরেই দলে ঠাঁই পাওয়া তাঁর পাওনা ছিল। তার ওপর উইকেটরক্ষণে বাড়তি গুণ। সব মিলিয়ে নতুন খেলোয়াড় খান্নার নির্বাচন সর্বসম্মত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা যায়। খান্নার কথা যখন উঠল তখন বলেই নিই যে রণজি ট্রফির ফাইনালে দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছরের অবকাশে মাত্র চারজন খেলোয়াড় উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করতে পেরেছেন। খান্না ছাড়া বাকি তিনজন হলেন বিজয় হাজারে, মুস্তাক আলি ও হনমন্ত সিং। খান্নার নির্বাচন কোন বিতর্কের সৃষ্টি করে নি। যেমন শোনা যায় নি গাভাসকার, বিশ্বনাথ, ভেংকটরাঘবন, ভেঙ্গসরকার, চৌহান, কপিল, ঘাউড়ি, মাহিন্দরের নির্বাচন ঘিরে কোন বেসুরো মন্তব্য।

উইকেটরক্ষক কিরমানির বাদ পড়ার দৃষ্টান্ত সব হিসেবেই অযৌক্তিক। মাস কয়েক আগেও কিরমানির স্বীকৃতি ছিল ভারতের পয়লা নম্বর উইকেটরক্ষক হিসেবে। কালীচরণের দলের বিরুদ্ধে সব কটি টেস্টেই খেলতে তাঁকে ডাকা হয়েছিল। তখন অন্য কারোর কথা নির্বাচকদের মনে উঁকি দেয় নি। অথচ মাস কয়েকের ব্যবধানে কী এমন ঘটে গেল যে দলের দুজন উইকেটরক্ষকের অন্যতম বলেও তিনি স্বীকৃত হতে পারলেন না?

কী যে ঘটে গেছে তার ঠাওর মেলা বোধ হয় কঠিন নয়। কেরি প্যাকারের দলে কিরমানি নাম লেখাতে পারেন বলে খবর রটেছিল। ক্রিকেট বোর্ড হয়ত অঘোষিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে। কারণ বোর্ড দু নৌকায় পা রেখে চলার রীতি পছন্দ করেন না। কিন্তু আরও পাঁচজন ভারতীয় খেলোয়াড় সম্পর্কেও একই কথা উঠেছিল। তাহলে অন্যদের রেহাই দিয়ে ছাঁটাইয়ের কোপটি শুধু কিরমানির ঘাড়ে বসিয়ে দেওয়া হল কেন? অন্যরা আরও শক্ত ঘুঁটি বলেই কী? কোন সন্দেহ নেই যে কিরমানিকে দলছুট হিসেবে রেখে দেওয়াতে তাঁর ওপর চরম অবিচার করা হয়েছে।

সুরিন্দর খান্নার এই প্রথম বিদেশ সফর

অবিচার করা হয়েছে সুরিন্দর অমরনাথের বেলাতেও। সুরিন্দর অমরনাথ সম্পর্কে নির্বাচকদের বোধহয় কোন অ্যালার্জি আছে। পাকিস্তান সফরে তিনি একেবারে ব্যর্থ হন নি। অথচ ঘরে ফেরা মাত্রই টেস্ট দল থেকে তাঁকে ছাটাই করে দেওয়া হয়। বিগত মরশুমে যে কজন খেলোয়াড়ের ব্যাটের দাপটে ঘরোয়া আসর গমগমিয়ে উঠেছিল। সুরিন্দর অমরনাথ তাঁদেরই অন্যতম। রণজি ফাইনালে তিনি সেঞ্চুরিও করলেন। তবু তাঁকে বঞ্চিতের দলে পড়ে থাকতে হল।

সরকারী এবং বেসরকারী, টেস্ট ক্রিকেটের উভয় স্তরেই আবির্ভাব লগ্নে সুরিন্দর অমরনাথ সেঞ্চুরি করায় সফল। অথচ তাঁকে উৎসাহে ও সহৃদয়তায় লালন-পালন করার নীতি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কোন দিন গ্রহণ করেন নি। সত্য বটে উইকেটে এসে রানের পেছনে ছোটা তাঁর স্বভাব। তাড়াতাড়ি স্ট্রোক নিতে তাঁর হাত যেন নিসপিস করে। সময়ের আগে মার মারার চেষ্টা করায় তিনি অনেক সময় নিজের পতন যেমন ডেকে আনেন, তেমনি যখন-তখন শরীরে আঘাতও পান। এ সবই তাঁর কৃতকর্মের ফল। নিজের অপরাধে ভোগান্তিও তাঁর কম হয় নি। তবু তাঁর ব্যাটিং সাফল্যের নজিরও নেহাৎ কম নয়। তাঁর মানসিক বিন্যাস তেমন পরিপাটি নয়। এটা তাঁর ত্রুটি। তবে এ ত্রুটি থেকে ব্রিজেশ প্যাটেল মুক্ত নন। তবু ব্রিজেশ দলে ফেরার সুযোগ পেয়েছেন। আর সেই সুযোগ সুরিন্দর অমরনাথের হাতের বাইরেই রেখে দেওয়া হয়েছে।

কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় দল নির্বাচকেরা যশপাল শর্মা, যজুবেন্দ্র সিং, ভরত রেড্ডিকে যে সহৃদয়তার সঙ্গে এবং দরাজ পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন, সেই কোমল মনের প্রসন্নতা সুরিন্দর অমরনাথ কোন দিনই পেলেন না।

অথচ কে না জানে যে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, পিঠ চাপড়িয়ে সুরিন্দরের চড়া ধাতের ক্রীড়া-রীতিকে যদি কিঞ্চিৎ সংযত করে তোলা যেত তাহলে তাঁর কৃতকর্ম ভারতীয় ক্রিকেটের উপকারে লাগত। যেহেতু সুরিন্দর অমরনাথ একজন চালু ব্যাটসম্যান এবং উঁচুদরের ফিল্ডসম্যান। অধিকন্তু তিনি বাঁ হাতে ব্যাট করেন। ইংলণ্ড সফরকালে ভারতীয় দলে একজন যোগ্য ন্যাটা ব্যাটসম্যানের অন্তর্ভুক্তি ছিল নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আশ্চর্য, দল গড়ার কাজে নির্বাচকমণ্ডলী এই সত্যটুকু উপলব্ধি করতে চাইলেন না। যদিও নির্বাচকমণ্ডলীতে রয়েছেন জনকয়েক ন্যাটা ক্রিকেটার। ন্যাটা ব্যাটসম্যান দলের কী প্রয়োজন সাধন করতে পারেন ইংলণ্ড প্রত্যাগত এই সব ক্রিকেটারের তা অজানা থাকার কথা নয়।

বেদী ও চন্দ্রশেখরকে দলে পাকাপাকিভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার দৃষ্টান্তেও দূরদর্শিতার অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। বেদীর দিন বিগত। চন্দ্রের মহিমাও আধ রাহুগ্রস্ত। নির্বাচকেরা এই দুজনকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে খেলার সময় মাঝে মাঝে বাদ দিতে কুণ্ঠিত হন নি। অথচ ক মাস পরে তাঁদের আবার ইংলণ্ড সফরে দলে ফিরিয়ে আনা হল। কেন?

হয়ত যুগল স্পিনারের অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওঁদের মধ্যাহ্নকাল কী শেষ হয়ে যায় নি? দুজনেই এক যুগের ওপর টেস্ট খেলছেন। কত দিন আর খেলতে পারবেন? ইংলণ্ডে দুজনেই যদি কিছুটা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন তাহলেও তো নতুন স্পিনারদের সন্ধানে ফিরতে হবে। কারণ বেদী বা চন্দ্রশেখর কেউই অনন্ত যৌবন নন। ভারতীয় ক্রিকেটকে তাঁরা দিয়েছেন অনেক। তবু দুজনের কেউই কামধেনু সদৃশ চিরায়ত আশীর্বাদও নন। একদিন তাঁদের ছুটি নিতেই হবে। ইংলণ্ড সফর উপলক্ষে উঠতি স্পিনারদের অথবা বিকল্প স্পিনারদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় দীক্ষা দেওয়ার যে সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, নির্বাচকমণ্ডলী তা সদ্ব্যবহার করতে চান নি। তাঁদের দূরদর্শিতা এবং সাহসের অভাব এ ব্যাপারেও প্রত্যক্ষ করা গেছে।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের এবারের সফর হচ্ছে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। দল নির্বাচনের আগে কোর প্যাকারের টোপে জনকয়েক খেলোয়াড় অন্যমনা হয়ে পড়েছিলেন। চুক্তিপত্রে সই-সাবুদ করার প্রশ্নে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ক্রিকেট বোর্ডের বিরোধ বাধে। বিষয়টি ঘিরে খেলোয়াড় মহলেও যে মতান্তর ঘটে নি তাও নয়। মতান্তর কী মিটে গেছে? ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কী অবসান হয়েছে? কে জানে এই লড়াইয়ের আঁচে দলগত সংহতির গায়ে ফোসকা পড়বে কিনা!

গাভাসকার বি বি সির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, নেতৃপদ হারিয়ে তিনি নিরাশ ও বিস্মিত। নৈরাশ্য ও বিস্ময়, ক্ষোভ, রোষ অসহযোগিতায় রূপান্তরিত না হলেই মঙ্গল। হলে, ভারতীয় ক্রিকেটের দুর্ভোগ বাড়বে। দলের মধ্যে আর এক দলের বৃত্ত হবে রচিত। তেমন দুর্ভাগ্যের সামনে ভারতীয় দলকে যেন না পড়তে হয়। অতীতে এমন আন্তঃকলহের জন্যে ভারতীয় দলকে বার বার ভুগতে হয়েছে। ইতিহাসের সেই শিক্ষা ভুলে যাবার বস্তু নয়। তাই বিশ্বাস করি, জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে ইংলণ্ডের মাঠ-ময়দান পরিক্রমণের কালে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যেন খেলোয়াড়োচিত চরিত্র ধর্মের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখতে পারেন। মতপার্থক্য থাকতে পারে। খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ যাই থাক না কেন, জাতীয় স্বার্থ যে অনেক বড় একথা যেন কেউ না ভোলেন।

তবে সে তো পরের কথা। পরেই না হয় হবে। আপাতত বলি, মস্ত পরীক্ষার ভ্রূকুটি আজ ভারতীয় ক্রিকেট দলের সামনে। অস্ট্রেলিয়াকে শোচনীয়ভাবে হারাবার পর ইংলণ্ডের মনোবল অনেক বেড়েছে। আর মতান্তরের জের টানতে গিয়ে ভারতীয় দলকে আগের মনোবল কিছুটা হারাতে হয়েছে।

এই অবস্থায় ভিন্নতর পরিবেশে সফর। শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা। এক কথায়, দলের সামনে দিগন্তপ্রসারী চড়াই। চড়াই ভাঙলে তবেই উৎরাই। সে পথের ঠিকানা জানা যাবে তো?

ভারতীয় হকি কোন পথে?

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন সকলের মুখেই ক্রিকেটের কথা। গাভাসকারের বদলে ভেঙ্কটরাঘবন ক্যাপ্টেন হয়েছেন। কিরমানি ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন। সুরিন্দর অমরনাথকে নেওয়া হয়নি—এসব ছাড়া কারো মুখে অন্য কোন কথাই নেই।

কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ক্রিকেট ছেড়ে আমরা যদি হকির দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো আর এক ছবি! একদিন হকি জগতে যে ছিল রাজা আজ তাকেই নেমে আসতে হয়েছে একেবারে নিচের সারিতে। সরাসরি ওলিম্পিক ক্রীড়ার হকি প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার হারিয়েছে ভারত। ভারত ১৯২৮ সালে ওলিম্পিক হকিতে যোগ দেবার পর এবারই সর্বপ্রথম আশি সালের মস্কোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খেলার জন্যে ভারতকে যোগ্যতা অর্জন করতে হচ্ছে। এর চেয়ে দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে?

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা হয়ে গেলো। ভারতের কাছে এই প্রতিযোগিতাটির গুরুত্ব ছিল অসীম। কারণ ভারত মস্কো ওলিম্পিকে খেলতে পারবে কিনা সেই প্রশ্নটি বিশেষভাবে নির্ভর করছিল পার্থের খেলার ফলাফলের ওপর।

কিন্তু ব্যাপারটা ভারতের পক্ষে খুব সহজ যে হবে না, তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। কারণ এই প্রতিযোগিতার বিভাগ বিন্যাস ভারতের পক্ষে মোটেই সুখকর হয়নি। ভারতকে ক বিভাগে খেলতে হয়েছে হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা আর ফ্রান্সের সঙ্গে।

আগেকার ফলাফলের দিকে চোখ বুলোলে আমরা দেখতে পাবো যে ক বিভাগের ঐ চারটি দলের মধ্যে হল্যাণ্ডের হাতে ভারতকে হার মানতে হয়েছে বার বার। ভারত হেরেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। এমন কি কানাডার মতো অতি সাধারণ দলও ভারতকে পরাজিত করেছে।

সুতরাং বলতে বাধা নেই যে পার্থের প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে হল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলাতেই ভারতের আসল পরীক্ষা হয়ে গেছে। ভারতের লক্ষ্য মস্কো ওলিম্পিক। সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে পার্থের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের যে ভাল খেলার দরকার ছিল সব থেকে বেশী। কিন্তু কাজের সময় তাঁরা তা পারেন নি। ভারত হেরেছে হল্যাণ্ডের কাছে ৬-৩ আর অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩-২ গোলে।

এবারই বোধহয় সর্বপ্রথম ভারতীয় দল গড়ার সময় তরুণ খেলোয়াড়দের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান খেলোয়াড়দের কয়েকজনকে বাদ দিয়ে তরুণ রক্তের জোয়ারে দল ভরিয়ে নির্বাচকরা চেয়েছেন খেলোয়াড়দের মনোবল বাড়িয়ে দিতে।

তাই আমরা দেখতে পাই—ব্যাঙ্ককের এশীয় ক্রীড়ার রানার্স আপ ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন অধিনায়ক ও লেফট-ইন গোবিন্দ। বাদ পড়েছেন ফুলব্যাক প্রমোদ বাটলা, হাফব্যাক বারীন্দর সিং, রাইট আউট ফিলিপস ও লেফট আউট জাফর ইকবাল। এঁদের স্থান পূর্ণ করা হয়েছে তরুণ খেলোয়াড়দের দিয়ে।

আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার সভাপতি শ্রীরেনে ফ্রাঙ্ক সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, ভারত মস্কো ওলিম্পিকে খেলবে না একথা ভাবাই যায় না। তিনি একথাও বলেছেন যে তাঁর বিশ্বাস মস্কো ওলিম্পিকে ভারত সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে। কারণ বিশ্ব হকিতে ভারতের স্থান আলাদা। আজো ভারত মর্যাদার

আসনে প্রতিষ্ঠিত। সেই প্রতিষ্ঠাই আজ ভারতকে অন্তত অলিম্পিকে খেলার ছাড়পত্র এনে দেবে।

অর্থাৎ সেই কবে যি খেয়েছি, তার গন্ধ আজো আমরা শুঁকে চলেছি।

অবশ্য তা ছাড়া আমাদের আছেই বা কি! বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে হকিই তো ভারতকে বারবার এনে দিয়েছে অনন্য সম্মান, এনে দিয়েছে মর্যাদা আর প্রতিষ্ঠা।

সেই বারবার জয়ই আমাদের আত্মসুখী করে তুলেছিল। পায়ের ওপর পা তুলে আমরা ভেবেছিলাম, এতো শক্তি যখন আমাদের তখন আর ভয় কি? আমাদের হারাবে কে? কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অনেকটা সেই – 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে' তার মতো হয়ে গেল। ভারতের ভাগ্যে পাকিস্তানের কাছ থেকেই এলো প্রথম আঘাত। আর আজ কে না হারাচ্ছে ভারতকে।

কিন্তু কেন এমন হলো? ঠিক এমনটি তো হবার কথা ছিলো না। হতোও না যদি ঐ আত্মসুখী মনোভাব ছেড়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে পরিকল্পনা মাফিক এগোতে পারতাম।

আমরা যখন দিব্যি বহাল তবিয়তে শুয়ে বসে কাটাচ্ছি আর অলিম্পিক হকিতে ভারত কবে কোথায় সোনা পেয়েছে এবং পাবে তার স্বপ্ন দেখছি ঠিক তখনই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভারতের কৃতী প্রাক্তন খেলোয়াড়দের মোটা টাকা দিয়ে নিজেদের দেশে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের খেলোয়াড়দের হকি খেলা শেখাবার জন্যে। তাদের দলকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্যে।

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড থেকে আরম্ভ করে সব দেশকেই হকি জগতে এগিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় প্রশিক্ষকরা। তাদের টেনে তুলেছেন মর্যাদার আসনে। এখনো অনেক দেশেরই প্রধান কোচ ভারতের প্রাক্তন খেলোয়াড়রা।

আগে অন্য দেশের দর্শকরা বলতেন, ভারতীয় খেলোয়াড়দের স্টিকে যাদু আছে। একবার তো তাঁরা হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদের স্টিকে আঠা মাখানো আছে কিনা পরীক্ষা করেও দেখেছিলেন।

অর্থাৎ ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার অস্ত্র ছিল ঐ 'স্টিক ওয়ার্ক'। স্টিক ওয়ার্কের সূক্ষ্ম কায়দাকানুন চট করে রপ্ত করা যায় না। তার জন্যে চাই দীর্ঘদিনের ব্যাপক অনুশীলন। তাই ইউরোপীয় খেলোয়াড়রা সেদিকে বিশেষ নজর দেননি। তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন গা-জোয়ারি খেলার পদ্ধতি। তাদের শরীর শক্ত-সমর্থ এবং মজবুত। দারুণ স্বাস্থ্য তাঁদের। তাই তাঁদের পক্ষেই গায়ের জোরে খেলা সম্ভব।

কিন্তু স্টিক ওয়ার্কের সূক্ষ্ম কারিকরির সঙ্গে গা-জোয়ারি খেলা তো পাল্লা দিতে পারে না। অথচ এই কথাটাই আমরাবেমালুম ভুলে গেলাম। তাই সনাতন পদ্ধতি ছেড়ে আমাদের খেলোয়াড়রা নকল করতে গেলেন ইউরোপীয় কায়দা। আর তার ফলও আমরা হাতে হাতেই পেয়েছি। হেরে গেছি হল্যান্ড-এর কাছে। গুণে গুণে আমাদের গোল দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। হারিয়েছে কানাডার মতো শক্তিহীন দেশও। তবু কি আমাদের নজর খুলেছে?

আরো একটি বিষয়ের কথা চিন্তা করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে আমাদের পরিকল্পনার এবং দূরদর্শীতার কতো অভাব। আজকাল আর আন্তর্জাতিক খেলাগুলি ঘাসের মাঠে হয় না। খেলা হচ্ছে অ্যাস্টো টারফের ওপর। ঘাসের মাঠ আর কৃত্রিম মাঠের মধ্যে তফাৎ আকাশ পাতাল। কৃত্রিম মাঠে খেলার গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়। বল ছোটে দারুণ জোরে। অর্থাৎ কৃত্রিম মাঠে নিয়মিত না খেললে অথবা অনুশীলন না করলে ঐ মাঠের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া খুবই মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় খেলোয়াড়দের এ এক মস্তো অসুবিধে।

অথচ এই অসুবিধে দূর করার জন্যে ব্যাপক কোন পরিকল্পনা করা হয়নি। তার ফলে ভুগতে হচ্ছে খেলোয়াড়দের। হারতে হচ্ছে ভারতকে এবং আন্তর্জাতিক হকির আসরে ভারতের মান-সম্মান মিশে যাচ্ছে মাঠের ধুলোয়।

বর্তমানের এই পরিবেশ এবং পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পেতে হলে চাই ব্যাপক পরিকল্পনা। সেই সঙ্গে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। দল গড়ার দরকারও অনেক আগে থেকে। এই ব্যাপারে আমরা প্রতিবেশী দেশটির দিকে নজর দিতে পারি। মস্কো অলিম্পিককে সামনে রেখে পাকিস্তান তাদের দল গড়ার কাজ গত বছর থেকেই শুরু করেছে। তারা বেছে নিয়েছে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সঙ্গে নবাগতদেরও। এক সঙ্গে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে প্রশিক্ষণ আর অনুশীলন চলছে তাদের।

আর আমরা কি করি? বাইরে খেলতে যাবার মাত্র কিছুদিন আগে আমাদের দল গড়া হয়। তারপর কিছুদিন তাঁদের তালিম দিয়ে প্লেনে তুলে দেওয়া হয়। সেই মুহূর্তে সকলেই আশা করেন যে আমাদের খেলোয়াড়রা দেশের জাতীয় সম্মান বাড়িয় আসবেন। একে দুরাশা ছাড়া আর কি বা বলা যেতে পারে?

কিন্তু এইভাবে চলতে পারে না। চলা উচিতও নয়। ভারতের জাতীয় খেলা হকি আজ বড়ই উপেক্ষিত। বেশী দূরে যাবার দরকার নেই। ঘরের দোরের দিকেই নজর বুলোলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এখন তো কলকাতায় হকির মরশুম চলছে। একবার গড়ের মাঠে গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসুন তার কি হাল!

আসলে হকি খেলা তার জনপ্রিয়তা দিন দিন হারাচ্ছে। দু একটি রাজ্য ছাড়া আর কোথাও হকি নিয়ে মাতামাতি হয় না। অথচ হকি খেলার উন্নতি করতে হলে তাকে যে সর্বজন প্রিয় করে তুলতেই হবে। স্কুলে-কলেজে, পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে দিতে হবে এই খেলা। আর তার দায় ও দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্য সরকার ও রাজ্য ক্রীড়া পরিষদগুলিকেই। ছোটদের মধ্যে এই খেলাকে প্রিয় করে তুলতে না পারলে হকি খেলায় ভারত-এর মুখ আর কোনদিনই উজ্জ্বল হবে না।

আন্তর্জাতিক হকির আসর থেকে আমরা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছি। এরপর এমন দিন হয়তো আসবে যখন আমাদের আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। সুতরাং যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা এখনই নিতে হবে। তা যদি নেওয়া না হয় তাহলে ভারতকে যেমন আন্তর্জাতিক হকির আসর থেকে সরে আসতে হবে তেমনি ভারতীয় হকি এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছুবে যেখান থেকে কোনদিনই উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হবে না।

তখন হয়তো আমরা লিখবো, এমন একটা সময় ছিল যখন ভারত দারুণ হকি খেলতো। আর অলিম্পিকের কাহিনী বলতে গিয়ে বছরের পর বছর ভারতের স্বর্ণপদক জয়ের কথা ছোটদের শোনাবো।

এইভাবে যদি হকি খেলাকে উপেক্ষা করে চলা হয় তাহলে বলতে বাধা নেই যে, খুব শীঘ্রই হকি জগতে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কথা, ভারতের হকি খেলার কথা ইতিহাসের পাতায় স্থান নেবে।

ফুটবলে যেমন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে আমাদের কোন স্থানই নেই। দেখতে দেখতে হকিও গিয়ে পৌঁছবে সেইখানেই।

হকি খেলাকে এখনকার এই শোচনীয় অবস্থা থেকে টেনে তোলার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে সরকারকে। সরকারের কড়া নজর ছাড়া এখনকার এই পঙ্কিল পরিস্থিতি থেকে ভারতীয় হকিকে উদ্ধার করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

একটা দেশ কতোটা এগিয়েছে তার প্রমাণ কিছুটা পাওয়া যায় খেলার মাঠে। দুই জার্মানীর মত ছোট দেশ কিম্বা ফিনল্যান্ডের মতো আরো ছোট দেশ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে কতো কি করছে। বিশ্ব ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় একটির পর একটি স্বর্ণপদক ঘরে তুলছে।

তার পাশে আমাদের এই বিশাল দেশের অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। বিশ্ব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কিম্বা অলিম্পিকের আসরের পদক তালিকায় আজকাল আর ভারতের নামই উঠছে না। এতোদিন হকি খেলাই ভারতকে অন্তত একটা পদক এনে দিতো। এখন সেই সবেধন নীলমণিটিও আমাদের হাতছাড়া হয়েছে।

তবু সেদিকে ঠিক তেমনভাবে নজর দেবার প্রয়োজন বোধ করছেন না কেউ। এর থেকে লজ্জা, এর থেকে দুঃখ, এর থেকে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে?

মনজিতের সামনে লড়াই

এই সেদিন পর্যন্ত পাঞ্জাবের ফুটবল বলতেই যে কটি নাম মনের পর্দায় ভেসে উঠত সেগুলি হল—জার্নাল সিং, ইন্দার সিং, মনজিত সিং। জার্নাল অবশ্য যতটা না পাঞ্জাবের তার চেয়েও বেশী বাংলার কারন জীবনের সোনালী সময়টুকু জার্নাল কাটিয়েছেন এই কলকাতার খেলার মাঠে। ইন্দার এবং মনজিত ভারতীয় ফুটবলের মানচিত্রে পাঞ্জাবকে একটি মর্যাদার জায়গায় পৌঁছে দিতে বিগত একটি দশক ধরে অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছেন এবং পাঞ্জাব যে আজ একটি সমীহ জাগান নাম হয়েছে তার জন্য এই দুই ফুটবল যোদ্ধা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অনেক ঘাম ঝরিয়েছেন। ইন্দার এখনও ফুটবলে পাঞ্জাবকেশরী মনজিত পরিণত বয়সে আনুগত্য বদল করেছেন। আন্তঃ রাজ্য ছাড়পত্রে সই করে মনজিত এখন বাংলার, ইতিমধ্যেই লাল-হলুদ জার্সি গায়ে দিয়ে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মনজিত।

বছর খানেক কিংবা দেড়েক আগে ভারতের সবকটি সংবাদপত্রেই একটি ছোট খবর বেরিয়েছিল যে মনজিত সিং অবসর নিচ্ছেন। হয়ত বিক্ষিপ্তভাবে সেই সময় অবসর নেবার কথা ভেবেছিলেন মনজিত কিন্তু চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেননি। তাই ইস্টবেঙ্গল থেকে ডাক আসতেই তিনি এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। কলকাতায় খেলার স্বপ্ন মনজিতের অনেক দিনই। মোহন-বাগান ক্লাবের সঙ্গে একবার কথাবার্তা পাকাও হয়ে গিয়েছিল কিন্তু নানা কারণে আসা হয়নি। তাই এবার কলকাতায় আসার আমন্ত্রণটি তিনি লুফে নিয়েছেন। 'মনজিত ফুরিয়ে গেছেন' বলে ইদানিং একটা রব উঠেছিল, তার জবাব দেবার জন্যই বর্ষীয়ান মনজিত আবার নতুন উদ্যমে অনুশীলনে মেতেছেন। যে কোন দিন সকালে ইস্টবেঙ্গল মাঠে দীর্ঘকায় এই ফুটবলারকে তরুণদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্র্যাকটিস করতে দেখা যায়। স্প্রিন্ট ছোটেন মনজিত এখনও অবলীলায়: মনজিত জানেন যে পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। তাই প্র্যাকটিসেও তাঁর ঘাটতি নেই। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এবার অনেক নামী ফুটবলারের ভিড়, এ'দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দলে আসতে হবে জেনেই মনজিত লড়ছেন। প্রয়োজনে স্ট্রাইকারের অভ্যস্ত জায়গা থেকে লিংকম্যানে নেমে আসতে মনজিতের কোন আপত্তি নেই। আগাগোড়া যিনি পরিকল্পনা সমৃদ্ধ ফুটবল খেলেছেন তাঁর আপত্তি থাকবেই বা কেন? হোসিয়ারপুর জেলার - মহালপুরের ছেলে মনজিত। মহালপুরের মাঠে ফুটবল খেলা হত, ছোটবেলা থেকেই মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে খেলা দেখত কিশোর মনজিত। এরকম ভাবেই ফুটবলের সঙ্গে মনজিতের ভালবাসা। স্কুল জীবনেই ফুটবল খেলতে শুরু করেন মনজিত। ফুটবল খেলতেন তখন নিছক আনন্দের জন্য. ফুটবল নিয়ে তখনও গভীর কোন চিন্তার জালে জড়ান নি মনজিত। জলন্ধরের স্পোর্টস কলেজে এসে ফুটবল নিয়ে পুরোপুরি মাতলেন তিনি। এক যুগ আগে, ১৯৬৭ সালে প্রথম বড় প্রতিযোগিতায় খেললেন মনজিত, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের সেই আসরে ফাইনালে মনজিতের দল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে একগোলে হারাল কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়। পাঞ্জাব হারল, কিন্তু ফুটবল জহুরীদের চোখ একটি সাচ্চা রত্নকে আবিষ্কার করল, নাম যার মনজিত সিং। ১৯৬৯ সালে মনজিত যোগ দিলেন বহুখ্যাত লিডার্স ক্লাবে। ১৯৭০-এ জাতীয় ফুটবলে পাঞ্জাব দলে ঠাঁই পেলেন মনজিত। জলন্ধরের সমালোচকদের স্বীকৃতি পেলেন। ব্যাঙ্কক এশীয় ক্রীড়ায় ভারতীয় দলের জার্সি পরলেন মনজিত। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ধারণের খেলায় ভারত জাপানকে মনজিতের দেওয়া গোলে হারাল। ব্রোঞ্জ জিতল ভারত। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতের সেই শেষ পদক জয়।

মনজিতকে এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৭০-৭৭ প্রায় সবকটি ভারতীয় দলেই পাঞ্জাবের এই দুর্দান্ত স্ট্রাইকারের জায়গা বাঁধা ছিল। ১৯৭৬ সালে মারডেকা ফুটবলে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন মনজিত। কলকাতাতেও কয়েকটি ম্যাচ খেলেছেন মনজিত। কলকাতায় তাঁর শেষ খেলা কুকটাউন দলের বিরুদ্ধে ম্যাচটিতে। সেদিন মাঠে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন ভুলতে পেরেছেন কি মনজিতের বুদ্ধিদীপ্ত সেই আক্রমণগুলির কথা?

মনজিত জীবনে অনেক ম্যাচ খেলেছেন, খেলেছেন বহু আন্তর্জাতিক ম্যাচ, তাঁর মধ্যে যে ম্যাচটি তিনি কোন দিন ভুলবেন না সেটা হল ১৯৭২ সালে বার্মার বিরুদ্ধে প্রি-ওলিম্পিক ম্যাচটি। বিরতির সময় ০-৩ গোলে পিছিয়ে থেকে ভারত বিরতির পর দারুণ খেলে ফল ৩-৩ করল। কিন্তু বার্মা ম্যাচ জিতল আকস্মিক করা একটি গোলে। সাত বছর আগের সেই ম্যাচটির কথা বলতে গিয়ে মনজিত এখনও উচ্ছ্বসিত হন।

মাঠের বাইরে মনজিত কেমন মানুষ? সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ওয়াই এম সি এতে হরজিন্দার সিং-এর সঙ্গে একই রুমে আছেন মনজিত! দুজনের ঘোরাফেরা সব একসঙ্গে! হরজিন্দারের ভাষায় মনজিত ও'র 'ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড'। পাঞ্জাবের এই দুই ফুটবলারই এখন ভাল খেলার স্বপ্ন দেখছেন. ও'রা জানেন ভাল খেলেই কলকাতার মানুষের মন জয় করা যায়।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

খেলা

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা

পার্থে ইসানডা বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাকিস্তান ৪—২ গোলে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে তার বিশ্ব হকি চ্যাম্পিয়ান খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রথমার্ধের ১৭ মিনিটে অস্ট্রেলিয়া গোল দিয়ে ১—০ গোলে এগিয়ে যায়। পাকিস্তান ২৭ মিনিটের মাথায় গোলটি শোধ দেয়। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে পাকিস্তান তাদের দ্বিতীয় গোল করে এবং বিশ্রাম সময়ে তারা ২—১ গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে অস্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় গোল দিয়ে খেলার ফলাফল সমান ২—২ করে। এর পর খেলায় একাধিপত্য বিস্তার করে পাকিস্তান এবং আরও দুটি গোল দিয়ে জয়লাভের গৌরব লাভ করে।

সেমি-ফাইনালে পাকিস্তান ৫—২ গোলে নেদারল্যান্ডস এবং অস্ট্রেলিয়া ৩—২ গোলে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। নেদারল্যান্ডস ৬—৫ গোলে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান এবং ভারত ৫—২ গোলে ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ৫ম স্থান লাভ করে।

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত স্থান নির্ধারণ এইভাবে হয়েছে : ১ম পাকিস্তান, ২য় অস্ট্রেলিয়া, ৩য় নেদারল্যান্ড, ৪র্থ ইংল্যান্ড, ৫ম ভারত, ৬ষ্ঠ নিউজিল্যান্ড, ৭ম কানাডা, ৮ম কেনিয়া, ৯ম মালয়েশিয়া এবং ১০ম ফ্রান্স।

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের 'এ' গ্রুপের খেলায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া (৮পয়েন্ট) এবং রানার্স-আপ নেদারল্যান্ডস (৬ পয়েন্ট)। অপরদিকে 'বি' গ্রুপের খেলায় চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হয়েছিল যথাক্রমে পাকিস্তান (৮ পয়েন্ট) এবং ইংল্যান্ড (৬ পয়েন্ট)। লীগের খেলায় অপরাজিত ছিল 'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়া এবং 'বি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান পাকিস্তান। 'এ' গ্রুপের রানার্স-আপ নেদারল্যান্ডস এবং 'বি' গ্রুপের রানার্স-আপ ইংল্যান্ড নিজ নিজ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দলের কাছে একটা করে খেলায় হেরেছিল। লীগের খেলায় সর্বাধিক গোল দেয় পাকিস্তান—২৪টি এবং সব থেকে কম গোল করে মালয়েশিয়া—মাত্র দুটি। সব থেকে কম গোল খেয়েছে পাকিস্তান—৪টি এবং বেশী গোল খেয়েছে কেনিয়া—২২টি।

প্রতিযোগিতায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক হকির স্বর্ণপদক বিজয়ী নিউজিল্যান্ড। 'বি' গ্রুপের চারটে খেলায় তারা ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তৃতীয় স্থান লাভ করে। নিউজিল্যান্ড তাদের প্রথম খেলাতেই অপ্রত্যাশিতভাবে ০—২ গোলে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যায়। দ্বিতীয় খেলায় মালয়েশিয়াকে ৩—১ এবং তৃতীয় খেলায় কেনিয়াকে ৮—২ গোলে হারিয়ে শেষ চতুর্থ খেলায় পাকিস্তানের কাছে ১—৫ গোলে পুনরায় হার স্বীকার করে। লীগের চারটে খেলায় নিউজিল্যান্ড ১২টা গোল দিয়ে ১০টা গোল খায়। পাকিস্তানের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড প্রথম গোল দিয়ে ১—০ গোলে এগিয়ে যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পাকিস্তান গোল শোধ করে দেয় (১—১)। এখানে উল্লেখ্য, লীগের খেলায় পাকিস্তান প্রথমেই গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে এই প্রথম। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের পাঁচটা গোলই ছিল ফিল্ড গোল।

অস্ট্রেলিয়া বনাম নেদারল্যান্ডসের খেলায় অস্ট্রেলিয়া চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত ০—২ গোলে পিছিয়ে ছিল। অস্ট্রেলিয়ার ফুলব্যাক ক্লিন আরভিন খেলার ৪০ ও ৪২ মিনিটে যথাক্রমে সর্ট কর্ণার এবং লং কর্ণার থেকে গোল করে খেলার ফলাফল সমান ২—২ করেন। খেলার ৫৪ মিনিটে আরভিন পুনরায় সর্ট কর্ণার থেকে গোল দিয়ে হ্যাট-ট্রিক করেন এবং স্বদেশকে ৩—২ গোলে এগিয়ে দেন। এরপর সর্ট কর্ণার থেকে নেদারল্যান্ডস গোল দিলে খেলার ফলাফল সমান ৩—৩ দাঁড়ায়। খেলা ভাঙ্গার মাত্র দুমিনিট আগে বদলী খেলোয়াড় লেফট-উইংগার স্টেভ স্মিথ দলের জয়সূচক চতুর্থ গোলটি করেন।

ভারতের খেলা

ভারত 'এ' গ্রুপের লীগের খেলায় ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। প্রথম স্থান পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া (৮ পয়েন্ট) এবং দ্বিতীয় স্থান নেদারল্যান্ডস (৬ পয়েন্ট)। ভারত তার প্রথম খেলায় নেদারল্যান্ডসের কাছে ৩—৬ গোলে এবং দ্বিতীয় খেলায় অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২—৩ গোলে হেরে যায়। ভারত তৃতীয় খেলায় ৪-২ গোলে ফ্রান্সকে এবং শেষ চতুর্থ খেলায় ৭-৩ গোলে কানাডাকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালের বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতায় এই কানাডার কাছেই ভারত ২—৩ গোলে হেরেছিল। লীগের খেলায় ভারত ১৬টা গোল দিয়ে ১৪টা গোল খায়।

প্রতিযোগিতায় ৫ম এবং ৬ষ্ঠ স্থান নির্ধারণের জন্য ভারতকে এখন খেলতে হবে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে। ভারত ৪—১ গোলে 'বি' গ্রুপের ৪র্থ স্থান অধিকারী কেনিয়াকে এবং নিউজিল্যান্ড ৫—৪ গোলে 'এ' গ্রুপের ৪র্থ স্থান অধিকারী কানাডাকে হারিয়ে ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্থান নির্ধারণের খেলায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেছে।

চূড়ান্ত লীগ তালিকা

গ্রুপ 'এ'

	জয়	ড্র	হার	স্ব	বি	প
অস্ট্রেলিয়া	৪	০	০	১৫	৭	৮
নেদারল্যান্ডস	৩	০	১	২০	১১	৬
ভারত	২	০	২	১৬	১৪	৪
কানাডা	১	০	৩	৭	১৭	২
ফ্রান্স	০	০	৪	৫	১৪	০

গ্রুপ 'বি'

	জয়	ড্র	হার	স্ব	বি	প
পাকিস্তান	৪	০	০	২৪	৪	৮
ইংল্যান্ড	৩	০	১	১৭	৬	৬
নিউজিল্যান্ড	২	০	২	১২	১০	৪
কেনিয়া	১	০	৩	৪	২২	২
মালয়েশিয়া	০	০	৪	২	১৭	০

অস্ট্রেলিয়া ৫—০ গোলে কানাডা, ৩—২ গোলে ভারত, ৩—২ গোলে ফ্রান্স এবং ৪—৩ গোলে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে 'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

পাকিস্তান ৯—০ গোলে মালয়েশিয়া, ৫—৩ গোলে ইংল্যান্ড, ৫—০ গোলে কেনিয়া এবং ৫—১ গোলে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে 'বি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

নেদারল্যান্ডস ৬—৩ গোলে ভারত, ৫—২ গোলে কানাডা এবং ৭—২ গোলে ফ্রান্সকে পরাজিত করে এবং শেষ ৪র্থ খেলায় ৩—৪ গোলে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে 'এ' গ্রুপের রানার্স-আপ হয়।

ইংল্যান্ড ২—০ গোলে নিউজিল্যান্ড, ৩—১ গোলে মালয়েশিয়া এবং ৯—০ গোলে কেনিয়াকে পরাজিত করে এবং ৩—৫ গোলে পাকিস্তানের কাছে হেরে 'বি' গ্রুপের রানার্স-আপ হয়।

আন্তঃ জেলা মহিলা ক্রিকেট

নদীয়ার বাগুলা নেতাজী ক্লাব মাঠে ২৪ পরগণা ১০ উইকেটে নদীয়াকে হারিয়ে উপর্যুপরি দুবার আন্তঃ জেলা মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

দর্শক

দৌড় বলিষ্ঠ ছবি— কিন্তু...

শ্রীযুক্ত শঙ্কর ভট্টাচার্য
সমীপেষু

আপনার প্রথম ছবি 'শেসরক্ষা' আমার ভালো লেগেছিল। সে ছবি নিয়ে কিছু লিখে উঠতে পারিনি তখন। তা নিয়ে আপনার অনুযোগ ছিল, আমারও কিছুটা আক্ষেপ ছিল। 'শেষরক্ষা' আমার ভালো লেগেছিল ওটি আপনার প্রথম পরিচালনা, সেটা স্মরণ রেখেই। আপনার দ্বিতীয় ছবি 'দৌড়' আমাকে মুগ্ধ করেছে, এবং বিস্মিতও করেছে। একটা সুস্থ সবল ছবি আপনি করেছেন, এজন্য প্রচুর ধন্যবাদ আপনার প্রাপ্য। সত্যি কথা বলতে কি, সারা বছরে তোলা তিরিশ কি পঁয়ত্রিশটি ছবির মধ্যে মাত্র দু-একটি ছাড়া আর বাকি সবগুলিই ক্লান্তিকর, বিরক্তিকর এবং হতাশাব্যঞ্জক। 'দৌড়' দেখে বেশ কিছুদিন পরে তৃপ্তি পেলাম, দমবন্ধ পরিবেশ থেকে কিছুটা মুক্তি পেলাম। এ-ছবির বক্তব্য এবং নির্মাণ-কৌশল উভয়তই কিছু বৈচিত্র্য আছে। আমার মত অনেককেই 'দৌড়' ভাবাবে এবং কিছুটা উল্লসিতও করবে। বাংলা ছবির জগতে একটা মর্যাদার আসন আপনার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে রইল। এটা আপনার গৌরব, আমাদের আনন্দ।

সমরেশ মজুমদারের 'দৌড়' উপন্যাসটি কর্মসূত্রে আমাকে একাধিকবার পড়তে হয়েছে। নিছক পড়া নয়, কিছুটা গভীরে প্রবেশ করতেও হয়েছে। ছবি করতে গিয়ে আপনি উপন্যাসের কয়েকটি ঘটনা এবং চরিত্রের নামগুলি ছাড়া আর কিছুই নেননি। সমরেশের উপন্যাসের বক্তব্য এবং আপনার ছবির বক্তব্যে একচুল মিল নেই। একেবারে আলাদা। উপন্যাসের নায়ক রাকেশ আধুনিক শহর-জীবনের উদ্দেশ্যহীন মূল্যবোধহীন ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতার ফসল। সে উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া, সুবিধাবাদী। জীবনটাকে নিয়ে তাই সে জুয়া খেলায় মেতেছিল। তার সামনে একমাত্র শ্রদ্ধেয় বস্তু ছিল তার প্রেম। তার শুভবোধের একমাত্র প্রতীক ছিল তার প্রেমিকা নীরা। উপন্যাসের নায়ক তাই সমকালীন যন্ত্রণাবিদ্ধ মানসতার প্রতীক।

শঙ্করবাবু, আপনার ছবির নায়ককে [illegible] সম্পূর্ণ বিপরীত সুরে এনে দাঁড় করিয়েছেন যে নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের অতি সাধারণ চাকুরীলোভী ভীরু প্রকৃতির যুবক। রাজনীতি তাকে আকৃষ্ট করে না, রাজপথের মিছিল তাকে উদ্বেলিত করে না, আধুনিক জীবনযন্ত্রণার কিছুই তাকে স্পর্শ করে না। এমন একটি মানুষের নাম যদি রাকেশ হয় তাহলে আমাদের ভাবনা প্রথমেই একটা হোঁচট খায়। নায়কের নামটি আপনি অনায়াসে বদলে দিতে পারতেন। [illegible] ড়ির চেহারা কিংবা মানসিকতা যা দেখিয়েছেন তাতে ওই জাতীয় নামকরণ কল্পনা করতে একটু অসুবিধে হয়। সান্ত্বনার জন্যে অতএব শেকসপীয়রকে স্মরণ করাই ভালো : নামে কি আসে যায়।

আপনার ছবির রাকেশ ভীরু ও দুর্বল। কবে থেকে? কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় সে উন্মুক্ত ছাদে দাঁড়িয়ে রিয়ার ছুঁড়ে দেওয়া চিঠি অবলীলায় খুলে পড়তে পারে, একটু গোপনতার আশ্রয় নেবার কথাও চিন্তা করে না, কিংবা ওই ব্যাপারটা তার হৃদয়স্পন্দন একবারও দ্রুততর করে না। রেস্তোরাঁর কেবিনে আপনার রাকেশ অনায়াসে রিয়ার মুখে মুখ রাখতে পারে। তার চোখের জলে বুক ভিজিয়ে দেবার জন্যে অনায়াসে বুকটা এগিয়ে দিতে পারে। ভালবাসা গভীর সন্দেহ নেই। আবার আপনার রাকেশ 'বিয়ে না করলে কি হয়' এই প্রশ্নও রিয়ার সামনে রাখতে পারে। অসবর্ণ বিবাহে ওর মা আপত্তি জানাবেন—এ প্রশ্নও তুলতে পারে। আপনার রাকেশ যথেষ্ট চতুর সন্দেহ নেই। রিয়ার প্রত্যাখ্যানের পর নীরার মত একটি মেয়ের ভালোবাসা যোগাড় করে ফেলতে পারে। দীঘার সমুদ্রতটে তার রবীন্দ্র-সংগীতের সহযোগী হিসেবে নেচে নেচে তুলকালাম করতে পারে। আপনার রাকেশ করিতকর্মা সন্দেহ নেই। সেই রাকেশ যখন হুল ফাইডে টেমপোরারি চাকরিটি হারিয়ে চোখের জল ফেলে, একটা সিগারেট ধরাতে তিন-তিনটি দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করে, তখন সব ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমেলে মনে হয়। আপনার রাকেশ রাজনীতি পছন্দ করে না, গণ-ডেপুটেশনে সামিল হতে চায় না। উচিত কথা, আজকের অনেক যুবকই এই সব ব্যাপার পরিহার করে চলে। তাহলে আপনার রাকেশ সুহাস চ্যাটার্জির মস্তান প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত ছিল কি হিসেবে? ও যে সাহিত্য করত, এবং যে কারণে একদা কমরেড সুহাস চ্যাটার্জির স্নেহধন্য ছিল এটা তো তার সংলাপেই পরিষ্কার। সুহাসের আদর্শবাদী চরিত্র এবং মিছিল পরিচালনা ইত্যাদি যে রাকেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত সেটাও তো পরিস্ফুট। অতএব রাকেশ রাজনীতির সংস্পর্শ-বিবর্জিত মানুষ এটা স্বীকার করি কি করে?

সমরেশ মজুমদারের রাকেশ এগুলি করলে বিস্মিত হতাম না। কিন্তু আপনি যে আপনার রাকেশকে গোড়া থেকেই অন্য সুরে বেঁধেছেন। সুতরাং ব্যাপারগুলো বেসুরো লাগছে। কিন্তু সুহাস চ্যাটার্জির ব্যাপারে আপনার সুর ঠিক আছে। একদা সে সক্রিয় রাজনীতি করত, মিছিল পরিচালনা করত, সর্বহারার মুক্তি সংগ্রামের সে ছিল শরিক। এখন সে জনসেবা করে এয়ার-কন্ডিশন ঘরে বসে। তার মিছিল এখন শেষ হয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে। তার কবিতা এখন মদের টেবিলে হুইস্কিকে কেন্দ্র করে রচিত। তাই সে যখন তার পোলিটিক্যাল দাদাদের উল্লেখ করে বলে : সব শালাই সুবিধাবাদী, ভণ্ড। মুখে মার্কসের বুলি, গায়ে কমিউনিজমের নামাবলী, আর ভেতরে ভেতরে এসটাবলিশমেন্টের সঙ্গে আঁতাত— তখন এই চরিত্রটি আমাদের কাছে পরিষ্কার বেরিয়ে আসে। অবিশ্বাস্য মনে হয় না, কারণ, শহরের রাজপথে সাদা অথবা কালো অ্যামবাসাডর বাহিত এমন চরিত্রের মিছিল আমরা প্রতিনিয়তই দেখি!

আপনার রিয়া যে সমাজের মেয়ে তার একটু পরিচয় ছবিতে রাখলে পারতেন। রিয়ার মুখ থেকে শোনা যায় তার বাবার মৃত্যুর পর তাদের বাড়িতে বিভিন্ন বয়সের প্রেমিক নিয়ে তার মা মশগুল। সেই পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতেই সে রাকেশের উপর নির্ভর করেছে। রাকেশের প্রত্যাখ্যান তাকে কেমন করে, কোন্ মানসিকতার খাতিরে, তার মায়ের এক তরুণ প্রেমিককে পতি এবং এক প্রৌঢ় প্রেমিককে উপপতি রূপে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করে তার বিশ্লেষণ আবশ্যক ছিল। পরিবেশ থেকে মুক্তিই যদি তার কাম্য ছিল তাহলে [illegible]

মনে বাংলাদেশে কি রাকেশ মিত্র ছাড়া আর কোন যুবকের সন্ধান পাওয়া যায়নি? তবে কি অভিমান? তাই বা বলি কি করে? তাহলে তো তাদের পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে রায়ের সঙ্গে রাকেশকে দেখে তার অন্য প্রতিক্রিয়া হতো। বটতলার উপন্যাসের নায়িকার মত কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে ন্যাকা ন্যাকা সংলাপগুলি বলতে শোনা যেত না পায়ের উপর দাঁড়িয়ে। এছাড়া ওর মায়ের মা চরিত্র তেমন চরিত্রের সন্ধান আমরা, মধ্যবিত্ত মানুষেরা, কেবল গল্প-উপন্যাসেই পাই। ছবির মধ্যে ওই চরিত্র চাক্ষুষ করতে পারলে মন্দ লাগত না। আফটার অল দৌড় একটা সমাজ-সচেতন ছবি তো! সমাজের বিভিন্ন চেহারা দেখে রাখা আমাদের আবশ্যক ছিল।

শঙ্করবাবু, আপনার নীরার চরিত্র সম্পর্কেও আমার কিছু জানবার আছে। আপনার নীরা এককালে ইউনিভার্সিটিতে রাকেশের সহপাঠিনী ছিল। এখন সে চলচ্ছক্তিহীন, ইনভ্যালিড চেয়ারে তার ঘোরাফেরা। সে শুদ্ধ, সুন্দর, পবিত্র। সে হো-চি-মিনের কবিতার বই পড়ে। রাকেশকে সে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে কেন? রাকেশ তো রাজনীতি পছন্দ করে না। সংগ্রামের কোন ধার ধারে না। তবে? তাহলে কি তার হাতের হো-চি-মিনের কবিতার বই নিছক একটা স্টান্ট? সময়ের সঙ্গে তাল রাখা? তাছাড়া রাকেশের টেলিফোন ছেড়ে দেবার আকস্মিকতায় এমন আকুল হয়ে পড়া ওই চরিত্রের গভীরতার সঙ্গে কেমন যেন বেমানান। ওই টেলিফোনকে কেন্দ্র করে তার জীবনে দু-দুটো বড় ঘটনা ঘটে যাওয়া যেন সাজানো ঘটনার মত মনে হয়। তাছাড়া রাকেশ যখনই নীরার সঙ্গে কথা বলে তখনই মনে হয় সে যেন পাপবোধে পীড়িত একটি মানুষ। উপন্যাসের রাকেশ হলে এটা মানাতো। কিন্তু ছবির রাকেশ তো কোন পাপ করেনি। সে পর্দায় যুবকে ড্রিঙ্ক রিফিউজ করেছে অন্তত বার ছয়েক, আর জিনার দেহ প্রত্যাখ্যান করেছে অন্তত তিনবার। তাহলে?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শঙ্করবাবু, আপনি উপন্যাসের রাকেশকে গ্রহণ করতে যেমন পারেননি, তেমনি সম্পূর্ণ বর্জন করতেও পারেননি। আপনি উপন্যাসের বাইরে বার বার যেতে চেয়েছেন, আবার বার বার ঘুরে-ফিরে সেখানেই এসেছেন। আপনার চিত্রনাট্যের এটাই একটা বড় দুর্বলতা।

জিনা তো একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান দেহ-পসারিণী।

জিনা সম্পর্কেও আমার কিছু প্রশ্ন আছে? রাকেশকে তার ভালো লেগেছিল কেন? নিশ্চয় তার নিষ্পাপ সরলতা? তা হলে তাকে ডিনারে ডেকে দেহের মাদকতা বিছিয়ে ছড়ানো কেন? রেসের ঘোড়ার টিপসের লোভে? সেটা তো কিছু বিনিময় না করেই অন্তত দুবার পেয়েছে। একটু অনুরোধ করলেই আরও বার কয়েক পাওয়া যেতে পারত। তাহলে রেকর্ড-প্লেয়ারে ওই গানটির তাৎপর্য কি—অল আই ওয়ান্ট ইজ মানি মানি মানি? তবে কি ধরে নিতে হবে জিনার মনে একটি শুদ্ধতা জন্ম নিয়েছে রাকেশের দেহ-প্রত্যাখ্যানকে কেন্দ্র করে। তাই যদি হয় তবে মিস্টার রায়কে তার দরজার সামনে থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার রাকেশের প্রতি সে ক্রুদ্ধ কেন? তার রেপুটেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ কেন? আবার যিশুর ছবির সামনে, রাকেশকে প্রায় ক্রাইস্টের প্রতীক হিসেবে দাঁড় করিয়ে এত কনফেশনের ধুমই বা কেন? আর শেষের কান্নাটির সময় জিনা তো বটতলার উপন্যাসের নায়িকাকেও হার মানায়।

তবে আপনার চিত্রনাট্যে মিস্টার রায়ের চরিত্রটি বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। জলের মত প্রাঞ্জল। সে একজন আউট অ্যান্ড আউট ব্যাডম্যান। সমাজের টপ ইনফ্লুয়েন-শ্যালদের একজন। অবৈধ উপায়ে রোজগার করা টাকায় দু-তিনটি উপপত্নী রাখে। জিনার মত মেয়েদের দেখলে পুনরায় উত্তেজনা বোধ করে। রাকেশের মত ছেলেদের বিপদের সুযোগ নিয়ে তাদের টাউট বানাতে চায়। এই জাতীয় চরিত্রের কোন শুভ বোধ থাকে না. ভাল দিক থাকে না, অন্তত আমাদের সিনেমায় থাকতে নেই। একে যে জিনার দরজার সামনে রাকেশ কলার চেপে ধরেছে, হাতের ফুল ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, শুয়োরের বাচ্চা বলেছে—ঠিকই করেছে। দর্শকরাও করতালি দিয়ে এব্যাপারটা সমর্থন করেছে। কিন্তু রাকেশ যে কারণে ওকে অভিযুক্ত করেছে সেটা কি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত? রাকেশের এক নম্বর অভিযোগ, রায় রিয়াকে রক্ষিতা রেখেছে। দু নম্বর অভিযোগ, জিনার খারাপ অসুখ আছে, রায় সেটা বহন করে নিয়ে গিয়ে রিয়ার জীবন নষ্ট করে দেবে। তিন নম্বর অভিযোগ রায় যদি মেট্রোর সামনে থেকে চলে যেতে না চাইতো তাহলে রাকেশকে টেলিফোন ফেলে ছুটে আসতে হতো না এবং নীরারও কোন দুর্ঘটনা ঘটতো না। তা এই সব অভিযোগে রায় কি একাই অপরাধী? রিয়া ও তার স্বামী কি খোকা-খুকু, না রিয়াকে রক্ষিতা রাখার সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজন রায়ের একতরফা সিদ্ধান্ত? দেহজীবিনী জিনার যে খারাপ রোগ আছে সেটা কি রায়ের কৃতকর্মের ফল? রায়কে দেখে রাকেশ যদি নীরার ফোন ফেলে ছুটে আসে তবে রায় দায়ী হবে কেন? রাকেশ কি নীরাকে 'আচ্ছা ফোনটা এখন রাখছি' বলে আসতে পারত না, অথচ ফোনের চার্জটা তো পকেট থেকে বার করে দিয়ে আসবার সময় পেয়েছিল! রায়ের মত লোকদের সমাজ দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু রাকেশ কেন?

শঙ্করবাবু, [illegible]

কিছু প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে। সেগুলি সবিনয়ে নিবেদন করলাম। কারণ, আপনার প্রতি আমার অনেক ভরসা। আপনার দৌড় এই সবে শুরু। সামনে অনেক পথ। আপনার শুভানুধ্যায়ী হিসেবে এই প্রশ্নগুলি করবার অধিকার আমার আছে বলেই মনে করি।

'দৌড়' দেখে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার পরিমাণও কম নয়। এমন বহু সাহসী সংলাপ আপনার ছবিতে আছে যা এমন সরাসরি, এমন তীব্রভাবে উত্থাপন করার সাহসই করবে না অনেকে। রুল ফাইভে চাকরি যাবার পর রাকেশ যখন সরকারী অফিসের অশোক-স্তম্ভ লাঞ্ছিত দেওয়ালে 'সত্যমেব জয়তে' কথা কটির দিকে তাকিয়ে দেখে তখন ওই বাক্যটি স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা বহন করে। রুল ফাইভে শব্দটির সঙ্গে কতকগুলি কাটা কাটা ভয়ার্ত অসহায় মুখ আর বসে থাকা রাকেশকে নেগেটিভ করিয়ে দেওয়া ওই মুহূর্তের একটি যথাযথ ব্যঞ্জনা। ক্রুদ্ধ রায়ের পুলিশকে টেলি-ফোন করার দৃশ্যে তার মুখটিকে রাগী কুকুরের মত দেখানোতেও আপনার চিন্তার বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত। আর ১৫ই আগস্টের সকালটি তো ভোলার নয়। ছবির মধ্যে স্বাধীনতা দিবস আর কখনো আমার কাছে এমন তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়নি।

আপনার ছবির শেষ মুহূর্তের চমকটিও অসাধারণ। রাকেশের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ছবিটার উত্তরণ আপনি ঘটিয়েছেন ওই একটি মুহূর্তে। বস্তুত নেতাজীনগর কলোনীতে আসল রাকেশের বাড়িতে যাওয়া, তার মায়ের দুরন্ত স্নেহময়তা এবং পরম বিশ্বাসই রাকে[illegible] মনের বিশ্বাসহীনতার মূলোচ্ছেদ করেছে। সে একটা পরিপূর্ণ সচেতন মানুষ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন। পুলিশ যদি এই রাকেশকেই নকশালাইট মনে করে থাকে তবে তাকে গ্রেপ্তার করল না কেন? কিছু কিছু ব্যাপারে এমনি তালগোল পাকিয়ে গেলেও দৌড় যে একটি উৎকৃষ্ট শিল্পপ্রয়াস তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ছবি দেখে মন স্নিগ্ধ হয়, পবিত্র হয়, জীবনের একটা অন্য মানে খুঁজে পাওয়া যায়।

ছবির অভিনয়ের দিকটি খুবই জোরালো। রাকেশের চরিত্রে প্রদীপ মুখার্জী খুবই ভালো অভিনয় করেছেন। এ ছবি তাঁকে অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবে। [illegible]

ভট্টাচার্যের ছবিতে প্রদীপ ভাল অভিনয় করেছেন এটা আমার কাছে বড়ো বিস্ময়। মনের স্পন্দন এবং যন্ত্রণা তিনি অপূর্ব দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন। ও'র মনের ঝড় বোঝাতে আবহে ঝড়ের শব্দ বাহুল্য এবং হাস্যকর মনে হয়েছে।' অনিল চ্যাটার্জি'র সুহাসদা প্রায় নিখুঁত। একমাত্র অভিযোগ ও'র শব্দোচ্চারণের বিশেষ একটি ঝোঁক নিয়ে যা কিছুতেই ও'কে অন্য ছবি থেকে আলাদা হতে ভাবতে দেয় না। এতবড় একজন শক্তিমান শিল্পীর এ সম্পর্কে অবিলম্বে সচেতন হওয়া উচিত। ও'র মুখের গানটি সম্পর্কে একটু অন্যভাবে চিন্তা করলে পারতেন। চরিত্রের কন্ট্রাস্ট বোঝাতে ব্যাপারটা কার্যকরী ব্যঞ্জনাটিও সুন্দর, কিন্তু বাস্তবতার ব্যাপারটা হোঁচট খায়। মহুয়া রায়চৌধুরীর নীরা একটি সুন্দর, শোভন, সংযত চরিত্রসৃষ্টি। এই অভিনেত্রীটি ক্রমশই পরিপূর্ণতার দিকে এগোচ্ছেন। ও'কে নিয়ে এখন বড় কিছু ভাবনা চিন্তা করার সময় এসেছে। রিয়ার চরিত্রে রুবী সেন আরও গভীরে যেতে পারতেন। তাঁর অভিনয়ের ক্ষমতা নেই একথা আমি মনে করি না। ও'র পিছনে আপনার আরও একটু পরিশ্রমের দরকার ছিল। রায়ের চরিত্রে বিকাশ রায়ের কাছে আপনি অতিরিক্ত ব্যাপারই চেয়েছিলেন, তিনি তা দিয়েওছেন: চমৎকার করেছেন নিরঞ্জন রায়। চরিত্রের সংগে আপনি তাঁকে বেমালুম বসিয়ে দিয়েছেন। একবারও মনে হল না এটা তাঁর অভিনয়। বিমল দেবকে দিয়ে আপনি তো হাসাতেই চেয়েছিলেন তাই না? জিনার চরিত্রের জন্যে বম্বের জাহিরাকে আনার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। এখানে আর ওই জাতীয় চরিত্র কে করবেন। সে ফিগার কোথায়? তবে সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন নেতাজীনগর কলোনীতে নকশাল রাকেশের মা। আহা কি বাস্তব, কি প্রাণবন্ত অভিনয়। ও'কে আমার অভিনন্দন জানিয়ে দেবেন দয়া করে। রুমা গুহঠাকুরতার অভিনয়ও খুব ভাল। চরিত্রটিও নিখুঁত বাস্তব। এছাড়া যতীন্দ্রনাথ চন্দ্র, শেখর মজুমদার প্রমুখ শিল্পীরাও ভাল অভিনয় করেছেন।

আপনার ছবিতে সুধীন দাশগুপ্তের সুর যতটা কার্যকরী আবহ কিন্তু ততটা নয়। অরুন্ধতী হোমচৌধুরীর রবীন্দ্র-সংগীতটি তো ভালই, অনিল চ্যাটার্জি'র মুখে পংকজ মিত্রের গাওয়া গানটি সুর ও গাওয়া উভয় দিক থেকেই ভালো। তবে সিনেমার ব্যাপারটি জিনার গলার ইংরিজি গানে আছে। ডবল ভয়েস এখানে দারুণ কার্যকরী।

আপনার ক্যামেরাম্যান ধ্রুবজ্যোতি বসু দারুণ কাজ করেছেন। নীরাদের বাড়ির দৃশ্যটি তিনি কিভাবে নিলেন ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। সারা ছবিতে তাঁর ভালো কাজের নমুনা ছড়িয়ে আছে! গঙ্গাধর নস্করের সম্পাদনাও আপনার ছবিতে একটা বড় ব্যাপার। উনি একটু অসাবধান হলেই কিন্তু অনেক জায়গায় গোলমাল হয়ে যেত। সুনীতি মিত্রের শিল্পনির্দেশনাও উল্লেখ করার মত।

শংকরবাবু, আপনাকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি, জানি। আপনার ডেডিকেশনকে আমি শ্রদ্ধা করি। যখনই যেখানে আপনাকে দেখেছি, সে কি উত্তপ্ত রাজপথে, অথবা শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, কিংবা কোন গানের আসরে—সর্বত্র সর্বক্ষণ আপনার মুখে সিনেমার কথা, আপনার মনে চলচ্চিত্রের চিন্তা। এটাই ডেডিকেশন। আমার এই আলোচনা আপনি সুস্থভাবে গ্রহণ করবেন এটাই আমার বাসনা। আপনার পরবর্তী ছবিতে আরও বলিষ্ঠ চিন্তা ও পরিণত শিল্পকর্মের আশা রাখি। আমার নমস্কার ও অভিনন্দন গ্রহণ করবেন। ইতি—বিনীত

রবি বসু

নাটক ঃ গান

হিন্দী নাটক সাগিনা মাহাতো

যতোদূর মনে করতে পারি, গৌরকিশোর ঘোষের 'সাগিনা মাহাতো' নামক রচনার শেষাবধি সাগিনার মৃত্যুর কথা আমরা পড়েছিলাম। কিন্তু গল্পটি যখন চিত্রায়িত হয়, সম্ভবত আশাবাদী বক্তব্যস্থাপনার প্রয়াসে সাগিনাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিলো। অতঃপর 'সাগিনা মাহাতো'র নাট্যরূপান্তর করেন বাদল সরকার। সেখানেও সাগিনার মৃত্যু ঘটেনি। বলে রাখা ভালো যে হিন্দী 'সাগিনা মাহাতো' বাদল সরকারের নাট্যরূপেরই হিন্দী অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন রামা সরাফ। এর নির্দেশক শিবকুমার ঝুনঝুনওয়ালা। যে-দল নাটকটি অভিনয় করছেন—তার নাম 'সর্জনা'। দল হিসেবে 'সর্জনা' রীতিমতো সংগঠিত।

আগেই বলেছি, 'সর্জনা' রীতিমতো সংগঠিত একটি দল। সে-কারণেই আধুনিকতম প্রয়োগকর্মে এ'রা সফল। মঞ্চকে মোটামুটি তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে: মজুর আড্ডা, পার্টি অফিস এবং মালিক চক্র। এই পরিকল্পনা যথাযথ। মূকাভিনয়ের মাধ্যমে নাটকে দ্রুতি সঞ্চার করা আধুনিক মঞ্চ বিজ্ঞানের একটি অন্যতম লক্ষণ। এ'রাও সেই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং শোভাযাত্রা দৃশ্য উপস্থাপনায় 'মাইম এ্যাকটিং' সত্যিই কার্যকরী হয়েছে। বাহুল্যবর্জিত মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত থেকে মাত্রাবোধের নিদর্শন লক্ষিত হয়েছে। একই সুরের পৌনঃপুনিক প্রয়োগের ভিতর দিয়ে শ্রমিকদের অপরিবর্তিত অবস্থা যে বিশ্বাসযোগ্যভাবে মঞ্চস্থ হতে পেরেছে—পরিচালককে অবশ্যই এ-কারণে অভিনন্দন জানাতে হবে। সর্বোপরি, 'সর্জনা'র অভিনয় বিভাগ বেশ শক্তিশালী। সাগিনারূপী দিলীপ ঘোষের বলিষ্ঠ, চরিত্রানুগ অভিনয়শৈলীর কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে। তাঁর স্বাস্থ্য এবং বাচনভঙ্গিমা সাগিনা মাহাতোর যে ভাবমূর্তি আমাদের মনে পূর্বাবধি রয়েছে, তাকে অনাহত রেখেছে। অনুপম মুখার্জি নামক চক্রান্ত-মগ্ন রাজনৈতিক নেতার চরিত্রে গোবিন্দ ঝুনঝুওয়ালার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিনয়ও আমাদের মনে থাকবে। তবে এই অভিনেতার মেলোড্রামামুখী অভিনয়ের খানিকটা প্রবণতা আছে—যা নিশ্চিতভাবে সংশোধনের অপেক্ষা রাখে। ললিতারূপিনী সুন্দরী জোহরা হীরজীর অভিনয় দেখে মনে হয়েছে যে, অভিনয়ের সময় তিনি চর্বিতচর্বণে কবলিত হয়ে পড়ছিলেন মাঝে মাঝে। অন্যান্যদের মধ্যে সরোজ ঝুনঝুনওয়ালা (গোরা), রামগোপাল বাগলা (গুরুং ও বিজন দত্ত), অরুণ মিত্র (কাজীমন), ওমপ্রকাশ [illegible] (মহাদেব), আরতি দত্তা (বিশাখা) এঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমাদের অভিনন্দন।

শুভশংকর ভট্টাচার্য

কলকাতায় রজার সাইমন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ নাট্যপরিচালক রজার সাইমন দিন কয়েক কলকাতায় কাটিয়ে গেলেন। এই শহরের অবাধ জনস্রোত এবং তাঁর জীবনযাপন তাঁকে আমূল আকৃষ্ট করেছিল।

তিনি যদিও জন্মেছেন নাইয়র্ক শহরে, স্নাতক হয়েছেন মিডল-বেরি কলেজ এবং ইয়েল-স্কুল অব ড্রামা থেকে এবং নাইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়েই টেলিভিশন ও ফিল্ম ওয়ার্কশপের পাঠ নিয়েছেন, তবু তাঁকে এক ভ্রাম্যমাণ জিপসী বললে ভুল বলা হবে না, বস্তুত নিজের সম্পর্কে তিনি নিজেও তাই ভাবেন। ১৯৬৩ সাল অর্থাৎ তাঁর একুশ বছর বয়েস থেকে নাট্যপরিচালক হিসেবে তাঁর জীবন শুরু স্কারস-ডেল সামার থিয়েটারে। তারপর থেকে এডিনবরা, ডাবলিন, আমস্টার্ডাম, লন্ডন এবং ফ্রান্স-এর বিভিন্ন থিয়েটারে, আমেরিকায় ব্রডওয়ের ভেতরে এবং বাইরে বহু প্রযোজনায় তিনি পরিচালক। জায়গা এবং দল বদলে গেছেন বারবার, ভিতরের ভ্রমণের নেশা এবং নির্দেশ সন্ধানের অস্থিরতা তাঁর এই ভবঘুরে মনোভঙ্গির অন্যতম কারণ বলা যায়।

বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার এই ক্ষমতা এসেছে তাঁর থিয়েটার বিষয়ে কোন কঠিন একগুঁয়েমি না থাকার জন্য, উদার নমনীয় এবং গ্রহণেচ্ছু দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, [illegible] সাহস্যতার জন্য। ব্যক্তিগত এক আলোচনায় বর্তমান প্রতিবেদককে তিনি বলেন যে [illegible] মতো আমি মনে করি না যে তার মতটাই থিয়েটারে চূড়ান্ত। তাঁর কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি শ্রদ্ধাবান, যেমন শ্রদ্ধাবান গ্রোটোস্কির কাজ সম্পর্কে। অবশ্য গ্রোটোস্কি-র প্রযোজনা আমি দুবারের চেষ্টা সত্ত্বেও দেখতে পাইনি। দুবারই শুনতে হয়েছে আজ পঁচিশ বা তেইশ জনকে দেখতে দেওয়া হবে এবং সেই সংখ্যক পূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে আমার তা দেখা হয়নি। (প্রসঙ্গত আমরা কিন্তু শুনেছি যে গ্রোটোস্কির বিখ্যাত প্রযোজনা 'কনস্ট্যান্ট প্রিন্স'এ একবার প্রস্তাবিত চল্লিশটি আসন পূর্ণ হবে বাবার পরেও ভারতীয় নাট্যশিল্পী গিরিশ কারনাডকে বিশেষ একচল্লিশ নম্বর হিসেবে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল)। ম্যারোভিট্‌জ এর সঙ্গেও আমি বছর দুয়েক কাজ করেছি, একটা স্তর পর্যন্ত তাঁকেও আমার খুব প্রয়োজনীয় মনে হয়। কিন্তু কোনটাই একেবারে চূড়ান্ত বা একমাত্র বলে আমি বিশ্বাস করি না। বস্তুত লেখকের নিজেরও [illegible] যে থিয়েটারের সন্ধান [illegible] না হওয়াই সে সন্ধানের মজা। চূড়ান্ত নয়, সেটা হতে পারে

রজার সাইমন

তা ভালো কিংবা মন্দ, কখনও খারাপ অথবা আরও ভালো।

রজার সাইমন কলকাতায় 'বাদল সরকার-এর নাটক দেখেছেন, 'সম্রাট ও সুন্দরী' দেখেছেন, দেখেছেন 'অগ্নিগোনে' এবং দেবেশ চক্রবর্তীর ওয়ার্কশপের' কাজকর্ম। এখানে এই নানা জাতের পাশাপাশি চেষ্টার সহাবস্থান তাঁর কাছে আকর্ষণীয় এবং [illegible] বলে মনে হয়েছে। এখানকার [illegible] অব্যবসায়িক থিয়ে[illegible] [illegible] সম্পর্কও তাঁকে উৎসাহিত [illegible]। [illegible] নিজের দেশে [illegible] থিয়েটারের [illegible] একটিকে [illegible]।

[illegible] তাঁর এক বক্তৃতায় বর্তমান আমেরিকান থিয়েটার-এর ভূমিকা আরো স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়। 'সাইমন' বর্তমান সময়কে আমেরিকান থিয়েটার-এর সবচেয়ে [illegible] অধ্যায় বলে চিহ্নিত করেন, ষাটের দশকের নাটকের উজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা মনে রেখেও। তিনি বলেন, ষাট দশকে আমাদের জীবনে এবং থিয়েটারে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং বিষয় ছিল। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে আমরা লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হতাম অনেক কিছুর বিরুদ্ধে। আমরা লড়াই করতাম ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যের বিপক্ষে, সকলের সমান অধিকারের জন্য এবং স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস করবার জন্য। এই দীর্ঘদিনব্যাপী উত্তেজনার পর আমরা এখন ক্লান্ত, লড়াই-এর প্রতিপক্ষরা আপাতত দৃশ্যমান নয়, ফলে আমাদের দিকচিহ্ন অস্থির। এবং সেই কারণেই এখন আমাদের নাটক বৈচিত্র্যপূর্ণ বেশি মাত্রায়। পথের জন্য নানাভাবে নানা-স্তরে চেষ্টা শুরু হয়েছে। আমরা ফিরে যেতে চাইছি কিছু মূলে প্রশ্নে, টেকস্টের প্রয়োজন বোধ করছি [illegible]। [illegible] [illegible] কিভাবে [illegible] সত্তর দশকের নাটকের চরিত্র [illegible] বোঝাতে তিনি বিশেষ কিছু কিছু নাটকের অংশ

পড়ে শোনালেন। তিনি নিজে কত নিপুণ অভিনেতা তাও বোঝা গেল সেই সূত্রে।

আমাদের দেশের গ্রুপ থিয়েটার-এর মত ওঁদের থিয়েটারের সংসারেও অনেক অভাব। নিউ-ইয়র্কে ব্রডওয়েতে থিয়েটার তৈরি হয় না, তৈরি হয় সে বৃত্তের বাইরেই বরং। অভিনবরা বা লসএঞ্জেলস-এর সেই প্রস্তুত শিল্পকে ব্রডওয়ের বৃহত্তম ব্যবসায়ীগণ একসময় কিনে নেয় কেবল। এদিকে ছোট ছোট থিয়েটার কোম্পানীকে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে নির্ভর করতে হয় বিভিন্ন ফাউন্ডেশনের অর্থসাহায্যের উপর এবং সেখানে সেসব সাহায্য যারা বিতরণ করেন তাদের সামনে বিভিন্ন কৌশলের টুপি পরে অভিনেতাদের তাদের অভিনয়ক্ষমতার অন্য রকম প্রমাণ দিতে হয়, যে দৃশ্য আমাদের থিয়েটার-এর কাছেও খুবই ঘরোয়া। তার এই সব কথাই আমাদের ভালো লেগেছিল, যেমন লেগেছিল ব্যক্তিগত আলোচনার সময় যখন তিনি দেবেশ চক্রবর্তীর ওয়র্কশপ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন 'আমি যদি এতে যোগ দিতে পারতাম,' অথবা নিজের প্রথম নাটক বিষয়ে বলতে গিয়ে যখন অন্তরঙ্গ পর্যায়ে বলেছেন 'তখন এমন লম্বা প্রেস ধর্মঘট ছিল যে নাটকটার কথা ভালো করে জানতে লোকের মিছিমিছি অনেক দেরি হয়ে গেলো'। এইসব মন্তব্যের ভঙ্গি থেকে একটি ব্যক্তিত্বের আদল স্পষ্ট হয়। কিন্তু এই প্রতিবেদকের কাছে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তাঁর একটি মন্তব্য 'আজ কোন কারণেই আমি আমার নাটকের চরিত্রকে কাদা মাখিয়ে বা ধুলোর প্রলেপে লোকদেখানো প্রাকৃতিকতায় উপস্থিত করবো না। কেননা, পরিবেশের তথাকথিত স্বাভাবিকত্ব তৈরি করাই যেখানে ফ্যাশন সেখানে আমার কাছে সেটাই সবচেয়ে মিথ্যে, অপ্রয়োজনীয় এবং অস্বাভাবিক।'—আমার মনে হয় রজার সাইমন বর্ণিত সমকালীন আমেরিকান থিয়েটারকে বর্তমান সময়ের দর্পণ হিসেবে দেখতে এই মন্তব্যটিকেই সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সুরজিৎ ঘোষ

সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন

রবীন্দ্রসদন মঞ্চে সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনে পণ্ডিত টি এল রাণার ধ্রুপদ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের একটি প্রায়-বিস্মৃত অধ্যায়কে যেন নতুন করে মেলে ধরল। যোগীনবাবু, উদয়বাবু আজ স্বর্গত। গৌরীঅঙ্গের ধ্রুপদ ও পরিপাটি অঙ্গের গায়ন আজকের দিনের শ্রোতাদের কাছে তিনি এবং ডাগর-শিল্পীরাই শোনাতে পারেন এবং এসব অনুষ্ঠান শুনলে শিক্ষার্থীদের অনেকটা তালিমের কাজ হয়।

হাম্বীর রাগের ধ্রুপদে, আলাপের প্রতিটি অঙ্গের ক্রমবিস্তার যেমন সুসংহত, তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল গান্ধারের ভূমিকা। হাম্বীরের কাছাকাছি রাগ কামজ

চিন্ময় লাহিড়ী

মন্টু ব্যানার্জী
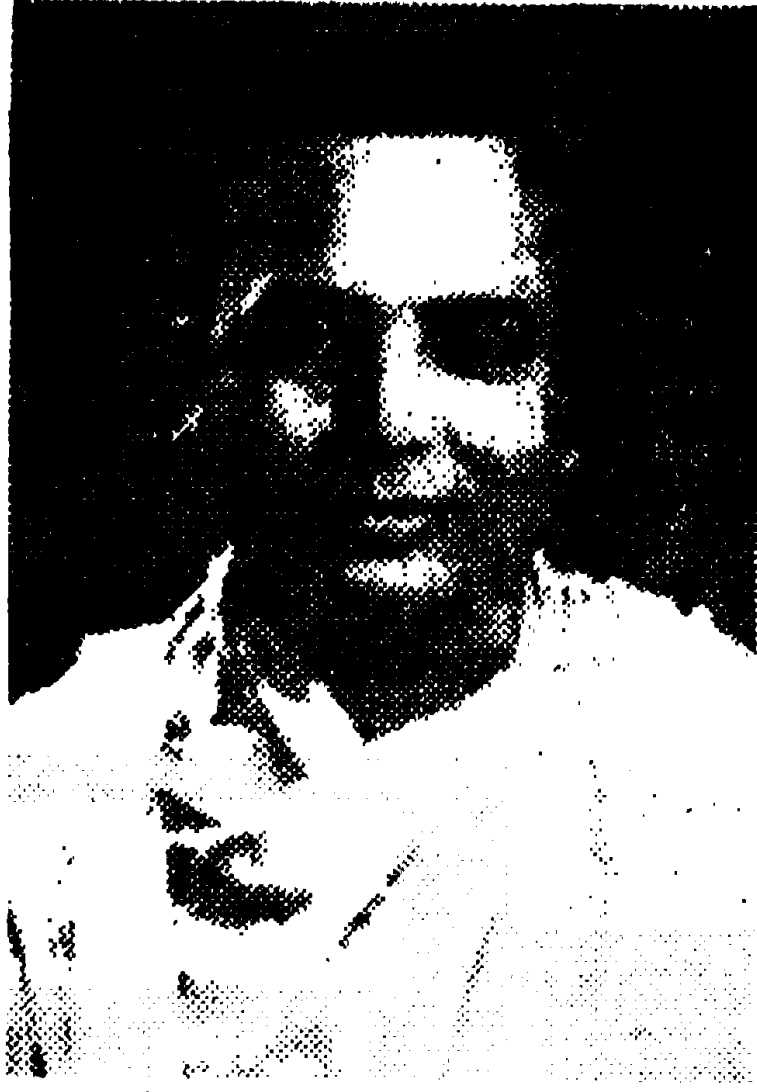
ও কেদারের সঙ্গে পার্থক্যও তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।

এ সম্মেলনের স্মরণীয় অনুষ্ঠান হল চিন্ময় লাহিড়ীর কণ্ঠসঙ্গীত এবং মন্টু ও মহারাজ ব্যানার্জির হারমোনিয়ম।

চিন্ময় লাহিড়ী শোনালেন স্ব-সৃষ্ট রাগ যোগেশ্বরী। রাগধারণার প্রাঞ্জল স্বচ্ছরূপ এবং বিশ্লেষণের শ্রীমণ্ডিত বিন্যাস—এই দুই-এর দুর্লভ সমন্বয়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছিল চিন্ময়বাবুর অনুষ্ঠান। পূর্বাঙ্গে যোগ এবং উত্তরাঙ্গে বাগেশ্রীর প্রভাব নিয়েও যোগেশ্বরীর যে নতুন একটি ডাইমেনশন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তারই মধ্যে পেলাম শিল্পী ও স্রষ্টা চিন্ময় লাহিড়ীর ভাবকল্পনাকে মন্দ্রসপ্তকে সানিধানিসা পকড়ের প্রতিটি স্বরের শ্রুতিরেশ সুরেলা কণ্ঠের মধুরতা যেমন প্রাণস্পর্শী তেমনই দীপ্ত এদের ব্যঞ্জনাগৌরব। তাঁর শক্তিশালী কণ্ঠের ক্রমিক উত্তরণ ও স্বরক্ষেপণ শুধু রোমাঞ্চকর মুহূর্তেরই সৃষ্টি করেনি, এ পর্যায় হয়ে উঠেছিল এক অনুপ্রেরিত শিল্পীর আত্মপ্রকাশ। নিষাদ ও গান্ধার তাঁর আদরের স্পর্শে যেমন দুলে উঠেছে তেমনই প্রাণকাড়া তাঁর পঞ্চমের আকুল অনুরণন।

যোগেশ্বরীর পর বসন্তবাহার ও কাফিহোরী যেন বসন্তের রংভরা পিচকারির উচ্ছল-উচ্ছাস ছড়িয়ে দিল সারা প্রেক্ষাগৃহে।

সবশেষে যখন তিনি ধরলেন সেই পরিচিত বাংলা গান পটদীপে বাঁধা 'ত্রিবেণী তীর্থপথে'—আমি তখন হারিয়ে গেছি সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিতে, যখন তাঁর ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া এই গান ছায়াচিত্রের সীমা ছাপিয়ে বাংলাগানের চিরন্তন ক্লাসিক সৌন্দর্যলোকে স্থান করে নিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গেই আর যে দুটি তরুণ প্রতিভার কথা উল্লেখ না করলে এ সমালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাঁরা হলেন শিল্পীর একাধারে পুত্রকন্যা ও শিষ্যশিষ্যা শ্যামল লাহিড়ী ও মন্দিরা লাহিড়ী। শ্যামলের প্রতিভা ও কণ্ঠের সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় ছিল—মন্দিরাও আগামীদিনের এক উজ্জ্বল আশ্বাস। যদি দুজনেই শিক্ষা ও অনুশীলনে একনিষ্ঠ থাকেন

আগামীতে শ্রোতারা এ'দের গানেই চিন্ময় লাহিড়ীর মত গুণীর গায়কীর আন্দাজ পাবেন।

কুমার মুখার্জির কণ্ঠ মধুর নয়। কিন্তু পরিশীলিত জোয়ারী, রাগের সুসংবদ্ধ বিন্যাস, তানের দাপট সব মিলিয়ে উপভোগ্য এবং আগ্রা ঘরানার গায়নশৈলীর এক বিশ্বস্ত নজীর হয়ে ওঠে তাঁর গাওয়া নটবেহাগ। বসন্ত ও ঠুংরী দিয়ে ইনি অনুষ্ঠান শেষ করেন।

পণ্ডিত যশরাজ 'মেওয়াকী' ঘরানার শিল্পী হিসেবে পরিচিত হলেও যে বস্তুটি তাঁর গানকে চিহ্নিত করেছিল, সেটি হল আমীর খাঁ ও ভীমসেন যোশীর যুগ্ম-প্রভাব। এই প্রভাবকে তিনি যথার্থ শিল্পীর মতই কাজে লাগিয়েছেন গোরখকল্যাণের সীমিত পরিসরের সুবিন্যস্ত বিস্তার ও তানে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য সুর ও মধ্যমে মীড়ের প্রতি (বিস্তারে) এবং তানের অঙ্গে সরাসরি পর্দায় ঐ দুটি স্বরের প্রয়োগরীতির সুদক্ষ শিল্পকৃতির।

মন্টু ব্যানার্জির হারমোনিয়মে শোনা গেল পূরবী। আঙ্গুলের মৃদু ও সুরেলা টিপ ও বেলোর প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করে যন্ত্রের বড় আওয়াজকে কত মধুর স্বরে পরিণত করা যায় তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সেদিনের এই অনুষ্ঠান। পূরবী রাগের উদাস করুণ বৈরাগ্য যেন কোমল রেখাব ও ধৈবতের স্পর্শে এক লহমায় মূর্ত হয়ে উঠল। যুগলমধ্যমের প্রয়োগে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত শিল্পকুশলতায় মনটা আপনা থেকেই বলে ওঠে 'বাঃ'। ঐ একটি হারমোনিয়মেই তিনি একাধারে পিয়ানো, অর্গ্যান ও বাঁশীর স্বরের ধ্বনিসুষমার এক মায়াময় সুরলোক রচনা করেছেন। পুত্র শ্রীকুমার ব্যানার্জির হারমোনিয়ম সঙ্গত মন্টুবাবুর পরিকল্পিত রাগরেখায় যেন কুশলী হাতের তুলির আঁচড়ে প্রয়োজনমত গাঢ় ও আলতো রঙের ছোপ দিয়ে ছবিটিকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে।

বেনারসের শিল্পী যতীন ভট্টাচার্যের সরোদে শুধু বসন্ত রাগ পরিচ্ছন্ন। তার জোওয়ার বাজ ও বোলতানে গুরু আলাউদ্দিনের শীলমোহরকে অনুভব করা যায়। তবলা সঙ্গতে বেনারসের প্রকাশ মিশ্রর শক্তিদৃপ্ত বোল খুব মানানসই হয়েছিল এ'র বাজনার সঙ্গে।

মণিলাল নাগের প্রথম রাগটি শোনা হয়নি। কিন্তু পিলু ঠুংরীর স্বল্প পরিসরেই তাঁর মেজাজী বাজনাকে উপভোগ করা গেছে।

ফণী ভট্টাচার্যর কণ্ঠে পরিবেশিত পুরিয়া রাগের খেয়াল ভাল লাগল আতিশয্যবর্জিত সুষ্ঠু রূপায়ণের কারণে।

উপালী অপরাজিতা দাসের ওড়িষী নৃত্যের স্বল্পনির্বাচিত কয়েকটি আইটেমেই এ নৃত্যের পরিচিত রূপটি মেলে।

শিশুশিল্পী মহুয়া মজুমদারের ভজনে প্রতিশ্রুতি ছিল।

—সন্ধ্যা সেন

চিন্ময় লাহিড়ীর পুত্রকন্যা শ্যামল-মন্দিরা লাহিড়ী

সুকমল স্মৃতি তর্পণ

ঘুরেফিরে ১৯ এপ্রিলের বিকেলটিতে যখন সময়ের গতি থমকে দাঁড়ালো, অস্তগামী রবির বিষণ্ণ আলো বিদায়ী আদরে আলিঙ্গন করলো লেকটাউনের একটি শিল্প-শ্রীমণ্ডিত ছবির মত বাড়িকে, যে বাড়ির সুন্দর রূপটি অনাহত রয়েছে, শুধু নেই তার রূপকার সুকমলকান্তি ঘোষ।

কিন্তু সত্যিই কি নেই? রজনীগন্ধার গুচ্ছ আর প্রদীপের স্বল্প আলোয় উদ্ভাসিত সেই স্নেহময় হাসিমুখ, তাঁর পরিচিত প্রিয়জনের মেলা, সব মিলিয়ে সেই রুচিমার্জিত বিদগ্ধ পরিবেশটিকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে পরিবেশটি তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর অনন্য শিল্পবোধের তাগিদে। ...আমার স্মৃতিবাসরে যেন কীর্তনভজনের আয়োজন না হয়। সেখানে ধ্বনিত হবে শুধুই আমার একান্ত প্রাণের গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত। একথা তিনি প্রায়ই বলতেন তাঁর অন্তরঙ্গ মজলিশে।

তাঁর আজীবন লালিত সেই আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়েছে তাঁর তিরোধান দিবসে। ধূপ-দীপ, ফুল আর একান্ত কটি আপনার মানুষের পরিমণ্ডলে গাইলেন সেই সব শিল্পীরা যাঁরা তাঁর অতি আদরের। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋতু গুহ, রণো গুহ-ঠাকুরতা, সবাই গেয়েছেন প্রাণঢালা দরদ মিশিয়ে। ও'দের কণ্ঠে সেই গানগুলিই শোনা গেছে যে গানগুলি তিনি শুনতে ভালবাসতেন। 'মা আমি তোর কি করেছি' (রণো), 'দিন ফুরালো' (ঋতু), 'তখন আমি যে শেষ কথা কে বলবে' (অশোকতরু)। এ'দের সঙ্গে সঙ্গতে ছিলেন জহর দে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৩৫ পয়সা। [illegible] অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। [illegible] অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত

১৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা

৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬

18 May, 1979

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী

সাড়ে ছয় কোটি শিশু স্কুলে যায় না

লিখেছেন রমেন দাশ

গল্প লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশিরকুমার দাশ

সামনে অন্ধকার

ইচ্ছা না থাকলেও, প্রকৃতির অভিশাপকে আমাদের কখনও কখনও মেনে নিতে হয়। বিজ্ঞানও অসহায় হয়ে পড়ে। যেমন হয়েছিল গত বছরের বন্যায়। অতিবর্ষণ ও অন্য কিছু কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দুর্গতির চরম শিকার হতে হয়েছিল। সেই দৃশ্য এখনও ভুলিনি আমরা।

এবার এসেছে খরা। বর্ষা এখনও নামেনি। অধিকাংশ জেলার খেত-খামার নিষ্প্রাণ। গরম হল্কা ছিটকে পড়ছে। তাপও বাড়ছে দিনের পর দিন। খাল বিল পুকুর শুকিয়ে গেছে। ইঁদারা আর নলকূপের জল শুকিয়ে নেমে গেছে অনেক নীচে। পানীয় জলের সংকট ঘনিয়ে আসছে।

জল শুকিয়ে যাওয়ায় ডোবার ছোট ছোট মাছ চলে আসছে বাজারে। গত চার মাসে গ্রামবাংলার মানচিত্র অনেক বদলে গেছে। ফসলী জমি রোদের তীব্রতায় ভেঙে টুকরো টুকরো। গাছপালা শুকিয়ে আসছে। সাধারণ শাকসব্জী নেই। বনজঙ্গল ঘুরে আনাজপাতি কুড়িয়ে শহরের বাজারে এনে দু পয়সা রোজগার করত যেসব নিরন্ন মানুষ তাদের সংখ্যাও কমছে। এরা খাবে কি? কি দিয়ে পেট ভরাবে?

এপ্রিল-মে মাসে প্রতি বছর যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, এবার তার সিকি ভাগও হয়নি। যা হয়েছে, তা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গেছে শুকিয়ে। ফলে পাট চাষ শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত। আউসও তাই। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়িসহ সমগ্র উত্তর বাঙলার অবস্থা শোচনীয়।

অর্থনীতির দুর্দশাগ্রস্ত চিত্র কল্পনা করা যেতে পারে। বীজ বিক্রি অন্য বছরের তুলনায় কম হয়েছে। অবিশ্রাম বিদ্যুৎ বিভ্রাটও চাষের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। ডীপ টিউবওয়েলগুলি আজ নিষ্প্রাণ খরাধরা মাঠের বুকে এক প্রহসনের ছবি। চাষ নেই, তাই কৃষি মজুর ও ভূমিহীন মজুরদের সামনে অন্ধকার। সাময়িক বৃত্তিজীবীদের অবস্থা আরও জটিল। প্রতিটি ভোগ্যপণ্যের দাম ক্রয় ক্ষমতার মাত্রা ছাড়িয়ে সিংহবিক্রমে এগিয়ে চলেছে।

পাট নেই, চাল নেই, তরকারি নেই, মাছ নেই—এমন একটি ভয়াবহ দিন [illegible]

খরার দুরন্ত প্রবাহ জানি না কতখানি ছড়িয়ে পড়বে। আর তার শিকার হবে কি পরিমাণ মানুষ।

সাহিত্য ইত্যাদি

মাতৃভাষা ও সাহিত্য

ইংরেজি ভাষায় যে সব ভারতীয় সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী। এক কথায় উত্তর দেওয়া শক্ত। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা মনে রাখলে বলতে ইচ্ছে যায়, ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যিকরা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কিন্তু মুলুকরাজ আনন্দ, নৈপাল এবং নিসিম ইজাকেল প্রমুখের দৃষ্টান্ত তুলে সার্থকতার দাবিও উপস্থিত করা কঠিন হবে না হয়তো।

অবিশ্যি যেসব সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত দিলাম, তাঁরা কতো বড় সাহিত্যিক এবং ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন কিনা, এসব প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই তোলা যায়। কিন্তু এই ধরনের নানারকম জেরা তো খাঁটি ইংরেজ লেখকদের সম্পর্কেও উঠতে পারে। ধরুন আমি যদি প্রশ্ন করি, গ্রাহাম গ্রীন ..কতো বড় ঔপন্যাসিক, এবং ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান আমাদের বাংলা সাহিত্যে ধরা যাক শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে বেশি ওপরে কিনা, উত্তর দিতে গিয়ে ঢোক গিলতে হতে পারে। কিম্বা মনে করা যাক কবি স্পেন্ডার বা লুই ম্যাকনিসের কথাই। এঁদেরও কাব্যিক অবস্থান কি সাহিত্যের ইতিহাসে দু-চার লাইনের চেয়ে বেশি কিছু দাবি করার মতো?

তার মানে, এ নয় যে আমি মুলুকরাজ আনন্দ বা নিসিম ইজাকেলকে গ্রাহাম গ্রীন বা স্পেন্ডারের তুল্য লেখক বলছি। একেবারেই তা নয়। আমি শুধু বলতে চাইছি, সাহিত্যিক স্বীকৃতি বড় গোলমেলে জিনিস, এবং একটা স্তর পর্যন্ত মোটামুটি সব সাহিত্যিকই একদলের লোক—আর সেই স্তরটি পার হতে না পারা পর্যন্ত কিছুতেই হওয়া যায় না বিশিষ্ট এবং বড় মাপের লেখক। কাজেই তাঁদের মধ্যে তর-তমের প্রকারভেদ করতে যাওয়া অনেকটাই প্রায় মনগড়া ব্যাপার। আর এইদিক থেকে মুলুকরাজ আর গ্রাহাম গ্রীনের মধ্যে গুণগত পার্থক্যও খুব একটা বড় কিছু নয় হয়তো।

জানি না, আমি যা বলতে চাইছি তা স্পষ্ট করতে পেরেছি কিনা। কিন্তু সে নিয়ে আর কালক্ষেপ করব না। কেননা আজকের প্রসঙ্গের পক্ষে তা জরুরি নয়। যে প্রশ্ন নিয়ে শুরু করেছি ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় লেখকদের ভবিষ্যৎ কী, তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাক।

মাইকেল মধুসূদনের কথা আগেই বলেছি। ইংরেজিতে দু-দুখানি কাব্যগ্রন্থ লিখেও কোনো দাগ কাটতে পারলেন না দেখে বাংলায় লিখতে শুরু করেন। এবং তৎক্ষণাৎ নিজের আসল ক্ষেত্রটি পেয়ে মহীরুহের মতো বিরাট লেখক হয়ে ওঠেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমে ইংরেজিতেই উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। কিন্তু রাজমোহনস ওয়াইফ লেখার পরই বুঝতে পারেন তাঁর ভ্রান্তি এবং বাংলায় লিখতে আরম্ভ করেন। ভাগ্যিস তা করেছিলেন। না হলে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বড় মাপের লেখকের উদ্ভবই ঘটত না হয়তো।

কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকে কেউ যদি বলেন, সাহিত্য শুধু মাতৃভাষাতেই লেখা সম্ভব, অন্য ভাষায় নয়, তাহলে কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হবে। তখন আমাকে বলতে হবে, মাতৃভাষা ছাড়াও সাহিত্য রচনা সম্ভব এবং ভারতেই তা ঘটেছে।

সংস্কৃত যখন ভারতের শিক্ষিতজনের ভাষা ছিল, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লেখকরা তখন আঞ্চলিক ভাষায় না লিখে সংস্কৃতে লিখতেন। যেমন ধরুন জয়দেব। তিনি বাঙালি কবি ছিলেন। (অবিশ্যি উড়িষ্যার কেউ কেউ তাঁকে উড়িষ্যাবাসীও বলেছেন শুনেছি।) বাংলাই ছিল তাঁর মাতৃভাষা। কিন্তু গীতগোবিন্দ লিখেছেন সংস্কৃতে। এবং লিখে স্বীকৃতি পেয়েছেন। সেইরকম কালিদাস যদি উজ্জয়িনীর মানুষ হয়ে থাকেন, তবে তাঁর মাতৃভাষাও নিশ্চয়ই সংস্কৃত ছিল না। এবং কাশ্মীরবাসী কহলন, যিনি রাজতরঙ্গিণী লিখেছেন, তাঁরও মাতৃভাষাও সংস্কৃত না হয়ে অন্য কিছু হওয়াই সম্ভব। এঁরা সকলেই সেকালের সর্বজনস্বীকৃত লেখ্য ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করে গেছেন। এমনকি সুদূর কেরালাবাসী শংকরাচার্যও বাদ যান নি অ-মাতৃভাষায় ভাষ্য রচনার কৃতিত্ব থেকে।

কিন্তু কথা উঠতে পারে, ভারতের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তখন এত সুসংহত ছিল যে, মাতৃভাষা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন অঞ্চলের লেখকদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ সক্রিয় ছিল। তাছাড়া ধর্মীয় জিজ্ঞাসা, মহাকাব্য-পুরাণ ইত্যাদির শিক্ষা, দার্শনিক উপলব্ধি, এসব ব্যাপারেও ছিল লেখকদের মধ্যে ঐক্য। কাজেই যে অঞ্চলের মানুষই হোন, সংস্কৃত ভাষার মারফৎ সাহিত্য রচনা সম্ভব হয়েছে তাঁদের পক্ষে।

অন্য পক্ষে ইংরেজি একেবারেই অন্য কোটির ভাষা। তার ব্যাকরণ শুধু আলাদা নয়, ধর্মীয় জিজ্ঞাসা, মহাকাব্য-পুরাণ ইত্যাদির শিক্ষা, দার্শনিক উপলব্ধি এসবও অন্য জগতের জিনিস। তাকে কী করে নিজের করে নেওয়া যেতে পারে? নিলেও তা কি সুকুমার রায় বর্ণিত বকচ্ছপ জাতীয় একটা বিদিকিচ্ছে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না?

না বোধহয়। অ-ইংরেজ লেখক ইংরেজিতে লিখলে তা সাহিত্যের ছাড়পত্র পাবে না, তা বোধহয় ঠিক নয়।

আফ্রিকার যে বিরাট অংশটি এই সেদিন পর্যন্তও পরাধীন ছিল, যাকে বোঝবার সুবিধের জন্যে আমরা আগে বলতাম কৃষ্ণ আফ্রিকা, তার অনেকগুলো দেশে সাহিত্য রচিত হয় ইংরেজি ভাষায়, এবং বাকি দেশগুলোতে ফরাসীর মাধ্যমে। অর্থাৎ যেসব দেশ আগে ইংরেজের কলোনী ছিল, সেখানে দেশীয় মানুষ শিক্ষিত হয়েছে ইংরেজির মারফৎ, আর সাহিত্যও করেছেন তাঁরা সেই ভাষাতেই। বেলজিয়ামের কলোনীতেও এইভাবে ফরাসী হয়েছে সাহিত্যের বাহন।

এবং ভালো সাহিত্যই রচিত হয়েছে তাতে। উপন্যাসের যতোটা না হোক, ছোটোগল্প আর কবিতাতে তো বটেই। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে গেলেই নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে তার।

অবিশ্যি ইদানীং আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে দেশী ভাষাতেও সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছে। তবে তা একেবারেই প্রাথমিক কাজ বলে শুনেছি। এসব ক্ষেত্রে পরের মুখে ঝাল খাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। কিন্তু কালে নিশ্চয়ই ভালো সাহিত্যই রচিত হবে দেশী ভাষায়। তবে তা ভবিষ্যতের ব্যাপার।

আপাতত যা দেখা যাচ্ছে তার দৃষ্টান্তে একথা জোর দিয়ে বলা যায় না যে মাতৃভাষায় না লিখলে ভালো সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়।

তা যদি হতো, এক্ষুনি একটু ভালো উদাহরণ মনে পড়ল, উর্দু ভাষী আবু সয়ীদ আইয়ুব বাংলায় এত সুসাহিত্য রচনা করলেন কী করে? উর্দু ভারতীয় ভাষা বটে, কিন্তু আগে যেসব কারণের কথা উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ ধর্মীয় জিজ্ঞাসা মহাকাব্য-পুরাণ ইত্যাদির শিক্ষা, দার্শনিক উপলব্ধি— এসব ব্যাপারে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ভাবধারা থেকে নিশ্চয়ই তা আলাদা। তাহলে?

এ প্রশ্নের জবাব যোগাতর কেউ দিলে খুশি হব।

জগদীন্দ্র রায়

হারানো বই

সংস্কৃত কলেজের ইন্টেলিয়েন্ট স্টুডেন্ট রামগতি ন্যায়রত্ন কুড়ি টাকার সিনিয়র ছাত্র বৃত্তি পেয়েছিলেন ১৮৫০-৫১ সালে। পরীক্ষার সাফল্যে উপাধি পেলেন ন্যায়রত্ন। ১৮৫৬ সালে হুগলি নর্মাল স্কুলের শিক্ষক হন। মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ন্যায়রত্নের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলেন ভূদেবচন্দ্র। দুজনে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তা অক্ষুণ্ণ ছিল। ও'দের যখন অনেক বয়স, তখন একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন দুজনেই। ভূদেবচন্দ্রকে একখানি চৌকিতে বসিয়ে ন্যায়রত্নের বাড়ির সামনে আনা হল। তাঁর হাতে কিছু যুঁই ফুল। ন্যায়রত্নকে আনা হল সেখানে। ভূদেববাবু তাঁর হাতে ফুল গুজে দিলেন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিন্তু কথা বেরোল না। ওই ওদের শেষ দেখা।

রামগতি সেকালের প্রখ্যাত শিক্ষক। নিষ্ঠাবান হিন্দু। সোমপ্রকাশে নিয়মিত লিখতেন। স্মৃতি, সাংখ্য জ্যোতিষ, ন্যায়-অলংকার প্রভৃতি শাস্ত্রে ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় জ্ঞান ছিল সব থেকে বেশি। প্রাচীনপন্থী হলেও, তিনি ছিলেন অন্ধকুসংস্কারের বাইরে যুক্তিবাদী। রামগতি প্রথমে হুগলি নর্মাল স্কুল, পরে বর্ধমান (লাকুড়ডি) গুরু ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তারপর বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক, শেষে হুগলি নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবেই কর্মজীবন থেকে অবসর নেন।

বহরমপুরের কর্মজীবন রামগতির জীবনে স্মরণযোগ্য পর্যায়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' তখন প্রকাশিত হয়েছিল। আর বহরমপুরে তখন সেকালের কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী যেন ঘটনাচক্রে মিলে গিয়েছিলেন।' "১৮৫৬ খৃঃ আগে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অক্ষয়চন্দ্র (সরকার) বহরমপুরে ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় বহরমপুরে সদর মুনসেফ ছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রামদাস সেন মহাশয়ের বাড়ী বহরমপুরে। তাঁহার একটি সুবৃহৎ সুসজ্জিত লাইব্রেরি ছিল। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা), বাঙ্গলার ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সময় বহরমপুরে ছিলেন। ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন বহরমপুর নিবাসী ছিলেন। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর পোস্টাল ইন্সপেক্টরের পদে এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন বহরমপুরে অবস্থিতি করতেন। এই সকল সাহিত্যিকের সমাবেশে বহরমপুর তখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।' [illegible] আছে রামগতির এক অনুকূলে

A
DISCOURSE ON THE BENGALI
LANGUAGE AND LITERATURE
(WITH A BRIEF ACCOUNT OF THE LIVES OF THE FAMOUS BENGALI AUTHORS TOGETHER WITH SHORT CRITICISM ON THEIR WORKS)
BY
RAMGATI NYAYARATNA.
EDITED BY
GIRINDRANATH BANERJEA, B. L.
FOURTH EDITION.

বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব
[illegible]
হুগলি
[illegible]

Price Three Rupees 8 Annas.

মানসিক পরিমণ্ডলে তাঁর বহরমপুরের চাকরি জীবন কাটেন। রামদাস সেনের সুবৃহৎ লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পারায় 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক' গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়েছিল। আর এই জাতীয় বই, বাঙলায় প্রথম লেখার কৃতিত্বও রামগতির। তাঁর পরবর্তীকালে অনেক বই-ই লেখা হয়েছে। গঙ্গাচরণ সরকার পদ্মনাভ ঘোষাল, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী আরো অনেকে লিখেছেন। কিন্তু রামগতিকে অপরিসীম শ্রম ও অপরিমাপ্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। অসংখ্য বই পড়েছিলেন।

OUT LINES OF THE HISTORY
OF
INDIA
(DOWN TO THE YEAR 1863)
BY
RAMGATI NYAYARATNA
Seventh Edition.

ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস।
[illegible]
হুগলী
[illegible]

গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছিলেন পাণ্ডু
ও পুঁথিপত্রের সন্ধানে। পরবর্তী
সমালোচকদের ভিত তৈরির দায়িত্ব
করতে হয় নি, যা করতে হ
রামগতিকে।

'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য
প্রস্তাব' সুবিশাল গ্রন্থ। স
থেকে প্রকৃত হয়ে বাঙলা ভাষা ও
উদ্ভবের কথা দিয়েই আরম্ভ।
আলোচনা তিনটি পর্যায়ে বি
অনির্দিষ্টকাল থেকে স্মরণ করে প
এসেছে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে
তার আগেই বিদ্যাপতি ঠাকুর, চ
আর রামায়ণকার কৃত্তিবাসের আত্ম
তারপর চৈতন্যদেব চৈতন্য জীবনী চ
মনসার ভসান, কাশীরাম দাসের মহা
ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল, রা
ভট্টাচার্যের শিবায়ণ বা শিবসংকীর্তন,
রঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর
গ্রন্থকার তৃতীয় পর্যায়ের আলোচন
করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভারত
অন্নদামঙ্গল থেকে দুর্গাদাস মুখোপা
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী, গীত ও কবিতা.
ভাষার উন্নতিতে ইংরেজদের দান, মৃ
বিদ্যালংকারের প্রবোধচন্দ্রিকা, রা
রায়, মদনমোহন তর্কালংকার, ঈশ্ব
গুপ্ত, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, ঈশ্ব
বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধু
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যো
রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র,
চাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হেমচন্দ্র
পাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিহা
চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার,
চন্দ্র সেন, রামদাস সেন, রজনীকান্ত
যোগেশচন্দ্র বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত
আলোচনা করেছিলেন রামগতি। সে
কার বাঙ্গলা ভাষার অবস্থা, তা
সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।
ছন্দ ও অলংকারের কথাও আছে।
সমকালীন বাঙ্গলা দিবসাপ্তাহিক,
মাসিক, দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকা
একটি সুদীর্ঘ তালিকার সঙ্গে
সম্পাদকের নাম। একালের গবেষকে
যা অমূল্য।

'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য
প্রস্তাবের' প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল
সালে। ১ম ভাগ সহ ২য় ভাগ ১৮৭
ছাপা হয় প্রথম অখণ্ড সংস্করণ
প্রতিটি সংস্করণেই তিনি
করে লিখতেন। তৃতীয় সং
ভূমিকা লেখেন অমূল্যচরণ
ভূষণ। রামগতির ছেলে
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংস্করণে
নতুন তথ্য সংযোজন করেন। অম
ভূমিকায় লেখেন : 'ন্যায়রত্ন ম
পরিশ্রমের ফলে আমরা সাহিত্যের
সুন্দর প্রতিকৃতি পাইয়াছি। তিনি
বর্ণমালা, [illegible], ব্যাকরণ ও
প্রভৃতি হইতে [illegible]

প্রবর্তীর জাতব্যবিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র।' একশ বছর পরে, আজও একথা সত্য।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকারের প্রথম গৌরব ন্যায়রত্নের। একশ বছরেরও আগে লেখা বই। পরবর্তীকালে আরও অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। তার ভিত্তিতে সাহিত্যের প্রতিটি পর্যায়কে নতুন যুগ-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু রামগতির পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার কারণে তাঁর বইটি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েই থাকবে। অনেকদিন ছাপা নেই। অনেক কথা পুরণো হয়ে গেছে। কিন্তু বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব হারিয়ে যাওয়ার পিছনে কোন যুক্তি নেই।

কারণ সমালোচক হিসাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার। সংকীর্ণতার বেড়াজালে তাঁর চিন্তা আবদ্ধ ছিল না। যার ফলে হিন্দু ভূদেব, ব্রাহ্ম রামমোহন আর খৃষ্টান মধুসূদন সমান বিচার পেয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। সংযম ও শালীনতা ছিল সমালোচক রামগতির রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নন্দনতত্ত্বের মাপকাঠি না বিছিয়ে লেখকের মানস প্রকৃতির প্রকাশভঙ্গীকেই তিনি ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : ..'বাঙ্গলা কবিদিগের মধ্যে স্বভাববর্ণনে কবিকঙ্কণের ন্যায় নিপুণ আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, এজন্য ফুল্লরার দারিদ্র বর্ণণ সময়ে তদ্বিষয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।... অন্তঃসত্ত্বার মানসিক অবস্থা, বৈবাহিক আচার পদ্ধতি, পতিবশ করিবার উদ্দেশে স্ত্রীর ঔষধকরণ, সপত্নী কলহ, রন্ধন, পাশ ক্রীড়া এবং অগ্রে সম্মান পাইবার জন্য বণিকদিগের বাগ্বিতণ্ডা প্রভৃতির বর্ণনাস্থলে কবির লোকব্যবহারাভিজ্ঞতার পর্যাপ্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।' যে সময়ের মানুষ রামগতি, তারপরিমণ্ডল থেকে চিন্তাধারায় যে কতখানি মুক্ত ছিল, উদ্ধৃতিতেই রয়েছে তার প্রমাণ।

রামগতির আর একখানি বই 'বাঙ্গলার ইতিহাস' বেরিয়েছিল ১৮৫৯ সালে। বইটির দ্বিতীয় খণ্ড লেখেন বিদ্যাসাগর আর তৃতীয় খণ্ডের রচয়িতা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিন খণ্ড একত্রে বাঙ্গলার এক অনন্য ইতিহাস। রামগতির বইটি হল 'ইহাতে বৈদ্যাবংশীয় হিন্দুরাজাদিগের চরমাবস্থা অবধি নবাব আলিবর্দি খাঁর আধিপত্যের কাল পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশের প্রসিদ্ধ ঘটনাসকল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।'

১৮৬৫ সালে ছাপা হয়ে বেরোল 'ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস'। ২০৬ পাতার বই। মূলত ছাত্রদের প্রয়োজনে লেখা। ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত ভারত ইতিহাসে কথা সংযোজিত হয়েছিল নবম সংস্করণে। এই সংস্করণে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি ভূমিকাও সংযোজিত ছিল। বিজ্ঞাপণে লেখক জানান : 'কিছু স্বল্পায়াসে ছাত্রেরা পরীক্ষা প্রদানোপযোগী জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে এই উদ্দেশে এই ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ইতিহাসখানি সংকলিত হইল। ইহাতে হিন্দু রাজগণের অধিকার হইতে গবর্ণর জেনেরেল লর্ড নর্থব্রুকের আগমণ পর্যন্ত সমস্ত সময়ের স্থূলে স্থূলে বিবরণ সকল সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় যে কয়েকখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস অধুনা বিশেষরূপে প্রচলিত আছে, তাহার অনেকগুলি এবং আমার কোন আত্মীয়ের যাচানিক উপদেশ ও তাঁহার হস্তলিখিত একখানি ইতিহাস এই সকলগুলি এ পুস্তকের অবলম্বন। ইহা কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ বা অনুকরণ নহে।"

নানা কারণে বইটি উল্লেখযোগ্য। সুপ্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ইংরেজ আগমন, ভারতের সর্বত্র তাঁদের অধিকার বিস্তার, পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী যুদ্ধ, কোম্পানি আমলের আইন-কানুন; ভারতকে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা, ইংরেজের বাণিজ্য, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র আইন, যুদ্ধ বিগ্রহ— প্রতিটি ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেছেন। পরিশিষ্টে আছে ব্রিটিশ ভারত, করদ বা মিত্র রাজ্য ও স্বাধীন রাজ্যের বিবরণ। সে সময়ে বিট্রিশ ভারতের আয়তন ছিল প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার বর্গ ক্রোশ এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। বিট্রিশ ভারতের অন্তর্গত ছিল ক বাংলা প্রেসিডেন্সি, খ, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, গ, বোম্বে প্রেসিডেন্সি, (ঘ) কমিসনরী বা নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশ। প্রায় দেড় লক্ষ বর্গক্রোশ এলাকা জুড়ে ছিল করদ রাজ্য। এসব রাজ্যে ইংরেজ রেসিডেন্ট বা এজেন্ট থাকত অধিপতিদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য। ১৫৩টি করদ রাজ্য। স্বাধীন রাজ্য ছিল নেপাল ও ভুটান। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে আছে : "এই পুস্তকে যে সকল গ্রাম ও নগরের উল্লেখ আছে, ভূগোলোকের বা ভূচিত্রের কিরূপ স্থলে তাহাদিগকে অঙ্কিত দেখা যাইবে, বা অঙ্কিত দেখিবার সম্ভাবনা, তাহারই নির্দেশ করণার্থ এই প্রকরণে তাহাদের অক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর প্রদত্ত হইয়াছে।" আর আছে সুদীর্ঘ কালানুক্রমিক সূচী। এই বইটির নিখুঁতভাবে রচনার জন্য রামগতি যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, বইটির পাতা না ওল্টালে তা বোঝা কঠিন।

'ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'—২০৫ পাতার বই বেরিয়েছিল ১৮৭৫ সালে। রামগতির আরও কখানি ইতিহাস বিষয়ের বই' কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ এবং অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস।' ছাপা পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৯৩। আর এক পাতা শুদ্ধিপত্র। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের হিস্ট্রি অফ দি ব্ল্যাক হোল'-এর বাঙলা অনুবাদ। বেরিয়েছিল ১৮৫৮ সালে। বস্তু বিচার ছাপা হয় ১৮৫৯ সালে। 'বাংলা ভাষায় এ জাতীয় প্রথম বই। এতদ্দেশীয় সাহায্যকৃত বাঙালা বিদ্যালয় সমূহে বস্তুবিদ্যার অনুশীলন অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ঐ বিষয়ের একখানিও পুস্তক নাই। এই বিবেচনা করিয়া কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলন পূর্বক সচরাচর— প্রচলিত ও সুশ্রূষা-জনক-গুণসম্পন্ন কতিপয় বস্তুর আকার প্রকার, প্রয়োজন ও উৎপত্তির বিবরণ প্রভৃতি কিঞ্চিৎ লিখিয়া এই গ্রন্থ মধ্যে নিবেদিত করিলাম।" আরও কয়েকখানি বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে ৯২ পাতার 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' ছাপা হয় ১৮৬৪ সালে। বছর কয়েক আগে, একজন গবেষক, তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন রামগতির ইংরেজিতে ভাল জ্ঞান ছিল না। কিন্তু কী করে তিনি এই সিদ্ধান্ত টেনেছেন, তা বলেন নি। রামগতি যদি ইংরেজিতে আনাড়ি হতেন, তাহলে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের বই অনুবাদের সাহস পেতেন না।

অজয় চক্রবর্তী

সাহিত্যের নেপথ্যে

বিদ্যাসাগর ও বঙ্গ নাট্যশালা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে বাংলা নাট্যশালার যোগাযোগ রীতিমতই ঘনিষ্ঠ ছিল। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে উড সাহেবের চেহারায় অর্ধেন্দুশেখরের অবিকল অভিনয় দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটি জুতো ছোঁড়ার বৃত্তান্ত তো রীতিমত কিংবদন্তী।

ঘটনাটা নাকি ঘটেছিল এই রকম : দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের উড সাহেবের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। এমন জীবন্ত অভিনয় অর্ধেন্দুশেখর ফুটিয়ে তুলেছিলেন ঐ চরিত্রের যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। অর্ধেন্দুশেখর এবং উড সাহেবে কোন প্রভেদ না পেয়ে স্বক্রোধে উড সাহেব অর্ধেন্দুশেখরকে আক্রমণ করেছিলেন। পায়ের চটি জুতো গিয়ে পৌঁছেছিল মঞ্চে দাঁড়ানো উড সাহেব—অর্ধেন্দুশেখরের কাছে। অর্ধেন্দুশেখর নাকি সে চটি মাথায় ছুঁইয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রণাম করেছিলেন। এ কিংবদন্তী আজও মুখে মুখে চলে আসছে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কিছু লেখাপত্রে জানা যায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যশালা'র কার্যনির্বাহক কমিটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম ছিল। এবং সক্রিয়ভাবে কিছু কিছু কাজকর্মও তিনি দেখাশোনা করতেন। ঐ কমিটিতে মাইকেল মধুসূদনও ছিলেন বলে জানা যায়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয় হয় চড়কডাঙার জয়রাম বসাকের বাড়িতে। দ্বিতীয় অভিনয়ও হয় একই জায়গায়। ঐ নাটকের তৃতীয় অভিনয় হয়েছিল বড়বাজারের গদাধর শেঠের বাড়িতে। তারিখ ১৮৫৭ সালের ২২ মার্চ। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জগদ্দুর্লভ বসাক, রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ বসাক এবং উদয় ঘটক। স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। জানা যায় ঐ নাট্যানুষ্ঠানে দর্শক হিসেবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন।

১৮৫৮ সালের ৩০ জুলাই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকের যে অভিনয় হয় ঈশ্বরচন্দ্র সে অভিনয়ও দেখেছিলেন।

১৮৫৯-তে সিঁদুরেপটির রামগোপাল মল্লিকের বাড়িতে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটকের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট দর্শকদের তালিকায় ঈশ্বরচন্দ্রের নাম দেখা যায়।

জোড়াসাঁকো থিয়েটার ১৮৬৫ সালের ১৫ জুলাই লোকশিক্ষার উপযোগী উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য 'ইন্ডিয়ান মিরর' কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। শ্রেষ্ঠ নাটকের জন্য রীতিমত পুরস্কার দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি ছিল সে বিজ্ঞাপনে। এ বিষয়ে ১৮৬৫ সালের সংবাদ প্রভাকরে লেখা হয় 'আমরা আহ্লাদপূর্বক পাঠকগণকে অবগত করিতেছি যে, যিনি ১৮৬৬ অব্দের ১লা জুনের মধ্যে হিন্দু মহিলাগণের বর্তমান অবস্থা উৎকৃষ্ট নাটকাকারে লিখিয়া জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় প্রেরণ করিতে পারিবেন তিনি ২০০ টাকা পাইবেন এবং ঐ সালের ১লা ফেব্রুয়ারির মধ্যে যিনি জমিদারগণের আচার ব্যবহার ঐরূপ নাটকের প্রণালীতে লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবেক। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র পুস্তক পরীক্ষা করিবেন।'

প্রথমোক্ত বিষয়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের 'নব নাটক' শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় এবং শ্রেষ্ঠ নাটকের পুরস্কার পায়। পুরস্কার ধার্য ছিল ২০০ টাকা। প্যারীচাঁদ মিত্রের সভাপতিত্বে এক বিশাল সভায় ঐ পুরস্কার দেওয়া হয়। রূপোর থালায় পুরস্কারের ২০০ টাকা সাজিয়ে তুলে দেওয়া হয় নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের হাতে।

ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষের চেষ্টায় বেঙ্গল থিয়েটার গড়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র ঘোষ একজন দক্ষ অভিনেতাও ছিলেন, বেঙ্গল থিয়েটারের অ্যাডভাইসারি কমিটিতে ছিলেন মাইকেল মধুসূদন। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনই ছিলেন শরৎ ঘোষের প্রধান পরামর্শদাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও অ্যাডভাইসরি কমিটির একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। মধুসূদনের পরামর্শে শরৎবাবু বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী নেওয়া ঠিক করেন, তার আগে নাকি কোন পেশাদার দল অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করেননি। সে সময় কলকাতায় যে কটি পেশাদার নাট্য সংস্থা ছিল তাদের কারোরই নিজস্ব বাড়ি ছিল না। বেঙ্গল থিয়েটারই সম্ভবত প্রথম বাড়ি তৈরী করেন। এখন যেখানে বিডন স্ট্রীট ডাকঘর—সেখানেই বেঙ্গল থিয়েটারের বাড়ি তৈরী হয়েছিল।

শরৎ ঘোষের প্রধান পরামর্শদাতা মধুসূদনের পরামর্শই বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী আনায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল তা স্বীকার করতেই হয়। তাঁর এ বিষয়ে প্রগতিশীল ভাবনারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তিনি নিশ্চিত বুঝেছিলেন স্ত্রীলোকের আবির্ভাব ছাড়া রঙ্গালয় জীবন-নির্ভর হবে না। বিলাতী রঙ্গালয়ের আদর্শও সম্ভবত তাঁর মনে ছিল। রসরাজ অমৃতলাল বসু স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটারে অভিনেত্রী লওয়া ঠিক হইল। তিনি বলিলেন, তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটার খোল, আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব, স্ত্রীলোক না হইলে কিছুতেই ভালো হইবে না।...

বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম দফায় চারজন অভিনেত্রী আনা হয়েছিল। এঁদের নাম ছিল এলোকেশী, শ্যামা, গোলাপ (সুকুমারী দত্ত) এবং জগত্তারিণী। এঁরাই সম্ভবত ১৮৭৩ সালের ১৬ আগস্ট মাইকেলের শর্মিষ্ঠা নাটকে অভিনয় করেছিলেন। বারাঙ্গনাদের ভিতর থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহের বিষয়টা নাকি ঈশ্বরচন্দ্রের মোটেই ভালো লাগেনি। নাট্যশালার অন্যতম পরামর্শদাতা হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র ঐ বিষয়ে তাঁর বিরূপ মনোভাবও জানিয়েছিলেন। এ মতান্তরকে কেন্দ্র করেই তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে সরে আসেন। এবং শুধু তাই নয় বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে সমস্ত রকমের সম্পর্কও শেষ করেন। এই প্রসঙ্গে উনিশ শতকের খ্যাতিমান নাট্যকার মনোমোহন বসুর বকতব্য থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, 'যেখানে পতিতা নিয়ে অভিনয় সেখানে আমি নেই। কেবল আমি কেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তো প্রথমে পাবলিক থিয়েটারের সম্পর্কে এসেছিলেন, আর এ-জন্যে তাঁর উৎসাহও কম ছিল না। কিন্তু থিয়েটারে পতিতাদের আগমনের কথা শুনেই তিনি পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।'

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

ব্ল্যাকমেলের রাজনীতি

বেদব্যাস বৈদ্য

বড়োর দায়দায়িত্ব এবং কর্তব্য যতখানি, ছোটর ঠিক ততখানি নয়। পারিবারিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক সর্বত্রই এই চিরন্তন রীতি লক্ষ্যণীয়। তাই বড়ো হওয়া অথবা বড়োর আসন নেওয়ার ঝুঁকি অনেকের না-পছন্দ। বড়ো হওয়ার জ্বালা যে কত গভীর, রাজ্য-রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে সি পি আই (এম) নেতৃত্ব তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

প্রফুল্লবাবুর মোর্চা গঠনের সংবাদে সি পি আই (এম) দলের খুশি হওয়ার কথা নয়। প্রফুল্লবাবুর অভিযোগ কতখানি সত্য-অসত্য তা নিয়েও তাদের মাথা ব্যথা নেই। অথবা বামফ্রন্ট বিরোধী আন্দোলনে প্রফুল্লবাবুর পেছনে রাজ্যের কতভাগ মানুষ সামিল হবেন—তার হিসাব-নিকাশেও সি পি আই (এম) নেতাদের এই মুহূর্তে তেমন কোন ভাবনা আছে বলেও মনে হচ্ছে না। কিন্তু এই দলের বিচক্ষণ নেতৃত্ব এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের মানসিকতার কথা বেশ ভালভাবেই জানেন। তাদের অজানা থাকবার কথা নয় যে, এই রাজ্যের মানুষ চিরদিনই ক্ষমতাসীন দলের বিরোধিতায় অভ্যস্ত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় ত্রিশ বছরের ইতিহাস অন্তত তারই প্রমাণ দেয়। সত্যমিথ্যা যাচাই করার মত ধৈর্য বা ক্ষমতা তাদের থাকে না। ক্ষমতাসীন দলের আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার চেয়েও সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা ব্যর্থতা তাদের কাছে অনেক বেশী বড় হয়ে ধরা পড়ে। কারণ, দায়িত্বহীন উগ্র বিরোধিতার মধ্য দিয়েই তাদের ত্রিশ বছরের পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে। গঠনমূলক বিরোধিতা কী—কেউ তাদের সে পথের সন্ধান দেননি বা দিতে পারেননি। সুতরাং দু বছরের অনেক সাফল্যের চেয়ে সামান্য ব্যর্থতাও সাধারণ মানুষকে সহজে হতাশাক্লিষ্ট করে তুলেছে এবং তুলছে। রাজ্যবাসীর এই মানসিকতা এবং নাড়ির খবর প্রবীণ নেতা প্রফুল্লবাবুর অজানা থাকবার কথা নয়। তাই তিনি পুজোর মুখে রাজ্যব্যাপী যে আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তুলছেন, সি পি আই (এম) নেতৃত্বের তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রফুল্লবাবুর মোর্চা গঠন ও তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে বামফ্রন্টের সংসারেও বেশ কিছুটা বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ছোট শরিকরা সুযোগ ও সময় বুঝে বড় শরিক সি পি আই (এম) দলের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

[illegible] শ্রী [illegible] ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি। সব জেলার সব গ্রামে নিজেদের সংগঠন আছে বলে এই দুই দলের নেতৃত্বও বোধ হয় দাবী রাখতে সংকোচ বোধ করেন। [illegible] ব্লকের পক্ষ থেকে সম্প্রতি দাবী তোলা হয়েছে, ব্লক পর্যায়ে বামফ্রন্ট কমিটি গঠন করা হোক। প্রস্তাবটি আপাত সুন্দর সন্দেহ নেই। কিন্তু সি পি আই (এম) নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর দল ছাড়া বামফ্রন্টের আর অন্য কোন দলের প্রতি ব্লকে সংগঠন আছে কি? অতএব এ ধরনের কমিটি গড়া হলে বিভিন্ন দলের সমর্থক সভ্য সেজে তাতে সুবিধাবাদীরা অনুপ্রবেশ করবে। এবং ব্লক পর্যায়ের বামফ্রন্ট কমিটি নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলার বাইরে চলে যাবে। ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ প্রতিক্রিয়াশীল বামফ্রন্ট বিরোধীদের সম্পর্কে রাজ্যবাসীকে সজাগ থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন। অথচ তাঁরই দলের অন্যতম নেতা এবং মন্ত্রী শ্রীকমল গুহ সহ কয়েকজন নেতা ব্লক পর্যায়ে বামফ্রন্ট কমিটি গড়ার দাবীতে সোচ্চার। প্রমোদবাবুর যুক্তি, অশোকবাবুর হুঁসিয়ারি এবং কমলবাবুদের দাবীর সমীকরণ কি সহজ ব্যাপার? প্রফুল্লবাবুদের আন্দোলনের ঘোষণার পর প্রমোদবাবু অবশ্য জেলা পর্যায়ে বামফ্রন্ট কমিটি গঠনে সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু কমলবাবুরা তাতে তুষ্ট নন। ব্লক পর্যায়ে কমিটির দাবীতে তারা সক্রিয়।

অপর শরিক আর এস পি দল। প্রফুল্লবাবুর মোর্চা গড়ার সংবাদ যখন সবে প্রচারিত, তখন বামফ্রন্টের ছোট এই শরিক দলের কৃষক সংগঠন কিষাণসভার সম্মেলন বসে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং শহরে। ক্যানিং-বাসন্তী অঞ্চলে এই দলের দৃঢ় সংগঠন আছে। আছে প্রচুর সমর্থক। সমাবেশে কৃষি-নির্ভর গ্রামীণ মানুষের ব্যাপক সমাবেশও ঘটে। কিন্তু মজার কথা, দলের নেতারা ঐ বিরাট সমাবেশে যে ভাষণ দেন তাতে সরাসরি বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতার সুরটাই বেশী পরিমাণে ধ্বনিত হয়। দু একজন বক্তার ঝাঁঝালো সুরের বক্তব্য শুনে তো মনেই হয়নি যে তাঁরাও বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম শরিক। বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ জোতদারদের স্বার্থে খেতমজুরদের হত্যা করেছে, ৩৬ লক্ষ ভূমিহীনের মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছয় লক্ষ নাম দু বছরে সরকারীভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে চললে আর পাঁচটা দলের মত সাধারণ মানুষ বামফ্রন্টকেও ছুঁড়ে ফেলে দেবে ইত্যাদি ভারি ভারি অভিযোগ কিন্তু প্রফুল্ল সেনের নয়। ক্যানিং-এর কৃষক সমাবেশে এইসব গরম বক্তব্য রেখে আর এস পি নেতারা প্রচুর বাহবা লুটেছেন। প্রফুল্লবাবুর আন্দোলনের সূচনায় সঙ্গে সঙ্গে যখন বামফ্রন্টের এক ছোট শরিকের সি পি আই (এম) মন্ত্রীদের (পুলিশমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এবং ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী) এই ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ধরা তাৎপর্যপূর্ণ। অভিযোগের পুরো রিপোর্ট ইতিমধ্যে আলিমুদ্দিন স্ট্রীটেও পৌঁছেছে। বড় শরিক দলের স্থানীয় কর্মী ও নেতাদের মধ্যে এ-নিয়ে রীতিমত উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ধারণা, আর এস পির অভিযোগ আর প্রফুল্লবাবুর বক্তব্যে কোনও ফারাক নেই—এই দুই-এর মধ্যে এক অদৃশ্য শক্তির যোগসাজস আছে।

সি পি আই (এম) নেতারা অবশ্য সব বুঝেও চুপচাপ। তাঁরা জানেন, প্রফুল্লবাবুরা যত তৎপর হবেন—তীব্র বিদ্যুৎ সংকট, খুন-রাহাজানি আর দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত সাধারণ মানুষ ততই সরকার-বিরোধী সমালোচনায় মুখর হবে। আর সেই সুযোগে জনপ্রিয়তা অব্যাহত রাখতে ছোট শরিকরা বড় শরিক দলের কাঁধে ব্যর্থতার সব দায়দায়িত্ব চাপানোর চেষ্টা করবে।

বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোন কোন সি পি আই (এম) নেতা আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লকের দায়িত্ব এড়ানোর এই মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করে নানা অভিযোগ তুলেছেন। অপর দিকে আর এস পি দল ও ফরোয়ার্ড ব্লকের একাধিক মন্ত্রী যে নকশাল নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং গোপন যোগাযোগ রেখে চলেছেন, সে খবরও মুখ্যমন্ত্রীর অজানা থাকবার কথা নয়। ছোট এই দুই শরিক-দলের আচরণের প্রতি অতএব সি পি আই (এম) নেতৃত্ব সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলছেন। তারা বুঝতে পারছেন প্রফুল্লবাবুর আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে ছোট শরিকরা তাদের বহু দিনের অভাব-অভিযোগ আদায়ের জন্য নানাভাবে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। প্রফুল্লবাবুর সার্বিক আন্দোলন বামফ্রন্টকে কতখানি ঘায়েল করতে পারবে পরবর্তী সময়ে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে এই মুহূর্তে বামফ্রন্টের শরিক দলগুলিকে পরস্পর বিরোধী করে তুলতে যে দারুণভাবে সাহায্য করছে, রাজনৈতিক মহলও তা স্বীকার করেন। সি পি আই (এম) নেতাদের ধারণা, প্রফুল্লবাবুর আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে বামফ্রন্টের কোন কোন শরিক ব্ল্যাক মেলের রাজনীতি শুরু করেছে। বামফ্রন্টের বৃহত্তর শরিকদল সি পি আই (এম), অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রফুল্লবাবুকে নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন, তার চেয়েও বেশি বিরত ও বিচলিত তার ছোট শরিকদের নিয়ে।

(১৫-৫-৭৯)

ডোণ্ট টেক্ এনি চান্স!

শ্যাম মল্লিক

এ যেন মশা মারতে কামান দাগা। ব্যাপারটা অনেকটা তাই। ডেট লাইন : ১০ মে। স্থান : বিবাদিবাগের লাল দুর্গ মহাকরণ। প্রসঙ্গ : রাজ্য কংগ্রেসের মহাকরণ অভিযান। নেতা সর্বস্ব ঐ দলের পক্ষ থেকে আগে থেকেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, মহাকরণ ঐদিন অচল করে দেওয়া হবে। মন্ত্রীদের সেক্রেটারিয়েটে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বলা বাহুল্য ওঁদের এই আন্দোলন লোড শেডিং-এর বিরুদ্ধে। বিদ্যুৎ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে।

৮ মে থেকে দু' পক্ষেরই সাজ সাজ আওয়াজ। মহাকরণে বৈঠকের পর বৈঠক। সত্যিই যদি কংগ্রেসীরা রাজ্য প্রশাসনের সদর দপ্তরে ঢুকে পড়েন। অনারেবল মিনিষ্টারদের যদি আটকায় তাহলে? মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অফিসারদের ডেকে বললেন ৯ মে সকালে দিল্লি চলে যাচ্ছি সব কিছু ঠিকমত দেখবেন। হ্যাঁ আর একটা কথা 'ডোণ্ট টেক এনি চান্স'। অফিসাররা মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাব বুঝতে পারলেন। অবরোধের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্ল্যানিং শুরু হল।

মহাকরণের সব কর্মচারীদের বলে দেওয়া হল পরিচয়পত্র ছাড়া ঐদিন কাউকে মহাকরণে ঢুকতে দেওয়া হবে না। যাদের পরিচয়পত্র হারিয়ে গেছে ঐদিনের জন্য তাঁরা যেন আইডেন্টিটি স্লিপ সংগ্রহ করে নেন। বলে দেওয়া হল ঐদিন ভিজিটরদের জন্য কোন প্রকার স্লিপ ইস্যু করা হবে না। এম পি ও এম এল এদের বলা হল ১০ মের জন্য কোন ভিজিটর স্লিপ ইস্যু করবেন না। এই ব্যবস্থার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর একটু সংযোজন ছিল। তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার সব সতীর্থের কাছে একই ধরনের একটা চিঠিতে বললেন, একেবারে নিশ্চিত না হয়ে কোন ব্যক্তিকে ভিজিটর স্লিপ দেবেন না। এত বড় ব্যবস্থা গ্রহণের একটা 'ব্যাক গ্রাউন্ড'ও আছে। গত বছর এপ্রিল মাসে ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থকরা আচমকা মহাকরণ আক্রমণ করেন। ইঁট-পাটকেল ছুড়ে ওরা অনেক সার্সির কাঁচ ভেঙে দেয়। দুই মন্ত্রীর গাড়িও ভাঙে। যখন ওদের এই তান্ডব নৃত্য চলছিল মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তখন মহাকরণে তাঁর কক্ষে বসে সরকারী ফাইল দেখছিলেন। সেন্ট্রাল গেটের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সার্জেন্ট ওদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন সার্জেন্টের পক্ষে ঐ বাহিনীকে আটকানো সম্ভব হল না। ওরা ডিফেন্সলেস। কোন রকমে গেটগুলো বন্ধ করে দিলেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র মুখ্যমন্ত্রী চকিতে তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে সোজা নেমে এলেন সেনট্রাল গেটে। ওখানে পুলিশের একটা অফিস আছে। ফোনটা তুলে বললেন লালবাজার।

উত্তেজিত মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, পুলিশ কমিশনার কোথায়। উত্তর এল : স্যার উনি পুলিশ লাইনে গেছেন। ডি-সি হেড কোয়াটারস : উনিও নেই। তাহলে জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার? উত্তর : ঘটনাস্থলে যাবার জন্য উনি ইউনিফর্ম পড়ছেন। রেগে মেগে মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, এই রকম একটা কান্ড চলছে, লালবাজারে একটা পদস্থ অফিসার নেই। জ্যোতিবাবুর কোন ভয়ডর নেই। কয়েকজন সার্জেন্টের বারন সত্ত্বেও তিনি মেন গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী পায়ের সামনে কয়েকটা বোতল ও পাথরের চাই এসে পড়লো। গেটের এ পাশ থেকে তিনি দুষ্কৃতকারীদের ধমকালেন। কে শোনে ধর্মের কাহিনী। ইতিমধ্যে লালবাজার থেকে ফোর্স এসে পড়েছে। শুরু হল লাঠি চার্জ। সাঁ সাঁ করে উড়তে লাগলো টীয়ার গ্যাসের সেল। ময়দানে তখন লাঠি হাতে পুলিশ কমিশনারও হাজির হলেন। ডান্ডা হাতে ডিসি হেড কোয়ার্টাস। ডান্ডাতে সব ঠান্ডা। সময় লাগলো মাত্র ৩৫ মিনিট।

এ ঘটনার জের গড়ালো অনেক দূর পর্যন্ত।

১০ মে কংগ্রেসীদের মহাকরণ অভিযানের ব্যাপারে সরকার পক্ষ যে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তার ব্যাক গ্রাউন্ড হল এটা। সত্য কথা বলতে কি ঐ ব্যবস্থা ছিল 'ফুল প্রুফ'। আগেকার দিনে রাজরাজড়াদের যুদ্ধের সময় কেল্লা রক্ষার জন্য যে আয়োজন করা হত এটা অনেকটা তাই।

তামাম মহাকরণে ঐদিন প্রায় চার কোম্পানী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। ঢাল পুলিশ, লাঠি পুলিশ কাঁদানে গ্যাস পুলিশ। হেলমেট পুলিশ। ৯ মে ডি সি সেন্ট্রাল অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে করে মহাকরণের চারটে চত্বর ভাল করে পরীক্ষা করলেন। ফোর্স পোস্টিং-এর ব্লু প্রিন্ট তৈরি করলেন তিনি। অধস্তন অফিসারদের বলে দেওয়া হল দেখবেন বে-আইনীভাবে একটা মাছিও না ঐদিন এখানে প্রবেশ করতে না পারে।

পূর্ব পরিকল্পনা মত ৯ মে রাত্রে মহাকরণের মধ্যে পুলিশ আচমকা অভিযান চালিয়ে কিছু বাইরের লোককে পাকড়াও করে। গাড বাই, গুড নাইট করে হোমরা-চোমরা অফিসাররা যখন মহাকরণ ত্যাগ করলেন তখন রাত্রি দেড়টা। পরের দিন অর্থাৎ ১০ মে কাকভোর থেকে ব্লু-প্রিন্ট মাফিক পুলিশ পোস্টিং শুরু হল। চারজন ডেপুটি কমিশনার, ১২ জন এ্যাসিটান্ট কমিশনার এবং ২০ জন ইন্সপেকটর সহ প্রায় চারশো পুলিশের ওপর মহাকরণের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল। মোট এগারোটা ব্লক। এক একটা ব্লকে একজন এ্যাসিটান্ট কমিশনার, একজন ইন্সপেকটর, একজন সাব ইন্সপেকটর একজন সাব ইন্সপেকটর এবং একজন সার্জেন্ট। এদের সঙ্গে মোট পাঁচশোক কনস্টেবল। মহাকরণের সামনেও বিগ কনটিনজেন্ট। চারটে রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড, তিনটে হেভি ফ্লাইং স্কোয়াড। মহাকরণের বিস্তৃত ছাদের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল একজন এ্যাসিটান্ট কমিশনারকে। তার সঙ্গে ছোটখাট একটা বাহিনী। একজন অফিসারের হাতে 'বায়নাকুলার'।

এর সঙ্গে এল পোর্টেবল ওয়াকিটকি সেট। ওদিকে লালবাজারে কন্ট্রোল রুমে বসে রথী-মহারথীরা। খবর এল মিছিল এগিয়ে আসছে। রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড কন্ট্রোলকে জানালো স্যার কয়েকটা জায়গায় ওরা পথ অবরোধ করেছে। মিছিলের মধ্যে থেকে কোন কোন জায়গায় ইঁট-পাটকেল ছুটতে শুরু করলো। পুলিশ নামলো এ্যাকসনে। দু' জায়গায় ১৪ রাউন্ড টীয়ার গ্যাস এবং কোথাও কোথাও মৃদু লাঠিচার্জ। ৪৮০ জনকে গ্রেপ্তার। তার মধ্যে দশজন নেতা। এক ঘন্টার মধ্যে সব ফাঁকা। সব শেষ।

পুলিশ কমিশনার্স থ্যাঙ্কস টু হিজ বয়েজ। বেলা সাড়ে এগারোটার স্বরাষ্ট্র সচিব রথীন সেনগুপ্তের ঘরে ঝন ঝন করে বেজে উঠলো একটা টেলিফোন। দিল্লির থেকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর টেলিফোন। রথীনবাবু মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন, স্যার সব শেষ হয়ে গেছে। অবস্থা পুরোপুরি আয়ত্তের মধ্যে! শ্রীবসু বললেন, যাদের ধরা হয়েছে সবাইকে আজই ছেড়ে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্য সচিব অমিয়কুমার সেনও ঐদিন দিল্লিতে ছিলেন। তিনি বেলা সাড়ে চারটায় রথীনবাবুকে টেলিফোন করে সব খবর জেনে নিলেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন আগে থেকেই ঠিক ছিল যে ১০ মে মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্য সচিব সরকারী কাজে দিল্লি থাকবেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে যদি কোন অঘটন ঘটে সেই আশঙ্কায় এই ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে অনেকে মনে করেন একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা মহাকরণ কেন, তার একশো গজের ধারে কাছে আসতে পারে নি। ওরা সংখ্যায় ছিল খুবই নগন্য। তবে কোন বিরোধী দল যদি ঘোষণা করেন তাঁরা মন্ত্রীদের পথ আটকাবেন, রাজ্য প্রশাসনের সদর দপ্তর অচল করে দেবেন এই হুমকির মোকাবিলার জন্য সরকার কোন প্রকার ঝুঁকি নেবেন কেন?

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে যখন নতুন সংবিধান রচিত হোল তখন রাজ্যের ক্ষমতার তালিকাতে পেশা, ব্যবসা, বৃত্তি ও চাকুরির উপরে কর বসানোর অধিকার আবার স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হোল। মূল সংবিধানে দুটি বিশেষ ধারা যোগ করে আইনগত দিকটা পরিষ্কার করবার চেষ্টাও করা হোল। এই কর আয়করের সঙ্গে সম্পর্কিত এই যুক্তিতে কোনো আপত্তি করা চলবে না। এবং রাজ্য সরকার ও কোনো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে দেয় মোট বৃত্তিকরের পরিমাণ কারো ক্ষেত্রেই বছরে মোট ২৫০ টাকার বেশি হবে না, এই বিধানও করা হোল। পেশা, বৃত্তি ইত্যাদি থেকে যে আয় হবে তার উপরে সরাসরি আয়কর বসাবেন কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার যদি আয়ানুপাতে বৃত্তিকর বসান তাহলেও কোন ব্যক্তিকে মাসে ২০·৮৩ টাকার বেশি দিতে হবে না।

বৃত্তিকরে কি সুবিচার হবে?

ভবতোষ দত্ত

এক বছর আগে ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেট পেশ করবার সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে যথাসময়ে পেশা, ব্যবসা বৃত্তি এবং চাকুরির ক্ষেত্রে একটি রাজ্য কর-বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন হবে। ১৯৭৯-৮০ সালের জন্য সম্প্রতি যে বাজেট দেওয়া হয়েছে তাতে এই কর-বিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। বর্তমান বছর থেকেই এই কর আদায় করা হবে এবং এর থেকে বার্ষিক আয় ৯ কোটি টাকা উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর জন্য অবশ্য নতুন আইন প্রয়োজন হবে এবং আইন বিধিবদ্ধ হবার পরেও কিছুটা সময় যাবে কার্যপ্রণালী নিয়মাবলী ইত্যাদি তৈরি করতে এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। নতুন কর থেকে প্রথম বছরে যা আদায় হবে সেটা ভবিষ্যতের বার্ষিক আয় থেকে অনেকটা কম হবার সম্ভাবনা।

পেশা, ব্যবসা ইত্যাদির উপরে কর বসানো হয়েছে নানা দেশে বহু শতাব্দী ধরে। ইয়োরোপে রাজারা এবং পৌর-সংস্থাগুলি নানা ধরনের বৃত্তির উপরে কর বসাতেন। উনিশ শতকে আয়কর ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হবার পরে বৃত্তি-করের গুরুত্ব কমে যায়। ভারতবর্ষে ১৮৬৭ থেকে ১৮৭৩ পর্যন্ত পেশা এবং ব্যবসায়ের উপরে একটি 'লাইসেন্স ট্যাকস' বসানো হয়েছিল। পরে ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত আরেকবার এই ধরনের লাইসেন্স ট্যাকস আদায় করা [illegible] ব্যবসায়ী এবং কারিগরদের কাছ থেকে। ১৮৮৬ সালে যখন নতুন আয়-কর ব্যবস্থা গৃহীত হয় তখন এই লাইসেন্স ট্যাকস তুলে দেওয়া হয়। ভারতে প্রথম আয়কর বসানো হয় সিপাহী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৮৬০ সালে। পাঁচ বছর পরে এই আয়কর ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। বস্তুত, ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৬ এই ২১ বছর আয়কর ছিল না এবং এর মধ্যে ১৩ বছর বিকল্প হিসাবে পেশা ও ব্যবসায়ের উপরে লাইসেন্স ট্যাকস আদায় করা হয়। আয়কর ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে চালু হবার পরে বৃত্তিকর বসানোর অধিকার চলে যায় পৌর ও স্থানীয় সংস্থাগুলির হাতে। সে-ব্যবস্থা এখনো বলবৎ আছে এবং বর্তমানে এই রাজ্যের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি বছরে মোট প্রায় দুই কোটি টাকা নানা ধরনের বৃত্তি-কর থেকে আদায় করে।

১৯৩৫ সালে যখন একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করে নতুন ভারতশাসন আইন পাশ করা হোল, তখন তাতে পরিষ্কার করে প্রদেশগুলিকে 'প্রফেশনস ট্রেডস, কলিংস ও এমপ্লয়মেন্টস, অর্থাৎ পেশা, ব্যবসা, বৃত্তি ও চাকুরির উপরে কর বসানোর অধিকার দেওয়া হোল। এই অধিকারের বলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে অবিভক্ত বঙ্গদেশের অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার এই প্রদেশের সব আয়করদাতাদের উপরে একটি এমপ্লয়মেন্ট ট্যাকস বসান—বছরে তিন টাকা হারে। যুক্তপ্রদেশেও (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) এই ধরনের কর বসানো হয়েছিল কিন্তু সেখানে বিভিন্ন আয়-স্তরে বিভিন্ন হার স্থির করা হয়েছিল। এর কোনোটিই বেশিদিন চালু ছিল না। উত্তরপ্রদেশের বৃত্তিকর নিয়ে প্রশ্ন ওঠে যে এটা একটা অতিরিক্ত আয়কর কিনা, অর্থাৎ

এই কর বসিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারের সীমার ভিতরে যাওয়া হচ্ছে কিনা। বঙ্গদেশে বৃত্তিকর তুলে দেওয়া হয় আদায়ের স্বল্পতার জন্যে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে যখন নতুন সংবিধান রচিত হোল তখন রাজ্যের ক্ষমতার তালিকাতে পেশা, ব্যবসা, বৃত্তি ও চাকুরির উপরে কর বসানোর অধিকার আবার স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হোল। মূল সংবিধানে দুটি বিশেষ ধারা যোগ করে আইনগত দিকটা পরিষ্কার করবার চেষ্টাও করা হোল। এই কর আয়করের সঙ্গে সম্পর্কিত এই যুক্তিতে কোনো আপত্তি করা চলবে না। এবং রাজ্য সরকার ও কোনো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে দেয় মোট বৃত্তি-করের পরিমাণ কারো ক্ষেত্রেই বছরে মোট ২৫০ টাকার বেশি হবে না, এই বিধানও করা হোল। পেশা, বৃত্তি ইত্যাদি থেকে যে আয় হবে তার উপরে সরাসরি আয়কর বসাবেন কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার যদি আয়ানুগ হারে বৃত্তি-কর বসান তাহলেও কোন ব্যক্তিকে মাসে ২০-৮৩ টাকার বেশি দিতে হবে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পেশা, ব্যবসা, বৃত্তি ও চাকুরি (ইংরেজিতে প্রফেশনস ট্রেডস, কলিংস ও এমপ্লয়মেন্টস) এই চারটি শব্দের অর্থ খুব পরিষ্কার করে আলাদা করা যায় না। যিনি ওকালতি করেন তাঁর কাজকে পেশা, ব্যবসা বা বৃত্তি এই তিনটি শব্দ দিয়েই বর্ণনা করা যেতে পারে। এমন কি যিনি চাকরি করেন তাঁর কাজকে পেশা বলে অভিহিত করলে কোনো ভুল হয় না। মাসিক বেতনের বিনিময়ে যিনি শিক্ষকতা করেন, শিক্ষাদান তাঁর পেশা। চারটি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত শব্দ ব্যবহার করার কারণ আইনে যাকে বলে 'প্রচুর সতর্কতা' (অ্যাবানড্যান্ট কশন)—যাতে আইনের ফাঁক দিয়ে কেউ বেরিয়ে যেতে না পারে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়—কৃষিজীবীর উপরে এই কর চাপানো হবে কিনা, যিনি ব্যাঙ্কে জমানো টাকার সুদ থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁকে এই কর দিতে হবে কিনা। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আইনের বিভিন্ন ধারার ভাষার উপরে তার প্রয়োগ নির্ভর করবে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন আইনের প্রস্তাব পাওয়া গেলে এ-সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে আলোচনা সম্ভব হবে।

এই বৃত্তিকর বসানোর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় দেরিতে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৭৮-৭৯ পর্যন্ত ভারতের ২২টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ১১টিতে এই ধরনের কর বসানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে এই সংখ্যা এবারে ১২তে ওঠার কথা, কিন্তু হরিয়ানাতে বর্তমান এই কর আদায় করা হচ্ছে না। ১৯৭৯-৮০ সালের বিস্তারিত রাজ্য-বাজেটসমূহ এখনো সহজে পাওয়া যায় না—তাই আগের বছরের হিসাবটা দেখাতে হচ্ছে। ১৯৭৮-৭৯তে দশটি রাজ্যে বৃত্তিকর থেকে মোট আয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ২৯.৮৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে এক মহারাষ্ট্র বাজেটেই ধরা হয়েছিল ১৮.২৩ কোটি টাকা। কর্ণাটকের বাজেটে ছিল ৪.৫০ কোটি টাকা, গুজরাটে ৩.৯৮ কোটি টাকা, মধ্যপ্রদেশে ১.৪০ কোটি টাকা। মেঘালয় নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরাতে স্বাভাবিক কারণেই আদায় খুব কম—দশ লক্ষ টাকা বা তার নীচে। আশ্চর্যের কথা যে উত্তরপ্রদেশে এই কর থেকে আদায়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল কুড়ি লক্ষ টাকা এবং কেরলে মাত্র ৬১ লক্ষ টাকা।

এর থেকে প্রমাণ হয় যে বৃত্তিকর বসাবার পরে তার আদায় সম্বন্ধে পুরোপুরি মনোযোগী ও দক্ষ না হলে, উত্তরপ্রদেশের মত রাজ্যেও (যেখানে ভারতের ১৬.৩ শতাংশ লোক বাস করে) সবটা প্রচেষ্টাই নিরর্থক হতে পারে। এটাও উল্লেখযোগ্য যে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর ওড়িশা, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও তামিলনাড়ুতে এই জাতীয় কর এখনো বসানো হয়নি। নতুন রাজ্যগুলির মধ্যে মণিপুর এবং সিকিমেও এখন পর্যন্ত কোনো বৃত্তিকর নেই। কোন রাজ্যে কোন নতুন কর বসানো হবে, যা বসালেও ভাল করে আদায় করা হবে সেটা অনেক সময়ে নির্ভর করে রাজনৈতিক কারণের উপরে এবং কখনো কখনো শ্রেণীবিশেষের কাছে জনপ্রিয় হবার প্রয়োজনের তাগিদে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং গুজরাটে এখনো কৃষিআয়ের উপরে কোনো কর নেই, বিহার ও মহারাষ্ট্রে কৃষি-আয়কর আছে, কিন্তু আদায় সামান্য। উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে এই কর তুলে দেওয়া হয়েছে, বিহারেও উঠে যাবার মুখে।

এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম থেকে বার্ষিক ৯ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে বৃত্তিকর বসানো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুসারে চাকরিজীবির ক্ষেত্রে মোট বেতনের উপরে এই করের হার নীচের তালিকা-অনুসারে হবে :

মোট মাসিক আয়	মাসিক কর
৫০০ টাকা বা তার নীচে	০
৫০১ টাকা—৭৫০ টাকা	২ টাকা
৭৫১ টাকা—১০০০ টাকা	৪ টাকা
১০০১ টাকা—১২৫০ টাকা	৬ টাকা
১২৫১ টাকা—১৫০০ টাকা	১০ টাকা
১৫০১ টাকা—২০০০ টাকা	১৫ টাকা
২০০১ টাকা বা তার বেশি	২০-৮৩ টাকা

যাঁরা স্বাধীন পেশাতে নিযুক্ত আছেন। যাঁরা স্ব-নিযুক্ত এরকম ব্যক্তি এবং কোম্পানির উপরে করের হার 'অন্যরকম হবে, কিন্তু সে-সম্বন্ধে বিবরণ এখনো প্রকাশিত হয় নি। তবে ঊর্ধ্বসীমা হিসাবে মাসে ২০-৮৩ টাকা বা বছরে ২৫০ টাকার উপরে কর আদায় করা হবে না।

বেতনের উপরে করের যে হার প্রকাশ করা হয়েছে, তার বোঝা উঁচু আয়ের বেলা খুব সামান্যই হবে। যাঁর মোট বার্ষিক আয় ২৫,০০০ টাকা (মাসিক ২০৮৩ টাকা) তাঁকে নূতন হারে আয়কর দিতে হবে বছরে ৩৮৪০ টাকা। এর উপরে তাঁকে ২৫০ টাকা বৃত্তি কর দিতে—হবে, কিন্তু আয়কর হিসাব করবার সময়ে এই টাকাটা বাদ দেওয়া হবে। অর্থাৎ তাঁকে আয়কর দিতে হবে ২৪,৭৫০ টাকার উপরে। এর ফলে তাঁর ৭৫ টাকা কম আয়কর দিতে হবে এবং আয়কর ও বৃত্তিকর নিয়ে মোট করের বোঝা বাড়বে ১৭৫ টাকা বা তাঁর আয়ের ০-৭ শতাংশ। পেশা, ব্যবসা বা বৃত্তি থেকে যাঁদের ভাল আয় হয় তাদেরও বোঝা সামানাই হবে।

সমস্যা উঠবে নিম্নস্তরের আয়ের করদাতাদের নিয়ে। যাঁর মাসিক আয় ৫০১ টাকা, তাঁকে মাসে ২ টাকা কর দিতে হবে। এটা তাঁর আয়ের ০-৪ শতাংশ, কিন্তু এই আয়-স্তরে এর বোঝাটাও উপেক্ষণীয় নয়। ২০০০ টাকা মাসিক আয় হলে ২০ টাকা দেওয়া যতটা শক্ত তার চেয়ে অনেক বেশি শক্ত ৫০০ টাকা থেকে ২ টাকা দেওয়া। এটাও লক্ষ্য করা উচিত যে মোট উপার্জনের পরিমাণ এক স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উঠলে দেয় করের পরিমাণ বাড়বে, কিন্তু যে কোনো একটি স্তরের মধ্যে যদি উপার্জনের বৃদ্ধি হয় তাহলে আনুপাতিকভাবে করের বোঝা কমবে। কোন উপার্জন মাসিক ৫০১ টাকা থেকে বেড়ে ৭৫০ টাকা হলে, করের পরিমাণ মাসিক ২ টাকাই থাকবে, কিন্তু উপার্জনের অনুপাত হিসাবে করের অংশ শতকরা ০.৪০ থেকে ০-২৭এ নেমে আসবে। মাসিক উপার্জন ১৫০১ টাকা থেকে বেড়ে ২০০০ টাকা হলে করের পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই ১৫ টাকা হবে, অর্থাৎ আনুপাতিক অংশ শতকরা ১-০০ থেকে ০-৭৫এ নেমে আসবে।

আর ২০০০ টাকার বেশি উপার্জনের ক্ষেত্রে, আয় যতই বাড়ুক না কেন, কর হবে মাসে ২০-৮৩ টাকা। ফলে করের বোঝা হবে মাসিক ২০০১ টাকা উপার্জনে শতকরা ১-০৪, উপার্জন ৫০০০ টাকা হলে শতকরা ০-৪২ এবং ১০,০০০ টাকা হলে শতকরা ০-২১। যাদের উপার্জন আরো বেশি তাদের ক্ষেত্রে করের কোনো বোঝা অনুভূত হবে না।

সংবিধানে বৃত্তিকরের যে উচ্চসীমা দেওয়া হয়েছে তার ফলে যাঁদের আয় বেশি তাঁদের বিশেষ সুবিধা হবে। রাজ্য সরকারের পক্ষে এই সীমার বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সংবিধানের সংশোধন সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময়ে এই বিষয়টিও মনে রাখা উচিত। ১৯৫০-এ যখন সংবিধান রচিত হয় তখন ২৫০ টাকার যে ক্রয়ক্ষমতা ছিল এখন তার সমান স্তরে পৌঁছতে হলে ১০০০ টাকাতে আসতে হয়। বৃত্তিকরে ন্যায়সঙ্গত সমতা আনতে হলে এই উচ্চসীমা এখন অনেক বাড়ানো প্রয়োজন। বৃত্তিকরের হার আয়করের মত ক্রমবর্ধমান করা যায় কিনা এ নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। বর্তমান অবস্থায় এরকম পরিবর্তন করলে আইন-গত জটিলতা দেখা দিতে পারে।

নীচের দিকের স্তরগুলিতে শুধু বোঝাটাই বেশি হবে তা নয়—এইসব স্তরে অন্য ধরণের অবিচারও দেখা দিতে পারে। যারা চাকরি করে উপার্জন করে, বৃত্তিকর তাদের দিতেই হবে, কিন্তু যারা কোনো পেশা বা ব্যবসা থেকে উপার্জন করে তাদের ক্ষেত্রে আয়ানুগ একটা করের বোঝা বসানো খুবই শক্ত হবে। ফলে দাঁড়াবে যে উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি পেশার লোকদের এবং রেজিস্ট্রিকৃত ব্যবসায়ীদের বাদ দিলে বৃত্তিকরের বোঝা পড়বে প্রধানত বেতনভোগীদের উপরে। তাছাড়া যাদের কাছ থেকে আয়কর বিভাগ ও পুরোপুরি কর আদায় করতে অসমর্থ হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বৃত্তিকরের বোঝা একটা সামান্যনীতি অনুসারে নির্ণয় করে দেওয়া এবং আদায় করা খুবই কঠিন হবে।

যারা বেতনভোগী তাদের কাছ থেকে বৃত্তিকর আদায় করা শক্ত হবে না। প্রত্যেক নিয়োগকর্তাকে নির্দেশ দিলেই হবে যে বেতন থেকে টাকাটা কেটে নিয়ে যেন সরকারের তহবিলে জমা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে রাজ্য সরকারের নানা অফিসে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল ২,৯০,০০০। তাছাড়া আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত লোক ছিল আরো প্রায় ৬,৫০,০০০। এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বেতনভোগী লোকের সংখ্যা প্রায় ৪,২৫,০০০। এই ১৪ লক্ষ সরকারি বা আধা-সরকারি বেতনভোগী ছাড়াও আছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী (যাদের সংখ্যা ঠিক জানা নেই) এবং কারখানা, কয়লাখনি এবং চা-বাগানে নিযুক্ত আরো প্রায় ১২ লক্ষ বেতনভোগী। এদের মধ্যে অনেকে বৃত্তিকরের আওতায় আসবে না, কিন্তু একটা বড় সংখ্যা মাসে ২ টাকা বা ৪ টাকা করের স্তরে পড়বে। এদের বেলাতেও নিয়োগকর্তার মাধ্যমে আদায় করা সম্ভব হতে পারে।

প্রশ্ন উঠবে অন্যদের নিয়ে—যারা ব্যবসা, পেশা বা অন্য কোনো বৃত্তিতে নিযুক্ত। এদের কাছ থেকে কর আদায় করবার জন্য ব্যাপক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে কর আদায়ের ব্যয় যাতে আদায়ের পরিমাণের চেয়ে বেশি না হয়ে যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অতীত কালে আয়করের নিম্ন-সীমা যখনই নীচে নামানো হয়েছে তখনই দেখা গিয়েছে যে অসংখ্য লোকের কাছ থেকে অল্প-অল্প করে টাকা আদায় করতে গেলে যে বাড়তি প্রশাসনিক ব্যয় হয় তাতে এরকম ব্যবস্থার কোনো সার্থকতা থাকে না।

সম্ভবত বৃত্তিকরের অনেকটা অংশই আদায় হবে না, কিংবা আদায় করতে গেলে অযথা ব্যয় বাড়বে। এই দিক থেকে এবং ন্যায় বিচারের দিক থেকে দেখলে নীচের স্তরের আয়ের লোকদের ক্ষেত্রে বৃত্তিকর না বসানোই সঙ্গত। যেখানে এই করের উর্দ্ধসীমা বছরে ২৫০ টাকা, সেখানে যদি ধরে নেওয়া যায় যে করদাতারা গড়পড়তা বছরে ১০০ টাকা করে দেবেন, তাহলে অর্থমন্ত্রীর হিসাব মত ৯ লক্ষ ব্যক্তি এবং কোম্পানির কাছ থেকে টাকাটা আদায় করা হবে। বহুলোক যারা সঙ্গতভাবে কর দিতে পারে তারা তাদের বোঝা এড়িয়ে যাবে। আদায়ের জন্য কত খরচ হবে তার কোনো নির্দেশ এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। বিধান পরিষদে যখন এসম্বন্ধে বিল আনা হবে তখন সম্ভবত এসম্বন্ধে আর একটু বিশদ খবর পাওয়া যাবে। আপাতত এইটুকু বলা যায় যে বৃত্তিকর আমাদের দেশে নূতন কিছু নয় এবং বর্তমানেও ১০টি রাজ্যে এই কর চালু আছে। রাজ্য সরকারের অর্থ সংস্থান বাড়ানো প্রয়োজন এবিষয়েও সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রত্যেক নূতন পদক্ষেপের সঙ্গে জড়িত আছে একদিকে পারস্পরিক ন্যায় বিচারের প্রশ্ন এবং অন্যদিকে কর আদায়ের প্রশাসনিক ব্যয়ের প্রশ্ন। এই দুই দিক থেকেই নীচের স্তরের উপার্জনে যে বৃত্তিকর বসানো হয়েছে সেটা বাদ দেবার পক্ষে যুক্তি খুব প্রবল। মাসিক ১০০০ টাকা বা অন্ততঃ ৭৫০ টাকার উপর থেকে যদি এই কর বসানো হয় তাহলে সরকারের নীট আদায় খুব কমবে না, কিন্তু অনেকের প্রতি সুবিচার হবে, কর ফাঁকি দেবার সুযোগ কমবে এবং আদায়ের জটিলতা ও ব্যয় কমবে।

অর্থমন্ত্রীর ভাষণ থেকে মনে হয় যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি বর্তমানে তাদের নিজেদের বসানো বৃত্তিকর থেকে বার্ষিক যে ২ কোটি টাকা পায়, রাজ্য সরকারের বৃত্তি কর তার সঙ্গে যুক্ত হবে। ঠিক কীভাবে এই দুই স্তরের করের সমন্বয় হবে সেটা এখনো পরিষ্কার করে বলা হয় নি। সংবিধানের অনুজ্ঞা অনুসারে কারো মোট দেয় বৃত্তিকরের পরিমাণ বছরে ২৫০ টাকার বেশি করা যাবে না। সব চেয়ে ভাল হয় যদি রাজ্য সরকার তাঁদের বৃত্তিকর থেকে আদায় করা টাকার একটা অংশ স্থানীয় সংস্থা-গুলিকে দিয়ে দেন—যেমন দেওয়া হয় চুঙ্গি করের বেলায়। কর আদায়ে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব দুর্বল। আদায়ের সবটা ভার রাজ্য সরকার নিয়ে নিলে এই সব সংস্থা শেষ পর্যন্ত লাভবান হবে। বৃত্তিকর থেকে রাজ্য সরকারের মোট আদায় যদি প্রথম দিকেই বছরে ৯ কোটি টাকা হয় তাহলে পাঁচ বছর পরে সেটা ১৪—১৫ কোটিতে দাঁড়াবে নিশ্চয়। স্থানীয় সংস্থাগুলিকে বছরে তিন কোটি টাকা দিলেও রাজ্য সরকারের হাতে অনেক টাকা থাকবে। অবশ্য প্রথম দিকে বছরে ৯ কোটি টাকা আদায় হবে কিনা এবিষয়েই সন্দেহের অবকাশ আছে।

নান্দীকার, মুদ্রারাক্ষস ও শম্ভু মিত্র

যবনিকা নেমে আসবার মুহূর্তে ক্ষণকালের জন্য পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ হয়ে থাকল তারপর প্রশস্তির দীর্ঘ হাততালিতে ফেটে পড়ল। এই সময়। এ্যাকাডেমীর হলে আলো জ্বলল. চাণক্যবেশী শম্ভু মিত্র মঞ্চে ফিরে এসে সদলে দর্শকের অজস্রধার অভিবাদন গ্রহণ করলেন। বিস্ময়ের, আনন্দের করতালি তখনও থামল না।

নন্দীকার প্রযোজিত মুদ্রারাক্ষসের যে অন্তিম দৃশ্যে দর্শক এমন আবেগে আপ্লুত হলেন, সেই দৃশ্যে তেমন কোনও তীব্র নাট্যমুহূর্ত নেই। আসলে বিশাখদত্তের এই নাটকটি প্রায় আদ্যোপান্ত নিচু পর্দায় বাঁধা। কিন্তু নাটকের শুরু থেকে ধীরে ধীরে অব্যর্থভাবে নাট্যাবেগ ঘনীভূত হতে থাকে। অপরাহ্ন আকাশে মেঘের সমাবেশের মতো, যা সন্ধ্যায় প্রবল বর্ষণে ধরণী অভিষিক্ত করে। কিন্তু এই নিবন্ধ মুদ্রারাক্ষস নাটকের মূল্যায়ন নয় নান্দীকারের প্রযোজনার সমালোচনাও নয়। তবুও না বলে থাকা যায় না যে, শম্ভু মিত্রের দৃঢ় অথচ মৃদু বাচনভঙ্গী। তাঁর সংযত অভিনয় নাটকটিকে প্রাণবন্ত করেছিল। দেড় হাজার বছরের পুরাতন নাটকের আড়াই হাজার বছর আগের এক চরিত্র এই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও জীবন্ত, অর্থবহ হয়েছিল।

আমাদের পরিচিত চাণক্য কুটিল, কূশাগ্রবুদ্ধি, বিশ্লেষণে পটু, আক্রমণে উদ্যত—এই নাটকে সামান্য ভিন্নরূপে উপস্থিত হন। মুদ্রারাক্ষসের চাণক্য ত্যাগী, বিবিক্ত। ধীর এবং অতন্দ্র কিন্তু ক্লান্ত। রাজকার্যে ক্লান্ত, চক্রান্তে ক্লান্ত। তিনি রাজ্যভার সক্ষম হস্তে ফিরিয়ে দিতে চান। তার ইচ্ছা যেদিন পূর্ণ হল, তিনি সানন্দে, ক্লান্ত অবসন্ন পদে বিদায় নিলেন। এখানেই নাটকের শেষ।

ইদানীং শম্ভু মিত্রের মধ্যেও একটা ক্লান্তির ছাপ দেখা যাচ্ছে। নইলে বহুদিন পরে বহুরূপীর দশচক্রের মাত্র দুটি কি তিনটি পুনরভিনয়ের পর ওই নাটকটি আর মঞ্চস্থ হল না কেন? টিকিটের জন্য ভোর থেকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো নাট্যরসিকদের অনুরোধেও নয়। নান্দীকার দর্শকের ধন্যবাদ পাবেন। তাঁরা আবার শম্ভু মিত্রকে মঞ্চে আনতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে একটি পুরাতন ধারার পুনঃ প্রবর্তনও করেছেন। তিন দশক আগেও বিশেষ রজনীতে মঞ্চের রথীরা গোষ্ঠীর বাঁধন ভেঙে মাঝে মাঝে মিলিত অভিনয় করতেন। একমঞ্চে দেখা যেত শিশিরকুমার ও অহীন্দ্রকে, নির্মলেন্দু, নরেশচন্দ্র ও যোগেশ চৌধুরীকে। নান্দীকারের মুদ্রারাক্ষস যদি আবার সেই ধারার সূচনা করে দর্শকসাধারণ আনন্দিত হবেন। প্রতিভাধর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা গোষ্ঠীর গণ্ডী মাঝে মাঝে পার হলে রসিকজনের অকুণ্ঠ ধন্যবাদও পাবেন। নান্দীকার ও শম্ভু মিত্র এত অভিনন্দন পাবার পরও কেন মুদ্রারাক্ষসের আর মাত্র পাঁচটি অভিনয় হবে বলে ঘোষিত হয়েছে?

আজ কলকাতার যে কয়েকটি নাট্য-[illegible] [illegible] [illegible] বাইরে তাঁদের সামর্থ্যানুযায়ী বাংলা নাটকের নতুন দিকচিহ্ন দেবার চেষ্টা করছেন, তাঁরা অনেকেই চল্লিশের দশকের নাট্য আন্দোলনের উত্তরসাধক। শম্ভু মিত্র সেই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। ত্রিশ বছর পরে আজও বাংলা নাট্যমঞ্চে তাঁর স্থান অক্ষুন্ন আছে। নিউইয়র্ক, প্যারিস, লণ্ডনের বাইরে কলকাতা ছাড়া আর কোনও শহর আমার জানা নেই যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় দশ, বারোটি মঞ্চে অভিনয় হয়। শম্ভু মিত্রের নাট্য আন্দোলন তো এখানেই সার্থকতা পেয়েছে। তবে কেন তাঁর বৈরাগ্য? ১৯৭১-এ চোপ অদালত চলছে-র পর আর কোনও নাটক তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হল না কেন?

শম্ভু মিত্রের বাংলা নাট্যমঞ্চের স্বপ্ন সফল হয়নি। প্রতিবাদে। অভিমানে তিনি এই উদ্দেশ্যে আহৃত লক্ষ টাকা দাতাদের ফেরৎ দেবার আয়োজন করেছেন। আশা করি। এই প্রতিবাদ নাট্যামোদীদের প্রতি নয়। তাদের যা দেবার ক্ষমতা, তারা দিতে কার্পণ্য করেনি। তারা এখনও আশা করে শম্ভুবাবুর আধুনিকতম কীর্তি চাঁদ বণিকের পালা তাঁরই পরিচালনায় মঞ্চস্থ হবে। চাঁদ সদাগরের সুপরিচিত কাহিনীর আধারে এক অভিযাত্রীর একনিষ্ঠ, বিফল যাত্রা, শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে পাঠ শুনে শ্রোতারা একদিন অভিভূত হয়েছিলেন: তাঁর চাঁদ বণিক প্রত্যয়ে অটল ছিল, আদর্শে একনিষ্ঠ ছিল, যার শেষ পারানির কড়ি: আমি মাথা মানিনি, আমি বিশ্বাস হারাইনি, আমি পাড়ি দিয়েছিলাম। প্র. কু. ম

অন্তরঙ্গ আবহাওয়ার ঘনিষ্ঠ কবি

সুরজিৎ ঘোষ

ওঁদের কত্তে দেখে মনে হলো এই ভিড়ের মধ্যে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই আমার খুব অন্তরঙ্গ।....তারা সব আমার রক্তের লোকের। বানানো কথা নয়, এই অনুভব যাঁর সংশয়হীন নিশ্চিত প্রত্যয় সেই কবির নাম 'অরুণ মিত্র', যাঁর সংবেদনশীল অনুভূতি-প্রবণ অথচ সংহত কাব্য 'প্রাজ্ঞের মতো নয়, শিশুর ছুঁয়ে দেখার মতো করে কথা বলে।

এই শতাব্দীর প্রথমদিকে যাঁর জন্ম (২রা নভেম্বর, ১৯০৯ যশোহর) বড় হওয়া মধ্যকালীন মন আটকানো দেয়ালের ভেতর, কোনখান থেকে তিনি আহরণ করেন এই সতেজ বিস্ময়, সেই অনুসন্ধিৎসার গভীরে যেতে হলে মানবিক স্তরে তাঁর জীবন এবং নিভৃত প্রবণতার পটভূমিতে চোখ ফেরাতে হবে আমাদের। বর্তমান জীবনের প্রচলিত লাভক্ষতির অংকের হিসেবে যিনি আমূল কাঁচা, ছাত্রজীবনে তিনিই কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশনে অংকে লেটার পেয়েছেন। বঙ্গবাসী কলেজে ইন্টারমিডিয়েটও পড়েছেন বিজ্ঞান বিভাগে। তারপর রিপন কলেজে বি-এ পড়বার সময় থেকে পড়াশুনার বদল সাহিত্যের দিকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় বছর ইংরেজীতে এম-এ পড়েও শেষঅবধি পরীক্ষা দেওয়া হলো না পারিবারিক কারণে। তার আগেই ঢুকে পড়া গেছিলো সাংবাদিকতার কাজে। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৩২ থেকে ৪২ অবধি বার্তা বিভাগের কাজ। বিশেষ করে বিদেশী সংবাদ প্রায় সবই সাজানো। ছিল তাঁর দায়িত্ব। পিতৃপ্রতিম সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন মাথার উপর, পাশে পাশে বন্ধু হয়ে প্রেরণা হয়ে। আর খোড়ো হাওয়ার মতো জুটে গেল সব মনের কাজের সহকর্মী—বিজন ভট্টাচার্য, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, এমন আরও অনেকজন। তারপর 'অরণি।' ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৮ সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়ভার নিয়ে কেবল চলা নয়, দৌড়নো। সেই 'অরণি' বাংলা সাহিত্যের তার সমকালতার এক উজ্জ্বল অধ্যায়। যেখানে প্রথম প্রকাশিত হলো সুকান্ত ভট্টাচার্য'র কবিতা, বিজন ভট্টাচার্য'র নাটক নবান্ন। তখন অজস্র কাজের। এরই মধ্যে চলছে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগ, আবার বহুকাংখিত ফরাসী ভাষার চর্চা আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজ-এ। কিছুদিন আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজ-এর গ্রন্থাগারে সহকারীর কাজও করা গেলো। এই সময় ১৯৪৮ সালে আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজ-এর উদ্যোগে তাঁর ফ্রান্স যাত্রা। ১৯৫১ সাল অবধি সেখানকার সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় কাটিয়ে ৫২ সালে আবার ফিরলেন ভারতবর্ষে। তাঁর একটা বদলানো জীবন যাপন। এবার অধ্যাপনা. '৫২ থেকে '৭২ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষার শিক্ষক ছিলেন। ১৯৭০ থেকে আবার কলকাতায়, ধরাবাঁধা চাকরি থেকে এবার অবসর। রইল কেবল স্বতঃস্ফূর্ত লেখা আর পড়ার জগৎ।

আমার মনে হয়, কবির ব্যক্তিগত জীবনের আর কোন অনুপুঙ্খ বিশদে তাঁর পাঠকের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এটুকুও দরকার হল কেবল তাঁকে জানতে পারার তাঁর মানসিক গঠনটা বোঝবার একটা সূত্র আবিষ্কারের তাগিদে। ছকে বাঁধা নিরুপদ্রব আশ্বাসের জীবন তাঁর সাধ্যায়ত্ত হলেও ঈপ্সিত যে ছিল না তাই কি স্পষ্ট নয় উপরের সারসংক্ষেপে। বৈদগ্ধ নয়, মেঠো পাগলামির জীবন তাঁর প্রিয়, প্রিয় খোলা গলার ছোট্ট সুর ঝনঝনিয়ে গান, যে পাগলামি, যে গানের খরস্রোত টানের দোসর বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। শিল্পের চেয়ে মানুষ চিরকালই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করেছে, করে। আর এই মানুষকেই কেবল সব কিছুর পরেও এই প্রতিযোগিতা দীর্ণ জীবনে একমাত্র নিঃশ্বাসের মতো উচ্চারণ করা যায়। অরুণ মিত্র-র কবিতার প্রতিশ্রুতি সেইজন্যই বিশ্বাস করতে জানে, বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে।

তের বছর বয়েসেই খাতায় হিজিবিজি কাটার অভ্যাস শুরু হয়েছিল তাঁর। ছাপার অক্ষরে প্রথম কবিতা বেরোল বছর পনেরো বয়সে, বাংলার বিপ্লবীদের সাময়িক পত্রিকা বেণুতে যাঁর সম্পাদক ছিলেন শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়। কলেজ জীবনে ম্যাগাজিনে কিন্তু প্রবন্ধ লিখেছেন ইংরেজিতে, বিষয় ফরাসী গদ্যকার আলফঁস দোদে। পরবর্তী অরুণ মিত্রের চরিত্রতা এবং ফরাসী চর্চার ইঙ্গিত এই পর্ব থেকেই পাওয়া যায়।

অরুণ মিত্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪৩-এ। প্রান্তরেখা। সমকালীন রাজনৈতিক ব্যূহের উন্মাদমতা এবং গোষ্ঠীগত প্রত্যয়ের উচ্চারণের ভিতর থেকে অরুণ মিত্রর অনন্যতা স্পষ্ট বোঝা যায় না এই গ্রন্থে। সেই বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হয় 'উৎসের দিকে'। উৎসের দিকের প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪-র, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৭-র সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোড়ন কবির ব্যক্তিগত আকুতিতে এখানে মৌলিক স্বাতন্ত্র্যে বিধৃত হয়, 'একটি বিপন্ন ঘর গড়া হয় বুকে বুক রেখে।' উপরতলার ফেনিল আবেগের চাঞ্চল্যকে ছাড়িয়ে অরুণ মিত্র ছুঁয়ে থাকেন অস্থিরতার কেন্দ্রগত স্থির সত্যকে। আপাতদৃষ্টিকে অন্তরালবর্তী সত্যের প্রতীক হিসেবে আবিষ্কার করেন আড়াল সরিয়ে দেখার নিঃশব্দ জাদুতে। এই দেখার জন্য তাঁকে অতন্দ্র প্রতীক্ষায় থাকতে হয়. তাই 'অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের চোখের পাতা পড়ে না।' তারপর একসময় তিনি অনুভব করেন প্রত্যাশার পাথর বিদীর্ণ করতে হলে সান্ত্বনার হাত নয়, যন্ত্রনার বিস্ফার প্রয়োজন, যখন বলেন 'হে বন্ধ্যা তোমার গর্ভে যন্ত্রণা একবার নড়ুক।'

'উৎসের দিকে'র পরে ক্রমে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'ঘনিষ্ঠ তাপ' (১৯৬৩) তারপর মঞ্চের বাইরে মাটিতে (১৯৭০) এবং এখন পর্যন্ত সব শেষ 'শুধু রাতের শব্দ নয়' (১৯৭৮)। অরুণ মিত্র-র সমস্ত কবিতার পরিমন্ডলে বিকীর্ণ মানুষের জন্য যে ভালোবাসা, তার তাপ ক্রমশ নিবিড় হয়ে উঠেছে। তাঁর গম্ভীর অথচ সুরেলা ধ্বনি-বিন্যাস, পরিমিতি, বাকসংযম অথচ টানটান অনুভূতি প্রবণতা বাংলা কবিতার ভান্ডারে ছড়িয়ে দিয়েছে অসামান্য ইঙ্গিতময় চিত্রময়তা, প্রত্যক্ষ জগতের যোগ্য অনুধাবনের প্রাণময় ছবির পর ছবি। কখনো এমনি বিশেষ জীবন্ত চরিত্রের ঘুরেফিরে আসা, জীবন ও কবিতার মর্মে তার ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকা (মঞ্চের বাইরে মাটিতে'র বুলা) কখনো বা কবিতার কেন্দ্রবিন্দুতে কোন চরিত্রের তাৎপর্যময় অবস্থান (ঘনিষ্ঠতাপ-এর 'রিক্সাওয়ালা' বা 'সে') তাঁর কবিতার স্পর্শময়, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বাস্তব দ্যোতনায় এক ভিন্নতর সাংকেতের মাত্রা যোগ করে। বাস্তব বিশেষের স্তর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এই সব ব্যবহার ক্রমে নির্বিশেষ হয়ে ওঠে। আবার কখনো লৌকিক কাহিনীর অস্পষ্ট আভাস তাঁর কবিতাকে অন্য মহিমা এনে দেয় অ্যাবস্ট্রাক্ট ধ্যান-ধারনা থেকে সরিয়ে এনে আমাদের মানুষের ঘরে মুখ ফেরাতে শেখায়।

কবি এবং পাঠকের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ সাধারণ ভূমি বা আবহাওয়া সৃষ্টি করার একান্ত প্রয়োজন অরুণ মিত্র-র কবিতার মাটি, জল, আলো-বাতাস তা আয়ত্ত করেছে অনায়াসে। শব্দার্থের সীমাবদ্ধতা তাঁর সন্ধি বা পূর্ণতার প্রতীককে আচ্ছন্ন করতে পারেনি

কারণ একই শব্দ তাঁর কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন সংস্থাপনে নতুনভাবে উচ্চারিত হয়েছে। 'ঘরের মধ্যেকার অনড় বাতাসে' কিংবা 'মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার' সর্বত্রই তিনি অনুভব করেছেন এক মুক্তির প্রসার, সুন্দরের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের বিস্ময় শিহরণে স্পন্দিত হয়ে।

অরুণ মিত্র-র কবিতার সব প্রশ্ন, সব জ্বালাই একসময় পরম বিশ্বাসে স্তব্ধ রাখে। বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে নয়, তার ক্লেদ, কুশ্রীতা ও জঘন্য কোলাহলকে অতিক্রম করে। 'কষ্ট কি ছিল না? ভীষণভাবেই ছিল। খাবারের দোকানের কাছে ভিখিরির ছেলেটা কোনদিন আমাদের নজর এড়ায়নি।' ....তবু আমরা তাদের ছাপিয়ে উঠেছিলাম। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন তাণ্ডবের অন্তর্নিহিত সুস্থিত অবস্থানে। ধ্বংসের কথা নয়, তার পরে যে অতন্দ্র ধ্যানে বসে মানুষ নতুন জীবনের প্রতিমা গড়ার কাজে তার উপরেই কবির বিশ্বাস।

প্রদর্শন নিস্পৃহ অথচ হাটের গোঝে সংগোপনে মানুষের হৃদয়ের অন্তরঙ্গ এই অরুণ মিত্রর কথা বলাই বর্তমান প্রতিবেদকের উদ্দেশ্য। তাঁর অসামান্য গদ্যছন্দের আলোচনা এই প্রসঙ্গে অনুপস্থিত. অব্যান্তর, এখানে তাঁর ফরাসী ভাষা এবং সাহিত্যে পাণ্ডিত্য। বরং অন্য অনুষঙ্গ মনে করা যেতে পারে ফরাসী অধ্যাপকদের শিক্ষাদানের আগ্রহে এবং শৃংখলা তাঁকে কত অভিভূত করে রাখে এই পরিণত বয়স পর্যন্ত। সেই কথা। লক্ষ্য করা যেতে পারে তরুণদের কবিতার দিকে এই বয়েসেও তাঁর সাগ্রহ অভ্যর্থনা। আধুনিক কবিতা কোন সাফল্যেই থেমে না গিয়ে চলতে থাকুক এই তাঁর মনোগত বাসনা।

অরুণ মিত্রর শেষতম কাব্যগ্রন্থ শুধু রাতের শব্দ নয় এবারে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে। আনন্দ এবং গৌরব যেমন সমস্ত কবিতা-অনুরাগীর, কবির তেমনি পুরস্কারের উদ্যোক্তাদেরও। আর একটা কথা হয়তো অনেকের কাছে সুবিদিত নয় তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচিতি। শিকড় যদি চেনা যায় নামে একটি অনন্য উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি দুই পর্বে ত্রৈমাসিক অলকানন্দা পত্রিকায় যা গ্রন্থাকারে সদ্য প্রকাশিত। প্রকাশের পথে আর একটি অমূল্য অনুবাদ গ্রন্থ। এলসা ত্রিয়োলের মায়াকোভস্কিং পূর্ণ অনুবাদ সরাসরি ফরাসী থেকে। এপর্যন্ত ইংরাজিতেও বইটির অনুবাদ হয়নি। অরুণ মিত্র-র অনুবাদ পড়লে মনে হয়, মূল বইটি যেন বাংলাতেই লেখা। এছাড়াও তিনি প্রচুর কাজ করে চলেছেন এখনও। ত্রৈমাসিক প্রমা পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি অন্যতম সক্রিয় সদস্য। তাছাড়া বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনার ফাঁকে ফাঁকে এখনও চলছে কবিতার নতুন সন্ধান। পুরস্কার কাউকে তখনই দিলে কাজে লাগে যখন তিনি সৃষ্টি-সক্ষম। অরুণ মিত্র-র ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দেরি করলেও বিশেষ ক্ষতি হয়নি, কেননা, তিনি এখনও সচল। আর পুরস্কার, সম্বর্ধনা ইত্যাদির যেটা ভয়ের দিক, ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে ফেলা—সেটাও এক্ষেত্রে ঘটবে না বলেই মনে হয় কারণ তিনি চিরদিন উপেক্ষা করতে পেরেছেন ময়দান আর জনসভার প্রবল হাততালির প্রলোভনকে যা একজনের, না লাখ-লাখের ঠিক ধরা যায় না। সাজানো মণ্ডপের ঝাড়লণ্ঠন ছাড়িয়ে তাই তাঁর চোখ আর মন চেয়ে থাকে কবিতার সেই উৎসবে যেখানে তারা থেকে তারায় হাৎ উওতর হয়।

মহারাণীর পয়লা প্রজা দ্বারকানাথের ব্যবসাবাণিজ্য

কাজল মিত্র

বাকিংহাম প্যালেস। ১৮৪২ সালের মোলই জুন। মহারাণী ভিকটোরিয়ার ড্রয়িং রুমে লর্ড ফিটজেরাল্ড-এর সঙ্গে এসে ঢুকলেন অসামান্য রূপবান এক পুরুষ। ছিপছিপে গড়ন। টানাটানা চোখ। উন্নত নাসিকা। পরনে দুধের মত শাদা সিল্কের চোগা আর চাপকান। তার ওপর উপবীতের মত দুদিক দিয়ে জড়ানো কাশ্মিরী শাল। চোখে মুখে একটা অসাধারণ দীপ্তি। লর্ড ফিটজেরাল্ড সসম্ভ্রমে সেই অতিথিকে নিয়ে গেলেন মহারাণীর সামনে। লাল কার্পেটের ওপর কালো ভেলভেট মোড়া থ্রোন চেয়ার। সেখানে বসে আছেন অতুলনীয়া রূপের অধিকারিণী ইংলণ্ডেশ্বরী ভিকটোরিয়া অ্যালবার্ট। আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। লর্ড ফিটজেরাল্ড অতিথির সঙ্গে অধিশ্বরীর পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, হিয়ার ইজ আওয়ার অনারেবল গেস্ট ফ্রম ক্যালকাটা—প্রিন্স দোয়ারকানাথ টেগোর। মহারাণীর মুখে কথা নেই। —এই সম্মানীয় অতিথি একজন বেঙ্গলী? এত রূপ থাকতে পারে কোনও বাঙ্গালীর! প্রিন্স দ্বারকানাথও নির্বাক হয়ে গেছেন বিস্ময়ে। স্বপ্ন সফল হবার বিস্ময়। দীর্ঘ প্রত্যাশার সাফল্যের বিস্ময়। আজকের এই দিনটির জন্যেই তো তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। সুদীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় প্রতিটি মুহূর্তে কত ছবি আঁকা হয়েছে আর কতবার কত ভাবনার ঢেউ আছড়ে পড়েছে তাঁর মনে তা তিনি নিজেই জানেন না। শুধু একটা বিচিত্র অনুভূতি, একটা অদ্ভুত শিহরণ জেগেছে বারংবার, যা কোনদিন ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

দেয়ালের গ্র্যান্ড ফাদার ঘড়িতে সুরেলা আওয়াজ। চমক ভাঙ্গল মহারাণীর। অতিথিকে বসতে বললেন সামনের চেয়ারে। করমর্দন আর শুভেচ্ছা বিনিময় হলো। এরপর এলেন তাঁর স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট। এলেন ডাচেস অফ কেন্ট। একে একে রাজ পরিবারের সকলে। কলকাতার প্রিন্সকে তাঁরা দেখলেন. মুগ্ধ হলেন।

দ্বারকানাথ প্রথমবার বিলেত যান ১৮৪২ সালের জুন মাসে। তখন তাঁর বয়স আটচল্লিশ বছর। ভিকটোরিয়ার বয়স মাত্র তেইশ। ১৮৩৭ সালের একুশে জুন রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুর পর মাত্র আঠারো বছর বয়সে ইংলন্ডের সিংহাসনে বসেন ভিকটোরিয়া। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী আর সেই রাজধানীর উনিশ শতকের নবজাগরণের আকাশে অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দ্বারকানাথ ঠাকুর। বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েও সেদিনের বেনিয়া আর অর্থ সরবরাহকারদের মত সাহেবদের তুষ্ট করার নিছক সখ ছিল না তাঁর। তাই জন্মসূত্রে রাজপুত্র না হয়েও চাল-চলন আর রুচি-বোধের জন্যে প্রিন্স আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। এই খেতাব দরবারের দেওয়া নয়. অনুরাগীদের আদরের নাম।

'—দ্বারকানাথ যখন প্রথমবার বিলাত যান তখন তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবসে টাউন হলে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। এই সভায় গণ্যমান্য য়ুরোপীয় ও বাঙ্গালীগণ উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণও দলে দলে আসিয়া এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রত্যেক রবিবার দ্বারকানাথের টিফিনের অংশভাগী হইয়া সেরি-স্যামপেন চালাইতেন এবং অভাব জানাইলেই দ্বারকানাথ যাঁহাদিগকে মুক্ত হস্তে দান করিতেন তাঁহাদের অধিকাংশ লোকই এই সভায় উপস্থিত হন নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।' ১

রামলোচনের দত্তক পুত্র দ্বারকানাথ। পূর্বপুরুষ জয়রামই ঠাকুর বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। সুতানুটিতে ঘর-বাড়ি তৈরী করে ঠাকুর বংশকে জয়রামই প্রতিষ্ঠিত করেন। জয়রামের চার ছেলের মধ্যে নীলমণি আর দর্পনারায়ণ দুই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। দর্পনারায়ণের বড় ছেলে রাধামোহন মদ্যপ আর ছোট ছেলে হরি-মোহন গুরুত্যাগী হওয়ার ফলে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। রাধামোহন ছিলেন একজন ইংরেজ উকীলের মুহুরী। কলকাতার লাটসাহেবের সভার কোন এক সভ্যের কাছে টাকার তাগাদা করতে গিয়ে রাধামোহনকে চাবুক খেতে হয়েছিল। সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে আগুন লাগিয়ে দিলে জয়রাম ঠাকুর

১। ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া : ৮ জানুয়ারি, ১৮৪২;
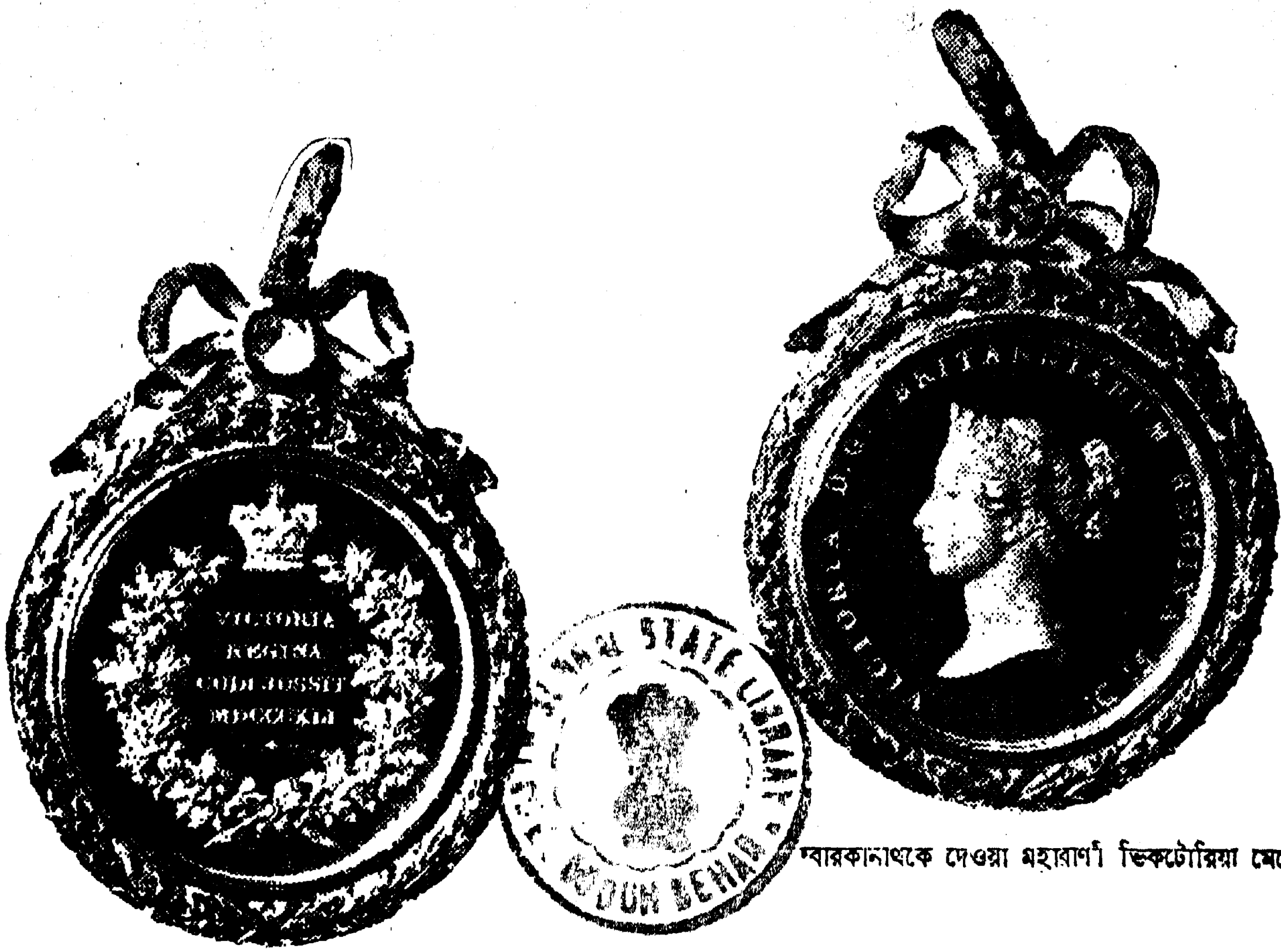
দ্বারকানাথকে দেওয়া মহারাণী ভিকটোরিয়া মেডেল।

সর্বস্বান্ত হয়ে যান। তাঁর মাত্র তেরো হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকে। সেই টাকা দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্ত জীউ-এর সেবার বন্দোবস্ত করে যান। দর্পনারায়ণের ভাই নীলমণি ছিলেন কোম্পানির সেরেস্তাদার।

নীলমণির তিন ছেলে—রামলোচন, রামমনি আর রামবল্লভ। রামমণির দুই বিয়ে। দুই পত্নীর তিনটি ছেলে। প্রথমা পত্নীর দ্বারকানাথ ও রাধানাথ আর দ্বিতীয় পত্নীর রমানাথ। রামলোচনের সন্তান না থাকায় তিনি দ্বারকানাথকে দত্তক নেন। এর আগেই নীলমণি ১৭৮৪ সালের জুন মাসে জোড়াসাঁকোয় (তখনকার মেছুয়া-বাজার) বৈষ্ণব শেঠের দেওয়া জমিতে বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। দ্বারকানাথের পালক পিতা রামলোচন ছিলেন সেকালের বিত্তবান ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ। 'তিনি তাঞ্জামে চড়িয়া বাড়ী হইতে বাহির হইতেন...। মহারাজ নবকৃষ্ণের কবি ও আখড়াই গান তখন বেশ জমিয়া ছিল বটে, কিন্তু খুব বেশী বিস্তৃত হয় নাই। রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি তখন বাঁচিয়া ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের আদর তখনও সার্বজনীন হয় নাই। রামলোচন ঠাকুরই এই সকল কবি ও কালোয়াতগণকে আহ্বান করিয়া নিজ বাড়ীতে মজলিসি আমোদের বৈঠক করিতেন এবং আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া শুনাইতেন...।' ২

রামলোচন জমিদার ছিলেন। খুব বড় জমিদারী না হলেও তিনি জমিদারী কায়দায় চলতেন। রামলোচনের মৃত্যু হয় ১৮০৭ সালের ১২ ডিসেম্বর। দ্বারকানাথের বয়স তখন মাত্র তেরো বছর। সেই বয়সেই তাবৎ জমিদারীর অধিকারী হলেন দ্বারকানাথ। পাবনা জেলার বিরাহিমপুরের জমিদারীর ভার তিনি নিজের হাতেই নিয়েছিলেন। আর তখন থেকেই জোত-জমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তখন থেকেই দ্বারকানাথ দাতা।

প্রথম জীবনে জমিদারীর কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থেকে আইন সম্পর্কে বিপুল জ্ঞান অর্জন করেন দ্বারকানাথ। পরে তৎকালীন বিখ্যাত আইনবিদ কাটলার ফার্গুসনের কাছে আইন পড়া শুরু করেন। রেগুলেশন আইনে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করার পর তিনি বাংলাদেশ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কয়েকজন জমিদারের ল' এজেন্টের কাজে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে নিজের ব্যবসার কাজের ফাঁকে ফাঁকেও তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন নানাজনকে আইনের পরামর্শ দিয়ে। দিল্লির নবাব হুসেন অ্যালেক খাঁ বাহাদুর ছিলেন দ্বারকানাথের বন্ধু। দ্বারকানাথ নবাবকে আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দিতেন। তাঁর নিজের লেখা ডায়েরির একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন -

প্রিয় নবাব –

আপনার ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে ইংরাজিতে লিখিত একটি পত্র এবং তৎপরে ফার্সিতে লিখিত অপর একখানি পত্র পাইয়াছি।

পূর্বোক্ত পত্র প্রাপ্তির পর হইতেই আমি আপনার নিকট পুনর্বার পত্র আশা করিতেছিলাম। কারণ আপনি আমাকে আপনার মামলা সম্পর্কে জ্ঞাত করিবেন এমত বলিয়াছিলেন। কিন্তু ফার্সী ভাষায় লিখিত পত্র ব্যতীত অন্য কোনও পত্র না প্রাপ্ত হওয়ায় আমি উহারই জবাব লিখিতেছি। স্বাস্থ্য মন্দ হওয়ার দরুন আমার ইংলন্ড যাত্রা পিছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি আগামী সেপ্টেম্বর মাসে যাত্রা স্থির করিয়াছি এবং ইতিমধ্যে আপনি আপনার মামলা সম্পর্কিত দলিলাদি সম্পর্কে অবহিত করিলে আমি তৎসম্পর্কে ব্যবস্থাদি লইতে বিলম্ব করিবনা .....ইত্যাদি ইত্যাদি। [চিঠিখানি ১৮৪৪ সালের ১৪ জুলাই লেখা] ৩

আইনের কাজে নেমে কয়েকটি মামলা পরিচালনা করে দ্বারকানাথ বিখ্যাত হয়ে যান। কিন্তু ব্যবসার টানে বেশি দিন স্থির থাকতে পারেন নি। তাই ল' এজেন্টের কাজ করার সময় তিনি ব্যবসার দালালি শুরু করেন। নীল আর সিল্ক কিনে ইওরোপে চালান দিতে থাকেন। চব্বিশ পরগণার কালেকটর ও সল্ট এজেন্ট মিঃ প্লাউডনের কাছে সেরেস্তাদারের কাজও তিনি করেন ছ' বছর। কিন্তু এখানেও মন টেকে না। চাকরী জীবনকে মনে হয় বন্দী জীবন।

২। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

৩। দ্বারকানাথের ডায়েরি

স্বাধীন ব্যবসার হাতছানি দ্বারকানাথকে টেনে নিয়ে যায় মনের মত ব্যবসা গড়ে তোলার জন্যে।

জে ডব্লু কারেল বলেছেন: '১৮৩৪ সালে দ্বারকানাথ এই পদে ইস্তফা দিয়ে উইলিয়াম কার ও উইলিয়াম প্রিন্সেপের সঙ্গে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কলকাতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তিনিই ছিলেন প্রথম দেশীয় ব্যক্তি।'৪ ১৮৩৪ সালে উইলিয়াম কারের সহযোগিতায় কার-ঠাকুর কোম্পানি গড়ে তুললেন দ্বারকানাথ।। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কই কারের সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কার ঠাকুর কোম্পানি প্রসঙ্গে দ্বারকানাথ ১৮৩২ সালের ২০ আগষ্ট বেন্টিঙ্ককে লেখেন--'বাংলার ব্যবসায়ের ইতিহাসে এই ঘটনা স্মরণীয়, কারণ ইওরোপীয় এবং বাঙালি ব্যবসায়ীর মধ্যে শেষোক্তের অর্থে একটি প্রকাশ্য ও স্বীকৃত অংশীদারী কারবার স্থাপিত হওয়ার এইটি প্রথম নিদর্শন।'৫

এদেশে ইওরোপীয় ধরনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে বেন্টিঙ্ক দ্বারকানাথকে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানান তার মধ্যে কোথাও এতটুকু বাহুল্য নেই। কারণ এর আগে বাঙালীরা তাদের সাধের স্বপ্ন বেনিয়া হতে পারলেই কৃতার্থ মনে করতো নিজেদের। ব্যবসা বলতে তারা বুঝতো ইংরেজকে অর্থ সরবরাহ করা আর মুৎসুদ্দী হিসেবে ইংরেজদের খিদমৎ খাটা। দ্বারকানাথই এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ। তিনিই এই প্রথার পাহাড় ভেঙে চূর্ণ করে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন পরমানন্দে দাসত্ব করাটাই জীবনের আদর্শ নয়।

কার-ঠাকুর কোম্পানির আর যাঁরা অংশীদার ছিলেন তাঁরা হলেন--উইলিয়ম কার ও উইলিয়ম প্রিন্সেপ। বিভিন্ন সময়ে এই কোম্পানির সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন মেজর এইচ বি হেন্ডার্সন, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডব্লু সি এম প্লাউডেন, ডাঃ ম্যাকফার্সন, ক্যাপ্টেন টেলর আর গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রসন্নকুমার ঠাকুরও ছিলেন কিছুদিন। দ্বারকানাথ ছিলেন এই কোম্পানির মধ্যমণি। কোম্পানির যাবতীয় আর্থিক বিষয়ে তাঁর কর্তৃত্ব ছিল অবিসম্বাদিত। দ্বারকানাথের উইলে দেখা যায় কোম্পানিকে তিনি দশ লক্ষ টাকা ধার দিয়েছিলেন। এছাড়াও কোম্পানির কাছ থেকে তিনি অনেক টাকা পেতেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর কার-ঠাকুর কোম্পানি উঠে যায়। ১৮৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারির ক্যালকাটা গেজেটে ঐ বছরের ১২ জানুয়ারি কার-ঠাকুর কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা লেখা হয়। তখনকার কলকাতার বড় বড় সাহেবরা দ্বারকানাথের কাছে নিজেদের ছেলেদের চাকরীর জন্য অনুরোধ জানাতেন। ডায়েরির একটি চিঠিতে দ্বারকানাথ বেঙ্গল আর্টিলারীর মেজর এইচ আই উডকে লিখেছেন:--

১৫ই জুলাই, ১৮৪৪

প্রিয় মহাশয়--

আপনার পত্রের পরিচয় প্রদানকারী-পত্র পাইয়াছি। আপনার পুত্র অসওয়াল্ডকে আমি কয়েকবার দেখিয়াছি। উহাকে দেখিলে অতিশয় কর্মঠ এবং বুদ্ধিমান মনে হয়। কিন্তু বর্তমানে আমার কার্যালয়ে কোনও পদ শূন্য না থাকার ফলে উহাকে আমি চাকুরী দিতে পারিতেছি না। কিন্তু কোনও পদ শূন্য হইলেই উহাকে অগ্রাধিকার দিব ইহা সুনিশ্চিত জানিবেন।

আশা করি বিশ্বাস করিবেন।

ইতি--

দ্বারকানাথ ঠাকুর ৬

দ্বারকানাথের তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমার পিতা ১৭৩৩ শকের পৌষ মাসে য়ুরোপে প্রথম বার যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজশাহী, কটক, মেদিনীপুর, রংপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী এবং নীলের কুঠি, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আমার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না।... অতএব য়ুরোপে যাইবার পূর্বে ১৭৬২ সালে আমাদের পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারির সঙ্গে তাঁহার স্বোপার্জিত ডিহি সাহাজাদপুর ও পরগণা কালীগ্রাম একত্র করিয়া এই চারিটি সম্পত্তির উপরে একটি টাস্টিডিড লিখিয়া তিনজন টাস্টি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।... আমাদের কার-ঠাকুর নামে যে বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল তাহার অর্ধেক অংশ আমার পিতার আর অর্ধেক অংশের অংশী অন্য অন্য ইংরাজ সাহেবরা ছিলেন, ইহার মধ্যে এক আনা অংশ আমার ছিল। আমার পিতা এই ব্যবসায়ে তাঁহার যে অর্ধাংশ ছিল তাহা কেবল আমাকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে অর্ধাংশ আমি কেবল আপনার জন্য রাখিলাম না, আমরা তিন ভাইয়ে তাহা সমান ভাগ করিয়া লইলাম।' ৭

দ্বারকানাথের বুদ্ধির প্রখরতাকে ইংরেজরা কতখানি শ্রদ্ধা করতো আর তাঁর ব্যবসায়ী বুদ্ধির ওপর তারা কতখানি নির্ভর করতো তা ১৮৪৫ সালের একখানি দলিল থেকেই জানা যায়। দলিলটি গ্রেট ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে অফ বেঙ্গলের।' দলিলটি ১৮৪৫-এর ১৫ নভেম্বর স্বাক্ষরিত হয়। ৮ এই দলিলে জন গ্রান্টকে ভারতে এই কোম্পানির এজেন্ট ও প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়। তাছাড়া গ্রান্টকে একটি অকজিলিয়ারি কমিটিও গঠন করার অধিকার দেওয়া হয় যে কমিটিতে আটজন সদস্য থাকবেন এবং ঐ আটজন সদস্যকে নিয়োগ করতে হবে কলকাতার মেসার্স কার-দ্বারকানাথ টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি কিংবা সেই কোম্পানির কয়েকজন সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষে। এ থেকেই বোঝা যায় দ্বারকানাথের বৈষয়িক বুদ্ধি আর ব্যবসায়িক কৃতিত্ব সাহেবদের কতখানি প্রভাবিত করেছিল।

শেরবোর্ণ সাহেবের কাছে ইংরেজী শেখা দ্বারকানাথ আজীবন ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কাটিয়ে গেছেন। সাহেবদের গুণাগুণ তাঁর মত খুব কম লোকেই বুঝতেন। প্লাউডেনের সেরেস্তাদার এবং ম্যাকিনটশ অ্যান্ড কোম্পানির পরিচালক হিসেবে কাজ করার সময় তিনি যে বৈষয়িক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই পরবর্তীকালে তিনি নিজে গড়ে তোলেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

১৮২৯ সালের ৭ আগষ্ট বাংলাদেশে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নামে প্রথম ব্যাঙ্কের কাজ শুরু হয়। এই ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা করেন দ্বারকানাথ জে জি গর্ডন, জন পামার মি কল্ডার এবং জেমস ইয়ং। প্রথম বোর্ড অফ ডিরেকটর্স-এ ছিলেন দ্বারকানাথ। ব্যাঙ্কের মূলধন ছিল প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা। জয়েন্ট স্টক ধাঁচের প্রথম ব্যাঙ্ক হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। ব্যবসা আর চাষবাসের কাজে অর্থ সাহায্য দেওয়াই এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য ছিল। এ যুগের স্টেট ব্যাঙ্ক-এর পথ প্রদর্শন করে গেছেন দ্বারকানাথ ১৮২৯-এ। নানা কারণে ১৮৪৭ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন ঘটে। তখনকার কমার্শিয়েল ব্যাঙ্কের পরিচালক ছিলেন ম্যাকিনটশ অ্যান্ড কোম্পানি। দ্বারকানাথ ছিলেন ম্যাকিনটশের অংশীদার। স্বাভাবিকভাবে তিনি এই ব্যাঙ্কেরও অন্যতম পরিচালক ছিলেন। ১৮৩৩ সালে ম্যাকিনটশ কোম্পানি ফেল পড়ে। কমার্শিয়েল ব্যাঙ্কেরও আয়ু শেষ হয়। কিন্তু দ্বারকানাথ কাউকে ফাঁকি দেন নি। 'সমাচার দর্পণে' ১৮৩৩ সালের ৫ জানুয়ারি প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে জানা যায়--শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ ব্যাঙ্কের শত দাওয়া আছে তাহা পরিশোধ করিবেন।'

দ্বিতীয়বার ইওরোপ যাবার আগে দ্বারকানাথ ডিনস ক্যাম্পবেলের সহযোগিতায় বেঙ্গল কোল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। আলেকজান্ডার কোম্পানির রাণীগঞ্জের কয়লাখনি দ্বারকানাথ নীলামে ৭০ হাজার টাকায় কিনে নেন।

বৈষয়িক বুদ্ধি আর ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতায় দ্বারকানাথ বুঝেছিলেন দেশের অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

৪। দ হাউস অফ টেগোরস। ৫। ট্রেড অ্যান্ড ফিনান্স ইন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী * অমলেশ ত্রিপাঠী।

৬। দ্বারকানাথের ডায়েরি।

৭। আত্মজীবনী, ৮। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে দলিলটি আছে।

করতে হলে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। শিল্পের প্রসার ছাড়া কোনও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই তিনি একের পর এক শিল্পে হাত দিয়েছেন। এমন কী সংবাদপত্রের মালিকানাও তিনি কিনে নিয়েছিলেন। জন বুল পত্রিকার দুর্বোধাগারের যোগ্য জবাব দেবার জন্য তিনি তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকা বেঙ্গল হরকরার স্বত্ব কিনে নেন। সংবাদপত্রকে সরকারী নিয়ন্ত্রন থেকে মুক্ত করার জন্যে দ্বারকানাথের সংগ্রাম সাংবাদিকতার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

ব্যবসার ব্যবহারিক জগতের বাঁধা নিয়মে আবদ্ধ থেকে কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন দ্বারকানাথ। রক্তে জমিদারীর আভিজাত্য। আহার—বিহার আর শিল্প-কলার প্রতি একটা সহজাত আকর্ষন তাঁকে বারে বারে হাতছানি দেয়। জোড়াসাঁকোর নতুন বাড়ি তৈরীর পর গৃহপ্রবেশের উৎসবে দেখা যায় এক অন্য দ্বারকানাথকে সকালের সংবাদপত্রে খবর ছাপা হয়—১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর নূতন গৃহ প্রবেশোপলক্ষে সাহেব বিবিগনের নাচগান ও ভোজন ও নানা সঙ দেওয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একজন বহুরূপী গরু সাজিয়া ঘাস খাইয়াছিল।" এই মেজাজের দ্বারকানাথ বেলগাছিয়া ভিলায় সাহেব-মেমদের নাচ-গানের বন্যা বইয়ে দিতেন। বেলগাছিয়া ভিলা ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সেই বাড়ির দেয়াল ভেঙে আস্তাবল আর রান্নাঘরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। হেস্টিংস এই বাড়ি বিক্রি করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে। ব্যারাকপুরে গভর্নমেন্ট হাউস তৈরির আগে পর্যন্ত লর্ড অকল্যান্ড আর লর্ড ড্যালহৌসি প্রতি সপ্তাহে ছুটি কাটাতেন বেলগাছিয়া ভিলায় এসে। পরে দ্বারকনাথ কোম্পানির কাছ থেকে বাড়িটি কিনে নেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ পিতৃঋণ পরিশোধের জন্যে ভিলার জিনিসপত্র নীলাম করেন।

"১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে স্বর্গগত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের কলিকাতার কিয়দংশ বিষয়-সম্পত্তি নীলামে বিক্রীত হইয়া যায়। বেলগাছিয়ার সুরম্য উদ্যানে যে সকল বহুমূল্য প্রস্তর মূর্তি, ছবি ও কাঠের জিনিস ছিল, বর্ধমানের মহারাজবাহাদুর তাহা নীলামে ক্রয় করেন। বাগানের তৈবত্ত্বাধিকারী মহাশয়ের কৃতী পুত্রগণ বাড়ীখানি ও ভূমিগুলি ৫৫ হাজার টাকা দিয়া খরিদ করিয়া লন। বাড়ী জমি ও অন্যান্য যাবতীয় বস্তু বিক্রয় করিয়া সর্বসমেত প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠিয়াছিল।[৯]

১৮৫৭ সালের ১ জুলাই হাইকোর্টের রিসিভারের কাছ থেকে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বেলগাছিয়া ভিলা কিনে নেন। ভিলার বিরাট বাগানের মধ্যে ছিল মতিঝিল। মতিঝিলের মাঝখানে একটি দ্বীপ। দ্বীপের ওপর ছিল দ্বারকানাথের গ্রীষ্মাবাস। এই গ্রীষ্মাবাসই ছিল আমোদ-প্রমোদের জায়গা। কলকাতার কেনসিংটন। বিশাল বৈঠকখানাকে একটি অতুলনীয় সংগ্রহশালা বললে অত্যুক্তি হতো না। বেলগাছিয়া ভিলায় আসতেন না এমন বড়লোক তখন কলকাতায় খুব কমই ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বর্ণনায়ঃ 'যখন এখানে গবর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড ছিলেন, তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্য সমারোহে গবর্নর জেনারেলের ভগিনী মিস ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়। রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্যে, নৃত্যে, মদ্যে, আলোকে বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল।"[১০] এখন এই বাড়িকে সন্ধের সময় দেখলে একটা প্রেতপুরী মনে হয়। সামনে পাতাল রেলের খোঁড়া রাস্তায় মাটির

৯। দি ক্যালকাটা স্টার ঃ ১৮৪৮, সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর দি ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক উদ্ধৃত।

দ্বারকানাথ : সেফ-এর আঁকা তৈলচিত্র
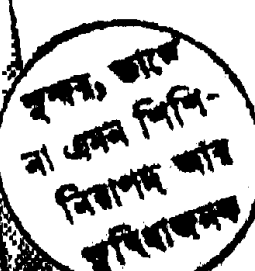
পাহাড়। ভিলার গেট ভেঙে বড় বড় ক্রেন ঢুকে গেছে ভেতরে। দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে দ্বারকানাথের সাধের প্রাসাদ বেলগাছিয়া ভিলা।

কার-টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই দ্বারকানাথ ইওরোপে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। উপলক্ষ দেশ-ভ্রমণ। লক্ষ্য হয়তো ছিল মহারানী দর্শন। কিন্তু তীক্ষ্ন বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন দ্বারকানাথ তাঁর ইওরোপ ভ্রমণের যে ডায়েরি লিখে গেছেন, তাতে কোথাও কোনও দুর্বল মুহূর্তের কথা নেই। প্রথমবারের সফরে লন্ডনে পৌঁছুবার পর ভিকটোরিয়ার বিশেষ আমন্ত্রণে দ্বারকানাথ বৃটিশ সেনাদের কুচ-কাওয়াজ দেখেন। সেই অনুষ্ঠানে সেদিন উপস্থিত ছিলেন মহারাণী ভিকটোরিয়া, যুবরাজ অ্যালবার্ট, ডিউক অফ ওয়েলিংটন আর ডিউক অফ কেম্ব্রিজ। এর পর আবার আমন্ত্রণ। মহারানীর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ। বাকিংহাম প্রাসাদের অন্তঃপুরে কলকাতার প্রিন্স আর ইংলন্ডের রানী একই টেবিলে মুখোমুখী বসে আন্তরিক আলোচনায় মগ্ন। প্রিন্সকে মহারানীর সেদিনের উপহার লন্ডন মিন্ট-এ তৈরি তিনটি কাঞ্চন মুদ্রা। খানিক বিশ্রামের পর বিদায়। কয়েকদিন পরে দ্বারকানাথ সমীপে আবার এল মহারানীর দূত। ইংলন্ডেশ্বরী আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রিন্স টেগোরকে রাজপ্রাসাদের নার্সারী পরিদর্শনের জন্যে। আমন্ত্রণ রক্ষিত হলো সানন্দে। তারপর দ্বারকানাথ গেলেন 'টাইমস' পত্রিকার অফিসে। সেখান থেকে লন্ডনের ডাক-ব্যবস্থা পরিদর্শন করতে। ব্যাঙ্ক অফ ইংলন্ডে গিয়ে দ্বারকানাথ দেখলেন নোট ছাপানোর বিচিত্র পদ্ধতি। একুশে জুলাই লন্ডন থেকে রওনা হয়ে দ্বারকানাথ গেলেন শেফিল্ডে ছুরি-কাঁচি তৈরির কারখানা দেখতে। নিউক্যাসেল-এ কয়লাখনি দেখে মুগ্ধ দ্বারকানাথ দীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেন ডায়েরিতে। এডিনবরা হয়ে স্কটল্যান্ডের বাণিজ্যকেন্দ্র গ্লাসগো। সেখান থেকে লিভারপুল আর ম্যাঞ্চেস্টার। প্রতিটি জায়গাতেই ব্যবসায়ী দ্বারকানাথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন উৎপাদন আর ব্যবসার নানা পদ্ধতি। তারপর আবার লন্ডন। আবার মহারানীর আমন্ত্রণ। উইন্ডসরে ভিকটোরিয়া-অ্যালবার্টের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন। ২৯ সেপ্টেম্বর টেবিলে মুখোমুখী বসে সহাস্য আলাপের মাঝখানে দ্বারকানাথ অনুরোধ জানালেন রানী আর অ্যালবার্টের অয়েল পেইন্টিং-এর জন্যে। সানন্দে সম্মত হলেন ভিকটোরিয়া।

১৫ অকটোবর এল বিদায় নেবার দিন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এলেন দ্বারকানাথকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স।

লন্ডন থেকে প্যারিস। আটাশে অকটোবর সেন্ট ক্লাউডে দ্বারকানাথ ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রানী, তাঁর বোন মাদাম এদেলেইদ, বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড আর তাঁর রানীর সঙ্গে পরিচয় হয় দ্বারকানাথের। প্যারিসে থাকাকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেকটর্স দ্বারকানাথকে তাঁর স্বদেশের জন্যে কাজের পুরস্কার হিসেবে একটি অভিজ্ঞানপত্র আর স্বর্ণপদক উপহার দেন. ১৮৪৩ সালের ৫ জানুয়ারি ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়ায় লেখা হয়—"ফরাসী দেশীয় রাজগণের প্রথানুসারে আগন্তুক ব্যক্তি কখনোই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু লুই ফিলিপ সেই প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া দ্বারকানাথকে নিজ অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্বীয় মহিষীর সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় করিয়া দেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বেলজিয়ামের রাজা ও রানী, নিমুর্সের ডিউক ও ডাচেসসহ রাজকুমারী ক্লেমেন্টাইনের সহিত দ্বারকানাথের পরিচয়-দান ও গুণকীর্তন করিতে ত্রুটি করেন নাই। দ্বারকানাথের সম্মানের জন্য সমগ্র রাজভবন আলোকিত করা হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং তাঁহাকে বাটির ভিতর লইয়া গিয়া তাঁহার যাবতীয় ঘর ও আসবাবসামগ্রী দেখাইয়াছিলেন।"

ফ্রান্সে থাকাকালে একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। একদিন এক ভোজসভায় দ্বারকানাথের নিমন্ত্রণ। সেই সভায় ফ্রান্সের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভা আলো করে বসে আছেন প্রিন্স। সকলেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ব্যগ্র। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন দ্বারকানাথের এই আদর-অভ্যর্থনা দেখে মনে মনে জ্বলছিলেন। হঠাৎ তিনি দ্বারকানাথকে জব্দ করার জন্যে বললেন 'এবার আসুন আপনার সঙ্গে একটু মল্লযুদ্ধ করা যাক।' দ্বারকানাথও পিছিয়ে যাবার লোক নন। তিনি একটি কথাও না বলে সোজা উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন। সকলেই অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। মল্লযোদ্ধা তো সেই

দ্বারকানাথকে ভিকটোরিয়ার ছবি উপহার প্রসঙ্গে উইন্ডসোর ক্যাস্‌ল থেকে লেখা চিঠির প্রতিলিপি

Windsor Castle
August 3/44

My dear Sir

As I wrote to you some time ago to announce to you officially that the two Royal Portraits painted, at your request, for the [illegible] of Calcutta were already embarked for India, so I now write to inform you that The Queen has commanded one Miniature of Herself to be made as soon as possible, and to be transmitted to you for your own Private Collection as a special mark of Her Majesty's favor..

You are probably aware that Artists employed in the portraiture of Royalty are apt to be somewhat dilatory, and I may not be able to get yours finished as soon as I could wish, but I will take care that it is in my [illegible] and will afterwards forward it by a secure conveyance to India. —

I shall be anxious to hear what the best informed and most unprejudiced persons in your country say of the wonderful changes that have lately occurred in the Govt of British India, but I must probably wait until [illegible] of such an person visiting England: for it is a delicate subject on which to commit oneself in writing, and all the world is now [illegible] [illegible] of [illegible] [illegible] a matter [illegible].

I am my dear Sir
very truly yrs
[illegible]

Dwarkanath Tagore

ভদ্রলোকের ওপর রীতিমত ক্ষুব্ধ। হঠাৎ সকলের চমক ভাঙল। দ্বারকানাথ আবার ফিরে এসেছেন পালোয়ানের বেশে। হাসির রোল পড়ে গেল তাঁর সাজসজ্জা দেখে প্রতিদ্বন্দ্বী ভদ্রলোক জানতে চাইলেন দ্বারকানাথ এই বেশে কেন। মুখ টিপে হাসতে হাসতে দ্বারকানাথ বললেন, 'আমাদের দেশে পালোয়ানেরা এই বেশে কুস্তি লড়ে।' ভদ্রলোক তখন পালাতে পথ পান না।

ইংলন্ড থেকে কলকাতায় ফেরার পর দ্বারকানাথকে একঘরে করবার সিদ্ধান্ত নিলেন 'প্রকৃত হিন্দুরা'। কালাপানি পার হওয়া ম্লেচ্ছ দ্বারকানাথের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার তোড়জোড় চলতে লাগল। দ্বারকানাথের আত্মীয়-পরিজনেরাও এই আন্দোলনের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শহর জুড়ে নির্বিবাদে দ্বারকানাথের সমালোচনা চলতে লাগল। রাজনারায়ণ বসু এর প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ 'দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]কার লোকেরা তাঁহাকে প্রিন্স দ্বারকানাথ টেগোর বলিয়া ডাকিত। মহারানী ভিক্টোরিয়ার নিকট তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি একেবারে দ্বারকানাথ ঠাকুরে মোহিত হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয়না। তাঁ[illegible] মহারাণীকে নবরত্ন অলংকার ও অনেক অনেক বহুমূল্য উপহার দিয়েছিলেন। এই অসাধারণ ব্যয়শীলতা নিবন্ধন তাঁহার যখন মৃত্যু হয় তখন প্রায় এক ক্রোর টাকা দেনা আর প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মাত্র বিষয় রাখিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রবাবু একেবারে অত্যন্ত পরিমিতাচারী হইলেন।

প্রতিদিন চর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয় পৃথিবীর যাববতীয় উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য পুরিত টেবিলের পরিবর্তে ফরাসের উপর বসিয়া কেবল রুটি-ডাল ভক্ষন ধরিলেন। দেবেন্দ্রবাবু টেবিলে খাবারের সময় একটু একটু সুরা পান করিতেন। এই সময় হইতে তাহা চিরকালের মত পরিত্যাগ করেন।' ১১ দ্বারকানাথের বিলেত যাওয়া নিয়ে চতুর্দিকে 'গেল গেল' রব পড়ে গেলেও তাঁর [illegible] সম্পর্কে কেউ স্পষ্ট ভাষায় কোনও কথা বলতে পারেননি। বলে থাকলেও প্রমাণ করতে পারেননি। 'তিনি নিজে প্রত্যহ স্নান করিয়া উঠিয়া গরদের জোড় পরিয়া গায়ত্রী জপ করিতেন। বিলাতে যাইবার সময় জাহাজেও প্রত্যহ তিনি এই নিয়মে গায়ত্রী জপ করিতেন....।' ১২ দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় 'তাঁহার স্নানের সময় আমি যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছি তখনই তাঁহাকে গায়ত্রী, সন্ধ্যা প্রভৃতি জপ তখনই দেখিয়াছি। এমন কি বিলাতে যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখনও তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন নাই।'১৩

রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও দ্বারকানাথ তাঁর পুজার্চনার পথ থেকে সরে যাননি। ...অপরঞ্চ শ্রীযুতবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম বা কাম্যকর্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেনা ঐ [illegible] বাটীতে দুর্গোৎসব ও শ্যামাপুজা [illegible]

১১। আত্মচরিত, ১২। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

'জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে [সমাচার দর্পন : ২২ অক্টোবর, ১৮৩১]।

দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলেত যান ১৮৪৫ সালে। উদ্দেশ্য কী ছিল তা সঠিক জানা না গেলেও মহারাণী দর্শন যে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তা জানা যায় তার সঙ্গে নেওয়া উপহার সামগ্রীর ফর্দ থেকে। ১৮৪৪ সালের ১৪ জুলাই বহরমপুরের রায় শ্রীনাথ বসুকে দ্বারকানাথ লিখেছেন—

প্রিয় মহাশয়—

কয়েকমাস পূর্বে আপনি যখন আমাকে কতিপয় গজদন্ত নির্মিত খেলনা সামগ্রী প্রেরণ করিয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন যে, আরও খেলনা সামগ্রী সত্বর প্রেরণ করিবেন। কিন্তু আমি তৎসম্পর্কে আপনাকে দুইখানি পত্র লিখিয়াও উত্তর প্রাপ্ত হইনাই। আপনি কখন উহা প্রেরণ করিবেন তাহা অবগত করিলে বাধিত হইব, কারণ আমি ঐসকল বস্তু শীঘ্রই ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে চাহি। ....ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৪

২৪ জুন দ্বারকানাথ লন্ডনে পৌঁছুলেন। এবার তিনি মহারাণী ভিকটোরিয়ার পার্লামেন্টের কাজ দেখতে গেলেন। রাজকীয় সম্মানে দ্বারকানাথ, তাঁর ছোট ছেলে নগেন্দ্রনাথ, ভাগ্নে নবীনচন্দ্রকে বিশিষ্ট অতিথিদের গ্যালারীতে বসানো হলো। রাণী ডেকে পাঠালেন দ্বারকানাথকে তাঁর ঘরে। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেন প্রিন্স আর ভিক্টোরিয়া। ভিক্টোরিয়ার চেয়ারের পেছনে দাঁড়ালেন দ্বারকানাথ। এই দুর্লভ সৌভাগ্যের প্রথম ও শেষ অধিকারী সম্ভবত তিনিই।

এরপর দ্বারকানাথ ভিক্টোরিয়ার কাছে পাঠালেন তাঁর উপহার সামগ্রী। তা থেকে রাণী নিলেন কয়েকটি চীনা অলংকার আর দিল্লির কারিগরকে দিয়ে গড়ানো সোনার বাজুবন্ধ আর কংকন। প্রিন্স অ্যালবার্ট নিলেন একটি শালের চোগা। বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে আবার নিমন্ত্রণ এল। প্রথমবারের দেখায় মহারাণী যে ছবি দেবেন বলেছিলেন এবার সেই ছবির মিনিয়েচার দিলেন তিনি দ্বারকানাথকে। ছবির নীচে মহারাণীর হাতের লেখা—দ্বারকানাথ ঠাকুরকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে—ভিক্টোরিয়া আর অ্যালবার্ট, বাকিংহাম প্রাসাদ, ৮ জুলাই, ১৮৪৫।' এ প্রসঙ্গে ইস্টার্ণ স্টার লিখেছিল—৯ই জুলাই দ্বারকানাথ মহারাণীকে কলিকাতাবাসীদিগের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। মহারাণী মৌখিকভাবে তাহার জবাব দিয়াছিলেন এবং বাবুকে উইন্টার হল্টারের অংকিত চিত্র হইতে তাঁহার এবং কনসর্ট-এর মিনিয়েচার চিত্র উপহার দিয়াছেন। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪৫। দ্বারকানাথকে দেওয়া মহারাণীর উপহার সামগ্রীর উল্লেখ করে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা পূর্ণিমাদেবী লিখেছেন : ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ চীৎপুর থেকে শোনা যেত। গপ্‌গপ আওয়াজ শুনলেই বোঝা যেত গাড়ি আসছে। লাল জুড়ি ছিল, কিন্তু তাদের অমন বাহার ছিল না! কালজুড়ির কাছে নতুন জুড়ি দাঁড়াতে পারত না। রমজান কোচম্যান, আব্দুল আর করিম খাঁ সহিসের লাল উর্দি তৈরি হল, হলুদে বর্ডার দেওয়া পাগড়ী। কোমরবন্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দেওয়া দ্বারকানাথ ঠাকুরের ক্রেস্ট—হাতীর পিঠে নিশান। গাড়ির দরজাতেও ক্রেস্ট আঁকা থাকত [ঠাকুর বাড়ির গগন ঠাকুর, পৃঃ ৬৭]

দ্বারকানাথকে এতাবৎকাল শুধু বাঙ্গালীবাবু, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ আর প্রিন্স বলেই সকলে জেনে এসেছে। তৎকালের সমাজপতিরা দ্বারকানাথ সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি করতেন

'দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলেতের চাল
নকুলে বাঙালীবাবু হলো যে কাঙাল।'

কিন্তু দ্বারকানাথকে সেই সমাজের হাফ আখড়াই, ঢপ্‌কীর্তন আর নিকির নাচে মশগুল বাঙালীবাবুদের প্রতিনিধি হিসেবে বিচার করার অর্থ তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার অমর্যাদা করা। আর ঠিক এই অমর্যাদাই দেখিয়েছিলেন সেকালের তথাকথিত মাথাওয়ালারা। এমন কি 'দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর কিরূপে তাঁহার পিতার আদ্যকৃত করিবেন ইহা তখনকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রভূত আন্দোলনের বিষয় হইল। ...একান্ত ব্রাহ্মপ্রণালী অনুসারে শ্রাদ্ধ না হওয়াতে সংবাদপত্রে বিলক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল।' ১৫

বেলগাছিয়া ভিলার 'ছুরি কাঁটার ঝনঝনি'ই দ্বারকানাথের একমাত্র পরিচয় নয়। ব্যাংক, কয়লা, জাহাজ, নীল, সিল্কের ব্যবসা থেকে শুরু করে ছোট-বড় অনেক ব্যবসারই তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

মর্ণিং ক্রনিকল-এর ভাষায় : ভারতে কোনও প্রতিষ্ঠানই দ্বারকানাথ ছাড়া কল্পনা করা যায় না। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বাবুরা কাগজে লিখলেন—'দ্বারকানাথ ঠাকুর কোম্পানীর সেরেস্তাদারী দেওয়ানী হইতে রাজপুত্র হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক ব্যবসাদার।'

ভিক্টোরিয়া-দ্বারকানাথ সম্পর্ক নিয়ে বহু রসাল কাহিনী তৈরী হয়েছিল তখনকার দিনে। বলা বাহুল্য ঈর্ষাই এইসব কাহিনীর একমাত্র ভিত্তি। আসলে ভারতীয় হয়েও মনের দিক থেকে দ্বারকানাথ ছিলেন ইওরোপীয়। এর কারণ—প্রথম জীবনেই তিনি পড়েছিলেন শোরবর্ণ সাহেবের স্কুলে। তারপর তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন রেভারেন্ড উইলিয়াম অ্যাডামস, জে জি গর্ডন আর জেমস কল্ডার। গর্ডন আর কল্ডার ছিলেন ম্যাকিনটোশ কোম্পানির অংশীদার। এর থেকেই বোঝা যায় কেন দ্বারকানাথের মানসিক গঠনে ইওরোপীয় প্রভাব ছিল। তাছাড়া নিজে বেলগাছিয়া ভিলায় ভোজ সমারোহের আয়োজন করলেও দেবেন্দ্রনাথকে তিনি যে ইংরেজদের খানা দিতে নিষেধ করেছিলেন সে কথা তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই লিখে গেছেন। শুধুমাত্র খানাপিনা আর সাহেব-মেমদের নিয়ে আমোদমত্ত হয়ে থাকার বাসনা থাকলে দেশের দরিদ্র লোকদের উপকারে ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিকে তিনি তৎকালে একলক্ষ টাকা দান করতেন না। মেডিকেল কলেজে অপারেশন থিয়েটারে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন যে ব্যক্তি তিনি শুধু 'প্রিন্স' নন তিনি সর্বকালের অনুকরণযোগ্য এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

শিল্প প্রসারে দ্বারকানাথের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জমিদারেরা যখন ফ্রন্ট তৈরি করল তখন দ্বারকানাথ নিজে জমিদার হয়েও জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পিছিয়ে থাকেন নি। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজদের কর্মোদ্যমকে এদেশের মানুষের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তাদের শিল্পমুখী করে তুলতে। এই মূর্তিভাঙ্গার কাজে তাঁর বিরুদ্ধে একজোট হয়েছিল তৎকালীন জমিদার, জোতদার আর মহাজনের দল। কিন্তু দ্বারকানাথকে ঠেকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি নিজেই কয়লাখান কিনে, কলকারখানা স্থাপন করে অগ্রণীর যোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তখন তাঁর বিলাসপ্রিয়তা আর ইংরেজদের প্রতি দুর্বলতার ধুয়ো তুলে সেই সমাজের মাথাওয়ালা ধনিক গোষ্ঠী দ্বারকানাথের চরিত্রহননেও কুণ্ঠিত বোধ করেন নি। সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে পরবর্তীকালে এদেশের মানুষ তাই দ্বারকানাথকে চিনে রেখেছে শুধুমাত্র বিলাসী আরামপ্রিয় প্রিন্স হিসেবে। এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর পিতামহ প্রসঙ্গে কোথাও তেমন কিছু উল্লেখ করেন নি। হয়তো তাহলে দ্বারকানাথের প্রতি সুবিচারের একটা সবুজ সঙ্কেত পেতেন এদেশের বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু তা হয়নি। আর তা হয়নি বলেই দ্বারকানাথের সমস্ত উদ্যম, উৎসাহ আর অধ্যবসায় আমাদের দুর্বল স্মৃতিতে উপেক্ষিত হয়ে আছে।

(এই নিবন্ধ রচনায় সহৃদয় সহযোগিতা পেয়েছি যাঁদের কাছ থেকে :—নিশীথরঞ্জন রায়, অমিতাভ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ সাহা, কুমার জগদীশ সিংহ, এ মুখার্জি, ঋত্বিক মিত্র, সমর ভৌমিক।)

১৫। আত্মচরিত : রাজনারায়ণ বসু।

১৪। দ্বারকানাথের ডায়েরি।

আর একবার

মনোজিৎ মিত্র

এতক্ষণে ট্রেনটা ছাড়ল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। এইবারে ঢিলেঢালা পাঞ্জাবী আর পাজামা পরে একটু আরাম করে বসা যাক। এই ফার্স্ট ক্লাশ কুপের আর একটা বার্থ দেখছি ফাঁকা। জানি না মাঝরাস্তায় কেউ এসে চড়বে কিনা। তবে আপাতত বেশ লাগছে। দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলেই মোটামুটি আমি একলা। বাইরে অন্ধকার রাত। মাঝে মাঝে এক একটা আলো জ্বলছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আমি একটু একা একা নিজের মনে থাকতে পারি। আলোটা নিভিয়ে দিলে বোধহয় আরও ভাল লাগবে। কেউ বিরক্ত করার নেই, কারো সঙ্গে একটানা অর্থহীন আলাপ চালাতে হবে না। নিজের এলোমেলো ভাবনাচিন্তাগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ কাটান যাবে। ঠিক যেমন চাইছিলাম।

এই ট্রেনে কতলোক কোথায় কোথায় যাচ্ছে। মানুষের কতরকম কাজ থাকে ভাবতে অবাক লাগে। অনেকে বোধহয় বেড়াতে যাচ্ছে, অনেকে কাজে যাচ্ছে, অনেকে খুশীমনে যাচ্ছে। হয়ত কেউ যাচ্ছে মনে অনেক কষ্ট নিয়ে, কিংবা পুরোন জায়গার বাস তুলে নতুন কোথাও। কেউ খুশী হয়ে ফিরবে, কেউ দুঃখ নিয়ে, কেউ হয়ত ফিরবে না। এদের মধ্যে আমার মত কেউ কি আছে? মনে হয় না। এরকম অদ্ভুত দরকারে আজকাল কেউ কষ্ট করে সারারাত ট্রেনে চড়ে কোথাও যায় বলে মনে হয় না। আমিও ত কতদিন থেকেই ভাবছি যাব যাব, কিন্তু সহজে যাওয়া হয় না। অনেকদিন পরে আজ যেতে পারছি। তাই আজ মনটা বড় ভাল। কাল সকালে কলকাতা শহর থেকে অনেক দূরে, পাহাড় আর নদীঘেরা একটা ছোট্ট শহরের স্টেশনে এই গাড়ীটা মিনিট কয়েকের জন্যে থামবে। আমি সেখানে নামব। সেই শহরটা এককালে আমার বড় চেনা ছিল। আমার ছোটবেলাটা সেখানে কেটেছে। তারপর, প্রায় পঁচিশ বছর হল, আমি আর সেখানে যাইনি। শহরটার সঙ্গে সম্পর্ক আস্তে আস্তে মুছে গেছে। আমি মনেপ্রাণে কলকাতার মানুষ হয়ে গেছি। আমার চাকরি-বাকরি বিয়ে সমাজ সংসার সবই কলকাতায়। মাঝে মাঝে স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে যাই পুরী দার্জিলিং কাশ্মীর কেপ কমোরিন। অফিসের টুরে যাই দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ। কলকাতাতে সিনেমা পার্টি আড্ডা হৈ চৈ। প্রথম প্রথম কয়েক বছর মাঝে মাঝে যেতে ইচ্ছে করত আমার ছেলেবেলার শহরটায়। তারপর প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু ইদানীং সেই ইচ্ছেটা আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। মাঝে মাঝে ছেলেবেলার স্বপ্ন দেখি। ঝাপসা রাস্তাঘাট নদীর পাড় পাখীর ডাক নীল পাহাড়ের সারি। অনেক দূরে গভীর শালের বন। গান গেয়ে সাঁওতাল মেয়েরা সেখানে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফেরে। ফাল্গুন মাসে বিকেলের হাওয়ায় কেঁদ-মহুয়ার গন্ধ আসে। রাতে নিঝুম রাস্তা-ঘাট, অনেক দূরে করতাল বাজিয়ে কারা গান গায়। শহরের বাইরে আপনমনে পাহাড়ী নদীটা বয়ে যায়, বুনো হাতীর পিঠের মত প্রকাণ্ড শ্যাওলা-ধরা কতকগুলো পাথরের মধ্যে দিয়ে। নদীর পাড়ে একটা উঁচু টিলার ওপরে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। ফুলে ফুলে বোঝাই হয়ে থাকে। কে যেন কবে শখ করে কৃষ্ণচূড়ার গোড়াটা বাঁধিয়ে দিয়েছিল।

আজ, পঁচিশ বছর পরে, আমি আবার যাচ্ছি, একবার সেই কৃষ্ণচূড়ার তলায় বসবার জন্যে।

আমি বিশেষ কাউকে বলিনি কেন কোথায় যাচ্ছি। বললেই হাজারটা প্রশ্ন, যার জবাব ঠিকমত দিতে পারব না। আমার জীবনে গুনি-গুনি দুদিন ছুটি, তার মধ্যে

আর তিনদিন ছুটি নিয়েছি। সহকর্মীদের সংক্ষেপে বলেছি, একটু কাজ আছে। কোথায় যাচ্ছি সেটা বলেছি শুধু আমার স্ত্রীকে। সে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি, আমিও খুব খুলে বোঝানর চেষ্টা করিনি। সে খুশী হয়নি। অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, হয়ত বা একটু সন্দেহের চোখে।

'ওখানে? ওসব জায়গায় ত তোমার টুর পড়ে না?'

'না না। ঠিক টুর না, আমি নিজেই একটু যাচ্ছি আর কি।'

'বেড়াতে? ওখানে? আমাদের বাদ দিয়ে?'

আমি একটু অপরাধের হাসি হেসেছি। আমার স্ত্রী আর মেয়েকে না নিয়ে কোথাও কখনও বেড়াতে যাই না। সুতরাং ওর অবাক হবার কারণ আছে বই কি! ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'দুদিন কি তিনদিনেই ফিরে আসব। ওসব জায়গায় গিয়ে তোমাদের ত বেড়ানর মজা কিছু হবে না। আর জুন মাসে আমরা ত ওয়ালটেয়ার যাচ্ছিই।'

'তুমি আজকাল কেমন যেন হয়ে যাচ্ছ। মাঝে মাঝে একা বসে কি সব ভাবো, ডাকলে শুনতে পাও না। এখন আবার একা বেড়াতেও যাচ্ছ। আমাদের সঙ্গ আর ভাল লাগে না বুঝি?

ওর কথায় আমারও একটু মনটা খারাপ লাগল। কিন্তু কি করব? ওকে বোঝান যাবে না যে এবার, অন্তত এই একবার, আমি একা যেতে চাই। একা থাকব বলেই ত এই যাওয়া। আমার বাড়ী-ঘর-সংসার, অফিস ক্লাব, এইসব গল্প তর্ক চেঁচামেচি সিনেমা রাজনীতি সব কিছু থেকে কদিনের জন্যে আমি উধাও হয়ে যেতে চাই, পালিয়ে যেতে চাই আমার ছোটবেলার সেই ছোট্ট জায়গাটাতে, এখন যেটা অনেকটা স্বপ্নের মত হয়ে এসেছে। আমি কদিনের জন্যে আমার এই বর্তমান অস্তিত্ব, অর্থাৎ সুব্রত ব্যানার্জি, রিজিওনাল ম্যানেজার, হিন্দুস্থান ডেভিডসন অ্যান্ড কোং, সাদার্ন এভিনিউ-এ তেরতলা বাড়ীর বারতলার এক ছিমছাম ফ্ল্যাটের মালিক, হাসব্যান্ড অফ অমুক, ফাদার অফ অমুক, মেমবার অফ অমুক ক্লাব ইত্যাদি থেকে সরে আমার সেই ছোটবেলাটায় ফিরে যেতে চাই। মাত্র কয়েক দিনের জন্য।

গাড়ীটা বেশ স্পীড় নিয়েছে। চাকায় চাকায় সেই একটানা আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছি, যাতে ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে। অন্ধকারে মাঝে মাঝে বড় বড় গাছগুলো যেন শিস দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। গুমগুম করে একটা ছোট পুল গেল। ইনজিন থেকে একবাশ আগুনের ফুলকি বেরিয়ে হাওয়ায় উড়ছে। এক এক করে নিভেও যাচ্ছে। হুইসিলও একটা দীর্ঘ ডাক দিয়ে ট্রেনটা আর একটা ঘুমন্ত গ্রাম পেরিয়ে গেল।

জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। আমার বারতলার ফ্ল্যাটে হাওয়ার অভাব নেই, কিন্তু এখন এই হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে অনেক বেশী ভাল লাগছে। বুকটা হালকা হয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে আমার বুকের উপরে আস্তে আস্তে চাপ বেড়েছে। আমার বয়স এখন প'য়তাল্লিশ, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যেন প'চাশী। আর তখনই নিজের মধ্যে একটা ছটফটানি আসে। কিন্তু কিছু করতে পারি না। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরছে আমার বয়স, আমার বন্ধুরা, শত্রুরা, আমার চারিপাশের পৃথিবী, আমার আশা-আকাংখা, আমার যত সাফল্য, যত ব্যর্থতা। চক্রব্যুহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকার অনুভূতি হয়। কি করব? কোথায় যাব? মনে হয় চারিপাশে অনেক ষড়যন্ত্র চলছে। আমি একটি সফল চাকুরে, সুখী গৃহকোণের মালিক, চকচকে চেহারায় চকচকে স্যুট পরে বসে আছি, আর চারিপাশে বহুলোক দাঁড়িয়ে আঙ্গুল তুলে আমাকে দেখাচ্ছে। তারা নিজেদের মধ্যে হাসছে। তারা বলছে, ঐ লোকটাকে দেখ, ওর গায়ে কি সুন্দর জামা। মুখে কি তৃপ্তির হাসি। ও জীবনে সব পেয়েছে। কিন্তু ও লোক ভাল নয়। ওর এইসব যোগাড় করে নেওয়ার মধ্যে দুষ্টুমি ছিল। ওর মাথায় অনেক ফন্দী ছিল। ও খালি নিজের কথা ভাবে। ও প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুয়িটি কেমন বাড়ছে তার হিসেব রাখে। ফিকসড ডিপোজিট করে। মেয়ের বিয়ের জন্যে গুণে গুণে টাকা জমায়। সল্ট লেকে জমি কিনে আর একটা বাড়ী বানাতে চায়। শাড়ী গয়না দিয়ে বউএর মুখ বন্ধ রাখে, পুজোয় মোটা চাঁদা দিয়ে প্রতিবেশীদের। ও খুব চালাক, গোছানো, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, ধুরন্ধর, ফন্দীবাজ, হুঁশিয়ার, প্যাঁচালো। ও শুধু নিজেকে নিয়ে থাকে।

বয়সের সঙ্গে বোধহয় মন দুর্বল হয়ে আসে। মানুষ নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায়। এ কি তাই? হয়ত কিছুটা তাই। কিংবা হয়ত সকলের এরকমভাবে হয় না। আমি কিন্তু জানি, আমার এই গত কয়েক বছর ধরে মনটা খুব তাড়াতাড়ি এই রকম হয়ে আসছে। তার আগে আমি অন্যরকম ছিলাম। আমি অফিসের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করতাম। বাড়ী এসে আবার স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যেতাম। হৈ চৈ করে পিকনিক হত ডায়মণ্ডহারবারে। এক একদিন বাড়ীতে অনেক রাত অবধি আড্ডা গানবাজনা খাওয়াদাওয়া। চাকরীতে উন্নতি হচ্ছিল। চারিদিকে খাতিরও বাড়ছিল। আমি রীতিমত তৃপ্তির সঙ্গে বেঁচে ছিলাম। ছোটবেলার শহরটাকে ভুলেই গিয়েছিলাম। বর্তমানে সর্বাকিছু পেলে অতীতকে কোলে নিয়ে কে বসে থাকে?

তারপরে আস্তে আস্তে তিনটে ঘটনা ঘটল। এগুলো যে ঘটেছে তাও খুব বেশী লোক জানে না। কিন্তু এই ঘটনাগুলো থেকেই আস্তে আস্তে আমার মন বদলাতে শুরু করল। আর ছেলেবেলার কথা, সেই শহরটার কথা বেশী করে মনে পড়তে লাগল। আমাদের সেই লালচে রঙের স্কুল-বাড়ী, উঁচু-নীচু পাথুরে রাস্তা। বর্ষাকালে নদীর বান দেখতে যাওয়া। মাঠে মাঠে ঘুড়ি ওড়ান। রাত করে বাড়ী ফিরে বাবা-মার কাছে বকুনি। সাইকেল চড়া শিখতে গিয়ে পা ভাঙ্গা। সন্ধ্যাবেলায় শিউশরণ চানাচুরওয়ালার সুরেলা হাঁক। আর মাঝে মাঝে একলা নদীর ধারে, টিলার উপরে, কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে বসে আমি সূর্যাস্ত দেখতাম। তখন এসব ঘটনা ঘটেনি। আমি তখন একটা পাখীর মত আনন্দে বেঁচে আছি। জীবনে ত কত কিছুই হয়ে যায়। সবকিছু ত দাগ ফেলে না। যখন হয়, তখন মানুষ হাসে, কাঁদে, রাগ করে, তারপরে ভুলে যায়। কিন্তু কিছু ঘটনা হয় যার দাগটা তখনি পড়ে না। আস্তে আস্তে পড়ে, গভীর হয়ে। কোনদিন মুছে যায় না। কয়েকটা মুখ, কয়েকটা কথা, কয়েকটা ছবি যেন কেউ লোহা দিয়ে দেগে দিয়ে যায়, অনেক চেষ্টা করেও ঘষে তোলা যায় না।

প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে। তখন কলকাতা বধ্যভূমি। কলকাতার বাতাসে কাঁচা রক্তের গন্ধ। দিনে রাতে রাস্তায় ঘাটে হঠাৎ ছুরি ঝলসে ওঠে, পিস্তল গর্জায়। তখন আমার সাদার্ন এভিনিউএর ফ্ল্যাট হয়নি, চাকরীজীবনের প্রথমে বেহালাতে যে বাড়ী নিয়েছিলাম সেখানেই থাকি। তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরোই, অন্ধকার হবার আগে বাড়ী ফিরি। রাস্তায় চারিদিক দেখে হাঁটি একসঙ্গে তিনটি অল্পবয়সী ছেলে আসছে দেখলে ফুটপাথ বদল করি। আমার স্ত্রী বারবার বোঝায়, রাস্তায় ঘাটে রাজনীতি নিয়ে কোন আলোচনা না করতে। রোজ অফিসে শুনি কাগজে পড়ি, আরও খুন হচ্ছে। আমার বাড়ীর খুব কাছেই পরপর কয়েকটা খুন হয়ে গেল। পুলিশের গাড়ী রাতবিরেতে আসে। রাত্রে হঠাৎ বোমা ফাটে, রাইফেলের কর্কশ আওয়াজ কানে আসে। ভয়ে ভয়ে থাকি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের পাড়ার ঠিক পাশেই একটা বড় গোলমাল হয়ে গেল। পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক ছুটতে ছুটতে বাড়ী ফিরলেন। আমাকে বারান্দায় দেখে বলে গেলেন, 'আজ আবার দুই পার্টিতে লেগেছে। লাশ পড়বে!'

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ হঠাৎ দরজার কড়া নড়ল। আমার স্ত্রী আর মেয়ে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি একটা বই পড়ছিলাম। দরজা খোলা নিরাপদ নয় কি করব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হল। তীরবেগে উঠে গিয়ে দেখি, আমার অতি বুদ্ধিমান ষোল বছরের চাকরটি দরজা খুলে দিয়েছে। একজন লোক ঢুকে পড়েছে এবং সে-ই নিজের হাতে দরজা বন্ধ করছে। আমার চাকর হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় ভয় নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। দরজা বন্ধ করে সে দ্রুতপায়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। একটি বছর কুড়ির ছেলে। মুখে কদিনের না কামান দাড়ি, পরণে ময়লা বুশ-শার্ট আর প্যান্ট, পায়ে চটি। মাথার চুল উসকো-খুসকো। মুখে-চোখে আতংকের ছাপ। আমি একটা লম্বা ছুরি দেখার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সে দু হাত জোড় করে, চাপা ভয় জড়ান গলায় বলল, আমাকে দয়া করুন। চিৎকার করবেন না। ওরা কাছেই আছে।

আমার তখনও গুছিয়ে কথা বলার শক্তি নেই। বেডরুম থেকে আবছা আলো এসে দরজার কাছে পড়েছিল। কয়েক মুহূর্ত সে আর আমি সেই আলোয় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। আজ ওরা আমাদের দুজনকে মেরেছে। আমি কোন রকমে পালিয়েছি। ওরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাল ভোরবেলায় আমি যে করে হোক চলে যাব। আজকের রাতটা আপনি আমাকে থাকতে দিন। বাইরের ঘরে, বাথ-রুমে, যেখানে হোক।

বলতে বলতে ছেলেটি প্রায় দৌড়ে গিয়ে আমার বাইরের ঘরে ঢুকল। ততক্ষণে আমার স্ত্রী উঠে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছে, তার ঘুম-জড়ান চোখ মুখ ভয়ে বিকৃত। আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে সে চেঁচিয়ে উঠল, ও কে গো? ও কে তোমার মারবে?

বাইরের ঘর থেকে ছেলেটর চাপা গলা, চেঁচাবেন না। দয়া করুন। ওরা এসে পড়বে।

ততক্ষণে আমার সম্বিৎ ফিরেছে। চকিতে আমার মাথায় খেলে গেল পর পর কতকগুলো চিন্তা। কোন একটি লড়াকু দলের ছেলে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তার পিছনে পিছনে তার শত্রুরা নিশ্চয়ই আসছে। তারা ওর সন্ধানে আমার বাড়ি আক্রমণ করবে। ও হয়ত কাল ভোরেও না যেতে পারে। আমার চাকর জানে, একথা চাপা থাকবে না। আজ রাতে হোক, কাল হোক ওর শত্রুদের আক্রোশ আমার উপরে পড়বেই। আমি মন ঠিক করে নিলাম। আমার স্ত্রী তখন কাঁদছে। তাকে শক্ত হাতে টেনে নিয়ে বিছানার উপরে বসিয়ে দিয়ে বাইরের ঘরে এলাম।

ছেলেটি সোফার এক কোণে গুটিসুটি হয়ে বসেছিল।

তুমি চলে যাও। ভয়ে আর রাগে আমার গলাও কেমন যেন শোনাচ্ছিল।

দয়া করুন ছেলেটি হাত জোড় করে উঠে দাঁড়াল।

তুমি বুঝতে পারছ না। আমি কি করে তোমার দায়িত্ব নেব? আমি ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারব না। আমি ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি...

ভিতরের ঘর থেকে আমার স্ত্রী প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, তুমি কোথায়?

ছেলেটির মুখ তখন ভয়ে আবার নীল হয়ে গেছে।

তুমি যাও, আমি প্রায় চিৎকার করলাম।

ছেলেটি আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা খুলে মিলিয়ে গেল।

আমার চাকরকে বলা হয়েছিল সে যেন এই ঘটনার কথা কাউকে না বলে। আমরা নিজেরাও মুখ বন্ধ ছিলাম। আমার স্ত্রী কয়েক দিন ভয়ে ভাল করে কারও সঙ্গে কথাই বলতে পারে নি। আমাকে অফিস থেকে দু দিন ছুটি নিয়ে বাড়ি থাকতে হয়েছিল।

সেদিন রাত্রে কিন্তু আমি আর ঘুমোতে পারি নি। তারপরেও অনেক দিন মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেছে, বহুক্ষণ জেগে থেকেছি। সেই ছেলেটি তখন চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। তখনও তার চুল উসকো-খুসকো, দাড়ি কামান নেই।

আপনি আমায় তাড়িয়ে দিলেন।

কি করব বল? আমি ছেলেপুলে নিয়ে....

আমি আপনার কোন ক্ষতি করতাম না। ভোরবেলায় চলে যেতাম।

আমার পক্ষে তোমার মত ছেলেকে আশ্রয় দেওয়া অসম্ভব....তোমাকে আমি কি করে বোঝাব....

তর্কটা শেষ হতে চায় না। আমি জানি যে গোড়া থেকেই আমি হেরে আছি। তবু কিছুক্ষণ লড়াই করি। তারপর অন্ধকারের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকি। কিছু করার নেই। বার বার মনকে সান্ত্বনা দিই, সে খুন হয় নি। সে বেঁচে আছে। কিন্তু ছেলেটি ত আর আসবে না। এলে এবারেও কি তাকে আমি আশ্রয় দেব? না, কারণ আমি ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি। রাজনীতি করি না। মারামারি করি না। কারুর মোকাবিলা করার সাহস আমার নেই। আমি শুধু সফল গৃহস্থ।

আর তখন ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। তখন কেউ আমাকে এই কাঠগড়ায় দাঁড় করায় নি। সকাল বেলায় উঠেই মা-এর পুজোর ফুল কুড়োতে যাওয়ার সে কি ধুম। রাত্রে দূরের পাহাড়ে মালার মত আগুন জ্বলে। নদীর ওপার থেকে আদিবাসীদের মাদলের শব্দ আসে। আমি জঙ্গলে মহুয়া কুড়োতে যাই। বড় হয়ে পাইলট হবার স্বপ্ন দেখি। আমার আঁচল টেনে মা ডাকেন, ভাত খেয়ে যা। নদীর ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা হাওয়ায় দুলতে থাকে।

আর কেউ ত জানে না আমার এই সব। যা যেমন চলার তেমনি চলছে। তিনশ টাকা দিয়ে আমি ভি আই পি ব্রীফকেস কিনেছি। নানা রঙের টাই পরি। ফ্ল্যাট কেনার টাকা জমাই। সব কিছু বেড়ে বেড়ে যায়। সেই ছেলেটির কথা আমার স্ত্রীও বোধহয় ভুলেই গেছে। আমার কাজের চাপ বাড়তে থাকে। শুধু মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়। ছেলেটি এসে দাঁড়ায়। তার মুখে নালিশ, ভয়, ব্যঙ্গ, করুণা, ঘৃণা। আমি মনে মনে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাই। বুড়ো হয়ে যাই।

হংকং-এ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার হবে। আমাদের অফিসে বিরাট তোড়জোড় চলেছে, কারণ আমরা সেখানে নিজেদের প্যাভিলিয়ন খুলব। হাওয়া গরম। কে কে হংকং যাবে তাই নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা তদ্বির-তদারক চলেছে। আমার নামও

অবশ্যই তার মধ্যে আছে, কারণ কোম্পানীর উদীয়মান তারকাদের মধ্যে আমি অন্যতম। আশে-পাশে সহকর্মীদের হাবেভাবে বুঝতে পারি, নানা রকম চেষ্টা-চরিত্র চলছে কর্তৃপক্ষের নেকনজরে পড়ার। ম্যানেজিং ডিরেক্টার থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বড়সাহেবদের ঘরে নানা রকম মিটিং চলেছে, আর মিটিং-এর আগে পরে কথাবার্তা হচ্ছে প্রচুর। হংকং যাবার লোভ আমারও কম নয়। শুধু কোম্পানীর খরচায় হংকং বেড়ানই নয়, আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে যে চেয়ে ক্যেরার-এ যে যত কাজ দেখাতে পারবে তার ভবিষ্যৎ তত তাড়াতাড়ি খুলবে। ফার ইস্টে আমাদের ব্যবসা সবে বাড়ার মুখে, এই সময় চাই কি বিদেশে কিছু দিনের জন্য একটা পোস্টিংও হয়ে যেতে পারে। অন্ততপক্ষে প্রোমোশন এবং ঘন ঘন বিদেশযাত্রার ভাগ্য খুলবে।

আমি তখন আমাদের পশ্চিম বাংলার বিক্রীবাটার সর্বেসর্বা। কিন্তু এত বড় কোম্পানীতে সেটা তেমন কিছু নয়, সুতরাং হংকংয়ের দিকে নজর না দেওয়াটা বোকামি। প্রাণপণে সেলস রিপ্রেজেনটেটিভদের পিছনে লেগে বিক্রী বাড়ানোর চেষ্টায় লাগলাম। কোন কোন অঞ্চলে আবার সাপ্লাই নিয়ে গোলমাল। মিটিং-এর পর মিটিং করছি, এমন সময় একদিন বেয়ারা ঘরে ঢুকে একটা স্লিপ দিল। তাতে লেখা আছে, স্মিতা সান্যাল। বললাম, বসতে বল।

প্রায় দু ঘণ্টা পর যখন আমার মিটিং শেষ হল, তখন বেয়ারা এসে বললো, সেই দিদিমণি এখনও বসে আছেন। আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কফি মেশাতে মেশাতে বললাম, ডাক।

একটি শান্ত, সাধারণ কাল চেহারার মেয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। পরণে খুব সাধারণ শাড়ী। আমার সামনে নিজেকে গুছিয়ে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা আছে। কিন্তু অপরিচিত সাহেবী পরিবেশে একটা ভয়ের ভাব ঠেকাতে পারছে না। বিনীতভাবে নমস্কার করে একটা চিঠি এগিয়ে দিল।

আমার কলেজ জীবনের এক দাদা সুপারিশের চিঠি দিয়েছেন। মেয়েটি ভাল, ইকনমিকস-এ হাই সেকেণ্ড ক্লাস নিয়ে এম-এ পাশ করেছে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার। বাবা অসুস্থ, দাদা বেকার। একটা চাকরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। দাদা শুনেছেন, আমার হাত আছে। যদি আমার কোম্পানীতে কোন সুযোগ-সুবিধা হয়, একটা দরিদ্র বাঙালী পরিবার বেঁচে যাবে।

অভ্যাসবশে বলতে যাচ্ছিলাম, এখন কোন চাকরী খালি নেই। তারপরই হঠাৎ একটা কথা মনে পড়াতে কথাটা আটকে গেল। মেয়েটিকে বসতে বললাম। আড়ষ্টভাবে সামনের চেয়ারে বসে সংকোচভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কয়েক দিন আগেই একটা গার্ডেন পার্টিতে সেক্রেটারী চাওলা সাহেব বলছিলেন, ওঁর দু নম্বর এ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটির হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেছে, সে চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। হয়ত ওখানে একটা কিছু হতেও পারে। অবশ্য চাওলাসাহেবের এ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়া এই রকম একটি সাদা-সিধে বাঙালী মেয়ের পক্ষে কি রকম ব্যাপার দাঁড়াবে বোঝা মুশকিল। ওনার আবার মেয়েদের সম্বন্ধে উৎসাহ অফিস ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু অত ভাবলে চলে না, নিজেই আবার ভাবলাম। সঙ্গে হঠাৎ একটা পরোপকার করবার বাসনা চাড়া দিল। মেয়েটিকে বসতে বলে চাওলাসাহেবের ঘরে গেলাম।

বড়সাহেবদের মধ্যে চাওলা সবচেয়ে বেশী কথা বলেন, হৈ-হৈ করেন, নিজের প্রচুর মদ্য পান ও নারী বিজয়ের গল্প করতে ভালবাসেন। তাই ওঁকে এ ধরনের প্রস্তাব দেওয়াও সবচেয়ে সোজা। চুরুট মুখ থেকে নামিয়ে প্রথমেই জানতে চাইলেন, মেয়েটির ব্যাপারে আমি উৎসাহী কেন? আমার কিছু হৃদয়ের ব্যাপার আছে কিনা। আমি যতই বোঝাই, উনি ততই অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়েন। তারপরে হঠাৎ সে সব ঝেড়ে ফেলে বললেন, এ ধরনের রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে কিছু সামান্য নিয়মকানুন আছে। তবে তুমি যখন বলছ....তাছাড়া আর কোন ক্যাণ্ডিডেটের কথা আমি ভাবিও নি। আজ ১৬ তারিখ, মেয়েটিকে বল সে সামনের মাসের ১লা জয়েন করতে পারে। আমি পার্সোনেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে রাখব।

চাওলা সাহেব আমাকে মোটামুটি পছন্দ করেন জানতাম, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে যাবেন সত্যিই ভাবি নি। ধন্যবাদ দিতেই চুরুট নামিয়ে বললেন, মনে রেখো, ১লা তারিখের পর কিন্ত তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকবে না। তখন শুধু আমি হা হা হা...

মেয়েটিও প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারে নি। উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়াল, হাতের ছোট্ট পয়সার ব্যাগটা মেঝেতে পড়ে গেল। চোখে আনন্দের চেয়েও বেশী বিস্ময়। আমি বললাম, বসুন।

তারপরে আরও দশ মিনিট। আমার খুব জরুরী কাজ ছিল। কিন্তু আমি সিগারেট ধরিয়ে বসে রইলাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আনন্দ আবেগ এইসব কাটিয়ে মেয়েটি আমাকে ধন্যবাদ দেবার অনেক চেষ্টা করল। ভালভাবে পারল না। আমি বুঝলাম। স্মিতা সান্যাল এত তাড়াতাড়ি এত ভাল জিনিস জীবনে কখনও পায় নি। যাবার আগে জিজ্ঞাসা করল, আর একবার খোঁজ নিতে হবে কিনা। আমি বলতে যাচ্ছিলাম দরকার নেই, তারপর কি ভেবে বললাম সাতাশ-আটাশ তারিখে একবার আসবেন। সেদিন নিজেও কেমন একটা খুশী খুশী ভাব নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

পঁচিশ তারিখ দুপুরে চাওলা সাহেব আমাকে একবার ডাকলেন। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দেখি, আগুনের মত একটি অবাঙালী তরুণী বেরিয়ে যাচ্ছে। আর পারফিউমের সুরভি সারা ঘরে ছড়ান। অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে সে একবার অল্প একটু হাত তুলল, তারপর বেরিয়ে গেল।

চাওলা সাহেব একটু হাসলেন।

কেমন দেখলে?

বেশী ইয়ারকি দেবার প্রয়োজন বোধ না করে, সুতরাং বিনীতভাবে হেসে বললাম, ভালই।

কাজের কথা শুরু হল। পরের দিন এম ডির সঙ্গে বেঙ্গল এরিয়া নিয়ে ওনার আলোচনা আছে, সে জন্যে আমার কাছ থেকে কিছু তথ্য নিলেন। আধ ঘণ্টা পর আমি যখন উঠে আসছি, তখন হঠাৎ বললেন, এ্যাণ্ড বাই দি ওয়ে। তোমার সেই গার্ল ফ্রেণ্ডকে বল, আমি এখন তাকে নিতে পারছি না। আই এ্যাম স্যরি।

উপরওয়ালার প্রাপ্য বিনয় দিতে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আমি বলে ফেললাম, হোয়াই?

চাওলা আমার ভাব বুঝলেন। চুরুট নামিয়ে ধীর গলায় শুধু বললেন, ঐ যে মেয়েটিকে দেখলে, ওর নাম চন্দ্রা সিং। আমার এক পুরোন বন্ধু ওকে পাঠিয়েছে। শী ইজ ভেরী স্মার্ট, দ্য রাইট টাইপ। ভবিষ্যতে ও আরও রাইজ করতে পারে।

প্রায় মিনিট খানেক আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল জিজ্ঞাসা করি, স্মিতা সান্যালকে আমি কি বলব? কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যায় না। আমি আস্তে, নীচু গলায় শুধু বললাম, অল রাইট স্যার।

দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছি, চাওলা ডাকলেন, ব্যানার্জি। এক মিনিট দাঁড়াও। তারপর চুরুটের ছাইটা দেখতে দেখতে বললেন, গত এক সপ্তাহে আমি পাঁচজনের কাছ থেকে আর্জি পেয়েছি হংকং যাবার ব্যাপারে। তুমি কি ইন্টারেসটেড নও?

উল্টোপাল্টা চিন্তার সঙ্গে আমি তখন কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু বললাম, ইয়েস স্যার। আমিও ইন্টারেসটেড... তবে...

তবে কাউকে এপ্রোচ করতে চাও নি?

আমি চুপ করে রইলাম। স্মিতা সান্যাল....চন্দ্রা সিং.... হংকং....আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। আমি হংকং-এর ব্যাপারেও কাল এম ডির সঙ্গে আলোচনা করব। অল রাইট ব্যানার্জি থ্যাংক ইউ।

সাতাশ তারিখ সকালে অফিসে গিয়ে খবর পেলাম, আমি হংকং যাচ্ছি। অনেকে এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম না, চাওলা সাহেবকে আমার ধন্যবাদ জানানর কথা কিনা। স্ত্রীকে ফোন করে জানাতেই বলল, তার জন্যে পারফিউম কোলোন আরও কি কি আনতে হবে। তারপরে বেয়ারা স্লিপ দিল, স্মিতা সান্যাল।

ভাবলাম বলি, আজ দেখা হবে না বলে দাও। তারপরে বললাম, ডাক।

আগের দিনের চেয়ে অনেক সহজ ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকে স্মিতা নমস্কার করল। মুখে চোখে একটু যেন আত্মবিশ্বাস, একটু কৃতজ্ঞভাব। কথাবার্তা এগোতে না দিয়ে আমি বললাম, আই এ্যাম স্যরি। ওটা হচ্ছে না।

'মানে?'

'ম্যানেজমেন্ট ঠিক করেছেন, আপাতত ঐ ভ্যাকান্সিটা ফিল ইন করা হবে না। আপনাকে আমি যা বলেছিলাম, সেটা করা গেল না।'

তারপর আমি চেষ্টা করতে লাগলাম একটা ফাইলের আড়ালে আশ্রয় নিতে। একটা ধ্বংসস্তূপের মত স্মিতা আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। আমি জানতাম, বেশী কথা বলার মত ক্ষমতা তার নেই। আমার সেটুকুই ভরসা। তারপর স্মিতা উঠে দাঁড়িয়ে আমায় নমস্কার করল। আমি বললাম, "আচ্ছা, ঠিক আছে। যদি কোন ভ্যাকান্সী হয়, দেবেশদাকে দিয়ে আপনাকে খবর দেব।' স্মিতা একবার কি বলতে গেল, থামল। তারপরে আর বলতে পারল না, চলে গেল।

আমার হংকং যাত্রা অত্যন্ত সফল। যাবার আগে চাওলা সাহেব পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন। চন্দ্রা সিং ভালই কাজকর্ম করছে। শুধু রাত্রে মাঝে মাঝে স্মিতা সান্যাল আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'আমি জানি, আমি চন্দ্রা সিং-এর মত স্মার্ট নই। কিন্তু আমার বাবা অসুস্থ, ভাই বেকার।'

'আমি কি করতে পারি...'

'চাকরীটা আমার বড় দরকার ছিল।'

'আমার হাতে ত নেই।'

'আপনি আর একটু চেষ্টা করতে পারতেন।'

'আমি সেক্রেটারীর অনেক নীচে...'

'কিন্তু তর্ক করলে বোধহয় আপনার হংকং যাওয়া হত না, এত উন্নতি হত না, তাই না? আমি জোর করে ঘুমিয়ে পড়ি। স্মিতা সান্যালকে তাড়িয়ে দিই। স্বপ্ন শুনি, মাদল বাজছে। খালি পায়, উসখো-খুসকো চুল নিয়ে, হাফ-প্যান্ট পরে আমি ছুটেছি টুসু পরব দেখার জন্যে, নদীর দিকে। মা ডাকছেন, খালি পায়ে যাস নে। বন্ধুরা চীৎকার করে, আমার ডাক নাম ধরে। আমি হু হু হাওয়ার মধ্যে দৌড়ে যাচ্ছি। আমি কারো কাছে কোন দোষ করি নি, কথার খেলাপ করি নি। আমি কাউকে কোন কষ্ট দিই নি।

রিজিওন্যাল ম্যানেজার হবার পর আমাকে দু' তিনটি ক্লাবের মেম্বার হতে হয়েছিল। চাঁদাগুলো অবশ্য কোম্পানীই দেয়। শনি-রবিবার মাঝে মাঝে সস্ত্রীক যাই। অল্প-স্বল্প মদ্যপান করি। মাঝে মাঝে সারাদিন অফিসে খাটুনির পর বাড়ী এসে স্যুট বদলে আবার ক্লাবের ফাংশনে যেতে হয়। আমার সহকর্মীরা আসে, অন্য অন্য কোম্পানীর পরিচিত অফিসারেরাও থাকে। এর মধ্যে একটি ক্লাবে একটা ছোট সুইমিং পুল আছে, সুন্দর মখমলের মত ঘাসে ঢাকা একটা লন আছে। সেটাই আমার বেশী পছন্দ। রঙীন ছাতলওয়ালা স্টীলের চেয়ার লনের উপরে টেনে নিয়ে বসে একটু হুইস্কিতে চুমুক দিই। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে আসে। বাইরে গাড়ীর মধ্যে বসে আমার ড্রাইভার ঘুমোয়। আমার সাদার্ণ এভিনিউ-এর ফ্ল্যাট তখন হয়ে গেছে।

গত বছরের আগের বছর ঐ ক্লাবে আমায় সেক্রেটারী হতে হল। নানা রকম ঝামেলা। অফিস আর ক্লাব, দু'দিক সামলাতে সামলাতে প্রাণান্ত। স্ত্রী অনুযোগ করে, আমি তাকে মনোযোগ দিই না। মেয়েকে মনোযোগ দিই না। আমি হেসে ম্যানেজ করি। আর ক্লাবের ফাংশনের তোড়জোড় করি। অফিসে মিটিং-এর জন্যে তৈরী হই।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্লাব থেকে ফোন এল। গিয়ে দেখি হৈ-চৈ কান্ড। ক্লাবের ভিতরে পুলিশ। একজন অফিসার ও তিনজন কনস্টেবল লনে বসে আছে, তাদের সামনে মাটিতে পড়ে আছে ক্লাবের বিহারী মালি মটরু। আমাকে দেখে কয়েকজন মেম্বার এগিয়ে এলেন। মটরু হঠাৎ মারা গেছে। সন্দেহ হচ্ছে আগের দিন রাত্রে কিছু খেয়েছিল। লাশ পোস্ট মর্টেমে পাঠাতে হবে। ঘন্টাখানেক ধরে আমাকে সেক্রেটারীর কর্তব্য করতে হল।

পুলিশ, লাশ সব যখন চলে গেল, মেম্বারেরা আস্তে আস্তে গেলাস হাতে লনে গিয়ে বসলেন, তখন আমি অফিসে গিয়ে খাতাপত্র বার করলাম। ওর কি পাওনা-টাওনা ছিল একবার দেখতে হবে। দেখা গেল সবশুদ্ধ কিছুই নেই। মটরু নেশাভাং করত, মাঝে মাঝে মাইনে আগাম নিত। চাকরীও খুব বেশী দিন হয় নি। এইসব দেখছি, এমন সময় একটি বার-তের বছরের মেয়ে ঘরে ঢুকল। তাকিয়ে দেখি, মটরুর মেয়ে লছমী।

মেয়েটাকে আমি মাঝে মাঝে দেখেছি। ক্লাবের পিছন দিকে মালির কোয়ার্টার, সেখানেই বাপের সঙ্গে থাকত। স্বভাবতই ক্লাবের ভিতরে ঢুকত না। ওকে ঢুকতে দেখে আমার প্রেসিডেন্ট চক্রবর্তী সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, এই মেয়েটাকে নিয়েও ত সমস্যা আর একটা। একে কোথায় পাঠান যায়। বাপটা ত গেল, যাবার সময় মেয়েটার কথা ভাবলও না।'

লছমী কিন্তু এসে অবধি একবারও মুখ তুলে তাকায় নি। গালের উপরে চোখের জলের দাগ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মাথা নীচু। চক্রবর্তী সাহেব অনেক জেরা করলেন। বোঝা গেল, ওর মা নেই। চাচা মামা বিশেষ কেউ নেই, বা থাকলেও ও জানে না। দেশের সঙ্গে মটরুর বোধহয় বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। আত্মীয় স্বজনের সাথেও না। চক্রবর্তী সাহেব বললেন, 'দেখুন ত। এইটুকু একটা মেয়েকে এখানে ত আর রাখা যায় না, আর বাপের জায়গায় চাকরীও দেওয়া যায় না। দেখি দুর্গা বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে, ওর বাপের চেনাশোনা কারো হদিশ দিতে পারে কিনা।'

দুর্গা বাহাদুর ক্লাবের নেপালী দারোয়ান। অনেক কথাবার্তার পর সে
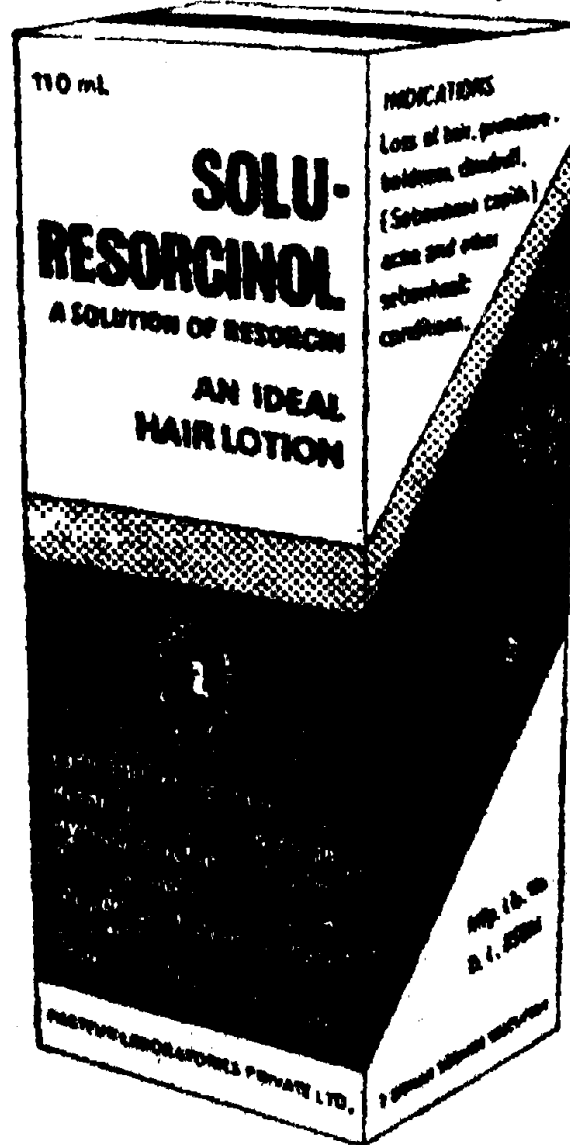
জানাল, বড়বাজার অঞ্চলে মটরুর এক বিহারী বন্ধু আছে, পান দোকানের মালিক। তার সঙ্গে মটরুর খাতির ছিল। চক্রবর্তী বললেন, 'কাল তাকে খবর দাও। দেখা যাক মেয়েটার একটা গতি ত করতে হবে।'

বাড়ী ফিরব বলে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ কে ডাকল, 'বাবুজী।' তাকিয়ে দেখি, লছমী।

'বাবুজী, হম ইধর হী রহেগা।'

'এখানে কি করে থাকবি রে? তোকে কি এখানে রাখা যায়? কাল তোর ঐ চাচা আসুক, ওর সঙ্গে বরঞ্চ ওর বাড়ীতে চলে যাস যদি ও রাজী হয়।'

'ও আদমী আচ্ছা নেহী হ্যায়।'

'কেন রে?'

কোন উত্তর নেই। মাথা নীচু করে লছমী ডান পা-এর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে।

'কি হল তোর?'

'হম উসকে পাস নহী যানা চাহতা।'

'তাহলে কোথায় যাবি?'

লছমী হঠাৎ মাথা তোলে। আমার চোখে চোখ পড়তেই আবার অন্য দিকে তাকায়।

'আপকে ঘর লে চলিয়ে। হম আপকে ঘরমে কাম করেগা।'

আমি প্রায় হেসে ফেললাম। বললাম, আমার বাড়ী যাবি কি করে? আমার ত আর লোক দরকার নেই। আর ও ত তোর চেনা লোক, তোর বাপের বন্ধু।'

তবু লছমী চুপ করে দাঁড়িয়ে। বললাম, 'যা ঘরে যা। কিছু খেয়ে নে, নিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাক। কাল দেখা যাবে।'

পরের দিন পাঁচটা নাগাদ অফিস থেকে উঠব উঠব করছি, এমন সময় ক্লাব থেকে ফোন এল। দুর্গা বাহাদুর মটরুর সেই বন্ধুকে নিয়ে এসেছে। আমাকে একবার ক্লাব হয়ে যেতে হবে।

গিয়ে দেখি, ছ' ফুট লম্বা, কালো একটি বিহারী লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে প্রায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। লোকটার চুলগুলো তেল চকচকে, মুখে ছড়ান ছেটান বসন্তের দাগ, চোখে তীক্ষ্ণ চতুর দৃষ্টি। সে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানাল, মটরুর মৃত্যুতে তার অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে। অনেক দিন রাত্রে এসে সে মটরুর ঘরে ডাল রুটি খেয়ে গেছে। মটরু অত্যন্ত ভাল লোক ছিল, তাকে খুবই ভালবাসত। মটরুর মেয়ের জন্যে তাকে যা হুকুম করা হবে সে করবে।

লছমী তখন ভিতরে ছিল। আমি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তার নাম রামনগিনা সিং। বড়বাজারে তার পানের দোকান আছে। বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকে। বাড়ীতে তার বউ আছে, মেয়ে আছে। লছমীকে সে রাখতে পারে।

কি কারণে লছমী লোকটাকে ভাল নয় বলেছিল, সেটা আমি বুঝি নি। আমার অত খেয়ালও হয় নি। বাচ্চা মেয়ের কথা ভেবে আমি সেটা গায়ে মাখি নি। আর আপাততঃ ক্লাবের সেক্রেটারী হিসেবে লছমীর একটা হিল্লে করা আমার কর্তব্য। এই বাজারে কেউ একটা অবাঞ্ছিত খাওয়ার মুখ নিজের সংসারে বাড়াতে চায় না। এ লোকটা যখন দায়িত্ব নিতে রাজী হয়েছে, তখন এর সাহায্যই নেওয়া উচিত। আমি দুর্গা বাহাদুরকে বললাম, 'লছমীকে তৈরী হতে বল।'

একটু পরেই লছমী একটা পুঁটলি হাতে বেরিয়ে এল। রামনগিনা সিং তখন দুর্গা বাহাদুরের সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। আমি লছমীকে বললাম, 'তোর চাচা এসে গেছে। ওর বাড়ীতে গিয়ে এখন থাক।'

হঠাৎ লছমী সোজা আমার দিকে তাকাল। তার গলা ঠান্ডা, শক্ত। 'ও হমরো চাচা নহী হ্যায়। ও বুরা আদমী হ্যায়।'

তারপর হঠাৎ ভীষণ নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপকা ঘরমে কাম নহী হোগা, না বাবুজী?'

আমি হাসলাম। লছমী আর দাঁড়াল না। রামনগিনা সিং সম্বন্ধে আসল খবরটা পেলাম পরের দিন। দুর্গা বাহাদুর জানত, ভয়ে ভয়ে আমাকে বলে নি। প্রেসিডেন্ট সাহেব বুড়ো মানুষ, তাঁকে সাহস করে বলেছে। রামনগিনা মেয়েলোকের ব্যবসা করে। অল্প বয়সী মেয়ে ধরে বেনারস, লখনউ, লুধিয়ানা পাচার করে। মটরুর কাছে কোন সময় গল্প গুজব করে থাকবে। লছমী সেটা জানত। ওদের ঘরে বার-তের বছরের মেয়েরা অনেক তাড়াতাড়ি অনেক কিছু শেখে।

আমি চেষ্টা করলাম, ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে। ভাবতে হলে ত এ রকম কতই ভাবতে হয়। এসব ঘটনা আশেপাশে কতই ঘটছে। আমি কি সকলের সব সমস্যা মেটাতে পারব? দুনিয়ার সব শয়তানদের মোকাবেলা করতে পারব? সবার দুঃখ ঘোচাতে পারব? কত মেয়েই ত লছমীর মত অবস্থায় পড়ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। আর লছমীকে যে পাচার করেই দিয়েছে, তারই বা প্রমাণ কি? হয়ত রামনগিনার বাড়ীতেই আছে, বহাল তবিয়তে!

কিন্তু সেই নাম-না-জানা ছেলেটির মত, স্মিতা সান্যালের মত, লছমীও ঘুরে ফিরে এসে সামনে দাঁড়ায়। আমি অসহায়-ভাবে তাকিয়ে থাকি।

'বাবুজী, তুম হামকো ভাগা দিয়া।'

'আমি তোকে রাখব কি করে বল?'

'তুমহারা বহুত প্যায়সা হ্যায়। ফির ভী তুমহারে ঘরমে কাম করনে নহী দিয়া।'

'আমি কতগুলো কাজের লোক রাখব?'

'রামনগিনা বুরা আদমী হ্যায়। ও হামকো দুসরা মুলুক ভেজে গা। নহী ত মার ডালেগা।'

আমি তখন পাশ ফিরে আমার ঘুমন্ত মেয়েকে আদর করি। তার কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিই। কপালে চুমু খাই। মেয়ের একটা নরম হাত টেনে নিয়ে জোর করে ঘুমিয়ে পড়ি। লছমী, তুই যা। তারপর আধো ঘুমে স্বপ্ন দেখি, আকাশে অনেকগুলো রঙীন ঘুড়ি উড়ছে। আমি দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছি, একটা ঘুড়ি কাটা পড়লেই দৌড়বো। ঘুড়িগুলো উড়ছে, ঘুরছে। আমি চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে আছি। আমার আর কোন চিন্তা নেই। আমি কোন পাপ করি নি।

কাল সকালে আমি আমার সেই স্বপ্নের জায়গাটায় পৌঁছব। লোকে বলে, ছেলেবেলার জায়গায় বহুকাল পরে গেলে কষ্ট হয়। মনের মধ্যে সেই পুরোন দিনগুলোই বেঁচে থাকে, কিন্তু জায়গাটা বদলে যায়। পুরোন দিনের চিহ্ন খুঁজতে গিয়ে শুধু ঘা খেতে হয়।

আর এও হয়ত ঠিক যে সে চিহ্নগুলো খুঁজে পেলেই বা কি? সেগুলোকে নিজের জীবনে ত আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। বয়স কমবে না, বর্তমান মুছে যাবে না, অতীত এসে মায়ের আঁচলের মত ঢাকতে পারবে না সব দুঃখ।

আমি সব জানি। কিন্তু সেই ছেলেটা স্মিতা সান্যাল, লছমী—এরা বড্ড বেশী ফিরে ফিরে আসে। বার বার এসে নিঃশব্দে অভিযোগ করে যায়। বলে, তুমি অপরাধী। তুমি স্বার্থপর। তুমি ভাল নও। তুমি পারতে আমাদের বাঁচাতে। তুমি শুধু নিজেকে নিয়ে রইলে।

ক'দিনের জন্যে তাই আমি সেই শহরটায় ফিরে যাচ্ছি। যেখানে আমাকে আঙ্গুল তুলে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার কেউ নেই। আমার কিছু উজ্জ্বল রামধনু রঙা দিন আমি ফিরে পাব। নদীর ধারে, টিলার উপরে, সেই কৃষ্ণচূড়ার নীচে বসে, আর একবার দেখব সূর্যাস্ত।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বাধা দেবারই কথা, কিন্তু মহামায়া বাধা দিতে পারলেন না। কথাগুলো জড়িয়ে আসছে, হাত পা ঠান্ডা। কিছুই খাননি দুদিন। পাশের বাড়ির গিন্নিও চিন্তিত মুখে ঘাড় নাড়লেন, তিন দিনের জ্বরে এমন হয়ে পড়া, আশ্চর্য। এমন কখনও দেখিনি। এ বাপু পাঠিয়েই দাও।'

ট্যাকসী ডেকে সবাই মিলে উঠিয়ে দিলেন ধরাধরি করে। গাড়িতে উঠে ইশারা করে মহামায়াকে ডেকে বললেন, 'আমার জপের থলির মধ্যে পনেরোটা টাকা আছে—বোনপোর হাতে বারোটা দাও, আর তিনটে বড়খোকার হাতে। এখন হয়ত দু-একদিন আসা-খাওয়া করতে হবে, কোথায় এত পয়সা পাবে ও বেচারী।'

মহামায়ার রুদ্ধ চোখের জলে দু পাশের রগে শিরাগুলো টনটন করছে তখন, মনে হচ্ছে ফেটে বেরিয়ে আসবে—জল বা রক্ত। তিনি প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে জপের থলি থেকে টাকা নিয়ে দুজনকে ভাগ করে দিয়ে জপের থলিটা বামুনদির গলায় গলিয়ে দিলেন। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলে মাটিতেই আছড়ে পড়লেন। একমাত্র সত্যকারের হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহায় যে ছিল—সেও আজ ত্যাগ করে চলে গেল। আর কি কখনও আসবে, আসতে পারবে?

বামুনদি বুঝেছিলেন নিজের অবস্থা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেন নি।

রাজেনকে আসা যাওয়া আর করতে হল না। যখন ওখানে পৌঁছল পাড়ার প্রবীণার দল এসে দেখে চমকে উঠলেন, 'ওমা, একী রুগী আনলে! এতো আর দেরি নেই, শ্বাস উঠেছে যে!'

ডাক্তার একজন তখনই ডাকা হল। তিনি এসে দেখে বললেন, 'ইঞ্জেকশ্যন একটা দিচ্ছি তবে বিশেষ ফল হবে বলে মনে হচ্ছে না বরং দেখুন যদি একটা অকসিজেন যোগাড় করতে পারেন।'

রাজেনের আর রাত্রে ফেরা হল না।

পরের দিন ভোরেও না।

সকাল আটটা নাগাদ বামুনদি মারা গেলেন।

॥২৫॥

এই সমস্ত সময়টা—মাঘ থেকে কার্তিক পর্যন্ত অন্য সব ভাবনা ও কাজের মধ্যে, বিভিন্ন বিচিত্র ও প্রবল আবেগের মধ্যে, বিপুল আশা ও বিপুলতর আশা ভঙ্গের মধ্যে আর একটি বড় রকমের আবেগঘন নাটকের অবতারণা চলছিল বিনুর জীবনে।

নতুন এক বন্ধন—স্বেচ্ছাকৃত, স্বেচ্ছাবৃত।

এ বন্ধনে বুঝি যেমন বেদনা, তেমনি মাধুর্য।

বিনুর সবচেয়ে বড় আশা ও সাধ, সেই ছোট থেকেই, নিজের মন ভাল করে বোঝবার বা—এটা যে একটা সাধ তা জানবার সে বিষয়ে সচেতনতা আসার অনেক আগে থেকেই—কোন একটি বন্ধুকে, একান্ত আপন করে অন্তরঙ্গ করে পাওয়া। একে বাসনা কি কামনা এই ধরনের কোন বহুল ব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগ করে ঠিক আশা করা যায় না—আধুনিক ভাষায় এ ওর বুঝি জীবন-স্বপ্ন, জীবন ভাবনা।

এ আকুতি যেন ওর স্বভাবের মধ্যে, সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে। এ ওর দৈহিক গঠনে, জীবন ধারায়—এ ওর রক্তস্রোতে মিশে আছে। এক সাংঘাতিক বীজাণুর মতোই তার দেহের সংগঠনে জড়িয়ে আছে। এ চিন্তা ওর বাকী সমস্ত চিন্তার নিত্যসাথী, মনের অবচেতনে সদা বিদ্যমান। একে ভাবনা বলাই উচিত।

আবেগ বা কামনা যখন প্রবল হয় তখন মানুষ পাত্রাপাত্র দেখে না। সেই জন্যেই দেখা যায় সমাজে বা সংসারে রমণীরত্ন নর-পশু বা নরপিশাচকে ভালবাসছে, তার জন্যে প্রাণ দিচ্ছে এই ধরনের প্রেমাস্পদ বা কাম্য পাত্রের জন্য তারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বেচ্ছায় নষ্ট করে, কোন দিকে তাকায় না, কারও কথা ভাবে না। নিজের কথা তো

এ পুরুষের বেলাও সমান সত্য। কত বিদ্বান বুদ্ধিমান—অনেক ক্ষেত্রে রূপবানও আদর্শবাদী তরুণ ছেলেরা যাদের সামনে উজ্জ্বলতম জীবন পথ প্রসারিত তারাই বেছে নেয়—কুরূপা, স্বার্থপর (বা অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থসর্বস্ব) অতি চপলমতি নিটোল মূর্তিমতী অশান্তি—এমনি মেয়েদের। বোধহয় এই ধরনের ভাল ছেলেরাই আরও বেশী এমনি নিজেদের আবেগের ফাঁদে ধরা পড়ে। নিজেদের স্বয়ংবৃত বন্ধনে বন্ধ হয়, জীবন নষ্ট করে—উচ্চাশা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিপুল সম্ভাবনা—সব কিছু জলাঞ্জলি দেয়।

এরা কেউ রূপও দেখে না। এদের চোখে নিজেদের উদগ্র আবেগ এক আবরণ টেনে দেয়। বিনু তো কত দেখল—বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারে কাছে—ভেতরেও, বহুদিন যাতায়াত করতে হয়েছে তাকে। পথে-ঘাটে বাসে-ট্রামে, বাসস্টপ-এ অনেক এমন সর্বনাশের নিভৃত অন্তরঙ্গ ছবি চোখে পড়েছে—আবেগে উন্মত্ত ছেলেমেয়েদের। সুশ্রী সুন্দরী মেয়েরা উচ্ছৃংখল অপদার্থ কদর্য চেহারার ছেলেদের জন্যে মা-বাপকে নিষ্ঠুরতম আঘাত দেয়। কান্তিমান সুপুরুষ উজ্জ্বল তরুণরা বাজে মেয়েদের পায়ে নিজের জীবন ও ভবিষ্যৎ সঁপে দিয়ে নিঃশোষিত হয়।

রূপগুন কিছুই পায় না এদের অনেকেই। ভাবেও না সে সব কথা। নিজেদের দৈহিক কামনার উগ্রতা এদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রাখে, অন্ধকার করে দেয়। এপর্দা যখন সরে তখন সর্বনাশের বিশেষ কিছু আর বাকী থাকে না।

এ সকলের পরিণতি হয়ত নয়—তবু অনেকের এ তো নিজেই দেখেছে।

দেখছে খুব অল্পবয়স থেকেই।

তবু এ নিতান্তই জৈবিক কামনা, যৌন ক্ষুধা ভেবেই উপেক্ষা করেছে সে এর অনেক উর্ধ্বে ভেবেই নিশ্চিন্ত হয়েছে।

এই দুই ধরনের আবেগের মধ্যে কোথায় একটা মৌলিক মিল আছে তা ভেবে দেখেনি।

ভেবেছে এটা নরনারীর বিশেষ মিলনের বিশেষ কামনার প্রশ্ন। জন্মের মতো জীবন-সঙ্গিনী বা সঙ্গী [illegible] নেওয়ার প্রশ্ন। নিজের তীব্র [illegible] আঘাতও তাকে এ-বিষয়ে সজাগ [illegible] পারেনি, বরং কোন কোন পরিচিত [illegible] এইসব কামনার [illegible] সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে যখন সিন্ধুবাদ নাবিকের সেই বৃদ্ধের মতো দুই সাঁড়াশি-কঠিন পা দিয়ে গলা আটকে পাথরের মত বোঝা হয়ে উঠতে দেখেছে—যা না যায় ফেলা, না যায় বওয়া তখন এক ধরনের কৌতুক রসই অনুভব করেছে।

অবশ্য তখন বিনু অত জানত না। সেই কিশোর বয়সে। এত ভাবেনি, এত দেখেওনি।

তার কল্পনা ও স্বপ্নের সীমাবদ্ধ

পর্যন্ত। সে স্বপ্নেরও যে সেই একই গতি, তা ও নিজে তখনও বোঝেনি। তখন কেন অনেক দিন পর্যন্ত বোঝেনি। হয়ত বুঝতে চায়নি বলেই। ওর গরজ এটা—কোন এক বন্ধুর প্রতি প্রীতি-প্রেম চিন্তাভাবনা নিঃশেষে উজাড় করে দেওয়া। না দিয়ে থাকতে পারবে না সে। যেখানে দিচ্ছে, যাকে দিচ্ছে —সে কেমন, এই সর্বস্ব ত্যাগ —স্বার্থ, ভবিষ্যৎ নিজের উচ্চাশা পর্যন্তও হয় বা—এর উপযুক্ত কিনা, এই ত্যাগের বিশালতা বিপুলতা মহত্তর মূল্য বা মর্ম বুঝবে কিনা, তা ভাবেনি, ভাবার কথাও ভাবেনি। সে বিষয়ে কোন সচেতনতাই নেই। ওর যে কাউকে বা কোথাও দেওয়া দরকার, না দিয়ে যে ওর স্বস্তি নেই, মুক্তি নেই। না দিতে পারলে জীবনটাই বুঝি অর্থহীন হয়ে যাবে।

আধারের বা পাত্রের যোগ্যতা ভাবতে গেলে তো ওর চলবে না। গোরা ওর কল্পনার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি, সে মানসিক গঠনই ছিল না তার। কিন্তু তাতে কি!

এই প্রবৃত্তি, এই প্রবলতা বা প্রবণতা যে ওর সহজাত। তা নাহলে গোরার ব্যাপারেই শিক্ষা হত সতর্ক হতে নিজেকে সংযত করত। কিন্তু তা হয়নি। গোরার কাছ থেকে—কাছ থেকে বললে হয়ত অবিচার করা হয়—গোরাকে উপলক্ষ করে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, ওর বয়স ও অভিজ্ঞতার তুলনায় প্রচণ্ড—তবু চৈতন্য হয়নি। এ আবেগ ও ঈপ্সা ওর প্রাণের পাত্র পূর্ণ করে উপচে পড়ছে—কোথাও বা কাউকে না দিয়ে থাকতে পারবে না। এ ওর এক রকম ব্যাধি, এর বীজাণুও বুঝি অমর।

এবার স্কুলে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিহ্নিত করেছে মনে মনে—অথবা চিহ্নিত হয়ে গেছে দেখা মাত্র—সেই বন্ধু।

ললিত।

ললিত লাহিড়ী।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ লম্বা ধরনের চেহারা, শান্ত আয়ত দুটি চোখ, তাতে গভীর স্থির দৃষ্টি।

অন্তত বিনুর তাই মনে হয়েছিল।

নিয়তিই যেন অমোঘ আকর্ষণে ওকে টানল সেদিন—সেই প্রথম দিন—ললিতের দিকে, ললিতের পাশে গিয়েই বসল। ওর সঙ্গেই প্রথম পরিচয় হল এ স্কুলে।

সেই দিনই—সেই ক্ষণেই ওর মন বলে উঠল, 'এই একেই সে চেয়েছিল,' এতদিন চাইছিল। এ-ই ওর সেই চিরদিনের বন্ধু।

মনে হল ভাবতে ভাল লাগল—জন্মাবধি এরই প্রতীক্ষা করছে সে।

ললিতরা এই পাড়াতেই থাকে—মানে স্কুলের পাড়ায়।

বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছাকাছি ওদের বাড়ি। বিনুদের বাড়ি থেকে লাইন পেরিয়ে পাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে পথে পড়ে ওদের বাড়ি। মাঝারি ধরনের পুরনো বাড়ি তবে একেবারে জরাজীর্ণ নয়। তখনও এ অঞ্চলে এত ধনী ব্যক্তিদের সমাগম হয়নি, হলে বেমানান মনে হত। তখন খুব হতশ্রী লাগত না।

ললিতের বাবা কি একটা বড় বিলিতি ফার্মে চাকরি করেন। ললিত তাঁর প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় সন্তান। ওর মা দুটি ছেলে হবার পর অতি অল্প বয়সেই সূতিকা হয়ে মারা যান। তখন ওর বাবা নিতাইবাবুরই মাত্র তেত্রিশ বছর বয়স।

সুতরাং নিতাইবাবু আবার বিয়ে করবেন সেটা স্বাভাবিক। যথানিয়মেই বিয়ে করেছেন এবং এ পক্ষেও তিনটি মেয়ে ও দুটি ছেলেও হয়ে গেছে।

ললিতের কথাবার্তায়, আর পরে পাড়ার অন্য ছেলেদের মুখে যা শুনেছে—ললিত বিনুর মতই দুর্ভাগা, স্নেহের কাঙাল। ওর এক বছর বয়সে মা মারা গেছেন, মাকে মনেই পড়ে না। তাঁর একখানা ছবিও ঘরে নেই। বিয়ের পর বুঝি ললিতের মামার বাড়ি জোড়ে একখানা ছবি তোলা হয়েছিল সেটা চিকে খেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, মামার বাড়িতে সে ছবির যে কপি ছিল সেও নেই, সে নাকি আগেই ছাদ থেকে বৃষ্টির জল পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

ললিতদের মামার বাড়িতে দিদিমা ছিলেন, ওর মার মৃত্যুর পর মাত্র চার-পাঁচ বছর বেঁচেছিলেন অবশ্য, তবু এই ক' বছরও তারা আদরে লালিত হতে পারত—কিন্তু হয়নি। দিদিমা ঐ বয়সেই অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর পক্ষে আর ছোট ছেলে মানুষ করা সম্ভব ছিল না। মামারা পৃথক, দিদিমা বড় মামার কাছেই থাকতেন—তবে সেও ভাগে, বাকী দু ছেলে মাকে দশ টাকা করে দাদার হাতে দিত, মার খোরাকী বাবদ।

এ অবস্থায় ভাগ্নেরা কোন মামীর কাছে মানুষ হবে? সে প্রশ্নই কেউ তুলতে দেয়নি, উত্থাপন মাত্রেই এড়িয়ে গেছে।

অবশ্য নিতাইবাবুও ছেলেদের মামার বাড়ি পাঠানোয় খুব আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর শালারা থাকে দর্জিপাড়া অঞ্চলে, ওখানকার ছেলেদের খুব সুনাম ছিল না। শালার ছেলেরাও যেভাবে মানুষ হচ্ছে সেটা ছেলেদের বাবার পক্ষে খুব আশাপ্রদ নয়। সেই জন্যেই তিনিও এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন নি, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী না আসা পর্যন্ত ক' মাস এক বিধবা মাসতুতো দিদিকে এনে রেখেছিলেন, তাকে এখনও সে জন্যে মাসে পাঁচ টাকা করে পাঠাতে হয়।

ললিতের দিদিমা একবার নিতান্ত কর্তব্য বোধে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রস্তাব তুলেছিলেন 'তা ওদের নয় কিছু দিনের জন্যে এখেনেই পাঠিয়ে দাও না! কে দেখছে ওখেনে ছেলে দুটোর ক্ষোয়ার হচ্ছ হয়ত--

অনাবশ্যক বোধেই নিতাইবাবু সে কথায় কোন উত্তর দেন নি। তিনি চিরদিনই [illegible] মানুষ, [illegible] তার এ [illegible] কেউ অস্বাভাবিক ভাবে নি, শাশুড়িও অপমানিত বোধ করেন নি। বরং বড় বৌমার কটু ভাষণ ও তাচ্ছিল্যের ভাত থেকে ছেলে দুটো বেঁচে গেল ভেবে জামাইয়ের সুবুদ্ধির প্রশংসাই করেছিলেন মনে মনে।...

ললিতের সৎমা বড় লোকের মেয়ে। মানে নিতাইবাবুর অবস্থার তুলনায়। এটা অবিশ্বাস্য বোধ হলেও অসম্ভব ঘটনা নয়। অবিশ্বাস্য এই জন্যে যে অবস্থাপন্ন লোকেরা কেউ সহজে দোজবরেতে মেয়ে দিতে চান না। এ ক্ষেত্রে দিয়েছিলেন তার কারণ অবস্থা ভাল হলেও ভদ্রলোকের ছটি মেয়ে—আর সে মেয়েদেরও কোন বিচারেই রূপসী বলা চলে না। একেবারে কুরূপা না এই পর্যন্ত।

আর ঠিক সেই সময়েই নিতা[illegible] বেশ একটু —সহকর্মীদের চোখ টাটানো গোছের—পদোন্নতি হয়েছিল। মেয়ের কাকা ঐ আপিসেই কাজ করেন কাজেই সংবাদ জানতে অসুবিধা হয়নি। বস্তুত তিনিই এ সম্বন্ধ এনেছিলেন।

ললিতের বিমাতা পদ্মলতা মানুষ খারাপ ছিলেন না। সন্তানদের প্রতি যা অবশ্য করণীয় সব কিছুই করে যেতেন—কিন্তু কর্তব্যের ওপরে উঠতে পারেন নি। তার কারণ এ বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তাঁরও সন্তান হতে আরম্ভ হয়েছে। স্নেহ মমতা উদ্বেগ প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি নিজের সন্তানদের ওপরই বর্তিত হতে বাধ্য। হয়ত সেখানেই নিঃশেষ হয়ে যেত। পদ্ম ঠিক ততটাই সমানভাবে সৎ ছেলেদের ওপরও আসবে তা আশা করাই অন্যায়।

ললিত আর তার দাদা অজিত এই পার্থক্যটা লক্ষ্য করবে সেও স্বাভাবিক। এবং এতটা আশা করা নিজেদেরই [illegible], বাস্তব বুদ্ধির অভাব—তাতে ঐ বয়সে তারা বুঝতে চাইবে না, বা পারবে না, সেও প্রকৃতির নিয়ম। অবহেলা বা অযত্ন ঠিক নয় —হয়ত ঔদাসীন্যই—তবু তাতেই ক্ষুণ্ণ হত ওরা। রাত্রে খেতে দেবার সময় নিজের ছেলেরা সবাই এসে না বসলে অপেক্ষা করতেন, ডাকাডাকি করতেন, খোঁজ নিতেন তারা আসছে না কেন—কিন্তু ভাষায় 'ধম্ম-ডাক'—ভাত তরকারী থালায় বেড়ে ঢাকা চাপা দিয়ে রাখতেন। বেশী দেরি হলে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে নিজেও খেয়ে চলে যেতেন। ওরা পরে এলে সেই সারিসারি এঁটো থালা ও উচ্ছিষ্টের রাশির মধ্যে একা বসে খেয়ে যেতে হত।

নিতাইবাবু অনেক আগে খেয়ে নিয়ে পাড়ার ক্লাবে তাস খেলতে যেতেন—তাঁর এসব জানার কথা নয়। আর এ এমন কিছু অভিযোগ করার মতো অসদ্ব্যবহারও নয় যে বিশেষভাবে তাঁর কাছে গিয়ে জানাতে হবে।

এই ধরনের নিতান্তই ছোটখাটো ঔদাসীন্য ও বিস্মৃতি—কোন একটা তরকারি একদিন কাউকে দিতে ভুলে যাওয়া, [illegible] থেকে মিষ্টি এনে সবাইকে দিয়ে

ওদের একজনকে দেবার কথা মনে না পড়া—হয়ত সকালে ওদের কারও জন্যেই কোন একটা খাদ্য তুলে রেখে পরের দিন পচে গেলে রাস্তায় ফেলে দিতেন, আগের রাতে সে কথা মনে না পড়ার জন্যে—এসব কোন অবিচার বা দুর্ব্যবহার নয়, এর নালিশ চলে না—একথা সেই টুকু বয়সেই বুঝত ওরা!

তবু এ স্নেহ বুভুক্ষা যে ঠিক বিনুর ক্ষুধার পথ ধরে চলত না—সেটা তখনই বোঝেনি সে।

অনেক অনেক পরে বুঝেছে। প্রাণপণে সেদিকে চোখ বুজে থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও একদিন সত্যকে স্বীকার করতে হয়েছে।

প্রথম পরিচয়ের পর ক'দিন যেতে না যেতেই বিনু ললিতের সঙ্গে একটু নিভৃত আলাপের জন্যে অস্থির অধির হয়ে উঠল।

একটু ঘনিষ্ঠ সাহচর্য, দু-একটা অন্তরঙ্গ কথাবার্তা—যাতে অনায়াসে ভাবা যায় অপরের সঙ্গে ললিতের যে প্রীতির সম্পর্ক তার থেকে বিনুর সঙ্গে অনেক বেশী। এইটুকু শুধু।

বাড়ি খুব দূরে নয়, যেতে আসতে আধ ঘন্টা আর আধ ঘন্টা গল্প করা কিছু অশোভন হবে না।

তার বাড়িতেও বাধা বিস্তর। বন্ধুদের ডেকে বাড়িতে আনা চলবে না। মা পছন্দ করেন না, তাছাড়া সে সুবিধাও নেই। তিনটে ঘর গায়ে গায়ে লাগা, ভেতর দিয়ে দিয়ে দরজা। মধ্যের যে ঘরটা বাইরের ঘর বা বাইরের লোক বসার ঘর হতে পারত, সেটায় আগে বামুনমা থাকতেন, তাঁর বিছানাটা গোটানো থাকত দেওয়ালের দিকে—এখন একেবারেই খালি পড়ে আছে। সেখানে একটা চেয়ার চৌকী এমন কি একটা টুলও নেই যে কাউকে বসতে দেবে। একটা ময়লা ছেঁড়া মাদুর আছে এক কোণে, সেটাও বামুনমারই—তিনি দুপুরে সন্ধ্যার একটু গড়াতেন। তা পেতে কাউকে বসানো যায় না, ওর বন্ধুদের তো নয়ই। সে মাদুরখানা ছাড়া আর কিছুই নেই।

দরকার ছিল না বলেই সে ব্যবস্থা হয়নি।

রাজেনের বন্ধু বলতে সহপাঠীরা, তারা কলকাতার ছেলে, ট্রেনে করে কেউ এখানে গল্প করতে আসবে না। একবার মাত্র একজন এসেছিল, শৈলেশ বলে একটি ছেলে সে নাকি বরাবর সব পরীক্ষায় প্রথম হয়—তাকে রাজেন মাঝের ঘর দিয়ে এনে নিজের ঘরে অস্থিতীয় বিছানাটাতেই বসিয়ে ছিল। সেদিন পূর্ণিমা, মা বেলায় নিজের খাবার করছিলেন, দুখানা পরোটা ভেজে দুটো রসগোল্লা আনিয়ে জলখাবার খেতে দিয়েছিলেন।

তবে সে রাজেনের বন্ধু, ভাল ছাত্র, তার সম্মান আলাদা। অনেকখানি দূরের ছেলে—বর্ধমানের দিকে কোথায় বাড়ি, এখানে হিন্দু হোস্টেলে থাকে। আত্মীয়স্বজন কলকাতায় বিশেষ নেই বলেই এতদূরের পথ এসেছে। আর কার এত গরজ হবে?

বিনুর বন্ধুদের মা ভাল চোখে দেখেন না, কে কেমন বিচার না করেই। তার এই স্থানীয় সহপাঠীদের ভেতরে এনে কোথাও বসানো যাবে না। মার ঘরে মার সঙ্গেই শোয় সে, সে বিছানায় বাইরের কাপড়জামা পরা, রাস্তায় মাঠে খেলে বেড়ানো ছেলেকে এনে বসানো যাবে না। তাছাড়া ওদের বিছানাপত্রেও দৈন্যের ছাপ স্পষ্ট। সে দারিদ্র্যের চেহারা বন্ধুদের দেখাতে রাজীও নয় বিনু।

বিনুর সঙ্গীদের ওপর মহামায়ার এ বিদ্বেষ বা বিরক্তির মূলে বিনু সম্বন্ধে মহামায়ার বিশেষ উদ্বেগ। কাশীর সহপাঠীদেরও উনি সন্দেহের চোখে দেখতেন। ওঁর বিশ্বাস পাড়ায় যত বখাটে উনপাঁজুরে বরাখুরে ছেলেরা ওঁর এই সরল, অনভিজ্ঞ আধপাগলা ছেলেটাকে বিগড়ে দেবার জন্য উৎসুক ও ব্যগ্র। কোন বন্ধুকে যদি ডেকে বাইরের ফালি বারান্দাটায় কি সিঁড়িতে বসিয়েও গল্প করে—মা যে ধরনের বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন করবেন—কণ্ঠের তিক্ততা গোপন করার কোন চেষ্টা না করেই—ভাবতেই ঘেমে ওঠে বিনু। সে রকম কোন ঘটনা ঘটলে সে অন্তত আর ঐ স্কুলে যেতে পারবে না।

সুতরাং বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে গেলে তাকেই যেতে হয়।

এমন কদাচ স্কুল থেকে ফেরার পথে বা কোন দিন হঠাৎ ছুটি হয়ে গেলে—সহপাঠীদের একজন টেনে নিয়ে গেছেও—বিশেষ যাদের এই স্কুলের পাড়াতেই বাড়ি। বিনুর নিজেরই ভাল লাগে না। দেরি হলে মা ভাবতে শুরু করবেন, অথচ চিন্তার কোন কারণ ঘটেনি মানে বিপদ আপদ ঘটেনি—আড্ডা দিতে গিয়ে দেরি হয়েছে—জানলে চটে উঠবেন বকুনি দেবেন।

অবশ্য হঠাৎ পাওয়া ছুটিতে সে বিপদ নেই, তবু বিনুর ভাল লাগে না কারও বাড়ি যেতে। প্রাণপণে এড়িয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করে।

তার কারণও যথেষ্ট।

এরা বাড়ি নিয়ে গেলে এদের বাবা মা ভাইবোনরা কেমন সস্নেহ ভাবে কথাবার্তা বলেন, কত কি খেতে দেন! এইসব বন্ধুরা যদি পাল্টা ওর বাড়ি কোন দিন আসতে চায়—এমনি দল বেঁধে!

এই ধরনের ঘনিষ্ঠতা হলে বলতেই পারে। বলা স্বাভাবিক। কিন্তু সে কোথায় বসতে দেবে? তাদের এমন বাড়তি পয়সাও নেই যে বাজার থেকে খাবার এনে খেতে দেবে, অথবা করবার মতোও অত লোক নেই বাড়িতে খাবার করিয়ে খাওয়াবে।

তার ওপর সবচেয়ে যেটা ভয়ের কথা—মায়ের বিরস মুখ, বিরক্ত ভঙ্গী এবং কঠিন কথাবার্তা। তারা অপমানিত বোধ করবে—ওর বন্ধুরা। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে, হয়ত ওর মুখের ওপরই কত কি বলবে। ওর মার সম্বন্ধে এমনসব কথা বলবে যা ওর সহ্য করা সম্ভব নয়, অথচ তার প্রতিবাদও করতে পারবে না।

এই ভয়েই শিঁটিয়ে থাকে সে। সহজে কোথাও কারও বাড়ি যেতে চায় না।

প্রসাদ বলে একটি ছেলে পড়ে ওদের সঙ্গে—খুবই ধনী ও বিখ্যাত লোকের ছেলে, বড় বংশের সন্তান—একডাকে সবাই চিনবে ওদের পরিবারের নাম। কিন্তু ছেলেটি দুনিয়ার খবর যত রাখে, বড়মা মানষীর রাজনীতি বক্তৃতা আরম্ভ, এই বয়সেই বেরায়া যা আর্দালীকে যে ভাবে শাসন করতে শিখেছে—কড়কড় করে ইংরেজী কথা বলে ওদের তাক লাগিয়ে—লেখা-পড়ায় সে পরিমাণ মন বা সামর্থ্য নেই। আর চাকর চাকরবাকরদের কাছ থেকে এখনই বিড়ি সিগারেট খেতে শিখেছে, খারাপ কথাও। সেগুলো যে খারাপ কথা তা বিনু জানত না, অন্য সহপাঠীদের লজ্জা ও ভয় মেশানো কৌতুকের হাসি দেখে বুঝত এগুলো প্রকাশ্যে—শিক্ষক কি অভিভাবকদের কাছে বলবার মতো কথা নয়।

একদিন এক শিক্ষকের আকস্মিক মৃত্যুতে স্কুল বসবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটি হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গেই সেদিন ওদের এক বিরাট দলকে নিজের বাড়িতে টেনে নিয়ে গিছল। বিনু প্রথমটা যেতে চায়নি, শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিল—কতকটা কৌতূহল সামলাতে না পেরেই। এত ধনী, এত বিখ্যাত লোক প্রসাদের বাবা, বিলেত ফেরৎ বললেও কিছু বলা হয় না, বিলেতেই মানুষ বলতে গেল, জীবনের অর্ধেকেরও বেশী দিন বিলেতে কেটেছে, অর্থাৎ পাক্কা সাহেব। তাঁদের বাড়িঘর জীবনযাত্রা না জানি কেমন—এ কৌতূহলও জানার আগ্রহ ছিলই মনে মনে। সেই কারণেই ওর স্বাভাবিক অনীহা—সতর্কতাও বলা চলে—সংবরণ করেই গিয়েছিল দলের সঙ্গে।

ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখেও ঠিক আশাভঙ্গ হয় নি।

বিরাট বাড়ি, চওড়া সাদা পাথরের সিঁড়ি পাথরেরই রেলিং—সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে সামনেই বড় হল ঘরের মতো ড্রয়িং রুম বা বৈঠকখানা। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, সোফা কউচ, সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো বড় বড় আয়না, অয়েল পেন্টিং ছবি। পরে শুনেছে ওগুলো কয়েকখানা বিশ্ববিখ্যাত ছবির নকল, অনেক খরচ করে পাকা শিল্পীদের দিয়ে করানো। বড় বড় ঝাড় বাতিদান—অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী থেকে নাকি কেনা। লাল ভেলভেটের পর্দা দরজায় দরজায়।

এছাড়া ঘরের এক কোণে একটা পিয়ানো—পিয়ানো এই প্রথম দেখল বিনু—উল্টো কোণে বড় গোছের একটা গ্রামোফোন আর তিন বাকস রেকর্ড।

প্রসাদ গিয়েই রাজ্যের শৌখিন খেলনা বার করে আনল কোথা থেকে, ক্যারম বোর্ড, লুডো, তাস। দান দান ভাগ করে

গুলে গেল সব। বিনুই এর মধ্যে সবচেয়ে আনাড়ি, বেমানান। সে এসব খেলা জানে না, কোন কোনটা কখনও দেখে নি পর্যন্ত। তাস চেনে, তবে গাধা পেটাপেটি ছাড়া কখনও কিছু খেলে নি। কার সঙ্গেই বা খেলবে, কে-ই বা শেখাবে।

কিন্তু প্রসাদও নাছোড়বান্দা। 'আয়, আমি তোকে মানুষ করে দিচ্ছি' বলে জোর করে নিজের সঙ্গেই বসালো। 'টোয়েন্টি নাইন' খেলার তখন নাকি খুব 'চল', সেটাই মোটামুটি শিখিয়ে দিল ওকে—মানে নিয়ম-কানুনগুলো। কিন্তু খেলার গভীরে ঢুকতে পারল না বিনু। সে ইচ্ছাও খুব ছিল না। এর যে এত হিসেব আছে, প্রথমে হাতে পাওয়া চারখানা মাত্র তাস দেখে রঙ ঠিক করতে হবে, যে রঙ তোমাকে খেলা জিততে সাহায্য করবে; কোন রঙের কখানা তাস পড়ল আর কখানা 'বাজারে' আছে এবং সেগুলো কার হাতে কোনটা থাকা সম্ভব খেলার গতি দেখে ঠিক করা—এত হিসেব করতে পারে না বিনু। খেলা খেলাই, তাতেও যদি অত অঙ্ক কষতে হয় তা হলে সে খেলার আনন্দ কি!

ফলে, যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না [illegible] বকুনি খেতে লাগল [illegible]

এইরকম খেলা আর হৈহল্লার মধ্যেই ভেতরের কোন ঘর থেকে প্রসাদের বাবা ডাকলেন ওকে, 'খোকা' বলে। প্রসাদ গিয়ে ওঁকে কি বলল কে জানে, একটু পরেই মুসলমান বাবুর্চি ও বেয়ারা এসে কয়েক ডিশ খাবার দিয়ে গেল—কেক স্যান্ডউইচ বিস্কুট সিঙ্গাড়া আর চা।

বোধহয় এই খাবারের কথাই ওর বাবা জানতে বা বলতে চেয়েছিলেন। বন্ধুরা এসেছে, তাদের কিছু খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছে কিনা। এত বড় লোক, পাকা সাহেব—তাঁরও কত সহৃদয়তা, কত বিবেচনা। ....মুগ্ধ হয়ে গেল বিনু। সেই সঙ্গে নিজের বাবার অভাবটা মনে পড়ে—সে যে কতখানি অভাব নিত্যই তো বুঝছে, পদে পদে, মনের একটা গভীর ক্ষত যেন নতুন ব্যথায় টনটন করে উঠল।

কিন্তু এদিকে একটা মস্ত বিপদ ওর সামনে। খাবার যারা দিচ্ছে, তারা মুসলমান যে। বিনুরা নাকি ব্রাহ্মণ, ওদের খাওয়া ছোঁওয়ার ব্যাপারে অনেক বিধিনিষেধ আছে, সেগুলো মেনে চলা দরকার। ছোটবেলা থেকেই কথাগুলো মা আর বামুনমার মুখে শুনে এসেছে। কারও বাড়িতেই বড় একটা খেতে দিতেন না মা, এখনও দিতে চান না। বাড়িতে এনে বারবার প্রশ্ন করেন কায়স্থ বা বদ্যি কোন বন্ধুর বাড়ির তৈরি করা খাবার খায় কিনা, সে, সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দেয়, যেন না খায় কখনও। ব্রাহ্মণ বাড়ি ছাড়া নিমন্ত্রণ যেতে দেন না, সঙ্গে করে কদাচ কখনও কারও বাড়ি গেলে আগে থাকতে সতর্ক করে দেন, কার বাড়িতে জল খাবার খাওয়া চলবে, কার বাড়িতে চলবে না।

ক্রমাগত এই নিয়মের বাধা আর নিষেধের কথা শুনতে শুনতে ওদের মনেও একটা সংস্কার গড়ে উঠেছিল বৈকি।

ঘেন্না? না ঘেন্না নয়—ওদের যেখানে সেখানে খেতে নেই, বর্ণশ্রেষ্ঠর মর্যাদা বজায় রাখার জন্যেই রসনায় সংযম দরকার—এই বিশ্বাসটাই বদ্ধমূল হয়ে গেছল সহজভাবেই।

কাজেই এখানের খাবার আর পরি-বেশনকারীদের দেখে মুখ শুকিয়ে উঠবে বৈকি।

ওর সামনে ডিশ নিয়ে আসতেই ক্ষীণ কণ্ঠে আপত্তি জানিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। কারণ? মিথ্যে কথা বলা খুব একটা অভ্যাস নেই বলে একটু উল্টোপাল্টা হয়ে গেল কৈফিয়ৎগুলো। একবার বলল খিদে নেই, আর একবার বলল, পেটটা খারাপ করেছে।

কিন্তু অত সহজে অব্যাহতি দেবার পাত্র প্রসাদ নয়। সে প্রথমটা খুব চোটপাট করল—সাধারণত যেমন করে ছেলেরা, 'নে নে, ন্যাকামো করিস না। পেট খারাপ করেছে না কচু। আসলে এটা তোমার নৌকোতা। এসব মেয়েলি ন্যাকামি কার কাছে শিখলি। দেখছিস তো সবাই খাচ্ছে। তোর এত লজ্জা কিসের তাই শুনি। তুই [illegible]—না কি। [illegible] বাড়ি [illegible] এলে [illegible] খাওয়াবে না।' ইত্যাদি—

তার পরই কিন্তু—দেখা গেল লেখা-পড়ায় যেটুকু খামতি ওর সেটা বুদ্ধির অভাবে নয়—ইচ্ছার অভাবে—একরকমের অবজ্ঞা আর অনুকম্পা মেশানো চোখে ওর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'ঠিক করে বল দিকি খাবি না কেন, মুসলমানের ছোঁয়া বলে? ..তোরা এখনও এসব মানিস! কবেকার লোকরে তোরা! ছোঃ! দেখছিস সবাই খাচ্ছে, ওদের মধ্যে বামুন নেই? ওরা হিন্দু নয়। আমি নিজেও তো বামুন।'

'না না—খা। —তার জন্যে নয় আরও বেশী বিব্রত হয়ে পড়ে বিনু, 'সে কি, সে কিছু নয়। এমনিই, বাইরে খাই না কখনও, অব্যেস তো নেই—'

'দ্যাখ, মিছিমিছি এক ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলিস না। তোকে পরশুই দেখেছি গণেশের কাছ থেকে ডালমুট কিনে খাচ্ছিস!' তারপর বিনুর গলার আওয়াজ ভেঙিয়ে বলে, 'সে জন্যে কিছু নয় তো খা—যা হয় কিছু মুখে দে, তবে বুঝি!'

কথাটা নির্ঘাৎ সত্য। মা একটা করে পয়সা দেন এখনও, টিফিন বাবদ। এক পয়সার চানাচুর ডালমুট ছাড়া কি বেগুনি ফুলুরি—কিছু খাওয়া যায় না। ইস্কুলের ধারে কাছে কোন তেলেভাজার দোকান নেই —কোন দোকানই নেই, সবই বসবাসের বাড়ি চারিদিকে—কাজেই ঐ গণেশের ডালমুট ছাড়া আর কিছু কেনা যায় না। অবশ্য তাও যে সব দিন খায় তা নয়—খুব খিদে না পেলে খায় না। পরশুই সেইরকম অসহ্য খিদে পেয়েছিল।

ওর চোখের ওপর তখনও প্রসাদের দৃষ্টি স্থির। সে যেন ওর মনের এই কথা-গুলো বইয়ের পাতার মতোই পড়ে গেল। বললো 'দ্যাখ, বাজারের খাবার তো কত কি কিনে খাস, কে কি দিয়ে কী তৈরী করে জানিস? কত নোংরাভাবে তৈরী করে। আর কেক কি কখনও খাসনি? সে তো মুরগীর ডিম দিয়ে হয়, মুসলমানরাই করে। ....যাক গে, বিস্কুট তো আছে, তাই খা:.. তবে এসব কুসংস্কার ছেড়ে দে, বুঝলি! এখনকার দিনে এসব চলে না। লোকে শুনলে গায়ে থুথু দেবে।'

আরও অনেক কথা বলল প্রসাদ। অন্য ছেলেরাও অনেকে প্রসাদের কথা সব শুনতে পেয়েছিল, তারাও হাসাহাসি করতে লাগল। টিটকিরী দিল বিস্তর। ছুঁচিবাই বিধবা এমনি অনেক ধিক্কার শুনতে হল।

অগত্যা—লজ্জায় অপমানে তখন কান মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। এটা যে জাত বা ধর্মের ব্যাপার নয়, এমনি বলছিল—সেইটে প্রমাণ করার জন্যেই কখানা সিঙ্গাড়া আর বিস্কুট তুলে নিল ডিস থেকে এবং প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণপণে চিবোতে লাগল।

সিঙ্গাড়াগুলো ভাল নয়, কী একরকম [illegible] দিয়ে ভাজা, তার ওপর ঠান্ডা, বোধহয় পাড়ার বাজে দোকান থেকে কিনে এনেছে বেয়ারারা, কিছু পয়সা মারার কৌশল এটা —অথবা অনিচ্ছার জন্যেই—খেয়ে তার গা কেমন করতে লাগল। কোনমতে মনের জোরে নিজেকে সামলে রাখল সে।

এখানে আসাই উচিত হয়নি। মা যদি কখনও জানতে পারেন, কত দুঃখ পাবেন। সত্যিই, তারা যখন আর পাঁচটা সাধারণ লোকের মতো নয়, তখন মেলবার সময়ও একটু দেখেশুনে বন্ধু বেছে মেশাই উচিত। এই কথাই মনে মনে বলতে লাগল বারবার।

তবু এইতেই রেহাই পেল না বিনু। আরও কিছু বাকি ছিল।

প্রসাদ কাজটা যে কোন আকস্মিকতায় করেছে তা নয়। ওর মাথায় এমনিতেই নানা রকম দুষ্টবুদ্ধি খেলে সর্বদা। বিনুর এই খাওয়া ছোঁওয়ার বাছবিচার দেখে ওকে যা ওদের পুরাতনপন্থী বুঝেই সে দুষ্টবুদ্ধি চাড়া দিয়ে উঠল।

বিকেলের দিকে ঘড়িতে সময়টা দেখে বিনু চঞ্চল হয়ে উঠল। ভাল লাগছিল না তার আদৌ, আশা করছিল এ-আড্ডাও এক সময় বিনা কর্মের ক্লান্তিতে আপনিই ভেঙে আসবে। কিন্তু বোধহয় সকলেই অপেক্ষা করছিল একজন কেউ আগে কথাটা তুলুক। বিনুই সে-কাজটা করল।

চারটেয় ছুটি হয় ওদের, বাড়ি পৌঁছতে সাধারণত সাড়ে চারটে বাজে, কোনদিন বেরোবার মুখে গল্পগুজবে পৌনে পাঁচটা বেজে যায়, তার বেশি নয়। আজও সেই সময়ই ফেরা উচিত। না হলেই নানান জবাব-দিহিতে পড়তে হবে। এত এক [illegible]

মিথ্যাচরণ। তবু এ ততটা দোষের নয়, বানিয়ে বানিয়ে অনেক মিথ্যা কথা বলাটা যতখানি। এই বলেই এতক্ষণ মনকে বোঝা-বার চেষ্টা করছিল সে, সেইজন্যেই অপেক্ষা করছিল অন্য দিনের ছুটির সময়টার। তার চেয়ে বেশি দেরি কিছুতেই করা চলবে না।

বিনু একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলল 'প্রসাদ আমি আজ এখন চলি ভাই, আর দেরি করতে পারব না।'

সে কিরে। এই তো সবে পৌনে চারটে। এখুনি উঠবি কি। চারটে বাজুক অন্তত, ছুটির সময়টা হোক। এখান থেকে হেঁটে গেলেও পাঁচটার মধ্যে খুব পৌঁছতে পারবি। আর যদি বাসে যাস—এখান থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন এক আনা ভাড়া---সাড়ে চারটেয় বেরোলেও চলবে।...এই তো সবে জমল, এরি মধ্যে যাবি কি।

এই সবে জমার একটা বিশেষ অর্থ আছে।

প্রসাদের বাবা গাড়ি বার করিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলেন। ওর দাদা এখানে থাকেন না, ইন্দোরে না কোথায় চাকরি করেন। মা বহুদিন মারা গেছেন। সুতরাং অভিভাবক বলতে বাড়িতে কেউই নেই সে সময়টায়। ফলে প্রসাদ আর আর মতো দু-তিনজন বন্ধু মুখের লাগাম খুলে দিয়েছে, খারাপ কথার ফোয়ারা ছুটছে।

বিনু এই চুরিবিদ্যার জন্য কথারই মানে বোঝে না। তবে এগুলো যে খারাপ কথা, তা অন্য বন্ধুদের ওপর প্রতিক্রিয়ায় বোঝে। ওর খারাপ লাগছে আরও একটা কারণে—স ললিত। ললিত অত হাসছে কেন। ও যে রকমভাবে হাসছে, মনে হচ্ছে এই কথা-গুলো বেশ উপভোগ করছে। ললিত এ-রনের কথায় আমোদ পাচ্ছে—এতে যেন একটা বিশেষ ব্যথা অনুভব করছে বিনু। তবু তো একটা সান্ত্বনা—সে নিজে এই তর রসিকতায় অংশগ্রহণ করছে না।

অবশ্য সোজাসুজি এতে যোগ দেয়নি আরও অনেকেই। এসব কথা নিজেরা বলছে শুধু যে তাই নয়, এ-পর্বের শুরু কেই উৎসাহ করছে—উঠে যাবার জন্যে। শুধু প্রসাদের ক্যাটকেটে কথার জন্যেই সাহস পাচ্ছে না।

ওরা উপভোগ করছে না, তার কারণ এইসব রসিকতার পূর্ণ রস উপভোগ করার মতো বয়স তাদের অনেকেরই তখনো হয়নি। শুধু নিষিদ্ধ আচরণের গোপন আনন্দ ছাড়া অন্য কোন রস পাওয়া ওদের সম্ভব না।

কিন্তু বিনু, এবার মনস্থির করে ফেলেছে। সে বই-খাতা গুছিয়ে নিয়েই উঠে পড়েছিল, সে সিঁড়ির দিকে যেতে যেতেই বললে, না ভাই, মাকে বলা আছে, ছুটির পর আর একটুও দেরি করব না। সাড়ে চারটেয় ফিরে মাকে—মাকে নিয়ে পাঁচটার মধ্যে এক জায়গায় যেতে হবে।

হঠাৎ। আবার মিছে কথার ঝাঁপি খুলি। প্রসাদ বলে ওঠে।

বিনুও তখন অপ্রস্তুত নয়, সে আগেই অবস্থাটা ভেবে রেখেছিল, সেও শান্ত অথচ বেশ একটু শাণিত কণ্ঠে বলল, তুই এত মিছে কথা বলিস প্রসাদ।

তার মানে।

প্রসাদ ঠিক বুঝতে পারে না আক্রমণটা কোথা দিয়ে কিভাবে আসছে।

বিনু বলল, নিজে দিনরাত মিছে কথা বলিস বলেই দুনিয়ার সব লোককেই কেবল মিথ্যে কথা বলতে দেখিস।

বলতে বলতেই সে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

প্রসাদও এর শোধ তুলবে বৈকি। সেও মোক্ষম ঘা দিল।

হঠাৎ ওকে ছেড়ে মানেদের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁরে এই মদনা, তাহলে আমাদের নেকস্ট মীটটা কোথায়? মানে এমনি কোন অকেশ্যান হলে? এবার আমা-দের ইন্দ্রর বাড়িই যাওয়া দরকার। কী বলিস? বেচারা একটেরে পড়ে থাকে, ওর বাড়ি তো যাওয়াই হয় না আমাদের।

বুকের মধ্যেটা ধড়াস করে উঠল বিনুর।

সে যে আজ এখানে এসে কি ভুল---ভুলও নয়, অন্যায় করেছে, তা ক্রমশই বেশি করে বুঝছে। হয়ত সে বোঝার শেষ হয়নি এখনও। প্রসাদকে বকে যাওয়া বড়-লোকের ছেলে বলেই জানত, কিন্তু সে যে এত পাজি, তা জানা ছিল না। জানলে কখনই সে ফাঁদে পা দিত না।

ওদিক থেকে আরও দু-তিনজন—অত কিছু তলিয়ে না বুঝেই ধুয়োটা ধরে নিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল।

বিনুর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে ততক্ষণে, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। তার ঐ অল্প সময়ের মধ্যে এটুকু বুঝে নিয়েছে যে, ভবিষ্যতে অনেক বেশি লজ্জা থেকে বাঁচতে হলে---এখন একটু লজ্জা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নেওয়া ভাল।

সে সিঁড়ির মুখেই একটু থমকে দাঁড়িয়ে বলল, না ভাই, আমি গরিব মানুষ, আমার বাড়িতে পাঁচ-ছ জনের বসবারই জায়গা নেই, কিছু খাওয়াতেও পারব না। বাড়িতে ঠাকুর-চাকর কোন লোকও নেই, এসব করবার। একটা ঠিকে ঝি আছে শুধু বাসন মাজার, মাকেই বাকি সব কাজ করে নিতে হয়। আমার ওখানে যাবার চেষ্টা করো না।

একটা ঠিকে ঝি পর্যন্ত নেই বর্তমানে, সেটা আর লজ্জায় বলতে পারল না।

আবারও সেই শান্ত কঠিন দৃষ্টি স্থির হয় ওর মুখে, সেই সঙ্গে ঠোঁটের একটা—নিষ্ঠুর যদিবা বলা না যায়—নির্মম ভঙ্গী।

ক্রমশ

পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

তারপর কত ঘর-দুয়ার পার হতে হয়। সময় লাগে খুব লাম্বা। অথচ দীপঙ্করের মনে হতে থাকে কতদিন কতপথ ধরে হাঁটছে। আলো অন্ধকার বেয়ে মহলের পর মহল পার হয়ে যাচ্ছে। দরজায় দরজায় খোজা প্রহরী, উদ্যত তরবারী। হৈ হৈ করছে মোসাহেবের দল। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে শৃঙ্খলিত বন্দী। ভেসে আসছে সারেঙ্গি সেতারের সুর। ঝন ঝন করে উঠছে তরবারী। অশ্বের হ্রেষায় চমকে উঠছে চারদিক। [illegible] নূপুর পায়ে ত্রস্ত পায়ে কোন সুন্দরী পার হয়ে যাচ্ছে ওদের। চোখেমুখে বিলোল কটাক্ষ। সমস্ত শরীর দিয়ে আমন্ত্রণ। মাথায় ঝাড় লন্ঠন দুলছে, আলো দুলছে। সব মায়ায় পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মহারাজার গম্ভীর কণ্ঠস্বরের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা।

—এই যে এসে গেছি।

দীপঙ্করের চমক ভাঙ্গো। দেখে বহুদিনের রংচটা দেয়ালে পিঠ রেখে একটা ডেক চেয়ারে বসে আছেন এক গৌরবর্ণ প্রৌঢ়। ওদের থেকে অনেকটা দূরত্বে। তবে কথায় আদান-প্রদান করা যায়। প্রৌঢ়ের সমস্ত দেহটা গেরুয়া চাদরে ঢাকা। চোখমুখ উজ্জ্বল করছে। চারপাশে প্রাচীন ঐশ্বর্য আর এখনকার দৈন্য চমৎকারভাবে সহাবস্থান করছে। কোনের অন্ধকার দরজা দিয়ে কে যেন আসে। পায়ে নূপুরের শব্দ। কলাপাতা রংয়ের শাড়ির আঁচল ক্রমশঃ প্রকাশ হচ্ছে।

ডাক্তারদা কখন এলেন?

নিঃশব্দভাবে [illegible] দেখা যায়। হাসতে হাসতে একটি বছর বাইশের মেয়ে এসে দাঁড়াল [illegible] প্রৌঢ়ের পিছনে।

[illegible] বেড ছিঁড়ে গেল [illegible] [illegible] পড়েছে। [illegible] ভাব। তার উপর প্রৌঢ় সারাগায়ে গেরুয়া চাদরে মুড়ে তারি মুখটি বার করে আছেন। শুধু চেয়ারের পিছনে ঘন অন্ধকারে এক চিলতে রোদের মত মেয়েটি। যা যা থাকলে একটি তরুণী উদ্ধত হয় রূপের অহঙ্কারে, সব আছে। অতিরিক্ত হল কণ্ঠস্বর, নেশা ধরিয়ে দেয়। দীপঙ্কর দেখে ডানপায়ের পাতা বেরিয়ে আছে চেয়ারের ধার দিয়ে। প্রতিটি নখে রং আছে, পায়ে গাঢ় আলতা। কাপড় সামান্য উঠে গেছে পায়ের পাতা থেকে। দীপঙ্করের চোখ ঝাঁ করে উঠে যায়। ভিতরটা কেমন করে ওঠে।

মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী। চোখ হরিণের মত ছটফট করছে। চোখ কথা বলছে। দীপঙ্কর চোখে চোখ রাখতে গিয়ে ব্যর্থ হয়।

—এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে শংকরবাবু!

প্রৌঢ়, এককালের এই কলাবনির প্রতাপশালী রাজা, হাসলেন অন্নদাশঙ্কর প্রহরাজ। মুখ স্তিমিত হয়ে গেল আবার।

—না। ঘন গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

—আমি কাল এসেছি, ল্যান্ড ডিসপিউট-এর ব্যাপারে, নির্মল মজুমদার ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন।

অন্নদাশঙ্কর স্থির দৃষ্টিতে দীপঙ্করকে দেখছেন।

—নির্মলবাবু কবে চলে যাচ্ছেন? মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

—আজ, কাল। দীপঙ্কর অন্যমনস্কের মত জবাব দেয়।

—ইনি আমাদের রাজকালের কেশবতী, লাবণ্যময়ী! ডাক্তার বললো।

—ডাক্তারদা। চোখ পাকালো মেয়েটি।

—কি নাম আপনার? দীপঙ্কর চোখে চোখ রাখে।

—লাবণ্য, শুনলেন তো।

চোখ আনত হয়ে যায় লাবণ্যময়ীর। দুটো হাত আঁকড়ে ধরেছে ডেক চেয়ারের পিছনটা শক্তভাবে।

—মিল আছে। দীপঙ্কর চমকে ওঠে নিজের স্বরে।

—অবশ্যই, আমিতো বাঁজ কেশবতী। ডাক্তার উচ্ছ্বল হয়ে ওঠে।

—তা হঠাৎ আপনি! লাবণ্য ডাক্তারের দিকে চোখ রেখেছে।

—খবর পেলাম তোমার জ্বর হয়েছে।

—জ্বর সেরে আবার অসুস্থ হতে চলেছি, এখন সময় হল। লাবণ্য ঝংকার দিয়ে ওঠে।

—আমি ছিলাম না, কালরাতে ফিরেছি। থাক যখন জ্বর নেই, তখন আমিও নেই। ডাক্তারের কণ্ঠস্বর কেমন ম্রিয়মান। লাবণ্য দাঁড়িয়ে নখ খুটছে দুহাতের। পায়ের আঙুল শক্ত মেঝেতে চেপে ধরেছে, নির্মলবাবুকে আনলেন না?

—কাজ আছে, চলে যাবে, অ্যারেঞ্জমেন্ট [illegible]। দীপঙ্করই জবাব দেয়। লাবণ্য মাথা [illegible] দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার উসখুস করে ওঠার জন্য।

—বসুন যাবেন কোথায়, আপনাদের আসলে ভাল লাগে, আর এই নতুন অতিথি এলেন এদেশে।

অন্নদাশঙ্কর খুব আস্তে আস্তে রাজকীয় ভঙ্গিতে কথা বলেন। কথায় জোর আছে, কেমন যেন কম্যান্ডের সুর। বলতেই হয়। দীপঙ্করের খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন অন্নদাশঙ্কর ঐ দূর থেকেই। দীপঙ্কর সাধ্যমত জবাব দেয়। কথায় কথা বাড়ে।

লাবণ্য সরে গেছে ওধারে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছে। ডাক্তার তার চেয়ার সরিয়ে এগিয়ে গেছে লাবণ্যর দিকে। ওরা দুজন কথা বলছে। ডাক্তারের ভঙ্গি খুব বিনীত। নিজেকে সমর্পণ করে দেবার মত। বোঝা যাচ্ছে দুজনের পরিচয় কমদিনের নয়। ভোরবেলা এই মেয়েটিকে যতটা রহস্যময়ী মনে হয়েছিল এখন ততটা নয়। যথেষ্ট প্রাণবন্ত একটি মেয়ে।

—নির্মলবাবুকে যাওয়ার আগে একবার আসতে বলবেন!

লাবণ্য ওধার দিয়ে কথা ছুঁড়ে দিয়েছে দীপঙ্করের দিকে।

ডাক্তার নিশ্চুপ। অন্নদাশঙ্কর তাকিয়েছেন মেয়ের দিকে, তারপর চোখ তুলে দিয়েছেন বাইরের আকাশে। দীপঙ্কর সরাসরি চোখ মেলেছে লাবণ্যর দিকে। রোদ্দুর আসছে, অল্প স্বল্প ছায়া পড়েছে দেয়ালে।

—গল্প শুনবে? ডাক্তার হঠাৎ বলে।

—না এখন নয়। লাবণ্য মুখ ফিরিয়েছে ওপারের দিকে।

ডক্টর বোস দারুন গল্প বলতে পারেন, এমনভাবে বলেন যেসব যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অন্নদাশঙ্কর কথা বলেন।

—তাই নাকি শুনাতে হবে একদিন। দীপঙ্কর উৎসাহ প্রকাশ করে। বিষাদে ভরা ডাক্তারের মুখে সামান্য আলো পড়েছে।

—অফুরন্ত স্টক ডক্টর বোসের।

অন্নদাশঙ্কর মাথা নিচু করেন। চোখ মুখে [illegible] পড়েছে। [illegible] জলের [illegible] নাকের নিচে গোঁফজোড়া [illegible] জল। [illegible] অন্নদাশঙ্কর। [illegible] ভিতর থেকে [illegible] করেন না। [illegible] চাদরে [illegible] নেন।

ডাক্তার অন্যদিকে [illegible] আছে। আজ আর রোগী দেখার নেই। মুখটা বিকালে ভরে গেছে বছর তিরিশের [illegible]। [illegible] দীপঙ্কর লাবণ্যর দি[illegible] তাকিয়েছে। লাবণ্যর মুখখানি [illegible] চোখ স্থির। সেই চোখে দীপঙ্করের চোখ [illegible]

কি ভাবছো? মুখে এত বিষাদ [illegible] কি হলো তোমার?

সব [illegible] করছে।

আমি যেন [illegible] হয়ে [illegible] কেশবতী। ডাক্তার [illegible] কেন? গল্প [illegible] না কেন [illegible]? [illegible] ভালবাস? নির্মল মজুমদার [illegible]? [illegible] কাদছি? তিনলো [illegible]

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়ায়। এবার যাবে। কাজ এসেছে, আজই এখানে এতটা সময় কাটানো বোধহয় ভাল নয়। নির্মল মজুমদার কি ভাবছে? যাওয়া উচিত।

—যাই, ডাক্তারবাবু আপনি থাকুন।

—না আমিও উঠি। ডাক্তার উঠে দাঁড়ায়।

—ডাক্তার বসুন আর একটু। অন্নদা-শঙ্করের গলা শোনা যায়।

দীপঙ্কর এগোয়। লাবণ্য বলে, চলুন এগিয়ে দিই।

দীপঙ্কর বারন করতে পারে না। এখন লাবণ্যর দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছে না। ও পাশাপাশি আসছে। দীপঙ্কর ঘোরের মাথায় এগিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে নেমে আসে। এই বারান্দা ধরে এগোলে ঐ কোনে নির্মল মজুমদারের ঘর। এরপর তার ঘর হবে। সেই রকমই ঠিক করেছে।

বারান্দায় কেউ নেই, লাবণ্য বলে, আমি যাই এবার। দীপঙ্কর ওর শরীরের গন্ধ পাচ্ছে। নতুন কাপড়ের গন্ধ পুরনো বাড়ির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

—বাড়িটা এত নির্জন কেমন যেন লাগে? কত মানুষ দরকার ঘরগুলোর জন্য!

—হ্যাঁ। লাবণ্য চোখ মেলে দেয়।

—ঐ ঘরটা আরো নির্জন, এক কোনে তো? দীপঙ্কর নির্মলের ঘরটা দেখায়। লাবণ্য কথা বলে না। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে।

—কাল রাতে ঐ দরজার সামনে দিয়ে কে যেন চলে গিয়েছিল? দীপঙ্কর হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠেছে।

—কেন? লাবণ্য অন্য মনস্কের মত কথা বলে।

দীপঙ্কর লাবণ্যর দিকে তাকিয়েছে। আবছা আলো অন্ধকারে কাঁচ কলাপাতা রঙটা নীল হয়ে যাচ্ছে। আবার আসবেন। কে যেন ফিস ফিসিয়ে বলে।

*

বিকেলে নির্মল মজুমদার চলে যায়। লাবণ্যর ওখান থেকে ফিরে দীপঙ্কর নির্মলকে দেখে অবাক হয়েছিল। ঘুমোচ্ছে লোকটা। দীপঙ্কর ঢুকতেই ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। চোখ মুখে কৌতুহলের চিহ্ন। দীপঙ্কর ঐ বিষয়ে কোন কথা বলে না। মজুমদার আশা করছিল কিছু শুনবে।

দুপুরে খাওয়ার পর মজুমদার অনেক কথা বললো। কলাবনির ল্যাণ্ড ডিসপিউড সম্পর্কে যা যা তথ্য সংগ্রহ করেছে সব বলে গেল দীপঙ্করকে। অনেক পুরনো কাহিনী। একেবারে গল্প কথার মত।

তিনটে নাগাদ দীপঙ্কর আর থাকতে না পেরে সকালের ঘটনা ভেঙে দিল মজুমদারের কাছে। লাবণ্য ও'র খোঁজ করছিল তাও বলল। সে কথা শুনে মজুমদার মাথা ঝাঁকিয়ে ঘরের ভিতরে দ্রুত পায়চারি করতে থাকে।

—বড় বিপদে পড়েছি মশাই?

—আন্দাজ করেছি।

—আমার ফ্যামিলিটা নষ্ট হয়ে যাবে।

—যা ভাল বোঝেন করুন, আমার কিছু বলার নেই। দীপঙ্কর নিরাশঙ্ক।

—আপনি কিছু শুনেছেন? মজুমদার আগ্রহ ভরে দীপঙ্করের দিকে তাকায়।

—কি করে শুনব, এলাম তো কাল রাতে।

—না মানে, এতক্ষণ ডাক্তারের সঙ্গে ছিলেন।

—শুধু ডাক্তারের সঙ্গে নয়, রাজকন্যা, রাজা সকলেই ছিলেন।

—ও। মজুমদারের চোখ ছোট হয়ে কুঁচকে যায়।

—যাব না, থেকেই যাই কি বলেন।

দীপঙ্কর চুপ করে থাকে। কিছুই জানে না এই ত্রিরিশোর্ধ লোকটির সম্পর্কে। বছর দেড়েক এখানে আছে মজুমদার। বছর দেড়েকের ইতিহাস তো ওর কাছেই জমা আছে। জানা হবে না কোনদিন। আস্তে আস্তে কিছু কিছু প্রকাশ হবে। তাও মজুমদারের অজ্ঞাতে।

—আপনার স্ত্রী কোথায়?

—ওর বাপের বাড়ি, ভেবেছি এবার মেদিনীপুরে সেটলড হবো।

—সেটাই ভাল মশাই, এখানে থাকবেন কেন?

—হ্যাঁ।

বাসে তুলতে গিয়েছিল দীপঙ্কর। নদী পার হবার সময় মজুমদার আবার দাঁড়ায়। চোখ মেলে দেয় রাজগড়ের দিকে। চুড়োটা দেখা যাচ্ছে। তারপর মাথা নামিয়ে হাঁটতে থাকে।

—খুব সাবধানে থাকবেন মশায়, কলা-বনিতে সাপের উপদ্রব কম নয়, তারপর গরম আসছে।

দীপঙ্কর হাসে।

—হ্যাঁ মশাই পুণ্যব্রত সংঘের সন্ন্যাসী আসবে, একটু নজরে রাখবেন, ওরা ভাল নয়।

—পুণ্যব্রত সংঘ!

—হ্যাঁ, ধর্ম প্রচারক সংস্থা জমি নিয়ে মেতেছে, সবটা বলতে পারলাম না, ভুলে গিয়েছিলাম।

নির্মল মজুমদার বাসে ওঠে। দীপঙ্কর মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে।

॥ ৫ ॥

কলাবনির নতুন অফিসার দীপঙ্কর চৌধুরীর কাছে যাচ্ছিল নিখিলানন্দ। পৃথিবী পাপে ভরে গেছে। পৃথিবীর মানুষকে পাপমুক্ত করতে এসেছেন মহাত্মা পুণ্যব্রত স্বামী। তিনি মানুষকে দিয়েছেন নতুন ধর্মের আশ্বাস। পুণ্যব্রত স্বামীর পথে পা বাড়ালে জগৎ আনন্দময় হয়ে উঠবে। পুণ্যব্রতের প্রবক্তা নিখিলা-নন্দ। সঙ্ঘের সাধারণ সভ্য। সর্বাঙ্গে গেরুয়া বসন, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, গাল মুখময় দাড়ি, চোখে চশমা আর হাতের ফোলিও ব্যাগ নিয়ে আল বেয়ে দ্রুত হাঁটছিল নিখিলানন্দ। বহু দূর থেকে ওর গেরুয়া বসন পরিষ্কার দেখা যায়। নিখিলানন্দের এই অঞ্চলে বছর তিনেক হল, কলাবনির কাছে হরিণডাঙ্গায় তার আস্তানা। এখন আশ্রম।

মহাত্মা পুণ্যব্রত রয়েছেন জেলে। পুতিগন্ধময় পরিবেশে মহাত্মার হৃদয় উপড়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। নিখিলানন্দ দ্বিধাগ্রস্ত মানুষকে বোঝায়। কিন্তু মানুষের চিত্ত বড় টালমাটাল। আজ যারা পুণ্যব্রতর মতাদর্শে দীক্ষিত কালই তারা বদলে যাবে। বদলে যাওয়ার মুখে অনেকে কেননা পুণ্যব্রত স্বামী জেলে। ঈশ্বর যদি জেলে থাকেন তাহলে পাপী মানুষেরা কিভাবে তাঁর প্রচারক হবে।

হরিণডাঙ্গা বড় বিপদে ফেলেছে। এখানকার মানুষগুলো বড় জটিল। আদি-বাসী সাঁওতালেরা আর আগের মত নেই। সারল্য ভেঙ্গে গেছে। শিখে যাচ্ছে অনেক কিছু তাই নিখিলানন্দের বড় অসুবিধে হচ্ছে। মাঠ ভেঙ্গে ছুটতে হচ্ছে কলাবনি।

এমনিতে গ্রাম-গঞ্জ হয় যেমন হরিণ-ডাঙ্গা সেই রকম। প্রথম যখন এখানে আসে নিখিলানন্দ, ভেবেছিল সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হবেই। এখন খটকা লাগছে মনে। সন্ন্যাসীর মনে দ্বিধা থাকতে নেই। নিখিলানন্দ দ্বিধার ভিতরে পড়েছে।

নিখিলানন্দের সঙ্গে যাচ্ছে নবীন হেমরম। অনেক কষ্টে একজন সাঁওতালকে সঙ্গে পাওয়া গেছে। পুণ্যব্রত স্বামীকে নবীন আজকাল স্বপ্ন দেখে। পুণ্যব্রত স্বামী সিংবোঙার মত। ভেবেই নবীন চমকে যায়। এই সন্ন্যাসী বার বার বুঝিয়েছে ওসব বোঙার সঙ্গে কখনো পুণ্যব্রতজীর তুলনা হয় না। যিশুর কথা ভাবতে গিয়ে কি কেউ কাঙ্কের কথা ভাবে।

যিশুর মূর্তি দেখেছে নবীন হেমরম, কাঁদন মুর্মুর ঘরে। ওখানে কেস্তানদের চার্চ তৈরী হয়েছে। মাটির বাড়ি। ধান কাটার পর শীতকালে পরব হয়। বড় পরব কেস্তানদের যিশুর জন্ম বৃত্তান্ত শোনানো হয়।

কাঁদন মুর্মুর বংশ দু পুরুষ আগে যিশুর পুজারী হয়েছে। কাঁদন প্যান্ট-শার্ট পরে গাঁয়ে যিশুর কথা বলে বেড়ায়। লেখাপড়া জানা মানুষ। ভীমপুরের ইস্কুল থেকে পাস দিয়ে কটক গিয়েছিল যিশুর পুজারী হওয়ার শিক্ষা নিতে। কত জায়গায় না ঘুরেছে। সেই ঘাটশীলা, বুরুডি পাহাড়ঘেরা শামলাগিল, গ্রামে যিশুর মহিমা প্রচার করে এসেছে। সেখানে কত মানুষ যিশুর কথা শোনে। নবীনের ভিতরটা যিশুর মূর্তিটা দেখলেই কেমন শির শির করে ওঠে এখনো। মারাং বুরু, সিংবোঙার মত মনে হয়।

সিংবোঙা কেমন নবীন দেখেনি। তার কথা জন্মাইস্তক শুনে আসছে। বছর পাঁচেক আগে নবীনের ঘর পুড়ল। ঘরে আগুন লাগল চোত মাসের সন্ধ্যেবেলায়। গাঁয়ের কুপের জল তখন অতলে, পুকুর শুকিয়ে খটখটে। নবীনের ঘর রক্ষে হল

না। তখন ভাবল কেশ্তান হবে। সিংবোঙা তাকে বিপদে রক্ষা করল না। আধন্যাংটা প্রায় সাঁওতাল জাতির মত অবস্থা যিশুর। দিকু মানুষেরা পেরেক ঠুকে মেরেছিল। এত কষ্ট পেয়ে যে বোঙা মরেছে সে মানুষের কথাভাবে ঠিক। দুঃখী মানুষের প্রাণে সুখ নিয়ে আসে। কাঁদন মুর্মু বলেছিল যিশুর গল্প, একবার কুষ্ঠ রোগের মানুষকে হাত ছুঁইয়ে ভাল করে দিয়েছিল যিশু। অন্ধ মানুষের চোখ ফিরিয়ে দিয়েছিল। কলাবনির রাজাবাবু যদি যিশুর কথা শুনত তো কুষ্ঠ রোগ নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যেত। রাজত্ব ফিরে পেত রাজাবাবু। রাজকন্যের জন্য রাজপুত্তুর আসত।

রাজাবাবুকে সেই কবে দেখেছিল নবীন হেমরম। তখন বয়স বছর দশেক হবে। বয়সের হিসেব জানে না, এখন কত হবে, এক কুড়ি পেরিয়ে দু কুড়ি ছুঁতে যাচ্ছে নিশ্চয়ই। বা দু কুড়ি পেরিয়ে গেছে হয়ত। সেই কম বয়সের দেখা রাজাবাবু এখনো চোখে ভাসে। সিংবোঙার চেহারা কি ঐ রকম। ধবল পাহাড়ের মত মানুষ, মেঘের মত গলার স্বর। হাত বাড়ালেই বোধহয় সব মানুষের কষ্ট দূর হয়ে যাবে। সেই মানুষের কুষ্ঠ রোগ হল। জাত কুষ্ঠ। নবীনের মনে ধন্দ লাগে। জগৎটা কেমন অদ্ভুত। একেবারে দিকু মানুষের মত, প্যাঁচ পোচারে ভরা। কোন কিছু ঠিকভাবে ভাবা যায় না।

সেই ঘর পোড়ার পর নবীন কাঁদন মুর্মুর কাছে যায়। ঘরপোড়ার জন্য যিশুর কাছ থেকে যদি সাহায্য জোটে। যিশুর কথা শুনে যারা কেশ্তান হয়েছে তাদের সাহায্য করে কাঁদন মুর্মু। কাঁদন বড় চালাক মানুষ।

—হ্যাঁ হেলেপ দিতে পারি, ধম্ম ত্যাগ করবু তো?

হেলেপ মানে সাহায্য। যিশুর ভাষা।

নবীন পড়ল মহাবিপদে। সে তো সিংবোঙার সন্তান পিলচুবুড়ো পিলচুবুড়ি ছিল ভগবানের গায়ের ময়লা। সেই বুড়োবুড়ি জন্ম দিয়েছে সাঁওতাল জাতির। জগতের প্রথম দুই মানুষ ঐ বুড়ো-বুড়ি সেসব কাহিনী ত্যাগ করতে হবে। সিংবোঙার কথা ভুলতে হবে। সে তো জাত সাঁওতাল, করমে, শালুই পরবে নাচে সন্ধ্যেয় হাড়িয়া খেয়ে গান ধরে। এসব তো জন্ম থেকে হয়ে আসছে। এর সঙ্গে তো যিশুর সম্পর্ক নেই। নবীন তখন উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘোরে।

—আগে যিশুর পা [illegible] সব পাপ স্বীকার কর, যিশুর মত [illegible] মিলাও, চার্চে গিয়া কেস্তান হও [illegible] না তুমি হেলেপ পাবে, হেলেপ [illegible] তার বাদি বাধা সিটি হবে না।

নবীন চুপ করে কাঁদনের [illegible] শোনে। কাঁদন কথা বন্ধ করে না।

—তবে হ্যাঁ যিশুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হবে, যিশু করুণাময় তুমাকে রক্ষা করিবে। যিশুর সঙ্গে মারাংবুরু, সিং বোঙার তফাৎ আছে হে।

জ্যাকব মান্ডি ঘাড় হেলিয়েছিল কাঁদন মুর্মুর কথায়। মুচিরাম মান্ডি কেস্তান হয়ে নাম বদলে হয়েছে জ্যাকব মান্ডি। জ্যাকব গত আষাঢ়ে কানাই শোর পাহাড়ে মারাং বুরুর পুজোয় গিয়েছিল একথা কাঁদন মুর্মু জানে না। নবীন জানে। সে তবু বলে নি কিছু।

কাঁদন মুর্মুকে তার ভাল লাগে না। যিশু এত করুণাময়, তার পুজারীর ঠাঁট-বাট কম নয়। দিকুমানুষের মত থাকে। মনে একটুও দয়া নেই: ঘর পোড়া নিরাশ্রয় মানুষ কেঁদে পড়ল, আগে সাহায্য করব তারপর তো অন্য কথা। যিশুর গল্পের মানুষের সঙ্গে কাঁদন মুর্মুর মিল কম। কাঁদন বলে, 'একেবারে নিজেকে তিন বছরের বাচচার মত করি তোল, মনে পাপ রেখ না, তবেই না সঙ্গে যাবে।' কাঁদনের কথার সঙ্গে কাজের মিল কম।

নবীন শেষে বউ বাচচা নিয়ে উঠেছিল অনাথ মন্ডলের বাড়ির প'ড়ে থাকা বারান্দায়। তখন সেখানে পুণ্যব্রত সংঘের নিখিলানন্দ সবে এসেছে।

অনাথ মন্ডল বড় চাষী। চাষা নয়। হাতে লাঙল ধরে নি কোনদিন, জমিদার বটে। বড় সুদের কারবার ছিল মন্ডল বংশের। সেই কারবারে টাকা। সেই টাকায় রাজার জমি কিনে নতুন জমিদার। একজন শেষ হয় অন্যজন ওঠে।

অনাথ লোক দিয়ে চাষ করাত তার পাঁচিশ একর জমি। চাষ হত দেখার মত। নবীনও সেই জমিতে লাঙল মারত। সে তো আজন্ম হেলে চাষা। কলকাতা থেকে সার বীজ আসত মন্ডলের। পাম্প বসিয়ে কাঁসাই থেকে জল তুলত। এ তল্লাটে সেরা চাষী, জমি থেকে ফসল নিংড়ে বার করত। সেই টাকায় তুলল এক প্রাসাদ। হরিণডাঙা কংসাবতীর ধার ঘেঁষে। একেবারে অগম্য। বর্ষায় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না, রিলিফের রাস্তা বাবলা কাঁটায় ভর্তি। বাবলা বনের রাজত্বে রাজা হয়ে উঠল অনাথ মন্ডল। দেখার মত ঘর-বাড়ি তৈরী হ'ল। গোয়াল খামার পুকুর সব।

তারপর এল সেই রাত।

অনাথ এত করেও অনাথ হয়েই ছিল! বিয়ে করেছিল, বউ-এর বাচচা হত না। সেটা অনাথের বড় কষ্ট ছিল। তিন দিনের জ্বরে সেই বউ মারা পড়ল। সেটা ঘোর বর্ষা, আষাঢ়ের দিন। অনাথের টাকা অনাথের হাতেই থাকল। কংসাবতীতে তখন জল এসেছিল, এদিকে বর্ষার শিয়ালও ঢোকে না তার ডাঙায়। অনাথ টুকিটাকি ডাক্তারি করত। বই পড়ে ডাক্তারি শিখেছিল। পয়সা বাঁচানোর ধান্দায় প্রথমে সেই ডাক্তারি চালালো বউয়ের উপর। তখন যদি বড় ডাক্তার ডাকত। বউয়ের ঘুস-ঘুসে জ্বর হত। অনাথ বউকে [illegible] [illegible] [illegible] শহর জানতে চেয়েছিল। ক'দিন রোদ্দুরও হয়েছিল, তখন ঝাড়গ্রাম থেকে ডাক্তার আনা যেত। সে তা করল না। পয়সা খরচ হওয়ার ভয়ে।

অনাথের চিকিৎসা মাঠে মারা গেল। বউ বাঁচল না। একেবারে একা হয়ে গেল বড় মানুষ অনাথ মন্ডল। ফাঁকা মাঠে নিঃসঙ্গ গাছের মত।

অনাথ বউকে ভালবাসত, তাই বিয়ে করে নি আর। রাজ্যের লোক ধন্যি ধন্যি করল। যা টাকার কুমীর, অনায়াসে আর একটা বউ ঘরে আনতে পারত সে। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। এদিকে লোকে এক সঙ্গে দুটো বিয়ে করে, বউ মরলে আর একটা বিয়ে করবে এতে অবাক হওয়ার কি আছে।

অনাথ মন্ডল একেবারে একা মানুষ হয়ে কিন্তু মরার কথা ভাবে নি। ভাবলে কি আর ঐ প্রাসাদ দশজনে লুটেপুটে খেত। ছেলেপুলে থাকলে কি আর ঐ জমির উপর ভূতের কেত্তন চলত। এখন অবশ্য কি হ'ত বলা যায় না। অনাথের জমির বারোআনা অংশই তো রাজাবাবুর থেকে নেয়া। এখন লোকে ছেড়ে কথা বলত না। ছেড়ে কথা বলছেও না, তাই নিখিলানন্দ নবীন হেমরমকে নিয়ে ছুটেছে কলাবনির নতুন মানুষটার কাছে।

নিখিলানন্দ এক দলিল পেয়ে চলে এসেছিল হরিণডাঙায়। অনাথ মন্ডল মারা গেছে। ওর কেউ নেই। জমিজমা সব পড়ে আছে। দূর সম্পর্কের এক বোন সব জমি পুণ্যব্রত সংঘকে দান করে দিয়েছে। তবে এই দান নিয়ে সংশয় আছে। অনাথ মৃত্যুর দু' বছর আগে আর এক দলিলে বলে গেছে, 'আমার মৃত্যুর পরে এই বিষয় সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশন বা তার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত কোন সংস্থাকে দান করা হবে দান করবেন আমার আইনানুগ উত্তরাধিকারী।'

কিন্তু তা হয় নি। পুণ্যব্রত সংঘের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সম্পর্কই নেই। কিছু লোক ধুয়ো তুলেছে এই দলিল জাল, আর সব জমি রাজার। সব খাস হয়ে যাবে। দখল কর। মহাত্মা পুণ্যব্রত স্বামী জেগে থাকার দরুন মন্দ লোকের এইসব অপপ্রচারে সুবিধাও হচ্ছে।

তখন নিখিলানন্দ সদ্য এসেছে হরিণডাঙায়। আস্তানা নিয়েছে অনাথ মন্ডলের প্রাসাদোপম গৃহ সরস্বতী কুঞ্জে। গ্রামের মানুষ গেরুয়া বসনের সন্ন্যাসী দেখে কিছু বলতে সাহস করছে না। নিখিলানন্দ চাবি এনেছিল অনাথ মন্ডলের সেই বোনের কাছ থেকে। বোন কলকাতায় থাকে।

নিখিলানন্দ সমস্ত ঘর-দুয়োর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলে গ্রামে বেরোল দু'-চারজন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে। নিখিলানন্দের ধর্ম প্রচারের পদ্ধতি বা তার আত্মরক্ষার পদ্ধতি সব এক রকম। পুণ্যব্রত স্বামীর ভক্তদের বিপদ অনেক। নিখিলানন্দ সব সময় কোমরে গুপ্তি রাখে।

খন নিখিলানন্দ খ‍ুঁজছিল একটা মানুষ কে সহজেই পুণ্যব্রতর পথে আনা যাবে। কে দিয়েই এই গ্রামে প্রভাব বিস্তার রতে হবে।

ছেলে বউ নিয়ে নবীন হেমরম অনাথ ডলের বাড়িতে গিয়ে উঠল সন্ধ্যে। কালে দেখল সামনে এক গেরুয়া বসনধারী ন্যাসী।

নিখিলানন্দ এগিয়ে হাত রাখে নবীনের থায়। নবীন হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

—মোর সব গিইছে।

—কি হয়েছে। নিখিলানন্দের কন্ঠস্বরে ভুত মাদকতা।

—ঘর দুয়ার আগুনে লাগি পুড়ি ইছে, মু যাবু কাই?

নবীন ভয় পাচ্ছিল এক্ষুনি বোধ'য় আশ্রয় ছাড়তে হয়।

—কোথাও যেতে হবে না, এখানে ক, দুঃখী মানুষের দুঃখে যদি তার পাশে দাঁড়াতে পারি তো মানব জন্ম বৃথা।

নবীন অবাক হয়। সন্ন্যাসীর কথা কর আগুনে জল ঢালে। আশ্রয় ছাড়তে না ভেবে সে নিশ্চিন্ত হয়।

নিখিলানন্দ বুদ্ধিমান। টাকা দেয় নিকে নতুন করে ঘর তুলতে। তারপর ত্মা পুণ্যব্রতর কথা শোনায় দু' রাত। নবীন গলে গেল। সন্ন্যাসীর স্বঙ্গী গেল।

নিখিলানন্দ বুঝিয়েছে নানা কথা! কারাগারে আছেন। পাপী মানুষ ন না তারা কাকে কষ্ট দিচ্ছে। মানুষে ন না কত বড় মহাত্মা তাদের ভিতরে য়েছেন। পুণ্যব্রত স্বামী যৌবনে ছিলেন ন্য মানুষ। তবে মহাত্মা হওয়ার লক্ষণ-লা সবই ছিল তাঁর ভিতরে। সংসার করে ভবঘুরে হয়ে পাগলের মত গঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন। দেখতেন ষের মনে আনন্দ নেই। সবার চোখ-দুঃখের চিহ্ন। এসব দেখে তাঁর কষ্ট। ভাবতেন মানুষ কি করে আনন্দময় ?

তারপর এক রাতে তাঁর সমস্ত দেহ জ্যোতি বেরোতে লাগল। তিনি ক্ষণে সমাধিস্থ হতে লাগলেন। ৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেলেন র্যজনকভাবে। এক মৃত শিশুর দেহে রাখলেন, শিশু জেগে উঠে আনন্দে উঠল। শিশুর পিতা মাতা হয়ে আনন্দময়। প্রভু আকাশবাণী লেন, জগতের অন্ধকার দূর করতে এই বীতে তাঁর জন্ম। গৃহি মানুষের মত ত পাপক্ষয় করা তাঁর জীবন নয়। তিনি বেরিয়ে পড়লেন হিমালয়ে। এক অজ্ঞাত বাসে কাটালেন, তারপর য় এলেন পাপী পৃথিবীর মাটিতে। ভারে নত পৃথিবী নড়ে উঠল। সমুদ্রে চহ্নাস হল দূর দেশে হল ভূকম্পন, বীব্যাপী প্রলয় হয়ে গেল একদিন। তিনি পুণ্যব্রতে ব্রতী। নাম নিলেন ব্রত স্বামী। প্রভু তাঁর মতাদর্শে থ মানুষকে অভয় দিলেন, 'আমার পথে এস, ভয় নেই। জীবন আনন্দময় হয়ে উঠবে। নতুবা জগৎ ছারখার হয়ে যাবে, তুমিও ধ্বংস হবে।'

নবীন হেমরমকে নিখিলানন্দ পাখি পড়া পড়িয়েছেন। বলেছেন সক্রেটিশের কথা, খ্রীষ্টের কথা। সক্রেটিশকে হেমলক বিষ পান করে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল. খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল মানুষ। জগতে যারা মহান আদর্শ নিয়ে নেমে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেককে চরম কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। পাপ অন্ধকারে পরিপূর্ণ মানুষের হৃদয় প্রথমে আলোর সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়, পরে যখন সমস্তটা উপলব্ধি করে তখন সময় পেরিয়ে গেছে। মহাপুরুষের নির্বাণ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর আদর্শ থেকে গেছে। সেই আদর্শকে অনুসরণ করে মানুষ পাপ-মুক্ত হয়েছে। খৃষ্টের মতাদর্শ, বুদ্ধের মতাদর্শ মহম্মদের মতাদর্শ এখনকার পৃথিবীতে আর মাপসই নয়। পৃথিবী অনেক বদলে গেছে। মানুষ বদলেছে। মানুষ হয়ে যাচ্ছে যন্ত্রের দাস। তাই মানুষের হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। দুঃখী মানুষকে ত্রাণ করতে মহাত্মা পুণ্যব্রত স্বামীর আবির্ভাব।

মানুষের পাপাত্মা দেবতাকে শুধু কষ্ট দিয়েই এসেছে। কষ্টে কষ্টে দেবতা সোনার মত হয়ে উঠেছেন। দেশের মূঢ় মানুষ বলে পুণ্যব্রত স্বামী ভন্ড, খুনী, জাল মানুষ। খুনের আসামী করেছে মহা-পুরুষকে। বাঁকুড়ার নতুন ডি আশ্রমে নাকি দশটা নিখোঁজ মানুষের করোটি পাওয়া গেছে। সব মিথ্যে। প্রভু রক্তপাতে বিশ্বাস করেন না। তবে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ তো ক্ষাত্রিয়ের ধর্ম, বীরের ধর্ম। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা।

প্রভুর বিরুদ্ধে চক্র বড় জটিল। একদিন প্রভু নিশ্চিত এই চক্রের মুখোস খুলে দেবেন। আইন আদালত পাপে ভরে গেছে। প্রভুর স্বপক্ষে কোন কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না কেউ। নিখিলানন্দ বুঝিয়েছে যেমন খৃষ্ট যেমন সক্রেটিশ তেমনই হলেন প্রভু পুণ্যব্রত স্বামী। পাপী মানুষে তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে।

নবীন সব মুখস্থ করে রেখেছে। জনে জনে বোঝানোর চেষ্টা করে মহাত্মা পুণ্যব্রতের মতাদর্শ। জীবন আনন্দময় হবে, দুঃখ দূর হবে, এই হল মূল কথা।

কোন কোন সকালে নিখিলানন্দ বিমল হাসিতে পরিপূর্ণ করে তোলে নবীনের অন্তর। গেরুয়া বসনের সন্ন্যাসী মহাত্মার মত এসে দাঁড়ায় তার ঘরের সামনে।

—নবীন।

ডাক শুনে সে তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসে, চোখ মুখে জিজ্ঞাসা।

—কাল প্রভু এসেছিলেন? নিখিলা-নন্দ বলে।

নবীনের শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে।

কাল রাতে প্রভু পুণ্যব্রত স্বামী জেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন সূক্ষ্ম দেহে নিখিলানন্দের কাছে। তাকে আশীর্বাদ করে গেছেন, নবীনকেও।

—এই আশীর্বাদী ফুল রেখে গেছেন প্রভু:

নবীন দেখে শুকনো জবা ফুল হাতে দাঁড়িয়ে আছে সন্ন্যাসী। সে ভয় বিস্ময় এবং অবিশ্বাসের দোলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

নবীন এক রাতে ঘুমঘোরে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখেছে। কোমরে এক টুকরো কানি ছাড়া আর কিছু নেই তার। চোখ মুখ দুঃখ ভারে পীড়িত। সমস্ত শরীর তাঁর জলের মত স্বচ্ছ। তাঁর শরীরের ভিতর থেকে পৃথিবী দেখা কাছে। তিনি সব শুনে গম্ভীর হয়েছিলেন। মুখ দেখতে পাচ্ছে। আয়নার মত মানুষ।

সকালে উঠে ছুটেছিল নিখিলানন্দের কাছে। তিনি সব শুনে গম্ভীর হয়েছিলেন। তারপর তাঁর মুখে আস্তে আস্তে বিমল হাসি ফুটে উঠেছিল।

নবীন জিজ্ঞেস করে, অই বুধ'য় সিং বোঙা।

নিখিলানন্দ চমকে নবীনের দিকে তাকায়, তারপর তার পিঠে হাত রাখে, 'না উনিই প্রভু পুণ্যব্রত স্বামী, কাল রাতে জেল থেকে বেরিয়ে তোকে স্বপ্ন দিয়েছেন।'

–তা উনার মুখে দুঃখ কেন?

নিখিলানন্দ দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে-ছিল, সরল মানুষকে বোঝাতে যে এত কষ্ট হবে তা ধারণা করে নি। তবুও সে রাগ সম্বরণ করে। কেননা উদ্দেশ্য অনেক, এত তাড়াতাড়ি নবীনকে হারালে চলবে না।

—উনি আনন্দময়, মানুষের দুঃখে দুঃখী, তোর কষ্ট দেখে ওনার মনে দুঃখের ভাব জেগেছিল, তুই মহাভাগ্যবান, উনি তোকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন।

সেই নবীন হেমরম নিখিলানন্দের সঙ্গে যাচ্ছে কলাবনি। জাতভাই সাঁওতালরা গন্ডগোল করছে। শুক্রান্দুর্ম হয়েছে ওদের নেতা। অনাথ মন্ডলের জমি ছাড়বে না। অথচ সবই তো পুণ্যব্রত সঙ্ঘের প্রাপ্য। সঙ্ঘ এই জমি উন্নত প্রথায় চাষ করবে, গ্রামের রাস্তাঘাট তৈরী করবে। পুণ্যব্রত স্বামীর নামে মন্দির গড়ে তুলবে। মেয়েদের স্কুল তৈরী করবে। তৈরী করবে অনাথ আশ্রম। কত পরিকল্পনা নিয়ে দূর দেশ থেকে এ'রা এসেছেন অথচ গ্রামের মানুষ তা বুঝছে না। জমি তারা দখল করেছে। ধান কেটেছে এবার। যেমন কলাবনির অবস্থা তেমনি হরিণডাঙ্গা।

অনাথ মন্ডলের চাষী ছিল এই সাঁওতালরা। পুরো সাঁওতাল পাড়াটা অনাথ মন্ডলের জমি চষত। অনাথ মরে যাওয়ার পর নির্বিঘ্নে সব চষেছিল ক' বছর তারপরই নিখিলানন্দের আগমন এবং হরিণডাঙ্গা গন্ডগোল।

অনাথ মন্ডল থাকলে হয়ত এসব হত না। বড় কর্মী মানুষ ছিল, তবে সুদ খেত শেষ বয়স অবধি। নবীনের নিজের জমিও আছে ঐ মন্ডলের জমির ভিতর।

দলিল করে দিয়ে টাকা নিয়েছিল। কথা ছিল টাকা সুদ সমেত ফেরৎ দিলে জমি ফেরত পাওয়া যাবে। টাকা ফেরত দিতে পারে নি, জমিও ফেরত পায় নি! এ তল্লাটের মানুষের বড় সহায় ছিল অনাথ মন্ডল। গহনা ঘটি-বাটি সব বন্ধক নিত, বিনিময়ে মোটা টাকা দিত। টাকা শোধ হত না, মন্ডল সব নিজের করে নিত। এখন সুদ খাটানোর তেমন মানুষ নেই। নিখিলানন্দ কিছু কিছু টাকা দেয়, প্রথমে সুদ নিত না, এখন অল্প হারে সুদ নেয়। কদিন মঠেও দেওয়া নেওয়া আরম্ভ করেছে। কদিন বলে, সুদের টাকা সব প্রভু যিশুর পায়ে রাখা হয়। মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়। নিখিলানন্দও ঐ কথা বলে।

অনাথ মন্ডলের চেয়ে এরা বোধ'য় ভাল। ভাল ছিল না বলেই তো আঁটকুড়ো হয়ে অনাথ মন্ডল মরল। এখনো সব ছবির মত ভাসে।

সে সময়টায় হরিণডাঙ্গা ফাঁকা হয়ে পড়েছিল। আদিবাসীরা কেউ ছিল না গাঁয়ে। সব গিয়েছিল কলকাতা দেখতে। আদিবাসী কল্যাণ সমিতি কি এক প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়। কোলের ছেলে নিয়ে নবীনের বউও কলকাতায় গিয়েছিল। নবীন গ্রামে ছিল।

কাঁসাই পার হয়ে বৈতায় বড় গো হাট। শ্রীদাম বাস্কে হালের বলদ কিনবে এক জোড়া, নবীন গিয়েছিল তার সঙ্গে বৈতার হাটে। গরু কিনতে কিনতে সূর্য অনেকটা হেলে গেল। ওরা দড়ি ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল হরিণডাঙ্গার দিকে। প্রায় নয় মাইল পথ হবে। নাচনাগুড়ি মোজায় পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে এল। পশ্চিম আকাশে শুকতারা ইপিল-সন্ধ্যাতারা জ্বলে উঠল। নাচনাগুড়ির বাজারে বসে শ্রীদাম বাস্কের সঙ্গে মুড়ি খাওয়া হল। জল আসল বামুন বাড়ি থেকে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সময় গেল। লোকের কত জিজ্ঞাসা। গরুর গায়ে হাত বুলিয়ে দাম জিজ্ঞেস করে, সিঙে হাত দেয়। বেশ তাগড়াই গরু। গরু দুটো ফোঁস ফোঁস করে। নাচনাগুড়ির এক বাড়ি থেকে জাবনা এনে গরুটাকে খাওয়ান হল।

তারপর আবার হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে যখন হরিণডাঙ্গায় পৌঁছল তখন তিনপ্রহর রাত। ফালি কুমড়োর মত চাঁদ ঝুলছে আকাশে। একটুও বাতাস নেই। বোশেখ মাস, গুমোট গরম। নবীনের শোস লেগেছিল, গলা শুকিয়ে কাঠ কাঠ। ও শ্রীদামের সঙ্গে তার বাড়ি যায়। গিয়ে হাঁপাতে থাকে। সমস্ত গাঁটা একেবারে থম মেরে পাথর হয়ে গেছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা গাঁয়ে তো মানুষ নেই। তাই সন্ধ্যায় ধামসা মাদল বাজা বন্ধ। কলকোলাহল স্তব্ধ। আর দিকু মানুষের তো শুধু টাকায় নজর। যে দু-চার ঘর তারা সন্ধ্যা থেকেই ঘরে খিল দিয়ে মাগ বাচ্চা নিয়ে শুয়ে পড়ে না-হয় কিতাব পড়ে। কিতাব পড়েই না অত বুদ্ধি।

শ্রীদামের বউ গরু দেখে হৈ হৈ করে উঠল না। এক বালতি জল নিয়ে আসে। হেরিকেনের শিখাটা উসকে দেয়। অনেকটা আলো হয়ে যাওয়ায় শ্রীদামের বউকে কেমন দেখায়। গম্ভীর হয়ে গেছে, হাসাহাসি করছেনা। অথচ সকালে গরু কিনতে যাবার সময় হাজার ফিরিস্তি দিয়েছিল, এই এইরকম যেন হয়, খুব তাগড়াই যেন হয়। এখন তো গরু দুটোকে ও নজর করছে না।

জল খেয়ে বুক ঠান্ডা করে নবীন জিরোয়। শ্রীদাম গরু দুটোকে গোয়ালে বেঁধে আসে। বউয়ের ব্যবহারে সেও অবাক হয়েছে। বউকে গম্ভীর স্বরে বলে গরুর পায়ে জল দিয়ে আসতে। এসব দিকু-মানুষের রীতি। তবুও ভাল। সারা বচ্ছর যে অন্ন জোগাবে তার সেবা তো পুণ্যকর্ম। শ্রীদামের বউ কাঠ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি হল?

—অনাথ মোড়ল মাডার হইছে।

শ্রীদামের বউ ফিসফিস করে বলে। মেয়েমানুষটা ভয় পেয়েছে। পুলিশের হাঙ্গামা আরম্ভ হবে। কি যে দিন-কাল শুরু হল। বাইরের মানুষ গাঁয়ে আনাগোনা শুরু করেছে। ভালমানুষগুলো পুলিশের হাতে মরবে।

নবীনের বুকের ভিতরটা ধক করে ওঠে। কি কথা বলছে শ্রীদামের বউ। পাগল হলো নাকি? বউটা তখনো দাওয়ার বাঁশ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। নবীনের ভিতরটা থমথমে হয়ে গেল। চারপাশে এতটুকু শব্দ নেই। গোটা হরিণডাঙ্গা মরে গেছে মনে হচ্ছে।

নবীন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। শ্রীদামও। শ্রীদামের বউ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দু-হাত দুদিকে প্রসারিত করে দিয়েছে।

—না, যাবুনি।

—কিনো?

—তুরা ভাল মানুষ, পুলুশে হাঙ্গামা হবে।

শ্রীদাম বউকে সরিয়ে দেয়, ইকটা মানুষ মরি-পড়ি রইছে যাবুনি?

—না, গিইলে তো বাঁচবুনি।

বউ শ্রীদামের হাত ধরে কঠিন হয়ে আটকায়।

—কষ্ট করছিস অনেক, ইখন আরাম কর।

—আরাম করার সময় লয়, সর।

দুজনে এক ঝটকায় বেরিয়ে আসে হেরিকেনটা নিয়ে। শ্রীদামের বউ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভাবনায় কেঁদে ফেলেছে।

অনাথ মন্ডলের বাড়ির বাইরের ঘরে তখনো লাশ পড়েছিল নিঃসঙ্গ। কেউ নেই। ওদের হাঁক ডাকে একজন বেরোল। চাকর-বাকর সব ভয়ে লুকিয়ে ছিল।

তারপর থানায় খবর গেল। পুলিশ এল পরদিন। সারা রাত ওরা লাশ পাহারা দিল। পরদিন লাশ গেল মেদিনীপুরে। গাঁয়ের আদিবাসীরা সব তখন ফিরে এসেছে। কাটা-ছেঁড়া লাশ তারা নিয়ে এল গাঁয়ে। কংসাবতীর চরে লাশ পোড়াল আদিবাসীরা। অনাথ মন্ডলের চোদ্দ পুরুষের কেউ দাহন কাজের সময় ছিল না। ঘরবাড়ি জোতা সব খাঁ খাঁ করতে লাগল।

।। ৬ ।।

কদিনেই দীপঙ্কর এখানে থাতস্থ বসেছে। আস্তে চিনছে মানুষজনকে। প্র মিক কাজকর্মগুলো করে ফেলেছে। ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছে পরিচিত জনকে। তারপর তার কাজ আরম্ভ দায়িত্ব গুরুতর। নির্মল মজুমদার করেছে, তাকে সমস্ত জালটা গুটিয়ে আ হবেই।

কদিন আগে তার খোঁজে এক সন্ন এসেছিল, সে শুনেছে। সেদিন সে ছিল এখানে। ঝাড়গ্রামে প্রয়োজনে গিয়ে মজুমদার বাস ওঠার সময়ে যে সন্ন্যা কথা বলে গিয়েছিল, সেই বোধহয়। নিয়ে জানতে পেরেছে হ্যাঁ সেই লোকা পুন্যব্রত সঙ্ঘের সভ্য। কাছের গ্রাম হ ডাঙ্গাতে সঙ্ঘ কিছু জমি পেয়েছে দান কিন্তু দখল পায়নি। সে ব্যাপারেই এসে এইটুকুই জেনেছে। সন্ন্যাসীকে এখনো দেখেনি।

জমির তদন্তে যেতে হয়। যত তাড়ি কাজ শেষ করা যাবে ততই ঝামেলা চুকে যাবে, ট্রান্সফারও হওয়া কলাবনির কম্যুনিকেশন সুবিধের একটা বাস, ঐ পার্বতী বাসসার্ভিস. যাতায়াত করে। বাস ফেল করলে পাক্কা মাইল হেঁটে আসতে হবে। রাস্তাও স জনক নয়। কলাবনির যাতায়াতের অসু ওকে বিরক্ত করে তুলেছে এ কদিনেই। কাল বিকেলে এসেছিল, একটা বই গেছে।

জমিতে চাষীরা স্পষ্ট কথা বলল. জমি আমাদের আমরা চাষ করি। হয় দাও, নাহলে ভাগে নাম লেখ।

অর্থাৎ হয় মালিক করে দা নতুবা বর্গাদার হিসেবে নাম নথিভুক্ত ব্যবস্থা কর। অদ্ভুত ডিম্যান্ড। চাষীরা সকলে এককাট্টা।

—কিন্তু জমির মালিক কে হবে যদি ভাগচাষী হিসেবে নাম লিখি।

—কেন রাজাবাবু।

দীপঙ্কর আশ্চর্য হয়। জমির বলছে, জমির মালিক অন্যলোক, তার রজনীকান্তও আছে। আছে আরো ক জন।

রজনীকান্ত স্পষ্ট গলায় না বলল তার হাত চাষের জমি। রেকর্ড বলছে জমির মালিক। রাজাবাবুর নাম হবে তাইনে।

পিথানায়েক সেই ভুসকালো দীর্ঘ যুবক চকচকে চোখে দীপঙ্করের তাকায়। চোখ বলছে, বাবু রজনী সা কথা শুনো না। এই পিথা নায়েক প্রথম ওকে কাঁধে তুলে নদী পার করতে চেয়ে

মায়াবনের হরিণ

অমল মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন কোথাও যাই না। মনটা হু-হু করে, খাঁ-খাঁ করে। সংসারজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী হয়ে আছি। স্ত্রী আছেন পুত্র আছে, বৃদ্ধ পিতা মাতা। হরেক সমস্যা। সবচাইতে বড় সমস্যা টাকার। অসুখ-বিসুখ, টানাটানি তো লেগেই আছে। ভাগ্যিস টিউশানিটা আছে। তা না হলে স্কুল থেকে যা পাই, তা দিয়ে দশদিনও চালাতে পারতাম কিনা সন্দেহ। একার পক্ষে একটা সংসার টানা কি যে কষ্টের সে ভুক্তভোগী ছাড়া কে আর বুঝবে।

তাই মরিয়া হয়েই টিউশানি করি। অঙ্কের বাজারটা অবশ্য ভালই আছে। যাদের পাশ ফেলের ভয় তারাও পড়তে চায়, আবার যারা স্কলারশিপ পেতে চায় বা খুব ভাল ফল করতে চায়—তাদেরও অঙ্কের একজন শিক্ষক দরকার হয়েই পড়ে। ভাগ্যিস অঙ্ক নিয়ে পড়েছিলাম। চিরকাল সাহিত্যের নেশা ছিল। বাবা ছিলেন ইংরেজী ও সংস্কৃতের লোক। আমাকে উৎসাহ দিতেন অঙ্কে। অঙ্কটা ভালই করিয়েছিলেন বাবা। টিউশানি খুঁজতে হয় না। অন্য স্কুল, দূরের কলেজ থেকেও ছেলে আসে। এখনতো অনেককেই ফিরিয়ে দিতে হয়। দিনে তিনটের বেশী ছেলে পড়ানো অসম্ভব ব্যাপার। দেহ-মন ক্লান্তিতে ভেঙে আসে।

মাঝে মাঝে ভীষণ ক্লান্ত ও অবসন্ন লাগে। ইচ্ছা করে কয়েকটা দিনের জন্য নিরব ও নির্জন কোন জায়গায় গিয়ে একটু ঘুরে আসি। কিন্তু কিছুতেই পারি না। বন্ধুরা ঠাট্টা করে। রোববার একবার কফি-হাউসের আড্ডায় যাই। আমি আছি এটা অন্তত জানান দিয়ে আসি। এমনিতেই আমার অফিসার ও অধ্যাপক বন্ধুদের ধারণা আমি গৃহশিক্ষকতার ব্যবসায়ে হাজার হাজার টাকা রোজগার করে ক্রমশ বাড়ি গাড়ি মন্দির মায় চিত্তার মঠ বানানোর মত টাকা সঞ্চয়ের লক্ষ্যে প্রায় উদাসীন হতে চলেছি। তার উপর রবি-বারটায়ও যদি একবার বন্ধুদের আড্ডায় না যাই, তাহলে হয়তো ভাববে, চিতায় মঠ স্থাপনের পর্বটাও আমার হয়তো সম্পন্ন হয়ে গেছে। তাই আমি আছি, অন্তত এইটুকু জানান দিতে প্রায় প্রতিবারই যাই।

গিয়েও শান্তি নাই। আমার সেতারে ওদের তবলা প্রায়ই একসুরে বাজে না। বাঙ্গ বক্রোক্তি আছেই। ওরা সব সময় হৈ-হুল্লোড় নিয়ে থাকতে ভালবাসে। এই সিনেমায় যাচ্ছে। এই প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লো। বনভোজন কি চড়ুইভাতি, বন্ধু পুত্রের অন্নপ্রাশন কি বান্ধবীর বিবাহ বার্ষিকী—সব কিছুতেই ওদের সমান উৎসাহ। খাদ্যের সঙ্গে পানীয় থাকলে তো কথাই নাই। ভাব দেখলে মনে হবে ওদের কাছে স্বর্গের দরজা খুলে গেছে। আমাকে অনেকবার যোগ দিতে অনুরোধ করেছে। একবার গিয়েওছিলাম। অধিকাংশবারই পারিনি। সেইজন্য দেড়-হাজারী দুহাজারী ব্যাঙ্ক বীমার বন্ধুদের আমার উপর খুব রাগ। বলে, বিয়ের পর আমি নাকি স্ত্রৈন হয়ে পড়েছিলাম। তারপর ছেলেটা হয়ে আজ একেবারে ভে...। সভা মহলে শব্দটা নাই বা বললাম। সেখানে একটা অশালীন প্রতি শব্দ প্রয়োগ করে বলে—আমি নাকি তাই বনে গেছি।

আমি শুনে হাসি। কোনো উত্তর দই না। উত্তর দেওয়ার কোনো মানেও হয় না। সাবজেকটিভ এ্যাসেসমেন্ট নিয়ে কি তর্ক হয়?

আসলে পৃথিবীতে খেয়ে পরে সুখে আহ্লাদে বাঁচার জন্য যে উপাদানগুলি দরকার তার খুব কম কিছু দিয়েই ঈশ্বর আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। না—বাইরের উপকরণ না চরিত্রের উপকরণ। পৃথিবীতে এসে খেয়ে পরে সুখে স্বচ্ছন্দে

বাঁচি—এটা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হোত—তাহলে অন্তত বাবার একটা বাড়ি, গাড়ি একটা বড় অঙ্কের স্থায়ী আমানত ব্যাঙ্কে থাকতোই। খাদিমপুর স্কুলের এ্যাসিস্টেন্ট হেড মাস্টারের ছেলে করে পাঠানোর মধ্যে ঈশ্বর আমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন—এমন নিশ্চয় কেউ বলবে না।

অবশ্য, আমার তাতে এতটুকু খেদ নেই। নিজের দারিদ্র্য সম্পর্কে দুঃখ থাকলেও, নিজের পিতামাতা সম্পর্কে আমার এতটুকু অভিযোগ নেই। কাঁড়ি কাঁড়ি সুখদা উপকরণ ঢেলে না দিয়েও যে নিজের স্ত্রী, সন্তান, স্বারস্থ দূর আত্মীয় প্রিয় ছাত্র ও সুহৃদ বন্ধুকে সুখী করা যায়—আমি তা বাবাকে দেখে জেনেছি। এখনতো পত্র-পত্রিকা নানারকম লেখাজোখা রেডিও টেলিভিশনের কল্যাণে আপাত মনোহারী শব্দ ও অর্থের রবীন্দ্রসংগীত মুখরোচক শাস্ত্র বচন অনেক ডেপো ছেলে অসামাজিক কুকর্মের গুরুদেবদেরও জানা। কাজেই কথাটা জোরদার শোনাবে না। তবু বলছি, আমরা দূর বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁয়ে থেকেও অনেক ছোট বয়সেই জেনেছি—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। আমরা জেনেছি যেনাহংনামৃতস্যাম কিমঅহম তেন কুর্যাম। শুধুই এই শ্লোকগুলি ও তার বঙ্গানুবাদ জানতাম তা নয়। আমরা ঐ শ্লোকগুলির অর্থ চোখ বুজে অনুভব করতে পারতাম।

কাজেই কি পেয়েছি না পেয়েছি তা নিয়ে দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু নিজের চরিত্রটা নিয়ে। যে নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ ভাব না থাকলে এই সংসার জমিতে টেকা খুবই মুস্কিল— আমার মধ্যে তা একদমই নেই। হয় আমি জড়িয়ে যাই নয়তো আমার মধ্যে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া হয়। হৃদয়-সুখ বিষয়গুলির সঙ্গে আমি লেপটে থাকতে ভালবাসি। যেখানে জড়ালে লাভ নেই, ক্ষতির সম্ভাবনা নানান জটিলতা হতে পারে, নিজের কাজের ক্ষতি হতে পারে আমি অবশ্যম্ভাবী সেখানেই জড়িয়ে পড়বো।

একবার এক বিধবা ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়। তখন বয়স অল্প। ইন্টারমিডিয়েট পড়ি। পরীক্ষা দিয়েছি। খড়গপুর থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে আলাপ। উনিও ফিরছিলেন গিধনী থেকে কলকাতা। সঙ্গে দুটি মেয়ে। একজন কিশোরী একজন সদ্য যৌবন প্রাপ্তা। বড় মেয়েটি অনিন্দ্য-সুন্দরী। চোখ চুল ও পায়ের পাতা যেন এক সারে বাঁধা। দোষের মধ্যে সামান্য একটু রোগা। ঠিক রোগাও বলা চলে না একহারা। তাতেই যেন আরো সুন্দর লাগছিলো বেশী।

খড়গপুরে চা পাওয়া যাচ্ছিল না। যা পাওয়া যাচ্ছিল তার নাম বলা যেতে পারে একপ্রকার পাতা সেদ্ধ দুধ মিশ্রিত সেকারিনের জল। ওরা চুমুক খেয়েই [illegible] রাখলেন। সুন্দর মুখগুলো চায়ের স্বাদে বেঁকে গেল। সুন্দর মুখ সুন্দর মুখ। দেখে হাসি পেলেও দেখতে খুব ভাল লাগছিলো। কামরার সবাই তাকিয়ে ছিল।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। উল্টোদিকের বেঞ্চিতে একটা জায়গা পেয়েছিলাম। ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাল চা খাবেন?

এতই আকস্মিকভাবে জিজ্ঞেস করেছি, ভদ্রমহিলা থতমত খেয়ে বললেন, তা কি আর পাওয়া যাবে বাবা? দেখছি। বলে ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে নামলাম। ট্রেন ছাড়ার তখনও মিনিট পাঁচেক বাকি। সামনেই ছিল ক্যাটারারের রেস্তোরাঁ। ভেতরে ঢুকে ম্যানেজারকে বললাম, ভি আই পি—তিন কাপ চা। ম্যানেজার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি ম্যানেজারের চোখে চোখ রেখে একটু উগ্রভাবে বললাম, হ্যাঁ। কামরার নম্বরটা বললাম।

ম্যানেজার উঁচু সুরে নামতা পড়লেন ৪৬৩৯ এক পট।

আমি বললাম, দয়া করে একটা কাপ বেশী দেবেন।

ম্যানেজার আমাকে গ্রাহ্য না করে আবার আওড়ালেন ৪৬৩৯ ডবল পট।

বেয়ারা বলল, আপনি যান। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

উর্দিপরা বেয়ারা এসে ট্রেতে করে চা দিয়ে গেল। বলল, পাঁশকুড়াতে নাবিয়ে দেবেন। আমাদের লোক আছে। এক কামরা লোকের সামনে আমার মাথা গিয়ে ট্রেনের সিলিং-এ ঠেকলো। ভদ্রমহিলারা লজ্জিত ও সংকুচিত হয়ে আমি কেন এমন ঝামেলায় নিজেকে ফেললাম সেই কথাটাই থেকে থেকে বলতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে আলাপ হল। সম্প্রতি ভদ্রমহিলার স্বামী মারা গেছেন। তিনটি মেয়ে। ছেলে নাই। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেছেন। উইল করে যেতে পারেন নি। ছোট মেয়ে দুটি পড়ে। একজন স্কুলে। একজন সবে কলেজে ঢুকেছে। কলকাতায় গোলাম মহম্মদ রোডে ছোট্ট একটা বাড়ি আছে। কনট্রাকটার দেওর সেটা নিয়ে ঝামেলা শুরু করেছে। তাই গিধনীতে কাঠের ব্যবসায়ী বড় ভাইয়ের শরণাপন্ন হতে এসেছিলেন। মেয়ে দুটিকে ওদের বড় মামার কাছে কিছু দিনের জন্য রেখে যেতে পারলে কোর্ট কাছারির চেষ্টা দেখতেন।

আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনারহিতের মত ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বললাম আমার জ্যাঠতুতো বড়দা এডভোকেট আপনাদের কাছেই থাকেন প্রতাপাদিত্য রোডে। আপনি চান তো, তিনি আপনার সব মুস্কিল আসান করে দেবেন।

ভদ্রমহিলা কাতো ধরাব ভঙ্গিতে বললেন, যদি একদিন নিয়ে যাও বাবা, খুব উপকার হয়।

আমি বললাম, কৃতজ্ঞতার কি আছে, আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

ঠিকানা নিলাম। সারাক্ষণ ট্রেনে মেয়ে দুটির সঙ্গে সামান্য কয়েকটি কথা হয়েছিল। প্রথম পরিচয়ের তৃপ্তি ও স্বাদ আমরা পরস্পরকে দৃষ্টির স্পর্শেই জানিয়েছিলাম। হাওড়া স্টেশনে নেমে ওরা চোখের সামনে ও মুখের ভাষায় ফরমান জারি করলো। দুই একদিনের মধ্যেই আমাকে ওদের বাসায় যেতে হবে। যাবেন কিন্তু যাবেন কিন্তু রোববারের মধ্যে আসা চাই ইত্যাদি বলতে বলতে ওরা হাওড়া স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। আমি আমার গন্তব্য স্থলের দিকে চললাম।

সাধারণত এই সমস্ত সংযোগগুলি এখানেই শেষ হয়। বড়জোর ডায়রির পাতায় কিছুদিন থাকে। তারপর একদিন ডায়েরী পুরনো হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে শেষ হল না। আমার থেকে থেকে মনে হতে লাগলো এক বিধবাকে ঠকিয়ে যে মানুষটা পথে বসাতে চায় তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। ভদ্রমহিলা ও মেয়ে দুটির অসহায় করুণ অবস্থা থেকে থেকে মনে আসছিল।

একদিন সত্যি ওদের ওখানে চলে গেলাম। আদরে আপ্যায়নে ওরা নিকট মানুষের মতই দেখালো ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এডভোকেট দাদার কাছে নিয়ে গেলাম। তিনিও যথাসাধ্য ওদের জন্য চেষ্টা শুরু করলেন। ইতিমধ্যে পরীক্ষার ফল বেরুলো। যতটা খারাপ হবে ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেকটাই ভাল হল। মাস্টারের ছেলে এবং ভাল ফলের জন্য একটা হস্টেলে ফ্রি পেয়ে গেলাম। অংক নিয়ে বি-এস-সি-তে ভর্তি হলাম। টিউশানি করে নিজের খরচ চালাই।

একদিন দাদা জিজ্ঞেস করলেন, কি রে পেমেন্টের কি হবে? এখনো তো কিছুই দিলটিল না।

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হলো। এসব কথা আমি কিছুই ভাবিনি। ওদের যা অবস্থা দেখেছি তাতে প্রতিটি পয়সা[illegible] জন্য পঞ্চাশ টাকা দেওয়ার সাধ্য ওদের নেই। কি করি। দাদা ছাড়বেন কেন। শেষে টিউশানির সামান্য টাকা থেকেই ওদের অক্ষমতার কথা জানিয়ে একটু কনসম করে নিয়ে, দু-তিন দফায় টাকা দিয়ে দিই। দাদাকে জানাই না আমিই টাকা দিচ্ছি। আর ওদের জানাই না দাদা টাকা পয়সার কোনো প্রশ্ন তুলেছেন।

ইতিমধ্যে মোকদ্দমার ব্যাপারটা আমার কাছে গৌণ হয়ে গেছে। আমি আর তেমন খবর রাখতাম না। প্রায়ই সুজাতাদের বাসায় যেতাম। গেলে ভারি ভাল লাগতো। মামলা-মোকদ্দমার কথা উঠলেই বিরক্তি প্রকাশ করতাম। ওরা বুঝে পরের দিকে আমাকে আর ও সবের সঙ্গে জড়াতো না। ছোট বোন অনীতার নাচ-গানের ঝোঁক ছিল। বিকেলের দিকে ও প্রায়ই বেরিয়ে যেত। নাচের স্কুলের বা গানের ক্লাশে বা ফাংশনে। লেখাপড়া দেখানোর কেউ ছিল না। তাই টিউটোরিয়েল ক্লাশ [illegible] হোত সন্ধ্যায়।

সুজাতাই আমায় আদর যত্ন করতো। এমন ভাল স্বভাবের মেয়ে সম্ভবত কদাচিৎ

দেখা যায়। মূলত একটা ঘরে ওরা থাকতো। বাকিগুলি কন্ট্রাকটার কাকার বেদখলে ছিল। ঘরটা বড় ছিল বটে কিন্তু প্রাচীন আমলের একটা নকসাকরা খাটই প্রায় সারা ঘরটা জুড়ে ছিল। ডাইনে-বাঁয়ে দু-একটা আলমারি সেলফও ছিল বটে কিন্তু অনেক-দিনের জমে ওঠা তোবক কাঁসার বাসনপত্রে ঘরটা ছিল ঠাসা। কোণার দিকে সামান্য ছেঁড়া বেতের একটা সোফা ছিল। আমি সেখানেই বসতাম। সুজাতার কোনই জড়তা ছিল না। গেলেই একমুখ হাসি নিয়ে বলতো ভেতরে আসুন। বসলে জিজ্ঞেস করতো কলেজ সেরে না টিউশানি ফেরত? উত্তর অনুযায়ী চায়ের সঙ্গে টা তৈরি হোত। টিউশানি ফেরত মানে খেয়ে এসেছি বড়লোকের মেয়েকে পড়াতাম। খাবাবটা রোজই জুটতো।

কলেজ ফেরত হলে চায়ের সঙ্গে ভারি জিনিস পেতাম। রুটি ছোলার ডাল, কি রুটি তরকারি। না থাকলে সামনের দোকান থেকে পাউরুটি আসতো। নরম পাউরুটি আমের মোরব্বা দিয়ে খেতে আমার দারুণ লাগতো। সুজাতার মা চাটনী, মোরব্বা বানাতে ও জমিয়ে রাখতে দক্ষ মহিলা ছিলেন। খাওয়ার পর বড় শ্বেতপাথরের কাপে চা পেতাম। আমার কেন জানি না ...ুব সিকিওরড লাগতো।

পরের দিকে এখানে আসাটা প্রায় অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পাড়ার ...লোকেরা অনেকেই জানতো আমি ওদের ...নকট আত্মীয়। শুধু সুজাতার কাকা ...রেশবাবু (যিনি বাড়ির চারখানা ঘরের ...ধ্যে তিনখানাই বেদখল করে আছেন) ...কদিন বড় রাস্তার মোড়ে ডেকে নিচু ...লায় বলেছিলেন, ভদ্রলোকের ছেলে, এসব ...টেঝামেলার মধ্যে জড়াবেন না। তাছাড়া ...সব বাজে সংসর্গে—অবিনাশ্ত ভুরু আর ...চোখের ইশারায় সুজাতাদের ঘর দেখিয়ে ...লেছিলেন—একদম যাবেন না। ওরা মায়ে ...য়েতে ছাগল ভেড়া করেও রাখতে পারে।

শুনে লোকটাকে কান বেড়ে ঠাস করে ...কটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছা করছিলো। ...গয়ে বে-পাড়ায় একটা ঝামেলা হয়ে যাবে ...ভবে নিজেকে সংযত করেছি।

ঘরে ঢুকে সুজাতাকে কথাটা বলতেই, ...খ ছলছল করে এল। তারপর খাটের ...জতে হাত রেখে, তার ওপর মাথা চেপে ...দিলো। ফুলে ফুলে। আমি বোকা বনে ...লাম। কি বলবো কি করবো কিছুই ...ঝে উঠতে পারলাম না। অনেক পরে ...লাম, সুজাতা আমি তো সব জানি। ...মি কেঁদো না। সুজাতা নিজেকে সংযত ...র ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল ...ক হাতে মুড়ির বাটি ও অন্য হাতে ...য়ের কাপ নিয়ে।

চা খাওয়া হয়ে গেলে ও কথা বললো। ...ব শান্ত ও স্নিগ্ধ সুরে বললো, ...পনি এখানে আর আসবেন না। আমি ...কে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? ও বলে গেল—তাতে আপনার ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। মানুষ যে কত হীন ও নীচ হতে পারে তা আপনি জানেন না। আপনি সরল মানুষ।

আমি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, সুজাতা আমি নিজের টানে আসি।

সুজাতা আবার বললো, আপনি আসবেন না।

আমি অনেকদিন যাইনি। যাব না, এটাই মনে মনে স্থির ছিল। পুজোর ছুটিতে খাদিমপুর চলে যাব। কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। রওনা হবার আগের দিন সুজাতাদের জন্য মন খারাপ করলো। হঠাৎ একটা ট্রামে চেপে বসলাম। ট্রামটা সুজাতা-দের বাড়ির কাছ দিয়ে যায়। যন্ত্রচালিতের মত ওদের স্টপেই নেবে পড়লাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে একেবারে ওদের বাড়ির কাছে। বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে সংকোচ হচ্ছিল। একবার ভাবলুম ফিরে যাই। ভাবতে ভাবতেই দেখি সুজাতার মা দরজায় দাঁড়িয়ে। ম্লান। মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ?

কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। শরমে মরে গেলাম। ভাবলাম, তার চেয়ে যদি বলতেন, আমরা তো শুনেছিলাম তুমি মারা গেছ, তাহলে অনন্ত একটা বাঁচার গল্প দিয়ে শুরু করতে পারতাম।

সাহস সঞ্চয় করে লজ্জা ও সংকোচকে ডিঙ্গালাম। জিজ্ঞেস করলাম, সুজাতা অনীতা ওরা কেমন আছে?

বললেন ভাল নেই।

কি হয়েছে? কার?

উত্তর এল সুজাতার। পেটের যন্ত্রণা। অসহ্য। ডাক্তার ধরতে পারছে না। বলতে বলতে বললেন, ভেতরে এস।

ভেতরে ঢুকে দেখি সুজাতা বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। অনীতা পাশে বসে। হাতে একটা গরম জলের ব্যাগ।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। সুজাতার মা রান্নাঘরে গেলেন। অনীতা

বললো, বসুন আকাশদা। এতদিন পরে যা হোক আমাদের মনে পড়লো। খোঁচাটুকু টের পেলাম। তবু ভাল লাগলো। কিন্তু কি বলবো বুঝতে পারলাম না। আমার অবস্থা দেখে অনীতা হাসলো। বললো দিদির সঙ্গে কথা বলুন, আমি চা নিয়ে আসি।

আমি অপরাধীর মত ম্লান হাসলাম। অনীতা উঠে গেলে মৃদু বাতাসের মত ভাবলাম সুজাতা।

সুজাতা আমার দিকে চোখ ফেরালো। সমস্ত মুখ বিবর্ণ। কে যেন সব রক্ত শুষে নিয়েছে। আমার বুকের ভেতরটা হায় হায় করে উঠলো। সুজাতা চোখের ইশারায় বড় খাটের এক কোণে বসতে বললো। তারপর অনেকটা বাদে কথা বললো, এলেন কেন? মরে গেলে একটু শোক করবেন বলে?

আমার গলায় কান্না ঠেকে ছিল। বললাম, এসে যখন গেছি, মরতে তোমায় আমি দেব না।

ছুটলাম মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলে। অরুপদার তখন হাউস সার্জন শিপের শেষ বছর। আমার চেয়ে বছর চারেকের সিনিয়ার একই স্কুলে পড়তাম আমরা। আমাকে খুব ভালবাসতেন। কতকটা বন্ধুর মতই ছিল।

সব শুনলেন। শুনে রসিকতা করে বললেন, তুমি যখন মরেছো তখন একটা কিছু তো করতেই হবে। মাথা চুলকালেন। সহকর্মী ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর বললেন যতদূর মনে হয় গাইনি ব্যাস। থাক ঠিকানাটা দাও। সন্ধ্যে সাতটায় ওখানে থেকো। আমাদের প্রফেসার গাইনির হেড ডঃ অনিল সেন। ওকে নিয়েই যাব।

সন্ধ্যে বেলায় ডঃ সেন এলেন। সঙ্গে অরুপদা। ম্যাডিকেল কলেজের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। ডঃ সেন নাকি অসম্ভব ভালবাসেন দেখলেন ভাল করে। জিজ্ঞাসাবাদ করলেন নানা খুঁটিনাটি। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করলেন। তারপর দীর্ঘ প্রেস-ক্রিপসান লিখে দিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওষুধটা খাওয়ার পর পিরিয়েডের আগে ও পরে কি ধরনের রিঅ্যাকশান হয়, আমাকে জানাবেন।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। ডঃ সেন গাড়ীতে উঠে গেলে আমি বললাম, অরুপদা টাকা? অরুপদা ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে প্রসঙ্গ তুলতে বারণ করলেন।

ডঃ সেন চলে গেলে বললেন, এসব ডাক্তারকে কি টাকা দিয়ে যে কোন সময় আনা যায়? আমার আত্মীয়া শুনেই উনি এসেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি বললেন?

অরুপদা হাসতে হাসতে বললেন সেই সনাতন রোগ। ক্রাই অব দি ওভারি। একটা বাচ্চা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আবার একটু মুচকি হেসে বললেন, সেসব তো এখন অনেক দূরের কথা। অঙ্ক নিয়ে পড়ছো। চট করে চাকরী পাবে, সে আশাও কম। যাই হোক ওষুধগুলো যাতে ঠিক মত খায় সেটা দেখো।

সুজাতার মা প্রেসক্রিপশান দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, এতো পঞ্চাশ ষাট টাকার কমে হবে না!

আমি বললাম, আমি এখন নিয়ে আসি। পরে টাকা নিয়ে নেব।

সুজাতা ভাল হয়ে গিয়েছিল। ওষুধ কিনে সেই রাতেই সুজাতার শিয়রে রাখতে গিয়ে একটু কাব্য করে বলেছিলাম, কি, বলেছিলাম না যেতে আমি দিব না তোমারে। ও বললো, দেখো ঠিক চলে যাব। আমাকে মনে করিয়ে দেবার অজুহাতে বলল, পরের লাইনটা মনে নেই? আবৃত্তি করলো, তবু যেতে দিতে হয়। কিছুক্ষণ নিরব থেকে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্চা তুমি মানুষ না দেবতা?

আমি বললাম, দেখবে? চকিতে দুই হাতে ওর সূর্যমুখীর মত মুখটা তর্পণের ভঙ্গিতে তুলে ধরলাম। তারপর নবীন ব্রহ্মচারী যেমন করে আচমন করে তেমনি করে আমার ঠোঁট দিয়ে ওর ঠোঁট ভিজিয়ে দিলাম। সুজাতা মদালসার মত আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। বলল, দেশ থেকে ফিরে আবার এসো কিন্তু।

প্রায় মাস দুয়েক পুজোর ছুটি কাটিয়ে দেশ থেকে ফিরে এলাম। পৈতেতে বাঁধা চাবি দিয়ে হস্টেলের ঘর খুলেই দেখি একটা বিরাট খাম মেঝের ওপর পড়ে আছে। দ্রুত তুলে নিলাম। একটা বিয়ের চিঠি। কিন্তু পাত্রপাত্রী কেউই আমার চেনা বলে মনে হল না। সুস্মিতা নামে কোনো পরিচিত মেয়েকে আমি মনে আনতে পারলাম না। নিমন্ত্রণ-কর্তা প্রিয়ংবদা দেবী বলেও আমি কাউকে চিনি না।

সন্দেহবশত চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে দেখি পেছনে এক টুকরো সাদা কাগজ আঠা দিয়ে লাগানো। তাতে লেখা, আগামী ৩রা অগ্রহায়ণ আমার বিয়ে। ঐদিন আপনি না-এলে বুঝবো, আপনি কোনোদিনই আমাকে ভালবাসতেন না। ইতি, সুজাতা।

সুজাতার মায়ের নাম জানার অবকাশ আমার কোনো দিন হয়নি। এমন কি সুজাতার যে একটা পোষাকী নাম আছে তাও আমি খেয়াল করে মনে রাখিনি।

বলা বাহুল্য সে বিয়েতে আমি যাইনি। কতটা দুঃখ হয়েছিল সে প্রশ্নও আজ অবান্তর। শুধু সেই অল্প বয়সেই বুঝে ছিলাম, আমি যেভাবে তৈরী হয়েছি, আমার পরিণতিগুলি সম্ভবত চিরকালই এমন হবে। আমার পরিণাম চিন্তা নাই। কী উদ্দেশ্যে কি করছি তাও আমার কাছে সব সময় পরিষ্কার থাকে না। মুহূর্তটাই আমার কাছে খুব বড় হয়ে ওঠে। অধিকাংশ সময়ই আমি ভাল লাগার কাছে নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ করে বসি। এখন তো বয়েস অনেক হল। চল্লিশ পার। অভিজ্ঞতাও হয়েছে ঢের। স্বভাব খুব একটা যে পালটাতে পেরেছি তা নয়। এখনো কোথায় কীভাবে জড়িয়ে পড়বো, আমি নিজেই তা জানি না।

আমাদের স্কুলটা বড়। বাজারে একটু সুনামও আছে। অর্থবান লোকেদের ছেলেরাই বেশীর ভাগ লেখাপড়া করে। বাইরের চাকচিক্য বা জৌলুষও খুব আছে। হয়তো এসব দেখেই অনেক গরীব ছাত্র, দুস্থ মাস্টারমশাই, শিশু-সন্তান সহ সদ্য স্বামীহারা বিধবা আমাদের স্কুলের গেটে এসে ভিড় করে। দরোয়ান তাদের ঢুকতে দেয় না। দেওয়া সম্ভবও নয়। কত লোককে এভাবে ভিক্ষার জন্য বা সাহায্যের জন্য প্রতিদিন স্কুলে ঢুকতে দেওয়া যায়?

কখনো কখনো দীঘল চোখের বেচারী চাউনির একটা ছেলে অথবা ঘোমটায় নত বিধবা রমণীকে দেখে আমার মায়া হয়। আমি দরোয়ানকে অনুরোধ করে ওদের গেটের ভেতরে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সাহায্য চাইবার অধিকার জোগাড় করে দিই। দরোয়ান কাঁই-কাঁই করে। কর্তৃপক্ষের বারণ আছে। তবু আমার অনুরোধ এড়াতে পারে না। আমি একজন পুরনো শিক্ষক। বাজটাও খুব অন্যায় বা অমানবিক নয়। ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়।

তারপরেই হয়তো বিপদ শুরু হয়ে যায়। যাদের গেটের পাশে দাঁড়াবার অনুমতি করিয়ে দিয়েছিলাম, তারা হয়তো ভরসা পেয়ে কতকটা বলতে পারেন প্রশ্রয় পেয়ে একেবারে দোতলার স্টাফরুমে এসে উপস্থিত হয়। আসার পথে রাসভারি হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকেও সাহায্য চেয়ে আসতে ভুল করে না। ফলে একটা মারাত্মক হৈ চৈ পড়ে যায়। সহকর্মীরা রেগে যান। হেডমাস্টার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। দরোয়ানের উপর আস্ফালনে ফেটে পড়েন। আমি গরীব বেচারাটির পক্ষে সহকর্মীদের কাছে দু চার আনা চাইতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে, সমস্ত দোষ নিজের কাঁধে তুলে নিই। এক-দুই টাকা যা পকেটে থাকে গোপনে লোকটির হাতে গুঁজে দিয়ে বলি, তাড়াতাড়ি চলে যাও। আর কখনো এসো না।

সারা বিকাল আমার মন খারাপ হয়ে থাকে। এভাবে সাহায্য করে যে দেশের বিশাল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা যায় না সে-সব সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক কথা আমার মনেই আসে না। আমি ভাবি পয়সা না-পেলে ছেলেটা হয়তো একটাও বই কিনতে পারবে না। হয়তো বিধবা রমণী তার শিশুপুত্রের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিতে পারবে না। কি জানি, বৃদ্ধ মাস্টারমশায়ের হয়তো রাত্রিবেলা খাওয়ার পয়সা নেই।

আসলে আমি একটি মায়াবদ্ধ জীব। এই সংসারে চলার যে নিয়ম প্রাচীন ঋষি

শাস্ত্রকাররা জানিয়ে দিয়েছেন যা জেনে জেনে অধিকাংশ লোকই মেনে চলে— ার সাগরে হাঁসের মত চলবে, দুঃখকষ্টের র দিয়ে ভেসে বেড়াবে—কিন্তু পাখনায় টু জল লাগবে না। প্রণয়-প্রীতির ঘতে কেলি কর ক্ষতি নেই। কিন্তু বে না। জড়ালে তো মরলে। আমি মূর্খং । এক তিলও জীবনে লাগাতে পারলাম যেখানে যাই সেখানেই লেগে থাকি। কিছু দেখি তাতেই মুগ্ধ হয়ে যাই। ৷ ভাল কথা শুনলে নেশা ধরে। রূপ াকে মাতাল করে দেয়। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ ন্ত শীত কি বসন্ত—আমি প্রকৃতির ার কিনারা পাই না। আমার আচ্ছন্নের লাগে।

আমার স্ত্রী পুত্র আছে। আমি একটা জ বাস করি। পেশার দিক থেকেও ার নাকি সন্ন্যাসী হওয়া উচিত। সমাজ তাই প্রত্যাশা করে। অথচ সত্য এই দের আমার আশ্চর্য ভাল লাগে। শুধু ্পেসী মেয়েদেরই ভাল লাগে তা নয়। টি নারীর মধ্যে আমি এক স্বতন্ত্র দেখতে পাই। কারো চোখ ভাল লাগে। । কণ্ঠস্বর। কারো নেতিয়ে পড়া খোপার গ্রীবার মসৃণতা। মায়াঞ্জন মাখা মুখের । কারো, কারুবো বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি। য বিশেষ রমণীর দেহভার, শ্রেণীভার ান্ত অসহায় দৃষ্টি—আমাকে বিহ্বল আসক্ত করে এবং ভেতরে ভেতরে এক ট অনুভূতিকে মৃদু হাওয়ায় নারকেল । পাতার মত কাঁপায়।

াঁয়ের ছেলে আমি। অনেকদিন কল- । আছি। কালে ভদ্রেও চিড়িয়াখানা ঙ্গার ধারে গিয়েছি বল্লে মনে পড়ে যেখানে থাকি সেখানে প্রকৃতি বলতে ীল আকাশ, বড়লোকের বাড়িতে গেটের লতা, আর এধার ওধার ছড়িয়ে থাকা টা নারকেল গাছের মাথা। অথচ ঋতু- য় আমাকে কি ভীষণ পর্যুদস্ত করে!

ই তো বসন্ত এসে গেল। মরা গাছের সবুজ পাতার সমারোহ দেখে, আমার র্মে আর তেমন মনে নেই। সব কেমন মলো হয়ে গেছে। ভীষণভাবে কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে। মনে হচ্ছে কত- যন একই জায়গায় স্থির হয়ে আছি। র জন্য, দূরের জন্য বুকের ভেতরটা করে। শুধু কি দূরের জন্য? আরো কি যেন মিশে আছে।

চ জানি বুঝি না: মনযোগ দিয়ে করছি। সব সময় ব্যস্ত থাকছি আর টিউশানি নিয়ে। টাকার জন্য ণ তৈরী করেছি। ভবিষ্যতের নর যুক্তিতে স্থায়ী আমানত কিছু করে বাড়াবার জালেও পা দিয়েছি। এরই কোন ফাঁক দিয়ে যে ডাক আসে। স্যময় ডাক। অসম্ভব টান। পূর্ণপক্ষে । বুকে চন্দ্রের টানের মতো। সে টানে করা জাহাজ জেলে যাবে। [illegible] ার হরিণ[illegible] পাল।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, সরকার পে-স্কেল গণতন্ত্র এ্যাফিসিয়েন্সি-বার মাদের থাসর স্নো পাউডার সেন্ট—এই সংসারের নগণ্যতম বিষয়। আসল বিষয় পুরুষ এবং নারী। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ মাটি নদী সমুদ্র পাহাড়-পর্বত। আদিগন্ত বিস্তৃত সবুজ সমারোহ। আমি বুঝতে পারি বিশ্ব-জোড়া ফাঁদ পাতা আছে। সে ফাঁদ আমারই জন্যে। অনুকূল পরিবেশে এক অজানিত সম্ভাবনার জন্য আমার হৃদয় কুমারী জমির মত প্রস্তুত হয়ে থাকে।

প্রায় পাঁচ সাত বছর একসঙ্গে কাজ করতে করতে আমি এক সহকর্মিণীর দিকে মনযোগ দিয়ে তাকিয়ে দেখার অবকাশ পাইনি। একে অনেক জুনিয়ার—দূরে দূরেই বসতো। তাছাড়া হালফিলের পাশকরা ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে একটি পূর্ব নির্দিষ্ট ধারণার কারণে কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভাবও আমার মধ্যে ছিল। আর এমনিতেই আমি নিজের ওপর একটু অতিরিক্ত পরিমাণে প্রবীণতার ভার চাপাতে ভালবাসতাম। ফলে নবীন সহকর্মী ও সহকর্মিণীরা কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখেই চলতো। অবশ্য এও সত্য যে আমি এই সময়টায় নানা বিষয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। টিউশানি তো যথা-রীতি ছিলই। দাবায় একটা অসম্ভব উৎসাহ তৈরী করেছিলাম। স্কুলের স্টাফরুমে বাড়িতে সামান্য ফুরসৎ পেলেই আমি দাবা নিয়ে বসে যেতাম। স্কুলে আমার চেয়ে উচ্চশ্রেণীর দাবা-পাগল দুতিনজন ছিলেন। তাঁরাই পাতা পেড়ে রাখতেন। আমার ফুরসৎ হলেই আমি বসে যেতাম।

বাড়িতে সঙ্গীর অভাব ছিল। তিনবাড়ি পরে এক অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপ হতেই অভাব ঘুচে গেল। তিনিও হাতে চাঁদ পেলেন। আমারও নেশায় তা লাগলো। কোনদিন আমি ওঁর ওখানে যেতাম। কোনদিন বা উনি আমার এখানে আসতেন। বাড়ি ফেরার পথে ওঁর জানলা দিয়ে জানান দিয়ে আসতাম। অথবা বৈকালিক ভ্রমণ সেরে উনি আমাকে হাঁক দিয়ে যেতেন। যেদিন বৃষ্টি বা অসুস্থতার কারণে উনি আসতে পারতেন না সেদিন ছেলেটাকে নিয়ে বসে যেতাম। ছেলে ইন্দ্রনীল দাবাটা বেশ ভালই রপ্ত করেছিল।

তাতে মুসকিলটা দেখা দিল অন্য দিক দিয়ে। বাবা হয়ে ছেলের হাতে এমন একটা নেশা তুলে দেওয়ায় সাংসারিক অশান্তি দেখা দিল। সমাধান খুঁজতে গিয়ে ছেলেকে পড়ানোর দায়িত্বটাও নিজেকেই নিতে হল। ছেলের আবার ছিল পাখির নেশা। এক খাঁচা বাগুরী পাখির জন্য তাকে যাতে অধিক সময় ব্যয় করতে না হয় সেজন্য আমি নিজেই অনেকটা কাজ এগিয়ে রাখতাম। তারপর অন্যান্য রুটিন মাফিক কাজ তো ছিলই।

একদিন স্কুলে নিতান্তই হঠাৎ মেয়েটি আমার পুরোনো চেয়ারে এসে বসলো। অনেকটা ইতস্তত করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমি সামান্য অন্যমনস্ক ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হতেই সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলবেন?

মেয়েটি হেসে ফেললো। শীতের জমাট মেঘ ফেটে নীল আকাশ বেরিয়ে পড়লে যেমন অনুভূতি হয়—আমার তেমনি হল। এই আমি প্রথম মেয়েটির দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম।

মুখের সলজ্জ হাসি মুখেই ছিল। বলল, কাল আমাদের বিয়ের প্রথম বছর পূর্ণ হবে। একটু সামান্য চায়ের ব্যবস্থা করেছি। বিকেলের দিকে যদি আসেন খুশী হবো।

আমি বললাম, আমি তো আপনাদের ঠিকানা জানি না।

ও ওর শ্যাওলা রঙের ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিল। বলল, আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন। মেয়েটির রুচিসম্মত পোষাক, চেহারা, আর কথাবার্তায় এমন একটা শুচিতার পরিচয় পেলাম যে—নিজের দীর্ঘদিনের অন্যায় আচরণের জন্য নিজেই অনুতপ্ত হলাম। বললাম, নিশ্চয় যাব। জিজ্ঞেস করলাম, শুধুই চা তো?

একমুখ হাসি নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। বলল, সে কি হয়? আপনি প্রথম আমাদের বাসায় যাচ্ছেন। অনেক দিন বাদে, মনে হয় পূর্বজন্মে শোনা এক আশ্চর্য আত্মীয়তার সুর আমার মনের উপর বিষাদের একটা ছায়া ফেলে চলে গেল।

রাসবিহারীর প্রাচীন নেড়া দেবদারু গাছগুলিতে তখন সবে হালকা লাল রংয়ের কাঁচ পাতা দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে সূক্ষ্ম পরাগ মিশ্রিত বাতাস রোম-কূপের অভ্যন্তরে মাদ্র কাজ করতে শুরু করেছে। একটা বিশাল হলুদ রংয়ের চাঁদ অবেলায় একটা তেতলা বাড়ির চিলে কোঠার পেছনে ঢাকা পড়েছিল। আমি শান্তিপুরের প্রশস্ত পাড়ের একটি মিহিধুতি পরেছিলাম। উপরে ছিল বাংলাদেশের নাগরিক জনৈক প্রতিবেশী ছাত্রের দেওয়া ঢাকাই মসলিনের পাঞ্জাবী। কাঁধে ছিল বিবাহে পাওয়া রাজ-স্থানী রেখাতের একখানা হাল্কা চাদর।

ফুলের দোকান থেকে একগুচ্ছ মরশুমী ফুলের বর্ণবাহার হাতে নিয়ে সর্বানীদের ফার্নরোডের বাড়িতে যখন গেলাম তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। সহকর্মী ও সহ-কর্মিণীদের অনেকেই সেখানে এসেছেন। গলির মোড়ে এক তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তিনিও সর্বানীদের ওখানেই যাচ্ছেন। আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে একটা হিক্কাধ্বনি তুললেন। বললেন, দাদা ঈশ্বর তো আপনাকে নিজেই দিয়ে দিয়েছেন। তবুও এতগুলো অস্ত্রের সমাহার?

আমি জিজ্ঞেস করলাম কি রকম?

তিনি বললেন, দৈর্ঘ্য প্রস্থ বর্ণ। তার সঙ্গে যোগ করেছেন গন্ধ।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, শেষটুকু আপনার বৌদির কাজ।

সর্বানীদের বসবার ঘরে ঢুকতেই সর্বানী এগিয়ে এল। আমি ওকে দেখে চমকে গেলাম। সর্বানী যে দেখতে এতো সুন্দর, তা আমি কোনো দিন জানতাম না। আমার অনুতাপ হল। দেখলাম কি অপূর্ব সেজেছে। ঈষৎ শ্যামলা রংয়ের গায়ে তুলেছে কাগজের খোলের মত ধনেখালি। সূক্ষ্ম সবুজ রংয়ের জলচুড়ি সারা শাড়ির গায়ে। জলচুড়ি আছে কি নেই বোঝা যায় না। কোরার মধ্যে সবুজের আভা। ঘন চওড়া অলিভ গ্রিন পাড়। দুই কানে লেগে আছে কচুপাতায় শিশিরবিন্দু রংয়ের দুটি মুক্তো। কপালে গাড় হলুদ বিন্দির মানানসই ফোঁটা। চওড়া ও সুপুষ্ট কাঁধের ওপর নেতিয়ে আছে অনেক পরিমাণ চুল দিয়ে ছোট করে বাঁধা একটা খোঁপা।

আমি ওর হাতে ফুলের গুচ্ছ তুলে দিলাম। ও সলজ্জ হাসিতে গ্রহণ করলো। বললো, বসুন। আমি খুব খুশী হয়েছি আপনি আসাতে। আমি জানি, আপনি কোথাও যান না। একলা থাকতেই ভালবাসেন।

আমি মুখর হয়ে উঠি. না-না, তা নয়। তুমি ভুল শুনেছ সর্বানী।

ও হাসির ফিনকি তুলে পাশের ঘরে চলে গেল। বলল, ও একটু ব্যস্ত রান্নাঘরে। আমি আসছি।

কে যেন বলল, এইবার সর্বানীর গান হোক। আমার মনে পড়লো, সর্বানী খুব ভাল গান করে এমন একটা কথা শুনেছিলাম বটে। সর্বানী ঘরে ঢুকেই বলল, আর যাই অনুরোধ করেন, রাখতে চেষ্টা করবো। গানটা পারবো না। ওর সমবয়সী বন্ধুরা হৈ হৈ করে উঠলো। বললো, গানের জন্যই আমাদের আসা। তুমি গান না-গাইলে আমরাও চা খাব না।

সর্বানী কিছুতেই রাজি নয়। আমি ওকে হাতের ইসারা করে কাছে ডাকলাম। ওর আয়ত সুন্দর চোখে চোখ রেখে বললাম, আমি তো কখনো তোমার গান শুনিনি সর্বানী। গাওনা একটা গান। আজ প্রথম বসন্তের বড় ভাল দিন।

আমি চোখের সামনে দেখলাম, ওর সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠলো। বলল, গাইবো।

ঘরের ভেতরে ঢুকে তানপুরা নিয়ে এল। দক্ষিণের জানলা জুড়ে ছিল একটা ডিভান। সেখানে উঠে বসল্যে। অনেকটা বীণা হাতে মীরার ভঙ্গিতে। মুখটা সামান্য সামান্য জানালার দিকে ফেরানো।

তানপুরায় সোহাগের আঙুলে বুলিয়ে চলছিলো। চোখ ছিল আকাশের দিকে। আকাশের রং ছিল ওর চোখে। বাইরে প্রথম বসন্তের হাওয়ার অনুরাগ ঘরের ভেতরেও একটু-আধটু ঢুকে পড়েছিলো। সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়ে ও উদাত্ত কণ্ঠে সুরু করলো—সে কী অবিনাশী গলা। এ কি লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ প্রাণেশ হে, আনন্দ বসন্ত সমাগমে। বিকশিত প্রীতি কুসুম হে, পুলকিত চিতকাননে। মীড়ের সিঁড়ি বেয়ে গান যখন নীচের দিকে নেমে আসছিলো—জীবনলতা অবনতা তব চরণে—তখন আমার বুকের দরজায় এক পরিচিত দস্যু আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছে।

আমি গানের শেষে কাউকে না-জানতে দিয়ে খুব আস্তে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে আসতেই সেই দস্যু যে আমাকে বহুবার পথভ্রষ্ট করেছে, আমার পথ আগলে দাঁড়ালো। বললো, মেয়েটি যে এমন পাগলকরা গান গায় আমি তো কোনদিন যানতাম না। সে আমাকে বিহ্বল করে দিয়েছে। তুমি তো আমাকে চিরকালই বন্দী করে রাখলে। যে ঘরে রেখেছো তাতে কোনো শব্দ যায় না। আজ কেমন করে জানি না আলোহীন শব্দহীন বাসাতবন্দী ঘরে মেয়েটির গান ঢুকে পড়ে—আমাকে পাগল আমাকে মাতাল আমাকে পূর্বাপর জ্ঞানরহিত করেছে। আমি এই রমণীকে প্রেম নিবেদন করতে চাই।

আমি নিরুচ্চারে চীৎকার করে উঠলাম। সব কিছুর একটা সীমা আছে। এটা সেই দেশ নয়, যেখানে ঈশ্বর পর্যন্ত ভালবাসায় বশীভূত। প্রেমে বিগলিত। স্পর্শে উদ্বেলিত। এক কণা প্রেম দিলে চিরকাল ঋণী হয়ে থাকে। এটা বেঁচে থাকার সংসার। এর নাম সমাজ। এখানে পুস্তকে সব নিয়মকানুন লেখা আছে। তার বাইরে এক-পা চলা যায় না।

দস্যুটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে, দরজা বন্ধ করে, আমি হাঁটিতে শুরু করলাম। বালিগঞ্জ স্টেশান থেকে রাত দশটার ফাঁকা ট্রামে চড়ে বসলাম। ভাল লাগাটা থেকে থেকে মোচড় দিয়ে উঠছিলো। দেশপ্রিয় পার্কের স্টপে নামলাম। পার্কের ভেতর দিয়ে সংক্ষেপ রাস্তায় যেতে যেতে আমি মরিয়ার মত উচ্চারণ করে ফেললাম, সর্বানী। তুমি যে এত ভাল গান করতে পার, তাতো আমি কোনো দিন জানতাম না। তোমার গান আমার ভাল লেগেছে। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। অপরাধ নিয়ো না। সর্বানী, তোমাকে আমি হৃদয় দিয়ে ফেলেছি।

ফিরে আসতে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, সর্বানী কেমন খাওয়ালো?

বললাম, শরীরটা ভাল লাগছিলো না। তাই না-খেয়েই ফিরে এলাম।

স্ত্রী বললেন, এই বয়সে বুঝে-শুনে খাওয়াই ভাল। [illegible] দমই খাওয়া উচিত না। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ, এটাই খারাপ সময়।

অন্যমনস্ক ছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কত বললে?

চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ।

চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ? হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। এই সময়টাই খারাপ সময়। এই সময়টাতেই সাবধান থাকা দরকার।

স্ত্রী বললেন, অত ভাববার কি আছে, তুমি তো বেশ সাবধানেই আছো!

হ্যাঁ, সাবধানেই আছি বটে, তবে ঋতু পরিবর্তনের টানটাতো লাগবেই।

গলায় একটা মাফলার দিলে পারো।

মনের ভেতরে হাসলাম। রসিকতা করে বললাম, গলায় না-হয় মাফলার দিলাম, কিন্তু জলবসন্ত ঠেকাবো কি করে?

ও, হ্যাঁ। ওটাতো ভাইরাস। ওটা নাকি পরীক্ষায়ও ধরা পড়ে না, ওষুধেও মারা পড়ে না।

আমি সংশোধন করে বললাম, অনেক কষ্টে ধরা যদি বা পড়ে, ওষুধে মারা কিছুতেই পড়ে না। একটা সময় পর্যন্ত তোলপাড় করবেই। তারপর একসময় নিজের থেকে যদি চলে যায়, চলে যাবে।

বুকের এক পাঁজরে সর্বানী। অন্য পাঁজরে সুজাতা। মাঝখানে রামসীতার ভঙ্গিতে সুঠাম কেদারায় বসে আছে আমার স্ত্রী জয়া এবং পুত্র ইন্দ্রনীল। বসন্তে মৌমাছি মাতাল গন্ধ নিয়ে মৃদু ফুরফুরে হাওয়া দিলে, প্রবল গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় বেলফুলের বনের উপর দিয়ে সুস্তনী [illegible] বুকের কাপড় দেওয়া হাওয়া যদি [illegible] দক্ষিণ সমুদ্র থেকে, আকাশের সহযোগিতা নিয়ে শরৎ পূর্ণিমায় চন্দ্রাকর্ষণ যদি বুকের তলে জোয়ার তোলে—তাহলে আমার অজান্তে, সর্বানী সুজাতা ও জয়ার মধ্যে জায়গা বদলা বদলি হয়ে যায়। আমি বিপন্ন বোধ করি। আমি বুঝি প্রতিরোধহীন ক্ষীণ দুর্বল স্বাস্থ্যের মানুষের মত আমার আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ নাই, নিয়ন্ত্রণ নাই, নিয়ন্ত্রণ নাই।

অকস্মাৎ আমি, বাঁচার শেষ চেষ্টায়, উলঙ্গ বাতাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। গুণটানা নৌকোর মত প্রাণপণে নিজেকে টেনে টেনে সুরক্ষিত জায়গায় নিয়ে আসি। আর মনে মনে বলি, পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠজ্ঞানী গোতম বুদ্ধ বলেছেন, প্রিয় অপ্রিয় কারু কাছেই যাবে না। কারণ, অপ্রিয়জনের দর্শনের দুঃখ, আর প্রিয়জনের [illegible] না।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। আটচল্লিশ ।।

পরের একটা মাস বাপী কাজের মধ্যে ডুবে থাকল। মেয়েদের রূপ সাজে, পুরুষের কাজে। মনের অবস্থা যেমনই থাক, পুরুষের এই রূপটাকে বাপী কোনদিন অবহেলা করেনি। প্রাকপ্রচারের চটকে আর পার্টির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার ফলে শুরু থেকেই সোনা ফলার লক্ষণ দেখা গেছে। আবু রব্বানী এর মধ্যে তিনদফা ট্রাক বোঝাই মাল চালান দিয়েছে। চিঠিতে তার একবার কলকাতায় ঘুরে যাওয়ার ইচ্ছের কথাও লিখেছে। দোস্তকে এতদিন না দেখে ওর ভালো লাগছে না।

কিন্তু বাপীর কাছে আগে কাজ পরে দোস্তি। আর এক প্রস্থ মালের অর্ডার দিয়ে ট্রাক ফেরৎ পাঠিয়েছে। তাকে এখন আসতে নিষেধ করেছে। বানারজুলিতে এখন অনেক কাজ। ওর ওপরেই সব থেকে বেশি নির্ভর। গেল মাসে সেখানকার লেনদেনের হিসেব যা পাঠিয়েছে, তা দেখে বাপী আরো নিশ্চিন্ত। তার অনুপস্থিতিতে সেখানকার লাভের অঙ্ক কোথাও মার খায়নি। ফাঁক পেলে বাপী নিজেই একবার যাবে লিখেছে। কিন্তু তেমন ফুরসৎ যে শিগগির হবে না তা-ও জানে। জিত মালহোত্রার কাজেকর্মে বাপী খুশি। লোকটা যেমন চৌকস তেমনি তৎপর। বাপী কি চায় বা কতটা চায় মুখ চেয়ে বুঝতে পারে। তবু একা সে কতদিক সামলাবে। তেমন বিশ্বস্ত কাউকে পেলে বাপী এক্ষুনি টেনে নেয়। কিন্তু [illegible]
[illegible]

মধ্যে সে নেই। সে রকম দরকার হলে আবুকেই বরং বানারজুলি থেকে বুঝে-শুনে কাউকে পাঠাতে বলবে।

কাজের চাপের মধ্যেও মাস্টারমশাইকে একবার করে দেখতে আসতে চেষ্টা করে। তাও রোজ হয় না। যেদিন পারে না, জিতকে খবর নিতে বলে দেয়। এ ব্যাপারেও লোকটার কিছু গুণ লক্ষ্য করেছে বাপী। মনিবের মাস্টার, তাই ওরও মাস্টারজি। তার মেয়েকে বলে 'মিস ভড়'। অসুস্থ মাস্টারের প্রতি মনিবের এত দরদের হেতু ওই মেয়ে কিনা মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু এই চালাক লোকটার মুখে কৌতূহলের আভাসও দেখেনি।

বাপীর ফ্ল্যাটে এখন দুজন কাজের লোক মোতায়েন। একজন জাঁদরেল বাবুর্চি রোশন। ইউ-পিতে ঘর। খাসা রাঁধে। এক হোটেল থেকে জিত ওকে খসিয়ে এনেছে। তার রাতের ডিনার এখন এখানে বরাদ্দ। দুটো বেডরুমের একটাকে অফিস ঘর করা হয়েছে। সকাল দুপুরের বেশিরভাগ ঘোরাঘুরির মধ্যে কাটে। বিকেলের দিকে সে অফিস খুলে বসে। রাতে খেয়ে দেয়ে মেসে ফেরে। বাইরে কাজ না থাকলে সকাল দশটা থেকে লাঞ্চ টাইম পর্যন্ত বাপী অফিসে বসে।

দ্বিতীয় কাজের লোকটার নাম বলাই। মিষ্টির মা মনোরমা নন্দীর সংগ্রহ। কথায় কথায় বাপী একদিন দীপুদাকে বলেছিল, ঘরের কাজ জানে আবার ফোন ধরে নাম-ঠিকানা লিখে রাখতে পারে এমন একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছে। তার দু'দিনের মধ্যে মনোরমা নন্দী একে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন। বছর উনিশ কুড়ি বয়েস। নাম ঠিকানা লিখতে পড়তে পারে কিনা জিগ্যেস করতে আহত মুখে জবাব দিয়েছিল, ক্লাস ফাইভ ফেল, বাবা আর পড়ালে না বলে এই দুর্গতি। বাপী তক্ষুনি তাকে বহাল করেছে। ঘুম থেকে উঠে প্রায়ই দেখে মেঝেতে ইংরেজি কাগজ বিছিয়ে বলাই গম্ভীর মুখে চোখ বোলাচ্ছে। আর কিছু না হোক, এই কাগজ পড়া দেখেই বাবুর্চি রোশন তাকে সমীহ করে। মনিব বা জিত সাহেবের অনুপস্থিতিতে বাইরের টেলিফোন বলাই ধরে। নাম-ধাম খবর প্রয়োজন ইত্যাদি শুনে নিয়ে একটা খাতায় লিখে রাখে। মনিব ফিরলেই গড়গড় করে [illegible] [illegible]।

দীপুদার সঙ্গে মনোরমা [illegible] এক-দিন এসে ফ্ল্যাট দেখে গেছেন। [illegible] মাসির মতোই যতটুকু সম্ভব [illegible] করে দিয়ে গেছেন। বলাই আর [illegible]কে সদাব্যস্ত সাহেবের খাওয়া-দাওয়া [illegible] সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। [illegible] বাপীকে [illegible] করে খাওয়ানোর কথা তুলতে বাপীই [illegible] [illegible] [illegible]।—[illegible] [illegible] বললে

খুশি যাব, গল্প করব, খাব—নেমন্তন্ন টেমতন্ন করলেই নিজেকে পর-পর লাগবে মাসিমা।

মাসিমা খুশি। কিন্তু ঘরের ছেলের এ পর্যন্ত তার বাড়ি যাওয়ার ফুরসৎ হয়নি। দীপুদা এ নিয়ে টেলিফোনে অনুযোগ করেছে। বাপী বলেছে, সকাল থেকে রাত কি করে কাটছে যদি দেখতে তোমার মায়া হত দীপুদা।

অন্তরঙ্গ আপ্যায়ন অসিত চ্যাটার্জির দিক থেকেও এসেছে। বাপীর একই জবাব, যাবে, কিন্তু আপাতত দম নেবার সময় নেই। তারপর সাদা মুখ করে জিজ্ঞাসা করেছে, নেমন্তন্নটা তোমার না মিলুর?

অসিত চ্যাটার্জি ঘুরিয়ে জবাব দিয়েছে, আমি আর মিলু কি আলাদা? জানো, তোমার জন্য ও বাপের বাড়ি যাওয়াও ছেড়েছে প্রায়!

—তোমার জন্যে কেন?

লালচে দু ঠোঁট পুলকে টসটস।—পতির নিন্দা সতীর কাঁহাতক সয়! গেলেই তো আমার ঝুড়ি ঝুড়ি নিন্দে শুনতে হবে--

হেসেছে বাপীও। আর মনে মনে লোকটাকে জাহান্নমে পাঠিয়েছে।

ঊর্মিলা টেলিগ্রামে তাদের পৌঁছন সংবাদ পাঠিয়েছিল। চার সপ্তাহ বাদে তার লম্বা চিঠি। বিজয় কাজে জয়েন করেছে। সকালে বেরোয়, রাতের আগে তার টিকির দেখা মেলে না। সপ্তাহে পাঁচদিন ওখানকার সব মানুষই কাজ পাগল। বাকি দু'দিন ফুর্তি আর বেড়ানো। কিন্তু ঘরকন্নার কাজে ওরা এত ব্যস্ত যে এখনো বেড়ানোর ফুরসৎ মেলেনি। ঘরের সমস্ত কাজ মায় রান্না পর্যন্ত ঊর্মিলাকে নিজের হাতে করতে হয়। প্রথম প্রথম কান্নাই পেয়েছে। কিন্তু সকলেই তাই করছে দেখে সয়েও যাচ্ছে। লিখেছে, এত দূরে গিয়ে এখন সব থেকে বেশি মনে পড়ে বানারজুলির কথা। তাজ্জব দেশ অনেক আছে, কিন্তু বানারজুলি বোধহয় আর কোথাও নেই। মা-কে শুধু মনে পড়ে না, মনে হয় মা যেন সেখানে তার অবাধ্য ছেলেটার আশায় একলা বসে দিন গুনছে। মায়ের সঙ্গে কোয়েলা, বাদশা ড্রাইভার, আর পাহাড়ের বাংলোর ঝগড়ুকেও খুব মনে পড়ে। মায়ের এই আশ্রিতদের ফ্রেন্ড কি ভুলে যাবে? তার পরেই খোঁচা। বানারজুলির আকাশ বাতাস পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে না পেলে ছেলেবেলার মিষ্টিকে কি আর অত মিষ্টি লাগত?

ঊর্মিলার দুষ্টুমি বাপী বুঝতে পারে। এইরকম করে মায়ের কথা আর বানারজুলির কথা লিখে ওকে কলকাতা থেকে [illegible] চায়। কিন্তু মিথ্যে লেখেনি। কাজে ডুবে থাকলেও মাঝে মাঝে হাঁপ ধরে। বানারজুলি তখন বিষম টানে। ওই ঊর্মিলার থেকেও ঢের বেশি [illegible] [illegible] [illegible]

নিজেকে। তার চিঠিটা পাওয়ার পর দু-তিন দিনের জন্য একবার বানারজুলি ঘুরে আসবে ঠিক করল। গিয়ে কাজ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। ওখানকার পাহাড়ে জঙ্গলে আগের মতোই নিজেকে ছড়িয়ে দেবে।

হল না। মাস্টারমশাই মারা গেলেন। ললিত ভড় চলে গেলেন। আজীবন মানুষটা একটাই মুক্তি চেয়েছিলেন। ক্ষুধার মুক্তি। শুধু নিজের নয়, সকলের। এমন চাওয়ার খেসারত অনেক দিয়েছেন। এবারে সত্যিই মুক্তি। তাঁর বেঁচে থাকার মধ্যে তবু কিছু সোরগোল ছিল। গেলেন বড় নিঃশব্দে। গোড়ার রাতে বাপীর একবার খোঁজ করেছিলেন। একটু ছটফটও করছিলেন। এমন প্রায়ই হয়। তাই শেষ ঘনিয়েছে কুমকুম ভাবেনি। আরো ভাবেনি, কারণ অন্য দিনের মতোই খেয়েছেন। ঘুমিয়েছেন। রাত তিনটে নাগাদ মেয়েকে ডেকেছেন। ভোর হতে দেরি কত জিজ্ঞেস করেছেন। তখনো সাংঘাতিক কিছু কষ্ট হচ্ছে বলেননি। কেবল বলেছেন, ঘরে বাতাস এত কম কেন, বাবার মুখ দেখে আর শ্বাসকষ্ট দেখে কুমকুমের অবশ্য খারাপ লেগেছে। কিন্তু অত রাতে কি আর করবে। সকালের অপেক্ষায় ছিল।

সকাল পাঁচটার মধ্যে শেষ।

বাপী কুমকুমের টেলিফোন পেয়েছে সকাল ছ'টায়। বাড়িঅলার ঘর থেকে ফোন করেছে বলাই ধরেছিল। সাহেবের নিকট কেউ অসুস্থ খবর, এ ক'দিনের মধ্যে বলাইয়ের তাও জানা হয়ে গেছল। কারণ, এই মেয়ে-গলার টেলিফোন সে আরো দিন দুই ধরেছে, আর একজনের শরীরের খবর সাহেবকে জানাতে হয়েছে। যেতে না পারলে সন্ধ্যার পর টেলিফোনে বাবার খবর দেবার কথা কুমকুমকে বাপীই বলে রেখেছিল।

দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি বার করে বাপী বেরিয়ে পড়ল। উল্টো দিকে দু' মাইল গাড়ি হাঁকিয়ে জিতকে তার মেস থেকে তুলে নিল। আজ পর্যন্ত নিজের চোখে তিন-তিনটে মৃত্যু দেখেছে। পিসি, বাবা, গায়ত্রী রাই। না, আরো দুটো দেখেছে। বনমায়ার আর রেশমার। এই এক ব্যাপারে বাপীর নিজের ওপর এতটুকু আস্থা থাকে না। ভিতরে কিছু গোলমেলে ব্যাপার হতে থাকে।

প্রসন্ন ঘুমে গা ছেড়ে শুয়ে আছে মানুষটা। চোখ দুটো আধ বোজা। দুনিয়ার কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অভিযোগ রেখে গেছেন মনে হয় না। বাপী অপলক চোখে দেখছিল।

—শেষের ক'টা দিন বড় ভালো কাটিয়ে গেলাম রে। আর কত খেলাম!

বাপী চমকে এদিক-ওদিক তাকালো। ...ক'দিন আগে মাস্টারমশাইই বলেছিলেন কথাগুলো। মনে হল, এখনো তাই বলছেন।

কুমকুমের মুখে রাতের বৃত্তান্ত শুনল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টনটনে জ্ঞান ছিল।

কুমকুমের বিবর্ণ, বিষণ্ণ মুখ। কিন্তু কাঁদছে না। বাপী তাইতেই স্বস্তি বোধ করছে। এ-সময়ে কারো আছাড়ি-বিছাড়ি কান্না শুনলে বা দেখলে আরো দম বন্ধ হয়ে আসে। ভেবেছিল, সেইরকমই দেখবে। আশ্রয় বা অবলম্বন খোয়ানোর ত্রাসে শোক অনেক সময় বেশি সরব হয়ে ওঠে। কুমকুমের বেলায় সেরকমই হবার কথা। বাপী মেয়েটার বিবেচনা আর সংযমের প্রশংসাই করল মনে মনে।

এক ঘন্টার মধ্যে জিত সৎকার সমিতির গাড়ি ভাড়া করে খাট আর ফুল নিয়ে হাজির। আর যা-কিছু দরকার শ্মশানে পাওয়া যাবে।

চিতা জ্বলে উঠতে জিতকে বাপী তার ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিল, কাজের মৌসুমে একসঙ্গে দুজনেই আটকে থাকলে চলে না।

বিকেল তিনটের মধ্যে নর-দেহ ছাই। কুমকুমকে আগে নিজের গাড়িতে তার বাড়ি পৌঁছে দিল। ওপরতলার বাড়ি-অলা আর তার স্ত্রী সদয় হয়ে ছোকরা চাকরটাকে দিয়ে ঘর দুটো ধোয়ার কাজ সেরে এসেছে। দাহ অন্তে কুমকুম গঙ্গায় স্নান করেছে। জিতের কেনা চওড়া খয়রা পেড়ে কোরা শাড়ি পরেছে। অত শোকের মধ্যেও মুখখানা কমনীয় লাগছিল। নিজের ফ্ল্যাটের রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে বাপী তার কথাই ভাবছিল। আগে মাস্টারমশাইকে নিয়ে সমস্যা ছিল। এখন তিনি নেই বলে সমস্যা।

ফ্ল্যাটে পা দিতেই বলাই জানালো, পার্টির ফোন পেয়ে জিত সাহেব বেরিয়ে গেছেন। আর খানিক আগে জামাইবাবু টেলিফোন করেছিলেন।

বাপী অবাক। —জামাইবাবু কে?

—আজ্ঞে...ও বাড়ির দিদিমণির বর, নন্দী সাহেবের ভগ্নিপতি...

এবারে বুঝল। বাপীর কেন যেন মনে হল মনোরমা নন্দীর পাঠানো লোককে রাখার ব্যাপারে আর একটু চিন্তা করা উচিত ছিল। জিজ্ঞাসা করল, দিদিমণি আর জামাইবাবুকে তুমি চেনো?

খবর দিয়ে আবার কি ফ্যাসাদে পড়া গেল বেচারা ভেবে পেল না। জামাইবাবু বা দিদিমণি বললে নিজের কদর হবে ভেবেছিল। সাহেবের চাউনি দেখে আর প্রশ্ন শুনে অন্যরকম লাগছে। এবারে সত্যি জবাব দিল। পিওনের চাকরির আশায় নন্দী সাহেবের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে যেত, সেখানে ওঁদের দুই-একদিন দেখেছে...ও চেনে, তাঁরা ওকে চেনেন না।

ফোনে কি বলল জিজ্ঞাসা করতে ও আর জামাইবাবু শব্দটা মুখে আনল না। জানালো, সাহেব নেই শুনে ভদ্রলোক জানতে চাইলেন কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন। বলাই বলেছে কখন ফিরবেন ঠিক নেই, সাহেবের একজন নিকট জন মারা যেতে খুব সকালে সেখানে গেছেন, পরে সেখান থেকে শ্মশানে চলে গেছেন। কে নিকটজন ভদ্রলোক তাও জিগেস করেছিলেন কিন্তু ও আর কিছু জানে না বলে এর বেশি বলতে পারে নি।

শোকের খবর নিতে অসিত চ্যাটার্জি বিকেলে এসে হাজির হতে পারে ভেবেও বিরক্তি।

অবেলায় অনেকক্ষণ ধরে চান করল। তারপর কিছু খেয়ে বিছানায় গা ছেড়ে দিল। ঘড়িতে বিকেল পাঁচটা। মাস্টারমশায়ের অনেক স্মৃতি চোখে ভাসছে। সে-সব ঠেলে সরিয়ে মাথাটাকে খানিকক্ষণের জন্য শূন্য করে দেওয়ার চেষ্টা।

একটু বাদে তাতেও বাধা পড়ল। হল ঘরে ফোন বেজে ওঠার শব্দ কানে এলো। পাঁচটার পরে পার্টির টেলিফোন আসে না বড়। জিত হতে পারে। দু-হাতে ফোনটা নিয়ে বলাই ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকল। সাহেব শোবার ঘরে থাকলে তাই রীতি। হল-ঘর ছাড়া অন্য দুটো ঘরেও ফোন রিসিভ করার প্লাগ পয়েন্ট করে নেওয়া হয়েছে এই জন্যেই। বলাইর শঙ্কিত মুখ দেখে বাপীর মনে হল অসিত চ্যাটার্জিরই ফোন আবার। শোকের খবর নেবার আগ্রহে চলেই আসে নি সেটা মন্দের ভালো। আসতে চাইলে কোনো অজুহাতে বারণ করা যাবে। প্লাগ করে [illegible] বলাই তক্ষুণি সরে গেল।

বাপী [illegible] শুয়েই রিসিভার কানে লাগিয়ে ক্লান্ত-গম্ভীর সাড়া দিল, হ্যালো...

—আমি মিষ্টি।

শোয়া থেকে বাপী উঠে বসল একেবারে। ঠান্ডা স্পষ্ট দুটো কথা কানের ভিতর দিয়ে ভিতরের কোথাও নামতে

। বাপী ফের সাড়া দিতে ভুলে
।
নীরবতায় ফলে লাইন কেটে গেগ
। ওদিকের গলার স্বর সামান্য
। —হ্যালো।
—হ্যাঁ বলো।
—তোমার কে আত্মীয় মারা গেলেন
নাম .....কে?
জেনেও বাপী 'জিজ্ঞাস' করল, কার
থেকে শুনলে?
—অফিস থেকে টেলিফোন করেছিল।
, তোমার কোন আত্মীয় মারা গেছেন
শ্মশানে চলে গেছ। ...তোমার তেমন
আত্মীয় কে আছেন আমি ভেবে
ম না।
আত্মীয় নয়। খুব কাছের একজন।
চুপ একটু।—কে?
-তুমি চিনবে না।
--ও আচ্ছা, এই জন্যেই ফোন
লাম।
-কোথা থেকে?
অফিস থেকে।
-আসবে?
-কোথায়? তোমার ওখানে?
দিক থেকে নীরবতাটুকুই জবাব।
দিকেও থমকালো মনে হল একটু।...
না. তাছাড়া শ্মশানে গেছলে
। তুমি ক্লান্ত নিশ্চয় খুব।

বাপীর গলায় উচ্ছ্বাসের ছিটে-ফোঁটাও নেই। জবাব দিল, তুমি এলে ক্লান্তি বাড়বে না।

ওদিকে হাসির চেষ্টা। সুরেও বিস্মিত একটু।—আজ থাক্। .....তোমার আপনার কেউ মারা গেলেন খবর পেয়ে অফিস থেকে আমাকে টেলিফোন করেছিল..... বিকেলের দিকে আমাকে তুলে নিয়ে তোমার ওখানে যাবার কথা বলেছিল। আমি রাজি হয়নি, তাকে ফেলে একলা চলে গেছি শুনলে কি ভালো হবে?

মনে যাই থাক, বাপী তক্ষুনি ঠাণ্ডা জবাব দিল, ভালো হবে না।

ওদিকের পরের সুর আরো সহজ।—তোমারও তো আমার ওখানে আসার কথা ছিল একদিন—

—তোমার হাসব্যান্ড বলেছিলেন। সাহস হয়নি......

—কেন?

—তোমার রাগ কতটা পড়েছে বুঝতে পারিনি।

গলার স্বরে কৌতুকের আভাস।—আমি রাগ কখন করলাম যে পড়বে।

—মাস খানেক আগে যেদিন উর্মিলাকে নিয়ে গেছলাম। তোমার হাবভাবে মনে হয়েছিল জীবনে আর আমার মুখ দেখতে চাও না।

হাসি।—আমি তোমার মতো অত রাগ পুষে বসে থাকি না। সেদিন কেন অত রাগ হয়েছিল তুমি বেশ ভালোই জানো।

—কথায় খেলাপ করে তোমার হাসব্যান্ড যদি ড্রিংক করে বাড়ি ফেরে তার দায় আমার ঘাড়ে কেন?

চুপ একটু। তারপর কথা শোনা গেল। —যেতে দাও আগেও তুমি কক্ষনো কিছু বুঝতে চাইতে না—এখনো না।

—আগে বলতে? বাপীর এখনো না বোঝার ভান।

আগে বলতে অনেক আগে। সেই বানারজুলি থাকতে। চট করে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল।— উর্মিলা বাইরে চলে গেছে?

—হ্যাঁ।

—আমার সম্পর্কে যাচ্ছেতাই ভেবেছে নিশ্চয়?

—না। আমাকে তল্পি তল্পা গুটিয়ে বানার-জুলি চলে যেতে পরামর্শ দিয়ে গেছে।

—কেন?

—কোন দিন মার-ধর খেতে পারি ভেবেছে হয়তো।

হাসল।—তোমাকে চিনতে এখনো কিছু বাকি আছে তাহলে। আচ্ছা, আজ ছাড়ি?

—হ্যাঁ।

ওদিকে টেলিফোন নামানোর শব্দ। হাতের রিসিভারটা বাপী বার বারেক নিজের গালে ঘষল। কানের ভেতর দিয়ে একটা স্পর্শ এতক্ষণ ধরে তাকে লোভাতুর করে তুলছিল। ফোন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। মিষ্টি এই দ্বিতীয় জীবনের গোড়া থেকেই আপোস চেয়ে আসছে। এখনো চায়। কেন চায়, বাপীর কাছে তা একটুও অস্পষ্ট নয়। মন থেকে ছেঁটে দিতে পারলে তাকে নিয়ে ও-মেয়ের এতটুকু মাথা ব্যথা থাকত না। পারছে না। বাপীর মন বলে দিচ্ছে পারা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে, যা ঘটে গেছে জীবনের সেটাই শেষ কথা—এমন একটা দুর্বল বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছে। তাই আপোসের চেষ্টা।

কিন্তু বাপী তরফদার শেষ দেখবে। যদি আরো ছিন্ন-ভিন্ন ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়—হবে। তবু এমন আপোসের দোসর হতে রাজি নয়।

মাস্টারমশায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজ পুরোহিতকে বলে কয়ে বাপী এক মাসের জায়গায় তেরোদিনে টেনে নিয়ে এলো। কুমকুমের বিয়ে অর্থাৎ গোত্রবদল হয়ে থাকলে তিনদিনেই সেরে ফেলা যেত। গোটা ব্যাপারটাই হাস্যকর মনে হয়েছে বাপীর। আর যা-ই হোক, গোত্রবদল তো হয়নি। বাপী আড়ম্বরের ধার দিয়েও যায় নি। তা বলে আচার অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখেনি। কালীঘাটে কাজ হয়েছে। শেষ হতে বেলা তিনটে গড়িয়েছে। বাপী এতক্ষণ থাকতে পারবে ভাবে নি। সাহায্যের জন্য জিত উপস্থিত ছিল। তাকে রেখে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু কাজ শুরু হবার পর কেন যেন আর নড়তেই পারল না। জিতকে চলে যেতে বলল।

খুব ছেলেবেলায় পিসীর কাজ করেছিল। একটু বড় হতে বাবার কাজ করেছে। মনে রাখার মতো কোনো ছাপই তখন পড়েনি। এখনো অভিভূত হয়েছে এমন নয়। পড়ার নেশায় আত্মার খবর গড়ে যা একটু-আধটু পড়েছে। তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি। আজ এই কাজ দেখতে দেখতে ভালো লাগার স্বাদটুকুই নতুন। গঙ্গায় স্নান করে চওড়া লালপেড়ে কোরা শাড়ি পরে কুমকুম কাজের আসনে বসেছে। এক পিঠ ছড়ানো চুল। যজ্ঞের আগুনের আভা বারবার মুখে এসে পড়ছে। এই সময়টুকু অন্তত ওর সমস্ত অস্তিত্ব একাগ্র নিষ্ঠায় অবনত। ওর দিকে তাকিয়ে শুচিতা যে ঠিক কাকে বলে বাপী ভেবে পেল না। মৃতের আত্মা বলে কোথাও যদি কিছু থেকে থাকে, তার প্রসাদ থেকে এই কুমকুমকে অন্তত বঞ্চিত ভাবা যাচ্ছে না।

পরদিন থেকেই আবার সম্ভব চিন্তা। মেয়েটাকে কোন কাজে লাগানো যেতে পারে ভাবছে। একটা কাজ হাতে মজুত। বানারজুলি থেকে মদ চালান আনার প্রস্তাব দিয়েছিল জিত মালহোত্রা। এখনো সে-আশা একেবারে ছাড়ে নি। তার মতে ওখান থেকে এখানে এতে ঢের বেশি লাভ। আবুকে জানালেই ব্যবস্থা পাকা করতে তার সময় লাগবে না। রেশমা হলে বাপী একটুও ভাবত না। রেশমার থেকে এই মেয়ে ঢের বেশি নরকের আবর্তে ডুবছে, বাপীর তবু দ্বিধা একটু। মাস্টারমশায়ের মেয়ে বলেই হয়তো। জীবন যুদ্ধে এ-রকম ভাবপ্রবণতার ঠাঁই নেই ভেবেই কুমকুমের মধ্যে অনেক সময় রেশমাকে দেখতে চেয়েছে সে। তবু মন স্থির করে উঠতে পারছিল না।

পরের সন্ধ্যায় কুমকুম নিজেই তুলল কথাটা। বলতে প্রথমে বাড়ির কথা। জিজ্ঞাসা করল, মাসের বাকি কটা দিন ও এখানেই থাকতে পাবে না তার আগেই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

বাপীর ভিতরে একটা তির্যক আঁচড় পড়ল তক্ষণি। চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। জিজ্ঞাসা করল, বাড়ি ছাড়ার কথা উঠছে কি করে, তুমি কোথায় যাবে?

কুমকুম অবাক একটু। বিব্রতও। বলল, বাবার জন্য যা করেছ—করেছ, এখন আমার জন্যে এত ভাড়া গুণে এ বাড়ি তুমি আটকে রেখে দেবে নাকি?

ভেতরটা তেতে উঠছে বাপী নিজেই টের পাচ্ছে। জবাবও নীরস।—তোমার জন্য কিছু দান খয়রাত করার কথা আমি ভাবছি না। আমি জিগ্যেস করছি, বাড়ি ছাড়লে তুমি কি করবে?

পুরুষের গলার আওয়াজ পেয়ে সামনের দরজায় একটি মাঝবয়সী রমনী মুখ বাড়ালো। পলার মা। পলা কুমকুমের ছোকরা চাকর। মাস্টারমশাই চোখ বুঝতে পলাকে বলে বলাই আপাতত তার মায়ের কুমকুমের কাছে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। বাপীকে দেখে চট করে সরে গেল।

শুকনো গলায় কুমকুম বলল, পলার মা বলেছিল তাদের বস্তিতে একটা ঘর খালি আছে। অসহায় অথচ ঠান্ডা দু' চোখ বাপীর মুখের ওপর থমকালো একটু। আবার বলল, নিজের ভাবনা-চিন্তা আমি অনেক দিন ছেড়েছি বাপীদা। বাবাকে নিয়ে আমার যেটুকু সাধ ছিল তার ঢের বেশি তুমি মিটিয়ে দিয়েছ। আমার মতো একটা মেয়ের জন্য তুমি ভেবো না।

বাপী চেয়ে আছে। দেখছে... এই দু' আড়াই মাস ভালো থেকে ভালো খেয়ে ভালো পরে মেয়েটার শ্রী অনেক ফিরেছে। পুরুষের ক্ষুধার মুখে অনায়াসে নিজেকে এখন আগের থেকেও বেশি লোভনীয় করে তুলতে পারবে হয়তো। এই জোরেই বাড়ি ছাড়ার কথা বলছে কিনা বাপীর বোঝার চেষ্টা। গলা দিয়ে রাগ আর ব্যঙ্গ একসঙ্গে ঠিকরে বেরুলো।—বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে যাবে আর আগের মতো রাস্তায় দাঁড়াবে ঠিক করেছ তাহলে?

...নাকি পলার মা তোমাকে ভালো খদ্দের জোটানোর আশ্বাসও দিয়েছে?

কুমকুমের সমস্ত মুখ পলকে বিবর্ণ, পাংশু। মাথা নীচু করে একটা চাবুকের যন্ত্রণা নিঃশব্দে সহ্য করল। আস্তে আস্তে মুখ তুলল তারপর।—বাপীদা, তুমি এত বড় যে বাবা চলে যাবার পর তোমার কাছে আসতেও আমার অস্বস্তি। তাই তোমার বোঝা আর না বাড়িয়ে নিজের অদৃষ্টে নিয়েই আবার ভেসে যাওয়ার কথা বলছিলাম—

তিক্ত রূঢ় গলায় বাপী বলে উঠল, আমি একটুও বড় না। অনেক কাজ আমাকে করতে হয় যা কেউ বড় বলবে না বা ভালো বলবে না। আমি কারো মতামতের ধার ধারি না। সে-রকম কোনো কাজে আমি তোমাকে টেনে নিতে পারি—তাতে আর কিছু না হোক বাড়ি ছাড়তে হবে না বা রাস্তায়ও গিয়ে দাঁড়াতে হবে না। রাজি আছ?

অবিশ্বাস্য আগ্রহে কুমকুম উঠে দাঁড়ালো। চোখে মুখে বাঁচার আকুতি। মুখেও তাই বলল।—বাগডোগরার এয়ারপোর্টেও তুমি কাজ দেবার কথা বলেছিলে বাপীদা—এখনো যদি সে-রাস্তা থাকে আমি তো বেঁচে যাই—আমি কোন মুখে আর তোমাকে সে-কথা বলব।

কৃত্রিমতা থাকলে বাপীর চোখে ধরা পড়ত। নেই। মেজাজ প্রসন্ন নয় তবু। বলল, এ-ও জল-ভাত রাস্তা কিছু নয়, ঝুঁকি আছে, বলেই এতেও কিছু বুদ্ধি বিবেচনার দরকার আছে, সাহসের দরকার আছে।

আশায় উদ্‌গ্রীব মুখ কুমকুমের।—আমার বুদ্ধি বিবেচনায় কুলোবে কিনা তুমিই ভালো জানো বাপীদা—আমার আর খোয়ানের কিছু নেই, তাই ঝুঁকি নেবার মতো সাহসের অভাব অন্তত হবে না। তাছাড়া তুমি আছ, চোখ বোজার এক [illegible] আগেও বাবা কি বলে গেছে তুমি [illegible] না বাপীদা—

কানে গরম কিছুর ছেঁকা লাগল। ওকে থামিয়ে বাপী চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। তেমনি নীরস গম্ভীর গলায় বলল, শোনো যিনি চলে গেছেন এরপর তাঁকে টানলে আমারও অসুবিধে, তোমারও। এখন থেকে তুমি শুধু তুমি—মনে থাকবে?

ধাক্কা সামলে নিয়ে কুমকুম মাথা নাড়ল। থাকবে।

—ঠিক আছে। আপাতত যেমন আছ—থাকো।

বাপী বেরিয়ে এলো। একটু বাদে গাড়ি দক্ষিণে ছুটল। ...মেয়েটা দুঃখ পেল হয়তো কিন্তু ও নিজে স্বস্তিবোধ করছে। মাস্টারমশাই মুছে গেছেন। যে আছে নতুন করে আর তার কিছু হারানোর নেই, খোয়ানোর নেই—এটুকুই সার কথা, সত্যি কথা ও মেয়ে নিজেই এ-কথা বলেছে। বাপীও শুধু এই বাস্তবের ওপরেই নির্ভর করতে পারে। নইলে তার যেমন অসুবিধে মেয়েটারও তেমনি ক্ষতি।

এখন আর বিবেকের আঁচড়পাঁচড়
ছু নেই। হালকা লাগছে।

মাস্টারমশাই মারা যেতে কাজে একটু
লে পড়েছিল। বাপী তাই আবার কটা দিন
শ ব্যস্ত। একটু খুশি মেজাজেই সেদিন
ক্ষিণদিক থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছিল।
ক নামী ওষুধের কারখানার কর্তা ব্যক্তির
স একটা বড় কনট্রাকটের কথাবার্তা পাকা।
দের পারচেজ অফিসারের মারফৎ চাহিদার
স্টও হাতে এসে গেছে। বছরে আপাতত
ড় দু-লাখ টাকার মাল তারা ওর কাছ থেকে
বে আশা করা যায়।

আজ আর ঘোরাঘুরি না করে তাড়াতাড়ি
র ফেরার ইচ্ছে। ঊর্মিলা এরমধ্যে আরো
টো চিঠি লিখেছে। একটারও জবাব দেওয়া
য়নি। এরপর হয়তো রাগ করে টেলিগ্রাম
র বসবে। আর কিছু না হোক, মেয়ে তা
য়ের মেজাজখানা পেয়েছে। ঘরে ফিরে
থম কাজ ওকে চিঠি লেখা।

গাড়ি ভবানীপুরের রাস্তায় পড়তে
ভতরটা উসখুস করে উঠল। ...সামনের
য়ের রাস্তায় গাড়িটা ঘুরিয়ে দিলে সেই
াঁচিশ-ঘর বাসিন্দার টালি এলাকা পাঁচ
নিটের পথ। আজ নতুন নয়, এ-পথে
লেই গাড়িটা ওদিকে ঘোরাতে ইচ্ছে
র। কিন্তু ব্রুকলিন পিওন রতন
শক ওকে যতো টানে, নিজেরই অগোচরের
ধেধ ততো বড় হয়ে ওঠে।

পার্ক স্ট্রিটের মুখে পড়ার আগেই
জ আবার আর একজনের কথা মনে পড়ল।
ারী বউদি। ...সেদিন বাইরে খুব একটা
রিবর্তন দেখে নি গোরী বউদির, কিন্তু
তরে কিছু রকম-ফেরের আভাস পেয়ে-
ল। অথচ তফাতটা কি স্পষ্ট করে ধরতে
রে নি। ওকে বলেছিল, ইচ্ছে হলে
ও একদিন...বাচচু এখনো তার বাপী
কাকে ভোলে নি।

তক্ষুণি গাড়িটা ঘুরিয়ে দিল। ওখানে
তে নিষেধ নেই আর।

দোরগোড়ায় গাড়ি থামিয়ে বিকেলের
া-ধরা আলোয় পরপর দুটো বাড়িই দেখে
ল একবার। দুটোই জীর্ণ, মলিন।
ন-বালি খসা। অনেকদিন সংস্কার হয়নি
ঝা যায়। বাড়ি দেখে বিচার করলে সন্তু
খুরীর রোজগারে কিছু ভাঁটা পড়েছে
ব হবে। গাড়িতে বসেই কয়েকবার হর্ণ
জালো। কিন্তু দোতলার বারান্দায় কেউ
ল দাঁড়াল না। অগত্যা নেমে দোতলার
লংবেল টিপল।

একটু বাদে যে এসে দরজা খুলল, সে
চু কোনো সন্দেহ নেই। বছর তের বয়েস।
াগের থেকে অনেক লম্বা হয়েছে। পরনে
ফপ্যান্ট, গায়ে ময়লা হাফশার্ট। শুকনো
গাটে মূর্তি।

ঝকঝকে গাড়িটা দেখে আর ফিটফাট
সাহেব মানুষ দেখে ছেলেটা ভেবাচাকা
র মুখের দিকে চেয়ে রইল। চেনা আদল
চ ঠিক ধরতে পারছে না কে।

বাপী বলল, তোর বাপী কাকুকে
তেই পারলি না রে!

শুকনো মুখে আচমকা খুশির তরঙ্গ।
বলা মাত্র চিনেছে। কিন্তু সেদিনের সেই
বাপীকাকু আজ এমন গাড়ি-অলা মস্ত
সাহেব হয়ে গেছে দেখেই হয়ত উচ্ছল
হয়ে উঠতে পারছে না। তাড়াতাড়ি বলল,
চিনেছি, মা বলেছিল তুমি কলকাতায় আছ,
একদিন আসতেও পারো—

তার হাত ধরে বাপী হাসি মুখে সিঁড়ি
দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, অনেক বড় হয়ে
গেছিস—কোন্ ক্লাস হল এখন?

—ক্লাস সেভেন।

—ফার্স্ট-টার্স্ট হচ্ছিস তো?

দোতলায় উঠে হাত ছেড়ে দিতে
ছেলেটা বিব্রত মুখে বলল, এবারে ফেল
করতে করতে পাশ করে গেছি—

—সেকি রে!! কেন দেখাবার কেউ নেই
বুঝি?

আসার সঙ্গে সঙ্গে বাপী কাকুকে এমন
অপ্রিয় খবরটা দিতে হল বলে ছেলেটার
বিমর্ষ মুখ। মাথা নাড়ল, নেই।

দোতলায় এখনো আগের মতো ডাইনিং
টেবিল পাতা। কিন্তু যত্নের অভাবে টেবিল
চেয়ার এমন কি ঘরের দেয়াল পর্যন্ত শ্রীহীন।
সামনের বসার ঘরের পর্দাও বিবর্ণ ছেঁড়া-
খোঁড়া।

বাচ্চু তাকে বসার ঘরে এনে বসালো।
সোফা সেটিগুলোরও কাল ঘনিয়েছে বোঝা
যায়।

—তোর মা বাড়ি নেই?

ছেলেটা ভেবাচেকা খেয়ে গেল একটু।
তারপর বলল, মা-তো এ বাড়িতে থাকে
না—মায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল,
তুমি জানো না?

একটা বড় রকমের ধাক্কা সামলে
বাপীর সহজ হবার চেষ্টা। কিন্তু ছেলেটার
কথার জবাবে মাথাও নাড়তে পারল না। মা
কবে থেকে এ বাড়িতে থাকে না, তা-ও
জিজ্ঞাসা করতে পারল না।

বাচ্চু এবারে নিজেই মাথা খাটিয়ে
বলল, সন্তুকাকু অনেক দূরে বাড়ি করেছে
তো—মা সেইখানে থাকে। ....তোমাকে এখন
কি সুন্দর লাগছে দেখতে বাপী-
কাকু—আগের থেকে ঢের ভালো।
ছেলেটা কি বলবে বা কি করবে
ভেবে পাচ্ছে না।—ভিখুদা আছে বাপী
কাকু, তোমাকে এক পেয়ালা চা দিতে বলি?

বুকেব তলায় মোচড় পড়ছে। বাপী
তাড়াতাড়ি সায় দিল, বল—

ছুটে চলে গেল। ফিরেও এলো
তক্ষুনি। অপ্রতিভ মুখ। —এই যাঃ! ভিখু-
দাও তো বাড়ি নেই বাপীকাকু...আমি
করে আনি?

বাপী তাড়াতাড়ি বাধা দিল, তোকে

করতে হবে না, বোস—আমি চা খেয়ে এসেছি।

ঘরটা অন্ধকার লাগছিল। বাচ্চু সুইচটা টিপে দিয়ে মুখোমুখি বসল।

—তোমার বাবার অফিস থেকে ফিরতে রাত হয় এখনো?

বাচ্চু আবার অবাক।—বাবার অফিস কি, কত বছর আগেই তো চাকরি চলে গেছে। বাবা এখন দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বেরোন আর অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যের সময় আসে। আর খানিকক্ষণের মধ্যে এসে যাবে—

এবারের ধাক্কাটা ততো বড় না হলেও বড়ই। মণিদার চাকরি কেন চলে গেছে আঁচ করা কঠিন নয়। তার ওখানে বাপীর চাকরির প্রসঙ্গে গৌরী বউদি বাধা দিয়ে বলেছিল, তোমার ওখানে ঢুকে পরের ছেলে হাত-কড়া পরুক শেষে। হাতকড়া না পরলেও মণিদা নিজের চাকরিই রাখতে পারল না। ছেলেটার এই স্বাস্থ্য বা এমন চেহারা কেন বাপী এখন বুঝতে পারছে।.. ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গৌরী বউদি সেদিন বলেছিল, তার হুকুম করার দিন গেছে। সে-কথার অর্থও এখন জলের মতো স্পষ্ট।

সাগ্রহে বাচ্চু জিজ্ঞাসা করল, আজ তুমি এখানে থাকবে বাপীকাকা? বলে ফেলেই অপ্রস্তুত একটু। প্রস্তাবটা কত অসম্ভব নিজেই বুঝছে যেন।

ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে বাপীর শুধু মায়া হচ্ছে না। যন্ত্রণাও হচ্ছে। বাপীকাকু-অন্ত প্রাণ ছিল একদিন, একসঙ্গে খাওয়া-শোয়া পড়া হুটোপুটি করার সব স্মৃতিই হয়তো মনে আছে। বলল, থাকতে পারছি না, তবে তোর সঙ্গে এরপর থেকে মাঝে মাঝে দেখা হবে। আমি কলকাতায় আছি তোর মা বলল?

—হ্যাঁ।

...মায়ের সঙ্গে কোথায় দেখা হল, এখানেই?

—হ্যাঁ, মা তো মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসে, আর মাসের প্রথমে আমার জন্য বাবার হাতে টাকা দিয়ে যায়। এবারে টাকা দিতে এসে বলেছিল। তার পরেই

অশান্ত।—বাবা এলে তাকে কিন্তু এসব কিছু বোলো না বাপীকাকু, শুনলেই আমাকে মারবে।

বুকের তলায় আরো একটা আঁচড়। হাত ধরে কাছে টেনে নিল।—বাবা তোকে আজ-কাল মারে নাকি?

—খুব। ভয়ে ভয়ে দরজার দিকটা দেখে নিল একবার। তারপর গোপন কিছু ফাঁস করার মতো করে বলল, মা যখনই আসে, বাবাকে যাচ্ছেতাই করে বকাবকি করে তো, বাবা তখন খুব রেগে থাকে—তারপর একটু কিছু হলেই আমাকে মারে—পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয় বলেও মার খেতে হয়—তুমি আমাকে আবার আগের মতো পড়াবে বাপীকাকু?

ঘরে যেন বাতাস কম।—দেখি, কি ব্যবস্থা করা যায়। এই বাপের কাছেই শুধু

ভ্রম সংশোধন

অমৃত নববর্ষ সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠার 'মশার শত্রু ওডোমস' বিজ্ঞাপনের নীচে পড়তে হবে 'এখন ১০০ গ্রামের প্যাকেট পাওয়া যাচ্ছে।' ৯ পৃষ্ঠার হিন্দুস্থান লিভারের 'রিন'-এর বিজ্ঞাপনের নীচে এখন ১০০ গ্রামের প্যাকেট পাওয়া যাচ্ছে' লাইনটি ভুল করে ছাপা হয়েছে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

ছেলেটা কিছু আদর-যত্ন আর প্রশ্রয় পেত মনে আছে। আর দুটো চারটে বছর বাদে এই ছেলে ওই বাপকে কি চোখে দেখবে বা কতটুকু ভয় পাবে?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। বাচ্চু সচকিত তক্ষুনি। ভয়ে ভয়ে বলল, বাবা আসছে। বাপী কাকুকে দেখে বাবা খুশি হবে কিনা সেই আশংকা।

মণিদা ঘরে ঢুকল। রাস্তার আলোয় দোরগোড়ায় ঝকঝকে গাড়ি দেখেছে। তখনো তার ঘরে কেউ এসেছে ভাবেনি হয়তো। এই বেশে বাপীকে দেখে চকচকিয়ে গেল একটু।

—বাপী যে...কখন এলি?

—এই তো কিছুক্ষণ। তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, এবার যাব।

—বোস্ বোস্, চা-টা দিয়েছে?

বাচ্চু বলে উঠল, ভিখুও বাড়ি নেই বাবা, কে দেবে?

মণিদার শরীরের বাড়তি মেদ ঝরে গেছে। জামাকাপড়ের বিলাস সুখের দিনেও খুব ছিল না, কিন্তু এখন দুরবস্থা বোঝা যায়। গালে কিন্তু দিনের না কামানো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

ঠাণ্ডা গলায় বাপী বলল, চায়ের দরকার নেই, বোসো।

মণিদা পরিশ্রান্ত বেশ। ঘামছে। ঘরে একটু সহজ হবার চেষ্টা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বিড়ি বার করে ধরালো। আগে সর্বদা চুরুট মুখে থাকত। বলল, তুই কলকাতায় আছিস খবর পেয়েছি, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিস শুনলাম...নিচের ওই গাড়িটা তোর নাকি?

—হ্যাঁ।

—বেশ, বেশ। উৎসুক একটু।—কিসের ব্যবসা করছিস?

—অনেক রকমের। বাচ্চুকে বলল সাতটা বাজল, তুই বই-টই নিয়ে বোসগে যা—আমি বাবার সঙ্গে কথা বলি।

বাচ্চু তক্ষুনি চলে গেল। বাপী মণিদার দিকে ফিরল।—তোমার খবর তেমন ভালো নয় বোধহয়?

—নাঃ। চাঁছাছোলা প্রশ্ন শুনে সহজ হবার চেষ্টা ছেড়ে মণিদা বলল, একটু গণ্ডগোলে পড়ে চাকরিটা চলে গেল, তোর বউদিও অবুঝের মতো বিগড়ে গেল...। হাতের বিড়িটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে এবারে অসহায়ের মতো বলে ফেলল, কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে পারিস?

—পারি। বাপীর গলার স্বর চড়া নয় কিন্তু কঠিন।—তোমার চাকরি গেল বউদি বিগড়ে গেল তার শাস্তি ছেলেটা পাচ্ছে কেন? ওর এই হাল কেন? এই চেহারা কেন? ওর গায়ে হাত তুলতে তোমার লজ্জা করে না?

মণিদা আবার ভেবাচাকা খেয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

গায়ে হাত তোলার কথাটা বলে ফেলার দরুণও ছেলেটার দুর্ভোগ হতে পারে মনে হতে বাপী আরো তেতে উঠল।—শোনো, বাচ্চুর জন্য আমি ভালো মাস্টার ঠিক করে দেব, ওর লেখা-পড়া খাওয়া-দাওয়ার সব ভার আমি নিলাম। তোমার পোষাবে আলাদা রোজগারের ব্যবস্থাও আমি করে দেব। কেবল, ওই ছেলেটার ওপর কোনোদিন কারো শাসন আমি বরদাস্ত করব না, এটুকু মনে রাখতে হবে।

উঠে দাঁড়িয়ে মানি ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে সামনে ধরল।—যদি রাজি থাকো তো কাল-পরশুর মধ্যে একদিন গিয়ে দেখা কোরো—আর বাচ্চুকে নিয়ে যেও।

মণিদা কার্ড হাতে নিল। এ সেই হাবা মুখ ভাইটাই কিনা ভেবে পাচ্ছে না।

বাপী নেমে এলো।

খিঁচড়োনো মেজাজ নিয়েই ফ্ল্যাটে ফিরল। বাইরের দরজা খোলা দেখে আরো বিরক্ত। এ [illegible] শুধু [illegible] দরজা খোলা [illegible] নয়।

[illegible] পা [illegible] দু [illegible] কপালে [illegible] মেজাজ [illegible] [illegible] গানুষ।

কিন্তু [illegible] [illegible] ফ্যাটাক্স।

ওদের দুজনের সামনের সোফায় আর রত্নখানী।

(চলবে

পাঠক, অক্ষরগুলি

শান্তনু রক্ষিত

আমি বেশ কয়েকটি অক্ষরকে নিয়ে
সোনালী-নীলা রঙের ফ্রককোট প'রে
বিষুবরেখায় কয়েক ডিগ্রি ওপরে উঠেছি

বিটকেল শিক্ষার্থীসুলভ তাদের হাত
আঁচড়ের সাহায্যে আমাকে এমন ব্যবহার করছে
আমার ছাঁদটায় চওড়া দোলনের ওপর
তারা এমন ভারি নয় অন্তহীন-খেলা খেলছে
যে তাদের ত্রস্ত শঙ্কিত নীলবর্ণের গ্রীবার ওপর
কম্পন তুলতে হয়েছে

তারা আমার অন্তর্হিত যুক্তির ধাপ দিয়ে
নৈঋর্ত ছায়ার পরিধি থেকে এসে
লবণের বরফখণ্ডের ওপর

তারপর তারা আমার কায়াহীন হাতের ওপর

আমি কোন বীভৎস মুহূর্তে অক্ষরগুলির বোঝাও নামিয়ে নিয়েছি
তাদের মধ্যে কোথাও সৃজনীশক্তি লুকিয়ে আছে কিনা দেখবার জন্যে
অতি সুস্বাদু মাছ দিয়ে তাদের করেছি বাতাস

বস্তুত তাদের রূপসী হৃদয় রুদ্ধশ্বাস, বৃত্ত, সামন্তরিক গড়ন নিয়েছে

পাঠক, অক্ষরগুলি এখা, উদ্যত এখন
একটু হেসে আমাকে ব্যাখ্যা করতে পারছে
অসম্ভব উৎস থেকে বেরিয়ে এসে
মন্থর আস্বস্ত পায়ে
অগোচর লক্ষ্যে হারিয়ে যেতে পারছে
আমার শাব্দবৃক্ষের মূল টেনে আনতে পারছে

বর্ণমালা

সামসুল হক

"আগুনের তাপে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো সাঁতার-না-জানা বর্ণমালা"
মৃতা মায়ের মাই চুষতে-চুষতে জ্যান্ত শিশুর রাজসভার আসার
মতো এই বাক্যটি
থমথমিয়ে নাকি গমগমিয়ে এসে পড়লো
ডানহাতে কাঁচা মাংস আর কোলের উপর পাথরের ভঙ্গ নিয়ে
কবিয়াল জমিয়েছিলো খুব

"আগুনের তাপে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো সাঁতার-না-জানা বর্ণমালা"
মায়ের মুখাগ্নি করার জন্যে নিজের চিতা থেকে ছেলের উঠে আসার
মতো এই বাক্যটি
সিরসিরিয়ে নাকি ঝমঝমিয়ে এসে পড়লো
গাছের-অশ্রু-ভরা কাঠের পাত্র ঠোঁটে ঠেকিয়ে জলান্ধ ঐ
মজার কবিয়াল জমিয়েছিলো খুব

মাথার উপর একটা পালকহীন পাখি গলায় কিছু আগুন দুলিয়ে
ব'লে ওঠে

বর্ণ মানে কি রঙ
পিছন থেকে বাঁশিহাতে একটা রাখাল ব'লে উঠলো
বর্ণ মানে কি অক্ষর
আর সামনের ঝোপঝাড় থেকে কয়েক হাজার জন্তু বেরিয়ে এসে
বলতে থাকে

বর্ণ মানে কি জাতি

ধন্যবাদ

অনন্য রায়

(ধন্যবাদ, স্বর্গীয় শ্যামকান্তি, ধন্যবাদ, মাংসল রূপক, ধন্যবাদ!)
যা পেয়েছি, তা যথেষ্ট। অতিরিক্ত কিছু প্রাপ্য নেই
শুভচক্ষু প্রতিধ্বনি, সংক্ষিপ্ত জ্বলন্ত কনীনিকা
দৃশ্যস্রোতে যা পায় তা শরীরী ধুলোর শুধু এই
(ধন্যবাদ হে প্রয়াণ; ধন্যবাদ প্রসবিত, উদ্বৃত্ত কীড়ক ধন্যবাদ)
ক্ষণিকের প্রতিবিম্ব : প্রজনন, মর-প্রহেলিকা—

চিঠিপত্র

ক্ষমা পেতে পারত

'হাওয়া গাড়ি' নিয়ে যে হাওয়া উত্তাল হয়ে উঠেছে তা অনুভব করতে পারছি। অনেকদিন এরকম চমকের কারণ ঘটেনি। এজন্য যে আলোচনা সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে তাও উপভোগ্য। তবু যেসব সমালোচনা চোখে পড়ল তার মধ্যে শ্রীমতী স্বপ্না রায়ের সুন্দর লেখাটি অনিন্দনযোগ্য। দুটি উপন্যাসের মধ্যে তুলনা দিতে চাওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করছি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে শ্যামলবাবুর লেখার কোনখানে কোনরকম তুলনা চলে না। আতসকাচের মধ্য দিয়ে সবাই জীবনকে দেখতে পারে না, দেখতে চায়ও না। সোনার হরিণ নেই'-এর সোনার হরিণ কি এ পৃথিবীতে সম্ভব? এই সম্ভাবনার অসম্ভাব্যতাকে আমরা মেয়েরা বড় যত্নে লালন করতে চাই। কিন্তু এ সত্যি নয়। আশুবাবু হয়ত নিজেও জানেন না অবাস্তবতার কোন্ চূড়ান্তে তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন। টেনশন এত বেশী যে সামান্য হাওয়াতেও তার বাজছে ঝনঝন করে। দয়া করে সুস্থভাবে শ্বাস নিতে দিন। আর ভাল লাগছে না। অনেক গরম হাওয়া বইয়ে দিয়ে 'হাওয়া গাড়ি' অবশেষে শেষ হল। শেষ হয়েও হল না এও বলা যায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা আমার বহুদিন থেকে ভালো লাগে। হাওয়া গাড়ি সম্প্রতি এ ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করল। কিছু কিছু দোষ-ত্রুটির কথা বাদ দিলে শ্যামলবাবু অপূর্ব। এর অনেক ভালো দিক আছে প্রশংসাযোগ্য অধ্যায় আছে যা এখনই বিস্তারিত লেখা যাচ্ছে না। এরকম অদ্ভুত সুন্দর লেখা অনেকদিন পড়িনি। অনেকদিন মনে থাকবে। স্বাভাবিকতার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েও রাণীর জন্য একটা আফশোস থেকেই যায়। রাণী এত সবের পরেও সকলের ক্ষমা পেতে পারত। কিন্তু লেখক নিজে কেন তাকে এভাবে শাস্তি দিলেন, সরিয়ে দিলেন। হাওয়া গাড়ি তাই সার্থক হয়েও সম্পূর্ণতা পেল না, এই দুঃখ শিপ্রা মুখোপাধ্যায়, রামপ্রসাদপুর, অণ্ডাল।

সোনার কলম হওয়া উচিত

অমৃতে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাওয়া গাড়ি' পড়লাম। রাণী ও প্রবোধের চরিত্র চিত্রণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। দক্ষ লেখক যা খুশি তাই ছবির মতো চোখের সামনে তুলে ধরতে পারেন। রাণীর চরিত্র এতো জীবন্ত এবং স্বাভাবিক যে শ্যামলবাবুর এজন্যই সোনার কলম হওয়া উচিত। রাণী যা করেছে তার জন্য রাণীই দায়ী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নয়। কারণ রাণীকে প্রাণশক্তি (সৃষ্টি করেছেন) দিয়েছেন শ্যামলবাবু ঠিকই, কিন্তু পরে চরিত্র আর লেখকের আওতায় না থেকে নিজেই নিজের মতো ভাবে জীবন যাপন করেছে। শ্যামলবাবুর এখানেই কৃতিত্ব।—শংকর ব্রহ্ম, ৪।৮১, বিদ্যাসাগর কলোনী, কলিকাতা-৭০০০৪৭

স্বস্তি পেলাম

সত্যি বলতে কি শ্যামলবাবুর 'হাওয়া গাড়ি' সমেত প্রস্থানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। অমৃতকে ভালবাসার অধিকারে একটু রূঢ় বক্তব্য রাখছি, গালটাল দ্যান নিপাট ভালোমানুষের মতো হজম করবো। কিন্তু দোহাই মশাই তথাকথিত স্ট্যাণ্ডার্ড সর্বস্বতাকে আদর্শ ভেবে এইসব প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বটতলামার্কা এরকম লেখাটেখা আর ছাপবেন না, চচ্চেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণদের ক্রিয়েটিভ লেখাটেখা ছাপুন আমরা মশামাছির মতো হামলে পড়বো অমৃতের ওপর। ধন্যবাদ। —সুকুমার চৌধুরী, ঝালদা ৭২৩২০২ (পুরুলিয়া)

লেখা শেষ হলে লিখুন

অমৃত পত্রিকার একটা বিশেষ আকর্ষণ 'চিঠিপত্র' বিভাগ। এই বিভাগের জন্য সমস্ত পাঠকমণ্ডলী কৃতজ্ঞ, কেন না তাঁদের মতামত সহানুভূতির সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে। আবার লেখকদেরও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত কারণ তাঁরা কোন ভুল করলে সজাগ পাঠক সে ভুল সংশোধনের জন্য যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করাচ্ছেন।

কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারি না, ধারাবাহিক উপন্যাস চলাকালীন সমালোচনা পাঠকরা কেন করেন? ইদানীং 'হাওয়া গাড়ি' ও 'সোনার হরিণ নেই' নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। পাঠক যদি একটু ধৈর্য নিয়ে ভাবেন, তবে সহজেই বুঝতে পারবেন এটা অন্যায়। ধারাবাহিক লেখা করলে লেখকের স্বাধীনতা বা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব নষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। আবার নিন্দাতেও তাই হবে। কাজেই আর প্রশংসার লোভে বা সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে লেখকের সৃষ্টি হবে কৃত্রিম অস্বাভাবিক। লেখা শেষ হলে, দীর্ঘদিন সমালোচনা হোক, পুস্তকাকারে ছাপার আগে সেই সব সমালোচনা পড়ে, লেখক তাঁর ইচ্ছামত কাজ করবেন। লেখক পাঠকদের চাহিদা মত লিখুন, এ বোধহয় আমরা কেউ চাই না। —অজিতকুমার দে, জটেশ্বর, জলপাইগুড়ি।

শেষটা ভাল লাগেনি

এক কথায় 'হাওয়া গাড়ি' অপূর্ব। কয়েকটি ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি ছাড়া লেখক এক অনাস্বাদিত বিষয় উপহার দিয়েছেন তাঁর পাঠককে। যা সত্য স্বাভাবিক, এজীবনে ঘটে, তাই রাণীর ক্ষেত্রে ঘটেছে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজে যা ঘটে তাই প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। সেই সত্যি দেহজ মিলনের ঘটনায় চমকে ওঠার কিছু নেই বা লেখককে গালাগাল দেওয়ার মতোও কিছু নেই। বরং সত্যকে স্বীকার করার মানসিকতা থাকলে ভাল হয়। ঠিক সেই স্বাভাবিক চিত্র রবির বৌ মালবিকাও লেখক খুব অল্প কথায় এঁকেছেন, যা মনের গভীরে দাগ কেটে যায়। এতেই লেখকের বাহাদুরী। 'কুবেরের বিষয় আশয়'-র পর 'হাওয়া গাড়ি' উপহার দেওয়ার জন্য লেখককে ধন্যবাদ (যদিও শেষাংশ ভাল লাগেনি)।—পার্থসারথী গুপ্ত, কলি-৫

প্রকৃত সাহিত্যকর্ম

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাওয়া গাড়ি উপন্যাস সম্পর্কে বেশ কিছু উত্তেজিত চিঠিপত্র নজরে পড়েছে। শ্যামলবাবু নিশ্চয় কৌতুকের সঙ্গে চিঠিগুলি পড়ছেন। সাহিত্যের অ্যানাটমি হচ্ছে অমৃতের পাতায়। ছুরি দিয়ে চিরে চিরে দেখা হচ্ছে প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি চরিত্র, তাদের সততা, রুচি, বাস্তবতা, অবাস্তবতা, শ্লীলতা, অশ্লীলতা (কালু ঘোষের চরিত্রটি এখনও কেন বিশ্লেষণ হল না—এই আক্ষেপ রয়ে গেল!) মনে হচ্ছে হাওয়া গাড়ি এক্ষুনি ইউনিভার্সিটির টেক্সট বুক হয়ে গেল। হাওয়া গাড়ি উপন্যাসটি শ্যামলবাবু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লেখেননি। সিনেমাহলের অন্ধকারে বসে আদর্শ চরিত্রদের মিছিল দেখতে দেখতে

চোখের জলে রুমাল ভিজিয়ে
—অধিকাংশ মিডিওকার উপ-
। এটাই জীবনের চরম প্রাপ্তি।
াঙ্গোপাধ্যায় তা নন। তিনি সৃষ্টির
লিখে গেছেন। সাহিত্য জিনিষটাই
ওয়া গাড়ি প্রকৃত সাহিত্য কর্ম'।
াল মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় বসু, আর
মডিক্যাল হোস্টেল, কলকাতা: ৩৭

াভিসন

ল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রানী'র সমা-
করছেন মহিলারা। 'মংপুতে
' বই-এ এক জায়গায় (১৮৫ পৃঃ
সংস্করণ) বলছেন বাবাঃ যখন
'ঘরে বাইরে' বেরুচ্ছে তখন সেকি
এক ভদ্রমহিলা আমায় জানালেন
কবারে অসম্ভব, হতেই পারে না,
মেয়ের এরকম মনোভাব হতে পারে
ল যে সমস্ত দেশ সতীত্বের
থেকে হুস্ করে পাতালে পড়ে
গললনা, আর হিন্দুললনা, সব
। সবার আগে ললনামাত্র, সে যে
র মধ্যে মোহ বিকার ভালোমন্দ
কা সম্ভব তা এরা মানবে না—
। যে, তাই সত্যের দেশ নয়।'
। কবে বেরিয়েছিল ঠিক তারিখ
কাছে নেই, এটা ১৯৭৯, সেই
সমানে চলছে।—শান্তা গুপ্ত,
াকিম।

মন্তব্য সম্পর্কে

কার ২৭ এপ্রিল, ১৯৭৯ সংখ্যায়
-আয়োজিত 'মায়ার খেলা' অভি-
সমালোচকের একটি মন্তব্যের
আকর্ষণ করি। তাঁর মনে হয়েছে
া' কখনোই কোন কারণে নৃত্য-
'হংসধ্বনি'র কোন অনুষ্ঠান
াগ হয়নি, তাই তাঁদের প্রযো-
ন, বা তাঁরা কতোটা রবীন্দ্র-
সে সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য
'মায়ার খেলা' শুধুই গীতি-
খনোই কোন কারণে নৃত্যনাট্যে
। ভাবা সঙ্গত নয় বোধহয়।
া' গীতিনাট্য রচনার (১২৯৫)
পরে (১৩৪৫) রবীন্দ্রনাথ
: নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করেন।

প্রসঙ্গত 'গীতবিতান' তৃতীয় খণ্ডের (প্রকাশ: আশ্বিন, ১৩৫৭) গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য:

'রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনের এই গীতিনাট্যকে শেষ বয়সে (১৩৪৫ সাল) নূতন রূপ দিয়া, পুরাতন গানকে নূতনভাবে রচনা করিয়া এবং বহু নূতন গানও যোজনা করিয়া নৃত্যে অভিনয় করাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন।' (পৃঃ ৯৬৮)
এই নৃত্যনাট্যের পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত, এবং তারই অনুসরণে 'গীতবিতানের' উল্লিখিত খণ্ডে এটি প্রথমমুদ্রিত হয়। 'গীতবিতান' তৃতীয় খণ্ডেরপরবর্তী সংস্করণগুলিতে 'গীতিনাট্য মায়ার খেলা' ছাড়াও 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলার এই স্বতন্ত্ররূপটি স্থান পেয়েছে। —আলপনা রায়চৌধুরী শান্তিনিকেতন

খেয়াল রস বনাম শঙ্কু

১৬ মার্চের অমৃতে 'অনুকার' নাট্যগোষ্ঠীর একটি প্রযোজনা বিষয়ে আমার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৩ এপ্রিল পুষ্পরঞ্জ নস্কর চিঠিটি পড়লাম মনে হচ্ছে খেয়াল রসের সংজ্ঞা নিয়েই আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হচ্ছে। আমি মনে করছি আমি লিটারের এককে দুধ মাপছি এবং উনি মিটারের এককে। উনি নিশ্চয়ই বিপরীত ভাবছেন।

গোড়ার দিককার শঙ্কু চরিত্র খেয়ালরসের ভিয়েনে প্রস্তুত একথা প্রমাণ করতে শ্রীবসু যুক্তি খাড়া করেছেন শঙ্কুর এক্সট্রাক্ট অফ সরগনাস...... বাবুইয়ের ডিম, গাঁদালের রস' দিয়ে অদৃশ্য হবার ওষুধ তৈরি করা জাতীয় দৃষ্টান্ত তুলে। বিক্ষিপ্ত উদাহরণ কোন রচনার চরিত্র বোঝানোর পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, আর আপাত অসম্ভব বা হাস্যকর প্রস্তাব তো সায়েন্স ফিকশনে থাকবেই, বর্তমান পর্যায়ের শঙ্কুতেও আছে, যাকে শ্রীবসু সায়েন্স ফিকশনের অন্তর্গত মানতে প্রস্তুত। মূলত শ্রীবসুর উদ্ধৃতিগুলো বা সত্যজিৎ-এর ঐ জাতীয় অংশ গল্পের চরিত্রের খেয়াল বোঝায়, যা বৈজ্ঞানিক-এর থাকেই। আমি বলতে চেয়েছি সত্যজিৎ-এর শঙ্কু খেয়ালী পর্যায়ের রচনার চরিত্র খেয়াল রসের নয়, তার প্রবণতা আলাদা।

'খেয়াল রসে'র প্রধান লক্ষণ ঘটনা বা যুক্তির পারম্পর্যহীনতা এবং সময়ের মাত্রার উল্টোপাল্টা হিসেব। শঙ্কুর গল্পে ঘটনা বা যুক্তি যতই অসম্ভব মনে হোক তার পারম্পর্য এবং সময়জ্ঞান নিখুঁত স্বাভাবিক হিসেবে তৈরি, যা খেয়াল রস সৃষ্টি করে না, করতে চায় না। আসলে শঙ্কু তাঁর নিজের কাজকে অসম্ভব সিরিয়াসলি নেবেন, যা দেখে দর্শক হয়তো আজগুবি ভেবে হাসতে পারেন, কিন্তু তিনি কেন ভাঁড় হবেন? কেন প্রচলিত থিয়েটার-এর কমিক কৌশলে গলা ক্র্যাক করে হাসাবেন? প্রতিবেশীর অজ্ঞতায় তিনি অনুকম্পা প্রকাশ করবেন ক্ষিপ্তও হবেন কখনো কিন্তু খ্যাঁক খ্যাঁক করবেন কেন? মজাদার অংশ মানেই তো খেয়াল রস নয়। হলেও ভালো শিল্পী কেন গল্পের মজার উপরেই নির্ভর করবেন না চরিত্রসৃষ্টিতে। কেন অঙ্গভঙ্গি বা কণ্ঠস্বরের ক্লিশে আমদানি করবেন অযথা।

'শঙ্কু'র গল্প খেয়াল রসের গল্প নয়। কিন্তু আমার ভয় অন্যখানে। অভিযোগও সেইদিকেই ছিল। এটাকে খেয়াল রসের এই ভাবলেও নিপুণ ভাঁড়ামির দোষে প্রদীপরা[illegible] অসফল, অথচ 'দ্বিঘাংচু'তে তিনি অনা[illegible] খেয়াল রসে মজিয়েছেন প্রচলিত ভাঁড়ামি না করেই। তিনি ভালো অভি[illegible] কিন্তু নিজের দলের অনর্থক শি[illegible] চাপড়ানিতে তাঁর ক্ষতি করে লাভ কী? এবং নাট্যকার যখন বইটিকে ইচ্ছাকৃত খেয়াল রসেরই করতে চেয়েছেন তখন আমার যুক্তিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটাই গ্রাহ্য নয়। আর নারী-চরিত্রটির অনুপ্রবেশকে তিনি সামগ্রিক খেয়াল রসের সঙ্গে মেলাচ্ছেনই বা কী করে। আসলে এত সব কিছু নয়। একটি চরিত্রকে খেয়ালী সাজানো এবং সমগ্র গল্পকে খেয়ালরসে মজানোর প্রভেদটা তিনি কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়েছেন।

যা হোক তাঁদের নাটক আমাদের সামগ্রিকভাবে ভালো লেগেছে জেনে শ্রীবসু যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।—সুরজিৎ ঘোষ, ৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭।

সত্যের মুখোমুখি

অজয় বসু

বিভাগীয় লীগের প্রথম দুটিতে হার পরের দুটি খেলায় জিৎ। পরিণামে মূল প্রতিযোগিতা থেকে ছাটাই এবং শেষপর্যন্ত দশটি দলের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেই সন্তুষ্ট থাকা।

পার্থের আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় হকি দলের ভূমিকার সংক্ষিপ্তসার সীমায়িত ওপরের ব্যাখ্যা কটিতে। গোড়ায় হেরে গিয়ে পরে জেতার এই দৃষ্টান্তকে কি ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরার নজিরের সমতুল্য বলে গণ্য করা যায়? না, তা যায় না। যেহেতু প্রথম দুটি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দুই সবল পক্ষ। তারা নিজেদের বাহুবলের জোরেই ভারতীয় বাহুবন্ধনের চাপ শিথিল করে লক্ষ্যপথে এগিয়ে গেছে।

তারা এগিয়েছে। আর ভারত পথের ধারে পড়ে থাকার অভিশাপে পিছু হেঁটে স্বদেশের ফিরতি পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। এই পিছু হাঁটা ভাব ভারতীয় হকির পদস্খলনের এক নিশ্চিত পরিচয়। তবে এ পরিচয় লক্ষ্য করার পরও হকি ফেডারেশনের সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যানেরা আশার আলোকবর্তিকা তুলে ধরতে ভোলেন নি। তাঁদের ধারণা, পার্থে ভারত মন্দ খেলে নি। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি জাগিয়ে যেটুকু খেলেছে তাতেই যুগল কর্মকর্তা সন্তুষ্ট।

কর্তাদের সন্তোষ তাঁদের আত্মতুষ্টিরই নামান্তর। আমরা কিন্তু তাতে ভাগ বসাতে পারছি না। আমাদের মনে পড়ছে যে অনেক কাল আগে ভারতের ঠাঁই ছিল বিশ্ব হকির রাজাসনে। একটানা ছবারের ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হকির সেই রাজরাজেশ্বর আজ দৃশ্যতঃ ফকির। সিংহাসনের ছায়া স্পর্শ করা তো দূরের কথা, প্রাথমিক লীগের গন্ডি পার হওয়াই তার সাধ্যাতীত। এতো নিছক পদস্খলনই নয়, এ যে গোঁৎ খেয়ে একেবারে নীচের মহলে ডুব দেওয়া। একেই বলে বুঝি ভরাডুবি!

উত্তরণের আশা কই। ডুবন্ত অস্তিত্বকে টেনে জলের ওপর ভাসিয়ে যে তুলবে তেমন প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সম্ভাবনাই বা কোথায়! কর্তারা যা বলে বলুন, যা ভাবেন ভাবুন, আমরা কিন্তু ভাবছি যে ভারতীয় হকির জন্যে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলার সময় এসে হাজির হয়েছে। কর্তারা তো প্রতিবারই আশ্বাস দেন, আশার বাণী শোনান। কিন্তু এক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আসে এবং বলে যায় যে ওঁদের আশা ও আশ্বাস শূন্যগর্ভ স্তোকবাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। মন্ট্রিল ও পার্থের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে নির্মম সত্য। তাই কর্তাদের বাণীগুলিকে নিষ্ঠুর পরিহাস বলে মনে করা ছাড়া আর কিছুই যে ভাবতে পারছি না।

চোখের জল চলার পথকে শক্ত ধাতে গড়ে দিতে পারবে না নিশ্চয়ই। ভারতীয় হকিকে পৌরুষে উজ্জীবিতও করবে না। তবু আর্দ্র চিত্তে বিলাপ করতে পারলে ভারশূন্য মন হয়তো ভারসাম্য ফিরে পেতে পারে। এবং তা পাওয়া গেলে তবেই স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রতিফলনে ভারতীয় হকির বাস্তব অবস্থা যথাযথ যাচাই করা সম্ভব হবে।

গত দশ বছরে কর্তারা দৃষ্টির এই স্বচ্ছতা হারিয়ে বসেছিলেন। তাই পদস্খলন-এর নিশ্চিত নিশানাগুলিকে দেখেও দেখতে পান নি। চিনেও চিনতে চাননি। বিপর্যয় ঘটেছে বারে বারে। সংকট হয়েছে ঘনীভূত। আর ওঁরা ভাগ্যের দোহাই পেড়ে ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায় ভাগ্যের প্রসন্নতা লাভের প্রতীক্ষাতেই বসে থাকতে চেয়েছেন। মুখ ফুটে স্বীকার করতে চান নি যে অন্যেরা বড় বড় পা ফেলে দিনে দিনে সামনের দিকে এগোচ্ছে; আর আমাদের হকি বদ্ধ কূপের নিস্তরঙ্গ নির্জীবতায় আটকা পড়ে রয়েছে। ব্যাপারটা আপেক্ষিক। তাই এক জায়গায় আটকে থাকাটা পিছিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভারতীয় হকিতে অন্ধকারের যুগ যে ঘনিয়ে আসছিল, তার প্রথম আভাস পাওয়া গিয়েছিল ১৯৬৮ সালে মেকসিকো ওলিম্পিক কালে। যেবার সোনা নয়, রুপো নয় ভারতের কপালে জুটেছিল ম্যাড়মেড়ে একটি ব্রোঞ্জ। চার বছর পর মিউনিখে মেলে কালচে রংয়ের ওই সস্তা ধাতুটিই। ১৯৭৫এ কোয়ালালামপুরে বিশ্ব কাপ জয় করে ভারত হকিতে হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে আশা জাগিয়েছিল বটে। কিন্তু বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই মন্ট্রিলে সেই আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

ভারত যখন সোনা ছেড়ে ব্রোঞ্জ এবং ব্রোঞ্জের বদলে শূন্যহাত সম্বল করে ওলি্ম্পিকের আসর থেকে ফিরছিল তখনও স্বদেশীয় হকি জগৎ জাতীয় হকির পুন গঠনও সর্বাত্মক সংস্কারের তাগিদ অনুভ করতে পারেনি। কর্তারা তখন আন্তর্কলহে দায় মেটাতে ব্যস্ত। ব্যক্তি ক্ষমতার লড়া জিতে বাজীমাৎ করতে। সেই লড়াইয়ে সামিল হতে খেলোয়াড়দের প্ররোচিত করা কামাই পড়েনি। শিক্ষাশিবিরে বিভেদে চারা রোপণ করে তার মূলে জল সিঞ্চ করা হয় সযত্নে। অন্য মহলের অগ্রগতি নিশ্চিত পরিচয়কে মেনে নিয়ে নিজেদে ইতিকর্তব্য নির্ধারণে তখন ছিল প্রব অনীহা।

হারের পর হার, সংকটের পর সং দেখে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরাও কেমন যে দিশেহারা হয়ে পড়েন। তাঁদের একদল বলতে থাকেন যে হিট ও রান, শক্তি ও গতিতে উজ্জীবিত হওয়াটাই হলো আমাদের হকি উত্তরণের পথ। আবার অন্য পথের মত পশ্চিমী কায়দা নয়, সাবেকী সৃজনধর্মিতাই হবে সঞ্জীবনী মন্ত্র। কেউ দোষেন অ্যাসট্রো টার্ফকে। কেউ বা ব্যবস্থাপকদের বেহিসেবী কর্মরীতির গলায় অপরাধের ঘন্টা দায়িত্বে খালাস পেতে চান। সবাই বুদ্ধি মান সাজতে চান ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তার আগে এক টেবিলে মুখোমুখি বসে ব্যাধি নির্ণয়ে সমঝোতার একটি সূত্র করায় কারুরই আগ্রহ দেখা যায়নি। অবশ্য এই অনিশ্চয়তা আজও চালু রয়েছে।

অ্যাসট্রো-টার্ফে ভারতীয়দের খেলার অভ্যাস নেই। এই অনভ্যাস হারের অন্যতম হেতু হতে পারে। কিন্তু ওইটিই একমাত্র ব আসল কারণ নয়। আসল কারণ, দক্ষত যোগ্যতার অভাব। অ্যাসট্রো-টার্ফের অন ভিজ্ঞতার বাধা ডিঙিয়ে নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া মন্ট্রিলের আসর মাতিয়ে দিতে পেরেছিল। তারা দক্ষ ও যোগ্য বলেই তো! তাছাড়া দক্ষ ও যোগ্য দল তো আমরা তাদেরই বলি যারা বাস্তব অবস্থাকে তা সে যতোই প্রতিকূল হোক না কেন, নিজেদের প্রয়োজনে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তবে হ্যাঁ, অ্যাসট্রো-টার্ফে খেলার রেওয়াজ যখন বিশ্বময় চালু হয়ে গেছে তখন ভারতের হকি মাঠেই বা এই ধরনের একটি টার্ফ থাকে না কেন? থাকলে অনুশীলন দেবে

ভারতীয় খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতার পুঁজি সমৃদ্ধ হতে পারতো।

অ্যাসট্রো-টার্ফ তো দূরে অস্ত, পার্থ-গামী হকি দলের খেলোয়াড়েরা কি উপযুক্ত মাঠে অনুশীলনের পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছিলেন? সে সুযোগটুকুও তাঁদের গোড়াস দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত এক দাক্ষিণী ক্রিকেট সংস্থার বদান্যতায় ক্রিকেট মাঠে তাঁদের অনুশীলনের ব্যবস্থা হলে খেলোয়াড়েরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচার স্বস্তি পান। শিক্ষাশিবিরে অনুশীলনের উপযোগী জুতো জোড়া ও আনুসঙ্গিক সাজ-সরঞ্জামও প্রথম দিকে খেলোয়াড়েরা হাতে পাননি। পাছন্দমাফিক আহার্যও নয়। খেলোয়াড়েরা চড়া গলায় প্রতিবাদ জানালে তবেই এসব বিষয়ের সুরাহা হয়। এমন অগোছালো ব্যবস্থাপনা দেখে কি মনে হয় না যে হকি দলের প্রস্তুতির ওপর তেমন জোর দেওয়া হয়নি? অথচ আশা রাখা হয়েছিল যে এই দলটিই পার্থ থেকে ফিরবে সোনাদানায় নিজের ব্যাগ ভর্তি করে।

একেই তো খেলোয়াড়দের যোগ্যতার পুঁজি সামান্য। সেই পুঁজি বাড়াতে শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু শিবিরের ব্যবস্থা ছিল একেবারেই ঢিলে-ঢালা। পরিণামে যা ঘটা স্বাভাবিক, ঘটেছে ঠিক তাই। বড় গাছে মই বাঁধার সাধ কাদের সাজে? যারা গাছে ওঠার মইটিকে পাকা করে বানাতে চায়। গড়ার কাজে নিষ্ঠ দেখায়, তাদেরই নয় কি?

পার্থে ভারতের প্রতিনিধি ছিল যথার্থই এক নবীন দল: এই দল শক্তি-শালী ওলন্দাজ ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটিও কিন্তু গোল করতে পারেনি। তাই প্রশ্ন তোলা যায় যে দলের ফরোয়ার্ড লাইনের সামর্থ্য ছিল কতোটুকু? সম্ভাবনাই বা কি? প্রবীণ ফুলব্যাক সুরজিৎ সিং পেনাল্টি কর্ণার হিটে পার্থে একাই এগারোটি গোল করেছেন। গোল করায় যতো কৃতিত্ব তাঁর। তবুও কি সুরজিৎ ও তাঁর সতীর্থরা কোনো ম্যাচে গোলের ক্ষেত্র বিশেষে গন্ডা গন্ডা গোলের রাস্তা আগলে দাঁড়াতে পেরেছেন? তাহলেই জিজ্ঞাসা, এই দলের রক্ষণ-ব্যূহে বস্তু বলে তেমন কিছু ছিল কি? থাকলে এক এক ধাক্কায় তাসের বাড়ীর মতো হুড়মুড়িয়ে পড়তো কি? আটাশ মিনিটের ফাঁকে পাঁচ পাঁচটি গোল খেয়ে বসা কিসের সাক্ষ্য দিচ্ছে?

তবে পাঁচটি গোল হজম করার পরও ভারত কিন্তু হাল ছাড়েনি। লড়েছে। পরের অধ্যায়ে দুর্বল ফ্রান্স ও কানাডাকে হারিয়েছে। স্থান নির্ধারক খেলায় হারিয়েছে ওলিম্পিক বিজয়ী নিউজিল্যান্ডকে। সান্ত্বনা বলেত এইটুকুই। কিন্তু এতেই কি ভারতীয় হকির শুভানুধ্যায়ীদের মনের ক্ষতের ওপর প্রলেপ পড়তে পারে?

সামনে মস্কো ওলিম্পিক। পার্থে হারের পর মস্কোর চিন্তা তাই রীতিমত দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু মাটি ক্ষয়ে যাওয়া, রং চটা এক প্রতিমার ভেতর থেকে শুকনো খড়ের বাণ্ডিল ক্রমশই ফুটে বেরিয়ে পড়ছে। এই প্রতিমাই ভারতীয় হকির প্রতিচ্ছবি। টানা ছবার ও মোট সাতবার ওলিম্পিক ও একবার বিশ্ব-কাপ বিজয়ের পর যে প্রতিমাকে আমরা মনের মতো করে সাজিয়ে রেখেছিলাম। কোথায় গেল সাজের সেই সৌন্দর্য অলঙ্করণের বাহার? উৎসবের রেশ কেটে গেছে। এখন সোচ্চার শুধু বিবশ বিলাপ। দেখে এবং শুনে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে সত্য সত্যিই কী নির্মমই না।

খেলা

বিশ্ব টেবিল টেনিস

উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়ং সহরে আয়োজিত ৩৫তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে চীন। প্রতিযোগিতায় ছিল মোট সাতটি বিভাগ—দলগত দুটি এবং ব্যক্তিগত বিভাগ পাঁচটি। এই সাতটি বিভাগের মধ্যে চীন ৬টি বিভাগের ফাইনালে উঠেছিল। পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে চীন কেবল উঠতে পারেনি। আরও উল্লেখ্য মেয়েদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে শুধু চীনের খেলোয়াড়রা খেলেছিলেন। নিঃসন্দেহে এটা বিরাট সাফল্যের নজির। সেমিফাইনালে চীনের একাধিপত্য উল্লেখ করার মত। পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস সেমিফাইনালে প্রতিনিধি তিনজন করে চীনের খেলোয়াড় ছিল। মিক্সড ডাবলসেরও সেমিফাইনালে ছিল তিন জোড়া চীনের খেলোয়াড়। পুরুষ ও মেয়েদের ডাবলস সেমিফাইনালে ছিল দুজোড়া করে চীনের খেলোয়াড়।

প্রতিযোগিতার মোট সাতটি বিভাগের মধ্যে চীন ৬টি বিভাগের ফাইনালে খেলে শেষ পর্যন্ত খেতাব জয়ী হয় এই চারটিতে—মেয়েদের দলগত বিভাগে, ব্যক্তিগত বিভাগের ছেলেদের সিঙ্গলস ও ডাবলসে এবং মিক্সড ডাবলসে। প্রতিযোগিতার বাকি তিনটি খেতাব তিনটি দেশ জয়ী হয়—হাঙ্গেরী পুরুষদের দলগত খেতাব জাপান পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব এবং যুগোশ্লাভিয়া পুরুষদের ডাবলস খেতাব জয়ী হয়। লক্ষ্য করার বিষয়, প্রতিযোগিতার সাতটি খেতাবের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশ পেয়েছে ৬টি খেতাব—চীন ৪, হাঙ্গেরী ১ এবং যুগোশ্লাভিয়া ১। এশিয়া মহাদেশ জয়ী হয়েছে সর্বাধিক ৬টি খেতাব (চীন ৪ এবং জাপান ১)।

পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে হাঙ্গেরী ৫—১ খেলায় চীনকে হারিয়ে এই নিয়ে ১২বার সোয়েথলিং কাপ জয়ী হল। ১৯৫২ সালের পর হাঙ্গেরীর এই প্রথম জয়। উল্লেখ্য প্রতিযোগিতার প্রথম পাঁচ বছরে হাঙ্গেরী সোয়েথলিং কাপ জয়ী হয়েছিল উপর্যুপরি ৫বার (১৯২৭-৩১)। ১৯৩২ সাল বাদ দিয়ে হাঙ্গেরী পুনরায় সোয়েথলিং কাপ জয়ী হয় উপর্যুপরি তিনবার (১৯৩৩-৩৫)। অপরদিকে চীন সোয়েথলিং কাপ জয়ী হয়েছে মোট ৬বার—১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৫ (উপর্যুপরি তিনবার), ১৯৭১, ১৯৭৫ ও ১৯৭৭ সালে।

মেয়েদের দলগত বিভাগের ফাইনালে চীন ৩—১ খেলায় উত্তর কোরিয়াকে হারিয়ে এই নিয়ে উপর্যুপরি তিনবার এবং মোট চারবার কর্বিলন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করলো।

দলগত বিভাগের চূড়ান্ত অবস্থান

পুরুষ বিভাগ : ১ম হাঙ্গেরী, ২য় চীন, ৩য় জাপান, ৪র্থ চেকোশ্লোভাকিয়া, ৫ম ফ্রান্স, ৬ষ্ঠ উত্তর কোরিয়া, ৭ম রাশিয়া এবং ৮ম সুইডেন

মহিলা বিভাগ : ১ম চীন, ২য় উত্তর কোরিয়া, ৩য় জাপান এবং ৪র্থ রাশিয়া

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস : ১৮নং বাছাই খেলোয়াড় সেইজি ওনো (জাপান) ২—১ খেলায় ১নং বাছাই কুও ইয়াও-হুয়াকে (চীন) পরাজিত করেন। চতুর্থ খেলার সূচনায় উরুর আঘাতের দরুণ ইয়াও-হুয়া প্রতিযোগিতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় ওনো ২—১ খেলায় এগিয়ে ছিলেন।

পুরুষদের ডাবলস : ডি সুরবেক এবং এ স্টিপানানিক (যুগোশ্লাভিয়া) ২১—১৮, ২১—২০ ও ২১—১৬ পয়েন্টে জাই জনিয়ার এবং টি ক্লাম্পারকে হাঙ্গেরী) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : ৩নং বাছাই গি জিনাই (চীন) ২১—১০, ২১—১৬ ও ২১—১১ পয়েন্টে ১১নং বাছাই লী সং সুক-কে (উত্তর কোরিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : জ্যাং লি এবং জ্যাং দেইং (চীন) ২১—১৩, ২১—১৪ ও ২১—১৬ পয়েন্টে স্বদেশের গি জিনাই এবং ইয়ান গুইলিকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : লিয়াং গেলিয়াং এবং গি জিনাই (চীন) ২১—১৬, ২১—১৬ ও ২১—১৫ পয়েন্টে লী জেন সী এবং ইয়ান গুইলীকে (চীনা) পরাজিত করেন।

দর্শক

সুনীল গাভাসকার

এস ভেংকটরাঘবন

ভেংকটরাঘবন ও তাঁর দল

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সুনীল গাভাসকারের বদলে ইংলন্ড সফরকামী ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন তামিলনাড়ুর চৌত্রিশ বছরের অফ স্পিনার এস ভেংকটরাঘবন। গাভাসকার মস্তো খেলোয়াড়। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ছ'টি টেস্টে তিনি তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি। সেদিক দিয়ে ভেংকটরাঘবন অনেক বেশী পারদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন। বুদ্ধিমান অধিনায়ক তিনি। এবার দেওধর ট্রফির ফাইনালে তিনি যেভাবে নিজের দলকে জিতিয়েছিলেন, তাঁর যে তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় সেই খেলায় পাওয়া গিয়েছিল মনসুর আলি পাতৌদির পর তেমনটি আর কারো মধ্যে দেখা যায় নি। ভেংকটরাঘবন ১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্ব কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এবং ওয়েষ্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একটি টেস্টে ভারতীয় দল পরিচালনা করেছেন তাছাড়া ইংলন্ডে তাঁর খেলার অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। সেখানে কাউন্টি দল ডার্বিশায়ারের পক্ষে তিনি কয়েকটি মরশুম খেলেছেন।

সে সব দিক দিয়ে বিচার করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্বাচন ভালই হয়েছে। তবে উইকেটরক্ষক ও স্পিন বোলার নির্বাচনের ব্যাপারে যথেষ্ট বিতর্কের কারণ আছে। সৈয়দ কিরমানিকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। গত ক' বছর ধরে তিনিই ছিলেন ভারতীয় দলের এক নম্বর উইকেটরক্ষক। ইদানীং উইকেটের পেছনে তাঁকে কিছুটা ম্লান মনে হলেও দল থেকে বাদ পড়ার মতো অবস্থা তাঁর যে এখনো হয় নি একথা বলাই বাহুল্য। কিরমানি বাদ পড়লেও এতোদিন ভারতীয় দলের দু' নম্বর উইকেটরক্ষক হিসেবে যিনি গত ক-বছর ধরে দেশ-বিদেশ ঘুরছেন, কিন্তু আজো একটি টেস্টও খেলার সুযোগ পান নি সেই ভরত রেড্ডী কিন্তু দিব্যি দলে রয়ে গেলেন। উইকেটরক্ষক হিসেবে দলে এসেছেন দিল্লির কুড়ি বছরের খেলোয়াড় সুরিন্দর খান্না। এ বছর রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে দু' ইনিংসে সেঞ্চুরি করে সুরিন্দর তাঁর দলভুক্তির যোগ্যতা প্রমাণ করেন। তবে যার জন্যে তাঁর নির্বাচন সেই উইকেটরক্ষকতায় তিনি কতোটা পারদর্শী তার পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নি।

অর্থাৎ ইংলন্ড সফরে যে দু'জন উইকেটরক্ষক যাচ্ছে তাঁরা একেবারেই নতুন। টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা তাঁদের নেই। ইংলন্ডের আবহাওয়া, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে চট করে মানিয়ে নেওয়া অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের পক্ষেও মুশকিল হয়। সেখানে অভিজ্ঞ কিরমানিকে বাদ দিয়ে দু'জন নবাগতকে পাঠানো যে কতোটা বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে তা নির্বাচকরাই জানেন।

আমরা আশা করেছিলাম ভারতীয় দলের সঙ্গে অন্তত একজন তরুণ স্পিন বোলারকে ইংলন্ডে পাঠানো হবে। যিনি এই সফরে গিয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসতে পারবেন। কিন্তু নতুন কাউকে না নিয়ে দলে আনা হয়েছে অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান ভাগবৎ চন্দ্রশেখর ও বিষেণ সিং বেদীকে। এছাড়া দলনায়ক ভেংকটরাঘবন তো আছেনই। কিন্তু বেদী-চন্দ্রশেখরের দিন যে শেষ হয়ে এসেছে তার প্রমাণ এবার পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলার সময় পাওয়া গেছে। বেদী দীর্ঘদিন ইংলন্ডে খেলেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা দলের কাজে লাগবে ঠিকই আর চন্দ্রশেখর যে কখন কি করবেন তা কেউই বলতে পারবেন না। কিন্তু দু'জনেরই যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। কমে গেছে বলের ধারও। এখন ভারতের দরকার নতুন স্পিন বোলার। যাঁরা ভবিষ্যতে বেদী-চন্দ্রশেখরদের মতো হয়ে উঠতে পারবেন। কিন্তু সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজন অনুভব করছেন না আমাদের নির্বাচকরা। তারপর যখন উপায় থাকবে না তখন ধীরাজ পারসানা নরসিমা রাও প্রমুখদের মতো খেলোয়াড়দের খুঁজে এনে খেলাতে হবে এবং দু-একটি টেস্ট

মহিন্দর অমরনাথ

খেলানোর পর দল থেকে বাদ দিতে হবে. এইভাবেই কি ভবিষ্যতের বেদী. চন্দ্রশেখর প্রসন্নরা তৈরি হবেন?

যাই হোক নীচে ইংলন্ড সফরকামী ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো:

এস ভেংকটরাঘবন (অধিনায়ক): তামিলনাড়ুর দলনেতা ও ভারতীয় দলের অফ স্পিন বোলার ভেঙ্কটরাঘবনের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২১ এপ্রিল। মাত্র উনিশ বছর বয়সে ১৯৬৪-৬৫ সালে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান। মাদ্রাজে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেবারই দিল্লি টেস্টে মাত্র ৭২ রানের বিনিময়ে নিউজিল্যান্ডের আটজন ব্যাটসম্যানকে আউট করে দিয়ে তিনি স্মরণীয় নজির গড়েছিলেন. টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসে সেইটাই তাঁর সেরা বোলিং। ভেংকটরাঘবন এ পর্যন্ত ৩০টি টেস্ট খেলেছেন। ৬০ ইনিংস ব্যাট করে করেছেন ৬৮৬ রান। আর বল করেছেন ১১৮৬৮টি। মেডেন ওভারের সংখ্যা ৩০১। ৪২৯১ রান দিয়ে উইকেট পেয়েছেন ৩৩টি। উইকেট প্রতি রানের হিসেব ২-২৬। উইকেটের কাছাকাছি দারুণ ফিল্ডিং করেন তিনি। ক্যাচ লুফে এ পর্যন্ত তিনি ২৬ জন খেলোয়াড়কে আউট করেছেন।

জি আর বিশ্বনাথ (সহ-অধিনায়ক): ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান বিশ্বনাথের জন্ম ১৯৪৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই সেঞ্চুরি করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৯-৭০ সালে। বিশ্বনাথ এ পর্যন্ত ৫২টি টেস্টের ৯৪ ইনিংস ব্যাট করেছেন। সাত বার অপরাজিত থেকে করেছেন মোট ৩৯৩০ রান। ইনিংস প্রতি তাঁর গড় রান ৪৪-৮২। সেঞ্চুরি করেছেন মোট আট বার। পঞ্চাশ বা তার বেশী রান করেছেন ২৪ বার। কোন রান করতে পারেন নি ছ'বার। সর্বোচ্চ রান ১৭৯। এবারই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কানপুরের শেষ টেস্টে করেছে।

অংশুমান গায়কোয়াড়

বিষেণসিং বেদী

সুনীল গাভাসকার: বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকারের জন্ম ১৯৪৯ সালের ১০ই জুলাই। ১৯৭০-৭১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে পোর্ট অফ স্পেনের দ্বিতীয় টেস্টে তিনি প্রথম খেলার সুযোগ পান। সে বছর ঐ মাঠেই তিনি তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ ২২০ রান করেন। গাভাসকার ৪৬টি টেস্টের ৮৬ ইনিংসে ব্যাট করেছেন। এর মধ্যে সাতবার অপরাজিত থেকে করেছেন মোট ৪৪০৫ রান। ইনিংসে প্রতি তাঁর গড় রান ৫৫-৭৫। সেঞ্চুরি করেছেন উনিশ বার। তাঁর শূন্যের সংখ্যা ছয়। আর ক্যাচ ধরেছেন ৪২টি।

চেতন চৌহান: ভারতের ওপেনিং ব্যাটসম্যান চৌহানের জন্ম ১৯৪৭ সালের ২১ এপ্রিল। ১৯৬৯-৭০ সালে বোম্বাইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেন। এ পর্যন্ত ১৮টি টেস্টের ৩১ ইনিংস ব্যাট করেছেন। দু'বার অপরাজিত থেকে ৯১১ রান করেছেন। ইনিংস প্রতি গড় রান ৩১-৪১। এখনো সেঞ্চুরি করতে পারেন নি। তবে পঞ্চাশের ওপর রান করেছেন ছ'বার। উইকেটের কাছাকাছি নিপুণ ফিল্ডার চৌহান এ পর্যন্ত ২২ জনকে ক্যাচ লুফে আউট করেছেন।
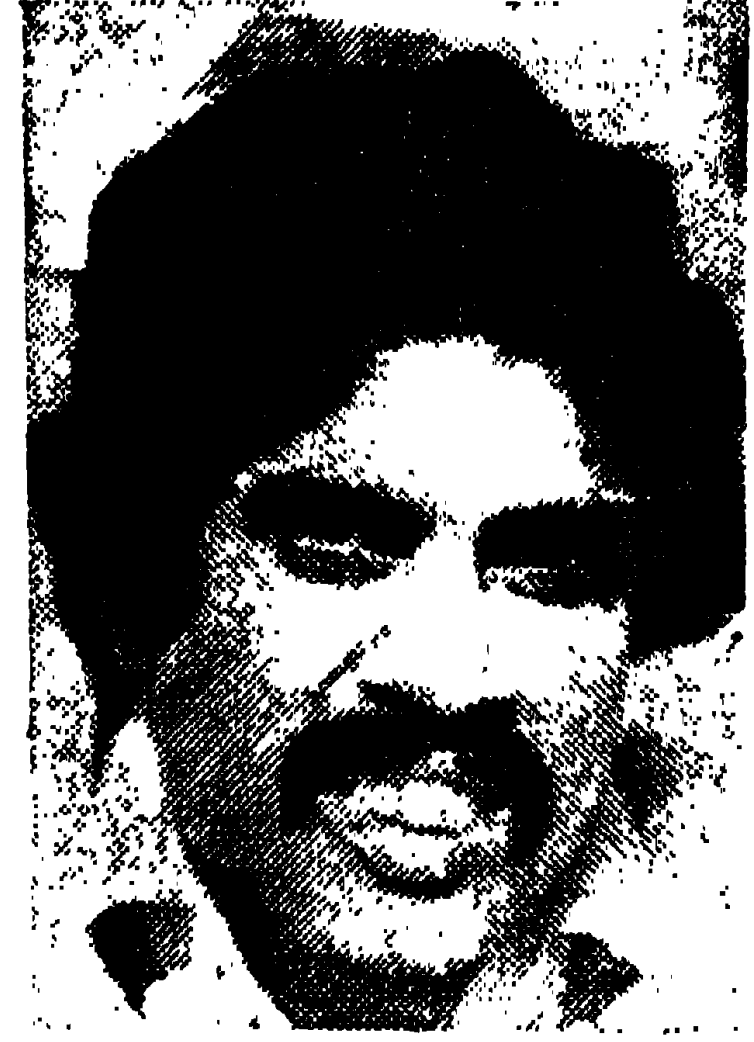
কপিলদেব

অংশুমান গায়কোয়াড়: জন্ম ১৯৫২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর। প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৭৪-৭৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতায়। এ পর্যন্ত ১৯টি টেস্টের ৩৩ ইনিংস খেলেছেন। দু'বার অপরাজিত থেকে করেছেন ১০৩৫ রান। ইনিংস প্রতি তাঁর গড় রান ৩৩-৩৮। প্রথম সেঞ্চুরি করেন এ বছরই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কানপুরের শেষ টেস্টে। পঞ্চাশের ওপর রান করেছেন পাঁচ বার। শূন্য একবার। আর ক্যাচ লুফেছেন পাঁচটি।

দিলীপ ভেংগসরকার: বোম্বাইয়ের তরুণ ব্যাটসম্যান ভেঙ্গসরকারের জন্ম ১৯৫৬ সালের ৬ এপ্রিল। ১৯৭৫-৭৬ সালে নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে প্রথম টেস্ট খেলেন। এ পর্যন্ত কুড়িটি টেস্টের ৩৪ ইনিংস খেলেছেন। মোট ১০৭৭ রান করেছেন। ইনিংস প্রতি গড় রান ৩৪-৭৪। দু'বার শত রান করেছেন। পঞ্চাশের ওপর চার বার। শূন্য তিনটি। ক্যাচ লুফেছেন কুড়িটি।

মহিন্দর অমরনাথ: ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক লালা অমরনাথের পুত্র মহিন্দরের জন্ম ১৯৫৪ সালের ২৪শে মে। প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৬৯ সালে মাদ্রাজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ২৩টি টেস্টের ৪১ ইনিংসে ১৪৩৩ রান করেছেন। গড়ে ইনিংস প্রতি ৩৭-৭৪ রান। দু'বার সেঞ্চুরি করেছেন। পঞ্চাশের ওপর নবার। শূন্যের সংখ্যা ৫। বল করেছেন

২২৬৪টি। মেডেন ৬১ ওভার। মোট ১০৫০ রানের বিনিময়ে ২১টি উইকেট পেয়েছেন।

কারসন ঘাউড়ি : পোশাক পরিচ্ছদে সব সময়ে ফিটফাট, ঘাউড়ির জন্ম ১৯৫১ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি। ১৯৭৪-৭৫ সালে কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেন। ১৮টি টেস্টের ২৮ ইনিংস খেলে ৫০২ রান করেছেন। সেঞ্চুরি করেন নি। তবে পঞ্চাশের ওপর একবার করেছেন। ক্যাচ নিয়েছেন দশটি। ২৯৫৫টি বল করেছেন। ৯৩ ওভার মেডেন পেয়ে ১৫৬৯ রানের বিনিময়ে ৫৯টি উইকেট পেয়েছেন। ঘাউড়ি পেস বোলিংয়ের সঙ্গে স্পিন বলও করতে পারেন। ১৯৭৬-৭৭ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ৩৩ রানে ৫টি উইকেট দখলই তাঁর সেরা বোলিং।

কপিল দেব : হরিয়ানার তরুণ খেলোয়াড় কপিল দেবের জন্ম ১৯৫৯ সালের ৬ জানুয়ারি। ১৯৭৮ সালে ভারতীয় দলের সঙ্গে পাকিস্তান সফরে গিয়ে প্রথম টেস্ট খেলেন। এ পর্যন্ত নয়টি টেস্ট খেলে ২২ ইনিংসে ৪৮৮ রান করেছেন। ইনিংস প্রতি গড় রান ৪৮-৮০। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছেন। আর তিন বার করেছেন পঞ্চাশের ওপর রান। এ পর্যন্ত ১৬৬৬টি বল করেছেন। ৩৪ ওভার মেডেন। ৯৮৭ রানের বিনিময়ে ২৪টি উইকেট দখল করেছেন। উইকেট প্রতি গড় রান ৪১-১২।

বিষেণ সিং বেদী : ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বেদীর জন্ম ১৯৪৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। ১৯৬৬-৬৭ সালে কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেন। এ পর্যন্ত ৬৪ টেস্টের ৯৯ ইনিংসে ব্যাট করে ৬৫৫ রান করেছেন। সর্বোচ্চ অপরাজিত ৫০ রান। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কানপুরে ১৯৭৬-৭৭ সালে। শূন্যের সংখ্যা ১৯। আর ক্যাচ নিয়েছেন ২৫টি। আর ২০৭৬১টি বল করে মেডেন ওভার পেয়েছেন ১০৬৩টি। ৭৩৮৮ রানের বিনিময়ে দখল করেছেন ২৫৯টি উইকেট। এক ইনিংসে পাঁচটি বা তার বেশী উইকেট পেয়েছেন ১৪ বার। সেরা বোলিং ১৯৬৯-৭০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কলকাতা টেস্টে। সেই ইনিংসে তিনি ৯৮ রানে সাতটি উইকেট পেয়েছিলেন। বেদীর উইকেট প্রতি রানের গড় ২৮·৫২।

বি এস চন্দ্রশেখর : ভাগবৎ চন্দ্রশেখরের জন্ম ১৯৪৫ সালের ১৮ মে। প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৬৩-৬৪ সালে বোম্বাইয়ে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে। এ পর্যন্ত ৫৭টি টেস্ট খেলেছেন। ৭৮ ইনিংস ব্যাট করে ৩৭ বার অপরাজিত থেকে করেছেন ১৬৭ রান। শূন্য করেছেন ২৮ বার। ক্যাচ নিয়েছেন ২৫টি। আর বল করেছেন ১৫৭৮৯টি। এর মধ্যে মেডেন ওভার ছিল ৫৬৭টি। ৭০৮৬ রানের বিনিময়ে দখল করেছেন ২৪২টি উইকেট। উইকেট-প্রতি গড় রান ২৯-২৮। এক ইনিংসে পাঁচটি বা তার বেশি উইকেট পেয়েছেন ১৬ বার। দু ইনিংস মিলিয়ে দশটা বা তার বেশি উইকেট পেয়েছেন দুবার। স্মরণীয় বোলিং ৮৯ রানে ৮ টি উইকেট ১৯৭২-৭৩ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দিল্লি টেস্টে।

বিজেশ প্যাটেল : মারকুটে ব্যাটসম্যান বিজেশ প্যাটেলের জন্ম ১৯৫২ সালের ২৪ নভেম্বর। প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৭৪ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। এপর্যন্ত ২১টি টেস্টের ৩৮ ইনিংসে ব্যাট করেছেন। পাঁচবার অপরাজিত থেকে ৯৭২ রান করেছেন। ইনিংস-প্রতি গড় রান ২৯-৪৫। সর্বোচ্চ অপরাজিত ১১৫। এপর্যন্ত ১৭টি ক্যাচ নিয়েছেন।

যজুবেন্দ্র সিং : নিপুণ ফিল্ডার যজুবেন্দ্রর জন্ম ১৯৫২ সালের ৯ আগস্ট। ১৯৭৬-৭৭ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে শেষ দুটি টেস্ট খেলেন। সেবার বাঙ্গালোর টেস্টে এক ইনিংসে ৭টি ক্যাচ নিয়ে তিনি অস্ট্রেলিয়ার গ্রেগ চ্যাপেলের বিশ্ব রেকর্ডের নজির স্পর্শ করেছেন।

যশপাল শর্মা : পাঞ্জাবের চব্বিশ বছরের ব্যাটসম্যান যশপাল এখনো টেস্ট খেলেননি। ভারতীয় দলের সঙ্গে পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন।

ভরত রেডডী : উইকেটরক্ষক ভরতের বয়স চব্বিশ। শ্রীলংকার বিরুদ্ধে বে-সরকারী টেস্টে খেললেও, সরকারী টেস্টে খেলার সুযোগ এখনো পাননি। তবে ভারতীয় দলের সঙ্গে গত কবছর ধরে তিনি পৃথিবীর সব দেশই সফর করেছেন।

সুরিন্দর খান্না : দিল্লির কুড়ি বছরের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান। এ বছর রণজি ট্রফির ফাইনালে দু' ইনিংসে সেঞ্চুরি করে তিনি সবার নজর কেড়েছেন।

সমালোচনার সমালোচনা

আপনার বিদগ্ধ সমালোচক পত্রলেখকের 'বাঙলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত' বইখানির দীর্ঘ একটি সমালোচনা (১৬ মার্চ, ১৯৭৯) লিখে লেখককে কৃতার্থ করেছেন। এত বড় বই, বিশেষ করে যা 'কথার ফেনা' দিয়ে 'মোটাতর করা' এবং যা 'শোওয়া বসা ও আত্মরক্ষার কাজ করে' বলে তাঁর রসিকতা, তিনি এত কষ্ট করে পড়েছেন, তারপর জমাটতর ফেনা দিয়ে কত কষ্ট করে কত বড় সমালোচনা লিখেছেন, এ সবই লেখকের সুকৃতের ফল তাতে সন্দেহ নেই।

সমালোচক মহাশয় পাতা তিনেক ধরে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর কোনো পর্যালোচনা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় গ্রন্থের নাম, নিবেদন অংশ ও ভূমিকা খাঁতয়ে বুঝতে পেরেছেন, গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য লেখকের কাছে স্পষ্ট ছিল না। লেখকের অক্ষমতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর নেই। তবে লেখকের কয়েকটি সসংকোচ বক্তব্য কুণ্ঠিতভাবে পেশ করা গেল। প্রথমত, বইটি নিউজপ্রিন্টে ছাপা বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এর জন্য লেখক সমালোচক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। কারণ এতকাল পর্যন্ত কাগজ ব্যবসায়ীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগকে গ্রন্থের কাগজের কোয়ালিটি সম্পর্কে অন্য কথা বলে আসছিলেন। এখন ভুল ভাঙল। সমালোচক যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয় বইটি নিউজপ্রিন্টে ছাপা, বোধহয় সংবাদপত্রগুলিই ম্যাপ-লিথো কাগজে ছাপা হয়।

দ্বিতীয়ত, তাঁর বিশ্বাস বইটি লেখকের বিশ্ববিদ্যালয়-স্বীকৃত গবেষণাপত্রের মুদ্রণ। তা ধরেই তিনি নানাবিধ উষ্মার কারুকার্য দেখিয়েছেন। লেখক দুঃখিত। তাঁর নিবেদন অংশে আছে, 'বর্তমান গ্রন্থটি সেই গবেষণাপত্রের মুদ্রণ নয়, এটি প্রায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ, তবে সেই গ্রন্থের উপকরণ এতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, সমালোচক মহোদয় গ্রন্থটির ঐতিহাসিক অংশের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্ধের রবীন্দ্রসংগীত আলোচনার সহাবস্থানকে অসঙ্গতি ও খাপছাড়া বলেছেন। তাঁর ধারণা, লেখক নিজেও এই অসঙ্গতি সম্পর্কে নাকি সচেতন ছিলেন তাই 'ব্যাপারটাকে জাস্টিফাই করার জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের কালানুক্রমিকতা নির্ণয়ের একটা অপটু ঐতিহাসিক চেষ্টাও' নাকি করেছেন। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বইটিতে সেই 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের কালানুক্রমিকতা'র অধ্যায়টি পাওয়া গেল না। কী করে পাওয়া যাবে? লেখক নিজেই সলজ্জভাবে জানাচ্ছেন, কথামুখে এরকম প্রতিশ্রুতি ছিল বটে, কিন্তু পরে সেটি গ্রন্থ থেকে তিনি বাদ দিয়েছেন। এটা তাঁর ত্রুটিই। কিন্তু মনোযোগী সমালোচক উক্ত অপ্রকাশিত বর্জিত অধ্যায়টি সম্ভবত ধ্যানযোগে পাঠ করেছেন। 'আহা কী অদ্ভুত কৌতুক! ভরসা করি সমগ্র গ্রন্থটি পাঠে এই রীতি অবলম্বিত হয়নি।

ইচ্ছা করলে পত্রটি ছাপাতে পারেন, তবে দয়া করে পত্রটির শিরোনামা 'সমালোচনার হাল' দেবেন না। আর পত্রটি না ছাপলে জানব সমালোচক মহাশয় পত্রটি পাঠ করেছেন। তাহলেও লেখক তাঁর শ্রম সার্থক জ্ঞান করবেন। ধন্যবাদান্তে, —অরুণ বসু, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

চিত্রধ্বনি

অধম-পুস্তক

যদিও উত্তমকুমার উপস্থিত, তবু ত্তম হইল না। ইহা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্য-নক।

মাস্টার রাজু অর্থাৎ বাবলি তার দিদি জামাইবাবুর সংসারে থেকে পড়াশুনো রে। এই কিতাব ব্যক্তিগতভাবে বাবলির। বং কিতাবের প্রতি প্রগাঢ় অনীহাও বাবলির। এখানে বাবলিই আসল বস্তু। পলক্ষ্য দিদি বিদ্যা সিনহা, জামাইবাবু ত্তমকুমার।

উত্তমকুমার স্বাভাবিক নিয়মে ভাল করি করেন। এটা তাঁর প্রাপ্য এবং উত্তম-মারের স্ত্রী যেহেতু বিদ্যা সিনা, সেহেতু দ্যা সিনহা মডেলিং-এর কাজে যুক্ত। থানে বিদ্যা যদি আদর্শ গৃহকর্মনিপুণা উজ-ওয়াইফ হতেন তাহলে বাবলির দিদি মাইবাবুর মধ্যে কোন সংঘাত থাকত না। ার সংঘাত না থাকলে তার ছবি কেন?

উত্তমকুমারের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও হেতু বিদ্যা মডেলিং করে সে কারণে দ্যাকে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতে হয়।

বাবলির স্কুল-জীবনের ইতিহাস লংকময়। সে শিক্ষকের কালির দোয়াত লট দিয়ে সেই কলংককে কালিময় করেছে। ং বাবলির কণ্ঠ নির্গত আওয়াজে পাঠ-ক্ষ হয়ে উঠেছে হরবোলার আসর।

স্কুল থেকে বাড়িতে চিঠি যায়। দির কাছে মারও খায় প্রথামত। জামাই-বু বকাঝকা করেন—এটাও রীতি। বাবলি ুল ছুটির পর বন্ধুর সঙ্গে সিগারেট ন। বয়স কত? দশ বা বারো।

বাবলি বাড়ি থেকে পালায়। স্টেশনে ন্ধ এক ভিখারি তাকে খেতে দেয় সেই খারিও বাবলিকে পড়াশুনোর কথা বলে। ন্তু ভবী ভুলবার নয়। অন্ধকে পরিত্যাগ র সে। রাত্রে প্লাটফর্মে এক বুড়ির পাশে মোয়।ভোরবেলা বুড়ির ভিক্ষাপাত্র থেকে কটা আধুলি নিয়ে মুখ ধুতে যায়। ফিরে খে বুড়ি মারা গেছে। সে আধুলি ফেরৎ য় ।

বাবলি আবার বাড়ি ফেরে। এক রাত্রে দ্যা উত্তমকুমারের হাতে চড় খায়। সুটকেশ য় বেরিয়ে যায় বিদ্যা। বাবলি জেগে থেকে শোনে বা দেখে। বাবলিও দিদির পেছন ছন শুধুমাত্র জুতোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তায়।

বাবলি বিনা টিকিটে গার্ডকে ফাঁকি য়ে রেল-পথ অতিক্রম করে।

এদিকে বিদ্যা সিনহা দেশের বাড়িতে কে এসেছে। উত্তমকুমারও বাবলির খোঁজে জর হয়েছে। বাবলির মার চোখে আনন্দে। না [illegible]

ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে বাবলির উদয় দৃশ্য বড় করুণ। গুলজার পরিচালিত কিতাবের বাবলি আবার পড়তে চেয়েছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পড়ার।

বাবলি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে কিনা আমরা জানি না। সঙ্গীত পরিচালক রাহুলদেব বর্মণ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন এটুকু বলা যায়।

প্রভাত চৌধুরী

অরুণ বরুণ কিরণমালা

চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটির কর্ণধার ভি শান্তারাম। সাতাত্তর বছর বয়সে সব-কিছু ছেড়ে যিনি ছোটদের জন্য ছবি তৈরীর কাজে নিজেকে নিমগ্ন করেছেন। সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত এক সাংবা-দিক সম্মেলনে উনি বলছিলেন ছোটদের ছবি দেখাতে গিয়ে ওঁর অভিজ্ঞতার কথা। 'সারা জীবন সীরিয়াস ছবি করে এসেছি। দর্শকরা আমার ছবি কি ভাবে নিয়েছে তাও প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু আজ ছোটদের ছবি দেখাবার সময় ওই নিষ্পাপ শিশুদের মুখে আনন্দের যে অভিব্যক্তি দেখছি, ওরা যেভাবে ছবিগুলো গ্রহণ করছে, তাতে এই বৃদ্ধ বয়সে আমার বড়ই আফশোষ হচ্ছে। হায়! সারা জীবন এদের জন্য কেন ছবি করলাম না! এদের মতন ভাল দর্শক কোথায় মিলবে! 'শান্তারামজী এখন দেশের সব বড় পরিচালককে এদের জন্য ছবি করার কথা বলে চলেছেন। যা তিনি নিজে পারেন নি।

আমাদের দেশে ভাল শিশুচিত্র নেই বললেই চলে। দুয়েকটা যা মিলেছে, তাও সেই সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে। স্বর্গত ঋত্বিক ঘটক এক সময় একটা সুন্দর ছবি করেছিলেন। নাম, 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। এঁরা ছাড়া আর কেউ যে ছোটদের জন্য ছবি করেন নি এমন নয়। তবে তার সংখ্যা অল্প। গত দশ-বারো বছরে বড়জোর দুয়েকটা। তাও হয়ত নয়। তবে এবছর 'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ'কে স্মরণ করে কেউ কেউ এগিয়ে এসেছেন। বরুণ কাবাসী এমনই একজন। তাঁর পরিচালিত 'অরুণ বরুণ ও কিরণমালা' ছবি হিসেবে কতটা সার্থক সেটা পরের কথা। আগে এমন প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই। আমরা চাইব, অন্যরাও এগিয়ে আসুন।

রূপকথার চরিত্র অরুণ, বরুণ ও কিরণমালাকে পর্দায় জীবন্ত দেখতে ছোট-দের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। যাতে আরও ভাল লাগে সেজন্য এ ছবি কালারে তোলা হয়েছে। এই রূপকথার সঙ্গে ছোটদের পরিচয় বই পড়ে বা গল্প শুনে। বরুণবাবুর ছবির মাধ্যমে ওরা আরো ভালভাবে অরুণ-বরুণদের জানতে পারবে, এমন আশা করা যায়। ওই তিন ভাই-বোন কিভাবে ওদের বাবা-মাকে ফিরে পেল, ছবিতে তার বিবরণ সুন্দর।

[illegible] [illegible] চিত্রনাট্য এবং বিশেষ করে সম্পাদনায়। অনর্থক দীর্ঘ না করে ছবিকে অনায়াসে দশ রীলে নাবিয়ে আনা যেত। অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যগুলো বাদ দিলে ছবি আরো জমত। এগুলো ছাড়া শব্দ গ্রহণ দুর্বল এবং সঙ্গীত দায়সারা গোছের। তবে শিল্পীদের অভিনয় ভাল। বিশেষ করে নামভূমিকার শিল্পীদের। অর্থাৎ পার্থ, সুপ্রতিম এবং মৃন্ময়। ওদের মানিয়েছেও সুন্দর। ছায়া দেবী (ডাইনী) এবং পদ্মা দেবীর (রাক্ষসী) মেকআপ ভাল হয়েছে। এঁরা ছোটদের ভয়ের কারণ হয়েছেন। এ ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়িও হয়ে গেছে। ছোটদের ছবিতে যা বাঞ্ছনীয় নয়। পরীর রানী ঝুমুর গাঙ্গুলীকে সুন্দর লেগেছে। ছবির শেষের এই অংশ সুন্দর। এখানেই রূপকথাকে ঠিকমত ধরা গেছে।

ঘটকালি

এক সময় নিয়মিতভাবে বাংলা হাসির ছবি নির্মিত হত। সেই রজতজয়ন্তী থেকে শুরু করে বরযাত্রী, টনসিল, ওরা থাকে ওধারে, সাড়ে চুয়াত্তর, চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে, অর্ধাঙ্গিনী, পাশের বাড়ি....এমনি কত হাসির ছবি আমরা বছরের পর বছর দেখে এসেছি। তারপর গত পনেরো বিশ বছর ধরে কেমন একটা ভাটা পড়ে। এই সময় হাসির ছবি যে তৈরি হয় নি তা নয়। কিন্তু দু-একটা ব্যতিক্রম বাদে (সাধু যুধিষ্ঠির কড়চা, মন্ত্রমুগ্ধ) সেগুলো তেমন জমে নি। উপ-যুক্ত কাহিনী, চিত্রনাট্য, সম্পাদনা এবং পরি-চালনার অভাবই এর কারণ। আর সবচেয়ে অভাব, যা এখন বেশী করে চোখে পড়ে, তা হল উপযুক্ত শিল্পীর। ইন্দু মুখার্জি, ফণী রায়, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ হালদার, জহর রায় — এঁদের উত্তরসূরী কোথায়? ভানু ব্যানার্জি এবং অজিত চ্যাটার্জিকে আমরা ত প্রায় ভুলতে বসেছি। আজকাল এঁদের দেখতেই পাই না। ব্যতিক্রম হরিধন মুখোপাধ্যায়। এই প্রবীন গুণী শিল্পীকে যে এখনকার পরিচালকেরা মাঝে মাঝে স্মরণ করেন এটাই আনন্দের। ঘটকালিতে হরিধনবাবু আছেন। এক বিয়ে-পাগলা বুড়োর চরিত্রে। ঘটকের কাছে যিনি প্রায়ই পাত্রীর জন্যে তাগাদা মারেন। ছবিতে যেটুকু সতিকারের মজা পাওয়া যায়, তা ওই হরিধনবাবুর কাছ থেকেই। অবশ্য রবি ঘোষ, অনুপকুমার এবং চিন্ময় রায়ও আছেন। তবে হরিধনবাবুর পাশে এ ছবিতে সবাই যেন ম্লান।

হাসির ছবি অনেক রকম থাকে। এক ধরনের ছবিতে গল্পটাই হাসির। কোনটাতে গল্প সাধারণ, সংলাপ হাসির। কোন ছবিতে আবার সিনেমাটিক টেকনিকে দর্শকদের হাসান হয়ে থাকে। যেমন ফাস্ট মোশনের দৌড়। ঘটকালিতে যা আছে। কিন্তু সবের ওপর থাকে অভিনয়। এ ছবিতে অনুপকুমার, রবি ঘোষ এবং চিন্ময় রায় সেদিক থেকে ভালই করেছেন: হরিধন ত আছেনই।

সেই সঙ্গে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহুয়া রায়চৌধুরীকেও ভাল লেগেছে। কাহিনীতে মজা আছে। নাতনিকে বিয়ে দেওয়া নিয়ে দাদু-নাতি সংঘর্ষ। এটাই আসল ঘটনা। ছবি একে ঘিরেই আগাগোড়া গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু মাঝে মাঝে এর থেকে সরে আসা হয়েছে। বিশেষ করে প্রথমার্ধে। তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধ ভাল। এই পর্বে ছবির গতিও বেড়েছে। গোপেশ মল্লিকের সুরে ছবিতে কিছু জমাটি গান আছে। বিশেষ করে শক্তি ঠাকুরের গানটি। কলাকৌশলগত কাজ সম্বন্ধে উল্লেখ করবার মত কোন কিছু চোখে পড়ে নি।

ঘটকালি হাল্কা হাসির ছবি। দমফাটা হাসি না হলেও, ছবিতে হাসির যথেষ্ট খোরাক আছে। যার সবটাই মোটাদাগের নয়।

অসিতবরণ মিত্র

দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব

সম্প্রতি সরলা মেমোরিয়াল হলে সাত দিনব্যাপী দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। এমন একটি সময়ানুগ চলচ্চিত্র উৎসবের ব্যবস্থাপনার জন্যে উদ্যোক্তাবৃন্দ অবশ্যই কলকাতার চলচ্চিত্রানুরাগীদের ধন্যবাদ পাবেন।

প্রথম ছবি 'ঘটশ্রাদ্ধ'—কানাড়া ভাষায়। প্রাক স্বাধীনতা যুগের পটভূমিকায় রচিত ডঃ আনন্দমূর্তির গল্প অবলম্বনে এ-চিত্র গড়ে উঠেছে। পরিচালক গিরীশ কাসারভাল্লি। পরিচালকের বয়েস মাত্র ছাব্বিশ। শিল্প-বলিষ্ঠতায় তিনি যে অনেক বেশী সাবালক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ-ছবিতে সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণসমাজের মানবনীতিবিগর্হিত আচরণধারার একটি বিশ্বাস্য পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। যে সংস্কার শুচির স্বপক্ষে মৃত্যুকে ডেকে আনে, একক-মানুষকে সমাজবিচ্ছিন্ন করে অন্ধকারে ঠেলে দেয়— 'ঘটশ্রাদ্ধ' ছবিতে তাকে নিরপেক্ষ অস্ত্রে বিদ্ধ করা হয়েছে। পরিচালক হিসেবে কাসারভাল্লি অত্যন্ত সংযত।

দ্বিতীয় ছবি 'চিল্লরা দেবুল্ল'—তেলেগু ভাষায়। এর পটভূমি ১৯৩৭-৪০-এর তেলেঙ্গানা আন্দোলন। স্থানীয় জমিদার শ্রেণীর একচ্ছত্র ক্ষমতার ভয়াবহ রূপ দেখানো হয়েছে এখানে। পাশাপাশি একটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প ও কিছু লঘু সঙ্গীতের ব্যবহারেও পরিচালকের মনস্কতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কতোটা সামঞ্জস্য আনা গিয়েছে—সেটা বলা মুস্কিল। ছবির 'অ্যাকশান' পর্যায় বিরক্তিকর। 'চিল্লরা দেবুল্লুর' পরিচালক টি মাধবরাও, সঙ্গীত-পরিচালক কে মহাদেবন।

তৃতীয় ছবি 'সমস্কারা'। একক বৈশিষ্ট্যে এই কানাড়া চিত্রটি ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র-ইতিহাসে অবশ্যই জায়গা পাবে। ব্রাহ্মণ-বিরোধী বক্তব্যের জন্যে 'সমস্কারা' মাদ্রাজে নিষিদ্ধ হয়েছিলো। বোম্বেতেও এ ছবির প্রদর্শন বন্ধ করা হয়। পরে সারা দেশের লেখক, নাট্যকার, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সমবেত প্রচেষ্টায় সমস্কারা মুক্তি পায়। পরিচালক রেড্ডির অবদানও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ছবিটির সঙ্গীতাংশ অসাধারণ—সঙ্গীত পরিচালকের নাম আর তারানাথ। ব্রাহ্মণ-সংস্কারকের ভূমিকায় গিরীশ কারনাদের অনবদ্য অভিনয় ছবিটির উৎকর্ষকে অনেক দূরে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। চিত্রনাট্যের রচয়িতাও তিনি। গিরীশ ব্যতীত স্নেহলতা রেড্ডিও যথেষ্ট আন্তরিক অভিনয় করেছেন।

পরবর্তী মালয়ালাম ছবি 'কোডিয়েট্টম'-এ পূর্ণাঙ্গ ছবির প্রায় প্রত্যেকটি গুণই লক্ষ্য করা গেছে। শ্রেষ্ঠ মালয়ালাম ছবির জন্যে কোডিয়েট্টম জাতীয় পুরস্কারও লাভ করেছে। ছবিটিতে দেখানো হয়েছে জীবনের নানা দিক, মানসিকতার সূক্ষ্ম পরিবর্তনীয়তা। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়তি-রূপ ভুলের মাশুল গোনা এক আবশ্যিক ব্যাধির মতো প্রকৃতিতে ছড়িয়ে আছে। পরিচালক গোপালকৃষ্ণ তাঁর অনবদ্য নিজস্ব ভঙ্গিতে সেই ব্যাধির সূত্র ও পরিণতিকে আমাদের সামনে হাজির করেছেন।

উৎসবের পঞ্চম ছবি 'কাঞ্চনসীতা'ও মালয়ালাম ভাষায়। ছবিটিতে 'সাব টাইটেল' ছিলো না, কিন্তু কথাবার্তা এতো কম যে বুঝতে কেন অসুবিধে হয়নি। 'কাঞ্চনসীতা'র পরিচালক জি অরবিন্দন শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। কাঞ্চন-সীতা রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে রচিত।

ষষ্ঠ চিত্র 'কাবানিনাডি চুভান্নাপ্পোল'-এর ভাষাও মালয়ালাম। এই কাহিনীর মূলে প্রেম, বাস্তবের কঠোরতায় যা মিলনান্তক হয় না। সাধারণ মানের কাহিনীকে মোটামুটি বিশ্বাস্যভাবে উপস্থাপনার জন্যে পিএ বেকার প্রশংসা দাবি করতে পারেন। অভিনয়াংশ যথাযথ, ফোটোগ্রাফি উত্তমাঙ্গের।

উৎসবে প্রদর্শিত সপ্তম বা শেষ চিত্র --'থাপ্পু থালাঙ্গল'। তামিল এই চিত্রটি শিল্পমানে মোটেই উঁচু নয়। পরিচালক কে বালাচন্দর বীর ও করুণ রসের ভূরিভোজের আয়োজন করেছেন। হিন্দী সিনেমার অনুকরণে কয়েকটি গানও আছে। আছে মারপিট।

শুভশংকর ভট্টাচার্য

ছবির খবর

অক্ষয়তৃতীয়ার দিনটায় টালিগঞ্জ পাড়া ছিল সবচাইতে ব্যস্ত। শুভ দিনেই সাধারণত ছবির শুভমহরৎ হয়ে থাকে। পয়লা বৈশাখ-রথযাত্রা-অক্ষয়তৃতীয়ার যাত্রা শুরু করেছে ছ'সাতখানি ছবি।

উপস্থিতির জাঁকজমক মৌলুষ আড়ম্বরে সবার প্রথমে নাম করতে হয় আলোকনাথ(?) ব্যানার্জির 'দুখের কাছে' ছবিটির শুরু অনুষ্ঠানটিকে। মহরৎ শটটি শুরু করার জন্য উপস্থিত ছিলেন কাননদেবী। তিনিই শুরুতে 'স্টার্ট সাউন্ড' এবং শেষ 'কাট' বলে শটটি গ্রহণে সাহায্য করলেন পরিচালককে। [illegible] [illegible] ক্যামেরার সামনে তখন ছিলে[ন] আরতি ভট্টাচার্য, কুনাল সিং। কুণা[ল] বাবুর এই প্রথম বাংলা ছবি। [...] বাংলায় তিনি বেশ দীর্ঘ সংলাপটি সু[...] ভাবে বলে গেলেন। বোঝা গেল বিয়ের [...] স্ত্রীর সান্নিধ্যে বাংলা ভাষাটি বেশ ভালে[া] রপ্ত করেছেন। শট দেবার পর সকলে[র] সঙ্গেও তিনি বাংলায় কথা বললেন।

আরতি ভট্টাচার্যের কাছ থেকে [...] গেল ছবির কাজ নিয়মিত শুরু হবে [...] মাসের মাঝামাঝি। অবশ্য বেশিরভাগ [...] হবে বিহারের নানা লোকেশনে। কাহিনীক[ার] বুদ্ধদেব গুহ ছাড়া সেদিন মহরতে উপস্থি[ত] ছিলেন সাহিত্যিক সমরেশ বসু, গীতি[কার] পুলক ব্যানার্জি এবং প্রতিষ্ঠ সকল [...] সাংবাদিকরা। মহরৎ শট নেবার প্রযোজ[ক] স্বপ্না ভট্টাচার্য (ব্যক্তিগত জীবনে আরতি[র] বোন) সকলকে মিষ্টিমুখ করালেন।

অক্ষয়তৃতীয়ার দ্বিতীয় জাঁকজমকপ[ূর্ণ] মহরৎটি ছিল নিউ থিয়েটার্স দুনম্[বর] স্টুডিওয়। বিভূতি লাহা বেশ কিছুদিন ব[াদে] শুরু করতে চলেছেন ছবি। সরকা[রী] অনুদানে তৈরি হচ্ছে এই নতুন ছ[বি] 'সূর্যসাক্ষী'। প্রধান ভূমিকায় আ[ছেন] উত্তমকুমার। মহরৎ অনুষ্ঠানে প্রধান অতি[থি] ছিলেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী।

বেশ কয়েক বছর বাদে বিশ্বজিৎ আ[বার] বুকভরা দম নিয়ে নামছেন ছবি পরিচালন[ায়,] অভিনয়ে। বাংলা ছবির দর্শকরা বহু[দিন] বিশ্বজিৎকে দেখতে পাননি। এবার দেখবেন[।] এবার দেখবেন রমা গুহের প্রযোজনায় দুখা[নি] ছবি নিয়ে তিনি আসছেন টালিগঞ্জে। অক্ষ[য়]তৃতীয়ার দিনেই ছবি দুটির শুভ মহ[রৎ] করলেন তিনি টেকনিসিয়ানস স্টুডিওয়[।] প্রথমে হল ভক্তিমূলক ছবি 'মহামায়া[র'] মহরৎ। কলকাতা-বম্বের একাধিক ন[ামী] শিল্পীরা থাকবেন এ ছবির বিভিন্ন [চ]রিত্রে[।] বিশ্বজিৎ অবশ্যই প্রধান চরিত্রে অভিন[য়] করবেন। কাহিনী ও গান লিখছেন গৌর[ী]প্রসন্ন মজুমদার। সুরকার নীতা সেন। ঘণ্[টা]খানেক বাদে একই ফ্লোরে বিশ্বজিৎ এলে[ন] নতুন চেহারায়। ছবির নাম 'অবিচার[']। অবিচারের প্রতিমূর্তি হয়ে উপস্থিত হবে[ন] তিনি এই ছবিতে। উষা খান্নার সুরে কয়েক[টি] গান খুব শিগগির বম্বেতে রেকর্ড কর[া] হবে। সুটিং শুরু হতে অবশ্য কিঞ্চিৎ দের[ি] আছে। এক ঘরোয়া সাক্ষাৎকারে বিশ্বজি[ৎ] পরে জানিয়েছেন তাঁর পরিকল্পনায় আর[ও] একটি ডবল ভার্সান ছবি আছে। জুন মাসে বিস্তারিত জানা যাবে।

ঐ দিন সকালেই কাজী নজরু[ল] ইসলামের জীবনী অবলম্বনে 'বিদ্রোহী কবি' নামে একটি ছবির শুভ মহরৎ হল। পরিচালক ঠাকুরদাস হাজরা। টেকনিসিয়ানস স্টুডিওয় উমানাথ ভট্টাচার্য শুরু করলেন 'চন্দ্রমুখী' নামে একটি ছবির কাজ। নিজের চিত্রনাট্যেই ছবিটি করছেন তিনি। কিছুদিন আগে তিনি সরকারী অনুদানে 'দুখে মার্চ(?)' একটি ছবি আরম্ভ করেছেন। 'চন্দ্রমুখী'র মুখ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করবেন [illegible]

মুখার্জি, মহুয়া চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, তরুণকুমার।

লোডশেডিং চলছে, চলবেও। সোম-মঙ্গল-বুধ কোনদিনই রেহাই নেই। সময়ের বাদবিচারও নেই। আলোছায়ার লুকোচুরির খেলা এখন চলছে কলকাতার সর্বত্র। স্টুডিও পাড়ায় এ খেলার প্রতিফলনটা একটু বেশি। শুধু সুটিং বন্ধ নয়, গান রেকর্ডিং, ল্যাবরেটরির কাজ—স-অ-অ-অ-ব বন্ধ। মুখ বুজে শিল্পীরা স্টুডিওর লনে নীরবে সহ্য করছেন সবকিছু। পরিচালকরা তিতি-বিরক্ত। অভিনয়, শিল্পসৃষ্টি এসব এখন আপ্তবাক্য। কিন্তু কতদিন আর? এক কষ্ট সহ্যের পরও সকলের মুখে একটাই প্রশ্ন কবে এই অমানিশা ঘুচবে?

নির্মল ধর

কাঞ্চনরঙ্গ

অপর্ণা গ্রুপ রিক্রিঃ ক্লাব সম্প্রতি কলামন্দিরে 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকটি তাদের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি আগাগোড়া জমেছিল। কখনও মনে হয়নি যে এটি ওদের প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা। শিল্পীরা সকলেই আন্তরিক অভিনয় করে-ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন মণিময় রায়চৌধুরী, স্বদেশ বোস, রাণী ব্যানার্জি, সবিতা রাহা, জ্যোৎস্না দাস, বুলা সেনগুপ্তা এবং কল্যাণ সেনগুপ্তা। নাটকের আগে উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানান কৃষ্ণদাস পড়্যাল, রাসমোহন সাহা এবং পূর্ণচন্দ্র পাল। সংস্থার তরফ থেকে এরা কিছু বক্তব্যও রেখেছিলেন। সবশেষে ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠান। গান গেয়েছিলেন অনুপ ঘোষাল এবং হৈমন্তী শুক্লা।

বসন্তমঞ্জরী

গত ৬ মে হাওড়ায় এক অনুষ্ঠান করলেন গান্ধার সংস্থা। গান, নাচ আর আবৃত্তিতে বসন্ত-বিদায় জানালেন। মনোরম এক সন্ধ্যা উপহার পাওয়া গেল। আবৃত্তি এবং একক সঙ্গীতানুষ্ঠানে দুটি উজ্জ্বল মুখ দেখা গেল—সুনীল কোলে ও মিঠু বসুমল্লিক। ভরাট কণ্ঠের সূক্ষ্ম কাজে সুনীল আবৃত্তিতে মন কেড়েছেন। মূল ব্যাপারটা ছিল নৃত্যনাট্য—বসন্তমঞ্জরী। নৃত্যনাট্যের কাহিনীটিতে নতুনত্ব পাওয়া গেল না কিছুই। তবু উপস্থাপনার গুণে নৃত্যনাট্যটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। অংশ গ্রহণ করেছিলেন — শ্রীপ্রমোদ বসু, অরুণ পাল, তানিয়া ভট্টাচার্য, শ্যামলী কারক, পুষ্পিতা মুখোপাধ্যায়, অমিত চক্রবর্তী, তপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ছিল অনুষ্ঠানে। কর্তৃ-পক্ষের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।—**গৌতম ভট্টাচার্য।**

সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

সারা ভারত সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের রজত-জয়ন্তীর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল গত ১৭ই এপ্রিল রবীন্দ্রসদনে। উদ্বোধন দিনে প্রধান কণ্ঠশিল্পী ছিলেন সুনন্দা পট্টনায়ক। তিনি তাঁর অনুষ্ঠান শুরু করেন মালকোষ রাগে খেয়াল দিয়ে। অল্পপ্রসিদ্ধ তাঁর স্টাইল এবং মূলতঃই তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও গবেষণাপ্রসূত। এক পর্দা থেকে অন্য পর্দায় যাবার সময় তাঁর গতিপ্রয়োগ মাঝেমাঝেই আমাদের স্বর্গত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর এবং কুমার গন্ধর্বের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর পদগুলি মাঝে মাঝে বিভিন্ন পর্দায় এতই ব্যক্তিত্বময় ও মুখর হয়ে উঠেছিল যে, কেউ কেউ অতিমাত্রায় সন্ধানী হয়ে পড়েছিলেন—আলাপের প্রারম্ভিক পর্যায়ে তিনি কি রাগ গাইছেন তা নিরূপনে। এতকাল মুখরা—যাতে একটি পরিষ্কার রাগের ছবি ছিল—এই কৌতূহল দূর করেছে। এই জাতীয় বন্ধকী আলাপ আগের শতকেও প্রচলিত ছিল। তাঁর বৈশিষ্ট্যানুযায়ী আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে মালকোষের বেলাতেও তিনি এই কাজটি অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। তাঁর কণ্ঠবিস্তার ছিল সুবিস্তীর্ণ জায়গা-জুড়ে, এবং স্পষ্ট ও শক্তিশীল। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে স্বপন চৌধুরী তাঁকে তবলায় সহ-যোগিতা করেছেন।

বন্দনা সেনের ফর্ম সেদিন ছিল খুবই উন্নত। ত্রিতালে তাঁর কত্থকটি ছিল সুসংবদ্ধ, পরিচ্ছন্ন। লয়ের ওপর সম্পূর্ণ দখল ও দ্রুতপায়ের কাজে অসামান্য দক্ষতা অর্জনকারী এই শিল্পীর অভিনয় অংশগুলি পুরোপুরিই অভিব্যক্তিতে ভরা ছিল এবং খুবই লাবণ্যমণ্ডিত হয়েছিল। সেটা খুবই প্রশংসনীয় তা বলে তবলার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অত্যন্ত স্বতঃ-স্ফূর্ততার সঙ্গে মুখের বোল ও মুভমেন্টের মধ্যে সমন্বয় সাধন। তবু যদি দর্শকের সঙ্গে কথপোকথনের নাটকীয়তা কিছুটা হ্রাস করা হলে পরিবেশিত অনুষ্ঠানটি আরো ভাল হত। মহাপুরুষ মিশ্রের তবলা সহযোগিতা প্রশংসনীয়। যদিও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তবলার মাইক্রোফোনের ভলিউম খুবই কম ছিল।

উদ্বোধন উৎসবে কালিদাস সান্যাল এবং রায়চাঁদ বড়াল

দুর্গাশংকরের সারাবেহাগ রাগে খেয়াল এবং পরে কাজরি খুবই উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা। এই শিল্পীর কল্পনাশক্তি খুবই প্রবল এবং কল্পনা অত্যন্ত সংযত এবং সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে—বিশেষতঃ শ্রুতি অংশগুলিতে। গোবিন্দ বসু তাঁকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন।

সুভাষ চাকলাদার ঐ সান্ধ্য অনুষ্ঠান শুরু করেন মধুবন্তী রাগে খেয়াল ও একটি ঠুংরী দিয়ে।

দ্বিতীয় দিনে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তই

ছিলেন একমাত্র যন্ত্রশিল্পী। সরোদে তাঁর জয়জয়ন্তী নতুন ও পুরনো ধাঁচের সঙ্গীতের এক আশ্চর্য সমন্বয়। তাঁর পরিবেশিত বাজ অথেনটিক সরোদেরই পরিচয় বহন করেছে। কারিগরী ক্ষমতার জন্যেই সিরিয়াস গায়কী স্টাইলের কঠিন কাজও মহৎ গুণগুলি একত্রীভূত হতে পেরেছে। সঙ্গীতের পুরনো ধাঁচ অক্ষুণ্ণ থাকলেও তাঁর জবা পাখোয়াজ ও রবাবের স্টাইলে সমৃদ্ধ। বাঁ হাতের জটিল কাজের মাধ্যমে তিনি মাঝে মাঝে এমন এক একটি চমৎকার সুরের জন্ম দিচ্ছিলেন—শ্রোতাদের কাছে সেগুলি একেবারেই অভাবিত ছিল। জয়জয়ন্তী-র আলাপ মূলতঃই সেনী, দেশ, অঙ্গের ওপর ভিত্তি করে রচিত এবং সেখানে নটঅঙ্গের কাজও কিছু ছিল। যেমন ধা কোমল নি পা। রাগের অস্তিত্বকে প্রকাশ করার জন্যেই তিনি রেখাব ও পঞ্চম-এর ওপর জোর দিয়েছিলেন। গৎ অংশগুলির মাত্রা ভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট। মাঝে মাঝে প্রায় বারোগুণ বেশী স্পিডে একহারা-র সঙ্গে বোল সংযুক্ত হয়েছিল। খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তেহাই দিয়ে এগুলি শেষ করা হয়েছে। তোড়-কে উপভোগ্য করে তোলার জন্যেই বোলের প্রাচুর্যতা সত্ত্বেও দিদ্রার বোল সংযুক্ত হয়েছিল। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর একটি মাত্রই ত্রুটী, তা হল তিনি স্থানীয় শিল্পী। প্রতিভাবান এই শিল্পী যদি বাইরে থেকে হোমড়া-চোমড়া নাম বহন করে পাগড়ী মেহেদী লাগিয়ে, মেডেল ঝুলিয়ে আসতেন—তাহলে কলকাতার শ্রোতারা তাঁর অনুষ্ঠানটি আরো উপভোগ করতেন। মহাপুরুষ মিশ্র চমৎকারিত্বের সঙ্গে তাঁকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন। তাঁর জবাব বিশেষতঃ তেরে কেটে সঙ্গ, খুবই সূক্ষ্ম, স্পষ্ট এবং যথাযথ ছিল।

পণ্ডিত যশরাজ উক্ত অনুষ্ঠানে খুবই ভাল মেজাজে ছিলেন। তাঁর কণ্ঠ খুবই পরিষ্কার ও নমনীয়—ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর বাগেশ্রী দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাতিয়ালা গায়কীর প্রভাব থাকলেও যশরাজ নিজস্ব একটি স্টাইল গড়ে নিয়েছেন। সঙ্গীতের সৌন্দর্যকে নৈপুণ্য যেন ক্ষতি না করে, সেদিকে তিনি সবিশেষ যত্নবান। যে সাঙ্গীতিক পরিবেশ ইতিমধ্যেই গঠিত, যশরাজ পরিবেশিত

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
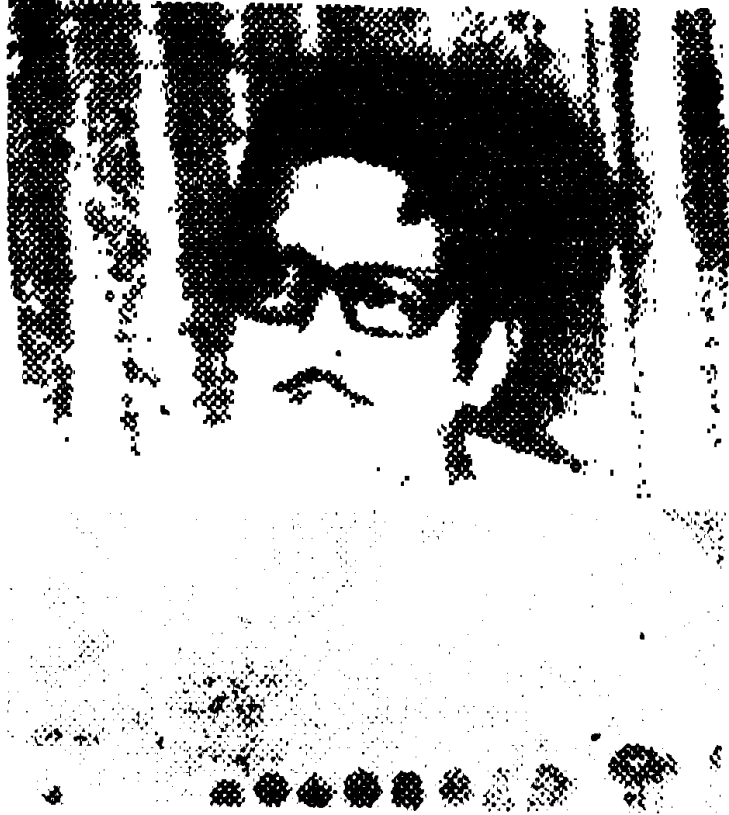
কেদারা ও মালখোষ-এ তা অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

প্রথম দিকে শিপ্রা বসু গেয়েছেন মেঘ। খুবই সুমিষ্ট তাঁর কণ্ঠ। তাল সর্বদাই স্পষ্ট এবং যথাযথ। পরিবেশিত ঠুমরীটি খুবই রীতিবদ্ধ ছিল। তাঁর গানে তাঁর গুরু চিন্ময় লাহিড়ীর ছাপ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় দিনের এই অনুষ্ঠান শুরু করেছেন শিবকুমার চ্যাটার্জি—ইমন-কল্যাণ রাগে খেয়াল দিয়ে। পরে তিনি গেয়েছেন একটি টপ-খেয়াল এবং একটি টপ্পা। শক্তিমান এই গায়ক নিজস্ব একটি ধারা গড়ে নিয়েছেন। তাঁর পরিবেশনায় শতশতাব্দীর বাঙালী সঙ্গীতচর্চার একটি সুস্পষ্টরূপ পাওয়া যায়। খুবই বলিষ্ঠ তাঁর লয়, পরিচ্ছন্ন রাগরূপ। খেয়াল ও টপ্পা—দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর কণ্ঠসঞ্চালন শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, অন্যান্য আরো উপযুক্ত শিল্পীর সঙ্গে এই গুণীশিল্পী এখনো অল ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃক উপেক্ষিত। পণ্ডিত যশরাজ ও শিপ্রা বসুকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন যথাক্রমে স্বপন চৌধুরী ও গোবিন্দ বসু।

সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের এই রজত-জয়ন্তী উৎসবে বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খান। অনুষ্ঠানের দিন তিনি খুবই মেজাজে ছিলেন। সাম্প্রতিক-কালে এটাই ছিল তাঁর বেস্ট কনসার্ট। বাজনার গুণে যেভাবে তিনি সেদিন শ্রোতাদের হৃদয় জয় করেছেন, তা কুড়ি বছর আগে এই সম্মেলনেই দেড়শ মিনিট ধরে বাজানো দেশ-এর কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গেই আজকের বাজনা তুলনীয়। অবিচ্ছিন্নভাবে ডানহাতের স্ট্রোকের মাধ্যমে তিনি যে ভিন্নতর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিলেন—তা সেতারের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এটা জটিল স্বরবৈচিত্র্য কিংবা খুবই সহজে ঢিকারি ছুঁয়ে যাওয়া—যাই হোক না কেন, সমকালীন সেতারবাদকদের কাছে বিলায়েৎ খান এখনো স্বপ্ন। যত সহজে তিনি তাঁর দৈবতগান্ধার যোগ-এ কাব্যগুণসম্পন্ন মীড় ব্যবহার করেছেন, তা প্রকৃতই যে-কোনো সঙ্গীতজ্ঞর কাছে ঈর্ষণীয়। এই সহজ ও সাবলীল ভঙ্গী তাঁর অপ্রথাসিদ্ধ আলাপের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়েছে। খেলনা নিয়ে মেতে থাকা শিশুর মতই তিনি তাঁর খুশীমত সুরের খেলায় মেতে-ছিলেন যেন। হেসে খেলে সেতারে এমন কঠিন কাজ করতে আমরা কাউকে দেখিনি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তো দেখি সেতার বাজাতে গেলে লোকের ভুরু কুঁচকে যায়, হাতের শিরা ফুলে যায়। সেতারকে এমন সহজ করে বাজানো কম কৃতিত্বের কথা নয়। কল্পনা এবং যন্ত্রের ওপর সম্পূর্ণ দখল থাকার জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। মধ্য-তিনতাল গৎ দিয়ে তিনি তাঁর রাগ যোগ শেষ করেছেন। শংকর ঘোষের তবলা ঠেকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখানে যদি শংকর ঘোষ বেশী বাজাতেন, তাহলে তা বিলায়েৎ খানের বাজনার সঙ্গে খাপ খেত না। বিলায়েৎ খানের পিলু খাম্বাজ-এর ঠুমরী এবং ভৈরবী সেদিন এক অনির্বচনীয় স্বাদ এনেছিল। শৈশব থেকে টানা একাগ্র শিক্ষা না থাকলে এটি কোনো-ক্রমেই সম্ভব হত না।

কঙ্কনা ব্যানার্জি তাঁর গুরু আমীর খানের ঢং-এ গেয়েছেন সারোরা—যা কিছুটা মন্থর রীতিবদ্ধ এবং সঠিক। রেখাব ও ধৈবতের ওপর জোর দিয়ে তিনি সেদিন প্রকৃতই একটি সাঙ্গীতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সাহানা পরিবেশনাটি খুবই ভাল। প্রথম দিকের তুলনায় শেষ-দিকে তাঁর আবেগময়তার এক সমূহ পরিচয় পাওয়া গেছে। অত্যন্ত সংযম ও পরি-চ্ছন্নতার সঙ্গে শ্যামল বসু তাঁকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন।

এই দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে অনুরাধা লোহিয়ার নাচ দিয়ে। তাঁর অভিব্যক্তি লাবণ্য এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল।

পাঁচ দিনব্যাপী সারা ভারত সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের শেষ শিল্পী ছিলেন ভীমসেন যোশী। একদা সঙ্গীতস্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত এই শিল্পী সেদিন শ্রোতাদের মনে দাগ কাটতে কোনোক্রমেই সক্ষম হননি। খুবই বেদনাদায়ক বিষয় যে, পুরনো দিনের কোনো ঐতিহ্যই সেদিন তার মধ্যে ছিল না। সুর থেকে না হলেও শতাধিকবার তিনি বিচ্যুত হয়ে পড়ে-ছিলেন। কেবল সঙ্গীতেন্দ্রজ্ঞ ইন্দ্রপুরে

তাঁর অবাধ অনুষ্ঠান শুনেছেন, তাঁরাই অনুমান করতে পেরেছিলেন অতিমাত্রায় অস্বাভাবিক মুভমেন্ট ও আকার-ইঙ্গিত-করণের মাধ্যমে তিনি গাইতে ইচ্ছুক—যদিও অস্পষ্ট স্বরছাড়া তিনি কিছুই দিতে পারেন নি। এটা হয়ত সাময়িকভাবে তাঁর মস্তিষ্ক ভারসাম্যহীন থাকার জন্যে হয়েছে। তাঁর মেঘমল্লার— মুদ্রা কি কালাড়া, মিয়াঁমল্লার ও মেঘ-এর এক জগাখিচুড়ি সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। মিয়াঁমল্লারের মত সুরদাসী-মল্লারেও তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে নি ধা নি সা রিপীট করে গেছেন। মাঝামাঝি জায়গায় তিনি অন্তরায় খেই হারিয়ে ফেলেন এবং শ্রোতাদের আনন্দ দেবার জন্যে বড় হাস্যকরভাবে নির্বাক চলচ্চিত্রের অভিনেতাদের মত শারীরিক অঙ্গভঙ্গী শুরু করে দেন। বর্তমান সমালোচক ভীমসেন যোশীর একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত কিন্তু বাধ্য হয়েই তাঁর জড়িত কণ্ঠে কোমল রেখাবের সময় তাঁকে হল থেকে দুঃখিত হয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। ঐ অনুষ্ঠানে যা খুবই প্রশংসনীয়, তা হল—শ্যামল বসু ও সোহনলাল শর্মার যথাক্রমে তবলা ও হার্মোনিয়ামে সহযোগিতা। তাঁদের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা মূলশিল্পীর ব্যর্থতার জন্যেই বিফলে গেল বলা যায়।

একজন দক্ষ সংগঠক হওয়ার জন্যেই বোধ হয় কালিদাস সান্যালের সঙ্গীত প্রতিভাকে অনেকে ছোট করে দেখেন। সেদিন তিনি খুবই ভাল গেয়েছিলেন। তাঁর গানে একটা আন্তরিকতার ছাপ পাওয়া গেছে। তাঁর সাজগিরি খুবই পরিচ্ছন্নভাবে গঠিত। তানগুলি খুবই পরিষ্কার। সাহসী লয়দারের মত অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তিনি সোমকে স্পর্শ করেছেন। পরে তিনি গেয়েছিলেন সাওনি। সাজগিরির মতই সাওনি খুব কঠিন রাগ। অত্যন্ত সহজভাবে গেয়ে তিনি তালশিক্ষা, স্পষ্ট রাগচিন্তা ও কণ্ঠের ওপর দখলের প্রমাণ রেখেছিলেন। তাঁর ঠুংরী এবং সবশেষের ভজনটি ছিল রীতিবদ্ধ এবং বর্ণাঢ্য। এটাই অবাক হবার বিষয় যে তিনি এই বয়সেও যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন। সঙ্গীতের ওপর প্রগাঢ় ভালবাসা এবং একাগ্র সাধনার জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। গোবিন্দ বসুর তবলা সহযোগিতা বেশ ভাল।

বেহালার জগতে শিশিরকণা ধরচৌধুরী এক স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত শিল্পী। তাঁর স্বরবিস্তারের গতি, ধ্রুপদের আলাপের মতই মন্থর। এরকম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিল্পী ভারতবর্ষে খুব কম আছে। কোনো দিন কোনো চটুল কাজের বিনিময়ে হাততালি নেওয়ার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। শুদ্ধকল্যাণ-এর আলাপে সেদিন তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্যগত আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। সেনী ঘরানা ভিত্তিতে রচিত প্রত্যেকটি পর্দাই সুসংবদ্ধ ছিল। দেশ-এর গতে বেশ কিছু মূল্যবান তার ও ছেহাইয়ের কাজ ছিল। চমৎকার তবলার সহযোগিতা করেছেন শংকর ঘোষ।

ফ্লুটে প্রবীর ঘোষের ইমন আমাদের আশা জাগিয়েছে। তাঁর গৎ কম্পোজিশন আলাউদ্দিন খান ঘরাণার। সলিল চ্যাটার্জির তবলার কাজ উজ্জ্বল এবং প্রতিশ্রুতিময়। তাঁর বাঁয়ার কাজ খুবই ভাল।

প্রতাপনারায়ণের ভীমপলাশী এবং গৌরগিরি মল্লার বেশ ভাল কাজ। রাগরূপ প্রশংসনীয়ভাবে গঠিত। চন্দ্রকুমার চ্যাটার্জির তবলার কাজ পরিচ্ছন্ন সংযত। গুণীর সঙ্গে নিয়মিত বাজানোর ফলেই আজ তিনি পরিণত সংগতদার হিসেবে চিহ্নিত।

শেষ দিনের এই অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছে করবী সেনগুপ্তের নাদ দিয়ে। অত্যন্ত সাবলীল এবং পরিচ্ছন্ন তাঁর পরিবেশনা।

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে আমি নিজে বাজিয়েছিলাম বলে অন্যান্য শিল্পীদের অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ হয়নি।

সুব্রত রায়চৌধুরী

সংযোজন : সন্ধ্যা সেন

বন্যার জোয়ারের সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন পিছিয়ে এল সেই এপ্রিলে। এবার রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপনের উৎসব উদ্বোধন করলেন রায়চাঁদ বড়াল। তাঁর পাশে ছিলেন সংঘ-সচিব কালিদাস সান্যাল। রায়বাবু কালিদাস সান্যাল মহাশয়কে অভিনন্দন জানালেন একাধারে প্রবীণ, তারকাশিল্পী ও উদীয়মানদের অনুষ্ঠানে গত পঁচিশ বছর ধরে নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারাকে অনাহত রাখার জন্য। কালিদাসবাবুও কৃতজ্ঞতা জানালেন সঙ্গীতপ্রেমী সমাজকে, যাঁদের সঙ্গীতের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগই তাঁর এই প্রেরণার উৎস। কিন্তু অনুষ্ঠানের গতানুগতিকতা ছাপিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল রংবাহার ঝিকিমিকি এক মুখর অতীতের ছবি। অন্যভাবে বলা যায় এই লেখিকার জন্মেরও আগে সঙ্গীত সম্মেলন গড়ে ওঠার আদিযুগের ইতিহাসের একটি পাতা যেন চোখের সামনে কে খুলে দিল।

সুব্রত রায়চৌধুরী

সুনন্দা পট্টনায়ক

তখনও জনসাধারণের দরবারে এইসব কনফারেন্সের মাধ্যমে বরেণ্য সঙ্গীতসাধকরা পৌঁছননি। কিন্তু এই কলকাতারই বুকে তামাম হিন্দুস্থানের শিল্পীদের জড় করে তাঁদের ধ্রুপদ, খেয়াল ঠুংরী-গজলে রাতকে সুরের স্বপ্নে মায়াময় করে তোলায় যাঁরা মেতে উঠেছিলেন তাঁদেরই অন্যতম ছেলো বৌবাজারের বড়াল বাড়ীর তখনকার রায়চাঁদ বড়াল। দশাসই চেহারা, বিরাট পাকানো গোঁপ রাইবাবুর আমন্ত্রণকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেননি, এমন শিল্পী কে ছিলেন ?

সেদিন সদারং-এর রজত জয়ন্তী উৎসবের মুহূর্তে মনে হল ভারতীয় সঙ্গীত-সম্মেলনের যে ধারা মুষ্টিমেয় কিছু ধনীর গৃহউৎসবে সীমিত ছিল, আজ তার প্রবল-স্রোত জনমানসকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—এক ধ্যানলোকের পানে। সকাল-সন্ধ্যায়, ঘরে-ঘরে আজ গান ও যন্ত্রসঙ্গীতের রেওয়াজ, প্রতি সন্ধ্যায় প্রতিটি মঞ্চে সন্ধ্যারতির মত গানের মজলিশ—এ সবের মূলেও ছিল এঁদের মত সঙ্গীতপ্রেমীদেরই প্রচেষ্টা ? এই উৎসবকে রায়বাবুর অভিনন্দনে মনে হল যেন আদি-যুগের সঙ্গীতসভার প্রবর্তক উত্তরসুরীর হাতে তুলে দিলেন এক মহান, কল্যাণময় দায়িত্ব, যার ভার ও ধার দুই-এর সম্বন্ধেই সমতা সচেতনতা প্রয়োজন। ক্লান্ত, প্রবীণ, রোগজীর্ণ আজ এঁদের উদ্যমের আলোয় নিজের প্রেরণাকে মিশিয়ে দিতে চান।

গানবাজনার আসরের বিস্তারিত সমালোচনা করেছেন আমার অনুজপ্রতিম সুব্রত। বিদগ্ধচিত্তের সৌজন্যবশতই তিনি বাদ দিয়েছেন নিজের অনুষ্ঠানের আলোচনা।

এবারের যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে বিলায়েৎ খাঁ সাহেব অথবা শিশিরকণাকে বাদ দিলে, যে দুটি আকর্ষণীয় শিল্পীর কথা মনে আসে তাঁরা নিঃসন্দেহে সুব্রত রায়চৌধুরী ও বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত।

বুদ্ধদেববাবুর (সুব্রতর নিবন্ধে আলোচিত) যন্ত্রসংগীতের একটি পুরানো ঘরাণার বাজনশৈলীর অতি বিশ্বস্ত রূপ তুলে ধরেছেন। ইনি রাধিকামোহন মৈত্রের

শিষ্য। সরোদী আমীর খাঁনের ঘরের বাজ, তোড়া, স্বরূপ-পরিসরে রাগের পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরার অনায়াস দক্ষতা, সব মিলিয়ে তাঁর জয়জয়ন্তী শ্রোতাদের চিত্তে এক মধুর আবেদন রেখেছে।

সুব্রত রায়চৌধুরীর সেতারে শোনা গেল শুদ্ধ-বসন্ত। —সুব্রত রায়চৌধুরী একান্তভাবে কোনো বিশেষ ঘরাণা বা বাদন-শৈলীর অনুসারী নন। তাঁর বাজনায় আলাদা একটা স্বাদবৈচিত্র্য আছে। প্রতি-বারের অনুষ্ঠানেই তাঁর প্রগতিশীল মনটির পরিচয় মেলে। এর আগের বাজনায় তাঁর তান ও ঝালার ছন্দে, বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের প্রভাবটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এবারে আলাপের অঙ্গ ধ্রুপদী কাঠামোয় সুবিন্যস্ত। বিলম্বিত, জোড়, থেকে সুরু করে ঝালা অবধি নানা ছাঁদের ছন্দ, মীড়ের স্পন্দন ধ্বনিসমারোহের মধ্যে একটি আইডিয়ার মননশীল বিস্তারকেই সুব্রত প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

গতের অঙ্গে ঝাঁপতাল, মধ্যলয় ত্রিতাল, একতাল এবং দ্রুত তিনতালের বিভিন্ন পর্যায়ে—তাঁর লয়-কুশলতাও শ্রোতাদের কাছে এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছিল। বিচ্ছিন্ন স্বরসংগমের মাধুর্যে তাঁর রঙিন-মনটির স্পর্শ মিলেছিল। এতগুলি বৈচিত্র্যের মধ্যেও রাগসঙ্গীতের ঐতিহ্য থেকে তিনি এতটুকুও সরে যাননি। বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর কাছে পাওয়া বীণকার ঘরাণার বিস্তারের বাঁধুনী যেমন দৃঢ়, তেমনই গাম্ভীর্যমণ্ডিত জাগারদের কাছে শিক্ষায় ফলশ্রুতি দিলো যন্ত্রের অনুরণনে ত্রমতানানা-র মত রেশ।

স্বপন চৌধুরী দক্ষতার সঙ্গে আগা-গোড়া তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করেছেন—বিশেষ উল্লেখ্য সাথ-সঙ্গতের পর্যায়।

সদারঙ্গের রাত্রজয়ন্তী উৎসবে সুনন্দা পট্টনায়কের গান শুনতে শুনতে মনে পড়-ছিল অনেক কথা। ১৯৫৭ সাল। মহাজাতি সদন, সদন তখনও অসম্পূর্ণ। সেই আসরে হঠাৎ মঞ্চে এলেন ছিপছিপে একহারা সুদর্শনা এক কিশোরী। পিঠের দুপাশে যুগলবেণী প্রলম্বিত। কপালে কালো টিপ। পরণে ছাই রং-এর শাড়ী। রিনরিনে মধ্য ও ভরাটের মিলনে সমৃদ্ধ অপরূপ কণ্ঠে জয়-জয়ন্তী গেয়ে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়ে-ছিলেন। এসেছিলেন বিনা দক্ষিণায় গাইতে। কিন্তু প্রথম গানের পরই গুণ-গ্রাহী ঘোষিত অজস্র সোনার পদক, মোটা টাকার চেক উপহারের সঙ্গে সঙ্গে একদিনের জায়গায় তিনদিন অনুষ্ঠান বিস্তার, দরবারের যুগে শিল্পীদের ইনাম পাওয়ার ঘটনাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল।

প্রথম দিনের প্রথম অনুষ্ঠানেই তিনি স্টার হয়ে গিয়েছিলেন। আজ দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে সারা ভারতে তাঁকে শুনছে, নিজের উচ্চ মান অন্তরমুখীন গভীরতা থেকে এতটুকুও সরে আসেননি।

তাঁর আজকের শুভ্রবেশ, প্রশান্ত গম্ভীর ভঙ্গির মত রাগের প্রকাশভঙ্গিও আরো গম্ভীর, থমথমে, উপলব্ধির গাঢ়তায় মর্ম-দ্রাবী। সঙ্গীতজগতের অবশ্যম্ভাবী রাজ-নীতি, বিদ্বেষের হীন উত্তেজনা, সুপরি-কল্পিত আক্রমণ ও বিরুদ্ধ রটনাও তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তাকে এতটুকুও ম্লান করতে পারেনি—সে কি তাঁর সমাজের সকল কোলা-হল থেকে দূরে থেকে ত্যাগ, তপস্যা ও জন্মগত বিবাগী মনের শক্তির কারণে?

কালিদাস সান্যালের গান এই প্রথম শোনা গেল সদারং সঙ্গীত সম্মেলনে। সংগঠক হিসাবে তাঁর শক্তি প্রশ্নের অতীত। কিন্তু শিল্পী হিসাবেও তাঁর কাছে আমরা পাবার মতই পেতে পারতাম, যদি এ দিকটাতে তিনি আরও বেশী মন দিতেন। এবারে তাঁর রূপক তালের শাওনী শুনতে শুনতে এই কথাটিই মনে হয়েছে, কারণ রামপুর ঘরাণার স্বচ্ছ রাগ রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এতে ছিল তাঁর শিল্পীমনের কল্পনার রং।

তবলায় সঙ্গতে — শংকর ঘোষের ব্যক্তিত্বের নানামুখী দিকটি এই সম্মেলনে বিশেষভাবে নজরে এসেছে। বিলায়েৎ খাঁ-সাহেবের সঙ্গে তিনি বাজিয়েছেন একেবারে বিশ্বস্ত অনুসারীর মত। এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে জাহির করবার অসংযম খাঁ-সাহেবের সুরের প্রবাহকে বিচলিত করেনি। আবার শিশিরকণার সঙ্গে বাজানোর সময় সঙ্গতের প্রশস্ত অবকাশকে মনোহর ছন্দে, তেহাই-এর আড়ি-দেড়ীর বংকিম গতি চমক-প্রদ সাসপেন্সে তাঁর সঙ্গতে যেন মূল বাজনার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের টপখেয়াল পায়-বিস্মৃত প্রাচীন বৈঠকী আসরের মেজাজকে যেন ক্ষণকালের জন্য জীবন্ত করে তুলেছিল। এমন সব গুণী এই গুণগ্রাহী কলকাতার আসরে অবহেলিত।

ওসমান খাঁ'র বাজনা

কয়েক দিন আগে শ্রীমতী আশা গাদ-গিল আয়োজিত এক সান্ধ্য-আসরে পুণার শিল্পী ওস্তাদ ওসমান খাঁর বাজনা শুনলাম বিড়লা একাডেমীতে। শিল্পীকে শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ওমর খান।

ওসমান খাঁ সাহেবের পিতামহ ওস্তাদ রহমত খাঁ সাহেবের শিষ্য ছিলেন। বংশ-পরম্পরায় বন্দে আলি খাঁ সাহেবের ঘরাণার তালিম পেলেও নিজের ভাবনামাফিক এক বাদনশৈলীতেই তিনি বাজিয়ে থাকেন বলে জানালেন।

সেদিনের অনুষ্ঠান শুরু হল ইমন দিয়ে। শিল্পীর রাগ বিশ্লেষণ সুষ্ঠু, পরিচ্ছন্ন। তারিফ করবার মত বস্তু হল তাঁর সুরেলা হাত। ছোট আলাপে ইনি ইমনের গম্ভীর ভাবটির প্রতি আলোকপাত করেছেন। তীব্র মধ্যম ও গান্ধারের ভূমিকাও প্রাঞ্জল রূপ পেয়েছে এঁর রাগ-বিশ্লেষণে। গতের সঙ্গে বেশীর ভাগ তানই মধ্য ও মন্দ্রসপ্তকের সীমায় রেখে ওসমান খাঁ সাহেব ইমন রাগের শান্ত ভাবটির প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন। তানের পর্যায়ে ইনি দারুণ কিছু করবার কেরামতীর দিকে না যেয়ে সহজ সরল সাপট ও মাঝে মাঝে বোল-তানের প্রয়োগে পরিমিতি বোধেরই স্বাক্ষর রেখেছেন। মীড়ের কাজ মনোরম। সাম-গ্রিকভাবে দেখলে অসাধারণ কোনো শিল্প-কৃতি যে তাঁর বাজনাকে অন্যের থেকে আলাদা করেছিল তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম থেকে শেষ অবধি তাঁর বাজনা শুনতে ভাল লেগেছিল একটা নিটোল সুরের মধু-রতার জন্য। এই সুর বোধহয় তাঁর নিজস্ব বস্তু।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। আসামে অন্যান্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত

১৯ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬
25 May 1979

আগামী সংখ্যায়

কলকাতায় উড়াল ট্রেন চাই
লিখেছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী
বিজনকুমার ঘোষ ও
গোপাল ভট্টাচার্যের গল্প
ভবেশ সান্যালের
প্রাচ্যশিল্পের তীর্থে তীর্থে

ভারতের আদি ইতিহাস

ভারত একটি প্রাচীন দেশ। কিন্তু তার সভ্যতা কতো প্রাচীন সে বিষয়ে সকলে একমত নন। বিদেশী পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন, তিন বা সাড়ে তিন হাজার বছর আগে থেকে ভারতে সভ্যতার বিকাশ হতে শুরু করেছে। ভারতীয় মনীষীদের কেউ কেউ তাকে ছ' হাজার বছর পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন।

অবিশ্যি সভ্যতা বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। সভ্যতার শুরু যদি শুধু বর্ণলিপির আবিষ্কারের পর থেকেই ধরা হয়, কাজটা তাহলে সহজ হয়। কিন্তু পাথর দিয়ে নানা আকারে অস্ত্র তৈরি, পোড়ামাটির ঘট বানানো, নানা ছাঁদের পাত্র তৈরি করা এবং তাতে নানাবর্ণের আকৃতি আঁকা, এগুলোকেও সভ্যতার এক আদিম স্তর হিসেবেই গ্রহণ করা হয়।

ভারতের এই ধরনের সভ্যতার অস্তিত্ব হরপ্পা মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত হয়েছে বহুকাল আগেই। ইদানীং তার চেয়েও পুরানো কিছু সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল উত্তরভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। সম্প্রতি লখনৌয়ের কাছে এক জায়গায় খননকার্যের অনুসন্ধানে পোড়ামাটির পাত্রের গায়ে এমন একটি চিরুনি-আকৃতির কালো রঙের প্রতীক দেখতে পাওয়া গেছে, যা পণ্ডিতেরা অনুমান করেন আসেরিয়া বা সিরিয়া থেকে এসেছে ভাবতে। ক্রীট দ্বীপেও দেখা গেছে এই কালো রঙের প্রতীকটি।

তাছাড়া খননের ফলে নলযুক্ত পাত্র, পিদিম আকারের ওষ্ঠযুক্ত পাত্র, গোলাকার পাত্র, পাদানীর ওপর ছিদ্রযুক্ত কুঁজো-সদৃশ পাত্র ইত্যাদি যা পাওয়া গেছে সেই ধরনের জিনিসপত্র ইতিপূর্বে এলাহাবাদ, বারাণসী, গয়া, মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডু রাজার ঢিবিতেও আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে অনুমান হয়, উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছ সাত হাজার বছর আগেও একটি আদিম সভ্যতা বিকাশলাভ করেছিল।

এবং সব থেকে যা বিস্ময়ের, সেই সভ্যতা যে আদিমতার স্তর অতিক্রম করে লিপিকুশল সভ্যতার যুগে উত্তীর্ণ হয়েছিল তারও নিদর্শন পাওয়া গেছে লখনৌয়ের সেই অনুসন্ধানের ফলে। নদীতে এমন কতকগুলো নুড়ি পাথর পাওয়া গেছে যাতে নব-প্রস্তর যুগের বর্ণমালার আভাস পাওয়া যায়।

গঙ্গা নদীর উপত্যকা অঞ্চলের এই আদি যুগের সভ্যতা সাত হাজার বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করছেন পণ্ডিতেরা। এবং এই অঞ্চলে যারা বাস করত তারাই ছিল পরবর্তীকালের পুরাণ মহাকাব্যের নিষাদ, পুলিন্দ, শবর প্রমুখ জাতি।

কবি বলেছেন, মহাভারতের কথা অমৃত সমান। দেখা যাচ্ছে, ভারতের কথাও একই রকম অমৃত সমান।

সাহিত্য ইত্যাদি

সাহিত্যে নাগরিকতা ও গ্রামীণতা

বাংলা সাহিত্যে যিনি বনফুল নামে খ্যাত, তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। যেমন আরো অনেকের সঙ্গেই তাঁর তা ছিল। কেননা বনফুল ছিলেন খুবই সদালাপী, স্নেহপরায়ণ মানুষ। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করা, এবং সম্ভব হলে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করা— এতে ছিল তাঁর সহজাত নৈপুণ্য। কাজেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার পর নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক বজায় রাখা কঠিনই হোত।

সূত্রপাতটি ঘটে এইভাবে।

সাহিত্য সংক্রান্ত কোনো একটি ব্যাপারে চিঠি লিখেছিলাম একবার। নিতান্তই আনুষ্ঠানিক চিঠি। তিনি তার উত্তরে ভাই বলে সম্বোধন করে যা লেখার লিখে শেষ করেছিলেন, ইতি তোমার বলাইদা বলে। তখনো তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অচেনা একটি মানুষের দাদা হয়ে যেতে তাঁর কিছুমাত্রও আটকায়নি।

ঘটনাটি আমার কাছে নতুন মনে হয়েছিল, এবং আমাকে স্পর্শও করেছিল। কারণ দৈবক্রমে আমি সাহিত্যের যে ধারাটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম আগে। সেখানে এরকম ব্যাপার অকল্পনীয়ই ছিল। আমরা ছিলাম আপাদ-মস্তক আধুনিক। নাগরিকতার সাধনাই ছিল আমাদের কায়মনোবাক্যে লক্ষ্য। কাউকে হঠাৎ ভাই বলা, কিম্বা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে কারো দাদা হয়ে যাওয়া, সে জগতে ছিল গ্রাম্যতার নামান্তর।

বনফুলে দেখা গেল এসব 'প্রোটোকল' এর তোয়াক্কা রাখেন না। তিনি যে অন্য জগতের মানুষ তাতে আর সংশয় রইল না।

যাহোক, এগুলো আমার আসল বক্তব্য নয়। আমার প্রশ্ন হল, জীবনযাত্রার যে ধরণগুলোকে আমরা 'গ্রাম্যতা' বলি তা কি নিতান্তই খারাপ? কিম্বা অন্যপক্ষে যেসব আচার-আচরণ নাগরিকতা বলে চর্চা করি, তা কি নিকষিত [illegible] তা মূল্যবান?

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আমার চেয়ে আঠারো বছরের বড় ছিলেন। দেখাও হয়েছিল সেই বয়সে যখন আমি সবে দাড়ি কামাতে শুরু করেছি। কিন্তু ঐটুকু বয়স থেকেই আমাকে আপনি বলতেন। গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ছিলেন আরো বড়, তিনিও আপনি ছাড়া তুমিতে নামেননি। এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ততোধিক বড়, তিনিও আপনি চালিয়ে গেছেন। এক হিসেবে তিনি আমার অধ্যাপকও ছিলেন, কিন্তু তাতেও তাঁকে নিরস্ত (বা পরাস্ত) করা যায়নি। মিষ্টি করে হেসে বলতেন, এসব হল স্যার গুরুদাসের শিক্ষা। তিনিও আপনি বলতেন।

আপনি-র রেওয়াজ তখন এমনভাবেই চেপে বসেছে যে মৌচাক-সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার থেকে সঙ্গীতাচার্য বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বা শিল্পী অতুল বসু, কেউই তুমির কথা ভাবতে পারেন নি। আমার দার্জিলিঙের অধ্যাপক এবং অধ্যাপনা স্থানীয়রা, তাঁরাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটান নি। যেমন হুমায়ুন কবীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং নীহাররঞ্জন রায়। এঁদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল নিতান্তই অল্পবয়সে। কিন্তু ঐ যে সম্পূর্ণ নাগরিক জীবনের যা মূল শিক্ষা অর্থাৎ ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসেবে দেখা এবং তার স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া, তারই তাগিদে এঁরা ছোটদেরকেও সমকক্ষের আসনে ঠাঁই দিতেন।

বনফুলের সঙ্গে আলাপ হবার পর অন্য একটি জগতের সন্ধান পেলাম। আসলে এই জগতটি আমার কাছাকাছিই ছিল এবং সম্ভবত আমি তারই ভেতর। কিন্তু সচেতন ছিলাম না। বনফুলের সংস্পর্শে এসে নতুন করে টের পেলাম।

অবিশ্যি তার মানে এ নয় যে, কলকাতার বড় বড় সাহিত্যিকরা সকলেই আমাকে 'আপনি আজ্ঞে' করতেন। মোটেই তা নয়। আর আমিও কাউকে দাদা বলতাম না তাও নয়।

আমার অধ্যাপক সাহিত্যিকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু আর বিষ্ণুবাবু প্রথম থেকেই তুমি বলতেন। তারাশঙ্করবাবুও বলতেন। আর শুধু 'তুমি' নয়, মাঝে মাঝে 'তুইও'। কারণ তাঁর বড় ছেলে আর বড় জামাই ছিল আমার বন্ধু। প্রেমেন্দ্র মিত্রও তুমি বলেন। এবং অন্য কারো বেলায় যা কখনো করিনি, আমি তাঁকে বলতে শুরু করি প্রেমেনদা। কারণ সকলেই তাঁকে তাই বলে ডাকতেন। অন্যভাবে যে ডাকা যায় তা ভাবতেই পারি নি বোধহয়। (যেমন যামিনী রায়কেও বলতাম যামিনীদা, আমার চেয়ে প্রায় তিরিশ বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও।)

তা যাক। বনফুল-এর সঙ্গে আলাপ হবার পর নতুন যে জিনিসটির বিষয়ে সচেতন হলাম তা হল, বাংলা সাহিত্যের আসল সমস্যা হল। দুটো আলাদা ধরনের সংস্কৃতির মধ্যে সংঘাত।

কথাটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা যাক।

পাঠক, এই যে এতক্ষণ ধরে 'আপনি' আর 'তুমি' নিয়ে কচকচি করছিলাম সেটা রম্যরচনা ফাঁদার জন্যে নয়। 'আপনি' আর 'তুমি' বেছে নিয়েছিলাম আমি প্রতীক হিসেবে। ঐ দুটি শব্দের তলায় রয়েছে দুটি ভিন্ন ধরনের অ্যাটিচিউড। (মানে কি? দৃষ্টিভঙ্গি? না বোধহয়। অ্যাটিচিউড দৃষ্টিভঙ্গির থেকেও বেশি কিছু।) এর তলায় রয়েছে জীবনযাত্রার বিষয়ে ভিন্নমুখী দুটি বিশিষ্ট জাতের ধারণাপুঞ্জ, এবং মূল্যবোধ। ভিন্ন জাতের এইসব মূল্যবোধের যোগফল থেকেই উৎপন্ন হয় নাগরিকতা ও গ্রামীনতা। (না 'গ্রাম্যতা' নয়!) প্রথমটি হল শিল্পসভ্যতার দান। দ্বিতীয়টি কৃষিসভ্যতার ঐতিহ্য। দ্বিতীয়টিই প্রাচীন। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই। মানবসভ্যতার বিকাশের ছন্দ মোটামুটি একরকমই। প্রথমে কৃষি, তারপর যন্ত্রশিল্প। জীবনযাত্রায় এই ভিন্নমুখী পদ্ধতির ফলে সংঘাতও তাই অনিবার্য। কখনো তা নীরবে ঘটে, কখনো সরবে। আবার কখনো বা থাকে মাখামাখি হয়ে। একটা থেকে অন্যটাকে চিনে নেওয়াই শক্ত।

বনফুলের কিছু কিছু সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। [illegible] দেখলাম, তিনি তিরিশের কল্লোলী লেখকদের ধার করা, ভুঁইফোঁড় ইত্যাদি বলে বিদ্রূপ করে মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন, সাহিত্যে তাঁরা দাগও রাখতে পারেন নি।

কল্লোলী লেখকরা ধার করাও নন, ভুঁইফোঁড়ও নন। তাঁরা যে কাঁচাও লেখক সে তর্ক অবান্তর। আসল কথা হল তাঁরা এই নতুন মূল্যবোধের বিষয়ে সচেতন হচ্ছিলেন, যার সামাজিক ভিত্তি এদেশেই তৈরি হচ্ছিল। অর্থাৎ কৃষি-সভ্যতার পাশাপাশি মাথা তুলতে চাইছিল আধুনিককালের শিল্পসভ্যতা। তারই কিছু কিছু ছাপ পড়েছে তাঁদের কিছু কিছু লেখায়। তাকে বিদেশী বলা চলে না। দুঃখের কথা বরং এইটেই যে, নতুনের পদধ্বনি যা তাঁরা শোনার চেষ্টা করছিলেন, সে প্রয়াসে ইস্তফা দিয়ে অনেকেই তাঁরা পুরনো আয়াসে গা এলিয়ে দিলেন।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রও তাই নব-নবরূপে দেখা দিতে লাগলেন।

অসমাপ্তি [illegible]।

অশীন্দ্র রায়

হারানো বই

সেই ১৩২৬ সালে এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে বেরিয়েছিল পোকা-মাকড় নামে একখানা ৩৬০ পৃষ্ঠার বই। পাতায় পাতায় ছবি। ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা পাঠ্য বই। লেখকের নাম জগদানন্দ রায়। মৌলিক রচনা। কিন্তু এ-জাতীয় বই এর আগেই কেবল নয়, তারপরও বহুকাল লেখা হয়নি। ১৯৭৪-৭৫ সালে গোপাল ভট্টাচার্য বাঙলার কীটপতঙ্গ নামে একখানা বই লিখে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধের সংকলন এটি। জগদানন্দদের সময় এমন দুর্লভ সম্মান প্রাপ্তির প্রলোভন ছিল না। বিদগ্ধজনস্বীকৃতির সম্ভাবনাও ছিল দুরাশা মাত্র। তবুও ওঁরা কাজ করেছেন। বইপত্তর ছিল না তেমন। অথচ পড়াতে গিয়ে বিস্তর অসুবিধে। যা দেখেন, বোঝেন, তাই পড়ান। অবশেষে রবি ঠাকুরের নির্দেশে বই লেখা। আর সেসব বই যেমন মৌলিক, তেমনি চিরন্তন। আজও পড়তে গিয়ে চমকাতে হয়। ওঁর বইয়ের ছবি প্রায় সবই শান্তিনিকেতনের সে সময়কার শিল্পী-দের আঁকা।

নিবেদনে জগদানন্দ বলেছেন : 'পুস্তক-খানি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিয়াছি, এজন্য যে সকল পোকামাকড় আমরা সর্বদা দেখিতে পাই, তাহাদেরি জীবনবৃত্তান্ত ইহাতে বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রাণীদের শ্রেণী-করিবার চেষ্টা ইহাতে আছে। কিন্তু, পাছে বইখানি নীরস হয়—এই ভাবিয়া বিশেষ শ্রেণী-বিভাগে দৃষ্টি রাখি নাই।' শুরু করেছেন জীবের উৎপত্তি দিয়ে। প্রাণীর সংখ্যা, প্রাণীর বংশ বৃদ্ধির কথা। প্রাণী হত্যার কারণকে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাণীর নানা শাখার আলোচনায় আছে আমিবা, খড়িমাটির পোকা, স্পঞ্জ, হাইড্রা, রাবণছত্র, প্রবাল, তারা-মাছ, কেঁচো, জোঁক, কৃমি, চিংড়ি, কাঁকড়া, পতঙ্গ বোলতা, ভীমরুল, কুমরে-পোকা, কাঁচ-পোকা, মৌমাছি, পিঁপড়ে, উঁই, জলফড়িং, ভুঁই-কুমীর, পাখির গায়ের উকুন, গোবরে পোকা, ধামসা, জোনাক-পোকা, প্রজাপতি, গুটিপোকা,, মাছি, মশা, ছারপোকা, ফড়িং, উচ্চিংড়ে ও ঘুরঘুরে পোকা, আরশুলা, মাকড়সা, কাঁকড়া-বিছা, কেন্নো, শংখ, শামুক, গুগলি—এতগুলি পোকা-মাকড় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন জগদা-নন্দবাবু। বিভিন্ন পোকা-মাকড়ের শাখা-প্রশাখা নিয়েও আছে অনেক কথা। তিনি কোন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। কিন্তু বস্তু বিশ্লেষণে দক্ষ বৈজ্ঞানিকের মানসিক গঠন ও চিন্তাধারার ছাপ সুস্পষ্ট। সুদীর্ঘকাল ধরে এইসব প্রাণীজগৎকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন বলেই, তাঁর পক্ষে এই জাতীয় অসাধারণ বই লেখা সম্ভব হয়েছিল।

পোকামাকড়

'প্রায় আটশত বৎসর পূর্বের লেখা 'সন্দর্শন সমুচ্চয়' নামে আমাদের একখানি প্রাচীন পুঁথি আছে। গাছরা কখন শিশু থাকে, কখন যুবা হয় এবং কখনই বা বুড়ো হইয়া পড়ে, এই পুঁথিতে তাহার আলোচনা আছে। তাছাড়া কোন্ কোন গাছ রাত্রিতে পাতা বুজাইয়া ঘুমায় এবং কোন গাছরা ছোঁয়াচ পাইলে লজ্জাবতী লতার মত পাতা গুটায় এইসব কথাও তাহাতে আছে।' —জগদানন্দ রায় তাঁর গাছপালা বইয়ে লিখেছিলেন। সেই একই সমস্যা। ছেলে-মেয়েদের পড়াতে হবে, জানাতে হবে গাছের সংসারের সংবাদ। বই নেই। লিখতে হল নিজেকেই। বাঙলা ভাষায় তখন এরকম বই কোথায়! 'গাছপালায়' বাঙলাদেশের সাধারণ গাছপালার পরিচয় দিয়েছেন। গাছের দেহ ও আয়ু, শিকড়ের কাজ ও খাদ্য, লতা, শুঁড়ি, গাছের কোষ, দ্বিবীজপত্রী গাছ, গাছের ছালপাতা, গাছের খাদ্য ভাণ্ডার, পরগাছা, পোকা খেগো গাছ, গাছের ঘুম, কুঁড়ি, ফুল, ফলের উৎপত্তি, গাছের বংশ-বিস্তার, অপুষ্পক গাছ, ফার্ণ, শেওলা, ব্যাঙের ছাতা, মদ্যানু, পানা নিয়ে আলোচনার সঙ্গে গাছের শ্রেণী বিভাগ করেছেন। আরও অনেক প্রসঙ্গে সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। এ বইখানিও ছবিতে ভরা।

গাছপালা নিয়ে ইদানিং কোন বইলেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। বেশ কয়েক বছর আগে ডঃ তারকমোহন দাশের 'আমার ঘরের আশেপাশে' বেরিয়েছিল। বইটির সংস্করণও হয়। খুব সম্ভবত এখন ছাপা নেই। বইটির ভাষা সুন্দর। আর ডঃ দাশ এই বিষয়ের একজন অভিজ্ঞ মানুষ হওয়ায় অনেক রকম গাছের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও করেছেন। রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির এই সম্পদকে সশ্রদ্ধভাবে তাঁর রচনায় নানাভাবে উল্লেখ করেছেন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার কথা সকলেরই জানা।

জগদানন্দবাবু যখন লিখেছিলেন তখ[ন] হাতের কাছে তৈরি উপাদান ছিল না আ[র] উৎসাহী লোকেরও অভাব ছিল। এখ[ন] সমস্যা মিটেছে। উপাদান আছে। শিক্ষা জগত বিস্তৃত হয়েছে। সম্ভবত উৎসাহী লোকের অভাব। যে কারণে, দীর্ঘকাল এ সম্পর্কে নতুন কোন বই চোখে পড়ল না

এর আগে একটি সংখ্যায় সুধীন্দ্রলা[ল] রায়ের 'বাংলার পরিচিত পাখী' নি[য়ে] লিখেছিলাম। সেখানে জগদানন্দবাবু 'বাংলার পাখী' বইয়ের নাম উল্লেখ করে ছিলাম মাত্র। হঠাৎ বইটি পেয়ে যাই পুরনো বইয়ের দোকানে। ছোট্ট বই।

বাংলায় পাখির অভাব নেই। ঋ[তু] অনুসারে এদের দর্শন মেলে। আ[বার] আঞ্চলিক পাখিও আছে। যেখানে এদে[র] জল-হাওয়া ভাল লেগে যায়, সেই পরিবে[শ] ত্যাগ করে অন্য কোথাও যেতে পারে না। যাযাবর পাখিরও সংখ্যা কম নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পাখি নানান ঋতুতে এখানে আসে। বহু পাখির বংশ শিকারী-দের হাতে শেষ হয়ে গেছে। এখনও যেসব পাখি চোখে পড়ে, তার যথার্থ আদম-সুমারী হওয়া দরকার। রঙীন ছবি তুলে না রাখলে, দৈনন্দিন আচরণ, জীবন ধারণ পদ্ধতি—এসব বিষয়ে বিবরণ সংগ্রহ না করলে, অতীতের বহু পাখির মত এরাও হারিয়ে যাবে।

জগদানন্দের 'বাঙলার পাখী'তে ৫৬টি পাখির কথা আছে। এরা সবাই আমাদের চেনাজানা। 'পাখীরা ত আমাদের প্রতিবেশী সমস্ত দিন আমাদের গ্রামেরই মাঠে-ঘাটে চরিয়া পেট ভরায়। তাহাদের সব খবর আমাদের জানিয়া রাখা উচিত নয় কি? এইজন্য সাধারণ জানা-শুনা কতকগুলি পাখীর কথা তোমাদিগকে বলিব।' সেই সঙ্গে আছে ছবি। ছবি এঁকেছিলেন নন্দলাল বসু।

'শব্দ' গ্রন্থের নিবেদনে লেখক বলেছেন : 'যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনায় শব্দ-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব বুঝিবার সুযোগ আছে, পুস্তকে সেইগুলিরই উল্লেখ করিয়া, বিষয়গুলিকে সুব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।' বইটি উৎসর্গ করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। বলা যায়, জগদানন্দের সব থেকে ভারী প্রবন্ধের এই 'বৈজ্ঞানিকী'। বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ। লেখাগুলি প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকায় বেরিয়েছিল। লেখকের কথায় "অ-বৈজ্ঞানিক পাঠক সাধারণ যাহাতে আলোচিত-তত্ত্বগুলিকে অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারেন, প্রবন্ধ রচনাকালে সর্বত্র তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি।"

জগদানন্দের মাত্র দশখানি বই বেরোয়নি আরও বই লিখেছিলেন। ছোটদের জন্য লেখা বই হল প্রকৃতি পরিচয়, গ্রহনক্ষত্র,

বৈজ্ঞানিকী জয় স্যার জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার। ছোটদের জন্য লেখা বই-এর মধ্যে আছে—গ্রহনক্ষত্র, বিজ্ঞানের গল্প, গাছপালা, পোকা-মাকড়, মাছ-ব্যাঙ-সাপ, পাখী, বাংলার পাখী, শব্দ, আলো, চুম্বক, স্থিরবিদ্যুৎ, স্থির বিদ্যুৎ আর নক্ষত্র চেনা।। এর মধ্যে গাছপালা, পোকামাকড়, মাছ-ব্যাঙ-সাপ, পাখী, বাংলার পাখী এই পাঁচখানি বইয়ের সমপর্যায়ের বা মানের কোন বই আজও বাঙলা ভাষায় লেখা হয় নি। অন্তত এই কয়েকখানি বই এখুনি ছাপা হওয়া দরকার।

মানুষ জগদানন্দের পরিচয় কি? শিলাইদহ জমিদারীর কর্মচারী, রবীন্দ্রনাথের ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক জগদানন্দ 'আচার্যাশ্রমের' শিক্ষক হয়েছিলেন, কারো দাবিতে নয়, নিজের দক্ষতায়ও ছেলেমেয়েদের পড়ান, অনুসন্ধান, গানবাজনা, অভিনয় আর বিশ্বভারতীর দায়িত্ব—সব নিয়ে এই কর্মব্যস্ত মানুষটির জীবনের খবর আজ আর কেউ বা রাখে। উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু স্বশিক্ষিত মানুষ ছিলেন তিনি। যা একান্তই দুর্লভ। জগৎ সম্পর্কে ও'র অনুসন্ধিৎসা ছিল অন্তহীন। কর্মব্যস্ত জীবন, অথচ নিজের গবেষণার কাজে কখনও অবহেলা করেন নি। বাংলার পাখির ভূমিকায় লিখেছিলেন : "আমাদের চোখের সম্মুখে সর্বদাই নানা ঘটনা ঘটে। চোখ খুলিয়া সেগুলিকে দেখা এবং দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করা, একটা বড় শিক্ষা। এই শিক্ষার অভাব আমরা পদে পদে অনুভব করি।" ছেলেমেয়েদের চোখ খুলে

গাছপালা

ছাত্র-সখাদের

শ্রীজগদানন্দ রায়

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড

এলাহাবাদ

১৩২১

দেখার শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন। নিজের জীবনকে একটি উদাহরণের নিদর্শন করে তোলেন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সূচনা সম্ভবত সাধারণভাবে বলা যায় অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে। তারপর এলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রবীন্দ্রনাথও সমৃদ্ধ করলেন। এবার জগদানন্দ দেখা দিলেন বিস্ময়কর জ্যোতির মত। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞানের গভীরতা এত স্বচ্ছ ছিল যে, দুরূহ বিষয়কে অনায়াসে লিখে গেছেন। গাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, পোকামাকড় ধরে পর্যবেক্ষণ চালাতেন দিনের পর দিন। এটা ওর বাতিক ছিল। আর সেই বাতিক দিয়েছিল অফুরন্ত জ্ঞান। যার ভিত্তি তার অসামান্য বইগুলি।

শান্তিনিকেতনে জনপ্রিয় মাস্টারমশায় ছিলেন জগদানন্দ। গায়ের রং কালো, রুক্ষভাবের চেহারা ঘিরে বিচারক সুলভ আবরণ তর্জন গর্জনের বিরাম ছিল না। অথচ যখন ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানের গল্প বলতেন, তখন চেনা যেত না তাঁকে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত সবায়। চুরুট মুখে ঘুরে বেড়াতেন তরি-তরকারির খেতে। তরমুজ ভরে গেছে চারদিক। চুরুটের গন্ধে, ছেলেরা বুঝত চুরির সুযোগ নেই। সন্ধ্যার দিকে তিনি একটু বেড়াতেন মাঠে-মাঠে খালি গায়ে। কাপড়খানা কোঁচা না করে সেটিকে লম্বা করে গলায় ঝুলিয়ে দিতেন। পায়ের চটি থেকে গোড়ালির সিকি অংশ বেরিয়ে থাকত এবং সেইজন্য চটি গুটিয়ে বেঁকে উঠত। মুখে থাকত কালো রং-এর বর্মা চুরুট। চলনসই সুন্দর বেহালা বাজাতেন জগদানন্দবাবু—তবে সে বাজানো মামুলি প্রথামতো নয়। দাঁড়িয়ে বেহালাটিকে বুকের উপরে না রেখে এবং গাল দিয়ে তাকে চেপে না ধরে তিন বেহালা বাজাতেন বসে বসে। '...শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র সুধীরঞ্জন দাশ আরও বলেছেন : 'অজিতবাবু, সত্যবাবু এবং জগদানন্দবাবুর গল্পের আসর ভর্তি থাকত। বস্তুত অমারা এ'দের গল্পের ক্লাসের জন্যে উৎসুক হয়ে থাকতাম। জগদানন্দবাবুর গল্পের তুলনা ছিল না—যেমন তাঁর বলার ভঙ্গি, তেমনি চিত্তাকর্ষক তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। তখন স্ট্র্যান্ড না কী একটা ইংরেজি সাময়িক পত্রিকায় মঙ্গল গ্রহের দিকে অভিযানের একটা গল্প ধারাবাহিক বের হচ্ছিল। জগদানন্দবাবু সেটা বাংলায় নিজের মত করে আমাদের বলেছিলেন। মনটা সেই গল্পে এমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত যে আজও মনে রয়ে গেছে।' প্রমথনাথ বিশীর বর্ণনায় আছে...'জগদানন্দবাবু জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করতেন, অন্ধকারে রাত্রে মাঠের মধ্যে তারা চিনিয়া বেড়াইতেন—চুরুটের দীপ্তি ও গন্ধে আমরা তাঁহার গতিবিধি বুঝিতে পারিতাম। ...আবার যখন তিনি শারদোৎসব নাটকের অভ্যাসের সময় লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় ঠাকুরদাদার বালখিল্যদলকে তাড়াইতে তাড়াইতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেন, তখন কাহারো পক্ষে হাসি সংবরণ করা সম্ভব হইত না।'

জগদানন্দকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হিসাবে নিয়ে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাধনা পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন : 'এই সকল প্রবন্ধের প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ বক্তব্য-প্রণালী দেখে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য আমি তাঁকে প্রথমে আমাদের জমিদারীর কাজে নিযুক্ত করেছিলাম। তার প্রধান কারণ জমিদারীর কাজে বেতনের কৃপণতা ছিল না। কিন্তু তাঁকে এই অযোগ্য আসনে বন্দী করে রাখতে আমার মনে বেদনা দিতে লাগল। আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলুম। আশ্রমের রূপ ও বিকাশে এ-কথা লিখেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর শিক্ষক জগদানন্দ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য : ছাত্রদের কাছে সর্বতোভাবে আত্মদানে তাঁর একটুও কৃপণতা ছিল না। এই আত্মদানের অকার্পণ্য যথার্থ শিক্ষকের পরিচয়।....তাঁর ক্লাসে গণিত শিক্ষায় কোনো ছাত্র কিছুমাত্র পিছিয়ে পড়ে পরীক্ষায় যদি অকৃতকার্য হত সে তাঁকে অত্যান্ত আঘাত করত।'

কমলেন্দু চৌধুরী

সাহিত্যের নেপথ্যে

সেকালের বিজ্ঞান পত্রিকা

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় কলকাতার ভবানীপুর থেকে যখন 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হত, কালীপ্রসন্ন তখন ছাত্র। সেই ছাত্রাবস্থাতেই 'সোমপ্রকাশে'র পাতায় কালীপ্রসন্নের লেখা বেরোত। অসাধারণ প্রতিভাধর কালীপ্রসন্নের ওপর দ্বারকানাথের এমন অগাধ বিশ্বাস ছিল যে কোন প্রয়োজনে তিনি স্থানান্তরে গেলে সোমপ্রকাশ-এর পরিচালনার দায়িত্ব কালীপ্রসন্নের হাতে দিয়ে যেতেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের নাম অবশ্য পরে জনসমাজে সুপরিচিত হয়েছিল 'হিতবাদী'র কর্ণধার হিসেবে। শুধু সুপরিচিতই নয় সংবাদপত্রের জগতে সে নামটি বিশিষ্টও ছিল।

এই কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের সম্পাদনায় 'প্রকৃতি' নামে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি সাময়িক পত্রের প্রকাশ সুরু হয়। 'প্রকৃতি' প্রকাশ করে কাব্য বিশারদ মহাশয় কাশিমবাজারের মহারাণীর কাছ থেকে ২০০ টাকা আর্থিক সাহায্যও পেয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি তখনও ঠিকমত বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী হয়নি। অর্থাৎ সোজা কথায় দেশে তখনও বিজ্ঞান বিষয়ে প্রকাশিত কাগজের পাঠক ও লেখক তৈরী হয়নি। কাজেই পাঠক, লেখক এবং খানিকটা টাকাকড়ির অভাবেও 'প্রকৃতি' অচল হয়ে যায়। পরে প্রকৃতিকে কাব্য বিশারদ মহাশয় তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কল্পলতা'র সঙ্গে যুক্ত করে দেন।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩৬৯ সালের প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যায় কালীপ্রসন্নের জীবন এবং কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এক জায়গায় লিখেছেন, ১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দ কাব্য বিশারদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দিরে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, এবং স্বেচ্ছানুরূপ বিজ্ঞান শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া 'প্রকৃতি' নামে এক মাসিক পত্রিকার প্রচার করেন। তৎপূর্বে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক কোন সাময়িক পত্র ছিল না। সেইজন্য 'প্রকৃতি' প্রকাশ করিয়া কাব্য বিশারদ মহাশয় কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে দুই শত টাকা সাহায্য লাভ করেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ মহাশয় মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা করেন ১৮৭৯ থেকে ৮০ সাল। তারপরে 'প্রকৃতি' প্রকাশ করেন। কিন্তু এর অনেক আগে থেকেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকার এবং বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু কিছু বই পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই প্রকৃতি সম্পর্কে যে শিরোপা বীরেনবাবু 'ভারতবর্ষে'র ঐ প্রবন্ধে কালীপ্রসন্নকে দিয়েছেন তা বোধহয় বিতর্কাতীত নয়। এই প্রসঙ্গে ১৮৮০-র আগে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকার উল্লেখ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে আশা করি।

১৮৩২ সালের এপ্রিল মাসে 'বিজ্ঞান সেবধি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্যোক্তা সোসাইটি ফর ট্রান স্লেটিং ইউরোপীয়ান সায়েন্স। 'বিজ্ঞান সেবধি'-র পয়লা সংখ্যার আখ্যান পত্রে লেখা হয়েছিল, 'বিজ্ঞান সেবধি' অর্থাৎ শিল্প শাস্ত্রের নিধি—লার্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞান শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও ফল এবং সন্তোষাদির বিবরণ হইতে শ্রীযুত এইচ এইচ উইলসন সাহেবের আদেশে শ্রীযুত বাবু অমলাচন্দ্র গাঙ্গুলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা ভাষান্তর হয় ইউরোপীয় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র, ভাষান্তরার্থে সমাজ কর্তৃক শোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। পত্রিকাটির মাত্র বারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ পায়। পত্রিকাটি দ্বিভাষিক। পত্রিকার প্রত্যেক পৃষ্ঠার ডানদিকে বাংলা এবং বাঁদিকে তার ইংরাজি অনুবাদ থাকত। 'রয়েল অক্টেবো' সাইজে ১৬ পৃষ্ঠার এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন ডব্লিউ এম উলেস্টন, নবকুমার চক্রবর্তী এবং গঙ্গাচরণ সেনগুপ্ত। দাম মাসিক বারো আনা।

১৮৩৪ সালের জানুয়ারী থেকে 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' মাসিক পত্রে পরিণত হয়। পাতার সংখ্যা বেড়ে হয় বত্রিশ। প্রতি সংখ্যার দাম আট আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ টাকা। ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান আমাদের দেশে প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রধানত 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' পত্রিকার আবির্ভাব। পত্রিকার চেহারা পাল্টানোর পর ইউরোপীয় গ্রাহকদের জন্য সংস্কৃত এবং বাংলা রচনার অনুবাদ দেওয়ার ব্যবস্থা জুড়ে দেওয়া হয়। ওই ধরনের পত্রিকা আমাদের দেশে তার আগে প্রকাশিত হয়নি।

১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বরে 'বিজ্ঞান কৌমুদী' নামে একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মাসিক। সম্পাদক জগমোহন তর্কালঙ্কার। পত্রিকাটি সম্পর্কে ১২৬৭ সালের ৩০ আশ্বিন সংখ্যার সোমপ্রকাশে লেখা হয়, 'বিজ্ঞান কৌমুদী' নামে একখানি নূতন পত্রিকা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাই এতৎপত্র প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্য অন্য বিষয়ও ইহাতে লিখিত দৃষ্ট হইল। প্রথমবারের পত্রে যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইয়াছে আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, সবগুলিই শ্রেয়স্কর। এতৎ পাঠে পাঠকগণের সবিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে...'।

১৮৬৭ সালের জানুয়ারীতে ঢাকা বিক্রমপুর থেকে প্রকাশিত 'পল্লী বিজ্ঞান' নামে একটি পত্রিকারও সন্ধান পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রামের মঙ্গল সাধনই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। ঐ মাসিক পত্রিকাটি ঢাকা মোগলটুলির সুলভ যন্ত্রে ছাপানো হত। প্রকাশক ছিলেন রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সময় পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখা হয়, 'পল্লী সমূহের অবস্থা সংশোধনোপযোগী গ্রাম্য পত্রিকার যে একটি অভাব তাহা এ পর্যন্ত বিদূরিত হয় নাই। গ্রাম ও পল্লীসমূহের উন্নতিতেই দেশের প্রকৃত উন্নতি। যে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যা ও শিক্ষার অভাব, সে দেশ বিদ্বান নয়, যে দেশের গ্রাম ও পল্লীতে সভ্যতা নাই সে দেশ সভ্য নয়, যে দেশের গ্রাম ও পল্লীতে স্বাস্থ্য নাই, সে দেশ সুস্থ নয়। অতএব আমরা উল্লিখিত অভাবটি মোচনের মানসে কতিপয় বন্ধুর পরামর্শানুসারে এই পত্রিকাখানির প্রচার করিতেছি। ইহার নাম 'পল্লী বিজ্ঞান' রাখা গেল। পল্লী বিজ্ঞান প্রথম সংখ্যার বিষয় সূচিতে ছিল (১) পল্লী বিজ্ঞান (২) ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা, (৩) সময় (৪) গ্রাম্য বিদ্যালয়, (৫) দেশের প্রচলিত অঙ্ক, (৬) ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত, (৭) গতবর্ষীয় মহামারী এবং জৈনসার ডিস্পেন্সারী, (৮) সেনেটরী কমিশন।

পুরোপুরি বিজ্ঞান পত্রিকা হিসাবে চিহ্নিত ছিল না এমন অনেক পত্রিকাতেও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ আলোচনা অন্যের সঙ্গে ছাপা হোত। এই সব পত্রিকারই প্রকাশ কাল ছিল প্রকৃতির আবির্ভাবের আগে। 'সর্বার্থ সংগ্রহ' নামে ১৮৬৬-র ফেব্রুয়ারীতে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল সে পত্রিকাটি সম্পর্কে ঘোষণা ছিল বিচিত্র রমণীয় উপাখ্যান এবং সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি ও শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধাত্মক মাসিক পত্র।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিপত্র

নির্বিচারে তথ্য প্রমাদ

১৮ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা 'অমৃত'তে রাজনীতি-কলকাতা স্টাইলে শ্রীবেদব্যাস বৈদ্য 'আই-এ-এস হঠাও আন্দোলন' শিরোনামায় যে রচনাটি লিখেছেন তাতে তিনি নির্বিচারে তথ্যপ্রমাদ ঘটিয়েছেন। শুধু তাই নয় তিনি আই-এ-এস পদে প্রমোশনলোভী রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষে আসীন 'প্রবীণ' বলে কথিত কিছু অফিসারের প্রশাসনযন্ত্রকে 'গতিশীল' করে প্রমোশন যন্ত্রে পরিণত করার কৌশলকে মদত দিতে গিয়ে সিভিল সার্ভিস, কমার্শিয়াল ট্যাক্স, একসাইজ কালেক্টর, এমপ্লয়মেন্ট, এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স, ফুড এ্যান্ড সাপ্লাইজ সার্ভিসের সাতটি সমিতির মিলিত সংগঠন কনফেডারেশন অব স্টেট সার্ভিস এসোসিয়েশনের আন্দোলনের প্রতিও অত্যন্ত অন্যায় কটাক্ষ করেছেন। প্রসঙ্গত, ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রকাশিত একটি প্রচারপত্রের সঙ্গে রচনাটির অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করলাম।

'সম কাজে সম বেতন নীতি'র ভিত্তিতে সার্ভিস একীকরণ-এর বিষয়টি তর্কাতীতভাবে বেতন কমিশনের আলোচ্য সূচীতে ছিল। স্বরাষ্ট্র বিভাগ ঘোষণা করেছিলেন **'ইউ উড বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দি (পে) কমিশন টু ডিসাইড হোয়েদার দি টু সার্ভিসেস সুড বি অ্যামালগামেটেড'** (২৫৩৩ জিএ; **তারিখ** (২৬-১১-৬৭) **অবশ্য তার আগেই অর্থমন্ত্রী** শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর বিভাগে সার্ভিস একীকরণের আদেশ দিয়েছিলেন। পরে যুক্তফ্রন্ট চলে **যাবার পর তখনকার প্রশাসনের শীর্ষে** আসীন ব্যক্তিরা বিষয়টি পুনর্বিচারের জন্য পাঠান। সেই সময়কার একটি পত্রের বিচ্ছিন্ন একটি বাক্যাংশ বিভ্রান্তিকরভাবে শ্রীজ্যোতি বসুর 'সুচিন্তিত মত' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

পে কমিশনের সদস্য ছিলেন সাতজন। বিচার ও শাসন বিভাগে অভিজ্ঞ শ্রী কে কে হাজরা ছিলেন চেয়ারম্যান। শ্রীহাজরা সহ ছয়জন সদস্য কর্মচারী আন্দোলনের পুরোধা নেতা, উপাচার্য, অর্থনীতিবিদ জননেতা, অধ্যাপক—সবাই একবাক্যে রায় দিলেন। দ্বিধাবিভক্ত স্টেট সার্ভিসের অফিসাররা একাই কাজ করেন অতএব একই বেতন পাবেন। বাকী একজন (এ-জি. ডবল্যু বি'র প্রাক্তন অফিসার) যিনি প্রায় সব কিছুতেই একটা 'নোট অফ ডিসেন্ট' দিয়েছেন তিনি এ ব্যাপারেও ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। তবে এই শেষোক্ত ব্যক্তি সহ সকলেই বিষয়টিকে **'টার্মস অফ রেফারেন্স'-এর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেছিলেন।**

১৯৭০-এ যখন সমস্ত কর্মচারীর ক্ষেত্রে পে-কমিশনের রায় কার্যকর করা হয় তখন সার্ভিস একীকরণের বিষয়টি মুলতুবী রেখে শুধু উচ্চ বিজ্ঞাপিত হয় এবং এর আওতায় যাঁরা আসতে পারেন তাঁদের এড-হক বেতনক্রম দেওয়া হয়।

১৯৭৪-এ তাঁদের প্রচন্ড আন্দোলনের চাপে পড়ে তখনকার সরকার নানা গোঁজামিল দিয়ে একীকরণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেই সুযোগে কতটা 'মেধা সম্পন্ন' জানি না একশ্রেণীর ডবল্যু বি সি এস অফিসারকে বিভিন্ন সিলেকশন গ্রেডে 'গণ প্রমোশন' পাইয়ে দিলেন।

আগে ডবল্যু বি সি এস-এ ক্যাডার-সংখ্যা ছিল ৬০৭। সেই হিসেবে সিলেকশন গ্রেডে পদসংখ্যা হবার কথা ছিল ১৫০। একীকরণের পর ক্যাডার সংখ্যা হল ১৫৮১। সিলেকশন গ্রেডে পদ সৃষ্টি হল ৩৯৭। আর এই সংখ্যাবৃদ্ধির সমস্ত সারাংশটুকু দেওয়া হল ১।৪।৭০ (যেদিন থেকে একীকরণ ছাড়া পে-কমিশনের অন্যান্য রায় কার্যকর হল) তারিখের আগে ডবল্যু-বি-সি-এস'এ নিযুক্ত ব্যক্তিদের। এ'দের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই এখন সিলেকশন গ্রেডে আছেন যেখানে অন্য যে শ্রেণীর কর্মচারীর পক্ষেই শতকরা জনের বেশী সিলেকশন গ্রেড পাবার কথা নয়। আবার জরুরী অবস্থার সময় আগেকার নিয়ম পাল্টিয়ে দিয়ে ঐ সুবিধাভোগী 'গণ-প্রমোশন' পাওয়া অফিসারদের কারুর কারুর একদানে ৬০০—৬৫০ টাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সরকারী বেসরকারী যেকোন বেতনভোগীর পক্ষেই এতটা বেতনবৃদ্ধি স্বপ্নাতীত।

এসবই সম্ভব হয়েছিল যাঁদের জন্য একীকরণ করা হয়েছিল যাঁদের সম্পর্কে **পে কমিশন বলেছিলেন, 'দে হ্যাড বিন ডিনাইড এ ফেয়ার ডিল ফর এ লং টাইম'** তাঁদেরকে নানাভাবে বঞ্চিত করার ফলে।

সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে সমকাজে সমবেতন নীতি প্রতিষ্ঠার দাবীতে যখন সার্ভিসগুলির সদস্যরা গণবিক্ষোভ করে, বিধানসভা অভিযান করে তাঁদের নীতিগত **অধিকার অর্জনের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তখন ঐ 'গণপ্রমোশন ভোগী' 'প্রবীণ' অফি**সাররা নানাভাবে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। এ'রা আগেকার সরকারের ভুল ও একপেশে নীতির সমস্ত সুযোগ আত্মসাৎ করে এখন নেমেছেন কি করে আই-**এ-এস'-এর পদগুলো দখল করা যায়। অত**এব এল, রাজ্যের হতে অধিক ক্ষমতার কথা। আই এ এস-এ 'আপাতত নতুন নিয়োগ' বন্ধ রাখার জন্য 'আবেদন'। 'আই এ এস হঠাও' আন্দোলন নয়। কেননা রাজ্য থেকে সর্বতোভাবে আই এ এস চলে যাক তা তাঁরা চান না। অন্ততঃ সেরকম 'আবেদন' কখনও করেন নি। আই এ এস-এ প্রমোশন **চাই না এমন কথাও ও'রা বলছেন না। শুধু** 'আপাতত' নতুন নিয়োগ বন্ধ রাখা হোক। **অর্থাৎ ও'রা ওই পদগুলো পেয়ে গেলে আবার নতুন নিয়োগ চলবে।**

বেদব্যাসবাবুর দোষ নেই। উনি একটা অপকৌশলের শিকার হয়ে গেছেন। একটু শ্রম স্বীকার করে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে এমন গোলযোগ হত না। ইতি—

অংশু শূর, ১২৯, হরিশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

ধন্যবাদ জানাই

বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার ১৮ বর্ষ ৪৩ সংখ্যায় রাজনীতি-কলকাতা স্টাইল' লেখাটিতে শ্রীবেদব্যাস বৈদ্য 'আই এ এস হঠাও আন্দোলন' শিরোনামায় যা লিখেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এতে তিনি যে প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন তা যেমন সময়োপযোগী তেমনই সাহসিকতার পরিচায়ক। তিনি স্বল্প পরিসরে বর্তমান রাজ্য প্রশাসনে যে সঙ্কটের কালোমেঘ ঘনীভূত হয়েছে তা সঠিক উপস্থাপিত করেছেন। কেবলমাত্র একীকরণ প্রসঙ্গে দুটি ভুল চোখে পড়েছে। প্রথমতঃ তিনি লিখেছেন ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে ছটি স্টেট সার্ভিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জুনিয়ার সার্ভিসগুলির একীকরণ হয় এবং সিদ্ধার্থশংকর মন্ত্রিসভা হাজরা কমিশনের সূত্র উল্লেখ করে একীকরণ ঘোষণা করেন' প্রথমতঃ একীকরণ ঐ সময় আটটি স্টেট সার্ভিসের ক্ষেত্রে ঘটে, ছ'টির নয়। দ্বিতীয়তঃ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় যখন প্রথম বিধানসভায় একীকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং পরে সরকারী আদেশ প্রকাশিত হয় তখনও হাজরা কমিশনের কোন উল্লেখ ছিল না। বস্তুতঃ এই একীকরণ ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠিত এস এম ভট্টাচার্য কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ছ'টি সার্ভিসের ক্ষেত্রে হয়েছিল। হাজরা পে কমিশনের সুপারিশ ছিল এই ছ'টি সার্ভিসের সংযুক্তিকরণ। বাকি দুটি সার্ভিস—ফুড ও সাপ্লাই সার্ভিস এবং এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসের সম্পর্কে একীকরণ অথবা সংযুক্তিকরণের কোন সুপারিশ ছিল না। কেননা ঐ দুটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে কোনরকম সরাসরি নিয়োগ হত না। হাজরা পে কমিশনের (১৯৬৭-১৯৬৯) সুপারিশ নানাকারণে বিতর্কিত ও আপত্তিকর বিবেচিত হওয়ায় পরবর্তীকালে ভট্টাচার্য কমিটি গঠন করা হয়।

এখন লেখকের আসল বক্তব্যের দিকে আসা যাক। আই এ এস বনাম ডবল্যু বি **সি এস-এর লড়াই সম্পর্কে যে যে কারণ লেখক উল্লেখ করেছেন তা সর্বতোভাবে**

জন্য। এই রাজ্যে স্টেট সার্ভিসগুলির মধ্যে ডবল্যু বি সি এস রাজ্য পুলিশ সার্ভিস এবং রাজ্য ফরেস্ট সার্ভিসের প্রমোশন খুবই সীমিত এবং যথাক্রমে আই এ এস আই পি এস এবং ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের সঙ্গে সংযুক্ত। এই ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক আমল থেকে চলে আসছে। অল ইণ্ডিয়া সার্ভিসের আইনকানুন এবং বেতনহার নির্ধারণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের অথচ ঐ তিনটি স্টেট সার্ভিসের আইনকানুন এবং বেতনক্রম রাজ্য সরকার ঠিক করেন। এই ব্যবস্থার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে আই এ এস-এর সংখ্যা ২৬৪ নির্ধারিত করে মাত্র ৪৯টি পদ ডবল্যু বি সি এস অফিসারদের জন্যে প্রমোশন পদ হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। অথচ রাজ্য সরকার নিজের প্রয়োজনানুযায়ী ডবল্যু বি সি এস-এর অফিসার সংখ্যা ১৯৭৪ সালে যখন ছয়শত ছিল তখন হঠাৎ জুনিয়র সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের রাতারাতি ডবল্যু বি সি এস পদে উন্নীত করায় ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৭১তে দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা আই এ এস-এ প্রমোশনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এবং রাজ্য সরকার ডবল্যু বি সি এস অফিসারের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়ায় উপরের দিকে সিনিয়র অফিসারদের আজ বাইশ তেইশ বছর চাকরি করার পরও প্রমোশন হচ্ছে না। তেমনি যাঁরা একীকরণের পরে ডবল্যু বি সি এস পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ দিয়েছেন তাঁদের মাথার ওপর রাতারাতি ঐ ৯৭১জন বসে যাওয়ায় এঁদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আই এ এস অফিসারদের সংখ্যা সংকুচিত করার দাবীতে প্রবীণ ডবল্যু বি সি এস যেমনি সোচ্চার তেমনি নবীন অফিসাররা একীকরণের সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ। এ অবস্থায় কিছু আই এ এস অফিসার প্রাক্তন জুনিয়ার সার্ভিসের অফিসারদের কেন মদত যোগাচ্ছেন তা সহজেই অনুমেয়, যে ক্ষেত্রে জুনিয়র সার্ভিসের অফিসারদের রাতারাতি প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হোল সেক্ষেত্রে ডবল্যু বি সি এস অফিসারদের প্রমোশনের ব্যাপারে স্বাধীনতার ৩০।৩২ বছর পরেও এ পর্যন্ত রাজ্য সরকার কিছুই করেন নি। কেবলমাত্র ১৯৭৪ সালে সিলেকশন গ্রেড সৃষ্টি করে শতকরা হারে কিছু অফিসারের কিছু বেতনবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে মাত্র। তাও একজন ডবল্যু বি সি এস অফিসারের ৮ বছর চাকরী করার পর আই এ এস পদে প্রমোশন পাওয়া ও ১২০০-২০০০ টাকার বেতন হার পাওয়ার কথা। ৮ বছর চাকরী হয়েছে এমন অফিসারের সংখ্যা দুশোর বেশি। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৭৯জন কমপক্ষে ২০ বছর চাকরী করার পর সিনিয়র সিলেকশন গ্রেডে ১৫৩৫ টাকা-১৭৭৫ স্কেলে বেতন পাচ্ছেন। অবশ্য ডেপুটি সেক্রেটারী হিসাবেই এঁদের সকলকে চাকরী জীবন শেষ করতে হবে অর্থাৎ চাকরী জীবনের মধ্যভাগে ডেপুটি সেক্রেটারীর পদ অনেকেই পেয়েছেন এবং বাকি অর্ধেক চাকুরী-জীবন অর্থাৎ ১৬।১৭ বছর ঐ ডেপুটি সেক্রেটারী পদেই থেকে যেতে হবে। মহাকরণের করণিকদের ভিতর থেকেও একজন এল-ডি ক্লার্ক ধাপে ধাপে প্রমোশন পেয়ে ডেপুটি সেক্রেটারী পদ পর্যন্ত পাচ্ছেন। স্টেট সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের এই অসহনীয় অবস্থায় বিক্ষোভে ফেটে পড়া ও 'আই এ এস হঠাও' আন্দোলন করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অন্যান্য রাজ্য সরকার তাঁদের রাজ্য সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের জন্যে এ ব্যবস্থার অবসানে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এ রাজ্যেও যে ইতিপূর্বে কোন প্রচেষ্টাই হয়নি তা সত্য নয়। তবে তা বিক্ষিপ্ত প্রয়াস মাত্র। ১৯৬৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন যে উদ্দেশ্যে গঠন করেছিলেন তাতে রাজ্য সিভিল সার্ভিসের উন্নতি সম্পর্কে সকলেই আশাবাদী ছিলেন। বস্তুতঃ এ রাজ্যে রাজ্যস্তরে কোন প্রশাসনিক কমিশন আজ পর্যন্ত হয়নি। রাজ্যে পে কমিশন ঐ একই সময়ে গঠিত হওয়ায় পে-কমিশনের সুপারিশে রাজ্য সিভিল সার্ভিস অফিসারদের প্রমোশনের বিষয়টি সম্ভবতঃ সঠিক গুরুত্ব পায়নি। পে কমিশন সিনিয়র অফিসারদের জন্যে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাজ্য প্রশাসন ঢেলে সাজাবার জন্য রাজ্যস্তরে একটি প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন। বিগত ইউনাইটেড ফ্রন্ট আমলে এই পে-কমিশন রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য এবং যুক্তফ্রন্ট শাসনকাল দুই পর্যায়ে হওয়ার ফলে প্রশাসন ঢেলে সাজাবার মত আবহাওয়া ও সুযোগ সুবিধা ছিল না। বিগত যুক্তফ্রন্টের আমলে ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে তদানীন্তন ক্যাবিনেটের ইকনমি কমিটি রাজ্য প্রশাসনে আই এ-এস-দের সংখ্যা কমিয়ে আনার বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য অর্থ দপ্তরকে নির্দেশ দেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার বিদায় নেওয়ার পর এই প্রচেষ্টার সমাধি হয়। এরপর রাষ্ট্রপতি শাসনে এই রাজ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আই এ এস অফিসাররা প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ডবল্যু বি সি এস থেকে আই এ এস-এ প্রমোশন কোটা বড়ানোর ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানান এই বলে যে, এতে সার্ভিসের মান অবনমিত হবে। অথচ স্বরাষ্ট্র দপ্তর একীকরণের সময় এই মান অবনমনের ব্যাপারে নীরব রইলেন। রাজ্য সরকারের আপত্তির ফলে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হোল না। বহু বছর পর গত ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর ওই সুপারিশ অনুযায়ী প্রমোশন কোটা কমিয়ে তা কার্যকরী করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একীকরণের ফলে ডবল্যু বি সি এস অফিসারদের সংখ্যা আড়াই গুণের বেশি হওয়ায় প্রমোশনের সমস্যা আরও গুরুতর হোল। অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলির মত এ রাজ্যে উচ্চ পদগুলির কিছু কিছু ডবল্যু বি সি এস অফিসারদের দেওয়ার কথা এবং আই এ এস এর মতো পে-স্কেল প্রবর্তনের কথা ভাবা হোল না। ১৯৭২ সালে পূর্বোক্ত এস এম ভট্টাচার্য কমিটিকে বলা হোল ডবল্যু বি সি এস অফিসারদের জন্য উচ্চপদ এবং উচ্চ বেতনহার দেওয়ার বিষয়টি পরীক্ষা করবার জন্য। ওই কমিটি গত ১৯৭৩ সালে সুপারিশ দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার আজও তা প্রকাশিত করলেন না। ১৯৭৪ সালে তদানীন্তন শ্রমমন্ত্রী ডঃ গোপালদাস নাগ এ ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ অর্থ দপ্তরকে দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে এপ্রিল মাসে অর্থ দপ্তর এ বিষয়টি অনুমোদন করেছিলেন। তারও আগে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিষয়টি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন লাভ করেছিল ক্যাবিনেটে পাঠানোর জন্য। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গড়িমসিতে কিছুই সম্ভব হয় নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য সরকার কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কের ওপর যে প্রতিবেদন কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাতে অল ইণ্ডিয়া সার্ভিসের অবলুপ্তির দাবি করা হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে বামফ্রন্ট ও ফ্রন্টের নেতারা স্টেট সার্ভিসগুলির উন্নতির জন্যে তাঁদের সদিচ্ছার কথা ঘোষণা করলেন! এর ফলে একশ্রেণীর আই এ এস অফিসার শঙ্কিত হলেন। ফলে ডবল্যু বি সি এস অফিসারদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলল। এর ফলে ডবল্যু বি সি এস অফিসারদের মধ্যে হতাশা ও বিক্ষোভ হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

—অমল চট্টোপাধ্যায়, ৯বি সরবখান রোড, কলকাতা-৩৭।

ছোটগল্প না হিন্দী ছায়াছবি ?

অমৃতের ৬ এপ্রিল সংখ্যায় অসীম চক্রবর্তীর 'নিঃসঙ্গ যোদ্ধা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। মনে হলো গল্প নয় যেন কোন সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছায়াছবির বিবরণ পড়লাম। কথায় কথায় রক্তারক্তি ফিল্মের নায়কদের মতই বেপরোয়া। শুধু তাই নয় গল্পের প্রধান পুরুষ জবরদস্ত মস্তান হয়েও প্রচন্ড রকমের দেশপ্রেমিক! দেশের জন্যে সমাজের জন্যে গভীর বেদনাবোধ সম্ভবত হিন্দী ছায়াচিত্রের হিরোদেরও লজ্জা দেবে।

ভাবতে কষ্ট হয়, যে রতনের বুকে দেশের মানুষের প্রতি অত দরদ, মানবিকতা বোধ প্রখর, তার বিবেক কিভাবে সায় দেয় ওয়াগান ব্রেকার হতে অথবা পকেটে পয়সা থাকা সত্ত্বেও বিনা টিকিটে রেলে উঠে বসতে?

রতনকে সামনে রেখে যেভাবে হিন্দী স্টাইলে শিউপ্রসাদ রামাচরণ পরিমল, মিঃ সেন গিরিজাপতি প্রভৃতিদের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ অভিমান, রাগ প্রকাশ করা হয়েছে তাতে হৃদয় আদৌ উদ্বেলিত হয় না। যদিও গল্পে বর্ণিত সমাজপতিদের দেখা বাস্তবেও পাওয়া যায়। আর এদের

বাঁচিয়ে রেখেছে রতনের মত যুবকরাই। রতনরা যেদিন সেই সত্যের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করতে পারবে সেদিন সমাজের চিত্রটাই হবে অন্যরকম।

আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যারা একান্তভাবে ছোটগল্প ভালবাসি এবং উচ্চমানের গল্পের আশায় দিন গুনি, এ ধরনের গল্প আমাদের রীতিমত বেদনা দেয়।
—নজরুল ইসলাম, ধুলোসিমলা, হাওড়া।

হৃদয়গ্রাহী

ইদানিং অমৃতে প্রকাশিত গল্প পড়ে খুবই ভাল লাগছে। বিশেষ করে অসীম চক্রবর্তীর লেখা 'নিঃসঙ্গ যোদ্ধা' বড় গল্পটি বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। উনি তাঁর গল্পে সমাজের একশ্রেণীর লোকের আসল চেহারা প্রকাশ করে দিয়েছেন। যাদের আমরা চোখের সামনে দেখতে পেলেও, না ঠেকলে আসল চেহারা দেখতে পাই না। কিন্তু এরাই সমাজজীবনকে দিনে দিনে রসাতলের দিকে টেনে চলেছেন।

শ্রীচক্রবর্তী তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে এই বড় গল্প লেখার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।
রামকৃষ্ণ মোহান্তি, ভুবনেশ্বর ৭৫১০০৯

উত্তর মেলেনি

২রা মার্চের 'অমৃতে'তে আমার একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। যে চিঠির সূত্র ধরে আমার ঐ চিঠি, আমার চিঠির ঠিক তলাতেই সেই পত্রলেখককে মূল রচনার (ভীষ্মদেব) লেখিকা ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁর রচনার একটি ভুল সংশোধন করে দেবার জন্য এবং সেই সঙ্গে জানিয়েছেন যে তাঁর ঐ রচনায় আর কোনো তথ্যগত ভুল নেই। কারণ তিনি প্রকাশিত হবার আগেই ঐ রচনা ভীষ্মদেব-পত্নী শ্রীযুক্তা দীপ্তকণা দেবী এবং তারাদা (ভীষ্মদেবের দাদা) কে শুনিয়ে অনুমোদিত করেন এবং এসম্পর্কিত স্বাক্ষরিত মতামতও তাঁর কাছে আছে। প্রথমটি জয়ন্তবাবুর (ভীষ্মদেব-পুত্র) চিঠির পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি ছিল সরাসরি ভুল সংশোধন এবং বাকী ছিল প্রশ্ন। অনুমোদিত রচনার ঐ তথ্যগত ভুলের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য লেখিকা ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু বাকী প্রশ্নগুলির উত্তর কই?

আরও একটি প্রশ্ন। বেশ কয়েক বছর ধরেই ৮ নভেম্বর তারিখে ভীষ্মদেবের জন্মবার্ষিকী পালিত হতে দেখেছি। অথচ শ্রীমতী সেনের রচনায় তারাদার বক্তব্য হিসাবে কোটেশান দিয়ে জানানো হয়েছে যে, ১৯০৯ সালের ৮ আগষ্ট সোমবার তাঁর জন্ম। সত্যিই যদি এটি তারাদার বক্তব্য হয় এবং শ্রীমতী সেনের রচনার সমস্ত তথ্য নির্ভুল বলে তাঁদের স্বাক্ষরিত মতামত থেকে থাকে, তাহলে তাঁর বাড়ির লোকেরা এমন কি ভীষ্মদেব নিজেও ৮ নভেম্বরের উৎসব পালনে সম্মতি জানাতেন কেন?

আমার আগের চিঠির কপিটি খুঁজে পেলাম না। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে ঐ চিঠিতেও আমি এই তথ্যগত ভুলটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, কোনো কারণে হয়তো তা বাদ পড়েছে। কিন্তু ভীষ্মদেবের সঠিক জন্ম তারিখ কোনটি—এ প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করি।
প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ফ্ল্যাট নম্বর—এন-১।৩; ১৯৭, আন্দুল রোড, হাওড়া।

আষাঢ়ে ক্লাব

ভীষ্মদেব বেগম আখতারের মত স্বনামধন্য ও চিরস্মরণীয় শিল্পীদের প্রচ্ছদপট সহ তাঁদের জীবনকে তুলে ধরার পরিকল্পনার জন্যে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। আশা করি এই ধারাটি আপনারা আপাততঃ অব্যাহত রাখবেন। স্বনামধন্য সরোদীয়া রাধিকামোহন মৈত্রের নাম, এই প্রসঙ্গে, পাঠক রূপে, আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করলাম।

বাঙালী এই সঙ্গীতগুরু, সঙ্গীতজগতে একজন অতি শ্রদ্ধেয় শিল্পী। বেতার থেকে অবসর নেওয়ায় (?) এঁর বাজনা আমরা শুনতে পাই না। সঙ্গীত জগতের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে শ্রীমৈত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 'অমৃতের' পৃষ্ঠায় পাঠ করার আকাঙ্খা নিয়ে অপেক্ষায় থাকলাম।

এই প্রসঙ্গে মনে আসছে অতীতের স্মৃতি। অবিভক্ত বাংলার রাজসাহী শহরে, শ্রীমৈত্রের উদ্যোগে, ভারতবর্ষের যে বিখ্যাত গুণী শিল্পীর সমাবেশ হোত, তার কথা মনে পড়লে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। বড়ে গোলাম আলি, ওঙ্কারনাথ, হাফেজ আলি খাঁ, ছোটে খাঁ, মনি বর্ধন, কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মিশ্র, থেরাকুয়া, কেরামত আলি, হীরু গাঙ্গুলী, পঙ্কজকুমার, শচীনদেব, রথীন চাটুজ্জে, যামিনী গাঙ্গুলী, সুনীল বসু, পরেশ ভট্টাচার্য, জ্ঞানপ্রকাশ এবং আরো কেউ কেউ একত্রে শ্রীমৈত্রের পিতা ও অন্যান্য সঙ্গীতানুরাগী প্রতিষ্ঠিত, 'আষাঢ়ে ক্লাবের' আসরে, পাশাপাশি উপবিষ্ট থাকতেন এবং একের এর এক তাঁদের শিল্পকর্ম শ্রোতাদের সম্মুখে তুলে ধরতেন। সেই পরিবেশ, সেই সুমধুর সঙ্গীতের আসরের সুরধনী আজো যেন হাতছানি দেয়।

জ্যোতি রায়
বহরমপুর

প্রমাণ দিতে পারবেন ?

ভারত সরকারের এক বিখ্যাত গবেষণাগারে আমারই সঙ্গে কর্মরত মুসলমান বন্ধুর চাকুরির পাওয়া না পদোন্নতির ক্ষেত্রে মুসলমান হওয়াটা কখনই অন্তরায় বলে মনে করেন না। যে সব মুসলমান বন্ধু অতিরিক্ত জেলা বিচারক ইত্যাদি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত তাঁরাও শ্রীনৌশাদ মল্লিকের 'আমরা মুসলমানরা কেমন আছি ?' যুক্তিকে ভিত্তিহীন বলে মনে করেন। শ্রীমল্লিক মুসলমান হওয়ার জন্যই 'এপ্লিকেশন' করেও রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংকে চাকুরি পান নি, এমন তথ্য প্রমাণ দিতে পারবেন কি? তথ্য প্রমাণহীন (?) ঘটনার উল্লেখ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ কি অসমীচীন হবে না?

ভাষা হিসেবে উর্দু আরবী শিখতে রাজী আছি, কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে নৈব নৈব চ। সংস্কৃত উর্দুসহ সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষার জননী—সংস্কৃত আদৌ ধর্মীয় ভাষা নয়। সুতরাং তৃতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত শেখান হয়। আরবী উর্দু কেন নয়, এ যুক্তি অচল। বাংলাদেশীয়রা সংখ্যাধিক্যে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে ত্যাগ করেছেন। উর্দু কখনই ধর্মীয় ভাষা নয়। উত্তর ভারতের বহু হিন্দুর মাতৃভাষা উর্দু—বহু হিন্দু উর্দুর প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক। অ-উর্দুভাষী মুসলমানরা উর্দুর ধুয়া তুললে অ-ইংরাজীভাষী খৃষ্টানরা ইংরাজীর ধুয়া তুলবেন। (সেদিনও বিহারে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজী পড়ান হত না, তা নিয়ে কোন রবও ওঠে নি।) কোরাণ শরীফ আরবীতে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিল বলে যদি আরবী শিখতে হয়, তাহলে বাইবেল হিব্রুতে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে বলে হিব্রুও শিখতে হবে। এতে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় থাকবে কি ?

আসলে, ভাষাকে ধর্মীয় ভিত্তিতে দেখার ফলেই শ্রী মল্লিক গোলে পড়েছেন
—শম্ভু মি
এন।৭, সি এম ই আর আই কলোনী
দুর্গাপুর

ধন্যবাদ সুভাষ।

ধন্যবাদ সুভাষ। আমরা মাঠের দর্শকরা খেলার মাঠে সাময়িক উত্তেজনা, ভালমন্দ নিয়েই চলি। প্লেয়ারদের বাইরের জগতের সঙ্গে কতটুকুই বা আমাদের পরিচয়? তার উপর প্রাক্তন প্লেয়ার? চুনী, পিকে, বলরাম ছাড়া আর বোধহয় কারুর খবরই রাখি না। অসীম মৌলিকের মত আরও অনেক লেখা সুভাষ ভৌমিকের কলম থেকে পাব—এই আশা আমাদের মনে রইল।

দেবব্রত ঘোষ, সালকিয়া, হাওড়া।

ফগহর্ণ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন জ্বর এলো আমার : অন্ধকারে,
মধ্যরাতের আধ ঘণ্টা আগে,
যখন দূরে উপসাগরের জল থেকে কোন্
আদিম জন্তুর ডাক ভেসে এলো : এক
সকাতর, বিলম্বিত, পুনরাবৃত্ত আহ্বান, যেন কোনো
প্রধান কুয়াশায় বারে-বারে অবিরাম
বেজে চলেছে কোনো ফগহর্ণ, আগন্তুক
পোতকে সজাগ ক'রে দেবে ব'লে, কিংবা
যেন স্মৃতির মধ্যে।

কেন তুমি এখনও জ্বরের ঘোরের মধ্যে ডাক দাও?

স্বপ্ন শব

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

আমি শহরের লোক নই, স্পষ্টতই গ্রামের মানুষ
শহরে থাকার শখ ছিল, এখন অনন্যোপায় আছি
গ্রামের ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে, এখন ফেরার পথ কই?

আমি শহরের লোক নই, যদিও শহরে বসবাস
কঠিন মসৃণ পীচে হাঁটি, দাঁতে কাটি ময়দানের ঘাস
শীতকণ্ঠ উল্লাসে জ্বলে উঠি স্বকাল পুরুষ নিরন্তর
আগত রক্তের ভিতরে সন্ত্রাসের গোপন খবর।

কবে যাবো, কবে বাড়ী যাবো? পাঁচ সাত মাইল হেঁটে
মধুবন থেকে ছোলাডাঙা রক্তমুখী মাঠ বন নদী
বেলা যায় বেলা যায় দূর গ্রামের ভিতরে ঘন ছায়া
[illegible]

উনআশি সাল

সমরজিৎ সিংহ

অন্তর্বাস ছিঁড়ে গেছে কবে, ছেঁড়া জামা পোশাক-সম্বল হয়ে
এখনো সে ঘুরে বেড়ায় ধরমতলা স্ট্রিট, আর
সল্ট লেক থেকে গাড়ি আসে, ডবলডেকার, পাতালরেলের কাজ
শুরু হয় ক্ষুধার্ত শরীরে,
দেখে দেখে তার চোখের পাওয়ার গেছে কমে
সে, চশমা বদলের কথা ভাবে, কবে যেন বাবুইবাজার থেকে, ভাবে,
পাখি উড়ে গেছে মানস সরোবরের দিকে

মনে নেই, অন্তর্বাস ছিঁড়ে গেছে কবে,
যে ম্যাপ এঁকেছে তার নীলরাত্রি
মনে নেই; ডবলডেকার আসে, মাঝে মাঝে উড়ো জাহাজের
বাঁশি বেজে ওঠে, সাইরেণ—সাইরেণ—
সচকিত ট্রামবাস ফেলে রেখে,
ছুটে আসে ডালহৌসি কলেজ স্কোয়ার
চারদিকে সাইরেণ—সাইরেণ...নিতান্ত বালক জানে না সে, হেসে ওঠে,
হাততালি দেয়, যারে যা, পাতাল রেল
বাবুইবাজার থেকে, ওরে পাখি, উড়ে যা মানস সরোবরে

সাড়ে ছয় কোটি শিশু স্কুলে যায় না

[illegible] দাস

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

সারা দেশে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি শিশু স্কুলে যেতে পারে না। অর্থনৈতিক অসঙ্গতি, প্রতিকূল পরিবেশ ভিন্ন মানসিকতা ইত্যাদিই তার অন্যতম কারণ। অথচ বিরাট সংখ্যক এই শিশু ভোলানাথদের মধ্যে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ-ভারতের সম্ভাবনা। যেভাবে যে পথেই অগ্রগতির কথা ভাবা হোক না কেন, অনাদৃত এই বিরাট সংখ্যক শিশুর ন্যূনতম শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে না পারলে, ভবিষ্যতের সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র একথা বলেন। তিনি বলেন, অতএব ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাঁর সরকার শিশু-শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ষষ্ঠ যোজনায় এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে নয়শ' কোটি টাকা। আগের যোজনায় এই পরিমাণ ছিল মাত্র সাড়ে চারশ কোটি টাকা। শিক্ষাঙ্গনে বঞ্চিত সাড়ে ছয় কোটি শিশুর মধ্যে অন্ত করেও চার কোটি শিশু ভোলানাথকে ১৯৮২ সাল শেষ হওয়ার আগেই হাতে খড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা অবিশ্বাস্যভাবে পেছিয়ে আছি। আর এক চরম অথচ মর্মান্তিক তথ্য উল্লেখ করে ডঃ চন্দ্র জানান, ১৯৭৬ সালে এদেশে প্রতিদিন প্রতি শিশুর পিছনে ব্যয় করা হয় মাত্র তিন পয়সা। অথচ এই একই বছরে সোভিয়েত রাশিয়ায় শিশু-প্রতি প্রতিদিন ব্যয় করেছে আট টাকা সত্তর পয়সা এবং এশিয়ারই আর এক প্রতিবেশী জাপান ব্যয় করেছে পনের টাকা নব্বই পয়সা হারে।

[illegible] [illegible] মত, বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাও এদেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অগ্রগতি সর্বমুখী করতে হলে অনগ্রসর দেশে বয়স্ক শিক্ষার প্রসার প্রচার অপরিহার্য। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকেও সরকার সযত্ন দৃষ্টি রেখেছেন। পঞ্চম যোজনায় এই খাতে ধরা হয়েছিল, আঠার কোটি টাকা। ষষ্ঠ যোজনায় তা বাড়িয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে দুশ কোটি টাকা। বয়স্ক শিক্ষা এবং শিশু শিক্ষা বিস্তারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা দেখে বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিনিধিরা সম্প্রতি যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাদের মন্তব্য, এই উদ্যোগ আয়োজনের বাস্তব রূপায়ণে গোটা দেশে নব-জাগরণ ঘটবে। ফলে আগামী দিনে ভারতের অর্থনীতি, কৃষিক্ষেত্রে সর্বোপরি সমাজজীবনে যে বিপ্লবের ঢেউ [illegible] পরোক্ষ ফল পৃথিবীর অন্যান্য দেশও লাভ করবে।

এই আশার আলো জ্বালাতে গিয়ে [illegible] শিক্ষাব্রতী শিক্ষা মন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র বোধ হয় নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। নানা আশঙ্কায় তিনি আশঙ্কিত। কম কথার মানুষ প্রতাপচন্দ্রের দুঃখ, তিনি যখন সারা দেশের ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক পরিকল্পনা নিচ্ছেন, তখন তাঁর রাজ্য পশ্চিমবাংলায় বয়স্ক শিক্ষা তথা শিশুশিক্ষার প্রসারের কাজে তেমন সক্রিয় কোন উদ্যোগ নিতে পারেন নি। তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, ১৯৭৮-এর ২ অকটোবর গান্ধীজির জন্মদিবস থেকে শুরু করে পরবর্তী ৩১ মার্চ—এই ছয় মাসের বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে সারা দেশে কমপক্ষে পনের লক্ষ লোককে বর্ণমালা চেনার উপযুক্ত করে তোলার সংকল্প নেওয়া [illegible]

খাতে পশ্চিমবাংলা সরকার কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে কোন অর্থ সংগ্রহ করেন নি। ফলে বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের কাজে তাঁরা কোন রকম উদ্যোগই নেননি। বারবার চিঠি দিয়েও রাজ্যের শিক্ষা-দপ্তরের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। রাজ্য সরকারের এই অনীহা অথবা অক্ষমতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি ভিন্ন কয়েকটি রাজ্য সরকারের তৎপরতা এবং উদ্যোগের কথা উল্লেখ করতে ভুল করেন নি। তিনি জানান, এক গুজরাট সরকারই এই ছয় মাসে তার রাজ্যে তিন লক্ষ লোককে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তুলেছেন! এই একইভাবে প্রায় সব রাজ্য সরকারই কেন্দ্র থেকে অর্থ নিয়ে বয়স্ক শিক্ষার ব্রতে ব্রতী হয়েছেন। অন্যতম ব্যতিক্রম পশ্চিমবাংলা সরকার।

কথায় কথায় শিক্ষামন্ত্রী আনমনা হলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ। কী যেন ভাবছিলেন। দেওয়াল ঘড়িতে ছ'টার ঘণ্টা বাজল। সন্ধ্যা নেমেছে। নির্জন সেই মুহূর্তে প্রতাপচন্দ্র দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। শান্তকণ্ঠে বললেন, জানো—এই দেওয়াল ঘড়িটির এক ইতিহাস আছে। শিক্ষাব্রতী-মনীষী ডেভিড হেয়ার সাহেব ব্যক্তি-জীবনে একজন দক্ষ কারিগর ছিলেন। এই ঘড়িটি তাঁরই হাতে তৈরী। শতাব্দীর সাক্ষী এই দেওয়াল ঘড়ির সময় নির্দেশ আমার জীবনে অনেক প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রতাপচন্দ্র আবার আনমনা, আবার নীরব।

শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বাসভবনের যে বিরাট কক্ষে বসে কথা বলছিলেন তার অতীত ঐতিহ্য আচমকা মুখর হল। সাবেকী আমলের আসবাবপত্রে ঠাসা কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে দেশ-নায়কদের আলোকচিত্র আর তৈলচিত্র। স্বদেশী যুগের সর্বভারতীয় নেতাদের কে না এসেছেন এই বাস-ভবনে, এই কক্ষে। জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র কলকাতার প্রায় দুই শতকের পুরানো এই ভবন ছিল একদা দেশনেতাদের গোপন আলোচনা, শলা-পরামর্শের স্থান। গান্ধীজি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওহরলাল, দেশবন্ধু-নেতাজীর স্পর্শধন্য এই বাসভবন আজও সেই ঐতিহ্য বহন করছে। সেটা বিশ দশকের গোড়ার কথা। গান্ধীজির ডাকে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা দেখা দিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অসহযোগের অভাবিত বন্যায় কিছুটা আত্মগোপনরত। দেশবাসী যে কোন মূল্যে স্বদেশের মুক্তির ব্রত স্থাপনে সঙ্কল্পবদ্ধ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনে সর্বত্যাগী সঙ্কল্পে ঐক্যবদ্ধ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সুভাষকে সঙ্গে নিয়ে এসে বসেন ঐতিহাসিক বাসভবনের এই নিভৃত কক্ষে। যুব-নরনারী দলে দলে এসে হাসিমুখে সঁপে দেন তাদের অর্থ অলঙ্কার।

পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসে যখন নীতি আর আদর্শের দ্বন্দ্ব দেখা দিল, তখনও এই কক্ষটি ছিল একাংশের কর্মকেন্দ্র। কংগ্রেসের মধ্যে যখন স্বরাজ্য দলের উদ্ভব, তখনও দেশবন্ধু তাঁর নানা তৎপরতার কেন্দ্র করে তোলেন এই কক্ষ। অবিভক্ত বাংলার জাতীয় কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সভাপতি নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম আর ত্যাগের আদর্শে মুগ্ধ দেশবাসী একদিন পথ চলতে এই ভবনটির দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধা জানাত। সেদিন এই ভবন ছিল বাঙালীর রাজনীতির তীর্থস্বরূপ। পূর্বসূরীর ঐতিহাসিক ভূমিকা আর নিষ্ঠার কথা স্মরণ করতে গিয়ে শতাব্দীর হয়তো কিছুটা আবেগপ্রবণ [illegible]। স্বভাবসুলভ ধীর [illegible] বললেন, এখনও অনেক [illegible] বাকি। ওঁদের [illegible] [illegible] হলে চাই সুশিক্ষায় শিক্ষিত আত্মসচেতন একটি জাতি। নিরক্ষরতা স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। অতএব শিক্ষার প্রসার এবং [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible]-

কল্পনা। জানি না, এই মহানব্রত পালনের গুরুদায়িত্ব কতখানি বইতে পারব।

প্রশ্ন করলাম, পূর্বতন অন্যতম শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীর এগার ক্লাসের শিক্ষাক্রম চালু করে বলেছিলেন, জাতীয় জীবনে তা এক আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। এ বিষয় আপনার মত কি?

প্রতাপচন্দ্র বললেন, বিষয়টার সঙ্গে জাতীর জীবন এমন-ভাবে যুক্ত যে তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার আগে তার সবদিক ধীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। সামান্য ভুলে জাতির অসামান্য ক্ষতি হতে পারে। এগার ক্লাসের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃ ব্যর্থ হয়েছে। অযথা অজস্র অর্থের অপচয় হয়েছে। এগার ক্লাসের পরি-কল্পনা যে ব্যর্থ, তা তার পরবর্তী ইতিহাসই প্রমাণ করে।

ডঃ চন্দ্র বলেন, শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে বেকার সমস্যা তীব্রতর করার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব থাকতে পারে না। শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্মমুখী করে ছাত্রদের স্বাবলম্বী হওয়ার মধ্যে ব্যক্তিজীবনে যেমন নির্ভরতা এবং তৃপ্তি আসতে পারে, তেমনি জাতীয় জীবনেও তা সৃষ্টি করতে পারে অগ্রগতির জোয়ার।

ঃ যদি তাই মনে করেন, তবে সামান্য কেরাণীর চাকরীর জন্যও সরকার স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অপরিহার্য ও আবশ্যিক বলে বিজ্ঞাপন দেন কেন?

ঃ কেরাণী বা ঐ ধরনের কাজের জন্য স্নাতক হওয়ার প্রয়ো-জন নেই। টেকনিকাল বা বিশেষ ধরনের বৃত্তির জন্য চাকরীর নিয়োগের ক্ষেত্রে স্নাতক বা গ্রাজুয়েট না হবে মাধ্যমিক সার্টি-ফিকেট থাকলেও চলতে পারে। আমাদের কার্যকালের মধ্যে এই নিয়ম চালু করা সম্ভব হবে। সর্বনিম্ন শিক্ষাপ্রাপ্ত ঐসব কর্মচারী যদি পদোন্নতি চান বিভাগীয় পরীক্ষা দিয়ে তারা অনায়াসেই পদোন্নতি পাবেন। বিভাগীয় প্রধান পর্যন্ত হতে পারবেন। তার জন্য গ্রাজুয়েট বা এম এ হওয়ার দরকার হবে না।

প্রসঙ্গত শিক্ষামন্ত্রী জানান, মাত্রাতিরিক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের মেধা নষ্ট করে। বিদ্যালয়ে কোনক্রমেই সাতটির বেশী বিষয় পড়ানো অনুচিত। সব রাজ্য সরকারকে এ বিষয় প্রয়োজনীয় পরা-মর্শ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিদ্যা-লয়গুলিতে মাত্র সাতটি বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা চালু হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করলে ছাত্ররা [illegible] [illegible] বাঁচবে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আরও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে। বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা সময়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সময় যাতে ছাত্ররা হাতের কাজ করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতেও বলা হয়েছে। শিক্ষাকে সমাজের প্রয়োজন ভিত্তিক বিষয় করে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। অতএব [illegible] [illegible]-গান খেলাধূলা শরীরচর্চা, আচার-আচরণ, নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এসবই ছাত্রদের মধ্যে মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

ঃ স্কুলে গিয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ-সুবিধা ও সময় না থাকায় বহু লোক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভে বঞ্চিত থাকে। তাদের সংখ্যাও এদেশে কম নেই। তাদের জন্য কোন রকম [illegible] [illegible] কি?

ঃ শিক্ষা লাভে আগ্রহী ঐ ধরনের মানুষের জন্য ইতিমধ্যে নন-ফরম্যাল এডুকেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। আগামী চার বছরের জন্য ঐ খাতে পঞ্চাশ কোটি টাকা বরাদ্দও হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। তাই অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হচ্ছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, সকল রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ এই খাতের বরাদ্দ টাকা নিয়ে নন-ফরম্যাল এডুকেশন চালু করলেও, এ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলা সরকারের কাছ থেকে কোন রকম সাড়া পাওয়া যায় নি।

: মিউজিয়াম অব ম্যান অথবা মানুষের জাদুঘর গড়ার একটা পরিকল্পনা আপনি গ্রহণ করেছেন বলে শুনেছি। তা কোথায় হচ্ছে এবং উদ্দেশ্যই বা কি?

: সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের দেশ জাতি ও সমাজ বিষয়ক শিক্ষার বিস্তৃতির জন্য মিউজিয়াম ম্যান অব গড়ে তোলা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের ভূপালে তার জন্য একশ একর জমিও পাওয়া গেছে। ভৌগোলিক হিসাবে ভূপাল ভারতের মধ্যবর্তী স্থান। এছাড়া আদিবাসী-উপজাতির হারও ঐ রাজ্যে অনেক বেশী। প্রস্তাবিত জাদুঘরে আদিবাসী-উপজাতি তথা দেশের সকল স্তরের মানুষের সামাজিক ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত নানা নিদর্শন ও তথ্য রাখা হবে। বর্তমান এবং অতীতকে অন্ধকারে রেখে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা অবাস্তব। তাই অতীত বর্তমানের সামাজিক ইতিবৃত্ত ও তথ্য সমৃদ্ধ প্রস্তাবিত মিউজিয়াম অব ম্যান হবে এক অপরিহার্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ চন্দ্র বলেন. এছাড়া রামায়ণ মহাভারতে যেসব যেসব চরিত্র ও কাহিনী বিধৃত, তার সঙ্গে ইতিহাসের সাদৃশ ও সঙ্গতি কতটুকু— তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজেও তাঁরা হাত দিয়েছেন: যেমন অযোধ্যা নগরী অথবা কুরুক্ষেত্র—এ দুটি স্থান রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানায় এই দুটি স্থানেরই অবস্থান বর্তমান। জাতীয় মহাকাব্যের উল্লিখিত ঘটনার সঙ্গে এইসব স্থানের তথ্যগত কোন মিল আছে কিনা এবং থাকলে কতখানি গ্রহণযোগ্য তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে বর্তমান অযোধ্যায় খনন-কার্য শুরু হয়েছে। এখনও তার কাজ চলছে। চলছে গবেষণা। তার রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি। প্রতিমুহূর্তে সরকার এবিষয় অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আলোচনার সূত্র ধরে কথা বলতে বলতে আর এক ইতিহাসের পথ ধরলাম। একটু বাদেই শিক্ষামন্ত্রীর দিল্লী যাবার কথা। তাই মন্ত্রীপুত্র রণবীর চন্দ্র আলোচ্য বিষয় সংক্ষিপ্ত করার অনুরোধ জানালেন।

পরিশেষে বললাম, সেটা ১৯৪৭ সাল। বৃটিশ-রাজের অন্তিম লগ্ন আগত প্রায়। তার আগে বিদেশী শাসকরা দুশ বছরের শোষণকালে ভারতবর্ষ থেকে ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ, পুঁথিপত্র, পুরানো গ্রন্থ, স্থাপত্য শিল্পের নানা নিদর্শন, তৈলচিত্র, ঐতিহাসিক অলঙ্কার-মূর্তিসহ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বহু মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গিয়ে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ভাণ্ডার পূর্ণ করেন।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মূলতঃ শাসনের নামে আমাদের ঐতিহ্য মণ্ডিত জাতীয় সম্পদ হস্তগত করে তাদের সাংস্কৃতিক ভাণ্ডার আরও মজবুত করার চেষ্টা করেন। এটা একটা সম্পদ অপহরণেরই সামিল বলে মনে করা চলে। যখন এদেশ ছেড়ে তারা চলে যেতে বাধ্য হন। তখন অপহৃত ঐসব জাতীয় সম্পদের প্রশ্ন তুলে তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ সোচ্চার হন। কিন্তু ঐ সম্পদের প্রশ্নে পাকিস্থানের স্রষ্টা জিন্নাসাহেব রাতারাতি দাবীদার হয়ে পড়েন। ভারতের মত তিনিও পাকিস্থানের পক্ষে সম্পদের ওপর ভাগ দাবী করেন: ফলে বিষয়টা বিতর্কিত হয়ে শেষ অবধি অমীমাংসিত থাকে। এই সুযোগে বিদেশী শাসক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের অপহৃত ঐসব অমূল্য সম্পদ আর ফেরৎ দেন না। স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পরও এ পর্যন্ত আর তা ফেরৎ পাওয়া যায়নি। আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গেলে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির শরণাপন্ন হতে হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রীরূপে আপনি কি ঐসব ঐতিহাসিক সম্পদ স্বদেশে ফিরিয়ে আনবার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন বা নিচ্ছেন?

প্রশ্নটা ধৈর্য নিয়ে শুনলেন প্রতাপচন্দ্র। তারপর বেশ কিছুক্ষণ তন্ময় থেকে বললেন, আগে আমরা নিজেদের তৈরী করে নিই। দায়িত্ব পালনে কতখানি সমর্থ? এই দেখুন না বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের বহু গ্রন্থ পুঁথি রক্ষণা-বেক্ষণের অভাবে প্রতিদিন নষ্ট হচ্ছে। আসলে আমরা দায়িত্ব নিতে যতখানি আগ্রহী, দায়িত্ব পালনে ততটা আন্তরিক নই। বেশী ভাবপ্রবণ বলেই হয়তো এরকমটা ঘটে।

প্রতাপ চন্দ্র বললেন, হতাশার কোন কারণ নেই। বৃটিশ সরকারের সঙ্গে এ বিষয় আলাপ-আলোচনা চলছে। তবে এখন তো আর শুধুমাত্র ভারত-পাকিস্থান নয়—আরেক শরিক বাংলাদেশও হয়তো ঐতিহাসিক সম্পদের দাবীদার হবেন। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সবকিছু সযত্নে আছে। নিয়মিতভাবে এ-বিষয় খোঁজখবরও রাখা হচ্ছে। যথাসময়ে যাতে হারানো ধন ফিরিয়ে এনে আমাদের জাতীয় সম্পদে সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ করা যায়, তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের আয়ুষ্কালের মধ্যেই যাতে এই কাজে সফল হওয়া যায়, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে আমিও কম উৎসাহী নই। কেননা জাতীয় এই সম্পদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতীয় সম্মানের প্রশ্ন।

সম্প্রতি কবরে আছেন তিনি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রমে এদেশের ওপর দিয়ে চৈত্র-বৈশাখ চলে গেল। অবনী ডিসপেনসারিতে আজ কদিন হল বসছে। প্রায় মাসাধিককাল সে শুয়েছিল। ওর অসুখ। কি অসুখ তল্লাটের কেউ জানতে পারছে না। ছাউনিতে থাকে যে লোকটা মুর্শেদ—সে মাঝে মাঝে এসে খোঁজ-খবর নিয়েছে—অন্যান্য সবাই। একটাই খবর সে অসুস্থ। জানালায় কেউ কেউ উঁকি মেরেছে— রক্ত সাদা হয়ে গেছে—রক্তশূন্য। মাথার কাছে জেগে হয়ে কেয়া না হয় মঞ্জু। একটা সাদা চাদর দিয়ে শরীর ঢাকা থাকত অবনীর। জব্বার চাচা কবিরাজী মতে ওষুধ দিয়ে যাচ্ছেন। যেন অবনী এবং জব্বার চাচা মিলে এই চিকিৎসা। আর অবনীর এমনিতেই ডাক্তারদের ওপর ভরসা কম। সে তার রোজগারপাতির জন্যই হাল আমলের ডাক্তারদের যমের তুল্য মানুষ ভাবে। মাঝে মাঝে সে তার রুগীদেরও ব্যবসার খাতিরে এমন বলত। কবিরাজী ওষুধে কী না আছে। যত প্রাচীন রোগ জড়া ব্যাধি সবই নিরাময় হয় এই চিকিৎসায়। সুতরাং এমন বিশ্বাসের মানুষ অবনী নিজের অসুখে যে ডাক্তার ডাকবে না তা মুর্শেদও মেনে নিয়েছিল। ঘোড়ার পিঠে রুগী বাড়ি যেতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে—দুদিন খোঁজ ছিল না এমনও চাউর করে দিয়েছেন জব্বার চাচা। আসলে এই ৭১ সালটাই বড় খারাপ। মানুষজন নির্বিচারে খুন হচ্ছে। একটা পেটি পাচার করতে গিয়ে অবনীর কাঁধে গুলি লেগে এফোঁড়-ওফোঁড়—এ খবর মানুষেরা ঘুণাক্ষরে জানলে সপরিবারে হাজত কিংবা আরও কি যে হতে পারে—মাঠে পড়ে থাকতে পারে, লাস হয়ে যেতে পারে—কত কি হতে পারে! এসবের জন্যই সব সময় জব্বারচাচায় শ্যান চক্ষু কয়—কিডা চাই।

—অবনী ভাইরে দেখতে আইছিলাম।

—তামাসা।

—শরীলডা শুনছি ভাল না।

—যাও দূর থাইকা দ্যাখবা। কাছে যাইবা না। বড়ই সংক্রামক ব্যাধি। কখন কারে ধরে কওয়ন যায় না।

এমন শুনে কেউ কেউ আর আসতই না। কারণ ইদানিং অবনীর কবিরাজীতে নাম ডাক হয়েছে। অসুখ শুনলে [illegible]

জেলে লোকজন আসতে শুরু করেছিল। কি থেকে কি হয় কে জানে। খান সেনাদের ভয়তো লেগেই আছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত জব্বার চাচা সংক্রামক ব্যাধি বলতেই লোকজনের ভালবাসায় টান কমে গেল। জব্বার চাচা তক্তপোশে বসে হুকো খায় আর আপন মনে গজর গজর করে। সংক্রামক ব্যাধি কারে যে ধরে। ছিল দেশ একখানা, হইল দুইখানা, এখন তেনারা তিনখানা করনের তালে আছে। কিন্তু জানের কথা ক্যাডা না হুঁস করে। কী যে হইব। এভাবে জব্বার চাচার এক কাজই ছিল তখন গভীর রাতে ক্ষতস্থান ধুয়ে দেওয়া। ভেবাক্তার কল গরম করে লাগিয়ে দেওয়া। এবং মানুষ জানেই না এই কবে কি আছে সঞ্জীবনী সুধা—কর্কট রোগে কাজে লাগে এমনও কইছেন কবিরাজ দাদা।

সে যাই হোক, মাসাধিককাল পর অবনী প্রথম একদিন লম্বা বারান্দায় এক-পাশে জামা গায় দিয়ে ইজিচেয়ারে বসল। সেখানে বসেই রুগীপত্তর দেখল। জব্বার চাচাকে ওষুধ এবং অনুপানের নাম বলে দিল। তারপর একদিন হেঁটে হেঁটে ডিস-পেনসারিতে গিয়ে বসল। বাঁ হাতটার শক্তি পাচ্ছে না জোর কেমন কমে আসছে। সে বুঝতে পারছিল, তার আর কোথাও যাবার উপায় নেই। দেশ ছেড়েও পালাতে পারছে না। তার একমাত্র সন্তান নীলুর জন্য মরুক বাচুক এখানেই থাকতে হবে। এবং এখন তার ভাবি সন্তান—এই উন্মাদনায় সে সামসের এবং কামালের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লেই ভাল করত। এই এক মাসের মধ্যে অবনী সমসেরেরও কোন চিঠি পায়নি। সব ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। এমন কি একটা চিরকুট কেউ দিয়ে যায়নি। কেউ এসে বলেনি সজনে ফুল, তালপাতার পাখা, তিন নম্বর কুটির। ওরা কি অবনীকে অবিশ্বাস করছে। তারপরই মনে হল ওরা কেউ বেঁচে নাও থাকতে পারে। যেখানেই খান সেনাদের সংশয়, সেখানেই মেশিনগান উঁচিয়ে ছুটে যাচ্ছে। দাবানলের মতো জ্বলে যাচ্ছে ঘর-বাড়ি। ধরে নিয়ে যাচ্ছে মা-বোনেদের। জব্বার চাচা এসব শুনলে বলছেন, ছোট শরিকে বড় শরিকে মামলা। কে কারে ছোট শরিক কয়। জনে বড় শরিক না জমিনে বড় শরিক। যে যা কন মিঞাভাইয়া এইটা ভাল কথা না, একখান, দুইখান তিনখানা, করে যে আর কত না হইব। সব কথার পরও জব্বার চাচা অবনীর ঘোড়াটা মাঠে নিয়া যায় অবনীর কথা বলালে কয়, তাইন এক ইনসান মানুষ। তাঁয় কে মরে। শান্তি কমিটির লোকদের দেখলে বলবে অ মিঞা ভাইরা বড় মিঞা গোসা কইরা রাওয়াল-পিন্ডি চইল্যা গেল, আব আগুন জ্বালাইয়া দিল হোমোন্দির পোতেরা, অগ [illegible] মা বোন নাই। অজু অজু করে [illegible] নামাজ পড়ে না। তয় অরা ইমানদার [illegible] পিছনে ঘোরে ক্যান। ধইরা নেয় ক্যান জবাই করে ক্যান।

সংশয় যে বাড়ছে সেটা মুর্শেদও এক-দিন বলে গেল। —অবনীবাবু যেখানে সেখানে যান ভাল না।

অবনী কিছু বলেনি, চুপ করে ছিল। মঞ্জু বলল, মুর্শেদ কি জন্য এসেছিল।
—এমনি।

মঞ্জু বুঝতে পারছে অবনী সব চেপে যাচ্ছে। সে বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন। সবার যা হবে আমাদের তাই হবে।
অবনী বলল, সবাই পালাচ্ছে।

—আমরা যাব কোথায়। কার গলগ্রহ হব। নীলুকে নিয়ে যাবে কি করে।

অবনী সব বুঝতে পারে। তারা কত অসহায় বুঝতে পারে। নীলুর দিকে তাকিয়ে সে তার মনের সাহস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। সে জানে ভবিতব্য বলে একটা কথা আছে। নীলুকে সে যেমন ভবিতব্যর হাতে ছেড়ে দিয়েছে, নিজেদেরও আজ তেমনি সেই ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে কিছুটা হালকা হতে চাইল।

কদিন ধরে অবনী রোজ সকালে নীলুর মাথার কাছে গিয়ে বসে। নীলু এখন আবার কদিন ভাল আছে। বিছানায় উঠে বসতে পারছে। এমন কদিন থাকবে তারপর আবার আর উঠতে পারবে না। শুধু শুয়ে থেকে বলবে মা আমার পাগুলি কে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দ্যাখ না মা কারা আমার হাত ধরে টানছে। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না কেন। জানালা খুলে দাও। মা আমি আমি... তারপর কেমন নির্বাক থাকে কিছুক্ষণ, কখনও কখনও কিছু মাস।

আজ কদিন ধরে নীলুকে বারান্দায় এনে বসিয়ে দেওয়া হয়। সে সকালের পাখ-পাখালি দেখে। কখনও সে বলে ওঠে, মা মা ইষ্টিকুটুম। মা মা পাখিটা কি সুন্দর। কখনও নীলু দেখতে পায় ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছে মাঠে, নীলু অবনীকে দেখলে বলে, বাবা আমি ভাল হলে ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূরে চলে যাব। কোথাও যেন তার জন্য বড় মাঠ আর জলাশয় আছে। সেটা কোথায় কতদূর জানে না। এই দেশটায় এখন বর্গীরা শস্য পুড়িয়ে দিচ্ছে, ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, বড় মিঞা গোসা করে রাওয়ালপিন্ডি চলে গেছে—কত যে এভাবে আছে খবর নীলু তার কিছুই জানে না।

কারণ নীলুর এই গাছপালা মাঠের সঙ্গে স্বপ্নের এক জগত তৈরি হয়ে গেছে। সেখানে আছে বড় নদী, আছে বালির চর আছে তরমুজের খেত। কোন বালিকার মুখ সে দেখতে পায়। বড় সোনার নোলক নাকে ঝুলছে। টুনটুনি গল্পের রাজকন্যা বোধহয় সেই মেয়েটা। নীলু অবোধ বালক জানেই না মানুষ বড় হয়ে মানুষ খুন করে। তার কাছে মানুষের জন্য শুধু ঈশ্বর ভালবাসার অপার মহিমা রেখে দিয়েছেন। নীলু মনমরা হয়ে গেলে খুব ভয়ের—নীলুকে কেবল পৃথিবীর যাবতীয় সুন্দর সুষমার কথা বলতে হয়। বলতে হয় বর্ষায় আমরা যাব লাঙ্গলবন্দের বান্নিতে। বিন্নির খৈ কিনে দেব লাল বাতাসার সঙ্গে। কেয়ার এমন স্বভাব, নীলু মনমরা হয়ে গেলেই রক্তের ভেতর তাজা ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে হয়। সে পাশে বসে তখন কতরকমের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার গল্প করে।

অবনী বারান্দায় ইজিচেয়ারে, পাশের টিপয়ে চা রেখে গেছে কেয়া। সকালের দৈনিক সংবাদ সে উল্টেপাল্টে দেখছিল। কিছু সংঘর্ষের খবর। সর্বশ এখন সেনারা শান্তি রক্ষা করছে এমন খবর।

মঞ্জুর স্বভাব সকালে উঠেই স্নান করে নেওয়া। জব্বার চাচা দুধ দুয়ে নিয়ে আসে। গগনা জেলে মাছ দিত। কদিন হল সে আসছে না। কেয়ার তোন তাড়াহুড়ো নেই কাজে। স্কুল কলেজ বন্ধ। মাঝে মাঝে মিলিটারি জিপ হুঁস হাস সামনের সড়ক ধরে চলে যায়। অফিস কাছারিতে কাজ হচ্ছে না। এবং একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে সারা বাড়িটাতে একটা গভীর আতঙ্কের ছায়া ক্রমে আরও গভীরতর হচ্ছে।

তবে জব্বার চাচা খুবই স্থিতধী মানুষ বলে সবই আল্লার মর্জি ভেবে নিয়ে কাজ কাম সব ঠিকঠাক করে যাচ্ছেন। ঘোড়াটাকে মাঠে ছেড়ে দেবার আগে সামনের দুপা বেঁধে দিলেন। আকাশটা ভার ভার। ঝড়-বৃষ্টি আসতে পারে। ঘরে গিয়ে আসমানের অবস্থা বুঝে বাসকের ছাল অর্জুনের ছাল এবং সব নানারকমের ফল মূল যা রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল তুলে ফেললেন। আকাশ আরও ঘন কালো হয়ে উঠছে। একটা পাতা পড়ছে না। ঠিক বিকেলের মুখে ঠেলে এল ঝড়। ঘোড়াটা তিনি খুঁজতে গেলেন মাঠে।

সাঁজবেলায় চাচা ফিরলেন ঘোড়া নিয়ে। একেবারে ভিজে গেছেন। বড় সড়কে বাস আসবে এখন। গোপালদির বাস। এ-সময় রোজ বাসের মানুষজনের মুখ থেকে ঢাকার খবর শুনে আসেন। তাড়াতাড়ি সড়কে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাসটা এল অনেক দেরি করে। চাচার প্রশ্নের কেউ জবাব দিল না। কেবল একজন বলল, আল্লারে ডাকেন। চাচার মনে হল, তবে কি সেই কেয়ামতের দিন এসে গেল। ডিসপেনসারিতে ঢুকে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। কবিরাজ দাদার ছবি দেখলেন, কবিরাজ দাদার মেয়ে মঞ্জু। সে কবিরাজ দাদার আমল থেকে এবাড়িতে আশ্রিত। কবিরাজ দাদা মরে গিয়ে তাকে বড় দায়ের মধ্যে রেখে গেল। ক্রমে রাত আরও গভীর হল। জব্বার চাচা ডিসপেনসারিতে এবার আলো জ্বাললেন। তারপর অজু ছেড়ে গামছা পেতে নামাজ পড়লেন। আল্লার কাছে দোয়া চাইলেন এ-পরিবারের জন্য। এবং আস্তাবলে ঘোড়াটা বেঁধে রেখে লন্ঠন নিয়ে বের হলেন দেখতে, কোথায় কোন গাছপালার ডাল ভেঙে পড়েছে। ঝড় কোথায় কি অনিষ্ট করে গেছে

এ-বাড়িতে দেখার জন্য গাছপালার মধ্যে একজন ফকিরের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকলেন, মঞ্জু বলল, চাচার কাণ্ড দেখেছ। কী বলবে!

অবনী জানালায় দাঁড়িয়ে দেখল, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কড় কড় করে আকাশ ভেঙে পড়ছে। জব্বার চাচার কোন হুঁস নেই। সব ভাঙ্গা ডাল পালা টেনে নিয়ে আসছে। যা দিনকাল! সকাল না হতেই কে আবার চুরি করে। দেশেতো আর কোন আইন নাই। জব্বার চাচার কাণ্ড দেখে অবনীর মুখে কিন্তু হাসি ফুটে উঠল। মঞ্জু তখনও অন্য জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। অবনী একটা সিগারেট খাবে বলে দেশলাই খুঁজল। আর তখনই মঞ্জুর মনে হল একটা ছায়ামূর্তি পুকুর ধরে এগিয়ে আসছে। বিদ্যুৎ চমকালে দেখল লোকটা লম্বা চোয়াল মানুষ। তফন পরনে। গায়ে গেঞ্জি। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লোকটা এগিয়ে আসছে ভিতর বাড়ির দিকে।

মঞ্জু সহসা ডাকল কেয়া কেয়া?

কেয়া এলে বলল, দেখত গাছটার নিচে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে।

বিদ্যুৎ চমকাল। সত্যি একজন ভীষণ চেহারার মানুষ। মঞ্জু আবার বলল। তোর দাদাকে ডাক।

অবনী সবই শুনছে। জানে ভবিতব্য এ-বাড়ির এটাই। তাকে কেমন নিস্পৃহ দেখাচ্ছে। সে তবু ও-ঘরে গিয়ে বলল, কী হয়েছে।

—একটা লোক।

—জব্বার চাচা ও ডাল পালা জড় করছিল।

—আরে না। দেখ না। গাছের নিচে।

ঘরে আলো নেই। অন্ধকার থেকেই কেয়া মঞ্জু অবনী দেখল লোকটা বারান্দায় উঠে আসছে। খুব সতর্ক গলায় বলছে সজনে ফুল, তালপাতার পাখা, তিন নম্বর কুটির। একদা সমসের কামালের এই কোড ছিল।

অবনী বলল, কে আপনি।

—আমি মেহের।

—মেহের! তুই বেঁচে আছিস!

—আছি কর্তা।

কেয়াকে অবনী দরজা খুলে দিতে বলল। মঞ্জু পাশের ঘর থেকে আলো নিয়ে এল। মেহেরের হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। বোঝাই যাচ্ছে মানুষটা অনেকদূর থেকে হেঁটে হেঁটে এখানে এসেছে। বাসে আসেনি। এখন কোন বাস নেই ঢাকা থেকে। অবনী কিছু বলার আগেই মেহের বলল, সময় নেই। বসব না। মঞ্জুদিকে সাবু এ-গুলি দিয়েছে।

অবনী সাবু বলে কাউকে চিনতে পারল না।

মঞ্জু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, সাবু কে?

এতক্ষণে মেহের বুঝতে পারল সাবুকে মঞ্জুদির চেনার কথা নয়। সমসের যে তার শেষ ইউনিট নিয়ে সাবু হয়ে গেছে সে-খবর এরা রাখে না। সে নিজেকে শুধরে বলল, সমসের ভাই।

মঞ্জু বলল, সমসেরের খবর কি। সে এখন কোথায় আছে?

মেহের মাথা নিচু করে রাখল। বুঝতে পারল সমসের এনকাউন্টারে মারা গেছে। তারপর মেহের হাতের ব্যাগটা মঞ্জুদিকে দিয়ে বলল, যাবার আগে সমসের ভাই এটা আপনাকে দিতে বলে গেছেন।

অবনী বলল, জামা কাপড় ছাড়।

মেহের বলল, না অবনী কর্তা। আমরা সব এখন বর্ডারে বর্ডারে আছি। আর ভয় নেই। ও-পার থেকে সব সাপ্লাই আসছে। কোনরকমে আর দু দশটা মাস বেঁচে থাকুন। তারপর আর মেহের দাঁড়াল না। অন্ধকারে ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই হারিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে সবাই নির্বাক। চামড়ার ব্যাগটা মঞ্জুর হাতে। এটা দিয়ে কি করতে হবে কেউ যেন বুঝতে পারছে না। এমন কি খুলে দেখতেও ভয় হচ্ছে। দরজা বন্ধ করে অবনী নিজেই ব্যাগটা তুলে নিল হাতে। তারপর নুয়ে ধীরে ধীরে খুলল ব্যাগটা। শুধু ভিতরে একটা বড় কাগজের বান্ডিল। তাতে কিছু হিজি বিজি লেখা। আর কিছু নেই। ফাঁকা।

মঞ্জু বসে পড়েছে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে সমসেরের হস্তাক্ষর দেখে। এ-লেখা তার অনেক দিনের চেনা। সমসের তার স্বামীকে ডাকত নাম ধরে। আর তাকে ডাকত মঞ্জুদি বলে। সে কেমন প্রথম দুটো পাতা উল্টে গেল। শেষ পর্যন্ত সমসের তার কাছে এটা পাঠাবার কি কারণ পেল! এবং তখনই মনে হল, সমসেরের লেখার সে ছিল অনুরক্ত পাঠিকা। সেই তাকে লেখার জন্য উৎসাহ দিয়ে যেত। মঞ্জু ঝাপসা চোখে কিছু লাইন পড়ল। লিখেছে, এটা একটা দলিল হীনতা নীচতার আর আতত্যাগের দলিল হীনতা নীচতার আর আত্মত্যাগের দলিল। এক জায়গায় লিখেছে, ধর্ম মানুষের চেয়ে বড় নয়। আর এক জায়গা লিখেছে মানুষের মধ্যে ধর্মের সহিষ্ণু রূপ ফিরে আসুক। শেষে লিখেছে, অজ্ঞাতবাস। দুদিকে দুটো ডট লাইন টেনে দিয়েছে। নিচে সমসেরের সই।

গভীর রাতে মঞ্জু গোপনে পাণ্ডুলিপিটা পড়ে। গণ-হত্যা গণ-কবরের বীভৎস সব ঘটনার কথা আছে পাণ্ডুলিপিতে। সঙ্গে আছে বাংলাদেশের নীলবর্ণের পাখিদের কথা। পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দেয়। কোথাও ঘটনা আশ্চর্য নিটোল গল্পের রূপ নিয়েছে। অথচ এমন নিষ্ঠুর সত্য কাহিনী, আত্মত্যাগের কাহিনী আগামী প্রজন্ম হয়ত ভুলে যাবে। এই দেশ, গাছপালা পাখির সঙ্গে নতুন এক জীবনের উন্মেষ হচ্ছে—সমসেরের লেখায় সেটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আবার হয়ত ধানদাবাজ মানুষেরা আসবে এবং স্বার্থ সিদ্ধির উপায় হিসাবে ধর্মের জিগিরও তুলতে পারে। ভবিষ্যতে যাই হোক মঞ্জু জানে বাংলাদেশের আসল রূপ সমসেরের লেখায় ফুটে উঠেছে। সে যে এখন পাণ্ডুলিপিটা কোথায় রাখে!

অবনী কিছুটা পড়েই বলল, এখুনি এটা আগুনে পুড়িয়ে দাও।

মঞ্জু চোখ তুলে তাকাল। তারপর বলল, না।

অবনী খুব রুষ্ট হয়ে উঠল। বলল, আমাকে কি তোমরা ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে চাও।

মঞ্জুর মুখটা কাল হয়ে গেল। যে কোন সময় এ-বাড়িতে তল্লাসী হতে পারে। শান্তি কমিটির কিছু মানুষজন অবনীর ওপর খাপ্পা। ভোটের সময় আওয়ামী লীগের হয়ে সে খেটেছে। এখন তো মুজিবের লোক হলেই গলা কাটা যাচ্ছে। ধর পাকড় যখন আরম্ভ হল নেশায় পেয়ে গেল মানুষটাকে। সমসের কামাল তাকে ডেকে বলেছিল, এটাই আমাদের ঠিক পথ। আমাদের সঙ্গে এস। সে আহবান মানুষটা উপেক্ষা করতে পারেনি। ছলে-ছুতোয় দু এক দিনের জন্য উধাও হয়ে যেত। কিন্তু এবারে জখম হয়ে ফিরে এসেছে। এবং একেবারে ভেঙে পড়েছে। সব ছত্রখান। সব ব্যর্থ। ও-পারে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণের দায়ে ছুটছে। মাঝে মাঝে শুধু ক্ষোভে দুঃখে চিৎকার শোনা যায় জব্বার চাচার—বড় মিঞা তোমার ক্ষমা নাই। আল্লা তোমাকে ক্ষমা করবে না। নিজের জালে নিজেই জড়াইয়া মরবা।

মঞ্জু কি ভেবে বলল, তবে কি করব বল!

অবনী উঠে দাড়াল। তারপর লণ্ঠন হাতে দরজা খুলতেই মঞ্জুর আবার প্রশ্ন—কোথায় যাচ্ছ।

—আমার সঙ্গে এস। ওটা সঙ্গে নাও।

মঞ্জু জানে, লোকটা এখন কোথায় যাবে। সে নিজেও উঠে গেল। দরজার কাছে গিয়ে বলল, কাল যা হয় কর।

অবনী থামল না। মঞ্জু সব জানে না। মুর্শেদ কিছু গোপন খবর দেয়। সে জানে আজ হোক কাল হোক একটা জিপগাড়িতে তারা আসবে। এবং তাকে ডেকে নিয়ে যাবে। জেরা করবে। তারপর মর্জি হলে ফিরতে দিতে পারে, নাও পারে। এসব কথা মঞ্জুকে বলে লাভ নেই। এখনই সংসারে কোন বিভীষিকার ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠুক

সে চায় না। অবনী বারান্দায় এসে কি ভেবে আবার ঘরে ঢুকে লন্ঠন রেখে টর্চটা হাতে নিল। মঞ্জুকে বলল, ওটা দাও।

—আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

—এস।

—আস্তাবলের মাচানে খড়ের গাদায় রেখে দি।

অবনীর ইচ্ছে হল চিৎকার করে উঠতে মঞ্জু তুমি পাগল। আমাকে ওরা এমনিতেই কলাবরেটর বলে সন্দেহ করছে। তারপর যদি হাতে নাতে কিছু পায় তবে কথাই নেই। অবনী সোজা হাঁটতে থাকল। মঞ্জু পাশে পাশে। সরকার বাড়ি পার হয়ে গেল তারা। আস্তানা সাবের দরগার পথটা ধরে গেলে হয়; কিন্তু কি ভেবে অবনী ওদিকটায় গেল না। কাচারি বাড়ির পেছনে বড় একটা বন-জঙ্গল আছে। ওটা অবনী তার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করার সময় মঞ্জুর মনে হল পাকা সড়ক ধরে অনেক দূর থেকে একটা গাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। জিপের শব্দ। আলোটা ক্রমে বড় হয়ে যেতে থাকল। মঞ্জু দরজা বন্ধ করে অবনীর পাশে অন্ধকার জানালায় দাঁড়াল। গাড়িটা পাকা সড়ক ধরেই চলে গেল। আবার ফিরে এল গাড়িটা। অর্জুন গাছটার নিচে থামল। কিছু ছায়ামূর্তি দেখা গেল নেমে আসছে। কি দেখল, আবার ছায়াগুলি গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। অবনীর বুক কাঁপছিল। মঞ্জু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মঞ্জু শেষে ফিস ফিস গলায় বলল, জিপ গাড়ি।

অবনী বলল, চলে গেল।

—কেউ নেই?

—না।

—ওরা কারা?

—জানি না। ওরা দুজনই সে রাতে ঘুমাতে পারল না। আর সকালেই গোপের বাগ মিলিটারি থেকে একটা জিপে পাঁচজন মিলিটারি অফিসার ডিসপেনসারিতে হাজির। জব্বার চাচা বলল, মিঞা কিডা চান।

ওরা একটা কি কাগজ দেখাল তাকে। সে বুঝল না কিছু। অবনী বের হয়ে আসছে। সে বুঝতে পারছে তার সমন। সে কাছে যেতেই জেব থেকে কি বের মিলিয়ে দেখল। তারপরে হাত দুটো বেঁধে টানতে টানতে জিপে তুলে নিল। অবশ্য প্রাণের দায়ে প্রথমে জোরজার করলেও পরে নিয়তি ভেবে সোজা হেঁটে গেল। বলল, লাগছে। ওর হাতের দড়ি সামান্য আলগা করে দেওয়া হল।

মঞ্জু জানালায় নিথর। নীলু দেখছে বাবাকে চোরের মতো পেছনে হাত বেঁধে মিলিটারির লোকেরা নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কোন প্রতিবাদ করছে না। মা মূর্ছা গেছে। মেয়া পিসি হাহাকার করে কাঁদছে। কেবল জব্বার চাচা চিৎকার করছে—পার পাইবা না বড় মিঞা। হুমোন্দির পুতেগ চিন না, নিজের জালে নিজে জড়াইয়া মরবা। খোদা তোমার কসুর ক্ষমা করবা না। এবং এই বলতে বলতে সে কেমন পাগলের মতো জিপ গাড়িটার পিছনে দৌড়াতে থাকল। কেউ তাকে থামাতে পারল না। বিড় বিড় করে বকছে আর একটা জিপ গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে বুড়ো মানুষটা। ছুটতে ছুটতে মানুষটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। হাত দুটো বিছিয়ে দিল সামনে। হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকল—মায়রে গিয়া মুখ দেখামু কি কইয়া!!

এবং এই এক শব্দই প্রতিনিয়ত তাঁকে তাড়া করেছিল। সময় যায়, মানুষ জন সব আবার ফিরে আসে—তবু লোকটার এক কথা, মায়রে মুখ দ্যাখামু কি কইরা!! মানুষটা কবরে যাবার আগেও বলত, বিড়-বিড় করে বকত, মায়রে মুখ দ্যাখামু কি কইরা। কসুর ক্ষমা কইর না। অনেক দূর দূর হেঁটে চলে যেত কখনও মানুষটা, বলত, কসুর ক্ষমা কইর না। শুধু একটাই কথা ছিল শেষ দিকে। জীর্ণশ্বাস, যক্ষ্মারোগীর মতো নিরন্তর বিবাগী মানুষ—সে মানুষটা আর এখন নেই। তার কথা কেউ [illegible]

ভ্রাম্যমান

শিশিরকুমার দাশ

দিল্লী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে আছি। শেষ ডিসেম্বরের শীত। এলাহাবাদ থেকে আমার এক আত্মীয়া আসবেন। কী কারণে কালকা মেল ঘণ্টা আড়াই লেট, কেউ বললে কোথায় রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, কেউ বললে ট্রেনে ডাকাতি; মূলে কথাটা হল আমাকে শুধু শুধু বসে থাকতে হয়েছে। সেই এসেছিলাম সাতটায়—তাড়াতাড়িই এসে পড়েছিলাম—এখন মনে হচ্ছে সাড়ে দশটার আগে ট্রেন আসার কোন সম্ভাবনাই নেই। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পাইচারি করেছি, হুইলারের স্টলে দাঁড়িয়ে দশ-বিশটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টেছি, এই নিয়ে তৃতীয় ভাঁড় চা খেলাম। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা নিজস্ব গতিতে চলেছে। যখন মনে হয় আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট কেটে যাওয়া উচিত তখন ঘড়িতে দেখি মাত্র সাড়ে আট মিনিট কেটেছে।। আবার উঠে দাঁড়ালাম, আবার পাইচারি।

দিল্লীতে ডিসেম্বরের শেষের শীত বেশ কড়া। এ বছর আরো কড়া। বিশেষতঃ কয়েকদিন আগে সিমলাতে খুব বরফ পড়েছে। সেই বরফ ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া এখন দিল্লীর আকাশে। আমার গায়ে গরম কাপড় যথেষ্ট, সত্যি বললে, একটু বেশী। সোয়েটার আর কোট, গলায় মাফলার, মাথায় কান ঢাকা উলের টুপি, গরম উলেন ট্রাউজার্স, মোজা এবং আমেরিকায় কেনা বরফের ওপর চলাফেরার পুরু জুতো। হাতে গ্লাভস্ও পরতে ভুলিনি। গ্লাভস্গুলো বিলিতি। কাজেই বেশ একটা আভিজাত্যের সঙ্গে পাইচারি করছিলাম।

প্ল্যাটফর্মে লোকজন কম। হুইলবারের বইর দোকানের আশেপাশে কিছু লোক। কিছু লোক চায়ের দোকানটার ধারে। আগুনে হাত সেঁকে নিচ্ছে মধ্যে মধ্যে। দু-চারটি কুলী সিঁড়ির ধারের বেঞ্চে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছে। আর কিছু লোক ভালো করে মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে বেঞ্চে পা তুলে বসেছে। হি-হি করে কাঁপছে আর বিড়ি খাচ্ছে। আমার মত আপাদমস্তক ঢাকা কিছু ভদ্রলোক অবশ্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর ঘড়ি দেখছেন। ওভারকোটে আর মাংকি ক্যাপে সবাই নিজেদের ঢেকে রেখেছে।। আসল ব্যাপার হল যে প্ল্যাটফর্মে কোন ভীড়ই নেই। এই কদিন আগেই কালকা মেল অ্যাটেণ্ড করতে এসেছিলাম, কি ভীড় ছিল।। আমার শালাকে খুঁজেই পেলাম না। আর আজ সেই শালার কোন দূরসম্পর্কীয় শালাকেও খুঁজে বার করা কোন সমস্যাই নয়।

পাইচারি করতে করতে ক্লান্ত বোধ হল। বিশেষতঃ ভারী বুটের জন্য পা দুটো আড়ষ্ট। সামনেই খালি বেঞ্চ দেখে বসে পড়লাম। পকেট থেকে খবরের কাগজটা বার করে পড়ার চেষ্টা করলাম। আলোটা বড় কম। প্ল্যাটফর্মের বাইরে বেশ ঘন কুয়াশা। কাজেই কাগজটা মুড়ে রাখলাম। হঠাৎ পাশে এসে বসলেন একটি ছোট-খাটো হাসিখুশি ভদ্রলোক। প্যাণ্ট-কোট পরা, গলায় একটা মাফলার। দেখে বুঝলাম বাঙালী। মুখে বেশ বিনয় বিগলিত হাসি। ভদ্রলোক মাফলারটা খুলে মাথায় বাঁধলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন হিন্দীতে,—সিমলায় বরফ পড়েছে কিনা, সেই উত্তুরে হাওয়া [illegible] [illegible] দিয়েছে—

আমি সন্তোষের ভঙ্গীতে হাসলাম এবং বাংলায় উত্তর দিলাম, যা বলেছেন। তার ওপর ট্রেন আড়াই ঘণ্টা লেট।

ও, আপনি বাঙ্গালী—বলে ভদ্রলোক আর একটু এগিয়ে বসলেন। সত্যিই কি ল্যাঠা বলুন তো। এই শীতের রাত্রে—যাকগে, যাকগে, তা আপনি দিল্লীতেই থাকেন? কতদিন হল?

আমি এ ধরনের প্রশ্ন পছন্দ করিনা। আমি কোথায় থাকি, কতদিন ধরে আছি। আমার বয়স কত, আমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়, আমার বড়মামা রেলে কাজ করতেন কিনা—এই ধরনের প্রশ্ন শুনলে হাড়-পিত্তি জ্বলে। কিন্তু আজ মনটা বেশ প্রশান্ত ছিল বলেই বোধহয় আমি আমার আভিজাত্যের হিমগিরি থেকে নীচে নেমে এলাম' সময় কাটানোই প্রধান কর্তব্য। তাই উদাসীনভাবে বললাম, তা বছর দেড়েক আছি।

'আমি অবশ্য বহু পুরোনো।' ভদ্রলোক হাসলেন,—বুঝলেন না, দিল্লীতেই হল প্রায় বিশ বছর। সত্যি সত্যি কি করে যে সময় কেটে গেল। তারপর কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। সরকারী কাজ বুঝি, ভদ্রলোক কৌতূহল প্রকাশ করেন।

হ্যাঁ, আমি সরকারী কাজই করি। ভদ্রলোকের পরের প্রশ্ন অনুমান করে জুড়ে দিই, আমি ফরেন সার্ভিসে—

বাঃ বাঃ। উল্লসিত হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক। ভারী মজা আপনাদের। আজ এদেশে, তো কাল ওদেশে। কত দেশ দেখছেন স্যার। বাঃ বাঃ খুবই আনন্দ পেলাম। আমি অবশ্য অনুমান করেছিলাম।

এবার কিছুটা কৌতূহলের ভঙ্গীতে তাকালুম। ভদ্রলোক বললেন, ঐ ধরুন আপনার কোট, ও স্যার বিলিতি কাট, এখানে পাওয়া যাবে না। আর ঐ জুতো—ভদ্রলোক এমনভাবে তাকালেন যেন শার্লক্ হোমস্ ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বলছেন, ইটস্ এলিমেণ্টারী, মাই ডিয়ার ওয়াট্সন। —কি ঠিক বলেছি কিনা?

আমি প্রসন্ন হাসি হাসলুম। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন। এ জ্যাকেটটা বিলিতি আর জুতোটা আমেরিকায়—বাফেলোতে কেনা।

কোন্ জায়গা বললেন স্যার?
বাফেলো। একটু হেসে বললাম।

আচ্ছা, এরকম নামের জায়গা আছে বুঝি।

তা আছে বৈ কি। ওখান থেকে নায়গ্রা ফল্‌স বেশী দূরে নয়।

নায়গ্রা?—মানে সেই নায়গ্রা জলপ্রপাত? ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন—নায়গ্রা জলপ্রপাত আপনি দেখেছেন?

বিনীতভাবে জানালাম, হ্যাঁ কয়েকদিন নায়গ্রা সিটিতে ছিলাম। তবে ক্যানাডা থেকেও নায়গ্রা দেখেছি বিকেলবেলা। গোধূলির রং জড়ানো সেই নায়গ্রা—

ভদ্রলোক জুড়ে দিলেন, সারা জীবন ভোলা যায় না।

আমি ঠিক এতটা বিহ্বলতা প্রকাশ করতে চাইনি। ভদ্রলোক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন তা আমেরিকায় কতদিন ছিলেন?

বেশী নয়, বছর খানেক। জরুরী কাজে ফিরে যেতে হয়।

বছরখানেক ছিলেন। সেও তো অনেক স্যার। তা ইংল্যাণ্ডে ছিলেন নিশ্চয়ই—

ইংলণ্ড? হ্যাঁ, তা প্রায় তিন সাড়ে তিন বছর। হাই তুলতে তুলতে কথা বলার চেষ্টা করি।

সাড়ে তিন বছর? সেতো অনেকদিন? আপনি ক্রিকেট খেলা পছন্দ করেন নিশ্চয়ই? লর্ড্‌সে খেলা দেখেছেন?

আমি হেসে বললাম, ক্রিকেট যে খুব পছন্দ করি তা নয়। তবে লর্ড্‌স-এর মাঠে খেলা দেখেছি—ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়া। ওভালের মাঠেও দেখেছি একবার।

—দু জায়গাতেই দেখেছেন? আঁ, খলিফা লোক মশাই আপনি। বলেই একটু সংকুচিত বোধ করেন। মানে, আপনি খুবই ভাগ্যবান লোক স্যার। আমাদের তো কিছুই দেখা হল না। হবেও না।

আমি উৎসাহ দেবার চেষ্টা করি। কেন, তা কেন? আজকালতো রাম শ্যাম হরি মধু সবাই বিদেশে যাচ্ছে। আপনি একদিন চলে যাবেন।

হো হো করে হাসলেন ভদ্রলোক। স্যার আপনি একজন আই এফ এস অফিসার আর আমি, আমি একটা সাধারণ টেকনিশিয়ান, ন্যাশনাল ফিজিকাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করি। এই যে আমার সঙ্গে বসে কথা বলছেন, কত আনন্দ পাচ্ছি। কত দেশের কথা জানতে পারছি। আপনি হয়ত ভাবছেন যে একটা সাধারণ লোক, প্রায় অশিক্ষিত—

আমি বাধা দিতে চাই। ছি ছি এসব কি বলছেন?

ভদ্রলোক আবেগের মাথায় বললেন, না স্যার, বাধা দেবেন না। আমি যে কিছু জানি না, আমি এইটুকু জানি।

আমি হেসে বললাম, আপনি যে সক্রেটিসের মত কথা বলছেন।

ভদ্রলোক একটু থমকে গিয়ে বললেন, সক্রেটিস? সক্রেটিস কে বলুন তো?

আমার ধারণা ছিল পৃথিবীর সব শিক্ষিত লোকই সক্রেটিসের নাম জানে। আমি বললুম, সক্রেটিস, সক্রেটিস মানে একজন দার্শনিক। গ্রীসের লোক। যিনি ঐ প্লেটোর—

ভদ্রলোক বললেন—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। সক্রেটিস, হ্যাঁ হ্যা মনে পড়েছে। প্লেটোর যেন কে? বাবা?

আমি হাসি চেপে বললাম, না, বাবা নন, তবে বাপের মতই। প্লেটোর গুরু।

ভদ্রলোক অপ্রতিভ হলেন না। বেশ সরল মধুর স্বভাব ভদ্রলোকের। এতক্ষণে আমি ভদ্রলোকের মুখটা ভাল করে দেখলাম। মুখটা কাঁচ কাঁচ। দুটো চোখে রাজ্যের কৌতূহল। নাকটা তীক্ষ্ম। কপালে কয়েকটা ভাঁজ। খুব আরামের চাকরি বোধ হয় নয়। জামা কাপড় সাধারণ। কোটটা খুব সস্তা, পুরোনো। জুতোর রং নেই। কিন্তু সমস্ত মুখটায় অদ্ভুত প্রশান্তি। চোখ দুটো বহু দূরে নিবদ্ধ। অনেক দূরের কোন কিছু যেন দেখতে পাচ্ছেন আর সমস্ত বর্তমানের মালিন্যকে তুচ্ছ করে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। একটা সাধারণ চেহারার অসাধারণ লোক। বয়স কত হবে? অস্পষ্ট, তিরিশ পঁয়ত্রিশ। কম হলেও অবাক হব না।

ভদ্রলোক হাসলেন। আসলে ফরেন সার্ভিসের লোকদের সম্বন্ধে আমার বিশেষ জানা নেই।

সক্রেটিস, মানে গ্রীসের লোক তো! আমি গ্রীস সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

আমি ভদ্রলোকের সহজ সুরে মুগ্ধ হয়ে বললাম, আমিও কিছু জানি না।

আপনি জানেন না? ভদ্রলোক বিস্মিত হলেন। আপনি যাননি গ্রীসে, গ্রীস এখন ম্যাপটা মনে পড়ছে, সেই এজিয়ান সমুদ্র। আচ্ছা, টয় ওখান থেকে কতদূর বলুন তো। একসময়তো গ্রীসে আর টয়ে লড়াই হয়েছিল।

টয়? আমি ঢোক গিলি। টয় হল টার্কিতে—তুরস্ক।

তুরস্ক? ভদ্রলোকের মুখটা হাসিতে ভরে উঠল। সত্যিই কত জায়গাই না আছে দুনিয়ায়। কি অদ্ভুত বলুন তো? পৃথিবীতে জন্মেছি, অথচ পৃথিবীটা দেখাই হল না। কোথায় ধরুন পেরু, ব্রেজিল কিংবা ধরুন পানামা ক্যানেল। কোথায় ধরুন সাইবেরিয়া, কিংবা বাগদাদ, কিংবা জেরুজালেম? হ্যাঃ হ্যাঃ এ সব জায়গা দেখাই হল না। স্পেন, সেই টলেডো, সেই বার্সিলোনা, জিব্রালটর—আমার স্যার গায়ে কাঁটা দেয়। মানুষের, মানে—আমাদের মত মানুষের পৃথিবী থেকে এসব দেশ বাদ। এরা আছে বই-এর পাতায়, কিংবা আপনাদের মতো দু-চারজন লোকের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হলে মনে হয় এরা সব আছে। সেদিন স্যার আমাদের ল্যাবরেটারিতে এক সাহেব এলেন, তিনি থাকেন আলপস পাহাড়ের ধারে— ভেবে দেখুন স্যার, কোথায় আলপস পাহাড় আর কোথায় আমি। ভাবলাম একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু স্যার চান্স পেলাম না। অর্ডিনারী টেকনিসিয়ানতো তার সঙ্গে আড্ডা মারার জন্য কে সময় নষ্ট করবে বলুন। তাছাড়া স্যার, আমার ইংরেজিটাও বড় পুয়োর—আপনি তো দেশ-বিদেশ অনেক ঘুরেছেন, অনেক বিদেশী ভাষাও জানেন—

বিনয়ের সঙ্গে বলি, ওটা কোন কাজের কথা নয়। বিদেশী ভাষা শিখতে হয় কাজ চালাবার জন্য নিজের ভাষাটা শেখাই হল আসল। দেশপ্রেমিকের আবেগ এসে যায় আমার গলায়।

তা যা বলেছেন স্যার। ভদ্রলোকও সায় দেন। নিজের ভাষা কজন ভালো করে শেখে বলুন।

তারপর ধরুন নিজের দেশ, নিজের দেশ কজন ভালো করে দেখে। স্যার, আপনিতো অনেক দেশ দেখেছেন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া—

না আমি রাশিয়া যাইনি। বাধা দিয়ে বলি।

ও, রাশিয়া যাননি। ইজিপ্ট গেছেন স্যার, মিশর?

হ্যাঁ, কায়রোয় ছিলাম ছ মাস আফ্রিকার আরো দু-চারটে দেশে—

ভদ্রলোক কথা শেষ করতে দিলেন না—কায়রোতে ছিলেন? বা পিরামিড দেখেছেন তাই না। উটে চড়েছেন স্যার, উটে?

আমি হেসে ফেলি।

ভদ্রলোক অবার নিজের মনে বলতে লাগলেন। কিন্তু দেখবেন স্যার, অনেক লোক বিদেশে নানা জায়গায় গেছে কিন্তু নিজের দেশটি দেখেনি। ভেবে দেখুন স্যার যদি কেউ ফতেপুর সিক্রি না দেখে, কিংবা ধরুন দিলওয়াড়া মন্দির, কিংবা চিতোর দুর্গ আপনিতো গেছেন এসব জায়গায়?

আমি লজ্জিতভাবে স্বীকার করি কোনটাই আমার দেখা হয়নি। তাজমহল দেখেছি, কিন্তু ফতেপুর সিক্রি যাওয়া হয়নি। অবু পাহাড়ে গিয়েছিলাম বটে কিন্তু দিলওয়াড়া দেখার সময় পাইনি। আর চিতোর। —না, তাও না। রাণা প্রতাপসিংহের মত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি।

ভদ্রলোক ব্যথিত হলেন। 'তাহলে তো স্যার অনেক কিছু দেখা হয়নি আপনার। ভোপালে গেছেন কখনও।

করুণভাবে বললাম না।

আমি চার বছর ছিলাম ভোপালে। ঔরঙ্গাবাদ গেছেন নিশ্চয়ই। অজন্তা, ইলোরা—

আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে চাই—না, না এসব কোথাও যাইনি ভাই।

ভদ্রলোকের মুখে ব্যথার চিহ্ন ফুটে ওঠে। ও ওখানে যাননি। আমার যদি সময় থাকত আমিই আপনাকে নিয়ে যেতাম।

আমি কথা ঘোরাবার জন্য বলি, 'চা খাবেন একটু, ট্রেন আসতে তো অনেক দেরি।'

'চা, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন। আপনি বসুন, স্যার, আমি আনছি। বেশ ভালো চা আনব, ওরা সব আমার চেনা লোক।'

আর কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক ছুটে চলে গেলেন। বেশ ভালোই লাগছিল ভদ্রলোককে, সরল, কল্পনাপ্রবণ। আর আমি যে দেশের ভালো ভালো জায়গা দেখিনি তাতে ভদ্রলোক খুব ঘা খেয়েছেন।

ইতিমধ্যে ভদ্রলোক দু ভাঁড় চা নিয়ে হাজির। আমি ধন্যবাদের সঙ্গে চা নিলাম, বললাম, চায়ের দামটা আপনিই—

ছিঃ ছিঃ সামান্য এক ভাঁড় চা। আপনার সঙ্গে কথা বলে কত কি জানছি। ঐ যে কায়রোর কথা বললেন, মানে ঐ যে সব পিরামিড, ওতো নীল নদীর পাশেই—

আমি পিরামিডে খুব আগ্রহ বোধ করছিলাম না। চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম কার জন্য স্টেশনে এসেছেন, কে আসছেন।

ভদ্রলোক বললেন, শালী।

রসিক হবার চেষ্টা করি। তাই ভাবছি শীতের রাত্রে এ করুণ প্রতীক্ষা কার জন্য?

ভদ্রলোক উড়িয়ে দিলেন। হ্যাঁ, যা বলেছেন, তবে, না এলেও ক্ষতি ছিল না। আমারই ভালো লাগে স্টেশনে আসতে। লোকজনের আসা-যাওয়া। ট্রেন আসছে যাচছে। কোনটা কলকাতা, কোনটা হায়দ্রাবাদ, কোনটা পাঠানকোট। বেশ লাগে আমার। প্রায়ই আসি। চাটা কেমন লাগছে স্যার?

খুব ভালো চা। শীতে জমে যাচ্ছিলুম একেবারে।

আমার স্যার ঐ নেশা—চা আর দেশ দেখা।

আপনি নিশ্চয়ই খুব ঘুরেছেন। ঐ যে সব বললেন ঔরঙ্গাবাদ চিতোর। আমি বন্ধুর মত আন্তরিকভাবে বলি।

অনেকটা চা একসঙ্গে খেতে গিয়ে ভদ্রলোক বিষম খেলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ যে বললুম না ফতেপুরসিক্রি, চিতোর, দিলওয়াড়া—ঐ সব জায়গায় গিয়েছি অনেকবার। সারা ভারতবর্ষটাই ঘুরেছি। আমি কি জানেন স্যার, নামকরা জায়গাই নয়, অচেনা-অজানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। একবার স্যার বুঝলেন গিয়েছিলাম ঝাঁসি, সেখান থেকে হাঁটা পথে, পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম চম্বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ যেখানে ডাকাতদের আড্ডা। তখন বুঝলেন মাধো সিং-এর নামে সবাই কাঁপছে। চম্বলে একেবারে চারদিক ধু-ধু করছে। আমি যেখানে পৌঁচেছি সেখানে সব ন্যাড়া পাহাড়, পাহাড়ের ঢেউ। আপনি দেখলেন ঐ পাহাড়ের মাথায় একটা লোক, তারপর হঠাৎ সে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল, চারদিকে কোন সাড়া শব্দ নেই। পাহাড়ের ঢেউ, গাছ নেই, পালা নেই, চলে যান যতদূর ইচ্ছে। তারপর হঠাৎ দেখলেন দু চারটে বাড়ি। ছোট গ্রাম। আমাকে তো ডাকতরা শেষ করে দিত, ভেবেছিল পুলিশের লোক—

আমি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি। তারপর?

সে অনেক কাণ্ড অনেক কাণ্ড। কি করে যে আবার ঝাঁসি ফিরে এলাম সে বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। আর একবার হল কি জানেন, কোচিনে, মানে কোচিন থেকে প্রায় শ দেড়েক মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়েছিলাম। জেলেদের গ্রাম, এরা সব চিংড়ি মাছ ধরে। সমুদ্র, সারারাত সমুদ্রের গর্জন—সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। রাস্তা হারিয়ে এক বৃষ্টির রাত্রে সেই জেলেদের গ্রামে গিয়ে পড়লুম, বুঝেছেন স্যার। আমি জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলুম, জেলেরা আমায় ওদের ঘরে নিয়ে গেল। ওদের ভাষা বুঝি না, ওরা আমার ভাষা বোঝে না কিন্তু স্যার, কি রকমভাবে যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। পনের-কুড়ি দিন ছিলুম সুন্দর গ্রাম, শুধু নারকেল গাছ, চারদিক সবুজ। লম্বা লম্বা সরু সরু নৌকো ভাসিয়ে জেলেরা সমুদ্রের মধ্যে চলে যাচছে, ভয় নেই, ডর নেই।

স্যার, আপনি ঘুরেছেন বিদেশে

বিদেশে, আমেরিকায়, আফ্রিকায়, রাশিয়ায়—না, রাশিয়ায় তো আপনি যাননি বললেন—আর আমি ইণ্ডিয়ায়। কিছু বাকী রাখিনি স্যার। হিমালয়ের কোনে কোনে বিন্ধ্য পর্বতে, আবু পাহাড়ে। ঐ যে আবু পাহাড় বললাম না, একবার ওখান থেকে চলে গেলুম অচলগড় বলে একটা জায়গায়, নাম শুনেছেন কি?

আমি মাথা নাড়ালাম, প্রশংসার সুরে বললাম, সত্যি নানা জায়গা ঘুরে দেখেছেন আপনি।

তা দেখিছি বৈকি। তবে কি জানেন এত দেখার আছে, আর প্রত্যেকটা জায়গাই একটি বিস্ময়। একবার জানেন পালামৌ গিয়েছিলুম। ভদ্রলোক কোটের বোতামটায় হাত দিয়ে বলে চলেন এই তখন ডিসেম্বর মাস। শীত তো কেমন বুঝতে পারছেন। চারদিকে ঘন জঙ্গল, আর কি নিঝুম, মধ্যে মধ্যে শুধু জন্তু-জানোয়ারের ডাক। ছিলুম এক ফরেস্ট অফিসারের বাড়িতে, বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বাচিলায়, খুব আদর যত্ন। একদিন একা একা কাউকে কিছু না বলে বিকেলবেলা চলে গিয়েছি জঙ্গলের মধ্যে। নানারকম ফুল, নানা রং-এর পাখি, দেখতে দেখতে একেবারে ঘন জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছি। এদিকে তো সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। গাছের মাথার ওপর চাঁদ উঠল পূর্ণিমার চাঁদ। সে কি দৃশ্য স্যার, সারা আকাশে জ্যোৎস্নার স্রোত বইতে হঠাৎ শুনি গর্জন, হাঁ যা বলেছেন, বাঘের গর্জন। আমার তো হৃৎপিণ্ড পেটে সেঁদিয়ে গেছে। গাছের মাথায় উঠব না ছুটব না মড়ার মত শুয়ে পড়ব ভাবছি। এমন সময়—

লাউড স্পীকারে আওয়াজ হল স্টেশন থেকে জানাচ্ছে আর আধঘন্টা চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ট্রেন আসার সম্ভাবনা আছে। প্ল্যাটফর্মে সামান্য একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল তবে কয়েক মুহূর্তের জন্য। কারণ আধঘন্টা অনেক সময়। ভদ্রলোক বললেন, আরেক কাপ চা খান স্যার— খান না ঠাণ্ডাটা জব্বর পড়েছে। একেবারে বিলিতী ঠাণ্ডা। আঃ দামের জন্য ভাবছেন কেন ঠিক আছে, এবার আপনিই দাম দিন, হ্যাঁ: পঞ্চাশ পয়সা, না, না আমি আনছি, এই আসছি, বসুন বসুন স্যার।

ভদ্রলোক মাফলার ভালো করে জড়াতে জড়াতে চলে গেলেন। বেশ জমিয়ে বসেছেন ভদ্রলোক। আগের সেই বিনীত ভাবটা কেটে গেছে। এখন বেশ আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে চোখে-মুখে। কথা বলতে পারেন ভালো, বেশ সব জিনিস ফুটিয়ে তোলেন। একটু উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা নাড়াচাড়া করে নিলাম। যাকগে শেষ পর্যন্ত ট্রেন আসছে। সময়টা হু-হু করে কেটে গেছে। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ।

চা হাতে হাসিমুখে ভদ্রলোক পৌঁছে গেছেন। এই নিন স্যার, ফার্স্টক্লাস চা। চা খেতে খেতে ট্রেন এসে যাবে।

আমি ধন্যবাদ দিয়ে বললুম যাক আপনি ছিলেন বলে বেশ গল্প করে কেটে গেল।

আমারও স্যার। আপনার কথা শুনে এত ভালো লাগল। নইলে এসব কথাতো আর সকলে এনজয় করে না। ভ্রমণের ব্যাপারটাই আলাদা।

আমি বললুম, তা আপনি প্রত্যেক বছরই নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েন।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভদ্রলোক বলেন, তা আর বলতে। ছুটি পেলেই হল, আর হাতে কিছু পয়সা। এই ধরুন গত অকটোবরে চলে গিয়েছিলাম নাগাল্যাণ্ডে। সেখানে ডাফলা বলে একটা ট্রাইব থাকে সেখানে গিয়ে পড়লুম। আর গত বছর—কোথায় যেন গেলুম, ও হ্যাঁ, উড়িষ্যা। কোনারক দেখেছেন তো—

আমি লজ্জায় মাটিতে মিশে যাবার চেষ্টা করলাম। করুণ কণ্ঠে বললাম, দেখি এবার যদি যাই।

অবশ্যই যাবেন স্যার। অবশ্যই। চায়ের ভাঁড়টা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেললেন ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলেন, তা এবার কোথা যাচ্ছেন, ইউরোপে।

আমি মৃদু হেসে বললাম, এখনও ঠিক নেই, বোধহয় জাপান।

জাপান। ভদ্রলোক খুশী হয়ে উঠলেন। এক-একটা দেশের নাম যেন ওঁর কাছে যাদুর মত। শব্দ শুনেই খুশী হয়ে ওঠেন। একটা কথা বলব স্যার সামান্য একটা কথা।

বলুন না।

স্যার, হাসবেন না যেন। আপনি যখন জাপানে যাবেন, তখন যদি কোনদিন খুব সুন্দর একটা গ্রামে যান, একটা পাহাড়ের ধারে। সমুদ্রের তীরে কিংবা কোন বুদ্ধ মন্দিরে—

বলুন। বলুন। আমি উৎসাহ দেবার চেষ্টা করি।

খুবই সংকোচের সঙ্গে ভদ্রলোক বলেন কোথাও একটা গাছে, কি দেয়ালে আমার নামটা লিখে দেবেন স্যার—বাংলায়—অজিত।

আমি হেসে ফেললাম।

হাসছেন স্যার। আমি খুব তৃপ্তি পাব। আমি ওখানে না গিয়েও পৌঁছে যাব। আমার নামটা লেখা থাকবে। কোন লোকের নজরে পড়বে, সে ভাববে একটা বিদেশী এসেছিল, কতদিন আগে, নিজের ভাষায় নাম লিখে গেছে। হাসছেন?

হাসতে হাসতে বললাম, বেশ বলেছেন। আপনি যেখানে যান সেখানে বুঝি আপনার নাম পাথরে গাছে লিখে আসেন?

আমি চাই। যদি যেতে পারতাম তো পাথরের গায়ে নাম লিখে আসতাম—অজিত। একশ বছর পরেও লোকে দেখতে পেত। কিন্তু কোথাও তো যাওয়া হল না।

কেন, বিদেশে না হয় যাননি, কিন্তু দেশে তো কত জায়গায় গেছেন। সে সব জায়গায় তো আপনার নাম লিখে এসেছেন। ধরুন আমি যদি ঔরঙ্গাবাদ কি কোনারকে যাই ঠিক আপনার নাম খুঁজে পাব।

ভদ্রলোক মুখটা তুললেন। সেই সরল ছেলেমানুষের মত মুখ। কপালের ভাঁজগুলো ম্লান। চোখ দুটো যেন হতাশায় ভরা। উদাসীনভাবে বললেন, না, স্যার, আমার নাম খুঁজে পাবেন না।

কেন, গুপ্ত জায়গায় লিখেছেন নাকি। রসিকতার চেষ্টা করি।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, না, আমার নাম খুঁজে পাবেন না। একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আবার বললেন, রাগ করবেন না স্যার। আসলে আমি কোন জায়গাতেই কখনও যাইনি।

আমি চমকে উঠলাম। একটু বিরক্তির স্বরে বললাম, বলেন কি মশাই। এই যে ঔরঙ্গাবাদ, চিতোর, ঝাঁসি—

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, কোনটাই সত্যি নয় স্যার। একদিক থেকে বানানো কথা। মিথ্যে কথা। আবার আর একদিক থেকে সত্যি স্যার কি জানেন আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমার মনে হয় আমি ঐ সব জায়গায় গিয়েছি, আমি ছিলাম। ঠিক ট্রেনে চেপে যাইনি। কিন্তু—আপনি শিক্ষিত লোক স্যার। আপনি বুঝতে পারবেন, আমি ঠিক মিথ্যে বলিনি।

আমি কি বলব বুঝতে পারি না। প্ল্যাটফর্মে চাঞ্চল্য বাড়ছে। ট্রেন আসার সময় হয়েছে। ভদ্রলোক আমার চোখের দিকে চাইলেন। কোন সংকোচ নেই, স্পষ্ট, সহজ-ভাবে বললেন, আপনাকে দেখে, আপনার কথাবার্তা শুনে কি যেন একটা হয়েছিল আমার। হঠাৎ এই বেঞ্চিতে বসে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আসলে স্যার, আমি দিল্লীর বাইরেই কখনও যাইনি। এখানেই জন্ম। বড় ছোট জগতে পড়ে আছি, আপনি একটা বড় পৃথিবীর আলো নিয়ে এলেন তাই হঠাৎ আমিও যেন—

আমি কথা বলতে পারছি না: রাগে না বিস্ময়ে জানি না। ট্রেন আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, দূর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে।

নমস্কার। ভদ্রলোক আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন। আমি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকছে, ভদ্রলোক হারিয়ে গেছেন, আর দেখতে পাচ্ছি না। মনে হল একবার ছুটে গিয়ে বলি, আমি আই এফ এস অফিসার নই। এ জীবনে ভারতবর্ষের বাইরে যাইনি। এ কোট, এ জুতো অন্যের কাছ থেকে পাওয়া। আমি দিল্লীর তিস হাজারী কোর্টের সামান্য উকিল।

চিতা

চণ্ডী মণ্ডল

অসময়ে দার্জিলিং-এ এসে পড়েছে অবনী।

ফুল নেই! ফুলের মতো মরসুমী টুরিস্টের মেলা নেই। কাঞ্চনজংঘাই নেই—ধূসর জমাট মেঘের আড়ালে অদৃশ্য।

অবশ্য ম্যাল আছে। আর ঘোড়া।

আর অবনী ঠিক প্রমোদ ভ্রমণে আসে নি। সিজিনের শেষে আসার কারণ আর্থিক। এই কারণেই সম্ভবত, নেই নেই করেও দু' চারশ পর্যটক এখনো আছে দার্জিলিংএ। আর এরই মধ্যে যেদিন আবহাওয়া একটু ভালো থাকে, সকাল হওয়ার আগেই সেদিন সকলে হৈ হৈ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ে।

সকাল থেকে দুপুর—বিকেলের আগে পর্যন্ত কে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে থাকে, বিকেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সকলেই ম্যাল-এ এসে হাজির হয়। যেন দার্জিলিংএ থাকার হাজিরা খাতাটা থাকে ম্যাল-এ।

দুপুরেই বা তার আগেই ম্যাল-এ চলে আসে দু-একজন। দুপুরের স্নান-খাওয়া সকাল সকাল সেরে হোটেল থেকে সোজা চলে আসে ম্যাল-এ। একটা বেঞ্চ দখল করে সারা দিনের জন্যে।

যেমন শিপ্রা।

দার্জিলিং-এ বেড়াবার জায়গায়, গাড়িতে চড়ে বা হেঁটে যেভাবেই, যেখানেই যাওয়া যাক, চড়াই-এর ধকল সহ্য করতেই হবে একটু-আধটু। সেটুকু সহ্য করবার সামর্থ নেই শিপ্রার। অনেক দিন ধরে শিপ্রা অসুস্থ।

অসুখটা কী, বড় বড় ডাক্তাররাও কেউ ধরতে পারছে না। কেউ কিডনীর চিকিৎসা করেছে। কেউ হার্টের। কেউ ফিমেল ডিজিজের। কেউ মানসিক চিকিৎসার কথা ভেবেছে। —সব অসুখই কিছু কিছু থাকতে পারে, কিন্তু শিপ্রার আসল অসুখটা কী—সঠিক ডায়গানোসিস করা যাচ্ছে না। সবাই বলে, সেরে যাবে—সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। দু বছরে ঠিক কিছুই হয়নি। শিপ্রা আরও বেশী রক্তশূন্য হয়ে গেছে। অদ্ভুত রোগা। ঘুমতে পারে না। মন খুলে কথা বলতে পারে না। প্রাণ খুলে হাসতে পারে না। সব সময় চোখে মুখে আতঙ্ক আর অস্থির ভাব। —একটা চেঞ্জ দরকার। সব ডাক্তার এক মত হয়ে বলেছে—জল-হাওয়ার বদল চাই।

শিপ্রাকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছিল অবনী গত বছর। পূর্ণিমার দিনের মতো ছিল সেখানে। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি- শিপ্রার মধ্যে চেঞ্জের কোন লক্ষণই দেখা যায়নি। সমুদ্রের উত্তাল উচ্ছ্বাস, আবেগের এক কণা পায়নি শিপ্রার শরীর, মন। মাঝখান থেকে অবনীর পনের দিন ছুটি আর নগদ পাঁচশ টাকা খরচ হয়ে গেছে। সেটা কিছু নয়, শিপ্রার সেরে ওঠাটাই জরুরী। ছ'মাস পরেই তাই আবার শিপ্রাকে নিয়ে এসেছে চেঞ্জে। মনোরম এই শৈল-শহরে।

সাতদিন ধরে শুধু ম্যাল-এ বসে আছে।

সন্ধ্যের পর ধীরে ধীরে হেঁটে হোটেলে ফিরে যায়। রাতটুকুর জন্যে। সকাল সাতটা, সাড়ে সাতটায় ঘুম ভাঙে, তখন থেকেই ম্যাল-এ আসবার জন্যে তৈরী হতে থাকে—দুপুরের আগেই চলে আসে।

ভোরে সবাই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে টাইগার হিলের ওপর ভীড় করে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই এক অলৌকিক সূর্যোদয় হবে সারা পূবের আকাশ, দিক-দিগন্ত জুড়ে সাদা [illegible] আশ্চর্য আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। প্রত্যাশায় উত্তেজনায়, আনন্দে আবেগে রোমাঞ্চে মানুষগুলোর মুখের আদলই বদলে যায়—সাধারণ একজন মানুষ অসা-

ধারণ মাহিমাময় হয়ে ওঠে। সেই সময়টায় রোজই অবনী স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে আলাদা খাটে শুয়ে থাকে। হয়তো জেগেই থাকে। ঘুমিয়ে থাকলে স্বপ্ন দেখে হয়তো। হয়তো কোন দুঃস্বপ্ন।

অবনীর দেখা হয় না দার্জিলিং এর কিছুই। বিখ্যাত সিনচর লেক, ঘুম মন্যাসট্রি, বাতাসিয়া লুপ, ভিকটোরিয়া ফলস—বোটানিক্যাল গার্ডেনও না—কিছুই না। শিপ্রা অবশ্য বলে, তুমি কেন আমার জন্যে সারাদিন এক জায়গায় বসে থাকবে, তোমার কি ভালো লাগে।—যাও না কোথাও বেড়িয়ে এসো।

শিপ্রা বলে। অবনী শোনে।

অবনী জানে শিপ্রা মনে মনে চায় না অবনী দূরে দূরে একা একা ঘুরে বেড়াক। অসুস্থ হওয়ার পর থেকে, তার আগে থেকেই শিপ্রার এই অদ্ভুত দুর্বলতা। কিছুতেই অবনীকে চোখের আড়ালে যেতে দেবে না।

ম্যালের চারদিকটা অবশ্য দেখে নিয়েছে অবনী। শিপ্রা বেঞ্চে বসে থাকে। অবনী মাঝে মাঝে উঠে পায়চারি করে। বেশী দূরে যায় না। দু-একবার শুধু চলে গেছে শিপ্রার চোখের আড়ালে।

ম্যালের উত্তর দিকে যে বাগানটা, বাগান নয়, বন—গহন জঙ্গল। জঙ্গলটা ঘিরে একটা রাস্তা আছে। ম্যাল থেকেই রাস্তাটা বেরিয়ে জঙ্গলটাকে পাক দিয়ে আবার ম্যালে ফিরে এসেছে। রাস্তাটা নির্জন খুব। ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ারের জন্যেই যেন রাস্তাটা। ম্যাল থেকে বেরিয়ে এই রাস্তা ধরে মিনিট দশেক হেঁটে গেলে দেখা যায় দূরে হ্যাপিভ্যালি। কুয়াশা না থাকলে দেখা যায় হ্যাপিভ্যালির সবুজ গভীর বিস্তার। দূরে অনেক দূরে ধূ ধূ করছে ভুটান সীমান্ত। সবুজ পাহাড়-এর ঢেউ। পিছনে কয়েকটা ধূসর পাহাড়-শৃঙ্গ। তারপরেই সেই অলৌকিক হিমগিরি, অলোকসুন্দর কাঞ্চনজঙ্ঘা।

অবনী কুয়াশার দিকে চেয়ে কল্পনায় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে। একটা বাঁক পেরিয়ে পুবের দিকে ফিরতেই আবার একটা ভ্যালি। তার-পর আর একটা। একটা বিশাল উপত্যকা। ঘন সবুজের ওপর সুতোর মতো রাস্তা আঁকা-বাঁকা, অসংখ্য! ওইখানে দার্জিলিংএর ভুটানী বস্তি। খাদ নেমে গেছে আরো নীচে। উপত্যকার ওপারে অনেক দূরে সবুজ পাহাড়। পাহাড়ের ওপর আকাশ। খাদের গভীর থেকে মেঘ উঠে পাহাড়ের গা বেয়ে আকাশে সেই মেঘ জমতে থাকে। সেই জমাট মেঘ তারপর একসময় সচল হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে ভুটানি বস্তি ঢেকে ফেলে, তারপর ধেয়ে আসতে থাকে ম্যালের দিকে।

অবনী তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে আসে ম্যালে, শিপ্রার কাছে। এসে দেখে শিপ্রার চোখে-মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা! স্পষ্ট বোঝা যায় শিপ্রা ভয় পেয়েছে।

—কী হয়েছে?

শিপ্রা ক্ষীণ স্বরে বলে, আমার ভয় করছে।

কেন, ভয় কীসের?

জানি না— তুমি অতদূরে যেও না।

দূরে তো যাইনি।

আর যেও না কখনো আমাকে একা রেখে তুমি কোথাও যাবে না। বল যাবে না।

পরের দিন থেকে অবনী ম্যাল ছাড়িয়ে কোথাও যায় না। ম্যালের মধ্যেই কোথাও যায় না। শিপ্রার পাশে, বেঞ্চে বসে থাকে। দুপুর গড়িয়ে যায়, বিকেল হয়। সন্ধ্যে হয়ে আসে।

সকালেই ঘোড়াগুলো চলে আসে ম্যালে। লম্বায়, চওড়ায় খুব বড় নয় মোটেই ঘোড়াগুলো। পাহাড়ী মানুষজনের মতো আকারে ছোট। শক্ত হাড়ের ওপর মেদ মাংস চামড়ার শক্ত বাঁধুনিতে পাহাড়ী সুষমা সুস্পষ্ট। পিঠে জিন লাগানো, মুখে লাগাম। ঘোড়াগুলো ঘিরে কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতীদের উৎসাহ বেশী, তাদেরই বেশী ভীড়। প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গে আছে একজন করে ঘোড়াওয়ালা—যাদের বয়েস বারো থেকে বাইশের মধ্যে। মলিন পোশাক আর ময়লা চামড়া দেখলেই বোঝা যায়, ভুটানী বস্তির ছেলেমেয়ে এরা, ঘোড়ার মালিক নয়।

ঘোড়ার মালিক কেউ ঘোড়া নিয়ে ম্যালে আসে না সওয়ার ধরতে এমন নয়। নোংরা পোশাক, রুক্ষ চুল, অপরিচ্ছন্ন চামড়ার মাঝখানে দু-একজনকে দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায় ঘোড়ার মালিক। কালো রঙের জিনের ভুটানী কামিজ, গোড়ালি থেকে গলা পর্যন্ত, বুক আর গলার কাছের কাপড়ের রং সাদা। লাল ফিতে দিয়ে বিশেষ ঢঙে বাঁধা চুল বিনুনী করে কোমরের নীচ পর্যন্ত নামানো। একটু ভারী কোমরের নীচে ভারা কিন্তু নিটোল নিতম্ব। চওড়া কঠিন কাঁধ যেন ছুরি দিয়ে গাঁথা। নাকটা একটু চাপা, চোখদুটো ছোট, কিন্তু মণি-দুটো নীল, নীলার মতো। দুটো গাল লাল—রক্তাভ। বুকে সাদা জিনের তলায় দুটো ছুরির ফলা লুকোনো।

একটা সাদা রংয়ের সুন্দর ঘোড়া নিয়ে রোজ দুপুরে সে অবনীর সামনে এসে দাঁড়ায়। রোজই তার এক কথা—ঘোড়েকে পর চড়েঙ্গে বাবু?

অবনী কোন উত্তর দেয় না।

কিন্তু উত্তর না নিয়ে সে নড়বে না। দাঁড়িয়ে থাকবে আর লাল ঠোঁটে মোহিনী হাসি ফুটিয়ে প্রলুব্ধ করতে থাকবে।

শিপ্রা নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হয় সেই ভেবেই অবনী বিরক্ত হয়ে বলে—ম্যায় ঘোড়েকে উপর নেই চড়না চাহতা।

ঝক ঝকে সাদা করাতের মতো দাঁতের সারি মেলে হাসতে হাসতে বলে—এ বাবু, ভরো মত—মেরা ঘোড়া বহুৎ বেইতারুন হ্যায়।—আইয়ে না!

আপ দুসরা আদমী কে পাস যাইয়ে। একটু বেশী রুক্ষভাবেই কথাটা বলা হয়ে যায়। অবনীর নিজের কানেই খারাপ লাগে। লাগুক. শিপ্রা নিশ্চয়ই খুব খুশী হয়।

শিপ্রার কিন্তু অন্য সুর। বলে—আহা! বেচারা রোজ তোমার কাছে আসে একদিন চড়লেই পার ওর ঘোড়ায়।

পাগল হয়েছ!

কেন, কী হয় একদিন চড়লে।

ভেবেছ একবার চড়লে ও তারপর ছেড়ে দেবে—।

তোমার যদি ইচ্ছা হয় রোজ একবার করে না হয় চড়বে।

অবনী বলে ওসব আমার ইচ্ছা করে না—কে দেখে ফেলবে. কী ভাববে।

শিপ্রা বলে—কে আর তোমাকে দেখছে।

অবনী বলল—তুমি তো দেখবে।

শিপ্রা বলল—দেখতে আমার ভালোই লাগবে।

মোটেই ভালো লাগবে না!

ভালো লাগবে বলছি—তুমি চড়েই দেখ।

না—।

না কেন. কোনদিন কি চড়ো নি. ছেলে-বেলায় কোনদিন—।

মনে নেই। অবনী বলল—এখন তো আর ছেলেমানুষ নই!

শিপ্রা বলল—বুড়োও তো হয়ে যাওনি।

অবনী আর কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

শিপ্রা কিছুক্ষণ পরে বলল—কী ভাবছ. কথা বলছ না। কাল চড়ো ওর ঘোড়ায়।

অবনী শিপ্রার চোখের দিকে তাকায়। তার কেমন সন্দেহ হয়। শিপ্রার চোখদুটো এত নিরীহ, এত নিষ্প্রাণ, কোন অনু-ভূতিই যেন নেই। যেন পাথরের চোখ। সাদা পাথরের রূপনমূর্তি যেন শিপ্রা।

অবনীর বুকের মধ্যে, কোথায়—কোন শুষ্ক ধূসর উপত্যকায় একটা পুরোনো আক্ষেপ আবার কুণ্ডলি পাকাতে থাকে।

এই সময় মেঘ উঠে আসে ম্যালে। নিমেষে বিকেলের সবটুকু আলো শুষে নেয়। হিমেল কুজ্ঝটিকার চারদিক ঢেকে যায়। শীতের কামড় চামড়া কেটে হাড়ে পৌঁছতে থাকে।

অবনী তাড়াতাড়ি শিপ্রাকে হোটেলে ফিরিয়ে আনে।

হোটেলের ঘর তখন হিমঘর।

কার্ডিগানের ওপর গরম শাল, তার ওপর দুটো পাহাড়ী কম্বল, তাতেও শিপ্রার হাত-পা গরম হয় না, কাঁপুনি থামে না। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালাতে হয়।

বেয়ারারা শুকনো কাঠ জ্বলতে থাকে দাউ দাউ করে। অবনী ফায়ার প্লেসের সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসে। মাঝে মাঝে দু একটা করে কাঠের টুকরো আগুনে ফেলে।

অবনীর বিশাল ছায়া শিপ্রার বিছানার ওপর, পিছনের দেয়ালের ওপর। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে শিপ্রা। শরীরে তাপ ফিরে এসেছে, অবনীর অনুমান, শিপ্রা ঘুমিয়ে পড়েছে।

হোটেলের বেয়ারাকে দিয়ে খাঁটি ভুটানী মৃগাণ্ড আনিয়েছে অবনী, শিপ্রা জানে না। শিপ্রা ঘুমিয়েছে, আরো কিছুক্ষণ পরে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে, অবনী উঠে গিয়ে সন্তর্পণে সেটা বের করে গোপন জায়গাটা থেকে। তারপর আগুনের সামনে এসে আবার বসে।

একটু পরে ম্যালের সেই ভুটানী যুবতী তার সাদা রঙের পাহাড়ী ঘোড়া নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

পরের দিন ভোর থেকেই আবহাওয়া খুব খারাপ। দূরের গাছপালা, সামনের মানুষ কিছুই দেখা যায় না এত কুয়াশা। চেনা মানুষকে খুব কাছ থেকে চেনা যাচ্ছে না। শীত চামড়া কেটে সরাসরি হাড়ে বিঁধছে। হাড় কন কন করছে। অবনী আগে ঘরে কিছু কাঠ আনিয়ে রাখল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কিছুটা কমল, কিন্তু আকাশ আরো থমথমে হয়ে এল। নাকি শিলাবৃষ্টি হতে পারে আজ।

অবনী বলল, তাহলে আজ আর ম্যালে গিয়ে কাজ নেই।

শিপ্রা বলল, তুমি একবার ঘুরে এস—।

অবনী কী ভাবল, বলল—তাহলে তুমিও চল।

দুপুরের আগেই শিপ্রার সঙ্গে অবনীও শীতে কাঁপতে কাঁপতে ম্যালে এসে পৌঁছল। তাদের নির্দিষ্ট বেঞ্চে দুজনে পাশাপাশি বসল।

দুপুর হয়ে গেল।

একটু পরেই ভুটানী তার ঘোড়া নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। সেই পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢাকা কালো জিনের কামিজ, বুক আর গলা সাদা—। গাল দুটো আজ একটু বেশী লাল। দুটো ঠোঁট এত বেশী লাল মনে হয় যেন রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।—ঘোড়েকে পর চড়েঙ্গে বাবু—। শিপ্রা কানের কাছে মুখ এনে ফিস-ফিস করে বলল—আজ ম্যাল খুব নির্জন—এমন সুযোগ আর পাবে না—যাও।

অবনীর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শিপ্রার মুখের দিকে তাকাতে পারছে না।

পাহাড়ী যুবতী যেন জেনে গেছে অবনী আজ সওয়ার হবেই। তার চোখের মণিদুটো চকচক করছে। সাদা দাঁতের সারি মেলে হাসতে হাসতে বলছে—চড়েসে বাবু—ঘোড়া বহুৎ বেইত্তিয়ন হ্যায়।—আইয়ে—আইয়ে না।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল অবনী। সম্মোহিতের মতো ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল। দু হাতে ঘোড়ার কাঁধটা আঁকড়ে ধরে লাফিয়ে উঠে পড়ল পিঠে।

শিপ্রার দিকে আর ফিরে তাকাবার সময় [illegible]

ধরতে পেরেছিল। পা দুটোও ঠিকমতো রেকাবে রাখতে পারে নি, তার আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল ভুটানী।

অবনী একটু অভ্যস্ত হওয়ার পরেই একবার পিছনে ফিরে তাকিয়েছিল শিপ্রাকে দেখবার জন্যে। কিন্তু ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। চমকে উঠে অবনী দেখেছিল সেই ভুটানী যুবতী ঘোড়ার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ছুটে চলেছে। তাকে পিছনে ফিরতে দেখে যুবতী তীক্ষ্ণ স্বরে সতর্ক করে দিল—পিছে মত্ দেখিয়ে বাবু—সামনে দেখিয়ে।

অবনীর আর একটুও শীত করছিল না। বুঝতে পারছে সে ঘামে ভিজে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে গেছে। ভেতরটা কাঁপছে ভীষণ। রাস্তার বাঁ দিকে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা যায়—গভীর খাদ। ডানদিকে ঘন জঙ্গল—জঙ্গলের মধ্যে জমাট কুয়াশা। সামনে কিছুই দেখা যায় না, শুধু কুয়াশা।

শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ। না সেই শব্দ অবনীর বুকের—হৃদপিণ্ডের। ভীষণ জোরে, সশব্দে আর অসম্ভব দ্রুত ওঠা-নামা করছে অবনীর বুক। উত্তেজনায়, রোমাঞ্চে, আতংকে এক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে অবনীর সারা শরীর অদ্ভুত কাঁপছে। সেই অনুভূতি সে সহ্য করতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে, তার মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো ছিঁড়ে যাবে, করোটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে যাবে—। একবার মনে হয় চীৎকার করে বলে, ভুটানী ঘোড়া থামাও, ঘোড়া থামাও, আমি নেমে যাব—ঘোড়া থামাও—আমাকে নামিয়ে দাও! লাগাম তার নিজেরই হাতে, অবনীর একবারও সেই কথা মনে পড়ল না।

এক যুগ পরে ম্যালে এসে পৌঁছলে যেন! অবনী ছুটে গেল দেখতে শিপ্রা কোথায়, কেমন আছে। দেখে শিপ্রা সেইখানেই সেই বেঞ্চে বসে আছে। শুধু আরও বেশী কুয়াশা শিপ্রার চারদিকে।

আর শিপ্রার মুখটা আর একটু বেশী ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ঠোঁটদুটো আরও সাদা। চোখদুটো আরও ঘোলাটে। অবনীকে দেখছে, যেন অন্য কাউকে দেখছে, যেন চেনে না। শিপ্রা কথা বলছে না—না কথা বলতে পারছে না!

অবনী কী করবে বুঝতে পারে না। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে.. ডাকে—শিপ্রা, আমি এসে গেছি। তোমার কী কষ্ট হচ্ছে আমাকে বল। শিপ্রা, তোমার কী হয়েছে?

ঠোঁটদুটো একটু নড়ে। খুব ক্ষীণ স্বরে, যেন অনেক দূর থেকে শিপ্রা বলে—শরীর খারাপ লাগছে—ঘরে চল।

অবনী তাড়াতাড়ি শিপ্রার হাত ধরে।—ওঠো। হেঁটে যেতে পারবে?

শিপ্রা তার [illegible] —পারব।

হোটেলে পৌঁছবার আগেই বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টি নয়, গায়ে বিঁধতে লাগল বরফের তীক্ষ্ণ কুচি। পথেই একটা বিপর্যয় ঘটে যেতে [illegible] গায়ে অমানুষিক শক্তি ছিল বলেই হোটেল পর্যন্ত শিপ্রার শরীরটা পৌঁছতে পারল।

ঘরটা গত সন্ধ্যে থেকেই ছিমছাম হয়ে আছে। শিপ্রার শরীরটাকে বিছানায় তুলে দিয়েই অবনী ফায়ার প্লেসের দিকে ছুটে গেল।

দু মিনিটের মধ্যেই আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

দেখতে দেখতে শিপ্রা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। ঠোঁটদুটো সাদাই রইল কিন্তু গলায় আগের স্বর ফিরে এল।

আমি আর বাঁচব না—।

অবনী কাছেই একটা চেয়ারে বসে ছিল আগুনের দিকে চেয়ে, চমকে ফিরে তাকাল।

শিপ্রা বলল—আমি এবার ঠিক মরে যাব।

অবনীর নিজের শরীরটাও ভালো লাগছিল না, কেমন অসুস্থ লাগছে। নিজের শরীরটাকে মনে হচ্ছে অন্য কারো শরীর। তবু খুব আন্তরিকভাবে, গলার স্বরে মমতা মিশিয়ে বলল—এ-সব কেন ভাবছ শিপ্রা, তোমার এমন কী অসুখ—।

অসুখ! শিপ্রা বলে উঠল—অসুখের কথা নয়!

তাহলে কেন মৃত্যুর কথা ভাবছ!

কেন!— যদি না মরি, কেন বাঁচব? —কী করে বাঁচব—যখন ভালবাসা নেই—বিশ্বাস নেই—।

এসব কী বলছ শিপ্রা?

সত্যি কথাই বলছি। বল, আছে—ভালোবাসা—বিশ্বাস—?

কেন একথা বলছ?

তুমিই বল কেন?

আমি—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

কিন্তু ঘোড়ায় শেষ পর্যন্ত চড়লে:

শিপ্রা!

ঘোড়ায় চড়লে তুমি। না চড়ে পারলে না।

শিপ্রা তুমি!—তুমিই তো আমাকে বাধ্য করলে। তুমি না বললে—।

আমি না বললেও তুমি চড়তে—। তোমার চোখে মুখে সেই লোভ দেখেছিলাম। আমি না বললেও, একদিন খুব নগ্নভাবে লোভটা তুমি প্রকাশ করতে। বল, তাই করতে কি না—বল—। বলতে বলতে উত্তেজনায় শিপ্রা বিছানায় উঠে বসে। তার শুখনো সাদা মুখ অদ্ভুত লাল হয়ে উঠেছে। যেন তার ভেতরে আগুন জ্বলছে।

অবনীর বুকের মধ্যেও আগুন ধরে যায়। দারুণ আক্রোশে কয়েকটা শুকনো কাঠ সে জ্বলন্ত চুল্লিতে ছুঁড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শিখাগুলি মেলে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন।

সবেগে শিপ্রার দিকে ফিরে অবনী বলতে থাকে—তুমি, তুমিও তাহলে আমাকে ভালোবাস না—সব সময় শুধু সন্দেহের চোখে দেখ—অবিশ্বাস কর—। আমি কী [illegible]

ঘামাচির চুলকানি আর জ্বালা-যন্ত্রনা ভুলে যান !

নাইসিল
ব্যবহার করুন!
সবচেয়ে দ্রুত
আরামদায়ক ঘামাচি-
নাশক পাউডার

২ রকমের
প্যাকে পাওয়া
যায়

নাইসিল আনুন
ঘামাচি ভুলুন
মাত্র টা.৬.৬৩প.*

* সর্বাধিক খুচরো দাম।
স্থানীয় কর আলাদা।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বসবার জায়গা নেই মানে কি? শুনেছি তো তোদের বাড়ির সামনে একটু খোলা বাগান মতো আছে—সেখানেই বসব আমরা, ঘাসের ওপর, মাটিতে, তাতে কিছু আটকাবে না। আর খাওয়া? সেও না হয় নিজেরা চাঁদা তুলে কিনে নিয়ে যাবো। একটু জল তো দিতে পারবি? না, তাও নেই।

হয়ত কোনদিনই যাবে না, অতদূরে কে যাবে। তবু বলা যায় না, প্রসাদের যেন একটা রোখ চেপে গেছে। শুধু বিনুকে জব্দ করার জন্যেই দলবল নিয়ে হাজির হতে পারে।

লজ্জায় অপমানে—এখানে অসহায় নির্বুদ্ধিতার জন্যে ক্ষোভে ও আত্ম-ধিক্কারে ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল, তবু এ পর্বের এখানেই শেষ করা উচিত—এই ভেবেই সে অতিকষ্টে গলার আওয়াজটাকে শান্ত আর স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে করতে বলল, না ভাই, আমার মা দাদা এসব পছন্দ করেন না।

বলতে বলতেই দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

পিছনে টিটকিরির রোল উঠেছে, সে তো উঠবেই। আর সব কথা শোনা গেল না, তবু দু-একটা শব্দ কানে এল বৈকি। কঞ্জুষ, কিপ্টে, অসাধ জলের মাছ—এবং শেষ কথাটা প্রসাদেরই—খাতি পারি, দিতি পারি, দিতি পারি না।....

দোলু বলে ওর এক সহপাঠী, লেখা-পড়ায় তত ভাল নয়—প্রসন্নবাবুর ভাষায় মাঠো—সে বেরিয়ে এসেছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—একটু দ্রুত এগিয়ে এসে ওর একটা হাত ধরে ফেলল। সে বোধহয় ওর অবস্থাটা বুঝেছিল—চোখের জল পড়েনি বলেই আরও, চোখের সামনে সব একাকার ঝাপসা হয়ে গেছে, অন্ধের মতো ঠোক্কর খেতে খেতে পথ চলছে—তাই খুব আস্তে, আলতোভাবে হাত ধরে রেখেই পাশে পাশে চলতে লাগল, ও যে পথ দেখাবার মতো করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা না জানাবার চেষ্টা করতে করতে। সেই ভাবেই যেতে যেতে বলল, 'কেন ওসব কথা বলতে গেলি! ওরা তোর ওখানে যাবে ভেবেছিস? কস্মিন-কালেও না। মিছিমিছি ঘাড় পেতে কতক-গুলো টিটকিরি শোনার দরকার কি!

আশ্চর্য। এই দোলুকে এত দিনের মধ্যে কখনই কোন রকম আমল দেয়নি বিনু। খুব একটা সচেতনভাবে না হোক, বোধহয় একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখেছে। পেছনের বেঞ্চেও বসে, হ্যা-হ্যা করে হাসে অকারণে চেঁচিয়ে কথা বলে। ঈষৎ একটু নাকি সুর ওর গলায়, আর কখনও হোম-টাস্ক তৈরী করে আনে না— এ কোন পরিচয়টাই ওর কাছে বন্ধুত্ব করার যোগ্য বলে বোধ হয়নি। আজ ওর হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেল। চোখের জলও আর সামলাতে পারল না। এতক্ষণ পরে এই সত্যকার সহানুভূতির স্পর্শে তা ঝরঝর করে ঝরে পড়ল।

সে তাড়াতাড়ি হাতের উল্টো পিঠে চোখ মোছার চেষ্টা করতে করতে গাঢ়স্বরে বলল, 'তুমি জানো না ভাই, ঐ প্রসাদটা সব পারে। শুধু আমাকে জব্দ করার জন্যেই হয়ত সকলকে গাড়ি ভাড়া দিয়ে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। আমার বাড়িতে একটা বসতে দেবার মাদুর পর্যন্ত নেই, মা সব কাজ নিজের হাতে করেন—'

বলতে বলতে আরও এক ঝলক জল উপচে পড়ে ওর চোখ থেকে।

দোলু তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে গলায় একটা বিকৃত সুর বার করে বলে, 'এ'—! তা আর নয়। তাহলেই তুই প্রসাদকে চিনে-ছিস। হাড় কিপ্পণ! ও কাউকে কোন দিন এক পয়সা খাইয়েছে দেখেছিস কখনও? সেদিন সেই যে একটি অন্ধ ভদ্রলোক সাহায্য নিতে এসেছিলেন—মনে আছে? মেয়ের বিয়ের জন্যে? হেড স্যার মাস্টারদের বলে-ছিলেন ক্লাস থেকে যে যা দেয়—যতটুকু হোক চেয়ে জড়ো করে ভদ্রলোককে দিতে। সব্বাই দিলে এক পয়সা দু পয়সা—ফণী অরবিন্দ লঝঝড় ছেলে সব—তারাও দিলে—প্রসাদের কাছ থেকে এক পয়সাও বেরোল? তুই নিশ্চিন্ত থাক, কেউ যাবেও না, প্রসাদও নিয়ে যাবে না কাউকে!'

॥২৫॥

ইতস্তত করেছিল বৈকি।

অনেক দ্বিধা, অনেক আশঙ্কা। কে কি মনে করবে, ওর গুরুজনরাই বা কি বলবেন—তার মাকেই বা কি কৈফিয়ৎ দেবে—ভাবনার অন্ত ছিল না।

কিন্তু যত ইতস্তত করে, যত নিবৃত্ত হবার কারণের সম্মুখীন হয় ততই আকর্ষণ আর আবেগ প্রবল হয়ে ওঠে।

এমন একতরফা আর অকারণ আবেগ তার কারও বোধ হয় কিনা, এতাবৎ হয়েছে কিনা—সে জানত না। আজও জানে না। হয়ত তার দৈহিক ও মানসিক গঠনের অস্বাভাবিকতা বা—এখন অনেকে বলেন, জন্মলগ্নে গ্রহ সংস্থানের ফল এসব মান-সিকতা—যে কারণেই হোক, যখন যে আবেগ মনের মধ্যে দেখা দেয় তা যেন দেখতে দেখতে প্রবল আর অসম্বরণীয় হয়ে ওঠে।

বিশেষ এই ব্যাপারটায়। এযে কী ওর এক অবর্ণনীয় মনোভাব, প্রায় আজন্ম তৃষ্ণা—এর কথা তো কাউকে বোঝাতেও পারবে না সে। ছেলেবেলায় কলকাতায় যখন ছিল, কাশীতে এসেও যে একবছর ইস্কুলে ভর্তি হয়নি—তখনও বোধহয় প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ থেকেই, মনে মনে এমনি একটা অস্পষ্ট ঝাপসা স্বপ্ন দেখেছে, একটা অজানা পিপাসা বোধ করেছে।

অস্পষ্ট আর অজানা তার কারণ—চোখের সামনে তেমন কোন স্পষ্ট ছবি নেই, অভিজ্ঞতা তো নেই-ই। একটু বড় হবার পর যে সব গল্প উপন্যাস পড়েছে তাতে নরনারীর আকর্ষণের কথাই অধিকাংশ। তা যে ভাল লাগে নি তা নয়—কিন্তু সে-গুলো ঐ অল্প বয়সেই উদ্দাম আবেগ এসে ওর মনের চোখ রুদ্ধ করতে পারেনি।

একটা অভ্যাস ওর বরাবরই ছিল, সেই প্রথম বাল্য থেকেই—যে গল্প বা গল্পের কোন অংশ ভাল লাগত—বোঝবার চেষ্টা করত, পরবর্তী বয়সে নিজেকে প্রশ্ন করত—কেন ভাল লাগল। সে অভ্যাস বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত করেছে। নিজের রচনা সম্বন্ধে আত্মজিজ্ঞাসার। কেবল দুটো গল্প ওকে অন্যভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তখনও সে কাশীতে—কী একটা কাগজে মনে নেই, বোধহয় যমুনা কি গল্প-লহরীতে, কিম্বা জাহ্নবী মানে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত কাগজে—দুই বন্ধুর গল্প পড়েছিল একটা। এক বন্ধু অপরের সঙ্গে তুচ্ছ কারণে

বিশ্বাসঘাতকতা করল তা সত্ত্বেও সেই অপর বন্ধু এত বিপদে নিজের সুনাম, পারিবারিক জীবন—সমগ্র ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে রক্ষা করল।

আর একটা গল্প—বোধ হয় টলস্টয়ের হবে—সেটা পড়েছে এখানে ফিরে এসে।

রাশিয়ায় প্রচণ্ড তুষারঝটিকা ও কল্পনাতীত ভয়াবহ শৈত্যের মধ্যে দুটি লোক এক বিরাট, প্রায় সীমাহীন প্রান্তরে আটকে পড়েছিল। এক গ্রাম্য চাষী গৃহস্থ আর তার দাসপ্রজা।

ওদেশে তখন চাষী প্রজারা জমির মালিকের সম্পত্তি বলে গণ্য হত। প্রায় ক্রীতদাসের মতোই জীবন যাপন করত এরা প্রভু বা জমি বদল করা চলত না। মালিকের বিনা অনুমতিতে বিয়ে পর্যন্ত করার হুকুম ছিল না। সুতরাং এইসব সার্ফ বা দাসপ্রজাদের মালিক সম্বন্ধে স্নেহ বা শ্রদ্ধা থাকার কথা নয়। কিন্তু এই ক্রীতদাসটি যখন বুঝল আরও কি বেশী শীতবস্ত্র না পেলে প্রভুর জীবন রক্ষা হবে না যথেষ্ট তাপ রক্ষা করা যাবে না—তখন নিজের জামাটিও খুলে তার জামার উপর চাপা দিল, তারপর—নিশ্চিত মৃত্যু জেনেই, নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে রাখল তাকে। ফলে প্রভু বাঁচল কিন্তু ঐ ভৃত্যটি বরফে কাঠ হয়ে জমে গেল।

এই দুটো গল্প পড়েই একটা অভূতপূর্ব উত্তেজনা আর আবেগ বোধ করেছিল বিনু, সেটা আজও স্পষ্ট মনে আছে।

গোরাকে যখন ভালবেসেছিল বা ভালবাসতে চেয়েছিল, তখনও বালক বয়স পার হয়নি একেবারে। ললিতকে দেখল কৈশোরে পৌঁছে। এ আবেগ অনেক বেশী প্রবল, অনেক বেশী উদ্দাম। এতে যেমন অধীরতা, তেমনি বেদনা। আবার সেই বেদনা বা যন্ত্রণার মধ্যে কোথায় একটা আনন্দও যেন যন্ত্রণা পেয়েই আনন্দ:

সুতরাং এ আবেগ যে তাকে অস্থির করে তুলবে—এ স্বাভাবিক।

আর স্বভাবের সেই অমোঘ নিয়মেই তার বিবেচনা হিসাব দ্বিধা সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

একদিন—কী একটা ছুটির দিন সেটা—একখানা জরুরী বই চেয়ে আনার অজুহাতে মাকে বলেই সে ললিতের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল।

বাড়ি সেদিন খুঁজে বার করতে হয়নি। এর আগেও একদিন বাজার যাবার পথে খোঁজ করে জিজ্ঞাসা করে করে এসে দেখে গেছে বাড়িটা। তবে সেদিন ডাকতে পারে নি সাহস হয়নি বললে বেশী বলা হয়—সংকোচে বেধেছিল। তখনও মনের দ্বন্দ্বে আশঙ্কা ও বিচারবুদ্ধি আত্মসমর্পণ করে নি।

আজ জানবে, দেখা করবে বলেই এসেছে।

ডাকলও। গলা কি কেঁপে গেল? সহজ স্বর বেরোল না? কে জানে। তার তো মনে হল সে যথাসাধ্য সহজভাবেই ডেকেছে।

প্রথমটা ললিত বুঝতে পারে নি।

এ-গলা তার তেমন পরিচিত বলে বোধ হয়নি। এতটা পরিচিত হয়ও না। পাশাপাশি বসে যার সঙ্গে কথা বলা যায়, সে হঠাৎ একদিন চেঁচিয়ে ডাকলে গলা চিনতে দেরি হয়।

তাছাড়া, বিনুর মতো এমন অন্তর্নিবিষ্ট বা অন্তর্নিমগ্ন ছেলে, অন্তত দেখলে তাই মনে হয়। (কথাটা কদিন আগে শিখেছে হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে - ইংরাজীতে নাকি একে ইনট্রোভার্ট বলে)। নিজে থেকে কোথাও আসবে কোন বন্ধুর বাড়ি—একেবারেই যেন ভাবা যায় না। ললিতও তাই ভাবতে পারে নি। জানলা দিয়ে দেখে তাই একটু অবাকই হয়ে গিছল, তারপর অবশ্য আর দেরি হয়নি—ব্যস্তভাবে খালি গায়ে কোঁচার খুঁটটা জড়াতে জড়াতে বেরিয়ে এল।

'কী ব্যাপার! তুমি! হঠাৎ!'

কন্ঠস্বরে আন্তরিকতার অভাব ছিল না' বিস্ময়ের সুরও অকৃত্রিম। কিন্তু বিনুর মনে হল কোথায় যেন একটা অস্বস্তির ভাব দেখা যাচ্ছে—তার মধ্যেই।

কারণটা পরে জেনেছিল। অথবা আরও কিছুদিন যাতায়াত করতে করতে বুঝেছিল।

সেদিন ললিতের বাড়ি গিয়ে একটু অসুবিধাতেই ফেলে ছিল বিনু তাকে।

ললিতদের বাড়িও ছোট, সে তুলনায় লোক বেশী।

এমনিতেই তারা ক' ভাইবোন মিলে সংখ্যায় কম নয়। ওদের দু ভাইকে যিনি মানুষ করতে এসেছিলেন, সে বিধবা আত্মীয়াটিকে আর তাড়াতে পারেন নি নিতাইবাবু। তাড়াবার খুব গরজও ছিল না, বরং ধরে রাখারই প্রয়োজন ছিল। অবিরাম ছেলে মানুষ করার পর্ব ওঁ'র বাড়িতে তো চলছেই। রান্নার কাজ ধাত্রীর কাজ—এবং আসল গৃহিনীর কাজও তিনিই করেন।

এছাড়া, ও'রা স্বামীস্ত্রী এই ভদ্রমহিলা ও এতগুলি ছেলেমেয়েদের ওপর দুটি ভাগ্নে এসে জুটেছে। তারা সুদূর মফস্বলের এক গ্রামে থাকে, সেখানে স্কুল একটা আছে সসেমিরে গোছের—কলেজের কোন বাবস্থা নেই। এই দু ভাই ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়তে এসেছে এখানে, এই শহরেই মামার বাড়ি থাকতে হোস্টেলে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সে সামর্থ্যও তাদের নেই। ভগ্নীপতি শুধু মধ্যে মধ্যে এক আধমণ চাল আর বাগানের ফসল কিছু কিছু দিয়ে যান।

রাত্রে শোবার জায়গারই অপ্রতুল, পড়বার কোন পৃথক স্থান তো নেই বললেই চলে। যে যার বিছানায় বসেই পড়াশুনো করে। ছোটরা চেঁচিয়ে পড়ে, মারামারি করে—ফলে বড়দের পড়ার ক্ষতি হয়। এরই কোন প্রতিকার করা যায় না—সে ক্ষেত্রে ছেলেদের বন্ধু এনে বসানোর বা গল্পগুজব করার জায়গা মিলবে কোথা থেকে?

সদরের পরেই একটি চলনমতো জায়গায় লোহার বেঞ্চি পাতা আছে, আর দু তিনখানা ভাঙাচোরা বাঁকা লোহারও চেয়ার—সেখানেই নিতাইবাবুর বৈঠকখানার কাজ চলে। সেখানে ছোট ছেলেরা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বসে গল্প করবে তা চিন্তারও অতীত। একমাত্র ললিতের দাদা—যেহেতু বাড়ির বড় ছেলে—এক আধ দিন সেখানে তার সহপাঠীদের এনে বসায়। আর কারও অতটা সাহস নেই।

ঘরে না হোক কোথাও একটা বসাতে পারল না—এর জন্য ললিত একটু অপ্রতিভ বোধ করছিল বৈকি! সেদিনই বাবার দুই বন্ধু এসেছেন কী একটা কাজে, ফলে সেই অদ্বিতীয় বেঞ্চিটিও জোড়া। আর ছুটির দিন, বাবা বাড়ি আছেন, সকালবেলা পড়াশুনোর সময় বন্ধুর সঙ্গে বসে গল্প করলে পরে বাবার কাছে—হয়ত ঠিক বকুনি খেতে হবে না—অনেক জবাবদিহি করতে হবে।

ওর এই ঈষৎ বিব্রতভাব অতিস্নায়ু স্পর্শসচেতন বিনুর দৃষ্টি এড়ায় নি।

লজ্জা আর দুঃখের সীমা রইল না তার। নিজেকে দিয়েই বোঝা উচিত ছিল তার এই অসুবিধার ব্যাপারটা।

সত্যিই, ললিতই যদি ওর বাড়ি যেত আজ, সেকি বসতে দিতে পারবে? এমনকি নিশ্চিন্ত হয়ে এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করাও তো চলত না।

ললিত অবশ্য নিজেই কৈফিয়ৎ দিল, 'তুমি এই প্রথম এলে ভাই আমার বাড়ি—অথচ আজই এমন অবস্থা একটু বসতে দেবারও জায়গা নেই।'

'না না, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।' বিনু এর মধ্যেই ঘেমে নেয়ে উঠেছে, কতকটা তোৎলার মতো থেমে থেমে বলল, 'আচ্ছা—তোমার কাছে—মানে ডার্ভিল-স্ট্যাম্পের জিওগ্রাফী আছে—?'

শেষের দিকে যেন কোনরকমে হঠাৎই বলে ফেলে।

'ডার্ভিল স্ট্যাম্পের জিওগ্রাফী?' অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে ললিত, 'সে আবার কি?...আমাদের কি পড়ানো হবে এবার? না তাই বা কী করে হবে। কে জানে—আমি তো নামও শুনি নি।...সে তোমার কি কাজে লাগবে?'

'না না, এমনি, একটু শখ হয়েছিল। বইটার খুব নাম শুনেছি। মনে হল তোমার দাদা কলেজে পড়েন, হয়ত ওঁ'র পাঠ্য আছে—'

হঠাৎই আর কোন কথা খ‍ুঁজে না পেয়ে বইটার নাম করে ফেলেছে। নামটা বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে। হয়ত একটু পাণ্ডিত্য দেখাবার ইচ্ছাও ছিল। বলে ফেলে এখন ভয়ঙ্কর অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে—এ বই এখানে খোঁজ করার অর্থ—হীনতা নিজের কাছেই ধরা পড়েছে। ফলে আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কথাগুলো।

ললিত অবাক।

'সে কি! দাদা তো আমাদের ইস্কুলেই পড়ে। এই তো সবে ফার্স্ট ক্লাশ। তুমি তো চেনো আমার দাদাকে—রোজই দেখছ!'

'হ্যাঁ হাঁ। তাও তো বটে।...আচ্ছা আমি আজ আসি ভাই কিছু মনে করো না।.. বইটার নাম শুনেছি এত, একবার খুব দেখার ইচ্ছে ছিল।'

বলতে বলতেই একরকম ছুটে পালিয়ে আসে সে।

সে সময়টা দিনই যেন কেমন এক ধরনের লজ্জা আর অপ্রস্তুত ভাবের মধ্যে দিয়ে কাটল।

সে লজ্জা নিজের কাছে, নিজের মনে।

ক্ষণে ক্ষণেই নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা মনে পড়ে আর যেন একটা যন্ত্রণা অনুভব করে। আত্মধিক্কারে এমন একটা শারীরিক কষ্ট বোধ করে লোকে তা সে জানত না।

ছি ছি ছি। কী ভাবল ললিত ওর সম্বন্ধে। কী ক্যাবলাই না জানি মনে করল। একসময়ের বন্ধু ভাবল নিশ্চয়. কিম্ভূত একটা পাগল!...এই কথা যদি ললিত অন্যদের কাছে গল্প করে! ইস! কী করল সে, কী করল। এ কি ভূতে ধরেছিল তাকে। একটা যা হোক দরকার কি কৈফিয়ৎ যদি ভেবে নিয়ে যেত সে। মাকে তো বলে গেছল একটা কম্পোজিশনের বই চাইতে যাচ্ছে। তা-ই কেন বলল না।

কথাটা মনে পড়লেই ঘেমে ওঠে, আপনা থেকেই লাল হয়ে ওঠে মুখ। ভাগ্যে মার অত লক্ষ্য করার মতো সময় নেই। নইলে এখনি এক ঝুড়ি প্রশ্নের জবাব দিতে প্রাণ বেরিয়ে যেত। এখনও যে মিছে কথার তত ওস্তাদ হয়নি সেইজন্যে। আরও এই ধরনের ওজর খুব সহজে মাথায় আসে না।

এইসব এলোমেলো চিন্তায় কাটে সারাদিন। নিজের কাছেই নিজে কৈফিয়ৎ দেয়—এক একবার এক এক রকম! আর এর মধ্যে মাঝে মাঝেই ললিতের মুখখানা মনে পড়ে যেন শিউরে ওঠে লজ্জায় অপমানে। পরের দিন কি করে মুখ দেখাবে ললিতের কাছে—ভাবতে গেলেই মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।

যদি এই যাওয়া আর পালিয়ে আসা নিয়ে মজাও করে গল্প করে বন্ধুদের কাছে! ও যাবার আগে কিম্বা যাবার পরে ওর [illegible]নেই।

[illegible] সে। কখনই যাবে না। তা মা দাদা যাই বলুন।..

খুব ভয়ে ভয়েই গেল পরের দিন। বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করছিল স্কুলে ঢোকবার সময়। কিছুতেই আর কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। কেবলই ভয় হয় এই বুঝি ওরা এখনই সবাই এক-সঙ্গে হেসে উঠবে। হাসিতে ঠাট্টায় ফেটে পড়বে। এই যে সব চুপ করে বসে আছে—শুধু বেশী করে মজা করবে বলে।

ফলে পড়ায় মন দিতে পারে না। বাড়িতে স্কুলের বই পড়ার অভ্যেস নেই, যেটুকু যা পড়ে এই ক্লাসে বসেই! মন দিয়ে মাস্টারমশাইদের কথা শোনে, তাতেই অনেকটা তৈরী হয়ে যায়। আজ অমনোযোগের জন্যে দু-তিনবার বকুনি খেল। প্রসন্নবাবুর মুখ আলগা তিনি এক দল ছেলের মধ্যেই প্রশ্ন করে বসলেন, 'কীরে, মুখ চোখের অমন অবস্থা কেন? এই বয়েসেই প্রেমেটেমে পড়লি নাকি;...... পাশের বাড়ির নাকে পোঁটা ঝরা খুঁচির সঙ্গে?'

কিন্তু ক্রমে যখন একটির পর একটি পিরিয়ড কেটে গেল, এমনকি একটা টিফিনও পেরিয়ে এল—কোন অঘটন ঘটল না তখন আস্তে আস্তে একটু স্বস্তি বোধ করতে লাগল।

ললিত তাহলে কাউকে বলেনি কিছু। সে ওকে অপদস্ত করতে চায় না।

ললিত ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ললিত কি ভদ্র

এতক্ষণের সমস্ত আশংকা ললিতের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রীতিতে পূর্ণ হয়ে এক নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলল ললিতের মানসমূর্তি ওর মনের চোখে। বার বার লোভ হতে লাগল ওকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমিই আমার সেই বন্ধু, আমি যাকে এতদিন মনে মনে খুঁজছি।

।। ২৬ ।।

তবু একসময় ওকে স্বীকার করতেই হয় যে, ললিতের সঙ্গে ওর কল্পনার বন্ধুর অনেক তফাৎ।

ললিত ওর এসব স্বপ্ন বা আবেগের ধার ধারে না। এসব বোঝেও না সে। তার এত পড়াশুনোও নেই যে এমন একটা জিনিস ভাবতে বা ধারণা করতে পারবে। সে একেবারে সম্প্রতি যা দু একখানা উপন্যাস পড়েছে। বাবাকে লুকিয়ে পড়তে হয় তার. তিনি সেকেলে মনোভাবের মানুষ, ছাত্রাবস্থায় নাটক নভেল পড়ার কথা ভাবতেও পারেন না। আর লুকিয়ে বসে পড়বার মতো এত নিভৃত জায়গাও নেই তাব বাড়ি। পাড়ার লাইব্রেরী থেকে বই আসে, ওদের মার জন্যে। তাঁর সময় কম—একখানা বই শেষ করতে দশবারো দিন, বড় বই হলে আরও বেশী কুড়ি পঁচিশ দিনও লেগে যায়। তাঁর অবসরের সঙ্গে ওর অবসর না মিললে পড়া যায় না। সুতরাং অনেক সময় বই খানিকটা পড়াই থেকে যায় শেষ হয় না! অন্য কোথাও থেকে কোন বই আসে না। তেমন বন্ধুবান্ধব না আত্মীয় স্বজনও নেই ওদের যাদের কাছে অনেক বই আছে, দু-চারখানা চেয়ে আনা যাবে, এত গরজও ওর মায়ের নেই। বাড়িতে পাঁজি আর এদের পড়ার বই ছাড়া অন্য কিছু নেই।

সেই জন্যেই সে এই 'ইনট্রোভার্ট' বন্ধুটির তল পায় না। তার মনের মাপে এর মন মাপা যে সম্ভব নয় তাও বোঝে না। বিনু কি চায়, কেন ওর সঙ্গেই কথা কইতে এলে অমন আটকে আটকে যায় কথাটা, এলোমেলো আছটকা কথা বলে, বক্তব্যটা গুলিয়ে যায়—তা বুঝতে পারে না। অথচ বোকা বলেও তো মনে হয় না। যখন সাধারণ ভাবে, অন্যদের মধ্যে কথা বলে—বিদ্রূপের। ওকে কেউ ঘাটাতে গেলে সে-ই জব্দ হয়ে যায়।

বিনুর যে পড়াশুনোও খুব, সেটা নিজেদের বিশেষ পড়া না থাকলেও বোঝে—ললিত শুধু নয়, মদন অসিত সবাই। মাস্টারমশাইরাও আরও। সেজন্যে তাঁরা ওর সঙ্গে বেশ একটু সমীহ করেই কথা বলেন। বাংলার স্যার বিভূতিবাবু তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়েই আলোচনা জুড়ে দেন—এটা পড়েছ? ওটা, অমুক কবিতাটা? আচ্ছা, মনে আছে এই কবিতাটা? এ লাইন কটা কোথা থেকে বলছি বলো তো? এই ধরনের সমানে সমানে আলোচনা করার মতোই কথা বলেন।

একদিন, ঠিক পরীক্ষা নয়, একনাইলাইজের মতো, ক্লাসে একটা প্রবন্ধ দিলেন লিখতে। বললেন, কুড়ি মিনিটের মধ্যে লিখতে হবে, বাকী সময়টা তিনি ওখানেই দেখে পড়ে নম্বর দেবেন। —যেমন তখনই। বিনুর অবশ্য প্রবন্ধ বা এসে শেষ হল না, শেষ মুহূর্তে এক রকম খাতা টেনে নিতে হল ওর কাছ থেকে—তবু দেখা গেল সেই সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে।

মদন ক্লাসের ফার্স্ট বয়—সে আগেই বিভূতিবাবুর পিছন থেকে ঝুঁকে দেখে নিয়েছিল লেখাটা। সে ঈর্ষা আর ক্ষোভ চাপতে পারল না, বলল, ও লেখার কি আছে স্যার, কেবলই তো একটার পর একটা কোটেশান দিয়েছে. প্রোজও যা লিখছে ঐ সব কবিতার লাইনগুলোই প্যারাফেজ করে দিয়েছে বা মানের বইয়ের মতো অর্থ লিখে দিয়েছে যেন। ও তো সবাই লিখতে পারে।

বিভূতিবাবু ভুরু কুঁচকে জবাব দিলেন, তুই পারিস? তোর লেখায় তো একটা উদ্ধৃতিও নেই। বাংলা এসে বা প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয় কেন? ছাত্রদের বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কতটা জ্ঞান দেখার জন্যেই তো। তা আর কে এত চট করে ঐ কুড়ি মিনিট [illegible] মধ্যে এতগুলো [illegible]

রক্তের সম্পর্ক কত নিকট সম্পর্ক

Glaxo
ग्लैक्सो
मिनाडेक्स
स्वस्थ रक्त और
नयी शक्ति के लिये
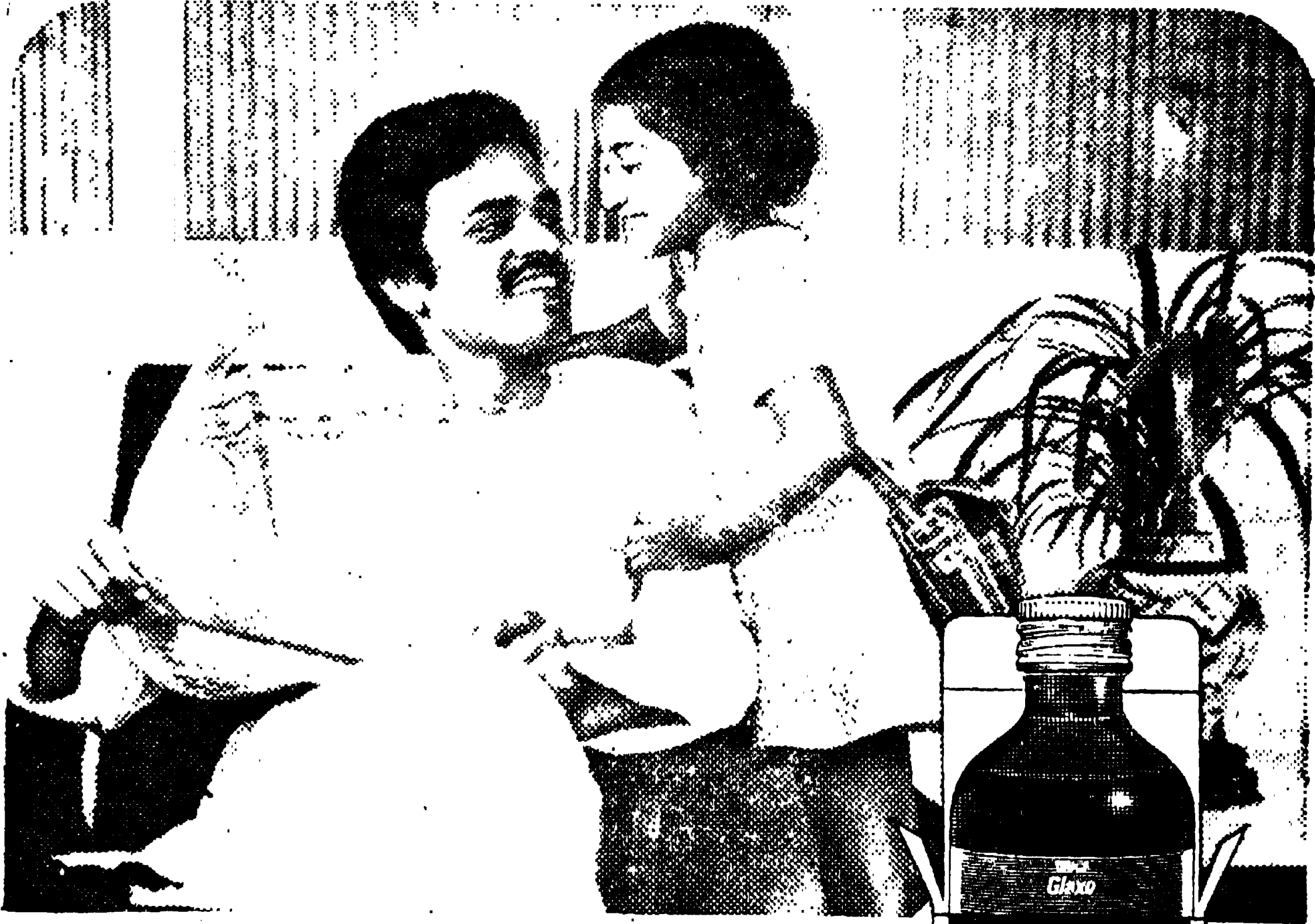
মিনাডেক্সেরও নিকট সম্পর্ক আছে আপনার রক্তের সঙ্গে!

সুস্থ রক্ত ভালো স্বাস্থ্যের আধার। আর সুস্থ রক্তের জন্যে দরকার লৌহতত্ত্বের। মিনাডেক্সে প্রচুর পরিমাণে লৌহতত্ত্ব থাকার দরুণ এর প্রত্যেক চামচে আপনার রক্তের পুরোপুরি লাভ হয়।

সুস্থ রক্তের জন্যে

মিনাডেক্স®

CASGM-19-209 BN

কোটেশান দিতে পারত শুনি। এতগুলো কবিতা কেউ পড়েছে তোদের মধ্যে? শুধু-শুধু হিংসা করিস কেন। ফার্স্ট ডিজার্ভ দেন ডিজায়ার!......তোরাও পড় না, পড়—অমনি ঠিক জায়গায় লাগসই করে কোট কর—তোদেরও ফুল মার্কস দোব।

আর একবারের একটা ঘটনা ওর আজও মনে জ্বল জ্বল করছে। সেকেণ্ড ক্লাসের য়্যানুয়াল পরীক্ষা সেটা, প্রশ্নপত্রে ইংরেজীতে লেখা ছিল—গিভ দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া কনটেনড ইন—এর অর্থটা ঠিক বুঝতে না পেরে বিনু সাবস্ট্যান্স-এর জায়গায় সিমপ্লিফিকেশন লিখেছিল। লিখেছিলোও বড় উত্তরের খাতায় আড়াই পৃষ্ঠা। একটা ছোটখাটো প্রবন্ধের মতো করে। হেমচন্দ্রের কবিতা—কিবা ছিল রোমরাজ্য এখন কোথায় ঐ বিখ্যাত লাইনটি যে স্ট্যাঞ্জায় আছে সেই স্ট্যাঞ্জা পুরোটাই তোলা ছিল প্রশ্নপত্রে।

বিভূতিবাবু ওকে পনেরোর মধ্যে বারো দিয়েছিলেন। তার ফলে ও মোট তিন নম্বর বেশী পেয়ে বাংলায় প্রথম হল।

মদন বাকী সব বিষয়েই প্রথম হয়েছিল, তবু এটুকুও তার সহ্য হল না। খাতা যখন ফেরৎ দেওয়া হয়েছে তখন বিনুর খাতা এক রকম জোর করেই টেনে নিয়ে দেখে নিল উলটে—আগেই শুনেছিল বিনু ভুল করেছে সকলের মুখে আসল কি পাওয়া হয়েছে শুনে নিজেই দুঃখ করেছে সে তার পরই গিয়ে নালিশ জানাল, স্যার, ও তো সাবট্যান্স-এর জায়গায় স্যামপ্লিফিকেশান লিখেছে—ও কি করে বারো পায়?

বিভূতিবাবুর চেহারা ছিল সুন্দর কিন্তু রেগে গেলে ঠোঁট দুটো একটা বিশ্রী ভঙ্গীতে বেঁকে যেত। উনি এখনও সেই রকমভাবে ঝাঁকিয়ে বললেন, তুমি একটি অতি নোংরা ছেলে। ....ওহে বাপু, আমি অনেক বছর ইউনিভার্সিটিতে একজামিনারী করছি—আমাকে তুমি আইনের প্যাঁচে ফেলে জব্দ করতে পারবে না। আমাদের নিয়মে বলাই আছে, কেউ যদি এই ধরনের ভুল করে তাহলে ঐ প্রশ্নর মোট নম্বর থেকে শতকরা কুড়ি নম্বর কেটে নিয়ে বাকীটাকে ফুল মার্কস ধরতে হবে। তারপর সেই নম্বরের মধ্যে ঠিক উত্তর লিখলে যেমনভাবে যোগ্যতা বিচার করা হত তেমনিই করতে হবে। মানে ঠিক যা চাওয়া হয়েছিল তাই লিখেছে কি লিখতে চেষ্টা করেছে এইটেই ধরে নিতে হবে। এ কোশ্চেনে ফুল মার্কস ছিল পনেরো—তা থেকে টুয়েন্টি আমি কেটে নিলে কত দাঁড়ায়—বারো, কেমন তো? আমি সেই বারোর মধ্যেই ওকে বারো দিয়েছি। এটা যদি স্যামপ্লিফিকেশন বা ভাব সম্প্রসারণ করতেই বলা হয়ে থাকত—ও যা লিখেছে, তার চেয়ে এই ক্লাসের বা এই বয়সের ছেলে কেউ ভাল লিখতে পারত বলে মনে করি না। বংকিমচন্দ্র থেকে প্রোজ কোটেশান তো তোমরা কেউ কখনও পড়োনি, পড়লেও মনে করে রাখতে না বা ঠিক জায়গায় লাগাতে পারতে না। ....বুঝেছ, জবাব পেয়েছ এবার? যাও, এখন নিজের জায়গায় গিয়ে বসো—আর এমনভাবে না বুঝে সুঝে হিংসে দেখাতে গিয়ে নোংরা মনের পরিচয় দিও না।

ওর ওপর চূড়ান্ত আস্থার পরিচয় দিলেন হেডমাস্টার মশাই। ওদের স্কুল লাইব্রেরীতে অনেক দিন হল কোন লাইব্রেরিয়ান নেই। বইয়ের সংখ্যা এত নয় যে পুরো মাইনে দিয়ে একজন লাইব্রেরিয়ান রাখা চলে। আগে নিচের ক্লাসের একজন শিক্ষক বিরাজবাবু অবসর সময়ে এই কাজ করতেন। ফলে কাজ কিছুই হত না প্রায়। না, ছেলেদের কোন বই পড়তে দেওয়া হত, না ভাল মতো একটা ক্যাটালগ করা হত, আর না নতুন বই ক্যাটালগে জমা হত। বইগুলো গুছিয়ে আলমারিতে তোলা পর্যন্ত হত না।

বই আগে যা কিছু কিছু ছাত্র বা অন্য মাস্টারমশাইদের দেওয়া হয়েছে—তাও যে সবাই ফেরৎ দিয়েছে কিনা কেউ জানে না। যাও বা ফেরৎ এসেছে তাও ঠিক ঠিক খাতায় জমা করা হয় নি। বিরাজবাবু এই কাজ করতেন, তিনি কোন এক সুদূর ভবিষ্যতে সময় পেলে খাতা খুঁজে বই ফেরৎ-জমা করে গুছিয়ে তুলবেন—এই ভরসায় ফেলে রেখেছিলেন। বিস্তর বই পোকায় কেটেছে, বিস্তর বৃষ্টির জলে ভিজে তাল পাকিয়ে গেছে।

এ নিয়ে প্রসন্নবাবু ওঁকে একটু বকাবকি করতে গিছলেন বিজয়বাবু সোজা বলে দিয়েছেন, 'দৈনিক পাঁচ পিরীয়ড পাড়িয়ে আর এত কাজ পারা যায় না। আপনারা অন্য কাউকে এ ভার দিন।'

সেই গোলমালটার সময়ই একদিন বিনু গিয়েছিল অনুযোগ জানাতে—'স্কুলে বই থাকতে আমরা কোন বই পড়তে পাবো না স্যার?'

হেডমাস্টার মশাই তখন বসে প্রসন্নবাবুর সঙ্গে এই কথাই আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন খানিকটা। তারপর বললেন, 'তুমি ভার নিতে পারবে? তুমি তোমার কোন বন্ধুকে নিয়ে?'

বিনু তো অবাক। কথাটা তার বুঝতেই বেশ কিছুটা সময় গেল। তারপর সে বলল, 'কিন্তু এসব তো আমি কিছু বুঝি না—তাছাড়া সময়—'

হেডমাস্টার মশাই অসহিষ্ণু ভাবে বললেন, 'কেউই আপনা আপনি বোঝে না, সবাইকেই সব কাজ সব লেখাপড়া—চেষ্টা করে শিখতে হয়। যা আর একটা মানুষ করতে পারছে তা তুমি পারবে না কেন? সে আমরা প্রথমটা বুঝিয়ে দেব একটু। আর সময়? দুটো টিফিনে তো বেশ খানিকটা সময় পাওয়া যায়,—আধঘণ্টা। আর যদি ছুটির পর আধঘণ্টা করে দাও, তাহলেই হয়ে যাবে। এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। বইগুলো নম্বর দেখে দেখে আলমারিতে তোলা মানে, তিনশ চুয়াল্লিশ নম্বর বই তিনশ তেতাল্লিশ আর পঁয়তাল্লিশের মধ্যে থাকবে—এ তো সবাই পারে। এ ছাড়া ইসু বুক দেখে কে কে কি বই ফেরৎ দেয়নি—তার একটা লিস্ট করা, ক্যাটালগ খাতা দেখে কত বই নষ্ট হয়েছে সে বার করা—এইগুলো হলেই আমি আমাদের যোগেনবাবুকে দিয়ে নতুন ক্যাটালগ তৈরী করিয়ে দেব, দুচারখানা নতুন বইও কিনতে পারি। তারপর—যতক্ষণ না অন্য পারমানেণ্ট লোক পাই, তোমরা টিফিনের সময় বই ইসু করা আর ফেরৎ নেওয়া—এটা চালাতে পারবে না? কটা ছেলেই বা স্কুল লাইব্রেরী থেকে বই নেয়—ঐ সময়ের মধ্যেই হবে যাবে!'

খুবই ঝুঁকির কাজ। সময়ও যাবে অনেকটা। তাছাড়া ফিরতে দেরি হলে মা যদি বকেন?

হেডমাস্টার মশাই যেন ওর চোখ দেখে মনের কথাটা পড়ে নিলেন, বললেন, যেতে আধঘণ্টা দেরি হওয়ার জন্যে, তোমরা যদি কাজ করতে রাজী থাকো আমি তোমাদের গার্ডিয়ানকে চিঠি লিখে দেবো। আর রোজ করার দরকারও নেই, সপ্তাহে দুদিন যথেষ্ট।'

বিনু রাজী হয়ে গেল।

রাজী হল তার কারণ ঐ সামান্য সময়ের মধ্যেই একটা আকারহীন আশা ওর মনে দেখা দিয়েছে।

এই তো সুযোগ। স্কুলের কাজ, হেড মাস্টার মশাই গার্জেনদের বলে দেবেন—কারও কোন অসুবিধাই থাকবে না। এই সুযোগে ললিতাকে অনেকটা সময় কাছে পাবে। পাশাপাশি একসঙ্গে কাজ করার সুযোগে দুজনে দুজনের মনের অনেকটা কাছে আসতে পারবে।

এতে যে ললিতের কোন অসুবিধা বা অনিচ্ছা থাকতে পারে—তা ওর মাথাতেই যায় নি। সে হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এল শুধু যে এত বড় একটা দায়িত্ব বহনের, বয়স্ক অভিজ্ঞ লোকের কাজ করার উপযুক্ত মনে করেছেন ওকে, এই গর্বে মাথা উঁচু করে তাই নয়—আনন্দে একরকম উড়ে এল বলতে গেলে। আশার আনন্দ তার মনই নয় দেহটাকেও যেন লঘু করে দিয়েছে। আনন্দ আর আশা। এক অভাবনীয় সুযোগ এসে যাওয়ার আনন্দ আর অকল্পনীয় এক সম্ভাবনার আশা।

কিন্তু ললিতের কাছে কথাটা পাড়তে সে একেবারে ওর সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনায় জল ঢেলে দিল। এতক্ষণের আশার দীপটি দিল এক ফুঁয়ে নিভিয়ে।

'ধ্যুস! তুমিও যেমন। কে ঐ ভূতের বেগার খাটতে যাবে! পুরনো বই, অর্ধেক গেছে পচে, ধুলোর পাহাড় জমেছে তার ওপর, দেবেন কিম্বা শিউশরণ এসে যে ওটুকুও করে দেবে তা আশা করো না—বলতে গেলেই বলবে, আমাদের এদিকে ঢের কাজ, আমরা পারব না। এসব বুঝেই হেড স্যার তোমাকে ভজিয়েছেন—আমাদের দিয়ে ঐ জঞ্জাল সাফ করাতে চান।..না ভাই,

আমার এত গরজ নেই। এ বেগার কেউ ঘাড় পেতে নিত না। তুমি ছাড়া। তুমি একটি বেহদ্দ বোকা যাকে বলে তাই। কাল বরং স্কুলে এসে বলে দিও তোমার মা দাদা রাজী হচ্ছেন না!'

এটা যে কতখানি আঘাত তা কেউই হয়ত বুঝবে না, বিনু নিজেও তখন বোঝেনি।

আঘাত বুঝেছিল ঠিকই, খুব জোরেই ঘা খেয়েছিল একটা, তবু তার গুরুত্ব—বোধহয় একেবারেই এমনটা ভাবা ছিল না বলেই—পুরোপুরি বুঝতে—উপলব্ধি করতে দেরি হয়েছে।

সেদিনের বাকী ক্লাস দুটোর কোন পড়াই মাথায় গেল না। ছুটির পরও, অপরাহ্ণ সন্ধ্যা কোথা দিয়ে কি ভাবে কেটে গেল টেরও পেল না। মাথায় খুব জোরে আঘাত লাগলে যেমন জ্ঞান বা অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে যায় মানুষের তেমনিই আচ্ছন্ন ভাবে রইল সমস্ত সময়টা। সব কিছুই বিস্বাদ লাগছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে চোখের সামনে।

রাত্রে ঘুমও এল না। আরও কষ্টকর—শুয়ে শুয়ে যত ভাবে ঘটনাটা—এই প্রত্যাখ্যানের নানা দিক চোখে পড়ে—ততই একটা অব্যক্ত এমন কি ওর কাছেও কতকটা অকারণ বেদনায় মাঝে মাঝে চোখে জল এসে পড়ে। মা যদি টের পান, এ চোখের জলের কোন কারণও দেখাতে পারবে না এই ভেবে প্রাণপণে চেষ্টা করে সামলাবার—কিন্তু পারে না, বরং তাতে যেন আরও বেশী বুকে মোচড় লাগে।

এতটা দুঃখ শুধু ওর প্রস্তাব এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছে---ওকে বিদ্রূপ করেছে বোকা বলেছে বলেই?

না, তা নয়। ওর কল্পনায় ললিতের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল বা গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল—সেটা চূর্ণ হয়ে গেল বলেই কি তবে এই কষ্ট? না, তাও না।

এই সুযোগ উপলক্ষ করে ওর আশা আর আকাঙ্ক্ষা যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল—ওর দোষ আর স্বপ্ন—সে আঘাতও কম নয়। তখনও পৃথিবী চেনার বয়স হয়নি, সেভাবে বহুলোকের মধ্যে মানুষও হয়নি, তাই এমনও মনে হতে লাগল মধ্যে মধ্যে যে সে তার একটা ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হল!

অথচ এতটা আশা করারও কোন কারণ ছিল না।

আজ বহু মানুষ দেখায় ও চেনায় জীবনক্ষেত্রে বহু ঘাতপ্রতিঘাতে, বুঝতে পারে যে, ললিত নিচে নামেনি. সাধারণ মাপকাঠিতে বরং সে ভাল ছেলের দলেই—বিনু নিজের গরজেই মনের আকাশে ওকে [illegible]

পক্ষেই ওঠা সম্ভব কিনা সন্দেহ। আর, এ কেউ চেষ্টা করে হতে পারে না, এধরনের মনসিক গঠন মানুষ নিয়ে জন্মায়।

ভুল ভেঙেছে বারবারই, আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসেছে স্বপ্ন, স্বপ্নের মতোই বাস্তবের আলোঘাতে তন্দ্রার দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ সাধারণ মাপের ব্যবহার করে, তা দেখে যদি কেউ ব্যথা পায়, সে তার নিজের দোষ, তার প্রাপ্য। তবু স্বপ্ন না দেখে যে থাকতে পারে না, তাকে যে স্বপ্ন দেখতেই হবে।

অবশ্য আগের চেয়ে অনেকটা কাছে এসেছে বৈকি।

আসা যাওয়ার সংখ্যা বেড়েছে, তারও বাড়িতে বন্ধুকে বসাবার জায়গা নেই, তবু তো ললিতের শান্ত ভাবভঙ্গী সুশ্রী আকৃতি দেখে মা ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকে বলে অনুমোদন করেছেন। তাই তবু বাইরের বারান্দায় ওঠার সিঁড়িতে বসে দুজনে কথা কয়। ললিতের সেটুকু সুবিধেও নেই। ওদের চলনের লোহার বেঞ্চি প্রায়ই জোড়া থাকে—অন্তত বিনু যখন যাবার অবসর পায়—ছুটির দিন ছাড়া হয়ে ওঠে না, সকালে বা বিকেলে, ললিতের বাপ কি দাদার বন্ধুরা আসেন, আড্ডা দেন। সুতরাং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হয়ে চলে আসতে হয়। তখনও বা দুজনেই ললিতের বাড়ির সামনে পায়চারি করে কিম্বা একটু দূরে গলির মোড় পর্যন্ত যায়।

এক আধ দিন অন্যত্রও যায় অবশ্য। মাকে বলে বাড়িতে তেমন কোন জরুরী কাজ না থাকলে ললিতের সঙ্গে বিকেলে—নতুন যে বড় সরকারী পুকুর কাটা হয়েছে, 'লেক' বলে চালায়, সেখানেও যায়। এদিকটা কাটা শেষ হয়ে গেছে, পশ্চিমের দিকে আর একটু নতুন জায়গা কাটা চলছে এখনও, সেইখানে গিয়ে বসে ওরা। তবে সে কতক্ষণই বা। ললিতের বেশীক্ষণ থাকতে আপত্তি ছিল না বিনুরই তাড়া থাকত। তবু এক একদিন সুযোগ মতো, বিশেষ যেদিন কোন কারণে সকাল করে স্কুলের ছুটি হয়ে যেত, যে ছুটির কথা বাড়িতে কেউ জানে না—সেইসব দিনগুলোয় এখানেই আসত ওরা। বিনুই টেনে আনত বেশির ভাগ নিভৃতে গল্প করবে বলে।

এইসব দিনে তিন চার ঘণ্টাও কাটত এখানে। গভীর করে কাটা হচ্ছে খুবই গভীর। মধ্যে মধ্যে সেই খাড়া মাটির গায়ে দু একটা গুহার মতো গর্ত করে রেখেছিল কাটুনিরা, কেন রেখেছিল কে জানে, সেইখানে কোন মতে নেমে গিয়ে বসত ওরা কোন কোন দিন—বিশেষ দীর্ঘ অবসরের দিনগুলোয়।

কিন্তু সেও তো একটানা আশাভঙ্গেরই ইতিহাস।

সেখানেও তো বিনুর কল্পনা ও চিন্তা দিয়ে গড়া ধ্যান মূর্তি বার বার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, ম্লান হয়ে গেছে বারবার।

এইসব কর্মহীন দীর্ঘ অবসরে, এমনি অন্তরঙ্গ জনের কাছে কিশোর বা তরুণ বয়সী বন্ধুর দল স্বভাবতই নিজেদের ভবিষ্যতের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা—বেশীটাই হয়ত বেশির ভাগ—সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের জানায়। জানাবার সময় সে স্বপ্নজাল বিস্তারলাভ করে। বলতে বলতে এগিয়ে যায়, যে কল্পনা তখনও পর্যন্ত মাথায় আসেনি, তাও মনে এসে যায়, ফলে যোগ হয় সেগুলোও।

বিনু বলে কম, কারণ তার বলার অসুবিধা আছে।

(চলবে)
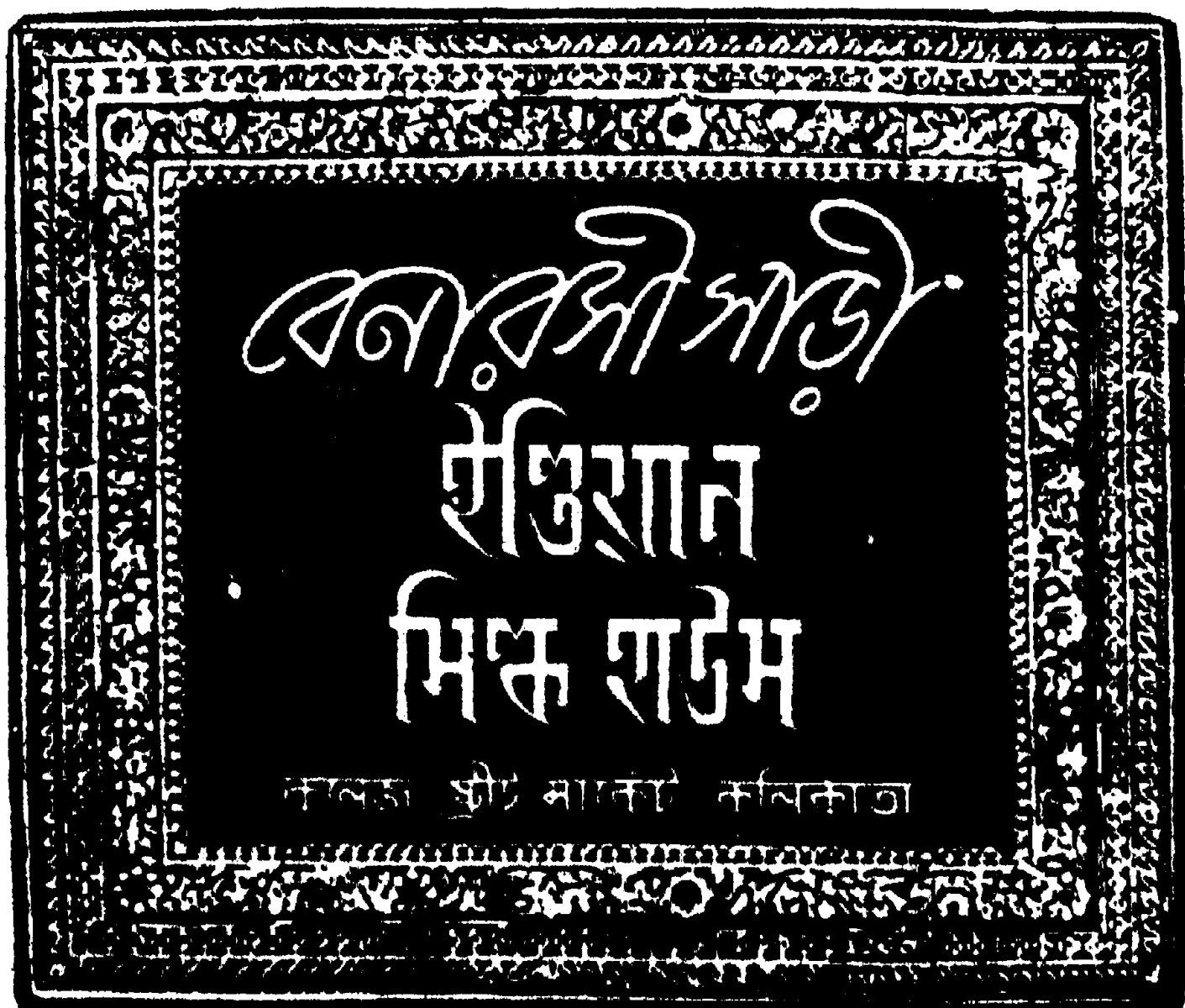
পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

গুহিরাম নিশ্চুপ রজনীকান্তর পাশে দাঁড়িয়ে দীপঙ্করের দিকে চেয়ে আছে। চোখের পলক পড়ে না। কালো চোখের তারা স্থির কোন ভাবা নেই। দীপঙ্কর বুঝতে পারে না রজনীকান্তর সর্বনাশে গুহিরামের রিঅ্যাকশন কি! সে কি সন্তুষ্ট নয়! গুহিরাম নিজেকে কোন জমির দখলদার হিসেবে ডিম্যান্ড করেনি।

রজনীকান্ত চিৎকার করে বলল, সার ভাগ রসিদ দেখাতে বলুন।

—নেই। সকলে একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে।

—সব মিথ্যে বলছে সার।

দীপঙ্কর চুপ করে থাকে। বুঝতে পারে না কি করা উচিত। সে পিথা নায়েককে ডাকে। পিথাকে ডেকে একটু দূরে সরে যায়।

পিথা নায়েক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে একই কথা বলে, ভাগ করি, রাজাবাবুদের ভাগ দিই।

—তাহলে মালিক হতে চাও কেন?

—রাজাবাবু জমিন দিই দেবে, উহার নামে করি দাও।

—জমি তো রজনী সাউয়ের, মিথ্যে বলছ কেন?

—উসব জানিনি, ই রাজাবাবুর জমিন, মুরা চাষ করি। পিথা নায়েক যেন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। পাহাড়ের মত শরীর টান টান হয়ে যায়।

সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এতদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা এই রকম হয়নি। অথচ তার স্পষ্ট ধারণা যে গরীব মানুষে, এইসব ক্লাসের লোকজন সচরাচর মিথ্যে কথা বলে না। জোটবদ্ধ হয়ে মিথ্যে কথা বলতে গেলেও বেশীক্ষণ তা টেকাতে পারে না। এরা সকলে একই কথা বলছে তার কাছে। নির্মল মজুমদারের কাছেও এই কথা বলেছিল।

পিথা নায়েক আবার এগিয়ে আসে, 'বাবু ঝুটা বলবেনি, ই গাঁ মুর জনমইস্তান, ঝুটা বলবেনি ই মাটিতে দাঁড়ায়ে।

—জমি কার?

—রাজাবাবুর।

—কি করে হয়! সব তো বিক্রি করে দিয়েছে পঁচিশ বছর আগে!

—জানি নি উসব, তবে জমিন রাজাবাবুর, মুরা চাষ করবো।

সেই একই গোলমাল থেকে যাচ্ছে। এখন ঝট করে কোন ডিসিশন নেওয়া যায় না। ব্যাপারটার অতলে তলিয়ে যেতে হবে। এরা যেভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কথা বলছে, তাতে রহস্য আরো ঘনীভূত হচ্ছে।

—বাবু মুরে যদি বিশ্বাস না-হয়, তো উ বিমলকে জিগাও, বাসের লোক। জগত ভরমন করিছে।

বিমল! মানে সেই হাফপ্যান্ট পরা মধ্যবয়সী লোকটা। সে কোথায়? সে এর ভিতরে জড়ায় কি করে? আবার জগত ভ্রমণ করেছে।

—কই বিমল?

—হুই যে, মুরা ঝাড়গাঁর বাহারে যাইনি, উ গিইছে, লিখাপড়াঅলা ভাল মানুষ, উ পিথিমী ঘুরিছে।

মানুষের ভীড় থেকে সেই মানুষটা বেরিয়ে এল। একই রকম পোশাক। চোখ পিট-পিট করছে। সে তার নাম উচ্চারণে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারলো না। গালে দাড়ি জমে গেছে, চোখ কোটরে।

—বিমল ঠিক কথা কহিবে। একজন বলে।

—হাঁ জগত ভরমন করিছে, সত্য কহিবে। পিথা নায়েক বলে।

জগত ভ্রমণ ব্যাপারটা কি? ঐ পার্বতী বাসটা নিয়ে কি বিমল পৃথিবী পরিক্রমা করেছে। সামান্য হেল্পার, টিকিট সংগ্রহ ওর কাজ। কত আর মাইনে পায়। খুব দায়িত্বশীল বলে কনডাকটরটাও ওকে মালিকের লোক বলে। মালিক একটু হিসেবে গরমিল হলে বিমলকেও ছাড়ে না।

বিমল সরে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে আবার মানুষের ভীড়ে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। দীপঙ্কর এগিয়ে যায়।

—আপনি শুনুন। দীপঙ্কর ডাকে।

—আমি। বিমলের গলা ঘসঘস করে।

—হ্যাঁ।

আমি কিছু জানি না, লোকটা ফিসফিসিয়ে এই রকম কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ঠোঁটজোড়া শুধু নড়ল।

দীপঙ্কর বুঝতে পারে বিমলের অবস্থা। এত লোকের সামনে সত্যি কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। সে কথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে অন্তরঙ্গ হতে যায়।

—আজ বাস বন্ধ?

—না ছুটি নিয়েছি। বিমল উদাসীন হাসি আনে মুখে।

বাসের কথা শুনলেই ওর ভাল লাগে। বাস মানেই চলমান কিছু। একটার পর একটা অঞ্চল পেরিয়ে যাচ্ছে। নতুন মানুষ তুলছে, নামাচ্ছে, নতুন জায়গা দেখছে। তার বাস-অন্ত প্রাণ।

—আপনি জগৎ ভ্রমণ করেছেন? দীপঙ্কর হেসে জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ মানে না। বিমল অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে।

—ব্যাপারটা খোলসা করে বলুন তো?

দীপঙ্কর বাঁধের রাস্তায় জাঁকিয়ে বসে। অনেক লোক জমা হয়েছে। তদন্ত ছিল রজনীকান্তর জমির। আদিগন্ত মাঠ এখন খাঁ খাঁ করছে। এইসব মাঠের অনেক গল্প আছে। ডাক্তার থাকলে গল্প খুঁজত এখানে।

জমির অনেক কাহিনী আছে। ইতিহাস আছে। জমি খুঁড়ে সেই ইতিহাসটা বার করে আনতে হবে। হয়ত পরিশ্রমই সার হবে, কোন কাজই হবে না, তবুও চেষ্টা। সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কলাবনির উত্তেজনা রাজগৃহের কাহিনী সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। জমির ইতিহাস জানতে হলে পাশাপাশি অনেক কাহিনী জানতে হয়। শুনতে হয়। এইসব গল্প কম আকর্ষণীয় নয়।

ডাক্তার ভাল গল্প জানে। অনেক গল্প। ডাক্তার গল্প খুঁজে বেড়ায়। সেদিন লাবণ্যকে ভূতের গল্প শুনিয়ে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। লাবণ্য ভয়ে সারাক্ষণ দীপঙ্করকে ছুঁয়েছিল। লাবণ্যর হাত কেমন ঠাণ্ডা! ঐ হাত উত্তাপে শান্তি আনে। ঐ হাত রোগ শোকের অবসান ঘটায়। লাবণ্য অনেকক্ষণ পরে ডাক্তারকে প্রশ্ন করেছিল।

—ডাক্তারদা যা বললেন, সত্যি?

—হ্যাঁ, সব আমার জীবনে ঘটেছে।

—আপনার জীবনে?

হ্যাঁ। ডাক্তার বেশ উদ্ধতের মত বলে।

লাবণ্য সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকে তারপর হঠাৎ বলে, যা আপনার জীবনে না দেখা তেমন গল্প বলতে পারেন না?

—না, বানাতে পারি না। ডাক্তার হেসে বলেছিল।

লাবণ্য হঠাৎ উচ্ছল হয়ে ওঠে। পায়চারি শুরু করে।

আচ্ছা আপনি তো একদিন [illegible] হয়ে যাবেন তাই না?

ডাক্তার ঘাড় হেলায়, লাবণ্যর জিজ্ঞাসাকে সমর্থন করে।

—অন্য জায়গায় গিয়ে গল্প বলবেন অন্য কারোর কাছে?

—তোমার মত শ্রোতা পেলে নিশ্চয়ই বলব। ডাক্তার হাসে।

দীপঙ্কর ডাক্তারকে সতর্ক করতে পারে না। ডাক্তার কিছু বোঝে না। একদম না। লাবণ্য খুব বুদ্ধিমতী, [illegible]
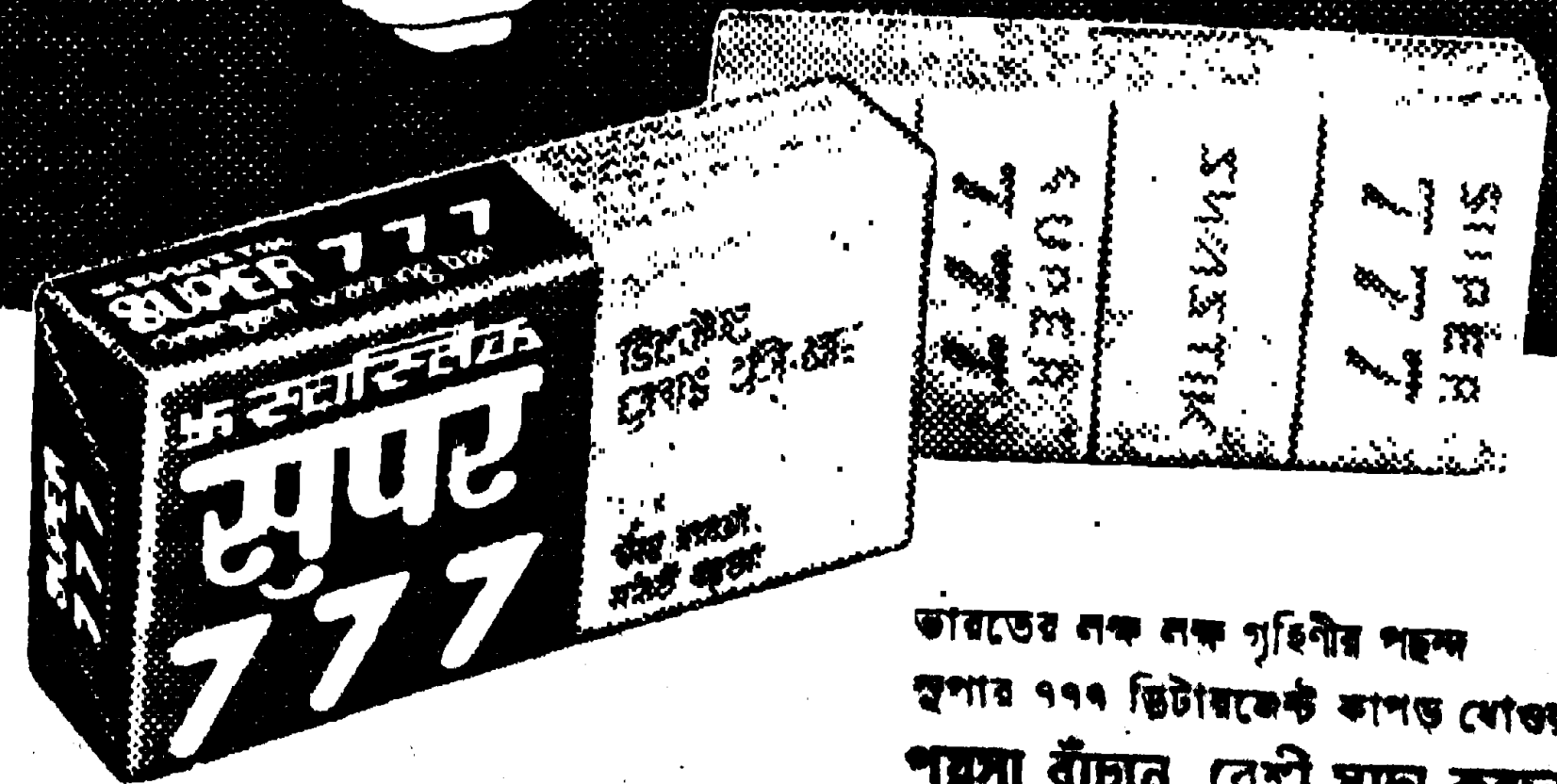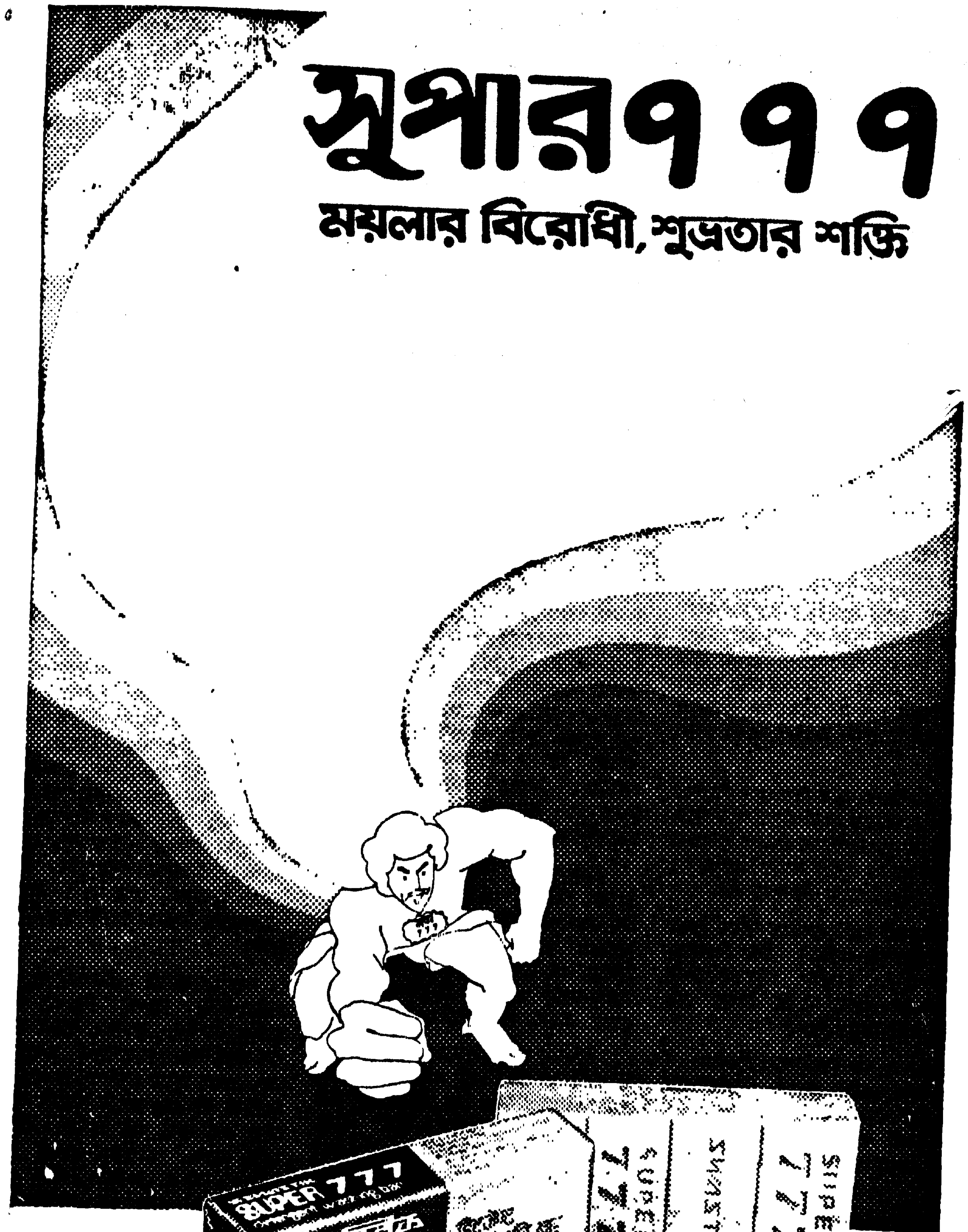
এগোচ্ছে, তা সুবিধের নয়। দীপংকর উঠতে যায়, 'চলুন ডাক্তার, বাইরে যাই'।

লাবণ্য ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, না বসুন।

সুতরাং বসতে হয়। ডাক্তারকে সতর্ক করা যাচ্ছে না। ও লাবণ্যর কথার জালে আটকে গেছে নিশ্চিত। দীপঙ্কর ভয় পায়।

—তাদের কাছে কি গল্প বলবেন। লাবণ্য স্থির চোখে তাকিয়েছে ডাক্তারের দিকে।

—কত রকম, জীবনে কত কিছু ঘটে যাচ্ছে!

ডাক্তার তখনো বোঝে নি। নিজেকে বড় বিনীত করে তুলেছে লাবণ্যর কাছে।

—তাহলে তো এই গল্পও বলবেন?

—কোন গল্প?

এই যে এক রাজা আছে। তাঁর বড় অসুখ। তিনি অস্পৃশ্য। তাঁর একটা মেয়ে আছে, লোকে রাজকন্যা বলে ব্যঙ্গ করে, হাসে, মেয়ের কাছে যারা আসে তারা কেউ তাকে ভাল বলে না, কেউ না...আরো আরো কত কিছু বানিয়ে দেবেন আরো অনেক কিছু।

বলতে বলতে লাবণ্য দৌড়ে চলে যায়। চোখ মুখও ভার হয়ে আসছিল কথা বলতে বলতে। নির্মল মজুমদারের একটা চিঠি এসেছে ওর কাছে। দীপংকর সেটা জানে। লাবণ্য বলেছিল দেখা হতে। কি লিখেছে মজুমদার? দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেও জবাব পায়নি।

ডাক্তার বিপন্ন হয়ে বসেছিল। দীপঙ্কর ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। খুব সরল মানুষ। এই ডাক্তার বোস। লাবণ্যর ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেনি। বুঝবে অনেক পরে। তখন একটা গল্প হয়ে যাবে ওর কাছে এটা।

এখন এই দূর অঞ্চলের জমির ভিতর থেকে এক একটা কাহিনী উঠে আসছে। কতরকম মানুষ, কতরকম গল্প। দীপঙ্কর বিমলকে নিয়ে বসেছে বাঁধের উপর। তার জগত ভ্রমণের কথা শুনবে।

—আমার নাম বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

—বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ তো নেই।

—আমার বাবা এসেছিলেন এখানে আমার জন্মের আগে, আদি বাড়ি ছিল হুগলী।

—কদ্দুর পড়েছেন?

—ম্যাট্রিক।

দীপংকর চমকে যায়। আর কোন চাকরী জোটে নি ওর।

—আমার বয়স কত বলতে পারেন? বিমল হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

—বছর পঁয়তাল্লিশ হবে, নাকি আরো বেশী?

—সবে আটত্রিশ পেরিয়েছি, লোকে বিশ্বাসই করবে না, কম বয়সেই বুড়িয়ে গেছি। বিমল ফিস ফিস করে বলে।

—বাসের হেল্পারি করেন কেন, অন্য কোন চাকরী জুটল না।

—না, জুটল না তাই দেশটা দেখা হল, আর বাসটাকে ভালবেসে ফেলেছি।

বিমল তার গল্প বলে। দীপঙ্কর নিশ্চুপ সব শুনে যায়। মানুষকে উপর থেকে দেখলে চেনা যায় না। ভিতরটা পুরোপুরি অন্য রকম। দীপংকর সকলকে বলে দিল আজ আর কোন এনকোয়ারি হবে না।

বিমলের পায়ে হেঁটে ভারত ভ্রমণ এতল্লাটে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। লোকে বলে জগৎ ভ্রমণ করেছে সে। তা প্রায় বছর পনেরো হয়ে গেল। তখন বিমল কলকাতায়। ম্যাট্রিক পাশ করে অনেক দিন বসেছিল, তারপর কলকাতায় গিয়ে উদভ্রান্তের মত চাকরীর খোঁজ করছিল। এই সময় দেখা হয়ে যায় রথীন সমাদ্দারের সঙ্গে।

রথীন পেশাদার ভ্রমণকারী। কলকাতার বাগবাজারের ছেলে। ছ' বছর বয়সে বাহাত্তর ঘন্টা একনাগাড়ে হেঁটে ছিল পাড়ার কম্পিটিশনে। বুকের উপর এক দুই পাঁচ মিলিয়ে গোটা তিরিশেক টাকা সেপটিপিন দিয়ে আঁটকা পড়েছিল। এ-সব পুরস্কারের টাকা। এহেন রথীন কলকাতা থেকে চুঁচড়ো, কলকাতা থেকে হাসনাবাদ পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করা শেষ করেছে তখন। তারপর সদ্য তিনটে জেলা কোনাকুনি হেঁটে গেছে। খবরের কাগজে বার তিনেক নাম উঠেছে রথীনের। নিজের এলাকায় ছোটখাট সম্বর্ধনাও পেয়েছে। সে তখন ভারত ভ্রমণের তোড়জোড় করছিল।

বাগবাজারের কিশোর সংঘ চাঁদা তুলেছে রথীনের জন্য। তার তখন সঙ্গী চাই একজন। চেনা পরিচিত কয়েকজন জুনিয়র ভ্রমণকারী ওর সঙ্গে কিছুটা কিছুটা করে হাঁটবে এমনি ঠিক আছে কিন্তু সমস্ত দেশটা ওর সঙ্গে হেঁটে ঘুরবে এমন লোক একটাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

বিমলের জমিজমা আছে সামান্য। তাও এজমালি সম্পত্তি। বাবা মারা যাওয়ার পর অনুপরমাণুতে ভাগ হয়ে গেছে। দু' ভাই তাদের ভাগের জমি বিক্রি করে সটকে পড়েছে টাটানগর। সেখানে ব্যবসা করবে। মা নেই। কলাবনিতে বিমল তখন একেবারে অনাথ। দু' বিঘে জমি একজনের জিম্মায় রেখে কলকাতায় ছুটেছে। ম্যাট্রিকে থার্ড ডিভিশন পেয়েছিল, সেটা কলাবনিতে এমন কিছু অনুল্লেখ্য ঘটনা নয়। একটা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি অনায়াসে জুটে যেত। কিন্তু জীবন সোজাসুজি চলে না, অন্তত বিমলের জীবন চলে না, তাই সে সেদিন কলকাতায় ছুটেছিল আর আজ পার্বতী বাস সার্ভিসের হেল্পার।

গাঁয়ের নরেন মাইতির ছেলে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করত কলকাতায়। বিমল তার কাছে গিয়ে উঠল। চাকরী একটা জুটোতে হবেই, না হলে নয়। গাঁয়ে থাকবে না। কলকাতায় তার এই দ্বিতীয়বার আসা। চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সে একের পর এক অফিস কাছারি ঘুরতে লাগল। নোটিশ বোর্ড দেখে অ্যাপ্লিকেশন ছাড়তে লাগল। কিন্তু দু'চার দিন যেতেই বুঝতে পারল তার কপালে শিকে ছেঁড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ট্যুরিস্ট ব্যুরোর নোটিশ বোর্ড দেখছিল বিমল। ঠিক দুপুর বেলা। নভেম্বরের প্রথম। কলকাতায় তখন ভালো রকমের রোদ্দুর বিছিয়ে রয়েছে। বেশ আরামের সূর্য। ঠিক তখনই দেখা রথীন সমাদ্দারের সঙ্গে। চন্দ্র সূর্যের মিলন। গ্রহণ লেগে গেল।

রথীন জেনে ফেলেছিল বিমলকে প্রথম দেখাতেই। এক ভবঘুরেকে সে পেয়েছে। বিমল রথীনের প্রস্তাবে কিন্তু কিন্তু করে অথচ সরাসরি না বলতে পারে না। কেননা তখন তার একটা কিছু করার দরকার ছিল। বুঝেছিল সাধারণ কোয়ালিফিকেশন-এ কিছু হবে না। একটু অন্য রকম হতে হবে। তাছাড়া গ্রাম থেকে বেরিয়ে কলকাতায় এসে মাথাও ঘুরে গিয়েছিল, বন্ধ ঘর থেকে একেবারে উন্মুক্ত মাঠে এসে পড়ার মত অনেকটা। বিমলের চোখটাও বেশ বড় হতে আরম্ভ করেছে তখন। চোখ ফুটছে, সে পৃথিবী দেখছে। কলাবনির সঙ্গে এ পৃথিবীর দুস্তর ব্যবধান। রথীন সমাদ্দার এক ওর কাছে আশীর্বাদের মত।

রথীন ওকে ঠিক দুপুরে ইডেন গার্ডেনে বসিয়ে অনেক কথা বোঝায়। এটা একটা বড় সড় কাজের মত। পায়ে হেঁটে ভারত ভ্রমণ, চারদিকে সাড়া পড়ে যাবে নিশ্চয়ই। খবরের কাগজের লোকজন আসবে। রেডিওতে খবর হবে দুজনের। তাছাড়া দেশটাও দেখা যাবে। বইয়ে পড়া জায়গাগুলো বিমলের চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

জয়পুর কেমন, শ্রীনগরই বা কেমন! দিল্লি রাজা বাদশার জায়গা, লক্ষ্ণৌ, চম্বলের জঙ্গল, বোম্বাই, আরব সাগর... কত রকম জায়গা, কত রকম মানুষ। এক এক রাজ্যের মানুষের ভাষা এক এক রকম। পোশাক এক এক রকম। আচার আচরণে কোন মিল নেই। তবু সকলে ভারতবাসী। বিমল ক্রমশঃ রথীনের কথায় অবাক হচ্ছিল। এমনও হয় নাকি! পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষকে দেখা, এই দ্রুতগতির যান-বাহনের যুগে। রথীন বোঝায় এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার, অনেকটা স্পোর্টসের মত। এখানে সাকসেসফুল হতে পারলে রথীন কলকাতায় ফিরে একটা ক্লাব খুলবে। সেখানে রীতিমত ট্রেনিং শুরু করবে শক্ত সমর্থ যুবকদের নিয়ে। হাঁটার অনেক রকম কৌশল আছে, কৌশল জানলে অনেক পথ ভ্রমণেও শরীরে ক্লান্তি আসে না। ভ্রমণের কৌশলটা জানা দরকার। রথীন বোঝায় এই ব্যাপারটা একান্ত দেশীয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এর নিবিড় যোগাযোগ।

এখন মানুষ ক্রমশঃ অলস হয়ে যাচছে। এক পা এগোতেই যন্ত্রের সাহায্য নেয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে অলস করে দিচ্ছে। অলস মস্তিষ্কে নানা রকম শয়তানির ফন্দি খেলছে। তাই পৃথিবী জুড়ে মানুষের এই দুঃখ। বিজ্ঞান মানুষকে অনেক দিয়েছে এটাও যেমন ঠিক, তেমনি মানুষের ভিতরের শুভ চেষ্টা-গুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছেও। মানুষকে শ্রম-বিমুখ করে তুলছে বিজ্ঞান। এর বিরুদ্ধেই রথীনের যাবতীয় ক্ষোভ।

বিমল গ্রামে বসে কিছু বইপত্তর পড়েছিল, সে সব বইয়ের কথার সঙ্গে রথীনের কথা মিলছে না! মানুষ শ্রমবিমুখ। কটা মানুষ? পৃথিবী জুড়ে লাখো লাখো মানুষ এখনো শ্রমের দ্বারা বেঁচে থাকে। শ্রম বিকিয়ে বেঁচে থাকে। শ্রমের সঠিক মূল্য পায়না। এই সব বিমলের এতদিনের উপলব্ধির সঙ্গে মিশে গেছে। তাই রথীনকে কেমন আশ্চর্য্য লাগছিল বিমলের। অথচ রথীনের কন্ঠস্বরকে ও উপেক্ষা করতে পারেনা।

রথীন বোঝায়, আগের দিনে আমাদের পিতামহরা পায়ে হেঁটে তীর্থে যেতেন। দশ বিশ তিরিশদিন এক নাগাড়ে হেঁটে প্রার্থিত তীর্থে পৌঁছতেন। কেউবা সেখানে দেহ রাখতেন, কেউ বা অক্ষত দেহে ফিরে আসতেন।এ থেকে আমরা তাঁদের মনের দৃঢ়তাকে উপলব্ধি করতে পারি, এক একজন বাঁচতেন একশো বছরের উপর। অথচ এখন দেখ, মানুষ সে সব ভাবতেও পারেনা। গড় আয়ু পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভ্রমণ হার্টকে সবল করে, শরীর সুস্থ রাখে, মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা গড়ে তোলে। মানুষকে শ্রমের দিকে ফিরিয়ে দেয়। এখন যানবাহন মানুষের সর্বনাশ করছে। কাশী যাও গয়া যাও, হেঁটে নয়, স্রেফ ট্রেন চেপে। তাতে তীর্থের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়। নতুন দেশ দেখা হয়না।

বিমল রথীনের কথায় সরাসরি প্রতিবাদ করতে পারছে না। কখনো সখনো সব সত্যি মনে হচছে। কিন্তু এক এক জায়গায় মন বিদ্রোহ করছে।

মানুষ শ্রম বিমুখ! তাহলে পৃথিবী-জুড়ে এত সম্পদ গড়ে উঠছে কি করে? এই সম্পদ তো মানুষের শ্রমেরই ফসল। হ্যাঁ মানুষের শ্রম নিয়ে যারা সুখে থাকে তারাই হয়ে উঠছে শ্রম বিমুখ। কেননা তারা নিজের শ্রমের দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। অগণিত মানুষের শ্রমের সুফল তারাই ভোগ করে। আর এই জন্যই তো পৃথিবীতে এত সমস্যা। যে বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের এত অহঙ্কার, যে সভ্যতা আমাদের গর্ব, সেই বিজ্ঞান আর সভ্যতার ছোঁয়া এখনো পৃথিবীর পঁচাত্তর ভাগ মানুষ পায়নি। এসব কথা বিমলের বুকের ভিতরেই থাকে। বলা হয়না; কেননা সে তখন নিজের শ্রমকে পুণ্য ক'রে কলকাতার রাস্তায় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামান্য অবলম্বন পাওয়া গেছে, তা ছাড়তে চায় না।

রথীন সমাদ্দার বলছে, ভারত ভ্রমণ করে ফিরে এসে তার চাকরির আর কোন সমস্যা থাকবে না। দরজায় মানুষ অপেক্ষা করবে। বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মিষ্টার বি কে বোনার্জী হয়ে যাবে। বিমল তার নিজের অভিজ্ঞতা বেচেই খেতে পারবে। জীবনে অভিজ্ঞতা বড় জিনিষ। কোন কিছুই ফেলা যায় না। শুধু ব্যবহার করতে জানতে হয়। সেই জানাটাই আসল শিক্ষা। এতবড় সুযোগ কখনো আসে না। অনেকেই রথীনের সঙ্গী হতে চাইছে, কিন্তু সে যাকে তাকে তো সঙ্গে নেবে না।

বিমল রথীনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

রথীন বলে, আসলে আমি চাই এমন একজন যুবককে, যার চোখ আছে, যার জীবনে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে, মাটির সঙ্গে যোগ আছে।

বিমলকেই এক্ষেত্রে ফিটেষ্ট বলে মনে হচছে রথীনের। বিমল গ্রামের ছেলে, অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে বড় হয়েছে। সে নদীর পারের ছেলে, নদীর চরিত্র বোঝে। সে এসেছে পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার অরণ্য থেকে, অরণ্যের প্রকৃতি জানে, জানে রুক্ষ মাটির চরিত্র। তাছাড়া গ্রাম সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বিমলের জন্মার্জিত। সব এই অ্যাডভেঞ্চারে কাজে লাগবে।

রথীন বিমলের কাছ থেকে তার নাড়ি-নক্ষত্র জেনে আসল জায়গায় টোপটি ফেলেছিল। বিমল নিজের সম্পর্কে এতটা জানত না। তার যে এত গুণ সে বিষয়ে কোন ধারণাই ছিল না। রথীন সমাদ্দার তার চোখ খুলে দিল। বিমলের নিজেকে তখন ইমপর্টান্ট বলে মনে হচ্ছে। সে এই বোধ-শূন্য কলকাতা শহরে যে অতুলবোধ নিয়ে এসেছে তা বুঝতে পারে। গ্রামের ছেলে বলে নিজেকে ভাল লাগতে শুরু করে। অরণ্যের কাছে নদীর ধারে জন্ম বলে সে বার বার কোন অজানা পুরুষকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

বিমলের চোখের সামনে তখন এক বিশাল ভারতবর্ষ খুলে যাচ্ছে। ভারতবর্ষ তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এই দেশে অরণ্য আছে পাহাড় আছে, নদী থেকে সমুদ্র আবার নরম সমতল ভূমি। সমতলের ফসলের ক্ষেত, অসংখ্য মানুষ সব কেমন আপন হয়ে উঠতে থাকে। অরণ্যের কথা মনে পড়তে থাকে বার বার, কংসাবতী নদীর কথা মনে পড়ে। এখন সেই নদীতে জল নেই, ধু ধু করছে নদীর বালিয়াড়ি। জঙ্গল থেকে কাঠ চুরি করে মানুষেরা সন্ধ্যের নদী পার হচ্ছে ভয়ে ভয়ে। দূর পশ্চিমের পাহাড়গুলো নীল হয়ে জেগে আছে। সেই রাজগৃহ, নামাল সবুজের ক্ষেত। বিমলের কলাবনিতে ফেরার ইচ্ছে হয়।

সেই ইচ্ছে ব্যক্ত করতেই রথীন হাঁ হাঁ করে ওঠে। বিমল রথীনকে বার বার বলে, যাওয়ার আগে একবার জন্মভূমি কলাবনিকে দেখে যাব না?

রথীন বোঝায়, 'ভারতবর্ষই কলাবনি, কলাবনিই ভারতবর্ষ', তুমি আমার সঙ্গে থাক, অনেক কাজ আছে।'

বিমল রাতে হোস্টেলে ফেরে। নরেন মাইতির ছেলেকে সব জানায়। সে কোন মন্তব্য করে না, শুধু একবার জিজ্ঞেস করে, টাকা চায়নি তো ঐ রথীন সমাদ্দার? বিমল ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এই প্রশ্নে। রথীনকে সে চিনে ফেলেছে। সুতরাং তার সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্যে সে স্পষ্টত তার ক্ষোভ প্রকাশ করে।

নরেন মাইতি ব্যবসাদার। তার ছেলেরও সেই রকম মন। ঐসব পাগলামির কান্ড সে বরদাস্ত করতে পারে না। চাকরীর খোঁজে এসে কোন লোকের খপ্পরে গিয়ে পড়ল বিমল বাঁড়ুজ্যে। একবার দেখতে হয়। নরেন মাইতির ছেলে বিম্বাধর বলে, তুমি কলকাতাকে চেন না, নানান রকম লোক নানান ধান্দায় ঘুরে বেড়ায়, একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। বিমল হাসে, 'আমার আছে কি যে সর্বস্বান্ত করবে?'

—তোমার কি আছে তা তুমি বুঝবে কি করে, চোর বাটপাড় ঠিক বুঝে ফেলে তোমাকে জালে আটকাবে।

—তা হয় না, তুমি রথীনকে চেন না। বিমল অনুযোগ করে।

—তুমি একদিনেই চিনেছ?

—মানুষকে চিনতে কয়েক ঘন্টা সময়ও লাগে না।

—বেশ তুমি যাও, তবে আমার ভাল লাগছে না।

—কেন?

—চাকরীর চেষ্টা কর দুটো পয়সা রোজগারের সময় এই বয়সটা, এখন তুমি কিনা, ওসব পাগলামি পয়সা থাকলে হয়।

—না। বিমল কঠিন স্বরে বলে।

—তাহলে? বিম্বাধর অবাক চোখে তাকায়।

—মন থাকলে হয়, দেশকে ভালবাসার মন। বিমল আবেগে বলে।

—তা দেশকেই ভালবাস গে, আমার কাছ থেকে যেতে পার।

—যাব বলেই তো এসেছি।

বিমল সেই রাতেই বেরিয়ে যায়। বেরোনর সময় বিম্বাধরকে বলে, আমি ভারত ভ্রমণে যাচছি, খবরটা কলাবনিতে দিয়ে দিও। বিম্বাধর জবাব দেয় না।

সে রাতে বিমল ফুটপাতে কাটিয়ে দেয়। রথীন পরদিন দশটার সময় ইউনিভার্সিটির সামনে তাকে নিতে আসবে কথা আছে। রাতের কোলকাতা তার চোখের অবশিষ্ট অন্ধকার দূর করে দেয়।

সে চুপচাপ ঘুমন্ত ভিখিরীর পাশে বসে রথীনের জন্য অপেক্ষা করে।

।।৭।।

কথা বলতে বলতে রোদ গাঢ় হয়ে উঠেছে। তেজ বেড়ে গেছে এরই মধ্যে। সকালের সেই ফিনফিনে শীতের আমেজ কোথায় উধাও। চারপাশে একটাও লোক নেই। শুধু একটু ওপাশে মাঠের আলে মিশকালো একটা দীর্ঘদেহী মানুষ মাথা নামিয়ে বসেছিল, সে পিথানায়েক।

বিমল থামল। বলতে জানে বিমল। পুরনো কথা বলতে বলতে সে নিজে তার পনেরো বছর বয়স কমিয়ে এনেছিল। দীপঙ্কর দেখছিল আপাত প্রৌঢ়ত্বের ছাপ লোকটার চোখ মুখে। অথচ বয়স কত কম! বছর আটত্রিশ। কথা বলতে বলতে বিমল উথলে উঠছিল।

নিজের সুবর্ণ সময়ের কথা ভাবতে বলতে ভাল লাগে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করল, তারপর?

বিমল চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। সেই এক ভঙ্গি। বাসের দরজা দিয়ে যেভাবে যে নীলিমায় দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয়। বাসের ভিতরের নানা কোলাহল ওকে স্পর্শ করছে না।

—তারপর কি হলো, থামলেন কেন?

বিমল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। চোখ মুখে বিপন্ন বিষাদ।

ব্যাপারটা কি? দীপঙ্কর ঠিক বুঝতে পারছে না। সেও উঠে দাঁড়ায়।

—আপনি এখানে কি করতে এসেছেন? বিমল তার চোখে কঠিন চোখ রাখে।

—সে তো আপনি জানেন, ল্যান্ড ডিসপিউট...।

—চলে যান এখান থেকে। বিমল সরাসরি যেন আদেশ করল।

—কেন, কি হয়েছে?

—আমার কাছ থেকে কিছু জানতে পারবেন না—

দীপঙ্কর স্তব্ধ হয়ে বিমলকে দেখতে থাকে। চোখ-মুখে সে উদাসীনতা আর নেই, বরং ফুটে উঠেছে এক কঠিন ইচ্ছে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব।

—আমাকে তো জানাতে হবেই। দীপঙ্করের কণ্ঠস্বর তুলনায় ম্রিয়মাণ।

—না।

—আপনি জানেন?

—না, কিস্যু না। বিমল ফিসফিস করে বলতে থাকে, চোখ-মুখ কুঁচকে গেছে। কেমন অসহায়তার ভাব। কাঠিন্য সরে গেছে।

দীপঙ্করএতক্ষণে যেন ধাতস্থ হয়। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হবে। সে বিমলের কাছে ঘন হয়ে যায়, পিঠে হাত রাখে।

—আপনি তো জানেন, এখানকার মূলে সমস্যায় না ঢুকতে পারলে দিন দিন পিজান্ট আনরেস্ট বেড়ে যাবে, ল' অ্যান্ড অর্ডার ব্রেক করবে, আপনি তো তা চান না, যে ইনফর্মেশন পারেন আমাকে দিয়ে সাহায্য করুন।

বিমল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মন আবার ফিরে যেতে চাইছে সেই সুবর্ণ সময়ে। স্মৃতি বড় কষ্ট দেয় ওকে। সব যদি ভুলে যেতে পারত।

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ। দীপঙ্কর আস্তে আস্তে সমস্তটা উপলব্ধি করে। মানুষের কাছে বিশ্বাস্য না হতে পারলে সব কথা জানা সম্ভব নয়। এত তাড়াতাড়ি কিসের! দিন যাক, সব জানা যাবে।

সে বিমলের পিঠে হাত দেয়, চলুন রোদ বেড়ে গেছে, আমার ঘরে যাই। গল্প করা যাবে।

—কলাবনির কথা জানতে চাইবেন না কিন্তু। বিমল ওর দিকে তাকায়। দীপঙ্কর ঘাড় হেলায়।

—কলাবনির কথা আমি বলবো না, আমার জন্মভূমি, তার কলঙ্কের কথা...।

বলতে বলতে বিমল চমকে ফিরে তাকায়। দীপঙ্কর চৌধুরী ওর দিকে অফুরন্ত কৌতূহলে তাকিয়ে আছে। বিমলের গায়ের ভিতরে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। বলবে না বলবে না করে ওকি বলে ফেলছে!

সে হনহন করে হাঁটতে থাকে মাঠ ধরে। মুহূর্তে অনেকটা দূরে।

—ও বিমলবাবু শুনুন। দীপঙ্কর চিৎকার করতে থাকে।

বিমল তার অতিপরিচিত পোশাকে দ্রুত মাঠ বেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হলো কি? দীপঙ্কর দৌড়ে যায়।

—আরে মশাই যাচ্ছেন কোথায়, রথীন সমাদ্দারের কথা বলবেন না?

—না।

—যাচ্ছেন কোথায়?

—ডিউটিতে!

—আজ ছুটি নিয়েছেন না?

বিমল দীপঙ্করের দিকে তাকায়। তারপর আবার হাঁটতে থাকে। এই লোকটাকে সে এই মুহূর্তে আর সহ্য করতে পারছে না। পুরনো কথা ভাবলেই ওর বুকের ভিতরে পুরো ভারতবর্ষের বাঁকাচোরা মানচিত্রটা ঢুকে পড়ে উত্তাল হয়ে যায়। সে কষ্ট আর সহ্য হয় না। বয়েস যেন সত্যিই অনেক বেড়ে গেছে। আটত্রিশের লোক পঞ্চাশ দেখায়। মাঝের বারোটা বছরের হিসেব নেই। সেই বারোটা বছর পিঠে নিয়ে জগৎ দেখিয়ে বেড়িয়েছি। সে ময়ূরের কথা বলতে পারবে না দীপঙ্কর চৌধুরীকে। কাউকে বলেনি। বলার মত মানুষ কই? যাকে বললে সব বিশ্বাস করবে। সমস্ত স্বপ্নকে ঘটমান সত্য বলে মেনে নেবে। হা-হা করে হেসে উঠবে না। বিমল চলে যায় দীপঙ্করকে এড়িয়ে নদীর দিকে। কংসাবতীর বালি দেখা যাচ্ছে। রোদ্দুরে রুপোর কুচি চিকচিক করছে। বালি পেরিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করবে, যখন আসুক না কেন।

ঠা ঠা রোদ্দুরে দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল বিমলকে চলে যেতে। এখন আর দেখা যাচ্ছে না, গাছগাছালির আড়ালে লুকিয়ে গেছে। সে বিষন্ন হয়ে মাথা নামিয়ে হাঁটতে থাকে। কৌশলে কি ভুল হল! আসলে এসব কাজে ভুল হলেই, আনসাকসেসফুল হলে উপরঅলা নির্দেশ দেন, ট্যাক্টফুল হও, মোর অ্যান্ড মোর ট্যাক্টফুল। নানাভাবে আসল তথ্যটি সংগ্রহ করে আন। তথ্য সংগ্রহের যাবতীয় ঝুঁকি তোমার, লাভও আছে। যদি লাভ বলে মনে করতে পার। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান, অর্জিত অভিজ্ঞতা পৃথিবীতে বসবাসের জন্য অতিপ্রয়োজনীয়।

সে চোখ তুলতেই দেখে মাঠের ভিতরে কালো মহিষ। কি বিশাল দেহ। পিথা নায়েকের অবয়বে রোদ্দুর পিছলে যাচ্ছে। সে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ এই মাঠেই বসেছিল।

—কি হলো বাবু? পিথা এগিয়ে আসে।

দীপঙ্কর ম্লান হাসে।

—উ চলি গেল কিনো?

—জানি না। দীপঙ্কর অন্যমনস্কের মত জবাব দেয়।

—উহার গোঁসা হইছে?

দীপঙ্কর নিশ্চুপ হাঁটতে থাকে। মনের ভিতরে এক ধরনের অহং বোধ নিয়ে হাজির হয়েছে এখানে। নির্মল মজুমদার পারেনি, হেল্পলেস হয়ে ট্রান্সফার প্রে করেছে, [illegible] বদলে সে এসে দায়িত্ব নিয়েছে। দায়িত্ব পালন করতে না পারলে তাকেও নির্মল মজুমদার হয়ে যেতে হবে।

—উহার বড় গোঁসা হয়। পিথা ওর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে।

দীপঙ্কর পিথার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়, পিথার দুটো চোখ রক্তবর্ণ, হাত-পা স্বাভাবিক নেই। এই দিনের আরম্ভেই গিলে এসেছে।

—উহার মাথা ভাল নয়, লেকিন সব জানে। পিথা বললো।

—তুমি জান না? দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করে।

—বুঝি নি কানুন, উ লিখাপড়াঅলা মানুষ!

দীপঙ্কর হাঁটতে থাকে। এদের নেতা অম্বুজাক্ষ বারিক কোথায়? অম্বুজাক্ষ এই টোট্যাল পিজান্ট্রিকে কন্ট্রোল করছে। অযৌক্তিক এক দাবী তুলেছে। তার সঙ্গে দেখা হলে হয়ত সব জানা যেত। নির্মল মজুমদার অম্বুজাক্ষর কথা বলে গিয়েছে। নির্মলের ধারণা ভাল নয় অম্বুজাক্ষ

সম্পর্কে। কেন? হয়তো এই ট্রাবলের জন্য সেই দায়ী এই কারণে।

—অম্বুজাক্ষবাবু কোথায় হে? দীপঙ্কর পিথাকে জিজ্ঞেস করে।

পিথা দাঁড়িয়েছে অম্বুজবাবুর খোঁজ করে এই বাবু। অম্বুজবাবুর সঙ্গে কি মোলাকাত হয়েছে? না হওয়ার কথা তো নয়। অম্বুজবাবু গেছে কলকাতায়, বউয়ের পেটে পাথর হয়েছে। গেছে তো দিন পনেরো। বাবুর আসার আগেই। বাবু তার কথা শুনল কার কাছ থেকে? শুনে থাকতে পারে। পিথার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। অম্বুজের আসার দিন হয়ে গেছে। তার সঙ্গে বসে কি বাবু সব জমি লিখে দেবে তাদের নামে।

—সে গিইছে কলকেত্তায়, আসবু দুরো দু-এক দিনাই...

—তুমি এখন যাও।

পিথা দাঁড়িয়ে পড়ে। জমি তাদের নামে লেখাতেই হবে। অম্বুজবাবু তাই বলে গেছে। যে করে হোক লেখাতেই হবে। গন্ডগোল হাঙ্গামা যাই হয় হোক। অম্বুজ বলে গেছে টাকার দরকার হলেও দেওয়া যাবে, যা চায় নতুন [illegible] তাই দেয়া যাবে। মদ মেয়েমানুষ টাকা সব। বাবুকে ক্ষেপানো চলবে না। [illegible]বাবুর মাথা গরম হয়ে গেছে বোধায়।

—বাবু আসবু কখন? পিথা জিজ্ঞেস করে।

—মু আসবু কখন

—আসবে কেন?

—তু কিমন আছিস [illegible]।

দীপঙ্করের মুখে হাসি [illegible]। মন ভরে লোকটার কথায় ঠিক নেই।

—এসো বিকেলের দিকে।

ঠিক আছে, আর হাঁ অম্বুজে [illegible] পাঠাই দিব।

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে আবার রাজার-বাড়ির গেটের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। পিথা নায়েক রাস্তার উপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। দীপঙ্কর কয়েক পা এগিয়ে ভিতরে ঢুকে বাঁদিকের মন্দিরের দিকে তাকাল। চোখ আপনা আপনিই ঘুরে যায়। [illegible] হাত-পা শিরশির করে ওঠে।

একি করছে লাবণ্য! না এক্কেবারে ভাল নয়। লাবণ্য ওর দিকে তাকিয়ে হেসে আবার মাথা নামিয়ে নিল। লাল পেড়ে শাড়ি পরেছে। গরদের হবে বোধহয়। চুল এলানো। ফুলের সাজি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কপালে চন্দনের তিলক। বছর তিরিশের একটা লোক। পুরোহিতের সাহায্য করে পুজোর কাজকর্মে। দুটো হাতে শাড়িটা পায়ের পাতা থেকে অনেকটা তুলে ধরেছে লাবণ্য, সেখানে জল ঢালছে এক বৃদ্ধা। লাবণ্যর কত অনায়াস ভঙ্গি। এতটুকু সংকোচ নেই। [illegible] এই এত বেলায় [illegible] [illegible]। আজ পুজোর [illegible] [illegible]। [illegible]

ঢুকতে ঢুকতে দীপংকরের মনে পড়ল, আজ পূর্ণিমা, লাবণ্য কাল বলেছিল। সে নিঃঝুম হয়ে বসে থাকে।

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে একা নদীর ধারে চলে গিয়েছিল দীপঙ্কর। সারাটা দুপুর অসহ্য কেটেছে। বিমল, পিথা নায়েক শেষে লাবণ্যর ওই ঔদ্ধত্য, সব জট পাকিয়ে গেছে মাথার ভিতরে। কোত্থেকে কোথায় এসে পড়েছে। একটা জায়গার মানুষকে কিছুতেই চেনা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না। সব লুকিয়ে আছে অদ্ভুত এক অন্ধকারে। অন্ধকার পুরনো ধ্বংস-স্তূপে। ধুলোয় চাপা হয়ে আছে সব। শব্দ উঠছে, কণ্ঠস্বর ধুলোর ভিতর থেকে উঠে আসছে, মানুষ আবিষ্কার হয়ে উঠছে না। গোটা রাজবাড়িটাকে একটা প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হচ্ছে। অসহ্য নির্জনতা। আজ দুপুরে ঘরে কেউ ছিল না, কোন দুপুরেই থাকে না, তবে আজ যেন নৈঃশব্দ বড় কঠোর হয়ে চেপে বসেছিল। এই নগরীর ধ্বংসাবশেষের পিছনে লুকিয়ে আছে এক মহা ইতিহাস তা খনন করে তুলে আনতে হবে। একটা মানুষও নেই যে তাকে সত্যি কথাটা বলে দেয়।

কলাবনির রূপ তার চোখের কাছে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এটা ছোটনাগপুর মালভূমির শেষ অংশ। চড়াই উৎরাই ঢেউ খেলানো মাঠ, ঘন নীল ফরেস্টের রেখা। বিকেলে পাহাড়গুলো সূর্যের ধাক্কা খেয়ে নীল হয়ে জেগে ওঠে, কংসাবতী। বিশাল রাজবাড়ি নিয়ে সারাদিন নিঝুম হয়ে থাকে। শুধু বাজারের অংশটা। একটা দোকানপাট নিয়ে সামান্য জমজমাট। সন্ধ্যে চায়ের দোকানগুলোয় পেট্রোম্যাক্স জ্বলে দুচার লোকজন বসে রাজা উজির [illegible]। খবরের কাগজ আসে বিকেলে। সব খবর তখন বাসী হয়ে নতুন খবর তৈরী হয়ে গেছে পৃথিবীতে। কলাবনি তাই সর্বক্ষণ অন্যদেশের পিছিয়ে আছে।

এহেন কলাবনি এখন বিপন্ন। রঞ্জনীকান্ত সাউয়েরা দ্রুত ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে জমির মায়ায়। দীপঙ্কর কংসাবতীর তীরে ছোট একটা উঁচু মাটির ঢিবির উপরে বসেছিল রোদ নামতেই। নিচে, অনেকটা নিচে জল। বেশ বড়সড় খাতই এখানে। পাতলা জল তির তির বয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমে বড়সড় একটা বাঁক নিয়েছে কাঁসাই। সন্ধ্যের আগেই দিগন্তে ভুবনের এক চাঁদ জেগেছে তার সমস্ত দেহটা নিয়ে। অন্ধকার খেয়ে ফেলে সন্ধ্যেটাকে করে তুলেছে আকাশে গ্রহহীন। চারপাশ জোলাটে হয়ে উঠছে ক্রমশঃ, না অন্ধকার না পরিপূর্ণ দিন। নদী, নদীর দুই পাড়, দূরে জ্যোৎস্নায় ভেসে থাকা জঙ্গল, সব মিলিয়ে কলাবনি অন্য। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

নদী পেরিয়ে কতগুলো কালো ছায়া এপাশে এসে উঠল। তখন দীপঙ্কর উঠবে। মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। একজন হে-হে করে উঠল।

—মু পিথা নায়েক, বাবু ইদিকে আসছিলেন কিনো?

ধূসর আলোছায়ায় সেই ভরাট গম্ভীর স্বর।

—এমনি বসেছিলাম।

—মুরা একটু নিশা করতে গিছিলাম, আপনে নিশা করবেন?

দীপঙ্কর এগিয়ে যায়, দেখে পিথা টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে। পা টলছে শক্ত করে মাটি কামড়ানোর চেষ্টা করছে।

—এই ভুরো খা, মু সাব বাবুরে নিশা করাইনি আনি।

দীপঙ্কর অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কি বলছে লোকটা? সে একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা, গাম্ভীর্য নিয়ে আসে কণ্ঠ-স্বরে না তুমি যাও, আমি ঘরে যাব।

—ঠিক আছে সার, মু তুরে ঘর দি যাই না।

পিথা একেবারে জঙ্গল থেকে উঠে আসা মানুষ, ধরা পড়েছে অম্বুজাক্ষর হাতে। পিথার কথার মাথা নেই। আপনি তুমি, তুই যখন যেমন মনে হয় বলে দেয়। অম্বুজাক্ষ নায়েক শেখাচ্ছে, চালাক হও, নতুবা তুমিও বোবা গাছিরাম হয়ে যাবে।

পিথা নায়েক কথা শোনে না। দীপঙ্করের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করে সাবধান এরই ভিতরে [illegible] [illegible] [illegible] পিথা চলছে দীপঙ্করের পাশাপাশি।

হাঁ বাবু, [illegible] সাবধান হওয়া দরকার আপনির।

দীপঙ্করের গায়ে হিম নামে। লোকটা এসব বলে কেন? কিসের সাবধানতা।

—বাবু ই রাজবাড়ি সাপের আড্ডা।

দীপঙ্কর নিশ্চুপ হাঁটছে। পিথা যা বলে বলুক, ও শুনে যাবে, এখন প্রশ্ন করলে মাতাল মানুষ কথার খেই হারিয়ে ফেলবে।

হাঁ সারবাবু, আগের সব রাজাবাবু, রাণীমা, রাজকন্যে মরি গিয়া সাপ হই আছে ই রাজবাড়িতে, ইটা জান?

দীপঙ্করের চারপাশে জমে উঠছে পুরনো গন্ধ। পুরনো বাড়ির গন্ধ। ধূসর রাতে মাথার ভিতরে ফুটে উঠছে এক মহা ধ্বংসস্তূপ, প্রাগৈতিহাসিক দিনের চিহ্ন। চারপাশ জুড়ে এই চরাচরে কোন শব্দ নেই শুধু পিথা নায়কের কণ্ঠস্বর:

—রাজবাড়ির মানুষের লালস বড়, মরি গিয়া লালস যায় না, তাই সাপ হই আছে।

—পুরনো বাড়ি সাপেদের আদর্শ বাসস্থান, সাপ তো থাকবেই।

নাহ, পিথা নায়েক গর্জে উঠেছে, অম্বুজের মানুষ বাবু, ই [illegible] [illegible] [illegible] কি করি, সব যক্ষি সাপ, ধনটো আর [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

সোনার হরিণ নেই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

।। উনপঞ্চাশ ।।

যত দোস্তিই থাক, মালিকের সম্মান আবুর কাছে কম নয়। তার হুট করে এসে হাজির হওয়াটা পছন্দ হবে কিনা সেই সংশয়ও আছে। হাসি মুখে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। জিত্ও।

আবুর পরনে ধবধবে সাদা চোস্ত, গায়ে জালি গেঞ্জির ওপর রঙিন ফুলকাটা সাদা পাঞ্জাবি, তার ওপর গাঢ় খয়েরি রঙের চকচকে মেরজাই। হঠাৎ মনে হবে ইতিহাসের পাতা থেকে কোনো নবাবজাদা উঠে এসেছে। ওকে দেখে বাপী কত খুশি মুখ দেখে বোঝা যাবে না। বানারজুলি টানছিল। আবু রব্বানি নিজেই তার চোখে অনেকখানি বানারজুলি। তবু ওকে আরো একটু বিব্রত করার কৌতুকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘটা করে দেখে নিয়ে চোখে চোখ রাখল।

আবুর ফাঁপরে-পড়া মুখ। বলে উঠল, ঘাট হয়েছে জনাব, মালের সঙ্গে চালান হয়ে এসে গেছি, কালই আবার ট্রাকে চেপে ফেরৎ চলে যাব!

বাপীর হাবভাব দেখে আর আবুর কথা শুনে অসিত চ্যাটার্জী আর জিতও মজা পাচ্ছে। বাপীর ঠোঁটে হাসি একটু এসেই গেল। এগিয়ে এসে দু'হাত আবুর দুই কাঁধে তুলে দিল। তারপর সামান্য চাপ দিয়ে আবার তাকে সোফায় বসিয়ে দিল। সামনের সোফায় নিজেও বসল।—কখন এসেছ?

—দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল। তোমার ট্রাক গুদোমে এসে দাঁড়াতেই জিত সাহেব সব ছেড়ে আগে আমাকে খালাস করে সোজা তোমার এখানে এনে তুলল। তুমি নেই দেখে গাঁটের পয়সা খরচা করে অনেক খাওয়ালে।

আবুকে জিতের একটু খাতির করারই কথা। একে মুরুব্বি মানুষ এখন, তার ওপর ওর সুপারিশের জোরেই সুদিনের মুখ দেখছে।

হাসিমুখে বাপী অসিত চ্যাটার্জির দিকে ফিরল।—অসিতদা কতক্ষণ?

—আমিও অনেকক্ষণ। সময়ে এসে গেছলাম তাই আমিও চপ-কাটলেট রসগোল্লা সন্দেশ থেকে বাদ পড়িনি—তুমি শুধু ফসকালে।

বাপী মনে মনে জিতের বুদ্ধির তারিপ করল। দু-একদিন দেখে এই লোককেও খাতিরের পাত্র ধরে নিয়েছে। আবুর দিকে ফিরল। ঠোঁটের হাসি চোখে ঠিকরলো। অসিতদার সঙ্গে গল্প তো করছিল দেখলাম—কে, বুঝতে পেরেছ?

আবু খুশিতে ডগমগ।—আমি কি এত বোকা বাপীভাই, তুমি ও'র বিবিসাহেবার ছেলেবেলার বন্ধু শুনেই ধরে ফেলেছি। এতক্ষণ তো বহিনজির ছেলেবেলার গল্পই বলছিলাম জামাই সাহবকে—একবার তুমি যে তাকে পেল্লায় ময়াল সাপের গেরাস থেকে ছিনিয়ে এনেছিলে তাও জামাইসাহেব আমার কাছ থেকে এই প্রথম শুনলেন। ও'কে দেখে আমাদের সেই ফুটফুটে ছোট্ট বহিনজি এখন কেমনটি হয়েছেন খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

আবু পদস্থ হয়েছে বটে। আগের দিনে পড়ে থাকলে মেমসায়েবের মেয়েকে বহিনজি না বলে মিসি সায়েব-টায়েব কিছু বলত। বাপী সাদা মুখ করে সায় দিল, দেখে এসো—অসিতদাকে বলো।

হৃষ্ট মুখে আবু জবাব দিল, বলতে হবে না আমি অলরেডি ইনভাইট!

বাপী হেসে ফেলল, আবার ইংরেজি কেন!

অসিত চ্যাটার্জি আর জিতও হাসছে। আবু মাথা চুলকে বলল, গড়বড় হয়ে গেল বুঝি—কি করব, তোমাদের কলকাতার বাতাসের দোষ, জিভ সুড়সুড় করে ইংরেজি বেরিয়ে আসে।

চাকরিতে বহাল হবার পর জিত্ মালহোত্রা এই প্রথম বোধহয় মালিকের হালকা মেজাজের হদিস পেল। সকলকে ছেড়ে বাপীর পলকা গম্ভীর মনোযোগটা হঠাৎ জিতের দিকে। -মিস্টার চ্যাটার্জি মানে অসিতদার সঙ্গে তোমার কত দিনের আলাপ?

যে-রকম চেয়ে আছে আর যেভাবে বলল, যেন গলদ কিছু ধরা পড়েছে। অপ্রতিভ জিত্ জবাব দিল আগে কয়েকবার এখানে দেখেছি ...আলাপ আজই।

বাপী আরো গম্ভীর।—তুমি তো বুদ্ধির ঢেঁকি দেখি, মিস্টার চ্যাটার্জি একজন আর-এ, চার্টারড অ্যাকাউনটেন্টের সুগোত্র, আর এক মস্ত তেল কোম্পানির চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট—এ খবর রাখো?

কি বলতে চায় কেউই বুঝছে না। আবু দোস্তকে দেখছে। অসিত চ্যাটার্জির সলজ্জ বদনের আভায় সোনালি চশমা চিকচিক করছে। ফ্যাসাদ শুধু বেচারা জিতের। খবর রাখে না যখন মাথা নাড়া ছাড়া আর উপায় কি।

বাপীর পালিশ করা মুখ।—তিন মাস ধরে খাতা পত্রের হাল কি করে রেখেছ তুমিই জানো। সব ঠিক-ঠাক করে সাজিয়ে রাখার ব্যাপারে সাহায্য করার মতো এমন আর একজন কলকাতার শহর চষে পাবে?

আবুর চোখে কৌতুক। অসিত চ্যাটার্জির ফর্সা মুখ খুশিতে টসটসে। এতক্ষণে মনিবের ইশারার হদিস পেয়ে জিতের অমায়িক বদন। পারলে এক্ষুনি গুণী মানুষটির তোয়াজ তোষামোদ শুরু করে দেয়। হালকা মেজাজে বাপী অসিত চ্যাটার্জিকেও সতর্ক করল।—জিত এরপর তোমাকে ছেঁকে ধরবে অসিতদা, ওর তোয়াজে ভুলো না, হাত দিয়ে ওর জল গলে না— সাহায্য চাইলেই প'চিশ পারসেন্ট চড়িয়ে ফী হাঁকবে।

বাড়তি রোজগারের লোভ আছেই। চড়িয়ে ফী হাঁকলে শেষ পর্যন্ত সেটা কার ঘাড়ে গিয়ে পড়বে ভেবে না পেলেও অসিত চ্যাটার্জির চোখে জিতের কদর বেড়ে গেল। ফলে অন্তরঙ্গ হাসি মুখ তার দিকে ফিরল। —ফী-এর জন্য কি আছে, দরকার হলেই বলবেন। আপিসের দশটা-পাঁচটা ছাড়া অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস।

চতুর জিতের দু'কূল বজায় রাখার চেষ্টা। সপ্রতিভ মুখে সে শুধু বলল, থ্যাংস।

আবুর আসাটা বাপী একটা বড় উপলক্ষ করে তুলল। রাতের খাওয়া-দাওয়ার আগে আজও অসিত চ্যাটার্জিকে ছাড়ল না। বলাই আর রোশন বাবুর্চির তৎপরতায় আয়োজনে কার্পণ্য নেই। খাওয়ার আনন্দের মধ্যে বাপী বলল, এক জিনিসের অভাবে তোমার সবটাই নিরামিষ লাগছে বোধ হয় অসিতদা, কিন্তু আজ তুমি কথার খেলাপ করলে। না দেখে মিলু নিশ্চয় খুশি হবে।

অভাব কোন্ জিনিসটার বুঝতে আবু বা জিতেরও অসুবিধে হল না। লজ্জা পেয়ে অসিত চ্যাটার্জি বলল, কি যে বলো, আমি কি রোজই ওসব খাই নাকি—

সঙ্গে সঙ্গে আবুর আফশোস।—জামাই সাহেবের চলে জানলে আমি তো গোটা কয়েক বছাই মাল নিয়ে আসতে পারতাম!

সোনালি চশমার ওধারে দু' চোখ উৎসুক।—ওদিকে ভালো-ভালো জিনিস পাওয়া যায় বুঝি?

বাপী জবাব দিল, নেপাল ভুটানের

[illegible] ঊর্মিলা এদিকে তো দেখতেই পাও না তোমরা। আবুর দিকে ফিরল, হবে'খন, আদিত্যদা তো পালিয়ে যাচ্ছে না—।

খাওয়ার পর্ব শেষ হতে জিতকে বলল, দুজনেই তো সাউথে যাবে, একটা ট্যাক্সি ধরে অসিতদাকে নামিয়ে দিয়ে যাও।

৩

তারা চলে যেতে আবু সোফায় বসে মৌজ করে একটা বিড়ি ধরাবার ফাঁকে দোস্ত-এর মুখখানা দেখে নিচ্ছে। চোখো-চোখি হতে বাপীর ঠোঁটে হাসি ছড়ালো। ঊর্মিলা দূরে চলে গেছে: কাছের মানুষ বলতে এখন শুধু এই একজন।

ভণিতা ছেড়ে আবুও সোজাসুজি চড়াও হল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, শুধু জামাই আদর নয়, বেশ একটা টোপও ফেললে মনে হল?

বাপী হাসছে।—কেন, খাতা-পত্র ঠিক রাখার দরকার নেই?

আবু মাথা নাড়ল।—আগের মতো তোমার ভেতর-বার এক লাগছে না বাপীভাই। ...ভদ্রলোক সত্যি অত গুণের মানুষ নাকি?

ছদ্ম গাম্ভীর্যে বাপী সায় দিল, হ্যাঁ, তার অনেক গুণ।

আবু তবু অপেক্ষা করল একটু। তারপর একটা বড় নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আগের দিন আর নেই, নইলে তোমাকে ধরে গোটা কয়েক ঝাঁকানি দিলে ভিতরে যা আছে গলগল করে বেরিয়ে আসত। যাক, তার বিবি-সাহেবার খবর কি?

—[illegible] [illegible] অফিসে ভালো চাকরি করছে।

—[illegible] সঙ্গে দেখা -টেখা হয়?

—কদাচিৎ কখনো। আপাতত তার হাসব্যাণ্ডের সঙ্গেই বেশি খাতির।

আবু টান হয়ে বসল।—আপাতত?

বাপীর মগজে সূক্ষ্ম কিছু বুনুনির কাজ চলেছে। আবু রব্বানীর হঠাৎ এভাবে চলে আসাটাও সামনে পা ফেলে এগোনর মতো লাগছে। নিরীহ মুখে মাথা নেড়ে সায় দিল।

আবুরও ধৈর্য বাড়ছে। জিগ্যেস করল, এদের বিয়ে হয়েছে ক'দ্দিন?

—বছর আড়াই প্রায়।

কৌতূহলে একটা চোখ আগের মতোই ছোট হয়ে এলো।—বাচ্চা-কাচ্চা?

এই সাদা সাপটা প্রশ্নের তাৎপর্য বে-আবরু গোছের ঠেকল বাপীর কানে। মাথা নাড়ল। নেই। আবুর জিভ আরো বেসামাল হবার আগে প্রসঙ্গ বাতিল। তোমার খবর কি বলো, হুট করে চলে এলে, দুলারি ছাড়ল?

রসের ঝাঁপি বন্ধ হয়ে গেল আবুও বুঝল। দোস্ত-এর পেট থেকে আপাতত আর কোনো কথা টেনে বার করা যাবে না। জবাব দিল, তোমার কাছে আসছি শুনে পারলে নিজেও ছুটে আসে।...আর, ছাড়া-ছাড়ির কি আছে, যে বোঝা কাঁধে চাপিয়েছ [illegible] [illegible] [illegible] দিন বাইরেই কাটাতে হয়। কিন্তু তুমি কথা রাখলে যা-হোক—

—কি কথা?

—আসার সময় কত রকম বুঝিয়ে এসেছিলে—হাওয়াই জাহাজে এক-দেড় ঘণ্টার পথ, দরকার হলে ফি হপ্তায় একবার করে চলে যাবে—তিন মাসেও একবার তোমার ফুরসৎ হল না?

বাপী বলল, দরকার হলে যেতাম। বেশ তো সামলাচ্ছ।

জবাবে গড়গড় করে আবু অনেক কথা বলে গেল। এবার থেকে দরকার যাতে হয় ফিরে গিয়েই সেই ব্যবস্থা করছে। তিন মাসের মধ্যে একবার আসার নাম নেই দেখে দুলারিও সাত-পাঁচ ভেবেছে। ও জানে কলকাতা হুরী-পরীর দেশ—কেউ গেলে তাকে ভুলিয়ে রাখে। দোস্ত কোনো জ্যান্ত পরীর খপ্পরে পড়েছে কিনা সেই চিন্তাও করেছে। আবার আবুর আসার ব্যাপারেও খুঁত-খুঁত করেছে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ গিয়ে হাজির হলে বাপীভাই নারাজ হবে কিনা চিন্তা। আবু বলেছে, নারাজ হয় হবে, কিন্তু দোস্তকে না দেখে আর সে থাকতে পারছে না।

বাপীর ভালো লাগছে। ঠিক এ-সময় একেই সব থেকে বেশি দরকার ছিল। কিন্তু মনে যা আছে এক্ষুনি ফাঁস করার তাড়া নেই। দিন-কতক ওকে ধরে রাখতে হবে। ওখানকার ব্যবসার খবর শুনল। লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ হলে এখন একটু আফশোস আবুর। সেই কারণে রণজিৎ চালিহার মতো একটু হম্বি-তম্বির চালে চলতে হয়। অসুবিধে খুব হচ্ছে না। কেবল বাপীভাই পাশে না থাকাতে ফাঁকা ফাঁকা লাগে, এই যা। বাপী পাহাড়ের বাংলোর বুড়ো ঝগড়ু, বদশা ড্রাইভার আর কোয়েলার খবরও নিয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়ের বাংলো থেকে ঝগড়ু একদিন নাচতে নাচতে নেমে এসেছিল। সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপার থেকে মেমসায়েবের মেয়ের চিঠি পেয়েছে। সেই চিঠি ওদের দেখাতে এসেছিল। তার ঊর্মি লিখেছে, ওদের কোনো চিন্তা নেই, নতুন মালিক সকলকে দেখবে, সবাইকে ভালো রাখবে। মালিকের পাত্তা নেই দেখে ওরা একটু ভাবনায় পড়েছিল।

—কেন, ওরা টাকা-কড়ি ঠিক মতো পাচ্ছে না?

—তা পাচ্ছে, কিন্তু বিয়ে সাদী করে মালিকের কলকাতাতেই থেকে যাওয়ার মতলব কিনা সে-চিন্তা তো হতেই পারে।

বানারজুলির কথা প্রসঙ্গে আবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, ধামন ওঝার ছেলে সেই হারমাকে মনে আছে তো তোমার?

—থাকবে না কেন, রেশমার হারমা.....

—হারমার রেশমা বলো, বেঁচে থাকতে রেশমা ওকে পাত্তাই দেয়নি।

—হারমার কি হয়েছে?

—মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। তুমি থাকতেই তো দিন-রাত রেশমার ঘর আগলে পড়ে থাকত, কেউ মুখ দেখতে পেত না। এখন আবার দিনে [illegible] রাতেও বাইরে টো-টো করে বেড়ায়। ওর এখন মাথায় ঢুকেছে, চালিহা সাহেবের জন্য রেশমা সাপের ছোবল খেয়ে মরেনি—ও জান দিয়েছে তোমার জন্যে। কেউ বিশ্বাস করে না, দুলারিও ওকে ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওর ওই এক কথা—

বাপী সচকিত একটু।—সে কি? আমার ওপর খুব রাগ নাকি ওর?

—রাগ না...দুঃখ। বলে, তোমাদের উঁচু-মাথা বাপী সাহেব কেবল দিল কাড়তেই জানে, দিলের কদর জানে না।

রাতটা এরপর অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কাটল বাপীর। আধ-ঘুমে মাথার মধ্যে একটা হিজিবিজি ব্যাপার চলতে থাকল। পাহাড়ী জঙ্গল...বুনো হাতি...রেশমা... পাহাড়ের বাংলো...নেশায় বুঁদ ঝগড়ু... রেশমা। বাপী...রেশমা...রণজিৎ চালিহা... টাকা মদ . রেশমা। হারমা...রেশমা...হারমা রেশমা... হারমা।

সকালে উঠে বাপী নিজের ওপরে বিরক্ত। কি দোষ করেছে? কোন দুর্বলতায় প্রশ্রয় দিয়েছে? এত দিন পরেও এ-রকম টান পড়ে কেন? হারমা যা ভাবে ভাবুক। যা বলে বলুক। তাতে ওর মগজে দাগ পড়ে কেন?

সকালটা আবুর সঙ্গে গল্প-গুজবের পর কলকাতার ব্যবসার আলোচনায় কেটে গেল। সব দেখে শুনে আবু দোস্ত-এর তারিফ করল, তুমি যাতে হাত দাও তাই সোনা দেখি বাপীভাই।

প্রশস্তির জবাবে আঙুল তুলে বাপী জিতকে দেখিয়ে দিল। বলল, জিত সঙ্গে থাকলে তার আর মার নেই, ওরও কেরামতি কম নয়। সঙ্গে সঙ্গে ছদ্ম আশংকা। মাইনে বাড়ানোর চাপ দিলো বলে।

আবু অখুশি নয়। জিতকে জোটানোর বাহাদুরি সবটাই তার। চিঠিতে দোস্ত এই লোকের প্রশংসা আগেও করেছে। তার ভাগ্য শিগ্‌গীরই আরো কিছু ফিরবে ধরে নিয়ে ভারিক্কি স্বরে মন্তব্য করল, চাপ দিলে আমি চোখ বুজে স্যাংশন করে দেব। বলে ফেলে সভয়ে বাপীর দিকে তাকালো।—স্যাংশনই তো বলে...নাকি?

জিত হাসছে আর টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছে। গায়ত্রী রাইয়ের কাছে মাস কয়েকের চাকরির কালে এই আবু রব্বানী তাকেও সেলাম ঠুকত। যার অনুগ্রহে লোক-টার আজ এই কপাল, তার দাক্ষিণ্য থেকে সে-ও বঞ্চিত হবে না, তিন মাসে সেই বিশ্বাস আরো বেড়েছে।

আলতো করে বাপী বলল, জিত তোমার অন্য স্যাংশনের আশায় অনেক দিন ধৈর্য ধরে বসে আছে—

মালিকের মনে কি আছে জিত নিজেও ধরতে পারল না। ঠাট্টার ব্যাপার কিছু কিনা না বুঝে আবু উৎসুক। দুজনারই কৌতূহল জিইয়ে রেখে বাপী জিগ্যেস করল, জাটো-বাবুর ক্লাবের সঙ্গে তোমার লাল জলের কারবার কেমন চলছে এখন?

—[illegible] কেমন! [illegible] [illegible] [illegible]

প্রাইভেট প্র্যাকটিসও আগের থেকে বেড়েছে —রইস খদ্দেররা এসে অর্ডার পেশ করে যায়। কেন বলো তো?
জিতকে তুমি কলকাতার বাজার সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলে দিয়েছিল?

আবু মাথা চুলকে সায় দিল। বলল, আমার মনে হয়েছিল ওই জলের কারবার এখানে ভালো চলতে পারে।

—বানারজুলি থেকেও চের ভালো চলতে পারে। জিত খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছে কলকাতার মতো বাজার আর হয় না। আমি গা করছি না বলে ওর মেজাজ খারাপ।

আবু জিতের মুখখানা দেখে নিল। এ ব্যাপারে তার আগ্রহ সত্যি কম মনে হল না। দোস্ত ঠাট্টা করছে না বা বাড়িয়ে বলছে না বুঝি নিয়ে তাকেই জিগ্যেস করল, তুমি তাহলে গা করছ না কেন?

বাপী প্রায় নিরাসক্ত। —এসে গেছ যখন নিজেই বুঝে শুনে নাও। ভালো বুঝলে শুরু করা যাবে।

দোস্তকে কাগজপত্রে মন দিতে দেখে আবু একটু বাদে বসার হলঘরে চলে এলো। দোস্ত দিনকতক থেকে যেতে বলেছে। সে সানন্দে রাজি। তাই ঘরে একটা চিঠি পাঠাতে হবে। দুলারি লিখতে পড়তে জানে না সে-জন্য আবুর এই প্রথম আফশোস একটু। নইলে দোস্ত-এর খবরাখবর দিয়ে বেশ রসিয়ে একখানা চিঠি লেখা যেত। কিন্তু পড়াতে হবে বড় ছেলেটাকে দিয়ে। সে ব্যাটা এখনই লায়েক হয়ে উঠেছে। ছোট সাইকেলে চেপে বানারহাটের স্কুলে যায়। চিঠিতে বেচাল কথা থাকলে ফিরে গিয়ে দুলারির মুখ ঝামটা খেতে হবে।

মনিবের হুকুমে জিত ড্রাইভারসুদ্ধু একটা ভালো প্রাইভেট গাড়ির সন্ধানে বেরুলো। তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা ভাড়া খাটবে। আবুর জন্য দরকার। টাকা যা লাগে লাগবে। মালিককে বাদ দিলে ব্যবসায় আবু রব্বানীর মর্যাদা এখন সকলের ওপরে। সঙ্গে গাড়ি থাকলে এখানকার পার্টির কাছে সেই মর্যাদা বজায় থাকবে। কলকাতার ঠাট আলাদা। পার্টির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করানোর জন্য মালিক নিজে তার জেনারেল ম্যানেজারকে সঙ্গে করে ঘুরে বেড়ায় কি করে। সে কাজটা জিত মালহোত্রা করলে বরং কোম্পানীর চটক বাড়বে। আর, এই কাজের ফাঁকে আবুর ইচ্ছে মতো কলকাতা দেখাও হবে।

মালিকের দরাজ মনের খবর জিত ভালোই রাখে। আজ আরো খুশি কারণ, আবুসাহেবের জন্য গাড়ি ঠিক করতে বলে মনিব তাকেও চটপট ড্রাইভিং শিখে নিতে বলেছে। বানারজুলির মোটরগাড়ি এখন আবু সাহেবের জিম্মায়। ওর ড্রাইভিং শেখা হলে জিপটা কলকাতায় নিয়ে আসবে হয়তো।

বড় হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে পছন্দসই প্রাইভেট গাড়ি জোটানো শক্ত নয়। জিত একেবারে গাড়িতে চেপেই ফিরল। গাড়ি কি জন্যে আর কার জন্যে শুনে আবু হাঁ। বলল, তোমার কাণ্ড দেখে আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি বাপী ভাই।

হাসি চেপে বাপী বলল, তুমি অমু লোক নাকি, ঘাবড়াবার কি আছে।

বিকেলে ওদের ফেরার অপেক্ষায় বসে ছিল। তাসলে ভাবছিল কিছু। মগজে একটা ছক তৈরি হচ্ছিল। আর থেকে থেকে কুমকুমের মুখ সামনে এগিয়ে আসছিল। রেশমার মতো করে না হোক, অবস্থা-বিপাকে এই কুমকুমও সর্বনাশের দড়ির ওপর কম হেসে খেলে নেচে বেড়ায়নি।

কলিং বেল বাজতে বলাই দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল। আবু বা জিত নয়। মণিদা। তার কথা বাপীর এর মধ্যে আর মনে পড়েনি। মণিদার শুকনো ক্লান্ত মুখ। দায়ে ঠেকে আসার অস্বস্তিও অস্পষ্ট নয়।

—বোসো মণিদা। বাচ্চু এলো না?

—আমি ইয়ে...বাড়ি থেকে আসছি না, পরে একদিন আসবখন।

গদী আঁটা সোফায় বসে ফ্ল্যাটের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। এই মানুষকে দেখে বাপীর আজ আর রাগ হচ্ছে না। বরং মায়া হচ্ছে। এই একটি মাত্র মানুষের সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক। অসময়ে দু'হাত বাড়িয়ে আশ্রয় দিয়েছিল। শুধু খেতে ভালোবাসতো, নইলে বরাবর সাদাসিধে চালচলনের মানুষ ছিল। স্ত্রীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ফলে আজ এই হাল।

বলাইকে হুকুম করে আগে তার ভালো জল খাবারের ব্যবস্থা করল। তারপর সোজা কাজের কথা।—বাচ্চুর অ্যানুয়াল পরীক্ষা কবে।

—দু আড়াই মাসের মধ্যেই বোধহয়...'

বাপী ভাবল একটু। তারপর বলল, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই সপ্তাহের মধ্যেই আমি ওর জন্যে একজন ভালো মাস্টার ঠিক করে পাঠাচ্ছি।...কিন্তু আমার মতে তারপর ছেলেটাকে এখানে আর রাখা ঠিক হবে না, অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। ওর মা... বিশেষ করে সন্তু চৌধুরীর কাছ থেকে ওকে তফাতে সরানো দরকার।

মণিদার অসহায় পাংশু মুখ।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, বাইরের খুব ভালো কোন ইনস্টিটিউশনে রেখে ওকে পড়ানো যায়? খরচ যা-ই লাগুক তোমাকে ভাবতে হবে না—ওর গার্জেন হিসেবে আমার নাম থাকবে।

মণিদার চোখে মুখে সংকটের দরিয়া পার হবার আশা। নরেন্দ্রপুর আর দেওঘরের বিদ্যাপীঠের কথা বলল। সামর্থ্য থাকলে ছেলেকে নিজেই ওরকম কোনো জায়গায় পাঠাতো। ছেলেটার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে নিজেই স্বীকার করল। মানুষটার যন্ত্রণাও চাপা থাকল না আর। —তুই যদি ছেলেটার ভার নিস আমি আর ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখব না। এত ঠকেছি...আর সহ্য হচ্ছে না।

বাপীর জিজ্ঞাসা করার লোভ গৌরী বউদির যে নালিশ শুনে ওকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলা হয়েছিল সেটা এখন আর মণিদা বিশ্বাস করে কি না। লোভ সামলালো। বলল, এই দুটো মাস কাউকে আর কিছু বলার দরকার নেই—যা করার তুমি চুপচাপ করে যাও।

উঠে ভিতরের দিকে গিয়ে দু-তিন মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো। দশখানা একশ টাকার নোট মণিদার পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, এই হাজারটা টাকা তোমার কাছে রাখো এখন। তোমাকে কিন্তু কিন্তু করতে হবে না, এও বাচ্চুর জন্য। মুখোমুখি বসল আবার। —এবারে তোমার কাজের কথা বলো, কাজ করবে তো?

দু'চোখ ছলছল মণিদার। ভিতর থেকে আরো কিছু যন্ত্রণা ঠেলে বেরুলো। বলল, কাস্টমসের পাকা চাকরি গেছে...কেউ আর বিশ্বাস করতে চায় না।

যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষটার ভেতর দেখতে পাচ্ছে বাপী। তবু এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথাই বলল। —কোম্পানীর লোক দরকার, তুমি কোম্পানীর কাজ করবে, সেখানে বাপী বলে কেউ নেই এটুকু মনে রাখলেই আমার দিক থেকে আর কোনো অসুবিধে হবে না।

জিতের সঙ্গে আবু ঘরে ঢুকল। বাপী ওদের সঙ্গে মণিদার পরিচয় করিয়ে দিল। তার কোম্পানীতে যোগ দেবার কথাও জানালো। মণিদাকে বলল, যতদিন না এদিকে সুবিধে মতো অফিস ঘর মেলে তাকে রোজ উল্টোডাঙ্গার গোডাউনে হাজিরা দিতে হবে। জিত চেষ্টা করছে, অফিস-ঘর পেতে দেরি হবে না। কাজ আপাতত মাল চালানের খাতাপত্র ঠিক রাখা, আর পার্টির কাছে চিঠি লেখা বা তাদের চিঠির জবাব দেওয়া। জিতই সব দেখিয়ে শুনিয়ে আর বুঝিয়ে দেবে। বানারজুলি থেকে আবু রব্বানী তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠাবে।

একটু বাদে মণিদা আর জিত চলে গেল। বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আবু বলল, আমাকে বাঁশ দিয়ে ঠেলে আর কত ওপরে তুলবে—একটু আগে তোমার হোমরাচোমরা পার্টিদের খাতিরের চোটে হাঁপ ধরে গেছল, এসেই আবার এই—

বাপী হাসছে। —দেখাশুনা হল সব?

—এখনো সব নয় শুনছি জিত জানিয়ে রেখেছে কাল রবিবার, পরশু আরো আর ছোট পার্টির সঙ্গে মোলাকাত হবে।

—জলের ব্যবসার খোঁজ নিয়েছ?

—নিশ্চয়। জিত ঠিকই বলেছে টুইংকিল টুইংকিল স্টার—ঘাবড়ে কেও না, বাইরে বেরিয়ে একটাও ইংরেজি বলিনি।

চায়ের পর্বের পরেও দোস্ত গা ছেড়ে বসে আছে দেখে আবু উসখুস করতে লাগল। শেষে বলেই ফেলল, ইয়ে—কোথাও বেরুবে-টেরুবে না?

—কোথায়?

আবুর মুখে দুষ্টু হাসি। —কোথায়

আমি তার কি জানি। ভাবলাম আমার জন্য তুমি অপেক্ষা করছ—এলেই বেরুবে।

ওর ইচ্ছে বাপী খুব ভালো করেই বুঝেছে। অসিত চাটার্জির আপ্যায়নে সাড়া দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। ওর চোখে সেই দশ বছরের মেয়েই লেগে আছে। এখন চোদ্দটা বছর জুড়েবার আগিদ।

বাপী উঠল। বলল, চলো—

ভাদ্র শেষের ছোট বেলা। আলো ঝলমল রাস্তা। দোস্ত এখন ভারী চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে দেখেও আবু মজা পাচ্ছে। জামাই সাহেবের সামনে টোপ ফেলার ব্যাপারটা মনের তলায় ঘুর পাক খাচ্ছে। দোস্তের মতলব এখনো আঁচ করতে পারেনি।

সামনে চোখ রেখে বাপী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, বানারহাট স্কুলের মাস্টারমশাইদের মনে আছে তোমার?

হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন আবু ভেবে পেল না। —যারা মারধর করত তাদের মনে আছে। কেন বলো তো?

—আমাদের ড্রইং করাতো ললিত ভড়—তাকে মনে আছে?

—পেটুক ভড়! তাকে খুব মনে আছে। ব্ল্যাক বোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে এঁকে কত রকমের খানা খাইয়েছে!

—এখানেও ফুটপাথে খড়ি দিয়ে এঁকে রাস্তার মানুষকে অনেক খানা খাইয়েছে—সকলে পাগল ভাবত।

—আ-হা...তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে বুঝি?

—হয়েছিল। খেতে না পেয়ে আধমরা হয়ে গেছল। শেষের দু'মাস একটু শান্তি পেয়ে গেছে। কিছুদিন আগে মারা গেল...

আবু চুপ খানিকক্ষণ। তারপর বলে উঠল, যাচ্ছি এক জায়গায় আনন্দ করতে, দিলে মনটা খারাপ করে—

বাপী শুধু হাসল একটু।

দোর গোড়ায় তার গাড়ি থামার আগেই কুমকুম ভিতর থেকে দেখেছে। তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এলো। সঙ্গে অচেনা লোক দেখে থমকালো একটু।

বাপী হাসি মুখে কিছু বলল, কটা দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। ভালো আছ তো?

কুমকুম মাথা নাড়ল। বাপীদার সঙ্গে এসেছে তাই দু'হাত জুড়ে অচেনা সঙ্গের লোকটাকে নমস্কার জানিয়ে তাদের ভিতরের ঘরে বসালো। আবু হঠাৎ ঘাবড়ে গেছে কেমন। সামনে যাকে দেখছে সে বেশ সুশ্রী বটে, কিন্তু জঙ্গলের বড় সাহেবের বাংলোর দশ বছরের যে ফুটফুটে মেয়েটাকে মনে হয়েছে পরের চোদ্দ বছরে তার চেহারা এই দাঁড়াতে পারে কল্পনায় আসে না।

নিরীহ মুখে দোস্ত তার দিকে তাকাতে আরো খটকা লাগল। জিগ্যেস করল বাহিনজি তো...?

—তুমি কোন বাহিনজির কথা ভাবছ! একটু আগে যে মাস্টারমশায়ের কথা বললাম তার মেয়ে কুমকুম।

আবু হতচকিত কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু বোকা নয়, চট করে সামলে নিল। দরাজ হেসে বলল, উনিও বাহিনজিই তো হলেন তাহলে। কুমুর দিকে ফিরল মাস্টারজির হাতে আমিও বছর কতক ঠেঙানি খেয়েছি।

কুমু হাসি মুখেই নরম প্রতিবাদ করল বাবা ভয় দেখাতেন· মারতেন না কাউকে।

বাপী সাদা মুখে কাজের কথায় চলে এলো। আবুর পরিচয় দিল। বলল, ওই সর্বেসর্বা এখন, তোমার যা কিছু বোঝা-পড়া সব এরপর ওর সঙ্গে আর জিতের সঙ্গে—আমাকে আর বিশেষ পাচ্ছ না।... আমাকে যতটা বিশ্বাস করো একেও ততটাই বিশ্বাস করতে পারো।

কুমুর মুখে কথা নেই। চুপচাপ চেয়ে রইল।

দোস্তের মাথায় কি যে আছে আবু ভেবে পাচ্ছে না। তাই আগ বাড়িয়ে সেও কিছু বলছে না।

বাপী জিজ্ঞাসা করল টাকা কেমন আছে?

—আছে...।

পার্স থেকে একগোছা টাকা বার করে তার দিকে বাড়িয়ে দিল। —এই পাঁচশ টাকা রাখো তোমার কাছে।

কুমকুম ইতস্তত করতে আবার বলল, আবুর সামনে লজ্জা করার কিছু নেই, ও আমার থেকে কড়া মুরুব্বি, এখন থেকে যা পাবে সব তোমার পাওনা থেকে কড়া-ক্রান্তি কেটে নেবে। ধরো।

কুমকুম হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। সম্মান বাঁচিয়ে সাহায্য করা হল আবু এটুকুই ধরে নিল।

দশ মিনিটের মধ্যে আবার গাড়িতে পাশাপাশি দুজনে। আবু বলল, অ্যাস মানে গাধা আবার ডংকি মানেও গাধা—আমি কোনটা?

বাপী হাসছে। —কি হল?

প্রথমদিন তুমি আমার ঘরে রেশমার শদকে দুলারিকে দেখে হাঁ হয়ে গেছলে—তার বদলা নিলে মনে হচ্ছে।...তোমার সব ইনটারেস্ট এখন তাহলে এই বাহিনজি?

—সব না, কিছুটা

আবুর খুশি ধরে না। —এও দেখতে শুনতে তো ভালোই। ঠাণ্ডা মেয়ে হলেও বেশ বুদ্ধি ধরে মনে হল—ঠিক না?

—ঠিক। কিন্তু তুমি তো চিনতেই পারলে না।

—আমি আগে দেখলাম কোথায় যে চিনব!

—দেখছ। ভেবে দেখো...।

আবু বিমূঢ় খানিক। এরকম ভুল তার হবার কথা নয়। —কোথায় দেখেছি?

—বানারজুলিতে। আমি তখন ডাটাবাবুর ক্লাবের সেই কোণের ঘরে থাকতাম! চা-বাগানের এক অফিসারের বখু মেয়েছেলে নিয়ে এসেছিল বলে আমাকে কোণের ঘরটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল—সে জন্যে তুমি ডাটাবাবুর ওপর খেপে গেছলে, আর সেই মোটা কালো লোকটাকে দেখে বলেছিলে, এই চেহারা নিয়ে বউয়ের সঙ্গে রঙ্গরস করার জন্যে কোণের ঘর চাই—মনে পড়ছে?

মনে পড়ছে বটে। কিন্তু তার ফলে আবু চারগুণ অবাক। —এই বাহিনজি সে নাকি! সেই লোকটার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?

সামনে চোখ রেখে বাপী নির্লিপ্ত মুখে গাড়ি চালাচ্ছে। জবাব দিল, শুধু সেই লোক কেন, তারপর আরো কত লোকের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

আবু আধাআধি ঘুরে বসেছে দোস্তের দিকে। জল-ভাত কথাগুলোও ঠিক-ঠিক মাথায় ঢুকছে না। এখানে একে কোথায় পেলে?

—রাতের রাস্তায়। কারো জন্যে অপেক্ষা করছিল।

এও হেঁয়ালির মতো লাগল। —রাতের রাস্তায়.. কার জন্যে অপেক্ষা করছিল?

—পকেটে পয়সা আছে এমন যে কোনো রসিক পুরুষের জন্য। হাতে কিছু পেলে তবে বস্তি ঘরের রুগ্ন বাপের জন্য খাবার আসবে।

আবুর মুখে কথা নেই আর। স্তম্ভিতের মতো বসে রইল। তার দিকে না তাকিয়ে বাপী মোলায়েম করে বলল, তুমি যে ইন্টারেস্টের কথা ভাবছিলে ঠিক সে ইন্টারেস্ট যে নয় আমার এখন বুঝতে পারছ?

ধাক্কাখানা এমনি যে আবু তার পরেও নির্বাক। একটু বাদে একই সুরে বাপী আবার মন্তব্য করল, তবু মেয়েটাকে আমি খারাপ ভাবি না।

রবিবারের বিকেল পর্যন্ত বাপীর ফ্ল্যাট ছেড়ে নড়ার নাম নেই। আড্ডা দিয়ে আর গড়িমসি করে কাটিয়ে দিল। অথচ সকাল থেকেই আবু আশা করছে এই ছুটির দিনে দোস্ত ওকে প্রত্যাশার জায়গাটিতে নিয়ে যাবে। শেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলল বেরুবে বেরুবে নাকি সমস্ত দিনটা ঘরেই কাটিয়ে দেবে?

বাপী সাদামাটা মুখ করে চেয়ে রইল একটু। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বলল, চলো—

কিন্তু এবারও আবুর অপ্রস্তুত হবার কপাল। অভ্যর্থনায় যারা এগিয়ে এলো তাদের একজন সুদীপ নন্দী আর একজন মনোরমা নন্দী। আবু দেখেই চিনেছে। তারা চিনতে পারল না। খাতিরের ছেলের সঙ্গে এসেছে তাই খাতির করেই বসালো। তার আগে আবুর আদাবের ঘটা দেখে মা-ছেলে দুজনেই অবাক একটু।

হাসি মুখে বাপী বলল, মাসিমার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, দীপুদা তুমিও ওকে চিনতে পারলে না?

সন্দীপ বলল, চেনা-চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক...

—বানারজুলির জঙ্গলের সেই অপদেবতা আবু রব্বানী। পাথর ছুঁড়ে কত বুনো মুরগি আর খরগোশ মেরে খাইয়েছে মনে নেই?

বলা মাত্র ছেলে ছেড়ে মায়েরও মনে পড়েছে। মনোরমা দেবী বলে উঠলেন, ওকে তো জঙ্গলের বীটম্যান করা হয়েছিল...।

বাপীর সরব হাসি। —সেই লোক আর নেই মাসিমা। আবু এখন আমাদের কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার, দুগ্গন্ডা বি-এ, এম-এ পাশ ওর আন্ডারে চাকরি করছে—নিজের বাড়ি নিজের গাড়ি।

লজ্জা পেয়ে আবু বলল, ছাড়ো তো, মাসিমা আর দীপুদার কাছে আমিও তোমার মতো একটা ঘরের ছেলে—

বাপীর মজা লাগছে। মওকা বুঝে সেয়ানা আবুও নিজেকে ঘরের ছেলে করে ফেলল। বানারজুলির সেই দাপটের কালে মহিলাকে মেমসায়েব আর দীপুদাকে ছোট সাহেব না বললে গর্দান যাবার ভয় ছিল।

বাইরে অন্তত মা ছেলে দুজনেরই হাসিমুখ আর খুশি মুখ। কিন্তু আসলে হয়তো ভেবে পাচ্ছে না, একটা বুনো জংলি ছেলেরও ভাগ্য এমন ছপ্পর ফুঁড়ে কেনে কি করে। টাকার ঘরে রূপের বাসা। সেই জংলি ছেলেরও রূপ ফিরে গেছে বটে।

আদর আপ্যায়নেও কার্পণ্য নেই। বাপী মোটে আসে না বলে মনোরমা দেবী বার কয়েক অনুযোগ করলেন। শিগগীরই আবার আসবে কথা দিয়ে ঘন্টাখানেক বাদে আবুকে নিয়ে বাপী উঠল। ছেলের পিছনে মাও নিচের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। এক ধাপ নেমে বাপী ঘুরে দাঁড়াল। —মিষ্টির খবর কি মাসিমা, অনেক দিন দেখি না..

মহিলার অপ্রসন্ন মুখ। গলা খাটো করে জবাব দিলেন, কে জানে মাথায় কি ঢুকেছে এখানেও বেশি আসে-টাসে না।

গাড়ি তাঁদের চোখের আড়াল হতে আবু ঝাঁঝালো চোখে দোস্তের দিকে ফিরল। বাপী বলল, আর পাঁচ-সাত মিনিট মুখ বুজে অপেক্ষা করো নিয়ে যাচ্ছি—

আবু ধৈর্য ধরে বসে রইল বটে, কিন্তু তার ভিতরে অনেক প্রশ্ন কিলবিল করছে এখন। বড় রাস্তা ছেড়ে কয়েকটা ছোট রাস্তা ঘুরে গাড়িটা মিনিট সাতেকের মধ্যেই থামল এক জায়গায়। আঙুল তুলে বাপী বলল, ঠিক চারটে বাড়ির পরে ওই বাড়িটা —নেমে যাও।

আবু আকাশ থেকে পড়ল। —আর তুমি?

—আমি না। একটা টার্ন্ নিয়ে ফিরে এসো তাহলে আর রাস্তা ভুল হবে না।

—তাহলে আমারও গিয়ে কাজ নেই। ফেরো।

বাপী গম্ভীর। —দেখো তোমাকে আমি বোকা ভাবি না। তোমার একা যাওয়া দরকার, একাই যাবে। নামো।

আবছা অন্ধকারে দোস্তের মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না। দরজা খুলে আবু নামল। সামনের বাঁক ঘুরে বাপী তখুনি গাড়িসুদ্ধু চোখের আড়ালে।

বড় রাস্তায় পড়ে নিজের মনেই হাসছে।

রাত নটার পরে আবু ফিরল। গোল গোল দু'চোখ বাপীর মুখের ওপর তুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

হাসি চেপে বাপী জিগ্যেস করল হল?

আবু মাথা নাড়ল। মুখেও জবাব দিল, হল।

কিন্তু রাতের খাওয়া সারা হবার আগে দোস্তের আর কোনো কিছুতে উৎসাহ দেখা গেল না। আবু সঙ্গ দেবার জন্য বসল শুধু। পর পর দু জায়গায় খাওয়া হয়েছে, খিদে নেই। সে দোস্তের খাওয়া দেখছে অর্থাৎ ভালো করে মুখখানা দেখছে।

খাওয়ার পর রাতের আড্ডা বাপীর শোবার ঘরে বসেই হয়। আবুর গুরু-গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে এবারে বাপী হেসে ফেলল। —কেমন দেখলে?

—এত ভালো ভাবিনি, তোমার জন্যে বুকের ভেতর টনটন করেছিল।

বাপী হাসছে। —আর অসিত চ্যাটার্জির জন্যে?

—খুব আদর যত্ন করেছে, তবু তাকে ধরে আছাড় মারতে ইচ্ছে করেছিল।

আলতো করে বাপী মন্তব্য করল সে সুযোগ পাবেখন।

আবু রব্বানী নড়ে চড়ে বসল। বাপী জিগ্যেস করল মিষ্টি তোমাকে দেখে খুশি হল?

—খুব।

—কি বলল?

—বানারজুলির পুরনো কথা, বনমায়ার কথা—আমার সে সময়ের সাহসের কথা শোনালো জামাই সাহেবকে পরিবার আর ছেলেপুলের কথা জিজ্ঞেস করল, এখানে মেমসায়েবের মেয়ে উর্মিলা আর তার বরের সঙ্গে আলাপের খবরও বলল—কেবল তোমাকে মোটে চেনেই না বোঝা গেল।

বাপী হেসে ফেলল। —বোঝা গেল?

—খুব। এই জন্যেই তো তোমাকে নিয়ে মিষ্টি বহিনজির ভিতরেও কিছু গড়বড় ব্যাপার আছে টের পেলাম।

বাপীর বাইরে নিরীহ মুখ। ভিতরে হাসছে। উর্মিলাও এই গোছের কিছু বলে গেছল। ওই মিষ্টিকে দেখে সব চুকে-বুকে গেছে বলে তারও মনে হয়নি। বাপী প্রস্তুত হচ্ছে। রণে বা প্রণয়ে নীতির বালাই থাকতে নেই।

আবুর একটা চোখ এবারে ছোট একটু। জেরায় জেরবার করার ইচ্ছে। —মিষ্টি বহিনজির মেমসায়েব মা এখন তাহলে তোমার মাসিমা?

হাবা মুখ করে বাপী মাথা নেড়ে সায় দিল।

—ওই মা আর ছেলের কাছে তোমার এখন খুব খাতির কদর?

আবারও মাথা নাড়ল। খুব।

—আসার সময় মেমসায়েব মেয়ের সম্পর্কে অমন কথা বলল কেন—তেমন বনছে না?

—জামাইয়ের সঙ্গে বনছে না।

এটা শোবার ঘর ভুলে আবু বিড়ি ধরালো একটা।— বনছে না কেন?

—জামাই মদ খায়, রেস খেলে, জুয়ার নেশায় বউয়ের টাকা চুরি করে, ঝগড়া করে।

—সত্যি?

বাপী মাথা নাড়ল। সত্যি।

—মেমসায়েবের তাহলে কি ইচ্ছে?

বাপী নির্লিপ্ত জবাব দিল, তার আর তার ছেলের ধারণা কাগজ-কলমের বিয়ে, ছিঁড়ে ফেললেই ফুরিয়ে যায়—অমন লোকের সঙ্গে ঘর করার কোনো মানে হয় না।

আবু লাফিয়ে উঠল।—বিসমিল্লা! তুমি তাহলে গুলি মেরে দিচ্ছ না কেন?

ঠেস দেবার মতো করে বাপী ফিরে বলল, দুলারির বেলায় তুমি অন্ধ ছুট্টু মিঞাকে গুলি মেরে দিতে পেরেছিলে?

আবু লজ্জা পেল।—লোকটা মরার জন্য ধুঁকছিল তাই মায়া পড়ে গেছল। তোমারও কি এই মরদের ওপর মায়া পড়েছে?

—আমার না। তোমার বহিনজির পড়েছে। তার বিশ্বাস, জামাই সাহেব যতোই নেশা করুক জুয়া খেলুক টাকা সরাক বা ঝগড়া করুক—লোকটার ভালবাসায় কোনো ভেজাল নেই—তোমার জামাই সাহেবের এটাই নাকি আসল পুঁজি—এই পুঁজির জোর মিথ্যে হলে কাউকে কিছু বলতে হত না, তোমার বহিনজি নিজেই তাকে ছেঁটে দিত।

ব্যাপারখানা তবু মাথায় ভালো ঢুকছে না আবুর। জিজ্ঞাসা করল, তাহলে?

—তাহলে ওই লোকের ভালবাসার সবটাই যে ভেজাল আর তোমার বহিনজির বিশ্বাস সবটাই যে ভুল এটুকু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারলেই ফুরিয়ে যায়।

—কি করে? আবু স্পষ্ট করে ধরতে ছুঁতে পারছে না বলে দ্বিগুণ উন্মুখ।

সোনা মুখ করে বাপী জবাব দিল. সেটা খুব আর কঠিন কি।...তুমি জিতকে একটু তালিম দিয়ে যাও বেচারা অসিত চ্যাটার্জীকে বেশ ভালো করে খাতির-যত্ন করে, রেসের নেশায় বউয়ের আলমারি থেকে টাকা সরাতে হবে এ কি কথা! আর ভদ্রলোক রংদার মানুষ, ভালো জিনিস খুব পছন্দ—মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে কুমকুমকে নিয়ে বোতলের ব্যবসা তো তোমরা শুরুই করে দিচ্ছ—ও জিনিসেরও অভাব হবার কথা নয়...

আবু লাফিয়ে উঠল।—কুমকুমকে নিয়ে বোতলের ব্যবসা!

—সেদিন গিয়ে বলে এলাম কি? অমন বিশ্বস্ত আর ভালো মেয়ে কোথায় পাবে। ...তাছাড়া মেয়েটার অভিজ্ঞতারও শেষ নেই।

নিরীহ মুখের দুই ঠোঁটে হাসিটুকু আরো স্পষ্ট হয়ে ঝুলছে। আবুর গোল-গোল চোখ তার মুখের ওপর চড়াও হয়েই আছে। আর দুর্বোধ্য কিছু নেই। অস্পষ্ট কিছু নেই।

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাছে এসে আধখানা ঝুঁকে সেলাম ঠুকল একটা। বলল, ঠিক আছে, এর পরের সব ভার তুমি এই বান্দার ওপর ছেড়ে দিতে পারো।

পরের দুটো দিন আবু জিতকে নিয়ে ব্যস্ত। তার পরের দিন বানারজুলি ফেরার তাড়া। বাপীকে বলল, জিত সাহেব আর কুমকুম বহিনকে তিন-চার দিনের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। আমি তো খুব ঘনঘন আসতে পারব না, ওদেরও দরকার মতো একটু ছোটাছুটি করতে হবে। নিয়ে যাই, একটু দেখে-শুনে বুঝে আসুক। কুমকুম বহিন তোমার বাংলোয় কোয়েলার কাছে থাকবে'-খন, আর জিত সাহেবের তো বউ ছেলে সেখানেই।...তোমার অসুবিধে হবে?

পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে। বাপী মাথা নাড়ল। অসুবিধে হবে না।

নিরাসক্ত মুখ আবুরও।—তুমি ঠিকই বলেছিলে বাপীভাই, কুমু বহিন ভারী ভালো মেয়ে। নতুন করে এখন কি ব্যবসায় নামছি শুনেও একটুও ঘাবড়ালো না। বলল, বাপীদার ব্যবস্থার ওপর আর কোন কথা নেই।...ওর বাবা নাকি চোখ বোজার খানিক আগেও বলে গেছে আমাদের স্বর্গ-নরক বলে কিছু নেই.. দরকার হলে ওই বাপীর জন্য যদি প্রাণ দিতে পারিস তাহলে সব স্বর্গ।

আবু হাসছে অল্প অল্প। বাপী নির্লিপ্ত। ভেতরটা খরখরে হয়ে উঠছে। কিন্তু বাপী তা হতে দেবে না। পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে। (চলবে)

আচার্য অমরেশ্বর ঠাকুর

তারাপদ ভট্টাচার্য

সংস্কৃতভাষা এবং সাহিত্য জগতের ইন্দ্রপতন ঘটল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের যিনি অনন্যপুরুষ ছিলেন, সেই ডক্টর অমরেশ্বর ঠাকুর সম্প্রতি মারা গেছেন।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে আর , পাঁচটি নব-জাতকের মতই তাঁর জন্ম। বলতে খুব ভালবাসতেন—চৈতন্যদেবের মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুরের আমি দ্বাদশ বংশধর।

পড়াশুনার পোড়াপত্তন পাঠশালায়, তারপর স্কুলে। এন্ট্রান্স-এর পর কলেজ। ১৯১১ খৃস্টাব্দে এম এ পাশ করলেন সংস্কৃত নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সংগে সংগে শুরু হল রিপণ কলেজে অধ্যাপনা। জ্ঞানের পিপাসা মেটে না।

জ্ঞান যত বাড়ে অজানা চক্রবাল রেখা যেন ততই দূরে সরে যায়। অমরেশ্বর অধ্যাপনা করতে করতেই আরও তিনবার এম-এ পাশ করলেন পালি, বেদান্তদর্শন এবং সংস্কৃতেরই আর একটি বিভাগে। দুবার সোনার মেডেল পেলেন। তারপর ডাক এল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেখানে অভিষিক্ত ডিন অফ দি ফ্যাকালটি অফ আর্টস পদে। আবার ফেরার পালা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যিনি রত্নখচিত করতে চেয়েছিলেন সেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে এলেন বিদ্যার ঐ মহাপীঠে। আরম্ভ হল পঁয়ত্রিশ বছরের সুদীর্ঘ আচার্য জীবন যার সমাপ্তি ঘটল বিভাগীয় প্রধানরূপে অবসর গ্রহণে। এরই মধ্যে চলেছে নানা গবেষণা। লাভ করলেন। যোগেশচন্দ্র ঘোষ রিসার্চ প্রাইজ, গিরিশচন্দ্র মেমোরিয়াল [illegible] এভিডেন্স-এর উপরে গবেষণা করে লাভ করলেন পি এইচ ডি ডিগ্রী।

কর্মের রথচক্র আবর্তিত হতে লাগল অক্লান্ত গতিতে। মিলেমিশে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠা করলেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদনা করলেন সিদ্ধহস্তে। বঙ্গশ্রীর সম্পাদক হলেন, তারকেশ্বর থেকে প্রকাশিত পুণ্যভূমি পত্রিকার সম্পাদক হয়ে হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতি নিয়ে সম্পাদকীয় লিখলেন অজস্র।

আর গ্রন্থ সম্পাদনা? এক বাল্মীকির রামায়ণই ৩ খাট খণ্ডে প্রকাশিত হল। তারপর ক্যালকাটা স্যানাসক্রিট সিরিজের চল্লিশটি দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিলেন নানা দুর্লভ টীকা, টিপ্পনী এবং বঙ্গানুবাদ আর বিশ্লেষণে পূর্ণ করে। মম্মটভট্টের কাব্য প্রকাশের সুদীর্ঘ ইংরেজী ভূমিকাটি এই জ্ঞানতপস্বীর সারস্বত সাধনার এক উজ্জ্বল কীর্তি। তারপর ধরলেন যাস্কাচার্যের নিরুক্ত নিয়ে বেদের অর্থবোধে পদে পদে যার [illegible]জন। দীর্ঘ পনের বছরের অবিশ্রান্ত [illegible]র ফসল হিসেবে চার খণ্ডে কলকা[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ গ্রন্থমালা প্রকাশিত হল তাঁর সম্পাদিত নিরুক্ত [illegible]। প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর রয়েছে অতন্দ্র মনন-শীলতার। তাঁর অনেক প্রবন্ধ দেখেছি ইংরেজিতে লেখা, নানান পত্রিকায়। একটির কথা খুব মনে পড়ছে, জৈনদর্শন সম্বন্ধে লেখা। জৈনদর্শনের সেই লেখাটি বিরাট রচনা। কোথায় আছে কোন গৃহে জানি না। লেখার তাগিদ অনুভব করতেন, হয়ে গেলে মনে রাখতেন কদাচিৎ। [illegible]

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় সুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কালীঘাটে তাঁর ২৯ সদানন্দ রোডের বাড়িটি আশ্রিতে পূর্ণ হল। ১৯৪৭-এ দেশবিভাগ। পূর্ব-বঙ্গ থেকে এলেন অসংখ্য পণ্ডিত। গৃহ-হারা নিরাশ্রয়। আপন গৃহে রেখে ঠাঁই করে দিলেন ক্রমে ক্রমে যাঁকে যেখানে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

শুধু বিদ্বান নয়, কর্মিষ্ঠ পুরুষ ডক্টর অমরেশ্বর। ভারতবর্ষের প্রায় তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এবং গবেষণার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কত ছাত্র গড়লেন, যাঁরা ছড়িয়ে আছেন আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এবং কলেজে। কত বিদ্যামন্দিরের পরিচালন সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন তা আজ বলা দুষ্কর। কালীঘাট টেম্পল কমিটির সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় সারস্বত সম্মেলনের সম্পাদক পদে অকুণ্ঠ পরিশ্রম করেছেন। পরিশ্রমই যেন জীবনের অবলম্বন ছিল তাই উননব্বই বছর বয়সে সুরু করলেন কঠিন কর্ম, ঋগবেদের ভাষাতত্ত্বের সম্বন্ধে লেখা ঋকপ্রাতিশাখ্যের সম্পাদনা। তাও চার খণ্ডে শেষ হল। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল কিন্তু অবশিষ্ট তিন খণ্ডের প্রকাশ দেখবার পরোয়ানা মিলল না।

অমরেশ্বর ঠাকুর বিশ্বের ঠাকুরের কাছে দু বছরের আয়ু চেয়েছিলেন। পেলেন না। পিতা যাঁকি পুত্রের জীবনে ক্লান্তির ছায়া দেখেছিলেন। বিরানব্বই বছরের শিশু না মানুন, সর্ব পিতার আগার আঁখি ও [illegible]

গোপাল দফাদার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও মহারাণী স্বর্ণময়ী দিং

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

নবাবী আমল খতম। বাদশাহীও চলে গেছে ইংরেজের হাতে। বণিক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশটার আসল মালিক এবং অভিভাবকও। সোনার বাংলার রাজস্ব আদায় করবার এজেন্ট হয়েছে কয়েকজন জমিদার, তাদের হাতেই বিরাট জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ইংরেজ কোম্পানির গুটিকয়েক বিশ্বাসভাজন পরিবারের মধ্যে কাশিমবাজারের কৃষ্ণকান্ত নিঃসন্দেহে অগ্রণী। তিনি যখন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর দেওয়ান তখনই কাশীরাজ চৈৎসিংহের সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে যে গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তা মীমাংসার ভার নিয়ে বারাণসী যাত্রা করেন। জট বেশ জমকালো ভাবেই পাকিয়ে বসেছিল। কৃষ্ণকান্ত তথা কান্তবাবু নিয়মিতভাবেই চৈৎসিং এর উকীল মীর্জা আবদুল্লা বেগের সঙ্গে মীমাংসার সূত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছেন, কিন্তু কোনো রফার রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে না। বেগতিক দেখে অবশেষে খোদ হেস্টিংস সাহেব ১৭৮১ সালের ১২ই আগস্ট গেড়ে বসলেন চুনার দুর্গে। এদিকে রাজা বলছেন রাজস্ব তিনি চুকিয়ে দেবেন কিন্তু তার আগে তাঁর কিছু শর্ত মেনে নিতে হবে। এই টালবাহানায় দেরি করিয়ে রাজা যে তলে তলে সৈন্য সংগ্রহ করছেন এইরকম একটা ধারণা গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের হয়েছিল বলেই তিনি চটপট হাজির হয়েছিলেন। বিলম্বে বিদেশী-শক্তির বিপদ আশঙ্কা করে ১৫ই আগস্ট অর্থাৎ চুনার দুর্গে পৌঁছবার পর দিনই রাজাকে বন্দী করার হুকুম জারি করেন এবং বন্দী অবস্থায় চৈৎসিং চিঠি লিখে জানালেন ইংরেজরা মিছামিছি ব্যস্ত হচ্ছেন, কেন না বিদ্রোহ করার কোনো মতলবই তাঁর ছিল না। এই অপ্রীতিকর অবস্থার হাত থেকে তিনি অব্যাহতি চান। এদিকে তিনি হেস্টিংস সাহেবের বিশ্বস্ত কান্তবাবুকেও চিঠি দিলেন, তিনি যেন নিজে এসে মামলা মিটিয়ে ফেলতে সাহায্য করেন। সেই অনুযায়ী গেলেন কান্তবাবু। কিন্তু দেখা গেল পরদিন চৈৎসিং সপরিবারে শিবালয় ঘাটের প্রাসাদ থেকে পলা- [illegible] অপর পার [illegible] হাজারো লোকজন এসে প্রাসাদে পাহারা দিচ্ছিল যে সব সৈন্য তাদের অনেককেই হত্যা করে রাজাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। স্বয়ং হয়েছিল নিহত প্রহরী। কান্তবাবুকেও রেখে যায় নি। ইংরেজদের আরও দুজন প্রতিনিধিকেও তারা নিয়ে গেছে। হেস্টিংসের অনুমান সত্য প্রমাণিত হ'ল। পরন্তু, তার চেয়ে চালাকিতে এক কাঠি ওপর দিয়ে টেক্কা মেরে বেরিয়ে গেছে দিশি মানুষগুলো! হিন্দু দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত, মুসলমান এক মৌলভী এবং ইংরেজ কারবারী সার্জেন্ট এই তিনজনকে তাদের ভেতর মত চৈৎসিং সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

তখন একটি পথই খোলা রইল—যুদ্ধ। ইংরেজরা রামনগর আর পতিতাপুরে রাজার দুটি ঘাঁটি আক্রমণ করল। রামনগরের যুদ্ধে চৈৎসিংহের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। রাজার লোকজন ইংরেজদের দেখিয়ে দেখিয়ে মৌলভীকে হত্যা করল এবং কারবারী সার্জেন্টকে চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত করল।

এইভাবে শিক্ষা দিয়ে প্রকারান্তরে হেস্টিংসকে শাসিয়ে দিল তারা। তবে সাময়িক জয়ের আনন্দ একটু থিতোলে চৈৎসিং বুঝলেন যে, জবাব দেবার মত হিম্মত ইংরেজদের আছে। সে প্রমাণও রাজা পেলেন। হারতে হ'ল তাঁকে। তিনি বিলম্ব না করে পালালেন প্রথমে বিজয়গড় দুর্গে। সেখানে তাঁর পরিবারের মহিলা মহলকে রেখে, সঙ্গে করে হাজার সৈন্য নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির এলাকার বাইরে বুন্দেলখণ্ডের দিকে রওনা হলেন। তার আগে অবশ্য কৃষ্ণকান্ত আর সার্জেন্টকে মুক্তি দিলেন। হেস্টিংস বারানসী দখল করে চৈৎ সিং এর ভাগ্নে মহীপনারায়ণকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন। কান্তবাবুর সঙ্গে চুনার দুর্গে বসে হেস্টিংস বিজয়গড়ের ভেতরের এবং চৈৎ সিংহের খবরাখবর সবই পেয়েছিলেন।

কাশিমবাজারের রাজাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের প্রথম পুরুষ এই কৃষ্ণকান্ত একদিকে যেমন ইংরেজদের বিশ্বস্ত ছিলেন অপর দিকে অবরুদ্ধ বিজয়গড় দুর্গের কর্ত্রী চৈৎ সিংহের মাতা রানি পান্নারও আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। পাহাড়ের ওপর প্রায় তিরিশ গজ খাড়াই-এর ওপর এই দুর্গটি দুর্ভেদ্য ও দুর্গম—নীচে থেকে মিছামিছি কামানের গোলাবারুদ খরচ করে কোনো লাভ হবে না এটা মেজর পপহ্যম বুঝলেন। তিনি রানীর কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, আত্মসমর্পণ করলে তাঁদের ভালোই হবে অযথা প্রাণহানি করা ইংরেজদের উদ্দেশ্য নয়। ইংরেজরা মাত্র দুর্গটির দখল পেতে চান। অবশ্য পপহ্যমের ভালোভাবেই জানা ছিল যে, চৈৎ সিংহ পালাবার সময় [illegible] কিছুই নিয়ে যেতে পারেন নি সঙ্গে। সব কিছুই তিনি বিজয়গড়ে রেখে গিয়েছেন। অতএব বিনা হাঙ্গামায় যদি সম্পদ হাতিয়ে ফেলতে পারা যায় তাহলে সময় নষ্ট হবে না। অন্যথায় ওপরের দুর্গে অল্প সংখ্যক প্রহরীই মাসের পর মাস রক্ষা করতে পারবে। শত্রুকে বেশি সময় দেওয়া মানেই সুযোগ দেওয়া।

কিন্তু রানী পান্না পপহ্যমের কথায় আস্থা রাখতে ভরসা পেলেন না।

[illegible]

হেস্টিংসকে তিনি জানালেন, দেওয়ান কান্তবাবু যদি মধ্যস্থ থাকেন তাহলে প্রস্তাবটা বিবেচনা করা যায়। কান্তবাবু বৈষ্ণব—আর ওই ভদ্রলোকের কথার দাম আছে। ঐতিহাসিক সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর 'বন্দর কাশিমবাজারে' লিখছেন : "১৭৮১ খৃস্টাব্দের ২ নভেম্বর রানী পান্নার চিঠি পেলেন কৃষ্ণকান্ত নন্দী। তাতে লেখা ছিল যে, আপনি উপস্থিত থাকলে তবেই আমরা ভরসা পাব যে আমাদের সম্মান ও নিরাপত্তা আত্মসমর্পণের পর রক্ষিত হবে।..." হেস্টিংস সঙ্গে সঙ্গেই মেজর পপহামকে লিখিতভাবে নির্দেশ দিলেন যাতে দুর্গে অবরুদ্ধ নারীদের আপন আপন সম্বল-সম্পত্তির ওপর হস্তক্ষেপ না করা হয় এবং রানীরা যাতে নিজ নিজ অলংকার, ধন-দৌলত নিয়ে দুর্গ থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পাবেন সে ব্যবস্থা করা হয়। হেস্টিংসের হুকুমনামা সঙ্গে নিয়ে কান্তবাবু সপ্তাহকাল পরে বিজয়গড়ে রাত দশটা নাগাদ পৌঁছেই পপহামের হাতে দিলেন সেটি।

কাশিমবাজার রাজবাড়ির সঙ্গে উত্তর ভারতের ইতিহাসের বিচিত্র যোগসূত্র এই-খানেই। ১০ই নভেম্বর ১৭৮১ তারিখে বিজয়গড় দুর্গ থেকে রানীর প্রতিনিধিরা নিচে পপহামের শিবিরে এসে সন্ধির বৈঠকে বসলেন এবং বিশদ আলোচনায় স্থির হ'ল যে, পর দিন দুর্গের দখল কোম্পানিকে দেওয়া হবে। তার আগে অবশ্যই শর্তানুযায়ী রানীর লোকজন হাতী, উট, পাল্কীর বন্দোবস্ত করে দেবে কোম্পানি—নির্বিঘ্নে রানীর আত্মীয় পরিজন ও যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে দুর্গ ত্যাগ করতে পারেন। পপহাম একটি শর্ত আরোপ করলেন—রানীদের পাল্কী কেউ স্পর্শ করবে না কিন্তু অন্যান্য লোকজন তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অতিরিক্ত কিছু নিতে পারবে না অর্থাৎ তাদের মাল-পত্র তল্লাসী করা হবে। কান্তবাবু দুর্গে হাজির হয়ে সব কথাই রানীকে বুঝিয়ে রাজী করিয়ে দিয়ে শিবিরে ফিরে আসেন। ওই রাতেই দুর্গের মাথায় কোম্পানির পতাকা উড়ল। মেজর পপহাম ওপর-ওয়ালার কাছে খবর পাঠাল—কেল্লা ফতে।' সৈনিকের লালসার কাছে সন্ধির শর্তের কোনো দাম নেই। সেটা প্রমাণিত হয়েছিল ১৭৮১ সালের ১১ই নভেম্বর বিজয়গড় দুর্গে। গোরা বাহিনীর লোক ভোর হতে না হতে দলে দলে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল পশ্চিম দিকের উঁচু প্রাচীর মাইন দিয়ে বিধ্বস্ত ক'রে। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার একটা সম্মানজনক নিষ্পত্তি করার পর স্বভাবতই নিশ্চিন্ত মনে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত ঘুমিয়েছিলেন সেনা শিবিরে নিজের তাঁবুতে। তিনি এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার বিন্দুবিসর্গও টের পান নি। ঘুম থেকে উঠতে তাঁর বেলা হয়েছিল। দুর্গে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন, এমন সময়ে তিনি শুনলেন, ওপরে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। স্বভাবতঃই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সেখানে পৌঁছবার জন্য। এদিকে পপহাম অযথা দেরি করিয়ে দিয়ে যখন তাঁকে যাবার অনুমতি দিল তখন দ্বিপ্রহর অতীত। হয়-রানির এখানেই শেষ হয়নি, কেন না দুর্গের সদর দরজায় প্রহরীরা তাঁকে আটকে দিল, সাফ জবাব—ছাড়পত্র না থাকলে কেল্লার ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার হুকুম নেই। গোরা সৈন্যদের সঙ্গে তকরার বেকার কাজেই কান্তবাবু ফিরে গেলেন মেজরের কাছে। লিখিত কোন খত না দিয়ে পপহাম এক পেয়াদাকে সঙ্গে দিল। লিখিত কোনো ছাড়পত্র নয়।

দুর্গের দেউড়িতে উট, পাল্কী, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি সব সাজিয়ে রাখা হয়েছে রাজ পরিবারের মহিলাদের নিয়ে যাবার লোকদেখানো আয়োজনের ওপারে কেল্লার ভেতরে নারীদেহের ওপর অবাধ লুঠতরাজ চলছে। ছুঁড়ি-বুড়ি কারুর নিস্তার নেই। বুভুক্ষু বর্বর গোরারা একদিকে নারী-ধর্ষণে উন্মত্ত অন্যদিকে পুরুষদের উলঙ্গ করে দেহতল্লাসী করা হচ্ছে, খেয়ালখুশি-মত হত্যা করা হচ্ছে। চোখের সামনে এই দৃশ্য ঘটতে দেখে কৃষ্ণকান্ত বাধা দিতে গিয়ে তাঁর প্রাণ বিপন্ন হ'ল—গোরারা তাঁকে ধাক্কা মেরে বন্দুকের কুঁদো উঁচিয়ে আঘাতে উদ্যত। এই অবস্থায় সঙ্গী পেয়াদাটি তাঁকে টেনে সরিয়ে আনল। লোকটি যে বুদ্ধিমান তাতে সন্দেহ নেই। বিচলিত, ক্ষুব্ধ কান্তবাবুকে সে বুঝিয়ে দিল, এখন তাঁর একমাত্র কাজ হ'ল রানী পান্নাকে রক্ষা করা। কথাটা শুনেই কান্তবাবু শিউরে উঠলেন। সত্যিই ত, নর-পিশাচদের অসাধ্য কিছুই নয়। অতএব—। দুজনে দ্রুতপদে চললেন রানীমহলের দিকে। পথিমধ্যে দেখলেন, রাজা বলবন্ত সিংহের বিধবা অপূর্ব রূপসী বিষণ কাউরকে গোরারা মাটিতে ফেলে দলবদ্ধ-ভাবে ধর্ষণ করছে। কৃষ্ণকান্ত উদ্‌ভ্রান্ত। এখন আর বাধা দেবার মত মনোবলও নেই। রানী পান্নার কি দশা এই শঙ্কায় তিনি অস্থির। এই মহিলার যে তাঁর ওপর গভীর আস্থা।!

মহিলামহলে অত্যাচারিতা নারীকুলের আর্ত-চিৎকারের মধ্যে কৃষ্ণকান্তকে রানী পান্না বললেন—লক্ষ্মীনারায়ণকে আগে উদ্ধার কর!' ছত্তরপুর থেকে রানী এই বিগ্রহের শিলামূর্তি নিজে এখানে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর কথামত কান্ত-বাবু মন্দিরের শিলামূর্তি তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। উন্মত্ত গোরারা মন্দিরের মূর্তি ভাঙছে, দেববিগ্রহের অলংকার ছিঁড়ে নিচ্ছে—বিজয়োল্লাসের বীভৎস তাণ্ডবে বিজয়গড় কেল্লা ইংরেজ সৈন্যের সভ্যতার ভণ্ডামি উদ্ঘাটিত করছে।

ওয়ারেন হেস্টিংসের হুকুমনামা, পপ-হামের সন্ধির সম্মানজনক আশ্বাস-বচন সবকিছুই বিরাট বিদ্রূপে পর্যবসিত হচ্ছে। এসব খবর পপহামের কানে যখন পৌঁছলো তখন সে কিঞ্চিৎ বিপন্ন বোধ করল। সে বোধহয় এতটা অত্যাচার হবে ভাবতে পারে নি। লুঠতরাজ আর খুন-জখম, ধর্ষণের কেলেঙ্কারি চাপা দেবার জন্যই হয়ত সে কান্তবাবুর পরবর্তী নিরাপত্তা ব্যবস্থার সব প্রস্তাবই সুবোধ বালকের মত মেনে নিয়ে কাজ করে-ছিল। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার তা ত হয়েই গেছে। তবু যতটা পারা যায় শেষ রক্ষার চেষ্টায় পপহাম উঠে পড়ে লাগল। যথাযথ ব্যবস্থা করতে কিছু সময় লাগল। কান্তবাবুর দাবি অনুযায়ী সে ক্যাপ্টেন স্কটের সঙ্গে একদল সেনা দিয়ে রাণীদের ১৪ই নভেম্বর বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিয়ে দিল। ১৮ই নভেম্বর কাশীধামে তাঁরা পৌঁছলেন। এরপর স্কট আর কান্তবাবু হেস্টিংসের কাছে বিজয়গড়ের কদর্য ঘটনা-বলীর বিশদ বিবরণ দাখিল করলেন। অতঃপর অপহৃত ধনদৌলত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছিল। সব পাওয়া যায় নি। কেন না নির্লজ্জ, আত্মপরতাচ্ছন্ন গোরা-দের কেউ কেউ ঝেড়ে জবাব দিয়েছিল। ফেরৎ দেবো না। অবশ্য সে জন্য তারা রেহাই পায় নি। রাণীদের আংশিক সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল। মেজর পপহামকে একেবারে নেমকহারাম বলা চলে না, বড় কর্তা হেস্টিংস আর তাঁর ধর্মপত্নীকেও বেশ মোটারকমের হীরেজহরৎ ভেট পাঠিয়েছিল সে। যদিও পপহামের কাজের পিছনে হেস্টিংস-এর হাত ছিল যথেষ্ট কিন্তু নোংরামি এতদূর গড়াবে তা কল্পনা করতে পারেন নি তিনি—তাই সরকারীভাবে হেস্টিংস এই ঘৃণ্য উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে-

ন সন্দেহ নেই। নতুবা বেচারার শেষ কি যে হাল হত অনুমান করা শকত কেন না দেশে ফেরার পর পার্লামেন্টে যে বিচারপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে খালাস পেতে হত না।

আমাদের কথা, কাশিমবাজারকে নিয়ে, কাশিমবাজারের আধুনিক যুগের র্তন থেকে। আরও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ ত হলে বলা যায়—কাশিমবাজার রাজা- পারিবারিক প্রতিষ্ঠার মূল পুরুষ কান্ত নন্দী। তিনি বাণিজ্য করে শুধু নীর কৃপা লাভ করেন নি, পরন্তু য়ণকেও আঁকড়ে ধরে ফেলেছিলেন।

কাশীধাম থেকে নৌকায় করে শ্রীশ্রী- নীনারায়ণ জীউকে সঙ্গে নিয়ে রওনা নন। সেই থেকেই এই শিলা বিগ্রহ শমবাজারের প্রাসাদে অধীশ্বরদের কুল- তারূপে বিরাজমান।

কৃষ্ণকান্ত দেবসেবার জন্য সম্পত্তি র্গ করলেন এবং তাঁর উইলে নির্দেশ গেলেন তাঁর উত্তরাধিকারীরা হবেন নীনারায়ণের সেবক। কৃষ্ণকান্তের পুত্র কনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজ কোম্পা- মহারাজা খেতাব পেলেন। তিনি ব্যবসায় জমিদারী সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দান- ও জনহিতকর কাজে অসাধারণ খ্যাতি ও পত্তির অধিকারী হলেন। বিষয়- ধতেও তিনি ক্ষুরধার ছিলেন অভাব কেবল সন্তানের। সে সাধও মিটল। ২ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হল পুত্র সন্তান। করে উৎসব হল অন্নপ্রাশনে। কান্তনামা থতে মানুল্লা মণ্ডল (বালুঘাট) এই রের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন :

পুত্র ঘরে হৈল রাজা খয়রাত করয়।
াত অভ্যাগত জতো আইলেন তথায়।।
দান বস্ত্রদান করএ বিস্তর।
কাঞ্চন দিল ইদান অপর।।
ক খয়রাত করে কি কহিব তার।
ত অভ্যাগত আসে হাজার হাজার।।"

ষষ্ঠীর কৃপা লাভের পর লোকনাথ দিনই জীবিত ছিলেন। পুত্র হরিনাথকে বছরের রেখে তিনি ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে গেলেন। হরিনাথও স্বল্পায়ু। তিনি যান ১৮৩২ সালে তাঁরও একটি পুত্র— নাথ। দশ বছরের নাবালক কৃষ্ণনাথ মা আ ঠাকুমার নয়ণতারা হলেন। বলতে লক্ষ্মীনারায়ণ। অবশ্য ইংরেজ পানির ওপরই তাঁদের নির্ভর করতে বৈষয়িক ব্যাপারে।

॥ দুই ॥

লক্ষ্মীনারায়ণের প্রসন্ন কৃপাবৃষ্টির সরস্বতীর বদান্যতা কাশিমবাজার রাজ বারে কৃষ্ণনাথকে কেন্দ্র করেই শুরু, দশ বছরে বালককে এমনভাবে শিক্ষা- য় অসাধারণ করে গড়ে তুলতে হবে সাবালক হয়ে সে যখন বিরাট জমিদারীর ভার হাতে নেবে তখন কোনো দিক অযোগ্য প্রতিপন্ন না হয়। বস্তুতঃ গোঁড়া বৈষ্ণব রাজমাতা ও পিতামহীর চেয়ে এ ব্যাপারে গরজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিছুমাত্র কম ছিল না। জমিদার শ্রেণীর মুষ্টিমেয় কিছু লোকই ত ইংরেজদের স্থানীয় প্রতিনিধি। রাজস্ব আদায়, প্রজাদের বশে রাখা সবই অনেকাংশে এই সুবিধাভোগী শ্রেণীর অভিপ্রেত শিক্ষাদীক্ষা ও বিচার- বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। কৃষ্ণনাথকে সেই ছাঁচে ঢালাইএর উদ্দেশ্যে উইলিয়াম স্টিফেন ল্যামবিককে ইংরেজি, ইতিহাস, জ্যামিতি, রসায়ন আর ভূগোল বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য এবং দিগবরা মিত্রকে বাংলায় পড়াবার জন্য রাখা হল। একেবারে ঘড়ি ঘন্টা ধরে লেখাপড়া করতে হয়। একটু অবসর যদি বা মেলে তাও নষ্ট করার উপায় নেই, সরকার মশাইএর কাছে জমিদারী সেরেস্তার কাজ শিখতে হয়।
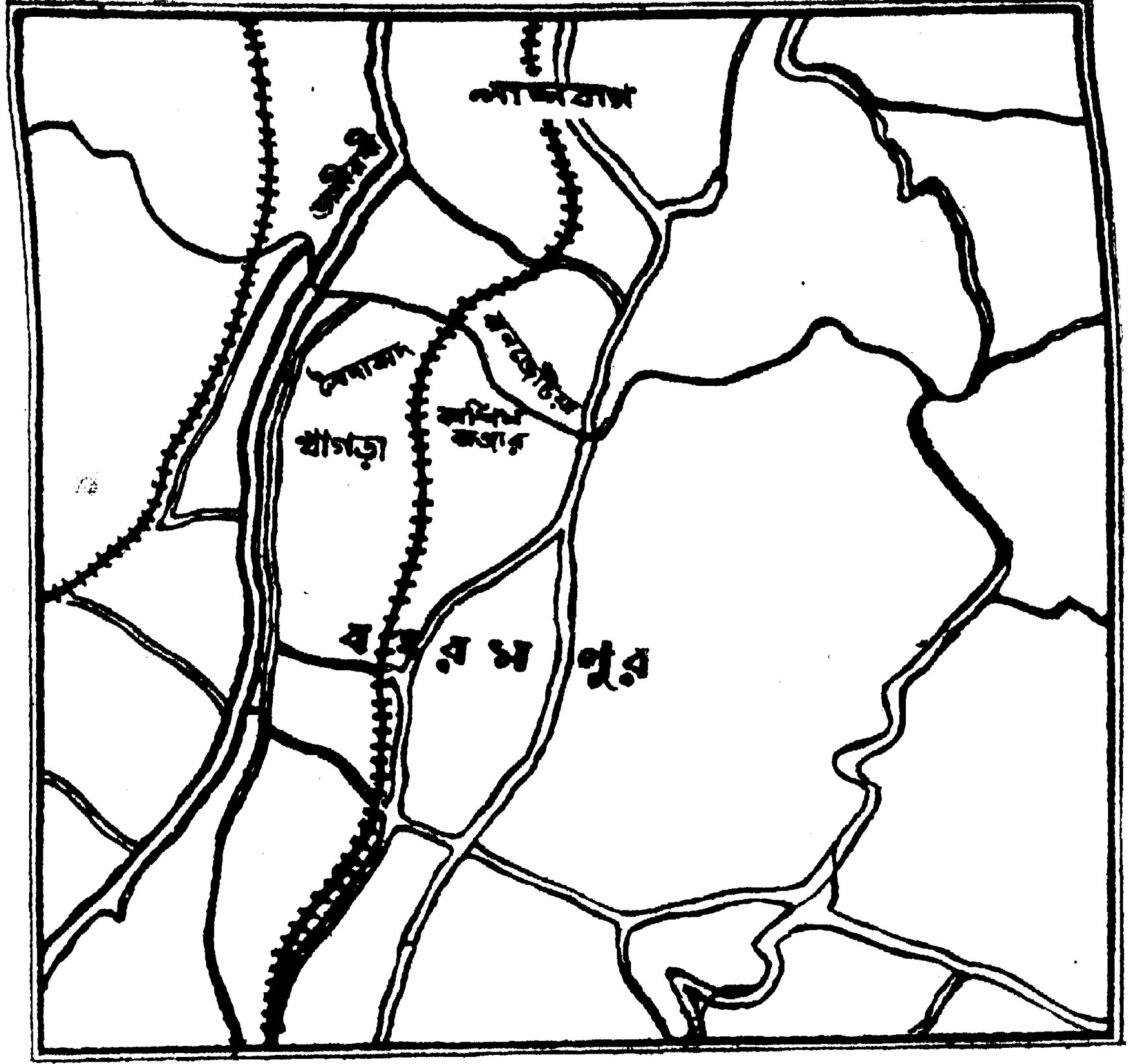
কৃষ্ণনাথ বুদ্ধিমান। কিন্তু অপরিণত বয়সের ওপর এই অস্বাভাবিক চাপ বোধহয় বুদ্ধিকে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। দিগম্বর মিত্র হয়ত বালকের প্রতি সহানু- ভূতিশীল ছিলেন—গতানুগতিক কেতাবী পড়ার বাইরের জগৎ সম্পর্কে অনেক গল্প করতেন, খেলাধুলোতেও উৎসাহ দিতেন। তাই তাঁর সঙ্গেই কৃষ্ণনাথের প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দিগম্বরের আধুনিক দৃষ্টি- ভঙ্গীর প্রভাব ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে কৃষ্ণ- নাথের আচার আচরণে। যদি চ এই আধুনি- কতা কেবল একা দিগম্বরের অবদান নয়, সমসাময়িক পরিবেশে ইংরেজিআনার সংক্রমণ বিশেষ করে উচ্চকোটিতে ব্যাপক হয়ে উঠে ছিল, তথাপি রাজমাতা মহলের বদ্ধমূল ধারণা হল, এই ছোকরাই ছেলের কাঁচা মাথা খাচ্ছে। অতএব দিগম্বরকে বিদায় করা হল —প্রাসাদে তাঁর প্রবেশ নিষেধ। তাঁর বদলে সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পণ্ডিত শিব- প্রসাদকে তাঁরা নিয়ে এলেন, গৌহাটি স্কুলের মাস্টারীতে ইস্তফা দিয়ে শিবপ্রসাদ কৃষ্ণনাথের গৃহশিক্ষক হলেন। রাজবাড়ির দেউড়িতে দিগম্বরের ঢোকা বন্ধ করে ফল হল বিপরীত, কৃষ্ণনাথের সঙ্গে মেলামেশা রাখা গেল না। তার প্রমাণ পরে পাওয়া গিয়েছে।

ল্যামব্রিক সাহেব তখনকার জেনারেল কমিটি অব পবলিক ইনস্ট্রাকশনের কাছে ছাত্রটি সম্পর্কে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাতে দেখা যায়, লেখাপড়ায় কৃষ্ণনাথ মোটামুটি ভালো কিন্তু এই শ্রেণীর ধনী ও মানী, রক্ষণশীল পরিবারের পরিবেশে শিক্ষার অভিপ্রেত চরিত্র গড়ে ওঠা দুঃসাধ্য। ছেলেটি খামখেয়ালী। বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্র এমন কতকগুলি যন্ত্রপাতি চেয়েছিল যা তার খুব দরকার ছিল না—ল্যামব্রিক মঞ্জুর করেন নি, তাতেই ছাত্র বিগড়ে গিয়েছিল।

পনের বছর বয়সে কিশোর কৃষ্ণনাথ ইংরেজি শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করলেন ১৮৩৭ সালে সৈদাবাদ ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা কল্পে দু হাজার টাকা দিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় ইংরেজি শিক্ষা তথা সাংবাদিকতা প্রসারের অগ্রনায়ক হিসেবে এই কিশোরকে অস্বীকার করার কোনও পথ নেই। ১৮৩৮ সালে ল্যামবিক সাহেব কৃষ্ণনাথের উৎসাহে মুর্শিদাবাদ নিউজ পত্রিকা প্রকাশ করলেন। ভারতীয় সাংবাদিকতার শৈশবকালে মফস্বলে প্রীতিপ্রদ প্রচেষ্টা [illegible]

যগণ্যা ছেলেটি বিষয়বুদ্ধিতে বিপরীত। তিনি কলকাতায় চললেন, কেন, না, ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসইটির কাজ আছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মাথাওয়ালাদের সংগে মাখামাখি। ষোল পেরিয়ে সতেরতে পা দিয়েছে যে ছেলে সে কিনা ওই সোসাইটির প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়ে বসল। কী বুকের পাটা। জমিদারীতে লাখেরাজ প্রথার ব্যাপারে সুবিধা সুযোগ আদায়ের জন্য বিলেতের বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সংগে চিঠিপত্র লেখালেখি, আন্দোলনে নেমে পড়ল ছেলেটা। মা-ঠাকুমা বা সেরেস্তার পুরোনো আমলাদের সঙ্গে বলা-কওয়া কিছুই দরকার মনে করত না সে। ছেলেকে দুষ্টা সরস্বতীর হাত থেকে উদ্ধারকল্পে গরীবের ঘর থেকে সুন্দরী স্বর্ণময়ীকে বধূরূপে বরণ করে ঘরে আনা হল। রূপের জাল ঘিরে আটক করায় এই চিরাচরিত কৌশলও খুব জুৎসই হয় নি। বালিকাবধূর আঁচলে বাঁধা পড়বার মত মানসিকতা কৃষ্ণনাথের নয়। বাইরের টান তার চেয়ে জোরদার। তিনি কখন স্বপ্ন দেখচেন বিলেতের সংগে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপনের—কাশিমবাজার থেকে লণ্ডন সরাসরি যাতায়াতের জন্য জাহাজ তৈরির কারখানা পত্তন করা চাই। জাহাজে করে কালাপানি পার হবে এদেশের হিন্দুর ছেলেরা। এই অনাচারকে প্রশ্রয় দিলে সর্বনাশ হবে যে। অতএব কৃষ্ণনাথকে এক ঘরে করার কথাও অনেকে ভাবতে লাগলেন।

তাঁর এইসব উড়নচণ্ডে খামখেয়ালের পিছনে রয়েছেন দিগম্বর। তাকে শায়েস্তা করতে পারলেই ছেলের মতিগতি ফিরবে। ধর্মের সংসারে এই অনাসৃষ্টি চলতে দেওয়া যায় না।

কৃষ্ণনাথও মা-ঠাকুমার খবরদারি বরদাস্ত করতে নারাজ। তিনি কমিশনার অব রেভিনিউএর কাছে অভিযোগ করলেন, সম্পত্তি কুক্ষিগত করার মতলবে তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তাঁর মা হরসুন্দরী ছেলেকে মেরে ফেলে দত্তক পুত্র নেবার মতলব করছেন এরকম সন্দেহ করছেন কৃষ্ণনাথ। রাজপ্রাসাদে থাকা তিনি নিরাপদ মনে করেন না, অতএব তাঁকে মাসিক ২০০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক, তিনি অন্যত্র বসবাস করবেন।

বিচিত্র চরিত্রের এই অপরিণত বয়স্ক তরুণটিকে ভালো বা মন্দ বলে এককথায় হিসেব করা চলে না। রূপ কথার রাজকন্যা যেমন রূপ চলে গেলেও কথা হয়ে বেঁচে থাকে যুগ যুগ ধরে কৃষ্ণনাথও সেই জাতের অনন্য মানুষ। কাশিমবাজারে অন্তঃপাতী একটি অঞ্চল লোকমুখে আজও লেংড়ী-বিবির হাতা নামে পরিচিত। কিম্বদন্তীর এই বিবি মোটেই খঞ্জ ছিলেন না, রূপ-যৌবনে পুরুষ চিত্তে প্রবল চাঞ্চল্য আনার মত মোহিনী এই মেয়েটি 'বিবি' অর্থে মুসলিম তনয়াও নন! বস্তুতঃ কোনও এক ল্যাংরিজ সাহেবের এই প্রণয়িনীর প্রতি কৃষ্ণনাথ নাকি প্রেম নিবেদন করেন। মেয়েটিও প্রসন্ন মনে পূজা গ্রহণ করে তারপর? ইওরোপীয় মধ্যযুগীয় প্রথামত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ল্যাংরিজকে পরাস্ত করে ভারতীয় কৃষ্ণনাথ তরুণীকে অধিকার করলেন। তারপর তাকে প্রমোদকুঞ্জে রাখা হয়েছিল তারই নাম কালক্রমে এই দাঁড়িয়েছে। এই কাহিনীর নায়িকার পরিণাম কি হয়েছিল অথবা আদৌ এই ঘটনা ঘটেছিল কিনা তা আজ নির্ণয় অসম্ভব না হতে পারে তবে অবান্তর। কেন না, কৃষ্ণনাথের সম্পর্কে আরও সম্ভব-অসম্ভব অনেক প্রণয়চর্চার কাহিনী কাশিমবাজার থেকে মুর্শিদাবাদ নবাববাড়ি পর্যন্ত ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। এটাও ঠিক যে, তিনি যেমন বন্দুকে অভ্রান্তলক্ষ্য ছিলেন তেমনি অসাধারণ ঘোড়সওয়ার ছিলেন। মাঝে মাঝে কাশিমবাজার থেকে কলকাতায় ঘোড়ায় চড়েই যেতেন। কিন্তু এইগুলিই তাঁর পরিচয় নয়, এর জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে নেই। ১৮৩৭ সালের অকটোবর মাসে দর্পণ পত্রিকার প্রকাশকের কাছে লিখিত এক পত্রে দেখা যায় '......শ্রীযুক্তবাবু কুমার কৃষ্ণনাথ রায় স্বীয় সংবদান্যতার দ্বারা অতি বিশেষ রূপে প্রশংসনীয় হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং ইংরেজী বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন সুতরাং তাঁহার নিতান্ত এমত বোধ হইতেছে যে আপনারদের দেশীয় বালকেরদিগকে ঐ বিদ্যা দানকরণেতে মহোপকার হইতে পারে।...' (সংবাদপত্রে সেকালের কথা : ২য় খন্ড পৃ ৮১-৮২ দ্রষ্টব্য)। এই স্কুলের প্রধানশিক্ষক হলেন স্টুয়ার্ট সাহেব, ইতিপূর্বে তিনি বেনারস সংস্কৃত কলেজের হেডমাস্টার ছিলেন।

পরের বছরে দিগম্বরের অনুপ্রেরণা[তেই] দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত জমিদা[র] সমাজের সভ্য হলেন এবং ১৮৩৯ সা[লে] প্রকাশ্য অধিবেশনে বাংলা ভাষাতে বক্তৃ[তা] করলেন তখন তাঁর বয়েস মাত্র সতের। এব[ং] দেখা যায় যে, লণ্ডনের বৃটিশ ইণ্ডি[য়া] সোসাইটির সঙ্গে লাখেরাজ বন্দোবস্তে[র] ব্যাপারে ইংরেজিতে চিঠিপত্র লেখালেখিতে নেমে পড়লেন। বাংলা দেশের জমি নিষ্ক[র] করার ক্ষেত্রে অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনের এটাই সূত্রপাত।

কৃষ্ণনাথ বয়সের তুলনায় চিন্তা ও কাজে এত দ্রুত এগিয়ে চলছিলেন যে তাঁ[র] পরিবারের সাবেকী আমলাতন্ত্রের উদ্যোগে তাঁর মা কড়া হাতে রাস টেনে ধরলেন হয়ত বা কিছু কুটিল পন্থাও অবলম্বন কর[া] হয়েছিল। বোধকরি সে কারণেই তরু[ণ] কুমার উত্যক্ত হয়ে পথ পরিষ্কার করার জন[্য] সুপ্রীম কোর্টে মায়ের বিরুদ্ধে মামলা কর[ে] বসলেন—সোনাদানা, হীরাজহরৎ ইত্যাদি অস্থাবর ত্রিশ লাখ টাকা মূল্যের সম্প[ত্তি] আত্মসাৎ করার অভিযোগে। ওদিক থেকে কাশিমবাজারের রাজ দপ্তর থেকে মোট টাকা চুরির দায়ে দিগম্বর মিত্রকে অভি[যুক্ত] করে মামলা দায়ের করা হল। খাতাপত্র, সাক্ষী-সাবুদ এমন নিপুণভাবে সাজানো হয়েছিল যে, দিগম্বরকে জেল খাটতে হত। কৃষ্ণনাথ নিজে এমন সাক্ষী দিলেন যাতে প্রমাণ হল আদৌ কোনো টাকা দিগম্বরকে দেওয়া হয়নি—হিসাবের খাতা জাল, সব সাক্ষী ভুয়া!

কৃষ্ণনাথ রাজা হলেন অর্থাৎ সাবালক হয়ে জমিদারী হাতে পেলেন ১৮৪০ সালে আর নিজের ক্ষমতাকে স্বাধীনভাবে কাজে রূপায়িত করার জন্য তাঁর প্রথম পদক্ষেপই হল দিগম্বর মিত্রকে দেওয়ান পদে বহাল করা। তর পরই 'মুর্শিদাবাদ [সংব]াদপত্রী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন (১০ মে, ১৮৪০) সম্পাদক হলেন গুরু[]দয়াল রায়চৌধুরী। কলকাতার বাইরে বাংলা ভাষার নির্ভীক সাপ্তাহিক হিসেবে এই পত্রিকা বৈশিষ্ট্য অর্জন করল অল্প দিনের মধ্যে। তখনকার কুঠিয়াল, কারবারী বিদেশী এবং এ-দেশীয় প্রভাবশালী বণিক[]দের তাঁবেদারী না করে উল্টো সমালোচনার ফলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিগড়ে গেলেন। ফলে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। দিগম্বরকে লাঞ্ছিত করেছিলেন যাঁরা তাঁদের পাল্টা জবাব হিসেবে কৃষ্ণনাথ এক লাখ টাকা গুরুদক্ষিণা দিলেন প্রাক্তন শিক্ষককে এবং প্রকাশ্যে জাহির করলেন, অকৃত্রিম বন্ধুত্ব আর প্রগতিবাদী কাজে উদ্বুদ্ধ করার কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ উপহার বলে! কাশিমবাজার যে কলকাতার চেয়ে কোনো দিকেই পিছিয়ে নেই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে এই ধারণা প্রচারের জন্য কৃষ্ণনাথ দু-হাতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাজে টাকা খরচ করতেন। যেমন ধরা যাক মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারী পাস করা প্রথম স্থানাধিকারী

চিজনের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা পুরস্কার ওয়া, হাসপাতালের ভান্ডারে ৭০০ টাকা ওয়া, ডেভিড হেয়ারের স্মৃতি রক্ষা ন্ডারে (১৮৪২ সালের ১৭ জুলাইতে ন্নকুমার ঠাকুরের সভাপতিত্বে মেডিক্যাল লজের থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত সভা)

১০০ টাকা চাঁদা দেওয়া। এরকম আরও ন্নাতের নজির অনেক আছে। কিন্তু ার সবচেয়ে বড় কীর্তির পরিকল্পনা হল নজেটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। বাস্তবে এটি পায়িত করে যেতে পারলে বাংলার প্রথম শ্ববিদ্যালয় কলকাতায় না হয়ে কাশিম-জারেই হতে পারত। ১৮৪১ খৃস্টাব্দে নশ বছর বয়সেই কৃষ্ণনাথ এক উইল রন, সেই উইলে এই কথা লেখা ছিল ঃ দ তাঁর কোনো পুত্র না হয়, তবে তাঁর ত্যুর পর দত্তক পুত্র নেওয়া হবে না। ার নির্দেশমত সম্পত্তি বিক্রি করে সেই ন দিয়ে কোম্পানির কাগজ কলকাতাস্থ কাউন্ট্যান্ট জেনারেলের নামে কিনে উক্ত াধিকারীর কাছেই গচ্ছিত রাখা হবে ং কৃষ্ণনাথের নামে একটি কলেজ তষ্ঠা করা হবে। গভর্নর জেনারেল এবং ান বিচারপতি মাথার ওপরে থেকে লজের নিয়মকানুন তৈরি ও অধ্যাপক াল করবেন। কলেজে ইংরেজি, বাংলা, র্সি, সংস্কৃত প্রভৃতি কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান ং পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ব। এই কলেজে এ-দেশের ছেলেরা পড়বে ং বিলেত থেকে মোটা মাইনে দিয়ে তমত বাছাই-করা পণ্ডিতদের এখানে নতে হবে। এখানে একটা কথা উল্লেখ া যেতে পারে, মুর্শিদাবাদের নবাব পরি-রর ছেলেদের শিক্ষা দেবার জন্যে দীর্ঘ-ন ধরে বিস্তর অর্থব্যয় করেছেন ম্পানির সরকার। সেখানে কতকগুলি প্রদায়িক বাধাবাধকতার জন্য যথার্থ ক্ষা-ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়নি। অর্থাৎ ন্দুর ছেলেরা সেখানে পড়তে যেত না। রও একটি কথা, মিশনারীরা খৃস্টধর্ম ারের উদ্দেশে দেশীয় ছেলে ও মেয়েদের) অনেকগুলি ইংরাজি স্কুল স্থাপন রেছেন, নানাভাবে প্রলুব্ধও করেছেন কিন্তু ; পর্যন্ত সেসব প্রচেষ্টাও ফলবতী হয়নি। ধ হয় সেজন্যও সংস্কারকমনোভাবাপন্ন ৷ তরুণ উদারপন্থী 'বৃহৎ শিক্ষা তষ্ঠান' গড়ে তোলার সংকল্প করেন।

বানজেটিয়ার যে বাগান ও বিরাট নাদটি হেস্টিংস-এর আমলে রেসিডেন্টের) তৈরি হয়েছিল, পরে কাশিমবাজারের ন সেটি কিনেছিলেন সেই বাড়িই হবে াজভবন।

১৮৪১ সালের এই সংকল্পকে আকার ওয়ার জন্য কৃষ্ণনাথ বেশ গুছিয়েই গাচ্ছিলেন। ১৮৪৩ সালে সিস্টারের । তাঁর অজ্ঞাত কারণে মনোমালিন্য ঘটার ন বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। ন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি কলেজ াপনের কথাটা ভোলেননি। দেখা যাচ্ছে কলকাতায় তাঁর জনপ্রিয় বন্ধু

বানজেটিয়ার বাড়ি

ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্রকে ওই বছরেই চিঠি লেখেন। তিনি হিন্দু কলেজে কি-কি বিষয় পড়ানো হয়, কটি ক্লাস, অধ্যাপক এবং কর্মচারীর সংখ্যাই বা কত, কিরকম ব্যয় হয়—এগুলি খোঁজ নিয়ে অবিলম্বে জানাতে হবে—অবশ্য এ-বিষয়ে যেন দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি টের না পান। চিঠিতে এ-কথাও প্রকাশ পায় যে, কৃষ্ণনাথের কলেজ কল-কাতার চেয়ে সবদিক দিয়ে ভালো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হবে। পরিশেষে অনুরোধ করে-ছিলেন, চিঠিখানি যেন ছিঁড়ে বা পুড়িয়ে ফেলা হয়। অবশ্য নবীনকৃষ্ণ তা করেননি। কাজটা যে ভালোই করেছিলেন নবীনকৃষ্ণ তার প্রমাণ পাওয়া গেল কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করার পরে। হ্যাঁ, কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করেছিলেন মিথ্যা অপবাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। পশ্চিমী ধারায় সমাজ-সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুধর্মের প্রচণ্ড বিরোধ তাঁকে নিজের পরিবার এবং স্থানীয় লোকজনদের কাছে অপ্রিয় করে তুলেছিলো, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হামবড়া এই তরুণের প্রতি ইংরেজ আমলাতন্ত্রের বিরাগ। ১৮৩৭ সালে মুর্শিদাবাদের কালেকটর এই চোস্ত ইংরেজি বলিয়ে ও বিদেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় আগ্রহী ছোকরা সম্পর্কে মন্তব্য করেন—হয় সে আস্ত অহংম্মক, নয়ত চরম উদ্ধত আর স্বেচ্ছাচারী এবং কোনো কারণে কড়া ভাবায় শাসিয়েও দিয়ে-ছিলেন। প্রসঙ্গটা ছিল প্যার্মবিক যাহেবের এই ছাত্রের শিক্ষা সম্পর্কে হতাশাজনিত। এছাড়া ক্রমেই তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর পুত্রসন্তান হবে না বা তিনি বেশি দিন বাঁচবেন না। নবীনকৃষ্ণকে লেখা চিঠি-পত্রে তার প্রতিফলন ঘটেছে। তাতে লেখেন অপুত্রক মানুষ যেমন নিজের ধনসম্পদ জন-হিতের জন্য উৎসর্গ করে, তিনিও তা-ই করতে চান। তবে তথাকথিত দেবসেবা, মন্দির প্রতিষ্ঠা বা সাধনভজনের চেয়ে বড় কাজ জনশিক্ষা, তাই তাঁর সম্পদ সাধারণ মানুষের জ্ঞানার্জনের কাজেই লাগাতে হবে; তবে যেহেতু জীবনমৃত্যুর ওপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই, সেহেতু অপেক্ষা করতে হবে এবং ওই দিকে লক্ষ রেখে কাজ করে যাবেন তিনি। প্রাক্তন উইলের কিছু কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিতও এই চিঠিতে রয়েছে।

কৃষ্ণনাথের মত এমন উদারচেতা তরুণকে হঠাৎ আত্মহত্যা করতে হল কেন? গোপাল দফাদার নামে এক ভৃত্যকে চুরির জন্য তিনি নাকি প্রচণ্ড মারধর করেন। এই অপরাধে বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রমোহন চাটুয্যের হুকুমে রাজাকে গেপ্তার করে তিনদিন কারারুদ্ধ রাখা হয়। তারপর জামিনে খালাস পেয়ে কৃষ্ণনাথ কলকাতায় রওনা দিলেন। দ্রুত যাত্রার জন্য তখনকার দিনে ঘোড়া পাল্টে পাল্টে স্থল-পথে যাওয়াই ছিল একমাত্র উপায়; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া; স্থানীয় সরকারী আমলারা তাঁকে অযথা উৎপীড়িত করতে বদ্ধপরিকর এই ধারণা হয়েছিল রাজার। সেই অবিচারের একটা বিহিত করতে হবে। কিন্তু এদিকে গোপাল দফাদারের মৃত্যু হল। বহরমপুরের কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণনাথের নামে গেপ্তারী পরোয়ানা জারি করলেন। থানায় থানায় খবর চলে গেল, খুনী আসামী কৃষ্ণনাথ ফেরারী, তাকে যেখানে যে অবস্থায় পাও গেপ্তার করো। এই সংবাদ পেয়ে বাইশ বছরের আদর্শবাদী তরুণের মন জীবনের প্রতি তিক্ততায় ভরে উঠেছিল। প্রাণের মায়া বড়, না আত্মমর্যাদা? এই প্রশ্নের সম্মুখীন কৃষ্ণনাথ। গেপ্তার, বিচার, খুনের দায়ে শাস্তি কি ফাঁসি, না কারাদণ্ড—যাই হোক ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে বিভীষিকা-ময়। চারিদিক থেকে বিরাট এক চক্রান্ত তাঁকে বেড়াজালে ঘিরে ধরেছে। এর পর সমাজে মুখ দেখাবেন কি করে। আত্ম-সমর্পণ করার মত পরাজয় মেনে নিতে মন ত প্রস্তুত নয়। অতএব মৃত্যুই শ্রেয়। তার আগে জীবনের এক ও অদ্বিতীয় সংকল্পকে নিষ্কণ্টক করতে হবে। কৃষ্ণনাথ শেষ উইল সম্পাদন করলেন ১৮৪৪ সালের

৩০শে অক্টোবর তারিখে। এই উইলে বানজেটিয়ার ভবনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাই আছে। লেখাপড়া শেখার আর্থিক অবস্থা যাদের নেই, সেইসব ছাত্রের বইপত্র ইত্যাদি সব খরচের ব্যবস্থাও শিক্ষা তহবিল থেকে করতে হবে। তাঁর অনুগত এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য কেশবচন্দ্র সরকারকে শেষ উইলের একজিকিউটর করলেন এবং মোটা রকমের পুরস্কার দেবার ব্যবস্থাও তাতে আছে। বানজেটিয়াকে শুধু কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয় হবে তাই নয়, হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ আছে। কৃষ্ণনাথ মৃত্যু বরণের পূর্বে যে লিখিত জবানবন্দী রেখে যান, তাতে আছে : আমার বাঁচার কোনো ইচ্ছে নেই, কেননা, আমি গোপালকে মারধর করিনি, তার সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করিনি, বস্তুতঃ গোপালের ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই, অতএব আমি আশংকা করছি যে, আমাকে বিপর্যস্ত হতে হবে। সেই অবমাননার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যই শপথ করে বলছি....।' চেয়ারে বসে গলায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে ট্রিগার টেনে জীবন বিসর্জন করলেন, ঘরের সিলিং-এ মগজের ঘিলু লেটকে ছিল।

চিৎপুরের যে বাড়িতে কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করেন, সেটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঠিক উল্টো দিকে ছিল। এই আকস্মিক বিপদের শব্দ কানে যেতেই কৃষ্ণনাথের মা হরসুন্দরী অন্দরমহল থেকে উচ্চকণ্ঠে বললেন —ওরে শিগগির দ্বারকাকে ডাক। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ ছিল যে, প্রিন্স দ্বারকানাথকে দ্বারকা বলেই ডাকতেন কৃষ্ণনাথের ঠাকুমা।

কৃষ্ণনাথের উইল বাস্তবে রূপায়িত হলে অথবা তিনি আত্মহত্যা না করলে কাশিমবাজারের অন্তঃপাতী বানজেটিয়াতেই আধুনিক পাশ্চাত্য ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হত এটা মনে করা অসঙ্গত নয়। ইংরেজিতে লেখা এই উইলের এবং নবীনকৃষ্ণকে লেখা চিঠিপত্রের বাংলা অনুবাদে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরমশাই সহায়তা করেছিলেন।

কৃষ্ণনাথের মৃত্যু সম্পর্কে ১৮৩৪ সালের ২রা নভেম্বরের ইংলিশম্যানে যে প্রতিবেদন হয়, তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছিল যে, রাজা সম্পূর্ণ নির্দোষ, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং আগাগোড়া ব্যাপার জানেন এমন দশজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কথা শুনে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মফঃস্বল আদালতের ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ পরিচয় আগে পেয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে তাদের হাতে আরও নিগৃহীত হতে হবে এই আশংকায় রাজা আত্মহত্যা করেন। কৃষ্ণনাথ সম্পর্কে কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৭৩ সালের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় যে মন্তব্য করেন, তাতে বলেন, এই মহাপ্রাণ তরুণের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক ছিল কিন্তু এমন কিছু অসাধারণ গুণ তাঁর ছিল যা এদেশে একান্তই দুর্লভ।

কৃষ্ণনাথের উইল সম্পর্কে আপত্তি উঠল। আপত্তি তুললেন রাজার পনের বছর বয়স্কা পত্নী রানী স্বর্ণময়ী। রাজার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এবং সেই অবস্থায় সম্পাদিত উইলকে বৈধ গণ্য করা যায় না। এই নিয়ে মামলা হল : বিধবা স্বর্ণময়ী দাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কেশবচন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে মামলার পর সুপ্রীম কোর্টের রায়ে রানী জিতেছিলেন।

।। তিন ।।

রাজারাজড়ার গল্পকে আজকের দিনে প্রতিক্রিয়াশীলতা দোষে ছোট করে ধরাই দস্তুর। তাও আবার আসল রাজা নয়, সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শোষণকারীর হাতিয়ার হিসেবে এদেশীয় জমিদারশ্রেণী কাজ করে এসেছে তাদের ঘরোয়া কথা ত রীতিমত টাবু! কিন্তু ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা দেশের মানুষের দখলে এসেছে এবং জমিদারী প্রথা যখন বিদায় নিয়েছে তখন শুধু ইতিহাস নির্ণয়ের ছাত্র হিসেবে যদি কিছু মালমশলা ঘাঁটাঘাঁটি করা যায় সেটা হয়ত খুব শাস্তিযোগ্য অপকর্ম গণ্য নাও হতে পারে! আর যেখানে উত্তরাধিকারের গাঁটছড়া সেখানে ত সাতখুন মাফ।

স্বর্ণময়ীকে কেশব সরকারেরা চাল মাত করে দেবার মতলবে প্রায় সিদ্ধকাম হয়েছিল। গোপালকে প্রহার করেছিল কে, মৃত্যুপথযাত্রী কোনো জবানবন্দী দিয়ে ছিল কি না—তা আমরা জানি না। কৃষ্ণনাথ খুনের দায়ে ফাঁসিতে ঝুলবেন এই ভয়ে এমনই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, কেশব তাঁকে দিয়ে নিজের কাজ গুছোবার তালে সইসাবুদ করিয়ে নিয়েছিল। এদিকে স্বর্ণময়ীর গর্ভে কৃষ্ণনাথের সন্তান রয়েছে। হঠাৎ তাঁকে অসহায় নিঃস্ব হতে হবে এতবড় অত্যাচারই বা তিনি চুপচাপ বরদাস্ত করবেন কেন। অতএব লড়াই করতেই হবে। এবং এ লড়াই ত কাশিমবাজারে বসে বসে চালানো যাবে না! অতএব কলকাতায় আসা স্থির হল। কিন্তু কলকাতায় থেকে মামলা মোকদ্দমা চালাবেন এমন আস্তানা নেই। অথচ চিৎপুরের বাড়িতে হরসুন্দরী অপয়া বৌকে ঠাঁই দিতে অনিচ্ছুক। মামলার ব্যাপারে ত মোটেই তাঁর সায় নেই। আর এক হতে পারে, বাগবাজারে ননদ গোবিন্দসুন্দরীর বাড়িতে উঠে মামলার তদবির। কিন্তু গোবিন্দসুন্দরীও সাফ জবাব দিয়ে দিলেন। এঁদের সবারই রাগ বৌ-এর ওপর। বৌ বেচারি কোথায় যায়!

অগত্যা স্বর্ণময়ী মনস্থির করলেন তাঁর স্বশুরের কবরডাঙ্গার বাড়িতেই থাকবেন। বর্তমান সূর্য সেন স্ট্রীট, কিছুকাল আগে যার নাম ছিল মির্জাপুর স্ট্রীট, তৎকালে তার উল্টো দিকে ছিল মির্জাপুর গ্রাম, ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামেরই একটি গ্রাম মাত্র। এই এলাকাটা মারাঠা খালের দ্বারা কলকাতা সীমানার বাইরে। রাজা হরিনাথ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা মিন্টের কর্মচারী জেমস্ ফরবেস সাহেবের কাছ থেকে কেনেন। কলকাতায় তখন ট্যাকস চালু হয়ে গেছে, সেই করের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে অথচ ঘোড়ার গাড়ি কাঠের পুল পেরুলেই শহরের মধ্যে পৌঁছনো যায়—এই সুবিধে আর বাড়ির সঙ্গে বিরাট বাগান। জমিও কম নয়। হরিনাথের এই বাড়িতে কিছুকাল ইংরেজি স্কুলও হয়েছিল, সবাই বলত কবরডাঙ্গার ইস্কুল। থাকার আস্তানা হল। আর সহায়তার জন্য বিধবা স্বর্ণময়ী দিগম্বরকে চিঠি দিলেন, তার বক্তব্য এই : আপনি আমার স্বামীর শিক্ষক অতএব আমি আপনার মেয়ের মত—মেয়ের বিপদের দিনে আপনি চুপ করে থাকবেন তা কি করে হয়! আপনার সাহায্য ছাড়া আমি বিপদমুক্ত হতে পারব না।

শুধু দিগম্বর মিত্রই নয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও স্বর্ণময়ীকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কেন করেছিলেন সেটা বুঝতে পারা যায় সহজেই। রাণী তাঁর মৃত স্বামীর আরব্ধ শিক্ষাব্রতের মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সেই দিকেই নিজের কর্মধারাকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। সে বিষয়ে যাবার আগে কবরডাঙ্গার বাড়ির কথাটা শেষ করি। রাণী স্বর্ণময়ী মাঝে মধ্যে বাস করার জন্য বাড়িটির সংস্কার করেন এবং লোকমুখে এর নাম দাঁড়িয়ে যায় রাণী কুঠি। সম্ভবতঃ ১৮৪৭ সালের পর থেকেই এই পরিচিতি। রাজ পরিবারের লোকে বলতেন কলকাতার বাগানবাড়ি। অথচ বাগানবাড়ি বলতে লোকের যা ধারণা, এই পরিবারে আর সেই ধরনের সুরা ও নারী ঘটিত আমোদপ্রমোদে কৃষ্ণনাথেই পূর্ণচ্ছেদ।

পড়েছে। অন্যান্য ভূস্বামীদের সঙ্গে কাশিমবাজার রাজ পরিবারের এটাই মৌলিক পার্থক্য।

স্বর্ণময়ীর বিয়ে হয়েছিল মাত্র এগার বছর বয়সে। বিয়ের ছ বছর পরে তিনি একটি মেয়ে নিয়ে গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হলেন। আদালতে এক এফিডেভিটে তিনি বলেন, বিয়ের সময়ে তাঁর অক্ষর পরিচয়ও ছিল না। পরে তিনি বাংলা লেখাপড়া শেখেন, সংস্কৃত ও ইংরেজি পড়তে শেখেন, ফার্সীও কিছু কিছু পড়তে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইএর সঙ্গে তাঁর প্রায়শঃই চিঠিপত্র আদানপ্রদান চলত। স্বর্ণময়ীর পড়াশুনোর ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রের নজর ছিল, কি কি বই পড়তে হবে তার তালিকাও তিনি লিখে পাঠাতেন। এছাড়া দানের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে স্বর্ণময়ী তাঁকে সাহায্য করেছেন। বিদ্যাসাগর মশাই অনুরোধ করলে স্বর্ণময়ী তা রক্ষা করতেন। এক কথায় তিনি বিদ্যাসাগরের ব্যাংক ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যায় : এই সময়ে (১৮৭৩ খৃঃ) মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়, ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহারাণী স্বর্ণময়ীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। এই প্রশংসা মধুসূদনের অহংকারের একটা রূপান্তর; বাস্তবের অপরিশোধিত ঋণকে প্রশংসা দ্বারা পরিশোধের চেষ্টা। (প্রমথনাথ বিশী : মাইকেল মধুসূদন, পৃঃ ১১৫-১১৬, মিত্রালয় সংস্করণ)। স্বর্ণময়ী পর্দানশীন ও রক্ষণশীল ছিলেন, পরপুরুষের সামনে বেরুনোর প্রশ্নই ওঠে না—অতএব বিদ্যাসাগর মশাই-এর মাধ্যমেই মধুসূদন তাঁর কাছ থেকে টাকা পেয়েছিলেন এটা বোঝা যাচ্ছে।

স্বর্ণময়ী স্বামীর সম্পত্তি বেহাত হতে না দেওয়ার পিছনে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি কাজ করে নি তার প্রমাণ জীবনের কর্মধারার মধ্যেই প্রতিফলিত। সে সব কথা পরে বলা যাবে।

তার আগে দেখা যাক, কৃষ্ণনাথের মানস কল্পনার বানজেটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দশা কি দাঁড়াল। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ভাবনা কি তিনি একাই ভেবেছিলেন? না, তা নয়, তৎকালের প্রগতিবাদের অন্যতম নজীর বলা যায় তাঁকে। ইংরেজ সরকার, মিশনারিরা, নবাব পরিবার, ব্যবসায়ী ও জমিদার জোতদাররা সবাই শিক্ষার প্রসারকল্পে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। মিলিত, দীর্ঘস্থায়ী এবং সুসম্বদ্ধ চেষ্টার অভাবেই কাজ আশানুরূপ হচ্ছিল না। তবে পদক্ষেপ পিছনের দিকে ছিল না, যেমন ধরা যেতে পারে ১৮৪৮ [illegible] নাজিম ফেরদুন জা মুর্শিদাবাদে একটি মাদ্রাসা আর কাশিম বাজারে একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য [illegible] টাকা [illegible] মঞ্জুর করলেন। মাদ্রাসাতে কেবল ফার্সী, উর্দু আর ইংরেজি শেখানো হবে আর কাশিমবাজারের স্কুলে বাস্তবমুখী ইংরাজি আর বাংলা। সেখানে কেরাণী, মুহুরী, হিসাবনবীশ, জমি জরীপের আমিন ইত্যাদি তৈরির জন্যই শিক্ষার কাঠামো রচনা করা হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসা ছাড়া আর কাজের কাজ কিছুই হল না।

কোম্পানির সরকার যে পাঁচটি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে মুর্শিদাবাদও ছিল। ১৮৪৫ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠা হল। এই কলেজের জন্য রাণী স্বর্ণময়ী ৩০ বিঘা জমি ১৮৫১ সালে দানপত্র করে লিখে দিলেন। অন্যান্যগুলি সম্পর্কে আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মুর্শিদাবাদের ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ল কৃষ্ণনাথের উইল সুপ্রিম কোর্টে বাতিল হওয়ায়। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা হাল ছাড়তে নারাজ। চেষ্টা চরিত্রের ফলে সরকার ১৮৫৩ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, তবে সেটা মুর্শিদাবাদে হবে কি বহরমপুরে তা ঠিক করার জন্য একদিন সভা ডাকা হল। তখন অবধি ভাগলপুর বা কটক কোথাও যখন কলেজ করা হয় নি, সেই টাকাটা সরকার এখানে ব্যয় করতে প্রস্তুত। কিন্তু বাকি টাকার ঝুঁকি কে নেবে? বহরমপুরে ডি, জে, [illegible]নির নিবাসে ১৮৫৩ সালের আগস্ট মাসে [illegible] দলের বিশিষ্ট ব্যক্তির বৈঠক হল। ১৬ই আগস্ট ১৮৫৩ তারিখের বেঙ্গল হরকরা এবং ২৫শে আগস্টের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে এ সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হল তাতে দেখা যাচ্ছে সভাস্থলেই কুড়ি হাজার টাকা চাঁদা উঠেছিল। সেপ্টেম্বর মাসে চাঁদার অংক পৌঁছে গেল ত্রিশ হাজার টাকার কাছাকাছি। বহরমপুরেই কলেজ হবে। যাঁরা মোটা টাকা দিয়েছিলেন : মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারের বেগম আমিরুন্নেসা ও নাজীরুন্নেসা, কাঁদির রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বহরমপুরের প্রভাবশালী জমিদার পুলিনবিহারী সেন, দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ন রায়, বাবু রামদাস সেন, বিদ্যাসগর মশাইএর অন্তরঙ্গ বন্ধু পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালংকার, লালগোলার রাজা মহেশনারায়ণ রায়, নসীপুরের রাজা কীর্তিচন্দ্র ও কুমার উদয়চন্দ্র, কাশিমবাজারের জমিদার নবকৃষ্ণ রায়, বনোয়ারীবাদের রাজা বনোয়ারী গোবিন্দ—এঁরা সবাই নেটিভ। এছাড়া সায়েবসুবোদের অনেকেই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে নিজামত কলেজের অধ্যক্ষ সীডন সায়েবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বড় বড় ব্যাপারে সমাজের মাথা-মাতব্বররা তো থাকবেনই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যাঁদের নুন-পান্তা নিয়ে মাথা ব্যাথা, যাঁদের কাছে একটি টাকার মূল্য এক মোহর সেই সাধারণ মানুষেরাও এ ব্যাপারে পিঠ ঘুরিয়ে থাকেন নি। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য রুকুনপুর গরগনার বুজু মিঞা, ঠাকুরদাস ঘোষ, কালী পোড়ী, পালঙ শেখ প্রমুখ সাধারণ খেটে খাওয়া ৮৪ জন ব্যক্তি শিক্ষার এই সংকল্পে দু-এক টাকা দিয়েছিলেন। রাণী স্বর্ণময়ী একাই দিলেন চার হাজার টাকা—একক দান তাঁরই সবচেয়ে বেশি।

বহরমপুর কলেজের শিক্ষাসূচী কৃষ্ণনগর, হুগলীর মতই হবে এবং ১৮৫৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে ক্লাস বসবে স্থির হ'ল। কিন্তু নামটা কৃষ্ণনাথের স্মৃতিযুক্ত হবে না এটাও স্থির হ'ল। কলেজ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তির বাংলা তর্জমাটি কৃষ্ণনাথ কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে নিম্নোক্তমত প্রকাশিত হয় (পৃঃ ১৫)

'বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুক্ত মোস্ট নোবল গবর্নর সাহেব মুর্শিদাবাদ জেলা (অন্তগত) অন্তপাতি বহরমপুরে এক কলেজ সংস্থাপনের অনুমতি করিয়াছেন অতএব ইহার দ্বারা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ করা যাইতেছে যে, ঐ কলেজ ছাত্রদের গ্রাহ্য হওনের নিমিত্ত ১৮৫৩ সালের ১ নবেম্বর তারিখে খোলা যাইবেক এবং তাহার পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র শিক্ষার আরম্ভ হইবেক।

'যাহারা কলেজে ভর্তি হইতে চাহে তাহারদের ধর্মের কি জাতির বিশেষ বিবেচনা না করিয়া গ্রাহ্য হইবেক কিন্তু যে রকম বয়স নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিক রকম হইলে, কিম্বা পড়িবার বইএর মূল্য দিতে ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যায়ার্থে মাসে ২ কিছু দিতে স্বীকার না করিলে গ্রাহ্য হইবেক না...'

আট বছরের কম বয়স্ক বা ষোল বছরের বেশি বয়স্কদের ভর্তি করা হবে না। ভর্তির আগে ছাত্রদের পরীক্ষা করে নেওয়া হবে, যোগ্যতার পরীক্ষা কেমন হবে তাও ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

স্কুল বুক সোসাইটির বইই ছিল তখনকার পাশ্চাত্য পাঠ্যসূচীর ভরসা। বার বছরের কম বয়সীদের স্কুল বুক সোসাইটির ২ নম্বর রীডার যথাযথ উচ্চারণ করে পড়তে পারলেই তাকে ভর্তি করা হবে আর...... "বার বৎসরের অধিক বয়সের বালক যদি স্কুল বুক সোসাইটির ইংলিশ রীডারের পঞ্চম নম্বরের কোন পদপাঠ ও তাহার শব্দের অন্বয় করিতে ও অর্থ করিতে পারে এবং অঙ্ক বিদ্যার সামান্য বিধান জানে এবং পৃথিবীর আকার ও তাহার প্রধান প্রধান খন্ড ও তাহার প্রধান উপভাগ অংশ অর্থাৎ দেশ এবং প্রতি দেশের রাজধানীর ৫ প্রধান ২ নগরের নাম ও প্রধান ২ পর্বতের নাম ও নদীর নাম জানে এবং বাঙ্গলা কি হিন্দুস্থানী কোন পদ ইঙ্গরেজী ভাষায় শুদ্ধরূপে অনুবাদ করিতে পারে এবং ইংলিশ রীডারের পঞ্চম নম্বর হইতে ইঙ্গরেজী ভাষার কোন পদ বাঙ্গলা কি

হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুবাদ করিতে পারে তবে সে বালক গ্রাহ্য হইবেক।

বাঙ্গলা দেশের মোস্ট নোবল গবর্নর সাহেবের হুকুম ক্রমে

সীসল বীডন

বাঙ্গলা দেশের সেক্রেটারি।

মেধাবী ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য বৃত্তি বা জলপানী দেওয়ার বন্দোবস্তও রাখা হল। ওই বছরের শেষে কলেজের ছাত্র সংখ্যা ২১৯ জনে দাঁড়ায়। কলেজ বসত পরিত্যক্ত আর্টিলারি ব্যারাকের পিছনের অংশে। মাসিক বাড়ি ভাড়া ৪০ টাকা।

কৃষ্ণনাথের ব্যানজেটিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার স্বপ্নে শুধু দেশের কল্যাণ সাধনই ছিল না, আত্মপ্রচারও নিহিত ছিল গভীরে। তিনি চেয়েছিলেন ব্যানজেটিয়ার বৈঠকখানাতে তার যে প্রতিকৃতি টাঙানো আছে, ওই পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে তারই অনুকরণে একটি মর্মর-মূর্তি স্থাপন করার কথাও উইলে লেখা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসপাতাল ব্যানজেটিয়ার বাড়িতেই করতে হবে, অন্য কোথাও নয়, এই নির্দেশও ছিল। এখানেই অহংকারী, বাস্তববুদ্ধিহীন, মহানুভব তরুণ স্বামীর সঙ্গে স্বর্ণময়ীর প্রকৃতিগত পার্থক্য। বহরমপুর কলেজ কৃষ্ণনাথের নামে না হওয়াতে মনে কিঞ্চিৎ বেদনা থাকলেও দশের কাজে সহায়তা করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি বরং প্রতিষ্ঠানটি যাতে সর্বসাধারণের সহযোগিতায় বড় হতে পারে তার চেষ্টা করেছেন। তাঁর যুগের প্রত্যেকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যথা শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন ও এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমস্ত জমিই তাঁর দান, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন, রাজশাহী মাদ্রাসা, আলিগড় কলেজ, অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্যও তাঁর আর্থিক দানের অঙ্ক কম নয়। —এমনি আরও অজস্র ক্ষেত্রে তিনি দান করে গেছেন। মোটামুটি তাঁর দানের অঙ্ক পঞ্চাশ লাখ টাকার কম ত হবেই না, বেশি হওয়াই সম্ভব।

সাধারণ চাইলে পাওয়া যায় না, আবার ক্ষেত্রবিশেষে তা অযাচিত ও অজস্র হয়ে দাঁড়ায়। স্বর্ণময়ীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার তরফ থেকে ভারত সরকার তাঁকে মহারাণী খেতাব দিয়ে ক্ষান্ত হন নি, ১৮৭৮ সালে ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া খেতাব দিলেন (সি, আই,)। কৃষ্ণনাথের ছবি আমরা দেখতে পাই কিন্তু স্বর্ণময়ীর কোনো ছবি আজ পর্যন্ত কোথাও দেখি নি। এই থেকেই আমার মনে হয়েছিল, এর পেছনে কোনো রহস্য আছে কি? প্রসঙ্গতঃ কাশিমবাজারের বর্তমান বংশধর বন্ধুবর সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে একটি প্রশ্ন করেছিলাম—স্বর্ণময়ীর ত চতুর্দিকে এত দান, তিনি কখনও প্রকাশ্য কোনো সভায় বা উৎসবে উপস্থিত হন নি?

জবাবে সোমেন বললেন—না, তবে একবার তিনি সরকারীভাবে বাইরের লোকের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। আবশ্য একে পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স বলা যায় কি না সেটা বলা শক্ত। ১৮৭৮ সালে বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর কাশিমবাজারে এসেছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধিরূপে ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া মানপত্রটি মহারাণী স্বর্ণময়ীর হাতে দেবার জন্য। বিরাট দরবার কক্ষের মাঝ-বরাবর কারুকার্যখচিত মসলিনের হাল্কা পর্দার অপর পারে কালো গাঢ় শাদা কাপড়ের আবরণের তলা দিয়ে ধবধবে একজোড়া পা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পর্দার এপারে স্বর্ণময়ীর পরিচারিকা দাঁড়িয়ে। দেওয়ান আছেন, আছেন আরও অনেকে। উপস্থিত গণ্যমান্যদের মধ্যে ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। লেফটেনাণ্ট গভর্নর মানপত্র পড়ে শোনালেন, তার তর্জমা করে স্বর্ণময়ীকে শোনানো শেষ হওয়ার পর সাহেব যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত মানপত্রটি পর্দার সম্মুখে গিয়ে স্বর্ণময়ীর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলেন! স্তম্ভিত দরবার। অপর দিক থেকে স্বর্ণময়ী বললেন—মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন, গভর্নর জেনারেলকেও আমার ধন্যবাদ জানাবেন। আমি আপনাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। রাজা কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৮৭ সনের ক্যালকাটা রিভিউতে এই ঘটনার অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন।

কাশিমবাজার ভারতের মানচিত্রে একটি বিন্দুবৎ কিন্তু গুণমাহাত্ম্য তাতে ঢেকে থাকে না। স্বর্ণময়ীর ইচ্ছে ছিল মুর্শিদাবাদে মেয়েদের জন্য একটি ডাক্তারী, নার্সিং শিক্ষার কলেজ গড়ে' তোলেন কিন্তু সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলেন, কলেজ না হয় হ'ল কিন্তু সেখানে পড়তে আসবে ক'জন? স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল সামাজিক অবস্থা তখন সুদূর কল্পনা। কিন্তু সংকল্প যখন একবার করেছেন তখন পিছু হঠবেন কেন! জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি দিলেন। সব কথা জানিয়ে শেষে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কলকাতাই এর উপযুক্ত স্থান। অতএব স্বর্ণময়ী দেড় লক্ষ টাকা সরকারের হাতে তুলে দিতে চান, সরকার এই অর্থ গ্রহণ করে যেন তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী মেয়েদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়েন এই অনুরোধ।

স্বর্ণময়ীর চরিত্র বিচিত্র উপাদানে তৈরি ছিল। দেশের ও দশের কাজে উপযাচক হয়ে নিজের বিত্তকে উজাড় করে দিতেন কিন্তু যদি কেউ তাঁর সঙ্গে কূটকৌশল অবলম্বনের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করত তাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে দশভুজার মত অস্ত্র প্রয়োগে একটুও দ্বিধা করতেন না। কথায় কথায় সোমেন্দ্র একটি বৃত্তান্ত বলেন, স্বর্ণময়ী তাঁর জামাতাকে একটি জমিদারী পত্তনী দিয়েছিলেন। এই পত্তনীর একটি শর্ত ছিল, যদি জামাতা স্বর্ণময়ীর কন্যাকে কোনোদিন ত্যাগ করেন অথবা কন্যার মৃত্যু হয় তাহলে ওই জমিদারী স্বর্ণময়ীকে ফেরৎ দিতে হবে। কিছুকাল পরে স্বর্ণময়ীর মেয়ে কাশিমবাজারে আসেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এবার জমি নিয়ে জামাই টালবাহানা শুরু করেন। তিনি বলেন, শাশুড়ি এই সম্পত্তি ফেরৎ পেতে পারেন না কারণ মেয়ে ত তাঁর মায়ের কাছে এসে মারা গিয়েছে। স্বামীর কাছে থাকলে এই মৃত্যু না-ও ঘটতে পারত— অতএব সম্পত্তি ফেরৎ চাওয়া স্বর্ণময়ীর উচিত নয়। অবশ্য স্বর্ণময়ী জামাইএর এই আবদার অগ্রাহ্য করলেন। তখন জামাই উপায়ান্তর না দেখে বর্ধমানে পঞ্চাশ বিঘে জমি চাইলেন এবং প্রত্যাখ্যাত হলেন।

আর একটি ঘটনা ঘটে মণীন্দ্রচন্দ্রকে নিয়ে। কৃষ্ণনাথের ভাগনে হিসেবে তিনিই হবেন স্বর্ণময়ীর পরে কাশিমবাজারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তিনি কলকাতায় থাকাকালে রাজা হরিনাথের উইল অনুযায়ী তিনশ টাকা মাসোহারা পেতেন এছাড়া মাতুলানী স্বর্ণময়ী দিতেন দু'শো টাকা। মণীন্দ্রচন্দ্রের কিছু পরামর্শদাতা জুটেছিল, তাঁদের উস্কানীতে মণীন্দ্র বললেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে এত বড় সম্পত্তি ঠিকমত দেখাশোনা করা সম্ভব নয়। পাঁচজনে তাঁকে ঠকিয়ে সম্পত্তির ক্ষতি করতে পারে এ আশংকা হচ্ছে। অতএব সরকার থেকে একজন তদারকারী রাখা হোক। মামীমা ত চিরকাল বাঁচবেন না, ভবিষ্যতে যাতে মণীন্দ্রচন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত না হন, এই জন্যই এই ব্যবস্থা দাবি করতে পারেন। মনোগত উদ্দেশ্য কাজে রূপায়িত করার জন্য তিনি কলকাতা ছেড়ে বহরমপুরে এসে বসলেন। বহরমপুরে তাঁর সহায় ও মন্ত্রণাদাতা হলেন বৈকুণ্ঠনাথ সেন। আসলে এস্টেটের ম্যানেজার শ্রীনাথ পালকে স্বর্ণময়ী একটু বেশি স্নেহ করতেন এবং ভাগনে মণীন্দ্রের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল হয়ত শ্রীনাথ পালকেই স্বর্ণময়ী সম্পত্তি দেবেন দত্তক হিসেবে গ্রহণ করে। সৈদাবাদে বিরাট একটি বাড়িও শ্রীনাথ বাবুকে স্বর্ণময়ী উপহার দিয়েছিলেন—এই থেকেই আশঙ্কার উৎপত্তি। মণীন্দ্র বহরমপুরে আসার পরই স্বর্ণময়ী মাসোহারা বন্ধ করে দিলেন।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

সমালোচনা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

জীবনের গতি-প্রকৃতি বড় বিচিত্র। আরও বিচিত্র মনের চলন, বলন। মন-মানসের এই চলন-বলনকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যিকদের যত ঘোরাফেরা, যত কেরামতি। জীবনের অফুরন্ত গতি-শীলতার কথা মনে রেখে চিরায়ত সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ যারা অনুভব করেছিলেন, চল্লিশ দশকের লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আলোচ্য বইটি লেখকের 'সমগ্র রচনাবলী'র দ্বিতীয় ন্ড। এতে স্থান পেয়েছে দুটি উপন্যাস—চনামহল' ও দেহমন। আর আছে চড়াই রোই—কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন, বং লেখকের স্মৃতি চিন্তা। প্রসঙ্গতঃ ল্লেখযোগ্য, উপরোক্ত দুটি উপন্যাসই ায় সমসাময়িক, রচিত হয়েছে পঞ্চাশ শকের গোড়ার দিকে।

চেনামহল ও দেহমন, দুটিরই প্রধান পজীব্য বিষয় সমাজ বহির্ভূত প্রেম। প্রম তখনই সমাজ বহির্ভূত যখন সামাজিক নুশাসন ঐ প্রেমের গতি-প্রকৃতির প্রতি ক্ত চক্ষু। এই প্রেমের পাত্র-পাত্রী কখনও াই বোন, কখনও যুবক ও বিধবা যুবতী া স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা কিম্বা কোন ববাহিত পুরুষ ও হতাশাগ্রস্তা নারী। াঠকের অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠার আগেই লখক এই প্রেমের গতিকে নির্দিষ্ট পরিণতিতে টেনে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। অসামাজিক প্রেমের মহিমা যেন তার সমাধিতে। তাই দেখতে পাই নরেন্দ্রনাথের নায়ক বা নায়িকা শেষ কথা বলার প্রাক মুহূর্তে হয়ে ওঠে চঞ্চল, অস্থির বা নবজা। পলায়নী সিদ্ধান্তের দিকেই যেন তাদের বেশী ঝোঁক। অরুণ, বিজু বা বী অন্তত সে কথাই প্রমাণ করে। কিন্তু পালিয়ে গিয়ে জীবন থেকে কি মুক্তি পাওয়া যায়? নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস তেন.... কোন একটি মুহূর্তকে—নুষের চরিত্রের একটি মরবিড ট্রেটকে কোন একটি ক্ষুদ্র দোষকে তার সমস্ত জীবন বলে প্রতিভাত করবার শক্তি আমাদের যত বেড়েছে, সমগ্রভাবে গভীর ব্যাপক বৈচিত্র্যময় জীবনকে রূপায়িত করে তোলার শক্তি তত হ্রাস পেয়েছে (পৃঃ ৬৩৫) এই বিশ্বাসের ছাপ অবশ্য লেখকের রচনায় অনেকাংশে লুপ্ত। টোটাল লাইফ স্ট্রীম-এর কথা মনে রেখেও তিনি প্রেমের অপমৃত্যু ঘটালেন। উচ্চৈঃ স্বরে কখনও বললেন না প্রকৃত প্রেম সামাজিক বিধি বাঁধনের অনেক উর্ধ্বে, তার কখনও মৃত্যু হয় না, বরং রূপান্তর ঘটে। তাছাড়া, লেখক তাঁর চরিত্রগুলিকে নির্দিষ্ট স্বল্প পরিসর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন, ছড়িয়ে দেন নি বাইরের খোলা পৃথিবীতে। ফলে ঘটনা-প্রবাহ রূপান্তর শ্রেণী [illegible] চরিত্রগুলি যেন সময় সময় জীবন বিমুখ। উপন্যাসের শিল্পিত আবেগের বশে যে-সব চিরন্তন জীবন সমস্যার সমাধানের কথা বলার ছিল, তা বলা হয় নি। তাই নরেন্দ্রনাথের রচনা নিছক উপন্যাস হয়ে গেছে, কালজয়ী পর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি।

ছোট গল্পের জগতে নরেন্দ্রনাথের মুন্সিয়ানা অবশ্য যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। ছোটখাট ঘটনা, সাধারণ চরিত্র—এইসব নিয়েই তিনি ভেলকি দেখান স্বল্প-পরিসরে। মনে হয় উপন্যাসের নরেন্দ্রনাথও ছোট গল্পের নরেন্দ্রনাথ, দুটি ভিন্ন সত্তা, দুটি বিপরীতমুখী বক্তব্য। ছোট গল্পে তিনি দ্রুত ছুটে চলেন, সহসা থমকান, মুহূর্তে পাঠককে তুলে নিয়ে যান ক্লাই-ম্যাক্সের শিখরে কখনও এ্যান্টি ক্লাই-ম্যাক্সের অতলে। রস গল্পটি লেখকের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। 'মোতালেফ', 'মাজু খাতুন' আর 'ফুলবানু'কে নিয়ে যে হৃদয় দ্বন্দ্ব, খেজুর রসকে ঘিরে রূপাসক্তির সঙ্গে জীবিকার যে সংঘাত পাঠকের মন কেড়ে রাখার পক্ষে তা যথেষ্ট। লেখকের আরেকটি কুশলী সৃষ্টি হল 'জৈব', যদিও গল্পটি সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক। এই গল্পের নিপুণ ঘটনাপ্রবাহ ও অদ্ভুত পরিণতি, সার্থক এ্যান্টিক্লাইম্যাকসের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। এছাড়া 'হেড-মাষ্টার' 'হেড মিস্ট্রেস' বা 'অবতরণিকা' নিজ গুনেই এক একেকটি সানন্দ সংবাদ। 'চড়াই উৎরাই' অবশ্য পাঠককে নিয়ে যাবে কোন এক সমতলে, যেখানে সে হবে বিস্মৃত প্রায় অতীতের মুখোমুখি। হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে হারিয়ে যাওয়া মনসীর সঙ্গে। না, নিজের সক্ষম পৌরুষের প্রতি ক্ষোভ অথবা উদ্বেল আবেগের ঝাপটা এসে পড়ার আগেই লেখক পাঠককে সরিয়ে নিয়ে আসেন তার নিস্তরঙ্গ বর্তমানে যেখানে উত্তাপ কম। কম বেদনাও।

অতীত ও বর্তমান, স্মৃতি ও সত্তা—এই দুয়ের সহযোগ বা সংঘাত সকলের জীবনেই ঘটে থাকে। ঘটেছিল নরেন্দ্রনাথের জীবনেও। পথ-চলতি পথিকের মত চলার গতি হঠাৎ স্তব্ধ করে পিছন পানে তাকিয়ে-ছিলেন তিনি। তার প্রমাণ 'আত্মচিন্তা'। চোখে ভেসে উঠেছিল একটি শবযাত্রা, ফুলে ফুলে ঢাকা এক নারী দেহ, মুখে প্রশান্তির ছাপ। ইনি ছিলেন নরেন্দ্রনাথের মা। লেখক তখন শৈশবে। কে জানে! মায়ের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক প্রশান্তির চাবিকাঠিও হয়তো লেখকের জীবন থেকে হারিয়ে গেল। তাই বোধহয় এত প্রশ্ন, এত আব্দার বা প্রত্যাশা তাঁর 'বাবা' কিম্বা 'অন্য-মা'-এর প্রতি।

যে প্রশ্ন শৈশবে কারও সামনে রাখতে পারেন নি, সেই প্রশ্নই মহীরুহ-প্রমাণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে লেখকের সামনে, তাঁরই প্রাপ্তবয়সে। জবাবের তাগিদে তিনি পৌঁছতে চেয়েছেন [illegible] সীমানা ছাড়িয়ে সেই উচ্চতার শিখরে থেকে 'সমগ্র জী[illegible] উপলব্ধি করা যায়। 'আজকালকার গল্প-উপন্যাস জীবনের কোন একটি সময়কে আমরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে চাই এই সময়টুকুই সমগ্র জীবন, এই সাময়িক বেদনা বা ব্যর্থতাই চরম। শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে যত চমৎকারিত্বই এই প্রতিভাসের থাকুক, একেক সময় মনে হয় জীবন সম্বন্ধে এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে ত্রুটি আছে। এই দর্শন জীবন সম্বন্ধে হয়তো সম্পূর্ণ সত্য কথা বলছে না।' লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গীর কতখানি প্রতিফলন তাঁর উপন্যাসে হয়েছে, এ প্রসঙ্গে অবশ্যই বিতর্কের অ[illegible] আছে। তাছাড়া কিছু কিছু অবাঞ্ছিত মুদ্রণ প্রমাদ চোখে পড়ল! সূচীপত্রে 'চড়াই উৎরাই' পর্যায়ের ছোট গল্পগুলির নামের অনুপস্থিতি ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্তী সংস্করণে সম্পাদক নিশ্চয়ই এগুলি সম্পর্কে সচেতন হবেন।

রাজেন্দ্রসুন্দর সরকার

নরেন্দ্র মিত্র রচনাবলী। দ্বিতীয় খন্ড। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০৭৩। পৃষ্ঠা ৬৪২। দাম কুড়ি টাকা।

আদি বাঙলা গদ্য

সব ভাষাই আদিতে চলতে শুরু করে-ছিল পদ্যে। বাংলাও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু বাংলা গদ্যের শুরু কবে থেকে এ-নিয়ে বিতর্কের অন্ত ছিল না। একসময় ধারণা ছিল, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা গদ্যের পথ পরিক্রমার সূচনা। ধারণা বদল হয়েছে। বহু নথিপত্রের সাহায্যে সাহিত্যের গবেষকরা দেখিয়েছেন, তার প্রায় দুশ বছর আগে গদ্যের প্রচলন ছিল। দলিল-দস্তাবেজ বা চিঠিপত্রের ভাষা তখন ছিল গদ্য। আর নিয়মিতভাবে গদ্যরচনার শুরু ফোর্টউইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। তারও আগে পর্তু-গীজ পাদরীরা কিছু প্রচারমূলক বই রচনা করেছিলেন। কিন্তু ছাপাখানার অভাবে সেগুলি ঠিকমত ছাপা হয়নি। শ্রীরামপুর মিশনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার আর ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় ভাষা অভিজ্ঞ সিভিলিয়ান তৈরি করা। গদ্যে নিয়মিত বই লেখার সূচনাও এই সময় থেকে। বাংলা ভাষা লেখা এবং বই লেখার প্রয়োজনে ইংরেজদের সঙ্গে বাঙ্গালী পণ্ডিতদের মিলন ঘটেছিল। মিশনারীরা

বাঙ্গালী পণ্ডিতদের কাছে বাংলা শিখেছিলেন। সেরকম বাংলা শেখাবার স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন রামরাম বসু। শ্রীরামপুর মিশনের পাদরী উইলিয়ম কেরী ছিলেন ফোর্টউইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বাংলা বই তিনি লিখিয়েছিলেন সহকর্মী বাঙ্গালী পণ্ডিতদের দিয়ে। সেসব বইয়ের মধ্যে ছিল রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) এবং 'লিপিমালা (১৮০২), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), রাজাবলি (১৮০৮), হিতোপদেশ (১৮০৮) প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩), তারিণীচরণ মিত্রের ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (ঈশপের গল্পের অনুবাদ, ১৮০৩), চণ্ডীচরণ মুনশীর (তোতা ইতিহাস, ১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র (১৮০৫), রামকিশোর তর্কচূড়ামণির হিতোপদেশ (১৮০৮), মোহনপ্রসাদ ঠকুরের ভোকাবুলারি বেঙ্গলী অ্যান্ড ইংলিশ (১৮১০) এবং হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)। কেরী নিজে লিখেছিলেন 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৮০১), কথোপকথন (১৮০১), ইতিহাসমালা (১৮১২) এবং 'এ ডিকশনারী অফ দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৮১৫-২৫)। কলেজের শিক্ষক না হলেও গোলকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০২) সমাদৃত হয়েছিল।

বাংলা গদ্যের আদি ইতিহাস, তার বিবর্তনের চরিত্র জানতে এসব বই-এর গুরুত্ব অসীম। একালের পাঠকের কাছে তার আকর্ষণ হয়ত তেমন নেই, কিন্তু গবেষকদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। বেশ কিছুকাল আগে সজনীকান্ত দাস এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এরকম বেশ কিছু বই নতুন করে ছাপিয়েছিলেন। সেসবও পাওয়া যায় না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'পুরাতন বাংলা গদ্য-গ্রন্থ সংকলন' প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে সম্প্রতি। এই খণ্ডে মোট নয়খানি বই সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ ছাপা হয়েছে। ছাপা বইগুলি হল : 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' 'কৃপা শাস্ত্রের অর্থভেদ', 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', 'লিপিমালা', 'হিতোপদেশ', কথোপকথন', ইতিহাসমালা', 'বাত্রিশ সিংহাসন' আর 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'। সুদীর্ঘ ভূমিকায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ের বিবরণ দিয়েছেন। বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনশ চারশ বছর আগেকার বাংলা গদ্যের। সংকলনে ছাপা বইয়ের লেখকদের সম্পর্কে বক্তব্য, রচনা পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক বহু তথ্য রয়েছে। তিনি বলেছেন, ...এই কালের গদ্যভাষা ও পুস্তক-পুস্তিকার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু-চার কথা আলোচনা করলাম। যাঁরা এই পূর্ব নিয়ে গবেষণা করে থাকেন, তাঁরা আমার এ আলোচনার উদ্দিষ্ট নন, কারণ এ-সব কথা তাঁদের অজানা নয়। এই যুগের গদ্য সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করার জন্য প্রথম খণ্ডে এই ক'খানি গ্রন্থের কথা আলোচনা করেছি। ঘোষণা থেকে জানা গেছে দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট', 'তোতাকাহিনী', 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র', 'পুরুষ পরীক্ষা!' 'বেদান্তসার', 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ', 'স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক', 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু বিলাস', 'নর্ববিবিবিলাস' আর 'দূতীবিলাস'। এগুলিও প্রাথমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ রচনা। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বইগুলি সম্পাদনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করে প্রতিটি বাঙ্গালীর সাধুবাদ পাবেন। কিন্তু অংশবিশেষ না ছেপে, সম্পূর্ণ অংশ ছাপা হলে বইগুলি পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে। সম্পাদব এ ব্যাপারে আশা করি বিবেচনা করবেন।

কমল চৌধুরী

পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন (১ম খণ্ড) —অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। শৈব্যা পুস্তকালয়। ৮।১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-৭৩। দাম পঁয়ত্রিশ টাকা।

সঙ্গীত

শ্রীযুক্ত শক্তিপদ ভট্টাচার্যর "তান-আলাপ" তথা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ রূপায়ণ, স্বরবিস্তার ও সুরের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনার বইটি শিল্পী, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষক সকলেরই কাজে লাগবে একাধিক কারণে। প্রথমতঃ আশীটি রাগ-পরিচয় (আলাপসহ তান) এবং চল্লিশটি তালের মাত্রা, বিভাগ, তালি খালিসহ তাললিপিতে গতানুগতিক রাগ ও তাল বিশ্লেষণ ছাড়াও যে অভিনব বস্তুটি উপরিপাওনা হিসেবে মেলে সেটি হল রাগ ও তালের কাঠামোর বাইরে তাদের মেজাজ, রসরূপ, ভাবকল্পনার রঙিন বাহার, গতিছন্দের কাব্যসুষমা। সুর, লয়, স্বরস্থান, গতি ঠেকা সবকিছুর বাঁধন শাসনকে মেনে নিয়েও সকল বন্ধনমুক্ত অনির্বচনীয় রূপ সৃষ্টির ইঙ্গিতও রয়েছে প্রতিটি রাগের চরিত্র বর্ণনা ও তালের চলার ছন্দের বিচিত্র নক্সাকে স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যার দক্ষতায়।

এছাড়া প্রতিটি রাগ বিশ্লেষণের সময় কিভাবে কোন পর্দার ওপর দাঁড়ালে তার মর্মবাণীটিকে মূর্ত করা যায় কিংবা কোন রাগে কোন পর্দা কোন কৌশলে প্রয়োগে তার সৌন্দর্যসৃষ্টির সহায়ক হয়ে ওঠে তারই সহজ ও সংক্ষিপ্ত নির্দেশে এবিষয়ে গ্রন্থকারের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে। এ দৃষ্টি সহজাত সঙ্গীতবোধের সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষা, অভিনিবেশ ও দীর্ঘকালের গবেষণারই ফলশ্রুতি।

এই অন্তর্দৃষ্টির জন্য আছে বইটির নামকরণেও। "তান-আলাপ"। তান ও আলাপ এই দুইএর সু-সম মিলনেই রাগের যথার্থ রূপবিকাশ ঘটে। এই দুটি অঙ্গের প্রকৃতি ও আঙ্গিক সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। আলাপ হল অনিবন্ধ সঙ্গীত, তান তাল ও লয়ে নিয়ন্ত্রিত সঙ্গীত। এই দুটির মিলনেই রাগের পূর্ণ বিস্তারের সমৃদ্ধ রূপটি পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সেই কারণেই শ্রদ্ধেয় শক্তিপদ ভট্টাচার্য মহাশয় তান আলাপ নামের মধ্যেই হিন্দুস্থানী ও রাগসঙ্গীতের বৈচিত্র্যময় রূপটি মেলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য কবিগুরুসৃষ্ট কয়েকটি তালের ঠেকা, বোল, মাত্রার আলোচনায় তাঁর উদার পাণ্ডিত্য ও এবিষয়ে সুবিস্তৃত জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

রাগগুলির পরিচয়পর্বের প্রথমেই দীন-দয়ালের দুই চরণের জোহার প্রতিটি রাগের ঠাট, আরোহী-অবরোহী, বাদী-সমবাদী থেকে সুরু করে বর্জিত স্বর জাতির উল্লেখ শিক্ষার্থীদের পক্ষে রাগরূপ স্মরণে আনা সহজ করবে।

এই বইটির যে দিকটি আমার সবচেয়ে আকৃষ্ট করে সেটি হল শিক্ষার্থীদের রাগ-সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে, ভাবের বিকাশ ঘটে তাদের শিল্পবোধ গড়ে ওঠে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এতগুলি গুণের এমন সমন্বয় দুর্লভ বলেই বোধহয় এত তাড়াতাড়ি এই বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল।

সন্ধ্যা সেন

তান-আলাপ। শক্তিপদ ভট্টাচার্য। প্রকাশক। শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাগ-মালঞ্চ, ৮২।২ বিধান সরণী কলকাতা

জ্যোতিষ

কোন জ্যোতিষ-চর্চার পত্রপত্রিকা বেশ কিছুদিন আগে বেরোত না। এখন বেরোয়। একাধিক। অনেকগুলিই মাসিক। এদের মধ্যে বিশেষ একটা স্থান করে নিয়েছে রাজ-জ্যোতিষী। জ্যোতিষ চর্চাকারীরা এতে অনেক কিছুই পান। দামী, চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তু সব। এ-সংখ্যাটিও পত্রিকাটির গত ২।১ বছরের গড়ে তোলা সুনামকে অব্যাহত রেখেছে। সু-সম্পাদনার দ্বারা, মূল্যবান কয়েকটি প্রবন্ধের সাহায্যে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরীর আমার অভিজ্ঞতায় ভৃগু-সংহিতা, অজিত সেনের ভাবাধিপতিত্ব প্রসঙ্গে। মাসিক রাশিফল বিভাগটি বিস্তৃত, ভাবেই পাঠকের আগ্রহ মেটাবে। প্রশ্নোত্তর বিভাগটি আকর্ষণীয়।

গৌতম ভট্টাচার্য

রাজ জ্যোতিষী। মার্চ, ১৯৭৯। সম্পাদক—শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী। ১।২এ, নীলা-ম্বর মুখার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৪ থেকে প্রকাশিত। ২ টাকা।

আবার পদস্খলন

অজয় বসু

টেবিলের ধারে আবার পদস্খলন।

বিশ্ব টেবল টেনিসের আসর পিয়ংইয়াং শহরের ইনডোর স্টেডিয়ামের কাঠের মেঝেটা ছিল বুঝি বড্ডই পিচ্ছিল। দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে ভারতীয় তরুণেরা সেখানে দাঁড়াতেই পারেন নি। অপ্রকৃতিস্থের মতো টলে পড়ে ভূমিশয্যা নিতে বাধ্য হয়েছেন। অবস্থা রীতিমত বেহাল।

অনুপাতে ভারত-ললনাদের ভূমিকা ছিল অনেক ভাল। কিছুটা আশাপ্রদ বৈকি। ঝকঝকে মেঝেতে পালিশের ছোপছাপ যতো ঘন করেই আঁকা হয়ে থাকুক না কেন, আমাদের মেয়েরা কিন্তু পায়ের নীচে শক্ত জমির সন্ধানে জেনে নিতে পেরেছিলেন। ক্রীড়াগত সামর্থ্যের কড়ি ফেলে তাঁরা এগিয়েছেন সামনের পানে। আর ছেলেরা পিছু হটতে হটতে আরও তলায় তলিয়ে যেতে বসেছেন।

বিশ্ব টেবল টেনিসে দলগত বিভাগের বিন্যাস দ্বি-স্তর। ওপরতলায় খেলে অপেক্ষাকৃত শক্তিধর আঠারোটি দল। নীচের তলায় দাপেন প্রতিযোগী ষোলটি। ভারতের ঠাঁই ছিল নীচের মহলে। পিয়ংইয়ংয়ের আসরের ফলাফলের মূল্যায়নে ভারত পুরুষ বিভাগে চতুর্বিংশতিতম এবং মহিলা মহলে অষ্টাদশ প্রতিযোগীর স্বীকৃতি পেয়েছে। এর আগের অনুষ্ঠানে ছেলের দলের স্বীকৃতি ছিল একবিংশতিতম এবং মেয়েদের ত্রয়োবিংশতিতমের কাজেই দেখা যাচ্ছে যে পরের অনুষ্ঠানে মেয়েরা প্রথম স্তরে খেলার অধিকার অর্জন করেছেন। কিন্তু ছেলেরা সেই তিমিরেই গা ঢাকা দিয়ে রয়ে যেতেই বাধ্য হলেন।

বিশ্ব টেবল টেনিসের দলগত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মেয়েরা নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন তো ঘটিয়েছেনই। তাছাড়া সাম্প্রতিক কালে তাঁরা এমন আরও কিছু করতে পেরেছেন [illegible]। যেমন বলা যেতে পারে [illegible] এশীয় টেবল টেনিসে ইন্দু পুরীর কীর্তির কথা। ইন্দু সেদিন তদানীন্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উত্তর কোরিয়ার পক ইয়াং সুনকে নতি স্বীকারে বাধ্য করান। অনগ্রসর ভারতের কোনো প্রতিনিধির পক্ষে বিশ্ব শ্রেষ্ঠকে পরাজিত করা যে এক বিরাট সাফল্যের পরিচায়ক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওই ইন্দু পুরী ও শৈলজা সালোখেকে নিয়ে গড়া ভারতীয় মহিলা রেল দল বিশ্ব রেলওয়ে টেবল টেনিস প্রতিযোগিতাতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।

পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের সাফল্যের এই সব নজির কতোটা গুরুত্ব পেয়েছে জানি না। তবে আন্তর্জাতিক মানের নিরিখে আমাদের দেশের মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে যে এগিয়ে যেতে পেরেছেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ছেলেরা তো প্রতি বছরই বিশ্ব টেবল টেনিসে যোগ দেওয়ার অধিকার পাচ্ছেন। এমন নিরবচ্ছিন্ন অধিকার মেয়েদের [illegible] প্রসারিত হয় না। মেয়েরা খেলতে পারে না তাদের ক্রীড়ামান অনুন্নত, এই অজুহাতে পঞ্চাশ-ষাটের দশকে মহিলা দলকে বিশ্ব টেবল টেনিসের আসরে পাঠানো হয় নি। এই সব অনেকো অজুহাত যে কতো অবিশ্বাস্য, নিজেদের চেষ্টাতেই মেয়েরা তার অকাট্য প্রমাণ ধরে রাখছেন।

এককালে বিশ্ব টেবল টেনিসে পুরুষদের দলগত বিভাগের প্রথম স্তরে খেলার অধিকার পেত মাত্র এক ডজন দল। ভারতও এক সময় সেই স্তরে নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছিল। ডর্টমুন্ডে বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় ভারত দশম শ্রেষ্ঠের আসনও পেয়েছিল। ১৯৬৩ সালে ভারতীয় টেবল টেনিস ফেডারেশন স্বদেশে স্যান্ডউইচ ব্যাট ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পর থেকে ভারতীয় খেলার মান নীচের দিকে নামতে থাকে। অন্যত্র কোথায়ও এই ব্যাট ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নি। বরং এর ব্যবহার বেড়েই চলছিল। স্যান্ডউইচ ব্যাটে অনভ্যস্ত ভারতীয়েরা স্যান্ডউইচ ব্যাটধারীদের বিরোধিতায় ক্রমশই দিশেহারা হয়ে পড়তে থাকার ১৯৬৫তে ভারত পঞ্চদশ এবং ১৯৬৭তে সপ্তদশ স্থানে গড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

অবিবেচক নীতি সংশোধন করে ফেডারেশন স্যান্ডউইচ ব্যাটের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় তরুণদের খেলার মান কিছুদিনের জন্যে উন্নয়নমুখী হয়েছিল বটে। কিন্তু বছর কয়েক বাদে আবার অবস্থার অবনতি ঘটে। ১৯৭৫ সালে কলকাতায় বিশ্ব টেবল টেনিসের অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রথম স্তরের দরজা যখন ষোলটি দলের জন্যে খুলে দেওয়া হয় তখন ভারত খেলেছিল প্রথম বিভাগেই। কিন্তু সেখানকার আসনটি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে নি। ফলে আবার নীচের মহলে নামতে হয়। বর্তমানে সেই ক্রমাবনতির পালাই চলছে। নামতে নামতে বর্তমানে গড়িয়ে পড়েছে চতুর্বিংশতিতম আসনে।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা লাভের কল্যাণে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ক্রীড়ামানের উন্নতি ঘটে। কিন্তু ভারতীয় তরুণদের [illegible] তা বুঝি হবার নয়। তাঁরা আন্তর্জাতিক আসরে উপস্থিত থাকার সুযোগ পাচ্ছেন যতোই ততোই বুঝি তাঁদের ক্রীড়ামানের অবনতি ঘটছে।

টেবল টেনিস আমাদের দেশে ফুটবল ক্রিকেটের মতো বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় খেলা নয় বটে। তবু এদেশীয় টেবল টেনিস খেলোয়াড়েরা বিদেশে খেলা এবং বিদেশীদের সঙ্গে খেলার অবাধ সুযোগ দীর্ঘদিন ধরে পেয়ে আসছেন। এমন সুযোগ অন্য অনেক বিভাগের খেলোয়াড়েরা বড় একটা পান নি এবং পান না। কিন্তু এমন অবাধ সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্বেও ভারতীয় তরুণেরা তাঁদের খেলার ছবি ফেরাতে পারেন নি। স্বদেশে অধুনা নগদ অর্থে পুরস্কার দেওয়ার রেওয়াজ চালু হওয়ায় তাঁদের সুবিধা আরও বেড়েছে। কিন্তু কিছুতেই তাঁরা যেন খেলায় সুবিধে করতে পারছেন না।

টেনিসের ধারে দাঁড়াতে গিয়ে ভারত বেসামাল হয়ে পড়ছে। অথচ বড়সড় প্রতি-

যোগিতা, যায় বিশ্ব টেবিল টেনিস উপলক্ষে ডজন ডজন টেবিল পেতে অনুষ্ঠান কেন্দ্র সাজাতে ভারতের আগ্রহে কমতি পড়ছে না। বড় গাছে মই বাঁধার সাধ আছে। কিন্তু খেলা বড় হওয়া এবং ভারতীয় ক্রীড়ার ভাবমূর্তিকে বড় করে তুলে ধরার সাধ্য নেই। বড় বড় আসর পাতবো, ঘুরবো দেশ বিদেশ, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থার কর্তাব্যক্তির পদ অলংকৃত করবো, এই মনোভাবের পাথেই যেন ভারতীয় টেবিল টেনিস জগৎ নামখৎ লিখে বসে আছে। খেলতে না পারলে এ সব বিলাসিতা যে মানায় না, এই বোধটুকুর কোনো তাগিদই নেই।

খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা বছর বছর বিদেশ যান। দেখেন অনেক কিছু। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। খেলোয়াড়রা যা দেখেন তা থেকে কি কিছু শিখতে পারেন? না, শিখতে চান? শেখার ইচ্ছে থাকলে, শেখায় নিষ্ঠা থাকলে তাঁদের নিয়মিত বিদেশ সফর এমন নিষ্ফল হবে কেন? এবং তাঁরা দিনে দিনে কেনই বা পিছিয়ে পড়বেন? আরও প্রশ্ন, পশ্চাদপসরণ ও অধঃপতন যদি অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবীই হয়, তাহলে ওঁদের প্রতি বছর বিদেশে পাঠানোই বা হয় কেন?

এর ওপর আর এক উৎপাত—ভারতীয় টেবিল টেনিস জগতের আন্তর্কলহ। সে যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া। কর্মকর্তাদের সঙ্গে খেলোয়াড়দের বিরোধ। সে বিরোধ এমনই তীব্র যে আগের বছর জাতীয় প্রতিযোগিতার সময় কর্মকর্তারা জনকয়েক খেলোয়াড়কে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেন। প্রশাসক বনাম খেলোয়াড়দের মতবিরোধের এমন শোচনীয় ও করুণ পরিণতি বিশ্বে আর কোথায় কোনোদিন ঘটেছে কিনা সন্দেহ। নজিরবিহীন এই নজির। দেখেই বোঝা যায় যে ভারতীয় টেবিল টেনিস কী এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে।

এই পরিস্থিতিতে আসল খেলাটা যে ফাঁকিতে পড়ে থাকবে তা আর এমন বেশি কথা কী! খেলোয়াড়রা ঝগড়া বাঁধিয়ে ফয়দা তুলতে এবং বিদেশ বিহার করতে ও গদী আঁকড়ে বসে থাকতে। এমতাবস্থায় খেলার মান যে পড়ে পড়ে মার খাবে তাতে আশ্চর্য হবার কীই বা আছে!

খেলা

টমাস কাপ ব্যাডমিন্টন

জাকার্তায় একাদশ টমাস কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। ইন্টার-জোন সেমিফাইনালে ডেনমার্ক ৫-২ খেলায় ভারতকে এবং ইন্দোনেশিয়া ৯-০ খেলায় জাপানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। ভারতের বিপক্ষে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ান ডেনমার্ক প্রথম দিনে ৩-১ খেলায় এগিয়ে ছিল। ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান প্রকাশ পাডুকোন অপ্রত্যাশিতভাবে ১৫-১০ ও ১৮-১৫ পয়েন্টে ডেনমার্কের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান মর্টেন ফ্রস্টকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় দিনে ডেনমার্ক আরও চারটে খেলায় জয়ী হয়। অপরদিকে ভারতের ডাবলস জুটি পার্থ গাঙ্গুলী এবং প্রদীপ গান্ধে প্রথম রিভার্স ডাবলসে জয়ী হন।

এখানে উল্লেখ্য, দলগত টমাস কাপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার বিগত দশটি আসরে ইন্দোনেশিয়া ৬বার এবং মালয়েশিয়া ৪বার টমাস কাপ জয়ী হয়। প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৪৯ সালে। দু বছর অন্তর প্রতিযোগিতার আসর বসে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছর ১৯৪৯ সাল থেকে মালয়েশিয়া উপর্যুপরি তিনবার (১৯৪৯, ১৯৫২ ও ১৯৫৫) টমাস কাপ জয় করে। এরপর ইন্দোনেশিয়া টমাস কাপ জয়ী হয় উপর্যুপরি তিনবার (১৯৫৮, ১৯৬১ ও ১৯৬৪)। মালয়েশিয়া ১৯৬৭ সালের ফাইনালে ৪-৩ খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে হারিয়ে চতুর্থবার টমাস কাপ জয়ের গৌরবলাভ করে। ১৯৭০ সাল থেকে ইন্দোনেশিয়া টমাস কাপ জয়ী হয় উপর্যুপরি তিনবার (১৯৭০, ১৯৭৩ ও ১৯৭৬)।

ফেডারেশন কাপ ফুটবল

গৌহাটির নেহরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত তৃতীয় ফেডারেশন কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ৩-০ গোলে বোম্বাইয়ের হারউড ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান মফৎলাল স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করে। প্রথম দিনের খেলা ২-২ গোলে ড্র ছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় মফৎলাল স্পোর্টস ক্লাবের তিনজন নামী খেলোয়াড় অসুস্থতার কারণে অংশগ্রহণ করেননি। ফলে বর্ডার সিকিউরিটি দলের পক্ষে জয়লাভ খুবই সহজ হয়। এখানে উল্লেখ্য, প্রাথমিক লীগের খেলায় মফৎলাল স্পোর্টস ক্লাব ১-০ গোলে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে হারিয়েছিল। গত বছরের ফেডারেশন কাপের যুগ্ম-বিজয়ী মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এ বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবও শেষপর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেনি। ফলে এবারের প্রতিযোগিতার আসরটা ছিল শিবহীন যজ্ঞ।

জাতীয় সাব-জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা

গৌহাটির নেহরু স্টেডিয়ামে তৃতীয় সাব-জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে আসাম ৩-০ গোলে গতবারের বিজয়ী কর্ণাটককে পরাজিত করে ইকবাল হোসেন ট্রফি জয়ী হয়েছে। আসামের পক্ষে এই ট্রফি জয় এই প্রথম। সেমি-ফাইনালে আসাম ২-০ গোলে বাংলাকে এবং কর্ণাটক ১-০ গোলে উত্তর প্রদেশকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

ইংলিশ এফ এ কাপ

লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইংলিশ এফ এ কাপের ফাইনালে আর্সেনাল ৩-২ গোলে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে মোট পাঁচবার এফ এ কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। স্টেডিয়ামে ৯০ হাজারের বেশী দর্শক উপস্থিত ছিলেন। আর্সেনাল শেষ কাপ জয়ী হয়েছিল ১৯৭১ সালে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

কলকাতায় আই এফ এ পরিচালিত প্রথম বিভাগের লীগ খেলা মে ৭ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। কলকাতার তিন প্রধান দল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং খেলতে নেমেছে কিছুটা পরে। মহমেডান স্পোর্টিং মে ২১, ইস্টবেঙ্গল মে ২২ এবং মোহনবাগান মে ২৩ তারিখে তাদের প্রথম ম্যাচ খেলে। এই তিন প্রধানের খেলা দেখতে মাঠের ভিড় উপচে পড়ছে, কিন্তু খেলা এখনও জমেনি। খেলা দেখে সমর্থকদের মন ভরছে না। অন্ধ সমর্থকদের কথা আলাদা। কোনরকমে দলের জয় হলেই তাঁরা খুশী।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান তিনটে খেলে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তারা ভ্রাতৃ সংঘকে ১-০ গোলে, উয়াড়ীকে ৩-০ গোলে এবং কুমারটুলিকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে। গত বছরের লীগের রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গল এ পর্যন্ত চারটে ম্যাচ খেলে ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তারা পুলিশকে ২-০ গোলে, স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ১-০ গোলে, বি এন আরকে ৪-০ গোলে এবং ইস্টার্ন রেলকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের তিনটে খেলায় ৫ পয়েন্ট উঠেছে। ক্যালকাটা জিমখানার সঙ্গে প্রথম খেলাটা গোলশূন্য ড্র করে কুমারটুলিকে ২-১ এবং খিদিরপুরকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে। বড় রকমের কোন অঘটন না ঘটলে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াইটা মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

দর্শক

চিত্রধ্বনি

এ কি প্রহসন।

বাংলা ছবির প্রতি কেন্দ্রের সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে ভুরি ভুরি। এইতো, আগামী ফিল্মোৎসবের জায়গা স্থির ছিল কলকাতায়, চক্রান্ত করে সেটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ব্যাঙ্গালোরে। যুক্তিহীন যুক্তি দেখিয়ে ব্যাঙ্গালোরের দাবীর কাছে মাথা নোয়ালেন কেন্দ্রের সরকার। কলকাতার ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করা হল।

সম্প্রতি আরও একটি ঘটনা ঘটে গেল। তরুণ মজুমদারের 'গণদেবতা' ছবিটিকে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করা হল সেরা কাহিনীচিত্র হিসাবে। স্বর্ণকমল পেল ছবিটি। কিন্তু জানি না কোন অজ্ঞাত কারণে পুরস্কার ঘোষণার সময় তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী এই তথ্যটি ঘোষণা করলেন না। বরং তিনি বললেন—বিচারকরা এ বছর স্বর্ণ-কমল দেবার মত কোন ছবি প্রতিযোগিতা বিভাগে পান নি। 'গণদেবতা'কে পুরস্কৃত করা হল ছবিটির নান্দনিক মূল্য, সুস্থ প্রমোদ ও গণ আবেদনের জন্য।

অথচ ক'দিন বাদেই তথ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে চিঠি এল 'গণদেবতা' প্রযোজক স্বর্ণ-কমল পাচ্ছেন, পরিচালক পাবেন একটি রজত কমল। তথ্যমন্ত্রী নিজে তারবার্তা পাঠালেন তরুণ মজুমদারকে।

কিন্তু পুরস্কার ঘোষণার পরদিন সারা ভারতবর্ষের প্রায় সব কটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'এ বছর স্বর্ণকমল দেওয়ার মত উপযুক্ত ছবি পাওয়া যায়নি' সংবাদটি।

এই লুকোচুরি খেলা কেন? বিচারক কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করা না করার অধিকার অবশ্যই তথ্য মন্ত্রকের আছে। সম্ভবতঃ সেই অধিকার বলেই 'গণদেবতা'কে স্বর্ণ-কমল দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এই সংবাদ প্রকাশে এ ধরনের কারচুপি কেন?

যে ছবি 'নান্দনিক মূল্য' সুস্থ প্রমোদ ও গণ আবেদনের জন্য সেরা কাহিনীচিত্রের পুরস্কার পায়, সে ছবিকে কোন যুক্তিতে ভারতের সেরা ছবির মর্যাদা দিতে দ্বিধা করেন বিচারকরা? তথ্যমন্ত্রীর এই সাহসকে যেমন আমরা স্বাগত জানাচ্ছি, তেমনি ধিক্কার দিচ্ছি মন্ত্রকের এই কারচুপি-লুকোচুরি চেষ্টাকে।

বিচারক কমিটির সুপারিশ না মানার সাহস যিনি দেখালেন, তিনি সেকথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করায় ভীত হলেন কেন? দেশের সব মানুষ জানল এ বছর স্বর্ণ কমল দেওয়া হল না, অথচ ঘটল বিপরীত। কিংবা তথ্য-মন্ত্রক পরবর্তী সময়ে এই পুরস্কারের একটি সংশোধিত তালিকাও অন্ততঃ পাঠাতে পারতেন সব কাগজের অফিসে। কোনটাই তাঁরা করেন নি।

'গণদেবতা' ছবির সার্বিক গুণ নিয়ে কারও মনে দ্বিধা থাকার কথা নয়। শোনা যাচ্ছে বিচারক কমিটির কয়েকজন সদস্য নাকি একটি হিন্দী ছবিতে স্বর্ণ কমল দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু কয়েকজন সুস্থবুদ্ধি সদস্যের হস্তক্ষেপে তা হতে পারেনি। এবং কমিটির চেয়ারম্যান চেতন আনন্দ 'সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে' এই নীতি অনুসরণ করে 'গণদেবতা' অমন একটি 'উদ্ভট' পুরস্কার দেবার প্রস্তাব করেছিলেন।

জানি সত্য ঘটনা জানা যাবে না। কিন্তু এই সত্যটি আজ আবার প্রমাণিত হল বাংলা ছবি অবহেলাই পেয়ে যাবে দিল্লীর কাছ থেকে। পুরস্কার পেয়েও সম্মানিত হয়েও মাথা উঁচু করে বলার পথ থাকবে না বাংলা ছবির জন্য। এ এক লজ্জাকর পরিস্থিতি! এ এক প্রহসন নয় কি?

স্টুডিও সংবাদ

পৃথিবীর সবচাইতে বড় গ্রামটির নাম এখন কলকাতা। বিদ্যুতের অভাবেই ভারতের অন্যতম বড় শহরটি এখন পোশাক বদল করে গ্রাম হয়েছে। দিনে নেই স্বস্তি, রাতে নেই আলো।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় কয়েক দিন আগে শুরু হয়েছিল জেনারেটর দিয়ে কাজ। ভোল্টেজের ওঠা-নামা, কম-আলো ইত্যাকার অসুবিধে নিয়েই সেদিন দেখেছিলাম পরিচালক দীনেন গুপ্ত কাজ করছেন। খবর নিয়ে জানলাম ঐসব জেনারেটরগুলো নাকি স্টুডিওতে আনা হয়েছে ছবির প্রযোজকের খরচায়। যখন যে প্রযোজক ঐ স্টুডিওয় ছবির কাজ করবেন তাঁকে বাড়তি ভাড়া দিয়ে জেনারেটরের আলো নিতে হবে। ভাড়া না দিলে জেনারেটরও বন্ধ।

শোনা গেল কয়েকজন প্রযোজক এই ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা বলছেন কারেন্ট নেই, সে জন্যই জেনারেটর আনা হয়েছে, তার বাড়তি খরচ—ভাড়া আমাদের দিতে হবে কেন? স্টুডিও মালিকরা লাভের একটি অংশও কি ছাড়বেন না?

স্টুডিও মালিকরা হয়ত বলবেন—এই আলোর আকালের বাজারে শুটিং করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সেটা কি কিছু নয়! আলো না থাকলে শুটিং তো বন্ধ হবার কথা। তাতে কি প্রযোজকদের খরচ কিছু কিছু কমত। সেটের খরচ, স্টুডিও ভাড়া সবই তো দিতে হত।

আসল কথাটা হল—ছবির মালিকদের মতই স্টুডিও কর্তৃপক্ষরাও আর্থিক কোন ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। এমনিতেই স্টুডিওগুলো ধুঁকছে, মাসের মধ্যে পনের দিন কাজ নেই। সুতরাং জেনারেটর চালানোর বাড়তি খরচ তাঁরা পকেট থেকে দেবেন না।

প্রযোজকদের দাবিটা এক্ষেত্রে অগ্রাহ্যও বটে। রঙিন ছবি না হলে যখন জেনারেটর দিয়ে কাজ চালানো যায়, তখন বিদ্যুতের জন্যে নিজেকে অশান্ত না করে কিঞ্চিৎ বাড়তি খরচে শুটিং চালিয়ে যেতে অসুবিধে কি। বরং তাতে খরচ বাঁচে। স্টুডিওগুলোর কাছ থেকে ধার করা টাকায় ছবি করতে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছবির কাজ শেষ করাই উচিত। ও'দের সুদের হার নিশ্চয়ই জেনারেটর ভাড়ার চাইতে অনেক, অনেক গুণ বেশি।

*

এ ব্যাপারে আরও একটি প্রস্তাব রাখা যায়। রাজ্য সরকার যখন নিকট ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সুরাহা করতে পারছেন না, তখন কলকাতার জীবন্মৃত ৫টি স্টুডিওকে উপযুক্ত শক্তির জেনারেটর কেনবার জন্য কিছু ঋণের ব্যবস্থা করে দিন। হয় রাজ্যের অর্থ দপ্তর দিক, নইলে ব্যাংক থেকে ঋণ পাবার সুযোগ করুন। কয়েক দিন আগে ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্ত বলছিলেন—বেশি নয়, ৫ লাখের মত টাকা পেলে অন্তত জেনারেটর বসান যায়। স্টুডিও-গুলো ধুঁকতে ধুঁকতেও বাঁচতে পারে।

এ বছরের 'ভরত' পুরস্কারজয়ী জাতীয় শিল্পী অরুণ মুখার্জির বহু দিনের ইচ্ছে মনের মত একটা ছবি করার। শুধু ও'র নয়, এই 'বদ ইচ্ছেটা' বোধ হয় কলকাতার নাটক-পাগল আরও অনেকেরই। নাটকের রস নিয়ে এ'রা সবাই যেমন মাতাল, তেমনি ফিল্ম নিয়েও হতে চান। টিফিন খরচ বাঁচিয়ে, অফিস থেকে ধার করে হয়ত বা একটা নাটক নামানো যায়, কিন্তু ওভাবে তো ছবি করা যায় না। তাই বুকে অমন ছটফটানো ইচ্ছে পাখিটা বুকের খাঁচায় এক সময় ঝিমিয়ে পড়ে। ঘটে অকাল মৃত্যু।

আমরা বার বার আক্ষেপ করি সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিকের পর তরুণরা কোথায় গেল? একটা উজ্জ্বল মুখ এতদিনেও উঁকি দিচ্ছে না কেন বাংলা ফিল্মে? কিন্তু নতুন মুখ উঁকি দেবার মত জানালা কি তৈরি করা হয়েছে? এই টালিগঞ্জের ফিল্ম ব্যবসায়ীরা নতুনদের প্রতি কচিৎ উদার হতেন, এখন একবারেই হচ্ছেন না।

অরুণ মুখার্জি ক'দিন আগে কথা-প্রসঙ্গে বললেন 'রাজ্য সরকার তো ফিল্মের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করছেন, অনেক টাকাও খরচ করছেন। একবারে নতুন ছেলে-দের হাতে কিছু টাকা দিন না। মনের মত একটা ছবি করি, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করি। বাজারের প্রযোজকরা তো আমাদের দিয়ে আমাদের শর্তে ছবি করবেন না। সরকার ছাড়া কার ওপরই বা আর আমরা ভরসা করব!'

বড় ছবি নয়, অরুণবাবুরা চান ছোট ছবিই করতে। শর্ট ফিচার করতে বেশি টাকার প্রয়োজন নেই। হাজার পঞ্চাশেক টাকা পেলে কেউ কেউ ছবি শুরু করতে পারেন। বললাম ঐসব ছোট ছবির আউট-লেট কি হবে? তিনি বললেন—'কেন, ফিল্ম ডিভিশন রয়েছে। ফিল্ম ক্লাবগুলো আছে, ও'রা নামমাত্র দর্শনীর বিনিময়ে ছবি দেখাবেন। ফিল্ম ডিভিশনের তো পয়সাই লাগবে না।'

শিল্পী অরুণ মুখার্জি তাই এখন ব্যস্ত নিজেদের দল 'চেতনা নিয়ে আর ছবি করার স্বপ্ন তার চোখে। ফিল্মের গ্ল্যামার রোগের জীবাণু এখনও তাঁতে সংক্রামিত হয়নি। ইম্পর্টান্ট চরিত্র না পেলে তিনি আর্ক-লাইটের সামনে দাঁড়াবেন না—এটা অরুণ-বাবুর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু ফিল্ম তৈরির ঘুণপোকা তাঁর মাথা বুক যে কুরে কুরে খাচ্ছে। হাতে রয়েছে ভরত মুণির মূর্তিটি আর অভিনয়ের ঝুলি। আর সেই ঝোলাটিতেই আছে বলিষ্ঠ, গভীর জীবন বোধের চেতনা, ফেনায়িত উৎসাহ, আপোষহীন সংগ্রামী মন। কোন প্রযোজক আসবেন কি এগিয়ে অরুণবাবুর কাছে?

অপেক্ষা করতে তিনি প্রস্তুত, কিন্তু সময় যদি অমিল হয়ে যায়!

নির্মল ধর

স্বীকারোক্তি

২৬শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার কলা-মন্দির-এর ভূগর্ভ-অঙ্গনে মার্টর-এর কাহিনী অবলম্বনে 'স্বীকারোক্তি' নাটকটির অভিনয় দেখলাম আলিয়াঁস ফাঁসিস-এর উদ্যোগে। দেখা অবধি দু-একটা প্রশ্ন আমাকে পীড়িত করছে। কোন চরিত্রলিপি না পাওয়াতে অভিনেতা বা পরিচালক, পরিকল্পনাকারীদের নাম জানতে পারিনি। সুতরাং বক্তব্য বোঝাতে চরিত্রের নাম (যেখানে মনে আছে) অথবা বর্ণনা ব্যবহার করছি।

(১) নাটকটি নিরাভরণ মঞ্চে উপ-স্থাপিত করায় এর অন্তর্লীন ত্রাস বা নিষ্ঠুরতা ফুটে ওঠার যোগ্য অবকাশ তৈরি হয়েছিল। তাহলে দু-একটি তাৎপর্যপূর্ণ মঞ্চ সঙ্কেত ব্যবহার করলে তা কি আরো অব্যর্থ হয়ে উঠতো না।

(২) উপস্থাপনার গোড়ায় যে শীতল ভাব ছিলো তাই কি নাটকটির যথার্থ চরিত্র নয়? তবে কেন তাকে ভেঙে দেওয়া হলো পরবর্তী আবেগময় দাপাদাপিতে। ভয়, মৃত্যু, শ্লীলতাহানি, সন্দেহ, বিচ্ছিন্নতা, জোট-বাঁধা এইসব কিছুকেই কি এক শীতল অবজেকটি রিয়ালিটির মধ্য দিয়ে দেখানো যায় না?

(৩) চরিত্রগুলির নাম নির্বাচনেও কি বাংলা থিয়েটার আর একটু মনোযোগ দাবি করতে পারে না, আর একটু বৈচিত্র। এ নাটকে 'রাজা' আছে, 'রঞ্জন' আছে, প্রেমদাত্রী নন্দিনী ঈষৎ বেঁকে 'নন্দিতা' হয়ে আছে। এখানেও 'রঞ্জন' 'মুক্তির খবর' নিয়ে আসবে ভাবে নন্দিতা, রাজা ছেলে-মানুষ হলেও ছাঁটফর্টানিতে 'রক্ত করবী'র অনুষঙ্গ টেনে আনে, নন্দিতা রঞ্জন ছাড়াও আর একটি বিশু পাগল জাতীয় প্রেমিক আবিষ্কার করে। চরিত্রটির নাম সম্ভবত অনিমেষ। অথচ এই নামগুলো একটু বদলে দিলেই অযথা এই অনুষঙ্গ অনেকটা প্রচ্ছন্ন হতো বলে আমার বিশ্বাস। পুলিশের বড় অফিসার-এর নাম দেবীবাবুও বড়ো বেশি কনভেনশনাল। এ নাটকের দেবীবাবু অবশ্য ভয় হলেও খানিকটা হৃদয়বান।

(৪) বিপ্লবীদের কথা বলার ভঙ্গিতে কি আর একটু স্বাভাবিকতা আনা যেতো না? রাজা মৃত্যু ভয়ে এত হাঁচোড় পাঁচোড় করে কথা বলে কিছুই বোঝা যায় না। অনিমেষ আর নন্দিতা শীতলতা আনতে গিয়ে কেবলই টাকগার কাছ থেকে ভারি ভারি কথা ছুঁড়ে দেয়, (আমার পার্শ্ববর্তী বন্ধু বললেন, আদর্শবাদীরা সবাই নাকি ঐভাবে কথা বলে, তিনি দেখেছেন চিরকাল মঞ্চে।) রঞ্জন প্রায় গোয়েন্দা গল্পের নায়কের মতো অবাস্তব তার সমস্ত সাজসজ্জা, কথোপকথন নিয়ে। কেবল যে বিপ্লবীটি আত্মহত্যা করলো সামান্য উচ্চগ্রামের হলেও সে স্বাভাবিক ছিলো। আর বিহারী বলা হচ্ছিলো ফাঁকে, বিহারে আগাগোড়া নিখুঁত এই চরিত্রটির নাম ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে অনুচিত হয়েছে, কারণ ইনি শুধু ভালো অভিনয় করেন নি, সমস্ত নাটকটিকে একাই ধরে রেখেছিলেন। আমাদের বসিয়ে রেখেছিলেন আগাগোড়া। সাধারণভাবেও বাংলা মঞ্চে শান্ত অভি-ব্যক্তিতে, নিপুণ হাঁটাচলায়, ব্যক্তিত্বে এমন অভিনয় দুর্লভ।

(৫) তুলনায় পুলিশদের চরিত্র ছিল অনেক বিশ্বাস্য। যে কনস্টেবলটির নির্যাতন করতে ভালো লাগে, স্থানীয় পুলিশের নিষ্ঠুর সর্বেসর্বা যিনি, পড়াশুনো না শিখতে পারার ক্ষোভে যে অফিসারটি সমস্ত শিক্ষিত সমাজের উপর খাপ্পা এবং নির্যাতনে অপটু দ্রুত অবসরকামী সিনিয়র অফিসারটি, সকলেই যেন চেনা। তবে এঁদের অভিনয় আরো একটু ভালো হলে কি কিছু ক্ষতি হতো? কনস্টেবলটি এতো লাজুক কেন? স্থানীয় নিষ্ঠুর অফিসারটি খামাখা অমন পা ফাঁক করে হাঁটেন কেন?—এসব প্রশ্ন থেকেই যায়। সিনিয়র অফিসার দেবীবাবুর চরিত্রে সঙ্গত কারণে স্বাভাবিক-ভাবেই দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, আর তিনি গালাগালগুলোও দিয়েছেন বড়ো স্বচ্ছ। তবে তাঁর মাথার চুলের মেক-আপ যিনি করেছেন তিনি হয় বেশি মাত্রায় রসিক, নয় উন্মাদ।

পরেশেষের মন্তব্যঃ—স্বীকারোক্তি নাটকের ঈপ্সিত স্বীকারোক্তি আসলে প্রত্যেকের নিজের কাছে নিজের। এই নাটকটিতে শেষ অবধি কিন্তু নাট্যকার, পরিচালক বা অভিনেতারা তাঁদের দুর্বল স্বীকারোক্তি রেখেছেন দর্শকের সামনে, দর্শককে বাধ্য করতে পারেন নি নিজের কাছে স্বীকারোক্তি দিতে।

সুরজিৎ ঘোষ

উদয়ন সংঘের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

গত ২৫ মে শিয়ালদহের ক্রেমব্রাউন হলে উদয়ন সংঘের উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল নৃত্য গীতি আলেখ্য 'ডাক দিল যে গানে গানে' এবং শৈলেশ গুহনিয়োগীর নাটক 'গারদ'। নৃত্যগীতি আলেখ্যর কয়েকটি গানের সঙ্গে নৃত্যের ব্যঞ্জনা সত্যিই সুন্দর। বিশেষ করে 'রোদ্দুর ভরা বসন্ত', 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', ধানের ক্ষেত্রে রৌদ্রছায়ায়', 'এলো যে শীতের বেলা'—গানগুলির সঙ্গে শিল্পীদের নৃত্য উপস্থাপনা পরিকল্পনাটিকে প্রাণময় করে তুলেছে। সঙ্গীত সহযোগিতায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম শান্তি রায়, দেবযানী ঘোষ তপন দত্ত, মুক্তি বসু, মিঠু দেব, জয়ন্তী দাশগুপ্ত, দেবযানী মৈত্র, দেবযানী ঘোষ, ধারণী সাহা এবং সৌমিত্র ব্যানার্জি। নৃত্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সুমিতা নাগ, সংঘমিত্রা রায়, শ্রাবণী মুখার্জি, সোমা মল্লিক, ঝোহিনুর সেনববাট এবং কাবেরী পাল। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন শান্তি রায়। নৃত্য পরিচালনায় সংঘমিত্রা রায়।

নাট্যানুষ্ঠান 'গারদ' সংস্থার শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠায় নিঃসন্দেহে দর্শকদের মন ভরিয়েছে। আগাগোড়া নাটকের গতি বজায় রেখে যেভাবে শিল্পীরা নাটকটিকে টেনে নিয়ে গেছেন তাতে তাঁদের বাহবা দিতেই হয়। অভিনয়ে শৈলেন সান্যাল, কবীর সেন বরাট, কল্লোল রায়, কল্যাণ রায় রীতিমত প্রশংসার দাবী রাখেন। পাগলিনী হওয়ার পর নীলিমা ব্যানার্জির অভিনয়ও প্রাণবন্ত। সংঘমিত্রা রায় একটু সংযত হলে আরও প্রশংসা পেতেন। তুলসীর অভিনয়ে অ-নাটকের ঝোঁক প্রবল। নাটকটির সু-পরিচালনার কৃতিত্ব অবশ্যই কল্যাণ রায়ের।

✻

বি টি বি এন্টারপ্রাইজের বিভাবরী রঙিন ছবি 'অন্তর্ঘাত-এর প্রযোজক বিশ্বনাথ ঘোষ সহ পনের জনের একটি দল গত সাতই মে এস এ এস বিমানে কলকাতা থেকে টোকিও গেছেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন, যোগীতাবালি, মিঠুন চক্রবর্তী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলজিৎ কাউর, প্রেম চোপরা ও জওহর কাউল।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত

১১ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬
1 June 1979

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী : অস্ট্রেলিয়ায় বাঙালী
লিখেছেন দেবেশ মুখোপাধ্যায়
অন্বয়ে দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ দত্ত
লিখেছেন সুর্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত ও
নির্মলেন্দু ঘোষালের গল্প

মস্তিষ্কের অপচয়

এককালে উপনিবেশগুলো থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে উন্নত মানের পণ্যদ্রব্য তৈরি করত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। এবং সেইসব উৎপন্ন দ্রব্য উপনিবেশেই ফেরৎ পাঠাত বিক্রির জন্যে। এর ফলে অনুন্নত দেশগুলো কীভাবে দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়েছিল, নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই তা আমরা টের পেয়েছি। স্বাধীনতা অর্জনের একটা প্রধান কারণ ছিল এই অবাধ লুণ্ঠনের হাত থেকে নিজের দেশকে রক্ষা করা।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতা অর্জনের পরও বিপদমুক্ত হতে পারিনি আমরা। পশ্চিমের উন্নত দেশগুলো সরাসরিভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণ করতে না পারলেও, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে যাতে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর উন্নয়নের কাজ বিলম্বিত হয়। বেশি মাইনের চাকরি এবং অন্যান্য সুযোগের প্রলোভন বিজ্ঞাপিত করে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে বিজ্ঞানী ও কারিগরী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের দেশে। ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো এইসব উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের সুপরামর্শ ও উদ্ভাবনী কৌশল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্য পক্ষে উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমদানি-করা এইসব বিশেষজ্ঞ ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কর্মপ্রচেষ্টার ফলে উন্নত দেশগুলো উন্নততর হচ্ছে। এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখছে। ফলে ব্যাপার দাঁড়িয়েছে সেই সোনা ফেলে আঁচলে গেরোর মতো!

জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলন, যাকে সংক্ষেপে বলা হয় 'আংকটাড', সেই সংগঠন থেকে এ-বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে সম্প্রতি। তা থেকে জানা গেছে, ১৯৬০ থেকে ৭৬ সালের মধ্য উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে এই প্রক্রিয়ায় ৩ লক্ষ বিশেষজ্ঞ ও কারিগরী বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি চলে গেছেন ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলোতে। বলা বাহুল্য, তাঁদের মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা বেদনাদায়ক রকম বেশি।

মস্তিষ্ক রপ্তানির এই সমস্যার বিষয়ে ভারত সরকার যে সচেতন নন, তা নয়। বিদেশে কর্মরত ভারতীয় বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের দেশে ফেরার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে উন্নত মানের কারিগরী পরিবেশ ও পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে দু'-চারজন যাও-বা এসেছিলেন, তাঁরাও ফিরে গেছেন।

অবিলম্বে মস্তিষ্ক অপচয়ের এই জটিল সমস্যার দিকে নজর দেওয়া দরকার। না হলে আমাদের উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হবে না, আরো দীর্ঘকাল পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে।

সাহিত্য ইত্যাদি

সাহিত্য এবং প্রকাশক

এককালে সাহিত্য রচিত হত ভূর্জপত্রে অথবা তাল পাতায়। পরের যুগে তুলট কাগজেও লেখা হয়েছে অনেক পুঁথি। লিপিকাররা তা থেকে কপি করে নিতেন। এবং কপি থেকে আবার কপি করা হত। এইভাবেই প্রচার চলত বইপত্রের।

কিন্তু ছাপাখানার আবিষ্কারের পর থেকে প্রক্রিয়াটি অনেক সহজ হয়েছে। দ্রুতও হয়েছে। আগেকার দিনে যে লেখা কপি করতে এক মাস লাগত, রোটারী মেসিনে তা এক ঘন্টায় করা সম্ভব। হাতে কম্পোজ করে ছোটো ছাপাকলে তার জন্যে দরকার হবে বড় জোর একদিন। কাজেই যে কোনো সাহিত্যকীর্তি এখন অনেক তাড়াতাড়ি অনেক বেশি লোকের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব। আর তার জন্যে দামও লাগবে কম।

এইটেই আইডিয়াল অবস্থা, অর্থাৎ এইরকমই হবার কথা। কিন্তু বাস্তবে কি তাই হচ্ছে? এককথায় উত্তর দেওয়া যায়—'না।' রিয়ালিটি একেবারেই অন্যরকম।

বিদ্যুৎ ছাঁটাই এবং প্রেস ও সংশ্লিষ্ট শিল্পে ধর্মঘটের ফলে বই ছাপা এবং বই বাঁধাইয়ের খরচ এখন দেড়গুণ বেড়ে গেছে। কাগজ কলে ধর্মঘট এবং বিদ্যুৎ ছাঁটাই ও কয়লার দুর্ভিক্ষে কাগজও এখন বাজার থেকে উধাও। যদি বা কখনো পাঁচ-দশ রিম আছে বলে খবর পাওয়া যায়, গিয়ে পৌঁছানোর আগেই তা বেহাত হয়ে যায়। আর যদিওবা মেলে, দাম দেড়গুণ বেশি।

তাহলে পরিণাম দাঁড়ায় কী?

এক. প্রতি মাসে কম বই ছাপা হবে, কম বই বাজারে বেরোবে। দেখা যাচ্ছে বৈশাখ মাস থেকে এ পর্যন্ত এক ডজন নতুন বইও বাজারে বেরয়নি।

দুই. কম বই বেরোবে বলে এমন বই-ই বার করতে হবে যার কোনো মার নেই। অর্থাৎ শুধুমাত্র বেস্ট সেলার লেখকের বেস্ট লেখার বই। কিম্বা এমন বই যা বিষয়-মাহাত্ম্যে বিকোয়। যেমন ধরা যাক, নেতাজীর সঙ্গে শেষ আধ ঘন্টা। কিম্বা, নটী বিনোদিনীর ব্যক্তিগত চিঠি। অথবা, বৈদিক সাহিত্যে কামকলা। এবং ইত্যাদি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক রকম করা যায়। লেখক এখানে বড় কথা নয়। আসল জিনিস হল ভেবেচিন্তে একটা চটকদার বিষয়বস্তু ঠিক করা এবং কায়দা করে সেটা উপস্থাপনা করা।

তিন. কম বই বেরোবে বলে প্রকাশক চাইবেন দাম বাড়াতে। না হলে চড়া দরে কাগজ কিনে বাড়তি হারে ছাপা ও বাঁধাইয়ের খরচ মিটিয়ে প্রকাশককে পথে বসতে হবে। তিনি চাইবেন এমনভাবে পড়তা ফেলতে যাতে কিছুটা অন্তত মার্জিন থাকে। কিন্ত এইখানেই বলে নেওয়া দরকার, কাগজ ছাপা ও বাঁধাই-ই বইয়ের একমাত্র খরচ নয়। এর সঙ্গে লেখকের রয়্যালটি বিক্রির কমিশন, বিজ্ঞাপনের খরচও যোগ করতে হবে। এইসব ধরে-টরে কিছুকাল আগে পর্যন্ত দাম ফেলার ক্ষেত্রে ফর্মা পিছু এক টাকা স্থির করা হত। অর্থাৎ দশ ফর্মার বই হলে দশ টাকা। কিম্বা খরচটা যাতে কমানো যায় সেজন্যে এগারশ'র বদলে বাইশ'শ ছেপে দশ ফর্মার দাম করা হত আট টাকা। এখনকার হিসেবে দেখা যাচ্ছে, দশ ফর্মার বই বাইশ'শ ছাপলেও দাম বারো টাকার নিচে করা যাবে না। কিন্তু বাইশ'শ ছাপা যায়, অর্থাৎ ছেপে বিক্রি করা যায় এমন লেখক কজন আছেন? কাজেই,

চার. ছোটো লেখক এবং মাঝারী লেখকদের জন্যে কোনো চাহিদা থাকবে না। বই ছাপতে হলে রয়্যালটির ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকতে হবে। যে যা দেন তাতেই রাজি। দরাদরি করা চলবে না। এবং

পাঁচ. যাঁরা বেস্ট সেলার তাঁরা চাপের মুখে পড়ে বিস্তর বাজে লিখতে বাধ্য হবেন। বাজারে বই না থাকার ফলে তাঁ[র] বেরোনো মাত্র বিকিয়ে যাবে। কিন্তু

ছয়, যেহেতু অনেক প্রকাশককে[ই] মাঝারি লেখকের ওপর নির্ভর কর[তে] হবে, তাই প্রকাশকদের তরফ থেকে এ[ই] বিক্রির জন্যে নতুন কিছু উপায় উদ্ভাব[ন] করতে হবে।

একথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার এখন যা অবস্থা তাতে প্রকাশকের কাজ সংযোগরক্ষাকারী সাঁকোর মতো। লেখ[ক] লেখেন, পাঠকেরা পড়েন, তিনি থাকে[ন] হাইফেন-এর মতো। অবিশ্যি বই ছাপা[তে] তাঁকে খরচ করতে হয়। তার জ[ন্যে] বিজ্ঞাপন দিতে হয়। বিক্রি না হ[লে] ক্ষতির বোঝাও তাঁরই স্কন্ধে চাপে। কিন্ত এর বাইরে বই বিক্রির জন্যে তিনি খ[ুব] একটা সক্রিয় ভূমিকা নেন না। আগে পত্র-পত্রিকায় রিভিউ বার করার জ[ন্যে] চেষ্টা করতেন কোনো কোনো প্রকাশক। এখ[ন] সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে লেখকদেরই দায়। পাঠক তৈরি করার জন্যে নিজেরা কো[নো] উদ্যোগ নেন না প্রকাশকরা। একম[াত্র] ব্যতিক্রম বোধহয় বই মেলা। কিন্তু [সে] তো সারা বছরে মাত্র দিন কয়েকের ব্যাপার।

বাংলা সাহিত্য দেখা যাচ্ছে খুব একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে পা[র] হচ্ছে। প্রকাশক ও লেখককে একস[ঙ্গে] কাজ কর[তে] হবে এখন। তার জন্যে কতকগুলো পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা যায়। যেম[ন] প্রত্যেক জেলায় লাইব্রেরী সংগঠনগুলো[র] সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং প্রত্যেক সপ্তাহে এক-একটি জেলায় বিশেষ বিশেষ লেখ[ক] ও প্রকাশকের টিম নিয়ে গিয়ে সেখানে আলোচনা সভা করা, এবং পাঠকদের মত মত জানার চেষ্টা করা। সেই সঙ্গে তাঁ[রা] সরকারের সঙ্গেও যোগাযোগ করে পা[ঠ্য] বইয়ের মতো অন্য বইয়ের জন্যেও স্বল্প দামে কাগজ সরবরাহের জন্যে অনুরো[ধ] জানাতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন পা[ঠ্য] বই ছাড়া অন্য সব বইই অ-পাঠ্য মনে কর[ার] কারণ নেই।

এবং বলতে পারেন, লেখাপড়া শেখ[ার] একটি কারণ, শিক্ষিত হয়ে আমাদে[র] সাহিত্যিক ঐতিহ্যের বিষয়ে ওয়াকিবহা[ল] হয়ে নিজেকে সুমার্জিত করা। তা [না] করতে পারলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা অচিরে অবিদ্যায় তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

প্রকাশকরা এছাড়া আর কী কী কর[তে] পারেন নিজেরাই ভেবে দেখুন। এবার লেখকরাও সঙ্গে থাকবেন না।

মণীন্দ্র রা[য়]

হারানো বই

কলকাতায় তখন সবে লেখাপড়া চালু হয়েছে। স্কুল পাঠশালা হয়নি তেমন। সাহেবদের সঙ্গে চলাফেরা করতে হয়। ওদের মত পড়াশুনো দরকার। বইপত্তর নেই। পুঁথির যুগ হারিয়ে গেছে। ছাপা হরফই যুগের চরিত্র বদলে দিল আমূল। এখনকার মত না হলেও, বইপত্তর যা দু'চারখানা বেরোত তার পাঠকও ছিল সীমিত। বই কেনার রেওয়াজ এখনকার মত ছিল না। থাকার কথাও নয়। তবে ভদ্রলোক হওয়ায়ার প্রাণপণ প্রয়াস চলছিল। কলকাতা জুড়ে টোল, পাঠশালা, সাহেবদের স্কুল, ধনী বাঙ্গালীদের স্কুল। প্রথমদিকে সাহেবরাই ছাপাখানা খুলেছিল। বাংলা ভাষায় লেখাপড়া চর্চার ব্যবস্থা করেছিল। সব ছাপাখানার মালিক ছিল বিদেশী। বাঙ্গালী আসরে নামে অনেক পরে। সাহেবদের দেখাদেখি ছাপাখানা, বইয়ের দোকান খোলে বাঙ্গালী। বিদ্যাসাগর মশায়ের একটি বড় বইয়ের দোকান ছিল কলেজ স্কোয়ারে।

কলকাতায় তখন শেঠ বসাকরা টাকার গদিতে বসে ঘুমায়। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম হয় ওদের ঘরে শিশুর। কিন্তু রামবাগানে উমেশ দত্ত লেনে রাজচন্দ্র বসাকের বাড়ি বিকিয়ে হয়ে যায় দেনার দায়ে। ছেলে নীলমণি আর কমলাকান্তের হাত ধরে গিয়ে উঠলেন পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে। ভাগ্য আর ফিরল না। নীলমণি অভাবের সংসারে মানুষ। লেখাপড়া শিখতে গিয়ে হেয়ার সাহেবের চোখে পড়লেন। সেই থেকে বদলে গেল রুচি আর মন। সাধারণ কেরানী থেকে হয়েছিলেন গেজেটেড অফিসার। বন্ধু ছিলেন গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। নীলমণি মারা যান ১৮৬৪ সালে।

১৯৫৯ সালে নীলমণির 'ইতিহাস-সার' বেরোল। ২৩৭ পৃষ্ঠার বই। একপাতা ভূমিকা। বিদ্যারত্ন যন্ত্রে ছাপা। প্রাচীনকাল থেকে সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত য়ুরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার বিবরণ দিয়েছেন গ্রন্থকার। চারটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আশিরিয়া, বেবিলন, পারস্য, গ্রীস, ইংলণ্ড, ওয়েলস, স্কটল্যাণ্ড, আয়র্লাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী, অস্ট্রিয়া, প্রাসিয়া স্পেন, পর্তুগাল, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, লাপল্যাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক রুশ, আরব রাষ্ট্র, আসেরিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি দেশের বিবরণ। ভূমিকায় নীলমণি লিখেছিলেন : 'ইতিহাস মনুষ্যের চক্ষুস্বরূপ, ইহা পাঠ করিলে আমাদিগের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। কোন দেশের মনুষ্যের কি চরিত্র, কি প্রকারে তাহারা রাজ্য ঐশ্বর্য ও বলবৃদ্ধি করিয়াছে, বা কি দোষে পতন-প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সকল জানিলে চিত্ত-

ইতিহাসসারের প্রথম পাতা
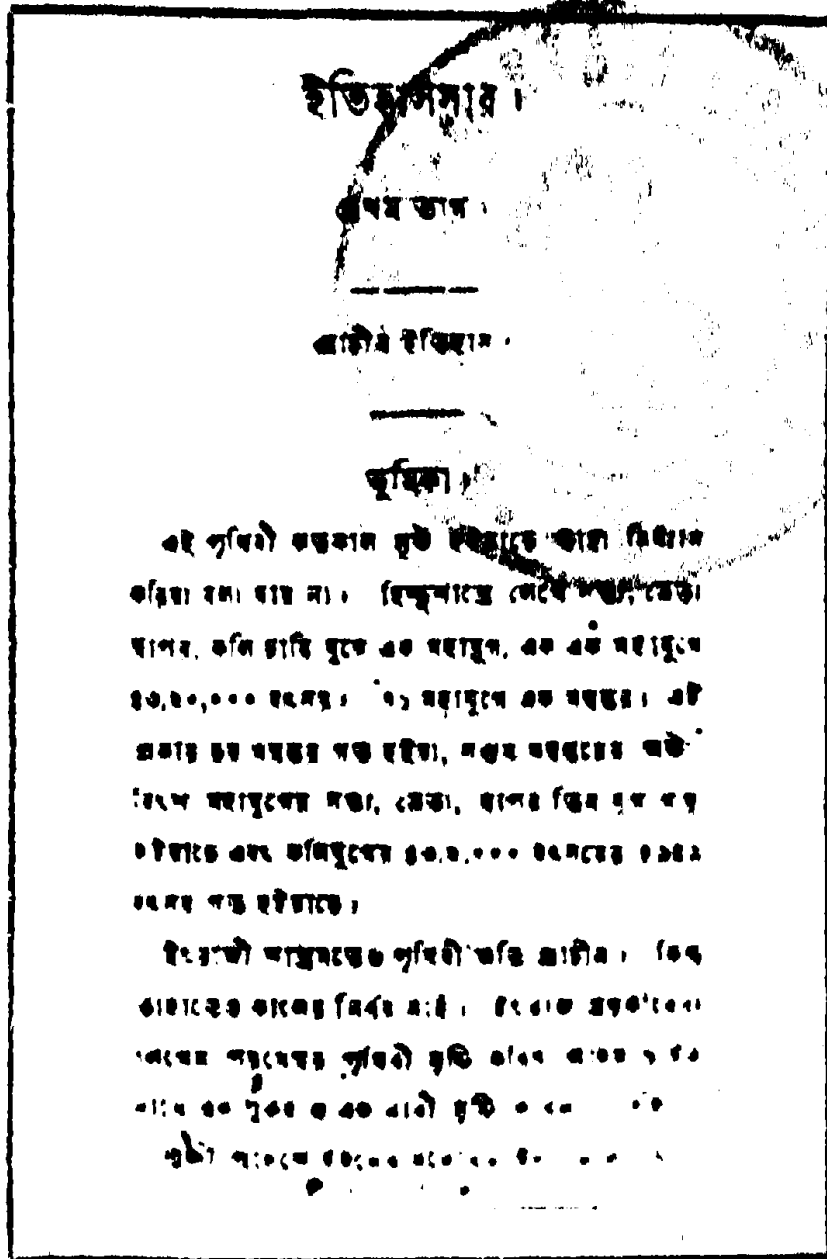
সংস্কার হয়। এই কারণ, সকল দেশে বালকদিগকে ইতিহাস পাঠ করান গিয়া থাকে। এদেশে এই প্রথা প্রায় ছিল না। ইদানীং স্থানে স্থানে বাঙ্গালা পাঠশালা হইয়া তাহাতে ইতিহাস পড়াইবার নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই; বিশেষ, সকল দেশের বিবরণ জানা যায় এমন পুস্তক এ পর্যন্ত হয় নাই। অতএব, বালকেরা সকল দেশর বিবরণ অল্পায়াসে জানিতে পারে, এই বাসনা করিয়া আমি এই পুস্তকখানি লিখিলাম।' নীলমণির ভাষা ছিল সমকালীন লেখকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সংস্কৃত শব্দবহুল বাঙলা ভাষার প্রচলন ছিল তখন। কিন্তু নীলমণির লেখায় ক্রিয়াপদকে চলতি করে নিলে, আর দু-চারটে সংস্কৃত শব্দ বদলে দিলেই কেউ ধরতে পারবে না, ওটা একশ' বছরেরও আগে লেখা হয়েছিল। নীলমণির রচনার উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য : 'ইংরাজেরা বিবেচনা করিলেন সেরাজুদ্দৌলা স্বপদে থাকিলে আমাদিগের কুশল নাই, অতএব তাহার রাজ্য হরণ করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, ক্লাইভ স্বসৈন্যে মুরশিদাবাদে যাত্রা করিলেন। সেরাজুদ্দৌলা সেই সংবাদ পাইয়া আপনার সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। পলাশিতে আসিয়া শুনিলেন ইংরাজ সৈন্য তথায় উপস্থিত। অতএব ২২ জুন ঐ স্থানে যুদ্ধের আয়োজন হইল। যুদ্ধকালে তাঁহার সেনাপতি মিরজাফর যুদ্ধে গমন করিলেন না। সেরাজুদ্দৌলা জানিতেন না তিনি ইংরেজদিগের সহিত কুমন্ত্রণা করিয়াছেন। অতএব ক্লাইভ তাহাকে অনায়াসে পরাস্ত করিলেন। তৎপরে তিনি মুর্শিদাবাদে যাইয়া মিরজাফরকে বঙ্গদেশের নবাব করিলেন।'—এই অংশ উদ্ধৃত করার অন্য কারণও আছে। সেকালের বুদ্ধিজীবী বাঙালীর মধ্যে ইংরেজস্তুতির রেওয়াজ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখাতেও তার নিদর্শন রয়েছে। নীলমণি সিরাজকে অপরাধী করেননি। বরং ইংরেজের স্বার্থান্বেষী চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। সিরাজ দোষী হতে পারেন। কিন্তু ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে তাদের চোখের সামনে বসে তাদের শঠতায় ইঙ্গিত করার সাহস খুব কম লোকেরই ছিল।

নীলমণিকে ভুলে যাওয়ার এটা অন্যতম কারণও হতে পারে। সাহেবপ্রীতি না থাকায় তিনি কলকে পাননি। গদ্যের হাত তাঁর কম ছিল না বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে, অথচ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকরা কোন মর্যাদাই দেননি ভদ্রলোককে। ১৩০ বছর আগে নীলমণির আরব্য উপন্যাসের তিনটি খণ্ড বেরিয়েছিল। সংস্করণ হয়েছিল ১৮৫৪ সালে। তখনকার দিনে পাঠ্য বই আর সরকারী আইনের বই ছাপা হত। অনুবাদ বা কাহিনীমূলক বই লেখার প্রথা তখনও চালু হয় নি। ঠিক সেই অবস্থায় 'অরেবিয়ান নাইটস নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মনোহর উপন্যাস সকল বঙ্গীয় সুকোমল ভাষায় অনুবাদ' করে প্রকাশের ব্যবস্থার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই নীলমণির। পারস্য ইতিহাস লিখেছিলেন পদ্যে আর গদ্যে। সীতা, সবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী। খনা, অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী—এই নয়জন ভারতীয় নারীর জীবন নিয়ে লেখেন 'নবনারী' সেসময় বিদুষী হিন্দু নারীদের কোন জীবনী গ্রন্থ না থাকায় নীলমণি বইখানি লেখেন। সংশোধন করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগ। হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠও হয়েছিল। হিন্দী থেকে অনুবাদ করেন 'বত্রিশ সিংহাসন'। রেভিনিউ বোর্ডের বিভিন্ন আইনের অনুবাদ গ্রন্থ হল 'রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম' —১ম খণ্ড। নীলমণি তিন খণ্ডে লিখেছিলেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। ইংরেজি ও বাঙলায় লেখা প্রচলিত ভারতের ইতিহাসে হিন্দু রাজত্বকালের বিবরণ যথার্থ মর্যাদার স্থান না পাওয়ায়, নীলমণি এই বই লিখেছিলেন তার প্রতিবাদে। এ থেকে বোঝা যায় নীলমণির মানসিক গঠন ছিল কী ধরনের। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি ও পারসি বিবিধ বই থেকে নিয়েছিলেন উপকরণ। প্রথম খণ্ডে ধর্ম বিষয়ক বক্তব্যটি লিখেছিলেন কাদম্বরীর লেখক তারাশংকর তর্করত্ন। আর বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা লিখে দেন হরিশংকর দত্ত। হরিশংকর ছিলেন বর্ধমানের স্কুল ইনস্পেকটর।

কমল চৌধুরী

সাহিত্যের নেপথ্যে

সেকালের চিকিৎসা পত্রিকা

১৮৬৬ সালের জানুয়ারীতে কলকাতার আহিরীটোলা থেকে চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মাসে একবার প্রকাশিত হত বলে জানা যায়। এর নাম 'চিকিৎসক'।

'চিকিৎসক' পত্রিকার বিষয়সূচিতে স্বাভাবিকভাবেই থাকত চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ে যাবতীয় খবরাখবর, চিকিৎসা সম্পর্কিত ইংরেজী ভাষায় লেখার ভাষান্তর, সংকলন এবং বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিষয়ে লেখা মৌলিক লেখাপত্র। পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষদের মধ্যে ছিলেন মহেন্দ্রনাথ মিত্র, রসিকলাল দাস, ক্ষেত্রগোপাল লাহা এবং অম্বিকাচরণ রক্ষিত।

বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যার সহায়ক বইপত্র এবং পত্রপত্রিকার অভাব দেখে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ আয়োজন হয়। আরও একটি বড় উদ্দেশ্য অবশ্য এই পত্রিকার প্রকাশ ব্যাপারে ছিল সেটি—মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্রদের উপকার করা।

'চিকিৎসক' প্রকাশের উদ্যোগ আয়োজন এবং আলাপ আলোচনা যখন চলছিল তখনই 'সম্বাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়' ১৮৬৫র ২৬ ডিসেম্বরের সংখ্যায় আগাম খবর দিয়ে লেখেন, 'আমরা সন্তুষ্টচিত্তে প্রকাশ করিতেছি মেডিকেল কলেজের বাংলা ক্লাশের ছাত্রগণ 'চিকিৎসক' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিবেন। ইহাতে যে যে বিষয় লিখিত হইবে, ইহার নামই তাহার পরিচয় প্রদান করিবে। বাঙ্গালা ক্লাশের ছাত্রগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া মফস্বলে গেলে যখন তাঁহাদিগের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার অথবা আলোচনার আর বিশেষ উপায় নাই, তখন এই পত্রখানি তাঁহাদের পরম উপকারী হইবে। আমরা উঁহার অনুষ্ঠানপত্র পাইয়াছি চিকিৎসকপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

১৮৬৬র জানুয়ারীতে যখন চিকিৎসক প্রকাশিত হয় তখন 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখে 'অত্রত্য মেডিকেল কলেজ হইতে চিকিৎসাপত্র নামে একখানি চিকিৎসা বিষয়ক পত্র প্রকাশ হইয়াছে। টিকিয়া গেলে হয়।

'চিকিৎসক' পত্রিকার অনুষ্ঠান পত্রে লেখা হয়েছিল, বঙ্গভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকার গুরুতর অভাব দর্শনে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া এই অসদ্ভাব সাধ্যানুসারে সংপূরণ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছি। ভরসা করি, আমাদিগের দেশের যাবতীয় চিকিৎসক সংপ্রদায় আমাদিগকে, এই মহদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইবার জন্য বিবিধ প্রকারে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য দান করিবেন।'

চিকিৎসক-এর অনুষ্ঠানপত্রে ঘোষিত ঐ মন্তব্য স্মরণে রেখেও বলা যায় 'চিকিৎসক' পত্রিকার আগেই সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও চিকিৎসা বিষয়ে কিছু পত্র-পত্রিকা এবং বইপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮১৯ সালের সমাচার দর্পনে চোখ রাখলে দেখা যায় 'ঔষধ সার-সংগ্রহ' নামে চিকিৎসা বিষয়ে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছিল। বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানা থেকে বইখানি ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। যেসব ওষুধপত্র সব সময়েই দরকার হয় সে রকম ছাপ্পান্ন রকমের ওষুধপত্রের বিবরণ, কোন রোগে কোন ওষুধ প্রয়োজন এবং তার ব্যবহার বিধি ঐ বইতে বিশদভাবেই লেখা ছিল।

বইটির প্রকাশ সম্পর্কে সমাচার দর্পণে লেখা হয়েছিল, 'ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই এখন এই পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমাদের ভরোসা হইয়াছে যে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে।'

মাসিক পত্রিকা হিসাবে 'আয়ুর্বেদ দর্পণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪০ সালেই। চাণক-নিবাসী নারায়ণ রায় এ পত্রিকায় প্রকাশক ছিলেন। এর আখ্যাপত্রে লেখা হয়েছিল, 'চাণক গ্রাম নিবাসী শ্রীশ্রীনারায়ণ রায় কর্তৃক সংগৃহীত ঃ চরক সুশ্রুত বাগভট হারিত ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি এবং রসায়ন গ্রন্থ রস-রত্নাকর রমেন্দ্র চিন্তামণি প্রভৃতি এবং নানা তন্ত্র প্রণীত গদ্যপদ্য তদীয়ার্থ সাধুভাষা সহিত বহু পণ্ডিত কর্তৃক সংশোধিত হইয়া প্রভাকর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল। এই গ্রন্থের প্রয়োজন সুস্থ শরীরের রক্ষোপায় এবং আতুর ব্যাধি মুক্ত্যুপায় বহুতর প্রয়োজনানুসারে সংগ্রহ সুচারু গ্রন্থ প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র শ্লোক গদ্যপদ্যে হইবেক, ইহাতে একশত খণ্ড হইবেক মাসিক পঞ্চাশত সংখ্যক শ্লোকেতে খণ্ড নিরূপিত হইল, প্রতি খণ্ডের মূল্য এক মুদ্রা কেবল মুদ্রাঙ্কিত জন্য ব্যয় লওয়া মাত্র এতদ্ গ্রন্থের যাবদ বৃত্তান্ত, প্রতি খণ্ডে নির্ঘন্ট পত্র দৃষ্টি করিলে বোধ হইবেক,... তিন খণ্ড প্রকাশ হয়ে আয়ুর্বেদ দর্পণ বন্ধ হয়। ১৮৫২ সালে আবার পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় লেখা হয়েছিল, 'বৈদ্য জাতির মধ্যে শাস্ত্র ব্যবসা প্রায় লোপ পাইয়াছে, চিকিৎসা-ব্যবসায়ি সহস্র ব্যক্তির মধ্যে একজনকে পণ্ডিত পাওয়া ভার অতএব রোগের লক্ষণ, রোগ নির্ণয়, উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য প্রভৃতি কিছুই ব্যবস্থামতে হয় না, সুতরাং তাহাতে উপকার হইবার সম্ভাবনা কি? একারণ ম্লেচ্ছ জাতির চিকিৎসা অর্থাৎ ডাক্তারি প্রভৃতি কলিকাতা-রাজধানী মধ্যে অতিশয় প্রবল হইয়াছে। অধুনা দেশের অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় বৈদ্যক শাস্ত্র ও বৈদ্য জাতির চিকিৎসা এককালে লুপ্ত হইবে, এই ভাবি বিপদের আশংকায় আমি 'আয়ুর্বেদ দর্পণ নামক গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। দর্পণ দ্বারা কেবল বাহ্য অবয়বমাত্র দৃষ্ট হয়, এই আয়ুর্বেদ দর্পণ দ্বারা সকলে শরীরাভ্যন্তর সন্দর্শনে সক্ষম হইবেন। কয়েক বৎসর গত হইল ইহার খণ্ডত্রয় প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের নয়নগোচর হইয়াছিল, তৎকালে গ্রাহকগণের আনুকূল্য বিরহে শ্রম সাফল্য সাফল্য না হওয়াতে ব্যয় বাহুল্য ভয়ে এতৎ অতুল্য অমূল্য বিষয়ে ক্ষুব্ধচিত্তে বিরত হইয়াছিলাম সংপ্রতি পুনরায় জগদীশ্বর স্মরণ পূর্বক এমত সঙ্কল্প করিতেছি যে প্রতি মাসে এক খণ্ড করিয়া, ক্রমে একশত বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৮৫২ সালেই 'আয়ুর্বেদ দর্পণ' বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময়ে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখে, গত বৎসর...কয়েক-খানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে...আয়ুর্বেদ দর্পণ একবার বাঁচিয়া আবার মরিলেন।

১৮৫৩ সালে চিকিৎসা বিষয়ে আর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের খবর পাওয়া যায়। পত্রিকার নাম 'চিকিৎসা রত্নাকর'। সম্পাদক হলধর সেন।

হাওড়ার সিভিল সার্জন ডাঃ রবার্ট বার্ডের চেষ্টায় ১৮৬৩ সালের জানুয়ারীতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্যোক্তা বিদেশী সাহেব ছিলেন বটে সম্পাদক ছিলেন এদেশী। নাম দ্বারকানাথ দাস। নিবাস বংশবাটী। পত্রিকার মাসিক মূল্য আট আনা। অগ্রিম বার্ষিক পাঁচ টাকা। পত্রিকাটি সম্পর্কে ১৮৬৩-র ১২ জানুয়ারীর সংখ্যার 'সোম প্রকাশ'-এ লেখা হয়েছিল, 'ইহা পাঠ করিয়া আমরা দুটী কারণে আহ্লাদিত হইলাম। এক, এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায় এই নূতন প্রচারিত হইতেছে, এতদ্দ্বারা মহোপকার লাভ সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয় ইহা অতি সহজ ভাষায় ও রীতিতে লিখিত হইতেছে।

বিদ্যুৎ [illegible]

মানুষ

অজিতকুমার চক্রবর্তী

ফার্স্ট গ্রিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে ঢোকার পর থেকেই গড়ার নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার অজিতকুমার চক্রবর্তী। বাপ-ঠাকুর্দাও ছিলেন এঞ্জিনিয়র। ভারতের সর্বত্র তাঁদের কাজ। দেশের অনেক, নতুন নতুন রেল-লাইন, ইয়ার্ড, ব্রীজ অজিতবাবুর হাতে গড়া। শিয়ালদা ডিভিশনে থাকার সময় সবকিছু নতুন করে ঢেলে সাজাবার পরিকল্পনা করেছিলেন—ওপরয়ালা সরিয়ে দিল। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বারংবার বিভিন্ন ডিভিশনে। ষাটের দশকে টপ ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার জন্যে আমেরিকা গিয়ে তৎকালীন পরিবহণমন্ত্রী শৈস মুখার্জিকে দীর্ঘ আঠারো পাতার চিঠি লিখে কলকাতায় চক্ররেল করতে চেয়েছিলেন। চক্ররেল না হোক, পাতাল রেল তো হচ্ছে—অজিতবাবু খুব খুশী। চার বছর জি এম থেকে কাজ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন। সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ের প্ল্যান মূলতঃ এঁর প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়নি। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের ইতিহাস ভূগোল নখদর্পণে। 'রেল ব্যবস্থা চালু হবার আটত্রিশ বছরের মধ্যেই ইংলণ্ডে পাতাল রেল হয়েছে। আমাদের এখানে ১২৫ বছর বাদে হতে চলেছে—এটা কি টু আর্লি?' কাজ, কাজের স্বপ্ন দেশ নিয়ে উন্নয়নমূলক গবেষণা—এই নিয়েই আছেন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা কলকাতাকে আক্রান্ত করছে। রাস্তা চওড়া করে সমস্যার সমাধান হবে না। চাই এক নতুন কলকাতা। ব্যারাকপুর-বারাসাত অঞ্চলে নকিলোমিটার পরিধি নিয়ে এই নতুন কলকাতার পরিকল্পনা করেছেন অজিতবাবু—কেউ সাড়া দেয়নি। 'নতুন দিল্লি যদি হতে পারে, নতুন কলকাতা হবে না কেন?' যাট হাজার কিলোমিটার রেলই যথেষ্ট নয়, দেশকে বড় করতে হলে গ্রামগঞ্জের ভিতর দিয়ে নতুন লাইন পাততে হবে। ছকটা সারা। সামনেই রিটায়ারমেন্ট—তারপর উঠে-পড়ে লাগবেন। শুধু কলকাতার নয়, সমগ্র ভারতের পিঠে ইনি জুড়ে দিতে চান সেই ডানা, যার আরেক নাম গতি।

তারকেশ্বর পাঠক

কলকাতার চালু হিন্দী দৈনিক সন্মার্গের নিউজ এডিটর তারেকশ্বর পাঠক চাকরি জীবনের পুরো সময়টা তো বটেই, জীবনেরও অধিকাংশ সময় এই কলকাতায় কাটিয়ে গেলেন। শান্ত, নম্র, মিতভাষী এই ভদ্রলোকের জন্ম উত্তরপ্রদেশে। শিক্ষা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। বললেন 'শিক্ষান্তে কিছু দিন বেকার জীবন যাপন করার পর চাকরির খোঁজে কলকাতায় আসি। সেটা ছেচল্লিশ সাল। হিন্দী কাগজ লোকমান্যতে একটা সাব-এডিটরের চাকরি পেয়ে যাই। এক বছর পর যাই 'বিশ্ব-বন্ধু' কাগজে। তারপরের বছরই সন্মার্গ-এ। এই কাগজের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই আছি। পঁয়ষট্টি সালে নিউজ এডিটরের দায়িত্ব পাঠকজীর হাতে এসেছে। যখন দায়িত্ব নেন, তখনকার তুলনায় এখনকার সার্কুলেশন তিনগুণ: চাহিদা মেটাতেই তিরাত্তরে নতুন রোটারি মেশিন কেনা হয়েছে। তবে সবটা কৃতিত্বই নিজে নিতে চান না। সহকর্মীদের অবদান স্বীকার করেন। 'বছর তিনেক আগেও নিউজ-প্রিন্টের অভাব ছিল। এখন লোডশেডিং-এর জন্যে কাজের ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে। কিছুদিন বাদেই রিটায়ার করবেন। তারপর ফিরে যাবেন দেশে। প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'যখন কলকাতায় প্রথম আসি, তখনকার চেহারাই ছিল একেবারে অন্য। স্বাধীনতার পর থেকেই কলকাতার অবনতি সবদিক থেকে হয়েছে। এত সমস্যা অন্য কোথাও আছে বলে মনে হয় না। তবু কলকাতার একটা আলাদা মাধুর্য আছে।'

ময়ূখ বসু

ময়ূখ বসু কলেজ স্ট্রীট বইপাড়ার এক তরুণ প্রকাশক। এক সময় গল্প লিখেছেন কিছু। মাঝে মধ্যে এখনো লেখেন। কিন্তু নিজস্ব প্রকাশনা ব্যবসা থাকা সত্ত্বেও, নিজের বই প্রকাশ করেন নি। সে রকম ইচ্ছেও নেই। যদিও লেখার ইচ্ছে আছে। লেখার মত মানসিক স্থিরতা এলেই লিখব। এবং সিরিয়াসলি লিখলেই বই প্রকাশ করব।' বেঙ্গল পাবলিশার্স চল্লিশ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান। গোড়াপত্তনের সময়ে আমার বাবা মনোজ বসু ছিলেন। সেই সময়ে তাঁদের মত লেখকদের বই প্রকাশের পথ প্রায় বন্ধ ছিল। বেঙ্গল পাবলিশার্স এবং গ্রন্থ প্রকাশ, এই দুটি প্রতিষ্ঠানই ময়ূখ দেখছেন তাঁর কুড়ি বছর বয়েস থেকে। দেখতে দেখতে এগারো বছর হয়ে গেল। শুরুতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে, নতুন ধরনের প্রকাশনার কথা ভেবে-ছিলাম। বেশ কিছু কাজও করেছি। আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দিতেন সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এখন ইচ্ছে আছে কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য বই নতুনভাবে প্রকাশ করার।' পড়াশুনা করেছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে। ওখানকার সঙ্গে এখনো গভীর যোগাযোগ আছে। ভালো খেলোয়াড় হিসেবে এক সময়ে স্কলারশিপ পেয়ে-ছিলেন। ডালহৌসী ক্লাবের ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন। সবার লেখাই পড়েন। তবে প্রিয় লেখক—তিন বাঁড়ুজ্যে। 'বাবার বিপ্লবের ওপর লেখা বইগুলিও ভালো লাগে।'
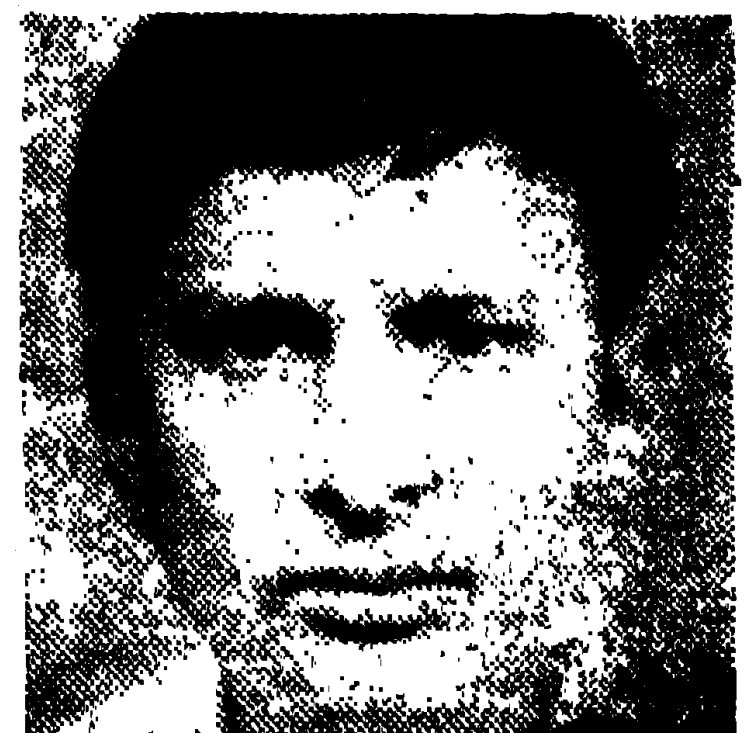
প্রশ্নের উত্তরে বললেন—এই মুহূর্তে নতুন লেখকদের বই প্রকাশ করা অসম্ভব। কারণ অকল্পনীয় কস্ট অফ প্রোডাকশন।' এর সময়েই চেষ্টা করছেন বইয়ের দাম কিভাবে কমানো যায়। কাজের সুবিধের জন্যে নিজস্ব প্রেস করার ইচ্ছেও মাঝে মধ্যে হয়।

[illegible]

দুপুর

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডুবে যাচ্ছি,
কনহলুদের গায়ে ঝুঁকে পড়ে যাচ্ছি।
কথা চুনে চুনে পাওয়া মধুর ওপরে দুটো চোখ
খিড়কি পথ ছাওয়া ওকড়া-জঙ্গলের রঙ—একটানা....চষামাটি মেঘ
গহন ঘোরের মতো—দোর ধরে বসে আছে সমস্ত দুপুর...
এক জীবনের মতো দীর্ঘ দুপুর
খোলা কলরোল ভরা শান্ত উজ্জ্বল
দু হাতের অবুঝ বাঁধন ধরে ঢুকে এল—
দম রোধ হয়ে আসে—ডালপালার, শষ্পাভ স্তনের
কষহলুদ গন্ধ....

দোর ধরে বসে আছে সমস্ত দুপুর
গহন ঘোরের মতো—কেবলই উসকে তোলে পোড়া সলতের মুখরাগ,
ভেতর পাথর ফুঁড়ে চলে যাও
খিড়কি পথ পার হয়ে চলে যাও মেঘ-জঙ্গলের নিচে নিচে
ভুবকৌড়িদের পথে—দুপুর পোয়াও দেহাতীর
কষহলুদের দম চেপে ধরা অবুঝ দুপুরে

দোর চেপে বসে আছে সমস্ত দুপুর....

বিষপান

শিবশঙ্কর রায়চৌধুরী

সারারাত তোমার বুকের কাছে শুয়ে আছি আমি,
খোলা জানালায় কী হলুদ রঙ, জ্যোৎস্নার মৃদু আলো,
ঘন রন্ধকারে ভাঙচুর বিষণ্ণ বেলার পাখি, তোমার ঘরের ধূপ,
শরীর ছায়ার মতো সুদূর স্বপ্নের থেকে ঝুলে থাকা কুসুম মশারি,
এই বন্ধ ঘরে তুমি আকাশ নামালে,
নিশ্চুপ সময় খেলে যায়, আমার কিছুই হয় না যে,
শুধু স্খলিত মালার ধুলো ঝেড়ে,
বাতাসের চুল থেকে উড়ে যায় আশ্চর্য আঙুল, সুচতুর নখ,

সমস্ত সময় জুড়ে তোমার ঘৃণার ওড়াওড়ি,
নাকি দাহন প্রস্তুতি—বিষপান।

নষ্ট কবিতায়

সমর চক্রবর্তী

এমনি করে প্রেম ভাঙে, বড়ো হয় মাংসল বিবেক—
জীবনের কবিতায়, একদিন কিছুতেই ছন্দ মেলে না,
ব্যর্থ শব্দ জেগে থাকে সারারাত ধরে আকাশের নিচে
সকালে শিশির ভেজা ঘাসে বদহজমির বমি হয়
জীর্ণ মন জোড়া দিতে বদ্যি ডাকে কোন এক গৃহস্থ প্রতিমা
ভুল হয় মাত্রাবৃত্তে আটাশের উচ্চারণে কোন সুর নেই।

বৃক্ষ পাশে ছিল, তার ছায়াটিও, আজ আর কেউ নেই
প্রাপ্য শীতলতা থেকে, প্রয়োজন পর্ব থেকে, এবং স্বপ্ন থেকে
বহুদূর চলে গেছে মন, ইতিহাস যেমনি এগিয়ে যায়
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নষ্টনারী দেবী হয় আর রমণী কুলটা,
সবেতে সন্দেহ জাগে, আপন পরের মুখ ভালবাসা, ভরসার কথা,
হৃদয় মেজাজ ভাঙে, রুচিটুকু একটু পাল্টে ফ্যালে:
এমনি করে প্রেম ভাঙে, বড়ো হয় বিষধর মাংসল বিবেক
ঘটনা তেমনি ঘটে, শুধু রং-করা ছাতে একটা ছোট্ট ফুটো থেকে যায়
একমাত্র বাঈজীকে দেখার লোভেই আমি মাঝে মাঝে মন্দিরে যাই।

কলকাতায় উড়াল ট্রাম চাই

অজিতকুমার চক্রবর্তী

বিরাট শহর কলকাতা অথচ পুরোন নয়। মাত্র তিনশ বছর আগেও এটা ছিল নগণ্য একটি মহাল যার নাম পাওয়া যায় আইন-ই-আকবরিতে রাজা টোডরমলের হিসাব খাতায়। ১৬৯০ সালে জব চার্নক এখানে বাসা বাধেন নবাবী ফৌজের তাড়া খেয়ে হুগলী থেকে পালাবার পর। এখানে ছিল সাবর্ণ চৌধুরীর কাছারী-বাড়ি। ১৭১০ সালেও গ্রাম-কলকাতার বাড়ীঘর প্রায় ছিলই না বলতে গেলে। সুতানটি আর গোবিন্দপুর নিয়ে, তিনটি গ্রামে ১২০০০ লোক বাস করত। এদেরই মাঝে আজকের বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগের চারপাশে বাস করত ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়। তখন ছিল ভারতবর্ষের দুঃসময়' মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব মারা যান ১৭০৫ সালে! আর তখন থেকেই আরম্ভ হয় সারা দেশে অরাজকতা। নবাব বদলাতে থাকে বাংলায়। জমিদারদের ওপর কড়া নির্দেশ জারি হয় খাজনা বেশী দেবার জন্য। না দিতে পারলে অত্যাচার চলবেই। জমিদাররা তাদের প্রকোপ বাড়ায় প্রজাদের ওপর। ব্যবসা বাণিজ্য, বিশৃঙ্খলায় শেষ হয়ে যায়। ওদিকে মারাঠারা চৌথ আদায় করে। না দিলে বাংলা পর্যন্ত হামলা করে। তাদের নৃশংসতা প্রবাদ হয়ে আছে শিশুদের ছড়ায়। সেই বর্গীদের ভয়ে ইংরাজরাও নদীর পূব পাড়ে বাণিজ্য বসত গড়ে তোলে। আর নবাবের ফৌজদারের ভয়ে খনন করায় কলকাতার উত্তরের খাল। ইংরেজের দুর্গ হয়ে দাঁড়ায় আশ্রয় প্রার্থীদের নিরাপত্তার প্রতীক। তাই ১০০ বছরের ভেতর কলকাতার জনসংখ্যা ১৮১০ সালে হয় প্রায় চার লাখ। তার মধ্যে ইউরোপীয়দের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। ফলে ইংরাজ বণিকরা নিজের এলাকাটুকু ভালভাবে গড়ে তোলে। কিন্তু ভারতীয় বসতকারীদের ওপর কোনও আইন আরোপ করে না তারা যে যেখানে পারে বসতি গড়ে ফেলে। রাস্তা বলতে তখন ছিল চিৎপুর রোড। আর সব অলিগলি তৈরি হল বাজার অনুযায়ী আর জমিদারদের অভিরুচি অনুসারে। কাজের লোকেরা বসে পড়ল তাদের পেশা অনুযায়ী। তাই কলকাতার এলাকাগুলোর নাম রয়ে গেছে বাজার হিসাবে বা কাজের নামে—যেমন শ্যামবাজার বা কুমোরটুলি। তাই কলকাতার রাস্তাঘাট তৈরি হল যেমন তেমন ভাবে। পাল্কি যেতে পারলেই হল এমনি ঢঙে। পাল্কি বহনকারীদের কাদা নোংরাজলে ভরা গলি পার হতে কষ্ট হত কিন্তু তাদের অসুবিধার কথা শোনার মত কেউ ছিল না। আশ্চর্য মনে হয়—সেই ইংরেজ যে আমেরিকায় ইংলণ্ড থেকে বিতাড়িত হলেও ১৭৭৬ সালে ওয়াশিংটনের গোড়াপত্তন করে, চওড়া রাস্তাকে শিরদাঁড়া করে আর গ্রিড সিস্টেম চালু করে আমেরিকার সব শহরে, তারাই ভারতের প্রথম বিলাতী শহর [illegible] এত কার্পণ্য করেছিল কেন। বোধহয় শহর গড়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। ভারতীয়দের জন্য কোন দরদ দেখাবার দরকার মনে করেনি। আরও আশ্চর্য যে সবচেয়ে পুরনো সভ্যতা গুলি যেমন 'সুমের', 'নীলনদ', 'সিন্ধুনদ' উপত্যকার বাসিন্দারা সকলেই গ্রিড, সিস্টেমের শহর গড়ার জ্ঞান লাভ করেছিল ভারতেরই মহেঞ্জোদারো থেকে। অথচ কলকাতার প্ল্যানের মধ্যে কোনও সভ্য স্থাপত্য দৃষ্টিভঙ্গী অন্ততঃ রাস্তাগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। ইংরাজরা বণিক হিসেবেই এখানে বাস করত। ভারতের উন্নতিকল্পে কিছুই করেনি।

কলকাতার সুস্বাস্থ্য নির্ভর করছে এর পরিবহণ ব্যবস্থার ওপরে। কলকাতার রাস্তাগুলো দখল করে আছে সারা এলাকার মাত্র ৬.২ শতাংশ যেখানে যে কোনও বড় শহরেই রাস্তার জন্য ছাড়া হয় প্রায় ২০ শতাংশ কিম্বা আরও বেশী: কলকাতার প্রশস্ত রাস্তা বলতে তিনটি—চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বা আচার্য জগদীশ বোস রোড, আর আছে চৌরঙ্গী থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত আশুতোষ আর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। অন্যসব রাস্তা নিতান্তই সরু আর তার ভিতর দিয়ে ট্রাম চলাচল করে বলে সেগুলির যানবাহন চলে মন্থর গতিতে। বাস যত বেশি চলবে তত তাদের গতি কমে যাবে, তাই বাস কিনলেও চলাচলের সুবিধে বিশেষ বাড়ে না। কলকাতার রাস্তাগুলোর ওপরে যে ভার পড়ে সারা দিনে, অত ভার [illegible] পৃথিবীর খুব কম শহরেই রাস্তাকে নিতে হয়। কিন্তু এ ভার নেবার ক্ষমতা কলকাতার রাস্তার নিচেকার মাটির নেই। কাদার ওপরে কোন রাস্তাই টিকতে পারে না। রাস্তারও ভিত দরকার। ভাল না হলে প্রতিটি চাকার তলায় রাস্তা চেপে যায় এবং চেপে গেলে রাস্তার পাথর আলগা হয়ে পড়ে, কারণ রাস্তা তো আর স্প্রিং নয় যে আবার চাড়া দিয়ে উঠবে। কলকাতার রাস্তার সঙ্গে তুলনা করা যায় নদীর ধারে পলির বিস্তারের সঙ্গে। রোদের তাপে ওপরটা শুকোয়। তখন হাঁটলে পা চেপে যায়, কিন্তু ভেতরের কাদা ভাবটা থেকেই যায়। এই রকম চাপ যদি ক্রমাগত সহ্য করেও ওপরকার আস্তরণকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে রাস্তার কার্পেটটা হতে হবে লোহার শিক দিয়ে শক্ত করা। তাই কলকাতার রাস্তার জন্য পাকা লোহা দেয়া কংক্রিটের দরকার। এখানে বিটুমেনের রাস্তা কিছুতেই চলতে পারে না; প্রতি বছর ভাঙবেই কারণ না আছে এর কোনও টেনশন সহ্য করার ক্ষমতা, না থাকে এর পাথরে আঠার ভাব বজায় রাখার গুণ। যখন বর্ষার জলে সবকিছু ধুয়ে মুছে পাথরে কাঁচগুলোকে পরিষ্কার করে দেয়। তাই এরকম রাস্তার ওপর ট্রাম চালালে রাস্তা তো নষ্ট—ট্রামের লাইনও ক্রমাগত খারাপ হয়। সব নিয়ে শুধু একটি অপরিসীম [illegible] দায়বহুল হয়ে পড়ে। রাস্তাগুলি আবার যদি ক্রমাগত খুঁড়তে হয়, আজ জলের পাইপ বাড়ানোর জন্য, কাল ইলেকট্রিক বা

টেলিফোন লাইন বসাবার জন্য, তাহলে তো কথাই নেই। রাস্তা রাস্তাই থাকে না, হয়ে দাঁড়ায় বিস্তীর্ণ জলাধার।

রাস্তাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে দরকার এমন সব প্রকল্প প্রথমতঃ যাতে মানুষের প্রয়োজনে ক্রমাগত সব সময় খুঁড়তে না হয়। দ্বিতীয়তঃ যাতে ট্রাম লাইনের মেরামতির জন্য সব সময় রাস্তা বন্ধ বা খারাপ হয়ে না যায় এবং তৃতীয়তঃ খরচ বেশী পড়লেও রাস্তা আরও পাকাপোক্তভাবে তৈরি করা যায় যাতে নীচের কাদা সত্ত্বেও যানবাহনের চাপে রাস্তা না ভেঙে যায়।

কলকাতার সীমিত রাস্তাগুলিতে এত বেশী মানুষকে সব সময়ই চলতে ফিরতে দেখা যায় সেরকম জনস্রোত অন্য শহরে হয়ত কেবলমাত্র কোন মেলাতেই নজরে পড়ে। হাওড়া বা শিয়ালদা স্টেশন থেকে সকাল বেলা অবিরাম পদাতিকের ভীড় এগিয়ে চলে আপিস পাড়ার দিকে। যানবাহন থমকে দাঁড়ায়। পিছু হটতে চাইলেও পারে না। কোনও রকমে অনেক সময় নিয়ে তারা ভয়ে ভয়ে এ জনস্রোতকে যেন সাঁতরে পার হয়। সকালে প্রায় সব রাস্তা-গুলোতে জমে ওঠা বাস, মোটর, ট্রাম, ট্যাক্সির ভীড় দেখা যায় আবার বিকেলেও তাই। আগে দুপুরের দিকে কিছুটা ফাঁকা পাওয়া যেত এখন আর নয়। এখন কলকাতার ভীড় সর্ব সময়ের এবং যাতায়াতও বহুমুখী। ভীড় দেখলে স্বতঃই মনে হয় সব মোড়গুলোতেই যদি উড়াল পুল হোত তা হলে হয়ত বা কিছুটা সুরাহা হোত। কিন্তু একটা উড়াল পুল করতেই বহু বছরের পরিকল্পনা চলে যায়; দ্বিধা যেন লাগাম; তাই অনেক সমীক্ষার পরও কোনও কিছু করে ফেলা কলকাতা শহরের পক্ষে যেন মুমূর্ষুর বহু পরিশ্রম করে পাশ ফেরা। এপাশ ওপাশ হয়ত করা চলে কিন্তু উঠে বসে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে ধাবমান হওয়া যেন স্বপ্নেই সম্ভব।

তবু এই কলকাতার বুকে যেন অস্ত্রোপচার করে কৃত্রিম নতুন রক্তের নালী বসান হচ্ছে যার আর এক নাম পাতাল রেল। হলে হবে এটা হৃৎপিণ্ডের পেসমেকার। কলকাতা কিছুটা বলীয়ান হবে এবং আর এক নতুন প্রয়াস স্বপ্ন থেকে বাস্তবে আসবে।

পাতাল রেলটা আসলে কী? প্রথমতঃ এটা পথচারীদের চলাফেরার সমভূমির চেয়ে নীচে, একেবারে আলাদা যাতায়াতের পথ। আবার লাইনের ওপর চলে এক সঙ্গে আটটা বগি বা কোচ। অথচ এই আটটা বগির প্রায় ২৫০০ লোক নিয়ে যেতে রাস্তার ওপর লাগত ৪০টা ডাবল ডেকার বাস বা ২০টা ট্রাম। বাস হাত ধরাধরি করে চলে না। প্রত্যেকটি বাসের আগে, পেছনে আর দুপাশে বেশ কিছুটা জায়গা ছাড় দিয়ে অন্য বাস বা যান চলতে পারে। এরকম একটি সমীক্ষা কিছুদিন আগে বিলাতে করা হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে একই সংখ্যক যাত্রী নিয়ে যেতে একটা ট্রেনের জন্য যত জায়গার প্রয়োজন তার থেকে অন্ততঃ ২৩ গুণ বেশী বর্গ জমি লাগে বাসে সমান লোককে নিয়ে যেতে। আরও কয়েকটি সমীক্ষা থেকে আমেরিকায় এটা নির্ধারিত হয় যে যতই বাস বাড়ানো হবে ততই তাদের সমষ্টিগত গতি কমে যায় এবং তাই বাসে করে কোন শহরে ব্যস্ত রাস্তায় ঘন্টায় ৬০০০০-এর বেশী লোক নিয়ে যাওয়া হয়ে পড়ে সুকঠিন। পরিবর্তে পাতাল রেলে ঘন্টায় ৬০০০০ লোক নিয়ে যাওয়া সহজেই সম্ভব। তাই বহু শহরে অনেক খরচ করেও পাতাল রেল সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হচ্ছে। যখন কলকাতায় পাতাল রেল চালু হবে অন্ততঃ ১৫ লক্ষটি সহস্র এতে করা চলবে। এগুলি বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলবে তাই শহরের বুকে তেল পুড়িয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে মানুষের স্বাস্থ্যহানির একটি প্রধান কারণও দূর হবে। তাই এখনকার কয়েক বছরের কষ্ট ভোগে যদি ১০০ বছরের আনন্দ জোগায় তাহলে না হয় কষ্টই করা যাক। মানুষের ওপর শল্য চিকিৎসার কষ্টের সন্দেহ নেই কিন্তু তার পর প্রাণহানির আশঙ্কা কমে যায়। সেরকম পাতাল রেলে যদি ১৫ লক্ষ যাতায়াত সাধিত হয় কলকাতার রাস্তার গাড়ি চাপায় মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমে যাবে।

পাতাল রেল চালু হলে মাত্র ২০ মিনিটে দূর প্রান্তের লোক শহরের মাঝখানে আসতে পারবে। স্বতঃই এর প্রতি মানুষের মন থেকে একটা সহানুভূতি সৃষ্টি হবে, তারা বেশী করে এটাকে ব্যবহার করবে। সময় কম লাগবে বলে দুপাশ থেকে অনেকেই বেশ কিছুটা হেঁটে এসেও পাতাল রেলে চড়বে। আর কলকাতা শহর লম্বাটে ধরনের তাই এই রেলের দ্বারা অনেক বেশী লোক উপকৃত হবে যাদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলবে। এর ফলে পাতাল রেলের প্রতিটি স্টেশনে এক সঙ্গে অনেক লোক নামবে বা উঠবে। তারা চারদিকে ছড়িয়ে যেতে চাইবে। তাছাড়া পাতাল রেল বি. বা. দী বাগের খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে না বলে অনেক যাত্রীর চাহিদা হবে যাতে তাদের বি. বা. দী বাগ যাওয়া আসার সুবিধা করা হয়।

এরকম একটা পরিস্থিতির কথা ভেবে ট্রামকে আরও ভালভাবে কাজে লাগানোর চিন্তা করা অহেতুক হবে না। একথা ভেবে আমার মতে উড়াল ট্রামের খুবই প্রয়োজন হবে আর সেটা কোথায় সহজে করা যায় তাও ভেবেছি।

মনে করা যাক কলকাতার ময়দানের কথা। এর পূব দিকে রয়েছে চৌরঙ্গী এলাকা, দক্ষিণে ভবানীপুর থেকে আলিপুর আর খিদিরপুরের পথ আর উত্তরে আপিসপাড়া, হাইকোর্ট, খেলার মাঠ ইত্যাদি, পশ্চিমে গঙ্গা। এর চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ ছাড়াও বেড়ানোর, চিত্তবিনোদনের নানা উপকরণ। রেস খেলার মাঠ, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রবীন্দ্র সদন, ফাইন আর্টস আকাদেমি, প্ল্যানেটোরিয়াম ও মিউজিয়াম। আর অনেকে যান গঙ্গার ঘাটে নিয়মিতভাবে আর পড়ুয়ারা যান বেলভেডিয়ার লাইব্রেরীতে। ময়দান যেন কলকাতার ফুসফুস। এখানে এসে লোকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আজকাল অনেকেই এখানে বেড়িয়ে বেড়ান। পাতাল রেল চালু হয়ে যাবার পর এর চারটে স্টেশন, রবীন্দ্রসদন, ময়দান, পার্ক স্ট্রীট আর এসপ্ল্যানেড নিয়ে আসবে সারা কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষকে আনন্দের খোঁজে। আমেরিকায় ডিসনিল্যাণ্ড যেমন আনন্দ দেয় বহু দূর দূরান্তের মানুষকে সেরকম ময়দান হয়ে উঠবে নতুন আকর্ষণ। ভাল করে চিন্তা করলে ময়দানকে আরও সুন্দর করে সাজানো যাবে আরও নতুন উপকরণ দিয়ে মনোরম করে তোলা যাবে। তাছাড়া গান্ধীজির বা বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপনের পরিবর্তে, সাবরমতি আশ্রম বা বিবেকানন্দের বাণী প্রচারের মত করে একটি পর্ণকুটির সম্বলিত শান্তিময় পরিবেশ করে তোলা যাবে যেখানে ময়দানের মানুষের বিশ্রাম করার ব্যবস্থা থাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে তারা কিছু জানতে পারবে, শিখতে পারবে ভারতের কৃষ্টি। অন্যদিকে লেনিনকেও শুধুমাত্র প্রস্তর মূর্তি করে না রেখে তাঁর ও কর্ম-জীবনকে লোক সমক্ষে প্রচার পরিবেশন করা চলবে।

ময়দানকে সবুজ করে রেখে মানুষের আত্মচেতনার অনেক খোরাক যোগান যাবে। পাতাল রেল চালু হলে আজ থেকে

অনেক বেশী লোক ময়দানকে ব্যবহার করতে ছুটে আসবে একথা মনে রেখে একটা নতুন পরিবহণ তৈরি করতে হবে। ময়দানের চারপাশে একটা চক্রাকার উড়াল ট্রাম যদি চালানো যায়, যার একটা 'পা' বিবাদী বাগ ছুঁয়ে আসবে তাহলে এই চক্রাকার উড়াল ট্রামের ব্যাস হবে প্রায় ৯ কিলোমিটার। একটি মাত্র লাইন পাতা যাবে কংক্রীটের থামের ওপর কংক্রীটের বীম পেতে। মাঝে মাঝে যাত্রীদের জন্য প্ল্যাটফর্ম থাকবে আর সহজে ওঠা-নামা করবার জন্য যান্ত্রিক সিঁড়ি লাগানো যাবে। লাইন বসানো হবে রাবার প্যাড দেয়া বেয়ারিং-এর ওপর এরকম লাইন বর্ষায় আদৌ বসবে না। এর আয়ু অনেক বেশী হবে। তাই মেরামতি খরচ খুবই কম হবে। সম্পূর্ণ বৃত্তাকার লাইনে একদিক ধরে যদি লাগাতার ট্রাম চলে, একটার পেছনে একটা এরকম অন্ততঃ ২০০ ট্রাম সেট চালানো যাবে। সকাল থেকে ট্রামগুলি চলবে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। চৌরঙ্গীর পাশ ধরে ঢুকবে বিবাদী বাগে, বেরিয়ে আসবে ইডেন উদ্যানের পুব ধার দক্ষিণ দিক ধরে। তারপর গঙ্গার ধার দিয়ে হেস্টিংসের নতুন পোলের তলা দিয়ে ময়দানের দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর আবার চৌরঙ্গী পর্যন্ত।

এরকম উড়াল ট্রাম যদি ক্রমাগত ময়দানের চারদিকে ঘুরতে থাকে পাতাল রেলের যাত্রীরা সকলে ৫টে স্টেশন থেকে নেমে উড়াল ট্রাম ধরে সকালবেলা অফিস চলে যেতে পারবে। তাহলে পাতাল রেল যে বিবাদী বাগ হয়ে চলবে না সে অসুবিধাটা আর কাউকে ভোগ করতে হবে না। এই ট্রামগুলি নিজের স্বনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত চক্রাকার লাইন ধরে ক্রমাগত বেশ দ্রুত বেগে ঘুরতে পারবে ৯ কিলোমিটার বৃত্তটিতে। এগুলোর গতি প্রতি ঘন্টায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত করে দেওয়া যাবে যাতে ৯ কিলোমিটার পথ ঘুরতে লাগবে মাত্র ২৫ মিনিট থামার সময় দিয়েও। যদি একটার পর একটা ট্রাম চলতে থাকে সহজেই অনুমান করা যায় এর পরিবহণ ক্ষমতা হবে অনেক বেশী আর ভীড়ও কম হবে। তাছাড়া ট্রাম ২ কোচের না হয়ে ৪ কোচেরও হতে পারে। অন্তত ১০ থেকে ১৫ লক্ষ মানুষের যাত্রা এর মাধ্যমে দৈনিক হতে পারবে। বেশ কম ভাড়া নিলেও এর থেকে লাভ নিশ্চয়ই হবে, কারণ মেরামতি খরচ খুবই কম হবে।

উড়াল ট্রাম সকাল থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইস ঘুরবে সাধারণভাবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। তারপর সবগুলি ট্রাম এক-সময় অন্য দিকে ঘুরতে পারবে অর্থাৎ ক্লকওয়াইস। তাহলে বিবাদী বাগ অঞ্চলের লোকেদের অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে আদৌ বেশী সময় লাগবে না।

এর সুবিধাগুলি এবার বিশ্লেষণ করা যাক।

প্রথমতঃ পাতালরেলের যাত্রীদের বিবাদী বাগ পৌঁছে দেবে বা আরও অন্য কোথাও যেমন হেস্টিংস এলাকা থেকে খিদিরপুর বেহালা যাওয়ার সুবিধে করে দেবে।

দ্বিতীয়তঃ ভবানীপুর আর চৌরঙ্গি অঞ্চলের লোকেরা হেঁটেই চলে আসতে পারবে ট্রাম পর্যন্ত। তাদের বাস ব্যবহার করতে হবে না।

তৃতীয়তঃ দ্বিতীয় গঙ্গা পুল তৈরি হবার পর যেসব যাত্রীরা ওপার থেকে আসবে, তাদের এই ট্রাম ধরে নিতে অসুবিধা হবে না।

চতুর্থতঃ খেলার মাঠের যাত্রীরা এই ট্রাম ব্যবহার করলে রাস্তাদের সকালের ভীড় থেকে পথগুলি মুক্ত হবে।

পঞ্চমতঃ এই ট্রামলাইন ধরে কী বড়লোক কী গরীব সকলেই সহজে যাতায়াত করতে পারবে। তাছাড়া অনেক মোটর আর ট্যাক্সি যেগুলি রোজ অফিস পাড়ায় যায়, তাদের জন্য উড়াল ট্রামের তলা ধরে অনেক মোটর পার্কিং-এর ব্যবস্থা করা যাবে। প্রতি মোটর যদি মাসে ১০৲ থেকে ৩০৲ টাকা এই বাবদে ভাড়া দেয়, তাহলে পার্কিং ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলবে এবং কর্মীরা রক্ষণাবেক্ষণ করেও ভাল রোজগার করতে পারবে।

ষষ্ঠতঃ বেশ কিছু সংখ্যক বাস রবীন্দ্র-সদন থেকে প্ল্যানেটেরিয়াম পর্যন্ত এসে যাত্রী নামিয়ে ফিরে যেতে পারবে যার ফলে বিবাদী বাগে বাসের সংখ্যা অনেক কমে যাবে।

এবার বুঝতে হবে উড়াল ট্রাম থেকে যদি এতগুলি সুবিধা পাওয়া যায়, তাহলে বিবাদী বাগ এলাকা থেকে অনেক যানবাহন সরে যাবে, ভীড় কমবে, পথচারীরাও নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারবেন। এমনকি অনেক বাস যেগুলি বৌবাজার ধরে বিবাদী বাগ আসে, সেগুলিকে ময়দানের কাছ পর্যন্ত এসে যাত্রী ছেড়ে যেতে বলা যাবে। বৌবাজার ধরে যদি বাস কমে যায় তাহলে ওই রাস্তা ধরে ট্রাম বাড়ানো যাবে। এতে শিয়ালদার প্যাসেঞ্জাররা পায়ে চলার অসুবিধা থেকে মুক্ত হবে।

এরকম উড়াল ট্রাম বা রেল টোকিও শহরে প্রচুর আছে। এবং সেখানে এদের ব্যবহারও হয় খুব বেশী। প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ উড়াল ট্রাম বা রেলে চড়ে। উড়াল ট্রামের বিফল হবার কোন আশঙ্কা নেই। লাভ হবেই, কারণ ভাড়া না দিয়ে কোন যাত্রী নিশ্চয়ই চলে যাবে না, আর এর ভাড়াও কম রাখা যাবে।

খরচের দিক থেকে বলা যায় ৯ কিলোমিটার কংক্রীটের উড়াল পুল করতে লাগবে মাত্র ৬ কোটি টাকা আর স্টেশন তৈরি, মেরামতি কারখানা ইত্যাদি করতে লাগবে আরও ৫ কোটি। তারপর যদি এখনকার ট্রামগুলোকে মেরামত করে ওপরে চালানো হয়, তাহলে মূলধন বেশী লাগবে না। হয়ত টালিগঞ্জ থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত পাতালরেল চালু হবার পর অন্ততঃ হাজরা থেকে এসপ্লানেড লাইনের আর প্রয়োজন হবে না। ঐ লাইন, এবং ওখানকার সব কোচ উড়াল ট্রামের জন্য ব্যবহার করা যাবে। ধীরে ধীরে নতুন ধরনের কোচ তৈরি করা যাবে ভারতবর্ষের কারখানাগুলিতে। মোট ১৫ কোটি টাকাও হয়ত লাগবে না। অথচ এর থেকে প্রচুর সুবিধা হবে লোকেদের।

অফিস খোলা থাকলে, অফিস যাত্রীদের সুরাহা তো হবেই, অফিস বন্ধ থাকলে ছুটির দিনে বহু লোক এতে করে বেড়াবে কারণ অনেক ছেলেমেয়ে বাড়িতে বসে না থেকে পাতালরেল ধরে ময়দান আসবেই, তারপর তারা উড়াল ট্রামে চড়বে, এর চারদিকের সব আনন্দের খোরাক থেকে কিছু হাসি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।

ময়দানের চারদিকে উড়াল ট্রামের চলাফেরা বেখাপ্পা দেখতে যাতে না লাগে তার জন্য এর দু-পাশে গাছ লাগাতে হবে। যেমন ইউক্যালিপটাস গাছের সারি সহজেই বেড়ে উঠতে পারে। গাড়ি-গুলিকে মনোরম রং দিয়ে সাজানো যাবে। স্টেশনগুলিও সুন্দর করে তৈরি করা যায়। মোট কথা উড়াল ট্রাম হবে পরিবহণ সমস্যার মোকাবিলা করতে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এরপর অনেক জায়গায় অনুরূপ উড়াল ট্রাম করার কথা ভাবা যাবে। কেননা পাতালরেলের থেকে এর খরচ অনেক কম। বিশেষ করে এগুলি চলবে বৈদ্যুতিক শক্তিতে যা কয়লা থেকে উৎপন্ন করা যায়। শহরে তেল পুড়বে না, ধোঁয়া হবে না, স্বাস্থ্যহানির আশংকা কমে যাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা অন্ততঃ প্রতিদিন একটি করে জীবন বাসের চাকায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে না। পথগুলি মানুষের ভীড় থেকে অনেকটা রেহাই পাবে।

সমালোচনা

আধুনিক বিশ্বকোষ

আরিস্টটলের যুগে জগতে জ্ঞানবার চ যা-কিছু বিষয়বস্তু ছিল, তা যে-কোন ক ব্যক্তির পক্ষে জেনে ফেলা সম্ভবপর ল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ওরোপে যে নব-জাগৃতি অনুষ্ঠিত হয়, রপর জ্ঞান-রাজ্যের পরিধি এমন দ্রুত- র সঙ্গে বিস্তারিত হল যে, সর্বজ্ঞ হওয়া নুষের পক্ষে আর সম্ভবপর রইল না। থনই জ্ঞানকোষ প্রণয়নের দিকে মানুষ ঝুকে পড়ল। প্রথম এগুলি লাতিন ভাষায় চত হতে লাগল। কিন্তু সাধারণ লোকের ক্ষে লাতিন ভাষায় রচিত এই বইগুলি ড়া সম্ভবপর ছিল না বলে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে এফ্রাহিম চেমবারস ইংরেজি ষায় তাঁর এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশ রেন। তাঁর দেখাদেখি দিদরো, দ' লেম্বার, ভলটেয়ার, রুশো মনটেসকু ভৃতি ফরাসী পন্ডিতেরা তাঁদের সাইক্লোপেদি রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই াষগ্রন্থই ফরাসী বিপ্লবের পথ প্রস্তুত র দেয়। তারপর ইংলণ্ডে উইলিয়াম র্মাল, অ্যান্ড্রু বেল ও কলিন ম্যাকফার- কুয়াহার-এর সম্মিলিত চেষ্টায় ১৭৬৮-৭১ খ্রীষ্টাব্দে একখানা আদর্শ বিশ্বকোষ কাশিত হয়, নাম এনসাইক্লোপিডিয়া িটানিকা। প্রামাণিক বিশ্বকোষ হিসাবে র সুনাম এখনও অব্যাহত। এদিকে উন- ংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই বাংলা াষায় বিশ্বকোষ প্রকাশের প্রচেষ্টা চলতে কে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সমাপ্ত গেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষই তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বকোষ প্রকাশের াবার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। াধুনিক বিশ্বকোষ এই সব প্রচেষ্টার অন্য- ম। বলা হয়েছে, ২৫ খণ্ডে এখানা সমাপ্ত ব। বছরে দু-খণ্ড করে বেরুলেও (যা র্তমানে মুদ্রণশিল্পের সংকটময় পরি- স্থিতিতে অসম্ভব), এটা সমাপ্ত তে বারো বছরের অধিক সময় লাগবে। থন গোড়ার খন্ডগুলির আধুনিকত্ব আর াকবে না। সেক্ষেত্রে আধুনিক নামের ার্থকতা ঠিক বুঝতে পারা গেল না। যদি গেন্দ্রনাথের বিশ্বকোষ থেকে এখানাকে ৃথক করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে নব বা ূতন নাম দিলেই ভাল হত।

ভূমিকায় বলা হয়েছে—আমাদের াধুনিক বিশ্বকোষ 'একাধারে শব্দাভিধান সাইক্লোপিডিয়া।' যেখানে বাংলা ভাষায় রিচরণ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও যোগেশচন্দ্রের রাট শব্দকোষসমূহ রয়েছে, সেখানে বিশ্ব- াষের সঙ্গে শব্দাভিধান যোগ করে অযথা লেবর বৃদ্ধি করার হেতু বুঝলাম না। বশ্য এমন অনেক শব্দ আছে র বিশেষ অর্থ ও ব্যাখ্যা বিশ্ব-

আধুনিক বিশ্বকোষ

প্রথম খণ্ড

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ...

কোষে থাকা উচিত, কিন্তু বিশ্বকোষ সাধারণ শব্দের অর্থপুস্তক হওয়া উচিত নয়। এ রকম শত শত সাধারণ শব্দ আধুনিক বিশ্বকোষে স্থান পেয়েছে। যথা বর্তমান খণ্ডে অগ্নিকাণ্ড অত্যাচার, অঙ্গ- মার্জন, অঙ্গহীন, অঙ্গহানি, অজ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতে, অতিদৈন্য (ভয়ানক দারিদ্র্য), অতি- দ্রুত (খুব তাড়াতাড়ি), অতিবিস্ময় (অত্যন্ত বিস্ময়), অতিবীর (অত্যন্ত পরাক্রমশালী), অতিব্যস্ত (অতি ব্যগ্র), অতিব্যয়ী (অত্যন্ত বেশী ব্যয় করে এমন), অতিমাত্রা, অতিশয় (অত্যন্ত অধিক), অত্যন্ত (অত্যধিক বেশী) ইত্যাদি। এরূপ শব্দ যোগ করে অযথা কলেবর বৃদ্ধি না করে যদি বিশ্বকোষখানাকে আট-দশ খণ্ডে প্রকাশ করা হত, তাহলে ভাল হত। তাতে তাড়াতাড়ি বইখানা শেষ করাও সম্ভবপর হত, ও বাঙ্গালী পাঠক সমাজের হাতে একখানা সস্তার বিশ্বকোষ দেওয়া যেত।

বিদেশে বিশ্বকোষসমূহে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়। এ বিষয়ে আধুনিক বিশ্বকোষের সম্পাদকদ্বয় সাধারণ বুদ্ধির অভাব প্রদর্শন করেছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সাড়ে পাঁচ পাতা স্থান দেওয়া হয়েছে অথচ সমস্ত বক্তব্যটা দু-তিন পাতায় শেষ করা যেত। অঙ্গুলী বিষয়ক নিবন্ধে পাঁচটি আঙ্গুলের নাম ও কতগুলি অস্থিদ্বারা আঙ্গুলগুলি গঠিত, তা বলা উচিত ছিল। তার পরিবর্তে তিন পাতা করকোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা সংযুক্ত করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের বইগুলি (যথা অগ্রদূত অগ্নিশিখা প্রভৃতি) সম্বন্ধে দীর্ঘ আলো- চনাসমূহ অনুপাতসম্মত হয় নি। একমাত্র যেখানে অনুপাত ও আলোচনার উৎকর্ষতা লক্ষিত হয়, সেগুলি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ও পুরাতাত্ত্বিক নিবন্ধসমূহ। বইখানির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কিত নকসাগুলি, তবে বুঝতে পারা গেল না কেন কোন নকসায় ইংরেজি হরফ কোন নকসায় বাংলা দু রকম হরফই ব্যবহার করা হয়েছে। অজন্তা সম্পর্কিত নিবন্ধটি চমৎকার হয়েছে। অক্ষর সম্পর্কিত নিবন্ধটিও ভাল হয়েছে এবং সংলগ্ন বাংলা অক্ষরের বিবর্তন ও অন্যান্য ভারতীয় অক্ষরের পরিচয়জ্ঞাপক নকসাগুলি সকলেরই কাজে লাগবে। তবে ওই নিবন্ধের মধ্যে একটা মারাত্মক ভুল আছে। বলা হয়েছে বাংলা অক্ষর তৈরি করতে চার্লস উইলকিনসকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। পঞ্চানন কর্মকার এবং তাঁহার জামাতা মনোহর কর্মকার এই কাজে উইল- কিনসকে বিশেষ সাহায্য করেন এবং তাঁহাদের মিলিত চেষ্টায় বাংলা বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরগুলি তৈয়ারী হয়।' পঞ্চাননের সহযোগিতা পাবার আগেই উইলকিনস কতকগুলি বাংলা হরফ তৈরি করে ফেলেছিলেন এবং উইলকিনস ও পঞ্চানন উভয়ে মিলে ১৭৭৮ খৃস্টাব্দে হল- হেডের ব্যাকরণ ছাপবার জন্য যখন বাংলা হরফ তৈরী করে, মনোহর তখন ইহজগতে ভূমিষ্ঠই হয় নি।

বিশ্বকোষ প্রামাণিক গ্রন্থ। সুতরাং বিশ্বকোষ প্রমাদশূন্য হওয়া উচিত; আধুনিক বিশ্বকোষে প্রমাদের প্রাচুর্য সম্পাদকদের দৃষ্টিক্ষীণতার পরিচয় দেয়। বাজসনেয় সংহিতা সর্বত্রই রাজসনেয় সংহিতা ছাপা হয়েছে। এরূপ ভুল অনেক জায়গাতেই আছে। যথা ১০২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের শীর্ষে পাঁচ লাইনের মধ্যে চারটে ভুল আছে। ব্যুলারের বইয়ের নাম 'ইন্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি', 'ইন্ডিয়ান প্যালিঅলজি' নয়। প্যালিঅলজি শব্দের অন্য অর্থ। দি অ্যাল- ফাবেট গ্রন্থের লেখকের নাম ডিরিংগার, ডিরিঞ্জার নয়, 'অ্যানথ্রোপলজি' গ্রন্থের লেখকের নাম ক্রোয়েবার, কেরোবার নয়, এবং এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, এনসাইক্লো- পিডিয়া ব্রিটানকা নয়। আক্কাদ ও সমেরের ইতিহাস যথাযথভাবে লিখিত হয় নি। দু জায়গায় দু রকমভাবে লেখাই তার প্রমাণ। অত্রি নিবন্ধে বলা উচিত ছিল যে, আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক নক্ষত্রের নামও অত্রি। ৪৩২ পৃষ্ঠায় 'অতি অল্প হইল' নিবন্ধে বলা হয়েছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় কদাচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত এই ছদ্মনামে এটা লিখেছিলেন। সকলেই জানেন যে তারানাথ বাচস্পতিকে পরিহাস করবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাই পোসা ছদ্মনাম নিয়ে- ছিলেন। কদাচিৎ নয়। ওই নিবন্ধে বিদ্যা- সাগর মহাশয়ের ওই প্রবন্ধেরই বংশধর

আবার অতিঅল্প হইল প্রবন্ধেরও উল্লেখ থাকা উচিত ছিল।

লেখকরা ছাড়া সম্পাদকরা নিজেরাও অনেক ভুল করেছেন। ১১ পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ শিরোনামের নীচে প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম। শব্দকল্পদ্রুম বাংলা ভাষার কোষগ্রন্থ নয়, এটা সংস্কৃত কোষগ্রন্থ। ১০ পৃষ্ঠায় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম প্রকাশ তারিখ ১৭৮৮ খৃস্টাব্দ বলা হয়েছে। এটা ভুল। প্রথম প্রকাশের তারিখ হচ্ছে ১৭৬৮—৮১ খৃস্টাব্দ। ১১ পৃষ্ঠায় ভারতকোষ ও ঢাকা হতে প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ-এর বিভিন্ন খণ্ডের যে পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো গুরুতরভাবে ভুল। ২৫৩ পৃষ্ঠায় অঙ্গ দেশের সীমানা সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে বলা উচিত ছিল যে অথর্ববেদে অঙ্গদেশের নামের উল্লেখ আছে ও অথর্ববেদে অঙ্গবাসীদের শোন ও গঙ্গা নদীর অববাহিকার অধিবাসী বলা হয়েছে। কথাসরিৎসাগর অনুযায়ী সমুদ্র উপকূলবর্তী বিতংকপুর অঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং অঙ্গ দেশ যে এক সময় শোন নদী থেকে গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ৪৩৮—৪৪০ পৃষ্ঠায় অতলান্তিক মহাসাগর নিবন্ধটি কিছু সংক্ষিপ্ত করে, লুপ্ত মহাদেশ অতলান্তিক সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ দেওয়া উচিত ছিল। আরও একটা কথা বলতে চাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ভারতকোষে যে সকল বিচ্যুতি লক্ষিত হয়েছিল, তা আধুনিক বিশ্বকোষেও দেখা যায়। ভারতকোষে নৈমিষারণ্য, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি সম্পর্কে কোন নিবন্ধ নেই। আধুনিক বিশ্বকোষেও অনেক পৌরাণিক ব্যক্তির নাম সংবদ্ধ করা হয় নি।

এতগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উত্থাপন করাতে, অনেকেরই মনে বইখানির প্রকৃত স্বরূপ ও ব্যবহারিক মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে। সেজন্য বলতে চাই বিজ্ঞানানুগত কোষগ্রন্থ হিসাবে বইখানি খুবই মূল্যবান হয়েছে। এতে এমন অনেক বিষয় সম্পর্কিত নিবন্ধ আছে, যা অন্য কোন কোষগ্রন্থে নেই। অধিকাংশ নিবন্ধই সুলিখিত ও প্রাঞ্জলই প্রমাদগুলি উত্থাপন করবার কারণ হচ্ছে, সম্পাদকরা যাতে সজাগ হয়ে, পরবর্তী খণ্ডগুলিকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করে, এখানিকে বাংলা ভাষার একখানি বৈশিষ্ট্যময় ও মূল্যবান কোষগ্রন্থ করে তুলতে পারেন।

অতুল সুর

আধুনিক বিশ্বকোষ। প্রথম খণ্ড। সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য ও ননীগোপাল আঢ্য সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব নলেজ, বি-৪৬, নজরুল ইসলাম অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-৫৪। মূল্য ৬০ টাকা।

সুখপাঠ্য উপন্যাস

প্রভাস ও সুরথ তাদের কিশোর কাল থেকে স্বপ্ন দেখত বড় হবে, সৎ থাকবে, এক সুখী জীবনে অংশ নেবে। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, বড় হওয়ার নেশায় প্রভাস হারিয়ে ফেলল সততা আর সততাকে আঁকড়ে থাকতে গিয়ে সুরথকে জঙ্গলে চলে যেতে হল। অন্যদিকে এই ওপরে ওঠার আকাঙ্ক্ষার প্রভাসকে ঘিরে তার বাবা-মার দুঃখ, মিলির সঙ্গে তার ভালবাসা, প্রভাসের এক কোম্পানী ছেড়ে আরেক কোম্পানীতে চাকরি নেওয়া—এই ধরনের ঘটনাগুলো পরপর এসে গেছে।

উপন্যাসটি বেশ সুসংবদ্ধ। এর শরীরে কোথাও কোথাও সামান্য ঢিলেঢালা ভাব থাকলেও আগাগোড়া চলেছে একটি পরিকল্পনাকে সামনে রেখে। উপন্যাসটি বিবৃত হয়েছে উত্তমপুরুষের মাধ্যমে এবং উত্তম পুরুষ এখানে নায়ক। নায়কের ভালবাসা কষ্ট, আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো লেখিকা নিপুণভবে তুলে ধরেছেন। লেখিকা অগোছালো নন, যেখানে যা থাকা দরকার, তা তিনি রেখেছেন, ফলে উপন্যাসটি হয়েছে ছকে বাঁধা।

এর প্রচ্ছদ, প্রচ্ছদের রং আমাকে আকৃষ্ট করে সবচেয়ে বেশী। বইটির নাম 'অরণ্য আসছে', কিন্তু একশো দুই পাতার এই বইটিতে অরণ্য আসার তেমন কোন শব্দ আমি শুনতে পাইনি, যদিও এর শেষ লাইন ছিল, 'কিন্তু সুরথ কি জানে সভ্য জগৎ আর সভ্য নেই—এই কলকাতার বুকেও আসছে—অরণ্য আসছে ?'

আরণ্য আসছে। মীরা বালসুব্রমনিয়ম। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী। কলকাতা ৯। দাম ছ'টাকা।

বিকাশ জানা

বিষয় : কবিতা

ইতিমধ্যে আরো দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে অনেকেই তাঁর নামের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। লিখছেন বহুদিন কিন্তু তাঁর কবিতার ভাষা আগেও যা ছিল এখনো তাই। তবে কিছু ওলোট-পালোট হয়েছে বৈকি! পাল্টেছে বোধ ও বুদ্ধি, মেধা ও প্রজ্ঞা। কিন্তু জীবন-সংসার সম্পর্কে যতখানি সচেতন হবার কথা, তেমন উদাহরণ মেলেনি। তিনি, রবীন সুর, কবি হিসেবে তরুণ কবিদের মধ্যে আলোচিত। অথচ স্পষ্ট স্বাক্ষরে উজ্জ্বল নন। অন্ততঃ এটাই আমার প্রথম এবং আপোষহীন ধারণা। এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রাবণের সিঁড়ি' পড়ে। রাবণের সিঁড়িতে মোট ৬৯টি কবিতা আছে। রবীন সুরের সাম্প্রতিক এই বই হাতে নিয়ে হঠাৎ করে 'শিখের' কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। গ্রন্থের নামকরণে কবি অন্ততঃ সেই রকম একটি ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। অথচ 'রাবণের সিঁড়ি' সবটুকু পড়ে উঠলেও এমনটি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এই ছোটখাট ত্রুটিগুলি দূরে ঠেলে আমরা যদি গভীরভাবে গ্রন্থটি পাঠ করি, দুটি বিষয় অন্ততঃ স্পষ্ট হবে। (১) প্রেমের সঙ্গে নিসর্গ, (২) দৃশ্যের সঙ্গে গন্ধের আত্মীয়তা এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি কবিতা শুধু মাত্র যা দেখেছেন, যা জেনেছেন', লিখেছেন। এখানে, কবিতার অঙ্গহানি বলে যে কথাটি আছে, তার অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। চিত্রকল্পরচনায় যে পটুতা প্রয়োজন সর্বত্র স্থান না হলেও কিছু কিছু সার্থকতা রয়েছে নিশ্চয়। অবশ্য এগুলি একজন সৎ কবির পক্ষে কোন জরুরী সার্টিফিকেট নয়। রবীন সুরের কবিতায় অতিকথন যেমন পীড়া দেয়, তেমনি আবার বক্তব্যের সরলতাও আনন্দের বিষয়। এই আত্মীয়হীন কবিতার মেলায় যদি আপন সত্তার প্রতিচ্ছবি দেখি, বিশেষত আলোচ্য গ্রন্থে। বলা বাহুল্য কবির প্রতি আমরা আকৃষ্ট হবো নিমেষে। কখনো কখনো এই মোহ দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে পেরেছেন রবীন সুর। রবীনের কবিতায় কিছু মারাত্মক দোষ, যেগুলি আমার কাছে কিছুতেই গ্রহণীয় বলে মনে হয়নি,—যেমন ছন্দের শিথিলতা, শব্দের প্রয়োগ এবং এক কবিতা থেকে আরেক কবিতার নির্মাণ। 'রাবণের সিঁড়ি' নামক কবিতাটি নানা দিক থেকে স্মরণীয়। বক্তব্যে, শব্দ ব্যবহারে এবং ছন্দে। এরকম কবিতা সারা গ্রন্থে আর দুটি একটি থাকলে আমরা হয়তো 'দুবেলা দুমুঠো শান্তি নীল বারো মাসে' পৌঁছে যেতাম।

দাউদ হায়দার

রাবণের সিঁড়ি। রবীন সুর, অরণি প্রকাশন, ১২, মুখার্জি পাড়া লেন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। প্রচ্ছদ : গণেশ পাইন।

*

আদত কবিরাতো নষ্ট[illegible] হন। দারুণভাবে। ওটা না হলে কবিতা ধরা দেয় না। ভাস্করের কবিতা পড়তে গিয়ে ঐ কথাটাই মনে পড়ে যায়। বারবার। ভাস্করের অধিকাংশ কবিতাই বড় বেশি স্মৃতিময়। এ স্মৃতিময়তা কোথাও স্পষ্ট কোথাও আবার প্রচ্ছন্নভাবে উঠে আসে। উঠে এসে শব্দগুলোকেও কাব্যিক দ্যোতনা দিয়ে ফেলে। কবিতা কি কেমন!—এর ব্যাকরণ প্রকরণ মত তুচ্ছ বিষয়ে পাঠককে যেতে হয় না। নিখাদ কবিতার পুরোন গন্ধ অনায়াসেই পেয়ে যান পাঠক।—এই ব্যাপারটাই ভাস্করের কবিতার বৈশিষ্ট্য বলেই মনে হয়। (১) শিল্পীর হাত। উপহার দিয়েছে কাকে। কত অজস্র চুম্বন! (২) তখনই ফুটতে পারে। পৃথিবীর কাছে মানুষ যখন বিশ্বাসে নতজানু হয়। (৩) প্রবল বাঁচার স্বাদ। পূর্ণিমার রাতের মত। স্বপ্ন চলে যায় —এরকম অজস্র উজ্জ্বল পংক্তি ভাস্করের উজ্জ্বলতাও দেয়।

গৌতম ভট্টাচার্য

এ সময় জন্মিলকালে। ভাস্কর লাহা। বর্ণালী ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা পাঁচ টাকা।

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

সংকটের মুখে ফরোয়ার্ড ব্লক

বেদব্যাস বৈদ্য

বামফ্রন্ট সরকারের মূল ভিত্তি ছয়টি রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ শক্তি। সি পি আই (এম) দল ফ্রন্টের একক এবং অনন্য শক্তিধর হলেও, বাদবাকি পাঁচটি দলের সমঝোতা ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ফ্রন্টের পক্ষে অপরিহার্য। একথা অনুধাবন করেই হয়তো বামফ্রন্ট কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, শরিকদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল অথবা বিবাদ-বিসম্বাদের কথা বাইরে প্রকাশ করা হবে না। শরিকদলগুলির মধ্যে কোনরকম ভুল বোঝাবুঝি হলে ঘরোয়াভাবে তা মিটিয়ে নেওয়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বামফ্রন্ট আয়োজিত বিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের সাম্প্রতিক বিশাল সমাবেশে মঞ্চ থেকে বিভিন্ন শরিক দলের নেতারাও ঐ একই সুরে বক্তব্য রেখেছেন। বিশেষ করে ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ এবং আর এস পি দলের প্রতিনিধি শ্রীনিখিল দাস। এঁরা দুজনেই বেশ স্পষ্ট ভাষা বলেছেন, ফ্রন্টের শরিকদলগুলির মধ্যে কোনও বিরোধ বা ঠাণ্ডা লড়াই নেই। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ এবং সুশাসন উপহার দিতে দেশবাসীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বরং খবরের কাগজ এবং একদল চক্রান্তকারী কাগুজে নেতা তাঁদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন প্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন।

বামফ্রন্টের মাঝারি এই দুই শরিকদলের সাংগঠনিক ক্ষমতা কার কতখানি আছে, তা নিয়ে এই মুহূর্তে বিতর্কে যাওয়ার হয়তো সঙ্গত হবে না। তবে এই দুই দলের দুই নেতার বক্তব্য শুনে অনেকেই বিস্মিত। কারণ, দুই নেতা যখন কলকাতার বিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের বিশাল ময়দানে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে দাবি করেন, তখনও উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্রন্টের এই দুই বিপ্লবী শরিকদলের মধ্যে তীব্র মন-কষাকষি, সংঘর্ষ ও লড়াই চলেছে। সেখানে কলকাতার কোন কাগুজে নেতা উপস্থিত থেকে দুই শরিকদলের মধ্যে সংকট সৃষ্টিতে মদত দিয়েছেন কিনা জানা যায়নি। বরং দেখা গেছে, কোচবিহার জেলার ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীদুর্গেশ নিয়োগী, আলিপুরদুয়ারের ঐ দলের সংগঠক শ্রীধীরেন সরকার তাঁদের কয়েকশ অনুগামীসহ আর এস পি দলে যোগ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এঁদের অভিযোগ, ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে কোটারি-গ্রুপ বা ব্যক্তি প্রাধান্য দারুণভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে। কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহর বিরুদ্ধে সরাসরি তাঁরা অভিযোগ তুলে বলেছেন, তিনি দলের সংগঠনের তোয়াক্কা করেন না। ব্যক্তিগত অভিরুচি অথবা ইচ্ছা কার্যকরী করে ব্যক্তিতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র খাড়া করে তুলছেন। দলের আদর্শ ও নীতি তাঁর কাছে গৌণ।

ফরোয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ অবশ্য এই অভিযোগের উত্তরে মন্ত্রী শ্রীকমল গুহর পক্ষই নিয়েছেন। অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেছেন, কমলবাবু পার্টির নীতি মেনে সঠিক পথেই দলের সংগঠন চালাচ্ছেন। এবং দলবিরোধী কার্যকলাপের ফতোয়া দিয়ে শেষ অবধি অশোকবাবুরা প্রবীণ এবং জনপ্রিয় আঞ্চলিক নেতা দুর্গেশবাবুকে দল থেকে বহিষ্কার করেছেন। এর ফল হয়েছে আরও বিষময় এবং সুদূরপ্রসারী। দুর্গেশবাবুর বিরুদ্ধে দলীয় শৃংখলাভঙ্গের অভিযোগ আনায় কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের ফরোয়ার্ড ব্লকের পুরানো কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কয়েকশ কর্মী এবং স্থানীয় নেতা ইতিমধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে স্বেচ্ছায় সম্পর্ক ছিন্ন করে ফ্রন্টের অন্য শরিক আর এস পি দলে যোগ দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন।

কোচবিহারে আর এস পি দলের তেমন কোনসংগঠন ছিল না। দুর্গেশবাবু এবং তাঁর অনুগামীদের পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আর এস পি দল কোচবিহারে ফুলে-ফেঁপে উঠছে। সেখানে এর মধ্যে একটি আর এস পি দলের অফিসও খোলা হয়েছে। কোচবিহারে এই দলের প্রগতিতে আর এস পি দলের নেতারা যেমন আনন্দিত-উল্লসিত, ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা তেমনি ক্ষুব্ধ এবং ক্ষিপ্ত। সুদূর কোচবিহারের প্রতিক্রিয়ার ঢেউ মহাকরণের কয়েকজন মন্ত্রীর কক্ষেও ইতিমধ্যে আছড়ে পড়েছে।

ওদিকে জলপাইগুড়ি জেলায় আর এস পি দলের সংগঠন তুলনামূলকভাবে বেশি জোরদার। সেখানে ফরোয়ার্ড ব্লকের তেমন কোনও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। কোচবিহারের ঘটনার পর জলপাইগুড়ির মাঠে-ময়দানে দলীয় অফিসে নতুন তৎপরতা দেখা দিয়েছে। ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা কোচবিহারের প্রতিশোধ তুলতে জলপাইগুড়ি দাওয়াই শুরু করেছেন। সেখানে আর এস পি দলের বিক্ষুব্ধদের দলে টেনে ফরোয়ার্ড ব্লক নতুনভাবে সংগঠন গড়ে তোলায় প্রয়াসী হয়েছে।

কোচবিহার-জলপাইগুড়ির এই ঠাণ্ডা লড়াই কলকাতার নেতাদেরও বেশ উত্তেজিত করেছে। ফরোয়ার্ড ব্লকের ক্ষতিটাই ইতিমধ্যে বেশি হয়েছে। দুর্গেশবাবু-ধীরেনবাবুর মত জনপ্রিয় নেতাদের হারিয়ে এই দল এখন এক বিপর্যয়ের মুখে। ক্ষমতাসীন দল হওয়ায় ফরোয়ার্ড ব্লকের সমর্থকের অভাব ঘটেনি। একদা কংগ্রেসীরা ক্রমে ফরোয়ার্ড ব্লকের সেবক হচ্ছে। এই শ্রেণীর সমর্থক নিয়ে সুদিনে আসর জমানো গেলেও, দলের দুর্দিনে যে এঁরা বেপাত্তা হবেন, তা ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বও জানেন। তবুও আপাততঃ তাঁদের বিকল্প কোন পথ নেই। অশোকবাবু অবশ্য বলেছেন, তাঁর দলে এতদিন ঢিলেঢালা ভাব ছিল। এবার তাঁরা তা দূর করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে শ্রেণীভিত্তিক সংগঠন গড়ার মন দিচ্ছেন।

আর এস পি অর্থাৎ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের নেতারা এপর্যন্ত উত্তরবঙ্গের অভিযান সম্পর্কে মুখ খোলেননি। কারণ, এই অভিযান তাঁদের দলকেই শক্তিশালী করছে। জলপাইগুড়ির চা-বাগান থেকে শুরু করে কোচবিহারের তামাক-বাগিচায় তাঁরা তাঁদের দলীয় প্রভাব বিস্তারের কাজে এখন সক্রিয়। ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা সব বুঝে এবং দেখেশুনেও কিছু করতে পারছেন না। দল ছেড়ে তাঁদের নেতা ও কর্মীরা আর এস পি দলে যোগ দেওয়ায় ফরোয়ার্ড ব্লক নেতারা বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ।

জুলাই মাসের শেষ তিনদিন বিহারের কানপুরে ফরোয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় প্লেনাম বসবে। তার আগে এ-মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় দলের দু-দিনের প্লেনাম বসছে। অশোকবাবুর মতে, মার্কসবাদ ও সুভাষবাদ নিয়ে দলে যে বিতর্ক ছিল, তার অবসান হয়েছে। দল এখন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের পথে চলবে। এর সঙ্গে শাস্ত্রীয় মার্কসবাদের অনেক মিল আছে। অশোকবাবুর ঐ বক্তব্যের বিরুদ্ধেও দলের বিশিষ্ট বহু নেতা সোচ্চার।

বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় ফরোয়ার্ড ব্লকের যে চারজন মন্ত্রী, তাঁদের মধ্যেও দলের নীতিগত প্রশ্নে মৌল পার্থক্য বর্তমান। উত্তরবঙ্গে দলের বিপর্যয়, কোন্দল-কলহ এবং সর্বোপরি মার্কসবাদ সুভাষবাদগত মৌল প্রশ্নে আসন্ন পার্টি প্লেনামে যে ঝড়ের আশংকা করা হচ্ছে, তাতে মনে হয়, বামফ্রন্টের এই শরিকদলের আগামী দিনগুলি খুব সুখের নয়। শরিক এই দলের আসন্ন সংকট সৃষ্টির পেছনে যে-কোনও প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অথবা কাগজে নেতার মদত নেই, সে কথা বিচক্ষণ নেতা অশোকবাবুদের অজানা থাকার কথা নয়। বরং তাঁর দলের সামনে যে বিপদের অশুভ ছায়া, তার জন্য দায়ী তাঁদেরই শরিকদল এবং দলীয় নেতারা।

(৫-৬-৭৯)

উপবিষ্টা-টেরাকোটা

ভবেশ সান্যাল

প্রাচ্য শিল্পের তীর্থে তীর্থে

সে সময় মোটামুটি শান্তির আবহাওয়া ছিল দেশে সে জন্য ভ্রমণ কষ্টসাধ্য ছিল না, রেইলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে শুয়ে বসে যাওয়া যেত। এ যাত্রার ট্রেইন চলাচলে বাধাবিঘ্ন এসেছিল, কুইট ইন্ডিয়ার কর্মীরা যথেষ্ট সক্রিয় থাকায় সরকারী সতর্কতার মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। সৈন্যদের অবাধ গতিবিধি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সাধারণ যানবাহনও অনেক সময় দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়। যাইহোক ভ্রমণের ইচ্ছা প্রবল তাই অসুবিধাগুলি উপেক্ষা করে পুরী পৌঁছলাম। অমিয় চক্রবর্তী মশায়ের মাতা-পিতা পুরীতে বাস করেন, নিজেদের একটি সুন্দর বাড়ী। তাঁদের সাদর আতিথ্যে জগন্নাথ দর্শন ও সমুদ্র স্নান সম্ভব হল। মন্দির ও সমুদ্র ছাড়া পুরীতে দ্রষ্টব্য আর কিছু মনে পড়ে না। উড়িষ্যার স্থপতিদের বহু মহান সৃষ্টির মধ্যে মহাপ্রভুর মন্দির অন্যতম। তোরণ দীপস্তম্ভ ও মন্ডপ শোভিত মন্দির গঠনের দৃষ্টান্ত এই প্রথম দেখলাম। গঠিত সৃষ্টির এক অংশ অন্য হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আরও বিস্ময়-কর খোদাইয়ের কাজ। সে যুগের মহা-শিল্পীদের স্মরণে প্রণাম জানাই।

পথের ধারে কেনা-বেচার বাজারে সুন্দর দুটি মাটির প্রদীপ নিলাম মাত্র চার পয়সায়। ঐ দীপের আকার, অলঙ্কার ও গঠনের মধ্যে যেন পেলাম যুগ-যুগান্তরের ওড়িয়া শিল্পের সংরক্ষিত সার তত্ত্ব। একটি প্রদীপ এখনও সযত্নে রাখা আছে আমার কাছে। পুরীতে এক বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে কলা সংগ্রহ দেখতে গেলাম। নিছক সখের সংগ্রহ নয়, বেচা-কেনা করেন। বিশ্বের বাজারে তখনও ভারতীয় প্রাচীন কলা নিদর্শনের দুষ্প্রাপ্যতা ঘটেনি, দেশের গোরা শাসকরা নির্বিচারে অমূল্য শিল্পকলা বস্তু দেশান্তরিত করে স্বদেশের মিউজিয়মগুলি সমৃদ্ধ করেছে। অতএব এই ভদ্রলোক দেশী কলানুরাগীদের সংগেই কারবার করেন। অবশ্য যুদ্ধের জোয়ারে বহু বিদেশী সৈন্যবাহিনী ভারতীয় দুর্লভ কিউরিও সংগ্রহে আগ্রহ দেখিয়ে বাজারে চাহিদা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। আশা করি ভদ্রলোকের সংগ্রহের বাতিক লাভবান হয়েছে। কিন্তু মাত্র দুই টাকায়

মাতা নারী—অজন্তা। ১৯৭৪

তিনি আমাকে মৈথুন চিত্রের একটি পুস্তিকা দিলেন। ফোক স্টাইলের রেখাঙ্কন। সওদাটিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই একটু অকারণ বিব্রত হওয়ার ভান করা হয়।

পুরী থেকে যাই কণারক। গো-শকটে একটা পুরো রাত ও প্রায় অর্ধেক দিন কাটিয়ে দূর থেকে দেখতে পেলাম কৃষ্ণবর্ণ মন্দিরের চূড়া।

কণারকের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ধর্মগত তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখিত, চিত্রিত, বর্ণিত প্রাসঙ্গিক এত রচনা রয়েছে যে আরও কিছু বলা অপ্রয়োজন। ধ্বংসাবশেষের অবশিষ্ট যা কিছু রয়েছে তা থেকে পরিপূর্ণ আদিরূপের কল্পনার প্রয়াস করি। নির্জন নিস্তব্ধ দিগন্ত প্রসারিত বালু-স্তূপের আবেষ্টনীর মাঝে আমি একা বসে কণারক সূর্য মন্দিরের পুনর্গঠন করি আপন মনে। এই মানসিক অনুশীলনে নিবিষ্ট চিত্তে সমাহিত হই, দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে—ক্রমশঃ কানে আসে অদূরবর্তী সাগরের মৃদু গর্জন।

আশ্চর্যের কথা এই মন্দির নির্মাণে যে অগণিত অপরিমাণ পাথর ব্যবহার করা হয়েছে তার উৎপত্তি স্থান কোথায়? যতদূর দেখা যায় সুদূর বিস্তৃত সমতল বালুভূমি, পাহাড় বা পাথরের খাতের চিহ্ন মাত্র নাই।

কণারকের কারিগরদের হাতে পাথর যেন মাখনের গোলা।

ছোট বড় যৌন ক্রিয়ারও বহু মূর্তি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দির গাত্রে মৈথুন মূর্তি দেখে দেশী-বিদেশী দ্রষ্টারা বিহ্বল বিচলিত মুগ্ধ। পবিত্র মন্দিরে অনাসৃষ্টির ঔচিত্য নিয়ে বিচার বিতর্ক শোনা যায়। গো-শকটের গাড়োয়ান আমার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য প্রকাশ করে বলে 'বাবা সাহেব, এগুলো অশ্লীল চিত্র নয়। এর তাৎপর্য জনসাধারণের যৌন শিক্ষা। তাছাড়া এইসব চিত্র ভক্ত উপাসকদের স্মরণ করিয়ে দেয়—সংসার ও সৃজন প্রবহমান কিন্তু কালে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরমাত্মার স্মরণ নিতে হবে। লক্ষ্য করে দেখবেন মন্দিরের অভ্যন্তরে একটাও মৈথুন চিত্র নাই। তার অর্থ হলো ভগবানের পূজার সময় সম্পূর্ণ নিষ্কাম নিরাসক্ত হও। বাইরের মূর্তিগুলোর মতই নিজের পার্থিব অস্তিত্ব বাইরেই থাক। অবশ্য সাংসারিক স্বাভাবিক জীবনকে অস্বীকার করতে বলা হয় নাই।'

গাড়োয়ানের গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রবচন যুক্তিসংগত। একটি নিরক্ষর গ্রাম্য লোকের মুখে এই ব্যাখ্যান কণারক মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকে আরও অর্থপূর্ণ করে তোলে।

সার কথা এই যে, তৎকালীন সমাজে অনাবশ্যক শোভনতার ভান ছিল না। উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রকাশ্য মৈথুন

নারী-কাহোম। ১৯৮০

মূর্তিগুলি প্রাণবন্ত মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ, তাদের উদার মনের আহরণ। সেই কাল ও সমাজের পট-ভূমিতে নিপুণ ভাস্করের সাবলীল ভাস্কর্যে ক্রীড়াসক্ত অতিরঞ্জন স্বাভাবিক। কাম শাস্ত্রের উদ্ভট কল্পনার শিল্পসম্মত রূপায়ণ মাত্র। এর তুলনায় পুরীর পুস্তিকা পোর্ট সৈয়দের পিকচার পোস্ট কার্ড।

মন্দিরের ভিতর পুরোভাগে আলঙ্কারিক অল্পতা সহজেই চোখে পড়ে. গর্ভ গৃহের অনাড়ম্বর উগ্রতা গাড়োয়ানের উক্তির সমর্থন করে। গোধূলি লগ্নে পান্ডা মাত্রা শুরু। মন্দিরের কণ্ঠলগ্ন ঘণ্টার রুনটুন ঘুমপাড়ানি ছড়ার মত তন্দ্রালস করে দেয়।

পুরীর সোনালি সমুদ্রতট ও উত্তাল তরঙ্গ ছবিতে ধরে রাখার চেষ্টা করি। জলরঙ-এর ছবিখানি অতিথি সেবিকার হাতে দিয়ে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আতিথেয়তা উপরন্তু তিনি দিলেন এক সেট গঞ্জামের তাস—উড়িষ্যার পটুয়াদের হাতের কাজ।

এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশ, ভাষা ভূদৃশ্য ভোজন ও পরিচ্ছদের বিভিন্নতা অভিনব। যা নাই ভারতে তা নাই বিশ্ব-জগতে। নাসিক, কানহেরি কারলায় গুহা মন্দির দেখলাম। অদ্ভুত পরিকল্পনা, অপূর্ব কলাকৌশল ও অনুকরণীয় সামর্থ্য পর্বতের কঠিন শিলাগাত্র কামনীয় সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করেছে।

মহান কলাসৃষ্টি ও শিল্প চাতুর্যের অভিজ্ঞান এই গুহা মন্দিরগুলির সাক্ষাত দৃষ্টি প্রথমেই মনে করিয়ে দেয় আর্ট স্কুলের ছয় বৎসরের অপ্রতুল শিক্ষা ও আমার শিল্পী জীবনের অনুল্লেখযোগ্য সাধারণত্ব। প্রবলতর দেখার আগ্রহ হয় ভারতের শিল্প-তীর্থগুলি— অজন্তা ইলোরা মহাবলিপুরম।

উপস্থিত হলাম বম্বাই শহরে। পূর্ব পরিচিত শহর। আর একবার গেলাম এলিফেন্টা। সর্ববিদিত ত্রিমূর্তির চেয়েও ভাল লাগে শিব পার্বতীর বিবাহ—হিমালয়ের কন্যাদান। যেমন রচনা তেমনই ভাবব্যঞ্জনা।

বন্ধু পত্নী সুশীলা গোয়ে বলেন, 'অবধূরে ভবেশ তুমি অরক্ষণীয় কুমার। বিবাহে আর বিলম্ব নয়।'

এক জ্যোতিষীকে ডেকে আমার হাত দেখালেন। জ্যোতিষী সুশীলাকে বলে, 'আপনার বন্ধুর মনটা একটা টুনটুনি পাখী। চঞ্চলতার বশে গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে বসে ও উড়ে যায়, বাসা বাঁধে না। বাসা এখনো না বাঁধলে আর বাঁধা হবে না।'

সুশীলাকে বললাম, উপস্থিত ভ্রমণ আকাঙ্ক্ষাটা পূর্ণ হলে এ বিষয় চিন্তা করব।

'কুইট ইন্ডিয়া'র জের তখনও শেষ হয় নাই। অন্য দিকে জাপানিরা প্রায় আসাম প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। কলকাতার বন্দরে দু' একটা বোমা ফেলায় বড়বাজার খালি,

গুহাভিমুখে।১৯৪৮

অন্যান্য ধনী বাসিন্দরা দিল্লী লাহোর বম্বে উপস্থিত। শুনতে পাই কলকাতায় বিনা ভাড়ায় বাড়ী পাওয়া যাচ্ছে।

পুনার নিকট কিড়কিতে সাক্ষাৎ হয় বাল্যবন্ধু স্নিগ্ধ গুহ'র সঙ্গে। বর্মাতে অধ্যাপনা করতো, জাপানিদের আসন্ন বর্মা অধিকারের অশুভ মুহূর্তে সর্বস্বান্ত হয়ে বহু সংকটের মধ্যে সপরিবারে দেশে ফিরে আসে। সাক্ষাৎ করে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয় যুদ্ধের পরিস্থিতি।

যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে বম্বাই-এর পথে একটি দৃশ্য ভুলি নাই। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে কিংকর্তব্য উপায়ে চালিত হয়েছে গান্ধীপন্থী সত্যাগ্রহীরা রাজপথে নির্ভয়ে গোরা সৈনিকদের সামনে 'ভারত ছাড়ো' নারা উচ্চারণ করেন। গ্রেপ্তার করার পূর্বে দেখলাম উত্তেজিত গোরারা ঐ নিরস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের নির্মম প্রহারে জর্জরিত করছে কিন্তু অহিংস গান্ধীবাদীরা সম্পূর্ণ অবিচলিত। এদের নৈতিক নিষ্ঠার তুলনা হয় না। গান্ধী টুপির সে মর্যাদা আজ কত মলিন!

লাহোরের লাহিড়ী তখন চাকরি উপলক্ষে বম্বেতে। তার জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা আমার মতই ভবঘুরে মনোভাব নিয়ে উপস্থিত হয়। অবিলম্বে আমরা জোনাল টিকিট কাটলাম। রেল ভ্রমণে তখন ঐ সুবিধা ছিল, এক পথে যাত্রা অন্য পথে ফেরত। স্বেচ্ছা মত যেথা সেথা যাত্রা ভঙ্গ মঞ্জুর।

আমাদের প্রথম গন্তব্য স্থান ঔরংগাবাদ অজন্তা ইলোরার পথে। স্থানীয় ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে রফা হয় আঞ্চলিক যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থানে নিয়ে যাবে। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ঐতিহাসিক স্থান-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লোকটা যথেষ্ট সচেতন। আপন পরিবেশে অনুরাগ ও স্বীয় ঐতিহ্যে গৌরব লোকটির দেশ ভক্তির পরিচায়ক।

প্রথম পরিদর্শন ঔরঙ্গাবাদের পাহাড়-কাটা গুহাবলি। এই গুহাগুলি অপেক্ষা-কৃত অজ্ঞাত ছিল। প্রথম দৃষ্টিতে সমগ্র পরিকল্পনার চমৎকারিত্ব আকর্ষণ করে।

শোক।১৯৪৬

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য কৌশলের অভিজ্ঞতা লক্ষণীয় এই শিল্পাগারে। অতীতের এই শিল্পীরা একাধারে পূর্ণাঙ্গ [illegible] স্থপতি ও ভাস্কর।

তিন নম্বর গুহার স্তম্ভ সারি অতুলনীয়। অনুপাত সঙ্গত আয়তন, আলংকারিক সূক্ষ্মতা অপূর্ব। ঐ কক্ষেই উপাসনারত মূর্তিসমূহ ভাস্কর্য শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সাত নম্বর কক্ষে বাদিকা পরিবেষ্টিতা নর্তকী সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। সমগ্র রচনা পূর্ণ স্বাস্থ্য, প্রাণবন্ত প্রাচুর্য জীবনী [illegible] প্রতীক। এই প্রকাশ্য সবল ইন্দ্রিয় পরায়নতার মধ্যে ঐ সাত নম্বর কক্ষেই দেখলাম সংস্কৃতিসম্পন্ন অন্তর্দৃষ্টা পদ্মপানি মূর্তি। অর্থপূর্ণ প্রত্যক্ষ বৈসাদৃশ্য।

[illegible] চালক [illegible] আরও দেখায় পঞ্চাক্কি দরগা-সরোবর এবং বিবিকা মকবরা। এটা ঔরঙ্গজেবের বেগম সাহেবার কবর, তাজমহলের নিকৃষ্ট অনুকরণ। স্বয়ং ঔরঙ্গজেবের কবরও ঔরঙ্গাবাদে। অনাড়ম্বর ও স্বল্পবিদিত।

ইলোরার পথে দেখলাম দৌলতাবাদ দুর্গ। মধ্যযুগের দুর্গ নির্মাণ কৌশলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এই দুর্গ থেকে দশ মাইল দূরে ইলোরার গুহা। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন চৌত্রিশটা গুহা মন্দির। আধুনিক যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কলায় বিশাল ও বিস্ময়কর সৃষ্টি হয়েছে। আকাশ স্পর্শী ইমারত, [illegible] প্রমাণ প্রেসিডেন্টদের প্রতিমা আমেরিকায় রয়েছে। কিন্তু ইলোরার পাষাণ কাহিনী যেন পার্থিব তুলনার ঊর্ধ্বে। ইতিহাস, কলাজ্ঞান, শিল্প কৌশল ধর্ম সমন্বয়ের সমষ্টি নিয়ে ইলোরার শিলা-মহাকাব্য রচিত। মন্দির মালার মধ্যমণি কৈলাস পর্বত গাত্র হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদিত। ইলোরার ধর্ম অনুপ্রাণিত ভাস্করীয় অভিব্যক্তি কলা-বিদ্যার্থীর বিশ্ব-ভারতী। নিরক্ষর জনতার দৃষ্টিগোচর ধর্মগ্রন্থ।

স্কেচ বুকে তুলে নিলাম—শিব তাণ্ডব, রাবনের কৈলাস কম্পন, শিবের ভৈরব রূপ, গঙ্গা যমুনা আরও কত।

সৌভাগ্যক্রমে নিকটবর্তী অহল্যাবাই মন্দিরের পূজারী এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ লাভ হয় ইলোরায়। স্বতঃই পূজারী আমাদের সঙ্গদান করেন ও প্রতি গুহায় খোদিত দেব-দেবী অসুর পশু পক্ষী সম্পর্কিত লোক কাহিনী ও নীতি কথার সামনে শ্লোক উচ্চারণে বিশেষ মুদ্রা ও গীতি-আবৃত্তি করেন। মুখ্য মূর্তিগুলির সামনে শ্লোক উচ্চারণে বিশেষ মুদ্রা ও ভঙ্গির সরল ব্যাখ্যা শোনান। পূজারীর চোখ দিয়ে দেখায় ঐ পাষাণ মূর্তিগুলি যেন সজীব হয়ে ওঠে।

সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ট্যাক্সি চালক নিয়ে এলো অজন্তায়। ঔরঙ্গাবাদ ইলোরায় যে কলাচাতুর্যের সূচনা দেখে এলাম সে নিপুণতা বহু পূর্বে পুঞ্জীভূত হয়েছিল অজন্তায়। স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ত্রিবেণী অজন্তা।

কালের বিনাশ ও মানুষের অবহেলা সত্ত্বেও ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা যায় প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে কত উচ্চস্তরে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। অজন্তার ভিত্তি চিত্রে পূর্ণাঙ্গ আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রাবলীতে ব্যবহৃত সবুজ ও পোড়া মাটি রঙ ঐ পাহাড় গাত্র হতে সংগৃহীত রঙিন প্রস্তর চূর্ণ। অন্ধকার গুহায় মসৃণ ধাতু-ফলক দিয়ে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এঁকেছেন ছবি। জাতক কাহিনী অধিকাংশ ছবির বিষয়বস্তু, উপরন্তু পশু পক্ষি ফল ফুল লতা-পাতা পোষাক পরিচ্ছদ তদানীন্তন সমাজ লোকাচার সর্বাঙ্গীন জনজীবনের সংবাদ দেয়।

সতেরটি গুহা কক্ষের মধ্যে মাত্র চার-পাঁচটিতে ভিত্তি চিত্র এখনও সংরক্ষিত দেখা যায়। বাল্য বয়সে প্রবাসী মাসিক পত্রিকায় উড্ডীয়মান অপ্সরাদের আলেখ্য দেখেছিলাম, পরে হাইদ্রাবাদের সৈয়দ আহম্মদের অনুকৃত শিশু ও মাতার চিত্র দেখি। কাজেই যথেষ্ট কৌতুহল ও আগ্রহ নিয়ে অজন্তায় উপস্থিত হই। এই মহান পরিকল্পনা স্বচক্ষে দেখে ভারতবাসী হওয়ার আত্মগৌরব অনুভব করি।

অপ্সরাদের সঙ্গীতময় স্বচ্ছন্দ আকাশ বিহার দেখে মনে হয় অজন্তার কলাকার কল্পনার চন্দ্রলোকে অবতরণ করেছেন দুই হাজার বছর আগে।

ভিত্তি চিত্রের রচনারীতিতে রেখাঙ্কনের প্রাধান্য থাকলেও আলোছায়ার অনুমিত সমাবেশে রয়েছে। চিত্রিত নর-নারী জীব-জন্তু এমন কি ফুলপাতাতেও ত্রি-আয়তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যায়।

খোদিত মূর্তির মধ্যে বুদ্ধের মহা-নির্বান ও পদপ্রান্তে উপবিষ্ট শোকাচ্ছন্ন শিষ্য গভীর ভাবব্যঞ্জক ও সুবিন্যস্ত রচনা। ইলোরা অজন্তা বিশ্বের অদ্বিতীয় কলাসৃষ্টি। স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলার ত্রিবেণী কলা সঙ্গম। শত বৎসরাধিক পূর্বে বৃটিশ সৈন্যদের দৈবাৎ অজন্তা আবিষ্কার কলা ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। লেডি হেরিংটন ও গ্রিফিথ সাহেব ইত্যাদি কলা প্রেমীদের সক্রিয় উৎসাহে অজন্তার ফ্রেস্কো কলাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আকবর হাইদারির উন্নত সত্তার প্রভাবে নিজাম সরকার ঐ অমূল্য সম্পদের তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের বিধি ব্যবস্থা করেন। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখন অজন্তা ইলোরার সংরক্ষণ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন। তবুও মনে হয় যথেষ্ট করা হয় নাই।

অজন্তা, ইলোরা, ঔরঙ্গাবাদের পর এলাম হাইদ্রাবাদ। মাশি মৃণালিনী উপদেশ দিয়েছিলেন যেন সরোজিনী নাইডুকে সাক্ষাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসি। পত্রযোগে তিনি ভগ্নী সরোজিনীকে সংবাদ দিয়ে রাখেন। সিকান্দ্রাবাদ হয়ে হাইদ্রাবাদ পৌঁছতে হয়। সিকান্দ্রাবাদ ছাউনি শহর, হাইদ্রাবাদের আর এক অংশ।

নিজাম রাজত্বে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব, সামাজিক মেলামেশা সহজেই লক্ষিত হয়। হাইদ্রাবাদে তামিল তেলেগু মারাঠি ভাষার প্রচলন সত্ত্বেও চলিত উর্দু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একীকরণের অন্যতম কারণ। কথিত উর্দুর স্বরভঙ্গি স্থানীয় রঙ-এ রঞ্জিত, সুতরাং লাহোরি কথনে অভ্যস্ত কানে হাইদ্রাবাদি ভাষণ শ্রুতি কৌতুকময় মনে হলো।

নিজাম সরকারের চালু মুদ্রা ও বৃটিশ-ভারত রাজ্যের মুদ্রা বিনিময়ে মজা পেলাম।

চট্টোদের এক জ্ঞাতি পরিবারও হাইদ্রাবাদ-বাসী। মৃণালিনী এই পরিবারকেও আমাদের আগমন বার্তা দিয়েছিলেন। পরিবার অর্থে এক ভ্রাতা ও তিন ভগ্নী। এক ভগ্নী ডাক্তার। তিনি কাদের সাহেবের বাগদত্তা। হাইদ্রাবাদীদের সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ নয়। চট্টোপাধ্যায় পরিবার তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই পরিবারে জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে বিবাহাদি প্রচলিত। এদের বিচার ধারায় উদার মানবীয়তার পরিচয় পাই।

ভগ্নীত্রয়ী আমাদের হাইদ্রাবাদ প্রদক্ষিণার দায়িত্ব নিলেন। শহরে ও শহর প্রান্তে দুটি কৃত্রিম হ্রদ শহরের রুক্ষ পরি-বেশে লালিত্য এনেছে। এই নিজাম সাগর শহরে জল জোগায়। শহরের সর্বত্র বড় বড় পাথর। স্বাভাবিক সমাবেশ। বাঞ্জারা হিলস-এ নবাব মেহদি নওয়াজ জঙ্গ-এর বাড়ী রককাট গুহার মত।

হাইদ্রাবাদের চারমিনার সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চার-মিনারের প্রসিদ্ধি চার-মিনার সিগারেটের জন্য নয়, এই তোরণের ছাদে উঠে দেখলাম চারটি মিনার আশ্রিত হিন্দু মন্দির ও মুসলিম মসজিদের আকারগত পরিকল্পনা, গোলকোন্ডার বাদশাহদের সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতার প্রতীক।
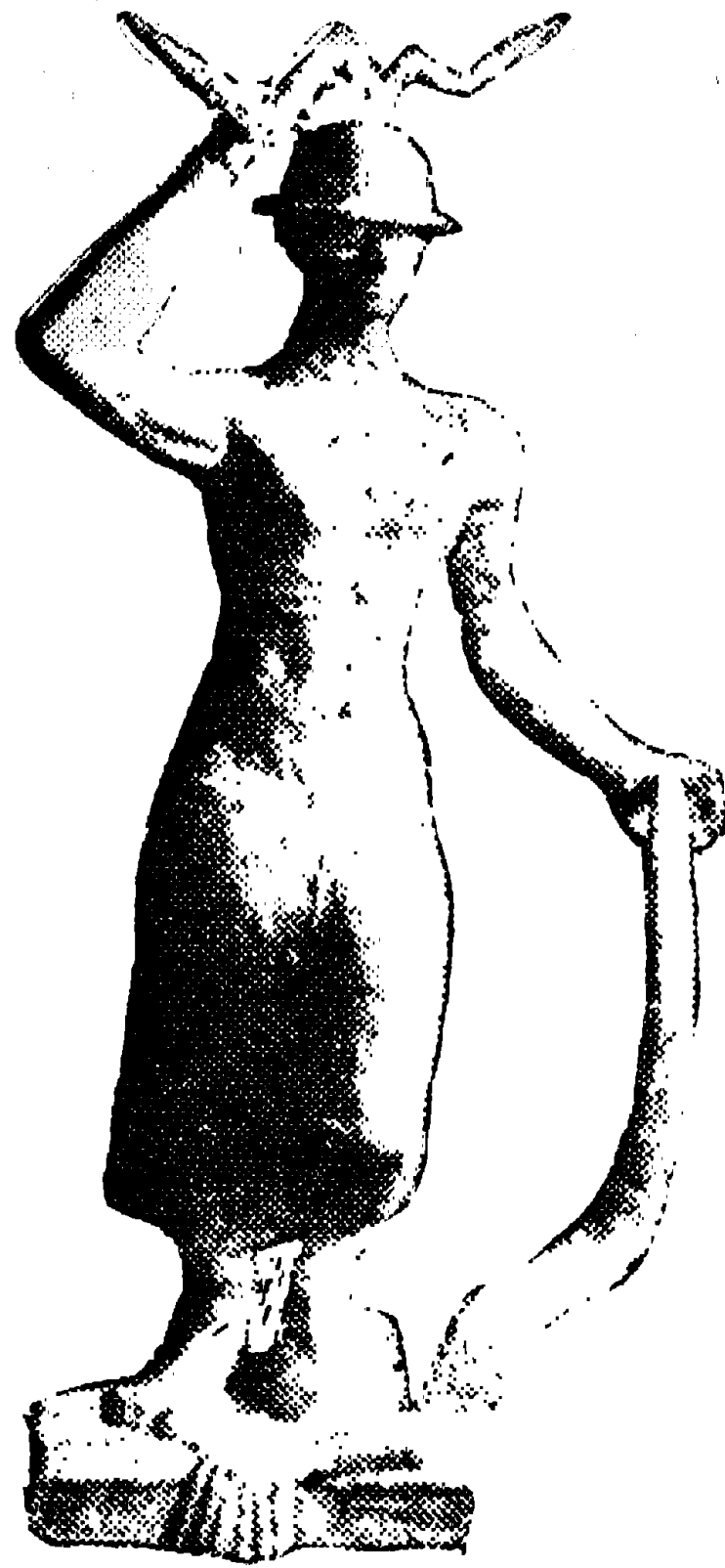
গেলকোন্ডা দুর্গ-প্রাসাদের ধ্বংসা-বশেষের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রচ্ছন্ন বিষাদ অনুভূত হয়।

হাইদ্রাবাদ আসার আগে নবাব সালার জঙ্গের অদ্ভুত সংগ্রহের তারিফ্ শোনা ছিল। ধননাশক এই সখের নেশায় নবাব সাহেবের দৌলত ভান্ডার রিক্ত হয়। ঐ বিশাল সংগ্রহ নবাব সাহেবের ব্যক্তিগত সম্পদ, জনসাধারণের উপভোগের জন্য উন্মুক্ত নয়। চট্টো ভগ্নীরা ফন্দি করে আমাদের নিয়ে যান ডাঃ জব্বরের গৃহে। সালার জঙ্গ ডাঃ জব্বরের বন্ধু, ডাঃ জব্বর মাশি চট্টোর বন্ধু, সুতরাং শাস্ত্রসম্মত মন্ত্রোচ্চারণের ফলে আলিবাবার গুহার দ্বার ফাঁক হয়ে যায়। সাতটা বিভিন্ন প্রাসাদে সমূহ সামগ্রী সঞ্চিত আছে, তবুও স্থানাভাব।

ডাঃ জব্বর পরিচয় করিয়ে দিলেন নবাব সালার জঙ্গের সঙ্গে। পরিচয় না পেলে [illegible] ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা সম্ভব হতো না। অতি সাধারণ পাজামা কুর্তা পরিহিত নবাব সাহেব বারান্দায় বসে চা সেবন করছেন, হাতে সিগার। অবশ্য তিনি অনুচরগোষ্ঠী পরিবৃত। কর্মচারীদের আদেশ দিলেন। কথাবার্তার মধ্যে আফশোষ প্রকাশ করলেন যে সংগ্রাহকদের তৎকালীন অচিন্তনীয়

ভাকরা ড্যামের শ্রমিক।
পরিকল্পনা।১৯৬৭

সুযোগের সদ্ব্যবহারে তিনি অসমর্থ। যুদ্ধের ধ্বংস লীলার ফলে এ সময় ইয়োরোপে কত শত আমীর উমরাও উদ্বাস্তু হয়ে অমূল্য তৈজসপত্র হস্তান্তরিত করতে বাধ্য হবে। চোরাবাজারে, মণি-মাণিক্য ছবি মূর্তি আরও কত কি দুর্লভ বস্তু পাওয়া যাবে। দুঃখের বিষয় গোলা-বারুদ তোপ বিস্ফোরণ নিরাপদ নয় এবং জাহাজ চলাচল বন্ধ।

যুদ্ধের নির্মমতায় তিনি দুঃখিত নন, কিন্তু সংগ্রহের ব্যর্থ সুযোগ তাঁকে পীড়া দেয়।

শুনেছি যৌন অনুভূতিতে স্বয়ংক্রিয় ব্যক্তি বিশেষ সংগ্রহের উন্মাদনায় যৌন ইচ্ছা উচ্চতর খাতে প্রবাহিত করান। আমাদের নবাব সাহেব অবিবাহিত। সংগ্রহের সম্মোহন তাঁর সকল শক্তি ও তেজ-চাঞ্চল্য নিশ্চয় একই নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করে। সাধারণত সংগ্রাহকরা কোন বৈশিষ্ট্যসূচক ক্ষেত্রে সংকলনের পক্ষপাতী হন। নবাব স্যার সালার জঙ্গ-এর সর্বগ্রাসী সংগ্রহ ক্ষুধা। তাঁর ভান্ডারে আছে দেশ-বিদেশের কলাসৃষ্টির অমূল্য নিদর্শন। প্রচুর সংখ্যক মিনিয়েচর, তৈলচিত্র, মার্বল ধাতু মৃৎ-মূর্তি। পটারি—চীন জাপান পারসিক ও দেশি। টেকসটাইল—তুলা রেশম পশম। হস্তকলা ভূরি ভূরি। আসবাবপত্র—সারি সারি। মণি রত্ন জহরত-জহুরির ঈর্ষা-উদ্দীপক।

এছাড়া রয়েছে অগণিত সামগ্রী যা হয়তো দুর্লভ ও কৌতুহল সঞ্চারক মাত্র। এই বিশাল সংগ্রহের জঙ্গলে দর্শকের দিশা হারিয়ে যায়। নীর ত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণ বিশেষজ্ঞের কাজ। সপ্ত মহল মন্থন করে একটি বস্তু দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম, ভারতীয় হাতে প্রস্তুত গজদন্ত শাড়ি, মোলায়েম মসৃণ।

শিল্পী সৈয়দ আহম্মদ অনুকৃত অজন্তার ছবি ইতোপূর্বে দেখেছিলাম ম্যুজিয়ম ও মাসিক পত্রিকায়। সন্ধান করে সৈয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বেশ গোল-গাল সরস মানুষটি। অজন্তার কপি তখন আদৃত ছিল, অজন্তা ফ্রেস্কোর মহিমা ম্লান হয় নাই। সৈয়দ আহম্মদের তুলিকা-পাত অতএব লাভবান ছিল। শাহজাদি নিলুফের-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অজন্তার বিবিধ আলংকারিক [illegible] পাড়ে। নিজাম রাজ্যের বস্ত্র কারখানার মাল সাময়িক ফ্যাশন সৃষ্টি করায় শিল্পী সৈয়দ আহম্মদের আমদানি ছিল ভাল।

হাইদ্রাবাদে দিন কয়েকের মুসাফিরি অতি আনন্দে যাপন করা হয় কিন্তু সর্বাগ্রে যে কর্তব্যটি পালন করা উচিত ছিল সেটা

সর্বশেষে স্থগিত রাখায় মনে ছিল অস্বস্তি।

সরোজিনী নাইডুকে সাক্ষাতে শ্রদ্ধা নিবেদন এখনও বাকি রয়েছে। আসলে সরোজিনীর সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে খানিকটা স্নায়বিক দুর্বলতা পোষণ করা ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে সরোজিনী, কবি সরোজিনী, বাগ্মী সরোজিনী--এই প্রতিভা-ময়ী নারী আমার চিত্তপটে উচ্চস্তম্ভমূলে স্থাপিতা ছিলেন, যাঁকে দূরে থেকে নমস্কার সহজ।

সন্ধ্যা সাতটায় মাদ্রাজের গাড়ী। অবশেষে সাহস করে অপরাহ্নে তাঁর দরজায় উপস্থিত হই।

মুখমন্ডলে একটু বিরক্তির ছাপ।

'বেশ দিন কয়েক হলো তোমরা এসেছ হাইদ্রাবাদে, তা সময় কেটেছে কেমন? নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত ছিলে, তা হোক, মনে করে যে এসেছো স্টেশন যাওয়ার পথে তাতে খুশি হলাম।'

খুশি অবশ্য তিনি হন নাই, আর খুশি না হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অনেকগুলি অসংলগ্ন কথা বলে প্রচন্ড ব্যস্ততার নজির দিলাম কিন্তু সর্বক্ষণ নিজেকে যথেষ্ট অসহায় মনে হল। ক্ষণপরেই তিনি আমাদের অস্বাচ্ছন্দ্য দূরে করে চা পরিবেশন করেন। তিনি বললেন, আমি চেয়েছিলাম ইয়াজদানের সঙ্গে তোমার আলাপ করাতে—লোকটির অগাধ পান্ডিত্য। অজন্তার অভিজ্ঞতায় ইয়াজদানি অদ্বিতীয়। হাইদ্রাবাদে এসেছো, এখানকার আমীর ওমরাদের পরিচিতিও প্রয়োজন, তাঁদের অনেকেই কলাপ্রেমী। আমি তার ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।'

সৈয়দ আহম্মদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় হয়েছে শুনে তিনি খুশি হলেন। সামান্য আলাপনেই জানলাম তাঁর গভীর হাইদ্রাবাদ প্রীতি। হাইদ্রাবাদের কৃষ্টি ক্ষেত্রে উন্নত বুদ্ধি চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অবদান প্রচুর।

হয়তো প্রথমেই সরোজিনীর শরণাগত হলে হাইদ্রাবাদী সমাজের অন্য একটা দিকের পরিচয় পাওয়া যেতো যা থেকে বঞ্চিত রইলাম।

বিদায়ক্ষণে প্রশ্ন করেন, 'তোমার এই ভ্রাম্যমানতার উপলক্ষ কি? জ্ঞান অন্বেষণ না চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ?' মৃদু ভৎসনার সঙ্গে বলেন, 'মেয়ো স্কুল অব আর্টের শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিলে কেন? কর্মচ্যুতি যেচে নেওয়া কি সুবুদ্ধির লক্ষণ?'

মনে মনে ভাবলাম সুবুদ্ধি ও প্রেম তো এক জিনিস নয়। মাম্মি চট্টো নিশ্চয়ই পূর্বাহ্নে আক্কা (দিদি) সরোজিনীকে আমার বৈরাগ্যের (সাময়িক) বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকবেন।

সরোজিনীরও কেমন নারীসুলভ কৌতূহল! নিজ মনে মিসেস নাইডুকে উচ্চস্তম্ভমূল থেকে ধরাতলে নামিয়ে বরং

আমাদের গ্রাম।১৯৭০

ভালই লাগল। একটু সন্নিকটে মনে হলো।

পরে যখন মৃণালিনীর সঙ্গে দেখা হয় তিনি বলেন, 'সর্বনাশ. তুমি করেছো কি? আক্কা এত রুষ্ট কেন?'

আমার বুদ্ধি বিভ্রান্তির বর্ণনা শুনে মাম্মির সে কি উচ্চ হাসি!

মাদ্রাজের পথে সহযাত্রী ভদ্রলোক অযাচিত উপদেশ দিলেন যেন মাদ্রাজ ভ্রমণ কালে সতর্ক থাকি। তার মাদ্রাজি বিরোধিতায় আশ্চর্য হলাম। তিনি বলেন, মাদ্রাজি চরিত্রে তার আস্থা নাই। মদ্রবাসীরা নাকি চুরি চাতুরিতে অভ্যস্ত ও বিদেশী বিমুখ।

'আপনি কি মাদ্রাজি নন?'

'আমি ক্রিশ্চিয়ন।'

ক্রিশ্চিয়নরা কি ভারতীয় নয়? তখন মাদ্রাস বিভাজন হয় নাই। তেলেগু তামিল কন্নাদ কেরল সবই মাদ্রাজি কিন্তু সহযাত্রী ক্রিশ্চিয়ন ভদ্রলোক নিজেকে সাধারণ হতে স্বতন্ত্র মনে করেন। ইনি নিশ্চয় একটি বিরল জীব কিন্তু একটু সন্দিগ্ধ চিত্তে মাদ্রাজ উপস্থিত হলাম। এগমোর স্টেশনে সি আই ডি'র গোয়েন্দারা ঘিরে দাঁড়ায়। নাম ধাম জন্ম স্থান জীবিকা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। জন্ম আসামে, জাতে বাঙালী ব্রাহ্মণ, বাস পাঞ্জাবে। সাথী বাঙালী, তিন পুরুষ পাঞ্জাববাসী।

সন্দেহ ভঞ্জনের পরিবর্তে সন্দেহ বর্ধন হলো। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। থাকা হবে কোথায়, কতদিন?

'তোমরাই করে দাও ব্যবস্থা,—গ্রীঘরে নয় কোন হোটেলে।'

স্টেশনের কাছে একটা হোটেলের

ঠিকানা দিয়ে তারা বলে গেল থানায় দৈনিক রিপোর্ট করা হয়। আপন দেশে একি অভ্যর্থনা! স্বদেশের আশঙ্কা কি মাদ্রাজে বেশি? আমরা কি গুপ্তচর?

মাদ্রাজে মহাবল্লিপুরম ও মায়লাপুরের মন্দির দেখে চমৎকৃত হই। মহাবল্লিপুরমের শিলা শিল্পের বিচিত্রতার তুলনা হয় না। সম্পূর্ণ বিনাশ থেকে এখনও যা উদ্বৃত্ত রয়েছে তার সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক। সমুদ্রতটের মন্দিরভ্যন্তরে অনন্তশয়ান বিষ্ণু দেখে মনে হয় মহাবল্লিপুরম অবিনশ্বর।

মধ্যযুগের ভারতীয় ভাস্কর্যে জীব জন্তু পশু পক্ষির যোগ্য স্থান আছে। তার মধ্যে হাতির স্থান আরও মর্যাদাপূর্ণ। মহাবল্লিপুরমের পাথরে কাটা হাতি অপূর্ব। ঐ যাত্রায় কৃত স্কেচের পট-ভূমিতে একটা ছবি এঁকেছিলাম। ছবিটা এখন রয়েছে বুকারেস্টের জাতীয় সংগ্রহালয়ে।

দাক্ষিণাত্যের মন্দির গঠনের, প্রথম উদাহরণ দেখলাম মায়লাপুরের মন্দির। তুলনায় উড়িষ্যার মন্দির বাহুল্যবর্জ্জিত মনে হয়।

আমাদের ভ্রমণ স্পৃহা তালিকামুক্ত। ত্বরিত সংকল্প নিয়ে গেলাম পন্দিচেরি, রেলপথে কয়েক ঘন্টা মাত্র। পন্দিচেরি মাদ্রাজের ফরাসডাঙ্গা।

নগরবাসীদের উপর ফরাসি কৃষ্টির প্রভাব প্রত্যক্ষ। ঘোড়া গাড়ীর কোচোয়ান, ট্যাক্সি চালক সাধারণ পথচারি ফ্রেঞ্চ বলে। জঞ্জির দুর্গ হতে অপসৃত সুন্দর প্রস্তর স্তম্ভ শিবে স্থাপিত দুপ্লেপ মূর্তি দেখলাম। সাম্রাজ্যবাদীতার মূক প্রতীক।

অরবিন্দ দর্শনের যোগ্যতা আমাদের নাই। সরোজিনী দর্শনের অভিজ্ঞতা মনে সদা জাগরূক, তবুও পন্দিচেরি ও অরবিন্দ অভিন্ন। আশ্রমের ছায়া স্পর্শ করা যেতে পারে। মনে এলো চারুদত্ত মহাশয়ের সস্নেহ সঙ্গলাভের স্মৃতি শান্তিনিকেতনে। তিনি তো আশ্রমবাসী।

ছাত্রাবস্থায় কয়েক বৎসর শ্রীরামপুর কলকাতায় কেটেছে কিন্তু শান্তিনিকেতন যাওয়া হয় নাই, অথচ লাহোর থেকে গতায়ত আছে। রামকিংকর তখন উদিত শিল্পী, শঙ্খ চৌধুরী উদয়ের পথে। যাওয়া আসার ঐ রকম এক লগ্নে শান্তি-নিকেতনে চারুদত্ত ও জ্যোতিশ বোস মহাশয়ের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছিল। সন্ধ্যার সময় রবীন্দ্রনাথ যখন বাইরে এসে বসেন আশ্রমের অধ্যাপক ও অন্যান্য আগন্তুকরা বিনা আমন্ত্রণে ধীরে ধীরে এসে সমবেত হন। সাময়িক মেজাজ অনুযায়ী কবি কি[illegible] করেন এবং উপস্থিতমন্ডলী যোগ্যানুসারে যোগদান করে। কখন দেখেছি গুরুদেব নীরব নিশ্চল, ধীরে ধীরে উঠে চলে যায় আশ্রমবাসীরা কবির মৌনতার সম্মানে। এই যেন অলিখিত নিয়ম ও রীতি এখানকার।

অমিয়বাবু বলেন—অমিয় চক্রবর্তী, বাঁশিটা সঙ্গে নিন, নিজে থেকে বাজিয়ে শোনাবেন, গুরুদেব প্রসন্ন হবেন। অমিয়-বাবুর ছোট একটু পরিচয় ভূমিকার পর তাঁর ইঙ্গিতে বাজালাম বাঁশি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হলেন কিনা জানি না, না হওয়াই সম্ভব, কেননা, রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই একটা বেসুরো ধুন বাজিয়েছিলাম। কিন্তু কবি বললেন—অত দূর দেশে রয়েছ কেন, আমাদের এখানে এসো।

চারুবাবু ও বোসমশাই উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন। পরদিন তাঁদের আহ্বানে কলাভবনের এক কক্ষে একটি সান্ধ্য মজলিশে তাঁদের কীর্তনের সুর শোনাই। উভয়েই কীর্তনভক্ত, খুব খুশি হলেন। সামান্য কয়েকদিনের সঙ্গলাভ কিন্তু প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলাম। রস ও রুচি-ভরা চারুবাবুর মুখের গল্প ও তাঁর লেখা।

অল্প সন্ধানেই তাঁর পন্দিচেরী বাস-ভবনের ঠিকানা পাওয়া গেল। সাদর আপ্যায়নে তিনি আমাদের স্বাগত করলেন। ভ্রমণকাহিনীর টুকিটাকি শোনার পর বল-লেন, বাঁশি এনেছো? খুশি হলেন শুনে বাঁশি আমার সাথী, অনুজ্ঞা দিলেন যেন পরবর্তী সন্ধ্যায় বাঁশিসহ উপস্থিত হই।

অরবিন্দ আশ্রম সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলাম। তাঁর স্বল্প ভাষণের সারমর্ম এই যে, প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে আশ্রমে চিত্তউৎকর্ষক মানবীয় পরীক্ষা চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের সাধারণ অস্তিত্বের উর্দ্ধে মানব জাতির যোগ্যতম উদ্বর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই চরম পরি-স্থিতির জন্য মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। অরবিন্দ আশ্রম ঐ উদ্দেশ্যসাধনের গবেষণাগার।

(হিরোসিমায় এটম বোমার বিস্ফোরণ তখনো হয় নাই।)

বিভিন্ন সমাজ ধর্ম ব্যবসায় সম্প্রদায়-ভুক্ত হলেও আশ্রমবাসীরা সীমাবদ্ধ নয়। প্রতি জন মুক্ত মানুষ। শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, মাস্টার, প্রফেসর, ইঞ্জিনয়ার, গায়ক, রাসায়নিক, ভূতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক—প্রাচী-প্রতীচীর এইসব মানুষ আশ্রম লেবরেটারীর টেস্ট-টিউবে উৎসৃষ্ট উপাদান।

মাদার (ফরাসী মহিলা)-এর তত্ত্বা-বধানে আশ্রমের কার্যপ্রণালী চালিত হয়। তাঁর নির্দেশে ইঞ্জিনিয়ার রন্ধন করেন, গায়ক চিত্রাংকন করেন, চিত্রকর বস্ত্র-প্রক্ষালন করেন, সাহিত্যিক করেন মালীর কাজ বাগানে। বিপরীতধর্মী কর্মে কুশলতা-প্রাপ্ত হন আশ্রমবাসীরা।

আশ্রম পরিধির মধ্যে ধূমপান নিষেধ। তাম্বাকু সেবনে অভ্যস্ত চারু দত্ত সেজন্য সীমার বাইরে বাস করেন। তিনি [illegible] প্রবেশ অধিকার দেওয়া হয় না কিন্তু প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত কলা বিভাগ ইত্যাদি দেখার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। আরও পরামর্শ দিলেন সকাল দশটায় আশ্রমের আফিসে গুপ্তমহাশয়ের সাক্ষাৎপ্রার্থী হই, আর প্রত্যুষে একটি বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে মাদার দর্শন দেবেন। সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে তিনি দর্শনাভিলাষী জনসাধারণের ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

ভোরবেলা হোটেল থেকে পদব্রজে বেরোলাম। যথাস্থানে ইতোপূর্বে জন-সমাগম হয়েছে। উদগ্রীব নয়নে সবাই সামনের বাড়ীটার ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের দৃষ্টি অনুসরণে তাকালাম। মুহূর্ত পরে আবির্ভূতা হলেন মাদার। কৃশতনু ক্ষীণাবয়ব শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা মহিলা জনতার দিকে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করে অপসারিতা হলেন। কি আশা করেছিলাম জানি না, নিরাশ হলাম, নিরাশার হেতু অজ্ঞাত রইল।

সন্ধ্যায় চারু-সান্নিধ্য। তাঁর বৈঠকে উপস্থিত দিলীপ রায়, সাহানা বোস ও অন্য কতিপয় আশ্রমবাসী। সাধুসঙ্গ বাঞ্ছনীয় কিন্তু গুণীজন সমীপে অপটু বাঁশীধ্বনির ধৃষ্টতা মনে করে চঞ্চল হয়ে উঠি। মনে আসে বোম্বাই রেডিও স্টেশনের দুর্গতি, কিন্তু শ্রদ্ধাভাজন চারুবাবুর সস্নেহ উপরোধ উপেক্ষা অসম্ভব। ফুঁ দিলাম বাঁশিতে। অভ্যাসমত চোখ বুঁজে বাঁশি বাজাই। ঘর আধ-খোলা আধ-অন্ধকার হলে ভাল হয়। কিন্তু বন্ধ চোখেও দেখতে পেলাম দিলীপ রায়ের মুখভাবে অনু-মোদনের অভাব। নিশ্চয়ই বেসুরো বাজাচ্ছিলাম। বাদন শেষে চোখ খোলামাত্র দিলীপ রায় হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে তাল দিয়ে আলাপ শুরু করলেন।

বহুদিন পূর্বে দিলীপ রায়ের গান শুনেছিলাম সমবায় ম্যানসনে অবনবাবুদের ওরিয়েণ্টাল সোসাইটিতে। ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির আসরেই দিলীপ রায়, উদয়-শংকর সর্বপ্রথম অনোপচারিকভাবে রসিকেষু রস নিবেদন করেন।

পরদিন সকাল দশটায় আশ্রমে গুপ্ত-মহাশয়ের দপ্তরে উপস্থিত হলাম। অনাড়ম্বর অভ্যর্থনায় আমাদের বসতে ইঙ্গিত করে গুপ্তমশাই আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে আমাদের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে বলেন। এই হঠাৎ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই না। এই আর কি, তাই আর কি বললাম। দ্বিতীয় প্রশ্নঃ আপনারা কি অরবিন্দ সাহিত্যের সহিত পরিচিত?

সাথী বন্ধু বিদ্যাকান্ত ইংরাজি সাহিত্যে এম এ। তদোপরি আইনজীবি ও যথেষ্ট মুখর। আশা করেছিলাম, সে সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে আমাদের সাধু অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ দূর করবে কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, বিদ্যাকান্তও হত-বুদ্ধি। সম্মুখের বুককেসে দেখলাম [illegible] ডিভাইন, [illegible] আলোচনা শোনাচ্ছিল। নাম উচ্চারণ করতেই বিদ্যাকান্ত বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছি, —মানে, বাবার লাইব্রেরিতে বইটা আছে।

যাই হোক, গুপ্তমশাই আর অধিক জেরার প্রয়োজন দেখলেন না। একজন কর্ম-চারীকে ডেকে আশ্রমের কয়েকটি বিভাগে আমাদের প্রবেশের ছাড়পত্র দিলেন।

সাহিত্য কলা পরিষদ সম্বর্ধনায় মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে

সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যজ্ঞান, পরিচ্ছন্নতা ও শৃংখলা আশ্রমের প্রধান লক্ষণীয় অঙ্গ। পরিপাটি ভোজনকক্ষ ও সমগ্র আবেষ্টনী সুরুচিপূর্ণ। আশ্রমবাসী এক তরুণ শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তার আশ্রমে অনুরক্তি ও মাদার ভক্তি সম্পূর্ণ আন্তরিক। তার আঁকা ছবিতে শান্তি ও আনন্দের আমেজ পেয়েছিলাম।

পাণ্ডিচেরিতে স্কচের দাম মাত্র তিন টাকা। উৎফুল্ল হৃদয়ে বন্ধুবর একটা প্রমাণ সাইজ বোতল সংগ্রহ করলেন। ট্রেন চলার পর নোটিশ দেখলাম, ফরাসী সীমার বাইরে মদ্যাদি আমদানি নিষিদ্ধ। স্কচের প্রেরণায় বন্ধুর মস্তিষ্ক এখন যথেষ্ট সক্রিয়। বোতলের লেবেল সরিয়ে ফিভার মিকশ্চারের বার মাত্রা কেটে লাগিয়ে দেওয়া হয়। অন্য যাত্রী যদি আসে কামরায়, তাহলে একে অন্যের নাড়ি টিপে এক মাত্রা গলাধঃকরণ করা হবে। মাদ্রাজের পূর্বে স্টেশনে খাকি-পরিহিত কাস্টমস কর্মচারী আর্দালীসহ কক্ষে প্রবেশ করে। সুটকেশ বিছানা খুলে দেখান হল, টয়লেটেও কোন গুপ্তধন পাওয়া গেল না। অবশেষে প্রকাশ্যে রাখা ফিভার মিকশ্চারের দিকে দৃষ্টিপাত করে অফিসার জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কিছু ঘোষণা করবেন কি? বন্ধুবর বলে—আপনি তো সবকিছুই দেখেছেন, ঘোষণা করার কিছুই নাই।

অঙ্গুলি নির্দেশে তিনি জানতে চাইলেন ঐ বোতলটায় কি? বন্ধু আমার নাড়ি টিপে ধরে, আমি বললাম—না, এখন আর জ্বর নাই, এক মাত্রা সেবন প্রয়োজন হবে না। এই প্রকাশ্য ব্যাখ্যার পরও কাস্টমস কর্মচারী আর্দালীকে আদেশ দিলেন—এক গণ্ডূষ ফিভার মিকশ্চার চেখে দেখো।

আজ্ঞা পালন করে বিকৃত মুখে আর্দালী বলে—সাহেব, এ জ্বরের ওষুধ নয়, স্বাস্থ্যবর্ধক স্কচ। যথেষ্ট জরিমানা দিয়ে ও ফিভার মিকশ্চার বোতল খালি করে আমাদের পণ্ডিচেরী ভ্রমণ শেষ হয়।

মাদ্রাজ থেকে আরও দক্ষিণে ত্রিচি-মাদুরা-তাঞ্জোর। কাঞ্চিভরম, চিদম্বরম, রামেশ্বরম, ধনুষ্কোটি হয়ে দক্ষিণতম কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হই।

উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্ত। জলবায়ু আহার-বিহার বসনভূষণ কথন শয়নের নতুনত্বে ভ্রমণ বিশেষ উপভোগ্য। দাক্ষিণাত্যের মন্দির স্থাপত্যে শৈলীগত বৈশিষ্ট্য আছে। উচ্চ শ্রেণীর কারিগরি কারুশিল্প সহজেই লক্ষ্যণীয়, পাথর খোদাই ধাতু ঢালাই-এ পরম্পরার মহিমা দেখতে পাওয়া যায়। মন্দির, মন্দির পরিবেশ, গোপুরম, পুষ্করিণীর পরিকল্পনার সমগ্রতার মধ্যে মানুষ ও দেবতার কল্পিত অনুপাতের ইঙ্গিত পাই। মন্দির ও মূর্তি, মূর্তি ও মন্দির দক্ষিণ ভারতের দাক্ষিণাত্যের পরিচায়ক।

ত্রিচির রক ফোর্ট মাদুরার মীনাক্ষি দুই বিভিন্ন গোত্র স্থাপত্য কৌশল। শিল্প-শিল্পের অদ্ভুত কারিগরি মীনাক্ষি মন্দিরে দেখা যাবে। সুরেলা স্তম্ভের উপর মৃদু আঘাতে সপ্তসুর বেজে ওঠে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও তস্য পত্নীর বলিষ্ঠ রূপায়ণে ভাস্কর্যের গাম্ভীর্য দেখলাম।

কিন্তু বলিহারি পাণ্ডাদের বিস্ময়গ্রস্ত সৌন্দর্যজ্ঞান। রং বেরং তুলিকা প্রয়োগে মন্দিরের সর্বাঙ্গ বিকৃত।

তাঞ্জোরের মন্দিরাভ্যন্তরে প্রাচীন প্রাচীর-চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু যুগে যুগে আদি চিত্রগুলির উপর নতুন তুলিকাপাতে মৌলিক চিত্র উদ্ধারের সমস্যা সহজ নয়। মন্দিরের পুরোভাগে মণ্ডপের নীচে বিশালকায় এক শিলানন্দী। পাণ্ডা বলে তিলে তিলে নন্দীর আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থাৎ কোনদিন ছাদ বিদীর্ণ করে নন্দীর স্কন্ধ উন্মুক্ত আকাশের নীচে দৃষ্ট হবে। পাণ্ডাকে বললাম নন্দীর পাশে একটা মানদণ্ড গেড়ে দেওয়া হোক।

তাঞ্জোরের সংগ্রহশালায় বহু প্রাচীন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে, আর নায়কদের পুরাতন প্রাসাদে কিছু ভিত্তিচিত্র দেখলাম।

কাঞ্চিভরমে নটরাজ, চিদম্বরমে ভরত-নাট্যম বা-রিলিফ, রামেশ্বরম মন্দিরের সহস্র স্তম্ভ অলিন্দ অতি [illegible] দর্শনীয়।

কন্যাকুমারী মন্দিরের [illegible] [illegible] স্থাপিত ক্ষুদ্র বাতায়ন অরুণোদয়ের প্রথম কিরণ আকর্ষণ করে কুমারী কন্যার (দেবী) হীরকখচিত ললাট প্রতিফলিত করে। যথালগ্নে উপস্থিত না হলে ঐ [illegible] দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয় না। কন্যাকুমারীতে আরও দেখা যায়, সমুদ্রের ভিতর হতে সূর্যোদয় ও সমুদ্রে [illegible] সূর্যাস্ত। কন্যাকুমারীর [illegible] [illegible] ও পমফ্রেট তাজা অতি সুস্বাদু। [illegible] পাওয়া যায় সাধ্যের অল্প।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের এই শেষ প্রান্তে বিশাল শিলার উপর [illegible] [illegible] ছিলেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কি মহান আমার দেশ।

ত্রিবান্দ্রমে [illegible] [illegible]

উপস্থিত হলাম নাদস্বরের ধ্বনি শুনে নিয়ে। আরতির পরই প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হবে। সংলগ্ন সরোবরে অঙ্গধৌতি ও শুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত প্রবেশ নিষেধ। পাণ্ডা এগিয়ে দের শুভ্র বস্ত্রখণ্ড। প্যান্ট শার্ট ত্যাগ করে ডুব দিলাম জলে। ধৌত বস্ত্র ধারণ করে বিগ্রহ দর্শনের অধিকার পেলাম।

মন্দির দর্শনের উপযোগী পোষাক শুভ্র বস্ত্রখণ্ড ও শ্বেতোজ্জ্বল উপবীত। উপবীতটি মন্দির প্রবেশের নিঃসন্দেহে ছাড়পত্র।

অঙ্গ ও বস্ত্রের শুচিতার মাহাত্ম্য আছে। যুদ্ধের প্রাক্কালে লাহোরের একটি জনপ্রিয় রেস্তরায় এক ইতালীয় পর্যটকের সঙ্গে আলাপ হয়। ইনি বেলুড় মঠ দেখার পর গঙ্গাপারে দক্ষিণেশ্বর মন্দির দেখতে যান। ডিঙ্গিতে গঙ্গাপার হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঘাটে এসে দেখেন ভাঁটায় জল নেমে গেছে, কাজেই ঘাট ও ডিঙ্গির মধ্যে কর্দমাক্ত তটের ব্যবধান। সহৃদয় মাঝি সাহেবকে কাঁধে নিয়ে অগ্রসর হয় কিন্তু পিচ্ছিল পথে সাহেব ও মাঝি কর্দম শায়িত হয়। অনন্যোপায় সাহেব তখন রীতিমত গঙ্গা-স্নান করে পূজারীর দেওয়া শুচি বস্ত্রে মন্দির প্রবেশ করেন।

তিনি বলেন ঐ অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে ভারতীয় ধর্ম গত আচার অনুষ্ঠানে তিনি আস্থাবান হন।

দক্ষিণের দেবদাসী প্রথা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারনা ছিল না। মাদুরায় মীনাক্ষি মন্দিরের পাণ্ডাকে প্রশ্ন করায় তিনি আমাদের গাইড রিকসাওয়ালাকে বলেন বাবুদের দেবদাসী দর্শনে নিয়ে যাও। রিকসাওলা উৎফুল্ল হয়ে বলে রুম্ব গুড দেবদাসী স্যার। মাদ্রাজের রিকসাওয়ালা স্থানীয় ইংরেজিতে পরদেশীদের সঙ্গে কথা বলে। মনে ভাবি দেবদাসীদের স্থান তো মন্দির —তবে অন্যত্র নিয়ে যায় কেন? শহরের প্রান্তে এক বস্তি। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেখানে জনৈক দ্বারপালের সঙ্গে অবোধ্য ভাষায় কিছু আলাপনের পর গাইড বলে বাবুরা ভিতরে আসুন। জন চার পাঁচ সারি বাঁধা দাসী ভাবের অভিব্যক্তিতে স্বাগতম জানায়। তাদের রক্ষক (অভিভাবক) বলে 'টু রুপিজ স্যার, ভেরি গুড দেবদাসী স্যার, সন্তোষম্ টু রুপিজ মোর, পূর্ণ সন্তোষম্ ফোর রুপিজ।'

আমরা বললাম থ্যাঙ্ক ইউ। দেখে গেলাম, আবার আসবো।

দেবদাসী সম্প্রদায় এখন লুপ্ত। তাদের অনেকেই ফিল্ম জগতে স্থান পেয়েছে বম্বে ও মাদ্রাজে, অনেকে শহরগুলির বস্তিতে দাসী।

চিদম্বরম মন্দিরে এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যা বেলা। প্রাঙ্গনে স্তিমিত দ্বীপের আলো, গর্ভ গৃহ অন্ধকার। আরতির প্রাক্কালে নাদস্বরম মৃদঙ্গম মুখরিত পরি-

কলা প্রদর্শনীতে।১৯৭৬
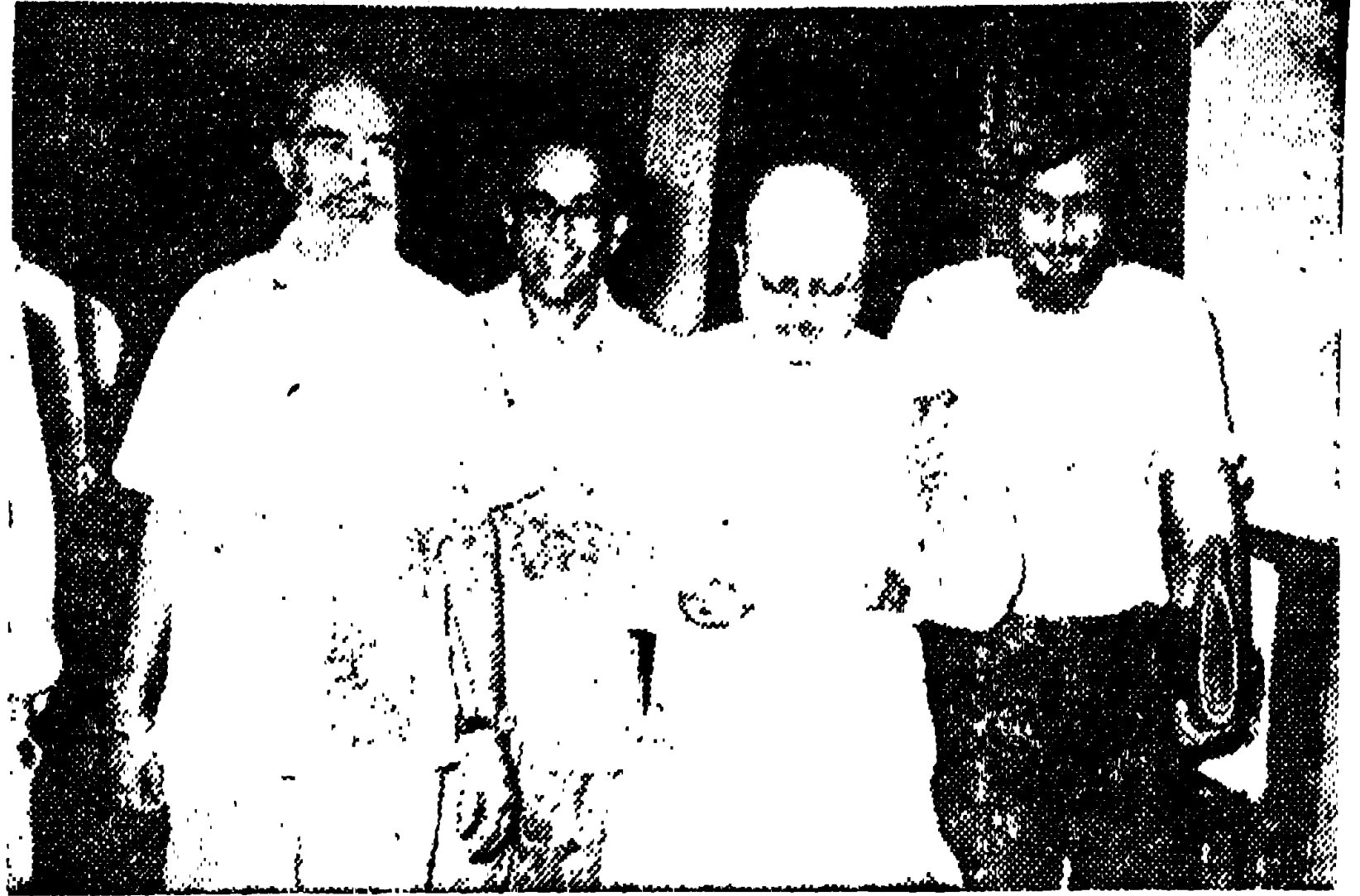
ক্রমা চলেছে। মুখ্য পুরোহিত বিগ্রহের পদমূলে একটি ঘি-এর প্রদীপ জেলে দিলেন। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় রহস্য-মূলক আলো-ছায়ার সৃষ্টি হলো কিন্তু অধ আঁধারের অস্পষ্টতায় বিগ্রহ দর্শন অসন্তোষ জনক, আমার তৃপ্তি হয় না। হাতে ছিল টর্চ, মুহূর্তের আবেগে আলোকপাত করি। চকিতে যে ক্রুদ্ধ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। দক্ষিণের পুরোহিত সম্প্রদায় নিষ্ঠবান গোঁড়া হিন্দু ও হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ। তামিল গর্জনে তিন চারজন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি প্রায় স্খলিত বস্ত্রম। উত্তোলিত উপবীতম্ ও ইংরেজি ভাষণম সেদিন আমায় রক্ষা করে।

রামেশ্বরমের কাছে পাম বনে এক ধর্ম শালায় আশ্রয় নিয়েছি। ধর্ম শালার চৌকিদারটি সরল সজ্জন। তার বিশ্বাস, ঐ যে সমুদ্র তট থেকে নীল শান্ত সলিলে বহু দূর পর্যন্ত বালুর ঢিবি দেখা যায় সেটা রামচন্দ্রের বানর সেনার হাতে তৈরী সেতুর ধ্বংসাবশেষ।

পামবন থেকে ট্রেনে যাব ধনুস্কোডি। সকাল বেলা যাত্রার আগে আবিষ্কার করলাম আমার জোনাল টিকেট অদৃশ্য। হাইদ্রাবাদী খৃষ্টিয়ন ভদ্রলোকের উক্তি মনে এলো। বহু অন্বেষণেও টিকেটটা পাওয়া গেল না। বন্ধুকে বললাম—তুমি যাও ধনুস্কোড়ি —ফেরার পথে সঙ্গ দেবো। বিদায় দিয়ে স্টেশন মাস্টারের পরামর্শ নিলাম। তিনি বলেন, হারানো টিকিটের নম্বর দিলে গার্ডকে বলে দিতে পারেন। কিন্তু নম্বর টোকা নাই। স্টেশন মাস্টার সহানুভূতি প্রকাশ করে বলেন ধনুস্কোড়ি দূর নয়, ক্ষণিক পরে একটা মাল গাড়ী আসবে পরবর্তী স্টেশনে। তাতে একটা যাত্রী কমপার্টমেন্ট আছে, সেটা ধরে দেখে এসো ধনুস্কোডি। এক ঝটকাওলাকে বললেন যাবুকে স্টেশনে পৌঁছে দাও। ক্রোশকট ও

একার মাঝামাঝি অশ্ব চালিত ঝট্কা। ঊর্দ্ধ শ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলো উড়িয়ে বালু ভূমি পার হয়ে দেখা গেল দূরে মাল-গাড়ীর ইঞ্জিনের ধোঁয়া। ট্রেনের গার্ড ধাবমান যাত্রীর জন্য একটু অপেক্ষা করেন। গাড়ী চড়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখি পয়সা নাই। মনে পড়ল কোষাধ্যক্ষ বন্ধুর পকেটে পার্স। কি বিড়ম্বনা। অদূরে আর এক ঝট্কাওলা ধুলো উড়িয়ে রুমাল দোলিয়ে ট্রেনের গতি রোধের আবেদন জানায়। মিনিট কয়েক পরে পামবন ধর্মশালার চৌকিদার ঝাঁপ দিয়ে নামে ঝট্কা থেকে, তার হাতে আমার জোনাল টিকিট। রিক্ত পকেটের লজ্জায় বিব্রত হলাম।

ধর্মশালার বালুময় অঙ্গনে চৌকিদার টিকিটটা পেয়ে পামবন স্টেশন মাস্টারকে দেয়। তারই পরামর্শে চৌকিদার আমার অনুসরণে মাল গাড়ীর উদ্দেশ্যে ছুটে এসেছে।

মাল গাড়ীর গার্ড ঝট্কাওলাদের ও চৌকিদারের নাম ধাম লিখে দিয়ে পামবন স্টেশন মাস্টারের মারফত পয়সা পাঠাবার পরামর্শ দিলেন। তারা বিনা প্রতিবাদে বিরক্তি প্রকাশ না করে চলে যায়। আবার ভাবলাম হাইদ্রাবাদি ভদ্রমহোদয়ের অযাচিত সতর্কতার উপদেশ।

মালগাড়ি থেকে নামতে দেখে বন্ধুবর নির্বাক। ফেরার পথে পামবনের স্টেশন মাস্টারকে ধন্যবাদ জানাই ও চৌকিদার ও ঝটকা চালকদের প্রাপ্য তাঁর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করি। কত অভিজ্ঞতা আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সেতুবন্ধ রামেশ্বর হয়ে রইল আমার মনে।

রেলপথে যাত্রার সময় পানভোজনের ছুঁতছাত দেখতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মিন হটেল মিলিটারি হটেল অর্থাৎ আমিষ-নিরামিষ। কফি পাত্রে ওষ্ঠ স্পর্শ না করে

আলগোছা গলাধঃকরণের রীতি। চলন্তি ট্রেনে আহার্য পরিবেশন ও ভোজনের চমৎকারিত্ব দেখলাম। ব্রাহ্মণ পরিবেশক কক্ষের মেঝেতে (পুরাতন ।। ক্লাশ) জল ছিটিয়ে কদলি পত্র বিস্তার করে দেয়। যাত্রীরা আসনস্থ হলে সুরু হয় পরিবেশন। অন্ন ও পাপড়ম তদুপরি তরল রসম সম্বর। তারপর প্রথানুযায়ী ঘোল দধি ইত্যাদি। ভোজন অবশ্য সুস্বাদু কিন্তু ভোক্তার পক্ষে কঠোর কৌশল দাবি করে। কম্পমান কক্ষ মসৃণ কদলিপত্র ও তরল ভোজ্যের অপূর্ব সমন্বয়। চমৎকৃত হয়ে দেখি অঙ্গুলির নিপুণতা ত্বরিত ওষ্ঠ সঞ্চালন ও পলায়পর খাদ্যের গতিরোধ।

প্রায় তিন মাস ভ্রাম্যমাণ। ইতোমধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি সংকটজনক। অনেকের ধারনা ব্রিটেন ক্লীব বৃটিশ পতন নাৎসী জয় ও ভারত স্বাধীনতা এক সূত্রে বাঁধা।

কমরেডরা সুভাষ বোসের বিরুদ্ধে কড়া আলোচনা জারি রাখেন। ব্যঙ্গ চিত্রে দেখা যায় ফ্যাসিস্ট সুভাষ নাৎসী হিটলারের কাঠ পুত্তলি। আমার মত অনেকে যারা বামপন্থী অনুরাগী এবং সুভাষের নিঃসন্দেহ দেশ প্রেমে মুগ্ধ পার্টির চিন্তাধারায় অস্বস্তিতে পীড়া বোধ করে। ফ্রেন্ডস অব দি শভিয়েট উনিয়নের মিটিং স্থান আমার স্টুডিওতে। তদুপলক্ষে লাহোরের বহু কৃতবিদ্য তরুণ সম্প্রদায়ের আসা যাওয়া ছিল। ভবিষ্য কবি লেখক অভিনেতার অঙ্কুর ছিল এদের প্রাণে। বলরাজ সাহনি তাদের একজন। চেতন আনন্দ আর একটি।

মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের ছেলে মেয়েরা টঙ্গাওলা কিষাণ মজদুরের সঙ্গে অভিন্নতা স্থাপনের অভিপ্রায়ে বসনভূষণ খাওয়া-দাওয়া শোয়া বসায় ইচ্ছাকৃত বোহিমির ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়। বন্ধুবর বি পি এল ও তস্যপত্নী ফ্রেদা বেদী শহর প্রান্তে পর্ণকুটিরবাসী হলেন। ফ্রেদা একটি মহিলা কলেজে অধ্যাপিকা ও সাংবাদিক পত্রাদিতে কলা সমালোচনা করেন। ফ্রেদা বেদীর অনুপ্রাণিত অনুরোধ আমি পার্টির দরদী সদস্য তালিকাভুক্ত হলাম।

মাতৃহীন হওয়ার দুই বৎসর পরে, ১৯৪৩ সাল কলকাতায় যাই। বাংলাদেশের ঐ দুর্দিনের দৃশ্য চোখে দেখলাম। দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনের কঠোর বিপন্নতা ট্রেনে বসে দেখতে পেলাম। কলকাতায় শুনলাম দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামবাসীদের করুণ ক্রন্দন—মাগো ফ্যান দাও, দুটি অন্ন দাও।

জয়নুল আবেদিনের স্কেচে মূর্ত হয়ে রইল দুর্দশার আর্ত কাহিনী।

ঐ সময় 'সিটি লাইফ', 'অন দি ফুটপাথ' ইত্যাদি কয়েকখানি বৃহদাকার ছবি আঁকি।

পাখি এবং সেই যুবা

গৌতম ভট্টাচার্য

প্রথমে মনে হয়েছিল অচেনা কোন উচ্চ উপত্যকার এক যুবা। অনেক চড়াই-উৎরাই ভেঙে এসেছে—এমনি ক্লান্ত পদক্ষেপ। ঈষৎ ঝুঁকে পড়া ছিপছিপে দীর্ঘ শরীর। রুক্ষ কর্কশ অথচ দূরে থেকেই চোখ-কাড়া এক মনোহারী অবয়ব। একটু বিকেল হতেই সে চার্চের দিক থেকে কোণা-কুণিভাবে নদীর পাড় ঘেঁষে, একটা উঁচু-মত জায়গায় এসে বসেছিল। —তখনই এমনটা মনে হয়েছিল ওদের।

ওরা বলার মত কথা, করার মত কাজ—তেমন কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না। সেই সকাল থেকে এই শেষ বিকেল পর্যন্ত কিন্তু দিব্যি ছিল। অনেক কথা বলেছে। মজা করে রান্নাবান্না করেছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাওয়া-দাওয়া। গান গেয়েছে, নেচেছে। হৈ-হুল্লোড় করেছে। অবশেষে এই কিছুক্ষণ আগে নিত্যদিনকার সেই ভার ভার এক-ঘেঁয়েমি ওদের গ্রাস করেছে। বিশেষ করে পাখিকে। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। কেননা ভেতরে ভেতরে কিছুদিন হল সবাই ব্যাপারটা টের পেলেও, প্রথম পাখিই স্পষ্ট-ভাবে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। —আমাদের কারো য়ুনিভার্সিটি, কারো অফিস, কারো ব্যবসা—তারপর এই একটু লেখালেখি, কি ছবি আঁকা, নইলে নাটক [illegible] প্রায় একই আলোচনা-গল্প কচলানি—সব মিলিয়ে আমরা কিরকম যেন বোর হয়ে যাচ্ছি না। কিরম যেন হয়ে যাচ্ছি। খুব ক্লান্ত...। ভারী বিশ্রীই লাগে। আমরা তো ধ্যান করতে পারতাম, কি বাইরে যেখানে হোক আলাদা আলাদাভাবে কেটে পড়ে উদ্দামভাবে 'জীবন' করতে পারতুম। তাতে মনে হয়....।

ওরা কিন্তু কোনটাই পারেনি। আপাতঃ ভাবে ঐ একঘেঁয়েমির ব্যাপারটার হাত থেকে রেহাই পেতে, একটা আধটা ছুটি-ছাটার দিন পেলেই বেরিয়ে পড়ছিল কলকাতা ছেড়ে। কাছাকাছি কোথাও। আজ এই যেমন এখানে এসেছে। কিন্তু [illegible] ওদের

রেহাই মেলেনি। বড় জোর একটা দিন একটু অন্যরকমভাবে কাটাবার পরই মনে হয়েছে, ওরা একইরকম সব কথা বলছে, একইরকম কাজ করে যাচ্ছে।

যাই হোক পাখি চুপচাপ বসেছিল এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি ভাসাচ্ছিল। তারই প্রথম চোখ পড়েছিল ছেলেটার দিকে। ছেলেটা তখন শ-চারেক বছরের পুরোণ পর্তুগীজ গির্জাটার দিক থেকে হেঁটে নদীর ধারে আসছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাখির দৃষ্টি বেয়ে ওদের সবারই নজর ছুঁয়েছিল ছেলেটাকে।

ছেলেটার বসার ভঙ্গিটায় ওদের মজা লেগেছিল। শিরদাঁড়া সোজা রেখে বদ্ধ-পদ্মাসনের মতো করে বসেছিল। গঙ্গার ওদিকে সোজাসুজি মুখ করে। পাখির পাশ থেকে তুষার ফুট কেটেছিল—ধ্যান টান করছে বোধ হয়। পাখি চোখদুটো ছোট করে অস্ফুটে বলেছিল—ভারী ইণ্টারেষ্টিং তো। কিছুটা পরেই ছেলেটা স্বাভাবিক ভাবে বসে খেলতে শুরু করেছিল। তার ঠিক সামনেই নদীর একটা নালা মত ফ্যাকড়া। ছেলেটা একটু ঝুঁকে ঝুঁকে কাঠিকুটো ছুঁড়ে দিতে লাগল জলের মধ্যে। এক-একটা ছোঁড়ার পর নিবিষ্ট মনে কি দেখে আবার একটা-দুটো ছুঁড়ে দেয়। —পাখি বলল—বাচ্চা ছেলেদের মত বোধ হয় নৌকো-নৌকো খেলছে। তারপরই এক সময় ছেলেটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে দুটো হাত সোজা ছড়িয়ে দিয়ে হো-হো বলে কিরকম একটা বিদঘুটে অথচ সুরেলা চিৎকার করে উঠল। একটানা ওরকম কিছুক্ষণ করে গেল। পাখিদের দলের এক-জন বলল—মাথায় বোধহয় ডিফেকট আছে। পাখি বলল—হয়ত আমাদেরই মত কি করবে এখন, ঠিক করতে পারছে না। তাই একবার হো-হো, একবার ধ্যান, একবার নৌকো খেলা এসব করছে....। কিন্তু ভারী মজার ব্যাপার। আচ্ছা ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করলে হয় না।—ঠিক বলেছিস, তুষার এক লাফে খাড়া। চেঁচিয়ে ডাকলো—এই যে, দাদা শুনছেন। প্রথমে ছেলেটা খেয়াল করেনি। তারপর দু-একবার ডাকতেই হো-হো থামিয়ে এদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। তুষার এবার হাতছানি দিতেই ক-মুহূর্ত কি ভাবল, তারপর সেই মার্কা-মারা ঢঙে হেঁটে এদের কাছে পৌঁছে গেল।

আমায় ডাকলেন কেন?—তুষার হঠাৎই ডেকে ফেলেছে। কেন ডাকল ঠিক জানে না। ও চুপ। বাকিরাও। পাখিই আচমকা বলে বসল—এই এমনি। মানে সময় কাটছিল না। আমাদের, যদি একটু সঙ্গ দেন আর কি। ছেলেটার মুখে প্রথমটা একটু বিস্ময়। তারপর হেসে ফেলে সবার মুখে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে পাখির চোখে চোখ রাখে। পাখি টের পায় তার চোখদুটো—যাকে বলে আমূলবিদ্ধকারী নয়ন—তাই আর কি। অথচ গভীরতার সঙ্গে রীতিমত মায়া এবং ছেলেমানুষীর মিশেল আছে। —কেন আপনারা তো চোর-পুলিশ খেলতে পারতেন? কি ঐ তো, বলে ছেলেটা অদূরে আঙুল দেখায়, ঐ গাছটা থেকে গন্ধরাজ ফুল পাড়তে পারতেন। খেলাও হত আর মুঠো ভর্তি ফুলও পেতেন। —ওগুলো তো একেবারে বাচ্চাদের ব্যাপার। আমরা পুলিশ ধরতে...এ পারে না' এসব করলে আর দেখতে হত না। পাবলিক জমে যেত। ভাবত নিঘ্যাত আমাদের মাথায় কোন স্ক্রু আলগা। —পাখি মজা করে উত্তর দেয়।

মিহির অস্ফুটস্বরে তুষারের পাশ থেকে ফুট কাটল—যেটা আপনাকে দেখে লোকে ভাবে। ছেলেটার কানে কথাটা গেল না। ও তখন কি একটা চিন্তা করছে। বেশ ক-মুহূর্ত পরেই কিছু একটা খুঁজে পাওয়ার আনন্দ ওর মুখে খুশীর কিরণ মাখিয়ে দেয়।—একটা ব্যাপার আমার মাথায় এসেছে—সেটা হল গিয়ে, আপনাদের এখন আমি ম্যাজিক দেখাতে পারি।

সবাই এবার সমস্বরে উথলে উঠল—উঃ কি দারুণ ব্যাপার, আপনি ম্যাজেসিয়ান। দেখান না ম্যাজিক, দেখান না!

—দেখাবো। দেখাচ্ছি। অত অধৈর্য হলে চলবে না—খোকা-খুকুরা একটু স্থির হয়ে বসুন।—খোকাখুকুরা।—কথাটা শুনে তুষাররা একই সঙ্গে মজা পায় এবং তেড়িয়া হয়ে ওঠে কিছুটা। নন্দনা চিড়চিড় করে ওঠে—আপনি তো আমাদেরই বয়সী, অথচ এমনভাবে কথা বলছেন যেন আমরা বালখিল্য সব। আর আপনি ঠাকুর্দা দাদামশাইরে...। পাখি পাতলা ঠোঁট বেঁকায়— অকালপক্ক। সোনামণিরে আমার ...। ছেলেটা মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দেয় পাখির কথায়।

ওরা নদীর পাড়ে যে ঢিপিটায় বসেছিল, সেটা থেকে নেমে ছেলেটা কাছা-কাছিই আর একটায় উঠে গিয়ে দাঁড়ায়। নদীর ওপারে অনেকটা দূরে সার সার কল-কারখানা তারই একটার, প্রায়—আকাশ-ছোঁয়া চিমনিটার ঠিক মাথার ওপরেই তখন অস্তগামী সূর্যটা। ছেলেটার মুখ সেদিকেই। ওদের দিকে পেছন ফেরা। পাখি তার মুখটা দেখতে পেল না। পাখি দেখল—ছেলেটার বিদেশী ধাঁচে ঈষৎ অবিন্যস্ত এক-মাথা চুলের রাশ পেছনমুখো হয়ে গেছে। বিপরীত হাওয়ার তোড়ে। আলখাল্লা পাঞ্জাবীটা পেছন দিকে নৌকোর পালের মত ফুলে উঠেছে। মুখের একটা পাশ ঈষৎ রক্তিম। দেখা না গেলেও বোঝাই যায় ছেলেটার সারা মুখটাই এখন বিদায়ী সূর্যের আলো মেখে ঝিকমিক করছে। ম্যাজিক সম্পর্কে পাখি কোনোই কৌতূহল অনুভব করে না। ছেলেটা চেঁচিয়ে ওদের বলে ওঠে—কয়েক মুহূর্ত, মনটাকে যতটা পারেন হালকা করে নিন। এবং চার-পাশটাকে স্পর্শ করে যান।

ছেলেটার বিপরীত মুখো বাতাস নরম-ভাবে তার গলার স্বর বহন করে আনে—অলৌকিক কিছু শব্দ। মিহিরের গা ঘেঁষে নন্দনা বসেছিল। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—এই ছেলেটা ওটা কি হচ্ছে। অ্যাঁ। ছেলেটা ঘাড় ফেরায় না। বাতাস আরও মোলায়েম ভাবে তার উত্তর বয়ে আনে—মন্ত্রোচ্চারণ।

ওদের সম্মিলিত হাসির তরল বাতাসকে ফালা ফালা করে দেয়। ছেলেটা মুখ ফেরায়। তার মুখে রাগ ফোটে না। পাখি দেখে এদের মস্করাকী তার মুখে যন্ত্রণা মাখিয়ে দেয়। বিশেষ করে চোখ দুটিতে।। সে চোখদুটো পাখির বুকে কেন জানে না হঠাৎ মোচড় দেয়। ছেলেটা আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারপর তার সেই মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করে। মিহির বলেই ফেলে—ছেলেটার মাথায় গোলমাল থাকলেও গলার মড্যুলেশনটা দারুণ। নন্দনা চকিতে ঠোঁট বেঁকিয়েও স্বীকার করে—আবৃত্তির এ ক্লাস গলা মাইরী। ভালো কবিতাও বানাতে পারে।

ছেলেটার কণ্ঠস্বর এবার ঈষৎ উচ্চ-গ্রামকে আশ্রয় করে।

—এবার দেখুন কিরকম সুন্দ-ও-ম ভাবে সূর্যটা ডুবে যাবে। শেষ শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, রাঙা আলোর আদর মাখিয়ে নদীর ওপারে আকাশ-ছোঁয়া ধূসর চিমনিটার আড়ালে সূর্যটা টুপ করে ঝাঁপ দিয়ে দিল। ছেলেটার উত্থিত বাহু এবং সূর্য-নির্দেশক আঙুল ওদের দৃষ্টি কাড়ে।

এরপর সে প্রতিভাময় এক ব্যান্ড-মাস্টারের মত অশ্রুতপূর্ব সব সুরের তরঙ্গ তোলে—

পশ্চিম আকাশে, মোলায়েম কিচ-কিচ কিচ আবহসঙ্গীত বহন করে বিশাল একঝাঁক পাখিকে উড়িয়ে দেয়। তখন তার পাখি-দেখা, সুদূরগামী দৃষ্টি ওদের আংশিকভাবে বিদ্ধ করে।

তারপর—আকাশের বিশাল নীল জমির নিম্নভাগে তাপমগ্ন লোহিতকে, চিরাচিরে ধূসরতা ফালা ফালা করে। ছেলেটার কোমল নয়নযুগল এখন বেদনাহত। সে গাঢ় বেদনার রঙ ওদের রক্তে মেশে।

সে পেছন ফিরে চার্চের ঘড়ি-গম্বুজ থেকে চতুর্দশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর গন্ধ-মাখা ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়ে দেয়। ঢং ঢং—।

তখন সে হাসিমুখেই নেমে আসে তার ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড থেকে। ওদের কাছাকাছি একটা চাঁপাফুলের গাছতলায় এসে প্রার্থী হয়। ফুল প্রার্থনা করে। টুপ-টাপ ফুল খসে পড়ে। দু-আঁজলা ভর্তি ফুল—সে পেয়ে যায়। সে ঘ্রাণ নেয়। ওদের দিকেও অনেক ফুল ছুঁড়ে দেয়।

তার উত্থিত বাহু এবং সূর্য-নির্দেশক আঙুল। তার পাখি-দেখা দৃষ্টি। তার নয়নযুগলের গাঢ় বেদনা। আনমনাভাবে ব্যান্ডস্ট্যান্ড থেকে নেমে আসা। আকাশ, খসে যাওয়া সূর্যের রঙ, মোলায়েম

কিচ-কিচ। কয়েক শতকের পুরোন গন্ধমাখা ঘণ্টাধ্বনি, টুপ টুপ খসে পড়া ফুল—তাক ঘিরে অদৃষ্টপূর্ব এক আবহ-মণ্ডল তৈরি করে।—সব মিলিয়ে সে এক অলৌকিক প্রেমিক যুবা হয়ে যায়। এদের গ্রহণ করার প্রচণ্ড অনিচ্ছাসত্ত্বেও, সে প্রার্থনীয় ধর্ষণ উপহার দিতে পারে—অল্প-বিস্তর করে।

কিছুক্ষণ পরে।

এক মনোরম ভঙ্গিতে, একটা হাঁটুর ওপর চিবুক ঠেকিয়ে পাখি বসেছিল। ছেলেটা দু-হাত দূরেই দাঁড়িয়ে। পাখি তার আনত দৃষ্টি ঈষৎ তুলে তার দিকে তাকায়। তারপর এ ক'মিনিটের নিস্তব্ধতাকে ও-ই প্রথম নির্দ্বিধভাবে কেটে ফেলে—ছেলে-টাকে বলে—বেশ যাহোক দেখালেন এক-চোট! না। পাখির মুখের ওপর রাখা ছেলেটার চোখ-দুটো একটু কেঁপে ওঠে। বোকার মত একচিলতে হাসি ফুটে ওঠে ওর ঠোঁটে—ঘাড় নেড়ে পাখির কথায় দুম করে সায় দিয়ে বসে—হ্যাঁ, ঐ আর কি! পাখির কেমন যেন হাসি পায়। ও হাসে না, গলায় বিদ্রূপ ফুটে ওঠে—তা এবার কি করবেন? ছেলেটা ঠিক ধরতে পারে না—নার্ভাস হয়ে যায় কিছুটা—এবার, এবার আপনাদের গল্প শোনাতে পারি। নন্দনা দেখে পাখির মুখের ওপর ছেলেটার কাঁপা কাঁপা অথচ আলোকিত দৃষ্টি ঘুরে বেড়ায়। পাখির কথায় সে গলে গলে যায় এবং নার্ভাস হয়। নন্দনা নিজের মুখে একটা কালো ছায়ার বিস্তার টের পায়। সেটাকে ঢাকতেই সে আকস্মিকভাবে রূঢ় হয়ে যায় এবং ঠাণ্ডাস্বরে ছেলেটাকে পুরো নিরাশ করে দেয়—থাক আপনার গল্প-টল্প শোনার সময় আর আমাদের নেই। সন্ধে হয়ে গেছে। এবার আমাদের কলকাতায় ফিরতে হবে।

ভাস্কর একটু চুপচাপ থাকতেই ভালোবাসে। এতক্ষণ ও কোন কথা বলেনি। চুপচাপ দেখেই যাচ্ছিল।

এবার বলে ওঠে—স্ট্রেঞ্জ! এতক্ষণতো আপনার নামটাই জানা হয়নি। তারপর ঘাসের ওপর সটান পা ছড়িয়ে দিয়ে ভারিক্কী চালে জিজ্ঞাসা করে—পরিচয়টা একটু দিয়ে দিন—

নাম একটা যা হোক ধরে নিন না। কলকাতাতেই থাকি। আপনাদের মতোই একটু সময়-টময় পেলেই এখানে সেখানে চলে আসি। তারপরই পুরো অন্য কথায় চলে যায় ছেলেটা—তা সন্ধে হয়ে গেছে না। সে মুখ ঘুরিয়ে পাখির দিকে, তারপর আকাশের দিকে চাঁদের দিকে তাকায়—এটা বোধহয় শুক্লপক্ষ হবে। পূর্ণিমার দেরী নেই। কি সুন্দর চাঁদটা—তাই না। নন্দনা দেখে একটা মায়াবী যুবা মুখ পাখির সায় চাইছে তার কথায়। আবার একটা জ্বলুনী অনুভব করে। রূঢ় ভাবে বলে ওঠে—হ্যাঁ আপনি বসে বসে এবার চাঁদ দেখুন, আমরা উঠি।

উঠবেন! ছেলেটার কণ্ঠে ঈষৎ অসহায়তা। পাখির চোখে চোখ। পাখি অস্বস্তিবোধ করে বারবার তার দিকে ছেলেটাকে তাকাতে দেখে। তবু ওর কোথায় যেন ভালো লাগে। ও নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করে—কেন এখনও আপনার কিছু ম্যাজিক দেখানো বাকি আছে নাকি?

একটা অবিশ্বাস আর মজাকীর জমির ওপরেই কিছুক্ষণের জন্যেও কয়েকটা অসীম সরলতা-গন্ধী, আকর্ষণীয় বর্ণের সমাহার ঘটেছিল। তারা অল্প বিস্তর আবিষ্ট হয়েছিল সে সমাহারে। কিন্তু—ক'বছরের গাঢ় সঙ্গী একঘেয়েমি। পাখি এবং ছেলেটার নিঃশব্দে দুটি প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠা। নন্দনার তাড়া লাগানো। আরও দু-একটা অদৃশ্য ব্যাপার—আবার তাদের মধ্যে একটা বাসী ক্লান্তি এনে দেয়।

মিহিররা পাখির নরম স্বর লক্ষ্য করে। তুষার রেগে যায়। যতোসব, এই পাখি উঠে পড়। চার্চের গেট বন্ধ হয়ে যাবে। অলরেডি হয়ে গেছে কিনা কে জানে! নন্দনা ভাস্করের গায়ে ঠেলা মারে—ভাস্করদা চলুন আমরা এবার উঠব।

পাখি একবার ওদের সবার মুখে চোখ বুলিয়ে নেয়, তারপর ছেলেটার দিকে তাকায়। ছেলেটার মুখে এসে পড়েছে মোহ চাঁদের আলো—ওর চোখে কি একটা অনুনয়। পাখি মুখ নামায়—একটু প্রশ্রয়ের সুরে বলে ওঠে—আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে—। তারপর হেসে ফেলে—লাস্ট আইটেমটা না হয় দেখা যেতে পারে। কিন্তু তাড়াতাড়ি।

ছেলেটা হঠাৎই বুঝতে পারে এই মায়াবী মেয়েটা যেন এবার চলে যাবে। তাই ওর কষ্ট হয়। ওর অনুনয় এবার বাঙ্ময় হয়ে ওঠে—একটু, একটুখানি আর বসুন। কেন জানি না প্রথম থেকেই ঠিক করে ফেলেছি—একটা ম্যাজিক আপনাকে দেখাবো। শুধু আপনাকে—না দেখাতে পারলে আমি খুব কষ্ট পাবো—খু-উ-ব। ছেলেটার গলা কেঁপে কেঁপে যায়।

সবাই চমকে ওঠে। ছেলেটার এমন উলঙ্গ ইচ্ছা প্রকাশের দুঃসাহস দেখে। এবং ফেটে পড়ে তারা। কি হচ্ছে কি পাগলামি—নন্দনার কণ্ঠস্বর কর্কশভাবে চিরে যায়—প্রথমে ভেবেছিলুম ছেলেমানুষী মজা করছে। এখন বোঝা যাচ্ছে বদ্ধ পাগল নইলে ভীষণ স্যায়না। একটা অসভ্য। মিহির বলে ওঠে— বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, কি! নন্দনার মাথার মধ্যে চকিতে কি একটা সন্দেহ খেলা করে যায়। তার চোখ পড়ে অদূরেই কয়েকটা গাছের জটলাস্থলের দিকে। সেখানে অন্ধকার ইতিমধ্যেই জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। নন্দনার গলায় এবার ভয় মিশে যায় কিছুটা—কি মতলব আছে কে জানে। ও কি একা—! নন্দনার ভয় এবং সংশয় স[illegible]র ওপরও দ্রুত পক্ষ-বিস্তার করে [illegible] তুষার হঠাৎ ছেলেটার সামনে চলে আ[illegible] মতলব যাইহোক না কেন—কেটে পড়। সুবিধা হবে না। সে ছেলেটার একটা কাঁধ চেপে ধরে দুটো প্রচণ্ড ঝাঁকুনি [illegible]
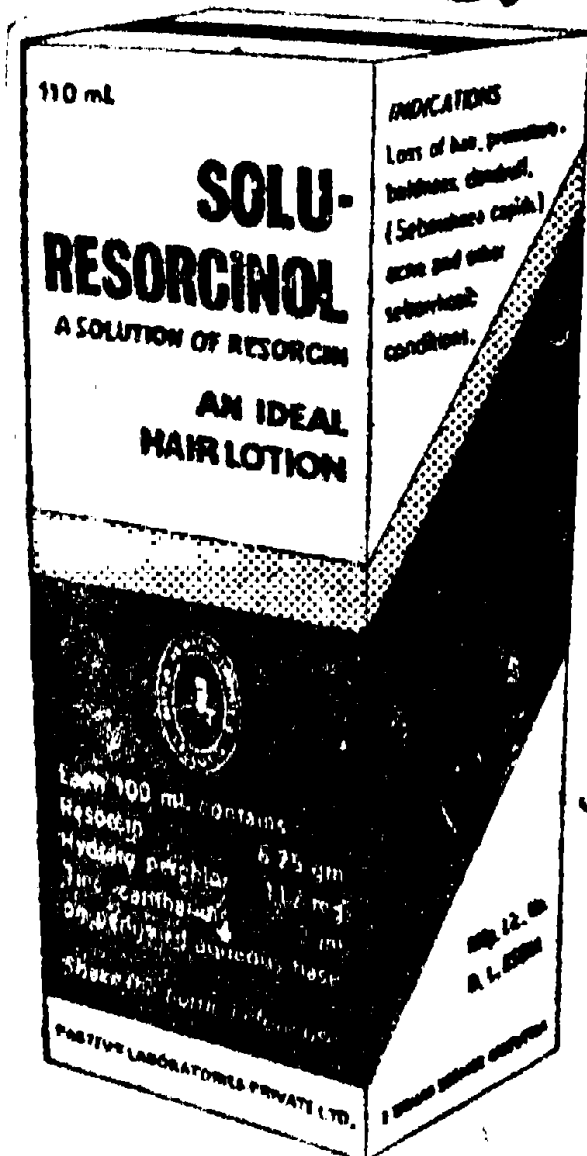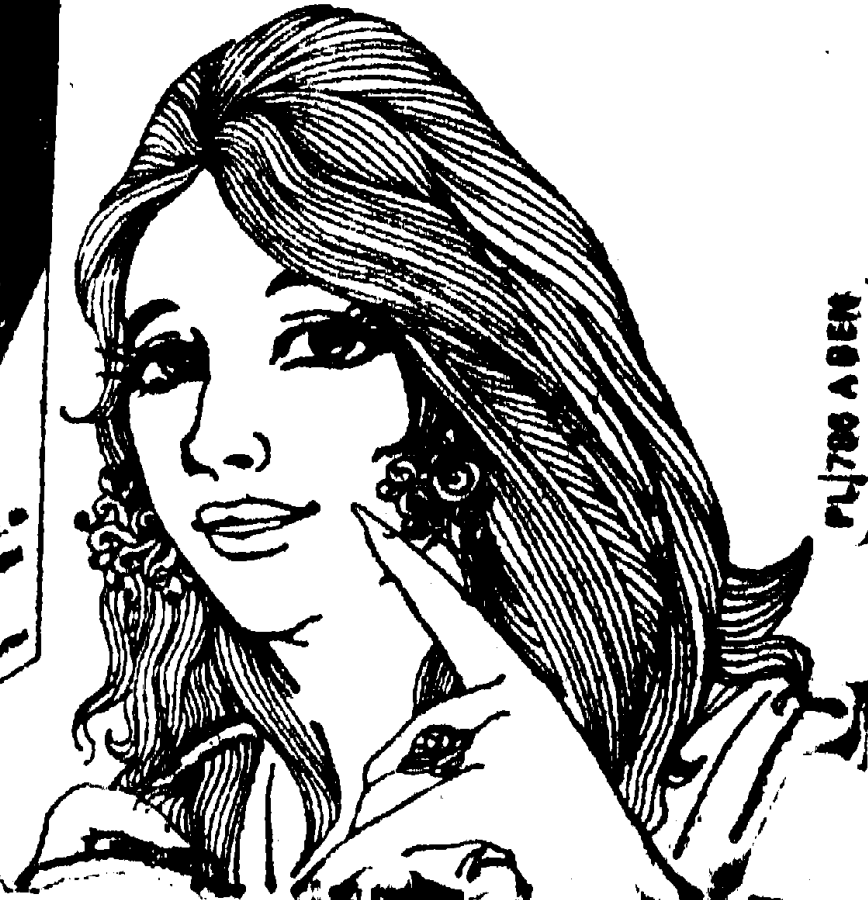
পড়ে যেতে যেতে কোনরকম টাল সামলে নেয়। ওর চোখে বিস্ময় আর যন্ত্রণা একই সঙ্গে খেলা করে যায়। ও শুধু অস্ফুট স্বরে অতি কষ্টে কোনক্রমে বলতে পারে—আপনারা আমায় অবিশ্বাস করছেন।

ভাস্কর এবার তেড়ে যায়—হ্যাঁরে শালা—কেটে পড় এখন।

ছেলেটা মুখ ঘুরিয়ে পাখির দিকে তাকায়—আপনিও! পাখি দেখে ছেলেটার এবার খড়কুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা। পাখির বুকের মধ্যে এসময় চিনচিন করে ওঠে। গলার কাছটায় দলা পাকিয়ে যায়।

পাখির গলার স্বর তীক্ষ্ন অথচ ভঙ্গা—তুষারের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—কি হচ্ছে তুষার! কেন শুধু শুধু ওকে যা তা করছ। ভেবেছোটা কি: তোমরাই ওকে ডেকেছিলে— তোমরাই তো ওর ম্যাজিক দেখতে দেখতে...পাখির গলার স্বর হঠাৎ বুজে যায়। ও আর কিছু বলতে পারে না।

নন্দনা দেখে একরাশ নির্ভরতা নিয়ে এক যুবা প্রেমিকের পূর্ণ দৃষ্টি এখন পাখির মুখের ওপর। নন্দনা হিংস্র স্বরে বলে ওঠে—তুষার ঐ ওটাকে এখনও টলারেট করছ কেন।

ছেলেটাকে পাখি আগলে দাঁড়ানোয় এমনিতেই তুষার ফুঁসছিল, এবার আর থাকতে পারল না। ওর জোরালো একটা ঘুঁষি পাখিকে পাশ কাটিয়ে ছেলেটার মুখের ওপর এসে আছড়ে পড়ল।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ছেলেটা দু-হাত দিয়ে মুখ চাপা দিয়ে বসে পড়ে।

পাখির গলার স্বর এবার চিরে যায়—তুষার তোমরা সব জানোয়ার—

বেশ কয়েক মুহূর্ত তারপর সবাই স্ট্যাচু। ছেলেটা তার মুখ থেকে হাত সরালে দেখা যায়—তার ঠোঁটের কষে রক্তের কালচে দাগ। —একটা চোখ ঝাপসা।

ঘটনাটার আকস্মিকতা প্রত্যেককেই স্থবির করে রাখে কিছুটা সময়। তুষার নিজের মধ্যেই একটা গভীর বিস্বাদ টের পায়। নিজেকে পরমুহূর্তেই তার উলঙ্গ মনে হয়। ক্রোধের মিশেল নিয়ে সে বিচিত্রভাবে অনুতপ্ত হয়ে পড়ে। পাতা খসার শব্দটুকুও পর্যন্ত সে শুনতে পায়! তারপর পাখির দিকে একবার তাকিয়েই দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসে ছেলেটার কাছে—আলতোভাবে ওর কাঁধে একটা হাত রাখতে যায়। কিন্তু তার আগেই পাখি ঝটকা দিয়ে তার হাতটা সরিয়ে দেয়। —লজ্জা করে না! জানো-য়া-র! বীরত্ব দেখানো হল, নয়...! এখুনি এক্ষুণি চলে যাও তোমরা সব। তুষার কিছু বলে না। সে শুধু মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভাস্কর এবার [illegible] বলে ওঠে—পাখি ব্যাপারটা কি রকম যেন নাটক-নাটক হয়ে যাচ্ছে না। সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, এবার তো আমরা ফিরবই। তুমিও তো যাবে। না কি যাবে না।

—না!

না—শব্দটা পাখি এত জোর দিয়ে উচ্চারণ করে যে, সবাই চমকে যায়!

চাঁদের আলোয় পরিষ্কারভাবেই পাখির থম মেরে যাওয়া মুখটা দেখা যায়। মুখের কয়েকটা জমিতে কাঠিন্যের আভাস। পাখির এ রকম মুখ ওরা কোনদিন দেখে নি।

পাখি আবার চিৎকার করে ওঠে—বললাম না, তোমরা সব চলে যাও। আমি একা ফিরব—তোমরা চলে যাও।

কেউ কোন কথা বলতে সাহস পায় না। অথবা কি বলবে ঠিক ভেবে পায় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে ওরা। পাখি অনেক মুহূর্ত ওদের দেখে, তারপর ছেলেটাকে। ছেলেটা নিজের আঘাতের কথা বোধহয় ভুলে গেছে। ও শুধু পাখিকেই দেখছে। আর সবার মতই।

পাখি—চাপা স্বরে গরজে ওঠে—কি দেখছো ওরকম—চলো— ছেলেটার হাত ধরে পাখি নদীর ঢালু পাড় বেয়ে নামতে থাকে।

পাখির সঙ্গীরা হতভম্ব হয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখে।

নদীর এদিকটায় ঢালু পাড়টা সটান একটা চর হয়ে নেমে গেছে, বেশ ভেতর পর্যন্ত। ওরা সেই চরেই বসেছিল। দুজনেই চুপচাপ।

পাখির মাথাটা কেমন যেন তালগোল

পাকিয়ে গেছে। এখন অনেকটা স্থির। পর পর ঘটনাগুলোকে ঠিকমত সাজানোর চেষ্টা করছিল। পারছিল না। সত্যিই ব্যাপারটা কি রকম যেন নাটক-নাটকের মত হয়ে গেল। কি করে যেন যে এমনটা সব হল, ও ঠিক ধরতে পারছিল না। এখন ওর সব রাগ গিয়ে পাশের জনের ওপর পড়ছিল। সে তখন দিব্যি বসে আছে পাখির একটা হাত পরম নির্ভরতায় ধরে। ব্যাপারটা দেখে পাখির রাগ হয়, কিন্তু ঠিক রাগ করতে পারে না। —কি একটা বা তা ছেলে। ঠায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। পাখি এবার একটু ক্ষেপে যায়—আমার মুখের দিকে অমন তাকিয়ে থাকা কেন।

ছেলেটা হঠাৎ পাখির এমন উত্তপ্ত অভিযোগে নার্ভাস হয়ে যায়। ও ঝট করে পাখির হাতটা ছেড়ে দেয়। পাখি দেখে ওর মুখটা বাচ্চাদের মত অভিমানী হয়ে যায়। পাখির হাসি পায়—আচ্ছা ছেলে যা হোক একটা—ও ঈষৎ বাঁকা স্বরে প্রশ্ন করে এ-রকম ঠ্যাঙানি-ট্যাঙানি খাওয়ার বুঝি অভ্যেস আছে!

ছেলেটার মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে—না, আজকেই এই প্রথম। তারপর সে দম করে বলে ফেলে—আমার কিন্তু কোন রাগ হয় নি। খালি মনে হচ্ছে—এ-রকম বোধহয় অনেকবার খাওয়া যায়—যদি আপনি অনেকবার আজকের মত ওরকম-ভাবে নদীর জলে আমার মুখ ধুয়ে দেন। শাড়ির আঁচলে ঠোঁটের রক্ত মুছে দেন।

—বা বেশ মজা যে—আমার যেন দুনিয়ায় কোন কাজকর্ম নেই শুধু তোমার মুখ ধুয়ে দেওয়া আর ঠোঁটের রক্ত পরিষ্কার করে দেওয়া...।

পাখি এই মুহূর্তে সেই প্রেমিক যুবার মুখে পরিপূর্ণ এক শৈশবকে তার সবকিছু নিয়ে আবিষ্কার করে। পাখির বুকের মধ্যে মোচড় দেয়। ভারি মায়া বোধ করে সে এখন। ছেলেটাকে সে বেশ একটু প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে এবার—কি যে ম্যাজিক দেখাবে বলছিলে, শুধু আমাকেই...

ছেলেটার মুখ মুহূর্তে আলোময় হয়ে যায়। —হ্যাঁ। দেখবে? সত্যিই...

পাখি হেসে ফেলে—বাব্বা এখনও তোমার ম্যাজিক দেখানোর ইচ্ছে—এত কান্ডের পরও—ধন্যি ছেলে যাহোক একটা...না এবার তো ফিরতে হবে...।

ছেলেটা অধৈর্য হয়ে ওঠে—না একটুখানি বস। পরমুহূর্তেই আবার বলে ওঠে—তুমি ওঠো, উঠে দাঁড়াও।

পাখি আবার প্রশ্রয়ের সুতো ছেড়ে দেয়। সবটাই এবার। তবু মুখে তার বিড়ম্বনার ভাব ফুটে ওঠে—

সেই যুবার ছেলেমানুষী অধৈর্য ভাব পাখিকে এক সুখ দেয়। তারিয়ে তারিয়ে সেই সুখটার আস্বাদ নেবার জন্যে পাখি সংগে সংগে উঠে দাঁড়ায় না।

একরাশ মধুর বিস্ময় ভাসিয়ে ও বলে—উঠে কি হবে।

—ওঠো না! ওঠো! —ছেলেটা আরো অধৈর্য হয়ে যায়। সে আচমকাই পাখির একটা হাত ধরে টান দেয়। নিজেই ওকে ওঠাবার চেষ্টা করে।

এই প্রথম পাখিকে সে স্পর্শ করে। পাখি প্রথমে কিছু অপ্রত্যাশিতের এক চমক খায়। তারপর তার শরীর জুড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে নতুন রকমের শিহরণ মেশানো সুখ ছড়িয়ে পড়ে—পাখি এবার না উঠে পারে না। হাসতে হাসতেই শরীরটা একটু ভাঙচুর করে ও উঠে দাঁড়ায়। ওর আলোময় মুখ এবং বিলোল—বিন্যস্ত শরীরময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে মনোরম সমর্পণের ভাষা। —আচ্ছা বাব্বা! বেশ উঠলুম। এবার কি করবে কর।

যুবার মুখে এখন কোন কথাই ফোটে না। সে নিস্পলক চেয়ে থাকে পাখির দিকে। শরীর ভাংচুর করে পাখির উঠে দাঁড়ানোর সুন্দর ভঙ্গিমা এবং তার সমস্ত মুখ আর শরীরের সমর্পণের মনোরম ভাষা তাকে আবিষ্ট করে ফেলেছে।

পাখি বুঝে যায় ব্যাপারটা। সে হাসি চাপতে চাপতে মৃদু তাড়া লাগায়—কি হল বোবা হয়ে গেলে যে—কি করবে, এবার কর...আচ্ছা ছেলে যাহোক। ম্যাজিক কি হল?

ছেলেটা এবার সম্বিত ফিরে পায়—না এবার ওসব ম্যাজিক-ট্যাজিক না।

—তাহলে কি? কি করবে?

—তোমায় পুজো করব—ছেলেটা আস্তে আস্তে তিনটে শব্দ উচ্চারণ করে। তার কন্ঠস্বর অনেক দূরের গন্ধ এনে আনে।

—পুজো! পাখি আঁতকে ওঠে। সামান্য হলেও ভেতরেও কিছুটা বিস্ময় খেলা করে যায়। —সত্যি ওরা তাহলে তোমাকে ভুল চেনে নি। —একটা বদ্ধ পাগল। নিজেও যেমন আমাকেও এবার তুমি পাগল করে মারবে।

—ছেলেটা কোন কথা বলে না। সে নতজানু হয়ে পাখির পায়ের কাছে বসে পড়ে। মোলায়েমভাবে তার দু-হাত পাখির পায়ের ওপর এসে পড়ে। তারপর শুধুই তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাখি ক-মুহূর্তের জন্যে পুরো বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে যায়। তারপর ও কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে। ওর বাধা দেবার ইচ্ছা হয়। একটু প্রশ্রয় মেশানো-ধমক দিতে চায় কি পা-দুটো সরিয়ে নিতে চায়। কিন্তু ছেলেটার চোখের দিকে তার পরিপূর্ণ দৃষ্টি পড়তে সে কিছুই করতে পারে না।

পাখি দেখে, সেই অলৌকিক যুবার আশ্চর্য সুন্দর এবং বিশ্বাসযোগ্য দুই চোখ, পাখি নাম্নী এক তরুণীর অপার্থিব সুষমামন্ডিত শরীরময় পুজো করে যাচ্ছে।

তখন চাঁদের মোম আলোর বন্যা ওদের ভাসিয়ে দেয়। ভিজে চরের গন্ধ মাখা নাতিশীতোষ্ণ বাতাস ওদের আদর করে যায়। নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দের দূরাগত সংগীত শুনতে শুনতে পাখি ক্রমশই ভরে উঠতে থাকে। এর আগে যেমনটা ও কোনদিন হয়ে ওঠে নি।

ঘুণ

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
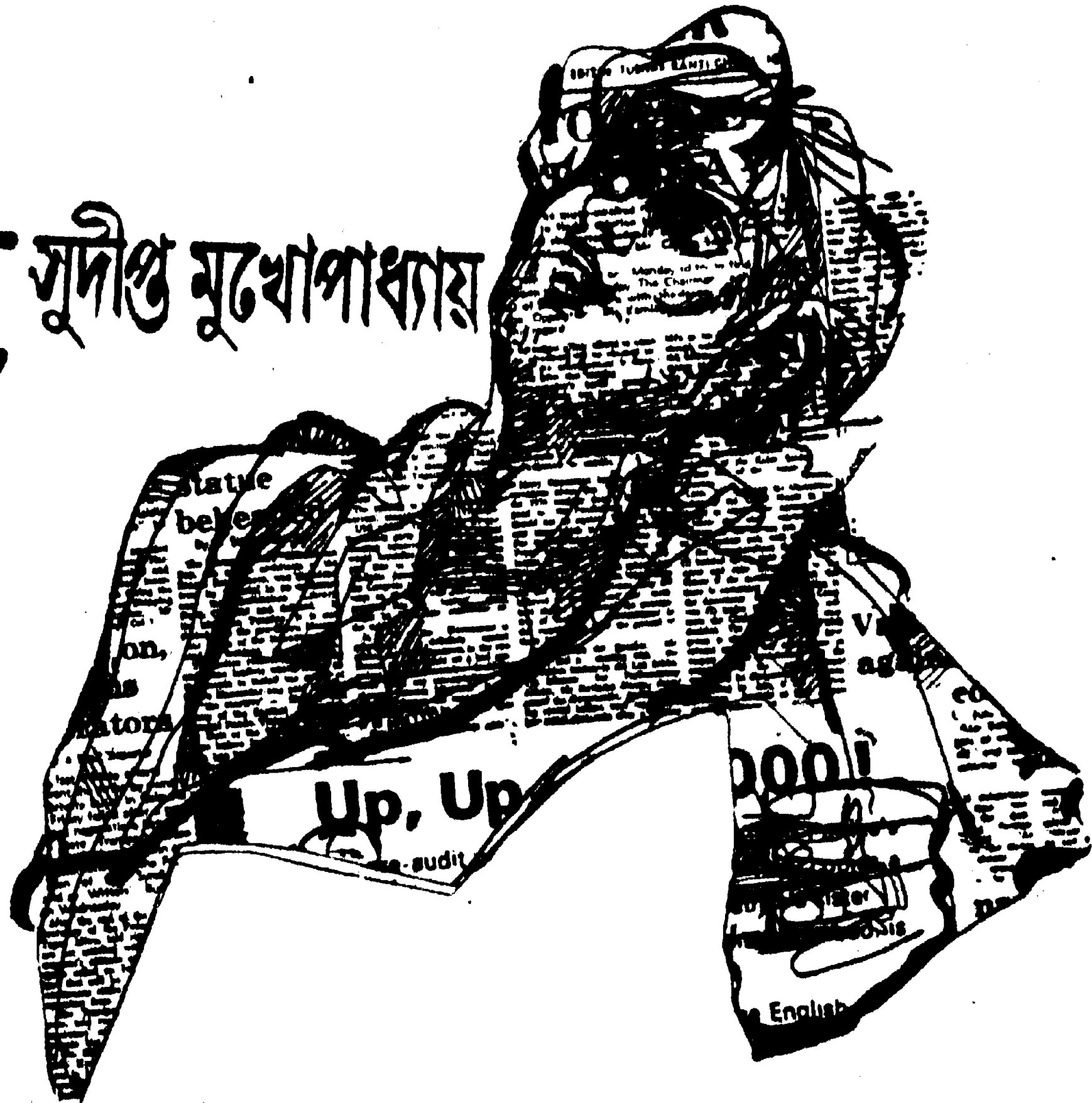
এই উত্তর-দক্ষিণ-পূব পশ্চিমে ছড়ানো বিশাল শহরটায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় বিজয়। অবশ্য এখন আর সকলে চিনতে পারে না। দীর্ঘ ঋজু সুঠাম চেহারাটা চল্লিশেই পাকিয়ে ধনুক হয়েছে। ভারী ভারী হাড়ের কাঠামোটার ওপর দড়িদড়া পাকানো শিরারা দক্ষিণবঙ্গের নদীদের মত ছড়ানো। শুধু তীক্ষ্ণ নাকের ওপর ঘেঁষে দুধারে বসানো দুটি চক্ষু, কোটরের মধ্যে ভুরুর তলায় ধক-ধক করে জ্বলে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি শরীরের যে কোন জায়গা থেকে ছুরি চালিয়ে কেটে নিলে কিছু ছিবড়ে আঁশওয়ালা মাংস পাওয়া যাবে, চর্বি নয়। ধক-ধক চোখ দুটো মাঝে মাঝে সাধুসন্তদের মত নির্লিপ্ত হয়ে যায়। তখন ওর আর কোন দুঃখ বেদনাবোধ থাকে না। এমনকি তার ঠোঁট দুটোও সে সময় বিড়বিড় বন্ধ করে 'আমি সে নই সেই বিজয় নই।'

এখনও সে ভিক্ষে করে না কাজ করে। অফিসে অফিসে প্যাকেট বেঁধে চায়ের পাতা সাপ্লাই করে। অবশ্য লাভের সিংহভাগটা খেয়ে নেন সিংহমশাই। মিঃ সিনহা। তবুও ওকে মাস গেলে একশো পঞ্চাশ টাকা দেন। আর ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয়। তার এই একজোড়া ডোরাকাটা টুইলের সার্ট আর ধুতি চুরি কোন চোর করে না, টায়ারের চটিটাও। তাই বিজয় রাত্তিরে কবিরাজদের বাড়ির রকে শোয়, খুব শীতে সিঁড়ির তলায়। অবশ্যই কাজের বিনিময়েই কবিরাজ চারুচন্দ্র দাঁ এই বদান্যতাটা দেখান। সন্ধ্যেবেলায় দু ঘন্টা হামালদিস্তে পিটিয়ে শিমূল ছাল, জাম্বা হরতকি সামরাজ, কন্টিকারী চূর্ণ করে দেয়। তাতে সময়ও কাটে, মাঝে মধ্যে ভেতর বাড়ি থেকে রুটি আর ভেলিগুড় পৌঁছয়। মন্দ কি. এরপর রকে শুয়ে পড়তে পারলেই.. ভোরের কাক... কর্পোরেশনের জল.. সিংহীমশাই-এর আপিস।

অবশ্য মাঝখানে সারাদিনের একমাত্র বিলাসিতাটা করে নেয় বিজয়। কার্তিকের দোকানে মাখম পাউরুটি ওমলেট আর চা দিয়ে হেভি ব্রেকফাস্ট। এটাই সারা দিনের মধ্যে সবচেয়ে ভারী খাওয়া। সিংহমশাই বাঁদিকের চোখটা রসিকতা করে বন্ধ করে মাঝে মাঝে বলেন, বিজয়, জাত এ্যাল-সেশিয়ানও দিনে একবার খায়। ওরা মদ এ ...ড়ে। বেশী খেলেই ম্যাদামারা হয়ে যাবে। না খেয়ে আর কটা লোক মরে। বেশী মরে তো খেয়েই। আমাকেই দেখো না এখন ...য়ে চিনিটুকুও চলে না।'

ঠিক এই রকম সময় বিজয়ের চোখ সাধু-সন্তদের মত নির্লিপ্ত হয়ে যায়। অন্য সময় দু হাতে দুটো চায়ের প্যাকেট ভর্তি মজবুত চটের থলি ঝুলিয়ে দুটো ধকধকে চোখ নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিড়বিড় করে 'আমি সে নই, সে বিজয় নই'। আজকাল তাই খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ...কের মত পাকানো শরীরে ধকধকে চোখে, চেনা লোকেরাও তাকে চিনতে পারে না। সেও ...স না কর পালায়। কার কাছ থেকে পালায় কে জানে। তবে এই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে ছড়ানো শহরের

পেটের মধ্যে ঢুকে পড়লেই অসংখ্য পালাবার জায়গা, লুকোনোর ফাঁক ফোকর। ওতো আর শহরতলি বা গ্রাম নয়।

বিজয়ের জন্ম দিল্লিতে, বাড়ি কলকাতার শহরতলিতে, পড়াশোনা খড়গপুরে, প্রথম চাকরি এই শহরেই। ভদ্র সৌজন্যপূর্ণ চেহারা ও ব্যবহার নিয়েই ও বন্ধু মহলে প্রিয় ছিল। বিলিতি কোম্পানীতে কেরাণীর কাজ, দায়দায়িত্বহীন বাড়ির ছোট ছেলে এবং একটু জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক আশাক, বিজয়ের প্রিয় ছিল। বড় এবং স্বচ্ছল পরিবারের ছেলের সাধারণ কেরাণীর চাকরিতেও চাল মেরে চলে যেত। কেউ বুঝত না। কাকলীও না। এবং প্রথম প্রেমে পড়বার পর বিজয়ও চাইত না যে কাকলী বুঝুক। কাকলী জানত যে বিজয় ঐ ডাকসাইটে বিলিতি কোম্পানীর কভেনেন্টেড অফিসার, ক্যাশ গোনা কেরানী হয়। এবং বিজয়ের মাইনের সমস্ত টাকাটাই তার হাতে খরচ। ফলে ট্যাক্সি রেস্তরাঁ আর সিনেমার বেশী দামের টিকিই অনায়াস লভ্য ছিল।

কাকলীর কাছে বলা লম্বা চওড়া মাইনের অংকটা—বিয়ের পরও ক'মাস ফাঁস হয়নি। কাকলী তখন বিজয়ের সঙ্গে আলাদা ঘর বাঁধার নেশায় মশগুল। এবং নানা তীক্ষ্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাস দুয়েকের মধ্যেই ওর আয়ের অর্ধেকেরও বেশী টাকার ভাড়া নেওয়া একটা ফ্ল্যাটে এসে উঠল বিজয়। এবং এই প্রথম বুঝতে পারল তাদের শহরতলির পৈতৃক বাড়ির ঘর কখানা কিভাবে এই শহরের ফ্ল্যাট ভাড়ার থাবা থেকে তার আয়কে বাঁচাছিল। কিন্তু কাকলীর সুখ ও হাসি এবং তার স্টাটাসের ফানুস ফুটো হয়ে যাওয়ার ভয়ে তার আর কিছু করার ছিল না। আসলে সে তার বৌকে সে যে একটা নিছক কেরাণী ছাড়া আর কিছু নয় সেটা বলতে পারল না। বললে হয়ত একটু কান্নাকাটি চিৎকার চেঁচামেচি হত কিন্তু এই অসহায়ভাবে বাড়ি থেকে টাই পরে বেরিয়ে, রাস্তায় টাই খুলে পকেটে নিয়ে অফিস করা এবং বাড়ি ঢোকার আগে গলির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে টাই পরে নেবার কসরতটুকু করতে হত না।

ব্যাপারটা খুবই সামান্য ও ছোট্ট ব্যাপার কিন্তু কারো কারো জীবনে এই ছোট ব্যাপারটুকু বটগাছের বীজের মত প্রোথিত হয় এবং ডালপালা বের করে মহীরূহ হয়ে ভিত ফাটিয়ে দেয়। এই মিথ্যাচারের বীজটুকু একদিন বৃক্ষ হয়ে বিজয়ের জীবনের ভিত ফাটিয়ে দিল। যে দামী ফ্রেম দিয়ে বিজয় নিজেকে বাঁধিয়ে নিয়েছিল সেটা খুলে ফেলে আর নিজের ন্যাড়া ছবিটা কাকলীর হাতে দিতে পারল না।

এই কমাসে স্ত্রীর অধিকার ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যাওয়ায় কাকলী মাসের প্রথমেই হিসেব করে ফেলত তার জন্য বিজয়ের মাইনের অঙ্কে কতটা উদ্বৃত্ত থাকবে এবং তারপর তার কি কি চাই। বিজয় শুনতো। চুপচাপ শুনতো এবং তখন হাসতো আর বলতো ঠিক আছে। আড়ালে তার চোখ একটা অদ্ভুত। অনুভূতিতে চকচক করত মাঝে মাঝে জ্বলে উঠতো। প্রভিডেন্ট ফান্ড শেষ। দুটো কো-অপারেটিভের দেনার চরম দেনার চরম সীমাটুকু অতিক্রম করে গেছে, দুমাসের বাড়িভাড়া বাকি, এবার মুদি ও গয়লার বিলও বাদ হল। সারাজীবনে যাকে পাওনাদার সামলাতে হয়নি, বন্ধু-বান্ধবদের যে অকাতরে অর্থ ও সৌজন্য বিলিয়েছে তার আর সামনে কোন পথ খোলা ছিল না।

সে মাসে কাকলী বলল, বিজু আমি সেতার শিখব একটা সেতার কিনে দাও। মাত্র চারশ টাকা দাম। আমি খোঁজ নিয়েছি।

বিজয় একবার ঠোঁট কামড়ে বলল, আচ্ছা কাকলী আনন্দে মাথায় ঝাঁকি দিল। সারা মুখে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল অকৃত্রিম আনন্দে। তারপর সোফায় বসে থাকা বিজয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখের স্বাদ শুষে নিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে গুণ গুণ করতে করতে রান্নাঘরে চলে গেল। ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আজ বিজয়ের চোখ ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলে উঠল। সেতার, চারশ টাকা, এ মাসে অসম্ভব। জানলার বাইরে গয়লার মুখ। কাল অ্যাসিস বলে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল বিজয়।

আনমনাভাবে অফিসে বেরিয়ে যাবার সময় একি টাই পরলে না? বলে আদুরে বেড়ালের মত বুকের কাছে লেপটে টাই পরিয়ে দিল কাকলী, গলির মোড় ঘুরেই হ্যাঁচকা টানে টাইটা খুলে ফেলল বিজয়। অথচ বৌকে একবারও বলতে পারল না, কাকলী সব মিথ্যে। চল আমরা আর একভাবে বাঁচার চেষ্টা করি। এখান থেকে চলে যাই।

গভীর রাতে জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা কাকলীর দিকে চেয়ে একটা ফিকে হাসি হেসে বাড়ি ঢুকল বিজয়। চোখের তারা নড়ে করে ভয় ও বড় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কাকলী দরজা খুলে ওর গলা জড়িয়ে বুকে মাথা রাখল। বিজয় ওকে বুক থেকে সরিয়ে গাল টিপে একটু আদর করে হাসিমুখে চল্লিশখানা দশ টাকার নোটের একটা তাড়া ওর হাতে দিয়ে বলল,

—তোমার সেতারের জন্যে। কোথায় শিখবে শুনি?

—হুঁ হুঁ সে দেখবে পরে, এখন বলবো না। একি? তোমার টাই কোথায় গেল?

—টাই। ওঃ হো টাই। হ্যাঁ আমার পকেটে। বড় গরম লাগছিল কিনা খুলে রেখেছি।

—দাঁড়াও হাত-মুখ ধোও। আমি খাবার নিয়ে আসি।

কাকলী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বিজয়ের চোখ আবার ধক ধক করে জ্বলে উঠল। টাকাটা সে অমিয়র কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। কাকলীর নাম করেই এবং জীবনে প্রথম বন্ধুর কাছে নোংরা মিথ্যে কথা বলে। বলেছে, গর্ভবতী অবস্থায় সিঁড়ি থেকে পড়ে কাকলী নার্সিং হোমে। ভীষণ টাকার দরকার।

সেদিন রাত্রে বিজয় ভাবল বার বার ভাবল, যে একবার বলে কাকলী। সমস্ত মিথ্যে, আমি সে নই, সে বিজয় নই, আমি একটা কেরাণী বিজয় দুশো টাকা মাইনেতে কোম্পানীর ক্যাশ গুনি। আমি আঠেরোশ টাকা পাই না। চলো আমরা আর একবার সমস্ত কিছু নতুনভাবে শুরু করি। তুমি ভুলে যাও ওসব। হে ঈশ্বর। আমাকে এমন একটা রবার দিতে পারো যা দিয়ে সমস্ত তৈরী করা ছবি মন থেকে মুছে দেওয়া যায়।

ওর পাশে ঘুমন্ত কাকলীকে তুলে এই কথা কটা ওর পায়ের নিচে হাঁটু গেড়ে বসে সেদিনও বলতে পারল না বিজয়।...

ঘরের একপাশে কাঠের জলচৌকির ওপর বসিয়ে লাল শালুর ঢাকনায় মোড়া সেতারটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো আছে। মাঝে মাঝে ঢাকনি খুলে একমনে সা রে গামা করে কাকলী। বিজয় চুপ করে দেখে। আর চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওই সেতারের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কাকলী। মাটি ভেসে যাচ্ছে রক্তে, ওকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নার্সিংহোমে। আর অমিয় গুণে গুণে দিচ্ছে টাকা এক দুই তিন পাঁচ পঁচিশ চল্লিশ।...

পরের মাসে দাদার বিয়েতে যাবার জন্য একটা বেনারসী চাইল কাকলী। তার পরের মাসে বলল একটা জড়োয়ার দুল ওর বড় পছন্দ হয়েছে...এবং তার মাস দুই পরে যখন একটা স্টিরিও রেডিওগ্রাম না হলে স্টাটাস থাকছে না বলল তখন সেই অদ্ভুত ধ্বকধ্বকে দৃষ্টিটা কাকলীর সামনেই জ্বলে উঠল বিজয়ের।

—ওকি ওরকমভাবে তাকিয়ে আছ কেন? কিরকম পাগল পাগল লাগছে চোখটা।

'পাগল' শব্দটা আবার বিজয়কে স্বাভাবিক করে দিল। তার মুখে মরিয়ার মত ফুটে উঠল একটা হাসি।

—স্টিরিও রেডিওগ্রাম না হলে স্টাটাস থাকছে না, তাই না? হাঃ হাঃ হাঃ।

—আবার ঐ রকমভাবে হাসছ? তোমার কি হয়েছে বলত?

—নাঃ কিচ্ছু হয়নি।

—কিচ্ছু হয়নি তো ওরকমভাবে হাসছ কেন?

—কাকলী! শোন তুমি যে বিজয়কে চেন আমি সে বিজয় নই।

—এই রাত দুপুরে হেঁয়ালী করো নাত। ভালো লাগে না। আমার বড় ভয় করে ওরকমভাবে হাসলে।

কাকলী বিজয়ের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সেদিনও বিজয়ের সব কথা বলা হল না। অথচ ভেবেছিল বলে ফেলবে। কাকলী

অনেকক্ষণ কাঁদল আর বলল, 'তুমি আজকাল আমার দিকে কিরকমভাবে যেন তাকাও, আমাকে আর ভালোবাসো না। আমি তোমার জন্যে আমার বাবা মা দাদা সবাইকে ছেড়ে এসেছি, আর তুমি এত টাকা পাও একটা রেডিওগ্রাম কিনতে বললুম তুমি আমার দিকে তাকিয়ে কিরকম করলে। সে রাতটা সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কেটে গেল বিজয়ের। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে পাথর গড়িয়ে গেলে যেমন আর তার থামার উপায় থাকে না, সেভাবে বিজয় গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। তাকে মাধ্যাকর্ষণের টানের মত টেনে নামাচ্ছিল মিথ্যা ঋণ আর ঋণ টাকা দেবার জন্যে সংগৃহীত ঋণ।

পরের দিন একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল বিজয়ের জীবনে। সুরেন আর বিমল ওকে অফিস ছুটির পর 'আজ একটা দারুণ মজা হবে, আয়' বলে ডেকে নিয়ে গেল বিমলের মেসে। সেখানে গিয়ে ভূত দেখার মত চমকে উঠল বিজয়। অমিয় বসে আছে। খুব পরিষ্কার এবং কাটা কাটা গলায় অমিয় বলল,—আমার টাকা ফেরত দে। তুই একটা জঘন্য মিথ্যেবাদি চিট। আমি সব খবর পেয়েছি। কাকলীর কিচ্ছু হয়নি।

বিজয় আমতা আমতা করে কিছু বলতে গেল কিন্তু তার রক্ত, তার উন্নাসিকতা, তার একদিন এইসব বন্ধুদের সামনে গড়ে-ওঠা বিরাট ইমারতের মত প্রতিপত্তি, অমিয়র নির্মম সত্যিকথার সামনে কোন বাজে মিথ্যা জবাব তৈরী করতে পারল না। সুরেন আর বিমল বিজয়ের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, 'অমিয় যা বলছে সেসব কি সত্যি বিজয়?'

বিজয় কোন উত্তর দিতে পারল না। অমিয় একটা স্ট্যাম্প কাগজে চারশ টাকার হ্যাণ্ডনোটে সই করালো বিজয়কে। তারপর ওর হাত থেকে ওমেগা ঘড়িটা বন্ধক হিসেবে খুলে নিল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বিজয়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলে উঠল ওর চোখ। তারপর মরিয়ার মত হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে মেস ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে কাকলীর কাছে টালিগঞ্জ ব্রীজের তলায় তার কাল্পনিক ঘড়ি ছিনতাই এর বিবরণ দিল বিজয়। এবং পরদিনই ট্যাকসী করে একটা বিশাল স্টিরিও রেডিওগ্রাম নিয়ে ঘরে ফিরে এল। রাত একটা পর্যন্ত বাজিয়ে বিলিতি কায়দায় নাচল বিজয়। আর মরিয়ার মত হাসল। কাকলীও খুব হাসল আর মাঝে মাঝে সরু চোখে বিজয়ের উৎসাহের আতিশয্য লক্ষ্য করল।

পরের দিন বিজয় যখন অফিসে তখন কাকলী এই বাড়ি ছেড়ে দে[illegible] নোটিশ পেল। কেসে হেরে গেছে বি[illegible] মাস বাড়ি ভাড়া না দেওয়ার জন্যে। অথচ বিজয় ওকে বুঝিয়েছিল যে বাড়িওয়ালার ত্যাঁদড়ামির জন্যে ও রেন্টকন্ট্রোলে ভাড়া জমা দিচ্ছে। বাড়িওয়ালা সত্যিকারের ভদ্রলোক তাই কোনদিন পাড়ার লোক জানিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করেননি।

বিজয় বাড়ি ফেরার পর কাকলী নিঃশব্দে নোটিশটা হাতে দিয়ে জানলার গরাদ ধরে বাইরে তাকিয়ে রইল। বিজয় পড়ে চুপ করে বসে রইল সোফায়। তার আর কিছু বলার ছিল না। অনেকক্ষণ পর কাকলী জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমায় এতদিন ধরে এই মিথ্যেটা বলেছিলে কেন?'

বিজয় বলতে চেষ্টা করল, আরো অনেক মিথ্যে অনেক বড় বড় মিথ্যে তোমার কাছে বলেছি কাকলী তাই এই ছোট মিথ্যেটার কথা মাথায় আসেনি। হঠাৎ মরিয়ার মত সেই জ্বলজ্বলে চোখ তুলল বিজয়।

—শোন কাকলী, তোমায় আমি আজ অনেক কথা বলব। অনেক কথা। মন শক্ত কর। আজ আমি বলবই। আমার সামনে এসে বোস।

কাকলী এগিয়ে আসতেই আবার দরজায় কড়া নড়ল। বেশ শব্দ করে, এবং জোরের সংগে।

কাকলী দরজা খুলতেই ঢুকল পুলিশ। ইন্সপেক্টার বললেন—আপনি বিজয়বাবু। অফিসের ক্যাশ ভাঙবার জন্যে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। চলুন আপনাকে থানায় যেতে হবে।

বিজয় কাকলীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাসল। বড় বিবর্ণ সেই হাসি তারপর বলল —আজো আমার সেই কথাটা তোমায় বলা হল না কাকলী। আমি সে নই সেই বিজয় নই। তুমি সুখে থাকো।

অফিসের ম্যানেজারও সংগে এসেছিলেন। তিনি বললেন, —আমি খুব দুঃখিত বিজয়বাবু। কিন্তু কোন উপায় নেই। আপনি গোড়া মেরে রেখেছেন। এই মাত্র তিন হাজার টাকা কী আপনি আমার কাছে চাইতে পারতেন না? আমি কী করব আমার হাত-পা বাঁধা। ইন্টারন্যাল অডিট সেকশন এই চুরি ধরেছে। জাল ভাউচারে আপনার সই আছে।

বিজয় উঠতে উঠতে বলল, —কাকলী তোমার স্টাটাস বজায় রাখার রেডিওগ্রামের দাম তিন হাজার।

—ছিঃ ছিঃ তুমি শুধু মিথ্যেবাদী নও। চোরও! ছিঃ।

বিজয় শুধু বিড়বিড় করে বলল,

—আমি সে নই, সেই বিজয় নই।...

জেল থেকে ফেরবার পরও দীর্ঘ আট বছর কেটে গেছে। এখন দীর্ঘ ঋজু সুঠাম চেহারাটা চল্লিশেই পাকিয়ে ধনুচ হয়েছে। সারা মুখে অসংখ্য ভাঁজ। দক্ষিণবঙ্গের নদীনালার মত শিরারা দড়ির মত ফুলে সারা শরীরে ছড়ানো। ছুরি দিয়ে কেটে নিলে শরীরের যেকোন জায়গা থেকে বেরিয়ে পড়বে ছিবড়ে আঁশওয়ালা মাংস, চর্বি নয়। শুধু দু চোখে ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে একটা দৃষ্টি আর বিড়বিড় করে 'আমি সে নই, সে বিজয় নই।' তারপরেই চোখ দুটো সাধুসন্তদের মত নির্লিপ্ত হয়ে যায়।

দু হাতে চায়ের প্যাকেট ভর্তি মজবুত দুটো চটের থলি ঝুলিয়ে ঈষৎ কুঁজো হয়ে শিরার দড়িদড়া ফুলিয়ে এই উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিমে ছড়ানো বিশাল শহরটায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় বিজয়। চেনা লোকেরাও তাকে চিনতে পারে না বা চেনা দেয় না। সেও চেনে না। মাঝে মাঝে খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা মুখে, বিশাল ভারী হাড়ের কাঠামোর শরীরে ঝাঁকি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'আমি সে নই...' হাতের থলি দুটো দু পাশে নামিয়ে একটু জিরিয়ে নেয়, আর সিংহি মশাই-এর কথা ভাবে, এ্যালসেশিয়ান নীল, ওয়ানস এ ডে। দিনে একবার। না খেয়ে কেউ মরে না, মরে বেশী খেয়ে।...

আকাশে তখন তামা রংয়ের রং ধরেছে। বেলভেডিয়ার রোডে নেমে আসছে সন্ধ্যা, সন্ধ্যার অন্ধকার। এ্যাণ্ডারসন হাউসে দুজন লোককে চা দিতে হবে। হাজরার মোড় থেকে হেঁটে আসছে বিজয়। এ্যালসেশিয়ান নীলে বড় বুকে হাঁফ ধরে। বোধহয় ছুটি হয়ে গেল অফিস। অনেক লোক হেঁটে বেরিয়ে আসছে। আজ আর বোধহয় চা দেওয়া যাবে না। আবার কাল আসতে হবে। তবু দেখি যাই একবার এতদূর যখন এলাম। আবার ভারী থলি দুটো তুলে নেয় বিজয়।

সামনে অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে কাকলী হেঁটে আসছে। ও বিজয়কে খেয়াল করে না। কারণ বিজয় যে কোথায় আর খোঁজ নেয়নি কাকলী। আবার কুমারীর মত সিঁথি হয়ে গেছে কাকলীর। গত মাসে চাকরী পেয়েছে। আজকেই এক বান্ধবীকে চোখের জলে ভিজিয়ে ওর সব গোপন পুরোন কথা বলে ফেলেছে। সে হেঁটে আসছে ওর সংগে।

—এখন মনে হচ্ছে না বললেই হত। যাক কী আর করা যাবে।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর সেই ধ্বক ধ্বকে চোখ নিয়ে ল্যাম্পপোস্টের ধারে দাঁড়িয়ে ব্যগ্র চোখে বিজয় কাকলীর মুখ দেখে, চোখ দেখে তার কুমারী সিঁথি দেখে। হাতের ব্যাগ দুটো নামিয়ে অবাক চোখে সে দেখতেই থাকে। কাকলী এগিয়ে আসে আনমনে। পথের লোকের মত তার মুখে দৃষ্টি ফেলে কাকলী ওকে ছাড়িয়ে বাস স্টপেজের দিকে চলে যায়। আজকাল আর কেউই বিজয়কে চিনতে পারে না। দু বছর রক্ত মাংস মেদে মজ্জায় একসংগে বাস করা কাকলীও না। সন্ধ্যার অন্ধকারে কাকলী বিজয়কে ছাড়িয়ে অনেক দূরে তার বান্ধবীর সংগে আবার কুমারী সিঁথি নিয়ে পথ বেয়ে চলে যায়। যেতে যেতে বান্ধবীটি বলে,

—ভাগ্যিস সেই লোকটা তোমার পেটে কোন ছেলে রেখে যায়নি।

বিজয় কপালের ঘাম মুছে থলে দুটো পিঠ বাঁকিয়ে তুলে নেয়, তারপর ধ্বক ধ্বকে চোখে বিড়বিড় করে,

—আমি সে নই, সে বিজয় নই।

বলেই তার চোখ দুটো সাধুসন্তদের মত নির্লিপ্ত হয়ে যায়।

ছবি

বিজনকুমার ঘোষ

সকাল ছটা। বলাইবাবু বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছেন। কিছু আগে জানালা দিয়ে খবরের কাগজখানা ছুঁড়ে দিয়ে গেছে। চা খেতে খেতে বড় বড় হেডিংগুলোর ওপর নজর বোলাচ্ছেন। একটু পরেই বাজার যেতে হবে। বাজার থেকে ফিরে অন্য সব খবর তারিয়ে তারিয়ে পড়বেন—সেই রকমই ইচ্ছে। সবার আগে পড়বেন বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত একটি আর্টিকেল—বাঙ্গালীর অবসর জীবন।

হ্যাঁ, বলাইবাবু মাত্র দিন সাতেক হল রিটায়ার করেছেন। একটি প্রাইভেট ফার্মে কেরাণী হয়ে ঢুকে শেষ পর্যন্ত সেকশন ইনচার্জ অর্থাৎ বাংলায় বড়বাবুর খেতাব নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। বালিগঞ্জের গা-ঘেঁষে তিন রুমের একতলা বাড়িও তুলেছেন। তিন ছেলে। বড় আমেরিকায় থাকে। মেমবৌ। এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে ওদের। অসুবিধে না হয় সেজন্যে বলাইবাবু রাশিয়ান সেট দেখে নি। হঠাৎ দেশে ফিরলে যাতে কাপ ডিশ, প্লেট, কাঁটাচামচ, স্যুপ খাবার গোল চামচ ইত্যাদি কিনে ওটাকে তালাচাবি দিয়ে রেখেছেন। মেজছেলে জিওলজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করে, জব্বলপুরে। ছেলেপুলে এখনো হয়নি। বোধহয় হবেও না। ছোটছেলে পান্নুর চাকরী কলকাতায়। শিগগীর বোধহয় ব্যাঙ্কের এজেন্ট হবে। তিনখানা ঘরের মধ্যে নিজেদের দাপাদাপি অসম্ভব বেড়ে যাওয়ায় গেল মাসে ওকে হস্টেলে ভর্তি করা হয়েছে। হ্যাঁ, সব দিক থেকে চৌধুরী পরিবার সুখি পরিবার। এই সুখ একজনই শুধু দেখে যেতে পারলেন না। [illegible]

তিন ছেলের মধ্যে নানুর স্মরণশক্তি সব চেয়ে বেশি। ছাত্র হিসেবেও ভাল। আমেরিকার নানা বৈজ্ঞানিক জার্নালে ওর লেখা প্রায়ই ছাপা হয়। লিখেছে—'মার মুখ মনেই পড়ে না, ছেলেমেয়েরা ঠাকুরমার ফটো দেখতে চায়। যাই হোক ছোট বৌমা যে আপনার একখানা ফটো তুলে বাঁধিয়ে করে পাঠিয়েছে সেজন্যে তাকে প্রচুর ধন্যবাদ।'

বলাইবাবু মনে মনে হাসেন। মার মুখ মনে রাখতে পারিস না, তাহলে তুই কিসের ভাল ছেলে! কই, আমি তো এত বছর পরেও ভুলতে পারিনি। চোখ বুজলে আজও সব দেখতে পাই। সেই লাল পাড় শাড়ি, কালো চুলের গোছ। হ্যাঁ, বাঁ-গালে ছোট একটা তিল ছিল। হাসলে চোখের মণি দুটো ঝিলিক দিত আর তখন ভারী চমৎকার দেখাত সরলাকে। হ্যাঁ, তাঁদের সময় পরিবার পরিকল্পনা ফটো তোলার তেমন রেওয়াজ ছিল না। সরলা অবশ্য দু-একবার মুখ ফুটে কথাটা বলেছিল। বলাইবাবুও ভেবেছিলেন ধর্মতলায় গিয়ে বড় দোকান থেকে দুজনের একসঙ্গে ফটো তুলবেন। কিন্তু তা আর হল কই। ঘোড়ায় জিন দিয়ে যে সরলা এসেছিল। বছর পাঁচেকের মধ্যে বার-তিনেক আঁতুড়ঘরে হাঁটাহাঁটি করে সব দম ফুরিয়ে গেল।

চা খাওয়া হয়ে গেছে। বাজারের থলের জন্যে হাঁক দিতে যাবেন, এমন সময় জানালা দিয়ে বছর চব্বিশ পঁচিশের একটা ছিপছিপে ছেলে মুখ বাড়াল।

—স্যার আপনি আমাকে দু মিনিট সাতাশ সেকেন্ড সময় দেবেন কি?

বড় রাস্তার পাশে বাড়ি হলে এই এক ঝামেলা। দিনরাত মিহি সুরে হয় ভিক্ষে না হয় কাটায় কাটায় দু মিনিট সাতাশ সেকেন্ডের দরবার। উদ্দেশ্য একটাই। বলাইবাবু খেঁকিয়ে উঠতে গেলেন, না না, সাহায্য-টাহায্য নয়—

কিন্তু তার আগেই ছেলেটি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

—আজ্ঞে আমার নাম সুজন। মোটেই সাহায্য চাইতে আসিনি। আমি একজন আর্টিস্ট।

বলাইবাবু ভিতরে ভিতরে একটু দমে গেলেন। পাইকারি সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠিক হয়নি। লম্বা চুল। লম্বা নখ। সুন্দর চোখ। তা আর্টিস্টদের মতই চেহারা। বলাইবাবু একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

—যাস্ট দু মিনিট সাতাশ সেকেন্ড। এর বেশিও নয় কমও নয়।—ছেলেটি শান্তি-নিকেতনী বড় ব্যাগ থেকে গোটা তিনেক ছবি বের করে টেবিলে পর পর সাজিয়ে দিল : দেখুন স্যার—

বলাইবাবুর মনোভাব অনেকটা এইরকম —বাজারে যাবার মুখে একি ফ্যাসাদ রে বাবা! সেটা গোপন করে একটু হেসে বললেন, আমরা কমন ম্যান। আমরা আর্টের কি বুঝি?

—নিশ্চয়ই, কমন ম্যানরাই আর্টের আসল সমঝদার। কেন? বুঝিয়ে দিচ্ছি। আসলে সাধারণ মানুষের ভাল লাগাটা হল ডাইরেক্ট। অর্থাৎ সোজাসুজি। কিন্তু অনেক পড়াশুনা করার ফলে পণ্ডিতদের রসবোধ যায় ঘুলিয়ে। তারা কোদালকে কোদাল বলতে পারে না।

এদিকে বাজারের থলে দিতে এসে কৃষ্ণা থমকে দাঁড়িয়েছে। তার পেছনে ব্রাশে পেস্ট মাখিয়ে পানু। বলাইবাবু আড় চোখে উপস্থিতি লক্ষ্য করে সমঝদারের কায়দায় মাথা নাড়লেন, বাঃ বেশ বেশ। চমৎকার হাত—

আমি আসলে স্যার পোর্ট্রেট আঁকিয়ে। নেতাজীকে দেখুন, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ভাব। ওই যে রবীন্দ্রনাথ, চোখ দেখে মনে হচ্ছে নাকি আমি সুদূরের পিয়াসী?

বলাইবাবু মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ, হচ্ছে।

—হবেই তো!—ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে উঠেছে : আর ওই দেখুন বেঁটে বামুন। কি দুর্জয় সাহস আর বিশাল বুক! মাত্র ক্রিমসন লেক, লাইট রেড, টেরাভর্ট, কোবাল্ট ব্লু আর ইয়োলো অকার রঙ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছি রেনেসাঁসের সেই অসাধারণ পুরুষটিকে। কেমন লাগছে?

—চমৎকার!

—এক একটি পিসের দাম স্যার পঞ্চাশ টাকা। আর সব বিক্রি হয়ে গেছে, মাত্র তিনটিই আছে। আজকাল রঙের যা দাম! মেহনতের কথা স্যার ধরছি না। —ছেলেটি এবার ঘরের প্রত্যেকটি মুখ গোপনে জরিপ করতে লাগল।

হরিপদ এই সময় মনে করাল, বাবু বাজারে যেতে হবে না?

বলাইবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, চুপ ব্যাটা বেরসিক।

কৃষ্ণা বলল, আচ্ছা, আপনি যে কোন লোকের পোর্ট্রেট আঁকতে পারেন? ধরুন তিনি হয়ত মহাপুরুষ না—

—কেন পারব না? এটাই তো আমার কাজ। —যুবকটি আড় চোখে ঘড়ির দিকে তাকাল : আমি বেকার। ছবি এঁকেই আমার চলে।

—রেট?

—রেট একই, ওই পঞ্চাশ টাকা। মহাপুরুষ আর কমনম্যান—আঁকার সময় দুজনেই আমার কাছে সমান। —যুবকটি আবার ঘড়ি দেখল : দেখুন, দু মিনিট সাতাশ সেকেন্ড হয়ে গেছে।

বলাইবাবু লুফে নিলেন, আর একটু সময় দিলে হয় না? সেকেন্ড ফেকেন্ড বুঝি না ভাই, এই ধর পাঁচ কি দশ মিনিট—

আবেদন মঞ্জুরের ভঙ্গীতে যুবকটি সামনের কয়েকটি দাঁত বের করল মাত্র।

কৃষ্ণা এবার বাবার দিকে তাকাল, বলাইবাবু বৌমার দিকে। কৃষ্ণা কি বলবে বলাইবাবু আঁচ করতে পেরেছেন। কৃষ্ণা বাবার চোখের মধ্যে পুরো সমর্থন এবং আনন্দ দেখতে পেল। বলল, আপনি আমার মার একটা ছবি এঁকে দিতে পারবেন?

বলাইবাবু বললেন, আমার স্ত্রী। তেইশ বছর সাত মাস বয়সে মারা গেছে। আমার তখন তিরিশ। আমিই তিন ছেলেকে মানুষ—

থামিয়ে দিয়ে যুবকটি বলল, পারব। তাঁর কোন ফটো আছে?

পানু, কৃষ্ণা, বলাইবাবুর মধ্যে চোখাচোখি হল। পানু বলল, মুশকিল হচ্ছে, মার কোন ফটোই নেই।

কৃষ্ণা বলল, এর জন্যে বাবাই দায়ী। সেকালে নাকি ফটো তোলার চল ছিল না। বুঝলেন, আমিই এ বাড়ি এসে জোর করে বাবার ফটো তুলেছি।

—সেকালে ফটো তোলার চল ছিল না, একথা বলবেন না। যুবকটি হাসল : বিদ্যাসাগর তো আরও অনেক আগের। ফটো ছিল কি করে? আর সেজন্যই আজকে এই পোর্ট্রেটটা আঁকতে পেরেছি। ঠিক কি না?

বলাইবাবু অপরাধীর মুখ করে বললেন, যা হয়নি তা নিয়ে এখন বলে কি লাভ! আচ্ছা ভাই, ওঁর মুখটা কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে। যদি বলি, সেটা শুনে আঁকতে পারবে না?

শিল্পী একটু ইতস্তত করে।

—দেখুন ফটো থাকলে সুবিধে হত।

পানু বলল, আপনি একজন বড় শিল্পী। এটা যদি পারেন তাহলে আমরা আমাদের মাকে দেখতে পাব।

—রাজি হয়ে যাও ভাই। বলাইবাবু গলা খাঁকারি দিলেন : মা যে কি বস্তু তা এঁরা জানল না। যদি কোন রকমে খাড়া করে দাও তো ডবল রেট।

একে বেকার, তায় ডবল রেট। শিল্পী তো এক গাল হেসে রাজি। বলাইবাবু চেয়ারটা কাছে টেনে তখুনি বর্ণনা করতে বসে গেলেন তিরিশ বছর আগে সরলার চেহারা। শিল্পী পেন্সিলের ডগা কামড়ে তাই শুনতে লাগল। কৃষ্ণা তখুনি হরিপদকে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। বাথরুমে ঢুকে পানু জীবনে প্রথম গান গাইবার চেষ্টা করল, মধুর আমার মায়ের হাসি—

ইতিমধ্যে বাড়িতে মৃদু একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। পানুর অফিসের তাড়া থাকায় কৃষ্ণা বলেছিল, হরিপদ [illegible] বানিয়ে তুমি না হয় আজ বাজারে যাও। তাতে হরিপদর

সাফ জবাব, আমি পারব না, আপনারা অন্য লোক দেখুন। কৃষ্ণারও অনেক দিন থেকেই সেই রকমই ইচ্ছে, কিন্তু ত্রিসীমানায় আর একজন হরিপদকে না দেখতে পেয়ে সামলে গেল।

এদিকে শিল্পীকে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে বলাইবাবু সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মনটা প্রফুল্ল। বললেন, যাকগে, তুমি পানুকে একটা ডিম-টিম ভেজে দাও, আমি চট করে বাজারটা ঘুরে আসছি।

আসলে এতখানি বয়সেও বলাইবাবু কাজ ছাড়া থাকতে পারেন না। রিটায়ার করে তাই বিশ্রামের কথা ভাবতেই চমকে উঠেছিলেন। অফিসে কোন দিন দশ মিনিটও লেট হয়নি। এখনো পুরো পরিশ্রম করতে পারেন। গল্প উপন্যাস পড়ার ধাত নেই। এই বয়সেও কোন গুরুর কাছে দীক্ষা নেননি। ফলে শরীরকে ফিট রাখতে দুধ, রেশন, বাজার করার দায়িত্ব সেধেই নিয়েছেন। তাতেই হরিপদর রাগ। মুশকিল হয়েছে, এসব করার পরেও হাতে প্রচুর সময় থাকে।

বাজারের পথে মন্মথবাবুর সঙ্গে দেখা। উনিও বছর কয়েক আগে রিটায়ার করেছেন। বললেন, বিকেলে আমাদের ক্লাবে ভর্তি হয়ে যান। সময়টা ভাল কাটবে।

বলাইবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ, ভাবছি ভর্তি হয়ে যাব—

—সপ্তাহে তিন দিন গীতা পাঠ। আহা, সে এক অপূর্ব জিনিস মশাই। —মন্মথবাবুর চোখ বুজে এল।

—নিশ্চই নিশ্চই!—বলাইবাবুর চোখও বুজল ঃ এসব দিকে এখন মন দিতে হবে বই কি!

বর্ষার পর আজকাল তরিতরকারি কম ওঠে। একটু বেলা হলে বাজারে কিছুই থাকে না। বলাইবাবু তবু ঘুরেফিরে দরদাম করে এক সময় থলে ভরিয়ে ফেললেন। কৃষ্ণা বলে দিয়েছিল, আসার সময় রিকসা করে আসবেন বাবা। বলাইবাবু হাসলেন! পদে পদে রিকসার দরকার যেন তাঁর কখনো না হয়। বাড়ি ফিরে রেশনের কথা মনে পড়ে গেল। বললেন, যাই রেশনটাও নিয়ে আসি—

—আজ রেশন দোকান বন্ধ। আপনি চুপ করে একটু বসুন তো—কৃষ্ণা আলতো করে ধমক দিল ঃ সারা জীবন তো কাজই করে গেলেন। এবার একটু বিশ্রাম নিন।

বকা খেয়ে বলাইবাবু খবরের কাগজখানা ফের খুলে ধরলেন। কিন্তু মন বসল না। বিগড়ে দিয়ে গেছে সেই ছিপছিপে আর্টিস্ট। সত্যিই কি আড়াই যুগ পরে তেইশ বছর সাত মাসের সরলাকে তুলে আনা যাবে? ছেলে বৌদের কাছে তাহলে কোন রকমে মুখ রক্ষা হয়৷ মনে পড়ে কৃষ্ণা এ-বাড়িতে পা দিয়ে প্রথম জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবা মার কোন ফটো নেই? সেজছেলে সানু কম কথা বলা স্বভাব: তবু বাবাকে কথা শোনাতে ছাড়েনি। বলেছে, আপনি খুব নিষ্ঠুর। মার মুখটা পর্যন্ত কল্পনা করার সুযোগ দেননি।

সব অভিযোগ মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া উপায় কি। ওরা মনে করে পাঁচটা বছর অনেক বেশি। কিন্তু বিবাহিত জীবনে এই সময়টা কিছুই না। দেখতে দেখতে উড়ে যায়। বলাইবাবু মনে করেন, সবার জীবনেই এমন কয়েকটা ভুল থাকে যা সংশোধনের অতীত। সেজন্যে সবার কাছেই কথা শুনতে হয়।

ভিতরে ভিতরে দুঃখ হয় বৈকি। তবে এখন একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে। সুভাষ বোস, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ তো ভালই এ'কেছে ছোকরা। তা সরলাকে কি ওই তুলি দিয়ে ফোটাতে পারবে না? রঙের দাম নাকি বেড়ে গেছে আজকাল। ঠিক আছে, আরো কিছু বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না হয়।

দিন কয়েক পরে বাইরের ঘরে হঠাৎ ঝগড়াঝাঁটি শুনে কৃষ্ণা ছুটে এল। দেখল, সেই শিল্পী একধারে দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে আর শ্বশুর মশাই সমানে বকাবকি করে চলেছেন।

—দেখেছ বৌমা, ওই নাকি তোমার মার ছবি! বলেছি বাঁ গালে তিল করেছে ডান গালে। তাছাড়া মুখ কিছুই হয়নি।

কৃষ্ণা ছবিটার দিকে তাকাল। সেকেলে টাইপের একটা গ্রাম্য মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শিল্পী বলতে গেল, দেখুন শুনে-টুনে ঠিকমত আঁকা যায় না। একটা অবলম্বন চা-ই-ই—

—খুন হয়েছে। এবার আসতে পার।
—আমার পরিশ্রম?

—হ্যাঁ বৃথা গেল। যেরকম আঁকার ছিরি তাতে সবকিছু বৃথাই যাবে। যত্তো সব—

বলাইবাবু ষাট পেরিয়েছেন। যদিও এখনো লাল পাড় শাড়ি, চুল, গায়ের রং আর বাঁ গালে তিলের কথা স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু সে আর কয় দিন। বয়সের চাপে প্রতিদিনই স্মৃতি ক্ষয় হচ্ছে। ভয় হয় কতদিন আর সরলাকে অবিকল বইতে পারবেন? ছেলেরা তো অ-আ-ক-খ শিখেই বাবাকে একদিন নিষ্ঠুর বলেছিল। বৌরা বলে, আপনি একটা—। কথাটা শেষ করে না নেহাৎ ভদ্র বলে। তা ভেবেছিলেন এবার বুঝি একটা ছিল্লে হবে। কিন্তু যে না আর্টিস্ট, ছাইভস্ম এঁকে এনেছে। দেখলে গা জ্বলে যায়।

বিকেল না হতেই পিঙ্কা ঘরে ঢুকে উপোস্ত শুরু করে দিয়েছিল জোরসে। এই সময় ওকে নিয়ে একটু বাইরে যেতেই হবে। বলাইবাবু [illegible], দাঁড়াও বাপু কাপড়টা আগে [illegible] এই সময় গ্রিল দেওয়া জানালায় [illegible] মুখ দেখা গেল।

—আবার কি [illegible] বলাইবাবু বিরক্ত হলেন।

—স্যার একটা কথা ছিল।—বলেই শিল্পী পয়লা দিনের কায়দায় সটান ঘরের মধ্যে। কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন ফিসফিস করল। বলাইবাবু তবু সন্দেহের সুরে বললেন, হবে বলছ?

নিশ্চয়ই স্যার। কিন্তু এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।

ব্যাপার দেখে পিঙ্কা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। হাতে সদ্য পাওয়া একটা লজেন্স। কৃষ্ণা বলতে গেল, বাবা চা খাবেন না? কিন্তু ততক্ষণে গলির মোড়ে দুজন অদৃশ্য।

রেল লাইন পেরিয়ে পঞ্চাননতলার বস্তির ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে মাত্র পনের মিনিটের মধ্যেই গড়িয়াহাটার মোড়ে আসা যায়। বিকেলের রং সবে গাঢ় হতে শুরু করেছে। রাস্তার আলোগুলি তখনো সব জ্বলে ওঠেনি। বলাইবাবুকে পছন্দসই একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে শিল্পী বলল, এখানে প্রতি মিনিটে একশোটা মেয়ে পাশ করে স্যার। একজন না একজনের সঙ্গে সরলা দেবীর মিল হবেই। আপনি শুধু দেখিয়ে দেবেন স্যার। ব্যস—

প্রস্তাবে যদিও বা একটু সন্দেহ ছিল, কিন্তু বাস্তবে সত্যি সত্যি এত মেয়েকে একসঙ্গে নদীর মত কলকল করে বয়ে যেতে দেখে বলাইবাবুর ভিতরটা আবার মোচড় দিল আশার আনন্দে। তারিফ করলেন শিল্পীর বুদ্ধিকে।

শিল্পী হাসল।

—একে বেকার, তার ওপর আপনি রেট বাড়িয়ে করেছেন দুশো টাকা। বুদ্ধি তো স্যার আপনি খেলবেই।

হো-হো হাসি। একজন ভুলল বেকারী যন্ত্রণা, অন্যজন বিলীয়মান স্মৃতির রেখা।

একটু পরে বলাইবাবু উসখুশ করলেন। ছায়াছিরি করা বিকেলে গলার স্বরে যেন আবেগ খেলে গেল, ওহে শিল্পী, আমার সরলাকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

—স্যার একেবারে ঠিক ঠিক কি হয়? মুখের খানিকটা আদল আছে এমন মেয়ে হলেও আমার চলবে। ওই যে স্যার তিনটে মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে—কুইক—

বলাইবাবু ঘাড় ফেরালেন, উঁহু।

—এদিকে তাকান স্যার, মেয়েটা দোকান থেকে বের হচ্ছে—।

—আরে না না, অত ফরসা সরলা ছিল না।

মোটামুটি সরলার সঙ্গে মিল আছে এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বলাইবাবু ঘড়ি দেখলেন। তা প্রায় ঘন্টা দেড়েক হয়ে গেল। তিরিশ বছরে মেয়েদের মুখের চেহারা পাল্টে যায় [illegible] তা [illegible] না গেলেও

লাইবাবুর ভালই লাগছে। কত রকমের মেয়ে। রঙীন নদীর মত যেন ঢল নেমেছে! পাঁচ ফোড়ং থেকে শাড়ি-গয়না—সবই মেয়েরা এখন কেনাকাটা করছে তো! তাঁদের সময়ে কন্তু রাস্তায় এত মেয়ে দেখা যায়নি।

—ওহে শিল্পী, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা যে ব্যথা হয়ে গেল। তা কত মেয়ে দেখলাম বল তো?

—প্রায় হাজার দুয়েক তো বটেই।

—অনেক হয়েছে। এবার বাড়ি চল। কাল না হয় আসা যাবে।

—তাই চলুন স্যার।—সরলা দেবীকে না পেয়ে শিল্পী ভিতরে ভিতরে একটু মুসড়ে পড়েছিল। কালের কথায় আবার চাঙ্গা হল।

বলাইবাবু বললেন, একটু চা খেয়ে নিলে হত না! ঘাড়ও ব্যথা হয়েছে।

—হ্যাঁ স্যার।—শিল্পীর সব দাঁত বেরিয়ে পড়ল : আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম।

গোল পার্কের কাছে একটা চায়ের দোকান দেখে বলাইবাবু ঢুকে পড়লেন। পেছনে শিল্পী।

—ওহে, তোমার খিদে লাগেনি? নাকি শিল্পীদের ওসব বালাই নেই!

এটাও চাঙ্গা হবার মত একটা কথা। শিল্পী বুঝে গেছে, বুড়োর মেজাজ ক্ষণে-ক্ষণে পাল্টায়। এখন মেজাজ শরিফ থাকতে থাকতে কাজটা হাসিল করতে পারলে হয়। খিদে-টিদের কথা বলে আর ঝামেলা বাধাতে চায়নি। বুড়োর নির্দেশে চা এল, সঙ্গে টেবিল আলো করে গরম গরম মোগলাই পরোটা। খেতে খেতে বলাইবাবু বললেন, ওহে শিল্পী, কাল একটু সকাল সকাল আসবে।

বলাইবাবুর উৎসাহ উদ্দীপনা আজ ঠিক একটি তাজা তরুণের মত। আর সরলাও যেন তিরিশ বছরের এক অন্ধকার নদী উজিয়ে প্রায় এপারে চলে এসেছে। যেন হাত বাড়ালেই ধরা যায়—এমনি অবস্থা। ইতিমধ্যে রেট আরও বেড়ে গেছে। শিল্পীও রেডি হয়েই আছে। একবার হদিশ পেলেই হয়। শ্যামা মেয়ের ছবি আঁকার সব রং-ই আছে। তবে সিনেমার গ্রীণ বা কাঁচ কলা-পাতার রংটা নেই। সেটা আজই কিনে ফেলতে হবে। বলা যায় না, আজই হয়ত সরলা দেবী উঁকি দিয়ে বসল।

একদল কুড়ি বাইশ বছরের কলেজের মেয়ে হৈ-হল্লা করতে করতে আসছে। প্রত্যেকের হাতে বইখাতা। শিল্পী গোপনে বলাইবাবুর হাতে চিমটি দিল। বলাইবাবু বলে উঠলেন, উহু, রাবিশ।

একটু পরে শিল্পী ফের ফিসফিস করল, ওদিকে একটু তাকান স্যার, শ্যামা মেয়ে—

—দেখেছি দেখেছি!—শ্যামা মেয়ে সরলা না হওয়ায় বলাইবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন।

এরপর অনেকক্ষণ দুজনের কথা বন্ধ। ঘাড় আর চোখের কসরত বেড়ে গেল শুধু। সেই সঙ্গে বাড়ল শিল্পীর খিদে আর বলাইবাবুর বিরক্তি। এত মেয়ে বলাইবাবু লাইফে একসঙ্গে দেখেননি। ঘন্টা দুয়েক হতে চলল. তবু সরলার দেখা নেই। বলাই-বাবু রাস্তা পার হওয়া একটি মেয়ে দেখ-ছিলেন, এমন সময় শিল্পী বলে উঠল, দেখুন দেখুন।—পেছনটা দেখে হঠাৎ মনে হল যেন সরলা হেঁটে যাচ্ছে। বলাইবাবু দ্রুত খানিকটা এগিয়ে মুখ দেখে হতাশা আর চেপে রাখতে পারলেন না, হুঃ, সরলা এত কুৎসিত ছিল না—

আচমকা এক বৃদ্ধের মুখে 'কুৎসিত' শুনে মেয়েটি সাপের মত ফুঁসে ঘুরে দাঁড়াল, তার মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি?

ঠিক সেই সময়ে যেন মাটি ফুঁড়ে চার-পাঁচটি ছেলে উঠে এল। তাদের বিশাল জুলফি, বব করা চুল, পরিধানে বেলবটস। একজন এগিয়ে গেল, বলি ব্যাপারটা কি? দু' দিন ধরে দেখছি চোখ দিয়ে যেন মেয়ে-দের গিলে খাওয়া হচ্ছে। বুড়ো বয়সেও এত রস।

আর একজন বলাইবাবুর থুতনিতে আলতো হাত রাখল, আমার দিদিমার সাথেই হয়ে যাক। দারুণ মানাবে। আহা, যেন রাজজোটক!

শিল্পী দেখল, মক্কেলের মহা বিপদ! এরকম উটকো ঝামেলা অলক্ষ্যে পাকিয়ে উঠতে পারে, তা আগে একদম আঁচ করা যায়নি। বলতে গেল, দেখুন উনি একজন মানী লোক। ওভাবে বিচার—

—আপনাকে সাফাই গাইতে হবে না—গালে পাউডার মাখা এক তরুণ ধমকে উঠল : মেয়ে দেখতে হয় নিজে দেখুন, আপনার এটা মেয়ে দেখারই বয়েস। কিন্তু তাই বলে পার্ভার্টেড একটা বুড়োকে জুটিয়ে আনবেন? সেম সেম—

অন্ধকার লেকের পার। একটা বেঞ্চের ওপর মাথায় হাত দিয়ে বলাইবাবু বসে। কিছু আগে গড়িয়াহাটার মোড়ে তাঁর যাবতীয় মান-সম্মান গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। ক'দিনের পরিশ্রম বৃথা যেতে দেখে হতাশায় ক্লান্তিতে শিল্পীরও কান্না পাচ্ছিল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পরে মনে হল, রোজ রোজ এক জায়গায় গিয়ে মেয়ে দেখাই ভুল হয়েছে। এতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। তাই খুব অন্তরঙ্গ হয়ে শিল্পী বলল, স্যার শ্যাম-বাজারে গেলে হয় না? ওদিকে একটু পুরোনো ধরনের মেয়েরা থাকে—।

—বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও রাস্কেল—বলাইবাবু ক্ষেপে উঠলেন : ইয়ার্কি মারার জায়গা পাও না? জীবনে আমি কখনো হ্যাংলার মত মেয়ে দেখে বেড়াই নি। তবু এই অপমান আজ পোহাতে হল!

—স্যার, আমাকে ভুল বুঝবেন না!

—যদি পানু কিম্বা বৌমা ওই সময় পাশ করত? কি ভাবত তাহলে, বাবা রাস্তায় এইসব করে বেড়াচ্ছে। ছি! ছি!

—স্যার—

—চুপ কর ইডিয়েট! দোহাই, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।

গলার স্বরটা হঠাৎ ভারী হয়ে যাওয়ায় শিল্পী হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, স্যার চলি।

চোখ দুটো বারবার ভিজে যাচ্ছে। সব-কিছু ঝাপসা লাগছে এখন। দিন কয়েকের জন্যে [illegible] এসেছিল সরলা। আবার নদীর ওপারে [illegible] দূরের দেশে চলে গেছে। [illegible] চুল ভেসে বেড়াচ্ছে। কি [illegible] চুলের রং। বলাইবাবু [illegible] পারছেন না তিলটা কোন [illegible] গালে, [illegible] না ডান গালে?

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

তার যা স্বপ্ন সে সবটাই যৌবনোজ্জ্বল ভবিষ্যতের নয়, কিছু ব্যক্তিগত এবং অন্যের ধারণাতীত অনন্য স্বপ্নের কথাও আছে তার মধ্যে, সে কথা কাউকে বলা যায় না। এটুকু এতদিনে তার মাথায় গেছে যে এসব কথা কেউ বুঝবে না, তাকেই পাগল ভাববে। তবু সেও কিছু বলে। কখনও বলে সে ছবি আঁকবে, রাফায়েল, মিখায়েলেঞ্জেলো টিসিয়ান হবে কিম্বা অবনী ঠাকুর নন্দলাল বোস (এসব নাম বিশেষ বিদেশী নামগুলো তার কোন সহপাঠীই জানে না এক মদন আর প্রসাদ ছাড়া, ভাবে সে বানিয়ে বানিয়ে কতকগুলো নাম আউড়ে যাচ্ছে তাদের বোকা বানানোর জন্যে হবে, কখনও বলে সে নাটক লিখবে—শেকস্‌পীয়ার ইবসেন না হতে পারুক—গিরিশ ঘোষ ডি এল রায়কে অবশ্যই ছাড়িয়ে যাবে। কখনও বা বাবুর কাছে বলে সে গল্প উপন্যাসই লিখবে, তাতে প্রতিষ্ঠা বেশী, অনেক লোক নাম জানবে। সে যখন কলম ধরবে তখন বঙ্কিম শরতের নাম ম্লান হয়ে যাবে। আর সেই তো সাধনা, গুরুকে ছাপিয়ে গেলেই গুরুর সম্মান বাড়ে। তার নাম করবে লোকে টলস্টয়, ভিক্তর হুগো, ডিকেন্স-এর সঙ্গে। আবার আপনমনে ভাববার মতো করে বলে এক এক সময়—'খবরের কাগজের সম্পাদক হওয়াও মন্দ নয়। সেও ভাবছি।'

এইসব—জীবনের বহিরঙ্গ আশার কথা বলে, কিন্তু মন ভরে না। অথচ তার যে গোপন কথা—ভালবাসার আর ভালবাসা পাবার—সে-কথা এদের কারও কাছে বলা যায় না।

ললিত অত শত্রর ধার ধারে না। এসব নামের অধিকাংশই সে শোনেনি— নয়তো এক-আধবার হয়ত কারও মুখে কথাপ্রসঙ্গে উচ্চারিত মাত্র হতে শুনেছে। সে নামের কোন মূল্য বা মহিমা জানে না, জানার চেষ্টাও করেনি। যা জানে না, যার সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, আশা বা কল্পনা তার কাছে পৌঁছবে কেন?

সে ম্যাট্রিক পাশ করে সায়ান্স নেবে অবশ্যই। অংকে খুব স্ট্রং সে, বাবা বলেন, আই এস-সি পাশ করলেই মেডিকাল কলেজে ভর্তি করিয়ে দেবেন, ডাক্তারী পড়াবেন। কিন্তু বাবার যা আয়, আর যা শরীরের অবস্থা—দাদাকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ানোই হয়ত অসম্ভব হয়ে পড়বে। কজেই ওসব কিছু হবে-টবে না। ওদের মা তাঁর নিজের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, বাবাকে দিয়ে জোর করে একটা মোটা টাকার ইন্সিওর করিয়েছেন—আট কি দশ হাজার, কত তা ললিত জানে না—সেটা নিজের নামে নমিনি করিয়ে নিয়েছেন, এটা জানে সে। তার প্রিমিয়াম টেনে আর কত খরচ চালাবেন বাবা?

না, সে উঠে-পড়ে লেগে চাকরির চেষ্টা দেখবে কলেজে পড়তে পড়তেই। শুনছে আশুতোষ কলেজে আই এস সি-র ছাত্রদের মধ্যে থেকে একটা পরীক্ষা দিইয়ে বেছে নিয়ে কিছু ছাত্রদের টেলিগ্রাফ বিভাগে নেওয়া হয়, আই এস-সি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিগ্রাফ শেখাও চলতে থাকে। পাশ করলেই চাকরি বাঁধা। ভাল মাইনে, একেবারে ষাট টাকা থেকে শুরু।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর থেকেই বাবাকে জপাবে সে। এটা যদি হয়, ডাক্তারী পড়ার ছ' বছরের ফাঁদে পা দেবে না। অত দিন যদি বাবা না বাঁচেন কিংবা এতগুলো ছেলেমেয়ের লেখাপড়া চালিয়ে ডাক্তারীর খরচা টানতে না পারেন? এ-কূল ও-কূল দু কূল যাবে না কি? কি দরকার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে গিয়ে। ডাক্তারী পাশ করলেই যে পসার হবে তারই বা কি মানে? কত ডাক্তার তো মুখ শুকিয়ে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই সব কথাই তার বেশির ভাগ।

সংসারের শখও খুব বেশি। নতুন মার সঙ্গে এক সংসারে থাকবে না সে। এ-বাড়ির প্রায় অস্তিত্বহীন একটুকরো অংশে তার লোভ নেই। সে বরং চেষ্টা করবে কিছু টাকা জমিয়ে নিজে একটু ছোট্ট জমি কিনে বাড়ি করতে। দাদাও ততদিনে রোজগার করতে শুরু করবে নিশ্চয়। যদি দাদা তার সঙ্গে থাকতে চায়—দুজনের চেষ্টায় বাড়ি করতে কোন অসুবিধাই হবে না। দু ভাই একত্রে সংসার পাতবে। দাদার পাত্রী সে দেখে পছন্দ করবে। ভাল মেয়ে আনতে হবে, নইলে পরে না সংসার ভেঙে যায়।

নিজের কথাও বলে ললিত।

আর বিপদের কথা।

সে নিজে দেখেশুনে এভাবে হিসেব কি বিচার-বিবেচনা করে বাড়ি করতে পারবে কিনা সন্দেহ। মেয়েরা তার মধ্যে যে কি দেখে কে জানে। এখন থেকেই কত মেয়ে যে তার পেছনে লেগেছে। বিশেষ একটি বিবাহিতা মেয়ে—ওর চেয়ে বয়সে এক-আধ বছরের বড়ই হবে হয়ত কিম্বা একবয়সী—বিয়ের পরও ওর জন্যে পাগল। থেকে থেকেই নানা ছুতোয় বাপের বাড়ি আসে—শুধু ওকে দেখবে বলে।

শুধুই কি দেখা! সে যাক গে। এ-ধরনের প্রেম যত খুশি করা যায়—বিয়ে করতে হয় সাবধানে, দেখেশুনে। বাজে মেয়ে আনা উচিত নয়। ঘর-সংসার করবে, দাদা-বৌদির সঙ্গে বানিয়ে চলতে পারবে এমনি মেয়েই ললিতের কম।

এসব শুনতে শুনতে এক-একদিন একটা তীব্র হতাশা বোধ করে বিনু।

ললিত, তার ললিত কেন এত সাধারণ হবে!

এত ছোট আশা, এত ছোট মাপের ভবিষ্যৎ চিন্তা কেন হবে তার! ঐসব বাজে ছেলেদের মতো এই বয়সেই মেয়েছেলে প্রেম বিয়ে—এসব কথা কেন ভাববে!

তবু হাল ছাড়ে না বিনু। সেকেণ্ড ক্লাশে উঠেই প্রস্তাব করে—তারা তাদের ক্লাশ থেকে একটা হাতে-লেখা মাসিক বার করবে।

এটা উপলক্ষ—লক্ষ্য ছিল ললিতকে এই দিকে টানা। ছবি আঁকা, লেখার নেশা ধরানো। কবিতা লেখা, গল্প লেখার নেশা ধরে গেলে সাহিত্যের বই পড়ার দিকেও ঝোঁক আসবে।

প্রথমটা সবাই উড়িয়ে দিল। এসব ব্যাপারের মধ্যে নেই তারা। মাসিক পত্র, তাও আবার হাতে লেখা। কে পড়বেই বা। ঐ তো একটা কপি হবে, এক-একজন করে পড়তে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখবে, কাগজের বারোটা বেজে যাবে।

তাছাড়া এত ছিষ্টি করবেই বা কে! ঐ ফার্স্ট ক্লাশের মণীদার ঘাড়ে এমনি ভূত চেপেছিল গত বছর এই সেকেণ্ড ক্লাশে উঠেই—ঋদ্ধি না কি এক ঘোড়ার ডিম নাম, নামে তো মাসিক, এক-একটা সংখ্যা বার করতে চার-পাঁচ মাস কেটে যায়। সোজা ব্যাপার নাকি? লেখা যোগাড় করা, সাজানো, ছবি আঁকা—সবচেয়ে শক্ত কাজ কপি করানো। হাতের লেখা মুক্তোর মতো হওয়া চাই, এমন হয়ত ক্লাশে একজনেরই আছে—তার নিজের কাজ সেরে তবে তো বেগার দেবে!

তাছাড়া, তার যদি এ-কাজ ভাল না লাগে—এদিকে ঝোঁক বা ঝোঁক না থাকে—

সে আরও গাড়িমসি করবে। না না, ওসব পাগলামি ছেড়ে দে বিকি, এর পেছনে যে সময়টা নষ্ট করব, সে-সময়টা কারো পিটলে কি গজালি মারলে কাজ দেবে।

বন্ধুরা—না, এদের বন্ধু বলাবে না কিন্তু—সহপাঠীরা সব পরামর্শ দেয়।

বিনুরও জেদ চেপে যায়। সে করবেই। একটা কথা সম্প্রতি শিখেছে—'মন্ত্রের সাধন। কিম্বা শরীর পতন ছবির দোকানে কাঁধে আঁটা লেখাটা লোকে নাকি এগুলো নিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখে। সে অনেকেই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল। মদন প্রসাদ আসিত, এদের বিশেষ করে। কেউই ঘাড় পাড়ল না। শেষে সুনীল বলে একটি ছেলে রাজী হল ওকে সাহায্য করতে।

সুনীলের বয়স একটু বেশী। ছেলেবেলায় বহু দিন রোগে ভুগে তিনবার বছর নষ্ট হয়েছে তার। বোধহয় সেই জন্যেই সে বড় একটা কারও সঙ্গে সহজে মিশতে পারে না—আড্ডা ইয়ার্কি হয়ত সকলে বোধহয়। অল্প কথা বলে। পড়াশুনোয় শক্তি কম—সেও বোধহয় অস্বাস্থ্যের জন্যেই, তাছাড়া গরিবের ছেলে, অপুষ্টিও একটা কারণ হতে পারে—তবে মন আছে। সেই জন্যে মাষ্টার মশাইরা সবাই তাকে ভালবাসেন।

এই সুনীলই লাইব্রেরীর ব্যাপারে বিনুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। একমাত্র সে-ই। তাও স্বেচ্ছায় নিজে থেকেই এসে বলেছিল, 'যদি আমাকে দিয়ে কাজ চলে, আমি রাজী আছি।'

আর বস্তুত সে-ই সময়ের বেশী কাজ করেছে। কাজটা ঠিক কি কি করতে হবে তা বিনুর মুখ থেকেই শুনেছিল কিন্তু বুঝে নিয়েছিল বিনুর অনেক আগে। নিঃশব্দে খাটত বলে কাজও দ্রুত করতে পারত সে।

এবার বিনুই গিয়ে কথাটা পাড়ল তার কাছে।

সুনীল একটু হাসল। ভারি মিষ্টি হাসে সে, ওর গলাও খুব মিষ্টি। গান-বাজনা কিছু শেখার সুযোগ হয়নি, কিন্তু গানে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে। অপরের মুখে একবার শুনেই তুলে নিতে পারে, আর পরে সে যখন গায় মনে হয় যার কাছ থেকে সুরটা তুলেছে তার চেয়ে অনেক ভাল গাইছে।

সুনীল বলল, 'তুমি যখন ওদের বলছ, তখনই আমি মনে মনে ঠিক করেছি, আগেই এগিয়ে যাবো তোমাকে সাহায্য করতে। ওরা যে কেউ রাজী হবে না সে আমি জানতুম। আর তুমিও তো তেমনি গেল এক বছর ওদের সঙ্গে মিশলে, এখনও লোক চিনলে না।'

লোক হয়ত চিনেছে বিনু কিন্তু চিনলে যে তার চলবে না। তবে সে কথাটা সুনীলকে বলা যায় না। সে হয়ত ঠিক বুঝবে না হয়ত ভুল বুঝবে। সে একটু অন্য ধরনের ছেলে। সে খুব বই পড়ে, তবে তা নাটক নভেল নয়, বেশির ভাগই হয় ধর্ম-গ্রন্থ, নয় প্রবন্ধের বই। কথা কয় সকলের সঙ্গেই, মিষ্টি ভদ্র ব্যবহার, কিন্তু কারও সঙ্গেই গলাগলি নেই। কারও কাছেই নিজের মন খোলে না।

ওর কথা বিনু ভেবে দেখেছে বৈকি। ভাল লাগে, বিশেষ লাইব্রেরীর ঘটনার পর থেকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। শ্রদ্ধা ও প্রীতি দুই-ই আছে সুনীলের প্রতি। তবে ওকে অন্তরঙ্গ বন্ধু, একমাত্র বন্ধু হিসেবে ভাবা যায় না। যাবে না কোন দিনই।' ওর মধ্যে কোথায় একটা দূরত্ব আছে, কিম্বা অন্য মানসস্তরের লোক সে—সেজন্যে চরিত্রগত একটা তফাৎ সত্ত্বেও মনে মনে ললিতকেই তার সেই একমাত্র বন্ধু, একমাত্র আপনজন বলে ভাবতে ভাল লাগে তার, সুনীল সম্বন্ধে সে ঈর্ষা বোধ করে না কোনদিন।

সুনীল এল সামান্য সহকারী হিসেবে নয়, অনেক দিক থেকেই কাজটা সহজ ও চালু করে দিল সে।

প্রথমেই সে মাষ্টার মশাইদের জানাল কথাটা। তাঁদের কাছে লেখা চাইল। তাঁদের পরামর্শ ও সাহায্য চাইল। এর আশ্চর্য সুফল ফলল।

মাস্টারমশাইরা বিশেষ বিভূতিবাবু আর হেডপণ্ডিতমশাই খুব উৎসাহ দিলেন, নিজেরাও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বিভূতি-বাবু হেডমাষ্টার মশাইকে বলে ব্যবস্থা করলেন, এরা কাগজ ভাঁজ করে আলাদা আলাদা সীট লিখবে, মানে লেখাগুলো কপি করবে, শেষ হলে ওঁরা দপ্তরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে দেবেন, সে খরচ ইস্কুলই দেবে। হেডপণ্ডিতমশাই কথা দিলেন তিনি ছেলে-দের সব লেখা পড়ে মেজে ঘষে দেবেন।

এতটা এগিয়ে যেতে দু একজন বন্ধু লেখা দিতে চাইল। দিলও দু-তিনজন। কবিতাই বেশির ভাগ। তারা কেউই লিখতে জানে না লেখেনিও এর আগে। তেমন বই পড়াও নেই পাঠ্যপুস্তক—ছন্দ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, বক্তব্যও স্পষ্ট নয়। কিন্তু হেড পণ্ডিতমশাই ধৈর্য ধরে সব-গুলোই মেজেঘষে একরকম চলনসই করে দিলেন।

অগত্যা বিনুকেই পাতা ভরাবার দায়িত্ব নিতে হল। নামে বেনামে লিখবে সে। কাশীর সেই অসমাপ্ত উপন্যাস ওখানের অপ্রকাশিত মাসিকপত্রের প্রথম সংখ্যায় যেটা শুরু করেছিল সেটার কথা ভোলেনি। ওর আজও বিশ্বাস সেটা লিখলে ভাল গল্প হত। তাই সেই স্মৃতিটাই ঝালিয়ে আবারও নতুন করে সেই প্রথম পরিচ্ছেদ লিখল। সেই সঙ্গে কোনান ডইলের একটা গল্পও অনুবাদ করে ফেলল। সেটা দেখে দিলেন বিভূতিবাবু। গল্পটা তাঁর পড়া, প্রিয় গল্পও। ভুলত্রুটি কিছু ছিল তিনি সেগুলো শুধরে দিলেন।

কিন্তু আসলে যার জন্যে এত আয়োজন তার—সে কৈ?

ললিতকে কিছুতেই যেন তাতানো যায় না। আগেই হার মেনে বসে আছে সে। কথা পাড়লেই বলে। আমার দ্বারা ওসব হবে টবে না। আমাকে বাদ দাও। কবিতা লেখা মিল দিয়ে—কিম্বা বানিয়ে বানিয়ে গল্প লেখা—আমার মাথায় ও আসে না।'

অনেক ভেবেচিন্তে বিনু অন্য পথ ধরল।

ললিতের হাতের লেখা ভাল সেই দিক দিয়েই তাকে চেপে ধরল, তবে তাহলে এগুলো বেশ ভাল করে সাজিয়ে—যেমন ছাপার বইতে থাকে প্যারা দিয়ে দিয়ে—ভাল করে কপি করে দাও এটা তো পারবে।

সে নিজে প্রতি পৃষ্ঠার চারিদিকে মাপ-মতো লতাপাতা আঁকা বর্ডার দিয়ে ছেড়ে দেয়, তার মধ্যে লেখার জায়গাটার পেনসিলে হাল্কা রুল টেনে দিয়ে—যাতে লেখার পর ইরেজার দিয়ে ঘষে দিলেই পেন্সিলের দাগ উঠে যেতে পারে, অথচ লিপিকারের লাইন বেঁকে যাবার ভয় থাকে না।

ফলে দুজনের খানিকটা সময় একসঙ্গে কাটাবার সুযোগ মেলে। ঠিক হয় ছুটির দিনে দুপুরবেলা খানিকটা করে সময় এই কাজটা করে দেবে ললিত। জায়গাও পাওয়া যায় একটা, ললিতই ঠিক করে, ওদের বাড়ির কাছে সুরেনবাবুর বাড়ির বাইরের দিকে একটা ছোট ঘর পাওয়া যায়।

মা আপত্তি করেছিলেন, 'ঘরে একটা লোক নেই, নিত্য ছুটির দিনে একটু বাড়ি থাকবে তা নয়, আড্ডার ছুতো খুঁজে খুঁজে বার করা। কিন্তু রাজেনের প্রতিবাদে চুপ করে যেতে হয়। রাজেনের উপার্জনেই সংসার চলছে আজকাল বলতে গেলে, দুটো টিউশানী করছে সে পড়া চালিয়েই। কনক ব্যবসারে নেমেছে, মাসে সত্তর টাকা আদায় করতে তিন দিনহাঁটতে হয়। তাও দু কিস্তি ধরেছে আজকাল। ফলে সব মাসে পুরো টাকা আদায়ও হয় না।

রাজেন বলে, দুপুরে তো আমি থাকি ছুটির দিনে, ও একটু থাক না। না খেলা, না ধুলো—ঐভাবে বিধবা মেয়ের মতো ওকে ঘরে বসিয়ে রেখে রেখে ওর শরীরটা ভেঙে যেতে বসেছে। একটু বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিশতে না দিলে জন্তু হয়ে যাবে যে।

তুমি দুপুরে বাড়ি থাকো ছুটির দিনে ঠিকই, কিন্তু তোমাকে দিয়ে ঘরের কাজ কিছু হয় না—এ-কথাটা মা লজ্জায় বলতে পারেন না আর।

সেটা বিনু বোঝে, কিন্তু বুঝতে গেলে তার চলে না।

এই দু ঘণ্টা-তিন ঘণ্টা পাশাপাশি কাছাকাছি থাকা, এইটেই তো পরম লাভ ওর কাছে।

তবে এ লাভটুকুও নিরঙ্কুশ হয় না। সুরেনবাবুর বাড়ি ছেলেমেয়ে অনেক-গুলি—ভাইপো-ভাগনে নিয়ে—তারা একটু ফুর্তিবাজ ধরনের। নিজেদের মধ্যেই হৈচৈ

ঠাট্টা-ইয়ার্কি চালায়, অভিভাবকরাও তাতে বাধা দেন না। তারা ওদের কলেজের সময় প্রায়ই এসে বলে—হৈ-চৈ করে, ইয়ার্কি করে গান গায়। বিনুর রাগ ধরে কিন্তু কিছু বলতে পারে না। তাদের বাড়ি, মুখের ওপর বলা চলে না। ললিতেরও তাদের ঐ বাজে ফ্যাংড়ামিতে ঝোঁক বেশি, সে আনন্দ পায়।

এ এক যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি—অথচ উপায়ও কিছু খুঁজে পায় না।

তবু কাজ এগোয়। বিনু লেখাগুলো ধরে ধরে পড়ে যায়, কোথায় কমা, কোথায় দাঁড়ি সঙ্গে সঙ্গে বলে যায়—ললিত লেখে। বিনুর মাথায় যায় প্রতিটি লেখার শিরোনামা যে হেডিং-এ কারুকার্য করতে হবে, ছাপা পত্রিকায় নাকি এমন থাকে, একেই নাকি হেড পীস বলে। তার জন্যে বড় তুলিও যোগাড় হয় চাঁদা করে। বিনুই আঁকতে বসে। হঠাৎ ললিত বলে, দেখি আমি একটা আঁকতে পারি কিনা।

দু একবার ইরেজার—ওর ভাষায় রবার্ট দিয়ে মোছার পর শেষ পর্যন্ত সত্যিই একটা ফুলের ডাল এঁকে ফেলল ললিত। যত্ন করে তাতে রঙ করল বিনু। ফুলটা জীবন্ত হয়ে উঠল যেন।

এতদিনে এত অনুরোধ-উপরোধে যা হয়নি, এই সাফল্যে তাই হল। নেশা লাগল ললিতের। সে এবার থেকে সব হেড পীসই আঁকবে। অতি কষ্টে তাকে নিবৃত্ত করে বিনু। এতগুলো হেড পীস আঁকতে গেলে—আনাড়ির হাতে—অনেক সময় লাগবে, কপি করা হয়ে উঠবে না। সে অন্য দিকে নেশা ধরাতে চায়, বলে, সবই পারো তুমি ইচ্ছে করলে, একটা কিছু লেখার চেষ্টা করো না, দেখবে এমন কিছু শক্ত নয়। সত্যি এত খেটে লিখছ, তোমার একটা নাম থাকবে না?

অনেক বলতে বলতে একটা কবিতা লেখে ললিত। ছন্দ মেলে না, মিলে গরমিল—বিনুই যত্ন করে সেগুলোয় তাপ্পি লাগায়, নিজে দু-একটা লাইন যোগ করে, কবিত্ব তারও বিশেষ আসে না, তবু এক রকম দাঁড়ায়।

কাগজ লেখা শেষ হলে বিভূতিবাবু দপ্তরীকে বলে ভাল করে চামড়া দিয়ে বাঁধিয়ে দেন। কাগজের নাম দিয়েছিল সেই পুরনো নাম—হিমালয়। প্রথমেই দিল হেড পণ্ডিতমশাইকে দেখতে। তিনি একটা লীজার পিরিয়ডে উল্টে দেখে কিছু কিছু পড়ে ছুটির সময় এসে ফেরৎ দিলেন। সুনীল বিনুকে খুব বাহবা দিলেন তাদের উদ্যম আর অধ্যবসায়ের জন্যে। বিনুর উপন্যাসের তারিফ করলেন, বললেন. পরে কি হবে তার জন্যে আমিই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, চটপট লিখে ফেল। তারপর আর দু-একটা লেখার কথা উল্লেখ করে শেষে হঠাৎ ললিতের দিকে ফিরে বললেন, তুইও তো একটা পদ্য লিখে ফেলেছিস দেখছি। মন্দ হয়নি। সত্যিই যদি এটা প্রথম চেষ্টা হয়, তাহলে তো খুবই ভাল বলতে হবে। প্রশংসার কথা।

প্রথম লেখার প্রশংসা—ললিতের সুগৌর মুখ জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠল, কপালে ঘাম দেখা দিল। অনেক কিছু হয়ত বলতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ও তো ইন্দ্রই, মানে ওই তো জোর করল, কখনও লিখিনি—বড়ো হয়ে গেছে এই ধরনের দু-একটা কথা ছাড়া কিছুই বলতে পারল না।

তবে বিনু বুঝল তার কাজ হয়েছে। প্রশংসার নেশার মতো উগ্র নেশা খুব কমই আছে। এর পর ললিতকে এদিকে আনা খুব কঠিন হবে না।

॥ ২৭ ॥

মাটিকে পাশ করার পর বিনু ভর্তি হল প্রেসিডেন্সী কলেজে, ললিত ঢুকল বঙ্গবাসীতে।

ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করলেও এমন কিছু ভাল রেজাল্ট করেনি যাতে প্রেসিডেন্সীতে নিতে পারে। বিনু স্থান পেল দাদার জোরে। এ-কলেজে নাকি বংশগত অধিকার বিবেচনা করার রীতি চলে আসছে অনেকদিন থেকেই। যার বাবা বা দাদা বা ঠাকুর্দা পড়েছেন, সে এখানে পড়বে এটা ন্যায্য দাবি বলেই মনে করেন এঁরা। অবশ্য পড় বলতে কিছুদিন পড়া বা ফেল করা ছাত্রদের কথা ওঠে না এখান থেকে যাঁরা সগৌরবে বি-এ কি এম-এ পাস করেছেন তাঁদের দাবিই ন্যায্য বলে ধরা হয়।

ললিতের বঙ্গবাসীতে যাওয়ার অন্য কারণ। ললিতের বাবা ঐ কলেজে পড়েছেন, তিনি চান তাঁর ছেলেও পড়ুক। বিশেষ করে নাকি সায়ান্স বিভাগে খুব ভাল ভাল অধ্যাপক আছেন এখানে, গিরিশ বোসের প্রচেষ্টায় এঁদের আনা সম্ভব হয়েছে—সায়ান্স পড়তে হলে এখানেই ভাল। কেমিস্ট্রীতে লাডলি মিত্র আছেন—তাঁর মতো অধ্যাপক আর কোন কলেজে পাওয়া যাবে? এই হল বাবার যুক্তি।

আশুতোষ কলেজের কথা তুলেছিল ললিত। বাবার পছন্দ হয়নি। তিনি বলেছেন, আমি বেঁচে থাকতে তুই এখন থেকেই টেলিগ্রাফের বাবু হবার কথা ভাবছিস কেন? ষাট টাকা মাইনের চাকরি কি আর কোথাও নেই? ম্যাট্রিকটা যেকালে পাস করেছিস সে একটু জুটেই যাবে। যদি ডাক্তারী না পড়তে পারিস তখন সে-চেষ্টা দেখিস। বারেন্দ্র বামুনের গুষ্টি কোথায় নেই। বদ্যি আর বারেন্দ্র এদের এই গুণটা আছে। একজন কোন আপিসে ভাল পোজিশানে থাকলে সে চেষ্টা করে নিজের জাতের লোক ঢোকাতে।

ছাড়াছাড়িটা ওদের ভাল লাগেনি। বিশেষ বিনুর। পারলে সেও বঙ্গবাসীতেই ভর্তি হত। কিন্তু দাদা সে-প্রস্তাব কানেই তুলল না। দূর দূর, প্রোফেসার থাকলে কি হবে। গুচ্ছের ছেলে, ওর মধ্যে কি পড়া হবে! জেলেপাড়ার কলেজ। প্রেসিডেন্সীতে পড়ার প্রেস্টিজই আলাদা। যত বড় বড় চাকরিতে বসে আছে বাঙালী, খোঁজ করে দেখ—হয় প্রেসিডেন্সী, নয় সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র। এখানে ঢুকতে পেলে কেউ অন্য কলেজ চায়?

কিন্তু বিনুর যে অন্য কথা। ভগবান তাকে সবদিক দিয়েই স্বতন্ত্র করে পাঠিয়েছেন। তার মনের এই বিচিত্র গঠনের কথা সে কাকে বোঝাবে? বোঝাতে গেলে বুঝবে তো না-ই, উল্টে ওকে পাগল ভাববে।

বিনুর একেবারেই ভাল লাগে না এখানে।

এত বড় কলেজ, এত নামী কলেজ—ওর কাছে জেলখানা বলে মনে হয়। মনে হয় সম্পূর্ণ কোন বিদেশে এসে পড়েছে, জার্মান কি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদের মতোই পরদেশী এইসব ওর সহপাঠীরা।

অধিকাংশই বড়লোকের ছেলে পড়ে এখানে। কেউ বালিগঞ্জ, কেউ ভবানীপুর থেকে আসে। আরও দূর—আলিপুর থেকে আসে কেউ কেউ। এদের অনেকেরই কোন-না-কোন আত্মীয় বিলেতে গেছে বা বিলেতে থাকে। সেই সুবাদে এরাও যেন সাহেব হয়ে গেছে—বরং তাদের চেয়ে বেশি সাহেব। প্রাণপণে সেই সাহেবীয়ানা প্রচারের চেষ্টা করে — কথাবার্তায় আচারে-আচরণে, গল্পে।

যারা সাহেব হবার জন্যে ব্যগ্র নয়, তাদের বড়মানুষীর দম্ভ। আর সেটা বড় বেশি প্রকট, বড় বেশি উগ্র। আদব সে চাল-এর কথা আদ্ধেক বুঝতেই পারে না বিনু।

সে গরিবের মতোই মানুষ হয়েছে, গরিবের ছেলেই বলতে গেলে। মার মুখে বাবার বড়মানষীর কথা কিছু শুনেছে, তবে তার সঙ্গে এর কিছু মেলে না। তিনি ছিলেন অন্য যুগের মানুষ, দান ধ্যান, খাওয়ানো ও খাওয়া—এই সবই বুঝতেন। উপার্জনের মধ্যে কৃতিত্বর প্রশ্নটাই তার কাছে বড় ছিল। বিলাস বলতে গাড়ি ঘোড়া যা- সেও তাঁর প্রয়োজনেই লাগত।

আর, বাবার সঙ্গই বা মা কতটুকু—ক'দিন পেয়েছেন? শোনা কথাই তো বেশির ভাগ। সে স্মৃতিও এতদিনে বিবর্ণ হয়ে এসেছে।

এরা সে যুগেরও না. সে ধাতেরও না। এরা নিজেদের বিশেষ গন্ডীর বাইরে বাকী সহপাঠীদের মানুষ বলে মনে করে না, তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে। খুব ভাল ছাত্র যারা. পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় স্থান পেয়ে এখানে এসেছে তারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। এইসব বড়লোকরা (অবশ্য সত্যিসত্যিই কে ঠিক কতটা বড়লোক—সে বিষয়ে সেদিনও সন্দেহ ছিল বিনুর, এখন তো মনে হলে হাসি পায়। অনেকেই যে বানিয়ে বানিয়ে বিস্তর কথা বলে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজের অবস্থা প্রমাণ করতে—আজ তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট) প্রথমটা তাদের দলে টানবার চেষ্টা করে। কেউ কেউ তাদের মিথ্যা দীপ্তিতে আকৃষ্ট হয়—যাদের মধ্যে ঐ আলেয়াজীবনের জন্য লুব্ধতা

আছে—এদের পোশাক-আশাকে বিলাসের উপকরণ সম্বন্ধে অসাড়ে গল্প শুনে চোখ ও চিন্তা শক্তি দুই-ই ঝলসে যায়, যারা হয় না তাদের অবিরাম ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে তারা যে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্বের উপযুক্ত নয়—সেটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

ফলে, বিনুর মনে হয় সে হঠাৎ যেন একটা প্রাণোজ্জ্বল ও প্রাণোচ্ছল লোকালয় থেকে মরুভূমিতে এসে পড়েছে। লেখাপড়া এখানে হয়, কিন্তু সে ব্যবস্থাও পরিবেশ অনুযায়ী। ভাল ছেলেরা আপনিই পড়ে বড়লোকের ছেলেদের দু-তিনজন টিউটার থাকেন—অধ্যাপকরা এ তথ্য ধরে নিয়েই পড়ান। ওরই মধ্যে যারা সত্যিসত্যিই শিক্ষায় আগ্রহী তারা নিজেরাই এগিয়ে যায়, অধ্যাপকরা তাদের হয়ত অবহেলা করেন না, তারা ও'দের সান্নিধ্যে ও স্নেহে অনেক কিছু পায়।

বিনুর মতো ছেলের কোন আশাই নেই। স্কুল আর কলেজ জীবনে যে এত তফাৎ হতে পারে তা সে ভাবে নি কোন দিন। তার সৌভাগ্য বা—এখন বুঝছে দুর্ভাগ্যক্রমেই মাষ্টার মশাইদের কাছ থেকে স্নেহ ও প্রশ্রয় পেয়েছে প্রচুর। সেই জন্যেই এখানটাকে এমন মরুভূমি বোধহয়। মনে হয় এ কোন জায়গায় এসে পড়েছে সে।

মাঝে মাঝে ভাবে ললিত যদি থাকত, কি সুনীলটাও অন্তত!

সুনীলের জন্যে দুঃখই হয়। ভাল-ভাবেই পাশ করল বেচারী কিন্তু কলেজে ভর্তি হতে পারল না। তার বাবার আর পড়াবার সামার্থ্য নেই। এ জগৎ থেকে বিদায় নিতে হল তাকে একেবারেই, চাকরির চেষ্টা দেখতে হবে এখন থেকে। পাবে কি, ম্যাট্রিক পাশ ছেলে কি চাকরি কোথায় পাবে, কে দেবে?

আর ললিত।

হয়ত দেখাটা পেত এখানে, সে-ই একটু সান্ত্বনা থাকত। হয়ত এখানে এই কলেজের মধ্যে তার সাহচর্যটুকু পেলেও এতটা শূন্য এতটা বিবর্ণ মনে হত না—বহু ছেলেরই ঈপ্সিত এই কলেজ-ছাত্র জীবন।

হয়ত ললিতও, এই কলেজে এত অপরিচিত ও ভিন্ন জগতের ছেলেদের মধ্যে বিনুর সঙ্গও সাময়িক আশ্রয় বলে মনে করত। এখানে অন্তত কঘন্টা কাছাকাছি থেকে দুজনে দুজনের মধ্যে ওদের পরিচিত জগতের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারত।

নইলে ললিত তো [illegible] সরে গেছে

কাছে এসেছিল কি আদৌ? সেও তো একটা ধারণার কথা মাত্র।

বিনুর বিশ্বাস করতে ভাল লাগত যে সে কাছে এসেছে।

এত কান্ড করে যে মাসিকপত্রের আয়োজন—সাহিত্য শিল্পের রসে ওকে উদ্বোধিত করা—সেও ব্যর্থ হয়ে গেল।

প্রথম সংখ্যার পর দ্বিতীয় সংখ্যার কাজ খানিকটা করেই ছেড়ে দিল এরা। সুরেন-বাবুদের বাড়ি কাছাকাছি বয়সের অনেক-গুলি ছেলের আড্ডা—আড্ডাটা ওর মতে বেশ রসালো, সেই ঝোঁকে মিশে গেল। সেখান থেকে তারা কজন মিলে মাসিক বার করবে—ললিতকে মুরুব্বি ধরে। সেও হল না, খানিকটা করেই তারা হাল ছেড়ে দিল, তাদের স্বভাবেই একাগ্রতা বা অধ্যবসায় নেই, সুনীল বা বিনুর মতো একজন থাকলেও তবু হত—কে এত কান্ড করবে। ওটাও হল না, এটাও গেল।

তবে মণীষীরা বলেন, সৎপ্রচেষ্টার কিছু সুফল ফলেই। এক্ষেত্রেও বিনুর কিছু সুফল লাভ হয়েছিল।

হয়ত ওর জীবনে এ অনেকখানিই।

স্কুলের সেকেন্ড ক্লাসের ছাত্রদের এই মাসিকপত্রের কথা শুধু ওদের ক্লাসের ছেলেদের মুখে মুখেই নয়, ফার্স্ট ক্লাস ও থার্ড ক্লাসের ছেলেদের মারফৎ ছড়িয়ে থাকবে। তার ফলে বিভিন্ন পাড়া থেকে কিছু কিছু ছেলেদের দল এসে ওকে ধরতে লাগল, 'তুমি' বা 'আপনি'—যেখানে যেমন—আমাদের একটু সাহায্য করো।

এতে গৌরবও আছে, লজ্জাও আছে। লজ্জার কারণটা অন্য। ওরা বাড়ি বদল করেছে কিন্তু এখানেও সেই এক প্রশ্ন, ওর বন্ধুদের বা ওর সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে তাদের বসাবার কোন জায়গা নেই। দাদার বন্ধুরা সেই আগের মতোই, দাদার শোবার ঘরে এসে বসেন, সৌভাগ্যবশত সেটা রাস্তার দিকেও বটে—ও কোথায় এনে বসায়? মার সেই একই কথা, 'হ্যাঁ, ইস্কুলের ছেলে—এখন থেকে ইয়ার বন্ধু এনে আড্ডা দেওয়া। তা আর নয়। ঢের হয়েছে, মন দিয়ে লেখাপড়া করুক। তার নামে তো সম্পর্ক নেই। কখনও তো দেখলুম না একটা ইস্কুলের বই নিয়ে বসতে!'

এর ওপর আর কথা চলবে না।

তবে যারা এসেছে নিজেদের গরজে, এত সামান্য কারণে তারা পিছিয়ে যাবে না। কসবা, হালুত, ঢাকুরিয়া—এর পাড়ায় হাতে লেখা কাগজ—তখন এই ঢেউটা খুব চলছে, ছেলেদের অন্য এত রকম পথে নিজেদের 'কৃতিত্ব' দেখাবার উপায় বেরোয় নি, সাহিত্যের ওপরও অনুরাগ ছিল। কতকগুলো কাগজের নাম আজও ওর মনে আছে—শেফালি ধারা, শান্তি, বিজয়, পরাগ—এমনি ধরনের নাম। অনেক, অজস্র। পাড়ায় পাড়ায় তাও পাড়া প্রতি একটা নয়—দলাদলি [illegible] আছেই, একটা কাগজ করতে করতে সামান্য কোন ব্যাপার নিয়ে মতবিরোধ হল, সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনজন দল থেকে বেরিয়ে এসে আর একটার পত্তন করল।

না, এরা আসত বিনু খুব একটা বড় লেখক বলে—বা নিপুণ শিল্পী বলে নয়। এরা আসত অন্য কারণে।

এদের উৎসাহ যত, সামর্থ্য তত নয়। আর সে উৎসাহের স্থায়িত্বও বড় অল্প। এদের ঐ রকম কর্মীরই অভাব, যে জন্তের মতো খাটতে পারে। শুধু তাই নয়, অন্যের লেখা যোগান দিতে পারে—এ লোকের অভাবই সবচেয়ে বেশী। লেখা ভাল কি মন্দ, অচল কি চলনসই—সে বিচার পরের কথা, পাতা ভরানোই যে দরকার।

বিনুর সেই খ্যাতিটাই ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ। ও একই সঙ্গে লিখতে পারে, আঁকতে পারে, সব রকমই লিখতে পারে। হাতে লেখা মাসিকে পাকা হাতের লেখা কেউ আশা করে না। বড় লেখকদের দ্বারস্থ হয়ে দু-চার লাইন লেখা চাওয়া—অন্যথায় আশীর্বাণী—এসব কথা এইসব নিতান্তই ভীরু ছেলেরা ভাবতেই পারত না। বিনুর ঐ গুণটা ছিল দ্রুত লিখতে পারত, কাঁচা লেখাই, তবু এলোপাথাড়ি যা হোক একটা কিছু খাড়া করে দিত, পাতা ভরাবার পক্ষে যথেষ্ট।

তবে তখন এইসব কাঁচা লেখার সমষ্টিও দু'-চারজন পড়ত। এখন এ চেষ্টা খুব সীমাবদ্ধ—বছরে একখানা বেরোয় কোথাও কোথাও থেকে, খুব খরচা করে, খুব মেহনৎ করে-নয়নাভিরাম একটা পত্রিকা বেরোয়—দেখাবার জন্যেই করা, লোকেও দেখে, রূপসজ্জারই বাহবা দেয়।

তখন যে পড়ত তার প্রমাণ কয়েক বারই পেয়েছে বিনু একবার তো তার জীবনের গতিই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল এই হাতে লেখা মাসিকের একটি লেখা থেকে, যাকে কেরিয়ার বলে—জীবনের উন্নতির পথ জীবিকার পথ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

তবে সে অনেক পরে। এমনি অনেকে পড়েছে, বাহবা দিয়েছে। একটা ঘটনা খুব মনে আছে তার। পাড়ার লাইব্রেরীতে রাখা একটি মাসিকে ওর একটি লেখা—মুসলমান শাহী আমলের ঐতিহাসিক গল্প পড়ে মুখুজ্জে পাড়া থেকে একজন দাদা শ্রেণীর একটি ছেলে ছুটে এসেছিলেন, ওর ফার্সী শব্দের ভুল ধরিয়ে দিতে। ভুল ধরানোর উৎসাহেও এত পরিশ্রম কেউ করে না—সে জন্যে খুবই কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ বোধ করল বিনু, তবে ভুল সেটা নয়। অবশ্য এটার একটা চলিত অর্থ আছে, লোকে সেটাই বেশী জানে—এবং এ নিয়ে কিছু ধিক্কার লাঞ্ছনা হতে পারে তা ও তখনই জেনে-ছিল। তার জন্যে প্রস্তুতও ছিল।

মার বইয়ের আলমারীতে যখন তখন হাত দেবার অধিকার ছিল না। সেই জন্যে সে পৃষ্ঠা সংখ্যাটা মনে করে রেখেছিল। চন্ডীদা যখন এসে ওকে [illegible] বলচেন, একটু ব্যঙ্গের সুরই ছিল বাপু হেসে ধরতে পারো না, কেউটে ধরতে যাও—এখনও লিখতেই শিখলে না, এসব ঐতিহাসিক মাসিক লিখতে চেষ্টা করো কেন, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!' এই ধরনের। বিনুও খুব ভারিক্কি চালে বলল, শুনেন তো ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে

পার্সিয়ান ডিকসনারীটা দেখে নেবেন। তবে অত দূরেও যাবার দরকার নেই, 'রাজসিংহ' বইটাই বরং দেখে নেবেন, তাতে বঙ্কিমবাবুও এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি যদি ভুল করে এতকাল পার পেয়ে থাকেন—আমিও করলুম না হয়। বসুমতীর বঙ্কিম গ্রন্থাবলী নিশ্চয় হাতের কাছে আছে—' এই বলে পৃষ্ঠা সংখ্যাটা একটা চিরকুট কাগজে লিখে দিয়ে বলে দিল, 'এই পাতার মাঝামাঝি আছে শব্দটা দেখে নেবেন।'

চন্ডীদা পরে অবশ্য স্বীকার করেছিলেন—বাড়ি আসেন নি আর—পথে দেখা হতে পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে বলেছিলেন, 'না, তোমার কেরামতি আছে। ঠিকই ব্যবহার করেছ। আর মেমরীও তো খুব। পৃষ্ঠা সংখ্যা শুধু নয়—কোথায় তাও। লেখাটাও কিন্তু আফটার অল মন্দ হয় নি।'

লেখা আর পড়া—এর মধ্যেই একটা জগৎ করে নিয়েছিল সে।

নিতে পেরেছিল, এইটেই তার সৌভাগ্য।

নইলে বোধহয় পাগল হয়ে যেত। মনের মধ্যে এমন নিঃসঙ্গতা—যারা কথা বলে, যত কথা বলে, কত ছেলের সঙ্গে, বিশেষ করে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গেও আজকাল আলাপ হয়। তাঁরা ডেকে গল্প করেন—সংসারের সব রকম কাজ তার ওপর এসে পড়েছে, দাদার সারাদিনই খাটুনি, কলেজের ফেরৎ টিউশ্যুনী সেরে ফিরতে দেরি হয়—সকালটাই তার নিজের পড়া খবরের কাগজ পড়ার অবসর, তার জন্যে মারাও হয়—আর ন'টা পর্যন্ত তো সময় এটুকু থাক বেচারার। আজকাল মার শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে বেশির ভাগ দিনই রান্নাতেও সাহায্য করতে হয় বিনুকে। সকাল থেকে নিরম্বু নিরসনের ব্যবস্থা—কিন্তু সেই ঠিক মানুষটি কোথায়, যে ওর মনের কথা আর মনের ব্যথা বুঝবে, ঠিক পরামর্শ দেবে, পরামর্শ না দিতে পারুক, ওর বোঝা ভাগ করে নেবে, ভালবাসা আর সহানুভূতির প্রলেপ দেবে?

নতুন বাড়িতে এসে—ভাড়া বাড়িই—বড় পাড়ার মধ্যে বলে—পরিচিতদের পরিধি বিস্তৃত হয়েছিল। স্কুলের বন্ধু ছাড়াও পাড়ার বন্ধু ঢের। এক বয়সী ছেলে, দু' বছর এক বছরের ছোট বা বড়—সহজেই আলাপ হয়ে যায়। সহপাঠীদের বন্ধু এই হিসেবেই দু' চার দিনের মধ্যে এই নবপরিচিতরাও বন্ধু শ্রেণীতে পরিণত হয়।

তবে এসব ক্ষেত্রেও ঐ একই অসাম্য। তার আর ওদের মধ্যে কোথায় একটা বিপুল ব্যবধান থেকে যায়। কেউই সে ব্যবধান পার হবার চেষ্টা করে না, ব্যবধান আছে কিনা, এবং সেটা কোথায় কেউ বোঝেও না। তাদের এত গরজই বা কেন থাকবে। আলোচনার গতি ও প্রকৃতি সেই একই। এই ধরনের আলোচনায় সে রস পায় না। আসলে কিছু বোঝেও না। এদের আলোচনায় যে সব ভাষা বা শব্দ বলাই উচিত—ব্যবহৃত হয় তার অর্ধেক কথাই বুঝতে পারে না। যেটুকু বোঝে ঝাপসা ঝাপসা।

ফার্স্ট ক্লাসে উঠতেই এটা আরও বাড়ল। অথচ তখন কতই বা বয়স। ষোল-সতেরো—এই তো। ওর নিজের সতেরো বছর তবে দেহের গড়নের জন্যে অনেক বেশী মনে করত এরা। এটা স্বাভাবিক। বিনুও কোন কোন ছেলেকে দেখে ভাবত চোদ্দ কি পনেরো বছরের—পরে শুনেছে তারাও এর এক-বয়সী। কেবল সুনীলই ওদের মধ্যে একটু বেশী বড়, তার আঠারো হয়ে গেছে। সে মিথ্যে বলে না, বয়স জিজ্ঞাসা করলে ঠিক ঠিক বলে দেয়। বাকী সকলেরই লক্ষ্য করেছে বিনু—বয়স কমানোর দিকে ঝোঁকে।

এই বয়সেই এইসব আলোচনা, বড় অবাক লাগত বিনুর।

ষোল সতেরোতে আগে বিয়ে-থা হত, কিন্তু সে যুগ আর নেই। তখন উপার্জনের কথা কেউ ভাবত না, বাপ-মা অল্প বয়সে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে মানুষ-পুতুল খেলার শখ মেটাতেন। নইলে এটাই কৈশোর, যৌবন সীমান্ত। আঠারোর কম যৌবন ধরা উচিত নয়। এর মধ্যেই এসব আলোচনা আসে কেন!

আজ বোঝে যে তখন এদের মনের সীমা অতি সংকীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ ছিল। এক খেলাধুলোর প্রসঙ্গ ছিল, তাও ফুটবল শুধু। ক্রিকেটের—এদেশের ক্রিকেটের তখন শৈশব দশা। বাংলা ছবি তত গল্প হয় নি, ইংরেজী ছবি আসে ভাল ভাল, তাতে এরা রস পায় না। ও জগৎ ও জীবন সম্বন্ধেই ধারণা নেই। তবে পরবর্তীকালে বাংলা ছবি যখন চালু হয়েছে তখনও দেখেছে—কানটা খোলা থাকেই—আলোচনাটা প্রধানত অভিনেত্রী বা স্ত্রী 'স্টার'দেয় কেন্দ্র করেই আবর্তিত। সুতরাং আলোচনাটা যদি বেশির ভাগই আদিরস ঘেঁষা হয় তো খুব দোষ দেওয়া যায় না।

ওর মা একটা উপমা প্রায়ই দিতেন, অনেকেই দিত, আজও দেয়, অবশ্য প্রবাদ বা এই শ্রেণীর প্রচলিত বাক্য আর প্রচলিত নেই এখন—'কাকে নতুন ময়লা খেতে শিখেছে, বাড়াবাড়ি তো করবেই। ওদের সামনেও এই প্রথম এত বড় একটা দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে, সত্যকারের পুরুষের জীবনে উপনীত হচ্ছে। তাছাড়াও তখন এইসব ছাত্র বা ছাত্র বয়সী ছেলেদের পৃথিবী নেহাৎই ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আসল কলকাতায় অনেক উত্তেজনা এসব শহরতলীর জীবন অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ। রাজনীতির উত্তেজনাও তখন প্রবল আকার ধারণ করে নি। বস্তুত ওরা ম্যাট্রিক পাস করার পর স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিবেগ বেড়েছে। উনিশ শো তিরিশে এসে—ইংরেজদের পক্ষে ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে। তখন মেয়েদের সঙ্গে খোলাখুলি মেশবার সুযোগ ছিল না, গোপনীয়তার রস এবং আকাঙ্ক্ষা বেশী। বৈষ্ণব কবিতায় এই কারণেই শাশুড়ি ও ননদ—জটিলা - কুটিলার প্রবল বাধা সৃষ্টি করতে হয়েছে।

কিন্তু এসব তো এখন ভাবছে সে। তখন এমন করে ভাবতেও পারত না।

তবে চেষ্টা যে একেবারে করে নি—সহজ হবার, স্বাভাবিক হবার ওদের সঙ্গে মিশে যাবার—তা নয়। এইসব বন্ধুদের কাছে অপদস্থ হবার ভয়ে আন্দাজে আন্দাজে আলোচনা চালাবার চেষ্টা করেছে, বাহাদুরী দেখাতে গেছে—সেও ওদের চেয়ে কম নয়, বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু আনাড়িপনা আর অনভিজ্ঞতা ধরা পড়তে কতক্ষণ লাগে? ফলে ঠাট্টা বিদ্রূপ লাঞ্ছনার অন্ত থাকে নি।

ওর একটা নির্বুদ্ধিতার জন্য আজও নিজেরই অবাক লাগে।

এত আনাড়ি তো এ বয়সে কেউ থাকে না। অবশ্য বয়সটা পুরো ষোল, সতেরোয় সবে পা দিয়েছে, তবে তখন ওকে দেখায় অনেক বড়। আর চেহারাটাও নাকি ভাল, বন্ধুদের মুখে, পরে অন্য মেয়েদের মুখে শুনেছে—কিন্তু সেদিনও ওর বিশ্বাস হত না, পরেও হয় নি। নিজের চেহারাটা আয়নায় কখনই ভাল লাগে না ওর, পুরুষ মানুষ সুন্দর বলতে যা বোঝায় তার ধারে কাছেও ও যায় না—এটা আন্তরিক বিশ্বাস। বরং বয়সকালে ওর দাদার চেহারা অনেক ভাল ছিল, মা বলতেন, 'ও ওর গুষ্টির মতো হয়েছে অনেকটা। তবে তাঁর মতো সুন্দর হয় নি।'

তখনও সেকেন্ড ক্লাসে পড়ে। বামুন মার এক বোনপোর বিয়েতে ওকে জোর করে বরযাত্রী নিয়ে গিছল। মা অনেক আপত্তি তুলেছিলেন কিন্তু নিহাৎ বামুন মার বোন এমন আড় হয়ে পড়লেন যে একেবারে কাটিয়ে দিতে পারলেন না। তিনি চেয়েছিলেন দু' ভাইকেই নিয়ে যেতে, দাদার উপায় ছিল না, আর মা একাই বা থাকবেন কি করে। সুতরাং বিনুকেই ছেড়েছিলেন। আসলে বামুন মার বোনের অত আগ্রহ কেন তা বিনু পরে বুঝেছিল, ভাল ঘরে বিয়ে হচ্ছে, বৌ নাকি খুব সুন্দরী। তাঁর ছেলে রাজগঞ্জের কলে কাজ করে, লেখাপড়া শেখে নি, চোয়াড়ে চেহারা, বিড়ি খেয়ে খেয়ে এই বয়সেই দাঁত কালো করছে। তার বন্ধুর দলও তেমনি, চোদ্দ আনা, এক টাকা রোজের মিস্ত্রীর দল। নিহাৎ মেয়ের বাপের বছর দুই আগে আপিস উঠে গিয়ে চাকরি গেছে—সেটা সেই পৃথিবীব্যাপী মন্দা বাজারের কাল—একেবারে নিঃস্ব বলেই এ ছেলেতে দিচ্ছে। তাই দু-একজন একটু ভদ্রগোছের বরযাত্রী যায়, তাঁর ইচ্ছে।

(চলবে)

পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

দীপংকর চুপ করে থাকে। আজ সকালে লাবণ্যকে দেখেছিল, গৃহদেবতার সেই কিংবদন্তীর নারায়ণ শিলা। মন্দিরে ঘন্টা বাজছিল। লাবণ্যর ধবধবে নির্লোম পায়ে জল ঢেলে দিচ্ছিল বৃদ্ধা দাসী। লাবণ্যর চোখে-মুখে কোন ব্যত্যয় ছিল না। দীপংকরের ভিতরে ঘন বিস্ফোরণ হয়ে যাচ্ছিল। বুকের ভিতরে হাতে-পায়ে শিরে-শিরে ভাব, চোখ-মুখ টান ছিল। তারপর সমস্ত দুপুরে ভয়াল নৈঃশব্দ্যে বসে থাকা। ঘরের এককোণে চুন সুরকি খসে পড়েছে একদলা।

পিথা কানের কাছে ফিসফিস করে, সার, ইরাজ বংশজাত সাপ, সব ইঁটের ভিতর লুকাই আছে, সাবধান হও, আগের সাহাব নিমুলবাবুরে কহিছিলাম, উশুনেনাই, পলাইছে বাঁচি গিইছে, উ ডাক্তার সাবধান হয়না, কখন সাপ কামড় দিবে ঠিক কি। নিম্মল সাহাব বড় বাঁচা বাঁচিছে, মুর দাদাটা বাঁচে নাই।

দীপংকর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি বলছে পিথা। সে হাত ধরে পিথাকে বসিয়ে দেয় ঘাসের জমিতে, এখান থেকে রাজবাড়িটা স্তূপ অন্ধকার বলে ভ্রম হচ্ছে।

—এখানে বস, কি হয়েছিল মজুমদারের? দীপংকর পিথার পাশে বসে পড়ে।

—সে লোক চলি গিইছে, শুনি লাভ নাই, মুর দাদাটা মরিছে।

গা হাত পা ছমছম করে ওঠে পিথার কণ্ঠস্বরে। ও-কি সব নেশার ঘোরে উল্টোকথা বলছে! নির্মল মজুমদার অনেক কিছু না বলে চলে গেছে। শেষের দিন দুপুরে লাবণ্যর কথা শুনে হঠাৎ থেকে যাবে বলেছিল। কি হয়েছিল ঐ তিরিশ পার হওয়া মানুষটার! লাবণ্য চিঠি পেয়েছে মজুমদারের। লাবণ্যর মুখ তো অন্য কথা বলে। মানুষের মুখই তো মানুষের পরিচয়। লাবণ্যর মুখ তো [illegible] ফিরিয়ে অন্য কথা ভাবার সুযোগ দেয় না। কিন্তু পিথা এসব কি বলছে! ওর দাদার মৃত্যুর কথা। সব কেমন অলৌকিক হয়ে যাচ্ছে।

আমার দাদা ভিখা আর রাম মাইতির ছেলে রাজেন বড় বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। রাজকুমারীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াত দুজন। রাজকুমারী কোন কাজ করতে বললে নতজানু হয়ে যেত। ওদের ভূত চেপেছিল। ঘটনা দুবছর হয়ে গেল, নাকি আরো বেশী। একদিন দুজনে রাজকুমারীর পায়ের পাতা ছুঁয়েছিল, চোখ ছুঁয়েছিল ভিখা। চোখের অসুখ হয়েছিল রাজকুমারীর। রাজেন এক সন্ধ্যেয় রাজকুমারীকে ফেলে দিয়েছিল মন্দিরের কোণে, চেয়ে ধরেছিল দু হাত দিয়ে, ঠোঁটের উপর ঠোঁট রাখতে যাওয়ার সময়ই রাজেন ছিটকে সরে আসে। কাছেই মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। আমার দাদা ভিখা এসে হাজির হয়েছিল সেখানে। ঘটনা আর এগোয়নি। কেউ জানল না।

পরের দিন ছিল পূর্ণিমা। শিমুলেশ্বর শিবের মন্দিরে রাজকুমারী পুজো দিয়ে এসেছে সকালে। দুপুরে সেই মন্দিরে গিয়ে হাজির হয় ভিখা আর রাজেন। কোথায় যেন পাখি মারতে গিয়েছিল। ভিখার হাতের লক্ষ্য ছিল নিপুণ। দুটো বালি হাঁস মেরেছিল কাঁসাই এর পূর্বদিকে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে শিমুলেশ্বরের মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসে ক্লান্ত হয়ে। শিমুলেশ্বরের মন্দির, ঐ নদীর ঐদিকে। এখন দেখা যাবে না। গাছগাছালি আর অন্ধকারে ঢেকে গেছে।

তখন নিঃঝুম দুপুর। ভিখা আর রাজেন আগের সন্ধ্যার কথা নিয়ে হাসাহাসি করে। হাসাহাসি শুরু হয় রাজকুমারীকে নিয়ে, রাজকুমারীর সৌন্দর্য নিয়ে। রাজেন ভিখাকে দোষারোপ করে, গত সন্ধ্যেয় ভিখা না আসলে রাজকুমারীকে দেখে নিত সে। বহুদিনের লোভ। ভিখা রাজকুমারীকে নিয়ে পাপের কথা উচ্চারণ করে। রাজেন মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ঢোকে, দেবতার পায়ের কাছে রাখা নৈবেদ্য তুলে নিয়ে আসে। দুজনে রাজকুমারীকে ভোগের কথা ভাবে সেখানে বসে।

তখন কাঁসাই পার হয়ে বোবা গুহিরাম আসছিল। গুহিরামের গায়ে জ্বর ছিল। ও যাচ্ছিল তফাবিনির হেলথ সেন্টারে তখন ডাক্তার বোস ছিলেন না। অন্য ডাক্তার ছিলেন। কদিন পরেই তো ডাক্তার বোস এলেন। বোবা গুহিরাম এই দুজনকে সহ্য করতে পারত না। সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মন্দিরে ওদের দুজনকে দেখে। গুহিরামের চোখমুখ ছলছল করছিল, একে জ্বর, তার এই রোদ্দুরে ও কাঁসাই-এর বালি পার হয়েছে।

গুহিরামকে দেখে ওরা হাততালি দিয়ে ডাকে। গুহিরাম পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে রোদ্দুরে। তারপর হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওদের দুজনকে আক্রমণ করে। কিন্তু শেষে প্রচন্ড মার খেয়ে ফিরে যায় আঁ আঁ করতে। ভিখা আর রাজেন সেই পাপের কথা উচ্চারণ করতে করতে ঘরে ফেরে।

সেই রাতে পুরো চাঁদ উঠেছিল। দূরে আদিবাসী পল্লীতে মাদল ধমসা আর বাঁশী বেজে উঠেছিল। কি এক উৎসব ছিল। ভিখা আর রাজেন মহুয়ার নেশায় এবং আর কি এক আকর্ষণে সেখানে যায়। পয়সা দিয়ে মেয়ে পাওয়ার কথা হয়ে গিয়েছিল ওদের সঙ্গে একজনের। ওরা তার কাছেই যাচ্ছিল। সেই পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার ভিতরে ওদের দুজনের পায়ে বিষ ঢেলে দেয় একটা সাপ। একসঙ্গে দুজনকে দংশন করে। ভিখা আর রাজেন সমস্ত রাত মাঠের ভিতরে পড়েছিল। শরীর নীল হয়ে গিয়েছিল, শক্ত কাঠ। একেবারে বরফের মত ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল দুজন। সেটা বোধহয় দোল পূর্ণিমার সময়। দুজনের পায়ে ভালরকম সর্প দংশনের চিহ্ন ছিল।

—রাজবাড়ি থিকে সাপ বার হই, কামড়াইছে দুজনারে

পিথা থেমে যায়। দীপঙ্কর পা গুটিয়ে নেয়, চশমাটা খুলে হাতে রাখে। সব আরো ধূসর হয়ে যায়। চারধারে গাঢ় বিষণ্ণতা। পিথাকে দেখতে পাচ্ছে না ও খুব আবছা অবয়ব। পিথা কোন অলৌকি রাজ্যে চলে গেছে। দীপংকর অন্ধের মত হাত বাড়ায়। পিথার কাঁধে হাত রাখে। সময় অনেকটা কেটে গেছে। কত রাত হল ঠিক নেই। চাঁদ রূপোর রঙ নিয়ে মাঝ আকাশে উঠে এসেছে।

—পিথা।

—কি বাবু!

—আমাকে ঘরে পৌঁছে দাও

—না। সাবধান হও।

পিথা ঝট করে উঠে দাঁড়ায়।

—তুমি এত কথা জানলে কি করে?

—ভিখা মুরে সব কহিত।

পিথা চলতে শুরু করেছে। দীপঙ্কর ওকে থামাতে পারে না। পিথা নায়েক ঝট করে আলোছায়া হয়ে গেল এই প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের ভিতর। এতক্ষণ কি স্বপ্নের ভিতরে কেটেছে! খুব ভাল একটা স্বপ্ন। কলাবনিতে এই রাতে দাঁড়িয়ে থাকাই এক বড় ভয়ের স্বপ্ন। দীপঙ্কর পা মেপে মেপে রাজবাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে। চোখে চশমাটা আবার তুলে নিয়েছে।

*

সতী ভাত নিয়ে চুপচাপ বসেছিল। মানুষটা কখন ফিরবে কে জানে? দিবারাত্র টৈ টৈ করে বেড়াচ্ছে। ঝাড়গ্রাম যাচ্ছে, আসছে। ব্যবসাপাতিতেও মন নেই। তবুও বড় ছেলেটা দেখে। কিন্তু বাপের মত দেখবে কি করে। বাপ যেভাবে গড়ে তুলেছে, ওদের তো সেইভাবে গড়ে তুলতে হয়নি। তাই মায়া বসেনি। মায়া বসেনি বলেই জমিজমাগুলোর জন্য মানুষটার মাথা খারাপ হয়, বড় ছেলে সন্ধ্যে হতেই বউ নিয়ে ঘরে ঢোকে। মানুষটা উকিলের কাছে ছুটছে, অফিসারের পায়ে পড়ছে।

সতী বাইরে এসে দাঁড়ায়। ধু ধু জ্যোৎস্নায় মাঠ ঘাট সব পরিষ্কার [illegible]

যাচ্ছে। বিকেল বিকেল রজনীকান্ত বেরিয়েছে, এখন চারঘড়ি রাত। গরম গরমে সন্ধ্যে হতেই রাত দুপুর হয়ে যায়। উপরের ঘরে আর ছেলেরা তাসের আসর বসিয়েছে। রাত অর্ধেক তো হয়ে যাবেই, এদিকে নিঃশব্দে কি ঘটে যাচ্ছে সে সব দিকে নজর নেই। জমিজমা ব্যবসাপাতি সব কুৎসিত লাগে এখন, কিন্তু যে স্বাদ লেগে গেছে জিভে তা ছাড়ানো বড় দায়। সতী আবার ঘরের ভিতর ঢুকে যায়। মাটিতে বসে খাটের পায়ায় হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়ে। চোখ মুখে ক্লান্তি নেমেছে। আজ পূর্ণিমার উপোস গেছে।

রজনীকান্ত হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে দেখে সতী ঘুমিয়ে পড়েছে মেঝেয়। ভাত ঢাকা দেওয়া রয়েছে। সে ডাকবে কি ডাকবে না ভাবতে ভাবতে চুপচাপ খাটে বসে পড়ে। পকেটের ভিতর হাত গলিয়ে নোটগুলো বার করে। ময়লা দোমড়ানো নোট। ব্যবসার টাকা এমনি হয়। এ তো মাস মাইনের চাকরীর টাকা নয় যে ব্যাংক থেকে নতুন জামা কাপড়ের মত গন্ধ নিয়ে নোট আসবে। সতীর কাঁধে বসে একটা মশা রক্ত খেয়ে ঢোল।

সতী ধরফড়িয়ে উঠে পড়ে। রজনীকান্ত ওর কাঁধে হাত দিয়ে টিপে মশাটা মেরে ফেলেছে। একটা গাঢ় রক্ত সতীর কাঁধে লেপটে গেছে। রজনীকান্তকে দেখে সে কাপড়-চোপড় সামলে মাথার কাপড় ফেলে উঠে পড়ে।

-কি হলো? তার স্বরে উৎকণ্ঠা।

—কিছু হল না, টাকাটা রেখে দাও।

সতী চমকে ওঠে। টাকা নেয়নি অফিসার, তাহলে তো আরো কেলেংকারি। সব জমি গেল।

সে হাত বাড়িয়ে টাকার বাণ্ডিলটা নিতে নিতে বলে, কি বললো?

—ধ্যুস দেখাই পেলাম না, সন্ধ্যে থেকে রাজবাড়ির গেটে বসে আছি, দুবার ভিতরে গেলাম, খবর পেলাম বেড়াতে বেরিয়েছে, এক্ষুণি ফিরবে, তা আজ ফেরে তো কাল ফেরে। বসে বসে হয়রাণ। ঘুষ দিতে এত হয়রানি!

—তুমি বোকামি করলে, তার আগে হয়ত কেউ টেনে নিয়ে গেছে কাজ সিদ্ধির জন্য, নতুন লোক তায় ছোকরা মানুষ। এখন তো টাকা পয়সা দরকার হয়ই, দিলে নিত, কাজও হয়ে যেত।

রজনীকান্ত সন্ধ্যে থেকে বসে বসে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে, ফেরার সময় দেখেছে পিথা নায়েকের সঙ্গে বসে লোকটা গল্প করছে মাঠে। তাই মেজাজটা ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল, এখন সতীর এই কথায় মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।

—মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের মত থাক, সবতাতে মাথা গলানোর দরকার কি?

সতী চুপ করে যায়। দুটো চোখ [illegible] হয়ে যায়। সে আস্তে আস্তে বলে, কাল সক্কালে গিয়ে ধরো, দেখ সব ঠিক হয়ে যাবে।

রজনীকান্ত জামা খুলতে খুলতে বিড় বিড় করে, হুঁ্যা, তা আর হয়েছে, সরকারি অফিসার, মাতাল ছোটলোকের সঙ্গে সন্ধ্যে থেকে বিড় বিড় করছে, কি এত কথা হারামজাদা পিথা নায়েকের সঙ্গে?

সতী আসন পাতে, জলের ঘটি এগিয়ে দেয়। রজনীকান্তর শেষ কথায় তার ভিতরটাও কেমন করছে। এদিনে এ সব জমিজমার উপর তার মায়া কম হয়নি।

।।৮।।

কলাবনি থেকে আবার ঘুরে এসেছে নিখিলানন্দ। দীপঙ্কর চৌধুরীকে পায়নি। দুটো দিন নষ্ট হল। এরপর খবর নিয়ে যেতে হবে। শুধু ঘুরে আসতে ভাল লাগে না।

সন্ধ্যেবেলায় নিখিলানন্দ নবীন হেমব্রমকে ডাকে। নবীন বসেছিল দাওয়ার উপর বাঁশের খুঁটোয় হেলান দিয়ে। নেশা করতে ইচ্ছে হচ্ছে নবীনের নেশা করে দশ জনের সামনে বসে করমঠাকুরের গল্প বলতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। এখন করম ঠাকুরের পরবের সময় নয়, সামনে আছে শালুই পরব, সে সব থাক. করম ঠাকুরের কাহিনী সর্ব সময় শোনা যায়। শুনলে পুণ্য হয়।

করম ঠাকুর সর্বস্ব অপহরণ করলেন ধর্মু আর কর্মুর। কর্মুর বড় কষ্ট। করমবাবার কাছে যাবে সে। করমবাবা কোথায় থাকে তা কেউ জানে না। কর্মু চললো বাবার কাছে। তেষ্টায় কর্মুর ছাতি ফাটে, পুকুরের জলে মুখ দিতে গিয়ে দেখে থিক থিক করছে পোকা। কর্মু এগোয়, পথে হাজার রকম বাধা। দেখা হয় নানান সমস্যা জর্জরিত জীবের সঙ্গে। সক্কলকে কর্মু করম বাবার কথা বলে, সকলের কাছে উপকৃত হয় সে।

শেষে পৌঁছয় সমুদ্র পাড়ে! কুমীর তাকে সমুদ্র পার করে দেয়। কুমীরের বড় দুঃখ, সমুদ্রে অত জল থাকতেও তার পিঠ ডোবে না। কর্মু তাকে করম ঠাকুরের কথা বলে। বলে করম ঠাকুরকে দিয়ে সর্ব দুঃখ হরণ করাবে সে।

এইভাবে হাজার যোজন পথ পার হয়ে সে এসে পৌঁছয় এক পাহাড়ের কোলে। পাহাড়ের চার ধারে মৃত্যুর চিহ্ন। কর্মু কি নরকের দরজায় এসে পৌঁছল। চারধারে মৃত মানুষের অস্থি-মজ্জা ভয়াবহ গন্ধ ছড়াচ্ছে। নিঃসীম স্তব্ধতা। ঘোর গ্রীষ্ম, সূর্য যেন হাজারটা হয়ে উঠেছে। কোথাও কোন জীবনের চিহ্ন নেই। আকাশে শুধু শকুনের পাখা।

কর্মু ডাকে, করম বাবা!

কোন জবাব নেই। শুধু ভীতিকর এক গর্জনের শব্দ শোনা গেল। কর্মু ভয় পায় না। কিসের ভয়! তার তো সর্বস্ব গেছে। আছে এইটুকু প্রাণ। যদি যায়, যাক। তবুও সে করমবাবাকে না দেখে যাবে না। করম বাবার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের পাপাত্মাকে শুদ্ধ করে নেবে।

সে চিৎকার করে ওঠে, করম বাবা! [illegible]

পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি ওঠে। ঘন অরণ্য স্থির থাকে না। কোথায় যেন আলোড়ন উঠছে। কর্মু চঞ্চল হয়।

করম বাবা আমার সব গেছে, আর যাওয়ার কিছু নেই, তুমি আমাকে দেখা দেও, আমি শুদ্ধ হই।

ঘন অরণ্যে দাবানল শুরু হয়েছে নাকি! অরণ্য জ্বলছে। আকাশে উঠেছে লেলিহান আগুনের শিখা। কর্মু দেখে সেই আগুনের ভিতরে ফুটে উঠছে এক আদিম মূর্তি। হ্যাঁ করমঠাকুর। স্বপ্নে দেখা সেই মূর্তি। ঠাকুর তাকে ডাকছেন। আগুনের ভিতর তাকে যেতে হবে! উত্তাপে দেহ এখনই শরীর ঝলসে যায়। ঠাকুর ডাকছেন। কর্মু স্থির চোখে আগুনের ভিতর বসে-থাকা দেবতাকে দেখছে—এখনই যদি না এগিয়ে যায় সে তাহলে এ জীবনে আর হবে না। দেবতা একবারই দেখা দেন।

শ্রীদামের ছেলে এসে খবর দেয় সন্নিসীবাবা ডাকছে। নবীন ঘোরের ভিতর উঠে বসে। মনের ভিতর দাবানল, সেখানে করম ঠাকুর বসে আছেন। নবীন পায়ে পায়ে এগোয়। সন্ধ্যে নেমে গেছে। ঘোর অন্ধকার এখন। কদিন আগে পূর্ণিমা গেছে, চাঁদ উঠতে দেরী আছে করম ঠাকুরের ভাবনাটা ধাক্কা খেল।

নবীন এসে দেখে সন্ন্যাসীর ঘরের দরজা বন্ধ। এরকমই হয়। এখন বোধয় ধ্যানে বসেছে সন্নিসীবাবা। তারপর বেরিয়ে আসবে, বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলে আবার ভিতরে ঢুকে যাবে। নবীন দরজার সামনে চুপ করে বসে থাকে। এখন ডাকা যায় না।

মিনিট দশেক পরেই ভিতর থেকে ঘন-গম্ভীর স্বর উঠে এল, নবীন এসেছিস?

—হাঁ বাপ।

—আয় ভিতরে আয়।

ঝনাৎ করে দরজা খুলে গেল। দরজার মুখে নিখিলানন্দ। মুখে স্বর্গীয় হাসি। এই হাসি নবীনের সহ্য হয় না। গা ছমছম করে।

—আয় ,ভিতরে আয়।

নবীন ইতস্তত করে। এতদিনে এক বারও তো সন্ন্যাসী তাকে ঐ ঘরে ঢুকতে দেয়নি। সে ঢোকেনি। ঢুকতে সাহস পায় নি। সন্ন্যাসীর চোখে নিষেধ ছিল। আজ নিখিলানন্দ নিজেই ডেকে নিল নবীনকে। ঘরে ঢুকে নবীন আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তার বিস্ময় কাটে না। অনাথ মন্ডলের ঘর, এই ঘরে মণ্ডলের বউ মরেছিল। সেই ঘর আজ দেবতার আশ্রয় হয়েছে। সব বদলে গেছে। মণ্ডলের বউ মরার পর দরজা জানালা বন্ধ থাকত। একদিন ঢুকেছিল নবীন এই ঘরে। সেদিন অনাথ মণ্ডলের বউ মারা গিয়েছিল। সমস্ত ঘরটা হয়েছিল ভয়াবহ।

নবীন চোখ বন্ধ করে। নিখিলানন্দ জোকাজাব্বা পরে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে। সব সৌগন্ধে ভরে আছে। নিখিলা-[illegible]

উপর প্রভাব ফেলুক। ঐ তো নবীন সাঁওতাল চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। মনে ওর ভক্তির ভাব উদয় হয়েছে। এই ঘরে ঢুকলে ঘোর নাস্তিকও দেবতার পায়ে মাথা নোয়াবে। দেবতা হলেন প্রভু পুণ্যব্রতস্বামী। নিখিলানন্দ নিঃশব্দ চরণে এগিয়ে আসে। নিঃশ্বাস ফেলতে হচ্ছে অতি সতর্ক হয়ে। কোন শব্দ যেন না হয়। নবীন সাঁওতাল যে এত তাড়াতাড়ি আবিষ্ট হয়ে পড়বে তা তার ধারণায়ও ছিল না।

নবীনের অন্ধকার চোখে ফুটে উঠছে এক অন্য সময়। তা নিখিলানন্দের জানার কথা নয়। নিখিলানন্দ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

বাইরের আকাশে মেঘ করে এল। আকাশ হয়ে উঠল ছাইরঙা। সময় বদলে গেল। সন্ধ্যে নামার দেরী নেই। ফিসফিসে বৃষ্টি শুরু হল। এই বৃষ্টি কদিন ধরে হরিণাডাঙাতে লেগে আছে ছিনেজোঁকের মত। হরিণডাঙা ঘোর বর্ষায় হয়ে উঠেছে নরক। কে যেন ভিজতে ভিজতে এসে বলে গেল মন্ডলের বউ মরেছে।

নবীনের বউ শুনল সেকথা। শুনে মেয়েমানুষটার মুখচোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নবীন ঘর থেকে বেরোয়। বউ থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে দাওয়ায়। মোঁড়লের কি ভাগ্য। এত পয়সার মানুষ, তবু তার বউ মরে এই অনাছিষ্টির দিনে। নবীন ছোটে শ্রীদামের ঘরে। সেখান থেকে সাহেবরামের ঘরে। ক্রমে পুরো হরিণডাঙাটা জেনে গেল অনাথ মন্ডলের বউ মরেছে। সব অনাথ মন্ডলের জমির চাষী, তার বউ মরলে হাজিরা দিতে হবে। হাজিরা তো দিতে হবেই, একটা মানুষ মরেছে এই গাঁয়ে, বড় মানুষের বউ। এর চেয়ে বড় খবর কি হতে পারে।

মরা বউয়ের সামনে চোখ বন্ধ করে ধ্যানের ভঙ্গিতে বসেছিল অনাথ মন্ডল। বাইরের বৃষ্টি তখন বেড়ে গেছে। নবীন ঘরে ঢুকে মেঝেতে বসে পায়ের বাবলা কাঁটা তুলতে থাকে। গোটা তিনেক কাঁটা ঢুকে গেছে কাদার ভিতর থেকে।

মন্ডলের কি কষ্ট হচ্ছে! কি জানি। মন্ডলের মুখে কোন কথা নেই। চোখমুখ সাদা হয়ে গেছে। বিকেলের মড়া ভোর সকালে বের করা হল। তখন বৃষ্টি একটু ধরেছে। কাঁসাই-এর চরে মন্ডলের বউ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। চিতায় তোলার আগে মন্ডল তার বউয়ের পায়ে আলতা মাখিয়ে ছাপ তুলে নিয়েছিল সাদা কাগজে। সেই ছাপ বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিল এই ঘরে। তারপর দরজা বন্ধ। শুধু অনাথ মন্ডলই মাঝেমধ্যে এই ঘরে ঢুকত। নবীন চোখ খোলে।

এই ঘরের দেয়ালে কলি করা হয়েছে। ভোল বদলে গেছে ঘরের। উত্তরে দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতে পুতুলর খাটের মত এক পালঙ্ক। নবীনের বিস্ময় বাড়ে। মশারী ঝুলছে সেই পালঙ্কে। ব্যাপার কি! অনাথ মন্ডলের বউ মরেছিল না এই ঘরে!

নিখিলানন্দ নবীনের বিস্ময় আন্দাজ করল, হেসে বলল, প্রভুর শয়ান দিলাম। নবীন হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে। একেবারে পাতলা নীলরঙা মশারী, তার ভিতর প্রভুজীর ছবিটা মাথায় বালিশ দিয়ে শয়ান দেয়া হয়েছে।

যে পেরেকে অনাথ মন্ডলের বউয়ের পায়ের ছাপ ঝুলত, সেখানে প্রভুর বড় ছবি। অনাথ মন্ডলের বউয়ের চিহ্নটা ঘর থেকে উধাও। ঘরে ধুপধুনোর গন্ধ ম-ম করছে। হ্যাজাক লণ্ঠন জ্বালিয়েছে নিখিলানন্দ। মানুষ সববদলে দিতে পারে, আগের মত অবস্থা থাকলে এই ঘরে ঢুকতে ভয় হত নবীনের। তার মাথাটা ঝিমঝিম করছে। চোখের সামনে যেন মন্ডলের বউ-এর চোখ দেখতে পাচ্ছে। চোখ খুলে মরেছিল বউটা: তার চোখ দিয়ে পরাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছিল।

—বাপ, ই ঘরে মোঁড়লের বউ মরেছিল। নবীন সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে। নিখিলানন্দ তখন সবে প্রভুর কথা বলতে যাবে, এই সময় নবীনের এই কথা, অনাথ মন্ডলের বউ মরার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। নিখিলানন্দের অন্তরে মেঘ জমতে আরম্ভ করল।

—বাপ মোড়লের বউর খোড়ের ইক ছাপ ছিল দেয়ালে ঝুলোনো, আলতা মরা বউর গোড়ে মাখাই ছাপ তুলি নিছিল মোঁড়ল, সি ছাপ কুথা গিলো? অ'ই প্রভুর ফোটোকের সিখানে ঝুলানো ছিল।

নিখিলানন্দ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে মনে মনে। কিন্তু বলার কিছু নেই। সেসব জঞ্জাল সে সরিয়ে দিয়েছে এ ঘর থেকে। কতসব কুৎসিত ব্যাপার।

—বাবা নবীন, জীবন আনন্দময়, মৃত্যুর কথা স্মরণ করাও কেন?

নবীন লজ্জা পায়, চমকে যায়। সত্যি কথাই তো বলছে সে, শুধু প্রশ্ন। যে জিজ্ঞাসা মনে আনন্দ আনে না সে জিজ্ঞাসা চোখে আনাও পাপ, সন্ন্যাসীজী এই কথা বলেছে। নবীন দেখে উত্তর পুব কোণে ধবধবে বড় মানুষের মত বিছানা, না, সেই খাটটা আছে। পালঙ্ক। ঐ পালঙ্কে একটু আগে কেউ শুয়েছিল, চাদরে ভাঁজ পড়ে গেছে। সাদা চাদর, সাদা বালিশ, সেই নীলরঙা মশারি। ঠিক যেন বড় সড় প্রভুর বিছানা। এই পালঙ্কের শুয়েই তো মন্ডলের বউ মরা গিয়েছিল। একথা তো জিজ্ঞেস করা যায় না। অথচ মনে আসে। পালঙ্কটা দেখেই নবীন চোখের সামনে কাঁসাইয়ের চর দেখতে পেল। সেই চরে অনাথ মন্ডল গম্ভীর হয়ে বসে, সামনে চিতা জ্বলছে হু-হু করে, ঘি আর পোড়া মাংসের গন্ধ মিলেমিশে একাকার। প্রভু যেখানে শুয়েছেন সেখানে একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। মন্ডলের বউ-এর চিতায় অনেক ঘি ঢালা হয়েছিল।

—নবীন চুপ করে কেন? নিখিলানন্দ জিজ্ঞেস করে।

নবীন কি বলবে! এই ঘরে ঢুকলে প্রভুর চেয়ে মন্ডলের মরা বউ-এর কথা মনে পড়ে যায় বেশী করে। সেসব তো সন্ন্যাসীকে বলা যায় না। সে কথা তো মনে আনন্দ আনে না।

—অ'ই পালুঙ্কে শুয়া হয়? মোঁড়লের বউ মরাছিল অ'ই পালুঙ্কে।

নিখিলানন্দ চুপ করে থাকে। সাঁওতালটা এই ঘরে ঢুকে এমন করছে কেন? চোখমুখে তো ভক্তির লেশমাত্র নেই। অথচ সে ভেবেছিল নবীন হেমরমকে আজ প্রথম এই ঘরে ঢুকিয়ে চমকে দেবে। শুধু মৃত্যুর কথা স্মরণ করায় সাঁওতালটা।

—মন থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবনা তাড়াও, শোন প্রভুর আদেশ পেয়েছি।

নিখিলানন্দ সময়মত কথাটা ছুঁড়েছে। কেননা তখন হ্যাজাক লন্ঠনটার পাম্প কমে গিয়ে ঘর আলো অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে। সে চট করে পাম্পটা খুলে দেয়। লন্ঠনটা নিভে যায়। ঘরে শুধু একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে প্রভুর পালঙ্কের সামনে। সব কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে।

নিখিলানন্দ গম্ভীর স্বরে বলে, 'শোন প্রভু অনেক দায়িত্ব দিয়েছেন আমাকে, দায়িত্ব দিয়েছেন তোকেও'

নবীন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এই ঘরে অনাথ মন্ডলের কথা মনের চাঞ্চল্য বাড়াচ্ছে, মরা মানুষের পালঙ্কে সাঁমসী শোয় কি করে?

নিখিলানন্দ নবীনের গায়ে হাত রাখে। নবীনের গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

—কাল একবার কলাবনি যেতে হবে।

নবীন কোনো কথা বলে না, সন্ন্যাসী বলছে যখন যেতেই হবে।

—বাপ্ আপনে যাবে তো?

—হ্যাঁ।

—কখুন।

—দশটায় বেরোব, তুমি যাও এখন!

নবীন হাঁপছেড়ে বাঁচে। কেমন লাগছিল যেন। গম্ গুলোচ্ছিল। সন্ন্যাসী ছেড়েছে না সে বেঁচেছে। কিন্তু মনের ভিতরে যে আনন্দ থাকছে না। জমিজমাগুলো তার জাতভাইদের ছেড়ে দিলেই তো পারে পুণ্যব্রত সংঘ। তাহলে হরিণডাঙার সাঁওতালরাও আনন্দে থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসী তো ছাড়বে না। সন্ন্যাসী ঐ ঘরে অনাথ মণ্ডলের হালে থাকে। তা থাকবেই। জীবনে আনন্দ চাই। নবীনের সব ভাবনা জট পাকিয়ে যায়, এত মানুষ দুঃখে আছে, দেবতারা দুঃখে আছে, তো মনে আনন্দ থাকে কি করে? ঐ ঘরে এখন [illegible]

মণ্ডলের মরা বউ-এর কথা মনে হয় না! সন্ন্যাসী তো সে কথা শুনেছে।

নবীন হেমরম বেরিয়ে যেতেই নিখিলানন্দ নিজে নিজের কাছে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। হিসেবে ভুল হয়ে যাচ্ছে নাকি! নবীনকে এই ঘরে ঢুকিয়ে যে মূঢ় আচরণ করেছে। এখনো সাঁওতালটার মনের যাবতীয় দ্বন্দ্ব দূর করা যায়নি। আজ নবীনকে সে ঘরে ডেকেছিল, ডেকে প্রভুর সামনে বসিয়ে শপথ করাবে এমন একটা উদ্দেশ্য ছিল। তা হল না। নবীন ঘরে ঢুকেই অনাথ মণ্ডলের বউ-এর কথা শুরু করে। তার মন হয়ে গিয়েছে বিক্ষিপ্ত। নিখিলানন্দ তার জোব্বা খুলতে আরম্ভ করে। পাগড়ি গায়ের গেরুয়া পাঞ্জাবী সব খুলে ফেলে, একটা চেককাটা লুঙ্গি পরে বিছানায় বসে। রাতে কিছু খাবে না, বিকেলে সব সারা হয়ে গেছে, আবার রাত সাড়ে তিনটে চারটের সময় উঠে চা খাবে নিজে হাতে স্টোভ জ্বালিয়ে। নিখিলানন্দ বিছানায় বসে বড় বিব্রত হয়ে পড়ে ভাবনায়।

পুণ্যব্রত সংঘের হাইকমাণ্ড থেকে চিঠি এসেছে, চিঠি নয় আদেশ, কোন রকমে হরিণডাঙা ছাড়া চলবে না। পঞ্চাশ বিঘে বিউটিফুল ল্যাণ্ড, প্রাসাদের মত বাড়ি, পুকুর বাগান এসব ছাড়া চলবে না। মেদিনীপুর জেলার সবচেয়ে বড় আস্তানা করতে হবে হরিণডাঙা। প্রভু যদিও জেলে আছেন, কিন্তু মুক্তি পাবেন একদিন। তিনি এসে কাজের হিসেব চাইলে দেওয়া যাবে না। হাতে পাওয়া লক্ষ্মী ছাড়া চলবে না। গ্রামের যুবক কিশোরদের ভিতর ইনফ্লুয়েন্স চালাও, তাদের সংঘের ভিতরে নিয়ে এস। সমবেত করে লাঠি খেলা ছুরি চালানো শেখাও। খুব বিশ্বাসী লোককে আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া যেতে পারে। নজর রাখতে হবে ভালভাবে। এ সব আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন। এখন বিশ শতকের শেষ, প্রভুজীর মতাদর্শকে ছড়িয়ে দিতে হলে মার খেয়ে ফিরে আসলে চলবে না। সে সব খ্রীষ্টের সময় চলত, এখন আত্মরক্ষা জরুরী। যখন তখন আঘাত নেমে আসতে পারে। যুবকদের একই সঙ্গে সন্ন্যাসী এবং সৈনিক করে গড়ে তোল। প্রভুই পৃথিবীর রক্ষাকর্তা এটা বুঝিয়ে দাও।

নিখিলানন্দ হরিণডাঙার ট্রুবল নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট করেছিল উপরে। সেই রিপোর্টেরই জবাব এসেছে এই রকম। বড় চিন্তা হয়ে গেছে। সন্ন্যাস জীবন সমস্ত জাগতিক চিন্তা মুক্ত জীবন। কিন্তু নিখিলানন্দের [illegible] জীবন বিড়ম্বিত হয়ে উঠছে। বিড়ম্বিত অবস্থায় প্রভুর চরণে কপাল ঠেকিয়েও স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। নিখিলানন্দ উঠে দেয়ালে [illegible] জ্বালিয়ে দেয়। পালংকের নিচ থেকে [illegible] টেনে বার করে। কোমর থেকে চাবিটা নিয়ে ট্রাংকটা খুলে ফেলে হাত ঢোকায় অন্ধকারে, হাতে শীতল স্পর্শ। ধাতব নলটায় হাতের তালু রেখেছে সে। সে স্বস্তি পায়, প্রতি রাতে একবার করে দেখে নিতে হয় রিভলবারটাকে। চুরি গেলে সর্বনাশ।

আজ নবীনকে প্রভুর পায়ের কাছে বসিয়ে শপথ করিয়ে ছুরি আর লাঠি খেলার বিষয়টা বলবে বলে ভেবে রেখেছিল নিখিলানন্দ। বুঝিয়ে দেবে ভেবেছিল প্রভুই পৃথিবীর রক্ষাকর্তা। আর কিছু লোককে সংঘের আওতায় আনার জন্য নবীনের সঙ্গে পরামর্শের কথা ভেবেছিল নিখিলানন্দ। কিছু ট্রাইবাল এবং কাস্ট-হিন্দুকে সংঘে এনে এখানকার ইউনিটটার শক্তি বাড়াতে হবে। কিছুই হল না। সাঁওতালদের মন পাওয়া ভার, এতটুকুও জটিল নয়।

কয়েকজন বৃদ্ধ বাঙালী হিন্দু এখানে সংঘের আওতায় এসেছে। তারা সন্ধ্যায় উপাসনায় বসে নিজেদের বাড়িতে। নিখিলানন্দ এক একদিন সেখানে পায়ের ধুলো দেয়, নিখিলানন্দকে দেখে তারা ধন্য হয়ে যায়। ট্রাইবালরাই ভীষণ মারমুখী এখানে। একমাত্র নবীন হেমরম ছাড়া আর কেউ সংঘের ভিতরে আসেনি। অনাথ মণ্ডলের জমিই বোধ হয় তার একমাত্র কারণ।

সাঁওতালরা বড় বিশ্বাসী। নিমকহারামি করে না। তাই নবীন হেমরম এখনো তার সঙ্গে আছে। নবীনের বিপদের দিনে নিখিলানন্দই তো পাশে দাঁড়িয়েছিল, নবীন সেটা ভুলতে পারে না। অথচ নিখিলানন্দ জানে, নবীন ও অনাথ মণ্ডলের জমির চাষী। এই চাষের মরশুমে নিখিলানন্দ মজুর এনেছিল বাইরের মৌজা থেকে। কাউকে মাঠে নামতে দেয়নি আদিবাসীরা। নবীনকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে জমিতে নামার চেষ্টা করেছিল পুণ্যব্রত সংঘ। ব্যর্থ হয়েছে। নবীন সে ক-দিন ঘর থেকে বেরোয়নি।

সুতরাং জমি নিখিলানন্দর চাষ করা হয় না। সব আদিবাসীরা দখল করে নেয়। তারাই চাষ করেছে। তারাই ধান কেটেছে। সন্ন্যাসী বুঝেছে জমির মালিকানা পুণ্যব্রত সংঘ না পেলে জমিতে সহজে নামা যাবে না। দলিল ভুয়ো বলে দশজনে চিৎকার করছে। এখন প্রথমেই তাদের চিৎকারটা থামানো দরকার। তাই কলাবনিতে বার বার দৌড়ন। আগের অফিসার নির্মল মজুমদার সব জানত। তাকে দিয়ে কিছু করা যায় নি। নতুন লোকটা কেমন জানা যায়নি। আগের দিন তো দেখাই হয়নি। যেন তেন প্রকারেণ জমির মালিকানা পেতেই হবে। তা হলেই অনেকটা হবে।

নিখিলানন্দ চুপ করে বসে থাকে। গরম লাগছে। বেশ গরম পড়েছে। সে জানালাটা খুলে দেয়, ঝট করে চোখের সামনে এক আকাশ তারা নিয়ে হরিণডাঙা জেগে ওঠে। সে নিশ্চুপ অন্ধকার হরিণডাঙার দিকে তাকিয়ে থাকে। একই রকম, সামান্য অদল-বদল। মাটির গন্ধ সব জায়গায় এক রকম। আকাশ সব জায়গায় এক রকম। এখানে যে আকাশ যে সব নক্ষত্র, সেই সুদূর বসিরহাট পেরিয়ে দন্ডীরহাট গ্রামেও সেই আকাশ সেই নক্ষত্র। ওখানে এখন কেউ না কেউ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কে ভেবেছিল এইভাবে এইদিনে দন্ডীরহাটের বিভূতি মন্ডল সুদূর মেদিনীপুর জেলার দুর্গম অরণ্যাঞ্চলে বসে আকাশ দেখবে।

দন্ডীরহাটে এখনো সবাই আছে। মায়ের খবর বাবার খবর প্রিয়জনদের খবর বিভূতি জানে না। এখন বিভূতি কোথায় থাকে তারা কেউ জানে না। বিভূতি চিঠি দেয় না, কোন ঠিকানা জানায় না। ভয়ঙ্কর ভাবে নিষেধ আছে সংঘের তরফ থেকে। সংঘের ডিসিপ্লিন খুব কঠোর।

কলকাতায় একজনের কাছে চাকরীর জন্য মাস তিনেক ঘুরেছিল বিভূতি। লোকটা আজ আসতে বলে, কাল আসতে বলে। কখনো আশাভঙ্গ করায় না। এক রবিবারে সেই কৈলাশ দত্ত যেতে বলেছিল, বলেছিল এইদিন নিশ্চিত সব খবর দেবে। চাকরী হবেই। সকাল আটটার সময় পৌঁছতে হবে পাইকপাড়ায় কৈলাশের বাড়ি। সে ফার্স্ট বাস ধরে পৌনে আটটায় নেমে পড়েছিল পাইকপাড়ায়। তারপর কৈলাশের বাড়ি গিয়ে সোজা উপস্থিত। চমকে গেল, কৈলাশ নেই। কৈলাশের বউ মুখে ব্রাশ করতে করতে বলল, এগারোটা নাগাদ আসবেন দেখা হতে পারে।

বিভূতির চোখমুখ কালো হয়ে যায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—ব্যবসার কাজে বেরিয়েছে, সেই কখন। আমিও তখন ঘুম থেকে উঠিনি।

কৈলাশের বউ বিভূতির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। বিভূতি আস্তে আস্তে নেমে আসে। বউটা এত বেলায় ঘুম থেকে উঠেছে। বয়স কম। বিভূতির মথোটা ঝিম ঝিম করতে থাকে, কি করবে। কেমন যেন সন্দেহ হয় মনে। কৈলাশ বেরিয়ে গেছে ভোর ভোর, এই রবিবারে, বউও ঘুম থেকে ওঠেনি তখন। যুবতী বউ। অথচ বলছে এগারোটা নাগাদ দেখা হতে পারে। নতুন বিয়ে করেছে কৈলাশ। বউকে না জাগিয়ে বেরিয়ে গেছে? কোন রোববারে তো বেরোয় না।

সামনে বাজার, রাস্তাটা ঘুরেছে এখান থেকে। সেই জায়গায় বিভূতি দাঁড়িয়ে থাকে। বাজার করতে বেরোবে নিশ্চয়ই কৈলাশ। রোববারের ভালমন্দ খাওয়া।

একটা মিষ্টির দোকান থেকে চা আর [illegible] খেয়ে [illegible] চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মে মাসের রোদ্দুর ক্রমশঃ চড়া হতে থাকে। অপমানে মুখ চোখ কালো হয়ে যায়। রাস্তার কোন মানুষ লক্ষ্য করছে না, যে একদৃষ্টিতে কৈলাশের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। কৈলাশ প্রিন্টিং-এর ব্যবসা করে। টাইপ ফাউণ্ড্রি আছে ওর। বেশ পয়সা করেছে এরমধ্যে।

আর তিরিশেই মাথায় টাক পড়তে আরম্ভ করেছে। বিভূতি তখন বছর চব্বিশের। ক'দিনের ঘটনা, বছর চারেক হল। বি.এ পাশ করে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে বসে আছে।

একটু পরেই চমকে ওঠে সে। যা ভেবেছে ঠিক তাই। বউকে পুতুলের সাজিয়ে তার সঙ্গে কৈলাশ দত্ত বেরিয়েছে, তখন বড়জোর নটা। হাসি উথলে পড়ছে দুজনের মুখে। বউ হাসতে হাসতে রাস্তার মধ্যেই ঢলে পড়ছে কৈলাশের গায়ে।

বিভূতি আর এগোয় না। পায়ে পায়ে ফিরে আসে। ইচ্ছে হয়েছিল দিশাখোর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, জিজ্ঞেস করবে ঘুম ভাঙলো কখন? কিন্তু ইচ্ছেটা সামলে চলে এসেছিল সেখান থেকে। তাকে চাকরী দেওয়ার দায় নিয়ে কৈলাশ জামাইদিন। ওরা দুজনে এখন বাজারে যাবে, ভালোমন্দ কিনবে। ডিস্টার্ব করা কেন?

সঙ্ঘের লোকজনের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল আগেই। দন্ডীরহাটে-- এসে ওদের দুজন সন্ন্যাসী আস্তানা করেছিল। বিভূতি সেখানে যেত, ওদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে সময় কাটাত। উপাসনা ভাল লাগত, ভাল লাগত ওদের শৃঙ্খলা বোধ। আলাপ ক্রমে গাঢ় হয়ে গিয়েছিল, শুধু এই জীবনের কথা ভাবতে বিভূতি ভয় পেত। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে. তাদের জীবনযাপন কল্পনা করতে ভাল লাগে দূরে থেকে। কিন্তু সন্ন্যাসী হওয়া। সে সম্ভব নয়।

সে রাতে দন্ডীরহাটে ফেরার পর সন্ন্যাসীদের খপ্পরে পড়ে গেল বিভূতি। সারারাত ওদের কাছে ছিল সে। এইভাবে জীবন নষ্ট করে লাভ কি। প্রভাত আনন্দ বড় কর্তব্য আছে পৃথিবীর মানুষের উপর, একথা প্রভু পুণ্যব্রত স্বামী বলেছেন। চাকরী বিভূতির হয়ত একদিন হবে কিন্তু তারপরেও তো দিনগত পাপক্ষয় করা, বিবাহ করা, সন্তান উৎপাদন, স্ত্রী-পুত্রের পালন এবং বৃদ্ধ হওয়া, এছাড়া মানুষের কাজ কি? এরই ভিতর নানান জাগতিক সমস্যায় বিব্রত হয়ে চুল পাকবে, ঝরে যেতে হবে অল্প বয়সে। মানুষটা যখন মারা যাবে, তখন কেউ হা হুতাশ করবে না। পৃথিবীর একটি কীট পতঙ্গও তার জন্য ভাববে না, না, মানুষটা সারা জীবন সংসার প্রতিপালন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতা কোন মানুষকে মহান করে তোলে না। মহৎ আদর্শ রূপায়নে মানুষ মহৎ হয়।

ঐ মানুষটার পৃথিবীতে জন্ম এমন কিছু জরুরী ছিল না। না জন্মালে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হত না জগতের। মানুষের জন্ম [illegible] জন্য। আর দশটা অন্ধ মানুষকে চক্ষুদানের জন্য। মলিন শরীরে শক্তি প্রদানের জন্য। মানুষ এটা মনে রাখে না।

এই সংসার দুঃখের সমুদ্র। ব্যাধি জরা মৃত্যুর দ্বারা শাসিত। প্রভু পুণ্যব্রত স্বামী এই শাসন শোষণের অবসান করে জগৎ আনন্দময় করে তুলবেন। অমৃতলোক থেকে নামিয়ে আনবেন এক পরম আনন্দময় নদী। সেই নদীতে অবগাহনে মানুষ পরিশুদ্ধ হবে। ইনি পথভ্রষ্ট পথিককে তার ঠিকানা জানিয়ে দেবেন, দুঃখের আগুনে পীড়িত মানুষের মাথায় স্থাপন করবেন সুবিশাল মেঘখন্ড, সেই মেঘ বৃষ্টি নামাবে। মানুষ শীতল হবে। ইনি তৃষ্ণা এবং মোহের অন্ধকার বিদীর্ণ করে পরম আলোকজ্যোতি বিচ্ছুরিত করবেন। পৃথিবী শোকতাপ বন্ধন মুক্ত হয়ে আনন্দের হবে। মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে।

প্রভুর পথই শ্রেষ্ঠ পথ। আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন। পরম আনন্দের উপাসনান্তে মহৎ করে তুলুন আপনার আত্মাকে। আর্তজন আপনার দিকে চেয়ে আছেন। প্রভু আপনাকে স্মরণ করছেন, তাই আপনি এত উদ্বেল।

সমস্ত রাত কেটে যায়। সকাল হয়। বিফল হয়ে বাড়ি ফেরে বিভূতি। সারাদিন চোখের পাতা এক করে না, চোখ টকটকে লাল হয়ে ওঠে। ঘর-বাড়ি প্রিয়জনকে বড় কুৎসিত বলে মনে হয়। সাংসারিক নিয়মকানুন, ব্যবহার, প্রথা সব অনর্থক মনে হয়। সমস্ত বাড়িটা পূতি গন্ধময় মনে হতে থাকে। মানুষের শরীর থেকে কুৎসিত গন্ধ ওঠে।

বাস্তুর সীমানা নিয়ে কাকার সঙ্গে বিবাদ ছিল বহুদিন। বাবা সেই বিষয়ে সন্ধ্যেবেলায় বিভূতিকে পরামর্শের জন্য ডাকেন। বিভূতি ওঠে না। সব খা খা করে। বুকের ভিতরটা হাল্কা হয়ে গেছে, ধু ধু মাঠ। এইসব সাংসারিক সম্পর্ক যুযুধান মানুষগুলো একদিন মারা যাবে। তারপর এই বাস্তুভিটে ভাগ হতে হতে অনুপরমাণুতে পরিণত হবে। একদিন সব চিহ্ন মুছে যাবে, এখানে হয়ত গড়ে উঠবে প্রশান্ত রাজপথ, অথবা নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে বয়ে যাবে এখান দিয়ে। সব বিলীন হয়ে যাবে। তখন কে মনে রাখবে এইসব ঘটনার কথা। সীমানা নিয়ে এই বিরোধের নিষ্পত্তি হলে মানুষের কতটুকু উপকার হবে। দলিলদস্তাবেজ সব পোকায় কেটে শেষ করবে. এই জন্য এতবড় জীবন ব্যস্ত রাখা মূঢ়তা।

সেই রাতে সে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করে। চিঠি রেখে আসে মায়ের উদ্দেশ্যে 'সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিব বলিয়া মনস্থির করিয়াছি, আমাকে আর পাইবেনা, প্রণাম লইয়ো। ইতি । বিভূতি

রাতেই পুণ্যব্রত সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা প্রাইভেট কারে দন্ডীরহাট ত্যাগ করে। গাড়ি কখন কোথেকে কিভাবে এল বিভূতি জানে না. শুধু এক বস্ত্রে সে তাদের সংগী হয়। কলকাতা থেকে সোজা বাঁকুড়ার নতুন ডি গ্রামে। কঠোর নির্দেশ ছিল তার পূর্ব পরিচয় যেন কেউ না জানে। বাড়িতে চিঠি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ হলো নতুন জন্ম। আগের জীবন দুঃস্বপ্নময়। সে জীবনের কথা একেবারে মুছে ফেলতে হবে মন থেকে।

দন্ডীরহাটের বিভূতি মন্ডল হয়ে গেল নিখিলানন্দ। গায়ে গেরুয়া বসন চাপল। শিখতে হল লাঠি চালানো, অসিযুদ্ধ, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার।

রাতে কোথেকে কিভাবে এল বিভূতি জানেনা, শুধু একবস্ত্রে সে তাদের সঙ্গী হয়। গ্রামে। ঠোর নির্দেশ ছিল তার পূর্ব পরিচয় যেন কেউ না জানে। বাড়িতে চিঠি দেওয়ার প্রয়োজন নে।

অস্ত্র শিক্ষায় বিভূতি প্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, 'এসব কেন?'

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। উত্তর আসে সংক্ষিপ্ত অথচ গম্ভীর।

সন্ন্যাসীদের আত্মরক্ষার ভয় কেন?

পুণ্যব্রত জীবন বড় কঠিন, এসব অতি-প্রয়োজনীয়।

আরো অনেক প্রশ্ন জেগেছিল তার ভিতরে, কিন্তু একটারও জবাব নেই। নিজের অভিজ্ঞতার সমস্ত প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে এই কথাই শুনেছিল।

বাঁকুড়ার পর বীরভূম. সেখান থেকে পুরুলিয়া, মালদহ, শেষে আবার বাঁকুড়ায় ফিরতে হয়। বাঁকুড়া থেকে এই আদিবাসীদের, হীরণডাঙ্গায়। অনেক বড় দায়িত্ব দিয়েছে তাকে সংঘ। এই দায়িত্ব পালনে সফল হলে পদোন্নতি নিশ্চিত, না হলে। নিখিলানন্দ জানে না না হলে কোথায় যেতে হবে। সংঘ ত্যাগ করা ইহজীবনে সম্ভব নয়। তাতে করতে চায় না সে।

রাত গাঢ় হয়ে উঠেছে। অন্ধকারে হীরণডাঙ্গা নিথর। দূরে কোথাও মাদলের শব্দ উঠেছে। এই শব্দ বড় মায়াচ্ছন্ন করে দেয়। নিখিলানন্দের ইচ্ছে হয় ওখানে গিয়ে দাঁড়ায়। সম্ভব নয়। আদিবাসীরা তাকে বিশ্বাস করে না, সেও আদিবাসীদের উপর ক্রুদ্ধ। এখন রাতের অন্ধকারে অনাথ মন্ডলের জোতজমি সব একা একা পড়ে আছে। জমি-জমা যদি চাষ করে দেওয়া যেত তবে তাই করত নিখিলানন্দ। সব তুলে নিয়ে উপহার দিত সংঘকে পরিবর্তে সংঘ তার আনন্দের ব্যবস্থা করত। মূল উদ্দেশ্যই জীবনকে আনন্দময় করে তোলা, যে পথে হোক। তা শুরু গেছে বিভূতি মন্ডল। দন্ডীরহাটের বিভূতি মন্ডল আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। সংসারে থাকলে এতটা বদল হত না।

(ক্রমশ)

গোপাল দফাদার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও মহারাণী স্বর্ণময়ী

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

সবটা নয়, নিজের অংশটুকু। এদিকে কলকাতায় আত্মীয় ও আশ্রিতের বিপুল পোষ্য, তিনশ টাকায় চলে না। খুব কষ্টে পড়ালেন মণীন্দ্রচন্দ্র। মামীমার ওপর অভিমান করে তিনি বহরমপুর ছেড়ে চলে গেলেন। কলকাতায় নয়, একেবারে বর্ধমানে নিজের পৈতৃক গ্রাম মাথরুনে। রাগ করে বললেন—'গরীবের ছেলে আমি হালবলদ নিয়ে চাষ করব, মোটা ভাত মোটা কাপড় সম্বলই আমার ভাল।' কিন্তু ওই পর্যন্তই। অল্প দিনেই মালুম হ'ল কাজটা ভালো করেন নি। পরিশেষে নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখলেন। ব্যাস, গোলমাল মিটে গেল, সম্পর্ক স্বাভাবিক হ'ল। এই ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিমত্তা ত—র শ্বশুরকুলের কেউ সুনজরে দেখতে রাজি ছিলেন না, কেন না, স্বর্ণময়ী নিজে যেমন ভোগবিলাসবিমুখ ছিলেন, মা। সে আমলে ত বটেই, তার পরের যুগেও কাশিমবাজার রাজ পরিবারের আত্মীয় পরিজন স্বর্ণময়ী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে এসেছেন। সোমেন্দ্র একথা বলেছেন এবং তিনি এও বলেছেন যে, পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে দেখছেন যে, কী ভুলই তাঁরা করে গিয়েছেন। স্বামীর বিলাসবাসনের দিকটা বর্জন করে' শিক্ষা ও জনকল্যাণের আদর্শকে মহৎ করে তোলার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তিনি—এটাই হ'ল আসল কথা। ইংরেজি শিখলে বা বিদেশীয় বিজ্ঞানের আধুনিক খোঁজ-খবর রাখলে স্বর্ণময়ীর আরাধ্য দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ কুপিত হবেন এমন কোনো অন্ধ সংস্কার তাঁকে আচ্ছন্ন করে নি, তাই দেখা যায় উনিশ শতকের [illegible] ভাগে প্রকাশিত রসায়ন, পদার্থ বিদ্যার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে, তৎসময়ে প্রকাশিত [illegible] পত্র পত্রিকার গ্রাহকও তিনি ছিলেন।

এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণার্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই প্রমুখ বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে তিনি চিঠিপত্র ও প্রতিনিধি মারফৎ যোগাযোগ রাখতেন।

পারিবারিক সূত্রে তাঁর প্রগতিবাদী মনের পরিচয়ও আমার জানা আছে। আমার পিতামহ শশিভূষণ বিদ্যাবাগীশ মশাই স্বর্ণময়ীর সভাপণ্ডিত হয়ে নদীয়া জেলার শ্যামনগর চিপাখালি থেকে কাশিমবাজারে আসেন। তিনি শাস্ত্রমতে বিলাতযাত্রা নামে একটি যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধ ছাপিয়ে প্রচার করেন। তার ফলে মুর্শিদাবাদের গোঁড়া পণ্ডিত সমাজে তাঁর অখ্যাতি হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু স্বর্ণময়ীর দরবারে মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। তখনকার যুগে সংস্কৃত বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি শাস্ত্র, কাব্য ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা শশিভূষণের বাড়ির টোলে ছিল। শশিভূষণকে দিয়ে পাশচাত্য মতবাদী ভাবলে ভুল হবে। তাঁর রচিত স্মার্তসর্বস্ব গ্রন্থ বাংলা ১৩০৪ সালে সৈদাবাদ বিশ্ববিজয় মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকে আমলে বহরমপুর থেকে মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং বলা বাহুল্য যে, যাঁরা এইসব কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তাঁদের মধ্যে স্বর্ণময়ীর দান সবচেয়ে বেশি ছিল। আবার খাগড়ার মিশনারি স্কুল বা কলকাতার বেথুন স্কুল কিম্বা বিশপ হেয়ারের বক্তৃতাবলী অনুবাদ কাজের জন্য তিনি প্রচুর টাকা দিয়েছেন। এ থেকে মহিলার দৃষ্টিভঙ্গী যে কতদূর সংস্কারমুক্ত এটাই প্রতিফলিত হয়।

বহরমপুর কলেজ পত্তনের প্রসঙ্গে ফিরে আসতে হবে, খুব সঙ্গত কারণেই। মুদ্রণ যন্ত্রের দৌলতে যেমন হাতে লেখা পুঁথির আধিপত্য খর্ব হয়েছে, তেমনি ইংরেজি শিক্ষার দিকে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দৃষ্টি পড়েছে রুজি রোজগারের রাজপথ মেলে স্কুল-কলেজে পড়তে পারলে অতএব চতুষ্পাঠির আদর গেল। এবং যেহেতু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার আগে বাংলার বিদ্যমান শিক্ষাকেন্দ্রের অন্যতম ছিল এই কলেজটি সেহেতু আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিবর্তনে এর অবদান যথেষ্ট।

১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠার সময়ে কলেজের নিজস্ব ভবন ছিল না, মিলিটারি দপ্তরের পুরানো ব্যারাক বাড়ি মাসিক ৪০ টাকায় ভাড়া করা হল। লম্বা হল ঘরের মধ্যে একই সঙ্গে একাধিক শ্রেণীর ছাত্রদের ক্লাস নিতেন বিভিন্ন শিক্ষক—তাঁদের একজনের ভারি গলার তলায় হয়ত অন্যের দুর্বল কণ্ঠ চাপা পড়ে যেত। পিরিয়ড শেষ-শুরুর সংকেত দিতে ঘড়িঘণ্টা নেই, লাইব্রেরির বই রাখার আলমারি, বিজ্ঞান বা ভূগোলের সাজসরঞ্জাম সব কিছুরই অভাব —তাতে কিছু যায় আসে না, অদম্য উৎসাহ আছে। অবিশ্যি এ শহরে ব্যাপক ম্যালেরিয়ার ধাক্কায় ছাত্রদের গরহাজিরার বহর দেখে একবার কলেজ হপ্তা দুয়েক বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এই ভাবেই চলছিল কিন্তু ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখা দিতে সামরিক কর্তৃপক্ষ বললেন আমাদের ব্যারাক ঘর ছেড়ে দাও। ১৮৫৬ সালে সুজাপুরে ভার্দন মোনাসাঁগ-এর দোতলা কুঠিতে কলেজ আবার জোরদারভাবে শুরু হল। এবার আর সাঁওতাল বিদ্রোহ নয়, সিপাহী বিদ্রোহ। ১৮৫৭ সালের শীতের শেষ দিকে এক বিকেলে বহরমপুরের সিপাহীরা দাঁত দিয়ে কার্তুজের মুখ কাটতে রাজী হল না, কমাণ্ডাণ্ট হুকুম অমান্য করার অপরাধে ওদের কোর্ট মার্শাল করার হুমকি দিল।

ওপরওয়ালার হুকুম মানতে সিপাহীদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু জাতধর্মের চেয়ে ত বড় নয় ওপরওয়ালা। কার্তুজে নাকি গরুর চর্বি আছে, দাঁত ঠেকানো গোমাংস খাওয়া ত একই—ফিরিঙ্গিরা এইভাবে তাদের জাত মেরে দিতে চায়। তাদের আপত্তি এই জন্যই। কর্ণেল মিচেল গভীর রাতে মশাল জ্বালিয়ে মাঠের মাঝখানে সিপাহীদের গোপন জমায়েতে হাজির হয়ে অনেক বুঝিয়ে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা ঘোচালেন। সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে কলেজের-কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের কোনো সম্পর্ক ছিল না এমন কি যেসব দেশীয় সিপাহী ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁরা যে ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন না সুস্পষ্ট প্রমাণ হল, তাঁদের ছেলেরা একদিনও ক্লাস কামাই করেনি। যতদিন পর্যন্ত তাঁরা বহরমপুরে ছিলেন ততদিন ছেলেরা আগের মতই ক্লাস করেছে। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ এঁদের ব্যারাকপুরে বদলি করল। তার ফলে কলেজের-স্কুলের মোট ২৪৪ জনের ছাত্র সংখ্যা থেকে চল্লিশ জন পড়ুয়া কমে গেল। সামরিক দপ্তর হঠাৎ একদিন কলেজের বাড়ি খালি করার নির্দেশ দিলেন। ওখানে সৈন্যদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এক ঘণ্টার নোটিস। মানোয়ারী গোরার জুলুম আর কাকে বলে। তাতেই কি শান্তি আছে এর কিছুদিন পর বলা হল নতুন আস্তানার বাড়িটা ভেঙে ফেলা হবে।

১৭৫৭ সালে এই মুর্শিদাবাদের পলাশীর প্রান্তরে ভারতের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। ঠিক তার এক শ বছর পরে ১৮৫৭তে সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। আবার একই বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পত্তন। বহরমপুর কলেজের তবু ত স্থায়ী না হোক অস্থায়ী একটা আস্তানা ছিল, কিন্তু ওই সময়ে ভারতের তাবৎ শিক্ষা জগতের অভিভাবক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরতো সেটুকু জমিও নাস্তি। বিশ্ববিদ্যালয় আসলে পরীক্ষা নিয়ামক প্রতিষ্ঠান। সিনেট, সিন্ডিকেটের অধিবেশন হত আজ এখানে ত কাল সেখানে। কলকাতায় পরীক্ষা নেওয়া হত কখনো টাউন হলে, কখন তাঁবু খাটিয়েও নেওয়া হয়েছে। সে যাই হোক বহরমপুর কলেজের মাথা গোঁজার সমস্যা ত রয়েই গেল। কি করা যাবে ? কেন বানজেটিয়াতে স্বর্ণময়ীর বাড়ি যেখানে কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সেটা ত পড়ে আছে। তথাস্তু। মাসে ১২০ টাকা ভাড়া ঠিক হল। সবই ঠিক হল কিন্তু শহর থেকে অতদূরে ছেলেদের আসা-যাওয়া, বিশেষ করে বর্ষাকালে ত বটেই, মহা সমস্যা। মাস কয়েকের মধ্যেই কলেজকে আবার ফিরিয়ে আনা হল শহরে। আবার সরকারী ব্যারাকই ভরসা। অর্থাৎ যে কোন সময়ে যে কোন অজুহাতে কলেজের পাততাড়ি গুটোনোর ভয় মাথার নিয়ে। ছ বছর বয়সের মধ্যে দশবার কলেজকে বাড়ি বদল করতে হয়েছিল। বেদেরা টোল ফেলার মত। তা হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

১৮৫৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা হয়—সারা ভারতের মোট ১৩টি কেন্দ্রের মধ্যে একটি পরীক্ষা কেন্দ্ররূপে বহরমপুর কলেজকেও নেওয়া হয় এবং এই কলেজের ছাত্র হরকান্ত বাগচী উত্তীর্ণ প্রথম কৃত ছাত্র, তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন।

পড়ার চাড় যত না হোক মাত্র তিনখানি ঘরের অল্প জায়গার মধ্যে দুশোর ওপর ছেলেকে খোঁয়াড়ে আটক রাখার ফলে যে হৈ হট্টগোল হত সংলগ্ন এলাকার সরকারী কাজকর্মে নাকি ভয়ানক অসুবিধে হত। বার কয়েক অফিস থেকে আরদালি পাঠিয়ে কর্মনিষ্ঠ আমলারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ অভিযোগ জানিয়েছিলেন। অবশ্য বাড়ি তৈরির জন্য তাঁরাও উঠে পড়ে লেগেছিলেন। জনসাধারণ কিছু চাঁদা দিয়েছেন, বলাবাহুল্য যে চাঁদার মধ্যে স্বর্ণময়ী ছিলেন, সরকারও দিয়েছেন টাকা। কিন্তু ঠিকেদার ব্রাডবেরি দেউলিয়া ফাঁকে দিয়ে আবার ফ্যাসাদে ফেললেন। দেখা যাচ্ছে ১৮৫৯ সালের শীতে ছ্যাঁচা বেড়ার তৈরি ১১টি ক্লাস রুম, যন্ত্রপাতি রাখার আর লাইব্রেরির একটি করে তা ছাড়া একটি ৫০′—২০′ হল ঘর বানিয়ে স্কুল ও কলেজের নিজস্ব ভবন তৈরি হল। গঙ্গার উন্মুক্ত প্রান্তরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া কনকনে হু হু হাওয়ার কামড়ে হাড়ে হাড়ে বাদ্যি বাজে—তা হোক এখান থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে না কেউ। তার চেয়ে বড় কথা, ১৮৫৮ সালে জুনিয়র বৃত্তি পেয়ে যে এগারজন ছাত্রের কলেজে পড়ার সুযোগ মেলে তাঁরা এই কুঁড়ে ঘরেই লেখা পড়া করেন। বৈকুণ্ঠনাথ সেন তাঁর স্মৃতিকথা লিখছেন—আমি, বাবু নফরচন্দ্র ভট্ট এবং তারাবিলাস মিত্র এই কুঁড়ে থেকেই সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিই—আমরা মাসিক কুড়ি টাকা করে বৃত্তি পেয়েছিলাম। তারও আগে ১৮৫৬ সালে কলেজিয়েট স্কুল, বাউলিয়া স্কুলের যে ৯ জন ছাত্র আট টাকা জলপানি পেয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন রাজকুমার সরকার, তাঁরই পুত্র ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার। নফরচন্দ্র ভট্ট এবং তারাবিলাস প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে যোগ দিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ আইনজ্ঞ এবং দেশনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। নফর চন্দ্রের পুত্র অধ্যাপক বিভূতিভূষণ ভট্ট এবং কন্যা নিরুপমা দেবী বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কছে সুবিদিত।

বহরমপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে সারা জেলাতে গোরাবাজার, কাঁদি, গোকর্ণ, বালুচর, লালবাগ, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে স্কুল খোলা হল, এর পিছনে স্থানীয় বাসিন্দাদের উৎসাহই কাজ করে, সেই সঙ্গে সরকারী সাহায্য যুক্ত হয়। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে লবণ ব্যবসায়ী, রেশম ও নীলের কারবারী এবং জমিদারের দান বেশি। আর পড়ুয়ারও অভাব হল না তার কারণ সাবেকী চতুষ্পাঠী বা পাঠশালার শিক্ষা নিয়ে চাকরির বাজারে জুৎ করা যায় না অথচ দেখা যাচ্ছে যে, পেটে কিছু ইংরেজির আঁচড় থাকলে ইজ্জতের চাকরি অনায়াসে মেলে।

তখনকার দিনে গরীবের ছেলেদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ থাকলে পয়সার অভাবে তা ঠেকত না, সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর মহিলা ও পুরুষেরা প্রত্যেকেই ২।১ জনের মাইনে, বইপত্র ইত্যাদি বাবদ মাসিক বা বার্ষিক অর্থ জুগিয়ে যেতেন। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে এসে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের আশ্রয়ে থেকে খেয়ে লেখাপড়া করারও রেওয়াজ ছিল। আজকের দিনে নিঃস্বার্থভাবে ওই ধরণের অনাত্মীয় পোষণ ধারণাতীত।

। তিন ।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে কর্তৃত্ব নিয়ে নেওয়া হয়েছে, খাশ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সরকার ১৮৫৮ সাল থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংল্যাণ্ডের মুরুব্বিদের মধ্যে দুটো শিবির তৈরি হয়েছিল—এক দলের মত, এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী নেটিভদের মধ্যে পশ্চিমী শিক্ষার প্রবর্তন। আর একদলের ঠিক উল্টো ধারণা, তাঁরা বললেন, কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় পর্যন্ত পশ্চিমী শিক্ষার বিস্তার করতে পারলে ১৮৫৭-র মত দ্বিতীয় কোনো বিদ্রোহ কোনোদিন হতে পারবে না।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচী নিয়ে ভাবতের ইংরেজ মহলেও মতবিরোধ দেখা দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁতুড়ঘর

স্বর্ণময়ীকে লেখা মধুসূদনের চিঠি

[illegible]

মি. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[illegible]

Michael M. Datta, Esqr.
Barrister-at-Law
High Court
Calcutta.

তখন কল্পনায় ছিল না, ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকেই বিদেশী শিক্ষার যাঁরা সূচনা করেছিলেন সেই মিশনারিরা দেখলেন খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারের কিছুবিসর্গও এই শিক্ষানুচীতে ঠাঁই পায় নি, অতএব তাঁরা ক্ষুব্ধ হবেন এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিক মনোভাবাপন্ন শিক্ষাব্রতীদের উদ্দেশ্য ত ধর্ম প্রচার নয়, ধর্ম নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞান বিস্তার। তাঁরা ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ প্রণয়নে ব্রতী।

ন বছর ধরে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনার পর রবার্ট হ্যাণ্ড বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এসে দেখলেন, এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে শুভানুধ্যায়ীর অভাব নেই কিন্তু পরিচালনায় হাল ধরার মত শক্ত মানুষ তেমন নেই। আসলে এই মানুষটি যেমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেমনি দূরদৃষ্টির গুণে, এক নজরে তাঁর চোখে কলেজের প্রশাসনিক ত্রুটিগুলি ধরা পড়ল। তিনি দেখলেন বিল্ডিং ফাণ্ডে অর্থ জমে আছে অথচ কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তিনি দেখলেন একই ক্লাসে বিভিন্ন ছাত্রের বেতন ভিন্ন ভিন্ন রকমের। প্রথমেই তিনি সব ছাত্রের মাইনে সমান করে দিলেন। স্কুলের মাইনে হল ২ টাকা, কলেজের ৩ টাকা। অনুনয় [illegible], কেন [illegible] [illegible] [illegible] সামর্থ্য [illegible] এমন ছেলেরাও কম দক্ষিণা দিচ্ছিল। মাইনের হার ঠিক করার আগেই তিনি মিলিটারী দপ্তরের কর্তার কাছে ছাত্রদের অসুবিধের কথা বুঝিয়ে কুঁড়ের খপ্পর থেকে স্কুল ও কলেজকে তুলে এনে ভালো বাড়িতে থিতু করেছেন। কিন্তু এটাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত মনে হয় নি তাঁর। নিজের বাড়ি চাই, সেদিকেও তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। আর আসল যা কাজ অর্থাৎ বিদ্যাদান—সে ব্যাপারেও তিনি শিক্ষকদের পড়ানোর সময় বাড়িয়ে দিলেন। সামনের বছরে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক আর পণ্ডিত মশাইদের ওপর এক ঘণ্টা আগে এসে কলেজের ছেলেদের পড়ানোর অনুরোধ করলেন তিনি। সব দিকেই নজর নতুন প্রিন্সিপ্যালের। বহরমপুর থেকে এফ এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন সে বছরে তিনজন, পাস করলেন একজন। তিনি রাজকৃষ্ণ সেন। মাসিক সাতাশ টাকা বৃত্তি পেলেন এবং এর পর তাঁকে পড়তে হবে প্রেসিডেন্সী কলেজে। কেন না এখানে বি এ পড়ানোর ব্যবস্থা নেই। এই পাশের সংখ্যা ১৮৬৩-তে ৯ জন হল। ক্রমেই উন্নতি হতে লাগল।

হ্যাণ্ডের আমলের সব চেয়ে বড় কাজ হল কলেজের নিজস্ব ভবন। কলকাতার সেনেট হল তৈরি হয়েছিল ১৮৭৩ সালে কিন্তু শতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে আর বেঁচে নেই (ভেঙে না ফেললে হয়ত আরও পঞ্চাশ বছর)। ১৯৬৯ সালের বহরমপুর কলেজ ভবনের ঘড়িওয়ালা মিনারটি ভূমিকম্পের চিহ্ন নিয়ে আজকের ছাত্রদলকে হাসিমুখে স্বাগত জানাচ্ছে।

শিলান্যাস করবার জন্য বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্ণর সেসিল বীডন কলকাতা থেকে এসেছিলেন। সে এক মহাসমারোহের আয়োজন হয়েছিল বটে। কয়লাঘাট থেকে বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনী তোপধ্বনি করে অভিবাদন ঘোষণা করল, গোরা ঘোড়-সওয়ার দল সারিবদ্ধভাবে গঙ্গারধারের পথ শোভিত করল, হাতি, উট আর দেশীয় পদাতিক বাহিনীর বহর চারিদিক আলো করে রয়েছে। ব্যাণ্ড বাজতে লাগল। বলাই বাহুল্য যে রাজামহারাজা ও নবাব পরিবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন। মফঃস্বল শহর বহরমপুরের কলেজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন লাটসাহেব। মুর্শিদাবাদ জেলায় তখনো কুঠিয়ালদের অনেকেই রয়ে গেছেন। এদিকে লালগোলা, নসীপুর, লালবাগ এবং আশপাশের অঞ্চলের নবাববংশীয় এবং রইস মুসলীম পরিবার। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জের লাখপতিরা, সিং, সিংহীরা, আর খাশ কুঞ্জঘাটা বহরমপুর কাশিমবাজারেই কি কম রাজা-মহারাজা, জমিদার। হ্যাণ্ড সাহেবের কল্পনাশক্তি এবং কর্মযজ্ঞের ব্যাপকতার দৌলতে কলেজকে কেন্দ্র করে নতুন জীবনের সাড়া জাগল। রাণী স্বর্ণময়ী প্রমুখের নেতৃত্বে ও স্বাক্ষরিত স্মারকপত্রে লাটসাহেবের কাছে শিক্ষানুরাগীদের তরফ থেকে নিবেদন করা হল, যেন বহরমপুর কলেজ যাতে ডিগ্রি কলেজে উন্নীত করা হয়। এফ এ পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তখনকার আমলে নিজের জেলার বাইরে গিয়ে বসবাস মানেই বিদেশ-বিভূঁইতে পড়ে থাকার সামিল ছিল। আর কলকাতা! এ আমলে লণ্ডনে প্রবাসী হওয়ার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। কলকাতায় থেকে খরচপত্র করে কজনই বা পড়তে পারে! তাছাড়া বাড়ি-ছাড়া হয়ে অল্পবয়সী ছেলেদের মন টেকে না। স্বাস্থ্যও খারাপ হয় এবং অভিভাবকদের আওতায় থেকে ঘরের খেয়ে যে শিক্ষা তারা পেতে পারত সে সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। অতএব ঢাকা কলেজে যেমন বি এ পড়ানো হয় সেই রকম ব্যবস্থা বহরমপুরেও করা হোক, সেই সঙ্গে আইনও পড়ানো হোক।

আইন পড়ানোর ক্লাস খোলা হল ১৮৬৪ সাল থেকে এবং ১৮৬৫ সালে থার্ড ইয়ার বি এ ক্লাস খোলা হল। মফঃস্বলের মধ্যে হুগলী, কৃষ্ণনগর আর বহরমপুরে এই ব্যবস্থা হল। পরের বছরে ফোর্থ ইয়ার ক্লাস খোলা হল। ১৮৬৭ সালে

কলেজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হলেন জানকীনাথ পোঁড়ি এবং তার পরের বছরে বহরমপুর কলেজ থেকে কৃষ্ণচন্দ্র সরকার হলেন প্রথম বি এল।

এই আমলে বহরমপুর শহরে বাংলার যে মনীষী সমাবেশ ঘটেছিল, কোনো মফঃস্বল শহরে তেমনটি আর কখনো ঘটেনি। এঁদের মধ্যে অনেকেই হ্যান্ড সাহেবের কাছে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছিলেন।

গুরুদাস ব্যানার্জী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন লোহারাম শিরোমণি, রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ রামদাস সেন, গঙ্গাচরণ সরকার এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মত স্বনামধন্য ব্যক্তি নানা সূত্রে এখানে জুটেছিলেন। এ শহরকে তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের সূতিকাগৃহ বললে ভুল হয় না।

যেমন ধরুন, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার সহকারী অধ্যাপক থাকাকালে ১৮৭৩ সালে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার বহরমপুরে ওকালতী করতে এলেন, হল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—আর তার ফলশ্রুতি বঙ্গদর্শন পত্রিকার পরিকল্পনা ও প্রকাশ। কলেজের আইনের প্রথম অধ্যাপক রমানাথ নন্দী মারা যাওয়ার পর ১৮৬৬ সালে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওই পদে এবং সেই সঙ্গে গণিতের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হলেন, মাইনে তিন শ টাকা। অবশ্য তাঁর কোর্টে প্র্যাকটিশ করার স্বাধীনতা রইল। গুরুদাস সকাল নটা থেকে দশটা পর্যন্ত এক ঘণ্টা আইনের ক্লাস নিতেন। তাঁর বাগ্মিতা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের এমনই খ্যাতি রটে গেল যে, বাইরের অনেক বিদগ্ধজন তাঁর ক্লাসে বক্তৃতা শুনতে এসে জুটতেন এঁদের মধ্যে ছিলেন রেভারেণ্ড জে লং সি এইচ ক্যাম্বেল, কমিশনার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

গণিতের অধ্যাপক আসবেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই রকম একটা গুজব ছড়িয়ে ছিল এবং বহরমপুরের লোকে যখন দেখলেন তার বদলে একেবারে দিশি মানুষকে ভার দেওয়া হল স্বভাবতঃই অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন। কিন্ত কার্যক্ষেত্রে গুরুদাস প্রমাণ করলেন অংকের জন্য বিলিতি মগজ অপরিহার্য নয়। হ্যাণ্ড নিজে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—উচ্চতর গণিতে গুরুদাস শিক্ষাদানে যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তার চেয়ে ভাল অধ্যাপনা কোনো ইওরোপীয়ের পক্ষে সম্ভব হত না। তিনি বছর ছয়েক এখানে ছিলেন। তার মধ্যে একবার ছুটি নিয়ে কলকাতায় যান সেই সময়ে ঊনবিংশ শতকের আর একজন

লালবিহারী দে
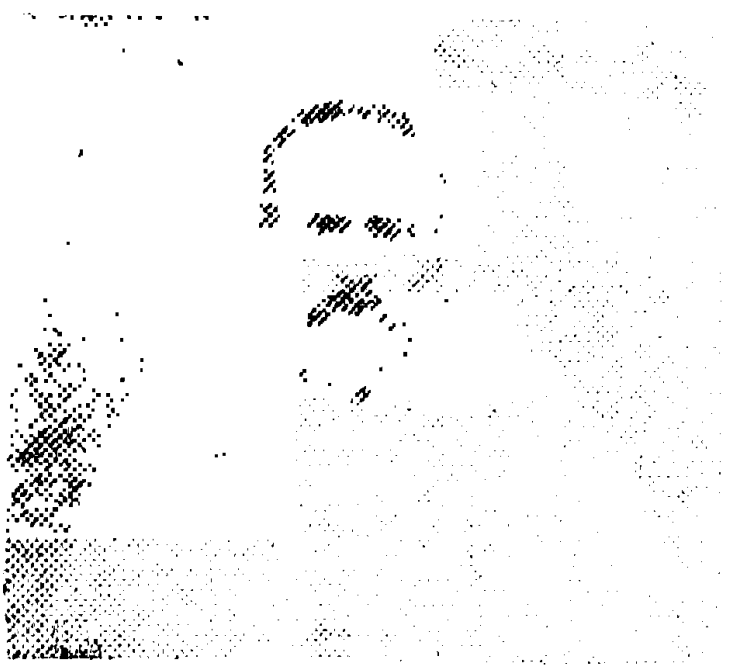
অধ্যক্ষ জানকীনাথ ভট্টাচার্য

বিখ্যাত পণ্ডিত রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর ক্লাস নিতেন। শরীর টেকে না বলে এখান থেকে গুরুদাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন এবং হাইকোর্টেও প্র্যাকটিশ শুরু করলেন।

রাসবিহারী ঘোষ ১৮৬৬ সালে অল্প কিছু দিনের জন্য বহরমপুর কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। ওই বছরেই ঢাকা থেকে বদলি করে গুড সাহেবকে কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাস্টার পদে নিয়োগ করা হয়। গুড সাহেব উগ্র মেজাজের মানুষ ছিলেন এবং কলহপ্রিয়ও। ঢাকা থেকে যে কারণে তাঁকে বদলি করা হয়েছিল সেই কারণে একেবারে শিক্ষাদপ্তর থেকেই বিদায় করা হল এই বহরমপুরে। গুড এসেই টেস্ট পরীক্ষার এমন কঠিন প্রশ্ন করলেন যে, ছাব্বিশ জনের মধ্যে মাত্র চারজন উত্তীর্ণ হল। প্রিন্সিপ্যাল হ্যাণ্ড গোটা ব্যাপারটা লক্ষ্য করে পুনরায় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করলেন। এতে হেডমাস্টার অপমানিত বোধ করেন এবং ক্ষেপে গিয়ে প্রিন্সিপ্যালকে অশোভন চিঠি লিখে বসলেন এবং—গুড গেলেন ১৮৬৭ সালের অগাস্ট মাসে।

গুড-এর পর রেভারেণ্ড লালবিহারী দে পরের মাসে হেডমাস্টার হয়ে এলেন। বহরমপুরে থাকার সময়েই তিনি বেঙ্গল পেজাণ্ট লাইফ লেখেন। লালবিহারীর নিয়োগকে কেন্দ্র করে ছোটখাট একটা ঝড় উঠেছিল। কেন না তিনি ফ্রী চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের প্রাদ্রী ছিলেন। সরকারী শিক্ষা বিভাগে কোনো মিশনারিকে নিয়োগ করা হবে না, এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১৮৬০ সালে। লালবেহারী বহরমপুরে বহাল হওয়ার পরই হিন্দু প্যাট্রিয়ট সরকারী স্কুলে মিশনারি শিক্ষক শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। অবশ্য শিক্ষা অধিকর্তা এই ব্যাপারের তেমন গুরুত্ব না দিয়ে লালবিহারীর পক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন—১৮৬০-এর আদেশটি উদার দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত এবং রেভাঃ লালবিহারী দে-র যথেষ্ট যোগ্যতা আছে, তাঁর নিয়োগ যুক্তিপূর্ণ মনে করি। লালবিহারী ১৮৭২ সাল পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল ছিলেন এবং বেঙ্গল পেজ্যাণ্ট লাইফ এখানে থাকার সময় ১৮৭১ সালে, যদিও লেখা হয়েছিল, বইটি ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়।

বহরমপুর কলেজ যেন মফঃস্বলের মধ্যে সব ব্যাপারেই নজীর সৃষ্টি করতে চায়। ১৮৬৯ সালে শহরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ধনসিন্ধু' মুদ্রণ যন্ত্রে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপা হল, এই প্রেসে তখন ইংরেজি, বাংলা আর হিন্দী টাইপ ছিল। কলেজের লাইব্রেরিতে কলেজের বাইরের পাঠক সমাজের পড়ার বন্দোবস্তও রাখা হল।

কিন্তু প্রকৃতি অগ্রগতির পথ রোধ করল। ১৮৬৬ সালে এই জেলার ওপর বিধাতা যেন ক্রুদ্ধ হয়ে মারণাস্ত্র হানলেন। প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়ার আক্রমণে উদ্যম, উৎসাহ, অর্থব্যয় সব স্তব্ধ! কলেজের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসককে গড়ে দৈনিক ২৫ জন ছাত্রের ওষুধপত্র দিতে হত এই সময়। কিন্তু চিকিৎসা ছাড়া অন্যান্য সমস্যাও ত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফল খারাপ হ'ল। সাধারণ গৃহস্থের ছেলেরা কাবু হয়ে পড়েছে, অভিভাবকদের আর্থিক সংগতি নেই। তার ওপর ১৮৬৮ সালে বারো বছর বন্ধ থাকার পর খাগড়াতে লণ্ডন মিশনারিদের ইংরাজি স্কুলটা আবার খুলে গেল। সেখানে মাসিক আট আনা মাইনেতে ছেলেদের পড়ানো হয়। কলেজিয়েট স্কুলের মাইনে দু টাকা। দুতিন মাইল পথ হেঁটে এত মাইনে দিয়ে কে পড়তে আসবে। অন্ততঃ নিচের ক্লাসের ছাত্রদের বেলায় এটা খুব যুক্তিযুক্ত। এদিকে স্বর্ণময়ী মিশনারি স্কুলের ভবন তৈরী করার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। তার ওপর মিশনারি শিক্ষকদের মধ্যে একজন আবার বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন। হ্যাণ্ড সাহেব সখেদে তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, এই চিকিৎসার সুবাদে ধনী দরিদ্র সমাজের সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সর্বস্তরে প্রভাব বিস্তার মিশনারিদের পক্ষে সহজ হয়। ১৮৬৮র সালের মার্চ মাসে ওই স্কুলের ছাত্র ছিল ৩৫ জন আর চার মাসের মধ্যে সেই সংখ্যা দাঁড়াল ১২৮ জন।

[আগামী সংখ্যায় শেষ হবে]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।।পঞ্চাশ।।

পরের টানা প্রায় দেড় বছরের নাটকে বাপী তরফদারের প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। সে নেপথ্যে দাঁড়িয়ে। শান্ত, নিরাসক্ত। কাজের সময় কাজে ডুবে থাকে। অবসর সময় বই পড়ে। পড়ার অভ্যেস আগেও ছিল। এই দেড় বছরে সেটা অনেক বেড়ে গেছে। যাওয়া আসার পথে এক-এক সময় গাড়ি থামিয়ে স্টল থেকে গাদা গাদা ইংরেজি-বাংলা বই কিনে ফেলে। এই কেনার ব্যাপারেও বাছ-বিচার নেই খুব। গল্প-উপন্যাস আর ভালো লাগে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখার মতো যে-সব বইয়ে জীবনের হাজারো অদৃশ্য খুঁটিনাটির সন্ধান মেলে সে-সব বেশি পছন্দ। ভালো লাগলে পাতা উল্টে যায়, না লাগলে ফেলে দেয়।

কমলার প্রসাদ অঝোরেই ঝরছে। এক বছরের ওপর হয়ে গেল কাছাকাছির অভিজাত এলাকাতে বাড়ি কেনা হয়েছে। টাকা কোনো সমস্যা না হলে যেমন বাড়ি কেনা যায় সেই রকমই। এক তলায় অফিস দোতলায় বাস। মণিদাকে বাপী এ অফিসে এনে বসায়নি। সে উল্টোডাঙার গোডাউনের অফিসেই বসছে। বাচ্চুকে নরেন্দ্রপুরে ভর্তি করে দিয়ে পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে মণিদা গোডাউনের পাশে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে। ছেলে সরানোর ব্যাপারটা মণিদার মনেই ছিল। আগে বাচ্চুর কাছেও ফাঁস করেনি। কারণ, সন্তু চৌধুরী তখন পাঁচ ছ' মাসের জন্য গৌরী বউদিকে নিয়ে ইংল্যাণ্ড সফরের তোড়জোড় করছে। রওনা হবার আগের ক'দিন তারা বাচ্চুকে দেখতে ঘনঘন পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে এসেছিল। বাচ্চুর মাসের বরাদ্দ টাকা সন্তু চৌধুরীর কোনো বিশ্বস্ত জন প্রতি মাসের গোড়ায় মণিদাকে দিয়ে যাবে। মণিদা সে টাকা সই করে রাখবে। ভরসা করে তারা একবারে সব টাকা তার হাতে তুলে দিতে পারেনি। মণিদা ব্যবস্থার কথা শুনেছে। কোনো মন্তব্য করেনি।

পাঁচ ছ' মাস বাদে ফিরে এসে থাকলেও তারা বাচ্চু বা মণিদার হদিস পায়নি। পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে অন্য অপরিচিত ভাড়াটে দেখেছে। আর সন্তু চৌধুরীর টাকাও মণিদা ছোঁয়নি দেখে হয়তো ধরে নিয়েছে, তাদের আক্কেল দেবার জন্যেই লোকটা বাড়ি ঘর ছেড়ে, আর সব বেচে দিয়ে ছেলে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। বাপীর বাড়ি কেনার খবরও তাদের জানার কারণ নেই। বাচ্চু দু-তিন মাস অন্তর ছুটিছাটায় আসে এখানে। বাপী কাকুর কাছে থাকে। সে ক'টা দিন খুব আনন্দ ছেলেটার। বাবার কাছেও গিয়ে থাকতে চায় না। ছেলেকে দেখার জন্য মণিদাকেই আসতে হয়। বাপী আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে। এখানে এসে ছেলেটা মায়ের নামও মুখে আনে না। এটা বাপের নিষেধ কিনা জানে না। হস্টেলে ফিরে যাবার সময় হলে ওর মন খারাপ হয় বুঝতে পারে। কিন্তু যেতে আপত্তি করে না। আবার কবে ছুটি ক্যালেণ্ডারে দেখে রাখে। যাবার আগে জিগ্যেস করে, জিতু কাকুকে পাঠিয়ে তখন আবার আমাকে নিয়ে আসবে তো?

ছেলেটাকে অনায়াসে নিজের কাছেই এনে রাখা যেত। কিন্তু বাপী নিজেই এখন মাসের মধ্যে টানা পনের দিন কলকাতায় থাকে না। কলকাতার ব্যবসা মোটামুটি বাঁধা ছকের দিকে গড়াতে সে আবার বাইরের ঘাঁটিগুলো তদারকে মন দিয়েছে। আবু উত্তর বাংলা নিয়ে পড়ে আছে। বিহার আর মধ্যপ্রদেশের রিজিয়ন্যাল ম্যানেজারদের কাজকর্ম এখন আবার বাপী নিজে দেখছে। মাসে দেড় মাসে একবার করে বানারজুলিতেও যেতে হচ্ছে। কিন্তু দেড় বছরের এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোন রকম উত্তেজনা বা উদ্দীপনার ব্যাপার নেই। প্রাচুর্য থেকে কোনো কৃত্রিম আনন্দ ছেঁকে তোলার আগ্রহ নেই। চারদিকে খাল বিল নদী-নালা সমুদ্র, তৃষ্ণায় ছাতি-ফাটা চাতক তবু স্বাতি নক্ষত্রের ফটিক জল ছাড়া অন্য জল স্পর্শ করে না। সামাজিক যোগাযোগও কমে আসছে। বাড়ি কেনার পর মিষ্টিকে আর অসিত চ্যাটার্জিকে একবার মাত্র নেমন্তন্ন করে আনা হয়েছিল। তাদের ঘরের শান্তিতে আবার চিড় খেয়েছে তখনই বোঝা গেছল। সেই কারণে দীপুদার যাতায়াত আগের থেকে বেড়েছে। তার মায়ের টেলিফোন আসাও। কিন্তু আগ্রহ সত্ত্বেও বাপীকে তারা তেমন নাগালের মধ্যে পায় না। তার ঘনঘন টুর প্রোগ্রাম। ফিরলে কাজের ডবল চাপ।

অসিত চ্যাটার্জীর সামনে কিছু বাড়তি রোজগারের টোপ ফেলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই বাপী জিতকে বলে দিয়েছিল হিসেব-পত্রের ব্যাপারে ওই লোকের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য নেবার বা কোম্পানীর ভাউচারে এক পয়সা দেবার দরকার নেই। ফলে জিত গা করছে না দেখে অসিত চ্যাটার্জী নিজেই কাজের কথা তুলেছিল। বাপীর জবাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। বলেছে তার ধারণা এটা মিলু বা তার মা-দাদা কেউ পছন্দ করবে না।

অপছন্দের ব্যাপারে স্ত্রী সঙ্গে তার মা-দাদাকে জুড়ে দেবার ফলে ফর্সা মুখ রক্তবর্ণ। —আমি কাজ করে বাড়তি উপার্জন করব তাতে কার কি বলার আছে? আর মিলুই বা আপত্তি করবে কেন?

—জিগ্যেস করে দেখো। তার আপত্তি না হলে আর কথা কি.. কাজ করে কত লোকই তো কত টাকা নিয়ে যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসার ফল কি হয়েছে বাপী আঁচ করতে পারে। মেয়ে জাতটার ওপরেই বীতশ্রদ্ধ। বলেছিল, যত লেখা-পড়াই শিখুক মেয়েরা মোস্ট আনপ্র্যাকটিক্যাল—সেন্টিমেন্টাল ফুলস যত সব।

ব্যবসার বাইরে জিত মালহোত্রার সঙ্গেও বাপীর অন্য কোনো কথা হয় না। এমন কি, প্রত্যক্ষ যোগ নেই বলে এখানকার মদের ব্যবসা কেমন চলছে, সে খবরও নেয় না। কিন্তু জল কোন দিকে গড়াচ্ছে চোখ বুজে অনুমান করতে পারে। এই দেড় বছরের মধ্যে আবু রব্বানী পাঁচ ছবার কলকাতায় এসেছে। ওদের লাল জলের ব্যবসা চালু হবার পরেই আবুকে বাপী এখানকার—জন্য একটা লিকার শপের লাইসেন্স বের করার পরামর্শ—দিয়েছিল। নিজেদের দোকান থাকলে শুধু সুবিধে নয়, নিরাপদও। টাকা খসালে বোবার মুখে কথা সরে! লাইসেন্স বার করতে জিতের বেশি সময় লাগেনি। লাইসেন্স কুমকুমের নামে। আবু আর জিত তার অংশীদার। লাভের চার-আনা শুধু বাপীর নামে জমা হবে—কিন্তু কাগজে-কলমে সে কেউ নয়। এরপর মধ্য কলকাতায় যে দোকান গজিয়ে উঠেছে তাতে খুব একটা জাঁকজমকের চিহ্ন নেই। যে দুজন কর্মচারীকে বহাল করা হয়েছে তারাও বানারজুলির লোক এবং আবুর লোক।

জিত মালহোত্রা সময় মতো অফিসে আসে, দরকার মতো পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে, কিন্তু বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার পর সে নিপাত্তা। শনিবারেও বেলা একটার পর তার টিকির দেখা মেলে না। এই ব্যস্ততা যে শুধু ওদের জলীর ব্যবসার কারণে নয়, তাও বোঝা গেছে। বাড়তি রোজগারের আশায় ছাই পড়লেই অসিত চ্যাটার্জির সঙ্গে জিতের যে গলায় গলায় ভাব এখন তার প্রমাণ দীপুদার নালিশ। তার অবুঝ বোন আবার অশান্তির মধ্যে পড়েছে। অমানুষ ভগ্নিপতি প্রায় রাতেই বদ্ধ মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফেরে। শনিবার শনিবার রেসের মাঠে যায়। দীপুদার চেনা-জানা অনেকেই তাকে দেখেছে। শনিবার অন্য দিনের থেকে নেশার মাত্রা বেশি হয়, তাই মিণ্টিরও রেসের ব্যাপারটা জানতে-বুঝতে বাকি নেই। ঝগড়ার মুখে ওই অপদার্থই বুক ঠুকে বলে, সে রেসে যায় নেশা করে—তাতে কার বাপের কি। রোজ মদ খাওয়া আর ফি হপ্তায় রেস খেলার অত টাকা কোথা থেকে পায় দীপুদারা ভেবে পায় না।

বাপী নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত। মিষ্টির মত নেই বলে ওই লোকের তার এখান থেকে কিছু বাড়তি রোজগারের প্রস্তাব নাকচ করা হয়েছে সে-খবর দীপুদা বা তার মাকে অনেক আগেই জানানো হয়ে গেছে।

কুমকুমের সঙ্গে বাপী এখন আর দেখা পর্যন্ত করে না। কিন্তু তার সমাচারও নখদর্পণে। জীবনের এই বৃত্তি সে শক্ত দুটো পা ফেলে দাঁড়িয়েছে। এখন সে নিজের সহজ মাধুর্যে আত্মস্থ। দ্বিধা-দ্বন্দ্বশূন্য। কুমকুম বাহিনের প্রসঙ্গে আবু রব্বানী প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বুদ্ধি ধরে, কথা শোনে, একটুও হড়বড় করে না। বৃত্তি বদলের শুরুতেই কুমুর জন্যে বেশি ভাড়ার ফ্ল্যাট ঠিক করা হয়েছে। মাথার ওপর বাড়িওলা বসে থাকলে কাজের অসুবিধে। তার দেখাশুনার জন্য একজন আয়া আর একজন বুড়ো চাকর আছে। সেই তখন আবুর সঙ্গে বাপী একবার কুমুকে দেখতে গেছল। নে ... বাপী নিজেও তখন ওর বিবেচনার তারিফ করেছিল। বেশবাস আর প্রসাধনে রুচির শাসনও জানে মেয়েটা। আলগা চটক কিছু নেই। বাড়তির মধ্যে আগের সেই ঝকঝকে সাদা পাথরের ফুলটা আবার নাকে উঠে এসেছে। ওটার জেল্লা চোখে ঠিকরোবার জন্যেই।

এর মাস তিনেক বাদে আবু তৃতীয় দফা যখন কলকাতায় এসেছে, তার সঙ্গে বানারজুলির বাদশা ড্রাইভার। এখন বুড়োই গাড়ি চালা চলে। কলকাতায় মালিকের কাছে এসেছে। ভারী খুশি।

বাপী আবুকেই জিজ্ঞাসা করেছে, কি ব্যাপার?

আবু মাথা চুলকে জবাব দিয়েছে, ও ছুটিটা এখন কুমকুম বাহিনের কাছে করবে।

বাপী আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আবু কোন চটকের ওপর নির্ভর করতে চায় জুকুশি বুঝে নিয়েছে। ওরও এখন মাথা হয়েছে বটে একখানা। দিন কয়েকের মধ্যে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড চকচকে গাড়ি কেনা হয়েছে। কিছুদিন বলতে বাদশা ড্রাইভার কুমকুমের কাছে টানা চার মাস ছিল। ও বানারজুলি ফিরে যাবার আগে মালিককে জানিয়ে গেছে দিদিজির গাড়ি চালানোর হাত এখন খুব পাকা আর খুব সাফ। ভারী ঠাণ্ডা মাথায় গাড়ি চালায় দিদিজি—মালিকের চিন্তার কোনো কারণ নেই।

পাকা হাত দেখাবার লোভে কুমকুম কোনো দিন গাড়ি চালিয়ে বাপীর কাছে আসেনি। জিত অনেক করে বলা সত্ত্বেও আসেনি। শুনেই মিস ভড়ের নাকি দারুণ লজ্জা। জিত আশা করেছিল এ-কথা শোনার পর মালিকই একদিন তাকে গাড়ি নিয়ে আসতে বলবে।

বাপী বলেনি। কিন্তু কুমকুমের গাড়ি নিজের চোখেই দেখেছে একদিন। পার্ক স্ট্রীট ধরে আসার পথে বাপীর গাড়ি ট্র্যাফিক লাইটে আটকে গেছল। সামনের সোজা রাস্তা ধারে সারি সারি গাড়ি যাচ্ছে আসছে। সেই চলন্ত সারিতে কুমুর গাড়ি। গাড়ি চালিয়ে কুমু দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাচ্ছে। ডান হাতের কনুই পাশের খোলা জানলায় রেখে স্টিয়ারিং ধরে বসার শিথিল ভঙ্গিটুকু চোখে পড়ার মতোই। কুমকুমের ওকে দেখার কথা নয়। দেখেওনি। বাপী এর পর নিজের মনেই হেসেছে অনেকক্ষণ ধরে। রাতের আবছা আলোর নিচে এই মেয়েকে শিকারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত কে বলবে।

এর পর যা, বাপীর সামনে তার সবটাই ছকে বাঁধা ছবির মতো স্পষ্ট।

...ব্যস্ততার অজুহাতে অসিত চ্যাটার্জির সঙ্গে জিতের মাখামাখির ভূমিকা কমে আসছে। সে পিছনে সরছে। সামনে মিস ভড়। কুমকুম ভড়। অসিত চ্যাটার্জি তার অন্তরঙ্গ সাহচর্যের দাক্ষিণ্যে ভাসছে। রমণীর যে রূপ গুণ বুদ্ধি পুরুষের আবিষ্কারের বস্তু, অসিত চ্যাটার্জির চোখে কুমকুমের সেই রূপ সেই গুণ আর সেই বাস্তব বুদ্ধি। পয়সা আছে, তবু আর পাঁচটা মেয়ের মতো ড্রাইভারের মুখাপেক্ষী নয়। নিজের গাড়ি নিজে ড্রাইভ করে। নিজের তত্ত্বাবধানে মদের দোকান চালায় এমন মেয়ে এই কলকাতার শহরেও আর আছে কিনা জানে না। সে জানে মিস ভড়ের বাবার দোকান ওটা। অসময়ে বাবা মরে যেতে লাইসেন্স নিজের নামে করে নিয়ে অনায়াসে সেই দোকান চালাচ্ছে। সামনে এসে বেচাকেনা করে না অবশ্য পর্দার আড়ালে পিছনের চিলতে ঘরে বসে দু'তিন ঘণ্টা দেখা-শোনা করে। কেউ টেরও পায় না এটা কোনো মেয়ের দোকান। আর যে-কোনো মেয়ে হলে বাপ চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে দোকান বেচে দিয়ে টাকার আণ্ডিল বুকে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকত। নিজে মদ ছোঁয় না, কিন্তু পুরুষের এই নেশাটাকে সংস্কারে অন্ধ মেয়েদের মতো অশ্রদ্ধার চোখেও দেখে না। মান্যগণ্য অতিথিদের জন্য রকমারি জিনিস ঘরে মজুত। চাইতে হয় না। একটু উসখুস করলেই তেষ্টা বোঝে। নিজের হাতে বার করে দেয়। আবার বেশি খেতে দেখলে আপত্তি করে। বলে অত ভালো নয়, আনন্দের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই ভালো। কুমকুমের চিন্তা হবে না তো কি। এত রূপ আর এত বিদ্যা যে মানুষের, তার ভালো মন্দের দিকে চোখ না রেখে কোনো মেয়ে পারে?

এ-সব খুঁটিনাটি খবর বাপী বানারজুলিতে বসে তার মুখে শুনেছে। আবু হেসে হেসে বলেছে, আর খুব বেশি দেরি নেই দোস্ত, জামাইসাহেব ঘায়েল হল বলে।

বাপী সচকিত। —দুলারি কিছু জানে না তো?

—খেপেছো। গেল মাসেও কুমকুম বাহিন এসে তিন রাত তোমার বাংলোয় থেকে গেছে—দুলারির সঙ্গে এখন খুব ভাব তার। ও বলে, মেয়েটা কত ভালো, বাপীভাই একেই বিয়ে করছে না কেন। এ-সব শুনলে আর খাতির করবে।

ফূর্তির মুখে আবু বলেছিল, কুমকুম বাহিন এবারে এসে খুব মজার কথা শুনিয়ে গেছে বাপীভাই। ওই লোকটার জন্যে তার নাকি মায়া হয়। কি রকম মায়া জানো? খারাপ সময়ে একবার ও কালীঘাটের মন্দিরে গেছল—মা কালীর কাছে প্রার্থনা করতে যদি একটু দিন ফেরে। সেখানে গিয়ে দেখে এক ভদ্রমহিলার মানতের পাঁঠা বলি হচ্ছে। জীবটার জন্য মহিলার এমন মায়া যে বলির আগে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল। কুমকুমেরও তেমনি মায়া, কিন্তু পুজোর বলি না দিয়ে পারে কি করে।

আবার হা-হা হাসি। কিন্তু বাপী তেমন খুশি হতে পারেনি। এ-রকম শুনলে বিবেকের ওপর আঁচড় পড়ে। এই বাস্তবে নেমে বাপী সেটা চায় না।

ঘটনার ঢল এবারে পরিণতির মোহনার দিকে। সেদিন শনিবার। সন্ধ্যার ঠিক পরেই দীপুদা এলো। থমথমে মুখ। সাধারণত টেলিফোন করে বাপী আছে কি নেই জেনে নিয়ে আসে। কিছু একটা তাড়ায় এই দিনে খবর না নিয়ে বা না দিয়ে এসে গেছে। এই মুখ দেখা মাত্র বাপীর মনে হয়েছে তার প্রতীক্ষার গাছে কিছু ফল ধরেছে।

—এসো। হঠাৎ যে?

—তোমার সঙ্গে সীরিয়াস কথা আছে....।

—বোসো। কি ব্যাপার?

হল-এর অন্য মাথায় দাঁড়িয়ে বলাই কিছু একটা করছে। সেদিকে চেয়ে দীপুদা বলল, তোমার ভিতরের ঘরে গিয়ে বসে চলো।

শোবার ঘরে এসেই চাপা রাগে দীপুদা বলে উঠল, রাসকেলটার এত অধঃপতন হয়েছে আমি শুনেও বিশ্বাস করিনি!

তিন হাতের মধ্যে মুখোমুখি বসে বাপী চুপচাপ চেয়ে রইল। অর্থাৎ ব্যাপারখানা কি কিছু বুঝছে না।

বোঝানোর জন্যেই দীপুদার আসা। তপ্ত গলায় দীপুদা যা শোনালো তাতে বাপীর মনে হল, প্রতীক্ষার গাছে ফল শুধু ধরেনি, অনেকটা পেকেও গেছে।

....মেয়েছেলে নিয়ে গোলমেলে ব্যাপার বেশিদিন ধামা-চাপা থাকে না। অসিত চ্যাটার্জির অপিসের এক বন্ধু আগে ওর বাড়িতে আসত, আড্ডা দিত। মিষ্টির সঙ্গেও বেশ আলাপ পরিচয় হয়ে গেছল। ওই স্কাউনড্রেলের সেটা পছন্দ নয় বুঝেই ভদ্রলোক বছরখানেকের মধ্যে বাড়িতে আর আসেটাসে না! সপ্তাহ তিনেক আগে সে এয়ার অফিসে এসে মিষ্টির সঙ্গে দেখা করে গেছে। কর্তব্য জ্ঞান আছে বলেই না এসে পারেনি। ....একটি সুশ্রী মেয়ে নিজে ড্রাইভ করে সপ্তাহের মধ্যে কম করে চার দিন তাদের আপিসে আসে। অফিসে ঢোকে না। ছুটির আগে আসে, গাড়িতে বসেই অপেক্ষা করে। অসিত চ্যাটার্জী নেমে এলে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়। প্রত্যেক শনিবার দিন একটা বাজার দু পাঁচ মিনিট আগে তার গাড়ি আসে, হাজার কাজ থাকলেও তখন অসিত চ্যাটার্জীকে অফিসে ধরে রাখা যায় না। ঠিক নেশা না থাকলেও আগে ওই বন্ধুটি মাঝেসাজে অসিত চ্যাটার্জীর সঙ্গে রেসের মাঠে যেত। শনিবারে ঘড়ি ধরে এই অফিস পালানোর তাড়া দেখেও তার সন্দেহ হয়। কয়েকটা শনিবার তাই সে-ও রেসের মাঠে গেছে। সব কদিনই সেই মেয়ের সঙ্গে অসিত চ্যাটার্জীকে দেখেছে। তারা গ্র্যান্ডে বসে খেলে। ছ'সাত মাস হয়ে গেল এই এক ব্যাপার চলেছে। জিগ্যেস করলে অসিত চ্যাটার্জী বলে, মেয়েটির বাবা তাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ একজন ছিলেন। উনি মারা যেতে তাঁর এই মেয়ে এখন ফার্ম দেখাশুনা করে। বিনে পয়সায় অসিত চ্যাটার্জি ফার্মের খাতাপত্র ঠিক করে দেয় বলেই এত খাতির কদর। সত্যি যদি হয় তাহলে বলার কিছু নেই। শুধু বন্ধুটির নয়, অফিসের অনেকেরই খটকা লেগেছে বলে শুভানুধ্যায়ী হিসেবে সে মিষ্টিকে সব খোলাখুলি জানানো দরকার মনে করেছে।

মিষ্টি জানে, একটা বড় ফার্মে বিকেলে একটা পার্ট টাইম কাজ জুটেছে বলে ফিরতে রাত হয় লোকটার। অনেক টাকা দেয় তারা। সেই টাকায় মদ গিলে ঘরে আসে। কিন্তু মতিগতি বদলাচ্ছে, তাও লক্ষ্য করছে। মদ খাওয়া বা রেস খেলা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হলে বেপরোয়ার মতো কথা বলে। শাসায়। তা বলে এরকম ব্যাপার কল্পনাও করা যায় না। তাই শোনামাত্র সব যে বিশ্বাস করেছে তাও নয়। যে সেধে এসে এমন খবর দিয়ে গেল তার রাগ বা আক্রোশ থাকা অস্বাভাবিক নয়। আজকাল বাড়িতে আসে না তার কারণ আসতে হয়তো নিষেধই করা হয়েছে। সরাসরি অপমান করাও খুব অস্বাভাবিক নয়।

দীপুদা জানিয়েছে, বোকা মেয়ে তার পরেও তাকে বা মাকে একটি কথাও বলেনি। ওই পাষণ্ডের সঙ্গে নিজেই বোঝাপড়া করতে গেছে। সেই রাতের নেশার মুখে কিছু বলেনি। পরদিন সকালে ধরেছে। বলেছে, আমার জানা কেউ কেউ শুনেলাম—সে নিজে ড্রাইভ করে, তুমি পাশে থাকো। কি ব্যাপার?

অন্ধকারের জানোয়ারের মুখে হঠাৎ জোরালো আলোর ঘা পড়লে যেমন ধড়ফড় করে ওঠে, কয়েক পলকের জন্য সেই মুখ নাকি অসিত চ্যাটার্জীর। মিষ্টির যা বোঝার সেই কটা মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে নিয়েছে। তারপর জানোয়ারের মতোই তর্জন গর্জন লোকটার। —কোন সোয়াইন বলেছে? আমি যখন কোন কাজে কার গাড়িতে বেরোই তা না জেনে তোমাকে এ সব বলে কোন সাহসে? তোমার জানা সেই চরিত্রবানেরা কারা আমি জানতে চাই। অফিসে তোমার চারদিকে যারা ছোঁকছোঁক করে বেড়ায়—তারা? কোন মতলবে তোমাকে তারা এ-সব বলে তুমি জানো না? না কি জেনেও ন্যাকামো করছ?

দীপুদার বোন তারপরেও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে। সে থামতে জানতে চেয়েছে, আপিসের পর সে কোন বড় ফার্মে পার্টটাইম কাজ করে ফার্মের নাম কি, টেলিফোন নম্বর কি।

এরপর শয়তানের মুখোশ আরো খুলেছে। চিৎকার করে বলেছে, যে স্ত্রীর এত অবিশ্বাস তার কোনো কথার জবাব সে দেবে না। তাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে কারো ঘাড়ে মাথা থাকবে না বলে শাসিয়েছে।

মিষ্টি এরপর টেলিফোন করে তার দাদাকে শনিবারের রেসের মাঠে যেতে বলেছে। শুনে দীপুদা প্রথমে আকাশ থেকে পড়েছিল। মিষ্টি শুধু বলেছে, কিছু গণ্ডগোলের ব্যাপার চোখে পড়তে পারে, কিছু বলবে না, শুধু দেখে এসো, পরে কথা হবে।

দুর্বোধ্য হলেও কাকে নিয়ে বোনের অশান্তি, জানা কথাই। দীপুদা গত শনিবারে রেসের মাঠে গেছল, এই শনিবারেও মাঠ থেকে ফিরে সোজা আগে মিষ্টির ওখানে গেছল। মাঠে যা দেখার দেখেছে। তারপর মিষ্টির মুখে সব শুনেছে। তাদের মা এখনো কিছু জানে না। সব শোনার পর মায়ের মাথাই না খারাপ হয়ে যায় দীপুদার এই চিন্তা।

বাপীর মুখের রেখা নিজের প্রতি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। চুপচাপ শুনছে। চেয়ে আছে। মিষ্টির ওখান থেকে দীপুদা সরাসরি এখানে কেন বোঝার চেষ্টা।

দুর্ভাবনায় মুখ ছাওয়া দীপুদার একটু চুপ করে থেকে বলল, মেয়েটি সুশ্রী আর অবস্থাপন্ন তো বটেই. বেশ কালচারডও মনে হল। এমন এক মেয়ের সঙ্গে স্কাউনড্রেলটা কি ভাঁওতা দিয়ে ভিড়েছে তার ঠিক কি! এরকম একটা থার্ড রেট-লোক ওখানে পাত্তা পেল কি করে?

এ আলোচনা যেন অবান্তর বলল, ওই থার্ড রেট লোক তোমার [illegible] কাছেও পাত্তা পেয়েছিল....একথা ভেবে আর কি হবে। এখন সমস্যাটাই বড়।

দীপুদা কথাটা মেনে নিয়েই বলল, মিষ্টি তখন ছেলেমানুষ, কি আর কাণ্ডজ্ঞান এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছে। উৎসুক একটু। আচ্ছা, বছর সাতাশ আঠাশ বয়েস, ব্যবসা আছে, নিজে ড্রাইভ করে—এ-রকম কোনো মেয়েকে তুমি চেনো বা দেখেছ?

বাপী ভিতরে সচকিত। প্রশ্নটা কেন যেন ব্যারিস্টার সন্দীপ নন্দীর নিছক কাঁচা কৌতূহল মনে হল না। প্রশ্নটা তার না হয়ে তার বোনেরও হতে পারে। মাকে কিছু না বলে বা তার সঙ্গে শলাপরামর্শ না করে হন্তদন্ত হয়ে আগে এখানে এসেছে কেন। বাপীর ঠাণ্ডা দু চোখ দীপুদার মুখের ওপর স্থির একটু। তারপর উঠে বলাইকে টেলিফোন এ-ঘরে দিয়ে যেতে হুকুম করল।

নম্বর ডায়েল করল। [illegible] নম্বর। কাছাকাছির মধ্যে এখন তারও আলাদা ফ্ল্যাট হয়েছে। বউ ছেলে নিয়ে এসেছে! জিত্ত সাড়া দিতে বাপী শুধু বলল, একবার এসো—

ঘনিষ্ঠ আলাপ না থাকলেও জিত জলহোত্রাকে সন্দীপ নন্দীও চেনে। আরো উৎসক। ওকে ডাকলে কেন.... এ ব্যাপারে সে কিছু জানে ?

জবাবে ঠান্ডা মুখে বাপী তার কৌতূহল আরো চাড়িয়ে দিল। —অপেক্ষা করো। এক্ষুনি এসে পড়বে।

ট্যাক্সি হাঁকিয়ে জিত দশ মিনিটের মধ্যে হাজির। বলাই খবর দিতে তাকেও শোবার ঘরেই ডাকা হল। সন্দীপ নন্দীকে দেখে সদাসপ্রতিভ জিত দুহাত জুড়ে কপালে ঠেকালো। বাপী বলল, পাঁচ ছ মাস আগে তুমি এঁর ভগ্নিপতি অসিত চ্যাটার্জী আর তোমার চেনা জানা কোন ওয়াইন-শপের মেয়ে মালিকের সম্পর্কে আমাকে কিছু কিছু বলতে চেষ্টা করেছিলে...যা জানো দীপুদাকে বলো। নিজের দোষ ঢাকার জন্য কিছু গোপন করার দরকার নেই।

বাপী উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। জিতকে ওটুকুও না বললে চলত। ওর নিজের বুদ্ধিই যথেষ্ট। তার ওপর আবু রব্বাণী অনেক রকমের তালিম দিয়েই রেখেছে। কাছে-পড়া মুখ করে ও কি বলবে বাপী জানে। বলবে, চ্যাটার্জী সাহেবের সঙ্গে আগে তারই গলায় গলায় ভাব হয়ে গেছল। ...চ্যাটার্জী সাহেবের মতো অত না হলেও অল্পস্বল্প নেশার অভ্যেস তারও আছে। লিকারশপের সেই মেয়ে মালিকের কাছ থেকে জিনিস কিনত। সেই মেয়ে তাকে খুব খাতির করত আর শস্তায় জিনিস দিত। কারণ, ইনকামট্যাক্সের অনেকের সঙ্গে তার দহরম-মহরম। তার গত দুতিন বছরের ইনকামট্যাক্সের জট জিত সাফ করে দিয়েছে অনেক টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে। চ্যাটার্জী সাহেব ড্রিংকএর এত বড় সমজদার, তাই জিতই সেই মেয়ে মালিকের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। শস্তায় ভালো জিনিস পাওয়া ছাড়া এর থেকে আর কোনো বিভ্রাট হতে পারে ভাবেনি। বেগতিক দেখে মাস পাঁচ ছয় আগে জিত ভয়ে ভয়ে ব্যাপারটা মালিককে জানাতে চেষ্টা করেছিল।....আর শেষে বলবে, মালিকের শোনার সময় বা আগ্রহ হয়নি দেখে সে-ও চুপ মেরে গেছে।

তাসের ঘর ধসে গেছে। মিষ্টি মেয়েদের কোনো হস্টেলে যাওয়ার মতলবে ছিল। তার বাবার জন্য পারেনি। বাবা রিটায়ার করে কলকাতায় চলে এসেছে। সকলে মিলে একরকম জোর করেই তাকে বাড়িতে ধরে নিয়ে এসেছে। এখন ঝড়ের পরের স্তব্ধতা থিতিয়ে আছে।

মনোরমা নন্দীর ঘনঘন টেলিফোন আসছে। গলার চাপা স্বর শুনেই বাপী বুঝতে পারে টেলিফোনের অগিদটা মেয়ের অগোচরে। সব থেকে বেশি এখন তাকেই দরকার, আভাসে ইঙ্গিতে তাও বলতে কসুর করেননি। দুচারবার বাপী এটা-সেটা বলে এড়িয়েছে। তারপর স্পষ্ট আশ্বাস দিয়ে বলেছে, আপনি ব্যস্ত হবেন না মাসিমা, যখন সময় হবে আমি নিজেই যাব, আপনাকে বলতে হবে না।

সন্দীপ নন্দীও কোর্ট ফেরত বাড়িতে হানা দিচ্ছে প্রায়ই। মায়ের বাড়িটা এরপর সম্পূর্ণ তার একার হবে এই আশাতেই হয়তো দ্রুত ফয়সালার দিকে এগনোর তাড়া তার। টাকার যার গাছপাথর নেই, আর মন যার অত দরাজ—সম্পর্ক পাকা হবার পর সে ওই বাড়ির ওপর থাবা বসাতে আসবে না এ বিশ্বাস আছে। তিক্ত বিরক্ত সে আসলে নিজের বোনের ওপর। তার মাথায় কি-যে আছে ভেবে পাচ্ছে না। কারো সঙ্গে কথা নেই। চুপচাপ আপিসে যায় আসে। এতবড় এক ব্যাপারের পরেও ডিভোর্সের কথায় হাঁ না কিছুই বলে না। দীপুদার তাই বাপীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

বাপীর একই জবাব। —আমার পরামর্শ যদি শোনো তো ব্যস্ত হয়ো না; এতবড় ব্যাপার হয়ে গেল বলেই ধৈর্য ধরে কিছুদিন সবুর করো। মাসিমাকেও তাড়া-হুড়ো করতে বারণ করো।

দেড় মাসের মধ্যে অসিত চ্যাটার্জীর ভরাডুবি ঘনিয়ে এলো আর একদিক থেকে। এর পিছনে সবটাই কুমকুমের হাতযশ। বড় তেল কোম্পানীর চিফ অ্যাকাউনটেন্ট, জমা-খরচের হাজার হাজার কাঁচা টাকা অসিত চ্যাটর্জীর হেপাজতে। আজকের জমার টাকা কাল বা পরশু পিছনের তারিখ দিয়ে খাতায় দেখালে কে আর ওটুকু কারচুপি ধরছে। ক্যাশ ব্যালান্স ঠিক রাখাও তো তারই দায়। তারিখ অনুযায়ী সেটা ঠিক থাকলেই হল। শনিবারে রেসের মাঠের জন্য পাঁচ সাতশ বা হাজার টাকা সরিয়ে সোমবারে আবার সে-টাকাটা পুরিয়ে রাখলেই হল। দু চারবার এ-রকম করেছে। শনিবারে তাড়াতাড়ি ব্যাংক বন্ধ, কুমকুম হয়তো সময় করে টাকা তুলে রাখতে পারেনি। অসিত চ্যাটার্জিকে ফোনে জানিয়ে রেখেছে, কিছু টাকার ব্যবস্থা রেখো, সোমবার পেয়ে যাবে।

রেসে জিতল তো কথাই নেই, ঘাটতির টাকা তক্ষুনি পকেটে এসে গেছে। না জিতলেও সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। রবিবারের সান্ধ্য বৈঠকে কুমকুম দোকান থেকেই সে-টাকা এনে তার হাতে তুলে দিয়েছে। তাই আপিসের টাকায় হাত দিতে অসিত চ্যাটার্জির তখন আর ভয়-ডর নেই।

কুমুর টেলিফোন পেয়ে শেষবারে চার হাজার টাকা সরিয়েছে। হাতে খুব ভালো ভালো টিপ আছে। কি এক উৎসব উপলক্ষে বড় দরের খেলা। কপাল দোষে সেদিন সবটাই হার হয়ে গেল, রবিবারের সন্ধ্যায় এসে আয়ার মুখে শুনল হঠাৎ কোনো জরুরি কাজে কুমকুম বাইরে গেছে, পরদিন সকালের মধ্যেই ফিরবে বলে গেছে। অসিত চ্যাটার্জি তখনো নিশ্চিন্ত। পরস্পরের প্রতি এমনি মুগ্ধ তারা যে বাজে ভাবনা চিন্তার ঠাঁই নেই।

কিন্তু পরদিন অফিসে যাবার আগে টাকা নিতে এসে দেখে কুমকুম ফেরেনি। এবারে অসিত চ্যাটার্জির চিন্তা হয়েছে একটু। কুমকুমের জরুরি কাজে হঠাৎ যাওয়া না গিয়ে দিন কতকের জন্য আটকে পড়া নতুন নয়। আগেও এরকম হয়েছে। সেরকম কোনো জরুরি কাজের জন্য যদি চলে গিয়ে থাকে, চার হাজার টাকার ব্যাপারটা হয়তো ভুলেই বসে আছে।

ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে, একদিন ছেড়ে চার পাঁচ দিনও এই ঘাটতি ধামা-চাপা দিয়ে রাখা সহজ ব্যাপার। কিন্তু লোকটার বরাত নিতান্তই খারাপ এবার। ভিতরের কারো শত্রুতার ফল কিনা জানে না। সেই বিকেলের মধ্যেই ধরা পড়ে গেল। বড় সাহেব স্বয়ং অ্যাকাউন্টস চেক করতে বসল।

অসিত চ্যাটার্জির মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। চাকরি খতম তো বটেই। এখন জেল বাঁচে কি করে। কাকুতি মিনতি করে আর হাতে পায়ে ধরে দুটো দিনের সময় নিল। কুমকুমের প্রতীক্ষায় পাগলের মতো সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটল। আর কোনো পথ না দেখে শ্বশুর বাড়িতে ছুটল মিষ্টির সঙ্গে দেখা করতে। অনেক করে বলে পাঠালো, ভয়ানক বিপদ একবারটি দেখা না হলেই না। মিষ্টি নিচে নামেনি। দেখা করেনি।

পরদিন সকাল নটা নাগাদ বাপীর কাছে এসে ধর্ণা দিল। উদভ্রান্ত মূর্তি। এক্ষুনি চার হাজার টাকা না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বাপী খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল। খুঁটিয়ে শুনল সব। টাকার জন্য তার স্ত্রীর কাছে গেছল কিনা তাও জেনে নিল। তারপর উঠে নিজের ঘরে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। নম্বর ডায়েল করল।

ওদিক থেকে দীপুদা সাড়া দিল। বাপী মিষ্টিকে ডেকে দিতে বলল।

কয়েক মুহূর্তের অধীর প্রতীক্ষা। ফোন ধরবে কি ধরবে না সেই সংশয়।

—বলো।

একটা বড় নিঃশ্বাস সংগোপনে মুক্তি পেয়ে বাঁচল। —ও-ঘরে অসিত চ্যাটার্জী বসে আছে। তার এক্ষুণি চার হাজার টাকা চাই। না পেলে জেল হবে। অফিসের ক্যাশ ডিফালকেশন...। তার খুব পরিচিত কে একজন মহিলা হঠাৎ দু' তিন দিনের জন্যে বাইরে চলে গেছে, সে ফিরে এলেই টাকাটা দিয়ে দেবে বলছে...

একটু বাদে ওদিকের ঠান্ডা গলা ভেসে এলো। —আমাকে ফোন কেন?

—দেব?

—যাকে দেবে আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। থাকলে চার হাজার টাকা আমিই দিতে পারতাম। তোমার টাকা বেশি হলে বা দয়া করার ইচ্ছে হলে দিতে পারো।

ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ। বাপীও রিসিভার নামিয়ে বেরিয়ে এলো। ঠান্ডা মুখে অসিত চ্যাটার্জিকে বলল, মিষ্টিকে ফোন করেছিলাম. টাকা দিতে পারছি না।

অসিত চ্যাটার্জী আর্তনাদ করে উঠল, চার হাজার টাকার জন্য আমার জেল হয়ে যাবে বাপী ভাই? আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মিস ভড় আজ ফিরলে আজকের মধ্যেই টাকাটা তোমাকে দিয়ে যাব!

পিছনে জিত এসে দাঁড়িয়েছে অসিত চ্যাটার্জী লক্ষ্য করে নি। বাপী ওর দিকে তাকাতে সে-ও দেখল। জিতের মুখে ভাব-বিকার নেই। অসিত চ্যাটার্জীর কথা কানে গেছে বলেই তাকে বলল, মিস ভড় খানিক আগে ফিরেছে, একটু আগে তার ফোন পেয়েছি।

ডুবন্ত লোকটা বাঁচার হদিস পেল! এক রকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

দু' মাসের আগেই কোর্টের রায় বেরিয়েছে। ডিভোর্স মঞ্জুর। বিচ্ছেদের মামলা রুজু করেছিল অসিত চ্যাটার্জী। অভিযোগ, স্ত্রী দীর্ঘদিন যাবৎ তার সঙ্গে ঘর করে না। অন্য তরফ থেকে কেউ প্রতিবাদ করে নি। ফয়সালা যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ব্যারিস্টার সন্দীপ নন্দী বরং সেই চেষ্টা করেছে। তাদের তরফ থেকে কেউ হাজিরাও দেয় নি. অসিত চ্যাটার্জীর অনুকূলে এক তরফা ডিক্রি জারি হয়েছে।

সেই দিনই বিকেলে কুমকুম এলো। বাড়িতে এসে বাপীর সামনে দাঁড়ানো এই প্রথম। খানিক আগে দীপুদা ফোনে তাকে জয়ের খবর জানিয়েছে।

বাপী অনেক দিন দেখে নি। আগের থেকেও কমনীয় লাগছে। বিনম্র, হাসি-ছোঁয়া মুখ। বাপীর মনে হল, কাজ হাসিল করতে পারার কৃতিত্বে আজ অনায়াসে সোজা তার সামনে এসে হাজির হতে পেরেছে। ভিতরে ভিতরে বিরক্ত তক্ষুণি। প্রশংসা বা পুরস্কার কুড়নোর জন্যে বানারজুলিতে আবু রব্বানীর কাছে চলে গেলে আপত্তির কিছু ছিল না।

—কি ব্যাপার? হঠাৎ যে?

একটুও ভনিতা না করে কুমকুম বলল, আমার কিছু টাকা দরকার বাপীদা...।

পুরস্কার নিতেই এসেছে তাহলে! বাপীর মুখের রেখা কঠিন। গলার স্বরও সদয় নয়। —কত টাকা?

দ্বিধা কাটিয়ে কুমকুম বলল, বেশি টাকাই দরকার... আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি, জলপাইগুড়ির সেই ভাঙা ঘরদোর ঠিক করে নেব ভাবছি...কিছুদিন চলার মতো আর নতুন করে দুজনারই কিছু শুরু করার মতো কত হলে চলে তুমিই ভালো বুঝবে।

বাপী বিমূঢ়ের মতো চেয়ে রইল খানিক। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, চলে যাচ্ছ! আমরা মানে আর কে? অসিত চ্যাটার্জী?

লজ্জা পেলেও সপ্রতিভ মুখেই মাথা নাড়ল কুমকুম। বলল, ওই লোকের ভালো কিছু নেই সত্যি কথাই বাপীদা, কোনো ভালো মেয়ের তাকে বরদাস্ত করতে পারার কথাও নয়। তবু যেখান থেকে যেখানে টেনে এনেছি...দেখা যাক না কিছুটা ফেরাতে পারি কিনা। না পারলেও আমার তো হারাবার কিছু ভয় নেই বাপীদা।

বাপী হতভম্বের মতো চেয়েই আছে। এক ঝটকায় উঠে ঘরে চলে গেল। তক্ষুনি চেক বই আর কলম নিয়ে ফিরল। খসখস করে চেকে কুমকুমের নাম লিখল। একটু থমকে বড়সড় একটা টাকার অঙ্ক বসালো। পছন্দ হল না। পাতাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিল। এবারে যে টাকার অঙ্কটা বসালো সেটা আরো বড়।

চেক হাতে নিয়ে টাকার পরিমাণ দেখে কুমকুমের দু' চোখ বিস্ফারিত। —এত টাকা কি হবে বাপীদা! না না এত দরকার নেই—আমরা তো ভালভাবে কিছু রোজগার করতে চেষ্টা করব!

অন্য দিকে চেয়ে বাপী বিড়বিড় করে বলল, কিছু বেশি না, নিয়ে যাও...।

কুমকুম চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক। আহত গলায় বলল, এর পর আমাকে তুমি আরো বেশি ঘৃণা করবে তো বাপীদা?

বাপী আস্তে আস্তে ফিরল তার দিকে। চোখের কোণ দুটো শিরশির করছে। একটা উদ্ধত অনুভূতি জোর করেই গলা ঠেলে বেরিয়ে এলো। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ওরে না না—এর পর আমাকে তুই কত ঘেন্না করবি তাই বরং বলে যা।

হতচকিত কুমকুম ত্রস্তে কাছে এগিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। ধরা গলায় বলল, তার আগে আমার যেন সত্যি মরণ হয় বাপীদা। বাবা আজ আমাকে নিশ্চয় আশীর্বাদ করছেন—তুমিও করো।

রাত প্রায় আটটা। বাপী উঠল। ঘরে এসে জামা-কাপড় বদলালো। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

সাতাশি নম্বরের সেই বাড়ি। বাপী নিঃশব্দে গাড়ি থামালো। নিচের বৈঠকখানায় দীপুদা আর তার মা। আজকের কোর্টের ফয়সালার প্রসঙ্গেই তাদের আলোচনা হচ্ছিল মনে হয়। বাপীকে দেখে দুজনেই খুশি, কিন্তু গলার স্বর চড়িয়ে কেউ অভ্যর্থনা জানালো না। দীপুদা বলল, এসো. মা তোমার কথাই বলছিল।

—মিষ্টি কোথায়?

—ওপরে তার ঘরে। খবর দেব? এবারের আগ্রহ মনোরমা নন্দীর।

—আমি গেলে অসুবিধে হবে?

—না না, অসুবিধে কিসের! মহিলার ব্যস্ত মুখ। —দীপু, বাপীকে নিয়ে যা।

দায়টা ছেলের ঘাড়ে চাপালেন মনোরমা নন্দী। ছেলেও খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না হয়তো। কিন্তু প্রকাশ করা [illegible] না। —এসো, এসো।

দোতলায় উঠে ছোট ঢাকা বারান্দা ধরে দীপুদা তাকে কোণের ঘরের সামনে নিয়ে এলো। পর্দা ঝুলছে। ভিতরে আলো জ্বলছে। পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে দীপুদা বলল, মিষ্টি কি করছিস রে, বাপী এসেছে।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দেয়াল ঘেঁষা ড্রেসিং টেবিলটা চোখে পড়ল বাপীর। তার আয়নায় দেখা গেল একটা বই হাতে মিষ্টি শোয়া থেকে আস্তে আস্তে উঠে বসছে। আয়নায় তারও দরজার দিকে চোখ। বাপীকে দেখছে।

দীপুদা তাকে ভিতরে পৌঁছে দিয়ে সরে গেল। বাপীর দু' চোখ মিষ্টির মুখের ওপর। শাড়ির আঁচলটা আরো ভালো করে টেনে দিতে দিতে সেও সোজা চেয়ে রইল। শান্ত, গম্ভীর। শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হওয়া বরদাস্ত করতে আপত্তি. সেটা পলকে বুঝিয়ে দিল।

তক্ষুনি সেই ছেলেবেলার মতোই একটা অসহিষ্ণু তপ্ত বাসনা বাপীর শিরায় শিরায় দাপাদাপি করে গেল। তার পরেই সংযত আবার। বলল, ওঃ্বা

নিজেই বসতে বলেছিলেন, আমি উঠে এলাম।

মিষ্টির চোখে পলক পড়ল না। বলল, দেখতে পারি।

আবারও নিজের সঙ্গে যুঝতে হল একটু। বসতেও বলে নি। ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে কুশনটা টেনে নিয়ে বাপী নিজেই বসল। স্নায়ু বশে রাখার চেষ্টা। —আমার আসাটা এখনো তেমন পছন্দ হচ্ছে না মনে হচ্ছে।

অনড় দৃষ্টি তেমনি মুখে আটকে আছে। —কেন এসেছো? সব কিছুর ফয়সালা হয়ে গেল ভেবেছ?

বাপী একটু থেমে জবাব দিল, তোমার আমার দুজনেরই তাই ভাবার কথা।...যা হয়ে গেল তার ধাককাটা বড় করে দেখছ বলেই বোধহয় তুমি এক্ষুনি সেটা ভাবতে পারছ না।

এবারের চাউনি তীক্ষ্ণ। মিষ্টির গলার স্বর চড়ল না। কিন্তু আরো কঠিন।—যা হয়ে গেল তার পিছনে তোমার কতটা হাত ছিল?

বাপীর দু' চোখ ওই মুখের ওপরেই হোঁচট খেল একপ্রস্থ। তারপর স্থির হল। ধীরে ধীরে বুকের দিকে নেমে এলো একটু। আবার চোখে উঠে এলো। আশার আলো নিভলে যে জানোয়ার অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় বাপী আগে তার টুঁটি টিপে ধরল। তার পরেও আকাশ থেকে পড়ল না। মিথ্যে বলল না। জবাব দিল, সবটাই।

মিষ্টির মুখের তাপ চোখে জমা হচ্ছে। —এর পরেও তাহলে তুমি কি আশা করো?

—আশা করেছিলাম অসিত চ্যাটার্জীর জোরের পুঁজিটা তোমাকে খুব ভালো করে দেখিয়ে দিতে পেরেছি। বাপীর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝলসালো, চোখের তারায় বিদ্রূপ ঠিকরলো। - তুমি বড়াই করে বলেছিলে না এই পুঁজিতে ভেজাল নেই বলে তার জুয়া আর নেশার রোগ বরদাস্ত করতেও তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে না··তা না হলে নিজেই তাকে ছেঁটে দিতে? এখন সবটাই মিথ্যে সবটাই ভেজাল দেখিয়ে দেবার পরেও আমি কি আশা করি তোমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে? আমাকে তোমার দয়ার পাত্র ভেবেছ?

প্রতিটি কথা নির্দয় আঘাতের মতো কানে বিঁধল। কিন্তু এমনি নির্মম সত্য যে কোনো জবাব মুখে এলো না। অসহিষ্ণু আরক্ত চোখে মিষ্টি চেয়ে রইল শুধু।

কুশন ছেড়ে বাপী উঠে দাঁড়াল। সামনে এগিয়ে এলো একটু। পুরুষের উঁচু মাথা। —শোনো, আঠার বছর ধরে আমি শুধু তোমাকে চেয়েছি, তোমার কথা ভেবেছি। এতে কোনো ভেজাল নেই—মিথ্যে নেই। বারো থেকে আজ এই তিরিশ বছর বয়েস পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি— এর পর হাতে গুনে আর তিন দিন অপেক্ষা করব। আমার কি প্রাপ্য যদি স্বীকার করে নিতে পারো, এই তিন দিনের মধ্যে তুমি আসবে, নিজে এসে আমাকে ডেকে নেবে। তা যদি না পারো এখানকার পাট গুটিয়ে আমি চলে যাব—আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসব না।

লম্বা পা ফেলে হাতের ধাককায় পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল।

(চলবে)

লুজনিকি ক্রীড়া অঞ্চল ঃ সামনে লেনিন সেন্ট্রাল স্টেডিয়াম।

ক্রীড়াতীর্থ লুজনিকি

অজয় বসু

'লুজনিকি ইওরোপের বৃহত্তম স্পোর্টস কমপ্লেকস। তার চেয়ে বড় কথা, এখানে কাজের বিরতি বলে কিছুই নেই। দরজায় তালা পড়ে না একদিনও। ৩৬৫ দিনই ক্রীড়াকেন্দ্রের দরজা খোলা থাকে সর্বসাধারণের জন্যে।'

খোলা থাকে প্রতিদিনই--বাক্যটি যেন ঘুরে ফিরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল শ্রীমতী হেলেনের কণ্ঠে। এতোক্ষণ মিহিগলায় বেজে চলেছিল নানা কথার সুর ঝংকার। হঠাৎ তার স্বরে জাগল ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া। আত্মতৃপ্তির ভরাট রেশ।

অন্য সুরের আওয়াজ শুনে শ্রীমতীর দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখি, আত্মপ্রত্যয়ের ছাপছোপে তাঁর মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্যের আভাস জেগেছে। এতোক্ষণ মেজাজ ছিল হালকা। হঠাৎ ভাবান্তর। শেষ আগস্টের পড়ন্ত বিকেলে গাছগাছালির ফাঁকে ঠিকরে পড়া সূর্যের রশ্মির আভায় শ্রীমতীর দুই কপোল রাঙা হয়ে উঠেছে। এমনিতে হেলেন সুন্দরী। কিন্তু সে সৌন্দর্য তো বাইরের। আকৃতিগত। ভেতরের সৌন্দর্য মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কথায়। নিটোল প্রত্যয়ে উচ্চারিত ওই একটি বাক্যেই—বছরে একটি দিনও লুজনিকি আলস্যে কাটায় না। বাক্যটি হেলেনের একার কণ্ঠে উচ্চারিত হলো বটে। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হলো না যে ব্যাপ্তিতে ওই বাক্য কতোখানি। একটি ধ্বনি ওই মুহূর্তে গোটা রুশ জাতির সমবেত কণ্ঠেই বুঝি প্রতিধ্বনিত হয়ে গেল। যে ধ্বনির পরতে পরতে জড়ানো রুশীদের আত্মগরিমার পরিচয়। তাঁরা শুধু বড় করে, সুন্দর হাতে ক্রীড়াকেন্দ্র সাজান নি, কর্মযজ্ঞের জোয়ার বইয়ে মূল প্রকল্পকে সার্থক করে তুলেছেন। শ্রীমতী হেলেন তো সেই কথাই বোঝাতে চাইলেন।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি, শ্রীমতী বানিয়ে বলেন নি এতোটুকু। লুজনিকির কেন্দ্রমণি লেনিন সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে ভাঙা-গড়া পুরোদমে চললে কি হবে, স্টেডিয়াম সংলগ্ন খোলা জমিতে কাজের কাজ হচ্ছে পুরোদমে। বেলা পড়ে আসছে। সূর্য পাটে বসছে। তবু সেখানে ভিড় কি জমজমাটই না!

একটি মাঠে একদল বয়স্ক খালি হাতে ব্যায়াম অনুশীলন করছেন। কী তাঁদের উৎসাহ। ঠিক যেন বড়দের শিশুসুলভ আচরণের অনুকরণের মতোই। পাশেই আর একটি খোলা জায়গায় শিশুদের স্বর্গোদ্যান রচিত। ঝাঁক ঝাঁক শিশু ছুটছে, লাফাচ্ছে। সোচ্চার কলকাকলিতে গোটা পরিমণ্ডলকে প্রাণময় করে রেখেছে। এক পাশে প্রৌঢ়-বৃদ্ধদের গাম্ভীর্যমাখা উৎসাহ, অন্য পাশে কচিদের স্বাভাবিক ছেলেমি দেখে উপলব্ধি জাগলো যে খেলাধুলোর দুনিয়ায় বয়সের কোনো বাছবিচার নেই। নেই শ্রেণী, সম্প্রদায়গত পার্থক্য। খেলাধুলোই পারে বাধার বাঁধকে এমনি করে ভাঙতে। পারে কৃত্রিমতার পাঁচিলকে ধ্বসিয়ে দিতে।

বৃহত্তর সমাজজীবনে শ্রেণী বৈষম্য মুছে ফেলার সংকল্পে রুশ চিন্তানায়কেরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে সে প্রয়াস চেষ্টাকৃত। নেতাদের আরোপিত। কিন্তু লুজনিকির ক্রীড়াঅঞ্চলে শ্রেণীগত বৈষম্যের খোলস কেমন আপনা হতেই খসে পড়েছে। বয়সের ভেদাভেদ নেই। নেই মানসিক সংকোচ। তাই এক জায়গায় ছেলে-বুড়ো, যুব-কিশোর মিলেমিশে সব একাকার হয়ে গেছে। তাদের কারুর লক্ষ্য, নিয়মিত হাত-পা ছুঁড়ে শরীরটাকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা। আবার কেউ কিছু না বুঝেই খেলার আনন্দে মেতে থাকতে চাইছে সুস্থ, সহজ এবং স্বাভাবিক জীবনী শক্তির নির্দেশে। কারুর কাছে খেলা হলো নান্দনিক তত্ত্ব। কারুর কাছে বয়স আর রোগভোগ এড়াতে মস্তো এক দাওয়াই।

ওই দেখুন টেনিস টাউন, ভলিবল কোর্ট শ্রীমতী হেলেন আমার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতেই নজরে পড়লো সিরিয়াস ব্যাপারের নজির। ডজন ডজন তরুণ-তরুণী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভলিবল ও টেনিস খেলা অনুশীলন করছেন। তাঁরা পাশের মাঠের প্রৌঢ়-বৃদ্ধ ও শিশুদের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁরা অঙ্গীকার বদ্ধ। আরও ভাল খেলতে হবে। এগোতে হবে অনেক দূর।

কয়েছে ইয়া ময়েঙ্গে, এই মন্ত্রেই তাঁরা উজ্জীবিত। মেহনতের কোনো বিকল্প নেই, এ সত্য তাঁদের কাছে ধ্রুব। তাই তাঁরা ভেজালবিহীন পরিশ্রমে নৈবেদ্য সাজিয়ে জয়লক্ষ্মীকে পাশে টানতে চাইছেন।

লুজনিকি সম্পর্কে অনেক কথা আগে শুনেছিলাম। বুঝি মেনেও ছিলাম। কিন্তু মস্কোয় পৌঁছবার পর যেদিন গাইড শ্রীমতী হেলেনের সঙ্গে খাস লুজনিকিতে গিয়ে হাজির হলাম, সেই দিনই বুঝতে পারলাম যে অনেক কথাই এতোদিন অজানা ছিল। শোনা কথা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্যে ফারাক যেন দুস্তর।

লুজনিকি বুঝি শুধু এক বিরাট ক্রীড়া কমপ্লেকসই নয়, আসলে ওটি সোভিয়েত জনজীবনের এক বিশিষ্ট ধারাও বটে। ক্রীড়াচর্চা মূল জীবনচর্চারই নামান্তর—এই সত্যোপলব্ধিতে যে দেশ আস্থাশীল সেই দেশের মানসিকতার ঠাওর ধরা রয়েছে লুজনিকির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। তাকালে এক পলকেই তা বোঝা যায়। ভাত হয়েছে কিনা তা যেমন টের পাওয়া যায় হাঁড়ির ভেতরের একটি চাল টিপে দেখলেই।

লুজনিকির মূল ক্রীড়াঙ্গন লেনিন সেন্ট্রাল স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আরামসে খেলা দেখতে পারে এক লক্ষ তিন হাজার দর্শক। কিন্তু তার চেয়ে বিশালতর হলো গোটা ক্রীড়া কমপ্লেকসের পরিধি। এতো বড় যে লুজনিকির সদর দরজায় মাথা গলাবার পরও বহুক্ষণ বিশালকায় লেনিন স্টেডিয়াম দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়।

সামনে ওলিম্পিক ১৯৮০ সালে। লেনিন স্টেডিয়ামে তাই সংস্কারের তোড়জোড়। আসন সংখ্যা বাড়াতে, দর্শকদের আরও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চারিদিকে চলছে ভাঙ্গাচুরের পালা। লোহা লককড়, ইঁট সিমেন্টের পাহাড় জমেছে। জড়ো করা হয়েছে বড়ো বড়ো যন্ত্রপাতি। সন্ধ্যা নামছে। তবু কি কাজে কামাই পড়েছে? কর্মীরা ব্যস্ত। হাঁকডাক সোচ্চার। সাজ সাজ রব।

চারিদিকে স্তূপীকৃত রাবিশ। কিন্তু তার একটি কণাও ছিটকে পড়েনি স্টেডিয়ামের অভ্যন্তরে আসল খেলার মাঠটিতে। মাঠ তো নয়, যেন তাজা তাজা ঘাসে বোনা এক সবুজ মখমল। শ্যামলিমার সমারোহ দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মাঠের শ্যামশ্রীকে অক্ষত রাখার ব্যবস্থাপনাই বা কী পরিপাটী। রাবিশ কণা ছিটকে ছড়িয়ে যাতে নিরীহ, নরম দুর্বাদলকে আঘাত না হানতে পারে তার জন্যে যত্ন ও দৃষ্টি পুরোপুরি সজাগ।

মাঠের ধারেই গুটিয়ে রাখা হয়েছে নাইলনের এক বিশাল চাদর। ঝড় বৃষ্টি নামলে, তুষার ঝঞ্ঝা ক্ষেপে উঠলে গোটা মাঠটিকে ঢেকে রাখা হয় নাইলনের চাদরে। মস্কো ডায়নামো স্টেডিয়ামেও অনুরূপ ব্যবস্থা দেখেছি। যতো দেখেছি ততোই ভেবেছি যে

লুজনিকিতে নতুন ইনডোর স্টেডিয়াম দ্য গোল্ডেন টার্টেল

আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা চালু করায় বাধাটা কোথায়? বর্ষায় ইডেনে খেলার প্রস্তাব উঠলেই প্রকৃতির অযাচিত কারুণ্য সে প্রস্তাবকে অসহায় করে তোলে। গত প্রায় এক যুগ ধরে এই ভোগান্তি চলেছে। অথচ কারুরই মনে হয়নি যে একটি বড়সড় নাইলনের চাদর যোগাড় করা গেলে প্রকৃতির রোষকে বাগ মানিয়ে ইডেনকে খেলার উপযোগী করে রাখা যেতে পারে। যেমন করে আগলে রাখা হয়েছে লেনিন সেন্ট্রাল বা মস্কো ডায়নামো স্টেডিয়ামের মাঠটিকে।

লেনিন সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে হবে দ্বাবিংশতম ওলিম্পিক ক্রীড়ার উদ্বোধন ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এবং অ্যাথলেটিকস, ফুটবল ও অশ্বারোহন প্রতিযোগিতার ফাইনাল। স্টেডিয়ামের বাইরে স্পোর্টস কমপ্লেকসের হাতার মধ্যে নতুন গড়ে তোলা আর একটি আচ্ছাদিত স্টেডিয়াম হবে জিমনাস্টিকস, ভলিবল ও জুডো প্রতিযোগিতার ফাইনাল।

ভলিবল, জিমনাস্টিকস হবে যে আচ্ছাদিত ক্রীড়াঙ্গনে সেটির অবস্থানও লুজনিকির হাতায়। নতুন গড়া এই স্টেডিয়ামের নাম দ্য গোল্ডেন টার্টেল। স্টেডিয়ামের আদ্যোপান্ত কাঞ্চন বর্ণে ছোপানো। তাই গোল্ডেন।

আর টার্টেল কেন? যেহেতু স্টেডিয়ামের আকৃতি কাছিমের মতো, তাই। মাথায় গম্বুজাকৃতি ছাদ। স্তম্ভগুলি ধনুকের মতো বেঁকে নেমে এসে কাছিমের পায়ের মতো মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে!

আধুনিক স্থাপত্য কলার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা গোল্ডেন টার্টেলের গঠন রীতির অভিনবত্ব বোঝাচ্ছিলেন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার আনাতোলি। হেলেনই তাঁকে ধরে এনেছিলেন। বোঝাতে আনাতোলের যত্ন ছিল। কিন্তু সব কি ছাই আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম? কি সব ভজকট ব্যাপার। বুঝি নি সবকিছু। শুধু বড় বড় চোখে তাকিয়ে ছিলাম স্টেডিয়ামের কাঠামোর দিকে। সত্যিই অসাধারণ। অভিনব। আমাদের মতো আদার ব্যাপারীদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বৈকি!

ইনডোর স্টেডিয়াম গোল্ডেন টার্টেল চারতলা। একটি তলা অবশ্য ভূগর্ভে। সেখানে আছে লকার, স্নানাগার চিকিৎসাকেন্দ্র ইত্যাদি। একতলায় অফিসঘর, রেস্টুরেন্ট, টেলিফোন একসচেঞ্জ, স্কেটিং রিঙ্ক। দোতলায় ৪২×৪২ মিটার পরিমিত হলঘর। মজা এই যে বিভিন্ন খেলাধুলার প্রয়োজনে এই হলের আয়তনকে সাময়িকভাবে সংকুচিত করে নেওয়া চলে। তিনতলাতেও বড়মাপের এক হলঘর ও আনুষঙ্গিক কয়েকটি কামরা। ছাদের উচ্চতা পঁচিশ মিটার, পরিধি ১০০×১০০ মিটার।

লুজনিকির এক প্রান্তে গোল্ডেন টার্টেল, অন্য প্রান্তে স্পোর্টস প্যালেস। প্যালেসের আদ্যোপান্তে কাচের আস্তরণ। পড়ন্ত রোদের আভায় স্ফটিক প্রাসাদ চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল।

তবে প্যালেস বা টার্টেল, অথবা লেনিন সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামই লুজনিকির সব নয়। সেখানে রয়েছে আরও অনেক কিছু। যথা আরও আটটি ফুটবল মাঠ, গোটা তিরিশ কোর্টসমেত একটি টেনিস টাউন, বাস্কেটবলের এক ডজন আর ভলিবলের নটি কোর্ট। একটি সাঁতারের পুল। জিমনাস্টিকের দুটি প্রমাণ সাইজের ফ্লোর, ছোটখাটো উনিশটি জিমনাসিয়াম। শ'খানেক সজাঘর। তাছাড়া সিনেমা হল, রেস্টুরেন্ট, ডাকঘর, পলিক্লিনিক স্পোর্টস মিউজিয়াম এবং আরও কতো কী! এককথায় লুজ-

নিকিতে পাতা রয়েছে হরেক রকম খেলাধুলোর এক বিরাট সংসার। যে সংসারে কেউই ব্রাত্য নয়। সবাই আমন্ত্রিত। বুড়োরা শারীরিক সুস্থতা অর্জনে, দক্ষ খেলোয়াড়েরা ক্রীড়ামানের উন্নয়নে এবং শিশুরা স্বভাবের টানে সেখানে আসতে পারে। সকলের সামনেই নিজেদের পছন্দ-মাফিক খেলাধুলোর চর্চা করার সুযোগ অবাধ। সুবিধাদি নির্বিঘ্ন। লুজনিকিতে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থাও মনোমত। কাছেই পাতাল বা রেল মেট্রো স্টেশন। লুজনিকি হাতাতেই পাতাল রেলের লাইন পাতা। এক জায়গায় সেই লাইন ওপরে উঠে এসে ছাদ ও দু পাশের দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। সেখানকার রেল লাইনের অবস্থা বাকসবন্দীর মতো।

যার যেমন খুশি সে তা করতে পারে। তবে নিয়মশৃঙ্খলা ভাঙ্গার উপায় নেই। নিয়মানুবর্তিতায় টান যাতে না পড়ে তা দেখার জন্যে মাইনে করা লোক আছে। খেলাধুলোর সাধারণ ও উচ্চতর তালিম দেওয়ায় ভারপ্রাপ্ত ট্রেনার, কোচ, তত্ত্বাবধায়ক, সবাই আছেন।

আর শুধু কি খেলতে এসেছে সবাই লুজনিকিতে? না আসে? ওই দেখুন না, ও'রাও তো এসেছেন, বলে শ্রীমতী হেলেন আমারে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে দিলেন আর এক-দিকে।

দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখি লেনিন স্টেডিয়াম-এর গা ঘেঁষে পাকা রাস্তা চলে গেছে একেবেঁকে। সড়কের দুধারে গাছগাছালি। এখানে ওখানে ফোটাফুলের কুঞ্জবন। রাস্তার দুধারে সার সার বেঞ্চি পাতা।

অবসরভোগী বৃদ্ধরা চলাফেরার ফাঁকে একটু জিরিয়ে নেবার সংকল্পে বেঞ্চে গিয়ে বসছেন। বয়সের ভারে ও'দের অনেকেই ক্লান্ত। শরীরকে মুড়ে রেখেছেন শীতের পোষাকে। ওই বয়সের যা ধর্ম সেই ধর্ম পালন করছেন পাশের মানুষটির সঙ্গে খোস গল্প জুড়ে দিয়ে।

কি গল্প ও'রা করছেন? হয়ত যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন। ও'রা চাইছেন ফেলে আসা দিনগুলিতে আবার ফিরে যেতে। অনেকের জ্যাকেটের কলারে লটকানো সেনা বাহিনীর ব্যাজ। নাৎসীদের রুখতে একদিন ওরা শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরেছিলেন রাইফেল। সেদিনের সেই অবিস্মরণীয় স্মৃতিচারনাতেই কি ও'রা মুখর? কে জানে। মুখের ভাষা জানি না। তাই দূর থেকে ও'দের মনের ঠাওরও পাই নি। তবে কলারের ব্যাজ-গুলি লোকচক্ষে তুলে ধরে ওরা যে অশেষ তৃপ্তি লাভ করছিলেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় নি।

শ্রীমতী হেলেন বলছিলেন, লুজনিকিতে ক্রীড়া কেন্দ্র গড়তে মাটি লেগেছে চাল্লিশ লক্ষ বর্গ গজ। ইঁট দু' কোটি চাল্লিশ লক্ষ, ফেরো-কংক্রিট মোড়া তিন লক্ষ বর্গ গজ, পিচ দশ লক্ষ বর্গ গজ পরিমিত এবং মাটির তলায় যে পরিমাণ পাইপ বসানো হয়েছে তা যদি লম্বা করে সাজানো যায় তাহলে পাইপের এক মুড়ো থেকে অন্য মুড়োয় পৌঁছতে যাট মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত জাতীয় ক্রীড়া স্পার্টাকিয়াডের আয়োজন উপলক্ষে লেনিন সেন্ট্রাল স্টেডিয়াম তথা লুজনিকি ক্রীড়া অঞ্চলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটে। সেই থেকে এটি সোভিয়েত দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় ক্রীড়াসনের দায়-দায়িত্ব পালন করে আসছে।

মস্কোভা নদীর এক পাড়ে ১৮০ হেকটরে ছড়ানো লুজনিকি ক্রীড়া অঞ্চল। বিপরীত দিকে লেনিন পাহাড়। সেই পাহাড়েই সুদৃশ্য সৌধরাজি—মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকেই নীচের দিকে তাকালে লেনিন সেন্ট্রাল স্টেডিয়াম নজরে আসে।

১৯৫৪ সাল পর্যন্ত লুজনিকিতে ছিল ছোট ছোট খামার, ক্ষেত, জলা জঙ্গল ও গাছ-গাছালির ঠাস বুনোট। মাঝে মাঝে নদীতে প্লাবন জাগলে আশ-পাশ ভেসে যেতো। তারপর একদিন ভারি ভারি যন্ত্র, মেশিনপত্তর, ইঁট, সিমেন্ট লোহালক্কড় নিয়ে একদল কারিগর এসে লুজনিকিকে গড়তে শুরু করে দিল। দিন রাত কাজ। কাজের নিরন্তর জোয়ার। দেখতে দেখতে মাত্র ষোল মাসের মধ্যেই গোটা অঞ্চলের ছিরি গেল ফিরে। জলা জমির জায়গায় এক ক্রীড়া নগরের পত্তন হলো। এবং লুজনিকি হয়ে দাঁড়ালো মস্কো শহরের গর্বের ধন।

শুকনো পাতা ছড়ানো পথ মাড়িয়ে এগোতে এগোতে মনে হলো, ওই যে বুড়োর দল যাঁরা শরীরটা সুস্থ রাখায় অল্প স্বল্প ব্যায়াম করছেন আর পরিশুদ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলছেন তাঁদের সঙ্গে দু-চার কথা বললে কেমন হয়?

হেলেনকে মনের ইচ্ছে জানাতেই তিনি বলেন, বেশ তো। সঙ্কোচ কিসের? চলুন না। বলেই নিয়ে গেলেন এক বৃদ্ধের কাছে। ব্যায়ামের ফাঁকে তাঁর তখন জিরিয়ে নেওয়ার পালা। মাটিতে বসেই হাঁফাচ্ছেন।

হেলেন গিয়ে বৃদ্ধটিকে কি যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে এক মাথা পাকা চুল নাড়িয়ে ভদ্রলোক হেঁকে উঠলেন, ডোবরে পোজলোভিৎ—অর্থাৎ ওয়েল কাম টু মস্কো!

ভদ্রলোকের বয়স কতো? অনুমান পঁচাত্তর তো হবেই, আমার পরিচয় পেয়ে নিজের ভাষাতেই প্রশ্নাবলীর জবাব দিতে লাগলেন হেসে হেসে। শ্রীমতী হেলেন দোভাষীর কাজ করলেন।

ভদ্রলোকের নাম এস এ গরলোভা। বর্তমানে পেনসনভোগী। কেন তিনি রোজই লুজনিকিতে আসেন?

জবাব দিলেন, চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকেই শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করতো। এখানে ওখানে অস্বস্তি। হৃদযন্ত্রটিও বুঝি তেমন সচল, সহজ নয়। কি করা যায়? ছুটলাম ডাক্তারের কাছে সব শুনে, দেখে পরীক্ষা করে চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন অল্পস্বল্প ব্যায়াম করবে। বললেন, ভাববার কিছু নেই। নিয়মিত ব্যায়াম করুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। তা সত্যি কথা বলতে কি, ডাক্তারের পরামর্শে কাজ হয়েছে। রোজই আমি এখানে আসি শরীরে অস্বস্তি বলতে আজ আর কিছু টের পাই না।

গরলোভার সঙ্গে আমার মতো এক বিদেশীকে কথা বলতে দেখে কৌতুহলবশে আশপাশ থেকে আরও দু-চারজন কাছাকাছি এগিয়ে এলেন। তাঁদের সঙ্গেও দু'-চার কথা হলো। ও'দেরই একজন পি আই নজরাশোভ। মাঝবয়সী ভদ্রলোক। পেশায় অর্থনীতিবিদ। অন্যজন কুমারী লারিসা কোলোনিনা—যুবতী, ইঞ্জিনিয়ার।

বয়স তো আপনাদের ক্ষেত্রে ভারবহ নয়। তা আপনারা কিসের টানে লুজনিকিতে রোজ আসেন?

প্রশ্ন শুনে দুজনেই হাসলেন। তারপর নজরাশেভ বলে চলেন, এখানে আসার কারণ আছে বৈকি। আমি খেলাধুলো করতাম। একটু অ্যাথলেটিকস চর্চা, ভলিবল খেলা, সবই ছিল আমার জীবনে। কিন্তু পড়াশুনা শেষ করার পর কাজের চাপে একদিন সে সব আমার বন্ধ হয়ে গেল, দেখতে দেখতে কায়িক পরিশ্রম করাও যেন কষ্টসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হলো। একটুকুতে হাঁফিয়ে পড়ি ওজনও দিন দিন বেড়ে যায়। এক সময় শরীর সারাবার দিকে ঝুঁকলো। অগত্যা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে তিনিই আমাকে প্রত্যহ ব্যায়ামের পরামর্শ দেন। সেই থেকে আসছি প্রতিদিন। তা বলতে নেই, এখন সত্যিই বেশ ভাল আছি।

কুমারী কোলোনিনা নজরাশেভের মন্তব্যে সায় দিয়ে বললেন, আমারও ওই একই কথা। আমরা দু' বোনে ফিজিক্যাল ফিটনেস গ্রুপের সদস্যা। তিন বছর এই গ্রুপে আছি। বলতে নেই, আছি ভালই।

আছি ভালই—প্রত্যয় জড়ানো স্পষ্ট মন্তব্য। শুনে আমার প্রত্যয়ও নিবিড় হতে চাইল। কেনই বা ও'রা ভাল থাকবেন না? জীবন ধারণের প্রয়োজনে, শরীরে সুস্থতা আনতে একটু আধটু ব্যায়াম করা তো সকলেরই দরকার। ও'রা সেই দরকারী কাজকে দৈনন্দিন জীবন চর্চায় আবশ্যিক করে রেখেছেন। ডাক্তার বদ্যি, ওষুধ-পত্তরের মুখাপেক্ষী না হতে চেয়ে ও'রা প্রকৃতির নিয়মে বাঁচতে চাইছেন। আচার মেনে বাঁচতে। ও'দের জীবনে একটি শিক্ষা

যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাতে আর সন্দেহ কি!

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলছিলাম হঠাৎ হাসি মুখে এক ভদ্রলোক এসে শুভ সন্ধ্যা জানালেন। শ্রীমতী হেলেন পরিচয় দিয়ে জানালেন, উনি মিঃ লেভ নিকিতিন—স্টেডিয়ামের ডাইরেকটর।

নিকিতিন শুধালেন, কেমন দেখলেন?

কী জবাব ও'কে দেবো! যতো দেখছি, ততোই অভিজ্ঞতা বাড়ছে জুটছে বিস্ময়ের খোরাক। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু লুজনিকির ক্রীড়াঙ্গনে ভিড় পাতলা হওয়ার কোনো লক্ষণই নেই। দলে দলে লোক আসছে তো আসছেই।

সন্ধ্যায় এতো ভিড় কেন?

নিকিতিন জানান সন্ধ্যার দিকে ভিড় তো বাড়বেই। অফিস কাছারি কল-কারখানায় ছুটি হলো। ওরা সেখানকার কর্মী। মস্কোর অধিবাসীরা তো আছেই, সেই সঙ্গে চেরিমুসকি, অকটিয়াব্রিস্কি, গ্যাগারিন লেনিন ইত্যাদি কাছাকাছি জেলা থেকেও মানুষ আসে প্রতি সন্ধ্যায়। তাদের কেউ কেউ প্রতিযোগিতার জন্যে তৈরী হয়। আবার শরীরকে সুস্থ রাখার সংকল্পে কিছুক্ষণ ব্যায়াম অনুশীলন করে চলে যায়।

নিকিতিনের কথায় সকলের জন্যেই সব দিন স্টেডিয়ামের দরজা থাকে খোলা। বাচ্চাদের আগ্রহ বাড়াতে খেলার মাঠে তাদের ধরে রাখতে আমরা শিশুদের জন্যে নানা রকম পুরস্কারের ব্যবস্থাও করেছি।

শুনতে শুনতে কখন যে আবার শিশুদের ক্রীড়া কেন্দ্রের কাছে পৌঁছে গেলাম টের পাই নি। সেখানে তখন হৈ চৈ থেমেছে। এবার ছোটদের ঘরে ফেরার পালা। আজকের মতো ওই অঙ্গনেই বিরতি। তবে আগামীকাল দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেই শিশুরা আবার ফিরবে তাদের স্বর্গোদ্যানে। হাসি-খুশির মেলা বসিয়ে নন্দনতত্ত্বের স্বাদ নেবে নিজেদের পথে হাঁটা চলা করে।

শিশুরা ঘরে ফিরছে। এবার আমারও ফেরার লগ্ন। ঘন্টাকয়েক ঘোরাঘুরি হলো। তবু কি সব দেখা সম্পূর্ণ হলো। বোধহয় টানা ক'দিন ধরে লুজনিকিতে চক্কর দিলেও সব দেখার তৃপ্তি মেলে না।

তবে অতৃপ্তিই বা কিসের? লুজ-নিকিতে এসে মনে হলো তীর্থ দর্শনের পুণ্য হয়েছে। ওইটুকুই যথেষ্ট। লুজনিকি নামেই ক্রীড়াঙ্গন। আসলে ওটি হলো এক ক্রীড়াতীর্থ। অন্ততঃ আমার মতো খেলা পাগল এক ভারতীয়ের কাছে তো বটেই।

খেলা

চতুর্থ এশীয় অ্যাথলেটিকস্

টোকিওর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে আয়োজিত চতুর্থ এশীয় অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতার পদক জয়ের চূড়ান্ত তালিকায় জাপান ১ম স্থান, চীন ২য় স্থান, ইরাক ৩য় স্থান এবং ভারত ৪র্থ স্থান লাভ করে। ফিলিপাইন তালিকার নিম্নস্থান পায়। আগের তিনটি আসরের মত জাপান এবারও যোগদানকারী দেশগুলির থেকে বিরাট ব্যবধানের তালিকার শীর্ষ স্থান লাভ করেছে। মোট ৩৮টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে জাপান ২০, চীন ৭, ইরাক ৩, ভারত ২, দক্ষিণ কোরিয়া ২, উত্তর কোরিয়া ২ এবং একটি করে স্বর্ণ পদক পেয়েছে থাইল্যান্ড এবং কোয়ায়েৎ। চারদিনের এই অ্যাথলেটিকস আসরে এশিয়ান রেকর্ড হয়েছে ৬টি—চীন করেছে ৪ এবং জাপান ২।

আলোচ্য চতুর্থ এশীয় অ্যাথলেটিকসের আসরে ভারত পেয়েছে মোট ১৩টি পদক—স্বর্ণ ২, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ৮। ব্যাংককে গত এশিয়ান গেমসে ভারতের পক্ষে অ্যাথলেটিকসে যাঁরা স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার দৌড়ের স্বর্ণ পদক বিজয়ী হরিচাঁদ ছাড়া বাকি সকলেই টোকিওর এই আসরে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু ২০ কিলোমিটার ভ্রমণের এশীয় গেমসের স্বর্ণপদক বিজয়ী হুকুম সিং ছাড়া অপর সকলেই ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ১,৫০০ মিটার দৌড়ে রতন সিং অপ্রত্যাশিতভাবে গত এশিয়ান গেমসের স্বর্ণ পদক বিজয়ী জাপানের তাকাসি ইসিকে দ্বিতীয় স্থানে রেখে স্বর্ণ পদক জয়ী হন।

ভারতের পক্ষে পদক জয়

স্বর্ণ (২)
২০ কিলোমিটার ভ্রমণ : হুকম সিং
সময় : ১ ঘঃ ৩৫ মিঃ ৩৯-৫ সেঃ
১,৫০০ মিটার দৌড় : রতন সিং
সময় : ৩ মিঃ ৪৯-৮ সেঃ

রৌপ্য (৩)
৪০০ মিটার দৌড় (মহিলা) : রীতা সেন
১১০ মিটার হার্ডলস : শতবীর সিং
লং জাম্প : সুরেশবাবু

ব্রোঞ্জ (৮)
৩০০০ স্টিপলচেজ : গোপাল সৈনি
৫০০০ মিটার দৌড় : গোপাল সৈনি
৮০০ মিটার দৌড় : সন্তকুমার
হ্যামার নিক্ষেপ : রঘবীর সিং
সটপাট : বাহাদুর সিং
৪×১০০ রিলে : ভারত
১,৬০০ রিলে : ভারত
৪×১০০ (মহিলা) : ভারত

চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকা

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	২০	১৮	২১
চীন	৭	৮	৫
ইরাক	৩	১	২
ভারত	২	৩	৮
দঃ কোরিয়া	২	১	১
উঃ কোরিয়া	২	২	১
থাইল্যান্ড	১	২	০
কোয়ায়েৎ	১	০	০
মালয়েশিয়া	০	২	১
ফিলিপাইন	০	০	০

বিশ্ব কাপ জিমন্যাস্টিক

টোকিওতে আয়োজিত ১৯৮১ সালের বিশ্ব কাপ জিমন্যাস্টিকসের আসরে রাশিয়া পুরুষ ও মহিলা—দুই বিভাগেই শীর্ষস্থান লাভ করেছে। পুরুষ বিভাগে প্রথম হয়েছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ান আলেকজান্দার দিতিয়াতিন এবং মহিলা বিভাগে স্টেলা জাখারোভা। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন রাশিয়া, পূর্ব জার্মানী, পশ্চিম জার্মানী, আমেরিকা, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং জাপান—এই আটটি দেশের প্রতিনিধি।

বিশ্বকাপ অ্যাথলেটিক্স

আগামী আগস্ট মাসে (২৪-২৬) মন্ট্রিলে দ্বিতীয় বিশ্ব কাপ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আসর বসবে। এই আসরে যে ৪৪ জন অ্যাথলীট নিয়ে এশীয় অ্যাথলিট দলটি যোগদান করবে তাতে ভারতের এই আটজন প্রতিনিধি দলভুক্ত হয়েছেন : ১,৫০০ মিটার দৌড়ে রতন সিং, ২০ কিলোমিটার ভ্রমণে হুকম সিং, ৫০০০ মিটার দৌড়ে গোপাল সৈনি, ১০০০০ মিটার দৌড়ে এডওয়ার্ড ভিনসেন্ট, ৪০০ মিটার রিলেতে রামস্বামী জ্ঞানশেখরণ, ১৬০০ মিটার রিলেতে উদয় প্রভু, লং জাম্পে সুরেশ বাবু এবং মেয়েদের ৪০০ মিটার দৌড় ও ১৬০০ মিটার রিলেতে রীতা সেন। ভারতের এই আটজনের মধ্যে সদ্য সমাপ্ত চতুর্থ এশীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিলেন মাত্র দু'জন—রতন সিং ১,৫০০ মিটার দৌড়ে এবং হুকম সিং ২০ কিলোমিটার ভ্রমণে।

আগামী দ্বিতীয় বিশ্ব কাপ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী এশীয় অ্যাথলীট দলে নির্বাচিত হয়েছেন জাপানের ১৮ জন, ভারতের ৮জন, চীনের ৭জন, ইরাকের ৪জন, দক্ষিণ কোরিয়ার ৩জন, থাইল্যান্ডের ২ জন এবং একজন করে উত্তর কোরিয়া কোয়ায়েৎ এবং মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি।

স্বর্ণশঙ্ক

চিত্রধ্বনি

চলচ্চিত্রের অনুদান

স্থানীয় চলচ্চিত্র শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির লক্ষ্যে পৌঁছতে বাম-সরকারের প্রাথমিক স্তরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 'চলচ্চিত্র - অনুদান'। চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী কার্যকরী কমিটি অর্থ দপ্তরের সহায়তায় ১৯৭৮-৭৯ সালে (মার্চ পর্যন্ত) মোট ত্রিশজন চিত্র-নির্মাতাকে প্রতিটি রঙীন ছবির ক্ষেত্রে দু' থেকে তিন লক্ষ টাকা এবং প্রতিটি সাদা কালো ছবির ক্ষেত্রে এক থেকে দু' লক্ষ টাকা অনুদান বন্টনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ প্রসঙ্গে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী বক্তব্য রেখেছিলেন—আমরা অনুদান দিচ্ছি শুধু ছবির সংখ্যা বাড়াবার জন্য নয়, ছবির মানও বাড়াবার জন্য। সেটা সরকার পারে না একমাত্র পরিচালকরাই পারেন।' প্রতিভাবান সম্ভাবনাময় তথা আর্থিক সঙ্গতিহীন চিত্র-নির্মাতাদের সরকারী অর্থ সাহায্য দানের ঘোষণা চলচ্চিত্রের সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ সঞ্চার করেছিল অনুদান-প্রার্থীর আবেদনপত্রের প্রাচুর্য তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বাস্তব ক্ষেত্রে '৭৮-৭৯ সালে সম্পাদিত সরকারী উদ্যোগ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘোষিত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সাকুল্যে মোট এগারোজনকে অনুদানের আওতায় আনা হয়েছে এবং অনুদানের আর্থিক মূল্যও রঙীন ও সাদা-কালো ছবির ক্ষেত্রে যথাক্রমে দেড় ও এক লক্ষ টাকায় হ্রাস করা হয়েছে। এ ছাড়াও অনুদান বন্টনে শৃঙ্খলাগতি, নিরপেক্ষতার অভাব, প্রতিশ্রুত নীতি পালন না করা, অনুদানকে সরকারের প্রাথমিক স্তরে অনুষ্ঠিতব্য কর্তব্যের আওতাভুক্ত করা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে চলচ্চিত্র অনুদানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত তিন ব্যক্তিত্বের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এরা হলেন নিরঞ্জন রায়, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং নীতিশ মুখোপাধ্যায়। সাদা কথায় বলতে গেলে, যিনি অনুদান দিয়েছেন, যিনি পেয়েছেন, এবং যিনি না পাওয়ায় বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে।

চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদের কার্যকরী কমিটির বিশিষ্ট সদস্য নিরঞ্জন রায়ের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক মুখ্যতঃ অভিনেতারূপে। ১৯৫৯ সালে রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা'র মুখ্য অভিনেতা হিসেবেই তিনি চলচ্চিত্র জগতের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে পাঁচশটির বেশী ছবিতে অভিনয় করলেও তাঁর প্রথম পরিচয় হল তিনি একজন সক্রিয় বাম-পন্থী রাজনৈতিক কর্মী। '৭৭ সালে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ছিলেন। মূলতঃ সরকারী আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবেই তিনি চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদ এবং আরও নানা বিশিষ্ট জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

অনুদান প্রসঙ্গে নিরঞ্জন রায় :

প্রথমেই বলা দরকার, চলচ্চিত্রে অনুদান কেন? অনুদান দেবার প্রধান দুটি উদ্দেশ্য হ'ল—কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং রুচিশীলতার মানোন্নয়ন। স্টুডিও, ল্যাব্‌, প্রদর্শন ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যার আশু সমাধানের প্রয়োজন উপলব্ধি করলেও আমরা প্রাথমিক স্তরে সমাধান হওয়া সম্ভব এমন কিছু সমস্যাকে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থায় নিরসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই চলচ্চিত্র অনুদানের প্রবর্তন। বেশী সংখ্যায় ছবি তৈরির দ্বারা একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে তেমনি রুচিশীলতারও উন্নতি সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে অনুদান বন্টনের বিচার্য বিষয় ছিল মূলতঃ ছবির বিষয়বস্তু, নির্মাতার ক্যারিয়ারগত উৎকর্ষ, পূর্ণ প্রত্যয়গত ও অভিজ্ঞ কলাকুশলীর প্রাধান্য এবং সর্বোপরি নির্মাতার আর্থিক অসঙ্গতি প্রভৃতি। এই মাপকাঠিতেই এ পর্যন্ত মোট এগারোজন নির্মাতাকে অনুদান দিয়েছি। বন্যার জন্য গত বছর চলচ্চিত্র উন্নয়ন খাতে ব্যয় হ্রাস করতে হয় বলে আমরা গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারি নি। আশা করছি এ বছর ত্রিশজনকেই আর্থিক সাহায্য দিতে পারবো এবং আমার মনে হয় না যে তারও বেশী যোগ্য অনুদান প্রাপক আপাততঃ ইন্ডাস্ট্রিতে আছে।

অনুদান সম্পর্কে বিতর্ক? সমালোচনা? কেন অসীমা ভট্টাচার্য? কেন অনিল ঘোষ? উত্তরটা লিখে নিন। অসীমা ভট্টাচার্যকে অনুদান দেয়া হয়েছে আর্থিক সঙ্গতিহীন নির্মাতা হিসেবে। শুনতে অবাক লাগলেও সেটাই সত্যি। সফল ছবির নির্মাতা হিসেবে সরকারকে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রমোদকর দিয়েছেন অথচ প্রদর্শন ব্যবস্থার মারপ্যাঁচের জন্য ঘরে তুলতে পেরেছেন খুব সামান্য। তাঁকে সাহায্য দেয়াটা অনেকটা নৈতিক কর্তব্যের মত ছিল। অনিল ঘোষের ক্ষেত্রে ওঁর বত্রিশ বছরের কর্মজীবনকে বিবেচনা করা হয়েছে এবং প্রবীণ কলাকুশলী হিসেবেই অনুদান দেয়া হয়েছে।

যিনি অনুদান পেয়েছেন : নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় মোট চারখানি ছবি (অদ্বিতীয়া চিঠি, নয়ে রাস্তে, রাণুর প্রথম ভাগ) পরিচালনা করেছেন। কোন ছবিতে ব্যবসায়িক সাফল্য না পেলেও সমালোচক এবং শিল্প সচেতন দর্শকের স্বীকৃতি লাভে কখনো বঞ্চিত হন নি। 'অফ-বিট' বা 'চিরাচরিত প্রথাহীন' ছবির নির্মাতারূপেই তিনি স্বীকৃত।

অনুদান প্রসঙ্গে নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় :

আমার শেষ ছবি 'রাণুর প্রথম ভাগ', যতদূর মনে পড়ে, আজ থেকে চার বছর আগে মুক্তি পেয়েছিল। তারপর থেকে আমি সৃজনশীলতার দিক থেকে বেকার। আর্থিক অক্ষমতা আমাকে পঙ্গু করে রেখেছিল। এই চার বছরের প্রতি মুহূর্তে আমার যে মানসিক যন্ত্রণা ছিল তা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। তোমার হাত থেকে ঐ কলমটা বা একজন শিল্পীর হাত থেকে তার তুলিটা চার বছরের জন্য কেড়ে নিলে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষায় কলমটা বা তুলিটা ফেরৎ পেতে চাইবে আমিও ঠিক সেই আকাঙ্ক্ষায় এই চার বছর ধরে যে কোন রকম আর্থিক সাহায্য পেতে চাইছিলাম। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি যে একেবারে পাই নি, তা নয়। তবে সবাই প্রায় একটা সর্ত নিয়ে এসেছিল। একটা ছেলের আর মেয়ের ভাব ভালোবাসার গপ্পো নিয়ে একটা মশলাদার ছবি চাই। কমপ্রোমাইজ করলে এতদিনে নিয়ত একজন নিয়মিত চিত্র-পরিচালক তকমাধারী হতে পারতাম। পারি নি। সংসারে-সমাজে কমপ্রোমাইজ করা যায়, শিল্পে নয়। শেষ পর্যন্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশু' গল্পের চিত্ররূপ দেবার জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের আবেদন করেছিলাম। কেন মানিকবাবু? কারণ মানিকবাবুর কলম কখনো চিরাচরিত সামাজিক অনুশাসনকে প্রশ্রয় দেয় নি তাই। গল্পের পটভূমি '৪২ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রাম। অনাহার! কান্না! মৃত্যু! এবং শেষ পর্যন্ত জীবিত নর-নারীর শহরে যাত্রা। পুরুষেরা দৈহিক পরিশ্রম করে, বৃদ্ধেরা পথে পথে ভিক্ষে করে, রমণীরা, বিশেষ করে তরুণীরা পতিতালয়ে আশ্রয় নিয়ে এ দুর্যোগ উত্তীর্ণ হয়। কয়েক মাস পর অবস্থা স্বাভাবিক হলে তারা ঘরে ফিরতে শুরু করে। জীবনের জয়গানে গ্রাম নতুন করে জেগে ওঠে। ঘর বাঁধা হল জমিতে চাষ পড়ল, গৃহস্থ বাড়িতে গৃহপালিতের ডাক শোনা গেল। নতুন জীবন শুরু করতে সবার মত রামপদ চাষীর সুন্দরী বউও পতিতালয় ছেড়ে গ্রামে ফিরে এলো। গ্রামবাসীরা তাকে মেনে নিতে পারল না। বিচলিত রামপদও বউকে ঘরে নিতে সাহস পেল না। অবশেষে একজন বৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা জীবন সম্পর্কে শেষ কথা শোনালো গ্রামবাসীদের—'জীবন জীবিতের জীবন অনুশাসনের নয়!' এ বিষয়বস্তুর ভিত্তিতেই অনুদান পেয়েছি। বলা বাহুল্য, এ সরকারী দান আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির অন্যতম। অনুদানের মর্যাদা রাখবার দায়িত্ব সম্পর্কে আমি পূর্ণ সচেতন।

যিনি অনুদান পান নি : নীতিশ মুখোপাধ্যায়। নীতিশ মুখোপাধ্যায়ের

একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'একদিন সূর্য' ক্লাসিক ছবির মর্যাদায় স্বীকৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর অসমাপ্ত উদ্যোগ 'নয়ন শ্যামা' এবং 'রবিবার'। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে ছবি সম্পূর্ণ করতে না পারলেও সম্ভাবনাময় এবং প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি চলচ্চিত্র জগতে পরিচিত। অনুদান প্রসঙ্গে বারীন্দ্র মুখোপাধ্যায় :

নতুন করে বলবার কিছু নেই। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন, ফিল্ম ক্লাবের মুখপত্র, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে আমার বক্তব্যকে আমি বার বার জানিয়েছি। বারবার বলেছি সরকারী অনুদান বা অর্থ সাহায্য সেই সব ছবির জন্য সীমাবদ্ধ থাক যে ছবিগুলো সরকারী সাহায্য ছাড়া কিছুতেই তৈরি হবে না। সরকারের শর্ত থাকুক সৎ, রুচিশীল, প্রগতি ধর্মী এবং অল্প বাজেটের ছবি। নাচ, গান, সস্তা সেন্টিমেন্টের ব্যবসাদারী ছবির জন্য সরকারী সাহায্যের দরকার নেই। ব্যবসায়ীরা আছে ইউরোপে স্যুটিং করবার পয়সা দেবার জন্য। এগুলো সরকার অনুদান দিলেও হবে—না দিলেও হবে। সুসভ্য সরকারের সঙ্গে ওদের পার্থক্য অনেক। ভালো ছবি সরকার করতে পারে না ঠিকই—তবে ভালো ছবি করবার সুযোগ, দেখবার এবং দেখাবার সুযোগ একমাত্র সরকারই করে দিতে পারে। সরকারকে দরকার হলে ভালো কিছুর জন্য ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। তাতে সাময়িক ক্ষতি, ভবিষ্যতের লাভ।

রাজনীতি তেমন বুঝি না। কিন্তু কারা দেশের কথা ভাবছে কারা মানুষের মঙ্গল চাইছে এটুকু অস্থিতে মজ্জায় বুঝি। তাঁদের মাধ্যম আর আমার মাধ্যম আলাদা হলেও সুদূরপ্রসারী ফলটা সার্বজনীন হতে বাধ্য। সে জন্যই আমি সরকারী অর্থ সাহায্যের আবেদন করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ, যিনি সর্বতোভাবেই মানুষের কথা ভেবেছেন, তাঁর 'রবিবার' গল্পটি নিয়েই আমার ছবি। সেখানেও সেই মানুষের কথা। দেবতা নয়। ধর্ম নয়। সংস্কার নয়, মানুষ। কোন মানুষ? না, যারা অন্ত্যজ, যারা মন্ত্রহীন। জানি না, ঠিক এইভাবে মানুষের কথা কতজন ভেবেছেন।

আমরা, যারা তিন মাসের কাজ তিন বছরেও শেষ করতে পারি নি, ব্যবসাদারের কাছে ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়িয়েছি, পরিবারকে বঞ্চিত করেছি—তবু এখনও এরই মধ্যে ডুবে আছি। উগ্র তপস্যার আনন্দের মত। যারা দেড় লক্ষ টাকাতেই ছবি করবার স্বপ্ন দেখি তাদের সকলের হয়েই বলছি—আমাদের ভালো হোক। যাচাই করা হোক, সুযোগ দেয়া হোক। গভীর বিশ্বাস নিয়েই বলছি বাংলা ছবির শ্মশান জমিতে সেদিন গোলাপ বাগান ফুটবে। জীবনের রঙে লাল, ভালোবাসার রঙে সবুজ।

সাক্ষাৎকার : রত্না শূর

বেলজিয়ান ছবি

বেলজিয়ান ছবির বয়স মেরেকেটে পঁচিশ বছর। এখনও জওয়ান হতে পারেনি, শিশুই বলা যায়। উপরন্তু ঐ ছোট্ট দেশটুকুতেই রয়েছে প্রতিবেশী রাজ্য জার্মানী আর ইতালীর গভীর প্রভাব, ফরাসীরা তো কাঁধে বসেছিল বহুকাল। দেশের ভাষাটাও তাই উত্তর-দক্ষিণ দুই অঞ্চলে দু রকমের। এই মিশ্র সামাজিক অবস্থায় বেলজিয়ামের সংস্কৃতি জগৎও যেমন গভীরভাবে কোন নিজস্বতার জন্ম দিতে পারেনি, তেমনি এই ষাট-সত্তর দশকের গোড়া থেকে চলছে সেই নিজস্বতার সন্ধান। খোঁড়াখুঁড়ি চলছে ঐতিহ্যের গোড়ায়।

আর এই কথাগুলো মনে রাখলেই বেলজিয়ান ছবির গতি চরিত্র অনুধাবন করতে সুবিধে হয়। সদ্য সমাপ্ত বেলজিয়ান ছবির উৎসব (আয়োজক—সিনে সেন্ট্রাল ও দিল্লীর বেলজিয়ান দূতাবাস) দেখে ধারণা করতে অসুবিধে হয় না যে ফরাসী ভাষা শুধু নয় সংস্কৃতির গোড়াটাও অনেক অ-নে-ক দূরে ছড়ানো। আঁদ্রে দেলভোর 'রাঁদেভু অ্যাট ব্রে' এবং জাঁ জ্যাক আন্দ্রিয়ে'র ছবিটিতে বেলজিয়ামের নিজস্বতার কোন ছাপ নেই।

দুজন পরিচালকই স্বখ্যাত। দেলভোর ছবির আপাতঃ বিমূর্ত চিত্রকল্পের গভীরে রয়েছে ফরাসী চিত্রকলার ইমেজ। ফ্রেমিং, দৃশ্য পরিকল্পনায় অনুভব করা যায় ব্রাক-সৌন্দর্য। আন্দ্রিয়ে'র প্রকরণে সিনেমা ভেরিতে পদ্ধতি অনুসৃত হলেও ফরাসী চরিত্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ থাকে।

পিয়ের নামের এক বেলজিয়ানের ধারণা হয়েছে সে তার আফ্রিকান বন্ধুর হত্যার জন্য দায়ী। এই চিন্তায় সে বিধ্বস্ত, মানসিক রোগাক্রান্ত। পিয়েরের মানসিক ঐ দ্বন্দ্ব আর যন্ত্রণাকে নিয়ে আন্দ্রিয়ে' বলিষ্ঠ ছবি করতে পারতেন, কিন্তু প্রকরণ ও প্রয়োগ শৈলীর জট ছাড়িয়ে গল্প বেরিয়ে আসতে পারে নি। দৃষ্টিনন্দন ছবি ছিল বটে।

পিয়ের লেদ্যোর 'বার্থা' ছবিটি কাব্যিক গুণসমৃদ্ধ! ছবির প্রধান আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্য হল গী দ্য মোপাঁসার বলিষ্ঠ কাহিনী। বার্থা নামের একটি বোধবুদ্ধিহীন তরুণীর স্বাভাবিক জীবন ও প্রেম প্রীতির প্রতি আকুলতা নিয়ে ছবির গল্প। দক্ষ হাতে পরিচালক গল্পটিকে বেঁধেছেন নিজস্ব স্টাইলে। বার্থার যন্ত্রণা নিখুঁতভাবে প্রকাশিত পর্দায়। ক্যামেরাকে তিনি ছুরি-কাঁচির মত ব্যবহার করে অপারেশন করেছেন বার্থার মন। কি ভয়ানক—সুন্দর ছবি! মনক্লাইমের ছবি 'ওয়ে আউট'কে উপভোগ্য ছবি বলতে পারি, বাড়তি কোন মর্যাদা দিতে বাধছে। মাংসল দৃশ্যের এত বেশি আনাগোনা ছবির মূল কেন্দ্রটি থেকে দর্শককে বিপথে চালিত করে। জার্মান 'সিজোফ্রেনিয়ার' প্রভাব শির-শির করে ওঠে রোম কূপে।

ম্যারিউস বোর্জ্যাতের 'আঁত' ছবিটি ছিল উৎসবের অন্যতম সেরা আকর্ষণ। যান্ত্রিক জীবনের লয় এবং যন্ত্রণার দিক-টির পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের কয়েকটি ধর্মীয় চরিত্রের ঘটনা নিয়ে একটি সুন্দর ছবি তৈরী করেছেন বোর্জ্যাত। রাম-শিব-কৃষ্ণ চরিত্রগুলি ছবিতে এসেছে হিন্দু জীবনের দর্শনকে প্রতিফলিত করতে। ছবি তৈরির ভঙ্গিটিও মনোগ্রাহী। ব্যালে নাচের ভঙ্গিতে হিন্দু জীবন ও নাচিয়ে শিল্পীদের দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর ভাবে সমান্তরাল রেখায় এনে দিয়েছেন তিনি।

বেলজিয়ামের এই ছবিগুলি নতুন এক দেশকে উপস্থিত করল আমাদের সামনে। হয়ত সব ছবিগুলিই যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করেনি আজকের বেলজিয়ান যুব সমাজের, কিন্তু নাড়ির বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার আকুতিটা বেশ বোঝা যায়। নির্মল ধর

রবি প্রণাম : শতরূপে শতবার

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল একজন ব্যক্তি-বিশেষ ছিলেন না, যুদ্ধ মহামারী বা ভূমিকম্পের মতো ছিলেন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় সেকথা বাংলাদেশের মানুষ বহুদিন ধরেই অনুভব করে আসছে। শুধু পঁচিশে বৈশাখের আশপাশে ঘিরে প্রতি বছর তাঁরা সেকথা বেশি করে মনে করেন, নামী-দামী নিপুণ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বহু শৌখিন সংস্থার বিভিন্ন ধরনের রবি প্রণামের উদ্যোগের মিছিল থেকে। এর মধ্যে অবশ্যই একটা ব্যবসায়িক দিক আছে, যেমন আছে কবির প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যেরও কিছু হিসাব। তবু সেটাই সব কথা নয়। অন্তত শৌখীন দলগুলোর আধকাঁচা আন্তরিক চেষ্টা দেখে মনে হয় শুধু বৎসরান্তে রবীন্দ্রসদনে একটি শো পাওয়ার ইচ্ছার বাইরেও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মনে ভিন্নতর কোন উদ্দীপনা জাগান আজও। দলের সকলের ক্ষেত্রে তা মনে হয় না, কেউ কেউ হয়তো নিছক শুধু সুরের আমোদ হিসেবেই ব্যাপারগুলো নিয়ে থাকে, তবু কিছু লোকের মধ্যেও যে নিষ্ঠা বা অপরিচিত নৈপুণ্য হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলি, তার মূল্য আমার কাছে কম নয়। বর্তমান পরিসরে রবীন্দ্র সদনের ভিতরে ও বাইরের এমন কিছু অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

নটরাজ-এর 'অরূপরতন'

শান্তিনিকেতনের বর্তমান বা প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং তাদের সম্পর্কিত আরও কিছু উৎসাহী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নটরাজ অনেকদিনের জমজমাট এক সৌখীন সংস্থা। এর কেন্দ্রে রয়েছেন সাংবাদিক-নায়ক বিশ্বজিৎ রায়। এঁদের যে কোন প্রযোজনাতেই একটা মিলনোৎসবের আমেজ এসে পড়ে। তাই এঁদের দেওয়া মঞ্চরূপে 'অরূপরতন' কেমন হয়েছিল সেকথা বলতে গিয়ে সঙ্গত কারণেই

আমি ভুলে থাকবো বহুরূপী প্রযোজিত 'রাজা' নাটকের স্মৃতি। তবু সেকথা ভুলে থাকলেও দুঃখ পেতে হয়, যখন দেখি ১৯৭৯তেও রবীন্দ্র নাটক অভিনয়ে মঞ্চে সুরঙ্গমা হাত নাড়ছে আর গানের গলা ভেসে আসছে তার কণ্ঠে অন্য কোন অন্তরালবর্তিনীর কাছ থেকে। অবশ্য প্রমিতা মল্লিকের 'সুরঙ্গমা'র গান এত অপূর্ব ছিলো এবং পিয়ালী রায় মঞ্চে সুরঙ্গমার চরিত্রে এত সপ্রতিভ ছিলেন যে দুঃখটা বাড়বার সুযোগ পায়নি। এদের দাপটে সুদর্শনার ভূমিকায় অনভিজ্ঞা অরুণী ঠাকুর অনেকটাই চাপা পড়ে গ্যাছে, যদিও তার চেষ্টা যথাযথ ছিলো। বিশ্বজিৎ রায়-এর পক্ষে রাজা বা জগজিৎ রায়-এর পক্ষে ঠাকুর্দা গুরুভার লাগছিলো। জগজিৎ-এর স্বাভাবিক সুকণ্ঠও এদিন গানে অনুপস্থিত ছিলো। প্রত্যেকটি চরিত্রের হাঁটাচলার নিয়ন্ত্রণে, প্রত্যেকটি দৃশ্যের কম্পোজিশনে শৌখীনতার পরিমাণটাই বেশি ছিল। তবু রাজাদের মধ্যে শমীক ঘোষ এবং আভাস সেন এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে তপন মল্লিক চোখে পড়ার মতো অভিনয় করে গেছেন। আর অনবদ্য ছিল আর একটি জিনিস এই নাটকের মঞ্চসজ্জা। এর পরিকল্পনা যাঁর সেই জয়শ্রী রায় প্রত্যেক নাট্যরসিকের কাছ থেকেই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ পাবেন।

মালঞ্চর শেষবর্ষণ

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত আর একটি শ্রদ্ধাবিনত নিবেদন সম্পূর্ণ অপেশাদারি সংস্থা 'মালঞ্চ'র শেষ বর্ষণ। অভিনয়, গান ও নাচের সমন্বয়ে এই আলেখ্যর পরিকল্পনায় সৌকুমার্য ছিল, অভিনবত্ব ছিল নির্দেশক অজিত রায়কৃত মঞ্চসজ্জাতেও। গানে সঙ্গীত পরিচালিকা জয়শ্রী রায়, মিতা দস্তিদার, বিশাখা বসু এবং সুবীরদের কণ্ঠ আগামী সময়ের প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য বহন করে। খ্যাতনামাদের মধ্যে অর্ঘা সেন স্বাভাবিক ভাবেই নিপুণ, তবে তাঁর উচ্চারণে বেশ কিছু অবাঞ্ছিত ত্রুটি লক্ষ্য করে দুঃখিত হতে হয়। অনুষ্ঠানের এক বিরাট আকর্ষণ ছিল সুপূর্ণ চৌধুরীর গান। দুটি মাত্র একক সঙ্গীতের পরিসরেই তিনি সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে এক অনুপম মায়া বিস্তার করে ফেলেছিলেন। এই সঙ্গে যদি নাচের অংশ সমস্ত দলটির আর একটু শক্তিশালী হত, তাহলে অনুষ্ঠানের উপভোগ্যতা আরও বাড়ত সন্দেহ নেই। তবু চোখে পড়ার মত নেচেছিলেন সুনন্দা চৌধুরী এবং সুমিতা ব্যানার্জি। হাসিমুখে নাচের মূলসুর এঁদের অধিগত ছিল বলে সূচনার সমবেত নৃত্য থেকেই দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়িয়েও এরা মনোযোগ আদায় করে নিয়েছিলেন। আর 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে' গানটির সময় শুধু যন্ত্রের সঙ্গে সুনন্দা চৌধুরির পায়ের কাজ অপূর্ব। অবশ্য এরা ছাড়া অদিতি বিশ্বাস, লীলাশ্রী বসু ও নৃত্য পরিচালক সুনীত বসু এবং তপতী রায়ের নাচেও সম্ভাবনা লক্ষ করা যায়। 'ওলো শেফালী' গানটির সঙ্গে শিশুশিল্পীদের সমবেত নাচটি সুন্দর এবং তার মধ্যে বালক সুমিত চৌধুরীর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি দারুণ মানিয়ে যায়। নেপথ্যে দীনেশ চন্দ্র পরিচালিত আবহ শ্রুতিমধুর, কনিষ্ক সেন-এর আলোও যথাযথ। সমস্ত অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা থেকেও বোঝা সম্ভব ছিল না যে এটি একটি অপেশাদারি সৌখীন প্রয়াস যদি না কেবল এর অভিনয় ও পাঠঅংশ যৎপরোনাস্তি দুর্বল হতো। তবু রাজার ভূমিকায় সুশান্ত সান্যাল চালিয়ে যান কিছুটা, কিন্তু রাজকবি পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোখেই পড়ে না। তবে সবচেয়ে করুণ নটরাজ অজিত রায়-এর সংলাপ আর তাঁর অংশে প্রম্পটারের সশব্দ অস্তিত্ব ঘোষণা। আশা করি 'মালঞ্চ' পরবর্তী প্রযোজনায় এই সব ত্রুটি থেকে মুক্ত হবে।

মিলনীর দাম্পত্য কলহচ্ছেব

রবীন্দ্রসদনের আয়োজনের বাইরে যে অসংখ্য রবিপ্রণাম আলোচ্য বছরে উদযাপিত হয়েছে তার মধ্যে নবনির্মিত ভারতীয় ভাষা পরিষদ-এর প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত 'মিলনী'র প্রীতি সম্মেলনের চরিত্র কিছুটা আলাদা। মিলনীকে দেখে বোঝা গেল যে আসলে এটি একটি উচ্চবিত্ত ঘরোয়া সাংস্কৃতিক সংস্থা। তবু এদের একটি অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ অভিনবত্ব আছে। রবীন্দ্র রচনায় প্রবীণ দাম্পত্য কলহের চারটি বিভিন্ন দৃশ্য এক সঙ্গে গেঁথে এঁরা 'দাম্পত্য কলহচ্ছেব' স্কেচটি উপহার দিয়েছেন। অভিনয়ে দুর্বলতা থাকলেও এই পরিকল্পনার উদ্ভাবক শ্রীমতী কাজল সেন-এর বেশ কিছুটা ধন্যবাদ প্রাপ্য। তাঁর নিজের অভিনয়ও প্রশংসাজনকভাবে স্বচ্ছন্দ।

ঘরোয়া আসরে হংসধ্বনি

'মিলনী'র মতো আরেকটি ঘরোয়া আসরে রবি-প্রণাম জানালেন হংসধ্বনি। এদের অবশ্য ঠিক সৌখীন বলা চলে না, কারণ এরা যথেষ্ট পরিশীলিত, তবে অপেশাদারি তো বটেই। এদের মাধ্যম অবশ্য ছিল গ্রন্থনা সহযোগে গান। কবিগুরুর পূজাপর্বের বিভিন্ন পর্যায়ের গানের সাহায্যে রচিত হয়েছিল এদের 'চন্দ্রেশ্বর' সঙ্গীতালেখ্য। সঙ্গীতাংশে মনোশ্রী লাহিড়ী, সুমাল্য মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস পাল, অনিমা চক্রবর্তী এবং বন্যা মজুমদার বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। দুই কিশোর শিল্পী অস্মিতা লাহিড়ী ও শুভাশিস রায়ও প্রাণবন্ত। শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য গ্রন্থনাতেই বেশি নিপুণ ছিলেন। কেবল একটি ক্ষোভ থেকে যায় যে রবীন্দ্রনাথের এত পেলব উপস্থাপনায় তাঁর ঋতু নাট্যের দিকটি একেবারেই অনুপস্থিত কেবল শুভাশিস পালের বাউল এর্গারের একক গানটিতে এবং বন্যা মজুমদারের কণ্ঠে ছাড়া।

শেষে আবার প্রথম কথাটাই বলতে হয়। বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এইসব অপেশাদারি উদ্যমের নিষ্ঠা এবং উদ্দীপনা রবীন্দ্রনাথের অদ্যাবধি অমোঘ প্রভাব সম্পর্কে কি আমাদের সচেতন করে দেয় না?

সুরজিৎ ঘোষ

সুরমঞ্জরীর রবি প্রণাম

২৫ মে রামমোহন মঞ্চে সুরমঞ্জরীর সভ্যারা রবি-প্রণাম করলেন রবীন্দ্রনাথের গান আবৃত্তি এবং নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল নৃত্য এবং আবৃত্তি সহযোগে 'সামান্য ক্ষতি' এবং নৃত্যনাট্য 'চন্ডালিকা'।

শিশুশিল্পীদের অনুষ্ঠান সামান্য ক্ষতির পরিকল্পনা প্রশংসার দাবী রাখে। মূকাভিনয়ে মল্লিকা রায়, পাপিয়া বোস এবং ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নেপথ্য আবৃত্তির কণ্ঠ এবং নাচনভঙ্গি ত্রুটিমুক্ত নয়। অতসী দাশগুপ্ত এবং শিপ্রা ঘোষের আবৃত্তিও প্রশংসা পেয়েছে। সব্যসাচী সেনগুপ্তের আবৃত্তিও ত্রুটিমুক্ত নয়। তবে তাঁর গলা ভালো। ঋতুরঙ্গের গানগুলির নির্বাচন ঠিকমত হয়নি। গানের সুরেও কোথাও কোথাও গোলমাল আছে।

'চণ্ডালিকা'য় প্রকৃতির ভূমিকায় মমতা আচার্য চরিত্রানুগ। মায়ের ভূমিকায় শ্বেতা দত্ত কিন্তু বেশ বেমানান। সংগীত শিল্পীদের মধ্যে কবিতা চৌধুরীর গান ছোটখাটো ত্রুটি থাকলেও ভালো লেগেছে। বাচ্চু মুখার্জির গান ভালো লাগেনি। মঞ্চ পরিকল্পনা 'চণ্ডালিকা'র চেয়ে 'সামান্য ক্ষতি'র অনেক পরিণত।

একক সংগীতে পাপিয়া বিশ্বাস, শিপ্রা আনে এবং তান্তালিতা দে দর্শকদের প্রশংসা আদায় করেছেন।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক … ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩
[illegible] মুদ্রিত ও … ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য
মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত

১৯ বর্ষ ৫ম সংখ্যা
২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬
8 June, 1979

আগামী সংখ্যায়

একগুচ্ছ বাঙলাগল্প
লিখেছেন নির্মলকুমার দাস, বিজন কুমার ঘোষ, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত দাশগুপ্ত, বিজয় পাল, সিদ্ধার্থ রায়, প্রলয় শূর, সোমক দাশ

পাতাল রেল সমাচার

কলকাতার লোকের কাছে তো বটেই বাইরে থেকেও যাঁরা আসেন তাঁদের কাছেও কলকাতার পাতাল রেল একটি প্রহেলিকার মতো মনে হচ্ছিল ইদানীং। এসপ্লানেড থেকে টালিগঞ্জের কোনো কোনো জায়গায় প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু কাজ চলছে দেখা যায়। কিন্তু কোনো কাজই যেন সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে মনে হচ্ছিল না। ফলে মাঝে মাঝে এ রকম সন্দেহও উঁকি দিচ্ছিল যে, পাতাল রেলের কি শেষ পর্যন্ত পাতাল-প্রবেশ ঘটতে যাচ্ছে ?

তাছাড়া কর্তৃপক্ষ মহল থেকেও মাঝে মাঝে এমন সব প্রস্তাবের কথা শোনা যাচ্ছিল, যাতে আশঙ্কাটি ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল। যেমন, দমদম থেকে টালিগঞ্জে পাতাল রেলের লাইন বসবে, পুরনো এই প্রস্তাবকে সংশোধন করে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, আগে টালিগঞ্জ থেকে এসপ্লানেড পর্যন্তই পাতাল রেলের কাজ শেষ হোক। পরে সেই অংশের কাজকর্ম দেখে এসপ্লানেড থেকে দমদম অংশের কাজ হাতে নেওয়া যাবে।

যাই হোক, নানা মহল থেকে কর্তৃপক্ষকে বোঝানো হয় যে, খন্ডিতভাবে চালু করা হলে পাতাল রেলের আসল উদ্দেশ্যই বরবাদ হয়ে যাবে। এবং এতে কলকাতার যানবাহন সমস্যারও সমাধান হবে না আর্থিক অপচয়ও বন্ধ হবে না। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, তাঁরা এ যুক্তি মেনে নিয়েছেন। পাতাল রেলকে পূর্ব-পরিকল্পনা মতো অখন্ডভাবেই চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

সম্প্রতি জানা গেল, এই প্রস্তাবকে কার্যকরও করা হয়েছে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের ওপর পাতাল রেলের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। এখন অবিশ্যি শুধু শ্যামবাজার, শোভাবাজার ও গিরিশ পার্কে স্টেশন তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। টানেল তৈরির কাজ শুরু হবে শিয়ালদহ স্টেশানের কাছে উড়াল পুলের কাজ শেষ হবার পর। যানবাহনের একটি বড় অংশকে তখন ঐ অঞ্চল দিয়ে চালিত করে চিত্তরঞ্জন এভিনিউকে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা করা যাবে। অতএব কাজের গতিও ত্বরান্বিত হবে।

কলকাতা-হাওড়ার নাগরিকদের কাছে আরো এক সুখবর, পাতাল রেলের দ্বিতীয় একটি লাইন যাতে লবণ হ্রদ থেকে রামরাজাতলা পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়, সে জন্যে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীটের স্টেশানটির নিচে দ্বিতীয় একটি স্টেশানের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

দেখেশুনে মনে হচ্ছে, যেমন আশা করা গিয়েছিল, তেমন দ্রুতগতিতে না হলেও পাতাল রেলের কাজ এগিয়েই চলেছে। এবং পাতালের পথে মর্ত্যলোকের যাত্রীদের যাতায়াতের দিনও হয়তো সুদূরে নয়।

সাহিত্যিকের স্বধর্ম

সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায় শুরু করেন অনেকে এক রাস্তায়, শেষ করেন অন্যভাবে। নজরুল আর শৈলজানন্দ ছিলেন ইস্কুলের বন্ধু। শৈলজাবাবু তখন লিখতেন কবিতা আর নজরুল উপন্যাস। কিন্তু একটু বয়স বাড়তেই তাঁরা পথ বদলে নিলেন। নজরুল শুরু করলেন কবিতা লিখতে, আর শৈলজাবাবু বেছে নিলেন গদ্যের পথ। এবং ভাগ্যি তা করেছিলেন। না হলে--

শৈলজাবাবু অবিশ্যি পরিণত বয়সে কবিতা খুব একটা লেখেননি। কিম্বা লিখলেও তা ছাপেননি। কিন্তু নজরুল কিছু উপন্যাস ও গদ্য রচনা লিখেছেন এবং তা ছাপাও হয়েছে। কবিতার তুলনায় খুবই নিষ্প্রভ সেগুলো। কবিতা না লিখলে লেখা হিসেবে হয়তো হারিয়েই যেতেন তিনি।

এরকম ভুল ও সংশোধন আরো অনেকে করেছেন। যেমন ধরুন বঙ্কিমচন্দ্র। 'ললিতা ও মানস' লেখার পরও যদি কবিতা নিয়েই থাকতেন, মধুসূদন দত্তের পাশে তাঁকে অত্যন্তই ফাঁকা মনে হত। সময় মতো পথ বদলে নিতে পেরেছিলেন বলেই হতে পারলেন তিনি সাহিত্য সম্রাট।

কবিতা আর গদ্য নিয়ে এই দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে বঙ্কিম কি নজরুলের যুগেই শেষ হয়ে যায়নি। নজরুলের পরে একই সমস্যায় পড়েছেন তারাশংকর মানিকের মতো বড় লেখকও। তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে যেসব ছড়া ও গান দেখা যায় তার বেশির ভাগই যে তাঁরই লেখা তা আমরা জানতে পেরেছি এখন। কবিতাগুলো নিয়ে বই বেরোচ্ছে বলে শুনেছিলাম তাঁর ছেলে সনৎকুমারের কাছে। হয়তো বেরিয়েও গেছে হাতে আসেনি। কিন্তু মানিকবাবুর কবিতার বইটি দেখেছি। জেনেছি গদ্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে জীবনের প্রথম থেকেই তিনি কবিতা লিখেছেন। কিন্তু ছাপার জন্যে উৎসাহ বোধ করেননি। তাঁর এই বাস্তববোধের পরিচয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করেছি, কেননা বেশির ভাগ কবিতাই ঠিক কবিতা হয়ে ওঠেনি। কারণ সেটা তাঁর নিজের পথ ছিল না।

প্রসংগত বলা দরকার লেখকের নিজের পথটা যে কী এটা সমঝে নেওয়া খুব সহজ কথা নয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একবার উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছিলেন। তার খানিকটা অংশ কোথায় যেন ছাপা হয়েছিল, দেখেছি। তাতে সুধীন দত্তীয় গদ্য যতোটা আছে উপন্যাস ততোটা নেই। সেই রকম জীবনানন্দ দাশের গল্পেও প্রধানত দ্রষ্টব্য হয়ে আছে তাঁর নিজস্ব লেখন-রীতি, গল্পের উদ্ঘাটন নয়। তার মানে অবিশ্যি এ নয় যে জীবনানন্দ দাশের কোনো গল্পই গল্প হয়নি। কিন্তু জীবনানন্দ কবি হিসেবে যেখানে পৌঁছেছেন, গল্প তার ধারে কাছেও পৌঁছয়নি। অর্থাৎ এক মিডিয়ামে এঁরা যতোটা পেরেছিলেন, অন্য মিডিয়ামে তা পারেনি।

সত্যি বলতে কি বাংলা ভাষায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কোনো লেখকই গদ্য ও কবিতার জুড়ি গাড়ি ছোটাতে পারেননি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায় আসার আগে, আধুনিকতর কালের আরও একজনের প্রসংগ শেষ করে নেই।

তারাশঙ্কর মানিকেরই সমকালের লেখক মনোজ বসু। কার যেন একটি কাব্য সংকলন দেখেছিলাম (মোহিতলালের কী?) মনোজবাবুর একটি কবিতা রয়েছে তাতে। বেশ বড়সড় একটি প্রেমের কবিতা। খুবই আবেগের সঙ্গে লেখা, যেমন সে সময়ে লেখা হত। খোঁজ নিয়ে জানলাম, প্রথম জীবনে তিনি এরকম অনেক কবিতা লিখেছেন, এবং ছাপাও হয়েছে। পরে গদ্য লেখার চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরে এসেছেন কবিতা থেকে। ভালোই করেছেন। না হলে হয়তো সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের চেয়ে বেশি দূর এগোতে পারতেন না। কিন্তু সরতে পেরেছিলেন বলে প্রথম শ্রেণীর গল্প লেখক হয়েছেন।

এই সুবুদ্ধি নারায়ণ গংগোপাধ্যায় আর নরেন্দ্রনাথ মিত্রেরও ছিল। নারায়ণবাবু সেকালে গল্প ও কবিতা দুই-ই লিখতেন। কবিতা লিখে তিনি এতোটা নাম করেছিলেন যে তাঁকে দিয়ে আবৃত্তি করিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানী একটা ডিসকে তা রেকর্ড করিয়েও রেখেছে। কিন্তু নিজে তিনি নিজের আসল জায়গাটি ঠিকই বেছেছিলেন। গল্প না লিখলে কি স্মরণীয় হতেন?

নরেনবাবুর অবিশ্যি কবি খ্যাতি একটু বেশিই ছিল। অন্তত চল্লিশের গোড়ার দিকে তো বটেই। কবিতা পত্রিকার পুরানো ফাইল ঘাটলে নরেনবাবুর কবিতা অনেকবার চোখে পড়বে। বাস্তবিক তাঁর যখন প্রথম গদ্যের বই বেরোয় (হলদে বাড়ি কী?) বেশ একটু অবাকই লেগেছিল। কিন্তু চতুরঙ্গ পত্রিকায় তাঁর সেই রস গল্পটি বেরোবার পরই বোঝা গেল তিনি ঠিক রাস্তাই বেছেছেন। গল্পে তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী।

হ্যাঁ এবার রবীন্দ্রনাথের কথায় আসি।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে বাংলা সাহিত্যে কী ব্যাপারটা ঘটেছে লক্ষ্য করেছেন কিনা কেউ জানি না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হল এই যে, অনেকেই মনে করলেন তাঁরা গদ্য ও কবিতা দুই-ই লিখতে পারবেন। এ তালিকায় এমন অনেকে আছেন যাঁরা সত্যিই উভচারী হতে পেরেছিলেন। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু। এরা সকলে কথাসাহিত্যে ও কবিতায় সমান উৎরেছেন তা অবিশ্যি বলা যাবে না। তবে দু দিকেই এমন কিছু কিছু লেখা আছে যা একালেও পাঠ্যযোগ্য মনে হবে। কিন্তু বনফুল যে জীবনের শেষ পর্যন্ত গল্প ও কবিতা দুই-ই লেখার চেষ্টা করে গেলেন তাতে কি নিজের ওপর অবিচার করা হয়নি। এবং ছবি-আঁকা? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কার প্রেরণায় এমন ঘটা সম্ভব। অথচ কবিতার বেলায় যিনি আত্মপ্রীতিতে অন্ধ গল্পে তিনিই রীতিমত চক্ষুষ্মান। এবং প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের যা থাকে সেই তৃতীয় নয়নেরও অধিকারী। অন্নদাশঙ্কর রায় অবিশ্যি কবিতার খাস মুলুক থেকে সরে এসে ছড়ায় ছাউনি ফেলেছেন এবং একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছড়াকেও স্মরণীয় হয়েছেন।

আবার দেখুন, রবীন্দ্রনাথ গদ্যের রাজ্যেও কতো বিপত্তি ঘটিয়েছেন। যেহেতু তিনি ছোটো গল্প আর উপন্যাসে সমান শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, বাঙালি সাহিত্যিকরা প্রায় সকলেই ধরে নিলেন তাঁরাও তা পারবেন। কিন্তু সকলে তো আর রবীন্দ্রনাথ নন। অতএব যা ঘটবার তাই ঘটতে থাকল।

বাংলা গল্পে সুবোধ ঘোষ একজন পয়লা সারির লেখক। যেমন তাঁর ভাষা, তেমনি বাঁধুনি আর ততোধিক উজ্জ্বল তাঁর বক্তব্য। কিন্তু উপন্যাসে? বোঝাই যায় না যে একই লেখকের লেখা। সেই তুলনায় অবিশ্যি সন্তোষকুমার ঘোষের কিনু গোয়ালার গলি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের চেনা মহল বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারো ঘর এক উঠোন অনেক বেশি সার্থক। কিন্তু এঁদের গল্পগুলো পড়ার পর বলতেই হবে ঐটেই হল তাঁদের আসল জায়গা।

কিম্বা অতো দূরেই বা যাবার দরকার কী? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ দিলে তিরিশের যুগের আর যাঁরা প্রথম শ্রেণীর গল্প লিখেছেন, উপন্যাস তাঁরা কজন লিখতে পেরেছেন? অথচ লিখেছেন, অজস্রই লিখেছেন। আর তার পরিনাম হয়েছে খুবই খারাপ।

অনুজ লেখকরা, যাঁরা একটা দুটো গল্প লিখে নাম করেন, অনেকেই তাঁরা বসে যান থান ইটের মতো একখানা উপন্যাস লিখে ফেলতে।

এবং শেষ পর্যন্ত গল্প লেখাও ভুলে যান। একালে তাই উপন্যাস লেখক তো গোনা-গুনতিতে এসে পৌঁছেছে ছোটো-গল্প যা নাকি ছিল বাংলা সাহিত্যের গর্ব, তাও হয়ে উঠছে অ-পাঠ্য।

শাস্ত্রে বলেছে, পরধর্ম ভয়াবহ, কিন্তু বাঙালি লেখকরা দেখা যাচ্ছে তা মানেন না।

প্রণবেন্দু রায়

হারানো বই

সব নিঃশেষ হয়ে গেছে, আলো নিভে গেছে, ভোজের উৎসব শেষ হয়ে গেছে। সবাই চলে গেছে, আমি একাকিনী চলেছি। সঙ্গী আমার নেই, আমি রিক্তা।—লিখেছিলেন জাহানারা। বাদশাহ শাহজাহানের প্রিয়তমা কন্যা। মা নেই, বাবাকে যত্ন, মমতা প্রীতি দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। মুঘল অন্তঃপুরে জাহানারাই ছিলেন মধ্যমণি। রাজকাজে সম্রাটকে পরামর্শ দিতেন। সাহায্য করতেন। সম্রাটের পাঞ্জা বহুকাল তিনি রেখেছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল বাদশাহ বেগম। বুদ্ধিমতী, বিদুষী, কর্মকুশলা জাহানারার সাহায্য নিতেন যুবরাজ দারা। এমন কি জাহানারার ইচ্ছায় নিয়োগ করা হত রাজ্যের প্রধান কর্মচারী, মনসবদার, সামন্ত। তাঁদের পদোন্নতিও তিনি ঘটাতেন।

সেই জাহানারার শেষ পরিণতিও বাদশাহ শাহজাহানের মতই মর্মান্তিক। ১৬৫৭ সালে বাদশাহ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়লেন। পুত্র শুজা, আওরঙজেব আর মুরাদ সিংহাসন দখলের জন্য এগিয়ে আসতে থাকেন দিল্লীর দিকে। দিল্লীতে তখন যুবরাজ দারা। ভ্রাতৃবিরোধে জাহানারার অংশও কম ছিল না। আওরঙজেব তাঁর সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হন। পিতা বন্দী হলে, জাহানারা হলেন তাঁর সঙ্গিনী—ভাই আর ভাইয়ের সন্তানদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূক সাক্ষী। মুঘল সাম্রাজ্যের এক নৃশংস অধ্যায়ের দর্শক। দারার ছিন্নমস্তক পাঠান হল আগ্রা দুর্গে বন্দী বাদশাহের সামনে। দেখে শিউরে উঠলেন জাহানারা। অসীম বেদনায় ভেঙে পড়লেন। তা প্রকাশের সঙ্গী কৈ। সেই সব দুঃখবেদনাঘেরা দিনগুলো জাহানারা লিখতে শুরু করলেন। এ কেবল তাঁর আত্মজীবনীই নয়, মোঘল সাম্রাজ্যের এক অসামান্য দলিল।

স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে অসার জীবনকে উপলব্ধি করে চমকে উঠেছেন। ক্ষমা করেছেন আওরঙজেবকে। পিতা মারা গেলে আরও চোদ্দ বছর আগ্রা দুর্গে ছিলেন জাহানারা। পুরনো লেখাগুলো বার বার পড়েছেন। ছিঁড়ে ফেলেছেন। আবার লিখেছেন। আত্মজীবনী নষ্ট করতে গিয়ে মত বদলে তাকে জেসমিন প্রাসাদের শিলাতলে চাপা দিয়ে রেখে যান। আর সেই ছিন্নভিন্ন আত্মজীবনীর পাতা ১৮৮৬ সালে আবিষ্কার করেন অন্দ্রিয় বুটশেন। অনুবাদ করে ছাপলেন। পরে কাশ্মীর থেকে বেরোল প্যারিস ভাষায়। এই বইয়েরই বাঙলা অনুবাদ করেন ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী ১৩৫৭ সালে, ১৯৫ পৃষ্ঠায় এই

জাহানারার আত্মকাহিনী

ডঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

এম-এ, বি-এল; পি-আর-এস; ডি-লিট; শাস্ত্রী

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

[illegible]

বই ছেপেছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। অনেকদিন ছাপা নেই।

আত্মকথা লিখতে বসে বাদশাকন্যা কৈফিয়তের সুরে বলছেন—আমি আগ্রা দুর্গে এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে মৃদু আলোক শিখার পাশে বসে কম্পিত হস্তে লিখছি আমার এই আত্মকাহিনী, কিন্তু আমার অন্তরের গোপন কথা আমি গোপনই রাখছি। যদি তাই না করি, তবে আমি জীবন রক্ষা করব কি করে? আমি যে নারী মাত্র। কিন্তু এইখানে এই নির্জন রাত্রিতে আমি আমার দুঃখের সংগীত বিস্মৃতিকে দিয়ে যাব, আমি বিস্মৃতির কাছে গচ্ছিত রেখে যাব আমার জীবনের দুঃখ আর গাথা।"

ব্যর্থ জীবনের হতাশা বার বার ঝরে পড়েছে। জাহানারা চিরকুমারী। বাদশা আকবর নিষেধ করে যান মুঘল শাহজাদীদের বিবাহ হবে না। সুন্দরী রাজকুমারীদের জীবন এর ফলে হয়ে উঠেছিল বীভৎস। কুৎসা, কেচ্ছা আর কেলেঙ্কারীর অন্ত ছিল না। মুঘল সাম্রাজ্যে এ নিয়ে অনর্থও কম হয়নি। জাহানারার প্রণয় প্রার্থী বল্খের আমীর বীর যোদ্ধা নজবৎ খানের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল শাহজাদা দারার। কিন্তু বুন্দেল রাজা ছত্রশালের ওপর আকৃষ্ট ছিলেন বাদশাহজাদী। এ দুজনের অজস্র কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল সাম্রাজ্য জুড়ে। ছত্রশালের ছদ্মনাম ছিল 'দুলেরা' জাহানারা বন্দীজীবনে দুলেরার পথ চেয়ে দিন কাটাতেন। বার বার মনে পড়ে এই মানুষকে। তার অসামান্য পৌরুষ, অসীম বীরত্ব আর সুললিত কণ্ঠসংগীতের মোহনীয় আকর্ষণে তিনি চিরপ্রতীক্ষমান। দেওয়ানি-ই-আমের সংগীত নিস্তব্ধ, কিন্তু সন্ধ্যার আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে এক করুণ সুর। মনে হচ্ছে যেন রক্ত গোলাপের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে 'দুলেরার' সঙ্গীত। সঙ্গীতের ছন্দে শিহরণ এই দুর্গ প্রাচীর ভেদ করে আমার কামনার রাজ্যে গিয়ে পৌঁছায়। আমি দুলেরার নাম দিয়েছি রাজা। দুলেরার বাহুপাশে আমি উত্তেজনাকে আনন্দ মুহূর্তে বলে কল্পনা করেছিলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গীত আমাকে নিয়ে গেছে সেই রাজ্যে—যেখানে আমার চরণ কখনও ভূমিস্পর্শ করে নি। আজ তাঁর রূপ আমার স্মৃতিপটে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তবু তাঁর সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। ....

ভাবতেও অবাক লাগে। দিল্লীর প্রাসাদের শালিমার বাগে যার জীবন খুঁজে ফিরেছে উত্তেজনা—চিরন্তন আলোর খোঁজে যার বল্গাহীন উচ্ছ্বাস পাখা মেলে উড়েছে—অজস্র প্রজাপতির রঙীন পাখার মত স্বপ্নে স্বপ্নে মোহন রাগিণী বেজেছে অতন্দ্র—তাঁকে কিনা আগ্রা দুর্গের বন্দী প্রাসাদে দিন রাত চোখের জল ফেলতে হচ্ছে। কোথায় সেই আমীর ওমরাহ—কোথায় সেই অপ্রতিহত প্রতাপ—কালের স্রোতে সব বিলীন।

আজ মনে হচ্ছে 'স্বামীবিহীনা নারী আর সূর্যহীন দিবস উভয়ই নিরর্থক।" কিন্তু জীবন হারিয়ে গেছে। তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। নারী জীবনের ব্যর্থতার গ্লানিভরা এই আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় আছে আওরঙজেবের নৃশংস আচরণের আলেখ্য, নিষ্ঠুরতার বীভৎস কাহিনী। বাদশাহ শাহজাহানের মর্মজ্বালা, আত্মবিক্ষেপ আর অনুশোচনার প্রতিটি মুহূর্ত। শাহজাহান মারা গেলেন। দুর্গ প্রাসাদের পিছনের পাঁচিল ভেঙে লুকিয়ে তাঁর শবদেহ সমাধিস্থ করতে নিয়ে যাওয়া হল। কোন সমারোহ ছিল না, কোন শোক মিছিল হয়নি, কাউকে জানতেও দেওয়া হয়নি। পাছে প্রিয় সম্রাটের মৃত্যুতে সেনারা বিদ্রোহ করে। এ ভয় ছিল আওরঙজেবের। খৃষ্ট থেকে শ্রীকৃষ্ণ, হিন্দু পুরাণ, শাস্ত্র, বাইবেল থেকে নানা উপমা প্রয়োগ করেছেন জাহানারা। মোগল অন্তঃপুরের এই নারী যে কেবল বিলাস ব্যসন উত্তেজনা আর ক্ষমতার দম্ভেই মেতে ছিলেন না—একজন বিদুষী নারীও—আত্মজীবনীকে তার প্রমাণ রেখে গেছেন।

জীবনের সমস্ত সুখ, আনন্দ, ক্ষমতা যিনি নিঙড়ে উপভোগ করেছেন, আজ তাঁকে কাতর কণ্ঠে বলতে হচ্ছে :

'অন্ধকার নেমে আসছে, আমি অঙ্গুরীবাগ থেকে আলোকোদ্ভাসিত 'জেসমিন' প্রাসাদে চলে যাচ্ছি। এখানে নীরবে একাকী বসে লিখতে পারব, এখানে কোন মানুষের পদধ্বনি আমার চিন্তাকে ব্যাহত করবে না। এখানে কোন মনুষ্য কণ্ঠ আমাকে আমার অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে না—আমার অতীতকে জাগ্রত করবে না—আমার বাস্তব জীবনের সংবাদ বহন করে আনবে না।'

কমল চৌধুরী

সাহিত্যের নেপথ্যে

সেই লেখা কি কেউ লিখছেন ?

কথা হচ্ছিল 'ক' বাবুর দপ্তরে বসে। না, আমার সঙ্গে নয়। কথা হচ্ছিল 'ক'-বাবুর সঙ্গে মাসিক পত্রিকার একজন সম্পাদকের। সম্পাদক মশাই রীতিমত উত্তেজিত। 'গ' বাবু তাঁর কাগজে উপন্যাস লিখবেন কথা দিয়েছিলেন। এখন সে কথা ফিরিয়ে নিচ্ছেন। আর সে কথা দেওয়াও তো আজকের নয়। ঊনিশশো আটাত্তরের রথের দিন সন্ধে সাতটা আঠার মিনিটে কলেজ স্ট্রীট পাড়ার এক প্রকাশকের দোকানে পাঁপড়ভাজা সহযোগে খোশগল্পের অন্তরঙ্গ মেজাজে 'গ' বাবু অলিখিত কথা দিয়েছিলেন সম্পাদক মশাইকে। সম্পাদক মশাই বললেন, কথা দিয়েছিলেন বললে ঠিক বলা হবে না বুঝলেন দাদা, আসলে 'গ'-বাবুর কথা দেওয়ায় প্রমিসের অ্যাটিচিউড ছিল।

'গ' বাবু এখন মুখে বলছেন শরীরে কুলোচ্ছে না। চোখটা ভীষণভাবে বিট্রে করছে। রাতে একদম লিখতে পারছি না। তার ওপর লোড-শেডিং। মাসিক পত্রিকার সম্পাদক মশাই জেনেছেন এটাই ফ্যাক্ট নয়। 'গ' বাবু যা বলছেন তাই ঠিক নয়। আসল প্রবলেম অন্য জায়গায়। 'গ' বাবু একটা টপ কাগজের পুজো নাম্বারে উপন্যাস লেখার অফার পেয়েছেন। দারুন সম্মানদক্ষিণা আর টপ পাবলিসিটি সে কাগজের। কাজেই পুরনো সেই দিনের কথা 'গ' বাবু এখন আর মগজে রাখতে চাইছেন না। গত বছরের রথযাত্রায় দেওয়া কথা এ বছরের নববর্ষে মনে রাখার তাগিদ বোধ করছেন না। তাই মোটামুটি পরিচিত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক রথযাত্রায় দেওয়া ওয়ার্ড নববর্ষে কনফার্ম করতে গিয়ে নেগেটিভ আনসার পেয়েছেন। আর তখনই মস্তিষ্কে কী এক দুরূহ যন্ত্রণা। শরীরে উচ্চ অথবা নিম্ন চাপ। মোদ্দা কথা হল মাসিক পত্রিকার সম্পাদক মশাইয়ের রীতিমত বেহাল অবস্থা। অগ্র সেই বেহাল অবস্থা সামাল দিতেই সম্পাদক মশাই 'ক' বাবুর চেম্বারে।

সাহিত্যিক 'ক' বাবু পাণ্ডুলিপি থেকে চোখ তুলে হাসেন। সে হাসিতে ইঞ্চি খানেকও ঠোঁট ছড়ায় না। না সে হাসিতে দাঁত দেখা যাওয়ার কথা নয়। আর যাবেই বা কেন। যিনি যে ওজনের সম্পাদক তার সঙ্গে তো সেই টাইপের হাসিই বরাদ্দ। যাইহোক 'ক' বাবু সম্পাদক মশাইকে মাপা হাসিতে রিসিভ করে বললেন, আসুন, আসুন, খবর কি বলুন? রীতিমত টাইট কর্নারে পড়া মাসিকের সম্পাদক আর খবরের কথা কথা কী বলেন? তিনি নিজেই তো এখন খবর। একটু থেমে তিনি 'ক' বাবুর কাছে একটি উপন্যাসের জন্যে প্রার্থনা জানালেন। 'ক' বাবু মনে মনে উল্লসিত হলেন নিশ্চয়ই তাঁর মুখ দেখে মনে হল বেশ অনিচ্ছুক তিনি এ বিষয়ে। সম্পাদক মশাই ব্যাপারটা একটু সহজ করে দেওয়ার জন্য বললেন, 'আপনি তো পুজোয় আমার কাগজে বড় গল্প লিখছিলেন সেটাই একটু বাড়িয়ে দিন। পাতা পাঁচ-ছয় বাড়ালেই আমি ম্যানেজ করে দেব। আরে মশায় পাঁচ-ছয় পাতা টেনে দেওয়া আপনাদের কাছে কিছুই না।'

অগত্যা সেই মতই কথা হল। আঠারো পাতার বড় গল্পকে পঁচিশ পাতার মিনি উপন্যাসে 'শেপ' দেবেন কথা দিলেন 'ক' বাবু। ঊর্ধ্ব নিম্ন অথবা পার্শ্বচাপ—মোট কথা বিরাট একটা মানসিক চাপ থেকে খানিকটা মুক্ত হয়ে ফিরে গেলেন মাসিকের সম্পাদক।

কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা তখনও মনে হয় দেবীর আবাহনে তেমন তৎপর হয়ে ওঠেননি। প্রাণপণে মূর্তিগড়ার কাজে হিমসিম হওয়ার অবস্থা তখনও আসেনি। আমাদের 'ক' বাবু 'খ' বাবু কিংবা 'গ' বাবুদের লেখার টেবিলে কিন্তু তখন থেকেই রীতিমত ঝড়। টিপিক্যাল সাইক্লোন। এই 'ক' বাবুর কথাই বলি না কেন। বড় গল্পকে উপন্যাস বানানোর বরাত পাওয়ার আগেই তো নানা রকমের কাগজে তাঁর গোটা পাঁচেক লেখার কথা গত বছর থেকেই পাকা। লোড-শেডিংয়ের কলকাতায় হ্যারিকেনের আলোয় তিনি একসঙ্গে তিনটে উপন্যাস আর দুটো বড় গল্পে হাত দিয়েছিলেন। আজ হিসাবটা একটু বদলে নিয়ে হল চারটে উপন্যাস আর একটা বড়গল্প। একটাকে অবিশ্যি মিনি উপন্যাস বলা যেতে পারে। 'ক' বাবু আবার রুটিন করে নিয়েছেন। সকালে 'তিমির' পত্রিকার উপন্যাস লিখছেন দু ঘন্টা। বাকি দু ঘন্টা লিখছেন অন্য তেন পত্রিকার উপন্যাস আর 'নির্বাক' পত্রিকার বড়গল্প। রাতে কখনও লোডশেডিংয়ের ভেতর হ্যারিকেন জ্বালিয়ে কখনও বিদ্যুত-এর আলোয় পর্যায়ক্রমে লিখছেন 'উজ্জ্বল প্রভাত' এবং 'দুঃসময়' পত্রিকার উপন্যাস দুটো। এরই মধ্যে আছে পারিবারিক নানান ঝামেলা। নিজের দাঁতের ব্যথা, সাইনাসের ট্রাবল, তার ওপর অফিসের কাজ।

'খ' বাবু তো তাঁর পুজোর লেখা জুলাইয়েই শেষ করে দেবেন। জুলাইয়ের লাস্ট উইকে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হবেন। শরীরে অস্ত্রোপচার হবে। অপারেশনের পর বিশ্রাম শেষে সুস্থ হয়ে আবার কখন লিখতে পারবেন কে জানে? তার আগেই কমসে-কম দুটো উপন্যাস একটা বড়গল্প জমা করতে হবে বিভিন্ন সম্পাদক-এর দপ্তরে। 'খ' বাবুর তাই এখন টাইট অবস্থা। নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। শৌখিন 'খ' বাবু দাড়ি কামাতেন প্রায় প্রতিদিনই। এখন গালে তিন দিনের বাসি দাড়ি। মাঝে মধ্যে ওষুধ খাওয়ার কথাও ভুলে যাচ্ছেন 'খ' বাবু।

'গ' বাবুর শরীরে নানা কম্প্লিকেসি। মর্নিং ওয়াক তাঁর ডেলি রুটিন। একটানা দীর্ঘ সময় লিখতে পারেন তিনি। গত এক মাসে দুটি উপন্যাস লিখেছেন: এবার লিখছেন পুজোর লেখা। লেখার তোড়ে কিন্তু মর্নিং ওয়াকে যাওয়ার কথা মোটেই ভুলে যান না। তার মধ্যেও লেখা ঠিক-মতই এগোয়। মাঝে মধ্যে রাতে মাত্র দু-তিন ঘন্টা ঘুমোন।

'ঘ' বাবু একদা এক প্রকাশকের বিয়েতে গিয়েছিলেন। 'ঘ' বাবু থাকেন কলকাতায় উপকণ্ঠে। সেখানে জমায়েত অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব আর সঙ্গীসাথীদের বলছিলেন একটা দারুণ জায়গা দেখেছেন তাঁর আস্তানা থেকে খানিক দূরে। কতদূরে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। এক মাইল হতে পারে। আধ মাইলও হতে পারে। আবার তার বেশিও হতে পারে। যাই হোক সেই স্বপ্নময় জায়গায় তিনি মাঝে মাঝেই যাচ্ছিলেন তখন। বলেছিলেন সেই জায়গার পটভূমিতে একটা দারুণ উপন্যাস লিখবেন। এ বছর তিনিও নিশ্চয়ই লেখার টেবিলে। পুজোর লেখাপত্র চলছে। হয়তো সে উপন্যাসখানা এবার লেখা হচ্ছে পুজোর ধাক্কায়।

'ঙ' বাবু সারা বছর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেসব গল্প আর বড়গল্প লেখেন তাই-ই জোড়া দিয়ে একটু আধটু এদিক ওদিক করলে একটা উপন্যাস দাঁড়িয়ে যায়। অর্থাৎ উপন্যাসের 'হাত-পা' গুলো তাঁর আগে-ভাগেই তৈরি থাকে। নাট-বল্টু জুড়লেই উপন্যাস। তাই 'ঙ' বাবু কোন কোন সময় অনেকটা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এমন হয় তা বলছি না।

পুজোর তাড়ায় লেখকদের টেবিলে এখন এই রকম হালচাল। লেখার টেবিলে এখন ওয়ান আপ টু ডাউন। পুজোর টানে লেখকদের কলমে এখন উপন্যাসের বাণ ডাকছে। পুজো চুকলেই সেসব উপন্যাস প্রকাশকের ঘর থেকে বই হয়ে বেরোবে। বছরের সাহিত্য ফসলে নতুন সংযোজন হবে কিছু। এই মতই চলছে। পাঠক হিসেবে আমাদের কিন্তু যথেষ্ট ক্ষোভ রয়ে যাচ্ছে। নাড়াবইহার, লবটুলিয়ার বন প্রান্তর কিংবা সরস্বতী কুণ্ডী আমরা দেখছি না, রাজু-পাঁড়ে, যুগলপ্রসাদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে না। হাসুলীর সুচাঁদ পিসি বলেছিল, 'হিয়ের জিনিস নিয়ে হিয়েতে যদি কেউ রাখত—তবে থাকত। তা তো কেউ নিলে না, রাখলে না। আমার সাথে সাথেই এ উপ-কথার শেষ। তবে পার তো লিক্ষে রেখো।' সেই লেখা কি কেউ লিখছেন?

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিপত্র

সংস্কৃত নাটক ও হিন্দী সিনেমা

আপনার পত্রিকার ৩০-৩-৭৯ তারিখে প্রকাশিত শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সংস্কৃত নাটক ও হিন্দী সিনেমা শীর্ষক তুলনামূলক নিবন্ধটি পড়লাম। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সমর্থন অনেক জায়গাতেই করতে হবে (১। নায়ক-নায়িকার প্রেমে পড়া, ২। শৃংগার রসাশ্রিত কাহিনীর সঞ্চারী রস, বীররস, বীররসাশ্রিত কাহিনীর সঞ্চারী শৃংগার রস ইত্যাদি)। কিন্তু তাঁর এ-আলোচনা হাল্কা রম্য রচনা জাতীয়—যদিও এতে রম্য রচনাসুলভ দৃঢ় কিছু বক্তব্য নেই। হিন্দী সিনেমা, সংস্কৃত নাটক উভয় দিক থেকেই তাঁর সিদ্ধান্তের অসারতা প্রমাণ করা যায়। শকুন্তলা নাটকের উল্লেখ এ-প্রসঙ্গে উচিত হয়নি। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের যে প্রেম (শ্রীমুখোপাধ্যায় যাকে সংস্কৃত নাটক ও হিন্দী সিনেমার ধারা অনুযায়ী আবশ্যিক বলেছেন এবং মিলনের অব্যবহিত পরেই শকুন্তলার গর্ভসঞ্চারের উল্লেখ করেছেন) এবং তার পরিণতি বিশ্ব-সাহিত্যের যে-কোনো প্রেমমূলক কাহিনীর সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্য। গর্ভসঞ্চারের উল্লেখ করে শ্রীমুখোপাধ্যায় সংস্কৃত নাটকের প্রেমিকাদের প্রেমকে কামজ বলেছেন—এ-ব্যাপারটাও হাস্যকর। দৈহিক মিলন ও প্রেম : এদের ফলশ্রুতি সেই একটিই—অতএব অবশ্যম্ভাবী সাধারণত্বকে কেন্দ্র করে অসাধারণত্ব আরোপ করা তো বাতুলতা। আর, শকুন্তলার শেষ অংকে কালিদাস তো হিন্দী ছবিসুলভ (বেশির ভাগই) দৈহিক মিলনে প্রয়াসী হননি এবং এটিই প্রেম-কাহিনীর মধ্যে একটি চিরকালীন সুর এনেছে। আবার শ্রীমুখোপাধ্যায় সংস্কৃত নাটকে সমাজের ছায়া খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু শকুন্তলা-র মুনি-ঋষিদের তপোবনের ছবি, মৃচ্ছকটিকাতে নিম্নবিত্ত পল্লীর বর্ণনা, নিষিদ্ধ ললনার সঙ্গে ব্রাহ্মণ রাজা চারুদত্তের প্রেমের কথা—এগুলো কি তৎকালীন সমাজমানসের কিছুমাত্র পরিচয় নয় ?

আবার হিন্দী ছবিতে হিরো-হিরোইনের প্রেম ও শেষে অবশ্যম্ভাবী ছকটি কমেডি মিলন ছাড়া বিশিষ্ট প্লোটেনিকত পাননি তিনি হিন্দী সিনেমার আগের যুগের বইগুলোর কথা বাদ দিলেও সে-গুলোতে সমাজমানসের প্রতিফলন, শাশ্বত প্রেমের কাহিনী মোটেও অপ্রতুল নয়) ভেলাভালা, দীবার প্রভৃতি বইয়ের দয়িত-দয়িতাদের পরিণতি কি নির্মম হাস্যরসের খোরাক ছাড়া কিছু নয় ? আর সমাজ-মানস — আধুনিক নগর-সভ্যতার (বোম্বে বিশেষ করে) জটিলতা কি একটুও ছোঁয়া দিয়ে যায়নি হিন্দী সিনেমায় ? এছাড়া বন্ধন, অভিমান কি খিলাড়ী, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি ছবিতে সমাজের যে-ছবি পাওয়া যায়, তা কি উৎকর্ষে কোনো অংশে নিম্ন মানের ? —রতন জানা, মেদিনীপুর।

(২)

সংস্কৃত নাটক ও হিন্দী সিনেমার মধ্যে তুলনা করে নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মোটামুটিভাবে শেষোক্তটির শ্রেষ্ঠত্বের কথা মেনে নিয়েছেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত একেবারে নির্ভুল। তবু তো হিন্দী সিনেমার কিছু উৎকর্ষ তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। যেমন হিরোর কথাই ধরা যাক—সংস্কৃত নাটকে 'উদাত্ত' অর্থাৎ উদারচেতা, 'ললিত' অর্থাৎ লঘুচেতা, 'প্রশান্ত' অর্থাৎ ধীর এবং উদ্ধত—এই চার প্রকার স্বভাবযুক্ত নায়কের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দী সিনেমার নায়কের ক্ষেত্রে এই চার স্বভাব একাধারে বর্তমান। তিনি দীন দরিদ্র বা বিপন্ন লোকের প্রতি উদাত্ত, ললিতরূপে নায়িকার সঙ্গে প্রেম করেন, বিরহের সময় (মন্থর গীত ও দাড়ি সহযোগে) প্রশান্ত এবং তাঁর উদ্ধত রূপটি ফুটে ওঠে ভিলেনের সঙ্গে মারামারি করার সময়। তাছাড়া সংস্কৃত নাটকের হিরো মাঝে মধ্যে দু-একটা বীরত্বের কাজকর্ম করলেও হিন্দী সিনেমার হিরোর তুলনায় সেসব কিছুই নয়। যেমন 'রত্নাবলীর' নায়ক উদয়ন শেষ অঙ্কে নায়িকাকে বাঁচাতে জীবন তুচ্ছ করে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। নায়িকাকে উদ্ধার করার পর জানা গেল ঐ আগুন আসল নয়, স্রেফ জাদুকরের মায়া। আর হিন্দী সিনেমার নায়ককে নায়িকারক্ষার্থে কতবার আসল আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে তার হিসেব পাওয়া মুশকিল। শুধু নায়ক কেন ? হিন্দী সিনেমার না[illegible]ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন। সংস্কৃত নাটকে নায়িকারা প্রেমে পড়েই খালাস, অথচ হিন্দী সিনেমার নায়িকাদের হিরোর জন্য কত কি করতে হয়। হিরোর প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাঁকে নিখুঁত ছন্দে খালি পায়ে কাঁচভাঙা ছড়ানো মেঝের উপর নৃত্যগীত করতে হয়। এমনি আরো কত কি।

তাই বলছিলাম শ্রীমুখোপাধ্যায় সংস্কৃত নাটক ও হিন্দী সিনেমার মধ্যে তুরি জুরি মিল খুঁজে পান ক্ষতি নেই, কিন্তু তিনি যে উভয়কে একেবারে একাসনে বসিয়ে হিন্দী সিনেমাকে অপমানিত করার মত অজ্ঞানতা দেখাননি এর জন্য তাঁকে অনেক ধন্যবাদ। কেননা হাজার হলেও গুড়ি আর মিছরি কি কখনো এক হতে পারে ? —অনিন্দ্যকুমার ভট্টাচার্য, গ্রামীণ সাহিত্য চক্র, গৌরাঙ্গপুর, বালিচক, মেদিনীপুর।

চোখের সামনে দেখছি

অমৃতে উত্তর মেরুর পথে নামের ভ্রমণ কাহিনী পড়ে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়েছি। আমি ইংরেজী ভ্রমণ সাহিত্যের সঙ্গে পুরোপুরি ও বাংলাতে অনেকটা পরিচিত আছি। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ক্যাপ্টেন কুকের বিশ্ব ভ্রমণের জার্নাল থেকে আধুনিক যুগের মেরুদেশ ও হিমালয় অভিযান, নীল ও শ্বেত নীলনদের উৎস সন্ধান, ন্যাশন্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিনের আশ্চর্য ও রোমাঞ্চকর দেশবিদেশের কাহিনী যথেষ্ট পড়েছি। কিন্তু শ্রীমতী কমল দত্তের অমৃতে প্রকাশিত রচনার সঙ্গে তুলনীয় কিছু পড়িনি। মনে হয়েছে উত্তরমেরু প্রান্তের মানুষ মনোবৃত্তি আর জীবনধারা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ জীবন্তভাবে দেখছি।

আমরা পাঁচ পুরুষে প্রবাসী বাঙালী, চাকুরী সূত্রে বিশ্ব বিচরণ করে থাকি। ঘরমুখো বাঙালীর মনকে যিনি এমন করে বহির্বিশ্বের মধ্যে টেনে আনছেন তিনি আমার মতে সমগ্র বাঙালী জাতের ধন্যবাদের পাত্রী। কিন্তু শ্রীমতী কমল দত্তের লেখা মোটে দুটি সংখ্যাতে শেষ হল কেন ? এ, সি, বোস, ৮৬, গিরিশচন্দ্র বোস রোড, লক্ষ্ণৌ।

মনকে নাড়া দেয়না

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক 'রিকসা' গল্পটি (৩০শে মার্চ ১৯৭৯) অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়তে পড়তে শেষ পর্যন্ত হোঁচট খেয়েছি। গল্পের নায়ক রাধাচরণকে লেখক গল্পের পরিণতিতে যেভাবে দাঁড় করিয়েছেন তাতে গাঁ[illegible] পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গল্পের নায়ক হয়েছে বই-এর পুরোনো মলাট। এতটুকু সহানুভূতি অনুকম্পা মনকে নাড়া দেয় না। অন্ততপক্ষে একটা প্রতিবাদধ্বনিত হওয়া উচিত ছিল এই সামাজিক দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে। —[illegible] চক্রবর্তী, বেলঘরিয়া, কলিকাতা—৫৬।

অস্ট্রেলিয়ায় বাঙালী কুলি গিয়েছিল

দেবেশ মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কালোদের পক্ষে নিষিদ্ধ দেশ অস্ট্রেলিয়ায় দেশ গড়ার কাজে কলকাতার বাঙালী তথা ভারতীয়দের যে খানিকটা অবদান আছে এ কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। ১৭৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে বিলেত থেকে অপরাধীদের প্রথম দল এসে পত্তন করেছিল অস্ট্রেলিয়া উপনিবেশ। পঞ্চাশ বছর পর অবিশ্বাস্য অত্যাচারের বলি কয়েদী শ্রমিকদের বুকের রক্তে অস্ট্রেলিয়া যখন অনেকটা গড়ে উঠেছে, খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়েছে, বদমাইসদের সঙ্গে তুচ্ছতম অপরাধে অপরাধী উচ্চশিক্ষিত উকিল, ধর্মযাজক, শিক্ষক, সাংবাদিক, প্রথম শ্রেণীর স্থপতি, ডাক্তার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, রাজনীতিক ও আর এক ধারে ভাগ্য ফেরাতে আসা দলে দলে ঔপনিবেশিকরা এসে একটা স্বাভাবিক, সুস্থ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, ফেলে আসা ইংল্যাণ্ডকে আর মাতৃভূমি না ভেবে অস্ট্রেলীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছে, তখন এই নতুন গড়ে-ওঠা সমাজ চাইছিলেন উপনিবেশের প্রথম পঞ্চাশ বছরের কলংকিত অধ্যায়টা ক্রমে ক্রমে মুছে দিতে কয়েদী আনা বন্ধ করা হোক। রাজনৈতিক কারণে-সরকার এ দাবি মেনে নেওয়ায় ১৮৪১ সাল থেকে মোটামুটিভাবে অস্ট্রেলিয়ায় কয়েদী চালান বন্ধ হয়ে যায়।

বিলেত থেকে কয়েদী আনা ত বন্ধ হয়ে গেল তাহলে সস্তায় শ্রমিক যাদের কাছ থেকে চাবুকের সাহায্যে কাজ পাওয়া যাবে তাদের কোথা থেকে যোগাড় করা যাবে? অন্য সকলের কথা বাদ দিলেও অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত পশম শিল্প এই সস্তার কয়েদী শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করেই এত প্রতিযোগিতা চালাচ্ছিল। কাজেই পশম সম্রাট জেমস ম্যাকআর্থারের নেতৃত্বে পশম উৎপাদকরা প্রস্তাব দিলেন যে, বিকল্প হিসেবে ভারত থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক আনতে দেওয়া হোক। পশমের বাজারে মন্দার অজুহাত দেখিয়ে তাঁরা বললেন, সস্তায় শ্রমিক না পাওয়া গেলে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারা যাবে না।

১৮২৭ সাল থেকে সিডনিতে কাজের তুলনায় অদক্ষ শ্রমিক কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যা বাড়ছিল। ১৮৪০ সালে অবস্থাটা হয়ত আরও খারাপ হয়ে থাকবে। কাজেই এ অবস্থায় যদি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ না বাড়ে আর তার ওপর ভারতীয় শ্রমিক এসে পড়ে তাহলে সাহেব শ্রমিকদের অবস্থা যে শোচনীয় হবে সে ত জানা কথা। কাজেই ভারতীয়দের আনার বিপক্ষে প্রবল আপত্তি উঠল। যুক্তি দেওয়া হল ভারতীয়দের চুক্তির মেয়াদ শেষে খরচা দিয়ে ফেরৎ পাঠাতে হবে, তারা সঙ্গে করে তাদের স্ত্রীদের আনবে না, ফলে নৈতিক অধঃপতনের স্রোত বইবে। উপনিবেশে সাধারণ লোকেদের জীবনযাত্রার যে উঁচু মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইংল্যণ্ডের আদর্শে তাদের কাজকর্মে যে শৃংখলাবোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার যে চেষ্টা দেখা যায়, ঢিলেঢালা প্রকৃতির ভারতীয়রা তার ওপর বিরাট আঘাত হানবে। সবচেয়ে বড় কথা ভারতীয় শ্রমিকরা যে কোন মজুরিতে কাজ করতে রাজি থাকায় তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্থানীয় সাহেব শ্রমিকরা হটে যাবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিলেত থেকে ভাগ্যান্বেষী দক্ষ মজুরেরা আর আসবে না। ভারতীয় শ্রমিক আনার দাবিও সরকার প্রত্যাখ্যান করেছেন, সরকারের এই সঠিক সিদ্ধান্তের ফলে উপনিবেশ আর একবার নতুন করে কালো মানুষের সমস্যা নিয়ে বিব্রত হবার দায় থেকে রক্ষা পেয়েছিল। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, অস্ট্রেলিয়ার নিকটতম ভারতীয় বন্দর কলকাতা থেকে বাঙালী তথা ভারতীয়রা উনিশ শতকে সে দেশে যায় নি।

১৮৪০ সালে ভারতীয় কুলিদের ওপর এত যে বিদ্বেষ, এত সোরগোল সেটা তারা বেশ কিছু সংখ্যায় তখনই সেখানে ছিল বলেই হয়েছিল ধরতে হবে। অস্ট্রেলিয়ায় যে গোপনে ভারতীয় কুলি চালান যায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার কোন খবরই রাখতেন না। সে জন্য ঠিক কোন সময় থেকে এরা যেতে আরম্ভ করেছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কলকাতার ক্যামবেল, ক্লার্ক এণ্ড কোম্পানীর রবার্ট কামবেল জুন ১৭৯৮ সাল থেকে কলকাতা থেকে গরু, ঘোড়া, মদ, চিনি, চা, কফি, মোমবাতি, সাবান চিনেমাটির বাসন, তামাক, চাল, মসলিন, দড়ি, চটের বস্তা ইত্যাদি নানান জিনিসের বিরাট চালান অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছতে থাকে। সে যুগের সাহেবরা এদেশ থেকে টাকা রোজগারের জন্যে যে কোন অসদুপায় অবলম্বন করতে অরাজি ছিলেন না, কাজেই ক্যামবেল সাহেবরা যে গরু, ঘোড়ার সঙ্গে কলকাতার কালো মানুষকে ভুলিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চালান দিত না এটা বিশ্বাস করা শক্ত, যদিও এ সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রমাণ নেই।

অস্ট্রেলিয়ায় যে কলকাতা থেকে গোপনে ভারতীয় কুলিদের চালান দেওয়া হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতার সদর দপ্তর সেটা প্রথম জানতে পারেন ১৮১৯ সালে অস্ট্রেলিয়া সরকার থেকে পাওয়া একটা চিঠি থেকে। চিঠিটার সংক্ষিপ্ত বয়ান দেওয়া হল।

নিউ সাউথ ওয়েলস
সিডনি, ২৩।৭।১৮১৯

সি এম রিকেটস, চিফ সেক্রেটারি, ফোর্ট উইলিয়াম, কলকাতা। আপনার মাধ্যমে সপারিষদ মহামান্য গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে জানাচ্ছি যে, নীচে যাদের নাম দেওয়া হল সেই ৩৫ জন হতভাগ্য দুর্দশাগ্রস্ত কলকাতার নেটিভদের, যাদের আগে কলকাতা বর্তমানে এখানকার অধিবাসী, উইলিয়াম ব্রাউন নামে জনৈক ব্যবসায়ী চুক্তি করে এনে অকথ্য অত্যাচার করে। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়হীন এই সব লোকেরা অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে সিডনির পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এদের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে সরকারি খরচে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এদের ব্যাপারে যে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয় তার আদেশে এই সব শ্রমিকদের চুক্তিনামা খারিজ করে সরকারি খরচায় মেরি নামে জাহাজে (কাপ্তান বেনজামিন অরম্যান) কলকাতায় ফেরৎ পাঠান হল। এদের সঙ্গে আরও পাঁচজনকেও ব্রাউনের খরচায় ফেরৎ পাঠান হল। তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ও এ-ঘটনার আরও যা বিবরণ পাওয়া যাবে তাও পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

নেটিভদের নামের তালিকা

পুরুষ ঃ জিতু, ঠাকুরদাস, গিরীশ, উদ্ধব, খোকা, গোপাল, লক্ষ্মণ (ছোট), ত্রিভুবন, বিষ্টু, ক্ষেত্র, নিমাই, মেধু

মাধু, মতিরাম, বাহাদুর, আজিম, কাসিম, আজমল, মিরজান, বদরুদ্দিন, খাটক, শুকোনি, মেহবুব, তেজমুরা, পাহাড় সিং, সংগ্রাম সিং।

স্ত্রী : ভক্তি, প্যারি, গঙ্গা, কমলা, বৌ, চাঁদমনি, জভ, শামিম, তামাসিয়া।

বাউনের খরচায় ফেরৎ পাঠান নেটিভদের নাম

কানু, দীনু, ভবানী, লক্ষ্মণ (বড়), দুর্গারাম দাস।

স্বাঃ জে এফ ক্যামবেল, সেক্রেটারী।

কোম্পানীও এ চিঠি পেয়ে আকাশ থেকে পড়লেন। যা হোক একটা কিছু ত করতে হয়, তাই কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে এ চিঠির নকল পাঠিয়ে শ্রমিকরা মেরি জাহাজ থেকে নামলে তারা কিভাবে কলকাতা ছেড়েছিল ও আর যা যা প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে তা জানিয়ে রিপোর্ট দিতে বলেন। পরে অবশ্য মত বদলে যাওয়ায় এ তদন্তের হুকুম তুলে নেওয়া হয়। এ থেকে বোঝা যায় বিদেশে কলকাতার লোকেদের গোপনে চালান দেওয়ার মত ব্যাপারেও কোম্পানী কোন গুরুত্ব দেন নি।

অস্ট্রেলিয়া সরকারের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রও শিগগির এসে গেল। ১৮২৯ সালে অস্ট্রেলিয়া সরকার নীতিগতভাবে তাঁদের দেশে ভারতীয় কুলি আমদানি ও তাদের সে দেশে থাকার বিরোধী ছিলেন না। ফলে কমিশনের মূল বিচার্য বিষয় ছিল শুধু ব্রাউন সাহেবের ফেরা ছেড়ে আসা হতভাগ্য শ্রমিকদের কেন ঐ রকম হাল হল তা জানা। যদি তদন্তের বিষয় আরও ব্যাপক হত তাহলে কবে থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় শ্রমিকরা আসতে থাকে, ১৮২৯ সালে তাদের মোট সংখ্যা কত ছিল, তাদের জীবনযাত্রার বিবরণ এ সব মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য জানা যেত। সম্পূর্ণ একটা ছবি না পাওয়া গেলেও কমিশনের রিপোর্ট থেকে মোটামুটি যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাও কম কৌতূহলের বিষয় নয়।

গোপন চালানের কথা

কমিশন তাঁদের রিপোর্টের মুখবন্ধে বলেন যে, ব্রাউন শ্রমিকদের ভুলিয়ে কলকাতায় তাদের সঙ্গে চুক্তি করে অসদুপায়ে তাদের এনে গোপনে সিডনিতে নামিয়ে সরাসরি কাজে লাগিয়ে দিত। কয়েক বছর ধরে এই রকমভাবে শ্রমিক আনা হচ্ছে সরকার তা পরে জানতে পারেন। এরা এত শান্তিপ্রিয় ও পরিশ্রমী ছিল যে, এদের থেকে উপনিবেশের শান্তিভঙ্গের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই এদের বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে ও সরকারের বিনানুমতিতে আনা হলেও, ব্রাউনের বিরুদ্ধে কোন আইন-মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সরকার ভাবেন নি।

নমুনা হিসেবে কমিশনের সামনে জবানবন্দী দিতে আসা দুজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোককে তারা কিভাবে জাহাজে উঠেছিল তা জিজ্ঞাসা করা হয়। ভক্তি, প্যারি ও পাহাড় সিং বলে, রাতের অন্ধকারে কলকাতায় তাদের জাহাজে তোলা হয়। পেশায় সূত্রধর ঠাকরদাস বলে যে, চুক্তি সই করার পর তাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে এনে চব্বিশ পরগণার কোন এক জায়গায় (ফলতা। বজবজ?) একটা গুদামে আটকে রাখা হয় ও সেখান থেকেই তাকে জাহাজে তোলা হয়। লক্ষ্য করবার বিষয় মেরি জাহাজের মালিক ছিল ব্রাউন নিজেই। কাজেই কলকাতা ও সিডনি বন্দরের কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে তার পক্ষে লোক ওঠান-নামান কিছু শক্ত ছিল বলে মনে হয় না। তদন্তটা খালি ব্রাউন সাহেবের শ্রমিকদের নিয়ে হওয়ায় অন্য কোন ঔপনিবেশিক সাহেব ব্রাউনের মাধ্যমে বা নিজেরাই সরাসরি শ্রমিক আমদানী করত কিনা জানা যায় না।

দোভাষী রহস্য

একজন জজ ও তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে তদন্ত কমিশন গড়া হয়েছিল। দোভাষী না হলে কমিশনের এই সব বিলিতি সদস্যরা সাক্ষীদের জবানবন্দীই বা কি করে বুঝবেন আর কেই বা তাদের আর্জি লিখে দেবে? কাজেই কমিশন নিজেরাই একজন দোভাষী নিয়োগ করেন। কলকাতা থেকে গেলেও ব্রাউন সাহেবের লোকেদের নামের তালিকা থেকে দেখা যায়, বাঙালী ও অবাঙালী দুই শ্রেণীর লোকেই ছিল। মুসলমানরা কোন্ ভাষাভাষী ছিল তাও বোঝা যায় না।

মুসলমনরা কোরাণ হাতে নিয়ে জবানবন্দী দিয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকের কথা বাংলা, হিন্দি বা উর্দু, ভাল তর্জমা করে কমিশনকে বলা ও উকিলি ইংরাজি ভাষায় আর্জি লিখে কমিশন ও কেন কোন ক্ষেত্রে খোদ গভর্নরকে পেশ করার কাজ যিনি করেছিলেন, তিনি কোন দেশীয় ছিলেন তার উল্লেখ নেই। নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর মুসলমানরা অস্ট্রেলিয়া যাবার সময় সঙ্গে করে কোরাণ নিয়ে গিয়েছিল, এটা যদি অসম্ভব না হয় তাহলে ধরতে হবে দোভাষীই কোরাণ জোগাড় করেছিলেন। যাই হোক কমিশনের দরকার হওয়া মাত্র দুটি বা তিনটি ভারতীয় ভাষা জানা ও মুসলমানদের কোরাণের ওপর শ্রদ্ধার কথা জানা লোক পাওয়া গেল এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা। ভারতীয় ভাষাবিদ ও আগে কলকাতাবাসী কোন সাহেব শুধু তদন্ত কমিশনকে সাহায্য করার সদিচ্ছায় নিজের জাত ভাই বিপদে পড়বে জেনেও এ মহানুভবতার কাজ যদি না করে থাকেন তাহলে সিডনিতে ১৮২৯ সালে ইংরিজিনবীশ বাঙালী তথা ভারতীয় (মুসলমান?) বসবাস করতেন বলে ধরতে হয়। অস্ট্রেলিয়ান ঐতিহাসিকরা উপনিবেশের প্রথম যুগে কোন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছিল না বলেছেন।

বিভিন্ন পেশার শ্রমিক, চুক্তির মেয়াদ, পারিশ্রমিকের হার

কমিশনের কাছে পেশ করা ব্রাউন সাহেবের কাগজপত্র থেকে দেখা যায় শ্রমিকদের বেশির ভাগ ছিল ক্ষেতমজুর। এরা ছিল বিভিন্ন বৃত্তির তথাকথিত নিম্নসম্প্রদায়ের মানুষ। চুক্তির মেয়াদ ছিল ১০ থেকে ৭ বছর, সামান্য কজনের ৩ বছর। মেয়াদ শেষে ফেরৎ পাঠানোটা ব্রাউন সাহেবের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত। মাস মাইনে ছিল সূত্রধর ১৭, দর্জি ১৬, খানসামা ১০, রজক ৮, অন্যান্য অদক্ষ শ্রমিকদের গড়ে ৬, স্ত্রী শ্রমিক ৩ ও বালক শ্রমিক ২ টাকা। এ প্রসঙ্গে ভাড়া করা সাহেব কয়েদী রাখবার খরচাটা তুলনা করা যেতে পারে। কয়েদীদের সোম থেকে শুক্রবার ভোর পাঁচটা থেকে সকাল ও দুপুরের খাওয়ার ছুটি ধরে দিনে দশ ঘণ্টা কাজ, শনিবার ৬ ঘণ্টা আর রবিবারে ছুটি। এরা খেটে-খাওয়া শ্রেণীর লোক ছিল না বলে কাজ তুলতও না বা তুলতে পারত না। কাজেই এদের ছুটির পর হয় অন্য লোকেদের কাছে কাজ করতে যেতে দিতে হত নয়ত সরকারের নির্দিষ্ট হারে ওভার টাইম দিতে হত। ওভার টাইম করে এরা মাসে পেত নগদ প্রায় দশ টাকা (১ পাউণ্ড= ৮ টাকা)। এদের খাইখরচার জন্য লাগত মাসে ১২ টাকা। জামা-কাপড় দিতে হত ডিসেম্বর মাসে একটা সার্ট, এক জোড়া ট্রাউজার একজোড়া বিচেস, এক জোড়া জুতো আর জুন মাসে একজোড়া কুর্তা এক জোড়া সার্ট, এক জোড়া ট্রাউজার বা বিচেস ও একটা টুপি। জামা-কাপড়ের মোট দামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এদিকে কলকাতায় চুক্তিপত্র সই হবার সময় মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, কলকাতায় যে মানের খাবার লোকে খায়, ঠিক সেই মানের চাল, ডাল, আটা, ঘি (?) সব মিলিয়ে মাথা-পিছু মাসে ২০ সের করে দেওয়া হবে। মাস মাইনে যেমন নিয়মিত দেওয়া হত না, খাবারের বেলাতেও তাই হয়েছিল। চাল ডাল কমিয়ে তার বদলে ভুট্টা, মকাই দেওয়া হত। এভাবেও যেমন হোক দিন চলছিল কিন্তু ১৮১৮ সালে রাজধানী ব্রাউন মেব-

সাহেব কলকাতার বাস উঠিয়ে আসবার পর থেকে অবস্থা আরও খারাপের দিকে গিয়েছিল। খাবারের মাসিক পরিমাণ ত কমে গেলই, এর ওপর আবার আটার ভুষির রুটি দেওয়া হতে লাগল। এ রুটির নমুনা গভর্ণর ও তদন্ত কমিশনের সামনে পেশ করা হয়েছিল। কমিশনের কাছে জবানবন্দী দেবার সময় সাক্ষীরা বলেছিল যে রকমের রুটি মেমসাহেব তাদের দিত, তা কলকাতায় কুকুরেও খায় না। যাই হোক এ থেকে ভারতীয় লোকদের যাথা ঔপনিবেশিকদের পক্ষে যে কত সুবিধের ছিল তা জানা যায়। কাজের নির্দিষ্ট সময়ের সরকারি নিয়ম-কানুনের আওতায় এরা পড়ত না বলে ২৪ ঘণ্টাই এদের খাটনি যেত।

কলকাতার হিন্দু গেরস্ত বাড়ীতে যেমন ক্রীতদাস বা সাধারণ চাকর জলচল জাতের হলে তাদের দিয়ে কোন নীচু কাজ করান হত না ব্রাউন সাহেব সে প্রথা মানে নি। রজকদের দিয়ে কাঠ চেলা, রান্নার জল আনা, ক্ষেত মজুরের কাজ, ওয়েটার করিমকে দিয়ে পায়খানার টব পরিষ্কার করতে বাধ্য করা হয়। বিন্টুর কাজ ছিল জঙ্গলে আগুন দিয়ে ফাঁকা জায়গা তৈরী করা কিন্তু তাকে দিয়ে গোবর কুড়ানো ও ঘুঁটে দেওয়ানো হত। অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম ঘুঁটে দেওয়ার গৌরবের অধিকারী এই বিন্টুর জ্বর হওয়ায় একবার গোবর কুড়নোর পরিমাণ কম হয়েছিল বলে মেমসাহেব তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। ঘরকন্নার কাজ করতে হবে বলে ভুলিয়ে এনে স্ত্রী শ্রমিকদের ক্ষেতমজুরের কঠিন পরিশ্রমের কাজ করান হয়। হাতের কাজ জানা লোকেদের মোটা মজুরির বিনিময়ে উপনিবেশের অন্যান্য সাহেবদের ভাড়া দিয়ে সে টাকাটা ব্রাউন সাহেব পকেটে পুরত। এই শ্রমিকদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মিলিটারি অফিসার ও অন্যান্যরা যে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন কমিশন তা নথিভুক্ত করেন।

জাহাজ কলকাতা বন্দর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাউন সাহেবরা নিজ মূর্তি ধরেছিল। উদ্ধব রজক ও জিতু ইস্তিরিওয়ালাকে জাহাজের লস্করের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। লস্কররা সব মুসলমান তাদের সঙ্গে খেলে জাত যাবে এটা বুঝিয়ে বলাতেও কোন ফল তো হলই না উল্টে তিনদিন তাদের খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। জাহাজেই যখন এ অবস্থা অস্ট্রেলিয়া পৌঁছনর পর অত্যাচারের পরিমাণটা কি রকম দাঁড়িয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। তুচ্ছ কারণে এদের ৩।৪ দিন অনাহারে রাখা হত। অকথ্য গালমন্দ ত নিত্য পাওনা ছিল। তার ওপর পান থেকে চুন খসলে বা সাহেব ওভারসিয়ারদের মিথ্যে লাগানি ভাঙানিতে এদের ঘোড়ার চাবুক, কাঠ, গরু বাঁধা দড়ি দিয়ে অমানুষিকভাবে মারা হত। মুখে ঘুষি মারা, গলা টিপে ধরা এসব ত ছিলই। কমিশনের কাছে শ্রমিকরা তাদের মাথা মুখ ও শরীরের অন্যান্য অংশের গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখিয়েছিল। শারীরিক অত্যাচার ছাড়া এদের যে কোন অভিযোগে হাজতে পাঠান হত এবং বলাই বাহুল্য হাজতে থাকার খাইখরচাটা তাদের মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হত। কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় না থাকায় গভীর রাত্তিরেও এদের ঘুম থেকে তুলে বাইরের কাজে পাঠান হত। বিছানা দেওয়া হত না, কাপড়চোপড়ও দেওয়া হত না বললেই হয়। কমিশন তাদের সামনে জবানবন্দী দিতে আসা শ্রমিকদের পোষাকের শোচনীয় দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। স্ত্রী শ্রমিকদের লজ্জা নিবারণের মত কিছু না থাকায় ব্রাউন সাহেবের প্রতিবেশী মেমসাহেবদের কাছ থেকে পোষাক ধার করে এনেছিল। শামির নামে এক স্ত্রী শ্রমিকের একটি সন্তান হয়। চারদিন পর তাকে কাজে যেতে বলায় সে কয়েকদিন সময় চায়। ফলে তার খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। পেটের দায়ে শিশুটিকে গুদাম ঘরে শুইয়ে রেখে কাজে যাবার ফলে মাতৃ স্তন্যের অভাবে শিশুটি কদিন পরে মারা যায়।

চাঁদমনি আসন্ন প্রসবা জেনেও তার কোন অনুরোধ না শুনে তাকে দিয়ে ভারি ভারি জিনিস বওয়ান হয়। এর ফলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তবুও তাকে পরদিন একই কাজ করতে বাধ্য করার ফলে তার শরীর ভয়ানক জখম হয়ে যায়। ভক্তি আর প্যারি এদের দিয়ে ক্ষেতের পাহারাদার কুকুরদের খাবারের জন্য দিনরাত গম ভাংগান হত। রাত্তির দুটো থেকে চারটে অবধি মাত্র এই দুঘন্টা তারা ঘুমতে পেত। পুরুষ শ্রমিকদের মত স্ত্রী শ্রমিকদের ওপর দিনরাত যে কোন সময়েই মারধোর করা হত।

মালিকের ঔদ্ধত্য

ব্রাউন সাহেবদের ঔদ্ধত্যের কোন মাত্রা ছিল না। বড়ই আশ্চর্যের কথা শ্রমিকদের গালমন্দ করবার সময় ব্রাউন সাহেব বিশেষ করে মেমসাহেব একজন ঔপনিবেশিক হয়ে উপনিবেশের মহামান্য গভরণরের নামে প্রকাশ্যে যা ইচ্ছে তাই বলবার সাহস রাখত। কমিশনের সামনে জবানবন্দী দেবার সময় সাক্ষীরা বলে যে-কোন বিষয়ে অভিযোগ জানাতে গেলে তাদের সোজা গভর্ণরদের কাছে গিয়ে নালিশ জানাতে বলা হত। রায়বাঘিনী মেমসাহেব সকলের সামনেই বলত গভরণর হল খুনী, চোর আর বদমায়েসদের আড্ডা এই উপনিবেশের কর্তা। সে আমার মাথার একগাছা চুল ছেঁড়ার ক্ষমতাও রাখে না। তার কাছে গিয়ে একবার জেনে আয় সে আমাদের কি কর্তে পারে ইত্যাদি। প্রকাশ্য আদালতে এসব কথা জানান হলেও কোন মানহানির মামলা দায়ের করা হয়নি। যেসব হতভাগ্য লোকদের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে সরকারের আশ্রয়ে রেখে কলকাতায় ফেরৎ পাঠান হয়েছিল তাদের ছাড়া অন্য শ্রমিকদের চুক্তিনামার কাগজপত্র বকেয়া পাওনা গণ্ডার হিসেব দিতে ব্রাউন অস্বীকার করে। কমিশনের আদেশ অনুযায়ী ৩৫ জন শ্রমিকের জাহাজ ভাড়া প্রথমে দেব বলে পরে তাও অস্বীকার করে। স্থাবর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও যখন টাকা আদায় করা গেল না, তখন মনে হয় আইনগত কোন বাধা ছিল।

শ্রমিকদের মনোভাব

শারীরিক অত্যাচারের কথা যা কমিশনের সামনে বলা হয় তা ১৮১৯ সালে সরকারের নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা কয়েদী শ্রমিকদের ওপর যে অবিশ্বাস্য অত্যাচার করা হত তার তুলনায় বেশী কিছু নয়। এত অত্যাচার, আধপেটা অখাদ্য খাওয়া, বিছানা জামাকাপড়ের অভাব সত্ত্বেও শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই বলেছিল যে, চুক্তির সর্ত ঠিক ঠিক মানা হলে তারা আরও কুড়ি বছর কিম্বা সারা জীবনই থাকতে রাজি আছে। ১৮১৯ সালে ব্রাউন সাহেবের মোট কজন শ্রমিক ছিল তা জানা না গেলেও কমিশন যেটুকু কাগজপত্র জোগাড় করতে পেরেছিলেন তা থেকে আরও বেশ কয়েকটা নাম পাওয়া যায়। এছাড়া সাফাই সাক্ষী হিসাবে যাদের দাঁড় করান হয়েছিল তারা ত আছেই। এরা শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছিল, না, অস্ট্রেলিয়ায় থেকেই গিয়েছিল তা জানা যায় না। আশ্চর্যের কথা কমিশন যখন ৩৫ জন শ্রমিককে সরকারি খরচায় আর ৫ জনকে ব্রাউনের খরচায় ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন তখন এদের মধ্যে কজন আবার গোপনে ব্রাউন সাহেবের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করবার চেষ্টা করে। কমিশনের হস্তক্ষেপে তাদের এ চেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি। এদের মনোভাব থেকে [illegible] শতকের গোড়ার দিকে কলকাতার শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের অর্থনৈতিক দুর্দশার চেহারা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible]দের খোরাকি বাদে গড়ে মাসে ৬ টাকা আর স্ত্রীলোকদের ৩ টাকার কাজ [illegible] পাওয়া [illegible] হয়।

যাবার সময় হয়ত অস্ট্রেলিয়া কোথায় এটা তারা জানত না কিন্তু একবার সেখানে গিয়ে তাদের অনেকেই কলকাতার অনিশ্চিত বা বেকার জীবন কাটনোর বিভীষিকার চেয়ে সেই বিদেশে কষ্ট করে থাকাটাই বেছে নিতে চেয়েছিল। আজও ত সেই ট্র্যাডিসন সমানেই চলছে, বৈধ বা অবৈধ যে-কোন উপায়ে হোক বেকার ভারতীয়রা কোথায় না পাড়ি দিচ্ছে এবং সেখানে গিয়ে কি অবস্থায় পড়ছে এত খবরের কাগজে প্রায়ই পড়া যায়।

কুকর্মায় শ্রমিক ও সরকারী নীতি

কালোদের নিষিদ্ধ দেশ সাদা অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় চুক্তি-বদ্ধ শ্রমিক একেবারেই ঢুকবে না ১৮১৯ সালে এটা সরকারি নীতি ছিল না। হাতের কাজ জানা ভাল মিস্তিরি পাওয়া খুব মুস্কিল ছিল। যে কজন হাতের কাজ জানা অপরাধী আসত তাদের বেশীর ভাগকেই সরকার নিজেদের কাজের জন্যে রেখে দেওয়ায় সাধারণ লোকেরা এদের বেশী সংখ্যায় পেতেন না। এইসব হাতের কাজ জানা লোকেরা নিজেদের ওজন ভালভাবেই বুঝত, কাজেই এদের যাঁরা ভাড়া করতেন, তাঁদের এইসব বদমেজাজী, মাতাল, গুন্ডা প্রকৃতির লোকদের নিয়ে অশান্তির শেষ ছিল না। উপায় না থাকায় বাধ্য হয়ে এদের উপদ্রব সহ্য করতে ত হতই, এর ওপর তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দিয়ে কাজ তুলতে হত। আর জন্ম অপরাধী অদক্ষ কয়েদী শ্রমিকরা কোনদিন খেটে খায়নি বলে পরিশ্রমের কাজে তাদের মন বসত না তাই তারা কাজ তুলত না।

বিলেতে একজন কয়েদীকে জেলে রাখবার খরচা ছিল বছরে ছাব্বিশ পাউন্ড পনের শিলিং এগার পেন্স আর কুড়ি পাউন্ড জাহাজ ভাড়া খরচ করে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে একবার তাদের ঔপনিবেশিকদের কাজে লাগিয়ে দিতে পারলে আর কোন খরচাই লাগত না। কাজেই সরকারি পর্যায়ে কলকাতা থেকে কুলি এনে উপনিবেশ ছেয়ে ফেলবার কোন প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু ঔপনিবেশিকরা যদি নিজেদের চেষ্টায় কিছু কিছু কাজ জানা, শান্তিপ্রিয়, সস্তায় ভারতীয় শ্রমিক এনে ভাড়া করা কয়েদীদের দিয়ে কাজ তোলাবার হাঙ্গামা থেকে খানিকটা মুক্তি পায় তাতে ক্ষতি কি? হয়ত এই কারণেই অস্ট্রেলিয়া সরকার কলকাতা থেকে আমদানী সম্বন্ধে উদার নীতি গ্রহণ করে থাকবেন। ব্রাউন সাহেবের শ্রমিকদের নিয়ে তাঁরা যে অসুবিধেয় পড়েছিলেন তা থেকে শিক্ষা পেয়েও শ্রমিক আমদানী বন্ধ করতে তাঁরা চান নি। বরং "ভবিষ্যতে যারা আসবে" তাদের নিয়ে আর যাতে গোলমাল না হয় সেই জন্যে তাঁরা তাঁদের ২১।৭।১৮১৯ সালের চিঠিতে কলকাতায় কোম্পানীর চিফ সেক্রেটারিকে অনুরোধ করেন কিছু কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিতে। দুঃখের কথা কোম্পানী কলকাতা থেকে শ্রমিক চালানের ব্যাপারে কোনদিনই সক্রিয় ব্যবস্থা নেবার দরকার মনে করেননি। যাই হোক অস্ট্রেলিয়া সরকারের অনুরোধের ফলে কোম্পানীর নীতি স্থির হল যে ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যাবার জন্য নিয়োগকারীদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে সেখানে নিয়ে গিয়ে শ্রমিকদের ওপর কোন অত্যাচার করা হবে না। ঈশ্বর জানেন কলকাতায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারপর অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে গিয়ে অত্যাচার ও শোষণ করলে কোম্পানী তাদের কি করে রক্ষা করতে পারতেন। তাঁদের এই নীতি অনুমোদন করাবার জন্য সপরিষদ গভর্নর জেনারেল বিলেতে কোর্ট অফ ডিরেক্টারসকে [illegible]০।১৮২০ সালের চিঠিতে লিখলেন "৩৫ জন বাংলাদেশের নেটিভকে সিডনিতে নিয়ে গিয়ে একজন [illegible] ব্রাউন [illegible] অত্যাচার করে সে বিষয়ে অস্ট্রেলিয়া সরকারের সেক্রেটারির চিঠির নকল পাঠান হল। কলকাতা থেকে শ্রমিক চালান আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই হয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়া সরকারের বিনা অনুমতিতেই তাদের সিডনিতে নামান ও সরাসরি কাজে লাগান হয়। ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়া সরকার আবার যাতে এখানকার নেটিভ শ্রমিকদের নিয়ে বিব্রত না হন সে জন্য তাদের জাহাজে ওঠার আগে নিয়োগকারীদের কাছ থেকে শ্রমিক-দের ওপর ভাল ব্যবহার করবার প্রতিশ্রুতি আদায় করার ব্যবস্থা করেছি। কলকাতার সিটি ম্যাজিস্ট্রেটদের এই কাজ তদারক করার ভার দেওয়া হয়েছে। ৩৫ জন শ্রমিককে কলকাতায় ফেরৎ পাঠান ও তাদের খাইখরচা বাবদ মোট ৩৮৬ পাউণ্ড যা অস্ট্রেলিয়া সরকার ব্রাউনের কাছ থেকে আদায় করতে পারেন নি সে টাকা এখানকার নেটিভদের জন্য সম্পূর্ণ মানবিকতার কারণে ব্যয় হওয়ায় অস্ট্রেলিয়া সরকারকে দিয়ে দিয়েছি। কলকাতায় নামার পর ব্রাউনের দুঃস্থ শ্রমিকদের সাহায্যে আমরা মোট দুশ টাকা খরচ করেছি। ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়ায় নেটিভ শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য আমরা যে সতর্কতা অবলম্বনের নীতি নিয়েছি ও ফেরৎ পাঠান শ্রমিকদের জন্য আমাদের যে মোট ব্যয় হয়েছে আশা করি আপনারা তা অনুমোদন করবেন।

যেখানে খোদ অস্ট্রেলিয়া সরকারেরই ভারতীয় শ্রমিকদের আসতে দিতে আপত্তি নেই সেখানে কোম্পানীর মালিকরা আর কি বলবেন? দু' বছর পর গভর্নর জেনারেলের চিঠির উত্তরে কোর্ট অফ ডিরেকটারস তাঁদের ২৭।১২।১৮২২ সালের চিঠিতে লিখলেন, "কলকাতার ৩৫ জন নেটিভদের ওপর সিডনিতে অত্যাচারের কথা জেনে আমরা দুঃখিত। ভবিষ্যতে যে সব শ্রমিক যাবে তাদের রক্ষা করবার জন্য আপনি যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন ও ফেরৎ পাঠান শ্রমিকদের জন্য মোট যে ব্যয় হয়েছে তা অনুমোদন করা হল।"

সরকারি বাধা নিষেধ না থাকায় ১৮৪০ সাল অবধি কলকাতা থেকে মোট কত শ্রমিক চালান গিয়েছিল, কোম্পানীর নির্লিপ্ততার জন্য তা জানবার উপায় নেই। সে যাই হোক এইসব হতভাগ্য খেতে না পাওয়া বাংগালী তথা ভারতীয়দের জীবনযাত্রার কুৎসিত মান, তাদের কাজকর্মে শৃংখলার অভাব এত যেসব কথা বলে তাদের আসা বন্ধ করা হল সে ধারণা ত সাধারণ লোকেদের একদিনে হঠাৎ গড়ে উঠতে পারে না। তাদের অনেকের সংগে কাছাকাছি বেশ কিছুদিন বাস করার ফলেই এটা হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়। ১৮৪০ সালে যে সব ভারতীয় অস্ট্রেলিয়ায় ছিল তাদেরও ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হবে এরকম কোন আন্দোলনের উল্লেখ নেই। তাই চুক্তির মেয়াদ শেষে তারা সবাই ফিরে এসেছিল কিনা তাও জানা যায় না। তদন্ত কমিশনের আসনে ব্রাউন সাহেবের কয়েকজন শ্রমিক সাহেবের কাছ থেকে জমি পাওয়া ও তাতে কিছু কিছু চাষ করার কথা বলেছিল। দেশে ফিরে গিয়ে তারা কোনদিনই চাষের জমির মালিক হতে পারবে না এটা জেনেই হয়ত ব্রাউন তাদের জমির লোভ দেখিয়ে চিরকালের মত বাঁধতে চেয়েছিল। এটা থেকে অনুমান হয় চুক্তির মেয়াদ শেষে দেশে ফেরৎ পাঠান—হয় বাধ্যতামূলক ছিল না—না হয় আবার নতুন করে চুক্তি করবার কোন অসুবিধে ছিল না।

লক্ষ্য করবার বিষয় অস্ট্রেলিয়ার বর্ণসংকরদের কথা বলতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহাসিকেরা "সব রকম রঙের" বর্ণসংকরদের উল্লেখ করে বলেছেন সাদাদের সংগে বিবাহ সূত্রে ৩।৪ পুরুষ পরে এদের আর কোন আলাদা অস্তিত্ব থাকবে না। কাজেই অনুমান করতে হয় ১৮২০ সালের পর যে সব বাঙ্গালী তথা ভারতীয় শ্রমিক অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে আসেনি, তাদের বংশধররা আজ সবাই সাহেব হয়ে গিয়েছে।

ভারত কতটা এগিয়ে

পুনের কির্লোস্কার অয়েল এঞ্জিন ফ্যাকটরির তৈরি আধুনিক ডিজেল ইঞ্জিন এখন চলে যাচ্ছে কাহা কাহা মুলুকে। কাঠের খাঁচাবন্দী হয়ে পাড়ি দিচ্ছে বাল্টিমোর, হামবুর্গ, লিভারপুল, সিডনি আরও কত কত জায়গায়। শুধু কি ডিজেল ইঞ্জিন, পুনে আর জামসেদপুরের টেলকো ম্যানুফ্যাকচারিং প্লানটস-এর তৈরি শক্ত-সমর্থ ট্রাকগুলো রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে কুয়েত, নাইজিরিয়া, উগান্ডা আর জাম্বিয়ার অসমতল আর বন্ধুর রাস্তায় ছোটানোর জন্যে। বোম্বাইয়ের কাছাকাছি অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিকস লিমিটেডের অত্যাধুনিক গবেষণাগারে তরুণ প্রয়োগ কর্মীরা পশ্চিম জার্মান, ব্রিটেন, কানাডা আর সিঙ্গাপুরের নানান কারখানার জন্য বানিয়ে চলেছেন পাওয়ার ইউনিট আর ওসিলোস্কোপ। তেমনি বোম্বাইয়ের টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের বিশেষজ্ঞরা এক নতুন ধরনের কম্পিউটারের ছক করছে অস্ট্রেলিয়ার সিটি কর্পের ব্যাঙ্কের দরকারে।

এ ভারতের ছবি নিশ্চয়ই তার স্টিরিও টাইপ চেহারার নয়। বেশিরভাগ পশ্চিমী মানুষের কাছে সেই স্টিরিওটাইপ চেহারাটাই কিন্তু জ্যান্তো হয়ে আছে। ধুতিপরা রোগা রোগা চেহারার ধর্মপ্রাণ মানুষ গঙ্গার জলে স্নান করছে বোম্বাইয়ের পথে বিচিত্র চেহারার ভিখিরির ভিড়। কাটাছেঁড়া শরীর দেখিয়ে তাদের পথচারীদের কাছে করুণা-ভিক্ষার প্রয়াস। গ্রামের দিকে আশ্রয়হীন মানুষের যেমন তেমন করে বানানো চট আর পিজবোর্ডের তৈরি আগোছালো আস্তানা। সে চিরাচরিত ভারত অবিশ্যি এখনও আছে। আর তার সে চেহারা স্মৃতিতে এমন দৃঢ়-মূল যে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, বর্তমানে সেনেটর শ্রীময়নিহান একসময় মন্তব্য করে-ছিলেন, 'ছড়িয়ে দেওয়া যায় এমন রোগ ছাড়া ভারত আর কিই বা রপ্তানী করতে পারে।' শিল্পে সমৃদ্ধ জাতিগুলির মধ্যে ভারতের স্থান আজ দশম। গত বছর রপ্তানী বাণিজ্যে তার আয় ছিল ৬৯০ কোটি ডলার। ৮৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার আয় ছিল শুধুমাত্র ইনজিনিয়ারিং দ্রব্য রপ্তানীতেই। এই রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে ছিল ছোটখাট লেদ মোটর স্কুটার থেকে শুরু করে টেকসটাইল মিল এবং পাওয়ার স্টেশন তৈরির আনুষঙ্গিক উপকরণ। চলতি রাজস্ব বছরে ঐসব শিল্প পণ্যে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ১০০ কোটি ডলার।

শিল্পক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করার জন্য ভারত হাতিয়ার হাতে রীতিমত তৈরি। তার হাতে প্রচুর কাঁচামাল। ৮১০০০ টন কয়লা মজুদ। মজুদ বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ আকরিক লোহা আর এক তৃতীয়াংশ ম্যাঙ্গা-নিজও। এছাড়াও হাত শক্ত করছে অন্যান্য খনিজ সম্পদ আর প্রচুর পরিমাণ অনাহত জলবিদ্যুতের উৎস। এশিয়ার বৃহত্তম রেল-পথ, (পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম) ভারতেরই। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান প্রয়াস (চলতি বছরে ২৯০০০ মেগাওয়াট), দেশী উড়োজাহাজ এবং জলজাহাজ নির্মাণের কারখানা এবং আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থার দ্রুত প্রসর ইত্যাদি ভারতের শিল্পে তৈরি থাকার স্বপক্ষেই রায় দেয়।

এ সমস্ত বস্তুগত সম্পদ ছাড়াও আরও রীতিমত দরকারী দুটি প্রয়োজন মেটায় মনুষ্য সম্পদ। অতি অল্প মজুরিতে এ-দেশের মানুষ শ্রম দেয়। সোজা কথায় বলতে গেলে কম খরচায় এদেশে শ্রমিক পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় ভারতের ১১১টি ইন্সটিটিউট এবং ইউনিভার্সিটি থেকে আসা প্রচুর সংখ্যায় গ্র্যাজুয়েট এনজিনিয়র এবং বিজ্ঞানী। সংখ্যার দিক দিয়ে এদের স্থান যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পরেই। ভারতের প্রয়োগ বিশেষজ্ঞরা প্রথম বিশ্বের দেশগুলির (উন্নত দেশ) উপযোগী ডিজাইনকে তৃতীয় বিশ্বের (উন্নয়নশীল দেশ) প্রয়োজন মত পুনর্গঠন করে দিতে পারার একটি বাড়তি দক্ষতার অধিকারী। ভারত হেভি ইলেকট্রনিকস লিমিটেডের ইনজিনিয়ারিং ডিরেকটর এইচ এন সরণ বলেন, যখনই আমরা কোন বিদেশী ডিজাইন ব্যবহার করি, তখনই আমরা জোর দিই সেটিকে বিশ্লেষণ করে দেখার। আমাদের ইনজিনিয়াররা সেই ডিজাইনটিকে বিচ্ছিন্ন এবং বিশ্লেষণ করে দেখেন কেন সেটি সেই বিশেষ ধরণে তৈরী হয়েছে। শুধু তাই নয় তাঁরা আরও দেখেন সেই বিশেষ ডিজাইনটি কি আমাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনের উপযোগী। যদি তা না হয় তা হলে ঐ ডিজাইনের পুনর্গঠন সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয়। মোট কথা তাদের কী ভাবে তৈরি হয়েছে তাই নয়—কেন তৈরি হয়েছে তাই।

এই ধরনের দক্ষতাই ভারতকে আন্ত-র্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিযোগী হওয়ার দুঃসাহস জুগিয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে ভারত হেভি ইলেকট্রনিকসের ইনজিনিয়ার থেকে অ-দক্ষ শ্রমিক নিয়ে ১৬০০ কর্মী এখন লিবিয়ায় ১০ কোটি ডলারের পাওয়ার প্রোজেক্ট সম্পূর্ণ করছে। বি এইচ ই এল এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে নিউজিল্যান্ডের জন্য দশটি হাইড্রোলেকট্রিক জেনারেটর তৈরির বরাত পেয়েছে। নাইজিরিয়াতে বিড়লা গোষ্ঠি বসিয়েছে কাগজের কল। ইন্দোনেশিয়াতে বয়ন প্রতিষ্ঠান। টেকস-টাইল ফাইবার প্ল্যান্ট আর পাম অয়েল একস্ট্রাকটিং প্ল্যান্ট এদেরই উদ্যোগে বসেছে থাইল্যান্ড আর মালয়েশিয়াতে। এই বিড়লা গোষ্ঠিই খুব শীগ্গির উচ্চ-কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মোটরগাড়ির সরঞ্জামের কারখানা বসাবে উইন্ডসরে।

প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত জাতিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিতে ভারত যথেষ্ট গৌরবে উজ্জীবিত। পররাষ্ট্র বিষয়ক অফি-সিয়াল শ্রীরমেশ ভাণ্ডারী এক সময় উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন, আমরা মালয়ে-শিয়ায় পিছিয়ে দিয়েছি জাপানীদের, জার্মানদের হারিয়েছি নিউজিল্যান্ডে আর ফরাসীদের দাবিয়ে দিয়েছি লিবিয়াতে। শ্রীভাণ্ডারী আরও বলেছেন, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ না দিয়েই ভারত এসব করতে পেরেছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান সুবিধা হল, ভারতের শিল্পপতিরা এখনও ছোট করে ভাবতে পারেন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বিড়লা গোষ্ঠির একজন উচ্চপদস্থ কার্যনির্বাহক শ্রীপি এম জাভেরী বলেন, আমরা প্রয়োগ-বিদ্যার যতদূর সম্ভব সঠিক স্তর উপায় যোগানোর চেষ্টা করি—উন্নয়নশীল দেশ-গুলি যা চায়। উদাহরণ হিসেবে তাঁত শিল্পের কথাই বলা যায়। মার্কিন কিংবা জাপানীরা এমন কারখানা বসাবে যেখানে ৪০০ তাঁতে এক ধরনেরই কাপড় তৈরি হবে, আমরা কিন্তু কারখানা করলে ১০০টি তাঁতে দশ রকমের কাপড় তৈরির ব্যবস্থা করব। এ দৃষ্টিকোণে মার্কিন বা জাপানীরা ভাবেই না।

চীনের থেকে ভারতের নকশাকারেরা অনেকখানিই এগিয়ে। ভারতের বিখ্যাত শিল্পসংস্থা টাটা গ্রুপের একজন ডাইরেকটর অর্থনীতিবিদ শ্রী এফ, এ, মেহতা বলেছেন, সম্পূর্ণ সিনথেটিক ফাইবার প্লান্টের একটি সম্পূর্ণ নকশা চীনারা করে উঠতে পারেন না। ভারত এই ধরণের কাজই অনায়াসে করছে সাউথ কোরিয়ায়। তিনটি তার মধ্যে থাইল্যান্ডেই। বোম্বাইয়ের কাছে পাওয়াইয়ে জুমিতল কর্মশালায়

ভারত যখন পারমাণবিক চুল্লির জন্য হেভি শীলড তৈরি করছে ভারতীয় মালিকানাধীন লারসেন এ্যান্ড টুবরো কোম্পানীর পরিচালনায় চীন তখন সামান্য ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট বসানোর জন্য বিদেশের শরণাপন্ন।

দুটি দেশের মধ্যে অবশ্য একটি জটিল পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি অবশ্যই রাজনৈতিক। যখন চীনের বিজ্ঞানীরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনে প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে তখন ভারতীয়রা এগিয়ে যাচ্ছে অত্যাধুনিক কারিগরি বিশেষজ্ঞতায়।

রাজনীতি নিঃসন্দেহে ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি শক্তিশালী ভূমিকা নিয়েছে। এদেশে লাল ফিতের দাপট এত বেশি যে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় কোম্পানী বিদেশের কন্ট্রাক্ট নিতে যাচ্ছে। যদি কোন ভারতীয় সংস্থা তার নির্ধারিত যন্ত্রপাতির সাহায্যেই বিশেষ কর্মদক্ষতা অর্জন করে তার নির্দিষ্ট উৎপাদন সীমা ছাড়িয়ে যায় তবে তার মালিকের জরিমানা হয়ে যায়। বিড়লা সংস্থার শ্রীঅশোক বিড়লা মন্তব্য করেন, ভারতই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে উৎপাদন বাড়ানো অপরাধের এবং শাস্তির। তিনি ঐ প্রসঙ্গে আরও বলেন, এই দশকের সুরু থেকে আমরা দেশের বাইরে পা বাড়ানোর জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছি। এর কারণ অবশ্যই ব্যবসার ক্ষেত্রে সরকারী চাপ। আমি 'বাধ্য করা হচ্ছে' এই শব্দটি প্রয়োগ করতে চাইছি না তবে বাইরে ব্যবসা ছড়িয়ে দিতে আমরা এক রকম বাধ্যই হচ্ছি।

অন্যদিকে বিদেশে বাজার খোঁজার এই যে প্রয়াস তা আবার অনেকটাই বাঁক নিয়েছে ভারতীয় জনজীবনের জটিল সমস্যার কারণে। ৬৫ কোটি জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮০ জনই ছোটখাট গ্রামে বাস করে। জীবিকা নির্বাহ চাষবাসে। এদের জীবন ধারণের মান মানে— কোনরকমে বেঁচে থাকা। যা একসময় প্রকট ছিল, সেই দুর্ভিক্ষের শাসন এখন প্রায় নেই বললেই চলে। সরকার এখন প্রচুর খাদ্য মজুদ করে ফেলেছে। শুধু তাই নয় প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা (৬৫০ কোটি ডলার) সংগ্রহ করেছে। এ সবের ফলে সে আশা করা [illegible] পর পর তিন বছর অজন্মা হলেও [illegible] সামাল দিতে পারবে। সত্যি কথা বলতে কি ১৯৭০ সাল থেকে খাদ্য সামগ্রীর বর্ধিত উৎপাদন ক্রমাগতই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও পিছিয়ে দিচ্ছে। কৃষিতে উন্নতি সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে অর্থাভাব এমন সুদূরপ্রসারী যে বিশাল সম্ভাবনাপূর্ণ এই সব বাণিজ্য ক্ষেত্র প্রায় সব শিল্পপতিদেরই নাগাল ছাড়িয়ে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের জনতা সরকার জনসাধারণের উন্নতিতে গ্রামোন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছেন। সরকার সম্প্রতি পাঁচসালা পরিকল্পনার সূচনা করেছেন, এ পরিকল্পনার মাধ্যমে জল সরবরাহ, সেচব্যবস্থা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ প্রয়াস চালানো হবে। ভারতীয় অর্থনীতিবিদ রাজকৃষ্ণ বলেন, এ শতকের শেষের দিকে আমরা শস্য উৎপাদনে ৩০০ শতাংশ থেকে ৪০০ শতাংশ লাভ দেখাতে পারব। টাটার এফ, এ, মেহতা অনুমান করেন পরবর্তী দশকের মধ্যে ভারত বিশ্বে শস্য রপ্তানীকারকদের একজন হওয়ার রূপে নিজেকে প্রকাশ করবে।

যতক্ষণ না সরকারী নীতি বিশাল এবং বস্তুত বেকার সমস্যার সংগে লড়াই করতে সক্ষম হয় ততক্ষণই তা বড় শিল্পের আভ্যন্তরীণ বিস্তারের বিরুদ্ধে কাজ করবে। শ্রীরাজকৃষ্ণ বলেন প্রতি বছরই আমাদের শ্রমিক শক্তিতে ছয় লক্ষ মানুষ যুক্ত হচ্ছে। আধুনিক শিল্পায়িত শাখায় এর অর্ধলক্ষ মাত্র নিয়োগ সম্ভব। তিনি আরও বলেন, যদি এক লক্ষই নিয়োগ করা যায় তাহলেই বা আমরা বাকি পাঁচ লক্ষ সম্পর্কে কী করতে পারি? ক্রমবর্ধিত ভূমিহীন গ্রামীণ শ্রমিকদের উন্নয়ণ প্রয়াসে কেন্দ্রীয় সরকার সক্রিয়ভাবে লেবার ইনটেনসিভ কটেজ ইনডাসট্রিজ' বাড়িয়ে চলেছেন। এবং সেই সঙ্গে 'ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট'গুলির বিস্তারকেও সীমায়িত করেছেন। শ্রীরাজকৃষ্ণ আরও বলেন, দশ লক্ষ ভারতীয় নিজের বাড়িতে ছোটখাট কারখানায় অথবা গ্রামের কারখানায় সুতোর জামাকাপড় বুনছে। অনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রচালিত তাঁত এদের অনেককেই কর্মচ্যুত করবে। এমনকি এখন গোলা বা খামারের সংখ্যাও কম। সম্প্রতি সরকার পাঞ্জাবের জন্য ১,০০০ ফসল কাটার যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর বিধিনিষেধ জারি করেছেন ১৫০,০০০জন দেশান্তরী মজুরদের কাজ বাঁচাতে।

ব্যবসায়ীরা কিছু কিছু সরকারী পরিকল্পনার ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে— সাবান শিল্প ও দেশলাই শিল্পকে কুটীর শিল্প করে তোলা। সমালোচকরা আশঙ্কা করছেন কুটির শিল্প দেশে রাতারাতিই ছড়িয়ে পড়তে পারে। যদি তাই হয়, তবে অনেক নতুন কারখানাই কাঁচামালের যোগান এবং তার সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থার অনিশ্চয়তায় ভুগবে।

সহরের প্রলোভন আজও প্রবল। মাত্র কয়েকমাস আগেই মীরাজ গ্রামের তেইশ বছর বয়সী আমির শেখ মাসে তিরিশ ডলার রোজগার করছিলেন পিতলের কাজ করে। এখন তিনি পুণের একটি কারখানায় অ্যালুমিনিয়মের কীটনাশক ক্যানেস্তারা তৈরির কাজ করেন। উৎপাদন ভিত্তিতে তার মাস মজুরি ২৫০ ডলার।

যোজনা কমিশনের সদস্য রাজকৃষ্ণ বলেছেন, অধিক ফলনশীল নতুন কৃষি ব্যবস্থায় একই সঙ্গে ভূমিহীন চাষীরা কাজ পাবে এবং দেশের বড় শিল্পেরও প্রসার ঘটবে। তিনি বলেন, যদি খাদ্যের প্রয়োজন থাকে সিমেন্টের ব্যবস্থা দরকার, যদি পাম্প চান, প্রয়োজন ডিজেল আর ইস্পাতের। যদি সার দরকার হয় চাই পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প, গ্রামে বিদ্যুৎ পাঠাতে চাইলে দরকার 'নন-ফেরাস' ধাতু। শ্রীরাজকৃষ্ণের ধারণায় ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির চেহারা আশাব্যঞ্জক। আমরা জনসংখ্যার উপরও নিয়ন্ত্রণ রাখছি। আমাদের কারিগরি দক্ষতা উন্নতির পথে। অব্যবহৃত সম্পদও প্রচুর।

---

* টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের বঙ্গানুবাদ। প্রতিবেদনটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে সাপ্তাহিকটি ভরত প্রীতির জন্য সুপরিচিত নয়।

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

বেদব্যাস বৈদ্য

ইন্দিরা কংগ্রেসে বিস্ফোরণ

দল ভাঙ্গার অভিযোগে একদা অভিযুক্তা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিজের দলই এখন চরম ভাঙ্গনের মুখে। মাত্র দশ বছর আগে জাতীয় কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধ এবং সুশৃংখল পরিবারে তিনিই প্রথম শৃংখলাহীনতার বীজ বপন করেন। প্রগতিশীল এবং বামমার্গী সাজার নামে তিনি সেদিন জাতীয় কংগ্রেসের জাবড় জাবড় নেতাদের সেকেলে এবং দক্ষিণপন্থী আখ্যায় আখ্যায়িত করতেও পিছপা হননি। বিবেকের রায় সেদিন তাঁর কাছে দলীয় শৃংখলার চেয়েও অনেক বেশী বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেদিন শ্রীমতী গান্ধী ছিলেন ক্ষমতার শীর্ষে—ভারতের প্রধানমন্ত্রী। অতএব, ক্ষমতার লোভ অথবা প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধার মুখ চেয়ে সেদিন অধিকাংশ কর্মী-নেতা তাঁর বিবেকবাণীতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দলীয় আদর্শ সেদিন গৌণ ছিল, মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিগত শাসন-অনুশাসনের নীতি-নির্দেশ। শ্রীমতী গান্ধীর দল ভাঙ্গার সেই পুরানো অস্ত্র বোধ হয় অনিবার্যভাবে বুমেরাং হয়ে এখন তাঁকেই ঘায়েল করতে চাইছে। তাঁর পরিচালিত এবং প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস দলে এখন ভাঙ্গনের সুর সর্বত্র। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শুধু মাত্র দেবরাজ আরসই তাঁর সমালোচনা অথবা বিরোধিতায় সোচ্চার নন, ছোট-বড় সকল শ্রেণীর কর্মী-নেতার মধ্যেই এখন ঐ রোগ সংক্রামিত।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিচারে পশ্চিম বাংলার পরিস্থিতি একটু স্বতন্ত্র। এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন। শ্রীমতী গান্ধীর এক নম্বর শত্রু জনতাদল ও সরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও সি পি আই (এম) দল অথবা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার তাঁর বন্ধু বা মিত্রশক্তি নয়। শ্রীমতী গান্ধী সম্প্রতিকালে যে কবার কলকাতা এসেছেন, ঘরোয়া বৈঠকে রাজ্যের নেতাদের তিনি বামফ্রন্ট, বিশেষ করে সি পি আই (এম) বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টির নির্দেশ দিয়েছেন। অন্য রাজ্যে জনতা সরকার বিরোধী আন্দোলনের মত, এ রাজ্যে বামফ্রন্ট বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখতে তিনি যথারীতি আগ্রহী।

কিন্তু রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের যেসব নেতা ও কর্মীদের নিয়ে বামফ্রন্ট বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে শ্রীমতী গান্ধী সচেষ্ট, তারা যে নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর আন্দোলন করতে বেশী আগ্রহী, সে খবরটুকু দলনেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর জানা আছে কিনা সন্দেহ। তিনি হয়তো ভুলে গেছেন, ১৯৬৯ আর ১৯৭৯ এক নয়। তখন তিনি দলনেত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। যে ক্ষমতা তখন তাঁর হাতে ছিল, এখন আর তা নেই। অধিকাংশ নেতাই ক্ষমতার লোভে সেদিন তথাকথিত শৃংখলা বজায় রেখে চলতেন। এখন তারা জানেন, শ্রীমতী গান্ধীর কিছু পাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও আর নেই। অতএব, তারা ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থক হলেও শ্রীমতী গান্ধীর অন্ধ অনুগামী অথবা সুশৃংখল সৈনিক হতে নারাজ। দলের সংগে যুক্ত থেকে রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখাই তাদের মূল লক্ষ্য মাত্র।

শ্রীমতী গান্ধী এ রাজ্যে বরকত গণি খান চৌধুরীকে সভাপতি নিয়োগ করেন। কয়েক বছর পার হলেও, এ পর্যন্ত রাজ্যের দলীয় কর্ম-পরিষদ অথবা সভাপতি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়নি। কর্মকর্তারা সকলেই শ্রীমতী গান্ধী অথবা তদীয় তনয় সঞ্জয় গান্ধীর মনোনীত নেতা। ফলে রাজ্যের দলীয় কর্মী এবং নেতাদের মধ্যে এ-নিয়ে বিস্তর ক্ষোভ রয়েছে। সেই চাপা ক্ষোভ এখন প্রকাশের পথে।

সরকারী ক্ষমতা হারাবার মাত্র দু বছর-এর মধ্যে একটা সর্বভারতীয় দলের দেউলিয়া অবস্থা দেখে রাজনীতি সচেতন মানুষের করুণা হওয়া স্বাভাবিক। আদর্শের চেয়ে ক্ষমতা যে শ্রীমতী গান্ধীর অনুগামী নেতাদের কাছে কতখানি প্রিয় ছিল, দলের বর্তমান অবস্থাই তার বড় প্রমাণ। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দলীয় আদর্শ ও শৃংখলা ভঙ্গ করে বিবেকবাণী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একদা যে পথ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই পথ ধরেই তাঁর দল এখন বিপর্যয়ের মুখে এগিয়ে চলেছে। অনিবার্য এই বিপর্যয় থেকে দলকে রক্ষা করার মত আদর্শবাদী কতজন নেতা তাঁর দলে এখন আছেন, সে খবর বোধহয় তিনি নিজেও জানেন না।

রাজ্য দলের সভাপতি বরকত সাহেব নিজে নবাব পরিবারের লোক বলে পরিচিত। তাঁর নবাবী চালচলনে নেতা ও কর্মীরা ক্ষুব্ধ। বিলাসবহুল বাড়ির টেলিফোন মাসের পর মাস বিকল করে রেখে তিনি ঝঞ্ঝাট-মুক্ত থাকতে বেশি আগ্রহী। দলীয় কর্মী আর নেতাদের উৎপাত তাঁর নাপছন্দ। আর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের দলীয় সদর দপ্তর? সেখানেও তিনি কয়েক মাস ধরে গরহাজির। তাঁর আশংকা, সেখানে গেলে প্রদেশ দপ্তরের ক্ষুব্ধ কর্মীরা তাঁকে ঘেরাও করবেন। কারণ, তাঁরা প্রায় বছর খানেক তাঁদের বকেয়া বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। প্রদেশ দপ্তরের টেলিফোন? তারও তার কাটা। সরকারী বিল বকেয়া থাকায় কর্তৃপক্ষ লাইন কেটে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। অতএব বলা চলে, সভাপতি বরকত সাহেব ঝঞ্ঝাটমুক্ত জীবনযাপন করেও দলীয় নেতৃত্বের এক নম্বর পদে বহাল।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের প্রদেশ দপ্তরে এখন সন্ধ্যায় দু-একজন বিক্ষুব্ধ নেতার আনাগোনা ঘটে। আবদুস সাত্তার, নুরুল ইসলাম, শান্তিমোহন রায়, গোবিন্দ নস্কর, আনন্দ বিশ্বাস, বীরেন মহান্তি অথবা সোমেন মিত্ররা তাদের সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে গিয়ে দলের করুণ অবস্থার কথা আলোচনা করেন। যে বাড়িতে মাত্র দু বছর আগেও আলোর রোশনাই ঝরত, সেখানে এখন মোমের আলোও ঠিকমত জ্বলে না। ঘরগুলি প্রায় সব সময় তালাবন্ধ। কয়েকটি টাইপরাইটার ছিল। তা-ও বেপাত্তা। প্রায় বেওয়ারিশ এই সদর দপ্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ভৌতিক দ্বীপপুঞ্জ বলে মনে হয়।

বরকত সাহেবের অবশ্য তাতে ক্ষোভ বা হতাশা নেই। তাঁর মতে, রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁদের হাতেই আসছে। বামফ্রন্ট সরকার আর কতদিন? মুখ্যমন্ত্রীর গদি খুব দুর্লভ বলে তিনি আর এখন মনে করেন না। নতুন আশায় ইতিমধ্যে তিনি পার্ক স্ট্রীট এলাকায় ধারকয়েক চক্কর খেয়েছেন। জনৈক অবাঙালী শিল্পপতি এবং সঞ্জয়-বন্ধু তাঁকে ঐ অঞ্চলে একটি সুরক্ষিত বাসভবনের খোঁজ দিয়েছিলেন। সেখানে প্রদেশ দপ্তর সরিয়ে নিয়ে তাকে শত্রুমুক্ত করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। কিন্তু বিধি বাম। দেখা গেল, শিল্পপতির আত্মীয়ের সেই বাসভবন নিয়ে একটি মামলা চলছে। অতএব, বরকত সাহেব আপাততঃ একটু থমকে দাঁড়িয়েছেন: শিল্পপতি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, শীঘ্রই একটি নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন।

জুলাই মাসের গোড়ায় বিক্ষুব্ধ এই নেতারা কলকাতায় এক সম্মেলন ডাকছেন। তাতে দলের বিভিন্ন জেলা সভাপতি ও সম্পাদক, বিধানসভা সদস্য, বর্তমান অ্যাড হক কমিটির সদস্যদেরও আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। বরকত সাহেব এবং ইন্দিরা তনয় সঞ্জয় গান্ধীর শিল্পপতি বন্ধুর সাম্প্রতিক গতিবিধি এবং বিচিত্র তৎপরতার আনুপূর্বিক এক রিপোর্ট সেখানে পেশ করার ব্যবস্থাও হচ্ছে। বলা বাহুল্য, বরকত সাহেবকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে নতুন সভাপতি নির্বাচনই এর অন্যতম উদ্দেশ্য। সঞ্জয়-সমাদৃত বরকত সাহেব শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মনোনীত সভাপতি। তাঁর বিরুদ্ধে গতিশীল এবং ব্যক্তি-পূজা বিরোধী এই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর যে-কোনও সিদ্ধান্ত শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ বলেই গণ্য হবে। অতএব, আসন্ন এই সম্মেলন রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসে যে এক বিস্ফোরণ ঘটাবে তা সহজেই অনুমেয়।

(২২-৬-৭৯)

ইজ্জতের লড়াই

শ্যাম মল্লিক

তামাম ভারতবর্ষে এখন একটাই জোর খবর 'পুলিশ ক্ষেপেছে'। বিদ্রোহের আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে: পশ্চিমবঙ্গেও উদ্বেগ না জানি বিক্ষোভ কখন এখানে ছড়িয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু গোপনে বড় কর্তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন — ব্যাপার-ট্যাপার কি? যে উত্তরটা পেলেন তা হল: না স্যার পাঞ্জাব হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও গুজরাটে যা হয়েছে এখানে সেরকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা দেখছি না।

এস বি এবং আই বির দুদুটো টপ সিক্রেট রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এসে পৌঁছলো। দুটো রিপোর্টের সুর প্রায় এক। ওদের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন আছে তবে অন্যান্য রাজ্যে যা ঘটছে তা ঘটার সম্ভাবনা নেই। তবুও পুলিশ লাইনগুলোর ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা হল। একটা 'জেনারেল এলার্ট'ও দিয়ে দেওয়া হল। বাইরে থেকে কোন এলিমেন্ট এখানে এসে উস্কানী না দিতে পারে সেদিকেও রাখা হল কড়া নজর। কলকাতা পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনের ডাকে মুখ্যমন্ত্রী গেলেন খোদ লালবাজারে। সানাইয়ের সুর আর গার্ড অব অনারের ভিতর দিয়ে জ্যোতিবাবু ৮ জুন বিকেল চারটায় লালবাজারে ঢোকেন। চারিদিকে শুধু জিন্দাবাদ ধ্বনি। একটানা ৫০ মিনিট বক্তৃতা। কখনও আবেদন কখনও হুঁশিয়ারী। প্রথমেই তিনি বললেন আপনারা ভুল পথে যাবেন না। বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে জনগণ ক্ষমা করবে না। তবে হ্যাঁ আপনাদের দাবি-দাওয়া সহানুভূতির সঙ্গে সরকার বিচার বিবেচনা করছেন। ৯ জুন মুখ্যমন্ত্রী আলিপুর পুলিশ লাইনে বক্তৃতা দিলেন। ১০ জুন হাওড়ায়।

সাধারণ পুলিশ কর্মচারীরা অন্ততঃ একটা দিনও নিজেদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়ে খুশি। কিন্তু তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের যে ক্ষোভ আছে তার আগুন কি নিভেছে? বড় কর্তার ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া বা আনা। জুতো পালিশ করা, মেমসাহেবের জন্য বেগার খাটা বাড়িতে ছোটখাট বাগান থাকলে তার পরিচর্যা করা আর অফিস যাবার সময় সাহেবকে ইউনিফর্ম পরিয়ে দেওয়া— এসবের হাত থেকে ওরা এখন রেহাই পেতে চান। বড়সাহেবের বাড়িতে এক শ্রেণীর পুলিশ কনস্টেবলদের অবস্থা 'বনেদী নবাবের' মত। পান থেকে চুন খসলে আর রক্ষা নেই। এতো গেল। সেলাম ঠুকতে ঠুকতে আর বুট ক্লিক করতে করতে ওরা সারাদিনে হিমসিম। বড়কর্তার জন্য বুট ক্লিক সে তো 'মাস্ট'। মেমসাহেব, দিদিমণি দাদাবাবুকে না করলেও রক্ষা নেই। জন্ম গেল যাদের সেলাম ঠুকে এখন অবশ্য তাদেরকেই সকলে কুর্নিশ করছেন।

নীরব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ রাজ্যের পুলিশ এ্যাসোসিয়েশন যে সব দাবী-দাওয়া আদায় করেছেন তা উল্লেখ করার মত। পুলিশ কর্মচারীরা পরিবারের চারজনের রেশন পান। চাল-ডাল সরষের তেল চিনি ইত্যাদি। ১৯৬০ সালে এই সব জিনিষের যা মূল্য ছিল সেই দামে। এজন্য রাজ্য সরকারকে পরে প্রায় ৬ কোটি টাকা ভরতুকি দিতে হয়। ১৯৫৯ সাল থেকে সরকারী কর্মচারীদের মত পুলিশ কর্মচারীও ভ্রমণ ভাতা পেয়ে আসছেন। ঐ সালেই দৈনিক ভাতা বেড়ে এক টাকা হয়। বাড়ি ভাড়া বাড়ে ১৯৬৬ সালে। ঐ সাল থেকেই শুরু হয় রেশন। ট্রাম-বাসে যাতায়াত ফ্রি।

ওরা এখন বিদ্যুৎ ভাতাও পাচ্ছেন। এ রাজ্যের পুলিশ যে এতটা শান্ত তার একটা কারণ এই যে ওদের অনেক আর্থিক দাবি-দাওয়া পূর্ণ হয়েছে। রাজ্য পুলিশের একজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে সেদিন কথা হচ্ছিল। তিনি স্বীকার করলেন যে সাধারণ পুলিশ কর্মচারী এখন মর্যাদা চায়। আজকের যে লড়াই তাতে আর্থিক দাবি-দাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কিছুটা আছে। তবে মর্যাদা আদায় করাটাই এখন ওদের কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কনস্টেবলদের প্রতি কোন কোন অফিসারের শ্যাবি-ট্রিটমেন্টের কথা শুনি। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। অফিসারটি এই কথাগুলো এক পলকে বলে গিয়ে সংযোজন করলেন: এম-এ পাশ কনস্টেবল এখন অনেক আছেন, আর গ্র্যাজুয়েট সে তো ভুরি ভুরি।

শান্ত কেন পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ—এ প্রশ্নের উত্তর অনেক আছে।

সবচেয়ে বড় একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মত, যে সব রাজ্যে অ-জনতা সরকার আছেন সেখানে কিন্তু পুলিশ বিদ্রোহ হয়নি। হয়নি তামিলনাড়ুতে কেরালায় পশ্চিমবঙ্গে, কর্ণাটকে এবং ত্রিপুরায়। সরকারের প্রতি একটা শৃংখলাপরায়ণ বাহিনীর আস্থার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অনেক বড়।

অফিসারটি স্বীকার করলেন সাধারণ পুলিশ কর্মচারীরা এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, এই সরকার তাদের জন্য ভাবেন। এই উপলব্ধিটাই দুয়ের সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করে। তাছাড়া বামফ্রন্ট সরকার পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনগুলোর সঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের মত [illegible] চলেছেন। যদিও ১৯৬৭ সালে একশ্রেণীর পুলিশ কর্মচারীর বিধানসভা [illegible] কেন্দ্র করে পুলিশ বাহিনীর [illegible] [illegible] সরকারের একটা অঘোষিত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল কিন্তু সংঘাত এখনও সরকারের [illegible] প্রকাশ্য সংঘর্ষে আসেনি।

জ্যোতিবাবু ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন, পুলিশের জন্য একটা পুনর্বিন্যস্ত বেতন কাঠামো তৈরি করা হবে। আবাসনের বাসগৃহ সমস্যা, প্রোমোশন ও অন্যান্য [illegible] অভিযোগের কথা আমরা সহানুভূতির সঙ্গে ভাবছি। মুখ্যমন্ত্রী একথা নিশ্চয়ই জানেন যে প্রমোশনের ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। বর্তমান ব্যবস্থায় ৭৭ শতাংশ কনস্টেবল কনস্টেবল হিসাবেই অবসর গ্রহণ করেন। হেড কনস্টেবলদের ক্ষেত্রে ৯১ শতাংশের সারা জীবন কোন প্রমোশন জোটে না। ৮০ শতাংশ এ এস আই এবং শতকরা ৭৫ ইনস্পেকটরের ভাগ্যে প্রমোশন বলতে কিছু নেই।

ইনস্পেকটর থেকে এ-সি ডি-সি হওয়া কিংবা ডি-এস-পি থেকে এস-পি বা ডি আই জি হওয়া অনেকটা লটারী পাবার মত। ইংরেজরাই পুলিশের মধ্যে এই শ্রেণী বিন্যাস ঘটিয়েছে। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু সকলেই নিযুক্ত হন কনস্টেবল হিসাবে। সেখান থেকে প্রমোশন পেয়ে কমিশনার। আর এখানে শুরু কনস্টেবল দিয়ে। তার মধ্যে লিটারেট কনস্টেবলের মর্যাদা একটু বেশি। হেড জমাদার, হেড কনস্টেবল, এ এস আই, এস আই ইনস্পেকটর এ-সি ডি-সি তারপর কমিশনার। রাজ্য পুলিশেও তাই। কনস্টেবল থেকে ইনস্পেকটর। তারপর সার্কেল ইনস্পেকটর। ডি এস পি এস পি এ আই জি ডি আই জি তার পর আই জি।

তাই সমস্ত ব্যাপারটা সরকারকে গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। জাতীয় পুলিশ কমিশন এ ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছেন। এ রাজ্যে পুলিশের সর্বময় কর্তা মাত্র ১৫০ জন আই পি এস। পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের ৪০ জন আই পি এস অফিসার এখন অবশ্য ডেপুটেশনে দিল্লীতে আছেন। ১৪০ জন অফিসারের মর্যাদা আস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেমন দেওয়া চলেছে তামাম রাজ্যে প্রায় ৫০ হাজার কনস্টেবলের অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং। আজও তাকে বাড়ির চাকরের মত অফিসারের বাড়িতে ডিউটি দিতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে আর্দালী প্রথা তুলে দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে সাধারণ পুলিশ কর্মচারীরা সুখী। কিন্তু দীর্ঘদিনের অবিচারের বিরুদ্ধে পুলিশ ভিতরে ভিতরে আগুন।

মুল প্রশ্ন চাপা দিয়ে শুধু মাইনে বাড়িয়ে বা বাড়তি কিছু সুযোগ দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না কারণ পুলিশের এই লড়াই হল ইজ্জতের লড়াই।

ভবঘুরে দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ দত্ত

অর্ঘ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের জীবনে প্রায়শই আমরা এমন অনেক মানুষের সাক্ষাৎ পাই যাঁদের জীবন-বোধ ও জীবনধারা সাধারণ মানুষের হিসেবনিকেশের মধ্যে পড়ে না। তাঁদের মূল্যবোধ ও আদর্শ সম্পূর্ণ অন্য খাতে বয়ে চলে। আমরা ঠিক তার নাগাল পাই না। বিখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজা সম্পর্কে উইল ডুরান্ট মন্তব্য করেছেন যে বোধহয় তিনিই ছিলেন পৃথিবীর শেষ ক্রুশবিদ্ধ যীশু। কেননা দর্শনের গভীরে যাওয়া মানে তো জীবনের গভীরে যাওয়া। স্পিনোজার দার্শনিক চিন্তার পেছনে ছিলো এক কঠিন আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস। এই বিদেশী বৈদান্তিককে মনেপ্রাণে আত্মীয় বলে মেনে নিয়েছিলেন বিবেকানন্দ ওরফে নরেন্দ্রনাথ। বোধহয় স্পিনোজার দার্শনিক মনের মধ্যে বিবেকানন্দ এক ভারতীয় উপনিষদের ঋষিকে খুঁজে পেয়েছিলেন। যিনি অনেক দূরের জিনিষ দেখতে পান তিনিই তো ঋষি। আমরাও তাঁদেরই মহাপুরুষ বলি যাঁরা আমাদের কাছে থেকে জীবনের এক নতুন ভাষ্যপাঠ করেন। নতুনকে ভালবাসতে শেখান। স্পিনোজার আপোষহীন জীবন তাই আমাদের কাছে বিস্ময়। জীবনকে ভালোবেসে জীবনকে ত্যাগ করা ভীষণ কঠিন কাজ। কিন্তু স্পিনোজা তাই করেছিলেন। যে বিবেকানন্দ উপনিষদ ও বেদবেদান্তের মধ্যে ভারতবর্ষের আত্মাকে খুঁজেছিলেন তিনিও ছিলেন সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এবং ভারতবর্ষের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কাছে কৃচ্ছ্রসাধন জীবনের অঙ্গ। বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথও সেই অর্থে ত্যাগী এবং সন্ন্যাসী, ভবঘুরে অথচ ঋষি। এই মানুষটির জীবন সত্যিই বিচিত্র। মহেন্দ্রনাথ সরাসরি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিত নন, আবার ভূপেন্দ্রনাথের মার্কসবাদী চিন্তাভাবনাও তাঁর কাছে নিকটাত্মীয় নয়। দার্শনিক চিন্তাভাবনায় মহেন্দ্রনাথ কখনো হাক্সলির মতো অজ্ঞেয়-বাদী আবার কখনো বেদান্ত-উপনিষদের ভারতবর্ষের কাছে সমর্পিত প্রাণ। অথচ ঊনিশ শতকের বাংলায় হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবনবাদীদের যে দর্শন ক্রমশঃ বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের মনকে আচ্ছন্ন করছিলো সেই দর্শনকে জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন নি মহেন্দ্রনাথ। ধর্মীয় কুসংস্কারের কদর্য রূপকে নিভৃতে, প্রচারবিমুখ জীবনে কার্যতঃ মহেন্দ্রনাথ পরিত্যাগ করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ ছিলেন [illegible] সহজ বিবাগী [illegible] এবং দার্শনিক [illegible] স্পিনোজার উত্তর-সূরী।

মহেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু বলবার আগে বলে নেওয়া ভালো, মহেন্দ্রনাথের কোন প্রামাণ্য জীবনী নেই। নিজের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ ছিলেন একান্ত-ভাবেই উদাসীন। এই উদাসীনতার বেড়া ভেঙে কিছু মানুষ তাঁকে কাছে পেতে চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই সমস্ত মানুষেরা মহেন্দ্রনাথের জীবনের বহু ঘটনাকে স্পর্শ করেছেন বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে। কিছু সংলাপ ও কিছু ঘটনার স্মৃতি। আপাততঃ আমাদের কাছে মূলধন এইটুকুই। এই মূলধনটুকুই সম্বল করেই দেখা যাক মহেন্দ্রনাথকে, মহেন্দ্রনাথের বাউল মনকে, মহেন্দ্রনাথের চোখে দেখা জীবনকে।

বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের জন্ম ১লা আগস্ট, ১৮৬৯ সালে। বয়সের হিসেবে নরেন্দ্রনাথের থেকে প্রায় ছয় বছরের ছোট ছিলেন আর ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথের থেকে প্রায় এগারো বছরের বড়। মহেন্দ্রনাথ যে সময়ে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই বাংলা এক উত্তাল বাংলা। ইতিমধ্যে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে এবং বাংলার বিদ্বজ্জন সমাজ ১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপ্তি দেখে হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন। কেউ কোন কথা বলছেন না। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে যখন নীলবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিলো তখনও বুদ্ধিজীবীরা মোটামুটি চুপচাপ। শুধু লড়ছেন সাদা চামড়া রেভারেন্ড জেমস লঙ কালা আদমী "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহাত্মা শিশির কুমার এবং আরও কিছু অসংগঠিত বুদ্ধিজীবী। বাংলা কিন্তু জ্বলছিল। বাংলার কৃষক হয়েছিলো দুর্বিনীত। এক কথায় ১৮৫০ সালের পর থেকে গোটা বাংলার সমাজজীবন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে অস্থির হয়ে পড়েছিলো। পুরাতন মূল্যবোধ সম্পর্কে সংশয় জাগছিল বাংলার মানুষের মনে। কিন্তু পুরাতনী জীবনের মূলোচ্ছেদ হোল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করে নির্মমভাবে শোষণ করতে লাগলো বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে। আর এরই মধ্যে জন্ম নিলো জাতীয়তাবাদ। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইউরোপের রেনেসাঁস ও ফরাসী বিপ্লব মন্থন করে ভারতবর্ষের জনজীবনে জাতীয়তাবাদের জোয়ার এনে দিল। এ সবকিছুই একটা অবস্থার মধ্যে বাঙালী মধ্যবিত্ত ধীরে ধীরে [illegible] এবং নতুন সমাজচেতনার উন্মেষ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু রেভারেণ্ড লং, মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ কিংবা হরিশ মুখোপাধ্যায়ের সহযোদ্ধা সকলেই ছিলেন না। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীই তখন মূলতঃ সমাজ সংস্কার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে আপোষ করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে লং মুখুজ্জে আর ঘোষদের যে বলিষ্ঠ জীবনবেদ বাঙালী মধ্যবিত্তকে আপোষহীন সংগ্রামী শ্রেণীতে পরিণত করতে পারত সঠিক রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের অভাবে তা ব্যর্থ হয়ে গেলো। ১৮৬০ সালের পরে বাংলার অবস্থা তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থে অনেকটা নৈরাজ্যবাদী ছিলো। বিবেকানন্দ মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথের পরিবার এই আবর্তের মধ্যেই জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে নেমেছিলেন। একদিকে রেভারেন্ড জেমস-লঙ, শিশির কুমার এবং বাংলার সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষদের আপোষহীন সংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাজশক্তিকে অস্বীকার করছে, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদন বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতির জীবনে নতুন কথা বলছেন। আবার রামকৃষ্ণদেব হিন্দুধর্মের মৌলিক চিন্তাভাবনার রূপান্তর ঘটিয়ে দক্ষিণেশ্বরে হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করলেন নতুন ভাষায়, নতুন কথায়।

মহেন্দ্রনাথ বেড়ে উঠেছিলেন বাঙলার এমনই এক সময়ে যখন বহুবিধ প্রশ্ন মানুষের প্রচলিত সংস্কার ও মূল্যবোধকে সরাসরি আক্রমণ করতে শুরু করেছে। মহেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ ও মাতা ভুবনেশ্বরীও মোটামুটিভাবে উদারপন্থী ছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনবোধ বিশ্বনাথ ও ভুবনেশ্বরীর জীবনের পাড় ঘেঁষে চলে যেত। বিশ্বনাথ সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ লিখছেন: পুরোহিততন্ত্রের কুসংস্কার মুক্ত করে আমাদের পরিবারের স্বগণদের নবজীবনের আদর্শ প্রদর্শনের জন্য আমি আমার পিতৃদেবের নিকট কৃতজ্ঞ। বিশ্বনাথের মত [illegible]

উদার ও সমন্বয়ী চিন্তাধারার বাহক। সেজন্যই তাঁর সন্তানদের চিন্তাধারা হয়েছিলো বিপ্লবী ও আমূল সংস্কারপন্থী। সুতরাং মহেন্দ্রনাথও যে মোটামুটি উদারপন্থী হয়ে উঠবেন তাতে খুব একটা সন্দেহ ছিলো না। বিশ্বনাথ ও ভুবনেশ্বরীর তিন সন্তানই শুধু যে অকুতভয় ছিলেন তা নয়, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন আত্মনির্ভর এবং বলিষ্ঠ জীবনবেদে আস্থাশীল।

মহেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ পরলোকগমন করেন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। তখন মহেন্দ্রনাথের বয়স সবে পনেরো। ভূপেন্দ্রনাথের বয়স চার। ফলে একমাত্র সাবালক পুরুষ রইলেন নরেন্দ্রনাথ। ইতিমধ্যে বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার বহু আত্মীয়স্বজনের আক্রোশের শিকার হল এবং এক অভাবনীয় সংকটের মধ্যে ভুবনেশ্বরী তাঁর তিন সন্তানকে নিয়ে জীবনের মুখোমুখি হন। এই সময় তাঁদের পারিবারিক জীবন কী অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে চলেছিলো তার প্রমাণ দিয়েছেন স্বয়ং ভূপেন্দ্রনাথ। ভূপেন্দ্রনাথ বলছেনঃ বস্তুত বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর কেউ তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে একটি কপর্দক দিয়েও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো না।' মনে হয় বাল্যকাল ও কিশোর জীবনে বাংলার অবক্ষয়ী একান্নবর্তী পরিবার ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভুবনেশ্বরীর তিন সন্তানকেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো।

ভূপেন্দ্রনাথের জবানীতেই আমরা জানতে পারছি যে নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করার ফলে দত্ত পরিবারের সামাজিক প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিলো। এবং মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ তাঁদের মাতামহীর কাছে বড় হয়েছেন ১৯০৩ সাল পর্যন্ত। তারপর ১৮৯৬ সালে মহেন্দ্রনাথ বিলেত যান উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য। ১৮৯৬ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত মহেন্দ্রনাথ কার্যতঃ সম্পূর্ণরূপেই বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি ইতিমধ্য সারা বিশ্বের বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন। ইংলন্ড থেকে তিনি যান উত্তর আফ্রিকায়। 'সে সমস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, নিকটপ্রাচ্য দক্ষিণ রাশিয়ার নানাস্থানে পর্য্যটন করেন।' অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর ১৯০৩ সালে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় কিন্তু বাঙলা আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছিলো। স্বামীজির মৃত্যুর পর নিবেদিতা ও অরবিন্দ ক্রমশঃ বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিকে তীব্রতর করার জন্য বিপ্লববাদী সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ শোষণের ফলে বাংলা তথা ভারতীয় জনসমাজের এক বিরাট অংশ চরমপন্থী রাজনীতির দিকেই ক্রমশঃ ঝুঁকে পড়ছিলো। এই উত্তাল সময়ে মহেন্দ্রনাথের কোন বিশেষ ভূমিকা ছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই। তবে মহেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদর্শনে কখনোই সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মসূচীকে প্রাধান্য দেন নি। যে অর্থে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ বৈপ্লবিক জীবনবোধকে নিজের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন সেই অর্থে মহেন্দ্রনাথ বিপ্লবী জীবনের শিল্পী ছিলেন না। মহেন্দ্রনাথ ছিলেন নিতান্তই একজন প্রচারবিমুখ সাধক ও দার্শনিক।

অথচ মহেন্দ্রনাথ রাজনীতিদর্শন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার ফসলকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। এবং সেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এক আশ্চর্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিকে। মহেন্দ্রনাথ বলছেন যে প্রজাতন্ত্রের আদর্শ এশিয়ার প্রতিটি স্বাধীন দেশে কার্যকর করতে হবে। মনেপ্রাণে ঘৃণা করেছেন গণতন্ত্রের নামে নৈরাজ্যবাদকে আর গোষ্ঠীতন্ত্রকে। উন্মত্ত জনতাতন্ত্রকে মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানসম্মতভাবেই আক্রমণ করেছেন। বলেছেন যে গণতন্ত্র যদি সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হয়ে ওঠে তাহলে এশিয়ার ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে না। দ্বান্দিক বস্তুবাদী না হয়েও মহেন্দ্রনাথ এক বিরাট আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়ে উঠেছেন। যেখানে রাসেল ও সোয়াইটজার, অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সোচ্চারে জঙ্গী জাতীয়তাবাদকে ঘৃণা করেছেন, মহেন্দ্রনাথও সেখানে নীরবে, নিভৃতে চুপিসাড়ে বলে গেছেন প্রজাতন্ত্রের কথা, রিপাবলিকের কথা। অতীতে যেমন জনপদ ছিলো, বর্তমানেও গ্রামে গ্রামে প্রজাতন্ত্রের কাঠামো নির্মাণ করতে হবে। এক কথায় ভারতবর্ষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে কোনও একটি গ্রাম থেকে গোটা এশিয়া মহাদেশে প্রতিষ্ঠা করতে হবে প্রজাতন্ত্রকে। প্রজাতন্ত্রের নিরাপত্তা চাই, নচেৎ এশিয়ার সাধারণ মানুষ বাঁচবে না। কেননা সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ এশিয়াকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। "ফেডারেটেড এশিয়া" গ্রন্থে মহেন্দ্রনাথ প্রজাতন্ত্রকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন এক সম্পূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে। বিবাহপদ্ধতি, নাগরিকতা, কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন পরিকল্পনা করেছেন মহেন্দ্রনাথ। আর এই পরিবর্তনের নায়ক হবেন সাধারণ মানুষ। গোষ্ঠী অথবা দলের প্রাধান্যকে মহেন্দ্রনাথ বিশেষ সুনজরে দেখেন নি। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মহেন্দ্রনাথ বলছেন যে সমাজের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। আর এই সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে মহেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কথাই বলেছেন। কেননা যে সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সেই সমাজ প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। মহেন্দ্রনাথ তাই জাতিভেদ-প্রথানির্ভর ভারতীয় হিন্দু সমাজকে সমাজবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। মহেন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের কোথায় যেন মিল আছে। উভয়েই এক বিরাট জীবনের মধ্যে, বড় 'আমি'র মধ্যে ভারতবর্ষের আত্মাকে খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। এই বৃহতের কাছে, মহতের কাছে, ধর্মীয় আচারবিচারের অনুশাসন এক অর্থহীন ও যান্ত্রিক জীবনচর্চার অনুশীলনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

মহেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শন আসলে তাঁর ব্রহ্মবাদী মনেরই এক খণ্ডিত প্রকাশমাত্র। কেননা মহেন্দ্রনাথের খেয়ালখোলা ভ্যাগাবন্ড মন কখনোই নিয়মের যান্ত্রিক শৃঙ্খলের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে নি। লেখার কথা উঠলেই বলতেন ঃ সুতোর মানুষ না এলে লেখাটা হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলে। সুতোর মানুষ চলে গেল, আমারও মুখ বন্ধ। তারপর যে মহীম দত্ত, সে মহীন দত্ত। একটা আহাম্মুখ ভ্যাগাবন্ড শিল্পের জগতে যেমন শিল্পী নিজের মনের স্বাধীনতাকে কোন নিয়মতান্ত্রিকতার যাঁতাকলে পিষতে চান না, মহেন্দ্রনাথও তেমনি কোনও ছক কাটা ধরাবাঁধা দর্শনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে মহেন্দ্রনাথের সহচর ছিলেন চীন বিপ্লবের অন্যতম নায়ক সান্-ইয়াত্-সেন। সান ইয়াত সেন সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথের মন্তব্য খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। মহেন্দ্রনাথ বলছেন ঃ "ব্রিটিশ মিউজিয়ামে থাকি, পড়াশুনো করি। আমার পাশে বসে সানইয়াত সেন, তখন একটা ছোঁড়া, খুব পড়াশুনো করে। আমার সঙ্গে গায়ে পড়ে খুব আলাপ জমায়।" যেন কিছুই হয় নি গোছের একটা মনোভাব। চীনা বিপ্লবের দুর্ধর্ষ নায়ক সানইয়াত সেন তাঁর বন্ধু ছিলেন। অথচ এই ঘটনা নিয়ে মহেন্দ্রনাথ চূড়ান্তভাবেই উদাসীন। কেননা মহেন্দ্রনাথের কাছে জীবনের মানে হোল ঃ "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং।তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।'

উপনিষদের মধ্যে ভারতের যে প্রাণরস সঞ্জীবিত হয়ে আছে সেই সজীব বহমান জীবনকে বারংবার প্রণাম জানিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ।

বোধহয় সেই কারণেই মহেন্দ্রনাথ সামাজিক বিদ্রোহের কারণ খুঁজতে গিয়ে বলেছেন যে নেতৃত্ব যখন জনগণের অধিকারচেতনাকে পদদলিত করে তখনই সমাজজীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। অর্থাৎ বিদ্রোহের বীজ উপ্ত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে বিসর্জন দিতে মহেন্দ্রনাথের তাই প্রচণ্ড অনীহা। সক্রেটিস্, প্লেটো অথবা বের্গসোঁ সকলেই মহেন্দ্রনাথের কাছে সভ্যতার এক মহামূল্যবান সম্পদ। মহেন্দ্রনাথের মতে সমাজ কখনোই ব্যক্তিসত্তাকে খর্ব করে, হত্যা করে সমৃদ্ধতর হতে পারে না। একথা তো শুধু মহেন্দ্রনাথের কথা নয়। একথা তো ভেসে আসছে সেই ডিমোক্রিটাস কিংবা নচিকেতার আমল থেকে। আমার আত্মাকে তো বধ করার অধিকার কেউ তোমায় দেয় নি। বেদান্তের সংস্কার ও সর্বপ্রকার ধর্মবিশ্বাসকে গ্রহণের মতবাদ পোষণ করতেন বিবেকানন্দ। ভূপেন্দ্রনাথ হেগেল ও মার্ক্স সৃষ্ট দ্বন্দ্ববাদকে জীবনের মুখ্য নিয়ামক হিসেবে মনে করেছেন। আবার রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রানাডে, বিদ্যাসাগর, সৈয়দ আহমেদ প্রমুখ মনীষীরা সামাজিক পুনরুজ্জীবনের

মধ্য দিয়ে ভারতের মুক্তি খুঁজেছিলেন। কিন্তু কেউই ব্যক্তিসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে সামাজিক মুক্তির কথা বলেন নি। মহেন্দ্রনাথও সেই অর্থে ইউরোপীয় হিতবাদ ও বৈদান্তিক জীবনদর্শনের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়বাদের আভাস আছে সেই আভাসকে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির এক অন্যতম সর্ত হিসেবে মনে করেছেন। আমাদের উপনিষদের মধ্যে অনন্ত বা ইনফিনিটির যে চিন্তা-ভাবনা আছে মহেন্দ্রনাথের জীবনবোধ সেই অনন্তকেই কেন্দ্র করে বাঁচতে চেয়েছে। "লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থে মহেন্দ্রনাথ বলছেন : "শূন্য বলিয়া কোন জিনিষ থাকিতে পারে না। আমরা বুঝিতে অক্ষম, এইজন্য ভ্রান্তভাবে শূন্য বলিয়া থাকি। সেটাকে শূন্য বলা যায় না, সেটি পূর্ণ। আমাদের খণ্ড ও পরিধি বিশিষ্ট বস্তু দর্শন করাই অভ্যাস, কিন্তু অখণ্ড ও পরিধি বিবর্জিত বস্তু উপলব্ধি করিতে গেলে আমরা ভীত, ত্রস্ত হইয়া পড়ি। এইজন্য ভীত ও ভ্রান্ত হইয়া শূন্য বলিতেছি। কিন্তু প্রকৃত এইটাই হইতেছে পূর্ণত্ব। এই পূর্ণত্ব হইতেছে ব্রহ্ম।" জীবনের মধ্যে সমাজের গভীরে নিজেকে চেনা আর অনন্তকে অনুভব করার মধ্যে মহেন্দ্রনাথ কোন অন্তর্বিরোধ খুঁজে পাননি।

আবার সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমরা মহেন্দ্রনাথের মধ্যে এক সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ও পেয়ে যাই। এশিয়ার জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ যেমন অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি, সমাজবিজ্ঞানী বিনয় সরকারের সঙ্গেও মহেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয়েই ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে মাইক্রো থেকে ম্যাক্রোতে সহজগতিতে চলাফেরা করেছেন। উভয়েই বাঙালী তথা ভারতবর্ষের জনজীবন থেকে এশীয় জাতীয়তাবাদের সুসংহত রূপ খোঁজবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে অনুজ ভূপেন্দ্রনাথও এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের কথা প্রসঙ্গে প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ভূপেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে সন্ত্রাসবাদ ও মার্কসবাদের প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, মহেন্দ্রনাথ যে দেশে যখনই অবস্থান করেছেন তখনই সেই দেশ ও সেই দেশের মানুষদের সম্পর্কে এক গভীর অন্তর্ভেদী বিবরণ রেখে গেছেন। প্যালেষ্টাইনে গেছেন। দেখেছেন সেখানকার মানুষদের ইতিহাস। লিখেছেন ছোট্ট করে ইহুদীদের কথা, রোমের সেনাপতি পম্পিয়াস্ ম্যাগনাসের কথা। লক্ষ্য করতে ভোলেন নি যে ইহুদীরাও মূর্তিপূজো করতেন। এবং তাঁরা পুনর্জন্মবাদেও বিশ্বাস করতেন। শুধু তাই নয় যে কলকাতায় মহেন্দ্রনাথ বড়ো হয়েছেন মানুষ হয়েছেন সেই কলকাতার জীবনের নানারূপ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে। এমন কি দেশের ও মনের পরিবর্তনের দৃশ্যপটগুলিও তাঁর সতর্ক চোখ এড়িয়ে যায় নি। 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' নামক গ্রন্থে মহেন্দ্রনাথ বলছেন : "তখনকার দিনের লোকের শরীরের আয়তন এখনকার লোক হইতে অনেক বড় ছিল। এখন মাঝে মাঝে সেই আয়তনের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। লোকেরা খুব লম্বা চওড়া, হাত লম্বা লম্বা বলিষ্ঠ ও বুক চাটাস। আমার পিতামহোদয়ের আয়তন হিসাবে নরেন্দ্রনাথ খর্বাকৃতি ছিলেন, এইজন্য নন্দ ঠাকুরদাদা গোপাল দত্ত আদর করিয়া নরেন্দ্রনাথকে 'বেঁটে হালা' বলিয়া ডাকিতেন।' তারপর কলকাতার তরজা গানের দুচার কলিও মহেন্দ্রনাথ অতি সন্তর্পণে তুলে দিয়েছেন ভবিষ্যৎ গবেষকদের হাতে। আমার নামটি কীর্তি, তরজা বৃত্তি, হাতিবাগানে বাড়ী। কখনও বেচি নারিকেল তেল কখনও তরজায় লড়ি ঢুলি বাজারে রাজা। ছন্দের সঙ্গতি নেই, শব্দ চয়ন অত্যন্ত দুর্বল, তবু তরজা ও খ্যাগান একসময় কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। পূর্বাঞ্চলের সারি গান, হাফ-আখড়াই, কাদামাটির গান সম্পর্কেও মহেন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। কাদামাটির গান সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে যে, "তখনকার দিনে নবমীতে পাঁঠা ও মোষ বলি করিয়া গায়ে রক্ত কাদা মাখিয়া মোষের মুণ্ডু মাথায় লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা হইত। আর বৃদ্ধ পিতমহ তাঁহার সমবয়স্কলোক, পুত্র, পৌত্র লইয়া হাতে খাতা লইয়া কাদামাটির গান করিত। সে সব অতি অশ্লীল ও অশ্রাব্য গান।" আবার মহিষাসুর বধের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ চকিতে তুলনা করে ফেলেন গ্রীক পুরাণে কথিত হাইড্রা বধের কাহিনীর। এমন কি এসিরিয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতাতেও যে দেব ও দেবীমাহাত্ম্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হোত সে কথা উল্লেখ করতে মহেন্দ্রনাথ ভোলেন নি। আদ্যিকালের কলকাতায় যে দুর্গাপুজো হোত সেই দুর্গাপুজোর ঘটা আজকের দিনের থেকে অনেক বেশী পরিমাণে হোত। 'শাক্তের বাটীতে দুর্গার সিংহ সাধারণভাবে এবং গোঁসাইএর বাড়ীতে সিংহ ঘোড়ার মত মুখ হইত।' অর্থাৎ শাক্ত ও বৈষ্ণবদের সঙ্গে যে সামাজিক বিরোধ ছিল তা দুর্গোপুজোর সময়ও মিটে যেত না। দোল খেলা সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ বলছেন হোলি সম্ভবতঃ সংস্কৃত শব্দ 'হল্লীসক্রীড়ম্'-এর অপভ্রংশ। এই জাতীয় মদনোৎসব পৃথিবীর বহু দেশে এখনও চালু আছে। আরব দেশ থেকে উন্মত্ত ইউরোপীয় দেশগুলি পর্যন্ত বাধাবন্ধনহীন মদনোৎসবের ক্রিয়াকলাপ কোন না কোনভাবে প্রচলিত আছে। পার্থক্য শুধু বেশভাষায় ও আচারবিচারে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় যে অতীতেও ভারতবর্ষে মদনপূজা প্রচলিত ছিলো। মহেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে 'কর্পূরমঞ্জরী' নামক একটা প্রাচীন নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন।

নাগবংশের উল্লেখ করতে গিয়ে মহেন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন যে, মহাভারতের কালে নাগবংশের ধ্বংস হয়। 'কারণ মহাভারতে প্রথমে জন্মেজয়ের অশ্বমেধ উপাখ্যান পড়িলে ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। বাসুকী নাগ দিয়া যে সমুদ্র মন্থন হইয়াছিল এটাও যোগ হইতেছে যে বৌদ্ধ যুগের গল্প।" আবার বঙ্গদেশের মনসাপুজা সম্পর্কে লখিন্দরকে বলতে শোনা যাচ্ছে : 'যে হাতে পুজেছি আমি দেবী ভগবতী সেই হাতে পুজিব কি না কানি চ্যাং মুড়ি?' 'কানি' শব্দের অর্থ অবজ্ঞা। বোধ হয় মনসাপুজোর ইতিহাস বাংলাদেশে বেশী দিনের নয়। তাই এই সংলাপের মধ্যে পুরাতনের সঙ্গে নতুনের দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে। আশ্চর্যের কথা এই সমস্ত ইতিহাস ও ইতিহাসের গল্প আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বয়ং। দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ মুহূর্তে সমাজবিজ্ঞানী হয়ে গেলেন।

মহেন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর চরিত্র। আগেই বলেছি মহেন্দ্রনাথের জীবনীর ওপর কোন নির্ভরযোগ্য দলিল নেই। যে সমস্ত টুকরো টাকরা লেখা ও স্মৃতি চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলিকে সংগ্রথিত ও সম্পাদনা করার দায়িত্ব নিয়েছেন মহেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ কিছু মানুষ যাঁরা নিজেরাও প্রচারের অন্তরালে থেকে গেছেন। মহেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে, বাংলা মাস হিসেবে ১৩৬৩ সালের ২৮শে আশ্বিন তারিখে—রবিবার। মৃত্যুর আগে তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি চললুম ঠাকুর রইলেন, তোমরা রইলে আর কাগজগুলো রইলো।' বলতেন তাঁরই এক শিষ্য প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁদের সতীর্থদের। মহেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বর্তমান লেখক যা পরিবেশন করলেন তাও প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। তবে এই বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষ প্রচারবিমুখতার জন্য যে বাঙলা ও বাঙালীর কাছে বিশেষভাবে পরিচিত নন সেটা সত্য। কেননা বিবেকানন্দ ও ভূপেন্দ্রনাথের মতো দুই দিক্‌পাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভাই থাকা সত্ত্বেও মহেন্দ্রনাথ নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন। আসলে মহেন্দ্রনাথের মন নিরাসক্তির মধ্যে মুক্তিকে খুঁজত। তাই ভ্যাগাবণ্ড মহেন্দ্রনাথ কখনই প্রচারপ্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দেন নি। পরনিন্দা পরচর্চাকে প্রশ্রয় দেন নি মহেন্দ্রনাথ। সদাই ভাবতেন মানুষ নিয়ে, মানুষের মন নিয়ে, সমাজ নিয়ে। মহেন্দ্রনাথের হোমোসেন্ট্রী সোসাইটী বা মনুষ্যকেন্দ্রীক সমাজ আসলে তো মানবতাবাদেরই এক সমৃদ্ধতর প্রকাশ : ন ধর্মো ন চার্থো না কামো ন মোক্ষ। এই অদ্ভুত উদাসীন নিস্পৃহ জীবনকেই মহেন্দ্রনাথ আমাদের দিয়ে গেছেন। দিয়ে গেছেন আমাদের ভারতবর্ষকে। আজকের প্রচারসর্বস্ব ভণ্ডামির যুগে মহেন্দ্রনাথের মতন মানুষদের প্রয়োজন আমরা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি। ভারতবর্ষে যেদিন এই অবক্ষয়ী সমাজ শেষ হবে সেদিনই মহেন্দ্রনাথের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হবে। আমরা সেদিনের জন্য অপেক্ষা করছি।

অমল, সুধা, সুদর্শনা এবং গোলাপ......

শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত

ভাঙা আয়নায় মুখ। মাকড়সার জাল যেন। মুখের টুকরো অংশ ছড়ান-ছেটান। উজ্জ্বল বিকেল। বাইরে মাঠে এক ঝাঁক চড়ুই। রোদের গুঁড়ো মেখে পাম গাছের মাথা দুলছে। বাতাসের আলতো আলিঙ্গন। সবুজ চুড়ে নকশার ঝিলিমিলি। উঁচু চারতলা বাড়িটার এন্টেনার মাথায় কাকের জমুরি সভা। মাঝে-মধ্যে অবনতমস্তক একটি কাক যেন শাস্তিযোগ্য অপরাধের যৌক্তিকতা বিচার করছে। তিনতলা বাড়ির নমভ্র ছাদে ছায়া প্রলম্বিত। ও-ছায়া অট্টালিকার। বিজ্ঞপনার তিনতলা মুখ গড়ায়। ফাঁকা ফাঁকা ইঁটের সারি। লাল সুরকির তাজা গুঁড়ো। নুনের মতো। এই পাশের বাড়ির জানলায় কিশোরের ছবি। অসুস্থ সে। বিষণ্ণ চোখে পরলা জানুয়ারির গড়ানো বিকেল দেখছে। চোখে আকাশের সুদূরতা.... পক্ষাহত হাত-পায়ে অসহ্য জড়তা। গালের শুকনো সমুদ্র-খাড়িতে জল টলমল।.... কেউ নেই...অমলকে বলো ফুল আনতে গেছে সুধা—সুধারা যায়—নীল পাহাড়ের তলায় ছুটন্ত ঝর্ণার জলে পা ফেলে ফেলে সুধারা চলে যায়—ফুল আনতে—যায় কিন্তু আনে না—ফুলের জন্য অমলেরা ভাঙা বিকেলের জীর্ণ হাট খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে। একটা প্রচণ্ড মিথ্যেকে জেনেও তারি জন্যে অপেক্ষাকাতর। কার্ণিশ ধুয়ে রোদের ছবি টপকে টপকে হাতের উজ্জ্বল আলু ছোঁয়া—কোনদিন না—অসুস্থ অমল ডাকঘরের চিঠির জন্য নয়, সুধার জন্যে জানলায় দাঁড়ায়। আমাদের অমলও দাঁড়িয়েছে—তার সুবর্ণ চুলে রোদের শেষ আদর, মায়াময় চোখে সময়ের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ—সে এই মুহূর্তে বিকেলের প্রান্তে বসে থাকা ঐ জীর্ণ মাঠের একমাত্র কাঠগোলাপ দেখছে!...কিছুদিন আগেও মাঠটা বাগান ছিল...আজ বাগানে নামের প্রহসনটুকু নিয়ে বসে আছে মাঠ।

বাঁ ধারে কলাবতীর ঝাড় ছিল—টকটকে লাল ফুলে চিকচিক করতো হিম—মা বলতো ওরা নিশির শিশির—আর কথায় একটা সুরেলা ছন্দ পেতো অমল। বিশাল কাঠগোলাপ গাছের প্রতি ডালে ডালে থোকা থোকা ফুল—বাগানের বুড়ো মালি লাফিয়ে লাফিয়ে গাছটা ঝাঁকাতো—ঝুরঝুর করে দাক্ষিণ্য ছড়াত গাছ—মায়ের স্নেহ আদর গালে গালে চুমু পড়ত ঐ বুড়ো মালিটার গায়ে—কত ফুল—চার-পাঁচটা টুকরি ভরে যেত। অমলের সতৃষ্ণ নয়ন তাকিয়ে দেখতো—রিন রিন করতো গলা—ও মালী আমায় ফুল দাও না—ও মালী দাওনা গো—ওই তো তোমার কতো ফুল, সবি লাগবে, আমায় কিছু দাও না—মালী হাসতো—মাথা নাড়তো—কিন্তু অমল জানতো দেবে—ঠিক দেবে—মালীর ফোকলা মুখে হাসি ঝুলে থাকবে—চলে যাওয়ার আগে কলাপাতা ছিঁড়ে একরাশ কাঠগোলাপ—একটা কলাবতী ফুল ভালো করে বেঁধে ছুড়ে দেবে অমলদের চালে। একঝলক রোদের মতো অমলের জীর্ণ চালে ফুলের প্যাকেট টুপ করে খসে পড়বে।

দেবতার মতো বুড়ো মালী চেয়ে দেখবে অমলের রুগ্ন মুখে কি অপার্থিব হাসি।—বাগানের কোথায় লাল হলুদ শাদা গোলাপের ঝাড়—যেন একচিলতে শাড়ির জমি। কাঠগোলাপ ভালো লাগে না অমলের কিন্তু যা ভালো লাগে তা মালী দেয় না। ঐ শাদা লাল গোলাপী গোলাপ একটা যদি পেত অমল। পরেশনাথের মন্দিরে মহাবীরের রুপোর পায়ে অজস্র গোলাপ আর জেবার অল দেখে অমলের খুব লোভ হত কিন্তু কিছুতেই গোলাপ পায় না। একটা গোলাপের জন্য অমলের সারাদিন দুঃখে কাটে। রোদ গলে গলে পড়ে চালে যেন অমলের দুঃখ। মা একতোড়া গোলাপ কিনে দিয়েছিল—অমল দেখেছিল, ছোঁয়নি—ভালো লাগেনি—মা অবাক! প্রশ্ন করেছিল—মা বোঝে না বাগানের গোলাপটা আর ঐ একতোড়া কেনা গোলাপ এক না—ঐ যে মস্তো বড়ো লাল টিপের মোত গোলাপটা ওর সঙ্গে অমলের কতো গল্প! অমলের ইচ্ছে হয় ওর নরম মসৃণ পালকের মতো পাপড়ি ছুঁতে। গোলাপটা দুলে দুলে হাওয়ায় ওকে ডাকে—কিন্তু হায়! অমল যে হাঁটতে পারে না।—ঐ বাগানের একটি গোলাপ প্রত্যাশী অমলের শৈশব ধুয়ে গেল—শরীরের ভাঙচুর হল, কিন্তু শীর্ণ কাঠির মতো দুটো পা আর অন্য চেহারা নিল না। অমলের সুবর্ণ চুলের ঢেউ-এ হাল্কা বাতাসের আনাগোনা। ফর্সা কপালে ছোটখাট ঢেউ তুলল রাশিকৃত চুল হাতের আদুরে উজ্জ্বল রেখায় বিস্তৃত হলো বয়েস, সময়ের চত্বর ধাপ পেরিয়ে পেরিয়ে অমলের পাশে এল অমলের সুধা।—সুধা, তুমি এতো দেরি করলে? আমি যে তোমায় কখন থেকে ডাকছি—শুনতে পাচ্ছো না তুমি—

—আমি যে অনেক—অনেক দূরে ঝর্ণাতলায় গেছিলাম—ঝর্ণার কলধ্বনি

আমার সমস্ত কানকে বধির করেছিল—আশপাশ দিয়ে কতো বাতাস সুগন্ধ নিয়ে গেল—হয়তো তোমার আকুলতাও কিন্তু আমি তা একটুও শুনতে পাইনি—অমলের অভিমানক্ষুব্ধ মুখ গম্ভীর। জানি জানি তুমি ইচ্ছে করে আমার ডাক শোন না। আমি সারা সকাল থেকে তোমাকে এতো ডেকেছি অথচ কিছুই তুমি শুনতে পাওনি। পারবেই তো না—তোমার কতো বড়ো জগৎ—আমার তো শুধু ঘর—এই চারটে দেয়াল আর শাদা বিছানা—মাথার কাছে জানালা, বাগান নেই, রুক্ষ মাঠ—ঐ মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখি কিভাবে সকালের প্রথম রোদটা পামগাছের ডগায় চুমু খায়, অমপর্ণ আদরের হাত বাড়িয়ে কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে নামে।

সুধার নদীর মতো চোখ টলমল করে—অমলের সুবর্ণ চুলের ঢেউ-এ হাত রাখে—শ্যামল হাতে তার সবুজ চুড়ি—যেন কালো আকাশের প্রান্তে একমুঠো সবুজ ওমি।—অমল, বিশ্বাস করো আমি সারাদিন তোমার কথা ভেবেছি—আমার যখন ঘুম ভাঙে তখন উষা ঘুমোয়—আকাশের সবক'টা নক্ষত্র জ্বল-জ্বল করে—উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাসে পাহাড় পেরোন ফুলের গন্ধ ভাসে—আমি মাঠের ঘাসগুলোতে দু-হাত ডুবিয়ে তোমার কথা ভাবি অমল—আমাদের বাড়ির চালে টুপটোপ শিশির পড়ে—হাত শিশিরে ধুয়ে যায়। বিশ্বাস করো অমল, আমার তখন ইচ্ছে করে ঐ শিশির-মাখা হাত তোমার কপালে বুলিয়ে দিই—জানো আমার ঠাকুর্দা বলতেন, শিশির-ভেজা ঘাসে পরিষ্কার কাপড় মেলে দিও—সমস্ত রাতের শিশিরে ঐ কাপড় ভিজে মৌচাকের মতো চুবচুবে হবে, তখন সকালের অরুণ আলোয় ঐ কাপড় নিংড়ে জল খেলে সব রোগ শরীর ছেড়ে চলে যায়—আমি কতদিন ভেবেছি অমল, শেষ রাতের শিশির উষা ফোটার আগেই তোমাকে খাইয়ে দেব—অমনি দেখো তোমার সব জড়তা কেটে যাবে। বিশ্বাস করো অমল, আমি তোমার কথা সব সময় ভাবি।

সূর্যটা যখন লাফিয়ে লাফিয়ে আকাশের মাঝখানে আসে—আমি তার আগেই ঝর্ণা-তলায় যাই, আমার যে কতো কাজ—জল এনে না দিলে মাসী আমাকে—

অমলের কপালে টপ্ করে গরম ছোঁয়া—অমলের শরীর যন্ত্রণায় বেঁকে যায়। বুকের গভীর গোপন সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল অপূর্ব ঝর্ণাস্রোত। সেই স্রোতের জলে মুখ ডুবিয়ে অমল বললো: তুমি কাঁদছো সুধা? কষ্ট পেয়েছ? বিশ্বাস করো, তোমার জন্য সারাদিন অপেক্ষা করে করে আমি যখন ক্লান্ত, সমস্ত পাখি একসঙ্গে কূজন করতে করতে বাড়ি ফেরে—সূর্যের অস্ত-যাওয়া পথ থেকে একরাশ লাল গোলাপ ছড়িয়ে পড়ে আকাশের জমিতে, তখন আমার ভীষণ ভয় করে—ঝর্ণাতলার শব্দ কান পেতে শোনবার চেষ্টা করি—তোমার বাগানের পূর্বদিকটায় মনে মনে চলে যাই—সেখানের শাদা পাথর-বেদীতে তোমাকে খুঁজি কিন্তু ওখানে তুমি নেই—কোথাও নেই—মনে হয় তুমি আর কখনো ফিরবে না—ঐ ঝর্ণার পথ বেয়ে নীল সারি পাহাড় ডিঙিয়ে অনেক—অনেক দূর চলে যাবে—আমি শুধু এই ভাঙা আয়নায় মুখ দেখব—মাকড়সার জালের মতো শতছিন্ন কাচে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবব—সুধারা ফুল নেবার কথা বলে কিন্তু নেয় না—ফুল আনতে চলে যায়। আর ফেরে না।

সুধার দুটো চোখে শ্রাবণের ঘন মেঘ ভেঙে ঝির-ঝির রূপো ঝরে—অমলের সুবর্ণ চুলে চিকচিক করে মুক্তো—সুধার অস্ফুট কুঁড়ির ঠোঁট ভেঙে বেরিয়ে আসে কান্না-ভাঙা কথা: তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যাব অমল? কোথায়? আমার সারাদিন তোমাকে কেন্দ্র করে ঘোরে—তুমি আছ তোমার এই অস্তিত্ব টুকুই আমার সান্ত্বনা—অমলের অভিমান হত, হৃদয় তবু বোঝে না—সুধার নরম হাত চেপে ধরে বুভুক্ষুর মতো। আমাদের অমলের কৈশোর সোনালী পর্দা লুটোতে লুটোতে চলে যায়। অমলের গাঢ় দুটো চোখে বিষণ্ণ সমুদ্রের যাওয়া-আসা—সুবর্ণ চুলের নদী ঢল হোয়ে কাঁধে নেমেছে। শিল্পী আঙুলের মেরজাবে অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষায় বাজে সেতারের করুণ সুর—ঝনঝন করে পাঁজর—অমলের সুধা জানলার জাফরিকাটা গিলে হাত দিয়ে ডাকে না—অমল—এই অমল—ঝর্ণার জল শুকিয়ে গেছে—পাহাড়ের সারি নীল গাঢ়তা হারিয়েছে—ঝর্ণা তলার পথ পাথরের রাশিতে ভর্তি—হয়তো বা কোথায় হারিয়ে গেছে—আকাশের শেষ প্রান্ত থেকে সুধার শ্যামল মূর্তি ছুটে ছুটে আসে না—অমলের সুধা হারিয়ে গেছে—অন্য দেশে জ্যোৎস্না ভেঙে পড়ছিল—অমলের বিছানায় সেদিন রুক্ষ মাঠে সেতারের আলাপের মতো জ্যোৎস্না বাজাচ্ছিল ঈশ্বর—সুধার বাড়ি থেকে কান্নার মতো ভেঙে ভেঙে আসছিল সানাই-এর সুর—বাতাসের আলতো ছোঁয়ায় সুরের ঘন রস কেটে কেটে শিমুল তুলোর মতো দিকদিগন্তে ছড়াচ্ছিল—অমল আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুঁজছিল সেই নিষ্ঠুর মানুষটিকে যে তার নির্মম দাবার চালে কিস্তিমাৎ করে সুধাকে পরদেশী করে দিল—অমলের পঙ্গু পা-দুটো আক্রোশে গড়ে উঠেছিল—ইচ্ছে হয়েছিল ছুটে যায়—আসর মাঝখানে ভেঙে দেয় মঙ্গলঘাট—চীৎকার করে পৃথিবীরাজের মা[illegible] হরণ করে—কিন্তু কিছুই হয় [illegible] শরীর অমলকে নিয়ে বিছা[illegible] থাকে।—অমলকে বলো সুধা তাকে ভোলেনি।

অমল জানে, সুধা ভুলে গেছে—জানলায় দাঁড়িয়েছিল সুধার কিশোরী মুখচ্ছবি। চন্দনের আল্পনায় লাল চেলীর ঘেরাটোপে সিঁথিমৌড়ের আবরণে কি অপূর্ব ছবির মতো উঠে এসেছিল সুধা—দু-চোখের জমি ভেঙে নামছিল চিকচিকে অভ্রের কুচি—লাল ঠোঁট কেঁপেছিল অমল—ওরা আমায় টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে—অমল, তুমি যদি জমীদার হতে, অমল আমায় তুমি যেতে দিও না। অমলের বুক ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল—সেতারে ঝালা বাজছিল—আলাপের মন্ত্রমুগ্ধতা কেটে গিয়ে সমস্ত জগতের দরজায় তার হাতের ধাক্কা—অমল, আমি চলে যাচ্ছি অনেক—অনেক দূরে, আমাকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার সমস্ত সত্তাকে মাঠের ডানদিকের কোণটায় ঐ চাঁপা গাছের তলায় রেখে গেলাম। তোমার যখন খুব কষ্ট হবে অমল, ঐ চাঁপা গাছটির দিকে তাকাবে—ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে বাতাস যাবে—তাতে লেখা থাকবে তোমার দুঃখের কথা—আমিও বাতাসে লিখে দেব আমার দুঃখ—আমার কথা—সুধার ছবি হারিয়ে গেল। জানলার গিলে হাত রেখে অমল চাঁপা গাছটিকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করে—কিন্তু না সেটা আর বাঁচেনি—ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে তার অস্তিত্ব মাটিতে—।

তোমার সুধা গেছে অমল সুদর্শনা আছে...অমলের শরীর কেঁপে ওঠে। সুদর্শনার দেহ ঘিরে পাহাড়ী ঝোরা... কৈশোরকে হন্তারকের মতো খুন করার বেনী ধুয়ে ফুলের সৌন্দর্য উগ্র যুঁইয়ের গন্ধ মেখে সুদর্শনা অমলের কৈশোরকে হন্তারকের মতো খুন করার চেষ্টা করে। অমলের মুগ্ধতা ভাঙে স্বচ্ছ পর্দা ছিড়ে যাবার আগে অমল আর্তনাদ করে—সুদর্শনার আলিঙ্গনে বন্দ হবার আগে অমল শেষ চীৎকার করে...সেই আর্তির আবেদনে সবুজ পৃথিবী টুকরো হয় রঙীন ফুলের সৌন্দর্য নিয়ে সুধার শান্ত মুখচ্ছবি ভাঙা আয়নায় শেষবার প্রতি-ফলিত হয়। আকাশের ঝারি থেকে ঝরে পড়ে বৃষ্টির পরাগ...রেণু রেণু তুলোর আঁশে ভরে যায় পৃথিবী...সমস্ত বহির্জগতের ঠাণ্ডা শান্ত পরিপ্রেক্ষিত অমলের বুভুক্ষু চোখের বাইরে অবহেলায় পড়ে থাকে হীরের মতো নিজেরাই নিজেদের চতুর্দিকে কৌনিক আলো ফেলে। শাদা বিছানায় পাহাড়ী উচ্ছল ঝোরার সঙ্গে অমল খেলা করে অমলের অক্ষত শরীরে প্রথম দংশনের চিহ্ন বসায় সুদর্শনা, ক্রীড়া পটিয়সী সুদর্শনা জ্ঞান বৃত্তির সদ্য শিশির সিক্ত ফলটা অমলের মুখে তুলে দেয়...অমলের নিস্তরঙ্গ শরীরের টলমল সমুদ্র হারাতে থাকে। সুবর্ণ চুলের থেকে মুছে যায় সুধার চোখ ভাঙা অভ্রের ফুল, আগুনের বিশাল উত্তাপে ছটফট করতে করতে অমল সৌন্দর্যে মুখ ডোবায়......অমলকে শিল্পি আঙুলের নখের আঘাতে কারুকার্য অঙ্কন করতে শেখায় সুদর্শনা। অমলের মসলিন কৈশোর সুধার প্রেম বিচ্যুত হয়ে পুরোন দড়ির মতো ঝুলতে থাকে। অমলের পঙ্গু পা দুটো আক্রোশে নড়ে ওঠে [illegible]।

অমলের পৃথিবী বাইরে ঝিমোতে থাকে শুষ্ক মাঠের ওপর সূর্যের মত্ত দাপাদাপি অমলকে সঙ্গী পায় না। রাতের আকাশে একরাশ রাজ হাঁসের মতো নক্ষত্র সাঁতার কাটে, অমলের সে দৃশ্য দেখার সময় হয় না জ্বান বৃক্ষের ফল অমলকে উন্মত্ত করেছে। অমল আজ মনের অসুখে, দাপাদাপি করে শরীরের ক্ষোভে শরীরের জন্য রক্তের হানাহানি, সুদর্শনা ঘুম ভাঙাতে জানে, কপালে হীরে চন্দনের জল হাত না বুলিয়েই শান্ত নিরুদ্বেগ স্বপ্নিল ঘুম ভাঙায়, শরীরের জ্বলন্ত দুর্জয় অপ্রতিরোধ্য সেতারে তীব্রভাবে সুর বাজাতে পারে, আলাপের মন্ত্রণা নেই তাতে, শুধুই দহন অমলের ভাসা ভাসা আয়ত চোখে অশভূত ক্ষুধা অমল সুদর্শনার হাত চেপে ধরে...

তুমিও চলে যাবে সুদর্শনা—তুমি চলে গেলে আমি পাগল হয়ে যাবো—সুদর্শনার সর্পিলবেণী দুলে ওঠে—সে বলে : অমল তোমার যৌবনকে জাগিয়েছি, আমার কাজ শেষ, আজকে যেতে দাও।

অমল চীৎকার করে, বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল অমলের কণ্ঠস্বরের ব্যকুলতায় তা যেন উল্টো বাতাসে ভেসে চলে যায়। মাঠের রোদ তখন রূপোঝুরি, মুঠো মুঠো ধুলো ছড়িয়ে চড়াই এর ঝাঁকের মত্ততা। অমল দেখে না, ও পাগলের মতো প্রশ্নের তীর ছোঁড়ে—কেন তুমি এলে সুদর্শনা? আমি তো তোমাকে চাইনি—সুধা চলে গেছে কিন্তু ওর স্মৃতির সোনালী রোদে বসে দিনগুলোর নকশা কাটছিলাম। আমার সুখ, আমার বৈভব আমার স্বপ্ন আমার সমুদ্র সব জুড়ে সুধার অলৌকিক অপার্থিব সত্তা, ওকে আমি করতলে রেখে ভাঙা আয়নায় নিজের মুখ দেখেছি। আমার সহস্র টুকরো মুখের ছবি, আড়ালে সুধার টলটলে নদী থেকে অভ্রের কুঁচির স্খলন আমি অনুভব করতাম। আমার জ্বালা ছিল না, আমি যন্ত্রণা নিয়ে সেতারের হৃদয়ের রক্তকে সুর করে ছেড়ে দিতাম বাতাসে, এই অলৌকিক প্রসাদী সময়ে কেন তুমি এলে সুদর্শনা? সুদর্শনা হাসে, এই তো আমার কাজ অমল, সুধারা চিরকাল থাকে না, কৈশোর বড়ো ক্ষণস্থায়ী, অমল যৌবনের সুখছবিকে বার বার হরণ করে, তুমি আজ যুবক, তোমার এ শরীরে কিশোর মনের স্থান কি সম্ভব? তাহলে তুমি মনেও অসুস্থ হতে। অমলের দেবতার মতো প্রশস্ত ললাটে সুদর্শনা আলতো হাত রাখে, ভয় কি অমল?

শান্ত নদীটির বুকে পালতোলা নৌকো ভেসে যেতে দেখেছ। মাঝে মাঝে ঝড়ের দাপটে নৌকো টালমাটাল হয়, পাকা পাটনী ঠিক সামাল দেয়, তুমিও তো আজ দেবদুর্লভ শক্তি পেয়েছ অমল, সুধার সোনালী চিঠি বুকে নিয়ে আমায় ভুলে যাও, তোমার বুকে উজ্জ্বল বসন্ত, ওখানে ডেকে নাও আরো সুদর্শনাকে, আমার কাজ শেষ, আমি যাই—।

তখন গলানো রূপোর মতো রোদ্দুরে লালে লাল, সূর্যের রাজকার্য শেষ, সিংহাসন থেকে নেমে অন্দরমহলে যাবেন তার আগে শান্তি মন্ত্রের মতো ছিটিয়ে দিলেন লাল গোলাপ পাপড়ি আকাশের ঝারি থেকে নেমে এল অন্ধকারের কালো পর্দা। কুঁড়ির মতো ফুটে উঠল নক্ষত্র। আর একটু পরেই গোল বাতাসার মতো চাঁদ উঠবে। অমল আকাশের এলোমেলো ভেসে যাওয়া মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাতাসের ঈষৎ পাগলামি ছুঁয়ে যায় তাকে।

অমল তার জলভরা চোখ ফিরে বাতাসে লিখে দেয় সুধা, তোমার অমল তোমাকে চায়, তুমি ফিরে এস, সুদর্শনা পরিবেশকে মুছে ফেলব সহজে। জলের বুকের মতো। বাতাস কিন্তু সে লেখা দেয় না, অমল জানে শৈশব তাকে গোলাপ দেয়নি, কৈশোর তাকে সুধা দেয়নি, যৌবন তাকে সুদর্শনা দেয়নি, সে না পাওয়ার অনন্ত চিরকাল স্থবির দর্শক, তার সামনে জীবন্ত ছবির মতো ভেসে যাবে ফুল সুধা, সুদর্শনারা, আর সে অমলরা চিরকাল সুধার জন্য অপেক্ষা করে, সুধারা কখনো ফুল দেয় না। অমলকে বলো সুধা তাকে ভুলে যায়নি। আমাদের অমল অস্ফুটে ঠোঁট ভাঙে, সুধা ভুলে যায়, ঝর্ণাগুলো পার হয়ে নীল আকাশের পক্ষীরাজে ওরা চলে যায়, কখনো ফেলে না, একা অমল, এই জায়গায় পড়ে থাকে।

পা ফেলা

নির্মলেন্দু ঘোষাল

কাবেরীর সঙ্গে তুহিনের পরিচয় মলয়ের মাধ্যমে। কাবেরীদের লালবাড়িতে মলয় ছোট থেকেই যায়। শৈশবে রোজ বিকেল-বেলা, ঐ বাড়ীতে খেলতে যাওয়াটা মলয়ের একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ বড়ো হয়েও সে অভ্যেসটা কিছুটা রয়ে গেছে। অবশ্য এ ব্যাপারটাকে নিয়ে কেউই তেমন চিন্তিত নয়। মলয় ওদের পরিবারের বন্ধু।

মলয়ের সঙ্গে তুহিনের পরিচয় খুব ছোটবেলায় না হলেও—বড়ো বয়সে বলা যায় না। দুজনেই স্কুলের শেষ দিককার ঝরে-যাওয়া ছাত্র। তুহিন এবং মলয়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মায় রাজনীতিতে এসে। সে বয়সে ওরা অবশ্য কেউই রাজনীতি বুঝতো না। শুধু পরিবেশ এবং সেই সময়ের পাড়ার-নীতি ওদের রাজনীতি করতে বাধ্য করেছিলো। তাছাড়া স্কুলের নীচু ক্লাসের ছেলেদের কাছে, এই রাজনীতি করার জন্যে যে খুব সহজেই দাদা হওয়া যায়, সে বয়সেই ওরা এটা বুঝতে পেরেছিলো।

কাবেরীকে তুহিন একটু বড়ো হয়ে চিনেছে। তুহিন যখন বুক-কিপিংয়ের জুবজবে খাতা নিয়ে গ্রীষ্মের টগবগে ফোটা ভোরে মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়তে যেতো, কাবেরী ছিলো সেই নিঃসঙ্গ হেঁটে-যাওয়া রাস্তার একমাত্র কিছু সময়ের সাথী। কাবেরী সেই ভোরবেলা, গেটের সামনের মালতী গাছের নীচে সান-বাঁধানো রকে বসে ভুগোল পড়া মুখস্থ করতো। কাবেরী সেই পড়া মুখস্থ করার অনিচ্ছা-ব্যস্ততায় কোনদিন হয়তো তুহিনকে ভুল করেও দেখেনি। তবু তুহিনের সেই ঘুমখোলা চোখে বন্ধ দোকান, জলে-ভেজা রাস্তা, জিলীপির গন্ধের মতো কাবেরীও ছিলো সকালবেলার মাতাল করা অন্ধ-আনন্দ। কাবেরীর একটা হাঁটু ছুঁয়ে যাওয়া লম্বা সাদা ফ্রক আর চোখে গোল কালো ফ্রেমের চশমা, একমাত্র নিজস্ব ছিল। কাবেরীকে এই অলংকারে দেখতে দেখতে তুহিনের চোখ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। তুহিনের সেদিন মনে হোত কাবরী কোন এক হাসপাতালের নার্স, যার জন্যে সারাদিনে কয়েক হাজার রুগী ওষুধের অপেক্ষা করে। তাদের অনেকেরই জন্মমৃত্যু নির্ভর করে এই সতেরো বছরের মেয়ে কাবেরী মিত্র ওপর। তুহিন ভাবত, আমার একটা খুব বড়ো অসুখ করুক, কাবেরী আমার নার্স হয়ে সারাদিন সেবা করবে। হাসপাতালের প্রকাণ্ড একটা আস্তাবল বড়ো হলের মধ্যে আমি শুয়ে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে সবার আগে কাবেরীর মুখ দেখবো। নিজস্ব অতি ব্যক্তিগত চোখে। ও আমাকে যখন ওষুধ খাওয়াতে আসবে আমি দুষ্টুমি করবো। তুহিনের মনে হোত, আমার যদি এরকম একটা সারাজীবন ধরে জি টি রোডের মতো দীর্ঘ অসুখ করে—তাহলে কাবেরী মৃত্যু অব্দি আমার সেবা করবে। কোন লোড-সেডিংয়ের সন্ধ্যায়, ইনজেকশন দিতে এসে ওর দুধ-হাত আমার শরীর ছুঁয়ে যাবে। ওতে আমার যতোই কষ্ট হোক, আমি অনেক অনেক ইনজেকশন নেবো। কাবেরী আমায় ছেড়ে তাহলে কোথাও যাবে না। একটা দীর্ঘ অসুখ হোক আমার।

আবেগ সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মলয়কে একদিন এভাবেই গল্প করতে করতে তুহিন জানিয়ে ফেললো তার শৈশব-স্মৃতি।

মলয় আবেগের লংপ্লেয়িংটা শেষ হবার পর, একটা গম্ভীরভাবে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো--তুই কাবেরীর সঙ্গে পরিচয় করবি?

—কবে?

—আমি তোর সব কথা বলবো।

—কি হবে বলে?

—দেখনা কতোদূর এগোয়।

তুহিন জানে না এগিয়ে কি হয়। একদিন এভাবেই এগিয়ে ছিলো অনিন্দতার দিকে। তুহিন আজ বোঝে বেশীদূর এগোলে মানুষকে এক জায়গায় থামতেই হয়। সেই থামাটা কেমন এবং কোথায় হবে তা অবশ্য ওর জানা নেই। তুহিন বিশ্বাস করে, যাকে ভালো লাগে তার কাছে কোনদিন যেতে নেই। অন্তরঙ্গতা মানুষের ভেতরকার নগ্নতা প্রকাশ করে। সেদিন তো আর সেই ভালোবাসা তেমন ভালো লাগে না। একদিন যদি এভাবেই কাবেরীকে ওর ভালো না লাগে? তুহিনের মন যদি ছুটি চায়? তুহিন সেদিন কি করে জানাবে অপ্রিয় অনীহার কথা। কাবেরী সেদিন কষ্ট পাবে। তুহিনের কি অধিকার আছে, একটা ফুটফুটে স্বপ্নের বালিকার মনে, ইচ্ছে করে অসুখ ডেকে আনার?

দুই

পৃথিবীতে সবাই সুখে থাকুক—মলয়ের ইচ্ছে। আজকের দিনে যখন খুশী মনের মতো খেয়ে বাঁচতে পারে না মানুষ। তার ওপর মানুষ যদি একটু মানসিক সুখ না পায়—তবে কেমন করে বাঁচবে? পেট ভর্তি খিদে আছে। শিক্ষা পেলে মাঠফাটা রোদে বেকার ভাতার জন্যে লাইন দিতে হয়। 'মৃত্যু' দিনের দিন মানুষদের কাছে উজ্জ্বল একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এসব জেনেও, মানুষের মুখে যেন সবসময় হাসি থাকে। সবাই যে যার মতো 'জীবন করুক'।

তুহিনের সঙ্গে একটা মেয়ের পাঁচ বছর ধরে সম্পর্ক ছিল। মেয়েটির নাম অনিন্দিতা। সেই কোন ছোট্ট বেলা থেকে খেলাধুলাটির

সম্পর্ক। পড়শীরা জানত, বিয়ে হবে ওদের। তুহিন অনিন্দিতাকে নিয়ে হাসতে হাসতে ছয়টাকা ঘন্টার নৌকায় হারিয়ে যেতো। পৃথিবীর সব চেয়ে শক্তিমান জ্যোতি ওদের খুঁজে পেতো না। সকল নগর কাঁপানো সমস্যা ওদের কাছে হয়ে উঠত অর্থহীন। কাগজের প্রথম পাতার আটচল্লিশ পয়েন্টের মরিচঝাপি সমস্যা বিচলিত কোরত না। ওরা জানত না, আসলে সত্যিকারের সমস্যাটা কোথায় লুকিয়ে আছে। একদিন পথ আলাদা হোল। ভেঙ্গে গেল নদীর পাড় আর সেই খেলাঘরবাটির সম্পর্ক। সব ভেঙ্গে গেল। স্বপ্ন লজ্জা পেলো।

আজ তুহিন কি করে বাঁচবে? একজন নারীই পারে অপরের শূন্যস্থান পূরণ করতে। সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়ে নতুন করে তুহিনকে স্বপ্ন দেখা শেখাতে। মলয় সেই কারণেই চায় তুহিনের সঙ্গে কাবেরীর পরিচয় হোক। দুজনে উভয়কে জানুক। অবশেষে কাবেরী হাজরা রোডের ডাক্তারখানা ফেরত, তুহিনের হাত ধরে লেকের অন্ধকারে অতি ঘনিষ্ঠভাবে বসে বাইচ বওয়া দেখুক। তুহিন সেদিন কাবেরীকে অনেক কবিতা শোনাবে। কাবেরীর মায়াবী চোখ বিস্ময়ে তুহিনের ভেতরের মানুষটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকবে। আজ তুহিনের জীবনে কাবেরীর আসায় বড়ো প্রয়োজন। নয়তো কিভাবে অনিন্দিতার পুরোনো উপহার দেওয়া অবহেলা তুহিন ফিরিয়ে দেবে? তুহিনকে কাবেরীর কাছে যেতে হবেই।

কাবেরীও কয়েক বছর মায়ের আদর থেকে অনেক দূরে। পৃথিবীর সব কিছু স্বাভাবিক আনন্দ ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মায়ের মৃত্যুর পর, বাবা একটু অন্যরকম। ভাই মামাতো বোনকে বিয়ে করে বাড়ীর বাইরে। গভর্নমেন্ট কোয়াটারে বাসা বদল করে, এখন ছোট্ট সাজানো সংসার। এম-এ পাশ একমাত্র দিদি দীর্ঘদিন অসুখে শয্যাশায়ী। কাবেরীর এই নিঃসঙ্গ একলা জীবনে একজন পুরুষের আসা, আজ বড়ো প্রয়োজন। যার কাছে বসে কিছু সময়ের জন্যে সকল একঘেয়েমি ভুলে যেতে পারে। এই দগ্ধ অনুভূতি ভোলার জন্যে কাবেরীকে পায়রা পুষতে হয়। লালন করতে হয় নিজস্ব সন্ততির মতো ঠিক সময় খেতে দিয়ে পায়রাগুলোকে। তাদের সাদা-বাচ্চাকে অতি যত্নে বড়ো করতে হয়। কাবেরীর আজ এই নিঃসঙ্গ জীবনে যদি আজ পায়রার পরিবর্তে তুহিন আসে তাহলে তুহিনও সেই পায়রাদের মতো অতি যত্নে বড়ো হয়ে উঠবে কাবেরীর ছায়াঘেরা আশ্রয়ে। কাবেরীও দুপুরের ক্ষণিক নিঃসঙ্গতা অনেক কমে যাবে। মানসিক সুখ ওকে হয়তো জীবনের নতুন পথ দেখাবে। সেইজন্য কাবেরীকে তুহিনের কাছে নিয়ে যেতেই হবে।

তিন

তুহিনের এখন ইচ্ছে কাবেরীর চোখের ওপর চোখ রেখে দীর্ঘসময় ধরে বসে থাকতে। কাবেরী [illegible] নদীর গল্প শোনাবে, [illegible] কোথায়

ছিল। কখনো বা কথার মাঝখানে কাবেরী এনে দেবে সাদা পাথরকাটা কাপে গরম চা। বলবে তার অসুস্থ দিদির কথা কিম্বা সেতার শেখার আসল ইচ্ছাটা। বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে করতে কাবেরীকে তুহিন সুযোগ মতো বেশ কয়েকটা তার লেখা কবিতা শুনিয়ে দেবে। এই সন্ধ্যায়, অতি বড়ো মুগ্ধতায়, কাবেরীর বিস্ফারিত চোখ দিয়ে নেমে আসবে সম্মতির হাসি। তুহিন বলবে, 'তুমি চোখ থেকে চশমা খোল, আমরা দুজনে অন্তরঙ্গ হই।'

মলয় বললো—তোর কথা কাবেরীকে বলেছি।

—ও কি বললো?

—তোকে একদিন নিয়ে যেতে বলেছে।

—কেন?

—পরিচয় করবে।

—তাতে হয়েছে কি? আমার সঙ্গে তো কতো মেয়ের পরিচয় আছে।

– প্রথমে পরিচয়টাই...।

—তারপর?

—সেটা তখন দেখা যাবে।

তুহিনের মনে হতে লাগলো, আমি কি করে কাবেরীকে বলবো তাকে আমার ছোট থেকে ভালো লাগে কিম্বা মনে মনে ভালোবাসি? আসলে সবকিছু মুখে বলা যায় না। বললে, কেমন অনেক গভীর কথা অগভীর শোনায়। তাহলে তুহিন কিভাবে জানাবে? আজন্মকাল ধরে এই ভাষার কাছে মানুষকে ঋণী হতে হচ্ছে। ভাষাকে আজও মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। অবশ্য তুহিনের একটা নিজস্ব ভাষা আছে, সে ভাষার কথা হয়তো কাবেরী বুঝবে না। তুহিনের তবু ভয় করে। কোথায় যেন একটা সংকোচ জাগে। কাবেরী যখন ছাদের ওপর তার কাঁধ অব্দি চুল খুলে পায়চারি করে তুহিন দূর থেকে চুরি করে দেখে। তুহিনের মনে হয় এভাবে হয়তো ওকে সারাজীবন কাবেরীকে চুরি করে দেখতে হবে।

মিত্তিরদের পরিবারে কাবেরী ছোট মেয়ে। মায়ের আদর থেকে বছর কয়েক বঞ্চিত। এরকম হওয়ার কোন কথা ছিল না, তবু মা বছর কয়েক আগে গত হয়েছেন। কাবেরীর বাবা সেই থেকেই স্ত্রী-বিরহে কাতর। একমাত্র ভাই ভাস্কর ছোট থেকেই স্বাধীনচেতা। এই স্বাধীনতা ওকে এনে দিয়েছে, দূরে সম্পর্কের এক বোনকে বিয়ে করার স্বাধীন অধিকার। এই কারণেই ভাস্কর আজ বাড়ী থেকে দূরে। কাবেরীর দিদি অপর্ণা অসুস্থ। বিছানায় দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী। একনজরে দেখলে বোঝা যায়, নিশ্চলভাবে কোন একটা ব্রত পালন করে যাচ্ছে। কাবেরীকে সেই কারণেই দিদিকে দেখাশোনা করতে হয়। কাবেরী আজ নার্স হয়েছে, সারাদিন সেবা করে। হাসপাতালে তুহিনকে নয়, একমাত্র অসুস্থ দিদিকে। দিদির রাতে ঘুম না আসা অব্দি। কাবেরীকে মশার কামড়ে অপেক্ষা করতে হয়। দিদির ঘুমের জন্য—সে যতো রাতই হোক। সেজন্য বই পড়াই কাবেরীর একমাত্র বন্ধু হয়ে উঠেছে। কাবেরীর চোখে মুখে কিন্তু এর জন্যে কোন অভিযোগ নেই। কাবেরীর চোখের দিকে দীর্ঘসময় ধরে তাকালে বোঝা যায়, আগামী যুদ্ধের জন্যে ওর ভেতরের ঘোড়াটা একটু নিঃশ্বাস নিচ্ছে। স্থির করছে নিজস্ব বাতাস কোথায় আছে। তুহিনের মনে হয়, কাবেরীর চোখের মধ্যে অদ্ভুত একটা ছায়াময় গভীরতা আছে। যেন গ্রীষ্মের খাঁ খাঁ উত্তপ্ত মরুভূমির ওপর এক-চিলতে মরুদ্যান। পথিক হাঁটতে হাঁটতে কিছু সময়ের জন্যে যেখানে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নিতে পারে। যে চোখের দিকে তাকিয়ে প্রতারণাবিহীন মনে তুহিন জীবনের সকল অবহেলা ভুলে যেতে পারে। নতুন করে স্বপ্ন দেখতে পারে। নতুন করে বাঁচার মতো পবিত্র নিঃশ্বাস নিতে পারে। যে নিঃশ্বাসে আর কোনদিন ব্যর্থতা আসবে না। কাবেরী আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতো জীবনকে ডিগ্রী, অর্থ এবং স্বচ্ছলতার মাপকাঠিতে শুধুই বিচার করবে না। বোঝার চেষ্টা করবে তুহিনকে। সারা জীবন ধরে তুহিনের ভেতরের ক্লান্ত ঘুমিয়ে পড়া মানুষটাকে আস্তে আস্তে আবিষ্কার করবে। কাবেরী স্বপ্ন দেখবে আগামী কোন যুদ্ধের। শীতের কোন এক সুখকর গভীর রাতে, কাবেরী তুহিনের হাত ধরে এগিয়ে যাবে, অপর হাতে রাইফেল নিয়ে—আগামী যুদ্ধের দিকে। কাবেরীর ভেতরের ঘোড়াটা সেদিন আর শুধু নিঃশ্বাস নেবে না। সকল অবহেলার বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবে। আর তুহিন হবে সেই ঘোড়ার চালক। লাগাম থাকবে তুহিনের হাতে। কখন ছাড়তে হবে তুহিনই জানবে। এইভাবে গভীর অন্ধকার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে ওরা একদিন

হারিয়ে যাবে। অথবা ক্লান্ত ঘোড়া যেমন দৌড় করে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে পৌঁছে দেবে, ভুবিতের শোকসংবাদ। তারপর আবার ঘোড়া নিশ্বাস নেবে আগামী কোন যুদ্ধের জন্য। পরাজয় কাকে বলে জানবে না। জানবে প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে জয় আসে। সফলতা সবকিছুর মাপকাঠি নয়।

চার

আর বেশী দিন ব্যাপারটাকে ফেলে রাখা উচিত হবে না, কাবেরীকে সব খুলে বলতে হবে—এই ভেবে মলয় কাবেরীদের বাড়ীর দিকে চাঁদ্ পথ ধরে হাঁটা শুরু করল। কলিং-বেল টেপার আগেই, কাবেরী মলয়কে দোতলার রাস্তার দিকের বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি নীচে এসে দরজা খুলে দিল।

—কি খবর মলয়ভাই হঠাৎ এই দৌড়-ঝাঁপ করে?

—আপনাকে একটা কথা জানাতে এলাম।

—শুরু করো।

—একটা কথা শুনলাম আপনার সম্বন্ধে। ব্যাপারটা সত্যতা জানার জন্য আসা।

—কি শুনেছ বলো না।

—না, লোকে বলছে।

—কি বলছে?

—আপনাকে দিদি বলি, আপনি যদি রাগ করেন।

—আমি রাগ করবো না, তুমি বলো।

তুহিনের সঙ্গে আপনার নাকি।

—কি? শেষ অব্দি বলো।

—মানে লোকে বলছে: আমি কিছু জানি না। আপনি যদি রাগ...।

—না আমি রাগ কোরব না। তাহলে তো আগেই রাগ করতাম। লোকে কি বলছে?

—মানে ইয়ে। মানে প্রে-ম-ম-ম আছে।

—এসব তুমি কি বলছো মলয়?

—হ্যাঁ আমি তাই শুনলাম।

—তুমি কি ঐজন্যেই তুহিনকে পরিচয় করাতে এনেছিলে?

—না তা নয়। তুহিন আপনার কথা রোজ বলতো তাই।

—আমি সেদিনই ওর চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যই তুহিনকে সহজ করে নিতে গিয়েছিলাম। তুহিন কিন্তু সহজ হতে পারলো না।

—কেন আপনার আপত্তি আছে?

—তুমি তো জানো আমি এ ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস।

—তাতে কি হয়েছে? তুহিন আরও বেশী সিরিয়াস।

—তুমি ওর হয়ে ওকালতি করতে এসেছ? তা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

—কেন?

—তুহিনকে আমি প্রথম থেকেই অন্য চোখে দেখেছি। আর তা ছাড়া...।

—আপনার সঙ্গে কি অন্য কারুর..?

—না সেটা ঠিক নয়: আচ্ছা তুহিনের সঙ্গে তো অনিন্দিতার ছিল—ওদের রোজ এখান দিয়ে রিক্সা করে যেতে দেখতাম?

—সম্পর্কটা অনেক দিন কেটে গেছে।

—কেন?

—সেটা ঠিক জানি না। অনিন্দিতা তবে তুহিনকে শেষ চিঠিতে লিখেছিল 'আমায় আর বিরক্ত কোর না।' চিঠিটা তুহিন আমাকে পড়িয়েছে।

কাবেরী কিভাবে তুহিনকে জানাবে মনের কথাটা? মেয়েদের মন তুহিন-ই বা বুঝতে চাইবে কেন? কাবেরী সেই ছোটবেলা থেকে একটা ছেলেকে ভালোবাসে। ছেলেটা আজ যুবক হয়েছে। কাবেরী আর সেই যুবক যেন একই মাটির দুইটি গাছ—পরস্পর পাশাপাশি বেড়ে ওঠা। যুবক কাবেরীকে চড়কের বিষাদমগ্ন মেলা থেকে একটা বাচ্চা সাদা পায়রা এনে দিয়েছিল। কাবেরী সেই সুগন্ধী যুবককে কাছে না পেয়ে, তার দেওয়া পায়রাকেই যত্ন করে। পায়রাদের নিয়মমতো বাচ্চা হয়, তাদেরও কাবেরী লালন করে। এইভাবেই চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোল। সুগন্ধী যুবককে কাছে না পেয়ে, তার স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে বেঁচে থাকা।

কাবেরী কিন্তু কোনদিন তার মনের কথা যুবককে বলতে পারে না। সে এতোই এসব ব্যাপারে উদাসীন—ভালোবাসার কথা শুনলে হেসেই উড়িয়ে দেবে। তাছাড়া যুবক কাবেরীর থেকে বয়সে অনেক ছোট—দিদি ডাকে। সমাজের চোখে যুবক সব দিক দিয়েই স্বামী হওয়ার অযোগ্য। কাবেরীর তবু ঐ যুবককে ছাড়া, অন্য কাউকে মন থেকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তুহিনকে তো কখনই নয়। এক যদি তুহিন ভালো-বাসা দিয়ে হার মানায়, বাধ্য করে—সে অন্য কথা। দীর্ঘমেয়াদী, অনিশ্চিত ব্যাপার সেটা। অনিন্দিতার সঙ্গে তুহিনের সম্পর্কের কথা এ শহরে কে না জানে? সেই সমুদ্র-সমান গভীর সম্পর্কের মধ্যেও যদি একটা দূরত্বের প্রাচীর উঠতে পারে, তাহলে কে না বলতে পারে—কাবেরী তুহিনের মধ্যেও একদিন এই প্রাচীর উঠবে না? না, তুহিনকে কাবেরীর পক্ষে কখনোই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অনিন্দিতা হয়তো দূরে থেকে আজও তুহিনকে ভালোবাসে। সে কষ্ট পেতে পারে। একজন মেয়ে হয়ে অপর মেয়ের সর্বনাশ করা ঠিক হবে না। ব্যাপারটাই চরম অমান-বিক। তুহিনকে সহজ করে দিতে হবে। নয়তো একটা বলিষ্ঠ ছ'ফুটের যুবক দুঃখের চাপে বেঁকে যাবে—তা হতে পারে না। তুহিনের আর্যপ্রতিম চেহারা দেখলেই বোঝা যায়—হৃদয় কতো বড়ো। তুহিন নিশ্চয় বুঝবে।

পাঁচ

তুহিনের মনে পড়ে কিভাবে শুরু হয়েছিল পথ। সেই পথ দিগন্তের দিকে চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে। পথ নয়, অরণ্যের জটিল অন্ধকার তুহিনকে হাতছানি দিয়েছে। কিছুটা পথ অনিন্দিতার সঙ্গে এক-সঙ্গে হেঁটেছিল তুহিন, বাকিটা সে একা হেঁটে যাবে। আজ জীবনের দুঃখ আনন্দ তুহিনকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। জীবন তুহিন-এর মতো বিকলাঙ্গকে চায় না। তুহিন জেনে গেছে, সে কিছুই পারে না। সুতরাং এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখে তার কোন অধিকার থাকতে পারে না। অযোগ্য বলেই কোন কিছুর প্রত্যাশা করতে পারে না। হয়তো অনিন্দিতাকে ভালোবাসতে পারেনি তেমন-ভাবে। যাতে তার ভালোবাসা পেতে পারে সারাজীবন। মানুষদের প্রতি অনেক দুঃখ, ক্লান্তি অসুখ ছুঁড়ে দিয়েছে—মুঠো মুঠো সুখ দিতে পারেনি। মানুষদের হৃদয় তুহিন ছুঁতে পারেনি।

না, কাবেরীর কোন দোষ নেই। কাবেরীকে দেবার মতো আসলে তুহিনের কোন ঐশ্বর্য নেই। কাবেরীর জন্যে দহন এবং আত্মসমর্পণ তুহিনকে কষ্ট দেয়। প্রাচীন গ্রীক যোদ্ধাদের মতো উচ্চতা আর্য-প্রতিম লম্বাটে মুখ, খাড়া নাক, পুরুষ কপালে ঝুঁকে পড়া চুল আর দীর্ঘ হাত-পা —কাবেরীকে ভালোবাসার জন্যে দিনের দিন অসুস্থ, ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। তুহিন নিজেই বুঝতে পারে, সে ক্রমশ খোঁড়া, কানা আর কালা হয়ে যাচ্ছে। এখন নয়, অনেকদিন আগেই বোবা হয়ে গেছে। অপমানে। তুহিনের চারপাশের মানুষেরা আত্ম-বিশ্বাসে সটান খাড়া, প্রেমিক হিসাবে দুরন্ত ডাকাত—তুহিন তাদের কাছে কতো অক্ষম। কোন রমণীর মনের কাছে তুহিন জ্বালাতে পারে না শুদ্ধ পবিত্র সন্ধ্যাদীপ। অন্যদের সঙ্গে তুলনা করে সে খুব লজ্জা পায়।

তুহিনের মনে হতে থাকে, এ পৃথিবী কতো বড়ো। এখানে কতো জাতের মানুষ বসবাস করে। কত ধরনের গাছ, খাদ্য, পোশাক, সঙ্গীত। এইসব মানুষদের ব্যক্তি-গত জমি, চাকরী, নিদেন পক্ষে একটা মেয়ে-মানুষও আছে। যে যার সময় মতো নারীর সঙ্গে সহবাস করে—সুখ-দুঃখের গল্প বলে। এরা সব জায়গা থেকে অবহেলা পেলে এক জায়গায় গিয়ে আশ্রয় পায়। তুহিনের সেসব কিছুই নেই। প্রকৃত অর্থে মানুষের নিজস্ব বলতে যা যা থাকা উচিত। তুহিন যেখানে পা দিতে যায়, অনেক আগেই সেই জায়গাটা দখল হয়ে গেছে। তুহিন দেখে, এইসব সভ্য মানুষেরা কেউ একটুকরো জমি ছাড়ে না—এতটুকু ভালোবাসা। মনের উষ্ণতা। সবাই যে যার নিয়ে ব্যস্ত। নিজেদের টুকু ঠিকঠাক বোঝে। কত বড়ো কর্মব্যস্ত হাওড়ার ব্রীজ, ধর্মতলা জংশন, শিয়ালদা মোড়। এখানে কতো মানুষেরা প্রতিদিন আসে যায়—রাত্রি হলে পশরা গোছায়। এই শহরে কেই বা তুহিনের খবর রাখবে? তুহিন ঘুরে বেড়ায় একটুকু মাটির জন্যে। জমির জন্যে। ভালোবাসার জন্যে। তুহিনের ডাকে কেউ সাড়া দেয় না। মাঠের পর মাঠ দখল। কোথাও এতটুকু ধ্বজা রাখার জায়গা নেই।

তুহিন কোথায় পা ফেলবে?

বিদেশিনী

তাঁর ডাক নাম ছিল 'সাফিয়ে', অর্থাৎ 'গৌরাঙ্গী' আসল নাম 'বাফো', ১৩ বছর বয়সে তুর্কি সুলতান তৃতীয় মুরাদের হারেমে ঐ বিদেশিনী যখন প্রথম পা দিলেন তখনই তাঁকে বলা যায় ডাক সাইটে সুন্দরী, তন্বী, দীর্ঘাঙ্গী, ঐ কিশোরী বাফোকে দেখে হারেমের আরমেনীয় ও সিরকাসীয় রূপসীরা প্রমাদ গুনলেন ঐ মেয়ে নির্ঘাৎ রমণী সঙ্গ লোলুপ সুলতানকে বশ করে ফেলবে হয়ে উঠবে দ্বিতীয় রোক্সেলানা, 'মহানুভব' প্রথম সুলেমানের সেই বিদেশিনী সম্রাজ্ঞীর মত এই মেয়েও রাজমাতা সেলিম পত্নী নূর বানুর তাঁবে থাকবে না। বাস্তবে ঘটলোও সেই ব্যাপার, বাফোকে দেখেই মজলেন তরুণ সুলতান, প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেলেন। অজস্র রক্ষিতা, ক্রীতদাসীর সঙ্গ এখন তাঁর আর ভালো লাগলো না। মা নূরবানুর নজর এড়িয়ে শুরু হল গোপন অভিসার। অবশেষে সেই বিদেশিনীর গর্ভে এলো সুলতানের প্রথম বংশধর—মোহম্মদ। প্রথম রাউন্ডে হার মানতে হল ক্ষমতা-প্রিয়া রাজমাতাকে। ভিন জাতের কটা চামড়ার বাফো এবার হারেমের নিয়মে সুলতানার মর্যাদা পাবেন। তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট হবে বাগিচা—সরোবর সাঁতার পুকুরে সাজানো আলাদা মহল, সেরালিয়' বা প্রাসাদ-নগরীতে তিনি হয়ে উঠবেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালিনী নারী।

অথচ আদিতে বাফো ছিলেন অজ্ঞাত-কুলশীলা, অবশ্য নিজে বলতেন ভেনিসের সুখ্যাত বাফো পরিবারে তাঁর জন্ম। ভাই-এর সঙ্গে জাহাজে করে একবার যাচ্ছিলেন প্রমোদ ভ্রমণে। তখনই আচমকা তাঁদের জাহাজে চড়াও হয় একদল তুর্কি জলদস্যু। রক্তের বন্যা বইলো ডেকের ওপর, মারা পড়লেন তাঁর ভাই ও স্বজনেরা। দস্যু সর্দার যে নিজেকে তুর্কি নৌবাহিনীর সেনাপতি হিসাবে জাহির করতো। বাফোকে ধরে নিয়ে হাজির করলো কনস-ভান্তিনোপল বন্দরে। সেখানে হারেমের আড়কাঠির কাছে চড়া দরে বিক্রী করা হল তাঁকে। অবহেলা, অবজ্ঞায় আর পাঁচটি ক্রীতদাসীর সঙ্গে ভ্যাপসা কুঠুরিতে, চাটাইয়ে শুয়ে কাটলো কয়েক দিন। তারপর দৈবক্রমে গোসলখানায় যাওয়ার পথে তাঁর ওপর চোখ পড়ে গেল সুলতানের। এর-পরের ঘটনা তো সকলেরই জানা। দাসী বাফো হয়ে উঠলেন সুলতানা সাফিয়ে। ইতিহাসের এক কুহকিনী, নির্মম, ক্ষমতা প্রিয়া সম্রাজ্ঞী ও শেষে কর্তৃত্বময়ী রাজমাতা।

অবশ্য নিন্দুকে বলতো বাফোর ঐ জলদস্যুর গল্প সম্পূর্ণ বানানো ব্যাপার। আসলে তিনি ছিলেন ইটালীয় গুপ্তচর। তুর্কি সুলতানকে মজাবার জন্যে ভেনিসের ধনী সওদাগরেরা নিয়োগ করেছিলেন তাঁকে। পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হারেমের ভেতর। কনসতান্তিনোপলে তথা সুবিশাল ওসমানলি সাম্রাজ্যে ইটালীয় বণিকদের স্বার্থ দেখা এবং সুলতানকে বশীভূত রেখে ভেনিস আক্রমণের ব্যাপারে নিরুৎসাহ করাই ছিল বাফোর আসল কাজ।

ইউরোপের সবাই তখন ডরাতেন সমর-প্রিয় ওসমানলি সুলতানদের। তাঁদের বিক্রমে তখন গোটা খৃষ্টান দুনিয়া কম্পমান!

যদিও ইংলণ্ডে তখনও চলছে ভার্জিন রাণী এলিজাবেথের আমল। ভারতের সিংহাসনে তখন বাদশাহ আকবর। ওসমানলি সম্রাটদের চাঁদ তারা চিহ্নিত লাল নিশান সে সময় উড়ছিল গোটা এশিয়া মাইনরে, গ্রীসে, মিশরে, সাইপ্রাসে, ক্রীটে, হাঙ্গেরি আর বুলগেরিয়াতেও।

ঠিক তখনই তুরস্ক সাম্রাজ্যের মসনদে বসলেন বাফো সুলতানার একমাত্র পুত্র মোহম্মদ, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৯ বছর। প্রায় ছ ফিট লম্বা এক শক্তিমান যুবা, তামাটে গায়ের রং। চিবুকের নীচে শরিয়তী বিধান মেনে সামান্য নূর। দু গালে ফরাসী রুজের প্রলেপ, চোখে সুর্মা। ইতালীর চিত্রকরের আঁকা সুলতানের যে প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে তার সঙ্গে মিলিয়েই এ বিবরণ। আর ইতিহাস বলে, নির্মমতায় তিনি নাকি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন সমস্ত পূর্ববর্তী সুলতানকে।

কিন্তু সুলতান মুরাদের চেহারা ছিল পুত্রের বিপরীত। শীর্ণ, পাণ্ডুর, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া দেহ। মুখ ভর্তি কালো দাগ রুজের প্রলেপেও ঢাকা পড়তো না। স্ত্রৈণ মুরাদ বাফোর কথায় তরুণ মোহম্মদকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দূর প্রদেশে শাসন কর্তার দায়িত্ব দিয়ে। সেরালিয়'র আনাচে-কানাচে তখন ওৎ পেতে ছিল নানা ষড়যন্ত্র। বহু স্বজন হত্যার খুন লেগে ছিল রাজপুরী আর হারেমের দেওয়ালে। তাই পুত্রকে যত দূরে রাখা যায় ততই নিরাপদ। নিরাপদ সুলতানও। তাঁর আত্মজকে শিখণ্ডি বানিয়ে রাজমাতা উজির জ্যানিজারি সেনাপতি কি খোজা সর্দার 'কিসলার আগা' সম্রাটের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ করতে পারবে না।

তবু মুরাদকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না বেশি দিন। অত্যধিক নারী সঙ্গ ও নানা নেশার পরিনামে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে-ছিল, অবশেষে ১৫৯৫ সালের জানুয়ারী মাসে, এক বাদলার দিনে হঠাৎ তিনি চোখ বুজলেন। গুপ্তচর মারফৎ বাফো তখনই খবর পাঠিয়ে দিলেন মোহম্মদকে। খবর পাওয়া মাত্র তিনি সসৈন্যে জলপথে রওয়ানা দিলেন। পরদিন রাজকীয় মর্যাদায় মুরাদকে

সমাহিত করা হবে। সেদিন সকাল নটায় প্রবল বর্ষণের মধ্যে সেরালিয়'র জাহাজঘাটায় এসে ভিড়লো মোহম্মদের রণতরী। জাহাজ থেকে নেমেই তিনি প্রথমে মুক্তি দিলেন দাঁড়টানার ক্রীতদাসদের। তারপর খবর পাঠালেন আলেপ্পোতে, তাঁর চাই ৫০ হাজার হায়াসিন্থ ফুলের চারা ঐ চারা লাগানো হবে জাহাজঘাটায় ঠিক যেখানে পদার্পণ করেছেন ভাবী সুলতান। সেখান থেকে তিনি সোজা গেলেন সুলেমান ক্যামিতে (মসজিদ), তারপর রাজকীয় কবরখানায়।

সেখানে তখন জনারণ্য। উজির খোজা প্রহরী উলেমা খৃষ্টান দাসদের কঠোর ট্রেণিং দিয়ে গড়া জ্যানিজারি সেনানী আর বিভিন্ন রাজ কর্মচারীর ভিড়। সবাই সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল মোহম্মদকে। পিতার শেষকৃত্য সেরে মোহম্মদ এসে উঠলেন সেরালিয়'তে বাফোর মহলে।

রুগ্ন হওয়া সত্ত্বেও মুরাদের যৌন ক্ষমতা ছিল বিস্ময়কর। মৃত্যুকালে তিনি তাই হাজার খানেক রক্ষিতা উপপত্নী রেখে গেছেন, তাঁর সন্তানের সংখ্যা ১০৩টি অধিকাংশই অবশ্য দাসীর গর্ভজাত, বৈধ উত্তরাধিকারীর সংখ্যা ২০, তারা সবাই প্রায় নাবালক, একমাত্র ব্যতিক্রম মোহম্মদ। বাফো সুলতানার একমাত্র সন্তান। তিনি সক্ষম, সাবালক। অতএব তিনিই সর্ব-জ্যেষ্ঠ হিসেবে বসবেন সিংহাসনে।

তবু বাফোর মনে ছিল ভয়। মুরাদের সাতটি পত্নী তখনও গর্ভবতী। কুড়িটি নাবালক রাজকুমারের জননীরাও নুরবানুর দলের। যে নুরবানু ছিলেন বাফোর সবচেয়ে বড়ো শত্রু, ধর্মপ্রাণা নুরবানু বিধর্মী বিদেশিণী বাফোকে গোড়া থেকেই দুচক্ষে দেখতে পারতেন না, তাই বুদ্ধিমতী বাফো হারেমে আসার পর থেকেই নুরবানুকে সসম্ভ্রমে এড়িয়ে চলতেন। তাঁর সঙ্গে সরাসরি ঝগড়া না বাধিয়ে বাফো ধীরে ধীরে নিজের রূপ ও বুদ্ধির জৌলুষে তরুণ সুলতানের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলেন ঠিক তখনই তাঁর প্রথম সন্তান (সুলতানেরও) মোহম্মদ জন্ম নিয়েছিল। প্রথম জাতকটি পুত্র হওয়ায় শরিয়তি নিয়মে সেই হয়ে উঠলো সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী। সুলতানের একান্ত স্নেহের পাত্র। বাফোও হয়ে উঠলেন সুলতানা। তখনও কিন্তু নুরবানু হাল ছাড়েননি। হারেমের রক্ষক খোজা সর্দারের (কিসলার আগা) সঙ্গে মিলে তিনি সুলতানের ওপর বাফোর প্রভাব কমানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন নানাভাবে, যেমন প্রায় প্রতিদিনই কিসলার আগা নানা আড়কাঠির মাধ্যমে দাসবাজার থেকে রূপসী আরমেনিয়ান, সিরকাসিয়ান ক্রীতদাসীদের হারেমের জন্যে সংগ্রহ করে আনতেন। স্বয়ং রাজমাতা তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করে, যারা বাফোর থেকেও সুন্দরী তেমন দাসীদের প্রতি রাতে গোপনে তাঁর পুত্রের শয়ন কক্ষে পাঠিয়ে দিতেন, নুরবানুর ঐ উদ্যোগে বাফো সরাসরি বাধা দেননি। বুদ্ধিমতী সুলতানা বুঝেছিলেন, ওরা ইন্দ্রিয় পরবশ সুলতানের দেহের ক্ষুধা মেটালেও মনের ক্ষুধা মেটাতে পারবে না। পরামর্শ, সান্ত্বনা বা আশ্রয়ের জন্যে নানা চিন্তায় উদ্বিগ্ন সুলতানকে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই আসতে হবে। তাঁর অনুমান মিথ্যা হয়নি। নুরবানুর মৃত্যুর পর বাফো হয়ে উঠলেন হারেমের সর্বেসর্বা। তিনি সুলতানের শেষ জীবনে চক্রান্তের হাত থেকে দূরে রাখার জন্যে পুত্র মোহম্মদকেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দূর প্রদেশে। তাই পিতার মৃত্যু হওয়া মাত্র মোহম্মদ ছুটলেন সেরালিয়-এর সুলতানা মহলে, সেখানে উৎকন্ঠিত মনে অপেক্ষা করছিলেন সদ্য বিধবা সম্রাজ্ঞী। মোহম্মদ আসা মাত্র বসলো মাতা-পুত্রের গোপন পরামর্শ সভা।

সে মুহূর্তে বাফো আর মোহম্মদদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। তবে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, বাফো জানতেন শত্রু চারদিকে, সিংহাসনের সম্ভাব্য দাবিদারের সংখ্যাও কম নয়, মোহম্মদের সেই সব বৈমাত্রের ভাই-এরা এই হারেমের মধ্যেই বেড়ে উঠছে। তাছাড়া মুরাদের সাতটি পত্নী তখনও গর্ভবতী। অতএব সিংহাসনে বসার আগেই ঐ সমস্ত আপদ বিদায় করতে হবে শেষ করতে হবে সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

ইসলামী রাজধর্মেও আগে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। সুলতান দিগ্বিজয়ী প্রথম মোহম্মদ জানান মামাদ বলেছেন—প্রয়োজন বোধে, সিংহাসনের অধিকার নিরঙ্কুশ রাখতে, যে কোন সুলতান তাঁর ভাই বা স্বজনদের হত্যা করাতে পারেন। তাতে কোন দোষ হয় না। সিংহাসনে বসার পর মহানুভব সুলতান প্রথম সুলেমানও নিজের নিরাপত্তার কারণে তাঁর বড়ছেলে ও একদা বিশেষ প্রিয় উজিরকে গোপনে হত্যা করাতে দ্বিধা করেননি। মোহম্মদের পূর্ববর্তী ১২ জন ওসমানলি সুলতানও সিংহাসনে আরোহণের পর ভ্রাতৃহত্যার বা স্বজন হত্যায় কুন্ঠা বোধ করেছেন বলে শোনা যায় না।

তাই দীর্ঘ শলা-পরামর্শের পর মনঃস্থির করে ফেললেন বাফো ও মোহম্মদ। ঠিক হল, সেই রাতেই সব কাজ শেষ করতে হবে। তখনই বাফো গোপনে তলব করলেন বেতনভুক ঘাতকদের। ওরা সবাই বোবা আর কালা। রাজকীয় গুপ্তহত্যার ব্যাপারে ওরা বিশেষ নির্ভরযোগ্য। ওদের হত্যার অস্ত্রটিও অদ্ভুত কয়েক হাত লম্বা রেশমের এক রশি যার ডাক নাম—ছিলা। ঐ ছিলার ফাঁসেই সে সময় হত্যা করা হত রাজবংশীয়দের।

ঠিক হল, ঐ ঘাতকেরা লুকিয়ে থাকবে সুরম্য ঘরের পার্শ্ববর্তী একটি গোপন কক্ষে। নির্দেশ পাওয়া মাত্র তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের ওপর।

এরপর খবর পাঠানো হল হারেমে। নতুন সুলতান ভাইদের একবার দেখতে চান, আজ রাতে তাই তারা সবাই এসে তাঁর হস্ত চুম্বন করে আনুগত্য জানিয়ে যাক।

মুরাদের অন্যান্য সুলতানা ও রক্ষিতারা নতুন সুলতান তৃতীয় মোহম্মদের ঐ নির্দেশ শুনে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক, নতুন সুলতান নাবালক ভাইদের আনুগত্য লাভ করেই খুশি, তাদের নিশ্চয়ই তিনি কোন অনিষ্ট করবেন না।

তাই ফুটফুটে রাজপুত্রদের ভালো করে সাজাতে বসলেন জননীরা। মোহম্মদের সেই ১৯টি ভাই-এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টির বয়স তখন মাত্র ১১ বছর। সর্বকনিষ্ঠের ৩। সন্ধ্যে হতেই তারা সেজেগুজে একে একে হাজির হল 'থ্রোন রুম' বা সিংহাসনের ঘরে, সেখানে রাজবেশ পরে হাজির ছিলেন সুলতান তৃতীয় মোহম্মদ।

ভাই-এরা কাছে আসতেই সুলতান একে একে তাদের কাছে টেনে নিলেন, তারা মাথা নীচু করে, হাঁটু ভেঙে অভিবাদন জানালো মোহম্মদকে, তারপর তাঁর হস্ত চুম্বন করে পিছু হটে গেল একে একে। ঠিক তখনই বলে উঠলেন মোহম্মদ,—'আমার প্রিয় ছোট ভাই এরা, তোমরা কেউ ভয় পেও না, এখানে

কেউ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তবে কাল দিভানে (দরবারে) বসার আগে আমি দেখতে চাই তোমরা সবাই সুন্নতের মাধ্যমে খাঁটি মুসলমান হয়ে উঠেছো। তাই এই রাতেই আমি তোমাদের সুন্নতের সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এখন তোমরা খোজা দেহরক্ষীর সঙ্গে একে একে সুন্নতের ঘরে যাও, সেখান থেকে হারেমে ফিরে যাবে।'

এই কথা বলে তালি বাজালেন সুলতান। হারেম থেকে আসা রাজকুমারের অনুচরেরা দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে. খোজা প্রহরীরা সম্রাটের ইঙ্গিতে তাদের সরিয়ে দিল তখনই। তারপর দুজন খোজা রক্ষী সবচেয়ে বড় ছেলেটিকে নিয়ে গেল পেছনের সুন্নৎ ঘরে। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন রাজবাড়ির মোল্লা শল্য চিকিৎসক। তাঁর কাজ শেষ হতে এক মিনিটও লাগলো না। কাজ সেরে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে—চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বালকের ওপর পেছনের দরজা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তিনজন ঘাতক।

একজন চেপে ধরলো তার হতভম্ব মুখ। অন্যজন জাপটে ধরলো হাত। তৃতীয় ফাঁস-ডুরিটি গলায় পরিয়ে দিল সিল্কের ফিতা। কয়েক লহমায় সব শেষ। প্রাণহীন বালকের দেহটি কাঁধে তুলে নিয়ে ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘাতকেরা।

এদিকে সুলতানের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি রাজপুত্রেরা কিন্তু কিছুই টের পেল না। খোজা রক্ষীরা তাদের একে একে নিয়ে যেতে থাকলো সুন্নতের ঘরে। প্রথম রাজকুমারের মত মোল্লা শল্য-চিকিৎসক তাদের সবাইকে যথাবিহিত দীক্ষা দিলেন। এবং সুন্নতের পরেই তাদের প্রত্যেকের ভাগ্যে ঘটলো সেই একই ব্যাপার। দেখতে দেখতে গুপ্ত মন্ত্রণা ঘরের মেঝে অনেকগুলি বালকের শবদেহে ভরে উঠলো। সবশেষে প্রাণ দিলেন হতভাগ্য সাক্ষী শল্য-চিকিৎসক। শাস্ত্রে আছে—শত্রুর শেষ রাখতে নেই!

মধ্যরাত্রে সবকিছু দেখতে এলেন সুলতান মোহম্মদ। দেখে খুশি হলেন। মোহরের কিনটে তোড়া ছুঁড়ে দিলেন মূক আততায়ীদের দিকে। তারা সেলাম জানিয়ে মিশে গেল অন্ধকারে।

এবার খবর দিতে হয় প্রবীণ উজির উলেমারদের। কালো কাগজে সাদা কালীতে লেখা হবে সেই রাজকীয় শোকবার্তা। হারেমেও খবর দেওয়া দরকার।

কিন্তু গোপন পথে সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা আগেই পৌঁছে গিয়েছিল হতভাগিনী জননীদের কাছে। কিন্তু তারা কেউ কাঁদতে পারেনি। কারণ সুলতানের প্রমোদভূমিতে যে ক্রন্দন নিষিদ্ধ। সেখানে কাঁদলে গর্দান যায়। প্রাণ ভয়ে মুখ বুজে পড়ে রইলো মুরাদের বিধবা পত্নীরা।

পরদিন ভোরে উজির এলেন। দিভানে সবাইকে তখন তলব করা হলো। গম্ভীর, শোকার্ত সুলতান রাজ্যের সবাইকে জানিয়ে দিতে বললেন রাজকুমারদের অপঘাত মৃত্যুর কথা। সেই সঙ্গে অর্ধনমিত করা হল রাষ্ট্র-পতাকা। রাজ্যব্যাপী শোক পালন-এর নির্দেশও দিলেন সম্রাট।

বিষণ্ণ মোহম্মদ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পিতা মুরাদের কবরের পাশে ভাইদের কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। করে ফিরে এলেন সেরালিয়'তে। তারপর সোজা চলে গেলেন বাফোর মহলে।

বিমূঢ় প্রজারাও ঐ হত্যাকাণ্ডের নায়ক নতুন সুলতানকে অভিবাদন জানিয়ে ফিরে গেল জীর্ণ আস্তানায়।

কিন্তু এখনও শত্রু রয়ে গেছে। বাফো বোঝালেন, হারেমের সব বাসিন্দাকে এবার এড্রিয়ানোপল-এর পুরানো, পরিত্যক্ত হারেমে চালান করা দরকার। অজুহাতের অভাব নেই। বসন্তকাল আসছে। সেরালিয়'তে তার আগেই ঝাড়পোঁচ আর সাফাই-এর কাজ শুরু হয়ে যায়। তাই এখনই হারেম খালি করা দরকার। [illegible] দিয়ে বিদায় করো ঐ আপদগুলোকে।

পরামর্শটি সুলতানের মনে ধরলো। তিনি উজিরকে ডেকে পরদিনই কনস্ট্যান্টিনোপোলের সমস্ত গাড়ি [illegible] গাধা [illegible] মুটেকে সেরালিয়'র গাড়ি দরোজা'র সামনে জড়ো করার নির্দেশ দিলেন। হারেমেও নির্দেশ গেল মোটঘাট বেঁধে তৈরী হয়ে থাকো। হারেমের হাজার করেক বাসিন্দার বুঝলো তাদের কপাল পুড়েছে। চোখের জল মুছে তারা তোরঙ্গ গোছাতে বসলো।

পরদিন ভোর হতেই শুরু হল বিচিত্র মিছিল। বোরখা পরা নানা বয়সের রমণীদল বিষণ্ণভাবে এগিয়ে চললো তাদের নয়া-হারেমের দিকে। সারাদিন ধরে চললো তাদের পরিবহণের পালা।

শুধু সেই মিছিলে দেখতে পাওয়া গেল না মুরাদের সেই সাতজন পত্নীকে, যারা ছিল গর্ভবতী। আগের রাতেই, বাফোর নির্দেশে, খোজা প্রহরীরা তাদের সবাইকে পাথর বোঝাই থলির মধ্যে ভরে, হাত-পা বেঁধে ফেলে দিয়েছিল বসফোরাসের জলে।

সেদিন সন্ধ্যায় এড্রিয়ানোপলের হারেমে একটাও দীপ জ্বললো না। হতভাগিনী, সন্তানহারা জননীদের আর্তনাদ আর ক্রন্দনের সঙ্গে মিশে গুমরে উঠতে থাকলো সমুদ্রের লোনা বাতাস।

সেখানে ক্রন্দনের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। আর সে রাতে দুই আলাদা মহলে বিদেশিনী বাফো আর সুলতান মোহম্মদ শান্তিতে ঘুমাতে গেলেন।

গোপাল দফাদার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও মহারাণী স্বর্ণময়ী

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

মিশনারিদের দিকেই যেন প্রকৃতি অনুকূল অর্থাৎ ১৮৬৮ সালে ম্যালেরিয়া, পেটের রোগ উৎকট আকারে হাজির হল। ১৮৬৯ সালে নিজস্ব নতুন বাড়িতে কলেজ উঠে যাওয়ার পর অনেকেরই ধারণা হ'ল এবার সরকারী সাহায্য বন্ধ হবে। খরচপত্র কমানোর দিকে নজর দেওয়া হ'ল শিক্ষক কমিয়ে। ছাত্র বাড়াবার জন্য মাইনে অর্ধেক করা হ'ল কিন্তু তাতেও লাভ হল না। শেষে আবার পুরোনো দু' টাকা বহাল করে স্থির হল যারা এখানে পড়তে আসবে তারা পুরো মাইনেই দেবে অর্থাৎ বিত্তবানদের ওপরই নির্ভর করতে হবে কলেজকে। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী পরিবর্তন, প্রশ্নপত্র কঠিনতর করা প্রভৃতি নানা কারণে বহরমপুর কলেজ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ল। একদা যে-সব কারণে মুর্শিদাবাদের নিজামৎ কলেজের রইস ছাত্ররা লেখাপড়ার দিকে নজর না দিয়ে খানদানী চালে পাল্লা দিত, নতুন বিল্ডিং-এ শহরের ধনীর ছেলেরা বোধহয় সেইরকম হয়ে উঠেছিল লেখাপড়ায়। ১৮৭১ সালে যে ৮ জন বি-এ পরীক্ষা দিল তাদের কেউ পাস করল না। আর ১৯ জন এফ-এ পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৪ জন পাস করল। কিন্তু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের মত মেধাবী ছাত্র ইনি বি-এতে ফেল করবেন বা মুকুন্দ ভট্টাচার্যের মত অসাধারণ ছেলে এফ-এতে ফেল করবেন এটা অধ্যাপকরা কল্পনাই করতে পারেন নি। এদিকে বিদেশী সরকারও দিশি ছেলেদের উচ্চতর শিক্ষার পিছনে ব্যয়ের মাত্রা গুটিয়ে ফেলতে উঠেপড়ে লেগেছেন। ফলাও ভাবে প্রচার করা হল যে, নিচের দিকে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারটা জরুরি অতএব সেদিকে নজর দিতে হবে। আসলে উচ্চতর শিক্ষাখাতে ব্যয় কমানো হ'ল কিন্তু সে অনুপাতে নিচের দিকের অন্ধ-কার ঘুচোনোর বেলায় অবহেলাটা রয়েই গেল। ব্যয় সংকোচের প্রথম বলি হ'ল বহরমপুর কলেজ, বি-এ ক্লাস বন্ধ করে দেওয়া হ'ল ১৮৭২ সালে। এতে স্থানীয় অধিবাসীরা ক্ষুব্ধ হলেন। রানী স্বর্ণময়ী প্রমুখ শিক্ষানুরাগীরা সরকারের কাছে এই মর্মে দরবার করলেন যে, ইওরোপীয় অধ্যাপকদের বদলে ভারতীয়দের লেকচারার পদে আধা বেতনে নিয়োগ করলে খরচ কমবে এবং দেখা গেছে যে, শিক্ষকতায় দিশি লোকেরা সমান যোগ্যতা ও অনুরাগ সহকারেই কাজ করেন। তাঁরা বললেন, যদিও রেলগাড়ি চালু হয়েছে (সরকার যুক্তি দেখিয়েছিলেন রেলের) তার ভাড়া কম নয়, তা ছাড়া আরও অসুবিধের ফলে আগ্রহী সাধারণ গৃহস্থের ছেলেদের শিক্ষার সুযোগ যা একবার দেওয়া হয়েছিল তা কেড়ে নেওয়া না হয়।

শুধু ত মুর্শিদাবাদ নয় এই কলেজের উপর রাজশাহী, মালদহ এবং আশপাশের অন্যান্য যে সব জেলায় কলেজ নেই সেখানকার মানুষও নির্ভরশীল।— কিন্তু সরকারের ত আগে থেকেই মতলব ছিল কলেজটা একেবারে বন্ধ করার নেহাত লেফটেনান্ট গভর্নর ক্যাম্বেল আর ডি, পি, আই, রাজি ছিলেন না। অতএব অনুরোধ নিষ্ফল হ'ল, জবাব এল, সব দিক ভেবেচিন্তে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা পাল্টানো যায় না। ১৮৭২ সালে বহরমপুর দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে নেমে গেল। সেই সঙ্গে কিছু নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'ল, সরকারী চাকরিতে ঢোকার পথ তৈরির জন্য সকালে সিভিল সার্ভিস ট্রেনিং-এর ক্লাস খোলা হ'ল। এতে আইন এঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যাও শেখানো হ'ত। আর ঘোড়ায়-চড়া শেখানোর জন্য সিভিল সার্জন ডাঃ [illegible] এবং অন্য- বাহাদুর লছমিপৎ সিং ধনপাল সিং-এর বদান্যতায় পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে একজন ঘোড়সওয়ার রাখা হ'ল। অবশ্য এ ব্যবস্থাও বেশিদিন চলে নি, মাত্র পাঁচজন ছাত্রের বেতনের ওপর এত ব্যয় পোষায় না— ১৮৭৫ সালেই উঠে গেল সিভিল সার্ভিস ট্রেনিং ক্লাস। আরও গেল আইন পড়ানোর ব্যবস্থা—বি-এ ক্লাস না থাকলে কি করে আইনের ক্লাসে ছাত্র বেশি হবে!

আর একটা তামাশা হয়েছিল, একেবারে 'প্র্যাকটিক্যাল জোক' বলা যায় তাকে এই কাষ্ঠরসিকতার নায়ক ছিলেন স্যার রিচার্ড টেম্পল। বাংলার ছোটলাট হয়ে তিনি বহরমপুর পরিদর্শনে এলেন ১৮৭৪ সালে। দেশের মুরুব্বিরা সেই সময় ধরে' বসলেন, কলেজের পুরনো ইজ্জতে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। তিনি আমতা আমতা করে বললেন—'কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দেরা দেশের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্যে মোটামুটি টাকা পয়সার ব্যবস্থা না করলে ত কোনো প্রস্তাব বিবেচনা করা যায় না।'

কথাটা মনে ধরল, সবাই উৎসাহী হয়ে উঠলেন। রায় বাহাদুর লছমিপৎ একাই ৪০০০০ টাকা বহরমপুর কলেজের পুরনো মান ফেরানোর জন্য দিলেন। এই তহবিলটি প্রিন্স অব ওয়েলস-এর নামে খোলা হ'ল তাঁর ভারত দর্শন স্মরণে। লাভের মধ্যে হ'ল এই যে, ১৮৭৬ সালের সরকারী সিদ্ধান্তে বলা হ'ল, বহরমপুর কলেজে বি-এ পড়বার মত ছাত্র কোথায়? এ বছরে মাত্র ২ জন ত এফ-এ পাস করেছে। তার চেয়ে অনেক ভাল কাজ হবে ওই প্রিন্স অব ওয়েলস ভাণ্ডারের টাকাটা ডাঃ মহেন্দ্র-লাল সরকারের সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর সূচনায় ঢেলে দেওয়া।

লালবিহারী দের চিঠি

much valuable and
interesting information
but which is not
generally known.
With kind regards
Yours sincerely
Lalbehari Day

র্শিদাবাদের জন্যে সরকার টাকা ত দেবেই না উল্টে এখানকার টাকায় কলকাতার বিজ্ঞানের চর্চা! কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজ হবে সে ত খুব ভাল কথা কিন্তু আমাদের কলেজ যে তিমিরে সেই তিমিরে! তা-ই রইল। এখান থেকে চলে গেলেন লড সাহেব, তাঁর জায়গায় প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী হলেন প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ (অস্থায়ী)! উইলিয়াম হান্টার প্রসন্নকুমার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: এই অসামান্য গণিতশাস্ত্রী ইওরোপের পাটীগণিত ও বীজগণিতকে দিশি বাংলার মাটিতে সার্থকভাবে রোপন করেছেন, রূপায়িত করেছেন স্বদেশী ছাঁদে।' ১৮৮১ সালে গঙ্গাধর রাধারঞ্জন প্রায় কিছুদিনের জন্য গণিতের লেকচারার হয়ে আসেন। পাণ্ডিত্য ছাড়াও কলকাতার ক্রিকেটের আদি ইতিহাসেও উনি স্মর্তব্য হয়ে আছেন।

বর্ধমানে কলেজ খোলা হল ১৮৮১ সালে এবং সেখানে পড়তে এক পয়সাও মাইনে দিতে হয় না। রাজশাহী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ১৮৭৮ সালেই পুরনো মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম ধাক্কাটা কেবল উঠতে পারছে না বহরমপুর কলেজ! ছাত্র সংখ্যা কমছে, লোকেদের মনে নৈরাশ্য জমছে। তার ওপর ১৮৮২ সালে শিক্ষা কমিশন পরামর্শ দিলেন যে, একান্ত প্রয়োজনীয় কেবল কলেজগুলিই সরকারের হাতে রেখে বাদবাকীগুলি বেসরকারী করে দেওয়া হোক। বেসরকারী কলেজের দায়িত্ব নেবার মত শক্ত-সমর্থ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এগিয়ে এলে তবেই সে ব্যবস্থা করা হবে অন্যথায় নয়। আর যে কলেজগুলি আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক নয় অথচ দেশের শিক্ষায়ও তেমন কোনো অবদান রাখছে না সেগুলি তুলে দেওয়া হোক। বহরমপুর কলেজ এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করলেন সরকার এবং ১৮৮৫ সালে অস্থায়ী ডি. পি. আই টনি সাহেব পরামর্শ দিলেন রাজশাহী কলেজ আর কৃষ্ণনগর কলেজ যখন রয়েছে তখন সেখানেই ত ছেলেরা পড়তে পারে, বহরমপুর থেকে এমন কিছু দূরও নয় সেগুলো। আর এই কলেজের নতুন ভবনটিতে জেলা স্কুল করা যাক। মেদিনীপুর কলেজ আর বহরমপুর কলেজের আয়ু রইল ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত। তার মধ্যে যদি স্থানীয় লোকেরা টাকাপয়সা যোগাড় করে কলেজের দায়িত্ব স্থায়িভাবে নিতে পারেন ত সরকার তাঁদের হাতেই তুলে দেবেন সমস্ত ভার অবশ্য যথাসম্ভব আর্থিক অনুদান সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হবে।

কৃষ্ণনাথের স্বপ্নের বানর্জোটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন বিয়োগান্ত দুর্দশা স্বর্ণময়ী সইতে পারলেন না। ইংলণ্ডের ভারত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সরকার এদেশ শাসনের নামে নিজের দেশে ভারতের ধনসম্পদ শুষে নিয়ে যাচ্ছে, ভারতের মানুষকে নিজের দেশ শাসনের চাকরিতে যে হারে বহাল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সরকার তাও ছলে কৌশলে না-দেবার জন্যে অর্থাৎ ঠকানোর নানা চক্রান্তের মধ্যে এও একটি। মহারাণী খেতাব যদি ইংরেজ সরকার সেই পরিহাসের অন্যতম হিসেবেই স্বর্ণময়ীকে দিয়ে থাকে তার যোগ্য জবাব এই বিধবা ভদ্রমহিলা যথাস্থ উঁচু মানসিক স্তর থেকেই দিলেন। অন্য ভাবে।

স্বর্ণময়ী পাঁচ বছরের জন্য তাঁর গঠিত বোর্ড অব ট্রাস্টীর হাতে কলেজের ভার পরীক্ষামূলকভাবে তুলে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। মধ্যে জেলা শাসক, জেলা জজ, বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও মহারাণীর আইন পরামর্শদাতা বৈকুণ্ঠনাথ সেন, শ্রীনাথ পাল এবং শ্যামাদাস রায়কে নিয়ে এই বোর্ড গঠিত হওয়া চাই এবং ব্যয় সংকোচের জন্য পুরনো অধ্যাপক ও শিক্ষকদের বদলে নতুন শিক্ষক ও কর্মচারীর ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব এই বোর্ডকে দিতে হবে। সরকার কিছু কিছু শর্ত আরোপ করলেন তবে স্বর্ণময়ী তা মেনে নিলেন। স্বর্ণময়ী ছাড়াও আর একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির তরফ থেকে পাদ্রী জনসনও ছিল। তাঁদের শর্ত ছিল সরকারকে মাসে ৩০০ টাকা দিতে হবে। সে প্রস্তাব বাতিল করে সরকার স্বর্ণময়ীর প্রস্তাবেই সম্মতি দিলেন। স্বর্ণময়ী বললেন, তাঁর দেওয়া চটি বাঙ্গিয়াপুরের আয় থেকে এবং স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের বেতন থেকেই কলেজের খরচ চালানো যাবে মনে হচ্ছে অতএব সরকারের সাহায্য দরকার হবে না। অর্থাৎ সাহায্য মঞ্জুরীর কোনো শর্তই কলেজের ওপর প্রয়োগ করতে পারবেন না সরকার। বেসরকারী ও ষোল আনাই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হোক। হল যই কি—প্রথমেই অধ্যক্ষ লিভিংস্টোনের স্থলে অল্পত বিখ্যাত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে এবং স্কুলের প্রধান ও ইংরেজির অধ্যাপক শিক্ষক হিসেবে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আনা হল। পরবর্তীকালে সতীশচন্দ্র ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে তাঁর অবদান অনেক।

স্বর্ণময়ীর কথা ছিল মাসে এক হাজার টাকা দেবেন। দেখা গেল তিনি বছরে ষোল হাজার দিচ্ছেন কিন্তু স্কুল আর কলেজ ভালভাবে চালাতে গেলে বিশ হাজারের কমে বছর কাটে না। শেষে সেইমতই ব্যবস্থা করলেন।

উনিশ শতকের শেষপাদে সংকটের সময়ে স্বর্ণময়ী উদার আগ্রহী চিত্তে এগিয়ে না এলে বহরমপুর শহর ভারতের ইতিহাসে পরবর্তী কালে যে প্রগতির ভূমিকা নিয়ে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছে তা কি করে সম্ভব হত, আজকের দিনে কল্পনা করা যায় না। তাঁর দানেই বহরমপুর কলেজে আবার বি-এ এবং আইন পড়ানোর ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বেসরকারী এই কলেজের নাম বহরমপুর স্বর্ণময়ী কলেজ হোক এমনও প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা থাকে এবং যেহেতু স্বর্ণময়ীর সম্পত্তিতে জীবনাসত্ত্ব ছিল কিম্বা অন্য কোনও আইনঘটিত কারণে ওই প্রস্তাবটি ধামাচাপা পড়ে যায়। স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর মণীন্দ্রচন্দ্র মাতুলানীর দানধ্যানের যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসেবে কৃষ্ণনাথ নামের পতাকাটিই উঁচু ধরলেন। ইতিহাসের ছাত্রের যদি স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার থাকত তাহলে বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে বলত স্বর্ণময়ী নামটি চিহ্নিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঘটনা ক্ষেত্রে যা হয়েছে তাকে সত্যের মর্যাদা দিতেই হবে।

স্বর্ণময়ী পর্দানশীন ছিলেন। তাঁর দুই হাত হিসেবে যাঁরা সমাজের সর্বত্র কাজ করতেন তাঁদের একজন বৈকুণ্ঠনাথ সেন অপরজন শ্রীনাথ পাল। বৈকুণ্ঠ বহরমপুর কলেজের প্রথম যুগের ছাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পরীক্ষায় স্বর্ণ পদক পেয়ে-

ছিলেন এবং আইনের অধ্যাপক হিসেবেও বহরমপুর কলেজে কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় স্বদেশ চেতনা। ১৮৯৫ সালে পুণাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনে বৈকুন্ঠনাথ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন: 'এ সময়ে ভারতীয় রাজস্ব ব্যয় সম্পর্কে একটি পার্লামেন্টারি কমিটি বসেছিল। কমিটির আলোচ্য বিষয় যাতে ব্যাপকতর করা হয় এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হল তাই। অর্থাৎ কোন কোন খাতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তাও যেন নির্ণয় করা হয়। এ প্রস্তাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ কমিশনই ওয়েলবি কমিশন নামে পরিচিত।'...এই প্রস্তাবের প্রসঙ্গে এই সভায় মদনমোহন মালবীয়...' সিভিল সার্ভিস, পেন্সন, ভাতা, সুদ (এক কথায় হোম চার্জেস) সামরিক ব্যয় বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি কোটি কোটি ভারতবাসীর কিরূপ মৃত্যুর কারণ হয়েছে তা বিশদভাবে ব্যক্ত করেন।' (যোগেশচন্দ্র বাগল 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' ৩য় সং পৃ: ১৮৩)।। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যকে করের বোঝা চাপিয়ে টুঁটি টিপে মারার জন্য ইংরেজ সরকারের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে যে কমিটি গঠিত হয় বৈকুন্ঠনাথ তার সদস্য ছিলেন।

উনিশ শতকের বাংলা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহরমপুরের বিশিষ্ট পণ্ডিত ডঃ রামদাস সেনের অবদান সামান্য নয়। গণিত ভীতির ফলে তিনি কলেজিয়েট স্কুলের চৌকাঠ পার হয়ে কলেজে পেঁছিতে না পারলেও এণ্ট্রান্সে হোঁচট খেলেও ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃত সাহিত্য ও অন্যান্য শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। রামদাস সেনের পাঠাগারে বড় বড় পণ্ডিতেরা আসতেন। তিনি নিজেও কলেজের সেবায় খুব পরিশ্রম করতেন। ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ডকটরেট ভূষিত করেছিলেন এবং ১৮৮১ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসে যোগদানের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিন্তু যেতে পারেন বলে একটি সংস্কৃত কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ১৮৮৭ সালে কলেজের বোর্ড অব ট্রাস্টীর সদস্য হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে তাঁর গভীর হৃদ্যতা স্থাপিত হয়েছিল এবং বঙ্গদর্শন প্রকাশের ব্যাপারে রামদাসের উৎসাহও ছিল যথেষ্ট। বঙ্গদর্শনের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। রামদাসের 'ঐতিহাসিক রহস্য' (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ), বুদ্ধদর্শন এবং ভারত রহস্য বিশ্ব বিখ্যাত পণ্ডিতদের সংগে রামদাসের পত্রের আদান-প্রদান উল্লেখযোগ্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৭২ সালে রামদাসকে একখানি চিঠি লেখেন সাধারণত মাইকেল চিঠিপত্র ইংরেজিতেই লিখতেন কিন্ত এ চিঠি বাংলায়, সে কারণে (স্বর্ণ বণিক সমাচার।১১।৯

বৈকুণ্ঠনাথ সেন

সংখ্যা পৃঃ ৪৯৪-৪৯৫) পুনর্মুদ্রিত করা হল।

মহাশয়

যদ্যপিও আপনার সহিত আমার সাক্ষাদ্দর্শন নাই, তথাপি আপনার যে দেশীয় ভাষার উপর নিতান্ত অনুরাগ এবং এ লেখকের প্রতিও যে স্নেহসম্বলিত যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহ আছে, তাহা সে লোক-মুখে সর্বদাই শুনিয়া থাকে, সেই হেতুই ব্যক্তি মহাশয়কে আপনার বর্তমান দুরবস্থার এই ভরসায় জানাইতেছে, যে যদিও আপনি তাহাকে এ বিপদরূপ রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করিতে অসম্মত হন, তবুও এ আবেদনপত্র তাহার পক্ষে অবমাননার কারণ হইবেক না।

যাচঞামাথা বরমধিগুণে লাধমে লব্ধ কামা।

অদ্য দেড় বৎসর হইল, আমি নিজের এবং পরিবারদিগের শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ কাজ-কর্মে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারি নাই, সাংসারিক ব্যয় অধিক তন্নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং মহাজনেরা যতদূর পর্যন্ত হইতে পারে কষ্ট দিয়াছে এবং দিতেও ত্রুটি করিতেছে না, এমন কি ২।১ জন আমাকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টাতেও আছে। এবং কেহ কেহ আমার যা কিছু সম্পত্তি ছিল, প্রায় সকলি বিক্রয় করিয়া লইয়াছে মহাশয় যদ্যপি ঋণ রূপে ৬।৭ হাজার টাকা আমাকে পাঠাইয়া দেন। তবে যে কি পর্যন্ত বাধিত হইব, তাহা পত্র লেখা বাহুল্য ঋণ পরিশোধের প্রণালী আপনকার হস্তে হয়ত বিচারালয় সম্পর্কীয় অর্থ দ্বারা মহাশয় অতি অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন, না হয় আমিও বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু দিয়া ২।৪ বৎসরে ঐ টাকা পরিশোধ করিতে পারি আপনকার প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় যে আমি কতদূর ব্যগ্রতার সহিত পথ নিরীক্ষণ করিতে থাকিলাম। তাহা আপনি বুঝিয়া দেখিবেন ভরসা করি যে, আপনি আমার এ প্রার্থনায় বিরক্ত হইবেন না। আর মহাশয় আমার বিপদত্তারকরূপ ধারণ করিলে আরও জন হিতৈষী মহদয়ের সহকারে বিপজ্জাল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পা কিন্তু মহাশয় যদি আপনি এ জনে প্রতি সদয় হন। তবে যেন কালিদাসে মেঘদূতের কবিতাটি স্মরণ থাকে। নিশব্দোহপি প্রদিশসি জলং

যাচিতশ্চাতকেভ
৩০ জানুয়ারি ১৮৭
নিঃ শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত
(সদর দেওয়া

কিংবা

মাইকেল এম দত্ত স্কোয়ার
ব্যারিষ্টার অ্যাট-ল হাইকোর্ট
ক্যালকাটা

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অধ্যক্ষ থাকা কা (১৮৮৭-১৮৯৬) গোরাবাজারে গোপালদা মুখোপাধ্যায় একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন গোপালদাস প্রখ্যাত উকিল এবং আইনে অধ্যাপনাও করতেন কলেজে। তাছাড়া ট্রাস্ট বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বাড়িতে ভাড়া ছিলেন একদা গুরুদা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেখানেই ছিলেন গুরুদ চলে যাওয়ার পর গোপালবাবু তাঁর প বহাল হন এবং বাড়িটি কিনে নেন। তা পুত্র ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুম মুখোপাধ্যায় বাল্যস্মৃতিচারণে আচা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বহরমপুর বাসের প্র কয়েকটি ছোটখাট ঘটনা দিয়ে অপূর্ব রেখা এঁকেছেন। রোজ সকালে শীল মশ একতলার বৈঠকখানা। পড়ার ঘরে ন নামতেন তখন একগাদা খুচরো পয়সা থাক একটা থলেতে, ভিকিরিদের আর চাইতে হ না, এসে দাঁড়ালেই চলত—এতে তাঁর ক বলা। শোনার বাজে সময় নষ্ট হত না। আমলে শহরে যানবাহন বলতে ঘোড় গাড়িই ভরসা, গাড়ির ভাড়া কোচম্যান বা আনা দাবি করলে তিনি একটি টাকার ক দিতেন না—কোচম্যান ফ্যাল ফ্যাল করে এ তাজ্জব লোকটিকে দেখত। শীল মশাই-এ বদ্ধমূল ধারনা—সমাজের উঁচু কেত লোকেরা দরিদ্র, খেটেখাওয়া লোকেদে শোষণ করে, আসলে যা প্রাপ্য এই লোকে হয়ত তার চেয়ে কম। ন্যায্য পাওনা হিসে তিনি আরও কিছু দিতে চাইলে কোচম্যা বেচারা কি করত কে জানে!....রাধাকুমুদে নিজের বেলায় একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে ছিল, ইংরেজির মাস্টার মশাই ললিতমোহ চ্যাটার্জি (পরে ইনি ঢাকা ডিভিসনে শিক্ষ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন) এ বাচ্চা ছেলেটির ইংরেজি পরীক্ষার খাতা দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, শিক্ষক মহা ঘোষণা করলেন 'একে আমি পুরো নম্ব দেবো—আঁচড় কাটারও উপায় নেই এম লিখেছে!' কথাটা কলেজের প্রিন্সিপালের কানে পৌঁছলো। ললিতবাবুকে শীল মশ ডেকে পাঠিয়ে জিগ্যেস করলেন, ইংরেজি মত বিষয়ে এরকম বিচার কি করে হয় এটা খিয়ালখুশির মত উদ্ভট ঠেকছে না তারপর দু-জনে মিলে আলাপ-আলোচনা

পর ২০০ নম্বরের মধ্যে ১৮৫ দেওয়া হল। অধ্যক্ষ মশাই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ নানা কাজের মধ্যেও স্কুল, কলেজের প্রতিটি ছাত্রের লেখাপড়ার ব্যাপারে প্রয়োজন মত নজর রাখতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ যখন বি-এ অনার্স ক্লাসে ওয়ার্ডওয়ার্থ পড়াতেন তখন সারা কলেজ ও স্কুলের দেয়ালগুলো জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে অনুরণিত হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ানো চলত। ঘড়ি ঘণ্টার পরোয়া করতেন না এমনই তন্ময়তার আবিষ্ট হয়ে পড়তেন। সে আমলে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষাকে লোকে বলত লাইব্রেরি-পরীক্ষা অর্থাৎ লাইব্রেরির সমস্ত বই মগজের মধ্যে ঢুকলে তবেই পি আর এস হতেন পন্ডিতেরা। শীল মশাই একবার স্থির করলেন, তিনি পি আর এস পরীক্ষা দেবেন। কথাটা কানাকানি হতে সে বছরে আর কেউ ওদিকে ঘেঁষলেন না, 'বাবাঃ বিশ্বের জায়েন্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তলিয়ে যাই আর কি!' শেষপর্যন্ত তিনি দিলেন না পরীক্ষা। এক বছরে ওই পরীক্ষার একজনই সাম্মানিক পুরস্কার পান। পরের বছরেও একই হাল হল, শীল মশাই তোড়জোড় করছেন শুনে সেবারেও প্রতি-যোগিতায় কেউ এগোলেন না, এবং শীল মশাইও দিলেন না পরীক্ষা। তৃতীয় বছরে তিনি আগেই জানিয়ে দিলেন, দেবেন না পরীক্ষা। বকেয়া দু-বছরের টাকা জমে ছিল বলে সে বছরে তিনজন পি আর এস হলেন। এঁদের মধ্যে দুজন হলেন বিখ্যাত পন্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং রেভারেন্ড ই এম হুইলার যিনি পরে কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ....রাধাকুমুদকে ব্রজেন শীলের পরবর্তী অধ্যক্ষ জানকীনাথ ভট্টাচার্য (ইনি জীবনে দ্বিতীয় হন নি কখনও এবং পি আর এস হয়ে শিরোমণির আসন অলংকৃত করেন) বলেছিলেন 'তুই ফার্স্ট' হবি এবং নিজেও পড়াশুনো দেখিয়ে দিতেন। সত্যিই এন্ট্রান্স পরীক্ষার শীর্ষ দশের মধ্যে রাধাকুমুদের নাম স্থান পেয়েছিল। তখনকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রাস পরীক্ষার এলাকা ছিল পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ব্রহ্মদেশ।

সে সময় ইতিহাস পড়াতেন কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি 'নবাবী আমল' ইত্যাদি ঐতিহাসের বই লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। রাধাকুমুদ রাধাকমল অর্থ-নীতিবিদ হিসাবে প্রখ্যাত এবং এককালে এই কলেজেও অধ্যাপনা করেছেন মুর্শিদা-বাদ কাহিনী মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রণেতা নিখিলনাথ রায় এই স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছিলেন। 'রামধনু' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং কৃষ্ণনাথ স্কুল ও কলেজের ছাত্র [illegible] ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণ দেখতে

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ
জয়তি

নং ২৫০

দাখিলা শ্রীপতি বাহাদুর [illegible] কাশিমবাজার ওয়ার্ডসের
মোতালক মৌজে [illegible] সন ১২৯০ সাল
তারিখ ৪ চৈত্র
আসামী হ. বকেয়া কীস্তি এলুম
খেলাপী ওগ,

আদায় প্রজা
শ্রী [illegible]
ওঃ [illegible]
খাজানা — [illegible]
পথকর
পবলিকওয়ার্কসেস

বকলমে [illegible]

পাই উনিশ শতকের শেষদিকে কাছাকাছি সময়ে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের উৎসাহ ও তত্ত্বা-বধানে তরুণদের আসর 'সুনীতি সঞ্চারিণী সভা' স্থাপিত হয়—নিখিলনাথও সেই সভার সদস্য ছিলেন এবং তখনই লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতেন। পুরাতত্ত্ববিদ, প্রত্নতত্ত্ব-বিদ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি আজও এই শহর সগর্বে বহন করছে।

মুর্শিদাবাদের আকাশ, বাতাস মৃত্তিকায় ইতিহাসের উপাদান মিশে রয়েছে—প্রাচীনকাল থেকে নবাবী আমল পর্যন্ত কালের স্রোতে ভাগীরথীর দুই তীরের জনপদে উত্থান-পতন, যুদ্ধ, বাণিজ্যের কত কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে তার কতটুকুই বা আমরা জানি, জানতে চেষ্টা করি। তবু ইতিহাসের রহস্যালোক সম্পর্কে তৃষ্ণা মানুষের বিচিত্র জীবন কাহিনীতে যার আকর্ষণ সে বালকের মতই পিছন ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখতে ভালবাসে। [illegible]

মাটির ওপর উবু হয়ে প্রায় শায়িত অবস্থায় কান পেতে শুনতে চায় মৃত্তিকার বুকের ভেতরে কোন্ গভীর কথা ধ্বনিত হচ্ছে।

বোধকরি রহস্যের দুর্নিবার আকর্ষণই গঙ্গাধর কবিরাজের গলির একটি শিশুকে অদৃশ্য কোনো অনুরাগের শিথিল কোমল শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। সেই শিশুটি মহারাণী স্বর্ণময়ীকে চাক্ষুস করেনি কিন্তু তাঁর স্মৃতি বহন করতেন এমন একটি বৃদ্ধাকে দেখেছে, তাঁর কানমলা চুম্বন দুইই পেয়েছে। কি জানি ঊনিশ শতকের ধন্বন্তরী বৈদ্যশাস্ত্রবিশারদ গঙ্গাধর কবিরাজ আমার পিতামহ তৎকালীন সভাপতি শশিভূষণ বিদ্যাবাগীশের নাড়ির বায়ুপিত্ত কফের অবস্থা পরখ করেছিলেন কি না। এই সংশয়ের মূল কারণ এই যে, শশিভূষণ খাঁটি ব্রাহ্মণ হলেও অন্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, গঙ্গাধর ছিলেন বিপরীত মনোভাবাপন্ন। তবে আজকের দিনের মানুষের মত সে-আমলের সামাজিক মানুষেরা বিপদের সময়ে পরস্পরের কাছে আসতে পারতেন, সেটুকু উদারতা রাজনৈতিক আধুনিকতার চাপে পিষ্ট হয়ে যায়নি।

অর্ধশতক পিছিয়ে গিয়ে আমার ঠাকুমাকে দেখি অতিকষ্টে একটা কাগজে জগত্তারিণী দেব্যা আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখছেন, নিকেল-ফ্রেমের চশমাটা নাক থেকে পড়ে যাবার মত অবস্থা। কিসের সই?

কাশিমবাজার রাজবাড়ির তকমা আঁটা পাগড়ি আর হাতে পেতলবাঁধানো তেল-চকচকে পাকা লাঠি। বঙ্কিমচন্দ্রের আক্ষেপ বোধহয় এই লোকটির কাছে বা তার মনিবের কাছে পৌঁছয়নি কিম্বা পৌঁছে থাকলেও সাধারণকে ভড়কে দিতে এটাই যথেষ্ট অস্ত্র তা উভয়ের জানা আছে) নিয়ে ঘোড়ার গাড়ির কোচ বাকস থেকে আমাদের বাড়ির সামনে যে লোকটা নামতো তাকে দেখেই দৌড়ে খবর দিতাম কর্তামাকে (ঠাকুমা) মহারাজার লোক এসেছে।'

জানি কর্তামা 'প্যাটরা' থেকে মটকার কাপড় বার করে পরবেন, তারপর ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে একগাল ঘোমটা দিয়ে ছোট ঘরে এসে চেয়ারে বসবেন। তখন তাঁকে কেউ কি ভাবতে পারতো সে এই লজ্জাবতীই মাত্র তিন মিনিট আগে গামছা পরিহিতা হয়ে আমার মায়ের কিম্বা অন্য কারও চতুর্দশ পুরুষের গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধে পাড়া মাথায় তুলেছিলেন। হ্যাঁ, কর্তামার একটু 'গরীদের' ছিল, থাকবে না কেন, রাজবাড়ি থেকে গাড়ি করে টাকা আসে যে। মানে আসত মানে গাড়ি বোঝাই নয়, মাসোহারা ছিল স্বর্ণময়ীর আমলে কুড়ি, ক্রমে দশ এবং পরে পাঁচ টাকায় দাঁড়িয়ে শেষে খতম হয়েছিল। ছোটবেলায় অত কে জানতো ঠাকুমা দেখেছিলেন স্বর্ণময়ীকে যিনি মহারাণী ছিলেন সেই স্বর্ণময়ীকে। আর মুড়িউলী গোলাপ বুড়ি যার ঘরে গিয়ে আমরা মুড়ি নিতাম, যে ঢেঁকীতে পাড়ার পাঁচজনের ধান কুটতো, খৈ-মুড়ি ভাজতো সেই গোলাপ বুড়ির সঙ্গে কর্তামার খুব ভাব ছিল, ভাব ছিল গোপী ঠাকুরুনের সঙ্গেও। দুপুরে বুড়িদের আসর বসতো, আলোচ্য বিষয় পাড়ার বৌ-ঝিদের কুৎসা কিম্বা নিজেদের পুরনো দিনের রং-রসের কথা—রাস্তার কলে জল এসেছে এ খবর কানে গেলেই বুড়িরা খোশগল্প গুটিয়ে ফেলত—'মহারাণীর কলে জল এসেছে।' অর্থাৎ বেলা সাড়ে তিনটে। মহারাণীর কল, মহারাণীর ছাপ দেওয়া টাকা-পয়সা, মহারাণীর রাজস্ব—এসব ছিল সাধারণের কথার কথা। তারা মহারাণী বলতে ভিক্টোরিয়া আর স্বর্ণময়ীতে তফাৎ বুঝতো না, তার দরকারও ছিল না বা এসব ভুল ভাঙিয়ে দেবার কথা কেউ ভাবতোই না।

তবে এই সব সাধারণ প্রজাদের কাছ থেকে আদায়-করা করের ওপরেই চিরকাল সর্বত্র রাজ্যের রাজা বাদশাহের বড়মানসী চলে এসেছে। বাংলা সন ১২৯০ সালের খাজনা আদায় দেওয়ার দাখিলা হাতে পেয়ে অবাক হয়েছিলাম, 'জমীদার শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহাশয়া, এম, আই, ও, সি আই অবলগো পাঁচ টাকা দেড় আনা মাত্র।' মহারাণীর যে এত টাকা তবে কেন পাঁচ টাকা দেড় আনা তিনি মৌজে মহারাজগঞ্জের প্রজার কাছ থেকে নিচ্ছেন? তার মানে এক হাতে নেওয়া অন্য হাতে দেওয়া। কৃষ্ণনাথ যে সাবালক হয়ে চার বছরে লাখ টাকা উড়িয়েছিলেন তার মধ্যে লেংড়ি বিবির হাতাতে ফূর্তিফার্তা থেকে শুরু করে বিবিধ সৎ কাজ সবই ছিল—এ টাকা প্রজার ছিল।

আবার কখনো মনে হয়েছে কৃষ্ণনাথ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে কি সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয় হত বানজেটিয়াতে? গোপাল দফাদারকে তিনি কি প্রহার করেছিলেন? নাকি কেশব সরকার? গোপাল যদি না মরত তাহলে কৃষ্ণনাথ যদি আত্মহত্যা না করতেন তাহলে ত স্বর্ণময়ী ক্ষমতায় আসতে পারতেন না এবং এটাও অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, কৃষ্ণনাথ যেমন চঞ্চল এবং কতৃত্বাভিলাষী ছিলেন তাতে একাই বিশ্ববিদ্যালয় বানাতে গিয়ে অন্য কিছু করা তাঁর পক্ষে বিচিত্র ছিল না অতএব—। দেশের ও দশের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে প্রয়োজনমত সহায়তার শুভবুদ্ধির দ্বারা স্বর্ণময়ী যেভাবে বড়মানুষী না-দেখিয়ে ধনসম্পদ বণ্টন করতে পেরেছিলেন, আত্মহত্যার দ্বারা তার উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ দিয়েছিলেন বলে, কৃষ্ণনাথকে আধুনিক কেতার কেউ যদি শহীদ আখ্যা দেয় এবং কৃষ্ণনাথের আত্মহত্যার মূল কারণ হিসেবে প্রহৃত (সে যার দ্বারাই হোক না কেন) হয়ে মারা যাওয়া গোপাল দফাদারকেও যদি শহীদ বলে, তাহলে আপত্তি করা চলে কি? এটা নেহাত কষ্ট কল্পনাপ্রসূত। তা হোক বা না হোক, ইতিহাসের উপাদান হিসেবে অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল থেকে সমাজের নিচুতলার গোপাল দফাদারের মত সকলেই গ্রাহ্য এটা মেনে নিতেই হবে।

আজও ভাগীরথী বয়ে চলেছে কালের স্রোতের অনিবার্য নিয়মে। নতুন মানুষেরা নিজের প্রয়োজনে ফারাক্কা বাঁধ বানিয়ে হেজেমজে যাওয়া চরের বুকে জলে ভরে দিয়েছে—কুঞ্জঘাটা থেকে গোরাবাজার হয়ে আপন খেয়ালে নদী চলেছে। দুই তীরে নতুন যুগের মানুষের প্রাণমুখরতার পাশে পুরানো কালের নন্দকুমারের পোড়ো বাড়ি কিম্বা সৈদাবাদের কুঠিবাড়িকে প্রাণহীন কঙ্কাল মনে হয়। সৈদাবাদের রাজবাড়ি, যেখানে ১৮৯৭ সালে এক বৃদ্ধা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে কত বছর ধরে কাশিমবাজার থেকে এসেছেন অন্দরের পিছন দিকের সঙ্গে পর্দার আব্রু রক্ষার জন্য চিকের ঘেরা পথ দিয়ে নিত্য গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জনের প্রসন্নতা পেয়েছেন, সেই গঙ্গানিবাস যেখানে তাঁর উত্তরাধিকারী মণীন্দ্রচন্দ্র যাঁর প্রচেষ্টায় বহরমপুর কলেজে কৃষ্ণনাথের নাম যুক্ত হয়েছে এবং—। থাক সে আর এক ইতিহাস। স্বর্ণময়ীর সেই বাড়ি আজ কোথায়? ভেঙে পড়ছিল বলে (অথবা তার আগেই চোরেরা দরজা-জানালা ইট-কাঠ খুশিমত অপহরণ করেছে) বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে। কেবল একটি অংশ জেলার সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে টিকে রয়েছে।

বাড়িঘরই কি কেবল ভাঙেচোরে—শিল্প বাণিজ্যের উপাদান উৎপাদনের রূপ বদল হয়নি? কোথায় গেলেন সেই সব কারিগর যাদের তৈরি হাতীর দাঁতের কাজ রেশম থান, রুমাল, বিদেশের বাজারে কোটি কোটি টাকায় বিকোতো। সেই খাগড়াই কাঁসা, বালাপোষ এবং আরও কত রকমের শৌখিনতার নমুনা যা দুনিয়ার সমঝদারদের তাক লাগিয়ে দিত। নেই। থাকে না কিছুই। রূপকথার রূপ গেছে কথা আছে। রাজকন্যার মতই দুনিয়ার সব কিছু। নেই কিন্তু ছিল এই ত ইতিহাস।

শেষের কবিতা : রচনার স্থান ও কাল

রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর দশম খণ্ডে 'উপন্যাস ও গল্প' অংশে মুদ্রিত শেষের কবিতা' উপন্যাসের শেষে এটি রচনার স্থান-কালের উল্লেখ আছে। বন্যার চিঠির শেষে একটি রেখ-চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে ব্যালারুরি, বাঙ্গালোর ২৫ জুন ১৯২৮। অবশ্যই এই তারিখ বন্যার চিঠির নয় কারণ ওই রেখ-চিহ্ন। ব্যালাব্রুয়ি ঠিকানায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে 'শেষের কবিতা' রচনাকালে বাস করছিলেন মহুয়া কাব্যগ্রন্থে সংকলিত শুকতারা ও বিদায় কবিতার রচনাকাল ও স্থানের উল্লেখে তা সপ্রমাণ। প্রথম কবিতাটির নীচে লেখা আছে : ২৩ জুন ১৯২৮ ব্যালারুয়ি বাঙ্গালোর। দ্বিতীয়টির নীচে শেষের কবিতা উপন্যাসের শেষে মুদ্রিত স্থান কালেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ বিশাল 'রবীন্দ্র জীবনী'র তৃতীয় খণ্ডে (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯) দক্ষিণ ভারতে ১৯২৮ পরিচ্ছেদে যে সব তথ্য দিয়েছেন সেগুলির সাহায্যে দেখা যায় যে, ২৫ বৈশাখে কলকাতার বিচিত্রাভবনে মহাসমারোহে জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের পর এই দিন কবির তুলাদান করা হয় অর্থাৎ তাঁহার ওজনের পরিমাণ গ্রন্থ বিশ্বভারতী হইতে নানা পাবলিক লাইব্রেরি ও প্রতিষ্ঠানে দান করিবার জন্য উৎসর্গ করা হইল (প্র, মু, রং জী ৩/২৩৩) রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজের পথে বিলাত যাত্রা করলেন ১২ মে ১৯২৮ ॥ ২৯ বৈশাখ ১৩৩৫ শনিবার, কৃষ্ণ সপ্তমী তিথিতে। এই বিলাত যাত্রার উপলক্ষ্য ছিল ইংলণ্ডে হিবার্ট ট্রাস্টিদের নিমন্ত্রণে বক্তৃতাদান। রথীন্দ্রনাথ সপরিবারে ইতোমধ্যেই য়ুরোপ যাত্রা করেছিলেন ৩. ৫ ১৯২৮ তারিখে। কথা ছিল মাদ্রাজ হয়ে কলম্বোতে অস্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ড যাত্রীবাহী জাহাজ ধরা হবে।

নির্মলকুমার মহলানবিশ তাঁর ৯২ পৃষ্ঠাব্যাপী স্মৃতিকথা কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে' (প্রথম প্রকাশ ১৬ আষাঢ় ১৩৬৩) পুস্তকে যা লিখেছেন তাতে হিবার্ট বক্তৃতাদানের উপলক্ষ্য সম্পর্কে আদৌ উল্লেখ নেই। তিনি লিখছেন : '১৯২৮ সালের গ্রীষ্মকালে রথীবাবু খুব অসুস্থ. কবিরও শরীর ভাল নয়, স্থির হল ওঁরা সবাই সেবারে বিলেতে যাবেন। জাহাজের তখনও মাসখানেক দেরী। তাই প্রতিমাদিরা কলকাতায় অপেক্ষা না করে কোডাইকানালে চলে গেছেন, যাতে কবি কলকতা থেকে জাহাতে রওনা হলে ওঁরা মাদ্রাজে অথবা কলম্বোতে এসে ওঁর সঙ্গে মিলতে পারেন। কবির যাওয়া সমস্ত ঠিক—পরদিন খিদিরপুর ডক থেকে জাহাজ ছাড়বে। জিনিসপত্র গোছানো শেষ হয়েছে। সুরেনবাবু (সুরেন কর), মিঃ আরিয়াম (অধুনা শ্রীআর্যানায়কম্) ও এণ্ডরুজ সাহেব রয়েছেন জোড়াসাঁকোতে কবির সঙ্গী। মিঃ আরিয়াম ও এণ্ডরুজ সাহেব কবির সঙ্গে বিলেত যাচ্ছেন আর সুরেনবাবু এসেছেন গোছগাছ করে ওঁকে রওনা করে দিতে।' (নি, ম, পৃঃ ১২-১৩) সুরেনবাবু খিদিরপুর চলে গেলেন জাহাজে কবির নির্দিষ্ট ঘরের সংলগ্ন স্নানঘর ইত্যাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে কিনা সরজমিন তদন্ত করতে। রাত সাড়ে নটা নাগাদ সুরেনবাবু ফিরে এসে জানালেন যে, 'এ জাহাজে গুরুদেবের যাওয়া অসম্ভব। উনি যে তলায় থাকবেন তার নিচের তলায় স্নানের ঘর—প্রত্যেকবার ওঁকে সিঁড়ি ভেঙে যেতে হবে।' (নি, ম, পৃ, ১৪)

স্বভাবতঃই জাহাজে যাত্রা বাতিল হয়ে গেল। কবি বললেন, 'ঐ জাহাজে এণ্ডরুজ ও আরিয়াম সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে যান, আমি দুদিন পরে ট্রেণে করে গেলেও ওঁদের সঙ্গে সঙ্গেই মাদ্রাজ পৌঁছতে পারব।' (ঐ পৃ, ১৪)।

পরদিন রাত্রে মাদ্রাজ মেলে প্রশান্ত ও নির্মলকুমারী মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হলেন। প্রভাতকুমার লিখছেন : 'মাদ্রাজ পৌঁছিবার পূর্বে কবির শরীর পথেই অসুস্থ হইয়া পড়িল, ১৭ মে যে জাহাজ ধরিয়া বিলাত রওনা হইবার কথা, তাহা ছাড়িয়া দিলেন। কবি মাদ্রাজের শহরতলী আদৈর-এ থিওজফিক্যাল বিদ্যায়তনের নিরালায় মিসেস অ্যানি বেসান্তের অতিথি হইয়া সপ্তাহকাল থাকিলেন।' (র, জী ৩/২৩৪)

নির্মলকুমারী লিখেছেন : 'মাদ্রাজে পৌঁছে দেখি আরিয়াম ও এণ্ডরুজ দুজনেই ষ্টেশনে হাজির। শুনলাম মিসেস বেসান্ত আড্ডিয়ার থাকার জন্যে কবিকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তাই আমরা সেখানে গিয়েই উঠলাম। 'ব্ল্যাভ্যাটস্কি হাউস' মস্ত বাড়ি। দোতলায় কবি ও আমাদের দুজনের জায়গা, ও একতলায় সাহেবের স্থান হল। আরিয়াম্ বোধ হয় আর কোনো একটা জয়গায় ছিলেন ঠিক মনে নেই।' (পৃ, ১৪)

মাদ্রাজে বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত (১৯১৭) ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির চ্যানসেলররূপে রবীন্দ্রনাথ এর আগে ১০, ১১, ১২ মার্চ ১৯১৯-এ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন রেজিস্ট্রার জর্জ অরুণদেল।

আদৈরে বসে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট গল্প লেখেন নাম 'সংস্কার' তারিখ ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ ও কিছুকাল পরেই লেখেন ক্ষুদ্র উপন্যাস শেষের কবিতা, খসড়ায় যার নাম দেন মিতা। এর ঠিক আগের কয়েকটি পংক্তিতে প্রভাতকুমার যা লিখেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ : 'বিলাত যাত্রার সম্ভাবনায় কবি ইতিপূর্বে যোগাযোগ উপন্যাস শেষ করিয়াছিলেন, তিনি পুরুষের

নী লিখিবেন বলিয়া যে পরিকল্পনা
ল তাহা দ্বিতীয় পুরুষের আবির্ভাব
ভাবনাতেই সমাপ্ত করিয়া দেন।

উপন্যাস লেখা শেষ হইয়াছে সত্য
ন্তু মন এখনো কাব্য ও গানে ভরিয়া উঠে
হ—কাহিনী সৃষ্টি করিবার কল্পনালোকে
ঘুরিতেছে। এই অবস্থায় লেখেন
ংস্কার' নামে ছোটো গল্প....' (র, জী,
/২৩৪)। প্রথম সংস্করণের দক্ষিণ ভারতে
১২৮ পরিচ্ছেদের শেষ প্যারাগ্রাফটি
ম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে দ্বিতীয়
ংস্করণে (অগ্রহায়ণ ১৩৬৮)। সেই
থাগুলির পরিবর্তে দ্বিতীয় সংস্করণে
তন যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল :
া বাসকালে কবি যোগাযোগ
ন্যাসটির শেষ দিকটা লিখিতেছেন,
ঝে মাঝে মিতা গল্পও চলিতেছে'
পৃ, ৩১৯)। কয়েক পংক্তি পরে আছে
ঙ্গালুরে যোগাযোগ ও মিতা (শেষের
বিতা) রচনা শেষ হয়।' (পৃ, ৩১৯) কোন
মাণে যে এসব নতুন কথা যোগ হল এই
দ্বতীয় সংস্করণে তা অবশ্য কারও জানার
য়োজন নেই, সম্ভবতঃ উপায়ও নেই।

১ জ্যৈষ্ঠ ছিল শনিবার, ইংরাজী ১৪
। অর্থাৎ প্রভাতকুমার যে তথ্য দিয়েছেন
র হিসাবে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করার
ল্প লেখার মধ্যে মাত্র একটি দিন
ছে। নির্মলকুমারীর তথ্য অনুসারে
ট দিনে খিদিরপুর থেকে জাহাজ যাত্রা
করে পরদিন মাদ্রাজ মেলে তাঁরা রওনা
য়েছিলেন। সেদিন সকালে যখন নির্মল-
মারী জোড়াসাঁকোতে গিয়েছিলেন তখন
বিই প্রস্তাব করেছিলেন, 'রাণী, চলো
তোমরা দুজনে আমাকে মাদ্রাজ পর্যন্ত
পৌঁছে দিয়ে আসবে।' মাদ্রাজ মেল ১৯২৮
ষ্টাব্দে কলকাতা থেকে কখন ছাড়ত এবং
খন মাদ্রাজ পৌঁছাত (আমার) আপাততঃ
না নেই। রাণীও স্পষ্ট করে বলেন নি
খন গাড়ি ছেড়েছিল তবে মনে হয় তাঁদের
স্বামী-স্ত্রী দুজনের মাদ্রাজ যাত্রার জন্য
স্তুত হতে অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা কেটেছিল।
ম্ভবতঃ সেদিন রাতের ট্রেণেই তাঁরা যাত্রা
লেন। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দেও সাধারণভাবে
লতে গেলে এই প্রায় ১৬৫০ কিলোমিটার
থ ট্রেণে যেতে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা লাগে। তা
থকে সময় সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করা
তে পারে। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত
ক্তিদের স্মৃতি আশ্রয়ী যাবতীয় রচনায়
াধারণভাবে সাল তারিখের কোন বালাই
াকে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও জীবনস্মৃতি
াতীয় রচনায় একই পথের পথিক। গুরু-
দেবের ভক্তদের রচনাও সেই পথ অনুসরণ
রায় যথেষ্ট নজীর পেয়েছে। রবীন্দ্র-
জীবনীর তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে
অগ্রহায়ণ ১৩৬৮) লেখা হয়েছে : 'আদৈরে
পৌঁছিবার পরদিন (১৬ মে) সন্ধ্যায় আশ্র-
মের উদ্যানে মিসেস বেসান্ত কবি-সম্বর্ধনার
য়োজন করিলেন। আদৈরে আসিয়া বোধ
য় ব 'সংস্কার' নামে একটি ছোটো গল্প
লখেন (১৫ মে)' (র, জী ৩/৩১৬ ২য়
সং) বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী
২৪ খণ্ডে এই গল্পটির শেষে মাদ্রাজ ১
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ তারিখ দেওয়া আছে। দ্বিতীয়
সংস্করণ রবীন্দ্র জীবনীতে দেওয়া তারিখ
ধরলে আবার ১৫ মে বাংলা মতে ১ জ্যৈষ্ঠ।
২৮ না, হয় ২রা জ্যৈষ্ঠ। কিন্তু
প্রভাতকুমার তো জীবনীকার। তাঁর
প্রায় চল্লিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও
নিষ্ঠার ফলেই তো আজ রবীন্দ্র চর্চায়
অনুরাগী ছাত্রদের পক্ষে পথ চলা সম্ভব।
তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে রবীন্দ্র জীবনের
এই রকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে তারি-
খের হিসাব না পাওয়া গেলে যথেষ্ট চিন্তার
কারণ ঘটে। বেসান্তের আতিথেয়তায় যদিও
শরীর ভালোই বোধ করিতেছেন ১ (র, জী
৩/২৩৪)। দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্য আগে-
কার সংস্করণের সেখানে গিয়া শরীর মন
ভালোই বোধ করিতেছেন।' এই পংক্তিটির
সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বরং নতুন খবর
হিসাবে আছে 'আদৈরে মে মাসের গরম
আদৌ উপভোগ্য নয়।' (র, জী ৩১৭ ২য়
সং) নির্মলকুমারী দেবী কিন্তু প্রচণ্ড
গরমের কথা লিখেছেন। এবং 'এক সপ্তাহ
দুঃখভোগের পর যখন গরম অসহ্য বোধ
হচ্ছে তখন হঠাৎ একদিন সকালে সাহেব খুব
উৎসাহিত ভাবে একখানা টেলিগ্রাম হাতে
নিয়ে কবির কাছে এসে হাজির।' (নি, ম,
পৃ, ১৭) পিঠাপুরমের মহারাজা কুন্নুরে
তাঁর এক কটেজে কিছু দিন কাটিয়ে যাওয়ার
জন্য রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই
দেনই রাত্রের গাড়িতে কুন্নুর যাত্রা, ভোরে
স্টেশনে নেমে ছোট রেলগাড়ির রিজার্ভ কাম-
রায় না উঠে মোটরে উঠলেন। 'বোধ হয় মাত্র
সতের মাইল পথ' (নি, ম, পৃ, ২৪) বেশি
সময় লাগল না পৌঁছাতে। পিঠাপুরমের
মহারাজার পাঠানো টেলিগ্রামের সম্পর্কে
এণ্ডরুজ সাহেবের উক্তিটি কিন্তু নির্মল-
কুমারী উদ্ধৃত করেছেন বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠায় :
অর্থাৎ য়ুরোপযাত্রার পূর্বে কবি যেন মহা-
রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। প্রভাতকুমারের
দেওয়া একটি তথ্য আগেই উল্লেখ করা
গেছে। তিনি লিখেছেন : '১৭ মে যে জাহাজ
ধরিয়া বিলাত রওনা হইবার কথা, তাহা
ছাড়িয়া দিলেন।' অবশ্যই টেলিগ্রামটি
২১-৫ তারিখের আগে আসেনি।

'মহারাজা ত ব্রাহ্মসমাজের একজন
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ও রবীন্দ্রনাথকে আন্ত-
রিক শ্রদ্ধা করিতেন।' (র জী ৩।২৩৫
পাদটীকা) তিনি ১৪-৫ তারিখের আগে
কি রবীন্দ্রনাথের মাদ্রাজ আসার খবর
পাননি? নাকি ১৭-৫ যাত্রা বাতিল হওয়ার
পরেই মাত্র সংবাদ পেয়েছিলেন? মহারাজা
য়ুরোপ যাত্রা আপাততঃ স্থগিত আছে কিনা
জানেন না যদি না ইতোমধ্যেই কবির
সঙ্গীদের বা সংবাদপত্র মারফৎ সে খবর
তিনি পেয়ে থাকেন। পিঠাপুরমের রাজার
নিকট হইতে কুন্নুরে কিছুদিন কবির
আতিথ্যগ্রহণের নিমন্ত্রণ প্রসঙ্গে একটি নতুন
তথ্য রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণে
পাওয়া যায় : 'বোধ হয় এণ্ড্রুজই রাজাকে
লিখিয়া নিমন্ত্রণের ব্যবস্থাটি ঘটান।'
(র জী পৃ, ৩১৭, ২য় সং) অর্থাৎ
'সংস্কার' গল্পটির রচনার তারিখ ১৪-৫
হইতে ২১-৫-এর হওয়াই অধিকতর সম্ভব।
টেলিগ্রাম পাওয়ার দিন রাত্রেই কবি ও তাঁর
সঙ্গীরা আদৈর ত্যাগ করে কুন্নুরে
পোঁছেছেন পরদিন। এই কুন্নুরে 'শেষের
কবিতা' উপন্যাসের রচনা প্রসঙ্গে নির্মল
কুমারী ৫ জুলাই ১৯৪১ সন্ধ্যেবেলা
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা উল্লেখ
করেছেন।

'সেইবারেই তো 'শেষের কবিতা' আপনি
লিখলেন। কী জোর করেই না আপনাকে
সেদিন লিখতে বসিয়েছিলাম।' বললেন,

'দ্যাখো, তুমি সব লিখে রাখো সেবারকার বেড়াবার গল্প। কিছু বাদ দিও না। তোমার খুব স্পষ্ট মনে থাকে, ছোটোখাটো খুঁটিনাটি সব কথা। আমি সহজেই ভুলে যাই। আজ তোমাদের মুখে শুনে আবার সব মনে পড়ছে। তুমি এখনি লিখতে আরম্ভ কর, নয়তো পরে ভুলে যাবে। কিছু বাদ দিও না, যা যা মনে আছে সব লিখো।' (ক স দা পৃঃ ৪)

নির্মলকুমারী তাঁর বইয়ের ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে কুন্নুরে পৌঁছানর কয়েকদিন পরে সন্ধ্যাবেলা রাতের খাওয়া সেরে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন একটা গল্প বলতে। রবীন্দ্রনাথ রাজী হয়ে গল্প শুরু করলেন। গল্পটি আসলে গল্পের একটি প্লট। 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে'র ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠায় সেটি ধরা আছে। পরদিন সকালে একটা খাতা জোগাড় করে নির্মলকুমারী কবির লেখবার টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখলেন। কবির অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল সেদিন আলস্যে 'কৌচের উপর লম্বা—আ-আ করে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিত হয়ে পড়ব আর পাখির ডাক শুনব...' কিন্তু নির্মলকুমারীর প্রচেষ্টায় ত্রুটি ছিল না। অবশেষে কবি 'খাতাটা টেনে নিয়ে বসলেন। আগেই ঠিক হয়েছিল, সেদিন আরিয়াম ও আমরা দুজনে সকালবেলা উতকামণ্ডে যাব। ফিরতে সন্ধ্যে হবে। তাই এণ্ড্রুজ সাহেব সারাদিন কবির কাছে থাকবেন।

আমরা তো চলে গেলাম। যাবার সময় চেয়ারের পেছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখে গেলাম তিন-চার লাইন মাত্র লেখা হয়েছে। সন্ধ্যেবেলা যখন ফিরেছি কবি প্রথম কথা বললেন, হয়েছে খানিকটা। এখন বুঝতে পারছি সহজেই এগোবে। প্রথম কয়েক লাইন একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। তারপর থেকে একেবারে আপনিই এগোচ্ছে। গল্পের পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে এখন কথাবার্তা চলছে আমার—জানি এরকম হলে আর কোনো ভয় নেই'। (ক স দা পৃঃ ৪৯) অর্থাৎ কুন্নুরে এই গল্প রচনা চলতে থাকে। পর পর চার সন্ধ্যায় চারটে গল্প হলেও অন্য কোনটা লেখবার জন্য তাঁরা আবদার করলেন না। 'কারণ তখনও 'যোগাযোগ'টা লেখা চলছে। কখনও এটা লেখেন কখনও ওটা।' (ঐ)

নির্মলকুমারী লিখেছেন 'বোধহয় দিন দশেক ছিলাম।' (পৃঃ ৪৬) কুন্নুর থেকেই টেলিগ্রাম করে ফরাসি জাহাজ 'শান্তিলি'তে ক্যাবিনের ব্যবস্থা হল। ভ্রমণ হিসেব করে কুন্নুর থেকে বেরোনো হল যাতে মাদ্রাজে আর এক রাতও না কাটাতে হয়।' (পৃঃ ৪৭) রাত্রে ট্রেনে চড়ে ভোরবেলা মাদ্রাজ পৌঁছলেন তাঁরা। 'সেইদিনই বিকেলে জাহাজ ছাড়বে শোনা গেল (পৃঃ ৫০) প্রভাতকুমার জানিয়েছেন এই জাহাজযোগে কলম্বো যাত্রার তারিখ ছিল ২৮ মে।' (র জী ৩।২৩৫) কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে তারিখ নিয়ে। নির্মলকুমারীর হিসাব মতে 'সপ্তাহখানেক' মাদ্রাজের আদেরে আর 'দিন-দশেক' তাঁরা কুন্নুরে কাটিয়ে থাকলে কলকাতা থেকে মাদ্রাজে পৌঁছানর তারিখ ১০ বা ১১ মে হয় যে। নির্মলকুমারী লিখেছেন : 'যে জাহাজখানা ঠিক হল তার নাম আমার এখন মনে নেই, তবে ফরাসী জাহাজ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর এটা বেশ মনে আছে। কাজেই অসম্ভব ভিড়, কারণ মেল জাহাজ নয় বলে ভাড়া অপেক্ষাকৃত সস্তা।' (পৃঃ ৫০-৫১) আরও লিখেছেন : 'কলম্বো পৌঁছতে চার-পাঁচ দিনের কম লাগবে না, কারণ এটা মেল জাহাজ নয়।' (পৃঃ ৫১-৫২)

কলম্বোর পথে পণ্ডিচেরী, 'শ্রীঅরবিন্দ এখানে থাকেন। কবি তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিলে অরবিন্দ তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অসময়ে কবিকে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।' (র জী ৩।২৩৫ . নির্মলকুমারী ' ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'দুদিন পরেই পণ্ডিচেরী—সেইখানেই প্রথম জাহাজ থামল।' অরবিন্দ সাক্ষাতের দিনটি ছিল ২৯-৫। শ্রাবণ ১৩৩৫ সংখ্যার প্রবাসীতে 'অরবিন্দ ঘোষ' শীর্ষ প্রবন্ধের রচনাটির তারিখও সেটাই। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগলভ স্তব্ধতায়...' (র জী ৩।২৩৫) প্রভাতকুমারের দেওয়া কলম্বো যাত্রার তারিখের (২৮-৫) নির্মলকুমারীর বর্ণনা অনুযায়ী দুদিন পরে হয় ৩০-৫। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার তারিখটির সঙ্গে মিলছে না। ৩০-৫ তারিখে মীরা-দেবীকে লেখা পত্রে পণ্ডিচেরীতে 'যেভাবে জাহাজ থেকে ওঠা-নামা করেছিল তাতে মর্যাদা রক্ষা হয় না' লেখা আছে। (চিঠিপত্র ৪, পত্র সংখ্যা ৬০, পৃঃ ১৩৮) কিন্তু এই পত্রের শিরোদেশে পর পর দুটি পংক্তিতে লেখা আছে মেসাজেরিস মারটাইমস সেটা কি ব্যাপার বোঝা গেল না। জাহাজের নাম? সে ত প্রভাতকুমার জানিয়েছেন 'শান্তিলি'। এই পত্রে আরও লেখা আছে : 'জাহাজ বন্দরে এসেচে, এখানে ঘাট নেই। অতএব ছোট স্টীম বোটে করে ডাঙ্গায় উঠতে হবে।' অর্থাৎ সেইদিনই বন্দরে নেমেছেন। কিন্তু কোন বন্দর? কলম্বো, না অন্য কোন বন্দর? রবীন্দ্রজীবনী ২য় সংস্করণে আছে, 'মাদ্রাজ হইতে কলম্বোগামী জাহাজ ধরিলেন (২৮ মে)। এই জাহাজ দুই দিন পরে পণ্ডিচেরীর ঘাটে আসিয়া থামে।' 'পণ্ডি-চেরিতে কবির সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হইল বহু বৎসর পরে।' আরও কয়েক পংক্তি পরেই আছে : 'সেইদিন (২৯ মে) অরবিন্দ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া কবি প্রবাসীতে পাঠাইয়া দিলেন।' (র জী পৃঃ ৩১৭) ২৮ মে থেকে দুইদিন পরে ৩০ মে হবার কথা। ২৯ মে হয় না বলেই মনে হয়। নির্মলকুমারী লিখেছেন : 'পণ্ডিচেরীর পর কলম্বো পৌঁছতে একদিন লাগল। পরদিন বিকেলবেলা জাহাজঘাট লোকে লোকারণ্য—শহরসুদ্ধ ভেঙে পড়েছে বিশ্বকবির আগমন সংবাদে।' (কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে পৃঃ ৫৭) মীরাদেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ ছিল ৩০-৫। সেই দিনই বন্দরে নেমে থাকলে তারিখটা হবে ৩০ মে। প্রভাতকুমার কিন্তু লিখেছেন : 'কবি সদলে কলম্বো পৌঁছিলেন ৩১ মে। তাঁহারা অতিথি হইলেন ডঃ ডি ডবল্যু ডি'সিলভার। এদিকে কবির শরীর কিছুতেই ভালোর দিকে যাইতেছে না। অবশেষে এ-যাত্রায় বিলাত যাত্রাই পরিত্যক্ত হইল। এণ্ড্রুজ একাই বিলাত চলিয়া গেলেন (৫ জুন)।' (র জী ৩।২৩৬)

'কলম্বোতে থাকতে থাকতেই বৈশাখী পূর্ণিমা এল। ডি'সিলভারা বৌদ্ধ—তাঁরা প্রতি বছর ঐ দিনে অনুরাধাপুরের অশ্বত্থ চৈত্যে অর্ঘ্য দিতে যান। কলম্বো থেকে অনুরাধাপুর সম্ভবত একশ মাইল হবে।' (কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে, পৃঃ ৬২)

নির্মলকুমারী লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ কলম্বো শহরে রইলেন আরিয়াম ও এণ্ড্রুজ-এর তত্ত্বাবধানে আর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী গেলেন অনুরাধাপুরে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন। ১৩৩৫ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা ছিল রবিবার, ইংরাজী মতে ৩ জুন। পরদিন সকালে আবার তাঁরা কলম্বো ফিরে এলেন অর্থাৎ ৪ জুন। এরপর নির্মলকুমারী লিখেছেন : 'কবিকে আরো দুদিন মিঃ এণ্ড্রুজের ওআরিয়মের কাছে রেখে আমরা ডাম্বালা, সিগিরিয়া, ক্যাণ্ডি প্রভৃতি সব দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখে এলাম।' (পৃঃ ৬৫) অর্থাৎ তারিখটা প্রভাতকুমারের লেখা এণ্ড্রুজের বিলাতযাত্রার তারিখ ৫ জুনের সঙ্গে মিলছে না। এই কলম্বোতে থাকার সময় 'কবির শরীর খুবই অসুস্থ চলছিল বলে বাইরে কোথাও এনগেজমেন্ট নেননি। তাই সারাদিন বাড়ি বসে বসে 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' (তখন গল্পটাকে 'মিতা' বলে উল্লেখ করতেন) লেখা চলছিল। তবে কলম্বোতে কেন জানি না যোগাযোগ'-টাই বেশি লেখা হয়েছিল।' (কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে পৃঃ ৬৯)

কলম্বো থেকে ফিরে ব্যাঙ্গালোরে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বাড়ি ব্যালাব্রুয়িতে রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন থাকেন। নির্মলকুমারী একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে ব্যাঙ্গালোরেও 'যোগাযোগ' লেখা চলছিল। কলম্বোতে 'যোগাযোগ'টাই বেশি লেখা চলত, মাঝে মাঝে 'শেষের কবিতা'। ব্যাঙ্গালোরে ব্রজেন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'টা শোনবার দাবি করায় ওটার দিকেই বেশি মন গেল।

কিন্তু প্রভাতকুমার যে লিখেছেন 'সংস্কার' গল্প রচনার (১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪ মে) আগেই 'বিলাতযাত্রার সম্ভাবনায় কবি ইতি-পূর্বে 'যোগাযোগ' উপন্যাস শেষ করিয়া দিয়াছিলেন...' (র জী ৩।২৩৪)।

'যোগাযোগ' উপন্যাস ১৩৩৫ সালের মধ্যে শেষ করিয়া সম্পাদকের হাতে দিয়ে দেন ও তারপর হাত দেন 'শেষের কবিতায়।'

র জী ৩।২৩৬)। নির্মলকুমারী মহলা- বিশ তাঁর 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে' স্তকের ভূমিকায় জানিয়েছেন যে, 'কবির গিদেই প্রথম কলম ধরেছি। খুব ইচ্ছে ল লেখাটা শেষ করে তাঁর হাতে দেব। বধাতার বিধানে তা আর হল না। সেই ময় তাঁর ঘরে বসে বসেই এটা লিখে- ছলাম। তাঁর চেয়ারের পিছনে বসে লিখতাম, তে দেখতে না পান, কারণ কাজ করছি খলে হয়ত তাঁর নিজের কোনো কাজের যাস করতে ইতস্ততঃ করবেন।'

রবীন্দ্রনাথের কাছে বসেই যদি এই লখা হয়ে থাকে, বিশ্বভারতীর দপ্তর- কি সাল-তারিখ সম্পর্কিত কোনও ম প্রামাণিক নথি ছিল না, যা থেকে লিয়ে নেওয়া যেত? রবীন্দ্রনাথ না হয় সুস্থ ছিলেন, তাঁর আত্মীয়রা? তাছাড়া র্মলকুমারী ত সেই দাক্ষিণাত্য যাত্রায় বির সঙ্গেই ছিলেন। প্রশান্ত মহলানবিশ গদ্বিখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ। রবীন্দ্রসাহিত্য জীবন সম্পর্কে চর্চার 'সাবধানী য়েন্টিস্ট'-এর মতই তথ্য সংগ্রহ করতেন বিশেষণগুলি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দেওয়া)। র দপ্তরেও ত কিছু হদিশ পাওয়া যত। ই রচনা চলাকালেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নের শেষ দিনগুলিতেও 'হঠাৎ দুই- দিন প্রশ্ন করেছেন 'তোমার লেখা করেছ?' 'হ্যাঁ, লিখছি।' 'ভালো রে খুঁটিয়ে লিখো কিন্তু। কিছু বাদ দিও ।...' এই হল কিছু বাদ না দিয়ে খুঁটিয়ে খার নমুনা—গুরুদেবের প্রতি আনুগত্য!

'দিন দশ কলম্বোতে থাকিয়া ১০ জুন বি ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। এবার শ্রয় লইলেন বঙ্গালুরে সার ব্রজেন্দ্রনাথ লের বাটিতে। ডাঃ শীল তখন মহীশূর শ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যানসেলর।' (র জী ।২৩৬) কলম্বো থেকে ফেরার পালার না দিয়ে নির্মলকুমারী মহলানবিশ যে খ্যাগুলি দিয়েছেন তা হলঃ

'কলম্বো থেকে রওনা হয়ে প্রথম র দুদিন বিশ্রাম' (পৃঃ ৭১)। দিন আবার বোট মেলে মাদুরা থেকে রা' (পৃঃ ৭২)। 'গাড়ি ছাড়বার পর ইনিং কার থেকে কবির জন্য খাবার নিয়ে দিয়ে আমরা তিনজন (সস্ত্রীক শান্ত মহলানবিশ ও আরিয়াম—লেখক) স রইলাম ত্রিচিনাপল্লী স্টেশনের 'হিন্দু বারের' আশায়।' (পৃঃ ৭৩)

'গাড়ি ভোরবেলা গিয়ে মাদ্রাজে পৌঁছল। বারে আর জাহাজ ধরার তাড়া নেই। বারেও আমাদের আস্তানা হল মিঃ গাডেরের বাড়িতেই। তখন জুন মাসের মাঝামাঝি...সেই রাত্রেই যাতে কলকাতা না হওয়া যায় সেই জন্যে কবি ব্যস্ত লন।' (পৃঃ ৭৪)

অর্থাৎ কলম্বো থেকে মাদুরাই কোন কোন যানবাহনের সাহায্যে এলেন র উল্লেখ নেই। তারিখের কথা ত বাদই ওয়া গেল। ত্রিচিনাপল্লীতে দুপুরে খাবার খেয়েছিলেন না রাত্রের খাবার ঠিক বোঝা যায় না। তবে খাদ্য তালিকার যে বর্ণনা আছে তা থেকে সাধারণত মনে হয় দুপুরের খাওয়া। কারণ এঁদের 'খাবারের চেহারা দেখে শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন 'আমাকে তোমরা কি কতকগুলো মাছ মাংস খাওয়ালে তিন টাকা খরচ করে। হয়ত কোনটা বাসিই হবে—আমি অনায়াসেই এই খাওয়া খেতে পারতুম।'

কিন্তু 'গাড়ি ভোরবেলা গিয়ে মাদ্রাজে পৌঁছলো' লেখায় মনে হয় এটা রাতের খাওয়াই ছিল। ত্রিচিনাপল্লী থেকে মাদ্রাজের যা দূরত্ব তাতে সেই রকমই সময় লাগবার কথা, এদিকে দিনের হিসেবে মাদুরাতে আসা থেকে মাদ্রাজ পৌঁছান পর্যন্ত তিন- দিন কেটে গেছে মনে হয়। অর্থাৎ তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে মাদ্রাজ পৌঁছান হয়েছে। কলম্বো থেকে ভারতে পৌঁছানর তারিখ প্রভাতকুমার বলছেন ১০ জুন (র জী ৩।২৩৬)। সে হিসাবে তার সঙ্গে তিন-চার দিন যোগ করলে জুনের মাঝামাঝি হওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রজীবনী ৩।২৩৬ পৃষ্ঠায় প্রভাতকুমার যেভাবে লিখেছেন তাতে মনে হয় কলম্বো থেকে সরাসরি ব্যাঙ্গালোরে ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 'ব্যালারুয়ি' নামক বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ উঠেছিলেন। আসলে তা নয়। কলম্বো ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর পৌঁছানর আগে অন্তত চার-পঞ্চাদিন কেটে গেছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ রবীন্দ্রজীবনীতে নতুন যে তথ্য পাওয়া যায় তাতেও কোনও স্পষ্ট ধারণা হয় না। সেখানে আছে : 'দিন দশ কলম্বোয় কাটাইয়া কবি ভারতে ফিরিয়া মাদুরাইতে একদিন থামিয়া মাদ্রাজে আসিলেন।' (র জী ২য় সং পৃঃ ৩১৯) কবি ব্যস্ত হলেও স্টেশনে গিয়ে জানা গেল সেদিনকার ডাকগাড়িতে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরাও খালি নেই। অগত্যা একটা দিন না থেকে আর কী উপায়?' (নির্মলকুমারী পৃঃ ৭৫)

ব্যাঙ্গালোরে স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তখন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ মাদ্রাজে পৌঁছনর দিনই সকালের গাড়িতে সেখানে রওনা হলেন। পরদিন ভোরেই ফিরে আস- বার কথা। কিন্তু সেইদিনই সন্ধ্যার ট্রেনে কবিও ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার প্রস্তাব কর- লেন এবং কার্যত যাত্রা করলেন। পরদিন 'ভোর পাঁচটার বোধহয় ব্যাঙ্গালোরে গাড়ি পৌঁছল।' (ঐ পৃঃ ৭৯)

ব্যাঙ্গালোরে থাকার সময়ে 'শেষের কবিতা' লেখা চলছে। ব্রজেন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'টা শোনবার দাবি করায় ওটার দিকেই বেশি মন গেল। আমরা বোধহয় দিন-দশ-বারো ছিলাম ওখানে--ঠিক মনে নেই। চলে আসবার দু'তিন দিন আগে কবি ব্রজেন্দ্রনাথকে বললেন ' প্রায় শেষ হল। কাল আপনাকে শোনাতে পারব।' (ঐ পৃঃ ৮৯)

সেই রাত্রেই কার্যত সারা রাত জেগে রবীন্দ্রনাথ রচনাটি শেষ করলেন। এবং নির্মলকুমারী তার এক রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়েছেন কেমন করে তিনি 'রাত তিনটের সময়' 'পা টিপে টিপে' 'খুব আস্তে আস্তে চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে 'একটু কাছে এগিয়ে ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করলেন' কবি রচনার 'কোন জায়গায় এসেছেন'। এদিকে কবি আপন মনে কয়েক লাইন করে লিখছেন আর চেঁচিয়ে আবৃত্তি করছেন। মাঝে মাঝে পছন্দ হচ্ছে না, আবার কাটা- কাটি অদলবদলের পর নতুন করে চেঁচিয়ে পড়ছেন।' নির্মলকুমারী 'মন্ত্রমুগ্ধের মত' শুনলেন শেষের কবিতার শেষ অংশটুকু সেই যেখানে আছে 'শত্রুপক্ষ হতে আমি'
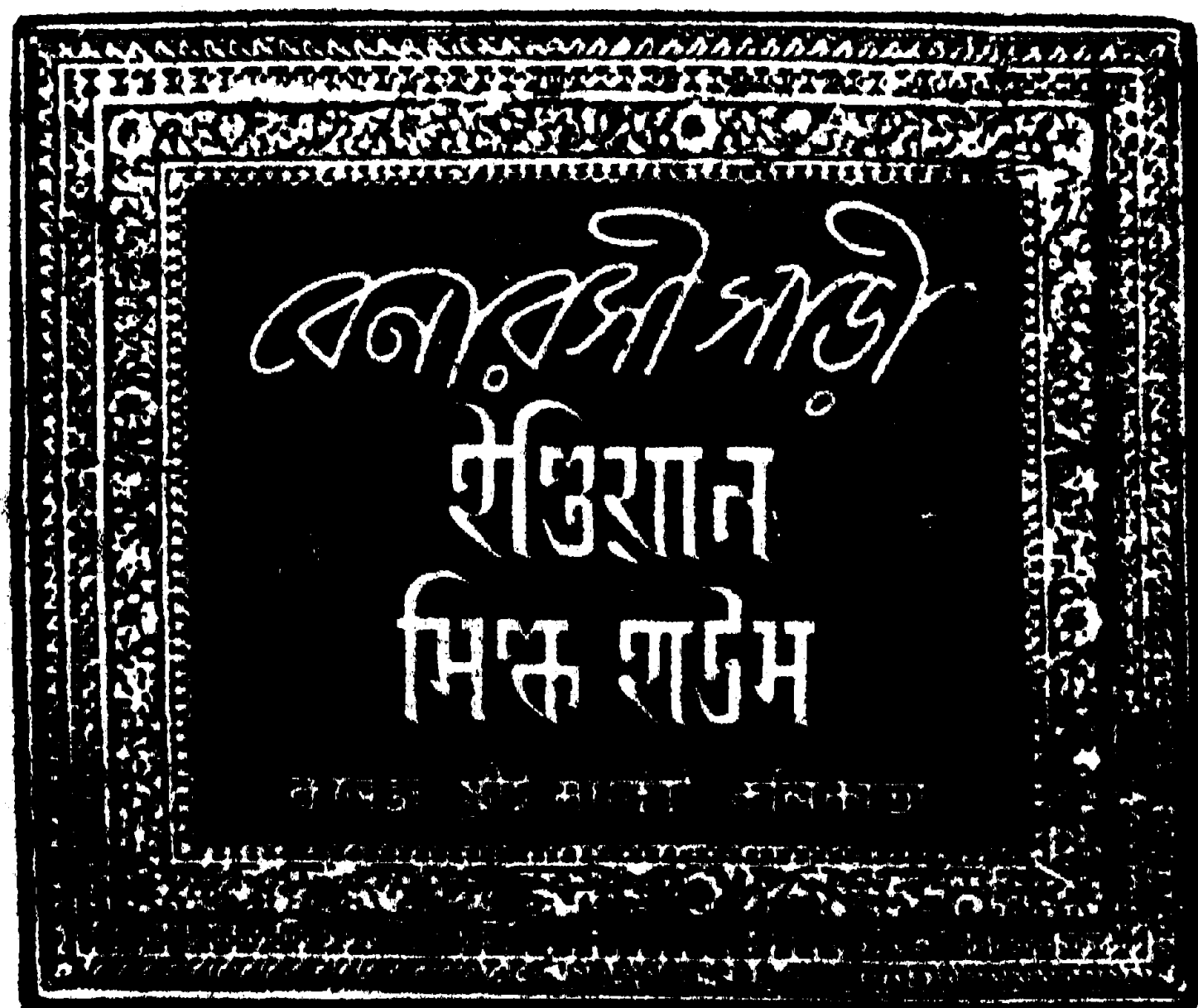
ইত্যাদি থেকে 'হে বন্ধু বিদায়' পর্যন্ত। চুপি চুপি ঘরে ফিরে এসে ঘড়িতে দেখলেন 'প্রায় চারটে বেজেছে।' (ঐ পৃঃ ৮৯-৯০) 'সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে লেখাটা চেঁচিয়ে পড়লেন।' (ঐ পৃঃ ৯২) অর্থাৎ উপন্যাসটির রচনা শেষ হল ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতা চলে আসার দু-একদিন আগে (দু-তিনদিন থেকে একদিন বাদ দিয়ে)। এবং সে তারিখটা হল ২৮ জুন ১৯২৮, বাংলা ১৪ আষাঢ়, ১৩৩৫ (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে)। আরও বলা যায় শুক্লা একাদশী, বৃহস্পতিবার।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ১০ জুন কলম্বো থেকে ভারতে এসে, পথে চার-পাঁচদিন কাটিয়ে ব্যাঙ্গালোরে দশদিন (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) বা দশ-বারো দিন (নির্মলকুমারী মহলানবিশ) কাটালেও এই ২৮শে জুন তারিখের হিসেবের সঙ্গে মেলে না; ওদিকে উপন্যাসের শেষে (রঃ রঃ ১০) তারিখ দেওয়া আছে ২৫ জুন ১৯২৮। তাছাড়া নির্মলকুমারী 'শেষের কবিতা'র সেই বিখ্যাত কবিতাটির যে উদ্ধৃত তুলে দিয়েছেন তাতে মনে হয় রচনা শেষ হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ আর যেন তার কোন মাজাঘষা করেন নি। নির্মলকুমারীর উদ্ধৃত পংক্তিগুলির কোন রূপান্তর ঘটে নি।

ব্যাঙ্গালোর বাস প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার লিখেছেন :

'এইখানে কবি দিন দশ থাকিয়া আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে শান্তিনিকেতন ফেরেন। বঙ্গলুরে কোনো সভাসমিতিতে কোনো বক্তৃতা দিতে দেখি না;...(রঃ জী ৩।২৩৬) এবার পথে-প্রবাসে লেখেন। 'শেষের কবিতা' বঙ্গলুরে সেটি শেষ করেন (২৮ জুন ১৯২৮।। ১৪ আষাঢ় ১৩৩৫)।'' পরবর্তী পরিচ্ছেদের (বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ ১৯২৮) শুরুতেই অবশ্য প্রভাতকুমার লিখেছেন : 'দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে মাস দুই কাটাইয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (১৩৩৫ আষাঢ়ের মাঝামাঝি সময়ে।... এবার 'মিতা' (শেষের কবিতা) নামে যে গল্পটি দক্ষিণ ভারতে লিখিয়াছিলেন, সেইটা লইয়া মাজাঘষা চলিতেছিল। দুইটি নূতন কবিতা লেখেন ২৬ আষাঢ় (১৩৩৫)—'অন্তর্ধান' ও 'শঙ্কিত' (মহুয়া); প্রথমটি 'শেষের কবিতা'র অন্তর্ভুক্ত করেন। (রঃ জী ৩।২৩৬) ১ পাদটীকায় আছে! কবিতা দুইটি প্রথমে এক ছিল। (দ্রঃ রঃ রঃ ১৫শ খণ্ড গ্রন্থ-পরিচয় পৃঃ ৫২১-২২)

এই পরিচ্ছেদে এসে তারিখের ব্যাপারে একটু অসঙ্গতি যে রয়ে গেছে প্রভাতকুমারের লেখায় তা অবশ্যই সকলের নজরে পড়বে! আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহটা আষাঢ়ের মাঝামাঝি হয়ে গেছে। অবশ্য 'শেষের কবিতা' ও একইভাবে 'উপন্যাস' থেকে বাদ হয়ে গেছে পরের পরিচ্ছেদে এসে। দ্বিতীয় সংস্করণে 'বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ-উৎসব' শীর্ষক পরিচ্ছেদে অবশ্য আগেকার সংস্করণের সময়ের হদিশ দেওয়া প্রথম পংক্তিটির বদলে আছে : দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে মাস দুই কাটাইয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিতেছেন; বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন বদলাইয়া ওভারব্রিজের উপর দিয়া চলিতে গিয়া কবি অনুভব করিলেন তাঁহার শরীর কী দুর্বল হইয়াছে। (পৃঃ ৩২০, ২য় সং) এর পরেই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যে চিঠিটি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেটি পথে ও পথের প্রান্তে গ্রন্থের ১৬ সংখ্যক পত্র, তারিখ ২০ আষাঢ় ১৩৩৫।। ৪ জুলাই ১৯২৮। তাছাড়া 'শঙ্কিত' নামে কোন কবিতা বিশ্বভারতী প্রকাশিত রচনবলীর পঞ্চদশ খণ্ডে 'মহুয়া' কাব্যের অন্তর্গত দেখা গেল না। সেখানে 'বিরহ' নামে একটি কবিতা আছে যার প্রথম ছত্রটি 'শঙ্কিত আলোক নিয়ে......' ইত্যাদি। সম্ভবতঃ ছাপার ভুল ঘটে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় 'মহুয়া' (বিঃ ভাঃ প্রকাশিত রঃ রঃ ১৫) কাব্য গ্রন্থের গ্রন্থ-পরিচয়ে লেখা হয়েছে :
'নির্ঝরিণী, শুকতারা, অচেনা, পথের বাঁধন, বাসরঘর, বিদায়, প্রণতি, নৈবদ্য, অশ্রু, অন্তর্ধান—এই দশটি কবিতা 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের জন্য লিখিত হইলেও ভাবানুষঙ্গ বশতঃ মহুয়াতেও মুদ্রিত হইয়াছে।' মহুয়ার প্রথম সংস্করণের পাঠ পরিচয়ের পাদটীকায় জানানো হইয়াছে যে 'বিরহ' ও 'বিচ্ছেদ' শেষের কবিতার জন্য লিখিত হইলেও ওই উপন্যাসে ব্যবহৃত হয় নাই।' (র র. ১৫ পৃঃ ৫১৭) ভালো কথা। কিন্তু 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে যতগুলি কবিতা আছে সবগুলিকেই মহুয়া কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। অবশ্যই ভাবানুষঙ্গের অভাবে।

বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চদশ খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে মহুয়ার যে এগারোটি কবিতার উল্লেখ করা হয়েছে 'মহুয়া' কাব্য অংশে তাদের ক্রমিক সংখ্যা নীচে দেওয়া গেল। সেগুলি রচনার স্থান কাল ও রচনাবলীতে যেভাবে মুদ্রিত হয়েছে তার উল্লেখ করা গেল। অনুবাদ করা কবিতাগুলি বাদ দিয়ে উপন্যাসে আবির্ভাবের ক্রমিক সংখ্যাও এই ছকের মধ্যে দেওয়া গেল :

শেষের কবিতা উপন্যাসের কবিতানুযায়ী ক্রমিকসংখ্যা	মহুয়া কাব্যে ক্রমিক সংখ্যা	কবিতার নাম	রচনার তারিখ	রচনার স্থান
৪	১৩	নির্ঝরিণী	আষাঢ় ১৩৩৫	[বাঙ্গালোর]
৮	১৪	শুকতারা	২৩ জুন ১৯২৮	ব্যালারুবি, বাঙ্গালোর
৩	২১	অচেনা	আষাঢ় ১৩৩৫	[বাঙ্গালোর]
২	২৪	পথের বাঁধন	আষাঢ় ১৩৩৫	[বাঙ্গালোর]
১০	৫৭	বাসরঘর	আষাঢ় ১৩৩৫	[বাঙ্গালোর]
	৫৮	বিচ্ছেদ	আষাঢ় ১৩৩৫	[বাঙ্গালোর]
১২	৫৯	বিদায়	২৫ জুন ১৯২৮	ব্যালারুয়ি, বাঙ্গালোর
৯	৬০	প্রণতি	আষাঢ় ১৩৩৫	[বাঙ্গালোর]
৫	৬১	নৈবেদ্য	আষাঢ় ১৩৩৫	[বাঙ্গালোর]
৭	৬২	অশ্রু	আষাঢ় ১৩৩৫	[বাঙ্গালোর]
১১	৬৩	অন্তর্ধান	২৬ আষাঢ় ১৩৩৫	[শান্তিনিকেতন]

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র রচনাবলী দশম খণ্ড

প্রথমেই যেটা নজর পড়ে তা এই যে উপন্যাসে আবির্ভাবের ক্রম হিসাবে কবিতাগুলিকে মহুয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং মহুয়াতে সেগুলি একত্রেও নেই। মহুয়ার কবিতাগুলি যথেষ্ট বিস্তৃতকাল ধরে রচিত; এতে চৈত্র ১৩৩৩ সালে এমনকি সম্ভবত বৈশাখ ১৩৩৩ থেকে শুরু করে ভাদ্র ১৩৩৬ সালে রচিত কবিতাও আছে। 'ভাবানুষঙ্গ' যদি এতই বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয় তাহলে তার ব্যাপ্তিকালটাও কম নয়। ভগবান জানেন ভাবানুষঙ্গ জিনিসটা কি বা কার বা কেন?

সকলেই জানেন যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ স্থান বা কাল সম্বন্ধে সম্ভাব্যতার চিহ্ন হিসাবে তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নটি ব্যবহার করে থাকেন। নিশ্চিত ক্ষেত্রে কোন চিহ্ন দেওয়া হয় না। অর্থাৎ উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত দশটি কবিতার মধ্যে মাত্র দুটির তারিখ ও রচনাস্থান বিশ্বভারতী নিশ্চিত করে বলতে পারেন। বাকিগুলির হয় একটি না হয় ওটি, না হয় দুটিই সম্ভাব্য।

বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর 'মহুয়া' অংশে 'অন্তর্ধান' কবিতাটির নীচে মুদ্রিত আছে ২৬ আষাঢ় ১৩৩৫ [শান্তিনিকেতন]। বাঙ্গালোর থেকে ফিরে শান্তিনিকেতনে কবিতাটি রচিত। অথবা উপন্যাসটির সঙ্গে সঙ্গে পরিমার্জিত হওয়াও সম্ভব। কিন্তু কবিতাটির নীচে ২৬ আষাঢ় ১৩৩৫ মুদ্রিত হওয়ায় একটু অসুবিধা হল এইযে তারিখটা 'শেষের কবিতা' উপন্যাস সম্পন্ন হওয়ার অনেক পরে হয়ে যায়।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ ধরনের আরও অনেক সাল তারিখ সংক্রান্ত অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তিকর মুদ্রণের [illegible] অনুসন্ধানী পাঠকের হাতেই পরিবেশন করতে।

এই [illegible] ব্যবহৃত [illegible] প্রত্যেকটিই বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত।

১ রবীন্দ্র রচনাবলী দশমখ.

আদি আছে অন্ত নেই

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বিনুর এই একা স্বাধীনভাবে বাড়ির বাইরে যাওয়া—খুব ভাল লেগেছিল। বিয়েও এমনভাবে সারাক্ষণ দেখেনি এর আগে, মায়ের কুশণ্ডিকা পর্যন্ত রাত জেগে দেখেছে। কি খেয়েছে, তারা কি খাইয়েছে বাড়ি এসে বলতে পারেনি কিন্তু বিয়ের বিবরণ মনে আছে।

মেয়ের বাপের বাড়ি হাওড়া জেলাতেই—তবে সাতরাগাছি থেকে অনেকটা দূর। মোটরে গাড়ি করে স্টেশনে আসার কথা। বরযাত্রীরা তাই আসবে। কেবল বরকনের পালকির ব্যবস্থা হয়েছিল—কিন্তু বোধহয় সুন্দরী বৌ, তায় একটু লেখাপড়াও জানে, বাসর ঘরে গানও গেয়েছে, বর নার্ভাস হয়ে পড়ে শেষ মুহূর্তে গাঁটছড়া বাঁধা চাদরটা বৌয়ের কোলে ফেলে দিয়ে একরকম জোর করেই বিনুকে সেই পালকিতে তুলে দিল, বললে, 'বাবা ও আমার পোষাবে না, আমি হেঁটে যাবো।'

পালকিতে আসতে আসতেই আলাপ জমে উঠেছিল। মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী, আর মিষ্টি কথাবার্তাও, গলার আওয়াজ একটু আধো-আধো। তাতে আরও ভাল লাগে। পালকী থেকে নেমে স্টেশন। ট্রেনে আসতে হবে সাতরাগাছি। বৌটি এবার সোজাসুজি বিনুর পাঞ্জাবী চেপে ধরে বললে, 'ঠাকুরপো, তুমি আমার কাছেই বসো ভাই। একা যেতে—ভাইটাকে ছেড়ে এসেছি, আমার বিশ্রী লাগছে।' বরও তাই চায়—বিনু আর কনেবৌ একধারে কোণ ঘেঁষে বসল। ফলে পরিচয় গাঢ়তর হবে এতে স্বাভাবিকই। বিনুর খুবই ভাল লাগল, ওদের তিন কুলে কেউ নেই—একটা বৌদি পেয়ে মনে হল যেন সৌভাগ্য স্বয়ং মূর্তি ধরে এসেছে। কোন আত্মীয়কে উপযুক্ত সম্বোধনে ডাকবার নেই, এ অভাববোধ এক এক সময় একটা দৈহিক যন্ত্রণার মতো মনে হয়।

বিয়ের পরের দিন। তারপরের দিন বৌভাত পর্যন্ত ওখানে কাটাতে হল। ওদের সেই পুরনো বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে—তাঁদের ওখানেই বিনুর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানের সব কিছু চেনা জানা—অসুবিধা হবে না এই আশায়। অসুবিধা প্রচণ্ড, যে কখনও কারও সঙ্গে থাকেনি একা এভাবে—রাজ্যের লজ্জা ও সংকোচ তাকে চেপে ধরবেই। তবু এরকম করে কাটালো। আরও মনে হল ঐ বৌটির কি কষ্ট একেবারে পরের মধ্যে এসে পড়ে আর এই তো বাড়িঘরের ছিরি। বেচারী।

ইদানীং মার শরীর ভেঙে পড়েছিল, তাছাড়া তেমন কোন আত্মীয় কুটুম্ব না থাকায় কখনও কাউকে নিমন্ত্রণ করার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। আত্মীয়তা বলতে পাশের বাড়ির কি সামনের বাড়ির—লৌকিকতা করা পর্যন্তই কর্তব্য। কখনও সখনও ভাল খাবার কিছু বাড়িতে হলে পাঠিয়ে দিতেন যাদের সঙ্গে বেশী আত্মীয়তা হয়ে যেত তাদের।

কিন্তু বামুনমার বোন এমনভাবে পুরনো আত্মীয়তা বানিয়ে তুলেছেন, তাছাড়া ঐ 'বনবাসে' থাকতে—মার তাহা এটা—অনেক করেছেন ও'রা এটা ঠিক। সুতরাং বর বৌকে নিমন্ত্রণ করতে হল একদিন। বরবৌ আর বরের ছোটভাই। ছোট ভাইই বৌদিকে নিয়ে এল, বড় ভাই আসবে পরে, তার 'ওভারটাইম', ছটায় ছুটি, তারপর বেরিয়ে এখানে আসতে সাড়ে সাতটা হয়ে যাবে। তবু সে পরিষ্কার কাপড় জামা নিয়ে গেছে—ছুটির পর ঐখানেই পোশাক পালটে নেবে।

বৌকে পৌঁছে দিয়ে ছোটজনা বেরিয়ে পড়ল, এই ছেলেটিই বিনুকে ওখানকার পথঘাট চিনিয়েছিল। সেও এখন চাকরি করছে, বড়বাজারে এক মারোয়াড়ির গদিতে। এ পাড়াতে তার আপিসের কে বাবু আছেন, এই ফুরসুতে সে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবে।

মা রান্নায় ব্যস্ত। দুটো হ্যারিকেন মাত্র বাড়িতে, টেবিল ল্যাম্প দাদার ঘরে। সেটা তখনও জ্বালা হয়নি। একটা মার কাছে রান্নাঘরে, আর একটা চলনে। বিনু আর নতুন বৌ বিনুদের ঘরে বসে গল্প করছিল। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার, তবে বাইরের আলোর একটা রেশ একেবারে মুছে যায়নি। একথা সেকথার মধ্যে বৌ হঠাৎ বলে উঠল, 'এই যে সব সন্ন্যাসী সেজে ভিক্ষে করতে আসে, এক একটা কি পাজী না কি বলব।'

'কেন, তুমি জানলে কি করে।' বিনু প্রশ্ন করে।

'সে কথা বলো কেন। একদি দুপুরবেলা অমনি পাড়ায় এসেছে, জটা আছে—হলদে কাপড় পরা, বলে পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী, হাতটাত দেখে টোট ওষুধ দেয়—আসে না? তোমাদের পাড়া দ্যাখো নি? সেদিন কেউ নেই, আমি বসে আছি, একেবারে উঠোনে ঢু এসেছে। আগে তো আবোল তাবোল কি বললে, আমি রাজরাণী হবো, আম বহুত পয়সা রুপেয়া হবে, সাত বেটা হ —তার পরই বলে কি, আরে খোক তোমার বুকে যে দুটো ফোড়া উঠেছে আ বাপরে, দেখি দেখি—বলে একেবারে ধারে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আ খুব রাগ করে উঠতে ঘর থেকে মা পেয়েছে—একবারে একটা বঁটি নি বেরিয়ে এসেছে—বেটা পালাতে প পায় না।'

বিনু প্রশ্ন করল, 'সত্যিই তোম ফোড়া হয়েছিল নাকি।'

আবছা আলোতেই দেখা গেল, যেন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে র ওর মুখের দিকে, তারপর একটু বিব গলাতেই বলল, 'দূর, ফোড়া হবে কে ওই ওদের ভড়ং। বদ মতলব।'

বৌদির বক্তব্যের গূঢ়ার্থ না বুঝলে সে যে কিছু বোকামি করে ফেলেছে বুঝেছিল। সে-ই অন্য প্রসঙ্গে চলে গে তাড়াতাড়ি।

হঠাৎ বৌদি একটা বালিশে এলিয়ে শুয়ে পড়ল। বিনু উদ্বিগ্ন হ ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করল, 'কি হল বৌ শরীর খারাপ লাগছে?'

'বুকের মধ্যেটা বড্ড ধড়ফড় কর ভাই, দ্যাখো হাত দিয়ে—' বলে বিনু ডান হাতখানা নিয়ে বুকের ওপর চে ধরল।

বিনু তেমন কিছু বুঝল না। ঘ জমেছে খুব হাতটা পিছলে যায়। ত একটু রাখার পর মনে হল সত্যিই বুকে মধ্যেটা ধড়াস ধড়াস করছে। সে হাত টে নিয়ে বলল, 'কি রকম বুঝছ, খুব খার লাগছে? মাকে বলব? তেমন যদি হয়—'

বৌদি যেন অকারণেই রেগে উঠ 'দ্যাৎ, তা আর বলবে না! মাকেই বলবে! কিচ্ছু হয়নি আমার। এমনি হয়েছিল তোমাকে বলা।'

বলতে বলতে উঠে গিয়ে পাশের ঘ মা যেখানে খাবার গুছিয়ে ঢাকা দিচ্ছে সেই ঘরের চৌকাঠে বসে মার সঙ্গে গ জুড়ে দিল।....

কি হল সেদিন কিছুই বোঝেনি

...র বেশ কিছুদিন পরেও যখন ...ার এই বৌদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ...বৌদি কি একটা কথা প্রসঙ্গে বলেছিল, ...তোমার কাছে আবার লজ্জা কমবে কে ...বয়েস যাই হোক, আমি তো কাঁচ থেকেই ...থেকে গিয়েছি।' তখনও সে কথার মধ্যে যে ...পূর্বে অভিজ্ঞতারই ইঙ্গিত ছিল, তাও ...বোঝেনি।

বুঝেছে অনেক পরে।

অথচ বোঝা উচিত ছিল। এর মধ্যে ...বাংলা ইংরিজী নভেল পড়েছে রাশি রাশি, ...নিজেও নানা ধরনের গল্প লিখেছে, প্রেমের ...গল্পও লিখেছে, বন্ধুরা নিরন্তর এই রস ...ঘেঁষা গল্প করছে—তবু কেন এসব ইঙ্গিত ...সেদিন বোঝেনি। পড়া ও শোনার অভিজ্ঞতা ...ওর মনের রসে জারিয়ে নিতে পারেনি ...বলে, না নিজের চিন্তা কল্পনা কামনায় এই ধরনের জিনিস উত্তেজনা আনতে শুরু করেনি বলে!

কে জানে কি। সে কি সত্যিই এত নির্বোধ ছিল।

এ প্রশ্ন সেদিনও অহরহ করেছে। কেন কোথাও খাপ খাওয়াতে পারে না ও। কেন সর্বত্র বেমানান ঠেকে। অথচ তার ফলেই যে এত নিঃসঙ্গ, এত একা। নিজেকে নিয়ে নিজের মনের গভীরে ডুবে থাকা ছাড়া কোনও মুক্তির পথ, সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে বাঁচার পথ পায় না। এ বোধ হয় ...ছেলেবেলায় ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে বন্ধুদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে মানুষ করার ফল। অহরহ তাই মনের কথা ও মনের ব্যথার ডালি সাজিয়ে যাকে উপহার দেওয়া যায়, যার ওপর জীবনের সমস্ত ভার আশা-আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় —এই বন্ধুই খুঁজে বেড়ায় ওর মন।

অথচ ঠিক কুণো স্বভাবের, কারও সঙ্গে মিশতে যে পারে না, তাও তো নয়।

যারা পরস্যাপি পর, যাদের সঙ্গে সব দিক দিয়েই বিপুল ব্যবধান, যাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না—তাদের সঙ্গে তো বেশ মিশতে পারে, অনেকক্ষণ ধরে গল্প চালাতে পারে—এমন কি সাহস ...কোথাও কোথাও বেশ ধৃষ্টতাও প্রকাশ করে ফেলে কিছু কিছু, বলা উচিত হচ্ছে না বুঝেও—কিন্তু তাতেও তাঁরা বিরক্ত হন না, ধমক দেন না। সে বয়সের তুলনায় অনেক বেশী জেনেছে, সেই জন্যেই একটু 'জ্যাঠামি' করবে বৈকি,, এই ভেবেই বরং প্রসন্ন মনে ক্ষমা করেন।

স্কুলের শিক্ষকরা তো অনেকে তার বন্ধুর মতোই হয়ে গেছেন। বিশেষ প্রসন্নবাবু। তিনি এমন সব প্রসঙ্গ আলোচনা করেন—যা শিক্ষক ও ছাত্রর মধ্যে আদৌ করা উচিত কিনা সন্দেহ।

এ পাড়ায় এসেও ওর কটি বৃদ্ধ বন্ধু জুটেছে। সকলেই চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন অর্থাৎ ষাটের ওপর পৌঁচেছেন। ...দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার কারণ বইয়ের ...প্রীতি। লাইব্রেরিয়ান মাধববাবু এঁদেরই একজন, খাঁকুড়ো চেহারার, তেমনি মিষ্টভাষী মানুষ, বয়সও তখন সাতষট্টি আটষট্টি—স্কুলের ছাত্র ইংরিজী বই পড়ে —এ পরিচয় পাওয়া মাত্র তিনি যেচে সেধে আলাপ করলেন এবং দুচার দিনের মধ্যেই বন্ধুত্বে পরিণত হলেন।

এ এক অদ্ভুত সদানন্দ ভোলানাথ মানুষ। সংসার বৃহৎ কিন্তু সংসারের বিশেষ ধার ধারেন না। বই পাগল মানুষ। তিনি সমঝদার পেলেই আর হাতের কাছে পেলেই বিনুকে ধরে ইংরেজ ফরাসী আর রাশ্যান লেখকদের বই ও সাহিত্যিক শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা জুড়ে দেন, এবং সে সময় একেবারে সমবয়স্কর মতোই কথা বলেন, সমানে সমানে—ওকে ছেলেমানুষ বলে অবহেলা করেন না, কি ধমক দিয়ে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করেন না। ভুলেই যান যে, দুজনের বয়সে অন্তত পঞ্চাশ বছরের তফাৎ।

বরং একটু যেন—অবিশ্বাস্য হলেও —মনে হয় শ্রদ্ধার চোখেই দেখেন। লাইব্রেরী থেকে তো বেছে বেছে বই দেনই —এগুলো বিনুদের মেম্বার হিসেবে প্রাপ্য নয়। যে একখানা করে বই পাওনা যার জন্যে বাংলা বই নিতে হয়—মাধববাবু এগুলো নিজের দায়িত্বে দিতে লাগলেন। এতদিন দাদাই একমাত্র সরবরাহকারক ছিলেন, রামমোহন লাইব্রেরী থেকে বন্ধুদের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে আনেন। মাধববাবুর কল্যাণে বিনুর বইয়ের অভাব রইল না। কিছু কিছু বই বাড়িতেও ছিল তাঁর, প্রাণধরে ছেলেদেরও তাতে হাত দিতে দেন না—তাও যোগাতে লাগলেন।

আর একজন জগন্নাথবাবু—এক বাঙালী অ্যাটর্ণীর বাড়ির সামান্য চাকরি করেন, যা কিছু হাতে পয়সা উদ্বৃত্ত হয় বই কেনেন—ইংরেজী বা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত বই। তিনিই ওকে হলকেন, এর বই পড়িয়েছেন। হলকেন আর হেনরী উড এর সব বই তাঁর কাছে ছিল। তাঁরও আরও আস্থা ওর ওপর। তিনি ওকে প্রবন্ধর সব বই পড়াবার চেষ্টা করেছেন। কোন কোন দাঁত ভাঙ্গা অংশের মানে বুঝিয়ে দিয়ে, লেখকের কি বক্তব্য তার একটা আঁচ দিয়ে কোথায় কোন লেখকের অসাধারণত্ব তা বলে ওর মনে আগ্রহ জন্মাবার চেষ্টা করেছেন।

আর একজন পাগল ছিলেন সত্যবাবু। তিনিও কেরানী, হয়ত একটু মাঝারি দরের কেরানী। কিন্তু সাহিত্য শিল্পকলা নাট্যকলা—বিশেষ অভিনয়-নৈপুণ্য সম্বন্ধে তাঁর প্রবল উৎসাহ আর অনুরাগ ছিল। তাঁর স্মৃতিকথা বা অভিজ্ঞতা বলার লোক পান না, একমাত্র বিনুই মন দিয়ে শোনে বলে হাতের কাছে পেলেই ধরে কিছুটা গল্প করেন।

বিনু শোনে তার কারণ তাঁর বলার মধ্যে দিয়ে আর একটা অজানা বিরাট জগৎ ওর চোখের সামনে উন্মোচিত হয়। আগের যুগের বাংলা থিয়েটার জগতের রোমাঞ্চকর ইতিহাস, তার বিপুল গৌরব—গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তাফী, অমৃত মিত্র, মহেন্দ্র বোস, অমর দত্ত। অভিনেত্রীদের মধ্যে সুকুমারী দত্ত, গঙ্গামণি, বিনোদিনী, তিনকড়ি—এদের অভিনয় যেন ওঁর বলার গুণে জীবন্ত হয়ে ওঠে ওর কাছে। শুধুই তো বর্ণনা নয় ভদ্রলোক ঐ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে বিস্তর মজার গল্পও সংগ্রহ করেছেন—সত্য ঘটনা কিন্তু তা বানানোর গল্পের চেয়েও অদ্ভুত। এখনও জীবিত আছেন দানীবাবু তারাকুসুম—সত্যবাবু বলেন কুশী, নেপা বোস—এদেরও বহু বিচিত্র সব কাহিনী। লজ্জার গৌরবের সাধনার।

এই প্রসঙ্গে কত কি বিদেশী বিখ্যাত নামের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে। গ্যারিক, হার্বার্ট ট্রী, এলেন টেরি আরও কত কি। গ্যারিক নাকি গিরিশবাবুর ম্যাকবেথ অভিনয় দেখে গেছেন। এলেন টেরির নব্বুই বছর বয়সে জাতির দিক থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল, তার দশ পাউন্ড করে টিকিট, তাই কেনার জন্যে দূরদূরান্তর থেকে লোক এসে তুষারপাতের মধ্যে পথে রাত কাটিয়েছে। তিনি চেয়ারে বসে পোর্শিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ঐ বয়সেও।

কিন্তু শুধুই থিয়েটার যাত্রা নয়—সত্যবাবুর উৎসাহ সব দিকেই। কবে নাটোরে সাহিত্য সম্মেলন করতে গিয়ে রবি ঠাকুরের কি দুর্দশা হয়েছিল, সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে কার তুমুল ঝগড়া হয়—এসব গল্পের পুঁজিও কম নয়। ক্ষমতা কম, রিটায়ার করে অর্থসামর্থ্য শুধু কমে গেছে, এখনও তিনটি আইবুড়ো মেয়ে বাড়িতে—কিন্তু উৎসাহ কমেনি, জীবনের সৌন্দর্যর দিক, রসসৃষ্টির দিক জানবার ও জানাবার। পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করেই সে আনন্দ কিছুটা উপভোগ করেন।

এই বন্ধুদের সাহচর্য আর বই—এই দুটিই আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়। বইয়ের মধ্যেই শান্তি, প্রকৃত বন্ধুত্ব।

একটা ঘটনা ওর আজও মনে আছে।

স্কুল পাঠ্য বই বাড়িতে পড়ার অভ্যেস কখনও ছিল না। কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে মনে হল এবার কিছু পড়া দরকার। এমন অনেক বই আছে যা ছোঁওয়া পর্যন্ত হয়নি, চেহারাই দেখেনি। যখন আর দিন কুড়ি পঁচিশ আছে—তখন থেকে সত্যিই মন দিয়ে পড়তে লাগল। দাদা ওর প্রয়োজন বুঝে নিজের ঘর ছেড়ে দিলেন। রাত্রি ছাড়া নিভৃতি মেলে না। রাত্রেই অনেকক্ষণ পর্যন্ত পড়তে লাগল তাই।

যেদিন পরীক্ষা শুরু হবে তার আগের দিন অনেক বেশী রাত পর্যন্ত পড়ার সংকল্প ছিল। কেরোসিনের একটা টেবল ল্যাম্প জ্বলে। চিমনিটা ভাল করে মোছা দরকার। আলমারির মাথার ওপর ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি থাকে, তার মধ্যে থেকে পরিষ্কার 'ন্যাকড়া' বার করতে গিয়ে দেখল,

কাপড়ের ভেতর একখানা বই। রাতারাতি বহু আলোচিত বহু প্রশংসিত ইংরেজী উপন্যাস। এক সপ্তাহে না এক মাসে নাকি এই বই এক লক্ষ বিক্রী হয়েছে। খবরের কাগজে নিজেই দেখেছে খবরটা।

সুতরাং বইয়ের খ্যাতি তো জানাই। কৌতূহল বা আগ্রহ অদম্য। দাদাও ছোট ভাইয়ের প্রকৃতি জানতেন, তাই ভাইয়ের দৃষ্টিতে না পড়ে এই জন্যেই অমন উদ্ভট জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন।

না, না। এ বই এ চারটে দিন পড়া চলবে না। কিছুতেই না।

তবে একবার পাতা ওলটাতে দোষ কি?

গোপনেই নিয়ে গেল। যথারীতি খাওয়ার পর ঘরে দোর দিয়ে শিয়রে আলো রেখে বইয়ের স্তূপ নিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই পড়ত, একটা বদভ্যাস। কিন্তু প্রথমে ঐ বইটা পাতা উল্টে একটু দেখবে সে পাতা ওলটানো শেষ হল রাত চারটেয় —অর্থাৎ বইও শেষ হল তখন। একেবারেই খেয়াল নেই, পরীক্ষা বা পাঠ্যপুস্তকের কথা।

বইটার নাম 'ইফ উইনটার কামস', শেলীর একটা কবিতার লাইন থেকে নাম নেওয়া। হাচিনসন বোধহয় লেখক। আশ্চর্য এরপর অনেক বই লিখেছিলেন ভদ্রলোক কোনটাই আর জমেনি।

অবশ্য এতে একটা উপকার হয়েছিল।

সে বছরই ম্যাট্রিক পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়েছিল। নতুন ভাইস চ্যান্সেলার নিজে বিখ্যাত পণ্ডিত, সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তাঁরই নির্দেশে ইংরেজীর প্রশ্নপত্র সবচেয়ে কঠিন করা হয়েছিল। ইংরেজীটা ছেলেমেয়েরা একেবারেই শিখছে না, অথচ সেটাই শেখা দরকার—উচ্চশিক্ষা পেতে হলে, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে। তিনি সত্যকার উপকার করতেই চেয়েছিলেন।

আর সেইজন্যেই সে বছর সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার্থী ফেল করেছিল। চারটে বিষয়ে লেটার পেয়েও ফেল করেছে কেউ কেউ ওর সহপাঠীদের মধ্যে যাদের সহজে সগৌরবে পাস করার কথা, তারাও অনেকে ফেল করেছিল। পরের বছর তারা সবাই ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করল। বিনুর সারা-রাত জেগে ইংরেজী বই পড়ার ফলে—মাথায় গজগজ করছে তখন ফ্রেজ ইডিয়ম—বাছাই করা শব্দ—সে ডঙ্কা মেরে বেরিয়ে গেল।

এই পরীক্ষার সময়ও আর একটি 'বাজে কাজ'ও সমান তালে চলছিল—সে লেখা। ঐসব হাতে লেখা মাসিকের ঝাঁক তাকে সে সময়ও অব্যাহতি দেয়নি। মা রেগে সারা হতেন, 'ও আবার লেখক, আর্শোলা আবার পাখী'। তাতেই এত ভক্ত ওরা না জানি তাহলে কি গণ্ডমূর্খ। বিশেষ করে পরীক্ষা ঘনিয়ে আসছে—এ সময় এইসব ছেলেখেলায় বিষম আপত্তি তাঁর। আবার শুধু লেখাই নয়, ব্যসের কাগজ তারা ভিজে দুমড়ে করে রঙ তুলিও নিয়ে বাস—আনাড়ি হাতে ছবিও আঁকতে বসে। এটা ওরই সাধ —শিক্ষার সুযোগ হল না বলে আপশোসের সীমা নেই ওর।

আর একটা শখ ইদানীং হয়েছিল—নাটক লেখার। এটা বোধহয় সত্যবাবুরই সাহচর্যের ফল। ও'র প্রেরণাতেই বহু নাটক পড়েওছে এর মধ্যে, অভিনয়ও দেখেছে কিছু কিছু। দাদা কোথা থেকে পাস যোগাড় করে কয়েকটা ভাল বই দেখিয়েছেন। এ শখ সেইজন্যেই। নিজেই জানে এখন লিখতে গেলে ঐসব নাটক পড়া ও দেখার অভিজ্ঞতা তালগোল পাকিয়ে অন্য উপায় হবে এই ইচ্ছাটাও চাপতে পারে না, অদম্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু লেখার খাতা বা কাগজ কৈ।

প্রসন্নবাবু যাকে বলেন চোতা কাগজ, তা আছে। দাদার পরিত্যক্ত খাতা অনেক পড়ে থাকে, কোনটার হয়ত মাত্র অর্ধেকটা ব্যবহার হয়েছে, কোনটার তিন ভাগ—এসব কলেজের এক্সারসাইজে লাগে—আঁকজোক কষা, দুর্বোধ্য ডায়াগ্রাম আঁকা। এক একটা থেকে ত্রিশ চল্লিশ পাতা পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতেই গল্প লেখে আজকাল কিন্তু এইসব টুকরো কাগজে টানা নাটক লিখতে মন করে না। দূর. সে বড় বিশ্রী।

অবশ্য কেন যে মন করে না, কেন যে বিশ্রী—এ প্রশ্ন করলে সেও উত্তর দিতে পারত না। কেবলই মনে হত ওতে নাটকেব অপমান।

এরও সমাধান করে দিল বদ্যিপাড়ার একটি ছেলে। ছেলেটি ওর খুব অনুরাগী। লেখা চাইতে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ গল্প করে যেত। ওরই সমবয়সী কিম্বা হয়ত এক বছরের ছোটই হবে। তার কাছেই একদিন শখের কথাটা প্রকাশ করে ফেলেছিল। সে দিন দুই পরে এসে একখানা আনকোরা নতুন বাঁধানো খাতা দিয়ে গেল। কেবল প্রথম পৃষ্ঠায় নাম লিখে ফেলেছিল কে, যার খাতা সে-ই নিশ্চয়। সেইটেই একটু নিপুণ হাতে কাটা।

নাটকের যেদিন পত্তন করল গভীর রাত পর্যন্ত জেগে—সেদিন থেকে ঠিক এক মাস পরেই পরীক্ষা!

॥ ২৮ ॥

কলেজে পড়ার স্বপ্ন প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রই দেখে। বিনুও দেখেছিল।

কলেজে পড়ার সুখ অনেক। সকলেই আত্মীয়দের মধ্যে, পাড়া ঘরে, রাস্তায় রেস্তোরাঁয়, ট্রামে বাসে ট্রেনে কলেজের ছাত্র দেখে। একখানা খাতা হাতে কলেজে পড়তে যায়, বড় বড় চালের কথা বলে, নামের পদবীর আদ্য অক্ষর ধরে প্রফেসারদের উল্লেখ করে, সাড়ে দশটা চারটে স্কুলের মতো বন্ধ থাকতে হয় না, কবে কখন কতটুকু ক্লাস করে তার হিসেব পাওয়া যায় না—এ যদি স্বপ্ন দেখার মতো না হয় তাহলে আর কিসের স্বপ্ন দেখবে।

ওর দাদার অবশ্য এত স্বাধীনতা ছিল না, কাশীতেও কিছু কিছু বই নিয়ে কলেজে যেত, এখানে তো আরও বেশী। বি-এস-সি পড়া অনার্স নিয়ে খাটুনিও ছিল যথেষ্ট। ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারে খাটুনি নেই চমক আছে।

কিন্তু এতদিনের ঈপ্সিত বহু প্রতীক্ষিত এই আনন্দ বিধাতা বিনুর ভাগ্যে লেখেন নি। তার জীবনটাই যেন একটানা আশাভঙ্গের ইতিহাস।

আরও বিপদ কলেজে মন বসে না, ঘরেও টিকতে পারে না। বিষম অশান্তি মনে মনেই কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। এত যে বইয়ের প্রতি প্রীতি, এ কলেজের বিরাট বিখ্যাত লাইব্রেরী হাতের মধ্যে, একটা লোক ক্রমাগত পড়ে গেলে তার কুড়ি বছর লাগবে বই শেষ হতে—তাও পারবে কি না সন্দেহ—সে তো, একটা বইতেও মন বসাতে পারে না। চিরদিন ইতিহাসের বইয়ের দিকে ঝোঁক, মোটা মোটা বই নেয়, কলেজ লাইব্রেরী থেকে, লাইব্রেরিয়ান ঈষৎ কৌতুক ঈষৎ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকান ওর এই বইয়ের নির্বাচন দেখে। নিশ্চয়ই ভাবেন ছোকরা চাল দেখাবার জন্যে নিচ্ছে শুধু।

আর দাঁড়ায়ও তাই। নেয়, পাতা উল্টায়, খানিকটা পড়ে হয়ত কোনটাই শেষ হয় না। আগেকার দিন হলে, এত বই হাতের কাছে দেখে আনন্দে পাগল হয়ে যেত। এখন কতকটা হর্ষিয়ে বিষাদ, তার চেয়েও বেশী, ট্যান্টালাসের অবস্থা। তৃষ্ণা অগাধ, তীব্র,—সামনে সুপেয় পানীয় —তবু তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারছে না।

অথচ কারণটা এত তুচ্ছ ... মনে হলে নিজেরই হাসি পায়।

পরীক্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সহ-পাঠীরা সবাই একটা করে টিউশানী ধরেছিল। কেউ কেউ দুটোও, মানে যোগাড় করতে পারলে। সকলকারই হাত খরচ দরকার। বাবা দাদা এঁদের কাছে চাইতে অসুবিধে অনেকেরই। এখন এমন একটা বয়স এসেছে—সব প্রয়োজনের কথা বলাও যায় না। সিগারেট ধরেছে অনেকেই। আবার এখনও পাকা হয়নি হয়ত, দু একটার ওপর দিয়েই চলছে, তবু তারও খরচা লাগে।

আরও তুচ্ছ তুচ্ছ কিন্তু রকমারী খরচা। বন্ধু-বান্ধবরা খাওয়ালে তাদেরও একদিন খাওয়াতে হয়। সে সময় খাওয়ানোর খরচা আজকের তুলনায় হাস্যকর—তিন পয়সা জোড়া ডিমের অমলেট, এক পয়সায় এক পীস বড় রুটি, এক পয়সায় চা। কলেজ স্কোয়ারের খাবারের দোকানে ঘিয়ে-ভাজা লুচি ছিল এক পয়সায় একখানা। এক আনার লুচি নিলে, দু তিনবার তরি

আর আলুর তরকারী নেওয়া চলত, তাতেই পেট ভরে যেত।

তবে পয়সার দামও ঢের। আরও কম—সেও হাস্যকর। টিউশ্যানীর মাইনে যৎসামান্য—পাঁচ ছ টাকা, নিচের ক্লাসের ছাত্র পড়ালে। আর তার জন্যেও যথেষ্ট উমেদারী করতে হত। বিনুর প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। দাদার যা আয় তাতে ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তাঁর কাছ থেকে এক পয়সা চাইতেও লজ্জা করে। তাও, অভাব বললেই—চাইলেও বিনা কৈফিয়তে পাওয়া যায় না। প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝলে তবে দেন।

মুশকিল হচ্ছে উমেদারী করার। কোথায় কাকে ধরবে? বিনুর আত্মীয় কেউ নেই, পরিচিতদের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে সবাই যখন ছেলে পড়াতে শুরু করে দিয়েছে, ও তখনও আকাশ-পাতাল ভাবছে, কাকে ধরলে কাজ হয়। দু একজনকে যে বলেনি তা নয়। তবে বন্ধুরা নিজেই প্রার্থী। একাধিক পেলেও তো অসুবিধে নেই, বরং সুবিধে। এখন তিন চার মাস অফুরন্ত সময়—তার পরও, যদি পাস করে এবং কলেজে ভর্তি হয়—দুটো টিউশ্যানী অন্তত অনেক দিন করা চলবে, ফার্স্ট ইয়ারটা তো বটেই।

ললিতের বাবা ধনী না হলেও পাড়ার সম্মানিত লোক। তাঁর ছেলের টিউশ্যানী পাবার অসুবিধে হবে না সে তো জানা কথাই—হয়ও নি। সে পরীক্ষা শুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার এক মাঝারি-গোছের সরকারী অফিসারের মেয়েকে পড়াতে শুরু করেছিল। এদের পরিবারের সঙ্গে ললিতদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, বহুদিনের হৃদ্যতা। বোধ হয় খুঁজলে একটা সম্পর্কও বেরোবে—বারেন্দ্রদের তো সকলেই সকলের আত্মীয়। মেয়ে পড়ানোর দায়িত্ব বিশেষ জানাশুনা না থাকলে তখন অল্পবয়সী ছেলেকে কেউ দিত না। মেয়েটি অবশ্য ছোট, বছর দশ এগারো বয়স—সিকসথ নয় সেভেনথ্ ক্লাসে পড়ে—কিন্তু মাইনে সে তুলনায় অনেক, দশ টাকা। রীতিমতো ঈর্ষা করার মতোই টিউশ্যানী।

শেষে যখন সকলেই কোথাও না কোথাও লেগে গেল—মাইনে কম-বেশী যাই হোক, একা বিনু বেচারাই শুকনো মুখে ঘুরছে—অজিত বলে এক বন্ধু প্রায় ওকে ডেকে এক টিউশ্যানী ব্যবস্থা করে দিল। দুটি ছেলেকে পড়াতে হবে, একজন সিকস্থ আর একজন সেভেনথ ক্লাসে পড়ে—মাইনে ছ টাকা। খাবার সামান্য আয়, কি সব টুকটাক অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করেন, এর বেশী দিতে পারবেন না।

মনটা দমে গেল খুব। দুটো ছেলে দু ক্লাসে পড়ে—ছ টাকা।

অজিত পিঠ চাপড়ে বললে, 'ও কিছু ভাবিস না। ব্লাইণ্ড আঙ্কল ইজ বেটার দ্যান নো আঙ্কল। বন্দোর, ধুলে পড়ো। ভাল টিউশ্যানী পাও, এটা ছেড়ে দিও। ছেলে দুটো অগা—ওদের যে লেখাপড়া হবে না সে ওদের বাবাও জানে। পাড়ার কারুরই জানতে বাকী নেই, এমন গুণবান ছেলে। তবু এখন থেকেই গাড়োয়ান কি মুটে মজুরদের সঙ্গে মিশলে ষোল বছরেই তাড়িখোর পকেটমার হয়ে দাঁড়াবে—এই ভয়ে নামমাত্র ইস্কুল আর মাস্টার দিয়ে একটু আটকে রাখা। এই আর কি।'

অগত্যা তাই নিতে হল। না নিয়ে উপায় ছিল না। হাতে এক পয়সা নেই সতেরো আঠারো বছর বয়সে এ অবস্থা দুঃসহ। তার ওপর লজ্জারও অবধি ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের সবাই কোথাও না কোথাও লেগে গেছে—ওরই কিছু জুটল না আজ পর্যন্ত—এ যেন ওর একটা অক্ষমতা—নিজের কাছেই লজ্জার কারণ হয়ে উঠেছিল।

অজিত ছাড়া এও পাওয়া যেত না। অপর কেউ যেচে সেধে দিত না।

এই অজিত এক অদ্ভুত ছেলে। ভাল কি মন্দ—এক কথায় হিসেব করে বলা শক্ত।

বিনু এতদিন—যখন থেকে পরিচয় হয়েছে—মনে মনে একটু বিতৃষ্ণার চোখেই দেখত, ঘেন্না করত বললেও বোধহয় বেশী বলা হয় না। সাধ্যমতো এড়িয়ে চলত ওকে।

ওর সহপাঠী নয়। দুবার ইস্কুল বদল করেছে নাকি। পাড়ার ছেলে বলেই—বন্ধুর বন্ধু, এই হিসেবে আলাপ, তুই তোকারিও চলে। তবে অজিত বন্ধু করতেও পারে। ললিতদের বাড়ি থেকে এ পাড়া কিছু দূরে—তবুও ললিতও এ পাড়ায় আসে ওর সঙ্গে আড্ডা দিতে। অজিতের বয়সও হয়েছে বিনুর থেকেও। তিন চার বছরের বড়। স্বাস্থ্য যাইহোক, গঠন ভাল—বয়স বোধহয় লুকনোও যায় না। অজিত অবশ্য লুকোবার চেষ্টাও করে না। এসবে যত দোষই থাক, খুব প্রয়োজন না হলে মিথ্যে বলে না, এটা বিনুও দেখেছে মিলিয়ে।

অজিতের বাবা নেই, অনেক ছোট বেলায় মারা গেছেন। ছাত্র যে খুব খারাপ ছিল তা নয়—মনটা অতি অল্প বয়সেই যৌবনধর্মে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল বলে পড়াশুনোয় আর যেত না। গতবার ফেল করে এবার আবার দিয়েছে—নিজেই বলে 'না আর না। দেখিস এবার ঠিক পাস করব, সেকেণ্ড কি থার্ড ডিভিশ্যান হবে হয়ত, তবে পাস করব ঠিকই।'

এত বয়সে ম্যাট্রিক দেবার এবং মন এই পথে যাবার একটা কারণ ছিল অবশ্যই। পুরো এক বছর ওর নষ্ট হয়েছে ম্যালেরিয়ায় ভুগে, তার পরও ওর মা দীর্ঘ দিন ওকে স্কুলে পাঠান নি, শরীর দুর্বল বলে, দু তিন খেয়ে রেখে ছেলে খেলে বেড়াক—শরীর সারুক, তারপর ইস্কুলে যাবে। এই রোগা ছেলেটা, আমার—দশটার সময় হাতে-ভাতে করে খায়, তাতে কখনও শরীর থাকে।'

কিন্তু এই স্নেহই কাল হয়েছে। এতদিন হেসে খেলে বেড়াবার পর নতুন করে লেখাপড়ায় মন দিতে পারে না। তাছাড়া অনেক কুঅভ্যাস এসে জুটেছে। সে অভ্যাস চালিয়ে যাবারও প্রধান যা বাধা—আর্থিক অসঙ্গতি—তাও ওর ছিল না।

বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, মার হাতে কিছু গোপন সঞ্চয় আছে। বাড়ি নিজেদের, ছোট বাড়ি অবশ্য, তারও অর্ধেকটায় ভাড়া আছে। এ ছাড়া ঝিলের দিকে কিছু জমিও আছে, তাতে ঠিকে, প্রজা বসানো আছে ক ঘর, কেউ বছরে ন টাকা, কেউ বারো টাকা ভাড়া দেয়। তবে প্রজাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা ভাল—নিয়মিত খাজনা বা ভাড়া উশুল দেয়। আর কিছু হাতেও পুঁজি—অল্পস্বল্প তেজারতিও করেন ভদ্রমহিলা।

সে যাই হোক— কোথা থেকে কি আসছে তা নিয়ে অজিত কখনও মাথাও ঘামায় নি, তার হাতখরচারও অভাব হয় নি কখনও। অবশ্য সে হাতখরচা বড়-লোকের মতো নয়। কখনও মা দেব না বললে, ব্রহ্মাস্ত্র তার হাতে আছে। গোপনে দোকান থেকে খেয়ে এসে, এক বেলা বাড়িতে খাওয়া বন্ধ করে, বলে আমার জন্যই যখন এত খরচ হচ্ছে, খাওয়াটাও বাদ দাও। নিজে রোজগার করতে পারি খাবো—নইলে খাবো না।' অতঃপর যা চেয়েছিল তার থেকে বেশী দিয়ে সন্ধি করা ছাড়া মায়ের উপায় কি?

অজিত নিজেই গল্প করে আর হাসে।

বন্ধুরা হয়ত বলে, 'তা এমনি করেই কি চলবে?'

'চলছে তো। যদি বিয়ে থা করতে হয় তাহলে অবশ্য তার আগে চাকরি বাকরি দেখতে হবে। তবে সে আমার এখন ইচ্ছেও নেই, বিয়ে হলেই মার দুর্গতি—সে আমি বেশ জানি। যাক না কিছু দিন। আমরা দরকার তো মিটে যাচ্ছে।'

এ 'দরকার' বড় বিচিত্র, তা মেটাবার পদ্ধতিও তাই।

অসুস্থতার অজুহাতে মা ভাল ভাল ওষুধ ও পথ্য খাইয়ে পুষ্ট করেছে. বয়সও কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পৌঁছে গেছে যথাসময়েই এখনই জীবিকার পিছনে ছোটা-ছুটি করবার কোন কারণ নেই। ওর বাবা শিক্ষক ছিলেন, নিরীহ ভদ্রলোক—তাঁর অকালমৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত, ছেলেটিকে সহানুভূতির চোখে দেখে পাড়ার লোক। আত্মীয়ের মতো মনে করে।

যৌবনে একটা বিশেষ ক্ষুধা দেখা দেয়—অজিতের এ যৌবনধর্ম একটু অস্বাভা-

বিক রকমের বেশী। ওর সব পরিচয় একদিনে পায়নি বিনু। ক্রমে ক্রমে শুনেছে। কিছু বলেছে অজিত নিজেই—তার কাছে এটা বাহাদুরী—কিছু শুনেছে পাড়ার বন্ধুদের কাছ থেকে। ললিতও তার মধ্যে একজন। এতটা বিশ্বাস হ'ত না, কিছুই হ'ত না—তবে কিছু কিছু দুই আর দুইয়ে চার নিজেই মিলিয়ে পেয়েছে বিনু।

সুযোগও যথেষ্ট। বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ছেলে, পরোপকারী আপাতদৃষ্টিতে ভদ্র সভ্য ছেলে, বিড়ি-সিগারেট পর্যন্ত খায় না, লোকের দায়ে আদায়ে নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। এমন ছেলেকে সবাই বিশ্বাস করে, তার ওপর নির্ভর করে।

একজনের ঘুরে বেড়ানো চাকরি, এক এক সময় বাড়িতে কেউ থাকে না, থাকার মতো তেমন কেউ নেইও—ঘরে অনুত্তীর্ণ-যৌবনা স্ত্রী এবং কিশোরী কন্যা। তাদের কে আগলায়? অজিত আছে, ভয় কি। বাড়িতে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও এক ভদ্রলোকের স্ত্রী একা থাকতে পারেন না, ভদ্রলোককে অথচ মধ্যে মধ্যে বাইরে যেতেই হয়। সেও অজিত আছে।

তবে অজিত যে এই সব পরোপকারের মূল্য নেয়—তা ভদ্রলোকদের জানার কথা নয়, জানেও না। সে মূল্য শোধ দেয় ঐ ধরনের মধ্যবয়সী, অল্পবয়সী বা কিশোরী কন্যার দল। মা ও মেয়ে একই সঙ্গে এই ভদ্রতার ঋণ শোধ করে অনেক সময়—পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই।

কারও অসুখ-বিসুখ করেছে, শক্ত অসুখ। অজিত আছে, রাতের পর রাত জাগবে। মা ব্যাকুল হন, ছেলের শরীর খারাপ হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় কিন্তু অজিত থামিয়ে দেয় তাঁকে, 'এই তো সারা দিন ঘুমুচ্ছি, তোমার সামনেই। একই তো কথা। ক ঘণ্টা ঘুমুচ্ছি সেটা হিসেব করো। আর পাড়াপ্রতিবেশী এদের জন্যে এটুকু না করলে আর মানুষ কি? তাদের জন্য না করলে তোমাদের বিপদে তারা এসে দাঁড়াবে কেন?

অসুস্থ বা মুমূর্ষু রোগীর সেবা করতে গিয়েও পারিশ্রমিক আদায় হয়। হয়ত সব ক্ষেত্রে নয়, যেখানে কেউ নেই, না মেয়ে না অল্পবয়সী ছেলে—সেখানে আর কি হবে। ঠিক এতটাই হিসেব করে যে আসত রোগীর সেবা করতে তাও না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটা না একটা কেউ জুটে যেত। আর এ বিষয়ে ওর সাহস দক্ষতা অপরিসীম, হয়ত একটা চৌম্বুক শক্তিও ছিল। সেটা ঈশ্বর দত্ত, নইলে খুব রূপবান কিছু নয়। বন্ধুরা বলে, অজিত নিজ তো বলেই, এদিকে দৈহিক কৃতিত্বও অসাধারণ রকমের বেশী তার। ক্ষুধাও।

অজিত শাস্ত্রেরও দোহাই পাড়ে মধ্যে মধ্যে। বলে, 'আমাদের হেড স্যার একটা গল্প বলেছিলেন, কে একটা সাপকে নাকি কেষ্ট ঠাকুর একবার কলজে কামড়িয়ে খুব, বলে—তুই এমন করে বিষ ছড়াস কেন রে, কেউ জলে নামতে পারে না! তা সে শালার সাপও তেমনি, উত্তর দিলে, তুমি তো শুনিচি সাক্ষাৎ ভগবান, তুমি জানো না কেন ছড়াই। আমাকে বিষই দিয়েছ তা আমি কি ছড়াব—চিনি? তো আমারও ঐ কথা, যেটা আমাকে যা করতে পাঠিয়েছে আমি তাই করি।'

এ বিষয়ে ওর রুচিও ছিল বহু-বিস্তৃত। পক্ষপাত নির্বিশেষে। সেটাতেই রাগ হ'ত বেশী। আগে তো বিনু ব্যাপারটা বুঝতেই পারত না। ছেলে দিয়ে কি হয়? অনেক পরে একদিন দোলু বুঝিয়ে দিয়েছিল। আগে তো বিশ্বাসই করতে চায় না, 'তুই সত্যি জানিস না ব্যাপারটা? মাইরি? যাঃ, গুল মারছিস!' তার পর বিনু দিব্যি গালতে বুঝিয়ে দিয়েছিল। শোনার পর বহুদিন পর্যন্ত অজিতকে এড়িয়ে চলত সে, পাছে সামনে পড়লে কথা কইতে হয়।

দোলুর কাছ থেকেই অনেক পরে একটা কথা শুনেছিল। ম্যাট্রিক পাশ করার পর—থার্ড ডিভিসনেই পাশ করেছিল অবশ্য—অজিত আর কলেজে পড়বার চেষ্টা করে নি—বৃথা জেনেই। টিউশানী তো করতই, আবার এক মিশনারী ফ্রি মাইনর স্কুলে বিনা মাইনেতে মাস্টারী নিয়েছিল। সেবা করার অজুহাতে অবশ্যই। ওখান থেকে উপার্জন তো হ'তই না, খরচাই হ'ত বেশী। ওপরের ক্লাসের ছেলেদের নিয়ে খাবারের দোকানে দেদার খাওয়াত, ঘুড়ি-লাটাই কিনে দিত—তারা অজিতদা বলতে অজ্ঞান ছিল। চোখের একটা বিশেষ ভঙ্গী করে দোলু বলেছিল, 'বুঝতেই পারছিস।'

অথচ, সত্যি সত্যিই কিছু সংগুণও ছিল। তার প্রমাণও বহু পেয়েছিল বিনু।

কেউ মারা গেলে লোক খুঁজতে যেতে হ'ত না। অজিত খবর পেলে সংকারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিত। লোকজন যা ডাকবার সে-ই যোগাড় করত, দরকার হ'লে পয়সাও খরচ করত, পরে তারা নিজে থেকে গরজ করে শোধ দিলে তো ভালই, না হ'লেও ও মুখ ফুটে চাইত না।

অসুখ শুনলেও—ভারী অসুখ—সে যে নিজে থেকে রাত জাগতে যেত—সব সময়ে শুধু নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতেই নয়। যেখানে সে-রকম কোন সম্ভাবনা নেই—সেখানেও যেত। দান ধ্যানও ওর পক্ষে যতটা সাধ্য করত—তাও গোপনে। একবার একটি ছেলে মা-বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিছল, ছেলেটির মা কেঁদে এসে পড়তেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল অজিত—ফিরল ছত্রিশ ঘণ্টা পরে ছেলেটিকে নিয়ে। এর মধ্যে কোথাও একটু বিশ্রাম করেনি। কিছু খায় নি। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছে যে শার্ট গায়ে দিয়ে তার পকেটে মাত্র টাকা খানেকের রেজগী ছিল, ট্রেনে কি গাড়িতেও চড়তে পারেনি, পায়ে হেঁটেই ঘুরেছে।

তবে এই বল্গাহীন প্রকৃতি একদিন প্রকৃতির নিয়মানুসারেই বিয়োগান্ত পরিণতির কারণ হ'ল ওর জীবনে। একটি মেয়ে একবার ওর বলি হয়েছিল, তখনকার কথা বিনু জানত না, এখানে থাকত না বিশেষ—দোলুর মুখে শুনেছে, যেমনভাবে নয়, তার দিদির সামনেই ঘটনা, সেজন্যে চেঁচাতে পারেনি। কি তেমনভাবে বাধা দিতে পারেনি। পরে মনে মনে গুমরে গুমরেই বোধহয়—যখন একটি অত্যন্ত সৎপাত্রে বিয়ে ঠিক হয়েছে, সকলেই মেয়েটার সৌভাগ্যে উল্লসিত বা ঈর্ষিত—মেয়েটা পাগল হয়ে গেল। বাবা মা চিকিৎসাদি যথেষ্ট করালেন, তবে আর বিয়ে দেবার মতো প্রকৃতিস্থ হ'ল না। বাড়িতে থাকত কদাচিৎ, পথে পথেই ঘুরত, একদিন ট্রেনে কাটা পড়ল।

এই পাগল হওয়া দেখেই অজিত যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। আর কোথাও যেত না, কারও বাড়িতেই না। এমন কি বিপদে-আপদেও যেত না আর। একটা কি সামান্য চাকরিও যোগাড় করে নিয়েছিল—আপিসে যেত আর বাড়িতে বসে থাকত। বিয়ে করতে রাজী হয়নি কিছুতেই।, মার বিস্তর কান্নাকাটিতেও না। মা মারা যাবার পর এক খুড়তুতো বোনকে বাড়ি-ঘরে বসিয়ে তীর্থ করতে যাবার নাম করে বেরিয়ে গিছল, আর বাড়ি ফেরেনি। কেউ বলে সে সন্ন্যাসী হয়েছে, কেউ বলে ঋষিকেশের এক আশ্রমে গোরুবাছুর দেখে, সেখানেই খেতে পায়—এইভাবে দিন গুজরাণ করছে। বিনুর এখন মাঝে মাঝে দুঃখ হয় ওর জন্যে—ওর কথাটা একদিক দিয়ে ঠিকই, কালীয় নাগের উদাহরণ—বিধাতা বিষই দিয়েছেন, সে বিষই ছড়িয়ে গেল।

।।২।।

ললিত দূরেই ছিল, তবু স্কুল জীবনে প্রতিদিন দেখা হ'ত, টেস্ট-এর পরও হয় ললিত আসত নয় বিনু যেত। কিন্তু পরীক্ষার পর যেন কেমন হয়ে গেল।

ললিত যে পাড়ায় আসে না তা নয়। আসলে আগে যে গাম্ভীর্য ছিল, যেটার জন্যে ওকে ভাল লেগেছিল প্রথম, সেটাই চলে গেল। অন্য ছ্যাবলা বন্ধুদের সঙ্গে অনায়াসে মিশে গেল। বিনুর মতে যে দলটা একান্ত অনভিপ্রেত সেই দলেই গিয়ে পড়ল। এ দল ছিল, তবে আড্ডা দেবার এমন অখণ্ড অবসর ছিল না। এখন এই আড্ডাই যেন সবচেয়ে লোভনীয় হয়ে উঠল ললিতের কাছে। সকালে একদফা দুপুর পর্যন্ত—বিকেলেও চারটে থেকে সাতটা—কোন মাঠের গাছতলায়, নয়ত পুকুর পাড়ে—নয়ত কারও রকে বসে—শুধুই বাজে কথার মালা গাঁথা এই চলত। সাতটার পর সকলেরই টিউশ্যনী, উঠে পড়তেই হ'ত। রবিবার টিউশানী থাকত না, সেদিন সিনেমা থাকত, না হলে রাত্রি সাড়ে নটা দশটা পর্যন্ত এই আড্ডায় কাটত।

বিনুও এ দলে মেশবার চেষ্টা করেছে। এখন অভিভাবকের এত কড়াকড়ি নেই, সময়ও বেশী। ললিতের সান্নিধ্য পাবে বলেই শুধু না—ললিতকে এই সংসর্গ থেকে মুক্ত করে নিজস্ব করে পাবে—এই আশাতেও।

(ক্রমশ)

পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

জমি-জমাগুলোর দখল চাই-ই। সংঘের সামনে প্রসারের এতবড় সুযোগ কম এসেছে। প্রয়োজনে ঘুষ দিতেও নির্দেশ আছে উপর থেকে। হাইকম্যান্ড টাকা ছড়াতে রাজী আছে। সরকারী লোক তো ঘুষ করে না এমন কাজ নেই, কিন্তু এই কাজটা। নতুন লোকটা কি টাকা নেবে। আগের লোকটি নেয় নি। ঘুষ! চমকে ওঠে নিজের ভিতরে নিখিলানন্দ। শ-পাঁচেক টাকা ঘুষ দিতে পারলে বোধহয় প্রথম চাকরীটা হয়ে যেত, কিন্তু সে দেয় নি। তার তখনকার যৌবন দিতে দেয় নি। ঘুষ দিয়ে নিজেকে কলঙ্কিত করার ইচ্ছে ছিল না বিভূতি মন্ডলের। নিখিলানন্দ ঘুষ দেবে, প্রয়োজনে অন্য ব্যবস্থাও করতে রাজী। জমি-জমাগুলো চাই-ই।

।।নয়।।

কলাবনি থেকে পার্বতী বাস ফিরছিল ঝাড়গ্রামের দিকে। বাস তখনো জঙ্গলের মোরাম রাস্তার ভিতরে। ফেরার সময় যাত্রী অনেক কম। বিমল দেখছিল সেই দীপঙ্কর চৌধুরী বাসে উঠে বসে আছে। ঝাড়গ্রামে যাবে। দীপঙ্কর চৌধুরীর চোখ দুটো চক চক করছে তার দিকে চেয়ে, কথা বলতে চায়, বিমল জরুরী কথা ছাড়া বলে না। বলার কি আছে, কলাবনিতে যা ঘটছে, তা ঘটনকই। এ-সবের বীজ বিশ-তিরিশ বছর আগে পোতা হয়েছে, এখন বিষ বৃক্ষ ডালপালা বিস্তার করে সূর্যের আলো প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে! বিষবৃক্ষ! বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা একটা বই আছে না! কবে পড়েছিল বিমল, এখন সব ভুলে বসে আছে। ম্যাট্রিক পাসের সার্টিফিকেটও হারিয়ে বসে আছে। বললে লোকে বিশ্বাস করবে না যা তার চেহারা আর পেশা হয়েছে [illegible] কথা লোকে বিশ্বাস করে না, [illegible]

বলাই ভাল। কয়েকজনকে বলতে গিয়ে পাগল আখ্যা পেয়েছে।

বাস হঠাৎ নেমে গেল। ড্রাইভার পরীক্ষিৎ চোখ ছোট করে মাথাটা সামনের কাঁচের সংগে ঠেকিয়ে দিল। বিমল পরীক্ষিৎ-এর দিকে তাকায়, চোখে জিজ্ঞাসা কি হল?

—যা হবার হয়েছে?

—হলোটা কি বল না। বিমল একটু মেজাজ দেখায়।

—ইস্কুলের ছানাগুলো...।

বিমলের মুখে সেই পরিচিত হাসি। সে স্বস্তি পায়। না তার পার্বতীর কিছু হয় নি। যত গন্ডগোল ঐ পরীক্ষিৎ আর ইস্কুলের ছেলে-ছোকরাগুলোর মধ্যে। পাটাশিমুল ইস্কুলের ছেলেগুলো বাসের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তাদের ইস্কুল ছুটি হয় চারটে দশে, বাস এখান থেকে কলাবনির দিকে যায় চারটে পনেরোতে। আজ বাস চারটের সময় কাঁসাই-এর ঘাটে পৌঁছে গিয়েছিল, তাই বিপত্তি। ইস্কুলের ছেলেগুলো এই বাসে বিনা টিকিটে নদী অবধি যায়, ওদিকে যাদের বাড়ি। বাস আগে এসে গেলে, তাদের যাওয়া হয় না, তখন প্রতিশোধ নেয়।

—দোষ তো তোমার। বিমল পরীক্ষিৎকে বলে।

—কেন?

—অ্যাডভান্স টাইমে গাড়ি আন কেন?

পরীক্ষিৎ চুপ করে থাকে। বাসের যাত্রীরা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। উসখুস করে কয়েকজন জানালা দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ব্যাপারটা দেখতে চেষ্টা করে। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। দু' পাশের ঘন শাল মহুয়ার বন তেমনি আছে, মাঝখানে উঁচু নিচু তরঙ্গায়িত টকটকে লাল মোরাম রাস্তা মোটাসোটা সাপের মত পড়ে আছে।

—কি হয়েছে বিমলবাবু, বাস যাবে তো? দীপঙ্কর বিমলকে জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, যাবে তো বটেই, বলে বিমল পরীক্ষিৎ-এর দিকে তাকায়, রাস্তায় নামবো?

—নামতে তো হবেই। পরীক্ষিৎ জবাব দেয়।

বিমল বাস থেকে নেমে পড়ে। পরীক্ষিৎ এর উপর রাগে গা হাত পা চিড়বিড় করছে। একটু তর সয় না ওর, তাড়াতাড়ি ট্রিপ শেষ করে ঝাড়গ্রামে গিয়ে মালের বোতল নিয়ে বসলেই হল। অ্যাডভান্স টাইমে বাস চালানোর জন্য যে কত লোকের অসুবিধে হয় তা বোঝে না। এর পর যখন লোকে ক্ষেপে যাবে তখন বুঝবে। ইস্কুলের ছেলেগুলো তো মহা ক্ষেপেছে। আর লোকেরাও বলিহারি, তাদের যাবতীয় রাগ ঝাড়বে এই বাসখানার উপর। পার্বতীর কাচ ভাঙবে, বডি দুমড়ে দেবে, পার্বতীর দোষটা কি? অবলা জীব, কথা বলতে পারে না।

ইস্কুলের ছেলেগুলো হেঁটে গেছে বাড়ি। যাওয়ার পথে সমস্ত রাস্তায় দু'-পাশে বড় বড় পাথরের টুকরো ফেলে রেখে গেছে। রাস্তা সারানোর জন্য পাথরগুলো স্তূপ করে রাখা আছে দু' পাশে। এই পাথর যদি পার্বতীর টায়ারে লাগে তো টায়ারের দফারফা হয়ে যাবে। পার্বতী অকেজো, মালিক ছাড়বে না। পার্বতী বন্ধ থাকলে বিমলের সময় কাটবে কি করে?

বাস হর্ন দেয়। খুব আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করে। বিমল তার ভারি শরীর নিয়ে দৌড়চ্ছে রাস্তার উপর, পাথর তুলছে আর জঙ্গলে ফেলছে। মাঝে মধ্যে হাত তুলে বাসকে থামতে বলছে: পার্বতীর যাওয়ার পথ মসৃণ করে না তুললে নয়। বাসের ভিতরে হাসির গুঞ্জন উঠেছে। সকলের চোখে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গিয়ে বিমল ভীষণ রকম হাস্যকর চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

—দাঁড়াও, এ পাথরখানায় ওজন কম নয়। বিমল চিৎকার করছে।

পরীক্ষিৎ বাস থামায়। রাজার মত বসে আছে স্টীয়ারিং-এ হাত রেখে। এইভাবে বাস থামে আবার চলে যতক্ষণ না পাটাশিমুলে এসে পৌঁছয়। তারপরই রাস্তা ফাঁকা। বিমল তার জামায় হাত মুছতে মুছতে উঠে আসে।

বাস স্পীড নেয়, বিমল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে ঢুকছে না। চৈতন্যর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, কে টিকিট কাটতে আরম্ভ করবে। চৈতন্য বুঝেছে আজ আর বিমলবাবু টিকিট নেবে না, মুখের হাবভাব তাই বলছে। টিকিট তাকেই নিয়ে নিতে হবে প্যাসেঞ্জার নামার সময়! আজ দু' পয়সা সরানো যাবে!

দীপঙ্কর বিস্ময়ের চোখে বিমলের দিকে তাকিয়ে আছে। বাসের ভিতরের হাসি থেমে গেছে যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আবার: লোকটার সঙ্গে কথা বলতে হবে। অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। এত হাস্যকর কাজ করে উঠে এলে মুখে তার কোন চিহ্ন নেই। খুব স্বাভাবিক, বরং গৌরবের ভারে ভারি হয়ে আছে ওর বড়সড় মুখমন্ডল।

বাসের ভিতরের লোক হাসছিল সে যখন রাস্তার দৌড়ে দৌড়ে পাথর সরাচ্ছিল। হাসুক। লোকের হাসার বিমল বাড়ুজ্যের কিছু যায় আসে না। এখন সকলে চুপ করে আছে, সামনাসামনি হাসতে লজ্জা পাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে সকলেই হাসছে। মানুষ মানুষের কথা বোঝে না। বিমল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার এই কাজে মানুষে হাসে, দীপঙ্কর চৌধুরীও হেসেছে, জানে না, মানুষের যাত্রাপথ মসৃণ করাই মানুষের ধর্ম।

বিমলের বয়স কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে ঘটমান পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে ভাবতে ভাল লাগে। সে অনুভব করতে থাকে যাসটা আস্তে আস্তে পাখা মেলে দিয়েছে আকাশে। নীল রঙের পার্বতী, নীল রঙের ময়ূর হয়ে গেছে। ময়ূরের পিঠে বসে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জগৎখ্যাত পরিব্রাজক। বিমল নিজের মনে ফিক ফিক করে হাসতে থাকে। চোখ মুখ অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় জ্বল জ্বল করতে থাকে।

সেই সারা রাত কলকাতার ফুটপাথে কাটিয়ে পরদিন রথীন সমাদ্দারের সঙ্গে সময় মত যোগাযোগ হল। তার ঘরে গিয়ে উঠল বিমল। বাগবাজারে পৈতৃক বাড়ি। এককালে সমাদ্দারদের অবস্থা ভাল ছিল। এখন ধসে গেছে। সমস্ত বাড়িটাই সেই ধ্বসের চিহ্ন বহন করে দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মত। খুব কাছেই গঙ্গা।

সমাদ্দারদের পড়তি অবস্থা। বাড়ি থেকে সর্বক্ষণ চুন সুরকি খসছে। দোতলার উপর তলাটা খা খা করছে। তিনটে ঘরই তালা বন্ধ, একটার তালা খুলে বিমলের থাকার ব্যবস্থা হল। রথীনের সম্বল বলতে এক বুড়িমা, এক দাদা আর ছোট একটা ভাই। রথীন চাকরি করে রাইটার্সে, ক্লার্ক, বোর্ড অব রেভিনিউতে। ওর দাদা একটা বিদেশী ওষুধ কোম্পানীর সেলসম্যান। দুজনের কেউ বিয়ে করে নি। ছোট ভাই কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকেছে। ইউনিয়ন করে। পোস্টার মারতে বেরোয় রাত দুপুরে। সে জন্যই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। রথীনের দাদা কোম্পানীর কাজে সারা মাসই বাইরে থাকে, এই দিল্লি এই গোহাটি করে বেড়াচ্ছে।

বিমল যেদিন দুপুরে এল সেদিন বিকেলেই রথীনের ছোট ভাই উৎপলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়। বিমল যেন মনের মত মানুষ পেয়ে বর্তে যায়। রথীনকে সে ঠিক ধরতে পারছে না তবু খারাপ লাগছে না, আকর্ষণ বাড়ছে। রথীন যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে, সাধ্যে পারা যাচ্ছে না। আসলে লোকটা কি ঠগ জোচ্চোর? কোন প্ল্যান আছে ওর মাথায়, বিমলকে নিয়ে রথীন খেলবে? কলকাতা বড় জটিল। বিশ্বাধর যা বলেছে তা যদি সত্যি হয়। কলাবনির বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতাকে চেনে না, পৃথিবীর মানুষকে চেনে না, যদি ওর কিছু হয়ে যায়! তবুও রথীনকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে, খুব শৈশবে জানা একটা কথা সে ভুলতে পারে না, বাবা কালপুরুষ চেনাতে চেনাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, নিজেকে কালপুরুষের মত করে গড়ে তোল, মানুষকে বিশ্বাস করো, মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ। কালপুরুষ হয়ে ওঠা হয় নি। মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখেছে বিমল, তাই একেবারে অচেনা মানুষটার সঙ্গে উঠে এসেছে তার বাড়িতে। কি হবে তার? নেই তো কিছুই। ভয় আসে অবিশ্বাস থেকে, বিশ্বাধরের ভয় আছে, তাই মানুষের প্রতি অবিশ্বাসও আছে।

রথীন নিশ্চয়ই ভাল, তার ভিতরে এক ধরনের পাগলামি আছে, আছে উদার হৃদয়। না হলে বিমলের মত এক অজ্ঞাত কুলশীল মানুষকে এনে বাড়িতে তোলে না।

রথীনের ভাই উৎপল এই নতুন অতিথিকে দেখে আকৃষ্ট হয়। সুদূর গ্রাম থেকে এসেছে। গ্রামের কত সমস্যা। বিমলকে সে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। বিমল এই সদ্য কৈশোর অতিক্রম করা যুবকটির কৌতূহলে অবাক হয়। নিজের উপর তার আস্থা ফিরে আসতে থাকে।

সে কলাবনির এক দরিদ্র চাষীর ছেলে। ব্রাহ্মণ লাঙ্গল ধরে না, সমাজ বাধা দেয়, কিন্তু তার বাবা নিজে হাতে জমিতে হাল করত। এছাড়া উপায় ছিল না। অবস্থা সব বাধ্য করায়। তাই কলাবনিতে সম্মান ছিল না বাবার। উৎকল ব্রাহ্মণদের সেখানে দোর্দণ্ড প্রতাপ, জমিজমা হাঁকিয়ে সব বড় মানুষ। সেখানে হাল ধরে জমিতে নেমে তার বাবা ব্রাহ্মণত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছিল। তাই বর্ণের অহংকার নেই বিমলের, নেই ভূসম্পত্তির অহঙ্কার। উৎপলের কৌতূহলে তার তো বিস্ময় জাগারই কথা মনের ভিতরে। তার এত কথা জানানোর আছে এই যুবকটিকে?

বিমল যথাসাধ্য প্রশ্নের জবাব দিতে থাকে। নিজের অনেক অব্যক্ত কথা জানায় যুবকটিকে। রথীনের সঙ্গে কথাবার্তার পর যেসব দ্বন্দ্ব জেগেছিল মনের ভিতরে সব উগরে দেয় উৎপলের কাছে। এই পায়ে হেঁটে দেশ ভ্রমণ এটা যে এক ধরনের মানুষের শক্তির অপচয় সেটা বোঝায় উৎপলকে। রথীনকে বোঝানোর সাহস ছিল না বিমলের। কেননা নিজের বিশ্বাস সম্পর্কেও সে যথেষ্ট স্থিরনিশ্চয় নয়। আলোচনা করে সব পরিষ্কার করে নেবে বিমল। সে উৎপলকে বোঝায়, এই এনার্জি অন্য কোথাও ব্যয়িত হোক, হ্যাঁ বিমল রথীনের সঙ্গে থাকবে। তার তো কোন শিকল নেই পিছনে।

উৎপল এখানেই বিমলকে কন্ট্রাডিক্ট করে, হ্যাঁ আপনি যা বলেছেন সেটা ঠিক, এই বিশ শতকের শেষে এই ধরনের পাগলামির অর্থ হয় না, তবে এতে যেভাবে মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবেন তা অন্য কোন ভাবেই নয়। চোখ খোলা রাখলে বোধ সঠিক থাকলে বিশাল অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নিয়ে ফিরে আসবেন। ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণ দু চোখ ভরে দেখতে পারবেন। এমন সুযোগ কখনো আসে না। আপনি কি ভারতবর্ষ দেখতে চান?

বিমল চুপ করে থাকে, কি বলবে? হ্যাঁ সেতো দেখতে চায়, কিন্তু কিভাবে দেখবে ভারতবর্ষকে। এই বিশ শতকে আকাশপথে শব্দের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইউরোপ চলে যাওয়া যায়, সেখানে দু পা ব্যবহার করে এগোন অর্থে দুশো বছর পেছিয়ে যাওয়া। আগামীর যুগে পৌঁছিয়ে যাওয়া কি মানুষের কাজ।

—হ্যাঁ বিজ্ঞানের যুগে এসব মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বিজ্ঞানকে কিভাবে মানুষ ব্যবহার করে সেটা দেখবেন। উৎপল হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলতে থাকে।

বিজ্ঞানকে মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করুন, বিজ্ঞান মানুষের ভিতর বিচ্ছিন্নতা আনার জন্য নয় আপনি শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উত্তর মেরু পৌঁছে যেতে পারেন অনায়াসে, কিন্তু উত্তর মেরু আবিষ্কর্তার অভিজ্ঞতার পাশে আপনার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার শূন্য, এটা তো ঠিক। অভিজ্ঞতা ব্যতীত পৃথিবীতে এক পা চলা যায় না।

বিমল থমকে যায়। মনের ভিতরে তোলপাড় হয়। উৎপলের প্রতিটি বাক্য তার চেতনায় বিদ্ধ হতে থাকে। সমস্তটা সে আস্তে আস্তে উপলব্ধির স্তরে নিয়ে আসে। শেষে তার মাথা নত হয়ে যায়। এত সহজে এত কঠিন কথাটা সে বলে দিল! বিমলের মনের অন্ধকার নিমেষে দূর হয়ে যায়।

সন্ধ্যের পর উৎপল চলে যায়। বিমল আবার একা। সে এই জীর্ণ বাড়িটার ছাদে একা একা দাঁড়িয়ে থাকে। উপরে এক আকাশ নক্ষত্র। এতদিন কলকাতায় এসে সে বুক ভরে আকাশ দেখেনি। বিমল নভেম্বরের আকাশে কালপুরুষ খুঁজতে থাকে। অল্প স্বল্প কুয়াশা পড়েছে, মাথায় হিম নামছে। উপরের আকাশে নক্ষত্ররা খুব স্বচ্ছ নয়। নক্ষত্ররা অনেক উপরে, সেখানে শীত বোধহয় খুব গাঢ়। তাই শীতের সময় ওরা লুকিয়ে থাকে।

মনে পড়তে থাকে কলাবনির কথা। বাবার কথা, মায়ের কথা। বাবা খুব শৈশবে সন্ধ্যের আকাশ দেখিয়ে নক্ষত্র চিনিয়ে ছিলেন, সেই চেনাটাই খুব সঠিক হয়েছিল। শৈশবই শিক্ষার প্রশস্ত সময়। শৈশবের দেখা কখনো ভুল হয় না, যদি না ভুল শেখা হয়। বাবা একের পর এক নক্ষত্রকে আবিষ্কার করে তুলে ধরতেন বিমলের সামনে। সপ্তর্ষি মণ্ডল এক অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে ফুটে আছে মহা-পৃথিবীর উপর। নক্ষত্রের পর নক্ষত্র যোগ দিয়ে একটা যোদ্ধার চেহারা আকাশে ফুটে ওঠে। কোমরে তরবারি, হাতে ধনুক নিয়ে অপরূপ যোদ্ধা আকাশে জেগে আছে। মনে মনে তাকে আবিষ্কার করতে হয় নক্ষত্র চিনে। সেই কালপুরুষ। মহা-পৃথিবীর [illegible]। তাকে জানাই বড় কথা, মনের [illegible] মূর্তি গড়ে তোলাই বড় কথা। এই আকাশ কলাবনির মাথায়ও জেগে আছে। এই কালপুরুষ কলাবনির আকাশে যেমন কলকাতার

আকাশেও তেমন। সমস্ত পৃথিবীর আকাশেই কালপুরুষ জেগে আছে। তাকে যারা আবিষ্কার করেছে তারাই হয়ে উঠেছে মহৎ, জাতিকে করে তুলেছে মৃত্যুঞ্জয়।

বিমল ভাবতে থাকে তার মত কলাবনিতেও নিশ্চত কেউ আকাশের দিকে চেয়ে কালপুরুষ সপ্তর্ষি মণ্ডলকে আবিষ্কার করছে, জয়পুর, শ্রীনগর, চম্বলের আকাশেও কালপুরুষ একা নেই। মাটির পৃথিবীর কেউ না কেউ তার সংগী হয়েছে নিশ্চিত। উৎপলাকে বিমলের ভীষণ ভাল লেগেছে।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার ঠিক নেই। কাছের গংগায় ভোঁ বাজে স্টীমারের। বিমলের বুকের ভিতরটা ছমছম করে ওঠে। কোথায় জন্ম কোথায় বৃদ্ধি, কোথায় এসে এই রাতে সে দাঁড়িয়ে! এরপর আর এক সন্ধ্যায় কোথায় চলে যাবে সে। কোন গহীন প্রদেশে, অজানা মানুষের ভিতর। মানুষ পাখির জাত, আজ এখানে বসতি করেছে, কাল অন্য কোথাও। বিমলের সামনের জীবন তো তাকে পাখি করে তুলছে নিশ্চিত। কাঁধে কে এসে হাত দেয়, বিমল চমকে ওঠে।

—মন খারাপ লাগছে?

বিমল দেখে রথীন এসে দাঁড়িয়েছে। একটা পাজামার উপর সাদা পাঞ্জাবী পরেছে পাঞ্জাবীটা গায়ে এঁটে বসেছে। রথীনের স্বাস্থ্যটা পেটান, ঠিক ঠিক জায়গায় ঠিক ঠিক মাংস। কোথাও এতটুকু কমবেশী নেই।

—কখন? বিমল অস্ফুট প্রশ্ন করে।

—এই একটু আগে, অনেক ব্যবস্থা করতে হবে, সেসব করছি।

বিমল চুপ করে রথীনের দিকে চেয়ে থাকে। গঙ্গায় আবার ভোঁ বেজে ওঠে। নদীর ওপারের জনপদের আলোকমালা কুয়াশায় ম্রিয়মান। বিমল দেখে রথীন স্তব্ধ মূর্তি হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। কথা বলছে না। নিশ্চুপ সময় কেটে যায় অনেক। তারপর হঠাৎ ফিসফিস কথা শুনে বিমল চমকে যায়, এই স্টীমারের ভোঁ আমার ভিতরটা ফালা ফালা করে দেয় জানো বিমল!

দুদিনেই ওরা আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছিল। রথীনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বিমল। কি বলছে সমাদ্দার!

—খুব ছোটবেলায় ভাবতাম নাবিক হব, যাক ওসব কথা যাক, যা ভাবা যায় তা তো হয় না, তা তোমার কেমন লাগছে এখানে।

—ভাল।

উৎপলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

—হ্যাঁ, অনেক কথা হল। বিমল আস্তে আস্তে জবাব দেয়।

—চুপচাপ এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ঠাণ্ডা লাগবে।

—কিছু হবে না।

—মন খারাপ লাগছে?

—কই না তো? বিমল চমকে বলে ওঠে।

রথীন হাসতে থাকে, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে, বেরিয়ে পড় মহাযাত্রায়, সব ঠিক হয়ে যাবে। রথীন পায়চারি করতে থাকে।

—কি বলছিলেন তখন? বিমল ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

—কি? রথীন চমকায়।

—নাবিকের কথা!

রথীন আবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়, ফিসফিস করে, ওসব বলতে নেই, বললে সকলে ভাবে উদ্ভট মানুষ। আমার কথা আমার থাক।

—আপনি নাবিক হতে চেয়েছিলেন?

হ্যাঁ, ভূগোল বইটার সমস্ত ম্যাপ আমার চোখের সামনে ভাসত, রথীন কেমন আত্মস্থের মত বলে।

বিমলের চোখমুখে ঘন বিস্ময়ে জমে ওঠে।

—খুব ছোটবেলায় পরিচয় হয়েছিল কলম্বাসের সঙ্গে, ক্যাপ্টেন কুক... এরা আমার স্বপ্নের মানুষ ছিলেন।

বিমল রথীনের কাছ থেকে সরে যায়, রথীন এই অন্ধকারে হৃদয় খুলে দিয়েছে, যাবতীয় কথা আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ে কুয়াশায় ঝুলতে ঝুলতে শুরু করেছে।

আমার মনে হত একটা না একটা দেশ নিশ্চয়ই অনাবিষ্কৃত থেকে থাকবে, সেই সময়ে খুব অভিমান হত কলম্বাসের উপর, ক্যাপ্টেন কুক, আমুণ্ডসেন-এর উপর, দেশ আবিষ্কার হয়ে গেল সব, সমস্ত জনপদ সভ্যতার আলো পেয়ে গেল, আমার জন্য কি থাকল? আমি কি আবিষ্কার করব! অরণ্য সমুদ্রের আড়ালে কি একটা দেশও নেই যা এখনো সভ্যতার আলো পায়নি।

বিমল নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। চোখের সামনে একটা মানুষ আবিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। রথীন সমাদ্দার কথা থামায় নি।

এরপর যখন বয়স বাড়ল দেখলাম আমার ঈর্ষার মানুষ অনেক, ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, বার্ণিয়ে, মার্কোপোলো এতসব বড়মানুষ এসে গেছেন আমার আগে। অচেনা দেশের কথা সব জানিয়ে দিয়েছেন এঁরা। এখন পৃথিবীটা কত ছোট হয়ে গেছে, দূরত্বটা কোন ব্যাপার নয়। উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, এখন পর্যটকের দিন ফুরিয়েছে, ইতিহাস তো আর পর্যটকের কথায় লেখা হবে না।

বিমলের সামনে দাঁড়িয়ে কে? সে ক্রমশঃ অবাক হয়ে যাচ্ছিল। এসব কথা কে বলছে! বিমলের ভিতরটা ঝিমঝিম করতে থাকে। এসব কথা রথীন জানল কি করে! কলাবনির মানুষটার ভিতরে কত উঁচছে থাকে। সব অব্যক্ত। সে তো সাজিয়ে কথা বলতে পারে না। সাজিয়ে না বললে কথা সুন্দর হয়না। কথা সুন্দর না হলে তার দাম থাকে না। তার সমস্ত ইচ্ছেগুলো তাই মাথার ভিতরে জমতে জমতে ব্যর্থ হয়ে যায়, অকেজো হয়ে পড়ে অনুভূতি। কে যেন বলেছিল, ঠিক তোমার মত মানুষ এই পৃথিবীতে তুমি আর একটা খুঁজে পাবে, একজন মানুষের সমপর্যায়ের আর একজন আছে। একথা কি সত্যি! রথীন কি বিমল! নাকি বিমলই রথীন। তার দেহ থেকে আর একটা মানুষ বেরিয়ে এসে রথীন সমাদ্দারের মাথার ভিতরে ঢুকে পড়ে তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে। রথীন সমাদ্দার নয়, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ই কথা বলছে। এসব কথা উল্টেপাল্টে সবই তো তার।

রথীনকে ভেবেছিল খেয়ালী মানুষ। পয়সাঅলা ঘরের ছেলে, বদখেয়ালে পয়সা পয়সা ওড়াচ্ছে। কিন্তু বুকের ভিতর কি সর্বনাশা ইচ্ছেগুলোকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় রথীন সমাদ্দার! একটা দীর্ঘদেহী মানুষ ক্রমশঃ নুব্জ হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। ইতিহাসে নাম লিখে রেখে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল রথীনের, সভ্যতার আলো নিয়ে এক গহীন প্রদেশে প্রবেশ করবার ইচ্ছে ছিল মানুষটার। ইতিহাস ওর জন্য একটা শব্দও ব্যয় করবে না এটা জেনে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। মধ্য সমুদ্রে ঝড়ে জাহাজের শব ভেসে গেছে! এই যাত্রা হয়ত নিস্ফল!

বিমল দেখতে থাকে রথীনকে। এই রথীন হয়ত তারই দশ বছর পরের অবস্থা। দশ বছর এগিয়ে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিমলের গা হাত পা ভারি হয়ে ওঠে। বুকের ভেতরটা কেমন করছে। অন্য কোন কথা হোক। এসব অলীক ভাবনায় ডুবে থেকে কষ্ট পেয়ে লাভ কি!

—চল চা খেয়ে আসি।

হ্যাঁ তাই চল, রথীন হঠাৎ যেন লজ্জা পেয়েছে, সে এগিয়ে বিমলের পিঠে হাত রাখে, বড় উল্টোপাল্টা বলছিলাম তাই না।

—তা তেমন কিছু নয়।

—আসলে কেমন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম, এসব তো কাউকে শোনানো যায় না।

—কেন?

—পাগল বলবে, কাউকে এসব বলা যায় না, নিজের বাপ মা বউ কেউ এসব পাগলামিকে প্রশ্রয় দেবে না। চল নিচে যাই।

ভাঙ্গাচোরা সিঁড়ি, সিঁড়িতে ষাট ওয়াটের পুরনো বাল্ব, আলোর চেয়ে রহস্যটা বেশী এখানে। সাবধানে নামতে হয়। দরজা দিয়ে বেরোনর সময় রথীনের মায়ের কাৎরানি শুনতে পায় বিমল। রথীনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

—বয়স এইট্টি ক্রস করেছে একেবারে শিশুর মত হয়ে গেছে মা।

ওরা বেরিয়ে আসে। বাগবাজারের সরু গলি ঘুপচি পেরিয়ে ঝট করে রথীন ওকে

নিয়ে এল একেবারে গঙ্গার পাড়ে। সব ফাঁকা হয়ে গেছে। ঠান্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে। দূরে ল্যাম্পপোস্টের গোড়ায় উনুনের উপর কলসি চাপিয়ে বসেছিল একজন। ওরা চা খায়। রথীন সিগারেট ধরায়, বিমলকে দেয়। বিমল হাত নাড়ে, খায় না। একটা চেয়ারে বসে দুজনে গঙ্গার ধারেই রেললাইন কাশীপুর গুডস ইয়ার্ডের দিকে ঘসটে ঘসটে ইঞ্জিন যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে আওয়াজ তুলে সতর্ক করে দিচ্ছে মানুষজনকে। গঙ্গার ধারের বাড়িগুলো নিথর হয়ে আছে।

—আসলে জান, মানুষ মূলত একা। রথীন আবার সেই প্রসঙ্গ আনে। রথীনকে যেন কথায় ভর করেছে। নিজের হার্টটাকে অন্ধকারে মেলে ধরেছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছ না, তাই বার বার বুঝিয়ে দেয়া।

—আমার কষ্ট আমার নিজের, কেউ শেয়ার করবে না।

—ঠিক সেইরকম নয়, আসলে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার দিকে ঝুঁকে যাচ্ছ তুমি। অত বেশী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ভাল নয়। বিমল রথীনকে বোঝাচ্ছে।

—আমার মন, আমার আত্মা এসব তো আমারই, এদের কষ্ট তো অন্যের অনুভব করার কথা নয়, আমার মনে হয় আমি ধু ধু মাঠে একটা নিঃসঙ্গ গাছ। রথনী সঙ্গে মাথা নামিয়ে থাকে।

—এই দীর্ঘযাত্রায় বেরোবেন, তাতেও তাই মনে হবে, এ মানুষ দেখার পর? এত মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার পর?

রথীন পায়চারি করতে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে, আচ্ছা তোমার সঙ্গে যদি আমার পরিচয় না হত?

বিমল চুপ করে থাকে, দেখা না হলে এখন বিম্বাধরের মেসে ওর কৃপায় পড়ে থাকত বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখের সামনে দেখত নরেন মাইতির ছেলে বিম্বাধর খুলে বসেছে বিদেশী পর্ণোগ্রাফির বই। মাবটে ছেলে গিলে খাচ্ছে সেসব। এসব ভাল না লাগলেও বলতে পারত না কিছু। বললে ওরা সকলে হো হো করে হাসত। সে বোঝাতে পারত না, এসব ভাল নয়। নিজের উপলব্ধি অন্যকে বোঝাতে পারে না বিমল এর চেয়ে কষ্ট কোথায়? অথচ সে জানে তার উপলব্ধিতে এতটুকু ভুল নেই।

হয়ত তাও হত না। সে অপমানিত হয়ে ফিরে যেত কলাবনিতে। তারপর চুপচাপ কলাবনির অন্ধকারে জেগে থাকা। চোখের আলো আস্তে আস্তে নিয়ে যেত। সে হয়ে যেত অন্ধ। ভাবতেও পারত না সুদূর কলকাতায় একটা মানুষ আছে, যে তার মত করে ভাবে, হয়ত তার ভাবনা অনেক আগে শুরু হয়েছিল, তাই সে এখন চিন্তায় বৃদ্ধ। অনেক জেনে গেছে কলাবনির মানুষটার চেয়ে। রথীন সমাদ্দার একটা মানুষ খুঁজে যাচ্ছে যে তার সঙ্গে দীর্ঘ পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়বে। এইরকম অনেক কিছু হতে পারত, কিন্তু কি হত বলা যায় না। যা হয়নি তা ভাবা বড় কঠিন। বাস্তব সত্য এই যে রথীন সমাদ্দারের সঙ্গে সে একটা নদীর সামনে নভেম্বরের শীতের রাতে কুয়াশার ভেতর ডুবে যাচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন হিম নামছে দুজনের মাথায়। রথীনের বাড়িতে এক বৃদ্ধা জেগে আছে, পৃথিবীকে দেখা হয়ে গেছে তার। রথীনের ভাই পোস্টার মারছে কলকাতার রাস্তায়। সেইসব পোস্টারে এসব কিছুই লেখা নেই। লেখা আছে। শিশুদের কথা, জন্মের কথা।

তীক্ষ্ণ হর্নের শব্দে মাথার ভিতরটা তোলপাড় হয়ে যায় বিমলের। বাসটা ব্রেক কষেছে খুব জোরে। একটা মানুষ বেঁচে গেছে। যাত্রীরা সব হৈ হৈ করে উঠেছিল! আর ভাবনা হয় না। সব নেমে যায়। এখনো ময়ূর তো আসেনি মাথার ভিতরে। বিমল মনে মনে অপ্রসন্ন হয়ে পরীক্ষিৎ এর দিকে তাকায়। বাসটা আবার চলতে শুরু করেছে।

ঝাড়গ্রাম এসে গেল। টিকিট সব চৈতন্য সংগ্রহ করেছে। বিমল বাসের ভিতরে তাকায়। দীপংকর চৌধুরী আছে। জুল জুল চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে।

দীপংকর আজ বিমলকে ছাড়ছে না, আশ্চর্য হয়ে সারাক্ষণ সে লোকটাকে লক্ষ্য করেছে। ধ্যানগম্ভীর হয়ে এতটা পথ এসেছে হাফপান্ট পরা হেল্পার বিমল। মাঝেমধ্যে আকাশের দিকে চেয়ে নিজের মনে হাসছিল। হঠাৎ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। কি এত ভাবছিল বিমল! ক্রমশঃ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে সে দীপংকরের কাছে।

বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছল, সুভাষ বসুর মূর্তির পাশ দিয়ে পাক খেয়ে ভস করে নেমে গেল। কয়েক মিনিট পর বাস ফাঁকা। দীপংকর উঠবে উঠবে করছে। চৈতন্য নেমে গেছে। পরীক্ষিৎও নেমে পড়েছে স্টীয়ারিং ছেড়ে। বিমল গেটের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, ব্যাপার কি, লোকটা যে নামে না।

—আর বাস যাবে না, নামুন।

দীপংকর গেটের সামনে। ঝাড়গ্রাম শহরে সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। আলো জ্বলে উঠেছে দোকানপাটে। বাস স্ট্যান্ডের পাশেই শালবন। সেখানে ঝুপসি অন্ধকার।

—সব ট্রিপ শেষ?

—হ্যাঁ।

—আপনি কোথায় যাবেন?

—যাব না, বাসেই থাকব।

—তাহলে আমিও। দীপংকর হাসে।

বিমল চুপ করে থাকে। লোকটা এমন করছে কেন? সরকারী অফিসার অথচ ধরণ-ধারণ দেখলে মনে হয় যেন—

—আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন?

—হ্যাঁ কেন পারব না? দীপংকর জেদী হয়ে উঠেছে।

তাহলে আসুন, বিমল ওকে ডেকে হন হন করে হাঁটতে থাকে।

দীপংকর সব কাজ ফেলে বিমলের পিছনে জোর পায়ে হাঁটছে। আজ লোকটাকে দেখতে হবে পুরোপুরি।

॥ ১০ ॥

হতবুদ্ধি হয়ে বিমল চারদিক দেখছে। লোকটা তাকে খুঁজে পাবে না তো! তার পিছনে সত্যিই ছুটেছিল দীপংকর চৌধুরী। এখন ওই লোকটাকে নিয়ে কি কথা বলবে। কোন ব্যাপারেই জড়া যাওয়া ভাল নয়। দীপংকর চৌধুরী ঘুরে তার তালে, নিজের কাজ গুছোবার জন্য তার সঙ্গে বিমলের কি কথা হবে। কে কথা নয়। কেমন একটা উদাসীনতায় এ এড়াবার জন্যই সে অফিসারটিকে ত সঙ্গে থাকার প্রস্তাব দিয়েছিল। সে প্রস্তা যে রাজী হয়ে যাবে লোকটা বিমল বোঝেনি। বুঝলে ডাকতো না, নিজে এড়িয়ে চলে যেত।

ঢোকার কথা ছিল মাতঙ্গিনী হি হোটেলে। এখন ঢুকবে না। অন্ধক প্ল্যাটফর্মে বসে থাকবে। দীপংক চৌধুরীর সাধ্য নয় তাকে খুঁজে বার কর তাকে বোঝার ক্ষমতা হবে না লোকট এবিষয়ে সে নিশ্চিত, সুতরাং প্রশ্রয় দি লাভটা কি?

সন্ধ্যে নেমে অন্ধকার বিছিয়ে গে পাট পাট। লম্বা প্ল্যাটফর্ম। এখা ওখানে দু-চারজন লোক উটকো পাট বসে গল্পগুজব করছে। প্ল্যাটফর্মের আ নিভে গেছে। দূরে রেললাইন বেয়ে চ মেলে দিলে ডিসটান্ট সিগনাল অঙ্গারে মত জ্বলছে। এখন কি ট্রেন আছে? ঘ খানেক দেরী স্টীল একসপ্রেস পৌঁছন তাছাড়া কিছু নেই। শুধু গুডস ট্রেন ছু প্ল্যাটফর্ম নিথর থাকবে। গরম আ বাতাস নেই। বিমল নিশ্চুপ বসে থাকে।

দীপঙ্কর চৌধুরী যেভাবে উঠে প লেগেছে কলাবনির যাবতীয় সমস্যার হী করে ছাড়বে মনে হয়। না সে কোন ক বলবে না। বললে কোন সুরাহা হবে শুধু শুধু মানুষের কলঙ্ক মাটি খু তুলে আনা হবে। সে সব সহ্য করা পুরুষের সম্ভব নয়। আর এই স প্রকাশের অর্থ কি? যে সত্য মানুষে জীবনকে মহৎ করে না, যে সত্য পৃথিব আবর্তনে বাধা দেয় সে সত্য প্রকাশ করাই ভাল। যা ঘটবার ঘটে যাচ্ছে, নিবৃত্তি সহজ নয়। এই ঘটনা তো স্বত স্ফূর্ত, এ রোধ করার ক্ষমতা ঐ ভদ্রলোকে নেই। রুদ্ধ হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই।

সময় বদলে যাচ্ছে। বদলাচ্ছে নিশ্চি কেননা মানুষ বদলে যাচ্ছে। মানু সময়। না হলে এই সব জমি অন্য মানুে হাতে। চলে যাবে কে ভেবেছিল? রজন কান্তর বন্দুকের নলে মরচে ধরে অথচ ধান ঘরে ওঠে না। অম্বুজাক্ষ বা এত লোকের মাথার মনি হয়ে উঠল ভাবে?

অম্বুজাক্ষকে কেউ চিনত না!

বিমল পা টান টান করে আধশোয়া হ যায় প্ল্যাটফর্মের ঘাসে। খোলা উর ফাঁকর ফোটে। বিড়ি বার করে বুক পকে থেকে, দাঁতে চিপে কমদামি লাইটার চাক ঘষে আগুন পেয়ে যায় টকটাকে। একের এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কলাবনিতে ক

বনির বাইরের জগতে তার সমরহাটা হচ্ছে কি ভাবে? কোন মানুষটা করছে? মনের ভিতরে নানান বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে, কলাবনিতে বাইরের মানুষ আসছে যাচ্ছে, তার সঙ্গে কলাবনির সমস্যার কোন সম্পর্ক গড়ে উঠছে না, দীপঙ্কর চৌধুরী কী করবে একা একা?

এরচেয়ে আমি আমার মত থাকি।

বিমল জামার বোতামগুলো খুলে দিয়ে আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করে। অন্ধকারে বহুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকে। একটা গুডস ট্রেন ঝমঝম শব্দে টাটানগরের দিকে ছুটে যায়, সমস্ত প্ল্যাটফর্মটা মুহূর্তে কেঁপে ওঠে, মানুষের কণ্ঠস্বর ডুবে যায় এই শব্দের ভিতরে। বিমলের শরীর কাঁপতে থাকে। আস্তে আস্তে সব নেমে যায়, ট্রেন চলে গেছে বহুদূরে, চারপাশে নেমেছে কঠিন স্তব্ধতা! নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আর নৈঃশব্দ্য মিশে একাকার হয়ে গেছে।

কে যেন ডাকছে। বিমল আস্তে আস্তে ঘাড় ঘোরায়।

—কে?

বিমলের চোখের পর্দা খুলে যাচ্ছে আবার। একের পর এক পর্দা। এখন এই রাতে চোখ সঠিক দেখে। নিঃসঙ্গতায় চোখ আর মন মিলে যায়। মন যা ভাবে চোখ তাই দেখে। রাতের চোখ মনের আয়না। কোন-রকম দেখায় ভুল থাকে না। মানুষটা কে? একেবারে ছবির মত। চোখ মুখ নাক মঙ্গোলীয়। গায়ের রঙ পীত। ছোট ছোট চোখে অপার বিস্ময়। আপাদমস্তক জোব্বা জাব্বায় ঢাকা। মাথায় অদ্ভুত রকমের টুপি। পোশাক মহার্ঘ, বহুদিনের অযত্নে ছিন্ন মলিন হয়ে গেছে। মনিমানিক্য খসে গেছে পোশাকের গা থেকে। মানুষটার বয়স কম নয়, জরা নেমেছে দেহে, মুখের চামড়া শিথিল হয়েছে, ক্লান্তি ঝরে পড়ছে দেহ থেকে। বিমল সম্মোহিতের মত উঠে দাঁড়ায়।

—কে আপনি?

—কুঙ্গ।

কুঙ্গ? বিমল হাতড়ে বেড়ায় মোহা-চ্ছন্নের মত। কুঁদ? কে এই মানুষ। এমন মানুষ তো স্মৃতিতে জড়িয়ে নেই। কলাবনিতে এমন মানুষ তো নেই। অথচ এই মুখ চোখ আবাল্য পরিচিত, কোথায় যেন দেখেছে?

—আমাকে চিনিতে পার নাই?

বিমল নিশ্চুপ দেখতে থাকে মানুষটাকে। এতো তার দেশের মানুষ নয়। এমন মানুষ তো চারপাশে কোথাও নেই। অথচ বড় চেনা—!

—কোথায় দেখেছি? বিমল ফিসফিস করে।

—ভগবান তথাগতর দেশে। স্পষ্ট জবাব আসে।

ঐ কণ্ঠস্বর বড় চেনা! বিমল চমকে তাকায়। এই পোশাক এই মুখ, এসব বড় চেনা। কে কে এই মানুষ। বিমল আকাশের দিকে তাকায়। নভমণ্ডলের নীলে নীল মিশিয়ে নেমে আসছে এক ময়ূর। অপরূপ পেখম মেলে দিয়েছে শূন্যতায়। মানুষটা হাতছানি দিয়ে ডাকছে ময়ূরকে। বিমল স্পষ্ট চোখে মানুষটার দিকে তাকায়, বিড়-বিড় করতে থাকে, পেয়ে গেছে সে, সব মনে পড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ সব ফিরে আসছে বহুদূর থেকে...। নভমণ্ডল নীল হয়ে যাচ্ছে ময়ূরের রঙে।

—ফাহিয়েন?

কোন জবাব আসে না।

—পরিচয় গোপন করবেন না।

—সে পরিচয় আর নাই। এই দেশের নাম কী? মানুষটা আস্তে আস্তে কথা বলে।

—ভারতবর্ষ, আপনার পরিচয় কি?

—ভারতবর্ষ! ভগবান তথাগতর দেশ, এই দেশ এখনো পার হইতে পারিলাম না, সহস্র বৎসর চলিয়া গেল। মানুষটা আত্ম-গত অবস্থায় বলতে থাকে।

—আপনি [illegible] স্বপ্নের সঙ্গে মিলে [illegible]

—একদিন তাহাই [illegible] অন্য-রকম হইতে ইচ্ছা [illegible]

দীর্ঘদিন [illegible] পর [illegible] লাম। ভারতবর্ষ [illegible] আবিষ্কার করিব, [illegible] ময়ূর নামিয়া [illegible]

বিমল দেখে [illegible] অন্ধকারে একটা ময়ূর দাঁড়িয়ে [illegible] পূবে আকাশে শুকতারা। ময়ূরের রঙে নভমণ্ডল নম্র নীলাভ। বিমল মোহাচ্ছন্নের মত ময়ূরের দিকে এগিয়ে যায়। ময়ূর মাথা নামিয়ে অভিবাদন জানায়। সে ময়ূরের পিঠে, পিছনে বসেছে পীতবর্ণের সেই মানুষ। ময়ূর আকাশে ওড়ে।

কত দেশ ঘুরিলাম, কত জনপদ, কত শত বৎসর পার হইল। অতিক্রম করিয়াছি ধূসর মরু, খোটান, খালচা গান্ধার পুরুষ-পুর। মথুরা শ্রাবস্তী গয়া বারানসী হইতে তাম্রলিপ্ত বন্দরে। স্পর্শ করিয়াছি কপিলা-বস্তু, ভগবান তথাগতর পুণ্য জন্মভূমি। মানুষ দেখি নাই। দেখি নাই অনাবিষ্কৃত নগর দেশ জনপদ।

বিমলের চারপাশে থেকে আশ্চর্য শব্দ-গুলি মেঘ হয়ে উড়ে যাচ্ছে। এই শব্দ মেঘের মত। মেঘ স্বপ্ন আনে। ঐ কণ্ঠস্বর জাগিয়ে তোলে আকণ্ঠ তৃষ্ণা। তৃষ্ণা মানুষের জন্য। তৃষ্ণা অনাবিষ্কৃত জনপদের জন্য।

—কোন মরুভূমি পার হয়েছেন। বিমল প্রশ্ন করে।

—গোবি মরুভূমি।

—সেই মরুদেশ কোথায়?

—আমার জন্মভূমি চীন দেশের বক্ষে।

—মরুদেশে কি দেখলেন।

—মৃত মানুষের অস্থি কঙ্কাল। পরি-ব্রাজকের কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে।

—মানুষ দেখেন নি?

—না, মানুষ আর অনাবিষ্কৃত নগর জনপদ দেখি নাই। সংঘারাম ত্যাগ করিয়া অন্ধের মত ঘুরিয়াছি, শুধু দেখা হয় নাই পৃথিবী। পৃথিবী অনাবিষ্কৃত রহিয়া গেল।

পিছনে পর্যটক বসে আছে। সামনে বিমল। ময়ূর উড়ে যাচ্ছে আকাশ পথে। পর্যটকের বয়স্ক চোখে শিশুর সারল্য। ক্রমশঃ নভমণ্ডলের নম্র নীল ধুয়ে যাচ্ছে। শুকতারা নিভে যাচ্ছে। পৃথিবী আলো হয়ে উঠছে। বিমলের বুকের ভিতরটা ফুলে যাচ্ছে। হৃদয় ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠছে। হৃদয় মিশে যাচ্ছে মহাকাশে। এই মুখ কতদিনের পরিচিত! সেই কিশোর বয়সের স্মৃতির ভিতরে অক্ষয় হয়ে আছে। অথচ দুজনে কোনদিন দেখা হয়নি। দেখা হবে এমন কথাও ছিল না। ঐ কণ্ঠস্বর রথীন সমাদ্দারের। চোখ মুখ চীন পরিব্রাজকের। সেই মানুষ ফা-হিয়েন।

—নিজের দেশ তথাগতর দেশ। বিমল বলে।

পরিব্রাজক মাথা নামিয়ে দেন। চোখ মেলে দেন সমতল জমির দিকে।

—কতদিন দেখিব ভাবিয়াছি, কতকাল! ভাবিয়াছি আবিষ্কার করিব ভগবান তথাগতর দেশ, হয় নাই। সহস্র ভ্রমন অগণিত সংঘারাম আমার দুই চক্ষুতে অন্ধতা আনিয়াছে।

বিমল শুনছে। চোখ রেখেছে পৃথিবীতে। পৃথিবী ক্রমশঃ আলোকিত। বহুদূরে গ্রাম জনপদ নদীনালা সব স্পষ্ট। ময়ূর উড়ে চলে। আকাশের মেঘ দ্রুত ভেসে যায়। তুলোর মত মেঘ, গর্ভিনী কালো মেঘ কোথাও বা। আকাশ গা থেকে অন্ধকার ঝরে ফেলেছে। মেখে নিচ্ছে ময়ূরের নীল। পরিব্রাজক হাত দিয়ে আকাশের গা থেকে মেঘ তুলে নিচ্ছিলেন। বৃষ্টির মেঘ ধরে ফেলছিলেন পরিব্রাজক। বৃষ্টির মেঘ ধরে ফেলে বন্দী করে ফেলছিলেন তার কাঁধের ঝোলায়।

—এই মেঘ কাহার? পরিব্রাজকের চোখে জিজ্ঞাসা।

বিমল অবাক হয়ে যায়! এত কৌতূহল নিবৃত্ত করার ক্ষমতা তার আছে? সে আস্তে আস্তে জবাব দেয়, এই মেঘ পৃথিবীর।

আকাশ পৃথিবীর মেঘ পৃথিবীর। এই নভমণ্ডল পৃথিবীর। সব বলতে ইচ্ছে করছে বিমলের। মুখের ভাষা প্রতিবন্ধক। সে চিৎকার করে বলে ওঠে, এই মেঘ এই আকাশ পৃথিবীর, নভমণ্ডল পৃথিবীর, আমরা নভমণ্ডলে, আমরা হয়ে পৌঁছে পৃথিবীর।

নভমণ্ডলে এই কণ্ঠ ব্যাপ্ত হয়ে যায়। আকাশ বাতাস মহাবিশ্বে এই কথা প্রতি-ধ্বনিত হয়। নভমণ্ডলে আলো গভীর হয়।

—এই মেঘ আমি আমার জন্মভূমিতে লইয়া যাই। পরিব্রাজকের কণ্ঠস্বর।

(চলবে)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।।একান্ন।।

এরোপ্লেন আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাপীকে ছেলেবেলায় ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসেছে। চোখে মুখে ঠোঁটে সেই রকম দুষ্টুমি। ছলে কৌশলে সেই রকম হাত-পা গা ছোঁয়ার লোভ। মিষ্টি টের পাচ্ছে। কিন্তু সহজে তার দিকে ফিরছে না বা সোজা হয়ে বসছে না। সে জানলার দিকে। বাইরের আকাশ দেখার সুবিধে। নিরাপদও।

এয়ারপোর্টে মিষ্টির মা বাবা দাদার সামনে বাপী এতক্ষণ মানানসই রকমের গম্ভীর ছিল। তার আগেও অসহ্য রকমের কতগুলো দিন গাম্ভীর্যের খোলসের মধ্যে ঢুকে থাকতে হয়েছে। মিষ্টিকে বাপী তিন দিনের সময় দিয়েছিল। সেই তিনটে দিন এই মেয়ে ওকে কম যন্ত্রণা আর উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখেনি। মনে পড়তে বাপীর হাত দুটো সেই ছেলেবেলার মতো নিশপিশ করে উঠল।

....সেই তিন দিনের বিকেল পর্যন্ত কোনো সাড়া মেলেনি। তার পরেও মিষ্টি নিজে আসেনি। টেলিফোনে তার গলা ভেসে এসেছে।—ফোনে ডাকলে হবে?

মুহূর্তের মধ্যে কি যে ঘটে গেল বাপীই শুধু জানে। কতকালের লতা-দুমড়ানো একটা জগদ্দল পাথর টুপ করে খসে পড়ে গেল। শূন্যে উঠে বাপীর মাথাটা তখন ঘরের ছাদে ঠোক্কর খেলেও অসম্ভব কিছু মনে হত না। স্নায়ুগুলোর ঝাঁপা-ঝাঁপি বন্ধ করতে সময় লেগেছিল। তারপর জবাব দিয়েছে, হবে। কিন্তু তোমার আসতে অসুবিধে কি?

—অসুবিধে বুঝে নাও।

—বুঝলাম। তুমি না এলেও আমার যাওয়া আর ঠেকাচ্ছে কে?

জবাবে টুক করে ফোনটা নামিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু সেখানে মিষ্টির মা বাবা আর দাদার সমাদরের বেড়া টপকে কতটুকু আর নিরিবিলিতে পাওয়া সম্ভব। ফলে সেখানেও বিরাট মানুষ হবু জামাইকে মানানসই গাম্ভীর্যের মুখোস ধরে রাখতে হয়েছে। মুখখানা আরো গুরুগম্ভীর করে তুলতে হয়েছিল শাশুড়ীর প্রস্তাব শুনে কাগজ কলমের বিয়েতে আর তাঁর আস্থা নেই। বিয়ে হবে হিন্দু মতে অগ্নিসাক্ষী করে। বাপীর তাতে আপত্তির কারণ ছিল না। কিন্তু সেটা ফাল্গুনের তৃতীয় সপ্তাহ সে-মাসে আর বিয়ের তারিখ নেই। তারপর টানা চৈত্র মাসে হিন্দু বিয়ের কথাই ওঠে না। বিয়ের তারিখ আছে বৈশাখের মাঝা মাঝি।

বাপীর তখন মনে হয়েছিল অত দূরের বৈশাখ জীবনে আর আসবে কিনা সন্দেহ। ফলে ভাবী শাশুড়ীকে ঘাবড়ে দেবার মতো ঠাণ্ডা মুখ করে আপত্তি জানাতে হয়েছে। ‑সব বিয়েই বিয়ে। ও সময়ে তাকে ভারত-বর্ষের বাইরেও চলে যেতে হতে পারে।

মনোরমা নন্দী তার পরেও মেয়ের মারফৎ বৈশাখ পর্যন্ত বিয়েটা স্থগিত রাখতে চেয়েছিলেন। মিষ্টি বলেছিল, মা যখন চাইছে ক'টা দিন সবুর করোই না।

বাপী আরো গম্ভীর।—ঠিক আছে। তুমি কাল পরশুর মধ্যে আমার সঙ্গে বানারজুলি চলো—বিয়ে না হয় পরেই হবে।

মিষ্টি প্রথমে থমকে তাকিয়েছিল। তারপর দ্রুত প্রস্থান। মা-কে কি বলেছে বাপী জানতেও চায়নি। মোট কথা সেই থেকে ভদ্রোচিত গাম্ভীর্যের মুখোস সরানোর তেমন ফুরসৎ মেলেনি। টাকার জোরে রেজিস্ট্রি আপিসে পিছনের তারিখ বসিয়ে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। আজই সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে বিয়ে শেষ। দুপুরে অতিথি অভ্যাগতদের নিয়ে নামী হোটেলে লাঞ্চ পার্টির পর শ্বশুরবাড়ি থেকে সোজা দমদম এয়ারপোর্ট। এতেও শাশুড়ীর খুব আপত্তি ছিল। এ জামাই অসিত চ্যাটার্জি নয় বুঝেই হাল ছেড়েছেন। রেজিস্ট্রি বিয়ের দোষ ঢাকার জন্য মেয়ের কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরিয়েছেন, মোটা করে সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ কেটে দিয়েছেন।

জীবনে মিষ্টি এসেছে। তার সবার আগ বানারজুলি ডেকেছে। সেখানকার আকাশ বাতাস জঙ্গল পাহাড় তারা আসবে বলে উন্মুখ হয়ে আছে। জীবনে মিষ্টি এলো এটা এখন আর স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের মতো বাস্তব। এমন বাস্তবের বাসর বানারজুলি ছাড়া আর কোথায় হতে পারে। আবু রব্বানীকে খবর দিয়ে রাখা হয়েছে বিয়ের পরেই তারা যাচ্ছে। সে বোধহয় এতক্ষণে বাগডোগরা এসে বসে আছে।

কিছুক্ষণ ধরে নিঃশব্দে খুনসুটি করার পরেও মিষ্টি সোজা হয়ে বসল না বা জানলা থেকে মুখ ফেরালো না। বাইরের দিকেই চেয়ে আছে আর হাসি চেপে আছে। সেই ছেলেবেলার দুষ্টুমি টের পাচ্ছে। বাপীও হার মানবে না। তার ঘুম পেল। মাথাটা বারবার মিষ্টির কাঁধে ঠোক্কর খেতে লাগল। শেষে ওই কাঁধের আশ্রয়ে ঘুমিয়েই পড়ল। কিন্তু হাত সজাগ। সেটা মিষ্টির বাহুর ওপর দিয়ে তার কোলের পর নেমে এসে বিশ্রামের জায়গা খুঁজছে।

এবারে মিষ্টি ধড়ফড় করে তাকে ঠেলে সরালো। এরোপ্লেন যাত্রী খুব বেশি না হলেও একেবারে কম নয়। চাপা তর্জনের সুরে বলল, এই! হচ্ছে কি?

—কি হচ্ছে?

গলা আরো নামিয়ে মিষ্টি বলল, শ্লীলতাহানির চেষ্টা।

মিষ্টি এবারে সোজা হয়ে বসল। গম্ভীর। কিন্তু ঠোঁটে হাসি ছুঁয়ে আছে। সিঁথি আর কপালের জ্বলজ্বলে সিঁদুরের লাল আভা গাল আর মুখের দিকে নেমে আসছে।

দুর্বার লোভের এমন স্বাদও বাপীর আগে জানা ছিল না। একটু বাদে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। গলা খাটো করে বলল, আমি একটা গাধা। গোটা এরো-প্লেনটা রিজার্ভ করে আসা উচিত ছিল।

মিষ্টি সামান্য ঘাড় ফিরিয়ে মুখখানা পলকে দেখে নিল। ঠোঁটের হাসিটুকুকেও আর প্রশ্রয় দেওয়া নিরাপদ ভাবছে না। নির্লিপ্ত দু' চোখ আবার সামনের দিকে।

বাপীর আরো মজা লাগছে। এয়ার অফিসের জুনিয়র অফিসারের ব্যক্তিত্বের ফাঁক দিয়ে বানারজুলির মিষ্টি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

বাগডোগরা।

আবু দুটো গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে হাজির। ওর নিজের গাড়ি একটা। অন্যটা বাপীর গাড়ি। বাদশা চালিয়ে এসেছে। সেই গাড়ি আবার ফুল আর লতা-পাতা দিয়ে সাজানো। কলকাতা থেকে আরো অতিথি অভ্যাগত আসতে পারে ভেবে দুটো গাড়ি আনা। শুধু দুজনকে দেখার পরে মনে

সময় ঝটু-ঝামেলা বাড়াবে দোস্ত,
বোকা নয়।

দু'হাতে বাপীকে জাপটে ধরল প্রথম।
র কাছে ফিসফিস করে বলল, তুমি
বটে একখানা দোস্ত।

নিরীহ মুখে বাপীও খাটো গলায়
ব দিল, চোদ্দ বছর বয়েসে বাবার সেই
র পর তুমিই তো তাতিয়ে দিয়ে
ছিলে মরদ হলে বদলা নিতে।

তাকে ছেড়ে আবু সভয়ে দেখে নিল
নজি শুনল কি না। তারপর মিষ্টিকে
নয়েই বলল, ভেরি ডেনজারাস আদমি
! মালিক হও আর যাই হও, এখন
ক আমি সব সময় মালকান বাহিনজির
ক

ঘুরে মিষ্টির উদ্দেশ্যে আধখানা নুয়ে
বদ কুর্নিশ করে উঠল। অপ্রস্তুত মিষ্টি
উঠল, ও-কি!

—সেরে রাখলাম। আবুর ডগমগ মুখ।
রপর সব গোস্তাকি মাফ হয়। আমি
তু আর তোমাকে আপনি-টাপনি বলতে
ব না বাহিনজি—দোস্ত আস্কারা দিয়ে
ল মানুষকে কাঁধে তুললে আমার কি
!

মিষ্টি হেসে জবাব দিল, কিছু দোষ
বলতে হবে না।

বানারজুলি পৌঁছুতে সন্ধ্যা।
আবুর কাণ্ড দেখে বাপী হাসবে না
করবে! আবুকে বেশি ঘটা করতে
ধ করে দিয়েছিল। পাশাপাশি দুটো
লোই রকমারি রঙিন আলোয় ঝলমল
ছ। দুই বাংলোর মাঝের মেহেদি
র পার্টিশনের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য
মার ফুল। দুই বাংলোর উঠোনে আর
ন্দায় লোক গিসগিস করছে। ব্যবসার
। সূত্রে উত্তর বাংলার কেউ বাকি নেই
হয়। চা-বাগানের অনেক পদস্থ
রাও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। বাপী
ন্দার আবু রব্বানীও আর উপেক্ষার
নয়। ডাটাবাবুও তার রেজিমেণ্ট নিয়ে
র। বুফে ডিনারের সব ভার তার
র। বাইরের যে-সব অভ্যাগতরা স্বস্থানে
তে পারবে না, রাতে তাদের ক্লাব হাউসে
র ব্যবস্থা হয়েছে। আবুর আয়োজনে
নেই।

উপহার আর অভিনন্দন পর্বের পরে
টকে নিয়ে বাপীর বাংলোর ঘরে উঠে
তে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। এরপর
ড় আটটায় ডিনার। আত্মজনেরা কেউ
ড় মিশে যেতে রাজি নয়, তারা বাংলোর
তরে অপেক্ষা করছিল। বাপী প্রথমে
রির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।
টকে বলল, আবুর বউ, আমার এখান-
গার্জেন।

বউ দেখে খুশিতে দুলারির চোখে
ক পড়ে না। তারপর স্বভাব-গম্ভীর
য় বাপীর দিকে ফিরে বলল, তোমার
না গার্জেন দেখে ভিরমি খায় বাপী-
আমি এখন গড় করি না কি
?

বাপী গম্ভীর একটু।—ছোট বোনকে
গড় করবে কি, আশীর্বাদ করো।

এদের শিক্ষা-দীক্ষা যেমনই হোক
হেলা-ফেলার যে নয় পরোক্ষে মিষ্টিকেই
সেটুকু বুঝিয়ে দিল। এরপর কোয়েলা
এগিয়ে এলো। সেও তার রুচি মতো সাজ-
সজ্জা করেছে। খাটুনি নেই, খেয়ে ঘুমিয়ে
বেচারী আরো খানিকটা বিপুলা হয়েছে।
অতি কষ্টে উপুড় হয়ে দু'হাত মাটিতে
ঠেকালো। গড়ের মধ্যে এই ওদের সেরা গড়।
মিষ্টি এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে সোজা
হতে সাহায্য করল, এটুকুতেই কালো মুখ
খুশিতে আটখানা।

খবর পেয়ে ঝগড়ুও হাজির। সকালেই
পাহাড়ের বাংলো থেকে নেমে এসেছে।
বয়েস এখন সাতাত্তর। মোটামুটি মজবুত
এখনো। বউয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বাপী
তাকেও মর্যাদা দিতে ভুলল না। বাদশা
ড্রাইভারের সঙ্গে পথেই পরিচয় করানো
হয়েছে।

একটু বাদে ঘর্মাক্ত কলেবরে আবু
এলো। সকলকে সরিয়ে দুলারি মিষ্টিকে
একটু বিশ্রাম নিতে বলছিল। আবু বাধা
দিল, বিশ্রাম সেই রাত্তিরে হবে—এখন মুখ-
হাত ধুয়ে সাজ-টাজ যদি কিছু করার থাকে
জলদি করে নিতে হবে। আরো লোক এসে
গেছে, আবার ডিনারের সময় হচ্ছে।

বাপী সত্যিকারের গম্ভীর।—আরো
লোক এসে গেছে?

—বা রে, আসবে না!

—তোমাকে নিষেধ করলাম, আর তুমি
এত বড় এক ব্যাপার করে বসে আছ?

আজ অন্তত আবু কারো ভ্রূকুটির
তোয়াক্কা রাখে না। জবাব দিল, ছাড়ো
তো! এ কি আমার বিয়ে যে তিন দিন
আগেও হবু বিবি চেলা কাঠ নিয়ে তাড়া
করেছে!

বিড়ম্বনা সামলে দুলারি সকোপে
তাকালো তার দিকে। মিষ্টি হেসে ফেলল।
বাপী বলে উঠল, আমারও তো সেই বরাত!
তাহলে তুমি এত ঘটা করতে গেলে কেন?

আর হাসছে।—বাহিনজির চেলা কাঠ
তো চন্দন কাঠ, কার সঙ্গে কার তুলনা।
দু' হাত কোমরে তুলে সদর্পে দুলারির
মুখোমুখি।—কি বলেছিলাম?

একটু কাঁচুমাচু মুখ করে দুলারি
মিষ্টির দিকে তাকালো।—বলেছিল, এই
সুরৎ নিয়ে আর বাহিনজির কাছে গিয়ে
কাজ নেই।

আবুর উদ্দেশ্যে মিষ্টির চোখে অনু-
যোগ ঝরার আগেই আবু চেঁচিয়ে উঠল,
নো ট্রু—নো ট্রু বাহিনজি আমি কক্ষনো
একথা বলিনি!

ইংরেজির ধাক্কায় মিষ্টি হেসে
ফেলল। বাপী হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করল,
তাহলে কি বলেছিলে?

এবারও দুলারিই জবাব দিল, বলেছিল,
দোস্ত-এর বউয়ের নাম মিষ্টি, কত মিষ্টি
দেখো'খন—এক কথাই হল না?

মিষ্টি লজ্জা পাচ্ছে। ভালোও লাগছে।
এই মানুষগুলো লেখা-পড়া জানে না,
শহরের আদব-কায়দা জানে না এ একবারও
মনে আসছে না।

সব শেষে আবু আর দুলারিকে বিদায়
দিয়ে বাপী ঘরে এলো। রাত সাড়ে দশটার
ও-ধারে। বাংলো নিঝুম এতক্ষণে। ঝলমলে
সাজ-পোশাক বদলে মিষ্টি চওড়া লাল পাড়
হালকা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছে। সেই
রঙেরই ব্লাউস। খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে
বসে আছে।

বাপী দু'চোখ ভরে দেখল খানিক।
ঠোঁটের হাসি চেপে মিষ্টিও চেয়ে রইল।
গায়ের জামাটা খুলে বাপী একদিকে ছুঁড়ে
দিল। দরজা দুটো বন্ধ করে কাছে এসে
দাঁড়ালো। মিষ্টির ঠোঁটে হাসি টিপটিপ
করছে।

—কেমন লাগছে?

মিষ্টির চোখে মিষ্টি কৌতুক। জবাব
দিল, এখনও বানারজুলির মতো লাগছে
না।

বাপী থমকালো একটু। জানলার পর্দার
ওপরের ফাঁকটুকু দিয়ে বাইরের দিকে
তাকালো। বলল, এক্ষুনি লাগবে, দেখো।

ঘরে আলোটা নিভিয়ে দিল। তারপর
জানলা দুটোর পর্দা সরিয়ে দিতেই দু'
দিক থেকে বাইরের জ্যোৎস্না এসে ঘরে আর
বিছানায় লুটোপুটি খেল।

বাপী বলল, শুয়ে পড়ো। চোখ বুজে
শোনো।

মিষ্টি তাই করল। বাপী নিঃশব্দে
একটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। দেখতে
দেখতে চারদিকের নীরবতা আরো নিঝুম।
না, নিঝুম বলা একেবারে ভুল। রাশি রাশি
ঝিঁঝি একসঙ্গে গলা মিলিয়েছে। সামনের
জঙ্গলের গাছপালার সঙ্গে চৈত্রের বসন্ত
বাতাসের মিতালির সড়সড় শব্দ থেকে
স্পষ্ট হচ্ছে। মিষ্টি কান পেতে শুনছে।

প্রায় মিনিট দশেক বাদে সুইচ টিপে
সবুজ আলোটা জ্বালল। কাছে এসে
জিজ্ঞাসা করল, বানারজুলি?

মিষ্টির চোখে হাসি দুলছে। মাথা
নেড়ে সায় দিল। বলল, বেশ তো ছিল,
আলো জ্বাললে কেন?

—হুঁ? বাপীর পলকা ভ্রূকুটি।—কেন
জ্বাললাম?

তার গা ঘেঁসে বসল। চেয়ে আছে।
মিষ্টিও। বাপী হাসছে অল্প অল্প।
মিষ্টিও। বাপীর দু'চোখ লোভে টইটম্বুর।
বাসনার দাপাদাপি টের পাচ্ছে তবু হাত
বাড়াচ্ছে না। এই রাত কৃপণের মতো খরচ
করার রাত।

হাসি টুপটুপ ঠোঁটের কোণ দাঁতে
কেটে মিষ্টি বলল, কি?

বাপী জিজ্ঞাসা করল, কি?

মিষ্টি বলল, এক গেলাস জল দেব?
বাপী বুঝে উঠল না। জিজ্ঞাসা করল,
জল কেন?

মিষ্টি বলল, সেই কতকাল ধরে জল
দিয়ে গিলে খাবার সাধ!

তার পরেই প্রমাদ গুনল। কণ্ঠ-
তরঙ্গের দস্যুকে দেখে অন্তঃপুরের দরজা

দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরে সবুজ আলো। জানালার পর্দা সরানো। মিষ্টি চেষ্টা করল বাধা দিতে। পারা গেল না। দেড় যুগের বুভুক্ষু দস্যু সব বাধা ছিঁড়েখুঁড়ে তাকে বিপুল বিস্মৃতির মাঝদরিয়ায় টেনে নিয়ে চলল।

পৃথিবী কি থেমে ছিল কিছুক্ষণ..... বা অনেকক্ষণ! কোনো নিঃসীম নীরবতার গভীরে ডুবে গেছল! নাকি বাপী ঘুমিয়ে পড়েছিল? আস্তে মুখ তুলে তাকালো। দেখছে, কোন অপরিসীম শান্তির জগৎ ঘুরে এখান থেকে এখানেই ফিরে এলো।

মিষ্টি চেয়ে আছে। তাকেই দেখছে।

কটা দিন প্রায় হাল ছেড়ে ভোগের এক অবুঝ দুরন্ত রূপ দেখল মিষ্টি। যৌবনের অতনুবাস্তবে এই লোক প্রথম নয়। কিন্তু পুরুষ যেন এই প্রথম। আগেও ভোগ দেখেছে। নিজেকে সেই ভোগের এমন একাত্ম দোসর ভাবতে পারেনি। দেহ-পথে সমস্ত সত্তার ওপর এমন দুর্বার দখল বিস্তার দেখেনি। আবার স্বার্থপরের দখলও নয়। দুদিকেরই সমর্পণ শর্ত, সমর্পণ লক্ষ্য।

নিজের ছাব্বিশের এই মেদশূন্য সুঠাম দেহ সম্পর্কে মিষ্টি কম সচেতন নয়। সক্রিয় চেষ্টায় বয়েসটাকে বাইশের পাকা-পোক্ত গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু কটা দিনের মধ্যেই অনুভব করেছে, যা আছে খুব বাড়তি কিছু নয়। এটুকু না থাকলে ওই দামাল পুরুষের দোসর হওয়া খুব সহজ হত না। মিষ্টির অবাক লাগে, এত ক্ষুধা এত তৃষ্ণা আর এমন দুর্জয় আবেগ নিয়ে এই মানুষ এতকাল বসে ছিল কি করে।

মিষ্টি সেদিন না বলে পারল না, যে কাণ্ড করছ, দুদিনে ফুরিয়ে গেলাম বলে।

বাপী নিরীহ মুখে ঘটা করে দেখতে লাগল তাকে। এ-রকম দেখাটাই হঠাৎ জুলুমের সূচনা মিষ্টি এ কদিনে সেটা বুঝে নিয়েছে। মিষ্টি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ হামলার মতলব দেখলেই সে ঘর থেকে পালাবে। অগত্যা গম্ভীর আশ্বাসের সুরে বাপী বলল, যতই করিবে দান, ততো যাবে বেড়ে।

বারান্দায় আবুর হাঁক শোনা গেল, বাপী ভাই আছ?

মিষ্টি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় এলো। তাকে বসতে দিয়ে বলল, দিদি, এলো না?

দিদি শুনে আবু গলে গেল।—তুমি ডাকছ শুনলে ছুটে আসবে—

বাপীও বারান্দায় এসে চেয়ার টেনে বসল। হাতে আগের দিনের খবরের কাগজ। ভাবখানা, এতক্ষণ এটা নিয়েই সময় কাটা-চ্ছিল। এখনো ওতেই চোখ। এক-পলক দেখে নিয়ে আবু জিজ্ঞাসা করল, দোস্ত-এর তবিয়ৎ ভালো তো?

—খুব ভালো। কেন?

—চার-চারটে দিন কেটে গেল, রোজই আশা করছি বহিনজিকে নিয়ে একবার গরিব ঘরে যাবে।

ছোট হাই তুলে বাপী জবাব দিল, কি করে যাই, নিজেও যাবে না, আমাকেও ছাড়বে না। সারাক্ষণ চোখে আগলে রেখেছে, দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী, বুঝতেই পারো...

মিষ্টির মুখ লাল। চার দিনের মধ্যে দুদিন জঙ্গল দেখতে বেরনোর কথা সেই বলেছে। টেনে বার করা যায় নি। রাগ করে ভিতরের দরজার দিকে পা বাড়ালো।

বাপী শাড়ির আঁচল টেনে ধরল। আ-হা, সত্যি কথা বললাম বলে আবুর সামনে অত লজ্জা কিসের। বিয়ের পর ওর বউ ওকে একমাস পর্যন্ত ঘর ছেড়ে বেরুতে দেয়নি—তারও ও দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী—বেরুতে চাইলে দুলারি নাকি চেলা-কাঠ নিয়ে তাড়া করত। তুমি তো অতটা করো না।

আবু গলা ছেড়ে হেসে উঠল। বলল, তুমি খামোখা লজ্জা পাচ্ছ বহিনজী—সেই বাচ্চা বয়সে তোমার জন্য বাপীভাই যে পাহাড় থেকে ঝাঁপ খায়নি আমার বাপ-ঠাকুর্দার ভাগ্য। এখন উল্টো বলতে না পারলে ভাত হজম হবে?

আবু উঠে পড়ল। তার কাজের অন্ত নেই। একবার খবর নিতে এসেছিল। বাপীকে বলল, ঠিক আছে, দুলারিকে বলবখন দোস্ত এখন বেজায় ব্যস্ত—ফুরসৎ মিললে বহিনজিকে নিয়ে আসবে।

সেই দিনই দুপুরের আকাশ অন্য রকম। বাতাস অন্য রকম। চৈত্রর মেঘ কালো আস্তরণ বিছিয়ে সূর্য ঢেকেছে। পাহাড়ী এলাকার অসময়ের মেঘ নতুন কিছু নয়। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে। গাছ-পালার সড়সড় শব্দ কানে আসতে কদিনের মধ্যে বাপীর মনে হল, বানারজুলির জঙ্গল আজ ওদের ডাকছে।

যেমন ছিল দুজনে তেমনি বেরিয়ে পড়ল। বাপীর পরনে পা-জামা, গায়ে গেঞ্জির ওপর শার্ট। ও এ-ভাবে বেরুলো দেখে মিষ্টিরও সাজ বদলের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। আটপৌরে ভাবে পরা দামী শাড়িটাই কুঁচি দিয়ে পরে নিল। গায়ে ফিকে লাল ব্লাউস। পিঠের ওপর খোলা চুল। যাচ্ছে জঙ্গলে। সেখানে যা সহজ তাই সুন্দর।

কিন্তু বাইরে এত ছোলাছুলি বাতাস আগে বুঝতে পারেনি। পাশাপাশি পাকা রাস্তা ধরে চলেছে। একটু বাদে মিষ্টি ফাঁপরে পড়ল। চুল সামলাতে গেলে শাড়ি যে বেসামাল হয়, আবার শাড়ির নিচের দিক ঠিক রাখতে গেলে আঁচল ওড়ে। বার কয়েক দেখে নিস্পৃহ গলায় বাপী বলল, যে যেদিকে চায় যেতে দাও না, অত ধকল পোহানোর কি দরকার।

ধমকের সুরে মিষ্টি বলল, খুব সখ যে - জঙ্গলে না নেমে হাঁটিয়ে মারছ কেন?

বাপী জবাব দিল না। মুচকি হেসে এগিয়েই চলল। দুপুরের রাস্তা একেবারে নির্জন বলেই মিষ্টিও খুব একটা অস্বস্তি বোধ করছে না। চলতে চলতে মাথার চুল আঁট-খোঁপা করে নিল। আর শাড়ির আঁচলটা কাঁধের ওপর দিয়ে এনে [illegible] করে কোমরে জড়িয়ে নিল। সামনে [illegible] পড়লে আঁচলটা চট করে খুলে [illegible] টেনে দেওয়া যাবে।

বাপী মন্তব্য করল, এয়ার অফি[illegible] জুনিয়র অফিসার মালবিকা এইবার [illegible] ঠিক খসল—বানারজুলির মিষ্টির [illegible] পাচ্ছি।

খুব মিথ্যে বলেনি। মিষ্টির নিজে[illegible] ফেলে আসা এক দূরের অতীতের [illegible] ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। একটু আগে [illegible] বাংলোটার সামনে এসে দাঁড়াল, দেখা [illegible] সেই অতীত যেন আরো কাছে এ[illegible] এলো। তাদের সেই বাংলো। সামনের কা[illegible] বারান্দাটা ঠিক তেমনি আছে।

পাশের লোকের দিকে চেয়ে [illegible] বলল, কি মতলব, ভেতরে যাবে নাকি?

বাপী মাথা নাড়ল। যাবে না। [illegible] ওই বারান্দাটার দিকে চেয়ে একটা [illegible] দেখছি।... এমনি দুপুরে চোরের [illegible] এসে আমি একজনের অঙ্ক বলে দিচ্ছি। যখন টুকছে আমি তখন চোরের ম[illegible] গায়ের সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়ে তার গায়ের [illegible] মাথার ঝাঁকড়া চুলের গন্ধ নাকে টান[illegible] অঙ্ক টোকায় ব্যস্ত সে আমাকে কাঁধ [illegible] কোমর দিয়ে ঠেলে দিয়ে বলছে, আঃ, স[illegible] না!

—অসভ্য কোথাকারের। দুগালে লা[illegible] ছোপ পড়ল।

সেখান দিয়ে জঙ্গলে নামার মুখে [illegible] মনে পড়তে মিষ্টি বলল, যাঃ সেই গা[illegible] কেটে ফেলেছে!

বাংলোর সামনে রাস্তার ধারের [illegible] গাছটা হালে কাটা হয়েছে মনে হয়। [illegible] কয়েক আগেও বাপী ওটা ওখানে দেখে[illegible] সেই গাছের ডালে বসে বাপী নানা কৌ[illegible] মিষ্টিকে বাংলো থেকে টেনে [illegible]।

জঙ্গলে ঢুকেই মিষ্টির [illegible]কখানা [illegible] বাপীর দখলে। এই উপদ্রব মিষ্টির ভো[illegible] কথা নয়। ভোলে নি মুখ দেখেই [illegible] গেল। ভ্রূকুটি করে বলল, ধেৎ, কেউ [illegible] ফেলবে—

হাতের দখল আরো ঘন করে [illegible] বলল, এই জঙ্গলে শুধু নিজের জ[illegible] আর কেউ কাউকে দেখে না।

মিষ্টি বাধা দিল না। তার [illegible] ভালো লাগছে। অনেক পিছনে ফেলে [illegible] অতীত এমন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে [illegible] জানত! ছোট বড় গাছগুলো [illegible] দুলে সেই আগের মতোই ডাকছে [illegible] সেই রঙিন প্রজাপতির দল জোড় [illegible] এদিক ওদিক ভেসে বেড়াচ্ছে। [illegible] জোড়ায় কাঠবেড়ালি গাছের ডালে [illegible] চুরি খেলছে। খরগোশের জুটি একটা [illegible] একটাকে ধাওয়া করছে। পেখম-মেলা ম[illegible] তার ময়ূরির মন [illegible]চ্ছে। জঙ্গলের যৌবনে জরা নেই [illegible]মতা নেই।

খুশি মনে [illegible] দেখ[illegible] সব ছেড়ে হাত ধ[illegible] মানুষটা যে [illegible] চোখে ওকেই দেখছে খেয়াল নেই!

একটা গাছের মোটা সোটা ডালের ওপর হাত রেখে বাপী বলে উঠল. বাঃ ঠিক সেই রকমই আছে—উঠে পড়া যাক, তারপর তুমি আমার পা বেয়ে উঠে পাশে বোসো।

মিষ্টি তক্ষুণি বুঝেছে। সমস্ত মুখ টকটকে লাল। এইভাবে ওকে তুলে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে পাশে বসানো হত। পড়ে যেতে পারে বলে ধমকেই এক হাতে নিজের গায়ের সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ধরে থাকত। বাঁদরের ভয় দেখিয়ে আরো কত রকমের দুষ্টুমি করত। নামানোর সময় আগে নিজের বুকের ওপর টেনে নামাতো। তার-পরেও সহজে ছাড়তে চাইত না। পিঁপড়ের ভুঁইয়ের ভয় দেখিয়ে ওই রকম করে দশ-বিশ গজ এগিয়ে যেত।

—তুমি একটা অসভ্যের ধাড়ী—চলো।

আবার খানিক চলার পর বাপী আচমকা থমকে দাঁড়াল। গলা দিয়ে সুসু্স করে ত্রাসের শব্দ বার করল একটা. সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে মিষ্টিকে জড়িয়ে ধরে অন্য হাতের আঙুল একটা শিশু গাছের গুঁড়ির দিকে তুলে বলে উঠল, সাপ!

বিষম চমকে মিষ্টি একেবারে তার বুক ঘেঁষে দাঁড়াল।—কোথায়?

আরো ভালো করে জড়িয়ে নিসে বাপী শিশুগাছের মোটা গুঁড়িটা দেখালো।—ওই !.. এই যাঃ, ওখানেই তো ছিল। .. একটু আগে দেখলাম, ওই গাছের গুঁড়িতে জড়ানো সাদা-কালোর ছোপ মারা একটা বিশাল ময়াল লম্বা চ্যাপ্টা মুখটা সামনের দিকে টান করে এগিয়ে দিয়ে একটা ছোট মেয়েকে চোখে আটকে ফেলেছে, আর তাকে ধরার জন্য গাছের গুঁড়ি থেকে শরীরের প্যাঁচ খুলছে—সেদিকে চেয়ে অবশ মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে—কোথা থেকে একটা ছেলে এসে এক ধাক্কায় মেয়েটাকে পাঁচ হাত দূরে ছিটকে ফেলে দিল, তারপর তাকে তুলে নিয়ে ছুটে পালালো!

জোর করেই দু হাতে বাপী ওকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে, তেমনি শক্ত করে আগলে রেখে বলল, তারপর সেই মেয়ের মায়ের হাতে ওই মেয়ের কানমলা পুরস্কার জুটল।

বুকেত দোলা লাগছে, মাথাটাও ঝিম-ঝিম করছে মিষ্টির।—ছাড়ো, কে কোন দিক থেকে এসে যাবে।

বাপী হাসছে।—বললাম না জঙ্গলের জগৎ আলাদা, এসে গেলেও কেউ কাউকে দেখে না। সেদিনের জন্য আমার কি পুরস্কার পাওনা ছিল?

জবাবে এদিক-ওদিক চেয়ে মিষ্টি নিজের ঠোঁটে তার ঠোঁট দুটো ছুঁয়েই ধাক্কা মেরে সরালো তাকে।

বাপী হাসতে লাগল।

মিষ্টি বলল, আর বেরিয়ে কাজ নেই. কারো!

বাপী বলল, আমার কি দোষ, একে একে সব মনে করিয়ে দিচ্ছি।

মিষ্টির ঠোঁটে চাপা হাসি। টিপ্পনীর সুরে বলল, জীবনে প্রথম পুরুষ চিনিয়েছ, সব মনে আছে, আর বেশি মনে করিয়ে দিতে হবে না।

বলল বটে, এক্ষুণি ফিরতে মোটেই চায় না। ছেলে-বেলায় জঙ্গলে ঢুকলে রক্তে নেশা ধরত। এখনো তাই। তার থেকেও বেশি। সঙ্গের লোক হঠাৎ বেশ সভ্য-ভব্য হয়ে গেল লক্ষ্য করছে। জঙ্গলের গাছ চেনালো। ব্যবসার কাজে লাগে এমন কিছু গাছ দেখালো। সাপ ধরার গল্প করল। প্রায় আধ ঘন্টা বাদে ঘুরতে ঘুরতে আর এক জায়গায় দাঁড়ালো।

গাছ-গাছড়ার মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা। বাপী ভাবুকের মতো চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপর আলতো করে জিগ্যেস করল, এ জায়গাটা মনে আছে?

চারদিক চেয়ে মিষ্টি ঠিক ঠাওর করতে পারল না। মাঝের আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে ঘুরে যাওয়ার ফলে সজাগও ছিল না তেমন। জিগ্যেস করল, এখানে কি?

জবাবে বাপী হঠাৎ গায়ের শার্টটা খুলে মাটিতে আছড়ে ফেলল। তারপর মিষ্টির বিমূঢ় চোখের সামনে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ালো। বলল, এখানে কিছু বেপরোয়া ব্যাপার ঘটেছিল বলে পিঠে এই দাগগুলো পড়েছিল। বাংলোয় দাঁড়িয়ে তুমি নিজের চোখে দেখেছিলে—

ওই হাসি-হাসি মুখ আর চোখের দিকে তাকিয়েই ভিতরে ভিতরে বিষম অস্বস্তি মিষ্টির। মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলের কোনো আদিম ইশারা আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরতে চাইছে তাকে। শরীর ঝিমঝিম করছে। ছোট ছেলেকে আশ্বস্ত করার মতো করে তাড়াতাড়ি বলল, ঠিক আছে, ওখানেও হাত বুলিয়ে আদর করে দেব'খন, জামা পরে নাও।

বাপী বাধ্য ছেলের মতো নিচু হয়ে জামা কুড়োতে গেল। তারপর মিষ্টি কিছু বোঝার আগে চোখের পলকে ছোঁ মেরে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ফেলল। এক হাত ঘাড়ের নিচে, অন্য হাত দুই হাঁটুর পিছনে। একেবারে বুকের ওপর তুলে এনেছে।

মিষ্টির গলা দিয়ে একটু গোঁ গোঁ শব্দ বেরুলো শুধু। দুই ঠোঁট আর মুখও ততক্ষণে এই অকরুণ দস্যুর দখলে। বাধা দেবার সব শক্তি নিঃশেষে শুষে নিচ্ছে। আর বুঝি থামবেই না।

থামল। মুখ তুলল। দু'চোখে অমোঘ অভিলাষের তরল বন্যা। চাপা ভারি গলায় বলল, পিঠের এ-দাগ ঘরের আদরে ভোলানো যাবে না।

দু'চোখ বড় করে মিষ্টি তাকালো একবার। জঙ্গলের সেই আদিম ইশারা এখন দামামা বাজিয়ে ধেয়ে আসছে। সর্বাঙ্গ অবশ। অবশ অঙ্গের আধখানা মাটিতে আর আধখানা মাটির জামাটার ওপর নেমে এলো টের পেল।.. তারপর পৃথিবী আবার থেমে গেল। জঙ্গলের কানাকানি স্তব্ধতার গভীরে ডুবে গেল। আজ বাপী নয়, মিষ্টি তরফদার প্রায়-অচেনা এক জগৎ ঘুরে এখান থেকে এখানেই ফিরে এলো।

জঙ্গল ভেঙে মিষ্টি আগে আগে চলেছে। ছেলেবেলায় জঙ্গলের সোজা পথে ও-বাড়ি গেছে। এতকাল বাদে ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। ভুল হয় হবে, তবু পিছন ফিরে তাকাবে না।

বাপী তার হাত দশেক পিছনে। রাগের মর্যাদা দিচ্ছে আর হাসছে অল্প অল্প। খানিক বাদে ভুল রাস্তায় পা বাড়াতে দেখে পিছন থেকে বলল,.. ওদিকে গেলে এক-আধটা বাঘ-ভালুকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

মিষ্টির পা থেমে গেল। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। গনগনে মুখ। কথা বলার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তপ্ত জবাবটা আপনা থেকে এসে গেল। —বাঘ-ভালুকও তোমার থেকে ঢের বেশি নিরাপদ —বুঝলে?

অপরাধী মুখ করে বাপী তক্ষুনি মাথা নেড়ে স্বীকার করল। তারপর কোন দিকে যেতে হবে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

মিষ্টি আবার আগে আগে চলল। এত দুঃসাহস কারো হতে পারে., তার শরীরটাকে নিয়ে কেউ এমন কাণ্ড করতে পারে ভাবা যায় না। প্রচণ্ড রাগই হচ্ছে মিষ্টির। কিন্তু রাগটা পিছনের লোকের ওপর যত না, তার থেকে ঢের বেশি নিজের ওপর। কারণ, ওই লোকের ওপর যত রাগ হবার কথা, চেষ্টা সত্ত্বেও ঠিক ততো রাগ হচ্ছে না।

পাছে এ-ও টের পেয়ে যায় সেই রাগে আগে আগে চলেছে। সেই ভয়েও।

জঙ্গল ছাড়িয়ে রাস্তায় উঠলো। মিনিট তিনেকের পথ। দেখা যাচ্ছে। আগে আগে পা বাড়িয়েও মিষ্টি থমকে দাঁড়াল। গেটের সামনে বিচ্ছিরি দেখতে একটা লোক দাঁড়িয়ে। খালি গা। মিস-কালো। একরাশ চুল দাড়ি। নিজের মনে বিড়বিড় করছিল। মিষ্টিকে দেখে ঘোলাটে চোখে তার দিকে চেয়ে রইল।

মিষ্টি ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে তাকালো। বাপী হাত পনের দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটে হাসি ছুঁয়ে আছে। এগিয়ে এসে বলল, কি হল, যাও?

—ওই লোকটা কে?

—ওর নাম হারমা। মাথার ঠিক নেই।

—আমাকে এভাবে দেখছে কেন?

—মনের মানুষের অভাবে ওর এই হাল। তুমি যে-মুখ করে ফিরছিলে সগোত্র ভেবে ওর বোধহয় পছন্দ হয়েছে। চলো—

মিষ্টির হাত ধরে বাপী গেটের দিকে এগলো। এবারে মিষ্টি তার বাধা দিল না। লোকটার চাউনি দেখে অস্বস্তি লাগছে। দাঁড়িয়েই আছে। চেয়েই আছে।

—কি চাই?

বাপীর ঠাণ্ডা প্রশ্নে লোকটার সম্বিত ফিরল একটু। হাত তিন-চার দূরে সরে দাঁড়াল। পুরনো অভ্যাসে একটা হাত তুলে কপালে ঠেকালো। কিন্তু চাউনি সদয় নয় এখনো। ঘুরে হনহন করে জঙ্গলে নেমে গেল।

(চলবে)

প্রদর্শনী

নতুন বাংলা বছরের শুরুতে, অশোক ভৌমিক আর তিলক মন্ডলের ছবির যুগ্ম প্রদর্শনী হলো আকাদেমী অব ফাইন আর্টস-এ। বর্তমান লেখক এর আগে তাঁদের যুগ্ম প্রদর্শনী দেখেছিলো বিড়লা আকাদেমিতে, আর এই সাপ্তাহিকে তাঁদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাস জানাবার সুযোগও তার হয়েছিলো কিন্তু তাঁদের এই গ্রীষ্ম-কালীন প্রদর্শনী তাকে কিছু নিরাশ করেছে। অবশ্য এটা কখনোই আশা করা যায় না যে মাস আটেকের মধ্যে শিল্পীরা নিদারুণভাবে পাল্টে যাবেন বা নতুন হয়ে উঠবেন, এটাও প্রত্যাশা করা সম্ভব নয় যে শিল্পীরা নিজেদের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে এতোটা তৎপর হয়ে উঠবেন। যা একমাত্র পাল্টেছে তা হলো বৈশাখ মাস আর তিলরঙ—অন্তত অশোক তিলকের এই প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বৈশাখ মাসটি আমাদের কলকাতায় একদম সহনীয় নয় ছবি দেখার পক্ষে। অশোক ভৌমিক ও তিলক মন্ডলের ছবির মতো বিস্ফোরক ছবি দেখার পক্ষে তো নয়ই, বিশেষতঃ, সেই বিস্ফোরণ যেখানে রিপিটিটিভ। সেই একই গ্রোটেস্ক আর বিদ্যার অশোকের উপজীব্য- সেই কালো গর্ত যাকে ফাঁপা গাছের গুঁড়ির মতো লাগে, সেই সুপারন্যাচারাল সবুজের ছোঁয়া। তফাত খারাপের দিকে। রয়াল ডিনার যে ছবির নাম সেই ছবির সন্দর্ভ যদি হয় একটি অতিপ্রাকৃত প্রাণীর আর একটি অতি-প্রাকৃত প্রাণীর বুকের মধ্যে শুঁড় ঢুকিয়ে কালো আত্মাপান, তাহলে নাটকীয়তা যতোটা প্রশ্রয় পায় ছবি ততোটা আশ্রয় পায় না। অশোকের মেজাজে নাটকীয়তা আছেই, এটাই যদি তাঁর চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে তাহলে দৃষ্টিভঙ্গির বদলে ভাবপ্রবণতার প্রশ্নই উঠে পড়ে। এবার তাঁর তিনটি ছবিতে চাকা চলে এসেছে। নতুন কোনো মাত্রা আনেনি— খানিকটা ইনফ্যান্টাইল রিলিফ হয়েছে ওই চাকার অবদানে। তেল-রঙের মর্ম অশোক জানেন না এ কথা কখনোই বলছি না—কিন্তু এতে নতুন কি সুবিচার তিনি নিজের প্রতি করে উঠেছেন আমি জানি না। বরং মনে হলো এতে তাঁর পারার্জিত কৃতী ও ক্ষমতার কতকটা লঘুকরণ হয়েছে। যদিও, অশোকের প্রদর্শিত চার নম্বর ছবি যেটির চিত্রনাম ইডিয়টস—খুবই চমৎকার। চন্দ্রা-লোকিত গাছের গুঁড়ির সারি আর তিনটি মানবেতর প্রাণীর উপস্থিতি এই ছবিতে এমন একটা মোহ রচনা করেছে যে হঠাৎ তাকালেও জীবনানন্দের কিছু নিশ্চিত কবিতার সঙ্গে এর প্রতিতুলনা খুঁজে পাওয়া যায়।

তিলক মন্ডলের চিত্রপটগুলির দৈর্ঘ্য হলের কারণে কমে গিয়েছে, যাতে, তাঁর বর্ণাঢ্যতার গ্ল্যামারও অপসৃয়মান। তাঁর ছবির মানুষরা একটু নিআন্ডারথল ধাঁচের-এর থেকে বিদ্রূপের বেশি কিছু আসে না, আমার ধারণা। রমনীমুখগুলি ঈষৎ বঙ্কিম ভিকটোরীয়। একটা অনভিপ্রেত শৌখিনতা তাঁর এই প্রদর্শনীর সমস্ত ছবিতে জড়িয়ে। অথচ, অশোক ও তিলকের এ সমস্ত ছবিতেও এমনভাবে শিল্পীব্যক্তিত্ব লেগে থাকে যে কোনো ছবিই অতিতুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁদের পরবর্তী প্রদর্শনীর অপেক্ষায় থাকলাম।

৩রা এপ্রিল পর্যন্ত অশোক ও তিলকের যুগ্ম প্রদর্শনীর পর ৪ঠা এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত তাপস বসুর ছবির প্রদর্শনী ছিলো একই ভবনে কক্ষান্তরে। তাঁর কুড়িটি ছবি প্রায় তিনটি ধরণ নিয়ে হাজির। ৩, ৫, ৬ নম্বর ছবি গুলিতে চরকার ঘর্ঘর, বাদামী লাল রঙের স্পন্দিত প্রয়োগ, জলতল আলো করা প্রস্ফোটিত সূর্যমুখীর সংস্থানে ও শৃংখলময়তার ডাইনামিক রূপসৃষ্টিতে কিছু নাটকীয়তা থেকে যাকে—যার প্রাণনা নির্বিধ স্বীকার করলেও, খুব নতুন কিছু এ-কথা বলা যায় না—কিন্তু মেনে নিতে হয় এটি তাঁর অন্যতম ধরণ। এই লেখকের ভালো লাগলো তাঁর সুষমাবৃত্ত ছবিগুলি, সেইগুলিই সংখ্যায় বেশি। তাদের সব কটিতেই গাঢ় নীলরংকে কোনো না কোনোভাবে ঘুরে আসতে দেখা যায়, সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত হতে দেখা যায় এবং ইদানীং-কার বাংলা চিত্রশিল্পে দুর্লভ এক মমতা তাদের বার্তা হয়ে ওঠে। তেরো নম্বর ছবিটি—বার্ড ওম্যান উইথ হার এগস—প্রায় কিছুটা মন দিয়ে, কিছুটা বন দিয়ে গড়া এক নীলকণ্ঠ পাখির মতো অপরূপ। এই সুষমাটি ভারতীয় কিন্তু ভারতীয় ছবি বলতেই যে অনর্থক বস্তুবহুল মেদময়তা আর বস্তুর কার্বন-কপি নিষ্ঠ-তার একটু এলায়িত প্রয়োগ বোঝায় তা নয়। আর মনে পড়ছে। তাঁর 'রাত্রির শহর' নাম্নী আলেখ্যটির কথা। পেন অ্যান্ড ইংকের সাহায্যে জ্যামাকার্নিক নাগরিক যান্ত্রিকতার পাশাপাশে মানোহীন স্কাই-স্ক্রেপারের পরিকল্পনা-ও হয়তো অতোটা মুগ্ধ করতে পারতো না যদি না চিত্রপটটির ঊর্ধ্ব ও বাম পাশের কিছু অংশ সাদা ছাড়া থাকতো এবং কিছু অংশ তুলি-বোলানো ধরণে বন্ধ্যা সন্ধ্যাভাস ফুটে উঠতো। প্রথম ধরণের সব থেকে ভালো ছবি [illegible] আমার ধারণা। [illegible] তাঁর নাংকর্ষিনী বা কসমিক [illegible] ভালো লাগেনি। জ্যামেটিক বেশি উচ্চাভিলাষী, বক্তব্যকাতর ও ভার্বস। সৌভাগ্য, কুড়িটি ছবির মধ্যে এই ধরণের ছবির সংখ্যা দুই। যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো পরিপ্রেক্ষিতের সাধারণবোধ্য কোহেরেন্স এবং নয়নরম্যতা - তাপস বসু এই দুটি জিনিষ ঐ দুই ছবি ব্যতীত কখনো বাদ দেননি, অথচ, তা কখনো শিল্পস্বভাবের বিরোধিতা করেনি।

*

আলপনা পন্ডিতের পুষ্পছবি আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে দেখানো হলো ১৬ থেকে ২২ জুন পর্যন্ত। বেলা চারটে নাগাদ গিয়ে, ষোলো তারিখে সাউথ গ্যালারি বন্ধ দেখলাম। কারণ জানিনা।

সমস্তই ফুলের ছবি—কাজেই একটা সহজ মন নিয়ে এই ছবিগুলো দেখা যাচ্ছিল। শীতকালের ফুল বেশি—শীত-কালের ফুল এমনিতেই বেশ ওজনদার ও বর্ণাঢ্য হয়। অবশ্য এই নয় যে আল্পনা পন্ডিত শীতকালের ফুলগুলির রঙ করা প্রতিচিত্র বা ফটো দিয়ে গেছেন। শুধু ইঙ্গিত বা এমফ্যাসিস পড়েছে শীতকালের ফুলের- একটু বা বিদেশি ফুলেই। পল্লবময় পরিপ্রেক্ষিত ফুলগুলির সাহায্য করেছে। ফুল এমনিতেই আমাদের শিল্পধারণার গুণে, প্রতীক হয়েই আছে। কাজেই একজন দর্শককে এখানে যা লক্ষ্য করতে হবে, তা হলো, শিল্পীর নি[illegible]চিত অনুপুঙ্খ, তাঁর ব্রাশ চালনার [illegible]সাফল্য আর ছবির প্রাণিত করার ক্ষমতা। এটি শিল্পীর প্রথম একক প্রদর্শনী হলেও, আমার ধারণা, কোনো দর্শককেই আলাদা-ভাবে সহানুভূতিশীল হয়ে তাঁর কাজ দেখতে হয়নি। কয়েকটি সফল ছবির পাশে অবশ্যই কয়েকটি দুর্বল আলিম্প-প্রভাবিত ছবি হয়েছে। কিন্তু সেরকম হওয়াই হয়তো সঙ্গত। হল ছেড়ে চলে আসার সময়ও ভোলা যায় না তাঁর একটি ছবির ফুলের পাপড়ি মৌমাছিদের শরীরের তুলনায় ভাবিত হয়েছে- যা একটি সুন্দর ও অমোঘ তুলনা। একটি নীল পশ্চাৎপটে কাত শাদা ফুলের সংকীর্তন, অনেককেই মুগ্ধ করবে। সাত নম্বর ছবিতে হরিদ্রা রঙ সেভাবে কালো বিদীর্ণ করে উঠে এসেছে তাতে হয়তো আন্দাজ করা যাবে ফুল নয়, স্ফুটনোন্মুখতাই শিল্পীর অন্বিষ্ট [illegible] ছিলো। তাঁর [illegible] রেখাসংযোজন উদ্দেশ্যহীন নয় সমস্তটা সার্থকও নয়—কারণ, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়, তাঁর দর্শকেরা পাননি। আমরা তাঁর পরবর্তী প্রদর্শনীর অপেক্ষায় থাকলাম।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

নদীর প্রবাহ বলে

শান্তিকুমার ঘোষ

নদীর প্রবাহ মানুষকে শান্ত হতে বলে
বলে, যেন না থামিয়ো গতি
দুই তীর ঢেকে দিয়ো পাতা ও কুসুমে
রেখো না আড়াল কোনো প্রেমিকের সাথে
মাঝে-মাঝে সাঁকো বেঁধো—যাতে চলে পারাপার

দু-একটি ফললেও বেশির ভাগ ঝরে যায় স্বপ্নের মঞ্জরী
উৎস থেকে মোহানায় মগ্নতা ভুলবে কি
নদীর প্রবাহ বলে, আনন্দের জাগিয়ো লহরী

জয়ের অলীক আনন্দে

শান্তি সিংহ

প্রতিটি জয়ের মধ্যে পরাজয়ের গ্লানি থাকে লুকিয়ে।
তাই আহ্নিক গতি, বর্ষাচক্র কিংবা যাযাবরী পাখির দুঃখ
বেমালুম ভুলে থাকি; কিংবা জয়ের আনন্দ তাৎক্ষণিক সত্যে
ব্যর্থতার বেদনাকে ধীরে ধীরে প্রকট করে, যেমন পেঁয়াজের
কোষ যায় খুলে আর ক্রমশ শূন্যতা হাঁ-করে,
তেমনি এক অর্থহীন অসংলগ্নতা জীবনের চতুর্দিকে
বোধ-বুদ্ধির পর্দা অবিরাম সরিয়ে দ্যায়, কেবলই
পরাজয়কে জয়ের অলীক আনন্দে ভরিয়ে তোলে।

আমি অর্থহীনতার মাঝে কেবলই ঘোরপাক খাই
অবিরাম রক্ত ঝরাই, গোপন যুদ্ধে বিধ্বস্ত হই আর রক্ত ঝরাই
তবু পরাজয়ের গ্লানি কিংবা মরচে পড়া দুঃখ অবিকৃত থাকে।

জানলায়

অজিত বাইরী

আমি দাঁড়াই আমার নিস্তরঙ্গ জানলায়
আর আকাশের দিকে ফিরিয়ে রাখি চোখ।
জুঁই ফুলের মত ফোটে ছোট ছোট নক্ষত্র
মেঘের ডিঙি ভেসে যায়।
আর বনের বাতাস এসে চমকে দ্যায়
বাতাসের হা-হা হাসি...

আমি একবার তাকাই জানলার বাইরে
একবার নিজের ঘরের ভেতর: বিস্রস্ত মলিন
বিছানা, ছেঁড়া বালিশের তুলো, ওডিকলোনের শিশি
টেবিলে স্তূপাকার কাগজ, আরশোলার
বিষ্ঠায় ভর্তি, কবেকার পুরনো পাণ্ডুলিপি।

একবার তাকাই আকাশে একবার ঘরের ভেতর।
আর ভাবি এক-একটি চন্দ্রভুখ রাত্রির কথা:
আর বিশীর্ণ সেই নোংরা কুৎসিত আঙুল
দারিদ্র্যের, চুরি করে নিয়ে যায় কবির হৃদয়।

সমালোচনা

আরব্য রজনীর গল্প

গল্পের গন্ধ সকলকেই পাগল করে। পাগল নেশার ঘোর লাগে, চোখ থেকে ঘুম উড়ে যায়—সারা শরীর জুড়ে নাচে গল্পের স্রোত। গল্প হাঁটে, গল্প কথা বলে, ফিশ-ফিশ করে ঘুরে বেড়ায় বসন্তে, বাগানে। পেয়ালা পেয়ালা গল্পের মদ বিভোর করে দিয়েছিল ইরানের সেই বাদশাকে—মেয়েদের বেইমানির শোধ নিতে গিয়ে যিনি হয়ে উঠলেন গল্পের মুগ্ধ শ্রোতা, নিবিড় বান্ধব।

আসল গল্পটা তাহলে কি ছিল? বাদশা শাহরিয়ারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তাঁর প্রিয়শ্রেষ্ঠা বেগম। ক্রোধে অস্থির হয়ে বাদশা তাকে খুন করলেন। সেই খুনের আলো গিয়ে পড়ল রাজ্যের প্রতিটি তন্বীর অঙ্গরাজ্যে। হারেমের তাবৎ বেগমের প্রাণ নিবিয়ে দিলেন এবং উজিরকে ডেকে হুকুম দিলেন, রোজ সন্ধ্যায় সম্ভ্রান্ত মহল থেকে একটি করে সুন্দরী যুবতী যোগাড় করে আনতে হবে। সেই-দিনই শাহরিয়ার সেই মেয়েকে বিয়ে করবেন—সারা রাত্রি আদর করবেন বেগমের সম্মান দেবেন—সকালবেলা মেরে ফেলবেন। এইভাবেই হলো বাদশার ধারাবাহিক নারী-হত্যার সূচনা। কিন্তু যুবতী সংখ্যারও সীমা আছে। যে কারণে বছরখানেক বাদে উজির দেখলেন, নিজের দুটি কন্যা ছাড়া শাহরিয়ারের যোগ্য নারী দেশে আর নেই। মন খারাপ করে তিনি ভাবতে বসলেন, কি করা যায়।

উজিরের বড় মেয়ে শাহরাজাদী। রূপে রঙ্গে, মেধায় উজ্জ্বলতায় ঝলমল করছে। দুর্দান্ত কথা বলার ভঙ্গী। এই চরিত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরব্য রজনীর নাটক শুরু।

উজিরের মন খারাপ দেখে শাহরাজাদী বলল, 'কেন তুমি ভাবছ আব্বা? আমায় নিয়ে চল বাদশার হারেমে।' উজির স্তম্ভিত। শাহরাজাদী হাসতে হাসতে বলল, 'মিথ্যে ভয় পেয়ো না। আমি এমন একখানা ফন্দি এঁটেছি, যদি খাটাতে পারি নিজে তো বাঁচবই, অন্য মেয়েদেরও বাঁচাতে পারব।'

কি সেই ফন্দি? কি সেই মোহস্পর্শ যার ছোঁওয়ায় বাদশার মনে ঘোর লাগল, নেশাগ্রস্ত হলেন তিনি? সেই ফন্দির নামই গল্প। রাশি রাশি পাগলকরা গল্প। একটি গল্প শেষ হতেই আরেকটি, আবার সেটি শেষ হতেই অন্য আরেকটি। হাসিমুখে ছোটবোন দুনিয়াকে বলল শাহরাজাদী, 'বেগম হয়ে শেষ রাত্রে আমি বাদশার কাছে বায়না ধরব, আমার ছোটবোনকে জন্মের শোধ একবার দেখব। অনুমতি বাদশা দেবেন। [illegible] এক-বার আমার কাছে গল্প শুনতে চাস। বাস। তাহলেই দেখবি কাজ হয়ে গেছে।'

বসরাই গোলাপের মতো সুন্দরী শাহরাজাদী যথারীতি পরদিন সন্ধেবেলা বাদশার অন্তঃপুরে ঢুকল। গল্পের ঘোড়াও ঢুকল তার সঙ্গে সঙ্গে। এখান থেকেই সে তার দৌড় শুরু করবে।

অনুমতি শাহরিয়ার দিয়েছিলেন। শেষ রাত্রের দিকে দুনিয়া এল দিদির কাছে। ফন্দি মতো সে শাহরাজাদীকে বলল, 'দিদি একটা গল্প শোনাবি? কি সুন্দর গল্প বলতিস তুই। আর তো শুনতে পাব না, জন্মের শোধ তাই—' দিদি উত্তর দিল, জাঁহাপনা ঘুমিয়ে আছেন। আমি কথা বললে ওঁর ঘুমের অসুবিধে হবে। তিনি যদি অনুমতি করেন, তবেই আমি তোকে গল্প শোনাতে পারি।'

শাহরিয়ার জেগেই ছিলেন। বললেন, 'আমি ঘুমোচ্ছি না। শোনাও না তুমি বোনকে গল্প—আমিও একটু শুনি।'

ঠিক এই প্লট থেকেই দৌড় শুরু করল গল্পের ঘোড়া। বাদশার অনুমতি পেয়ে মনে মনে খোদাকে তসলিম করে ধীর মধুর কণ্ঠে শাহরাজাদী শুরু করল তার গল্প। আশ্চর্য সঙ্গীতশিল্পীর মতো সে সুরবিন্যাস করল। শাহরিয়ার আর দুনিয়াজাদীর সামনে ভেসে উঠতে লাগল, কত মরুপ্রান্তর, খর্জুরবীথি, কত সরিৎ-সাগর পর্বত, কত দৈত্যদানাপুরী, রাক্ষস, কত ধনরত্ন হীরে-জহরত, কতরকম পাখী আর তিমিঙ্গিল, কত বিপদঝঞ্ঝা, প্রমোদ বিলাস, কত সুন্দরী বিলাসিনী নর্তকী, কত দুঃসাহসিক অভিযান, কত কুটিল চক্রান্ত হিংসাদ্বেষ আর প্রণয়ের কাহিনী। গল্প শুনতে শুনতে রাত্রি শেষ হয়ে গেল, গল্প শেষ হলো না। শাহরিয়ার বললেন,—বাকীটুকু কাল আবার শুনব—'

এভাবেই গড়িয়ে এসেছে একটির পর একটি গল্প। দুঃখের গল্প, মন ভালো হওয়ার গল্প, পাখপাখালি জীবজন্তুর গল্প, একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের গল্প। সমগ্র খণ্ডে জায়গা পেয়েছে মোট ছয়টি গল্প। এগুলির মধ্যে সবচাইতে সুগন্ধি এবং সব-চইতে আকর্ষণীয় সম্ভবত প্রথম গল্পটি—'আজিজ, আজিজা ও শাহজাদা' তাজ-অল মুলুকের কাহিনী। ইস্পাহান পাহাড়ের ধারে সবুজ শহর। সবুজ শহরের সুলতান সুলেমান শাহ। সফেদ শহরের সুলতান জহুর শাহের মহা খুবসুরত কন্যাকে বিয়ে করলেন তিনি। সেই বেগমের গর্ভেই এল সুলেমান শাহের বংশধর—একমাত্র পুত্র তাজ-অল-মুলুক। এরই এক দুখী বন্ধু আজিজকে নিয়ে এই গল্পের চলাফেরা। আজিজকে ভালবাসত তার চচেরা বোন আজিজা। ভালোবাসা চিনতে ভুল করে আজিজ নিজে কষ্ট পেল, আজিজাকেও শোকে ভাসাল। বর্ণনাভঙ্গির কথা বাদ দিলে, এই গল্পের অন্যতম সম্পদ করুণগন্ধ [illegible]।

পরের গল্প—'শাহাজাদী দুনিয়া ও শাহজাদা তাজ-অল-মুলুকের কাহিনী'। এখানেও সেই আজিজ প্রায় মুখ্য চরিত্র। সুলেমান শাহের মৃত্যুর পরে তাজ-অল মুলুক সবুজ শহরের সিংহাসনে বসল। গল্পও চুপ করল। এ গল্প মন ভালো হওয়ার গল্প। ঝড়ঝাপটার ইতি ঘটিয়ে শাহাজাদী দুনিয়াকে পেয়েছিল তাজ-অল মুলুক। গল্পের নায়িকার সঙ্গে নিজের নামের মিল দেখে শাহজাদীর ছোটবোন দুনিয়া খুব খুশী। এদিকে ভোর হয়ে এসেছে। বাদশার নমাজের সময় হলো। দুনিয়া আবদার ধরল, 'কাল শুনব পাখ-পাখালি আর জীবজন্তুর গল্প।' হাসিমুখে শাহরিয়ার অনুমতি দিলেন। নতুন বেগমের প্রাণদণ্ডও পিছিয়ে গেল আরেকদিন।

এইভাবে পরপর ছয়টি গল্প বাসা বেঁধেছে পাঠকের বুকে। কিন্তু তারপর? কতদিন এভাবে গল্প বলবে শাহরজাদী? কতদিন শুনবেন শাহরিয়ার? সে উত্তর খোঁজার দায় আমাদের নয়। সে উত্তর দেবে 'আরব্য রজনীর রহস্যরাজ্য। আমরা শুধু গল্প শুনব।

অভীক রায়

আরব্য রজনী (ষোড়শ খণ্ড) : তারাপদ রাহা। প্রকাশক : রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, দাম : আট টাকা

ছোটদের গল্পের বই

বড়দের জন্য লেখা গল্প বা বড়দের জন্য প্রচলিত গল্পও অনেক সময় ছোটদের ভাল লাগে যদি গল্পগুলি ছোটদের উপ-যোগী করে রচনা করা হয়। এইরকম চেষ্টা আগে বহুবার হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের কয়েকটি গল্প নিয়ে ছোটদের জন্য শিশির মজুমদারের 'ছোট বউ ও কালো বেড়াল' এই রকম একটি বই। এতে আছে মোট দশটি গল্প। শিশিরবাবু প্রতিটি গল্পই লিখেছেন এমন চিত্তাকর্ষক করে, এমন সহজ ভাষায় যে, ছোটরা একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে উঠতে চাইবে না। আমারও সেই দশাই হয়েছিল। তবু বলতেই হয়, সবগুলি গল্প একই মানের হয়নি। আমার বেশি ভাল লেগেছে রুমনা ঝুমনার গল্প এবং ছোটবউ ও কালো বেড়াল। শিশুসাহিত্য রচনায় শিশিরবাবুর হাত পাকা—এমন প্রমাণ মিলেছে এই বইটিতে। আশা করতে পারি, ছোটরা বইটি পড়ে দারুণ খুশি হবে।

অমিতাভ চক্রবর্তী

ছোট বউ কালো বেড়াল : শিশির মজুমদার, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৯ দাম : ছয় টাকা।

াত্মপ্রবঞ্চনার দায়

ায় বসু

গমগমে গড়ের মাঠে ঘরোয়া ফুটবলের ভরা মরশুম। ময়দান জোড়া আসব । ছোট বড় সব দলই এই আয়োজনের ল।

জ জনতার জমাট জমায়েৎ বাছা বাছা ক আঙিনায়, যেখানে খেলে ওই বাছা কটি দলই কীর্তি কৃতিত্বের য়ে যাদের খ্যাতি আজ তুঙ্গে। কল-র ফুটবল মঞ্চে তাবাই দর্শনধারী লব। ভিড় সেখানেই। চড়চড়ে রোদ, াটে ঝড়, চরম অব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা না কিছুই দর্শকদের দমাতে পারে না। নিয়মিত হাজিরা দেন টিকিট ঘরের গোড়ায়। ভোর হতেই শুরু প্রতীক্ষার ।

অপেক্ষায় দীর্ঘ প্রহর কাটে। মধ্যাহ্ন ি আপ্যায়নে চাঁদি যায় ফেটে। আর্দ্র হাওয়ায় সারা অঙ্গে ঘাম ঝরে। ভরার তৃষ্ণা মেটাতে এক বিন্দু জল মেলে তালু শুকোয়। ভেতরটা চাসফাঁস র মিলিয়ে এক দুঃসহ অবস্থা জ তার তাতে থোড়াই কেয়ার। চোখের সামনে বহুবিদিত খেলোয়াড়,

সমর্থিত দলের প্রতিনিধিদের দেখতে পেলেই তাঁরা খুশি। পরম পাওয়ার তৃপ্তিতে তুষ্ট। সমর্থিত দলের জিৎ হলে তো আর কথাই নেই। তখন গলায় গলায় গলাগলি। বাহু-বন্ধনে জড়াজড়ি। উর্ধ্ববাহু হয়ে স্বতঃ-স্ফূর্ত নাচানাচি। আনন্দ বাঁধন ছেড়া। আবেগ শিথিল। প্রিয় দলর জয়ধ্বনিতে পরিপার্শ্ব সোচচার।

কোনো দিন অতর্কিতে যদি সমর্থিত দলকে অল্প বিস্তর হলেও হোঁচট খেতে হয় অমনি ময়দানী চিত্র যায় বদলে। ঠোঁটের হাসি মিলোয়। মেজাজে আগুন ধরে। আর সেই আগুনে ফুলকিগুলি ইঁট পাথরের টুকরো হয়ে মাঠের মধ্যে ঠিকরে পড়তে থাকে। তখন খেলার মাঠে খেলা ভাঙ্গার পালা গান শুরু হয়ে যায়। তবু ভাঙ্গতে ভাঙ্গতেও খেলা শেষ পর্যন্ত ভাঙে না। আবার জোড়া লাগে। ইঁট পাথরের ঘায়ে চোট পেয়েও কলকাতার ফুটবলের মেরুদণ্ড আবার খাড়া হয়েই দাঁড়িয়ে ওঠে।

কলকাতার ফুটবল ফুটবলের শহরের নিজস্ব পরিবেশেই বেশ অবাধে । বাঁচার মতো বেঁচে। এই পরিবেশে যা কিছু ঘটে তার সবটুকু অবশ্য শোভন, রুচিকর নয়। কিন্তু সবই যে প্রাণের স্পর্শে জীবন্ত, তাতে আর সন্দেহ কী! এমন পূর্ণ প্রাণের পরিচয়কে যদি সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংহত করা যেত তাহলে এই মাঠই কল্যাণকর কর্ম-যজ্ঞে অর্থবহ অবদান রেখে দিতে পারত। কিন্তু তা আর হল কই। বে-হিসেবের দায় মেটাতে গিয়ে গড়ের মাঠ তুচ্ছ খেলার মাঠই হয়ে রয়ে গেল. জীবন খেলার মনোমত মাঠে রূপান্তরিত হতে পারল না। পারল না আমাদেরই কর্মদোষে। চিন্তার দৈন্যে। চিন্তিত পরিকল্পনার অভাবে।

চলতি মরশুমে কলকাতায় কেমন খেলা হচ্ছে? যেমন হয়ে আসছে গত কয়েক বছর ধরে, ঠিক তেমনি। বড় বড় দল জিতে চলেছে। ছোটরা বড় মাপের মূলধন হাতে নিয়ে বড়দের মুখোমুখি হতে পারছে না। আর তা পারবেই বা কী করে? তেমন মূলধন ওদের কোথায়: বড়দের সামর্থ্য অঢেল। লোকবল, অর্থবল। এবং নামী-দামী খেলোয়াড়দের সামর্থ্য ঘিরে আরও কতো অপরিমিত বল। দুনিয়ার সব সুযোগই তো তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠে, এমন সাধ্য কি ছোটদের আছে? কী আছে তাদের ইচ্ছা-শক্তি ও মনোবল ছাড়া?

তবু এক ফাঁকে একদিন, তথাকথিত এক

ছোট দল টালিগঞ্জ অগ্রগামী প্রথিতযশা ইস্টবেঙ্গলের মোকাবিলায় ভিন্ন স্বাদের ফুটবল খেলে সাবেকী ধ্যান-ধারণার এবং একপেশে দর্শকদের গোঁড়ামির মূল ধরে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে।

সেদিনের টালিগঞ্জ ছিল আচরণে নিয়ন্ত্রিত, পরিমিত। সৃজনধর্মিতায় উজ্জীবিত। আত্মপ্রত্যয়ে নিটোল। সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকলাপের কল্যাণেই টালিগঞ্জ নিজের প্রতিচ্ছবির ওপর রংয়ের প্রতিফলন জাগিয়েছিল। বলার কথা এই যে স্বীকৃত কোনো ফুটবল কোচ পথ নির্দেশ দিতে সেদিন টালিগঞ্জের পাশে ছিলেন না। নেইও। টালিগঞ্জের ছেলেরা নিজেরাই নিজেদের বন্ধু, উপদেষ্টা ও পথ নির্দেশক। স্বরচিত পথ পরিক্রমায় আত্মস্থ টালিগঞ্জ বুঝি বলে গেল যে যথার্থ ফুটবল খেলা অল্পখ্যাতদেরও সাধ্যায়ত্ত। সে গৌরব শুধু নক্ষত্রমার্কা চরিত্রদের একচেটিয়া নয়।

আর ওই নক্ষত্রমার্কা খেলোয়াড়ের দল। তাঁদের অনেকেই এবার প্রত্যাশিত মানে পৌঁছতে পারেন নি। দেখে অনেকেই আশাহত হয়েছেন। যেহেতু তাঁদের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মেটেনি। নামীদের মধ্যে গৌতম সরকার, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, মানস ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রসূন ব্যানার্জি, সত্যজিৎ মিত্ররা না হয় নিজেদের সুনামে মানানসই হয়ে আছেন। কিন্তু অন্যদের কী হল? বিশেষত বাইরে দিকে আমদানী করা নামী-দামী খেলোয়াড়দের?

কলকাতায় এবার বাইরের খেলোয়াড়দের ভিড় নেহাৎ পাতলা নয়। পাঞ্জাব, কেরল ছেঁচে গণ্ডাখানেককে সাদরে আনানো হয়েছে। নামের পুঁজি তাঁদের অনেক। কিন্তু কাজের হিসেবে তাঁরা কি নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করতে পেরেছেন?

এঁদের জমায়েৎ উপলক্ষেই দলানুরাগীরা বড় আশায় বুক বেঁধেছিলেন। প্রত্যাশা ছিল যে তাঁদের সমর্থিত দলগুলি প্রতিদ্বন্দ্বীদের সামনে পেলেই গোলের মালা পরিয়ে তবেই ছাড়বে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। ক্ষেত্র বিশেষে বড় তরফদের জিততে হয়েছে এক সুতোর ব্যবধানে এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলে।

হারজিতের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবধান কিসের সাক্ষ্য দিচ্ছে? ছোটদের লড়িয়ে মেজাজের এবং বড়দের অকৃতকার্যতার নয় কি?

ছোটদের সীমিত স্বার্থ ছত্রখান করার কৌশল বড়দের অজানা রয়ে গেল কেন? তাহলে বড়রা বড় কিসে? বড় দলের বড় বড় খেলোয়াড়দের কেউ কেউ কাগুজে বাঘ নয় তো?

কাগুজে বাঘ? প্রশ্নটি অনুধাবনযোগ্য। অনুন্নত পর্যায়ের আন্তর্জাতিক খেলায় ভারতের বেহাল অবস্থা দেখে প্রশ্নটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আরও আকৃষ্ট হয়। এশীয় ক্রীড়ার উপর্যুপরি দুটি অনুষ্ঠানে ভারতকে যথাক্রমে তিনটি খেলায় চোদ্দটি এবং পাঁচটি খেলায় তেরোটি গোল হজম করতে হয়েছে। দেশে যদি সত্যিই তেমন বাঘা বাঘা খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষক থাকতেন, যদি থাকত ক্রীড়া উন্নয়নে সর্বাত্মক আয়োজন তাহলে এশীয় ফুটবলে ভারতের এমন শোচনীয় পদস্খলন কি ঘটতে পারত? পারত না।

আসলে প্রচার সর্বস্ব এইকালে অনেক মেকী জিনিস সাচ্চা বলে বাজার চলু হয়ে আছে। প্রচারের জোরে এবং বোঝার ভুলে অনেকেই আজ মস্ত খেলোয়াড় বনে গেছেন। সাধারণ হয়ে পড়েছেন অসাধারণ। কিন্তু প্রচারে আর কাজের হিসেবে যখন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন সত্যোপলব্ধির ক্ষেত্র হয় প্রশস্ত।

কলকাতার দর্শকরা বোধহয় এবার সেই সত্যেরই মুখোমুখি হতে চলেছেন। যাঁরা খেলোয়াড় হিসেবে জাতে কুলীন নন, তাঁদের নিয়ে মাতামাতির কাল বোধহয় শেষ হতে চলেছে। যতো তাড়াতাড়ি শেষের সেই লগ্নটি সামনে এসে পড়ে ততোই মঙ্গল। কারণ, হুজুগে মেতে থাকার বিলাসে নিজেকে জড়িয়ে রাখার পরিণামে ফুটবলের এই শহরকে অনেক ফাঁকি মাথা পেতে নিতে হয়েছে। আত্মপ্রবঞ্চনার দায় থেকে ফুটবলের কলকাতা না হয় এবার নিজেকে বাঁচাতে শিখুক।

খেলা

ফরাসী টেনিস

১৯৭৯ সালের ফরাসী মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের এক নম্বর বাছাই বিয়রন বর্গ (সুইডেন) ৬-৩, ৬-১, ৬-৭ ও ৬-৪ গেমে প্যারাগুয়ের ভিক্টর পেচাচিকে হারিয়ে মোট চারবার ফ্রেঞ্চ সিঙ্গলস খেতাব জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছেন। এ বছরের এই প্রতিযোগিতায় প্যারাগুয়ের ২৩ বছরের ভিক্টর পেচাচি অবাছাই খেলোয়াড় হিসাবে তিনটি অঘটন ঘটিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন। তিনি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ৬ নং বাছাই আমেরিকার হ্যারোল্ড সলোমনকে হারিয়ে প্রথম চমক সৃষ্টি করেন। এর পর কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁর কাছে হার স্বীকার করেন ৩ নং বাছাই গিলারমো ভিলাস (আর্জেন্টিনা)। এর আগে ভিলাস একবার ফ্রেঞ্চ খেতাব পেয়েছিলেন এবং গত চার বছরে দুবার রাণার-আপ হন। সেমি-ফাইনালে পেচাচি ৭-৫, ৬-৪, ৫-৭ ও ৬-৩ গেমে প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান এবং বিশ্বের ২ নং বাছাই আমেরিকার জিমি কোনর্সকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। কোনর্সের বিপক্ষে পেচাচির অসাধারণ খেলা দেখে টেনিস কোর্টের ১৮ হাজার দর্শক বিস্ময়ে হতবাক হন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন আন্তর্জাতিক টেনিস গগনে আর এক নতুন তারকার উদয় হল।

মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে ক্রিস এভার্ট লয়েড (আমেরিকা) ৬-২ ও ৬-০ গেমে অস্ট্রেলিয়ার ওয়েণ্ডি টার্নবুলকে হারিয়ে মোট তিনবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন। এর আগে এই আসরে তিনি সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন উপর্যুপরি দুবার (১৯৭৪-৭৫) অস্ট্রেলিয়ার ওয়েণ্ডি টার্নবুল তিনটি বিভাগের ফাইনালে খেলে শেষ পর্যন্ত দুটি বিভাগে খেতাব জয়ী হন (মেয়েদের ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে)।

জুনিয়র বিভাগের ফাইনালে রমেশ কৃষ্ণান (ভারত) ২-৬, ৬-১ ও ৬-০ গেমে আমেরিকার বেন টেস্টারম্যানকে হারিয়ে খেতাব জয়ী হন।

জাতীয় ফ্রি স্টাইল

সিমলায় আয়োজিত ২৮তম জাতীয় ফ্রি-স্টাইল কুস্তি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম দিল্লী (৫২ পয়েন্ট), ২য় সার্ভিসেস (৪০ পয়েন্ট,) ৩য় রেলওয়ে (৩৪ পয়েন্ট) এবং ৪র্থ হরিয়ানা (২২½ পয়েন্ট)।

বিশ্ব কাপ ক্রিকেট

ইংল্যাণ্ডের মাটিতে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসেছে মে ২২ তারিখ থেকে। প্রাথমিক পর্বের খেলা শেষ হয়েছে এবং বর্তমানে মূল পর্বের লীগ খেলা চলছে। প্রাথমিক পর্বের খেলায় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্সের ১৪টি এসোসিয়েট সভ্য-দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল এবং তাদের থেকে লীগ এবং নক-আউট খেলার মাধ্যমে দুটি দেশ (শ্রীলঙ্কা এবং কানাডা) মূল পর্বের খেলায় অপর ছয়টি দেশের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

প্রাথমিক পর্বের খেলা

প্রাথমিক পর্বের খেলা হয়েছিল লীগ এবং নক-আউট প্রথায়। পনেরটি 'এসোসিয়েট' সভ্য-দেশ নিয়ে প্রাথমিক পর্বের লীগ খেলার তালিকা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তিনলনং গ্রুপের জিব্রাল্টার প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ায়। ফলে চোদ্দটি দেশ তিনটি গ্রুপে ভাগ হয়ে লীগ প্রথায় খেলে

এবং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হিসাবে প্রাথমিক পর্বের সেমি-ফাইনালে উঠেছিল ১নং গ্রুপ থেকে বার্মুদা, ২নং গ্রুপ থেকে ডেনমার্ক এবং ৩নং গ্রুপ থেকে শ্রীলঙ্কা। তাছাড়া রানার্স-আপ দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে ২নং গ্রুপের রানার্স-আপ কানাডা সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। প্রাথমিক পর্বের সেমি-ফাইনালে শ্রীলঙ্কা ডেনমার্ককে এবং কানাডা বার্মুদাকে হারিয়ে মূল পর্বের লীগের খেলায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে।

মূল পর্বের খেলা

মূল পর্বের লীগ খেলায় আটটি দল সমান দুভাগে ভাগ হয়ে খেলছে। লীগের 'এ' গ্রুপে খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিউজিল্যান্ড, ভারত এবং শ্রীলঙ্কা। অপর দিকে লীগের 'বি' গ্রুপে খেলছে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তান এবং কানাডা।

মূল পর্বের লীগের খেলা শুরু হয়েছে জুন ৯ থেকে। এ পর্যন্ত লীগের খেলা হয়েছে দুদিন (জুন ৯ ও ১৩)। জুন ৯-র তারিখের চারটি খেলার মধ্যে মাত্র ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে। বৃষ্টির ফলে ইংল্যান্ড বনাম কানাডা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম শ্রীলঙ্কার খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। 'বি' গ্রুপের অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের খেলা মাঝপথে স্থগিত থাকে।

'এ' গ্রুপের খেলায় নিউজিল্যান্ড ৯ উইকেটে শ্রীলঙ্কাকে এবং ৮ উইকেটে ভারতকে হারিয়ে মূল পর্বের সেমি ফাইনালে উঠেছে। তারাই সেমি-ফাইনালে প্রথম ওঠার গৌরব লাভ করলো। ভারত দুটি খেলায় হেরে গিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে এবারের মত বিদায় নিয়েছে।

লীগ খেলার ফলাফল

গ্রুপ 'এ'

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯ উইকেটে ভারতকে পরাজিত করে।

নিউজিল্যান্ড ৯ উইকেটে শ্রীলঙ্কাকে পরাজিত করে।

নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে ভারতকে পরাজিত করে।

গ্রুপ 'বি'

পাকিস্তান ৮ উইকেটে কানাডাকে পরাজিত করে।

ইংল্যান্ড ৬ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে।

মেয়েদের ফেডারেশন কাপ

কোয়েম্বাটোরে মেয়েদের প্রথম ফেডারেশন কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বি-পার্বিক ফাইনালে বাংলা মোট ৯-০ (৪-০ ও ৫-০) গোলে কর্ণাটককে হারিয়ে 'এস এম সাফদার ট্রফি' জয়ী হয়েছে।

সেমি ফাইনালে বাংলা ৬-০ গোলে মণিপুরকে এবং কর্ণাটক ৩-১ গোলে (টাই ভেঙ্গে) কেরলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। **দর্শক**

রীতিমত দুঃখ পেলাম

অসীম চক্রবর্তী মহাশয়ের নিঃসঙ্গ যোদ্ধা (৬ এপ্রিল ৭৯) গল্পের জন্য ধন্যবাদ। শ্যামল, দিলীপ এবং ভবেশবাবুর চরিত্রগুলি অপূর্ব সৃষ্টি। শুধু দুঃখ হয় রতন চরিত্রের পূর্ব পরিচয়ের জন্য। অসীম বাবু কি পারতেন না আর খানিকটা এগিয়ে এসে রতনকে খানিকটা পরিমার্জিত রূপে দিতে? যেখানে তিনি ভবেশবাবুকে দিয়ে লাথি মারাতে পারলেন আমাদের কুসংস্কারকে, শ্যামলকে দিয়ে পারলেন ক্লাস ক্লাইম্বিং এবং ক্যাসে স্ট্রাগল-এর উপর সুচিন্তিত যুক্তি রাখতে, সেখানে রতনের মত একজন বিচ্ছিন্ন মানব যে শুধুমাত্র সীমিত আঘাত হানতে পারে এই সত্যটুকু তাকে দিয়ে স্বীকার করালেন আমার আশা রতনের পুরোনো জীবনের পরিচয়টুকু একটু অন্যরকম হলে গল্পের তাৎপর্য হয়তো আরও সুদূরে প্রসারী হতো। যাই হোক 'সূর্যের আলোয় ছুরিটা ঝকঝক করছে' শুধুমাত্র এই লাইনটির জন্য ধন্যবাদ।

সবশেষে বলি এ সংখ্যার সম্পাদনা সত্যি সুন্দর। কিন্তু রীতিমত দুঃখ পেলাম যখন দেখলাম 'একটি ঘাসের শীর্ষে দুটি মৃগনীন মাছি' বা 'অরণ্য চন্দনের' মত কাঁচা হাতের লেখা তাৎপর্যহীন গল্প অমৃত পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। সম্পাদক মশাইকে একটু সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ রাখলাম—বি সরকার, অম্বরনাথ, মহারাষ্ট্র।

দুর্ভাগ্যজনক

৬ এপ্রিল '৭৯ তারিখের অমৃতে অসীম চক্রবর্তীর লেখা নিঃসঙ্গ যোদ্ধা পড়লাম। গল্পের পঞ্চম অংশ যে অংশটুকু আছে তা ছোটগল্প হিসাবে একবার সম্ভবতঃ এই কি অমৃতেই ছাপা হয়ে থাকবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ প্রকাশটির সংখ্যা ও তারিখ আমি ঠিক [illegible] করতে পারছি না. এ বিষয়ে আমি অমৃতের অগণিত পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নিশ্চয়ই কেউ ঠিক বলতে পারবেন, যদি তাই হয় তাহলে ঘটনাটা খুবই দুর্ভাগ্যের। —অরুণাংশু পাল, হিন্দমোটর হুগলী।

ভিন্নমতও প্রচলিত আছে

গত ৬ এপ্রিল সংখ্যার অমৃতে অসীম চক্রবর্তীর বড় গল্প নিঃসঙ্গ যোদ্ধা পড়লাম। দারুন ভাল লেগেছে। দীর্ঘদিন লেখাটা মনে থাকবে বক্তু ও আর্ট [illegible] জন্য। এখনকার গল্পকারদের মধ্যে তিনি অশ্যাই স্বতন্ত্র চরিত্রের। [illegible] বিষয়-বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

কিন্তু একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলা দরকার. গল্পের চতুর্থ অংশে তিনি নক্ষত্রের আদি বস্তু কণার রূপান্তরিত হওয়ার যে তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করেছেন তার বিপরীত মতামতও প্রচলিত আছে। আসলে এস্ট্রো ফিজিকসে শেষকথা বলে কিছু নেই। অবশ্য যারা 'বিগব্যাং' ব্যাকগ্রাউন্ড 'রেডিয়েশন' এক্সপ্যানডিং ইউনিভার্স তত্ত্বে বিশ্বাস করেন (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গত বছরের নোবেল প্রাইজ এস্ট্রো ফিজিক্স-এর এই তত্ত্বের জন্যই ডঃ পেনজিয়াস ও ডঃ উইলসন পেয়েছেন।) তারা হয়তো নক্ষত্রের আদিবস্তুকণার রূপান্তরিত হওয়ার এই তত্ত্বকে মেনে নেবেন। কিন্তু ভিন্নমতও প্রচলিত আছে।

অসীম চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ বিজ্ঞানকে গল্পে কোলাজের কাজের মত ব্যবহার করতে পেরেছেন। —গৌতম চন্দ, ১১৮।২, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, কলিকাতা—৭০০০৪৭।

প্রশ্ন থেকে যায়

অসীম চক্রবর্তীর বড় গল্প 'নিঃসঙ্গ যোদ্ধা' যেহেতু অত্যন্ত তীব্র [illegible] [illegible] রতন তাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই গল্পের উপস্থাপনার [illegible] [illegible] পাঠককে মুগ্ধ করে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লেখক অসীম চক্রবর্তী কি সত্যিই মনে করেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] শিকার? তারা জনতাকে বিপথে চালিত করছেন? অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলির পঙ্কিল আবর্তে তারা জনতাকে আটকে রেখেছেন? সত্যিই তাই? অন্যান্য পাঠকের মতামত জানতে চাইছি। —প্রণতি ঘোষ, পশ্চিম রাজাপুর, ২৪ পরগণা।

চিত্রধ্বনি

সব মঞ্জিলই প্রাসাদ নয়

ছবির নায়িকার নাম অরুণা। ভূমিকায় মৌসুমী মুখার্জি। বংশ পরিচয়ে ধনী ব্যারিষ্টারের একমাত্র কন্যা। নায়ক অজয় বি-এ পাশ, নিম্ন মধ্যবিত্ত বিধবার পুত্র। রূপদানে অমিতাভ বচ্চন।

বাসু চ্যাটার্জি'র নয়া খেল মঞ্জিল-এ এ হেন বস্তাপচা কাহিনীর পুনরুত্থান হয়েছে। এ রকম অ-সম শ্রেণীর নায়ক নায়িকার প্রেম কাহিনী পাবলিকে খায় ভালো। তাই বাসু চ্যাটার্জিও মহাজনপথ ধরে ফেলেছেন।

যেহেতু ছবিতে নায়িকার বাবা ধনী। তাই দু-তিন গাড়ি তার থাকতেই হবে। না হলে মানাবে কেন? আর গাড়ি থাকলে তার যন্ত্রপাতি বিগড়োতে পারে। ছবির প্রথম দৃশ্যেই নায়িকার গাড়ি খারাপ হয়েছে। তিনি যাচ্ছিলেন তাঁর বান্ধবীর বিয়ের অনুষ্ঠানে। বাধ্য হয়েই তাঁকে গাড়ি পরিত্যাগ করতে হয়েছে। স্থলপথে হাঁটতে শুরু করেছেন। নায়িকা যখন বিবাহ বাসরে যাচ্ছেন নায়ক তখন তো পার্কে কিংবা আস্তাবলে থাকতে পারেন না তাঁকেও নিশ্চয়ই সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত করাতে হবে। না হলে গল্প জমবে কেন? আমাদের নায়কের বন্ধুকে হতে হয়েছে নায়িকার বান্ধবীর স্বামী। কাজেই সেখানে তাঁর নিমন্ত্রণ থাকতেই হবে। নায়িকা হাঁটছেন (গাড়ি ছাড়ার পর) পেছনে নায়ক। নায়িকা নায়ককে গুন্ডা ভেবে হাটার গতি বাড়িয়ে দেন। এ ক্ষেত্রে নায়ককে গুন্ডা ভাবার কোনো সংগত কারণ খুঁজে দেখবেন না। নায়কও দেরী হচ্ছে বলে গতি বাড়ান। নায়িকা তার গতি আরও বাড়িয়ে দেন। নায়কও তদোপরি যান। অবশেষে এক সময় নায়ক নায়িকাকে অতিক্রম করে চলে যায়। নায়িকা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

বিয়ের অনুষ্ঠানে পুনর্মিলন। যেহেতু নায়ক এখানে সরল, মারপিঠ করার তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, সেহেতু তাকে ভালো গান গাইতেই হবে। না হলে পাবলিক তাঁকে হিরো হিসাবে স্বীকৃতি দেবে কোন হিসেবে। সেই গানেই বাজিমাৎ। নায়িকা মুগ্ধ। নায়কের প্রেম সাগরে তাঁর তরণী ভাসানোর বাসনা হয়। ধনীর দুলালীকে প্রেমিকা রূপে পাওয়ার পর নায়ক নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে শুরু করেন। নায়িকা তাঁকে ধনী ব্যবসায়ী হিশেবে চেনে। নায়কের ব্যবসা কিন্তু মোটেই চলে না। পুরোনো বাজার থেকে পুরোনো গ্যাল-ভ্যানোমিটার কিনে মিস্ত্রী আনোখে লালকে (এ কে হাঙ্গল) দিয়ে তা সারিয়ে বিভিন্ন কোম্পানী, স্কুল কলেজে সাপ্লাই করাই নায়কের ব্যবসা। এই রকম ব্যবসা আরো অনেকেই করে। বড় বড় ব্যাপারীরা নায়ককে নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। নায়ক স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাই তারা মোটা টোপ দিয়ে মিস্ত্রী আনোখে লালকে হাত করে। আনোখে লাল যন্ত্রপাতি ঠিকমতো সারায় না। কাজেই সেগুলো কাজ শুরু করতে না করতেই বিকল হয়। এবং নায়কের টেবিলে ফিরে আসে।

নায়কের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রকাশ (রাকেশ পান্ডে) চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তার নিজস্ব বাড়ি গাড়ি টেলিফোন আছে। বন্ধুটি বন্ধুবৎসল। নায়ককে নিজের সমস্ত কিছু ব্যবহার করতে দেয়। নায়ক প্রকাশের স্যুট, বাড়ি গাড়ি দেখিয়ে নায়িকার বাবা-মার মন জয় করে ফেলে। কাজেই নায়ক-নায়িকার প্রেমপর্বে কোনো বিঘ্ন ঘটে না।

এরকম তো বেশীক্ষণ চলতে পারে না। কাজেই নায়িকার বাবার কাছে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়। এবং তিনি তাঁর মেয়েকে নায়কের সঙ্গে মিশতে দিতে চান না। ওদিকে নায়ক যে যে কোম্পানীকে মাল সাপ্লাই দিয়েছিলেন তাদের একজন নায়কের নামে মামলা করেন। আদালতে নায়িকার বাবা নায়কের বাবা নায়কের বিপক্ষের উকিল। আর ডাঃ শ্রীরাম লাগু নায়কের পক্ষে। ডাঃ লাগুর বাচন ভঙ্গী ও বাচালতায় নায়ক মামলা জিতে যায়। তার আগে অবশ্য নায়ক মোটা মোটা ফিজিক্স বই ঘেটে নিজেই গ্যালভ্যানোমিটার বানাতে শিখেছেন। এবং বানিয়ে সেই কোম্পানীর মাল রি-সাপ্লাই করে দিয়েছেন। এই খবরটা আদালতে কেসের চরম মুহূর্তে এসে হাজির হয়। কাজেই মামলা আর চলতে পারে না। মামলা খতম, খেলভি খতম। নায়ক-নায়িকার পুনরায় মিলন। নায়িকার বাবা সৎ-নায়ককে মেনে নেন।

এ ছবির পরিচালকের নাম বাসু চ্যাটার্জি না হয়ে অন্য যে কোনো নাম হতে পারতো!

রাহুলদেব বর্মণের সুরে কিশোরের কৃপায় নায়ক অমিতাভ বচ্চন বেশ কয়েকটি ভালো গান গেয়েছেন। কিন্তু প্রেমদৃশ্যে বেমানান লেগেছে। অনেকদিন পরে মৌসুমী নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, তাঁর অভিনয় ভালো লাগবে।

মঞ্জিলের অর্থ প্রাসাদ— বই মঞ্জিলকে কি কোনো অর্থেই প্রাসাদ বলা যেতে পারে?

প্রভাত চৌধুরী

পরিচয়

গল্প করবার সময় ভূমিকা বেশী হলেই হয় বিপদ। শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতি তো ঘটেই, সেই সঙ্গে গল্পের আকর্ষণও যায় কমে। 'পরিচয়' ছবির প্রথম সাত রীল এমনই লেগেছে। ওই দীর্ঘ সময় ধরে চিত্রনাট্যকার পরিচালক নির্মল মিত্র ছবির বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের শুধু পরিচয়ই করিয়ে গেছেন। ছবি এদিকে অর্দ্ধেক শেষ। কাহিনী বলতে তখনও কিছু শুরু হয়নি। বিমল করের মিষ্টি ছোট গল্পটিকে বড় করতে গিয়েই হয়ত এই অগোছালো ভাব। তবে শেষের ক'রীলে নির্মলবাবু তা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন।

কাহিনী সামান্য। পুজোর ছুটিতে একটি পরিবার হাজারীবাগে বেড়াতে এসেছে। এদের মধ্যে কেউ দাদার বন্ধু, কেউ দূর সম্পর্কের আত্মীয়, আবার কারুর সঙ্গে ট্রেনে আলাপ, এমন লোকও আছে। কলকাতার পুজোর ভীড়, মাইক, চাঁদা— এসবের হাত থেকে অনেক দূরে ওই সুন্দর নিরিবিলি পাহাড়ী জায়গায় পৌঁছে এই দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আরো নিবিড়ভাবে পরিচিত [illegible] পেরেছে। হৃদয়গত পরিচয় ঘটেছে আরতি-শুভেন্দুর, দীপংকর-সুমিত্রার এবং সন্তু-পূর্ণিমার। আরতির মধ্যে রুমা নিজের হারানো মেয়ে অর্চনাকে খুঁজে পেয়েছে। ব্যতিক্রমও আছে। যেমন অনিল চট্টোপাধ্যায়কে একটু মহান হয়ে আরতিকে ভুলতে হয়েছে। ছবি শুরু হয়েছে প্রতিমা গড়ার দৃশ্য দেখিয়ে। টাইটেলের ফাঁকে ফাঁকে। যে কারণে টাইটেলের একঘেয়েমি কিছু কমেছে। এরপর থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা ভাল লেগেছে সেগুলো হল, এক— শুভেন্দুর মুখে মৃণাল চক্রবর্তীর গাওয়া রজনীকান্তের গান 'আমি স্বপনে তাহারে'। গানের শেষে সকলের মিলিত কণ্ঠ এবং দৃশ্যটির পরিবেশ। দুই রুমার অতীত জীবন বর্ণনা। যেখানে চিরাচরিত ফ্ল্যাশ ব্যাকের একঘেয়েমি নেই। তিন— ফ্ল্যাশ ব্যাকে অনিলের এবং পাশাপাশি আরতির চিন্তার কয়েকটি কাটা কাটা দৃশ্য। চার— অনিল-আরতির কাছে বিয়ের কথা পাড়তেই কাট করে বিসর্জনের দৃশ্য ও ঢাকের আওয়াজ। আর বিশেষ ভাল লেগেছে শেষের দৃশ্যটি। রুমা-বসন্তর পাশ থেকে সদা বেড়াতে আসা পরিবারের কর্তা ছোট্ট মেয়েটিকে যেখানে অর্চনা বলে ডেকে ওঠে। রুমা [illegible] ওর হারিয়ে যাওয়া মেয়ের নামও যে অর্চনা। যাকে সে ওই বয়সেই হারিয়েছিল। এছাড়া আরও

পরিচয়ে আরতি ভট্টাচার্য

শ্যামশ্রী ঠাকুর আয়োজিত রবিশংকর সম্বর্ধনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, রবিশংকর, রাজ্যপাল ত্রিভুবননারায়ণ সিং, যতীন চক্রবর্তী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এবং শ্যামশ্রী ঠাকুর।

কয়েকটি দৃশ্য বেশ স্বাভাবিক লেগেছে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙাতে সন্তুর ব্যর্থ চেষ্টার দৃশ্য এমনই। ভূতের গল্প বলার দৃশ্য এবং গল্পের শেষে সন্তুর আচমকা দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকাও স্বাভাবিক।

ভাল লাগেনি এমন কিছুর কথাও বলছি। এক— রেডিয়োর থিয়েটার। দুই— 'আজ জ্যোৎস্না রাতে' গানের দৃশ্য। আরতি যেখানে মুহূর্তের মধ্যে দূরে রাস্তা থেকে ঘরের ভেতরে চলে আসে। নের মিনিটের গান তখনও চলছে। তিন— 'আমার সোনার হরিণ চাই' রবীন্দ্রসংগীত যা শুনতে ভাল লাগেনি। অর্কেস্ট্রাও বেশ চড়া। অপর রবীন্দ্রসংগীত 'চরণরেখা'র রেকর্ডিং ভাল হয়নি। চার— দীপংকর-সুমিত্রার আলিঙ্গন দৃশ্যগুলো, ছবির বাকী অংশের সঙ্গে যা একসুরে মেলেনি। পাঁচ— ছবির ঘটনা বেশীর ভাগই 'চান্স ওরিয়েন্টেড'।

এবার আসল কথায় আসি। ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও নির্মলবাবু 'পরিচয়'কে কোনোরকমে ভাল লাগার স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছেন। দল করে বেড়াতে যাবার আনন্দ ছবিতে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এর জন্য অবশ্য শিল্পীদের অবদান অনেকখানি। অনিল, শুভেন্দু, কুমার, দীপংকর, বসন্ত, সুমিত্রা, অনুপম এবং বিশেষ করে রুমা ও আরতি— এরা সকলেই স্বাভাবিক এবং সুন্দর। এদের সম্মিলিত অভিনয়ের গুণেই পরিচালক যা চেয়েছেন, অর্থাৎ ছবিকে ঘরোয়া এবং স্বাভাবিক করে তুলতে, তা সম্ভব হয়েছে। সুন্দর এ ছবির লোকেশান।

অজিতবরণ মিত্র

ছবির খবর

লোডশেডিং এর অবস্থার কোন উন্নতি নেই। সুতরাং স্টুডিওর স্টুডিওয় এসে গেছে জেনারেটর। স্টুডিও মালিকরা আনেন নি। এনেছেন ছবির প্রযোজকরা। যে যার প্রয়োজনমত ক্ষমতার জেনারেটর চালিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। আলো-অন্ধকারের কোন লুকোচুরি খেলা নেই। প্রায় নির্বিঘ্নেই চলছে সব ছবির কাজ। তবে একটা অসুবিধে আছে। সন্ধে ছটার পর আলো থাকলেও শুটিং করা যাচ্ছে না। সরকারী নির্দেশ। জেনারেটর দিয়ে কাজ করা যেতে পারে. কিন্তু খরচের ভয়ে অনেকেই সে পথে এগোচ্ছেন না।

সেদিন নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর স্টুডিওর ঢুকে দেখি পরিচালক সলিল সেন [illegible] লোড শেডিং হয়েছে। এখন আর কাজ করা যাবে না। সময় কাটাতে ঘাসের কার্পেটে বসে পড়লেন সবাই। পরিচালক নিজে, সহকারী শরৎবাবু, উদয়বাবু, ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু বাবু, পূর্ণেন্দু বসু—সবাই-ই। শুরু হল নতুন ছবি নিয়ে আলোচনা। পরিচালক সলিল সেনের নতুন ছবির নাম মৌচোর। নিজের লেখা নাটক নিয়েই এবার ছবি করছেন তিনি।

নায়ক-নায়িকা নিয়েছেন দুটি প্রায় অপরিচিত মুখ। আসামের নিপন গোস্বামীর পরিচয় অবশ্য অমৃত পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়। কিছুদিন আগে প্রভাত মুখার্জির তুষারতীর্থ অমরনাথ ছবিতে তিনি অভিনয় করে গেছেন। ঐ ছোট্ট চরিত্রেই তিনি নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এবং সেই ছবি দেখেই সলিলবাবু সিলেক্ট করেছেন নিপনকে মৌ চোর-এর নায়ক চরিত্রে। নিপনের আসল পরিচয় হল তিনি আসামের নম্বর ওয়ান হিরো। কলকাতার ছবিতে তাঁর কাজ করার ইচ্ছে বহুদিনের। নিপনের বিয়েল ব্রেক হবে এবার নায়িকা চরিত্রের জন্য যে মহিলাকে দেখলাম গাছকোমর বেঁধে একটু করে ফুরফুরে ইংরেজিতে একজনের সঙ্গে কথা বলছেন তাঁকে এক ঝলকে সুন্দরবনের মেয়ে বলে না মনে [illegible]। [illegible] পোষাক [illegible]

মুখার্জী। ডাক নাম শিখা। বাস বোম্বাইয়ে। পেশা বিমান সেবিকা। সলিলবাবু পরিচয় করিয়ে দিতে বললাম—আপনি বম্বে থাকেন তো। পরিচালক হা হা করে হেসে বললেন এই তো দোষ। আপনারা সব কিছুই জানতে চান। ও আমার ছবির ময়না, সুন্দরবনে থাকে। ব্যস্।

হবেও বা। একটু বাদে খুশী মুখার্জি'র খুশি উপচানোরূপ ধরা পড়লো ক্যামেরায়। সন্ধ্যে ছটা বেজে যাবার ভয়ে তাড়াহুড়ি আলো ঠিক করে একটা গানের কয়েক লাইন পিকচারাইজ করলেন সৌমেন্দু রায়। আরতি মুখার্জি'র গলায় খুশী মুখার্জি গাইলেন কেন তুমি বোঝ না আমি যে তোমার....... তোমারই গলে দেব বলে গেঁথেছি এ হার.... ইত্যাদি। সময় এবং ফিল্ম দুটো জিনিষেরই অভাব থাকায় একাধিক টেক করা গেল না।

পরিচালক সলিলবাবু জানালেন আগামী সপ্তাহেই তিনি প্রায় সত্তরজনের এক বিরাট ইউনিট নিয়ে রওনা হচ্ছেন সুন্দরবনে। যদিও এ ছবির প্রকৃত ব্যাকগ্রাউন্ড মরিচঝাঁপি এলাকা, কিন্তু সেখানে শুটিং করতে পারছে না। রাঙ্গা বেলিয়া গ্রামকে বেস ক্যাম্প করে তিনি গোসাবা, বিদ্যা, ঝড়খালি, সন্দেশখালি পাথিরালা ইত্যাদি জায়গায় প্রায় তিন সপ্তাহ শুটিং করে কলকাতা ফিরবেন। নিপনও প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবে সুন্দরবনে গিয়ে। এ ছবির অন্যান্য শিল্পীরা হলেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, বরুণ দাশগুপ্ত, অজিতেশ ব্যানার্জি, শৈলেন মুখার্জি, প্রেমাংশু বসু, অলকা গাঙ্গুলি গীতা দে, ও সত্য ব্যানার্জি, সুরকার সলিল চৌধুরী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে এই রঙিন ছবির জন্য রাজ্য সরকার অনুদান করেছেন দেড় লাখ টাকা। ছবির বাজেট প্রায় সাত লাখ।

রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পটা মনে পড়ছে কারও? কিশোর ফটিকের সেই চিরছুটি নেবার কাহিনী নিয়ে কি বুক-ব্যথা করা গল্প লিখেছিলেন তিনি। ঐ ছুটি যদি সিনেমার হয় কেমন হবে? প্রশ্নটা আমার নয়, পরিচালক দিলীপ রায়ের। ক-দিন আগে নতুন কোন খবর আছে কিনা জানতে চাইলে টেলিফোনের অনপ্রান্ত থেকে প্রশ্নটা আমার দিকেই ছুঁড়ে দেন। এখন সেটা রিডাইরেকট করছি পাঠকদের দিকে।

কথা শুনে মনে হল, দিলীপবাবু ছুটি গল্পটা নিয়ে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। আগে শুনেছিলাম শরৎচন্দ্রের স্বর্ণ চূর্ণ করবেন। সে কথা বলতে তিনি বললেন—ওটাও করার ইচ্ছে আছে, তবে আগে হয়ত ছুটিই শুরু করব। একটা প্রস্তাব দিলীপবাবু—এই আন্তর্জাতিক শিশু বছরে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার—এর চাইতে বড় আর কোন উপায় নেই। কিন্তু, তাড়াহুড়ো করবেন না। ধীরে সুস্থে ছবিটা করুন। নাইবা মুক্তি পেল এ বছরে ছবি।

তরুণ পরিচালক নীতিশ মুখার্জি এবার কিছু জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠ শিল্পীদের নিয়ে কাজ করবেন ঠিক করেছেন। ছবির প্রযোজক নাকি সেই শর্তে রাজিও আছেন। ছবির নাম পল্লী-সমাজ। নায়ক—রণজিৎ মল্লিক। কিন্তু নীতিশবাবু, নরক গুলজার কবে করবেন?

নির্মল ধর

বল্লভপুরের রূপকথা নাটকের দৃশ্য

বল্লভপুরের রূপকথা

বাদল সরকার নামটি সর্বভারতীয় নাটকের স্তরে এতই বিশিষ্ট যে কোন নাটকের নাট্যকার হিসেবে তাঁর নাম লেখে দেবার পর বিশেষ বাগবিস্তারের অবকাশ থাকে না। তবু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে তাঁর রচিত নাটকগুলির যে প্রধান তিনটি ভাগ সম্বন্ধে সকলে অবহিত তার গোড়ার দিকের ভাগটির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'বল্লভপুরের রূপকথা'। এই নাটকটির অমল হাস্যরস, বিদ্রুপহীন মজা এবং চমকপ্রদ সংলাপের গুণে চিরকালই, যে কোন দলের প্রযোজনাতেই দর্শক প্রীতিধন্য। শৌলিক' প্রযোজিত আলোচ্য প্রযোজনাটিও সে প্রসাদ থেকে এতদিন পরেও বঞ্চিত নয় দেখে আনন্দিত হওয়া গেলো।

বর্তমান প্রযোজনাটিতে অবশ্য আরও কিছু দামি নামের সমাবেশ ঘটেছে। যেমন কুমার রায় (মঞ্চ), ভি, বালসারা (আবহ) বা প্রদীপ ঘোষ (নেপথ্য কণ্ঠ)। এঁদের মধ্যে কেবলমাত্র কুমার রায় ছাড়া আর কারও ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি। বস্তুতপক্ষে, প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য একটি ছোট নাট্যগোষ্ঠীর এই প্রাণান্তকর প্রয়াস আমাদের ব্যথিতই করে। কারণ এমনিতে তো শৌলিকের ভাঁড়ার খুব দীন ছিল না। নির্দেশক 'প্রদীপ দাশগুপ্ত' অভিনীত 'সঞ্জীব' চরিত্রটি তো সহজ স্বাভাবিকত্বের জন্য বাংলা নাটকে স্বচ্ছন্দেই নিজের জায়গা করে নিতে পারে। 'রূপক সেনগুপ্ত'র হালদার একটু শিথিল হলেও অভিজ্ঞ নৈপুণ্যের ছাপ লেগে থাকে সে চরিত্রে। আর একটি অনবদ্য টাইপ 'গোরীদাস বসাক'এর সাহা। তাঁর ইচ্ছাকৃত কণ্ঠস্বর বিকৃতি যদিও দর্শককে অসহিষ্ণু করে তোলে, তবু তাঁর একটি ফোকলা দাঁত বার করে হাসির ইঞ্চি মাপা পুনরাবৃত্তি সম্ভ্রম আদায় করে নেয়। অনন্ত ঘোষ-এর অভিনয় এবং মেকআপ দুই-ই একটু চড়া হলেও চরিত্রটি সুঅভিনীত। আর এই পরিসরে 'পলি সেনগুপ্ত'র কথাও বলা প্রয়োজন যিনি ছন্দার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয়েও জড়তা কমই ছিল। অবশ্য মঞ্চে দাঁড়ানো এবং শরীর সংস্থাপনের বিভিন্ন কৌশল তাঁর এখনও অনায়ত্ত এটা মনে রাখা ভালো।

এই ধরণের স্ল্যাপস্টিক নাটক বাহুল্যহীন মঞ্চ ও প্রয়োগরীতিতে মূলত জোরদার অভিনয়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। সেই কারণে এর অভিনয়ের কথাটাই বেশি করে বলতে হচ্ছে। শৌলিক'এর সহজ, অনাড়ম্বর প্রাণবন্ত অভিনয়টি যে কারণে শেষ পর্যন্ত একটি সম্পন্ন প্রযোজনা হয়ে উঠতে পারে না, তা হল এর প্রধান চরিত্র ভূপতির (গোতম বসু) আড়ষ্টতা এবং দুটি প্রয়োজনীয় চরিত্র চৌধুরী (অভিজিৎ বসু) এবং স্বপনার (রীতা দাস) নিম্নমানের অভিনয়। গোতম বসু 'রসুদা'র জুতোয় পা গলিয়ে তাও হাঁটতে পারেন, কিন্তু ছন্দার দিকে তাকাতে গিয়ে লক্ষণের মতো ভূমিকানিবদ্ধ দৃষ্টি হয়ে পড়েন। অভিজিৎ বসুর স্বরগ্রামেই তাঁর ভালো অভিনয়ের অন্তরায়ে এবং রীতা দাস-এর অভিনয়ের বিভিন্ন প্যাঁচ লাগানোর চেষ্টা করেছেন তার কৌশলটা অধিগত না করেই। এই চরিত্রগুলো পবন বা শ্রীনাথ এর মতো অনুল্লেখ্য হ'লে এদের নিয়ে এতো কথা বলার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু এরা নাটকের মোচড় এবং মজার এতো অমোঘ উপাদান যে এদের স্থূলতা সামগ্রিক মানকে অনেকটা বেশিই নামিয়ে দেয়। আমার মনে হয় 'শৌলিক' তাঁদের অভিনয়ে উত্তরোত্তর এই সব খাম-তি কাটিয়ে উঠবেন। কেননা, দর্শককে হাসাতে গিয়ে নিছক হাস্যকর হয়ে উঠতে কে আর চায়।

সুরজিৎ ঘোষ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
ইন্ডিয়ান এন্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য
মূল্য ৬৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। আসামে অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত

[illegible] বর্ষ, [illegible] সংখ্যা
৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬
15 JUNE 1979

একগুচ্ছ বাঙলা গল্প

আগামী সংখ্যায়

সাম্প্রদায়িক শান্তি চাই

আলিগড় ও জামশেদপুরে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিঘ্নিত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে শান্তি বজায় ছিল। সম্প্রতি নদীয়ায় কিছু দাঙ্গাহাঙ্গামা ও প্রাণহানি ঘটায় সে সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু আমরা আশা করছি অচিরেই রাজ্যের প্রধান দুটি সম্প্রদায় শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে সৌভ্রাত্রের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কেননা, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এ ধরনের অশান্তি থেকে দূরে থাকতেই চান। এবং কোনো রকম উস্কানিতেই তাঁরা বিভ্রান্ত হবেন না।

সাম্প্রদায়িক অশান্তি কতো ক্ষতিকর তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভালোভাবেই জানেন। দেশবিভাগের সময় এবং তার পরে দীর্ঘকাল এখানে হানাহানি ও রক্তপাত ঘটেছে। উদ্বাস্তু সমস্যা এবং আরো বহু রকম সংকটে এ রাজ্য উৎপীড়িত। শান্তির পরিবেশ অব্যাহত না থাকলে উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হতে পারবে না। এ রাজ্যে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষই তাই শান্তির স্বপক্ষে।

সরকারের মধ্যে এবং বাইরে এ রাজ্যে যতগুলো রাজনৈতিক দল রয়েছে, প্রত্যেকেই নদীয়ার ঐ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে অচিরে শান্তির আবহাওয়া ফিরিয়ে আনার জন্যে আবেদন জানিয়েছে। জনসাধারণের সমস্ত অংশ থেকেই এ আবেদনে সাড়া মিলবে [illegible] সন্দেহ নেই।

নদীয়ার ঐ ঘটনার জন্যে দায়ী ঠিক করা সেটা খুঁজে বার করা দরকার। যদি প্রশাসনযন্ত্রের মধ্যে কোনো ত্রুটির ফলে তৎপরতা দেখতে দেরি হয়ে থাকে, অবিলম্বে তার সংশোধন দরকার। বাস্তবিক সাম্প্রদায়িক অশান্তি এমন একটি বিষ যা সূচনাতেই নির্মূল করা না হলে সমাজদেহে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। সেজন্যে আত্মসন্তুষ্টির মনোভাবে [illegible] নষ্ট না করে মূল অপরাধীকে বিচ্ছিন্ন করা দরকার।

এ রাজ্যে কংগ্রেসী আমলেও বটে, বামফ্রন্টের শাসনকালেও, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উপযুক্ত রাজনৈতিক অধিকারের অংশীদার হয়েছেন। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সর্বদাই এ কাজে সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছেন। সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী উচ্চপদে আসীন। বাস্তবিক পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি শান্তির পরিবেশ রয়েছে যে, অশুভ শক্তির স্ফুরণ এখানে অঙ্কুরে বিনষ্ট হতে বাধ্য।

সাহিত্য ইত্যাদি

সাহিত্য ও নৈতিকতা

সাহিত্যে নৈতিকতার স্থান কতোটুকু? কিম্বা জীবন যে নীতিতে চলে, সাহিত্যও কি তারই অনুসরণ করবে।

প্রশ্নগুলোর উত্তর মনে হয় খুবই সোজা। কিন্তু ভাবতে শুরু করলেই দেখা যায়, জটিলতা এর পদে পদে। চেষ্টা করে দেখা যাক।

একটা উত্তর নিশ্চয়ই এই হবে যে সাহিত্য আর জীবন খুবই কাছাকাছি ব্যাপার, কেননা জীবন বাদ দিলে সাহিত্য থাকে না, অতএব জীবনের নীতিবোধ সাহিত্যেও ছাপ ফেলবে।

কিন্তু সত্যিই কি তা হয়? কিম্বা হলেই তা ভালো হয়? তাহলে তো মনু সংহিতাই শ্রেষ্ঠ কাব্য হত। কিম্বা চাণক্য শ্লোক। কিন্তু বাস্তব উপযোগিতা এগুলোর যতোই হোক, অতিবড় নীতি-বাদীও এদের সাহিত্যের কোঠায় ঠাঁই দেবেন না।

অন্য দিকে নীতি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে জীবনে যা-যা ঘটে সবই যদি সাহিত্যে আনা যায়, তা হলেও কি সাহিত্য হয়? তাহলে ফৌজদারী আদালতের রোমহর্ষক মামলাগুলোই সাহিত্য বলে চিহ্নিত হত। কিম্বা দারোগার ডায়রী জাতের কোনো রচনা। অথবা মনোরোগ চিকিৎসকের কেস-হিস্ট্রি। এসব বস্তু যে ছাপা হয় নি তা নয়। কিন্তু সাহিত্য হিসেবে উৎরেছে কি? উত্তরটা যে নঙর্থক তা আশা করি বলে দিতে হবে না।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী?

নীতি মেনে চলেও সাহিত্য হয় না, দুর্নীতির কাহিনী লিখেও সাহিত্য হয় না। অথচ সাহিত্যের মধ্যে নীতির কথাও থাকে, দুর্নীতির কথাও থাকে।

সমাধানটি তাহলে কোথায়?

বাস্তব দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখা যাক। ধরুন মহাভারত। কাব্যটির মধ্যে এত দুর্নীতি রয়েছে যে তালিকা করতে গেলে সেও এক দ্বিতীয় মহাভারত হয়ে যাবে। প্রথম ধরুন, কৌরব বংশে শেষ স্বাভাবিক মানুষ বোধহয় ভীষ্ম—যিনি কোনো এক কৌরব রাজার পুত্র। অন্যেরা সকলেই হয় ক্ষেত্রজ পুত্র, নয় তো অস্বাভাবিক উপায়ে ভূমিষ্ঠ। প্রথম তালিকায় পাওয়া যাবে বিচিত্র বীর্য চিত্ররথ, ধৃতরাষ্ট্র পান্ডু এবং পান্ডুর পুত্রেদের সকলকেই। দ্বিতীয় তালিকায় রয়েছেন দুর্যোধনের একশ ভাই। [illegible] দ্রোণ, দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন এরাও অস্বাভাবিকভাবে জন্মেছেন। তাঁদের জন্মের যে ইতিহাসের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা কেবল মহাকাব্যে চলে, বাস্তবে নয়।

তারপর ধরুন, পান্ডু নিজেই কুন্তীকে ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্যে বলছেন, কিম্বা জননী কুন্তী নিজেই বলছেন দ্রৌপদীকে পঞ্চ পুত্র এক সঙ্গে বিবাহ করুন, এগুলো সেকালে খুব স্বাভাবিক ছিল, তখনকার পাঠকের কাছে তাই আটকাতো না—এ না হয় বোঝা গেল। কিন্তু এখনকার সমাজে তো এসব রীতি স্বাভাবিক নয়, এখন যারা পড়ি আমরা, আমাদের কেন খারাপ লাগে না?

তার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই এই যে, মহাভারতকারের আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু বলা। এগুলো নিতান্তই নগন্য ব্যাপার, অনেকটা ভূমিকার মতো। আসল বস্তু হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘাত, ভালোর সঙ্গে মন্দের সংঘাত—অর্থাৎ নীতির সঙ্গে দুর্নীতির সংঘাত, এবং পরিণামে নীতিবোধের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। তাছাড়া মহাভারতের অন্য একটি বক্তব্য আছে, যা আরো মহত্তর। কিন্তু এখানকার বিষয়বস্তুর পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বলে সে কথা তুলছি না।

সেই সঙ্গে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। বক্তব্যের এই সুস্থতাও ব্যর্থ হয়ে যেত যদি বইটি লেখা হত অকবির কলমে। যুগে যুগে এর মধ্যে অনেক আখ্যান যুক্ত হয়েছে, কিন্তু প্রথম যিনি প্রচলিত নানা উপকথা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বেঁধেছিলেন এই কাহিনী (তাই তাঁর নাম 'ব্যাস') তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন অনন্য সাধারণ এক সাহিত্যিক প্রতিভা। না হলে এমন মুন্সীয়ানার সঙ্গে কাহিনী বয়ন করা এবং প্রত্যেকটি বিচিত্র স্বভাব চরিত্রের নিজস্ব বিকাশের রীতি অনুসরণ করে তাদের ন্যায্য পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া আর সেই সঙ্গে অফুরন্ত কবিত্বের উৎসার—পৃথিবীতে এমন সৃষ্টি আর একটিও হয়েছে কিনা জানি না।

আর শুধু মহাভারতই বা কেন? গ্রীক সাহিত্যেও কি অনৈতিক ঘটনা কিছু কম? হত্যা তো যথেষ্টই পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে রয়েছে পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, সন্তান হত্যা। তাছাড়া পাওয়া যাবে যৌন অনাচার। ইডিপাস কমপ্লেকস ও ইলেকট্রা কমপ্লেকস বলে পুরুষ ও নারীর যে দুটি মনোবিকার ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে বহুলভাবে আলোচিত এবং এখন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও যেগুলোর কথা হামেশাই বলে থাকেন, তা তো গ্রীক নাটকেরই অবদান। মাতৃকাম ও পিতৃকামই বলা বাহুল্য ঐ দুটি নাটকের মূল উৎস। এবং তা যে ভয়াবহ রকমভাবে অ-নৈতিক তা নাট্যকাররাও জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কলম ধরেছিলেন। নিশ্চয়ই নিজেদের কালা পাহাড় বলে চিহ্নিত করার জন্যে নয়, পর্ণোগ্রাফী লিখে নামডাক বাড়ানোর জন্যেও নয়। মর্মান্তিক ঐ দুটি দুরূহ বিষয় নিয়ে তাঁরা নাটক লিখেছিলেন, মানুষের আদিম রিপুর অন্ধকারতম দিকটির বিষয়ে স-চেতন করার জন্যে, মানুষকে মালিন্যমুক্ত করার জন্যে। গ্রীকরা একে বলতেন 'ক্যাথারসিস'। আমাদের এখানে যেমন প্রায়শ্চিত্ত বা আত্মশুদ্ধির ব্যাপার রয়েছে সেই রকমই অনেকটা। তবে সেটা ঘটানো হত নাটকের মারফৎ। অর্থাৎ নাটকের মাধ্যমে অ-নৈতিক ক্রিয়া কর্মের ভয়াবহ প্রতিফল দেখে সাবধান হওয়া। কাজেই বিষয়বস্তু যা-ই হোক, নৈতিকতার অবিচল প্রতিষ্ঠাই হয়ে দাঁড়ায় আসল উদ্দেশ্য।

তা হলে শেষ সিদ্ধান্ত কী?

সেটা বোধহয় এই যে, কাহিনীর মধ্যে যে রকম ঘটনাই থাক সাহিত্য হতে গেলে কোনো-না কোনোভাবে তাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। এবং তা যদি যায় তাহলে দেখা যাবে, যাকে বিচ্ছিন্নভাবে হয়তো অনৈতিক বলে মনে হয়, পুরো লেখাটি পড়ার পর তা মনে হচ্ছে না, সমগ্রের মধ্যে মিশ খেয়ে গেছে। অর্থাৎ গোটা লেখাটিই একটি অন্য ডাইমেনশানে উত্তীর্ণ হয়েছে।

অর্থাৎ হ্যাঁ আরো একটি অর্থাৎ আছে। কোনো একটি সাহিত্যকৃতির বিরুদ্ধে যখন অ-নৈতিকতার অভিযোগ ওঠে, তখন বুঝতে হবে, লেখক হয়তো ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন নি। একটি দিকে হয়তো বেশি নজর দিয়ে ফেলেছেন।

অবিশ্যি যুগ-ভেদে রুচি বদলায়, সে আলাদা বিতর্ক। এ আলোচনায় সেটা গৌণ ব্যাপার।

অণীন্দ্র রায়

অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যায় গজেন্দ্র কুমার মিত্র এবং অমর মিত্রের ধারাবাহিক উপন্যাস বেরোল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত বেরোবে।

হারানো বই

সেই কবেকার কথা। তখনও সিপাহী যুদ্ধ হয়নি। কোম্পানির রাজত্ব বেশ ভাল-মতই ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙালী ইংরেজি শিখছে। সংবাদপত্র সম্পাদনায় বাঙালী এগিয়ে এসেছে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখনকার একজন বিখ্যাত সম্পাদক। ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি বের করেন সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর। অন্যতম সহযোগী ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই পত্রিকাই ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন হয়ে যায় দৈনিক সংবাদে প্রভাকর সমকালীন বাংলার প্রতিচ্ছবি। জনজীবনের বিচিত্র তথ্য ছড়িয়ে আছে। বিনয় ঘোষ এই পত্রিকার বহু রচনা উদ্ধার করেছেন। সম্পাদক ও সাংবাদিক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্রের মূল্যায়নে এই সংগৃহীত সংকলনের ভূমিকা অসীম।

কলকাতার ব্যস্ত জীবন। সম্পাদনা ও ছাপাখানার কাজে ব্যস্ত কবি। দিনরাত পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়ল। হাওয়া বদল করা দরকার। কোথায় যাবেন? কবির একটা আকর্ষণ ছিল পূর্ব বাঙলায়। এই সুযোগ। বেরিয়ে পড়লেন। এখনকার মত তখন গাড়িঘোড়া তেমন ছিল না। নৌকায় নৌকায় কাটল কয়েক মাস। জলে স্থলে পর্বতে ঘুরে ঘুরে এক নতুন জগতকে জানালেন। নতুন জীবন জাগাল নতুন অনুভূতি। ভিন্নতর এক জগতের দরজা গেল খুলে।

নদী-নদের সরল তরল লহরীলীলা, তরংগ রঙ্গ অতি সহজ ও অতি বংকিম কুটিলগতি। —পর্বত-পুঞ্জের প্রকৃষ্ট ভাতি। কাননের কমনীয় কান্তি। সুন্দরবনের সুন্দর শোভা।—কত নগর, কত গ্রাম, কত হাট, কত গঞ্জ, কত দেবালয়, কত তীর্থ, কত ক্ষেত্র, কত উপবন, কত সরোবর, এইরূপ কত কত বিষয় বিলোকন করত কেবল পুলকে পরিপূরিত হইয়াছি, কক্ষের সার্থকতা হইয়াছে।

পূর্ববাংলার প্রকৃতি আর মানুষ কবিকে প্রভাবিত করেছিল নানা ভাবে।

কয়েক মাসে রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, বিক্রমপুর, রাজনগর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, জাফরগঞ্জ, ঢাকা, রায়পুর, দালাল-বাজার, লক্ষ্মীপুর, শান্তিসীতা, ভুলুয়া, সুধারাম, চন্দ্রশেখর, শম্ভুনাথ, সীতাকুণ্ড, বাড়বাকুণ্ড, কুমারীকুণ্ড, লবণাক্ষ্যা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বরিশাল, নলছিটি, ঝালকাটি, মহারাজগঞ্জ, গুরুধাম, তুসখালি, মেহামতি, সাহেবের হাট, সুন্দরবন, বাদাবন, প্রাণসায়ের, টাকী, শ্রীপুর বাগুন্তী, পুঁড়া, ঘোরগাছি, বাদুড়ে, বসিরহাট, চাদুড়ে, গোলাপনগর, বনগাঁ, ফকগঞ্জ, শিবনিবাস, হাঁসখালি রাণাঘাট এবং আরো কয়েকটি খ্যাত অখ্যাত জায়গা ঘুরে ফিরে আসেন কলকাতায়। যে কয়েক মাস বাইরে ছিলেন, তখন প্রভাকরের সম্পাদকীয় ভার ছিল শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর।

কবির ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সংবাদ প্রভাকরে ছাপা হয়েছিল ভ্রমণকারি বন্ধু হইতে প্রাপ্ত শিরোণামে। লেখকের নাম ছিল না। কিন্তু এ যে গুপ্ত কবিরই রচনা তার অনুকূলে প্রমাণও আছে যথেষ্ট। কবির চোখে নয়, সাংবাদিকের চোখ নিয়েই তিনি ঘুরেছিলেন। যে কারণে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর আলেখ্য এই রচনা। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলার এক বিস্তৃত অঞ্চলের জনজীবনের কথা জানতে এমন প্রামান্য তথ্য পাওয়া কঠিন। অথচ লেখার মধ্যে আছে যেমন উপভোগ্য বিষয়, তেমনি চিন্তাকে নাড়া দিয়েও যায়। বিভিন্ন জেলার থানার সংখ্যা, পরগণা, চৌকী, রাজস্ব খাতে আয় ও ব্যয়, ইংরেজ কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট, বাঙালী জমিদার, ব্যবসায়ী, বাঙালী খাজাঞ্চি, দেশীয় হাকিম, পেস্কার, ট্রান্সলেটর, সেরেস্তাদার, কেরাণী, পাল্কী বেহারা, কয়েদী—বিভিন্ন শ্রেণীর প্রসঙ্গ এসেছে। কয়েকটি জায়গার পুরনো ঐতিহাসিক তথ্যও আছে। তিনি লিখেছেন : পাবনা বাণিজ্যকার্য্যের পক্ষে একটা প্রধান স্থান। এখানে বিস্তর ধনী মহাজন আছেন; চতুর্দিকের নানাস্থানে তাঁহারদিগের আড়ৎ ও দোকান আছে, যেখানে পাবনার মহাজনের ব্যবসায় নাই, এমত গোলা গঞ্জ প্রায় নাই, ঐ সমস্ত মহাজনের মধ্যে অধিকাংশ শুঁড়ি, এ-দেশে শুঁড়ি জাতিরাই মান্য ও ধনাঢ্য। ফরিদপুর প্রসঙ্গে লিখেছেন : বাণিজ্যপক্ষে অতি বিখ্যাত ও প্রধান স্থল, কত দেশের কত মহাজন কত দ্রব্য ফরিদপুরে খরিদ করিয়া কত স্থানে বিক্রয় করিতেছেন, এখানে বহু প্রকার শস্য, নীল, ইক্ষু, ইক্ষুর গুড় ও তাহার চিনি, খেজুড়ে গুড় ও খেজুরে চিনি যথেষ্ট জন্মে। খেজুরে গাছ এত অধিক কুত্রাপিই নাই। এইখানকার গুড় চিনি সর্বত্রই রপ্তানি হইতেছে। ভুলুয়া প্রসঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা হল : যদি কৃষিকার্য নিপুণ কোন কোন ব্যক্তি এখানে আসিয়া স্থান পরীক্ষা পূর্বক যথারীতিক্রমে নানাদ্রব্যের কৃষিকার্য করেন, তবে তাঁহারা স্বয়ং সৌভাগ্যশালী হইয়া এতদ্দেশকে শস্যশালী ও সৌভাগ্যশালী করিতে পারেন। চট্টগ্রামের বিবরণ দিয়েছেন বিস্তৃত। এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন : এই এক সুখের বিষয় যে চট্টগ্রাম জিলায় ভিতরে হিন্দুজাতিতে প্রায় বেশ্যা নাই, এ বিষয় কত আনন্দকর তাহা কল্পনাতীত, আর এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর বেশ্যা আছে, কিন্তু তাহার-দিগের ভিতরে এক অত্যাশ্চর্য প্রথা প্রচলিত আছে। কুলটাগণ সতীত্ব সংসারপূর্বক বহু কাল বেশ্যাভাবে বাহিরে থাকিয়া পুনর্বার আবার সতী হইয়া গৃহে যাইতে পারে, তখন তিনি সাবিত্রীরূপে জাতির কণ্ঠভূষণ হইয়া বসেন। তাছাড়া এখানকার ফিরিঙ্গি ও মুসলমানেরাই বাণিজ্যকার্যে অধিক অনুরাগি, হিন্দুরা তদ্রূপ নহে, অত্যল্প মাত্র, ইহার কারণ হিন্দুগণ সমুদ্রপথে গমনাগমনে অশক্ত। কেহ কেহ কেবল দেশীয় বাণিজ্য ও টাকার মহাজনি করিয়া থাকেন। কোন কবি নিশ্চয় দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে জনজীবনের এই-সব দিককে দেখতে পেতেন না।

ভ্রমণকারি বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১২৬১ সালের বিভিন্ন সংখ্যা সমাচার দর্পণে ছাপা হয়। দীর্ঘদিন বই করে কেউ ছাপেন নি। অধ্যাপক মোহনলাল মিত্র ১৬ বছর আগে রচনাগুলিকে একত্র করেছিলেন। নাম দেন ভ্রমণকারি বন্ধুর পত্র। ১৪৪ পাতার বই দাম ছিল চার টাকা। অধ্যাপক মিত্রের পরিশ্রম সার্থক। সে সময়ে বইটি যথেষ্ট বিক্রি হয়েছিল। তিনি বিস্তৃত ভূমিকাও লেখেন। তারপর আর ছাপা হয়নি। কিন্তু ওপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় বাংলার এক বিশেষ সময়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে জানতে রচনাগুলির গুরুত্ব অসীম। কোন প্রকাশকের উচিত বইটি আবার প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

এইসঙ্গে আরো কয়েকখানি বই-এর নাম উল্লেখ করছি। ভ্রমণ জাতীয় রচনা। রমেশচন্দ্র দত্তের 'ইংলণ্ডে তিন বৎসর', রাজকুমারী দেবীর 'ইংলণ্ডে বঙ্গবধূ', রামদাস সেনের 'বাঙালীর য়ুরোপ দর্শন', দুর্গাচরণ রায় সম্পাদিত 'দেবগণের মর্তে আগমন', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বোম্বাই-চিত্র', গিরিশচন্দ্র বসু 'বিলাতের পত্র', শরৎচন্দ্র দাসের তিব্বত ভ্রমণ, জলধর সেনের 'হিমালয় পথিক', রাজনারায়ণ বসুর 'চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশ ভ্রমণ' ও 'গৌড় ভ্রমণ' শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ', স্বর্ণকুমারী দেবীর দার্জিলিং-এর চিঠি ও গাজীপুরের চিঠি, ঢোলপুর—এসব বই যেন ছাপা হয় না জানি না। এই রচনার একটিও পাঠযোগ্যতা হারায়নি। পড়ার সুযোগ পেলে পাঠকও আনন্দ পাবেন।

কমল চৌধুরী

সাহিত্যের নেপথ্যে

তাঁরা কবে আসবেন ?

'ক' বাবু রীতিমত খাপ্পা। একটু রাগলেই মুখখানা তাঁর লাল হয়। গলার দু' পাশে শিরা নীল হয়ে ফুলে ওঠে। তিনি রীতিমত ধমকাচ্ছিলেন এক লেখককে লেখক ভদ্রলোক দিনকয়েক তাঁর বাড়ি ধাওয়া করতে শুরু করেছেন। খেরো খাতা টাইপের একটা খাতায় দীর্ঘ একটা ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছেন ভদ্রলোক। হরিদ্বার না কোথায় যেন গিয়েছিলেন তিনি সুদূর অতীতে। এ কাহিনী তারই রেখাচিত্র। খেরোর খাতায় লেখা। এ মুড়ো ও-মুড়ো লিখেও হরিদ্বারকে দুশো পাতার নিচে কব্জা করা যায়নি।

তো সে যাই হোক লেখক ভদ্রলোক গত কয়েক বছর দেখেছেন শারদীয় সংখ্যায় ভ্রমণ বা অভিযান টাইপের লেখা ছাপা হচ্ছে। আর তাইতেই ভদ্রলোক দারুণ উৎসাহিত হয়ে সোজা সম্পাদকের চেম্বারে এবার পুজোয় হরিদ্বার যাত্রার গতি করতেই হবে। সম্পাদক 'ক' বাবু খাতাটা হাতে নিয়ে খানিক উল্টেপাল্টে দেখেই লেখকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন: এ লেখা আমি ছাপতে পারব না।

অগত্যা বাড়ি ধাওয়া করলেন হরিদ্বার যাত্রার লেখক। রাতভোর লোডশেডিংয়ের ধাককায় সম্পাদক 'ক' বাবুর মোটেই ঘুম হয়নি। তার ওপর পুজো সংখ্যার লেখার চাপ। ভোরের দিকে একটু ঘুম জড়ানো তন্দ্রার মধ্যেই কড়া নাড়ার শব্দ। মেয়ে এসে বললে: বাপি একজন লেখক দেখা করবেন। চোখ আর কপালে অসংখ্য বিরক্তি জমা করে উঠেছিলেন 'ক' বাবু। তারপর দরজা খুলতেই দেখেন সেই হরিদ্বার যাত্রা—বগলে খেরোর খাতা। শুধু খাতাই নয় এক হাতে হিমঘরের অসময়ের কপি অন্য হাতে সন্দেশের বাকস। ভ্রমণ-কাহিনীর লেখক ভদ্রলোক কোন কথা বলার আগেই 'ক' বাবু ভয়াবহ হয়ে উঠলেন। সন্দেশ আর কপিতে উৎকোচের নোটিশ দেখেই তাঁর সবটুকু রক্ত মাথায়। মুখ যথারীতি লাল। ম্যাকসিমাম রাগে কথা পর্যন্ত আটকে গেছে। ভ্রমণকাহিনীর লেখক ভদ্রলোক 'ক' বাবুর বিপজ্জনক চেহারায় বিন্দুমাত্র ভরসা না পেয়ে না ছোটা না হাঁটা গোছের পা চালিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু হাল ছাড়েননি তিনি। ঘণ্টা পাঁচেক কোথায় ঘাপটি মেরে দুপুর নাগাদ ফের হানা দিয়েছেন 'ক' বাবুর অফিসের সম্পাদকীয় দপ্তরে। সন্দেশের বাকস আর হিমঘরের কপি সঙ্গে নেই।

'ক' বাবুর কাঠের ঘেরাটোপে ভর দুপুরে রীতিমত ঝড়। ভ্রমণ কাহিনীর লেখক ভদ্রলোক 'ক' বাবুর চেম্বারে মুখ বাড়াতেই 'ক' বাবু সোজা উঠে পড়েছিলেন। রাগের সিমটমগুলো তুরন্ত দেখা দিয়েছিল চোখেমুখে। সকালে 'ক' বাবু রাগে কথা বলতে পারেননি। এখন রীতিমত জোরে চিৎকার করে ধমকাচ্ছিলেন তিনি ভদ্রলোককে। চীৎকারে আমি ছুটে গিয়েছিলাম 'ক' বাবুর চেম্বারে। তাঁর কাছেই সব শুনলাম। সন্দেশ থেকে হিমঘরের কপি পর্যন্ত সব বৃত্তান্তই। আরও শুনলাম 'ক' ভ্রমণ কাহিনীর পাণ্ডুলিপিটির পাতা পনের পড়েছেন। পনের পাতার প্রতি পাতায় গড়ে গোটা কুড়ি বানান ভুল। আর লেখা একদম কাঁচা হাতের।

'ক' বাবু ধমকে বেয়াড়া টাইপের ঐ ভ্রমণ কাহিনীর লেখককে ফিরিয়ে দিলেও সব বাবুই যে এই মতনই করেন এমন নয়। ধরুন 'খ' এমনটা না-ও করতে পারেন। কোন লেখক ভদ্রলোক যদি 'খ' বাবুর উইক পয়েন্টগুলোর হদিশ ঠিকঠাক পেয়ে থাকেন তবে তিনি 'খ' বাবুকে নিশ্চিত কব্জা করতে পারবেন। লেকের ধারে 'খ' বাবু যখন তাঁর অনুরাগী ভক্তদের নিয়ে হাওয়ায় বসেন তখন ভক্ত নাম্বার ওয়ান, ভক্ত নাম্বার টু সবাই 'খ' বাবুর লেটেস্ট উপন্যাসের প্রশংসায় একেবারে মাল্টি পারপাস। কাহিনী বিস্তার, চরিত্র বিশ্লেষণ, সমাজ অধ্যয়ন থেকে প্রচ্ছদ মায় পোস্তানী পর্যন্ত নিখুঁত তাঁদের ধারণায়। ভক্ত নাম্বার ফোর থ্যাবড়া মুখ জড়ানো জিভে খেজুর গুড় খাওয়ার মত মুখভঙ্গি করে বলেন: দাদার এ উপন্যাসখানার জবাব নেই। শেষটায় যা দিয়েছেন না—এ আপনিই পারেন। ভক্ত নাম্বার ফাইভ সম্ভবত সামান্য অ্যাড করলে। ঠিক ঠিক কথাটা কানে না এলেও বোঝা গেল পাঁচ নম্বর উপ-ভক্ত 'খ' বাবুর লেটেস্ট উপন্যাসের সঙ্গে একখানা ফরাসী উপন্যাসের তুলনা করতে চাইছেন। ভক্ত নাম্বার সিকস এতক্ষণ চুপ-চাপ ছিল। সে গলাটা 'বেস'-এ নামিয়ে বলল: না খ-দাদার উপন্যাসখানার তুলনা টানতে কোন দেশি বিদেশীর দরজায় ধর্ণা দেওয়া দরকার হয় না। দাদার প্রতিটি লেখাই অরিজিন্যাল। আর তাঁর লেখার সে অরিজিন্যালিটিই তাঁকে অনেকের মধ্যে নিশ্চিত চিনিয়ে দেয়।

নিজের উপন্যাসের প্রশংসা শুনলে 'খ' বাবু রীতিমত পুলকিত হন। সে পুলকের চেহারা কিন্তু বাইরে ফোটে না। শরীরের কোষে কোষে সংগুপ্ত থেকে মুখ চোখে একটা দার্শনিকসুলভ নিস্পৃহতা এনে দেয়। এখন তিনি ভক্তদের দিকে চেয়ে তাদের সাহিত্য ব্যবসার খোঁজ-খবর নেন। চার নম্বর ভক্তের গল্পের শেষ অংশটা পাল্টিয়ে দিয়ে যেতে বলেন। দু নম্বর ভক্তের গল্পটা কম্পোজ হয়ে পাঁচ গেলি দাঁড়িয়েছে। দু নম্বরকে 'খ' বাবু গল্পটা কেটেকুটে তিন গেলিতে ম্যানেজ করে দিয়ে যেতে বলেন। চার নম্বরের গল্পটা অনেক-দিন পড়ে আছে, দেখা হয়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। আগামীকাল অবশ্যই দেখ-বেন—নিশ্চিত কথা দেন। ছ নম্বরকে 'খ' বাবু ঘাড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন: তোর গল্প তো আগামী সংখ্যায় যাচ্ছে।

'গ' বাবুর বাড়িতেই অ্যাকচুয়ালি সম্পাদকীয় দপ্তর। ম্যাকসিমাম লেখক কবি কাগজের অফিসের চেয়ে বাড়ির দপ্তরেই বেশি যাতায়াত করেন। সেখানে 'গ' বাবুর নিজস্ব অ্যাডভাইসারি কমিটি আছে। তাঁর সাহিত্য সার্ভে করেন। এক-কথা দু কথায় তাঁরা যে কোন লেখকের ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারেন। কাউকে কাউকে একেবারে মর্গেও চালান দেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত এতাবৎ কবি যশঃপ্রার্থী রাতারাতি নভেলিস্ট হয়ে যান। কোন মাঝারি ওজনের কবি রাতারাতি মহাকবি বনে যান। সেখানে অনেক লেখকেরই বায়োডাটা করা আছে। অ্যাডভাইসরি কমিটি সেই ডাটা দেখে প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের লেখার সুযোগ দেন। 'গ' বাবু ব্যস্ত মানুষ। সারাদিন কাগজ চালানোর চিন্তায় মাথা খাটান। সব লেখকের সব লেখা পড়ার সময় পান না তিনি। তাই মাঝে মধ্যে অ্যাডভাইসরি কমিটির সার্ভে রিপোর্ট শুনে সংশ্লিষ্ট লেখকের প্রশংসা অথবা নিন্দা করেন। অ্যাডভাইসরি কমিটির রীতিমত জোরালো ভূমিকা 'গ' বাবুর দপ্তরে। বলা বাহুল্য, অ্যাডভাইসরি কমি-টির সকলেই নিয়মিত লেখক। তাঁদের লেখার সমালোচনায় কোন কমিটি নেই।

আমার মনে হয় 'ক' বাবুর দপ্তরে আসা ভ্রমণ কাহিনীর লেখক, 'খ' বাবুর ভক্তবৃন্দ কিংবা 'গ' বাবুর অ্যাডভাইসরি কমিটি কেউই লেখক নন। এইভাবে লেখক হওয়া যায় না। আদৌ লেখাই যায় না। সত্যিকারের লেখক এই সব সমাবেশে থাকেন না। যে চাতালো গোষ্ঠী বা গ্রুপ গড়ে লেখক হওয়ার চেষ্টা, সম্পাদককে সন্তুষ্ট করে লেখক হওয়ার প্রয়াস সেখানে সত্যিকারের লেখক অনুপস্থিত। আসলে লেখার ব্যাপারটা তো একটা সাধনা। এবং রীতিমত নিভৃত সাধনা। কলরবে তো তা হওয়ার নয়। নিজস্ব একটা যন্ত্রণার তাগিদে লেখককে লেখায়। সেই যন্ত্রণার ক্ষরণ থেকেই লেখক কলম ধরেন। তাঁর সময় কোথায় ক বাবু খ বাবু কিংবা গ বাবুর কাছে ছোটাছুটি করার।

হাতের কাছে সাহিত্যের এই প্রায় নিষ্ফলা সময়। এখন মনে হয় তেমন সাহিত্যিক কেউই নেই। যিনি বাঁশবাদির অরণ্যে হাঁসুলির উপকথা লিখছেন, ময়না দ্বীপের স্বপ্ন নিয়ে ভেসে যাচ্ছেন পদ্মার গা বেয়ে, কিংবা পথের পাঁচালী শুনিয়ে যাচ্ছেন আমাদের। এ নিষ্ফলা সময়ে এ ভিড়ের মধ্যে সত্যিই তাঁদের কেউই নেই। আষাঢ়ের খেয়াঘাটের পথে, বাঁশবাদি প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার মাড়িয়ে, পদ্মা বিস্তীর্ণ চর পার হয়ে তাঁরা কবে আসবেন কে জানে?

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ

কুমার মুখোপাধ্যায়

আজীবন সাঙ্গীতিক পরিবেশে লালিত কুমার মুখোপাধ্যায়ই এখন ফৈয়াজ খান ঘরানার এক নম্বর বাঙালী গায়ক। জীবনের অনেকটা সময় কুমারবাবুর কেটেছে লক্ষ্ণৌ-এ। উর্দু বলেন চোস্ত, চলনে-বলনে লক্ষ্ণৌ ঘরানার সুস্পষ্ট ছাপ। গান শিখেছেন প্রথমতঃ মালবিকা কাননের পিতা রবীন্দ্রলাল রায় এবং রামপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ মুস্তাক হুসেন খানের কাছে। 'পরে ফৈয়াজ খানের কাছে গিয়েছিলাম। খান সাহেব চেয়েছিলেন বরোদায় আমি ওঁর কাছে থেকে যাই। পড়াশুনার জন্যে সম্ভব হয়নি। ষাট সালের পর ওস্তাদ আতা হুসেন খান ও ওস্তাদ লতাফৎ হুসেন খানের কাছে পাঠ নিই।' ছেচল্লিশ সালে লক্ষ্ণৌ য়ুনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাশের পর টানা চোদ্দ বছর সঙ্গীত-চর্চা কিছুটা হ্রাস পায়, 'য়োরোপীয় ক্ল্যাসিকাল মিউজিক চর্চা ও ক্যারিয়ার বিল্ডিং-এর জন্যে।' ইনি এখন কোল ইন্ডিয়ার কমার্শিয়াল ডিরেক্টর। 'না লোড শেডিং-এর জন্যে কয়লা একটুও দায়ী নয়। জ্যোতিবাবুকে ভুল বোঝানো হয়েছিল। অবশ্য মুরশেদ আমাকে চিঠিতে বলেছেন জ্যোতিবাবু একথা বলেননি।' কোল ইন্ডিয়ার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে সিরিয়াস মিউজিক চর্চা এবং ভারতের প্রত্যেকটি কনফারেন্সে যোগ দেওয়াই শুধু নয়, শিল্পের আরেকটি মাধ্যমেই ইনি অক্লান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন—ফোটোগ্রাফি আশ্চর্য ভদ্রলোক এত সময় পান কোথায়? যাঁদের নিয়ে একেকটি সময় চেনা যায়, বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের একজন—নির্দ্বিধায় বলা যায়, সন্তান হিসেবে কুমারবাবু তাঁর সার্থক উত্তরাধিকারী।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

'আমরা কার পক্ষে? যেখানে যত প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, জীবনমুখী প্রচেষ্টা আছে, প্রতিষ্ঠান আছে—আমরা তাদের পক্ষে। তাদের রক্ষা করার জন্যেই আমরা অর্থাৎ রাজ্য সরকার সর্বদা তৈরী'। কথাগুলি বললেন, রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এম সময়ে শিক্ষকতা করেছেন, রাজনীতি করছেন অল্প বয়েস থেকে। 'এই সরকার আসার পর আমরা কলকাতায় দুদুটো নতুন মঞ্চ পেয়েছি যা গ্রুপ থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠেছে—অহীন্দ্র মঞ্চ এবং শিশির মঞ্চ।' শিশির মঞ্চের পিছন দিকের পুকুর বুজিয়ে ফিল্ম ফেডারেশনের সঙ্গে যৌথভাবে ফিল্মের জন্যে একটি আর্ট থিয়েটার করব। অনুদান দিচ্ছি, কালার ল্যাবরেটরী ও সেনসর ভিত্তিক প্রিভিয়ের ব্যবস্থা, আমার রাজ্যের ছবি আমাদের হলে দেখানোর ব্যবস্থা—এসব কিছুই করছি শুধু ফিল্মের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে নয়— ফিল্মের মান বাড়ানোর জন্যেও, যেটা পুরোপুরি পরিচালকের ব্যাপার। আমি বিশ্বাস করি না, ভাল ছবি লোকে দেখে না। আসলে ব্যবসার খারাপ জিনিস দেখিয়ে, ভাল জিনিস দেখার চোখ তৈরী করার চেষ্টা করা হয়নি।' চলচ্চিত্রই নয়— নাটক নিয়েও সমান ভাবিত। কী অকল্পনীয় অভাব অনটনের মধ্যে এঁরা নাটক করেন। আর্থিক সাহায্য এঁদের অবশ্যই পাওয়া উচিত, রাজ্য সরকার দিতে পারেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললাম সেন্ট্রাল বছরে কলকাতার বড় বড় কয়েকটি গ্রুপকে মোটা অংকের টাকা দেয়, ছোট গ্রুপেরা পুরোপুরিই বঞ্চিত—বিষয়টি আপনাকে ভাবায় না? পাশে [illegible] সেনগুপ্ত। 'আমাদের কোনো কিছু করার নেই।' দিল্লি সেনসর বোর্ড করলেন—রাজ্য সরকারের সঙ্গে কনসাল্ট না করে, ইনি অবাক, মর্মাহত। পেশাদারী মঞ্চে ইউনিয়ন হয়েছে—খুব খুশী।

নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত

থিয়েটারের জন্যেই চাকরি ছেড়েছেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত—'পরবর্তী বিমান আক্রমণ' প্রযোজনার পর থেকে যাঁকে আমরা একবাক্যে চিনি। বত্রিশের কাছাকাছি তরুণ যুবক। জেদী। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর— তাই ঝুঁকি নিতে পারেন। শুরুতে মোহিত চট্টোপাধ্যায় হাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন 'নক্ষত্রে'। বাহাত্তরে দল গড়লেন 'থিয়েটার কমিউন।' সব নতুন ছেলেমেয়ে নিয়ে। প্রথম প্রযোজনা বিভুর বাঘ থেকে শুরু করে 'পরবর্তী বিমান আক্রমণ,' স্বদেশী নকশা, কিং-কিং, দানসাগর এবং সাম্প্রতিক প্রযোজনা প্রস্তুতি—এই অব্যাহত জয়যাত্রার নায়ক নীলকণ্ঠ নাটক লেখেন, পরিচালনা করেন, এবং যেমন অভিনয় করেন, তেমন সহানুভূতিশীল অথচ নির্মম উপায়ে অন্যকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে নিতেও জানেন। সকলের নাটকই দ্যাখেন। তবে থিয়েটার ওঅর্কশপ এবং চেতনার নাটক নীলকণ্ঠ-র ভাবনা-চিন্তাকে স্টিমুলেট করে। কথায় কথায় দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার প্রযোজনা সম্পর্কে বললেন, 'ওদের নাটক দেখে মনে হয়, ওদের পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদানের অংকটা বেশ বড়। এ যেন একজোড়া স্বাস্থ্যবান স্বামী স্ত্রী, অথচ প্রসূত সন্তানটি কেমন রিকেটি। আমাদের এখানে বিভিন্ন আর্ট মিডিয়ামের মধ্যে যোগাযোগ কম—নীলকণ্ঠ দুঃখিত। বিদেশী নাটকের ট্রান্সলেসনে কিংবা এ্যাডাপটেশানে চরম অনীহা। 'কেননা আমাদের প্রগতি-সাহিত্য রত্নগর্ভা। নাটকের উপাদানের সমূহ সম্ভাবনায় ভরপুর। তবে পুতুল খেলা, দশচক্র, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী ইত্যাদি নাটক যে বাংলা মঞ্চকে শক্তিশালী করেছে, এটা নীলকণ্ঠ স্বীকার করেন। বললেন, গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের ঐতিহাসিক জন্মসূত্র ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ধারা থেকে।

নির্মলকুমার দাস

রাজনীতি
কলকাতা
স্টাইল

মহাকরণে বিস্ফোরণ

বেদব্যাস বৈদ্য

বরাদ্দ অর্থ ব্যয় না করে সরকারী ভাণ্ডারে তা' জমা রাখা কোন সরকারেরই উদ্দেশ্য হতে পারে না। রাজনৈতিক দল পরিচালিত কোন জনপ্রিয় সরকারের পক্ষে তো তা' কোনরকমেই সম্ভব নয়। অথচ কী আশ্চর্য এই দেশ, এ দেশের ত্রিশ বছরের সরকারী নথি ঘাটলে তার অজস্র প্রমাণ মিলবে। ফলে বছর বছর উন্নয়ন প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা শেষ পর্যন্ত আর ব্যয় করা হয়নি। উদ্যোগ ছিল। ছিল আগ্রহ ও উৎসাহ। কিন্তু আমলা-নির্ভর প্রশাসন দেশবাসীর বাঞ্ছিত এবং জনহিতকর বহু উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ হয়তো আঁতুড়ে বিনষ্ট করেছেন, নয়তো তা কার্যকর করতে বিলম্বিত নীতি নিয়েছেন।

রাজ্য প্রশাসনের মূল কেন্দ্র মহাকরণের গত ত্রিশ বছরের এই মানসিকতায় কতখানি পরিবর্তন হয়েছে, তা খতিয়ে দেখবার সময় এসেছে। শ্রীজ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছেন দু' বছর আগে। পরিবর্তনশীল ব্যবস্থায় অনেক প্রগতিশীল কাজেরও সূত্রপাত হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গ্রাম-বাংলায় উন্নয়নমুখী কাজের আগ্রহও অনেকগুণ বেড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মহাকরণের অর্থ দপ্তরের বোধহয় এখনও এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির খবর জানা নেই। অতএব হয়েছে বিঘ্নিত। বলাবাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব জনবিরোধী কাজকর্মের দায়-দায়িত্ব অর্থদপ্তরের।

এ রাজ্যে বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দু'বছর আগে। তার আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর। শৈশব এবং কৈশোর ছেড়ে বামফ্রণ্ট সরকার এবার যৌবনের পথে পা বাড়িয়েছে। তার আগেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়েছে। গ্রামীন মানুষ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উন্নয়নমুখী কাজের বহু সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছেন। গান্ধীজী পরিকল্পিত "পঞ্চায়েত রাজ' প্রতিষ্ঠিত না হলেও গ্রাম-বাংলায় যে দেশ গড়ার একটা নতুন মানসিকতা গড়ে উঠেছে, তা' অনস্বীকার্য। অথচ এ রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে মহাকরণের এক শ্রেণীর আমলা এখনও তাদের 'মানুষের চেয়ে আইন মূল্যবান' মানসিকতা ছাড়তে পারে নি। ফলে, গ্রামীণ উন্নয়নের বহু কাজ এখনও বিঘ্নিত হচ্ছে। বরাদ্দ অর্থ আদায় করতে না পেরে মহাকরণে মন্ত্রীরা অসহায়ভাবে অর্থমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের শরণাপন্ন হয়েছেন। পুরো দু' বছর এভাবে কাটার পর অবশ্য বামফ্রণ্ট সরকারেরই একাধিক মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর কাছে অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ শুরু করেন। তাঁদের অনেকের মতে, আইন-আঁকড়ে থাকা অর্থমন্ত্রী গ্রামীন জীবন ও গ্রামীন উন্নয়নের চেয়ে শহরের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতেই বেশী আগ্রহী। এই মর্মে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একাধিক মন্ত্রী অনুযোগও করেন।

অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র মশাই একজন বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ। এক সময় তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অন্যতম সহযোগী ছিলেন। নিজেকে তিনি প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদ বলে মনে করেন। ডঃ মিত্রের বাজেট ভাষণে একবার তিনি বলেওছিলেন, তাঁর বাজেট গরীব মানুষের স্বার্থে রচিত এবং তা শ্রেণী শত্রুদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তাঁর এই বক্তব্যের রেশ টেনে জনৈক প্রবীণ মন্ত্রীকে মহাকরণে খেদোক্তি পর্যন্ত করতে শোনা গেছে, আবেগময়ী ভাষণে শ্রেণীশত্রু বিনাশ হয় না। তার জন্য প্রয়োজন, ত্যাগ-নিষ্ঠা আর অনুভূতি।

অর্থমন্ত্রীকে নিয়ে সি পি আই (এম) দলের একটা বিরাট অংশেও নানা ক্ষোভ ও বিতর্ক বর্তমান। বিভিন্ন এল. সি অর্থাৎ লোকাল কমিটিতেও অর্থমন্ত্রীর কঠোর সমালোচনায় সি পি আই (এম) নেতা ও কর্মীদের মুখর হতে দেখা গেছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একজন দক্ষ প্রশাসক এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। এ সব অভিযোগ এবং নানা তথ্য তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়। বিভিন্ন মহল থেকে মন্ত্রিসভায় ছোট-খাটো পরিবর্তনের সুপারিশও তিনি পান। কিন্তু দলীয় স্বার্থের ঊর্ধে রেখে বৃহত্তর স্বার্থে তিনি গ্রহণে নারাজ। তিনি মনে করেন এই মুহূর্তে মন্ত্রিসভায় কোন রকম নাড়া দিলে তা' নিয়ে নানা মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। অতএব জনৈক সহকর্মীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ-অনুযোগ সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য নিয়ে চলছেন।

অর্থ দপ্তর তথা অর্থমন্ত্রীর আচরণে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দলের একাধিক প্রবীণ মন্ত্রীও তাঁর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বামফ্রণ্টে নেতাদের ধারণা ছিল, ডঃ মিত্র যেহেতু দিল্লীতে বহু বছর উচ্চপদে আসীন ছিলেন, সেইহেতু অর্থমন্ত্রীরূপে সেখানকার আমলাদের উপর তিনি যথেষ্ট প্রভাব খাটাতে পারবেন। এবং প্রকারান্তে তাতে রাজ্য সরকার বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। দু' বছর পর সম্ভবতঃ বামফ্রণ্টের বহু নেতার সে বিশ্বাস ম্লান হয়েছে। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রভাবের তুলনায় তা' অত্যন্ত নগণ্য। এমন কি বহু ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীকে দিল্লী হতাশ করলেও, মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব সেখানকার প্রশাসনকে টলাতে সক্ষম হয়েছে।

মহাকরণ সূত্রে জানা গেছে, অর্থ দপ্তরের গোঁড়ামি এবং তথাকথিত 'আইন মেনে চলা' মানসিকতার ফলে এই সরকারের প্রথম দু' বছরে প্রায় একশ' কোটি টাকার স্কীম কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে সেচ দপ্তর, কৃষি দপ্তর, পূর্ত ও গৃহনির্মাণ দপ্তর এবং স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা দপ্তর অর্থদপ্তরের অসহযোগিতায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও হতাশ। উল্লেখ্য, সরকার গৃহীত কোন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করলে তা' কার্যকর করার জন্য অর্থদপ্তরে অনুমোদন বা সবুজ সংকেত প্রয়োজন।

অতি সম্প্রতি মহাকরণে এক নেপথ্য নাটক ঘটে। সকল মন্ত্রী এবং আমলাদের বিস্মিত করে অর্থ দপ্তর আচমকা এক সার্কুলার বিভাগীয় প্রধানদের কাছে পাঠান। সার্কুলার নম্বর—৫৭৩৩এফ তারিখ ১৬ জুন, '৭৯। তাতে বলা হয়েছে, বিভাগীয় সচিবরা গুরুত্ব বুঝে জরুরী কাজের জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকার দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করতে পারবেন। তার জন্য অর্থ দপ্তরের আগাম অনুমোদন প্রয়োজন হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই অর্থদপ্তর শেষ অবধি 'আইন বাঁচানোর ওজর' ছেড়ে 'মানুষ বাঁচানোর' পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। বামফ্রণ্টের একাধিক মন্ত্রীর মতে, অর্থদপ্তরের এই সার্কুলার অর্থমন্ত্রীর পূর্ববর্তী বহু নোটকে এখন ব্যঙ্গ করছে। আসলে অর্থমন্ত্রীর কিছু কাজের প্রতি এটা কিছুটা অনাস্থারই সামিল।

মহাকরণের ইতিহাসে এই সার্কুলার একটা বিস্ফোরণ বলা চলে। আমলাতন্ত্রের গোয়ে খুলতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু সাহসিকতার সঙ্গে যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে ডাঃ বিধানচন্দ্রের সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে। ত্রিশ বছরে আর কোন মুখ্যমন্ত্রী জনস্বার্থে এতবড় ঝুঁকি নিয়েছেন বলে জানা যায়নি।

২৫-৬-৭৯

প্রধানমন্ত্রীর বিস্ময় ও ক্ষোভ

শ্যাম মল্লিক

সম্প্রতি পাঁচদিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কোন কোন ব্যাপারে কিছু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কোনটায় তাঁর ছিল অনীহা, কোনটায় বুঝি ক্ষোভ। দমদম এয়ারপোর্টে রিপোর্ট করতে গিয়ে কয়েকজন সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার অফিসারদের হাতে নিগৃহীত হন। ব্যাপার কি—না খুব কাছ থেকে বা ক্লোজ রেঞ্জ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ছবি তুলতে দেওয়া হবে না। আর দিল্লির সাউথ ব্লকের অনুমতি না থাকলে রিপোর্টারদেরও ভি ভি আই পির কাছাকাছি যেতে দেওয়া হবে না। দিল্লির সবুজ সংকেত, সাউথ ব্লকের অনুমতি—এখনকার জনতারাজে এসব তাজ্জব ও অভাবনীয় ব্যাপার ঘটছে। দমদম এয়ারপোর্টে সাংবাদিকদের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে প্রধানমন্ত্রী নাকি একটু উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

রাজনীতিতে বা প্রশাসনে কিংবা সমাজ ব্যবস্থায় যাঁরা ভি আই পি তাঁদের সঙ্গে সংবাদপত্রের একটা সম্পর্ক আছে। সাংবাদিকরা সেই সম্পর্কের একটা অংশীদার। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় এক শ্রেণীর অফিসারের অযথা কঠোর মনোভাবের শিকার হচ্ছে সাংবাদিকরা। সাংবাদিক বা ফটোগ্রাফাররা হলেন সুশৃংখল সৈনিকদের মত। বিধ্বংসী বন্যা, সর্বনাশা খরা, ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ভি আই পি ভ্রমণ, কি শান্তি কি যুদ্ধ ওরা সবেতেই ছুটছেন। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে এই বিপত্তি কেন?

এধরনের এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। অনেকদিন আগেকার ঘটনা গৌহাটিতে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় জনৈক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফারের ধস্তাধস্তি দেখে পণ্ডিত নেহেরু ছুটে গিয়ে ঐ ফটোগ্রাফারকে রক্ষা করে পুলিশ অফিসারটিকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন। ফটোগ্রাফারটির অপরাধ হয়েছিল : পণ্ডিতজীর একটা ছবি তোলার জন্য তিনি তাঁর কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

কয়েক বছর আগেকার কথা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বোম্বাইতে এসেছেন। একজন পুলিশ অফিসার সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের কিছুতেই কাছাকাছি যেতে দেবেন না। উপস্থিত সাংবাদিকরা চীৎকার করে ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি এগিয়ে এসে ঐ অফিসারটিকে বলেন, আপনাদের কাজ চোর-ডাকাত ধরা। এঁদের ধরে রেখেছেন কেন? এই কলকাতায় অনেক বড় বড় ভি আই পি এসেছেন। কোসিগিন, প্রয়াত ভুট্টো, রাণী এলিজাবেথ, বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ, চৌ এন লাই, হো-চি-মিন ও ফিদেল কাস্ত্রো প্রমুখ। ঐ রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে নিজেদের সিকিউরিটি ছিল কিন্তু কই রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের তো কখনও হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়নি।

আবার ফিরে আসছি শ্রীমোরারজী দেশাই প্রসঙ্গে। ২৯ মে শ্রীদেশাই দার্জিলিং আসবেন। কলকাতা থেকে একদল সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার দুদিন আগে দার্জিলিং গিয়ে হাজির। পাশ ইস্যু করার সময় জেলা কর্তৃপক্ষ সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন লেবং হেলিপ্যাডে আপনাদের যেতে দেওয়া হবে না। আর প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের মধ্যে আপনাদের গাড়ি ঢুকতে পারবে না। সাংবাদিকরা হতবাক। কিন্তু উপায় কি। উল্লেখ্য লেবং হেলিপ্যাডে ফটোগ্রাফার ও সাংবাদিকদের না দেখে প্রধানমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর কাছেও তিনি এই প্রসঙ্গটা তোলেন। নেপালীকে অষ্টম তপশীলভুক্ত করার দাবিতে সেদিন ছিল দার্জিলিং-এ হরতাল স্বাভাবিক কারণে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রশ্নটাই ছিল সবচেয়ে বড়। নিরাপত্তার কারণে নয় হেলিপ্যাডে যেতে দেওয়া হল না। কিন্তু কনভয়ের মধ্যে সাংবাদিকদের দু-একটা গাড়ি থাকলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?

এতো গেল সাংবাদিকদের কথা। এবার প্রধানমন্ত্রীর ক্ষোভের কথা বলছি। জাঁকজমক করে সারি সারি মোটর গাড়ির বিরাট কনভয়ের মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আজকাল যেতে চান না। তাঁর মতে এসবের কোন প্রয়োজন নেই। এবার পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণের সময় তিনি বলে গেছেন, আবার আসবো তখন যেন এসব বড় ব্যাপারের আয়োজন না করা হয়। এপ্রসঙ্গে তিনি বিরাট কনভয়ের কথাও নাকি বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর এই জাঁকজমকের ব্যাপারে খুব আপত্তি।

যে কোন কাজে দার্জিলিং গেলে সিদ্ধার্থবাবু আগে থেকে রাজ্য সরকারের হেলিকপ্টারটা বাগডোগরায় পাঠিয়ে দিতেন। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে বোয়িং-এ চেপে বাগডোগরা পৌঁছে হেলিকপ্টার নিয়ে সোজা গিয়ে উঠতেন লেবং-এ। জ্যোতিবাবু এসবের ঘোরতর বিরোধী। শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ী পথ বেয়েই তিনি দার্জিলিং যান। হেলিকপ্টারে নয়।

পশ্চিমবঙ্গে পাঁচদিন অবস্থান কালে প্রধানমন্ত্রী সাগর স্নান করেছেন, কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দিয়েছেন। হেলিকপ্টারে সুন্দরবনের জঙ্গল ঘোরার সময় তিনি একজন অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কটা জেলা ঘুরলাম। অফিসারটি যখন বলেন, স্যার এটা একটা জেলারই অংশবিশেষ তাতে প্রধানমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, না না এত বড় জেলা থাকা উচিত নয়। ঠাট্টা করে বলেন, এই জেলা ভাগ না করলে তিনি সুন্দরবনের উন্নতির জন্য কোন টাকা দেবেন না। দার্জিলিং-এ প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা 'হার্ড নাট টু ক্র্যাক' পরিষ্কার জবাব : নেপালীকে অষ্টম তপশীলভুক্ত করা হবে না। ক্ষোভে ফেটে পড়লেন, ভাষা সমিতির সমর্থকরা। ক্ষুব্ধ হলেন জেলার জনতা পার্টির নেতারা। ওদের শান্ত করার জন্য একটা কিছু বলার জন্য মোরারজী দেশাইকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু শক্ত নারকেল কিছুতেই ভাঙা গেল না।

আর একটা ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ২৯ মে রাজভবনে রাজ্যপাল টি এন সিং প্রধানমন্ত্রীকে এক নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন। এই নৈশভোজে যোগদান করার আগেই মোরারজী দেশাই তাঁর আহার সেরে নিয়েছিলেন। প্রোটোকল অনুযায়ী তিনি ওখানে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যপালের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। হঠাৎ পুলিশের একজন বড় অফিসার ওঁদের দুজনের মাঝখানে একটা খালি চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে এটা ওটা বলতে শুরু করে দিলেন। অফিসারটি নিজেই তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন 'আমি ওমুক'। হ্যান করেছি ত্যান করেছি বলে কিছুক্ষণ নিজের ঢাক পিটিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে 'অটোগ্রাফ চাইলেন। বিস্মিত প্রধানমন্ত্রী গম্ভীর মুখে বললেন, আপনি যেই হোন না খাদি না পরলে আমি কাউকে অটোগ্রাফ দিই না। সমস্ত ঘটনায় রাজ্যপাল বিস্মিত। অফিসারটির ঐ আচরণে তিনি প্রধানমন্ত্রীর মনের ভাবটা বেশ ভাল করে বুঝতে পারলেন। রাজ্যপাল এব্যাপারে একটা চিঠিও লিখলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। অনেকের ধারণা ছিল ঐ অফিসারটি মত্ত অবস্থায় ঐরকম ব্যবহার করেছেন কিন্তু সংশ্লিষ্ট অফিসার তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলেছেন, মদ আমি খাইনি। একটা টনিক খেয়েছিলাম। অফিসারটির বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে মহাকরণে এখন চিন্তা ভাবনা চলছে।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী আর একটা ব্যাপারে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ রাজ্যের জনতা পার্টির কয়েকজন নেতার কাজকর্মে তিনি ক্ষুণ্ণ। জনতা পার্টির এক মাতব্বর সম্পর্কে তিনি বলে গেছেন, যে পদে উনি আছেন তার উপযুক্ত তিনি নন। স্পষ্টভাষী প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে পাঁচদিন থেকে বিস্ময় ও ক্ষোভের অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করে গেলেন।

মড়া

সিদ্ধার্থ রায়

আউটডোরের শেষ হবার পর নির্জন হাসপাতালে অচেনা ওয়ার্ডের কোণ থেকে মস্তিষ্কবিরোগের টানা কাটা-কাটা হাহাকারের মতো দীর্ঘ মধ্যদুপুর স্টেশন-চত্বরের নতুন বিল্ডিং-এর সংক্ষিপ্ত ছায়ায় ছায়ায় হল্কা হাওয়ার ঝাপটা মেরে ছড়িয়ে গেল। একটু আগে অফিসটাইমের শেষ ভিড়টা শুয়োরের পালের মতো খেদান খেতে খেতে বেরিয়ে গেছে। স্টেশন-চত্বরে এখন বেলা সাড়ে এগারোটার গিন্নী, পানাচবুনো মন্থরমে অবেলার গড়ান দিচ্ছে।

বেরুবার গেটের ধারেই, এক কোণে একটা মড়ার খাট পাতা। খাটে শাদা থান-ঢাকা একটা পুরুষের মড়ার পাশে বিধবা বেশে একটি মহিলা। মৃতদেহের স্ত্রী। স্টেশন চত্বরের এই বেওয়ারিশ সময়ে মৃতদেহের স্ত্রী তার লম্বা মুখঢাকা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ইতিউতি চাউনি মেরে একটু ঝুঁকে খাটের ধার ঘেঁষে মড়ার কানে কানে বলে, শুনছও মা। লুকজন একটু সুনসান তুমি শ্বাস ফেলাও ঠিক কইরা। কেউ আইলে আমি কইব।' এই কথায় খাটে শায়িত মড়ার ভেতর কোনো পরিবর্তন বোঝা যায় না। ওপর থেকে মনে হবে সেই শাদা থান ঢাকা অসাড় মড়া নিস্পন্দ পড়ে আছে। [illegible] কাছে কিছু বাসী রোদেপোড়া ফুলের গুচ্ছো ভাদ্রের হল্কা ঝাপটাতেই যেন এক-আধবার নড়ে-নড়ে ওঠে। মড়ার গন্ধে মাছিরা ভন-ভন করে, দেহ ছেঁকে ধরছে বলে মুখটাও শাদা কাপড়ে ঢাকা। মড়ার চামড়া মাছি খুঁটবে, বা, শ্মশান খরচা ওঠাবার জন্য অনাথা স্ত্রীকে স্বামীর মড়া নিয়ে স্টেশন-চত্বরে বসে থাকতে হলে ভাদ্রের আঁচে মড়ার মুখ ঝলসে যাবে, কোনো স্ত্রীই ভিখিরি হলেও তা চায় না। যারা দেখে তারাও নয়। অন্ততঃ এই রকম কার্যকারণ সম্বন্ধ পরিবেশই অনিবার্য ছিল—ভাদ্রের দুপুর, অনাথা স্ত্রীলোক, পাশে মড়া। এমন পরিবেশ যে, উপরিউক্ত কার্যকারণ সম্বন্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল তাই নয়—এতক্ষণ যে হাজার হাজার মানুষ শুয়োরের পালের মতো বেরিয়েছে, আরও হাজার মানুষ যে ফিরে যাবে ঐ একইভাবে—তাদের প্রাত্যদিনকার আপ-ডাউনের যান্ত্রিকতার ভেতরেও এই দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে হঠাৎ মড়া দেখে হাত তুলে প্রণাম করবার সেই দ্রুততায় ঝনঝন অনুকম্পা ছুঁড়ে দেওয়ার ব্যতিক্রমও ঘটিয়ে ফেলে।

আশেপাশে পাবলিক কম মনে হলে মহিলা শরীরের এক-আধটা মোচড়ে কখনও বাঁয়ে হেলে, ডানে ঝুঁকে সামনে উবু হয়ে ছড়ানো-ছিটোনো পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে পরে। সকাল থেকে এখনও আন্দাজ টাকা কুড়ি মতো হয়েছে। 'শুনছও না। টাহা কুড়ি হইছে। তুমি শ্বাস ফেলাও। কেউ আইলে কইব আমি।' মৃতদেহের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। ওপর থেকে মনে হয়—নিস্পন্দ কাঠের মতো একটা পুরুষের মড়া। মাছি উড়ছে। ভাদ্রেরই গরম কুড়িয়ে নিলে জায়গাটা আবার দাক্ষিণ্যহীন অনাথ হবার সুযোগ পায়—কিছুক্ষণ পরেই পশ্চিমের দীর্ঘ সূর্যকিরণে ডুবন্ত আভায় আকাশে পাখিরা আর এই শহরে পাল-পাল মানুষ ঘরমুখো হলে, দ্বিতীয় খেপের জন্য এভাবেই যেন প্রস্তুতি নেওয়া হয় শূন্যতার ভেক ধরে। সারাদিন ঠায় রোদে-বসা মহিলাটিও এমন ঘেমে নেয়ে পুড়ে খাক, যে, সকালবেলায় ঘুম-ভাঙা কিছু সরলতা মুখে নিহিত থাকলেও, ঠিক এই মুহূর্তে তার চোখে কালি, শাঁখা-লোহাহীন হাত, আর ভেঙে ভেঙে যাওয়া খোঁপার বিস্রস্ততায় সে পরিপূর্ণ বিধবা।

শাদা থানের বয়নে যে অসংখ্য গ্রন্থি-বন্ধ অবকাশ আছে, মড়া তার ভেতর দিয়েই পিটপিট চোখে দেখতে পাচ্ছিল। সারাটা দিন একভাবে সস্তা নারকেলের দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে গাগতরে খিঁচ ধরবার যোগাড়। দড়িগুলো এমন ফুটছে, মনে হচ্ছে তীরের ফলা। শালা কুরুক্ষেত্রের তীরের ফলা। নড়া যাচ্ছে না। সে তো মড়া। খাটিয়াটা শারীরিক ভারে মাঝখানে ঝুলে যাওয়ায় পেশীগুলো, চামড়া, হাড়গোড় এমন ঘেঁষাঘেঁষি, সব ঢাকা-ফাকা তুলে, শালা মড়া সাইজা পয়সার ধান্ধার নিকুচি করছে বলে, সোজা দাঁড়িয়ে উঠতে ইচ্ছে জাগে। ভাদ্রের গরমে সারাটা দিন একভাবে চিৎ হয়ে, না নড়ে, প্রচুর কসরৎ করে প্রায় প্রাণায়ামের নিয়মে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করে, ভেতরে ঘেমে প্যাচপেচে হয়ে, মড়া সেজে শুয়ে থাকা চাট্টিখানি কথা নয়। যদি উল্টা পাল্টা কিছু হয় যদি অকারণেই, তার ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে, শরীরের অন্তর্গত নিয়মে যদি কোনো আঙুল, বা পেশী নড়ে ওঠে। যদি সম্পূর্ণ হঠাৎই তার হাঁচি পায়। বা কোথাও চুলকায়। কোথাও কোনো পোকা কামড়াবার জ্বালা করে। মাছি আনবার জন্য যে পচা পেয়ালা তার তলায় আছে, তার গন্ধে মাছিরা যদি সুড়সুড়ি দেয়! তাহলে [illegible] পিটুি-থান তো তাকেই গিলা ক[illegible]বে। এমন কঠিন বিপদসংকুল শবাসনে তার বুক প্রতি মুহূর্তে যেন আরও জোরে, শব্দ করে বেজে যায়। মড়ার বুকের শব্দ যদি কেউ শোনে!

সকালবেলা, আকাশে শরতের প্রথম দূরগামী মেঘমালা বিক্ষিপ্ত আলস্যের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মন্থর হয়ে গেলে চারটে ছেলে বলহরি হরিবোল, বলহরি হরিবোল করতে করতে রাস্তার দুধারে চাকতে সব গাড়িঘোড়া থামিয়ে দ্রুত পায়ে মড়াকাঁধে স্টেশন-চত্বরে ঢুকে পড়ে। পেছনে,

স্বভাবতই শোকাকুলা স্ত্রী অন্যত্র একজনের গায়ে প্রায় এলিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদছে। অফিসটাইমের ঐ ধাবমান ঝংকার টংকার ছাপিয়ে তার কান্না তীক্ষ্ণ বাঁশির মতো বিঁধে ফেলে সকালবেলার ঝুলন্ত ভিড়ক্লান্ত বিবেক। সবাই হাত তুলে নমস্কার করে। কেউ কোনো মৃত্যুস্মৃতি মন্থন করে। কেউ বা ফেলে দীর্ঘশ্বাস। জানলা গলিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে কেউ। কেউ বা বীতশ্রদ্ধ, বিরক্তিতে হয়তো বলেই ফেলে শালা আফিসটাইমেই মরবার-সময় হলো! কাণ্ডজ্ঞানহীন! কোনো যুবক তার প্রেমিকার কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে চায় মনে মনে। কোনো স্ত্রী স্বামীর হাত চেপে বন্ধন দৃঢ় করে। এক-একটা শবযাত্রা এইভাবে আমাদের বিস্মৃত যান্ত্রিক উদাসীনতায় হঠাৎ হঠাৎ আত্মচেতনা এনে দেয়। প্রতিটি শবযাত্রা আমাদের মৃত সত্তাকে বাঁচিয়ে তোলে।

মড়া নিয়ে, ডাকপাড়া স্ত্রী নিয়ে, স্টেশনে ঢুকলেই একটা সোরগোল পড়ে যায়। হঠাৎ এইরকম পাবলিক শোক-প্রদর্শনীতে লোকজনের বাচচারা হঠাৎ একটা বেশ হুজুগ পেয়ে গেল। শকুনের পালের মতো মুহূর্তে জায়গাটাতে একটা জটলা পাকিয়ে ওঠে। কিছু ঠেলাঠেলি। চারটে ছেলে খাটিয়াটাকে একেবারে কোণার দিকে রেখে সামনে এসে ভিড়ের বৃত্তটাকে বড় করে তোলে। মড়ার পাশে, খাট ছুঁয়ে, বা মড়াকেই ছুঁয়ে সদ্যবিধবা বৌ আছাড়ি-বিছাড়ি কাঁদছে। কাটা পাঁঠার মতো বৌ-এর ছটফটানি। তার মাথায় শেষ সিঁদুর লেপ্টে কপালে, চোখে, গালে মাখামাখি। পরজন্মবাদ, কর্মফল, মাদুলীধারণ, তারকেশ্বর, ও নানা জ্যান্ত বাবাদের পায়ে সর্বস্ব সমর্পিত ধর্মভীরু বাঙ্গালীর বাচচাদের মনে এইরকম একটা দৃশ্যের ঐতিহ্যগত ও ইতিহাসগত, বলা যায় সংস্কৃতিগতও, একটা প্রভাব আছেই। আর এরকম একটা ঐতিহ্যগত, ইতিহাসগত ও সংস্কৃতিগত প্রভাবে জনসাধারণের মনকে ক্যাপচার করতে পারলে অচেতনেই একটা সমষ্টিগত বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে ওঠে। অন্ততঃ। এই দৃশ্যে এরকম বিশ্বাসযোগ্যতা নিহিত ছিল।

দর্শক ও দৃশ্যের ভেতর এ ধরনের মানসিক ভারসাম্য তৈরি হলে চারটি ছেলের ভেতর একটি উঠে দাঁড়ায়। এলোমেলো মনস্কতায় মাথার অযত্নলালিত একরাশ চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে, বার দুই ভিড়টার ঔৎসুক্যে জোড় হাত করে বলে ফেলে দাদারা সব—আমাদের পাড়ার এই অবনীদা না খেয়ে মরেছে। ঘরে ছোট পোলাপান খায় নাই। অবনীদাকে হাসপাতালের মেঝেতে রাখছিল। কিন্তু দুর্বল শরীর হাসপাতালের ধকল, চিকিচ্ছার ধকল সামলাতে পারে নাই। আইজকে সক্কালে হাসপাতালে অবনীদা মরছে। বৌটা বিধবা হয়ে পথে বসব দাদাবাবুরা। সৎকারের জন্য আর এই বিধবা ছাওয়াল পাওয়াল গুলান যাতে কিছু খাইতে পায়—তার জন্য আপনাদের সাহায্য চাই। যার যা সাধ্য তাই দিবেন। কত পয়সাই তো যায় এধার-ওধার। আউজকে না-হয় একটা মড়া পোড়ানোর জনাই দিলেন বাবুরা। অবনীদার আত্মার সদ্গতি হবে। আপনাগো পরলোকে পুণ্য সঞ্চয় হবে। বাবুরা.... খাটের মধ্যে শাদা চাদর-ঢাকা মড়া আর শুনতে পারে না—সারা গায়ের লোম রি-রি করে ওঠে, মুখের ভেতরে দাঁতগুলো কিড়মিড়ায়—'শালা তোর চোদ্দ গুষ্টি মরছে—শালার বেটা শালা অবনিদার পিণ্ডি চটকা—মনে মনে মড়া খিস্তি দেয়। কিন্তু উত্তেজনা প্রশমন করে। তাকে দীর্ঘ শবাসনে থাকতে হবে—উত্তেজনা শবাসনের বিরোধী। আর এখন ভুলচুক হলে, একেবারে আড়ংধোলাই।.... 'বাবুরা যার যেমন সাধ্য দিবেন। একটা মড়া লোকের আত্মার সদ্গতি হবে। নইলে মুখে একটু আগুন লাগায়ে নদীতে ভাসায় দিতে হবে, শকুনে কাকে ছিঁড়ে খাবে, শেয়াল-কুকুরে খেয়োখেয়ি করবে মড়া নিয়ে, বাবুরা'....চাদর-ঢাকা মড়ার ওপর দিয়ে শরৎকালের বাতাস বহে যায় বলেই বুঝি মৃতদেহের শীত লাগে, একটু কেঁপে ওঠে। চাদর ঢাকা অবনীর চোখের সামনে দুই দিকে ছড়ানো ডানা নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাঁকা ঠোঁট চেটে শকুন-শকুনীরা আসছে। পাখসাটে ঘূর্ণি তুলে কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো, ডানার বাঁকা রেখাগুলো আকাশের প্রেক্ষায় অন্ধকার আঁচড়, নখরের থাবায় থাবায় আকাশ ক্ষতবিক্ষত করে, হাওয়া ছিঁড়ে, মেঘ কুটি-কুটি করে, তীক্ষ্ণ শিষের দ্রুততায় অব্যর্থ নেমে আসছে শকুনেরা, চারদিকে ডানার ঝাপটা আর কর্কশ উল্লাসের ধ্বনি। মৃতদেহের মনে হলো—এখুনি পালায়। সারাদিন এইভাবে মড়া হয়ে শুয়ে থাকলে সন্ধেবেলায় তার বেঁচে ওঠাটা বিশ্বাসযোগ্য হবে তো? শাদা থানের ভেতর গ্রন্থিবদ্ধ ঘুলঘুলি দিয়ে মড়া তাকায়। বাইরের পৃথিবীটা ঝাপসা দেখাচ্ছে। মানুষজন অনেক জমেছে যদিও, এই আবরণের আড়াল থেকে ওদের আলাদা সত্তা বোঝা যায় না। মনে হয়, একতাল মাংসপিণ্ড ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। তার মাথার কাছে বৌটা ডাক ছেড়ে কাঁদছে—চিৎকারও পাড়তে পারে। মড়ার হাসি পায়। চীৎকার এতদিনে তার হৃদয়ঙ্গম হলো। মেয়েছেলেরা রঙ্গ করতে জানে। এই যে কাঁদতেছে—কী মনে হয়—মিথ্যা। কোনো হালার পো কবুক তো—এই কান্নাডা ভাতার মরা কান্না না।

মড়া মনে মনে অবাক হয়—মেয়েছেলেদের গলার স্বরে, হাবেভাবে এই চরম মিথ্যার চূড়ান্ত সত্যপ্রতিষ্ঠা কী করে হয়! বৌ-এর কান্নায়, তার গলার স্বরে কোনোরকম খাদ নেই। না-মরতেই মড়াকান্নার স্বরক্ষেপণ বৌ জানল কী করে!

মড়ার এই চিন্তার পাশাপাশি যুবকের কথা থামলে প্রথমে খুব একটা উদার তৎপরতা জনতা দেখায় না। সব শুনল, ভীড় করে দেখতে আসল, দেখে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে, চোখ বন্ধ করে প্রণাম ঠুকল, তারপর দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর তাকিয়েই থাকল, তারপর পকেটের কথা উঠতেই কেটে গেল—নগরের এধরণের জটলার মোটামুটি চরিত্র এমনি হলেও, যুবকের কথা শেষ হতেই জনগণ কাটল না। আবার মড়া বলেই বেশীক্ষণ তামাশা দেখবারও কিছু নেই—সরে পড়বার এমন নিস্পন্দ মর্মগ্রাহী কারণ আর কী হতে পারে।

ঠিক তখনই ভীড়ের নিষ্ক্রিয়তা ভেঙে কোনো জাগ্রতবিবেক একটা পুরোনো দশ পয়সা ছুঁড়ে মারে। বাতাসে একটা বাঁকা কক্ষপথ অবলম্বন করে তা গিয়ে লাগে একেবারে সোজাসুজি মড়ার একটা পাঁজরে। ঠং করে শাদা থানে পয়সা পড়ে। 'ভারত সরকারের অশোকস্তম্ভ আকাশের দিকে চিতিয়ে। আর মড়া মুহূর্তের জন্য একটা ক্ষুদ্র কিন্তু চরম সংহত বাধায় প্রায় 'উফ'

বলে উঠতে যাচ্ছিল। 'মাটি ছিল না।' দেখছ মড়া, মারো পাজর বরাবর পয়সা। আরে, হালা, তোর বাপকে মারিস। জায়গাটায় হাত বোলাবার জন্য মড়ার শরীর তাকে আদেশ করছে। বাঁ হাত নিশপিশ করছে নড়বার জন্য। সমস্ত জৈব প্রক্রিয়া ঐ ছোট্ট জায়গাটার কনকনে ব্যথার অনুকম্পা আর শুশ্রূষার জন্য মড়াকে শারীরিক চাপ দিচ্ছে। কিন্তু মড়া তার সমস্ত শারীরিক স্বাভাবিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে খাটের দড়ি ধরে টান টান পড়ে থাকে। জীবন্ত অস্তিত্বের সমস্ত নিয়মকে অগ্রাহ্য করে আজ তাকে মরে থাকতে হবে। শরীর যা চাইবে—তাকে তা দমন করতে হবে। তাকে হতে হবে একটি পরিপূর্ণ মড়া।

শাদা থানের ঘুলঘুলি দিয়ে মড়া ওপরের দিকে তাকায়। একদিক থেকে তার এই-ই ভালো লাগছে। অন্ততঃ একদিন বিশ্রাম পাওয়া গেল। ঠিক এইরকম মড়ার মতো পড়ে থাকবার ইচ্ছে তার কতদিনের। কিন্তু ভগবানের বাচ্চা তো তা হতে দেবে না। সকালবেলা থেকে রাত্রির অবদি ধায় পায়ের ওপর। একবেলা খাওয়া জোটে। অন্যবেলা এতদিন আটাগোলা, ভুষিগোলা চলত। ইদানীং সেই বিলাসিতাও গেছে। *এখন খাওয়া জোটে না। বৌ না খাওয়া দুইট্যা বাচ্চা না-খাওয়া। নিজে না-খাওয়া. মাথা গুজবার কোনে জায়গা নাই।* ফুট-পাথের গাড়ি-বারান্দার নীচে রাত কাটে। ঝড়ে বৃষ্টিতে কাদায়। তাই আজ যে-মড়ার খাট বিক্রি করে সে রোজগার করত—সেই খাটে চেপে নিজে মড়া সেজে তাকে আসতে হয়েছে রোজগারের ফিকিরে। খিদার বড় জ্বালা—দুই হাটু ভাইঙ্গে আসে কানে লাগে তালা। বাঁশ কিনবার টাকা ধার, দড়ি কিনবার টাকা ধার, ধারে ধারে মহাজনের কাছে—কাবুলের কাছে বিকিয়ে গেছে। আঁটিবাঁধবার জন্য নিজের বলে কিছু নেই। অন্ততঃ মৃত্যুটা এখনও তার নিজের একান্ত. সেই শেষ সম্বল নিয়ে সে তার শেষ চেষ্টা করে দেখছে বাঁচবার। সে যত মারা যেতে পারবে, তত তার বেঁচে ওঠার দিন বেড়ে বেড়ে যাবে—তার মৃত্যু তার বাঁচবার একমাত্র অবলম্বন।

একভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে লাগতর ব্যথায় বিব হয়ে যাচ্ছে ঠিকই. একভাবে শুয়ে থাকা মানে তো আর দুপুরবেলার ভাতঘুম নয়. সমস্ত পেশী স্নায়ুতন্ত্র, জীব-কোষ, মস্তিষ্ক, তার শরীরচালনার জটিল সংবাদ আদানপ্রদান প্রক্রিয়া, আর সেই প্রক্রিয়াসঞ্জাত শারীরিক অঙ্গের চঞ্চল প্রবণতা—সব কিছুকে দাবিয়ে রেখে শুয়ে থাকা। নারকেলের দড়ির খোঁচা লাগছে ঠিকই. কাঁধে চড়ে আসবার সময় ঝাঁকিতে পিঠটা বোধ হয় ফুলেও গেছে, জ্বালা জ্বালা করছে। কিন্তু এত নিগ্রহ আর সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটাতে একটা চরম বিপদের ঝুঁকি থাকলেও মড়ার এই নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম. এই শুয়ে-থাকা খিদে সংসার, ছেলেমেয়ে, বৌ, রোজগার, টাকা, টাকা, ধার, ধার থেকে অনন্ত মুক্তির মতো মনে হয়। কাঁধে চড়ে যখন আসছিল, তখন তার চোখের সামনে উন্মুক্ত ছিল অসীম আকাশ, আকাশের অনেক বুকের ভেতর দুরন্ত, ইচ্ছের মতো হাওয়া-তাড়িত ভাসমান মেঘপুঞ্জ, প্রথম শরতের সকালবেলা ডানে-বাঁয়ে ধাবমান নোংরা নিষ্পিষ্ট নগরের ওপর এই আকাশের পারাপারহীন শূন্যতা শৈশবের স্মৃতিময় তেপান্তরের অবকাশ। 'বলহরি হরিবোল, বলহরি হরিবোল' ধ্বনিগুলো চারটে অসমান কণ্ঠের আওয়াজে, আর চলবার পিচমাড়ানো তালে তালে কেটে কেটে যায়—শববাহকদের সেই ছিন্ন ধ্বনিময় দুলুনীতে শারীরিক যন্ত্রণা ছাপিয়েও একটা আবেশ তাকে ঘিরে ধরে। খিদের অবসাদ, দেহের ক্লান্তি, মনের অবসন্নতা, তার ওপর শরতের সকালবেলায় নিহিত শিশিরের ভেতর সিঞ্চিত মহাকাশের সুদূর প্রশান্তি তার চোখে সেই আবেশকে ঘন প্রশ্রয়ে নিবিড় করে তোলে। তার শরীর ছাপিয়ে সে পেরিয়ে যায় দিগন্তের সীমানা। তার সমস্ত পেশী, সমস্ত আর্তি, সমস্ত উপলব্ধি তাকে প্ররোচিত করে চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে কফমেশা হড়হড় শব্দ তুলে গেয়ে উঠতে—"আমার প্রাণ পাখি, আমার মন-পাখি তোর সাথে মোর কথাটা ছিল কি। কিন্তু আবর সেই দমন—শরীরের তীব্র সঘন আর্তিকে তার নীরব সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে সে লাথি মেরে হটায়। সে এখন শবাসনে। মাছি আনবার জন্য তার তলায় পাকা ক্যাত-ক্যাতে পেয়ারার ভেজা ভেজা গা পিঠে লাগছে। সে মৃত। আর সেই মৃতদেহের বুকের ভেতর তার কোষে কোষে, স্নায়ুতে স্নায়ুতে, করোটিতে. অঙ্গে, প্রত্যঙ্গে, মনে. এক শারদ উল্লাসের চরম বিস্ফোরণ। গনগনে উত্তপ্ত স্রোত তাকে অন্তর্গত প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার শবাসন। ভুল-চুক হলে কিমা করে দেবে। তার ওপরে শাদা থান। ফুল। শরতের বাতাসে তাদের বাসী পাঁপড়িগুলো কাঁপছে। লোকজন জিভে 'চুক' করে বিয়োগান্তক ধ্বনি তুলে পেন্নাম ঠুকছে। গাড়ি ঘোড়া থেমে গেছে। পুলিশ হাত দেখিয়ে আছে। দমকল, এ্যাম্বুলেন্স, ডাকাত, পুলিশ ঈশ্বর ও শবযাত্রার কোনো ট্র্যাফিক নেই। থেমে থাকা। গাড়িঘোড়ার শব্দের ওপর শোনা যাচ্ছে অন্তিম জঘন্য চীৎকার—বলহরি হরিবোল। আর থানের তলায় ঢাকা মড়া, মুখে বাঁকা হাসি চেটে, মনে মনে গেয়ে যায়—"ও আমার প্রাণ পাখি, আমার মন-পাখি, তোর সাথে মোর কথাটা ছিল কি"।

স্টেশনচত্বরে জমে-ওঠা ভিড়টা হঠাৎ টাকি মাছের মতো থলবল করে। ভিড়টার মাঝখানে একটা গলি তৈরি হয়। সেই গলির মুখে ময়লা ভাঁজ-ভাঙা শাদা চাপকান, কালো হাই-এ্যাঙ্কলের বুট, শাদা জামা, কালো বেল্ট, মাথায় ভুরু অবদি নেমে আসা শাদা টুপী, গাল তোবড়ানো, জামার হাতা ঢলঢল করছে—একটি খ্যাঁচা চেহারার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধির উদয় হয়। এতক্ষণ রাস্তার ট্র্যাফিকে ট্রাক থামাচ্ছিল। যে-সব ট্রাক শহরে ঢুকছে—দূরে থেকে তাদের একটা আঙুল, দুটো আঙুল, লোড বুঝে তিন-চার আঙুলও ওঠে, দেখায়। ট্রাকগুলো ট্রাফিকে থেমে, ডানলপশুসোজনো উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়ানো পুলিশের হাতে আঙুলের নির্দেশ অনুযায়ী কাগজ গুঁজে বেরিয়ে যায়। কোনো কোনো ট্রাককে একাধিকবার দিতে হয় বলে আপত্তি জানালে পুলিশ তার নিয়ম অনুযায়ী ঐদিকে হাত তুলে দাঁড়ায়। পেছনে—এবং উল্টোদিকের ট্রাফিক অকারণে বাড়তে থাকে। যতক্ষণ না দিচ্ছে—ট্রাফিকও চলবে না। তারপর নিরুপায় ট্রাক যখন দিতে বাধ্য হয়, তখন মোটামুটি একটা দুতিন ঘন্টার জ্যাম তৈরি হয়ে গেছে। পুলিশ বাবাজীবনেরা ভীড়ের ঐ জটিলতায় লুকোচুরি খেলে। আর দুতিন ঘন্টা ধরে চলে এক তুঙ্গ অর্কেস্ট্রা। ট্রাকে, গাড়িতে, ঠেলায়, রিকসায়, টেম্পোতে, ডাবল ডেকারে, সরকারী বাসে, মানুষে. এক দারুণ মাখামাখি চলতে থাকে। ততক্ষণ বাবাজীবনদের ছুটি।

ঐ রকম একটা অন্তরঙ্গ নাটক তৈরি করে এই লোকটি এখন অবকাশ যাপন করতে এসেছেন। নিয়ম রক্ষাও বলা যায়। বলা নেই, কওয়া নেই, একটা গোটা লাশ নিয়ে হুড়মুড় করে স্টেশনের ভেতর ঢুকে যাওয়া। এই দিনে দুপুরে।

'কী রে ব্যাপার কি?' বসে-থাকা চার যুবকের ভেতর একটা উসখুস ভাব জাগে। বৌ-এর গলায় মড়াকান্নার সত্যতা আরও জাঁকিয়ে আসে। পুলিশ কী বুঝতে পারে—মিথ্যে গলা সত্যি গলা!

এই স্যার—আমাদের অবনীদা মরছে—সৎকার করবার পয়সা নাই—তাই একটু সাহায্যের জন্য'—একজন হাত কচলায়। তার রুখু চুল চোখের ওপর।

'আমাদের বলিস না, জানালি না—একটা আস্ত লাশ নিয়ে ঢুকে গেলি সরকারি এলাকায়'—খ্যাঁচাচন্দ্র দাঁত খোঁচাল।

উত্তরদাতা ক্যাবলার মতো হাত-কচলায়। দাঁতের ময়লা দুএকবার থু থু করে ফেলে সরাষ্ট্র দপ্তরের যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করে—

'কী করে মরল র‍্যা?'

'আজ্ঞে,বেশ কিছুদিন খইরাই না-খাওয়াইয়া ছিল। দুব্বল শরীলে আর কিছু ছিল না ছ্যার। ঐভাবেই টাঁইশে গেল'।

'না খেয়ে?'

আজ্ঞে ছ্যার।'

এইরকম শহরে খাবার জোটাবার লাইন করতে পারল না! বলিস কী রে!'

'ছ্যার, আপনাগো মতো হইলে তো হইছিলই। আমাগো প্যাটে খিদাতে পিত্তির চড়া পইর‍্যা গেছে।'

'তা তোদের অবনীদা, না কী দা, কাজ-কারবার কি নবডঙ্কা?'

'উত্তরদাতা যুবক একটু ইতস্তত করে, তারপর আমতা আমতা বলে, 'হ্যাঁ ছ্যার, ঐ মড়ার খাটিয়া, চৌকি, বিক্কিরি করত।'

'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ' মাল হেসেই খুন হয়। হাসতে হাসতে তার ছিবড়ে শরীরখান বেঁকিয়ে সমবেত জনগণের দিকে তার হাসিগুলো ছুঁড়ে মারে। সেই সংক্রামক প্রবণতা জনসাধারণের ন্যাজ-নাড়ার ইন্ধন যোগায়—তারাও সায় দেয়—'বলিস কী রে—ই হিঃ হিঃ হিঃ—হাঃ হাঃ, ও হোঃ, শালা মড়ার খাট বিক্কিরি করত, আর সেই খাটেও নিজেই চেপে বসেছে। শালা জব্বর তামাশা তো!' আলোচ্য মৃতদেহের জীবিকা, জীবন এবং মৃত্যুর ভেতর এমন কার্যকরণ সম্বন্ধ ও তার পরম কৌতুক বোধে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের হাসির রেশ জনগণের ভেতরেও ছড়ায়। তামাশা বেশ জম্পেশ, এই মজায় জনগণ আরও জোরে জোরে ন্যাজ নাড়তে থাকে। ঐ সহাস্য কাটা কাটা কথা পেছনে বৌএর চীৎকার পেড়ে মড়াকান্না মড়ার ওপর ভনভনে মাছির শব্দকে যুক্ত করে, পুলিশটি জিগেস করে—

'তাহলে, আমাদের দেশে কেউ মরছে না—কী বলিস?'

'কেন ছ্যার?'

'তোর অবনীদা তো না-খেয়েই পটল তুলল।'

'আজ্ঞে ছ্যার।'

'তোর অবনীদা তো মড়ার খাট বিক্কিরি করত।'

'তাই তো ছ্যার।'

'তোর অবনীদা আর ব্যবসা চালিয়ে পেট ভরাতে পারল না।'

'ঠিক ছ্যার।'

'অবনীদার-ব্যবসা চলল না মানে—'

'কী ছ্যার?'

'কী ছ্যার? হারামজাদা তাও বোঝ না?'

'আজ্ঞে আমরা তাহলে আর কেউ মরছি না। দেশে আর কোনো লোক মরছে না।'

'কেন ছ্যার?'

'আবার কেন ছ্যার? আচ্ছা ছাগল তো! দেশের লোক যদি মরতই, তাহলে কী অবনীদা মরত? দেশে লোক মরত, অবনীদা বাঁচত দেশে লোক মরছে না অবনীদা বেঁচে থাকতে পারছে না! মাথায় ঢুকল?' প্রশ্ন আর উত্তরদানের পরম্পরায় পুলিশটি যুবকটিকে এমন এক সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে, যখন 'মাথায় ঢুকল?'-র উত্তরেও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানানো ছাড়া উপায় থাকে না। ঘাড় নেড়ে, যুবক, অপ্রস্তুতভাবে হেসে ফেলে। অবনীদার মরনে দেশের আর সবার অমরত্বের ব্যাপারটা বেশ তো।

জনগণের ভেতর বেশ একটা আমেজ এসেছে। মৃতদেহ সংকারের জন্য ক্রন্দনরতা স্ত্রী মড়া, এসবের সঙ্গে জড়িত প্রাথমিক জড়তাটা কেটে যাচ্ছে। একটুক্ষণ পুলিশটি কথা বলে না। এইরকম সময়ে এ ধরনের নীরবতার মানে আছে। অবনী তুমি যতই মরো, পুলিশকে কী কাটাতে পারো! অর্থ-ময় নীরবতা যখন পার হবো হবো যার পরই পুলিশটি তার সরকারী দায়িত্বপালন ও সততা সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হয়ে বলবে, 'যাও তো এবার, লাশটাকে নিয়ে জ্বালোয় জ্বালোয় কেটে পড়।' ঠিক সেইরকম জটিল মানসিক অবস্থায় একজন যুবক বলে চলুন, ছ্যার, আপনাকে হাসপাতালের কাগজপত্তরগুলান দেখাই। 'হ্যাঁ হ্যাঁ—চল তো দেখি—' বলে মানুষজন ফাঁক হওয়া গলিপথে বেরিয়ে সামনে ডানদিকে বেঁকে যায়।

কিছুক্ষণ বাদে যুবকটি ফিরে আসে। ধারাজীবন ট্রাকে মন দেয়। লাশের ব্যাপারটা সৎকার খরচার টোয়েন্টি পারসেন্টে রফা হয়।

পুলিশ অসাড় খাটে শায়িত মৃতদেহ সাঁতাই ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল। যদিও পুলিশকে যুবকটি আর জনগণকে পুলিশ ও যুবকটি মৃতদেহ থেকে অন্যমনস্ক করে সরিয়েছিল, তাও, ভয়ে, মড়া নিশ্বাস আটকে ছিল। অনেকক্ষণ নিশ্বাস আটকে রাখলে ধীরে ধীরে ছাড়লে, স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহের ঘাটতিতে হৃৎপিণ্ডে অকুপাকু হয়, ধড়ফড়ায়, মনে হয় একটা দীর্ঘপ্রশ্বাসে সমস্ত বাতাসে ভরে যাক বুক, মিটে যাক শরীরের তৃষ্ণা। কিন্তু তারও তো উপায় নেই, শাদা থান হাওয়ার টানে নাকের ফুটোর মধ্যে সেঁধিয়ে পড়বে। মড়া বাতাসের জন্য হাঁকুপাঁকু করে।

যে ভিড়টা এতোক্ষণ ন্যাজ নাড়ছিল তার অধিকাংশই কোনোও তামাশা দেখতে জোটে পড়েছে। অন্য একধরনের ভীড়, শরৎ-কালের মেঘেরই মতো উড়ু উড়ু, যেতে যেতে চুকচুক চাটছে, মন্তব্য করছে, কেউ একটা দুটো পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে, কিন্তু সেই ভীড়ের প্রবাহ এতো অনিঃশেষ যে, মড়ার আশেপাশে সবসময়ই লোক আছে মনে হয়। লোকাল ট্রেনগুলো স্টেশনে আসছে একে একে। তা থেকে কালো বা বাদামী রঙের ছোট হাতলঅলা ডেইলি প্যাসেঞ্জারী ব্যাগ, চটা-ওঠা টিফিন-বাক্স, বিভিন্ন ধরনের ছাতা

আর হাজার হাজার বীভৎসতা নিয়ে নেমে আসছে পিলপিল করে। জীবনের সব কিছু সম্পর্কে অসমাপ্ত বাক্য, তাদের খীতগ্রন্থা প্রকাশ করা এদের স্বাভাবিক বাচনভঙ্গী হয়ে গেছে।

প্রতিদিনের এক ট্রেনে, এক কামরায়, প্রায়ই এক সীটে, এক যাত্রী পরিবেশে, এক সময়ে, এক ব্যাগ বা টিফিনবাক্স বা ছাতা, এক দৃশ্য, এক কথা, এক আলোচনা, এক কাগজ, এক খবর, এক চিন্তা, নয়ত এক ঘুম, এক তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব, এক ঢুলে ঢুলে পড়া, এক স্টেশন, এক প্ল্যাটফর্ম, এক পদক্ষেপ, এক রাস্তা—এরকম নির্দিষ্ট ঘুনটে ঠাসা স্বাধীন দেশের এইসব আত্মবিস্মৃত জীবনের—বোঝা — যুঝে — যাওয়া জনগণ স্টেশন থেকে বেরিয়েই প্রতিদিনকার এক শব্দরাশির ভেতর একটি মেয়ের চেঁচানো কান্নায় মুহূর্তে হতচকিত হয়ে পড়ে। প্রতিদিনকার ঠাসা বুনট এই কান্নার আওয়াজ বেসুরো লাগে। তারপরই মড়া।

'যাঃ শালা—হয়ে গেল সারাটা দিন'

'কেলঅ! হলঅ টা কী-ই-ই'

'কী আবার! বাঁদিকে মড়া'

'বাঁদিকে থাকলে খারাপ না কি! আমি তো জানতাম ডানদিকে'

'আপনি আপনার জানা নিয়ে থাকুন, আমাকে আমারটা ভাবতে দিন। আজকে যে কী হবে সারাটা দিন—সে আমিই জানি'

'শালা—মড়াটা রাখবারও আর জায়গা পেলি না'

'একেবারে আপিস টাইমের মুখে'

'আপনার বেরুবারও মুখে।'

'যা বলেছেন—একেবারে সকালবেলাই মৃত্যুমুখে'

'গেল আমার ইন্টারভিউ—এত বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে শেষে ঘাটের মড়া'

'তোদের বাড়ি তো গুণ্ডিবাবার ভক্ত, না'

'হ্যাঁ আমিও তো—ছবিও আছে কাছে'

'গুরুবার প্রণাম করে নে—কেটে যাবে'

'গুরু, কেস খতম, আমাদের টিম আজ গেল'

'কেন—কী'

'আরে মাল দশ নম্বরী—মড়া—ঐদিকে'

'জয় গুরু—আত্মার শান্তি হোক'

'মড়াটাকে রোদে ফেলে রেখেছে'

'ও মা—কী হবে—ভাল্লাগে না'

'মানুষের জীবন! কী তার দাম বলো'

'তা যা বলেছেন—কোনো ঠিক নেই। বাড়ি থেকে বেরুই যমে কাঁর লেখ লেখেনো। বাড়িতে ঢুকি, যমে কাঁর, লেখ তোকা'

এই যে এতো দৌড়ঝাঁপ, সংসার, মান-অভিমান, ঝগড়াঝাঁটি, বিবাহ, সন্তান, বাড়ি, ভালো, উন্নতি, হিংসা—এ সব কিছুইতো তুচ্ছ'

'মানুষকে মরতে হবে, মড়া মানে খড়ির তজন......'

'এখন ইলেকট্রিক চুল্লিও আছে...'

'ঐ হলো, সেই কথাটা মনে রাখলে, পৃথিবীতে এত গোলমাল হতো না'

'তা তো ঠিকই'

'জিনা ইঁহা, মরনা ইঁহা, উসকে সিওয়া, জানা কাঁহা'

'মরলে না, পোড়াবার সময় ছেলেদের উপুড় করে, আর মেয়েদের চিৎ করে পোড়ায়'

'এবং ন্যাংটো করে'

'যাঃ আর কোনো কথা নেই'

'চাকরী বাকরী কর, পয়সা টয়সা জমা, নইলে হাল দেখছিস তো, সৎকার করবার পয়সাও জুটবে না'

'মাইরী, জীবন সম্পর্কে একটা দারুণ অনিশ্চিতি এসে যাচ্ছে'

'দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন ওরে দীন ওরে উদাসীন'

'আজকে অনীতাকে চুমু খাবই'

'কেন'

'কী জানি কবে মরে যাই'

'মরণেরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান'

'কই, আমার শ্রীরাধিকার মুখখান, দেখি'

'শ্যা—ম—অ সমান—রসগোল্লা সমান'

আপিস-টাইমের লোক্যালগুলো এসে যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ নামছে। শরত-কালের মেঘের মতো তারা উড়ু উড়ু। শরত-কালের বাতাসের মতো তাদের কথা, মড়ার কানের এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। মড়া শোনে। শাদা থানের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে দার্শনিক, জীবনের সার-বুঝে-যাওয়া-জনগণকে চোখ মারে। মড়া জানে, সব লোককে কিছুকাল, আর কিছু লোককে চিরকাল বোকা বানিয়ে রাখা যায়। তাই সে মড়া সেজে শুয়ে আছে আর বোকা জনসাধারণ কিছু মন্তব্য ও কিছু কিছু পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে।

তাকে ঘিরে এই ঔদার্য, আত্মস্মৃতি মন্থন, মধ্যবিত্ত ধর্মভীরুতায় পয়া-অপয়ার চর্চা, জীবন সম্পর্কে নানা বোধোদয় চলতে থাকলে মড়া হঠাৎ শুনতে পায়—একটা মিহিন নাড়ুগোপাল গলার স্বর—ববা ববা —ব—প-হ আ' আর খিল খিল ফোকলা হাসি। অবনী হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বলে—কে রে, আমার ঘরে, ঘর জ্বল জ্বল করে, আলো চাল আর সবরি কলা টকর টকর করে'—আর নাড়ুগোপাল হাত দোলায়, টালমাটাল পায়ে থলথল থলবল করে অবনীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নরম দুধের কাঁচা ওম নিজের বুকে লেপ্টে অবনী বিছানায় এলিয়ে যায়। ছোট ছোট হাত গালে থাবড়ায়, চোখে আঁচড় দেয়, চুল টেনে ধরে, আর থেকে থেকেই ফোকলা হেসে মিহিন গুঁড়ো গুঁড়ো উচ্চারণ করে—বু বা বা বা বা বা' দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর নাম তার মুখে মুখে শব্দের কারুকাজে অলংকৃত হয়ে যায়—শেষে দম ফুরিয়ে গেলে ঢোক গেলে, বিষম খায়।

মাঝে মাঝে অবনী ধপাস করে বিছানায় পড়ত। তখন লাশ একেবারে মরে যায় নি। খাটিয়াতে মচ-মচ শব্দ হলেই নাড়ুগোপাল টলমল করতে করতে ছুটে আসত। অবনী তখন 'জিভ বের করে মরে আছে। ছোট ছোট আঙুল অবনীর জিভ ধরে টানে। বন্ধ চোখের পাতা ধরে টানে। বুকে বেয়ে উঠে চুল ধরে ঝাঁকায় তারপর না পেরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, ঠোঁট উল্টে, ফুলিয়ে ফুলিয়ে কান্না। অবনী অমনি তড়াক করে উঠেই চীৎকার করে হেড়ে গলায় গান ধরত —ও আমার প্রাণ পাখি, আমার মন পাখি, তোর সাথে মোর কথাটা ছিল কি। আর কান্নার ভাব বদলে বদলে সাবা মাখা চোখের জলভরা খিলাখিল নিষ্পাপ হাসিতে ভরে উঠত, রোদ আর শরতকালে পলকা বৃষ্টি একসঙ্গে নামলে যেমন চারিদিক ছলবলিয়ে ওঠে।

ঠিক এই সময় হারামী কয়েকটা মাছি শাদা থানের ভেতর সেঁদায়। মাছি আনবার জন্য যে-পেয়ারার টোপ মড়ার পিঠে লেগে গলে লাগছিল—মাছিদের স্বভাবতই ঐ কেন্দ্রাভিমুখী অভিযানই হবে, এই ভেবে থানটা বেশ ভালো করে বন্ধ ছিল চারদিকে। কিন্তু হারামীরা কোথা থেকে যে ঢুকে পড়ে। মড়ার গা খালি। পরণে হাঁটু অবধি তোলা ন্যাতা গোছের কাপড়। মাছিগুলো শলপ গতিতে ঐ খালি গায়ের ওপর দিয়ে বগলের কাছে, মুখের নীচে, পেটের ওপর চলে বেড়াতে শুরু করে। অনিবার্য ফল হিসেবে মড়ার গায়ে শিরশিরানি অনুভূত হয়। মড়ার ক্যাতকুতু বরাবরই একটু বেশী। ফলে সেই শিরশিরানি ক্রমশ কেঁপে কেঁপে ওঠা অবিমৃশ্যকারিতায় পরিণত হবার প্রবণতা পায়। যে জায়গাগুলোতে মাছিগুলো নাচানাচি করছে, গরু বা ছাগলের মতো শুধু সেই জায়গাটাই কুঞ্চিত করে নাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা যদি মানুষের থাকত, তাহলে অবনীর কোনো সমস্যাই হতো না। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ত শারীরিক শিহরণ তার হাত দুটো মাছি তাড়াবার জন্য নিশপিশ করতে থাকে। মস্তিষ্ক কড়া আদেশ করছে হাত দুটোকে—কিন্তু মড়া তার সমস্ত ইচ্ছে দিয়ে সেই স্বাভাবিক ও সহজাত ক্রিয়াকে দমন করে। দমন করতে তার দাঁত চেপে বসে চোয়ালে, নিজের খ্যাংরাকাঠির শরীরেও চিমসে পেশীগুলো দপদপে হয়ে ওঠে, কপালের দুপাশে দপদপ আওয়াজ হয়। অবনী নিরুপায়। চারদিকে লোক। এখন একটুও নড়া চলবে না। একটু শিহরণও নয়। মাছিগুলো ঘোরেফেরে। ঘুরতে ঘুরতে পেয়ারাটার কাছাকাছি অঞ্চলে এলে অবনী রেহাই পায়। অবনীর গা ছেড়ে ওরা পাকা

পোয়াতী ছেঁকে ধরে। নেমে গেলেও তার গায়ে শিরশিরানিটা অনেকক্ষণ লেগে থাকে।

সকালবেলা। স্টেশন চত্বরে খবরের কাগজের হকাররা নানা মনোহারি কথায় চীৎকার করছে। তাদের চীৎকারে, আর হাতে নাচানো মুদ্রিত প্রামাণিক তথ্যসম্বলিত কাগজে সমসাময়িক সামাজিক বাস্তবতার চেহারাটা বোঝা যায়। দেশের উচ্চমধ্যবিত্ত মহিলাদের—বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে স্বাতন্ত্র্যের বিভিন্ন দিক, দেশের আশী ভাগ লোককে অশিক্ষিত ও অনাহারে রেখে দুই মন্ত্রীর পারিবারিক কোঁদল, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারী সদস্যদের নিজের পারিবারিক সংস্থান করবার প্রচেষ্টায় স্ব স্ব পদের নিয়োগ, বিদেশে বিশেষ জাতের বাঁদর রপ্তানীতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ, পূর্বতন সরকারের সমস্ত দোষ টেনে বের করবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার কমিশন ও তার বিভিন্ন রিপোর্ট, ভারতবর্ষের একটিমাত্র পরিবারেরই ফেস ভ্যালুতে শেয়ারের পরিমাণ ও ৮ কোটি টাকা ও মোট এ্যাসেটের মূল্য হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি, শ্রাবণের বন্যায় বছর বছর হাজার হাজার মানুষ ভেসে যায়, ফসল নষ্ট হয়, বন্যারোধ প্রকল্প নিয়ে অর্থ মঞ্জুর করবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী আলোচনা শাসিত অঞ্চল মন্ত্রীমহোদয়ের আকাশপথে পরিদর্শন, খাদ্যে দেশের স্বয়ম্ভরতা, মদ বন্ধ করে প্রস্রাব সেবনের উপকারিতা, স্রোপানে প্রস্রাব কালচার, শ্রমিক-কৃষকের মজুরি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বর্ষীয়ান জননেতার জোতদারের সঙ্গে ধান বুনে জীবনের পরম আনন্দ লাভ, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সর্বাত্মক বিপ্লবের জন্য দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ।

কোথায় খুব জোরে রেডিও বাজছে। —আমাদের দেশের সার্বিক অগ্রগতির মুখ-চেহারা স্বাধীনতার পর এই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে আমরা দেখছি—তা অত্যন্ত আশাপ্রদ। আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে আমরা ব্যাংক ছড়িয়ে দিচ্ছি। ব্যাংক ব্যবসা জাতীয়করণের পর এই ক' বছরে আমরা বহু ছোট ছোট গ্রামকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করেছি। শুধু তাই নয়—আমরা সুন্দরবতী দ্বীপপুঞ্জে, মোহনার মোহনায় ভাসিয়ে দিয়েছি আমাদের নৌকা—যেগুলো প্রতিটি এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাংক। আমরা গরিব লোকদের সাহায্য করতে চাই। কিন্তু যে প্রধান সমস্যা এই শুভ কর্মোদ্যোগে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা হলো, ঋণ ফেরৎ পাওয়া। ঋণ দেওয়া হয় কিছু একটা সম্পদের বন্ধক ধরে। কিন্তু যখন সঞ্চয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনামাফিক ঋণশোধে ঘাটতি পড়ে, তখন তো তাদেরই যেতে হয় মহাজনের কাছে। অতএব এই দুষ্টচক্রে না পড়ে দেশের জনগণের উচিত ব্যাংককেই মদত দেওয়া। তাহলে, আমরা দেশেরই উপকার করব।

এমনি করেই সেই দীর্ঘ কান্নার মতো দুপুরটা ভেঙ্গে পড়ে স্টেশনচত্বরে। দূরে কারা বিবিধ ভারতী ধরেছে। টুং টাং—শরীরের পুষ্টির জন্য খান এক্সট্রা ভিটামিন যুক্ত হরলিকস। হরলিকস আরও শক্তি বেশি দেয়। টারান টারানটেরা........ আপনার ত্বককে মসৃন করে তোলে নতুন বিউটি ক্রীম। আপনার কালো ত্বক করবে ফরসা, আপনার উজ্জ্বল রং হবে মাখনের মতো। নিজেকে সুন্দর করবার নতুন প্রাকৃতিক উপায়। লাং লাং লাং পাং........ মামমি মামমি মডার্ন ব্রেড, দুধে তৈরি মডার্ন ব্রেড—ভারতে সবচাইতে বেশি বিক্রির পাঁউরুটি। টুন টুন টান টা টা টা ....আপনার দাঁতের উপযুক্ত যত্ন নিন। দাঁতের থেকে আপনার সারা শরীরের ক্ষতি হতে পারে। দাঁত সুস্থ থাকলে হাসলেও সুন্দর, খেয়েও আরাম। প্রাণের সুখে চিবুতে পারবেন, ফরহ্যান্স। টুন ঠান টুন ঠান........জীবনবীমা করুন। আপনার অনিশ্চিত জীবকে ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিত করে তুলুন। আপনার নিকটবর্তী এজেন্টের কাছে খোঁজ নিন। বেঁচে থাকুন বাঁচতে দিন...

ভাদ্রের আঁচ একেবারে সেঁকে দিচ্ছে। চোখ বন্ধ করে অবসন্ন মড়া পড়ে থাকে। এবার আর সত্যিই শুয়ে থাকা যাচ্ছে না। কত কত আর হত্যা করা যায় নিজেকে কত দাবিয়ে রাখা যায় মানসিক প্রবৃত্তিগুলোকে, কত সহ্য করা যায় আর এই তাপের দহন।

মড়ার সেইসব দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। যখন রাস্তায় রাস্তায় লাশ। প্রতি মোড়ে মোড়ে লাশ। নালায় ম্যানহোলে ফুটপাথ বড় রাস্তায় চারিদিকে মানুষের লাশ অবনী হাসপাতালের সামনে বসে থেকে থাকত খোঁজ রাখত প্রতিটি অলিগলির। কোথায় লাশ পড়ল। কোথায় লাশ পড়ে আছে রাত থেকে। কোথায় খাবি খাচ্ছে নালার জলে। খাট নিয়ে আশেপাশে অবনী হাজির। প্রতিদিন শ'-এ শ'-এ মৃত্যুর উল্লাসে অবনী লাফাত। প্রার্থনা করত, আরও আরও লোক মরুক। আর আর খুনোখুনি হোক। আরও আরও হিংস্র হয়ে উঠুক মানুষ। হাসপাতালের গেটের কাছে ঘাপটি মেরে থাকত। প্রতিটা গাড়ি উঁকি দিয়ে দেখত—পেশেন্টের অবস্থা কেমন। গাড়ির আত্মীয়স্বজনরা অবনীর নীরব প্রার্থনা শুনতে পেত না—হে ভগবান, বেশী দিন যেন না টেঁকে। হে ভগবান তাড়াতাড়ি টাঁসাও। প্রত্যেকটি রুগীর মৃত্যুকামনা ছাড়া অবনীর আর কোন শুভ কামনা ছিল না। হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে অবনী ঘুরে বেড়াত, হিসেব করত, কোন রুগীর অবস্থা কেমন। একটু অক্সিজেন লাগানো, বা রক্ত নেয়া, বা পেচ্ছাপের নল দেওয়া, ধুঁকছে—এমন রুগী দেখলেই অবনী দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। চোখ দিয়ে যেন মানুষটার সমস্ত প্রাণরস নিংড়ে বের করে নিতে চাইত অবনী। আর মনে মনে বলত—মর মর। মরবি না—মর। এবং আশ্চর্য সে—রুগীতে অবনী নজর লাগাত, সে-রুগী মরতই। সেই লাশে লাশে ছয়লাপ দিন হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মরণকামনা করে ফেরবার দিন, আজ এই ভাদ্রের পড়ন্ত বেলায় প্রলম্বিত ছায়াদের সঙ্গে দীর্ঘ স্মৃতিমালা হয়ে যাচ্ছে। অবনী আর পারে না। তাই নিজের মড়ার খাটিয়ায় সে নিজেকে মড়া হিসেবে তুলে দিয়েছে। জীবনের পরম কৌতুক।

কিন্তু এরপর ? তার শেষ সম্বল মৃত্যু নিয়েই তো মাঠে নামা হলো। কিন্তু এরপর ? কোন পুঁজি ? আজ যা রোজগার হলো ভাগবাঁটোয়ারায় তা তো আজকেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর ?

অবনী কিছু ভেবে পায় না। রোজ কী তাকে নতুন করে মরতে হবে! মরতেও আর যে ভালো লাগে না। মরণে বড় ক্লান্তি। বড় ক্লা—ন্তি।

বেলা শেষে, যখন সেই চারজন শববাহক ফের বলহরি হরিবোল, বলহরি হরিবোল ধ্বনি দিতে দিতে ট্র্যাফিক থামিয়ে সমবেত জনসাধারণের পেন্নাম কুড়োতে কুড়োতে, আকাশে নক্ষত্রের আলোয় ছায়াপথে ছায়াপথে দৃষ্টি মেলে চিতিয়ে থাকা অবনীকে নিয়ে যায়। শরৎকাল ঠাণ্ডা বাতাস সমবেত জনসাধারণের ন্যাজনাড়া বেতারে দূরদর্শনে ছড়িয়ে যাওয়া সান্ধ্য অগ্রগতির সংবাদ ভাষ্য, দেশের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবান নান্দনিক সম্ভারের অজিরে প্রদর্শিতব্য বড় বড় হোর্ডিং-এর মোকাবিলায়।

আর ঠোঁটে একটা বখরা হাসি চেটে গুন-গুন গেয়ে ওঠে—ও আমার প্রাণপাখি ও আমার মনপাখি, [illegible] ছিল [illegible]...

পুরুষ

বিজনকুমার ঘোষ

মঞ্জু বাবাকে খুব ভালবাসে, সি-[illegible]তাহে দাদার চিঠি না পেলে অস্থির হব, [illegible]তু লেডিজ কামরায় কোন পুরুষ উঠলে [illegible]র রক্ষে নেই। কিছুতেই মঞ্জু এটা সহ্য [illegible]তে পারে না। জাত ক্রোধে রোগা কালো [illegible]ত্রিশ বছরের চিমড়ে চেহারাটা ফুঁসে [illegible]সে উঠতে থাকে।

মঞ্জুর হয়েছে জ্বালা। বি-এ পাশের এত বড় কলকাতা শহরে কোথাও [illegible]রী জুটল না। জুটল গিয়ে বনগাঁ [illegible]নের বাগুনগাছিতে। স্টেশন থেকে দু' [illegible]ল হাঁটার পর ভাঙ্গা রং-চটা একটা [illegible]নবোর্ড দেখতে পাওয়া যাবে—ভব[illegible]শী বালিকা বিদ্যালয়। কলকাতা থেকে [illegible] এখানে এসে অঙ্ক আর ব্যাকরণ [illegible]

তিন বছর হল মা চলে গেছে মঞ্জুর কাঁধে সব ঝামেলা চাপিয়ে। রান্না সেরে বুড়ো বাপের ভাত ঢাকা দিয়ে নিজে খেয়ে বাসে ট্রেনে আরও বিস্তর ঝামেলা পুইয়ে এসে শুনল ইস্কুল ছুটি। দিল্লিতে কে একজন মন্ত্রী মারা গেছে। তখনি মনে পড়ল আর পনের মিনিট পরেই দত্তপুকুর লোকাল। ইস, সকালে ঘুম থেকে উঠেই যদি খবরের কাগজটা দেখত!

একটা টাকা গচ্চা দিয়ে রিকশায় এসেও প্রায় ছুটেই লেডিজ কামরায় উঠতে হল। পরের ট্রেন দু ঘণ্টা বাদে। কামরা বলতে গেলে ফাঁকা। জানালা ঘেঁষে বসতেই মাঠের বাতাস ঘামের ফোঁটাগুলোকে [illegible] [illegible]। এদিক ওদিক তাকিয়ে, [illegible] সন্তর্পণে ব্লাউজের একটা গোপন বোতামও খুলে দিল। বাঁ দিকের বেঞ্চের এক কোণায় তিনটে বিধবা টাইপের বুড়ি পা তুলে পান চিবোচ্ছে। তাদের সামনে তিনটে নোংরা বস্তা। মঞ্জু তাকিয়েই বুঝল, দরকারের সময় এঁদের কাছ থেকে বিন্দুমাত্রও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

হঠাৎ হঠাৎ ছুটি হয়ে গেলে রোজকার দেখা ইলেকট্রিক তারের পাখি, সবুজ ক্ষেত ডোবা, শাপলা ফুলের ওপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া লাল ফড়িং—এসবই নতুন ভাবে দেখতে ইচ্ছে করে। ট্রেন মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে আবার পিছলে যাচ্ছে। মঞ্জুর ঘুম পাচ্ছে।

খদ্দেরের একান্ত অভাব, তবু কি স্টেশনেই দাদের মলম, চিনেবাদাম নিয়ে ফিরিওয়ালারা একবার করে হাঁক দিয়ে যাচ্ছে। দু চার জন উঠছে, আবার নেমে যাচ্ছে একটু পরে। হঠাৎ মঞ্জুর ঘুমটা ভেঙে গেল। দমদম জংসন। ট্রেন আবার মোশন নিতে আরম্ভ করেছে। বাজে দৃশ্যটা দেখে মঞ্জু তাড়াতাড়ি ব্লাউজের বোতামটা ঠিক করে নিল। ধোপ-দুরস্ত মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। চট করে সবটা রক্ত মাথায় উঠে গেল। ব্যাকরণ পড়ানো খ্যানখেনে গলায় মঞ্জু চেঁচিয়ে উঠল, একি, আপনি এখানে কেন?

আচমকা আঘাতে ভদ্রলোক একটু থত-মত খেল।

—আজ্ঞে, তাড়াতাড়িতে উঠে পড়েছি। দেখতে পাইনি।

—না দেখার তো কথা নয়। ইংরেজী বাংলায় লেখা আছে লেডিজ, মহিলা। সে-টুকু অন্তত পড়তে পারেন।

—আচ্ছা পরের স্টেশনে নেমে যাব।

এই ধরনের লোকদের কথা শুনিয়ে খুব আরাম। একটু বয়স্ক, ভদ্র আর লেখা-পড়া জানা লোকই মঞ্জুর পছন্দ। সময়টাও দিব্যি কেটে যায়। বলল, সেটা তো পরের কথা। আপনারা ইন্টেনশনালি ওঠেন। আপনাদের চেহারাটা ভদ্র, ভিতরে—

—কি যা তা বলছেন!—ভদ্রলোক বিস্মিত।

—ঠিকই বলছি। এত বড় ট্রেনে আপনা-দের কামরাই তো বেশি। তবু বেছে বেছে মেয়েদের কামরায় ভিড়। এর মানে কি?

মঞ্জুর রোগা শরীরটা ঝাঁকিয়ে উঠল। অনেক দিন পর একটা পছন্দসই লোক হাতে পাওয়া গেছে, কিছুতেই ছাড়া হবে না। আজকাল এলাইনে বাজে লোকের বড্ড ভিড়। ওদের কিছু বললেই নিজেদের মধ্যে চোখ টেপাটেপি করে আর হাসে। গেরাহ্যই করে না। বেঞ্চির ওপর তবলা বাজায়। আর কলেজের ছোকরাদের তো কিছু বলারই জো নেই। [illegible] মঞ্জুকে দেখতে পেলে ইচ্ছে [illegible] [illegible]। 'ঢেকার' [illegible], 'উদ্দেশ্য খারাপ', 'জানোয়ার'—এই সব বাছা বাছা তীর দিয়ে মঞ্জুও ছেড়ে কথা [illegible] কিন্তু কোন [illegible]

থামলেই ওদের ইয়ার-বন্ধুদের ডেকে ডেকে তোলে। যেন ভারী একটা মজার ব্যাপার। মন্তব্যও ছোঁড়ে, আপনার দিকে কেউ তাকাবে না। 'চরিত্র সংশোধন বটিকা' কথা-টাও বারকয়েক কানে এসেছে।

মঞ্জু নিজের মনে গজরাতে থাকে। ওর মামাত ভাই হাবু খবরের কাগজের অফিসে চাকরী করে। ওকে দিয়ে একটা চিঠি ছাপাবে, রেল কোম্পানির ব্যর্থতা। আশ্চর্য ব্যাপার, কেউ একটা কথা বলেও সাহায্য করে না। যেন একা মঞ্জুরই গরজ।

বারকয়েক জোরে জোরে দম ফেলে মঞ্জু হাঁফানোটা সারিয়ে তুলল। ভদ্রলোকের অবস্থা এখন কলে পড়া ইঁদুরের মত। একবার বলতে গেল কামরায় তো আরও মেয়েছেলে আছে কিন্তু কেউ তো আপনার মত চেঁচাচ্ছে না?

কপালের পাশের রগ দুটো আবার দাপাদাপি করে উঠল দারুণ ভাবে। যে কোন ভদ্র পুরুষকে ঘায়েল করতে হলে আপনার উদ্দেশ্য খারাপ' এই কথা বলাই যথেষ্ট। মঞ্জু এবার এই মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করবে। হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল। স্টেশন এসে পড়ল নাকি? কথাটা মুখে রেখে জানালা দিয়ে চোখ বাড়াল। না, এটা একটা ফাঁকা জায়গা। দু' পাশে রগের দাপাদাপি বন্ধ হয়ে গেছে। তার বদলে কপালে তিনটে রেখা আর মুখে অসংখ্য বিন্দু জমল। মামাত ভাই হাবুকে দিয়ে খবরের কাগজে যে চিঠিটা ছাপাবে, তাতে লেডিজ কামরায় পুরুষদের ওঠা ছাড়াও ট্রেন চলাচলে অব্যবস্থা নিয়েও চড়া কথা থাকবে। আজ-কাল এসব লেগেই আছে। হয়ত কেউ চেন টেনেছে। পাঁচ মিনিট হয়ে গেল। দশ মিনিট হবার উপক্রম। মঞ্জু একটু অধৈর্য হয়ে উঠল। ওপাশের শক্তপোক্ত বুড়িগুলি থপথপ করে বস্তা ফেলে দিল, তারপর নিজেরা লাফিয়ে পড়ল। ভদ্রলোক যেন কাকে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার ভাই?

... ভদ্রলোকও লাফ দিল।

লেডিজ কামরায় মঞ্জু এখন একেবারে একা। চমকে উঠল। গলায় একটা সরু হার, এক জোড়া দুল ও দুটো বালা সঙ্গে আছে। মঞ্জু তাড়াতাড়ি দরজার কাছে চলে গেল। চিন্তা করার আর সময় নেই। সবাই ট্রেন থেকে ঝপঝাপ নেমে পড়েছে।

—এইযে, শুনছেন—

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়াল।

—আমাকে বলছেন?—ভদ্রলোক যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

—ট্রেনটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল যে?

—সামনে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, আর যাবে না। ভদ্রলোক আবার চলতে শুরু করল।

এখন মঞ্জুই ইঁদুর কলে পড়ে চিঁ-চিঁ করছে।

ভদ্রলোক অবস্থা বুঝে একটু হেসে বলল, সামনেই উল্টোডাঙ্গা স্টেশন, ওটুকু হেঁটে গিয়ে বাস ধরতে পারেন। একা লেডিজ কামরায় থাকা ঠিক নয়।

গলায়, কানে, হাতে মিশিয়ে না-হোক দেড় হাজার টাকার জিনিস আছে। আর লোকটা যখন সত্যিই ভদ্র, তখন কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। ডাক শুনে ভদ্র-লোককে আবার ফিরতে হল। বাহুমূলে দুটো অপরিচিত বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শে সুড়সুড়ি লাগল খুব। কোন রকমে হাসি চেপে মঞ্জু ভেবে নিল, ভাগ্যিস 'উদ্দেশ্য খারাপ' কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়নি।

পাশের ফাঁকা লাইন ধরে ভদ্রলোক এগোচ্ছে, পেছনে মঞ্জু। একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে অনেক হালকা লাগছে এখন। ঘাড় ফিরিয়ে ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবেন?

—কালিঘাট।

—তাহলে তো ন' নম্বর ধরতে হবে। আমারও ওই বাস ধরলেই চলবে।

কিন্তু বাস ডিপোয় এসে দেখা গেল ওদের জন্যে আরো একটা বিপদ অপেক্ষা করে আছে। গণ ডেপুটেশনে স্টেটবাস কর্মীরা আজ পরিবহণমন্ত্রীর কাছে যাবে। তাই ডিপোয় একটা ঝড়তি-পড়তি বাসও নেই। সকাল সকাল ইস্কুল ছুটি হয়ে ভাল বিপদে পড়া গেছে। স্টেট বাস বন্ধ হবার ফলে ট্রাম বা প্রাইভেট বাসে ওঠে কার সাধ্য। এখন ভরসা এক ট্যাকসি।

সংসারে এমন কিছু মানুষ থাকে যাদের মুখে সব সময়ই একটা প্রশান্তি ঝিকমিক করে। ছোটদের নীচতা সেই প্রশান্তিতে কখনো ছায়া ফেলতে পারে না। ভদ্রলোককে ছোটাছুটি করে ট্যাকসি ধরতে দেখে মঞ্জুর সেই কথাই মনে হল।

আর ভদ্রলোক যখন ট্যাকসির দরজা খুলে বলল, আসুন, তখন মঞ্জুর মনে হল জীবনে যা করেনি আজ তাই করবে। প্রথমে ভাড়াটা নিজেই মিটিয়ে দেবে। তারপর ভদ্রলোককে কিছুতেই ছাড়বে না। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাবে। বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে নিজের হাতে চা তৈরি করবে।

ছাম্বিশের দুই সদানন্দ রোডে ট্যাকসিটা থামতেই ভদ্রলোক একখানা নোট বাড়িয়ে ধরল। মঞ্জু ব্যাগ খোলারই অবসর পেল না। ফলে অন্যান্য প্রতিজ্ঞাগুলি রাখার দায়িত্ব আরও বেড়ে যাওয়ায় লজ্জার মাথা খেয়ে মঞ্জুকে ভদ্রলোকের একটা হাত ধরতেই হল।

আজ শরীরের ওপর অনেক ধকল গেছে। মঞ্জু পাশের ঘরে গিয়ে ফ্যান খুলে ধপ করে শুয়ে পড়ল। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে বাবা খুব খুশি হয়েছে। গায়ে ফতুয়া চাপিয়ে নিজেই মোড়ের দোকান থেকে খাবার কিনে এনেছে।

পাখার বাতাসে টেবিলের ওপর একটা সবুজ চিঠি জোর ওড়াওড়ি করছে। হাতের লেখা দেখেই বুঝল জামালপুর থেকে দাদা লিখেছে। 'আমাদের মা নাই, তাই সংসারের এই অবস্থা। আপনি এত দিনেও মঞ্জুর একটা সম্বন্ধ জোগাড় করিতে পারি-লেন না। উহার শরীর দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে।' খাবার জন্যে হঠাৎ খুব মায়া অনুভব করল মঞ্জু। বিছানার ওপর গত রবিবারের কাগজখানা পড়ে আছে। পাত্রী চাই-য়ের ওপর কালো কালির অজস্র আঁচড়। পাশেই অনেকগুলি খাম পোস্ট-কার্ড। বাবার কি দোষ?

পাশের ঘরে বাবা বলছে, আপনি কি বনগাঁ লাইনে থাকেন?

—না, মানে ওই দিকের এক কলেজে ইন্টারভিউ ছিল। কেরানীগিরি আর ভাল লাগছে না।

ভাল কথাবার্তা শুনলে সুধাংশুবাবুর হেঁ-হেঁ করা অভ্যাস।

বাবা কিছু মনে করে বসে আছে নাকি? মঞ্জু ভিতরে ভিতরে অল্প একটু চমকাল। কিন্তু একথা তো সবাই জানে, মঞ্জু বাইরের পুরুষদের ওপর কত কঠিন। নেহাৎ বিপদে সাহায্য করেছিল বলেই না ঘরে এনে বসিয়েছে। তবে ভদ্রলোক খুবই ভাল। মুখে প্রশান্তি আছে। কিছু একটা হলে অবশ্য—

—আপনি কি বিবাহিত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দুই ছেলে এক মেয়ে।

বাবার হেঁ-হেঁ থেমে গেল। পাউডার-মাখা পাফটা মঞ্জুর মুখের দিকে উঠে আসছিল, থেমে গেল।

ঘুম থেকে উঠেই মঞ্জু বুঝল, শরীরের কলকব্জাগুলোর বয়স হয়েছে। আগের মত কাজ করছে না। মাথা অসম্ভব ভার। মুখের মধ্যে চিরতার কাঠি ভরা। কিন্তু তাই বলে শনিবার দিন কামাই করার কোন মানে হয় না।

দুপুর রোদে ইস্কুল থেকে স্টেশনে আসতে ওকে দেখে গোটা তিনেক খালি রিকসা দাঁড়িয়ে পড়ল। মঞ্জু কোন দিকে তাকাল না। শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ভাল দিয়ে হবেটা কি?

ট্রেন আজ আধ ঘন্টা লেট। মঞ্জু সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে হাঁফাতে লাগল। চারপাশে রোদের কড়াইতে যাবতীয় সবুজ জ্বলে যাচ্ছে। দিগন্ত কাঁপছে। দুটো সমান্তরাল লাইন আগুনের মত চলে গেছে কলকাতার দিকে। আর ক-ত-দি-ন ওই লাইন দিয়ে মাকুর মত আসা-যাওয়া করবে? আর ক-ত-কা-ল পুরুষদের ওপর গালাগাল বুনে যাবে! হঠাৎ গোটা দিগন্ত বুকের মধ্যে ঢুকে পড়ায় সেখানেও জোর কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। মনে হল এই প্ল্যাটফর্মের ওপরেই বুঝি পড়ে যাবে। মাথা ঘুরছে। এখন চোখে মুখে একটু ঠান্ডা জল দিলে ভাল হয়। ভীষণ পিপাসা পেয়েছে। কোন রকমে টলতে টলতে টিউবওয়েলের কাছে আসতেই নীল জামা গায়ে ... একজন পুরুষ হেসে বলল, কন্ খারাপ আছে দিদিমণি।

ঝিনুকের জন্য

প্রলয় শূর

কি আছে ঐ পুকুরের নীচে, ঐ গাছের পাতায়, ঐ টেস্টগুলো ঢেকে যাওয়া মাটির স্তূপে? আমি একটি মধুর ভাব-ব্যঞ্জক মুখের কথা ভাবছিলাম। সেই মনোরম মুখ-প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই সন্ধ্যা নেমে আসে, সে মুখ তখন জিজ্ঞাসায় গাঢ় নীল। তারামণ্ডলের গায়ে জ্বর থার্মোমিটারের মতো ঘড়ির কাঁটা, অতি দ্রুত সময় বয়ে যায়। মেয়েটির নাম সুরমা, তার চিত্তবিভ্রমকারী কণ্ঠস্বরে যে অনৈসর্গিক রহস্যময়তা একদা সেখানে আমার গোপন ইচ্ছা কম্পিত হয়েছিল। এমন তো আপনারও হয়। যে আপনি চরণ 'সং বাজেট বক্তৃতায় কী ঘোষণা করছেন, জানবার উৎসাহে অসময়ে রেডিওতে সংবাদ শুনছেন। হয়, অনেক কিছুই আপনার অজ্ঞাতসারেই। এখন যারা নিয়তি, শব্দটি অনেক প্রকার, শোনা যায় ভাগ্য মানি না, তাদের সংখ্যাও কম নয়, তবুও দেখুন লেকের কাছে দু কিলোমিটার গাড়ির সারি। নিকটে কালীবাড়ি। বগলামুখী কবচ, ধনদা মহালক্ষ্মী কবচ, নীল সরস্বতী কবচ, বন্ধ্যা কবচ, সকল প্রকার কবচের বিক্রয় বেড়ে যায়, দ্বিপ্রহরে গৃহবধূ মিনিবাসে একাকী ঠিকুজি প্রস্তুতে এক টাকা তিরিশের টিকিট কাটে।

সুরমা রূপনারায়ণে মাছ দেখেছিল, দীঘায় মাছ দেখেছিল। অবিমিশ্র সরলতায় সাদা মাছ ভাসছিল তার চোখে। মাছগুলি মোহিনী রূপ ও অপূর্ব স্বাদে তাকে পরিতুষ্ট করে। তার চক্ষুযুগল অল্প বিস্তৃত করে। মৃদু মনে পড়ে, গঙ্গার ধারে এক রেস্টুরেন্টের বর্ণহীন কাঁচে তার মোহময় বাৎসল্য। উল্লসিত মাছের ঝাঁক বালকের মতো আনন্দে তারা কাছে উঠে আসতে চায়। গোয়ালিয়র মনুমেন্টে আমাদের সামনে গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে নারীপুরুষ পরস্পরকে চুম্বন করে। সুরমা চিৎকার করে বলে, 'এই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।' তারা বোঝে কি না বোঝা যায় না।

একদা সুরমা ছিল আমার কাছে, কিম্বা বলা যায় আমি ছিলাম তার কাছা-কাছি। আর মূঢ় অভিমান প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে একদিন স্মৃতিও যে অপসৃয়মান, তখন বুঝিনি। আমি একটা ওষুধের কার-খানায় কাজ করছিলাম। ওষুধের গন্ধের মধ্যে আমার একটি ইন্দ্রীয় অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছিল। আমার বন্ধু শিবাজী ফুলের ব্যবসা করে, আমি বেলুড়ে তার ফুলবাগানে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফুলের গন্ধে আমি বিভোর হইনি। সুরমাকে সে কথা বলাতে সে খুব অবাক হয় না। শরীর না চাইলে যুবতীর মনোবাঞ্ছা কে বোঝে।

বোলপুর টুরিস্ট লজে সুরমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। একটা বেতের চেয়ারে বসে সে এইসা বড় বড় দুখানা আতা খাচ্ছিল, পাশে একটা প্লেটের ওপর ছিলো আরো দু তিনটে। সে একটা আতা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, খেয়ে দেখুন না, রাণী চন্দের বাড়ি থেকে এনেছি। তা তাকে বেহায়া মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই, তার ঐ আহ্লাদ আমাকে কতদূর পর্যন্ত বিদ্ধ করে এখন ঠিক মনে নেই। অতো ভালো আতা কোলকাতার লোক কখনো চোখেও দেখেনি। আমি অন্য বঙ্গ সন্তানের তুলনায় একটু বেশি লম্বা, এছাড়া মেয়েদের চোখে পড়ার আমার আর কোনো কারণ নেই, লম্বা হওয়াটাকে কেউ গুণ বলে স্বীকার করে না, তাই এখানে কারণ শব্দটা ব্যবহার করলাম। পরে দেখেছি আমি লম্বা হওয়াতে সুরমার অসুবিধে হচ্ছে, লোকে খুব দূরে থেকেও আমাকে দেখতে পায়।

ওষুধের গন্ধ আর ভালো লাগছিল না। আমি এখানে ওখানে চাকরি খুঁজতে থাকি, এবং যখন আমি সুরমার সঙ্গে ভালোবাসার ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিন্ত তখন একদিন হঠাৎ সে আমাকে তার বিয়ের কথা জানায়। তার বাবা মা একটি অতি সুপাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করেছে এবং তাতে সুরমাও রাজী হয়েছে। রাজধানী এক্স-প্রেসের ড্রাইভারের মতো লোককে বিয়ে করার ইচ্ছে তো সব বাঙালী মেয়েরই থাকে, কিন্তু যখন একটা ভালোবাসা তৈরি হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই প্রেমিকার বিবাহের সংবাদ এত স্বাভাবিকভাবে কি মেনে নেয়া যায়? এই লোকটি বিদেশ থেকে সবচেয়ে দ্রুতগামী গাড়ি চালাবার ট্রেনিং নিয়ে না এলেও, ইনি একজন পদস্থ ব্যক্তি, নিজেই সুরমাকে দেখতে এসে-ছিলেন, সুরমাকে পছন্দ না করার মতো নির্বোধ তিনি নন।

আমি একটা খবরের কাগজে চাকরি পেয়ে যাই।

চায়ের আড্ডায় বন্ধুদের কাছে আমি বিধান সরণীতে সোনার দোকানে ডাকাতির খবর বর্ণনা করি। উত্তর চব্বিশ পরগণার হাসনাবাদ এলাকায় বেনামি গ্রামে ধানকাটা নিয়ে সংঘর্ষের ফলে ঘটনাস্থলেই চারজন মারা যান। একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত শ্যামনগর স্টেশনের কাছে আপ গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠে গারডের বুকের উপর রিভলবার উঁচিয়ে পারসেল প্যাকেট ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। মধ্য প্রস্তর যুগের ১৫টি নরকংকাল প্রতাপগড় জেলার পট্টি তহ-শিলের মহাদহে খনন করে পাওয়া যায়।

আমি অবিচলিত ছিলাম।

সুরমা এক লাস্যময়ী শোভার তার বিবাহিত জীবনে কীভাবে রূপান্তরিত আমি তার খোঁজ রাখিনি। বিবাহিত দিবসের যৌবনভরা ঋতু পরিবর্তনে, তা সম্পূর্ণ সুরমারই, ত্রিসীমানায় আমার ব্যস্ত দূরত্ব। সে এবং তার স্বামী দুজনেই মাছ খেতে খুব ভালোবাসে প্রথম-দিকে আমি এইটুকুই জেনেছিলাম। সুরমা যখন আমাকে তার বিয়ের কথা জানিয়েছিল আমি খুব অল্প সময়ের জন্য ব্যর্থতাবোধে আক্রান্ত হয়েছিলাম এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে আমি বুঝতে পারি তার সঙ্গে আমার কোনো ভালোবাসা ছিল না। বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরে যখন আমি খবর সংগ্রহ করছিলাম ইন্দিরা কংগ্রেস ভোট পাবে কি না, তখন একদিন সন্ধ্যে গ্রামে একটি সাপ ধরার দলের সঙ্গে আমি গোটা একটা রাত্তির কাটিয়েছিলাম, সেই রাত্তিরে সুরমার কথা বারবার মনে পড়ছিল। যেন নিষ্পলক শূন্য দৃষ্টিতে সে স্থির চেয়ে আছে আমার দিকে। সেদিন আমি ভয়ংকর মদ্য পান করি, আমি ভুলে যাই আমার মাথার পাশে ঝোলার মধ্যে ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ।

ভারতবর্ষে লজ্জার বদলে আজও।

পশ্চিমবঙ্গ বন্যায় ভেসে যায়। চীন ভিয়েৎনামে সীমান্তের পূর্বাঞ্চলে লড়াই চলে। মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে পাক সুপ্রীম কোর্টে ভুট্টো যে আপীল করেন তা বাতিল হয়ে যায়। ভিয়েৎনাম সরকার একদল বিদেশী সাংবাদিককে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। মহারাষ্ট্রে ধর্মঘট মিটে যায়। ৪৯ দিন পর চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের মীমাংসা হয়। সীমান্ত রক্ষীরা জানে চীনা মহিলারা গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। ইরানের অস্থায়ী সরকারের পরামর্শদাতারা বলেন, গেরস্তার খেয়ালখুশিমত করা চলবে না।

মুহূর্তমধ্যে সে ঘরময় উৎফুল্ল ছেলেমানুষী ছড়িয়ে দেয়। স্নেহপরায়ণ অপেক্ষায় একটু দূরে আমি চেয়ারে বসে আছি। তিন বছর পর আমার ঘরে এই বিকেলবেলা তাকে দেখে আমি অতীব বিস্মিত। এর মধ্যে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি যে তা নয়, কিন্তু কেউই কাউকে সময় দিতে পারিনি। তার স্বামী সোমনাথের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। সোমনাথ শিক্ষিত ভদ্র রুচিসম্পন্ন, কম কথা বলে প্রাণখুলে হাসে, খরচ করার জন্যেই উপার্জন করে, সিনেমা থিয়েটার দেখার সময় পায়, সর্বোপরি সুরমার মতোই মাছ খেতে ভালবাসে। সুরমা মাংস খায় না, সোমনাথ আমাকে বলে, 'ওর জন্যেই আমাকে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিতে হোলো।' আমি বলেছিলাম, এ রকম আদর্শ স্বামী দেখা যায় না। তখন সোমনাথ অর্থবহ বিষণ্ণতায় কিছুক্ষণ চুপ হোয়ে থাকে। সোমনাথ বলতে থাকে, ব্যাপারটা কি জানেন, আমি বোধহয় ওকে ঠিক সুখে রাখতে পারছি না। আমার অর্থের অভাব নেই, এটা সুরমা জানে তা সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারি ও আমার দিকে খুব মনোযোগ দিচ্ছে না। আমি কিছুতে জোর করি না। এতদিনেও আমি বুঝে উঠতে পারিনি ও আমার কাছে কি চায়। আমি আমার সাধ্যমত কম্প্রোমাইজ করার চেষ্টা করি, কিন্তু তারও তো একটা লিমিট আছে। আপনাকে খুব বোর করছি, আসলে এসব কথা তো ঠিক কারো কাছে বলা যায় না, বিশ্বাস করুন আমি এই প্রথম বলছি। সুরমাকে আপনিই শুধু চেনেন।

সোমনাথ আরো অনেক কথা বলেছিল। কিন্তু আমি ওকে জিজ্ঞেস করিনি সুরমাকে আমিই শুধু চিনি, এই কথাটা সে কেন বলছে। তাদের বিবাহ হয়েছে মাত্র তিন বছর আগে। তাঁদের বিয়েতে বাইরে কয়েক হাজার টুনি বাল্ব ও প্যাণ্ডেলের ভেতরে থোকা থোকা ঝাড়লণ্ঠন জ্বলেছিল। অতো ভালো বিয়ের কার্ড আর কখনো ছাপা হয় নি।

আমি তাদের সৌভাগ্যের খবর রাখিনি।

এখন সুরমা যা বলে তার অর্থ সোমনাথের সঙ্গে তার পক্ষে আর বাস করা সম্ভব নয়। সুরমা কি জানে সুরমা কি বলছে, সুরমা কি জানে সোমনাথের মতো পুরুষ জীবনে দ্বিতীয়বার পাওয়া যায় না। আমি জানি সুরমা আমার কাছে আশ্রয় চাইবার মতো মেয়ে নয়। সে কি কোনো সাহায্য চাইতে পারে? সুরমার দেহ এখন আরো সুঠাম, আরো ফুটফুটে করে, ঐ শরীরে দুঃখ খোঁজার জন্যে গোয়েন্দা লাগাতে হয়। যে চোখে অশ্রু নেই, সে চোখ সুন্দর নয়, মেয়েরা সুন্দর হবার জন্যেই চোখে জল রাখে। এই যে একই কথা একই রকমভাবে দুবার বলছি এজন্যেই আমি কবি হতে পারিনি। ওসব কথা থাক। সমস্যা অন্য। সেই মনোমুগ্ধকর মুখোমুখি সন্ধ্যায় আমি তাকে তার স্বামীর কাছেই ফিরে যেতে বলি, তাকে গৃহ প্রত্যাবর্তনে উৎসাহিত করি। কিন্তু সে ফিরে যাবে না। মেয়েরা তো ছেলেদের মতো সহজে ভুল করে না। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা মেয়েরাই করে। পুরুষ মানুষ কার্যের ফলাফল বিষয়ে উদাসীন। এই পরস্ত্রী আমার কাছে সহানুভূতি চায় না, উঠে বাড়িও যায় না।

'সোমনাথকে আমি চিনি সুরমা।'

'আমার চেয়েও বেশি চেন?'

'তা হয়তো চিনি না, কিন্তু তুমি তো বলতেই পারছো না তার অপরাধটা কী?'

'সেটা জেনে তোমার কোনো লাভ আছে?'

'আমার লাভের কথা তো হচ্ছে না, তুমি তোমার নিজের ক্ষতি করছো, তুমি ভুল করছো সুরমা।'

'আমি জানি আমি কি করছি?'

ঝোঁকের মাথায় লোকে অনেক কিছুই করে, কিন্তু জেনেশুনে কেউ নিজের সর্বনাশ করে না।'

'সোমনাথ নিশ্চয়ই তোমার কাছে এসেছিল?'

'না। আসে নি।'

'তাহোলে তুমি ওর হোয়ে কথা বলছ কেন?

'আমি তোমার হয়েই কথা বলছি, সুরমা, তুমি সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করো।'

সহানুভূতিহীন রুক্ষতায় ঘরের আলোটা জ্বলছিল। সুরমা চুপ করে বসে আছে।

আমি সোমনাথের স্বভাব ও সহনশীলতার কথা জানি। তার মধ্যে কোনো কপটতা নেই, দীনতা নেই। সোমনাথের ঘরে সুরমার অসুখী হওয়ার কারণ কি?

'চলো তোমাকে পৌঁছে দি।'

'আমি তোমার এখানে একাই এসেছি।'

'এখন রাত হয়ে গেছে. এত রাতে মেয়েরা একা ফেরে না।'

'আমি একাই ফিরতে পারব।'

'তাহলে......'

'কি তাহলে, তুমি তা হলে চলে যাও, এই তো?'

'না, যাবে আমি ভাবছি—'

'তোমার কিছু ভাবতে হবে না, আজকের রাতটা শুধু, তুমি আমাকে থাকতে দাও।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ, এখানে।'

আমি তো একা।'

'একা তো কি হয়েছে?'

এই একটা রাত কিন্তু খুব কম নয়।

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

'তোমার বিশ্বাস আমাকে রাখতেই হবে এমন কোনো কথা আছে?'

কথাটা বলে কি ঠিক করলাম? ও কি ভয় পেতে পারে? আমাকে ভয় পেলে ও আমার কাছে থাকতে চাইছিল কেন? সে কি এর পরিণাম জানে না? এক অনুচিত উচ্চাভিলাষে একদিন সে আমাকে তার বিয়ের খবর দিয়েছিল। কিয়ৎক্ষণ সে আমার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে ঠিক আছে আমি চলেই যাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছো?'

তৎক্ষণাৎ তার সাতাশ বছর বয়সের প্রান্ত থেকে সম্ভ্রান্ত কণ্ঠে সে জবাব দেয়, 'কোথায় যাচ্ছি তোমাকে বলতেই হবে এমন কোন কথা আছে,' সে নিঃশব্দে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পরদিন সোমনাথ আমাকে ফোন করে।

'আজ আমার সারাদিনে একদমই সময় হবে না।'

'রাত্তিরে?'

'রাত্তিরেও পারবো না।'

'কাল?'

'কি ব্যাপারটা কি?'

'এলেই শুনবেন। আমি আপনার সাহায্য চাইছি। আপনার পরামর্শ উপদেশ, যা বলুন।

'খবরের কাগজের রিপোর্টারকে অনেকেরই দরকার হয়, কিন্তু আপনারও যে এত দরকার হবে, আমি তো ভাবতেই পারি না।'

'যা আপনি ভাবতে পারেন না তেমন ঘটনাই তো ঘটছে।'

'আমি কিন্তু একটুও বুঝতে পারছি না।'

'পারছেন।'

'অফিস থেকে বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কাল যখন হোক একবার আসুন।'

'আমি কাল ভোরে মরিচঝাঁপি যাচ্ছি। সি এম এর মিটিং আছে। ফিরতে তো রাত হবে।'

'যত রাত হোক আপনি একবার আসুন।'

'ও কি আমার কথা শুনবে?'

'চেষ্টা করে দেখুন না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

পরদিন যে লনচগুলি ন্যাজাট থেকে ছোটমোল্লাখালির দিকে রওনা দেয় তার একটাতে আমি ছিলাম। কোরাণখালি নদীতে ঢুকতেই পুলিশ লনচগুলো এসে পড়ে। নদীর একদিকে কুমীরমারি গ্রাম, অন্যদিকে মরিচঝাঁপি। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এসেছেন ছোটমোল্লাখালিতে মিটিং করতে। এস সি বিদ্যাপীঠ ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী জনসভায় ভাষণ দেবেন। মরিচঝাঁপিতে দণ্ডক ফেরৎ যে দশ হাজার উদ্বাস্তু, তাদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন...।

ফেরার পথে হঠাৎ কি খেয়াল হল, মাছটা নিয়েই নিলাম, না নিলে বুড়ো হয়তো খুব কষ্ট পাবে। দু কিলো ওজনের রুই মাছটা বুড়োর হাত থেকে নিতে আমি বাধ্য হলাম। সুন্দরবনে আমাকে আসতেই হয়, আমার পত্রিকার জন্যেই আমাকে আসতে হয়, বুড়োকে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না।

সমস্তদিনে আমি ভুলে গিয়েছিলাম গতকালের ফোনের কথা। কি হলো, মাছটা হাতে নিয়েই মনে পড়ল, 'যত রাত হোক আপনি একবার আসুন।' ফিরতে তো সত্যিই অনেক রাত হবে। তখন কি যাওয়া যায়? একটি বিবাহিত জীবন ভেঙ্গে পড়ছে। কেন ভাঙ্গছে আমিও ভালো করে জানি না, একজন আমার কাছে একরাত থাকতে চেয়েছিল। অন্যজন আমার পরামর্শ চান। সত্যিই কি সোমনাথ আমার পরামর্শ চায়? নাকি সে অন্য কিছু বলবে? সোমনাথ যদি আমাদের পুরোনো কথা সব শুনে থাকে? তাতেই বা কি? অনেকেরই পুরোনো বাকসে এরকম এক আধখানা প্রেম লুকানো থাকে। যদি অভিযোগ করে সোমনাথ? সোমনাথ কি আমাকেই সন্দেহ করছে, তা নিশ্চয়ই নয়, সোমনাথের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, বড় চাকরি করে, বাড়িতে ডেকে এত ছোট একটা অপমানের সুযোগ সে নেবে না।

মাছটা তো আমি নিলাম। এই মাছ নিয়ে এখন আমি ওদের বাড়ি যাই কি করে? ওরা তো কোনো সুখের দিনে আমাকে ডাকে নি। তেমন কোনো দিনে ঐ মাছটা মানিয়ে যেত। কিন্তু আজ? স্বামী স্ত্রীর যে নির্ধারিত অলিখিত চুক্তি সেটা কে ভঙ্গ করছে আমি কেমন করে বুঝব? স্বামী স্ত্রী অপেক্ষা করছে একজন সাংবাদিক বন্ধুর জন্য। যখন তারা পরস্পর কেউ কাউকে বুঝতে চায় না," একজন তৃতীয় ব্যক্তি একটা সম্মানজনক বোঝাপড়া বাতলে দেবে। কি করে হয়?

থাকবে। ওরা দুজনেরই মাছ খেতে ভালোবাসে। গম্ভীর পরিবেশে এই মাছ টাই বরং সব হালকা করে দেবে। বলব, তোমাদের জন্যে এনেছি। মাছটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকার সময় যদিও আমাকে একটা কমেডিয়ানের মতো দেখাবে তবু এখন আর কিছু করার নেই, দেখাই যাক না মাছটা দেখে ওরা দুজনে যারা অনেক দিন হাসেনি তারা হেসে ওঠে কিনা।

কিন্তু সুরমাকে কি বলব আমি? সে যদি বলে এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেই রাত্তিরে ওকে ফিরিয়ে না দিলে পরদিন সকাল থেকে জীবনটাকে ও অন্যরকমভাবে দেখত। সুরমার মতো মেয়েরা জীবনের কাছ থেকে কেবলই চায়, তার নিজেকেও যে কিছু দিতে হতে পারে সেটা তারা কখনোই ভাবে না। সেই রাত্তিরটা ওকে আমার থাকতে দেওয়া উচিত ছিল। আমি ভুল করেছি। খুব সহজেই সুরমা একদিন নির্বিকারভাবে আমাকে তার বিয়ের খবর জানিয়েছিল। আমিও ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলাম। ওষুধের কারখানায় চাকরি করা আমায় তখন কে চেনে? আমি জানতাম সুরমাই একমাত্র আমাকে জানে, আমি একটা অন্যরকম মানুষ। ওষুধের গন্ধ থেকে বেরিয়ে এসে আমি একটা মেয়ের গন্ধ পেতে চাইতাম। সুরমা আমার সঙ্গে বসিরহাটে মাছ দেখতে গিয়েছিল। 'দে গঙ্গার হাটে' ডাব খেতে গিয়ে তার মুখ ভিজে যায়, তখন ভারী সুন্দর লাগছিল তার সুকুমার মুখখানি।

আমি ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখিনি।

আমি একটি মুখে অপূর্ব শোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, সেই মুখটি উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব কাছে জেগে উঠেছিল। এমন লাগসই একটা পাত্রের সঙ্গে অমন সুন্দরী একটা মেয়ের বিয়ে হোলো, আর এত অল্প সময়ের মধ্যে সেই বিয়েতে ঘুণ ধরে গেল?

একটা সুযোগ আমি হাতছাড়া করে ফেলেছি। কিন্তু আজ যদি সেই সুযোগটা আবার কোনোরকমভাবে আসে, এবারে আর দ্বিধা নয়, সুযোগটা আমাকে নিতেই হবে। সুরমা জীবনের কতোটুকু জানে? সোমনাথের সঙ্গে, এক বিত্তবান সোমনাথের সঙ্গে তার বিবাহকে সে তার জয় বলে মনে করেছিল। সে বোঝেনি যে এই জয়টা চিরকালের জন্যে ধরে রাখা যায় না। ঐ বয়সের মেয়েরা জিতে যাওয়ার মোহে যে ভুল করে, সেই একটা ভুল থেকেই তারা আরো অনেক ভুলের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। জটিল দড়ির জটটা গোল্লা পাকিয়ে পড়ে আছে, গিটগুলো খোলা অতো সহজ নয়, অতএব তলোয়ার দিয়ে এককোপে কেটে ফেলতে হবে।

ঘরে ঢুকেই দেখি একটু দূরে রাখা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় সোমনাথ একটা বই পড়ছে। আমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বইটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো। বলল, সারাদিনে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন।

আমি ওদের এই ঘরে কখনো আসিনি। ঘরের সর্বত্র অযত্ন অবহেলা। কী পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ছিলো। সুরমা এটা সুরমার ড্রয়িং-রুম বিশ্বাস করা যায়। আমি তো ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম।

সুরমা কোথায়? সুরমার জন্য আমি মরিচঝাঁপি থেকে রাত এগারোটার সময় একটা মাছ নিয়ে এসেছি। সোমনাথও তো কিছু বলছে না। ব্যাপারটা কি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সুরমা কোথায়?' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না সোমনাথ। সে মাছটার দিকে চেয়ে আছে।

'সুরমা কোথায়?'

'সুরমা চলে গেছে।'

'কবে?'

'আজ সন্ধ্যেবেলা।'

'কোথায়?'

'কোথায় যাচছে কিছু বলেনি।'

'আপনি যেতে দিলেন?'

'আগেও দিয়েছি।'

'কিন্তু আমাকে ডেকেছেন কেন?'

'সব বলব, তার আগে আসুন মাছটার একটা ব্যবস্থা করি। আমাদের জন্যেই এনেছেন তো?

'হ্যাঁ, আপনাদের জন্যেই।'

'সুরমা থাকলে খুব ভালো হতো।'

আমার হাত থেকে মাছটা নিয়ে সোমনাথই মেঝের ওপর রেখেছিল। এখন টেবিল-ল্যাম্পের আলো কাত হয়ে এসে পড়েছে মাছটার গায়ে। আমি জানি মাছের ভেতরটা আইসক্রীমের মতো সাদা। আমি দেখলাম টেবিলের ওপর একটা আশ্চর্য সুন্দর সমুদ্র ঝিনুকের পাখি। সোমনাথ ঐ বিরাট গোল টেবিলটার দিকে এগিয়ে যায়। পাখিটাকে হাতের ওপর তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতেই পাখির একটা ডানা খুলে ফ্যালে। একটা ঝিনুকের ডানা। ঝিনুকটা নিয়ে মাছটার পাশে দাঁড়িয়ে বলে, 'বিউটিফুল মাছ। এটা দিয়ে চমৎকার আঁশ ছাড়ানো যায়, আজকের রাতটা আপনি এখানেই থাকুন। আমি সব ঠিক করে রেখেছি।'

অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়মের সম্মুখে আপনি নির্লিপ্ত সাক্ষী।

টেবিলের উপর ঐ যে ডানাকাটা ঝিনুকের পাখিটা, ঐ পাখিটাকে আমার রক্তাক্ত জটায়ুর মতো মনে হচ্ছিল। তখন ঝিনুকের ডানায় খসখস করে উঠে আসছিল মাছের আঁশ।

কোন পাষাণের ঘায়

[illegible] দাশগুপ্ত

অনেকের মত, সৌম্যরও কিছু কথা ছিল। বলেছিল, "তপতী শোনো, কিছু কথা আছে। শুনছ?—সৌম্যর ডাকে ও মুখ ফিরিয়ে তাকায়। ওর ধোঁয়া ধোঁয়া ঝাপসা চোখে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে দুএকবার পলক ফেলে। যেন বলতে চায়, কি কথা বল শুনি।

গোপন কয়েকটি কথা অতি দ্রুত সেরে নেওয়ার প্রয়োজনে ওর কাছে এগিয়ে যায় সৌম্য। যেন দ্বিতীয় কেউ না শোনে। কিন্তু ও সমান দূরত্ব বজায় রেখে একটু সরে দাঁড়ায়। ওদের দুজনের মাঝে এক অদৃশ্য অনৈক্যের বেড়ার অস্তিত্ব অনুভব করে সৌম্য। অনৈক্য বলা হয়ত সঙ্গত হবে না। বলা যায় অলঙ্ঘনীয় দূরত্বের বেড়া। ওপাশ থেকে তপতী একটু ঝুঁকে থাকে কথা শুনবে বলে। এপাশে সৌম্যও। অতি স্নেহে, নরম ভালবাসার স্বরে তপতীকে ডাকে। বলে, মামার বাড়ি থেকে যখন ফিরছি তখন আমি একা। দাদা, বোনেরা এবং বাবা ফেরেনি তখনো। ওরা পরে ফিরবে। আমাদের বাড়ির লাগোয়া বাগানে সেদিন জ্যোৎস্না এক অপার্থিব নির্জনতা ছড়িয়েছিল। শীতের দিন। আশপাশের বাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ। আমার বাড়ির বাগানের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল এ বাড়িতে আমি কখনো আসিনি। কোনো কথা নেই, কোনো কোলাহল। আশেপাশে কেউ নেই। পৃথিবী যেন ঘুমিয়ে পড়েছে আর কোনোদিন জাগবে না—এই কথা ভেবে। নির্জন চাঁদ আর গ্রহ-[illegible] এক অনাবিষ্কৃত জগতের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়েছি। ভাবছিলাম ওই বন্ধ দরজার তালায় চাবি ঘোরানো উচিত হবে কিনা। যাক সে চেষ্টা নাইবা করলাম। যদি না খোলে। আচ্ছা, ধরা যাক খুলল। আলো জ্বালালাম। এবং আলো জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রবেশ করলাম আমার নিজের জগতে। সেইরকমই হবে নিশ্চয়। অতএব তালা খুলে ঠেলা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আওয়াজ তুলে দরজা হাট করে খুলে গেল। দরজা খুলতেই বাতাস শূন্যতাবোধক স্বরে ঢেউ তুলে ঘরের ভেতর ছুটে গেল। এ-ঘর ওঘর ফেলে ক্রমশ সেই দূরের ঘরে গিয়ে আবার ফিরে এল সে আমারই কাছে। তারপর আবার ছুটে গেল। এইভাবে সে আমার ঘরের ভেতর দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল। অন্ধকার ঘরের ভেতর ওই আলমারিটা, ওই টেবিল চেয়ার জামাকাপড় নীরবে আমার অবাঞ্ছিত উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবটা এমন যেন বেশ তো ছিলাম আমরা, তুমি কেন বিরক্ত করতে এসেছ। মনে হচ্ছিল ওদের থাকতে দিয়ে আমি পালাই। এ আমার জায়গা নয়। এখানে আমি কখনো থাকতে পারব না! শূন্যতা যেন হো হো শব্দে হাসছে। হেসে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, কি কেমন, বেশ না আজকের রাতটা? একটু বাদেই দাদা এবং বোনেরা, স্বজনেরা ফিরে আসবে। আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাব। কথা বলব। যেভাবেই দাঁড়াই অথবা বসি না কেন আমাদের মাঝে ছোট ছোট ফাঁকগুলোতে ওই শূন্যতা এসে দাঁড়াচ্ছে। তখনো ওইভাবে কথা বলছে। ওইরকম চাপা স্বরে। কারণ আমরা সবসময়ই একজনের অস্তিত্ব স্বীকার করে চলার চেষ্টা করব। এইসব ভেবে সুইচ অন করতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আলো। চেয়ারটা চেয়ার হয়, টেবিলটা টেবিল।

তপতী সৌম্যর কথা কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক চোখে সৌম্যর দিকে তাকায়। সৌম্য বলে, আমায় চিনতে পারলে না?... আমায় যদি চিনতে তবে আমার কোনো কথাই আর অপরিচিত ঠেকত না। আমি সেইজন, প্রতি ভোরে ঊষার নতুন আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অনাঘ্রাত ফুলের মত যার দিন শুরু হত। তোমাকে একবার স্মরণ করতাম সেই সময়ে। মনে পড়ে না তপতী? তপতীর ঠোঁটে হাসির ভঙ্গিমা। মনে পড়ে গেলে ঠিক যেভাবে হাসি ফুটে ওঠে কারুর ঠোঁটে।

আসলে ও যে কবে প্রথম এসেছিল সৌম্যর মনে পড়ে না। কারই বা নতুন বন্ধুত্বের ক্ষণটি মনে থাকে। হয়ত সবায়ের জীবনেই তপতী আসে। যায়। আবার আসে। সৌম্য কখনো ওকে একভাবে পায়নি। বিভিন্ন সময়ে ও এসেছে। সৌম্যর সমস্ত হাসি কান্নার, দুঃখের দিনে চোখ তুলে ও অবাক চোখে তাকিয়েছে ওর দিকে। সৌম্য ওকে বিদ্রূপ করেছে। গালিও পেড়েছে কতসময়ে। ওর অকারণ উপস্থিতি কত অসহ্য মনে হয়েছে একেক সময়। তবু কেন ও আসে, কেন ও হেঁটে যায় সৌম্যর দৃষ্টিকে আবৃত করে।

সেইরকম একটা সকাল সৌম্যর খুব ভাল লাগত। হাল্কা কুয়াশার সঙ্গে রোদ্দুর মাখামাখি করে গাছের ফাঁক-ফোঁকর থেকে সৌম্যর উঠোনে এসে পড়েছে। এই রোদ্দুরে ওম হয় না। তবু গায়ে চাদর জড়িয়ে রোদ্দুরে বসতে বেশ লাগে। এবং একবার যদি সেই দূরের দিকে তাকায় দেখে ঝাপসা মেঘরংয়ের আকাশ দূরের গাছগাছালির নিবিড় রংয়ের সঙ্গে মিশেছে। সব ধান-গোলায় ভরা হয়েছে। ধবলীকে ওই যে মাঠে খুঁট দিয়ে এল বাংলার রমণী। একজন বাঁকে খেজুর রস ঝুলিয়ে এইদিকেই আসছে। কাঁচা হলুদ রোদ্দুর। হাম্বা স্বরে ডাকল দূরের গরুটা। একটা ঝুলন্ত লেজের খয়েরি আর সাদা ডানার পাখি তীব্র স্বরে চারিদিক চকিত শব্দে ভরে দিয়ে ডেকে উড়ে গেল, ওই দেখ ওই দেখ—

সৌম্য দেখল ওই মাঠ নয়, সৌম্যর ঠিক সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে তপতী। ওই রোদ্দুর নয়, ঘাসের শরীরে লেগে থাকা শিশির বিন্দু নয়, গাছের সবুজ অবয়ব নয়, তপতী। ওকে দেখে খুব উল্লাস জাগে ওর মনে। বলে, তপতী তুমি! এসো বোসো আমার পাশে। আজ অনেক কথা আছে।—

তপতী ঝাপসা ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ মেঘ চোখ মেলে নীরবে সৌম্যকে দেখে। অকারণে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। ওকে কত কথা বলে সৌম্য। এক একসময় [illegible]

সুন্দর মনে হয় একথা কে অস্বীকার করবে। ওকে সেইসব সুন্দর কথা শোনায়।

সুন্দর সকাল গড়িয়ে গেলে ক্রমশ রোদ্দুরে কড়া হয়। বাতাস গরম হয়ে ওঠে। অসহ্য রোদ্দুর আর বাতাসের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার তাগিদে প্রমোদ কাননে অনেকের মত ভীড় করে সৌম্য। সেখানে সুন্দর ছায়া ছায়া নীল নীল পথ। ও যেন হেঁটে যায় না। ভেসে বেড়ায়। গাছ থেকে সুন্দর দুটো ফুল ছিঁড়ে গন্ধ শোঁকে। তারপর আবার হাঁটে। হাঁটে না, সে বেড়ায়। শরীর জুড়োনো মৃদু সুগন্ধ বাতাস। কোথায় গাছে বসে ডাকছে দুটো পাখি। কান পেতে মুহূর্তকাল শোনে তাদের কথা। তারপর আবার এগোতে এগোতে এসে দাঁড়ায় স্বচ্ছ নীল পুকুরের ধারে। সেখানে সাজান নৌকোয় কে যেন বৈঠা হাতে বসে। ও পেছন ফিরে তাকাতেই সৌম্য অবাক হয়ে যায়, আরে তুমি! কি ব্যাপার।

ওর ঝাপসা মেঘ মেঘ চোখ মুখ। একবার পলক ফেলে। তারপর এই সৌম্যরই দিকে তাকিয়ে থাকে তপতী। সৌম্য জিজ্ঞেস করে, এতো প্রমোদ তরণী, এখানে কেন তুমি? —ও একবার চোখের পলক ফেলে। তারপর সৌম্যকে যেন বোঝানোর চেষ্টা করে, তা হলেই বা আমি থাকার আপত্তি কোথায়?—

ওর যুক্তিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সৌম্য ভেবে অবাক হয় যে তপতী সমান নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সর্বত্র সৌম্যর ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। জলে মৃদু আলোড়ন জাগে। নৌকো এগোয়। সৌম্য আধশোয়া ভঙ্গিতে এলিয়ে আকাশ মেঘ রোদ্দুর জল দূরের ক্যাকটাস—এইসব দেখে। আর দেখে তপতীকে। ও দাঁড় বেয়ে চলেছে। যেন সৌম্যকে কোথায় কোন অজানা দেশে নিয়ে যাবে। চিরযৌবনের দেশে। সৌম্য ওকে ওর যাবতীয় গোপন কথা শোনায়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আজ কি ভাবছে সেকথাও বলে। আসলে ও যে চায় সকলের চোখমুখ সুন্দর হয়ে উঠুক। যেন সেখানে কোনো দুশ্চিন্তার ছায়া না পড়ে। প্রকৃতপক্ষে যথার্থ অমৃতের সন্তান হয়ে উঠতে তো কোনো বাধা নেই।

ও যখন সেই প্রমোদভূমি পেছনে ফেলে বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখে ঘন কাল মেঘ বহুদূরের দেশ ঢেকে ভীষণ হুঙ্কারে ছুটে আসছে। অনেকেই আসন্ন ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে এদিক ওদিক দৌড়োচ্ছে। সৌম্যরও কি দৌড়োনোর প্রয়োজন নেই? দৌড়াতে হবে ভেবে ও দৌড় দেয়। কোথায় কোনদিকে তার ঠিক ছিল না। তবু ছোটে, ছোটে। পথ তবু সামনে পড়েই থাকে। পেছন থেকে তাড়া করে আসে কালো মেঘ। ঠিক এই সময়ে ও দেখে প্রসন্ন হেসে ওর আগে আগে এগিয়ে চলেছে তপতী।

সৌম্য বলেছিল, তপতী শুনছ, শোনো কিছু কথা ছিল।—

তপতীর দৃষ্টি ওকে [illegible] করে। মনে হয় এখনি যেন কোনো সুন্দর ঘরে ও সৌম্যকে নিয়ে যাবে। ওর মনে হয় রোদ্দুরে পিঠ রেখে তপতী ওর জন্য যেন উল বুনছে। অথবা বর্ষার দিনে একলা ঘরে বসে সৌম্যরই কথা ভাবলে যেমন দৃশ্য তৈরী হতে পারে তেমন মনে হয় ওকে দেখে। ও বলে, তপতী শোনো। কিছু কথা ছিল।—

আনন্দ বলে, কি রে তোকে খুব অফ মুডে মনে হচ্ছে?—

বাড়ি থেকে বেড়িয়ে কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে আনন্দর বাড়িতে হাজির হয় সৌম্য। আসলে কিছুই ভাল লাগে না। এসে মনে হয়—না এলেই ভাল ছিল। প্রকৃতপক্ষে পালানোর কোনো জায়গাই খুঁজে পায় না ও। কারণ, কিছুই যে আর জ্ঞানের অথবা বোধের অতীত নয়। চরাচর হঠাৎ বেশীরকম সংক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আনন্দকে বলে, মার শরীর ভাল যাচ্ছে না। ডাক্তার বলেছে অসুখটা সহজে কিওরেবল নয়।... ওই কষ্ট চোখে দেখা যায় না।—
তারপর হতাশ স্বরে বলে, কি করি বলুন তো?—

আনন্দ সমব্যথীর স্বরে কিছু একটা বলে। এবং তারপরই পাশের ঘরে গিয়ে বলে, কোই তোমরা রেডি, দেখি বড়মামা তুই হাসিটা আর একটু সুন্দর কর...এই ছবিটা ভাল আসবে।—

আশ্চর্য হয় সৌম্য। ওর দুঃখ আনন্দকে যেন স্পর্শ করে না। ইচ্ছে হয় চীৎকার করে বলে, এ উৎসব থামাও। এই কি আনন্দের সময়। আমার মার খেতে কষ্ট হচ্ছে। গলা দিয়ে কিছু নামছে না।—

তাবৎ বিশ্বকে এই কথা চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে। আনন্দ এসে হাত চেপে ধরে, তোকে কিছু খেয়ে যেতেই হবে। কিছু খেয়ে যায়।—

আসলে কোথাও হাসি, কোথাও অবিচলিত গাম্ভীর্য—এতো খুবই স্বাভাবিক। আজ আনন্দের স্ত্রীর জন্মদিন—একথা সৌম্যর জানা ছিল না। ওদের হৈ চৈ-কে পেছনে ফেলে সব মানুষের থেকে আলাদা হয়ে একা একা বাড়ি ফেরে সৌম্য। এই প্রথম হঠাৎ ও নিজেকে একটা নির্জন পর্বতশৃঙ্গের মত মনে করে। বহু উচ্চে সবাইকে ছাড়িয়ে ওর মাথা। ওর ধবধবে সাদা শরীর আকাশ ছুঁয়েছে। শুধুই ছুঁয়েছে। সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসেনি। এইরকম আরো দূরে, বহু দূরে আরো অনেকে। অজস্র।

এই সময়ে ঠিক ওর সামনে দিয়ে চকিত দৃষ্টি হেনে চলে যায় তপতী। এই দারুণ অসময়ে ও কেন আসে। এই দারুণ [illegible]।

খেতে বসার সময় পাশে রেডিও নিয়ে বসা সৌম্যর দাদার পুরোনো অভ্যাস। রেডিওর সংবাদ পাঠক কি যেন বলছে। বোন থালায় ভাত বাড়ছে। সেদিকে অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে আছে দাদা। রেডিও শুনছে না। সৌম্য জানে ও কি ভাবছে। দুশ্চিন্তা কখনো সুখকর নয়। তাই ওকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সৌম্য। যেন সবই সহজ স্বাভাবিক আছে—এই ভাব এনে বলে, এবার সম্বলপুরে [illegible] পট্টনায়ক আসছে, বুঝলে।—
—হুঁ—

সৌম্যর কথায় ওর দাদার মনোযোগ আকৃষ্ট হল না। বোন শুধু একবার সৌম্যর দিকে মুখ তুলে তাকাল। যেন বোঝাতে চাইল একথা বলার এখন সময় নয়। সে তো সৌম্য জানে। তবু মাঝে মাঝে মনেরও তো ছাড়া পাওয়া দরকার। ও আর কি বলবে ভেবে পায় না। বোন মাথা নামিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়। বলে, কবে?—

ওর প্রশ্নের ধরনে মনে হয় ও সৌম্যর কথার মধ্যে বাধা পড়ে নেই। তবু সৌম্য বলে, বোলই।
—ও—
ও ভাত এগিয়ে দেয় দাদাকে। রেডিওর সংবাদ শেষ হয়ে গান শুরু হয়। দাদা বলে, কি বলছিলি যেন?—

কোনো উত্তর না দিয়ে রেডিওর সুইচ অফ করে সৌম্য। ও জানে দাদা আবার অন্যমনস্ক হয়ে যাবে এবং সেই একই কথা ভাববে। তাই চুপচাপ খেতে থাকে। বাবা এইসময় খাবার ঘরের দরজার মুখে এসে দাঁড়ায়। বলে, তোমার অফিসের কথা কি বলছিলে তখন?—

তার মানে অফিস থেকে ফিরে সৌম্যর দাদা অফিস সম্বন্ধে যে কথা বাবাকে বলেছিল বাবা তা শোনে নি। হুঁ-হাঁ করেছে বটে কিন্তু অন্য কথা ভাবছিল। এবং কি ভাবছিল তা সৌম্য জানে।

দাদা সৌম্যর প্রতি ওর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে না এবং বাবাকে [illegible] বলে, তখন তো একবার বললাম।—
—হ্যাঁ কি বলছিলে যেন?—

সৌম্য বাবার দিকে তাকায়। [illegible] প্রশ্নকে চাপা দিয়ে বলে, [illegible] ডাক্তার ছিল?—
—হ্যাঁ—
—কি বলল?—

—ভয়ের কিছু নেই। সারতে [illegible] সময় লাগবে।—

এই একটা ব্যাপারে [illegible] উত্তর দেয়। বাবা বলে, কালকে [illegible] ট্যাবলেট দুটো নিয়ে আসবে। আজ [illegible] গেছে ট্যাবলেটটা।—

সৌম্য মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ [illegible]।
এই সময় মার সাড়া পায়। বুক থেকে ওপর দিকে শ্লেষ্মা তুলে আনার [illegible]। একবার দুবার চেষ্টার পর হাঁফাতে থাকে। তবু শ্লেষ্মা মুখে আসে না। আবার চেষ্টা করে। আবার। ঘরঘরে আওয়াজ হয়। [illegible] ভেতর জ্বালা করতে থাকে [illegible]। [illegible] এই [illegible] সৌম্যকে [illegible]

থাকে। বোন সামনে বসে দেখে ওদের আর ভাত লাগবে কিনা। সৌম্য ওকে বিরক্ত হয়ে বলে, যা মাকে দেখ। একটু বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দে, আরাম পাবে।

বোন চলে যায়। দাদা আপন মনে খেতে থাকে। বাবা ফিরে গিয়ে আবার নিজের আসনে বসে। সৌম্য আকাশ পাতাল কত কি ভাবে। মা অনেক চেষ্টার পর শ্লেষাটা মুখে নিয়ে আসে। বোনের গলায় দুশ্চিন্তা ফুটে ওঠে, এখন একটু ভাল লাগছে মা?—

মা বেশ ভালই জানে ভাল লাগছে এই কথা শুনতে পেলেই ওদের আনন্দ। আসলে সেই ভাল লাগা সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও স্পর্শ করে। তাই স্পষ্ট বলার চেষ্টা করে, হ্যাঁ, এখন একটু ভাল লাগছে।—

এই কথাটার জন্যই এতক্ষণ যেন অপেক্ষায় ছিল সৌম্য। খাওয়া শেষ হতেই মার কাছে যায়। বলে, এখন বেশ ভাল লাগছে না?

মা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে—খেয়েছিস?

—হ্যাঁ। তোমার কেমন লাগছে এখন?

—কি খেলি...পেট ভরে খেয়েছিস তো?

—হ্যাঁ, তোমার গলায় আর কষ্ট হচ্ছে না?

—না। ...কি দিয়ে খেলি...রান্না ভাল হয়েছিল?—

—হ্যাঁ।—

যেদিন হসপিটালের উদ্দেশ্যে দাদারা ওর মাকে নিয়ে গেল সেদিন মা গাড়িতে বসে জানালার বাইরে কোন এক অনির্দেশ দূরত্বের দিকে তাকিয়েছিল। কি ভাবছিল তখন। কি ভাবছিল। মার সেই গভীর টলটলে চোখের দিকে তাকিয়ে সৌম্যর মনে হয়েছিল কতদূরে দেশ। কতদূরে। একটা নীল ভোমরা ভোঁ শব্দে উড়ে এসে ট্রেনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে চিৎ হয়ে হয়ে পড়ল। মাথার ওপরে পরিষ্কার নীল আকাশ। হলুদ রোদ্দুর। ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হল মা খুব শিগির সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে। এমন সুন্দর দিনে কেউ কি দূরের দেশে চিরদিনের মত চলে যেতে পারে।

—তপতী আমার ভীষণ শীত করে আজকাল। শরীর কাঁপতে থাকে। তুমি কি উল বুনছ?—

তপতী নরম চোখে তাকায়। আসলে সৌম্যকে জীবনমুখী করে তোলার চেষ্টা করে হয়ত। ওর আর সৌম্যর মাঝের অলংঘনীয় বেড়াটা একবার যদি পার হতে পারত সৌম্য। একদিন শীতের রোদ্দুরে এবং বসন্তের আগত সন্ধ্যা সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা ও শোনাতে পারবে। কিন্তু আজ তপতী চাইলেও তেমন কথা ওকে শোনাতে পারে না সৌম্য। তেমন কিছুই মনে পড়ে না। এবং যতই ও নিজের কথা বলে ততই তপতী ওকে দেখায় যে ও উল বুনছে।

চশমার ব্রীজটা একটু ওপরে ঠেলে ডাক্তার বলেছিল, কত বয়স?

—বাহান্ন-তিপান্ন হবে।

ডাক্তার উদাস গলায় বলে, ভেরি স্যাড। এই বয়সেই এমন অসুখ।

ভদ্রলোক এই কথা বলেই থেমে যান। ও'র মুখের দিকে ভাল কিছু শোনার প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকে সৌম্য। তারপরে বলে, কেমন বুঝছেন আপনি?

—প্যালিটাল প্যাল্সি। গলার প্যারালিসিস। বার্ধক্যজনিত শারীরিক অক্ষমতা বলতে পারেন। কিন্তু ওর যা বয়স।...খুব বেশী খাটতেন নাকি?—

ম্রিয়মান চোখে তাকায় সৌম্য। এ কি অস্বীকার করবে। ও কি বলবে, না তা ঠিক নয়। আসলে কোন গৃহিণী তাঁর ছেলে-মেয়ের সংসারকে অস্বীকার করে দিন কাটান। মার সমস্ত কথা টুকরো টুকরো অভিমান অথবা স্নেহের ছবি মনে পড়ে সৌম্যর। বলে, এ রোগ কি সারে না ডাক্তারবাবু? ...কিছুই যে খেতে পারছেন না। শরীর ক্রমশ আরো বেশী খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—যে করেই হোক খাওয়ানোর চেষ্টা করতেই হবে। একবারে না পারুন বার বার খাওয়ান। পুরোপুরি কিওর হতে সময় লাগবে। তবে তেমন চিন্তার কিছু নেই।

তারপর কিছুক্ষণ টেবিলের ডেট প্যাডের ওপর আঁকিঝুঁকি কেটে সৌম্যর দিকে আবার মাথা তুলে তাকান ভদ্রলোক। বলেন, আসলে কি জানেন, আমাদের নার্ভ সিস্টেম কখন হঠাৎ অকেজো হয়ে পড়ে... হঠাৎ অসাড় হয়ে যায়--খুব সবল সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেও হঠাৎ শরীরের কোন অংশ প্যারালাইজড হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

সৌম্য ভালবেসে নরম সুরে ডাকে, তপতী।

দেখে ও উল বুনছে। সৌম্যর খুব শীত করে আজকাল। এইজন্যই ওর এত আগ্রহ। নরম চোখ। মৃদু হাসি। ওকে ভালবাসতে ইচ্ছে হয় সৌম্যর। শীতের সকালে লাল ষ্টোল জড়িয়ে কোনো সুন্দরী চলে গেলে যেমন ইচ্ছে জাগে মনে। কিন্তু কি এক অলংঘনীয় দূরত্বের বেড়া ওদের মাঝে। সৌম্যর সমস্ত কাজে তপতীর নীরব উপস্থিতি। তবু এই বেড়া। তবুও।

সৌম্য হসপিটালে গিয়ে দেখে মার জলের কুজোটা ভেঙে একদিকে গড়িয়ে গিয়েছে। জল পড়ে ভিজে রয়েছে মেঝেটা। ও মাকে জিজ্ঞেস করে, এমন কিভাবে হল মা?

—জল গড়িয়ে খেতে গিয়েছিলাম, পারিনি। হাত থেকে পড়ে গিয়েছে।

—তুমি কি তাই পার, ওদের ডাকলে না কেন...নার্স অথবা আয়া কেউ ছিল না?

—নার্স ছিল না। আয়া ছিল। ঐ ওখানে বসেছিল ওরা। ডাকছি ডাকছি কেউ আসে না। জল তেষ্টা পেয়েছে, ওদের বললাম, কি মানুষ তোমরা...লোকে জল চাইলে জল দিতে পার না একটু। কেউ ফিরেও তাকায় না একবার।

মার কথা বলার ধরণে মাকে হঠাৎ কত ছোট, কত অপরিচিত মনে হয় সৌম্যর। মনে হয় কোনো শুভক্ষণে ওদের এই যোগাযোগ হয়ে গেছে। এ যোগাযোগ একদিন ছিন্ন হবেই। সময়ের অনন্ত স্রোতে কে কোথায় ভেসে চলে যাবে আবার! মার পাশে বসে একটা হাত টেনে নিয়ে হাতে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, এখন একটু জল খাবে?

—দে।

জল এনে দিয়ে সৌম্য বলে, ওরা কেন তোমাকে জল দিতে চায়নি জান?

মা মাথা নাড়ে। সৌম্য ভাবে, জানবেই বা কোথা থেকে। তোমার সমস্ত শরীর জুড়ে সারল্য। তুমি কি এতসব বোঝো। এবং মা এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনের মধ্যে ভেসে ওঠে ওর মায়ের মত কোনো মহিলা, যিনি অত ফ্লুয়েন্ট ইংরেজী বোঝেন না, বিচিত্র আধুনিক কায়দা, কথা-বার্তা যাঁর জানা নেই। যিনি শুধু পুত্র এবং পরিবার পরিজন এবং তাবৎ মানব-সংসারের কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই চান না। কিন্তু সৌম্য মনে করে এঁদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। ও বলে, কালকে তোমাকে যখন ভর্তি করে নিয়েছে তখন আয়াটায়া রাখার কথা ভাবেনি। আসলে তখন মনে হয়নি রাখার কথা। হসপিটালের ব্যাপার-স্যাপার ভাল জানা নেই তো,... কখনো এর আগে আসতে হয়নি তাই।... তা ওরা যদি তোমার কাজ করে দেয় তাহলে হয়ত আর আয়া রাখব না--এইজন্যে, বুঝলে না?

মা বোঝে হয়ত। অথবা বোঝে না। সৌম্য ভাবে যারা ফ্রি বেডে আছে তাদের কাছে জীবন কি ভীষণ দুর্বিসহ। এবং অর্থহীনের কাছে এই মৃতপ্রায় দেশ, দেশের অর্থলিপ্সুরা কি ভীষণ অভিশাপ।

খোলা দরজার পরে প্যাসেজের লাগোয়া ওদিকের ঘরে উঁকি দিয়ে সৌম্য দেখতে পায় অনেকের মাঝে একজন বৃদ্ধা অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় মাটিতে বসে রয়েছেন। পাশেই তাঁর বিছানা। অতি দুঃস্বপ্নেও অমন বিছানায় শোয়ার কথা সৌম্যর মনে আসবে না। ঐ বৃদ্ধার মত আরো কেউ

কেউ এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। ঘরের ভেতর একটা কেমন অন্ধকার মাখানো আলো। ও খুব ভালই বুঝতে পারে ওই ঘরে যাঁরা আছেন জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ তাদের অবশিষ্ট নেই। ওই বৃদ্ধা প্রাকৃতিক কর্মটি তাঁর বিছানার ধারেই সেরে ফেলেছেন। এবং তাঁর বিছানার ধার থেকে মেঝের ওপর কিছুটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা জলকে হাতের ঠেলায় সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করে সৌম্য, একটু ভাল ব্যবস্থা কি হতে পারে না? ওহে সৌম্য, একটু ভাল ব্যবস্থা? আত্মাকে পাঁকের মধ্যে পুঁতে না দিয়ে একটু বাতাস, একটু নীল আকাশের মত স্বাচ্ছন্দ্য কি জোটে না?

দুবেলা দুটো আয়া যে করেই হোক রাখতেই হবে। তবু অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা ভেবে দুর্বলের একমাত্র নির্ভর ঈশ্বরের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করে সৌম্য। ভাবে, তপতী তো উল বুনছেই। তবে আর চিন্তা কি, একদিন এর যাবতীয় শীত দূর হবে। হবে নিশ্চয়।

কিছুকাল আগে পরিচিত সমাজের কিঞ্চিৎ দূরে বসে একদিন সৌম্যর মনে হয়েছিল বৃহৎ জীবনের সঙ্গে একটা আত্মিক যোগাযোগ থাকা অবশ্য প্রয়োজন। এতে অন্তত গণ্ডিবদ্ধতার অসহ্যতা কাটে। মা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলে এবার মাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবে সৌম্য। ওর বারবার মনে হয়, এই হল উপযুক্ত পুত্রের কর্তব্য। সৌম্য দেখে যে তপতী ওর জন্য উল বুনছে। মা হসপিটালে থেকে কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে এলেও এখনো তেমন কিছুই খেতে পারে না। গিলতে কষ্ট হয়। স্বাস্থ্য যেন আরো ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। গভীর দীঘির মত চোখ বেয়ে কষ্টের জল উঠে আসে। সৌম্য ভাবে, এত কষ্ট কেন পাবে, কোন অপরাধ জমা হয়েছিল?

মা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, কি কষ্ট কি কষ্ট।—

মার মুখে গলায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ও বলে, আজ কিন্তু তুমি অনেকটা খেয়েছো। কালকে আর কিছুটা। পরশু আরও। এবং দেখো এইভাবে একদিন...।

বলতে বলতে ও সত্যিই অনেক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে। সুন্দর মাঠ-ঘাট-আকাশ নয়। সুন্দর মানুষ। সুন্দর পোশাক আশাকের অকর্মণ্য বিলাসী আবরণ নয়। সুন্দর চরিত্র। সততা, মহত্তা এইসব। এখানে মায়ের অসুখ, তবু আরোগ্যের প্রয়োজনে কেউ সচেষ্ট নয় যেন। সচেষ্ট নয়, তবু রোদ্দুরে পিঠ রেখে তপতী ঐ উল বুনতে বসেছে।

অভিজ্ঞতায় সৌম্যকে দেখলেই ভাবে এই বুঝি ওর ছায়াটা এখনি চাকরীর কথা তুলবে। সৌম্যর আশেপাশে অনেকেই এই-রকম আশঙ্কায় ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। কিন্তু ওর ছায়াটা, হিলহিলে বায়বীয় ছায়াটা কি করতে পারে। তপতী কেন আশা জোগায়। উল বোনে। হয়ত কখনো কোনো নিশ্চয়তা খুঁজে পাওয়া যাবে—এই আশায় ছায়াটা লক্ষ হাত বাড়িয়ে বলে, আমার চাই, আমাকে আরো দাও। আমি বেঁচে থাকতে চাই, আমাকে চাকরী দাও। অন্ন দাও। আরো অর্থ দাও। আমি বাঁচব, আমাকে দাও। আরো অর্থ, আরো বিত্ত, ফ্রিজ, গাড়ী, বাড়ি। 'দাও দাও'—এইভাবে ওর ছায়াটা চেঁচায়। চেঁচাতে চেঁচাতে ওর গলা ফাটে। মুখ লাল হয়। পাশাপাশি আরো অনেকে লক্ষ হাত বাড়িয়ে বলছে। দেশের প্রধান কর্ণধার, সেও বলছে। মাথার মুকুটটা হীরের দ্যুতিতে ঝলসে উঠছে বারবার। তবুও।

সৌম্য যখন ওর মার পাশে বসে, মা বলে, তোর অত রাগ কেন। এত বিরক্তি কিসের? সবাইকে সব সময় মুখ খিঁচোস?—

ওর মার কথা বলতে কষ্ট হয়। আজকাল প্রায় সব কথাই কেমন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। ডাক্তার বলে এও নাকি সেরে যাবে। তবে সময় লাগবে। কতদিন সময় লাগতে পারে। কতদিন সৌম্য তেমন সুদিনের অপেক্ষায় বসে থাকবে। মাকে বলে, রাগ করব কেন? ও কিছু নয়। মা বিষণ্ণ চোখে তাকায়। বলে, দেখিস ভায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিস না কখনো। চিরকাল একসঙ্গে থাকিস। ওদের ভালমন্দের দিকে নজর রাখিস সব সময়।

মা যে কেন এসব কথা ওকেই বলে। ওর কোনো কিছুতেই তেমন মন লাগে না। কিছুতেই। তবু দেখে তপতীর ছায়া। তপতী নরম চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। যেন গরম লেপ শরীরের ওপর বিছিয়ে এখনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়বে সৌম্য। মা বলে, আমি যে কোথায় যাই। কোথায় যাই বলত?...তোদের এমন ভাসিয়ে চলে যাচ্ছি।—

খেতে দিলে গিলতে কষ্ট হয়, তাই খেতে চায় না। ছায়াঘেরা দিঘীর মত সরল সুন্দর চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে জল। বলে, কি কষ্ট, কি কষ্ট।—

এমন ধরনের কষ্ট কেউ পেতে থাকলে তা চোখে দেখা যায় না। তবু সান্ত্বনা পাবার আশায় ঘুরেফিরে কাছে আসে সৌম্য। বলে, এখন কেমন লাগছে মা?...আগের চেয়ে ভাল লাগছে না একটু?—

মা বিষণ্ণ চোখে ওর দিকে তাকায়। তারপর জানালার বাইরে দূরের দিগন্তের দিকে। দুটো হলুদ পাখি গাছের ছায়াঘেরা মাঠটায় উড়ে উড়ে একে অপরকে ছুঁয়ে যায়। মা আত্মমগ্ন হয়ে সেইদিকে চুপচাপ তাকিয়ে [illegible] [illegible]

কলকাতার ভাড়াবাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে গরমের নির্জন সন্ধ্যায় একা দাঁড়িয়ে ওর মা একটা গান গাইত। বারবার সেই ছবি মনে পড়ে সৌম্যর। "খেলার সাথি বিদায় দ্বার খোলো...গেল যে খেলার বেলা..."। মায়ের সেই হাসি, কথা বলার নিশ্চিন্ত ধরন বারবার মনে পড়ে।

অবশেষে মেঘটা ওকে দখল করে ফেলে। ভীষণ গর্জন করে কালো ঘন মেঘটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত পাক খেয়ে খেয়ে আরো বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। ছুটতে ছুটতে এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকে সৌম্য। ওর বোনেরা কাঁদে। বিলাপ করে। সৌম্যর শীত লাগে। কি ভীষণ শীত। সমস্ত শরীর কাঁপে। কাঁপুনি থামতে চায় না কিছুতেই। কে যেন বলে ঘিটা ভাল মাখিয়ে দাও শরীরে। আরেকজন বলে, বাসাংসি জীর্ণানি...ইত্যাদি।

নির্জনে গোপনে অজস্র গ্রহ তারকার বুকে উন্মুক্ত আকাশের তলায় ওই অচেনা মেয়েটা শুয়ে আছে। ওকে কি ভীষণ অপরিচিত দূরের মানুষ মনে হয় সৌম্যর। এ জন্মে যেন চেনা হল না। আর কি কোনোদিন তেমন সুযোগও পাবে। কখনো কি আর দেখা হবে। সৌম্য চোখ বুজে মাথা নত করে ওরই পায়ের কাছে। সৌম্যর সামনে ভেসে ওঠে দিগন্ত বিস্তৃত একটা বিরাট সর্ষের ক্ষেত। সর্ষের হলুদ ফুলের ঢেউয়ে বাতাস এসে নেচে যাচ্ছে। চরাচরে আর কেউ কোথাও নেই। শুধু মাথার ওপরে একা এক দূরদেশী চিল নীল আকাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছে। সৌম্য ওই নির্জনতা ভঙ্গ করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ওর পার্থিব স্বরে একবার ডেকে ওঠে, মা, মাগো!—

ডুব দিয়ে উঠে যখন গুরুদশায় পরিধেয় বস্ত্র পরিধান সারা হল, আলো আর অন্ধকার মাখানো আকাশ ভরা গ্রহ তারকার মৌন বিশ্বের দিকে অভিমান আর জিজ্ঞাসার চোখে যখন তাকিয়ে রয়েছে সৌম্য তখন ওর চোখে যখন তাকিয়ে রয়েছে সৌম্য, তখন ওর হাত ধরল। যেন বলল, এস, ফিরে চল জীবনে।—

ফিরে তাকায় ও। দেখে তপতী। সৌম্যর চোখে বিস্ময় খেলা করে। বলে, তবু যেতে হবে?—

তপতীর মৌন মুখ। চোখে গভীর হাতছানি।

জীবনের প্রতি অকৃত্রিম আকর্ষণ কিছুতেই যেন শেষ হতে চায় না। সৌম্য দেখে, কারা যেন এইমাত্র ঊষার আলোয় মাছ ধরার উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রের দিকে রওনা হল। পাঁচটা দাঁড় একসঙ্গে জলে পড়ে একটাই আওয়াজ ভেসে এল, ছুপ্‌।
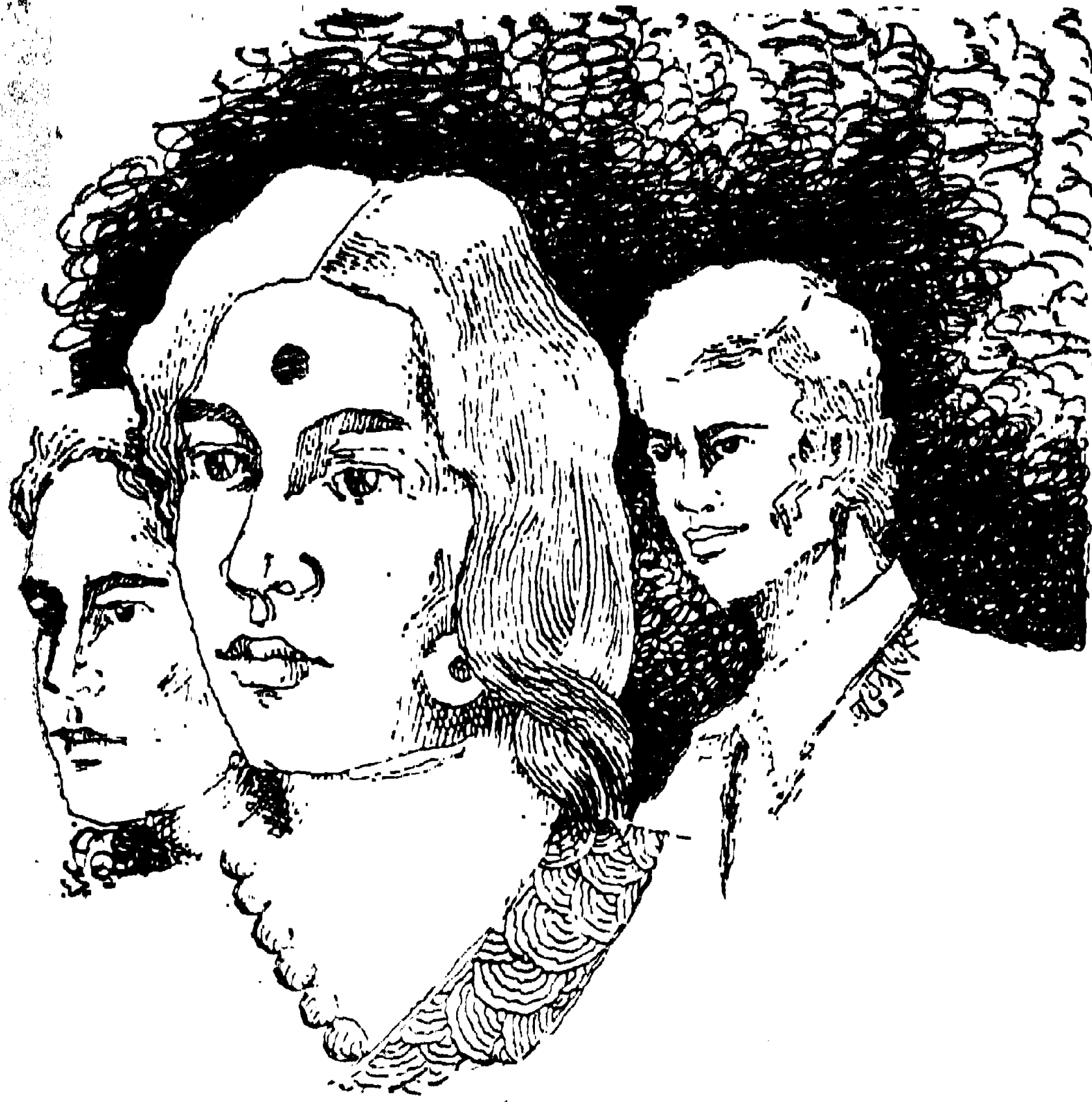
রোদ পড়ে আছে

বিজয় পাল

এক

—এই যে, এখানে—

নিখিলকে দেখে হৈ হৈ করে উঠল টিপু। এটা টিপুর স্বভাব নয়। সে এমনিতে শব্দ করে হাসে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলে না। একদিন মুখ ফসকে কি একটা খারাপ কথা বলে ফেলেছিল। কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়, আর কথাটাও এমন কিছু মারাত্মক ছিল না। ছেলেরাতো বটেই, রেখা প্রভৃতি করবীরা পর্যন্ত অমনি দু-চারটে ভালো-মন্দ কথা মুখ একটুও না বেঁকিয়ে কতইতো বলে। তবু টিপু তারপর পাক্কা এক ঘন্টা আর ঠোঁট খোলেনি। সেই টিপুকে অমন হা রে রে রে গলায় হাঁক পাড়তে শুনে নিখিল অবাক হল।

—আয়—

চেয়ার টেনে বসতে বসতে নিখিল বলল, তোর কি হয়েছে বলত? টিপু অল্প হাসল।

—কি খাবি?

ঠিক এই মুহূর্তে জল ছাড়া আর কোন তৃষ্ণার কথা মনে করতে পারল না নিখিল। বলল, শুধু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল—ব্যাস।

—আর কিছু?

—জল খেয়ে বলব।

দুজনেই হেসে ফেলল। টিপুর হাসির শব্দ শুনতে পেল নিখিল।

কোলকাতায় অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি। খালি রোদ আর রোদ। থেকে থেকে শুকনো বাতাসের এক-একটা ঢেউ ওঠে। ছোট ছোট ঘূর্ণীর হাত ধরে দুনিয়ার যত ঝরা পাতা, কাগজের টুকরো, ধুলো আর খড়কুটো খানিক দৌড়ে গিয়ে ফের ভেঙ্গে ছড়িয়ে যায়। চোখ চলে না এমন অবস্থা।

নিখিলের চশমার কাঁচে পুরু হয়ে ধুলো জমেছিল। ফ্যানের হাওয়া লেগে ঘামে ভেজা চোখের কোণ শির শির করছিল। টেবিলের ঠিক মাঝখানে টিনেব এ্যাসট্রে। সদ্য ফেলা সিগারেট থেকে সরু হিলহিলে নীল ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠে আসছে। সব মিলিয়ে টিপুর মুখটা অন্য রকম লাগছিল। ভাঙ্গা ঝাপসা। একেকবার জোড়া লাগছে। আবার ভাঙ্গছে।

—কি দেখছিস?

—তোকে। একটু থেমে নিখিল আবার বলল, ঠিক তোকে নয় অবশ্য।

—তবে?

চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিয়ে নিখিল ও ভাবছিল। হাতের দিকে চোখ রেখে বলল, ধর তোরই মত কাউকে।

—আমি না আমারই মত আর কেউ—সে পরে ভাবলেও চলবে। টিপু ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখন বেরোই চ।

—কোথায়?

—বেরিয়ে বলছি।

তেজী গলায় কথা বলছে টিপু। ধারালো চাউনি। লম্বা টান টান শরীর। একটু রোগা এই যা। তা নইলে জামা-প্যান্ট জুতোয় ভালোই তো দেখাচ্ছে। তৈরী ঘোড়ার মত। নিখিল কিন্তু তেমনি বসে রইল।

—খাওয়াবি বললি যে।

—বলেছি যখন খাওয়াব—প্রমিজ। এখন ওঠ।

উঠেই বসে পড়ল নিখিল। একটু জল না হলেই নয়। বড় তেষ্টা। বলল, দাঁড়া জলটা খেয়ে নিই।

কফি হাউস থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে দু প্যাকেট সিগারেট কিনল টিপু। দামটা গায়ে লাগার মত। তাও আবার কড়কড়ে বিশ টাকার নোট ভাঙ্গিয়ে। ফেরত টাকা গুনল না পর্যন্ত। মুঠো পাকিয়ে হিপ পকেটে গুঁজল যেন কিছুই নয়। টিপুর বাড়ি নিখিল বেশ কয়েকবার গেছে। দেখে শুনে আর যাই হোক খুব একটা সচ্ছল মনে হয়নি। আসলে ওদের দলের মধ্যে দিবাকর আর শিপ্রাদের অবস্থাই যা একটু সচ্ছল। বাদবাকি সব লটারির খদ্দের।

—কেসটা কি বলত? সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল নিখিল।

—চল না বাসে যেতে যেতে বলছি।

কাল থেকে এই নিয়ে মোট তিনবার প্রায় একই কথা বলল টিপু—তিনভাবে অবশ্য। বলছি বলব করে করে আসল ব্যাপারটাই এড়িয়ে যাচ্ছিল।

নিখিল দাঁড়িয়ে পড়ল। এতই যদি ঢাক ঢাক তো তাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া কেন? বোবা কালারতো অভাব নেই পৃথিবীতে। অন্ধের সংখ্যা কয়েক কোটি। তাদের কাউকে সঙ্গে নিলেই হতো। প্রশ্ন করা চলবে না, কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে জিজ্ঞেস করা যাবে না। টিপুটা ভেবেছে কি?

নিখিল বলল, যেখানে যাচ্ছিস যা। না জেনে আমি আর এক পাও এগোচ্ছি না।

—তুই কি রে। টিপু নিখিলের আরো কাছে সরে এসে বলছিল, দিবাকর ছিল অতীন ছিল। যা ফিচেল সব, ডিপেন্ড করা যায় না। তাইতো তোকে ধরে আনলাম। তোকে বলব না ভাবলি কি করে?

টিপু যেন ময়দানের দক্ষ স্ট্রাইকার। আবারও নিভুল পাশ কাটাল। তাকে খুব বোকা ঠাওরেছে যা হোক। নিখিল

আজকের গোলটা টিপুকেই দিয়ে দিল। একমুখ ধোঁয়া ইঞ্জিনের মত ভস ভস করে ওড়াতে ওড়াতে বলল, গ্যাসের কে জি কত জানিস?

—না তো। টিপু কেমন হাঁ হয়ে যায়।

—না ভেবেই ছাড়ছিস যে বড়?

নিখিলকে চমকে দিয়ে টিপু আবারও সানন্দে হেসে উঠল।

দুই

বাস থেকে নেমে টিপু মেট্রোর কাছাকাছি এসে একটু দাঁড়াল। চারদিক দেখে নিয়ে ডাকল, আয়। ঠিক তখনই নিখিল শুনতে পেল, নেবেন নাকি স্যার, অল গোল্ড জাপানী পাইলট? খুব সস্তা। শোনা মাত্র নিখিল যেন চমকে জেগে উঠল।

খুব সাধারণ চেহারার একটা লোক। চারপাশের আরো হাজারটা লক্ষটা লোকের মতই দেখতে। তফাতের মধ্যে দুটো নয়, লোকটার যেন তিনটে হাত এবং তৃতীয় হাতটি অস্বাভাবিক দীর্ঘ। কি বড় থাবা। কত মাস যে নখ কাটেনি। সেই দীর্ঘ হাতের বিশাল থাবার মধ্যে চকচকে একটা পেন উঁচু করে ধরে আছে। দেখতে সোনার মত, লোকটা বলছে সোনা। সস্তার সোনার লোভ মূলধন করে জবর ব্যবসা ফেঁদেছে তো।

ধাঁ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল নিখিলের। চলতে চলতে সে লোকটার পেটের কাছে কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে শেষে নিজেই পড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করল, যেন সবটাই অনিচ্ছাকৃত। নিছক দুর্ঘটনা। কিন্তু সস্তার সোনা দিয়ে মোড়া সেই পেনটা কি, অতিরিক্ত হাতটাতো ধরা গেল না।

টিপু এগিয়ে গেছে। নিখিল চিন্তিত মুখে সোজা সেদিকেই হাঁটতে লাগল।

—দাঁড়া।

নিখিলের মনে হল, সেই লোকটা তার তৃতীয় হাতটা বাড়িয়ে তাকে ধরতে আসছে। না থেমেই বলল, কেন?

টিপু বলল, এখানেই আসার কথা।

—কার?

—দেখতেই পাবি।

নিখিল মুহূর্তের স্তব্ধতা থেকে বেরিয়ে এসে বলল, তুই থাক, আমি চললাম।

হিংস্র হাতে পেছন থেকে জামার কলার টেনে ধরে নিখিলকে থামিয়ে দিল টিপু। বলল, তবে এলি কেন?

—ইচ্ছে হল তাই।

—মানে?

—ইচ্ছের আবার মানে কি? ইচ্ছে হল এলাম, এখন চলে যাব।

—ঠিক আছে যা। টিপু মুঠো আলগা দিয়ে বলল, কাওয়ার্ড।

ভীরু, ভীরু। টিপু বলছে, নিখিল ভীরু। সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে চাইছে। শরীরের স্বল্প একটি মোচড়ে নিখিল টিপুর মুখোমুখি এসে গেল।

—এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না।

টিপু কথা বাড়াল না। এক-একটা বাস এসে দাঁড়াচ্ছিল। টিপু লোকের ওঠা-নামা লক্ষ্য করছিল। রাস্তা দেখছিল। এবং নিখিল তাকে বারবার হতাশ হতে দেখে মনে মনে হাসছিল। শেষে প্রায় কোন কারণ ছাড়াই টিপু বলল, খুব কাল বাড়ি গেছে। হঠাৎ?

—হঠাৎ কোথায়। কদিন ধরেই তো মন ভালো নেই, মন ভালো নেই করে প্যান প্যান করছিল। পরশু আলটিমেটাম দিল কমুকে একবারটি না দেখলে নির্ঘাৎ মরে যাব।

—কমু আবার কে?

—তুই জানিস না?

—কি করে জানব। কোন শালা কি কিছু বলে আমাকে?

—তা ঠিক। তবে সকলের সঙ্গে আমাকে জড়াস না দোহাই। আমি কিন্তু তোকে বাদ দিয়ে এখানে আসিনি।

—কি আনাই এনেছিস। নিখিল হেসে ফেলল। —কেন এসেছি তাই জানি না এখনো।

টিপু অপ্রস্তুতের একশেষ। কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। বেশ কয়েকবার ঢোক গিলে কেশে বলছিল, আরে কমু হল গিয়ে ঐ যে...ওদের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে একটা মেয়ে থাকে না...বাসনটাসন মাজে ঘর মোছে—ঝি আর কি...খুবতো বলে, বেশ দেখতে...

নিখিল শুনছিল, মন ছিল না। তার চোখ তখন উল্টোদিকের ফুটপাথে ভীড় করে থাকা গুটিকয় ছাতিম আর বকুলের ছায়া অব্দি চলে গিয়েছিল। সেখানে একা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। সে একবার ঘড়ি দেখছে। কখনো রাস্তা। ঘাড়ে মুখে ঘন ঘন রুমাল ঘষে কি মুছতে চাইছে সে। ঘাম ধুলো না অন্য কিছু। চাপা কপাল, নিচের ঠোঁটটা পুরু, রং ময়লার দিকে। সব মিলিয়ে বড় বেশি আটপৌরে। কিন্তু তার অপেক্ষার ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর। নিখিল সেদিকে চোখ পেতে রেখে অন্যমনস্ক গলায় বলল, তাতে কি?

—আরে তাতেই তো সব।

মেয়েটি চার-পাঁচ পা হেঁটে গিয়ে রোদ্দুরে ঘেঁষে দাঁড়াল। কচিৎ হাওয়া তার সারা শরীর জুড়ে ছায়া রোদের কাটাকুটি খেলছিল। মাঝখানের রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাওয়ার বিরাম নেই। হাজার হাজার গাড়ি মানুষে থিক থিক করছে। একটা দশাসই ডবল ডেকার এই মাত্র মেয়েটিকে আড়াল করে দাঁড়াল।

টিপুর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে নিখিল ফিস ফিস করে বলল, তুই ঠিক জানিস?

টিপু সারা মুখে রক্ত ছিটিয়ে চাপা স্বরে বলে উঠল আসছে।

(তিন)

নিখিল যেন অন্ধ। বড় বড় হোর্ডিং রং বেরং-এর পোস্টার ট্যাক্সি, বাস প্রাইভেট কার আরো আরো কত উল্টোপাল্টা জায়গায় যে হোঁচট খেয়ে ফিরছিল। একটা ভুলের জের কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ফের আর একটা ভুল। দেখতে দেখতে ভুলের আস্ত একটা পাহাড় চোখের সামনে গজিয়ে উঠছিল। কিছুতেই আর খুঁজে পাচ্ছিল না নিখিল। দু চোখ টান টান করছিল ব্যথায়। জল এসে যাচ্ছিল।

শেষমেষ টিপুর দৃষ্টি ধরে ধরে নির্ভুল ঠিকানায় পৌঁছে গেল নিখিল। নিখিল মেয়েদের অহংকারী দেখতে ভালোবাসে। এক আকাশ খাঁ খাঁ রোদ্দুরের নিচ দিয়ে আপাদমস্তক অহংকারে সেজে সে আসছিল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় অসহ্য বোধ হওয়ায় নিখিল চোখ ফিরিয়ে নিল। ঠিক ঠিক ভালো কিছুর দিকে বেশিক্ষণ চোখ রাখা যায় না।

—এস পরিচয় করিয়ে দেই—টিপু বলছিল,—এই নিখিল, নিখিল সেন—আমার বন্ধু। আর

—আমি স্বাতী।

খুব চেনা গলা। নিখিল স্বপ্নভঙ্গের ভয় নিয়ে দেখল। তার মুখে এখনো টাটকা রোদের গন্ধ লেগে আছে। কিন্তু কোথায় যে দেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারল না। নাকি সব সুন্দর জিনিসই পরিচয়ের দাবী নিয়ে আসে।

নিখিল হেসে মাথা নোয়াল। একরাশ অগোছালো লম্বা চুল তার কপাল এবং চোখ ঢেকে ছিল। স্বাতীও হাসছে। টিপু বলল, সারপ্রাইজটা কেমন হল বল?

—দারুণ।

নিখিল মনে মনে স্বীকার করল, ঠিক এরকমটি সে ভাবেনি। সে আজকাল বেশি বেশি ভাবতে ভয় পায়। যা নিজে থেকে আসে ভাবে সেটুকুই তার পাওনা। ইচ্ছের অবশ্য অবাধ নেই। কিন্তু নিখিলের হাততো আর আঁকশি নয় যে সূর্য পেড়ে খাবে। তার চেয়ে এই ভালো... সে যেমন সে তেমন।

টিপু বলল, এই জন্যেই আগে কিছু বলিনি। বললে সারপ্রাইজটা মাঠে মারা যেত।

স্বাতী বলল, কি তখন থেকে খালি সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ করে যাচ্ছ? কিসের সারপ্রাইজ?

হাসিতে মুখ ভরে গেল টিপুর। বলল, তুমিই যে আসবে নিখিলকে বলিনি। দেখছ না তোমাকে দেখে কেমন হকচকিয়ে গেছে। বোকা বোকা মুখ করে হাসছে। কথা বলছে না।

নিখিল টিপুকে দেখছিল। ও একাই কথা বলে যাচ্ছে। হাসছে। স্বাতী লজ্জা পাচ্ছিল। টিপুকে থামাতে চেয়ে বলল, এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? আমার কিন্তু ভারি অস্বস্তি হচ্ছে।

এভাবে দুজন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সত্যিই কোন মানে হয় না। কোথাও যাওয়া

উচিত। নিখিল আমরণ দেখল। রোদ্দুর। গাছের নিচে ছায়া হয়ে সেই মেয়েটি এখনো দাঁড়িয়ে। নিখিল কি আর কেউ তাকে দেখছে, কৌতূহলের বৃত্ত সংকীর্ণ হতে হতে কত ছোট কী ভীষণ হয়ে পড়ে সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তার। নিয়েনো ভেতর ঢুকে গিয়ে, নিখিলের ধারণা হল, মেয়েটি যেন অপেক্ষার বয়স মাপছে।

স্বাতী ছটফট করছিল।

টিপু বলল, কোথায় যাওয়া যায় তুমি বল। রোডিও ফার্স্ট।

স্বাতী সপ্রতিভ গলায় বলল, নিখিল বলুক—গেস্ট ফার্স্ট।

বলবে না বেড়াবে না সিনেমা দেখবে এসব খুবই পুরনো কিন্তু জরুরি প্রশ্ন। নিখিল ভাবতে পারেনি, প্রশ্নটা তার কাছে ফিরে আসবে। তাই তৈরী হওয়ার সময় পেল না।

—আমি কি বলব ? বরং—নিখিল স্বাতীর দিকে ফিরে বলল, তুইই বল—প্লিজ।

এবার ? টিপু ছেলেমানুষের মত খুশি হয়েছে বোঝা যায়। দাঁত বের করে হ্যা হ্যা করে হাসছিল।

নিখিল বলতে গেল, আমি ঠিক.......

—বুঝেছি। কি বুঝল তা শুধু স্বাতীই জানে। বলল, তোমাদের কাউকে বলতে হবে না, আমি বলছি।

নিখিল এবং টিপু স্বাতীর হাসি হাসি মুখের দিকে দম আটকে চেয়ে রইল। স্বাতীর মুঠোর ভেতর সময়। চোখে রোদের ঝিলিক। ওদের তিন জনকে ঘিরে থাকা শব্দহীন বৃত্তরেখার বাইরে তখন চৈত্রের প্রখর মধ্যাহ্ন এবং একা সেই মেয়ে।

স্বাতী বলল, আমরা আজ হাঁটব।

টিপু শুধালো, হাঁটবে ?

—হ্যাঁ হাঁটব, অনেক অনেকক্ষণ ধরে শুধু হাঁটব আর হাঁটব।

—কোনদিকে ? নিখিল জিজ্ঞেস না করে পারল না।

—মাঠ পেরিয়ে সোজা আউটরাম—

বুকের ভেতরে বহুক্ষণ ধরে চেপে রাখা বাতাস হা হা শব্দে উড়িয়ে দিল নিখিল। সে প্রবলভাবে হেসে উঠল।

টিপু বলল, কোথাও বসে চা টা খেয়ে তারপর বেরোলে হত না ?

নিখিল বলল, সে ওখানে গিয়েও হতে পারে।

স্বাতীর তর সইছিল না। বলল, তোমরা ভাবতে থাক, আমি এগোই।

—এই রোদ্দুরে ?

এবারে বোঝা গেল টিপুর আসল ভয়টা কোথায়। এমনভাবে কথাটা বলল যেন রোদ্দুরে হাঁটাহাঁটির কোন অর্থ কোন সুখ থাকতে নেই।

স্বাতী হাসতে গিয়েও হাসল না। অপরাধীর মত মুখভঙ্গি করে বলল, এখন কি হবে ? আমি যে রোদ্দুরের কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।

চার

বেশ অনেকটা পথ স্বাতীকে মাঝখানে রেখে পাশাপাশি হেঁটে গেল তারা।

মাথার ঠিক ওপরে জোয়ান সূর্য। এদিকে চৌরঙ্গী ওদিকে রেড রোড, আদিগন্ত প্রসারিত শুয়ে থাকা ময়দানে খাড়া রোদ্দুর পড়েছে। ঘাসের ডগায় দাউ দাউ আগুন। একনাগাড়ে এত রোদ, ঝলসানো সবুজের দিকে তাকালে মাথার ভেতরটা কেমন ঝিম মেরে যায়। নিখিল তাই খানিক পিছিয়ে এসে স্বাতীর অতি হ্রস্ব ছায়ার ওপর চোখ ফেলে, কখনো সেই ছায়াকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটছিল। এটা ওর প্রিয় খেলা।

কেউ কোন কথা বলছে না। হতে পারে রোদ জলের মত কথাও শুষে নেয়। তাতে অবশ্য নিখিলের কিছু আসে যায় না সে তার খেলা পেয়ে গেছে।

নিখিল নিখিলের মত খেলছিল। ওরা ওদের মত।

অনেক পরে স্বাতী টিপুকে বলল, তোমাকে কি পুলিশে তাড়া করেছে ?

নিখিল খেলা ছেড়ে বলল, পুলিশে নয়—রোদে।

টিপু বলল, আমি আস্তে হাঁটতে পারি না।

—তুমি আস্তে কেন, কোনভাবেই হাঁটছ না, তুমি দৌড়োচ্ছ।

নিখিল স্বাতীর কথায় সায় দিয়ে বলল, হানড্রেড মিটার—

স্বাতী হেসে উঠল।

—যা বলেছিস।

টিপু কিছু বলল না। আগের মতই পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে চলছিল। আর স্বাতী টিপুর পাশাপাশি থাকার আপ্রাণ চেষ্টায় হাঁপিয়ে মরছিল। শেষে যেন মরীয়া হয়ে বলেই ফেলল, এই, আর একটু আস্তে হাঁটোনা। আমার কষ্ট হচ্ছে।

—বললামতো আমি আস্তে হাঁটতে পারি না।

—আমি দৌড়োতে পারি না।

—তা হলে এলে কেন ?

অবশিষ্ট হাসিটুকু ঠোঁটের প্রান্তে ভাসিয়ে স্বাতী বলল, বারে, হাঁটব বলে এলাম তুমি যে হাঁটার নাম করে দৌড়োবে তাতো জানতাম না।

—এখনতো জানলে।

—খানিকটা।

পুরোটা আজই জানতে চাও ?

স্বাতী ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

টিপু স্বাতীর পাশ থেকে ছিটকে সরে গিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগল। স্বাতীর ঠোঁট থেকে হাসি টুপ করে ঝরে পড়ল মাটিতে। নিখিল নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল। কেউ দেখতে পেল না।

কি থেকে যে কি হয়। নিখিল ভাবল, টিপুটা ভীষণ স্বার্থপর। তোর রোদ সয়না। জানলাম তোর কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তা কি স্বাতীর চেয়েও বেশি। ভাবছিস খুব লড়ে যাচ্ছিস, তাই না ?

নিখিল দেখল, টিপুর পাশে আর একটা টিপু মাটি ফুঁড়ে উঠে আসছে। ক্রমশ টিপুর মাথা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল সে।

পেছন থেকে সেই আর একটা টিপুর ঠিক কসাই-এর মত। একেবারে নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। স্বাতীও ঠিক তেমনি আগের স্বাতী নয়। নিখিল স্বাতীর গায়ে ঘামের গন্ধ পাচ্ছিল না।

আসলে কেউ বোধহয় জন্মসূত্রে পাওয়া দুটো হাত দুটো পা দুটো চোখ কি নাক—মোটামুটিভাবে মানুষী শরীরে খুশি নয়। অতিরিক্ত কিছু তার চাই-ই চাই। অনেকটা সেই পেনওলার মত, টিপুর মত অথবা স্বাতীর মত।

স্বাতীর মধ্যে তবু চেষ্টা ছিল। দাঁতে ঠোঁট চেপে অনেক করেও যখন আর পারল না হতাশ ক্লান্ত পায়ে পিছিয়ে এল। নিখিল ছায়া থেকে সরল না। অর্থাৎ দৃশ্যটা এইরকম দাঁড়াল : অনেকখানি এগিয়ে হাঁটছে টিপু। ভ্রূক্ষেপহীন, জেদী। তার হাত দশেক পেছনে একা নিখিল। মাঝখানে স্বাতী—অবলম্বনহীন অথচ প্রত্যাশী। তারা সরলরেখায় হাঁটছিল। কিন্তু দূরত্বটুকু বজায় ছিল পূর্বাপর।

স্বাতী ডাকল। টিপু সামান্য ইতস্তত করে তার কাছাকাছি এল। অথচ স্বাতী নিখিলকেই যেন বলল, আর হেঁটে কাজ নেই।

—কেন ?

টিপু বলল, কেন আবার। এভাবে আর কিছুক্ষণ হাঁটলে সানস্ট্রোক হয়ে যাবে তাই।

নিখিল স্বাতীর সৌজন্যে টিপুর অভদ্রতা উপেক্ষা করতে পারল। সে সান-স্ট্রোকের বাংলা রৌদ্রাহত না রৌদ্রপীড়িত—কোনটা ঠিক ভাবতে ভাবতে আড়চোখে স্বাতীকে দেখল। তার মুখে রোদের আঁচড় টিপুর নখের দাগ। কি যে ঘামে মেয়েটা। স্বাতী এবং সেই প্রায় ছায়া হয়ে যাওয়া মেয়েটি—দুজনেরই জন্য বোকার মত মায়া হচ্ছিল নিখিলের। হালকা হতে চেয়ে সে টিপুকে বলল, মরতে এত ভয় তোর ?

—শুধু আমি কেন, মরতে সবাই ভয় পায়।

—ঠিকই বলেছিস, মরতে সবাই ভয় পায়, কিন্তু ভয়টা বোধহয় সকালের সমান নয়। কারো কম কারো বেশি। নিখিল বলল, তুই বেশি ভয় পাওয়ার দলে পড়িস। এটা আগে জানলে ভালো হত।

—জানলে কি করতিস ?

—কি আর.......এই রোজ সকালে উঠে খালি পেটে এক কোয়া রসুন, খাবারের সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ কি অন্যকিছু খেতে বলতাম। শুনেছি তাতে রোদ লেগে মরার চান্স অনেক কম—থাকেনা বললেও চলে।

—আমি মোটেই নিজের কথা ভাবছি না। টিপু রাগে ফুঁসছিল।

স্বাতী ভোলা চোখে টিপুকে দেখল। টিপুর ফিরে দেখার অবসর নেই। আস্ত গোঁয়াড় একটা। মাথা নামিয়ে গাঁক গাঁক করে হাঁটছেতো হাঁটছেই।

আউটরাম এখনো অনেক দূরে। নিখিল ময়দানের প্রায় বরাবর এক জসল গাছের

জমাট ছায়ার ভেতর সমানেই ঢুকে যেতে যেতে বলল, আয়রে স্বাতী, তুই আর আমি এখানেই একটু জিরিয়ে নিই। টিপু ওদিকে আউটরামে গিয়ে আমাদের জন্যে বেশ ভালো দেখে একটা জায়গা রিজার্ভ করে রাখুক। টিপু, জায়গাটা যেন মনের মত হয়। নিরিবিলি সিকোয়েন্স অনুযায়ী মাথার ওপরে মাধবীলতা আর পায়ের নিচে ঘাস এসেনশিয়াল। তুই কি বলিস স্বাতী।

টিপু দুলিয়ে বসে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, নেশা কেটে গেল?

নিখিল মাথা নাড়ছিল। তাতে হ্যাঁ না কিছুই স্পষ্ট নয়।

টিপু ঠোঁটের ফাঁকে অদ্ভুত হাসি ঝুলিয়ে বলল— না না আর একটু হেঁটে আয়। তোর তো আবার রোদ রোদ বাতিক— ভালো লাগবে।

মুখে জল ঠেকিয়েও আর ওঠাতে পেলাম না।

—অথচ তখন এমন ভাব দেখালি যেন আমি একটা আস্ত পাগল, রোদ্দুর টোদ্দুর কোন ফ্যাক্টরই নয়।

স্বাতী ডাকল, টিপু।

এক একটা ডাক এক একটা আহবান অনেকগুলো অর্থ নিয়ে বাজে। কি ভেবে টিপু চুপ করে রইল।

স্বাতী মুখ নামিয়ে বসেছিল। তার ঘামে ভেজা কপালের খানিকটা, শ্যামল চিবুকের একাংশ, নাকের একটা পাশ, শুকনো ঠোঁট দেখা যাচ্ছে। স্বাতী চোখে কাজল পরেনি। মুখ প্রসাধন ছিল কি না এখন বোঝার উপায় নেই। স্বাতীকে কেমন দুঃখী দুঃখী লাগছিল নিখিলের।

মাথার ওপরকার সূর্য পশ্চিমে হেলব হেলব করছে। এখন তত গরম নেই। ছায়া যেন ভেজা গামছাটি। কি আরাম। নিখিল ঘাসের ওপর আধশোয়া হয়ে বসে সিগারেট ধরাল।

—চার্মিনার ধরালি কেন? দামী সুতরাং ভালো একটা সিগারেট বার করে টিপু বলল, নে।

—ওতে এখন পাবে না। তার চেয়ে বরং বিড়িটিড়ি থাকলে দে।

—তুই বিড়ি খাস?

স্বাতীর বিস্ময় নিয়ে একটা ভারি মজার খেলার প্ল্যান নিখিলের মাথায় ঝট করে এসে গেল। বল, শুধু বিড়ি কি রে, বিড়ির ভেতর গাঁজা পুরেও খাই।...... না না, ভুল বললাম, পান করি। আঃ, কি জিনিষ রে, ভাবতে পারবি না।

—বাজে কথা।

—বাজে-কাজের কি আছে, যা বলছি শুনে রাখ।

—কথাটা কিন্তু ভারি বিশ্রী।

—চেখে দেখেছিস নাকি?

—না।

—তাহলে গাঁজার গন্ধ বিশ্রী না সুশ্রী [illegible] কি করে?

স্বাতী রেগে মেগে একশা। বলল,

আমি গাঁজা মানি বিড়ি.......মানে এই.......

—মানেটা আমি বলছি। নিখিল একটু চুপ করে থেকে বলল, গন্ধটা টিপুর গায়ে পেয়েছিস তাই না?

—নাতো। বলল বটে, স্বাতীর চোখ কিন্তু প্রশ্নের মত বেঁকে গিয়ে টিপুর গায়ে বিঁধে রইল।

টিপু বলল, কি যা তা বকছিস?

ওরে আমার কে রে! নিখিল নয়, নিখিলের ভেতর থেকে হিংসুটে কে আর একজন বলল, গাঁজা টাজা এমন কিছু খারাপ জিনিষ নয়। খেয়েছিস বেশ করেছিস। মিথ্যে কথা বলার কি দরকার? নিখিল খেলতে খেলতে খেলার বাইরে চলে যাচ্ছিল।

রেগে গেলে খুব সুন্দর দেখায় টিপুকে। টিপুর পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এবার ওকে ফিরতেই হবে। বলল, তুই যে মদ খাস, আর কি সব গিলিস আমি কি তা কাউকে বলেছি?

একেবারে ছেলেমানুষ। নিখিল বলল, তা বলিসনি। তবে এটাতো স্বীকার করলি যে বিড়ির ভেতর গাঁজা পুরে তুইও খাস।

—কখন বললাম?

—এইতো।

—কক্ষনো না।

—স্বাতীকে ছুঁয়ে বলতে পারবি?

স্বাতী কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নিখিল সেই অদৃশ্য হানাদারটাকে কাবু করে ফেলল। নিখিল আগের নিখিল হয়ে গিয়ে ঠা ঠা করে হেসে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে হাসল। এবারে নেহাত খেলার মজাতেই হাসি হাসি মুখে বলল, স্বাতী, তুই কিছু ভাবিস না। টিপু সত্যিই খুব ভালো ছেলে। সিগারেটের বাইরে ওর আর একটাই মোটে নেশা।

শুধু টিপু নয়, স্বাতীও ভয় পেয়েছে। শুধোল কি?

ইচ্ছে করেই চুপ করে গেল নিখিল। টিপু বলল, থামলি কেন, বল।

—তুইতো জানিস, তুই-ই বলনা।

—আমি কিছু জানি না।

নিখিল মুখ কাঁচুমাচু করে জানতে চাইল, আমাকেই বলতে হবে?

টিপু আর স্বাতী মুহূর্তের জন্য—ভিন্ন ভিন্ন কারণে যদিও—একাট্টা হয়ে বলল, তোকে বলতেই হবে।

—বেশ বলছি। কষ্ট হচ্ছিল। নিখিল কষ্টের গায়ে হাসি মাখিয়ে বলল, প্রেম!

প্রেমের ওপর দিয়ে এতক্ষণ ধরে যা ধকল গেল, তাতে বেচারার অবস্থা বেশ কাহিল। টিপু আর স্বাতী হাসল বটে, কিন্তু সে হাসি বড় ফিকে, ময়লা ময়লা। সাফসুতোর জন্য সময়ের আরো কিছু শুশ্রূষার প্রয়োজন। নিখিল বলল, দেরে টিপু, তোর খুব দামী আর খুব ভালো সিগারেটই একটা দে। চার্মিনার আর ভাল্লাগছে না।

টিপু নিঃশব্দে পুরো প্যাকেটটাই এগিয়ে দিল। নিখিল দুটো সিগারেট বার করে টিপুকে একটা দিল। একটা নিজে নিল। দেশলাই জ্বালিয়ে ধরাল। দুজনেই খুব মন দিয়ে ধোঁয়া গিলছিল। ছাড়ছিল যখন স্বাতীর মুখ আবছা দেখাচ্ছিল।

টিপু টুসকি মেরে ছাই ঝাড়ল। ছাইগুলো বিপরীত হাওয়ায় তার দিকেই উড়ে আসছে দেখে গাল পলা ফুলিয়ে সাক্ষাত গোবিন্দের মত ফু দিচ্ছিল। মাছি তাড়ানোর মত করে হাত নাড়ল। সাদা প্যান্টে লাগলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। টিপু ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

গুচ্ছের ধুলোময়লা বাটার পর সামান্য একটু ছাই নিয়ে এত ভয়! রোদে তাততে তাততে, তেতে ওঠা টিপু আর স্বাতীতে অথবা যে কোন একজন কি একাধিক মানুষে মানুষে ঘষা লাগতে লাগতে গোটা কোলকাতাই জ্বলে উঠল, আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছিল সারা পৃথিবীতে এমন হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এখন কি করবে টিপু?

টিপুর ভাবনা টিপুর। নিখিল আয়েস করে চিৎ হয়ে শুল। শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে গেল। পাতার ফাঁক দিয়ে অতর্কিতে সূর্য দেখে ফেলল। অন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামাল স্বাতীর দিকে। স্বাতীকে এই মুহূর্তে টলটলে জলের বিশাল একটা হ্রদের মত লাগছিল। কি ঠাণ্ডা! কি বিষণ্ণ! নিখিল ছোট্ট একটা নুড়ি ছোঁড়ার কথাও ভাবতে পারল না।

স্বাতী হঠাৎই বলল, তোর খুব খারাপ লাগছে তাই নারে? বলে হাতের ব্যাগ এমনি এমনি খুলল। বন্ধ করল। আঙুলে আঁচল জড়াচ্ছিল। —অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক, যা একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হল না!

সূক্ষ্ম মান অভিমানের ব্যাপার সব। নিখিলের ধাতে সয় না। বলল, বিচ্ছিরি ভাবলেই বিচ্ছিরি, নইলে কি আর! টিপুকে কেমন রাগানো গেল। হৈ হৈ করে ঝগড়া হল। রাগ বল, ঝগড়া বল, সবই [illegible] ন্যাচারাল এ্যাপিটাইজার, মেঘ ফেগ জমতে দেয় না।

—তোর আর কি! টিপু মুখ চোখ ভার করে বলল, তুইতো বলেই খালাস।

টিপু ভবিষ্যৎ ভাবছে। নিখিল কে? প্রেমের ফটোফাটার পুলটিসতো টিপুকেই লাগাতে হবে। ঝড় বাদলায় ছাতা ধরবে। রোদে আড়াল দেবে। মেরামতির দায়-দায়িত্ব সব টিপুর। মাঝখান থেকে নিখিল পোড়ামুখো ওদের হাসি, ওদের সুখ চুরি করে পকেটে নিয়ে বসে আছে।

নিখিল বলল, যা হবার তাতো হয়েই গেছে। তার চেয়ে বরং যা এখনো হয়নি সেটা বন্ধ করার জন্য কিছু করা যায় কিনা ভেবে দ্যাখ্।

টিপু বলল, আমি টোটাল সারেণ্ডার করছি।

—ওসব কেরেস্তানী সারেণ্ডার ফারেণ্ডারে কিস্সু হবে না। পুরো হিন্দু স্টাইলে ভাবতে হবে।

নিখিলের কথায় টিপু আরো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল। বলল আমার মাথায় কিছু আসছে না। তুই যা ভালো বুঝিস কর।

নিখিল যথাসাধ্য গম্ভীর হয়ে বলল, সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা সবাই মিলে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।

কি ভাবে?

টিপুর আগ্রহ এবং স্বাতীর জিজ্ঞাসার কোন ফাঁক নেই। নিখিল একটুও না হেসে বলল, বাদাম খেয়ে।

প্রথমে স্বাতী তারপর টিপু ঝর ঝর করে হেসে উঠল। এইতো বেশ! ওদের হাসি আর সুখ ওদেরই ফিরিয়ে দিতে পেরে স্বস্তি পেল নিখিল। নিজেকে কি যেন হালকা বোধ হচ্ছিল তার!

স্বাতী সুখের কাপড় গায়ে জড়াতে জড়াতে বলল, বেশ হয় তাহলে, কিন্তু ধারেকাছেতো একটাও বাদামওলা দেখছিনা।

—তাতে কি! দুঃখের মত সুখও বুঝি সংক্রামক টিপু স্বাতীকে বলল, পাপ করেছি এটা বুঝতে পারাটাই বড় কথা।

-তা বলে বাদামের কথাটা ভুললে চলবে না। স্বাতী হাসছে।—যে যন্ত্রের যে বিধান।

কিন্তু পয়সা দেবে কে?

যেন এর চাইতে বোকা প্রশ্ন আর হয় না এমন ভঙ্গিতে স্বাতী বলল, এ কি একটা কথা হল! পয়সা আমি দেব।

—না না, তুমি কেন? টিপু মাথা নাড়ছেতো নাড়ছেই। — আমার পাপ, প্রায়শ্চিত্তটাও আমিই করব। তোমার শেয়ারের প্রশ্নই ওঠে না।

—বারে! শেয়ারের কথা আসে কোত্থেকে? রোদ্দুরে হাঁটার কথা আমি বলেছি, বাদাম আমি খাওয়াব।

—খাওয়াতে চাও খাইও, তবে আজ নয়, আর একদিন হবে সেটা। আজ আমার পালা।

—কি করে তোমার হল?

—খুব সোজা। রোদ্দুরে হাঁটতে চাওয়া কোন পাপ নয়। পাপ হল তা নিয়ে গোলমাল পাকানো। আমি যদি—

—থাক্। স্বাতী টিপুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, কথায় কাজ কি? তার চেয়ে নিখিল আছে, নিখিলই বলুক পয়সাটা কার দেওয়া উচিত।

নিখিল যথেষ্ট বিবেচক। বলল, আমাদের তিনজনের।

বাঃ। টিপু নিখিলকে নস্যাৎ করে দিতে চাইল।—তোর আবার পাপ কি?

—ঐতো মজা! আমার পাপ গোপন পাপ, বাইরে থেকে চট্ করে কিছু বোঝা যায় না। অথচ সব জানলে পর এই তোরাই আমার মুখ দেখতে চাইবি না।

—খালি বাজে বাজে কথা! বলে স্বাতী রাগ খুলল। টিপুকে বলল, তার চেয়ে আমরা দুজনে দিই।

পয়সা দিতে গিয়ে টিপু ইচ্ছে করেই যেন স্বাতীর হাতটা বেশি করে ছুঁয়ে দিল। দেখার ভুল বলে মেনে নিতে আপত্তি ছিল না নিখিলের। কিন্তু স্বাতী চকিত কটাক্ষে যেভাবে তাকে দেখে নিল, রক্তোচ্ছ্বাস যেভাবে স্বাতীর গাল রঙ্গীন করে তুলছিল তাতে ব্যাপারটাকে চোখের ভুল বলে ভাবতে কোন মানেই হয় না। বরং নিখিলের ভালো লাগছিল এই ভেবে যে, তার আর কিছু করার নেই।

নিখিল শুয়ে ছিল। —পাপ ফিরতে ফিরতে বলল, তাহলে তোরাই পয়সা দে, বাদাম আন, ততক্ষণে আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। বাদাম খেয়ে শেষ করার আগে আমাকে মনে করে ডেকে দিস। আমি না খেলে প্রায়শ্চিত্ত পুরো হবে না বলে দিচ্ছি।

স্বাতী বলল, নিখিল, তুই উঠে বসতো। এসে থেকে সেই যে শুয়েছিস ওঠার নাম নেই।

-ইচ্ছে করলে তুইও শুয়ে পড়তে পারিস। কেউ আপত্তি করবে না।

নিখিলের পিঠে দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিল স্বাতী। টিপু বলল, কেন ওর পেছনে লাগতে যাচ্ছ? ও ঘুমোতে চাইছে ঘুমোক। বাদাম পেলে ডেকে দেব।

স্বাতী অবাক হয়ে বলল, ও কি সত্যি সত্যিই ঘুমোবে নাকি?

—নিখিল সব পারে।

পাঁচ

টিপু বলছিল, নিখিল সব পারে।

নিখিল জানে, নিখিল সব পারে না। কোন মানুষের পক্ষেই সব কিছু পারা সম্ভব নয়। তবে অন্য অনেকের সঙ্গে নিখিলের তফাৎ হল, অনেকে অনেক কিছুই পারে আর নিখিল পারে শুধু ঘুমোতে। ঘুম পেলে তার রক্ষে নেই। সেক্ষেত্রে বাস ট্রেন-বসা কি দাঁড়ানো কোনটাই কোন সমস্যা নয়। ঘুমোলে তার পৃথিবীও ঘুমোয়। তখন একটা মৃতদেহ বা নিখিলও তাই।

ওরা কথা বলছে। নিখিল ঘুমোচ্ছে ভেবে সতর্কতার খিল খুলে পোষাকের আড়াল থেকে কেমন স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসতে পারছিল। ভালোবাসার মত ওদের কথাবার্তা আচরণ কোন কিছুরই অর্থ ছিল না। থাকলেও নিখিলের বোঝার ক্ষমতা নেই।

টিপু বলছিল, অনেক অপেক্ষা করেছি। এরপর একদিন দেখো কি হয়, তখন আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

ইস্, কী আমার বীর পুরুষরে!

অপেক্ষা, একদিন, দোষ, বীরপুরুষ প্রত্যেকটা শব্দের মানে নিখিল জানে। কিন্তু সব মিলিয়ে কি হয় নিখিল বুঝতে পারছিল না। ফলে টিপু এবং স্বাতী ক্রমশই তার নাগাল ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। স্কুল থেকে যে টিপুকে সে চিনত, যে টিপু তার ছেলেবেলার বন্ধু—টিপুর ভাষায় সিজন্‌ড ফ্রেন্ডশিপ, এ যেন সেই টিপু নয়। অথবা স্বাতীর কথাই ধরা যাক, একই ইউনিভার্সিটিতে একই বিষয় নিয়ে একসঙ্গে পড়াশুনো, আড্ডা গল্প কি নয়। তবু মনে হচ্ছে, সে আর কেউ। আসলে ওদের যে স্বতন্ত্র ও নিজস্ব একটি পৃথিবী আছে সে পৃথিবীতে এলে টিপু চীৎকার করে কথা বলে, স্বপ্ন দেখে রঙিন রুমাল নিশানের মত ওড়ায় অথবা স্বাতী যে এত আলাদা, এত সুন্দর—হাসলে ওকে আরো সুন্দর দেখায় তার কিছুই জানতে পারেনি নিখিল। আজ যখন ওদের সেই পৃথিবীর ভুবনের দরজা হাট করে খুলে গেল, নিখিল হাজার চেষ্টাতেও তার চৌকাঠটুকুও ডিঙোতে পারছিল না।

নিখিল শুনতে পেল স্বাতী বলছে, একটা জিনিষ এনেছি, দেখবে?

—কই দাও।

টিপুর প্রসারিত হাতে কিছু একটা দিল স্বাতী। স্বাতীর গলা বাতাসের মত পাতলা, প্রায় শব্দহীন। বলল, আগে বলতো কি?

টিপু ভাবছে। স্বাতীর চোখে আকাশ একটু একটু করে বড় হচ্ছিল। সেখানে আকাশের রং লাল নীল সবুজ হলুদ কোনটাই নয়। ঠিক যে কি নিখিল স্বাতীর চোখে তারই সন্ধানে ফিরছিল।

—বলেই ফেলনা বাবা!

টিপু অস্থির হয়ে উঠছিল। উত্তরে স্বাতী মজার মুখ করে শুধু একটুখানি হাসল। সন্তর্পণে পা ঢাকল। বুকের কাছে কাপড়ের কুচি আরো ঘন করল। তারপর আর কিছু করার নেই দেখে হাঁটুর ওপর চিবুক পেতে চমৎকার একটা ছবি হয়ে গেল।

স্বাতীর হাসি, ঝলমলে শরীর, আশ্চর্য একটা বয়স, চোখের দৃষ্টি, অন্যদিকে টিপু, টিপুর অপেক্ষার হাত দুটো দেখতে দেখতে যা জানার সব জানা হয়ে গেল, নিখিলের এবং তারও পরে সে এক চেষ্টাতেই শোয়া থেকে উঠে দাঁড়াতে পারল। বলল, তোরা বস, গল্পসল্প কর, আমি চলি। এখন না গেলে পৌঁছোতে দেরি হয়ে যাবে।

নিখিল ঘাড় দেখল। স্বগতোক্তির মত করে বলল, একা দাঁড়িয়ে থাকবে।

স্বাতী জিজ্ঞেস করল, কে?

—তুই চিনবি না।

টিপু বলল, আমি?

তুইও না।

স্বাতী মেয়েলি কৌতুহল নিয়ে বলল, নামটা অন্তত বল।

—সময় হলেই বলব।

নিখিল আর দাঁড়াল না। ওর অনেক কাজ। শুধু তারই জন্য যে অপেক্ষা করে আছে প্রথমে তাকে খুঁজে বার করতে হবে। এত বড় পৃথিবীতে এত মানুষের মাঝখান থেকে একা একজনকে ঠিকমত চিনে খুঁজে বার করা চাট্টিখানি কথা নয়! তারপর তাকে নাম দিতে হবে। নাম ধরে ডাকতে হবে।

টিপুর স্তব্ধ বিস্ময়, স্বাতীর অসহায় দৃষ্টির নাগাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল নিখিল। কাঁধের ওপর সবে চাপিয়ে, সামনে দুদিকের পায়ে থাকা নিজের দীর্ঘ ছায়াটিকে ঠেলে ঠেলে পায়ের জোয়ার খেলে যাওয়া পথ অপসৃয়মান দোকানপাট, কাঁচের জিনিস, ওষুধের দোকান, রেস্তরাঁ, কখনো সখনো গাছ একা নারী দেখতে দেখতে চলতে চলতে নিখিল এক সময় হঠাৎ ভেতরে শোষ চেপে যাওয়ার মত উৎকণ্ঠা অনুভব করল। বুকে আস্ত একটা নদীর তৃষ্ণা।

আমার মা সহজেই তাঁর সিঙ্গার সেলাই কলে
আমাদের পোশাক বানিয়ে
সংসারের অনেক সাশ্রয় করতেন।
আমার ছেলেমেয়েদের পোশাক খুব তাড়াতাড়ি
ছোট হওয়ার কারণে, আমিও সাশ্রয় করছি
সিঙ্গারের মেরিট দিয়ে।

দুদিকে দুজন / তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় সিগারেটটাও পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পর প্রভাসের মনে হোলো আজ আর রুমা আসবে না। সিনেমা হাউসের লবিতে ভিড় জমে এসেছে, যারা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তারা ঢুকে পড়েছে ভেতরে। এতক্ষণে নিউজরীল এবং তেল-সাবানের বিজ্ঞাপনও ফুরিয়ে এলো প্রায়। এবার সে বোধহয় নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারে। এত দেরিতে কি রুমা আসবে?

অবাক হয়ে প্রভাস দেখলো সে বেশ হালকা বোধ করছে। এ তো ভারি মজা! রুমা না এলে যদি সে খুশি হয়, তাহলে রুমাকে সে কথা দিতে গেলো কেন? অথবা সে নিজেও তো না এলে পারতো। অন্যায় হয়ে যাচ্ছে—এ কথা বুঝতে পেরেও সে নিজেকে ফিরিয়ে নিচ্ছে না কেন? পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিতে নিতে প্রভাস যেন হঠাৎ উপলব্ধি করলো এক গভীর খাদের ধারে সে স্বেচ্ছায় এসে দাঁড়িয়েছে। কারো দোষ নেই, সে নিজে এসেছে এখানে। আর এক পা এগিয়ে গেলেই তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। অথচ সে মোটেই সাবধান হচ্ছে না। হিউম্যান রিমোট কন্ট্রোল বলে কিছু আছে নাকি? রুমা কি ম্যাজিক জানে?

এর চেয়ে বেশি ভাববার সময় পেলো না প্রভাস। চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সে রুমার মুখোমুখি হয়ে গেলো।

—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো, না? যা ঝামেলায় পড়েছিলাম। বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি—এমন সময় পিসিমা এসে হাজির। অনেক কষ্টে ছাড়া পেয়েই ছুটে [illegible]।

আবার অবাক হয়ে প্রভাস অনুভব করলো তার মন ভালো হয়ে যাচ্ছে। সামনের খাদটার কথা আর মনে নেই। [illegible] সে বললো—চট করে চলো, এখুনি ছবি আরম্ভ হয়ে যাবে। বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে।

হলের ভেতরে একটা [illegible] ঠাণ্ডা ভাব। বেশ লাগে। [illegible]

প্রভাসের নাকে গন্ধটা ভেসে এলো। পাশে সামান্য ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলো প্রভাস, কি মেখেছো বলো তো? সুন্দর গন্ধ?—

অন্ধকারে চোখ বড় বড় করে রুমা বললো, কি সাংঘাতিক নাক রে বাবা! এরই মধ্যে টের পেয়েছো?

—বলো না কি?

—অত জানতে হয় না। ভালো লেগে থাকলে বসে বসে শোঁকো।

রুমা মুগ্ধ হয়ে ছবি দেখছে, প্রভাস সন্তর্পণে মাড় ঈষৎ ফিরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বাতানুকূল প্রেক্ষাগৃহ, পর্দা থেকে ছিটকে আসা সামান্য আলো, রুমার অসামান্য প্রোফাইল, সব মিলিয়ে যেন রিমঝিম শব্দ তুলছে পাঁজরের মধ্যে।

ছোটবেলায় একটা মফস্বল শহরে মানুষ হয়েছে প্রভাস। যে বাড়িতে তারা ভাড়া থাকতো তার পাশেই গুরুপদবাবুর ফ্ল্যাট। গুরুপদবাবুর বৃদ্ধা মাকে পাড়ার সবাই দিদিমা বলে ডাকতো। প্রভাসের মা-ও, প্রভাসও। সন্ধেবেলা দিদিমা তাঁদের বাড়ির ছাদে পাড়ার বৌ-ঝিদের নিয়ে আসর বসাতেন। গল্পের লোভে মায়ের আঁচল ধরে প্রভাসও যেতো। দিদিমার একটা গল্পের কথা তার এখনো পরিষ্কার মনে আছে— নিশিতে পাওয়ার গল্প। কি করে গভীর রাত্তিরে ঘুমন্ত মানুষের জানালার কাছে এসে নিশি ডাকে, বাছবিচার না করে সেই মানুষ উঠে চলে যায় নিশির ঘোরে। শুনতে শুনতে তখন ভয়ে উদ্বেগে বুকের মধ্যে কেমন করতো।

চিন্তা করে দেখতে গেলে এ-ই বা নিশির ডাকের চেয়ে কম কি? রুমার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ভূতগ্রস্তের মতো সে কি ভয়ানক সর্বনাশের দিকে পা বাড়িয়েছে!

আবার আড়চোখে রুমার দিকে তাকালো প্রভাস। একটু মাথা হেলিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে রুমা। ওর কোনো দোষ নেই, ও তো জানেনা প্রভাস কি খারাপ লোক!

প্রভাসের পাশের অফিসেই রুমা কাজ করে। মাস ছয়েক হলো ঢুকেছে। দুই অফিসের লোক মিলে একটা পিকনিকের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো গত শীতে। সেইখানেই আলাপ। ও বসে সিগারেট খাচ্ছে, রুমা এসে বলেছিলো—এই যে, শুনছেন?

—আমাকে বলছেন?

—আবার কাকে? ওই ওধারের কল থেকে এক বালতি জল এনে দেবেন? মাংসটা ধুয়ে ফেলি—

রুমাকে দেখতে ভালো লাগার এক-কথায় রাজী হয়নি। অবশ্য তখনো ওর মনে অন্য কোনো ইচ্ছে বাসা বাঁধে নি। নিতান্ত রসিকতার সুরেই হেসে বলেছিলো—এতো লোক থাকতে আমারই কাছে আসতে হলো?

—ভারি ফাজিল লোক তো আপনি! জল এনে দেবেন কিনা বলুন, নইলে আমিই নিয়ে আসছি।

প্রভাসের মজা লাগলো মেয়েটির অসংকোচ ব্যবহারে। প্রথম আলাপেই কাউকে 'ফাজিল' বলা চাট্টিখানি কথা নয়। সে বললো—হুকুম মানতেই হবে?

—হুকুম বলেন হুকুম, অনুরোধ বলেন তো তাই। আপনি না গেলে আমাকেই যেতে হয়। বাকিরা তো দেখছি তাস-ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত।

—থাক, আমাকেই দিন। আপনার হাত যা দেখছি, ও জলভরা বালতি টানবার জন্য তৈরি হয়নি।

—তবে কিসের জন্য তৈরি হয়েছে?

—পরে বলবো। সুযোগ পেলে। দিন বালতিটা।

এটা একজন সহকর্মিণীর সঙ্গে সাধারণ নির্দোষ কথোপকথন। এরকম রসিকতা ঘটেই থাকে। কিন্তু প্রভাসের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যের এই শুরু। পিকনিকের দিন আরো অনেক কথা হলো রুমার সঙ্গে। রুমাও যেন ইচ্ছে করে বেশি বেশি মনোযোগ দিলো ওর দিকে। প্রভাস অভিজ্ঞ লোক, সে বুঝতে পারলো ঠিকই, কিন্তু বাধা দিলো না: তখনই কায়দা করে আসল ব্যাপারটা রুমাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিলো। এখন রুমার আশ্চর্য মাদকতায় সে অবশ হয়ে পড়েছে। মাতালের প্রতিজ্ঞার মতো রোজ সে বাড়ি থেকে ঠিক করে বের হয় আজ রুমাকে প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে দেবে, কিন্তু দূর থেকে পানাগার দেখতে পেলে মদ্যপের সংকল্প যেমন বাতাসে উড়ে যায়, তেমনি রুমার বহ্নিজ্বালাময় শরীরের সান্নিধ্যে এলে আর কোনো কথা থাকে না।

প্রভাস বিবাহিত। তার বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখী। মানসী, তার বৌ, ডানাকাটা পরী না হলেও দেখতে ভালো এবং এতোদিন কোনো উপলক্ষে এক জায়গায় হলে বন্ধুদের তার বৌয়ের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাতে দেখে সে মনে মনে বেশ গর্বিত বোধ করেছে। মানসী গ্র্যাজুয়েট, কোলকাতায় আজীবন মানুষ, শিল্পে রুচি আছে, ভালো ইংরিজি বলতে পারে—তার মতো স্ত্রী থাকতে কেউ অসুখী হতে পারে না। অথচ প্রভাস রুমার সঙ্গে কেমন জড়িয়ে গেলো। এখন যাকে বলে হাই টাইম, এখন তার সবকিছু ফাঁস করে দেবার সময় হয়েছে। কারণ এর মধ্যে রুমার মনের প্রশ্নও জড়িত। প্রভাসকে অবিবাহিত ভেবে সে ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে চলেছে। এরপর সে যখন আসল পরিস্থিতি জানতে পারবে তখন কি হবে? এই আঘাত সহ্য করবার মতো মনের জোর তার আছে কি? একটি নিরপরাধ মেয়েকে কেন জটিল দুঃখের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে প্রভাস? রুমা তাকে চিরদিন ঘৃণা করবে।

যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। রুমার ঘৃণাকে তার দুহাত পেতে নিতেই হবে। কিন্তু সেই ঘৃণার ভার ইচ্ছে করে আর বাড়ানোর কোনো মানে হয় না।

এই অস্বাভাবিক খেলায় ঈশ্বরও তাকে সাহায্য করেছেন। কোলকাতা এসব ব্যাপারে অতি ছোট শহর। অথচ কখনো রুমাকে নিয়ে ঘোরার সময় সে কোনো পরিচিত লোকের মুখোমুখি হয়ে পড়েনি। পাশের অফিসে নতুন এসেছে বলে রুমা প্রথমে তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জেনে উঠতে পারেনি। নিজের ভয়ের জন্য প্রভাস খুব সাবধানে মেশে রুমার সঙ্গে, অফিসের ভেতরে কখনো কথাও বলে না। দেখা হলেও না। কাজেই তাদের মেলামেশা কারো চোখে পড়েনি। পড়লে রুমা হয়তো সবকিছু জানতে পারতো। অনেকদিন হয়ে গেছে বলে আজকাল রুমার সঙ্গে দেখা হলেই প্রভাস চকিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। জানতে পেরেছে কি? ভয় হয়, এই হয়তো রুমা বলে উঠবে, ছিঃ! আমি জানতাম না আপনি এইরকম! কেন খেলা করলেন আপনি আমার সঙ্গে?

কিন্তু দিন যায়, তেমন কিছুই ঘটে না। প্রতিদিনই রুমা এসে হাসিমুখে বলে, কি? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো বুঝি? দিনের পর দিন বেঁচে যাচ্ছে প্রভাস।

ইন্টারভ্যালে রুমা বললো, পপ্ কর্ন খাবো, কেনো।

এক প্যাকেট পপ্ কর্ন কিনে রুমার হাতে দিয়ে প্রভাস বললো, এতে যে কি স্বাদ আছে তুমিই জানো, কয়েকটা ভুট্টার খইতে একছিটে সরষের তেল দেওয়া। বাড়িতে এই জিনিস বানিয়ে দিলে তুমি খেতেই চাইবে না—

রুমা বললো, ঠিকই তো। বাইরের জিনিসের স্বাদ আলাদা। বাড়িতে আবার কেউ এ খায় নাকি?

রুমার সুন্দর মাথা নাড়ার ভঙ্গি দেখতে দেখতে প্রভাস ভাবলো সে তার তুরুপের তাস হাতে রেখে দিয়েছে। যেহেতু আজ পর্যন্ত রুমা তাকে স্পষ্ট করে বলেনি 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বা 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই', সেহেতু প্রভাস কোনো মতেই তার কাছে কোনোভাবে দায়বদ্ধ নয়। কারণ সে নিজেও এমন কথা কোনোদিন রুমাকে বলেনি। অবশ্য এসব কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, উভয়ের ব্যবহারেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। একজোড়া যুবক-যুবতী রোজ একান্তে নিশ্চয় অদ্বৈতবেদান্ত নিয়ে আলোচনা করবার জন্য দেখা করে না। কিন্তু তবুও ফরম্যাল প্রস্তাবের একটা গুরুত্ব আছে। এক্ষেত্রে সেটা গভীরভাবে ক্রিয়া করবে। রুমা জানবার পর বেশি হৈ চৈ করলে বা কেলেঙ্কারী ঘটবার উপক্রম হলে প্রভাস এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে। প্রভাস বলতে পারবে, আমি নির্দোষভাবে বন্ধুর মতো মিশেছিলাম। তুমি যে অন্যরকম ভাবছো সে কথা আগে বলোনি কেন?

সিনেমা দেখে বেরিয়ে ওরা দুজন চা খেলো একটা ছোট দোকানে বসে। তারপর রুমাকে বাসে তুলে দিয়ে ট্যাক্সির খোঁজে চারদিকে তাকালো প্রভাস। নাঃ, কাছাকাছি একখানাও নজরে আসছে না। সিগারেট খাওয়ার জন্য প্যাকেট বের করে দেখলো সেটা খালি। রাস্তার ওপারে পান-

সিগারেটের দোকান। প্রভাস রাস্তা পার হয়ে দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আজকাল সব পানের দোকানেই আয়না আর রেডিও থাকে। এখানেও খদ্দেরের দেখার পক্ষে সুবিধেজনক জায়গায় একটা বিরাট আয়না লটকানো। আয়নায় চোখ পড়তেই আশ্চর্য হয়ে গেলো প্রভাস। এঃ, ভারি চোর-চোর চেহারা হয়ে গিয়েছে ত! সুকুমার রায়ের কবিতার নোংরাপানা ভূতের ছানার মতো। নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে বদমাইশ বলে মনে হলে বড়ই দুঃখের কথা।

—কি দেবো বাবু?

চমক ভেঙে প্রভাস বললো, ওই তোমার ইয়ে, এক প্যাকেট সিগারেট দাও—

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত। প্রথমবার উত্তেজনা কেটে যাওয়ার পর আজকাল রুমার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরতে অস্বস্তি হয়। যেন ওর মুখ দেখলেই সবাই ধরে ফেলবে ও এতক্ষণ কোথায় ছিলো। নিজের মনের কাছে তো ফাঁকি চলে না।

শোবার ঘরে ওয়ার্ডরোব খুলে জামাটা হ্যাংগারে টাঙিয়ে রাখছে, মানসী বললো, কি ব্যাপার, এতো দেরী হলো যে?

অন্যমনস্কতার ভান করে প্রভাস বললো, দেরী আর কি। বেশি রাত হয়নি তো।

—বেশি রাত হয়নি! ঘড়িটা দেখ দিকি একবার। ছিলে কোথায় তাই বলো সত্যি করে।

প্রভাস চট করে মানসীর দিকে তাকালো। ও তো এমন জেরা করে না কোনদিন। হলো কি আজ? কেউ পথে দেখতে পেয়ে বলে দিয়েছে নাকি মানসীকে?

প্রভাসের শরীর ঘেমে উঠলো। মানসীও যেন কেমন চোখে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। অফিসে ফাইল ক্লিয়ার করতে গিয়ে দেরী হয়ে গেছে—এই কথা বলে আজ সামলাবে ভেবেছিলো বাড়িতে ঢোকবার আগে। প্রভাস একজন অফিসার গ্রেডের কর্মী, তার এরকম দেরী হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এখন সে কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না মনে হচ্ছে। মানসীর মনে সন্দেহ হলে কাল ও অফিসে অনায়াসেই জেনে নিতে পারে প্রভাস কখন অফিস থেকে বেরিয়েছিলো। অফিসে কিছু প্রভাস বলে রাখতে পারে না—আমার বৌ ফোন করলে মিথ্যে কথা বলবেন।

শুকনো গলায় প্রভাস বললো, তুমি অমন করে কথা বলছো কেন বলো তো? যেন উকীলের জেরা—

—কোথায় ছিলে তা কিন্তু তুমি বললে না। প্রভাস হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বললো—তোমার যেন আজ কি হয়েছে—থাকবো আবার কোথায়, আশুর জন্য মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম, ওর বিয়ের কথা হচ্ছে। বন্ধুর জন্য মেয়ে দেখতে যেতে নেই? তুমি এমন করছো—

—কোন আশু?

এবার একটু সাহস ফিরে পেলো প্রভাস। মানসী জানতে পারেনি কিছু নিশ্চয়, নইলে এতক্ষণ শান্ত থাকতো না। এটা দেরী করে বাড়ি ফেরায় স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রাত্যাহিক অনুযোগ।

প্রভাস বেশ জোর দিয়ে বললো, কোন আশু আবার? আমাদের আশু রায়। ক'টা আশু আছে?

তারপর বৌয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, এবার তুমি পরিষ্কার করে বলো তো তোমার কি হয়েছে? এত জেরা করছো কেন? আমার খারাপ লাগছে—

প্রশ্নটা করে প্রভাস উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করে রইলো। এই বুঝি মানসী বলে বসে, আজ যে মেয়েটার সঙ্গে ঘুরছিলে, সে কে শুনি?

কিন্তু সেসব না করে মানসী তার কাছে আরো এগিয়ে এসে বললো, একটা সত্যি কথা বলবে?

—প্রশ্নটা শুনি।

—তুমি মদ ধরোনি তো?

প্রভাস হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো।—মদ! হঠাৎ এ কথা মনে হলো যে তোমার? বাপ্বাঃ! পারোও তোমরা। মদ খেয়ে কেউ এরকম সুস্থভাবে বাড়ি ফিরতে পারে? পা টলতো না? মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুতো না?

মানসী বললো, তুমি এদিকে সরে এসে হাঁ করে নিঃশ্বাস ফেলো তো—

প্রভাস এগিয়ে এসে মানসীর দুই কাঁধ খামচে ধরে হাঃ করে বিরাট নিঃশ্বাস ফেললো মানসীর মুখের সামনে।

—কি হলো, পেলে মদের গন্ধ? পাগলী কোথাকার! মানসীর চুল এলোমেলো করে দিয়ে একটু আদর করলো প্রভাস। জড়িয়ে ধরে আর একটু বাড়াবাড়ি করার চেষ্টায় ছিলো, কিন্তু মানসী হাত দুটো সামনে এনে সামান্য ব্যবধান তৈরি করে বললো, যাঃ, কি হচ্ছে! পাশের বাড়ির ছেলেটা রোজ এই সময় ছাদে উঠে এদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে—

মানসীর চিবুক ধরে নেড়ে দিয়ে প্রভাস বললো— তোমাকে দেখে। দাও না একটু সুযোগ করে বেচারীকে।

আদরের সুরে মানসী বললো, ঝামেলা কোরো না।

—আচ্ছা, তুমি কি বলে ভাবলে আমি মদ ধরেছি? কেন একথা মনে হলো তোমার?

—বারে! তুমিই তো বলেছিলে তোমাদের অফিসে কে এক মজুমদারবাবু আছে, খুব মদ খায়।

—আছে তো!

—সে নাকি মানুষ ধরে ধরে মদ খাওয়া শেখায়। তাও তো তুমিই বলেছো। এত রাত্তির করে বাড়ি ফিরলে ভয় হবে না? কেমন মেয়ে দেখলে?

বিপদ থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়ার একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে, প্রভাসের মনে এখন সেই আনন্দ। সে হেসে বললো, ওই এক-রকম। ভালো করে দেখেছি নাকি ছাই! তুমি ছাড়া আর কারোর দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করে না—

মেয়েদের ভোলানো কতো সোজা: একটু ভালো কথা, একটু আদর—ব্যস, অমনি সব ঠাণ্ডা। মানসীর আনন্দিত মুখের দিকে তাকিয়ে প্রভাসের হঠাৎ কেমন দুঃখ হলো। সে জানে মানসী কি ভয়ানক ঠকে যাচ্ছে অথচ মানসী তা জানে না। স্বামীর প্রতি সরল বিশ্বাসে এখন ওর মুখের আদল নরম হয়ে আছে। সাধারণত মানুষ অন্যায় করলে সেই অন্যায়ের স্বপক্ষে সে একটা যুক্তি তৈরি করে নেয়। তার নিজস্ব যুক্তি। নিজেকে কেউ সহসা খারাপ বলে ভাবতে চায় না। কিন্তু প্রভাস মনের তলা অবধি হাতড়ে তেমন কিছু পেলো না। মানসীকে ঠকানোর পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।

রাত্তিরে খাওয়ার পরে দিনের শেষ সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে নীলচে নাইলনের মশারী তুলে বিছানায় উঠলো প্রভাস। মানসী আগেই শুয়েছে, কিন্তু ঘুমোয় নি। খেয়ে উঠে ও ঘরে কি খুটখাট করছিলো। এখন চোখের ওপরে বাহু আড়াআড়ি রেখে শুয়ে আছে। কিন্তু দেখেই বোঝা যায় সে এখনো ঘুমোয়নি।

ঘরে নীলরঙের একটা নাইট-ল্যাম্প জ্বলছে। মশারীর রঙের সঙ্গে আলোটা সুন্দর ম্যাচ করেছে। সম্প্রতি মশারীটা কিনিয়েছে প্রভাস, প্রত্যেকদিন শুতে এসে এই মৃদু রঙটা চোখে পড়লে তার মনে হয় আজ সে একটা ভালো স্বপ্ন দেখবে।

আজ কিন্তু ঘুম আসছে না। কানের নিতান্ত কাছ ঘেঁষে তাঁর গিয়েছে আজ। শরীর ও মনের ভেতর যুগপৎ কি একটা অস্বস্তি হচ্ছে।

বিবেক?

আপন মনে হাসতে গিয়েও হাসি ঠিক ফুটলো না। পৃথিবী অনেক এগিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আজও 'বিবেক' কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মানসীর প্রতি যদি তার ভালোবাসা না থাকতো, অথবা তাদের দুজনের ভেতর যদি কোনো মনোমালিন্যের ঘটনা থাকতো, তাহলে নিজেকে প্রবোধ দেবার ব্যাপারটা সহজ হতো তার কাছে। নিজে বাগানের মালিক হয়ে কেউ অপরের গাছের ফল চুরি করতে যায় না। কিসের মোহ তবে? রুমার শরীর? হ্যাঁ, রুমার তন্বী শরীরের যে ভয়ানক মাদকতা আছে তা সে অস্বীকার করছে না। কিন্তু সে বিবাহিত, বেশ কিছুদিন বিবাহিত জীবনযাপন করার পরে নারীদেহ তার কাছে আর কোনো অজানা রহস্যের স্বর্গস্বার নয়! এইখানে এসে রোজই প্রভাস আটকে যায়—আর থই পায় না।

হাত দিয়ে অনাবৃত কোমরের কাছে একটা মশা তাড়ালো মানসী। প্রভাস বললো, মশা নাকি?

—হুঁ।

চোখের ওপর থেকে হাত সরালো না

নসী, তার গলার স্বর ভারী। প্রভাস
কটু অবাক হলো। বললো, ঘুমোও নি?

—না।

শোবার পর আধঘন্টাখানেক গল্প
রতে ভালোবাসে মানসী। আজ কি হলো
র? সব তো মিটে গিয়েছে একটু আগে,
াবার এসব কি তাহলে? গুরুতর একটা
কছুর ইঙ্গিত স্পষ্ট। পরিস্থিতি হাল্কা
রার জন্য প্রভাস বললো, ঘুমোবে কি?
মশা, এক একটা যেন ডানাওয়ালা
দুরের বাচ্চা! ঢুকলো কি করে?

উত্তর নেই।

প্রভাসের তালুর কাছটা শুকিয়ে
ঠলো, আঙুলের ডগাগুলো যেন ঠাণ্ডা
ছে। বেফাঁস কিছু হয়ে গিয়েছে নাকি?

মানসীর গায়ে একটা হাত দিয়ে নিজের
কে টেনে আনবার চেষ্টা করতে করতে
বললো, কি হয়েছে তোমার? চুপ করে
াছো যে? এখনো রাগ রয়েছে? এসো,
ক করে দিচ্ছি—

বাধা না দিয়ে মানসী সরে এলো কাছে,
ন্তু তার দেহ শ্লথ ও নিস্তেজ। প্রভাস
লো, কি হয়েছে বলো আমাকে—না
লে কি করে বুঝবো? বলবে না?

আস্তে আস্তে চোখের ওপর থেকে
সরালো মানসী। তার দুই চোখে জল।
ভিজে আছে চোখের চারদিক।

—কি হয়েছে বৌ?

—কাল সকালে ধোপা আসবে। তাকে
ওয়ার জন্য কাপড় গুছিয়ে রাখতে গিয়ে
মার প্যান্টের পকেট থেকে এইগুলো
লাম—

বালিশের তলা থেকে কি যেন বের
র তার সামনে মেলে ধরলো মানসী।

সিনেমার টিকিটের কাউন্টারফয়েল
খানা!

ওঃ! মূর্খ সে! কি অসাবধানী!
কবারও তার সিনেমার টিকিট দুটো ফেলে
বার কথা মনে আসেনি।

মানসী আবার বললো, এতে আজকের
রিখ রয়েছে। ইভনিং শোয়ের টিকিট—

তারপরেই হঠাৎ বালিশে মুখ গুঁজে
ফুঁপিয়ে বললো, তুমি আমাকে মিথ্যে কথা
লে কেন? বলো—

প্রভাস আবার শক্ত হয়ে গিয়েছে। যা
কে কপালে, আজ পুরোপুরি লড়ে যেতে
ব। অভিনয় যখন করেইছে, তখন নিখুঁত
ভিনয় করতে হবে।

মানসীর দিকে কাত হয়ে তার পিঠে
ত রাখলো প্রভাস। বললো, কি ছেলে-
নুষী করছো বৌ, ছিঃ। আমার কথাটা
গে শোনো। তুমি তো জানো আমি
মাকে কিরকম ভয় পাই। আজ আশু
লো কিনা—চল একটা সিনেমা দেখে
সি—ওকে এড়াতে না পেরে তাই একটা
জে ছবি—মানে, তুমি রাগ করবে সেই
বলতে পারছিলাম না। এখন দেখছি
দিলেই ভালো হতো। তুমি জিনিষটা
তা সিরিয়াসলি নেবে জানলে আমি কি
মিথ্যে বলতে যাই? দেখি, এদিক হও।
উঃ, কি রাগ তোমার! দেখি মুখ?

একটুখানি মুখ তুলে মানসী বললো,
সত্যি বলছো?

—বারে! তোমার কাছে মিথ্যে বলে
আমার লাভ কি? নাও, আর মুখ গোমড়া
করে না থেকে একটু হাসো তো—

এক ঝলক হেসেই প্রভাসের বুকের
মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে মানসী বললো,
আমি সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

—কেন? তুমি কি—তুমি কি ভেবেছিলে
আমি কোনো সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে
তাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছি?

কথাটা ঝপ করে বলে ফেলে কিরকম
ভয় করছিলো প্রভাসের। বলবার সময় তার
মুখ অন্যরকম দেখায়নি তো?

মানসী বললো, যাঃ, আমি বুঝি তাই
বললাম?

—তবে?

—সিনেমার ব্যাপারটা আমি বুঝতেই
পেরেছিলাম তুমি অফিসের কোনো বন্ধুর
পাল্লায় পড়ে গিয়ে আমার কাছে চেপে
যাচ্ছো। সে ভয় না। ওই মজুমদার
সাহেবের কথা শোনবার পর থেকে আমার
যা ভয় করে না।

মানসীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে
দিতে প্রভাস হেসে বললো, একেবারে
পাগল—আমি মদ ধরতে পারি বলে তোমার
মনে হয়?

আর ভালো লাগছে না প্রভাসের। আজ
এখন মানসী ঘুমিয়ে পড়লে ভালো হয়।
মদ তো সামান্য কথা, আরো কতো
সাংঘাতিক কাজ যে প্রভাস করতে পারে
সেই কথা ভেবে সে নিজেই অবাক হয়ে
যাচ্ছে। পরম নির্ভরতার দৃষ্টি চোখে নিয়ে
মানসী বুক থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে
তার দিকে। সেদিকে স্পষ্ট করে তাকাতে
পারছে না প্রভাস। অকারণ কেন এমন
খেলায় সে নামলো? এখন সবদিক সামলাতে
পারবে তো সে? সব জেনে ফেলবার পর
রুমা যদি আত্মহত্যা করে? যদি নিদারুণ
রাগে তার বাড়ি এসে মানসীকে সব বলে
দেয়? তাহলে তার সাধের সংসার কাল-
বৈশাখী ঝড়ের সামনে রঙীন কাগজের
টুকরোর মতো কোথায় ভেসে যাবে তার
ঠিক নেই। এমন করে আর বোধহয় কখনো
ভাবেনি প্রভাস। সে বুঝতে পারছে সে
মানসীকে কতোখানি ভালোবাসে। সারাদিন
বাইরের রূঢ় পৃথিবীটার সঙ্গে যুদ্ধ করে
দিনশেষে নিজের সংসারের এই পরিচিত
আরামটুকু তার চাই-ই। একটা অভ্যাসের
প্রশ্নও আছে। অনেকদিন ধরে মানসী তার
পাশে থাকে। ঘুমের মধ্যে কখনো হাত
বাড়ালেই পাশে মানসীর নরম শরীরের—
পরিচিত শরীরের উষ্ণ নৈকট্য সে অনুভব
করতে পারে। এখন সেখানে অন্য কাউকে
সে সহ্য করতে পারবে কি? না বোধহয়।
শোনা যায় কতো লোক বৌ থাকতেও অন্য
মেয়েকে নিয়ে ইলোপ করেছে, যাঁধা রক্ষিতা

দেখেছে খারাপ পাড়ায়—অথবা বৌকে লুকিয়ে প্রেম করে চলেছে অন্য কারো সংগে। এতদিন সেসব নেহাৎ গালগল্প বলে মনে হয়েছে। তার নিজের জীবনে সেটা যে রীতিমতো একটা বাস্তব সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানতো। কিছুই অসম্ভব নয় দেখা যাচ্ছে।

নিজেকে গভীরভাবে বিচার করে প্রভাস দেখলো রমা ও মানসী—দুজনকেই সে ভালোবাসে। তবে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর বিচারে বারবারই মানসী জিতে যাচ্ছে। ভালোবাসে দুজনকেই, কিন্তু তেমন প্রয়োজন উপস্থিত হলে বরং রমাকে সে ছেড়ে দিতে রাজী আছে—কিন্তু মানসীকে ছাড়া তার চলবেই না। এই যদি তার মনের অবস্থা হয়, তাহলে রমাকে সে আর কাছে আসতে দেবে না, দেওয়া উচিত না।

মানসীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে প্রভাস বললো, ঘুমোও বৌ, ঘুমোও। কোনো ভয় নেই—ঘুমোও তুমি।

রবিবার। প্রভাস বেড়াতে বেড়িয়েছে মানসীকে নিয়ে। হলুদ রঙের জমির ওপরে চওড়া ছুঁতে পাড় বসানো পিওর সিল্কের শাড়িতে বৌ-কথা-কও পাখির মতো দেখাচ্ছে মানসীকে। দেশপ্রিয় পার্ক রোডে প্রভাসের মেসোমশাই থাকেন, সেখানে বিকেলটা কাটিয়ে আপাততঃ বাড়ি ফিরছে তারা। সুন্দরী বৌ নিয়ে রাস্তায় বেরুনোর একটা আনন্দ আছে। মানসীর দিকে কেউ তাকিয়ে দেখলে প্রভাসের মনে ভয়ানক গর্ব হয়। যেন মানসীকে যে সুন্দর দেখাচ্ছে, তার সবটুকু কৃতিত্ব তারই। গল্প করতে করতে সে আড়চোখে সবার দিকে তাকিয়ে দেখে।

একটা নোংরা চেহারার বাচ্চা মেয়ে এসে ভিক্ষে চাইলো। প্রভাস ধমক দিয়ে বললো, যা ভাগ—আগে দেখ—

মানসী বললো, আহা, অমন করছো কেন? দাঁড়, তুই—

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা দশ পয়সা বের করে মেয়েটাকে দিতেই সে ফিক করে হেসে দৌড়ে পালালো।

মানুষ রয়েছে চারদিকে। মহানগরীর অজস্র মানুষ আপন আনন্দে বেঁচে রয়েছে. হাসছে, কাঁদছে। ওই ভিখিরি মেয়েটার মতো, তার অফিসের বেয়ারার মতো—ভাড়ার আশায় বসে থাকা সামনের ওই বুড়ো রিকসাওয়ালাটার মতো—সব মিলিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা খুশী খুশী স্বাদ ছড়িয়ে পড়ছে। কেবল প্রভাস এর থেকে আলাদা। জেনেশুনে সে একটা সামাজিক ও মানবিক অপরাধ করে চলেছে বলে এই আনন্দযজ্ঞে তার নিমন্ত্রণ নেই।

বিয়ের পরে পরেই, আজ বছর তিনেক আগে কথা, প্রভাস মানসীকে নিয়ে কোলকাতা থেকে মাইল তিরিশেক দূরে তার এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলো। এক সঙ্গে কলেজে পড়েছে, বন্ধুটি এখন নারাণপুরের হাইস্কুলে হেডমাস্টার। ধানখেত, আম-জাম-কাঁঠালের বনের মধ্যে ইস্কুল। ছাত্ররা হাঁটু অবধি ধুলো নিয়ে সেলাই করা জামা পরে পড়তে আসে। প্রভাস জিজ্ঞাসা করেছিলো—তোর খারাপ লাগে না কানাই? কত বড়ো আদর্শ ছিলো তোর। এভাবে একটা গ্রামের স্কুলে—

বন্ধু হেসে বলেছিলো—না রে, বেশ লাগে। জীবন নিয়ে তো কথা, জীবন এখানে আমার ভালোই কাটে।

শহরে সব মিশে গিয়ে জীবন বড়ো জটিল হয়ে আছে। এখানে রয়েছে নিজেকে অনেক দূরে বিস্তৃত করে দেওয়ার অবকাশ। কতো সবুজ দেখেছিস চারদিকে? ফুল ফোটে, ফল ধরে, পাখি গান গায়—না রে, আমি ভালোই আছি। তোদের হিংসে করি না।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে তিনজনে একটা বড়ো বটগাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলো, হঠাৎ এলো বৃষ্টি। মাঠের ওপারটা ধোঁয়া ধোঁয়া দেখাচ্ছে. ল্যাজ তুলে বাড়ির দিকে দৌড়ে যাচ্ছে গরু—বাতাসে ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ।

আজ বিকেলে রাসবিহারী এভেনিউ ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রভাসের হঠাৎ সেই সোঁদা মাটির গন্ধটার জন্য মন কেমন করে উঠলো। যুগান্তের ওপার থেকে এই গন্ধ তার নাকে ভেসে এলো যেন আজ। প্রভাসের মনে হলো ভেজা মাটির গন্ধটার সংগে তার জীবনের সমস্ত সুখ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। এটা তার সততার, তার দুশ্চিন্তাহীন সরল জীবনযাত্রার প্রতীক। আর একবার মাঠে দাঁড়িয়ে দিগন্ত অন্ধকার করা বৃষ্টির মধ্যে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না? রক্তে নতুন স্পন্দন অনুভব করা যায় না?

আচ্ছা, সে যদি কাল চার-পাঁচদিনের জন্য ছুটির দরখাস্ত করে? যদি মানসীকে নিয়ে চলে যায় নারাণপুরে কানাইয়ের কাছে? তাহলে তো সেই মাঠ. সেই বটগাছ, সেই আদিগন্ত মাঠের নীরব শান্তি আবার তাকে ছুঁয়ে যাবে?

না, সে আশা প্রভাস আর করতে পারে না। আনন্দ পেতে হয় মনে। মলিন দর্পণে প্রতিচ্ছবি ফোটে না। তার সংগে পৃথিবীর যাবতীয় পবিত্র আনন্দের এখন বিপুল দূরত্ব, কারণ আর একজনের পবিত্র বিশ্বাসকে সে হত্যা করেছে।

রাসবিহারী আর ল্যান্সডাউনের মোড়ে পথের ওপর একটা ফুলের দোকান বসে। মানসী তার দিকে তাকিয়ে বললো, আমাকে একটা যুঁইয়ের গোড়ে মালা কিনে দেবে? মাথায় জড়াবো—

—বেশ তো পছন্দ করো না।

মানসী ঝুঁকে পড়ে ফুল পছন্দ করছে, হঠাৎ প্রভাসের চোখ পড়লো রাস্তার উল্টো দিকের ট্রাম স্টপে।

সেখানে রমা দাঁড়িয়ে আছে। সংগে একজন প্রৌঢ়া মহিলা, বোধহয় ওর মা।

প্রভাস আর রমা একেবারে মুখোমুখি, মাঝখানে কেবল রাস্তার ব্যবধান। রমা একবার এদিকে তাকালেই তাকে দেখতে পাবে।

প্রথমে একটা ভয়ের ঢেউ তার গলার কাছে লাফিয়ে উঠে এসেছিলো। সে আর মানসী খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে, বিশেষ করে এখনই মানসী ফুল নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার সংগে কথা বলতে শুরু করলে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না যে, তারা দুজন এক সংগে রয়েছে। মানসীর কপালে সিঁদুর, তাছাড়া তার ভাবভঙ্গি দেওর বা অন্য আত্মীয়ের সংগে কথা বলার মতো নয়। রমা দেখে ফেললে আর একটা বিপদ আছে—মানসীকে খেয়াল না করে ও হয়তো প্রভাসের সংগে কথা বলতে এপারে চলে আসতে পারে। তা হলেই সেরেছে। রমা আবার তাকে 'তুমি' বলে ডাকে। বেফাঁস কিছু বলে ফেললেই বিপদ।

না, রমা আসবে না এদিকে—তাকে দেখলেও না। কারণ সংগে ওর মা রয়েছেন। বরং তাকে এখন মানসীর সংগে দেখতে পেলে আসল ব্যাপার কিছুটা সে আঁচ করতে পারবে। ভালোই হবে, প্রভাসের নিজের মুখে প্রথম বলার সংকোচ থাকবে না।

এই ভেবে প্রভাস বুক টান করে মানসীর একেবারে গায়ে লেগে দাঁড়ালো, একটা হাত ইচ্ছে করে ওর পিঠে রেখে বললো—হলো তোমার? সব ফুল নিচ্ছো নাকি?

মানসী হাসি মুখে বললো, এই যে, হয়ে গিয়েছে। দামটা দিয়ে দাও তো—

রমা এদিকে তাকাচ্ছেই না। ট্রাম আসছে কিনা তাই দেখতেই সে ব্যস্ত।

প্রভাস পার্স বের করে টাকা দিলো লোকটাকে, মালাটা বেঁকে গিয়েছিলো বলে মানসীর খোঁপায় হাত দিয়ে ঠিক করে দিলো। মানসী সুখের হাসি হেসে বললো. কি ব্যাপার! আজ আমার এতো আদর যে?

প্রভাসও হাসলো। —এমনিতে বুঝি অনাদরে রেখেছি?

রমা কিছুই দেখছে না। একবার তাকালোও না এদিকে। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অজুহাত নেই। প্রভাস আর মানসী হাঁটতে শুরু করার সংগে সংগেই একটা ট্রাম এসে তুলে নিলো রমা আর তার মাকে।

এবং আশ্চর্য!

প্রভাসের মনে হলো—বাঁচলুম! ভাগ্যিস দেখে নি!

মনে হয়ে কিন্তু প্রভাস ভয় পেয়ে গেলো। তার মন এমন অদ্ভুত চিন্তা করছে কেন? কিসের থেকে মুক্তি চাইছে সে তবে? সে কি আসলে মানসীকে ভালোবাসে না? তার অশান্ত মন হয়তো মানসীকে পেয়ে খুশী নয়।

াকিন্তু এই তো মানসী হাঁটছে ওর পাশে বো-কথা-কও পাখির মতো। ওর দিকে াকালেই গভীর মায়ায় ভরে যাচ্ছে মন। রীরিক ও মানসিক, দু'দিক দিয়েই নসী তাকে গভীরভাবে তৃপ্ত করেছে। বে?

এই 'তবে'-র উত্তর নেই, বুঝতে ারলো প্রভাস। এ এক অলৌকিক 'তবে'। নই গ্রন্থি বেঁধেছে, মনই পারে মোচন রতে।

পরের তিন দিন রুমা অফিসে এলো া। প্রভাস যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচছে। ওলড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে একটা াড়ির দোকানের সামনে গাড়ি বারান্দায় ওদের দেখা করার জায়গা। রোজকার অভ্যেস মতো প্রভাস একবার তার সামনে দিয়ে যায়। নাঃ রুমা আসে নি। কি হলো ওর? বাড়িতে জরুরী কাজ? বাবার অসুখ? নিজের ইনফ্লুয়েঞ্জা?

চার দিনের দিন প্রভাস দেখলো গাড়ি-বারান্দার নিচে রুমা দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দ ও হতাশা একই সঙ্গে অনুভব করলো প্রভাস।

—কি খবর? তিন দিন দেখা নেই, অসুখ-বিসুখ হয় নি তো?

স্বভাবসিদ্ধ চঞ্চল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে রুমা বললো, আমার অসুখ হলে তো তুমি বাঁচো—

—এমন কথা তোমার মনে হলো কেন?

—যা উচ্ছেব মতো মুখ করে আছো, আমাকে দেখে মনে ভারি ব্যথা পেয়েছো মনে হচ্ছে।

রসিকতা করার চেষ্টা করে প্রভাস বললো, দেখলে মনে হয় গালে ভুতে চুমু খেয়েছে, তাই না?

হেসে উঠে রুমা বললো হ্যাঁ, তাই।
—তোমার কি হয়েছিলো তা কিন্তু বললে না।

—হবে আবার কি? কিছুই হয় নি, ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।
—তা তো দেখতেই পেলাম

আশ্চর্য হয়ে রুমা বললো, দেখতে পেলে! তার মানে?

—চার দিন আগে দেখলাম রাসবিহারীর মোড়ে তুমি আর তোমার মা দাঁড়িয়ে রয়েছো। কোথায় যাচ্ছিলে?

চোখ বড়ো বড়ো করে রুমা বললো, তাও দেখে ফেলেছো। মা কোথায়? উনি তো আমার পিসিমা—

—আমি কি করে জানবো বলো? গায়ে তো লেবেল ছিলো না।

—বা গুরুজনদের সম্বন্ধে বুঝি অমনভাবে কথা বলে?

—মাপ চাইছি। কোথায় ধরেছিলে তাই বলো।

ছোট্ট সুগন্ধী রুমাল দিয়ে মুখ মুছে রুমা বললো, যেদিন আমাকে দেখেছো, তার পরদিনই আমি শান্তিনিকেতন বেড়াতে গিয়েছিলাম। পিসতুতো দিদির বিয়ে হয়েছে বোলপুরে, জামাইবাবু ওখানকার ব্যাংকে কাজ করেন। থেকে এলাম দু'দিন।

—বেশ করেছো। চলো, কোথাও গিয়ে বসে একটু চা খাই। এখানে বড়ো রোদ্দুর— তাছাড়া দাঁড়িয়ে কথা হয় না।

রেস্তোরাঁর পর্দাঘেরা কেবিনে বসে কাটলেটে চামচ বসিয়ে প্রভাস বললো, সেদিন আমাকে দেখতে পেলে তুমি কি করতে? দৌড়ে আসতে এপারে?

একটু চিন্তা করে রুমা বললো, না, তা বোধহয় আসতাম না। পিসিমা ভীষণ গোঁড়া, রাস্তায় মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে কথা বলবে, এটা উনি একদম পছন্দ করেন না। আমার বাবাও তাই, দারুণ কনজারভেটিভ—

—তাহলে তুমি চাকরী করছো কি করে? করতে দিচ্ছেন কেন তোমার বাবা?

—সহজে কি রাজী হয়েছেন নাকি? জেদ করে চাকরী করছি আমি। কি করবো বাড়িতে বসে বসে? চাকরী পাওয়ার আগে আমার সময়ই কাটতে চাইতো না—

—সময় কাটাবার অন্য ব্যবস্থা হয়ে গেলে চাকরী ছেড়ে দেবে তো? নাকি তখনো ছাড়তে ইচ্ছে করবে না?

কথাটা বলে প্রভাস মনে মনে জিভ কামড়ালো।

রুমা তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো, তারপর নিজের ডান হাতটা রাখলো তার হাতের ওপরে।

রুমার স্পর্শ জীবনে এই প্রথম!

কি নরম রুমার হাতের তালু। নরম ভেলভেটের মতো চামড়া। বিয়ের আগে এমন একটি মেয়ের স্পর্শ কতো কাম্য ছিলো।

কিন্তু এখন তার সমস্ত মন হঠাৎ যেন পিন-ফোটানো বেলুনের মতো সংকুচিত হয়ে এলো। রুমার হাতের উষ্ণতা তরল উত্তপ্ত ধাতুর মতো রক্তের বদলে ছড়িয়ে পড়ছে তার শিরায়। একই সঙ্গে একটা প্রবল উত্তেজনাও কাজ করলো তার মনে। নিজের দু' হাতে প্রাণপণে চেপে ধরলো রুমার নরম হাত, মুখের কাছে টেনে এনেও ঝটকে গিয়ে ছেড়ে দিলো, বললো, আজ একটু তাড়াতাড়ি করবে রুমা? আমার একটা জরুরী কাজ আছে।

বাড়ি ফিরে প্রভাস দেখলো মানসীর জ্বর হয়েছে।

জামা-কাপড় না খুলেই আগে থার্মো-মিটার নিয়ে এলো প্রভাস। মানসী হেসে বললো ভাগ্যিস জ্বর হয়েছে, নইলে কি আর তোমার সেবা পেতাম! তাড়াতাড়ি গেল না সারে—

প্রভাস ধমক দিয়ে বললো, বোকো না! দেখি, হাতটা তোলো, থার্মোমিটার লাগাই। কখন এসেছে জ্বর?
—দুপুরে।

—তুমি একটু একলা থাকতে পারবে? আমি দৌড়ে গিয়ে সেন ডাক্তারকে ডেকে আনছি।

—কোনো দরকার নেই, ডাক্তার কি হবে এইটুকু জ্বরে? তুমি আমার কাছে বসে থাকলেই আমি সেরে যাবো।

—তাহলে লোকে অসুখ হলে ডাক্তারের বদলে আমাকেই ডাকতো। বেশি কথা না বলে চুপ করে শুয়ে থাকো।

থার্মোমিটারে জ্বর উঠলো একশো দুই।

ডাক্তার সেন দেখে ওষুধ দিলেন। বললেন, দিন তিনেক না গেলে কিছু বলা কঠিন, তবে ভয়ের কিছু নেই বলেই মনে হয়। সাধারণ জ্বর।

সকালেই রাত্তিরের রান্না করা ছিলো। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে মানসীর পাশে এসে শুয়ে পড়লো প্রভাস। মশারী পুরে টাঙাবে ঘরে নীল আলোটা ল্যাম্পের রঙ ছড়াচ্ছে। দু' হাতে আলতো করে পাখির বাচ্চার মতো মানসীকে টেনে নিজের কাছে আনলো, কানে কানে বললো, আমার হাতের ওপর মাথা রেখে শোও। জানো তো সারাটা বনবাসের সময় ধরে সীতা রামচন্দ্রের হাতে মাথা রেখে ঘুমোতেন।

নিবিড় আদরে তার বুকের কাছে মিশে আছে মানসী। ওর কানের পিঠে ঠোঁট ছুঁইয়ে প্রভাস বললো, ইস্, এখনো বেশ জ্বর তোমার! মাথা ধরেছে? টিপে দেবো একটু?

—না। আমি বেশ ভালো আছি।

শাস্তি। কি গভীর শাস্তি প্রভাসের মনে। মানসী একবার সেরে উঠুক, আর কখনো সে ভুল করবে না। আজ বিকেলে রুমার স্পর্শে তার শরীর বিদ্রোহ করে উঠতেই সে বুঝতে পেরেছে, সে পারবে না আর কাউকে গ্রহণ করতে। সে চিরদিনের মতো বিশেষ একজনের হয়ে গিয়েছে।

মানসী জানতে পারুক বা না-ই পারুক মানসীকে সে আর এমন করে অপমান করতে পারবে না। রুমার কাছে সে বরং নতজানু হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

পরের দিন মানসীর জ্বর একই রকম রইলো। তারপরের দিন থার্মোমিটারে উঠলো একশো চার। নিরবচ্ছিন্ন জ্বর। এখন আর ভালো করে তাকাতে পারে না মানসী, এক-টানা হাই টেম্পারেচার থাকায় শরীর নিতান্ত দুর্বল।

ডাকতার সেন বললেন, মনে হচ্ছে বি-কোলাই ইনফেকশন। আজ এ্যাম্পিসিলিন দিয়ে গেলাম, চারঘণ্টা অন্তর একটা করে ক্যাপসুল। বাজারে এটাই বর্তমানে সবচেয়ে ব্রড স্পেকট্রাম এ্যান্টিবায়োটিক। এতেও না কমলে ম্যান্ডেলামিন বা ওই জাতীয় কোনো স্পেসিফিক ড্রাগের কথা ভাবতে হবে—

ডাকতার সেন চলে গেলে মানসী ক্ষীণ-স্বরে প্রভাসকে ডাকে।

—কিছু বলছো?

—আমার কাছে এসে বোসো। উঠে যেও না।

—না যাবো না কোথাও। কোথায় যাবো তোমাকে ফেলে?

—যাবে না তো?

গভীর স্নেহে মানসীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় প্রভাস।

—কোথাও যাবো না, দেখো তুমি—

অফিস থেকে পনেরো দিনের ছুটি নিলো প্রভাস। বলে এলো কেউ খোঁজ করলে যেন বলা হয় সে বাইরে গিয়েছে। বাড়ির ঠিকানা কাউকে দিতে বারণ করে দিলো।

এগারো দিনের দিন জ্বর ছাড়লো মানসীর। রোগা হয়ে গিয়েছে সে। কলার-বোন ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন। ওঠবার ক্ষমতা নেই বিছানা থেকে। এই এগারো দিন পাগলের মতো প্রভাস পরিশ্রম করেছে মানসীর জন্য। নিজের হাতে মাথা ধুইয়ে দিয়েছে, জামাকাপড় বদলে চুল আঁচড়ে দিয়েছে। রাত জেগে তৈরি করেছে টেম্পা-রেচার চার্ট। মাঝে মাঝে সম্বিত এলে দুর্বলভাবে আপত্তি করেছে মানসী। বলেছে, সোনারপুরে তোমার বাড়িতে খবর দাও, কিম্বা আমার বাপের বাড়িতে—

—কাউকে খবর দিতে হবে না, আমি একাই পারবো। তাছাড়া এ আমার শাস্তি—আমাকে নিতেই হবে।

রোগে মানুষের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই উজ্জ্বল অস্বাভাবিক চোখ তুলে মানসী বলেছে, কিসের শাস্তি?

ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রভাস বলেছে, তোমাকে আরো বেশি করে কেন ভালোবাসিনি—সেজন্য শাস্তি। তাহলে তোমার অসুখ করতো না। একলা আমার হাতে অসুখ হয়ে পড়ে থাকতে তোমার ভয় করছে না তো?

কাঁপা কাঁপা হাত প্রভাসের গালে বুলিয়ে মানসী বলেছে, পাগল কোথাকার!

মানসী সেরে উঠে আজকাল প্রভাসের কাঁধে ভর দিয়ে একটু বারান্দায় আর্ম-চেয়ারে গিয়ে বসে। ছুটি বাড়াতে হবে প্রভাসকে। এ-অবস্থায় মানসীকে ফেলে অফিসে যাওয়া যায় না। ছুটির এক্স-টেনশন চাইবার জন্য একবার তাকে অফিসে যেতে হবে কাল।

আর একবার রুমার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

তাকে সবকিছু বলে দেবে প্রভাস। আর দেরি নয়। সর্বনাশের নিঃশ্বাস পড়েছে তার গায়ে।

নারাণপুরে বৃষ্টির দিনে ছড়িয়ে পড়া ভেজা মাটির গন্ধটা যেমন তার জীবনের সুখকে চিহ্নিত করেছে, তেমনি মানসীর অসুখ চিহ্নিত করেছে তার স্বকৃত অন্যায়কে। এখনো সাবধান না হলে আবার কি অসুখ হতে পারে না মানসীর? চির-দিনের জন্য হারিয়ে যেতে পারে না তার কাছ থেকে? এবার সময় হয়েছে।

রুমার সঙ্গে তার সম্পর্কই যে মানসীর অসুখের কারণ—এ চিন্তা মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারলো না প্রভাস। অনেকদিন বাদে অফিসে যাওয়ার জন্য স্নান করতে বাথরুমে ঢুকে দেখলো দেওয়ালে গাঁথা এলুমিনিয়ামের রডে মানসীর শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার ঝুলছে। তোলা কাজের ঝি এসে কেচে দেবে দুপুরে। ব্লাউজটা হাতে নিয়ে আস্তে করে একবার গন্ধ শুঁকলো প্রভাস। মানসীর গায়ের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, এতে যেটা মাখানো। শুঁকলেই মনে একটা নরম অনুভূতি জেগে ওঠে, মনে হয় মানসী দাঁড়িয়ে আছে পাশে। চোখ বুজে শুধু গায়ের কাছে নাক নিয়ে গিয়ে সে হাজারটা মেয়ের মধ্যে থেকে মানসীকে আলাদা করে চিনে নিতে পারে।

রাস্তার একটা পাবলিক কল অফিস থেকে সে ফোনে রুমাকে ডাকলো।

—কি ব্যাপার? তুমি ছিলে কোথায় এতোদিন? আমি ভেবে ভেবে হয়রান।

—রুমা, তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে। আজ একটা হাফ-ডে ক্যাজুয়াল লিভ নিতে পারবে?

পারবো। কিন্তু কি হয়েছে তা তো বললে—

—পরে বলবো। তুমি বেরিয়ে সোজা গঙ্গার ধারে মেরিন হাউসের পাশে সেই হিন্দুস্তানীর চায়ের দোকানটায় চলে যাবে, কেমন?

—ঠিক আছে।

—আমি তিনটেয় পৌঁছবো। ছাড়ছি।

অফিসে গিয়ে ছুটি বাড়াতে দেরী হলো প্রভাসের। ওপরের অফিসার নিজের ঘরে ছিলেন না। কাজ সারতে সারতে নামলো প্রবল বৃষ্টি। পৌনে তিনটে বাজে। আর দেরী করা যায় না। বৃষ্টি নামবার আগেই নিশ্চয় অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছে রুমা।

বেয়ারাকে দিয়ে একটা ট্যাকসি ডাকালো, ভিজে গিয়ে উঠলো ট্যাকসিতে।

চায়ের দোকানের টিনের শেডের নিচে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাস আর রুমা। প্রভাস বললো, আমি সবকিছু তোমাকে খুলে বললাম। অসাধু হলে তোমাকে না জানিয়ে আমি আরো সুযোগ নিতে পারতাম। তুমি তো জানো, তেমন সুযোগ তুমি আমাকে দিয়েছো। কিন্তু তোমাকে প্রতারণা করবার কোনো অধিকার আমার নেই। আমার স্ত্রীকেও না, নিজেকে না! যা করেছি তার জন্য যদি ক্ষমা করতে পারো, কোরো। না পারলে দোষ দেবো না। তোমার ঘৃণাই আমার যোগ্য পাওনা।

কিছু না বলে রুমা একবার মুখ তুলে তার দিকে তাকালো। প্রভাস ভেবেছিলো রুমা কাঁদবে। কিন্তু রুমার চোখ শুকনো মুখ ভাবলেশহীন। যেন এসব তুচ্ছ ব্যাপারের চেয়ে গভীর কিছু সে ভাবছে। কি বলবার জন্য একবার তার ঠোঁট কাঁপলো, তারপরেই হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় নেমে হাঁটতে শুরু করলো রুমা। প্রভাস চেঁচিয়ে ডেকে উঠলো—রুমা! যাচ্ছো? ভিজে যাবে যে—

পেছনে না তাকিয়ে অবিরল বৃষ্টি-ধারার ভেতর রুমা ক্রমেই মিলিয়ে আসতে লাগলো। আর একবার ডাকতে গিয়ে থেমে গেলো প্রভাস, পরক্ষণেই নিজেও বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

তখনও বৃষ্টি পড়ছে চারদিক আবছা করে।

অবিশ্বাস

সোমক দাস

বাবার বয়েস এখন চুয়াত্তর। মানুষ হিসেবে তিনি খুবই সরল ও বোকা। আবেগপ্রবণ ও অল্পবিস্তর পরিশ্রমী। ধর্মভীরু। দুশ্চিন্তাপ্রিয় ও অকর্মণ্য। দাদু যা যা তৈরি করেছিলেন– বাড়ি, জমিটমি ও ব্যবসা; সবই তিনি মানে আমার বাবা সযত্নে নষ্ট করেছেন। কেউ অভিযোগ করলেই বলে ওঠেন—কর্মফল, গীতা, কপাল, সংসার বাঁচানোর জন্যে সব বেচে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না—ইত্যাদি। যৌবনে শোনা নেতাজীর বক্তৃতা, মহম্মদ আলির বক্সিং, পেলের পায়ের কাজ, বঙ্কিমের কুকচরিত্র, আর মায়ের বহুবিধ রোমহর্ষটি—এই-ই হচ্ছে বাবার প্রিয় বিষয়। কারণে অকারণে হিসেবের খাতায় জমা-খরচ লিখতে খুব ভালোবাসেন। অসুখের মধ্যে তাঁর আছে ব্রঙ্কাইটিস, বাত আর অল্প হাঁফানি। ছোটবেলায়, একটু হাই তুললে দশজন ঝি-চাকর ছুটে আসতো। তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ আয় দিনে বাইশ হাজার টাকা। পুজোর বাজারের হাতিবাগানের শাড়ির দোকান থেকে। আটপুর বস্ত্রালয়। এখন সেখানে দুটো দোকান।

বাবা সন্ধ্যেবেলা সেই বিশাল দোকান বেচোকাকার হাতে ছেড়ে দিয়ে নাইট শোয়ে মাকে নিয়ে সিনেমা চলে যেতো—দোকানটা বন্ধ করে দিল, বেচো। সেই বেচো এখন আটপুরে চমৎকার একটা বাড়ি করেছে। মেয়েকে শিশুমঙ্গল হাসপাতালে নার্সিং পড়ায়। বাবার কর্মচারী বলে সেই বেচোকে আমি বেচোকাকা বলতাম। তার ভালো নাম বিজয়কৃষ্ণ দে। আর একজন কর্মচারী ছিল দিলীপ সিংহ। সে বাড়ি করেনি, তবে দমদমে স্মল টুলসের ব্যবসা করেছে।

দোকানে তখন বছরে বিক্রি হত দু লক্ষ টাকা। বার্ষিক নেট আয় বিশ হাজার। আটপুরের আর কলকাতার মোট সংসার খরচ ছিল বছরে দশ হাজার। বাকি দশ হাজার ছিল দোকান খরচ। এর মধ্যেই বড় বোনের বিয়ে দিতে বাবা খরচ করেছিল বারো হাজার। ঊনিশশো পঁয়তাল্লিশের বারো হাজার। মেজ আর সেজ বোনের বিয়েতে খরচ বেশি হয়নি। ছোট বোনের বিয়েতে রিজার্ভ ব্যাংকের অফিসার পাত্র পাওয়া গেল। অর্থাৎ পনেরো হাজার। দোকানের মহাজনদের খাতায় ততদিনে দেনা বেড়েছে অনেক। এক লাখ দশ হাজার। বাহাত্তর সালে দোকানের দাম উঠলো পঁচানব্বই।

সোম থেকে বেস্পতিবার ওদিন বাবা থাকতো কলকাতায়। শনি রবি থাকতো দেশে। তখন ম্যানেজার নন্দকিশোর দে একা দোকান চালাতো আর আটপুরে জমি কিনতো। বাবার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। জয়েন্ট ফ্যামিলি। বাবার পাঁচ ভাই চার বোন।

এক লাখ দশ হাজারের দেনা কথাবার্তা বলে পঁচানব্বই হাজারে মেটানো হল বাহাত্তর সাল। সে বছরই বিধান রায় মারা গেলেন। বাবা তাতে দুঃখ পেয়েছিল বেশি। ফিউনারেলে গিয়েছিল।

ছোটবেলায় বাবা দেখেছে দাঙ্গা, দেখেছে কলকাতার রাস্তায় পাহাড় করা মৃতদেহ দেখেছে কলকতার ওপর দিয়ে পঙ্গপাল উড়ে গেল। দেখেছে স্বদেশী আন্দোলন—ডাঁই করে বিলিতি পোশাক সাজিয়ে পোড়ানো হচ্ছে—কেন পোড়ানো হচ্ছে বুঝতে পারতো না ঠিক।

তারপর কলকাতায় এল সত্তর সাল। বাবা দেশে কাশীনাথ চাটুজ্জের সঙ্গে পাটের ব্যবসা করতো। [illegible] কাশীনাথ জেঠামশায়ের। বাবা শুধু হিসেব লিখতো। আমি তখন স্কুলে পড়ি। স্কুলের মাইনে দেবার নাম করে আসলে সিনেমা দেখার জন্যে যখন জেঠামশায়ের গদিতে গিয়ে বাবার কাছে টাকা চাইতুম, আটপুরে, বিশাল একটা দাঁড়িপাল্লায় তখন পাটের বস্তা ওজন করা হতো মহাসমারোহে—কাশীনাথ জেঠু সুর করে কাঁটা আর বাট-খারা দেখতে দেখতে বলতো, আর, বস্তা বার, বিয়াল্লিশ। বাবা লিখতো—বিয়াল্লিশ মানে বিয়াল্লিশ কেজি। এসবের মাঝখানে আমি গিয়ে টাকা চাইলে বাবা বলতো, ইয়ে—কাশীবাবু, দশটা টাকা দিন তো। উদা-সীনভাবে দাঁড়িপাল্লার বস্তার দিকে চেয়ে জেঠামশাই বলতো—দিচ্ছি। কথা ছিল, ব্যবসা যেরকমই হোক, কাশী জেঠু মাসে বাবাকে পাঁচশো টাকা দেবে।

কাশী জেঠু খুব ভালো লোক ছিল। আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতো।

তারপর কলকাতায় সত্তর সাল এল। কলকাতার বাড়িতে আট বছরের মাড়োয়ারি ভাড়াটে। ভাড়াটে বসানোর কথা শুনেই ঠাকুমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। অথচ ঠাকুমা গোলা থেকে লুকিয়ে ধান বিক্রির পয়সা জমিয়ে একা একা গোমুখ ঘুরে এসেছে নির্বিঘ্নে। দাদুর নিজের হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৈরি করা বাড়ি।

বাবা বলেছিল—দুশো টাকা ভাড়া দেবে। বাড়িটা তো খালিই পড়ে থাকে। দোকান যখন নেই তখন কলকাতার বাড়িতে কারো থাকার কোনো কারণ নেই। ভাড়াটে বসালে ক্ষতি কি। লাভের মধ্যে মাসে মাসে দুশো টাকার নিশ্চিন্তি। মাড়োয়ারির পেমেন্ট ভালো। সত্যিই ভালো। [illegible]রা এখনো এক তারিখে ঠিক ঠিক দুশো টাকা আমার পিসতুতো দাদার হাতে তুলে দেয়। বাড়িটা এখন তার। ভাড়াটে আছে বলে আর কোন খদ্দের না পেয়ে বাহাত্তর হাজারে বাবা সেটা আত্মীয়কেই বেচেছে। সেন্ট্রাল এভিনিউর ওপরে তিনতলা দক্ষিণখোলা বাড়ি। বিকেলের বারান্দায় এখন মোটা ছোটগিন্নি শকুন্তলা আগরওয়াল বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছোটবেলায় ওই বারান্দায় আমরা ভাইবোনে কত খেলেছি।

শরিক ছিল ছজন। পাঁচ ভাই আর ঠাকুমা। বারো হাজারে টেনে টুনে বছর দুয়েক চলেছিল। প্রতি সোমবার বাবা একশো টাকা তুলে আনতো ব্যাঙ্ক থেকে।

দেশের ধানজমি বাহাত্তর সালের পর থেকে ততদিনে বেচতে বেচতে ফুরিয়ে গেছে। বাড়ি না বেচলে খাবো কি? কাশী-নাথ চাটুজ্জের পাঁচশো টাকায় কিছু হয়! বাবা বলেছিল। ওঃ, বলতে ভুলে গেছি—আমরা তখন পাঁচ ভাই আর দুই বোন। আমি মেজো।

আমি হায়ার সেকেন্ডারি দিই একাত্তরে। ওই গোলমালের মধ্যে কি করে যেন ভর্তি-

পেয়ে গেলাম। প্রোভিডেন্সতে চান্সও লাম। অথচ একদিন আমার হাত ধরে বা এক জায়গায় নিয়ে গেল। সেখানে নেক ভাঙাচোরা টাইপমেশিন ছিল। নেক দুমড়ে যাওয়া চশমাপরা বুধ ছিল। রে জানলাম সেখানে উকিলের কাগজপত্র ইপ হয়। পৃথিবীতে হাইকোর্ট নামে কটা জিনিস আছে। সেখানে অনেক টাইপ রা কাগজ লাগে।

আস্তে আস্তে টাইপ মেশিন আমার র বন্ধু হয়ে গেল। প্রায় একমাত্র বন্ধু। রা দিনের টাইপ সেরে সন্ধেবেলার বিদ্যা-গরের কলেজ আমার যাওয়াই হত না। ল দেখতুম—প্রফেসরের মাথাটা সারা র লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। কানে কতো না কিছু।

বাবা তখন হনুমান হরলালকার পড়ের দোকানে খাতা লিখতো। মতি ল স্ট্রিটে। এখনো লেখে।

সম্প্রতি, একটা পুরো সেদ্ধ ডিম বাবা কেটে করে কিনে এনে সেদিন রাত্তিরে কা একা একটু একটু করে খেল। ছোট ন খুব কাঁদছিল। তখন মা, পুরনো নো খারাপ রেকর্ড বাজানোর মত এক-া চিৎকার করছিল। আর বাবা, পরম ডিমাহার সমাপ্ত করে বলল—পাক্কা বছর পরে ডিম খেলুম কিনা। আসলে াত্মাকে কষ্ট দিতে নেই, তাই খেলুম। ক দু বছর পরে কিনা, তাই কাউকে লুমনি। ওরা তো সারা জীবনে অনেক মই খাবে।

বাবার মাইনে এখন দেড়শো টাকা। ন্দেহজনক ম্যানেজারকে ওয়াচ করার কাজে কে লাগানো হয়েছে বলে ইদানীং পাঁচ কা মাইনে বেড়েছে।

কেউ কথা শোনে না বলে বাবার একটা ুঃখ আছে। ছুটির দিনে বাড়ি থাকলে তনি এগারো বছরের বড় মেয়েকে আদর নামে অনবরত পিঠে কিলচড় মারতে কেন। সুযোগ পেলেই। বোন রান্নাঘরে মাস্ত মাকে গিয়ে নালিশ করে। রান্না ফেলে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এসে মা একটানা নিট পনেরো বড় অশ্লীল সুরে বাবাকে কাবকি করেন। মাকে তখন মা বলে কিছু-তেই চেনা যায় না। আর বাবার মুখে এক রনের অপমানিত সুখ দেখা যায়। বুঝতে ারি, মায়ের মনোযোগ আদায় করতে পেরে নি খুশি হয়েছেন।

কথা বলতে গেলে, একটা সেনটেন্স নবার না বললে বাবা বুঝতে পারেন না। জাজে থাকলে, বাবার এই অভ্যেসটা নিয়ে খুব মজা করে।

সেদিন পিসতুতো বোনের বিয়ে ছিল। য়ে-দেয়ে সবাই বাড়ি চলে গেছে। এই তুতো বোনটি একদম আমার বয়সী। আত্মীয়দের ধারণা ছিল, ঝর্ণার সঙ্গে মার একটা [illegible] 'সম্পর্ক' আছে।

ধারণাটা মিথ্যে হলেও ঝর্ণার সঙ্গে আমার অনেক কথা হত। মেয়েদের অনেক জটিল ও মসৃণ তথ্য আমি তার কাছেই শিখেছি। বিয়ের রাতে সাড়ে বারোটা নাগাদ ঝর্ণাকে তার বরের সঙ্গে, অনেক দিন আগে থেকেই যাকে আমি চাঁদু-দা বলে চিনি—সেজগুজে বসে থাকতে দেখে বলে ফেললুম—কিরে ঝুনু, তোর তাহলে বিয়ে হয়ে গেল? জায়গাটা ছিল আহিরিটোলা। আমরা বরা-নগরের ন-পাড়ায় থাকি। তাই ঝর্ণা আমাকে বাড়ি পাঠানোর জন্যে ব্যস্ত হল।

বাড়ি যাবার জন্যে বাইরে এসে দেখি ফুটপাথে পেতে রাখা অতিথিদের ফাঁকা চেয়ারগুলোর মধ্যে একা বাবা।

তোর জন্যে এক ঘণ্টা বসে আছি। সবাই বাড়ি চলে গেছে। তুই কি করছিলি এতক্ষণ। এখন যদি বাস না পাওয় যায়।

অথচ আমার তখন খুব সিগারেট খাওয়া দরকার। আর বাবা, কোম্পানি-বাগানের পাশ দিয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউএর মোড়ে আসতে আসতে সেই প্রায় মধ্যরাতে আমাকে বলছিলেন, দইটা খুব ভালো ছিল, না? আমি অনেকবার চেয়ে চেয়ে খেয়েছি। তুই?

স্কুলে পড়ার সময় সন্ধেবেলা কাশী জেঠুর গদিতে গিয়ে পি কে দে সরকারের বই থেকে প্যাসেজ ট্রানস্লেসন করে বাবাকে দেখাতুম। তারপর থেকে কতদিন যে বাবার সঙ্গে কথাই বলি না।

বিডন স্ট্রিট থেকে শেষ মিনিবাসটা পেয়ে গিয়ে বাবাকে সামনের সিটে বসতে বলে আমি একদম পেছনের সিটে বসে সিগারেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বুঝতে পারলুম, বাবাকে আমার এই প্রথম খুব বাবা বাবা লাগছে। আর বাবা আমার বন্ধু হতে চায়।

চাঁদুদাকে আর লুকিয়ে লুকিয়ে ঝর্ণার বিছানায় যেতে হবে না। সামনের সিট থেকে বাবা গোপনে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

মধ্যরাতের মিনিবাস হু-হু করে ডান-লপ যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত আমি আর বাবা ছাড়া বাসে কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। শ্যামবাজার থেকে কেউ উঠলেও উঠতে পারে।
ভরা পেটে শেষ সুখটান দিয়ে সিগা-রেটটা জানলা দিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে, অনেকখানি ধোঁয়া গিলে, মনে হল, এই আরামের জন্যে আমার এই সামনের সিটের ভদ্রলোকটির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমার এই হাত-পা, চোখ, চুল, ক্ষুধা,—সবই তো তিনিই দিয়েছেন।

আমার বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে আমি কি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবো আরো? আমিও একদিন বাবা হয়ে যাবো, প্রেক সে-কারণে আমি কি আমার এই চির-অকৃত-জ্ঞ বাবাকে ক্ষমা করে দেবো? বুঝতে পারি না।

রোজ রাতে দশটা সাড়ে দশটায় বাবা যখন সারাদিন খাতা লিখে পা টেনে টেনে দু'হাত পিছনে রেখে বাড়ি ফেরে—আমি তখন সুভাষ কিংবা বাবুর সঙ্গে [illegible] সাধারণ হাসপাতালের পুকুরপাড়ে বসে গাঁজা খাই। সুভাষ গাড়ি চালায়। বাবু কিছু করে না। বাড়ি ভাড়া পায়। আর একটা প্রাইভেট ভাড়া খাটায়। আর সারা দিন মেয়েদের পেছনে লাগে। একদিন বাবা ও-রকম ক্লান্ত বেবুনের ভঙ্গিতে বাড়ি ফিরছে—সুভাষ বিড়ি খাচ্ছিল—আমি বল-লুম, এই সুভাষ, আমার বাবা। শুনে বাবু আর সুভাষের সে কি হাসি। এই লোকটা তোর বাবা? হতেই পারে না।

তারা নেশাগ্রস্ত ছিল বলে ক্ষমা করেছি। তবু আমি মাঝরাতে নপাড়ার এই ভাড়া বাড়িতে মশারির ভেতর মশা মারতে মারতে বুঝতে পারি না, আমি আমার কোন বাবাকে বিশ্বাস করবো। যে বাবা বাড়ি ব্যবসা বেচে দিয়ে অনেক দিন পরে ছোট্ট মেয়েকে ভাগ না দিয়ে একা একা সেদ্ধ ডিম খায় তাকে, না যে বাবা পা টেনে টেনে পেছনে হাত রেখে রাত দশটায় এই চুয়ান্ন বছর বয়সে অক্ষয় মুখার্জি রোড দিয়ে একশো পঞ্চান্ন টাকার চাকরি করে বাড়ি ফিরে আসে, তাকে।

(মা)

মা এখন দক্ষিণেশ্বরে যায় রোজ। দক্ষিণেশ্বরের কাছে কোন মঠের এক প্রৌঢ়া প্রসন্না সন্ন্যাসিনী মাকে এখন জীবনের সারমর্ম শেখাচ্ছেন রোজ। মা আজকাল বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ আর শ্রীশ্রীমায়ের ছোট ছোট বাঁধানো তিনটি ছবির সামনে জবাফুল ছড়িয়ে টানা চার পাঁচ ঘণ্টা ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতে পারে। কি করে পারে আমি বুঝতে পারি না।

প্রিয়তমা রমণীটির সামনেও আমি এভাবে টানা চার পাঁচ ঘণ্টা বসে থাকতে পারবো না। অনেক কিছু করে ফেলবো। বকবক করবো এন্তার। সুখী হবো হয়তো কখনো, দুঃখীও হবো, বিষণ্ণ বা ক্লান্তও হতে পারি মাঝে মাঝে। মা বোধহয় এসবের বাইরে চলে গেছে। রোজ বিকেলে সন্ধের মুখে বেরিয়ে যাবার সময় চার বছরের ছোট্ট মেয়ের আকুল কান্না মাকে আজকাল একটুও আটকাতে পারে না।

অথচ মাসের শেষ দিকে সংসার খরচের টাকা ফুরোলে, একটু সর্দি-টর্দি যদি হয় কখনো, দেখেছি মায়ের মুখ কেমন, পাহাড়ী মেষপালকের মত হয়ে যায়, যার অনেকগুলো পশু সারা দিনের চারণপর্বে হারিয়ে গিয়েছে। বিহ্বল ও বিরক্ত সেই মুখে কান্নার মেঘ ঝুঁকে আসে। সেই মাকে তখন আমার খুব মায়ের মতন লাগে।

বিয়ের সময় মায়ের বয়েস ছিল চোদ্দ। বাবার একুশ। উনিশশো আটচল্লিশ সাল। সদ্য স্বাধীন কলকাতায় ছিদাম মুদির লেন

থেকে হুগলী জেলায় দামোদরতীরের এক সম্পন্ন ব্যবসায়ী শুধু রূপ ও সারল্য দেখে মাকে বড় ছেলের বৌ করে এনে ফেলেছেন খোলা আকাশ, ধানখেত, আম-জাম আর তাঁতকলময় এক গ্রামে। সকালবেলায় বেণী দুলিয়ে স্কুলে যাওয়া আর সন্ধেবেলায় পাহাড় হারমোনিয়ামে চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে...ভুলে গিয়ে মা দেখল আট-চালায় পাহাড় হয়ে আছে সুতোর বান্ডিল বাঁধা গাঁট, এই সুতো দিয়েই তবে শাড়ি-টাড়ি তৈরি হয়। গোয়ালে বাচ্চা দিচ্ছে গাইগরু। দুধ জিনিসটা আসলে গরুর বাঁট থেকেই দুইতে হয়। খিড়কিপুকুরে স্নান করার সময় কলকাতায় অন্ধকার কল-ঘরের শাসন ও জল ব্যবহারের কৃপণতাময় ঐতিহ্য কোনো কাজে লাগে না। সিনেমা দেখে পাশের গ্রাম থেকে ইস্কুলবাড়ির পাশ দিয়ে চোধুরীদের আমবাগান বাঁয়ে ফেলে বাড়ি ফেরার সময় কখনো কখনো চাঁদের হাসি এত বাঁধভাঙা হয়ে ছড়িয়ে থাকে যে তা নিয়ে গান গাইতে গেলে হাসি পেয়ে যায়।

পুরুষেরা কলকাতার বাড়িতে দোকান দেখছে। এখানে সন্ধের কাঁধে হাত দিয়ে রাত আসে। সদর থেকে রান্নাবাড়ি ওদিক হেঁটে যেতে গা ছমছম করে। বিকেলবেলায় কাঠঠোকরা আমড়াগাছে ঠোঁট ঠুকে ঠুকে বলে—অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো।

রাতদুপুরে কর্তা কিংবা শ্বশুরমশাই কলকাতা থেকে অতিথি নিয়ে হঠাৎ চলে আসে। সদরের সিংদরোজায় কর্তা হলে কড়া নাড়ার শব্দ হয়। শ্বশুর হলে বাজখাঁই ভরাট গলা পাওয়া যায়—বড় বৌমা। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে মা দেখতো, ঘরের লোকের হাতে হরিণের মাংস। রান্না করো।

বড় হয়ে মায়ের শাড়ির আলমারির তলা থেকে একটা বই পেলুম। একান্ত গোপন কথা। সেই আমার প্রথম অবিশ্বাস। মাও তাহলে মানুষ।

ম-পাড়ার এই ভাড়া বাড়িতে জায়গা কম বলে ব্যবহারিকভাবে অদরকারী জিনিস-গুলো খাটের নিচের শ্যাওলা ধরা একটা তোরঙ্গে ঢোকানো আছে। সেখানে মায়ের একটা কমবয়েসী নিষ্পাপ নিষ্পাপ. বাঁধানো ছবি আছে। বাস্তবে সেই ছবির মাকে আমি কখনো দেখিনি বা দেখতে পাবো না বলে আমার একটা দুঃখ আছে, একটা সুখও আছে। বড়লোকের ছেলেমেয়েদের গায়ে একটা ঘামতেল মাখানো থাকে। সেই ঘাম-তেলের নাম পয়সা। ছবির মায়ের গায়ে সেই ঘামতেলের ফিনিশিং আছে বলে খারাপ লাগে। আমার আসল মায়ের ছেচল্লিশ বছরের ভগ্নস্তূপ স্বাস্থ্য, সাতটি জীবিত ও একটি মৃত সন্তানের জন্মদান ও প্রতি-পালনের পরে শুধুই মাতৃত্বের আবহাওয়া তার চারপাশে– উনুনের সামনে সত্যিকারের ঘামে ভেজা এই মা পোস্ত আর বিউলির ডাল দিয়ে ভাত বেড়ে দিলে মনে থাকে না

—ছেলেবেলায় কিংবা আমার জন্মের আগে মা ঠিক কি রকম ছিল। সেই অচেনা মাকে আমার কোনো দরকার নেই। বিশ্বাস নেই।

সেদিন ভোর রাতে দর্জিপাড়ায় মেজ-দাদু মরে গেলে সেজোকাকার স্কুটারে চেপে খবর এসে বলল, বড়মাইমা, দাদু আর নেই। বাড়ির সবাই সেখানে চলে গেল। শিশুদের শ্মশানে বোধহয় মানার না বলেই মা ছোট বোনকে অনেক কান্নাকাটি সত্ত্বেও নিয়ে গেল না। জুয়াড়ী ও স্বেচ্ছাচারী মেজদাদু যিনি যৌবনে অশ্বারোহণ ভালোবাসতেন তাঁকে আমি সন্দেশদাদু বলতাম কারণ জীবনে যে কয়েকবার তাঁর কাছে ঘটনাচক্রে গিয়ে পড়েছি, ততবারই তিনি আমাদের সন্দেশ খাইয়েছেন। মৃত্যু ও অশৌচ আমি বিশ্বাস করতে পারি না বলে কোন দিন আমি শ্মশানবন্ধু হতে পারিনি। ফলতঃ পাঁচ বছরের ছোট্ট বোনের সঙ্গে নানারকম গল্পগুজব ও খেলাধুলো করতে হল। মায়ের দিয়ে যাওয়া একটা টাকা দিয়ে সে আমাকে লুকিয়ে পুরো একটা রাজভোগ একা খেয়েছে বলে আমার নকল কান্নায় সে বিস্তর মজা পেল যা দেখে আমারও এক ধরনের সার্থকতার সুখ হয়েছিল। তাড়া-তাড়িতে রেঁধে রেগে যাওয়া শুধু ভাত খেতে গিয়ে দেখি ডালটা দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে। তরকারি নেই। পাড়ার চায়ের দোকানে ডিম সেদ্ধ ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না।

মড়া পুড়িয়ে ফিরে এসে মা বলল, সামাজিকতা না মানলে আমার কাছে থাকা চলবে না। আমার অপরাধ আমি অশৌচ না মেনে ডিম খেয়েছি। কোনো খাবারই যে ছিল না সেটা কোনো অপরাধ হতেই পারে না। ছোট মেয়েকে ফেলে যাওয়া সম্পর্কে অভিযোগ করলে মা বলল, আমার আর ভালো লাগে না। তোরা কি করতে আছিস।

আমি বিশ্বাস করি না একজন জীবিত শিশুর চেয়ে একজন মৃত বৃদ্ধের প্রতি বেশী সম্মান দেখানো উচিত।

তবু আমি মাকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারিনি। দূরে চলে যাওয়া বা কাছে থাকা কোনোটাতেই আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি না।

আমার ছোটখাটো প্রয়োজনগুলো আমার মায়ের মত পৃথিবীর আর কোন নারী। কোন দিন বুঝতে পারবে না আমি জানি। বোধহয় সে কারণেই ভালোবাসা ও দাম্পত্য আমার অর্থহীন মনে হয়। সেসব হল আসলে দাদা, নিরুপায় ও নানারকম মেনে নেওয়া।

(সেজোকাকা)

যৌবনে সেজোকাকা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঈশ্বরসন্ধানে গোমুখ পেরিয়ে জন-মানবহীন পার্বত্যপথে একবার তাঁর খুব আমাশা হয়েছিল।

বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন—বড়দা, টাকা পাঠাও, আমি মরে যাচ্ছি।

গ্র্যাজুয়েট হবার পরে দোকানে বসার ভয়ে তিনি বন্দুক হাতে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এখন তিনি পুলিশের ও-সি।

ছোটবেলায় তীর-ধনুক দিয়ে তাঁর পাখি মারা দেখেছি আমরা। একটু বড় হয়ে কল-কাতার বাড়ির ছাতে বুকে বালিশ দিয়ে কাক মারা দেখেছি। নিচের রাস্তায় ঠিক বু... হয়ে ঘরে পড়তো মৃত কুকপক্ষীকুল আমরা ছুটোছুটি করে ডাস্টবিনে ফেলে আসতুম। যে কটা কাক ফেলবে সে তত গুলো রসগোল্লা। রসগোল্লার লোভে তখন থেকেই বোধহয় মিথ্যে কথা বলতে শিখি।

সেজোকাকা শিকার করে করে বুনো খরগোশ, খরহাঁস, জলপিপি, ঘুঘুপাখি ইত্যাদি কত কি যে আনতো। মা মিথ্যে করে রাগ দেখাতো কিন্তু রেঁধে দিতো ঠিক আর আমরা খুব মজা করে খেতুম।

পুজোর সময় সেজোকাকা স্কুটারে চাপিয়ে কুয়ো ভ্যাদিস জুতো কিনে দিতো। একবার আমার ভাই হাবলুর আর কিছুতেই জুতো পছন্দ হয় না। সারা কলকাতার সবকটা দোকান যখন ঘোরা শেষ, তখন আমি বুঝতে পারলুম, হাবলু আসলে স্কুটার চাপার সুখের জন্যে জুতো পছন্দ হচ্ছে না বলে আসছে।

এখন যিনি আমার সেজোকাকা তিনি বাড়ির সামনে এসে খেলা থেকে ডেকে আমার হাতে ছোট ছোট চিঠি দিতেন। সেরকম একটা চিঠি দুপুরের ঘুম থেকে তুলে সেজোকাকার হাতে দিলে কাকা বলেছিল—এই ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানির কি শেষ নেই? আমি পরে মাকে গোপনে জিগ্যেস করেছিলুম—ঘ্যানঘ্যানানি প্যান-প্যানানি মানে কি গো মা?

বাড়ি থেকে চলে যাবার আগে সেজো-কাকা তবলা বাজাতো। আর আমকে ডেকে ডেকে বলতো—এই বেঁটে, বলতো তবলাটা কি বলছে। আমি যখন যা ইচ্ছে হতো বলে দিতুম। একবার বলেছিলুম—চান করবো না, ভাত খাবো না, বেড়াতে যাবো। চান করবো না ভাত খাবো না বেড়াতে যাবো। সেজোকাকা খুব হেসেছেন।

এই সেজোকাকা এখন আর একদম হাসে না। আমাকে আই-এ-এস কিংবা ডবলু বি সি এস দিতে বলে। তবলা বাজায় না। কিছু জিগ্যেস না করলে নিজের থেকে কোনো কথা বলে না। দু বছর অন্তর কোয়ার্টার পাল্টায়। সেখানে টি-ভি ফ্রিজ বিলিতি কুকুর ইমার্সন হিটার এইসব।

বাড়ি-দোকান বিক্রির পর থেকে মা কিংবা দাদা কিংবা বাবা মাঝে মাঝেই এই সেজোকাকার কাছ থেকে টাকা চেয়ে আনতো। একদিন শেষতম ঠিকানায় খুঁজে খুঁজে গিয়ে দেখলুম দুনম্বর চৌরঙ্গী টেরেস আসলে চৌরঙ্গী থেকে অনেক দূরে, [illegible]

সেই কাকীমা বললেন—ছেলের সন্ধান দিল কোথায়?

ভেতরে তখন একজন কালোমতন লোক পিগরাপরা সেজোকাকাকে চাপড়ে চাপড়ে সেজ করছিল।

গত বইমেলায় সেজোকাকার সঙ্গে শেষ দেখা। সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র না, কাকার ছেলে। তার হাতে ছিল অ্যাটম বোমা তৈরির ইতিহাস জাতীয় একটা মোটা ইংরেজী বই। আর কাকার হাতে দেখলাম—শ্রীশ্রী মায়ের জীবনী ও বাণী।

(ন-কাকা)

ন-কাকার বিছানায় অনেক ছারপোকা অথচ তাঁর কোনো অসুবিধা হয় না। কাকার গোঁফ খুব মোটা। গলার স্বর কি নাকি ও উচ্চতা চার ফুট চার ইঞ্চি। এর মধ্যে ন-কাকার পিঠে একটি চমৎকার কুঁজ আছে।

আমি যখন ক্যাশ সিকসে পড়ি তখন ন-কাকা আমার কিংবা দাদার সঙ্গে দাবা খেলতে গিয়ে হেরে যেতো।

ছোটকাকা সব পরীক্ষায় তরতর করে এগিয়ে যেতো আর ন-কাকা এক ক্যাশে অনেক বছর ধরে থাকতে থাকতে স্কুলে যাওয়াই ছেড়ে দিল। তারপর হঠাৎ দর্জির কাজ শিখতে শুরু করলো। কুঁজো হয়ে কাজ করতে করতে আর পিঠে বালিশ দিয়ে শোওয়া অভ্যাস ছিল বলে আস্তে আস্তে একদিন পিঠে কুঁজ হয়ে গেল।

দেশের বাড়িতে ন-কাকা একাএকা থাকে আর জমিটমি দেখাশোনা করে। দেশের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়। একবার পুজোর সময় কালী বলে একজন লোক যে যৌবনে কয়লা বয়ে দিতো অথচ এখন ভিখিরি হয়ে গেছে—আমার কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে ভাত খেতে চাইছিল।

আমি ন-কাকাকে বললুম, কালীকে কিছু খেতে দাও।

ন-কাকা বলেছিল, চাষ করতে কি পয়সা লাগে না?

অথচ দেশেসারদা ভবন নামে যখন প্রেমানন্দ মঠের গেস্ট হাউসটা তৈরি হল তখন সারদা ভবনের দাতাদের লিস্টে ন-কাকার নাম আছে—শ্রীবিজয়বসন্ত দাস।

আমি এম-এ পরীক্ষা দিচ্ছি শুনে ন-কাকার বাল্যবন্ধু আমার ছোটবেলার মাস্টারমশাই সুদর্শন চক্রবর্তী আমাকে বললেন—পরীক্ষার পর নোটগুলো দিস। প্রাইভেটে বসবো। ন-কাকা শুনে বলল—কাউকে নোট দিবি না। পড়বার সময় ওরা পয়সা দিয়েছে?

(ভাইবোন)

আমার বড় বোন আমাকে রোজ সকালে ঘুম থেকে তুলে চা দেয়। আমাকে প্রায়ই সংস্কৃত মানে বই কিনেদিতে বলে। সে এখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। আজকাল শরীর খারাপের অজুহাতে সে প্রায়ই স্কুলে যায় না।

কাঁচের গ্লাস বা চায়ের কাপ ভেঙে ফেললে বা ছোট বোনের সঙ্গে অকারণে ঝগড়া মারামারি করলে তাকে যত বকুনি দেওয়া হয় বা প্রহার করা হয় সে তত হাসতে থাকে। একদিন অসম্ভব রাগে তাকে অনেকক্ষণ মারধোর করার পর সে কেঁদে ফেলে। বকুনি দিলে সাধারণত যে হেসে থাকে, তাকে কাঁদাতে পেরে বড় খুশি লেগেছিল সেদিন, মনে আছে।

আমার পরের ভাই সারাদিন অঙ্ক করতো ঘরের এক কোনে বসে। কলেজ লাইফে। তার কোনো বন্ধু নেই।

এখন সে সেজোকাকার থ্রু একটা চাকরি পেয়েছে। সেটা এত দূরে যে যাতায়াতেই আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। বেরিয়ে যায় সকাল ছটায় আর বাড়ি ফেরে সাতটা-আটটা সন্ধ্যেবেলা। এসেই ঘুমিয়ে পড়ে বলে তার সঙ্গে আমার ছুটির দিন ছাড়া দেখা হয় না।

সে ছ' মাস চাকরি ক'রে তিনশো টাকা মাইনে থেকে টাকা জমিয়ে কিভাবে যেন একটা ঘড়ি কিনে ফেললো। আমার দুশো টাকা শুধু হাতখরচ তাও সবান্ধবে চা-সিগারেট মজলিসি নেশাতে সব দশ দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়।

একদিন মায়ের কাছে শুনলাম, ভাই আমার সম্পর্কে বলেছে—ও কিসের এত লাটের বাঁট যে এত একা খরচ করে?

তার পেট এত খারাপ যে কোনো খাবারই ঠিক ঠিক হজম হয় না, না বাড়ির না বাইরের। অনেকদিনই অফিস যাবার সময় বাস স্ট্যান্ডের অর্ধেক রাস্তা গিয়ে বাড়ি ফিরে আসে ও কোনো কথা না বলে গম্ভীরভাবে পায়খানায় ঢুকে যায়।

সে আমার চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট বলে ছোটবেলায় তার সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশী মারামারি হতো।

তার পরের ভাই ভদ্র মানুষ। সে বি-কম পার্ট-ওয়ান ফেল। আমার বন্ধুবান্ধব বাড়িতে এলে সে প্রশ্ন করে—জীবন কি? মুক্তি কি?

একদিন তার একটা চিঠি এল।

মাজুভাই,

তোমার সহিত সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত আমি সবিশেষ মনোকষ্টে ছিলাম। তোমার সহিত কথাবার্তা বলিয়া আমি মুক্তির সন্ধান পাইয়াছি। আমি দীক্ষা নিতে চাই। কবে কোথায় যোগাযোগ হইতে পারে জানাইয়া পত্র দিও।

ইতি
বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

লালু বাড়ির বাজার করে। রেশন তোলে। দীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে আমি তাকে একবারও ভেবে দেখতে বলিনি।

কোনো একদিন সে কোন মিশনের মহারাজ হয়ে গেলে আমার খারাপ লাগবে কিনা আমি বুঝতে পারি না। শুধু বুঝতে পারি, লালু যে মুক্তির কথা বলে, সেই মুক্তিও একধরনের বন্ধন। আর সেই বন্ধনের ভার অনেক, অনেক বেশী।

একটা চিৎকার আমি আজো মাঝে মাঝে শুনতে পাই। বাম অঙ্গ প্যারালিসিস গ্রস্থ শীর্ণ আত্মা দাদুকে একজন খালি গা অনেক পাথুরে মালা পরা ওঝা মন্ত্রতন্ত্রের ঝাড়ফুকসহযোগে দেশের বাড়ির আট চালার জোর করে হাঁটাচ্ছে। অপদেবতাকে উদ্দেশ করে দাদুর গায়ে যেখানে মন্ত্রপূত ঝাঁটা পেটাচ্ছে। সঙ্গে চলছে বীভৎস খিস্তি আর গালিগালাজ। আটচালায় ভেঙে পড়েছে সারা গাঁয়ের মানুষ। দাদুর অমানুষিক চিৎকার আর গাঁয়ের মানুষজনের দিকে কোটরাগত চোখে করুন তাকান মনে পড়ে। আজও দেখতে পাই সেই চোখে কী তীব্র অবিশ্বাস ছিল।

আজ তোমরা যারা মজা দেখছ আপাত-অসহায় মুখ করে, তোমাদের সবাই আমার শংকরী মাছের চাবুক আর দামী বেতের পরিচয় আজীবন পেয়েছ। তোমাদেখ দুর্বল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রতিহিংসাতৃপ্ত একটি মুখ নিয়ে আজ তোমরা ঘরে ফিরবে।

দু দিন চলেছিল ওঝার অত্যাচার। সকাল সন্ধ্যে দাদুর চিৎকারে আতঙ্ক হয়ে উঠত চরাচর। বিকেলে দাদু এমনিতে বাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে বাবলু বলে ডাকলে আমরা বোদের পাড়ের খেলার মাঠ থেকে শুনতে পেতাম। সেই বাজখাঁই গলার প্রাণান্তকর চিৎকার আজও প্রায় মর্মে গেঁথে আছে।

ঠিক দু বছর দাদু প্যারালিসিসে ভুগেছিল। ঠাকুমা আগেই মারা গেছে। সিঁড়ির মুখে দাদুর ঘর থেকে পালাক্রমে বাড়ির সবাইকে দাদু কাছে ডাকত। জল চাইত। কেউ আসত না।

শুধু বড় বৌমা, মানে আমার মাকে দেখেছি দাদুর মুখ ধুইয়ে দিতে, ভাত খাইয়ে দিতে, বেডপ্যান পাল্টে দিতে।

এভাবে অনেক দিন চলার পরে একদিন সকালে দাদুর ঘরে খুব ভিড় হল। দাদু মারা যাচ্ছে।

ন-কাকার হাতে ছিল সিন্দুকের চাবি। বাবার হাতে গীতা। আর সবাই গোল হয়ে দাদুকে ঘিরে। খুব সজ্ঞানে গীতা পাঠ শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে দাদু মারা গেলেন।

ছ ফুট লম্বা চেহারার একটি উজ্জ্বল শাদা গোঁফ ছিল দাদুর। বিকেলবেলায় ছড়ি হাতে দাদুর প্রশ্ন ছিল, কে কটা লিচু চুরি করেছ? ঠিক ঠিক বললে কম মারব। আমি চুরি করতাম সবচে বেশি। স্বীকার করতাম সবচে আগে। বেত খেতাম সবচে কম।

সেজকাকা খবর পেয়ে বিকেলবেলা গাড়ি এনে ব্যাকসিটে মৃত দাদুকে কোন রকমে শুইয়ে কলকাতা নিয়ে গেল। বিদ্যুৎ-চুল্লীতে পোড়ান হবে। সঙ্গে গেল বাবা।

সারা গাঁয়ের লোক বলল—আমরা কি আমাদের পূর্ণ দাসকে কাঁধে নিতে পারতুম নি? আমরা কি নেই?

শত্রুর

নির্মলকুমার দাস

—আসছে গোলাপদাকে নে আসছে—এই বলতে বলতে দলবদ্ধ কয়েকটি কিশোর ঊর্ধ্বশ্বাসে উত্তর-দক্ষিণে ছুটে যাওয়া ডাকাবুকো সড়ক থেকে ছুটতে ছুটতে পশ্চিমে—চটকল পাঁচিল ঘেঁষা বিরাট বস্তি এলাকার একটি নির্দিষ্ট বাড়ীর সামনে এসে থামতেই, এই বাড়ীর লোকসন্তপ্ত মানুষগুলি—যারা গতকাল থেকেই নাওয়া-খাওয়া ভুলে গোলাপকে নিয়ে আসার অপেক্ষায় বসে থেকে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল—তারা এই খবরে প্রথমে চমকে উঠল, তারপর নড়েচড়ে একে অন্যের মুখের দিকে মুহূর্তকাল নির্বাক চেয়ে থেকে, কেউ শব্দ করে ডুকরে, কেউ নিঃশব্দে কেঁদে উঠল—ভীষণ তৎপর হয়ে কয়েকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে গে সড়কের দিকে।

গোলাপকে নিয়ে আসার খবরে এখন আর কেউ বাড়ির ভিতরে নেই। সকলে বেরিয়ে এসে কেউ বাড়ির সামনে, কেউ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তির অন্যান্য বাড়ির মানুষেরাও বেরিয়ে পড়েছে ঘর ছেড়ে। সকলের মুখেই এখন গোলাপ এবং গতকালের ঘটনা নিয়ে নানান আলোচনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাত-আটটি ঝড়ু-তাড়িত চেহারার মানুষ ক্লান্ত গলায় হরি-ধ্বনি দিতে দিতে খাটিয়ার করে গোলাপকে নিয়ে এসে থামল বাড়ির সামনে, এবং খাটিয়াটি মাটিতে রাখার সঙ্গে সঙ্গে অগুনতি অপেক্ষমান মানুষ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাই শববাহকেরা এবং আরো কয়েকজন প্রাণপণে এদের সামাল দেওয়ার জন্য শক্তহাতে হাত ধরাধরি করে খাটিয়াটি ঘিরে একটি বৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে থাকল। চারপাশে প্রচণ্ড ঠেলা-ঠেলি। গোলাপকে শেষবারের মত দেখা এক আকুল আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা! কান্না!

ভিড়ের মধ্যে থেকে এই বাড়ির বাড়ি-ওয়ালীর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'একবার ভেতরে নে আয় না। এই তো শেষবার—'

শববাহকেরা নিজেদের মধ্যে চোখা-চোখি করল। ওরা এই বাড়িওয়ালিরই ভাড়াটে। ওদেরও ইচ্ছে হল—শেষবারের মত গোলাপ একবার বাড়ির ভিতরে ঢুকুক। ভাবামাত্রই ওরা লোকজন হটিয়ে খাটিয়া তুলে ভিতরে পা বাড়াল। তই দেখে বাড়ি-ওয়ালী দ্রুতপায়ে পাশ কাটিয়ে ওদের আগে বাড়িতে ঢুকে বলল,—'উঠোনে রাখিসনি, সন্দমায় জল উঠেছিল—বলে সে. কাঁচামাটির উঠোনে পাতা ইঁটের লম্বা-সারি থেকে শশব্যস্ত চারটি ইঁট তুলে নিয়ে আন্দাজে খাটিয়ার মাপে ফেলে বলল, —'এর ওপর রাখ্।'

ওরা ঠিকঠাক করে ইঁটের ওপর খাটিয়াটি আলগোছে রাখল। বাড়িওয়ালী ধপ্ করে খাটিয়ার পাশে বসে পড়ে. ওদের একজনের দিকে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে বলল.—'ও গণেশ কাপড়টা একটু তোল না, মুখটা দেখি—'

শুনে গণেশ দলের একজনকে জিজ্ঞাসা করল—'ভানুদা তুলব?'

ভানু নামে লোকটি বলল 'না।'

বাড়িওয়ালী জিজ্ঞাসা করল,— 'কেন?'

ভানু এই প্রশ্নে খানিক বিরক্ত হয়ে চারপাশের মানুষের কান বাঁচানোর জন্য ঈষৎ ঝুঁকে বাড়িওয়ালীর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল,—'ও আর দেখবে কি। মর্গে কাটাছেঁড়া করে সব্বাঙ্গ সেলাই করেছে। তার ওপর রডের বাড়িতে তো সারাটা গা থ্যাতলানো। দেখার কিছুই নেই।'

ভানু জিজ্ঞাসা করল,—বুঁচি কোতায়? ওকে নে এসো। শেষ দেখা দেখুক। সনধার আগেই মড়া তুলতে হবে। 'মড়া' কথাটি শোনামাত্রই বাড়িওয়ালির বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। খাটিয়ার পাশ থেকে উঠে বাড়ি-ভাঙা-ভিড় ঠেলে সে কোণের দিকে এগিয়ে গেল। হাট করে খোলা দরোজা দিয়ে মাথা নিচু করে সারাটা শরীর ধনুকের মত

[illegible] অন্ধকারাচ্ছন্ন দাড়িয়েতে ঘরে ঢুকল। পরক্ষণেই চোখেমুখে এক ভয়ার্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে বেরিয়ে এল। সারাদিন বউটা দাপিয়ে ঝাঁপিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল।

—'ঘরে নেই?'

বাড়িওয়ালী দুপাশে মাথা ঝাঁকাল।

—'দ্যাখো তাড়াতাড়ি। বেলা পড়ে এল।'

বাড়িওয়ালী আবার ঘরে ঢুকল। ওদিকে ভিড় থেকে কিছু নারীপুরুষ অন্যান্য ঘরে ঢুকে খুঁজতে শুরু করেছে। কিন্তু কোনো ঘরেই পাওয়া গেল না। সকলে বেরিয়ে এসে, একে অপরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। এমন সময় একটি বাচ্চা ছেলে সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'গোলাপদাদার বউ পিটুলি গাছের নিচে পড়ে আছে। বাড়িওয়ালী সমেত বেশ কিছু মানুষ ঝটিতি বাড়ির পিছনে গেল। দেখল গোলাপের বউ খুঁচি দাঁতে দাঁত লেগে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। বাড়িওয়ালী ইশারা করতেই একজন ছুটে জল নিয়ে এল। অন্য একটি বয়স্কা মহিলা খুঁচির বুকের ওপর থেকে সরে যাওয়া কাপড় টেনে ঠিকঠাক করে দেবার পর বাড়িওয়ালী ওর চোখে-মুখে জলের ঝাপটা মেরে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খুঁচির চোখের পাতা অল্প একটু ফাঁক হল। গলা দিয়ে গোঙানির স্বরে কিছু কথা বেরিয়ে এল। বাড়িওয়ালী কান খাড়া করে শুনল, ও বলছে,—'আমাকে মেরে ফেলো গো, আমি কালসর্প, ওকে খেয়েছি। আমাকে মেরে ফেলো— বলার পরক্ষণেই আবার দাঁতে দাঁত লাগল।

বাড়িওয়ালী হা-হুতোশে সজোরে নিজের কপাল চাপড়াল। তারপর আবার জলের ঝাপটা মারতে লাগল। এইভাবে কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পর ওর চোখের পাতা আবার ফাঁক হল। গলা দিয়ে অস্পষ্টভাবে কিছু কথা বেরিয়ে এল। কিন্তু আগের মত চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল না। একটু একটু করে সম্পূর্ণ খুলে যেতে, ঘোলাটে, ভয়াবহ চোখের মণিটি দিয়ে খুঁচি চারপাশের মানুষগুলিকে একবার রোষকষায়িত দৃষ্টিতে দেখল।

—'ওঠ। গোলাপকে এনেছে।'

শোনামাত্রই ও সজোরে উঠতে গেল। কিন্তু কান্নায় ও শোকে ভেঙে পড়া দুর্বল শরীরে তেমন জোর না পাওয়ায় দমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে ধরাধরি করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এল। এবং ও আসার সঙ্গে সঙ্গেই বড় আকস্মিকভাবে এক নিস্তব্ধতা নেমে এল। খুঁচি গোলাপের পায়ের দিকে বসে ওর কাপড়ে ঢাকা পায়ের পাতা দুটি আঁকড়ে ধরে নিজের কপালে ঠেকিয়ে রাখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আচমকা জোড়া পায়ের পাতা দুটি তীব্র জোরে নিজের [illegible]

কেঁদে বলল,—'আমাকেও তোমার চিতেয় তুলে দিও গো—'

এই দেখে কয়েকজন ইশারায় ওকে ওখান থেকে সরিয়ে নিতে বলল। বাড়িওয়ালী ওকে ঠেলে বুকে চেপে ভিড় ঠেলে বাইরে নিয়ে এল। আসার সময় ভিড়ের মধ্যে একটি মাঝবয়সী দেহাতি লোককে হাতের কাছে পেয়ে খুঁচি ওর জামা খামচে ধরে বলল,— 'ওকে বাঁচিয়ে দে না, তুই তো মড়া মানুষ বাঁচাস। দে না বাঁচিয়ে—'

লোকটি এই কথায় ভড়কে গেল। সে এই বস্তিরই বাসিন্দা। টিনের বাকস, রঙচঙে কাপড়ের পোটলা ইত্যাদি নিয়ে নানান জায়গায় মাদারিকা খেল্ দেখিয়ে বেড়ায়।

আহত চোখে খুঁচির দিকে চেয়ে ও অপরাধী গলায় বলল, —'হামি কুছ নেই জানি। উসব ঝুটমুট কে খেল আছে।' খুঁচি অবিশ্বাসী ও হিংস্র চোখে ওর দিকে চেয়ে ওর জামা পূর্ববৎ আঁকড়ে থাকল। তাই দেখে বাড়িওয়ালী জামা থেকে ওর হাত ছাড়িয়ে সজোরে টানতে টানতে ওকে বাইরে নিয়ে এল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই কতকগুলি বউ-ঝি সিঁদুরের কৌটো উপুড় করে ঢেলে খুঁচির কপাল ও সিঁথি রাঙিয়ে দিল। এই শেষ। এবং সেটা মনে হতেই নাভিমূল থেকে উঠে আসা এক কান্নায় ও তীব্র চিৎকারে ও ভেঙে পড়ল।

সারাবস্তির সব ঘর খালি করে মানুষ এইখানে এসে জড়ো হয়েছে। জনমানবশূন্য ঘরগুলো দূর থেকে এখন দেখলে ঠিক মনে হবে কয়েক বছরের ডাঁইকরা অনপসারিত জঞ্জাল।

বেশ কিছুক্ষণ পর বাড়ির ভিতর থেকে খাটিয়াটি বাইরে আনা হল। চার কোণে ধূপকাঠি হু-হু করে জ্বলছে। কিছু ফুলও ছড়ানো হয়েছে। বেলা পড়ে এসেছে দেখে একসময় ভানু বলল, —'দেরী করে আর কি লাভ। রওনা দি—' বাড়িওয়ালী, বলল, —'কাছেই তো যাবি।আর একটু থাক না—'

—'না না আর দেরী না। এদিকে দেরি করলে আবার ওদিকে দেরী হয়ে যাবে। ওদিকেও তো কিছু কাজ আছে, না!' বলে ভানু অন্যদের দিকে ফিরে তাড়া দিয়ে বলল,—এই নরেশ হারু তোল তোল—

বলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা খুব জোরে হরিধ্বনি দিল। এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে নিচুগলায় কেউ বলল—বলহরি হরিবোল, কেউ বলল—রামনাম সত্য হ্যায়। খুঁচি তাই শুনে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—ওরে আমি কালসর্প আমাকে তোরা মেরে ফেল—চিতেয় তুলে দে...'

ঠিক এই সময়েই জনারণ্যের [illegible] সবার অলক্ষ্যে কোথা থেকে আবির্ভূত হল যেন। ওদের মধ্যে একজন [illegible] কিছুটা নির্দেশের সুরে [illegible] বলল, দাঁড়া—

[illegible]

[illegible]

সাধনবাবু। ইউনিয়নের লিডার। [illegible] তিনি সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে এলেন। একজনের হাত থেকে বড় একটা [illegible] নিয়ে গোলাপের গলায় পরালেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি কান্নার রোল পড়ে গেল। সাধনবাবুর সঙ্গে আসা এক হিন্দুস্থানী বলল—তুমলোগ রোতা কিউ?'

সাধনবাবুও কিছুটা [illegible] বললেন, —এটা কি কান্নার সময়?

বাড়িওয়ালি খুঁচিকে বুকে চেপেই জিজ্ঞাসা করল, —বাবু গোলাপকে মারল কেন? দেশে কি ন্যায় অন্যায় বলে কিছু নেই?'

সাধনবাবু দোষারোপ করার ভঙ্গীতে বললেন, —তোমরাই দ্যাখো, দেশে ন্যায় অন্যায় বলে কিছু আছে কিনা সেটা তোমরাই দ্যাখো। আমি আর কত বলব। অনেক বলেছি। বলে বলে হয়রান হয়েছি-তোমরা তো আমার কথা কানে তোলো না. এবার নিজেরাই দ্যাখো। আজ গোলাপকে মারা হল. কাল গণেশকে মারবে, পরশু ভানুকে মারবে, এইভাবে দিনের পর দিন অত্যাচার আপনার চলতে থাকবে আর আমরা—কেন, কেন গোলাপকে মারা হল, কি অপরাধ করেছিল [illegible] বলো তোমরা .

সারা বস্তি স্তব্ধ হয়ে শুনছে সাধনবাবুর কথা। এবং একটু একটু করে

প্রত্যেকের চোয়াল শক্ত হচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে আগুন ঝিকিয়ে উঠছে চোখে।

সাধনবাবু বলে চলেছেন, '—আমরা দাবি জানিয়েছিলাম রোববার কাজ করলে ডবল মাইনে দিতে হবে। চটকল শোনেনি আমাদের কথা—গলার স্বর উত্তরোত্তর চড়া উঠছে তাঁর, চটকল বোঝেনি আমাদের শিশুদের যন্ত্রণা, তখন আমরা ঠিক করলাম শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করব চটকল গেটের সামনে। গোলাপ ছিল আমাদের দলে ও-ও তাই চাইল। গোলাপের এই অপরাধ। তোমরাই বলো এবার ভুখা মানুষ যদি খেতে চায় সেটা কি তার অপরাধ অন্যায় —চুপ করে আছো কেন জবাব দাও? সকলে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে, সমস্বরে চিৎকার করে উঠল—'না।'

—কিন্তু আমাদের বিপক্ষ ইউনিয়ন এটাকে অন্যায়ের চোখে দেখল। শোষক-শ্রেণীর ঐসব দালালেরা বলল রোববারের জন্যে ডবল মাইনে চাই না। শুধু তাই নয় বন্ধুগণ, আমরা যারা পিকেটিং শুরু করলাম, তাদের ওপর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং গোলাপকে নৃশংসভাবে খুন করল।

গোলাপ এবং খুন শব্দ দুটি কানে যেতেই সকলের চোখ চকিতে খাটিয়ার দিকে চলে গেল। শীতের দুপুরে বাইরে, বোল্লপাতা খাটিয়ায় আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে ঘুমানোর মত গোলাপ পড়ে আছে যেন। মনেই হয় না—নেই। পরশুও সারাদিন ছিল। গতকাল সকালে চটকল গেটের কাছে যেতেই—।

বুঁচিকে এখনো বাড়ীওয়ালী নিজের বুকে চেপে আছে। তীক্ষ্ম চোখে ও চেয়ে আছে সাধনবাবুর দিকে। গত বেশ কয়েকদিন ধরে সকাল-বিকাল এই লোকটা এদের বাড়ীতে এসে এসে গোলাপকে পিকেটিং-এ যোগদান করার কথা বলত। যোগদান করলে মাইনে বাড়বে, সেকথা জলের মত করে বোঝাত। ওর জন্যেই-ভাবার পরক্ষণেই বুঁচি নিজেই নিজের ভুল শোধরাল। ও নয়—ও যাদের কথা বলছে, তারাই ওর স্বামীকে খুন করেছে। একই ধারনার বশবর্তী হয়ে ঝিমিয়ে পড়া শোকার্ত এই মানুষগুলি জ্বলে উঠল—ফুঁসে উঠল।

—যারা গোপালকে খুন করল—সাধনবাবু ভীষণ চিৎকার করে, মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুঁড়তে ছুঁড়তে বললেন —শোষকশ্রেণীর ঐসব দালালদের কালো হাত গুঁড়িয়ে দিতে হবে। গোলাপের মৃত্যু যেন আমাদের শত্রু সম্পর্কে সতর্ক রাখে। আমরা যেন প্রতিক্রিয়াশীলদের দুর্গে আঘাত হানতে পারি—বলে তিনি বুঁচির কাছে এসে ওর মাথায় হাত রাখলেন এবং অন্যান্য মানুষদের দিকে ফিরে বললেন-মনে রেখো, আজ কান্নার দিন নয়, আজ শপথ নেওয়ার দিন—'

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মিউনিসিপ্যালিটির আলোগুলিও সবার অলক্ষ্যে জ্বলে গেছে। সাধনবাবু একসময় খাটিয়া তোলার নির্দেশ দিতে, খাটিয়া কাঁধে তোলা হল এবং পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরতেই উনি বললেন,—'ওদিক দিয়ে না—'সঙ্গে পূবমুখো রাস্তা চিহ্নিত করলেন। অতঃপর শববাহীরা পূবমুখো সরু রাস্তা ধরে পাকা রাস্তায় গিয়ে উঠল এবং এই চটকল এরিয়া কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে হরিধ্বনি দিতে দিতে একসময় গঙ্গার কিনারে, শ্মশানের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু তাদের হরিধ্বনিকে দাবিয়ে রেখেছিল ইউনিয়নের লোকগুলির সোচ্চার কণ্ঠ—গোলাপের মৃত্যুর বদলা চাই—

গোলাপকে পুড়িয়ে ওরা ফিরল শেষ রাতে। পরপর দুদিন নিদ্রাহীন থাকায় সকলেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। চোখ জ্বালা করছে। তবু কেউ বিছানায় যায় নি। গোলাপ খুন হয়ে সকলের ঘুম কেড়ে নিয়েছে যেন। এখন সকাল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ীর বাইরে— কেউ বাঁশের মাচায়, কেউ মাটিতে বসে গোলাপের স্মৃতিচারণ করছে। কারো কারো মনের গভীরে দৃঢ় বিশ্বাস,—এটা ঘটনা নয়। একটা দুঃস্বপ্ন। অন্য একজন এই ভুল ভেঙ্গে দিতেই, সে মুহূর্তে ঝলসে ওঠে,— সব ছারখার করে দেবো—'

সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত, অবসন্ন শোকাহত এই মানুষগুলির চোয়াল শক্ত, হাতের পাতা মুষ্টিবদ্ধ হল। বস্তুত সাধনবাবু এদের শত্রু চিনিয়ে দিয়ে গেছেন গতকাল। তখন থেকেই এরা তেতে আছে। গণেশ প্রবল চিৎকার করে বলল,—'ঐ বিলাসকে আমি একবার পাই, জ্যান্ত চিবিয়ে খাব—' ওকে ঐরকম উন্মত্ত হিংস্র চিৎকার করে উঠতে দেখে বাড়ীওয়ালী ভয় পেল। ঝটিতি উঠে গিয়ে ওর দু হাত ধরে ওকে থামাবার চেষ্টা করে বলল,—'পাগল হোসনি, সাধনবাবুরা আছে। ওরাই সব ব্যবস্থা করবে'

শুনে গনেশের বউ এবং অন্যান্য বউ ঝিরাও একবাক্যে এই কথায় সায় দিল। কিন্তু পুরুষেরা সকলে হঠাৎ বন্য জন্তুর মত খেপে উঠেছে যেন। নিচু স্বরে ওদের উত্তেজিত শলাপরামর্শ করতে দেখে মেয়ে বউদের অনুসন্ধিৎসু চোখে সহসা ভয়ের রঙ লাগল।

ঠিক এই সময়েই একটা গলা শোনা গেল—আমরা না আসতেই কাল তোরা চলে গেলি যে? সকলে দেখল বিলাসবাবু। সাধনবাবুর বিপক্ষ ইউনিয়নের লিডার। সঙ্গে বেশকিছু লোক। দেখামাত্রই এই সকলে শিকারপ্রাপ্ত অভুক্ত নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে বিলাসবাবুকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলতে চাইল। ওদের এই ভাব দেখে বাড়ীওয়ালি—পাছে কোনো অঘটন ঘটে এই ভয়ে ইসারায় ওদের থামতে বলে, বিলাসবাবুর দিকে ফিরে অনিচ্ছুক ভঙ্গীতে বলল,—সাধনবাবু এল, সেই গুলল·'

—সাধন আবার বাবু হল কবে থেকে আঁ?' বলে বিলাসবাবু সঙ্গের লোকগুলির দিকে একবার তাকালেন। তারপর ফিরে বললেন—ওটা তো একটা খুনী। ঐ খুনীর কথা তোরা শুনলি? বলে কৈফিয়ৎ নেবার ভঙ্গীতে উনি চেয়ে রইলেন।

কে একজন দাঁতে দাঁত চেপে নিজের উত্তেজনা সম্বরণ করে বলল,—সাধনবাবু খুনী না—'

শোনামাত্রই বিলাসবাবু ম্যাৎকে উঠলেন- সাধন খুনী না?'

একটু থেমে—যেন নিজের ভুল শুধরে নিলেন তিনি, '—হ্যাঁ সাধন খুনী না—নিজে হাতে ও খুন করেনি কিন্তু ওর গুণ্ডারা কি চটকল গেটের সামনে রড দিয়ে পিটিয়ে মারেনি গোলাপকে?'

বুঁচি একটা বাঁশের মাচায় শরীর এলিয়ে পড়েছিল। এই কথা শুনেই ভাঙ্গা গলায় কেঁদে উঠল। বিলাসবাবু ওর কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত রেখে বললেন—কাঁদিসনে মা। এ এক আজব দুনিয়া। অতিরিক্ত চাওয়ার জন্যে নয়, যেটুকু আছে সেটা রক্ষা করতে যাওয়ার জন্যেই এই দুনিয়ার লোকে খুন হয়—কাঁদিস নে' বলে পিছিয়ে এসে জোর গলায় বললেন, কেন সাধন গোলাপকে খুন করাল, কেন তবে? শুনে রাখ—লোভীদের সঙ্গে ও যোগ দেয়নি, কারণ ও জানত— এই পিকেটিং-এ যোগ দিলে মালিকপক্ষ অন্য এ্যাকশন নেবে। তাছাড়া ও এই ছোটখাটো আন্দোলনের পক্ষপাতীও ছিল না। ভবিষ্যতে আমরা যে বড় রকমের আন্দোলনে নামার কথা ভাবছি, সেই আন্দোলনে ও সামিল হতে চেয়েছিল। কারণ ও আমাদের পথকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত।

·এই ছিল ওর অপরাধ। পিকেটিংএ যোগ না দিয়ে ও আমাদের কর্মীর সঙ্গে চটকল গেট পেরিয়ে ভিতরে যেতে চেয়েছিল—কোনো লোভের জন্য নয়, কাজ করার জন্য—এই ছিল ওর অন্যায়, আমাদের অন্যায়। তাই ওরা আমাদের ওপর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রড দিয়ে গোলাপকে পিটিয়ে মারার সময় ওরা একবারও ভাবল না—ঘরে ওর বউ। সংসার। জ্যান্ত মানুষটাকে পিটিয়ে মেরে মড়া কাঁধে নিয়ে গেল শ্মশানে—তাই তোরা খুনীকে বন্ধু ভাবলি। তোরা কি জানিস না। চোরের মায়ের বড় গলা?

সকলে বাস্তবিক ভড়কে গেছে।

ইতিমধ্যে বস্তির অন্যান্য বাড়ী থেকেও বেশ কিছু মানুষ এসে জড়ো হয়েছে। সকলের চোখেমুখে শোকের সুস্পষ্ট চিহ্ন। শুধু মানুষ নয়—ঘরবাড়ী গাছপালা সবকিছু শোক-আচ্ছাদনে ঢেকে আছে যেন। প্রায় প্রত্যেকেই বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কারো কারো মনে গতকাল শত্রুকে চিনতে না পারার জন্যে এত তীব্র অনুশোচনা খোঁচা মেরে উঠছে। গনেশ জান, এরা পরস্পর পরস্পরের দিকে অপলক বিস্মিত বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। সাধনবাবুর মুখটি চোখের সামনে ভেসে উঠতেই এদের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। বিলাসবাবু

বললেন, 'গোলাপকে খুন করার আমরা সমুচিত শিক্ষা দেব। কিন্তু শান্তিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে। গরম গরম কথায় না ভুলে তোরা মানুষ চিনতে শেখ। আর গণেশ, ভানু তোদের বলা রইল, বিকেলে চটকল গেটের সামনে থেকে আমরা একটা শোক মিছিল বের করব। সবাইকে নিয়ে আসিস। বাঁচি থাকবে সবার সামনে' বলে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করে তিনি সদলে চলে যান। ওদিকে ভানু গণেশ এবং আরো কয়েকজন বিকালের শোক মিছিলের জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগল।

কয়েকদিনের মধ্যে বড় আশ্চর্যভাবে এদের বানডাকা রক্তে ভাটা পড়ল। সকল উত্তেজনা থিতিয়ে এল। শোকের চিহ্ন অতিদ্রুত অস্পষ্ট হতে হতে একসময় আবহাওয়া পূর্ববৎ স্বাভাবিক হয়ে গেল। শুধু কখনো চা-খানায় কি ভাটিখানায় কিংবা বিদ্রূপালাপে নিরুত্তেজিত গলায় গোলাপের প্রসঙ্গ ওঠে। চোখ আর ঝলসায় না। রক্তে আর বান ডাকে না। মাঝে মাঝে নিতাইবাবু, সাধনবাবু দলবল নিয়ে আসেন শত্রু সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেন। এক-সময় তারাও ডুমুরের ফুল হয়ে ওঠেন।

বেলা দশটা এগারোটা হবে।

বাঁচি বাড়ীর পিছনের পিটুলি গাছের নিচে বসে, পশ্চিমে গঙ্গার পাড়ের শ্মশানের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিল—যদি পিকেটিং-এর আগে ওরা এই চটকল এরিয়াটা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেত। যদি যেত।—কেন, কেন শুনলে না আমার কথা, কেন আমাকে ভাসিয়ে চলে গেলে। পিকেটিংএর আগে যখন দু দলের অবিরাম যাতয়াত ছিল এই বস্তির সব ঘরে ঘরে, তখন এক একটি দলের প্রস্থানের পরই ও গোলাপকে জিজ্ঞাসা করত, 'তুমি কোন দলে গো?'

গোলাপের মুখে কোন উত্তর থাকত না। বস্তুত এই কঠিন প্রশ্নটির উত্তর তার অজানা। খেই হারিয়ে সে অসহায়ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে অপলক চেয়ে থাকত বাঁচির দিকে। বাঁচি গোলাপের অসহায়তা বুঝে ভয়কাতুর গলায় বলত 'তারচে চলো, আমরা এই চটকল এরিয়া ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই—'

এই কথায় গোলাপ অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করত, 'কোথায়?'

বাঁচি স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় বলত, 'যেখানে কুনো দল নাই, হিংসা নাই—'

খানিক হেসে গোলাপ বলেছিল, 'দল নাই, হিংসা নাই, এমন জায়গা সংসারে আছে নাকি রে।'

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেই বলেছিল, 'নাই'—

'তবু—'তবু চলো। একবার খুঁজে দেখি। আমার যে বড় ডর লাগে।' বলে অশ্রুত আশঙ্কায় চেয়ে থাকত গোলাপের দিকে। গোলাপ এই অর্থহীন কথায় হেসে ওর মাথায় আলতু চাটি মেরে বলত, 'কাজ ছাড়লে কি আর কাজ পাওয়া যাবে পাগলি'

—'তবু চলো—'

যদি যেতে দুজনে ভাসতাম। কিন্তু না গিয়ে আমাকে কেন একা সমুদ্দুরে ভাসিয়ে চলে গেলে, কেন গেলে? তোমার পানে মায়া ছেলনি, দয়া ছেলনি, তুমি আমাকে ভালবাসোনি— মনে মনে এই কথাগুলি বলতে বলতে ওর অজান্তেই দু' চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। আঁচলের খুট দিয়ে মুছতেই, হঠাৎ গণেশের বউয়ের চেরাবাঁশের মত গলা শোনা গেল, 'বল মিনসে, ঐ বাঁচির সঙ্গে তোমার কিসের সম্পক্ক। কিসের টানে তুমি ওকে আমার কাপড় দিয়েচ—বল?'

গণেশের অনুত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'আমি দিয়েচি?'

—'ন্যাকা সাজছ—' বলে ঝটিতি সে গণেশের হাত তীব্র আক্রোশে চেপে ধরে হিড হিড় করে টানতে টানতে ঘরের পিছনে বাঁচির ঠিক সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে সাপের মত ফুঁসতে ফুঁসতে বলল—'এটা কার কাপড়? কে দিচে—তিনজনের মা? বল কি সম্পক্ক তোমার ওর সঙ্গে, কেন ওকে কাপড় দিয়েচ?'

গণেশ এমন ঘটনার সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাই প্রথমটায় কেমন দমে গিয়ে বলল, 'না দিলে বউটা ন্যাংটো হয়ে থাকবে না—'

'—তাই বলে তুমি কেন কাপড় দেবে। ও ন্যাংটো হয়ে থাকবে তো তোমার কি?'

ইতিমধ্যে অন্যসব বউরাও জুটে গেছে। গণেশের বউ তাদের ব্যাপারটি বলতে এক-জন পূর্ণগর্ভবতী বউ বলল, 'কাকে বলচিস, আমার জন তো সেদিন দুপুরে পাতের ভাত দিয়ে এল। মরদাগুলোর নোলা দেখে ঘেন্না ধরে গেল। ঘরে এক একটা বউ, তবু—'

গণেশ তীব্র প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিপক্ষে এতগুলো মেয়েছেলের সমবেত চিৎকার ও অভিযোগে ও ভ্যাবাচ্যাকা মেরে দাঁড়িয়ে মনে মনে বলল, 'তোরা খারাপটাই কেন দেখিস রে?'

ওদিকে ওর বউ অবিরাম চেঁচিয়ে চলেছে— 'আসুক বাড়িউলি। এটাকে আজই দূর করে ছাড়ব। কি রাক্ষুসী, রাক্ষুসী গো, নিজেরটা খেয়ে এখন আমাদের কপাল পোড়াতে এয়েচে। এই বলে দিচ্ছি, আমিও যে সে না—যে মরদের পিরীত হবে, তাকে শেষ করে তবে ছাড়বে। কাপড়—এতই যদি কাপড়ের সখ, লাইনে গে, দাঁড়া না। নিত্য-নতুন কাপড় হবে—'

পুবের রেল ইয়ার্ড থেকে পোড়া কয়লা কুড়িয়ে ফিরে এসে বাড়িওয়ালী

বাঁচির মুখে সব শুনে প্রথমে অবাক, পরক্ষণে ভীষণ ক্ষেপে গেল, মাঝ উঠোনে দাঁড়িয়ে চোখমুখ বিস্ফারিত করে প্রথমে মুখ খারাপ করে একচোট গালাগাল দিয়ে বলল, কার এত বুকের পাটা বাঁচিকে আমার বাড়ি থেকে দূর করবে, আয় আমার সামনে—'

সারাটা বাড়ি নিস্তব্ধ। শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করছে। পুরুষেরা সব শুনে চলে গেছে চটকলে। দরজায় খিল এঁটে মেয়ে-বউরা পড়ে আছে। সবাই জেগে।

বাড়িওয়ালী অবিরাম গালাগাল করে বলে যেতে লাগল—'সব ভয়ে গর্তে ঢুকেছিস কেন, বেইরে আয়, দেখি কে বাড়িউলি। লম্বা-চওড়া সব কথা বলিস, লজ্জা করে না, মাসের পর মাস ঘর ভাড়া ফেলে রাখিস—খালি সামনের মাস দেখাস? দেখি কোন মুখে ওকে দূর করবি বলেছিস, বেইরে আয়, একবার ঐ মুখ দেখে ধন্য হই, আয়!' কোনো ঘর থেকে টুঁশব্দটি পর্যন্ত এল না।

—'এই বলে রাখছি, এক মাসের মধ্যে আমার সব ভাড়া যদি মিটিয়ে দিস তো থাকবি, নালে সবটাকে লাথ মেরে তাড়াব। ভাড়া বসিয়ে ভাড়া পাব না, আবার সব ওপর দিয়ে কথা বলবে।'

অপরাহ্ন বেলায় সে বিলাসবাবুর সঙ্গে দেখা করবে বলে রওনা দিল। কিন্তু রাস্তায় সাধনবাবুর দলের একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে সে কিছুটা অভিযোগের সুরে বলল, 'হ্যাঁ বাবা, তোমরা বল গোলাপ তোমাদের দলে ছেল, তা গোলাপের বউটা এখন দোরে দোরে লাথি ঝ্যাটা খেয়ে বেড়াচছে, তা তোমাদের চক্ষে পড়ে না? পাসে কি তোমাদের মায়া-মমতা একটুক নেই গো—'

এমন কথায় লোকটা থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন কেন—'

'—কেন আবার, বউটার কি পেটে ভাত আছে, না গায়ে কাপড় আছে, তারওপর মোহন্ত—'

—'ঠিক আছে। আমি একথাটা পার্টি অফিসে কথাটা তুলব।'

পরদিনই তাকে ব্যাগ হাতে সসঙ্কোচ ও বিনম্র ভঙ্গীতে বাঁচির ঘরের সামনে দেখা গেল।

আশেপাশে তার দলের কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে কাঁপা গলায় বলে, 'পার্টি অফিস থেকে এগুলো দিয়েছে।'

বাঁচি হাত বাড়িয়ে ব্যাগটি নেওয়ার সময় তার চোখে চোখ রাখে এবং তার চোখের মত, এক গভীর অর্থপূর্ণ চাহনি দেখে ওর বুক কেঁপে ওঠে। লোকটা ফিরে গেল।

[illegible] ঝুপকো আঁধারে সে আবার [illegible] চারদিক দেখে বলল, 'যাচ্ছিলাম এই পথ দিয়ে, ভাবলাম একবার ঘুরে যাই। বাড়িওয়ালী নেই?

বাঁচি ভয়াতুর গলায় জবাব দেয়—'পুকুরে কয়লা ধুতে গেছে—'

'—আমি যাই, পার্টি অফিসে কাজ আছে—' বলে লোকটা অতি দ্রুতপদে বেরিয়ে যায়। সমস্ত ঘটনাটি বাঁচিকে আশঙ্কাগ্রস্ত ও সন্দিগ্ধ করে তোলে। বড় আশ্চর্যের সঙ্গে ও লক্ষ্য করল, দু-একদিন অন্তর অন্তরই লোকটা আসতে শুরু করেছে। আসার পরই তার মধ্যে একটা আত্মগোপনের চেষ্টা থাকে। বস্তির ধারে-কাছেই কি সে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে, নাহলে বাড়ী যে মোটামুটি খালি সেটা বোঝে কি করে?

সেদিন সবে সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। সারাদিন ধরে রেলইয়ার্ডে কুড়ানো কয়লা পুকুরে ধুয়ে, ঝুড়িতে ভরে বাড়িওয়ালী গেছে চটকল গেটের সামনে। এমন সময় লোকটা এল। এসেই দরোজার একটা কপাট ভেজিয়ে নিজেকে আড়াল করে, বাঁচির ডানহাতটি আচমকা সজোরে টেনে, নিজের বুকে রেখে বলল,—'দ্যাখ তো আমার গায়ে জ্বর কিনা—'

বাঁচি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে বলল, 'গা তো তোমার পুড়ে যাচছে গো দাদা, যাও যাও, ঘরে যাও।' লোকটা ততক্ষণে পা দিয়ে ঠেলে অন্য কপাটটি বন্ধ করে দিয়েছে।

এরপর তার যাতায়াত আরো ঘন হয়। বাড়িওয়ালী ব্যাপারটা ভালো চোখে দ্যাখে না। একদিন সে বলে : 'বাবা, ওকে চটকলে একটা কাজটাজ দাও না। কদিন আর তোমাদের—'

'—চটকল—' লোকটা আঁৎকে ওঠে, চটকলে গেলে ও আর আস্ত থাকবে ভেবেছ?'

বাড়িওয়ালী স্পষ্ট কথায় কিছু বলতে ভয় পায়। কেননা, লোকটা পার্টির লোক। আভাষ ইঙ্গিতে কথাটা বিলাসবাবুর দলের একজনের কানে তুলতেই, সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে,—'কানাই, কানাই বাঁচির ঘরে যায়?'

—'যায় মানে কি, এই চালটা আটাটা দিতে যায়। তা বাবা ঘন ঘন গেলে পাঁচজনে পাঁচটা কথা বলবে তাই।'

—'ঠিক আছে।'

কয়েকদিনের মধ্যে বাঁচি লক্ষ্য করল, এই নতুন লোকটার সঙ্গে কানাইয়ের কোনো প্রভেদ নেই। ওর মনে প্রশ্ন ওঠে—একই চরিত্রের লোক দু দলে হয় কি করে?

আলাদা আলাদাভাবে এরা এসেই কোনোদিন পকেট থেকে সদ্য কেনা ব্লাউজ বের করে দেয়ে হয় কিনা সেটা তার সামনেই [illegible] শরীরের ওপর আছড়ে পড়ে অন্ধকারের দোহাই দেয়—। এবং বাঁচি তখন প্রাণপণে চায় অন্যান্য ঘরের বউরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটা হুলুস্থুল কান্ড বাধাক। কিন্তু বড় আশ্চর্যের সঙ্গে ও লক্ষ্য করে, এরা এলেই ওরা ঈর্ষায় ফেটে পড়ে। একজন তো একদিন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় বলেই ফেলল,—'মর না, মর না মিনসে, মরলে তো ভাত-কাপড়টা ঠিকমত পাই—'

দিন যায়। বাঁচির ভরা যৌবন অতিদ্রুত অসময়ে শুকিয়ে আসে। চোখ কোটরাগত হয়। চোয়ালের হাড় প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে। বয়েসের তুলনায় ওকে অনেক বয়স্ক দেখায়। সারাটা শরীর বড় ফ্যাকাশে—প্যাকাটির মত সরু সরু। ওদিকে শীতার্ত পাতাহীন ন্যাড়া গাছগাছালি, বসন্তে কাঁচ কচি সবুজ পাতায় ভরে ওঠে। ভাঁটার টানে জল নেমে যাওয়া গঙ্গায়, জোয়ার আসে।

একটা উড়ো খবর বেশ কয়েকদিন ধরেই লোকমুখে বস্তিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেটাই একদিন সত্য হয়ে কালবৈশাখীর মত আছড়ে পড়ল—পিকেটিং।

সেই একই দাবিতে সাধনবাবুরা পিকেটিং করবেন আবার। প্রত্যেকের মন থেকে গোলাপ নামটি মুছে গিয়েছিল। কিন্তু পিকেটিং-এর কথায় গোলাপের প্রসঙ্গ পুনরুজ্জীবিত হল। পিকেটিং-এর সঙ্গে গোলাপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটা তুলতেই অন্যটা এসে পড়ে। পিকেটিং হবে শুনে বস্তির নারীপুরুষের [illegible] ভয়ার্ত জিজ্ঞাসা—এবারও কি প্রাণহানি ঘটবে? বউরা নিজের নিজের স্বামীকে সাবধান করে বলতে লাগল,—'ঐদিন চটকল গেটের কাছে যেও না—' বুন্দাবা রাজনৈতিক দলের যাদেরই হাতের সামনে পায়, প্রায় পায়ে ধরার মত করে বলে,—'বাবারা যাই করিস, কাউকে জানে মারিসনি। ওরে এক-জনকে জন্ম দিতে অনেক কষ্ট কত্তে হয়। বিশ্বেস না হয় মাকে গে জিজ্ঞেস কর। কাউকে জানে মারিস নি বাবা—'

কিন্তু কারো মুহূর্তকাল দাঁড়ানোর সময় নেই। কখনো একা, কখনো দলবদ্ধভাবে চারদিকে ছোটাছুটি। বস্তির ঘরে ঘরে গিয়ে পিকেটিং-এর পক্ষে বিপক্ষে নানান যুক্তি। সর্বত্র—সর্বক্ষণ এক উত্তপ্ত উন্মাদ বাতাস বয়ে চলেছে।

বেশ কিছুদিন যাবৎ বস্তিটি কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল। আবার সরব হয়ে উঠল। লোকজনের এখন বস্তিতে বস্তিতে যাতায়াত, সোচ্চার কণ্ঠ, বিচার বিশ্লেষণ [illegible]

প্রাণপণ প্রয়াস—এই সবকিছু বাঁচি ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে দেখে। মাঝে মাঝে ওর অনিবার্য ভুল হয়—গত পিকেটিং-এরই প্রচারকার্য এটা, গোলাপ মারা যায়নি। ওটা যেন ভোররাত্তিরে দেখা এক দুঃস্বপ্ন। পরক্ষণেই ভুল ভাঙে। দুদলের লোকেরা বস্তির সব ঘরে যায়—কিন্তু ওর ঘরে নয়। ও ঘরে বসে কিংবা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অর্থহীনভাবে চেয়ে থাকে। কিন্তু বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারে না। গা কেমন গুলিয়ে ওঠে, বমি পায়। একাগ্র হয়ে ও বুঝতে পারে—কেউ যেন ওর শরীর থেকে রক্তমাংস নিংড়ে অতিদ্রুত বর্ধিত হয়ে চলেছে। এবং তখনই ভয়ে ভয়ে ওর সারা শরীর কাঠ হয়ে আসে। দিগভ্রান্তের মত পথের নিশানা খোঁজে। মাঝে মাঝে ওকে এখন অন্যমনস্ক দেখে বাড়ীওয়ালী বলে,—'ভেবে আর কি করবি. যে যাবার সে তো গেছে। ভগমান তো একটা কানা—'

পিকেটিং-এর দিন এগিয়ে আসার সংগে সংগে উত্তেজনা বাড়তে লাগল। বস্তিসমেত এই চটকল এরিয়ার এক বদ্ধমূল ধারণা—এবার অনেক লোকের প্রাণ যাবে। একটা বড় রকমের দাংগা বাধবে—এই ভেবে সকলেই ভীতি আশঙ্কিত।

ওদিকে দু' দলই বলে বেড়াচ্ছে—গোলাপ তাদের দলের লোক। সেই গোলাপকে অন্য দল খুন করে, ওর অল্প-বয়সী বউকে বিধবা করেছে।

সেদিন চটকল গেটের সামনে কয়লা বেচে বাড়িতে ফিরে বাড়িওয়ালী বাঁচিকে জিজ্ঞাসা করল—'সাধনবাবুদের মিটিনে তুই নাকি যাবি?'

বাঁচি এই কথায় হতবাক।

—'এই যে শুনে এলাম, রোববার গঙ্গার পাড়ে সাধনবাবুদের মিটিন হবে. সেখানে তুই যাবি, কিসব বলবি—'

বাঁচি হতভম্বের মত চেয়েই রইল। পরদিন সাধনবাবু নিজে এসে ওর সকল সংশয় দূর করে গেলেন। রবিবার মিটিং হবে। বাঁচি সেখানে যাবে এবং ওকে কিছু বলতে হবে।

শুনে বাঁচি অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল,—আমি কি বলব বাবু?

—সে তোকে ভাবতে হবে না। আমাদের লোক এসে সব বলে দিয়ে যাবে। তুই শুধু ওগুলো একেবারে ঠোঁটের আগায় তুলে নিবি।

পরের দিন বিলাসবাবু বলে গেলেন, —রোববার মিছিল হবে রে, তোকে যেতে হবে বাঁচি—

বাঁচির বুক ভয়ে কুঁচকে যেতে লাগল। বস্তুত ওর কি করণীয় সেটা বুঝে উঠতে পারল না। মাঝেমাঝেই মনে হল, রবিবারের আগে কোনদিন গভীর রাতে এই বস্তি ছেড়ে যাওয়ার কথা। পরক্ষণেই ভাবনায় ও ভয়ে পিছিয়ে এল। কোথায় যাবে? এই বস্তির বাইরে বিরাট জগৎ, সে সম্পর্কে ওতো সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

রবিবার যতই এগিয়ে আসে, দু দলের যাতায়াত ততই ঘন হয়। দু দলের এই ভয়ংকর চাপে, উপায়ান্তর না দেখে কী প্রবলভাবে ওর গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার কথা মনে আসে—কিন্তু কিসের এক দুর্দমনীয় টানে, এক অদেখা মানুষের জন্য এক অদম্য মায়া ও প্রতীক্ষায় মৃত্যুর গলার পারা দিয়ে পৃথিবীর মাটি কামড়ে বেঁচে থাকার এক তীব্র আকাংখা ওর ভিতরে জেগে ওঠে। অতিদ্রুত যেন রবিবার এসে গেল।

সকাল থেকেই তুমুল হৈ-হল্লা। উত্তেজনা। সারা বস্তি জুড়ে একটা ভয়ংকর গুমোট—থমথমে ভাব। সবাই বলছে—যে কোন সময়েই একটা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হবে।

তাই হল। বেলা তিনটে নাগাদ বস্তির ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে ভীষণ শব্দে একটা বোমা ফাটল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের গুলতানি ভেঙে মানুষগুলি যে যার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং গাছগাছালি থেকে অসংখ্য পাখি আশ্রয় ছেড়ে সশব্দে উড়ে গেল আকাশে। কয়েক মুহূর্ত পর একই সঙ্গে আরও দুটো আওয়াজ হল। এবং ঠিক তারপর ছোট ছোট তীক্ষ্ণ শব্দ। সকলে যে যার ঘরে উৎকণ্ঠায় ও আতংকে কাঠ হয়ে থাকল। বাইরে ছোটা-ছুটি। তাদের মুখ থেকেই জানা গেল—বাঁচিকে নিতে আসার সময় দু দলই মুখো-মুখি হয়। প্রথমে কথা কাটাকাটি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই—আক্রমণ।

ওদিকে অবিরাম আওয়াজ, ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

অন্যান্য ঘরের বড়রা, স্ব স্ব সন্তানকে বুকে আগলে ঘর থেকেই বাঁচিকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে বলতে লাগল, —চলে যা না, আমাদের আর কপাল পোড়াবি কেন রাক্ষুসী—

বাঁচি ভীষণ ভয় পেয়ে একেবারে পাথর হয়ে গেছে যেন। এমন পরিস্থিতি হবে—এটা ছিল অকল্পনীয়, ওর মনে মুহূর্তে একটি প্রশ্ন ওঠে—কেন ও এত প্রয়োজনীয়?

এক সময়, বাড়ীর ভিতরের গালাগাল ও বাইরের বোমার শব্দ যখন চরমে উঠল তখন ও দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দরোজায় গুম গুম শব্দ হতে লাগল, কেউ ধাক্কা মেরে দরোজা খোলার চেষ্টা করছে। কোন পার্টির লোক?

বাড়িওয়ালীর গলা শোনা গেল,—দরজা খোল বাঁচি—

সহসা ও যেন আঁকাড় ধরার মত একটা কিছু পেল। দরজা খুলতেই ঝড়ের বেগে বাড়িওয়ালী ঘরে ঢোকে, বড় আশ্চর্যভাবে ওর হাত দুটো জড়িয়ে অসহায়ভাবে বলল, —ওরা তোকে নিতে আসচে বাঁচি, তোর পায়ে পড়ি ভালয় ভালয় চলে যা। নইলে আমার বাড়ি আর আস্ত থাকবে নারে। এই বাড়িই আমার পেটের ভাত জোগায়, তুই যা বাঁচি—

বাড়িওয়ালার এই কথায়, এই অপ্রত্যা-শিত পরিবর্তনে বাঁচি অবাক হয়ে মুহূর্ত কাল চেয়ে থাকল। তারপর কোনক্রমেই নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে অপ্রতিরোধ্য কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল,—কোন দলে যাবো গো—

বাড়িওয়ালী ওকে খানিকটা তাড়া দিয়েই বলল,—তুই যে দলের, সেই দলে যা—

—আমি তো জানি না আমি কোন দলের—বলে বাড়িওয়ালীকে জড়িয়ে অবিরাম হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল এবং কয়েক মুহূর্ত পর কান্নাজড়িত গলায় তীব্র কান-কাটা চিৎকার করে বলল,—ওগো, দু পার্টির লোকই আমার সব্বোনাস করেচে গো, ওরা আমার কেউ না, শত্তুর....

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। বাহান্ন ।।

বানারজুলির বসন্ত এবারে শুধু আনন্দের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। সেই আনন্দের ছোঁয়া বাপীর শিরায় শিরায়। অস্তিত্বের কণায় কণায়। এতকালের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা, দুঃসহ প্রতীক্ষা—সবেরই কিছু বুঝি অর্থ আছে। হাত বাড়ালে সহজে যা মেলে তার সঙ্গে এই পাওয়ার কত তফাৎ, সমস্ত সত্তা দিয়ে সেটুকু অনুভব করার জন্যেই বোধহয় অত যন্ত্রণা আর অমন প্রতীক্ষার প্রয়োজন ছিল। নিজের সৃষ্টির বিস্তারে শিল্পী অনেক সময় নিজেই ভেসে যায়, ডুবে যায়।

মিষ্টিকে নিয়ে আবু রব্বানীর বাড়িতে সেদিন সকালের দিকে এসেছিল। আগের-বারে সন্ধ্যায় এসেছিল। আবু অনুযোগ করেছিল, জঙ্গলের বাড়িখানা বহিনজি রাতে আর কি দেখবে, সকালে এলে ভালো লাগত।

এবার দিন বাপী তাই সকালে নিয়ে এসেছে। আবুর এখন দস্তুর মতো বড়সড় কাঠের বাংলো। একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এরকম বাংলো বানারজুলিতে আর দুটি নেই। মিষ্টির সত্যি ভালো লেগেছে। ইলেকট্রিক নেই, তাই আগের বারে রাতে এসে গা ছমছম করেছিল। আবু বা দুলারির কারোই ইলেকট্রিক পছন্দ নয়। জঙ্গলের মধ্যে বিজলির আলো বেখাপ্পা। জঙ্গলে থাকার মজা মাটি। দিনের আলোয় চার-দিকের সবুজের মধ্যে সবুজ বাংলোটা সত্যি সুন্দর।

প্রায় ঘণ্টা দুই আদর আপ্যায়ন আর আড্ডার পর মিষ্টির আপাদ মস্তক একদফা ভালো করে দেখে নিয়ে দুলারি হঠাৎ বাপীকে বলল, তোমাদের বিয়েতে মরদেরা বউকে কত গয়না দেয় শাড়ি দেয়, তুমি বহিনজিকে কি দিলে বাপীভাই?

ভিতরে ভিতরে বাপী সত্যি অপ্রস্তুত। অন্যভাবে সামাল দিল। সাদামাটা মুখ করে বলল, এত দিয়েছি যে তোমার বহিনজি নিতে পারছে না।

শুধু দুলারি নয়, আবুও উৎসুক। আর কিছু বলছে না দেখে দুলারিই জিজ্ঞেস করল, কি দিলে।

মুখে জবাব না দিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা বাপী বার দুই তিন নিজের বুকে ঠুকল। অর্থাৎ নিজেকেই দিয়ে ফেলেছে।

আবু রব্বানী আনন্দে হি-হি করে বলে উঠল, বহিনজি বুঝলেও এই দেওয়ার কদর ও বুঝবে না দোস্তু, ও বুঝবে না—নিজেকে ফতুর করে দিয়েও মন পেলাম না।

দুলারির কোপ আর আবুর চপলতায় প্রসঙ্গ ধামা চাপা পড়ে গেল। কিন্তু বাংলোয় ফেরার পথে দুলারির কথাগুলো বাপীর মাথায় ঘুর-পাক খেতে লাগল। জঙ্গলের মেয়ের পর্যন্ত যে-বাস্তব চোখদুটো আছে ওর তাও নেই। মিষ্টিকে ঘরে এনে তুলেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তাকে কিছুই দেওয়া হয়নি। না দুটো ভালো শাড়ি না কিছু গয়না। কলকাতা থেকে ওকে তুলে নিয়ে বানারজুলিতে ছুটে আসা ছাড়া মাথায় আর কিছু ছিলই না। নইলে দুটো জোড়া দু'ডজন শাড়ি কিনে ফেলতে পারত। আর গয়নাও ..

আবার মনে পড়ল কি। ঠোঁটে স্বস্তির হাসি।

শোবার ঘরে ঢুকে মিষ্টি বাইরের শাড়িটাও বদলাবার ফুরসৎ পেল না। দু-মিনিট বিশ্রামের জন্য সবে শয্যায় এসে বসেছিল। আঁতকে উঠে দাঁড়াল।—ও কি!

বাপী ঘরে ঢুকে ভিতরের দরজাদুটো বন্ধ করছিল। বাইরের দরজা বন্ধই ছিল। ছিটকিনি তুলে দিয়ে বাপী ঘুরে দাঁড়াল।
—কি?

—এই সাত সকালে দরজা বন্ধ করছ কেন?

নিরীহ মুখে বাপী ঘড়ি দেখল।
—সকাল কোথায় এখন, বেলা সাড়ে দশটা।

—ভালো হবে না বলছি, দরজা খোলো শিগগির।

বাপী ঘটা করে নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা।
—উঃ! পাপ মন সবেতে সাপ দেখে। হাসতে হাসতে দেরাজ খুলে বড় একটা চাবির গোছা বার করল। একটা চাবি বেছে নিয়ে সামনে ধরল। কোণের পেল্লায় সিন্দুকটা দেখিয়ে বলল, ওটা খোলো।

মিষ্টি থতমত খেল একটু। —ওটা কি?

আঙুল তুলে দেয়ালে টাঙানো গায়ত্রী রাইয়ের বড় ছবিটা দেখালো। —এটা ওই ঠাকরোনের, খোলেই না।

ওই মহিলার সম্পর্কে এ কদিনে অনেক শুনেছে। চাপা আবেগও লক্ষ্য করেছে। তাই দুষ্টুমির ব্যাপার কিছু ভাবল না। খুলল।

ওপরে ভাঁজ ভাঁজ করা রঙ-চঙা কার্পেট, রঙিন বেড-কভার, শৌখিন গায়ের চাদর। বাপীই এগিয়ে এসে একে একে সেগুলো তুলে ফেলল। তার পরেই মিষ্টির দু চোখ ধাঁধিয়ে যাবার দাখিল। এত সোনা একসঙ্গে দেখেনি। শুধু সোনা নয়, একদিকে হীরে জহরত মণি মুক্তো। আগে প্রথমে সোনার বারগুলো তুলে বাপী বেড-কভারে ঢাকা বিছানার ওপর রাখল। মিষ্টি হাঁ করে দেখছে, ছোট বড় মিলিয়ে পনেরটা বার হাতে নিয়ে দেখল। সব থেকে ছোটটির ওজন দশ ভরির কম হবে না। বিশ তিরিশ ভরি ওজনেরও আছে। বাপী হীরে জহরতের মুক্তোর কাঁধ-উঁচু ট্রেটাও এনে খাটের ওপর রাখল।

মিষ্টির হঠাৎ কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। সোনার বাজার চড়া। একশ দশ পনের টাকা ভরি। কম করে আড়াই শ' ভরি হবে এখানে। আর দামী পাথর। এসব খোলা ... সিন্দুকে এসে উঠেছে ভাবতে পারছে না। ঘরে কারো এত সোনা থাকে কি করে। কেন থাকে।

—এই সব তোমার?

বাপীর মজাই লাগছিল। জবাব দিল ওই স-ব তোমার। এর ডবল ছিল। ওই ঠাকরোনটি তার মেয়েকে এই কাঁধে ঝোলাতে না পেরে মনের দুঃখে অর্ধেক তাকে ভাগ করে দিয়েছে, বাকি অর্ধেক তোমার জন্য রেখে গেছে।

মিষ্টি মনে মনে মস্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—উনি আমার কথা জানতেন?

—ও বা-বা, না জানলে রেহাই পেলাম

করে। পিঠের দাগ পুরোপুরি দেখানো রয়েছে।

এই লোকের অন্যান্য কিছু আছে ভাবে মিন্টি। জিজ্ঞেস করল, তুমি কলকাতায় লে আর এ-সব এখানে পড়ে ছিল?

—না তো কি, এরা থেকে ঢের দামী নিস ছিনিয়ে আনায় তালে ছিলাম বলে দবের কথা মনেও ছিল না। আজ দুলারি দতে মনে পড়ল।

মিন্টি হেসে ফেলল। তারপর বলল, বলাম, কিন্তু এসব ব্যাঙ্কে না রেখে ঘরে লে রেখেছ কোন সাহসে?

—ব্যাঙ্কের থেকে এখানে রাখা ঢের নরাপদ। ধরা পড়লে চোখে সর্ষেফুল খতে হবে।

শোনামাত্র মিন্টির আবার সেই স্বস্তি। কিছু সংশয় প্রকাশ পেলে য়ালের ওই মহিলার প্রতি অবিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ভাবতে পারে। —ঠিক আছে, এখন পট তুলে ফেলো।

—তুলে ফেলব মানে। দুলারি দারুণ জা দিয়েছে। খাওয়া দাওয়া সেরেই তামাকে নিয়ে আর এসব নিয়ে শিলিগুড়ি । সেখানে গয়নার অর্ডার দিয়ে পরে ড়ি কেনা হবে।

মিন্টির আবার মজা লাগছে। চোখে-খে কপট খেদ। —এটুকু সোনার আর রে মুক্তোর গয়না?

কি দিয়ে হয় বা কতটা হয় বাপীর ধারণা নেই। তবু ঠাট্টা বুঝল। হেসে জবাব দিল, করে রাখতে দোষ কি, ইঁটের ভেলা আর পাথর কুঁচির মতো তো পড়েই আছে।

জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে মিন্টিই এবার খাট থেকে সব-কিছু তুলে নিয়ে আবার সিন্ধুকে রাখল। তার ওপর যা ছিল একে-একে সব তুলে চাপা দিতে লাগল।

—ও কি! সব চাপাচুপি দিচ্ছ, শিলি-গুড়ি যাবে না?

—না।

—আলবৎ যাবে। বাপী বাধা দিতে এগিয়ে এসো।

—দেখো, পাগলামো কোরো না! তোমার এই বুদ্ধি দেখলে দশ বছরের ছেলেও হাসবে।

—কেন হাসবে?

—কলকাতা থেকে এসে শিলিগুড়ি যাব গয়না গড়াতে আর শাড়ি কিনতে? কলকাতায় গিয়ে যা-হয় হবে।

বেজার মুখ দেখে হেসে ফেলে মিন্টি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ এখনো। এই লোককে বিশ্বাস নেই। বলতে যাচ্ছিল, এই জঙ্গলের রাজ্যে তুমিই আমার সেরা গয়না।

আরো সাত দিন বাদে মিন্টিকে নিয়ে বাপী ভুটান পাহাড়ে বাংলোয় চলে এলো। দিন দশেক নিরিবিলিতে কাটানোর ইচ্ছে এখানে। নিজেই ড্রাইভ করে এসেছে। পাহাড় বেয়ে ওঠার সময় গায়ত্রী রাইয়ের স্বামীর অ্যাকসিডেন্টের গল্প করেছে। ফলে এমন সুন্দর পাহাড়ী রাস্তাটাকে মিন্টি ভয়ের চোখে দেখছে। পরে ওঠা-নামার সময় গল্পের ফাঁকে ওর দিকে ঘাড় ফেরালেই ধমক লাগায়, সামনে চোখ রেখে চালাও—বর্ষায় এ-রাস্তায় তুমি মোটে আসবে না!

বাপীর দু-কান জুড়োয়। আরো বেপরোয়া হতে ইচ্ছে করে।

দুজনকে একসঙ্গে পেয়ে ঝগড়ুর কালো মুখে খুশি ধরে না। মাথায় তুলে রাখা সম্ভব হলে রাখত। পাহাড়ের এই বাংলোর সে-সব জমজমাট দিনগুলো সে ভুলতে পারে না। তাই মন মরা। দিন কতকের জন্য হলেও মরা নদীতে খুশির জোয়ার এসেছে। এই মালিক মস্ত দিলের মানুষ গোড়া থেকেই জানে। কিন্তু তার পরীপানা বউও যে সেই রকমই হবে, নিজের হাতে খেতে দেবে, বসে গল্প শুনতে চাইবে—এ কি ভেবেছিল।

এখানে বসন্ত আরো উদার। আরো অকৃত্রিম। বাংলোর সামনেই ফুলের বাহার। পিছনে ব্যবসার গাছ-গাছড়ার চাষ করে পাঁচ-ছ'টা লোক। বাংলোর বাইরে যে-দিকে তাকায় জঙ্গল আর পাহাড় পাহাড় আর জঙ্গল। পাহাড়গুলোও রিক্ত নয় এখন, মৌসুমি ফুলের মুকুট পরে বসে আছে। আর জঙ্গল তো ঋতুসাজে সেজেই বসে আছে। তার বাতাস রক্তে দোলা দিয়ে যায়। তখন নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

যেতে হয়ও। জীবনের এই দোসরই তাকে বসন্তের বে-হিসেবী ভোগের রকমারি স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গেলে বাঁধ ভাঙে। তখন আর কৃপণ হতে ইচ্ছে করে না। হাল ছেড়ে রাগই করেছিল। —তুমি এত জানো কি করে?

এ সম্পর্কেও বাপীর কিছু বইপত্র পড়া ছিল। তা ফাঁস না করে মাথা চুলকে জবাব দিয়েছে দেখে-শুনে একজন মেয়ে মাস্টার রেখেছিলাম—সেই শিখিয়ে পড়িয়ে পাকা করে দিয়েছে।

দু-হাতের ধাক্কায় বাপী খাট থেকে উল্টে পড়তে যাচ্ছিল। সেই ফাঁকে মিন্টি ঘর থেকে পালিয়েছে। ভালো মুখ করে ঝগড়ুর সঙ্গে গল্প করতে বসেছে। আর ভয়ে ভয়ে বার বার পিছন ফিরে দেখেছে। তিন দিন বাদে বাপী ওকে নিয়ে বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। বলল, চলো আজ জঙ্গলে বেড়িয়ে আসি।

মিন্টি উৎসুক তক্ষুনি। তার পরেই ধমকালো। —কোনরকম অসভ্যতা করবে না?

বাপী হাসতে লাগল। —তা কি বলা যায়, সব এখানকার বাতাসের দোষ।

—যাব না, যাও।

বাপী আশ্বাস দিল, ঠিক আছে, চলো। এই জঙ্গলে পিঠে দাগ পড়ার মতো কোনো কারণ ঘটেনি।

পিঠে না হোক, মনে দাগ পড়ার মতো কিছু ঘটেছিল। মিন্টির হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় পা ফেলা মাত্র সেটা মনে পড়ে গেল। আঙুল তুলে সামনের মস্ত দেবদারু গাছটা দেখিয়ে বলল, ওখানে এক অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

মিন্টির তক্ষুনি আগ্রহ। —কার সঙ্গে?

—উদোম ন্যাংটো এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। তখন হাড় কাঁপানো শীত—ওই গাছটার নিচে দিব্বি বসেছিল, সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখা, সামনে একটা ত্রিশূল। অমন দুটো চোখ আমি আর দেখিনি, ঝাঁকড়া চুল-দাড়িতেও তার আলো ঠিকরোচ্ছিল। আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, আগে বাঢ়। মিল জায়গা।

মিন্টি অবাক। —কি মিল জায়গা?

—ওই জানে। আমার তখন সব সামনে এগানোটা শুধু তোমাকে লক্ষ্য করে এসবে ভক্তি বিশ্বাসের ছিটে-ফোঁটাও নেই—কিন্তু গমগমে গলার স্বর আমার কানে বসে গেল, আর তারপর থেকে মনে এক আশ্চর্য জোর পেলাম। হেসে মন্তব্য করল, এর কোনো মানে নেই, সবটাই সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার জানি, কিন্তু তখন শুধু মনে হচ্ছিল, আমার দিন ফিরবেই আর তোমারও নাগাল পাবই।

মিন্টি বাধা দিল, মানে নেই বলছ, কেন, দিনও ফিরেছে, নাগালও পেয়েছ।

বাপী হেসে উঠল। জবাব দিল, সে-কি ওই সন্ন্যাসীর দয়ায় নাকি! আমার তেড়ে-ফুঁড়ে এগনোটা তো দেখোনি। তবে এগনোর জোরটা মনের সেই অবস্থায় অনেক বেড়ে গেছল সত্যি কথা।

মিন্টি আর কথা বাড়ালো না। সাধু-সন্তদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু অমঙ্গলের আশংকায় তাদের প্রতি কোনরকম অবিশ্বাস বা অবজ্ঞার কথাও শুনতে চায় না।

ফেরার পথে জঙ্গল-ঘেঁষা সেই ছোট পাহাড়। বাপী নিজে উঠল খানিকটা, হাত ধরে মিন্টিকেও টেনে তুলল। তারপর কোন জায়গায় বনমায়ার শোকে পাগল সেই বুনো হাতির খপ্পরে পড়ে ছিল আর কোন পর্যন্ত ওটা তাদের ধাওয়া করে নিয়ে গেছল, দেখালো। এই অবধারিত মৃত্যু থেকে প্রাণে বাঁচার গল্প মিন্টি কলকাতায় বাপীর প্রথম-বারের সেই নামী হোটেলের সুইটে বসে শুনেছিল। তখনো শিউরে উঠেছিল। কত অল্পের জন্য বেঁচেছে চোখে দেখে এখন আরো গায়ে কাঁটা।

দুদিন বাদে সকালের দিকে আবু গাড়ি নিয়ে হাজির। একটা বড় কনট্রাক্টের যোগাযোগ। মালিকের সামনে পার্টির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ইচ্ছে। বহিনজিকে আশ্বাস দিল বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে।

বাপীর ফিরতে সন্ধ্যা গড়ালো। বাদশা পৌঁছে দিয়ে গেল। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেতে খেতে বাপীর মনে হল, মিষ্টি একটু চুপচাপ। জিগ্যেস করল, সমস্ত দিন কি করলে?

মিষ্টি বলল, ঝগড়ুর সঙ্গে গল্প করলাম, তোমার এখানকার বাগানে কি কি চাষ হয় না হয়, ঝগড়ু বোঝালো, সাপের বিষ তোলার ঘরও দেখালো—একটা মেয়ে মরে গেল বলে অমন লাভের ব্যবসাটাই তুমি বন্ধ করে দিলে বলে ঝগড়ুর খুব দুঃখ।

বাপী চেয়ে রইল একটু। তারপর অল্প অল্প হাসতে লাগল। —তোমার আরো কিছু বলার ইচ্ছে মনে হচ্ছে?

মিষ্টিও হাসল একটু। —তুমি রাগ না করলে বলতে পারি।

—তুমি আমার রাগের পরোয়া করো এই প্রথম জানলাম। আচ্ছা, বলেই ফেলো—

মিষ্টির তবু দ্বিধা। —আজ থাকগে, সমস্ত দিনের ধকল গেছে তোমার...।

—কিছু না। তার দিকে চেয়ে বাপী একটু মজার খোরাক পাচ্ছে। বলল, যেদিন তোমাদের ডিভোর্সের রায় বেরুলো, আমার ওপর ক্ষেপে গিয়ে তুমি জিগ্যেস করেছিলে, যা হয়ে গেল তার পিছনে আমার কতটা হাত ছিল, আমি বলেছিলাম সবটাই—মনে আছে?

মিষ্টি মাথা নাড়ল, মনে আছে।

—তার মানে তোমাকে চাওয়া বা পাওয়ার ব্যাপারে আমি কোনো মিথ্যের আশ্রয় নিইনি। তোমার আমার মধ্যে লুকোচুরির কিছু থাকতে পারে না এটুকু ধরে নিয়ে মনে কি আছে বলে ফেলো দেখি?

এবারে মিষ্টি সোজা চেয়ে রইল একটু। মনে যা আছে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত নিজেও স্বস্তি বোধ করছে না। কলকাতার এয়ারপোর্ট থেকে প্রথম যেদিন তুমি আমাকে হোটেলে নিয়ে গেছলে সেদিনও তুমি বনমায়ার সেই বুনো হাতির হাত থেকে প্রাণে বাঁচার ব্যাপারটা আমাকে বলেছিলে। ...বলেছিলে, তোমার সঙ্গে একজন ছিল, সেই তোমাকে বাঁচালে। সেই একজন কোনো মেয়েছেলে তখনো বলোনি... এখানে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে সেই জায়গা যখন দেখালে, তখনও না।

বাপীর ঠোঁটের হাসি মিলিয়েছে। বুকের তলায় মোচড় পড়ছে। কলকাতার হোটেলে রেশমার নামটা করতে পারেনি বলে নিজেকে অকৃতজ্ঞ ভাবছিল, তাও মনে আছে।

—তোমার কাছে এ গল্প কে করল, ঝগড়ু?

—সাদা মনেই করেছে। তোমাকে বাঁচানোর ব্যাপারে জঙ্গল আলো করা মেয়েটা কত সাহস আর কত বুদ্ধি ধরে তাই বলছিল। ...রাত পোহাতে হঠাৎ সে এখান থেকে চলে গেল, আর কয়েকদিনের মধ্যে বানারজুলির সাপ-ঘরে গিয়ে সাপের ছোবল খেয়ে আত্মহত্যা করল—সেই শোক আর সেই অবাক ব্যাপার ওর মনে লেগে আছে।

মুখের দিকে চেয়ে কিছু একটা যন্ত্রণার আভাস দেখছে মিষ্টি। একটু চুপ করে থেকে বাপী ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, বানারজুলির বাংলোর সামনে সেদিন যে পাগল লোকটাকে দেখেছিলে, মনে আছে?

...হারমা না কি নাম বলেছিলে।

—হ্যাঁ। রেশমা ওকে ভালবাসত না, ও দারুণ ভালবাসত। তার শোকে এই দশা।... এখন ওর ধারণা রেশমা আমার জন্যেই আত্মহত্যা করেছে। বলে বেড়ায়, রেশমাকে যে বাঁচতে দিল না তার কি ভালো হবে...।

মিষ্টি সত্রাসে চেয়ে আছে।

—হারমার ধারণা খুব মিথ্যে নয়।... রেশমাকে বাঁচাতে পারতাম। তাহলে বাপী মরত। সে তোমাকে পেত না। তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারত না।

মিষ্টি নির্বাক।

ভারী অথচ নিরুত্তাপ গলায় বাপী এরপরে অবার্থ সেই বীভৎস মৃত্যু থেকে রেশমার তাকে বাঁচানোর চিত্রটা অকপটে তুলে ধরল। বাংলোয় ফেরার পর রাতের ঘটনাও।

মিষ্টি উৎকর্ণ। তারও চোখে মুখে বেদনার ছায়া।

বাপী বলল, এরপর ক্ষিপ্ত হয়ে সে আমার কত বড় শত্রুর হাতের মুঠোর চলে গেল আর কোন অনুশোচনায় সে নিজের ওপর অমন বীভৎস শোধ নিল—সে কথা তুমি দুলারির মুখে শুনে নিতে পারো—রেশমা তাকে সব বলে গেছে।

মিষ্টি সখেদে মাথা নাড়ল। দু চোখে অনুতাপ। আর কারো কাছে কিছু শোনার দরকার নেই।

তেমনি ভারী গলায় বাপী আবার বলে গেল, কিন্তু তোমার কথার জবাব এখনো দেওয়া হয়নি।...যাই করুক, রেশমা রেশমাই। নিজের ওপর ওরকম শোধ সেই নিতে পারে। সেই বীভৎস দৃশ্য তুমি কল্পনা করতে পারবে না। পুর পুর অনেক-গুলো রাত আমি ঘুমুতে পারিনি। যন্ত্রণার বুক ফেটে গেছে। কলকাতায় বা এখানে তোমার মনে এতটুকু ভুলের ছায়া পড়ুক তা আমি চাইনি। তোমাকে পাওয়ার আনন্দে স্বার্থপরের মতো অতবড় শোকের স্মৃতিও ভুলতে চেয়েছি। তাই তার নাম করিনি।

মিষ্টির বিচ্ছিরি লাগছে। নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে যাকে হাড়ে হাড়ে চিনেছে, তার ভোগের দুর্বার তৃষ্ণাও দেখছে এখন। রেশমার সম্পর্কে এই গোপনতার ফলে একটা কুৎসিত সন্দেহ দানা বাঁধছিল মনে আসছিল, নিজের কাছে অন্তত সেটা অস্বীকার করার নয়। চেয়ার ছেড়ে কাছে এসে দাঁড়াল। একটা হাত তার পিঠে রাখল। —ঘাট হয়েছে, আর কক্ষনো তোমাকে কিছু বলব না—হল?

—হাজার বার বলবে। বললে বলেই এখন হালকা লাগছে। তোমার আমার মধ্যে কোনো মিথ্যে থাকবে না, লুকোচুরি থাকবে না—বাস!

দশ দিন বাদে আবার বানারজুলি। এসে সেই বিকেলেই গেটের কাছে আবার হারমাকে দেখেছে। বাংলোর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে কি বলছিল। তাকে দেখেই ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। লোকটা নাকি বলে, রেশমাকে যে বাঁচতে দিল না তার কি ভালো হবে...।

মিষ্টির এই অস্বস্তি বাপীও লক্ষ্য করেছে। আবুকে বলেছে, হারমার এদিকে আসা আটকাও তো। তোমার বহিনজি ঘাবড়ে যায়।

তিন দিন দার্জিলিং আর দুদিন শিলিগুড়ি বেড়ানোর পর আবার বানারজুলিতে ফিরে মিষ্টি কলকাতায় ফেরার জন্য ব্যস্ত। তার এক মাসের ছুটি প্রায় শেষ।

এ ব্যাপারে বাপী নির্লিপ্ত। জিগ্যেস করল, এয়ার অফিস তোমাকে কত মাইনে দেয়?

—কেন, তুমি তার থেকে বেশি দেবে?

—দেব।

মিষ্টি হেসেই জিজ্ঞাসা করল, কত বেশি দেবে?

—বেণীর সঙ্গে মাথা।

তার চাকরির ব্যাপারে এই লোক বিগড়বে এরকম আশংকা মিষ্টির ছিলই। এরপর যা দেখল তাতে দু চক্ষু স্থির। উত্তর বাংলার নানা ব্যাঙ্কের এক-গাদা পাশবই। তার কোনোটাতে বাপী তরফদার, কোনোটাতে বিপুল তরফদার, কোনোটাতে বিপুলনারায়ণ তরফদার, কোনটাতে বা শুধু নারায়ণ তরফদার। এক-একটাতে টাকার অঙ্ক দেখেও মাথা ঘোরার দাখিল।

শুধু অবাক নয়, মিষ্টি অস্বস্তিও

বোধ করেছে। সাদা-সিধে রাস্তায় এত টাকা এলে নামের এত কারচুপি কেন? শুধুই ইনকাম ট্যাক্স এড়ানোর জন্যে বলে মনে হল না। পাহাড়ের বাংলোয় গিয়ে সে আরো কিছু দেখেছে, জেনেছে। রেশমাকে নিয়ে অমন এক আবেগের ব্যাপার ঘটে গেল বলেই মুখ ফুটে তখন কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি। বানারজুলিতে ফেরার পর ভুলে গেছল।

ভাবনাটা এখনো চেপেই গেল মিন্টি। বাপীর তক্ষুনি আবার দরকারি কাজ মনে পড়েছে। এসব পাশ বই বাতিল করে দুজনের নামে অ্যাকাউন্ট করতে হবে। চার-পাঁচ দিন অন্তত লাগবে তাতে।

তাকে কিছু না জানিয়ে মিন্টি টেলি-গ্রামে আরো এক সপ্তাহের ছুটির মিয়াদ বাড়িয়ে নিল।

ওই সব ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট দুজনের নামে ট্রান্সফারের সময়েও সেই নাম বদলের খেলা দেখল। এবারে একজনের নয়, দুজনেরই। কোথাও মিন্টি তরফদার কোথাও মালবিকা তরফদার। কোথাও শুধু মিন্টি দেবী বা মালবিকা দেবী। কোনটাতে আগে বাপীর নাম পরে ওর। কোনটাতে আগে ওর পরে বাপীর।

মিন্টির সাদামাটা বিস্ময়। —নামের ওপর এত হামলা কেন?

জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেছে। চোখে দুষ্টুমি চিকিয়ে উঠেছে।—সত্যি, আমি রাম বোকা একটা আসল লোক এত কাছে, তাকে ছেড়ে কিনা তার নামের ওপর হামলা!

নিরাপদ ব্যবধানে সরে গিয়ে মিন্টি আবার জানতে চেয়েছে সত্যি, বলো না কি ব্যাপার?

বাপীর এবারে সত্যি বলার দায়ে-পড়া মুখ। —জেল-টেল যদি হয় কখনো, একলা যায়ে মরি কেন, দুজনে জড়াজড়ি করেই যাব।

মিন্টিও হেসে ফেলে তাড়াতাড়ি কৌতূহল চাপা দিল। খুব কম নয়, উদবেগ টের পেলেই এই ঠাট্টা হয়তো। মিন্টি তার পরেও শুধু লক্ষ্য করেছে। মুখের আয়নায় ভেতর দেখতে চেষ্টা করেছে। বড় রকমের গলদ বা জটিলতা কিছু থাকলে কেউ এমন নিঃশঙ্ক অকপট স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে দিন কাটাতে পারে না। এখানে এসে মিন্টি পাহাড়ী ঝরনা কম দেখল না। পাথরে বিঘ্ন ঠেলে, কোনো আবর্জনা গায়ে না মেখে তরতর করে নেমে আসে। হাতে নিলে স্ফটিকস্বচ্ছ। এই লোকের সঙ্গে মেলে। বিঘ্ন মানে না। আবর্জনা গায়ে মাখে না। ওসব যে দেখে, দেখুক।

মিন্টিও আর দেখতে চেষ্টা করল না। উৎকণ্ঠাও সরে গেল। সুখই লাগতে বুঝতে থুব সময় লাগবে মনে হয় না। পাহাড়ের বাংলোর এই লোকের সেদিনের জোরের কথাগুলো ভোলার নয়। বলেছিল, তোমার আমার মধ্যে কোনো মিথ্যে থাকবে না, লুকোচুরি থাকবে না—ব্যস!

থাকবে না যে, তার প্রমাণ কলকাতা রওনা হবার দিনও আর এক-দফা পেল। উপলক্ষ হাতের চিঠি। এই সকালে এসেছে। আমেরিকা থেকে ঊর্মিলা একসঙ্গে ওদের দুজনকে লিখেছে। রেজিস্ট্রি হয়ে যাওয়ার পরেই বাপী আট-দশ লাইনের চিঠিতে বিয়ের খবর আর বানারজুলিতে লম্বা হনিমুন কাটানোর খবরটা শুধু দিয়েছিল। তার জবাব। চিঠিতে এমন কিছু প্রগলভ রসিকতার আভাস ছিল যার দরুন বউয়ের জেরার ভয়ে অনেক পুরুষ ওটা লুকিয়ে ফেলতে চাইত। চিঠিটা নিজে পড়ে নিঃসংকোচে তার হাতে তুলে দিয়েছে। পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত মিটিমিটি হেসেছে।

ফ্রেন্ড ডিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ডিয়ার মিন্টি। চিঠি পেলাম। সব জানলাম। চিঠি এত ছোট কেন, তাও বুঝলাম।

যুগলে শোনো! দেশের মতো এখানেও সামার এখন। ছোট বড় যে কোনো উপলক্ষে এখানে এখন মেয়ে পুরুষের নাচার ধুম। ওর আপিসের অসভ্য বন্ধুগুলোর আমাকে নিয়ে নাচার জন্য টানাটানি। আমি ছুতো-নাতায় পালিয়ে বেড়াই। কিন্তু সেদিন চিঠিখানা পেয়ে আর পড়েই ঘরের মধ্যে আমি এমন নাচা নাচতে লাগলাম যে তোমাদের মিস্টার মেহেরার দুই চোখ ছানাবড়া। ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে থামাতে এসে আরো বিপাকে পড়ে গেল। আমি তাকে নিয়েই ধেই-ধেই নাচতে লাগলাম।

বাপী, তুমি একখানা সত্যিকারের শয়তান। যা চাও তাই পাও। তাই করো। আমি এরকম শয়তানের কত যে ভক্ত জানলে মিন্টি না রেগে যায়। যাক এখন কি করে মিন্টি পেলে না জানা পর্যন্ত আমার ভাত হজম হবে না। পত্রপাঠ সবিস্তারে লিখবে।

মিন্টি, তুমি কত যে মিন্টি একদিন স্ব-চক্ষে দেখেছি। আজ সত্যি কথা বলছি ভাই তোমার সেদিনের অত ঠান্ডা হাব-ভাব দেখেও আমার মনে হয়েছে তুমি কোনো গৌরবের সমর্পণের অপেক্ষায় বসে আছ। নইলে সেদিন তুমি অত বটা করে ফ্রেন্ডের অস্তিত্ব উপেক্ষা করতে চাইতে না। কিন্তু খুব সাবধান, ওই ভেলকিবাজ মানুষকে কক্ষনো যেন আর মিন্টি ছাড়া করতে চেও না। তার মিন্টি ছাড়া হবার আক্রোশ আমি যেমন জানি তেমন আর কেউ জানে না। এই আক্রোশে সে নিজে রসাতলে ডুবতে পারে অন্যকেও টেনে নিয়ে যেতে পারে।

বাপী, মিন্টিকে ওভাবে সাবধান করার জন্য তুমি নিশ্চয় আমার মুণ্ডুপাত করছ। মানে মানে এখন সরে পড়ি।

তোমাদের হনিমুনের হনি অফুরন্ত হোক। —ঊর্মিলা।

বাপীর ঠোঁটে হাসি ঝুলছে। চিঠি পড়া শেষ করে মিন্টি মুখ তুলল। স্বাভাবিক জেরার সুরে জিজ্ঞেস করল শেষের এই কথাগুলোর মানে কি?

—মানে অত দূরে বসেও ওই মেয়ের আমাকে ডোবানোর মতলব।

—তোমার মিন্টি ছাড়া হবার আক্রোশ ও যেমন জানে আর কেউ তেমন জানে না লিখেছে আক্রোশে ওকেই রসাতলের দিকে টেনেছিলে নাকি?

—প্রায়।

মিন্টির কৌতূহল বাড়লো। —শুনি না কি ব্যাপার?

বাপী বিপন্ন মুখ। —শুনতেই হবে?

মিন্টি একটু হালকা খোঁচা দেবার লোভ ছাড়ল না। —তুমিই বলেছিলে আমাদের মধ্যে লুকোচুরির কিছু থাকতে পারে না। বলতে আপত্তি থাকলে বোলো না।

বাপী বড় নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা।—এরপর আর না বলে পারা যায় কি করে। ...তোমার বিয়ে হয়ে গেছে জেনে সমস্ত মেয়ে জাতটাকে ভস্ম করার মেজাজ নিয়ে বানারজুলি ফিরেছিলাম। সেই আক্রোশে ঊর্মিলার প্রেম কাণ্ডে আগুন ধরিয়ে ওকেই প্রায় গিলে ফেলেছিলাম—

মিন্টি হাসতে গিয়েও হোঁচট খেল।—তোমার গেলার নমুনা তো জানি, প্রায় বলতে কতটা?

—তা অনেকটা। ওর মা তখন ষোলো আনা আমার দিকে--আমাকে ঠেকায় কে!

মিন্টি এবারে রুদ্ধশ্বাস।। —তারপর?

—তারপর ওই মেয়ের চোখের জল আমার পিঠে চাবুক হয়ে নেমে এলো। পড়িমরি করে আবার কলকাতা ছুটে গিয়ে বিজয়কে শিলিগুড়ি ধরে নিয়ে এলাম। আর এখান থেকে মায়ের অজান্তে মেয়েকে সরে নিয়ে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে ওদের বিয়ে দিলাম।

মিন্টি চেয়ে আছে। তার কান-মন ভরে যাচ্ছে।

(চলবে)

চিঠিপত্র

সুরুচিপূর্ণ সুখপাঠ্য উপন্যাস

বেশ কয়েক সংখ্যা ধরে আশুবাবুর সুন্দর, সুরুচিপূর্ণ এবং সুখপাঠ্য উপন্যাস 'সোনার হরিণ নেই' পড়তে না পেয়ে মনটা খুব খারাপ লাগছিল। ৪ মে-র সংখ্যায় আবার তা পড়তে পেয়ে মন আনন্দে ভরে উঠলো। কিছুদিন ধরে একটা কথা মাঝে মাঝে ভাবছিলাম বাপীর সঙ্গে গৌরী বৌদির দেখা হবে কিনা। কারণ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাপী সেদিন মণিদার বাড়ী থেকে চলে এসেছিল, গৌরী বৌদি কোনদিন তা কারোর কাছে সত্যের আলোকে প্রকাশ করেননি। 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'এর মত নিশ্চয়ই বাপীর ঘাড়ে দোষ চাপানো হয়েছিল। তারপর দীর্ঘ ছ' বছর পর সেই বাপী এবং সেই গৌরী বৌদি পরস্পর মুখোমুখী। শুধু তাই নয়, গৌরী বৌদি ভীষণ ভাবে জব্দ, পড়তে পড়তে কি যে মজা পাচ্ছিলাম, ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। লেখকের সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার মনের মিল বুঝি এমনি করেই ঘটে।

শুক্লা দত্ত, শিলচর মেডিক্যেল কলেজ, আসাম।

প্রতিটি চরিত্রই ভালো

আমি অমৃত পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠিকা। প্রথম যখন অমৃত প্রকাশিত হয় তখন থেকেই আমি নিয়মিত অমৃত রাখি। অমৃত আমার খুবই ভালো লাগে। কবে আবার অমৃত আসবে সেই আশায় দিন গুণি।

অমৃতে প্রকাশিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'সোনার হরিণ নেই' অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। এর প্রতিটি চরিত্রই খুব ভালো লেগেছে।

প্রতিভাময়ী বসু, ২০।২বি, প্যারাডাইস লেন, কলকাতা-৭০০০১৪।

সোনার হরিণ ভাল লাগছে

আমি আপনাদের অমৃতের গ্রাহক। অমৃত পড়তে শুরু করার পরেই দেখি, এতে কয়েকটি গল্প, উপন্যাস ছাড়া আর ভাল কিছু থাকে না। যাইহোক, তবুও ভাল লাগছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সোনার হরিণ নেই' ধারাবাহিক উপন্যাসটি পড়ে। মহেন্দ্রলাল সাহা, শালবনী, মেদিনীপুর।

অনবদ্য

আমি অমৃতের একজন অনুরাগী পাঠক। প্রতি সপ্তাহে এই পত্রিকাটির জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে থাকি: বিশেষ করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য উপন্যাস 'সোনার হরিণ নেই' উপন্যাসটির জন্য। অমৃত হাতে পেয়ে মোটামুটি একবার নজর বুলিয়ে রাখি যদিও তখনি পড়ে ফেলতে প্রবল ইচ্ছা জাগে। পড়ে নিলে তো আবার এক সপ্তাহ পরে পাবো। সেইজন্য ধীরে সুস্থে আরাম করে একদিন দুদিন পরে অবসর সময়ে পড়ি।

অমৃতের অন্যান্য প্রবন্ধ, গল্প, প্রচ্ছদপট এককথায় অমৃত অমৃতই। তবে নিয়মিত প্রকাশিত হলে আরো ভাল লাগবে। দয়াময় সাঁই, উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ, পঃ দিনাজপুর।

বাপী অনাথ আশ্রম খুলবে

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস সোনার হরিণ নেই-এর নায়ক বাপী তরফদার মনে হচ্ছে এবার একটা অনাথ আশ্রম খুলবে। কুমু তো আছেই. বাচচুও এসে জুটল, রতন ও কমলা বণিক না হয় জুটে যাবে—আশ্রমিকের অভাব হবে না। সত্যি বাপী তরফদার দিলদরিয়া মানুষ বটে। বাপীর আপনজন বলতে কেউই নেই—অতো টাকায় ছাতা পড়ে যাবে. তাছাড়া তার অন্য কাজও যখন নেই, তখন একটা অনাথ আশ্রম পরিচালনা করা বাপীর পক্ষে মোটেই অসম্ভব হবে না। পাপিয়া চক্রবর্তী কলকাতা—৪৭।

আত্মার তৃপ্তি হোত

আমি স্কুল জীবন থেকে নিয়মিত অমৃতের পাঠক। অনেক দিন পরে সাত্যিকারের সেরা একটা উপন্যাস পড়তে পারলাম বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি লেখক শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে তার সুন্দর উপন্যাস সোনার হরিণ নেই-এর জন্য। সর্বদাই আগ্রহ নিয়ে বসে থাকছি কখন পরবর্তী সংখ্যাটি প্রকাশ হবে। ছাড়তে ইচ্ছা করে না—মনে হয় সমস্ত উপন্যাসটি যদি একসঙ্গে পেতাম তবে আমার আত্মার তৃপ্তি হোত। রতনলাল চক্রবর্তী দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।

অমৃতের আকর্ষণ বাড়িয়েছে

আমি অমৃত-এর একজন নিয়মিত পাঠক বেশ কিছুদিন চলার পর বিচিত্রা বিভাগ কেন আর থাকছে না বুঝতে পারলাম না। আশা রাখি বিভাগটি আবার থাকবে।

'সতী সাবিত্রী কথা' আমাকে মুগ্ধ করেছে। লেখক প্রভাত চৌধুরীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর বর্তমানে অমৃতের বিশেষ আকর্ষণ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর সোনার হরিণ নেই উপন্যাসটি পরবর্তী সংখ্যার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। লেখাটি অমৃতের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। শান্তিময় মণ্ডল, পোঃ চোবাগা, কলিকাতা—৩৯।

পড়ে সমালোচনা করুন

গত ১৮ মে তারিখের অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে সুকুমার চৌধুরীর 'সর্বাস্ত পেলাম' চিঠিখানি পড়ে এবং মর্মাহত হলাম। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাওয়া গাড়ি নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস হয়েছে. অবশ্য তিনি আর একটু মনোযোগ দিলে শেষটা হয়তো আরো বেশী ভাল হতে পারতো। তবে সব মিলিয়ে লেখাটিকে আদৌ খারাপ বলা চলে না। কিন্তু সুকুমার চৌধুরী শ্যামলবাবুর এই হাওয়া গাড়িকে কেমন করে বটতলা মার্কা বলে অভিহিত করলেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। সুকুমারবাবু সম্পূর্ণ লেখাটা মার্কা বলে অভিহিত করলেন তা আমি পড়েই এ ধরনের মন্তব্য করলেন না লোকমুখে শুনেই করলেন সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। হাওয়া গাড়ি পড়ার পর এ ধরনের উক্তি কেউ করতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

তাই সবশেষে এই সব সমালোচকের কাছে আমার একটাই অনুরোধ তাঁরা যেন কোন কিছু ভালোভাবে পড়ার পর সমালোচনা করেন। বাপি ঘোষ, নূতন বাজার, বসিরহাট। ২৪ পরগণা।

আনন্দ পেয়েছি

আমরা অমৃত পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। তাই অমৃতের প্রশংসা না করে পারছি না। গত ৬ এপ্রিল সংখ্যায় অমৃতে লেখক শ্রীঅসীম চক্রবর্তীর নিঃসঙ্গ যোদ্ধা গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হলাম। এরকম ছোট গল্প একমাত্র অমৃতেই আশা করা যেতে পারে। এছাড়া সদ্য সমাপ্ত হাওয়া গাড়ি উপন্যাসটি পড়েও প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। যদিও উপন্যাটি শেষদিকে কেমন যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য। আলিপুরদুয়ার কোর্ট ৭৩৬১২২।

একঘেয়ে লাগছে

বলতে পারেন সেই ছেলেবেলা থেকেই অমৃত পত্রিকা আমি নিয়মিত পড়ি। তাই এই পত্রিকাটির ক্রমবর্ধমান উন্নতির একজন সাক্ষী বলে আমি রীতিমতো গর্ব করি। সম্প্রতি যে সব গল্প কবিতা এবং প্রচ্ছদ প্রবন্ধ আপনার সম্পাদিত এই পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে উন্নতমানের। উপন্যাসের কথাই বা বাদ দিই কেন? আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সোনার হরিণ নেই বেশ ভালো লাগছে—তবে ইদানীং একটু একঘেঁয়ে হয়ে গেছে। তরণী পাহাড়ে বসন্ত—অপূর্ব বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী।

৯ ফেব্রুয়ারী পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প—একে চন্দ্র দশে দিক আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। পাপিয়া চক্রবর্তী কলকাতা—৪৭।

গোল না হলেই গণ্ডগোল

অজয় বসু

বড় তাড়াতাড়ি গোল করে জয় লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারলেই ভাল। নইলেই ঝামেলা। নানান অশান্তি।

গোল না হলেই গন্ডগোল। ফাটা বোমার ধারালো টুকরোর মতো ঝাঁক ঝাঁক ইঁটপাটকেলের টুকরো এসে পড়বে গ্যালারি থেকে মাঝমাঠে। ঘুণধরা অপলকা কাঠের খুঁটি উপড়ে নিয়ে বেড়া টপকে কেউ বা মাঠে নেমে পড়ে রেফারি আর খেলোয়াড়দের তাড়া করবে। পুলিসের যদি হস্তক্ষেপ ঘটে তবে তাড়া খাওয়া মানুষগুলির নিস্কৃতি। নইলে তাঁদের কপালে শারীরিক নির্যাতন জুটে যেতে পারে।

এ সবই বড় বড় দলের সমর্থকদের কীর্তি। তাঁরা খেলা দেখতে কি মাঠে আসেন? আসেন, সমর্থিত দলের জিৎ দেখতে। বড় বড় দলের সামর্থ অঢেল। নামী দামী খেলোয়াড়েরা থাকেন সেইসব দলে। তাঁদের ক্রীড়া দক্ষতা সম্বল করে বড় বড় দলের সহজেই জেতার কথা। কিন্তু জিৎ যদি সহজে না হয়, তথাকথিত ছোট ছোট দল যদি অর্বাচীনের মতো বড়দের পথ আগলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, অমনি দলানুরাগীদের মেজাজ যায় বিগড়ে। তখন তারা করতে পারে না এমন কোনো অপকর্ম নেই।

ফুটবল যদি কলকাতার গর্ব হয় তাহলে এক শ্রেণীর উগ্র, উশৃংখল দল সমর্থকদের বিবেকবর্জিত কান্ডজ্ঞানহীন ক্রিয়াকলাপও কলকাতার কম লজ্জা নয়। সমর্থিত দল যদি খেলায় সুবিধে না করতে পারে অমনি গ্যালারির মদতদারেরা আইনটিকে নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ইঁট ছুঁড়ে, মারদাঙ্গা বাধিয়ে তারা অন্য পক্ষের খেলোয়াড়দের ভয় দেখায়। রেফারি লাইন্সম্যানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তাদের সব চেষ্টাই সমর্থিত দলের অনুকূলে বাড়তি সুবিধা আদায় করে নেওয়া।

কলকাতার ফুটবল মাঠে ইঁট ছোঁড়ার রেওয়াজটি যেন অনেকের কাছে গা-সওয়া হয়ে গেছে। খেলার ব্যবস্থা যাঁরা করেন, যাঁরা গ্যালারির ব্যবসা করেন এবং যাঁরা দল সমর্থকদের পরের পেছনে ফেউয়ের মতো লাগিয়ে দিয়ে নিজেদের সুবিধা আদায় করে নেন তাঁরা ইঁট ছোঁড়াছুঁড়ির দৃষ্টান্তের দিকে তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু ইঁটের ঘায়ে যাদের মাথা ফাটে, কপাল ফাটে তাঁদের ব্যাপারটা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। সারাক্ষণ যদি পেছন থেকে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁট ছুটে আসতে থাকে তাহলে ছোট দলের গোলরক্ষক খেলায় মন বসাবেই বা কী করে?

[illegible] প্রতিদ্বন্দ্বী বড় দলের আক্রমণ সুখতে তিনি এমনিতেই নাজেহাল। তারওপর এই ইঁট-পাথরের হামলা। সব মিলিয়ে তাঁর একেবারে অসহায় অবস্থা। প্রান্তিক লাইন্সম্যানেরও তেমনি বেহাল অবস্থা। এমন এক একটি মুহূর্ত আসে যখন লাইন্সম্যানটিকে ইঁটপাটকেলের আপ্যায়ন এড়াতে পুব ধারের পার্শ্বরেখা ছেড়ে অন্যত্র ছুটে পালাতে হয়। এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে লাইন্সম্যান খেলা পরিচালনায় রেফারিকে সাহায্য করবেন কী করে? তখন নিজের জান্ বাঁচানোই তাঁর কাছে এক সমস্যা।

এই সমস্যার বোঝা ঘাড়ে নিয়েই কলকাতায় তথাকথিত ছোট ছোট দলগুলি সিনিয়ার ফুটবল লীগে খেলছে। তাদের বোঝাটি যাতে হাল্কা হয় তার ব্যবস্থা কেউ করছে না। নিয়ামক সংস্থা খেলার আয়োজন করেই খালাস। রাজ্য সরকার উচ্ছৃংখল দর্শকদের উদ্দেশ্যে মাঠের দরজা খুলে দেন কিছু পয়সা হাত পেতে নিয়ে। এবং সেইখানেই যেন সরকারের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। তারপর কী ঘটলো, খেলা হল, না উচ্ছৃংখল দর্শকদের বেপরোয়া দাপাদাপিতে মাঠে দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল এসব কথা জানায় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা এবং রাজ্য সরকার, কোনো পক্ষেরই যেন মাথাব্যথা নেই।

সরকারেরও মাথা ব্যথা নেই? বাক্যটি সুপ্রযুক্ত হল? হয়ত কেউ প্রতিবাদের সুরে বলে উঠবেন, রাজ্য সরকার তো এ ব্যাপারে বেশ চিন্তিত। মুখ্যমন্ত্রী কি তাঁর উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন নি? শক্ত হাতে উচ্ছৃংখলতার মোকাবিলা করা হবে, এ আশ্বাস তিনি দিয়েছেন বটে। কিন্তু সে আশ্বাসের ভরসা কোথায়!

মাঠে যাঁরা বেয়াড়াপনা করে থাকে তাদের কানে মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবাণীও কোনো দল ঢোকাতে পারে নি। যেদিন সকালে প্রাত্যহিক দৈনিকে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল সেদিন বিকেলে একটি বড় দলের খেলায় গ্যালারি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁট ছোঁড়া হয়েছিল বড় দল গোল করার সঙ্গে সঙ্গেই ডজন দু-তিন উগ্র সমর্থক বেড়া টপকে মাঝমাঠে গিয়ে খেলোয়াড়দের ঘিরে তান্ডব নৃত্য শুরু করে দেয়। তাদের নর্তন কুর্দনে খেলাও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

বড় দল জিতেছিল তাই সেদিন মাঠে আর বড় রকমের গোলমাল হয়নি। তবে খেলা ভাঙ্গার পর ট্রামে বাসে মাঠের দর্শকদের বাঁধন ছেঁড়া জয়োল্লাসের যন্ত্রণা যে অসংশ্লিষ্ট নিরীহ যাত্রীদের সইতে হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কী! খেলা ভাঙ্গলে ঘরমুখো মেঠো দর্শকদের অনেকেই বাস ট্রামের ভাড়া দিতে চায় না। ফলে যানবাহন কর্তৃপক্ষকে আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হয়। সেদিনও সে ক্ষতি মাথা পেতে নিতে হয়েছিল। প্রায় রোজই এই ব্যাপারটি ঘটে। নিত্যকার অঘটন। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও এসব ঘটছে এবং ঘটবে বলে তাঁর মৌখিক আশ্বাসে তেমন ভরসা রাখতে পারছি না।

মনে হয়, শুধু মুখের কথাতে চিঁড়ে ভিজবে না। মেঠো হাঙ্গামা বন্ধ করতে, বেয়াড়াপনার চরিত্র শুদ্ধ করতে কার্যকর কিছু ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আজ আর অন্য কোনো উপায় নেই। এবং সে ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারী, প্রশাসনিকস্তরে।

সরকারী জমি গড়ের মাঠকে খেলার প্রয়োজনে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন রাজ্য সরকারই। সেই অনুমতি হাতে পেয়ে কেউ বা কারা যদি খেলার মাঠটিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার আখড়ায় পর্যবসিত করতে চায় তাহলে সরকার তো হাত পা গুটিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকায় স্ফিংক্সের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। সেক্ষেত্রে সরকারকে হয় অনুমতি ফিরিয়ে গড়ের মাঠটিকে কেড়ে নিতে হয়, আর না হয় গেটের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফাঁকা মাঠে খেলার ব্যবস্থায় সায় দিতে হয়।

প্রস্তাবিত দুটি ব্যবস্থাই চরম। এমন একটি চরম পন্থা অনুসরণের সংকোচ থাকা স্বাভাবিক। সরকারের মনে সেই সংকোচ আছে বলেই চরম ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবা হচ্ছে না। কিন্তু যেভাবে অবস্থার অবনতি ঘটছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সেই ভাবনাটিই তো বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। কে জানে গড়ের মাঠের উচ্ছৃংখল দর্শকেরা অনাগত সেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন কিনা। বোধহয় না। কিঞ্চিৎ সচেতনতা থাকলে তাঁরা মাঠের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার কাজটিকে নিজেদের আচরণে ত্বরান্বিত করতে চাইত না।

আমরা বলি, খেলাধুলোর মাধ্যমে সৎ শিক্ষা পাওয়া যায়। খেলার মাঠে গড়ে ওঠে জাতীয় চরিত্র। কলকাতার ফুটবল মাঠে জাতীয় চরিত্র যে কীভাবে গড়ে উঠছে তা ভাববার কথা। খেলার মাঠে যদি বাড়ন্ত ছেলেদের সদাচরণে দীক্ষা না দিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাতে কেবলই তাদের প্ররোচিত করে তাহলে সেই মাঠ জাতীর জীবনে এক অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় না? কি দরকার এমন একটি অভিশাপকে সাধ করে স্বাগত জানানোর?

তবু রাজ্য সরকার প্রতিদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে প্রকাশ্যে একটি হুঁশিয়ারি তুলেছেন। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ের মাঠে ফুটবলের আয়োজন

ঘটাচ্ছেন সেই প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে কুটোটি পর্যন্ত নাড়েন নি। উচ্ছৃংখলতার প্রতিবাদে সামান্য একটি বিবৃতি দিতেও এই প্রতিষ্ঠানের অনীহা। এই প্রতিষ্ঠান হলেন কলকাতার ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আই-এফ এ। মাঠে ইঁট পড়ছে, মারদাঙ্গা বাধছে। জোটবাঁধা সমর্থকদের হাতে ছোট ছোট দলের খেলোয়াড় এবং রেফারিরা নিগৃহীত হচ্ছেন। অথচ আই এফ এ কিছুই করছেন না। খেলোয়াড় রেফারিদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যদি সাধ্যের অতীত হয় তাহলে খেলার আয়োজন করার নৈতিক অধিকার কি আই এফ এ-এর থাকতে পারে? পারে না।

কিন্তু নীতিবোধের কোনো তাগিদই যেন নেই আই এফ এ-র। এবং তা নেই বলেই আই এফ এ এ বছরে এমন একটি নিয়ম চালু করেছেন যা থেকে বোঝা যায়, যে মনের দিক থেকে আই এফ এ একেবারে দেউলে বনে গেছেন।

নতুন নিয়মটি এই রকম: লীগে কোনো প্রতিযোগী যদি গরহাজির থাকে তাহলে তার চার চারটি পয়েন্ট কাটা যাবে। হারলে মাত্র দু পয়েন্ট, আর অনুপস্থিতি থাকলে এক গন্ডা পয়েন্ট হারাতে হবে। ছোট ছোট দল পড়ে পড়ে মার খাবে, আই এফ এ দেখেও দেখবেন না। না করবেন তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা অথচ বাড়িয়ে অসহায় দলগুলিকে মারদাঙ্গার মুখে ঠেলে দেবেন। এ কীরকম বিচার? সব প্রতিযোগীই আই এফ এর অনুমোদিত। আছে নিয়ামক সংস্থার ছত্রছায়াতে। কিন্তু বিপদের দিনে আই এফ এ যদি তাঁর পরিবারের সদস্যদের মাথায় নিরাপদ ছাতাটি খুলে ধরতে না পারেন তাহলে কোন্ বিচারে তিনি ফুটবলের সংসারের কর্তাপদবাচ্য হতে পারেন? সংসারের কর্তার কাজ কি শুধু চোখ রাঙানো ও কিল মারা? এবং সকলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করা নাকি?

জানি, নীতির দোহাই পেড়ে আই এফ এ-কে কর্তব্য পালনে বাধ্য করানো রীতিমত কঠিন। হয়ত বা অসম্ভব। তবু বাস্তবের দিকে চোখ রেখে বলতে চাই যে চার-চারটি পয়েন্ট কাটার হুমকি তুলে আই এফ এ অনুমোদিত সংস্থাগুলির ওপর অত্যাচারের রোলার চাপিয়ে দিতে চাইছেন। এই নিয়ম যদি প্রত্যাহৃত না হয় এবং তথাকথিত ছোট ছোট দলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যদি নিশ্ছিদ্র না করা হয় তাহলে ছোটরাই একদিন কোণঠাসা বেড়ালের মত রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইবে। তারা যদি সবাই একজোট হয়ে বলে, নিগ্রহ, নির্যাতনে আমাদের কোনো লোভ নেই। তাই আমরা কেউ বড় দলের সঙ্গে খেলব না, তাহলে অবস্থা কীরকম দাঁড়ায়। নিয়ামক সংস্থার অস্তিত্বই তখন বিপন্ন হয়ে পড়বে নাকি?

বিশ্বকাপে ভারতের পরাজয়

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

গাভাসকার

প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ

ভারতীয় ক্রিকেটকে ঠিক এই রকম অপমান বোধহয় এর আগে আর সহ্য করতে হয়নি। বিশ্ব কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ভারত যে এতোটা খারাপ খেলবে তাও বোধহয় কেউ কল্পনা করতে পারেননি।

বিশ্ব কাপ অর্থাৎ প্রুডেনসিয়াল কাপ ক্রিকেটের ক বিভাগের প্রথম খেলায় ভারত হেরে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে। এ পরাজয় অপ্রত্যাশিত নয় গতবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে ভারতকে হেলায় হারাবে সে বিষয়ে কারো বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তবু সকলে আশা করেছিলেন, ভারত হয়তো কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারবে। হয়তো ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাঘা বাঘা বোলারদের বিরুদ্ধে গাভাসকার, ব্রিজেশ প্যাটেল, কাপিলদেবরা ভারতকে অন্তত দু'শর ওপর রান এনে দিতে পারবেন। কিন্তু তা তাঁরা পারেননি। একমাত্র বিশ্বনাথ ছাড়া আর কেউই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কড়া আক্রমণের সামনে বুক চিতিয়ে ব্যাট করতে পারেননি। আর বোলাররাও পারেননি আঘাত হানতে। ফলে একতরফা খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ সহজেই জিতেছিল।

ভারতের দ্বিতীয় খেলা ছিল নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে। সেই খেলাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ ভারতকে সেমিফাইনালে উঠতে হলে নিউজিল্যান্ডকে হারাতেই হবে। চার বছর আগে প্রথম বিশ্ব কাপের আসরে ভারত নিউজিল্যান্ডের খেলাটি দারুণ জমেছিল। এবং খেলার অন্তিম লগ্নে নিউজিল্যান্ড দল পেরেছিল জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছুতে। দলগত শক্তির দিক দিয়ে নিউজিল্যান্ডের চেয়ে ভারতের দিকেই পাল্লা কিছুটা ভারী ছিল। কিন্তু একদিনের খেলায় নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়দের মুন্সিয়ানার কথা সকলেরই জানা। তবু সকলে আশা করেছিল যে গুরুত্বপূর্ণ ঐ খেলাটিতে ভারতীয় খেলোয়াড়রা ব্যাটে বলে দাপট দেখাতে পারবেন।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা তা পারলেন না। সব মিলিয়ে ভারতের রান দু'শর কিছু

ভেংকট রাঘবন

হতাশ অধিনায়ক

ওপরে পৌঁছেছিল। কিন্তু দুর্বল ফিল্ডিং-য়ের, (বিশেষ করে ক্যাচ লোফার দিক দিয়ে) জন্যে ভারত হারালো সেই সুযোগ। ভারতের অধিনায়ক ভেঙ্কটরাঘবনের এক ওভারে তিন তিনটে ক্যাচ ফেলে দিয়েছিলেন ভারতীয় ফিল্ডাররা। পরের ওভারে উইকেটরক্ষক সুরিন্দার খান্না হাতছাড়া করেছিলেন স্টাম্প করার একটি সহজ সুযোগ। ফলে নির্ধারিত ষাট ওভারের তিন ওভার আগেই নিউজিল্যান্ড পৌঁছে গেলো জয়ের লক্ষ্যে। এবং পর পর দুটি খেলায় হেরে ভারতকে বিদায় নিতে হয় উনআশি সালের বিশ্ব কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর থেকে।

বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের বিভাগীয় লীগের

খেলো ছিল শ্রীলংকার বিরুদ্ধে। এই ...র কোন গুরুত্বই ছিল না। কারণ ...যোগিতার আসর থেকে দুটি দলকে ...ভাগেই বিদায় নিতে হয়েছিল। খেলাটি ... নিয়মরক্ষার অনুষ্ঠান মাত্র। কিন্তু সেই ...টিতেও ভারত হেরে গেল। এই ...জয় অত্যন্ত লজ্জার। টেস্ট ক্রিকেটের ...রে যে শ্রীলংকা স্বীকৃতি পায়নি সেই ... কিনা ভারতকে হারালো বিশ্ব কাপের ...রে।

শ্রীলংকা আগে ব্যাট করে ২৩৮ রান ...ছিল। ভারত ছুটছিল সেই রানের ...নে। একসময় তিন উইকেটে একশ ...রিশের ওপর তাদের রান ছিল। কিন্তু ... ওভারের সংখ্যা কমে আসছিল। ... শেষের দিকে তড়িঘড়ি রান তুলতে ...র ভারত চটপট উইকেট হারাতে ...লো। এবং লক্ষ্য থেকে ৪৭ রান দূরে— ... রানের মাথাতেই খতম হয়ে গেল ...তের ইনিংস। সেই সঙ্গে একরাশ লজ্জা ...স ঢেকে দিয়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেটের ...। বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের আসরে ভারত ...টি খেলায় একটি পয়েন্টও সংগ্রহ ...তে পারেনি। ভারতের ওপরে আছে ...লংকা। তাদের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট। ...রতের বিরুদ্ধে চার আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ...দু পয়েন্ট ভাগাভাগী করে নিয়েছে। ...ষ্টির জন্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ...লংকার খেলাটি হতে পারেনি। তাই দু ...ই পেয়েছিল দুটি করে পয়েন্ট।

...খ বিভাগে অনেকটা ভারতের মতো ...বস্থা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার। পাকিস্তান ...র ইংলন্ড উঠেছিল সেমিফাইনালে। ...কিস্তান সেমিফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ...ঙ্গে আর ইংলন্ড খেললো নিউজিল্যান্ডের ...রুদ্ধে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাকিস্তানের ...লাটি জমেছিল খুব। তবে ফাইনালেও ...ঠলো প্রত্যাশিত দুটি দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ...র ইংলন্ড।

*

এবারের বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংলন্ডকে হারিয়ে পর পর দুবার প্রুডেন্সিয়াল কাপ ঘরে তুলেছে।

এখন স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন উঠবে—বিশ্ব কাপ ক্রিকেটে ভারত কেন এতো খারাপ খেললো?

সংগত প্রশ্ন ঠিকই। কারণ ঠিক এতোটা খারাপ খেলার পেছনে কোন যুক্তিই ছিল না। আমরা ধরে নিয়েছিলাম, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলায় ভারত হারবে। কিন্তু নিউজিল্যান্ড আর শ্রীলঙ্কাও যে ভারতকে হারাবে একথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। না পারাই স্বাভাবিক।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের এই শোচনীয় ব্যর্থতার পেছনে আছে এক দিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট খেলার মানসিকতার অভাব। একদিনের খেলার মেজাজই আলাদা। সেই খেলায় একটি বল অপচয় করার অবসর নেই। ব্যাট করতে হয় বুক-ভরা সাহস নিয়ে। নেতিবাচক বোলিং চলবে না। আর ফিল্ডিংয়ের সময় চাই দারুণ দক্ষতা।

একদিনের সীমিত ওভারের খেলায় ব্যাটসম্যানদের দেখেশুনে মারার অবকাশ নেই। নেই মার মারার মত বলের জন্যে

বিষেণ্‌সিং বেদী

সীমিত ভারে খেলার যোগ্যতা এখনো আছে কি?

অপেক্ষা করার অবসর। প্রতিটি বলেই রান চাই। ওভার কিছু চার পাঁচটি রান করতে হবে। কিন্তু ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সেই মানসিকতা এখনো গড়ে ওঠেনি। সুতরাং যা হবার তাই হয়েছে।

ভারতীয় দলের ব্যর্থতার আর একটি বড় কারণ হলো—দল গড়ার প্রশ্নটি। প্রুডেন্সিয়াল কাপে অংশ গ্রহণকারী ভারতীয় দলটি যে ঠিকভাবে গড়া হয়নি সে

কপিল দেব

ব্যাটেবলে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন

বিষয়ে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দলের অতি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হলেন উইকেট-রক্ষক। কিন্তু অজানা কারণে ভারতের এক নম্বর উইকেটরক্ষক সৈয়দ কিরমানিকে দল থেকে বাদ দিয়ে সেখানে পাঠানো হয়েছে দুজন নতুন উইকেটরক্ষককে। তাছাড়া বেদী অংশুমান গাইকোয়াড় কিম্বা দিলীপ ভেঙ্গ সরকাররা কি ঐ ধরনের ক্রিকেট খেলার যোগ্য প্রতিনিধি?

ভারতীয় দলে বিশেষভাবে দরকার ছিল সুরিন্দর অমরনাথ, সৈয়দ কিরমানি আর তরুণ সন্দীপ পাতিলের মত খেলোয়াড়দের। সুরিন্দর ন্যাটা মারকুটে ব্যাটসম্যান। যতোক্ষণ উইকেটে থাকেন ততোক্ষণ রানের ফোয়ারা ছোটান। কিরমানি উইকেটের পেছনে যেমন নিপুণ, তেমনি মার মেরে খেলতেও ওস্তাদ। আর তরুণ সন্দীপ পাতিলের ব্যাটে-বলে দক্ষতার কথা তো সকলেরই জানা।

মনে হয় এঁরা তিনজন দলে থাকলে ভারতীয় দলের চেহারা এবং মেজাজ বদলে যেতো। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারত গড়ে তুলতে পারতো আর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হেরে ভারতীয় ক্রিকেটের এমন অসহায় চেহারা হত না।

খেলা

দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ক্রিকেট

ইংল্যান্ডের লর্ডস মাঠে আয়োজিত ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্ব কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯২ রানে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে উপর্যুপরি দু' বার প্রুডেন্সিয়াল কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম প্রুডেন্সিয়াল কাপ জিতেছিল ১৯৭৫ সালের উদ্বোধন বছরের ফাইনালে, অস্ট্রেলিয়াকে ১৭ রানে হারিয়ে।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারলি টসে জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে প্রথম ব্যাট করার দান ছেড়ে দেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলার গোড়াপত্তন মোটেই ভাল হয় নি। ৯৯ রান তুলতে চারটে উইকেট পড়ে যায়। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান দাঁড়ায় ১২৫, চারটে উইকেট খুইয়ে—৩৪ ওভারের খেলায়। বাকি ২৬ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আরও ১৬১ রান সংগ্রহ করবে এটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেন নি। কিন্তু তাঁরা এই অসাধ্য সাধন করেছিল প্রধানত পঞ্চম উইকেট জুটি রিচার্ডস এবং কিংয়ের সহযোগিতায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৯৯ রানের মাথায় চতুর্থ উইকেট পড়ে যায়। ৫ম উইকেটের জুটিতে রিচার্ডস এবং কিং মাত্র ৭৬ মিনিটে ১৩৯ রান সংগ্রহ করে দেন। কিং ব্যক্তিগত ৮৬ রান করে দলের ২৩৮ রানের মাথায় আউট হন। তিনি ৬৬টা বল খেলে তাঁর ৮৬ রানে দশটা বাউন্ডারী এবং তিনটে ছক্কা মেরেছিলেন। রিচার্ডস ১৩৮ রান করে অপরাজিত থেকে যান। তাঁর এই ১৩৮ রানে ছিল তিনটে ছক্কা এবং এগারোটা বাউন্ডারী।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেখানে ৬০ ওভার খেলে ৯ উইকেটে ২৮৬ রান করেছিল সেখানে ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হয় ১৯৪ রানের মাথায় (৫১ ওভারে)। ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের মেরুদন্ড ভেঙেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস বোলার জোয়েল গার্নার। তিনি ৩৮ রানে ৫টা উইকেট পান এবং মাত্র ১১ রানে ইংল্যান্ডের শেষ পাঁচজন খেলোয়াড়কে বিদায় করেন।

ভিভিয়ান রিচার্ডস নট আউট ১৩৮ রান করার সূত্রে 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' পুরস্কার লাভ করেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৮৬ রান, ৯ উইকেটে ৬০ ওভারে (রিচার্ডস নট আউট ১৩৮ এবং কিং ৮৬ রান। বোথাম ৪৪ রানে ২, হেনড্রিক ৫০ রানে ২, ওল্ড ৫৫ রানে ২ এবং এডমন্ডস ৪০ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ১৯৪ রান, ৫১ ওভারে সকলেই আউট (ব্রিয়ারলি ৬৪ এবং বয়কট ৫৭ রান। গার্নার ৩৮ রানে ৫, ক্রফট ৪২ রানে ৩ এবং হোল্ডিং ১৬ রানে ২ উইকেট)

বিশ্বকাপ ক্রিকেট

মূল প্রতিযোগিতার লীগ পর্বের খেলায় আটটি দেশ দুটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে খেলেছিল এবং প্রতি গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দেশকে নিয়ে সেমি-ফাইনাল খেলার তালিকা তৈরী হয়েছিল।

'এ' গ্রুপের লীগের খেলায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১০ পয়েন্ট) এবং রানার্স-আপ নিউজিল্যান্ড (৮ পয়েন্ট)। লীগ তালিকায় তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। শ্রীলংকা (৬ পয়েন্ট) এবং শেষ চতুর্থ স্থান ভারত (পয়েন্ট ০)। ভারত লীগের তিনটে খেলাতেই হেরেছিল—ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৯ উইকেটে, নিউজিল্যান্ডের কাছে ৮ উইকেটে এবং শ্রীলংকার কাছে ৪৭ রানে। যে শ্রীলংকা আজও সরকারী-ভাবে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ছাড়পত্র পায়নি, তার কাছেই কিনা ভারতের এই শোচনীয় হার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম শ্রীলংকার খেলা বৃষ্টির জন্যে আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। ফলে প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে দুই দেশই দুটো করে পয়েন্ট পেয়েছিল।

'বি' গ্রুপের লীগের খেলায় লীগ চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছিল ইংল্যান্ড (১২ পয়েন্ট) এবং রানার্স-আপ হয়েছিল পাকিস্তান (৮ পয়েন্ট)। লীগের তালিকায় তৃতীয় স্থান পেয়েছিল ১৯৭৫ সালের ফাইনালিস্ট অস্ট্রেলিয়া (পয়েন্ট ৪) এবং শেষ চতুর্থ স্থান কানাডা (পয়েন্ট ০)।

দুটি গ্রুপের লীগের খেলায় আটটি দেশের মধ্যে সমস্ত খেলায় জিতেছিল একমাত্র ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের ওপর এখন শনির কুদৃষ্টি পড়েছে।

১৯৭৮—৭৯ সালের টেস্ট সিরিজে আটটি টেস্ট খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া হার জয়। (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ এবং পাকিস্তানের কাছে ১) এবং জয় ২ (ইংল্যান্ড এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে একটা করে)। ইংল্যান্ডের কাছে ১৯৭৮—৭৯ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ১—৫ খেলায় গোহার হেরেছিল এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৭৯ সালের টেস্ট সিরিজটা ১—১ খেলায় ড্র করেছিল।

লীগ খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল
গ্রুপ 'এ'

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯ উইকেটে ভারতকে এবং ৩২ রানে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম শ্রীলংকার খেলা বৃষ্টির জন্যে হয়নি।

নিউজিল্যান্ড ৯ উইকেটে শ্রীলংকা এবং ৮ উইকেটে ভারতকে পরাজিত করে।

শ্রীলংকা ৪৭ রানে ভারতকে পরাজিত করে।

গ্রুপ 'বি'

ইংল্যান্ড ৬ উইকেটে অস্ট্রেলিয়া, ৮ উইকেটে কানাডা এবং ১৪ রানে পাকিস্তানকে পরাজিত করে।

পাকিস্তান ৮ উইকেটে কানাডা এবং ৮৯ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে।

অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে কানাডাকে পরাজিত করে।

লীগের চূড়ান্ত তালিকা
গ্রুপ 'এ'

	খেলা	জয়	হার	পঃ
ওঃ ইন্ডিজ	৩	২	০	১০
নিউজিল্যান্ড	৩	২	১	৮
শ্রীলংকা	৩	১	১	৬
ভারত	৩	০	৩	০

দ্রষ্টব্যঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম শ্রীলংকার খেলা বৃষ্টির জন্যে আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি।

গ্রুপ 'বি'

	খেলা	জয়	হার	পঃ
ইংল্যান্ড	৩	৩	০	১২
পাকিস্তান	৩	২	১	৮
অস্ট্রেলিয়া	৩	১	২	৪
কানাডা	৩	০	৩	০

সেমি-ফাইনাল

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৩ রানে পাকিস্তানকে এবং ইংল্যান্ড মাত্র ৯ রানে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

দর্শক

জন ওয়েন

১১ জন, মার্কিন রাত্তে, জন ওয়েন সিনেমার পর্দা থেকে আরো সদূরে, আরো অমোঘ ও অলৌকিক এক পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। ভাঙাস্বাস্থ্য, বার্ধক্য, মারমখী রিপোর্টার—এসবের বিরুদ্ধে লড়াই তো ছিলোই. তার ওপরক্যান্সার, সকলেই জানেন ক্যান্সার ক্ষমা জানে না, এই অবস্থায় ৭২ বছর বয়েসে মৃত্যুর খবর নতুন করে কী-আর এমন দুঃখজনক!

তাঁর শেষজীবনের এই শোকসংবাদের চেয়ে অনেক বড়ো ব্যাপার তাঁর মধ্যজীবনের সাফল্য। দি বিগ ট্রায়াল' বা ওই পর্বের নানান ব্যর্থতার পর জন ফোর্ডের বিখ্যাত 'স্টেজকোচ' ছবিতেই তাঁকে প্রথম সত্যিকার স্বরূপে পাওয়া গিয়েছিল। সেটা ১৯৩৯-এর কথা। তারপর দি নাইট রাইডার্স, থ্রি টেক্সাস স্টিয়ার্স, নিউ ফ্রন্টিয়ার ইত্যাদি একটার পর একটা ছবিতে কাজ করে তিনি নিজেকে মার্কিন চলচ্চিত্রে প্রথম সারির প্রতিভা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন। এই সেদিনও, ১৯৬৯-এ, ট্রু গিফট ছবিতে অভিনয়ের জন্য আমেরিকান মোশন পিকচার অ্যাকাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস তাঁকে বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার দিয়েছেন। ৩৯-এর প্রথম সফলতার ৪০ বছর পরেও এই সাফল্য! ক-জনের ভাগ্যে জোটে!

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

চিত্রধ্বনি

ভূতের চেয়ে অদ্ভুত

জয়ালা প্রসাদের প্রেতাত্মা আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষের শরীরে সেই প্রেতাত্মার প্রবেশ তাদেরকে অমানুষ করে দিচ্ছে। লাল চেলী পরা দুলহনরা হচ্ছে সেই দুশমনের শিকার। সোহাগ-রাতে জয়ালা প্রসাদকে কদাপি মারবেন না, তাহলেই তার প্রেতাত্মা অসাধারণ দুশমন হয়ে উঠবে, যেমন হয়েছে রাজকুমার কোহলী পরিচালিত জানী দুশমন ছবিতে।

বিক্রম তার সদ্যবিবাহিতা বৌকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। মাঝপথে একটা পোড়ো বাড়ির সামনে গাড়ি খারাপ হয়েছে।—ঐ বাড়িটা কার হতে পারে? নিশ্চয় জয়ালা প্রসাদের!—যাকে হত্যা করা হয়েছিল সোহাগ-রাতে। খড়মের খটাখট্ শব্দ আর সিঁড়ির ধাপে খড়মের কালো কালো ছাপ নেমে এসে দর্শকদের গায়ে কাঁটা ছড়িয়ে দিয়ে জয়ালা প্রসাদের প্রেতাত্মা বিক্রমের নববধূকে তাড়া করে ফেরে। সেখান থেকে কোনো রকমে বেরিয়ে এসে একটা ট্রেনের একদম ফাঁকা একটা কামরায় উঠে আসে সস্ত্রীক বিক্রম। সেই কামরায় তৃতীয় জন উপস্থিত। তিনিই এখন জয়ালা প্রসাদের প্রেতাত্মা বহন করে ফিরছেন। লাল চেলী পরা বিক্রমের বৌকে দেখেই দুশমনের আত্মপ্রকাশ। এবং বিক্রমের বৌকে সাবাড়। সঙ্গে সঙ্গে সেই বেচারীও শেষ। প্রেতাত্মা কিন্তু অন্য শরীরের প্রবেশ করে তার তান্ডব অব্যাহত রাখে।

সঞ্জীবকুমার তার নব-বিবাহিতা বৌ যোগীতাবালীকে নিয়ে একটা নির্জন গুহার ভেতর কেন বা কিভাবে আসবে এরকম প্রশ্ন করা চলবে না। দুশমনরা আবার এরকম নির্জন জায়গাই বেশী পছন্দ করে। কাজেই সঞ্জীবের বৌকে সাবাড় করে প্রেতাত্মা অনায়াসে সঞ্জীবকুমারের সুললিত শরীরে প্রবেশ করে। এই ঘটনাটা অবশ্য অনেক পরে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছে।

ঠাকুর সাহেব ওরফে সঞ্জীবকুমার গ্রামের সকলের খুব শ্রদ্ধার পাত্র। সঞ্জীবও তাদের খুবই স্নেহ করে। কিন্তু লাল চেলী পরিহিতা কোনো সদ্য বিবাহিতা তার কাছ থেকে নিস্তার পায় না। মন্দিরের তলার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে সেই নির্জন গুহায় নিয়ে গিয়ে দুশমনরূপী সঞ্জীবকুমার একে একে যথাক্রমে অরুণা ইরাণী, নীতু সিং (গৌরী, লাখনের বোন), সারিকা (বিন্দিয়া-অমরের বোন) দের সাবাড় করে. বেঁচে গেছে শুধু সঞ্জীবকুমার কন্যা বিন্দিয়া গোস্বামী (শান্তি) আর রীনা রায়।

আঠারো রিল সেলুলয়েডের মধ্যে আরো অনেক নামী-দামী স্টারদের বন্দী করেছেন পরিচালক। তারা হলেন প্রেমনাথ (মন্দিরের পূজারি), শত্রুঘ্ন সিনহা (শেরা—ঠাকুর সাহেবের পুত্র), সুনীল দত্ত (লাখন), জীতেন্দ্র (অমর—গৌরীতে ভালোবেসে তাকে পাওয়ায় বিষপানে তার অমরত্ব ঘুচে যায়), রেখা (চম্পা—শেরাকে একতরফা ভালোবেসে যে শেষপর্যন্ত তার মন জয় করে নেয়), মদনপুরী (রীনা রায়ের বাবা), বিনোদ মেহরা (পুলিশ ইন্সপেকটর), তাছাড়া জগদীপ, জয়শ্রী টি. পেণ্টাল, রূপেশকুমার ও আরো অনেকে। এদের সবারই অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন কোহলী সাব। সবাই নেচেছেন, গেয়েছেন, লড়াই করেছেন আউর তামাশা ভি করেছেন।

দুশমনের দুশমনী শেষ হয়েছে রীণা রায়ের পাল্লাতে এসে। পাল্লা মানে পর্বে। পাল্কীর ভেতর রীণা। তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার স্বামী সুনীল দত্ত। পূজারির মন্দিরে এসেই রীণা আক্রান্ত হয় দুশমনের দ্বারা। দুশমন তাকে সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে নিয়ে আসে সেই নির্জন গুহায়। সেখানে উপস্থিত হয়েছেন তিন বীর—সুনীল দত্ত, শত্রুঘ্ন সিনহা আর বিনোদ মেহেরা। এখানে দুশমনের শক্তির পরিমাণ দেখিয়েছেন পরিচালক। মোটা-সোটা থাম ভেঙেছে দুশমন, মোটা লোহার রড বেঁকিয়েছে অনায়াসে. লোহার শিকল কেটেছে বিনা পরিশ্রমে। বন্দুকের গুলি দুশমনের গায়ে লেগে ফেরত এসেছে। বুঝুন তো দুশমন কত শক্তিমান।

অথচ দুশমনকে তো আর চিরকাল বাঁচিয়ে রাখা চলে না। তার শরীরের একটা অংশ নরম রয়ে গেছে। সেই জায়গাতে ত্রিশূল বিঁধিয়ে সুনীল দত্ত তাকে কাবু করে ফেলেছেন। জয়ালাপ্রসাদ তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সঞ্জীবকুমারকে ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে অনেকদূর চলে গেছে।

এখানে কিন্তু একটু ত্রুটি থেকে গেছে। সেইসব নববিবাহিতা নারীদের, যাদের হত্যা করা হয়েছিল, তাদের অনায়াসে ফিরিয়ে আনতে পারতেন কোহলী সাহেব। আমরা পাবলিক, আমরা তাদের ফেরৎ চাই। নাকি প্রেতাত্মা তাদের রেজেস্ট্রী পার্সেল করে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে? কোহলী সাহেবের পরের ছবিতে আশা করি সেই পার্সেল এসে পৌঁছে যাবে?

প্রভাত চৌধুরী

হীরে মাণিক

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে অরুণ বরুণ কিরণমালার পর বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এটি দ্বিতীয় নিবেদন।

হীরে ও মাণিক দুই ভাই। মোটর দুর্ঘটনায় বাবা-মাকে হারিয়ে ওরা ভীষণ

অসহায় হয়ে পড়ে। যদিও ওরা বাবা-মার বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়, তবু নাবালক অবস্থায় দূর সম্পর্কের কাকার আশ্রয়ে ওদের কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকে না। শেষে কাকা কাকীমার অত্যাচার চরমে উঠলে একদিন হীরে মাণিক পালায়। গন্তব্য-স্থল চাঁদের পাহাড়, যেখানে আছে ওদের হারানো বাবা-মা। বন্দী হয়ে আফ্রিকায় নাকি আছে সেই চাঁদের পাহাড়। অনেক দুর্ঘটনার পর হীরে মাণিক এক গভীর জঙ্গলের রেঞ্জার সাহের প্রশান্ত রায় ও তার স্ত্রী মণিমালার মধ্যে কিভাবে ওদের হারানো বাবা-মাকে ফিরে পেল, ছবির বাকি অংশে তারই বিবরণ রয়েছে।

পরিচালক সলিল দত্তর হীরে মাণিক ছোটদের মন জয় করতে পারবে। কারণ গল্প জমেছে। চিত্রনাট্যও ভাল হয়েছে। বড়দেরও এ ছবি খারাপ লাগবে না। স্লো-মোশনে হীরে-মাণিকের দৌড়ের ওপর টাইটেল, দুর্ঘটনা দৃশ্যের সম্পাদনা ও স্টীল, কুকুরের গলায় ঘুঙুরের মালা, জ্বরের মধ্যে মাণিকের ভুল বকা, মা হাতীর বাচ্চাকে ফিরে পাওয়া (একই সময় সাবিত্রীও হীরে মাণিককে ফিরে পায়) এবং শেষ দৃশ্য তখন অপ্রয়োজনীয় চাঁদের পাহাড় গল্পের বইটিকে জঙ্গলের ওপর ফেলে যাওয়া—ছবির এই অংশগুলো ভালো লেগেছে। ভাল লাগেনি এমন দৃশ্য হল হীরে মাণিকের মুখে গান ও হাত নাড়া, ওদের নির্মমভাবে প্রহার করা এবং দীর্ঘসময় ধরে হীরে মাণিকের শুধু হেঁটে চলা। বেমানান লেগেছে শিশুদের মুখে হিন্দী গান।

অভিনয় অংশে প্রথমেই নাম করতে হয় হীরে-মাণিক চরিত্রের শিশু-শিল্পীদ্বয়ের কথা। নাম বাপ্পা চক্রবর্তী ও সোম চট্টোপাধ্যায়। ওদের মানিয়েছেও সুন্দর। ছেলেদুটোকে দেখেই যেন ভাল লেগে যায়। অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় সন্তান-হারা বাবা-মার মানসিকতা ভালই ফুটিয়েছেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহুদিন পর এক সহৃদয় ভালো মানুষের চরিত্রে সফলভাবে দেখা গেছে। চিন্ময় রায়ের রবিমামা চরিত্রটি ভিলেন এবং কমেডিয়ানের সংমিশ্রণ। এক দিলখোলা লরী ড্রাইভারের চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাল লেগেছে। সত্যবাবুর মুখে বেডফোর্ড-মার্কা দেশ গোছের ডায়ালগও জমেছে। ছবিতে জঙ্গলের দৃশ্যে স্টকশটে কিছু জন্তুজানোয়ার দেখানো হয়েছে। টেকনিক্যাল কাজ, সঙ্গীত এবং ক্যামেরা মোটামুটি। শেষে একটা কথা। ছবির শেষ সুন্দর দৃশ্যটি দেখে বার বার মনে হয়েছে, এ ছবির নাম হীরে-মাণিক না হয়ে চাঁদের পাহাড় হলেই যেন ভাল হত।

—অসিতবরণ মিত্র

পেশাদারীর বেড়া ভেঙেছেন সৌমিত্র

বাংলা নাটকের মঞ্চরূপে প্রতীক প্রয়োগ এবং এক ধরণের অর্ধরূপকথার রাজত্বের পাশাপাশি আবার চূড়ান্ত রিয়্যালিজমের একটা টান ফিরে এসেছে বলে ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাধারণভাবে সংস্কৃতির অন্য যে কোন শাখার মতো নাটকের ক্ষেত্রেও এই পুনর্ন্যাস স্বাভাবিক। দর্শকের চোখে এবং মনও এই ব্যবহারে ভিন্নতর স্বস্তিই পেয়ে থাকে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ও পরি-চালিত নাম জীবনও অনেকাংশে সেই দাবি পূরণ করেছে।

নাম জীবন কলকাতার ব্যবসায়িক থিয়েটারের চৌহদ্দির মধ্যেকার নাটক। সে চিহ্ন তার বিজ্ঞাপনের ভাষায়, তার স্মারক পুস্তিকার চরিত্রে প্রকাশ্য দৃশ্যমান। গ্রুপ থিয়েটারের নাম ভাঙিয়ে অন্য থিয়েটার-এর ভড়ং তার মধ্যে নেই। কিন্তু আনন্দের কথা এই যে কমার্শিয়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রযোজনা প্রফেশ্যানালও হতে পেরেছে নিপুণ অভিনয়ে, সুন্দর মঞ্চসজ্জায়, পরিমিত আলোক প্রয়োগে। সস্তার ফাঁকির বাজারে এও একটা বড়ো লাভ বইকি।

এ-নাটকের কাহিনী অংশ একটি জীর্ণ বাড়ির এজমালি উঠোনের তিনপাশ ঘিরে থাকা কয়েকটি মানুষের জীবনের গল্পে অভাসিত। চতুর্থ দিকে দর্শকের আসন। চল্লিশ দশকের বাংলা উপন্যাসের আদল এই নাটকের কাঠামোয় পরিস্কার। গল্পে অনাবশ্যক জটিলতা নেই, বরং অতিমাত্রায় ছক বাঁধা আছে। বাণীর সঙ্গে নেপাল সর-কার এর ব্যবহার। অমরনাথের টাকা চুরি করা, বিশ্ব-র মনোভঙ্গি, কামনা আর অমর-নাথের ফেলে আসা জীবনের ধূসর পাণ্ডু-লিপি সবই বাংলা কথাসাহিত্যের পাঠকদের কাছে চেনা, বলা উচিত আপন করে চেনা। আর আপন করে চেনা বলেই নামজীবন-এর গল্প পুরনো হলেও তাদের ভালোই লাগে অনেকাংশে। ভালো লাগানোর কৃতিত্ব অবশ্য উপস্থাপনারও। সুরেশ দত্তর নিখুঁত বাস্তব মঞ্চসজ্জার অর্ধেক অংশ প্রথম থেকেই, নাটক শুরু হওয়ার আগে থেকেই দর্শকের চোখের সামনে খুলে রাখা হয়। এজমালি উঠোনে তার চরিত্রগত নির্লজ্জ নিরাবরণে দর্শকের সামনে অভিনীত হয় বেশির ভাগ দৃশ্য। আর বিশ্বর দোতলার ঘরের সিঁড়িতে গোপন নিঃসঙ্গতার বাণী আর বিশ্বর জীবনের কিছু অবাঞ্ছিত অংশের উন্মোচন হয় পর্দা সরিয়ে এবং দেয়ালও সরিয়ে। প্রত্যাখ্যাতা অপমানিতা বাণী যখন প্রথম-অংকের শেষে বিশ্বর সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে থাকে এবং তার নেমে আসার উপর বিশ্বর দরজা বন্ধ হয়, ঘরের দেয়ালের যান্ত্রিক ঝাঁপ পড়ে যায়।' এবং কেবল বিশ্বর ঘর পর্দায় ঢাকা পড়ে তখন প্রকাশ্য ও গোপনীয়তার এই সহজ উপ-স্থিতি অনিবার্য ফল পায় দর্শকের অনু-ভবে। তার পর সারাক্ষণই এই কাজটুকু তারা যথার্থ পূরণে লক্ষ করেন। তবে একটি অসঙ্গতি দেখা যায়। খুনির খোঁজে বিশ্ব যখন ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে যায় তখন তার ঘরে ভিতরের অংশ দেখা যায় কেন? তখন তো সেখানকার চলমান দেয়ালের নেমে আসবার কথা। প্রসঙ্গত পরিচালক সৌমিত্র চটোপাধ্যায়কে তাঁর প্রাপ্য সাধুবাদ দিলেও নাট্যকার সৌমিত্রকে একটি প্রশ্ন করতেই হয়। নাটকের মাঝ-খানের কিছু কিছু ছকে বাঁধা মেলোড্রামা কোনরকমে মানিয়ে গেলেও, আরও সঠিক করে বলতে হলে নাটকের শেষ যেভাবে করা হয়েছে সেই কাহিনী বিন্যাস এবং সেই অংশের সংলাপে কি উচিত ছিল না গতানু-গতিকতা কাটিয়ে ওঠা। অন্তত নমিতা চরিত্রটি, যা কাহিনীতে সারাক্ষণ বিচ্ছিন্ন অর্থে ভারসাম্য রেখেছে, সুর কেটে সুর লাগিয়ে তাক ব্যবহার করেও তা শেষটা অন্য রকম করা যেতো। একটি ঈষৎ চড়া সুরের অথচ পরিচ্ছন্ন বাস্তবানুগ নাটকের শেষটা তাহলে এমন জোলো না হতেও পারতো।

তবু এই নাটকটি প্রায় শেষ পর্যন্ত কোথাও অন্তত ক্লান্ত করেনি। প্রতিটি মুখ্য চরিত্রই অভিনয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন, কেবলমাত্র অশোক মিত্র ছাড়া। কোনও সহিষ্ণুতাই ১৯৭৯ সালে তাঁর নেপাল চরিত্রের বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারবে না। অথচ নীলিমা দাসও তো চড়া সুরেই বাসনাকে এঁকেছেন। তাঁকে তো বেমানান মনে হয়নি। বড়জোর দু-একবার কষ্ট হয়েছে যখন দেখেছি বাণীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আর গামছা দিয়ে গা হাত-পা মুছতে মুছতে তাঁর ঝংকার দেওয়া দর্শকরা সরবে গ্রহণ করতেই তিনি সেটার অপর্যাপ্ত পুনরাবৃত্তি করছেন। নীলিমা দাস বড়ো অভিনেত্রী, একটা বিশেষ অনুভবের স্তর পর্যন্ত আমা-দের দেখা বাংলা রঙ্গমঞ্চের সবচেয়ে ক্ষমতা-সম্পন্ন অভিনেত্রী, তাঁর তো এই হাততালির মোহ সহজেই অতিক্রম করা উচিত ছিলো। তবু এই নাটকটিকে প্রায় সারাক্ষণ ধরে রেখে-ছিলেন কেন্দ্রভূমিতে তিনিই। তাঁর নিপুণ কণ্ঠস্বরের বিচিত্র ওঠাপড়া, মুহূর্তে অভি-ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ পরিবর্তন, বাসনা চরিত্র এবং সমস্ত নাটকটিকেই সক্ষমতার মর্যাদা দিয়েছে। তবে নমিতার বিরুদ্ধে ভগবানের কাছে তাঁর প্রার্থনা করার দৃশ্যে আরো একটু সংযম ভালো লাগতো।

নাটকের মুখ্য চরিত্র বিশ্বর ভূমিকায় সৌমিত্রবাবু কোথাও তাঁর রূপালি পর্দার গ্ল্যামার কাজে লাগাননি, ফলে চরিত্রটি আগাগোড়া বিশ্বাস্য মেকানিক হয়ে উঠেছে। বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার নিষ্ঠুর দৃশ্যে আবার বাসনাকে অর্থসাহায্য করার লজ্জিত সংকোচ মুহূর্তে তিনি অসামান্য, তবে বাণীর সঙ্গে রোম্যান্টিক শেষদৃশ্যে তাঁকে আমার ভালো লাগেনি, তার একটা কারণ বোধহয় ঐ প্রত্যা-শিতটাই ভালো না লাগে। বাণী চরিত্রে

মিন্টু চক্রবর্তীও ভালো অভিনয় করেছেন। তবে তিনি এতো মোটা হয়ে গ্যাছেন যে তাঁকে তাঁর সাবলীলতায় ফিরে পাওয়া দুরূহ। তাঁর মুখমণ্ডলের অত্যধিক স্ফীতি ও ব্যঞ্জনা প্রকাশে অসমর্থ। এ নাটকে অবশ্য বাণী গর্ভবতী হওয়ায় তাঁকে কিছুটা মানিয়ে যায়। নাটকের আর একটি বিশিষ্ট চরিত্র নির্মল ঘোষ কৃত অমরনাথ। এই ছোট অভিনয়ের পরিসরে নির্মলবাবু আবার একটি সুন্দর টাইপ উপহার দিলেন, অবিচারে ফুরিয়ে যাওয়া অথচ তখনো খেলোয়াড়ি মেজাজে। নমিতার ঘরের উটকো কাঙাল অতিথির সঙ্গে রাজার মারামারির দৃশ্যে তাঁর ঈষৎ ঝুঁকে বসে হাসিমাখা মুখের স্থির অভিনয় অপূর্ব। তেমনি ভালো লাগে তাঁর আত্ম বাসনার মেয়ে রুনির ভূমিকায় স্বর্ণালী গাঙ্গুলীকে। এই চরিত্রটিই সংবেদনশীল অভিমান, কিশোরী ব্যক্তিত্ব সবই এই ছোট্ট অভিনেত্রীটির মধ্যে বর্তমান। এর জন্য সৌমিত্রবাবুর শিক্ষাদানের গুণও অনস্বীকার্য।

নামজীবন এর অপর দুই পার্শ্বচরিত্র নমিতা (সুচেতা দাস) এবং রাজা (মিন্টু চক্রবর্তী)। জীবন নামের এই বিচিত্র রঙ্গ-

নাম জীবনে নির্মল ঘোষ।নীলিমা দাস

শালায় এরা আমাদের চেনা প্রাচীন দুই চরিত্র, আধুনিক খোলসে প্রাচীনতম পেশায় নিযুক্ত। দুজনেই অসম্ভব ভালো অভিনয় করেছেন। হাসিতে, অশ্লীলতায়, অঙ্গভঙ্গিতে চরিত্র দুটি বিশ্বাস্য করে তুলেছেন: আবার বিয়ের কথায় অনিশ্চয়তার প্রসঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য সুচেতা ছুঁয়ে গেছেন গভীর কোন তার। বহুদিন মনে রাখবার মতো সেই অভিনয়।

এই সব চরিত্র ছাড়াও আরো কয়েকজন সেই উঠোনটিতে এসেছেন। কোন কোন জনকে কখনও ভালোও লেগেছে। আর সমস্ত পরিবেশ রচনায় পরিমিতি বোধে অনন্য হয়ে উঠেছে তাপস সেন-এর আলোয়। কোথাও কায়দা দেখানো নেই, বাড়াবাড়ি নেই, কেবল মাঝে মাঝে এক একটা দিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই আলোর-সঙ্গে মিশে থাকে সুরেশ দত্তর ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় মঞ্চ। জরাজীর্ণ ভাঙা ঘর, চালের উপর ভাঙা ওল্টানো ঝুড়ি, ছেঁড়া ঝুড়ি সব সব। শুধু নাটকটির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায় ভাস্কর মিত্র কৃত সঙ্গীত। এতো চড়া, এতো গতানুগতিক, এতো অনাবশ্যক এই সঙ্গীত যে এতোগুলো অভিনয় হয়ে যাওয়ার পরেও সেটাকে পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে হয়।

সুরজিৎ ঘোষ।

যামিনীর অনুষ্ঠান

যামিনী কৃষ্ণমূর্তির নাচ আবার দেখলাম রবীন্দ্রসদনে। সেই ভারতনাট্যম কুচিপুরী, যদি পারিভাষিক অর্থে ধরা যায়, তাই দাঁড়ায়। কিন্তু শুধুই কি তাই? যামিনীর নৃত্যে সেই গণেশবন্দনা, শৃঙ্গার-লীলা, বর্ণম, তথা ভারতনাট্যমের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিবারই আনে নতুন উদ্ভাস। এই নিত্যনতুন উদ্ভাসের উৎস হল তাঁর ডাইমেনস্‌নাল পারসোনালিটি, শিল্পীর সৃষ্টিশীল মন এক জায়গায় থেকে থাকে না। সার্থকতার চরমে পৌঁছেও আবার নতুন করে পথ কেটে, নতুন বাঁকে যাত্রা করে সৌন্দর্যতৃষ্ণার অস্থির তাগিদে।

গণেশবন্দনায় হংসধ্বনি রাগের আরতিতে গণপতির রূপ যখন মূর্ত হয়ে উঠছিল এই দেবতাটির লোহিতবর্ণ, সিদ্ধিদানের বরাভয়, চতুর্ভুজ মূর্তির বর্ণনাকে ছাপিয়েও যে বস্তুটি এক ধ্রুপদী সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছিল সেটি হল শিল্পীর অধ্যাত্মচেতনাসঞ্জাত দর্শন। এই দার্শনিকতাই ভারতীয় শিল্পের প্রাণ। আর এই চেতনার ক্রমবিকাশই যামিনীর নৃত্যকে এমন গভীর বোধে সমৃদ্ধ করেছিল। প্রতিটি মুদ্রা, দেহভঙ্গি ও ছন্দের স্পন্দন—একটি মহান আইডিয়াকেই মূর্ত করে দর্শক-চিত্তকেও এক জ্যোতির্ময় চেতনার শরিক করেছে। এই হৃদয়চারী ব্যঞ্জনাধর্মিতাই যামিনীর শিল্পধর্ম।

এরই বিপরীত ভাবে পরিবেশিত তাঁর লাস্যদৃপ্ত শৃঙ্গারলনী। নীলাম্বরী রাগে এবং আদি তালে। প্রথম নৃত্য পূজার, তাই শুদ্ধস্বরের রাগ সরল ঋজু চলনে—একমুখী। শান্ত ধূপারতির মৃদুসৌরভে এ নৃত্য স্থির।

কিন্তু শৃঙ্গারলীলায় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতি রেখেই কোমল স্বরের মধুরতায় বর্ণোজ্জ্বল রোমান্টিক সুরের পরিবেশ ঘনিয়ে এসেছে। দুটি নৃত্যেরই তাল আদি। প্রথম নৃত্যে অলংকারহীন সরল বোলে, ধ্রুপদী নিনাদ। দ্বিতীয় নৃত্যে ঐ বোলো-মাত্রার বৃত্তে [illegible] মাত্রাবিভাগের কারিকুরী, বঙ্কিম গতি। বোলের দ্রুত ও মৃদু আওয়াজ—কখনও বা মন্দ্ররবে, কখনও বা মঞ্জুল গুঞ্জরণে হৃদয়ের ওঠাপড়ার আবেগকে ধ্বনিরূপ দিয়েছে। আর তারই তালে তালে নৃত্যময়ী যখন আপনাকে প্রকাশ করলেন এই ধ্বনি ও সুরের নায়িকা-রূপে,—মনে হয়েছিল সমুদ্রমন্থন থেকে উঠে এলেন অনন্তযৌবনা উর্বশী। সাগরের অন্তহীন ঢেউয়ের ওঠানামার দোলে রত্নাকরী সমাহার, তালবর্ণমের দুরূহ ছন্দ যেন লাস্যময়ীর হৃদয়াবেগের উচ্ছল লীলা মাতন। লাস্যের এমন উচ্ছল, উদ্দাম রূপ। কিন্তু ঐ কল্লোলিনী চাঞ্চল্যের মধ্যেও প্রতিটি ভঙ্গি ও গতির মধ্যে কি ব্যালান্স? পদবর্ণমে সাহিত্য ও চিত্রমননের মিলনে শিল্পীর আশ্চর্য কাব্যমালিকাকে অনুভব করা যায়। চিন্তা ও আবেগ, সৌন্দর্যতৃষ্ণ ও সমাহিতি, প্রাণলীলা ও মননশীলতার তুলনাবিহীন সমাহার যামিনীর শৃঙ্গার-লালা।

পরে দেখালেন নবরস--তিল্লানা তথা ভাবসম্পদ ও লয়ের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব, কৃষ্ণনাবদগ মন্দোদরী, উপাখ্যান। সবশেষে কুচিপুরীতে যেখানে ভারতনাট্যমের ধ্রুপদী ভঙ্গি কুচিপুরীর গীতিকাব্যের স্পর্শে সঙ্গীধর্মী। একটি বৃত্তাকার থালায় দাঁড়িয়ে পদক্ষেপের গতিতে সারা মঞ্চে আবর্তনের মুহূর্তে তাঁকে পৌরাণিক দেবী বলে মনে হয়েছে। কুচিপুরীর নাট্যধর্মী প্রকাশের যে রসরূপ জীবন-মরণ-নাচের দোলন হয়ে উঠেছিল। আর এই সৃষ্টিমুখর শিল্পীর শিল্পকৌশলে কঠিন নয়, জটিল ছন্দও তাঁর দেহদোলে রূপান্তরিত হচ্ছিল সুর-ভরা কবিতায়। মনে হয়েছিল এই রূপ দেখেই বুঝি 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।'

অনুষ্ঠান সুরু হয়েছিল সুমিত্রা গুহর (রাজু) খেয়াল ও ভজন দিয়ে। বেশ কয়েক বছর আগে এঁর গান শুনেছি বিদ্যামন্দির হলে। তরুণ শিল্পী যে বলে নেই সেই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিল তাঁর কেদার ও হংসধ্বনি। সুমিত্রা সুকণ্ঠী। শিক্ষার বাদেও ভাল। প্রতিভা ত আছেই। এই সবকিছু মিলে সেদিনের কেদার উপভোগ্য। এই পূর্বাঙ্গবাদী রাগের শান্ত প্রকৃতি তিনি অনাহত রেখেছেন মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকের বিস্তার ও তানে। গান্ধারের প্রয়োগকুশলতাও লক্ষ্য করবার মত। সম্ভবত সন্ধ্যার নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তিনি পরে হংসধ্বনিও গাইলেন। ভজনগুলিও সু-গীত। কিন্তু এর সঙ্গে যদি দীর্ঘ অনুষ্ঠানকে কমপ্যাক্ট করে নেবার শিল্পবোধটি আয়ত্ত করেন তাঁর অগ্রগতি অনিবার্য।

সুমিত্রার সঙ্গে সুন্দর তবলাসঙ্গত করেছেন সুখেন্দু কর্মকার।

অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করেন সুমধুর হংসধ্বনি সংস্থা। সভাপতি দক্ষিণারঞ্জন বসু জানালেন—নবীন ও পরিণত প্রতিভার সমন্বয়ে এই ধরনের রুচিশীল অনুষ্ঠান পরিবেশনাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

সন্ধ্যা সেন

রবীন্দ্র সংগীত : বাংলাদেশ

১৪ জুন রবীন্দ্রসদনে আমাদের প্রিয় কিছু রবীন্দ্রসংগীত শুনলাম। শুনলাম

ওপার-বাংলার তিনজন রবীন্দ্রনগন শিল্পীর গলায়। ডেকেছেন প্রিয়তম, রূপসাগরে, তোমার নয়ন আমায় বলেছে বারে-বারে, একটার পর একটা গেয়ে গেলেন পাপিয়া সারোয়ার। হে সখা, মম হৃদয়ে রহ-র কথায়-সুরে মেশা তাঁর গলা আমাদের হৃদয়ে মুঝি রয়েই গেল। শেষ গানটিতে তাঁর গলা ক্লান্ত, আগাগোড়াই তিনি শারীরিক অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেয়েছেন, ফলে দম একটু কম শেষ গানে শেষ রক্ষা করতে পারেননি, গলা চিরে-চিরে যাচ্ছিল।

তাঁর পরে গাইলেন কাদেরী কিবরিয়া। প্রথম গান 'ধায় যেন মোর সকল ভালো-বাসা' তাঁর কিছু-বা নাটকীয় স্বরক্ষেপণে ঠিকমতন ফোটে না। কথা ও সুরের সম্মিলিত মূর্তিটিতে তিনি একটু অভিনয়-প্রবণতা মিশিয়ে দেন কেন?

'কাঁদালে তুমি মোরে' গানটিতে, মুখে কান্নার ভাব ফোটানো রবীন্দ্রসংগীতের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য। অবশ্য পর-পর অনেক-গুলি গান গেয়ে কাদেরী শ্রোতাদের মন ভরে দেন।

শেষ শিল্পী ফহমিদা খাতুন। প্রথমেই ও মোর দরদিয়া গেয়ে তিনি সহৃদয় শ্রোতাদের সঙ্গে সেতু বেঁধে নিলেন। স্বরের সূক্ষ্ম স্তরপরম্পরা ও দমের প্রশংসা করতে হয়। জানি জানি গো দিন যাবে, ফিরে এসো হে—অনেকগুলি গাইলেন।

এসব খুঁটিনাটি আসল কথা নয়। কার ওপর এপার-বাংলার কোন শিল্পীর অপ-রূপ প্রভাব, তা-ও তুচ্ছ প্রসঙ্গ। আসল কথা ওদিনের গান শুনতে-শুনতে স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম, রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে বাংলার রাজনৈতিক ভাগ-বাঁটোয়ারা বলে সত্যিই কিছু নেই। মস্ত ওই সংগীত-প্রতিভার সামনে আলাদা রাষ্ট্র-ফাষ্ট্র, ফুঃ!

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

নাটক ঃ নরক গুলজার

কৃষিতথ্য বিনোদন সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক মিলন উৎসব গত ৫ মে দক্ষিণ কলিকাতা বালীগঞ্জ শিক্ষাসদসন মঞ্চে প্রচুর দর্শক সমাগমে অনুষ্ঠিত হল। উৎসব উপলক্ষে মনোজ মিত্রের মঞ্চসফল নাটক 'নরক গুলজার' চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের পরি-চালনায় প্রশংসনীয়ভাবে উৎরে গেছে। তবে সঙ্গীত বা আলোক সম্পাতের দিকে পরি-চালকদের দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। প্রতিটি দৃশ্য প্রাণবন্ত হলেও কয়েকটি চরিত্র বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখতে পারে। যেমন মানিকচাঁদরূপী সমীর বোস। যাঁর

ছোট্ট মেয়ে মোম সরকার বিভিন্ন আসরে আবৃত্তি করে প্রচুর সুনাম পেয়েছে।

অভিনয়ে বিশেষ কোন খুঁত পাওয়া যায়নি। পান্নালাল চরিত্রে কণককমল চ্যাটার্জির পার্শ্ব চরিত্র হলেও প্রথম দুটি দৃশ্য প্রাণ-বন্ত কিন্তু পরের দিকে তিনি তা ধরে রাখতে পারেন নি। গুইবাবা সুকুমার দেব অভিনয় পরিষ্কার। শেষের দিকে তিনি বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। নারদ ও বটুলরূপী চিদানন্দ গোস্বামী চরিত্র ফোটানর জন্য চেষ্টা করে গেছেন। যম রূপী অরবিন্দ চক্রবর্তী যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। চিত্রগুপ্ত দিলীপ সাহার অভিনয় প্রশংসনীয়। ব্রহ্মা চন্ডী বসু গোড়ার থেকে শেষ পর্যন্ত চরিত্রটি ফোটানর যথেষ্ট চেষ্টা করে গেছেন। অন্যান্য চরিত্রে খোচো নিমাই মুখার্জি, নেংটি কাশীনাথ ঘোষ, যম ননী-পাল চেষ্টা করেছেন। একমাত্র মহিলা চরিত্রে সোনালী দাসের ফুলরানি অভিনয় ভাল হলেও তাঁর হত্যার দৃশ্যটি মনে হয় দর্শকদের কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

সুরবাহার

এক সোমবারের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে 'সুরবাহার' নামে একটি নবগঠিত সংস্থা আয়োজিত যন্ত্রসঙ্গীতানুষ্ঠানে শোনা গেল ইমরাত খান এবং তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র নিশাত ও ইরশাদ খানের বাজনা। অনুষ্ঠান শুরু হল ইমরাত ও নিশাত খানের দ্বৈত সেতার দিয়ে। রাগ 'শ্রী'। আজকাল আমরা যে ধরনের সেতার শুনি, শুনে অভ্যস্ত— নির্দ্বিধায় বলা যায় পিতাপুত্রের ঐ পরি-বেশনে তার তুলনায় অনেক বেশী ডিটেলের কাজ ছিল, অনেক বেশী জটিলতা ছিল। 'আলাপ' এবং 'জোড়' অংশগুলিতে সঙ্গীতের ছোট ছোট বিভিন্ন ধাপ যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল—যেগুলি শেষ হয়েছিল গান্ধারের মধ্য দিয়ে রেখাবে, অথবা কোমল ধৈবতের মধ্য দিয়ে পঞ্চমে। পাকড় অংশগুলিকে বিন্যাস ও সুরের কম্বি-নেশনকে যতদূর পর্যন্ত সম্ভব প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। যা অচিরেই সিরিয়াস মিউজিকের স্বাদ আনে এবং শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। বাজনার ছোট ছোট সূক্ষ্ম কাজ, এবং আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে তাদের সংঘবদ্ধতা ইত্যাদি সব কিছুই সম্ভব হয়েছে ইমরাতের প্রয়োগ-ভাবনা এবং সেই ভাবনাকে নিখুঁতভাবে উপস্থিত করার আশ্চর্য ক্ষমতার জন্যে যা তাঁকে বিশিষ্ট করেছে এবং নিজস্ব ঘরানা শিল্পীদের মধ্যেও তাঁকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। তানের ছোট ছোট অংশগুলি, বিশেষত নিশাতের বাজনার সময়, খুব বেশী রকম মার খাচ্ছিল আচমকা মাইক্রোফোনের ওঠা-নামার জন্যে। মাঝে মাঝেই রবীন্দ্রসদনের কর্মীরা মাইক্রো-ফোন নিয়ে এইরকম আচমকা নাড়াচাড়া করেন। কেন করেন—যখন অনুষ্ঠান পরি-বেশনের আগেই সংশ্লিষ্ট শিল্পী মাইক্রো-ফোনের সাউন্ড ঠিক করে নেন।

নববর্ষ উৎসব

সব পেয়েছির আসর (মুকুলকেন্দ্র, ছোটদের পাততাড়ি, যুগান্তর) আয়োজিত বর্ষবরণ উৎসব দেশবন্ধু পার্কে শতাধিক শাখা আসরের সাড়ে সাত হাজার শিশু কিশোর ভাইবোনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও অপূর্ব ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। আকাশ-বাতাস মুখরিত শঙ্খধ্বনির সঙ্গে পতাকা উত্তোলনের পর মুকুল আসরের ভাইবোনেরা উদ্বোধনী সঙ্গীত ও নববর্ষের গান গেয়ে শোনান। স্তোত্র পাঠ করেন অধ্যাপক বুদ্ধদেব চক্রবর্তী। ছোটদের নববর্ষের আশীর্বাদ জানান ডঃ রমা চৌধুরী, সভার সভাপতি স্বপনবুড়ো। প্রধান অতিথির ভাষণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় সরকারের বিভিন্ন শিশু-কল্যাণমূলক উদ্যোগের উল্লেখ করেন এবং ছোটদের বড় হতে উৎসাহিত করেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীপরেশ ব্যানার্জী সব পেয়েছির আসরের কেন্দ্রীয় ভবনের জন্য এক খন্ড জমি ব্যবস্থার আশ্বাস দিলে তুমুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে এ ঘোষণাকে অভিনন্দন জানানো হয়। আসরের হাজার হাজার পৃষ্ঠপোষকের উপস্থিতিতে সুন্দর এ উৎসবের সমাপ্তি ঘটে ছোটদের মিষ্টান্ন বিতরণের মাধ্যমে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত

১৯ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা
৭ আষাঢ়, ১৩৮৬
22 JUNE, 1979

একগুচ্ছ হিন্দী গল্প

আগামী সংখ্যায়

কাগজের দুর্ভিক্ষ

বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের দাপটে বইপত্র ছাপা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তার ওপর কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা তাকে অসম্ভবের স্তরে নিয়ে যাচ্ছে।

বাজারে কাগজ নেই। যাও বা পাওয়া যায় তার দাম প্রায় দেড়গুণ বেশি। কালোবাজার এমনভাবেই জেঁকে বসেছে যে, বিধিবহির্ভূত বাড়তি দামকে 'প্রিমিয়াম' নামে অভিহিত করে তাকে প্রকাশ্য স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

অবিশ্যি কাগজ উৎপাদনে যে কোন ঘাটতি ঘটছে না তা নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বাজারে কাগজের চাহিদা থাকে ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টনের মত। উৎপন্ন হয় ১০ লক্ষ টন কাগজ। কিন্তু এ বছর বিদ্যুৎ ও কয়লা সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় সত্যিকার উৎপাদন আরও কিছু কম হওয়ারই কথা।

কাজেই সরকারী সূত্রে যেমন বলা হয়েছে — ঘাটতির পরিমাণ ৭৫ হাজার টন তা নয় বোধহয়। বরং বেসরকারী সূত্র থেকে যেমন বলা হচ্ছে—ঘাটতির অংক ১ লক্ষ ৫০ হাজার টনের মত, সেইটেই হয়ত বাস্তবের কাছাকাছি।

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও কালোবাজারীর আরো একটি কারণ হল পাঠ্য পুস্তকের দরুণ সস্তা দামে কাগজ সরবরাহের জন্যে সরকারী নির্দেশ। ব্যবস্থাটি যে খুবই সঠিক তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের মত দেশে বেশি দামে বই কিনে পড়াশোনা চালানো অনেক ছাত্রের পক্ষেই কষ্টকর। সস্তা দরে কাগজের ব্যবস্থা করে সেই দামকে যদি সাধারণ গৃহস্থের আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায়, তাহলে দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে পুত্র-কন্যাদের শিক্ষিত করে তোলা কিছুটা সহজ হয়। এবং সেই প্রক্রিয়ায় জাতির ওপরও চাপ কমে। কিন্তু বাজারে যেহেতু রয়েছে এখন অস্বাভাবিক কাগজ বুভুক্ষা, তাই এসব সুযুক্তি অতিসহজেই হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে। বিশেষ করে পাঠ্য পুস্তকের জন্যে নির্ধারিত কাগজের সরকার-নির্দিষ্ট দামের চেয়ে কালোবাজারের দাম যখন টনপ্রতি ৩ হাজার টাকা বেশি।

এই পরিস্থিতিতে সরকারী সূত্র থেকে কাগজের কল-গুলোর প্রতি উৎপাদন বাড়ানোর বিনিময়ে বিদ্যুৎ ও কয়লা সর-বরাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রস্তাবে যে মিলের পক্ষ থেকে নীরবতা পালন করা হচ্ছে তা বিরক্তিকর হলেও দুর্বোধ্য নয়।

অবিশ্যি অতিসম্প্রতি সরকার কিছু নতুন ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হবে কিনা এখনি সেটা বলা কঠিন।

সাহিত্য ইত্যাদি

বর্ষা ও বাংলা কবিতা

জল পড়ে, পাতা নড়ে—রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম কবিতা। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় তো কোটি কোটি শিশুই পড়েছে, রবীন্দ্রনাথের আগে এবং পরে। অন্যদের কাছে তা কেবলই পাঠ্যপুঁথির পড়া। কিন্তু শিশু কবির চোখে কবিতা। এই দুটি লাইনই তাঁকে প্রথম স্পর্শ করেছিল, খুলে দিয়েছিল তাঁর সামনে স্বপ্নলোকের দরজা। নিজেই বলে গেছেন তিনি সে-কথা।

অবিশ্যি জল পড়ে, পাতা নড়ে লাইনদুটি পড়েই কবি কাব্যাক্রান্ত হয়েছিলেন তা হয়তো না হতেও পারে। এরও একটা পূর্বপ্রস্তুতি থাকতে পারে। ছিল বলেই মনে হয়। হয়তো নিঃসঙ্গ বাল্যকালের অনেক দুপুরে ও বিকেলে তিনি জানলার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখেছেন। লক্ষ্য করেছেন, বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়ার তালে তালে কেমন আন্দোলিত হয় গাছের পাতা। তা দেখে ছন্দের দোলা জেগেছিল কবির মনে। এবং এই অভিজ্ঞতার পর যেই তাঁর চোখে পড়ল বর্ণপরিচয়ের ঐ জল পড়ে, পাতা নড়ে—সমস্ত কল্পনা তাঁর বাঙময় হয়ে উঠল।

কিন্তু তার মানে কি এই যে ঐ দুটি লাইন চোখে না পড়লে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতেন না, কিম্বা লিখলেও বর্ষা নিয়ে লিখতেন না? না, তা কখনোই নয়। কল্পনা-উদ্রেককারী বিদ্যাসাগরী লাইন-দুটি চোখে না পড়লেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র কবিতাই লিখতেন। এবং তার একটা বড় অংশ হত বর্ষার কবিতা। কেন? তার কারণ, রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের সঙ্গে বর্ষার মেদুরতা ও নস্টালজিয়া অচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো। বিশেষ করে তাঁর বর্ষা-সম্বন্ধী গানগুলো। তিনি যদি তাঁর ঐ গানগুলো না লিখতেন, তাহলেও নিশ্চয়ই তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, কৃতজ্ঞতা জানাতাম, মাঝে-মধ্যে ভালোও বাসতাম, কিন্তু কখনোই তাঁকে আমরা আমাদের গোপন বেদনার সঙ্গী হিসেবে কাছে টানতাম না। বর্ষার ঐ গানগুলোতে এত অজস্র অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত রয়েছে যা অন্য কোনো মিডিয়ামে প্রকাশ করতে পারেন নি কবি। রবীন্দ্রস্বভাবের একটি মেরু যদি হয় তাঁর ছবিগুলো, (যাতে পাওয়া যায় অবচেতন মনের নানা সংঘর্ষ ও অন্তর্ঘাতের পরিচয়) অন্য মেরু অবশ্যই তাঁর বর্ষার গানগুলো. (যেখানে রয়েছে নানা স্তরের আনন্দ ও বিষাদ এবং তার চেয়েও যা [illegible] একটি আসঙ্গ-আতুর নির্জন মনের [illegible])। এ গান না লিখে রবীন্দ্রনাথের কোনো পরিত্রাণই ছিল না।

ব্যক্তিগত স্বভাবের এই অনিশ্চয়তার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি গৌণ কারণেও হয়তো রবীন্দ্রনাথকে বর্ষার দিকে নজর দিতে হত। সেটা হল ঐতিহ্যের দায়। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' মহাকবি কালিদাস যাকে নায়কের পদে বরণ করেছিলেন সে ঐ পত্নীবিরহ কাতর নির্বাসিত যক্ষ না নববর্ষার নবীন মেঘপুঞ্জ, স্পষ্ট করে বুঝে ওঠা শক্ত। অন্ততঃ শাপগ্রস্ত এবং শাস্তিভয়ে ভীত যক্ষটির অ-ক্ষমতার তুলনায় আকাশচারী মেঘ যে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দগতি ও অঘটন-ঘটনপটু, তাতে সন্দেহ নেই। নাহলে যক্ষ তাকে হাজার মাইল দূরে দূত হিসেবে পাঠানোর কথা ভাবত না। তা সে যাই হোক, কালিদাসের পর ভারতীয় কবিরা অনেকেই নানাভাবে বর্ষা নিয়ে কবিত্ব করে গেছেন। এবং আমাদের ঘরের কাছে এসে দেখি, পাঁচশ বছর আগেই তা বাংলা কবিতার সঙ্গে একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত হয়ে গেছে। যেমন, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদাবলীতে। বিরহ-মিলন-অভিসার নিয়ে বর্ষা সেখানে নতুন এক সাম্রাজ্য বিস্তারই করে ফেলেছে দেখা যায়। কতো তার রঙরদল, কতোই না ভাবের আলোছায়া! বিদ্যাপতির সেই 'এ ভরা বাদর' আর 'শূন্যমন্দিরে' 'ফাটি যাওত ছাতিয়া' যেন বাংলা কবিতারই নিজস্ব দীর্ঘশ্বাস হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকে এড়াবেন কী করে! আর এড়াবেনই বা কেন? ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেই তো তাকে অতিক্রম করতে হয়। বড় কবি হওয়ার আসল রহস্য তো সেই গ্রহণ আর অতিক্রমণের ভারসাম্যের মধ্যে!

ঐতিহ্যের এই ধারাবহনের কাজটি সত্যেন দত্ত থেকে সুধীন দত্ত পর্যন্ত অনেকের কবিতার মধ্যেই চলেছে। ইলশে গুঁড়ির মতো গোটা একটি কবিতা লিখে হয়তো নন্দিত করেন নি অনেকেই বর্ষাকে, কিন্তু নানা কবিতার উপমা ও চিত্রকল্প রচনায় বর্ষা মেঘ-বজ্র-বন্যা ইত্যাদির নানা রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। অনেক সময়েই হয়তো তা বন্ধুর মতো নয়, বাধার মতো। প্রীতির চেয়ে সেখানে হয়তো ভীতির ভাবটাই বেশি। কিন্তু প্রেম আর ঘৃণা তো একই মনোভাবের এপিঠ-ওপিঠ। কিম্বা আরো ভালোভাবে বলা যায়, প্রেম আর ঘৃণা হল অর্ধনারীশ্বর ব্যাপার। (মনস্তত্ত্বে তাই তো তাকে বলা হয় লাভ হেট কমপ্লেকস!) রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতাতেও অনেককাল পর্যন্ত বর্ষার প্রভাব ছিল।

ব্যতিক্রম শুরু হয় জীবনানন্দ থেকে। কিম্বা আরো সূক্ষ্মভাবে হয়তো যতীন সেনগুপ্তের সময় থেকেই। বর্ষা যে কেবল মিলন-বিরহ-অভিসারের ঋতু নয়, জলকাদারও সময়, 'দেশোদ্ধার' (যতীন সেনগুপ্ত লিখিত) কবিতায় তা অত্যন্ত বেআব্রুভাবে উদঘাটিত। আমাদের শহুরে ভদ্রলোকদের দেশপ্রেমের বিষয়েও উচ্চারিত হয়েছে সেখানে অপ্রিয় সত্য। দেশের মানুষ মানে গ্রামের মানুষ। কিন্তু গ্রামে গিয়ে দেশোদ্ধার কি সহজ কথা। বর্ষা নামলে তো পথঘাট সব কাদাজলে একাকার। কাজেই 'সেই দুর্যোগে কেটে পড়ি দাদা', 'খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা?' বর্ষা নিয়ে 'কাব্যি' করাকে কবি বাঁকা হাসির সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন।

কিন্তু জীবনানন্দ দাশে তাও নেই। বর্ষা সম্বন্ধে কোনো উল্লেখই নেই তাঁর কবিতায়। বৈশাখের দাবদাহে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা নেই, আষাঢ়ের সজল মেঘ দেখে উল্লাস নেই, ভাদ্রের ভরা গাঙ দেখে ভয়মিশ্রিত বিস্ময় নেই। কোনো রকম আসঙ্গ পিপাসা বা স্মৃতির পীড়নে অস্থির হন না তিনি। ব্যথিত বা বিস্ময়ও বোধ করেন না। তাঁর কাছে বর্ষার কোনো অস্তিত্বই নেই। অন্ততঃ কবিতার মধ্যে নেই।

কিন্তু তার মানে কি এই যে বর্ষাকে তিনি জানতেন না? তা নয় মোটেই। যে কবির আদি নিবাস বরিশালে এবং জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছেনও যিনি নিম্নবঙ্গের ঐ নদী-অধ্যুষিত জেলাটিতে, বর্ষার অভিজ্ঞতা তো তাঁর আশৈশবের সঙ্গী। তাহলে কেন এড়িয়ে গেলেন তিনি বর্ষাকে?

কেউ কেউ মনে করেন, রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই বর্ষাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন জীবনানন্দ। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার ধারণা, বর্ষা বিষয়ে তিনি নিরুৎসাহ ছিলেন নিজের কবিস্বভাবের তাগিদেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুবক জীবনানন্দের চিঠি লেখালেখি হয়েছিল একবার। তার মূল বিষয় ছিল, যতদূর মনে পড়ে, রবীন্দ্র-ভক্ত আনন্দ মঙ্গল ইত্যাদির একাধিপত্য - বিষয়ে তরুণ কবির সন্দেহ। তাঁর বক্তব্য ছিল, ক্ষয় ধ্বংস অলক্ষণ ইত্যাদিও তা সংসারে সমানই প্রবল। আর তা নিয়ে কবিতাও লিখে গেছেন অনেকে। আমরাই বা সেদিকে চোখ বুজে থাকব কেন?

এই ধারণা এবং বিশ্বাস থেকে কোনো কবি বর্ষায় যাবেন না। কেননা বর্ষা হল ফসল ও আশা-আনন্দের প্রতীক। যাবেন তিনি হেমন্তের দিকে। কেননা তা রিক্ততার প্রতীক। জীবনানন্দও তাই বর্ষা ছেড়ে গেছেন হেমন্তের রাজ্যে।

এবং লক্ষ্য করার বিষয়, সেইটেই ছিল যুগলক্ষণ। উনিশ শতকের ভিক্টোরীয় স্বচ্ছলতা থেকে দুই যুগের মধ্যবর্তী সময় যে ক্রমেই চলে যাচ্ছিল বাঁজা মাটির (ওয়েস্ট ল্যান্ডের) দিকে, তা তো এখন সকলেরই জানা।

বাংলা কবিতাতেও তাই বর্ষা সেই থেকে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত।

অপরাজিত?

অশ্রীন্দু রায়

হারানো বই

জন্মভূমি পত্রিকায় ১২৯৯ সালে বিহারীলাল সরকারের 'আরকট অবরোধ ও পলাশী' প্রবন্ধ ধারাবাহিক বেরোতে থাকে। সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অনুরোধে বিহারীলাল সেদিন এই বিতর্কিত বিষয়ে কলম ধরেছিলেন। সোজাসুজি বলে বসলেন আরকটে ইংরেজ জিতেছিল শক্তির জোরে আর পলাশীতে জয়ের কারণ প্রতারণা। অন্ধকূপ হত্যা একেবারে কাল্পনিক। ইংরেজদের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। ভিত্তিহীন, অপপ্রচার। বিহারীলালের আগে অন্ধকূপ হত্যার ঘটনাকে এভাবে কেউ চ্যালেঞ্জ জানান নি।

অর্মি, আইভিস, স্টুয়ার্ট, লেথব্রিজ, বিভারিজ, অনেকের লেখায় অন্ধকূপের নির্যাতনের আর সিরাজের পৈশাচিকত্বের মনোরম বিবরণ আছে। একটি কুড়ি ফুটের ঘরে ১৪৬ জন বন্দী। ভয়ঙ্কর গরম। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ২৩ জন বাদে সকলে মারা পড়ল। ঐ ঘরে বন্দী ছিলেন হলওয়েল। বিলেতে ফিরে ১৭৬৪ সালে লিখলেন 'ইণ্ডিয়ান ট্র্যাক্টস'—অন্ধকূপ হত্যার মর্মন্তুদ কাহিনী। সকালে দরজা খুলে জীবিতদের আনা হল নবাবের সামনে। মৃতদের ফেলে দেওয়া হল ড্রেনে। অন্ধকূপ হত্যাকে সমস্ত ইংরেজ ইতিহাসকার স্বীকার করেছেন। কেউ দায়িত্ব চাপিয়েছেন সিরাজের ওপর, আবার কেউ কেউ সিরাজের কর্মচারীদের দোষারোপ করেছেন। ইতিহাস-লেখক টরেন্স বলেন—'সিরাজদ্দৌলার আদেশমতে এ কাজ হইয়াছে, তাহার এমন কোন প্রমাণ নাই, ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছা থাকিলে তিনি কখনই ২৩ জনকেও এ ভীষণ বার্তা ঘোষণা করিবার অবসর দিতেন না।' মজার কথা গোলাম হোসেন তাঁর 'মুতাক্ষরীণে' অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। ১৭৮০ সালে বইটি লেখা। বইটি অনুবাদের ব্যবস্থা করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। বিশিষ্ট ইংরেজ লেখকরা মুতাক্ষরীণের প্রশংসা করেছিলেন। যদিও গোলাম হোসেন ছিলেন কোম্পানির পেন্সনভোগী কর্মচারী। মুতাক্ষরীণের অনুবাদকের মতে, কলকাতার মানুষ এরকম একটি বীভৎস ঘটনার কথা পর্যন্ত জানত না। এমন কি ক্লাইব বা ওয়াটসনের চিঠিতেও উল্লেখ নেই। বিহারীলাল ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চিঠিপত্র দলিলদস্তাবেজ ঘেঁটে অন্ধকূপ হত্যার স্বপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ পান নি। তাহলে হলওয়েল এমন বীভৎস কাহিনী রচনা করলেন কেন? [illegible] খুঁজতে গিয়ে বিহারীলাল বলেছেন, [illegible] স্বাধীন নবাবকে [illegible] [illegible] [illegible] ইংরেজের

ইংরেজের জয়

অথবা

"আরকট-অবরোধ" ও "পলাশী"।

"বিদ্যাসাগর" "শকুন্তলা-রহস্য" "তিতুমীর"
"কমণ্ডপুরের যুদ্ধ" "বাগ বগী" "মহারাণী
স্বর্ণময়ী" "দান" প্রভৃতি
গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীবিহারিলাল সরকার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
[illegible]
শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত।

[illegible] সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র
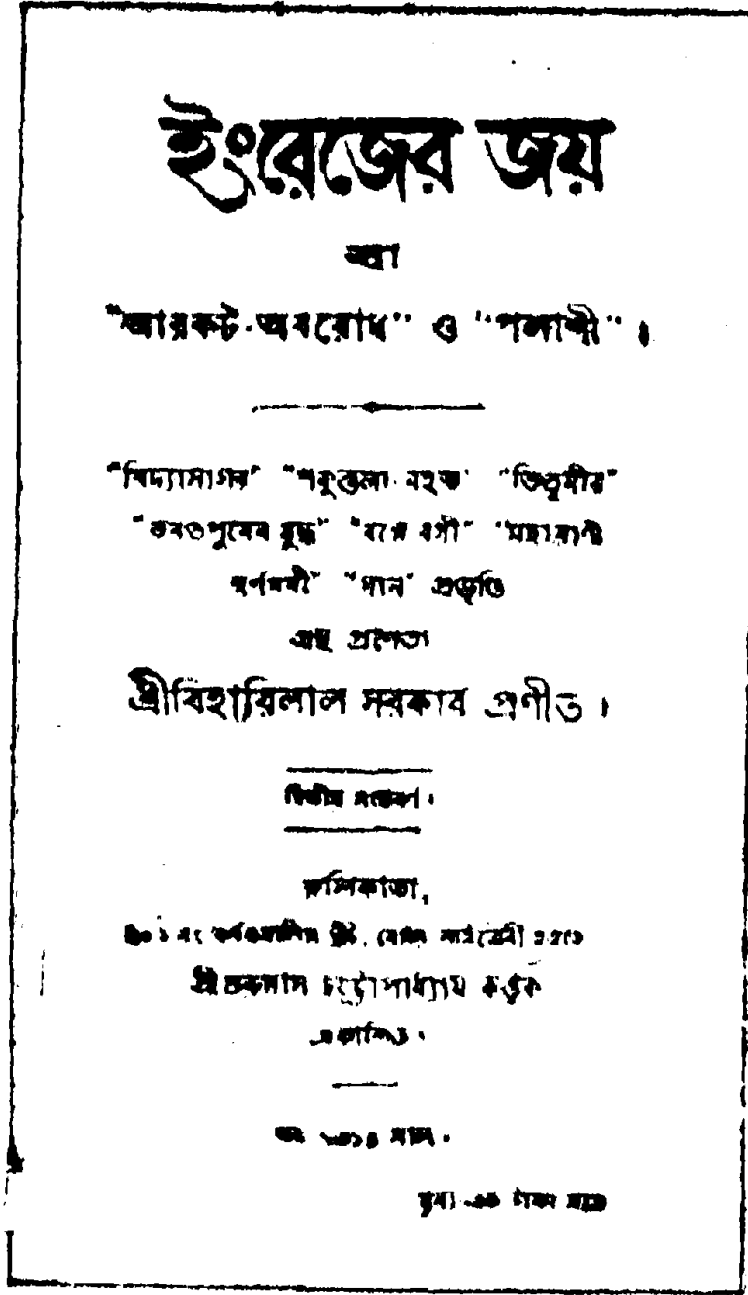
দুর্নাম রটবে। সেই কলঙ্ক দূর করতেই অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর সৃষ্টি।

ইংরেজ ইতিহাস লেখকদের বেশীরভাগই সিরাজকে দুশমন বানিয়ে ছেড়েছেন। সিরাজকে নীচ প্রবৃত্তির মানুষ প্রমাণ করে, ক্লাইভকে তাঁরা মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। কিন্তু ম্যালিসনের লেখায় আছে 'সিরাজদ্দৌলার যত দোষ থাকুক, তিনি রাজদ্রোহী নহেন, তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা বিক্রয় করেন নাই। ৯ই ফেব্রুয়ারি হইতে ২৩ জুন পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলে নিরপেক্ষ ইংরেজ মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে, ক্লাইভ অপেক্ষা সিরাজের আত্মমর্যাদা অনেক অধিক।' বিহারীলাল দেখিয়েছেন দোষে-গুণে মেশান বাঙলার নবাব সিরাজদ্দৌলা ছিলেন আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন স্বাধীনতা প্রেমিক। তাকে নৃশংস প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে ইংরেজের স্বার্থে। তা না করলে কোম্পানির অপকীর্তির কথা জানাজানি হয়ে পড়ত। আর বিলেতে কোম্পানির বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যা কম ছিল না। তারা পার্লামেন্টে হৈচৈ তুলত। এমন ঘটনা ঘটেও ছিল কোন কোন ব্যাপারে।

বিহারীলালের রচনা গ্রন্থাকারে বেরোল—'ইংরেজের জয়' ৩৪৩ পাতার বই। দ্বিতীয় সংস্করণও হয়েছিল। মূল রচনা ২১৪ পাতা। ২১৫ থেকে ৩৪৩ পর্যন্ত সিরাজ ও কোম্পানির কর্তাদের চিঠিপত্র আছে। মূল চিঠি ৪৪ পাতা। তারপর আছে বাঙলায় অনুবাদ। এ সব চিঠিপত্রে সিরাজের সঙ্গে কোম্পানির কর্তাদের সম্পর্ক পরিষ্কার বোঝা যায়। [illegible] ইংরেজ-কর্তাদের চিঠির উত্তর সিরাজ কখনও উদ্ধতভাবেই দিয়েছেন কখনও নরম সুরে। [illegible] [illegible] বণিক দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে কব্জা করার প্রয়াসকে সিরাজ নির্বীজের মত মেনে নেন নি। ইংরেজের সঙ্গে সিরাজের সন্ধি হয়েছিল। সেই সন্ধির সর্ত মেনে নিয়ে কোম্পানি জানায়: 'বাঙলা, বিহার এবং উড়িষ্যার সুবাদার নবাব মনসিরাদমুল্লুক সিরাজুদ্দৌলার সমক্ষে আমরা (ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া বণিক সম্প্রদায়) আমাদিগের লাট-সাহেবের সভাসদবৃন্দের স্বাক্ষর করিয়া এই সন্ধিপত্রে অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই বণিক সম্প্রদায়ের কুঠির কার্য (যাহা নবাবের এলাকাভুক্ত) পূর্বের অঙ্গীকার মত চালান হইবেক, আমরা বিনা কারণে কোন লোকের অনিষ্ট করিব না, নবাবের এলাকাধীন কোন জমিদার, তালুকদার, দস্যু কিম্বা খুনী লোকের বিচার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না, এবং আমাদের পূর্ব অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না।'—কিন্তু ইংরেজ কথা রাখেনি। বরং তাদের লোভ ও প্রভুত্ব প্রয়াস বাঙলার স্বাধীন নবাবকে অসহায় দুর্ভোগের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। উৎকোচপ্রিয় ক্যাইভ ইংরেজের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে মিশিয়ে সেদিন বাঙলার বুকে এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। আর অবশেষে পলাশীর যুদ্ধে যাবতীয় শঠতার মিশ্রণে ইংরেজের জয় হল। ইংরেজ ইতিহাস-লেখকরা অলীক সিদ্ধান্ত এবং ভিত্তিশূন্য ঘটনার সংমিশ্রণে ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত করেছেন। অন্ধকূপহত্যা তাদের অসৎ প্রবৃত্তিরই নিদর্শন।

সিরাজের শেষ দিনগুলোর করুণ আলেখ্য বিভিন্ন লেখকের রচনায় নানাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বন্দী সিরাজকে আনা হল মুর্শিদাবাদ। ক্লাইভ, মীরজাফর আর মীরণ সে সময়ে যে ঘৃণ্য ভূমিকা নিয়েছিল, বিহারীলাল তারও উল্লেখ করেছেন। বইটির মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান মানচিত্র এবং ছবিও আছে। তাছাড়া বিহারীলালের গ্রন্থে সিরাজ চরিত কলকাতা অভিযানের কাহিনী, ইংরেজদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে। তিনি ঐতিহাসিক নন। কিন্তু ইংরেজের অসংচরিত্রের আবরণ খুলে দিতে দ্বিধা করেন নি। বিহারীলালের সমস্ত তথ্যই অভ্রান্ত নয়। আজ তাঁর যুক্তি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। পরবর্তীকালে বহু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। নতুনভাবে সিরাজ-চরিত্রকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পলাশী যুদ্ধের অন্তরালের সংবাদও পাঠকের সামনে এসেছে। বিহারীলাল-লেখা শুরু করেন ১২৯৯ সালে। তার অক্ষয়কুমার মৈত্র 'সাধনা' ও 'ভারতী' পত্রিকায় সিরাজ সম্পর্কে লিখলেন ১৩০২ সাল থেকে। গুণগত দিক থেকে অক্ষয়কুমারের রচনা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। তিনি সিরাজ চরিত্রের নবমূল্যায়ণ করলেন। বিহারীলাল হারিয়ে গেলেন।

কমল চৌধুরী

সাহিত্যের নেপথ্যে

নতুনদের জায়গা দিন

ফি সপ্তাহেই দেখছি। চালু সাপ্তাহিকের পাতায় পাতায় ফলাও বিজ্ঞাপন। হরেক কিসিমের বই—হরেক পাবলিশার। গ্রন্থমালা, পেপার ব্যাক, বিদেশী অনুবাদ, খেলার বই, রহস্য সিরিজ—ভ্যারাইটি পাবলিকেশনস। হপ্তায় হপ্তায় কাগজপত্রে সোচ্চার ঘোষণা—গ্রাহক হোন—অবিলম্বে গ্রাহক হোন—গ্রাহকদের বিশেষ সুবিধা। আবার কখনও. আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিশেষ ডিসকাউন্ট—এমনি সব। মোদ্দা কথা হল বইয়ের বাজার নড়াচড়া করছে। ঝিম মেরে বসে নেই।

নিজের চোখে দেখতে চাইলে পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে দেখুন—প্রকাশক পাড়ায় ভিড় কমতি নেই। খুচরো ক্রেতা পাইকারি ক্রেতা সবাই মিলে মিশে আছে সেখানে। মফঃস্বলের বই বিক্রেতাদের লম্বা কিউ প্রকাশকের দোকান ছাপিয়ে। তাঁদের হাতে ঝুলছে বইয়ের লম্বা ফর্দ। কাগজে যদি দু' চার দিনের মধ্যে রবীন্দ্র, অ্যাকাডেমী কিংবা জ্ঞানপীঠের খবর থাকে তো কথাই নেই। সেইসব উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক কিংবা কবির বইয়ের ম্যাকসিমাম চাহিদা থাকবে সেই ফর্দে। মোট কথা দোকানে দোকানে বইয়ের কেনা-বেচা, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন। সব মিলে বোঝা যায় বই পাড়া চলছে—দাঁড়িয়ে নেই।

অবশ্যই প্রকাশকপাড়ায় গিয়ে প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বললে অনেকেই তাঁরা মুখ চোখে নৈরাশ্য ফুটিয়ে তুলবেন। মোমবাতির আলোয় থমথমে মুখে লোড শেডিংয়ের প্রসঙ্গ তুলবেন। আরও বলবেন ছাপাখানার খরচ বেড়ে যাওয়ার কথা। সবশেষে জানাবেন কাগজের বাজার আগুন। অর্থাৎ কিনা এইসব মিলিয়ে বইবাজারে এখন গভীর অ-সুখ। একজন রীতিমত পরিচিত তরুণ প্রকাশক বলেছিলেন : দেখেন নি এ বছর নববর্ষে সারা বই পাড়ায় নতুন বই বেরোনোর হার কেমন? লোড শেডিংয়ের ধাক্কায় ছাপাখানার অর্ধেক ছাপা হওয়া কিংবা সিকি ছাপা হওয়া ফর্মা পড়ে পড়ে ধুলো খাচ্ছে। যাঁরা নতুন বছরে আট দশটা নতুন বই বাজারে ছাড়েন তাঁরা অনেকেই এ বছরে একটাও বই ছাড়তে পারেন নি—এমনও হয়েছে। তার ওপর ছাপার রেট বাড়ছে, বাড়ছে কাগজের দাম।

তরুণ প্রকাশকের কথাটা অস্বীকার করি না। লোড শেডিংয়ের সহরে বসে লোড-শেডিং নেই বলি কেমন করে। ছাপার খরচ বেড়েছে, বেড়েছে কাগজের দাম. বেড়েছে এ তো খবরের কাগজের খবর। আর এ নিয়ে তো রীতিমত কান্নাকাটি করে গেলেন সেদিন মফঃস্বলের একজন লেখক। অনেক কষ্টে টাকাপয়সা জোগাড় করে তাঁর একখানা উপন্যাস নিজে ছাপবেন ঠিক করেছিলেন, হঠাৎ কাগজের দামে এই নড়াচড়া। তো সে যাই হোক। কথা হচ্ছিল তরুণ প্রকাশকের কথা নিয়ে। ছাপায় যেমন খরচ বেড়েছে, কাগজের দাম বেড়েছে তেমনি প্রয়োজন মত ব্যবস্থাও তো তাঁরা নিয়েছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফর্মা পিছু এক টাকা হারে বইয়ের দাম করা হচ্ছিল।.ইদানিং তো তা হচ্ছে না। আট টাকার বইটা দশ টাকা। দশ টাকারটা বারো টাকা এত মতোই নতুন সংস্করণে দাম বেড়ে যাচ্ছে। চড়া বাজারের কড়া পাহারায় তাঁরা তো খদ্দেরদের ওপর ট্যাকসো বসাতে পিছপা হননি।

যাক এসব কথা থাক। আসল কথাটা বলেনি। আসল কথাটা পাড়লেই যাতে নৈরাশ্য জমা না হয় তাই তাঁদের সমস্যা—সে সমস্যা সমাধানে তাঁদের ব্যবস্থাটা আগেই জানিয়ে রেখেছি। আসল কথাটা তেমন কিছুই নয়—সামান্য একটা সবিনয় নিবেদন। নিবেদনে বলছিলাম প্রকাশকমশায়রা একটু নতুন লেখকদের দিকে তাকাবেন কি? মস্ত মস্ত নামী লেখকের ভারী ওজনের প্রায় অর্ধশত টাকা মূল্যের বই তো তাঁরা রুটিন করে প্রকাশ করে যাচ্ছেন। গ্রন্থাবলী রচনাবলীতে বাজার ছয়লাপ করে যাচ্ছেন—তো নতুন লেখকরা কি আপনাদের সামান্য দাক্ষিণ্যও পেতে পারেন না। বাজার চলতি লেখক না হলে আপনারা ব্যবসার প্রসঙ্গ তুলতে পারেন। কিন্তু হলফ করে বলতে পারেন কি বাজারে নামী সব লেখকেরই সব বই আপনাদের ঘরে প্রচুর লাভ এনে দেয়। আমি কিন্তু জানি তা দেয় না। বাজারে রীতিমত পরিচিত অথবা মোটামুটি পরিচিত সব লেখকের সব বই-ই 'হট কেক' তো নয়ই নরম গরমও নয়। কাজেই বই ছেপে আশানুরূপ ফল আপনারা অনেক ক্ষেত্রেই পান না। নামীদের ক্ষেত্রে না পেলেও মন খারাপ করেন না। অথবা করলেও বাইরে প্রকাশ করেন না। এই ধরনের ঝুঁকি দু একবার তরুণদের জন্যে অথবা নতুন লেখকদের জন্যে নেওয়াও যে রীতিমত দরকার। মস্ত মস্ত নামী উপন্যাস লেখকদের ফি সপ্তাহে বোল্ড টাইপে নতুন উপন্যাসের যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন তারই মধ্যে হাল্কা টাইপে এক-আধজন নতুন উপন্যাস লেখকেরও অপরিচিত নাম উঁকি দিক না। কলমে জোর থাকলে পাঠক নেবে। আপনাদের তালিকায় স্থায়ী হবে। বোল্ড টাইপ হবে। না হলে ঠোঙ্গা। একটু বিবেচনা করে দু-একজন নতুন লেখককে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিন না। প্রকাশনা যদি ব্যবসা বলেন, বলব ব্যবসায় লাভ-লোকসান, ঝুঁকি-ঝঞ্ঝাট তো আছেই। আপনারা হয়তো বলবেন ১১০০ ছাপলে পড়তা পোষানো যাবে না। নতুন লেখকের ২২০০ ছাপতে ভরসা হয় না—এসব যুক্তি কিন্তু জোরালো নয়। ১১০ টাকা রিম মিনিমাম কাগজের দাম কিংবা ছাপা খরচ ১৬০ টাকা ফর্মার অজুহাত তুললেও কিন্তু ঠেকানো যায় না। যদি বলেন, প্রকাশনা তার সঙ্গে সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদি, তাহলে বলব এমন প্রয়াস নেওয়া তো আপনাদের দায়িত্ব। ফি-বছরই আট দশ টাকা দামের পুজো সংখ্যাগুলোয় যে সমস্ত নাম ডাক-ওয়ালা উপন্যাস লেখকরা ফুল ফোটান তার শতকরা আটানব্বইটাই প্রকাশকদের সঙ্গে আগে থেকেই চুক্তিবদ্ধ থাকে। দেওয়ালী না ধুরতেই লেখকদের হাতে ফার্স্ট প্রুফ এসে যায়। সঙ্গে ফেরৎ দেওয়ার তাগাদা। মাস তিন চারের মধ্যেই সব কাজকর্ম চুকে যায়। বই বেরোয়। বিজ্ঞাপন দেখা যায়। ধারাবাহিক লেখার ক্ষেত্রেও একই হাল। নামী উপন্যাস লেখকের ধারাবাহিক উপন্যাস যখন কোন সাপ্তাহিক বা মাসিকে নিয়মিত 'বেরোচ্ছে প্রকাশকের উদ্যোগে তার প্রকাশের কাজও একই সঙ্গে চলেছে তার ঘরে। এই সব নামী পত্রপত্রিকায় কখনও সখনও অনামী বা অল্পনামী উপন্যাস লেখকের উপন্যাসও ছাপা যে হয় না এমন নয়। ফি-বছর না হলেও মাঝে মধ্যে হয় বৈকি! তবে বলা বাহুল্য, প্রকাশক মহাশয়দের সে-সবে তেমন আগ্রহ নেই। তাঁরা নামী লেখকের উপন্যাস ছেপে ব্যর্থ হতে প্রস্তুত। তবু নতুন লেখকের উপন্যাস ছেপে চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে রীতিমত অনিচ্ছা। এক-আধজন প্রকাশক কখনও যদি বা অনিবার্য কোন কারণে নতুন লেখকের লেখা ছাপেন তা-ও নিতান্তই দায় ঠেকাতে! নতুন লেখকের প্রতি প্রায় প্রকাশকেরই হৃদয় তেমন প্রসারিত নয়। এক প্রকাশকের ঘরে তো নতুন লেখক-লেখিকার খানকয়েক বই দীর্ঘ সময় পড়ে আছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম বছর দেড়েক আগে। দু'এক ফর্মা কম্পোজও সম্ভবত দেখেছিলাম, কিন্তু ফর্মা ভরে মলাট পরিয়ে বইখানা আজও সম্পূর্ণ হয়নি। ইতিমধ্যে সেই লেখকেরই আরও একখানা বইয়ের বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে। বলতে দ্বিধা নেই এই সময়ের ভেতর বাজার চলতি অনেক লেখকের অন্তত খান দুই তিন বই প্রকাশিত হয়েছে।

যাই হোক নতুন লেখকের স্বপক্ষে প্রকাশক মহাশয়দের কাছে সবিনয়ে এই আর্জি রাখছি—তাঁদের কথাও একটু ভাবা হক। প্রত্যেক প্রকাশকই বছরে অন্তত দু' একখানা নতুন লেখকের বই ছাপুন। শুধু নতুন লেখক বলেই ছাপতে হবে এমন বলছি না। সে লেখায় যদি ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনা থাকে তা হলেই। নতুনদের সব লেখাই তো নজর টানে না। কোন কোন লেখা তো টানে। কোনো লেখা পড়ে তো নিশ্চয়ই মনে হয় ভবিষ্যতে ইনি লিখবেন। সেই আশা-জাগানো নতুন দু-একজনকে প্রকাশকরা আশাবাদী করলে ক্ষতি তো কিছু দেখি না। অকালে ফুরিয়ে যাওয়া নামী লেখকের চর্বিতচর্বণ ছাপার চেয়ে সে প্রয়াস অবশ্যই সৎ হবে।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতের হলুদ পাতা

কালীকৃষ্ণ গুহ

শীতের হলুদ পাতা, তুমি ঝ'রে যাও। আমি বসন্তদিনের জন্য
অপেক্ষায় থাকি।

রেল যাদুঘর থেকে ছাপা হ'য়ে আসে পত্রিকা, আমি ছুঁয়ে দেখি—
স্পর্শ করে দেখি, যুবকের ক্রোধ, ভয় হিম নিঃসঙ্গতা
আমি কিশোরের মৃত্যুর শোক স্পর্শ করি শীর্ণ দুই হাতে,
স্পর্শ করি খড়কুটো, টম্যাটোর খেত।

বই মেলা থেকে কারা বাড়ি ফেরে গ্রন্থরাজি নিয়ে? প'ড়ে দেখে?
তাদেরও কি গন্ডগোলে পচা কুমড়ো, নষ্ট শস্য ফলে?

আমি মানুষের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি, লক্ষ করি:

কিশোরের শোক ও শীতের হলুদ পাতা
পাশাপাশি বসন্তদিনের জন্য অপেক্ষায় আছে।

অসংগতি

রবীন সুর

তুই ভাবলি ভয়
আমি তো জানি ঘৃণা,
দাঁড়িয়ে সংশয়—
সময় প্রসবহীনা।

সাত দশকে কবি কি এখন
বুকে পুরেছে যক্ষ্মা?
ক্ষুধায় রাগে ঝনানো আক্রমণ
আসলে প্রতিরক্ষা।

উল্টোপথে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় কুণ্ঠিত?
আত্মরতির ছালছাড়ানো কাব্য লেখা,
থাক না বাকি মগজ বিক্রির গোপন চুক্তি
যা শুনি তা মিথ্যে সব, অনেক বাকি দেখা।

শুঁয়োপোকার বিষমাখানো ক্রোধ
কোথায় থাকে যখন প্রজাপতি?
ভূত ঢুকেছে সর্ষে ফুঁড়ে, তাবিজে প্রতিরোধ?
ঝড় তো ওঠে, পোড়োবাড়ির ঘোচেনা দুর্গতি।

ভালোবাসার কবিতা

কবিরুল ইসলাম

তোমার আমার এই ভাব-ভালোবাসা
ক্রমশ প্রকাশ্য গল্পে উন্নয়নশীল
আমার স্বদেশ যথা খোঁজে নিজ ভাষা
প্রথম পদ্যের ছন্দে মিল ও অন্তমিল।
যাবতীয় জটিলতা শিল্পের সাহসে
স্রোতস্বিনী ভেঙে ছোটে সংগমের দিকে,
সবুজ স্বাক্ষরে ভ'রে দূতীর সন্তোষে
দিগ্বিদিকে খোলা চিঠি নিমন্ত্রণে নীল।

আমি সেই ভাষা খুঁজে, সেই ভাবে লিখে
অন্তর বুকের এই পঙক্তি কতিপয়
তোমার দেহের পারে ঋজু, মেদহীন
গাহীন গচ্ছিত ক'রে দিগ্বিজয় নয়
আমি শুদ্ধ হতে চাই যেমন স্বাধীন
বুদ্ধদেব বসুর ভালোবাসার কবিতা।

সমালোচনা

মানুষের কথা

গোপাল হালদারের বিস্মৃতপ্রায় উপন্যাস ত্রিদিবা পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল একদা, অন্য দিন—আর এক দিন নামে। ত্রিদিবা অর্থাৎ তিন দিন। কিন্তু, উপন্যাসটির ঘটনাক্রম তিন দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গোটা চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, আলোড়ন-বিলোড়নের দিনগুলো একটা অসাধারণ তীক্ষ্ণতা আর স্পষ্টতা নিয়ে সজীব হয়ে আছে উপন্যাসটিতে। ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন, কবিত্ব প্রভৃতি বহু কিছুর একত্র সমাবেশে উপন্যাসটিতে সৃষ্টি হয়েছে একটা মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি এবং বলা দরকার, জীবনের গভীরতা থেকে এই সব-কিছু উৎসারিত বলে জীবনচর্চার এই কঠিন দিকগুলো সহজ-সমীকরণের মাধ্যমে ঘটনা স্রোতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উপন্যাসের দিগন্তকে করেছে প্রসারিত। রাজনীতি-নির্ভর উপন্যাস ইতিপূর্বেও লিখিত হয়েছে কিন্তু বলতে বাধা নেই, জীবনের সামগ্রিক রূপকে ধরে রেখে আগামী দিনের সহজ-সত্যকে অকম্পিত কণ্ঠে কেউ উচ্চারণ করেন নি বা করতে চান নি। গোপাল হালদার নির্ভীকভাবে সেই সত্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং ভবিষ্যতের অভ্রান্ত ইঙ্গিত রেখেছেন অকুতোভয়ে। এরই নাম সোসালিস্ট রিয়্যালিজম যা স্বভাবে ক্রিটিক্যাল রিয়্যালিজম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আর, এখানেই তাঁর আসলটি বিশেষভাবে চিহ্নিত। আসলে তিনি ব্যক্তি এবং সমাজকে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। সেখানে ব্যক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং সামাজিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয় তার ব্যক্তিত্ব। সেই বিকাশধর্মী ব্যক্তিত্ব, যাকে বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বলে অভিহিত করা যায়। কেবল আত্মার চিন্তায় মগ্ন থাকে না, বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সংহত সামাজিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। এইভাবেই খণ্ডিত ছোট আমি সত্তার পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে রূপান্তরিত হয়। সেখানে সে পর্যায়ত মানুষ, আর তাই ব্যক্তিগত সুকুমার মনোবৃত্তি সেখানে যেমন জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ, তেমনি তার সঙ্গে যুক্ত দায়-দায়িত্ব বোধের মহান চেতনা। এই নিয়েই তৈরি হয় হোল ম্যান। ত্রিদিবা সেই সামগ্রিক জীবনের উপন্যাস। এখানে প্রেম ভালবাসার কথা আছে, কিন্তু তা অবক্ষয়ের পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হয় নি। জীবনের চড়াই উৎরাই ভাঙতে গিয়ে ভালবাসা মুকুলিত হয়েছে হৃদয়ের রঙ নিয়ে। দুটি তরুণ প্রাণ তাদের আকণ্ঠ পিপাসা নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে মুক্ত-শুদ্ধ মন নিয়ে, সুস্থ-বলিষ্ঠ জীবন-ভাবনা নিয়ে। তাই একটি হাত এবং একটি পা না থাকা সত্ত্বেও মঞ্জু বিজয়কে জীবনে বরণ করে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। ভালবাসার অজস্রতা দিয়ে সে পঙ্গু মানুষটিকে নিজের জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছে।

এই খণ্ড-ক্ষুদ্র আমিত্বের সংকীর্ণ সীমানা পেরিয়ে বৃহত্তর আমির আলোক-সরণিতে যাত্রা করার ইতিহাস ত্রিদিবার ইতিহাস। আমিও সেই ইতিহাসের নায়ক। ইতিহাস কথার অর্থই হল মানুষের কথা, চলমান মানুষের সুখ-দুঃখ-সংগ্রামের কথা। ইতিহাসের সেই কঠিন পথে শুরু হয় অমিতের যাত্রা। সে জেনেছে, এই পথেই তার প্রাণের মুক্তি। তাই শুষ্ক ইতিহাস চর্চায় যৌবনকে বেঁধে ফেলার মত স্থবির মানসিকতা তার নেই, তার যৌবন ইতিহাস সৃষ্টির কামনায় অস্থির। এই জন্যেই সব কিছু পেছনে ফেলে অমিত স্বাধীনতা-সংগ্রামে আর দশজনের সঙ্গে পায়ে পা মেলায়। সংগ্রামের সেই রাজপথে অজস্র মানুষের মহামিছিলে সে সঁপে দেয় নিজেকে। এখন আর চোখ বুজে স্বপ্ন দেখার সময় নেই, ব্যক্তিজীবনের প্রসপেকট নিয়ে ভাববার সময় নেই, নেই নিভৃত প্রেমালাপনের বিলম্বিত অবকাশ। অতীত জেনারেশনের সঙ্গে এই জেনারেশনের এখানেই তফাৎ। এখন শুধু কাজ আর কাজ, রূপান্তরের কাজ, নবজন্মের কাজ। তাই আজ যৌবনের চোখে মধ্যাহ্ন জ্বালা। সেই জ্বালায় জ্বলছে সারা ভারতবর্ষ, জ্বলছে বাংলাদেশ। সেই জ্বালায়ই কত তাজা প্রাণ ভুল পথে চলে শেষ হয়ে গেছে অকালে। অমিত ইতিহাসের ছাত্র, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েই তার পথ চলা। তাই টেররিজম নয়, সংগঠন-শক্তি তার পথ চলার মূল পাথেয়। তাকে অবলম্বন করেই সে ঢুকেছে জেলে। সেই নির্জন কারাবাসের বিভীষিকার মধ্যে মাঝে মাঝে মনে হত মৃত্যু বুঝি ইহার অপেক্ষা শান্ত, অনেক সুশৃংখল, অনেক সহনীয়। তবু সে আত্মবিশ্বাস হারায় নি। আর, সেই অখণ্ড বিশ্বাসের প্রদীপ্ত আলোকে শুরু হয় তার মনের গোত্রান্তর। এখন থেকে আরম্ভ তার নতুন ধরনের কাজ, নতুন জীবনের মোহনায় পেঁছানোর কাজ। এই জন্যেই জেল থেকে মুক্তি পেয়ে একটা উৎসর্গীকৃত মহাশক্তির মত সে ঘুরে বেড়ায় মেহনতী মানুষের কাছে, জীবনে জীবন যোগ করে তৈরি করে সংগঠন। এখন তার লক্ষ্য শ্রেণীহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন নবজীবন প্রতিষ্ঠা। সেই স্বপ্ন ও সাধনার পথে তাকে পুনর্বার যেতে হয় কারাকক্ষের নির্জনতায়।

অমিত কোন যান্ত্রিক নায়ক নয়, রক্ত-মাংসের গড়া মানুষ। তারও স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা আছে। কিন্তু তা শুধু গৃহের নিভৃতে একান্ত উপভোগের মধ্যে সীমায়িত করে রাখার অবকাশ নেই, এখন 'পথে পথে জীবন রচনা করবার দিন এল পথচারী শতাব্দীর মানুষের।' এখন পথের গান জীবনের, সে গুজন ইন্টারন্যাশনাল [illegible] মানব জাত।

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে অমিতের যাত্রা শুরু, এখন তা অনেক পরিবর্তিত। বিষয়বস্তু ও শিল্পকলার দিক থেকে বাংলা উপন্যাস এখন অনেক পথ এগিয়ে গেছে, জীবনের কোন অংশই এখন তার দৃষ্টির বাইরে নয়। তবু মনে হয়, নায়কেরা এখনও ত্রিদিবার জগৎ ছেড়ে এগিয়ে যেতে পারে নি। মাঝে মাঝে নড়াচড়া করেছে, এগোবার স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু চার দিক দেখে সেখানেই যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। একালের মানুষের কাছে, প্রাণময়তার অজস্রতা-সমৃদ্ধ তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে ত্রিদিবার আবেদন এখানেই।

কার্তিক ভদ্র

ত্রিদিবা : শ্রীগোপাল হালদার। সাক্ষরতা প্রকাশন। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি। মূল্য : পনেরো টাকা।

তমসা তীর্থে

বাঙালী ভ্রমণ বিলাসী। আবেগ প্রবণ বাঙালীর এই ভ্রমণ বিলাস ভিন্ন রাজ্যের বহু মানুষের ঈর্ষার বিষয়। হাতে পয়সা থাক আর নাই থাক, সামান্য সুযোগ পেলেই এঁরা বেরিয়ে পড়েন অজানাকে জানতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরসে মন-প্রাণ ভরে নিতে। যাঁরা নানা কারণে ডানামেলা পাখির মত ভ্রমণের নেশায় মেতে উঠতে পারেন না, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে তাঁরা নিদেনপক্ষে মনোমত ভ্রমণকাহিনী সঙ্গী করেন। বাঙালীর কাছে তাই ভ্রমণ-সাহিত্যের কদর কোন অংশে কম নয়।

রূপবতী তমসা মূলতঃ ভ্রমণ কাহিনী। তমসা হিমালয়ের উপত্যকায় গাড়োয়ালের একটি উপনদী। যমরাজের ভগিনী এবং যমুনা সখী তমসার জন্ম যমুনোত্রী, হিমবাহ, বন্দরপুঁছ এবং স্বর্গারোহিণী গিরিশৃঙ্গ নিঃসৃত অমৃতধারায়। তমসা-গাড়োয়ালের অবস্থান এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক অনাবিল আনন্দের উৎস বলা চলে। লেখক বৈতালিক তাঁর স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তার অপূর্ব বর্ণনা রেখেছেন।

ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক পাঠককে তাঁর অজান্তে কখন হিমালয়ের সৌন্দর্য উজাড় করা অঙ্গনে নিয়ে যান, বোঝা যায় না। তমসার তীরে তীরে পরিক্রমাকালে সেখানকার সরল সহজ মানুষ এবং তাদের সমাজজীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী তুলে ধরতেও তিনি ভুলে যাননি। শুধুমাত্র সৌন্দর্য উপভোগ করতেই বৈতালিক হিমালয় ভ্রমণে যাননি।

তিনি সেখানকার প্রচলিত মহাভারতীয় রীতিনীতি এবং সমাজব্যবস্থারও তিনি সুন্দর ছবি এ'কেছেন। লিখেছেন, হাজার হাজার বছরের সভ্যতার বিবর্তন তমসা গাড়োয়ালের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের উপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এখনও সেখানে প্রচলিত আছে বহু পতিপ্রথা, বে'চে আছে কর্ণ দুর্যোধন—সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারূপে।

তমসার রূপে মুগ্ধ লেখক তমসাতটকে রহস্যাবৃত করে রাখতেই বোধকরি তিনি আগ্রহী। তিনি চান না, আধুনিক সভ্যতার স্বার্থান্বেষী হাত কুমারী তমসাতটকে অপবিত্র করুক। কিন্তু তা কি সম্ভব? হয়তো নয়। তাই নিজেই আবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, রাস্তাঘাট তৈরি সম্পূর্ণ হলে যখন বাস চলাচল করবে, তখন এই তমসার পথও কেদারবদ্রীর পথের মত রিক্ত অবহেলিত হয়ে পড়বে। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, যোশীমঠের মত জারমোল্লা, ভালকো, ওসলার কোন আকর্ষণ যাত্রীর মনে থাকবে না। তমসাতটের প্রকৃতি এবং জনজীবনের অনন্ত রহস্য যাত্রী বোঝাই বাসের ধুলোয় আড়াল হয়ে যাবে।

সচিত্র এই ভ্রমণগ্রন্থে যুক্ত একটি মানচিত্র ভ্রমণ বিলাসীদের অতিরিক্ত পাওনা হিসাবে গণ্য হবে।

রমেন দাস

রূপবতী তমসা ঃ বৈতালিক ।। জ্যোতি প্রকাশন, ২।এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলি-৯। সাত টাকা।

বিষয় ঃ কবিতা

মোট প'য়তাল্লিশটি উজ্জ্বল কবিতার সংকলন গৌতম চৌধুরীর 'কলম্বাসের জাহাজ'। এই পদ্য গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৭৪-৭৬ সাল পর্যন্ত। গৌতম বয়সে তরুণ: সঠিক জানা যায়নি তিনি জীবনে প্রথম পদ্য কবে লিখেছেন, তবে সংকলনভুক্ত সময়ের চিহ্ন দেখা ধরা যায় চুয়াত্তর সালের প্রথমে। এত অল্প সময়ের মধ্যেই এই পদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করা রীতিমত বিপজ্জনক, এর বিপরীত ঘটনাও ঘটতে পারতো, তবে গৌতম ঝু'কি নিয়েছেন এবং জিতেছেন।

বাংলা কবিতা বিশেষভাবে পঞ্চাশ দশকের পর নানারকমভাবে নিজের পথ বদল করেছে—যার ফলশ্রুতি এই সত্তরের কবিতা, যে কবিতার সঙ্গে পূর্বসূরীদের কবিতার কোন মিল পাই না। তবু মাঝে মধ্যে অজ্ঞাতসারে দু'একজনের প্রভাব হয়তো পরিলক্ষিত হয়, সেটা প্রকৃতই অজ্ঞাতসারে। তাহলেও আমাদের সতর্ক থাকাই উচিত মনে হয়। গৌতমের কবিতা পড়তে পড়তে যা মনে আসে--তা মোটামুটি এরকম (১) গৌতম ছন্দে লিখলে আরো ভালো করবেন, কেননা গৌতম প্রচলিত ছন্দের কয়েকটি ধারা তার কবিতায় আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রথমেই মাথায় আসে—'দু'হাতে তার মাখন।তবুও ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়।এম্নি মরমযতন। (ফ্রীজ শট)'। 'যাবজ্জীবন বিমুখ কোরবে সে জন্যেই কি গন্ধিমোচন।খেলার মাঝ বরাবর তোমায় ফুসলে নিচ্ছে কোন ত্রিলোচন।' (প্রণয়গান)। 'সে' দীর্ঘ ছিন্ন কবিতার শেষ ৬ অংশে 'একদিন সকলেই একা কোরে দিয়ে চলে যাবে তাকে খুব—এই কথা জেনে তবুও সে বারবার একাকার হতে চায় জলাতঙ্কে সৌন্দর্যে শ্রীজ্ঞানে'। ইত্যাদি। ছন্দে কবিতা সত্তরের ছেলেরা কমই লেখে।

(২) শব্দ ও তার ব্যবহার পদ্যকারের জানা। কখনো সখনো দেখি বিদ্যুতের মত ঝলসে ওঠা পংক্তি। যেমন—'একটি সাদা ঘোড়া আচমকা ছুটে যায় সীমানার কাঁটাতার ছি'ড়ে।সে বোঝে শব্দের কাছে তার ঋণ ততখানি যত ঋণী থাকবে এই মূর্খ ইতিহাস—তাকে তুমি ভাঙ্গো। (এসো হাওয়া)।

(৩) টানা গদ্যে লেখা পদ্য গদ্য যে কটি সংকলনে আছে—তার মধ্যে 'সত্তর দশকের কবি'—১৮ থেকে ৩৫-এর প্রত্যেকেরই ভালো লাগবে। 'একটি বেসামরিক কবিতা' বেশ ভালো।

(৪) 'কলম্বাসের জাহাজ' পড়তে পড়তে মনে হয় এটি সিরিয়াস পদ্য সংকলন। কিন্তু যখন পড়ি—'ভেলিয়াম ফাইভ', 'চৌঠা ডিসেম্বর মুনিয়াকে' 'মুনিয়ার বান্ধবীর জন্যে ও দীর্ঘ কবিতা 'দেবী ও জলদস্যু' তখন গ্রন্থভুক্ত অন্যান্য কবিতার ওজন ও গাম্ভীর্য অনেকাংশে পাঠকের কাছে কমে যায়।

(৫) গৌতম নিজের জন্য চোদ্দ লাইন লিখেছেন, আসলে ওটা হবে১৪×২=২৮ লাইন জার্নাল ছিয়াত্তর (দুবার) পড়লেই ষাটএর দশকের পরিচিত অন্য এক কবির লেখন ভঙ্গীর গন্ধ পাই।

(৬) যে কবিতাটির নামে সংকলনটি—তার চিত্রকল্প বেশ সুন্দর। তবে গৌতম, বানান নিয়ে অভিযোগ আছে—করবো=কোরবো, ভেতরে=ভেতোরে, গেল=গ্যালো, করে=কোরে ইত্যাদি। বাংলা বানান অনেকে অনেকভাবে লেখেন, তবুও চোখ কান কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করে।

'কলম্বাসের জাহাজের' বেশির ভাগ কবিতাই সুখপাঠ্য। প্রথম কবিতাগ্রন্থ হিসাবে গৌতম পাঠককে মনস্কতায় ধরে রাখতে পেরেছেন, তরুণ কবির পক্ষে এটাই অনেকখানি।

অজয় সেন

এখনকার সমাজ ও জীবনযাপনের নানা অসঙ্গতিই কবিকে পীড়া দেয়। এবং তাঁর হাতে কবিতা হয়ে ওঠে।—এ বইয়ের অধিকাংশ কবিতা পড়ে সেটাই পাঠকের কাছে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবিতাগুলিতে ভাবপ্রকাশে সূক্ষ্মতার পাশাপাশি সহজ সরল ব্যাপারটা অনেক জায়গাতেই পাঠকদের আবিষ্ট করবে।

সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায়। সুধীরকুমার বসু। প্রকাশিকা—শ্রীমতী পুষ্প বসু। ১৫, ঘোষ লেন, কলকাতা। সাত টাকা।

গভীর মানুষিক কিছু ব্যাপার যেমন, ঠিক পাশাপাশি বাইরের প্রাকৃতিক বিপর্যয় কবির মনে ঝড় তোলে। তাঁকে ভয়ার্ত করে দেয়। অতি সামান্য অনুভবেও তাঁর হাড়-পাঁজর ঝনঝন করে ওঠে--তারই ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর এই বইয়ের অধিকাংশ কবিতাতেই। অনুভূতির সূক্ষ্ম তীব্রতা বড় বেশী স্পষ্ট। যেন সে কারণেই অধিকাংশ কবিতাই পাঠকের ভালো না লাগুক, কিছু পংক্তি অন্তত ভেতরে দাগ কেটে বসে যাবে।

এ শতাব্দী এ জীবনে। অজিত বসু। পরিবেশক—সাহিত্যশ্রী। ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

অমিয়বাবুর সব কবিতা ভালো লাগে না। কয়েকটি ভালোই লাগে। তাঁর ভাব বড়ই অতীতময় হওয়ার দরুণ বোধহয়। তাঁর গভীর বেদনার সরল প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রেই অশৈল্পিক মনে হলেও, সরলতার কারণেই তাঁর কিছু কবিতা পাঠককে ছুঁয়ে যাবে।

গৌতম ভট্টাচার্য

একালের শিলাপটে। অমিয় চট্টোপাধ্যায়। আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা-৯

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

বেদব্যাস বৈদ্য

বরকত-সুব্রতর রঙ বদলাচ্ছে

ইন্দিরা-আর্স সম্পর্ক কাটলেন সঞ্জয় গান্ধী। সঞ্জয় বিরোধীতায় কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীকে যখন কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, তখন তাঁর মা আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নন। কিন্তু যখন তিনি ক্ষমতাসীন ছিলেন, তখনও পশ্চিম বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ইন্দিরা-তনয় সঞ্জয় গান্ধীর কম বিরোধীতা করেন নি। সঞ্জয় কলকাতা এলে তাঁকে স্বাগত জানাতে মালা নিয়ে তিনি কখনও দমদম বিমানবন্দরে হাজির হতেন না। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সঞ্জয়ের নাক গলানোকে শ্রীরায় খোলা মনে মেনে নিতে পারেননি। এ নিয়ে সঞ্জয়-সখারা এবং দিল্লীর কিছু স্তাবক আমলা সিদ্ধার্থ বিরোধী জাল বুনে শ্রীমতী গান্ধীর মন ভাঙ্গাতে কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু তাতেও খুব একটা টলেননি। পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, সেই সুযোগ নিয়ে একদল সঞ্জয় সখা এ রাজ্যে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর দাবীতে দিনের পর দিন দিল্লী-অভিযান করেছেন। শুধু মাত্র সিদ্ধার্থশংকর নন, বহু নেতা শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীসহ বহু নেতাই তখন সঞ্জয় বিরোধীতায় প্রকাশ্যে মুখর হন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী তখন সঞ্জয় বিরোধীতাকে তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিরোধীতা বলেই গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য ক্ষমতাসীন হওয়ার পরও তিনি তাঁর সেই মানসিকতা ত্যাগ করেননি। বরং সঞ্জয় গান্ধীকে রাজনৈতিক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি আরও বেশী তৎপর। আর তার চূড়ান্ত অথচ বিলম্বিত ফলশ্রুতিই সাম্প্রতিক ইন্দিরা-আর্স সম্পর্ক।

পশ্চিম বাংলার ইন্দিরা কংগ্রেসের আহ্বায়ক কমিটি গড়ার গোড়া থেকেই সঞ্জয় বিরোধীতা প্রবল ছিল। সাত্তার-নুরুল-আনন্দ-গোবিন্দ আনসারিরা শ্রীমতী গান্ধীর মাঝে সঞ্জয় ট্যাবলেট গিলতে নারাজ ছিলেন। তা সত্ত্বেও সভাপতি বরকত সাহেব তাঁর কয়েক সহযোগীকে নিয়ে সঞ্জয়-সখাতায় মেতে ওঠেন। আর এই সখ্যতার সূত্র হিসাবে মধ্যমণি রূপে বরণ করে নেন এক অবাঙ্গালী তরুণ শিল্পপতিকে। এই শিল্পপতি অবশ্য সঞ্জয় গান্ধীর সুদিন এবং দুর্দিনের নীরব বন্ধু। এ রাজ্যে সাত্তার নুরুল আনন্দদের সম্মিলিত সাংগঠনিক শক্তি অবশ্যই অনেক বেশী। অতএব বরকত সাহেবরা রাজ্য রাজনীতিতে নিজেদের অস্তিত্ব ও প্রাধান্য রক্ষা করতে পুরামাত্রায় এখন তরুণ শিল্পপতির আশ্রয় এবং পরামর্শের মুখাপেক্ষী। শিল্পপতি ভদ্রলোক যতখানি রাজনীতি বোঝেন, তার চেয়ে অনেকে বেশী ভাল বোঝেন ব্যবসা-বাণিজ্য। অথচ নেপথ্যে বসে তিনিই এখন এ রাজ্যের ইন্দিরা কংগ্রেসের কলকাঠি নাড়ছেন।

জুনের শেষ সপ্তাহে রাজ্যের ইন্দিরা কংগ্রেস সঞ্জয় গান্ধীকে সামনে রেখে মহাকরণ অভিযান করেন। কিন্তু এই অভিযান শুরুর আগে তরুণ শিল্পপতির পরামর্শে বরকত সাহেব মহাকরণে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে তিনি একান্তে প্রতিশ্রুতি দেন, মহাকরণ অভিযানকালে তাঁরা কোন গণ্ডগোল করবেন না, সঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কেবল তাঁর হাতে একটি দাবীপত্র পেশ করবেন। মুখ্যমন্ত্রী একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক। ব্যক্তিগত জীবনে বিরোধী নেতারূপে তিনি বহু বড় বড় আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন; অতএব বরকত সাহেবের এই সাক্ষাৎকার এবং আগাম প্রতিশ্রুতির তাৎপর্য বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীও কলকাতায় কোন গণ্ডগোল চাইছিলেন না। তার মাত্র এক সপ্তাহ আগে এস ইউ সির বিরাট মিছিল এবং তার উপর পুলিশী আক্রমণের ঘটনার রেশ তখনও একদম মিলিয়ে যায়নি। অতএব তিনি যথারীতি বরকত সাহেবকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, আপনারা আসুন। আমিও আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব। সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ জানাতে এ ধরনের আগাম প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাস আদান-প্রদানের ঘটনা এ রাজ্যের কোনও বিরোধী নেতার নেতৃত্বে আর ঘটেছে বলে জানা যায়নি। ফলে বরকত সাহেবের এই আচরণে তাঁর বিপ্লবী চরিত্র সম্পর্কে তাঁর দলীয় নেতা এবং কর্মীদের মধ্যেই নানা সংশয় সন্দেহ দেখা দেয়।

নির্দিষ্ট দিনে যথারীতি মহাকরণ অভিযান শেষে বরকত-সুব্রত-হরিপদরা সঞ্জয় গান্ধীসহ যথাসময়ে মহাকরণে যান। মুখ্যমন্ত্রী সঞ্জয়কে তাঁর মার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। সঞ্জয়ও তাৎক্ষণিক উত্তরে মায়ের কুশল বার্তা জানান। বরকত সাহেবরা এই সুযোগে তাঁদের দাবীপত্র মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পেশ করেন। পরে সঞ্জয় গান্ধী তাঁদের দেওয়া দাবীপত্র প্রসঙ্গে কোন উচ্চবাক্য না করে, কেবলমাত্র মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর ব্যক্তিত্ব এবং ভদ্রোচিত আচরণের প্রশংসার কথা সাংবাদিকদের কাছে বিবৃত করেন। প্রসঙ্গত আরও একটা ঘটনা লক্ষণীয়। মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে যখন তাঁরা আলোচনারত, ঠিক সেই সময় রাজভবনের সামনে তাঁদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর কে বা কারা পাশের একটি বাড়ি থেকে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। শান্ত মিছিল, ফলে অশান্ত হয়। পুলিশ তখন তাদের বাগে আনতে লাঠি-কাঁদানে গ্যাস চালায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, পুলিশ যখন এই ব্যবস্থা নিচ্ছিল, তখন ডেকার্স লেনের মোড়ে দাঁড়িয়ে সেই তরুণ শিল্পপতি পুলিশকে লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস চালাতে বারণ করতে থাকেন। তার এই অভাবিত আচরণের রিপোর্ট পুলিশের খাতায় এখনও জ্বলজ্বল করছে। একাধিক পুলিশ অফিসারকে এই শিল্পপতির আচরণ-আবেদনে বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

বিশেষ।

নদীয়ার দাঙ্গা মোকাবিলায় সর্বদলীয় নেতাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু কৃষ্ণনগর সারকিট হাউসে এক বৈঠক করেন। দাঙ্গা পরিস্থিতির ব্যাপকতা বিবেচনা করে জনতা দলের নেতা শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, কংগ্রেসের শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী উপদ্রুত এলাকায় সেনা পাঠানোর সুপারিশ করেন। নানা যুক্তি দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ইন্দিরা কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক শ্রীসুব্রত মুখার্জী সভায় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষই সমর্থন করেন। অথচ তাঁর দলের জেলা নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীআনন্দগোপাল বিশ্বাস এবং তাঁর অনুগামীরাও ছিলেন সেনা তলবের সমর্থক।

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের একাংশের সাম্প্রতিক গতিবিধি এবং আচার-আচরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সঞ্জয় বন্ধু শিল্পপতি তাদের পরামর্শ দিয়েছেন, বামফ্রন্টের বিরোধীতা করে শক্তি ক্ষয় নয়। বরং জনতা দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে যে প্রশ্নে সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব, সেই সব ইস্যু নিয়ে রাজ্য ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলা। শ্রীমতী গান্ধীর সাম্প্রতিক নদীয়া সফরে সুব্যবস্থা এবং দার্জিলিঙের রাজভবনের অতিথিশালা তাঁর জন্য খুলে দিয়ে ফ্রন্ট সরকার যে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন, তার নেপথ্যে তরুণ এই শিল্পপতির অসাধারণ প্রয়াস বর্তমান। দার্জিলিঙের রাজভবনের অতিথিশালায় শ্রীমতী গান্ধী বরকত ও সুব্রতর সঙ্গে শলা পরামর্শ করেছেন। বরকত-সুব্রতদের সি পি আই (এম) ঘেঁষা রাজনীতি কৌশলগত কারণে শ্রীমতী কতখানি অনুমোদন করেছেন, খুব শীঘ্রই তার প্রকাশ ঘটবে। এবং তার উপরই নির্ভর করবে দলের পরবর্তী কর্মসূচী।

(২৯।৬।৭৯)

নতুন ব্যবস্থা ভাবতে হবে

শ্যাম মল্লিক

অনেকে এখন প্রশ্ন করছেন—চাপড়ার হাংগামা কি ঠেকানো যেত না? পুলিশ একটু সতর্ক থাকলে ৩২ জন মারা যেত না। ছ-সাতশো বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যেত না, আর তিন হাজার ভীত সন্ত্রস্ত নরনারীকেও কুষ্টিয়াতে পালিয়ে যেতে হত না। অনেক দিন ধরেই চাপড়াতে গণ্ডগোল চলছে। গত এক মাসের মধ্যে একটা-আধটা নয় ৪০টা ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডাকাতিগুলো যে ভাবে হচ্ছিল তা থেকে পুলিশ বা জেলা কর্তৃপক্ষের ধারণা করে নেওয়া উচিত ছিল যে এর ভিতর দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

চাপড়ার কাছেই বি এস এফের অর্থাৎ সামান্ত রক্ষী বাহিনীর একটা এফের অর্থাৎ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর একটা শক্ত ঘাঁটি আছে। সেখান থেকে জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে টপ সিক্রেট রিপোর্ট পাঠিয়ে বলা হয়েছিল যেভাবে গণ্ডগোল হচ্ছে তাতে যে কোন সময় ওখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেধে যেতে পারে। ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ থেকেও মহাকরণে অনুরূপ রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার ঐ রিপোর্টগুলোর কোন গুরুত্ব দেওয়া হল না। অন্য আর একটা রিপোর্টে পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল যে, দুটো দলই চাপড়াতে তাদের আধিপত্য বিস্তারে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুরু করেছে। নতুন জেলাশাসক মাত্র দু মাস আগে কার্যভার গ্রহণ করেছেন। যেদিন থেকে গণ্ডগোল শুরু হয় সেদিন পুলিশ সুপার ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দেন। এ দুজনের কথা নয় বাদ দিলাম আরো তাবড় তাবড় অফিসাররা কি করছিলেন। নদীয়া একটা সেনসিটিভ সীমান্ত জেলা। পাশেই বাংলাদেশ। ওপার থেকে এপারে এসে গরু চুরি, অনুপ্রবেশ লেগেই আছে। সুতরাং এই জেলাকর্তৃপক্ষের সর্বদিকে সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। জেলাশাসক বললেন সবে মাত্র এসেছি। এখনও পর্যন্ত এই জেলার ভৌগোলিক সীমানা বুঝে উঠতে পারিনি। পুলিশ সুপার বললেন, সবে মাত্র কাজে যোগ দিয়েছি তাই একটা গ্রামে আগুন লাগানো হয়। মাত্র এক মাস ধরে ছোট বড় অনেক গণ্ডগোল হল কিন্তু তার রাজনৈতিক মোকাবিলার জন্যও কোন দলকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় নি। দু পক্ষের বহু লোক অভিযোগ করেছেন কোন কোন পঞ্চায়েত সদস্য বাড়ি-বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। কয়েক দিন বাড়িতে আগুন লাগানোর ঘটনা রাত্রিতে ঘটছিল। ২০ জুন থেকে দিনের বেলায় শুরু হল তাণ্ডব। ২২ জুন চাপড়া থেকে ৬ মাইল পশ্চিমে সকাল ৯টায় কল্যাণডিহি নামে একএা গ্রামে আগুন লাগানো হয়। মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে একশোটা বাড়ি পুড়ে ছাই। এইভাবে ১৪টা গ্রামে প্রায় সাতশো বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কল্যাণডিহিতে যে আগুন লাগানো হল তার তিন-চার দিন আগে স্থানীয় অধিবাসীরা বিভিন্ন গোলমেলে পকেটে পুলিশ পিকেট বসাবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। থানার বড়বাবু বা মেজবাবুর সেই ছেঁদো কথা। ফোর্স-টোর্স নেই। রিকুইজিশন করা হয়েছে এখনও এসে পৌঁছায় নাই। বেচারী গ্রামবাসীরা। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে গোয়ালভাঙ্গা গ্রামের। ঐ একটা গ্রামেই প্রায় তিনশো বাড়ি পুড়েছে। দেখা গেছে ঘটনা ঘটার দু-তিন ঘন্টা বাদে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে। বল্লাভাঙ্গা গ্রামের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। সকাল ৯টার সময় জেলাশাসকের কাছে একটা 'ফ্ল্যাস' এল যে একদল সশস্ত্র লোক পুলিশ পার্টির বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে নিয়েছে। বন্দুক উদ্ধার করতে আর একদল পুলিশ যখন ঐ গ্রামে গিয়ে পৌঁছোলো তখন বেলা প্রায় ১২টা। ততক্ষণে ঐ বন্দুকগুলো হয়তো বাংলাদেশে পাচার হয়ে যেত। যাই হোক দেরিতে হলেও পুলিশ শেষ পর্যন্ত বন্দুকগুলো উদ্ধার করেছে। ছোট বল্লাডাঙ্গা, বড় বল্লাডাঙ্গা, কাঠগোড়া এবং লাখিমপাড়া গ্রামেও ব্যাপক হাঙ্গামা হয়েছে।

ঘটনা যেদিন ভয়াবহভাবে ঘটলো। তখন সেই ট্র্যাডিশন। মন্ত্রীরা ছুটলেন, ছুটলেন পুলিশের বড় কর্তারা। দিল্লিতে গেল ফোন ও এস ও এস। পুলিশ চাই আরো। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীকেও ছুটতে হল। ১৪৪ ধারা জারি হল। পুলিশ পিকেট বসলো। জারি হল কার্ফু। ইনটেনসিভ পুলিশ পেট্রোলিং, বেতার ভ্যান, রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড। সে এক বিরাট ব্যাপার। আমাদের সবটাই চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ার মত। চারিদিকে সাজ সাজ রব। কৃষ্ণনগর আর মহাকরণে হটলাইনে ঘন্টায় ঘন্টায় খবর, তাজা খবর। চীফ সেক্রেটারী হোম সেক্রেটারী সব তটস্থ। সবার চোখে তখন উদ্বেগের ছাপ। এসবের পর অবস্থা যখন শান্ত হল তখন সেই পরিচিত শব্দগুলোর সমারোহ। সিচুয়েশন আণ্ডার কন্ট্রোল, নরম্যাল, পিসফুল। কিসের পর না, ৩২টা প্রাণহানি, সাতশো বাড়ি পুড়ে ছাই, আহত একরাশ মানুষ। হাজার হাজার লোক ছিন্নমূল হবার পর।

উপদ্রুত অঞ্চলে গিয়ে অনেক অভিযোগ শুনেছি। যেমন সময় মত পুলিশ এলে এই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটত না, গোড়া থেকে বি এস এফকে ডাকা হলে অবস্থার অবনতি ঘটতো না। সময় মত কার্ফু জারি করা হলে কৃষ্ণনগরে কোন হাঙ্গামাই ঘটতো না। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের নীতি এ ব্যাপারে খুব পরিষ্কার। সাম্প্রদায়িক হাংগামাকে এঁরা কোন দিন প্রশ্রয় দেন নি, দেবেনও না। চাপড়ার পরিস্থিতির অবনতির সংবাদ মহাকরণে পৌঁছতেই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু চীফ সেক্রেটারী, হোম সেক্রেটারী এবং অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে বসে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন, দুষ্কৃতকারীদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ পাঠান। ভারতের বহু রাজ্যে সম্প্রতিকালে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেছে। সেদিক থেকে গত ১৫ বছর পশ্চিমবঙ্গ ছিল নিষ্কলঙ্ক। গত বছর মাইনরিটি কমিশনও এ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের প্রশংসা করে গেছেন। চাপড়ার পরিস্থিতির যেদিন অবনতি ঘটে তার আগের দিন নয়াদিল্লিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপারে একটা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে রাজ্যের বিচারমন্ত্রী শ্রী হালিম বলেছিলেন, সাম্প্রদায়িকতা বলতে পশ্চিমবঙ্গে কিছু নেই, এজন্য আমরা গর্বিত।

যাই হোক চাপড়ার ওপর একটু সজাগ দৃষ্টি রাখা হলে এই গর্ব ভেঙ্গে যেত না। চাপড়ার ঘটনা থেকে এই সরকারকে নতুন করে শিক্ষা নিতে হবে। আর একটা আশ্চর্যের ব্যাপার তিন হাজার ভারতীয় নরনারীকে কেন বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় যেতে দেওয়া হল। সীমান্তে কি কোন প্রহরা ছিল না? জেলা কর্তৃপক্ষের একথা জানা উচিত ছিল যে বাংলাদেশ এ নিয়ে জল ঘোলা করবেই। ঠিক তাই হল। ওখানে গেল তিন হাজার লোক। বাংলাদেশ সরকার বললেন, ৩২ হাজার। বিভিন্ন ঘটনায় মৃত্যু ঘটলো ৩২ জনের ওরা বললেন, ৫০০। তারপর কুষ্টিয়াতে একটা ক্যাম্পে আটকে রাখা হল ১৫০০ ভারতীয় নারী ও শিশুকে।

কয়েকটা ডাকাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। আমি আগেই বলেছি নদীয়া একটা সেনসিটিভ জেলা। ঠাণ্ডা তো ঠাণ্ডা একবার আগুন জ্বললে রক্ষে নেই। ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে এই জেলা জ্বলে উঠেছিল।

যাই হোক নতুন করে এই সাম্প্রদায়িক শক্তির মাথা চাড়া দেওয়ার ব্যাপারটা খুব শুভ লক্ষণ নয়। দাঙ্গায় অংশ গ্রহণকারী দুষ্কৃতকারীদের সরকারকে কঠোরভাবে সাজা দিতে হবে। যে সব এলিমেন্ট এখনও আন-আইডেন্টিফায়েড তাদের খুঁজে বের করতে হবে। চিরাচরিত সেই ইনটেলিজেন্সের বদলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংক্রান্ত ব্যাপারে পূর্বাভাষ দেবার জন্য নতুন মেসিনারীর দরকার। এই ব্যাপারটা সরকার একটু ভেবে দেখুন না। যদি কোন গ্রামে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয় তাহলে পাঁচ বছরের জন্য ঐ গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ রাখা হবে —এই হুঁশিয়ারীটা দেওয়া যায় কিনা। পিটুনি কর ইত্যাদি অনেক কথা শুনেছি মা ফলেষু কদাচ। তাই বলছি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা রোধে নতুন একটা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সরকারকে আজই ভাবতে হবে।

শবযাত্রা

রাজকমল চৌধুরী

ঘরবাড়ীর জানলা দিয়ে যখন সন্ধ্যা নামে, মনে হয়, ধীরে ধীরে অচিরেই অন্ধকার আরো গাঢ় হবে—তখন বাড়ীতে বসে থাকতে ইচ্ছে হয় না। সমস্ত দিন তো ঘরেই কেটে গেল। কাপড়-চোপড় ধোয়াধুয়ি করতে, ইস্ত্রি করতে—পাশের ঘরে নন্দিতা বৌদির সঙ্গে গল্পগুজবে এবং রেডিও শুনে। রেডিওটা লোকাল সেট, সুতরাং একটা স্টেশনই বাজে—কলকাতা। কিন্তু উমারাণীর বাংলা গান ভাল লাগে না। ভাল লাগে না এর মিষ্টতা—পছন্দ হয় না এর স্বরের কোমলতা হাল্কা চড়াই উতরাই আর শিরায় প্রেমের অনুরণন! যা ভাল লাগে তাকে পাবার উপায় নেই। উপায় নেই এজন্য যে, সুকুমার মাত্র সত্তর টাকা পায়। ও ম্যাট্রিক ফেল। বারবার পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারে নি। এখন বছর কয়েক ধরে একটা অফিসের পিওন। চল্লিশ টাকায় কাজে ঢুকেছিল—এখন সত্তর হয়েছে।

আর সত্তর টাকা হওয়ার পরই বেহালা ক্যাম্পের উমারাণীকে বিয়ে করে ঘরে এনে তুলেছে ও। অবিশ্যি, ঘর নিজের নয়—ভাড়ার। শঙ্কর দাস গলির গোয়ালাদের খাটালের পেছনে একসার অনেকগুলো ঘরের একটা ওর। পনেরটা ঘর। বড় কামরার ভাড়া তিরিশ টাকা। সুকুমার বারো টাকার ছোট কামরা নিয়েছে। বিজলীবাতি নেই। সামনে জলের কল আর পেছনে ভাঙা দেওয়ালের বাথরুম। বর্ষায় নালি নর্দমার জলে গলিটা ভরে ওঠে। ঘরের মেঝে ভিজে ওঠে। সুকুমার কোত্থেকে যেন একটা রেডিও নিয়ে এসেছে এবং উমারাণী তাতে খুসীই হয়েছে। লোকাল সেট—ব্যাটারীর। নতুন ব্যাটারী কেনার পয়সা প্রায়ই থাকে না।

প্রায়ই সুকুমার দেরী করে বাড়ী ফেরে। মদ খেয়ে এলে রাত্রে কিছু খায় না। চুপচাপ শুয়ে পড়ে। চেঁচামেচি করে না। মদ খেলে ও আরো চুপচাপ, কেমন যেন ভয়ে সড়োসড়ো হয়ে যায়। উমারাণীর আপত্তি কিন্তু মদে নয় ওর ঐ নিস্তব্ধতায়। ও যেন ঝড় তুফান চায়। যেমন ঝড়ঝাপটা বেহালা ক্যাম্পে আসত। পুলিশের গাড়ী আসত আর নরসিং পানবালাকে দোকান থেকেই তুলে নিয়ে যেত। সকলেই জানত নরসিং পান বেচে না-বেচে চোরা চালানের মদ—শরাব! আর রাত একটু বেশী হলেই শ্রীপতি কুমারের বাড়ীতে যেন প্রলয় শুরু হত। কখনও কখনও ট্যাকসী করে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে বাবুরাও আসত। আসত এবং রাতভোর আটার মত জমে যেত! কেবল শ্রীপতি কুমারই নয়, বেহালা ক্যাম্পের সবচেয়ে বদনামী জায়গা ছিল নীলিমা মাসীর ঝুপড়ি। ঝুপড়ি, কুঁড়ে ঘর নয়—ইঁটের প্রাচীন বাড়ী। বাড়ীটাতে বেশ খাসা তিন চারটে ছোট ছোট ঘর ছিল। প্রত্যেক ঘরে রিফিউজী স্ত্রীলোকেরা বাস করত। সঙ্গে ওদের কাচ্চা বাচ্চা। কখনো কখন কোন স্ত্রীলোকের স্বামীও হঠাৎ চলে আসত।

এজন্যই বিকেলের পর ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে হয় না। উমারাণী বাকস থেকে তেলের শিশি ও চিরুণী বার করে। মার-কোল তেল দিয়ে কেশ বিন্যাস করল। গায়ে পাউডার, সিঁথের সিঁদুর, কপালে সিঁদুরের টিপ পরল। মেজাজ শরীফ থাকলে চোখে কাজলও পরে। ঘরে তালা লাগিয়ে, চাবি প্রতিবেশীর কাছে দিয়ে বলে : বেহালা যাচ্ছি। সুকুমার এলে বলে দিও আমার দিদি এসেছিল। ওর সঙ্গেই গেছি।

নন্দিতা বৌদি উমার এরকম নির্জলা মিথ্যে শুনে মুচকি হাসল। ওর জন্যও উমাকে মাঝে মাঝে এরকম মিথ্যে বলতে হয়। এরকমই কোন মিথ্যে কথা। এরকম ছোটখাটো কারণে মিথ্যে কথা। মিথ্যের বেসাতি চলেই। না চলে উপায় নেই। উপায়ও নেই—জীবনে ক্ষণিকের মিষ্টতার স্বাদ নেই।

এই মিষ্টত্ব হল মিথ্যে কথা বলা। মিষ্টি হল বেহালা ক্যাম্পের চাঁদতারার বেশ ছোট্ট ঘরটি। চাঁদতারা নীলিমা মাসীর ঘরে ভাড়া থাকে। একেবারে একলা। মাথার সিঁথিতে সিঁদুরের মোটা দাগ—কিন্তু নিঃসন্তান এবং অন্ধকারে শয্যাসঙ্গ দেবার মত কোন পতিদেবতাও নেই। কখনও ছিল কিনা কেউ জানেও না। একদিন ছোট্ট একটা টিনের সুটকেশ নিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে নীলিমা মাসীর কাছে এসে উঠেছিল। বন্ধু ওকে পৌঁছে দিয়ে অদৃশ্য হল—তারপর থেকে আজও ওকে কেউ দেখেনি। নীলিমা মাসী কিংবা আর কেউ কখনও জিজ্ঞাসা করেনি: ও কেন আর ফিরে এল না কিংবা মাঝে মধ্যে খোঁজ নিতে আসে না কেন। মনে হয়, এরকম জায়গা থেকে কেউ একবার গেলে দ্বিতীয়বার আর পা রাখে না!

আমাদের সমাজজীবন ছোট-বড় নানান অংশে বিভক্ত। এরকমই একটা অংশ বেহালা ক্যাম্প। রেলওয়ে লাইনের নীচে ছোট একটা বস্তী। এরকম বস্তীতে ভদ্রলোক কেউ থাকে না—থাকে ছোট-লোকেরা। গরীবেরা। ঠেলায় মাল বওয়া কুলি। বাস স্টপে খামোখা দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ের দল। ভিখিরীদের জমজমাট আড্ডা। নোংরার স্তূপ: নালি নর্দমায় কিলবিল করছে কীট। চতুর্দিকে কাদা-পাঁকে ভরা খন্দ, খাল বিল ডোবা। আর তাতে মরা কুকুরের পচে ফুলে ওঠা লাশ। কুকুরের মড়া।

এধরণের বস্তীতে ভদ্রলোকেরা থাকে না—কিন্তু কোথাও ঠাঁই না হলে চলে আসে এখানেই। চলে আসে এবং রাতের অন্ধকার কেটে গেলে চলেও যায়। যেমন উমারাণী মা আর দিদিকে নিয়ে বেহালা ক্যাম্পে এসেছিল এবং সুকুমারের হাত ধরে ফিরে গিয়েছিল। মা অসুস্থ হয়ে

বাঁচল। দিদি মরেনি এখনও ওখানেই
। দিদি এবং তার চার-পাঁচ ছেলেমেয়ে।
ছেলে কোন চায়ের দোকানের চাকর।
বাচচারা ছোট। উমারাণী শংকর দাস
দিয়ে এলেও দিদির কাছে যায় না।
ণ চাঁদতারার কাছে চলে আসে। দিদির
ওর ঘৃণা হয়—অকারণ ঘৃণা।

ঘৃণার তেমন বিশেষ কোন কারণ নেই।
রাণী যখন ওর সঙ্গে থাকত তখন
। ওকে কোনরকম দুঃখ-কষ্ট দেয়নি।
ন নালিশ নেই। শাপ-শাপান্তিও নেই।
ভালবাসাও নেই। আর যখন উমারাণী
কুমারের সঙ্গে চলে যেতে চাইল তখনও
দ কোন আপত্তি করেনি—বাধা দেয়নি।
ন অভিযোগও না। শুধু বলেছিল:

—শংকর দাস লোক খুব দূরে নয়।
নই ইচ্ছে হবে চলে আসিস।

এখন দিদি জানে, উমারাণী হামেসাই
হালা ক্যাম্পে এক বন্ধুর কাছে যায়।
দু দিদি নিজের কোন ছেলেমেয়েকে
তারার কাছে কোন খোঁজ-খবর নিতে
ঠায় না। না। কোন অভিযোগ নেই।

উমারাণীর দিদি ইদানিং যেন পাথর
হ গেছে। বাচচরা কাঁদতেই থাকে। কোন
য়াল নেই। পনের বছরের বড় ছেলে মুখে
দর দুর্গন্ধ এবং পকেটে বিড়ির বান্ডিল
য়ে বাড়ি ফেরে। আট বছরের একটা
য়ে মায়ের দয়ায় মারা গেছে। কিন্তু
দি তবু পাথর।

বেহালা ক্যাম্প থেকে মাইল দুয়েক
রে আলিপুরে একটা বাড়িতে বাসন
জার কাজ করতে যায় ওর দিদি। সকাল
ধ্যায় এঁটো উদ্বৃত্ত খাবার-দাবার নিয়ে
াসে। ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়চোপড় যা দেয়
রা নিয়ে আসে। পুরো মাস কাজ করার
র পঁচিশ টাকা। এবং চার-পাঁচটা ছেলে-
য়ে। পনের বছরের বড় ছেলেটা। সংসারে
কউ এক পয়সা দিয়েও সাহায্য করে না।
বু উমারাণী দিদির কাছে যায় না। কেন
খোঁজ-খবর নেয় না। এসবের কারণ আর
কিছুই নয় ঘৃণা। আর ঘৃণারও কোন
কারণ নেই।

ঘৃণার কোন কারণ নেই উমারাণী
নজের ইচ্ছায় প্রথমবার চাঁদতারার ঘরে
গিয়েছিল। দিদি জানত উমা ওখানেই
যাচ্ছে। দিদি আরও জানে বেহালা ক্যাম্পে
প্রত্যেক মেয়েই প্রথমে ওখানে যায়। নীলিমা
মাসীর ঘরে। কামরা চাঁদতারার হোক
অথবা অন্য কারুর তাতে কিছু যায় আসে
না। কিন্তু দিদি বারণ করেনি। মা মরে
বেঁচেছে আর দিদিও ওকে বারণ করেনি।
উমা নিজেও নিজেকে কখনও বারণ করেনি
যদিও ও যথেষ্ট সমঝদার ছিল। জানত
যে, চোদ্দ-পনের বছর সমঝদারীর পক্ষে
কিছু কম বয়েস নয়। আর আজকাল তো
মেয়েরা মায়ের পেট থেকে পাখনা নিয়েই
জন্মায়। আর উমারাণী তো বেহালা
ক্যাম্পের মেয়ে। অন্ধকারের সবরকম

অত্যন্ত বেপরোয়া ও অসংযমী জীবন ছিল রাজকমল চৌধুরীর। জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য এবং সাহিত্যে তেমনই একটা কিছু সৃষ্টি করার জন্য যে কোন শাস্ত্রবিরোধী নীতিবিরোধী কাজ করতে তিনি পিছপা হতেন না। তাই হয়ত ছিলেন দিল-দরিয়া। অত্যধিক মদ্যপান, নারী এবং নেশায় আসক্তিজনিত উচ্ছৃংখল জীবন তাঁকে অল্পায়ুর পথে টেনে নিয়ে গেছে। তবু যে কটি রচনা তিনি সৃষ্টি করে গেছেন হিন্দী মৈথিলী সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে অবিসম্বাদিতভাবে তা স্বীকৃত—অভিনন্দিত। 'শবযাত্রা' ছোট-গল্পটি পঁচিশটি শ্রেষ্ঠ হিন্দী গল্পের মধ্যে অন্যতম। (জন্ম ১৯২৯। মৃত্যু ১৯৬৭)

চেহারা ও চিনত, জানত। নোংরামীর সব
গন্ধ ও বুঝত।

বিকেল হলেই ক্যাম্পের মেয়েরা
রিকসায় চেপে কোথায় যেত? নিরখু
পান্ডেকে বস্তীর সবাই কেন এত ভয়
করে? রেশন দোকানের মালিক লালাজী
প্রতিদিন সকালে কেন সুরমা দেবীর বাড়ি
যায়? পুলিশ গাড়ি কেন আসে? সীতা
রেল লাইনে থেঁতলে মরল কেন?

এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর উমারাণী
জানত। তবুও সেদিন লালাজীর দোকানে
ওর সঙ্গে চাঁদতারার দেখা হয়েছিল এবং
কথাবার্তা হয়েছিল। সেদিনই ও ঠিক করে
নিয়েছিল যে নীলিমা মাসীর বাড়ি ও
নিশ্চয়ই যাবে। চাঁদতারার সঙ্গে দেখা
করতে যাবে।

ও দেখা করতে গিয়েছিল। দিদির
দেওয়া চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী পরে রাত
প্রায় সাত-আটটার সময় চাঁদতারার ঘরে
গিয়েছিল একদম একলা। চাঁদতারাও একলা
ছিল এবং মেঝের বিছানার ওপর বসেছিল।
সিগারেটের একটা খালি টিনে টাকা সু
টাকা ও খুচরো পয়সা গুণছিল। খুচরো-
গুলো সব এক জায়গায়। লালাজীর

দোকান ছাড়া একসঙ্গে এতগুলো পয়সা
উমারাণী এর আগে কখনও দেখেনি।
পঞ্চাশ টাকার বেশীই হবে হয়ত। চাঁদতারা
মুচকি হাসল। মাথা তুলে বলল, এসো
বোস। পয়সা গুণছি। গুনে তোমায় চা
খাওয়াব।

পয়সাকড়ি গুনে গুছিয়ে ঐ টিনে
রেখে দিয়ে উমাকে বলল, তুমি এক
মিনিটের জন্য ঘরের বাইরে থেকে ঘুরে
এসো।

পয়সাগুলো লুকিয়ে রাখব। কিছু
মনে কোর না রাণী এটাই আমার সম্বল।
হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে বেঘোরে
মারা পড়ব।

উমারাণীর খারাপ লাগেনি কথাগুলো—
কিছু মনেও করেনি। টাকা পয়সার
ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।
কার মনে কি আছে কে বলতে পারে। আর
সত্যি বলতে কি সে তো নিজেও চোর।
দিদির অনেক পয়সা চুরি করেছে। বেশী
নয় অবিশ্যি—একআনা কি বড় জোর
দুআনা। চানাচুর কোচকা কিনে খেয়েছে।
পকোড়া খেয়েছে। কখন কখন কাঁচি
সিগ্রেট খেয়েছে।

উমারাণী বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে
রইল—আর চাঁদতারাও অন্ধকারে লুকিয়ে
রাখল টাকা-পয়সার টিনটা।

চাঁদতারার পাশের কামরাটা হল রাম-
দুলাল মাঝির। রামদুলাল মাঝি আগে
মাছ বেচত। এখন অসুখে পড়ে আছে।
আর নিজের দুটি মেয়ের মধ্যে মারপিট
লাগিয়ে দিয়ে মাঝে মধ্যে মজা উপভোগ
করে। অসুস্থ লোক আর কি করে? জুরে
দুটোই নতুন আগন্তুকদের উৎপাত সহ্য
করে, খেস্তাখিস্তি করে, মাঝে মাঝে
মারপিট লাগিয়ে দেয়। এই হল বেহালা
ক্যাম্পের জীবন। ওরা সবই মানিয়ে
নিয়েছে।

কুৎসিত কুরূপা মেয়েদের কে বিয়ে
করবে। বয়েস বিশ-পঁচিশ হবে হয়ত
কিন্তু এরই মধ্যে বুড়িয়ে গেছে। দেহে
সের-দুসের মাংসও নেই যে কাবাব করা
যেতে পারে। কিন্তু তবু ওরা কাবাব
হয়ে যায়। উমারাণী উঁকি মেরে দেখল,
রামদুলাল মেঝেয় শুয়ে আছে আর শান্তি
এবং মান্তি নিরখু পান্ডের সঙ্গে ফিসফাস
কথা বলছে।

নিরখু পান্ডেকে দেখেই উমার রক্ত
যেন শুকিয়ে গেল। এবং প্রায় একলাফে
চাঁদতারার ঘরে ঢুকে পড়ল। চাঁদ বলল,
তুমি এখানে বোস। চৌমাথার দোকান
থেকে দু গ্লাস চা আনছি।

—না...না। আমি একলা বসব না।
তোমার সঙ্গে যাব।

—না রাণী। তুমি এখানেই বোস।
সন্ধ্যার সময়। ঘর বন্ধ করে যাব না। কেউ
এসে গেলে খালি হাতে তাকে ফিরে যেতে
হবে। তুমি বোস না। আমি এই গেলাম
আর এই এলাম। কেউ এলে ভয় পেও
না। বসেই থেক...

চাঁদতারা মাথায় ঘোমটা টেনে কোন থেকে দুটো কাচের গ্লাস নিয়ে বাইরে বেরুতে যাবে এমন সময় উমারানী মিনতি করে বলল আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল না। ওপরের ঘরে পাণ্ডেজী বসে আছে যে...যদি এদিকে চলে আসে?

—আসে তো কি হবে। চাঁদতারা হাসতে লাগল। বলল, ওর তো রাঙ্গা-মুলোর মত চেহারাই সার—আর কি আছে ওর। ওকে তো স্রেফ পুরুষেরাই ভয় পায়—মেয়েছেলেরা ভয় পাবে কেন? আমি গত ছ মাস ধরে এখানে আছি কিন্তু শালা একবারও এদিকে আসেনি। হাসতে হাসতে বাইরে বেরিয়ে গেল চাঁদতারা।

উমারানী চুপচাপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। দরজার ফ্রেমে আটকান একটা ছবি যেন। অন্ধকার চতুর্দিকে। অন্ধকার এবং বাধা। হাসাহাসি করছে। দূরে কারুর বাচ্চা চীৎকার করে কাঁদছে। যদি এ সময় মিরথু পাণ্ডে চলে আসে তো...যদি কোন নতুন অচেনা লোক চলে আসে তো...উমা ভাই, ছোট্ট এ ঘরটায় পায়চারি করতে লাগল। কোথাও কোন জানলা নেই। ছাদের নরগায় একটা লণ্ঠন ঝুলছে। তেল কম তায় ছোট লণ্ঠন। আলো অত্যন্ত কম। প্রত্যেকটা জিনিষই কেমন যেন হলদে হলদে দেখচাছ। দেওয়ালের একপাশে রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের ছবি। রামকৃষ্ণ যেন মৃদু মৃদু হাস-ছেন। পরমহংসের সামনে ভগবতী দেবীর কোন ছবি নেই: চাঁদ-তারার ঘর আছে--আর সেই ঘরে উমারানী আছে। পনের ষোল বছরের উমা। যে উমা জানে, এ ঘরে অচেনা অজানা লোকই বেশী আসে। আরো অনেক কিছু জানে ও।

হঠাৎ বারো তের বছরের একটা মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির। কাঁদছে। চেঁচাচ্ছে এবং ঐ অবস্থাতেই ঘরে ঢুকে পড়ল। উমাকে দেখে একটু থামল যেন, পরে বলল : মা মরে গেছে। আমার মা মরে গেছে। বাবা কাঁদছে। তারাচাচীকে ডাকছে...

উমা এই মেয়েটাকে চেনে—জানে। বাস স্টপে ভিক্ষে করে। নাম বোধহয় মিনু। মিনুর মাও এখানে—এই বাড়ীতে থাকে। খুব বদনাম আছে ওর। তাছাড়া খুব সস্তা মেয়েছেলে। ওর স্বামীও ঐ রকম। দুশো টাকায় বড় মেয়েটাকে বেচে দিয়েছে—হয়ত দু-একশতে মিনুকেও বেচবে।

মিনু অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদল কিন্তু চাঁদতারা এল না। প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে হয়ত। কিছু-ক্ষণ পর মিনু চলে গেল। উমারানী আবার একলা হয়ে গেল। এরপর আরো এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পর একটা নতুন, অচেনা লোক এল। সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরণে। মুখে সিগারেট। দোহারা চেহারা। হাতের কব্জীতে চকচকে ঘড়ি। আঙ্গুলে আংটি নেই। সোনার বোতাম নেই। পায়ের চটি পুরনো। চেহারাটাও পুরনো। চোখে আশা নেই—নেই উল্লাস। উদাসীও নয়। সবই যেন 'ঠিক আছে' এমন ভাব।

দরজার কোণে চটি ছেড়ে চেয়ারে বসল লোকটা। উমারানীও বসেছিল—উঠে দাঁড়াল। ও বলল : বোস...বোস। দাঁড়াচ্ছ কেন? বসে পড়। তোমার নাম তো উমা-রাণী? না? চৌরাস্তায় চাঁদতারার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ও আসছে। পান-টান নিতে আটকে গেছে হয়ত!

লোকটার চোখেমুখে নবাগতের কোন লক্ষণ নেই। বরং আত্মীয়তার হাবভাব। উমারানীর ভয় ভেঙ্গে গেল। বলল : মিনুর মা মরে গেছে।

—কি! পেছনের ঘরের মিনুর মা? ওর তো মরাই দরকার ছিল। কোন অসুখ ছিল না ওর? ভালই হল মুক্তি পেয়ে গেল। খুব ভাল হয়েছে। ও আবার একটা সিগ-রেট ধরাল। বলল : উমারানী এক গেলাস জল খাওয়াও। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কিন্তু চাঁদতারা এল না। হয়ত ওদিক থেকেই মিনুর কাছে চলে গেছে। মিনুর মা মরে গেছে—তাই হয়ত দেরী করে ফিরবে। এমন কোন অসুখ নেই যা ওর ছিল না। মরে গেছে ভাল হয়েছে। কয়েক বছর পরে মিনুও মরে যাবে। চাঁদতারাও মরবে। দিদিও মরবে। সবাই মরবে। কেবল আমি মরব না। কেবল আমি না...কেবল আমি...

বেহালা ক্যাম্প এবং শঙ্কর দাস লেনে অনেকগুলো রাস্তা এসে মেলামেশা করে। উমারানী এদেরই মধ্যেকার একটা সড়ক। একটা গলি আছে যার কোন আদি অন্ত নেই। কোথাও বিশ্রাম নেই—যেমন, একটা নদী। বহতা নদী—যে নদী চুপচাপ আপন-মনে চুপচাপ বয়ে চলে।

উমারানী রেলওয়ে পুলের কাছে নেমে গেল। এবং রেল লাইন ধরে এগুতে থাকল। নিচে নেমে গেল একবার। সামনেই বেহালা ক্যাম্পের বড় বস্তী। বস্তীর বাইরের ময়-দানে কোন এক সার্কাস কোম্পানী তাঁবু ফেলেছে। বড় বড় পোস্টার চতুর্দিকে। লাউড স্পীকারে ফিল্মের গান বাজছে। চৌরাস্তার দোকানগুলোর ভীড়। চায়ের দোকানে কর্মহীন যুবকদের কচকচানি।

কিষণদাসও [illegible] সঙ্গে [illegible] এল। বলে : চন্দু তোমার ওপর খুব রেগে আছে। তুমি ওর ছোটভাইকে কেন থাকতে দাও। সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে। অবুঝ। কেন ওকে নষ্ট করছ? চন্দু খুব রেগে আছে!

—রেগে আছে তো আমার কি? কি করবে ও আমার? উমা পথ চলতে চলতেই বলে : বিন্দুকে আমি ডেকে আনি নাকি! চাঁদতারার কাছে আপনি আসে। আমিও যাই। নষ্ট হবে তো আমার কি। চন্দু রাগলে বোল ও যেন আমার সামনে আসে। বেহালা ক্যাম্পের মেয়ে আমি নই যে, ভয় পেয়ে যাব।

কিষণদাস ফিরে গেল। উমারানী একাই রাস্তা পার করল। নীলিমা মাসীর বাড়ীর আগে একটা চৌরাস্তা আছে। ওখানে একটা 'চা-খানা' আছে। পান-বিড়ির দোকান দুটো। একটা সেলুন।

রঞ্জন সেলুনে বসে শির মালিশ করাচ্ছিল। আর উমার জন্য অপেক্ষা কর-ছিল। উমারানী সেলুনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল কিন্তু থামল না। এগিয়ে গেল। সেলুনবালা রঞ্জনকে বলল : দিল্লী মেল এসে গেছে রঞ্জন ভাই। এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রঞ্জনের মাথায় চিরুনী বোলাতে লাগল।

উমারানী অন্ধকারেই পা চালিয়ে চাঁদ-তারার ঘরে এসে পৌঁছল। চাঁদতারা তখন ক্যাম্প খাটের এক পাশে চোখ বুজে, দু' হাতে বুক চেপে শুয়েছিল। উমা চটি চৌকাঠের এক কোণে খুলে, আঁচলটা ভাল করে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে ওর কাছে এসে বলল : ব্যথাটা কি আবার বেড়েছে?

—দুদিন থেকে মরছি রানী। এবার বাঁচার কোন আশা নেই। মিনুর বাবা ডাক্তার এনেছিল। বিলিতি ওষুধ খাচ্ছি। কিন্তু রক্ত পড়া কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না রে। সমস্ত কাপড়-চোপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ডাক্তার তো ভরসা দিয়ে গেছে। বিকেলে ফের এসেছিল—কিন্তু আমার নিজের ভরসা নেই রে...

চাঁদতারা যখন কথা বলছিল তখন ক্যাম্প খাটটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ও ছটফট করতে লাগল। আবার এক সময় আপনি শান্ত হয়ে গেল।

কিছু পরেই রঞ্জন এসে গেল এবং চেয়ারে বসে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল। ও বিকেলে এসে চাঁদতারার খবরাখবর নিয়ে গেছে। খুব ভাল ছেলে। কোন এক ফিল্ম কোম্পানীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যানের কাজ করে। রোজগারপাতি ভালোই করে। ওর বড় বোন রেডিওতে গান গায়। ছোট বোন ফিজন্টার হবে। কমাস আগে রঞ্জন এক বন্ধুর সঙ্গে চাঁদতারার কাছে এসেছিল। উমারানীর কাছেও প্রায় আসা যাওয়া শুরু করেছে। ক্যামেরা এনে উমা ও চাঁদের অনেক ছবি তুলেছে। বলে : যখন নিজের ফিল্ম বানাব তখন উমারানীকে

হিরোইন যাবার। অনেক কিছুই বলে ও। জুতো খুলে নিচে রেখে, মেঝের পাতা বিছানায় এসে বসল ও।

গোলাপী রঙের নকল মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ী পরে উমা এসেছে আজ। এমন অস্পষ্ট আলোতেও ওর গলায় পাউডারের সাদা দাগ দেখা যাচ্ছে। চাঁদতারা বলে : আমি বাঁচব না রে উমারানী। মনে হচ্ছে বুকের কলজেটা যেন ফেটে যাচ্ছে... ওর টুকরো টুকরো মাংস যেন রক্তের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে। তোমরা আমার চিন্তা কোর না। বসে গল্পগুজব করো। তোমরা কথা বললে, হাসলে আমার ভাল লাগবে...

উমা বিছানার চাদরটা তুলে নিয়ে অন্য একটা আধময়লা চাদর বিছিয়ে দিল। বিছানা ঠিক করতে করতে বলল : আমি বারবার বারণ করেছিলাম। আগে শরীর ভাল হোক। তারপর যা ইচ্ছে করগে যাও। কিন্তু তুমি তা শুনবে কেন? সব সময় পয়সার জন্য হায় হায় করতে! এবার পয়সা নিয়ে বসে থাক!

চেয়ার ছেড়ে রঞ্জন বিছানায় এসে বসল। ওদিকে, কোণের দিকে ক্যাম্প খাটে চাঁদতারা। দেওয়ালে ছোট্ট মত একটা ফাঁক দিয়ে নিচে চেয়ে দেখে রঞ্জন—বাইরে গাঢ় অন্ধকার। সার্কাস পার্টির লাউডস্পীকারে ফিল্মী গীত ভেসে এল। উমা বিছানার বালিশ ঝেড়ে পুঁছে পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখল। তারপর অন্য কোণে দাঁড়িয়ে নিজের শাড়ী খুলতে লাগল। শাড়ীর নেচে পেটিকোট। পেটিকোটের ওপর হলুদ নীল রংয়ের ফুলের কাজ। ছাড়া মুর্শিদাবাদী নকল সিল্কের শাড়ীটা পাট করে চেয়ারে রেখে দিল। চাঁদতারা বেহুঁস শুয়ে—পাশ ফিরে। রঞ্জন তখনও ঐ ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। উমা বলল : আচছা রঞ্জনবাবু

—বলো। রঞ্জন ঘুরে উত্তর দেয়।

পেটিকোট আর ব্লাউজে আমাকে খুব খারাপ দেখায়। রঞ্জনের ভাল লাগে না। উমার পা দুটো খুব সরু। বুকে তেমন মাংস নেই। কোমরটা মোটা। পেটে যেন চর্বি জমেছে। ফোলা ফোলা থাজ। রঞ্জন ঘুরে বলে : আজ যদি এভাবেই বসতে তো কি হয়েছে? যদি বলো তো এক বোতল বাংলা নিয়ে আসি। এক ঢোক চাঁদতারাও খেয়ে নিক।

—কেন বসব না রঞ্জনবাবু! আমি তো তোমার জনাই অতদূর থেকে আসি।... তাছাড়া আমারও পয়সার দরকার আছে। চাঁদেরও প্রয়োজন। ও অসুস্থ। তুমি আরাম করে বোস বাবু।

উমারানী যতদূর সম্ভব বেশ দরদ মাখিয়ে বলল কথাগুলো। এবং বিছানার এক কোণে বসে পড়ল। বসে কনুয়ে ভর দিয়ে ঐ ফাঁকটা কাপড়ের দলা দিয়ে বন্ধ করে দিল। এবং উঠে এসে দরজাটাও। ঘরের ভেতর ঝোলানো লণ্ঠনের ক্ষীণ বাতিটুকু আরো কমিয়ে দিল। চাঁদতারা যন্ত্রণায় কাতরে কাতরে উঠছে। রঞ্জন এসময় নিজেকে পাথরের মত তৈরী করতে চায়। আর উমারানী রঞ্জনকে, নিজেকে এবং অসুস্থ চাঁদতারাকে আনন্দ দিতে চায়। চাঁদতারা থেকে থেকে কাতরে উঠছে।

উমার মনে পড়ছে, ও যখন প্রথমবার চাঁদতারার ঘরে এসেছিল, চাঁদতারা সেদিন নিজের এক বন্ধুকে ওর কাছে পাঠিয়ে মিনুর কাছে চলে গিয়েছিল। মিনুর মা সেদিন মরেছিল—অনেক দেরীতেও ফেরেনি চাঁদতারা। লাশ তুলতে, শ্মশানে যেতে দেরী তো হয়-ই। লাশ পোড়াতেও বেশ সময় লাগে—দেরী হয়। কিন্তু উমারানীর লাশ জ্বালাতে বেশী দেরী লাগে নি। কারণ, উমা স্বেচছায় জ্বলতে চেয়েছিল। ওর মধ্যে ভয়ঙ্কর আগুন ছিল—সর্বত্র আগুনের ফুলকি ছিল, তাই উমা জ্বলতে চেয়েছিল। জ্বলছে।

এখন কিন্তু উমা জ্বলতে পারে না। ভিজে কাঠের মত উমার দেহ থেকে শুধু ধোঁয়াই বের হয়। আগুনের শিখা নয়।

রঞ্জন বলল : ঠিক আছে। হ্যারিকেনটা আরো কমিয়ে দাও রানী। রঞ্জনের বুকে প্রচণ্ড ভারী দুটো মাসংসপিণ্ড ঝুলছে যেন। বরফে জমে যাওয়া ঠাণ্ডা মাংসের পিণ্ড। উমারানীও লাশের মত ঠাণ্ডা। আগুনের মত গরম শুধু ওদিকের ক্যাম্পখাটে শুয়ে থাকা চাঁদতারা। চাঁদতারা অচৈতন্য অবস্থায় ডিলিরিয়াম বকে যাচছে : একটা মানুষের দাম তিন টাকা। মাসে তিরিশ দিন। তাহলে তিরিশ দিনে তিরিশটা মানুষের দাম নব্বুই টাকা। কামরার ভাড়া বিশ টাকা। তিরিশ দিন মাছ-ভাত খাবার দাম তিরিশ টাকা। আর একটা লোকের দাম তিন টাকা। হিসেব মেলে না...যদি শরীর ভাল হয়ে যায়...আজ না বসলে.. হিসেব মিলছে না... কিন্ত বিছানার নিচে একটা গর্ত আছে। সেই গর্তে একটা সিগারেটের টিন আছে! টিনে টাকা পয়সা আছে। উমারাণীর সিগারেটের টিনে টাকা আছে। ..একটা মানুষের দাম তিন টাকা..

মনে হয় চাঁদতারা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। উমার জ্ঞান আছে। মড়ার মতই ঠাণ্ডা উমাকে হঠাৎ ধাককা মেরে বিছানা থেকে ফেলে দিল রঞ্জন। উমা ধাককাটা সামলে নিল—রঞ্জন উঠে দাঁড়াল : ধুর শালা! আর কখনো এখানে আসব না...

রঞ্জন ঝটপট কাপড় পরে নেয়। জুতো পায়ে গলিয়ে ঘরের বাইরে চলে যেতে চায়। উমা ওর রাগের কারণ বুঝতে পারে। কিন্তু কিছু বলে না—চুপচাপ বিছানার পাশে এলিয়ে পড়ে থাকে। ক্লান্ত চোখে রঞ্জন এবং চাঁদতারাকে দেখে। কোন কথা বলে না। ওঠার চেষ্টাও করল না। জুতো পরেই ক্ষিপ্রগতিতে রঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আজকের পয়সাও উমাকে দিল না। চাইলেও দিত না উমা জানে।

রঞ্জনের চলে যাবার পর উমা উঠোনে এসে কুয়োর জলে হাত-পা ভাল করে ধুয়ে নিল। তারপর ভেতরে এসে ক্যাম্প খাটের কাছে এসে দাঁড়াল। চাঁদতারা একটা সুতির চাদরে নিজেকে জড়িয়ে বেহুঁস পড়ে আছে। উমারানী পেটিকোটটা ভাল করে বেঁধে নিয়ে, শাড়ী পরে, ব্লাউজটা গলিয়ে নিল। তারপর বিছানার চাদরটা বদলে ফেলল। চাদর বদলাবার অছিলায় ও তোষকটা উল্টে মেঝেতে সেই গর্ত খুঁজল। গর্ত ও সিগারেটের টিন খুঁজতে বেশী সময় লাগল না। টিনটাকে আঁচলের তলায় দুটি অপুরুষ্ট মাংসপিণ্ডের মাঝখানে রাখতেও বেশী সময় লাগল না।

বেঁচে থাকলেই সময়ের দাম—নইলে কিসের! মরে গেলে, লাশ বনে গেলে সময়ের দাম কি!

মেঝের বিছানাটা ভাল করে পেতে দিল। চাদরও বিছিয়ে দিল। বালিশও সাজিয়ে রাখল। খাটের বিছানা ও চাদর ঠিক করে দিল। এবং বন্ধু চাঁদতারাকে বলল উমারানী : আজ যাচ্ছি চাঁদ। কাল আসব। রঞ্জন আজ আমার টাকা দেয়নি। তোমার বখরার পয়সাও দিতে পারব না...যদি ও কাল দেয় তখন দেবখন।

কিন্তু চাঁদতারার কানে কোন কথা পৌঁছল না। ও মড়ের মত পড়ে আছে। ওর আয়ু বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে।

অনুবাদ আনন্দ ভট্টাচার্য

শহর শহর

গিরিরাজ কিশোর

পঁচিশ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত গ্রাম। সেখানকার বাসিন্দারা অবশ্য তাকে শহর বলত। এই নামকরণে তাঁরা বেশ আনন্দিত। এই শহরে একদা একজোড়া স্বামী-স্ত্রী এসে বাস করতে থাকে। চাকর-বাকররা তাঁদের যথাক্রমে সাহেব ও মেম বলে ডাকে। আসলে তারা ছাউনিতে বাস করতো, তাই তাদের শহরে আসা বড় একটা হয়ে উঠত না। অবশ্য, যখনই আসতো, তারা নিজেদের মোটরগাড়িতে চেপেই আসতো। স্বামী তখনই গাড়ি ড্রাইভ করত, যখন তার নিজের কোন কাজ থাকত আসলে স্বামীর এই শহর তেমন মনঃপূত ছিল না। স্ত্রী অবশ্য প্রায় শহরে যাতায়াত করতো। যাবার আগে স্বামীকে জিজ্ঞেস করতো, 'তুমি কি যাবে?' 'হুঁ, না!' তারপর একটু থেমে বলতো, 'তুমি তো রোজই যাও।' তারপর একেবারে চুপ করে যেত। স্ত্রী কথাটা শেষ অবধি শুনতো, তারপরে রওনা হতো। স্বামী তখন বারান্দায় বসে বাজনা বাজাত। বাজনার পর ঘরে ইতস্তত পায়চারী করত, ঘরের নোংরা ও অগোছালো অবস্থা দেখে ব্যথিত হত। চাকরদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করত। শেষে পান করতে বসে পড়তো।

ঐ দম্পতি তাদের বিবাহ এমন এক শহরে সম্পন্ন করেছিল, যা প্রকৃতই একটি শহর ছিল। স্ত্রীও তখন সেই শহরকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত। শহর আসলে অপরের ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামাতো না। কারো কারো ব্যাপারে খুবই কম। প্রেম-পর্বে তারা দুজনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রেম করেছে, সিনেমায় করেছে, এমনকি, থিয়েটারেও। শহর নিরন্তর দেখে গেছে। অবশ্য তাদের প্রেম দেখে সে মোটেই খুশী হতো না, বরং তার চোখ প্রেমকাতর হয়ে উঠতো। অভিমানে লাইট-পোস্ট থেকে সরে গিয়ে পাকদণ্ডী ধরতো। শহরের এই অনুগ্রহের জন্য তারা বেশ খ্যাত ছিল। বিবাহের পর শহর তার নিজস্ব আচরণ পাল্টে ফেলে, ফলে তাদের চারিদিক সংকুচিত হয়ে ওঠে। মদের পার্টিতে, রেল বা বাসভ্রমণে, নাচ কিংবা থিয়েটার হলে, হোটেল বা সিনেমাগৃহে—সব ব্যাপারে শহরের মনে হতো, তারা বড় ব্যস্ত। তাদের মাথার ওপর 'আগামীকাল' চেপে থাকতো, এবং তারা চাইতো সেটাকে নামিয়ে ফেলে দিতে। নিজেদের এই উপলব্ধি থেকে তারা মুক্ত হতে চাইতো যে তারা স্বামী-স্ত্রী না হয়ে বরং শহর হয়ে আছে। তাই তারা প্রায়শঃই আড়াল থাকতে চাইতো। আসলে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে শুয়ে থাকতে চাইতো, নয়তো বেড়াতে যেতো। তাদের একটা ধারণা ছিল, শহর যত বড়ই হোক না কেন, তার মাঝে এক ধরনের অপ্রসারণের ভাব থাকবেই। বহুদিন তারা স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকার অশান্তিবোধে বিব্রত হয়ে উঠেছিল। একদিন আকস্মিকভাবে তাদের মনে হয়, স্রেফ স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকাটা বেশ মুশকিল। তারা দুজনেই বেশ বিব্রত বোধ করে এবং ভিতরে-ভিতরে সংকুচিত হয়ে উঠছে—এমন অনুভব হতে থাকে। তাদের সামনে অন্য কোন পথ ছিল না। তখন তারা নিজেরাই নিজেকে শহরের হাতে তুলে দেয়, এবং নিজেদের ওপর প্রয়োগ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। ফলে, শহরের কাছে তারা লিটমাস পেপার হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য, এই নির্ণয়ে তারা দুজনেই খুশী।

শহর এবার তাদের সঙ্গে একটা খেলা শুরু করে। তাদের দুজনের আলাদাভাবে অনুভূত হয়, এই শহর তাদের কাছে আলাদা-আলাদা। অভিজ্ঞতার ব্যাপারে তাদের অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয়। পরস্পরের প্রতি সচেতন থাকার সঙ্গে সঙ্গে একটা মনোভাব গড়ে ওঠে। যখনই তারা শহরের বিস্তার সম্পর্কে সচেতন হয়, তাদের দৃষ্টিকোণ আরও বেশি গভীর এবং উত্তর-দায়িত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। তারা দুজনেই শহরের কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে আলাদা-আলাদা ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা কোনভাবেই সেই ভূমিকার পুনর্বিবেচনা করে না। যা গ্রহণ করা হয়, তা টিঁকিয়ে রাখে।

স্ত্রীর মাঝে অবশ্য এক ধরনের দুর্বলতা ছিল। রাত্রি থেকে সে সর্বদা দূরে সরে থাকে। অথচ, স্বামীকে এই শহর রাত্রির ভয় থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল। রাত্রে তার জন্য ক্লাব, অর্কেস্ট্রা, পেয়ালা নির্দিষ্ট ছিল। স্ত্রীর পক্ষে এই রাত্রি একা মুখোমুখি হওয়া সম্ভব ছিল না। বাগানের গাছগাছালি, বাড়ির দরজা, খোলা বা ভেজানো জানালা, শূন্যতায়-ভরা ঘর খালি চেয়ার ভর্তি বারান্দা সবকিছুই একযোগে তাকে বিরক্ত ও বিব্রত করতো। প্রথম দিকে স্বামী তার প্রতি মনোযোগ দিত। গাড়িতে করে তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়তো। স্বামীর সঙ্গে যেতে যেতে সে ঐ রাত্রি-কে একটা চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতো। রাত্রির অন্ধকার তখন এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াতো। কিংবা গাছে উঠে পড়তো। চৌবাচ্চার নীচে ঘাপটি মেরে থাকতো। বাড়ির জানালার খড়খড়ি থেকে উঁকি মারতো, কিন্তু আলো এসে হাজির হলেই ঝাঁপ দিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করতো। স্ত্রীর কাছে সেই সময়টা সবচেয়ে আনন্দিত মনে হতো, যখন গাড়ির আলো রাতের অন্ধকার মাঝামাঝি চিরে বেরিয়ে যেত। স্বামী অবশ্য এসব ব্যাপারে প্রচণ্ড উদাসীন হয়ে গাড়ি চালাতো। মাঝে মাঝে বেশি ভাবুক হয়ে পড়লে বলতো, 'তোমার সঙ্গে আজকের সন্ধ্যেটা বেশ কাটলো।' কথা শেষ করে লাইট ফুল করে দিত। চারিদিকে তখন কেবল জ্যোৎস্না, আর জোৎস্নায় ছেয়ে যেত। অনতিবিলম্বে তারা ডিনারে ফিরে আসতো। স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখত, তারপর শান্ত হয়ে পড়ত। মনে হতো, ধার ক্রমশঃ ভোঁতা হয়ে আসছে।

পঁচিশ লাখ বাসিন্দার গ্রামে আসার কয়েক মাস আগে, সেই শহর স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কিছু ব্যাপারে রফা করেছিল। সেই রফা অনুসারে স্বামীকে অফিস, কয়েকটি সঙ্গদাত্রী রমণী, কয়েকজন পেটোয়া বন্ধু, নাচঘর এবং ক্লাব দিয়েছিল। ওদিকে

স্ত্রীর কানে কানে ফিসফিস করে বলে, শহর সম্পূর্ণভাবে তোমার সঙ্গেই আছে। স্বামীর পরিধি তেমন বৃহৎ ছিল না, কিন্তু প্রচুর সুবিধে ছিল। অফিসের কর্মীদের কাছ থেকে ছুটি পেয়ে, স্বামী তার সঙ্গদাত্রী রমনীদের সঙ্গে কথা বলতো, কিংবা পেটোয়া বন্ধুদের মাঝে গিয়ে বসতো। সেই সব বন্ধুরা তাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, তারা শেষনিশ্বাস অব্দি তার সঙ্গে থাকবে। নাচঘর এবং ক্লাব, সে নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখত; কিছুনা জুটলে, সেই সবের ব্যবহার করতো। শহরের কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা সত্ত্বেও, স্ত্রী কখনও শহরকে কাছে ঘেঁষতে দিত না। তার স্থির বিশ্বাস ছিল, অফিসটা সেই অকর্মা শহরের একটা গুণ। এদিকে অফিস স্ত্রীকে বলতো, 'সাহেব রওনা হয়েছেন, এক্ষুনি গিয়ে পৌঁছবেন।' আর ওদিকে পেছনের দরজা দিয়ে স্বামীকে তার বন্ধু বা সঙ্গদাত্রী রমনীদের সঙ্গে বার করে দিত।

স্বামী ফিরত। বেশ বিরক্ত। সঙ্গদাত্রী রমনী এবং মতলবী বন্ধুদের প্রতি ক্ষুব্ধ। এখন তার পক্ষে শুয়ে পড়া ছাড়া গত্যান্তর নেই। স্বামীর শুয়ে পড়াটা অনিদ্রা রোগে পীড়িত বিব্রত লোকের মত স্ত্রী দেখতে থাকে। শুয়ে পড়ার পর স্ত্রীর মনে হয়, এই বুঝি ঘুমোবে....এই ঘুমোবে। এবং ঘুমিয়ে পড়ে। স্ত্রী উঠে ঘরের প্রতিটি বস্তুর দিকে দৃষ্টি ফেলে। প্রাণহীন ও কঠিন বস্তুসমূহ ছুঁয়ে ফেলে। ঘরের দেওয়ালে বেশ ভারি অন্ধকার ঠেলাঠেলি করতে থাকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে আলো নেভায় না, তারপর নিভিয়ে ফেলে। অন্ধকারের আঘাতে দরজা ভেঙ্গে পড়ে। তারপর অন্ধকার জমাট হয়ে বসে পড়ে। কঠিন বস্তুসমূহের কিছুই হয় না। কেবল স্ত্রীর বুকের ওপর ওজন ভারি হতে থাকে।

সেই সময় চুকলিখোর শহর তার কানে কানে বহু কথা ফিসফিস করে বলতে থাকে। সেই ফিসফিসানি ক্রমশঃ তার কানকে বধির করে তোলে। কিন্তু স্বামী পাশ ফিরতেই নিস্তব্ধতা ঝন-ঝন করে বেজে ওঠে। নিস্তব্ধতা কিছু বললেই সে সহ্য করতে পারে না, উঠে আবার আলো ধরায়। চুকলিরত শহর তখন গায়েব হয়ে পড়ে। নিদ্রিত স্বামীকে ভাল করে লক্ষ্য করে, তারপর আবার শুয়ে পড়ে। তার হাতে একটা মিহি সুতো পড়ে থাকে। স্বামী তখন ডুব দিয়ে অনেকটা গভীরে পৌঁছে গেছে। স্ত্রী ভাবে, সুতোটা সে একদিন ছিঁড়ে ফেলবে, এবং সেই অকর্মা, চুকলিখোর শহরকে মেরে স্বামীর পাশাপাশি শুইয়ে দেবে।

স্বামী একটি বড় প্রতিষ্ঠানে বড় চাকুরে ছিল। চাকরি করতে করতে সে অফিসার হয়ে বসে। চাকরির ক্ষেত্রে অফিসার একটি বড় নামের অধিকারী। এ-ধরনের কোন নাম চাকুরিজীবিকে সুখ দেয়, কিন্তু তার চেয়েও বড় অফিসার ছিল। যেমন তার হুকুম অধস্তন কর্মচারীদের মানতে হতো,

গিরিরাজ কিশোর (১৯৩৬) আধুনিক হিন্দী গল্পকারকদের মধ্যে চর্চিত নাম। তার অধিকাংশ গল্প নগরকেন্দ্রিক হলেও ঘটনার বিবরণ গৌণ থাকে। এবং মানসিক বিশ্লেষণই দেখা যায় বেশি। ফলে শিল্পমূলকের চেয়ে বেশি হয় দৃষ্টিমূলক। নগর-জীবনের জটিলতার মাঝে আজকের মানুষ কোথাও-না-কোথাও ছিন্ন হয়ে পড়ছে, আবার হয়তো কোথাও যুক্ত হয়ে পড়ছে। এই হলো লেখার প্রতিপাদ্য। পাঁচটি গল্প-সংগ্রহ ও পাঁচটি উপন্যাসের জনক, এই লেখক বর্তমানে সরকারী দায়িত্বশীল পদে আছেন।

সেইরকম তার অফিসারের হুকুমও তাকে মানতে হতো। হুকুম দিতে ভাল লাগে, হুকুম মানতে খারাপ লাগে। তার অফিসারের হুকুমনামা আসে, ফলে তার ট্রান্সফার পাঁচিশ লাখ বাসিন্দার সেই গ্রামে হয়। তার খারাপ লাগে। কিন্তু সেই হুকুম মোতাবেক তাকে শহর ছাড়তে হয়। স্ত্রী অবশ্য এই ট্রান্সফারে খুশী-ই হয়, যাক এই চুকলিখোর শহর থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। যতক্ষণ না তারা ত্যাগ করে যায়, শহর ততক্ষণ তাদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। যাবার সময় স্ত্রী শহরের সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেনি, বরং সহযোগিতার জন্য ভদ্রতাসূচক ধন্যবাদ জানায়।

তারা চলে যাবার সময় শহরকে চৌরাস্তায় মোড়ে, বাজারে এবং পার্কের ধারে বিরক্তিময় নজরে দেখা দেয়। যদিও শহর, লোকেদের সঙ্গে করমর্দন করছিল, আলিঙ্গন করছিল, তবুও শহরের চেহারা নিজের তরফ থেকে পরিষ্কার ছিল না। এমন কি শহর তাদের 'টা-টা বাই-বাই' করে নি। স্ত্রী বলে, দেখেছো, কেমন মুখ ভার করে আছে। যেন আমরা তার কিছু সঙ্গে নিয়ে চলেছি। আগে, কেমন ছটফটে ঘুরে বেড়াতো।

স্বামী গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বলে, 'কথা বলার সময় অন্যমনস্ক হবার সম্ভাবনা থাকে। এমনিতে উদার শহরের মধ্যে এই শহরও একটি। আমাদের অনেক কিছু এই শহর দিয়েছে।' স্ত্রী তার দিকের কাঁচ নামিয়ে দেয়।

স্বামীর দিকে পা-দানির তলায় এই শহর উপস্থিত। গাড়ী চালাতে চালাতে দেখে নেয়। গাড়ী বেশ ভারি গতিতে চলছে। স্ত্রী যেদিকে বসেছিল, সেদিকটায় ধুলো জমছিল ক্রমশঃ। স্বামী বলে, 'দেখলে, এখান থেকেই এই গ্রাম তোমার উপর চেপে বসতে চাইছে।' স্ত্রী চুপ থাকে। স্বামী গাড়ী থামিয়ে স্ত্রীকে বলে, 'এবার তুমি ড্রাইভ করো, আমি একটু রেস্ট নিই।' দুজনেই স্থান পরিবর্তন করে রওনা দেয়।

গাড়ী ড্রাইভ করতে স্ত্রীর বেশ অসুবিধা বোধ হতে থাকে। পা-দানির তলায় শহর বার বার খোঁচা মারে। স্ত্রীর আশঙ্কা হয়, কে জানে এই রাস্তা আবার ঘুরে-ফিরে সেই শহরে না গিয়ে পৌঁছয়। স্বামীও বেশ বিব্রত বোধ করে। তার সামনে পাঁচিশ লাখ বাসিন্দার গ্রাম ফুটে উঠতে থাকে। সে বলে, 'আমার মনে হয়, জানালার সাহায্যে এই গ্রাম ভেতরে ঢুকতে চাইছে।'

বস্তি নজরে পড়তে শুরু করে। আকাশে পাখী উড়ে বেড়ায়। স্ত্রী খুশী হয়। গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দেয়। স্বামী গাড়ীর কাঁচ উপরে তুলে দেয়। কিছুক্ষণ পর স্বামী গাড়ী থামিয়ে দেয় বলে, 'আমি এদিকে আর বসতে পারছি না। তুমি এদিকে এসে বসো, আমি ড্রাইভ করি। আমার মনে হয়, তুমি এই গ্রামের সঙ্গে মিশে আছো। জ্বরের মত কেবল বেড়ে চলেছে।' সে নিজেই সিটে গিয়ে বসে, উঁকি মেরে পেছনে দেখতে থাকে; শহর এখনও পেছন-পেছন দৌড়ে আসছিল।

পাঁচিশ লাখ বাসিন্দার গ্রাম কোন ধৃষ্টতা প্রকাশ করে না। স্ত্রীও প্রথম দর্শনেই তাকে 'শহর' উপাধি দিয়ে বসে। কিন্তু স্বামী তাকে 'গ্রাম' নামেই ডাকে, যদিও সে সমশ্রেণী লোকেদের মতই স্বাগত জানায়। পাঁচিশ লাখ বাসিন্দা সত্ত্বেও সেই শহর তাদের বাস করার জন্য ছাউনীতে একটা বাংলো দেয়। ছাউনীর বাংলো বিশাল এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে। যতক্ষণ না স্বামী-স্ত্রী বাংলোর ভেতরে ঢুকে, শহর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। বাংলো সম্পর্কে স্বামী কোন মতামত প্রকাশ করে না। স্ত্রী অবশ্য বলে, 'আমরা এখানে ভালো ভাবে থাকতে পারবো, মনে হয়। সেখানে পা-ও ভাল করে ছড়ানো যেত না।'

স্বামী স্ত্রীর দিকে না-চেয়েই উত্তর দেয়, 'বেশতো, তুমি তাহলে পা ছড়াও।' তারপর স্ত্রী বাংলো সম্পর্কে আর কোন কথা বলে না. স্বামীও পা ছড়ানো সম্পর্কে চুপ থাকে।

এই শহরে স্ত্রীর কাছে জীবন্ত এবং ভালো লাগে। স্বামীর মনে হয়, এই শহরটা জোয়ার ও ভোঁদা ধরনের।

স্বামী প্রত্যহ সকালে বেরিয়ে পড়ে। স্ত্রী বাড়ীতেই থাকে। স্বামী অফিসের কাজ-কর্ম দেখাশোনা করে। অফিসের কাজ-কর্মের শেষে সে শহরে পরিক্রমায় বেড়ায়। স্ত্রী দিন কোনভাবে কাটায়, তবুও দিন তার কাছে তেমন-ই থাকে। সে শহরকে কেবল দেখেছিল মাত্র, আলাপ-পরিচয়ও ঘটে নি। শহরেও তার বাংলোর চারদিকে তাই পরিক্রমা করে। কাছে আসে না।

গোটা শহরে ঘুরে বেড়ানোর পেছনে স্বামীর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। আসলে, সে আগেকার শহরের মত এই শহরের সঙ্গেও কিছু গোপন রফা করতে চাইত। রফা করাটা তার স্বভাবের একটা গুণ। কিন্তু, শহর এ ব্যাপারে বেশ বিব্রত বোধ করে। শহর অবশ্য তার সঙ্গে আলাদা-আলাদা স্থানে আলাদা-আলাদা ভাবে সাক্ষাৎ করতো। মার্কেট, পাড়া, সিভিল লাইন, এয়ারপোর্ট, সিনেমা, ক্লাব, চা-ঘর, ঘর, সমস্ত পরিবেশই দেয়ালের দিকে মুখ করে পেচ্ছাপ করার ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো থাকে।

চাকরীতে থাকার ফলে দায়িত্বশীল লোকেদের সঙ্গে তার কথা-বার্তা, আলোচনা হত। সে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। রফার কথা কার সঙ্গে করা চলে? কোন দায়িত্বশীল লোকের সঙ্গে? সহজ সম্পর্ক না হবার ফলে অফিসেরও কেউ তাকে সাহায্য করতে পারছিল না। সম্ভবতঃ সেও অফিস থেকে সাহায্য নিতে চাইতো না। তার ধারনা ছিল, এসব ব্যাপারে পেটোয়াদের কাছ থেকে সাহায্য নেবার অর্থ তাদের মুঠোয় আটকে পড়া।

উঁচু উঁচু বৃক্ষ শ্রেণী সেই বাংলোকে কিছুটা পাহাড়ী দুর্গ করে রাখে। বাংলো দেখে স্ত্রী প্রায়শঃ ভাবতে চেষ্টা করে—এই দুর্গ সৈন্য সামন্তে সুরক্ষিত। এই অবস্থায় সে অন্ততঃ পাখীর ডানা ঝাপটানোর ভয় থেকে মুক্ত হয়, ছেলেবেলায় 'রাণী গুলেবকাবলী'র গল্প শুনেছে। তাতেও পাখী ডানা ঝাপটাতে পারত না। সেই বাংলোর স্থাপত্য-কারণে সে নিজেকে 'গুলেবকাবলী' ভাবতে শুরু করে। তার এ-রকম একটা স্থির বিশ্বাস হয়েছিল, গুলেবকাবলীও এই ধরনের দুর্গে একাকী থাকতেন। এই ধারনা তার কল্পনাকে আরও বেশী প্রসার করে তোলে। তবে, স্বামীও এসে জিজ্ঞেস করবে.... 'হাঁউ-মাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ।' তখন সে বলবে—আমিই শুধু আছি, আমাকে খাও। তাকেই খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। স্বামীর ঘুমিয়ে পড়ার কথা মনে হতেই স্ত্রীর হাতে সংজ্ঞা একটা সুতো দেখা দেয়। অন্ধকারে গোটা বাংলো ভরে যায়।

স্ত্রীর পক্ষে বাংলোর থাকা যখন অসহ্য হয়ে উঠতো, এবং বাইরে বেরোতে চাইতো, [illegible]

গাড়ি এসে পড়তো। স্ত্রী তখন গাড়িটাকে ছাউনির পথে তীব্রবেগে চালিয়ে নিয়ে যেতো। মনে হত সে যেন ম্যাজিক কার্পেটে বসে উড়ে চলেছে। অগণিত দৈত্য তার পেছু নিয়েছে। চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে, বিচিত্র আকার নিয়ে জীনের মত উড়ে বেড়াতে থাকে। সে গাড়ির গতি আরও তীব্র করে। পথের প্রতিটি কণা তার পশ্চাদনুসরণ করে। সামনে বিশাল ফটক দেখা দেয়। বহুবার তার মনে হয়েছে, সেই চন্দ্রকান্তার শহর বুঝি এখানেও এসে হাজির হয়েছে।

শহর থেকে ফেরার পথেও দৈত্যের কল্পনা তাকে মুক্তি দেয় না। মনে হয়, দৈত্য এই পথেই আসছে, দেখা হয়ে যাবে সহসা। দৈত্যের চেহারা-টেহারা সম্পর্কে সে ভেবে চলে। তীব্র বেগেই গাড়ি চলে। জানালা বন্ধ করে দেয় পরে প্রশস্ত হয়ে ওঠে। বাংলোয় পৌছে সমস্ত ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়, তারপর খাটের ওপর শুয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ সেইভাবে শুয়ে থাকে। সহসা মনে হয়, দৈত্য তার মুখোমুখি উবু হয়ে বসে আছে। চমকে ওঠে। দেখে, ঘর খাঁ-খাঁ, কেবল ফ্যান চলতে থাকে হাল্কা গতিতে। ঘরের চারদিকে দৃষ্টি ফেরায়। অপ্রাণ বস্তুসমূহে ঠাসা ঘর দেখে সে আশ্বস্ত বোধ করে।

স্বামী ফিরে আসে। তাকে মার্কেটের সম্পর্কে বলে।

স্বামী তার দিকে চেয়ে বলে, মার্কেট ভালো জায়গা। তারপর ভেতরে চলে যায়। স্ত্রী তার সঙ্গ কামনায় প্রতীক্ষা করে। স্বামী চুপচাপ এসে টেবিলে বসে, খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে চলে যায়। তার ঘুমোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘর বন্ধ হয়ে পড়ে। স্ত্রী ভাবে, দৈত্য হয়তো বলি নিয়ে ফিরে আসছে।

এতদিন স্বামী, স্ত্রী এবং শহর ছিল। একদিন এই শহরে একজন ভবা ব্যক্তি এসে উপস্থিত। আগেকার আমল হলে, সকলেই তাকে কোন দেশের যুবরাজ মনে করত। সে ছিল কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী। মেশিন মেরামত এবং তৈরি করত। শহর নিতান্ত কৌশলেই, তাকে সরাসরি স্বামীর কাছেই পাঠিয়ে দেয়। তারা উভয়ে ইতিপূর্বে সাগরপারে কোথাও আলাপ করেছিল। স্বামী তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। স্ত্রী আগন্তুকের সম্পর্কে জানতে চাইলে, স্বামী চুপ করে থাকে। স্ত্রী অগত্যা চুপ করে থাকে। ততক্ষণ সে চা খায়, স্ত্রী ভাল করে লক্ষ্য করে। তার সম্পর্কে মনের অদম্য কৌতূহল জাগে। স্ত্রী আশ্চর্য হয়, লোকটি কেন চোখ নামিয়ে চা খাচ্ছে। সে গোঁফও রাখেনি। তার চেহারার সঙ্গে সে তার স্বামীর চেহারা তুলনা করে। কিন্তু, কিছু স্থির করতে পারে না। ফলে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রচণ্ড রাগ হয়। কিছুটা হতাশ মনে হয় তাকে। বিদায়-মুহূর্তে লোকটি স্ত্রীর দিকে চেয়ে মৃদু হাসে। স্বামীর সঙ্গে করমর্দন করে। [illegible]

লোকটি চলে যাবার পর তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে ড্রইংরুমে বসে পড়ে। অনেকদিন বাদে তারা সেখানে বসে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে স্ত্রী প্রশ্ন করে, 'তুমি তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না কেন?'

স্বামী হেসে ওঠে। তার হাসি ড্রইংরুমকে সামান্য উঁচু করে তোলে। হাসি থেমে নেবার পর বলে, 'তুমি বুঝবে না।'

তারা দুজনে তারপর বহুক্ষণ কথা বলে না। স্ত্রীর মন দরজার ঝুলন্ত পর্দায় গিয়ে থেমে থাকে। স্বামী জানালায় বাইরে চেয়ে থাকে। তারা দুজনে আবার পরিচিত হতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে স্বামী সহসা বলে ওঠে 'সে মেশিন মেরামত করে। রাশিয়ায় আমাদের আলাপ হয়েছিল। অপরিচিত লোকেদের সঙ্গে আলাপ করার ভাল জায়গা রাশিয়া।'

'তাকে তোমার ভাল লেগেছে।'

স্বামী হাল্কাভাবে বলে, 'আমার চেয়ে ভাল তোমার লেগেছে।'

স্ত্রী কম্পমান পর্দার দিকে চেয়ে বলে, 'দরজার কাঁচ ভেঙে গেছে।' সেদিকে মুখ রেখে চুপ থাকে। ড্রইংরুম থেকে যখন তারা ওঠে, বাংলোয় সামান্য আলো ছিল।

রাত নামে। শহরে মঙ্গল-শাঁখ বেজে ওঠে। স্বামী-স্ত্রী সেদিন অনেকক্ষণ জেগে থাকে। চৌকিদারের গলা শোনা যায়, 'সজাগ থেকো, চোর থেকে সাবধান।'

স্বামী বলে, 'এবার শোয়া যাক।' তারা শোয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। শোবার আগে তারা সমস্ত ধরনের কথাবার্তা শেষ করে নেয়। শহর সম্পর্কে তারা কোন কথা বলে না। স্বামী সেই মেশিন প্রস্তুতকারক লোকটি সম্পর্কে শোয়ার আগে বাতি জ্বালিয়ে বলে, 'সে অবিবাহিত, এজন্য তাকে খলনায়ক বলাটা যুক্তিযুক্ত হবে।'

স্ত্রী বলে, 'খলনায়ক কেন?'

'এখন খলনায়ক-ই নায়ক হয়ে থাকে।'

স্ত্রী সামান্য কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে, তারপর উঠে বাতি নিভিয়ে দেয়।

স্বামী মাঝখানে বলে ওঠে, 'কাল খাবার সময় সে থাকবে।' স্ত্রী কিছু বলে না, কেবল স্বামীর চেহারার সঙ্গে তার চেহারার তুলনা করে।

স্ত্রী শহর সম্পর্কে ভাবতে থাকে। শহরের কোন চিহ্ন নেই। এরি মধ্যে বাজির শব্দ শোনা যায়। স্বামীকে বলে, 'দৈত্য বলি নিয়ে এসেছে।' কিন্তু স্বামী সেখানে নেই। হয়তো বলির জন্য গিয়ে থাকবে, স্ত্রী ভাবে। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে সে। কি জানি, দৈত্য তাকেই না আবার গ্রাস করে।

বাজি বন্ধ হয়ে গেছে। শহর ফেরার পথে স্ত্রীর কাছে আসে এবং তাকে সেখানেই ফেলে যায়। স্ত্রী তার সঙ্গে খেলতে থাকে। সকাল হতে এখনও বেশ দেরি।

[illegible]

ওহ্ মাই গড

রুকম্

ওঃ কি মুস্কিল। সাত নম্বর এখানে তো আট নম্বর দু ফার্লং দূরে।

কলকাতা মহানগরে এই প্রথম আসা। প্রথম প্রথম তো রাস্তা খুজে পাই না—রাস্তা যাও বা পেলাম, বাড়ি পাওয়া মুস্কিল। একই রাস্তায় এধার থেকে ওধার খোঁজাখুঁজি করতেই দু ঘণ্টা সময় কেটে গেল। পশ্চিম দিকের লোক পূবে পাঠায় তো পূবের লোক পশ্চিমে।

দিল্লি থেকে আসবার সময় ভগবানদাস এক ঝঞ্ঝাট আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে। নিজের কাজ হলেও বা কথা ছিল. এত দৌড়ঝাঁপ গায়ে লাগত না। কারণ এতক্ষণে হয়ত নিজের মত পালটে ফেলতাম। কিন্তু তা হবার নয়। ভগবানদাস আমার বিশেষ বন্ধু—আর এই প্রথম ও আমায় কোন কাজের দায়িত্ব দিয়েছে। কলকাতায় যখন আসতেই হবে, বন্ধুর কাজটাও করে দিই—ক্ষতি কি।

ধন্যবাদ সেই ভদ্রলোককে যিনি আমায় পূব-পশ্চিম কোথাও না পাঠিয়ে স্বয়ং মিস্টার রবার্টের ফ্ল্যাটের সামনে এনে আমায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। দরজায় নেমপ্লেটের ওপর আংগুল দেখিয়ে বললেনঃ এই হল মিঃ রবার্টের ফ্ল্যাট।

তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম।

তিনি চলে গেলে আমার আংগুল স্বতঃই কলিং বেলের ওপর চাপ দিল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে সুমধুর সঙ্গীতের মত স্বরলহরি শুনতে পেলাম। মনে হল, কেউ যেন জলতরঙ্গে রেওয়াজ করছে।

ভেবেছিলাম, দরজা খুলতেই কোন বলিষ্ঠ সাহেব ভারিক্কী গলায় জিজ্ঞাসা করবে ঃ ইয়েস, কিসকো মাংগতা।

কিন্তু এমনটি হল না। দরজা খুলতেই দেখলাম, এক অনিন্দ্যসুন্দরী মেম। ঝিলের মত নীল দুটি চোখে নেশার মাদকতা। বয়স খুব জোর বিশ কি বাইশ।

তিনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। পরে বাঁশীর মত সুরেলা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কাকে চাই আপনার?

—মিস্টার রবার্টের সংগে দেখা করতে চাই। আপনি........

—মিসেস রবার্ট। কোথা থেকে আসছেন?

—দিল্লি থেকে। জুয়েলার ভগবানদাস আমায় পাঠিয়েছে।

—ও আই সী....। মিস্টার ভগবানদাস? একটু থেমে সৌজন্য দেখিয়ে বললেন ঃ তো বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে আসুন।

মহিলাটির কণ্ঠস্বর এমনই সুন্দর যে, ওঁর কথা বলার ভঙ্গী আমার কাছে মধু-মাখানো টোস্টের মত ভাল লাগছিল। হংস-রাজের মত মৃদুমন্দ চলার ছন্দ মিসেস রবার্টের। মাথায় যদি দু-একটা বই রেখে দেওয়া যায়, চলতে গিয়ে তা কখনই পড়ে যাবে না, একথা আমি হলপ করে বলতে পারি। এমনই মোহময় চলার ছন্দ।

ফ্ল্যাটটি অপূর্ব সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো। যে-ঘরের মধ দিয়ে তিনি আমায় ভিতরে নিয়ে এলেন, মনে হল, সেটি বেডরুম। বড় একটা পালংকের মত খাট পূব দিকের দেওয়াল ঘেঁসা। তার সামনে কাঠের একটি গোল টেবলে কয়েক গুচ্ছ রজনীগন্ধা।

টেবলের ওপর ব্র্যাকনাইটের একটি বোতল। অর্ধেক খালি। কাছেই একটা গ্লাস। মনে হল, এইমাত্র বুঝি ওটা খালি হয়েছে।

খাটের দিকে ইসারা করে মিসেস রবার্ট আমায় বসতে বললেন। আমি বসার পর উনি আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। আলমারি খুলে একটি গ্লাস বার করে খাটের একদিকে এসে বসলেন। নিজের গ্লাসটি ভর্তি করার পর অন্য গ্লাসে ব্র্যাকনাইট ঢালতে ঢালতে বললেন ঃ (যথারীতি ইংরিজি হিন্দী শব্দ মিশিয়ে) আমি বুঝতে পারলাম

ভগবানদাস তোমায় কেন পাঠিয়েছে।

আবার তিনি উঠে অন্য ছোট্ট একটা আলমারি থেকে একপ্লেট কাজু বার করে, মদের গ্লাস ও কাজুর প্লেটটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ প্রথমে কিছু খাও-দাও। তারপর কথা হবে।

আমি হাত জোড় করে বললাম ঃ থ্যাংকস। আমি এসব কিছু খাই না।

আমার উত্তর শুনে তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যার অর্থ, আমার মনে হল, তাহলে এতদিন আমি বেঁচে আছি কি করে। সেটাই প্রকাশ পেল তাঁর বিস্মিত প্রশ্নে ঃ

—হোয়াট। ইউ ডোণ্ট ড্রিংক হুইস্কী?

মুচকি হেসে বললাম ঃ না। জীবনে কখনও স্পর্শ করিনি। আপনি স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন।

অতঃপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে এমন মিষ্টি হাসলেন যার অর্থ হল, আমি যেন নিষ্পাপ অবোধ এক শিশুর মত।

—কিন্তু এগুলো তো খারাপ জিনিস নয়....

—আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি খাই না।

—ঠিক আছে। তাহলে কাজ খাও।

কিছু নোনতা কাজু আমি নিলাম। মুখে পুরলাম। দেখলাম, মেমসাহেব হুইস্কীতে না সোডা মেশালেন, না জল। ঢক-ঢক করে এক নিঃশ্বাসে সমস্তটাই গলায় ঢেলে ফেললেন। তাঁর এমন কাণ্ড দেখে আমি অত ঠাণ্ডাতেও ঘামতে আরম্ভ করলাম।

এখানে আমার বেশিক্ষণ থাকার কথা নয়। কাজের কথা সেরে উঠে পড়াই উদ্দেশ্য। এই ফ্ল্যাটে, এই যুবতী মেম ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর সাড়াশব্দ পেলাম না। তাই কেমন যেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেললাম :

—মিস্টার রবার্টের সঙ্গে কখন দেখা হবে?

—আপনি কি ও'র সঙ্গেই দেখা করতে চান?

—হ্যাঁ। তাঁর সঙ্গেই দেখা করব।

—তাহলে তো আপনাকে ব্যাঙ্গালোরে যেতে হবে।

—ব্যাঙ্গালোর! আমি অবাক হই।

—ইয়েস। সিক্স মান্থস থেকে উনি ওখানে........

হঠাৎ মনে পড়ল, ভগবানদাস বলছিল যে, ওর রেজিস্ট্রি-করা চিঠির অ্যাক-নলেজমেণ্টে সই ছিল মিসেস জুলি রবার্টের।

ব্যাঙ্গালোরের কথা বলে মিসেস রবার্ট ঐ সময় হয়ত ঠাট্টা করেছিলেন কিন্তু আমার হাসি-ঠাট্টার মুড সে-সময় ছিল না। কিন্তু তবু মিসেস রবার্টকে আমার খুব সরল প্রকৃতির যুবতী মনে হল। লক্ষ্য করেছি এটুকু সময়ে, কথা বলায় কোন জড়তা নেই। অবলীলাক্রমে কখনো আপনি কখনো বা তুমি সম্বোধন করেছেন আমায়। আমিও কিছু মনে না করে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছি। প্রথম পরিচয়ে তিনি আমায় হুইস্কী অফার করলেন। হয়ত এটা ভদ্রতা। কিন্তু আমার তা ভাল লাগেনি। কারণ আমি এ-ধরনের ব্যাপারে আদৌ অভ্যস্ত নই। তাই প্রথম দর্শনেই যদি কোন যুবতী নারী মদ খাবার আমন্ত্রণ জানায়, যদি এমন প্রাণখুলে কথাবার্তা বলে যেন কতদিনের পরিচিত বন্ধু আমরা, তাহলে কার না অবাক লাগে!

মিসেস রবার্ট প্রচুর মদ্যপান করে ফেলেছিলেন। আমি দেখতে পাচ্ছি— বুঝতেও পারছি, সময় যেমন যেমন বাড়ছে, আর নেশাও তেমন বেড়ে যাচ্ছে। কখনও কখনও ও'র কথাবার্তা জড়িয়ে যাচ্ছে, অসংলগ্ন কথা বলছেন, কখনও বা চুপ মেরে যাচ্ছেন। কখনও আপন মনে হেসে উঠছেন —বিড় বিড় করে কি সব বলছেন।

আমি এবার বোর ফিল করতে লাগলাম। কি করে কাজ সেরে চটপট পালাতে পারি তাই ভাবছিলাম। অথচ উনি নিজেদের কথা, নিজের বিষয়—না জানি কি কি বলে যাচ্ছিলেন। কখনও নিজের ফেলে-আসা বন্ধুদের কথা, মিঃ রবার্টের কথা, তাঁকে উপেক্ষা করার কথা। মিসেস রবার্ট কি নিজেই জানেন, উনি নেশার ঘোরে কত কিই না বলে যাচ্ছেন।

রুক্ম এই ছদ্মনামের আড়ালে শ্রীরামখিলাবন ত্রিপাঠী হিন্দী সাহিত্য জগতে দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ভারতের এমন কোন হিন্দী পত্র-পত্রিকা নেই যাতে তিনি গল্প-উপন্যাস ছোটদের জন্য লেখেননি। প্রায় ৩০০টি বিভিন্ন স্বাদের ছোটগল্প, ডজনখানেক উপন্যাস, এবং ছোটদের জন্য তিন ডজনের মত উপন্যাস তাঁর রচনা-সৌকর্যের স্বাক্ষর বহন করে। অছাড়া সম্পাদনা করেছেন ডজন দুয়েক নামীদামী হিন্দী পত্র-পত্রিকা। দীর্ঘ ২৬ বছর কলকাতা তথা উত্তর ভারতের বিখ্যাত হিন্দ দৈনিক 'সন্মার্গে' অন্যতম বার্তা-সম্পাদকরূপে বর্তমানে কর্মরত এবং এই পত্রিকারই 'রবি-বাসরীয়'তে 'কপূত কলকাতিয়া' নামের আড়ালে ব্যঙ্গ কবিতার বিখ্যাত কবি।

'ও মাই গড' গল্পটি হিন্দী সাহিত্যে প্রেমের গল্পের মধ্যে একটি অসাধারণ সুন্দর সংযোজন।

—দু' বছর আগেও তিনি একজন ফেমাস ক্যাবারে ড্যান্সার ছিলেন। জুলির ড্যান্স কে না দেখেছে? ওখানেই মিঃ রবার্টের সঙ্গে প্রথম দেখা। মিঃ রবার্ট প্রতি দিন ও'র ড্যান্স দেখতে আসতেন। ড্যান্স শেষ হবার পর সবাই চলে গেলেও, তিনি নিজের টেবলে চুপচাপ বসে থাকতেন। যখন জুলি টেবলের সামনে দিয়ে ভিতরে চলে যেতেন, মিঃ রবার্ট তখন উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাভরে মাথা নিচু করে তাঁকে অভিবাদন জানাতেন এবং পকেট থেকে একটি গোলাপ ফুল তাঁকে উপহার দিতেন।

গোলাপ ফুল নিয়ে থ্যাংকু বলে বিদ্যুতের মত সর্বাঙ্গে ঢেউ তুলে অদৃশ্য হয়ে যেতন জুলি। রবার্ট অপলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে থাকতেন তাঁর চলে যাওয়ার পথের দিকে।

বেশ ক'মাস ধরে এমনিই চলল। রবার্টও ও'কে কিছু বলেন না জিজ্ঞাসাও করেন না কোন কথা। জুলিও না। কিন্তু হঠাৎ মনে হতে লাগল, রবার্টের জন্য নিজের হৃদয়ে কোন অজান্তে ছোট্ট একটু দুর্বলতা যেন আপনি জন্ম নিয়েছে।

আর এই দুর্বলতাই একদিন ও'কে রবার্টের সঙ্গে কথা বলতে অস্থির করে তুলল। রবার্টকে জিজ্ঞাসা করলেন জুলি, একদিন : আপনি রোজ আমায় ফুল উপহার দেন। সবাই চলে গেলেও আপনি যান না—এসব কেন করেন?

রবার্ট অত্যন্ত সংকোচে মাথা নিচু করে বলেছিলেন :

—আমিও কখনও কখনও ঠিক একই কথা ভাবি।

—কি!

—এই যে, কেন আমি এমন করি? আচ্ছা, আপনিই বলুন না আমি কেন এমন করি! এটা কি ভাল, না, উচিত?

রবার্টের কথা শুনে তিনি খিলখিল করে হেসে উঠলেন। কি সরল এই লোকটা। ঠিক যেন সরল বালকের মত। এইরকম বলিষ্ঠ একটা যুবকের মধ্যে কত নম্রতা কত সংকোচ। রবার্টের এই সরলতা, জুলির নারীত্বকে নারীসত্তাকে জাগিয়ে তুলল।

এরপর দুজনের বাইরে দেখাসাক্ষাৎ হতে লাগল। একে অন্যকে ভালবেসে ফেলল। রবার্ট তাই চায় না যে, সে এভাবে আর নাচুক। রবার্টের খুসীর জন্য এক-কথায় নাচ বন্ধ করে দিলেন জুলি।

পরিবারে মা ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী কেউ ছিল না ওর। মাও নিজের কালে বিখ্যাত ড্যান্সার ছিলেন। মেয়ে ড্যান্স ছেড়ে দেওয়ায় তিনি রেগে আগুন হয়ে গেলেন। কারণ জুলির রোজগার, এই ড্যান্সের পয়সাতেই ওদের সংসার চলত, গ্রাসাচ্ছাদন হত।

মিসেস রবার্ট নেশার ঘোরেই বলে চলেন, জড়িয়ে জড়িয়ে এলোমেলো ভাবে : এবার খাবে কি? হরিমটর? ঐ ছোকরা ড্যান্স বন্ধ করতে বলল আর অমনি তুই বন্ধ করে দিলি। কাল বলবে কুয়োয় ঝাঁপ দাও, অমনি তুই ঝাঁপ দিবি। পরশু বলবে ওর গলাটা কাট......

কি জানেন মিস্টার শর্মা। জুলি অনেকটা যেন ধাতস্থ হয়ে বলেন : রবার্টের প্রেমে তখন হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। সুতরাং রবার্টের বিরুদ্ধে কোন কথা আমি বরদাস্ত করতে পারতাম না। প্রথম কদিন চুপ করে ছিলাম। কিন্তু পরে, মার কাটা কাটা কথায়, ব্যঙ্গে বিদ্রূপে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন মাকে শাসিয়ে দিলাম :

—ফের যদি রবার্টের নামে কোন কথা বল, তাহলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

মা, হাজার হলেও মা। মেয়ের এই দেমাক, মেজাজ সহ্য করবে কেন? রাগে জ্ঞানহারা হয়ে আমায় বেশ পিটিয়ে দিলেন ঘাকতক। পরের দিন সকালেই মা পাড়ি দিলেন সুইজারল্যাণ্ডের পথে। নিজের যা কিছু সম্পত্তি সব ছেড়ে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে টেবলের ওপর খোলা চিঠি পেলাম :

জুলি,

আমি চিরদিনের মত তোমায় ছেড়ে সুইজারল্যান্ড চলে যাচ্ছি। তুমি যখন আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ তখন আমি আর কার ভরসায় ওখানে থাকব? আমার অল্প যা ছিল তা সবই প্রায় রেখে গেলাম। তিন হাজারের একটা বিয়ারার চেক দেরাজে রেখে গেলাম। এটা তোমার অসময়ে কাজে লাগবে। রবার্টকে এ বিষয়ে কিছু বোল না—ছেলেটা মোটেই ভাল নয়। ওর হাতে এ পয়সা গেলে, উড়িয়ে দেবে। মুক্তোর একটা নেকলেস রেখে গেলাম। ভেবেছিলাম যেদিন তোমার বিয়ে হবে সেদিন এটা নিজের হাতে তোমায় পরিয়ে দেব। কিন্তু— এটা তোমার জন্যই রেখে-ছিলাম তাই নিয়ে গেলাম না। এখনও সময় আসে রবার্টের কাছ থেকে সাবধানে থাকবে। আমি দিন দুনিয়া দেখেছি, ঠোককর খেতে পার—ধোঁকা খেতে পার। রবার্ট তোমায় ধোঁকা দেবে। যেশাস করুন তা যেন না হয়।

তুমি যখন ঘুমচ্ছিলে তোমায় শেষ-বারের মত চুমু খেয়ে এসেছি। যখন তুমি ঘুম থেকে উঠবে তখন আমি আকাশপথে অনেক দূরের যাত্রী......

—তোমার মা।

মিসেস রবার্টের চিঠি পড়া শেষ হলে জিজ্ঞাসা করলাম : তাহলে এটাই কি সেই মুক্তোর মালা? দিল্লীর জুয়েলার্স ভগবান দাসের কাছে বাঁধা রেখেছিলেন মিস্টার রবার্ট মাত্র দু হাজার টাকায়। এখন এটাকে ছাড়াবার কোন ব্যবস্থা করছেন না। সুদের টাকাও ভগবানদাস পায়নি। ছ মাসের বন্ধকি মেয়াদ আর কিছুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এই ব্যাপারেই আমি মিস্টার রবার্টকে বলতে এসেছিলাম যে নিজের গচ্ছিত মাল ছাড়িয়ে নিন— তা নাহলে, আইনত আর কিছু করার থাকবে না।

—হ্যাঁ। এটাই সেই নেকলেস। আমার মার শেষ স্মৃতিচিহ্ন। জুলি অনেকটা যেন আত্মস্থ হয়ে বলেন : রবার্ট আমায় একটা প্ল্যানের কথা বলে যে, আমার তা খুব ভাল লাগে। নেকলেসটা ও আমায় দিতে বলল। ওটা বন্ধক রেখে কিছু টাকা নেবে। পাঁচ হাজার টাকা দেবে ওর এক বন্ধু। এই সব টাকা নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে ও একটা ধূপের কারখানা খুলবে। ব্যাংক থেকেও টাকা লোন নিয়ে ওটা বড় করবে। মাল বিদেশে একসপোর্ট করবে কিন্তু—কিন্তু সিকস মান্থস পাসড। ও এখন পর্যন্ত কিছুই করেনি ম্যান। আমার মুক্তোর মালাও আটকে দিল। মা যে টাকা দিয়ে গিয়েছিল তাও শেষ হতে চলল। কি করব বুঝতে পারছি না। অথচ রবার্ট বলে গেছে আমি যেন কিছু না করি, বাইরে না বের হই, ডান্স না করি। রবার্ট আমায় খরচ পাঠাবে বলেছিল; পাঠায়নি। বলেছিল যখন গুছিয়ে বসবে তখন বাড়ী নেবে, আমায় নিয়ে যাবে। ভগবানদাসের রেজিস্ট্রি চিঠি পেলাম—সঙ্গে সঙ্গে ওটা রবার্টের কাছে পাঠিয়ে লিখলাম :

ওটা আমার মার শেষ স্মৃতিচিহ্ন, ছাড়িয়ে আমায় দাও। তা না হলে আমি তোমার ওপর নারাজ হব। তোমার সঙ্গে কখনও কথা বলব না—কখনও দেখা করব না......

মিসেস রবার্ট এবার হুহু করে কেঁদে উঠলেন।

এরপর আমি কোন কথা না বলে ওকে বিশ্রাম নিতে সময় দিলাম। ক্ষণিক বিশ্রাম প্রয়োজন।

কিছুক্ষণ পর ঘরের বেদনাদায়ক মৌনতা ভঙ্গ করে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি ও'র কাছে এখনও জানতে চাননি যে এই ছ মাস ধরে উনি ওখানে কি করছেন?

—হ্যাঁ। জানতে চেয়েছি বৈকি। লেটার দিয়েছি। একটা নয়—বোধহয় কয়েক ডজন। জবাবে কি পাই দেখবে? দাঁড়াও দেখাচ্ছি এখুনি ...

জুলি উঠে দাঁড়ালেন। উত্তেজনায়, নেশায় সমস্ত শরীর যেন টলছে। চোখ মুখের অবস্থা বিমস্ত। ক্লান্ত, অবসন্ন চেহারা। কোন একটা টেবলের ডয়ার থেকে চিঠিপত্রর একটা বান্ডিল নিয়ে এলেন। বান্ডিল খুলে সবকটি চিঠি খাটের ওপর আমার সামনে বিছিয়ে দিলেন। বললেন : দেখো তো। এগুলো চিঠি না কি মাথা-মুণ্ডু। প্রত্যেকটাতেই এক কথা লেখা। আসল কথা যা জানতে চাই তার কোন জবাব নেই।

দেখলাম চিঠিগুলো। তাজ্জব বনে গেলাম আমি। আশ্চর্য। চিঠিগুলোর ভাষা সবই প্রায় এক :

প্রিয়তমা জুলি,

আশাকরি ভাল আছ। এখানে কাজ চলছে। ঠিকঠাক হয়ে গেলেই তোমায় গিয়ে নিয়ে আসব। নিজের হেলথের দিকে নজর রাখবে। তোমা বিনা এখানে একদম ভাল লাগে না আমার। কিন্তু কি করি বল? ভবিষ্যতের জন্য কিছু তো করা দরকার। তাই— তাড়াতাড়িতে লিখছি। বিস্তারিত পরের চিঠিতে।

—তোমার রবার্ট

এই তো চিঠি। আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। মনে হল, ব্যাপারটা রহস্যময়। ব্যাপার যাই হোক না কেন, রবার্ট পরিষ্কার জুলিকে ঠকাচ্ছে; ওর সরল মনের—রবার্টের প্রতি ওর অন্ধ ভালবাসার সুযোগ নিয়ে ওকে সর্বশান্ত করছে।

আজকের দুনিয়ায় জুলির মত এমন আত্মভোলা, সরল মেয়ে বোধহয় খুব কমই দেখা যায়। তাই ওর প্রতি আমার রাগ হল না—জাগল সহানুভূতি। ওর মত ফেমাস ক্যাবারে ডান্সারও তাহলে এক-আধ জন দৈবাৎ দেখা যায়। আশ্চর্য। কি গভীর বিশ্বাস। আজও জুলি রবার্টের পথ চেয়ে বসে আছে। অথচ পাষণ্ড রবার্ট তাকে দিনের পর দিন ঠকিয়ে যাচ্ছে। ওর অন্ধ অটল প্রেমই এজন্য দায়ী। যদি আমি বলি রবার্ট অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে এখন—তাহলে জুলি হয়ত আমাকে এখুনি তাড়িয়ে দেবে। বলবে—গেট আউট।

শুনেছি বিদেশে পতি পত্নীর ছোট-খাটো কথায়, মতান্তরে মনান্তরে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। তালাক দেওয়া ও-সব দেশে কোন ঘটনাই নয়। এ ব্যাপারে জুলি আশ্চর্য ব্যতিক্রম মনে হল। ভাবতে লাগ-লাম কেন এমন হল? ওদের মধ্যে এরকম তো হবার কথা নয়। অথচ বাস্তবে তাই হয়েছে। কেন? কি কারণ? শংকা সন্দেহের দোলায় হঠাৎ একসময় জিজ্ঞাসা করে ফেললাম।

—ম্যাডাম আপনার জন্ম কোথায় হয়েছে?

—এখানেই, আই মীন, ইন ইন্ডিয়া। বাট হোয়াই?

—এমনি, জানতে ইচ্ছা হল।

সত্যি বলতে কি, অর্থহীনভাবে ওকথা জানতে আমি চাইনি। একটা সংশয়ের বিষয় আমি অশ্বস্ত হলাম। জুলি বিদেশিনী নন। আমাদের দেশের জল-হাওয়ায় এমন একটা গুণ আছে, কেন জানি না, পতি পত্নীর সম্পর্ক এখানে অচ্ছেদ্য। যে কোন মেয়ে, যে কোন নারী স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ কল্পনা মাত্রেই পাপ জ্ঞান করে।

মনে হল, জুলিও তার ব্যতিক্রম নন। এখানেই জন্মেছেন, এ দেশের জল মাটি আলো বাতাসের গুণে উনি যদি এমনই পতিব্রতা হয়ে থাকেন তাতে অবাক হবার কি আছে?

ভাবছি, রবার্ট যদি জুলিকে চিঠিপত্র দেওয়ায়ও বন্ধ করে, সব সম্পর্ক ত্যাগ করে তাহলে কি উনি আবার ডান্সিং-এ ফিরে যাবেন? রবার্টকে বুঝতে, চিনতে এখনও এর এত দেরী কেন? এমন সময় আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল জুলির প্রশ্নে : তুমি কি রবার্টকে দেখেছ কখনও?

—না। দেখিনি।

—এটাই সম্ভব। জান, রবার্ট প্রচণ্ড হ্যান্ডসাম দেখতে। এত ম্যানলি, লাভলি, ম্যান আজো দেখিনি। দাঁড়াও ওর ফোটো দেখাচ্ছি।

মিসেস রবার্ট এবার কেমন যেন হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠলেন। আলমারি থেকে একটা অ্যালবাম বার করে আনলেন। প্রচুর ছবি, বিভিন্ন মুদ্রায়, বিভিন্ন পরি-বেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ছবি। সত্যি সুপুরুষ রবার্ট।

সত্যি সুপুরুষ আপনার হাসব্যান্ড।

আমার মুখে রবার্টের প্রশংসা শুনে জুলির অর্থাৎ মিসেস রবার্টের চেহারায় প্রসন্নতার আভা দেখা গেল।

এবার হাতঘড়ি দেখে চমকে উঠলাম। রাত সাড়ে আটটা। তাড়াতাড়ি হোটেলে ফেরা দরকার। খাওয়া-দাওয়া তেমন করতে পারিনি। নতুন জায়গা। অথচ জুলির কথাগুলো, ওর জীবনের ব্যর্থ করুণ প্রেমের কাহিনী শুনতে শুনতে মজে গিয়েছিলাম। এখন আর খারাপ লাগছিল না।

আমার ঘড়িতে সময় দেখা লক্ষ্য করে মিসেস রবার্ট বললেন : ঘড়ি দেখছেন কেন? আমার সঙ্গে ডিনার খেয়ে ফিরবেন। তুমি আমার স্পেশ্যাল গেস্ট। এত কথা আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি—কেউ জানে না কি ভয়ানক আগুন বুকে চেপে আমি তিল-তিল পুড়ে যাচ্ছি— তোমাকে ভাল লাগল বলে ফেললাম। মুখ বুজে থাকতে ভীষণ কষ্ট হত—কিন্তু কাকে বলি......

—ম্যাডাম আপনি সত্যি গ্রেট। অসাধারণ, মহৎ...

—কেন, কেন এমন কথা বলছেন?

—কারণ, আপনার জায়গায় অন্য যে কোন মহিলা হলে এতদিনে ওকে ডাইভোর্স করে দিত, মামলা ঠুকে দিত।

কথাটা মিসেস রবার্টের ভাল লাগল না।

ক্ষণিক আগের প্রসন্নময় বদন একথায় হঠাৎ কেমন যেন ফ্যাকাসে, উদাস হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুকে আঙ্গুল দিয়ে 'ক্রস" এঁকে বললেন : ওহ্ মাই গড! আমি একথা ভাবতেও পারি না; স্বপ্নেও না।

ওর জবাবটা আমারও ভাল লাগল না। নানান প্রশ্ন মাথায় আসতে লাগল। জুলির মা মেয়েকে ছেড়ে সুইজারল্যাণ্ডে কেন চলে গেলেন? ওখানে এদের কে আছে? এই বুড়ো বয়সে উনি কার ভরসায় ওখানে থাকবেন? কথায় কথায় জেনেছি, বিয়ের আগে জুলির মা ছাড়া ওদের সংসারে আর কেউ ছিল না। তাহলে সুইজারল্যাণ্ডে কোন্ আকর্ষণে গেলেন তিনি। কি সে আকর্ষণ যেখানে একমাত্র নিজের পেটের মেয়েকে এ অবস্থায় ফেলে যেতে হল? এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে এক সময় জিজ্ঞাসা করে ফেললাম :

—সুইজারল্যাণ্ডে আপনাদের কে আছেন।

—না। ওখানে আমাদের কেউ নেই। কেন? হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন আপনার?

—না, এমনি। তাহলে আপনার মা কার ভরসায় থাকবেন ওখানে? এই বুড়ো বয়সে...

হো হো করে জুলি হেসে উঠলেন আমার কথা শুনে : ওহ্ মাই গড। সি আই ডির মত তোমার প্রশ্ন করা দেখে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

হাসি থামিয়ে বললেন : না—সুইজারল্যাণ্ডে আমাদের কোন রিলেটিভ্ নেই। মা তার বয় ফ্রেণ্ডের কাছে গেছে।

—বয় ফ্রেণ্ড! এবার ঘাবড়াবার পালা আমার। চোখে মুখে আপনি বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। এবং ঐ বিস্ময় আমার মুখ দিয়েও বেরিয়ে এল : বুড়ো বয়সে বয়ফ্রেণ্ড! এটা কি রকম!

আমার হতচকিত ভাব দেখে জুলি মুচকি হেসে বললেন : —ইয়েস! মাই মাদার ইজ কোয়াইট ইয়াং...

বয়েস মাত্র বিয়াল্লিশ—বাট চেহারায়, আই মীন দেখতে সুইট টোয়েন্টিফাইভ। স্মার্ট। পূর্ণ যুবতী। মার বয়ফ্রেণ্ড মিঃ জন আজও বিয়ে করেন নি। তিন কুলে কেউ নেই—মাম্মীকে দারুণ লাইক করে। রেগুলার চিঠি লিখত। আমার ড্যাডী যখন বেঁচে তখন একবার এসেছিল। মা অবশ্য আগেই বলেছিল, আমার বিয়ে হয়ে গেলে জনের কাছে গিয়ে থাকবে...

—যাক। সে একরকম ভালই হয়েছে।

—শুধু ভাল নয়, খুব ভাল। কারণ মা জনের কাছে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই ছিল—শুধু আমার স্টেবিলিটির জন্য ওয়েট করছিল। আমাদের বিয়েটা সলেমনাইজড হতে যা বাকি ছিল...তার আগেই রবার্টের কথায় মা এমন জড়িয়ে পড়েছিল যে, কিছু করতে পারছিল না—আমার ওপর রাগ করে চলে যাওয়া তো একটা অজুহাত মাত্র...

—একটা কথা জানতে চাই...

—না, না—একটা কেন, যত খুসী।

—রবার্টের সংসারে কে কে আছে।

—কেউ নেই। বেচারা একদম একলা।

—হুঁ! আরো একটা কথা—আপনারা থাকেন কলকাতায় অথচ মুক্তোর নেকলেস বাঁধা দিলেন দিল্লীতে; ব্যাপারটা কেমন যেন মনে হচ্ছে না? বিশেষ করে কলকাতায় যখন অনেক ভাল ভাল জুয়েলার্সরা বন্ধকী কারবার করে থাকে...

—রবার্ট বলেছিল, দিল্লীতে ওর এক পুরনো বন্ধুর জুয়েলারের কারবার আছে। ওর কাছে বন্ধক রাখলে সবদিক দিয়ে নাকি নিরাপদ। তাই...ওর কাছে বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে ওখান থেকেই ব্যাঙ্গালোরে যাবে।

—ও। মিস্টার রবার্ট ঠিকই বলেছেন; ভগবানদাস অবশ্য ওদের সম্বন্ধে কথা আমায় তেমন কিছু বলে নি। বললে বা আমি আগে জানলে এই কাজ কখনই নিতাম না। খামোখা আপনাকে কষ্ট দিলাম মিসেস রবার্ট!

—না- না! কষ্ট কি। কোন কষ্টই আপনি দেন নি। বরং ভালই হল মনপ্রাণ খুলে কথা বলতে পারলাম—নিজের দুঃখ কিছুটা তো হাল্কা হল।

কথাগুলো বলে মিসেস রবার্ট কেমন যেন উন্মনা হয়ে গেলেন। খানিক চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন আস্তে আস্তে। মনে হল যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা ক্লান্ত এক পাখীর স্বর : কি জানেন মিস্টার শর্মা! আসলে আমিই ওকে ভীষণ ভালবাসি। ও হয়ত আমায় অত ভালবাসে না। ওর এধরনের কাজের, ব্যবহারের কোন মানে আমি খুঁজে পাই না। তবু আমি ঠিক যেন ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলে একটা আংটি দেখিয়ে বললেন : এই দেখুন ওর দেওয়া এনগেজমেন্ট রিং. প্রায় মাস ছয়েক আগে পরিয়েছিল—বলেছিল খুব শিগগিরই ম্যারেজ সলেমনাইজ করবে। আগে ব্যবসাটা গুছিয়ে নিয়ে পাকা করে নি। তারপর এসে সব করব। হনিমুনে যাব প্যারিসে... কি করে জানব বলুন যে ওর কাছে বর্ধমান যাবার পয়সাও ছিল না।

ও এত নিঃস্ব। স্রেফ বড় বড় কথা বলে গেছে...

দেখলাম, রবার্টের ওপর অভিযোগ আছে জুলির তবে তা ফুৎকারে উড়ে যেতে পারে। আপাততঃ অভিমানটাই বড় হয়ে দেখা যাচ্ছে: অদ্ভুত এক ভালো ভাল-বাসা। কোথায় যেন পড়েছিলাম: ভালবাসা পাখির চোখ দুটি অন্ধ--ওরা কিছু দেখতে পায় না। মিসেস জুলি রবার্টও তাই। বর্তমান যুগে এমনও দেখা যায় তাহলে! খুবই অবাক হলাম আমি। কিন্তু এ এমন এক সমস্যা যাতে আমার করণীয় বলতে কিছুই নেই।

সাড়ে নটা বাজতে চলল। এবার না উঠে উপায় নেই। হোটেলে তাড়াতাড়ি ফিরতেই হবে। মিসেস কিছু বলার আগেই আমি উঠে দাঁড়ালাম : এবার কিন্তু আমায় উঠতেই হবে।

কলকাতা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন জায়গা। পথঘাট চিনি না—জানি না। ভয় হচ্ছে, এত রাত হয়ে গেল, বিপদে না পড়ি!

উনিও উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে দোর-গোড়া অবধি এগিয়ে দিতে দিতে বললেন : কলকাতায় যদি থাকেন কিছুদিন তাহলে আবার আসবেন এখানে।

—দেখব'খন! যদি থাকি, নিশ্চই আসব। কিন্তু, নাঃ' যে কাজের জন্য কলকাতা আসা তা দুদিনের মাথায় শেষ হয়ে গেল। এবং আমাকে সেই রাতেই দিল্লী ফিরতে হল।

মাস দুয়েক বাদে হঠাৎ ভগবানদাসের সঙ্গে দেখা হল আমার। কনট প্লেসে। রবার্ট প্রসঙ্গে ও জানাল : দিন দশ-বারো আগে রবার্ট এসে মুক্তোর নেকলেসটা আমায় ফাইনালি বেচে কিছু টাকা নিয়ে আবুধাবি রওনা হয়ে গেছে! মিসেসের কথা বলতে রবার্ট বলল, ওরকম অনেক মেয়েই ওর পথ চেয়ে বসে আছে। ওর মতে : মেয়েরা ভোগের বস্তু। ভোগ কর, মৌজ কর। ওসব প্রেমটেম সব ফালতু!

আমি চমকে উঠলাম। প্রচণ্ড আঘাতও পেলাম। কিন্তু কেন? কেন বলতে পারব না—তবে, ঐ কনট প্লেসের জনবহুল জায়গায়, দিনদুপুরে, জুলির সরল করুণ মুখখানা জ্বলে জ্বলে করে ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। কোন কথা বলতে পারি নি ভগবানদাসকে।

জানি না, জুলি এখনও রবার্টের পথ-পানে চেয়ে বসে আছে কিনা।

অনুবাদ : আনন্দ ভট্টাচার্য

সন্ধ্যা প্রহরে

ইব্রাহিম শরীফ

আজকের সন্ধ্যাও তার কাছে ফাঁকা লাগছে...অন্যান্য সন্ধ্যার মত। সে বিছানায় পড়ে কিছুক্ষণ আলস্যে কাটায়। কোনো প্রোগ্রাম তৈরী করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিশেষ কিছু খুঁজে পায় না। দু-একবার পাশ ফেরে। কয়েক মুহূর্ত ছাদের দিকে চেয়ে দেখে। হাল্কা ধরনের সিনেমার গানের কলি ভাঁজে। তবুও মনে হয়, মগজ তার ফাঁকা...ঠিক আজকের সন্ধ্যের মত।

সে খাট থেকে উঠে পড়ে। বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধোয়। ফিরে এসে প্রমাণ-সাইজের আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বহু-ক্ষণ ধরে চুল আঁচড়ায়। মুখে মহার্ঘ পাউডার ঘষে। পোশাক পাল্টায়। আলমারি খোলে। পাঁচ টাকা ও এক টাকা নোটের দুটো বান্ডিল পকেটে রাখে। গলায় গানের কলি গুনগুন করে। তবুও মনে হয়, তার মগজে কোন বিশেষ ব্যাপার জেগে ওঠেনি।

তারপর সে জুতোর ফিতে বাঁধে। দেরাজ থেকে চাবির গোছা নিয়ে, দরজা খুলে বাইরে বেরোয়। চাকরকে ডাকে। গ্যারেজ খোলে। গাড়ী বার করে। উঁচু গলায় বোনকে উদ্দেশ্য করে বলে—রিনকী, মা-কে বলে দিস, আমি বাইরে বেরোচ্ছি... ঘন্টাখানিক বাদে ফিরবো... সামান্য দেরীও হতে পারে। ও, কে...। গাড়ী স্টার্ট দেয়। বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে।

রাস্তায় বেশ ভিড়...সন্ধ্যের ভিড়। সে আবার মনে করার চেষ্টা করে। তবুও তার মগজ ফাঁকা বোধ হয়। গাড়ীর গতি কিছুটা তীব্র করে: ভিড়কে সচকিত করে, নিজেকে সামলে নিয়ে কোন রকমে সে এগিয়ে যেতে থাকে।

এখন সে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা প্রশস্ত রাস্তায়। মুহূর্ত খানিকের জন্য রাস্তার মাঝখানে গাড়ী থামিয়ে দেয়। পাশ দিয়ে পথচারী মেয়েদের চকিত দৃষ্টিতে দেখে। কিছু মনে করার চেষ্টা করে। তার মনে হয়, মগজ এখনও সেরকমই ফাঁকা। সে এগিয়ে যায়। অনতিদূরে রাস্তার মোড়। গাড়ী বাঁক নেয়। আবার সেই রাস্তায় ফিরে আসে, যেখান থেকে সে গিয়েছিল।

এবার [illegible] একটা গানের কলি ভাঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু, আকস্মিক কিছুই মনে পড়ে না তার। গাড়ীর গতি, বাড়িয়ে দেয়। পাশের রাস্তায় বাঁক নেয়। গতি হ্রাস করে। এযাবৎ তার কোন ভাল গান মনে পড়ে নি। দ্বিতীয়বার গাড়ীর গতি বাড়ায় দু-একটা মোড়ে বাঁক নেয়।

সে নিজেকে এক সময় আবিষ্কার করে, কনট প্লেসে ঢুকে পড়েছে। এরি মাঝে তার একটা জমকালো গান মনে পড়ে। কিছুটা উঁচু পর্দায়, কাঁপা-কাঁপা স্বরে সে গাইতে থাকে। গানের মাঝে তার মনে হয় কোন কথা বুঝি মগজে ভেসে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর গতি হ্রাস করে। ইতঃস্তত কিছু হাতড়ানোর দৃষ্টিতে দেখে। একটা বড় দোকানের সামনে গাড়ী পার্ক করে। চাবির গোছা নাচাতে নচাতে হাঁটতে শুরু করে।

কনট প্লেসের মাঝামাঝি ছড়িয়ে থাকা পার্কে গিয়ে ঢোকে। সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে। পার্কের চারধারে ইতস্তত লোকেরা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছোট ছোট বৃত্তে বসে ছিল। বিশেষ কারও প্রতি সে তেমন দৃষ্টি দেয় না। একই ভঙ্গিমায় চাবির গোছা নাচাতে নাচাতে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারী করে। অবশেষে পার্কের একটা কোণ বেছে বসে পড়ে।

তার মনে হয়, মগজে কিছু একটা কটকুট করতে শুরু করেছে। সে সামান্য উৎসাহ বোধ করে, চাবির গোছা পকেটে রাখে, তারপর ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। সন্ধ্যে কিছুটা ঘন হয়ে আসে। শুয়ে শুয়ে সে আকাশের এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত দেখে। বাতাসে হাল্কা, ফুরফুরে ভাব। সহসা তার নজরে পড়ে, আকাশে বোহিসেবী পাখীর ঝাঁক কোলাহল করতে করতে উড়ে যায়। কিছুক্ষণ সে ঐ অচেনা পাখীদের চেনার চেষ্টা করে: এবং চিনতে পারে, তারা টিয়া। তার বস্তুতঃ ভাল লাগে। দারুন উৎসাহে সে উঠে বসে। টিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিও অনুসরণ করে।

ক্রমাগত কিছুক্ষণ সে কলরব-মুখর পাখীদের দেখা তার একঘেয়েমি ধরনের মনে হয়। সে কোন টাটকা গান মনে করার চেষ্টা করে। আবার শুয়ে পড়ে। তখনি তার মনে হয় কোন একটা ব্যাপার তৈরী হতে হতে তার মগজ থেকে বেরিয়ে পড়ে। সে হাত-পা শিথিল করে শুয়ে থাকে।

দ্বিতীয়বার পাঁচ-সাত মিনিট সবে পেরিয়েছে, এমন সময় তার সামনে বারো-তেরো বছরের রোগাটে একটি ছেলে এসে দাঁড়ায়। ছেলেটার জামা-পাৎলুন অসম্ভব ময়লা, এবং কাঁধে একটা নোংরা থলে ঝোলানো। ছেলেটা কিছুক্ষণ তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। সে ছেলেটার দিকে কোন মনোযোগ দেয় না। শেষে ছেলেটাই অনুনয় স্বরে বলে—বাবু, পালিশ...?

তবুও সে কোনো মনোযোগ দেয় না। একই ভাবে শুয়ে আকাশের দিকে অনু-সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। কিছুক্ষণ আগে আকাশে উড়ে বেড়ানো বোহিসেবী টিয়ার ঝাঁক এখন কাছে পিঠে গাছের উপর এসে বসেছে। কয়েকটা টিয়ার ছানা ডালের উপর বসে কর্কশ করছে এবং দু-

একবার সামান্য উড়ে বেরিয়ে আরেক ডালের উপর গিয়ে বসছে।

এসব দেখতে তার ভাল লাগছিল। একই ভঙ্গীতে শুয়ে ভাবে, সম্ভব হলে, দু-একটা টিয়ে বাড়ীতে পোষা যেত। ভাবে, পাখীদের কথা বলাও শেখাবার চেষ্টা করতো। এমনকি গাড়ীতে চাপিয়ে বেড়াতে নিয়ে বেরুতো।

তার এভাবে অচঞ্চল থাকা ছেলেটার কাছে অদ্ভুত লাগে। সে দ্বিতীয়বার একই স্বরে বলে—পালিশ, সা'ব...। মাত্র পনরো পয়সা...। জুতো চকচকে করে দেবো...।

এবার সে ছেলেটার কথা শুনতে পায়। শোয়া অবস্থায় তার দিকে ঘাড় ফেরায়। ছেলেটাকে ভাল করে লক্ষ্য করে। তারপর হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডেকে বসায়। ছেলেটার দিকে পাশ ফেরে। কিছুটা রোয়াবী স্বরে বলে—কি রে ছোঁড়া, তুই কি শুধু পালিশ করিস, না কি অন্য কিছুও?

তার এই প্রশ্ন ছেলেটা বুঝতে পারে না। সে তার দিকে ভাল করে দেখতে থাকে। ছেলেটার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে সে ঝট করে উঠে বসে, এবং কিছুটা ক্রুদ্ধ স্বরে বলে—কিরে ছোঁড়া, জবাব দিচ্ছিস না যে....? মদ আনতে পারবি? তোকে একটা টাকা দেবো...

এই কথা শুনে ছেলেটা মুহূর্তখানিক ভ্যাবাচ্যাকা খায়। তারপর কিছুটা সামলে নিয়ে বলে—বাবু। এখানে পুলিশেরা...।

সে ছেলেটাকে ধমকে দেয়—যা, শালা। পুলিশের নিকুচি করি........। বল, তুই মদ আনতে পারবি কিনা.... (দু টাকা দেবো....

দু টাকার কথা শুনে ছেলেটার মাথা ঘুরতে শুরু করে। দু' টাকা তার পক্ষে অনেক। গত দেড় বছর ধরে সে জুতো পালিশ করে আসছে, এ রকম কাঁধে থলে ঝুলিয়ে, কিন্তু কোনও দিন তার দু' টাকা আয় হয়নি। এই কাজ শুরু করার পর সে, গোটা দিন শহরের যে কোন অংশে ঘুরে বেড়াক না কেন, সন্ধ্যের সময় কনট প্লেসের এই পার্কে ঠিক চলে আসে। সেখানে বিশ্রামরত, বায়ুসেবী, আলাপচারী লোকেদের মাঝে ঘুরে বেড়ায়। এমনিতে, প্রতি সন্ধ্যে কম করেও দু-চারটে খদ্দের জুটে যায় এবং প্রতি সন্ধ্যে ষাট-সত্তর পয়সা আয় করে। কনট প্লেসের এই সন্ধ্যের তার এক সঙ্গীও আছে। সেও প্রায় তারই সমবয়সী, এবং একই কাজ করে। এরা দুজনেই রাত নটা ওব্দি ঘুরে বেড়িয়ে পালিশ করে, এবং বাড়ী যাবার আগে দুজনে এক স্থানে একত্রে মিলিত হয়. একসঙ্গে বিড়ি টানে এবং নিজেদের সারা দিনের আয় হিসেব-নিকেশ করে। যদিও দুজনে কাজ একই ধরনের, তবুও কি আশ্চর্য, তাদের মাঝে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

ছেলেটাকে কোন জবাব দিতে না দেখে তার রাগ ধরে। আগের মতই সে রোয়াবি গলায় ও রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—আ্যাই, বল, পেঁচার মত জুলে জুলু করে আমায় কি দেখছিস! মদ আনাতে পারবি কিনা বল....? না হলে সোজা কেটে পড় এখান থেকে।

ইব্রাহীম শরীফ (৩৮) অন্ধ্র প্রদেশে জন্ম। অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লী। শান্তিনিকেতন থেকে বি-এ (অনার্স) এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ (হিন্দী)। ইব্রাহীম শরীফ, ধর্ম, নামে এবং শ্লোগানের নামে বজ্জাতি সহ্য করতে পারেন না। ভাবনা এবং ক্রিয়াকর্মে সমাজবাদী। 'অ্যাকশন' এবং 'সিস্টেম'-কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। এই কারণে নিজেকে জনসাধারণের খুব কাছাকাছি মনে করেন। এ'র গল্প নিজের অভিজ্ঞতার ফসল।

অদ্যাবধি একটি উপন্যাস একটি গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত। বর্তমানে কেরালায় একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন।

ছেলেটা তাকে ভাল করে লক্ষ্য করে। তার চোখে বাস্তবিক ক্রোধ ছিল। ছেলেটা এখনও সঠিক বুঝতে পারে না তাকে কি জবাব দেবে, দু টাকা দেবার ব্যাপারটা যদিও তার কাছে আকর্ষণীয়, কিন্তু, অদ্যাবধি সে কারো কাছ থেকে মদ কেনে নাই। কেনা কেন, সে অদ্যাবধি মদ দেখে নাই। যদিও, মদ সম্পর্কে নানা ধরনের কথা সে শুনেছে। পাড়ার রামুকাকাকে জানে, প্রতিরাতে কাজ থেকে ফেরার পথে মদ খেয়ে আসত এবং নেশার ঝোঁকে অনেক খারাপ-খারাপ গালাগালি দিয়ে পাড়ার সবকটা কুকুরকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। রামুকাকাকে অবশ্য সে ভয় করত, আসলে সে কুকুরদের ভয় করত বেশী। ভাবত, যে লোকটা মদ খেয়ে এমন ভয়ংকর কুকুরদের নাচিয়ে বেড়ায়, সে নিজে না জানি কত ভয়ংকর। তার ছোট্ট ভাবনায় এমন সংকটে যাবতীয় দোষ মদের মাথায় চাপিয়ে দিত এবং সিদ্ধান্ত করত, রামুকাকা ভয়ংকর এই কারণে যে সে প্রতি সন্ধ্যায় মদ খায়।

এইসব ব্যাপার ভেবে ছেলেটার মনে হয় তার সামনে বসে থাকা লোকটা সেই রকম ভয়ংকর হতে পারে। পাড়ার কুকুরগুলোর চেয়েও ভয়ংকর ভীতিপ্রদ মনে হয়। ছেলেটা ভাবে, সে তার জন্য মদ কিনে আনতে পারবে না। বেশ বিনীত স্বরে বলে—বাবু ...আমার বড্ড ভয় করে।

ছেলেটার একথা তার পক্ষে অপ্রত্যাশিত নয়। তবুও লোকটার রাগ ধরে। ঐ রাগান্বিত অবস্থায় সে তড়াক করে উঠে বসে, এবং বাঁ পা সামান্য ওপরে তুলে দিয়ে বলে—শালা, পাছায় এমন একটা লাথি ঝাড়বো যে রাস্তায় গিয়ে পড়বি...। ভয় করে! তবে বেটা এখানে দাঁড়িয়ে কেন...? যা ভাগ, এখান থেকে...। ছেলেটার প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে সে বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখায় না। চুপচাপ আবার ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে, আগের মত চিৎ-অবস্থায়।

তার তীব্র ধমক খেয়ে ছেলেটার মন খারাপ হয়ে যায়। অপ্রত্যাশিত রুক্ষ ব্যবহারে ছেলেটা আশ্চর্য হয় এবং সামান্য ক্রুদ্ধও। সে নিজের জায়গা থেকে সামান্য পেছনে সরে মুহূর্তখানিক লোকটাকে আগাপাশতালা দেখে, তারপর ছোট ছোট পা ফেলে সেখান থেকে রওনা দেয়। এরকম মনে হয়, লোকটা বুঝি তাকে খামোকা বকুনি দিয়েছে। তার এও মনে হয়, উচিৎ ছিল লোকটাকে শক্ত-কড়া ভাবেই এসবের জবাব দেয়া। কিন্তু সে জানে, সে একা এবং ভয়ংকর লোকটার তুলনায় সে খুবই দুর্বল। এই জন্য সে নিজেকে যেন তেন বোঝাতে থাকে, ভয়াবহ লোকটার কথায় কোন জবাব না দিয়ে সে বেশী ভুল করেনি। নইলে, এটা নিশ্চিত যে সে মার খেত এবং লোকেরা পার্কে এই অবস্থায় দেখে তাকেই বকুনি-মারধোর করত। এই সব ভেবে তার মন আরও ভারি হয়ে পড়ে, তার চলনে তেমন গতি দেখা যায় না।

ছেলেটা সবে পনেরো-কুড়ি পা এগিয়েছে, এমন সময় লোকটা পেছন থেকে ডাকে—আ-বে, এ্যাই ছোঁড়া..। এদিকে আয়...। ছেলেটা ফিরে তাকায়। লোকটা তার দিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে এবং তারই দিকে চেয়ে হাতের ইশারা করছে। ছেলেটার ক্ষণকাল ইচ্ছে জাগে, সেখান থেকে সেই লোকটাকে কোন তাগড়া গালাগাল দিয়ে দৌড়ে পালায়। কিন্তু সে যদি আরও ক্ষীপ্র বেগে দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলে, তাহলে? সাংঘাতিক ধুনোপেটা করে ছাড়বে। মাতালদের কিসের ভরসা? ছেলেটা সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে থাকে তারপর সাহসে বুক বেঁধে ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে যায়।

ছেলেটা তার কাছে পৌঁছুবার আগেই, লোকটা উঠে বসে এবং সামান্য মিষ্টি ও নিম্নস্বরে বলে ...শোন চার টাকা দেবো, আনবি? আরও লাগলে, বল........যত চাই, দেবো...।

ছেলেটার কাছে এ যেন অগ্নিপরীক্ষা। নতুন করে আবার তার মাথা ঘুরতে শুরু করে। পাঁচ টাকা, নাকি আরও বেশী.. যত চাই মানে কত? তার মনে হয় বড়লোক হয়ে পড়া এখন তার হাতের মুঠোয়, তাও একটা সামান্য কাজের জন্য। কিন্তু,

মদ আনা সামান্য কাজ নয়। অথচ, পাঁচ টাকা...দশ টাকা ও সামান্য পয়সা নয়। তার মনে হতে থাকে, দশ টাকার একখানি নোট যেন তার চোখের সামনে কর্কর করে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে! কিছুক্ষণ সে সেই নোটের স্বপ্নে ডুবে থাকে. তারপর সহসা চমকে উঠে বলে—বাবু...এই মদ কোথায় পাওয়া যায়...?

লোকটা বুঝতে পারে, ছেলেটা এবার ধরা পড়েছে। পকেটে হাত সেঁধিয়ে পাঁচ টাকার বাণ্ডিল বার করে এবং সেই ভাবে শোয়া অবস্থায় দ্রুত হাতে আট-দশখানা নোট গুনে বিচ্ছিন্ন করে। তা থেকে উদাসীনভাবে ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে—এই নে টাকা...রীগ্যাল সিনেমা দেখেছিস...ওর কাছেই মদের দোকান আছে ....সেখানে গিয়ে বলবি একটা পাইন্ট দিতে ...যে কোন মাল...বুঝেছিস?

ছেলেটা টাকার দিকে তাকায়। একবার তাকে দেখে। তারপর কাচুমাচু করে বলে—বাবু...দাঁড়ান। আমি এখুনি আসছি। আমার এক বন্ধু আছে...তাকে ডেকে আনছি। সেও সঙ্গে যাবে. তাহলে আমার ভয় করবে না... আমার থলেটা আপনি একটু দেখবেন। ছেলেটা তার পাশেই থলে রাখে, তারপর একদৌড়ে অন্যদিকে চলে যায়।

মিনিট দশ-বারো বাদে ছেলেটা যখন তার কাছে হাজির হয়, সঙ্গে আরেকজন ছেলে...তার মতই কালো, রোগা এবং হাড়-জিরে। নতুন ছেলেটার কাঁধে তার মত ময়লা দুমড়ানো থলে ঝুলছে। কিন্তু প্রথম ছেলে-টার সঙ্গে শেষের ছেলেটার পার্থক্য লক্ষিত হয়. যা তার চাল-চলনে ও চোখে-মুখে প্রকাশ পায় সামান্য চটপটে ও বুদ্ধিমান। নতুন ছেলেটা তার সঙ্গীর সঙ্গে সেখানে হাজির হয়ে দূর্ দৃষ্টিতে শুয়ে থাকা লোকটাকে ভাল করে চেয়ে দেখে। কাছে এগিয়ে ক্ষণকাল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, মিটি মিটি হাসতে-হাসতে হাত জোড় করে স্পষ্ট এবং উঁচু স্বরে বলে—নমস্তে বাবুজী আপনি একে কিছু আনতে বলেছেন...দিন টাকা... আমি এনে দিচ্ছি...

কেন জানি, এই ছেলেটির ব্যবহার লোকটার ভাল লাগে। এই ছেলেটার কথা-বার্তার ধরণ-ধারণেও সে সামান্য খুশী হয়। মুঠোয় বাঁধা নোট সেই ছেলেটার হাতে গুঁজে দেয়, তারপর কিছুটা আন্তরিক ভাব দেখিয়ে বলে—তোর বন্ধুটা ত এক নম্বরের গাধা...জানে না মদ কোথায় পাওয়া যায়। যা, এক দৌড়ে নিয়ে আয়... একটা পাইন্ট... যে কোন মাল, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবি।

নতুন ছেলেটা টাকা নেয়। কাঁধ থেকে থলে নাবায়। সেখানেই রাখে। তারপর সঙ্গীকে বলে—তুই এখানে থাক। আমি পাঁচ মিনিটে ফিরে আসছি। বলেই সে সেখান থেকে দৌড়ে যায়। প্রথম ছেলেটি কিছুক্ষণ তার সঙ্গীকে উৎসাহে দৌড়তে দেখে, তারপর সেই লোকটার জুতোর দিকে দৃষ্টি ফেলে ভাবে, যদি লোকটা পালিশ করিয়ে নেয়, তাহলে আরও কয়েকটা পয়সা পাওয়া যেতে পারে।

খুব বেশী হলেও পনরো মিনিট পেরোয়নি, সেই ছেলেটা দৌড়ে ফিরে আসে। তার ডান হাতে কাগজের পাতলা প্যাকেটে জড়ানো বোতল, যা সে জামার ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে। লোকটার কাছে পৌঁছেই ছেলেটা উৎসাহে জামার ভেতর থেকে বোতল বার করে এবং সীমাহীন খুশীতে তার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে—নিন, বাবু ...পাইন্ট...আর এই নিন, বাকী পয়সা।

সম্ভবতঃ দৌড়ে আসার ফলে ছেলেটা বড় বেশী হাঁফিয়ে পড়েছে। তার নিঃশ্বাস ফুলে উঠতে থাকে। সে লোকটার পাশেই বসে পড়ে। তবুও হাঁফ কমে না। তার নাকের ডগা দ্রুত ওঠা-নামা করতে থাকে। জামার অগ্র অংশ দিয়ে কপালে বেরে আসা বিজ-বিজে ঘাম মোছে, কাছেই বসে থাকা সঙ্গী ছেলেটির দিকে বিচিত্র ধরনের তৃপ্ত হাসি হাসে। এবং লোকটাকে ভাল করে লক্ষ্য করতে থাকে।

বোতল পেয়েই লোকটা উৎসাহিত হয়ে ওঠে, আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে উঠে বসে। প্যাকেট থেকে বোতল বার করে। উল্টে-পাল্টে দেখে। হাল্কা-হাসির সঙ্গে দ্বিতীয় ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখে—বাহঃ তুই তো বাহাদুর ছোঁড়া! এই নে, বাকী পয়সা তুই রেখে দে...। তার দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে বলে—নে...এই পাঁচ টাকাও রাখ। শোন.. এরপর যখনই আমি আসবো, তোকে দিয়ে মদ আনাবো...বুঝলি?

ছেলেটা প্রায় হামলে পয়সা তুলে নেয়, পুরনো পাৎলুনের ভেতর গুঁজে রাখে। চোখে-মুখে খুশী ভাসতে থাকে। সঙ্গীর দিকে আরেকবার দেখে এবং আগের মত হাসে। প্রথম ছেলেটির মনে হয়, তার বুদ্ধি হয়তো লোপ পেয়ে বসেছে। সে চুপচাপ বসে মনে-মনে হিসেব কষে বন্ধুটি কত পয়সা মোট পেয়েছে। পাঁচ টাকার একখানি নোট, তিন-চার টাকার খুচরো, প্রায় ন-দশ টাকার কাছাকাছি, অর্থাৎ কিনা দশ দিনের আয়! তাও, মোটে পনরো-কুড়ি মিনিটে। এইসব ভেবে সে যত আশ্চর্য হয়, তার চেয়েও বেশী দুঃখ। সে ভাবে, ইস, হেলাফেলা না করে সে যদি নিজেই মদ এনে দিত! কিছু না হলেও, অন্ততঃ মার জন্য একটা ধুতি কিনতে পারত। বেচারী কবে থেকে ঝরঝরে ধুতি পরে থাকেন। হঠাৎই মার ধুতির কথা মনে পড়তেই সে টের পায় তার ভিতরে সামান্য ব্যথা হতে থাকে। সে ঐ লোকটার দিকে, সেই সঙ্গে বন্ধুর দিকে কিছুটা লোভী দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে।

লোকটি বোতলের মুখ খোলে। ভেতরে মদের গন্ধ শোঁকে। আবার বোতলের মুখ বন্ধ করে ফেলে, তারপর ছোঁড়া দুটোর দিকে চেয়ে দেখে। কেন জানি, সহসা প্রথম ছেলেটির পাড়ার রামুকাকার কথা মনে পড়ে, এবং সে অসহায় দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ চেয়ে দেখে- কোথাও কোন কুকুর নেই তো। টের পায়, ভেতরে ভেতরে নাভাস হয়ে পড়েছে। কোন রকমে সাহস সঞ্চয় করে বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখে, ইশারা করে এবার এখান থেকে কেটে পড়া যাক। বন্ধুর হাতে চাপ দেয়।

লোকটি মদ শোঁকার পর, কেন জানি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে। তার চোখ খানিকটা কুঁচকে যায়, এবং ভ্রূ জোড়া টান-টান হয়ে পড়ে। ঐ রকম গম্ভীর স্বরে সে বলে ওঠে—এই ছোকরা...মদ এনেছিস... কিন্তু গেলাস কোথায়? দৌড়ে গিয়ে একটা নতুন গেলাস নিয়ে আয়। আরও ' পয়সা দেবো যা।...

যে ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে লোকটা এসব বলছিল, সে কিছু বলার আগেই, প্রথম ছেলেটা ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ায়। হাত এগিয়ে দিয়ে ব্যগ্রভবে বলে—দিন, বাবু, গেলাস আমি এনে দিচ্ছি....পাঁচ মিনিটে।

লোকটা পাছে কিছু বলে, তার আগে বন্ধুর প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে দ্বিতীয়জন বলে ওঠে—হ্যাঁ, বাবু...

নিজের তরফ থেকে লোকটা কোন প্রতিক্রিয়া জাহির করে না। পকেট থেকে এক টাকার নোট বার করে, তারপর প্রথম জনের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে—যা, এক দৌড়ে নিয়ে আয়।

ছেলেটি যখন দৌড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে গেলাস নিয়ে আসে, তখনও লোকটি বোতলের মুখ খুলে গন্ধ শুঁকছে। ছেলেটি গেলাস তার সামনে রাখে, তারপর সেখানে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। লোকটা গেলাস হাতে তুলে, উল্টে-পাল্টে দেখে, তারপর ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেলে চেঁচিয়ে ওঠে—অ্যাই গাধা, এটা কি তোর বাপ এসে ধোবে....; শালা, দেখতে পাস না, কত নোংরা রয়েছে এতে....; তোর কিনা আবার পয়সা চাই... অ্যাঁ?

লোকটির রোয়াবি কণ্ঠস্বর শুনে ছেলেটা আগাপাস্তালা কেঁপে ওঠে। মুখ থেকে অনেকক্ষণ কোন কথা সরে না। কম্প-মান হাতে নিঃশব্দে গেলাস তুলে নেয়, তারপর ধুয়ে আনার জন্য আবার দৌড়ে যায়। দ্বিতীয় ছেলেটিও লোকটার ক্রোধে ভয় পেয়ে ওঠে। সে একটু পেছনে সরে বসে. এবং লোকটির চোখ বাঁচিয়ে ইতস্ততঃ চেয়ে দেখতে থাকে।

—নিন, বাবু...গেলাস ধুয়ে এনেছি। দ্বিতীয় ছেলেটি লোকটার হাতে গেলাস তুলে দেয়, তারপর তার মুখের দিকে লক্ষ্য রেখে সেখানেই বসে পড়ে। সে তীব্রবেগে দৌড়ে এসেছিল, ফলে সাংঘাতিকভাবে হাঁফাতে থাকে।

লোকটা আরেকবার গেলাস উল্টে-পাল্টে দেখে। বোতল খোলে। অর্ধেক গেলাসে মদ ঢালে। ঢকাঢক করে এক চুমুকে গিলে ফেলে। দুটো ছেলেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তার এইসব কাণ্ডকারখানা দেখতে থাকে। মদ গেলার পর লোকটা যেই মাত্র ছেলে দুটোর দিকে দৃষ্টি ফেলে, অমনি তাদের মধ্যে কারো আর সাহস হয় না চোখ তুলে তাকাবার। প্রথম ছেলেটি লাল হয়ে আসা লোকটার

চেহারা দেখে ভয় পায়, অনুভব করে যে কোন মুহূর্তে ভয়ংকর কুক্কুর হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। মনে মনেই সে স্থির করে, এখনি এই মুহূর্তে তাদের এখান থেকে কেটে পড়া দরকার।

লোকটা একটা পা সামনের দিকে ছড়িয়ে দেয়। বাঁ পকেটে হাত গলিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে গেলাস নিয়ে আসা ছেলেটার মুখে ছুঁড়ে মারে। কিছুটা তরল গলায় বলে—রাখ তোর কাছে। মনে রাখবি...এরপর কোন দিন না ধুয়ে গেলাস এনে দিবি না...বুঝলি। ছেলেটা টাকা কুড়িয়ে নেয়। কিছুক্ষণ মুঠোর ভেতর চটকাতে থাকে। শেষে পকেটে রেখে বন্ধুর দিকে তাকায়। তার বন্ধু একদৃষ্টে সেই লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল।

লোকটা আবার আগের মত গেলাসে মদ ঢালে। কিছুক্ষণ লাল ফেনার দিকে চেয়ে দেখে। তারপর গেলাস তুলে, এক চুমুকে সমস্ত গেলাস শূন্য করে ফেলে। ছেলে দুটো এবারও তার দিকে লক্ষ্য রাখছিল। লোকটা বোতল বন্ধ করে গেলাস এক পাশে সরিয়ে রাখে, তারপর ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে।

ছেলে দুজন একে-অপরের দিকে চেয়ে দেখে। দুজনেই পরস্পারের চোখে কিছুটা ক্রোধ ভেসে থাকতে দেখে। কিছুক্ষণ তারা একে-অপরকে, সেই লোকটাকে, কাছে-পিঠে গমনরত এবং বসে থাকা লোকেদের দেখে।

লোকটা চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর চোখ বোজা অবস্থায় ডাক ছাড়ে—কিরে ছোঁড়া । সিগারেট এনেছিস আমার জন্য?

ছেলে দুজন চকিতে একে-অপরকে দেখে। দ্বিতীয় ছেলেটি একটু সাহস সঞ্চয় করে বলে- দাদা আপনি সিগারেট আনতে বলেন নি, তাই...বরং...

ছেলেটার কথা শেষও হয়নি, সংগে সংগে লোকটি বিদ্যুৎগতিতে উঠে বসে, এবং যে ছেলেটি তার ডান দিকে বসে ছিল, তার গালে শক্ত হাতে একটা চড় কষিয়ে দেয়। ঘটনাচক্রে, মারখাওয়া ছেলেটা প্রথমজন। চড় বেশ জোরেই লেগেছে। ছেলেটির মনে হয়, তার আশে পাশে বস্তুসমূহ বন্‌বন্ করে ঘুরছে। এই অবস্থা তখনও সামলে উঠতে পারেনি, এরি মধ্যে লোকটা গর্জে ওঠে—কোন হারামজাদা আমাকে দাদা বলেছে....? বল! শালা, পাঁচ-পাঁচের নোট পেয়ে তোদের মাথা এমন ঘুরে গেছে যে আমি কিনা তোদের দাদা হয়ে পড়েছি....? শালা নিকুচি করি. .বলবি আর কখনও....? ক্রোধে আরেকবার হাত তোলে।

ছেলে দুজন এমন ঘাবড়ে গেছে যে লাফ মেরে পেছনে সরে যায়। দুজনের মুখ থেকে একই সংগে বেরোয়--আজ্ঞে না সা'ব . .আর কখনও বলবো না...।

লোকটা ছেলে দুজনের জবাবে বিশেষ কোন মনোযোগ দেয় না। পকেট থেকে এক টাকার দুটো নোট বার করে। ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—যা... সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে আয়.. দৌড়ে যা...। দ্বিতীয় ছেলেটি প্রায় হামলিয়ে তুলে নেয়, যদিও প্রথম ছেলেটি নিজের দিকে নোট ছোঁ মারার চেষ্টা করে। নোট নিয়ে দ্বিতীয় জন দৌড়ে যায় এবং দৌড়ে সিগারেট দেশলাই নিয়ে ফিরে আসে। সে তখন প্যাকেট থেকে ১টা সিগারেট বার করে ধরায়, দুটো সিগারেট বার করে ছেলে দুজনের দিকে ছুঁড়ে দেয়। বোতল খোলে, সামান্য মদ ঢালে, তারপর গিলে ফেলে।

ছেলেরা দেখে, সত্যি, তার চোখ জোড়া বেশ লাল হয়ে উঠেছে। এবং আধবোজা হয়ে আছে। তারা সিগারেট তুলে নেয়, কাঁচুমাচু করে বলে—সা'ব...আমরা... সিগারেট...

শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটা মুখে ধরানো সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে, চেঁচিয়ে ওঠে—খাবি না কেন....? টান...। এই নে, সিগারেট টানার জন্য এক-এক দু'টাকা...। ছেলেরা সিগারেট ঠোঁটে রাখে এবং আগুনে ধরিয়ে ধীরে ধীরে টান মারতে থাকে।

লোকটা হাত দুটো দু পাশে ছড়িয়ে দেয়, পা সামনের দিকে ছড়িয়ে টান-টান বসে পড়ে। এখন তার চেহারা টকটকে। চোখ টেনে আসছে। কিছুক্ষণ সে রাস্তায় যাতায়াতরত পথচারী ও পার্কের লোকেদের দেখার চেষ্টা করে। কি মনে হল কে জানে, সে চেঁচিয়ে ওঠে—অ্যাই ছোঁড়া, আয়, পা টেপ...।

সহসা ছেলেরা তাদের বুদ্ধিতে ব্যাপারটা ধরতে পারে না। দুজনেই চোখ বড়বড় করে তার দিকে তাকায়, তারপর পরস্পর পরস্পরকে দেখতে থাকে। কিছুই স্থির করতে পারে না। এরি মধ্যে লোকটা পকেটে হাত গলিয়ে পাঁচের দু'খানা নোট বার করে, দু-হাতে দুজনের দিকে এগিয়ে দেয়। বলে—এই নে টাকা...আয়...পা টেপ।

ছেলে দুজন যন্ত্রবৎ টাকা নিয়ে নেয়। কিন্তু পা টেপার ব্যাপারটা তাদের পছন্দ হয় না। কয়েক মুহূর্ত তারা নোটের দিকে চেয়ে দেখে। পাছে ক্রোধবশে আবার চড় কষিয়ে না দেয়, এই ভয়ে চুপচাপ জায়গা থেকে সরে তারা দুজন লোকটার প্রসারিত পায়ের দু'দিকে বসে পড়ে। তাদের মনে হয়, হাতে এমন শক্তি নেই যাতে লোকটার পা টিপতে পারে। তবুও, যেমন তেমন তারা দুজনেই আপন ভার তার পায়ের উপর ফেলে অগ্র-পশ্চাতে ঝুলতে থাকে।

এরি মাঝে লোকটা আবার চোখ বুজে ফেলে। ছেলে দুজন সেই রকম ভাবে পা টেপার টাল-বাহানা করতে থাকে। মাঝেমাঝে তারা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে, কেন জানি তাদের একে-অপরের দিকে তাকানোটা ভালো লাগছিল না। অনেকক্ষণ বাদে লোকটা পা মুড়ে ফেলে। চোখ খুলে ইতস্ততঃ চেয়ে দেখে। দু'হতের তালু দিয়ে চোখ কচলায়, গেলাস তোলে! বোতল প্রায় ফাঁকা। অবশিষ্ট মদ গেলাসে ঢালে, এবং এক চুমুকেই গিলে ফেলে। তারপর বোতল তুলে চিলড্রেন পার্কের দিকে ছুঁড়ে ফেলে। গেলাসটা ছেলেদের দিকে ছুঁড়ে, পকেটে হাত গলিয়ে মুঠোভরা নোট বার করে। ঘাসের ওপর ছড়িয়ে রেখে বলে—এ্যাই শোন, তোরা এক কাজ কর, জামা খুলে কুস্তি লড়...। যে জিতবে, এই সব টাকা সে পাবে। বুঝেছিস....? আর যে হারবে, তার কাছে এতক্ষণ যা দিয়েছি সব কেড়ে নেবো....!

এই প্রস্তাব শুনে ছেলে দুজন টের পায়, তাদের চারদিক ঘিরে সহসা গভীর অন্ধকার ছেয়ে ফেলে। একযোগে তারা সেই লোকটার মুখের দিকে তাকায়, তারপর নিজেরা পরস্পরকে দেখে। যেন, তারা একে-অপরের শরীর ওজন করতে থাকে কে কতটা ভারি। ছেলে দুজন ভাবে, তারা কুস্তি লড়ার যোগ্য নয়। দু'জনেই আলাদা করে এটাই ভাবে, যদি আমি হেরে যাই, তাহলে? তারা কোন রকম উৎসাহ দেখায় না। চুপচাপ বসে থাকে।

এরি মাঝে লোকটা উবু হয়ে বসে। ভারি গলায় বলে—অ্যাই ছোঁড়ারা, তাড়াতাড়ি শুরু কর...। অনেক দিন হল কুস্তি দেখেছি...। আচ্ছা, ঠিক আছে, যে হারবে তার কাছ থেকে পয়সা ফেরৎ নেবো না... কিন্তু যে জিতবে, এই সব টাকা সে পাবে...। লোকটা মুঠোয় ধরা নোটগুলি আরেকবার দেখায়।

ছেলে দুজন কাঁচুমাচু করে উঠে দাঁড়ায়। শার্ট খুলে থলের ভেতর রাখে। প্যাৎলুন মুড়ে হাটুর ওপর তোলে। একঅপরের দিকে দৃষ্টি ফেলে। বেশ নির্জীবের মত একে-অপরের সঙ্গে মিলিত হয়। দু-তিন মিনিট পেরোতেই ছেলে দুজন টের পায়, তাদের শরীরে তাপ নেমে এসেছে। দুজনেই আপন দিক থেকে প্যাঁচ-পাঁয়তাড়া শুরু করতে থাকে। দুজনের চোখের সামনে ঐ লোকটার মুঠোয় ধরা নোট কর্কর করতে থাকে। দুজনেরই মনে হয় তাদের শরীরে অদম্য শক্তি এসে জমেছে।

ছেলে দুজনকে কুস্তিতে মত্ত দেখে লোকটার মাঝেও উৎসাহ নামে। সে চেষ্টাহীন উঠে দাঁড়ায়, তারপর কাছে এগিয়ে গিয়ে বেশ দরাজ গলায় চেঁচাতে থাকে—বাহ...। এই মার...। হ্যাঁ... এমনি করে...। কোমর ছাড়বি না...। আরে, পা গুটিয়ে নে ...। ব্যস...ব্যসে...হা হা ...এমনি করে...! বাহ....। সাবাস....! তর কথা শুনে ছেলে দুজনের মনে হয় তাদের উৎসাহ, শক্তি দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে পড়েছে। পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ বন্যতার সঙ্গে তারা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লোকটা অনেকক্ষণ সরবে চেঁচিয়ে ছেলে দুটোকে উস্কে দিতে থাকে। তারপর, হঠাৎ-ই মনে হয়, কুস্তি দর্শনে তেমন মজা পাচ্ছে না। মুঠোয় ধরা টাকাগুলো সেখানে ছড়িয়ে দেয়, তারপর টালমাটাল পায়ে চুপচাপ সোজা গাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়।

কিছুটা দূরে গিয়ে পেছন ফিরে দেখে। ছেলে দুটো মাটিতে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। সম্ভবতঃ তাদের বোধ নেই, টাকা পাবার নেশায় দুই বন্ধু বাস্তবিক লড়াই করতে শুরু করেছে।

অনুবাদ : সুবিমল বসাক

শব

অবধনারায়ণ সিংহ

এখন আমি একা, এবং আমার পাশেই তার শবদেহ পড়ে আছে! পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই একে একে চলে গিয়েছে। আমি চাইছিলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার দাহ-সংস্কারের ব্যবস্থা হোক। কিন্তু, উপস্থিত লোকজনের শলা-পরামর্শের পর ঠিক হয় দাহক্রিয়া কাল সকালে করাই ঠিক। এখন তারা পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত, তাছাড়া কাল তাদের কাজে বেরোতে হবে। সকাল চারটে থেকে ছ'টার মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করা হবে। আমার মনে হলো, তারা আসলে এই কাজ থেকে নিজেদের পৃথক করতে চাইছে। যাই হোক, আমিও বিশেষ জোর দিলাম না। যাকগে, একটা রাতের ঝামেলা! কোন রকমে কাটিয়ে দেবা যাবে। লোকেদের কথাবার্তায় জানা গেছিল, শুধু সংস্কার বশেই এই মানবিক প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে, নইলে এই সব ব্যাপারে তাঁদের কোন সংশ্রব নেই। একবার মনে হয়েছিল, এই মৃত লোকটির যে দু'চারজন বন্ধু-বান্ধব ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, তাদের মৃত্যু-সংবাদ দেয়া উচিৎ। কিন্তু, এই ভেবেই পিছিয়ে এলাম--এর কি কোন প্রয়োজন আছে! আমার পক্ষে যত-দূর সম্ভব, করে দিই, মিছিমিছি আর সকলকে কোথায় খুঁজে বেড়াই। পাবই বা কাকে!

মৃত্যুকালীন তার শরীর যেভাবে মোচড় দিয়ে উঠেছিল, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন হয়েছিল, এখন সে রকমই আছে। তার ঘাড় এখনও ডানপাশে বাঁকানো, দুই হাত দুই পাশে উল্টোভাবে পড়ে আছে। একটি চোখ সম্পূর্ণ বোজা অবস্থায়, অন্যটি আধখোলা। ডান পায়ের জঙ্ঘার কাছটুকু প্রায় নগ্ন, বাঁ পায়ের হাঁটু ওব্দি ঢাকা। কোমরে আধ-পুরনো আণ্ডারওয়্যারের ওপর সবুজ রঙের কাপড় জড়ানো। পায়ের পাতার রগ ফুলে ওঠা, আঙুলে নখের উপরের অংশ ছালদেটে, গোড়ার দিকের অংশ নীল হয়ে আছে। দিন কয়েক আগেকার ধোয়া গেঞ্জী গায়ে, বুকের কাছে অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়া অংশ থেকে বুকের কালো ঘন রোমগাছি বাইরে উঁকি মারছে; তিন-চার দিন আগেকার কামানো দাড়ি। প্রশস্ত ললাটে তিনটে ভাঁজ সেরকমই—যা সাধারণতঃ ছিল। ঠোঁটের দু পাড় বেয়ে হাল্কা কষ গড়ানো, মুমূর্ষু অবস্থায় বেরিয়ে ছিল—এখন শুকিয়ে থর্থরে হয়ে আছে। চোখের নীচে কালো দাগ, আরও গভীর কালো হয়ে উঠেছে। মাথার চুল অবিন্যস্ত, সচরাচর সে সপ্তাহে একবারের বেশী তেল মাখে না—তাও আমারই আগ্রহে। তেল মেখে বোঝাতে চায় যেন আমারই উপকার করছে।

গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখার পর সহসা আমার মনে হয়, সে বুঝি এখনও বেঁচে আছে! সচরাচর তার ঘুম বেশ কড়া হতো। বার কয়েক ঠেলা দিলে পরে তার ঘুম ভাঙত। যদিও, নিজের মনকে আমি বারবার বোঝাতে চাই, সে মারা গেছে, সম্পূর্ণভাবেই, এখন তার বেঁচে থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না, তবুও, থেকে থেকে এমন মনে হয় এই বুঝি কিছুক্ষণ পরেই জেগে উঠবে, তারপর আমাকে ধমক দিয়ে বলবে—একি, আমাকে ঘুম থেকে তুলে দাওনি কেন? অ্যা? তুমি কি চাও আমি চাকরিটা খোয়াই? কাজের সময় ঘুমনো নীতিবিগর্হিত ব্যাপার।

আমি জানতাম সে বেকার ছিল। কোনও চাকরি-বাকরি করে না। গোটা দিন এই শহরের চারদিক ঘুরে বেড়ায়, গভীর রাতে ফিরে এলে, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পূর্বেই বলে ওঠে, আজ প্রায় পাঁচ ঘন্টা ওভারটাইম করতে হয়েছে। তার হিসেব মত, মাসে সে তিনশ টাকা আয় করে—যদিও এমন কিছু নয়, কিন্তু যখনই আমি তার কাছে টাকা চাইতাম, জবাব দিত—ভাই, ইদানীং বড় টানাটানির মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কিছু দিতে পারছি না। কিছু মনে করো না।

বহুদিন সে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ত। আমি টের পেতাম, সে না খেয়েই শুয়ে আছে, তবুও আমি চুপ করে থাকতাম। প্রায় সে বড় বড় হোটেল এবং বা'র সম্পর্কে নানারকম আলোচনা করত, যদি তা সত্যি হয়, তাহলে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার বিল তাকে শোধ করতে হয়েছে। এত টাকা কোত্থেকে পায়—এই ব্যাপারটাকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য শহরের কয়েকজন ধনী ব্যক্তির নাম তালিকা পেশ করে। তার মতে—বড়লোকেদের সঙ্গ—তাকে বড়ই বো'র করে। সে একা ক'জনের সঙ্গ করে? যার সঙ্গ দিতে পারে না, সে-ই অভিমান রাগ করে। এসব কথাবার্তায় তার মাঝে সজীবতা ফুটে উঠতো। এরই ফাঁকে আমার মুখের রেখা দেখে, উজ্জ্বল চেহারা থেকে বেরিয়ে আসতো তার বক্তব্য—বলো গুরু! আমি কি কম চালাক! এই ভালো-না-লাগা শহরের অনুভূতি, তার ছলাকলা খুব করেই চিনি। তুমি কুকুরের মত এই ঘরে বেঁচে থাকো। বোকাদের নিয়তি শেষে এই হয়। তুমি বরং ওদের সঙ্গে বাস করতে শুরু করে দাও। একটা ছিমছাম ভালো ফ্ল্যাট নিয়ে কারবার শুরু করে দাও। চাকরী করবে না কি শুনি! পরিচয়ের গণ্ডিতে লাভ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তার-পর, মুখখানা বিকৃত করে বলত—তুমি হলে এক নম্বরের হাঁদারাম! জানো, ওরা আসলে আমার পরিচয়ে ধনী হতে চলেছে। টাকা-পয়সা সম্পর্কে আমার তেমন আগ্রহ নেই। আমি বস্তুতঃ নিরুদ্বেগ, শান্ত জীবন কাটাতে চাই! তুমি হাজার চাইলেও, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না। আসলে, তোমার কাছ থেকে যে আন্তরিকতা এবং ভালবাসা পাওয়া যায়, তা আর কারো কাছে পাওয়া যায় না। টাকা-পয়সা বস্তুতঃ লোকে-দের টুইস্ট করে, এবং তুমি ভালো করে জানো, এসব কাণ্ডকারখানা আমি একেবারে বরদাস্ত করতে পারি না।

সে আমার অন্তরঙ্গভাবে কাছে টেনে নিত, বলত—কুড়িটা টাকা আছে, দাও তো। বিশেষ জরুরী। টাকা পেয়েই সে চলে যেত তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে আসত। এতক্ষণ কোথায় ছিলে, একথা জিজ্ঞেস করলেই চোখে-মুখে ক্রোধ ছড়িয়ে সে বলে উঠত—দেখে নেব শ শাল্লা কে। এত বড় সাহস, আমায় কিনা চিট করে। বেটাকে কালকেই হাজতে পাঠাবো! আই-জি আমার ফ্রেন্ড। লোকেদের আমি দয়া করি বটে, তার অর্থ এই নয় যে তারা আমায় বোকা ঠাউরাবে। অভ্যুতার অনুচিৎ লাভ তোলাটা সত্যি 'মাংরামী'র পরিচয়।

গোটা ব্যাপারটা আমি ধরে ফেলতাম, পরে তাকেও ভালোভাবে বুঝে ফেলি। ভালোভাবে বুঝে ফেলতেই সে বলল—এ-সব কোন ফ্যাক্টর নয়। আসলে এইসব ব্যাপার

একজন লোকের পক্ষে নেহাৎ জরুরী। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কোন কিছু করাটা মোটেই অপরাধ নয়। তাছাড়া বেঁচে থাকতে হলে আর কিই বা উপায় আছে, বলো।

সহসা চোখে পড়ে তার হলুদ চেহারায় একটা আরশোলা ধীরে ধীরে শুঁকে বেড়াচ্ছে। তারপর ঠোঁটের কষের কাছে থেমে গিয়ে শুঁড় নাড়াতে থাকে, যেন সেখানে কোন ভোজ্য পদার্থ আছে। কিছুক্ষণ আমি একদৃষ্টে চেয়ে থাকি. মনে হয়. এই বুঝি সে আরশোলাকে ঠোঁট থেকে সরিয়ে দেবে। কয়েক মুহূর্ত পার হলে. আমি চমকে উঠে সামান্য ঝুঁকে আরশোলাটাকে এক পাশে ছুঁড়ে ফেলি। কিছুটা দূরে. মেজের উপর চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ে তারপর উপুড় হবার চেষ্টায় বার বার সেখানে দাপাদাপি করতে থাকে!... তার মাঝেও একটা গভীর অসহায়তা লুকিয়ে ছিল। আরশোলা উপুড় করে বিচিত্র আনন্দে মেতে থাকত। এমন কি আরশোলার ছটফটানি লক্ষ্য করে সরু সরু ঠ্যাংগুলি আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করত। বলত—জানো আজ মানুষের অবস্থা ঠিক এই রকম আরশোলার মত। আমাকে অবশ্য এই অবস্থা খুবই ভরসা দেয়। পিঠের চাপে হাত-পা ছোড়া লোকেদেরই আজ এই নির্যাত।

সহসা মনে হয়. তার শবদেহ যেন একটু নড়েচড়ে ওঠে। ভয়ানক চমকে উঠি। তারপর ভাল করে লক্ষ্য করতে দেখি. না. যেমন ছিল তেমন আছে. কোন পরিবর্তন ঘটে নি তার অবস্থার। শবদেহ পূর্ববৎ আছে। তবুও আমি তার হাতের নাড়ী. বুক এবং নিঃশ্বাস পরীক্ষা করি। না. বেঁচে থাকার কোন লক্ষণ না পেয়ে. আমি আবার নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানি. তারপর বিড় বিড় করি—এটা আমার ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের বোকামির কথা ভেবে হাসি পায়। ডাক্তার তো স্পষ্টই বলে দিয়েছে—এর মৃত্যু হয়ে গেছে। এবার অন্যান্য ব্যবস্থার তোড়জোড় করুন।

সে সম্পূর্ণ মৃত. একথা মনে পড়তেই পাশে রাখা চাদর তুলে তার গা ঢেকে দিই। হ্যাঁ. এবার বাস্তবিক একটা মৃতদেহ মনে হতে থাকে। কিন্তু ঘুমের সময় সে যখন চাদর ঢেকে শুয়ে থাকত. তাকে এমনি মনে হত। তবে. বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে নিঃশ্বাসের তালে তার বুকের ওঠা-নামার তফাৎ চোখে পড়ত। এবার আমি নিশ্চিন্ত হই. সে সত্যি মারা গেছে। এখন তার পুনর্জীবনের কথা ভাবা বাতুলতা।

বেশ গরম। ফ্যানের বাতাসেও কোন তারতম্য নেই। আধ ভেজানো জানালার পাল্লা সম্পূর্ণ খুলে দিই। বাইরে অন্ধকার এবং নিস্তব্ধতা। গলির এ-মাথা থেকে শেষ মাথা অবধি নির্জনতা ছেয়ে আছে। মাঝে মাঝে অপরিচিত একটা শব্দ ফুটে ওঠে।

অবধনারায়ণ সিং (১৯৩৩) গত পনরো বছর ধরে কলকাতার বাসিন্দা। স্কুলে কাজ করেন। তাঁর অধিকাংশ লেখার পটভূমি কলকাতা, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমাজ। বিষয়-বস্তুর চেয়ে মানুষের অন্তঃস্থলের গভীরতা তাঁর লেখায় বেশী প্রাধান্য পায়। প্রথম কাহিনী সংগ্রহ 'আত্মীয়', ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত। সম্প্রতি 'খোলা বাড়ী' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

চেষ্টা সত্ত্বেও সেই শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি না। এক ধরনের ভয় আমায় চেপে ধরে। জানালার বাইরে অন্ধকার. নিস্তব্ধতা এবং নির্জনতা দেখে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবার স্বস্থানেই ফিরে আসি। তার শবদেহ পড়ে আছে। ভয়ে কেঁপে উঠি। শরীরের রোমসমূহ খাড়া হয়ে পড়ে। কয়েক বছর ধরে তার সঙ্গে আমি বাস করছি. বহুবার সে আমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছে. তবুও তাকে কখনও ভয় পাই নি। আজ কিন্তু তাকে ভয় পাচ্ছি। নিজেকে শক্ত করে ভয় চেপে ধরি হাত ঘড়ি দেখি এখন দুটো বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী। চারটে অবধি শুয়ে কাটানো চলে। তারপর সকালের দিকে দাহ সংস্কার করে কাজে বেরোতে হবে। তিন দিন ধরে কাজে হাজির হচ্ছি না। কাল না যাওয়াটা ঠিক হবে না।

তার পাশাপাশি মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। বালিশ মাত্র একটা—যা এখন তার মাথার তলায় রাখা। সত্যি তো. এই বালিশের কোন যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। অথচ বালিশ ছাড়া আমার মোটেই ঘুম আসতে চায় না। তার মাথাটা সামান্য তুলে ধরে আমি বালিশ টেনে আনি। ফলে বালিশ-শূন্য তার মাথা যেভাবে পড়ে থাকে. তা আমার মোটেই ভাল লাগে না। কি জানি, এই অবস্থায় তার খুব কষ্ট হচ্ছে কিনা। পুরনো একটা চাদর টেনে বালিশের মত ভাঁজ করে তার মাথার তলায় গুঁজে দিই। যাক আমি অপরাধ থেকে মুক্ত হয়েছি। বস্তুতঃ আমার এইসব বোকামির জন্য হাসি পায়। সত্যি তো. এখন তার বালিশের প্রয়োজনই বা কিসের।

বালিশে মাথা রেখে শোবার পর, ঘাড়ে-গর্দানে কিছু একটা বিঁধতে থাকে। এই বালিশটাই একজন মৃত শরীরের মাথার তলায় রাখা ছিল। ঘৃণা ও জুগুপ্সায় সমস্ত মন একেবারে গুলিয়ে ওঠে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি বালিশটাকে টেনে এক পাশে সরিয়ে রাখি। চোখ বুজে ফেলি। চোখের পাতা ভেদ করে আলোর ছটা চোখের মণিতে ঠেকে। আলোর উপস্থিতিতে ঘুমোতে বেশ অসুবিধে হতে থাকে। উঠে গিয়ে বাতি নিভিয়ে দিই। সহসা এক টানে আলোর স্থানে অন্ধকার ছেয়ে যায়। জানালা বেয়ে আসা ঈষৎ আলোর স্বচ্ছতায় তার শবদেহ অস্পষ্ট দেখা যায়। অন্ধকারে সে যেন আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমি পাশ ফিরে চোখ বুজে ফেলি।

চোখ বোজা অবস্থায় তার সেই অবয়ব আবার নাচতে থাকে। আমি তাকে ভুলে যেতে চাই। অথচ বুঝতে পারি. তার স্মৃতি যতক্ষণ আমার মনে জাগরূক থাকবে. ঘুম কখনই চোখে আসবে না। তার ভাবনা থেকে নিজের মন দূরে রাখার বহু চেষ্টা করি. অথচ সে বার বার আমার সামনে হাজির হতে থাকে। যেন জেদ চেপে ধরে আছে।

ঘাড় ফিরিয়ে আবার তাকে দেখি। সে তেমনি পড়ে রয়েছে। আমি এমনভাবে দেখি. যেন ইতিমধ্যে তার মাঝে কোন পরিবর্তন ঘটে গেছে। এবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি. তারপর জোর করে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলি। তিন-চার দিন ধরে আমার ভালো ঘুম হয় নি। চোখ টেনে আসছে. ঈষৎ তন্দ্রা নেমে আসে. তারপর ঘুমিয়ে পড়ি।

ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হয়. একটা পা আমার শরীর ছুঁয়ে রয়েছে। ভয়ে একেবারে ঘেমে উঠি. দ্রুত উঠে বাতি জ্বালিয়ে দিই। ভেবেছিলাম. এটা বুঝি তারই পা। দেখি সে একইভাবে পড়ে আছে, কেবল তার মুখের ওপর থেকে চাদর সরে গেছে। প্রায় পঁচিশটা আরশোলা ছেঁকে ধরেছে, ফলে তার মুখ-চোখ একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে। কেন জানি. সহসা আশঙ্কা জাগে, হয়তো ক্রমশঃ সে পচে যাচ্ছে। দ্রুত হাতে আমি আরশোলা ইতস্ততঃ সরিয়ে ফেলি, তারপর এগিয়ে তাকে শুঁকি। বিচিত্র ধরনের একটা গন্ধ ঘ্রাণে টের পাই। এ ধরনের গন্ধ আমি এই প্রথম অনুভব করি। আমার গা গুলিয়ে ওঠে, দ্রুত ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসের তালে অন্তঃস্থল থেকে প্রশ্বাস বাইরে বের করে ফেলি। মনে হয়, হৃদপিণ্ডে অসহনীয় দুর্গন্ধ জমে উঠেছে। তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে নাক চেপে

ধরি, তিন-চার বার দ্রুত প্রশ্বাস ছাড়ি। হাঁফ হাঁফ করে হাল্কা শব্দ বেরোয়, এই নিস্তব্ধ পরিবেশে ঐ শব্দ আমার ভালো লাগে।

এখনও আমার শরীরে তার পায়ের স্পর্শ অনুভূত হতে থাকে। তিন-চারবার ঐ স্থানে হাত বুলোই। আগে. প্রায় সে ঘুমন্ত অবস্থায় বার বার তার পা আমার গায়ে ছুঁড়ে মারত। ঘুম ভেঙ্গে গেলে, আমি দু-চারটে ঘুষি তার পায়ে চালিয়ে দিতাম, তারপর ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতাম। তবুও কি সহজে তার ঘুম ভাঙতো? ঘুম ভাঙলে নিজের জায়গায় সরে যেত, ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বলে উঠতো—একসকিউজ মী। পুরনো হ্যাবিট, বুঝলে। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, আমি যদি মেয়ে হতুম তুমি কি তাহলে আমার পা দুটোর সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার করতে? এমত অবস্থায় নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আমার ব্যবহার অন্য ধরনের দাঁড়াতো। আসলে আজ আমি একটা মেয়ের সঙ্গে ফ্লার্টিং করেছি, তারই কথা এখনও মনে পড়ছিল। তাই এমন হয়েছে। নারী সম্পর্কিত ব্যাপারে তুমি বড় বেশী নার্ভাস তাই এসব বুঝতে পার না। বিচিত্র ধরনের অনুভূতি জাগে, বুঝলে।

তার এসব বাজে কথায় বিরুদ্ধাচারণ করলে, বলে উঠতো—শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও ঘুমের ভেতর পা জোড়া নিজের আয়ত্তে রাখতে পারি না। জেনেশুনে আমি এমন ব্যাপার করি না। বেশ কয়েক বছর হলো দেশে যাই নি। বউ আমায় বড্ড ভালবাসে। তোমার সঙ্গে আলাপ হলে খুব খুশী হত। বস্তুত সে একজন সুন্দরী রমণী। লাখে এক বলা চলে। প্রায় সে এ ধরনের কথা আওড়াতো। এ-সব কথা শুনে আমি বিরক্ত বোধ করতাম—বিশেষ করে ঘুম ভেঙ্গে গেলে। শেষে আমি ওকে বলতাম—ঠিক আছে কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলবো। এখন একটু স্বস্তিতে ঘুমুতে দাও। আমার বারণ অগ্রাহ্য করে সে বলে উঠতো, কাল সকালেই আমি দেশে ফিরে যাবো। এখন আর ভাল লাগে না এখানে। একঘেয়ে জীবন। এ শহর আমাকে একেবারে উৎসাহহীন করে ফেলেছে, আর ঝামেলা পোহানোর সাহস নেই। এমনিতে সে বড় একটা কথা বলে না, কিন্তু কখনই বলতে শুরু করে আমাকে 'বোর' করে তুলতো।

বার বার তাকে বারণ করায় সে চুপ করতো, তার চুপ করে থাকা জানিয়ে দিত সে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। তার প্রতি কারো সহানুভূতি নেই। সে কারও সহানুভূতি প্রত্যাশা করে না, কারণ ঐ প্রত্যাশা এক ধরনের ভিক্ষে। পরদিন সকালে যখন তাকে রাত্রের কথা মনে করিয়ে দিই, সে বলে ওঠে—দেশে গিয়ে করবো কি? আপনজন বলতে সেখানে আমার আছেই বা কে? না, সেখানে আমার সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই। এই শহরই এখন আমার সবকিছু। কোন রকমে এ-জীবন কাটিয়ে দেবো। আমার জন্য তোমার কিছুটা অসুবিধে হয় বটে, কিন্তু আমি কিই বা করতে পারি। ভাবি কারো অবলিগেশানে থাকবো না।

বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে তার দেশের কথা আমায় বলে না, এমন কি কোন আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কেও। রোগের অবস্থা যখন চরম হয়ে উঠেছে, আমি তার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম, কিছু বলুক—যাতে মৃত্যুর পর অন্ততঃ মুখাগ্নির ব্যবস্থা করা চলে। ঐ অবস্থায় সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠেছিল ঃ আমার অতীত সম্পর্কে জানার জন্য তুমি এত বিচলিত, অস্থির হয়ে উঠেছো কেন? মৃত্যুর পর আমার বডি সরকারের দায়িত্বে ফেলে দিও। তোমার কোন কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, আমি সেইজন, যে তোমার সামনে এখন হাজির আছি। এছাড়া আমার অন্য কোন পরিচয় নেই। তুমি আমাকে জানো, আমিও তোমাকে জানি। ব্যস। আমাদের পরিচয়ে তৃতীয় জনের প্রয়োজন কিসের? আমি বলেছি, আমার মৃতদেহ বেওয়ারিশ মনে করে সরকারের ঘাড়ে তুলে দিও। সরকারের কর্তব্য হবে দাহ-সংস্কার করা। মিছিমিছি তুমি ভেবে মরছো।

আমি তাকে বারবার বলি, স্ত্রীর সঙ্গে তোমার এই ব্যবহার খুবই অন্যায় হচ্ছে। সে তোমাকে এত ভালবাসে, অথচ তুমি কিনা রোগের সংবাদটুকুও তাকে জানাতে চাইছো না। সে হঠাৎ রেগে ফেটে পড়ে, স্ত্রী আমায় ভালবাসে, তোমায় নয়, বুঝলে। সে আমার স্ত্রী, তোমার নয়। আমার কর্তব্য-অকর্তব্য আমি খুব ভালো করেই বুঝি, এবং তা পালন করতেও জানি। বরং আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তুমি যদি মাথা না ঘামাও ভালো হয়। উপদেশ-টুপদেশ দেয়া আমি ঘৃণার চোখে দেখি। কিসের অধিকারে একজন আরেকজনকে উপদেশ দেবে? তোমার এমনটি করা উচিত নয়।

আমি চুপ হয়ে পড়ি। এছাড়া কি-ই বা করা যেত। এসব ব্যাপারে বেশি কথা বলাই অর্থহীন। এরপর সে মাত্র একদিন জীবিত ছিল, কিন্তু আমি তার সঙ্গে কোন কথা বলিনি, সে-ও বলেনি। এবারকার কাল আমার প্রতি তার মেজাজ খিটখিটে ছিল। যখনই কোন জিনিসের প্রয়োজন বোধ করত, তখন সে এটা দেখাবার চেষ্টা করতো, আমার অপেক্ষায় বসে নেই। কোন জিনিস চাইবার আগে সে নিজেই চেষ্টা করত। আমি তার মেজাজ বুঝে ফেলেছিলাম। তাই, চাইবার আগেই সব জিনিস তার সামনে হাজির করার চেষ্টা করতাম। আমার এই ব্যবহার তার বেশ মনঃপুত ছিল, পছন্দ করত।

একবার, তাকে ওষুধ খাওয়াবার সময়, সে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। ডান হাতে আমার বাঁ-হাতের চেটো ধরে জড়িয়ে বলেছিল—বন্ধু! মৃত্যুর পর কারো চিন্তা করা যায় না, এমনকি জানতেও পারবো না আমার সম্পর্কে ক্যারা কি ভেবেছেন। তুমি বাস্তবিক [illegible]

তার নিমীলিত চোখে বেদনা ফুটে উঠেছিল। এই ব্যাপারটা আমার কাছে নতুন। এমনিতে কথাবার্তায় সে ভয়ানক ঝকঝকে। বলত, এসব মানুষের দুর্বলতা। সেণ্টিমেণ্ট ছাড়া কিছু নয়। এসব থেকে মানুষের রক্ষা পাওয়া দরকার, পাছে আবার জড়িয়ে না পড়ে।

তিনটে বেজে গেছে। এখনও উষার কোন আভাস নেই। দেহে-শরীরে ব্যথা অনুভূত হয়। মাথার ভেতর ঈষৎ যন্ত্রণা বোধ হতে থাকে। কি জানি, জ্বর চেপে বসেনি তো। না, ভয়ের কোন কারণ নেই। পরিশ্রমের ফলেই সম্ভবতঃ এমন বোধ হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সকাল হলে, তার দাহ-সংস্কার করে কাজ মিটিয়ে ফেলতাম। কিছুটা দুশ্চিন্তা-মুক্ত হওয়া যেত।

ঐ দ্যাখো, সে একইরকমভাবে পড়ে আছে। পুরনো কাপড় জড়িয়ে পড়ে আছে। পায়ের ধারে ছোট বাকস রাখা আছে। কি আছে জানা নেই। গতকাল জিজ্ঞেস করার ছিল, টাকা-পয়সা আছে নাকি, কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি। তার রোগে আমার পকেট থেকে প্রায় শ' দুয়েক টাকা বেরিয়ে গেছে। দাহ-সংস্কারেরও কিছু খরচ আছে। মন কিছুটা খিন্ন ছিল। এতগুলো টাকা অবশ্য অবধারিতভাবে খরচ হয়ে গেছে। কর্তব্যের খাতিরে নিজের এমন বোকা বনে যাওয়া অদ্ভুত মনে হচ্ছিল।

আমি উঠে পড়ি। তার শার্টের পকেট হাতড়াতে থাকি। পকেটে চাবি রয়েছে। সপ্তাহখানিক আগে সে বলেছিল, তিন চারশ টাকা পাবার কথা আছে। হয়তো, বাক্সের ভেতরে থাকতে পারে। তালা খুলে দেখি, কেবল দু-তিনটে পুরনো কাপড় ও কয়েক টুকরো কাগজ পড়ে আছে। নেড়েচেড়ে দেখি সব কিছু। কোথাও কিছু পাই না। হতাশ হয়ে অবশেষে বাক্স বন্ধ করে ফেলি, তারপর চাবিটা তার পকেটে গলিয়ে দিই। হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হয় তার ওপর। শালা দেউলিয়া। ইচ্ছে হয়, মৃতদেহ সরকারের কাছে সঁপে দিই। যা ইচ্ছে তারা করুক না। নিজেকে আর বেশী বিব্রত করার প্রয়োজন নেই। বহু টাকা সে আজে-বাজে কথা বলে আমার থেকে নিয়েছে। যখনই চাইতো, তখনই প্রতিজ্ঞা করতো সপ্তাহ খানেক বাদে তোমায় নিশ্চিত ফেরৎ দেবো। কিন্তু, কখনও ফেরৎ দেয়নি।

গত মাসে আমার কাছ থেকে দশ টাকা নিয়েছে এই বলে যে, একটা শুভ কাজ করতে যাচ্ছি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে, এই দশ টাকাই দশ-শো হতে পারে। কিন্তু, হায়, ভাগ্য তার কখনই প্রসন্ন হয়নি। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে আমাকেও জড়িয়ে অবশেষে বিদায় নিয়েছে। টাকা চাইবার সময়, আশ্চর্য, তার চোখে মুখে একজনের আত্মবিশ্বাস এবং দ্বিধাহীনতা ছেয়ে থাকতো। আমি চাইতাম, তার চোখে মুখে সংকোচ বা লজ্জা ফুটে উঠুক। কিন্তু, কখনই তা দেখা যায় নি। মনে হতো, আমিই বুঝি তার কাছে ঋণী, এবং সে আমার মহাজন। [illegible] তাকে টাকা দিতে [illegible] [illegible] মুখ

লম্বাটে হয়ে দাঁড়াতো। বেশ শক্ত গলায় বলে উঠতো—তুমি নেহাৎ দায়িত্বহীন লোক। আমি তোমার বন্ধু। তোমার উচিৎ আমাকে সাহায্য করা। টাকা-পয়সা আসে যায়। আজ আমার অবস্থা খারাপ, তা বলে চিরদিন এমন থাকবে, এমন গ্যারাণ্টি নেই। ধরো, আমার কাছে টাকা আছে, তোমার যদি টাকার দরকার পড়ে, তাহলে কি আমার উচিৎ হবে না তোমার প্রয়োজন মেটানো। এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, তবুও আমি চেষ্টা চরিত্র করে এর ব্যবস্থা করবোই। প্রশ্ন থেকে যায়—চাওয়ার ব্যাপার। অপরের সামনে আমি নিজেকে নগ্ন করতে চাই না, —নইলে একটা কথায় হাজার টাকা অবলীলায় পাওয়া যেতে পারে! আমি নিজের একটা পরিকল্পনা করে রেখেছি। মানুষের জন্য তা খুবই জরুরী। সত্যি, সে এতদূর ক্রুদ্ধ হতো, যেন আমার কতখানি অন্তরঙ্গ, তাকে সাহায্য না করাটা আমার কর্তব্যে বিচ্যুতির প্রমাণ।

আমি তখন চুপ করে থাকতাম। জানতাম, তর্ক করে তার সঙ্গে কখনও এঁটে উঠতে পারবো না। যে কোন বিষয়ে সে দু-চারঘণ্টা আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে!

আমি তৃষ্ণা অনুভব করি। কুজো থেকে জল গড়িয়ে খাই, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। বাইরে এখনও অন্ধকার। আশে-পাশে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। সকলেই নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে। বাতাসে হাল্কা হিমের আভাস। ভেতরের গুমোট থেকে বেরিয়ে বাইরে হাল্কা বাতাসে একটু আরাম বোধ হয়। হঠাৎ, পাশের দরজা খুলে যায়। কেউ একজন বেরিয়ে আসে। আমাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাছে এগিয়ে আসে।

সে জিজ্ঞেস করে, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন। আমার কাছ থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি তাকে জানাই ঘুম আসছে না। ঘরে বড্ড গুমোট। ভেতরে ভালো লাগছে না।

সে আবার জানতে চায়, মড়া তোলার ব্যবস্থা হয়েছে কি। আমি কোন জবাব দিই না। সে তখন উপদেশ দেয়, এখন থেকে ধাঁধাছাঁদা করে তৈরী রাখেন, যাতে সকাল-সকাল তার দাহ-সংস্কার করা যায়। দেরী হলে যে-যার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে:

স্নানঘরের দিকে সে চলে যায়, আমি ফিরে আসি ঘরে। আমার পদশব্দে আরশোলারা ইতঃস্তত পালিয়ে যায় ভয়ানক দুর্বল বোধ করি আমি। সাহস জোগায় না আরশোলাকে দূরে দূরে সরে তাড়াই। নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ি বসে থেকে কষ্ট বোধ হবার পর শুয়ে পড়ি। বসে-বসে শিরদাড়া টনটন করে উঠেছে।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ে। দুচোখে আমার চোখে ঘুম নেমে আসে।

দরজায় কারো খটখট শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। দেখি, দিন অনেকটা এগিয়ে গেছে। ধড়ফড় করে আমি উঠে বসি। একজন প্রতিবেশী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বলে ওঠে, তুমি যেন ঘোড়া বিক্রী করে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছো। সকলেই বেরিয়ে গেছে। অথচ, তুমি এখনও খাটুলি তৈরী করনি। শেষকালে কি পচিয়ে তুলতে চাও? কে আর আছে, যার ভরসায় বসে আছো?

আমি উঠে দাঁড়াই, হতভম্ব চোখে ইতঃস্তত চেয়ে দেখি। তারপর ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসি। আশে-পাশে সকলের ঘর-দরজা বন্ধ। আজ এত তাড়াতাড়ি সকলে চলে গেল কি করে! তাদের জানা ছিল, প্রতিবেশীর ঘরে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে: এবং দাহ-সংস্কার করাটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তবে? কে যেন বলছিল, লোকটি যা-ই থাক না কেন—সমালোচনার ঊর্ধ্বে চলে গেছে। এখন আপাতত মৃত দেহের প্রতি আনুষ্ঠানিক ব্যবহার করা প্রয়োজন।

প্রতিবেশী লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কিছুটা অনুতাপ প্রকাশ করে বলে, মাফ করো ভাই, আমার একটা দরকারী কাজ আছে। চেষ্টা করবো, যাতে শ্মশানে উপস্থিত থাকতে পারি। যাই হোক, তুমি ভাই এ কাজটা কোনরকমে করে দাও। এভাবে তো কোন মৃতদেহ ঘরে পড়ে থাকতে পারে না। তাছাড়া, তোমার বন্ধু। তোমার কর্তব্যটা নিশ্চয়ই আলাদা ধরনের হবে।

প্রতিবেশী লোকটি অশেষ দুঃখ প্রকাশ করে বিদায় নেয়, সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় তলায়। তার যাওয়া দেখে মনে হয়, সে যেন নিষ্কৃতি পেয়ে পালালো।

আমি চেয়ে দেখি, শবদেহ একই অবস্থায় পড়ে আছে। সহসা মনে হলো, ঐ দেহ ক্রমশ পচে উঠেছে, এবং তা থেকে ভয়ংকর দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। বিরক্ত, বিব্রত হয়ে প্রতিবেশীরা আমাকে গালাগাল দিতে থাকে—তুমি অতি জঘন্য, বন্ধুর শবদেহটুকুও দাহ করতে পারনি। তুমি কি চাও, আমরা সকলেই অসুস্থ হয়ে মারা পড়ি। আসলে, তুমি একে অনেক আগেই হত্যা করেছো, এখন তার শবদেহের লাঞ্ছনা ও দুর্গতি করছো। ছিঃ। এই অপরাধের জন্য তোমার ফাঁসী হওয়া উচিৎ। তার সমস্ত টাকা-পয়সা তুমি আত্মসাৎ করে ফেলেছো।

এবার বাস্তবিক আমি ভয়ানক ভয় পেয়ে যাই। ঘামে শরীর ভিজে ওঠে। চেয়ে দেখি, তার শবদেহ আমার সম্মুখে ঐ একই অবস্থায় পড়ে আছে এবং আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি একাকী। অসহায়বোধ আমায় একেবারে অবশ করে ফেলে। শবদেহ থেকে আচ্ছাদন বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে আমি আৎকে উঠি। একি, স্পষ্ট দেখি, তার চেহারা একেবারে বিকৃত হয়ে পড়েছে। ভয়ে, আতংকে আমি দ্রুত একপাশে সরে দাঁড়াই।

অনুবাদ : সুবিমল বসাক

শেষ সম্বল

সিদ্ধেশ

দোরগোড়ায় পা রাখতেই তার মনে হয়, মৃত্যুর মত নৈঃশব্দ সমগ্র বাড়ীতে ছেয়ে আছে। সামনেই উঠোনে দেখা যায় কতকগুলো ফুলের চারাগাছ দাঁড়িয়ে আছে শান্ত নিরীহ। দরজা পেরিয়ে ভেতরে যাওয়ার প্যাসেজে একটা ঢিলে খাটিয়া রাখা আছে, যেমন আগে থাকত। বৃষ্টি ভেজা জানালার পাল্লা হাট করে খোলা, কিন্তু ভেতরে কোন চাঞ্চল্যের সাড়া নেই। বাইরে ছাদহীন বারান্দা ঘাস-আগাছায় পূর্ণ, ঘরের বাইরের দিকে দেয়ালে শ্যাওলা জমে ওঠার ফলে সবুজ ও কালচে রঙের কিছু কিছু ছাপ পড়েছে। এক নজর দেখেই তার মনে হল, এভাবে যদি গোটা বর্ষায় দেয়াল ভিজতে থাকে, তাহলে নিশ্চিত, এই দেয়াল দু হাত মাটির নীচে সেঁধিয়ে যাবে।

ভেতর থেকে তাকে নেয়ার জন্যে যখন কেউ বেরোল না, তখন এই নৈঃশব্দ ভাঙ্গার জন্য, স্টেশান থেকে সঙ্গে আগত লোকটি গলা উঁচু করে ডাকে—'খোকাবাবু এসে পড়েছেন।'

সে ভেতরে ঢুকে চটি খোলার অজুহাতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, যদি ইতিমধ্যে আশেপাশের ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে আসে। পরক্ষণেই সে ব্যাকুল হয়ে ঘরের ভেতর ঢোকে, দেখতে পায় বাবা বিছানায় শুয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে আছেন। এগিয়ে

কান্না উপচে পড়ে, কান্না থামতে গিয়ে আরও করুণ হয়ে ওঠে। সেও ভেতরে-ভেতরে ভয়ানক বিচলিত বোধ করে। তার মনে হয়, সে বুঝি ভেতর থেকে ঠেলে আসা ব্যথা আটকাতে পারবে না।

এরি মাঝে, স্টেশনের সেই লোকটা কাঁধ থেকে অ্যাটাচী নাবিয়ে রাখে। আর তখন, সামান্য সময়ের জন্য সে আবার সম্পূর্ণ নৈঃশব্দের মাঝে এসে পড়ে। তার মুখ থেকে কোন কথা সরে না, বাবাও তেমন চুপ।

শহর থেকে রওনা হওয়ার সময়, তার মনে আশঙ্কা ছিল, হয়তো এবার বাবাকে সে দেখতে পাবে না। হয়তো এরি মাঝে সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে সে কেবল শোক, কিছু আচার-নিয়ম পালন করা ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না। পিসীমার জন্যই তার বেশী চিন্তা, গত বছর থেকে মৃত্যুর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস টেনে চলেছেন, উন্মাদ অবস্থার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন—তবুও মারা যাননি। সকলেই এখন তাঁর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শেষ প্রহর গুণছে—কিন্তু মৃত্যু আসে কই। গত বছর সে যখন গাঁ ছেড়ে যায়, বাবা বলেছিলেন, 'সামনের বছরে পিসীমাকে হয়তো আর দেখতে পাবি না!' কিন্তু পিসীমার বদলে যখন বাবার সম্পর্কে টেলিগ্রাম পায়, সে স্তব্ধ হয়ে যায়। এবং পড়ি-কি-মরি

এক নজরে টেবিলে রাখা সমস্ত ওষুধের শিশি সে গুণে ফেলে। ছোটবড় নানান শিশিতে ওষুধ ভর্তি অবস্থায় পড়ে আছে। কয়েকটা ট্যাবলেট এবং ইনজেকশানও। সেই লোকটি পথে তাকে জানিয়েছিল, বাবা নাকি দু-দুবার কঠিন অজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও এখনও টিঁকে আছেন। সবই ঈশ্বরের কৃপা, নইলে তাঁর বেঁচে ওঠার আশা প্রায় ত্যাগ করেছিল।

সে বাবাকে হাতে ধরে বালিশের সহায়তায় উঠে বসায়। তারপর বলে—আপনি একটু চাঙ্গা হয়ে গেছেন—ভালই হয়েছে। পিসীমা কোথায়? তাঁর গলা পাচ্ছি না যে।'

বাবা নিজের তরফ থেকে কিছু বলেন না। ইঙ্গিতে জানান, তিনি দালানে শুয়ে আছেন। কিছুক্ষণ তার আর সাহস হয় না উঠে দালানে যায়। সেখানেই বসা অবস্থায় উঠোনে বিছিয়ে থাকা রোদ দেখতে থাকে। তার মনে হয়, বেশ কিছুদিন একনাগাড়ে বর্ষা হয়েছে, এবং আজই রোদ উঠেছে। এই রোদে এক বিচিত্র ধরনের উজ্জ্বলতা এবং ছটা, যা ঘরে বসেও তার তাপ সহ্য করতে পারছিল না। সে পাখা নাড়তে চেয়েছিল, কিন্তু বাবার অবস্থা দেখে সেই মুহূর্তে এও মনে থাকে না—স্টেশনে খিদে তাকে কাতর করে তুলেছিল, কিন্তু এখন তা বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে।

রাত্রে শহর থেকে রওনা হওয়ার সময় খাবার সঙ্গে এনেছিল, কিন্তু খেতে পারে নি এবং সমস্ত খাবার ঐ অ্যাটাচীতে রাখা আছে। এতক্ষণে, খাবার বার করে অন্যান্য বাড়ী থেকে আসা ছোট ছোট ছেলেদের মাঝে বিলি করে দেয়। বাবার কাতর চোখে তাকে দেখছিলেন। বছর খানিক পর সে গাঁয়ে এসেছে। এরি মধ্যে বাবার শরীরে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে। আঙ্গুল ও পায়ের হাড় উপরের দিকে বেরিয়ে এসেছে, মাংস ঢিলে হয়ে হাড় থেকে আলাদা হয়ে গেছে, ফুটে উঠেছে ঘন নীল শিরা। এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বাবা নিজেই বলে ওঠেন—এই রোগ আমায় অনেকখানি গিলে খেয়েছে। এখন ভাল হয়ে উঠলেও আগের মত স্বাস্থ্য আর ফিরে পাবো না।

হয়তো. তবে আপনি যে সেরে উঠেছেন, এটাই বা কম কিসের?

সবই ঈশ্বরের অনুগ্রহ! কারো কথায় বা ইচ্ছের ওপর কি আর মানুষ মরে। তোর পিসীমাকে দ্যাখ। গত দু বছর ধরে বেঁচে আছে, এখন একেবারে খাটের সঙ্গে মিশে গেছে। কে জানে, এবছরেই—

পিসীমাকে দেখার জন্য সে ভেতর-দালানের দিকে এগোয়। উঠোনে শ্যাওলা জমে আছে। আশেপাশে বড় ছোট গাছে কিছু শাকসব্জী ঝুলে আছে। গোলাপের চারাগাছে দুটো ফুল বাইরের দিকে উঁকি মারছে। বোঝা যায়, কিছুদিন বেশ ভাল রকম বৃষ্টি হয়েছে, ফলে মাটির দেয়ালের

হয়েছে, ফাটল দেখা দিয়েছে কিছু কিছু স্থানে। যে কোন সময়ে তা থেকে সাপ কিংবা বিছে বেরিয়ে এসে কামড়াতে পারে। সেই দেয়াল ঘেরা দালানে পিসীমা খাটের ওপর প্রায়-পুটলি হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁকে জাগিয়ে তোলা সে যথাযথ মনে করে না। জানে পিসীমা জেগে উঠলেই তাকে ছুঁয়ে অসংলগ্ন বকবকানি শুরু করবেন। মনে পড়ে, গতবার তাকে চিনতেই অস্বীকার করেছিলেন, পরে চিনতে পারায় জেদে তাকে বিরক্ত-ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। এবারেও যে এমন ঘটবে, তার জানা ছিল, তাই পিসীমার চুপ-চাপ পড়ে থাকাটাই ছিল শান্তিপূর্ণ অবস্থান। সে তাঁকে ওখানে শায়িত অবস্থায় রেখে কুঁয়োর ধারে এগিয়ে যায়, ঝুঁকে দেখে কতটা জল উঠে এসেছে। কিন্তু জল ততটাই ছিল, যতটা সে গতবারে দেখে গেছে। বর্ষা হোক, গ্রীষ্ম হোক, এই কুয়ার জল—উপরের স্তর থেকে সামান্য নীচে থেমে থাকে। বাড়েও না, কমেও না। ট্রেনের ক্লান্তি, তাছাড়া ভেতরে-ভেতরে টানাপোড়েনের ফলে সে বেশ পরিশ্রান্ত অনুভব করছিল। ভাল করে স্নান করতে চাইছিল।

ভেতরে এসে দেখে, বাবা আগের মত খাটের ওপর শুয়ে নাক ডাকছেন। সেই লোকটি কাছেই বসে আছে, বলে—এরকম নিশ্চিন্তে অনেকদিন পরে আজ ঘুমোচ্ছেন।

সে ইশারায় জানায়, বাবাকে ঘুমোতে দাও ঘুমোলে শরীর একটু ভাল লাগবে। বলেই, সে বাইরে দালানে বেরিয়ে আসে।

বাইরে এসে দাঁড়ালে দালান থেকে সব কিছু দেখা যায়। প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ। তার শাখা-প্রশাখা বেশ বয়স্ক এবং প্রসারিত। তলার দিকে কয়েকটা ডাল পুকুরের জল ছুঁয়ে আছে। পুকুরের জল অনেকটা বেড়েছে। সামনেই কয়েকটা গরু-মোষ বসে-বসে জাবর কাটছে। তাদের দেখাশোনার কেউ নেই কাছেপিঠে, কিন্তু কয়েকটা ছেলে-পেলে দৌড়ঝাঁপ করছে অদূরে। বাঁদিকে শিবালয়ের চৌহদ্দী দেয়াল ধ্বসে পড়েছে, এবং ঐ ধ্বংসাবশেষে কিছু ঘাস-আগাছা ফুটে উঠেছে। কয়েক বছর ধরে সেই দেয়ালের মেরামত হয়নি এবং হবার আশাও নেই। এইভাবে ধ্বসে যাওয়াই দেয়ালের নিয়তি। কেবল শিবালয়ের চূড়ায় কলশের সঙ্গে যুক্ত ধ্বজা তার দৃষ্টির সামনে কাঁপতে থাকে। সে মনে মনে কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছতে পারার দরুন ভেতরে এসে পড়ে। অন্ধকার ক্রমশঃ ছেয়ে আসছে এবং উঠোনে ফুলগাছ অদৃশ্য হয়ে আসতে থাকে। পিসীমা জেগে পড়েছেন, এবং একা একা বিছানায় পড়ে আপন মনে বক বক করে চলেছেন।

কখন যে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং উঠে খাটের ওপর উবু হয়ে বসে সম্মুখে দেয়ালের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে দেখছিলেন। দুই চোখের আলো শেষ হয়ে এসেছে। অন্ধকার ও আলো, তাঁর পক্ষে

সিদ্ধেশ। (১৭-৮-৩৮) স্বল্প-ভাষী, রোমান্টিক চেহারা। কলকাতার হিন্দী লেখকদের মধ্যে সিদ্ধেশ বেশী পরিচিত। নিয়মিত লেখেন। যে কোন-দিন সন্ধ্যে ছ'টার পর সেন্ট্রাল কাফি হাউসে পাওয়া যায়। তাঁর অধিকাংশ গল্প নিজেকে কেন্দ্র করে লেখা, সাধারণ ঘটনা, সাধারণ পরিবেশে জটিল বিষয় নিয়ে লিখে থাকেন। মূলতঃ গল্পলেখক, কিন্তু দুটি ছোট উপন্যাসও লিখেছেন। এযাবৎ সাতটি গ্রন্থের জনক।

আসে। বস্তুতঃ তাঁর শরীরে আর কোন মোহ অবশেষ নেই, চামড়া ঝুলে-কুঁচকে গেছে, এবং চেহারায় মৃত্যুর ছায়া হেঁটে বেড়াচ্ছে। সে কেবল মাত্র কণ্ঠস্বরে তাঁর পাগলামিকে জাগাতে চায় না। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ আর তাঁর প্রতি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। সে ভাবছিল, এখন পিসীমার পক্ষে বেঁচে থাকার কিইবা অর্থ থাকতে পারে, বেঁচে থেকেও যে নিজের কাছেপিঠের সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, অন্ধকারে হাতড়াতে থাকেন, তবুও আলোর সামান্যতম কনাও দেখা দেয় না। বস্তুতঃ এটা তাঁর পক্ষে বৃহৎ সাজা, বা অসামান্য উপহাস। এরচেয়ে মৃত্যুকামনা অনেক ভাল।

কিন্তু মৃত্যুকামনা করলেই বা কি? এতো ঈশ্বরের অনুগ্রহ, একথা বাবা গত-বারে কয়েকবার আউড়ে ছিলেন। আজও একথা সত্যি না ফললেও মিথ্যে ফলেনি। বস্তুতঃ পিসীমা থাকতে-থাকতে যদি তাঁর চেয়ে পনরো বছরের কনিষ্ঠ বাবার কিছু একটা ঘটে যায়—তাহলে একথা তখন এবং এখনও ধ্রুব সত্যই মনে হবে।

সে খুব ধীরে পা ছুঁয়ে তাঁর কাছে খাটের ধারে এসে বসে। পিসীমার কেবল একটাই অনুভূতি জাগ্রত আছে—তা কেবল স্পর্শানুভূতি। পা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত সচকিত হাতড়াতে থাকেন ইতস্ততঃ—'কে রে?'

'আমি তোমার ভাইপো।'

'অ, কোত্থেকে এলি, কখন এলি খোকা? আর কে কে এসেছে তোর সঙ্গে?'

'কেউ নয়, বাবার শরীর খারাপ শুনে [illegible]'

'হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে। তোর বাবা কই, কেমন আছে? এখন আমার কাছে আর আসেই না। আমি যে এখন আলাদা হয়ে গেছি খোকা, আমার কথা কে আর শোনে বল?'

'তুমি কেমন আছো, পিসী?'

'আমার কথা জিজ্ঞেস করছিস বুঝি? আমি কিসের আর ভালো থাকবো, বৌমা কোথায় রে?'

'সে শহরেই আছে।'

'ছেলেপেলে কটা তোর?'

'দুটি। পুজোর ছুটিতে ওরা আসবে।'

'ভাল, ভাল। তোরা সুখে থাক। কিছু খেয়েছিস?'

'হ্যাঁ, তুমি বিশ্রাম করো, আমি আবার আসবো।' সে উঠে দাঁড়ায়। যাবার সময় মনে হয়, পিসীমার চোখ তার দিকে এক দৃষ্টে অনুসরণ করছে। চোখের দৃষ্টি হারালে কি হবে: অন্তর্দৃষ্টি আছে যে, মমতার কারণে আরও বেশী তীব্র হয়ে পড়ে। তার আট বছর বয়সে মা যখন মারা যান, সেই থেকে তিন-চার বছর আগেও তার পেছনে তিনি কতই না খেটেছেন। বড় করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তার প্রতিটি শিরা-উপশিরায় পিসীমার মমতা ও স্নেহের অংকুর শেকড় গেঁথে আছে। সে তা কখনই উপড়ে ফেলতে পারবে না। উঠোনে দাঁড়িয়ে শুনতে পায়, পিসীমা তাঁর পাগলামির মাঝে অসীম মমতায় মাখামাখি হয়ে হাততালি দিতে দিতে 'সোহর' গাইছেন।

বেশ রাত হয়েছে, তবুও চোখে ঘুম আসে না। গাঁয়ে সচরাচর সন্ধ্যা শেষ হতে-না-হতে রাত্রির সম্পূর্ণ নৈশব্দ গোটা পরি-বেশে ছেয়ে যায়। ঘরের কাছেপিঠে ইতস্ততঃ ঝিঁ-ঝিঁ পোকার শব্দ, পুকুরের ওপারে শেয়ালের সম্মিলিত হুক্কা হুয়া ডাক অন্ধকার রাতে দ্বিগুণ ভয়াবহতা সৃষ্টি করছিল। এছাড়া কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। দোরগোড়ায়, অন্ধকারে পড়ে থাকা পিসীমা হয়তো কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন, হয়তো নিজের অতীত। স্বামী ও চারটি সন্তান খুইয়ে তাঁকে আবার পিত্রালয়ে ফিরে আসতে হয়, এই ভাইয়ের ভরসায়। কত কথা তাঁকে ঐ সময়ে সহ্য করতে হয়েছিল। চরিত্র সম্পর্কে সামাজিক বিরোধ, অন্তর্মনে কত ভাঙ্গা-ছেঁড়া স্বপ্ন। এই ভাই-ই তখন বহু বিরোধ সহ্য করে তাঁকে নিজের কাছে রাখতে সামান্যতম দ্বিধা করেন নি। ত্রিশ বছরে বৈধব্যের আঁচল টেনে পিসীমাকে সারাজীবন নিজেকে পাহারা দিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। জীবনে কখনও শান্তি বা সুখ পাননি। অবশেষে সেখানেই এসে পড়েন, যেখানকার মাটিতে জন্ম নিয়ে-ছিলেন।

বাবা ধীরে ধীরে নাক ডাকছেন। তার মনে হয়, সে এসে পড়ায় তিনি সান্ত্বনা ও সাহস পেয়েছেন। অনেকদিন পর সম্ভ-বতঃ তিনি গভীর ঘুমে মগ্ন।

দুপুরে ওষুধ সম্পর্কে বলার সময় বাবা বলেছিলেন,—খোকা, ঘুমোবার জন্য [illegible]

চায় না। কি জানি, হঠাৎ কি যে হলো আমার ?'

'কিছুই হয়নি, আপনি এবার সেরে উঠবেন। এত চিন্তা করার কিছু নেই। মিছিমিছি বেশী চিন্তা করবেন না।'

'চিন্তা কি আর শুধু নিজের জন্য হয়। মাঝে মাঝে তোর পিসীর জন্যই চিন্তা হয়। রাগও হয়, এখন তো আর জ্ঞানগম্যির সীমা ছাড়িয়ে গেছে।'

মৃত্যু অব্দি এখন সব কিছুই সহ্য করতে হবে। তাছাড়া তাঁর আশ্রয় বা কোথায় ?'

'তাতো বটেই। গত তিন বছর ধরে একই অবস্থা। এখন অবশ্য কিছুটা ক্লান্ত হয়েছে। কিন্তু, ভেতরে জেদ এখনও প্রখর আছে। তাছাড়া খরচ-পত্রও আছে।'

'তা নিয়ে ভাববেন না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'সব বুঝি খোকা। তুই না করলে কে করবে এখন। আমারও শেষ ইচ্ছে, তোর পিসীর একটা গতি হলেই যেন আমি যাই। কিন্তু, আগে যদি আমার কিছু ঘটে যায়, তা হলে তার যে কি গতি হবে।'

সে কোন জবাব দিতে পারে না। বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন, তারপর বালিশে ঠেস দিয়ে শুয়ে পড়েন। শোয়া অবস্থায় বাবা বাইরে আকাশের সামান্য অংশ দেখতে থাকেন। সে বাবাকে দেখছিল, গোটা আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়ে তাঁর দিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

রাতের নৈঃশব্দে সে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, এই বুঝি সমস্ত নক্ষত্ররাজি হুড়মুড় করে এসে পড়বে। আকাশে কেবল কালো ছায়া ছেয়ে থাকবে। দালান ঘেঁষা উঁচু জমিতে ফুলগাছের ঝুঁড়ি থেকে ভেজা সৌরভ ভেসে আসছে। কিন্তু, গ্রামের রাত এত ভয়াবহ এবং নিস্তব্ধ হয়, শহরে বাস-কালীন সে কখনও ভাবতে পারে নি। বাবার নাসিকা-ধ্বনির শব্দ নেই, পিসীমার বকবকানি বা চেঁচামেচির শব্দও নেই এখন। তার সহসা এমন মনে হয়, তাঁরা দুজনেই এই অন্ধকার কালো রাতে নিজের মতই সংঘর্ষ করে চলেছে। সম্ভবতঃ তার অনুপস্থিতিতে এই রকম কত না বিনিদ্র রজনী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে কাটিয়েছেন। এই অন্ধকারে কিছুই থাকে না, শুধু ভয় ছাড়া।

হঠাৎ তার মনে হয়, ঘুম না আসার ফলে বাবা হয়তো বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরলেন। অন্ধকারে তাঁর চোখজোড়া জ্বলজ্বল করতে থাকে, সেখান থেকেই তিনি ডাকেন —'কে রে, খোকা বুঝি? কি করছিস সেখানে? ঘুম আসছে না বুঝি?'

'না, এমনিই, বড্ড গরম তাই বাইরে একটু দাঁড়িয়েছি।' তারপর, আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। দুজনেই পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহী। মনে হল, বাবার গলায় কিছু যেন আটকে আছে। কিছু বলতে চান তিনি।

বাবা উঠে বসেন, বলেন, এদিকে আয় তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

সে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে যায়। খাটের পায়ার ধারে বসে বাবার মুখের রেখা পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু, অন্ধকারে সব কিছুই একাকার। কেবল, তাঁর চোখের মণি অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছিল।

খোকা, আমার মাথায় কিছু ঋণ আছে, শোধ করতে হবে। তাছাড়া, পিসী মারা গেলে আরও পাঁচশো টাকার দরকার পড়বে। তুই সামলে নিতে পারবি তো ?

তার মনে হয়, এমন একটা ব্যাপার নিয়ে বাবা হয়তো কয়েক রাত চিন্তা করে কাটিয়েছেন। কয়েকবার অজ্ঞান হয়েছেন, জ্বরে বেঘোরে ভুগেছেন, তাহলে কি এই ব্যাপারটা সর্বদা তার পেছনে তাড়া করে ফিরছিল? তিনি আবার বলেন, তোর পক্ষে যদি ব্যবস্থা না হয়, বল, কিছু গয়নাগাটি, থালা-বাসন পড়ে আছে এমনি, বিক্রি করে দিই। কিছু দাম পাওয়া যাবে।

মনে হল, পাশের গলিতে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার শব্দ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। এবং পিসীমা চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও চেঁচাতে পারেন না। সহসা তার গলায় কিছু যেন আটকে যায়। বস্তুত, অন্ধকারে করুণাহীন চিৎকারও কত ভয়াবহ মনে হয়।

আজ সে শহরে ফিরে যাচ্ছে। ডাক্তারের সঙ্গে শলাপরামর্শ হয়েছে। ডাক্তারের বক্তব্য : এখনও বেশ দুর্বল আছেন, অন্য কোন ব্যাপারে ভয় নেই। তাছাড়া শরীর পুরনো হয়েছে, আর কতদূর ধকল সহ্য করবে। আপনি বুঝি তাঁর একমাত্র ছেলে

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কি মনে হয়, বাবা সুস্থ হবেন না ?

আপনার বাবার একটি মাত্র চিকিৎসার প্রয়োজন, যদি তিনি আপনার পিসীমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পান। তাঁর পক্ষে পিসীমার কষ্ট দেখা সম্ভব নয়। হয়তো, তিনি তাঁকে মরতে দিতে চান না। এতদিনকার মোহ। আপনি আর কি করবেন ?

সকালের দিকে বাবা আরেকবার অজ্ঞান হয়ে পড়েন, সিঁড়ি বেয়ে নাববার সময়ে। পিসীমা তখন শুয়েছিলেন। সে-ও শুয়েছিল, তাকেও ঘুম থেকে তুলে দিয়েছিল। সে উঠে দেখে, বাবার চোখ কপালে উঠে গেছে এবং থরথর করে বসে পড়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। বাবাকে তখন খুব অসুস্থ মনে হতে থাকে, মুখখানি ছোট হয়ে এসেছিল, চোখ দুটো কোলের ভেতরে বসে গিয়েছিল, গালও বসে গিয়েছিল। শরীর যেন চিমসে গিয়েছিল ভয়ঙ্করভাবে।

তার যাবার সময়ে বাবার চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। প্রায় কাঁদতে শুরু করেন। তখন সেবাবার দিকে লক্ষ্য না করে, উঠোন পেরিয়ে একা অন্ধকারে সংঘর্ষরত পিসীমাকে দেখতে থাকে।

অনুবাদ : সুবিমল বসাক

আপনি কি দৈনন্দিন কাজ-কর্ম শুরু করার জন্যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব?

গ্ল্যাক্সোজ-ডি® নিমেষে শক্তি যুগিয়ে আপনার সব ক্লান্তি দূর করবে!

গ্ল্যাক্সোজ-ডি খেয়ে আপনি ঘরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করার জন্য পুরোপুরি তৈরী হয়ে যান। গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার ক্লান্ত শরীরে সেই ভরপুর শক্তি যোগায় যা ফের চাঙ্গা হবার জন্যে আপনার অবশ্যই দরকার। ডাক্তারদের সুপারিশ করা গ্ল্যাক্সোজ-ডি'তে রয়েছে উচ্চমানের গ্লুকোজ যা' ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের গুণে সমৃদ্ধ।
গ্ল্যাক্সোজ-ডি আপনার সব ক্লান্তি দূর করে যার দরুন আপনি ঘরের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম খুব স্ফূর্তির সঙ্গে করতে পারেন।

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®

আপনার পরিবারের নিমেষে শক্তি যোগানদার

dCA/GL/54/BN/Rev

দূরত্ববোধ

ঝর্ণিকা মোহিনী

কলবেল এত তীব্র একটানা বেজে উঠে, যে আমি ঝনঝন করে উঠি এবং ঘাবড়ে গিয়ে দৌড়ে বালকনিতে ঝুঁকে পড়ি। তলায় কাউকে না দেখে তারপর সিঁড়ির দিকে ছুটে যাই। আসলে, এটা ছিল কলবেলের ছন্দহীন শব্দের প্রভাব, যা আমাকে এমন অস্থিরতার মাঝে ফেলে দেয়, কি জানি কে এসেছে। কলবেল বেজে ওঠার অর্থই হলো কেউ না কেউ এসেছে, কিন্তু যে অস্বাভাবিক নিয়মে কলবেল বাজানো হয়েছে তাতে কারুর বিচলিত হয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। আমি সিঁড়ির ধারে পৌঁছে অস্থিরভাবে আগন্তুকের ওপরে ওঠার প্রতীক্ষা করতে থাকি। অবশ্য আমার ঘর ততটা উঁচুতলায় নয় যে ওপরে ওঠার জন্য এত সময় লাগতে পারে। তখনই আমি দেখি, ধীরে ধীরে ক্লান্ত পদক্ষেপে দেয়াল ধরে সিঁড়ি ভেঙে তিনি উপরে উঠছেন। হাতে ধরে সেলাই করা পুরনো কাপড়ের ময়লাটে থলে, থলের ভেতরে মুখ বাড়ানো উর্দুর কোন সংবাদপত্র, রুক্ষ কেশ এবং ঠোঁটে জোর করে টেনে আনা হাসি।

আমি তাঁকে দেখে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিই. কলবেলের অস্বাভাবিক শব্দ এখনও আমার মগজে পাক খাচ্ছে এবং আমি ভাবছিলুম আগন্তুকের মর্যাদা দেখে কলবেল টেপার নিয়ম শিখিয়ে দেবো। কিন্ত তাঁকে দেখেই আমার নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হই, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে হাসি টেনে আনি, আপ্যায়নের ভঙ্গিমায় হাত এগিয়ে দিয়ে তাঁর হাত থেকে থলে নিয়ে বলি, 'এসো,...এসো, বহু দিন পর এলে।' যদিও আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম, 'এদিকে এলে কি করে?' কিন্তু তাঁর চেহারায় এমন একটা আভাষ ছিল, যেন তিনি এসে পড়ে বেশ লজ্জাবোধ করছেন, যেন আসতে চেয়েও ভয়ে ভয়ে আসছেন, এজন্য সঙ্কোচ ও লজ্জা থেকে তাঁকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আমি আরও বেশী উৎসাহিত হয়ে বলে উঠি, 'তুমি এতদিন বাদে বাদে আসো কেন? আরও তাড়াতাড়ি আসবে।' এই কথা কটি আমি এমন নীচু মুখে বলি, যে নিজের চোখেই আমি অপরাধী হয়ে পড়ি। কথা কটি আমি তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি করে বলার সাহস জোগাতে পারি না। বহুদিন যাবৎ, আমার বয়স যতটা এখন, তাঁর ও আমার মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ, বাক্যালাপের সম্পর্ক অবশ্য যথাযথ কায়েম ছিল, যার আড়ালে আমাকে মাঝে মাঝে ধৈর্য ধরে থাকতে হত।

আমি তাঁকে নিয়ে ড্রইংরুমে চলে আসি। এখন তিনি নিশ্চিন্তে সোফার উপর বসে পড়েন। কিন্তু তাঁর চেহারায় বিষণ্ণতা এত গভীর, যা আড়াল করার জন্য তাঁকে বারবার হাসতে হচ্ছে। সামনে দেয়ালে ঝোলানো ছবির দিকে দৃষ্টি রেখে আমায় বলেন—'খোকা, তুই-ই মাঝে মাঝে চলে আসতে পারিস। কতদিন পার হয়ে যায় তোকে দেখি। তোর মা-ও বলছিল। তুই এলে, সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ত হবে।' আমার সঙ্গে চোখাচোখি করে কথা বলার সাহস তাঁর মাঝেও নেই।

আমার কাছে এই কথার কোন উত্তর নেই। আমাদের দুজনের মাঝে সহসা প্রসূত কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতাকে তাঁর উৎসাহ ভেঙে ফেলে, 'দেখিস, আজ ওপরে ওঠার আগেই আমি ঘন্টি বাজিয়েছি। আজ আমি গোটা রাস্তায় এই কথাই আউড়ে এসেছি যে ঘন্টি টিপে উপরে উঠতে হবে, দরজার কড়া নাড়বো না।' যেন তিনি কিছু একটা দিগ্বিজয় করে ফিরেছেন। পশ্চাত্তাপে আনত হয়েও, তাঁকে বোঝাবার মতো আমার মানসিক অবস্থা নেই।

ইতিপূর্বে যখনই তিনি আসতেন, দরজা খোলা অব্দি তিনি দরজায় এক নাগাড়ে কড়া নাড়তেন। আমি বিব্রত বোধ করতাম, তাকে কি করে বোঝাই যে, ঘরের লোক দরজা থেকে কিছুটা দূরেও থাকতে পারে, এবং দরজার কাছে পৌঁছুতে কিছুটা সময় লাগবেই, এক সেকেণ্ডই হোক না কেন, এজন্য দরজার কড়ায় একবার নাড়া দিয়ে, খোলার জন্য ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করা উচিৎ। কিন্তু তাঁকে আমি এটা না বুঝিয়ে বলে ছিলাম যে, নীচের তলায় গেটের কাছেই কলিংবেল আছে, সিঁড়িতে ওঠার আগে টিপে দিও। সেদিন ফেরার সময় নীচে নেমেই তিনি 'কোথায় ঘন্টি দেখি' জিজ্ঞেস করে বাচ্চা ছেলের মত চাপল্যে দু-তিনবার ওটা জোরে জোরে টিপে দেন।

সেদিন আমি বহুবার মনকে বোঝাবার চেষ্টা করি, এটা তাঁর শিশুর মত সরলতা, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মনের ভিতরে কোথাও খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধছিল এবং আমি কিছুই করতে পারিনি কেবল নিজের ঘরে ঢুকে তার এ ধরনের সংখ্যাতীত সারল্য বেছে বেছে আমি মগজের ভেতর থেকে বার করি এবং নিজে সেই সারল্যের অংশীদার হবার পর মনে মনে আপশোষ করতে থাকি, এমনিতেই এ ব্যাপারে আফশোষ তাঁরও কম ছিল না, প্রায়শঃ তার চোখের কোণে ঝিলিক মারতে থাকে। আমাদের দুজনের মাঝে আফশোষ স্থায়ী ভাবনা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দুজনের সম্পর্কের

চেতনাবোধও ততখানি স্থায়ী ভাবনায় ছিল এবং আশ্চর্য এই দুই স্থায়ী ভাবনা একই সঙ্গে দুরীকরণের যন্ত্রণা আমরা দুজনে অনুভব করছিলাম।

তখনই তিনি থলে থেকে কমলালেবু বার করে টেবিলের উপরে রাখেন। প্রতিটি লেবু হাতে বুলোতে বুলোতে বলেন–'সস্তায় পেয়ে গেলাম...এক টাকায় পাঁচটা। দু টাকার কিনে ফেললাম। এখানে দর কত?'

দর জানানোর পরিবর্তে আমি উঠে দাঁড়াই, রান্নাঘরে ঢুকে পড়ি। ঢুকে তাড়াতাড়ি গ্যাস ধরাই, তরাপর দু কাপ জল চাপিয়ে দিই। আবার আমি ঘরে ফিরে আসি, তিনি তখন সামনে ঝুলানো আঁকা ছবি দেখছেন। আমি ফিরে আসতেই বলে ওঠেন, 'আচ্ছা, এই ছবিটার অর্থ কি?

কথাটা অগ্রাহ্য করার মত উত্তর দিই, 'অর্থ আমারও জানা নেই। এক শিল্পী-বন্ধু আমায় উপহার দিয়েছে।'

'তুই অন্তত ছবিটার অর্থ জিজ্ঞেস করে নিস।'

'জল হয়তো ফুটতে শুরু করেছে,' বলেই আমি উঠে দাঁড়াই।

তিনি বলেন, 'চা আমি খেয়ে বেরিয়েছি তোর মা করে দিয়েছে। বলছিল, তোকে যেন, চা তৈরী করার কষ্ট না দিই। ততক্ষণে আমি রান্নাঘরে ঢুকে পড়ি।

তোকে যেন চা তৈরী করার কষ্ট না দিই.......হুঁ, আমি কি আর ঘরে চা করি না? আমি কি ঘরের ছোটখাটো কাজ নিজে হাতে করি না? মা কি কখনও এসে আমায় শুঁকে গেছেন? উনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন আমি একা একা কতখানি উদাস থাকি? উনি কি কখনও ভেবেছেন আমার বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার? হঠাৎ মার ওপর প্রচন্ড ক্রোধ হয়। ক্রোধে আমার হাত থেকে হঠাৎ পেয়ালা নড়ে ওঠে। কিন্তু ঘরে ঢোকার আগে আমি নিজেকে সামলে নিই হাসিমুখে চা টেবিলের ওপর রাখি। আবার রান্নাঘরে যাই, গিয়ে দুটো প্লেটে বিস্কুট ও কিছু নোনতা খাবার সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসি। তিনি হাতে বিস্কুট ভাঙ্গাতে ভাঙ্গাতে বেশ আরাম করে চা খেতে থাকেন।

"বাহ, তুই এখন চা ভালই করতে পারিস।" আমি তাঁর কথা শুনে চায়ে প্রথম চুমুক দিই, তক্ষুনি আমার দৃষ্টি পাখার বাতাসে কাঁপা- কাঁপা জানলার পর্দার পেছনে উঁকি মারা 'বোনী স্কট' এর শূন্য বোতলে গিয়ে পড়ে। আমার চায়ের স্বাদ একেবারে নষ্ট হয়ে পড়ে। এবং ক্রমাগত আশংকা হতে থাকে, আমি যখন রান্নাঘরে ছিলাম তিনি হয়তো জানলার পর্দা সরিয়ে দেখেছেন। এটা তাঁর স্বভাব—আমার ঘরের প্রতিটা বস্তু স্পর্শ করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন যেন আমার ঘরের প্রতিটি বস্তুই তার কাছে এক আশ্চর্যময় অভিজ্ঞতা যেন তিনি ইতিপূর্বে কখন তা দেখেননি। এমন কি, আমার তেলের শিশি এবং সাবান ও তিনি নেড়ে-চেড়ে দেখতেন, যেন আমি বিশেষ কিছু ব্যবহার করে থাকি। যাই হোক, একদা তিনি আমার ঘরে ইম্পোর্টেড সিগারেট দেখে ফেলেছিলেন, যদিও আমি তাঁকে বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি এক বন্ধু ভুল করে ফেলে গেছে, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস হয়নি। বরং তার চোখে দুটি বিরোধী ভাব একাকার হয়ে উঠেছিল—প্রথমটি, কি আশ্চর্য আমি ইমপোর্টেড সিগারেট খাই, অপরটি উনি কখনও কল্পনা করতে পারেন নি যে পান করার ব্যাপারে আমি দুধ থেকে এগিয়ে যাবো। এই দুটি ব্যাপারই আমার কাছে অর্থহীন ছিল, কিন্তু 'বোনী স্কট' এর লেবেল আমাকে বারবার বিব্রত করতে থাকে, কিন্তু জানালা থেকে আমি এতদূরে বসেছিলাম, যে, উঠে সরাসরি গিয়ে পর্দার পেছনে ভাল করে আড়াল করা সম্ভব নয়।

তোমাকে আমার নিজের ছাপা লেখা দেখাই... বলেই আমি উঠে পড়ি, সুচতুর ভাবে জানালার পর্দা গুছিয়ে অলার র‍্যাক থেকে দুটো বই তুলে এনে তাঁর সামনে রেখে দিই।

এই বইতে আমার একটা গল্প আছে, আর এই বইয়ের সব কটা গল্প আমারই, আমি তাঁকে খোলাখুলি বুঝিয়ে বলি।

যে সংকলনে অন্যান্যদের গল্পের সঙ্গে আমার একটা গল্প ছিল, তিনি সেটা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ তার মলাটের রঙে ডুবে যান। তারপর, রঙের পৃথিবী থেকে ভেসে উঠে বলেন—এতে তোর একটা গল্প কেন? সব কটা গল্প তোর নয় কেন? আমার ইচ্ছে করে ভাগ্যকে ধিক্কার জানাই। সত্যি, আমারই বোকামি, বোতল আড়াল করার জন্য আমি মিছিমিছি নিজের লেখা তাঁকে দেখাতে গেলাম। বোতল সম্পর্কে কোন মন্তব্য করলেও, এরকম ভোঁতা হত না।

তুই শুধু সে পাতাটা বের করে দেখিয়ে দে, যাতে তোর নাম ছাপা আছে, তিনি দুটো বই আমার দিকে এগিয়ে দেন।

উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে যে আমি কি ভুল করেছি, এখন তা ভাল করে টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু, যে অবস্থায় আটকা পড়েছি, তা থেকে বেরিয়ে আসার দুরন্ত উপায় ছিল না। বইয়ে মুদ্রিত আমার নাম যেমনভাবে বুলোতে থাকেন, যেন কোন বাচ্চা ছেলেকে আদর করছেন। সহসা, সেদিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন আমার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল এবং তিনি প্রহারের চোটে আমায় প্রায় আধমরা করে ফেলেছিলেন, প্রহারের পেছনে একটা কারণ ছিল আমি লেখাটেখায় বাউন্ডুলে হয়ে পড়েছি। তাছাড়া, কবিতার সেই পংক্তি সম্ভবতঃ এরকম ছিল, 'আঁধার দূর করার তরে কোথা থেকে আমি প্রকাশ?' প্রকাশ আমাদের ভাড়াটের মেয়ে এবং বাড়ীর লোকেরা কবিতার অর্থ বার করেছিল, আমি নাকি ভাড়াটের মেয়েকে ঘরে আনা অর্থাৎ বিয়ে করার ফিকিরে আছি। তারপর, প্রকাশ শব্দকে কেন্দ্র করে বাড়ীতে প্রচন্ড বিক্ষোভ ঘটে, যদিও, ধীরে ধীরে কবিতা লেখার স্বাধীনতা কোনরকমে পাওয়া গেছিল, কিন্তু কোথাও পাঠাবার সময় প্রকাশিতার্থে লেখার স্বাধীনতা পাওয়া যায়নি। সেই ভাড়াটের মেয়ে সম্পর্কে বাড়ীর লোকেদের ভুল ধারনায় আমার ইম্প্রেশন কিছুটা নষ্ট হয়ে পড়েছিল। ফলে, ছোট ভাইয়ের বিয়ে আমার আগেই ঘটে। আমার বিয়ের কথা উঠলে ভাড়াটেদের তাড়াবার কথাই হতে থাকে। ঘটনাটা বেশ পুরনো। সেই ভাড়াটেরা কবে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে, আর সেই মেয়ে কয়েকটা সন্তানের মা হয়ে বেঢপ হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি সাহিত্যাকাংক্ষার জন্য এখনও আইবুড়ো হয়ে বসে আছি। এবং এও একটা সাহিত্যিক মহত্বাকাংক্ষা, আমি পরিবার থেকে পৃথক হয়ে আছি। তিনি আমাকে বা আমি তাঁকে কোনমতে স্বীকার করতে পারিনি, অস্বীকারের বোধ শেষসীমা অবধি পৌঁছে গেছিল, যার ফলে আমি

মণিকা মোহিনীর প্রথম গল্প-সংগ্রহ 'খতম হোনে কে বাদ' (শেষ হবার পরে) ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। মানুষের অস্তিত্ববোধ ও নিঃসংগতাই তাঁর লেখার মুখ্য বিষয়। এই যান্ত্রিক সভ্যতা, সমাজের ফাটল তাঁকে বড় বেশী বিচলিত করে। দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম এ, বর্তমানে চাকুরীজীবি

একদিন সব কিছু ছেড়ে-টেড়ে এই ফ্ল্যাটে উঠে আসি। আমার জীবন প্রণালী তাঁর দৃষ্টিতে কিছুটা অসংগত বোধ হয়েছিল, যে কারণে আমার সঙ্গে কোন নারীকে যুক্ত করে, তিনি সেই 'হতভাগীর জীবন নষ্ট করতে চাননি।

সেই দিনকাল এখন অতিক্রান্ত, আমার বাবা আমার সামনে বসে বইয়ে ছাপা আমার নামে হাত বুলিয়ে আদর করছেন।

তুই কি এ থেকে টাকা পয়সা পেয়েছিস? তিনি জিজ্ঞেস করেন। আমি হাল্কাভাবে হ্যাঁ বলি, তারপর টেবিলের ওপর থেকে একটা পত্রিকা খুলে তার সামনে রাখি, যাতে আমার কবিতা ছাপা আছে। আসলে ভয় হচ্ছিল, পাছে তিনি টাকা পয়সার হিসাব করতে শুরু করেন। পত্রিকা হাতে নিয়ে নামের উপর আঙ্গুল রেখে আমাকে দেখিয়ে বাচ্চা ছেলের মত উল্লাসে বলে উঠেন, এই যে তোর নাম। আমি আবার বিরক্ত বোধ করি, কিন্তু মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করি, সত্যি তো, তিনি হিন্দী পড়তে জানেন না! তাছাড়া এমন কিছু লেখা-পড়া শেখেন নি সেই কারণে আমি বেশী প্রত্যাশা করতে পারি। আমি মনকে বোঝাতে থাকি, এমন সময় তার গলা শোনা যায়, কবিতায়ও কিছু পেয়েছিস?

কবিতায় কিছু পাওয়া যায় না। পেলেও খুবই সামান্য।

এ কথা শুনে তিনি আন্তরিক ক্ষোভের সঙ্গে বোঝাতে শুরু করেন, তাহলে, তুই আর কবিতা লিখিস না। যে কাজে টাকা-পয়সা নেই, সে কাজ করে লাভ কি?

বস্তুতঃ আমি ক্রমশঃ বিরক্ত ও একঘেয়ে বোধ করছিলাম এবং বুঝে উঠতে পারছিলাম না তাঁর কাছ থেকে কিভাবে নিষ্কৃতি পাবো। আমার দুর্ভাগ্য, তার সামনে আগড়-বাগড় আমার মুদিত সামগ্রী রাখতে হয়েছে, নইলে আমি এটাই চাই—তিনি যেন টের না পান আমি কি. আমি যে তাঁর এক ছেলে—যাকে প্রথমে অযোগ্য মনে করতেন, কিন্তু কয়েক বছর ধরে সহসা আমি তাঁর নজরে যোগ্য হয়ে পড়েছি। আশ্চর্য, অদ্যাবধি তিনি যে ব্যাপারের জন্য আমাকে অযোগ্য মনে করতেন, সেই ব্যাপারই আজ আমার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু, আমার দৃষ্টিতে তার মূল্য সেটাই, যা জ্ঞান হবার পর আমি উপলব্ধি করে আসছি।

তিনি বেশ গম্ভীর ভারী গলায় আমায় প্রশ্ন করেন, তুই কেমন গল্প লিখিস?

কেমন....মানে? আমি বিস্মিত হই তিনি হঠাৎ আমার সাহিত্য সম্পর্কে এত আগ্রহী হলেন কি করে।

তখনই তিনি বলেন, মানে ধার্মিক, রাজনীতিক, সামাজিক, কোন ধরনের? নিজের ছেলে গল্প লেখে, আমার কি এটা জানা উচিত নয় যে, সে কোন বিষয়ে গল্প লেখে?

সহসা আমার মনে হয়, সামনে বসে লোকটা আমার বাবা হতে পারেন না। ইচ্ছে হয়, বলে ফেলি, যে ঘৃণিত জীবন এবং যতটা একাকীত্ব তোমরা সকলে মিলে আমায় দিয়েছো, আমি সেই ঘৃণা ও একাকীত্বের কথাই লিখি। কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারি না। আমার ও তাঁর মাঝে কেবল একটা সম্পর্ক যা বহন করে চলেছি। দৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও ঐ সম্পর্কে তেমন আন্তরিকতা ছিল না, যাতে আমি মনের কথা স্পষ্ট করে বলি। তিনিও এমন কোন সুযোগ রাখেন নি যে আমি তাকে কিছু বলি। ফলে, আমি তার সামনে সর্বদা সংকুচিত হয়ে থাকি, আমার দুঃখকষ্ট ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ফেলি। না হলে, অন্ততঃ আমার দুঃখ-কষ্ট কবিতা কাহিনী রূপে ফুটে বের হত।

টেবিল থেকে পেয়ালা তুলে নিতে নিতে তিনি বলে উঠেন, এবার তুই বিয়ে কর।

তিনি যখন আমায় বিয়ে করার কথা বলতেন, আমি মনে মনে ক্রোধে ফেটে পড়তাম, কেন বিয়ে করবো? আমি একা এত স্বাধীনভাবে থাকি, বিয়ে করে কেন বন্ধনে জড়াবো? আবার, যখন তিনি আমার বিয়ে করার নামগন্ধ তুলতেন না, তখন আমি অন্যধরনের ক্রোধে ডুবে যেতাম, আমি কত একা-একা বোধ করি সেই খেয়ালটুকু নেই। বাপ-মার অন্ততঃ দায়িত্ববোধ থাকা উচিত, ছেলেমেয়ের বয়স হলে, বিয়ের ব্যবস্থা করা।

ছোট-খোকা বলছিল, কে এক মাদ্রাজী মেয়ে নাকি তোর বাড়ীতে আনাগোনা করে? দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

কে? লক্ষ্মী?

আমি তাঁর মাদ্রাজী মেয়ে সংশোধনের চেষ্টায় এমন এক প্রশ্ন করি, যার উত্তরে আমার জানা ছিল, তিনি হ্যাঁ বলবেন। কিন্তু তিনি বলে উঠেন, লক্ষ্মী নয় অলক্ষ্মী! সেই অলক্ষ্মীর খপ্পরে পড়েই তুই বিয়ে করতে চাস না।

ওফ, আমার মনে হয়, তিনি আমায় শান্তিতে বাঁচতে দেবেন না, আমার সুখে তিনি কাতর হয়ে ওঠেন। অদ্যাবধি তিনি আমার সুখে-আনন্দে তুষারপাত করে এসেছেন। এমন পৃথক থেকেও আমি তার ছায়া থেকে মোটেই দূরে নই। মনে মনে পরিকল্পনা আঁটি, প্রতিটি ছুটির দিনে আমি বাইরে থেকে দরজায় তালা এঁটে অন্য দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়বো, তিনি এলেও তালা দেখে ফিরে যাবেন। তিনি কি আমায় স্বস্তিতে থাকতে দেবেন না? কেন অযথা সম্পর্কের বোঝা যখন-তখন আমার উপরে চেপে ধরেন? আমি তাঁকে কি করে বোঝাই, যে তাঁর কোন উপদেশ, কথা, এমন কি তাঁর উপস্থিতিও আমার পক্ষে কোন অহমিকা রাখে না, বরং অন্তঃস্থল থেকে এক ধরনের নিরুৎসাহ বোধ কুরে কুরে খেতে থাকে।

কিন্তু, তখনই আমি দেখি, ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিমায় তিনি সংকুচিত হয়ে উঠেছেন, খোকা, মনে করিস না। আমি বলতে চাই যে স্বজাতির মেয়ে দেখিস। বলেই, আবার ছবির দিকে চোখ আটকে রাখেন, আমার মুখোমুখি তিনি, তবুও, কি ভয়ানক একাকী হয়ে পড়ি আমি। তাঁর সম্পর্কে পিতার কোন ছবি আমার মগজে ফুটে ওঠে না। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেন তুমি পিতৃ-পরিচয়ের ভার বয়ে চলেছ? তখনি দেখতে পাই তাঁর চোখের কোণ শূন্য হয়ে পড়েছে এবং আমার কাছ থেকে আড়াল করার জন্য ছবির অর্থ অন্বেষণ করছেন।

তুমি অন্য ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করো, ততক্ষণে আমি কয়েকটা কাজ সেরে নিই। ঘরোয়া মহিলাদের মত আমি বলি। যেই তিনি উঠে বেডরুমের দিকে এগো- থাকেন, অমনি আমার ভুলে যাওয়া -টা কথা মনে পড়ে—বালিশের তলায় রাখা, জিনিসটার দিকে যদি তাঁর চোখ পড়ে, তাহলে? আমি জানি, আমাকে কিছু বলার সাহস তাঁর হবে না, বেচারী মাদ্রাজী মেয়েটাকে অসংখ্য অভিসম্পাত জানাবেন, কিন্তু, সৌভাগ্য যে তিনি আর খাটের দিকে এগোন না। আয়নার পাশে রাখা আমার শেভিং ব্রাশ তুলে হাতের চেটোয় ঘষতে থাকেন। তারপর, তিনি আয়না তুলে আমার সামনে এনে ধরেন, দ্যাখ, ছোট-খোকার সঙ্গে আমার এতটুকু মিল নেই, একেবারে মা-র আদল পেয়েছে। কিন্তু, তুই যেন আমার কার্বন কপি।

আয়নায় দেখি, পাশাপাশি দুটো মুখ, হুব-হু এক রূপ, এক রং তাদের মাঝে কেবল বয়সের তারতম্য। আমার বয়সকালে তাঁকে নিশ্চিত আমার মতই মনে হতো। তাঁর বয়সকালেও আমি তাঁর মতই হবো। আয়নায় তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টির বিনিময় হয়। কিন্তু, লহমায় তিনি তার মুখ অন্যদিকে সরিয়ে ফেলেন।

অনুবাদ : সুবিমল বসাক

পালংক

উপেন্দ্রনাথ "অশ্ক"

নববধূর চোখে চোখ রেখে, ঝুঁকে দেখতে গিয়ে কেসির দৃষ্টিটা হঠাৎ পালঙ্কের মাথার দিকে লাগান গোল কাঁচে মার ছোট্ট ছবির ওপর গিয়ে আটকে গেল। পানপাতার মত সুন্দর মুখ, বড় বড় আয়ত দুটি চোখ, বাঁশীর মত নাক, বেদনামিশ্রিত হাসির ফ্রেমে মুক্তোর মত দাঁত এবং...এবং এবং অকস্মাৎ নববধূর মুখখানি ওর মার মত মনে হল। আশ্চর্য! দুজনেরই চেহারা—নাক মুখ চোখে কেমন যেন এক অবাক করা সাদৃশ্য।

কেসির মাথা ঘুরে উঠল। অদ্ভুত এক শিহরণ ওর সর্বাঙ্গে, শিরায় শিরায় সির-সির করে খেলে গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে ও ঐ ছবিটা দৃষ্টি থেকে সরাতে চেষ্টা করল। কিন্তু শৈশব থেকে মাত্র কয়েক বছর আগে পর্যন্ত না জানি কতবার ও মার বুকে, মার সঙ্গে পালঙ্কে শুয়ে কাটিয়েছে। সেই স্মৃতি ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ল। নব-বধূর আয়ত দুটি সুন্দর চোখ এবং কামার্ত ওষ্ঠ দুটি চুম্বন করতে গিয়ে সহসা ও সরে গেল বাঁদিকে। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। চকিতে ওর দৃষ্টি পালঙ্কের ছত্রীতে বেল যুঁই ফুলের লম্বমান মালার দিকে পড়ল। এবং ওর হাত পালঙ্কের ওপর ছড়ানো বেলফুলের ওপর পড়ল। এবং কেসির সহসা মনে হল, ও লাফিয়ে এই সুবাসিত ফুলশয্যার ঘরের বাইরে পালিয়ে যায়।

কিন্তু ও বিছানা ছেড়ে উঠল না। লাফালও না। বরং চুপচাপ শুয়েই থাকল। নববধূটি না জানি কি কি ভাববে এই চিন্তা ওর অচেতন মনে ওকে পালঙ্কের সঙ্গে বেঁধে রাখল। মাথা ঝাঁকিয়ে ও চেষ্টা করল—খানিক আগের ঐ স্মৃতির ছবিটা চোখের সামনে থেকে যেন চলে যায়। কিন্তু, না...। কিন্তু তা না হয়ে বর্ষার মেঘের মত একের পর এক অনেকগুলো ছবি ওর চোখের সামনে ভাসতে লাগল...

...এই তো সেই ঘর। এই তো সেই পালঙ্কের ওপর ওর বাবা ও মা শুয়ে আছে আর ও বারান্দায় খাটে শুয়ে টুকটুক করে দেখছে। বাবার কাছে শুয়ে থাকা মাকে কত ছোট্ট আর যেন কত সুন্দর মনে হত।

....ওর মা মেঝেয়, আয়নার সামনে বসে চুল বাঁধছে আর ও দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছে। আয়া ওকে যেসব পরীদের গল্প শোনায় ওর মা তো ওরকম পরীর মত সুন্দর। মা ওকে দেখে ফেলে এবং আদর করে কাছে ডাকে। ও হামাগুড়ি দিয়ে, পুলকিত মনে মার কোলে গিয়ে মুখ লুকোয়। মা এক হাতে ওকে আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় এবং অন্য হাতে চুল আঁচড়ে যায়।

...কে জানে, বাবার কি হয়েছে। একটা লোক রোজ আসে। ওর গলায় দুটো সাপের মত কি যেন ঝোলে। দুটো সাপের মুখ যেন এক। আর ল্যাজ দুটো লোকটা কানে গুঁজে, সাপের ঐ মুখ দিয়ে বাবার বুকে এখানে সেখানে রেখে কি যেন দেখে। তার-পর বাবার হাতে ছুঁচ ফোটায়। আশ্চর্য! বাবা কিন্তু কাঁদে না...ও কেঁদে ফেলে। মা ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়।

...কেসির বাবা মেঝেয় শুয়ে আছে। নড়াচড়া করছে না। ঘরের সবাই কাঁদছে। ও-ও কাঁদছে। ওর মা তো কেঁদেই যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে ওকে আদর করে, চুমু খেয়ে ভুলিয়ে—কেঁদে যাচ্ছে। কিছু মেয়ে-ছেলে এসে মার হাতের চুড়িগুলো ভেঙে দিল। মাথার সিঁদুর মুছে দিল। আর ওকে মার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কেসি ককিয়ে কেঁদে উঠল। কেঁদেই চলল। কেউই ওকে ভোলাতে এল না, ও কেঁদেই চলল।

...এই সেই পালঙ্ক। বাবার জায়গায় ও শুয়ে আছে। ওর মাও ওর সঙ্গে শুয়ে আছে। পরনে সাদা একটা শাড়ী। সকালের আলোয় ঝলমলে ঘর। কিন্তু ওর মা গভীর ঘুমে অচেতন। ও মাকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে। সেই পানপাতার মত, পরীর মত মুখশ্রী, চোখদুটি বন্ধ। মাথার চুল এলো-মেলো। মনে হল ওর মা যেন সেই শাহজাদি যে শাপগ্রস্ত, ঘুমে অচেতন এবং এক শাহজাদা এসে ওকে জাগিয়েছিল। ও গুটি গুটি মার কাছে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল। মা জেগে গেল। মা-ও ওকে সোহাগ করে বুকের মধ্যে টেনে নিল...

...ও মার বুকে শুয়ে আছে। রাজ-কুমারের গল্প শোনাচ্ছে মা। যে কিনা সাত-সমুদ্দুর পার থেকে একটা রাজকুমারীকে বিয়ে করে এনেছিল। গল্প শুনিয়ে মা ওকে জিগ্যেস করেছিল :

—তুমিও কি ওরকম রাজকুমারীকে বিয়ে করবে?

—আমি তোমাকে বিয়ে করব মা।

—দূর পাগল! ছেলে কি মাকে বিয়ে করে যায়?

শেষে মা ওকে আশ্বাস দেয়, নিজের মতই একটা বৌ আনবে ওর জন্য।

--তাহলে কিন্তু আমি এই পালংকটাই নেব মা! পালঙ্কের মাথার দিকে গোল কাঁচে লাগান মার সুন্দর ছবিটা দেখে বলল ও।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে সোনামণি। আমি এই পালংকটা তোমাকে ও তোমার বউকে বিয়েতে দেব। বলে, মা আনন্দে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিল।

—কি হল? শরীর খারাপ লাগছে নাকি? নববধূ সহসা পাশ ফিরে কেসির মাথায়, চুলে সপ্রেমে হাত বোলাতে বোলাতে বলল।

—না! ও কিছু নয়। মাথা ঝাঁকিয়ে স্মৃতির শৃংখল ছিঁড়ে কেসি হাসল। টেনে টেনে হাসল—যা দীর্ঘশ্বাসেরই নামান্তর।

কেসির মা তো ঠিকই বলেছিল। কথা রেখেছে ওর মা। বাড়ীর একমাত্র ছেলের বৌ, ঠিক নিজের মতই এনেছে মা। মার মতই ছিপছিপে, লম্বাটে গড়ন, বড় বড় চোখ, বাঁশীর মত নাক, গোলাপ পাঁপড়ির মত দুটি ঠোঁট, আর মুক্তোর মত ঝকমকে সুন্দর দাঁত। মার পছন্দ, মার নির্বাচন ধন্য।

যদিও কেসি বিয়েতে সুন্দর একটা পালঙ্ক পেয়েছে, তবু, মা বহু বছর আগের কথামত নিজের বড় দামী পালংকটা ফুলশয্যার ঘরে সাজিয়ে দিয়েছে ওদের মিলন-যামিনীর জন্য। শুধু পালংকই বা কেন, মা তো নিজের সব কিছুই দিয়ে দিয়েছে নতুন বৌকে!

নববধূ কেসির চোখের দিকে চেয়ে কোন এক দূরের কিছু যেন দেখতে চাইল। বুঝতে জানতে চাইল, কিছুক্ষণ আগে ওর উৎসাহ প্রাণচাঞ্চল্য হঠাৎ কেন ঝিমিয়ে পড়েছিল? কিন্তু জানবে কি করে? কোন উপায়ে? তাও ও পরম আশ্লেষে ওর মাথায় হাত বোলাচ্ছিল।

কেসি কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ও নতুন বৌকে পরম স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এভাবে কেসি ওর সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ রইল। তারপর ওকে পাগলের মত অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিয়ে ওর বুকে মাথা দিয়ে পড়ে রইল। ওর বারবার মনে হল এবার নববধূকে অকৃপণভাবে আদর করে, কিন্তু পালঙ্কের মাথার দিকে মার ঐ ছবিটার দিকে নজর পড়তেই ও সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিত হয়ে ওঠে। ওখানে শুয়ে শুয়েই একটা বালিশ দিয়ে মার ঐ ছবিটা ঢেকে দিল। মাথা তুলল এবার। কিন্তু আশ্চর্য! ছবিটা ঢাকা দেবার পর যেন আরও জীবন্ত হয়ে উঠল। নববধূর মুখ চোখে যেন অন্যের মুখ-চোখের আকৃতি রূপ পেতে লাগল। না-না-না। এ হতে পারে না। ও যেন মনে মনে চেঁচিয়ে উঠল। এবং আবার আগের মত চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই মনের মধ্যে ঝড় উঠল—ও ধড়ফড়িয়ে এক লাফে ফুলশয্যা ছেড়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

বাইরে সারারাত [illegible] পূর্ণিমা লাজুক লাজুক জ্যোৎস্না দিয়ে ভেতরে যেন উঁকি মারার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে ও গাড়ীবারান্দার তলায় এসে দাঁড়াল। এবং চুপচাপ জ্যোৎস্নার প্লাবনের দিকে তাকিয়ে রইল। ঠান্ডা হাওয়ার পরশে ওর ক্লান্ত স্নায়ুগুলো যেন একটু সজীব হয়ে উঠল।

সামনেই উন্মুক্ত . বাগান। বাঁয়ে ডাঁয়ে সবুজ নরম ঘাসের লন। বাগানে নানান দেশী বিদেশী ফুলের কেয়ারী। মধ্যে মোরামের রাস্তা গেট অবধি প্রসারিত। নানান রং বেরংয়ের ফুলের ওপর জ্যোৎস্নার প্লাবন। কটেজ থেকে গেট আর গেট থেকে কটেজ অবধি কেসি বার কয়েক পায়চারী করল। শেষে যখন ফিরে আসছে তখন দেখে কটেজের কোনের ঘরে আলো জ্বলছে। ওর মা তাহলে নিশ্চই জেগে আছে। ওর কাকীমা এবং বিবাহ উপলক্ষে আগত অন্যান্য মহিলারাও জেগে আছে এবং হয়ত ওর কথাই ভাবছে। ওর মা কত যত্ন কত পরিশ্রম করে এই ফুলশয্যার ঘরটি সাজিয়েছে। সারাদিন ধরে তো সে আয়োজনই চলেছিল। কোনের দিকে ঘরটা খালি করে সাজানো হল! চেয়ার সোফা প্রভৃতি সব বাইরে বার করে বারান্দায় রাখা হল এবং বউকে সেই ঘরে বসান হল। নানান স্ত্রীআচার চলল। আর সেসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেচারা কেসি ড্রইং রুমে নিজের বন্ধুদের নিয়ে কাটাল।

ওদিকে মার ঘরে ঘটা করে ফুলশয্যা তৈরী করা হচ্ছে—সাজানো হচ্ছে। তার পাশের কামরাটা কেসির। ওর সেই নিজস্ব ঘরে, বিয়েতে পাওয়া দুনিয়ার দানসামগ্রী ও ফার্ণিচারগুলো ঢোকান হয়েছে। ওর মার খুশীর যেন অন্ত নেই। বাড়ীভর্তি নানান আত্মীয় স্বজন, অতিথি অভ্যাগতদের দেখাশোনা—আদর যত্ন করা, দৌড়ধূপ করা, রাত জাগা সবই শুধু এই দিনটির, এই শুভ ক্ষণটির, এই ফুলশয্যার জন্য। কেসি মাঝে মধ্যে মাকে দেখতে এসেছে। দেখতে এসেছিল কিরকম সাজগোজ হচ্ছে, কিন্তু বারবারই ওকে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাত না হলে ওঘরে নাকি উঁকি মারাও নিষিদ্ধ!

টুকটাক কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে, হাসি ঠাট্টার মাঝে কেসি মাকে বারবার দেখেছে। মার বয়স চল্লিশ। গত বাইশ বছরের বৈধব্যে চেহারায় সামান্য কাঠিন্য ছাড়া তেমন বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। চোখের কোনে সামান্য হাল্কা কালিমা, অঙ্গে সাদা সিল্কের শাড়ী। নিজের একমাত্র ছেলের বিয়েতে—আনন্দের আসরে কেসি দেখল : উপস্থিত সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ওর মা-ই সবচেয়ে সুন্দর। তবু ওর মনে হল : এত খাটাখাটুনি মার সহ্য হবে না। অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই বলতে চাইল : মা, অনেক হয়েছে। এবার শুয়ে পড়। কিন্তু কেসি নিশ্চিত জানে মা তার কথা শুনবে না।

কেসির হঠাৎ মনে পড়ল, এক সময় মা ওকে বলেছিল : আমার বিয়ে তো নামমাত্র হয়েছিল। তোমার বাবা ছিলেন মামুলী এক কেরানী। ফুলের ভাল একটা তোড়াও আসেনি আমার বিয়েতে। তাই তোমার বিয়েতে আমি দেখিয়ে দেব, বিয়ে, ফুলশয্যা কাকে বলে। আমি চাই না তোমার বৌ-এর মনে কোন ক্ষোভ থেকে যায়।

রাত্রে এক সময় ফুলশয্যার ঘরের পর্দা তুলে কেসিকে জোর করে ঢুকিয়ে দিলেন ওর কাকী। বললেন : দেখ, যেন দর্শন আউড়িও না। তিনি হেসে চলে গেলেন। এবং কেসি ঘরে ঢুকেই হকচকিয়ে গেল। একি! এই তো সেই চিরপরিচিত ঘর! সেই পালঙ্ক! অন্যান্য টুকটাক জিনিষপত্র, আসবাবও চেনা জানা। মার প্রায় সব জিনিষপত্র সাজানো গোছানোর কায়দায় একেবারে নতুন ঘর মনে হচ্ছে যেন! সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছে পালঙ্কের ছত্রীতে মশারির মত লম্বমান বেলফুল-এর হার। মনে হল যেন ফুলের মশারি! পালঙ্কে, বিছানায় ফুলের মোটা আস্তরণ। মনে হচ্ছে, নববধূ যেন স্বয়ং ফুলদেবী—

উপেন্দ্রনাথের একাধিক উপন্যাস ও সাহিত্যকর্ম ভারতীয় প্রায় সকল ভাষাতে এবং ইংরাজী, রাশিয়ান, জার্মানী প্রঃ ভাষায় অনূদিত হয়ে তাকে উত্তরোত্তর খ্যাতির শীর্ষে আসন দিয়েছে।

'অশ্ক' তাঁর উপনাম। উপেন্দ্রনাথ 'অশ্ক'-এর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর 'গিরতী দিওয়ারে' উপন্যাস। দেশভাগের পূর্বের নিম্নমধ্যবিত্ত পাঞ্জাবী সমাজ জীবনের একটি নিখুঁত দলিল। এই উপন্যাসটিকে হিন্দী সাহিত্যের বাস্তববাদী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকরূপে প্রেমচন্দের 'গোদান'-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। প্রায় ষাটখানি বিভিন্ন সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করেছেন ইনি। এঁর একাধিক গল্প বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য। এই সংখ্যার 'পালঙ্ক' গল্পটি বিখ্যাত একটি গল্প।

হাল্কা ঘোমটা টেনে, সুবাসিত শ্বেতশুভ্র চাদরে বসে কেসির জন্য অপেক্ষমানা...

যদিও ওর বাবা পরবর্তী জীবনে ইঞ্জিনীয়ার হয়েছিলেন এবং সংসারে কোন অভাব ছিল না, তবু মা নিজের বিয়ের সময়কার দারিদ্র্যের জ্বালা ভুলতে পারে নি। তাই ছেলের বিয়েতে সেই সুপ্ত বাসনার চরম রূপদান করেছে। আর মার এই সাজাবার ঘটা কেসির কাছে রীতিমত পীড়াদায়ক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কারণ, যেদিকেই চোখ যায়, সেদিকেই পুরনো স্মৃতিভারে ও জর্জরিত হয়ে ওঠে।

—'দেখ যেন দর্শন আউড়িও না'। কাকীমার এই কথা এবং তাঁর হাসি সহসা কেসির মনে পড়ল। তাহলে কি কেসি নিজেকে জালে জড়িয়ে ফেলেছে? না জানি নতুন বৌটি কি ভাবছে! অনেকগুলো ঘটনা ওর মাথায় কিলবিল করে উঠল।

...মানুষের জীবনে বিয়ের প্রথম রাতে পুরুষের দুর্বলতা বিবাহিত জীবনের বারোটা বাজায়...কিন্তু তা বলে কি এই প্রথম রাতেই পুরুষের পৌরুষ প্রমাণ করা খুব কি জরুরী?...এই রমণীকুল কি তাহলে এজন্যই এত কাণ্ডকারখানা করে?...তাহলে, তারাও কি সকলে এইভাবে...একই কায়দায় ফুলশয্যার রাতে...তবে কি ওর মাও...ওর ফুলশয্যার ঘর সাজাবার জন্য এত কাণ্ড, এত পরিশ্রম করা...নিজের পালঙ্ক...সব কিছু দিয়ে দেওয়া...ইস্‌! কেন মরতে ও বলতে গিয়েছিল যে আমি এই পালঙ্কটা নেব! কিন্তু ও তো তখন এতটুকু বাচ্চা! ওর মাও কি বাচ্চা নাকি!

কেসি বারান্দায় ফিরে এল। সহসা ও দেখল, সদ্য বিবাহিত স্ত্রীও গাড়ীবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে!

—আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে?

—না।

—আমি কি কোন অন্যায় কিছু করে ফেলেছি?

কেসির মনে হল: খুব জোরে যেন চীৎকার করে ওঠে। একই কথা ওরও মাথায় ঘুরছে? কিন্তু না। ও তা করল না। আদর করে বৌ-এর কোমরে ভালবাসার হাত রেখে ভেতরে নিয়ে গেল ওকে। মনে মনে ঠিক করে নিল: নিজের কমপ্লেক্সগুলোকে পরিত্যাগ করে ও তাই করবে আর পাঁচজনে যা করে! কেসি জোর করে ওকে পালঙ্কে শুইয়ে দিল। ঝট করে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নববধূ চট করে বালিশটা টেনে নিজের মাথায় যে মাত্র দিল, ঠিক সেই মুহূর্তে কেসির চোখে পড়ল মার ঐ ছবিটা। সেই ছবিটা যেটা পালঙ্কের শিরে যত্ন করে বাঁধান। ওর মাথা কেমন যেন গুলিয়ে উঠল। উঠে পড়লও। বাইরে বেরুবার জন্য পা বাড়াতেই বৌ ওর হাত চেপে ধরল।

মাঝের বন্ধ কপাটের দিকে কেসির চোখ পড়ল। কি ভালই না হত যদি মা এঘরের বদলে ওর নিজের ঐ ঘরে ফুলশয্যার ব্যবস্থা করত। কিন্তু হায়! এখন তো ওর ঘর বিয়ের যৌতুকের জিনিষপত্রে ও ফার্ণিচারে ঠাসা গোদাম বিশেষ। আর তার চাবি ওর মার কাছে!

হতাশা ও ব্যর্থতার এবং অক্ষমতার একটা শূন্য দৃষ্টি নিয়ে ও বাইরে তাকিয়ে দেখল। ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ওদের বারান্দা কেমন উদ্ভাসিত! হঠাৎ ও বলল: দেখ বাইরে কি চমৎকার চাঁদনী!

চলো বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি।

নবপরিণীতা উঠে দাঁড়াল। আলুথালু বেশবাস ঠিক করে নিল। আয়নার কাছে গিয়ে মাথার এলোমেলো চুল আঁচড়ে মাথায় একটু ঘোমটা তুলে কেসির পেছনে পেছনে এল।

বাকাহারা কেসি বারান্দা থেকে ফটক আর ফটক থেকে বারান্দা বার দুয়েক পায়চারি করল। বৌ দুএক বার পূর্ণিমা ও জ্যোৎস্নার প্রশংসায় দুএকটা কথা বলল কিন্তু কেসির মৌনতা দেখে ওর সঙ্গে সঙ্গে পায়চারি করে যেতে লাগল।

চৈত্রের চাঁদনি যেন সত্যি অদৃশ্য মদিরার মত ওদের শিরায় শিরায় মাতন লাগিয়েছিল। তাই ওরা কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। সদ্য বিবাহিত পতিদেবতার এরকম বিচিত্র ব্যবহারে নববধূ ঘাবড়ে গিয়েছিল। কারণ ওর বান্ধবীদের কাছে (এদের মধ্যে অনেকে দুএকটি বাচ্চার মা আছে) বিবাহিত জীবনের মধুরতম এই প্রথম রাত্রির বিষয় যা শুনেছিল, ওর ক্ষেত্রে তা যেন হাতের মুঠোয় এসেও ফস্কে যাচ্ছে। এই পতিদেবতার শান্তশিষ্ট, রূপযৌবন, ওর কাজকর্মের বিষয় অনেক প্রশংসা শুনেছিল বধূটি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ছিল অধ্যাপক। ওর বাবা, শুধুমাত্র সহকর্মী অধ্যাপকদের কাছেই নয়, ওর ছাত্রদের কাছ থেকেও পুরো খোঁজখবর নিয়ে তবেই এ সম্বন্ধ পাকা করেছিলেন। ওর ভাবীস্বামী যে ছিটগ্রস্ত অথবা ওর মাথার দুএকটা স্ক্রু যে ঢিলে এমন কথা কিন্তু কেউই বলে নি। নিজের স্বামীর এমন বিচিত্র ব্যবহারের কি যে কারণ হতে পারে সে জন্য ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। ভবিষ্যত জীবনের অজানা আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে ও স্বামীকে সংশয়াকুল দৃষ্টিতে দেখে নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করছিল। চাঁদনী চাঁদনীর দিকে ওর বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না।

আর কেসির মাথাও যেন কোন কাজ করছিল না। ও কিছু ভাবতে পারছিল না। হাত দুটো পিছমোড়া করে শুধু, অর্থহীনভাবে ঘোরাঘুরিই করছিল ও। যখনও দ্বিতীয়বার গেটের কাছে পৌঁছল তখন হঠাৎ কেসি বলে উঠল: চলো। একটু বাইরে বেরুই!

—কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে যে! নবপরিণীতা মৃদু প্রতিবাদ করল।

—এই কাছেই যাবো। জলের ট্যাঙ্কের কাছে। কেসির মনে পড়ল, ওর এক বন্ধু বলেছিল, জলট্যাঙ্ক থেকে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ফটক পর্যন্ত রাস্তাটা এত নির্জন, ছায়া ছায়া আর রহস্যময় যে প্রেমিক প্রেমিকাদের কাছে জায়গাটা একটা আদর্শ বিশেষ।

এবং ও বাংলোর গেট খুলে বাইরে এল। জলের ট্যাঙ্ক কোথায় নতুন বৌটির তা জানার কথা নয়। বেচারী চুপচাপ কেসিকে অনুসরণ করল। তাছাড়া ওর করার আর আছেই বা কি!

কেসি অতঃপর বৌকে ওখানকার জলট্যাঙ্ক, জি-টি-রোডের, রেলওয়ে কোয়ার্টারের ইতিহাস বলে চলে। কিভাবে ইংরেজের বদলে হিন্দুস্তানীরা বাংলোগুলো পেল—আটাকলে কিভাবে ময়দা তৈরী হয়—কোল্ড স্টোরেজে কিভাবে হাজার হাজার মন আলু রাখা হয়—রোটারী মেশিনে কিভাবে সংবাদপত্র ছেপে ভাঁজ হয়ে বেরিয়ে আসে ইত্যাদি। এইসব কথা বলতে বলতে ও'র খেয়াল ছিল না। স্টেশনের দিকে কখন যেন এগিয়ে এসেছে। লেভেল ক্রসিং-এর ফটক বন্ধ। লাল আলো জ্বলছিল। তা দেখে কেসি বলল: এই গুমটিটা একটা আপদ। চব্বিশ ঘন্টা বন্ধ থাকে—কোন না কোন গাড়ী পাশ করেই। এতবড় স্টেশনটা তৈরী হয়ে গেল অথচ এই গুমটির কোন কিনারা হল না। এখানে একটা ওভারব্রীজ হলে আমরা বাঁচি।

গাড়ী আসার দেরী ছিল। পাশের রাস্তা দিয়ে ওরা আবার জলট্যাঙ্কের কাছে এসে পৌঁছল। ডানদিকের রাস্তা আলোর ঝলমল—বাঁদিকের ছায়াময় অন্ধকার। কেসি যখন ওদিকে পা বাড়াল তখন ওর বৌ বলে ওঠে:

—চলুন এবার বাড়ী যাই। রাত অনেক হয়ে গেছে যে...

কিন্তু কেসি ওর আবেদনে কর্ণপাত না করে ওকে ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে: চলো না আরো খানিকটা যাই। দেখ না কালো পিচের রাস্তায় জ্যোৎস্নার কেমন বান ডেকেছে।

—তাহলে, ওদিকে কেন গেলেন না? কেমন খোলামেলা রাস্তা...

—কেন গো' ভয় লাগছে? কেসি বৌকে বুকের মধ্যে নিয়ে চুমু খেল। বধূ তাড়াতাড়ি নিজেকে ওর বাহুবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেল: মা-মা করছেন কি? রাস্তার ওপর...

—তাতে কি? এখানে আর কে আছে? বলে কেসি ওকে পুনরায় ধরার চেষ্টা করে, চুমু খেতে চায়। আর ঠিক তখুনি সামনের

[illegible] থেকে একটা বড় লরী হেড লাইট জেলে ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। পরপর অনেকগুলো লরী-ট্রাক চলে গেল। না জানি কোত্থেকে আসছে সব...আচ্ছা নিরিবিলি জায়গা বটে! কেসি মনে মনে বিরক্ত হয়। ওর সমস্ত রোমান্স উবে গেল।

—চলুন, এবার যাই...নতুন বৌ কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে : বড্ড ক্লান্ত লাগছে...

—এটা মেইন রোড। এখানে দিনরাত গাড়ীঘোড়া, লরীবাস ট্রাক চলাচল করে.. কেসি নববধূকে বোঝাবার চেষ্টা করে : চলো, ওদিকে এম-টি লাইন্সের দিকে যাই।

গীর্জা পর্যন্ত নিরালা সড়ক।

—চলুন, আমি কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বৌ মিনমিন স্বরে বলে। কিন্তু কেসি ওর কথায় কান না দিয়ে, সোহাগ করে ওকে বাহুতে বেঁধে মিলিটারি লাইন্সের খোলা নির্জন সড়কে পা বাড়াল।

ঝকঝকে তকতকে পিচমোড়া রাস্তার দুপাশের বাংলোগুলোর ওপর জ্যোৎস্না নিঃশব্দ অরূপণ মায়াজাল। উদার সড়ক। পাশের গাছগাছালিতেও তলায় আলো আঁধারির লুকোচুরি খেলা। কোত্থেকে যেন সুন্দর মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। কেসি কল্পনার চোখে দেখে নিল : কোথাও যেন 'রাতের-রাণী' ফুল স্পর্ধাভরে বিকশিত—মৃদুমন্দ হাস্যে জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে এবং ওর প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসের সুগন্ধি সমস্ত বায়ুমণ্ডলকে সুবাসিত করে তুলেছে। কেসি সদ্য বিবাহিতাকে রাস্তার পাশের একটি গাছতলায় নিয়ে গিয়ে পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল : কি গো। সত্যি খুব ক্লান্ত লাগছে?

নববধূ কোন জবাব দিল না। নিজের ক্লান্তশ্রান্ত দেহটাকে সহসা ও কেসির বুকের ওপর এলিয়ে দিল। এবং কেসি ঐ আলো আঁধারির গাছতলায় ওকে পরম সোহাগে বুকের মধ্যে নিয়ে চুমু খেল।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার ওপার থেকে টর্চের তীব্র আলো ওদের মুখের ওপর এসে পড়ল। দুজনেই শক্ খাওয়ার মত ছিটকে সরে দাঁড়াল। কেসি কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল—ভয়ে। ওর বুক কেঁপে উঠল। ওর মনে পড়ল, হঠাৎ—এম টি লাইন্সে রাত বারোটার পর চলাফেরা, ঘোরাঘুরি করা নিষিদ্ধ।

গাঢ় সবুজ রঙের ইউনিফর্ম পরা তিন-চারজন সৈনিক নিজেদের মধ্যে গান গাইতে গাইতে রাস্তাটা পেরিয়ে গেল। যাক...

যাক। বাবা বাঁচা গেল...

কেসির রোমান্সে আপ্লুত মন আর মুড নষ্ট হয়ে গেল। আর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ওর মার ওপর। ঐ পালঙ্কের ওপর। এবং ঐ পালঙ্ককে কেন্দ্র করে ওর অহেতুক [illegible] যেন রাগে ফেটে পড়তে চাইল...

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওরা বাড়ী এল। বৌ বেচারী ওর পেছনে যেন ঘন্টাতে ঘন্টাতে যন্ত্রের মত এল। বাংলোয় এসে কেসির চালচলন কেমন যেন মিইয়ে গেল। কিন্তু নববধূ টলতে টলতে পালঙ্কে নিজের শরীর ডুবিয়ে দিল। কেসি যখন ঘরে ঢুকল, তখন ও পালঙ্কে শুয়েছিল—পা ঝুলিয়ে। শাড়ীর আঁচলটা নিচে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। খোলা ব্লাউজের অংশ দিয়ে ওর বুকের ফর্সা অংশ আয়নার মত চমকাচ্ছিল। কেসির ইচ্ছে হল ও পালঙ্কে ওর নিচে বসে পড়ে এবং মাথাটা বৌ-এর কোলে নিশ্চিন্তে রেখে দেয়। ইচ্ছেটা হতেই নিজের স্ত্রীর শায়িত শরীর থেকে ওর দৃষ্টি হঠাৎ অজান্তে পালঙ্কের শিরে লাগানো মার সেই ছবির দিকে চলে গেল। এবং ও অনিশ্চিত যন্ত্রবৎ ঘরের মাঝখানে উঠে দাঁড়াল। নতুন বৌ চিৎ হয়ে শুয়ে ছাদের সিলিং-এর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ওর চোখে ক্লান্তির জ্বালা...

কেসির নজর হঠাৎ মাঝের দরজার দিকে পড়ল : এই ঘরটা তো ভেতর থেকে বন্ধ। তাই না?

বৌ তেমনি ছাদের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়—হ্যাঁ।

—এর চাবি কোথায়?

—কাকীমার কাছে। তিনিই তো সব জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখছিলেন, কেসি বাইরে এল। কটেজের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত গেল। দেখল : মার ঘরের আলো জ্বলছে না। নেভান। ক্লান্ত শ্রান্ত রমণীকুল ঘুমিয়ে। মনে এল : মাকে জাগালে কেমন হয়? কিন্তু কাকীমা যদি জেগে যান? আবার যদি সেরকম ঠাট্টা করেন তাহলে? ও ফিরে এল। ঘরের মধ্যে এসে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল। ওর দৃষ্টি বৌ-এর দিকে গেল। সে ঠিক তেমনি—নিশ্চল ছাদের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে। সহসা ও এগিয়ে বন্ধ ঘরের দরজায় ধাক্কা মারল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। নিচেও ছিটকিনী আঁটা। ভাবল, যদি ওপরে ছিটকিনী থাকত তো সার্সির কাঁচ ভেঙে ছিটকিনী খোলা যেত। কিন্তু মনে পড়ল : ওর মা বরাবরই নিচের ছিটকিনী লাগায়। কি করবে না করবে ভেবে পায় না কেসি। কারণ যাই করুক না কেন, মার জেগে ওঠার সম্ভাবনা আছে। সেটা ও চায় না। হঠাৎ কেসি দেখতে পেল। বন্ধ দরজাটার নিচের পাল্লায় একটা যেন চিড় প্যানেলের কাঠ ভাঙা। ও মেঝেয় বসে, পালঙ্কে পিঠ লাগিয়ে ডান গোড়ালি দিয়ে খুব জোরে ধাক্কা মারল। দরজা যেমন ছিল তেমনই রইল, একটুও নড়ল না। বরং পালঙ্কটা একটু সরে গেল।

ছাদের সিলিং দেখতে থাকা বৌ তেমনই শুয়ে আছে। পালঙ্ক সরে যাওয়ার কোন প্রতিক্রিয়া ওর মধ্যে হল না। হঠাৎ [illegible] নববধূও তখন দেখল। জানি না, ওই চাহনিতে কি ছিল—কেসির মাথায় যেন খুন সওয়ার হয়ে গেল। ভাবনা-চিন্তার কোন শক্তিই ওর মধ্যে কাজ করল না। এবং এই ঝোঁকে ও হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দরজার মাঝের কাঁচে মারল জোর এক ঘুষি।

ঝনঝন শব্দে কাঁচ ভেঙে পড়ল।

নতুন বৌ আর শুয়ে থাকতে পারল না। ঘাবড়ে গিয়ে উঠে বসল। এবং স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল। বেশ যেন বিরক্ত হয়েই বলল : এ আপনি কি করলেন?

কেসি ওর কথার কোন জবাব দিল না। এমন কি ওর দিকে ফিরেও চাইল না। ভাঙা কাঁচের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ও নিচের ছিটকিনিটা অনেক কষ্টে খুলে ফেলল। ওর হাত কেটে গিয়েছিল। বাঁ-হাতে ভর দিয়ে সামলে, ডান হাত বার করল। এবং বিজয়ীর মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—হায়! এ আপনি কি করলেন! কেসির হাত দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখে ঘাবড়িয়ে অনুযোগের সুরে বলে বৌ। চারিদিকে ভীত সন্ত্রস্ত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল—এমন কিছু পাওয়া যায় কিনা যা দিয়ে ওর হাতে ব্যাণ্ডেজ করা যায়।

কিন্তু কেসির ওসব দিকে নজর ছিল না।

দরজা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকল। আলো জ্বালল। বিয়েতে পাওয়া রাজ্যের জিনিস ঘরময় ছড়ানো ছিটানো। ফার্ণিচার, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি, স্তূপীকৃত কাপড় চোপড়, মিষ্টিমাণ্ডার থালা-ট্রে। আর ঐ একদিকে বিয়েতে পাওয়া ওর পালঙ্ক—যার ওপর ডাঁই করা দুনিয়ার কাপড়চোপড়। দুহাত দিয়ে ঐসব কাপড় ও সোফার ওপর ছুড়ে ফেলে দিল। নববধূও দেখাদেখি ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে।

বৌ-এর চোখে কৌতুকের বদলে দেখা দিয়েছে ভয়। সহসা কেসি ধরে, ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে পাগলের মত চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুলল। আচম্বিতে এমন ঘটনায়, স্বামীর এমন কাণ্ড কারখানা নবপরিণীতা আরো ভয়ভীত হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন ও স্বামীর চোখে রুক্ষতার পরিবর্তে অপার মাধুর্য এবং প্রেম দেখতে পেল, যখন ওর উষ্ণ ওষ্ঠের পরশে ওর সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল তখন, ওর ভয়ে সিঁটকে যাওয়া শরীর আপনি শিথিল হয়ে এল। এবং ও নিজেকে পরিপূর্ণভাবে ধরা দিল কেসির কাছে।

পরদিন সকালে মা বাইরে এসে দেখে—ঘরে ভাঙা কাঁচের ছড়াছড়ি—ফুলশয্যা ফাঁকা। তাহলে কি চুরি....শঙ্কা জর্জর, ভয় বিহ্বল মা ভেতরের ঘরে পা রাখতেই দেখে...

সোফার গদী মাথায় দিয়ে খালি পালঙ্কের ওপর বর ও বধূ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

অনুবাদ : আনন্দ ভট্টাচার্য

মা এই চাকরী ছেড়ে দাও

নিরুপমা সেবতী

সারাটা দিন সে মায়ের জন্য বড় কাতর বোধ করে। বিশেষ করে ছুটির দিনে এখন একেবারে ভাল লাগে না। বিশাল বড় এক রাক্ষসের মত দিন, সকাল থেকেই হাজির হয়, আর তার চোখ মুখ ক্রমশ ঝুলে পড়ে।

সারাটা দিন সে করবেই বা কি, সকাল-সকাল মা তাকে জল-খাবার খাইয়ে দেয়। দিয়ে দুত তার গালে চুমু খেয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ে। তারপর থেকেই সে এই শূন্য ঘরে চুপচাপ বসে থাকে। ঘর অর্থাৎ যাকে সকলেই পাকা ঝুপড়ি বলে। কিন্তু মা তাকে বোঝায়—নারে, এটা পাকা ঘর। তোর বাবার ঘরটা ছিল সিমেণ্টের, আর এটা হল ইঁটের গাঁথুনি।

এমন নিঃসঙ্গ দিনে সে বার বার গলিতে উঁকি দেয়। তবুও, ঐসব ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে না। ওপারের কাঁচা ঝুপড়ি থেকে ছেলেরা এসে এই গলিতে ডাংগুলি, আর কতসব বাজে ধরণের খেলা করে। কিন্তু তার যে বারণ আছে ওদের সঙ্গে খেলা করার, তাছাড়া ওরা সকলেই তারচেয়ে বয়সে বড়। ডাকলে তবে তো গিয়ে খেলবে।

মার কথা সে সবসময় শোনে। আদর করে কোলে বসিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মা বলে—'আমার খোকন-সোনা কি আর বাজে ছেলে হবে। সে মস্ত বড় অফিসার হবে। তাই না খোকন?' তা শুনে, সে আনন্দে ডগমগ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ খুলে, বই বার করে পড়তে বসে পড়ে। যেন এক লাফেই সে ক্লাস ফোর্থ থেকে ক্লাস টেন-এ পোঁছে যেতে চায়। মার কাছে নিজেকে আজ্ঞাকারী প্রমাণ সে সঙ্গে সঙ্গে দেয়। কিন্তু, এখন মার কাছে ভাল হয়ে দেখাতেও তার সুখ নেই। স্কুল থেকে ফিরে এসে মাকে ঘরে পায় না, পাঁচ-ছ ঘণ্টা পার হয়ে যায়, গোটা বিকেল অতিক্রম করে মা ঘরে ফিরে আসে। সেই পাঁচ-ছ ঘণ্টা একা-একা সে কেবল ভাবে—হ্যাঁ, সে যাবে ঐ কাঁচা ঝুপড়ি-অলা ছেলেদের সঙ্গে খেলতে। তখন, মা ভাল করে টের পাবে।

কিন্তু, সে মোটেই সাহস পায় না। কেবল ভাবে। আগে যেখানে কাজ করত, সেখানে দুপুরেই ফিরে আসত মা। অবশ্য ত্রিশ টাকা পেত, তাতে কি! মা বলত, আরো টাকা চাই। এই কাজটা ষাট টাকার। হবে হয়তো। সে কি করবে। কিন্তু মাকে ক্ষেপাবার জন্য সে একটা ব্যাপার করে ফেলত। —হাত মুখ না ধুয়েই খেতে বসে পড়ত। মা বকুনি দিলে আরও বেশী ঢিট হয়ে থালার সামনে বসে থাকত। নোংরা, ধুলো মাখা হাত দেখে মা ফেটে পড়ত। কাঁধ চেপে ধরত—'নে, উঠে হাত মুখ ধুয়ে আয়।'

তখন সে উঠে পড়ত, তবুও মার বকবকানি থামত না—'আমি কত কষ্ট করে জল তুলে আনি। যাতে তুই ভাল করে চান করিস, একটু পরিষ্কার থাকিস। ভদ্রবাড়ীর ছেলেদের মত যাতে মনে হয়। আর তুই কিনা গেঁইয়া হয়ে থাকতে চাস। আমার কথা যদি একটু-আধটু শুনিস।'

বরং এসব ব্যাপার তার ভাল লাগে। মা যে তার জন্য ভাবে, তার কথাই বলে। একটা ভীতিময় দূরত্ব লোপ পায় মন থেকে। নতুন চাকরি পাবার পর থেকে মার সঙ্গে কম কথাবার্তার ফলে কয়েকবার সে এই দূরত্ব উপলব্ধি করেছে।

যেটুকুই বা কথাবার্তা হয়, তা আবার 'আজ সাহেব নতুন সোফা কিনেছে, ...আজ সাহেবের বাড়ীতে অনেক বড় বড় লোক এসেছিল, অনেক কাজ করতে হয়েছে, ...কিংবা, আজ সাহেবের দিদি-শাশুড়ীর জন্য অনেক দামী দামী গয়না পড়েছিল'—সাহেবের কথা শুনতে তার একেবারে ভাল লাগে না। সারাটা দিন মা সেখানে কাজকর্ম করে কিনা, তাই অন্য কথা মোটেই মনে পড়ে না এখন। সেজন্য যেদিন মা তাকে বকুনি দেয়, তার ভাল লাগে, কারণ জানা ছিল এরপর মা রাতে প্রচণ্ড আদর করবে।

তাও, আট দশ মাস পেরিয়ে গেছে। এমন দিন তো বারবার আসে না, তাছাড়া এই দীর্ঘ কালো দিন—এমন কালো, নিঃসঙ্গ দিন তার কাছে ভয়ংকর মনে হয়। একা-একা বল খেলে, মার্বেলগুলি ছোঁড়ে, নিঃসঙ্গ বসে নিজের পায়েই চিমটি কাটে। অথচ, কান্না পায় তার, কেন?—মার সঙ্গে দেখা করার প্রচণ্ড বাসনা নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

সাড়ে এগারোটা নিশ্চয় বেজে গেছে। প্রতিবেশী বিন্দো কাকার ছেলে টিফিন নিয়ে বাইরে বেরিয়েছে। পরের শিফটে যোগ দেবার জন্য এই সময়ে বাইরে বেরোয়। মা, এখন কি করছে। আজ অবদি মা তাকে দুবার সেখানে নিয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, এই সময়টা মা রান্নায় ব্যস্ত থাকে। সাহেবের অফিসটা বাড়ীর সামনের দিকে ঘরেই। একটা পর্যন্ত কাজ করেন সেখানে।

'কি কাজ করেন তিনি?' জিজ্ঞেস করায় মা বলেছিল—'বেশ লম্বা-চওড়া নাম। কি যেন ইমপর্ট-ইমপর্ট বলে। মানে, অন্য দেশের জিনিস আনিয়ে এখানে বিক্রী করেন। যাদের কেনার ইচ্ছে থাকে, তারা এই অফিসে কাগজে সই করে যায়।'

তারপর সে আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি। মা তখন মাছের-তরকারীর মশলা ভাঁজছিল, সে দেখতে থাকে। এখনও সেই তরকারীর স্বাদ তার জিভে লেগে আছে যেন।

মা-কে সে বলবে—বাড়ীতে ওরকম মাছের তরকারী রাঁধো না কেন? বাবার বাড়ীতে মা কয়েকবার রেঁধেছিল। নিজে খায় না, অথচ বাবার জন্য কি আগ্রহে না রাঁধতো।

বাবার বাড়ীর কথা মনে পড়তে, তার চোখ জোড়ায় সামান্য টান ধরে। দুর্বল, শীর্ণ [illegible] রাস্তার কাঁকর জোরে ঠোকর মারতে [illegible] ভাবে, সত্যি, বাবার পাড়াটা বেশ ভাল ছিল। এ পাড়াটা বিশ্রী। কিন্তু,

সে-পাড়ায় আর সে কখনও যেতে পারবে না। যাবেই বা কেন? বাবার বাড়ী বললেই মনে হয় সেই কালো ভয়ঙ্কর রাত...আর্ত-চিৎকারে সে জেগে পড়ত। কাকে যেন পেটাচ্ছে। চাপ...চাপ...সপাত...সপাত...মা'র আর্তনাদ। আর সে যদি চেঁচাত, তার পিঠেও দু'চারটে চাপড় পড়ত।

পরদিন সকালে মা ক্ষতস্থল যখন শেঁকত, সে তখন ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে থাকত। বাবা হাতের কাছে যা পেত, তা দিয়েই মা-কে পেটাত। ক্ষুন্ন-উদাস হয়ে বাইরে বের হলে, পাড়ার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করত—কিরে, রাতে তোর বাবা গিলে বেশ মেজাজে এসেছিল বুঝি!'

সে একেবারে চুপ, সারাটা দিন ভয়ঙ্কর অস্বস্তিতে কাটত। বাবার মুখ থেকে মদের কটুগন্ধ, তার ভেতরে বমি উগলে দিতে চাইত। এ পাড়ায় আসার সময় বিশ্রী মনে হয়েছিল তার, তবু একটা ব্যাপারে সে খুশী বোধ করে—যাক, এখন আর কারো হাতে পিটুনি খেতে হবে না। এখন কেউ আর বলে না—রাতে পারবতীর মরদ বেশ মেজাজে ছিল। এখন সে বরং বুক ফুলিয়ে বলে—'আমার বাবা গাঁয়ে চাষবাস করে। আমি এখানে লেখাপড়া করি।'

এ কথা মা-ই বলে দিয়েছিল। —কেন মা, বাবা ঐ শহরে চাপরাসী। তাহলে...

'যা বলছি, সেটাই বলবি। বেশী বকবক করলে তোকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবো।'

বাবার কাছে পাঠিয়ে দেয়াটা সে শুরু থেকেই ভয় পেত। যদিও, এখন মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সেই ভালো পাড়ায় সিমেন্টের ঝুপড়িতে যায়। ইচ্ছে হলেই বা কি। মা যদি যায় তবেই তো সে যাবে। আর মা শুধু শুধু মার খেতে যাবেই বা কেন।...

তাই সে প্রায় ভাবে, এখানে দারুণ মজা হয়। এই শহরটা বেশ বড়, তাছাড়া সুন্দর শহর। মা বড়বাজারে তাকে বেড়াতে নিয়ে যায়। কি মজাই না লাগে তার—সেখানে গেঞ্জী পরে কাটাত, আর এখানে মা সুন্দর, ফুলতোলা একটা জামা কিনে দিয়েছে বাজার থেকে, বার বার বলে দিয়েছে—শার্ট, শার্ট—জামা নয়। বুঝলি।' সত্যি, জামাকে 'শার্ট' বলতে খুব মজা পায় সে।

'কেন রে, দেখে হাঁটতে পারিস না। যদি, জোরে ধাক্কা খেতিস...

বিন্দোকাকীর ছোট ছেলে মনসুখা। গলির মোড়ে হাঁটতে গিয়ে তার সঙ্গে ধাক্কা লাগে।

'কিরে, চুপ করে রয়েছিস কেন? আজ বিকেলে, আমাদের ছেলেদের ফার্স্টকেলাস ক্রিকেট ম্যাচ হবে পার্কে। যাবি নাকি?'

'সন্ধ্যে হয়ে যাবে যে।' বিন্দোকাকীর ছেলেদের সঙ্গে মা খেলতে বারণ করে না। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে এলে দূর পার্কে মা হয়তো খেলতে দেবে না। সে চিন্তায় পড়ে।

'তুই ছেলে না মেয়ে। সন্ধ্যে হলে বুঝি ভয় করে।'

'আচ্ছা, যাবোখন। এখন কথা কওয়ার সময় নেই।'

হিন্দী কথাসাহিত্যে যে কজন লেখিকা গত দশক থেকে লেখায় বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন, নিরুপমা সেবতী তাঁদের একজন। জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং মানুষের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, সেই সঙ্গে পরিবেশগত লড়-যন্ত্রণা তাঁকে কলেজ জীবনেই গল্প লিখতে বাধ্য করে। যদিও কবিতা লিখে আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু জীবনের কঠিন পটভূমির জন্য পরবর্তীকালে গল্প লেখাই বেছে নেন। গত আট বছরে প্রায় আশিটা গল্প প্রকাশিত হয়েছে। খুব সহজভাবে জটিল বিষয় বচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। অদ্যাবধি দুটি গল্পসংগ্রহ এবং দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

'হুঁ-স, তুই যা তাহলে। এখন ছোট আছিস। কোলে বসে দুধ খা গিয়ে।'

মনসুখ তার উঁচু উঁচু দাঁত বার করা হাসি হেসে ঘরের দিকে এগিয়ে যায়, আর সে লজ্জায় লাল হয়ে পড়ে। গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। পাছে কেউ দেখে ফেলে, এই লজ্জায় দ্রুত পায়ে সে রাস্তার ধারে এগিয়ে যায়।

'ছোট নাকি সে? কোথায় ছোট। এখুনি সে একা-একা মার সাহেবের বাড়ী যেতে পারে। সমস্ত রাস্তাটুকুও তার বেশ মনে আছে। সে মোটেই ছেলেমানুষ নয়। মা-ও জানতে পারবে—সে একা একা সেখানে যেতে পারে। সে শক্ত হাতে কণ্ঠার কাছ থেকে বেরিয়ে পড়া শার্ট-এর কোণ দিয়ে চোখের জমাট অশ্রু মুছে ফেলে।

কয়েকটা রাস্তা পার করে, বিশাল বাড়ীর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠার পর, তার মাথা ঘুরতে থাকে—কোন দরজায় ধাক্কা দেবে। কার দোরের ঘণ্টি বাজাবে! তারপর দরজার হ্যান্ডেল দেখে চিনতে পায়! হ্যাঁ, এই দরজাই—মেয়ে-পুতুলের হ্যান্ডেল। গতবারে এই পুতুলটাই সে দেখেছিল কয়েক-বার। হাতে চেপে দু-তিনবার সে দরজা বন্ধ করছিল—খুলছিল দেখে মা চোখ বড় বড় করে বলেছিল—এমনটি করতে নেই খোকন। [illegible]

সে সামান্য উঁচু হয়ে দরজার পাশে ঘন্টি টিপে ধরে। মা-ই দরজা খুলে দেখে দারুণ খুশী হয়—'ওমা, তুই এসেছিস! আয়, সোজা কিচেনে চলে আয়। এখন রান্না করছি।'

প্যাসেজ অতিক্রম করে কিচেনে ঢুকলে মার চোখ-মুখ সামান্য শক্ত হয়ে ওঠে—'কেন এসেছিস রে? কোন কাজ ছিল?'

'না, এমনি এসেছি।' চোখ নীচু করে সে বলে—তোমায় দেখতে।'

মা চুপচাপ আলুর খোসা ছাড়াতে থাকে। গতবারের মত টুলের ওপর সে এসে বসে। খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে মা বড় ডেচকিতে হাতা নাড়িয়ে মশলা ভাজতে থাকে। ওহ্, মনে পড়েছে। এটা তো কুকার—মা-ই বলেছিল। মা কুকার নাবায়, ওপর ঢাকনা তুলে কলের তলায় রেখে দেয়. সাদা চকচকে আঁশহীন মাছ ধুতে থাকে।—তাহলে মা আজ আবার 'মাছের তরকারী' রাঁধছে। সে কিছুটা অবাক হয়ে বসে থাকে।

ক্যাচ-চ-চ...শব্দ ওঠে, মাছের চোখ নীচে গলে পড়ে। 'ওহ্' সে সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে মুখ সরিয়ে নেয়।

'কি হলো? ভয় পেয়েছিস বুঝি?' বলেই মা সশব্দে হেসে ওঠে। কিন্তু তার ভাল লাগে না। মার এ ধরনের হাসি আর অমনভাবে জিজ্ঞেস করা। যেন এই হাসি তাকে আবার মনে করিয়ে দেয় সে ছেলে-মানুষ, কিচ্ছু বোঝে না। —জমাট খয়েরী রক্ত, যা এখন মাছের চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে দেখছে, তার গলার ভেতরে খচ খচ করতে থাকে।

—'কে এসেছে?' সাহেবের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে সেই সময়। ভেতরে ঢুকে তাকে দেখে বল্লেন—'ওহ, তুমি বুঝি!'

তার মনে হয়, সাহেবের গোঁফটি আগের চেয়ে বেশী ঘন ও ছুঁচলো হয়েছে। গতবার, এখান থেকে ফিরে গিয়েই [illegible] বহুক্ষণ দেখেছিল, ঠোঁটের ওপরে নরম রোঁয়া স্পর্শ করে অদ্ভুত ভাবনায় পড়েছিল—সত্যি, কেমন করে, কবে এখানে গজাবে—তারও কি ভাল গোঁফ গজাবে এখানে।'

'শোন, একটু তাড়াতাড়ি রান্না করে দে। দিদিভাইও তাড়াতাড়ি বেরোবে। তার পর সাহেব মার কাঁধ ছুঁয়ে সামান্য নাড়া দেন—'কেমন যেন ঢিলে-ঢালা হয়ে পড়েছিস, একটু তাড়াতাড়ি হাত নাড়া।'

মা শুধু ঘাড় নাড়ায়। সে দেখে, মা যেন সামান্য বিব্রত বোধ করে। হাসছে বটে, তবু কেমন ভয়-ভয় ভাব। সাহেব বেরিয়ে গেলেই, মা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে মার দিকে কেবল চেয়ে-চেয়ে দেখে।—খোঁপা ঢিলে হয়ে পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে। মার মাথার চুল তার সবসময় ভাল লাগে। এই যে হবুদ শাড়ি পরেছে—মাকে বড় ভালো লাগে এই শাড়িতে। আগে মা জংলা ধরনের শাড়ি পরত, হাতে বাসন-ধোয়ার অদ্ভুত গন্ধ আসত, কিন্তু এখন মার হাতে কেমন গন্ধ-সাবানের মিষ্টিগন্ধ [illegible]
[illegible]

আঁচলে মুখ আড়াল করে মা যখন আদর করে, কি মজা লাগে তার। এই সময়টায় মাকে তার খুব ভাল লাগে। সহসা সে বলে ওঠে—মা, এত তাড়াতাড়ি কাজ করো না। হাঁফিয়ে পড়বে যে!'

'ওমা, আমার হাঁফিয়ে পড়ার কথা ভাবিস।' মা সস্নেহে আদর করে—'খোকন আমার বড় হয়নি। যেদিন চাকরি করবি, আমায় আর কাজ করতে হবে না।'

'মা, ঐ সাহেব তোমায় রুখু কথা বলেন কেন?'

'ছিঃ ছিঃ।' মার স্নেহ নিঃশেষ হয়ে গেছে—'খবর্দার, সাহেবকে যদি কিছু বলিস। কি বলেছে সে। তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বলে গেল, এই তো।'

সে চুপ। তবুও মা বলে—'নিজেকে কেউকেটা ভাবছিস বুঝি?' রাগে মা সশব্দে কুকারের ঢাকনি বন্ধ করে দেয়।

'সাহেবের কথা যদি এত খারাপ লাগে—আসিস না আর এখানে। তোর মা যে জমিদার-গিন্নী—তাই না! হাত নাড়িয়ে খেতে হবে না, কেবল পালঙ্কে শুয়ে কাটাবে।'

সে চুপচাপ পায়ের নখ দিয়ে টুলের পায়ার কাঠ আঁচড়াতে থাকে। ফিরে যাবে সে। কোথায়? সেই শূন্য ঝুপড়িতে। তার কান্না পায়। কিন্তু সাহেব যে তার কান্না টের পাবে। তার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে ছুঁচলো গোঁফ ছড়িয়ে পড়বে—না, তার ভাল লাগে না ওর কথা। গতবারেও তার সরু পা সম্পর্কে বলতে গিয়ে হেসেছিল—'পার্বতী, তোর ছেলের পা দুটো এত সরু-সরু কেন রে, তুই তো তেমন নস।'

হ্যাঁ, মা তেমন নয়। মা যখন পা ধোয়, হাঁটু অব্দি তোলা শাড়ির নীচে মায়ের পা-জোড়া কেমন সুন্দর, গোল গোল। কিন্তু মা করবেই বা কি—কতবার নিজে খাবার না খেয়ে, তাকেই বেশী খাইয়ে দেয়। তবুও সে সেরকমই রোগাটে, মা আর কি করবে? হ্যাঁ, সাহেব তো আর জানে না তার ও মা-র কথা। সেই কেবল জানে তার মা-কে। ও আর জানেই বা কি!

কিন্তু মা যদি এখন সাহেবের দিকে ঝোল টেনে কথা বলে, তাকে উপেক্ষা করে, তাহলে সে কি করবে! পরিষ্কার বকুনি দিয়ে গেল, অথচ মা বলে কিনা, তাকে বকুনি দেয়নি এবং কান্নাটে অবস্থায় সে স্থির করে, এখানকার মাছের তরকারী সে একেবারেই খাবে না।

'পার্বতী আর কত দেরী? আমায় যে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে।

সাহেবের দিদিভাইকে সে এর আগে দেখে নি। ঘরে ঢুকতেই, সে উৎসুক আগ্রহে চেয়ে দেখে—বেশ দেখতে: ভারি দোহারা শরীর, কিন্তু প্রাণ-প্রাচুর্যে-ভরা। সাহেবের মত রুক্ষ্ম, খিটখিটে নয়।

'তোর ছেলে নাকি?' দিদিভাই তার দিকে উপেক্ষাভরা দেখে না।

'হ্যাঁগো দিদিভাই।'

'পার্বতী তোর মানুষটা কি নিজের ছেলের খোঁজ-খবর নেয় না?'

'কি আর বলবো দিদিভাই, শুনেছি এখন নাকি আরেকটা সংসার পেতেছে, এই সংসারে একটা ছেলেও হয়েছে। আরও হবে। এই ছেলের সঙ্গে এখন ওর কিসের সম্পর্ক?'

'ইট ইজ ডিসগাসটিং'—

কি বললেন ইংরাজীতে। ফার্স্ট বুক-পড়া বিদ্যেতে সে-ই যখন বুঝতে পারল না, মা আর বুঝবে কি করে। মনে হয়, কোন গালাগাল দিলেন বাবাকে!

'পার্বতী!'

'আজ্ঞে।'

'তোমাদের জাতে কি অন্য বিয়ের চল নেই? তুমি বরং আরেকটা দিয়ে করে নাও। নইলে তোমার মানুষটার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করো। তোমাকে শুধু শুধু বার করে দিয়ে অন্য মেয়েমানুষ আনে কি করে। ইচ্ছে করলে ওকে ধরিয়ে দিতে পারো।'

'দিদিভাই, এমন কাজ আমি করবো, ছিঃ ছিঃ। শেষকালে কিনা নিজের পুরুষ-এর নাম পুলিশে এজাহার দেবো? নরকে যে জায়গা হবে না আমার।'

'তাহলে, তুমি করবে কি। গোটা জীবন একা একা দুঃখভোগ করতে হবে। এখন বয়সও তেমন নয়— পঁচিশের বেশী হয়নি।

'না'। মা খুব আস্তে আস্তে বলে, তারপর সহসা দ্রুতগলায় বলে ওঠে—দিদি-ভাই, আজ মাছের তরকারী খুব ভাল হয়েছে। খেলেই বুঝতে পারবে।

'তা জানি। তুমি ভাল রান্না করতে পারো। তোমার আগে যে চাকর ছিল—সেটা এক-নম্বরের চোর। এদিকে, দেখেছোত ভাই একা থাকে—কিছুই জানে-টানে না। ঐ চাকরটা সুযোগ পেয়ে ভাল আটা বিক্রী করে দিত, তার বদলে পোকা-ধরা কাঁকড় মেশানো আটা নিয়ে আসত। তাই খেয়ে ভাইয়ের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছিল।

—না দিদিভাই, আমি এমন কাজ করি না। মাথার উপর ভগবান আছেন। আপনি বসুন, আমি পাঁচ মিনিটে খাবার বেড়ে দিচ্ছি।

দারুণ আগ্রহ ও উৎসাহে মা কথাগুলি বলে। হ্যাঁ, মাকে এরকম দেখতেই ভাল লাগে। খুশীতে ডগমগ। অভাবের দিনের কথা বাদ দাও, তার আগে বাবার বাড়ীতে মা সবসময় এমনটি থাকতো—ঘরের সমস্ত কাজকর্ম গুনগুন করে উৎসাহে শেষ করত। তখন মার পায়ে নূপুর। তোড়ার শব্দ শুনতে কতই না ভাল লাগত।

এখন মা সেই পুরনো ঢঙে, দিদিভাই ও সাহেবকে খাবার পরিবেশন করতে ব্যস্ত হতে দেখে, সে ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াতে থাকে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নীচে দূরে পার্ক দেখে। তারপর ঘুরেতে ঘুরেতে পেছন দিকে সাহেবের ঘরে ঢুকে পড়ে। পরিষ্কার ছিমছাম ঘর। খাটের ওপর সুন্দর ফুল-তোলা চাদর। খাটের নীচে একপাশে স্লিপার জোড়া। আরাম কেদারার ওপর রাখা আছে সাহেবের গাউন—যা শোয়ার সময় পরেন। খেয়েদেয়ে সাহেব আরাম করবেন যে।

চারটের সময় আবার অফিসে যান। —এইসব জিনিস মা-ই গুছিয়ে পরিপাটি করে রেখেছে। বাবার জিনিসও মা এরকম যত্ন করে গুছিয়ে রাখতো। সে আবার কিচেনে ফিরে আসে।

দিদিভাই ততক্ষণে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গেছে। মা তাকেও খাবার খেয়ে নিতে বলে।

'না, খিদে নেই।'

'নে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। কাজ শেষ করি। তোর ঢং দেখার আমার আর সময় নেই।

সে বিচিত্র ভঙ্গিতে তার চাপা রাগ ভাঙাতে থাকে। কিন্তু মাছ খেতে পারে না। উফ, সেই কালো রক্ত। চোখ প্যাট করে বেরিয়ে এসেছিল। ভয়ে ভয়ে বলে—'মা, এটা

বাড়ীতে নিয়ে চল। রান্নে খাবো। এখন হাঁটতে পারছি না।'

'আচ্ছা, এখন বাড়ীতে গিয়ে একটু পড়াশুনো করগে যা।'

সে এবার রেগে ওঠে। পড়ার কথা ছাড়া মা আর কিছু দেখে না। সে চিট হয়ে বসে। —না, আমার এখন খেলতে ইচ্ছে করছে।

'তাহলে বাড়ী গিয়ে খেলা কর।

'আমি তোমার সঙ্গে বাড়ী ফিরবো, একা যাবো না।'

'মাগো, কি জ্বালাতেই না পারে এই ছেলে। যাও, এখান থেকে তুই এখন সরে যা। নইলে, সাহেব রাগ করবেন।

'কেন, এতেও সাহেব...' আর কিছু সে বলতে পারে না। রাগে কান্নায় তার গলা যেন চিরে যায়।

'হয়েছে, আর কিছু বলতে হবে না। দাঁড়া একটু।' মা সামান্য হাসে।

তার কাছে এই হাসি অকৃত্রিম মনে হয় না, তবুও সে কোন আশায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

'এই নে একটা টাকা। বিল্ডিং-এর ওধারে একটা পার্ক আছে, সেখানে অনেক খাবারঅলা আসে। অনেক ছেলেরাও খেলতে আসে। তুই সেখানে গিয়ে খেলা কর, আর যা ইচ্ছে. খাস—কেমন!'

সে হতভম্ব হয়ে পড়ে—এক টাকা।

শুধু খরচ করার জন্য এক টাকা। চট করে টাকাটা সে তুলে নেয়।

'শোন. চারটের আগে উপরে আসবি না। বুঝলি। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। বাসনপত্র, রান্নাঘর ধোয়া-মাজা করতে হবে।

'আচ্ছা! আচ্ছা!! সে ছুটে তরতর করে নীচে নেমে যায়। এক টাকা খরচ করার জন্য সে কখনও পায়নি। মাঝে মাঝে মা তার মাটির ভাড়ে পয়সা ফেলে বটে, তাও খরচ না-করার উপদেশ দিয়ে।

—এইভাবে টাকা জমাতে শেখো। পরে এই জমানো টাকা বহু কাজে লাগবে। যখন তুই দশ ক্লাশ পাশ করবি, তখন ভাঙবি এই ভাঁড়।

'কত টাকা হবে তখন?'

'অ-নে-ক টাকা—আমি যে গুণতেও পারি না।'

'একশ টাকার চেয়ে বেশী।'

মা তখন পাঁচ আঙুলে তার মাথা চেপে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—যত চুল তোর মাথায় আছে—তত টাকা।'

সে খিলখিল করে হেসে ওঠে। উ'-হু'', মিথ্যুক কোথাকার।'

তখন মাও এমন হাসতো যে তার চোখের চমক সে চেয়ে দেখত।

কি ভাল তার মা। এই সময়েও তার চোখেমুখে চমক। —টাকাটা বেশ আনন্দে খরচ করেছে। ছেলেদের খেলা দেখেছে। ঘুরেছে। তবুও এত করেও চারটে বাজেনি। সাড়ে তিনটের সময় সে উপরে উঠে আসে। —'আমি চারটের সময় আসতে বলেছিলাম না।' মা অপ্রস্তুত, রাগ দেখায়। তারপর, একেবারে চুপ হয়ে পড়ে। সে মায়ের পেছন [illegible] কিচেনে যায়। সহসা লক্ষ্য করে, মা সাহেবের সেই গাউনটা পড়ে আছে।

'এটা কি পরেছ তুমি—' বলতেই মার রাগী চেহারা দেখে মনে হয়, এবার বুঝি নিস্তার নেই।

'তোর কি তাতে? চুপ করে বসে থাক।'

এমন রুক্ষ কণ্ঠস্বর সে বাস্তবিক টুলের ওপর গড়িয়ে পড়ে। মা বাথরুমে যায়। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসে. সরু-পাড়ের ধুতি পরনে।

'মা, সকাল বেলাকার শাড়ি—'

'তুই চুপ করে বসতে পারিস না—সবসময় বকর বকর—।' এবং সে ভেবে নেয়, বাড়ী পোঁছনো ওব্দি মার সঙ্গে কোন কথা বলবে না।

এক কাপ চা তৈরী করে সাহেবকে দিয়ে আসার পর, মা বলে—আজএ-বেলা আর রান্না হবে না। আমি বাজার হয়ে এখন বাসায় ফিরবো।

এরি মধ্যে সাহেব এসে পড়ে।

'কাল সকাল সকাল চলে এসো, ছয়-সাতজন লোক খাবে। অনেক কিছু আয়োজন করতে হবে।'

সে মনে মনে হিসেব করে ফেলে—অর্থাৎ কাল আবার শূন্যঘরে একা একা স্কুলে যাবার জন্য তৈরী হতে হবে। কাঁধে ব্যাগ বাঁধবে। সে সহসা উদাস হয়ে পড়ে।

'আমি এখন বেরোচ্ছি। তুমি সব দেখে শুনে বন্ধ করে যেও।'

'আচ্ছা।' মা বেশ রুক্ষভাবে চাবি হাতে নেয়। সাহেবের দিকে ফিরেও দেখে না।

তারপর, সহসা কঠিন স্বরে বলে ওঠে—হিসেবের টাকা চাই। অনেক কিছু জিনিস কিনতে হবে।

'বেশ তো, আগেই চেয়ে নিলে পারতে।' সাহেব দশ টাকার তিনখানি নোট ফেলে দেয়, তারপর দ্রুতবেগে বেরিয়ে যায়।

বড্ড ঢ্যাঙা, কি বিশ্রীই না লাগে সাহেবকে। চোয়াড়ে কথাবার্তায় আরো মনে হয়। —'ইস. কবে যে আমার শরীর এত লম্বা হবে?' সে রুদ্ধাবেগে মনে মনে ভাবে।

তারা দুজনে যখন ঘর থেকে বাইরে বেরোয়, অপরাহ্নের রোদের শেষটুকু তখনও আকাশ জুড়ে। বাজারে ঢুকে তারা সেই চায়ের দোকানে ঢোকে—যেখানে সব সময় রেডিও বাজে। দোকানে বসে থাকতে তার বেশ মজা লাগত।

সে তৃপ্তি সহকারে কচুরী খায়। উৎসাহিত হয়ে বলে—'মা, এই বাজারে আগে আমরা কত বেড়াতে আসতাম, তখন তো তুমি দুপুরে ফিরে আসার চাকরি করতে।'

'হ্যাঁ।' মা এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তার মনে হয়, মার চোখ জোড়া ভিজে উঠেছে।

তারপর মনে হয় মা অনেক কিছু ভাবছে। সাহেবের সঙ্গেও ভাল করে কথা বলে নি। হয়তো মা এটাই ভাবছে—যেন সে একটা নির্দিষ্ট আধার পায়—'মা, এই চাকরিটা ভালো নয়; না?'

'ভালো-মন্দ কি জানি? কে জানে, কতদিন চলবে? বয়স হয়েছে, সাহেব এখনও বিয়ে করেন নি। কিন্তু একদিন করবেই। তখন মেমসাহেব এসে আমায় দূর আবার সরিয়ে দেয়। আবার অন্য চাকরি খুঁজতে হবে।'

বুঝতে পারে না, মেমসাহেবের নাম মা ঘৃণায় উচ্চারণ করে কেন—সাহেবের উপরেও সম্ভবতঃ রেগে আছে...তবুও কি নতুন চাকরি-ই করবে মা।

সে মোহগ্রস্তের মত চা খেতে থাকে।

মা তখন আঙুলের কর গুনতে থাকে। সে টেবিলের ওপর মাছির ভনভনানির হাত দিয়ে তাড়ায়।

'তোকে ভাল স্কুলে ভর্তি করতে হবে। প্রথমে পঞ্চাশ টাকা লাগবে।' মা যেন কিছু হিসেব করে। পঁয়ত্রিশ টাকা আগেই জমিয়ে রেখেছিলাম, এখন ত্রিশ টাকা আরো হলো। হবে না?'

এ টাকাটা মাইনে থেকে কাটবে। তখন তুমি অর্ধেক মাইনে ত্রিশ টাকা করে পাবে। তা থেকে আবার স্কুলে কুড়ি টাকা দিতে হবে।'

'চুপ কর। ছেলেমানুষ, অথচ হিসেব করছে বুড়োদের মত। না, কিছুই কাটবে না। এটা এখন চাকরী। এমন ভাল চাকরি কি আর সহজে পাওয়া যায়? তাছাড়া তোকে ভাল স্কুলে পড়াতে হবে। বিনে মাইনের স্কুলে পড়লে কি আর অফিসার হতে পারে?'

তার সমস্ত খুশী, আনন্দ এক লহমায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে... মা আর এই চাকরি কখনও ছাড়বে না। তাকেও স্কুল থেকে ফিরে এসে মা'র জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে।

সত্যি তার বুদ্ধি নেই। মা কি এই সাহেবের ওপর রাগ করতে পারে। যার চাকরি এত ভালো লাগে মার। গোটা রাস্তায় সে চুপ করে এটাই ভাবতে থাকে আর মনে মনে সংকুচিত হয়ে ওঠে। বা[illegible] গলির কাছাকাছি এলে তার কিছু একটা মনে পড়ে যায় একটু তেরিয়া স্বরে বলে—'আমি যাচ্ছি। দেরী করে ফিরবো।'

'কোথায় যাচ্ছিস রে।'

'খেলতে, বড় ময়দানে।'

'আচ্ছা যা। বেশী দেরী করিস নে।'

মা এখনও কিছু একটা ভাবছে। কি হয়েছে। এবারেও তাকে যেতে বারণ করল না। এমন কি ভাল করে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না। সে রেগে ওঠে—এতদূর, যে অসহায়-কান্না তার গলায় এসে থেমে পড়ে।

কিন্তু, মা-কে খুব পরিশ্রান্তও মনে হয়। কেন? তার বস্তুতঃ আরও বেশী কান্না পেতে থাকে, এই ভেবে যে, এমন কিছু আছে যা তার মগজে ঢুকছে না।

এবার সে আর কান্না সামলাতে পারে না। বলা স্বত্বেও ময়দানের দিকে না গিয়ে. বাড়ীর দিকে ফিরে যায়। কিন্তু দূরে বাড়ীর দিকে গমনরতা মা-কে ততটাই পর মনে হতে থাকে, যতটা মনে হয়েছিল সাহেবের গাউন-পরা অবস্থায়।

অনুবাদ ঃ সুবিমল বসাক

ও বলেছিল

চন্দ্রধর শর্মা গুলেরী

বড় বড় শহরের এক্কাওয়ালাদের কথার জ্বালা ভীষণ। এই জ্বালায় যাদের কান ঝালাপালা, তাদের কাছে আমার প্রার্থনা অমৃতসরের বম্বুকার্টওয়ালাদের কথার মলম একবার যেন তারা লাগিয়ে দেখতে পারে।

বড় বড় শহরের প্রশস্ত রাজপথে ঘোড়ার পিঠে চাবুকের খেল দেখিয়ে, কখনও কখনও ওদের ঠাকমার সঙ্গে নিজের নিকট সম্পর্ক পাতিয়ে, কখনও পথ চলা পথিকের চোখ কান না থাকার জন্য, ঘোড়া গাড়ীটা প্রায় ঘাড়ে তুলে দেবার জন্য দুঃখিত হয়—কিম্বা কখনও পথচারীদের পায়ের পাতার কাছাকাছি এক্কার চাকা চলে যাবার জন্য নিজেকেই ধমকায় কোচওয়ানরা। তখন ওরা সংসারের সব গ্লানি নিরাশা আর ক্ষোভের স্বয়ং অবতার হয়ে, পরম বৈরাগিকের মত সোজা নাকের ডগায় গাড়ী হাঁকিয়ে যায়। সে সময় অমৃতসরে কোচওয়ানদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, [illegible] লোকেরা [illegible] [illegible] গলির মধ্যে ধীরে সুস্থে সবুর করে ওদের চলে যাবার জন্য। সাবধান খাল সাজী, সরে যাও ভাইজী, একটু দাঁড়াও ভাই, লালাজী আসুন, বাদশাহ সরে যান ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে পাগড়ী, খচ্চর, হাঁস, আখওয়ালা, ফেরিওয়ালা, ফোচকাওয়ালা প্রভৃতি নানান জনপ্রাণীর জঙ্গলের মধ্যদিয়ে এক্কাওয়ালারা আপন পথ করে নেয়।

কার সাধ্য আছে যে, 'জী' এবং 'সাহেব' ডাক না শুনে রাস্তা ছেড়ে যায়। তার মানে এই নয় যে ওরা অন্য কথা বলতে পারে না—বলে, তবে মিষ্টি ছুরির মত সূক্ষ্ম মার থাকে সে সব কথার। ধরা যাক, যদি কোন বুড়ীকে বার বার সচেতন করা সত্ত্বেও পথ থেকে যদি সে সরে না যায় তাহলে, তার জন্য নির্দিষ্ট রচনাবলীর কিছু নমুনা হল এই : 'হঠ যা জীনে যোগিয়ে' 'হঠ যা করমাঁবালিয়ে', 'হঠ যা পুত্তা প্যারিয়ে', বচ যা লম্বী উমরাবালিয়ে' ইত্যাদি। এক কথায় এর মানে এই দাঁড়ায় যে, তুমি বাঁচার [illegible], তুমি [illegible], অনেকের প্রিয়, দীর্ঘ আয়ু তোমার কপালে লেখা তুমি কেন [illegible] আমার [illegible] চাকার নিচে আসতে চাও? বচ যা...

এমনই এক বম্বুকার্টওয়ালাদের ভীড়ের মধ্যে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে চকের একটি দোকানে এসে মিলিত হল। ছেলেটির চুল আর মেয়েটির ঢিলেঢালা পোষাকে জানা গেল, এরা দুজনেই শিখ। ছেলেটি মামার চুল ধোয়ার জন্য দই নিতে এসেছিল—মেয়েটি রান্নার জন্য বড়ী। দোকানদার এমন এক বিদেশী [illegible] পাল্লায় পড়েছিল যে, একসের মাপা পাঁপড়গুলো না গুনে ছাড়বে না লোকটি।

—তোমার বাড়ী কোথায়? ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে।

—মগরার। আর তোমার?

—মাঝার। এখানে কোথায় থাক?

—অতর সিং-এর বৈঠকে। উনি আমার মামা।

—আমিও আমার মামা বাড়ী এসেছি। ওঁর বাড়ী গুরু বাজারে। ছেলেটি বলে।

এর মধ্যে দোকানীর কাজ শেষ হল এবং এদের মাল দিতে লাগল। জিনিস নিয়ে ওরা দুজনেই এক সঙ্গে চলতে লাগল। কিছু দূরে গিয়ে ছেলেটি মুচকি হেসে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল : তোমার কুড়মাই (বিয়ে) হয়ে গেছে?

ওর কথা শুনে মেয়েটি কৃত্রিম রাগত-ভাবে 'ধাত' বলে দৌড়ে পালিয়ে গেল এবং ছেলেটি ওর পালানো মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে থেকে গেল।

দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনেও সব্জীওয়ালার ওখানে, দুধওয়ালার কাছে অকস্মাৎ ওদের দেখা হয়ে যায় আবার। প্রায় মাসখানেক ধরে 'দেখা হওয়া' চলতে লাগল। এর মধ্যে বার দু-তিন ছেলেটি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল : তোমার কুড়মাই হয়ে গেছে? জবাবে আবার সেই 'ধ্যাত' মিলেছিল। শেষে আরো একদিন মেয়েটিকে নিছক রাগাবার উদ্দেশ্যে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে এবং এবারে মেয়েটি চিরাচরিত জবাবের বিরুদ্ধে বলল : হ্যাঁ হয়ে গেছে।

: কবে?

: কাল। দেখছ না, রেশমের কাজ করা এই ওড়না পরেছি?

মেয়েটি পালিয়ে গেল। ছেলেটি ঘরে ফিরে এল। ফিরবার সময় পথে একটি ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে নালায় ফেলে দিল—এক পাকোড়াওয়ালার দিনভরের রোজগার তুলে নিল—একটা কুকুরকে পাথর দিয়ে মারল—এক সব্জিওয়ালার ঠেলায় দুধ ঢেলে দিল। স্নান সেরে ফেরার পথে কোন এক বৈষ্ণবী [illegible] ধাক্কা মেরে 'অন্ধ' উপাধি পেল। এবং এইভাবে ছেলেটি বাড়ী এসে পৌঁছল।

॥ ২ ॥

রাম রাম। এটা কি কোন যুদ্ধ হচ্ছে। এই কি যুদ্ধের ছিরি। দিনরাত খানাখন্দে বসে বসে হাড়গুলো শুদ্ধু সব জমে গেল। লুধিয়ানার চেয়ে দশগুণ ঠাণ্ডা আর তেমনি কাঁপুনি। তার ওপর আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পায়ের গোড়ালি শুদ্ধ কাদায় সেঁধিয়ে গেছে। কোথাও শত্রুর দেখা নেই। ঘণ্টা দুঘণ্টা অন্তর কানের পর্দা ফাটানো গোলার আওয়াজে খন্দক নড়ে ওঠে যেন। আর শ' শ' গজ মেদিনী যেন লাফিয়ে ওঠে। এই গুপ্ত গোলা থেকে কেউ প্রাণে বাঁচলে তবে তো লড়বে।

নগরকোটের ভূমিকম্পের গল্প শুনেছিল লহনা সিং। আর এখানে তো দিনে পঁচিশবার ভূমিকম্প হয়। যে কেউ খানা-খন্দের বাইরে বেরিয়েছে স্বাভাবিকভাবে অথবা কনুয়ে ভর দিয়ে তারই গায়ে নিশ্চিত গুলি লাগবে। জানি না, শালা বেইমানগুলো মাটির সঙ্গে চিপটে থাকে কিনা—নাকি ঘাসের পাতায় পাতায় লুকিয়ে থাকে।

—লহনা সিং, আর তিন দিন আছে। চারদিন তো খন্দকেই কাটিয়ে দিলাম। পরশু রিলিফ এসে যাবে। তারপর সাত দিনের ছুটি। নিজের হাতে খাসি কাটব আর পেট ভরে খেয়ে শুয়ে থাকব। ঐ ফিরিঙ্গি মেমের বাগানে মখমলের মত নরম সবুজ ঘাস আছে। ফল আর দুধের বর্ষা করে দেয় যেন। লাখ বললেও দাম নিতে চায় না। বলে : তোমরা রাজা। আমাদের দেশ বাঁচাতে এসেছ। —হ্যাঁ। চারদিন পর্যন্ত চোখের পাতা এক হয়নি। বিনা চলাফেরায় ঘোড়া বিগড়ে যায়—তেমনি সিপাহী বিনা লড়ায়ে ... লহনা সিং বলে চলে : আমি যদি সঙ্গীন চড়িয়ে মার্চ করার হুকুম পেয়ে যাই তো সাতটা জার্মানকে একলা শেষ করে যদি ফিরে না আসি, তাহলে দরবার সাহেবের মন্দিরের চৌকাঠে মাথা ঠেকাবার নসীব যেন আমার না হয়। শালা... পাজী কোথাকার। কলের ঘোড়া ... সঙ্গীন দেখলেই বদন ব্যাদন করে পা জড়িয়ে ধরে। এমনিতে অন্ধকারে শালারা তিরিশ তিরিশ মণ গোলা ছোঁড়ে। সেদিন পিছু নিয়েছিলাম— চার মাইল পর্যন্ত একটা জার্মানকেও ছাড়িনি। নেহাৎ জেনারেল সাহেব চলে আসতে বললেন। নইলে...

—নইলে সোজা বার্লিন পৌঁছে যেতে। ঠিক কিনা লহনা? সুবেদার হাজারা সিং মুচকি হেসে বললেন : লড়াই-এর ব্যাপার জমাদার কিংবা নায়েকের চালনায় হয় না। বড় অফিসাররা দূরের জিনিস ভাবেন। তিন শো মাইলের ব্যাপার এক-দিকে এগিয়ে গেলে কি হবে?

—ঠিকই সুবেদারজী। লহনা সিং বলল : কিন্তু এছাড়া আর করবই বা কি? হাড়ে হাড়ে শীত সেঁদিয়ে গেছে। সূর্যদেব বেরুচ্ছেন না আর খন্দের দু ধার থেকে চম্বার ইঁদারার মত জলের স্রোত ঝরছে তো

মাত্র তিনটি ছোট গল্প লিখে তার মধ্যে একটি গল্পের জন্য সাহিত্য জগতে পাকাপোক্ত আসন লাভ এবং আসমুদ্র হিমাচল জনপ্রিয়তা লাভ যে কোন ব্যক্তির পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। হ্যাঁ—ইনিই চন্দ্রধর শর্মা 'গুলেরি' সেই দুর্লভ খ্যাতির অধিকারী যাঁর ছোট গল্প 'উসনে কহা থা' হিন্দী সাহিত্য জগতে এক সুদুর্লভ মণি বিশেষ। কারণ উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও হিন্দী সাহিত্যের শৈশবাবস্থা। প্রেমচন্দ তখনও হিন্দী আসরে নামেন নি—সবেমাত্র উর্দুতে লিখছেন। এ সময় (১৯১৫) শর্মাজীর 'উসনে কহা থা' হিন্দী সাহিত্যকে শৈশবাবস্থার থেকে একেবারে পূর্ণ যুবাবস্থায় এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাঁর অন্য দুটি গল্প সে তুলনায় অপরিণত রচনা।

ঝরছেই। একটা দৌড়াদৌড়ি করলেই শরীর গরম হয়ে যায়।

—উদমী ওঠ। সিগড়ীতে (উনুন) কয়লা দে। বজীরা তোমরা চারজনে মিলে খন্দের জল বালতি দিয়ে তুলে বাইরে ফেল। মহা সিং, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, খন্দের মুখের পাহারা বদল করার ব্যবস্থা কর। এই সব বলতে বলতে সুবেদার খন্দময় চক্কর কাটতে লাগলেন।

বজীরা সিং প্লাটুনের বিদূষক। বালতিতে নোংরা জমা জল খন্দকের বাইরে ফেলতে ফেলতে বলল : আমি আচার্য বনে গেছি। জার্মানীর বাদশার তর্পণ করব। বজীরার কথা শুনে সবাই হৈ-হৈ করে হেসে উঠল। ওদের মধ্যে গুমোট উদাস ভাব অতঃপর কেটে গেল।

লহনা সিং দ্বিতীয় বালতি ভরে ওর হাতে দিয়ে বলল : নিজের বাড়ীর খরবুজ গাছে জল সিঞ্চন কর। এমন খাদের জল সারা পাঞ্জাবে পাবে না....

—হ্যাঁ। দেশ মানেই তো স্বর্গ। লড়াই শেষে আমি তো সরকারের কাছে এমনিতে দশ ঘুমাও (ঘুমাও—৮ বিঘা) জমি আদায় করে নেব আর তাতে নানান ফলের গাছ লাগাব।

—ভাল কথা। এখন বোধা সিং আছে কেমন? বজীরার হঠাৎ খেয়াল হওয়ার জিজ্ঞাসা করল।

—ভালই আছে। লহনা সিং বলল।

—মনে করেছ, আমি যেন কিছুই জানি না। না? লহনা রাতভর তুমি নিজের দুটো কম্বল ওকে ঢাকা দিয়েছ আর নিজে সিগড়ীর তাপে কাটিয়েছ। ওর পাহারার কাজ তুমি নিজে করে এসেছ। নিজের শুকনো কাঠের তক্তায় ওকে শুইয়েছ আর নিজে কাদায় পড়েছিলে। আমার ভয় হয় লহনা তুমি নিজে অসুখে না পড়ে যাও। এ তো ঠাণ্ডা নয়, সাক্ষাৎ মৃত্যু। আর নিমোনিয়ায় মারা গেলে মুরব্বা (২৫ ঘুমাও-এ এক মুরব্বা) পাওয়া যায় না।

—আমার জন্য ভয় পেও না বজীরা। আমি তো বুলেলের খাদের কাছে মরব। ভাই কীরত সিং-এর কোলে থাকবে আমার মাথা আর নিজের হাতে লাগান উঠোনের আমগাছের ছায়ার তলায় থাকব আমি

বজীরা সিং রাগতস্বরে বলল : কি মরা মরার কথা শুরু করেছ শুনি? মরুক শালা জার্মান ও তুর্কীরা। হ্যাঁ ভাইসব, কেমন করে...

সমস্ত খন্দকটা বিদূষকের কথা বলার ধরনধারনে যেন সঙ্গীতময় হয়ে উঠল। সিপাহীরা এরপর ফের তরতাজা হয়ে উঠল। যেন ওরা সবাই গত চারদিন [illegible] কেবল শুয়ে বসে মৌজ করেই কাটিয়েছে।

(৩)

দ্বিতীয় প্রহরে রাত্রি নামল। অন্ধকার। চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা। বোধা সিং খালি বিস্কুটের তিনটি টিনের ওপর ওভারকোট পরে, নিজের কম্বল বিছিয়ে আর লহনা সিং-এর দেওয়া দুটো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। লহনা সিং প্রহরারত। ওর একটা চোখ খাদের মুখে আর অন্যটা শীর্ণকায় বোধা সিং-এর ওপর। বোধা সিং কাতরে উঠল।

—কি বোধা ভাই, কি হল?

—একটু জল খাওয়াও।

লহনা সিং জলের টিন ওর মুখে ধরে জিজ্ঞাসা করল :

—বলো কেমন আছো?

জল খেয়ে বোধা সিং বলল : বড্ড কাঁপুনি দিচ্ছে। লোমকূপগুলো সিরসির করছে। দাঁতে দাঁত লাগছে...

—আচ্ছা, আমার জার্সিটা পরে নাও

—আর তুমি?

—আমার কাছে সিগড়ী আছে। তাছাড়া আমার খুব গরম লাগছে। এই দেখ না ঘাম বেরুচ্ছে।

—না। আমি তা পারব না। চারদিন ধরে তুমি আমার জন্য......

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। আমার কাছে অন্য একটা গরম জার্সি আছে। আজ সকালেই এসেছে। বিলেতের মেম সাহেবরা নিজের হাতে বুনে পাঠিয়েছে। গুরু ওদের মঙ্গল করুন, লহনা সিং নিজের কোট ছেড়ে জার্সি খুলতে লাগল।

—সত্যি বলছ?

—তা নয় তো কি মিথ্যে? বলেই, বোধা সিং 'না, না' আপত্তি করা অবস্থায় জোর করে লহনা ওকে জার্সি পরিয়ে দিল এবং নিজে সাধারণ একটা খাঁকি কোট আর জিনের সার্ট পরে পাহারায় রয়ে গেল। মেমদের জার্সি বোনার ব্যাপারটা কথার কথা মাত্র।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। ইতিমধ্যে খাদের মুখগহ্বর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল : সুবেদার হাজারা সিং।

—কে? লপটন সাহেব? হুকুম হুজুর। সুবেদার হাজারা সিং মিলিটারী কায়দায় তাঁকে অভিবাদন জানালেন।

—দেখ। এখুনি ওদের পিছু নিতে হবে। মাইলখানেক দূরে পূর্ব কোণে, জর্মানদের একটা ছাউনি আছে। তাতে পল্টনটির বেশী জার্মান নেই। এই গাছ-গুলির নিচে দুটো ক্ষেত কেটে রাস্তা হয়েছে। তিন চার ঘুরাও মাত্র। যেখানে মোড় সেখানে পনেরটা জার্মান জওয়ানকে দাঁড় করিয়ে এসেছি। এখানে তুমি দশজনকে রেখে বাকি সবাইকে নিয়ে ওখানে যাও। যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য হুকুম পাও ততক্ষণ পর্যন্ত খন্দক দখল করে ওখানেই থেকে যাবে। আমি এখানে থাকব।

—জো হুকুম।

নিঃশব্দে সবাই তৈরী হয়ে নিল। বোধাও কম্বল ছেড়ে উঠে যাবার জন্য যেই তৈরী হতে গেল, লহনা সিং ওর পথ রোধ করল। লহনা এগিয়ে যেতেই বোধার বাপ সুবেদার আঙ্গুল তুলে বোধাকে ইসারা করলেন। লহনা সিং ব্যাপারটা বুঝে চুপ করে গেল। এদের মধ্যে দশজন কে কে থাকবে তা নিয়ে ঝামেলা দেখা দিল। কেউই থাকতে চায় না—সবাই যেতে চায়। সুবে-দার হাজার সিং বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মার্চ করালেন। লপটন সাহেব লহনার সিগড়ীর কাছে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাতে লাগলেন। মিনিট দশেক পরে উনি লহনার দিকে সিগারেট বার করে এগিয়ে দিলেন : নাও, তুমিও ধরাও একটা।

চোখের পলকে লহনা সিং ব্যাপারটা ধরে ফেলল—সব বুঝে নিল। খুব সংযত হয়ে বলল : দাও, সাহেব দাও।

হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নেবার সময়-টুকুর মধ্যে লহনা সিগড়ীর অস্পষ্ট আলোয় সাহেবের মুখ দেখল। চুল দেখলই সাহেবকে ভাল করে দেখতে মাথা ঘুরে গেল ওর! লপটন সাহেবের ফেট্টি বাঁধা চুল একদিনেই কোথায় উড়ে গেল! তার জায়গায় ফরেদীর ছাঁটা চুল? এ কি করে হল? নিজেকে বোঝাতে চায় লহনা : হয়ত সাহেব মদ্যপান করে নেশার ঘোরে চুল কাটাবার সুযোগ পেয়ে গেছেন। ব্যপারটা একটু যাচাই করতে চাইল লহনা সিং। লপটন সাহেব পাঁচ বছর ধরে ওদের রেজিমেন্টে ছিলেন :

—সাহেব আমরা হিন্দুস্তান কবে ফিরব?

—লড়াই শেষ হলেই যাব। কেন, এই দেশ কি ভাল লাগছে না?

—না সাহেব। শিকারের সেইসব মজা কোথায়? মনে পড়ে, গত বছর নকল লড়াই শেষে আমি আর আপনি জগাধারী জেলায় শিকার করতে গিয়েছিলাম? হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই যে আপনি গাধার পিঠে চেপে যাচ্ছিলেন। আর আপনার খানসামা আবদুল্লা রাস্তার ধারে এক মন্দিরে পুজো করতে গিয়েছিল?

—নিশ্চয়ই মনে আছে। শালা পাজী কোথাকার।

—সামনে হঠাৎ একটা নীল গাই বেরুল। অত বড় সিংওয়ালা নীল গাই তার আগে আমি দেখিনি। আর আপনার একটি মাত্র গুলি কাঁধে লাগল, ব্যাস, ফিনিস। এমন অফিসারের সঙ্গে শিকার খেলায় আনন্দ আছে। কি সাহেব। নীলগায়ের মাথাটা শিমলা থেকে তৈরী করান হয়েছিল মনে আছে? আপনি বলেছিলেন রেজিমেন্টের মেসে ওটা টাঙ্গাবেন?

—হ্যাঁ। মনে আছে। কিন্তু আমি ওটা বিলেত পাঠিয়ে দিয়েছি।

—ওঃ! কত বড় সিং। দু-দু ফুটের তো হবেই,

—না। দু ফুট চার ইঞ্চি ছিল। লহনা সিং এ কি। তুমি সিগারেট খাচ্ছ না যে?

—এই যে খাচ্ছি, দেশলাই নিয়ে আসি। বিদ্যুৎ গতিতে লহান সিং খন্দকের ভিতর ঢুকল। এবার আর কোন সন্দেহ রইল না তার যে—। ও চটপট ঠিক করে নিল এরপর কি করতে হবে।

অন্ধকারে কে শুয়েছিল: তার সঙ্গে তার পায়ে ঠোক্কর লাগল : কে বজীরা সিং। হ্যাঁ। কি ব্যাপার লহনা? এমন কি সর্বনাশ হল শুনি যে চোখের দুটো পাতা এক করতে দিলে না!

—বাজে বোক না। সর্বনাশ এসেছে এবং লপটন সাহেবের উর্দি পরেই এসেছে!

—কি?

—লপটন সাহেব হয় মারা গেছেন, না হয় বন্দী হয়েছেন। কোন এক জার্মান তাঁর পোশাক পরে এসেছে। সুবেদার-এর মুখ দেখেননি। আমি দেখেছি এবং কথাবার্তা শুনেছি। শালা, পরিষ্কার উর্দু বলে—কিন্তু কেতাবি উর্দু। আর—আর আমায় সিগারেট খেতে দিয়েছে।

—বলো কি। তাহলে, এবার'

—তাহলে আর কি। মারা পড়লাম। ধোঁকা দিল। সুবেদারজী কাদায় ঘুরপাক খাবেন আর এখানে বন্দরে আক্রমণ চালাবে। ওদিকে, ওদের খোলা মাঠে আক্রমণ করা হবে। ওঠো. একটা কাজ কর। পলটনদের পায়ের ছাপ দেখে দেখে শিগগীর দৌড়ে যাও। এখনও ওরা বেশীদূর যায়নি হয়ত। সুবেদারকে বল, ওরা যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে। ওদের ঐ খানাখন্দের কথা ডাহা মিথ্যে। যাও. যাও। পিছন দিয়ে—দেখ, একটা পাতা নড়ারও শব্দ যেন না হয়। দেরী কর না।

—হুকুম তো এই যে. এখানেই—

—নিকুচি করেছে হুকুমের। আমার হুকুম। জমাদার লহনা সিং যে এখন এখানে মৌজুদ, সেই এখন সবচেয়ে বড় অফিসার। তার হুকুম। আমি লপটন সাহেবকে সামলাচ্ছি।

—কিন্তু এখানে তোমরা তো মাত্র আট-জন আছ!

—আট নয়, দশ লাখ। এক একজন আকালী শিখ সোয়া লাখের সমান। যাও দেরী কর না।

ফিরে এসে লহনা সিং গহ্বরের মুখের কাছে, দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে একেবারে সেঁটে গেল। ও দেখল : লপটন সাহেব পকেট থেকে বেলের মত তিনটে গোলা বার করল। ঐ গোলাগুলো গহ্বরের জায়গায় জায়গায়, দেওয়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে, তারের মত একটা জিনিস দিয়ে বেঁধে দিল। তারের মুখে সুতোর মত একটা সলতে সিগড়ীর কাছে রেখে দিল। এবার বাইরের দিকে গিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে সলতেতে আগুন ধরাতে যাচ্ছিল—

এমন সময় বিদ্যুতের মত বন্দুকের বাঁট দিয়ে, সাহেবের কনুয়ে দড়াম করে মারল লহনা সিং। সশব্দে সাহেবের হাত থেকে দেশলাই খসে পড়ল। লহনা সিং তাক করে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সাহেবের ঘাড়ে মারল। 'আখ মীন গোট্‌' (জার্মান ভাষায় : হায়! আমার রাম) বলতে বলতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। লহনা সিং ঝটপট ঐ তিনটে গোলা গহ্বরের দেওয়াল থেকে টেনে বার করল এবং সাহেবকে ঘসটে এনে সিগড়ীর কাছে শুইয়ে দিল। পকেটগুলো সার্চ করল। তিন চারটে খাম আর একটা ডায়রী বার করে নিজের পকেটে রাখল।

সাহেবের মূর্ছা ভঙ্গ হল। লহনা সিং ওর কাছ থেকে একটু তফাতে সরে গিয়ে বলল : কি লপটন সাহেব, মেজাজ কেমন আছে? আজ তোমার কাছে আমি অনেক কিছু শিখলাম। শিখলাম যে শিখেরা সিগরেট খায়। এও জানলাম যে জগাধারী জেলায় নীলগাই হয় এবং ওদের সিং দু-ফুট চার ইঞ্চি লম্বা হয়। শিখলাম যে. মুসলমান খানসামা হিন্দুর মন্দিরে পুজো করতে যায়। আর লপটন সাহেব গাধায় সওয়ার হল। কিন্তু এটা তো বল এত সাফ ও সুন্দর উর্দু কোত্থেকে শিখেছ? আমাদের লপটন সাহেব বিনা 'ড্যাম' 'টাভিরট' দিয়ে পাঁচটা কথাও বলতেন না।

লহনা কিন্তু সাহেবের প্যান্টের পকেট সার্চ করেনি। যেন ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য সাহেব প্যান্টের দু পকেটে হাত লুকিয়ে দিল।

লহনা সিং বলে চলে : তুমি তো বেশ চালাক। কিন্তু মাঝার লহনা অতগুলো বছর সাহেবের সঙ্গে কাটিয়েছে। ওকে বোকা বানাতে গেলে চারটে চোখের দরকার। মাস তিনেক আগে আমাদের গাঁয়ে এক তুর্কী মৌলভী এসেছিল। যেসব স্ত্রীলোক-এর সন্তানাদি হয়নি, তাদের কাম্য সন্তানের জন্য তাবিজ দিত এবং শিশুদের ওষুধ। চৌধুরীর বটগাছের তলায় খাটিয়ার বসে হুঁকো টানত। বলত জার্মানীরা খুব পণ্ডিত জাত। বেদ পড়ে পড়ে তা থেকে বিমান চালনার বিদ্যা রপ্ত করে ওরা। গরু মারে না। ওরা হিন্দুস্তানে এসে গেলে গোহত্যা বন্ধ করবে। বেনেদের বোঝাত যে টাকা পয়সা সব ডাকখানা থেকে তুলে নাও—এ সরকারের মেয়াদ ফুরিয়ে এল। ডাক-বাবু পোলহু রামও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি সহ্য করতে না পেরে মোল্লাজীর দাড়ি মুচড়ে দিয়ে গ্রামের বাইরে বার করে দিয়ে বলেছিলাম : ফের যদি আমাদের গ্রামে পা রাখবে তো—

সাহেবের পকেট থেকে গুলি চলল এবং তা লহনার উরুতে লাগল। এদিকে লহনার হেনরী মার্টিনীর দুটি মাত্র গুলি সাহেবকে পরপারে পাঠিয়ে দিল। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে সবাই ছুটে এল। চীৎকার করে উঠল বোধা : ব্যাপার কি!

—একটা দলছুট কুকুর হঠাৎ পা ফসকে এখানে এসে পড়েছিল। তাকে শেষ করে দিলাম। যাও শোও গে যাও।

লহনা সিং বোধাকে শুইয়ে দিয়ে অন্যান্যদের ব্যাপারটা খুলে বলল। সবাই বন্দুক নিয়ে ঝটপট তৈরী হয়ে নিল। লহনা সিং পাগড়ী ছিঁড়ে ক্ষতের ওপর ব্যান্ডেজ বেঁধে নিল। চোট এবং ক্ষতটা উরুর মাংসের ওপরই ছিল। তাই, ব্যান্ডেজ বাঁধার রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে সত্তরজন জার্মান চেঁচামেচি করতে করতে গহ্বরে ঢুকে পড়ল। শিখেদের বন্দুকের গুলির বন্যায় প্রথম ধাক্কা সামলে, দ্বিতীয়কে ঠেকাল—কিন্তু এরা তো মাত্র আটজন! লহনা সিং দাঁড়িয়ে তাক করে করে এক-একটাকে মারছিল আর বাকি ওরা শুয়ে শুয়ে বন্দুক চালাচ্ছিল। ওরা সংখ্যায় সত্তরজন। নিজেদের মৃত ভায়েদের লাশ মাড়িয়েই ওরা সব হুড়-হুড় করে ঢুকে পড়ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই....

অকস্মাৎ বাইরে জয়ধ্বনির কোলাহল শোনা গেল : গুরুজীর জয়....গুরুজীর রাজত্ব....আর ধড়াধ্বড় জার্মানদের পিঠে গুলির বর্ষা হতে লাগল। খুব মোক্ষম জার্মানদের চৌকি থেকে ওরা সরে পড়েছে। পিছনে সুবেদার হাজারা সিং-এর ওজস্বিনী কথাবার্তা এবং সামনে লহনা সিং-এর সাথীদের অবিরাম সঙ্গীন চালনা। কাছে এসে পিছনের শিখেরাও সঙ্গীন চালন শুরু করে দিল।

আর একবার সবাই আনন্দে চীৎকার করে উঠল : আকালি শিখের ফৌজ এসে গেছে....গুরুজীর জয়.... গুরুজীর ধর্ম-রাজত্ব কায়েম হল ...অকালপুরুষ স্মরং ভগবান.... ॥

এবং এক সময় লড়াই শেষ হয়ে গেল।

তেষট্টিজন জার্মান হয় খাবি খাচ্ছিল, না হয় মরণযন্ত্রণায় ছটফট করছিল। শিখেদের পনেরজন মারা গেল। সুবেদারের ডান কাঁধে একটা গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় বেরিয়ে গেছে। লহনার পাঁজরায় একটা গুলি লেগেছে। ক্ষতস্থানটিতেও খন্দকের কাদার প্রলেপ লাগিয়ে দিল এবং পাগড়ীর কাপড় ছিঁড়ে জায়গাটা ভাল করে কষে কোমরবন্দের মত বেঁধে দিল। কেউ জানল না যে লহনার দ্বিতীয় আঘাতটা কত মারাত্মক। জীবন লেগেছে ওর।

লড়ায়ের সময় অকালে চাঁদ দেখা দিয়েছিল এবং তা এমনই চাঁদ যার জ্যোৎস্নায় সংস্কৃত কবিদের দেওয়া ক্ষয়ী নাম সার্থক হয়েছে। মৃদুমন্দ পবনও বইছিল।

বজীরা সিং বলছিল কি ঃ ফ্রান্সের গাদা-গাদা মাটি আমার বুটের তলায় কেমন চেপে বসেছে দেখ। সুবেদারের পিছনে তাই নিয়েই ছুটেছি....লহনা সিং-এর কাছে সুবেদার সব বৃত্তান্ত শুনলেন এবং বাজেয়াপ্ত কাগজপত্র দেখে ওর উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করে বললেন ঃ তুমি না থাকলে আজ সবাই শেষ হয়ে যেত লহনা....

এ-লড়ায়ের আওয়াজ তিন মাইল দক্ষিণের খন্দকের লোকেরাও শুনেছিল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করে দিয়েছিল ফিল্ড হেড কোয়ার্টারে। ওখান থেকে দুজন ডাকতার এবং আহতদের নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি খুব তাড়াতাড়ি—প্রায় ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে এখানে পৌঁছে গেল। ফিল্ড হাসপাতাল কাছেই ছিল। সকাল হতে না হতেই ওখানে পৌঁছে যাওয়া যাবে এই ভেবে মামুলি পট্টি বেঁধে একটা গাড়িতে আহতদের এক অন্যটাতে মৃতদের তুলে দেওয়া হল। সুবেদার লহনার পাঁজরে ও উরুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে চাইলেন কিন্তু ও দিল না। বলল ঃ সামান্য চোট। সকালে দেখা যাবে।

বোধা সিং জ্বরে গবগব করছিল। ওকে গাড়িতে শোয়ান হল। কিন্তু লহনাকে ছেড়ে সুবেদার যেতে চাইছিলেন না। তা দেখে লহনা বলল ঃ তোমার বোধার কসম আর সুবেদারনীজীর মাথায় দিব্যি যে, তুমি এই গাড়িতে না যাও।

—আর তুমি?

—ওখানে পৌঁছে আমার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিও। তাছাড়া জার্মানদের মড়া নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি তো আসছেই....আমার অবস্থা ততটা খারাপ নয়...দেখছ না আমি দাঁড়িয়ে আছি...আর বজীরা সিং আমার সঙ্গে রইল।

—আচ্ছা, কিন্তু....

বোধা গাড়িতে শুয়ে পড়েছে? আশ্চর্য, তুমিও উঠে বস না। শোন....সুবেদারনীজীকে চিঠি দিও যে আমার প্রণাম জানিও। আর যখন বাড়ি যাবে ওঁকে বল—উনি আমায় যা বলেছিলেন, আমি তা করেছি।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছিল। সুবেদার চড়তে চড়তে লহনার হাত দুটি ধরে বললেন ঃ তুই আমার ছেলের ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিস। লেখালেখি কিসের রে! একসঙ্গেই বাড়ি ফিরব। তোর সুবেদারনীকে যা বলার তুই নিজের মুখেই বলিস, ও তোকে কি বলেছিল—এবার ওঠো। আমি যা বললাম তা লিখে দিও আর দেখা হলে বলে দিও।

গাড়িটা চলে যেতেই লহনা সটান শুয়ে পড়ল।

—বজীরা একটু জল খাওয়া ভাই.... আর আমার কোমরবন্ধটা খুলে দে....রক্তে ভেসে যাচ্ছে.......

(৪)

মৃত্যুর কিছু সময় আগে স্মৃতি খুব জাগরূক হয়ে ওঠে। জীবনভরের ঘটনা এক এক করে সামনে আসে। সমস্ত দৃশ্য পরিষ্কার ভেসে ভেসে ওঠে—সময়ের ছাপ, সময়ের আবিলতা, অস্পষ্টতা তাতে বিন্দুমাত্র থাকে না। তখন.......

তখন লহনা সিং-এর বয়স মাত্র বারো বছর যখন ও ওর মামাবাড়ি এসেছিল। দই-ওয়ালার কাছে, সব্জীওয়ালার ওখানে, প্রায় সর্বত্রই আট বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ওর সঙ্গে। বেশ মনে পড়ে যখন ও মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করত ঃ তোমার কুড়মাই হয়ে গেছে? তখন মেয়েটি ধ্যাৎ বলে লজ্জায় পালিয়ে যেত। অন্য আর এক-দিন যখন জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন ও বলেছিল ঃ হ্যাঁ। কাল হয়ে গেছে। দেখছ না রেশমের কাজ-করা ওড়না পড়েছি!

সেদিন কথাটা শুনে লহনা সিং-এর দুঃখ হয়েছিল। রাগ হয়েছিল। কিন্তু কেন হয়েছিল?

—বজীরা সিং...জল খাওয়াও।

*

পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন লহনা সিং সাতাত্তর নম্বর রাইফেলসের জমাদার। সেই আট বছরের ছোট্ট মেয়েটির কথা আর মনে নেই। জানি না ওর সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়েছিল কিনা?

জমি-জায়গার মামলার তদারকি করতে সাতদিনের ছুটি নিয়ে সেবার ও বাড়ি গিয়েছিল। বাড়িতে পা দিতে না দিতেই রেজিমেন্টের বড় সাহেবের চিঠি এল ঃ আমাদের দল লাম যাচ্ছে। এক্ষুনি চলে এস। সঙ্গে সুবেদার হাজারা সিং-এরও চিঠি ঃ আমি আর বোধা সিং-ও লাম যাচ্ছি। যাবার সময় আমার বাড়ি এস। একসঙ্গেই যাব। সুবেদারের গ্রাম রাস্তায় পড়ে। আর সুবেদার লহনাকে খুব ভাল বাসতেন। লহনা সিং চিঠি পেয়ে যাবার পথে সুবেদারের বাড়ি গেল।

যাবার সময় হয়ে গেছে। এ-সময় সুবেদার উঠোন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ লহনা, সুবেদারণী তোমায় জানে। ডাকছে। যাও, দেখা করে এস।

লহনা সিং ভিতরে গেল। সুবেদারণী আমায় জানেন, কবে থেকে? কিভাবে? রেজিমেণ্টের কোয়ার্টারে সুবেদারের সঙ্গে তো বাড়ির কোন লোকজন থাকত না। তাহলে...সাতপাঁচ ভেবে লহনা দরজার কাছে গিয়ে বলল ঃ প্রণাম হই...

কোন প্রত্যুত্তর নেই। কোন কথা না। সব চুপচাপ। লহনাও নিশ্চুপ।

—আমায় চিনতে পারলে?

—না তো। লহনা সিং অবাক হয়।

—তোমার কুড়মাই হয়ে গেছে?...ধ্যাৎ...কাল হয়ে গেছে। দেখছ না রেশমী কাজ করা ওড়না পরেছি...অমৃতসরে...

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব ছুটে গেল। পাশ ফিরে শুলো লহনা সিং। পাঁজরার ক্ষত থেকে রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে।

—বজীরা, জল খাওয়াও। ও বলেছিল।

স্বপ্নের ঘোরে আছে লহনা সিং।

সুবেদারণী বলছে ঃ আমি তোমাকে আসতে দেখেই চিনে ফেলেছি। একটা অনুরোধ করব, রাখবে বিশ্বাস করি। আমার কপাল তো ভেঙ্গে গেছে। সরকারতো ওকে বাহাদুরীর খেতাব দিয়েছে। লায়ালপুরে জমিও দিয়েছে—দেশের গর্ব, দেশগৌরব হবার সুযোগ এসেছে। সবই সত্যি। কিন্তু সরকার আমাদের মত স্ত্রীদের জন্য এক নারী পল্টন কেন বানিয়ে দিলেন না? তাহলেতো আমিও আজ সুবেদারের সঙ্গে চলে যেতে পারতাম রণাঙ্গনে...একটা ছেলে সেও বছর খানেক হল ফৌজে ভর্তি হয়েছে। চারটি আরো হয়েছিল কিন্তু কেউ বাঁচেনি...সুবেদারণী কাঁদতে লাগল। ওড়নার আঁচলে চোখ মুছে বলল ঃ এবার দুজনেই একসঙ্গে যাচ্ছে। হায় আমার কপাল!...তোমার মনে আছে, একদিন এক টাঙ্গার ঘোড়া বিগড়ে গিয়েছিল দইওয়ালার দোকানের সামনে?

লহনা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

—সেদিন তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে। নিজে ঘোড়ার পায়ের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আমায় দু-হাতে তুলে ধরে ঐ দোকানের চাতালে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলে! ঠিক তেমনভাবেই এই দুজনকে দেখ—বাঁচিও। এই-ই আমার অনুরোধ! তোমার সামনে আঁচল পেতে আমি এ-ভিক্ষা চাইছি....সুবেদারণী কাঁদতে কাঁদতে ভিতরের ঘরে চলে গেল। লহনাও মন্ত্রমুগ্ধের মত চোখ মুছতে মুছতে বাইরে বেরিয়ে এল।

—বজীরা সিং, জল খাওয়াও। ও বলেছিল।

লহনার মাথা নিজের কোলে নিয়ে বসে আছে বজীরা সিং। যখনই জল চাইছে—জল খাওয়াচ্ছে। এইভাবে প্রায় আধঘণ্টা লহনা সিং আচ্ছন্নের মত চুপ করেছিল। দু-চোখের কোণে জল টলটল করছে। বিড়বিড় করে বলল ঃ কে? কীরত সিং?

বজীরা কি ভেবে বলল ঃ হুঁ।

—ভাই আমায় একটু উঁচু করে ধর। তোমার উরুতে আমার মাথা রাখতে দাও।

বজীরা তাই করল।

—হ্যাঁ। এবার ঠিক আছে। জল খাওয়াও। ব্যাস, এবার আষাঢ়ে এই আমগুলো খুব ফলবে। চাচা-ভাইপো মিলে এখানে বসে আম খাও। যত বড় তোমার ভাইপো, তত বড় এই আম। যে-মাসে ওর জন্ম হয়েছিল, সে-মাসেই আমগাছটা লাগিয়েছিলাম। বজীরার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়তে লাগল।

কিছুদিন পর। খবরের কাগজে সবাই পড়ল ঃ 'ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম—৬৮ নং সূচী। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত ৭৭ নং রাইফেলসের জমাদার, লহনা সিং।'

অনুবাদ ঃ আনন্দ ভট্টাচার্য

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

আদি আছে অন্ত নেই

কোনটাই হয়নি। ললিত নিজে কি করে, কতটা করে সে পরের কথা, তবে এই সব আলোচনা ঠাট্টা ইয়ার্কিতে রস পায়—এটা ঠিক। স্পষ্টই দেখা যায় সকলেই মিথ্যে বলছে বা বাড়িয়ে বলছে—শুধুই বাহাদুরী নেবার প্রতিযোগিতা, তবু তার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারে না। নিজেও যতটা সম্ভব বাড়িয়ে বলে, মিথ্যে বড়াই করে।

বিনু এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে না। তার বাড়িয়ে বা বানিয়ে বলার ইচ্ছাও নেই, উপায়ও নেই। সকলেই জানে যে সে কারও বাড়ি যায় না, বন্ধুদের বাড়ি গেলেও বাইরে থেকে কথা করে চলে আসে। তার বাড়িতেও কেউ আসে না, অন্তত কোন তরুণী মেয়ে নয়। এমনিই ওর মা দিন-রাতই ব্যস্ত থাকেন, গেলে গল্প করার জুৎ হয় না বলে পাড়ার গিন্নীস্থানীয়রাও বড় একটা কেউ আসেন না, দরকার না পড়লে। সুতরাং কাকে নিয়ে কাহিনী চয়ন করবে? মেয়েদের সঙ্গে মেশার একটা সুযোগ আসে বিয়ে বাড়িতে, ওর নিজের বাড়ি কি আত্মীয়ের বাড়ি বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

ওর ছাত্রীও নেই। ছাত্র যা আছে তাদের বাড়িতে ছাত্রর মা ছাড়া কেউ নেই। ললিত যাকে পড়ায় সে অবশ্য ন দশ বছরের মেয়ে, তবে তার চোদ্দ পনেরো বছরের দিদি আছে। তাকে কেন্দ্র করে বহু প্রণয় কাহিনী রচনা করে ললিত। বিনু এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করলে বন্ধুরা থামিয়ে দেয়, 'যা যা! তুই এসব কি বুঝিস? তোর সেই বুড়ো ইয়ারদের সঙ্গে আড্ডা দিগে যা!'

ললিত যে বাহাদুরী দেখাবার জন্যে ওদের ঈর্ষা জাগাবার জন্যেই প্রতিদিন একটা করে নতুন নতুন গল্প বানায়, তা আজ বোঝে—সেদিন এমনই নিজের একটা কল্পিত জগতে বাস করত মনের মধ্যে—এসব কোন কিছুই মাথাতে যেত না। অথচ, যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে সংসার ও মানুষ সম্বন্ধে তাতে এটা ভেবে দেখা চলত অনায়াসে। কিন্তু সে চেষ্টাও করে নি, এই সব গল্পই সত্যি বলে ধরে নিয়ে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কথাগুলো শোনামাত্র ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে যেত বলে যা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট—তা ওর চোখে পড়ত না।

আজ এটাই ভেবে অবাক লাগে কেন এমন বুদ্ধু হয়ে গেছল সে।

সে হাতে লেখা মাসিকে গল্প উপন্যাস লিখত বটে, তখনও ছাপা কাগজের জগতে প্রবেশাধিকার পায়নি—এবং এসব কাগজই পাড়ার (বা অন্য পাড়ার) ছেলেরাই বানাত, তারাই উদ্যোক্তা ও উৎসাহী,—তবু ছেলেদের কাগজ তো এগুলো নয়। আর সাধারণভাবে 'ছেলেরা' বলা হলেও তাদের বয়স কারও সতেরো আঠারোর কম নয়—ওদিকে ত্রিশ বত্রিশ পর্যন্ত।

দু একজন, যেমন সর্বজিৎ রায় ওদের পাড়ার সব চেয়ে ভাল কাগজ—মানে রূপ-সজ্জার দিক থেকে, নয়নাভিরাম যাকে বলে—বনফুলের সম্পাদক তিনি বিনুরা ম্যাট্রিক পাস করার অনেক আগে এম-এ পাস করেছেন এবং তিনি তার পর দীর্ঘ-কাল পর্যন্ত এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন। এই একটিই কাগজ যা এতদিন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। শেষের দিকে তিনটি কর্মীতে ঠেকে ছিল, একজন রূপসজ্জা করত, একজন অক্লান্তভাবে হাতে কপি করত (বিয়ের পর ছেলেপুলে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চালিয়ে ছিল), আর লেখা বলতে একা বিনু—নামে, বেনামে, গল্প-প্রবন্ধ, নাটক, যা দরকার যোগাত।

এইসব কাগজে কেউ 'ছেলেদের লেখা' বলতে যা বোঝায়—বর্তমানের ভাষায় 'বাচ্চাদের জন্যে' তা কেউ লেখে না। আবার, অভিভাবকদের যদি চোখে পড়ে এই ভয়ে বড়দের জন্যে যেমন সব লেখা হয়—প্রেম, যৌন-আবেগ ইত্যাদি নিয়ে, তাও লিখতে সাহস করে না। কিন্তু বিনু প্রথম বছর দুই বাদ দিয়ে যা লেখে, বড়দের লেখাই। প্রেমের গল্পই বেশী—তবে তাতে অসভ্যতা অশ্লীলতা থাকে না। থাকার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। ওটা তার মাথাতেও তেমন আসে না। ভাল গল্প লিখতে পারলে জঘন্যতার পিঁয়াজ রসুন দিতে লাগে না—এখনও ওর এ বিশ্বাস আছে।

সে যাই হোক, প্রেমের গল্প যে লেখে মানুষের মনের গোপন অন্তঃপুরের কোন খবর রাখবে না সে, তা সম্ভব নয়। অন্য সব সময়ে এতদিনের এত বই পড়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগে, লাগে না শুধু এই একটি ক্ষেত্রে।

এমনকি, ওর চিরদিনের 'মোহমুদ্গর' বন্ধু দোলু যখন অবস্থাটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করত, তখনও ঠিক তার ওপর পুরো-পুরি ভরসা করতে পারত না।

দোলুর ভাষা তার চিরদিনের মতোই, স্পষ্ট ভাষণ, 'এঃ, তুই এমন রামবোকা তা তো জানতুম না! রামপাঠা নয়, রাম গাধা! এইসব গালগপ্প বিশ্বাস করিস এখনও? তোর বয়েস হয়নি, এদের চিনতে পারিস নি! প্রেম এত সস্তা নয়!...ওঃ, খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, অমনি সব সুন্দরী মেয়েরা ভজনে ভজনে এসে তোর এই কেলো-ভুলো-হাঁদাদের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে! শুনে যা পছন্দ। কান আছে শুনবি বৈকি! ও নিয়ে ভাবিস কেন, ভাবাটাই তো লোকসান!

'তবে যে ললিত বলে, 'যেদিন বলবি সেদিনই দেখিয়ে দোব। বাইরে বাঁশবাগানে কি ওদের বাগানে আবডালে দাঁড়িয়ে থেকো—তোদের চোখের ওপর ছাত্রীর দিদিকে চুমো খাবো। তাহলেই হবে তো। আমি একটা চুমো খাবো এই লোভ দেখিয়ে যা খুশি তাই করাতে পারি।' বলে সে দিদি ওর কোলে এসে বসে, গায়ে গা দিয়ে দাঁড়ায় ঘাম মুছিয়ে দেয়—এসব যে কোন দিন বাগানে গিয়ে দাঁড়ালেই নাকি দেখা যায়!'

'সে বলে বলেই তুমি অমনি বেদবাক্যির মতো বিশ্বাস করবে! তুই এক নম্বরের হাঁদারাম। এসব না বললে টেক্কা মারবে কি করে? ও তো ভাল করেই জানে তোদের—কে ঐ বাঁশবাগানে মশার কামড় খেয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে! তাছাড়া সকলেরই তো ঐ সময়ে টিউশানী আছে!...বেশ তো এক কাজ কর না, একদিন ওকে বলিস যে দোলু বলেছে ওর ফেলে দেওয়া মাল, বিশ্বাস না হয় সে ভাজিয়ে দেবে।'

'সত্যি?' বিনু আবারও বোকার মতো প্রশ্ন করে, 'তোর মধ্যেও এত রস আছে?'

'ধ্যুস! তুই বড্ড ক্যাবলা, সত্যি! তোর মতো আনাড়ি দেখিনি আর। এই জন্যেই যে যা বলে তাই সত্যি ধরে নিয়ে মনে মনে এত কষ্ট পাস!...কে অজান্তে যাবে তাই শুনি! তাহলে তো মেয়েটাকে ডেকে এনে একটা নির্জন জায়গায় দাঁড় করাতে হয়। সে আসবে কেন!

তারপর ভুরু পাকিয়ে বলে, 'তা তুই-ই

এ এ নিয়ে গোয়েন্দার মাথা ঘামান কেন? তোর শখ থাকে নিজে একটা খোঁজ, আর যদি না থাকে—প্যাঁট হয়ে বসে থেকে আপনার কাজ করে যা। যে যা করছে করুক না, তোর এত মাথাব্যথাই বা কেন!'

দোলু খুবই ভাল বন্ধু, ওর প্রতি টান আছে সেটাও সত্যি—তবু মাথাব্যথা যে কেন সেটা বোঝানো যায় না ওকে।

কাউকেই কি বোঝাতে পারবে কোন দিন?

একদিন একটা তুচ্ছ কারণে—এই ধরনের প্রণয়-প্রসঙ্গেই—কথা কাটাকাটি হয়ে গেল ললিতের সঙ্গে। যে কখনও কটু কথা বলে না, সে প্রথম বলতে গেলে একটু বেশী কঠিন হয়ে যায়, তবু হঠাৎ যে ললিত তার জবাবে অত রূঢ় কথা বলবে, বলতে পারে ওকে—তা কখনও ভাবেনি। আর এই উপলক্ষ্য করে যে ওর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেবে—পাছে দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে, বিনুর অপ্রতিভ হাসিহাসি মুখে একরাশ কালি ঢেলে দিয়ে—তাও ভাবতে নি।

একি করতে কি হয়ে গেল!

এযে একেবারে অবিশ্বাস্য।

প্রদীপটা উজ্জ্বল করতে গিয়ে একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেল ওর জগৎ, ওর জীবন!

আবার মনকে এক-একবার বোঝাবার চেষ্টা করে, এ এক রকম ভালই হল। সম্পর্ক তো ছিলই না বলতে গেলে—মিছিমিছি লোকদেখানো একটা কল্পিত অন্তরঙ্গতা, মিথ্যা আন্তরিকতা, সৌহার্দ্য রাখার অর্থ কি! এই ভাল, এই আঘাতে যদি ওর এবার চৈতন্য হয়।

বোঝার চেষ্টা করে—ললিত এটা চাইছিল অনেক দিন থেকেই। বিনুর এ অভিভাবকত্ব তার ভাল লাগছিল না। এ একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কোন পক্ষেই ওর মার ভাষায় 'ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধার প্রয়োজন রইল না; বৃথা মনোকষ্ট—দুজনেরই একটা কপট প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থহীন চেষ্টা—এসবের দায় থেকে অব্যাহতি পেল দুজনেই।

যা নেই, হয়ত ছিলও না কোন দিন—তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে শুধুই হাস্যাস্পদ হওয়া—সকলের কাছে, নিজের কাছেও—তাই নয় কি?

কিন্তু এসব সান্ত্বনা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়না। বাস্তব সত্যকে কোন যুক্তি দিয়ে আবারিত করা যায় না।

শুধু চোখের দেখার জন্যে মন এমন আকুলি বিকুলি করে, কোন স্নেহের বা প্রেমের সম্পর্ক নেই তা প্রমাণিত হওয়ার পরও—তা কে জানত!

দেখা অবশ্য কিছুদিন থেকেই বিরল হয়ে এসেছিল। কদাচিত দেখা হত দুজনের ইদানীং। এখন একেবারেই হয় না। হয় না এই কারণে—পাছে এই বিচ্ছেদটা জানাজানি হয়ে বন্ধুমহলে টিটকারির তুফান তোলে, সেই জন্যে দূর থেকে বন্ধুমহলের আড্ডা বা গজালি কোথাও চলছে দেখলে সরে পড়ত বিনু।

কেবল নিজের তরফ থেকেই নয়। দুএকদিন কাছাকাছি গিয়েও দেখেছে, ললিতেরও হয়ত সেই আশঙ্কা, এই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে বহু সব্যঙ্গ প্রশ্ন এবং অসুবিধাজনক কৈফিয়তের সামনে পড়তে হবে,—সেও দু-একটা আলতো কথা, তা বিনুকে সম্বোধন করেও হতে পারে বা সাধারণ সকলের উদ্দেশ্যেও হতে পারে—এই ভাবে যেন শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে কোন একটা জরুরী প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ে।

মিছে এ উভয় পক্ষেই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে লাভ কি?

কিন্তু দিন যে বিষাক্ত হয়ে ওঠে, রাত্রে ঘুম নামে না চোখে—এটাও অস্বীকার করা যায় না।

কলেজ যাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। কোন কোন দিন এক আধবার যায়, এক-আধটা ক্লাস করে, দাদার চেনা অধ্যাপক অনেকে আছেন তাঁরা ক্রমাগত পরপর না দেখতে পেয়ে দাদার কাছে খোঁজ করেন বা খবর দেন এই ভয়েই—নইলে শুধুই পথে পথে ঘোরে।

আগে গোলদীঘিতে গিয়ে বসত, বসেই থাকত পুরো কলেজের সময়টা কিন্তু দুএকদিন যেতে যেতেই বুঝল এখানে বড্ড চেনা লোকের ভীড়।

ধনী সন্তান যারা তারাই বেশী। প্রক্সির ব্যবস্থা করে এখানে চলে আসে—সিগারেট খেতে আর বড়মানষী ও সাহেবীয়ানায় পরস্পরকে টেক্কা মারতে—তারা কলেজের মধ্যে যে কোন দিন ওকে লক্ষ্য করেছে বা সহপাঠী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কখনই মনে হয়নি ওর। কিন্তু এখানে একা এইভাবে বসে থাকতে দেখে, চুপচাপ মুখ শুকিয়ে, সিগারেটও খাচ্ছে না—কাছে এসে দাঁড়ায়, উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বা প্রশ্ন করে। 'ওয়েল হাণ্ড্রেড এ্যাণ্ড ওয়ান, আপনি চলে এসেছেন, কোন প্রক্সির ব্যবস্থা করে আসেন নি—পরে অসুবিধেয় পড়বেন যে'' কিম্বা কেউ বা বলে, 'কি হয়েছে আপনার? অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি? থাকেন কোন পাড়ায়? আমার কার কিন্তু রেডী আছে—ছেড়ে দিয়ে আসবে?' এছাড়াও, ওর মতো দু-চার জন নিম্ন মধ্যবিত্ত সহপাঠী আছে, তারা ওখানে দেখলে আন্তরিক উদ্বেগ প্রকাশ করে, এখন থেকে এত ফাঁকি দিলে পরে বিপদে পড়তে হবে সে বিষয়ে সতর্ক করে।

এর চেয়ে পথে পথে ঘোরা অনেক নিরাপদ।

এই দুর্দিনে পাড়ায় ওর একটি আশ্চর্য বন্ধু জুটে গেছে ঠিক দুর্দিনের বন্ধু যাকে বলে, যে দুঃখের ভাগ নিতে চায়।

সে কেষ্ট, বা কেষ্টা।

ভদ্রলোকের ছেলে, ললিতেরই দূর সম্পর্কে আত্মীয় হয়। মা ছাড়া পৃথিবীতে কেউ নেই, মানে তার হয়ে ভাববার ওকে দাঁড় করিয়ে দেবার কেউ নেই। চালচুলো বলতেও কিছু নেই, একজনদের বাড়ির পাকা দেওয়াল খড়ের চাল ঘরে ভাড়া থাকে, তারও ভাড়া বাকী বোধহয় বছর খানেক, মা চেয়ে চিন্তে—বলতে গেলে ভিক্ষে দুঃখু করে সংসার চালান—কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই কেষ্টার। এক বর্ণও বোধহয় লেখাপড়া জানে না, বাংলা পড়তে পারে, হাতের লেখা দেবেরও অসাধ্য পাঠোদ্ধার করা, ইংরেজী হরফগুলো চেনে এই পর্যন্ত। বিশ্ববকাটে বয়ে যাওয়া ছেলে বলেই পরিচিত। পয়সা নেই বলে মদ খায় না, বা অন্য নেশা করতে পারে না। থিয়েটার করার প্রচণ্ড ঝোঁক, কোন না কোন পাড়ার ক্লাবে পড়ে থাকে, মেয়েদের পার্ট করে, তার জন্যে মেয়েদের মতোই বড় চুল রেখেছে—গর্ব করে বলে, 'আমার পরচুলো লাগে না—হুঁ হুঁ বাবা!' নাচতে বা গাইতেও পারে একটু আধটু—কাজ চলা গোছের। সেখানেই চা আর বিড়ি মেলে, যত খুশি, মাস্টারদা বা ঐ শ্রেণীর কর্তাব্যক্তিরা দু-চারটে পয়সাও দেন—বাকী সময়টা চালাবার মতো। একবার কি একটা বই, 'দোকানদার' নাকি নাটকে খুব ভাল পার্ট করতে চীনে সিল্কের পাঞ্জাবী পেয়েছিল সেক্রেটারীর কাছ থেকে।

এই কেষ্টর সঙ্গে বিনু এ অবধি দুটো চারটের বেশী কথা বলেছে কিনা সন্দেহ। তাও যা বলেছে, ললিতেরই খাতিরে— তার আত্মীয় বলে, যদিও ললিত এ পরিচয় বিশেষ দিতে চাইত না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন, সন্ধ্যার সময় অন্ধকারে ললিতের ছাত্রীর বাড়ির সামনের রাস্তার পাশে—যেখানে বাঁশবনে আর একটা বড় তেঁতুল গাছে অনেকখানি অন্ধকারের সৃষ্টি করেছে—সেইখানে গিয়ে একটু উঁচু জায়গা খুঁজছে যেখান থেকে ওদের জানলার মধ্যে দিয়ে ভেতরটা দেখা যাবে—কেষ্ট কোথা থেকে এসে ধরল। বরং বলা যায় লাফিয়ে গায়ের ওপর এসে পড়ল।

পাতলা গোছের চেহারা কেষ্টর, দেখলে মনে হয় ছিপছিপে গোছের কিন্তু রোগা নয়। বয়স হয়ত উনিশ কুড়ি হবে, তবে ক্রমাগত চা আর বিড়ি খেয়ে—অন্য কোন পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে—মনে হয় অনেক বেশী আরও। অল্প বয়সে বোধ হয় কিছু দিন ব্যায়াম করেছিল, সে জন্যে বুকের গঠনটা ভাল হয়েছে, ওপর হাতের গুলী দুটোও বেশ গোলালো, একটু শক্ত হলে পেশীবহুল বলা চলত; বোধহয় নাচার অভ্যেস ছিল বলেই ঐ ছিপছিপে ভাবটা আছে।

খুব ঘামত কেষ্ট, জামা যখনই যা পরুক, খুব শীতের সময় ছাড়া—ভিজে সপসপ করত। পাজাবীই পরত বেশীর ভাগ, আস্তিন গুটিয়ে, ফলে দুই হাত দিয়ে স্নান-করে ওঠার মতো দিনরাত ঘাম গড়িয়ে পড়ত দরদর করে।

সেই ঘামসুদ্ধ একটা হাত কতকটা থাবার মতো করে হঠাৎ কাঁধের ওপর বসিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বললে, 'কী দোস্ত, বন্ধুকে দেখতে এসেছ! তা এখেনে কেন? ...ওহো, হো, সেদিন মনে হল বটে ভাব-গতিক দেখে যে কথাবার্তা বন্ধ। ঝগড়া হয়েছে বুঝি? কী, এ বাড়ির ঐ ছুঁড়িটাকে নিয়ে? তুমি মিছে ভাবছ দোস, তোমার যা চেহারা একখানা তুমি গিয়ে দাঁড়ালে ওসব লুলে ল্যাহিড়ী ফাহিড়ী ভেসে তলিয়ে যাবে। তুমিও যেমন!'

চাপাগলায় বললেও, কথাটা কতদূরে যেতে পারে, সেই ভেবে বিনুও দেখতে দেখতে ঘেমে নেয়ে উঠল। চারপাশে অন্য বাড়ি আছে, এদেরও বাগান কিছু বিঘে-খানেকের নয়—তাছাড়া এ বাঁশবাগান দিয়ে অজিতের যাওয়া আসা আছে রাত্রিবেলা অন্ধকারে—অনেকেই বলাবলি করে শুনেছে, বিছের ভয় নেই ওর এই জন্যেই আরও বলে, সে যদি এসে পড়ে কী কাণ্ড করে বসবে কে জানে। সে আস্তে কথা বলার লোক নয়।

বিনু কথাটা চাপা দেবার জন্যে বলতে গেল, 'না না যাঃ। ওসব কিছু নয়। এই এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম তাই—'

আবারও একটা সেই থাবার থাপ্পড়।

'বুঝেছি দোস, বুঝেছি। আমরা ঘাস খাই না। আমি কেষ্ট মিত্তির আমার চোখে যে ধুলো দেবে সে এখনও মায়ের পেটে। তুমি ক'দিন প্রাণের ইয়ার পঞ্চাতেলিকে না দেখে থাকতে পারো নি তাই পাদাড়ে বাঁশবনে এসে দাঁড়িয়েছ।' বলতে বলতে তেমনি নিচু গলায় এক কলি গান করে দিল, 'আজ কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা, কাঁহা কাহা ঢুঁড়ত হি হাম! হাওড়া ডোম-জুড় থেকে এক ক্লাব ডাকতে এসে ছিল বলে চন্দ্রশেখরে পার্ট করতে হবে ওমা দু'দিন গেলুম! গানও গোটানো চল—গাড়িভাড়ার পয়সা দেয় না। কে যাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে! হট্। আমি আর যাইনি!'

তারপরই নর্তমানে ফিরে আসে, 'তা ওতো পড়ার ওদিকের ঘরে, জাতে গিন্নি রাঁধতে রাঁধতে নজর রাখতে পারে—তবে তাতেও যে ননীচোরা ননীচুরি করতে পারে না তা বলছি না—তবে এখেন থেকে দেখার কোন উপায় নেই।'

তারপর কাঁধ ছেড়ে খপ করে ডান হাতের মাহুমুলটা চেপে ধরে কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'কেন বাবা বন্ধু বন্ধ করে প্রাণ কয়লা করছ! পুরুষে পুরুষে পিরীত হয়! [illegible] সেই বিল্বমঙ্গল নাটকে আছে না, চিন্তামণি বলছে এই ভালবাসাটা একটা বাজে মেয়েমানুষকে না দিয়ে যদি ভগ-বানকে দিতে তো কাজ হত—আমি একবার যাত্রায় গিয়ে বিল্বমঙ্গল পালা যাত্রা গেয়ে এইচি, আমি থাকোর পার্ট করেছিলুম—এসব আমার মুখস্ত। ঐটেই আমি একটু ঘুরিয়ে বলতে চাই—বন্ধুর জন্যে জীবন যৌবন বিসর্জন না দে যদি কোন মাগীকে ভালবাসতে, সে তোমার পায়ের জুতো হয়ে থাকত!'

তখন বিনু প্রাণপণে চেষ্টা করছে ঐ বাড়ি থেকে যতটা সম্ভব দূরে যেতে, কেষ্টর বক্তৃতা সহজে থামবে না সে বুঝেছে। গলা ক্রমেই চড়াবে, থিয়েটার করার গলা।

হলও তাই। কেষ্টও ওর সঙ্গে সঙ্গে এসে মাঠে পড়ল, পুকুরপাড়ে একটা নার-কোল গাছের গুঁড়ির গায়ে বসে পড়ে ওকেও হাত ধরে জোর করে বসাল, 'মাইরি বলছি, এই তোমার গা ছুঁয়ে—তুমিও বামুনের ছেলে—মা কালীর দিব্যি—ভাল-বাসতে হয় তো কোন মাগীকে বাস, কি জিনিস তুই ভাবতে পারবি না। এক কথায় কেমন করে 'তুমি' থেকে 'তুই' তে চলে এল, অবাক হয়ে ভাবে বিনু, এত অন্তরঙ্গতা কোন দিনই হয়নি এ পর্যন্ত। এর স্বাদ পেলে পাগলা হয়ে যাবি—বুঝেছিস? এসব বন্ধু বন্ধু সিকেয় উঠবে তখন।...এই যে আমি দুটো মাগী কেড়েছি, দুটোই আমার চেয়ে বয়েসে ঢের বড়, একটা বিধবা, আর একটার আধবুড়ো বর আছে, তার চোখের সামনেই আমার পা টেপে বসে বসে, সে জুলজুল করে দেখে' এ নিয়ে কত লোক কত কি বলে, আমি বলি আমার এই ভাল। কচি মেয়ে ধরো, তার পিছু পিছু তোমায় ঘুরতে হবে। খোশামোদ করতে করতে দিশে পাবে না। নিত্যি মান ভঞ্জনের পালা। আর এ? এরাই আমায় খোশামোদ করে, হাতে পায়ে ধরে।...সত্যি বলতে কি, চ্যাংড়া ছ্যাবলাদের কাজ নয়, ভালবাসা কি জিনিস বুঝতেও মেয়েদের একটু বয়েস হওয়া দরকার। এই যে আমার দু নম্বরটি, চল্লিশের মতো নাকি বয়েস—তা হতে পারে, তাতে কি এল গেল আমার? আমি বেশ আছি, আমার এইতেই বেশী সুখ। ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে আমি যদি রাগ করি। যদি বলি, এই, আমার জুতোটা চাট—তাই চাটবে। গরিবের সোংসার, বরজোটা তো ঐ কি চানাচুর-মানাচুর তৈরি করে ইস্টিশানের ধারে বসে বিক্কিরি করে—কটা পয়সাই বা আসে—তাই থেকেই নিজের ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করে আমার হাতখরচা যোগায়! এই যে পাজামা দেখছিস, ওর পয়সায়!'

আরও অনেক কথা বলে কেষ্ট। বিনু অবাক হয়ে শোনে। এওকি সম্ভব? এ-যা বলছে সব সত্যি?

এরপর থেকে কেষ্ট যেন তাকে পেয়ে বসে। দেখা হলেই হল, আজকাল আবার দেখা হওয়ার জন্যে ওৎ পেতে বসেও থাকে।

আসলে তার কমবয়সীরা কেউ তাকে বড় একটা ঘেঁষ দেয় না। একটু বোধহয় নিচু চোখেই দেখে। সেটা স্বাভাবিকও, কেষ্টও তা স্বীকার করে। অথচ তারও মনের কথা কাউকে বলা দরকার।

অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলে বিনুকে। নিজের জীবনটা নিজেই বরবাদ করেছে, দোষ আর কারো নয়।

'দুষী যদি কাউকেই বলতেই হয় তো সে বরং আমার মা। বাবা শাসন করবে। আমি ইস্কুলের ছেলে রাত্তির বেলা বেরিয়ে চলে যাই দেড়টা দুটোয় বাড়ি ফিরি—মা বালিশে নেপ চাপা দে চুপ করে সদরের কাছে আঁচল জড়িয়ে বসে। তাও ডাকবার জো ছিল না, বাবা জানতে পারলে কেটে দুখানা করে ফেলবে, মা সেই ঠায় রাস্তার দিকে কান পেতে বসে আছে— পায়ের শব্দ চিনে আমি আসছি বুঝে নিঃসাড়ে দরজা খুলে দেবে। ভাবত খুব ভাল বাসছে ছেলেকে। আহা, বকুনি খাবে দুধের বাছা! ...দুধের বাছা রাত দুটো পর্যন্ত কি করত, কেন অত রাত অবদি বাইরে কাটিয়ে আসত —তা একবার ভেবেও দেখত না। আশ্চর্য, মাইরি মা জাতটা এত বোকাও হয়। ঐ যে নাটকে বলে না, স্নেহে অন্ধ—এও তাই।'

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, 'তার ফল এখন ভুগছে! পাড়ায় পাড়ায় ডোকনা সেধে এনে আমাকে খাওয়াতে হচ্ছে। নে ভোগ, আমি কি করব! আমার জীবনটা যে এইভাবে নষ্ট করে দিল, তার কি? তুই তো দুদিন বাদে পটল তুলবি, আমার গতি কি হবে? দুধের ছেলে আদরের ছেলেকে পথে বসে ভিক্ষে করতে হবে তো!'

'তা তুমি তো ভাই এখনও চেষ্টা ক... পারো। লেখাপড়ার সময় মানুষের য... ।' বিনু বলে, 'না হয় ইস্কুলে যেতে লজ্জা করে প্রাইভেটেই পরীক্ষা দেবে: কীই বা বয়েস তোমার। সত্যি দ্যাখো, তোমাকেই তো ভুগতে হবে। এখনও তো গোটা জীবনটাই পড়ে আছে!'

'দূর, সে আর হয় না। বুড়ো শালিকের গায়ে রোঁ: কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ। য়্যাদ্দিন করলুম না, আর এখন মন বসে। এখন ঐ নর নরৌ নরা কি লেট এবিসি বিএ ট্র্যায়াঙ্গল—এসব পড়তে গেলে হাসি পাবে। না, ও আর হয় না।'

'খুব হবে, হয় না কেন!' বিনু গলায় জোর দেয়, 'এই তো এখনও এইসব মনে আছে তোমার। আর যাইহোক তুমি তো বোকা নও। নিজের ভুলও বুঝেছ, ভবিষ্যতের ভয় আছে। এখন পড়তে বসলে পড়ায় দেখতে দেখতে এগিয়ে যাবে। বল তো আমার অনেক বই এখনও আছে, সেগুলো তোমাকে দিয়ে দিই, কিছু যদি মনে না করো আমিও তোমাকে একটু আধটু সাহায্য করতে পারি।'

'আরে দোস, বোকা নই বলেই তো

বুঝি যে আমার আরা এ বয়সে আর হবে না। যে ছেলের আমার অল্প বয়সে মেয়ে মানুষ ঢুকেছে—আমার তো পাড়ার মহল না ছাড়তে ছাড়তে—তার আর জীবনে কোন আশা নেই। ঐসব মুখস্থ বলছিস? এ তো এত বাড়ি ঘুরি—ভালবাসে আমাকে অনেকে, পাগলাছাগলা বলে কিছু দোষঘাট নেয় না—তা সেসব বাড়িতে ছেলেরা পড়ে কানে যায় না?

তারপর হঠাৎই বলে ফেলে, আমি কিন্তু কোন মেয়েকে বকাই নি ভাই. মেয়েছেলেরাই প্রথম আমাকে বকিয়েছে। কিছুই বুঝতুম না তখন। তারপর অব্যেস হয়ে গেলে—' বলে চুপ করে যায়।

বিনু আগের কথার জের ধরে। 'তুমি এত বাড়ি ঘোর, তোমাকে পাত্তা দেয়? এই—এইসব করে বেড়াও, থিয়েটার যাত্রা, অন্য দোষও আছে—তারা খবর রাখে না?'

কেমন এক রকমের শান্ত স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'জানে, তবে এও জানে—যারা বিশ্বাস করে স্নেহ করে বাড়ির ভেতর যেতে দেয় আমি তাদের সে বিশ্বাসের অমর্যাদা করব না। বেইমানী বড় পাপ, বুঝলি। আমার অনেক দোষ আছে স্বভাবে—তবে ওটা নেই। আমি ঐ স্খলিত নই, বুঝেছিস? যে স্বেচ্ছায় আসে সে আসে। তাও ঐ রকম আধা ভদ্দরলোক—এর ওপরে কখনও উঠি নি। যদিও আমায় প্রথম যে জড়িয়েছে সে মস্ত ঘরের মেয়ে—এখন বিরাট বড়লোকের বৌ। তবে তখন বলতে গেলে অজ্ঞান ছিলুম। এখন অনেক বুঝি। আমার যিনি দু' নম্বর, এককালে অবিশ্যি সেও বড় ঘরের মেয়ে ছেল, কিন্তু এমন পুরুষের হাতে পড়ল অমানুষ, বাঁধা চাকরি ছেড়ে ঘরে এসে বসল।...ছেলেমেয়ে মানুষের জন্যেই অল্প বয়েস থেকে পাড়ার বাবুদের মন যোগাতে হয়েছে। নইলে ঐ ভাতারের মুখেও অন্ন জুটত না। সে সব খবর নেবার পর আমি ধরেছি। আমি তো ওদের কিছু দিতে পারি না, ও নিজেই আমাকে চায়। তাতে দোষ কি—বল!'...

আবার কোনদিন বলে, 'ক্লাবের মাস্টারদা বলে, সেও দেখায় একটা কার-খানা - কারখানার ঢুকিয়ে দেবে, কিম্বা ওদের তো সরকারী আপিস বেয়ারার কাজ জোগাড় করে দেবে। সেই জন্যেই কাদায় গুণ ফেলে পড়ে আছি—। আরও একটা বছর দেখব, তারপর আমিও ভাগব।'

'কোথায় যাবে?' বিনু প্রশ্ন করে 'খেতে তো হবে?'

'সেই জন্যেই তো ওদের ক্লাবে জল তোলা থেকে ঘর ঝাঁট দেওয়া সব করি। গোপাল মামা তো ঐ গম্ভীর মানুষ পুজোপাঠ নিয়ে থাকে, বয়েসও হয়েছে ঢের, এ বছরই শুনছি চাকরি ছাড়তে হবে তার মানে ধর বাট—কিন্তু লোকটা নাচ জানে। কতকগুলো ছোটলোকের মেয়ে ধরে এনে তাদের দিয়ে সখীর নাচ নাচায় দেখিস না? গোপাল মামা নাকি শখ করে বড় থিয়েটারের কোন ডান্সিং মাস্টারের কাছ থেকে নাচ শিখেছেন। ওর কাছ থেকে দু-একটা কাজ আদায় করে নিতে পারলে পশ্চিমের কোন শহরে চলে যাবো। আরে এখানে আমি বামুনের ছেলে ভদ্দরনোকের ছেলে—সেখানে কে চিনবে? এখনও বয়েস আছে গায়ে ক্ষ্যামতা আছে, প্রথম প্রথম যদি দরকার হয় কুলিগিরি করব তাতে কি।... আমাকে একজন বলেছে, সে পেরায়ই ওষুধের ব্যাপারে বাইরে যায় আরা পাটনা মজঃফরপুর গয়া কাশী এলাহাবাদ সব চষে ফেলেছে—সে আমাকে বলেছে এখেনে যেমন কোন কোন সিনেমায় ছবির সঙ্গে ইন্টারভ্যালে নাচ দেখায়—সেখেনেও আজকাল তেমনি হচ্ছে। তা চার আনার টিকিটে ছবি নাচ এত যারা দেবে তারা কি আর বাইজীর নাচ দেখবে? আমার মতো নাচিয়েই রাখতে হবে। আমি যখন নাচি এখেনে আমি যে মেয়েমানুষ নই কেউ ধরতে পারে? দেখিচিস তো আমাকে প্লে করতে—বল।'

বলতে বলতে ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, চোখে ভবিষ্যতের স্বপন দেখা দেয়, তারপর একবার ইদিকে নাম হয়ে গেলে—। দেখি অন্য মতলব আছে। উদিকের সব শহরে বেস্তর বাঙালী বাবু আছে তারা মেয়েদের নাচ শেখাতে চায়। সে লোকটক ওখানে। ...একবার তেমন কোন লোকের নজরে পড়ে গেলে—একটা কোন আপিসেও ঢুকিয়ে দিতে পারে। লেখাপড়া না জানি, আদব-কায়দায় হার মানব না, বলি বেয়ারাও তো লাগে আপিসে।... আসলে মা-টার বড্ড খোয়ার হচ্ছে এখেনে। টাকা পয়সা তো আমিও উড়িয়েছি, আমার জন্যেই আজ এমন দুগগতি—বলতে গেলে পথের ভিখিরি—যতই হোক মা তো। কোথাও যদি একটু নুন ভাত জোটারও ব্যবস্থা হয় মাকে নিয়ে চলে যাবো এখেন থেকে চিরদিনের মতো।'

বিনু ওর কোন অভিনয়ই দেখে নি, তবু বাধা দেবার ভয়েই চুপ করে থাকে।...

মুখে যাই বলুক, ওর দুঃখও বোঝে কেষ্ট। বোধহয় ও ই একমাত্র বোঝে।

বলে, 'তুই যেমন। তুই যা চাস, ওকে ভাল পথে আনবি, বড় করবি—ও তার মর্ম কোন দিনই বুঝবে না। তোর এতটা ভাল-বাসার যুগ্যি নয়। বিশ্বাস কর। আমার রাগ আছে বলে বলছি না। এই হৈ হৈ করে বেড়ানো, আমোদ আহ্লাদ ফুর্তি করে দিন কাটাবে—তারপর একটা চাকরি-বাকরি যে-থা করে ঘর-কন্না করবে—এই বোঝে এই গোত্তরের লোক, অত বড় বড় কথা বোঝে না।'

আবার বলে, 'দ্যাখ তোরা তো শুধু আমার সঙ্গে কথাবাত্তারা বলিস, এই তো পাড়ার এত বাড়িতে যাই—কই গো মাসিমা কি 'কৈ গো কাকীমা এক গেলাস জল হবে নাকি?' বলে বসি গিয়ে, তারা বকে ভালো মানুষ হতে বলে, মায়ের দুঃখু দূর করতে বলে—কিন্তু সে ভালবাসে বলেই বকে আবার চাও দেয়—তার সঙ্গে যার ঘরে যা থাকে রুটি হোক পরোটা হোক—নিদেন এক গাল মুড়ি দিয়েও দেয়, কেউ আমার মুখ ধরিয়ে নেয় না। ওরা তো আমার আত্মীয়, আমি না হয় বকা লোচ্চা, বাউন্ডুলে—কোন দিন আমার মাও তো খবর নেয় না। পরের বাড়ি ঘর জোড়া করে পড়ে আছে—সেই যে বলে না, বলতে নাথি উঠতে ঝ্যাটা—সেইভাবে দিন কাটছে। দেও নাক—পুজোর সময় একটা সুতোর থি দিয়েও তো উদ্দিশ করে লোকে! তাও তো মনে পড়ে না। তবে এসা দিন নেই রহে গা বাবা, তাও বলে দিচ্ছি।'

॥ ৩০ ॥

শেষে মন স্থির করেই ফেলে বিনু। সে কলেজ ছেড়ে দেবে।

সে যে পড়াশুনো করে না, কলেজেও আসে না, বা এলেও বেশীক্ষণ থাকে না—এটা জানাজানি হয়ে গেছে। সবাই অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করেছে, দু-একজন টিটকিরিও দেয়—মিছিমিছি এত বড় কলেজের বেঞ্চি জোড়া করে রেখেছে বলে। ক্রমশ দাদার কানেও উঠবে। নিজের ভাগ্য তো ডুবছেই—তার মুখ ডুবিয়ে লাভ কি?

এ পড়া ওর কিছুই মাথায় ঢোকে না, গোড়া থেকেই অবহেলা করেছে—ইংরেজী বাংলার ক্লাস ছাড়া কোনটাই মন দিয়ে শোনে নি, এখন চেষ্টা করলেও পাস করতে পারবে না। তার থেকে এ পাট চুকিয়ে দেওয়াই ভাল।

তবে তার পর?

লাঞ্ছনা যা হবার তা তো হবেই। দাদা বসে খাওয়াবেনও না—ওটা ঠিক। রোজগার যা হোক একটা করতেই হবে। যেখানে সেখানে—তেমন হলে বামুন মার বোনপো-দের বলে কোন কারখানায়, বাজবজের চটকলে বা লিলুয়ার রেলের কারখানায় ঢুকতে হবে।

দাদাকে দোষও দিতে পারে না সে। তাঁরও বহু আশা ভঙ্গ সহ্য করতে হয়েছে। চরম দুঃখ বা অভাবের মধ্যে পড়াশুনো করা, না খেয়ে সকালে গেলে, একখানা কাপড় একটি জামায় দিন কাটিয়ে বর্ষার দিনে রবিবারও একটু বিশ্রাম হয় নি—সারাদিন মরা উনুনের ওপর কাপড় ধরে শুকোতে হয়েছে—তার মধ্যে টিউশ্যুনী—তবু যে এম এস সিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে এই তো ঢের।

দাদার কতটা আশায় ঘা পড়েছে, কী আশা ছিল, তাও জানে বিনু। বড়লোক হবার নয়, বড় হবার আশা।

(ক্রমশ)

পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

—কেন?

মরুদেশে বৃষ্টিপাত সম্ভব হইবে, সৃজন হইবে সভ্যতার।

বিমল ময়ূরকে নিয়ে দূরে বহুদূরে। নিচের পৃথিবী বড় স্বপ্নময়। শস্যপূর্ণ জমি, অফুরন্ত জনপদ, নদী সাগর। বাতাসের গতি মন্দ।

—কোথায় নামব আমরা? বিমল জিজ্ঞেস করে।

—এমন কোন দেশ, যে দেশে আলো দেখেনি। কণ্ঠস্বর মেঘ গম্ভীর।

অনেকক্ষণ পর ময়ূর নেমে আসে মাটির দিকে। দ্রুত অতিদ্রুত। মানুষের ঘরবাড়ি সংসার সব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আলো নিভে যাচ্ছে। অন্ধকার নেমে আসছে ময়ূরের পেখমে। ময়ূরের পেখম থেকে তা ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। বিষণ্ণতা প্রবল।

—কোন দেশে ময়ূর নামিল?

—তথাগতের জন্মভূমি এই দেশ।

—কপিলাবস্তু। পরিব্রাজক চিৎকার করে ওঠেন।

—না কলাবনি, হয়ত একদিন ছিল কপিলাবস্তুর রাজকীয় মহিমা।

পরিব্রাজক থমকে যান। ময়ূরের পিঠ থেকে নেমে পড়েন। চারধারে কৌতূহলী চোখ মেলে দেন। একটা নদী দেখা যায়।

—ঐ নদীর নাম?

—কংসাবতী। বিমল উত্তর দেয়।

—এই অরণ্যের নাম?

—নাম নেই। এদেশের অরণ্যের নামকরণ হয়নি।

অবশেষে ময়ূর নেমেছে কলাবনিতে। ওরা দুজন হাঁটছে কলাবনির পথে। ফিস-ফাস শব্দ শোনা যায়, কে যেন দ্রুত পার হয়ে ওদের, কে বা কারা। ওদের দেখে না। দেখতে পায় না।

—ময়ূর কোথায় নামিল এদেশ তথাগতের দেশ! এখানে সভ্যতা কোথায়, আলো?

ধ্বস্ত কুটীর. জীর্ণ মলিন মানুষ আপাত বসনহীন যুবতীরা মুখ আঁধার করে হেঁটে যায় এদিক ওদিক। ওদের দুজনকে দেখছে না কেউ। কোথাও কোন আলো নেই।

—তোমরা আলো জ্বালাও নাই কেন? পরিব্রাজক চিৎকার করে ওঠেন।

অন্ধকার স্থির থাকে, ফিসফিসে কণ্ঠস্বর শোনা যায়, তোমরা কারা, কে কথা বলছ, চিনতে পারছি না।

পরিব্রাজক বুঝতে পারছিলেন তার স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে। এমন এক দেশে ময়ূর নেমেছে যেখানে সভ্যতার আলো প্রবেশ করেনি।

—তোমরা ভগবান তথাগতর পুণ্যবাণী শ্রবণ করিয়াছ?

জবাব আসে না। অন্ধকারে মানুষগুলো স্থির হয়ে গেছে।

—তোমরা মহান ভারতবর্ষের নাম শুনিয়াছ?

—তোমরা মহান চীন সাম্রাজ্যের নাম শুনিয়াছ?

—তোমরা সাগর দেখিয়াছ? আকাশ নদী পর্বত?

জবাব নেই। পরিব্রাজকের কণ্ঠস্বর একা অন্ধকারে বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তিনি চিৎকার করে ওঠেন আবার, আমাদিগে চাহিয়া দেখ, সভ্যতার আলোবিহীন তোমাদিগের জন্মভূমি আবিষ্কৃত হইল, সভ্য পৃথিবীতে ফিরিয়া তোমাদিগের কথা আমি ব্যক্ত করিয়া দিব, আইস তোমাদিগের জন্মভূমিতে আলো জ্বালাই।

এই কণ্ঠস্বর তেমনিই নিঃসঙ্গ। মানুষগুলোর ভিতরে প্রতিক্রিয়া নেই। পরিব্রাজকের ভিতরে উল্লাস প্রবল হয়ে উঠেছিল, তা বাঁধা পাচ্ছিল চারদিকের মন্থর নৈঃশব্দ্যে। তবু তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না যে তাঁর সামনে সভ্যতার বীজ বপন করে একটি জাতিকে পুণ্যবান করে তোলার বিশাল সুযোগ। এই সুযোগ তিনি হারাতে পারেন না।

—আমাদিগে চাহিয়া দেখ, আমরা এই পুণ্যদেশে আমাদিগের পতাকা প্রোথিত করিয়া ফিরিয়া যাইব, তোমাদিগের আকাশে ঐ পতাকা উড্ডীয়মান হইবে, আইস পতাকা আগুনের পতাকা আকাশে তুলি। আকাশময় আলো ব্যপ্ত হউক।

পরিব্রাজক চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালালেন। আগুনের তেজ নেই। আগুনের পতাকা আকাশে উড়ল। পরিব্রাজক উল্লাসে ফেটে পড়লেন। বিমল দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। অপার বিস্ময় আনন্দে ওর বুক ফেটে যাচ্ছে।

—এই আমি, জগতে নতুন আর এক সভ্যতার উন্মোচন করিলাম, এই দেশ ভগবান তথাগতর দেশ, এই দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিল পুনর্বার, এই দেশে আমি প্রথম আলো, জ্বালাই, সভ্যতার পাতাকা তুলি।

পরিব্রাজক আনন্দে ময়ূরের মত হয়ে উঠলেন। ময়ূরের মত দৌড়াতে লাগলেন। ধরলেন একজন মানুষকে, 'দেখ তোমাদিগের আকাশে আমি পতাকা তুলিয়াছি।' বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, আমরা যে কিছুই দেখি না।

এই কণ্ঠস্বর আকাশ অন্ধকারে ব্যপ্ত হয়। অন্ধকার তীব্র হয়, শীত নামে।

পরিব্রাজক চমকে যান। থর থর করে কাঁপতে থাকেন। মুখ চোখে বিষাদ নামে।

—চাহিয়া দেখ, আকাশময় পতাকার আলোর কি বিস্তার!

—আগে চক্ষু দাও, তখন আলোর পতাকা দেখিব।

হু হু করে বাতাস বইতে লাগল। বাতাসে পতাকার আগুন দুলতে লাগল। আগুন সাপের জিভের মত হয়ে গেল। মানুষের চিৎকার করে ওঠে। চক্ষু দাও, আকাশ দেখিব, আকাশে পতাকা দেখিব।

পরিব্রাজক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। আগুন দুলতে দুলতে অরণ্যের ভিতর ঢুকে গেল। অরণ্যে আগুন ধরে গেল। আকাশ হবে উঠল রক্তিম। আগুন পরিব্রাজকের কাছে এগিয়ে যেতে থাকে, তিনি সরে যান। উদভ্রান্তের মত নদীর দিকে দৌড়ন। নদীতে গিয়ে জল দেখেন না তিনি। বালিভরা নদীতে মাছেরা সব মরে পড়ে আছে, ধু ধু করছে, পরিব্রাজক নদীর বালিতে পড়ে যান। কাঁধের ঝোলাটা পড়ে গেল নদীতে। তিনি সেটা কুড়িয়ে নেন। ঝোলার ভিতর থেকে মেঘ বার করতে থাকেন। সেই আগুনে মেঘও পুড়তে লাগল। তিনি সুতীব্র চিৎকারে মহাবিশ্ব কাঁপিয়ে দেন। বিমল শুনেছে পরিব্রাজক ডাকছেন। সে বিড়ি ধরায়, আস্তে আস্তে এগোতে থাকে। রথীন সমাদ্দার আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। বিমল নদীর ধারে দাঁড়িয়ে নিশ্চুপ।

এই অবধি ঘটনা এগোয়। এরপর আর মনে থাকে না কিছুই। সে চোখ খোলে। স্টেশনে কোলাহল শুরু হয়ে গেছে। বিমল উঠে দাঁড়ায়। মাথার ভিত[illegible] লেগেছে। [illegible]এই স্বপ্ন [illegible] কিছুতেই হয় না। আগুনের কাছে [illegible] সব চিন্তা আটকে যায়। রথীন সমাদ্দারের বাড়িতে শুয়ে মধ্যরাতে চোখের ভিতরে একদিন এসব ঢুকে পড়েছিল কোন অলক্ষ্যে। চোখ থেকে মাথার ভিতর। মাথার ভিতর থেকে ময়ূরকে তাড়ানো যায়নি। যাবে না কোনদিন হয়ত। আজকাল পার্বতী বাসটা পাওয়া

মেলে ময়ূর হয়ে যায় ঘুমের ভিতর। বিমল আস্তে আস্তে এগোয় রেললাইন ধরে, লেভেল ক্রশিংএর কাছে এসে আবার শহরে ঢুকে পড়ে। এখন যদি ময়ূরটাকে নিয়ে সে এই শহরের উপর দিয়ে সত্যি সত্যি উড়ে যেতে পারত! নিচের মানুষ, ঐ দীপঙ্কর চৌধুরী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত।

দীপঙ্কর চৌধুরী তার সঙ্গে রাত কাটাতে চেয়েছে। রাত কাটিয়ে তাকে ধন্য করে দেওয়ার মতলব মানুষটার। কোনো সত্যিই এসব হয় না কখনো, সরকারি অফিসার, তার একটা মানমর্যাদা আছে, সে তার সঙ্গে রাত কাটাতে চায়। দীপঙ্কর চৌধুরীর ভিতরে লোভ ঢুকে পড়েছে। মহত্বের লোভ। বিমল হাসতে থাকে। মহৎ কি অত সহজে হওয়া যায়, তাহলে চাকরী বাকরী রাজার পালঙ্কে শোয়া কেন? সে আস্তে আস্তে মাতঙ্গিনী হোটেলের দিকে এগোয়।

মাতঙ্গিনী হিন্দু হোটেল। হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট। দুপুরে বারোটা এবং রাত আটটার পর থেকে মিল সাপ্লাই করা হয় কাস্টমারদের। কাস্টমার প্রধানত বাসের কর্মচারীরা, আর এই শহরে একেবারে নতুন যেসব যাত্রীরা ট্রেন থেকে নামে তারা। হোটেলটা খুব পরিচ্ছন্ন নয়। সে কারণে এই শহরে পরিচিত লোকজন প্রয়োজনে এখানে ওঠেন না। বাজারে ভাল হোটেল আছে।

বিমল রাতে এই হোটেলে খেয়ে বাসে শুয়ে থাকবে। বাস পেট্রল পাম্পের পাশের গ্যারেজে চলে গেছে। মনটা হঠাৎ ভার হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যে বেলায় ঐরকম পালিয়ে আসা উচিত হয়নি। দীপঙ্করবাবুকে ডেকে সে লুকিয়ে পড়ল। শুধু কি এড়াতে! নাকি অন্য কোন কারণ আছে। দীপঙ্কর চৌধুরীকে সে ভয় পেয়েছিল। সে ভয় করতে আরম্ভ করেছে লোকটাকে। বিমলের গা শির শির করে ওঠে। মানুষের চোখ দেখলে মানুষকে চেনা কষ্ট নয়। দীপঙ্কর চৌধুরীকে সে চিনতে আরম্ভ করেছে। তাই ভয় পাচ্ছে। বার বার ভাবছে কিছু করতে পারবে না লোকটা। কই নির্মল মজুমদারকে দেখে তো একথা মনে হয়নি। জলাবনিতে এই লোকটা হয়ে উঠেছে মহীরুহের মত। ডালপালা বিস্তার করে দিচ্ছে ক্রমশঃ। বিমল ভয় পাচ্ছে। এই লোকটা তার কথা শুনেছিল নিবিষ্ট মনে। মুখে এক বিন্দুও হাসির চিহ্ন ছিল না, কি করে হয়! লোকটা ক্রমশঃ আসল সত্যের দিকে পা বাড়াচ্ছে। লোকটা আজ ক্ষুব্ধ হয়েছে নিশ্চিত।

বিমলের চোখ চারদিকে ঘুরে যাচ্ছে। সে ঘুরে ঘুরে পিছনে তাকাচ্ছে। দীপঙ্কর চৌধুরী কাছে পিঠে কোথাও আছে নাকি! থাকলে ভাল হত। সে দেখত লোকটাকে ডাকার সাহস হত না। ওর পাশ দিয়ে উদাসীন হয়ে হেঁটে যেত। লোকটা তাকে ধরে ফেলত নিশ্চিত। লোকটাকে এড়িয়ে ভুল করেছে নাকি। বিমল হাতের আঙুল মুচড়োতে থাকে। এখন এই মুহূর্তে দীপঙ্কর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার বাসনা প্রবল হচ্ছে। এক্ষুণি যদি আসত মানুষটা ওকে সে অনেক কথা বলে দিত। বলে দিত অনেক মানুষের কথা। বিমল হোটেলের ভিতর ঢোকে না। সুভাষ বসুর মূর্তির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা বাস স্ট্যান্ড ফুঁড়ে উঠে গেছে শহরে মূল রাস্তায় সেদিকে হাঁটতে লাগল। কোথায় যেতে পারে মানুষটা!

এই রাস্তার আলো ফ্যাকাশে হলে গেছে। অনেক দিনের পুরোন ফ্লুওরেসেন্ট ল্যাম্প। আলোয় রাস্তা ঝাপসা। দুপাশে সারি সারি শালগাছ উঠেছে রাতের আকাশের দিকে। অরণ্য ফুলের গন্ধ উড়ে আসছে। শুকনো পাতা ফুল ঝরে পড়ছে মাথার উপর। ঝাপসা আলোয় বিমল দেখে রাস্তায় টুপ টাপ ঝরে পড়ছে শাল ফুল। দীপংকর চৌধুরী কোথায় গেল।

বিমল ক্রমশঃ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে।

> অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যায়
> সোনার হরিণ নেই
> বেরোল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত বেরোবে।

লোকটাকে দেখার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছে। এখন হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে, কেন ওকে সে এড়িয়ে গেল। এরপর হয়ত আর ঐ মানুষটা তার কাছে আসবে না। তার স্বপ্নের ময়ূরের গল্প বলে দিত। ময়ূরের কথা। এই কথা কাউকে কখনো বলেনি। লোকে জানে রথীন সমাদ্দারের কথা, তার ভারত ভ্রমণের ইতিবৃত্ত। কিন্তু ময়ূরের স্বপ্ন কেউ জানে না। বলার মত মানুষ পায়নি বিমল।

আস্তে আস্তে সে রাস্তায় উঠে আসে। এদিকটা ঝলমলে ছিল সন্ধ্যেয়। এখন দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। রিকসার স্ট্যান্ডে রিকসার উপর এক একজন বসে ঝিমোচ্ছে। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করছে।

বিমল উদভ্রান্তের মত রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। দীপঙ্কর চৌধুরী আজ থাকবে কোথায়? তাকে না পেয়ে ঘুরেছে নিশ্চয়ই বহুক্ষণ। হয়ত আর অপেক্ষাই করেনি। সম্মানে লেগেছে মানুষটার। মানুষটা তার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল? তার অর্থ কি বিমলকে অসম্মানিত করা। বিমল নুয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সে তো অপমান করল লোকটাকে। এখন কোনদিকে যাবে? বিমল স্তব্ধ হয়ে তিন রাস্তার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়ে। যদি এখানে দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সে বড় একটা অপরাধ করেছে।

বাস থেকে নামার সময় বিমল ডেকেছিল ওকে। দীপঙ্কর বাস থেকে নেমেই দেখেছিল হাফপ্যান্ট পরা মানুষটা হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছে। সে দ্রুত তাকে অনুসরণ করে। তখন সবে সন্ধ্যে হচ্ছে। নানান জায়গা থেকে বাসগুলো এসে দাঁড়াচ্ছে, প্যাসেঞ্জার নেমে পড়ছে। মুহূর্তে জায়গাটা হয়ে উঠল মানুষের ভীড় ভীড়াক্কার। দীপংকর অনায়াসে মানুষ কাটিয়ে লোকটাকে ধরতে পারল না। বিমল খুব জোরে হাঁটছিল। দীপঙ্কর যখন ভীড় কাটিয়ে পৌঁছল তখন সবই ঠিক ঠিক আছে, বিমল নেই। সে এদিক ওদিক দ্রুত ঘোরাফেরা করল। এর মধ্যে কোথায় গেল লোকটা? আশ্চর্য তো! তাকে তো ডেকেছিল। বলেছে তার সঙ্গে রাত কাটাবার কথা। তাহলে!

ঐ মানুষটা একটু অন্য রকম। স্বপ্ন দেখে বড় বেশী। ওর চোখ মুখ মাথার ভিতরের বহু স্বপ্নের চিহ্ন নির্দেশ করে। লোকটা ভাবালু আবেগে চলে। সেটা দীপংকর আগের দিনই বুঝেছে। আগের দিন মানুষটা সেই মাঠের ভিতরে বসে হঠাৎ কেমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এখন তাকে ডেকে এগিয়ে গেল লোকটা। নিশ্চিত ভেবেছে দীপংকর চৌধুরী পিছনে আসছে। কোন-দিকে গেল? এখন যদি ওকে না পাওয়া যায় তাহলে? বিমল নিশ্চয়ই আহত হবে। ভাববে দীপংকর চৌধুরী তার সঙ্গে মিশতে ভয় পায়। আবেগের ঘোরে বলেছে রাত কাটাবে, পরে উপলব্ধি করেছে সেটা সম্ভব নয়, তাই ইচ্ছে করে হারিয়ে গেছে। কিন্তু আসলে তো সেটা হয় নি, বিমলকে এক্ষুনি খুঁজে বার করা দরকার। দীপংকর চার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি ফেলে। দেখা যাচ্ছে না। লোকটা কোথাও গিয়ে নিশ্চিত থেমেছে, তাকাচ্ছে চারধারে, কোথায় গেল অফিসারবাবু। তারপর। দীপংকর ভাবতে পারে না।

সে আস্তে আস্তে ডান দিকের রাস্তা ধরে এগোতে থাকে, আপাত নির্জন এই রাস্তাটা। এই দিকে যেতে পারে মানুষটা। ঐ রকম মানুষ তো নির্জনতা পছন্দ করে। রাস্তাটা নৈঃশব্দ্যে থম থম করছে। শহর থেকে দূরে চলে গেছে অরণ্যের ভিতর দিয়ে। দু পাশে অরণ্য সরিয়ে বসতি গড়ে উঠেছে। পাশের বাড়িগুলোয় জ্বলে উঠেছে আলো। দীপংকর অনেকটা এগিয়ে যায়, দেখতে পায় না বিমলকে। এ রাস্তায় ঢুকে নি। তাহলে! তাকে না পেয়ে লোকটা আবার বাস স্ট্যান্ডে ফিরে আসতে পারে। বাস স্ট্যান্ডে খুঁজছে হয়ত। এটাই তো স্বাভাবিক।

দীপংকর দ্রুত পিছনে ফেরে। জোরে পায়ে হাঁটতে থাকে। রাত নেমে গেছে। বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দেখে কেউ নেই। ঘামে গেঞ্জিটা ভিজে গেছে। হাল্কা অন্ধকারে সে চার দিক তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কি হল এটা? ঐ রাস্তায় না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই ভাল হত। মানুষটা তো এখানে ফিরে এসেছিল তাকে খুঁজতে। খুঁজে ফিরে

গেছে। ধারণা করেছে দীপংকর চৌধুরী তাকে এড়াতে চেয়ে পালিয়ে গেছে। রাতে আর মত লোকের সঙ্গে থাকা দীপংকর চৌধুরীর সম্ভব নয়।

দীপংকর একটা ছোট চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ভাঁড়ে চা নেয়। চায় দিকে উদভ্রান্তের মত তাকাতে তাকাতে চায়ে চুমুক দেয়। সামান্য ভুলের জন্য একটা মানুষের ধারণা বদলে যেতে পারে। এর পর কি হবে? ঐ রকম আবেগী লোককে সে বোঝাতে পারবে তার ভুলের কথা। লোকটা তো মুখ ফিরিয়ে নেবে।

এর পর বহুক্ষণ সে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করে। স্টেশনে গিয়ে ওভার-ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে অন্ধকার মাখে। সময় কাটানোর উপায় কি এখন! রাতে ঝাড়-গ্রাম অফিসের মেসে গিয়ে উঠলে হবে, হোটেল থেকে খেয়ে নেবে। একটা গুডস ট্রেন সমস্ত স্টেশন ওভার ব্রীজে ভূকম্পনের স্বাদ দেয়। সে আস্তে আস্তে নেমে আসে। বাইরে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসে। অনেক দিনের বাসী খবরের কাগজ মুখের সামনে তুলে নেয় জোর করে।

চায়ের দোকান থেকে বেরোতেই রজনীকান্তর সঙ্গে দেখা। এতটা ঘোমটা দেওয়া বউ নিয়ে বেরিয়েছে লোকটা। তাকে দেখে এগিয়ে, বউটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। সোঁকে চুলে কলপ লাগিয়ে যথারীতি যৌবন ফিরিয়ে এনেছে রজনীকান্ত।

—হেঁ হেঁ স্যার, আপনি এখানে?

দীপংকর চমকে দেখে, বউটা মুহূর্তে ঘোমটা সরিয়ে তাকে নিবিষ্ট চোখে দেখছে রজনীকান্তর পিছন থেকে। বয়স্ক মুখ, লালিত্য ঝরে গেছে। দৃষ্টি কেমন কঠিন। দীপংকর চোখ সরিয়ে রজনীকান্তর দিকে মনোযোগ দেয়।

—কি ব্যাপার, আপনি?

—সিনেমা দেখতে আসছিলাম বেহুলা লখিন্দর।

—ফিরবেন কি করে?

—ফিরবো না, থাকবো, অফিসের মেস আছে এখানে।

—আহ, আমিও থাকব, এখানে।

—আমার সঙ্গে চলুন না স্যার। আরামে থাকবেন।

—না, একজনের জন্য ওয়েট করছি, কথা দিয়েছে আসবে।

—ঠিক আছে, অন্য দিন থাকতে হবে কিন্তু। অফিসে যাব দরকার আছে। রজনী-কান্ত হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়। দীপংকর দেখে বউটা আবার একবার পিছনে ফিরে তাকে বিদ্ধ করল।

সে আর দাঁড়ায় না। আস্তে আস্তে এগোয়। মনটা খারাপ হয়ে গেছে। [illegible]

সে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে একটা হোটেলে ঢুকে পড়ে।

॥ ১১ ॥

কয়েক পা এগিয়েই সতী মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল। মাথার ঘোমটা ঘাড়ের কাছে পড়ে গেছে। চোখ মুখ ঝকঝক করছে। বেহুলা লখিন্দর দেখে চোখ মুখে একটু ভক্তির ভাব তৈরী হয়েছিল, সে সব উড়ে গেছে মুহূর্তে। কলাবনির কর্মকাণ্ডের কাণ্ডারী এখন ঐ ছোকরা লোকটা। ওকে বশ করতে পারছে না এই মানুষটা, তার স্বামী রজনীকান্ত।

—তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না, জমিজমা সব যাবে।

রজনীকান্ত অবাক চোখে তাকায় সতীর দিকে। খোলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ঘোমটা মাথায় নেই, রাগে গরগর করছে, এমন তো হয় না। সে চুপ করে থাকে।

—ভেবেছ জমি সব তোমার, আমার ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ নেই?

রজনীকান্ত বিব্রত হয়ে পড়ে, কেন, একথা।

—বুঝতে পার না? সতী বিড়বিড় করতে করতে হঠাৎ খেয়াল করে মাথার ঘোমটা পড়ে গেছে, সে চট করে মাথায় কাপড় তুলে দেয়, তারপর হাত বাড়ায়, পান দাও।

রজনীকান্ত পকেটের কৌট বার করে একখিলি পান এগিয়ে দেয় বউ-এর দিকে, নিজেও একটা মুখে দেয়, তারপর বলে, কি হল কি?

সতী গুম হয়ে গেছে। জমি কি শুধু এই লোকটার। তার নয়। লোকটা ভাবে কি? এত বছর সংসার করে তার মায়া বসেনি ঐ জমি-জমার উপর। সেই সব জমির ধান যদি অন্য লোকের ঘরে ওঠে, নিজেদের খামার যদি শূন্য পড়ে থাকে তাহলে কার বুক ঠিক থাকে। আর লোকটার মাথার ঠিক নেই, এসব ক্ষেত্রে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবে চিন্তে কাজকর্ম করতে হয়। ঠিক সময় ঠিক অস্ত্রটি প্রয়োগ না করতে পারলে কর্মসিদ্ধ হয় না। কি লোকের কি অবস্থা হয়েছে। একদিন এই লোকটা বন্দুকের নলের ডগায় দাঁড় করিয়ে রাত বিরেতে দাপটে মানুষকে ওঠা বসা করিয়েছে প্রবল প্রতিপত্তি নিয়ে দশ-বিশটা গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছে, সরকারি অফিসার বি ডি ও, এস ডি ও সেটেল-মেন্টের অফিসারকে ঘরে তুলে মুর্গী মেরে ঢালাও ফিস্ট করেছে, মদের ফোয়ারা ছুটিয়েছে, সেই সব বাবুদের সঙ্গে এখন সব গিয়ে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। কোন বুদ্ধিই ওর মাথায় খাটে না। কেমন যেন বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়ে যাচ্ছে লোকটার। নাহলে আজকের এমন সুযোগ হেলায় হারায়।

[illegible]

বসে ফিরে এসেছে, তাই বলে আবার চেষ্টা করতে নেই। টাকার কাছে স্বজন পরিজন বউ ছেলেপুলে সকলে বন্ধা। টাকা পেয়ে মেয়ে মানুষ তার সর্বস্ব দিয়ে দেয়। টাকায় জগৎ সংসার এমনকি ভগবানও বশ হয় আর ঐ ছোকরা অফিসার বশ হবে না। এ কেমন কথা। আর ঐ তো ঐটুকুন লোক। চশমার ভিতর দিয়ে দেখছিল তাকে। সতীর মুখে এক বিন্দু হাসি এসে যায়। সে লম্বা করে পানের পিক ফেলে। কিভাবে দেখছিল তাকে, দেখার মত সে আছে এখনো। সতী ঘোমটা ফেলে খোপাটা ঘুরিয়ে একবার বেঁধে নেয়। চুল সব উঠে যাচ্ছে। যা আছে তাও কটা সোমত্ত মেয়ের থাকে? তার তো বয়স দু কুড়ি ছুঁয়ে গেল। ছেলেপুলে হয়ে দেহের বাঁধুনি গেছে। ছেলের বউ ঘরে এসে নাতি হয়ে গেল পর্যন্ত। সতী আবার ঘোমটা তুলে দেয় মাথায়, একটু ভারিক্কি চালে হাঁটতে থাকে।

—এমন ক্ষেপলে কেন? রজনীকান্ত পানের পর সিগারেট ধরিয়ে বউকে জিজ্ঞেস করে।

—তোমার যদি একটু বুদ্ধি থাকে, জমির শোকে বুদ্ধি হারালে তো চলে না, জমি-জমা রক্ষে করতে হবে না।

—তা তো হবেই, সেই জন্য দেখলে তো লোকটার মেজাজ।

—ঐ রকম তো হবেই. তোমায় দেখে কি আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরবে। সে রকম বিশ্বাসী হতে পেরেছ ওর।

—মানে?

—লোকটাকে ছাড়লে কেন?

—বললাম তো আসতে এলো না কি করব?

—ঐ রকম বলায় আসে! এত বড় সুযোগ আসে, কলাবনির বাইরে, রাত্তিরে লোকটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এটা ঝাড়গ্রাম, এই সুযোগটা নিলে না, একদিন টাকা দিতে গিয়ে ফিরে এসেছো বলে—।

রজনীকান্ত সতীর কথার উত্তর দিতে পারে না। মনে মনে অবাক হয়, সেটা প্রকাশ করে না। বউ-এর বুদ্ধি তো কম নয়। সে চমকে গেছে একরকম। ঠিক সময়ে মেয়ে মানুষের বুদ্ধি খোলে। সেদিন তো ধমকে দিয়েছিল, আজ রজনীকান্ত বুঝতে পারছে বউ তার ফেলনা নয়। কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে নেই। তাহলে বউ মাথায় চেপে বসবে। পুরুষ লোকের সব সময় মেয়েমানুষের উপরে উপরে চলা উচিত। বউ তাহলে বশে থাকে। না হলে এর থেকে লাই পেয়ে সব ব্যাপারে মাথা গলাতে আসবে সতী।

সতী বিড় বিড় করছে, এই যে লোকটাকে একা পেলে, এখন কতবড় কাজটাই না হত, যেমন ওকে জোর করে [illegible]

যেতে পারতো। তারপর জোর খাওয়া-দাওয়া, রাত্তিরে সুযোগ বুঝে টাকার প্রস্তাবটা পেড়ে দেখতে কায়দা করে তুমি না বলতে পারলে হারুই বলত না হয়।

হারু সতীর ভাই। রজনীকান্তর সম্বন্ধি। কর্মী লোক, এই আটত্রিশ বছর বয়সেই ঝাড়গ্রাম শহরে বাড়ি তুলেছে তিনতলা। একেবারে হাল ফ্যাশানের কায়দা সেই বাড়ির। বাস নামিয়েছে ঝাড়গ্রাম বেল-হাড়ী রুটে। তাকে কত কাজ করতে হয়। বাসের ব্যাপারে কম টাকা এধার ওধার ঢালতে হয়নি। সে টাকা ঢালতে ওস্তাদ। কতলোক কত সরকারি হোমরা-চোমরাকে কায়দা করল, এ তো একটা শিশু। বিয়ে থা করেছে কি করেনি। একা থাকে। ওর মনে বিক্ষোভ জাগে না। মনের ব্যাপারটা ধরে ফেলে সেই পথে এগোও কাজের সিদ্ধি।

—তোমার কথাটা ঠিক, কিন্তু আমি কেন এগোলাম না সেটা জান?

—কি ব্যাপার?

—আরে বাবা ওকি একা এসেছে এখানে পিথা নায়েকটা ছিল, আমি দেখেছি ওই ধারের পানের দোকানে, পিথার জন্যই তো দাঁড়িয়ে আছে, সুতরাং আমি এগোই কি করে।

—তাহলে গেলে কেন? সতী উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

—না গেলে হয়, ও তো দেখেছে, না গেলে কি ভাবত, তুমি বুঝছ না।

—কিন্তু পিথার সঙ্গে এই ঝাড়গ্রামে কেন?

—সেটা ও জানে, লোকটা সন্দেহজনক। তবু চেষ্টা করতে হবেই, টাকায় কে না বশ, বল।

সতী রজনীকান্তর দিকে তাকায়। এতক্ষণে ওর মুখে হাসি ফোটে। না, তাহলে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায়নি লোকটার। সে বৃথাই ওসব অলক্ষুনে কথা মনে আনছিল। হ্যাঁ ভাল কাজই করেছে। পিথা নায়েকের সামনে থেকে লোকটাকে নিয়ে আসলে আর এক ঝামেলা বাঁধত। আর লোকটাও সাহস করে আসত না।—আমার কথায় কিছু মনে করনি তো, কষ্ট হয় জমিগুলোর জন্য।

রজনীকান্ত মাথা নাড়ে, ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় কিছু মনে করেনি। কিন্তু কথা বলে না। চুপ করে থাকে। এক প্যাঁচেই বউ শান্ত। কিন্তু সতীর বুদ্ধি কম নয়। তার ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছে সঠিক। এই রকম ভুল করলে তা শুধরো-বার উপায় থাকে না। ভগবানের বই দেখতে গিয়েছিল রূপছায়া সিনেমা হলে। মনে ছিল দুঃখ। দুঃখ জমিগুলোর জন্য। ভগবান সেকথা শুনেছিলেন ঠিক, তাই একেবারে সংগে সঙ্গে সুযোগ করে দিয়েছিলেন, সে সুযোগটা নিতে পারল না। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। ভাবতে হবে, কিভাবে করা যায়। আজ লোকটাকে হারুর বাড়িতে এনে তার মনের খবর, মনের ইচ্ছে যাচাই করা যেত। সতী ছিলই সংগে। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এতদূর আছে লোকটা। মা বউদির জন্য তো মন খারাপও হয়। সতী ওর মা হয়ে যেত। রজনীকান্তর মুখে সামান্য হাসি দেখা যায়। না হলে টাকার ব্যাপারটাই ভাবা যেত, আজ প্রস্তাব দিত না সে, শুধু ইচ্ছেটা জেনে নিত। ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত। এইভাবে ঘনিষ্ঠতা যদি তার পরিবারের সংগে তৈরী করে দিতে পারে, তাহলে বিনা টাকাতেও কাজ হয়ে যায়। যাক সেসব ভেবে লাভ নেই। এবার বুদ্ধির খেলায় নামতে হবে। সতীর দিকে তাকায় রজনীকান্ত। এক কথাতেই কাত। একেই বলে বউ-এর বুদ্ধি। বেশী দূর এ বুদ্ধি নিয়ে এগোন যায় না। এই রাতে পিথা নায়েক ঝাড়গ্রামে আসবে কি করতে আর ঐ লোকটা তার সঙ্গেই বা শহরে ঘুরবে কেন? সরকারী লোকের তো একটা মান সম্মান আছে। বুঝল না। না বুঝেছে ভালই হয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে সম্বন্ধির বাড়ি পৌঁছে যায় রজনীকান্ত। সম্বন্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। সতীকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই হারু লুঙ্গির কষি বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে আসে, কেমন হল গো বেউলো লখীন্দর।

সতী ভাইকে বুঝে ফেলে মদ গিলেছে ঠিক। বাসের ব্যবসা ধরার পর থেকেই মদের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে হারাধন। সমস্যায় নেই, দিব্যি আছে। এইরকম দিব্যি যদি সে থাকতে পারত লোকটার জমির উপর এত মায়া। সতী দুদ্দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। রজনীকান্ত বসে হাঁপায়।

লোধাশুলি থেকে একটা রাস্তা বোম্বাই রোড থেকে ছিটকে ঝাড়গ্রাম শহরের ভিতর ঢুকে পড়েছে। এই রাস্তাটা মনোরম। কিছুটা অংশ দুপাশে ফেলে রেখেছে লাল মাটির চড়াই উৎরাই নামাল চাষের জমি, তারপর শালবনের শুরু। ঘন শালবনের ভিতরে গড়ে উঠেছে এই শহর। এইটা হলো মূল রাস্তা। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ শহর ছাড়িয়ে দূরে, শহরের মাঝামাঝি জায়গায় পথ নির্দেশ দেওয়া আছে। এখানটাকে সোজাভাষায় বলে কলেজ মোড়। কলেজ মোড় থেকে একটু এগিয়ে ডানদিকে একটা সরু মোরাম রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই সেই মেস বাড়িটা। সামনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের একটা মঠ মন্দির। আটটা পনেরোয় কলাবনির বাস ছাড়ে। দীপংকর মেস থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে সোজা বাস স্ট্যান্ডের দিকে যায়।

কালকের ব্যাপার নিয়ে কিছু কথা বলেছিল মেসে এসে অজয় মজুমদারেব সংগে। অজয় বিচক্ষণ দীপঙ্করের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং ট্যাকট সম্পর্কে অজয়ের কোন সন্দেহ নেই। ঝাড়গ্রামে পোস্টেড। অজয় বার বার বলে দিয়েছে, তুমি এমনভাবে মানুষটার দিকে এগোবে যাতে ও না বুঝতে পারে যে তুমি ওকে এড়ানোর চেষ্টা করেছো, সত্যি কথাই প্রকাশ করবে এমনভাবে যাতে তা কখনো মিথ্যে বলে মনে না হয়। ওই লোকটার কাছ থেকে অনেক ইনফর্মেশন পাবে বলে মনে হয়। তবে হ্যাঁ অত ইমোশানাল হয়ে লোকটার সঙ্গে রাত কাটানোর প্রস্তাবে রাজী হওয়া তোমার উচিত হয়নি, এই কাজে খুব রিস্ক।

দীপঙ্করও কাল রাতে ভেবেছে ব্যাপারটা। হ্যাঁ অত ইমোশানাল হওয়া উচিত হয়নি তার। এক্ষুনি তো সব হয়ে যাচছে না। ঠিকই তো, রাত কাটাতে যাওয়াটা রিস্কি ব্যাপার হত। জমজমা নিয়ে কলাবনির বিত্তবানরা খুব বিব্রত। তাদের এই ভূসম্পত্তি বহুদিনের। এবং নিশ্চিত কোন গন্ডগোল জড়িয়ে আছে এইসব জমিতে। সেই সূত্র বার করতে তার ওখানে যাওয়া। একটু সাবধানে থাকা উচিত। কেননা এখন এমন একটা সময় যে ঐ সব জমিজমা চলে যেতে পারে তাদের হাত থেকে, তারা সহজে এসব ছেড়ে দেবে না। স্বার্থে ঘা লাগলে, মূল শত্রুতে আঘাত না করতে পারলে তার উপর আঘাত আসাটা বিচিত্র নয়। তবে হ্যাঁ বিমলকে চিনতে তার ভুল হয়নি। খুব সন্তর্পণে এগোতে হবে এটা ঠিক।

অজয় একটু এগিয়ে দিয়ে চলে গেল। দীপঙ্কর জোর পায়ে বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগোতে লাগল। এই সময়টা ভিতরে ভিতরে একটু সঙ্কোচের ভাব এসে গেল। কাল বিমল নিশ্চিত ধরে নিয়েছে দীপঙ্কর চৌধুরীর কথাবার্তা সব ভড়ং। লোক-দেখানো মহত্ত্ব। বাস ছাড়ার সময় হয়ে এল।

দীপঙ্কর একটু এগিয়ে পায়ের জোর বাড়াল। ওই দেখা যাচছে পার্বতীকে। হর্ন দিচছে। সে দৌড়ে গিয়ে বাসে উঠে পড়ল। এই সকালে বাস ফাঁকা। সিট ছিল। বসে চোখ ঘোরায়, দেখে বিমল জোর গলায় ড্রাইভারের সঙ্গে কি একটা নিয়ে তর্কে মেতেছে। বাস গড়াতে আরম্ভ করেছে। দীপঙ্কর মাথা নামিয়ে বসে থাকে। আবার ইমোশনাল হয়ে যাচছে। এক্ষেত্রে ইমোশনকে ঝেড়ে ফেলা কষ্টকর। মনের ভিতরে একটা সঙ্কোচের ভাব এসে গেছে।

—কাল কোথায় ছিলেন সার?

দীপংকর চমকে দেখে বিমল এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। মুখচোখ কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে, বিষাদ এসে ভর করছে।

—এখানে বন্ধুদের মেসে। দীপঙ্কর অস্পষ্ট জবাব দেয়।

—আমি মানে, ডেকে এগিয়ে গেছি একটু জোরে, কিছু মনে করবেন না— বিমল বিড়-বিড় করতে থাকে।

[illegible]

ভেঙ্কটরাঘবন

অবোধ আত্মম্ভরিতা

অজয় বসু

সব বিভাগেই আমরা ব্যর্থ! নানা কথার ছলে নানাভাবে জল ঘোলা করার পর শেষ পর্যন্ত সত্যোচ্চারণে বাধ্য হলেন শ্রীনিবাস ভেঙ্কটরাঘবন। এছাড়া তাঁর আর কীই বা বলার ছিল। বিশ্ব কাপ ক্রিকেটে সব কটি খেলায় বিপর্যয় বরণ করার পর হারা—পার্টির নেতার পক্ষে অন্য কোনো কৈফিয়ৎ দাখিল করা সম্ভব ছিল না। তার আগে যে সমস্ত কথা তিনি বলেছিলেন সে সবই তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে সখেদে স্বীকারোক্তি কবুল করতে হয়েছে। এমনটি যে ঘটতে পারে তার ঠাওর তিনি আগেভাগে পাননি। কেন যে পাননি, সেইটিই তো আশ্চর্য!

অনিশ্চয়তাই হল ক্রিকেট খেলার সবচেয়ে নিশ্চিত বৈশিষ্ট্য। এই খেলা কখন যে কাকে হাসায় আবার কাঁদায় তা কেই বা বলতে পারে। তা পারা যায় না বলেই বুদ্ধিমান ক্রিকেটার মাত্রেই খেলার ফলাফল বা তার চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে সমঝে বুঝে, রেখে ঢেকে কথা বলেন। কিন্তু যাঁরা অপরিণত, নির্বোধ এবং যাঁদের ক্রিকেটী শিক্ষা অসম্পূর্ণ তাঁরাই চান বুক ফুলিয়ে ক্রিকেটের পরম বৈশিষ্ট্যের মাহাত্ম্য অস্বীকার করতে। পরিনামে জড়িয়ে পড়েন আহাম্মুখিতার জালে। যেমন জড়িয়ে পড়তে হয়েছে এবার ভেঙ্কট রাঘবনকে।

ভেঙ্কট নেহাৎ বালখিল্য নন। ক্রিকেট খেলছেন দীর্ঘদিন। কিন্তু, অভিজ্ঞতা ও বাস্তব ঘটনাবলী থেকে তিনি যথার্থ শিক্ষা পেতে চাননি। পেলে কি আর ইংলণ্ড পদার্পণ করেই নিজের হাতে নিজের ঢাক পেটাবার চেষ্টা করতেন?

একটি দেশের জাতীয় দলের তিনি অধিনায়ক। তাঁর দায়িত্বজ্ঞান এবং পরিমিতিবোধ থাকবে বলেই সবাই আশা করেছিলেন। কিন্তু সব বোধ বিসর্জন দিয়ে অবোধের মত তিনি যে সব উক্তি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে তাঁর নিজের প্রতিচ্ছবিই মসীলিপ্ত হয়ে গেছে। প্রুডেনশিয়াল বিশ্ব কাপে ভারত কিছুই খেলতে পারেনি। জাতীয় দলের এমন ধূলি মলিন আকৃতি আমাদের কাছে পরম বেদনাদায়ক ও দুর্ভাগ্যজনক। সে দুর্ভাগ্য মেনে নেওয়া ছাড়া আজ আর গতি নেই। কিন্তু জাতীয় দলের অধিনায়কের হামবড়াই আচরণকে মেনে নেওয়াও কোথায় যেন বাধছে।

ইংলণ্ডে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙ্কটরাঘবন প্রকাশ্যে বলেছিলেন, আবহাওয়া ভাল থাকলে আমরা ভাল খেলব। জিতব। প্রুডেনশিয়াল বিশ্ব কাপের সেমি-ফাইনালে উঠব। চাই কি ফাইনাল পর্যন্ত এগোতেও পারি।

তারপর একটি একটি করে পর পর দুটি খেলাতে হার হতেই আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর নিজের জল্পনা-কল্পনার কথা ভুলে গিয়ে দলের ব্যাটসম্যানদের কাঁধে অপরাধের বোঝাটি চাপিয়ে দিতে চাইলেন। নিজেকে রেহাই দিতে বোলার ও ফিল্ডসম্যানদের গা বাঁচাতে ভেঙ্কট যখন দলের ব্যাটসম্যানদের যূপকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়ার মতলব ফাঁদছিলেন তখন বোধহয় অলক্ষ্যে ক্রিকেটের দেবতা হাসছিলেন। হেসে হেসেই তিনি ভেঙ্কটকে আরও শিক্ষা দেবার জন্যে পরবর্তী ক্ষেত্র তৈরীর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

সে লগ্ন এল শ্রীলঙ্কার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কালে। শ্রীলঙ্কা যখন ভারতকে হারাল তখন আর ভারতীয় দলপতি অন্য কোনো অজুহাতের সাফাই গাইতে না পেরে সার্বিক ব্যর্থতার জন্যে সমগ্র দলের অকৃতকার্যতাকেই দোষী সাব্যস্ত করতে বাধ্য হলেন। এবার আর কি করে তিনি বোলারদের দোষস্খালনের পথ খুঁজে পান? তা খুঁজতে গেলে যে তাঁকে আর একবার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় রাখতে হোত।

দোষ ব্যাটসম্যানদের। এমন একটি বি-হিসেবী মন্তব্য ছোঁড়ার মস্ত কারণ ভেঙ্কট কোথায় খুঁজে পেয়েছিলেন? নিজে বোলার বলেই কি তাঁর কাছে স্বাজাত্যবোধের অভিমান বড় হয়ে উঠেছিল? প্রুডেনশিয়াল বিশ্ব কাপের প্রথম খেলায় ভারতীয় বোলাররা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একজনের বেশি দুজনকে আউট করতে পারেননি। দ্বিতীয় খেলাতেও তাই। তবুও ভেঙ্কটরাঘবন বোলারদের ফিল্ডসম্যানদের ব্যর্থতার ঠিকানা খুঁজে পাননি। ব্যাটসম্যানেরা অবশ্যই ভাল খেলতে পারেননি। কিন্তু ফিল্ডাররা, বোলাররা কি করতে পেরেছিলেন? বিশেষতঃ বিশ্ব শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের ভারতীয় স্পিনাররা? ভারতীয় ফিল্ডসম্যানেরা নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংসের গোড়ার পর্বে গণ্ডা গণ্ডা ক্যাচ ফসকেছেন! তিন তিনটি ম্যাচে যুগল স্পিনার একজন ব্যাটসম্যানকে ফেরাতে পারেনি। যা কিছু উইকেট পেয়েছেন তা মিডিয়াম বা মিডিয়াম ফাস্ট বোলাররাই। স্পিনারদের এই বেহাল অবস্থা দেখে কি এখনও বলা সাজে যে বেদি ভেঙ্কটেরা হলেন বিশ্ব শ্রেষ্ঠ বা 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস' পর্যায়ভুক্ত? 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস' স্পিনার [illegible] এক [illegible] রসিকতা বলে ঠেকছে, একদা লোকমুখে প্রচারিত এই বিশেষণ আমাদের কানে মধু ঢেলে দিত। আজ কিন্তু এই উচ্চারণ গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিতে কার্পণ্য করছে না। নিজেদের দেশের মাঠে, নিজেদের হাতে তৈরী পিচে বল করার সুযোগ পেলে না হয় ভেঙ্কটরাঘবন মনের সুখে বল করতো পারেন। উইকেটও পেতে পারেন, যেমন পেয়েছিলেন কালিচরণের দলের বিরুদ্ধে। কিন্তু অন্যদের হাতে অন্য উদ্দেশ্যে গড়া পিচে বল করতে হলে তিনি যে স্পিন জমাতে পারেন না, এই সত্যই এবারের প্রুডেনশিয়াল কাপের আসরে প্রমাণিত হয়েছে। অন্য স্পিনার বেদি সম্পর্কে নতুন করে আর বলার কি আছে। বেদির দিন যে বিগত, যতোদিন যাচ্ছে এই উপলব্ধি ততোই সাচ্চা হয়ে উঠছে। যুগল স্পিনার একজনও একটি উইকেট পাননি, ফিরিয়ে দিতে পারেননি শ্রীলঙ্কার কোনো ব্যাটসম্যানকেও। তবুও যদি তাঁদের ওয়ার্ল্ড ক্লাসের জাতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় তাহলে তার চেয়ে হাস্যকর আর কীই বা ঘটতে পারে?
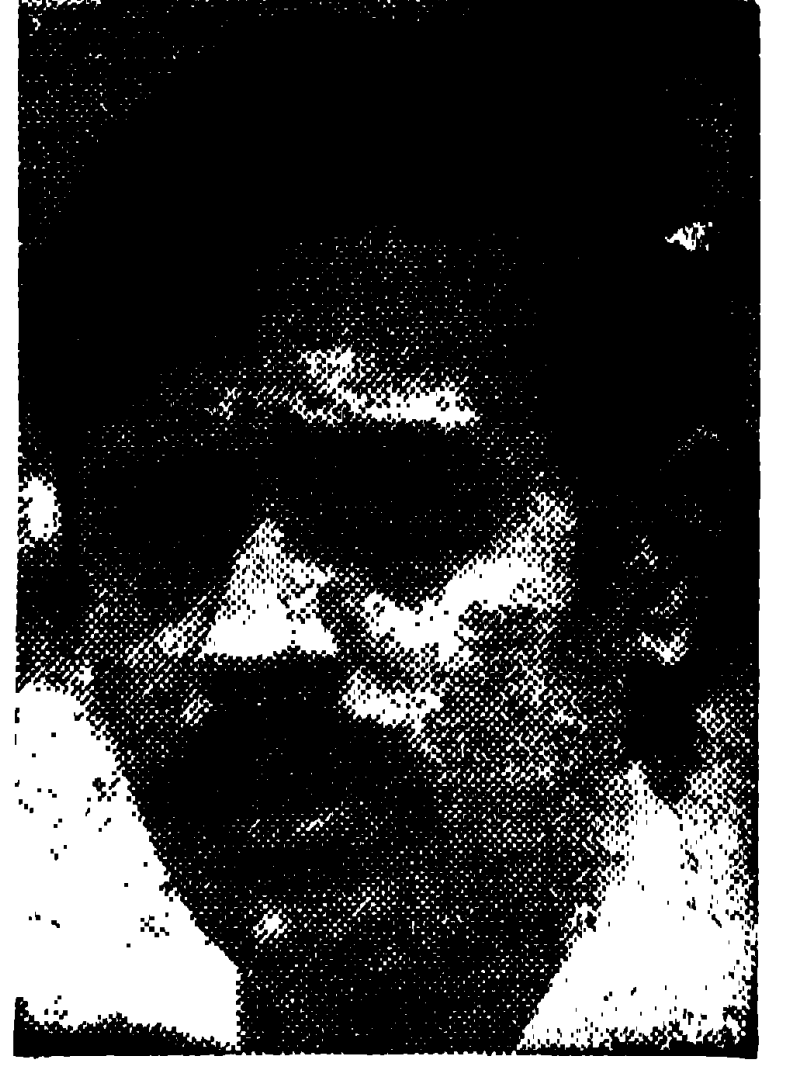
আর ওই আবহাওয়ার অজুহাত। ওই অজুহাত তুলে আরও কতোদিন নিজেদের অক্ষমতাকে আড়াল করে রাখার প্রয়াস পাওয়া হবে? ইংলণ্ডে গ্রীষ্মে বৃষ্টি হয়, আকাশ থাকে মেঘলা, কনকনে শীতে হাড় কাঁপানো বাতাস বইতে থাকে। সে দেশের গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ায় এই রূপ চিরকালের। এই অবস্থার কথা জেনে শুনেই ভারতীয় দল ইংলণ্ডে খেলতে গেছে। তবে অকারণে আবহাওয়ার অজুহাত তোলা কেন? এই অজুহাত অক্ষমের কাঁদুনীরই নামান্তর। ছেলেমানুষের মতো কাঁদুনী গাইলে কেই বা তা শুনতে চাইবে? তাছাড়া এবারের প্রুডেনশিয়াল কাপের খেলার সময় তেমন আতঙ্ক জাগানো আবহাওয়ার সামনে ভারতীয় দলকে পড়তেও হয়নি। সাধারণ অবস্থায় [illegible]

প্রতিযোগীরা ভারতীয়দের হারিয়ে দিয়েছে। এক কথায়, এই বিপর্যয় শোচনীয়।

এমন বিপর্যয় ঘটা ক্রিকেটে অভাবনীয় যে নয় তার সাক্ষী ইতিহাস। বেশি দিনের কথা নয়, ওয়াদেকারের নেতৃত্বাধীন জাতীয় দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংলণ্ডে রাবার জয়ের পরমুহূর্তেই লর্ডস মাঠে মাত্র বিয়াল্লিশ রানে ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়েছিল। এমনি অপ্রত্যাশিত আরও কতো ঘটনা ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসে ঘটে গেছে। বছর কয়েক আগে ইংলণ্ডের তদানীন্তন অধিনায়ক টনি গ্রেগ জাঁক করে বলেছিলেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েস্ট ইন্ডিজের চ্যালেঞ্জকে তাঁর দল ধরাশায়ী করে ছাড়বে। কিন্তু বাস্তবে সেবার গ্রেগের ইংলণ্ডকেই ভূমিশয্যা করতে হয়েছিল। গ্রেগ ব্যবহৃত গ্রোভেল শব্দটি আত্মম্ভরিতার নজির হিসেবে ক্রিকেটে ইতিহাসের পাতায় আজও জ্বলজ্বল করছে। এতো সব দৃষ্টান্ত দেখে-শুনেও যে ভেঙ্কটরাঘবনের চৈতন্যোদয় হল না, চড়া গলায় নিজেদের অনুকূলে জাঁক করার লোভ সামলাতে পারলেন না, এইটিই আশ্চর্য!

প্রুডেনশিয়াল কাপের সেমি ফাইনালে উঠবই, চাই কি ফাইনালেও যেতে পারি— ভেঙ্কটের এই আত্মবিশ্বাসের উৎস কোথায় তাই বা কে জানে। আগেরবার অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে বিশ্ব কাপের আসরে ভারত যে নিউজিল্যাণ্ডের কাছে হেরেছিল সেই নিউজিল্যাণ্ডকে বাগে আনতে না পারলে ভারতের পক্ষে সেমি ফাইনালে ওঠা সম্ভবপর ছিল না। তবু ভেঙ্কট আগে-ভাগেই ধরে নিতে চেয়েছিলেন যে তাঁর দল নিউজিল্যাণ্ডের বাধা টপকাতে পারবে। এমন ধারণা জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর পাতৌদিও মনে মনে পুষে রেখেছিলেন।

সেদিনের সুখ্যাত ক্রিকেটার মনসুর পাতৌদি এখন কলম ধরেছেন। প্রুডেনশিয়াল কাপের প্রাক সমীক্ষা করতে গিয়ে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে তিনি ভারতকে জিতিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি! পরবর্তী ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে মনসুরের হিসেবে ভুল হয়েছে। তা হতেও পারে। ক্রিকেটে এই জাতীয় ভুল-ভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে যা স্বাভাবিক সে সম্পর্কে দল নায়কদের সচেতন থাকাটাইতো আরও স্বাভাবিক। ভেঙ্কট তা হতে চাননি বলেই আজ তাঁকে আত্মম্ভরিতার দেনা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেটের দুর্ভাগ্য যে দলপতির বে-হিসেবী মন্তব্যের জন্যে গোটা দলটিই যেন অন্যদের চোখে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে।

এতে অন্যেরা হাসুক বা নাই হাসুক আমাদের এখন কাঁদার পালা। টেস্ট ক্রিকেটের সংসারে যে দেশ এখনও পিণ্ডি পায়নি, সেই শ্রীলঙ্কাও এবার ভারতকে ধরে বেঁধে হারিয়ে দিয়েছে। তিনটি ম্যাচের কোনোটিতেই ভারত নিজের ইনিংসকে পুরো ষাট ওভার পর্যন্ত জিইয়ে রাখতে পারেনি। তার আগেই ব্যাটসম্যানদের খেল খতম, যদিও ব্যাটসম্যানদের দলে ছিলেন গাভাসকার বিশ্বনাথের মত ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্যাটধারীরা। তিনটে ম্যাচে বোলিং সাফল্যের চূড়ান্ত নমুনা রান আউট সমেত আটটি উইকেট। সব খেলাতেই হার। জমার ঘরে শূন্য। পাওনা গণ্ডার এই হিসেব আমাদের চবিত কোথায়!

ভেঙ্কট অবশ্য বলেছেন যে সীমিত ওভারের খেলায় যাই ঘটে থাকুক না কেন, সনাতনী টেস্টে কিন্তু ভারত ভাল খেলবে। কে জানে এটিও শূন্য কুম্ভের গমগমে শব্দের মত নিরর্থক কিনা। তা না হলেই ভাল। উত্তর পর্বে ভারত ভাল খেলতে পারলে হয়ত কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যাবে। কিন্তু তাতেও কি শ্রীলঙ্কার কাছে হারের শোক ভুলতে পারা সম্ভব হবে?

তবে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা ভবিষ্যতের জন্যেই তোলা থাক। আপাততঃ নিবেদন দলাধিনায়ক ও ম্যানেজার, যুগলে যেন তাঁদের প্রকাশ্য উচ্চারণে কিছুটা সংযমের পরিচয় রাখতে শেখেন। হারজিৎ যাই হোক না কেন, খেলোয়াড়োচিত মনোভাব প্রদর্শনে ভারতীয়েরা পিছিয়ে পড়বেন কেন?

খেলা

উইম্বলেডন টেনিস

১৯৭৯ সালের ৯৩তম উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসে গেছে। এবারের প্রতিযোগিতা সুইডেনের বিয়রণ বর্গ এবং এবং আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিংয়ের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত তিন বছরের মত এ বছরও বর্গ পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হলে তিনি উপর্যুপরি চারবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হবেন, শেষবার হয়েছেন ১৯১৩ সালে এ এফ উইল্ডিং (১৯১০-১৩)। অপরদিকে শ্রীমতী কিং এবছরের আসরে যে-কোন একটি খেতাব পেলে উইম্বলেডন টেনিস খেলার ইতিহাসে সর্বাধিক ২০টি খেতাব জয়ের রেকর্ড করবেন। এখানে উল্লেখ্য, কুমারী এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা) ১৯৩৪ সালে তাঁর ১৯তম খেতাব জয়ের সূত্রে উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক (১৯টি) খেতাব জয়ের যে রেকর্ড করেন সে রেকর্ড ১৯৭৫ সালে আমেরিকারই শ্রীমতী বিলি জিন কিং মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে স্পর্শ করেন। কুমারী এলিজাবেথ রায়ানের ১৯টি খেতাবের মধ্যে আছে মেয়েদের ডাবলস খেতাব ১২ এবং মিকসড ডাবলস খেতাব ৭। তাঁর পক্ষে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয় সম্ভব হয়নি। অপরদিকে শ্রীমতী বিলি জিন কিং যে ১৯টি খেতাব জয়ী হয়েছেন তার মধ্যে আছে সিঙ্গলস ৬, ডাবলস ৯ এবং মিকসড ডাবলস ৪। শ্রীমতী কিং তাঁর ২০তম খেতাব পাওয়ার জন্য গত তিন বছর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। অল্পের জন্যে এই দুর্লভ গৌরব তাঁর হাতছাড়া হয়েছে। ১৯৭৬ সালে মেয়েদের ডাবলস এবং ১৯৭৮ সালে মিকস ডাবলসের ফাইনালে তিনি অকৃতকার্য হন।

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে পুরুষ... ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাবই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ৩৩ বছরে (১৯৪৬-৭৮) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জিতেছে এই সাতটি দেশ —অস্ট্রেলিয়া ১৪ বার, আমেরিকা ১২ বার সুইডেন ৩ বার এবং একবার করে ফ্রান্স, ইজিপ্ট, স্পেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়া অপরদিকে এই সময়ে (১৯৪৬-৭৮) মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছে আমেরিকা ২৩ বার (এরমধ্যে উপর্যুপরি ১৩ বার— ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৮), অস্ট্রেলিয়া ৪ বার, ব্রাজিল ৩ বার এবং গ্রেট বৃটেন ৩ বার। গত ৩৩ বছরে (১৯৪৬-৭৮) উপর্যুপরি তিনবার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন একমাত্র বিয়রণ বর্গ (সুইডেন)। অপরদিকে উপর্যুপরি তিনবার করে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জিতেছেন আমেরিকার এই তিনজন খেলোয়াড়—লুসী ব্রাউ (১৯৪৮-৫০), মৌরীন কনোলী (১৯৫২-৫৪) এবং বিলি জিন কিং (১৯৬৬-৬৮)। গত ৩৩ বছরে (১৯৪৬-৭৮) সর্বাধিক চারবার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার (১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৮-৬৯) এবং সর্বাধিক পাঁচবার মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জিতেছেন আমেরিকার বিলি জিন কিং (১৯৬৬-৬৮, ১৯৭২-৭৩)। এই হিসাব মত দেখা যাচ্ছে, উপর্যুপরি তিনবার সিঙ্গলস খেতাব জয় এবং সর্বাধিক সিঙ্গলস খেতাব জয়ের ব্যাপারে পুরুষদের ওপর মেয়েরা দারুণ টেক্কা মেরেছে। একই বছরের আসরে পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছে মাত্র দুটি দেশ—আমেরিকা দশবার (এরমধ্যে উপর্যুপরি পাঁচবার—১৯৪৭-৫১) এবং অস্ট্রেলিয়া দুবার।

প্রাচীনত্ব, ঐতিহ্য এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকে এই উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার গুরুত্ব এত বেশী যে, এখানের যে কোন একটি খেতাব জয় বিশ্ব খেতাব জয়ের সমান। এপর্যন্ত কোন ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়ের পক্ষে উইম্বলেডন টেনিস আসর থেকে কোন খেতাব নিয়ে স্বদেশে ফেরা সম্ভব হয়নি। একমাত্র রমানাথন কৃষ্ণান উপর্যুপরি দু'বার (১৯৬০-৬১) পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে উঠে আশার আলো দেখিয়েছিলেন।

দর্শক

স্বপ্ন সফল হল

তপনকুমার দাস

১৯৭৩ এর স্বপ্ন সফল হল ১৯৭৯তে টোকিওর ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে। সেবার মিলখা সিং বলেছিলেন, রীতার ৪০০ মিটার ইভেন্ট হওয়া উচিত। চারশ মিটারে ও সফল হবে। হলোও ঠিক তাই। এবার টোকিওতে এশীয় ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড প্রতিযোগিতার আসরে রীতা সেন ভারতীয় তথা বাঙালী মহিলাদের মান রেখেছেন। চারশ মিটার দৌড়ে রূপোর পদক পেয়েছেন তিনি। পেয়েছেন আরো একটি ব্রোঞ্জ পদক।

জুন মাসের তিন তারিখে টোকিওর মাঠে চারশো মিটার দৌড়ে ভারতের মেয়ে রীতা দ্বিতীয় হলেন। ঐ দূরত্ব অতিক্রম করতে তাঁর সময় লাগলো ৫৪-৯ সেকেন্ড। প্রথম হয়েছো দক্ষিণ কোরিয়ার স্কুলের ছাত্রী ১৭ বছরের চুয়াঙ বেঙ। তাতে কিন্তু কোনো দুঃখ নেই ভারতীয় মহিলা কোচ কমলজিৎ সান্ধুর। কমলজিৎ, দৌড় শেষ হবার পর আনন্দে রীতাকে জড়িয়ে ধরে সবার আগে অভিনন্দন জানালেন। ১৯৭০ সালে ব্যাংককে এশিয়ান গেমসে প্রথম হয়েছিলেন ৪০০ মিটারে এই কমলজিৎ সান্ধুই। তার সময় লেগেছিল ৫৬-৩ সেকেন্ড। রীতা টোকিওতে কমলজিতের থেকে আরও উন্নতমানের সময় করলেন। তিনি ব্যাংককে এশিয়ান গেমসএ গড়া রেকর্ডটিও ভেঙে দিয়েছেন। অথচ মজার কথা এই যে, রীতা কিন্তু এর আগে কোনো প্রতিযোগিতাতেই ৪০০ মিটার ইভেন্টে দৌড়ন নি। আর এটা তো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। ভাবাই যায় না, এখানে এশিয়ার সমস্ত দেশের বড় বড় প্রতিযোগীরা উপস্থিত রয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করেন। অনুশীলনের জন্য বাড়তি অনেক সুবিধা পান তাঁরা।

টোকিওর যে ট্র্যাকে দৌড়ে রীতা পদক পান সেটা কিন্তু এখানকার মত ঘাস বা সিণ্ডারে তৈরী নয়। [illegible] বলা হয়। এখানকার ট্র্যাকের চেয়ে নরম, রং লাল। ভারতে কোথাও এই ধরনের ট্র্যাক

রীতা সেন

নেই। ভারত থেকে যাঁরা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে গেছিলেন তাঁরা কেউই এই ধরনের ট্র্যাকে অনুশীলন করার সুযোগ পান নি। কাজেই টোকিওতে যাঁরা পদক জিতেছেন, তাঁদের কৃতিত্ব পদক জেতার চেয়ে অনেক বেশী।

২রা জুন ভারতীয় মহিলা দল ৪×১০০ মিটার রিলে দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক পান। সেই দলে রীতাও ছিলেন। এর আগে ওঁর নিজস্ব ইভেন্ট ১০০ মিটারেও দৌড়েছিলেন। কিন্তু হিট থেকে ফাইনালে উঠতে পারেন নি, কারণ হাওয়া ছিল বিপক্ষে। ১০০ মিটার দৌড়েই ছিল রীতার আশা [illegible] করেছিলেন। রীতার ধারণা ভারতে যদি টারটন ট্র্যাকে অনুশীলন করার সুযোগ থাকতো তাহলে ভারতীয় দল আরও উন্নতমানের সময় করতে পারতো। টোকিওর এশীয় অ্যাথলেটিক্সে রীতার কৃতিত্বটি রীতিমতো জ্বলজ্বলে। এই সাফল্যই এনে দিয়েছে রীতাকে মন্ট্রিলের বিশ্ব কাপের এশীয় দলে স্থান পাবার সম্মান। এর আগে কোন ভারতীয় মহিলা এশীয় দলে স্থান পাননি। রীতার স্বামী আশীষ সেনই হলেন রীতার কোচ। তিনি রীতার উন্নতি কিসে হবে, সেই সব বিষয়ে সব সময় চিন্তা করেন। কলকাতার বৃটিশ কাউন্সিল, ও আমেরিকান লাইব্রেরীতে গিয়ে আশীষবাবু অ্যাথেলেটিকস নিয়ে পড়াশুনা করেন। আবার বাড়িতে এসে রীতাকে সেইগুলি বোঝান।

চেতলা স্ট্যান্ড লেনে মুখার্জি বাড়ির মেয়ে রীতা পড়ত লেক গার্লস স্কুলে, প্রথমে সে খেলাধুলার ভেতর থেকে বেছে নিয়েছিল বাস্কেট বল। রীতার বাবা স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ মুখার্জি রীতাকে খেলাধুলোয় ভীষণ উৎসাহ দিতেন। তখন রীতার গৃহশিক্ষক ছিলেন আশীষ সেন। একবার লেনিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ক্রীড়ানুষ্ঠানে রীতা হাইজাম্প এবং ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হন। তখন কোচিংয়ের দায়িত্ব নেন আশীষ সেন। ৭০ সালে রাজ্য অ্যাথেলেটিকস আসরে রীতা জুনিয়ার বালিকাদের ১০০ মিটার দৌড়ে ও লং জাম্পে বিজয়িনী হন। রীতা ৭৩, ৭৪ সালে রাজ্য অ্যাথেলিটিকসের ১০০ মিটার দৌড়ে ১৩.১ সেকেন্ডে) এবং লং জাম্পে ২৪.৯২ মিটার) যে রেকর্ড করেছিলেন তা আজও কেউ ভাঙ্গতে পারেননি। ১৯৭৫ সালে রীতার সঙ্গে আশীষ সেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। গত বছর সোভিয়েট অ্যাথেলেটিকস দল ভারত সফরে আসে। রীতা ভারতীয় দলে স্থান পান। মৈত্রী অ্যাথেলেটিকস টেস্টে রীতা অমৃতসরে ১০০ মিটার দৌড়ে, এবং মীরাটে ২০০ মিটার দৌড়ে বিজয়িণী হন। রীতা ছাড়া আর কোন ভারতীয় মহিলা সোভিয়েট মহিলাদের পিছনে ফেলতে পারেননি। এরপর এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালের সময় রীতা অসুস্থ হয়ে পড়েন। রীতার ফেবারিট ভারতীয় অ্যাথলিট জ্ঞানশিখরন। হবি গান শোনা। এবার গীতা জুৎসি এশীয় অ্যাথেলেটিকসে ডিসকোয়ালিফায়েড হওয়াতে রীতা খুবই দুঃখিত। কারণ ভারতের আরও একটি পদক হাতছাড়া হয়ে গেল।

রীতা ফুড কর্পোরেশনের কর্মী।

চিত্রধ্বনি

স্টুডিও খবর

কল্পতরু গোষ্ঠীর "পরবেশ" ছবির কাজ শেষ করে ফেলল। ছবির শেষ দিনের স্যুটিং দেখার নেমন্তন্ন করেছিলেন পরিচালক মিহির গুহ। টেকনিসিয়ান স্টুডিওর দু নম্বর ফ্লোরে ঢুকেই দেখি ছবির অন্যতম শিল্পী ঝুমুর নামের ফেঁসো ভালুকটি একটা টেবিলে বসে। পাশে শমিত ভঞ্জ। বিকাশ রায় পাকা চুলে মাথা ঢেকে সামনের চেয়ারে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ক্যামেরাম্যান বিশু চক্রবর্তী আলো ঠিক করছেন।

একটু দূরে বুড়োদা মানে তরুণকুমার গেরুয়া পাঞ্জাবী আর ধুতি পরে একটি চরিত্র হয়েছেন। আপাততঃ দেখছি তিনি ব্যস্ত পরিচালনার কাজ নিয়ে। মহুয়া রায়চৌধুরীকে বোঝাচ্ছেন কোন্ ডায়লগের ওপর কি রিঅ্যাকশন দিতে হবে।

ফ্লোর ভর্তি লোক, অথচ তেমন কোন ভীড় নেই। ভালুকটাও চুপচাপ ঘাড় কাত করে শমিতের পাশে বসে। ভালুকটির মালিককেও আশপাশে দেখতে পাচ্ছি না। বোঝা গেল এই ইউনিটের সঙ্গে ঝুমুরের সম্পর্ক হয়ে গেছে। কোন উদ্বেগের কারণ নেই। অবশ্য সবারই চোখ তার দিকে। বোধহয় একটু আগে শট দিয়ে সে ক্লান্ত।

একদল সাংবাদিক ফ্লোরে ঢুকতেই বুড়োদা বলে উঠলেন — দেখলে তো, কথা একবারে পাকা।

বুঝতে পারছি না কথা পাকা বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন। মুখে দ্বিধা-সংশয়ের ছাপ দেখে বুড়োদাই সংশয় ঘোচালেন। বললেন — ধীরেন দে-র বাড়িতে স্যুটিং-এর সময় কি বলেছিলাম মনে আছে?

নিরুত্তর, বিস্মৃত আমি।

বলেছিলাম ছবির শেষ স্যুটিং-এর দিনে ডাকব। এতক্ষণে মনে পড়ল সেই ছ-মাস পুরনো দুপুরের কথা। হেসে উঠলাম সবাই।

মহুয়া ততক্ষণে শট দেবার জন্য রেডি হয়েছে। সে উসখুস করছে। বেলা প্রায় দুটো, লাঞ্চ হয়নি। খেয়েদেয়েই তাকে ছুটতে হবে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয়। ওখানে বিজয় বসুর সুবর্ণলতা ছবির স্যুটিং চলছে। বিকেলের সিফটে কাজ রয়েছে অনেকের।

মহুয়ার তাড়ার কথা চিন্তা করেই বুড়োদা মন দিলেন কাজে। মাত্র তিনটে শট্ নেওয়া হল। সবগুলোই সুন্দর শট। ক্যামেরার বাইরে থেকে তিনি ডায়ালগ বলতে লাগলেন আর মহুয়া সেই মত এক্সপ্রেশন দিতে লাগল। একবার হাসল, একবার লজ্জা পেল, একবার বিস্ময়ের চোখে তাকাল [illegible]।

ব্যাস্। ওর কাজ শেষ। লাঞ্চব্রেক ঘোষণা করলেন তরুণকুমার। পেটে সবার খিদে। সুতরাং দেরী নয়। শমিত বিকাশ রায়, মহুয়া, বুড়োদা সবাই-ই বেরোচ্ছেন ফ্লোর থেকে। ভালুকটাও দেখি বেরোচ্ছে। চমকে গিয়ে দেখি, চার পায়ে নয়, মানুষের মত দু-পায়ে চলছে ঝুমুর। তার একটা থাবা শমিতের কাঁধে। হকচকিয়ে যাচ্ছি।

কয়েক পা সামনে এগিয়ে এসে দেখি ভালুকের ছাল পরে সন্তু মুখার্জি মুখে সিগারেট ধরিয়েছে।

এই-ই তাহলে ঝুমুর?

বিকাশ দা শুধরে দিয়ে বললেন আসল নয়, নকল।

*

জাপান থেকে দ্বিতীয় দিগন্ত ছবির কাজ শেষ করে কলকাতায় এসেছিলেন সম্প্রতি মিঠুন চক্রবর্তী। এখানে ওঁর হাতে এখন তিনটে ছবি। প্রযোজকরা মিঠুনের ডেট্ পাচ্ছেন না। বোম্বাইতে তিনি তো ঝড়ের গতিতে ছবি করছেন। কলকাতার জন্য ইচ্ছে থাকলেও সময় দিতে পারছেন না। উপলব্ধি ছবির প্রযোজক তারক ঘটবাল, প্রদীপ দাশগুপ্ত এবং বাঁশরীর ছবির পরিচালক অসীম ব্যানার্জি অনেক কষ্টে মিঠুনের হাত থেকে কয়েকটা ডেট্ প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছেন।

এবং সেই কারণেই সেদিন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরে সাধু মহারাজের পোশাক পরে মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখলাম চোখের জল ফেলছেন। তার মা সন্ধ্যা-রাণী- মৃত্যু বিছানায়।

ক্যামেরাম্যান গণেশ বসু লম্বা ট্রলি লাইন পেতে ক্যামেরা বসিয়েছেন। সন্ধ্যা-রাণীর ক্লোজ শট থেকে ক্যামেরা ট্রলি ব্যাক করল প্রায় কুড়ি ফুট। মৃণাল মুখার্জি মিঠুনকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ডাক্তার সুব্রত সেনশর্মা বিছানায় বসে। বাবা সত্য ব্যানার্জি চেয়ারে বিষণ্ণ মুখে। মিঠুন ঘরে ঢুকতেই এবার নাটক জমবে। মা-ছেলের ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে।

সে দৃশ্যগুলো অবশ্য টেক্ করা হল না। কারণ মিঠুনকে চারটের মধ্যে ছেড়ে দিতেই হবে। তিনি যাবেন বসিরহাট। ওখানে অসীম ব্যানার্জি ক্যামেরা নিয়ে বসে আছেন। ফ্লোরের বাইরে মিঠুনকে নিয়ে যাবার জন্য লোকজন গাড়ি সব রেডি।

পরিচালক তপন সাহা জানালেন এভাবেই মিঠুনকে নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। কোন উপায় নেই। রাত্রে কাজ করছে বসির-হাটে, দিনের বেলা আমার এখানে। কি আর করা যাবে। শিল্পী জনপ্রিয় হলে এ অবস্থাই হয়। ফ্লোর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় মিঠুন বললেন কলকাতা কিন্তু আমার ফার্স্ট লাভ। ভালো কাজের অফার পেলে কল-কাতা আমাকে দাবী করতে পারে। আর পয়সার জন্য যদি ছবি করি, বম্বেতেই করব।

না ছুটি নয়, প্রযোজকের চাপে পড়ে দিলীপ রায় দর্পচূর্ণ-ই শুরু করছেন। রথযাত্রার দিন ছবির মহরৎ। ওঁর এ ছবিতে ভিন্ন কাস্টিং-এর। নিজে অভিনয় করছেন না। যতদূর শুনলাম সৌমিত্র সন্ধ্যা রায়, দীপঙ্কর ও সুমিত্রা মুখার্জি আছেন প্রধান চারটি চরিত্রে।

'ছুটি' নিয়ে এখন আবার চিন্তা করছেন। কাগজপত্রও ঠিক করেছেন। কিন্তু করা যাচ্ছে না। প্রযোজকেরা রাজী না হলে উপায় কি?

চামেলী মেম সাহেব করার জন্য ইন্দর সেন যেমন এক মহলের কাছে সুনাম হারিয়েছেন, পরিবেশক প্রযোজক মহলে তেমনি সুনাম পেয়েছেন পরিচ্ছন্ন ব্যবসায়ী ছবি করিয়ে হিসাবে। অসময়-এর মত ছবি করার পর তাঁকে এই কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে টিঁকে থাকার জন্যই।

কিন্তু বিস্ময়কর ঘটনাটি হল—এখনও পর্যন্ত তিনি নতুন ছবি আরম্ভ করতে পারলেন না। গল্প নির্বাচন প্রযোজক পরি-বেশকদের মতভেদে আটকে যাচ্ছে একাধিক পরিকল্পনা। কিছুদিন আগে তিনি বলে-ছিলেন—'চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি প্রোডিউসার পাবার, পাচ্ছি না।'

সম্প্রতি দেখা হতে জানলাম —তিনি একজন প্রোডিউসার পেয়েছেন। নতুন ছবির প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ এখন ধীর গতিতে চলছে। স্যুটিং আরম্ভ হতে দেরী আছে। ইন্দরবাবু নাম না বললেও একটু জানা গেল শক্তিপদ রাজগুরুর গল্প নিয়ে ছবির জন্য চিত্রনাট্য লেখা শেষ। দীপঙ্কর দে ও মহুয়া হয়ত প্রধান দুটো চরিত্রে কাজ করবে। একটা অনুরোধ ইন্দরবাবু অসময়-এর পরিচালকের কাছে দর্শকের প্রত্যাশা একটু অন্য। তাঁদের হতাশ করবেন না যেন।

নির্মল ধর

প্রথম পার্থ ও সংক্রান্তি

গত বিশে জুন মুক্তাঙ্গনে সন্ধ্যা-বেলায় থিয়েটারের পরিবেশনায় অভিনীত হোলো বুদ্ধদেব বসুর দুটি কাব্য নাটক 'প্রথম পার্থ' ও 'সংক্রান্তি'। মহাভারতের কয়েকটি চিরউজ্জ্বল চরিত্র যেমন কানীন পুত্র কর্ণ, পাণ্ডবজননী কুন্তী, পাণ্ডব-দয়িতা দ্রৌপদী, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং মহাভারত যুদ্ধ ভাষ্যকার সঞ্জয়—এ দুটি নাটকের পাত্রপাত্রী। 'প্রথম পার্থ' ভাগ্য বিড়ম্বিত সূর্যসন্তান কর্ণের কাহিনী। 'সংক্রান্তি' অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর পুত্রশোক, বাৎসল্য-স্বধর্ম এবং সত্যধর্মের অন্তর্বিরোধের উপাখ্যান। প্রথম পর্বে দেখতে পাই স্বধর্ম (অর্থাৎ পুরুষকারে) স্থিত থাকতে নিঃস্বার্থ বসুষেণ কৌরবপক্ষে যুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত অটুট, স্বয়ং পৃথা—যাজ্ঞসেনী হৃষিকেশের উপদেশ পরামর্শ তাকে ফেরাতে পারে না। অনেকটা গ্রীক ট্র্যাজিক চরিত্রের উপাদান নির্ভর এই কর্ণ

চরিত্রটিকে ইশকাইলাস সফোক্লেয়ান নাটকের আবহাওয়ায়, পোয়েটিকসের ব্যাকরণ শুদ্ধতায় (হামারশিয়া, অ্যানাগনোরেসিস, পেরিপেটিয়র সংজ্ঞা অনুসারে) গড়তে চেয়েছিলেন বুদ্ধদেব। এবং তার সঙ্গে বিশশতকী ভ্রষ্ট বিবেচনা (যেমন টি এস এলিয়টের ককটেল পার্টির সিলিয়া চরিত্রটিতে), অস্তিনির্ভর বিষাদ-দর্শন (যেমন জঁ আনুই, জঁ পল সাত্র, আলব্যার কামুর নাট্যচরিত্রগুলিতে দেখা যায়) এ নাটকে মিলেমিশে থাকে। তুলনায় 'সংক্রান্তি' অনেক বেশি স্বয়ং নির্ভর, দেশজ সুরের। মহাভারতে বহু উল্লেখিত ধর্ম-অধর্ম-স্বধর্মের অন্তর্বিরোধ, ছিল, নাটকটির অস্তিত্বমূলে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষদিনে সঞ্জয়ের ধারাভাষ্যে আত্মীয় স্বজনহারা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর মানসিক প্রতিক্রিয়া নিয়েই নাটকটি। স্বধর্ম-অধর্মের মহাভারত জিজ্ঞাসার দৃষ্টিকোণেই এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারীকে।

অস্পষ্ট অভিনয়, দুর্বল মেক-আপ, বিফল মঞ্চ ব্যবহার এবং চরিত্র ও অভিনেতাদের বৈসাদৃশ্য নাটকটিকে মঞ্চ-সাফল্য দেয়নি। কর্ণ তো মেক-আপের দোষে একসময় তাঁর সুমহান ট্রাজিক চেহারাটি হারিয়ে পুরোপুরি একটি কমিক চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। কুন্তী (শ্রীমতী পারমিতা বসু) কিম্ভূত অভিনয়ের নামে দর্শকের স্নায়ুর ওপরে অসহনীয় অত্যাচার করে গেলেন। তাঁর উচ্চারণের অশিক্ষিত-পটুত্ব, তাঁর কণ্ঠস্বরের বহুরূপী চিৎপুর শান্তি মহাপ্রস্থান এবং তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ, [illegible] নাটকের আবহাওয়া বিনষ্ট করতে অনেকাংশে দায়ী। এবং কর্ণকে মাহাত্ম্য দেবার জন্য কৃষ্ণকে খর্বকায় করা লৌকিক বা রাজকীয়, কোনো ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অনুগামী হয়নি। দৃশ্যশোভনতা বজায় থাকতো তবু যদি কর্ণ (মন্টু মুখোপাধ্যায়) বা কৃষ্ণ (অভিজিৎ সেন) অভিনয়ে শক্তিশালী হতেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রৌপদীর অহংকার, সজীব মোহময়ী নারীত্বকে মহাভারতের মাত্রা দিতে সক্ষম হয়েছেন অরুন্ধতী। তাঁর আরোপিত [illegible] কণ্ঠস্বরও মনে রাখার মতো। মঞ্চ-ব্যবহারের দিকটিতেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এখানে। মঞ্চে রাখা সিঁড়িটি তো প্রায় নিষ্ক্রিয় ভূমিকাতেই রয়ে গেল সারাক্ষণ। অথচ সার্থক ব্যবহারে তা নাটকটিকে সক্রিয় সহযোগিতা করতে পারতো। মঞ্চে গভীরতা ও বৈচিত্র্য আনতে পারতো।

বিরতির পর অভিনয় হোলো সংক্রান্তি'র। যুদ্ধপর্বের অষ্টাদশ দিনে (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষদিন) সঞ্জয়ের ধারাভাষ্য এ নাটকটির দৃষ্টিকেন্দ্র। নাটকটির সমস্ত অ্যাকশন পরোক্ষ প্রত্যক্ষ কেবল চরিত্রগুলির মানসিক প্রতিক্রিয়া। অতিরিক্ত দক্ষ অভিনয় ছাড়া যাকে গড়ে তোলা সম্ভব হতো না। অথচ তা সম্ভব হয়েছে। এত সাবলীল অভিনয়, এত দৃঢ় দলবদ্ধ কাজ, এত নিখুঁত মঞ্চসজ্জা এবং নাট্য-নির্দেশনা (সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়) যে দর্শকেরা প্রায় ধৃতরাষ্ট্রের মতোই রুদ্ধশ্বাস-চঞ্চল রক্তগতিতে যুক্ত হয়ে গেলেন প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগের এক নিষ্ঠুর যুদ্ধকাণ্ডের সঙ্গে। সঞ্জয়ের (রথীন দে) যুদ্ধ বিবরণ মনে রাখার মতো। মনে হচ্ছিল যুদ্ধটি যেন আমাদের আশেপাশেই খুব কাছাকাছি, দৃষ্টিক্ষমতার মধ্যেই ঘটে যাচ্ছে। তাঁর অভিনয় এই বিশ শতকের বেলা শেষেও ইতিহাসের সেই প্রাচীন মৃত্যু শব্দের দ্রুত স্পন্দন কাছে নিয়ে এলো। গান্ধারীর ভূমিকায়, দ্রৌপদীর মতোই অসাধারণভাবে সফল হয়েছিলেন অরুন্ধতী। এবং ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় শান্তনু রায়। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে আরো ভাবহীনতার প্রয়োজন ছিল। গান্ধারীর খোলা চোখ মেনে নেওয়া হয়তো যায় (বিশেষতঃ তা যখন নাট্যকার বুদ্ধদেবের নির্দেশ অনুসারেই হয়েছে) কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের চোখে সজীব চাঞ্চল্য অসম্ভব। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে সাবধানতা নেবেন। কেননা নাটকটি তাঁর সফল পরিচালনার প্রতীক। সামান্য ত্রুটিও সেখানে না থাকা উচিৎ।

—দীপঙ্কর চক্রবর্তী

লাইম লাইট (নর্থ)

সম্প্রতি লাইম লাইট (নর্থ)-এর সপ্তম বার্ষিক উৎসব বাসুদেব মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রথম দিনটি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে উদযাপিত হয়। তরুণ তীর্থের ছালুয় ঘুড়োর ঝোলা ও বাণীদীপা নিবেদিত ব্যাঙের তীর্থযাত্রা নাটিকা দুটি অভিনীত হয়। অজিত চট্টোপাধ্যায়ের হাস্যরসে শিশুরা হাসিতে ফেটে পড়ে। একক নৃত্যে ছোট্ট বন্ধু সঙ্গীতা সেনগুপ্ত যথেষ্ট কৃতিত্বের ছাপ রাখে। সোমনাথ ভট্টাচার্যের কচি কণ্ঠের গান শোনার মত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গীতা গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত শেষ থেকে শুরু নাটকটি অভিনয় করেন সংস্থার সভ্যবৃন্দ। নাটকটির মূল বক্তব্য সুন্দর। পরিবেশনা ও অভিনয় গুণে নাটকটি সকলকেই আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে। আলোক সম্পাত ও আবহসঙ্গীত মোটামুটি।

রায়পুরে অনুষ্ঠান

মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে গত ১৩ জুন পিপলস থিয়েটার কম্বাইন আয়োজিত একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেল স্থানীয় রঙ্গ মন্দিরে। কলকাতার জনপ্রিয় চিত্রশিল্পী শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং চিন্ময় রায়, মঞ্চ এবং চলচ্চিত্রশিল্পী গৌরী আড্ডি এবং মূকাভিনেতা তারক দত্ত এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং চিন্ময় রায় দেড় ঘণ্টা স্টেজে থেকে তাদের কৌতুক প্রহসন পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে আনন্দ দান করেন। গৌরী আডডি তাঁর কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। তারক দত্ত তাঁর মূকাভিনয়ের মাধ্যমে ভূত - বর্তমান - ভবিষ্যত, লোডশেডিং এবং অচল টাকা এই তিনটি পরিবেশন করে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন।

আলিবাবা পাঁচালী

পঞ্চমিত্রম সাংস্কৃতিক সংস্থা তাঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে কিছু উল্লেখযোগ্য উপহার দিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল নাট্যানুষ্ঠান 'আলিবাবা পাঁচালী'। শ্যামাকান্ত দাস রচিত নাটকের নির্দেশনা শ্যামল রায়ের। বলা বাহুল্য, নির্দেশনায় শ্রীরায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। তবে সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব বোধ হয় সঙ্গীত পরিচালক কল্যাণ সেন বরাটের। এই বিভাগে তাঁর নিষ্ঠা এবং দক্ষতা নাটকটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিভিন্ন চরিত্রে স্বপন চ্যাটার্জি, কবীর সেন বরাট, কল্যাণ চক্রবর্তী, গোপাল মুখার্জি, অমিত মল্লিক, রঞ্জন নিয়োগী এবং তপন মল্লিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানটিও কম উপভোগ্য হয়নি। সংগীত, নৃত্য দুই বিভাগের আন্তরিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের মন ছুঁতে পেরেছে। সংগীত এবং নৃত্য পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যথাক্রমে অমিত মল্লিক এবং দীপ্তি গুহ এবং পূর্ণিমা পাইন। নৃত্যাংশে দীপ্তি গুহ, পূর্ণিমা পাইন এবং মাধুরী দত্ত প্রশংসা দাবী করতে পারেন। সংগীতাংশে সাধনা গুপ্ত, বন্দনা মল্লিক, ফাল্গুনী ঠাকুর এবং অলোক চক্রবর্তীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। গ্রন্থিকের ভূমিকা যথার্থভাবে পালন করেছেন কল্পনা সেন বরাট এবং শিপ্রাদাস মুখোপাধ্যায়। এছাড়া ক্যালকাটা কয়্যার প্রযোজিত গণসংগীতের অনুষ্ঠানটিও শ্রোতারা উপভোগ করেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

[illegible] বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। [illegible] বিক্রয় মাশুল ১০ পয়সা॥

অমৃত

১৯ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
১৪ আষাঢ়, ১৩৮৬
29 JUNE, 1979

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী

মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি
লিখেছেন রমেন দাস

গল্প লিখেছেন সুলেখা দাশগুপ্ত,

একরাম আলি, দীপঙ্কর দাস

শিশুবর্ষে উপেক্ষিত

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে কলকাতা এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গেই নানা ধরনের অনুষ্ঠান করা হচ্ছে এ-বছর। শিশুদের জন্যে নানা জাতের পরিকল্পনার কথা শোনা গেছে। অমৃতে তার সাফল্য কামনা করে লেখাও হয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতি লোকসভায় শিক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের এই রাজ্যের শিশুদের বিষয়ে এমন কতকগুলো তথ্য জানিয়েছেন যাতে সম্পূর্ণ বিষয়টিকেই আবার নতুন করে ভেবে দেখা দরকার মনে হচ্ছে।

শিশুদের জন্যে সমস্ত পরিকল্পনারই গোড়ার কথা হল, তাদের বর্তমানকে নির্বিঘ্ন করা, এবং ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করে তোলা। সম্ভবত এই কর্তব্যের কথা মাথায় রেখেই আমরা তাদের জন্যে পার্ক করেছি, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম এবং নাচ-গান-ছবি আঁকার প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছি। এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহরের তুলনায় কলকাতাতেই এসব ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে বেশি পরিমাণে। কারণ, সকলেই বলে থাকি, কলকাতা হল সারা ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী।

বাস্তবে কিন্তু দেখা গেল, আমাদের এই অতি গৌরবের সাংস্কৃতিক মহানগরীর শিশুকেন্দ্রিক পরিকল্পনাগুলো অদৃষ্টের পরিহাসের মতোই করুন। আমাদের মতো শিশু-উদাসীন শহর সারা ভারতেও আর দ্বিতীয়টি নেই।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রীর তথ্য থেকে জানা গেছে, শিশু অপুষ্টির হার দেশের অন্যান্য শহরের চেয়ে কলকাতাতেই বেশি। এবং শুধু তাই নয়, অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা ক্রমবর্ধিষ্ণু। ভারতের অন্যান্য শহরে অপুষ্টদেহ শিশুর সংখ্যা কমতির দিকে। অবশ্যই সেসব শহরের অভিভাবক এবং সরকার ও শিশু-প্রতিষ্ঠানগুলো সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই তা ঘটেছে। কারণ নিশ্চয়ই তাঁরা বুঝেছিলেন যে, শিশুদের জন্যে যা-ই করা হোক তার আসল ভিত্তি হওয়া দরকার সুস্থদেহী শিশু। অপুষ্ট শরীর নিয়ে যে শিশু বর্তমানের টিকে থাকা নিয়েই ব্যস্ত, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল হাতছানি তার কাছে একেবারেই অর্থহীন। এই মৌল সমস্যাটি জানা ছিল বলেই বোম্বাইয়ের শিশু-সচেতন নাগরিকেরা ১৯৭৬ সাল থেকে ৭৭ সালের মধ্যেই সেখানকার অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা শতকরা ৬২-২ থেকে কমিয়ে ২৪-১ ভাগে আনতে পেরেছেন। মাদ্রাজে ৫৮-৯ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৩৫-৫ শতাংশ। দিল্লিতে ৩১-৬ শতাংশের জায়গায় হয়েছে ১৯ শতাংশ।

কিন্তু কলকাতা? ১৯৭৬ সালে ছিল ১৮-৪ শতাংশ, এবং ১৯৭৭ সালেই তা এসে দাঁড়াল ৪৬-৩ শতাংশে।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সাহিত্য ইত্যাদি

সাহিত্য বিচারে 'দশক'

দশক হিসেবে সাহিত্য বিচারের এক নতুন রেওয়াজ চালু হয়েছে কিছুকাল ধরে। অনেকেই তাতে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য এতে ভুল বোঝার আশঙ্কা থাকে।

যেমন, তিরিশের কবি বলতে যাঁদের বোঝানো হয় তাঁরা কি শুধুই তিরিশের কবি। চল্লিশ বা পঞ্চাশের কেউ নন? তাহলে তো জীবনানন্দ দাশ বা বিষ্ণু দের কবিতার একটা উল্লেখযোগ্য অংশই আলোচনার বাইরে থেকে যাবে। কিম্বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকেও যদি কেবল চল্লিশের কবি বলেই চিহ্নিত করা হয় তাহলেও কি তাঁরা খর্বিত হবেন না।

অন্যদিকে, যাঁরা দশক হিসেবে সাহিত্য ভাগ করেন তাঁদেরও যে কোনো যুক্তি নেই তা নয়। প্রথমত কোনো লেখক বা কবিকে তিরিশের লেখক বলা মানে সেই দশকেই তাঁকে আটকে রাখা নয়। শুধু এইটুকু বলা যে তাঁর কবিস্বভাব এবং লেখার ধরন ঐ সময়কার। একথা বলামাত্রই অবিশ্যি প্রশ্ন উঠতে পারে ঐ সময়কার কবিস্বভাব এবং লেখার ধরন বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? কিম্বা ঐ সময়কার সব কবির কবিস্বভাব এবং লেখার ধরনও কি একরকম? তাহলে তো তাঁরা আলোচনার যোগ্যই হতেন না। বিশিষ্টতাই তো তাঁদের গণ্য কবি করে তুলেছে। তাহলে ঐ সময়-কার কবিস্বভাব আর লেখার ধরন বলে তাঁদের এক বেঞ্চিতে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন?

খুবই সঙ্গত আপত্তি। কাজেই একটু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার।

প্রত্যেক কবির (যদি তিনি বিশিষ্ট হন) কবিস্বভাব এবং লেখার ধরন আলাদা সেটা ঠিকই। কিন্তু তবু দেখা যায় একটা বিশেষ সময়খণ্ডের কবিদের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলো প্রশ্ন ও অ্যাটিচ্যুড মোটামুটি একই রকম থাকে। এই এক রকম থাকা মানে কিন্তু ঐকমত্য নয়। একমত তাঁরা হতেও পারেন বা নাও হতে পারেন। কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ বিষয়ে প্রশ্ন উঠে থাকে তাঁদের মনে। এবং এই প্রশ্ন ওঠার সূত্রেই তাঁরা এক। যেমন অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা আছে। সুধীন দত্তের কবিতায় আছে নাস্তিকতা। কিন্তু দুজনেই তাঁদের সিদ্ধান্তে আসছেন, আবেগের মারফৎ নয়, বুদ্ধির মারফৎ। এবং এইটেই তাঁদের ঐক্য-সূত্র। আবার দেখা যাবে, বিষ্ণু দে সমাজ প্রগতিতে বিশ্বাস করেন, সুধীনবাবু তা করেন না। কিন্তু দুজনেই তাঁদের যুক্তি খোঁজেন মানব ইতিহাসের স্তর পরম্পরায় মধ্যে। তাঁদের প্রধান মিলন ক্ষেত্র তাহলে দেখা যাচ্ছে আত্মচেতনতা; যা তাঁদের পরিপার্শ্ব সচেতন এবং অতীত সচেতন হতে বাধ্য করেছে। আরো দেখুন, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় স্বপ্নাচ্ছন্নতা আমাদের আবিষ্ট করে। সমর সেনের কবিতায় খুশি হই তাঁর বুদ্ধিসচেতন বিদ্রূপের দীপ্তি দেখে। কিন্তু সামাজিক অবক্ষয়ের বোধ দুজনেরই সাধারণ উপলব্ধি।

কাজেই বলা যায়, বিশ্ব বিধানের মঙ্গলময়তার বিষয়ে প্রশ্ন, আত্মসচেতনতা ও ইতিহাসবোধ, সামাজিক অবক্ষয়ের এবং মানুষের ভবিষ্যৎ বিষয়ে জিজ্ঞাসা—এই সবই হল তিরিশের কবিদের প্রধান চরিত্র লক্ষণ। তাঁরা প্রত্যেকেই নানাভাবে বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কবিস্বভাবের মধ্যে এই গুণগুলো কোনো কোনোটি বা অনেক-গুলো একসঙ্গে উপস্থিত থাকার ফলে মোটামুটি তাঁদের ভেতরে এক ধরণের পারিবারিক সাদৃশ্য (ফ্যামিলি এফিনিটি) এসেছে। এবং তাতেই তাঁদের একটি বিশেষ দশকের লেখক বলে সনাক্ত করা যায়।

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় কি সব কবিকে ফেলা যায়? বোধহয় না ধরুন অরুণ মিত্রের কথা।

অরুণ মিত্রের সঙ্গে আমার বহুকালের আলাপ। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর তো বটেই। বেশিও হতে পারে। চল্লিশের দশকের প্রথম থেকেই তাঁকে মোটামুটিভাবে চিনি, আর তখনই তিনি সুপরিচিত কবি।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম সংকলন বেরয় ৪০ সালে বোধহয়! সম্পাদক ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আবু সয়ীদ আইয়ুব। হীরেনবাবু তাঁর ভূমিকায় অরুণ মিত্রের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন পাঠকের। সেই থেকেই অরুণবাবু সামনের সারিতে এসেছেন। কিন্তু তাই বলে কি তিরিশের দশকের প্রধান কবি হিসেবে গণ্য হয়েছে? না তা হননি। কেন হননি সে এক জটিল প্রশ্ন। কিন্তু হননি যে তা বাস্তব সত্য। তিরিশের প্রধান কবি বলতে বুঝি জীবনানন্দ দাশ বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু এবং অবশ্যই প্রেমেন্দ্র মিত্রকেও। প্রেমেনবাবুর নাম সব শেষে বললাম তাঁর প্রসঙ্গে বিশেষ জোর দেব বলে। কারণ আধুনিক বাংলা কবিতার ওপর একটি আলোচনার বই বেরিয়েছিল সেকালে, তাতে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে দ্বিতীয় সারিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

সে যাক। এ তালিকায় অরুণ মিত্র নেই। চল্লিশের দশকেও নেই। সেখানে আলোচ্য হন সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং আরো কেউ-কেউ। কিন্তু অরুণ মিত্র নন। চল্লিশে আলোচ্য হবার পক্ষে তিনি যেন বড় বেশি প্রবীণ। অথচ তাঁর চেয়ে বেশি বা সমান বয়সী হওয়া সত্ত্বেও সে সময় তিরিশের দশকের প্রায় সব কবিই তখনো আলোচনা যোগ্য থাকেন।

তারপর পঞ্চাশ কি ষাটের দশকেও কোনো নতুন পরিস্থিতি দেখা দেয় না। সেখানেও আলোচ্য হন সেই সেই দশকের নতুন কবিরাই। অরুণ মিত্র সে সময় একের পর এক উজ্জ্বল কবিতা লিখে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেও দশক-ওয়ারী আলোচনার রীতি চালু থাকায় আউট-সাইডার থেকে যান তিনি।

কিন্তু সত্তরের দশক শেষ হবার মুখে পুরস্কার পেলেন যখন অরুণ মিত্র তখনই বোঝা গেল আলোচ্য হয়ে উঠেছিলেন তিনি অনেকদিন আগেই। শুধু দশক ধরে আলোচনা রীতির ফলে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন কোনো একটা উপলক্ষ পেয়ে অনুরাগীরা সরব হতে পেরেছেন। অরুণ মিত্র তাঁর বকেয়া সম্মান সুদে-আসলে ফেরৎ পেলেন।

কিন্তু দশকের দশচক্র এড়িয়ে এখনো অজিত দত্ত বা দিনেশ দাসের মতো কবিকে আলোচ্য করে তোলা যায়নি।

মণীন্দ্র রায়

হারানো বই

ক্লাস নাইনের ছেলে। বারটি ভাষায় সমান দখল। যখন এন্ট্রান্স দিচ্ছেন তখন আরও আটদশটি ভাষা শিখে ফেলেছেন। দিনের আঠার ঘন্টা পড়াশুনোয় ব্যস্ত। দেখা দিল মাথায় যন্ত্রণা। ছ'মাসের জন্য পড়াশুনো বন্ধ। কাশী-নরেশের চতুষ্পাঠী থেকে বিদ্যাভূষণ উপাধি পেলেন। জীবনে মোট ২৬টি ভাষা শেখেন। এই অসাধারণ পণ্ডিত মানুষটি হলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। হরিনাথ দে-র পরেই বহু ভাষাবিদ হিসাবে যাঁর নাম করা যেতে পারে।

বিচিত্র বিষয়ে পড়াশুনো করেছেন। তার মৌলিক বই সংখ্যায় কম। নানান বিষয়ে অসংখ্য মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। যার সব রচনা এখনও বই হয়ে বেরোয়নি। মৌলিক বইয়ের মধ্যে আছে চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ, সরস্বতী—প্রথম খন্ড, মহাভারতের কথা, আধুনিক বাঙ্গালা রচনা, দি থিয়েটার অফ দি হিন্দুজ, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য এবং লক্ষ্মী ও গণেশ। নয়খানি বই সম্পাদনা করেন। এর মধ্যে আছে বঙ্গীয় মহাকোষ, জৈন জাতক, শের মুতাক্ষরীণ, বিদ্যাপতি আরও বেশ কয়েকটি মূল্যবান বই। ১১টি বইয়ের ভূমিকাও লেখেন। বেশ কয়েক বছর আগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত একান্নটি প্রবন্ধ সংগ্রহ করে বিশাল আকারে বেরোয় 'ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস ধারা'। আলোচিত বিষয় ভাগ করা হয়েছে এভাবে—সংস্কৃতি ও সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ও সম্প্রদায়, নাটক ও নাট্যশালা। অজস্র ছবিও আছে। বেশ কিছু পত্রপত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'ভারতবর্ষ' তার মধ্যে একটি

সর্বাঙ্গীন জাত্যাভিমান আর স্বদেশ-প্রীতির ঐতিহ্যে অমূল্যচরণ ছিলেন ভূদেব, বঙ্কিম, রমেশ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উত্তরসূরী। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মূল্যায়ণে এই ছিল তার দৃষ্টিভঙ্গী। একটি প্রবন্ধে ত'র চিন্তার স্বরূপকে বোঝা যায় : 'সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মাত্র একটি বাঁচিয়া আছে। সেই অদ্বিতীয় গৌরবের স্থান ভারতীয় সভ্যতার। অন্যদেশে অন্য যে সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল তন্মধ্যে এমন প্রেরণা ছিল না, এমন গভীরতা ছিল না, যাহার ব্যাপকতা এত বেশী। যে সকল সভ্যতার সমস্যা ছিল সাময়িক, তাহাদের চিন্তা বর্তমানকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেখানে পরের সভ্যতা নূতন কথা লইয়া আসিয়াছে, পরের চিন্তা নূতন আলোক লইয়া আসিয়াছে, সেই নূতন বাণীকে বাধা দিবার শক্তি পুরাতনের ছিল না। ...প্রাণহীন এরকম সভ্যতা বাঁচিতে পারে না। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্পন্দন ছিল বলিয়াই.....সে মরে নাই।' এই দৃষ্টিকোণেই অমূল্যচরণের মূল্যায়ন সম্ভব।

জৈন সরস্বতী
কঙ্কালী টোলা — মথুরা

'দেবতত্ত্ব গ্রন্থমালার' প্রথম বই 'সরস্বতী'র প্রথম খন্ড বেরোল ১৩৪০ সালে। তেলিপাড়া লেনের শচীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রকাশক। ১৩৮ পাতার বই। সম্প্রতিকালে এ ধরণের গবেষণামূলক তথ্য-ভরা বই খুব একটা চোখে পড়েনি। বিনয়ের সঙ্গে গ্রন্থকার লিখেছেন 'এই গ্রন্থ সংকলনে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই। নানা গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে।' কিন্তু গ্রন্থকার যে বিশাল জগৎ সন্ধান করে সরস্বতীর উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, তার অংশমাত্র ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড বেরোয় নি। এই দুটি খন্ডে সরস্বতী সম্বন্ধে আলোচনা এবং বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারত সংস্কৃতি বিশ্লেষণের ইচ্ছা ছিল লেখকের। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

বইয়ের নাম সরস্বতী হলেও আলোচনা হয়েছে নানান প্রসঙ্গে। সূচনাংশে লেখক দেবতা কল্পনায় মানুষের বিশ্বাস, ঈশ্বর বিশ্বাস, বিভিন্ন দেবতার প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের ধর্মাচরণের তাৎপর্য এবং উপাসনার উদ্ভব নিয়ে ব্যাখ্যার পর লিখেছেন : 'মানুষ বহুকাল ধরিয়া আপনার অনুকূলে ও শত্রুর প্রতিকূলে দেবতাকে বাধ্য করিবার চেষ্টা পাইয়া আসিয়াছে। প্রয়োজন বিশেষে দেবতার ক্রোধশান্তি ও প্রয়োজন বিশেষে তাঁহার ক্রোধোদ্রেক করিবার জন্য মানব নানা উপায় অবলম্বনও করিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশের নানা প্রকার ধর্মানুষ্ঠান এই সকল চেষ্টার ফল।' তারপরই শুরু হয়েছে সরস্বতী প্রসঙ্গে আলোচনা। প্রথমেই বলেছেন বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী স্মরণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য। তিনি দেখিয়েছেন, মহাভারত থেকেই সরস্বতী বন্দনার সূচনা। তারপর থেকেই সংস্কৃত কবিরা সরস্বতীকে নমস্কার জানিয়ে গ্রন্থারম্ভ করতেন। এখন শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা হয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদ নবমীতে এবং শতপথ ব্রাহ্মণ পূর্ণিমায় সরস্বতী বন্দনার বিধান দিয়েছিলেন। বাঙলায় শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা হলেও বাংলার বাইরে কোথাও কোথাও আশ্বিন শুক্লা অষ্টমীতে হয়ে থাকে। একসময়ে বাঙলার মেয়েরা সরস্বতী পূজায় অঞ্জলি দিতে পারত না। কারণ-স্বরূপ বলেছেন, মেয়েদের অন্ধকারে রেখে দেওয়ার প্রবণতা।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল, ভারতের বিভিন্ন অংশে সরস্বতী মূর্তি ও পূজা প্রসঙ্গের আলোচনা। পদ্মাসীনা সরস্বতী, হংসবাহনা সরস্বতী আর সিংহারূঢ়া বাগীশ্বরীর সচিত্র আলোচনা করেছেন বিদ্যাভূষণ। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র-মতে সরস্বতী অর্চনার বিচিত্র রূপকে অসংখ্য ছবিসহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সরস্বতী মন্ত্র ও স্তব প্রসঙ্গের পর আলোচিত হয়েছে সরস্বতীর ব্রহ্মপত্নী হওয়ার কারণ। সরস্বতীকে ব্রহ্মার কন্যারূপে পাওয়া যায়। বিদ্যাভূষণ লিখেছেন : 'ব্রহ্মার একটি অপবাদ আছে যে, তিনি কন্যাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণে এসম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। ইহাতে দেখা যায় যে, সরস্বতী প্রজাপতির মানসকন্যা-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সরস্বতীর মূর্তি দেখিয়া প্রজাপতি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার মানসপুত্রগণ তাহাতে বাধা দেন। শেষে তিনি ক্ষোভে দেহত্যাগ করেন।' কন্যা বিবাহ ব্যাপার নিয়ে দেবতাদের মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা দেয়। নিন্দাও ছড়ায়। মৎসপুরাণে গোটা ঘটনাকেই চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বিদ্যাভূষণ প্রসঙ্গটি সংক্ষিপ্ত, অথচ সুন্দরভাবে লিখেছেন। বিদেশে সরস্বতী মূর্তি পাওয়া গেছে। সে প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছেন বিদ্যাভূষণ।

বইয়ের মধ্যে সরস্বতীর প্রায় আশিটা আর্ট প্লেট আছে। তার মধ্যে বিদেশে সংরক্ষিত সরস্বতী মূর্তিও রয়েছে। ছবি আর মূল রচনা মিলিয়ে বইটির আয়তনও বিশাল। ধর্ম, ধর্মীয় চিন্তাধারা, মন্দির ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ভারতকে জানবার পক্ষে এর গুরুত্ব অসীম। ইদানীং এজাতীয় রচনা চোখে পড়ে কম। যেসব ধর্মীয় পত্রিকা বা বই ছাপা হয় তার মধ্যে চিন্তার গভীরতা সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। যে গভীর পড়াশুনা ও নিষ্ঠায় এই জাতীয় বিষয়কে বিশ্লেষণ করা সম্ভব একালে তা সম্পূর্ণ দুর্লভ। এই পর্যায়ের দুর্লভ প্রতিভাশালী কয়েকজন বাঙালীর মধ্যে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ অন্যতম।

কমল চৌধুরী

ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা

তুষার চৌধুরী

ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা যদিও বিশ শতকের স্পেনের একজন মহান কবি, সারা পৃথিবীর কবিতার পরিমণ্ডলে তাঁর প্রভাব কিছু কম নয়। আমাদের ভাষায় অনেক কবিই তাঁর কবিতার অনুবাদ করেছেন যত্রতত্র।

লোরকা গ্রানাদার সোনালি সমতলে জন্মেছিলেন ১৮৯৮ সালের ৫ জুন, ধনী কৃষক পরিবারে। কিন্তু তাঁর অপার কবি-ক্ষমতার আগ্রাসী থাবা দূর-দূরান্তরের কত কত কবিতামনস্ক তরুণদের লাঞ্ছিত করেছে ভাবলে অবাক হতে হয়। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে গুপ্তঘাতকেরা তাঁকে হত্যা করে, আর তাঁর শব চির-দিনের জন্য নিখোঁজ হয়ে যায় এবং এ নিয়ে কিছু পংক্তি তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত লিখে গিয়েছিলেন :

> আমি টের পাই আমি খুন হয়ে গেছি।
> তারা খুঁজে দ্যাখে কাফে ও কবরখানা ও গির্জা যত,
> তারা খুঁজে দ্যাখে যত পিপে আলমারি
> তারা লুটে নিল তিন কঙ্কাল সরাতে সোনার দাঁত।
> তারা খুঁজে তবু পেল না আমাকে।
> কখনো কি খুঁজে পায়নি আমাকে?
> না, তারা আমাকে কখনো পায়নি খুঁজে

আর এগুলো, এমনও দেখা গেছে, বহুদিন পর হুবহু তাঁর লেখালেখিতে ঢুকে গেছে অনায়াসে তাঁরই অনবধানতায়। গ্রানাদায় পড়াকালে তিনি, বরাবরের মতই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বাইরের বিষয়েই বেশি আগ্রহী থাকতেন। চায়ের দোকানে বসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পসল্প করতে আরাম পেতেন। প্রাচীন দেশ আন্দালুসিয়ার সভ্যতা সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে আবিষ্কারের নেশায় মশগুল থাকতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে শিল্পসাহিত্যের মধ্যে যেসব 'ইজম' মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল লোরকা তা থেকে একটু দূরে থাকতেন। কলাকৈবল্যসর্বস্বতা আর চাতুর্য বিষয়ে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন। সুররেয়ালিজমের ধুরন্ধর প্রবক্তা সালভাদর দালির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর এইসব তত্ত্বকথায় তাঁর রুচি হয়।

তাঁর প্রথম 'কবিতার বই' বেরোয় ১৯২১ সালে। দ্বিতীয় ১৯২৭-এ। লেখা ছাপানোর ব্যাপারে তাঁর অনীহা ছিল খুব। বন্ধুবান্ধবকে অনেক কসরৎ করে তাঁর লেখা যোগাড় করতে হত। দুয়েন্দে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, কবিতাকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে একজন জলজ্যান্ত মানুষই দরকার।

তিনি নাটক মঞ্চস্থ করতেন, পিয়ানোয় সুর তুলতেন, ছবি আঁকতেন, লোকগীতি টুকতেন, আবৃত্তি করতেন কবিতা।

কবি লোরকাকে অল্প কথায় বুঝতে হলে কবি রাফায়েল আলবের্তি'র চাবিকাঠির মত : 'একটি স্রোত যেনবা বৈদ্যুতিক, সহমর্মিতা, একটা ঘোর, এক অপ্রতিরোধ্য যাদু-বাতাবরণ যা তাঁর শ্রোতৃবর্গকে ঘিরে ফেলে বন্দী করত, সেরকম একটা কিছু বেরিয়ে আসত তাঁর ভেতর থেকে যখন তিনি কথা বলতেন, আবৃত্তি করতেন, হঠাৎ কোনো নাটকের দৃশ্য অভিনয় করে দেখাতেন, বা নিজে পিয়ানোয় বসে গাইতেন। কেননা লোরকা যেখানেই গেছেন দেখতে পেয়েছেন একটি পিয়ানো।'

লোরকার বোদাস দা সাংগে (১৯৩৩), ইয়েমা (১৯৩৪) ইত্যাদি নাটকের এতই দুনিয়াজোড়া খ্যাতি যে এর প্রাসঙ্গিক উল্লেখ বাতুলতা মাত্র।

১৯২৯-৩০ সালে লেখা যেসব কবিতা 'পোয়েতা এন নুয়েভা ইয়র্ক' বা 'নিউইয়র্কে কবি' এই কাব্যগ্রন্থে জায়গা পেয়েছে তা-ই বর্তমান অনুবাদকের চিত্তচাঞ্চল্যের উৎস। এখানে 'হার্লেমের রাজা' 'ভোর' ও 'ক্ষুদ্র অসীম কবিতা', 'নিউইয়র্কে কবি'-র এই তিনটি কবিতার অপারগ অনুবাদ উপস্থাপিত করলাম।

১৯২৯-এর গরমকালে লোরকা নিউইয়র্ক যান। এর আগে কিছুদিন তিনি মনমরা ছিলেন। তখন এক বন্ধুকে লিখে-ছিলেন, 'এখন আমি এমন এক কবিতা লিখছি যা শিরার উন্মোচন দাবি করে, বাস্তবতা থেকে ছাড়া পাওয়া এক কবিতা'। তার কাছে নিউইয়র্ক মনে হয়েছিল 'অতিমানবিক স্থাপত্য এবং ক্ষিপ্ত ছন্দ জ্যামিতি ও যন্ত্রণার' শহর। এখানে এসে তিনি যা লিখলেন ১৯৪০ সালে তা ছেপে বেরোয় যখন তিনি আর নেই।

তিনি আগেই জানতেন নিউইয়র্কে তিনি কী দেখতে এসেছেন—

আমি দেখতে এসেছি ঘোলাটে রক্ত।
যে রক্ত যন্ত্রপাতিকে নিয়ে যায় জলপ্রপাতের কাছে
আমাদের আত্মাকে গোখরোর জিভে।

আমাদের চারপাশে এই যে সুরেলা কবিতা, মিঠেকড়া টকঝাল কবিতা, টুকিটাকি জপতপের ধাঁধার গীত, সিঁড়িভাঙা অঙ্ক, চিত্রনাট্যের টোকাটুকি, সেই কবেকার কালিগ্রাম, দাদাবাদ ফুতুরবাদ, লেখালেখির এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার, তিন লক্ষ পঁচিশ কবির গণটোকাটুকি, এর থেকে মুখ ফেরানোর সরল রাস্তা যদিও নিশ্চয়ই নয় বিদেশের বড় বড় কবিদের লেখা পড়া, কেননা এদেশেও আগে পরে মহান ও বড় কবিদের সমাবেশ বেশ উজ্জ্বল, তথাপি এ এক পরিব্রাজনা এমন এক কবিতার দেশে যেখানে শব্দেরা গোঙায়।

লোরকা বিশ্বাস করতেন, শুধুমাত্র মুক্ত অবস্থাতেই কবিতা বুক ভরে বাতাস নিতে পারে। এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, কবিতায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখা দরকার। আর খুবই গোড়ার কথা হচ্ছে কমিটেড হওয়ার লোভ যেনতেন প্রকারেণ ত্যাগ করা।

১৯৩৫-এর গরমকাল। বিকেলবেলা। মাদ্রিদের একটি কাফে। লোরকার কিছু কমিটেড বন্ধুবান্ধব ঈষৎ ব্যঙ্গভরে কিঞ্চিৎ সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তাঁর রাজনৈতিক সত্তার ব্যাখ্যা দিতে বললেন। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি? আমি একজন নৈরাজ্য-বাদী, একজন স্বাধীনতাকামী কম্যুনিস্ট, বিধর্মী ক্যাথলিক, ঐতিহ্যবাদী এবং পর্তুগালের ডন ডুয়ার্তের রাজতন্ত্রী সমর্থক একজন।'

যদিও মাঝে মাঝে খুব ধূমপান করতেন তাকে দেখে কখনোই অভ্যস্ত ধূমপায়ী মনে হোতো না। যখনই তার আঙুলে সিগারেট দেখা যেত, মনে হোতো যেন এই বুঝি জীবনে প্রথম সিগারেট খাচ্ছেন।

বাড়ির দরজা থেকে ট্যাক্সির জটলা অব্দি মাত্র ৫০ গজের হাঁটা পথ। তিনবার থেমে লোকজনের সঙ্গে করমর্দন ও বাক্যালাপ। একজন মদের দোকানী, দোকানের দোরগোড়ায় বসে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছোকরা। আর এক পথচারিণী। একজন ডাকসাইটে বুলফাইটারের মত ছিল তাঁর জনপ্রিয়তা।

তিরিশের দশক। তখন স্পেনে ছিল গৃহবিবাদের যুগ। রাজনৈতিক অশান্তি কবির মনে হতাশা এনে দিয়েছিল। তার মতিস্থির ছিল না। মৃত্যুর সামান্য কিছুকাল আগে মাদ্রিদের শেষ কটা দিন তিনি মনমরা কাটিয়েছিলেন। অভ্রান্ত স্বজ্ঞার অধিকারী দুঢ়চেতা মানুষটিকে হঠাৎ কেন যেন মনে হোতো নিসঙ্গ, দিশেহারা। আর সেইসব দিনে তিনি মানুষজনের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতেন। মেলামেশা বলতে যা বোঝায় গুটিকয় পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে।

'দয়ালো রাফায়েল? এত যে দেশ বেড়ানো, এতসব সাফল্য আর জল্পনাকল্পনা, কিন্তু আমার নিজেকে দিন দিন হাবা ঠেকছে'। এরকম তিনি বলেছিলেন বন্ধু নাদালকে :

১৯২৯ সালে কবি বলেছিলেন, এখন সবার আগে আমার দরকার গ্রানাডার পরিমণ্ডলের আত্মিক গহীনতা ও শান্তি যাতে আমার অন্তকরণ ও কবিতার সাথে যে দ্বৈতলড়াই আমি পুষে রেখেছি তা বাঁচিয়ে তোলা যায়। হৃদয়ের সাথে আমার লড়াই তাকে বিধ্বংসী আবেগ থেকে মুক্ত করতে, তাকে নপুংসক মার্তণ্ডের দুনিয়া যে কপট ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে তা থেকে উদ্ধার করতে। কবিতার সাথে আমার লড়াই, যেন সৃষ্টি করতে পারি, কবিতা যতই অক্ষতযোনি থেকে যাবার চেষ্টা করুক না কেন, জীবন্ত নির্ভেজাল কবিতা যেখানে সৌন্দর্য আর ভয় এবং অনির্বচনীয় ও জঘন্য এক প্রজ্জ্বলিত আনন্দের ভেতর সহাবস্থান ও ঝগড়াঝাটি করে।

১৯২৬ সালে কবিবন্ধু হোর্গে গিয়েনকে কবি লিখেছিলেন, তুমি আমি দুজনেই কবি। কবি! নিজেদের খোশখেয়ালে!

১৯৩২ সালে নিউইয়র্কে কবির গোড়ার কথায় কবি লিখেছিলেন : ওয়াল স্ট্রীট তার নির্দয়তা ও হিমের জন্য মনে খুবই দাগ কেটে যায়। সারা দুনিয়া থেকে এখানে বয়ে আসে সোনার স্রোতধারা, এবং মৃত্যুও।

১৯৩৫ বুয়েনস এয়ারেসে 'নিউইয়র্কে কবি'-র কবিতা পাঠের আসরে কবি বললেন, আমি আপনাদের জন্য এনেছি এক তিক্ত ও জীবন্ত কাব্য আপনাদের কশাঘাত করে চোখ খুলে দিতে।

তারা ঘৃণা করে অশরীরী তীর
বিদায়ের বিশেষ রুমাল...
তারা [illegible] অনুমানবহীন নদী...
চড়চড়ে নীলিমা[illegible] তারা যায়
নীলিমা যাতে [illegible] পোকা বা নিদ্রালু পায়ের ছাপ,
যেখানটায় উট[illegible]ম ধারণ করে অনন্ত...

[নিগ্রোদের আদল ও স্বর্গোদ্যান]

উনিশশো দশের চোখ, আমার সেই চোখ
দেখেছিল শাদা দেয়াল, বালিকারা জলত্যাগ করে
ষাঁড়ের লম্বা মুখ, বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা...
আর প্রশ্ন কোরো না, আমি যা দেখেছি সব কিছুই
নিজের মত এগিয়ে শেষটায় খুঁজে পায় শূন্যতা,
গর্তের বিষাদ, জনমানবহীন নীল শূধু থেকে যায়
আমার চোখের সামনে জামাকাপড়পরা লোকেরা, তাদের
নগ্নতা থেকে বঞ্চিত
(বিরতি)

এই খণ্ড পংক্তিগুলো 'নিউইয়র্কে কবি' বই থেকে নেয়া।

ইগনাথিও-র জন্য শোক : ৪
অনুপস্থিত আত্মা

ষাঁড় বা ডুমুরগাছ চেনে না তোমাকে
তোমার ভিটের পিঁপড়ে কিংবা ঘোড়াগাড়ী
শিশু বা বিকেলবেলা চেনে না তোমাকে
কেননা তুমি তো মরে গেছ চিরতরে

পাথুরে ইঁটের পিঠ তোমাকে জানে না
কিংবা কালো দাগ যাতে তুমি ক্ষয়ে যাও
তোমার নিঃশব্দস্মৃতি তোমাকে চেনে না
কেননা তুমি তো মরে গেছ চিরতরে

শরতের দিন আসবে সঙ্গে নিয়ে শাঁখ
কুয়াশার দ্রাক্ষা আর পাহাড়ের ভিড়
কিন্তু কেউ চোখ রাখতে চাইবে না তোমার দু'চোখে
কেননা তুমি তো মরে গেছ চিরতরে

কেননা তুমি তো মরে গেছ চিরতরে
পৃথিবীর সব মৃত মানুষের মত
সব মৃতদের মত যারা বিস্মরণে
নামহীন কুকুরের স্তূপে
তোমাকে চেনে না, কেউ। না। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমি গান করি।
তোমার সৌন্দর্য আর তোমার প্রোফাইলের ভাবী পুরুষের জন্য
আমি গান করি।
তোমার বোধশক্তির অভিজাত মেধা।
তোমার মৃত্যুর জন্য বুভুক্ষা এবং তার মুখের আস্বাদ।
দৃপ্ত উল্লাসের নিচে নিহিত বিষাদ।

সুদীর্ঘ সময়ে আর জন্মাবে না, যদিবা জন্মায়,
ওরকম মহান ও দুঃসাহসী আন্দালুসিয়ায়
আমি তার গুণগান করি শব্দে—শব্দ যা গোঙায়,
মনে পড়ে যায় এক দুঃখী হাওয়া জলপাই-বনে॥

হার্লেমের রাজা

একটি চামচে দিয়ে তিনি কুমীরদের চোখ ওপড়ালেন
এবং বাঁদরদের তলদেশে আঘাত করলেন।
একটি চামচে দিয়ে।

অনন্ত আগুন ছিল চকমকি পাথরে নিহিত,
এবং আরশোলা যারা মৌরীমদ খেয়ে মাতোয়ারা
তারাও ভুলেছিল কমে গাঁয়ের শ্যাওলাকে।

সেখানে নিগ্রোরা কেঁদেছিল
ব্যাঙের ছাতায় ঢাকা বুড়োলোকটা সেখানে যাচ্ছিল,
তখনই রাজার চামচে ঝনঝনিয়ে ওঠে
আর পচা জলের পুকুর দ্যাখা দ্যায়।

গোলাপেরা পালিয়েছে বায়ুর অন্তিম বক্ররেখা বরাবর,
নোংরা খ্যাপামোর তাড়নায়
রাশি রাশি স্যাফ্রনের ভেতরে শিশুরা হত্যা করেছে অনেক
ছোট ছোট কাঠবেড়ালীকে।
প্রত্যেকেই সেতু বরাবর হেঁটে যাবে
পৌঁছবে সেখানে নিগ্রো লজ্জার রক্তাভা
টেনে নেবে ফুসফুসের ঘ্রাণ
উষ্ণ আনারসের পোষাক দিয়ে
ঝাপটা আমাদের মন্দিরের গায়।

প্রত্যেকেই খুন করবে সুদর্শন ব্র্যান্ডিবিক্রেতাকে
এবং সকলকে যারা বান্ধব বালির আপেলেরও,
এবং বুদবুদসহ ফুটছে ওই যে খুদে খুদে শিম
তাতেও চালাবে বজ্রমুষ্টির আঘাত,
যাতে হার্লেমের রাজা গাইতে পারেন নিজ স্বরগ্রামে,
যাতে কুমীরেরা লম্বা সারি দিয়ে নিদ্রা যেতে পারে
জ্যোৎস্নার চাঁদোয়ার নিচে,
এবং যাতে না কেউ পালকের ঝাড়ন জাফরি বা তামা রন্ধনশালার
চাটুর অপরিমেয় সৌন্দর্য সন্দিগ্ধ হতে পারে।

আহ্ হার্লেম! আহ্ হার্লেম! আহ্ হার্লেম!
এমন যন্ত্রণা নেই যা তোমার নির্যাতিত লালের তুলনা,
অন্ধকার গ্রহণের মধ্যেকার তোমার রক্তের শিহরণের তুলনা,
আলোআঁধারির মধ্যে বোবাকালা তোমার বেদানারঙ
দেহের তুলনা,
কিংবা দ্বারপ্রহরীর উর্দিপরা তোমার মহান বন্দী
রাজনের তুল্য হতে পারে।
রাত্রির ভেতর ছিল বিশাল ফাটল শান্ত সাদা গিরগিটিরা।
মার্কিনী মেয়েরা বয়ে নিচ্ছিল শিশু ও মুদ্রা তাদের জঠরে,
শ্লথ উত্থানের কুক্লেশে যুবকেরা মূর্ছা গিয়েছিল।

এবং তারাই
তারাই সেসব বর্জিত আগ্নেয়গিরির পাশে বসে যারা রুপালি
রঙের হুইস্কি টানে
ভালুকের বসতি হিম পাহাড়ের গায় বসে হৃৎপিণ্ডের
খণ্ডিতাংশ খায়।
সেই রাতে হার্লেমের রাজা একটা খুবই শক্ত-পোক্ত চামচে দিয়ে
কুমীরদের চোখ ওপড়ালেন
এবং বাঁদরদের তলদেশে আঘাত করলেন
একটা চামচে দিয়ে।

অনেক ছাতার আর অনেক সোনালি
সূর্যের মাঝখানে পড়ে হতবুদ্ধি নিগ্রোরা কেঁদেছে,
মিউলাটো মেজে ধরে মাড়ি,
তারা উদ্ভিদের মত কিম্ভূত মূর্তির দিকে ছোটে
বাতাস আয়নাকে ঢাকে চূর্ণ করে নর্তকের শিরা

নিগ্রোগণ, নিগ্রোগণ, নিগ্রোগণ, নিগ্রোগণ।

তোমাদের ঊর্ধ্বমুখী সুপ্তির সেই রক্তের একটিও দরজা নেই
রক্তের ফোয়ারা নেই। রক্ত ফুঁসছে চামড়ার তলায়,
রক্ত বসবাস করছে নিসর্গশোভার বুকে ছুরির ফলায়,
কর্কটের স্বর্গীয় চাঁদের
সাঁড়াশি ও জেনিস্টার নিচে।

রক্তই হাজার পথে [illegible] মৌচাকে ময়দাঢাকা
মৃত্যু ছাই রজনীগন্ধার,
আর দৃঢ় হেলানো আকাশ, যেখানে গ্রহের পুঞ্জ
জঞ্জালের সঙ্গে ঘুরতে ফিরতে পারে সমুদ্রের তীরে

রক্ত, যা আলস্যভরে আড়চোখে তাকায়,
চাপচাপ ঘাসের তৈরি, পাতালের সুরা।
রক্তই জারিত করে আয়নবায়ুকে
এবং আয়নবায়ু একটি পদচিহ্নে উদাসীন
রক্তই ভণ্ডুল করে সার্শির ওপর যত পোকার জটলা।

এ হচ্ছে রক্ত যা আসে এবং আসবেও
গৃহ গম্বুজের চূড়া বরাবর চতুর্দিক থেকে
সুদর্শনা নারীদের ক্লোরোফিল দগ্ধ করে দিতে
বোসনের অনিদ্রার মুখোমুখি বিছানার
পদপ্রান্তে গোঙাতে এবং
তামাক ও হলদে ম্লান সকালে ধাক্কা লেগে চূর্ণ হয়ে যেতে।

প্রত্যেকে পালাবে
অবশ্য পালাবে গলিঘুঁজি বেয়ে এবং নিজেকে তালাবন্দী
রাখবে ওপর তলায়
কেননা উদ্ভিজ্জ মজ্জা ঢুকে পড়বে সমস্ত ফাটলে
তোমাদের মাংসের ভেতর
গ্রহণের একটি মৃদু ছাপ
বিবর্ণ দস্তানা আর কেমিক্যাল গোলাপের এক
ছল দুঃখ রেখে যেতে

আসলে প্রবৃদ্ধতম নৈঃশব্দেই পরিচারকেরা
পাচকেরা এবং আর সব যারা নিজ নিজ জিভ দিয়ে
চাটে কোটিপতিদের ক্ষতস্থান
সবাই রাজার খোঁজ করে পথে পথে কিংবা যবক্ষারের
তীক্ষ্ণ কোণে কোণে

এক বুনো দক্ষিণ বাতাস, তার দেহ কালো কাদায় হেলানো,
বিধ্বস্ত নৌকোয় থুথু ছিটোয় নিজের কাঁধে বেঁধায় পেরেক
দক্ষিণ বাতাস বয়ে আনে
গজদন্ত, সূর্যমুখী, বর্ণমালা, আর একটি বিদ্যুৎ ব্যাটারি
যাতে কিছু বোলতা ডুবে আছে

একচোখা চশমায় তিনটি কালির ফোঁটার দ্বারা
বিস্মৃতি নিজেকে মেলে দিল
ভালোবাসা উদ্ঘাটিত হ'ল এরকম যেন একক অদৃশ্য
মুখপাথরের গায়
উদ্ভিজ্জের মজ্জা আর দলমণ্ডলেরা মেঘে মেঘে
গড়ে তোলে শুধুই বোঁটার মরু একটিও গোলাপ তাতে নেই

ডাইনে বাঁয়ে উত্তরে দক্ষিণে
ছুঁচো কিংবা জলের ছুঁচের কাছে অনুভূতিহীন
একটি দেয়াল জাগে
নিগ্রোগণ এরকম ফাটল খুঁজো না
যার মধ্যে দেখতে পাইছে অনন্ত মুখোশ
নিজেদের [illegible] আস্ত একটি [illegible] অবয়বে
তৎপর [illegible] সেই সূর্যের সন্ধানে ব্রতী হও
যে [illegible] বনের ভেতর
একটি [illegible] না [illegible]
যে সূর্য সংখ্যাকে ধ্বংস করে

অথচ কখনো ডুবে পড়েনি [illegible] অভ্যন্তরে,
উল্কিপরা সূর্য বয়ে চলেছে নদীতে

এবং গর্জন করছে অনুগামী অ্যালিগেটরদের সাথে [illegible]!

নিগ্রোগণ, নিগ্রোগণ, নিগ্রোগণ, নিগ্রোগণ।
কখনো সাপ বা জেব্রা অথবা খচ্চর
মৃত্যুতেও হয়নি পাণ্ডুর
কখন যে করাতে-কাটা বৃক্ষগুলি মরে
কাঠুরে জানে না।
দাঁড়াও প্রতীক্ষা করো তোমাদের রাজনের
উদ্ভিজ্জ ছায়ায় যে অব্দি না
বিছুটি শেয়ালকাঁটা ধুতরো ফুল উপদ্রব করে

দূর দূরতম ঘরের চালায়।
নিগ্রোগণ তখন, তখন,
তোমরা উন্মাদের মত চুমু খেতে পারবে বাইসাইকেলের চাকায়
জোড়া জোড়া মাইক্রোস্কোপ রাখতে পারবে
কাঠবেড়ালীর আস্তানায়
শেষটায় আশ্বস্ত হয়ে নাচতে পারবে যে সময় টগবগে ফুলেরা
হত্যা করবে আমাদের মোজেজকে স্বর্গের রীডের আশেপাশে

আহ্ হার্লেম, ছদ্মবেশী!
আহ্ হার্লেম, তোমাকে সন্ত্রস্ত রাখে অসংখ্য কবন্ধ
সাজপোশাক!
তোমার কল্লোল শুনতে পাই
তোমার কল্লোল ভেসে আসে শুনি লিফট আর গাছের
গুঁড়ির মধ্য দিয়ে
ধূসর ধাতুর পাত বেয়ে
যেখানে অজস্র দাঁতে ঢাকা প'ড়ে তোমার মোটরগাড়িগুলো ভাসমান
তোমার কল্লোল ভেসে আসে
খচরো অপরাধ আর মৃত ঘোড়াদের মধ্য দিয়ে
তোমার মহান একলা দুঃখী যে রাজার দাড়ি
সমুদ্রে পৌঁছেছে তার মধ্য দিয়ে ভেসে আসে
তোমার কল্লোল।

ভোর

পাঁক কাদার চারটি থাম
আর পচা ডোবায় সাঁতরে ফেরা
কালো পায়রাদের এক তুফান।
এই নিয়েই নিউইয়র্কের ভোর।

নিউইয়র্কের ভোর
অন্তহীন সিঁড়ি বেয়ে কেঁদে যায়
[illegible] তাকের ভেতর হাতড়ে ফেরে
[illegible]-আঁকা যন্ত্রণার রজনীগন্ধা।

ভোর আসে এবং কেউ তাকে মুখে নেয় না
কেননা কোনো সকাল বা কোনো আশার আলো নেই।
মাঝে মাঝে [illegible] কাঁধে বাঁধে
[illegible] আর গিয়ে বাজা

[illegible]
কোথাও কোনো স্বর্গোদ্যান বা প্রকৃত ভালোবাসা নাই;

তারা জানে তারা চলেছে সংখ্যা আর কানুনের পাঁকে,
বিদ্রী খেলা খেলতে বৃথাই ঘেমে নেয়ে উঠতে।

শেকল আর কোলাহল আলোকে গোর দ্যায়
ভিত্তিহীন বিজ্ঞানের বেহায়া অন্ধকূপনায়।
শহরতলীর মানুষ একরত্তি ঘুমোয় না টলে
যেন এই মাত্র রক্তের জাহাজডুবি থেকে বেরিয়ে এল।

অন্ধকার মৃত্যুর কবিতা

আমি আপেলের মত ঘুমে যেতে চাই
আমি ছেড়ে যেতে চাই কবরখানার কলরব
সেই শিশুটির মত ঘুমে যেতে চাই
যে তার হৃদয় দুই টুকরো করতে চেয়েছিল গভীর সমুদ্রে

আমি আর শুনতে চাই না যে, মড়ার দেহ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে না
বা পচনশীল মুখ অবিশ্রান্ত কাঁদে 'জল দাও'
জানতে চাই না কোন অস্থিরতাগুলো ঘাসের যৌতুক
সর্পচঞ্চু মুদ্রিত যে চাঁদ
ভোর অব্দি গতর খাটায়
তার বিষয়ে কিছু জানতে চাই না আমি

আমি ঘুমে যেতে চাই কিছুটা সময়
এক লহমা এক মিনিট একশ বছর
কিন্তু সকলের জানা আবশ্যক যে আমি মরিনি
আমার দু ঠোঁট জুড়ে রয়েছে সোনার আস্তাবল
আমি তো সামান্য বন্ধু পশ্চিমবায়ুর
আমিই বিপুল ছায়া আমার অশ্রুর

ভোরের বেলায় ঢাকো আমাকে ঘোমটায় ঢেকে দাও
কারণ তা আমার গায় মুঠো মুঠো পিঁপড়ে দেবে ছুঁড়ে
এবং আমার জুতো জোড়াটি ডোবাও ক্ষরজলে
যাতে তার বৃশ্চিকের শুঁয়োগুলো পিছলে যেতে পারে

কেননা আমি তো চাই আপেলের মতন ঘুমে যেতে
এমন শোকের কান্না শিখতে চাই যা আমাকে মর্তলোক
থেকে মুছে দেবে
কেননা আমি তো সেই দুঃখী শিশুটির সাথে দিন
কাটাতে চাই
যে তার হৃদয় দুই টুকরো করতে চেয়েছিল দূর সমুদ্দুরে

অন্ধকার পায়রার কবিতা

লরেল গাছের ডালে আমি দুই অন্ধকার পায়রা দেখলাম।
একটি ছিল সূর্য আর অপরটি চাঁদ।
'ক্ষুদ্র প্রতিবেশীগণ,' তাদের বললাম আমি 'কোথায় আমার
কবর?' 'আমার লেজে' সূর্য বলে ওঠে।
'আমার গলায়' বলে চাঁদ।
আর আমি
আমার কোমর ঘিরে রয়েছে পৃথিবী
এমন করে দাঁড়াতে ফিরাতে দুই
[illegible]
[illegible]
এবং বাস্তবিক কেউ নয়।

'হে খুদে ইগলগণ', তাদের বললাম আমি,
'কোথায় আমার
কবর?' 'আমার লেজে', সূর্য বলে ওঠে।
'আমার গলায়,' বলে চাঁদ
লরেল গাছের ডালে আমি দুটি ন্যাংটো কবুতর দেখলাম।
একজন ছিল অন্যজন
এবং উভয়ে কেউ নয়।

ক্ষুদ্র অসীম কবিতা

পথ ভুল করা অর্থে শাদা হিমে পৌঁছোনো বোঝায়
আর হিমে পৌঁছোনোর মানে
বিশ শ' বছর শুধু কবরখানার ঘাসে বিচরণ করা

পথ ভুল করা বলতে নারীর কাছেই যেতে হয়
নারী যার আলোভীতি নেই
নারী যে মুহূর্তে হত্যা করে দুই মোরগছানাকে
আলো যে মোরগছানা বিষয়ে ভীতু না
এবং মোরগছানা যারা হিমে চেঁচাতে পারে না

কিন্তু হিম যদি একটি হৃদয় বিষয়ে ভুল করে
দক্ষিণের হাওয়া আসতে পারে
এবং যেহেতু বায়ু আর্তনাদ শোনে না কখনো
কবরখানার ঘাসে আমাদের বিচরণ করতে হবে ফের

আমি দেখলাম দুই শোকাতুর মোমদণ্ড গোর দিচ্ছে আগ্নেয়গিরির
নিসর্গদৃশ্যকে
আমি দেখলাম দুই পাগলশিশুকে, চোখে জল,
একটি খুনীর দুই চোখের মার্বেলে খোঁচা দিতে

কিন্তু দুই কখনোই একটি সংখ্যা ছিল না কারণ
এ হলো যন্ত্রণা আর যন্ত্রণার ছায়া
কারণ এ হলো সেই গীটার যেখানে ভালোবাসা ক্ষয়ে যায়
কেননা এ হলো অন্য এক অসীমের অভিজ্ঞান
আত্মঅভিজ্ঞান নয়—
এবং এ হচ্ছে শবসংরক্ষক দুর্গের দেয়াল
এবং সমাপ্তিহীন নব্য রেজারেকশনের দণ্ডাজ্ঞা
মৃতগণ দুই সংখ্যাটিকে ঘৃণা করে
কিন্তু তবু সংখ্যা দুই নারীদের ঘুমোবার জন্য লোভ দেখায়
এবং যেহেতু নারী ভয় পায় আলো
আর আলো কেঁপে ওঠে মোরগছানার মুখোমুখি
যেহেতু কেবলমাত্র মোরগশিশুই জানে কীরকমভাবে
শাদা হিমের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে হয়—
আমাদের চিরকাল কবরখানার ঘাসে বিচরণ করে যেতে হবে

গীটার

গীটারের শোকবিলাপ হয়েছে শুরু
ভোরের বেলায় মদের পেয়ালা ভাঙে
গীটারের শোক বিলাপ হয়েছে শুরু
একে নিশ্চুপ করানো নিরর্থক
একে নিশ্চুপ করানো অসম্ভব
গীটার [illegible] একঘেয়েভাবে যেন [illegible]
যেমন বাতাস কেঁদে যায় হিম সম্প্রপাতের ওপর

একে নিশ্চুপ করানো অসম্ভব
যা কিছু দূরের সুন্দরের তারই জন্য গীটার কাঁদে
উষ্ণ ভূমিতে দক্ষিণদেশে বালি
চায় সাদা ক্যামেলিয়া
গীটার কাঁদছে চাঁদমারিহীন তীর
সকালবিহীন সন্ধ্যা
এবং প্রথম মৃতপাখি তরুশাখায়
ওহ্, গীটার।
হৃদয় দারুণ জখম হয়েছে পাঁচখানি তলোয়ারে

যখন বেরিয়ে আসে চাঁদ

যখন বেরিয়ে আসে চাঁদ
ঘন্টাধ্বনি ফিকে হয়ে আসে
দুর্গম পথঘাট দ্যাখা দ্যায়

যখন বেরিয়ে আসে চাঁদ
সমুদ্র পৃথিবী ঢেকে ফেলে
এবং হৃদয় মনে হয়
অনন্তের মধ্যে এক দ্বীপ

কেউই কমলালেবু খেয়ে
থাকে না কখনো পূর্ণিমায়
সবুজ বরফ ঠান্ডা ফল
সকলেই খাবে

একশটি অনন্য মুখের
চাঁদ যেসময় দ্যাখা দ্যায়
পকেটে রূপোর
টাকা সিকি আধুলিরা কাঁদে

আত্মহত্যা

(সম্ভবত ব্যাপারটি ঘটেছিল কেননা তুমি তোমার জ্যামিতি জানতে না)
ছেলেটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছিল
তখন সকাল দশটা

তার হৃদয় ভরে উঠছিল অজস্র
ভাঙ্গা ডানা আর বাসি ফুলে

যে অনুভব করল শুধু একটিই কথা
তার মুখে থেকে গেছে

তার দুই হাতের দস্তানা খুলে নিতে
করতল থেকে ঝরে পড়ল মসৃন ছাই

ঝুলবারান্দার জানলা দিয়ে একটি সৌধচূড়া চোখে পড়তে
সে নিজেকে ভাবল জানলা ও সৌধচূড়া

সে দেখল সন্দেহাতীত কীরকমভাবে
যাত্রবন্দী নিশ্চল ঘড়িটি তাকে দেখল

সে দেখল তার শান্ত হেলানো ছায়া
শাদা রেশমী ডাইভানে

আর সেই দৃঢ় জ্যামিতিক ছেলেটি
কুঠার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল আয়না

আর তা গুঁড়িয়ে দিতেই এক বিশাল ছায়ার ঝিলিক
ঝাঁপিয়ে পড়ল ভৌতিক বুলুভিগতে

জখম—জলার পাশে পাশে

আমি ইঁদারার দিকে নেমে যেতে চাই
আমি উঠতে চাই উঁচু প্রানাদাপ্রাচীরে
দেখতে চাই যে হৃদয় ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে
অন্ধকার জলজকাঁটায়

শাদা বরফের রাজমুকুট মাথায়
আহত শিশুটি গোঙাচ্ছিল
পুকুর চৌবাচ্চা ঝর্ণা ফোয়ারা সকলে
শূন্যে তুলেছিল তলোয়ার
আহ্ ভালোবাসার কী তেজ!
কী শাণিত ফলা! কী যে রাতের কল্লোল,
কী শাদা মরণ!
কেমন আলোয় মরু ডুবে আছে ভোরের বালিতে!
শিশুটি একাই ছিল
তার কণ্ঠনালীর ভেতর ছিল ঘুমন্ত শহর
স্বপ্ন থেকে ঝর্ণা উঠে এসে
সামুদ্রিক আগাছার বুভুক্ষার থেকে তাকে রক্ষা করেছিল
ছেলেটি ও তার সে যন্ত্রণা মুখোমুখি,
দুই সবুজ বৃষ্টির শেকলের মত জড়িয়ে থাকছিল
মাটির ওপর শিশু বিছিয়ে দিচ্ছিল নিজেকেই
আর তার যন্ত্রণাও কুঁকড়ে গোল হয়ে গিয়েছিল

আমি ইঁদারার দিকে নেমে যেতে চাই
আমার মরণ হোক গ্রাসে
আমার হৃদয় হোক শ্যাওলায় ভরপুর
যেন দেখতে পাই তাকে—জখম—জলার পাশে পড়ে আছে একা

রাজনীতি কলকাতা স্টাইল

বেদব্যাস বৈদ্য

স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পূর্ণ হবে সামনের পনেরই আগস্ট। দেশ-বিভাগের পর সিকি শতক জুড়ে এই উপমহাদেশে অজস্র ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, পূর্ব পাকিস্থানের অবলুপ্তি এবং বাংলাদেশের জন্ম। নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম বাংলা ও বাঙালীর কাছে আনন্দদায়ক তো বটেই, ঐতিহাসিক কারণেও তা বাঙালীর গর্বের বিষয়। পুরোপুরি না হলেও পূর্ব পাকিস্থানের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঙালীবোধ মানসিকতা দুই বাংলার মানুষের মধ্যে অদৃশ্য হলেও আন্তরিক এক সেতু স্থাপনে অবিশ্বাস্য রকমের সাহায্য করছে। তারই ফলে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক এখন অনেক উন্নত। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজি দেশাইয়ের সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর এবং পরবর্তী সময়ে দুই সরকারের মধ্যে সখ্যতার বিস্তার এই দুই দেশের মানুষের মনে যে নতুন আশা আর উদ্দীপনা সৃষ্টি করছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিবেশী সব দেশের সব মানুষই কী তাতে খুশি?

ভারত-বাংলাদেশ আন্তরিক সম্পর্ক যখন উপমহাদেশে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছে, তখন একটি অশুভ শক্তি রাতারাতি সক্রিয়। অবশ্য অশুভ ঐ শক্তির প্রকাশ্য মুখ এখনও পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক দর্পণে ধরা পড়েনি। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর তার অশুভ ছায়া ইতিমধ্যে ঘনীভূত। এবং ঐ অশুভশক্তির অনাহুত আবদার-আর্জির কথা জানতে পেরে পশ্চিম বাংলার প্রশাসনও কম চিন্তিত নয়। রাজ্য তথা ভারত সরকার মনে করছেন, অশুভ ঐ শক্তির আর্জির অন্য নাম হুমকি বা হুঁসিয়ারি। তার পেছনে মতলববাজ কোনও দেশ বা দলের উস্কানি থাকা অসম্ভব নয়।

সাড়ে তিন লাখের লঙ্ মার্চ

সত্তরের দশকের গোড়ায় 'বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে বাঙ্গালীকে কম খেসারৎ দিতে হয়নি। তদানীন্তন পাকিস্থান সরকার শাসনের নামে দুই যুগ ধরে পূর্ব পাকিস্থানে যে শোষণ ব্যবস্থা চালু রাখেন, তাতে একটি জাতির কৃষ্টি-সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রায় ধ্বংসের মুখে চলে যায়। রাজনীতির নামে ন্যায়নীতি ও আইন-শৃঙ্খলা শিকেয় তুলে পূর্ব পাকিস্থানের উপর চালায় অত্যাচারের স্টীম রোলার। অবশেষে একদিন পূর্ব পাকিস্থানের সাধারণ মানুষ তাদের জাত-পাত আর ধর্মের ব্যবধান ভুলে অকস্মাৎ ভীমগর্জনে গর্জে ওঠে। তাদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে যান শেখ মুজিবর রহমান আর তাঁর সহযোগীরা। গোটা দেশ জুড়ে শুরু হয় বিদ্রোহ। শোষণের বিরুদ্ধে, স্বশাসনের দাবীতে বাঙ্গালীসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদের সেই দাবী ধূলিসাৎ করতে তদানীন্তন জঙ্গী পাক শাসক নগ্ন মূর্তি ধারণ করেন। কাতারে কাতারে খান সেনা পাঠিয়ে পূর্ব পাকিস্থানের গ্রামে-গঞ্জে-সহরে চালায় অমানবিক অত্যাচার। পাক-সেনাদের সেদিনের সেই নির্মম নগ্নরূপে দেখে সারা বিশ্ব চমকে ওঠে। শত শত বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেই তারা ক্ষান্ত হয় না। শত শত শিশু-নারীর রক্তে উল্লাসনৃত্য করে। বলাবাহুল্য খান সেনাদের এই ধরনের অত্যাচার-অনাচার এবং বাঙ্গালীর জীবন দানের ভিতর দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জন্মলগ্নে যেসব অবাঙ্গালী পাকিস্থানী ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন, তাঁরা বঙ্গবন্ধু অথবা বাংলাদেশকে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য বাংলাদেশে আটক পাকিস্থানীদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ-পাকিস্থানের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক কয়েক লক্ষ পাকিস্থানীকে রাওয়ালপিন্ডি সরকার ফেরৎ নিলেও, নানা অজুহাত আর ওজর দেখিয়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পাকিস্থানীকে আর তাঁরা ফেরৎ নেননি। এই সাড়ে তিন লক্ষ পাকিস্থানী এখনও 'বাংলাদেশে' বহাল তবিয়তে।

অতিসম্প্রতি এই পাক-নাগরিকদের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রচার করে বলা হয়েছে, আগামী ১৪ আগস্ট এই সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ ভারতের উপর দিয়ে 'লঙ্ মার্চ' করে তাদের জন্মভূমি পাকিস্থান যাত্রা করবে। মজার কথা হল, এই লঙ্ মার্চ মিছিলের কেন্দ্রীয় প্রস্তুতি কমিটির সাধারণ সম্পাদক করাচীর জনৈক সৈয়দ জুবাইব মোহম্মদ। এ ধরনের লঙ মার্চের কথা ইতিপূর্বে কোনদিন শোনা যায়নি। শ্রীমোরারজি দেশাইয়ের বাংলাদেশ সফর এবং ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী যখন গাঢ় হতে চলেছে, তখন এধরনের উদ্যোগ আয়োজন নিঃসন্দেহেই তাৎপর্যপূর্ণ। এর পেছনে রাজনৈতিক কোন ষড়যন্ত্র যে নেই—তা-ও বলা দুষ্কর। ভারতের বিভিন্ন অংশে বেশ কিছুদিন ধরে হঠাৎ সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে হাঙ্গামা সৃষ্টির একটা গোপন চেষ্টা চলছে। আর-এস-এস'কে জড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ সৃষ্টির অপপ্রয়াসও কম নেই এ ধরনের অভিযোগ তুলতে এ দেশের তথাকথিত প্রগতিবাদী রাজনীতিকরাও কম সক্রিয় নন। বাংলাদেশে অবাঙ্গালী পাক নাগরিকদের নিয়ে ভারতের উপর দিয়ে যারা বে-আইনী লঙ্ মার্চ করার পরিকল্পনা আঁটছেন, তাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সাক্ষাৎ সংযোগ নেই, একথা কী কেউ হলফ করে বলতে পারেন? বাংলাদেশের মানুষের মনে অন্ততঃ সেই সন্দেহই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বাংলদেশের একটি দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলমেও এ প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করে লেখা হয়েছে :

.. পাকিস্থান-এজেন্টরা যেখানে আজো এদেশে প্রকাশ্যে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের বিরোধিতা করছে এবং পাকিস্তানের পক্ষে দালালী করছে.... দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে যারা মেনে নিতে পারেননি, এখনো যারা গোপনে পাকিস্থানের স্বপক্ষে প্রচার চালান, তারা যে এদের পেছনে থেকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ইন্ধন যোগাচ্ছেন না তাই বা কে বলতে পারে!

বাংলাদেশের প্রভাবশালী পত্রিকাটির মন্তব্যের সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশের অধিকাংশ চিন্তাশীল মানুষই যে একমত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। বলাবাহুল্য, ভারতের ভিতর দিয়ে এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে যেতে হলে তার জন্য প্রয়োজন ভারত সরকারের অনুমতি। উদ্যোক্তরা তার তোয়াক্কা না করে লঙ্ মার্চের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় স্বভাবতই তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। সাড়ে তিন লক্ষ পাক নাগরিক ভারতের উপর দিয়ে যাবেন, তাতে নানা সমস্যার সঙ্গে খাদ্য-আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নও জড়িত। বলাবাহুল্য, প্রস্তাবিত লঙ্ মার্চ কার্যকর হলে প্রথম ধাক্কা খাবে এই পশ্চিম বাংলা।

লোহা—৭

জয়তি মুখোপাধ্যায়

সমস্ত রাত চাঁদ ছিল না, কেবল লোহা ছিল
লোহার থেকে চাঁদের মতো জ্যোৎস্না ঝরেছিল
আগুন আগুন জ্যোৎস্না আমায় পুড়িয়ে মেরেছিল।

তখন ছিল চরাচরে ফুলের বনে প্রেম
প্রেমের পীঠস্থানে এখন শ্রমের কাঁচা হেম
শ্রমের পরে স্বপ্ন তাকে ভুলেই গেছিলেম।

লোহার ভিতর তৃষ্ণা ছিল, অনুরাগের ছল
মানচিত্রে যেমন সাগর একান্ত নিষ্ফল
কুসুম ভেবে আগুন ছুঁয়ে পতঙ্গ চঞ্চল।

রাগ

জ্যোৎস্না কর্মকার

এরকমই ছলখান করি আমি আমাকে
আমাকে কেউ অবহেলা করলে রেগে যাই
নিজেকে ঝোপের আড়ালে
ডেকে নিয়ে গিয়ে জোর ধমক লাগাই
আমি আরও অবহেলা করে
নিজেকে পাঠাই দূরে বনে কাঠ কাটতে

কাঠ ঠোকরার মতো ঠুকরে ঠুকরে দিন খাই
কেন সে তোকে রুমাল পেতে দিলো না বসতে
কেন সে এগিয়ে দিলো না আর একটু পথ
কেন সে বললো না স্পষ্ট :
তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না তোমাকে চাই......

কুড়ুলটা রাগতে হয় কথাই শোনে না
রেগে পায়ের ওপরই বসিয়ে দি তাই
একটা নতুন পায়ের জন্য বায়না ভাল লাগে না আর ..

শোধ

নির্মলেন্দু ঘোষাল

বিধাতার সব ঋণ শোধ দেবো আমি; ক্ষমতাহীন হলে
আছে সন্তানপ্রিয়
মানুষের সব প্রেম শোধ দেবো আমি; এতোদিনের ভুল পথ—
ভুলের মাশুল।
আমারও বয়স ছিলো আয়না দেখার, লম্বা-গ্রীষ্মে প্রতীক্ষা
মাস ফুটপোজে
নানীও বড়োদিন ছিলো মানুষের মতো অগ্রিম টিকিট কেটে
হিন্দী সিনেমা।

আমাদের মতো আমি আজ ঠিক নেই, জীবনযাপন একটু অন্যরকম
আমাদের নিস্তব্ধ জীবন : স্যুইমিং পুল, ক্লাবে যাওয়া রুটিন মাফিক,
ক্যারাম খেলা।
মনে পড়ে পরিচয় আর্টেই জানে? পাঁচ বছরের দীর্ঘ নামে ভেজা দিন?
অবিশ্বাসে তুমি আজ দূরে চলে যাও, দূরের আর এক নাম
অন্য মানুষ।

মানুষ বলতে আমি জানি জানোয়ার; তুমি তাকে মোহ-চোখে
মানুষ ভাবো।
দুই-পাওলা পশুদের ভয়ঙ্কর বড়ো লেডিস দেখে বাসে
ওরা অজ্ঞাতবশত।
তোমাদের সব খাদ্য শোধ দেবো আমি; সন্ধ্যা হলে ভেজে দেওয়া
ডিম-পাঁউরুটি।
তোমায় আনন্দ-ঘুম শোধ দেবো আমি; আমার প্রাচীন শোক
মৃত্যুর শিখায়।

ক্ষমতাহীন হলে আছে সন্ততি প্রিয়; জন্মের পরে আমি
মালা পাবো তাকে।
ক্ষমতাহীন হলে আছে সন্ততি প্রিয়; আমার মৃত্যুর পর
তুমি বোলো ডেকে।

সমালোচনা

জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি নেই

সজনীকান্ত দাস আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট এবং বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। এই বৈশিষ্ট্য তিনি অর্জন করেছেন প্রধানত আধুনিক সাহিত্য-তথা রবীন্দ্র-বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, তাঁর উপন্যাস বা কবিতা বা রসরচনা তাঁর ব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিচায়ক নয়। তিনি লিখেছেন প্রচুর : উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ, নানারকম সরস রচনা। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সম্বন্ধে ভেবেছেন, তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন। বাংলা গ্রন্থ সম্পাদনাতেও তাঁর অদম্য উৎসাহ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান বাঙালী লেখকদের রচনাবলী সম্পাদনায় নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার পরিচয় যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও সজনীকান্তের যে ভাবমূর্তি আধুনিক বাঙালী পাঠকের মনে গড়ে উঠেছে, তা কোন ঔপন্যাসিক বা গল্পকারের নয়, নয় কোন রূপবিহ্বল আত্মনিমগ্ন কবির, কিংবা কোন অনলস নিষ্ঠাবান গবেষকের। যে সজনীকান্ত দাস সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিত, তিনি শনিবারের চিঠির সম্পাদক, যার প্রধান কর্মধারা নেতিবাচক, কর্মপদ্ধতি আক্রমণাত্মক। তাঁর রচনায় চাতুর্য আছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি রচনার তীক্ষ্ণ ধার। প্রতিপক্ষের প্রতি নির্মম এবং শাণিত বিদ্রূপ, তীব্র ও মর্মভেদী আক্রমণ।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত সজনীকান্ত দাস পুস্তিকার লেখক ঠিকই বলেছেন, 'সাহিত্যে সজনীকান্তের মৌলিক সৃজনের গভীরতা অপেক্ষা তাঁহার আক্রমণাত্মক সমালোচনার অকুণ্ঠ ব্যাপকতা এবং শাণিত বিদ্রূপের ক্ষমাহীন পীড়নই অধিকতর প্রকট হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্য-সেবার একটি প্রধান অধ্যায় এরূপ নেতি-বাচক ধারায় গ্রথিত হওয়ায় এবং উচ্চাবচ-নির্বিশেষে তাঁহার লেখনীর তীব্রতা অসহনীয় হইয়া ওঠায় সজনীকান্তের জীবনাবসানের অল্পকালের মধ্যেই গুণগ্রাহী বিদগ্ধ সমাজে তাঁহার স্বীকৃতি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।' প্রকৃতপক্ষে সজনীকান্তের সাহিত্য-জীবনের প্রধান অধ্যায় তার ভাবমূর্তিটি গড়ে তুলেছে। এবং এই ভাবমূর্তি শুধু যে সাধারণ পাঠকের মনে তাই নয়। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকেরাও আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন এবং বিভিন্ন সাহিত্যিক সংঘের আলোচনা প্রসঙ্গেও যে সজনীকান্তকে ফুটিয়ে তুলেছেন তার মধ্যে একটি মুখর, বিদ্রূপপরায়ণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অশিষ্ট একটি ব্যক্তিত্ব ধরা পড়েছে। সজনীকান্তের সাহিত্য-জীবনে আচরণের অশিষ্টতা বা রুচিহীনতার অভিযোগ পুরোটা তাঁর বিরোধী পক্ষের অভিযোগ নয়। কৌতূহলী পাঠক শনিবারের চিঠির পুরোনো সংখ্যাগুলি উল্টে দেখলে তার পরিচয় যথেষ্ট পাবেন। সজনীকান্ত শেষজীবনে তাঁর কোন কোন আচরণের জন্য দুঃখ বোধ করেছেন সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর ভাবমূর্তি পাঠকের মনে এমনই স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে যে, সজনীকান্তকে পাঠক রঙ্গব্যঙ্গের স্রষ্টা হিসেবেই চিনতে অভ্যস্ত। বলাই বাহুল্য, হয়ত সেইটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়, তাঁর অন্য পরিচয়ও আছে। কোন কোন লেখক সেই পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টাও করেছেন সাম্প্রতিক কালে।

শ্রীদেবজ্যোতি দাস সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় অন্তর্ভুক্ত সজনীকান্ত দাস পুস্তিকায় দাবি করেছেন, 'একাধারে কবি, গবেষক, সাংবাদিক ও গোষ্ঠীগত হিসাবে এপ্রকার প্রতিষ্ঠা লাভ বঙ্গসাহিত্যে বিরল।' হয়ত অনেকেই এই বক্তব্য মেনে নেবেন। কিন্তু সজনীকান্তের যে ভাবমূর্তির কথা বলেছি, সেই ভাবমূর্তি কতটা সত্য—এই প্রসঙ্গে খুবই মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন শ্রদ্ধেয় জগদীশ ভট্টাচার্য। তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত গ্রন্থটিতে তিনি একটি জটিল ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের জটিলতা সবচেয়ে বেশি প্রকট রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে। জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন 'সজনীকান্তের মানসলোকে দুই সজনীকান্ত পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতই বাস করেন। একজন রবীন্দ্রনিষ্ঠ কবি, আর একজন দুষ্টা সরস্বতীর প্ররোচনায় শনিবারের চিঠির সংবাদ-সাহিত্যের দুর্মুখ লেখক ও দুর্ধর্ষ সম্পাদক।' সজনীকান্তের আত্মস্মৃতি প্রধানত তাঁর চরিত্র ও আচরণের এই বিপরীতমুখিতার জন্যই মূল্যবান। পাঠক হয়ত তাঁর আচরণের স্ব-বিরোধিতা ও আপাত-অযৌক্তিকতার ব্যাখ্যা পেয়ে যেতেও পারেন। জগদীশ ভট্টাচার্য সজনীকান্তের যে ছবি এঁকেছেন, তার সবচেয়ে বড় সমর্থন সজনীকান্তের নিজের লেখাতেই, তাঁর আত্মস্মৃতিতে। আর তা যদি সত্য হয়, তাহলে সজনীকান্ত বাংলা-সাহিত্যের বেদনাদায়ক অপচয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি বসবাস করছিল, তাদের তিনি বশ করতে পারেননি, এক-একটি শক্তি সময়বিশেষে তাঁকেই চালিত করেছে এবং তিনিও প্রায় বিনাযুদ্ধে প্রতিকূল শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এ যেন ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইডের করুণ কাহিনী।

সজনীকান্তের আত্মস্মৃতি স্বভাবতঃই আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস রচনার মাল-মশলায় ভরা। অবশ্যই তাঁর সব মন্তব্য বা বক্তব্য ঐতিহাসিক মেনে নেবেন না। বিরোধী মন্তব্য ও বক্তব্যও অন্যত্র প্রচুর পাওয়া যাবে। কিন্তু আত্মস্মৃতির সর্বাধিক মূল্য এইখানে যে, আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন তথা রবীন্দ্র-বিরোধিতার ইতিহাসে সজনীকান্তের ভূমিকা সক্রিয় এবং দূরবিসর্পী। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সজনীকান্ত এই সাহিত্য-আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন, বিরোধিতার কারণ দেবার চেষ্টা করেছেন এবং সমকালীন সাহিত্যের নেপথ্যলোকের একটি ছবি দেবার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ সজনীকান্তের জীবন এমনভাবে সমকালীন সাহিত্যের (এবং ক্ষীণভাবে রাজনীতির) সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে যে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কালানুক্রমিক পরিচয় শেষপর্যন্ত বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের বহুধা-বিভক্ত ধারার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। সজনীকান্ত লিখেছেন, 'সৌভাগ্যক্রমে কাব্য-সরস্বতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন, ছন্দের বন্ধনে অগোচর ও অধরা ক্ষণে ক্ষণে বাঁধা পড়িয়াছেন—মহাজীবন জলতরঙ্গে আমার নগণ্য জীবনও ঢেউয়ের শীর্ষে উঠিয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে। সেই তরঙ্গমালার কথা সকলকে শুনাইবার উপকরণ আমার রচনায় আছে।'

প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে সজনীকান্ত তাঁর সাহিত্য-জীবনের উন্মেষপর্বের একটি সুখপাঠ্য পরিচয় দিয়েছেন। সেই উন্মেষ-পর্বে প্রধান প্রেরণার নাম রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বঙ্গবাণী সাধক, যাঁহার রচনা আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এবং তিনিই সর্বপ্রথম কবি যাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।' সজনীকান্তের প্রথম পর্বের রচনা রবীন্দ্রানুসারী এবং শেষ পর্যন্তও তাঁর কাব্য-সাধনায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। নবীন কাব্যধারা তাঁকে আকর্ষণ করেনি কিংবা বলা বাহুল্য, নবীন কাব্যধারার যে বহিরঙ্গ, তার প্রয়োজনীয়তা এবং অনিবার্যতা সম্বন্ধে তিনি সুবিচারও করেননি। তাই আধুনিক কাব্য এবং সেই সূত্রেই আধুনিক বাংলা-সাহিত্য আন্দোলনের কোন কোন সেক্টরের প্রতি তাঁর বিরূপতা যত সহজে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপতাকে একটি সাহিত্যিক-কাঠামোর মধ্যে ধরা যায় না। সেই বিরূপতার উৎস কোথায়? সে কি কোন বিশেষ সাহিত্য-সংস্কার, কোন সাহিত্যিক আদর্শের দ্বন্দ্ব, অথবা কোন ব্যক্তিগত বিক্ষোভ অথবা শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় দিয়েছেন, সেই বিভক্ত মানসিকতার অন্ধ অনুসরণ? তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না যদিও সজনীকান্ত আত্মস্মৃতির মধ্যে তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। আর সেই চেষ্টার ফলেই আত্মস্মৃতি বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের পরিচয়ের ইতিহাসে মূল্যবান উপকরণ।

শনিবারের চিঠিতে একটি স্তরে প্রধান উপজীব্য ছিল পলিটিক্স। দ্রুতগতিতেই পট পরিবর্তিত হল। প্রধান উপজীব্য হল সাহিত্য বা আধুনিক সাহিত্য। শনিবারের চিঠির [illegible]

কবিতা প্রকাশিত হল, 'আমি ন্যাঙ' নজরুলে ইসলামের বিদ্রোহীর প্যারডি। নজরুল তার জবাবে সর্বনাশের নেশা কবিতায় মোহিতলালকে আক্রমণ করলেন আর উত্তর এল মোহিতলালকে 'দ্রোণ-গুরু'। বাংলা সাহিত্যের একটি বেদনাদায়ক ঘটনা। আর এই ঘটনাকেই উপলক্ষ্য করে শনিবারের চিঠি ও কল্লোলে বাঁধল কলহ। এই কলহের পেছনে যে বিশেষভাবে কোন সাহিত্যিক আদর্শ ছিল তা মনে হয় না। এর পেছনে মূলতঃ দেখতে পাই চাপল্য এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের তিক্ততা। অবশ্য সজনীকান্ত একটি সাহিত্যিক আদর্শের দাবী করেছেন। তিনি লিখেছেন, ১৩৩২ সালের পর কল্লোল 'হঠাৎ যৌন কল্লোল হইবার সাধনায় মাতিল।' কালি-কলম সম্বন্ধে লিখেছেন 'কল্লোল অপেক্ষা মার্জিত ও ভদ্ররুচির পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু প্রথম সংখ্যাতেই হাবিলদারী কামকণ্টকবৃন্দ দৃষ্ট তার জন্য আমাদের আক্রমণের বিষয় হইয়াছিল।' অর্থাৎ সজনীকান্ত কল্লোল ও অন্যান্য কোন কোন লেখকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন, রুচির ও শ্লীলতার। একেই কেন্দ্র করে বাংলা-সাহিত্যে তীব্র বিতর্ক ও কলহের সূচনা। এই বিতর্কে শেষ পর্যন্ত প্রবীণ ও নবীন সব প্রধান সাহিত্যিকই যুক্ত হন। এই বিতর্কের বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন সজনীকান্ত তার মধ্যে সমকালীন বাংলা-সাহিত্যের নেপথ্যলোকের প্রচুর খবর আছে। পরিচয় আছে অনেক সাহিত্যিককের। বিশেষতঃ সজনীকান্ত-রবীন্দ্রনাথের চিঠি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, সাহিত্যের অতি-আধুনিক আন্দোলনের বিরোধিতায় 'একমাত্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের পক্ষে ছিলেন।' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর কল্লোলযুগ গ্রন্থে যে-ছবি দিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি এঁকেছেন সজনীকান্ত।

সজনীকান্তের আত্মস্মৃতিতে একদিকে যেমন আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের সংঘর্ষের ছবি ফুটে উঠেছে, যার সবটুকু তৃপ্তিকর নয়, আর একদিকে ফুটেছে কোন কোন সাহিত্যিকের আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিচয়। শনিবারের চিঠির লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রতিভাবান। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, গোপাল হালদার আর বিশেষ করে মোহিতলাল। এঁদের সংঘবদ্ধ শক্তিতে শনিবারের চিঠি বাংলা-সাহিত্যে আরো মূল্যবান এবং স্থায়ী দান রেখে যেতে পারত। কিন্তু প্রায় সমস্ত শক্তি শনিবারের চিঠি চালিত করেছিল আক্রমণে, সংগঠনে নয়। সজনীকান্ত লিখেছেন, শনিবারের চিঠির অভিযান শুধু অশ্লীলতার বিরুদ্ধে নয়, 'ভানের বিরুদ্ধে ন্যাকামির বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত সুক্কনী লেহনীর বিরুদ্ধে।' শনিবারের চিঠির সাহিত্যিক আদর্শ অনেকটা নির্ণীত হয়েছিল মোহিতলালের প্রচেষ্টায় বা অন্যভাবে বলা চলে মোহিতলাল বহুল পরিমাণেই শনিবারের চিঠির সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরোধিতাকে একটা আদর্শগত সংঘর্ষে পরিণত করেছিলেন। সজনীকান্ত নিশ্চয়ই সেই আদর্শে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁর স্বভাবের পরিহাসপ্রিয়তা এবং তীক্ষ্ম ব্যঙ্গপ্রবণতা সেই আদর্শকে অনেক সময়েই আড়াল করেছে তাতেও সন্দেহ নেই। শনিবারের চিঠির জনপ্রিয়তার পেছনে ছিল সজনীকান্তের ব্যঙ্গপ্রবণতা, লক্ষ্যভেদের নৈপুণ্য, ছন্দের ও ভাষার চাতুর্য। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি, ধূপছায়া পাইলেই লাল-নীল পেন্সিল হাতে বসিয়া যাইতাম মণিমুক্তা ও সংবাদ সাহিত্যের খোরাকের জন্য। অতিরিক্ত জিদের বশে ইহা বদ অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল।'

এই বদ অভ্যাসই, কোন সাহিত্যিক আদর্শগত স্পন্দন নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি সজনীকান্তের আক্রমণের প্রধান কারণ। সজনীকান্ত লিখেছেন, নটরাজ গীতিনাট্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অবতরণ লক্ষ্য করেছিলেন আর সেই কথাটিই তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ন হন। রবীন্দ্রনাথ এই সময় একটি চিঠিতে পরোক্ষভাবে সজনীকান্তের সমালোচনার নেতিবাচকতার উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর স্বভাবগত ব্যঙ্গপ্রবণতা (যা অনেক সময়ই কোন আদর্শ বা নীতির শাসন মানে না)—দুই মিলে সজনীকান্তের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছে এবং সেইজন্যই তাঁর জীবনে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যা তাঁর প্রতিপক্ষকে প্রবলভাবে ব্যথিত করেছে এবং অনুমান করি তাঁকেও খুব খুশী করেনি। অন্ততঃ তাঁর আত্মস্মৃতিতে সেই পরিচয় পাই। জীবনে কোন কোন মুহূর্তে তাঁর এই সংগ্রামী ভূমিকার নিষ্ফলতা তাঁর মনেও ভেসে উঠেছে। 'সমরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে নিভৃত নিরালায় নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া যখন বসিতাম, তখন ভয় হইত।'

আত্মস্মৃতি সজনীকান্তের সমরে ক্ষতবিক্ষত জীবনের কথাতেই প্রধানতঃ ভরা, নিজের সঙ্গে মুখোমুখি মুহূর্তগুলি বড় বিরল। এই তিনখণ্ডে বিধৃত বৃহৎ আত্মজীবনী পড়ার পর সেই আক্ষেপই থাকে। এর মধ্যে বহু তথ্য আছে, সংবাদ আছে। মন্তব্য আছে। সাহিত্যিক বিতর্ক আছে, মতামত আছে। কিন্তু জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি নেই। অথচ একটি হতাশা, একটি নিষ্ফলতার বোধ অকস্মাৎ উঁকি দিয়েছে, আবার তথ্যের কোলাহলে মিলিয়ে গেছে। রাজহংস কাব্যগ্রন্থে প্রকাশের পর সজনীকান্ত বলেছেন একদিন ব্যঙ্গ ও লঘু কবিতার কবি ছিলেন, এবার তাঁর রচনায় এল গভীরতা। কিন্তু 'শনিবারের চিঠির সংবাদ-সাহিত্যের লেখক সজনীকান্তকে কবি সজনীকান্ত অতিক্রম করিতে পারিল না। আমার সাহিত্যজীবনের ইহাই সর্বাধিক ট্র্যাজেডি।

তথ্যবহুল প্রামাণ্য ইতিহাস

সজনীকান্ত দাসের বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে তিরিশ বছরেরও আগে। তখন থেকেই বইটি সুধী সমাজে সমাদৃত হয়ে আসছে। সুশীলকুমার দে এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন সজনীকান্ত বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগের একটি তথ্য বহুল, প্রামাণ্য ও সংযত ইতিহাস রচনা করেছেন। গত তিরিশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের গবেষকরা এই মন্তব্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই সমর্থন করেছেন।

সজনীকান্ত তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কালসীমা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর লেখা গদ্য বিশেষ পাওয়া যায়নি। কিছু চিঠিপত্র, কিছু দলিল দস্তাবেজ অবশ্য আছে কিন্তু যাকে বলা চলে সাহিত্যিক গদ্য তার পরিচয় প্রায় সেই বঙ্গদেশেই চলে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে বাঙ্গালী এই সময়ে গদ্য রচনা করেনি। পুঁথিপত্র খুঁজলে কিছু প্রমাণও পাওয়া যাবে মনে হয়। কিন্তু সেই গদ্যের নিদর্শন আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। এই পর্বে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে বাংলাগদ্যের গঠনের ইতিহাসে যাঁদের কথা আমরা বিশেষভাবে জানি তাঁরা সবাই বিদেশী। হয় পর্তুগীজ ধর্মযাজক নয় ইংরেজ রাজকর্মচারী। সজনীকান্ত বিশেষ পরিশ্রম করে এঁদের কাজের যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। সজনীকান্ত এ ব্যাপারে পথিকৃৎ নন কিন্তু সুশীলকুমার দের কথায় সজনীকান্তের রচনা তাঁহার পূর্বগামীদের রচনার পূরণ ও সংশোধন হিসাবে বহু অজ্ঞাত ও মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়েছে। অর্থাৎ সজনীকান্তের রচনায় প্রধান মূল্যই হল তথ্য সংগ্রহে ও বিন্যাসে। তিনি যে যুগের কথা লিখেছেন তাতে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক, প্রধানতঃ তা সাহিত্যের নিয়মিত ছাত্র ও গবেষকের আগ্রহের বিষয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের যে গদ্যের পরিচয় সজনীকান্ত দিয়েছেন তাও সাধারণ পাঠকের আগ্রহের বস্তু নয়। শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ—এই দুটি প্রতিষ্ঠানে বাংলাগদ্য বিকশিত হয়েছে। সজনীকান্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচয় দিয়েছেন, প্রধান প্রধান ব্যক্তি যাঁদের নায়কত্বে নির্দেশ এবং পরিশ্রমে বাংলাগদ্যের সোপান রচিত হয়েছে তাঁদের কথা বলেছেন, তাঁদের রচনার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন, সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য সাহিত্য সমালোচনা নয়, ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নয়। তাঁর লক্ষ্য মূলতঃ তথ্য সংগ্রহ ও

আত্মস্মৃতি (তিনখণ্ড একত্রিত), সজনীকান্ত দাস. সুবর্ণরেখা, কলিকাতা-৯। পৃঃ ৬৬৬। [illegible]

তথ্যগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো। গ্রন্থটি পড়তে পড়তে তাই এমন মনে হতেও পারে এ যেন কোন বৃহৎ ইতিহাসের একটি মূল্যবান খসড়া।

সজনীকান্ত তাঁর ইতিহাসে বাংলাগদ্যের বিকাশের দুটি যুগের কথা বলেছেন। প্রথম যুগের সূচনা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। অবশ্য তার আগেও একটি প্রাক-গদ্যযুগ আছে যার সূচনা প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। প্রথম যুগের সমাপ্তির কাল সজনীকান্ত ধরেছেন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে। তারপর থেকে দ্বিতীয় যুগের শুরু। এই যুগের স্মরণীয় ঘটনা হল রামমোহন রায়ের বাংলা গদ্য চর্চা, স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, সাময়িক পত্র-পত্রিকার উদ্ভব এবং প্রচার। বিদেশীদের বাংলাগদ্যের চর্চা এ যুগেও অব্যাহত ধারায় চলেছিল। মালদহে এলার্টন, বর্ধমানে স্টুয়ার্ট চুঁচুড়ায় হার্লি, মে ও পীয়ারসন এবং শ্রীরামপুর মিশনে ফেলিকস কেরী ও জন ক্লার্ক মার্শম্যান এ পর্বের উল্লেখযোগ্য লেখক। এঁদের কর্মজীবনের পরিচয় দিয়ে সজনীকান্ত বাংলাগদ্য সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

যে পর্বের ইতিহাস সজনীকান্ত রচনা করেছেন তা স্বভাবতঃই খুবই কৌতূহলের। কেমনভাবে বাংলাগদ্য গড়ে উঠল, কারা এই গঠন পর্বের প্রধান কর্মী কি ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য, কি ছিল তাঁদের সমস্যা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। সজনীকান্তের পূর্বে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন এবং বিশেষ করে সুশীলকুমার দে তাঁর ইংরেজিতে লেখা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। সজনীকান্ত মূলতঃ ব্রজেন্দ্রনাথের ধারা অনুসরণ করেছেন। সুশীলকুমার তথ্যের সঙ্গে বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন পুরোনো গদ্যের মূল্যায়নও করতে চেয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণের চেয়েও তথ্য সংগ্রহে মনোযোগ দিয়েছেন বেশী। সেইজন্যই তাদের রচনা পরবর্তী গবেষকদের কাছে আকর গ্রন্থ বিশেষ।

সজনীকান্তের ইচ্ছা ছিল আরো তিন খণ্ড প্রকাশের। যদি তা করতে পারতেন বাংলাগদ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরো বাড়ত সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তবে যে গ্রন্থটি তিনি লিখে গেছেন তাতেই তাঁর গবেষক খ্যাতি অম্লান থাকবে। সজনীকান্তের যে ভাবমূর্তি সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিত—তেই তিক্তভাষী, বিদ্রূপ পরায়ণ কঠোর সমালোচক—তার পরিচয় এই গ্রন্থে নেই এখানে আছে এক অক্লান্ত তথ্যান্বেষী এবং বিনয়ী পাণ্ডিতের পরিচয়। গ্রন্থের ভূমিকায় সজনীকান্ত লিখেছেন পূর্বগামীগণ যাহা দেখেন নাই আমি কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আমি যাহা দেখি নাই। স্বভাবতঃই অন্যে তাহা দেখিবেন। আমি এ বিষয়ে শেষ কথা বলিলাম এমন অহমিকা কাহারও থাকা উচিত নয় অন্ততঃ আমার নাই। এই সৌজন্যমূর্তি সজনীকান্ত বাঙ্গালী পণ্ডিতের আদর্শ হওয়া উচিত।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস : সজনীকান্ত দাস, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা : ১২, ১৯৭৫। পৃঃ ২৯২, দাম : পাঁচিশ টাকা।

কবিতায় গভীর কণ্ঠস্বর

শংকর চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে যে সম্ভাবনা ফুটে উঠেছিল তাকে অপূর্ণ রেখেই কবি অকালে চলে গেছেন। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে তাই বেদনায় মন ভরে ওঠে। কবিতাগুলির মধ্যে একটি গভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই দেখতে পাই এক আত্মমগ্ন যুবককে আমাদের প্রাত্যহিক সংসারের অসংখ্য সুখ-দুঃখ স্মৃতি বিস্মৃতির টুকরো টুকরো মেঘের মধ্যে তার দৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে কখনও ব্যথায় বিহ্বল তার দৃষ্টি কখনও বা জীবনের চলমান ছবিগুলিকে তিনি দেখছেন অসহায় চোখে। আর সেই সঙ্গে আমাদের মন দুঃখে বিস্তারিত হয়ে যায় যখন দেখি তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে আসছে সব কিছু ছেড়ে যাবার ধ্বনি সেকি তাঁরই আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাস?

শংকরের কবিতাগুলি আমাদের স্পর্শ করে তাদের আন্তরিকতার জন্য। কিংবা অন্য ভাষায় বললে তাদের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা ও সততা আমাদের আকর্ষণ করে। বেশ কিছুদিন ধরে আধুনিক কালের কবিতায় প্রাধান্য পাচ্ছে পরিশীলিত বাণী বিন্যাস অনেক সময় মনে হয় যেন শব্দের চতুর গ্রন্থনাই কবিত্ব, যেন পাঠককে ক্ষণকালের জন্য চকিত ও চমকিত করাই কবিতার শেষ লক্ষ্য। তার ফলে অনেক কবিতাই আমাদের মুগ্ধ করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অন্তরে স্থান পায় না, বাকচাতুর্যের শৈল্পিক নিদর্শন হিসেবে তাদের প্রশংসা করা চলে, কিন্তু কবিতার বিদ্যুতে তাদের উদ্দীপিত মনে হয় না। শংকরের কবিতাতেও সেই চাতুর্যের পরিচয় আছে তাঁরও অনেক সময়ই ঝোঁক একটি চমৎকার কাব্য রচনা, অনেক সময় তাঁরও লক্ষ্য একটি পরিশীলিত শব্দ চিত্র সৃষ্টি। কিন্তু সৌভাগ্যবশত শঙ্করের কবিতায় সেইটি শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পায়নি। তিনি বুঝেছেন কবিতা শব্দ দিয়ে তৈরী কিন্তু শব্দেই শেষ নয়। কবির কিছু বলা চাই আর বলা মানে এই নয় যে কবির অভিজ্ঞতার বিবৃতি কিংবা কোন মহৎ চিন্তার ছন্দোময় রূপান্তর। তাঁর কবিতায় মনে পাই সেই পুরুষকে যিনি জীবনের কোন মূল্যবান মুহূর্তকে অনুভব করেছেন আর সেই অনুভবটুকুকে শব্দের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন।

শংকরের কবিতার জন্য আমি কোন বিরাটত্ব বা মহত্ত্বের অসঙ্গত দাবী করছি না। শুধু দেখতে পাচ্ছি এই কবিতাগুলির মধ্যে একটি সম্ভাবনা ফুটে উঠছে। কবি সম্ভবতঃ একটি নিজস্ব ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন, তিনি সম্ভবতঃ তাঁর অন্বিষ্ট জগতের কাছাকাছি এসেছেন, এখনও তাকে নিজের করায়ত্ত করতে পারেননি, কিন্তু সেই জগতের তীররেখা ক্রমশঃই সংশয়ের কুয়াশা ভেদ করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই সন্ধানের প্রচেষ্টাই তাঁর কবিতাগুলিকে আন্তরিকতা দিয়েছে এবং কখনও কখনও গভীরতার স্পর্শ।

'কেন জন্ম, কেন নির্যাতনে'-র কবিতায় ছিল মুখরতা, কখনও কখনও কণ্ঠস্বরে বেশী প্রাবল্য এবং এক ধরনের চিন্তাক্লিষ্টতা। এই কাব্যে কবি নিজেকে অনেক বেশী বুঝেছেন, অস্থিরতা কমেছে, চিন্তায় এসেছে বুদ্ধির ছাপ। এখানে তাই শুনি 'জন্ম জন্ম বিষাদ যেন ফুল হয়ে ফুটে উঠছে পাষাণে' কিংবা সাড়া পাচ্ছি—'মানুষের ভাঙা বাসা গড়ে উঠছে জ্যোৎস্নায়' কিংবা 'তবু পথ ও গন্তব্যে কোন বিচ্ছেদ নেই/বিচ্ছেদ নেই প্রাণী ও উদ্ভিদে।' অনেক ক্ষেত্রেই কবিতায় লেগেছে গদ্যের কাঠিন্য, কবিতায় ফুটে উঠেছে একটা কিছু কঠিন অনুভবকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার তীব্রতা। আর সেখানেই পাঠক থমকে দাঁড়াবে, একটা কিছু গড়ে ওঠার সম্ভাবনা অংকুরিত হচ্ছে সেখানে, সেখানে অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা লড়াই করছে ভাষার সঙ্গে স্পষ্ট ও ঋজুভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য। পাঠকও কবির মতনই বুঝছে লেখেন কত কঠিন, কত রহস্যময়। অথচ যখন তা সত্যি সত্যি প্রকাশের পথ পেয়ে যায় তাকে মনে হয় কত সহজ আর কত সুন্দর। কবির কণ্ঠস্বরে লাগে প্রগাঢ়তা, শব্দগুলি স্পর্শ করে যায় বুকের ভেতরে :

> 'আর তো আমার কাজ বাকি নেই
> গৃহস্থ হে।
> আর তো আমার জীবন নদীর
> ঘুরতে ঘুরাতে সপ্তপদীর
> নেই প্রয়োজন—বিরাম এখন
> নাচছি এবার
> আর তো আমার নেই প্রয়োজন
> বেলা যে যায়
> বিন্দু বিন্দু রক্তকণায়
> ফুটছি নিজে—আপন চিতায়
> গৃহস্থ হে।

শিশিরকুমার দাশ

জোনাকী কুশে হরিৎ আলো। শংকর চট্টোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা—৭৩ মূল্য চার টাকা।

স্বপ্নলব্ধ বঙ্গদেশের ইতিহাস

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

একসঙ্গে এত বলদ এই কলিকাতা শহরেও পূর্বে কখনও দেখি নাই। ডাইনে বলদ, বামে বলদ, সামনে বলদ, পিছনে বলদ। যেদিকে তাকাই শুধু বলদ বলদ বলদ। গায়ে গা লাগাইয়া কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া আছে নীরব নিথর। উহাদের অর্ধনিমীলিত প্রশান্ত করুণ চক্ষু দেখিয়া শরৎচন্দ্রের মহেশের কথা মনে হইল। তবে বঙ্গীয় বলদ হইলেও, উহারা মোটের উপর বেশ স্বাস্থ্যবান। গঙ্গার ওপারে নির্মল আকাশে শরতের সাদা মেঘ মৃদুগতিতে ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিয়া মনে হয় কিছু ক্ষণের মধ্যেই মেঘখণ্ডগুলি বুঝি গঙ্গাবক্ষে ভাসমান অর্ণবপোত কয়টির মাস্তুলে স্পর্শ করিবে এবং তারপর গড়ের মাঠে পুঞ্জীভূত বলদের মেঘের সঙ্গে একাকার হইয়া মহাকাশে উড্ডীয়মান হইবে। নিশ্চল বৃষকুল সচল মেঘকুলের স্পর্শে পক্ষীরাজের ন্যায় ঊর্ধ্বাকাশে উড়িতে থাকিবে।

বলদ দেখিয়া ইতিপূর্বে কখনও এত ভাবের উদয় হয় নাই। বরং পথেঘাটে, বিশেষ করিয়া বাজারে যতবারই বলদ-সাক্ষাৎ হইয়াছে, প্রায় ততবারই উক্ত প্রাণীটির প্রতি একটু বিরক্তই বা হইয়াছি। হাতীবাগান বাজারে হাতী কখনও দেখি নাই, বলদ নিত্য দেখিয়াছি। একদিন ঐ বাজারের পশ্চিম ফটকে গণেশের পুরানো বই-এর দোকানে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের কান্ত কবি রজনীকান্ত বইখানি দর করিতেছি, এমন সময় একটি অতিকায় বৃষভ আমাকে যেন একেবারে কোণঠাসা করিল। গণেশের অনুরোধে বলদ মহোদয় আমাকে অবশ্য অচিরেই ত্যাগ করিলেন। সেবার গণেশের কৃপায় ত্রিলোকনাথের আশীর্বাদ লাভ করিয়া বলদের রোষ হইতে রক্ষা পাইলাম। পশুলোক নরলোক দেবলোক সেদিন যেন আমার কাছে একটি অখণ্ড লোক বলিয়া মনে হইল। কান্ত কবি রজনীকান্তকে লইয়া হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিলাম।

কিন্তু আজ এই সন্ধ্যায় এই বিশাল বলদ-সংগ্রহ আমাকে বিহ্বল করিল। এই ময়দানে অনুরূপ বিশাল জন-সংগ্রহ দেখিয়াছি। দেখিয়া বিহ্বল হই নাই। এমনকি ঐ সংগ্রহে প্রদত্ত বক্তৃতা শুনিয়াও বিহ্বল হই নাই। প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্যে বলদ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি। [illegible] এই অগণিত জীবন্ত বলদ দেখিয়া বিমূঢ় হইলাম। কাহার আহ্বানে ইহাদের এই সমাবেশ? কোথা হইতে এত বলদ আসিল? কলিকাতায় কি এত বলদ ছিল? না কি শহরতলি বা দূর-দূর গ্রাম হইতেও অনেক বলদ আসিয়াছে। ইহাদের দলপতিই বা কে। ইহাদের প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইল না ইহারা দূর-দূর স্থান হইতে বিনা টিকিটে রেলে চড়িয়া ময়দানে ফুটবল খেলা দেখিতে বা অনুরূপ কোন রাজনৈতিক খেলা দেখিতে কলিকাতায় আসিয়াছে। কোন জনগণমন অধিনায়কের শংখধ্বনি শুনিয়া এক দারুন বিপ্লব ঘটাইতে বা বিপ্লবাত্মক রীতিতে সংগৃহীত বাস লরি ট্রাক বোঝাই হইয়া ইহারা এই মাঠে উপস্থিত হয় নাই, তাহাও বুঝিলাম। উক্ত যানবাহনাদিও আশেপাশে দেখিলাম না। উহাদের দলপতির অনুসন্ধানে তৎপর হইলাম।

কিন্তু কৈ এমন একটি প্রাণী কোথাও দেখিতেছি না যাহাকে দলপতি বলিয়া ধরিতে পারি। দলপতি বেশি দেখি নাই, কিছু দেখিয়াছি। উহাদের অবয়ব, উহাদের পরিচ্ছদ, উহাদের চাহনি, উহাদের চালচলন দেখিয়া বুঝিতে পারি, উহারা দলপতি শ্রেণীর মানুষ। উহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই বুঝিতে পারি কোন দলপতির কণ্ঠস্বর শুনিতেছি। উহাদের বাচনভঙ্গির সঙ্গেও পরিচয় হইয়াছে। যখনই দেখিবে লোকগণের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় বাংলা ব্যাকরণের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা হইতেছে, যখনই যৌবনে ভাবের প্রকাশের জন্য উত্তেজনাময়ী হইতেছে, বুঝিবে কোন দলপতি বক্তৃতা করিতেছেন। কিন্তু এই বলদ সমাজ একেবারে নীরব। আর কোন একটি বলদ দেখিয়া মনে হইতেছে না ইনি বলদ-শ্রেষ্ঠ, বলদের সেরা বলদ, বলদ-দলপতি।

তবে কি ইহারা একদা লীডারশিপে বিশ্বাস হারাইয়াছে এবং কালেকটিভ লীডারশিপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দলপতির আসনটি শূন্য রাখিয়াছে? হায়, বলদ ইহা যদি করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি কিছুই করিতে পারিবে না। বঙ্গীয় বলদ হইয়া (আশা করি তোমাদের পিতৃ-পিতামহ ভাগলপুরী বা মুলতানী হইলেও তোমরা বাঙ্গালী) বঙ্গীয় মনুষ্যের ধ্যান-ধারণাকে এইভাবে উপেক্ষা করিও না। দল-পতি ছাড়া দলের কথা ভাবিও না। বঙ্গদেশের সমাজচেতনা রাজনৈতিক চেতনা আজ শতদলে প্রস্ফুটিত এই দলপতিদের ফুটিবার আসনায়। আগে দলপতি তারপর দল। এ দেশ এমন দলও আবির্ভূত হইয়াছে, যাহা দলপতির নামেই চিহ্নিত। কত অধ্যাপক পর্যন্ত সেই নাম-মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া সেই দলে ভিড়িয়াছেন। কত মানুষ সেই নামের ডাকে আজ মিলিয়াছে। বংকিম-চন্দ্রের মাকে প্রায় শতবর্ষ পরে আজ কত বাঙ্গালী চিনিতে পারিয়াছে, চিনিয়া তাহার জন্য মরিতে, অন্ততপক্ষে অন্যকে মারিতে প্রস্তুত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের আর একবার দেশকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়াছিলেন। আজ মায়ের সন্তানেরা অনেকে মাকে ডাকিতেছে, আর ভাবিয়া বলিতেছে অবলা কেন মা এত বলে। আর এই মাটিও তোমার ঐ রামপ্রসাদের মায়ের ন্যায় বড় সোজা মা নন। রামপ্রসাদের মা জগদম্বা হইয়া রামপ্রসাদের মা। মাটি আগে একের মা, পরে সকলের মা। রামপ্রসাদ মাকে শাসাইয়া ছিলেন, তিনি মাকে খাইবেন। এই মা তোমাকে খাইতে পারেন। রামপ্রসাদের মা কালো বরণ, দেখিতে বড় সুন্দর নন। এই মা কিন্তু ও-পাড়ার, লেডি মাকবেথ প্রভৃতি মহিয়সী মহিলার তিল তিল লইয়া এক অনন্যা তিলোত্তমা। তাই বলি দলপতি ছাড়া দল নাই বরং দল ছাড়া দলপতি হইতে পারে।

আহা, বলদ-প্রসঙ্গ হইতে বড় দূরে চলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইনি কে? হাঁটিতে হাঁটিতে এই বৃহৎ সমাবেশের পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি। দেখিলাম, এই অগণিত বলদগুলির দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছেন এক শাল-প্রাংশু মহাভুজ বৃষস্কন্ধ গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী। পরনে গেরুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, শ্বেত-কৃষ্ণ শ্মশ্রুর মধ্য দিয়া দুইটি চক্ষু হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বল-জ্বল করিতেছে। মাথার শ্বেতকৃষ্ণ কেশ জট পাকাইয়া চূড়ার আকার ধারণ করিয়াছে, দীর্ঘ জটাযূটে পরিণত হইয়া স্কন্ধ বাহিয়া নামিয়া আসে নাই। শান্ত সৌম্য মূর্তিটি দেখিয়া প্রথমে মনে হইল, বিনা পুণ্যে দেবদর্শন লাভ করিলাম। এমন একখানি মুখ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাহারও থাকিতে পারে কখনও ভাবি নাই। কিন্তু ইনি কে? রুদ্রাক্ষের মালা দেখিয়া ভাবিলাম, ইনি শৈব অথবা শাক্ত সন্ন্যাসী। কিন্তু ঐ দেখ মুখখানি যেন এক কোমল-হৃদয় বৈষ্ণবের মুখ। আবার কেন যেন মনে হইল ইনি এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। আর যদি উঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বুদ্ধিদীপ্ত ললাট এবং পাতলা ঈষৎ কৌতুকময় ও নিবদ্ধ ওষ্ঠদ্বয়ের দিকে তাকাও তাহা হইলে মনে হইবে ইনি কি গৈরিকধারী ভলতেয়ার বা বঙ্কিম। তবে ইনি বোধহয় বংকিমের বহু পূর্ব হইতে বাঙ্গালীর ধর্ম-কর্ম সকলই দেখিয়া আসিতেছেন। ইনিই বোধহয় গুপ্তযুগে বাঙ্গালীর বেদচর্চা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—আর্যাবর্তের শাস্ত্র মাথায় করিয়া লইলে বটে, উহাকে হৃদয়ে বসাইতে পারিবে না। আর্যাবর্তের সঙ্গে তোমার বিরোধ বিবাদ লাগিয়াই থাকিবে। ইনিই আবার পালযুগে বৌদ্ধ রাজাকে বুঝাইয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম সারাদেশ হইতে একদিন নির্বাসিত হইবে। সেনযুগে ইনি বাঙ্গালীকে বলিয়াছিলেন—রাষ্ট্ররক্ষা, রাষ্ট্রচালনা বাঙ্গালীর কার্য নয়। চৈতন্য-দেবের ভক্তদের ইনি ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—এত প্রেম এই চোর-ডাকাইতের দেশে বেশীদিন টিকিবে না। শাক্ত-কবি রাম-প্রসাদকে বলিয়াছিলেন—তবিলদারি নাহলে তুমি নিমকহারামি করিবে না সত্য, কিন্তু এই হালিশহরের এবং সারা বঙ্গদেশের আর সকলেই করিবে। রামমোহনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, যে ঈশ্বর-পূজায় কলাটা মুলাটা নাই, চোখের জল আছে, কিন্তু জিহ্বার জল বন্ধ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই, সে-পূজায় ঈশ্বর প্রীত হইতে হইতে পারেন, তাহাতে বাঙ্গালীর মন বা পেট কিছুই ভরিবে না। বংকিমকে বলিয়া-ছিলেন—অত বুদ্ধি, যুক্তি-তর্কের কথা বাঙ্গালীর বেশী দিন ভাল লাগবে না। অরবিন্দ, বিপিন পাল, সুরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন—আজ বঙ্গভঙ্গ রোধ করিলে বটে, কাল তোমাদের দেশ এই ইংরাজের সঙ্গে মিলিয়া তোমরাই দুই টুকরা করিবে। নিজেরাই উহাকে উড়াইয়া দিবে। স্যার আশুতোষকে বলিয়াছিলেন—উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটাইয়া তুমি অশিক্ষিত চোর-ডাকাইতের সঙ্গে অসংখ্য শিক্ষিত চোর-ডাকাইত যুক্ত করিয়া চুরি-ডাকাইতির ক্ষেত্রটি আরও প্রশস্ত করিয়া দিলে। সুভাষ-চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—তুমি দেশের জন্য প্রাণ দিবে কিন্তু তোমার দেশের মানুষ বলিবে, তুমি প্রাণ দাও নাই, তুমি তোমার প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া আছ। আর সর্বশেষে গান্ধীকে বলিয়াছিলেন—তোমার ঐ অহিংস নিরামিষ রাজনীতি এই খুনীর দেশে চলিবে না, তুমি খুনের রস বুঝিলে না, তুমি বাঙ্গালীকে ক রাজনীতি শিখাইবে?

কিন্তু আজ এই প্রাজ্ঞ কৌতুকময় সন্ন্যাসী এই বিরাট বলদ সমাবেশে কি বলিতে আসিয়াছেন? চাহিয়া দেখি, সন্ন্যাসী ধীর পদক্ষেপেই বলিবর্দ সমাজের অতি নিকটে আসিয়া উঁহাকে সম্বোধন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। একটি কি শব্দ উচ্চারণ করিলেন বুঝিলাম না। শব্দটি শুনিবামাত্র বৃষভগণ তৃণ ভক্ষণ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বুঝিলাম, সভা আরম্ভ হইয়াছে। আর সভাটি সর্বতোভাবে নিরাপদ ইহা বুঝিয়া আমিও সন্ন্যাসীর কথা শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলাম। বলদের হাত নাই, সে ছোরা লাঠি বন্দুক চালাইবে না। বলদ কথা বলিতে পারে না, সে চিৎকার করিবে না, গালি দিবে না। আর সভা শেষ হইলে এই শান্ত, ধীর স্থির বলদগণ ভিড় করিয়া পথিকের পথ আটকাইবে না, বাসে ট্রামে বাদুড়ের মত ঝুলিবে না। লক্ষ্য করিলাম, বলদগুলির শান্ত ভাব দেখিয়া কোন পুলিশও সভার ধারেকাছে আসে নাই।

সন্ন্যাসী সংযত অথচ উদাত্তকণ্ঠে যাহা বলিলেন তাহা এইরূপঃ সমবেত বৃষভ মহোদয়গণ, আপনারা মনুষ্যজাতির ভাষা বলিতে পারেন না কিন্তু বুঝিতে পারেন। আমি সেই ভাষাতেই আপনাদের কয়েকটি কথা বলিতেছি। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন। পশুকুলের মধ্যে আপনারাই শ্রেষ্ঠ। পশুরাজ বলিতে সিংহকেই বুঝায় ইহা সত্য এবং ভগবতী দুর্গা সিংহবাহিনী একথাও সত্য। কিন্তু স্বয়ং পশুপতি মহাদেবের বাহন বৃষ। এই বৃষই আবার শিব, শ্রীকৃষ্ণ সূর্য। মনুষ্য সমাজ, বিশেষ করিয়া বঙ্গীয় মনুষ্য সমাজ রসাতলে যাইতেছে। সেই বঙ্গীয় মনুষ্য সমাজের উদ্ধারের জন্য আমি আজ আপনাদের ডাকিয়াছি। আপনারা এই রাজ্যের ভার গ্রহণ করুন। আপনারা নির্বাক বলিয়া আপনারাই আমাদের এই বাক্‌সর্বস্ব অমৃতভাষী রাজনীতিতে এক নীরব সত্যপ্রিয়তা প্রআনিতে পারিবেন। আপনাদের হাত নাই, আপনারাই আমাদের এই হাতা-হাতি হানাহানির রাজনীতিতে এক নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করিতে পারিবেন। আপনারা তৃণভোজী নিরামিষাশী। আপনারা সে কর্মে যোগ দিলে আমাদের রাজনীতিতে দুঃশাসনের রক্তপান বন্ধ হইবে। আপনারা নিরক্ষর, কিন্তু জ্ঞানবান। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যাপকগণ রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়া রাজনীতিকে উন্নত করে নাই, শিক্ষার অবনতি ঘটাইয়াছে। আপনারা মন্থর গতি। আপনারা দেশব্রতী হইলে আমাদের রাজনীতির ঘোড়দৌড় বন্ধ হইবে। আপনাদের পারিবারিক জীবন বলিতে কিছু নাই, অনাসক্ত শ্রমণের ন্যায় আপনারা ঘুরিয়া বেড়ান। আপনারা রাজ্য চালাইলে আপনাদের পুত্র-কন্যা জামাতার জন্য চাকরি জুটাইবার অখ্যাতি অর্জন করিতে হইবে না। আপনাদের মধ্যে বর্ণ-ভেদ নাই। আপনারা সকলেই বলদ। আপনাদের রাষ্ট্রস্বার্থে বর্ণবৈষম্যের গলদ থাকিবে না। আপনাদের ভাষা নাই, আপনাদের নাম নাই, আপনারা [illegible]

জন্য অন্যের নামে কালি দিবেন না। আপনারাই যথার্থ অনাসক্ত কর্মযোগী। আপনারা ঘানি টানিয়া তৈল প্রস্তুত করেন, কিন্তু সেই তৈল আপনারা কোন-ভাবে ব্যবহার করেন না। এমনকি আপনা-দের প্রচুর পদযুগলে একটু তৈলদান করিয়া আপনাদের কার্যকাল বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করেন না। আপনারা মনুষ্য-জাতির কৃষিকর্মের পরম সহায়। কিন্তু সেই কৃষির ফলে আপনাদের আসক্তি নাই। আপনারা শর্করা প্রভৃতি কত সুস্বাদু বস্তু বহন করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনারা সেই সকল বস্তুর আস্বাদ কি তাহা জানেন না। গান্ধী যদি মনুষ্যদের বাদ দিয়া কেবল আপনাদের লইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন করিতেন তাহা হইলে ১৯২১ সালে আমরা স্বাধীন হইতাম। আর মানুষের কংগ্রেস ছাড়িয়া তিনি একটি বলদের কংগ্রেস সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে স্বাধীন ভারতের এই দুর্গতি হইত না।

বৃষভ মহোদয়গণ আজ আমি বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে আপনাদের কৃপা-ভিক্ষা করিতেছি। আজ বাঙ্গালীর বড় দুর্দশা। তাহাদের সব চাইতে বড় দুর্দশা এই যে তাহারা যে দুর্দশাগ্রস্ত তাহাই তাহারা বুঝিতেছে না। কলহ করিতে করিতে তাহাদের কণ্ঠনালী বিদীর্ণ। লোভ করিতে করিতে তাহাদের জিহ্বা জলসিক্ত কিন্তু হৃদয় বিশুষ্ক। আর সেই বিশুষ্ক হৃদয়টিও ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতায় জীর্ণ। প্রচণ্ড অহমিকাও সেই জীর্ণ হৃদয়কে স্ফীত করিতে পারে না। এমত অবস্থায় তাহারা বোমা ফাটাইয়া, বন্দুক চালাইয়া, পরস্পরকে গাল দিয়া চেঁচাইয়া, লাফাইয়া তাজা থাকিবার চেষ্টা করিতেছে। বাঙ্গালীর মনে আনন্দ নাই, তাই সে খুব হাসে। কোন গভীর দুঃখ বোধ নাই বলিয়া সে সহজেই কাঁদিতে পারে, মনে বল নাই বলিয়া সর্বদা আস্ফালন করে। নীতিবোধ নাই বলিয়া কেবল নীতি কথা বলে। ধর্মবোধ নাই বলিয়া বারো মাসে তের পার্বন করিয়া সর্বস্বান্ত হয়। স্ত্রীর প্রতি প্রেম নাই বলিয়া ভয়ে ভয়ে স্ত্রীকে মাথায় করিয়া রাখে। দেশের প্রতি প্রেম নাই দেশ দেশ করিয়া চীৎকার করে আর চিৎকার করিতে করিতে দেশ—বরেণ্য হয়। সর্বোপরি বৃষভ মহোদয়গণ বাঙ্গালী বড় 'স্বাস্থ্যহীন বড় রুগ্ন। তাহার শরীরের প্রায় সব যন্ত্র-গুলি বিকল। তাহার প্লীহা যকৃতের ক্রিয়া প্রায় বন্ধ। কেবল ফুসফুসটি লইয়া সে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। আপনাদের এই নধর দেহ, এ দিব্য কান্তি, এই শান্ত সৌম্য মূর্তি এই নীরব আত্মবিশ্বাস, এই গভীর আত্মমর্যাদা বোধ সকলই আপনারা লাভ করিয়াছেন আপনাদের সবল সুস্থ প্লীহা যকৃৎ হইতে। আপনাদের এই অনায়াস অক্ষয় প্লীহা যকৃৎ দেখিয়া দেব-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবাদিদেব মহা দেবকে পরামর্শ দিলেন আপনাদের তাহার বহন করিতে। আপনারাই এই সুপ্তপ্লীহা সুপ্ত যকৃৎ বঙ্গ সন্তানদের রক্ষা করিতে পারিবেন।

বৃষভ মহোদয়গণ আর বিলম্ব করিবেন না। আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখিবেন মারামারি হানাহানি করিয়া একেবারে অবসন্ন ও পঙ্গু হইয়া বাঙ্গালী রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছে। দেখিবেন কাহারও হাত নাই কাহারও পা নাই কাহারও চক্ষু নাই আর মস্তিষ্ক প্রায় কাহারও নাই। এখন আপনারা আসিয়া কর্মভার গ্রহণ করুন। ধর্ম এখন শঙ্খ রবে বাঙ্গালীকে আহ্বান করিতেছে। বাঙ্গালী মনুষ্য সে ডাকে সাড়া দিতে অশক্ত। আপনারা বাঙ্গালী বৃষভগণ সাড়া দিন আপনারাই সাধক, আপনারাই যোগী, আপনারাই ত্যাগী, আপনারাই দুঃসহ দুঃখ ভাগী। আপনাদের দুর্জয় শক্তি সম্পদ এই বঙ্গদেশে এক মুক্ত বন্ধ সমাজ সৃষ্টি করিবে। বাঙ্গালী মনুষ্য আপনাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাদের ন্যায় ধীর স্থির সংযত প্রাণী হইয়া উঠিবে। আপনাদের সংসর্গে থাকিয়া আপনাদের দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা কিন্তু তৃণ-ভোজী বলদে পরিণত হইবে। ভারত রতন বঙ্গ তখন অগণিত ধবল বলদে পরিপূর্ণ হইয়া জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে। আপনারা তখন অবসর লইবেন, এই নবজাত বঙ্গীয় বলদ কুলকে পরম স্নেহভরে আশীর্বাদ করিয়া ঐ নীলাকাশের রক্তিম মেঘ খণ্ড-গুলির সঙ্গে ভাসিয়ে ভাসিয়ে দিব্যলোকে উপনীত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের সুবিশাল বৃষভশালায় প্রবেশ করিবেন। এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন আসিবে সেদিন আসিবে।

বক্তৃতা যখন শেষ হইল তখন এই সুবিশাল গোষ্ঠে সন্ধ্যা নামিয়াছে। আমার ইচ্ছা হইল এক সুমহান বলদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এই সন্ন্যাসীর পাদস্পর্শ করিয়া তাহাকে বলি—যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম তাহার তুলনা নাই। কিন্তু নিমেষের মধ্যে সন্ন্যাসী এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেলেন। সেই বিরাট বলদ সমাজও ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া ঐ অন্ধকারে বিলীন হইল। আমি যেন এক স্বপ্নলব্ধ বঙ্গদেশের ইতিহাস বুকে লইয়া ময়দান পার হইয়া ঘরে ফিরিলাম।

একটি সফলতার কাহিনী

মিহির সিংহ

সেন সাহেবকে লোকে সেন সাহেব বলেই ডাকত—পাড়ার লোকেরা ঈর্ষামিশ্রিত সম্ভ্রমে কর্মসঙ্গীরা কর্মজগতে তাঁর কৃত-কার্যতার স্বীকৃতিতে। আত্মীয়-পরিজন এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলেও সেন সাহেব নামটা চলে গিয়েছিল—তার কারণ তাঁর অত্যান্ত সুস্পষ্ট সাফল্যমণ্ডিত জীবন।

সাহেবী পোশাক অবশ্য সেন সাহেব বেশি দিন হল পরেননি। সত্যি কথা বলতে গেলে তাঁর পুরনো পাড়ার বাসিন্দারা তাঁকে পাজামা-পাঞ্জাবি অথবা ধুতি-পাঞ্জাবি ছাড়া অন্য পোশাকে কল্পনা করতে খুব অভ্যস্ত ছিল না। এমন কি শার্টও যে তিনি এম-এর পরে যখন সরকারী চাকরিতে ঢুকলেন তার আগে কখনো পরেননি তাও তাঁর কোনো কোনো পুরনো বন্ধুর মনে ছিল।

কাহিনীটা তাহলে গোড়া থেকেই বলা দরকার।

সেন সাহেবের বাবা ছিলেন একটা

সেন সাহেবরা পাঁচ ভাই-বোন, দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হলেও 'মানুষ' হওয়াটা যে পয়সা করার চাইতে বড়, এই ধারণা নিয়েই বড় হলেন। তারপরে কোথা থেকে কী হল, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অন্য পাঁচজন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ছেলে যেমন না-ভেবে বসে যায়, তেমনি করেই সেন-সাহেবও বসে গেলেন। কিন্তু পাড়ার লোক এবং আত্মীয়-স্বজনেরা ক্ষুব্ধ হল এবং সেনসাহেবের পরিবারও বেশ একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল যখন সেনসাহেবের নাম ছাপা হল খবরের কাগজে, সফল পরীক্ষার্থীদের তালিকার প্রায় গোড়ার দিকে। নানারকম মন্তব্য শুনে, শুভেচ্ছা হজম করে, বাবা-দাদা-দিদিদের অসঙ্গতিতে ভরা মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে স্বপ্ন-ময় কয়েকটা দিন কেটে গেল। নিম্নমধ্যবিত্ত পাড়াটার মধ্যে প্রবল এক আলোড়ন তুলে সেনসাহেব যাত্রা করলেন সেই প্রচণ্ড শিক্ষা-য়তনের পথে যেখানে আত্মসচেতন ভারত-বর্ষকে শাসন করবার জন্যে কুলীন শাসক-

সেনসাহেব সাহেব হয়ে ফিরলেন। সাফল্যের মইটা শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

সেটা চাকরির দ্বিতীয় বছর। সেন-সাহেবের বেতন এমন কিছু নয়, যাতে করে সত্যিই সাহেবিয়ানাটা পোষানো যায়। কিন্তু তবুও এটা সত্যি যে চাকরির গোড়াতেই তিনি যা উপার্জন করছেন তা তাঁর বাবা পঁচিশ বছর ইস্কুল মাস্টারি করার পরে পেয়েছিলেন। আসলে কিন্তু বললে ভুল হবে যে সেনসাহেব এই পয়সার কথাটা ভেবেই সাহেব হয়ে গেলেন। বরং তিনি প্রয়োজনের তুলনায়, বিশেষত তাঁর নিজের কাছে ও আমাদের কাছে তাঁর পদের যে মর্যাদা ছিল তার তুলনায় উপার্জনটুকুকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবেই কম বলে মনে করতেন। আসলে এটা সমস্তটাই তাঁর মধ্য-বিত্তসুলভ সামাজিক স্বীকৃতি লাভের প্রয়াস মাত্র। তাও ঠিক না, এটা তাঁর সেই প্রয়াস ব্যাহত হওয়ার পরিচয়। যথা, পুলিশকে তিনি কলকাতার ছাত্র হিসেবে ভয়ই করে এসেছেন। আজ দেখলেন দুটো-তিনটে ঝকঝকে তারা-লাগানো মোটাসোটা প্রৌঢ় পুলিশ অফিসারেরা তাঁকে শুধু সেলামই করেন না, সসম্ভ্রমে করেন। আগে দেখেছেন সরকারী কর্মচারীরা হঠাৎ তাঁর বাবার ইস্কুলে এসে পড়লে বাবার বিব্রত হওয়ার পরিমাণ। আজ কিন্তু তিনি অব-লীলাক্রমে সরকারী মহলের নামজানা অনেক উপরের ধাপের অফিসারদের সঙ্গে সহজ ব্যক্তিগত পরিচয় দাবি করতে পারেন। তার মধ্যে অবশ্য অসত্য অনেকটাই, কিন্তু থিয়োরিগতভাবে তার মধ্যে অসম্ভব কোথায়? এটা তো অস্বীকার করা যায় না যে বাদুড়বাগান হাইস্কুলের অপরিচ্ছন্ন, লংক্লথের পাঞ্জাবি-পরা, নস্যি-নেওয়া প্রধান শিক্ষক শ্রীবিশ্বনাথ সেনের ছেলে শ্রীবিদ্যুৎ-কুমার সেন আজ নিজের নামের পাশে তিনটে অক্ষর লিখতে পারেন যার [illegible]-দর সত্যিই বড় ভাল।

কিন্তু মুশকিল হল ঐ লংক্লথের পাঞ্জাবি নিয়ে আর বাজার দর নিয়ে। লজিকটা খানিকটা এই রকম : চাকরিটা সত্যি। তার মর্যাদাও নেহাত সত্যি, বহুবার যাচাই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঐ দুখানা ঘরের মধ্যবিত্ত ভাড়াবাড়িটা আর তার মধ্যে যে পরিবারটি বাস করে সেটাও তো নেহাৎ মিথ্যে নয়। লোকে এই চাকরির উপার্জন যা মনে করে তার চাইতেও যদি কিছু বেশি হত সত্যিকারের উপার্জন, তাহলে হয়তো সাতজনের পরিবারটাকে টেনে আনা যেত একটা উচ্চমধ্যবিত্ত পাড়ায়, কেনা যেত দুটো একটা ভাল ফার্নিচার, আর লংক্লথে পাঞ্জাবিটাকে কেমিক্যাল দিয়ে স্থানভ্রষ্ট কর যেত। কিন্তু উপার্জন যখন তত নয়, তখ একমাত্র রাস্তা হচ্ছে নিজের একটা স্প স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করা, যাতে [illegible] সন্দে না থাকে যে জন্মটা নিতান্তই আকস্মি অস্তিত্বটাই একমাত্র ব্যক্তিগত ও অর্থপূর্ণ

হল, কেন তা ময়লা হবে, আর কেনই বা নস্যি নেওয়া। এ থেকে তো বোঝা যায় যে ওটা মানুষের ব্যক্তিগত রুচিরই ব্যাপার, আর্থিক সঙ্গতির ব্যাপার নয়। কাজেই সেনসাহেব একটু চেষ্টা করে জোগাড় করলেন এমন একটা জেলার কাজ যেখানে থেকে কলকাতায় আসা সহজসাধ্য নয় এবং না এলে লোকে খুব কিছু মনেও করবে না।

এই জেলায় এসে ধাক্কা খেলেন। জেলার কর্তা মোটেই সাহেব নন। তিনি আগের যুগের স্বনামধন্য অফিসার। মনে যারা ছোট তারা তাঁর নামে নিন্দে গেয়ে বেড়ায়। কিন্তু যাদের মতামতের দাম আছে এই নতুন রাজার যুগে, তারা জানে এ-লোক চাকরদের মোড়ল করবার জন্যেই জন্মেছে। মুখার্জি সাহেব এণ্ডির শেরোয়ানি কায়েছেন এবং পার্টি ছেড়ে বক্তৃতা রপ্ত করেছেন। রাজা পাল্টানোর সময়ে, একটু বেশি বয়েসে ফের মফস্বলে বদলী হওয়াতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, কারণ তিনি তো সেনসাহেবদের মতন একদানে একেবারে ওপরের ধাপটাতে ঠাঁই পাননি, তিনি জানেন যে প্রোমোশানের মই বেয়ে উঠতে হলে অত অল্পেতে ধৈর্যহারা হলে চলে না। যে যখন রাজা তার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলাটাই আসল। ফলে তাঁর অতীতে ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিপত্তি বর্তমানে আরো বেড়েছে, এবং তিনিও তা জানেন। সেনসাহেব এখানে এসে বুঝলেন, অর্থাৎ তাঁকে বুঝতে দেওয়া হল যে, শুধু পরীক্ষা পাস করলেই হয় না, চাকরি করতে শিখতে হয়।

স্পর্শকাতর সেনসাহেবের আহত মনের ব্যথা পল্লবিত হবার সুযোগ পেল এই জেলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যে। জেলাটি পশ্চিম বাংলায় একটি দারিদ্রতম বলে খ্যাত। ছাত্রজীবনে অর্থনীতির কূট তর্কগুলি আয়ত্ত করবার ফাঁকে সেনসাহেব এই তথ্যটি জানবার সুযোগ পাননি, কিন্তু এখানে কাজের খাতিরে জানলেন। শুধু তাই জানলেন না, তিনি বুঝতে পারলেন যে সরকারী কর্মচারীরা এই পরিবর্তিত যুগেও নগ্নভাবে সমাজশোষক ছাড়া আর কিছুই নয়। বুঝলেন যে টাই পরা, ডাকবাংলোয় বসে কাঁটাচামচেতে ভাত খাওয়া আর চাকরির বিদ্যালয়ে শেখা কায়দায় ইংরেজি বলে পুরনো কায়দায় কেরানীকুলকে মোহিত করার মধ্যে দাস মনোবৃত্তিই আছে, আর কিছু নেই। উপলব্ধিগুলো প্রায় রাতারাতিই হল।

এই সময়ে সেনসাহেব প্রেমে পড়লেন। এবং বলতে গেলে সেই জন্যেই এই গল্পের উৎপত্তি। প্রেমটা বেশ সাফল্যমণ্ডিতই হল। সেনসাহেবের শ্বশুর বহুদূর অতীতে ছিলেন বিশ্বনাথবাবুর সহপাঠী। শুধু সহপাঠী নন, বিশ্বনাথ তদানীন্তন শহরে সাড়া-জাগানো মেধার একান্ত অনুরাগী। কিন্তু সে অনেক দিন আগেকার কথা। বয়ে-যাওয়া দিনস্রোতের নিয়ম অনুসারে মেধাবী বিশ্বনাথবাবু শিক্ষক হয়েছেন এবং পালন করেছেন দারিদ্র্যপীড়িত সংসার। ওদিকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি নরেনবাবু প্রথমে চাকরি, তারপরে ব্যবসা, তারপরে রাজনীতি, তারপরে ব্যবসামূলক রাজনীতি করে অনেক টাকা, অনেক নাম, অনেক ক্ষমতা করেছেন। ভগবান তাঁর ওপরে সুবিচার করেননি। ছেলে দেননি, দিয়েছেন দুটি মেয়ে। বলা বাহুল্য দূরদর্শী বিচক্ষণ নরেনবাবু খবরের কাগজও পড়ে থাকেন এবং কোনো পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হতে দেন না। কাজেই বাঙ্গালী তরুণ সমাজের মুখোজ্জ্বলকারী বিদ্যুৎকুমারের সঙ্গে বাঙ্গালী সমাজের স্তম্ভস্বরূপ নরেনবাবুর বড় মেয়ের পরিচয় হতে খুব বেশি দেরী হল না। মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিদ্যুৎকুমারের জানা থাকলেও, হাতে-কলমে কোনো মেয়ের সঙ্গে নেহাত এইভাবে মেশা এইই প্রথম। ফলে প্রেম প্রায় গোড়া থেকেই এসে গেল।

বলা বাহুল্য, সেনসাহেবের লেখাপড়ায় যেমন ফাঁকি ছিল না, চাকরিতে যেমন মিষ্টি কথা আর খাতির ছাড়া ঘুষ নিতেন না এবং সাধারণভাবে দেশবাসীর সম্বন্ধে যেমন একটা সহজ সেবার প্রবৃত্তির ঔচিত্য নিয়ে কখনো কোনো সন্দেহ প্রকাশ করতেন না, তেমনি এই মোটামুটি শিক্ষিতা, সুশ্রী এবং খুশি-স্বভাবের তরুণীটির মন জয় করার ব্যাপারেও কোনো ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা কখনো করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারা বজায় রেখে পরকীয়া প্রেম, বন্ধনহীন প্রেম ইত্যাদি বেজায় আধুনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে থাকলেও, এই প্রেমটিকে অত্যন্ত কনজারভেটিভ নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। এমন কি বাসে-ট্রামেও অন্য তরুণীদের দিকে দৃকপাত করা যে তাঁর মতো লোকের পক্ষে অন্যায় সে বিষয়ে তাঁর নিজের কোনো দ্বিধা রইল না। স্বভাবতই তিনি কোমল স্বভাবের, কাজেই তরুণীটিকে শিষ্টতার ও কোমলতার লক্ষ্য হিসেবে পুরোপুরি গ্রহণ তো তিনি করলেনই, উপরন্তু নিজেকে তিনি সবসময়ে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করতে লাগলেন, নিজেকে নিজেরই প্রেমের যোগ্য করে তোলার জন্যে। অর্থাৎ যদি না তরুণীটি প্রথম দিন থেকেই, এমনকি বিদ্যুৎবাবুকে দেখবার আগে থেকেই বিজিত হয়ে থাকতেন তা এই কয়েক মাসের অধ্যায়টি প্রেমের এক মহৎ বিজয়ের কাহিনী বলে পরিগণিত হতে কোনো বাধা থাকত না।

প্রেম খুব দানা বাঁধল বিয়ের আগেকার ছয়-সাত মাসে। তখনকার অবস্থাটা বেশ গল্পের মতন। নরেনবাবুর প্রাচুর্য তাঁর দরাদারির শক্তিটাকে খর্ব করে রেখেছে। তিনি চান তাঁর মেয়ে সুখী হোক। এবং তিনি জানেন যে পয়সায় যখন কুলোয় না, তখন রাজনীতি করতে হয়। অতএব তাঁর পক্ষে দুর্বল হয়ে থাকা ছাড়া উপায়ই বা কী? কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁর ভূতপূর্ব সহপাঠীর না ছিল পয়সার জোর, না ছিল রাজনীতির অভিজ্ঞতা। ফলে তিনি তাঁর দুর্বলতাটিকে ব্যক্ত করলেন জেদের মধ্যে দিয়ে অভিমানে। তিনি বেশ বাঁধি-হীনতার সঙ্গেই বলতে থাকলেন যে, এ তাঁর ছেলেকে পর করার ষড়যন্ত্র মাত্র। শুধু তাই নয়, তিনি সহসা ইঙ্গিত করলেন যে তাঁর দূরসম্পর্কে এক আত্মীয়াকে কন্যাদায় থেকে মুক্তির আশ্বাস তিনি দিয়ে এসেছিলেন বহু আগে থেকেই, এবং সেটা উপেক্ষা করলে স্রেফ আপস্টার্টের মত কাজ হবে। বলা বাহুল্য যে সেনসাহেব তখন নেহাত আন্তরিকভাবেই প্রেমে পড়েছেন নরেনবাবুর কন্যার সঙ্গে। এবং নরেনবাবুর বাড়িতে এই তরুণ লাজুক স্বল্পভাষী (দুহিতাম্বয়ের কাছে নয়) বড় চাকুরেটির সম্বন্ধে বীরপূজা গোছের একটা ভাব চাকর-বাকর থেকে আরম্ভ করে গৃহকর্ত্রী পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ফলে এতদিন যেটা হয়নি এইবার সেইটা হল। সেনসাহেব আবিষ্কার করলেন যে অন্য কবিদের নাম করে নিজের লেখা কবিতা পড়ে শোনানো ছাড়া এই সুশ্রী কলকণ্ঠী তরুণীটির সঙ্গে অন্যান্য ব্যবহারও সম্ভব। যথা তার হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে প্রায় এক মিনিট ধরে রাখা। সে একটা অসহ্য আনন্দ।

যোগাযোগ হয়ে গেল। আর একটা বদলি হল। প্রায় কলকাতার মধ্যে একটা মহকুমার দায়িত্ব নিয়ে উত্তর থেকে নিচে নেমে এলেন সেনসাহেব। খুব জরুরী কোনো কাজ না থাকলে সেনসাহেবকে অবসর সময়ে পাওয়া যেতে লাগল নরেনবাবুর বাড়িতেই। সন্ধ্যাগুলো হঠাৎ হয়ে উঠল মোহময়। বাসিন্দার অনুপাতে অনেক বড় বাড়ি, যদিও নরেনবাবু লোক দেখানো আতিশয্য কখনই করেননি। তিনতলার বারান্দার পাশে একানে, ঘর, টেবল ল্যাম্পের মূল্যবান সংক্ষিপ্ত আলো আর পর্দায় টানা শান্ত নীরবতা দুটি মানুষের চিরপুরাতন নতুন-জানার খেলায় সৌন্দর্য আনল। সেনসাহেব আবিষ্কার করলেন অবিশ্বাস্য রকমের কোমল দুটি গাল, যাদের স্পর্শ করলে একটু হাড়-বার করা কাঁধটা উঠে ব্যগ্রভাবে তাঁর হাত চেপে ধরে গালের সঙ্গে। নরম রেশমের কিংবা অমসৃণ খদ্দরের তলায় দুটি নিতম্ব মোটেই কোমল নয় বরং চঞ্চল কঠিন পেশীবহুল। তারপরে যখন সেনসাহেবের মন ক্ষুব্ধ আহত তাঁর সরকারী জীবনের চাপে আর পারিবারিক জীবনের হীনতায়, এমন এক বসন্তী হাওয়ার সন্ধ্যায় বিধাতাপুরুষ ঈষৎ হাসলেন।

নরেনবাবুর এক আত্মীয় খুব অসুস্থ। খবর পেয়ে স্ত্রী এবং ছোট মেয়েকে নিয়ে গিয়েছেন চন্দননগরে। বড় মেয়ের শরীর ভাল নয়, তাকে রেখে গিয়েছেন বাড়িতে। বিকেলে সেনসাহেবের জীপ নিশ্চয়ই আসবে, নরেনবাবুর স্নেহশীলা স্ত্রী বলে গিয়েছেন তাঁকে এ-বাড়িতেই খেয়ে নিতে রাত্রে। এটা তেমন নতুন কিছু নয় তবে বাড়িতে ভৃত্যস্থানীয় ছাড়া আর কারো না থাকাটা একটু নতুনই বটে। বায়োলজি ইকনমিকসের ওপরে চিরাচরিত নিয়ম অনুসারেই জয়লাভ করল। এবং যেহেতু সেনসাহেবের স্বাভাবিক কৌতূহল ও [illegible]

বিষয়ে আনন্দ দেওয়ার ইচ্ছা, সেইহেতু অভিজ্ঞতাটুকু শুধু দুজনের কাছে প্রথম দিনকার বলেই বিশেষ হল না, শারীরিক তৃপ্তির দিক থেকেও দুজনের কাছে বিশেষ হয়ে রইল। পেন্যাল কোডের কথাগুলো সেনসাহেবের মাথায় ছিল না যে তা নয়—কমবয়সী মেয়ের সম্মতি থাকলেই যে আইনের কঠোর হাত থেকে বাঁচা যায় না, তা তাঁর মনে ছিল। কিন্তু প্রচন্ড প্রয়াসের পরে কয়েকটি অমূল্য মুহূর্তের জন্যে যে অতুলনীয় শান্ত, প্রসন্নতা তাঁর মনকে অধিকার করেছিল এবং তারও পরে প্রেয়সীর মাঝে যে তৃপ্ত কৃতজ্ঞতার ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন, তার স্মৃতিটুকুই তাঁর কাছে প্রধান হয়ে রইল। সম্পূর্ণ নতুন স্তরের একটা আত্মবিশ্বাস লাভ করলেন সেনসাহেব।

পরের দিন জেলার কর্তার খাস কামরায় একটা জরুরী বৈঠক ছিল। সেখানে পদাধিকারে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের গড় বয়েস সেনসাহেবের ঠিক দ্বিগুণ। সেনসাহেবের মতন পয়লা নম্বর চাকরি তাঁরা কেউই গোড়া থেকে পাননি, তাঁরা এসেছেন অনেক দুঃখে কষ্টে পদোন্নতির খিড়কি দরজা দিয়ে। সেনসাহেবদের মতন হঠাৎ-আমীরদের ঈর্ষাও করতেন, আবার পদে পদে ছোট প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও করতেন। এবং সরকারী মহলে অনভিজ্ঞতার চাইতে বড় প্রমাণ কী আছে ছোটত্বের? কিন্তু সেদিন পূর্ব-অভিজ্ঞতাই তাঁদের কাছে হয়ে উঠল বিষম ভার-স্বরূপ। তাঁরা এরকম বৈঠক এর পূর্বে বহু দেখেছেন। এবং ভবিষ্যতেও যে অনেক দেখতে হবে তাও তাঁরা জানতেন। কাজেই এর জন্যে বিশেষ কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেননি। তাছাড়া কেরাণীরা বা অন্য অফিসাররা তো হাতের কাছে আছেনই তাঁদের কাগজপত্তর আর লিখিত-অলিখিত বিধি-নিষেধের পুঁজি নিয়ে। অর্থাৎ তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে বৈঠকে তাঁদের উপস্থিতিই যথেষ্ট হবে। কিন্তু জেলার কর্তাকে আর স্ব স্ব মনিবকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে এবং পরস্পরের মধ্যে অনুপস্থিত দু-একজন সহকর্মীর চরিত্র ও কর্মজীবনের দুটি-একটি বিচ্যুতি নিয়ে জনান্তিক আলোচনা শেষ করতে না করতে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে ছোকরা বিদ্যুৎ সেন সভাপতির সমস্ত মনোযোগটি অধিকার করে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি অত্যন্ত যত্ন করে এবং উত্তেজিতভাবে কোনো একটা পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করছেন এবং সভাপতি প্রায় পুরো মন দিয়ে তাঁর কথা শুনছেন। প্রথমত তাঁরা অত্যন্ত লজ্জায় পড়ে গেলেন এই এটিকেট-বিরুদ্ধ নিষ্ঠায়। এটা কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পদস্থ কর্মচারী যে করতে পারেন তা তাঁরা ভাবতেই পারেননি। কিন্তু সে তো হল নীতিগত প্রশ্ন। আশু বিপদ তাঁদের কাছে এইটাই মনে হল যে ছোকরাটি ঘোষসাহেবের মতন ঐরকম জাঁদরেলকেও যেন ডিঙিয়ে এনেছে বলে মন হল। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাঁরা পেলেন যখন ঘোষসাহেবের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বলে পরিচিত প্রৌঢ়টি সেনসাহেবের জোরালো কথাগুলিতে ঘাড় নেড়ে সায় দিতে লাগলেন। এটা সকলেই জানতেন যে ঐ বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রৌঢ়ের এসব বিষয়ে একটা বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি আছে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে উপস্থিত রাজপুরুষেরা ত্বরিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বহুখ্যাত ক্ষমতার পরিচয় দিলেন। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়ে একদল সেনসাহেবের পক্ষ নিলেন এবং অপর দল সেনসাহেবের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চলে গেলেন। বলাবাহুল্য যে প্রচলিত প্রথা অনুসারে সমর্থকেরাই সেনসাহেবের পরিকল্পনাটিকে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলার ব্যাপারে বেশি সফলতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু এবারেও সকলে অপ্রস্তুত হলেন। সেনসাহেব তাঁর হঠাৎ-পাওয়া সমর্থকদের স্পষ্টই বলে বসলেন যে তাঁরা পরিকল্পনাটির কিছুই বুঝতে পারেননি। এইবারে জাঁদরেল ঘোষ-সাহেবের পাইপ পেরিয়ে একটু হাসি ফুটল। তিনি বৈঠকটিকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। একটু পরে কয়েকটি ছোট ছোট কাগজের টুকরো এসে পৌঁছল সেন-সাহেব এবং দু-এক জনের কাছে। আজ কারো বুঝতে বাকি রইল না যে জেলার নিভৃত রাজনীতিতে কার জয় হল। কিন্তু কেউই বুঝলো না যে সেনসাহেবের এই নতুন আত্মবিশ্বাসের উৎস কোথায়। সেনসাহেব নিজেও না।

জীবনের লয়টা হঠাৎ দ্রুত গেল। সকালটা হয়ে উঠল নতুন কামানো, আফটার শেভ লোশান-মাখানো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল গালের মতন। দুপুরটা যেন আঁটসাট পোশাক-পরা পরিচ্ছন্ন, কর্মক্ষম সৈন্যাধ্যক্ষ। অনেক উৎসাহ কিন্তু তার চাইতেও বেশি ক্ষমতা। অন্যের ত্রুটি সম্বন্ধে অসহিষ্ণু কিন্তু তার আসল কারণ নিজের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব। আর বিকেলগুলো রাত্রের সাররিয়ালিজমের আগে ইম্প্রেসানিজমের ঝড়ের মতন। ফুলের আকার নেই, শুধু তার সৌরভ। শুধু রং, সাদা, গোলাপী, চকলেট আর নীল বেগুনী শিরা। চুল কালো। চুল সোনালী। নরম আর উষ্ণ, কখনো বা লবণাক্ত স্বাদ। আর সব ছাপিয়ে আরামের আমেজ, গা-ভরা সুগন্ধ যা কোনো শিশিতে বিক্রি হয় না। সেনসাহেব তার মধ্যে ডুবে গেলেন, আবার ভেসে উঠলেন সফলতার মণি হাতে করে।

বিয়ে আর বদলি একসঙ্গেই প্রায় হল। নরেনবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিবেচনা শক্তির পরিচয় দিয়ে অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে অনুষ্ঠান করলেন। বিশ্বনাথবাবু কিছুতেই কোনো অজুহাত পেলেন না যাতে করে তিনি ছেলে অথবা বৈবাহিকের হঠাৎ বড়লোকিয়ানার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন। নরেনবাবু অবশ্য তাঁর প্রস্তরীভূত ভদ্রতা ও নীরবতার মধ্যে দিয়ে সকলের কাছেই প্রমাণ করলেন যে বড় মেয়ের বিয়েতে অবশ্যই তিনি দু-চার লাখ টাকা খরচ করতে পারতেন, কেবল বৈবাহিকের সম্মান রক্ষার জন্যেই নমো নমো করে পাত্রস্থ করলেন। পয়সাটা বড় নয়, জামাই-এর নিজস্ব গুণেই বড় তাছাড়া দেবার দিনতো আর ফুরিয়ে যায়নি।

বদলিও এই সময়ে হল। একেবারে খোদ সদর দপ্তরে। যাদের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল সেনসাহেবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের বাধ্য হয়ে বলতে হল যে আকাশে নতুন তারা উঠেছে। একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল যে সেনসাহেবের তখন বয়েস মাত্র পঁচিশ।

বিভারলি নিকলস-এর মতন সেনসাহেব অবশ্য ভাবলেন না যে পঁচিশ বছরেই তাঁর জীবনে গৌরবময় সৃজনী শক্তির যুগ শেষ হয়ে গেল। বরং তিনি আবিষ্কার করলেন যে তাঁর অনেক কিছু করবার ক্ষমতা আছে যা তাঁর সহকর্মীদের কাছে বিস্ময়কর এবং অনেকটা সেই জন্যেই মিসেস সেনের কাছে শ্লাঘনীয়। সেনসাহেব আবিষ্কার করলেন যে আসলে উচ্চ রাজকর্মচারীরা, যাঁদের বাইরে থেকে দেখতে হয় অনেকটা পুরু সম্ভ্রমের কাঁচের মধ্যে দিয়ে, তাঁরাও নিতান্তই গৃহপালিত জীব! মদ খাওয়া, ক্লাবে যাওয়া, কিম্বা নিজের বাড়িতে পরস্ত্রীদের সঙ্গে প্রেম করা, মোড়ের দোকানে চা খাওয়া কিংবা রকে বসে আড্ডা দেওয়া কিম্বা পাশের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার নাম করে নিষিদ্ধ আনন্দের উত্তেজনা অনুভব করারই নামান্তর মাত্র। শুধু সুযোগের ব্যতিক্রমে ভিন্ন পরিচয়, তা না হলে মনোবৃত্তি একই।

তবে দু-একজন যে অন্যরকম ছিলেন না তা নয়। শ্রীবিরূপাক্ষ মুখোপাধ্যায়, যিনি মুখোপাধ্যায় ছাড়া নাম সই করতেন না, তিনি ছিলেন এই দল-ছুড়াদের দলপতি-স্বরূপ। বিলেতে তিনি যাননি, বিদেশ বলতে গিয়েছেন জাপানে, তাও সরকারী খরচে এবং কয়েকটা সপ্তাহের জন্যে মাত্র। তবে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কারণ তিনি অবিবাহিত, তিনি বহু আধুনিক দেশী ও বিদেশী পত্রিকার গ্রাহক এবং সরকারী পিরামিডের একেবারে ওপর তলায় যে দু-চারজন আছেন তাঁদের ছাড়া আর সকলকে মুখে অশ্লীল বাংলা ভাষায় এবং লেখনীতেও ভাল ইংরেজিতে সমালোচনা করে থাকেন। তিনি বুদ্ধিমান লোক, তা না হলে কী করেই বা পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে এড়িয়ে সরকারী চাকরির এতটা উপরের দিকে উঠবেন। তিনি সেন সাহেবকে চিনতে দেরি করলেন না এবং সেন সাহেবকে প্রথমে একদিন কলকাতার এক চোখ ঝলসানো রেস্তোরাঁতে বসে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে উন্নতিশীল দেশের আর্থনীতিক উন্নয়ন সমস্যার উপরে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী বোঝালেন এবং দ্বিতীয় একদিন তাঁর নিজের বাড়িতে একটা ছোট্ট ঘরোয়া পার্টিতে নিয়ে এলেন যেখানে যতজন পুরুষ ততজন মেয়ে কিন্তু চেয়ারের সংখ্যা তাদের চাইতে কম। সেখানে পুলিশ বিভাগের একজন কুলীন কর্তা, অতি-আধুনিক আপাতদৃষ্টিতে

পত্রিকার একজন সম্পাদক, ইংরেজি ভাষা ও চলচ্চিত্রের একজন অত্যন্ত নামকরা সমঝদার এবং মুখোপাধ্যায় সাহেব ও সেনসাহেব ব্যতীত আর কোনো পুরুষ ছিলেন না। মহিলারা যাঁরা অবশ্য উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ততটা নামকরা কেউ নয়, তবে তার জন্যে অসুবিধের চাইতে সুবিধেই হল। পার্টি কী ভাবে জমাতে হয় তা সেনসাহেব বেশ হাতে-কলমে শিখলেন। বিবাহের গণ্ডির বাইরে সেনসাহেবের মহিলা সংযোগ সেইই প্রথম।

উন্নতিশীল দেশে আর্থনীতিক সমস্যার উপরে বিরূপাক্ষবাবু যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটা অবশ্য মাসখানেক পরে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাতে গিয়ে সেনসাহেব দেখলেন একজন নামকরা বিদেশী পণ্ডিতের নামে প্রবন্ধের আকারে। কিন্তু তাতেও বিরূপাক্ষবাবুর সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধার ভাব খুব কমলো না। অন্যান্য সকলে বিরূপাক্ষবাবুর কীর্তি-কলাপ শুনে সেগুলোকে নিজেদের জীবনে অসম্ভব মনে করে তাঁকে সোজাসুজি সম্ভ্রম অথবা ঈর্ষার চোখে দেখতেন। সেনসাহেব কিন্তু বুঝলেন যে এগুলোর কোনটাই তাঁর নিজের ক্ষমতার নাগালের বাইরে নয়। ইচ্ছে করলে বা লেগে থাকলে তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় বিরূপাক্ষ হওয়া খুব মুশকিল নয়। দ্বিতীয়ত তিনি বুঝেছিলেন যে আসলে এসব ক্রিয়া-কলাপ বিরূপাক্ষবাবুর বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে যতটা তার চাইতে বেশি নিজের চারিপাশে একটা বিস্ময়ের মায়াজাল রচনা করা যাতে করে নেহাত চাকরি তথা অর্থ তথা ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলতা লাভ সহজতর হতে পারে। কাজেই সেনসাহেবের শ্রদ্ধার মূল কারণ এই যে তিনি বিরূপাক্ষবাবুর সাফল্য লাভের প্রয়াসকে এবং তার জন্যে প্রচলিত রীতির বাইরে যেতে পারার সাহসকে শ্রদ্ধা করলেন। সেনসাহেব সাফল্যকে এতদিনে স্পষ্টভাবে পুজোর বেদীতে তুলতে পারলেন।

সেনসাহেবের জীবনে তাঁর গৃহিণীর প্রভাব কিন্তু কম ছিল না। সেনসাহেবের মনের ভিতরে একটা কোমলতা ছিল যেটা প্রায় প্রথম থেকেই মিসেস সেনের চোখে পড়েছিল। বিশেষ করে যেটা মিসেস সেনকে আকৃষ্ট করেছিল সেটা সেনসাহেবের অন্যের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে চলার অভ্যাস। তাই বলে সেনসাহেবকে দুর্বল মানুষ বলেও মনে হত না-বসে-ভেবে কোনো কর্মপন্থা ঠিক করা বা সেই অনুসারে কাজ করে চলা সেনসাহেবের চরিত্রগত। প্রথম দিকে নতুন প্রেমের আতিশয্যে অবশ্যই বাইরের কর্তব্যে অবহেলা ঘটত, কিন্তু বিবাহিত জীবনে সেটা কমে এল। বস্তুত দাম্পত্য জীবনে সেনসাহেবের কোনো ত্রুটি পাওয়া মুশকিল হল। সকাল নটায় কাজে বেরোনোর তাড়া। সেন-গৃহিণীর অনভিজ্ঞতার জন্যে যা-কিছু দেরি বা দুর্ঘটনা তা তাঁর দিক থেকেই হত, সেনসাহেবের দিক থেকে নয়। আর তিনি যে সেনসাহেবের চাইতে বয়েসে ছোট, এবং অনেক বেশি অবস্থাপন্ন বাড়িতে মানুষ একথা সেনসাহেবের মনে থাকত। রাগ করা কিম্বা বিরক্ত হওয়া যে উচিত নয়, তা কখনো সেনসাহেবের ভুল হত না। কোনো দু-একদিন না খেয়ে বেরোতে হলেও সেনসাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটত না। বলা-বাহুল্য যে ধৈর্য তিনি হারলেই বোধহয় মিসেস সেনের কাছে ব্যাপারটা সহজ হত। দুপুরে টেলিফোন করে সেনসাহেবের খাওয়া-দাওয়ার খবর নিয়েও মিসেস সেনের অপরাধী ভাব যেত না। উপরন্তু বিকেলে যখন সেনসাহেব একমুঠো লজেন্স কিম্বা ফুল নিয়ে বাড়ি ফিরতেন তখন মিসেস সেনের মনে হত স্বামীকে খুন করলেও বোধহয় রাগ মেটে না। সেনসাহেব কিন্তু বিশেষ করে সৌজন্য আর আদরের আয়োজন করতেন। বেশির ভাগ দিনই সন্ধ্যার গভীরতার সঙ্গে মিসেস সেনের দৈহিক প্রবণতাগুলো তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধেও সাড়া দিত সেনসাহেবের আবেগের কাছে। সেনসাহেব যেন বেশি করে ভালবাসতেন সেদিন, মিসেস সেনেরও আবেগ আর তারপরেকার তৃপ্তি যেন লড়াই লাগিয়ে দিত মনের মধ্যেকার অপরাধী ভাবের সঙ্গে। অনেক রাত্রে যখন ঘুম ভাঙ্গাত দেখতেন পাশ ফিরে পাঁচ বছরের শিশুসুলভ অসহায়তা নিয়ে সেনসাহেব ঘুমোচ্ছেন তাঁর একটা হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে। কী একটা তীব্র অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। জানলার পাশে বসে একটা খুব নরম প্যাঁচা উশখুশ করে বন্ধুত্ব করত আরো নরম বহুদূর থেকে ভেসে-আসা পেটা-ঘড়ির শব্দের সঙ্গে। বিকেলে পাওয়া রজনীগন্ধার ডাঁটিগুলো জানলা বেয়ে আসা ফ্যাকাশে জ্যোৎস্নার দীর্ঘ তির্যক রেখাগুলোর যেন প্রতিধ্বনি করত। ঘরের ভিতরটা বাইরের গভীর রাতের ঝিরঝিরে হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভারী হয়ে থাকত। মিসেস সেন অনেকক্ষণ কাঁদতেন, খুব আস্তে, খুব লজ্জিতভাবে। তারপর একসময়ে ঘুমিয়ে পড়তেন।

আরো কিছুদিন কাটল। চাকরিতে আর এক-ধাপ উঠলেন সেনসাহেব। বন্ধুদের সংখ্যা কমল, শত্রু কিছু বাড়ল। সেনসাহেব আরো গভীরভাবে বুঝলেন উন্নতি করাই জীবনের ধর্ম, তবে পয়সার দিক দিয়ে শুধু নয়। আগের চাইতে অন্য মানুষের কাছ থেকে ব্যক্তিগত আশা তিনি আরো কমিয়ে আনলেন। তবে নিজের দিক থেকে কোনো ত্রুটি প্রায় রাখলেন না। উপরওয়ালারা নিশ্চিন্ত হলেন যে, বয়েসে কাঁচা হলেও বুদ্ধিতে এত পাকা লোক মেলে না। কোনো কাজ হাতে নিলে এ লোক নিশ্চয়ই তা করে ফেলবে। তবে কোনো কাজ হাতে নেওয়ার আগে তার সঙ্গে নিজের উন্নতির পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ যোগাযোগটাকে যে কোনো ব্যবসায়ীর মতন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে নেয়। কাজ হয়ে গেলে অত্যন্ত ভদ্রভাবে এবং সুবিধামতন সময়ে নিজের প্রাপ্যটুকু আদায় করে নেয়। উপরওয়ালারা সত্যিই খুব খুশি হলেন কারণ যেসব কর্মচারীরা নিছক উৎসাহের জন্যে কাজ করে, তাঁরা তাদের ঘোরতর অবিশ্বাসের চোখে দেখে থাকেন।

বাড়ির মধ্যে সেনসাহেব আরো কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠলেন। অকারণে তো দূরের কথা, কোনো কারণ থাকলেও তাঁকে মেজাজ খারাপ করতে দেখা যেত না। ক্রমে ক্রমে আর্থিক অবস্থাও ভাল হতে লাগল। কিন্তু মিসেস সেনের মনে শান্তি এল না। দু-একবার সেনসাহেবের সঙ্গে প্রকাশ্যেই অবনিবনা হল, বাপের বাড়িতেও গেলেন। কিন্তু সেখানেও সেনসাহেবের সম্বন্ধে কারো মতদ্বৈধ ছিল না। মিসেস সেনও তাঁর স্বামী সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতামত শুনতে নিশ্চয়ই চাননি, এবং তা শুনতে তিনি পেলেনও না। উপরন্তু সেনসাহেবের ব্যবহারে পরিবর্তন যদি কিছু হল তা আরো কোমলতার দিকে। অসতর্ক মুহূর্তে মিসেস সেনের মনের মধ্যে হু-হু করে গ্লানি ভরে আসত। নিজের কাছে গোপন করতে পারতেন না যে স্বামীর প্রতি বহু অসঙ্গত ব্যবহারের অপরাধ জমা হয়েছে। যেন জীবনের চরম ভালবাসার পাত্রটিকে আঘাত না করে থাকাটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কেন যে এমন হয় তা তিনি বুঝে উঠতে পারতেন না। ক্রমাগত টেলিফোনের কাছে যেতেন স্বামীকে বলতে—ওগো আমার দোষ হয়েছে, ছোটোমি আমি করেছি, তোমার তো কোনো অপরাধ নেই, আমাকে আজ নিয়ে চল, আবার আমি আমাদের ভাঙ্গা জীবন গড়ে তুলব। কিন্তু বারবারই পৌঁছিয়ে আসতেন, কোনো একটা না-পাওয়া আঘাতের আশংকায়। মনকে প্রবোধ দিতেন—তিনি তো আসবেনই আপিস থেকে ফেরার পথে। আসতেনও তিনি। হাতে কিছু একটা ছোটো খাটো জিনিস, ফুল, কি রঙ্গিন ফিতে কি কোনোদিন একবাকস সন্দেশ কি কেক। মুখে সারাদিনের ক্লান্তির ছাপ, পোশাক মোটেই নিখুঁত নয়। মিসেস সেন অপ্রস্তুত সলজ্জ মুখে দোতলার বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসতেন, সেনসাহেব আহত হাসি ঢেকে অত্যন্ত নিচু গলায় বলতেন—কেমন আছ, সারাদিনের খবর কী? মিসেস সেনের মনটা যেন দপ করে নিভে যেত, তিনি অনেক ভিতরে অনেক দূরে চলে গিয়ে ক্ষীণতর হাসি টানবার চেষ্টা করে হাত থেকে জিনিসগুলো নিতেন। কিছুই বলতে পারতেন না। মা এগিয়ে আসতেন, মেয়ের দিকে উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উদ্বেগ-ভরা গলায় সেনসাহেবের সমস্ত তুচ্ছ খবরগুলো নিতেন, মেয়েকে বলতেন তোয়ালে দিতে, জামাইকে চায়ের টেবিলে—না থাক, তার নিজেরই ঘরে চা দিতে। মিসেস সেন চায়ের টেবিলেই চা দিতেন। জিজ্ঞাসা না করেও বুঝতেন যে সেনসাহেব সকালে ভাত খাননি। ভয়ানক রাগ হত। মনে মনে যেন ফেটে পড়তেন। কেন, এত গোছানো স্বভাব, এত কাজের

লোক, অথচ নিজের খাওয়ার ব্যবস্থাটা করে নিতে পারেন না? লোকজন তো সব আছে—নাকি তারা মরেছে? কোনো এক সময়ে চা খাওয়া শেষ হত। সেনসাহেব ইতস্তত করে বলতেন—চলো না ওঘরে যাই। ওঘর মানে তিনতলার বারান্দার প্রান্তে মিসেস সেনের পুরনো ঘর, নিজের ঘর। মিসেস সেনের মনে হত এটা কত বড় অন্যায়, ঐ ঘরে কত স্মৃতি জড়ানো আছে, ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়া মানে তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করার মতন। তবু যেতেন, ওঘরের আকর্ষণ এড়ানো তো সহজ নয়। সেনসাহেব অতি ধীরে সন্তর্পণে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিতেন, মাথায় চুমু খেয়ে চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্রায় শোনা যায় না এত নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করতেন—চুল বাঁধনি কেন? মিসেস সেন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলতেন। সেনসাহেব বিষম বিচলিত হয়ে পড়তেন। বলতেন—আমি কি তোমাকে অনেক কষ্ট দিই? মিসেস সেন আর সহ্য করতে পারতেন না। ছুটে বেরিয়ে যেতেন ঘর থেকে। অনেকক্ষণ পরে মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে যখন আসতেন মা খুব গম্ভীর হয়ে বলতেন—বিদ্যুতের একটা তাড়া ছিল, ও চলে গেছে, পরে ফোন করবে। বলে, আর একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখতেন। বড় অভিমানী মেয়ে, জামাইয়ের কাছে যেতে বললে হয়তো আর কোনো দিন বাপের বাড়ি আসবেই না।

তাই বলে সব সময়েই যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা এইভাবে চলত তা নয়। বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব আসতেন সেনসাহেবের। তাঁরা মিসেস সেনের সপ্রতিভ আতিথেয়তায় মুগ্ধ হতেন। তাঁদের প্রশংসার দৃষ্টি আর কথায় মিসেস সেনের চাইতেও যেন সেনসাহেবের তৃপ্তি বুক ছাপিয়ে উঠত। স্ত্রীর গাল টিপে বলতেন—তুমি আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ, জানো, আমি যদি ওদের জায়গায় থাকতাম তো তোমাকে নিয়ে অনেক কিছু রঙিন কল্পনা করতাম। মিসেস সেন স্বামীর বুকের মধ্যে মাথা ঘষে বলতেন—আমাকে খোসামোদ করে মাথায় তুলো না। আবার কোনো দিন মিসেস সেন যেতেন তাঁর কোনো বান্ধবীর বাড়িতে কিম্বা তাঁর পুরনো কলেজে। সন্ধ্যাবেলায় স্বামী যেতেন হয়তো তাঁকে আনতে। সেনসাহেব তখন সবে একটা দুটো কাগজে অর্থনীতির উপরে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছেন। বাইরের লোকে তখনো তাঁকে শুধু বড় চাকরে বলেই জানে। কিন্তু মিসেস সেনের বান্ধবীদের কাছে বা তাঁদের স্বামীদের কাছে সেনসাহেব খুব ফেলনা তো নিশ্চয়ই নন। আর সেনসাহেবের চোখে আর স্বল্পবাক রসিকতার মধ্যে যে বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশ পেত তাতে তাঁর স্ত্রীর মনে হত অন্য মেয়েরা আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। তাঁর সে ঈর্ষা-মিশ্রিত গর্বের যেন তুলনা হয় না অন্য কোনো মনোভাবের সঙ্গে। সেদিন বাড়ি ফিরে এসে তাঁর উগ্র আকাঙ্ক্ষায় সেনসাহেবই অবাক হয়ে যেতেন।

এই রকম এক অধ্যায়ে একদিন সেনসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এলেন বিরূপাক্ষ মুখোপাধ্যায়। সেনসাহেব অসুস্থ ছিলেন, বিরূপাক্ষবাবু শোবার ঘরেই বসলেন। মিসেস সেনের সঙ্গে অবশ্য তাঁর পরিচয় ছিলই। তবে তা খুব বেশি নয়, যদিও তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্পই মিসেস সেনের শোনা ছিল। বিরূপাক্ষবাবু মহিলাদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারেন এবং পছন্দ করেন তা কারুরই প্রায় অজানা ছিল না। কাজেই তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই যে অনেক মজার মজার এবং শালীনতার কান-ঘেঁষে-যাওয়া গল্প বলবেন এবং বলতে থাকবেন তাতে সেনসাহেব আশ্চর্য হলেন না। কিন্তু আশ্চর্য হলেন মিসেস সেনের অভাবিত উৎফুল্লতায়। তিনি যেন পনেরো বছরের মেয়ের মতন উচ্ছল হয়ে উঠলেন।

এইখানে অবশ্য সেনসাহেবের সঙ্গে বিরূপাক্ষবাবুর সম্পর্ক নিয়ে দুটি-একটি কথা বলা যেতে পারে। বিরূপাক্ষবাবুর সঙ্গে সেনসাহেবের প্রথম পরিচয়ের পর কিছুদিন কেটে গিয়েছে। এর মাঝে সেনসাহেবের আর এক ধাপ পদোন্নতি ঘটেছে। কিন্তু বিরূপাক্ষবাবু সেখানে ছিলেন সেখানেই রয়ে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অন্যদিক থেকেও দুজনের মধ্যে দূরত্ব কমে গিয়েছে। সেনসাহেবের মধ্যে ছেলেবেলা থেকে যেসব ভাল-লাগা মন্দ-লাগা পারা না-পারাগুলো ছিল, যার জন্যে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ধুতি-পাঞ্জাবির যুগেও সাহেব বলে ঠাট্টা করতেন, সেগুলো প্রায় পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। তিনি ভারতীয় খুব ভাল গানের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য গানও যে খুব পছন্দ করেন ও বুঝতে পারেন তা তিনি আর গোপন করে রাখেন না। ইংরেজি ভাষাটা তিনি বাংলাভাষার চাইতে বেশি রপ্তই শুধু করেন নি, তা স্বীকারও করে থাকেন অকুতোভয়ে। সাহেবদের ভোজন পদ্ধতি ছাড়া আর পোশাকের আঁটসাঁটপনা ছাড়া সব কিছুই তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন! অর্থাৎ তিনি সত্যিই মনের দিক থেকে সাহেবীয়ানার বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করেছেন। এবং সেই জন্যে বিরূপাক্ষবাবুর ফাঁকিগুলো চোখে পড়ে আজকাল। তিনি বোঝেন যে বিরূপাক্ষবাবুর সাহেবীয়ানা রুচিতে নয় রীতিতে, দীক্ষায় নয় শিক্ষায়। তিনি পোশাক অনেক নিখুঁতভাবে পরেন কিন্তু তার জন্যেই তফাতে থাকেন প্রকৃত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির থেকে। তবুও বিরূপাক্ষবাবুকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেন না সেনসাহেব। প্রথমত তিনিও সফল চাকুরে বলে, দ্বিতীয়ত তিনি যে ওবু সমঝদারের কাজটাও করতে পারেন, সেটাই বা কে করবে? যাই হোক, সন্ধ্যাটি বেশ ভরে উঠল, অসুস্থ সেনসাহেবের ক্লান্ত নীরবতা সত্ত্বেও। সেনসাহেবের ক্লান্তি আরো ঘনিয়ে উঠল যখন নিঝুম রাতে ঘুম ভেঙে দেখলেন মিসেস সেন জানলার পাশে বসে শুক্লপক্ষের কলকাতার উপর দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে গুন গুন করে গান করছেন বেদনাপ্লুত আনন্দের উপলব্ধির মতন।

সেনসাহেবের শরীরটা আর সারতে চাইল না, কিন্তু কাজে ফাঁকি দিলেন না। উপরন্তু সরকারী কাজ ছাড়া লেখাপড়ার কাজ আরো বাড়িয়ে দিলেন। নিজের দপ্তরের কাজ ছাড়াও তিনি অন্য আর একটি কাজের আংশিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন। লেখাও একসঙ্গে অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল—বিদেশী দুটো-একটা একেবারে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাতেও। মিসেস সেন তাঁর বর্ধমান খ্যাতিতে খুশি হলেন কিন্তু তাঁর শরীরটা মেরামত করতে পারলেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রম আর ক্লান্তির কথা তুলতে গিয়ে স্বামীর মনের নাগাল পেলেন না। সেন সাহেব শুধু সামান্য হেসে তাঁর কোমর জড়িয়ে টেনে নিয়ে একটু মৃদু আদর করে হাতটা দিয়ে আসে, করে তাঁর শরীরটাকে অনুভব করে ছেড়ে দিলেন। মিসেস সেনের চোখ ভারী হয়ে উঠল। সেদিন দুপুরে সেন সাহেব কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছেন। বিরূপাক্ষবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে মিসেস সেন সিনেমায় যাবেন ঠিক করলেন। তিনটের থেকে ছয়টা পর্যন্ত শো, বাড়ী ফিরলেন প্রায় সাড়ে নয়টায়।

বিরূপাক্ষবাবুর একটা জরুরী কাজ ছিল পরের দিন। তিনি সেটাকে শেষ করলেন ঊর্ধ্বশ্বাসে। কিন্তু মিসেস সেন রাজি হলেন না। বিরূপাক্ষবাবু অবশ্য এধরনের দ্বিধায় খুব অনভ্যস্ত নন। তিনি খুব সুন্দর ছোট্ট একটা ইংরেজি চিঠি লিখে ঠিকানাটা টাইপ করে পোস্ট করে দিলেন মিসেস সেনের কাছে। দুটি চিঠিই মিসেস সেন পেলেন একসঙ্গে। বিরূপাক্ষবাবু মাপ চেয়েছেন তাঁর অপরাধের জন্যে, বিশেষ করে সেন সাহেব তাঁর বন্ধু এবং বাংলাদেশের এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্রস্বরূপ বলে! কিন্তু তিনি এও বলেছেন যে মিসেস সেনের মোহিনী শক্তি তাঁর মতন ক্ষুদ্র পুরুষের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সেন সাহেবের চিঠি অনেক বড়। তিনি বাংলায় আরম্ভ করেছেন, শেষ করেছেন ইংরেজিতে। নিজের নিম্নমধ্যবিত্ত দীনতাপূর্ণ বাল্য ও কৈশোর থেকে শুরু করে চাকরি পাওয়া, চাকরি পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করা, প্রেয়সীকে পাওয়া, নিজের জীবনে প্রেয়সীর সর্বব্যাপক প্রভাব ইত্যাদি, সবই তিনি ফাইলের ওপরে নোট লেখার মতন নিখুঁতভাবে লিখেছেন। বিরূপাক্ষবাবুর সম্বন্ধে সমালোচনার কথা কিছুই লেখেননি, লিখেছেন তাঁর সন্দেহাতীত তীক্ষ্ণতার কথা। এবং শেষকালে জিজ্ঞাসা করেছেন যে মিসেস সেন কি বিরূপাক্ষবাবুর প্রেমে পড়েছেন?

সেদিন বিরূপাক্ষবাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যাযাপনের পর থেকে মিসেস সেনের মনে একটা হতাশা তাঁকে গ্রাস করল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি মনে মনে খেলা করলেন আত্মহত্যার চিন্তা নিয়ে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আবার বিরূপাক্ষবাবু তাঁর নিয়মিত আড্ডা বাতিল করলেন। অনেক রাত্রে মিসেস সেনের ঘুম ভেঙে কেমন গুলিয়ে গেল তিনি নিজের বাড়ীতেই আছেন না

বিরূপাক্ষবাবুর বাড়ীতে। বিছানা হাতড়ে উঠে বসে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।—কোথায় নিশ্চিন্ত? একটা তীব্র রাগ-দুঃখ-অভিমান ফেটে পড়ল। কয়েক বছরের পুরনো বিয়ের বাঁধাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, ঝন্‌ঝন্‌ করে কাচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর মনে হল সমস্ত বাড়ী, সমস্ত শহর, সমস্ত সমাজ যেন ছি-ছি করে উঠল সেই শব্দে। সেন সাহেব ফিরলেন পরের দিন।

স্ত্রীর সঙ্গে কথা হল। সেন সাহেব যেন দীর্ঘ চিঠিটা লিখেই নিজের সব আবেগ খরচ করে এসেছিলেন। তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে সব শুনলেন। স্ত্রীর হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—আমার অনেক দোষ আছে, তুমি যা চাও তার অনেক কিছুই দিতে পারিনি, তোমার সম্বন্ধে অন্যদের নিয়ে ঈর্ষাও হয় মাঝে মাঝে যদিও জানি সেটা ছোট মনের পরিচয়। তবুও তোমাকে আমি ভালবাসি, পৃথিবীতে আর যে কোনো মানুষের চাইতে বেশি ভালবাসি! সেন সাহেবের চোখে জল এসে গেল। তিনি আস্তে স্ত্রীর হাতটি নামিয়ে রেখে জল মুছলেন। আবার একটু কাঁপা গলায় বললেন—বিরূপাক্ষ যদি তোমাকে সুখী করতে পারে তো আমার আপত্তি নেই। তবে তাড়াহুড়ো করবার কিছু নেই, ওর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা কিছু কম নয় তবে লোকে বলে ও কাউকে নিয়ে বেশিদিন চলতে পারে না। আশা করি তোমার সঙ্গে ওর বোঝাপড়া হয়েছে এবং আরো ভাল করে হবে। তবে তা না হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে কেন থাকবে না? এ তো তোমারই বাড়ী, একি আমার একলার কিছু? সেন সাহেব এবার সত্যিই কেঁদে ফেললেন। উঠে তিনি চলে গেলেন। মিসেস সেন পাথরের মূর্তির মতন বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ বাদে টেলিফোন বাজল। মিসেস সেনের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল—এ নিশ্চয়ই বিরূপাক্ষ। কিন্তু কথা বলছিলেন সেন সাহেব। তিনি আপিসে পৌঁছে গিয়েছেন, মিসেস সেন যেন সময়-মতন খেতে বসেন, তিনি চলে আসবেন আর আসবার সময় মিসেস সেনের জন্যে অর্ডার দেওয়া জুতো জোড়া নিয়ে আসবেন। সমস্ত রাগটা স্বামীর ওপরে পড়ল। বললেন—তোমার লজ্জা করে না, এখনো বসে বসে মেয়েমানুষের মতন ভাত আর জুতোর হিসেব করো? তুমি কি ভাবো একজোড়া নতুন জুতো এনে দিলেই আমি পরম প্রসন্নমুখে তোমার গৃহপালিত হয়ে বসে থাকব? সেন সাহেব নীরব রইলেন।

মিসেস সেনের রাগের অভিব্যক্তি কিন্তু এরপর থেকেই কমে এল। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াল ভদ্রতার। তিনি স্বামীর সম্বন্ধে আগের চাইতে অনেক বেশি নজর দিতে থাকলেন। তাঁর খাওয়া, তাঁর পোশাক সেন সাহেবের পক্ষে অনভ্যস্ত রকমের পরিপাটি হয়ে উঠল। সেন সাহেবও নিজেকে আরো ডুবিয়ে দিলেন নানা রকমের কাজের মধ্যে। বাড়ী থেকে বেরোতেন নটার মধ্যে আর ফিরতে সাড়ে দশটা প্রায় হতই। মিসেস সেনও মধ্যে মধ্যে বেরোতেন, তবে একলা। বিরূপাক্ষবাবু আর এলেন না এ বাড়ী। অফিসেও দু-একজনের সন্ধানী দৃষ্টিতে পড়ল যে তিনি সেন সাহেবকে এড়িয়েই চলছেন। আগেকার অভ্যাসের বশে সেন সাহেব বিকেলে এক একদিন বাড়ীতে ফোন করতেন, শুনতেন মেমসাহেব বেরিয়েছেন। দুদিন শ্বশুর বাড়ীতেও ফোন করেছেন, শুনেছেন সম্প্রতিকালে তাঁদের মেয়ে তাঁদের বাড়ীতে আসেন নি।

এতটা চাপ অবশ্য মানুষের পক্ষে সহ্য করা সহজ নয়। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনও তো ভাঙলই সেন সাহেবের। লেখাপড়ায় তাঁর ধারটা একটু কমে এল—অন্যেরা বোঝার আগে নিজে তা বুঝলেন এবং বুঝে শঙ্কিত হলেন। তার জন্যে আরো বেশি চিন্তার মধ্যে দিয়ে কাটল তাঁর দুটো দিন, তিনটে রাত। তৃতীয় দিন আপিসে হঠাৎ বড় অমনোযোগী হয়ে পড়লেন। ছুটি নিয়ে অনেকদিন আগেকার মতন নিরুদ্দেশভাবে বেরিয়ে পড়লেন শহরের রাস্তায়। তফাত শুধু তখন বেরোতেন পায়ে হেঁটে কিম্বা ট্রামে-বাসে আর আজ সরকারী গাড়ির বদলে বেরোলেন একটা ট্যাক্সি নিয়ে। সেন সাহেব অত্যন্ত ক্লান্ত, জীবনটা কেমন বিবর্ণ লাগছে। গঙ্গার ধার দিয়ে খিদিরপুর হয়ে আলিপুরের মধ্যে দিয়ে আবার ফিরে ঢাকুরিয়া লেকের দিকে চলে এলেন। ট্যাক্সি ছেড়ে যখন লেকের ধার দিয়ে হাঁটতে লাগলেন তখন ভরা দুপুর, মাথার উপরে প্রচণ্ড সূর্য গাছের পাতার আবরণ ভেদ করে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে একটু একটু ঝিরঝিরে হাওয়ার সঙ্গে। একটা ঘাটের কাছে সেন সাহেব বসলেন। ঘাটে তখন স্নানার্থীদের ভিড়। এক পাশে একটি অল্প বয়স্ক দম্পতি তাদের শিশু পুত্রটিকে স্নান করাতে গিয়ে নিজেরাই মেজাজ খারাপ করে, হেসে, অস্থির হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটির বয়েস অল্প তার দিকে, তার পুত্রের দিকে, তার তরুণ স্বামীর দিকে সেন সাহেব অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনটা কেমন খুশি উঠল।

তারা স্নান করে চলে যেতে সেন সাহেবও উঠে পড়লেন। মাথা ঘুরছে, মনে হচ্ছে অসুখ থেকে উঠেছেন। অনেকটা হেঁটে ট্যাক্সি পেলেন। বাড়ী যখন পৌঁছলেন তখন পাড়াটা জানলা-দরজা বন্ধ করে নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। শুধু রেডিওয় দুপুরবেলাকার প্রোগ্রাম একটু আধটু ভেসে আসছে। কলিং বেলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ীর কুকুরটা ডেকে উঠল। আবার বাজালেন কলিং বেলটা। মনে হল ওপরের জানলাটা একটু ফাঁক হল। আরো একটু পরে মিসেস সেন নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। সেন সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—নেপাল কোথায় গেল? কারণ, জানতেন যে দাসী ছুটি নিয়ে বাড়ী গিয়েছে আজ। মিসেস সেন কোনো উত্তর দিলেন না, বোধহয় সেন সাহেবের কথা শুনতেই পাননি। নিচের তলায় চাকর-দের স্নানের ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে জলের আওয়াজ পেলেন। বিরক্ত লাগল, মনে হল এরকম শব্দ করে জল ঢালা চাকরদের পক্ষে অশোভন। তখনো খুব ক্লান্ত লাগছে, দ্বিধা করে বললেন—একটু চা খাওয়াতে পার? শরীরটা খারাপ লাগছে। শোবার ঘরে ঢুকে তাঁর তীক্ষ্ণ হয়ে আসা অনুভূতিগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল একটা অতিপরিচিত গন্ধে, এত মৃদু যে ঘ্রাণ নিতে গেলে মিলিয়ে যায় কিন্তু অন্যমনস্ক থাকলে চেতনায় ফিরে আসে। দরজা পেরিয়ে মিসেস সেন পাজামা আর পাঞ্জাবি হাতে ঘরে ঢুকলেন। হঠাৎ দুটো উপলব্ধি এসে সেন সাহেবকে সজোরে আঘাত করল—আচ্ছা এই রকম অসময়ে বাড়ী ফেরা, যা তাঁর জীবনে বোধহয় প্রথম, তার জন্যে তো কোনো কারণ জানতে চাননি মিসেস সেন? সেই সঙ্গে লক্ষ্য পড়ল তাঁর মুখের দিকে—একটা অতি পরিচিত ক্লান্তির আভাস, পদক্ষেপ আলস্য মন্থর, শাড়ির আর জামার বাঁধন যেন দৃষ্টির অগোচরভাবে শিথিল। সচকিতে সেন সাহেব ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকালেন, ড্রয়ার আধখোলা। আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখলেন তাঁর স্ত্রীর মুখে একটা ঘৃণা, ভয়, উল্লাসের অপূর্ব অদ্ভুত সমাবেশ, তাঁর ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি। তার মানে সেন সাহেব না বুঝেও বুঝতে পারলেন।

তারপরেরটুকু বিকারের বিভীষিকার মতন। তার বিস্তার হতে পারে এক মুহূর্ত কিম্বা এক যুগ। যখন হুঁশ এল তখন সেন সাহেব দেখলেন তাঁর হাতে এক গোছা চুল আর মিসেস সেন ছিটকে উপুড় হয়ে বিছানার ওপরে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। নির্বোধের মতন সেন সাহেব হাতের চুলের সঙ্গে বিছানার ওপর [illegible] ছড়িয়ে পড়া চুলের রাশি মিলিয়ে দেখলেন একেবারে এক। পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল তাঁর চোখে। তিনি বেরিয়ে আসতে গেলেন ঘর থেকে। তাঁর প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? পৃথিবীতে থাকার অধিকার কী? তাঁর এতদিনের চেতনার বনিয়াদ ধ্বসে পড়েছে—কোথা থেকে একটা গুহাবাসী আদিম মানুষ বেরিয়ে পড়েছে তাঁর সত্তাকে লোপ করে দিয়ে। অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে সেন সাহেব চলে আসতে গেলেন। পিছন থেকে একজোড়া বালাপরা হাত তাঁকে সজোরে জড়িয়ে ধরল, সেন সাহেব টাল সামলাতে পারলেন না। বিছানার উপরে পড়ে গেলেন। রক্তাক্ত ঠোঁট দিয়ে উন্মত্তের মতন তাঁকে চুমু খেতে খেতে মিসেস সেন কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন—এতদিনে, এতদিনে—কিন্তু কেন আরো আগে তুমি এলে না!

সেন সাহেব সত্যি অজ্ঞান গেলেন, কিন্তু ডুববার আগেকার [illegible] মতন সমস্ত জীবনের চিত্র তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল তিনি বুঝতে পারলেন তিনি সফল হয়েছেন।

ইয়ার-দাদাজীর গুলগপ্প

বাহারউদ্দিন

ছোটবেলা আমাদের বাড়িতে এক বৃদ্ধ আসতেন, ঠিক পাকা বৃদ্ধ নন, অনেকটা কাঁচা-পাকার মত, বাবা বলতেন 'আলিম-চাচা'—মা বলতো 'আলেম না জালেম।' আর তামাসা করে বলতো 'মুলই-ছাব।' মৌলভী শব্দেরই সিলেটি সংস্করণ 'মুলই', আর 'ছাহেব' হ্রস্ব উচচারণের ফলে হয়ে দাঁড়াল ছাব বা সাব। পূর্ববাংলার অধিকাংশ মানুষই সাহেব শব্দকে সাব সায়েব বলে উচচারণ করে সাহেব ব্যবহৃত হয় সম্মানার্থে, বিশেষ করে মুসলমানদের বেলায়, সাদা-চামড়ার প্রসঙ্গ অনুরূপ হলেও মুসলমান আর ইউরোপের বাসিন্দার ক্ষেত্রে এই শব্দ প্রয়োগের শ্রদ্ধা মনোভাবের মধ্যে দেদার তফাৎ। 'সাহেব' শব্দের আসল অর্থ খোয়া গেল এই বাংলাদেশে এসে, হিন্দু মহাশয়কে যেহেতু বাবু বলব অতএব মুসলমান-বাবুকে সাহেব, অর্থাৎ হিন্দু যদি বলে জল, আমি মুসলমান আমাকে বলতে হবে পানী, হিন্দু বলে ঈশ্বর, আমাকে বলতে হবে খোদা, অথবা আল্লা, হিন্দু বলে পাপ, আমি বলব গুনাহ, এরকম কথায় কর্মে চলায়-ফেরায় সর্বত্রই আমাকে দেখাতে হবে আমি আলাদা, আমি পরবাসী, দেখাতে হবে আমার স্বপ্ন ইরাণে, আরবের খেজুর গাছে, কেননা আমার জাত-ফাত অন্য, আমার ঈশ্বর তো আর এই ভারতের ঈশ্বর বা পরমাত্মা নন, তিনি খোদ আরবের আল্লা, মক্কায় তাঁর আবির্ভাব, আরব থেকে তিনি এলেন ইরাণে, ইরাণীরা তাঁর আদেশ নিষেধ মানল, তাঁকে খোদা বলেই ডাকল, তাঁর আওতায় ইরাণীরা কোরাণ হাদিস পড়ল, উপাসনা শিখল, কিন্তু জালাতকে নামাজ বলল, ছওমকে রোজা বলল, ইসলামও মেনে নিল তাদের আব্দার। কিন্তু ইরাণী অথবা তুর্ক পাঠানদের দেশ হয়ে তিনি যখন এলেন এই হিন্দুস্থানে অতঃপর বাংলা মুল্লুকে তাঁর অহমিকা জাগল, নিতে তিনি না-রাজ দিতে তিনি আগ্রহী, শেখা হল না বাংলা, অথচ অন্যদিকে তাঁরই বান্দার-বদৌলতে, দরবারী আবহাওয়ায় ব্রাহ্মণ পীড়িত লোক-ভাষা বাংলা উন্নিত হল সাহিত্যের ভাষায়, হল সংস্কৃত, সংহত এবং মার্জিত। সেই রাজা-বাদশারা এখন স্বর্গে বা মার্গে আমার অজানা, জানি না জীবিতাবস্থায় ওবা শিরকীপ (পার্টিশিয়ান) জন্যে কি অভি-শাপ পেয়েছিলেন মোল্লা-মৌলভীর কাছ থেকে তাঁদের অনুপ্রেরণায় দেব ভাষায় রচিত পাদকে লোক-ভাষায় রূপান্তরিত বা অনুবাদ করার জন্যে সমসাময়িক কবি [illegible]র স্থান হয়েছিল 'রৌরব' নরকে। রাজা-বাদশা বলেই পাঠান তুর্কীরা বেঁচে গেলেন, হয়তো তাদের জন্যেও প্রস্তুত ছিল 'হাবিয়া দোজখ।'

'সাহেব' শব্দের আরবী রূপ 'ছাহিব' অথবা 'সাহিব'। অর্থ সংগীতবন্ধু। এ জন্যেই হজরত মোহাম্মদের সঙ্গী-সাথী-বৃন্দকে বলা হয় 'সাহাবা'। এই অধম চির-দিনই গণ্ডমূর্খ। ছোটবেলা আমার মনে হত সাহাবারা নবীদের মতই হয়ত ঈশ্বর প্রেরিত। এঁদেরকে নিয়ে যে রকম গল্প-গুজব শোনা যায়, তেমনি মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কালক্রমে অনেক ধোঁসা খেয়ে খেয়ে অভিধানে দাঁত-মুখ ভেঙ্গে টের পেলাম, না এরাও মানুষ, আমাদের মত ঘুমোতেন, খেতেন, আমাদের মত এঁদেরও জন্ম হয়েছিল, এদেরকেও [illegible] দেয়নি মৃত্যু, সহজ কথায়, এঁরা [illegible] হজরত মোহাম্মদের বন্ধু শিষ্য।

সেই মৌলভী সাহেব ছিলেন বিচিত্র ধরনের মানুষ। হাসি-খুশী দিল দরাজী, চোখ ছিল বড় বড়। হাত-পা দশ-দরাজী। আমাদের জন্যে নিয়ে আসতেন ফলমূল, আমাদের বাড়িতে আগে শুনতাম ফলকে বলত 'মেওয়া' বিশেষ করে আমার দাদাজী, দাদাজী মানে আমার ঠাকুরদা। আমরা তো আর এই বাংলাদেশের লোক নই, যে দাদাজীকে ঠাকুর্দা বা দাদু বলব। দাদাজীর দোস্ত ছিলেন এই মৌলভী দাদাজী বলতেন ইয়ার—ইয়ারই হচছে আসল, আসল বন্ধু, সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে ইয়ার যদি ভালো হয়, তুমিও ভাল, ইয়ার খারাপ হলে তুমিও খারাপ। ইয়ার পুণ্যাত্মা হলে পরকালের বিচারে ইয়ারের সুপারিশেও নাকি মুক্তি ঘটে পাপী-তাপী ইয়ারের। এই লোভে দেখতাম—পাড়া প্রতিবেশীর অনেকেই 'ইয়ারনা' বন্ধুত্ব করত, যাদের ইয়ার ছিল না তারা ছিল গোণতির বাইরে, একটু বয়স হলেই, হয় নিজে নিজে করে ফেলত ইয়ারানা অথবা করিয়ে দিত বাড়ির লোক। এই নিয়ে এক প্রবাদ প্রচলিত, ইয়ারে ইয়ারে আলি (আইন) এক ইয়ারে বিয়া করইন আরেক ইয়ারের হালি (শালিকা)। ইয়াররা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্মান দেখিয়ে কথা বলে, ইদ-উৎসব, বিয়ে পার্বে এক ইয়ার অন্য ইয়ারের বাড়িতে অন্যতম সম্মানিত অতিথি, এক ইয়ারের বিয়েতে অন্য ইয়ার—শ্বশুর বাড়ির তরফ থেকে মান (উপহার) পাবে নিঃসন্দেহে। আমারও ইয়ারানা ছিল। ইয়ার যে ফারসী শব্দ, আমি জানতাম না। এত সহজ সরলভাবে মিশে আছে আমাদের রক্তে এরকম অসংখ্য আরবী-ফারসী শব্দ, অভ্যাসের ফলে এগুলো হয়ে আছে আমাদের একান্ত নিজস্ব এসবের পরিবর্তে অন্য বিকল্প শব্দের কথা ভাবাই যায় না। আমার ইয়ার ছিল আজিজ। আজিজের অর্থও বন্ধু, সে একজনের নাম। আমাদের ইয়ারানা বেশী দিন টেকেনি। একদিন খেলার মাঠে সামান্য ব্যাপার নিয়ে হঠাৎ দুজনের মধ্যে রণ-দামামা বেজে উঠল, শুরু হল দুজনের পাথরযুদ্ধ, দর্শক ও অন্য খেলোয়াড়রা তো অবাক। একি ইয়ারে ইয়ারে মারামারি। ফেটে গেল আমার মাথা, সঙ্গে সঙ্গেই রেফারির হস্তক্ষেপ এবং সিজ-ফায়ার রণাঙ্গনে হাজির হলেন বাড়ি সংঘের রাণী বিবি পুরআবজান মাকে দেখেই আজিজ ভাগলবা সেই যে পালাল, পালালই, আর কোনদিন ইয়ারের খবর নিতে আসেনি, আসেনি স্কুলে নিয়ে যেতে, দেখতে দেখতে প্রায়ার জলাল, [illegible]

তাঁর বন্ধু হয়ে উঠল, আমি একা হয়ে পড়লাম। আমার উপর বাবার শাসন দণ্ড নেমে আসল, বিকেলে বহুদিন আমাকে আটকে রাখা হল বাড়িতে, কাজ দেয়া হল—খড় কঠিন কাজ দুর্দান্ত লাল গাই (গাভী) আর ইংরাজী গ্রামার হাতে দিয়ে নজরবন্দী করে রাখা হল প্রায় দু মাস।

দাদাজীর ইয়ারকে আমি আমার বুবুর (মুসলমানরা দিদিকে বুবু বলে ডাকে) খুব ভালো লাগত। কারণ তিনি খুব স্নেহ পরায়ণ, কারণ তিনি আমাদের জন্যে নিয়ে আসেন মেওয়া, লজেন্স চকলেট-বিস্কুট, তাঁর আগমন ঘটলে আমাদের বাড়িতে ছুটে আসে উৎসব উৎসব হাওয়া আমাদের বৈঠকখানায় মজলিস বসে, পুঁথি পড়া হয়, গজল হয়, আমরা ভাই-বোন কিছুটা স্বাধীনতা অনুভব করি, লেখা-পড়ার অত্যাচার থেকে রেহাই পাই। সেদিন আমাদের আনন্দ অসীম। বাড়িতে ইদ-ইদ ভাব গল্প-গুজব চলে। হাসি-তামাসার আওয়াজ ভেসে যায় বাইরে, দূরে পাড়ার ছেলেরা আসে, বড়দের ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার বাইরে। তখন আমার বুকে গর্বে ফুলে উঠত। নিজের বাড়ি বলে বৈঠকখানার ভেতর-বাইরে আমার আসা-যাওয়া অবাধ তাছাড়া ইয়ার দাদাজীর কাছা-কাছি বসার অধিকারও বিস্তর তাঁর দাড়িতে লম্বা সুন্নতী চুল নিয়ে খেলতে খেলতে আমি আমার প্রতিবেশী সমবয়সী খেলার মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখে সাময়িক পরাজয়ের চিহ্ন দেখে গর্বে আরো ফুলে উঠতাম, খেলার মাঠে মার-খাওয়া পরাজিত পলাতক নায়কের প্রতিশোধের এ ছিল অন্যতম উপায়।

মৌলভী সাহেব আসলেই আমার মা ক্ষেপে যেত। সুরু হত মেঘলা আকাশে ঘুট-ঘুট, মাঝে মধ্যে বাবার দিকে ছুটে যেত বজ্রধ্বনি অবশ্য, এসব বৃদ্ধদাদাজী অথবা মেহমান ইয়ার দাদাজী কোনদিনই টের পাননি আমার বুবু, বাবা ও আমি তিনজনই হাড়ে হাড়ে টের পেতাম, তিন-জনই তিরস্কার বকবকম ফুসফাসের শিকার তিনজনই একে অন্যের সহায়। বাড়িতে বাবার তরফের অতিথি আসলেই মাতৃ-মূর্তির কাল বৈশাখীর ভয়ংকর আক্রোশ তিল থেকে তাল হলেই বজ্রমুষ্ঠি ধারণ করে বর্ষিত হত আমার পিঠে অথবা দিদির চুল খেলা মাঠে, এজন্যে আমরা দুই ভাই-বোন যুগপৎ শত্রু-মিত্র মার রক্ত চক্ষুর আড়ালে থেকে সাময়িকভাবে মাকে ভুলে থাকতে পারলেই বাঁচি, আর আমাদের স্কুল মাস্টার বাবা এমন দুর্দিনে মাঝে-মধ্যে স্রৈণ কখনো বেয়ারা, কখনো নকর, কখনো পাঠক, ইলাতক।

কোন পাত্রে কি তেল, কোন সেবনে কি ঘি দিতে হবে, মৌলভী সাহেব সেটা ভালো জানতেন। এসেই দাদাজীকে লম্বা সেলাম, একে অন্যের প্রতি শান্তি বিনিময়, তাও যেই সেই শান্তি নয়, স্বর্গীয় আসসালামু আলাইকুম তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, অয়া আলাইকুমুস সালাম, আপনার উপরও বর্ষিত হোক, বাংলায় বললে হবে না, শুনিয়ে শুনিয়ে খোদগবীর মক্কী ভাষায় এ যে সুন্নত নবীর আদর্শ। অতঃপর বাড়ির খবরা-খবর জিজ্ঞাসা। বাড়ি বলতে মৌলভী সাহেবের একটা আস্তানাই ছিল সার। দারা-পুত্র পরিবার— কিছুই ছিল না তার। মৌলভী সাহেব লম্বা পাগড়ী খুলে রাখতেন টেবিলে। বেরিয়ে পুটলা হাতে এগিয়ে গেলেন বাড়ির ভেতর। বুড়ো মানুষ বলেই পর্দানসীন ভদ্র পরিবারের ভেতর তার যাবার অধিকার আছে, তাছাড়া তিনি আত্মীয়, তিনি ইয়ার। এদিকে ডাক দিলেন 'আমার বউ-বেটি মরুক মা কোথায়!' যেন গ্রীষ্মে আখের রস ঝরে পড়ছে মুখ থেকে। মা বেরিয়ে মাথায় কাপড় টেনে আদব-কায়দা রেখে পায়ে প্রণাম ঠুকে—তোবা এ যে প্রণাম নয়, কদমবুসি করে হাত দিয়ে রস চুষে তুলে ফেললেন। তেভতর ভেতর বিরক্ত হলেও কোথাও বিরক্তির বর্ণটুকু নেই। মৌলানা আব্বর আলীর পুত্রবধু মান-সম্মান সে লাখের ধন, কথায় বলে, মানীর কাছে মান বড়, মতই তুমি নামাজ গড়, অঞ্চলের সেরা আলেমের ঘর-লক্ষ্মী—আহ আবার না-ফরমানী কথা, কলমটাও বেসামাল তহজীব তমদ্দুন মুসলমানী কিছুই বজায় রাখবে না বুঝি, যতসব শিরকী, বে-আদবী, আসলের খুটি হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই ভাষা, এই ভাষার জন্যেই পাকিস্থান দু টুকরো হলো। হাঁ—এখানে একটু রেহাই আছে, ইসলামের খোদ খেদমত সার ওহাবী ফরাজীরা লক্ষ্মী শব্দের কোন প্রতিশব্দ খাড়া করেননি-- তকদীর এয়াবী—শব্দটায় পোষায় না, বলেই আজো বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ্মী শব্দের তবিয়ত বহাল। আমি নাদান বান্দা অজ্ঞতার অজুহাতে রক্ষা পাব। নতুবা আমাকেও রৌরব প্রতিদ্বন্দ্বী হাবিয়া দোজখে পাপ-স্খলন করতে হত। বলাবাহুল্য অনেক হক-কথা লেখার জন্যে আমাকে মিথ্যে-বাদীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। ভবিষ্য দ্রষ্টা নই। জন্ম সূত্রে মুসলমান, অতএব পয়গাম্বরী দাবী করাও সম্ভব নয়।

মধ্য যুগের বিখ্যাত আরব কবি--আবু মুতাম্নবী ও নিজেকে নবী বলে দাবী করে মুতম্নবী নামে খ্যাত হলেন। এর অনেক অনেক পরে আরো একজন দাবী করলেন তিনি ও পয়গাম্বর, নাম গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ভারতের বাসিন্দা। শাস্ত-বিশারদ অহংকারী পণ্ডিত মূর্খ। তিনি স্বীকার করলেন হজরত মোহাম্মদকে। অস্বীকার করলেন শেষ নবীত্ব। আজও কাদিয়ানী জামাত (দিল) বিরাজ করছে ভারতে-পাকিস্থানে। গোলাম আহমদের মৃত্যু বড় করুণ, বড় ভাইয়ের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে আর ঘরে ফেরেননি লেখাজাই উপুড় হয়ে পড়ে রইলেন। এটা অবশ্য গল্পও হতে পারে। ধর্ম প্রাণদের বিশ্বাস এ হচ্ছে অহংকারের পরিণাম। জানি না মনস্তাত্বিক কি বলেন? মা বাবা, চাই না আমার নবুওতী চাই না [illegible]

হাজারখানেক মাইনা পেলেই চলবে গোদন
আসবে ঘরে টৌরিন সুন্তি।

আমি আগেই বলেছি আমি দ্রষ্টা নই, আর মুসলমান বলে সে— সম্ভাবনা একেবারে নীল বলতে পারব না সুইস নবেল কমিটির পাপ কর্মে, পুণ্যকর্মে নবেল প্রাইজ দেবার নেক নজর হবে কিনা, যদি হত—(উপায় নেই বলেই সাবজাংটিভ মুড ব্যবহার করলাম) মিঃ দেশাই আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গ মন্ত্রী ধরে পাপ-কর্মের জন্যে আমার নিজের নাম আর পুণ্যকর্মের জন্যে নাম পাঠাবার ব্যবস্থা করে বসতাম। সুইস নবেল কমিটির এরকম সুমতি হবার সম্ভাবনা যে একেবারে অ-প্রতুল বলা যায় না, কিসিংগার সাহেব যদি শান্তি পুরস্কার পেতে পারে, তাহলে আমাদের দেশের উল্লা মোল্লা সংঘী-উন্দিরাই বা কেন পাপ পুণ্যের ইনাম পাবে না, কারণ বুঝি না।—

মা শত্তর-ইয়ারের পা ছুঁয়ে একেবারে কৃতার্থ, শত্তর পয়ারও ইয়ার ও পুত্র বধূর কি দর্শনে ভাবাবেগে গলিত, মূর্ছিত। 'আম্মা, আম্মাগো তোমারে না দেখলে আর আসান থাকে না। আইতে হয় ঘুরি ফিরি। হ্যাঁ হ্যাঁ আইবেনই তো!' —ভালো বরাল খয়র-খাতিরের সম্প্রীতি পেয়ে ইয়ার দাদাজীর পরিতৃপ্তির হাসি বারান্দা ও উঠোনে ছড়িয়ে পড়ে। পরম শান্তিতে মার অন্তরত্মা যেন ঘুমিয়ে পড়ত। ছোটবেলা প্রথম প্রথম ভাবতাম, তিনি হয়ত আমাদের মায়ের আত্মীয়। মার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি গলে পড়তেন। একটু বড় হয়ে জানলাম পাতানো পিরীতি আর সিঁদুরের সিঁথির মধ্যে তফাৎ বড়ই থোড়া—

লাগলেই ভাঙে আর অয় গুড়া গুড়া।

এই পিরীতি অবশ্য টিকে ছিল ইয়ার দাদাজীর মৃত্যু অব্দি।

আমরা ওঁকে ইয়ার দাদাজী বলে ডাকতাম। তিনি গল্প শোনাতেন দু-একবেলা রেহাই দিতেন পড়ার চর্চার থেকে। এ যে কত বড় মেহেরবাণী শিশু মাত্রই এর উপকারিতা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। ইয়ার দাদাজীর গুণ ছিল অনেক, সুরেলা গলা, কোরাণ তেলাওত (পাঠ) করতেন উঁচু কণ্ঠে, আরবী ভাষায়, নামাজ পড়তেন পাঁচ বেলা। কিন্তু এই নিয়ে জুলুম-জবর তাঁর অপছন্দ ছিল। আমার দাদাজীর ঠিক উল্টো। আমার দাদাজী পাঁচ বেলা নামাজ পড়ার বাইরে ,—াদিন সুন্নত মস্তাহার এরকম জরু— —রী স্বেচ্ছা নামাজ —য়ে লেগে —ন। আমার এগারো বছর হতে —ই আমার উপর ও চাপিয়ে — নামাজের পাহাড়, আমি ব্যাটা চঞ্চলচূড়ামণি, আমার চারদিকে দেয়াল—ক্লাসের দেয়াল, বাড়ির দেওয়াল— বালেগ হতে না হতেই খাড়া হল নামাজের দেয়াল।

আমার চারদিকে দেয়াল- ক্লাসের দেয়াল বাড়ির দেওয়াল,—'বালেগ' হতে না হতেই খাড়া হল নামাজের দেয়াল।

ইয়ার দাদাজী গল্প বলতেন হুর-পরীর গল্প। জিনের গল্প। কিরকম জিনের বাদশা রাজত্ব করত মরুভূমিতে! তাঁর সঙ্গে দেখা হল মানব-কন্যার, মানব-কন্যার প্রেমে পড়ল বাদশা, মানব-কন্যা পাগল হল, এক-দিন জলে নামল আর উঠল না, জিন-সেপাই জলের ভেতর দিয়ে নিয়ে গেল জিনের দেশে—এরকম অসংখ্য আরবের গল্প। মিশরের গল্প, আর রাজরাজড়ার গল্প। শুনতে শুনতে আমার ঘুম পেত, স্বপ্নে দেখতাম আমিও চলেছি সেই দেশে! এই গল্প-বলার জন্যেই এই ইয়ার দাদাজীকে একসময় পৃথিবীর সবচেয়ে আপনজন মনে হত। ইয়ারদাদাজীর গল্পের নায়ক সব-সময়ই ভবঘুরে টাইপের। দুঃখী দুঃখী। বিয়ে করে না। সংসার পাতে না। এক সবুজ দুঃখের অবশেষে অধিকাংশ নায়কেরই মোহভঙ্গ হত, নেমে আসত সন্ন্যাস, এখন মনে হয় অনেক গল্পে ইয়ার-দাদাজী নিজেকে, নিজের অভিজ্ঞতাকে মিশিয়ে দিতেন। আমি ও আমার দিদি গল্পের নায়ক, নায়কের ঘোড়া উঠ, সৈন্যসামন্তের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তাম দিগদিগন্তে, ঘুম পেলেও আমাদের ঘুম ছিনিয়ে নিত ডানা-ভাঙ্গা পরী, অথবা ডাইনীর ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠত মধ্যরাতের শিশু-শরীর, চোখ খুললেই দেখতাম হারুণ রশীদ বাদশার সোনার সিংহাসন, নমরুদ ফেরাউনের মসনদ আর মণিমুক্তার ভাণ্ডার। হাজার রাত্রির গল্পের মধ্যে মধ্যে ইয়ার দাদাজী পড়ে শোনাতেন আরবী-ফারসী শের ফারসী জবানের এত চোস্ত উচ্চারণ আজকাল আর শুনতে পাই না, গানের সুরে চোখ দুটো বন্ধ করে তিনি উচ্চারণ করতেন :

'বিস্নু হাফিজ, বাতুগুযম কে গুলে তাজা-
নমিমানদ
আগর মানদ, শবি মানদ, শবি দিগর
নমিমানদ।'

হাফিজ আর রুমি ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। আমরা তাঁর কাছে অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি ভেঙে ভেঙে শব্দে বলে দিতেন। 'বিস্নু মানে শোনো, বাতুগুয়ম, তোমাকে বলছি, এই ফুল বেশী সময় টিকে থাকবে না। যদি থাকে এক রাত্তির থাকবে, দুই রাত্তির থাকবে না। আরবী ফারসীতে তাঁর দখল ছিল অপূর্ব। মূল আরবী-ফারসী ভাষায় তিনি পড়েছেন—আরাফাতুন (এরি-স্টেটল), গাজ্জালী, ওমর খৈয়াম, হাফিজ এবং আলকে লায়লা। এ নিয়ে তাঁর অহংকার ছিল না, তিনি ছিলেন কিছুটা তৃপ্ত।

বয়স বাড়তে থাকলে ইয়ার-দাদাজীর আসা-যাওয়া কমে যায়। বছরে আসতেন একবার দুবার। বলতেন 'শরীর নরম আর চলাফের করতে পরি না। গল্পও বলতে পারেন না আগের মত। সেই এক ধরনের গল্পে আমাদেরও মন বসে না। দিদি রীতি-মত বড়। সে গুনগুন করে গান করে। কলেজ যায়। বাড়িতে এসে পড়ে। খাতায় কি কি নাম লেখে। মাকে গল্প বলে কলেজের। মা ও মেয়েতে এখন গলায় গলায় ভাব। মা খাতা খুলে দেখে না, দেখলে একদিনেই কলেজ পড়ার ইতি ঘটবে।

শেষের দিকে ইয়ার দাদাজীর আসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আমরাও তাঁর খোঁজখবর রাখিনি। আমার দাদাজী গত। একদিন পড়ার ঘর থেকে শুনতে পেলাম বাবা শব্দ করে পড়ছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন। (নিশ্চয় আল্লার জন্যে, আল্লার দিকে তারা ফিরে যায়)। ইয়ার-দাদাজীর মৃত্যু-সংবাদ আমাকে আবার পড়ার কবল থেকে রেহাই দিল, এবং এই শেষবার।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। তিপ্পান্ন ।।

চাকরির মোহ মিষ্টিরও আর নেই খুব। উপার্জনের সঙ্গে প্রয়োজনের কিছুমাত্র যোগ না থাকলে সেটা সখের চাকরি। তখন দশটা পাঁচটার কড়াকড়ি খুব সুখের মনে হয় না। মিষ্টি তবু তর্ক করতে ছাড়েনি। বলেছে, ঘরে বসে থেকে করব কি, খাব দাব ঘুমুবো আর মুটিয়ে যাব?

ওর মুটিয়ে যাবার নামে বাপীর কপট আতঙ্ক।—সর্বনাশ! সেটা বরদাস্ত করা যাবে না। যা আছ তার থেকে এক চুল মোটা হতে দেখলে খাওয়া আর ঘুম আধেক করে দেব আর হরদম উঠ-বোস করাবো। এতদিনে আমার হাতের একটা পাকা আন্দাজ হয়ে গেছে—রোজ রাতে আর ছুটির দিনের দুপুরে খুব কড়া করে মাপ নিয়ে ছাড়ব।

মিষ্টির অবাকই লাগে। এরকম খোল-আবরু রসের কথা ওই মুখেই দিব্বি মানায়। অগত্যা হাসি চেপে না বোঝার ভান করে বলেছে, তোমার অত কষ্ট করার দরকার কি, আমি চাকরিটা করে গেলেই তো হয়।

বাপী গম্ভীর।—তা হয় না। অসিত চ্যাটার্জি আমার কান বিষিয়ে রেখেছে। সেখানে নাকি গণ্ডায় গণ্ডায় লোক তোমার রূপে গুণে মজে আছে। সব ছেড়েছুড়ে আমাকে তাহলে তোমার অফিস পাহারা দিতে হয়।

সন্তর্পণে একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে মিষ্টি। দুজনের মধ্যে দুস্তর ফারাক কত, অনুভব করা যায়। মুখের কথা ছেড়ে আগের লোকের চাউনিতে অবিশ্বাসের ছায়া দেখলেও বরদাস্ত করতে পারত না, ঝলসে উঠত। আর এই একজনের তাই নিয়ে খোলাখুলি ঠাট্টাও নির্ভেজাল রসের বস্তু হয়ে ওঠে।

মিষ্টির মা বাবা দাদারও এখন বাপীর সর্ব কথায় সায়। বিশেষ করে মায়ের। জামাই গর্বে মহিলা ডগমগ। মেয়ের নিজের আলাদা নতুন গাড়ি হয়েছে, তার জন্য ড্রাইভার রাখা হয়েছে। সোনাদানার ছড়াছড়ি। ছেলের বউয়ের আর তাঁর নিজের গায়েও এক-গাদা নতুন গয়না উঠেছে। মেয়ে কোনো আপত্তিতে কান দেয়নি। মেয়ের একলার হাত খরচের জন্য এখানকার ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা পড়েছে তা-ও চোখ ঠিকরে পড়ার মতো। জীবনভোর বড় চাকরি করেও মেয়ের বাপ অত টাকা জমাতে পারেনি। জামাইয়ের 'পরামর্শ' মতো সেই টাকা মনোরমা নন্দী আর মালবিকা নন্দীর নামে রাখা হয়েছে—ঠিকানাও সেই বাড়ির। বাপীর সঙ্গে এই টাকার সহজে কেউ কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাবে না। ইনকাম ট্যাকস এড়ানোর এই ফন্দি মিষ্টির খুব পছন্দ নয়। কিন্তু দাদা এমন কি বাবাও বলে, বেশি টাকা যাদের, এভাবে কিছু কিছু টাকা সরিয়ে রাখতেই হয়।

মায়ের সেই উদ্ভাসিত মুখ দেখে মিষ্টি তাকে আরো কিছু দেখানোর লোভ সামলাতে পারেনি। গাড়ি পাঠালেই মা চলে আসে। মেয়ের ঐশ্বর্যের আভাস পেলেও তার পরিমাণ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। মায়ের সঙ্গে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলার পর আনন্দে আত্মহারা মা-কে মিষ্টি নিজের এখানে নিয়ে এলো। খাওয়া-দাওয়ার পর আরো কত সোনা আর মণিমুক্তো ঘরে পড়ে আছে মা-কে দেখালো। উত্তর বাংলার নানা ব্যাঙ্কে জমা টাকার পাশ বইগুলো দেখেও মায়ের দম বন্ধ হওয়ার দাখিল। মিষ্টি আনন্দ পেয়েছে বই কি। যে জামাইয়ের আজ এত গুণকীর্তন, এই মায়ের হাতে তার ছেলে-বেলার হেনস্থা মেয়ে ভোলেনি। মানুষটার পিঠের ওই দাগগুলোর ওপর মিষ্টি যখন হাত বা ঠোঁট বুলিয়ে আদর করে, তখন সেই সব নির্যাতন অবজ্ঞা আর অবহেলা সব থেকে বেশি মনে পড়ে।

কিন্তু এত ঐশ্বর্য বলেই মিষ্টি নিজেও স্বস্তি বোধ করে না খুব। একটা উৎকণ্ঠা মনের তলায় থিতিয়েই আছে। ভুটান পাহাড়ের বাংলোয় নিজের চোখে কিছু দেখে এসেছে। কিছু বুঝেও এসেছে। তারপর ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে এই জমা টাকার স্তূপ দেখে কেবলই মনে হয়েছে এত বড় ব্যবসার তলায় তলায় কিছু বে-আইনী ব্যাপারের স্রোতও বইছে। বাপীর দিকে চেয়ে যে কোনরকম উদবেগের ছিটে-ফোঁটাও দেখে না—সেটা অবাক হবার মতো কিছু নয়। তার মতো বেপরোয়া দুঃসাহসী কজন হয়।

মুখে কিছু না বলে মিষ্টি দেখে যাচ্ছে। বুঝতে চেষ্টা করছে। নিজের চোখ আর বুদ্ধির ওপর আস্থা আছে। বাড়ির নিচের তলায় অফিস। বাপীর কথামতো খাওয়া দাওয়ার পর দু'তিন ঘণ্টার জন্য এসে বসে। জিত থাকলে তার কাছ থেকে কাজ-কর্ম বোঝা সহজ হয়। আর শুধু এই লোক থাকলে খানিক বাদে ফষ্টি-নষ্টি শুরু হয়ে যায়। এক-একদিন কাজের অছিলায় বাপী গম্ভীর মুখে জিতকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। মিষ্টি মনে মনে অপ্রস্তুত হয়। জিত চলে গেলে রাগ দেখায়। —তোমার যে-যেদিনে বাইরে কাজ থাকবে সেই সব দিনে আমি এখানকার কাজ দেখতে বা বুঝতে নামব।

বাপীর ঠোঁটে জবাব মজুত। —আমার যা হবার হয়েছে, বউ ছেলে আছে, বেচারা জিতের মাথাটা আর খাবে কেন।

—জিত কি বোকা নাকি, তোমার চালাকি বুঝতে পারে না ভাবো?

—না পারার কি আছে। তোমাকে কি করে ঘরে এনেছি ও সেটা খুব ভালোই জানে।

তবু এই ক-মাসে মিষ্টি যতটুকু দেখেছে বা বুঝেছে, এখানকার ব্যবসায় বেআইনী কিছু আছে মনে হয়নি। বাপীর সঙ্গে উল্টোডাঙ্গার বিশাল গোডাউনও দেখে এসেছে। সেখানে ভাসুর অর্থাৎ মণিদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ভদ্রলোকের দুর্ভাগ্যের কথা মিষ্টির শোনা ছিল। মাসখানেকের আগের ছুটিতে বাচ্চু এসেছিল। তখন শুনেছে। শোনার পর ছেলেটার জন্য ভারী মায়া হয়েছিল। ওই ছেলেও খুব আর ছোটটি নেই এখন। সবই বোঝার কথা। যাই হোক, গোডাউন দেখেও সন্দিগ্ধ হবার মতো কিছু চোখে পড়েনি।

প্রথম ধাক্কা খেয়েছে মাস চার পাঁচ বাদে বাপীর সঙ্গে টুরে এসে। পর পর দুবার মিষ্টিই যেচে সঙ্গ নিয়েছে। তার স্পষ্ট কথা, খুব আনন্দ করে চাকরি ছাড়িয়েছ, এখন একলা বসে আমার দিন কাটে কি করে?

বাপী সানন্দে নিয়ে এসেছে। ভালো হোটেল যেখানে আছে সেখানে আর অসুবিধে কি। মিষ্টি সেই প্রথম টের পেয়েছে এ-সব দিকের ব্যবসায় সবটাই সাদা রাস্তায় চলছে না। ফার্মের নামে অনেক টাকা চেকেও আসতে দেখেছে। সেই সঙ্গে থোকে থোকে কাঁচা টাকাও। কাঁচা টাকার বেশির ভাগই ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে না। যা-ও পড়ছে তা-ও ফার্মের নামে নয়, দুজনের নানা নামের অ্যাকাউন্টে। [illegible] নিন্দুকে অত কাঁচা

টাকার আমদানিও এই থেকেই বোঝা গেল। প্রথম বারের সন্দেহ দ্বিতীয় বারে সঙ্গে এসে আরো মাথায় গেঁথে গেল। এবারে মধ্য প্রদেশের কয়েক জায়গায় টুরে আসা হয়েছিল। ফেরার সময় সঙ্গে গা শিরশির করার মতো পাঁজা পাঁজা নোট।

এবারে ফিরে এসে মিষ্টি আর চুপ করে থাকতে পারল না। উদবেগ বুঝতে না দিয়ে ঘুরিয়ে প্রসঙ্গটা তুলল। জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের সেই ভুটান পাহাড়ের বাংলোর পিছনের অত জায়গার সবটা জুড়ে শুধু নেশারই নানারকম গাছগাছড়ার চাষ হচ্ছে দেখেছিলাম, সব ওষুধে লাগে?

বাপী হেসে জবাব দিল, ওষুধে যতটা লাগে নেশায় তার থেকে বেশি লাগে।

—তোমার লাইসেন্স আছে?

—লাইসেন্স না থাকলে এত জায়গায় ব্যবসা চালাচ্ছি!

—না, মানে নেশার জন্য ও-সব বিক্রি করার লাইসেন্সও আছে?

বাপী হাসতে লাগল। —হঠাৎ তোমার মাথায় এসব চিন্তা কেন?

—এলোই না?

—আমি হোলসেলারদের দিয়ে খালাস। যা করার তারা করে। কোটার বাইরে তারা যা নেয় তার হিসেব মুখে মুখে—আমার রেকর্ড সাফ।

মিষ্টির পছন্দ হল না। বলল, কোটার বেশি জিনিস দেওয়াও তো অন্যায়, বিশেষ করে কেন বেশি নিচ্ছে তা যখন তুমি জানো।

এই গোছের ন্যায় নীতির আলোচনা ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু বাপীর একটুও খারাপ লাগছে না। মিষ্টির ভেতরটা এখনো ছেলেবেলার মতোই পরিষ্কার! বলল, লোকে নেশা করবেই, তাই এ অন্যায় তুমি না করলে আর একজন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে করবে। হেসে খোঁচাও দিল আর ন্যায়-অন্যায় যা-ই বলো সব করেছি তোমার জন্য—পিছনে টাকার জোর ছিল না বলে বানারজুলির বড়সাহেবের বাংলোয় ঢুকতে পর্যন্ত পেতাম না—লোকে নেশা আর কতটুকু করে, তোমার জন্য আমার টাকা রোজগারের নেশা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মিষ্টি মুখে আর কিছু বলল না, কিন্তু ভিতরে একটা দুশ্চিন্তা থিতিয়েই থাকল। বলতে ইচ্ছে করছিল, আমার জন্যেই যদি হয় তো এ নেশায় আর কাজ কি! আমার নাগাল তো পেয়েছ, এখন সাদা রাস্তায় চলো। বলতে পারল না। এত বছর ধরে এত জায়গায় যা ছড়িয়ে বসেছে, হুট করে তা গুটিয়ে ফেলতে বললে কান তো দেবেই না, উল্টে হেসে উড়িয়ে দেবে। বিরক্তও হতে পারে। এর পর বাপী টুরে বেরুলে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত মিষ্টির একটা চাপা অস্বস্তির মধ্যে কাটে। এত কাঁচা টাকা নিয়ে অনায়াসে ঘোরাফেরা করে, মিষ্টির সে-জন্যেও দুশ্চিন্তা।

ইচ্ছে থাকলেও এখন আর সঙ্গে যাওয়া হয় না। নরেন্দ্রপুর থেকে বাচ্চুকে ছাড়িয়ে এনে আবার কলকাতার স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। মুখে না বললেও বাচ্চুর এখানে থাকার ইচ্ছেটা মিষ্টি টের পেত। কলকাতায় এলে কাকিমার কাছ ছাড়া হতে চায় না। এই থেকেই বুঝেছে। আর এই ছেলেটার ওপর তার কাকার স্নেহ মায়া মমতাও লক্ষ্য করেছে। এত বড় বাড়িতে মিষ্টিরও একা একা ভালো লাগে না। সে-ই তাগিদ দিয়ে বাচ্চুকে আনিয়েছে। ছেলেটার ওপর আগেই মায়া পড়েছিল। এখন আরো বেড়েছে।

সামনের বারে স্কুল ফাইন্যাল দেবে। কিন্তু মিষ্টি মাস্টার রাখতে দেয়নি। বাপীকে বলেছে, এটুকু দায়িত্ব তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।

বাপী আরো নিশ্চিন্ত।

সময় সময় তবু মিষ্টির কেমন নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিমনা দু-চোখ নিজের দেহে ওঠা-নামা করে। যেমন ছিল তেমনি আছে। আগের মতোই কাঁচা, তাজা। তবু খুশি হতে পারছে না তেমন। বছর ঘুরতে চলল, দেহের নিভৃতে কোনো সাড়া নেই, ঘোষণা নেই। সব থেকে বেশি কাম্য কি এখন, মুখ ফুটে বাপীকে বলতে না পারলেও নিজে জানে। কোল-জোড়া হয়ে থাকার মতো কাউকে চাই। আগের জীবনে আর ছেলেপুলে না হওয়াটা ইচ্ছেকৃত ভাবত। এক বারের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে সেই সম্ভাবনাও ভয়ের চোখে দেখত। সেই দোসরের ওপর ভরসা আদৌ ছিল না, তাই নিরাপদ বিধি-ব্যবস্থার দায় নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু এখন কি? এই এক বছর ধরে তো কোনো বাধাবন্ধ থাকেনি নেই। ভাবতে গেলে নিজের মুখ লাল হয় মিষ্টির। দুর্বার স্রোতে ভেসে যাওয়ার এমন পরিপূর্ণ আনন্দ আগে জানা ছিল না। নিজের শরীর স্বাস্থ্য অত ভালো না হলে ধকল পোহানোও খুব সহজ হত না। এই ভোগবিস্মৃতির একটাই পরিণাম। কিন্তু এত দিনেও শরীরে তার কোনো লক্ষণ বা ইশারা নেই কেন?

মিষ্টির দুশ্চিন্তার ছায়াটা ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে। সেই অভিজ্ঞ ডাক্তারের কথা মনে পড়েছে। সেই ডাক্তার বলেছিল, অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। তখনকার সেই ভাঙা স্বাস্থ্যই সব থেকে বড় ক্ষতি ধরে নিয়েছিল মিষ্টি। সেই ক্ষতি মানে কি তাহলে এই? এত পাওয়ার বিনিময়েও তার কিছু দেবার থাকবে না?

নিজের হেপাজতে গাড়ি, হাতে অঢেল টাকা, মিষ্টি দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে বসে থাকল না। মা-কে শুধু বলল। তারপর সেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে মায়ের মারফৎ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তার কাছে গেল। সঙ্গে কেবল মা। আর কেউ কিছু জানে না।

মা সব বলার পর কেসটা বড় ডাক্তারের কিছু কিছু মনে পড়েছে। দু সপ্তাহে বার কয়েক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সে মা-কে জানিয়েছে, এত দিনেও হলনি যখন, আর হবে বলে মনে হয় না। একেবারে না এমন কথা ভদ্রলোক খুব জোর দিয়ে না বললেও মিষ্টি যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। মা ডাক্তার-এর কথা মানতে রাজি নয়। কলকাতার শহরে বড় ডাক্তার ওই একজনই নয়। মায়ের তাগিদে সমস্ত কেস সহ আরো দুজন বিশেষজ্ঞকে দেখানো হয়েছে। তাদেরও উনিশ-বিশ একই কথা। তবে একজন আশ্বাস দিল, বিজ্ঞান থেমে নেই, এ ধরনের কেস নিয়েও বিদেশে ঢালাও গবেষণা চলছে। কোনো আশা নেই, এ-কথা জোর দিয়ে বলা চলে না।

প্রথম জামাইয়ের ওপর জ্বলন্ত আক্রোশে মনোরমা নন্দী দুর্ভাবনার ব্যাপারটা ছেলেকে না বলে পারেনি। ছেলে আবার কথায় কথায় সেটা বাপীকেই বলে ফেলেছে। এই ভগ্নিপতি তার সব থেকে অন্তরঙ্গজন এখন। মা-কে নিজে তাগিদ দিয়ে দাদুর সাতাশি নম্বরের বাড়ি দীপেন নন্দীর একলার নামে লেখা-পড়া করিয়েছে। শুধু তার জন্যেই ঘরে দামী বিলিতি বোতল মজুত রাখে। নিজে এরোপ্লেনের টিকিট কেটে সপরিবারে তাকে বানারজুলিতে বেড়াতে পাঠিয়েছে—সেখানে নিজের বাংলোয় নিখরচায় রাজার হালে রেখেছে। সেখানেও বেড়ানোর জন্য একটা গাড়ি চব্বিশ ঘণ্টা তার দখলে। এমন দরাজ ভগ্নিপতির কাছে গোপন করার কি আছে! তার ওপর তরল পদার্থ পেটে পড়তে মনের খেদ আপনি প্রকাশ পেয়েছে।

বলেছে, বোনটার মন খুব খারাপ। তিন-তিনজন স্পেশালিস্ট দেখানো হয়েছে, তারা এই-এই বলছে—ওই অসিত রাসকেলটাকে হাতের নাগালে পেলে দীপুদা নিজেই বা তার মাথাটা ছাতু করে দেয় ইত্যাদি।

বাপী আদৌ আকাশ থেকে পড়েনি। প্রথম বারের সেই অঘটনের পর দীপুদার মুখ থেকে বড় ডাক্তারের মন্তব্য শুনে বাপীর মনে এই সংশয় ছিল। মিষ্টিকে ঘরে আনার তিন মাসের মধ্যেও কোনো লক্ষণ না দেখে ছেলেপুলে যে আর হবে না, ধরেই নিয়েছে। কিন্তু সে-জন্য তার এতটুকু মাথা ব্যথা নেই না অসিত চ্যাটার্জির মাথাও ছাতু করার ইচ্ছে নেই। সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে মিষ্টিকে চেয়েছিল। পেয়েছে। সেই অঘটন না ঘটলে বা তার পরেও একটা বা দুটো ছেলেপুলে থাকলে বাপীর চাওয়া আর পাওয়া দুই-ই বরবাদ হয়ে যেত।

বলে ফেলার পর দীপুদার অন্য সুর। —মা নিষেধ করেছিল, কিন্তু আমার মনে হয়েছে তোমার জেনে রাখাই ভালো। আমার মুখ থেকে শুনেছ মিষ্টিকে বোলো না যেন —দুদিন আগে হোক পরে হোক ও নিজে তো বলবেই তোমাকে।

বাপী বলেনি।

মিষ্টির থেকে থেকে বাপীর ওপরেই রাগ হয় এখন। এত বড় ব্যবসার কোনো কিছু চোখ এড়ায় না। বানারজুলির থেকে সময়ে সাধারণ রতনবানীর চিঠি না এলে এখান থেকে টেলিগ্রাম যায়। সব কেন-যেমন জানছে জানাও। ঊর্মিলার চিঠি পেলে মিষ্টিকে

তাগিদ দিয়ে জবাব লেখায়। জিতের আবার ডেভেলপ্‌ করতে হবে, তার বউ অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। কিন্তু জিতের থেকেও চিন্তাভাবনা বেশি তার মালিকের। থেকে থেকে টাকা দিচ্ছে, খবর নিচ্ছে। বাচ্চুর দিকেও কড়া দৃষ্টি, তার ভবিষ্যত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা। একমাত্র মিষ্টির সঙ্গেই যেন শুধু ভোগ দখলের সম্পর্ক যোলআনা ছেড়ে আঠের আনা।

খুব সুবিচার করছে না ঠান্ডা মাথায় মিষ্টি নিজেই বোঝে। এই সম্পর্কে ভোগ দখলের থেকে সমর্পণ ঢের বেশি। আসলে রাগ হয় অন্য কারণে। নিজের দুশ্চিন্তা সম্পর্কে এই লোককে সেধে সজাগ করতেও সংকোচ। কিন্তু এত সার বুদ্ধি বিবেচনা আর সবেতে এমন প্রখর দৃষ্টি, এতদিনে এ-ব্যাপারেও তো তার নিজে থেকেই সচেতন হওয়ার কথা। হলে মিষ্টির পক্ষেও সংকোচ ঝেড়ে সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ানো সহজ হত। ও এখনো একেবারে হাল ছেড়ে বসে নেই। এরকম কেস নিয়ে বিদেশে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে শুনেছে। দরকার হলে তাদেরও বাইরে চলে যাওয়া তো জলভাত ব্যাপার। কিন্তু এ-ব্যাপারে ওই মানুষের এতটুকু হুঁশ নেই দেখেই মিষ্টির কখনো রাগ, কখনো অভিমান।

এই মানসিক অবস্থার মধ্যে হঠাৎ বড় রকমের ধাক্কা খেল একটা। দিন কয়েক আগে মিষ্টির কাছে উর্মিলার চিঠি এসেছে। তার শরীরটা খুব ভালো যাচ্ছে না লিখেছে। খুব অস্পষ্ট একটু ইঙ্গিতও আছে চিঠিতে যা পড়ে শুধু মেয়েরাই সন্দিগ্ধ হতে পারে। মিষ্টি সেটা ধরিয়ে দিতে খুশি মুখে বাপী পারলে তখুনি তাকে পাল্টা চিঠি লিখতে বসিয়ে দেয়। তাগিদ সত্ত্বেও তিন দিনের মধ্যে লেখা হয়ে ওঠেনি। বিকেলে বাইরের ঘরে বসে বাচ্চু কারুর কাছে তাদের স্কুলের খেলার গল্প ফেঁদে বসেছে। মিষ্টিও শুনছিল। আর এক-ফাঁকে উঠে গিয়ে চট করে চিঠিটা লিখে ফেলবে কিনা ভাবছিল। ওদিকে মনে পড়লেই বকুনি খেতে হবে।

কলিং বেল বেজে উঠল।

দরজা দুটো ভেজানো ছিল। বাপী সাড়া দিল, কাম ইন!

দরজা ঠেলে ঘরে পা ফেলল সন্তু চৌধুরী। পরনে দামী ট্রাউজারের ওপর সিল্কের শার্ট। কব্জিতে সোনার ব্যান্ডের ঘড়ি, দু-হাতের আঙুলে জেল্লা ঠিকরনো আংটি। লম্বা ফর্সা বলিষ্ঠ অপরিচিত মানুষকে খবর না দিয়ে সরাসরি দোতলায় উঠে আসতে দেখে মিষ্টি বাপীর দিকে তাকালো। একটুও প্রসন্ন মনে হল না তাকে।

সন্তু চৌধুরীর পিছনে আরো কেউ আছে কিনা বাপী ঝুঁকে দেখে নিল। তারপর নীরস স্বরে বলল, সন্তুদা যে...

ঘরে বাচ্চুকে বলল, ভিতরে যা।

ছেলেটার দিকে চোখ পড়তেই মিষ্টি বুঝে নিল কে হতে পারে। বাচ্চু উঠে চলে গেল। কি করবে ভেবে না পেয়ে মিষ্টিও উঠে দাঁড়াল।

বাচ্চুকে এখানে দেখেই সন্তু চৌধুরীর ফর্সা মুখ রাগে লাল। ওকে ভিতরে চলে যেতে বলা হল তাও কানে গেছে। সপ্রতিভ গাম্ভীর্যে এগিয়ে এলো। দৃষ্টি মিষ্টির মুখের ওপর। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর আর ঘরোয়া বেশবাস দেখে কে হতে পারে আঁচ করেছে। আর বাপীর মনে হল সেদিন-এর হা-ঘরে ছেলের এই বরাত দেখেও লোকটার বুক চড়চড় করছে। চোখ তুলে আলতো করে একবার তাকাতে মিষ্টি বুঝে নিল, ভব্যতার দায় কিছু নেই, সে-ও ভিতরে যেতে পারে।

ঘরের দিকে পা বাড়াতে পিছন থেকে বেশ অবাক সুরের প্রশ্ন কানে এলো, সঙ্গে সঙ্গে সরস জবাবও।

—তোমার মিসেস নাকি?

—একেবারে নির্ভেজাল।

মিষ্টি আড়ালে চলে গেল বটে, কিন্তু দূরে নয়। যে এলো তার থেকে ঘরের লোকের হাবভাব দেখে ওর বেশি দুশ্চিন্তা।

বাপী বলল, বোসো, হঠাৎ কি মনে করে?...

—হঠাৎ নয়, বিলেত থেকে ফিরে তোমার অনেক খোঁজ করেছিলাম। ফ্ল্যাট ছেড়ে বাড়ি করেছ কি করে জানব। ফোন গাইডেও তোমার নিজের নাম নেই। দিন কয়েক আগে খবরের কাগজে হঠাৎ হার্ট-ভিলার রাই অ্যান্ড তরফদারের বিজ্ঞাপনে টেলিফোন নম্বর দেখে তোমার বউদি অনেকটা আন্দাজেই ফোন করেছিল। তোমার অফিস থেকে খবর পেল তুমি এ-বাড়িরই দোতলায় থাকো।

খুব ঠান্ডা গলায় বাপী জিজ্ঞাসা করল আমাকে এত খোঁজাখুঁজির কারণ কি?

চাপা ঝাঁঝে সন্তু চৌধুরী জবাব দিল বাচ্চু তোমার ঘাড়ে পড়ে আছে সেই সন্দেহ আমাদের হয়েছিল। দু বছরের ওপর নিজের ছেলের একটা খবর পর্যন্ত না পেলে মায়ের মন কেমন হয় সেটা ওই রাসকেল বুঝতে না পারুক, তোমার বোঝার কথা।

...কার কথা বলছ, মণিদার?

সন্তু চৌধুরী জবাব দিল না। ঝাঁঝালো মুখ।

বাপী আরো শান্ত। —যা বললে, দ্বিতীয় বার উচ্চারণ কোরো না, ওই ভদ্রলোক আমার দাদা।

সন্তু চৌধুরীর ছোট চোখ জোড়া খাপ্পা হয়ে উঠল।

একই সুরে বাপী আবার বলল, বাচ্চুকে কেউ আমার ঘাড়ে চাপায়নি, আমিই ওকে নিয়েছি।

রূঢ় স্বরে সন্তু চৌধুরী বলল, এখন আমরা যদি ওকে নিয়ে যেতে চাই?

—আমরা বলতে তুমি কে?

সন্তু চৌধুরী থমকালো একপ্রস্থ। মুখ আরো লাল। —ওর মা যদি নিতে চায়?

—ওর মা বলে কেউ আছে আমি ভাবি না। আর কিছু দিন গেলে বাচ্চুও ভাববে না।

দু চোখ ধক ধক করছে সন্তু চৌধুরীর।

সেদিনের সেই করুণাপ্রার্থীর এত স্পর্ধা ভাবতে পারে না। চেঁচিয়ে উঠল, ধরাকে সরা দেখছ; এখন তাহলে, মস্ত একজন হয়ে গেছ, কেমন? নিতে চাইলে তুমি ঠেকাতে পারবে?

—চেষ্টা করে দেখ। গলা চড়িও না, ছেলেটা শুনতে পাবে।

—চড়ালে তুমি কি করবে?

—গলা ধাক্কা খাবে।

সন্তু চৌধুরী ছিটকে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছাকাছি গিয়েও আবার ফিরল। দু চোখে গলগল করে তপ্ত বিষ ঝরছে। —অপমান মনে থাকবে, নিজের চরিত্র ভুলে এখন এতবড় সাধু হয়ে উঠেছ জানা ছিল না।

বাপী আস্তে আস্তে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখে একটি কথাও বলল না। আরো কিছু জানানোর জন্যে ধীরে সামনে এগলো।

মুহূর্তে বিপদ বুঝে সন্তু চৌধুরী এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ওদিক থেকে মিষ্টি ছুটে এসে বাপীকে টেনে ফেরালো। দু কাঁধ ধরে জোর করে তাকে সোফায় বসিয়ে দিতে দিতে বলে উঠল, একি কান্ড—অ্যাঁ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি—বোসো বলছি! সত্যি তুমি ভদ্রলোককে মারতে যাচ্ছিলে?

—ও ভদ্রলোক নয়।

—খুব হয়েছে। ঠান্ডা হয়ে বোসো এখন।

—বাচ্চু কি করছে?

—ওর ঘরে কাঠ হয়ে বসে আছে।

বাপী বলল, ঠিক আছে, তুমি ওর কাছে যাও।

সোফায় হাত রেখে মিষ্টি দাঁড়িয়ে রইল একটু। পুরুষের এত সংযত অথচ এমন ভয় ধরানো মূর্তি আর দেখেছে? এদিক-ওদিক দেখে নিল। তারপর চট করে দু-হাতে বাপীর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়েই দ্রুত ভিতরে চলে গেল।

দুদিন বাদে বিকেলের দিকে মিষ্টি নিউ মার্কেট থেকে ফিরল। যখন বেরোয় বাপী বাড়ি ছিল না। মিষ্টি ফেরার আগে ফিরেছে। বাইরের ঘরে বসেছিল। বলাই তাকে বলেছে দিদিমণি গাড়ি নিয়ে মার্কেটে গেছে। কিন্তু ফিরল খালি হাতে বাপী খেয়াল করল না। ও কাছে আসতে খুশি মুখে বলল, জিতের এবারও ছেলেই হয়েছে —মেয়ের ইচ্ছে ছিল খুব।

কিছু না বলে মিষ্টি চুপচাপ ঘরে চলে যাচ্ছিল। বাপীর তখুনি আবার মনে পড়ল কি। ডাকল, শোনো! উর্মিলার চিঠির জবাব দেওয়া হয়েছিল তো?

মিষ্টি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। থমথমে মুখ। চোখে চোখ। —না।

—কেন? সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত।

—আমার সময় হয়নি, হবেও না। তুমি নিজে লেখো।

চলে গেল।

বাপী ভেবাচাকা খেয়ে গেল প্রথম।

কি হতে পারে ভেবে নিল। ওর নিজের মনে চাপা দুঃখ থাকতেই পারে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তা বলে এমন থমথমে মুখ দেখবে বা এমন কথা শুনবে ভাবা যায় না। বাপীর মনে মিষ্টির জায়গা ঈর্ষার অনেক ওপরে। অন্যের আনন্দে খুশি না হতে পারাটা ঈর্ষা ছাড়া আর কি? বাপীরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আশা করল, একটু ঠান্ডা হবার পর নিজেই লজ্জা পাবে। ঠান্ডা করার উদ্দেশ্যে উঠে সে-ও হাসিমুখেই ঘরে এলো।

মিষ্টি চুপচাপ খাটে বসে আছে। তেমনি থমথমে মুখ।

—কি ব্যাপার?

জবাবে মিষ্টি অপলক চেয়ে রইল।

বাপীর খটকা লাগল একটু। মনে হল, দু চোখে তার ভেতর দেখছে।

—এই মূর্তি কেন?

এবারে জবাব দিল। ফিরে জিজ্ঞাসা করল, বলব?—তোমার আমার মধ্যে লুকোচুরির কিছু থাকতে পারে না, তবু বললে ঠান্ডা মাথায় বরদাস্ত করতে পারবে?

যে গোপনীয় ব্যাপারটা এত দিন ধামা চাপা দিয়ে রেখেছিল সেটাই কবুল করতে হবে নিয়ে হাসি চেপে বাপীরও নিজের মুখখানা সীরিয়াস করে তোলার চেষ্টা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে বসার কুশনটা টেনে নিয়ে ওর দুই হাঁটুতে প্রায় হাঁটু ঠেকিয়ে মুখোমুখি বসল। —পারব। মিষ্টির সবই আমার কাছে মিষ্টি। বলে ফেলো।

উঠে সামনের দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে মিষ্টি আবার জায়গায় ফিরে এলো। —তোমার গৌরী বউদির সেই ভদ্রলোক একটু আগে আমার ওপর দিয়ে তার সেদিনের অপমানের শোধ নিল। সেই মহিলাও পাশে ছিল।

বাপীর সত্তাসুদ্ধ আচমকা ঝাঁকুনি খেল একপ্রস্থ। তপ্ত রক্তকণার ছোটাছুটি জায়গার ফিরে স্থির হতে সময় লাগল। —কি অপমান করেছে?

মিষ্টির দু চোখ তার চোখে বিঁধে আছে। মার্কেটে মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতে খুব খুশির বিনয়ে তোমার বউদির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সম্মান দেখিয়ে আমার সঙ্গে আপনি আপনি করে কথা বলল। তুমি কত বড় একজন হয়েছে দুবার করে শোনালো। তারপর আমাকে কংগ্রাচুলেট করে বলল, এমন মস্ত মানুষের ঘরে আমাকে আশা করেনি, অন্য একজনকে দেখবে ভেবেছিল।

—কেন? বাপীর দুই চোয়াল শক্ত।

—গাড়িতে আর একজনের অবাঙালী সুন্দরী বউকে পাশে বসিয়ে তোমাকে আনন্দে হাওয়া খেয়ে বেড়াতে দেখেছে। শুধু সে নয়, তোমার বউদিও দেখেছে। গাড়িতে সেই মেয়েকে বসিয়ে রেখে তুমি নাকি দোসে এসে তাদের সঙ্গে কথাও বলেছ। তুমি তাদের বলেছ, নিজের বউ নয়, অন্যের বউ। তাই আমার বদলে তাকে এখানে দেখবে আশা করেছিল।

বাপীর তখুনি মনে পড়ল। অল্প অল্প মাথা নেড়ে বলল, একদিন দেখেছে—ঠিকই দেখেছে। —তাহলে একথা শুনেই তোমার সব বিশ্বাস ধ্বসে গেছে?

মিষ্টি চেয়ে আছে। নিরুত্তর।

—সেই আর একজনের সুন্দরী বউকে তুমিও দেখেছ। তার নাম ঊর্মিলা। গাড়িতে পাশে সে ছিল। সেই একই দিনের কথা। তোমার অফিস থেকে তাকে নিয়ে ফেরার পথে পার্কস্ট্রীটের রাস্তায় তাদের সঙ্গে দেখা।

মিষ্টি অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা সুরে বলল, সেদিনের কথা জানতাম না, তবে আমারও ঊর্মিলা বলেই মনে হয়েছিল।

—তাহলে? সে আর কি অপমান করেছে তোমাকে?

মিষ্টি চেয়ে রইল একটু। —শুনলে তুমি খুব ঠান্ডা মাথায় বরদাস্ত করবে মনে হয় না।

—আমার মাথা সম্পর্কে তোমারও খুব ধারণা নেই। বলো।

—প্রথমবার কলকাতায় এসে তুমি কয়েক মাস বাচ্চুর বাবা-মায়ের আশ্রয়ে ছিলে নিজেই বলেছিলে। আজ শুনলাম বয়সে অত বড় বউদির দিকে তোমার চোখ গেছল বলেই নাকি সেখান থেকে তোমাকে তাড়ানো হয়েছিল। সত্যি কিনা তোমার বউদিকেই জিজ্ঞাসা করতে বলল। আমি জিজ্ঞেস করিনি, তোমার বউদি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

এই মানেরে বাপী জানত। কশন ঠেলে ঘরের মধ্যে একবার পায়চারি করে আবার মিষ্টির সামনে এসে দাঁড়াল। —আমার ভিতরের জানোয়ারকে তুমি ছেলেবেলায় দেখেছ। পরেও তার চোখ অনেক বার অনেক দিকে গেছে। কিন্তু বাপী তরফদার তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চায়নি বলে চাবুক খেয়ে ওটাকে চোখ ফেরাতে হয়েছে। বাচ্চুর মা কোথায় কোন বাড়িতে থাকে জানে কিনা ওকে জিজ্ঞেস করে এসো!

আগের কথায় ধাক্কা খেয়েছিল, এবারে মুখের দিকে চেয়ে প্রমাদ গুনল। —জেনে কি হবে, তুমি সেখানে যাবে?

—না গেলে সন্তু চৌধুরী যা বলেছে তার কতটা সত্য তুমি জানবে কি করে?

উঠে দু-হাত ধরে মিষ্টি তাকে বিছানায় বসাতে চেষ্টা করল। —আর কিচ্ছু জেনে কাজ নেই—অপমানে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছল।

তখনকার মতো বাপী ঠান্ডা হল বটে, কিন্তু তার পর থেকে সমস্তক্ষণ গুম হয়ে থাকল। সন্ধ্যা পর্যন্ত এ-ঘর ও-ঘর করল। মিষ্টিকে সামনে দেখলে দাঁড়াচ্ছে। দেখছে। আবার অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। একটু বাদে একটা বই খুলে বসল। কি বই মিষ্টি জানে। আরো দুই একদিন এ-বইটার পাতা ওলটাতে দেখা গেছে। নেপোলিয়ন হিল-এর থিংক অ্যান্ড গ্রো রিচ। রিচ অর্থাৎ বড়লোক হওয়ার রাস্তা দেখানো হয়েছে ভেবে কৌতূহলী হয়ে মিষ্টিও বইটা উল্টেপাল্টে দেখেছিল। আগাগোড়া মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার দেখে পড়ার উৎসাহ হয়নি।

রাতেও চুপচাপ।

মিষ্টির এতক্ষণের চাপা অস্বস্তি এবারে বুকে চেপে বসল। —যেমন মা-ই হোক, ছেলের জন্য কাতর হওয়া স্বাভাবিক। বাচ্চুর মা-ও অনেক কষ্টে ছেলের হদিস পেয়েছে। সেই সঙ্গে ওই ছেলের এখন একমাত্র আশ্রয় কে বা কারা তাও জেনেছে। তবু ছেলের মুখ চেয়েও মহিলা ওই লোকটার অমন কুৎসিত কথাগুলোর প্রতিবাদ করল না কেন? সত্যের ছিটেফোঁটাও না থাকলে ও-ভাবে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারল কি করে?

এর জবাব পর দিন পেল। স্কুল থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে বাচ্চু তার ঘরে গেছে, মিষ্টি ডাইনিং টেবিলে বসে। বাপী নিচের অফিসঘরে। উঠে এলে একসঙ্গে চা খাবে।

সময় ধরেই। উঠে এলো। একলা নয়, তার পিছনে আরো একজন।

—মিষ্টি, গৌরী বউদি তোমার কাছে এসেছেন।

মিষ্টি নির্বাক কয়েক মুহূর্ত। সহজাত সৌজন্যে উঠে দাঁড়ানোর কথা। পারা গেল না। অস্ফুট স্বরে বলল, বসুন।

বসল। বেশ সহজ সুরে বলল, বেশি বসার সময় নেই ভাই। বাপীর দিকে ফিরল। চোখে একটু হাসির আভাস। —বউয়ের নাম মিষ্টি তুমি রেখেছ না ও-ই নাম?

বাপীও হালকা জবাব দিল, আমার কোনো কেরামতি নেই।

গৌরী বউদি মুখে আর নামের সঙ্গে চেহারার মিলের প্রশংসা করল না। তাড়ার মধ্যে কিছু দরকারি কাজ সেরে যাওয়ার মতো করে বলল, তোমার কাছেই একবার এলাম ভাই...

মহিলার রীতি জানা নেই মিষ্টির। গ্লানি বা পরিতাপকাতর মুখ দেখছে না।

—কাল যা শুনে এসেছি তা সত্যি নয় জানাতে? গলার স্বর সংযত হলেও সদয় নয় খুব।

—হ্যাঁ। সব মিথ্যে।

—কিন্তু কাল তো একটি কথাও বললেন না?

গৌরী বউদি চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। জবাব দিল, কেন বললাম না, না বুঝে থাকলে বাপীকে জিগ্যেস কোরো।

প্রায় আধ মিনিট কারো মুখে আর কথা নেই। গৌরী বউদি চেয়ার ছেড়ে উঠল। বাপীকে বলল, তোমার বউভাগ্য ভালো, এর থেকে ঢের বেশি রাগ দেখব ভেবেছিলাম। চলি...

বাপী পলকে ভেবে নিল কি। গলা চড়িয়ে ডাকল, বাচ্চু—!

বাচ্চু এলো। তারপরেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কে এসেছে জানত না।

গৌরী বউদি ওর আপাদমস্তক দেখে নিল একবার। সহজ সুরেই জিজ্ঞাসা করল, কি রে, কেমন আছিস?

গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না ছেলেটার। অমনো মাথা নাড়ল।

গৌরী বউদি চুপচাপ দেখল আর একটু। বলল, সব সময় কাকা কাকিমার কথা শুনে চলবি।...

দরজার দিকে পা বাড়ালো। বাপী এগিয়ে এলো।

নিচে গৌরী বউদির ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। তাকে তুলে দিয়ে বাপী দু মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো। বাচ্চু ঘরে চলে গেছে। বলাই তখুনি চায়ের পট আর পেয়ালা সাজানো ট্রে রেখে গেল।

বাপী চেয়ার টেনে মিষ্টির মুখোমুখি বসল। চা ঢেলে মিষ্টি একটা পেয়ালা তার দিকে এগিয়ে দিল।

বাপী বলল, গৌরী বউদিকে এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতে বললে পারতে।

নিজের পেয়ালা মুখের দিকে তুলতে গিয়ে মিষ্টি থমকে তাকালো। চেয়েই রইল একটু। বলল, কি জানি, আমি জানতাম মাস্তুকে তুমি ওই মায়ের ছায়াও মাড়াতে দিতে চাও না, তাছাড়া সেদিন আর একটা লোককে তুমি গলা ধাক্কা দিতে গেছলে দেখে আজ আরো এই ভুলটা হয়ে গেল।

প্রচ্ছন্ন খোঁচাটুকু বাপী চুপচাপই হজম করে গেল। ভিতরে একটা অসহিষ্ণুতার তাপ ছড়িয়ে আছে। কেন, নিজেও জানে না। মনের অনুভূতিগুলো সর্বদা যুক্তির পথে চলে না। তাই কেউ বুঝতেও পারে না। যেমন এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে সমস্ত অতীত মুছে দিয়ে এই গৌরী বউদিকে যদি মণিদার কাছে আর তাদের ছেলের কাছে ফিরিয়ে এনে দিতে পারত—দিত। তা হবার নয় বলেই ক্ষোভ হয়ত। কিন্তু মিষ্টি এই ক্ষোভের কি অর্থ খুঁজে পাবে?

একটু বাদে মিষ্টিই আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, অপবাদ দিয়ে তোমাকে তোমার দাদার বাড়ি থেকে তাড়ানোর কথাটাও মিথ্যে তাহলে?

পেয়ালা সামনে রেখে বাপী সোজা হয়ে বসল। সোজা তাকালো। দুজনের মধ্যে কোনো গোপনতা থাকবে না বলেছিল। এই গোপনতার সবটুকু ছিঁড়েখুঁড়ে দিলে কি হয় দেখার তাড়না। জবাব দিল খুব সাত্যি।

মিষ্টি থতমত খেল। অপবাদ সত্যি হলেও এই মুখ দেখবে ভাবেনি। আরো শোনার প্রতীক্ষায় চেয়ে রইল।

চোখে চোখ রেখে খুব ঠান্ডা গলায় বাপী বলল, কাল আমার ভেতরের যে জানোয়ারটার কথা তোমাকে বলেছিলাম, কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও গৌরী বউদি সেটাকে ঠিকই দেখেছিল। দেখে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিল। তার আগে জানোয়ারের টুঁটি টিপে ধরে বাপী তরফদার ছিটকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল বলেই ও-বাড়িতে আর ঠাঁই হয়নি।

নিখাদ সত্যের আলোয় এসে দাঁড়ানোর ফল দেখল বাপী। মিষ্টির চোখে প্রথমে অবিশ্বাস, তারপর সমস্ত মুখ লাল। পাহাড়ের বাংলোয় রেশমার কথা শুনে বুক ভরে গেছল, আজকের অনুভূতিটা তার বিপরীত ধাক্কার মতো। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে চুপচাপ উঠে চলে গেল।

কিন্তু বাপীর হালকা লাগছে। এই সত্যের স্বাদটুকু বিচিত্র লাগছে।

(চলবে)

সমালোচক ও গ্রন্থকার

গত ১৬ মার্চ সংখ্যায় অমৃত-তে আমি অরুণকুমার বসুর 'বাংলা কাব্য সঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত' বইখানার পর্যালোচনা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় অরুণবাবু তাতে ভীষণ রেগে গিয়েছেন। এবং গত ১৮ মে সংখ্যায় অমৃত-তে আমার 'সমালোচনায় সমালোচনা করতে গিয়ে খুব কায়দা করে আমাকে ঠুকেছেন। আমি সরল লোক। তার উপরে আমার কপাল খারাপ। সমালোচনার বেশীর ভাগটাই অরুণবাবুর বইয়ের প্রশংসা করেছিলাম। শেষে মনে হল সবটাই প্রশংসা করবো? যদি কোনো সতর্ক পাঠক বইটা সত্যি পড়ে ফেলে? তাহলে তো আমাকে অসৎ সমালোচক বলবে। তাই সঙ্গে কয়েকটি ত্রুটির তালিকাও দিয়েছিলাম। যেমন ধরুন ওর গ্রন্থের উদ্দেশ্য উনি 'নিবেদন' অংশে এক রকম বলছেন আবার 'কথামুখ' নামে ভূমিকায় অন্য রকম বলেছেন। আমি ওর বই থেকেই লাইন তুলে দিয়েছি। নিজে কিছুই বলি নি। তারপর ধরুন উনি এক জায়গায় ঘোষণা করেছেন বাংলা কাব্য সংগীতের লুপ্ত ইতিহাসের 'কিছুটা' তিনি এই গ্রন্থে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন। আবার আরম্ভেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ওর গবেষণা গ্রন্থের বিচারক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি ওর গবেষণাকে 'কোষ গ্রন্থ' হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। আমি প্রশ্ন তুলেছি কোনো বিষয়ের 'আংশিক' আলোচনা কি 'সমগ্রের' মর্যাদা পেতে পারে? গবেষণাগ্রন্থকে গ্রন্থকারের [illegible] ত্রুটিই বাছাই করতেই হয় অথবা কখনো কিছু যোগ করতে হয়। সামান্য সংযোগ বিয়োগে মূল গ্রন্থ কি অন্য গ্রন্থ হয়ে যায়? আরো অনেকগুলি ত্রুটির তালিকা দিয়েছি। অরুণবাবু সেগুলি সম্পর্কে নিরব। উনি সরব হয়েছেন যেখানে আমি ওকে সমর্থন করার চেষ্টা করতে গিয়ে ভুল করেছি। অর্থাৎ ম্যাপ লিথো কাগজকে নিউজ প্রিন্ট বলেছি। বইটা এত মোটা হল কেন বোঝাতে গিয়ে আমার উদ্দেশ্য ছিল নিউজ প্রিন্ট ধরনের কাগজ বলা। গ্রন্থের সমালোচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই বিষয়টির সামান্যতম যোগ নেই।

যাই হোক আমারই কপাল খারাপ। এত বড় একটা বই পড়লাম। প্রশংসা করলাম। আরো যে অসংখ্য ত্রুটি ছিল তা চেপে গেলাম। গোটাটা প্রশংসা করলে পাঠক ধরে ফেলতে পারে ভেবে সামান্য কয়েকটি দোষ ত্রুটি দেখিয়েছি। তাতেই অরুণবাবু আমার উপর এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে একটু অবিচার করে ফেলেন নি কি?

বিশ্ব বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত অরুণবাবু তো নিশ্চয় আমার চেয়ে ভালই জানেন আজকাল এমন অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হয় যা গবেষক বা লেখক, তাঁর স্ত্রী এবং প্রেসের কম্পোজিটার ছাড়া আর কেউই গোটা বইটা সম্ভবত পড়েন না। অরুণবাবু তো এই ভেবেও আমার উপর একটু দয়াপরবশ হতে পারতেন যে আমি অন্যতম লোক যে গোটা বইটা পড়ে উপরে কথিত গ্রন্থ শ্রেণী থেকে বইটিকে আনার চেষ্টা করেছি।

অমল মুখোপাধ্যায়

অবাক হয়েছি

৩০ মার্চের সাপ্তাহিক অমৃতে একটি কংকাবতী দত্তের লেখা 'ঘাসের শীষে দুইটি রঙীন মাছি' পড়ে অবাক হয়ে গেছি। এত কাঁচা লেখা 'অমৃত'র মত সাপ্তাহিকে প্রকাশ পেল কেমন করে? নতুনদের সুযোগ দেওয়া উচিত, কিন্তু তার একটা মানদন্ড থাকা দরকার।

এ ঘোষ
শিবপুর, হাওড়া।

অনুরোধ রইল

গত ২০ এপ্রিল সংখ্যায় গল্প প্রিয় পাঠকদের এক গুচ্ছ গল্প উপহার দেওয়ার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

এই সংখ্যায় বিশেষ করে ভালো লেগেছে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'পেতলের খিদে' প্রশান্ত চৌধুরীর 'ফেরতাই' ও সুরজিত ঘোষের 'অপারেশন ভেজিট্যাবেল'।

এই ধরনের গল্প সংখ্যা মাঝে মাঝে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ রইল।
—পার্থজিত গঙ্গোপাধ্যায়, ৪, জগোবিন্দ সিংহ লেন, সালকিয়া, হাওড়া—৭১১১০৬

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

আদি আছে অন্ত নেই

বিজ্ঞানেই গবেষণা করবেন, ডকটরেট পাওয়ার পর অধ্যাপনা করবেন। কিন্তু প্রথম না হওয়ার জন্যে রিসার্চ স্কলারশিপ পাওয়া গেল না। তখন আর অপেক্ষা করবারও সময় নেই। 'নিত্যভিক্ষা তনুরক্ষা' অবস্থা। ঐ যা একটি 'টিউশনি ভরসা। দুটো করতে হলে আর পড়াশুনো করা যায় না। তখনও বড় চাকরির আশা ছাড়তে পারেন নি। তবু তখনকার দিনের অবিশ্বাস্য মাইনে—পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু তা থেকে তো আটাশ টাকা বাড়ি ভাড়াই চলে যায়। তিনটে লোকের খাওয়া পরা চলে কিসে?

এতদিন তবু কনক সত্তর টাকা করে দিতেন। অন্তত দেবার কথা। তবে সে একবারে নয়—দু' কিস্তিতে দিতেন, চল্লিশ আর ত্রিশ করে। কিন্তু এরও কোন নির্ধারিত তারিখ ছিল না, বিস্তর হাঁটা-হাঁটি করতে হত প্রতি কিস্তির বেলায়ই। ফলে সব মাসে দু' কিস্তি আদায়ও হত না। এমনিভাবে ছাড় যেতে যেতে কত যে বাদ চলে গেছে, তার হিসেব নেই। ইদানীং ওটাকে মাসিক পঞ্চাশ করে ধরে নিয়ে-ছিলেন দাদা।

এখন তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন আর তিনি দিতে পারবেন না। রাধা-প্রসাদকে দিয়ে বলাবার চেষ্টা করেছিলেন মা, তাঁকে উত্তর দিয়েছেন কনক, 'একজনকে মানুষ করে দিয়েছি, চারটে পাস করেছে—আমার চেয়ে বেশী বিদ্বান হয়েছে—আর আমার কোন দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি না।'

আসলে বিনুর মনে হয়, রাজেন এম এস সি পড়ায় উনি বিরক্ত হয়েছেন, ওটাকে স্পর্ধা বলে মনে করেছেন। হয়ত ঈর্ষাই এটা। সেই জন্যেই একটা আক্রোশ অনুভব করেন।

অথচ তিনিও অনায়াসে পড়তে পারতেন, তা পড়েন নি। সবাইকেই বলে-ছেন, 'ওটা সময়ের অপব্যয়। যে মাষ্টারী কি ওকালতী করবে না, তার গ্র্যাজুয়েট হবার পর পড়ার কোন দরকার নেই। একটু লেখাপড়া জানা দরকার সে তো হয়েই গেল। রোজগারই যখন করতে হবে তখন অল্প বয়স থাকতেই সে চেষ্টা করা ভাল--দশনার দা বেটার।'

তিনি নিজে উনিশ বছর বয়সে বি-এ পাস করার পরই ও পর্বে ইস্তফা দিয়ে-ছেন, হাতে অনেক টাকা—ব্যবসায় নামার জন্য অধীর ব্যস্ত। ব্যবসা সম্বন্ধেও কিছু শিক্ষা বা অভি—তা সম্ভব প্রয়োজন এটা তার মাথায় যায় নি। অভিজ্ঞতা তো নেইই কোন ধারণা পর্যন্ত নেই। পৈতৃক কনটাকটরি ব্যবসা ধরলেও পিতৃ বন্ধুদের সাহায্য পেতেন--গেলেন অনেক লাভের কিম্বদন্তী শুনে--একসপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা করতে।

ছেলেমানুষের হাতে অনেক টাকা--'মধুগন্ধ লোভী মোসাহেবের দল তো এসে জুটবেই। তারা যে ওর মাথায় হাত বুলোতে এসেছে এটা বোঝার মতোও অভিজ্ঞতা নেই। কাকাদের সঙ্গে পরামর্শ করাটাকে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির অবমাননা ভেবেছেন। এইসব চাটুকারদের হাতেই ব্যবসা চালানোর ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ঘরে ততদিনে সুন্দরী বধূ এসে গেছে—সে নেশা তো একটু লাগবেই।

সে বয়সটা ভবিষ্যৎ ভাবার বয়েস নয়। ব্যবসায় যে লাভ না-ও হতে পারে—সে কথা মাথাতেই যায় নি। পৈতৃক বাড়ি বিক্রী করে যে যার অংশ নিয়ে নিয়েছিলেন। সে টাকাতে একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনে নিতে পারতেন, তাও করেন নি। বাড়ি কেনা মানে টাকা ব্লক করা—সে টাকা ব্যবসায় খাটালে ভাড়ার বহু গুণ আদায় হয়ে আসবে—এই তাঁর ধারণা ফলে সে টাকাও উড়ে গেছে। এখন একটি হোসিয়ারী ব্যবসার কথা এক-জন বন্ধু বলছেন। সম্ভবত সেটাই হবে। মাসিকপত্রের কথাও মাথায় আছে নাকি।

দাদার আশাভঙ্গ একটা নয়—বহুবিধ। বড় বড় চাকরির দিকেই ঝুঁকেছেন স্বভা-বতই। সেসব পরীক্ষায় পাশও করেছেন কিন্তু তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে সে কাজ পাননি। দিল্লীতে তদ্বির করার লোক ছিল না বলেই এটা হয়েছে কিন্তু সরকারী চাকরির এ রহস্য জানা ছিল না তখন। স্বাস্থ্য ভাল নয় এ অজুহাত বার দুই গেছে, স্বাস্থ্য বেশী ভাল এ অজুহাতেও। একবার চোখের জন্যে, একবার বুকটা পুরো দুই ইঞ্চি ফোলেনি—মাত্র দেড় ইঞ্চিতে থেমে গেল এটা নাকি স্বাস্থ্য খারাপের লক্ষণ, তার মানে বুকে চর্বি। আর একবার সাহেব সার্জন জেনারেল আবিষ্কার করলেন—মাথাতে চর্বি জমেছে, গোরু খাবার পরামর্শ দিলেন।

শেষে দুরবস্থার শেষ সীমায় পৌঁছে সবচেয়ে লজ্জাকর কাজই বেছে নিতে হল—ওঁর উচ্চাশার পক্ষে লজ্জাজনক—সরকারী আপিসের কনিষ্ঠ কেরাণী। এ চাকরির পরীক্ষাও দিয়ে প্রথম হয়েছিলেন সেবারই চোখে বেশী পাওয়ার বলে কাজ হয়নি, এবার একজনের সুপারিশে একদিনেই হয়ে গেল। ওঁর ছাত্রের বাবা নামকরা ডাক্তার, এক বড় অফিসার তাঁর মক্কেল, মানে সে বাড়ির ডাক্তার তিনি—তিনি বলাতেই সমস্ত আইন-কানুন ভেঙে অফিসারটি পরের দিনই যাকে বলে 'টুলে বসিয়ে দেওয়া' তাই দিলেন। তখনকার মতো অস্থায়ী। তবে স্থায়ী হতে বেশী দেরীও হয়নি। বিভা-গীয় পরীক্ষা দিয়ে উন্নতিও হয়েছে। কিন্তু সেও, যতটা উন্নতি হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি শেষ পর্যন্তও।

এ অবস্থায় বিধবা মেয়ের মতো বাড়িতে বসে থেকে দাদার ভাত ধ্বংস করা। দাদা যদি বা বসিয়ে খাওয়ান, কঠিন কথা বললেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন না, মার মুখ চেয়ে—কিন্তু সে কোন লজ্জায় কি করে থাকবে? মা নিত্য চোখের জল ফেলবেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন। বাইরে বেরোলে বন্ধুর দল আছে। টিটকিরি যদি বা সহ্য হয়, নানাবিধ প্রশ্ন, উপদেশ ও ভাসা ভাসা সহানুভূতি সহ্য হবে না।

কলেজ ছাড়লে বাড়িও ছাড়তে হবে। এ দেশই ছেড়ে চলে যেতে হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে কেউ চিনবে না, কেউ প্রশ্ন করবে না এ বয়সে কেন লেখা-পড়া ছাড়লে।

এখানে ওর সম্বন্ধে এখনও অনেকের উচ্চ ধারণা আছে। মাধববাবু প্রভৃতি বৃদ্ধের দল ছাড়াও—সাধারণ প্রতিবেশীরাও অনেকে—যারা বাজারে বা লাইব্রেরী দেখলে ডেকে কুশল প্রশ্ন করেন—তার কথায় বার্তায় ভদ্র চাল-চলনে ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভেবে রেখেছেন, সে কথা বলেনও পরস্পরকে, ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে। তাঁদের কাছে মুখ দেখানোই তো সবচেয়ে কঠিন কাজ।

দুটো দিন রাত ধরে ভাবল। অবশ্য শুধুই এলোপাতাড়ি ভাবা, তার মধ্যে

আবেগপ্রবণ, মাথাতে একটা কিছু ঢুকলে সেটা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত শান্তি পায় না। এ দুদিনও যে ইতস্তত করল, দেরি করল, মার কথা দাদার কথা ভেবেই আরও। মার শরীর খারাপ, সে সাংসারিক কাজকর্মে তাঁকে অনেক সাহায্য করে—এখন সেসব কাজই তাঁর ঘাড়ে এসে পড়বে। সকাল নটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এই নির্বান্ধব পুরে—শূন্য বাড়িতে একা থাকতে হবে।

দাদাকেও কম কৈফিয়ৎ সহ্য করতে হবে না। ইন্দু বা বিনু কোথায় গেছে—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে অবিরাম। ভাই লেখাপড়া ছেড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে—এ কথাটা বলাও বড় লজ্জার, বড় গ্লানির।

অথচ সেও আর পারছে না এ ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে।

ছায়া? না, ছায়াও না। মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র, স্বপ্ন-কল্পনার একটা বিদেহী মূর্তি। তার দুর্গ্রহ আসলে, দুর্ভাগ্যই ঐ ছায়ামূর্তি হয়ে তাকে ধ্রুব থেকে, শুভ থেকে তাড়না করছে—অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-এর দিকে, হয়ত ব্যর্থতার দিকে।

কিন্তু তা জেনেও লাভ নেই। যা তাকে টেনে নিয়ে বা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তার শক্তি অসীম, অমোঘ তার বিধান।

লেখাপড়া কিছুই হল না, হবে না। তাই বলে এখানে বিধবা মেয়ের মতো সংসারের কাজ করে এক ঘরে-বাইরে বিড়ম্বিত জীবনযাপন করতে পারবে না। অকূলেই ভাসবে, দেখবে ভাগ্য কোথায় নিয়ে যায়।

অনেক ভেবে একদিন ভোরবেলা বাজারটা করে দিয়েই 'আসছি' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এক বস্ত্রে, পকেটে বাজার ফেরৎ মাত্র সাত আনা পয়সা।

কোথায় যাবে?

কি করবে? কি খাবে?

সে পরে দেখা যাবে। যেতে যেতে ভাববে। এখনও কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। যেখানে হোক [illegible]বে। হাওড়ায় গিয়ে একটা ট্রেনে চ[illegible] [illegible]চমের ট্রেন ই আই আর-এর। [illegible] [illegible]হাবাদ পাটনা লক্ষ্ণৌ—না না, কা[illegible] ... সেখানে এখনও চেনা লোক আছে অনেক। কাশী ছাড়া অন্য কোন শহরে যাবে। বিনা টিকিটে যাবে। পথে চেকার ধরে নামিয়ে দেয়, নেমে যাবে, আবার একটা গাড়ি ধরবে। মারধোর করে—? মার খেতে হবে।

শহরে কেন? শহর ছাড়া ভবিষ্যৎ জীবিকা খুঁজে বার করা বা অবলম্বন করার পথ কোথাও পাবে না। অন্তত সে পাবে না। পাড়াগাঁয়ে চিরদারিদ্র্য, সীমিত সম্ভাবনা! কাজ বলতে চাষের কাজ, সারাদিন মাঠে রোদে পুড়ে জলে ভিজে কাজ করলে দিনে দশ এগারো পয়সা মজুরি, আর একসরা মুড়ি। ওদের হেডবাবু মাস্টারমশাই ছিলেন বীরভূমের লোক, তাঁর মুখে অনেকবার শুনেছে।

শহরে অনেক রাস্তা উপার্জনের। মোট বইতে পারে, ঠোঙা গড়ে বিক্রী করতে পারে। চায়ের দোকানে বাসন ধোয়ার কাজ আছে। নিদেন কিছু না জোটে লোকের বাড়ি রান্না করবে। গলায় পৈতে আছে, চেহারাটাও নিহাৎ ছোট জাতের মতো নয়। বামুন না মনে করার কোন কারণ নেই। রাঁধতে জানেও। বাড়িতে মার সঙ্গে রান্না করেছে, মার নির্দেশমতো। যদি চোর ডাকাত ভাবে, এই চেহারার লোক রান্নার কাজ খুঁজতে এসেছে বলে বদ মতলব ভাবে? স্বদেশী ডাকাত ভাবাও আশ্চর্য নয়। সে স্পষ্ট বলবে, 'বাড়িতে থাকতে না দিতে চান দেবেন না, আপনারা আমাকে দিয়ে রাঁধিয়ে নিন—বাকী সময়টা আমি বাইরে বাইরে থাকব। বাইরের রকে কি রাস্তার ফুটপাথে শোব। তাহলেই তো হল!'

কোনটারই কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। অভিজ্ঞতা থাকা তো সম্ভবই নয়। নিজের কল্পনায়, উপন্যাস পড়া বিদ্যের ওপর নির্ভর করে একটি ভবিষ্যতের ছবি আঁকে, নিজেই মনে মনে তার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তির উত্তোর চাপান দেয়। দিতে দিতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

বাস্তব ছবি যেটা—বিষাদের ছবিও—সেটা বাড়ির অবস্থা।

মা, দাদা। কিন্তু তা ভেবে লাভ কি?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা গিয়েই অপেক্ষাকৃত একটা চওড়া রাস্তা। এটাই এখানের বড় রাস্তা। সে পথ ধরে কিছুদূর গেলে রেল লাইন, লাইন পেরিয়ে খানিকটা গেলে বালিগঞ্জের দিকে যাওয়ার বড় রাস্তা পড়বে। সেখানে পৌঁছতে পারলে চেনা লোকের ভীড় অত থাকবে না। নিরাপদে চলে যেতে পারবে। আরও অনেকটা হাঁটলে একটা বাস, তাতে মাত্র দু পয়সা খরচ করলে হাওড়া পৌঁছানো যাবে। এই এগারোটা নাগাদ একটা এক্সপ্রেস ছাড়ে, পাটনা যায়। সেদিনই মাধববাবু বলছিলেন, মাধববাবুর সেজছেলে মধুপুর যাবেন।

কিন্তু অতদূরে যাওয়া গেল না। তার আগেই বাধা পেল।

বাধা কিন্তু আজ মনে হয় শুভবাধা।

লাইন পেরিয়েই মোড়ের মাথায় ছগনলালের বড় খাবারের দোকান। অজিত সেখানে গোটা বছর বারো তেরোর ছেলেকে কচুরি জিলিপি খাওয়াচ্ছে।

দূর থেকেই বিনুকে দেখেছে অজিত। বিনু অত লক্ষ্য করেনি। তার তখন চোখ ঝাপসা। বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। মার জন্য দুঃখ তো বটেই, বহুদিনের নিবিড় সম্পর্ক, সেই মার একমাত্র অবলম্বন অন্তত তার দিক থেকে। এ ছাড়া, কোন অকূলে ভাসল, কোন দিন কোথাও কোন তীরে আশ্রয় পাবে কিনা—এই একূল ও অকূল দুই চিন্তাতেই সমস্ত চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে আছে—তার চোখে পরিষ্কার কিছুই পড়ছে না।

অজিত কিন্তু দূরে থেকেই দেখে ওকে চিনেছে শুধু নয়, অবস্থাটাও লক্ষ্য করেছে ওর ভেতরই। কোথাও একটা কিছু বিপর্যয় ঘটেছে—এটা অনুমান করে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই।

'এই, তোরা খা, আমি আসছি। লালু এরা যা খায় দিস, আমি ওবেলা এসে দাম দিয়ে যাবো।' বলতে বলতেই একরকম দ্রুত এগিয়ে এসে হাতটা ধরল, এবং কোন প্রশ্ন করার আগেই এক পাশে, একটু ওরই মধ্যে ফাঁকা জায়গায় টেনে এনে প্রশ্ন করল, 'এই, কোথায় যাচ্ছিস রে, এত সকালে? মুখ-চোখের অবস্থা এমন কেন? কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি।........চোখে তো জল ভরে আছে দেখছি। দাদা বকেছে? না কি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছিস?'

'কিছু না, ছাড়। যেতে দে। আমার তাড়া আছে।' বলে বিনু হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে অজিত আরও জোরে চেপে ধরল ওর হাতটা। বললে, 'মিথ্যে কথা বলা অভ্যেস নেই তো, পারবি কেন। আমার মতো খচ্চর ছেলে হলে বলতিস, মার খুব অসুখ, ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিস। তাহলে এ অবস্থাটার সঙ্গে মানিয়ে যেত। শোন, ওসব চালাকি ছাড়। আমাকে তো চিনিস, লজ্জা ঘেন্না নেই। এখুনি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব। বলব, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। ওপারে বাজার, এখন সবচেয়ে ভীড়, লোকের অভাব হবে না। এক পাল লোক মিলে ধরে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে হাজির কর[illegible]—সেইটে ভাল হবে?'

তারপর নরম গলায় বলল, 'তারচেয়ে কি হয়েছে সোজাসুজি বল। মনের কথা বলার লোক তোর বেশী নেই তা জানি। আর আমাকে বলার কি সুবিধে জানিস তো, যাইহোক, যা-ই করে থাকিস আমার কাছে মন খুলতে লজ্জার কোন কারণ নেই, কেননা আমার আর কোন কুকর্ম বাকী আছে?

এবার আর বিনুর চোখের জল বাধা মানে না।

রুমাল বার করতেও তর সয় না, জামার হাতায় চোখ মুছতে থাকে।

'এঃ, কেঁদেই ফেললি। চল চল, এখানে না। লোকে হাঁ করে দেখবে। চল, ইস্টিসানে যাই, ওদিকের ডাউন প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা—ওভার ব্রীজের সিঁড়িতে গিয়ে বসি চল।'

এতটা সহানুভূতি এর আগে বিনু অন্য কোন বন্ধুর কাছ থেকে—ওর মতে ভাল ছেলে যারা, বন্ধুত্বে[illegible] উপযু[illegible]—পায় নি।

তা ছাড়া, সে যা করতে যাচ্ছে—[illegible] করবে সেটাই তো বড় কথা—এ ব্যাপারে

কারও সঙ্গে পরামর্শও তো করা হয় নি এ পর্যন্ত। কাউকে না বলেও তো থাকতে পারছে না। একজন কাউকে বলতে পেলেও যেন বেঁচে যায়—এইঅবস্থা।

ওধারের প্ল্যাটফর্ম তখন একেবারেই জনবিরল। ওভারব্রীজের নিচের দিকের সিঁড়ি কটায় একটু ছায়াও আছে, পাশেই বড় কাঠচাঁপার গাছ একটা। তখন আর যেন আর দাঁড়াবারও শক্তি নেই, গিয়ে নিচের ধাপটাতেই বসে পড়ল। তারপর অজিতের অল্প দু এক কথার প্রশ্নে, আন্তরিকতার আশ্বাস পেয়ে সব কথাই খুলে বলল। বলল অবশ্য—কারণটা নয়, শুধু কার্যটাই। কলেজে পড়া আর তার দ্বারা হবে না, আর তা না হলে বাড়িতেও থাকতে পারবে না।

সুতরাং তাকে পালাতে হবে। যেখানে হোক। সেই উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে এসেছে আজই পালাচ্ছে। এখনই। কোথায় যাবে জানে না। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে যে কোন পশ্চিমের দিকের গাড়িতে চড়ে বসবে। বিনা টিকিটে যাবে। যে কোন একটা শহরে নেমে পড়বে, সেখানে কাজকর্মের চেষ্টা করবে। যতদিন না কোন ভদ্র কাজ পায়, মোট বইবে কিম্বা লোকের বাড়ি বাসন মাজা ঘর মোছার কাজ করবে। সেটা তো পাবে।

'তুই পাগল হয়েছিস। ও কাজ চাইতে গেলে লোকে পুলিশ ডাকবে। ভাববে ডাকাতের দলের লোক সন্ধান নিতে এসেছে। মোটও বইতে পারবি না, মুখে যা-ই বলিস। সে অভ্যেস থাকা চাই। এক মণ চাল মাথায় করে তুই বিশ পা চল দিকি, তোর চেয়ে ঢের রোগা পাতলা লোক দেখবি আড়াই মণ বস্তা নিয়ে তেতলায় উঠে যাচ্ছে।....ওসব কথার কথা। এ মতলব ছাড়, এ নিহাৎই বোকামি। কোন একজন জানাশুনো লোক না থাকলে ওভাবে বিদেশে গিয়ে কিছু করা যায় না। না না, ও হবে না। তা ছাড়া ভাত ভিক্ষের চেষ্টা দেখতে গেলে কলকাতার মতো জায়গা আর কোথাও নেই ইণ্ডিয়ায়।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'তুই এখানে বোস, নয়ত যা ঐ মন্মথর পরটার দোকানের ভেতরে গিয়ে বেঞ্চিটায় থাপটি মেরে বসে থাকগে, ওর যা খাবার তৈরি হয়েছে একটু কিছু খেয়ে নে। আমি দেখি মাকে বাকতাল্লা দিয়ে কটা টাকা যদি বাগিয়ে আনতে পারি। আপাতত কোন মেসে তো তোকে থিতু করে দিই। একটা মেস আছে জানাশুনো—আমার মামাতো ভাগ্নপতি ছিল কিছুদিন, আধ মাসের টাকা আগাম দিলে এখন এক মাস নিশ্চিন্ত। মেসটা খুব সস্তা হবে না, আরও সস্তায় মেস আছে হুজুরীমল লেন কি চাঁপাতলায় গলির মধ্যে, শুনেছি আট টাকায় সেসব মেসে থাকা খাওয়া হয়—তবে তাতে দরকার নেই। তোর আখের দেখতে হবে তো—এ মেসটাতে অনেক মাস্টার থাকে শুনেছি, যদি কাউকে জমিয়ে টমিয়ে দুটো একটা টিউশনী যোগাড় করে নিতে পারিস—[illegible]দের খরচটা তো চলবে, বল মা অন্ন দাঁড়াই কোথায় হবে না।

ধর গোটা পনেরো টাকা হলেই আপাতত তোর চলে যাবে।'

বিনুকে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে গিয়ে খাবারের দোকানটার উত্তর দিকে পরোটার দোকানে বসিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে একটা সিকি গুঁজে দিয়ে বললে, 'খবরদার কোন পাগলামি করার চেষ্টা করিস নি। মা কালীর দিব্যি রইল। আমি যাবো আর আসব।'

এলও তাই। বোধহয় কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই চলে এল।

কিন্তু একা নয়। সঙ্গে কেণ্টাও এসেছে। এক হাতে লম্বা চুলে চিরুণী চালাচ্ছে, আর এক হাতে কম্বলে মোড়া একটা কি বাণ্ডিল, বিছানার মতো।

একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে অজিত বলল, 'টাকা এনেছি আটটা, মার হাতে আর ছিল না—কিন্তু এর ওপর বিছানা চাইলে কি হত জানিস, মা ঠিক ভাবত আমি কোনদিকে ভাগব, কেঁদে চেঁচিয়ে হাট বসাতো, কেলেঙ্কারির শেষ থাকত না। ...আমি ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি কেষ্টার সঙ্গে দেখা। মনে হল ও তো অনেক জায়গায় যায়-আসে, যাকে বলে সাত হাটের কানাকড়ি —তা ওকে বলতে দোষ কি। তখনও তোর নাম করিনি। বলেছি, এই একটা কম্বল চাদর আর বালিশ যোগাড় করে দিতে পারিস? ভাবছি কোথাও ভাগব মাস খানেকের জন্যে—! তা বলার সঙ্গে সঙ্গে— শালা এমন খচ্চর—বলে কি, 'উঁহু, তুমি তো সে চীজ নও, তোমার রস আলাদা, আর কারও জন্যে'—বলতে বলতেই বলে, 'বিনু না? কদিন ধরেই দেখছি মুখ কালি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন কথা জিগেস করলে জবাব মেলে না, যেন কোন ঘোরে আছে—দু তিনবার বলার পর জবাব দিলেও আন বলতে ধান বলে। তাই ভাবছিলুম, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। ও শালা বুধু বুধু করেই গেল।'....তখন আর কি করি, ভাঙতেই হল কথাটা। তা ওস্তাদ আছে, যাই বলিস, আমি মার কাছ থেকে টাকাটা বাগিয়ে রাস্তায় পা দিতেই দেখি ইয়ার আমার রেডী।'

কেষ্টার তখন সিঁথি কাটা শেষ হয়েছে—সরল সোজা বিধবার সিঁথির মতো সাদা রেখা না হওয়া পর্যন্ত শান্তি হয় না ওর—তবে আয়নায় না দেখেও সিঁথি সিধে করতে পারে—বলল, 'কম্বলটা আমার পৈত্রিক, 'পেটারন্যাল প্রপার্টি' আমার —একটু আধটু ফুটো আছে তবে পাতনচি হিসেবে দিব্যি চলবে, আমাদেরও বিছানার তলাতেই পাতা ছিল, বার করে এনেছি, মা বাড়ি ছিল না ভাগ্যিস. বোনেদের বাড়ি কিসব কান্না করতে গেছে ওদের বাড়ি বে না কি—আর চাদর নিলুম একজনের কাছ থেকে, ফরসা চাদর, কেবল বালিশটাই আমার দুনম্বরের, ওয়াড়টা তাড়াতাড়িতে কাচা হয়নি, পালটে আর একটা দিয়েছে, সেও তেমনি—ভদ্দরলোকেরা [illegible] মতো নয়, তবে বালিশের ওপর যদি চাদরটা ঢেকে দিতে পারিস বালিশের অবস্থা অত কেউ বুঝবে না।'

দুজনে সঙ্গে গিয়ে পটলডাঙ্গায় কানাই মল্লিক লেনের এক মেসে থিতু করে দিয়ে এল। মাসে এগারো টাকার মতো পড়ে নাকি, সিটরেট মাসে তিন টাকা, আর খাওয়া সাড়ে সাত আট পর্যন্ত পড়ে যায় এক মাসে। তবে ফী রবিবার মাংস হয়, মাসে একদিন 'ফিস্টি'।

'এখানের চালটা একটু অন্যরকম। তুমি তো জানই অজিত ভাই। আমরা চাই না যে বাজে দুখচেটে লোক আসে। একটু ভদ্রভাবে থাকতে চাই আর কি।' ম্যানেজার বাবু বললেন।

তার হাতে সাতটা টাকা দিয়ে অজিত বাকী টাকাটা বিনুর পকেটে গুঁজে দিল। কেষ্টা বললে, 'বিকেলে আবার আসব কাপড় জামা তো চাই। দেখি কি করতে পারি। গামছা আমারটা এনেছি—এই যে, পকেটেই থেকে যাচ্ছিল আর একটু হলে—যদি ঘেন্না হয় একটু গরমজল চেয়ে নিয়ে কেচে নিস। তবে কোন খারাপ অসুখ টসুখ হয়নি আমার—বিশ্বাস কর। বাইরে তো যাইনি কখনও। এখন জামা। জামা যে কার কাছ থেকে চাইব, তাই ভাবছি। তোমার যা শ্রীগতর একখানি। না না, তোমার নাম করে চাইব না, ভয় নেই। আমি যখন কারও কাছ থেকে কিছু চাই—কৈফিয়ৎ দিই না। কৈফিয়ৎ যে দেবে, তার কাছ থেকেই নেব।'

তবে বিকেলে সে আর এল না। এল অজিতই। তার একটা জামা আর ধুতি কেষ্টাই যোগাড় করে দিয়েছে। কিন্তু তার আজ ক্লাবে রিহস্যাল আছে—কী একটা নাটকের, সে আসতে পারবে না।

ধুতি কাচা ধোপদস্ত, আর [illegible] নয়—শার্ট। তা ছাড়াও একটা গেঞ্জি ঐ মাপের। গেঞ্জিটা নতুন। সেই সঙ্গে দুটো টাকাও পাঠিয়েছে সে—কোথা থেকে বাগিয়েছে—বলেছে, 'এটা ওর কাছে রাখতে বলিস, হাত খরচ তো চাই।'

যাবার সময় অজিত বলে গেল, এবার তোমার হিম্মতে যা পারো! চাকরি বাকরির আশা ছাড়। গোটা দুই দশ টাকা মাইনের টিউশ্যানী যদি জোটাতে পারো—তাহলেই তো আপাতত মেসের খরচা চালাতে পারবে। সেই চেষ্টাই দ্যাখো।'

।। ৩১ ।।

তবু ওরা কেউ বিকেলে আসবে—এই একটা আশা ও প্রতীক্ষা নিয়ে এতক্ষণ একরকম ছিল। এবার সেটুকু আশাও ঘুচল, ঘুচল ওখানকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক। আজ এই পৃথিবীতে সে একেবারে একা। কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এভাবে জীবন কাটাবার, এই ধরনের পরিবেশেও বাস করেনি এ পর্যন্ত। কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষাও নেই, হাতের কাজ বলতে যা বোঝায় তা জানে না—যাতে, কোন বড় না হোক, ছোটখাটো কারখানাতেও কাজ করে খেতে পারে।

একটি ক্ষীণ আলো সামনে আছে, ঘন তমসার মধ্যে—বামনুন মার বোনের বাড়ি যাওয়া। তাঁর ছেলেরা একজন রাজগঞ্জের কলে কাজ করে, একজন লিলুয়ায় কারখানায়। গিয়ে ধরে পড়লে আঠারো টাকা ছ আনা মাসিক মাইনের একটা কাজ কিংবা দশ আনা রোজের—জুটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু সে বড় লজ্জার। জানাজানি হবে. তারা বোঝাতে শুরু করবে কাজটা ভাল হচ্ছে না। বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার পড়াশুনো করাই উচিত। হয়ত ওর লজ্জা কমানোর জন্যে সঙ্গে করে এসে পৌঁছে দিতে চাইবে। বাড়িতে তখনই অন্তত একটা খবর পাঠাবে—সে বিষয়ে সে নিশ্চিত।

না, সে আর হয় না। এপারে এসে নৌকো ডুবিয়ে দেওয়া বলে ইংরিজিতে--তাই সে দিয়েছে।

অথচ, চুপ করে মেসে বসে থাকলেও অন্য লোকের সন্দেহের কারণ ঘটে।

প্রশ্নও করবে অনেকে।

কিন্তু কোথায়ই বা যায়।

এপাড়া ওর কলেজের পাড়া। এদিক দিয়ে অনেকে যাতায়াত করে। পথেঘাটে যদি কোন সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? এমনি কেউ বড় একটা তার সঙ্গে কথা বলে না, দু-একজন—যারা তার পাশে তারা ছাড়া। কিন্তু তবু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে বাবাও আশ্চর্য নয়, কী, আজকাল ক্লাসে যে একেবারেই আসেন না। কি ব্যাপার?

এই ভয়টাই তার সবচেয়ে বেশি। তার দাদার এত সময় নেই যে, পথে পথে খুঁজে বেড়াবেন।

তবু ভরসা করে সন্ধ্যের আগে একটু বেরিয়েই পড়ল। পথঘাটগুলো চিনে রাখা দরকার। শুনেছে ইউরিনালগুলোয় টিউটর চাই ও টিউশ্যনী চাই—দুরকম বিজ্ঞাপনই হাতে লেখা কাগজে সাঁটা থাকে। সেগুলোও দেখা দরকার।

ঘুরতে ঘুরতে মির্জাপুর স্ট্রীটে পড়ল। সামনে একটা বিখ্যাত কেবিন অর্থাৎ চা-টোস্টের দোকান।

পকেটে তিনটে টাকা আছে এখনও। চা আর কত দাম হবে— দু পয়সা, হাফ কাপ এক পয়সাতেও পাওয়া যায় শুনেছে। চা সে অবশ্য খায় না. এপর্যন্ত দুবার দিনের বেশি খায়নি—সর্দি-কাশি হলে বামুনমা করে খাইয়েছেন। টোস্ট তো খাওয়া হয়ই না বাড়িতে। কিন্তু এখন কিছু খাওয়া দরকার। মনের এই হতাশাটা কি চা খেলে কাটবে? সে একটু চা-ই খাবে আজ। চা আর একটা টোস্ট।

এক আনা খরচ। তাতে খাওয়া তো যাবেই, অনেকক্ষণ বসে থাকা যাবে নহ বিচিত্র মানুষের মধ্যে। সেটাও কম লাভ নয়।

আসলে সারাদিন মেসে বন্ধ থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে।

কাজ নেই, বই নেই। চেনা লোকও নেই।

এ কোথায় এসে পড়ল সে।

বারো ফুট গলির মধ্যে বাড়ি, তবু এই দিকটাই যা খোলা। বাকি তিন দিকে বড় বড় বাড়ি। নিরন্ধ্র ভারি দেওয়াল। এদিকে মানে রাস্তার ধারে যে ঘর. তাতে বাইরের দিকে জানলা আছে, বাকি সব ঘরেই, যদিবা জানলা থাকে, সে উঠোনের দিকেই। দুবেলা উনুনে আঁচ দেবার সময় কী ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়ায় না জানি।

যে-ঘরটা ওকে দিয়েছেন ম্যানেজারবাবু সেটা ফালিপানা লম্বা ঘর। সামনের দিকে এক স্কুল-মাস্টার থাকেন—নিশীথবাবু, তার কারণ, পিছনের যে জানলা—যার কাছে বিনুর বিছানা পাতার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে, সে জানলা খুললে একটা তিন ফুট মতো পথ আছে, ময়লা জল নিকাশীর জন্যে হয়ত—সিওয়ার্ড ডিচ বলে লেখা—সেটা এখন আসার সময় লক্ষ্য করেছে, কোন পথ নয় আদৌ। জানলা খুললেই একটা দুর্গন্ধ আসে। তার চেয়ে ভেতরের উঠানের দিকে ভাল, দরজা দিয়ে খানিকটা আলো আসে, হাওয়াও আসে খুব সম্ভব।

চিরদিনই ওদের ফাঁকায় থাকা অভ্যাস। জ্ঞান হয়ে যে-বাড়ি দেখেছে, তার ছাদ ছিল, সে এক বিপুল মুক্তি। তার কোন দিকে কোন বাধা ছিল না। আর গলিটা ছোট হোক তাতে দুর্গন্ধ ছিল না। কাশীর বাড়ির দক্ষিণ অবারিত খোলা, বহুদূর অবধি। রাস্তাটা ষোল ফুটের মতো হলেও সামনে কাদের একটা খোলা জমি পড়েছিল. ফলে অনেকখানিই ফাঁকা ছিল। এখানে আসার পরও সামনে-পিছনে বাগানের মতো ছিল একটু—দাদা বলেন বাগানের অপভ্রংশ।

কিন্তু, বাগান ছাড়া কি বলবে তাকে? দুটো কলাঝাড় ছিল, আমগাছ, সজনেগাছ, একটা আমড়াগাছ, ওরা দু-তিন রকমের ফুলগাছও লাগিয়েছিল আশপাশের বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে এনে। উঠোনে এছাড়া গয়লা নটের তো কথাই নেই, রাশি রাশি হত। কাঁটা-নটের একটা একটা করে শাক তোলা হাঙ্গামা, নইলে খেতে খুব মিষ্টি। একটা পাকা উচ্ছের বিচি থেকে উচ্ছেগাছ হয়েছিল। এসবে হাত বুলিয়েও আনন্দ পাওয়া যেত।

এখনকার বাড়িটা একেবারে রাস্তার ওপরে, দুফুট একটা বারান্দা মতো আছে শুধু, কিন্তু ভেতর দিকে অনেকটা খালি জমি আছে। বিনু নিজে আগের বাড়ির আকাশচাঁপা কলার তেউড় এনে বসিয়েছে. একঝাড় বিচেকলা আপনিই হয়েছে। আঁটি পড়ে একটা আমগাছ হয়েছে, সেও বেশ মাথাচাড়া দিয়েছে, হয়ত দু-এক বছর পরেই বোল আসবে। গাঁদাফুল বেলফুলের গাছ লাগানো হয়েছে—দুটো-চারটে ফুলও ফোটে।

আসলে এতদিনের জীবনে আলো-হাওয়ার অভাব বোধ করেনি কোনদিনই:

এখানে এই তিনদিক চাপা বাড়িতে সে থাকবে কি করে? সকালে দশটা নাগাদ ও ঢুকেছে তখন—যারা আপিসে কাজ করে, তারা বেরিয়ে গেছে, মাস্টারমশাইরা একে একে বেরোচ্ছেন। একটি দুটি ছাত্রকেও দেখল বই-খাতা নিয়ে স্কুলে যেতে। বোধ হয় বাবা কি কাকা কি মামা—কারও সঙ্গে থাকে। নিশীথবাবু ছিলেন। তিনি ওকে দেখে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বেজার মুখে বললেন, এ-ঘরে আবার দুজন দিচ্ছেন ম্যানেজারবাবু, উনি থাকবেন কি করে? ঐ পচা নর্দমার ওপর একফালি জানলা—না আলো, না হাওয়া—। আমার আবার ছাত্র-টাত্র পড়তে আসে, সেও ওঁর খুব অসুবিধে হবে।

ম্যানেজার অমায়িকভাবে হেসে বললেন, আপনাকে তো বললুম স্যার, আর পাঁচটা টাকা আপনি বেশি দিন, ঘর আপনারই থাক। টু সিটেড রুম. বরাবরই দুজন থাকেন। কলকাতার মেসবাড়িতে অত আলোবাতাস খুঁজতে গেলে চলবে কি করে বলুন। তিন টাকা সীট রেন্ট নেওয়া হয়, তা বৈ একটা লোকের খাওয়ানতও কিছু মার্জিন থাকে। আমি তো অন্যেহ্য কিছু বলিনি। আপনিও তো মাস মাস হিসেব দেখেন আমাদের। আপনারাই ধরে করে আমাকে পারমানেন্ট ম্যানেজার করে দিলেন। আমাকে তো চালাতে হবে। এই তাই ঠাকুর দুজন নিত্যি ঘ্যানঘ্যান করছে, দু টাকা করে বাড়াতে হবে।

এরপর আর কিছু বলতে পারেননি নিশীথবাবু। বোঝা গেল পাঁচ টাকা খরচ করে একাধিপত্যের বিলাস তাঁর ইচ্ছা নয়। হয়ত আয়ত্তেরও বাইরে।

আরও চার-পাঁচদিন যেতে বুঝেছিল কেন আয়ত্তের বাইরে, এবং এত বিরক্তির কারণও।

সন্ধ্যার অনেক পরে মেসে যখন ফিরল, তখন সব ঘরেই আলো জ্বলেছে। কেরো-সিনের আলো। টেবিল ল্যাম্প হ্যারিকেন ইত্যাদি। রান্নাঘরে দুটো কুপি।

নিচের রান্নার গন্ধ ও ধোঁয়ার সঙ্গে এতগুলি, অন্তত দশ-বারোটি কেরোসিন আলোর ধোঁয়া মিলে সমস্ত বাড়িটারই হাওয়া ঘন করে তুলেছে, নিঃশ্বেস নিতে কষ্ট হয়, চোখ জ্বালা করে।

একবার মনে হল ছুটে বাইরে চলে যায়, রাত দশটা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আসে। কিন্তু দৈহিক ক্লান্তিও অপরিসীম। সারাদিনের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, যাদের চিরকাল নিজের থেকে নিম্নস্তরের জীব ভেবেছে, তাদের কাছ থেকে সাহায্য ও উপদেশ নেওয়ার গ্লানিও অপমান, আত্মীয়-বিচ্ছেদ-ব্যথা ... এবং অবিশ্রাম ঘুরে বেড়ানো, হাঁটা—সব জড়িয়ে পা যেন ভেঙে আসছে।

আর, এইখানেই তো থাকতে হবে, দিনের পর দিন। কতদিন তাই বা কে জানে।

(চলবে)

পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

দীপঙ্করের বিস্ময় কাটে না। কি হ'ল ব্যাপারটা.! যাই হোক লোকটা নিজে অনুতপ্ত, এগিয়ে এসেছে তার কাছে। তাহলে.! সব মিটে গেল এইভাবে। দীপঙ্কর মুহূর্তে সহজ হয়ে ওঠে। এর পর আর গতকাল নিয়ে কথা না তোলাই ভাল। যা হয়ে গেছে হয়ে যাক। সে সব জেনে কোন উপকার হবে না কারোর।

—হ্যাঁ আমিও পিছিয়ে পড়েছিলাম। দীপঙ্কর হাসতে হাসতে বলে।

বিমলের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে চিৎকার ক'রে ব'লে, 'এই চৈতন টিকিট কাটতে আরম্ভ কর।' তারপরই দীপঙ্করকে বলে, আপনার কাছে যাবো। দু-একদিন বাদে, ছুটি পেলেই, এখনতো আমার ঘর-বাড়ি এই বাস।

দীপঙ্কর সোল্লাসে বলে, নিশ্চয়ই যাবেন, আমি ওয়েট করছি আপনার জন্য, জা কলাবনির কথা শুনবো না, গল্প করব।

বিমলের চোখমুখ মুহূর্তে থমকে গিয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। সে এগিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ বার করে দেয় আকাশের দিকে। বাসটা শহর ত্যাগ করার মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে। সস্ত্রীক রজনীকান্ত লাউ উঠে আসে। উঠে রজনীকান্ত একেবারে দীপঙ্করের পাশে এসে বসে হাসতে হাসতে। সতী মুখ-চোখ প্রায় ঘোমটার ভিতরে ডুবিয়ে লেডিজ সীটে বসেছে খুব সংকোচের সঙ্গে। তার পাশে একটি সাঁওতাল রমণী।

—সিগারেট নিন স্যার। রজনীকান্ত ক্যাপসটানের প্যাকেট বার করেছে।

—বাসে খাব না। দীপঙ্কর জবাব দেয়।

—এই বাসে ওসব চলে, এটা তো কলকাতা নয়।

—তবুও।

রজনীকান্ত বুঝে ফেলে দীপঙ্কর চৌধুরী এড়াতে চাইছে। সে চুপ ক'রে যায়। সতী ওদিক থেকে বিদ্ধ করছে তাকে। আবার কি ভুল হল? রজনীকান্ত মনে মনে একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। সে দীপঙ্করকে ঝাড়গ্রাম শহরের মহিমা শোনাতে আরম্ভ করে। সকালে রাস্তাটায় কেমন শাল ফুল বিছিয়ে আছে। এখন সন্ধ্যায় কেমন ফুলের গন্ধ ছড়ায় বাতাসে, এ-সব বলতে থাকে। এ সব বলা অনর্থক সেটা বোঝে না। শাল-ফুল যে রাস্তায় বিছিয়ে থাকে তা কোন চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিই এড়ায় না। এ শহর অনুপম।

সতী কঠোর দৃষ্টি বাইরে মেলে দিয়েছে। কই পিথানায়েক তো বাসে নেই। কাল মানুষটা তাহলে মিথ্যে বলেছিল! পিথার তো এই বাসে ফেরাই উচিত। নাকি ঝাড়গ্রামে থেকে গেছে। কি করে থাকবে, অত পয়সা কোথায় ওর.! মানুষটা হ্যাংলামি করছে কেন? নিজের সম্মান রেখে এগোতে হয়। খুব আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হয়। মা মানুষটার মাথা সত্যিই গেছে.!

দীপঙ্কর বিরক্ত হচ্ছে ক্রমশঃ। জানালা দিয়ে শহরটাকে আর একবার দেখে নিচ্ছিল। কিন্তু বাদ সাধল এই মানুষটা। এত সুন্দর শহর, এত অনুপম প্রকৃতিতে এই সব মানুষ কেন থাকে? দীপঙ্করের মাথার ভিতর মাঝে মাঝে অদ্ভুত কতগুলো ব্যাপার খেলা করে। সুন্দর কিছু দেখলেই মনে হয় এসব ভাল মানুষের জন্য। কুৎসিত মনের চরিত্রের মানুষের জন্য এই প্রকৃতি নয়। তাদের বিষ-নিঃশ্বাসে সব নষ্ট হয়ে যায়। ঝাড়গ্রাম শহর, এর আশপাশের গ্রামগুলির অবস্থা ঐ রকম হচ্ছে। একদিন নষ্ট হয়ে যাবে নিশ্চিত। শালগাছে কুঠার পড়ছে। এখন থেকে ব্যবসায়ীরা ট্রাকে ক'রে শালকাঠ চালান দিচ্ছে কলকাতায়। পরিবর্তে যে প্লানটেশন হচ্ছে, তার পরিপূর্ণতায় এখনো অনেক দেরী। ততদিনে শহর হয়ে উঠবে রুক্ষ, কাঠ-কাঠ, রূপরসগন্ধহীন। এই শহরে একমাত্র বিমলই ঠিক মানুষ, আর সকলে বিষনিঃশ্বাস ছাড়ছে দিনরাত।

বিমল দরজায় দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত। এত সহজে মিটে যাবে ব্যাপারটা সে আশা করেনি। যাক, বুঝতে পারেনি লোকটা যে সে তাকে এড়াতে চেয়েছিল।

পার্বতী শহর ছাড়িয়ে দূরে চলে গেছে। বাসের স্পীড বাড়ছে।

নবীনকে সেদিন রাতে নিখিলানন্দ কলাবনি যাওয়ার কথা বলেছিল। পরদিন যাওয়াও ঠিক ছিল। যাওয়া হয়নি। দুটো দিন পরে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কলাবনিতে আসতে হ'ল নবীনকে। ওরা অফিসারের জন্য অপেক্ষা করছিল।

নিখিলানন্দ অপেক্ষা করছে দীপঙ্কর চৌধুরীর জন্য। বেলা দুটো। টিফিন আওয়ার। আগের অফিসার নির্মলবাবু তার পরিচিত ছিল। তাকে দিয়ে কিছু হয় নি। কিছু হতনা এটাও নিখিলানন্দ জেনে গেছে। লোকটা গোঁয়ার এবং জেদী ছিল। আর সবচেয়ে বড় রোগ ছিল ওর সম্মান আদায়ের আকাঙ্ক্ষা। যে মানুষ রেসপেক্ট-এর পিছনে ঘোরে তাকে দিয়ে কোন বড় কাজ হয় না। তাই তার কাজও হয়নি। নিখিলানন্দ বিশ্বাস করে এটা একটা বড় কাজ। পুণ্য-কর্ম। হরিনডাঙার এই জমিজমা যদি পুণ্য-ব্রত সঙ্ঘের নামে হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর উপকার হবে। মহাত্মা পুণ্যব্রত স্বামীর আশীর্বাদ নেমে আসবে সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধা-শীল মানুষের উপর।

নবীন হেমরম ভাবলেশহীন চোখমুখে নিখিলানন্দর পাশে দাঁড়িয়ে। আজ সকালে নিখিলানন্দ নবীনকে এক আশ্চর্য সংবাদ দিয়েছে। সে নবীনকে পুণ্যব্রত সঙ্ঘে ঢুকিয়ে নেবে পাকাপাকি। পুণ্য ধর্মে দীক্ষা দেবে। নবীনের নতুন নাম হবে ভবানন্দ।

নবীন হেমরম হয়ে যাবে ভবানন্দ স্বামী। এই নাম ঠিক ক'রে দিয়েছেন স্বয়ং মহাত্মা পুণ্যব্রত স্বামী। তিনি রাতে জেলের ভিতর থেকে সূক্ষ্ম শরীরে বেরিয়ে হরিনডাঙাতে এসেছিলেন নিখিলানন্দর কাছে। নবীন বুঝতে পারছেনা কি করবে? কার কাছে পরামর্শ চাইবে। পরামর্শ দেওয়ার আছে কে? সে জিজ্ঞেস করেছিল নিখিলা-নন্দকে।

নিখিলানন্দ বলেছে, এ তোর পরম সৌভাগ্য, এমন হয়না কখনো। তোর ভিতরে গুরুজী এক আশ্চর্য শক্তির সন্ধান পেয়েছেন, তাই তিনি চরম কষ্ট উপেক্ষা ক'রে সূক্ষ্ম শরীরে আমার কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তুই ভাববার কে? ভাববে তো স্বং ভগবান। সেই ভগবান হলেন আমাদের গুরুজী, একেবারে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদের সমগোত্রীয় মানুষ।

এই সন্ন্যাসী বারবার পুণ্যব্রত স্বামীকে যিশুর সঙ্গে তুলনা করে। যিনি নিজেই সূর্য, সিংবোঙার মত মানুষ তার কি কোন তুলনা হয়.! এতবার এক কথা বলে কেন সন্ন্যাসী। এতে মহাত্মার শক্তিতে অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয় না.! নবীন ভাবে নিখিলানন্দকে জিজ্ঞেস করবে এসব কথা একদিন। কিন্তু হয়ে ওঠেনি।

নবীন নিখিলানন্দকে জিজ্ঞেস করেছে, মনের ভিতরে কুলগুরু আছে, দেওআ মরু তক এত কষ্ট করে?

সন্ন্যাসী চমকেছে। সাঁওতালটা তার সঙ্গে মিশে এত কথা শিখে গেছে? তার সেই বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে? লোকটা এখনো ঠকে, তবুও ঠকে শিক্ষা নিতে আরম্ভ করেছে। ওকে কায়দা — সহজ হয়ে উঠছে না। নিখিলান্দকে ভেবে-চিন্তে কথা বলতে হয় আজকাল। নবীনের প্রশ্নের জবাব দিতে হবেই। সে নবীনের মাথায় হাত রেখে [illegible]

মানুষ তো মূলত অহংকারী, অহংকার তার গুণের জন্য, নিজের গুণগুলোকে মানুষ জানতে পারে, সেই জানাই তো বড় কথা, তুমি নিজেই তো জান আর দশটা আদিবাসীর থেকে তোমার পার্থক্য কোথায়?

নবীন ঠিক বোঝেনি। এই ঘোর প্যাঁচের কথায় তার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সন্নিসীকে ঠিক দিকু মানুষের মত মনে হচ্ছে আজকাল, সিধা কথা বলতে পারে না, একেবারে দিকু মহাজনের ঢং। সাফ জবাব দিয়ে দিক, নবীন তোর এই এই গুণ আছে, তুই এইরকম, তুই এই কারণে ভাল তাই তোর জন্য প্রভুজী আমার কাছে বাতাসের মত দেহ নিয়ে উড়ে আসেন।

দিকু মানুষে বড় ভয়: এক কে একশো করতে ওরা খুব দক্ষ। সুদই শোধ হয় না সারা জীবনে তায় আসল। কথায় মধু ঝরে। সেই মধুর ভিতরে বিষ। সেই বিষে মরে সাঁওতালগুলো।

নবীন হেমরমের বিপদের দিনে নিখিলানন্দ দাঁড়িয়েছিল পাশে। তখন তার চোখে এই সান্নিসী সিং বোঙার মত। সে নিমকহারামি জানে না। সে জানে ধার নিয়ে সুদ সমেত শোধ না করতে পারলে, ধারের বদলে বাস্তুভিটে জমিজমা দিকু মানুষের নামে না লিখে দিলে হয় পাপ। সেই পাপে সেরমাপুরি—স্বর্গপুরিতে ঠাঁই হয় না। তাই অক্লেশে সে নিজের পাপের ভার পৃথিবীতে বসেই কমাতে থাকে। পাপ পুণ্যের সহজ সীমারেখাটা তার আজন্ম পরিচিত। পাপ হল মিথ্যে কথা বলা, পাপ হল ধার শোধ না করা, পাপ হল নিমকহারামি করা।

একবার সে অন্য কথা শুনেছিল। সেসব শুনে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তার জন্মগত বোধের সঙ্গে কেমন অমিল সে কথার। তবুও মিথ্যে বলে মনে হয় না। মনে হত সব সত্যি! সেই কথা বুকের অন্ধকার দূর করে দিয়ে নতুন বোধের জন্ম দিচ্ছিল। সে বছর নয়েক আগের কথা। তখন অনাথ মণ্ডল মরেনি। চারধারে বেকায়দা গণ্ডগোল আরম্ভ হয়েছিল জমিজমা নিয়ে। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকছিল।

গাঁয়ে একটা দিকু মানুষ এসেছিল। একেবারে অন্যরকম দিকু। মহাজনের সঙ্গে মিল নেই। লোকটাকে নিয়ে এসেছিল পীতাম কিস্কু। পিতাম এখন হরিণডাঙ্গায় নেই। কোথায় আছে কেউ জানে না। বয়স অল্প, ছোকরা-মানুষ। দিনের বেলা বিশেষ বেরোত নি রাতে আদিবাসীরা সব মিলত পীতাম কিস্কুর ঘরে। কি নাম তার! স্পষ্ট মনে আছে নবীনের, মেঘনাদ। ছোটখাট চেহারা, জ্বলন্ত চোখ।

সেই মানুষটা রাতে বসে পাপপুণ্য শেখাত ওদের। পাপের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছিল। একটা কথা কেমন জোর দিয়ে বলত, পৃথিবীর মালিক যদি তোমাদের সিং বোঙা হয়, তাহলে আলো বাতাস জমির মালিকও তিনি। [illegible] আলো বাতাস সকলকে সমানভাবে দিয়েছেন, জমি কি করে সব একটা দুটো লোকের হাতে তুলে দেন। তাহলে সিং বোঙা ভুল: তিনি অন্যায় করেন। সকলে হাঁ হাঁ করে ওঠে, ছ্যা ছি করি হয়:

—তাহলে সিং বোঙার নিয়ম রক্ষা হয় না জগতে।

—তা বটে। একজন মন্তব্য করে।

—এটা পাপ!

—মনে হচ্ছে পাপই, বলছ ঠিক।

—এই পাপ দূর কর।

এইভাবেই মানুষের দুঃখ বেদনা, মানুষের শোকতাপ সবের মূলে যে সিংবোঙার আইনকানুন না-মানা সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল লোকটা। সেই পাপের কারণ দিকু বড়মানুষ। প্রায়শ্চিত্ত করছে গরবী মানুষ।

সেই মানুষটা শুনিয়েছিল সিধু কানুর গল্প, চাঁদ ভৈরবের কাহিনী। শুনিয়েছিল বীরসা ভগবানের কথা। ভগবান বীরসা জগতের দুঃখ, সাঁওতাল মুণ্ডা ওরাঁও, সমস্ত আদিবাসীর দুঃখ দূর করতে যুদ্ধ করেছিল সাহেবদের সঙ্গে, দিকু মহাজনের সঙ্গে সিধু কানুর ভাগনাডিহির কাহিনী আদিবাসী সাঁওতাল জাতির গর্ব। এসব জানত না সকলে, পীতাম কিস্কু জানত। এসব শুনে সকলের পাপ-পুণ্যের বোধ বদলে যাচ্ছিল।

কদিন পরে গাঁয়ে পুলিশ ঢুকল। সেই ছোকরাবাবুর পাত্তা নেই। তাকে খুঁজতে এসেছিল পুলিশ। আদিবাসীরা ছাড়া তাকে কেউ দেখেনি। কেউ জানে না তাকে। যারা জানত তাদের বুকের ভিতর সে সিং বোঙার রাজ্য গড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল। পুলিশ শত তল্লাসী করেও তার সন্ধান পেল না। গাঁ ভর্তি আদিবাসীদের উপর লাঠি চালিয়েছিল। নবীন পিতামকে নিয়ে গিয়েছিল ঝাড়গ্রামে। জেরা করেছিল। নবীন হেমরম সেই প্রথম পাপ করেছিল। সেই পাপ হয়েছিল পীতাম কিস্কুরও। পাপ দিকু বড়মানুষে অনাথ মণ্ডলের চোখে, পাপ পুলিশ-এর চোখে। এসব পাপ! এসবে মানুষের মনে হিংসা ঢুকে যায়। মানুষ মিথ্যে বলতে শেখে। নবীন সেই প্রথম মিথ্যে বলেছিল সত্য বলার উপলব্ধি নিয়ে। বুক কেঁপেছিল, তবুও মুখ খোলেনি—না সে গাঁয়ে কাউকে দেখেনি। ওই রকম ছোটখাট রোগা ডিগডিগে মানুষ, মেঘনাদ না কি যেন নাম, সে তো গাঁয়ে ঢোকেনি। তাকে কেউ দেখেনি। তারা চাষবাস করে খায়, বাবু অনাথ মণ্ডলের হেলে চাষা। অতসব জানবে কোথা থেকে। তারা বেশ আছে, অত ঝুট-ঝামেলায় দরকার কি? গাঁয়ে ঐ লোক ঢুকলেই খবর দেবে নিশ্চিত।

শেষে পুলিশের লোকই ফাঁপরে পড়েছিল। ভুল সংবাদ। এত আদিবাসী সবাই কি মিথ্যে বলছে? চৌকিদার চিন্তামণি মাহাতো ভুল সংবাদ দিয়েছে নিশ্চয়ই। চৌকিদারকে ধমকে ছেড়ে দেওয়া হল। নবীনের বেকসুর মুক্তি। পীতামও বেঁচে গেল।

এরপর অনাথ মণ্ডলের মৃত্যু। তখনও হাঙ্গামায় পড়েছিল নবীন থেকে পীতাম কিস্কু শ্রীদাম বাস্কে যারা গাঁয়ে ছিল সেই সময় সকলেই। কিছু করতে পারল না পুলিশ। প্রমাণ পায়নি! কেননা নবীন সেদিন সত্যিই শ্রীদাম বাস্কের সঙ্গে গরু কিনে ফিরে এসেছিল রাতে তার প্রমাণ আছে। খুন ভর সন্ধ্যায় হয়। যে লোকটা গরু বেচেছিল সে সত্যি কথা বলে সত্যি কথা বলে হাট থেকে হরিণডাঙ্গা ফেরার পনের গ্রামের মানুষ। তবে লাঠির ঘা খেতে হয়েছিল। অনাথ মণ্ডলের লাশ তখন কাঁসাইয়ের চরে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সংকার করার পরই পুলিশের হাঙ্গামা হয়।

এই সময় সকলে সত্যি কথা বলেছিল। কেননা কেউই তো জানে না কি ভাবে মণ্ডল মারা যায়। কে গলা নামিয়ে দিয়েছে তাও জানে না কোন মানুষ। তাই কারোর পাপ হয়নি। পাপ হয়েছিল নবীনের। সে যে পাপ করেছিল মিথ্যে বলে, সে-কথা কেউ জানে না, সে বলেনি কাউকে। ঐ মিথ্যে তো পাপ নয়।

সত্যি কথাটা চেপে রেখেছিল বহু কষ্টে। মাঝে মধ্যেই সত্য প্রকাশের তাড়নায় ফুলে উঠেছিল বুক, সে অতি কষ্টে সম্বরণ করেছিল আবেগ। কেননা অনাথ মণ্ডলের মৃত্যুতে সে প্রবল কষ্টে অস্থির হয়নি এটা ঠিক। দুবার বুক মুচড়ে উঠেছিল। একেবারে প্রথমে ডেড-বডি দেখার পর, তারপর সেই কংসাবতীর চরে নিঃসঙ্গ অনাথ মণ্ডলের লাশ পোড়ানোর সময়। তবে সত্যি কথা বললে যদি মণ্ডল বেঁচে উঠত, তাহলে সে বলত হয়ত। তার সত্যি কথা বলার সঙ্গে তো মরা মানুষের বেঁচে ওঠার সম্পর্ক নেই। আর বেঁচে উঠে সেই মানুষটা যে ভাল হয়ে যাবে এমন তিন-সত্যি কোন ওস্তাদ বলেনি।

অনাথ মণ্ডলের যে জমির জন্য এত রমরমা সেসব জমি কার? কাদের? দুখিরা গোল, শিয়ালডাঙ্গা, ছোলাবেড়িয়া এসব জমি তো অনাথ মণ্ডলের নয়। সব সাঁওতাল মানুষের জমি। নবীনের বাবার জমিও আছে। অনাথ মণ্ডল ছিল পাকা মহাজন। তার মৃত্যুতে অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। বাঙ্গালী বাবুরা কষ্ট পেয়েছিল। হ্যাঁ চাষ করত বটে অনাথ মণ্ডল। সে চাষ আর এ তল্লাটে হবে না কোনদিন। অমন যত্ন করে লোক খাটিয়ে ফসল ফলাবে কে? ফসলের হাওয়া যে বুকের ভিতরে ঢুকে পড়ত।

হ্যাঁ নবীন জানতে পেরেছিল কে মারল অনাথ মণ্ডলকে। শুধু নবীন হেমরম জানে, আর জানে সেই মানুষটা, যে ধড় থেকে মুণ্ড নামিয়ে দিয়েছিল অনাথ মণ্ডলের। নবীন সেই জানাটা বুকের ভিতরে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। বিশ্বাস করে কাউকে বলা যায় না। অথচ এই সত্য চিরদিন চা-

থাকবে। থাকুক। এই সত্য প্রকাশে মানুষের জীবন সুখের হবে না এটা বুঝে গেছে নবীন হেমরম। মানুষের সুখ যদি না আসে তাহলে সত্য প্রকাশ করে লাভ কি? সে তার মনের ভিতরে সব রেখে দিয়েছে সযত্নে সংগোপনে।

। ১২ ।

নবীন হেমরম বুকের গভীরে এক ভয়ংকর সত্য লুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সে কথা বলতে পারে না কোন মানুষকে। যাকে বলতে পারত সে কোন অন্ধকারে ডুবে গেছে। তার অপেক্ষায় আছে সে। যদি সেই মানুষটা আসে কোনদিন আবার, তাকে এই গভীর সত্যের চিহ্ন ফেরত দিয়ে নবীন ভারমুক্ত হবে।

অনাথ মণ্ডলের মরণে বাবুমানুষের কষ্ট হয়েছিল। বাবুমানুষেরা হা-হুতাশ করেছিল, এই সব জমিতে আর সুন্দর ফসল দেখা যাবে না। নবীনও বুকের ভিতরে ঝিরঝিরানি অনুভব করেছিল মণ্ডল ছাই ছাই হয়ে যাওয়ার সময়। কিন্তু তখন এক গভীর গোপন সত্য জেনে যাওয়ার আতিশয্যতায় সে সমুন্ধ। সেই ভয়ে কোন কিছু মাথায় ঢুকছিল না।

তবে এটা ঠিক ঐ সব জমিতে অত [illegible] ফলানোর সময় আদিবাসীরা সেই অন্ধকারেই ছিল। চোখের সুখে তো দেহের সুখ হয় না। পীতম কিস্কু বলেছিল, মণ্ডল 'মরিছে, সুদ, ধার সবু মরিছে।'

ধারের টাকাগুলো, হিসেবপত্তরগুলো সব অনাথ মণ্ডলের মরার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। নবীনের ইচ্ছে হয়েছিল সব [illegible] এনে চিতার আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। অনাথ মণ্ডলের জমির কোন খতিয়ান যেন না থাকে। সমস্ত কাগজ চিতায় পুড়ুক। কাগজের মূলেই তো অনাথ মণ্ডলের এত সমৃদ্ধি। কাগজ না থাকলে জমি তো আবার তার আসল মালিকের হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয় না। মুখ ফুটে সে [illegible] পারে না সে।

এই সন্ন্যাসী তাকে বাঁচিয়েছে। [illegible] কানন মুর্মু বাঁচায় নি। তার ঘর পোড়ার সময়ে তো সেই দুদিনের চেনা [illegible] ডিগরীওয়ালা মানুষটা ছিল না— নবীনের বুকটা ছম ছম করে ওঠে। সেই [illegible], সেই মেঘমেদুর, [illegible] মত। সেই [illegible] পীতাম কিস্কু ও গাঁয়ে ছিল না। পীতাম এর সঙ্গে ওঠা-বসা ছিল নবীনের। পীতাম গাঁ ছেড়ে চলে গেলে নবীন অকূল পাথারে। লোকমুখে শুনেছে পরে পীতাম খড়্গপুরে রেলের মজুর হয়েছে। ঝাণ্ডা নিয়ে ইনকিলাব করে। গাঁয়ে আসে না। [illegible] কেন, ওর তো [illegible] পিছুটান নেই।

এখন এই সন্ন্যাসী বড় বিপদে ফেলেছে। দীক্ষা দিয়ে তাকে ভবানন্দ স্বামী করে দেবে। তখন তার গান [illegible] [illegible] [illegible], শালুই পুজো, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] যাবে। দীক্ষা হয়ে গেলেই তাকে পাঠিয়ে দেবে বাঁকুড়া, তারপর কোথায় কোথায় ঘোরাবে তার ঠিক কী। পুণ্যধর্মে দীক্ষা নিলে দেশমাতৃকার দায় এসে পড়ে মাথার উপর। তখন জন্মভূমি গ্রাম, স্বজন পরিজন স্ত্রী-পুত্র কারোর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলে না। নবীন তার বউ বেটাকে বাঁচাতে তাদের নিয়ে আশ্রয় খুঁজেছিল সন্ন্যাসীর কাছে। এখন সেই বউ, বেটাকে ত্যাগ করতে হবে?

এখন জিজ্ঞেস করবে এমন একটা মানুষ নেই। পরামর্শ নেবে তেমন মানুষ নেই। নবীনের নিজের উপর আস্থা থাকছে না, যদি কেউ পরামর্শ দিত।

পরামর্শ নেওয়ার কথা শুনে নিখিলানন্দ আঁতকে উঠেছে, মাথা খারাপ হয়েছে তোর, লোকের কাছে পরামর্শ নিবি? তা কেউ করে? ডিসিশন তোর হয়ে ভগবান নিয়েই নিয়েছেন, তবু যদি মন না মানে তো নিজের ভিতরে জিজ্ঞেস কর, সাড়া পাস কিনা দেখ। যাদের কাছে পরামর্শ নিবি তারা কি কেউ তোর চেয়ে উচ্চমার্গের মানুষ! আর যদি একান্তই তোর ইচ্ছে হয় ভগবানের আদেশ না মানতে তো আসিস না, ভগবান তার ডিসিশন নিয়ে নেবেন, তোকে রক্ষাও করবেন।

একেবারে দিকু মানুষের মত কথা। এত প্যাঁচপোচরে নবীন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ছাপা কিতাব মানুষকে পেঁচিয়ে কথা বলতে শেখায়। নবীন নিখিলানন্দের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। এই মানুষটা তার চরম বিপদের দিন পাশে দাঁড়িয়েছিল সে কথা সে ভু[illegible] করে? তার আদিবাসী-রক্ত, হাজার দ্বন্দ্ব হলেও নিমকহারামি করবে না। মিথ্যে বলবে না। পাপ করবে না। পাপ করবে না। শুধু যা দুবার মিথ্যে বলেছে, শেষবার অনাথ মণ্ডলের মরার পর। কে খুন করেছে তা বলতে পারেনি।

দীপঙ্কর লম্বা করিডোর বেয়ে পায়ের চটির শব্দ তুলে আসছিল। আর দেখা করতে এসে সন্ন্যাসী ফিরছে না। নির্মল মজুমদার যে সন্ন্যাসীর কথা বলে গিয়েছিল। সেই পুণ্যব্রত সংঘের লোক। কদিন ফিরে গিয়েছে। আবার এসেছে। সঙ্গে একটা সাঁওতাল রয়েছে। দীপঙ্কর অফিসে এসে বসে।

দীপঙ্কর অফিসে ঢুকতেই পিছনে পিছনে সন্ন্যাসী এসে ঢুকল। নবীন হেমরম বাইরে দাঁড়িয়ে। নিখিলানন্দের হাতে একটা ফাইল। তাতে অনাথ মণ্ডলের জমির হিসেব, জমির জরুরী কাগজপত্র, উইল, [illegible] চেক [illegible]। এখন নিখিলানন্দ নিজের [illegible] প্রকাশ করে তুলে দীপঙ্কর চৌধুরীর সামনে দাঁড়াল। সন্ন্যাসীসুলভ গাম্ভীর্য সফিস্টিকেশন নিয়ে আসে নিজের ভিতরে। প্রতিটি মুভমেন্টে নিজের [illegible] এবং সন্ন্যাসের অহংকার ফুটিয়ে [illegible]। [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দশটা মানুষের থেকে আলাদা করেছে, আর দশটা মানুষের থেকে সে অনেক বড়, তার চিত্ত মোহমুক্ত। সংসারে জড়ানো মানুষ তার কাছে কীটপতঙ্গের মত, চোখ মুখে এই ভাবটা সে প্রকাশ করে।

দীপঙ্কর শান্ত হয়ে সব শুনল। অখণ্ড ধৈর্য্যে সন্ন্যাসীকে অনেক কথা বলতে দিল। তারপর হঠাৎ নিখিলানন্দ ওরফে বিভূতি মণ্ডল আর দীপঙ্কর চৌধুরী পরস্পরের চোখে চোখ রেখে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ। খুব চেনা লাগে কি? কেমন যেন পরিচিত ভাব। দীপঙ্করের ভিতরটা ছম্ ছম করে ওঠে। নাহ্, চেনা নয়। সে চোখ নামিয়ে নেয়।

নিখিলানন্দের চোখে সন্দেহের ছায়া। চেনা মনে হচ্ছে কি? পরিচিত। এই মুখ চোখ আগে দেখেছি যেন! কোথায়? নিখিলানন্দ থৈ পায় না। অথচ মনের ভিতরে সন্দেহ ঢুকেছে। তা হলে। সন্ন্যাসীর মনে তো সন্দেহ থাকার কথা নয় কোন বিষয়ে। সন্দেহ অর্থেই পিছুটান। নিখিলানন্দ কূল পায় না। না পেয়ে বেঁচে যায়, অন্তত এই মুহূর্তের জন্য বেচে যায়। সে আবার টান টান হয়ে যায়।

নিখিলানন্দ কঠোর চোখ রেখেছে দীপংকরের ওপর। দীপংকর আড়চোখে সন্ন্যাসীকে দেখছে। ভেবে ওঠা যাচ্ছে না, কে এই সন্ন্যাসী, এর জন্যই হরিণডাঙা উত্তাল।

—আপনাদের ভ্যালিড পেপারস থাকলে অবশ্যই আইনের সাহায্য পাবেন, এর বেশী আমি কিছু বলতে পারি না। দীপঙ্কর বলে।

—আমাদের সমস্ত কাগজপত্তর বাঁকুড়ার হেড কোয়ার্টারে জমা ছিল, গণ্ড-গোলে কিছু কাগজপত্তর খোয়া গিয়েছে, তার ভিতরে হরিণডাঙার অনাথ মণ্ডলের দানপত্রও আছে।

—দানপত্র কি অনাথ মণ্ডল করে-ছিলেন? দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করে।

—না, তা ঠিক নয়।

—তবে যে [illegible] অনাথ মণ্ডলের [illegible]।

—ওঁর অনাথ মণ্ডলের এক দূরসম্পর্কীয় বোন করেছিলেন, তিনিই ছিলেন মণ্ডলের একমাত্র বৈধ ওয়ারিশন।

—অনাথ মণ্ডল কি মৃত্যুর আগে কোন অভিলাষ ব্যক্ত করেন নি [illegible] পত্রে?

নিখিলানন্দ চমকে তাকায় দীপঙ্করের দিকে, কিন্তু চোখ রাখতে পারে না, [illegible] নেয়, হ্যাঁ একটা ইচ্ছে ছিল....।

—কি জানি ইচ্ছে?

—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

একটা উইল ছিল, তাতে বলা আছে যে, এই ভূসম্পত্তি তার মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশন বা তার সংশ্লিষ্ট কোন অর্গানাইজেশনকে ছাড়া কাউকে দান করা যাবে না, দান করবেন তাঁর বৈধ ওয়ারিশান সারদা মহাপাত্র।

—আপনারা কি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত?

নিখিলানন্দের অহংকারে ঘা লাগে, সে গম্ভীর হয়ে বলে, 'না, আপনি জানেন না আমাদের ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা, পুণ্যধর্মাবলম্বী আমরা, আমাদের ধর্মের প্রবর্তক প্রভু পুণ্যব্রতস্বামী, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে কোন যোগ নেই। প্রভু পুণ্যব্রতস্বামীর আহ্বানে আমরা, এই আমি বিশাল সম্পত্তি, বাড়িঘর স্ত্রী পরিজন সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। সংসারে থাকলে পায়ের উপর পা রেখে তিনপুরুষ খেয়ে-পরে বেঁচেবর্তে থাকতাম।

দীপঙ্কর নিশ্চুপ হয়ে নিখিলানন্দের কথা শুনছিল। একটু উত্তেজিত হয়ে গেছে সন্ন্যাসী।

—কিছু মনে করবেন না, উত্তেজিত হবেন না, আপনি সন্ন্যাসী, যাইহোক, এক্ষেত্রে অনাথ মণ্ডলের ইচ্ছে রক্ষা করা হয়নি।

—হ্যাঁ তার কারণও আছে, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগের শত চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হয়েছেন সারদা দেবী, তখনই আমাদের ডেকেছেন, রামকৃষ্ণ মিশন এত-দূরে এই সম্পত্তির দায়িত্ব নিতে চায়নি। দানপত্রে সে উল্লেখ আছে।

—আপনার কাছে সেই দানপত্র আছে? দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করে।

—না, বললাম তো সব খোয়া গিয়েছে একটা কপি আছে তার।

—জাবদা, মানে রেজিস্ট্রি অফিসের কপি?

—না, হাতে তৈরি করা, আমরাই তৈরি করেছি। কাগজ খোয়া যাওয়ার আগে।

দেখবেন?

—আপনার সেই কপি দেখে কোন কাজ হবে না।

—তাহলে উপায়?

—মূল দানপত্র দলিলের জাবদা, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে যান, বের করে আনুন।

—ঠিক আছে।

নিখিলানন্দ থম মেরে বসে থাকে। এই লোকটাকে একটু প্রভুর কথা বোঝাবে নাকি? কাজ হবে! কিন্তু লোকটাকে দেখে সে সিঁটিয়ে যাচ্ছে কেন? নিখিলানন্দ উঠে পড়ে। বেরিয়ে যায়। বেরিয়েই আবার ঘরে [illegible] সন্দেহ! তবে সঙ্কোচ আছে এই জীবনে। বিভূতি মণ্ডল একেবারে নিখিলানন্দ হয়ে গেছে। পূর্বজীবনের সব শেষ। এখন যদি পূর্ব পরিচয় কেউ বার করে আনে? টেনে হিঁচড়ে বার করে ফেলে আসা জীবন। পুণ্যধর্মের কঠোর শৃঙ্খলা এবং নিয়ম। পুরনো পরিচয় একেবারে মুছে ফেলতে হবে; কেননা এই ধর্মে ঝুঁকি অনেক। যে জীবন ছুঁড়ে ফেলে বিভূতি মণ্ডল নিখিলানন্দ হয়ে গেছে সে জীবনের উপর মায়া মমতা রাখতে নেই। এই দীপঙ্কর চৌধুরীকে চেনা লাগছে কেন? কোথায় দেখেছে! ওকি তার পূর্ব জীবনের কথা জানে? নিখিলানন্দ ঘামতে থাকে।

—আপনার বাড়ি কোথায়? হঠাৎ দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করে।

—কেন?

—বলুন না।

—পূর্বজীবন শেষ, সব গোপন করা আমাদের শৃঙ্খলার অন্যতম শর্ত। আপনাকে বলবো না, তা একথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?

—না বলছিলেন, বিশাল প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করে এই ধর্মে এসেছেন, আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

—হ্যাঁ তাই, যাকগে, জাবদাটা বার করে আনলে কোন কমপ্লিকেসি থাকবে না তো? নিখিলানন্দ পূর্বজীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকতে চাইছে, এর অর্থ প্রমাণ করার চেষ্টা, দেখ আমি কেমন মোহমুক্ত উচ্চমার্গের মানুষ। কত কিছু ছেড়ে পুণ্যধর্মে দীক্ষা নিয়েছি। আমি সর্বত্যাগী।

এই অহঙ্কারের চিহ্ন নিখিলানন্দের চোখমুখে ফুটে ওঠে। এ এক অস্ত্র, দীপঙ্কর চৌধুরী কি এই অস্ত্রে বধ হবে। নিখিলানন্দ মাথা নামিয়ে ভাবতে থাকে।

—জাবদা বার করে আনুন, তখন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাবে, সব কিছু আইনমত হলে, অনাথ মণ্ডলের শেষ ইচ্ছে মত হলে আপনারা স্বত্ব পেতে পারেন, তবে সব কটা কনডিশন ফুলফিল হওয়া চাই।

নিখিলানন্দ মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে যায়। চোখমুখে কেমন দীনতার ভাব চলে আসে। সে সেটাকে অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করে। দীপঙ্কর একটা সিগারেট ধরায়, একটা বাড়ায় সন্ন্যাসীর দিকে। নিখিলানন্দ হাত বাড়িয়ে নেয়। সিগারেটে আগুন নেওয়ার জন্য দীপঙ্করের দিকে মুখ বাড়ায়। দেশলাই কাঠিটা জ্বলছে। নিখিলানন্দ সিগারেট ধরিয়েই আর সময় নষ্ট করে না, বুকটা হাল্কা হয়ে যাক, সে ফিসফিস করে ওঠে, 'আপনি কি কখনো বাঁকুড়ায় ছিলেন?'

—না। দীপঙ্কর বিব্রত হয়ে পড়ে সন্ন্যাসীর আচরণে।

—মালদহ, মুর্শিদাবাদ?

—না।

—বাড়ি কোথায়?

—এত ভয় কেন? দীপঙ্কর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

ঝট করে বিভূতি মণ্ডল উঠে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে নিখিলানন্দ হয়ে যায়। চোখ জ্বলছে। নিখিলানন্দ আর দাঁড়ায় না। সে বুঝতে পারছে না লোকটাকে এত চেনা লাগছে কেন? দুর্বলতা প্রকাশ করে দিল লোকটার কাছে? নিখিলানন্দ দ্রুত বেরিয়ে যায়। ভিতরটা টলমল করছে। বুঝতে পারছে না কি হয়ে গেল। লোকটা কি তাকে চিনতে পেরেছে? নিখিলানন্দ প্রবল দ্বন্দ্বের ভিতরে পড়ে গেছে। কোথায় দেখা হয়েছিল এর সঙ্গে? বসিরহাটের লোক! দণ্ডীরহাট! না, তা নয়তো। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, অথবা মালদহ। সন্ন্যাস জীবনের পরিচিত মানুষ হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু তার আগের জীবনের মানুষ যদি হয়। আগের জীবনের চিহ্ন থাকলে এ জীবনে ক্ষতি হয়। সন্ন্যাসধর্ম ব্যাহত হয়।

নবীন হেমরম সন্ন্যাসীজীকে হঠাৎ চোখমুখ কালো করে বেরিয়ে আসতে দেখে একটু দমে গেছে। কি হল নিখিলানন্দর! নবীনের সরল মাথায় এসব ঢোকে না। তবে কারোর মুখ চোখে বিষাদ দেখলে তার কষ্ট লাগে। নবীন আর তার নিজের কথা নিয়ে আলোচনায় যেতে পারে না। এখন ওসব কথায় সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে। অথচ নবীনের নিজের ভিতরটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। একটা মানুষ চাই। যার কাছে দাঁড়িয়ে সে তার সব কথা খুলে বলবে। মানুষটা তার মনের অন্ধকারে আলো জ্বালাবে।

তেমন মানুষ কই? ওরা রাজবাড়ি ছাড়িয়ে বাইরে চলে আসে। আলপথ ধরে হাঁটতে হবে। সন্ন্যাসী আস্তে আস্তে হাঁটছে। পিছনে নবীন। আলো মরে এসেছে। সারাদিন যে হাল্কা গরম হাওয়া উঠেছিল তা এখন নেই। নবীন এগোতে এগোতে সন্ন্যাসীর কথা শোনে।

—দেখ কত কিছু ছেড়ে এই জীবন নিয়েছি।

নবীন কোন কথা বলে না।

—আমার যা ছিল তা দিয়ে রাজার মত থাকতে পারতাম, কিন্তু থাকলাম না। নবীনের চোখে বিস্ময় জমা হয়। এমন কথা তো সন্ন্যাসী বলে না। সে চুপ করে থাকে।

—কিন্তু এই জীবনই রাজার জীবন, মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে করতে পারার মধ্যে বড় তৃপ্তি।

কথা বলতে বলতে নিখিলানন্দ চমকে ওঠে। এই [illegible] ভিতর কি লুকিয়ে আছে। সন্দেহ! সন্দেহ তো ঈর্ষার অপর পিঠ। ঈর্ষা? ঈর্ষা কাকে? ঐ অফিসারকে।

কেন? তার কাছে নত হয়ে যেতে হয়েছে বলে। নাকি ঐ মানুষটার মুখচোখে আশ্চর্য অহঙ্কার, যে অহঙ্কারের জন্ম সুখ থেকে। সুখই তো পৃথিবীতে মানুষের কাম্য। অন্যের সুখে নিখিলানন্দের ভিতরে ঈর্ষার জন্ম হচ্ছে। তাহলে এই সন্ন্যাস, এই পুণ্যধর্ম। এসব কি ব্যক্তিগত সুখের জন্য! প্রভু পুণ্যব্রতর মনও কি সেইরকম! নিখিলানন্দ সজোরে মাথাটা ঝাঁকাতে থাকে। মনের ভিতরে বিক্ষেপ এসেছে ঐ আপাত চেনা মানুষটিকে দেখে। কোন ধূসর মনের স্মৃতির ভিতরে ঐ মুখটা গোপনে লুকিয়ে আছে। তাকে বার করে আনলে কি মনের বিক্ষেপ দূর হবে? না, আজ প্রভুর পায়ের কাছে মাথা নামিয়ে বসে থাকতে হবে। মনের ভিতরে পুণ্যচেতনা জাগিয়ে করে তুলতে হবে।

নবীন হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে দেখে ডান-দিকের আল দিয়ে একটা মানুষ কলাবনির দিকে যাচ্ছে। দুলে দুলে হাঁটছে। মাথাটা অদ্ভুত তালে নাচিয়ে দিচ্ছে। মানুষটার চোখ মুখে আশ্চর্য হাসি। এখানে যে দুটি মানুষ হরিণডাঙার দিকে যাচ্ছে, নবীন আর নিখিলানন্দ, তাদের চেয়ে অনেক ছোট মাপের মানুষ এই লোকটা। বোবা এবং কালা। বলতে পারে না, শুনতে পায় না। শুধু চোখে দেখে। নবীন হেমরম ওকে চেনে। হরিণডাঙা কলাবনির মানুষ ওকে চেনে। গরীব মানুষেরা বলে, ঐ বোবা গুহিরাম একনম্বরের দালাল। হাজার ঘটনাতেও জোতদার-এর সঙ্গে থাকে। এক-ফোঁটা জমি দখল করতে ও পা বাড়ায়নি। তার মূলে ওর ভয় এবং দীনতা। রজনীকান্ত সাউ-এর মজুর। বাবুর উপর ওর কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। ওকে দেখলে খারাপ লাগে। করুণা হয়। মানুষের যুদ্ধকে ও বোঝে না।

এই বিকেলে পৃথিবীর গায়ে অনেক ময়লা লেগে গেছে আলো কমে আসায়। বোবা গুহিরাম যাচ্ছে কংসাবতীর দিকে। নদী পার হওয়ার সময় এখন। এই প্রথম নবীনের কেমন যেন মনে হয় গুহিরামকে, খুব ভাল। বুকের ভিতরটা ছমছম করে ওঠে। ময়লা নেই ওর কোথাও, অথচ পৃথিবীটা এখন পরিষ্কার নয়। নবীনের হঠাৎ মনে হয়, এই মানুষটাকে জিজ্ঞেস করা যায়। একে জিজ্ঞেস করলে হয়ত সত্যি কথা বলবে, সৎপরামর্শ পেয়ে যাবে। তার মনের যাবতীয় দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে। নবীন দাঁড়িয়ে পড়ে। এগোবে নাকি গুহিরামের দিকে।

ভাবতেই নবীন হেমরমের মুখ চোখে [illegible]লের পোঁচ পড়ে যায়। গুহিরাম জবাব দেবে না। জবাব দেয় না। শুধু চোখে দেখে যাবে তাকে। কথার কি কোন দর্শনযোগ্য রূপ আছে? নবীন ভাবতে পারে না। গুহিরাম চোখ দিয়ে কথা দেখে কি করে? নবীন গুহিরামকে মাথা দুলোতে দুলোতে চলে যেতে দেখে। বুকের ভিতরে কি এক পাহাড় ঢুকিয়ে দিয়েছে সন্ন্যাসী। এই [illegible]

অফিস থেকে বেরিয়ে দীপঙ্কর বারান্দা থেকে মাঝখানের লনটায় নেমে পড়ে। লনটায় ছায়া নেমে এসেছে। রোদ্দুর রাজ-বাড়ির শীর্ষে শীর্ষে ঝুলে আছে। ও ডান-দিকের দোতলায় তাকায়। তাকিয়েই চমকে যায়। বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে। লাবণ্য চুল এলিয়ে দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। গভীর দৃষ্টি বহুদূরে গিয়ে মিশেছে। দূর বহুদূর! দীপঙ্কর চোখ নামিয়ে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ ভিতরটা এমন হয়ে উঠল কেন, লাবণ্যকে ক'দিন দেখেনি। ও ভিতরে যায় কদাচিৎ। আজ এই আলো-মরে যাওয়া পৃথিবীতে লাবণ্যকে অন্যরকম মনে হল। চারধারে গার্জিন্য, লাবণ্যর ভিতরে সেসব কিছু নেই। অদ্ভুত লাগছে! আর একবার দেখতে ইচ্ছে হলেও চোখ তুলতে পরল না। এসব কেন মনের ভিতরে। দীপঙ্কর অনামনা হওয়ার চেষ্টা করে—

সন্ন্যাসীকে চেনা মনে হচ্ছিল। খুব চেনা। অস্পষ্ট স্মৃতির ভিতরে দুলে যাচ্ছে মুখটা। অথচ সব পরিষ্কার হচ্ছে না। খুব বড় ঘরের ছেলে, অল্পবয়সে সন্ন্যাস নিয়েছে। লাবণ্য এখনো দাঁড়িয়ে আছে? দীপঙ্কর ঘাড় ঘোরাতে পারে না। সন্ন্যাসীকে সে কোথায় দেখেছিল? দেখা হয়েছিল এক-দিন এটা ঠিক, কেননা সেই দ্বন্দ্ব সন্ন্যাসীর ভিতরেও ঢুকে গেছে। না হলে সে অমন করে কাছ নুরে পড়ত না। সন্ন্যাসীর মূল শিকড় কোথায় লুকিয়ে, বাঁকুড়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ! এই তিন জায়গায় মানুষটার শিকড় ঢুকে গেছে এটা স্পষ্ট। শিকড় না ইতিহাস। যা এখন আর প্রকাশ করতে চায় না সে। ইতিহাস বড় নির্দয়। মানুষকে কষ্ট দেয়। এই রাজবাড়ি কত ইতিহাস নিয়ে— দীপঙ্কর চোখ ঘোরায়, মাথা তোলে। লাবণ্য নেই।

দাড়ি চুল জোব্বাজাব্বা ছাড়লে বোধহয় লোকটাকে চেনা যেত। ওই গেরুয়া বসন দাড়ি চুল সব ওর আসল চেহারাটাকে লুকিয়ে রেখেছে। ওর ভিতরের আসল মানুষটাকে চেনা যায় না। জোব্বা খুলে দাড়ি উপড়ে আসল মানুষটাকে বের করে আনলে দীপঙ্কর স্বস্তি পেত। একটা ইতিহাস আলোয় মেলে ধরা যেত। ওই চোখ, ওই দৃষ্টি কথা বলার ধরন কণ্ঠস্বর সব কেমন স্মৃতির ভিতরে ধুলোচাপা হয়ে পড়ে আছে। মানুষটাকে আবিষ্কার করতে না পারলে দীপঙ্করের স্বস্তি নেই।

রাজবাড়ির গেট দিয়ে একটা সাইকেল ঢুকছে। ডাক্তার। এত বেলায় ডাক্তার কেন? সন্ধে তো হয়ে এল। কি ব্যাপার! দীপঙ্কর হঠাৎ অস্বস্তিতে পড়ে ডাক্তারকে দেখে! এইরকম অস্বস্তি তো ডাক্তারকে দেখে কোন-দিন হয়নি। সে জোর করে মুখের কোণে হাসি এনে এগিয়ে যায়।

—কি ব্যাপার, হঠাৎ এই সন্ধ্যের মুখে।

—আমার কি, রাজ[illegible] অসুখ। [illegible]

—রাজবৈদ্য তাই [illegible] উপর বসে আছেন, দীপঙ্করের কণ্ঠস্বরে শ্লেষ। ডাক্তারের চোখ জ্বলে উঠল, পরক্ষণেই সে হো হো করে হেসে ওঠে, রাজবৈদ্যই বটে, রাক্ষসে গোটা রাজপুরীকে পাথর করে দিয়েছে, এখন রাজবৈদ্য সেই পাথরের বুকে স্টেথো বসাচ্ছে ..

—স্টেথো ঠিক নয়, বলুন সোনার কাঠি।

ডাক্তার অপ্রস্তুত হয়ে সামলে নিল নিজেকে। চোখ মুখে কেমন বিপন্নতা।

—গল্প এনেছেন তো, আপনার চিকিৎসার ওষুধ তো মশাই গল্প—

ডাক্তার কি বলতে গিয়ে সামলে নেয় নিজেকে তারপর এগিয়ে যায়।

*

গুহিরাম ঘরে ফিরছিল আজ তাড়া-তাড়িই। বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিতে হয়েছে। এর বদলে একদিন বেশী কাজ করে দিলেই হবে। বাবু রজনীকান্ত সাউ-এর বাড়ীর যাবতীয় কাজই বোধহয় তাকে করতে হয়। মা তাকে স্নেহ করেন। খাওয়ায় কার্পণ্য নেই। তবু বাবুর ছেলেরা সুবিধের নয়। কাজে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সেই ক্ষোভে এক একদিন সে ইচ্ছে করে কাজে নানান গলদ ঢুকিয়ে দেয়। গরুগুলোকে জাবনা দেয় না সময়মত, ধানের বস্তা ধান-কাটা কলে নিয়ে যেতে অহেতুক দেরী করে। ঠিক দুপুরে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গরু-গুলোকে বেঁধে রাখে। সারাদিন অভুক্ত রেখে দেয়। রেখে শালজঙ্গলের ছায়ায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়। এছাড়া উপায় কি? বাবুর ছেলের রকমসকম দেখে তার কথায় উত্তর দিতে ইচ্ছে হয়। সম্ভব হয় না। রজনী-বাবুকে সে ভয় করে। রজনীকান্তর বয়স আর তার বয়স সমানপ্রায়। ছোট থেকে দুজনে পাশাপাশি বেড়ে উঠেছে। এই বেড়ে ওঠার দরুণ রজনীবাবুকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে।

রজনীর বউ ভাল। সে হল মা। গুহি-রাম মা বলতেও পারে না। রজনী এখন একটু অনরকম থাকে। মুখের হাসি নিভে গেছে তার। জমিগুলোর ধান এবার অধি-কাংশই ঘরে ওঠেনি। বাবু কথায় কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। গরীব মানুষকে এমনিতেই দেখতে পারে না, শুধু তাকেই সহ্য করে। হ্যাঁ করে না করে উপায় নেই। সে তো জড় পদার্থ পাথরের মত। তার চোখ মুখ দেহে কোন ব্যাপারেই চাঞ্চল্য ওঠে না। যে পাথর তার উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে লাভ কি? এসব ঘটনার আগে রজনী এমনি ছিল না।

রজনীকান্ত তো এখন এমন হয়েছে। আগে তো থাকত রাজার মত। কথা বলত কম। তার দাপটে ঘরের মানুষ তটস্থ হয়ে থাকত। তখন গুহিরাম ভাল ছিল। কোন ভয় ছিলনা। এখন তার ভয় ঢুকেছে। বাবু

ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন
কিন্তু জাতি ঐক্যবদ্ধ।

এই আমাদের গৌরব

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের জন্য ভারত বিশ্বে চিরকাল শ্রদ্ধার আসন পেয়ে এসেছে। এ দেশে সব কটি ধর্মের অনুগামী আছেন এবং আমাদের সংবিধানে তাঁদের প্রত্যেকের সম-অধিকার ও ব্যক্তিগত মর্যাদা স্বীকৃত।

ধর্ম হল পবিত্র বিষয়। ধর্ম উপলক্ষ্য কারো কারও কোনও অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দেওয়া হবে না।

ভদ্র সজ্জন নাগরিকরা বিভ্রান্তি, উত্তেজনা ও সাম্প্রদায়িক হিংসার প্ররোচকদের নীরবে দীর্ঘকাল বরদাস্ত করে এসেছেন। আইন শৃঙ্খলা যখনই ভেঙেছে তার মূল্য দিতে হয়েছে আইনমান্যকারী নাগরিকদের। একটি নয় দুটি নয়, অসংখ্য পরিবার দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় বাধা পড়েছে, শ্রমজীবীদের জীবিকা ও ব্যবসায়ীদের আয়ের পথ রুদ্ধ হয়েছে। আমাদের সকলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সর্বজনীন সম্পত্তি নষ্ট ভ্রষ্ট করা হয়েছে।

নির্দোষকে এর পরিণাম ভুগতে হবে কেন?

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী নাগরিকদের অভিন্ন অধিকারে কাউকে কোনও হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্যচ্যুতি কঠোরভাবে বিচার করা হবে।

আসুন আমরা শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ়মূল করাতে সচেষ্ট হই

সাম্প্রদায়িক ঐক্য ক্ষুন্নকারী সমাজবিরোধীদের প্রতিরোধ করুন DAVP 79/67

সন্দেহ করে যে, সেইসব লোক যারা সমস্ত জমিজমা দখল করে নিয়েছে তাদের সঙ্গে বোধ'য় তার যোগাযোগ আছে। পিথা নায়েক, বঙ্কিম, লালচাঁদ, ফকির সকলের সঙ্গে বোধ'য় গোপনে তার যোগাযোগ।

গুহিরাম গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে। বাবু কথায় কথায় এসব বলে বেশ চিৎকার করে, যাতে সে শুনতে পায়। শুনতে পায় গুহিরাম, মানুষের ঠোঁটের কাঁপন দেখেই সে কথা ধরতে পারে। বাবু এই কথা বলেন, আর চাষীরা বলে দালাল গুহিরাম, রজনী দাউ এর পা চেটে ওর দিন কাটে। কি করবে সে। যাবে কোথায়? অম্বুজ বারিকের কাছে। তার মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে। মুখ দেখলে মানুষ চেনা যায়, আর অম্বুজকে সে তো বেড়ে উঠতে দেখেছে। গরীবের ভাল চায় ওই লোকটা! গুহিরামের বিশ্বাস হয় না। অম্বুজ এইসব জমির অনেক জানে। কিন্তু চুপ করে আছে। চাষী লেলিয়ে দিয়েছে রজনীবাবুর পিছনে। অম্বুজ সব জানলেও বলতে পারবে না কিছুই; তাহলে ওর নাড়ি ধরে টান পড়ে যে।

এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে হরিণডাঙার সাঁওতালটা যাচ্ছে। নবীনকে সে চেনে। নবীন হঠাৎ দাঁড়াল তারপর হাঁটতে লাগল। গুহিরাম মাথা দুলিয়ে ওদের অতিক্রম করে রাজবাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে নদীর দিকে যাবে। রাজবাড়িতে ঢুকেছে কবে মনে নেই। তার এই বাড়িতে ঢোকার প্রয়োজন হয় না। সে ঢুকতেও চায় না। ভিতরে কি আছে? গুহিরাম দূরে থেকে মাথা উঁচু করে রাজবাড়ির দিকে তাকায়, এখন সে নদীর কাছে। ছাদে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালোছায়ার মত। নজর পড়ে আসছে। কে? রাজকুমারী! গুহিরাম দুটো হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়।

নদীতে নেমে এগোতেই দেখে ওপারের ঢাল থেকে নেমে আসছে পিথানায়েক আর প্যান্ট শার্ট পরা। হ্যাঁ অম্বুজাক্ষ বারিক। কলকাতায় গিয়েছিল অম্বুজ, বউ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ফিরে এল নাকি! তা বউ কোথায়? হাসপাতালে ভর্তি রেখে এসেছে! গুহিরাম হালুক চালুক দেখে, না অম্বুজের বউ নেই।

যারা চলে গেল, সেই শব্দ মাঝনদীতে দাঁড়িয়ে শুনল অম্বুজাক্ষ বারিক আর পিথা নায়েক। গুহিরাম শব্দ শুনল না, দেখল দূরে ধুলো উড়ছে। সুতরাং বাসটা আড়গ্রামে ফিরে গেল। সেই আবিষ্কারবাবু কোথায়! যাকে একদিন এখানে আবিষ্কার করেছিল গুহিরাম। খুব ভাল মানুষ। তার কথায় হাসেনি। সব বুঝেছিল। সে তো অনেকদিন হল। তারপর আর কোনদিন ঐ লোকটার পাশে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ হয়নি। দাঁড়াতে পারলে আরো নতুন কিছু দেখিয়ে দিত গুহিরাম। দীপঙ্কর চৌধুরীকে তার প্রথম বিকেলে কলাবনি চিনিয়েছিল। সেই চেনানোর কথা, সেই সময়, গুহিরামের জীবনে অক্ষয়। এইতো বাস চলে গেল, অফিসার লোকটি নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকবে না আর কোনদিন।

থাকলেও আর তো অচেনা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না, যে গুহিরাম তাকে পৃথিবী চেনাবে। পৃথিবী চিনিয়ে দেওয়ার অহংকারে অহংকারী হবে সে।

—হেই গুহিয়া। পিথা নায়েক ডাকে।

গুহিরাম বোঝে তাকে ডাকছে, সে দাঁড়ায়, ভাল লাগে না।

—কালা হই গেল? পিথা নায়েকের চোখ মুখে শ্লেষ।

গুহিরাম শোনে না, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। চোখ বালিতে নামিয়ে দিয়েছে। আবছা আবছা একটা দুটো শব্দ যেন বহু লক্ষ যোজন দূর থেকে ভেসে আসছে।

....শালা.... শুয়োর...... রজনী... চাম....

গুহিরাম পা দুটো বালিতে প্রোথিত করে রাখে। চোখের সামনে সাদা আস্তরণ। শুধু বালি আর বালি। তার কাঁধে হাত পড়ে। সে চোখ তোলে।

—কেমন আছিস গুহিরাম!

অম্বুজ হাসছে। গুহিরাম অনড় হয়ে থাকে। কথা বলে না।

—জমি নিবি?

গুহিরামের চোখ বড় বড় হয়ে যায়। কথা ধরতে পেরেছে, ঠোঁটের কাঁপুনি লক্ষ্য করেছে।

—দূর শালা, দালাল।

পিথা নায়েক ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে এগিয়ে যায়। অম্বুজাক্ষও এগিয়ে যায়। বেলা মরে এসেছে। শুধু ছায়া আর ছায়া। গুহিরাম বালির উপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। শরীর বয় না। চোখমুখে সন্ধ্যে নেমেছে! পিথা নায়েক যা বলেছে শুনতে পেয়েছে সে। শুনতে পেয়ে করবে কি! জবাব কই? তার মুখে ভাষা আসে না যে! কেউ যদি কথা বলতে শিখিয়ে দিত।

॥ ১৩ ॥

এই দেউড়ি পার হলেই ডাক্তারের বুকের ভিতরটা ঝমঝম করে বেজে ওঠে। শিরশিরানি শুরু হয়। সমস্ত শরীরটা ভার হয়ে যায়। সে আর আগের মত থাকে না। এই গৃহ ডাক্তারের ভিতরে অসুখ এনে দেয়। তবু এখানে আসতে পারলে সে বেঁচে যায়। সারাটা দিন কাজের ভিতর ডুবে থেকে তার স্বস্তি নেই। সারাক্ষণ এই রাজগৃহ তাকে আকর্ষণ করে। প্রবলভাবে টানতে থাকে। ডাক্তার আস্তে আস্তে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মধ্যেই তার মনে হয় এই অঞ্চলে যদি না আসত বেঁচে যেত। বা যদি কোনদিন এই দেউড়ি তাকে পার না হতে হত, অথবা এই রাজগৃহে লাবণ্য না থাকত। লাবণ্য থাকার কথাও ছিল না। এই অঞ্চলে এ বয়সে সবার বিয়ে হয়ে যায়। লাবণ্যর হয়নি। হয়নি কেন তা অনেকেই আঁচ করতে পারে। অন্নদাশঙ্করের কুষ্ঠ। কুষ্ঠ রোগীর মেয়ে লাবণ্যময়ী অপরূপা। তাকে গ্রহণ করার মত কেউ নেই। যারা আছে তাদের জন্য তো লাবণ্য নয়।

প্রহরাজ বংশের আভিজাত্য আছে। আছে কয়েক পুরুষের বলার মত ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পাতা দুমড়ে মুচড়ে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে এখন। তবুও ধরে রাখার প্রবল প্রচেষ্টা।

এই পুরীতে শুধু অন্নদাশঙ্কর আর লাবণ্য। লাবণ্যর সঙ্গী কয়েকজন পরিচারিকা, আর কেউ নয়। এই ধ্বস্ত পুরীতে পুরুষ বলতে পিতা অন্নদাশঙ্কর, আর দু একজন মুনিষ। তাদেরই দুজনের ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল লাবণ্য। সে আজ বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। অল্পবয়সের ভুল। ঐ বয়সটা সর্বনাশা। পা মেপে মেপে চলতে হয়। একটু ভুল হলে রক্ষে নেই। লাবণ্যর সেই ভুল হয়েছিল। তবে অক্লেশই রেহাই পেয়েছে। দুজনেই সর্পাঘাতে মরে পড়েছিল মাঠের ভিতর। তাদেরই একজনের ভাই পিথা নায়েক। পিথা কি সব বলে দিয়েছে নতুন মানুষদের। লাবণ্য পিথাকে ভয় পায় আজকাল।

তার ভয় ছিল না। কেননা তখন তো রাজপুরী অন্ধ। জানালা দরজা বন্ধ। কোন ফাঁক ফোকর নেই। বাতাস ঢুকবার কোন উপায় ছিল না। তারপর একদিন দুম করে প্রবল বাতাসে দরজা খুলে গেল। সোনার খাটে রাজকন্যা ঘুমিয়ে ছিল। তার অপরূপ দুই চোখ মুদিত ছিল। কে একজন এসে মাথার কাছে সোনার কাঠি নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করল। সে তফাবনির হেলথ সেণ্টারের ডাক্তার বোস। আস্তে আস্তে সে ইমপর্টাণ্ট হয়ে গেছে লাবণ্যর কাছে! কবে যেন ঢুকে পড়েছিল এই বাড়িতে তারপর সম্পর্ক হয়ে গেছে অচ্ছেদ্য।

ডাক্তার অদ্ভুত মানুষ। লাবণ্যর অসুখ ধরে ফেলেছে। লাবণ্যর মনের অন্ধকারে আলো ফেলেছে ডাক্তার। ডাক্তার আসলেই লাবণ্য উদ্দাম হয়ে ওঠে। অথচ এই মানুষটাকে অন্যভাবে নেয়ার কথা তার ভাবনাতেও আসে না। ডাক্তার গল্প বলে, গল্প শুনতে শুনতে লাবণ্য শূন্য দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চেয়ে থাকে। লাবণ্যর এই ব্ল্যাঙ্ক লুকিং ভয়াবহ। ডাক্তার নিজেকে অতি কষ্টে সামলে নেয়। আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে লাবণ্যর দৃষ্টির অন্য কোন অর্থ নেই।

ডাক্তার খুব মাপা মানুষ। নিজেকে চেনে। কোথায় কিভাবে পা ফেলতে হয় জানে। লাবণ্যর জন্য মাঝে মধ্যে বিষাদ আসে ওর মনে। লাবণ্যর মনে ধরেনি ওকে অথচ লাবণ্য ওকে ব্যতীত থাকতে পারে না। লাবণ্য মায়াময়, মমতাময়ী। লাবণ্যর এই চেহারা ডাক্তারকে বারবার আকর্ষণ করে নিয়ে আসে এখানে। তাই লাবণ্যর কাছে এক মুহূর্তেও অসহায়তা প্রকাশ না করে তার ভিতরে ঢুকে পড়ছে সে ক্রমশ।

(চলবে)

পোষাক বদল

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকেলে বাড়ি ফিরে একটু আয়েস করে বসেছিলেন অরুণাংশু। সেই সকাল থেকে সারা দুপুর প্রচুর ঘোরাঘুরি, বহু ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে নানা কাজে। একটুও বিশ্রাম পেলেন নি। সমাজসেবার কাজে ঝক্কি কী কম।

কোথাও কোন কারখানায় শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের বিরোধ, সালিশি করতে হবে। কোন অঞ্চলের ঝাড়ুদারেরা ধর্মঘট করেছে—জঞ্জাল জমে জমে বিরাট পাহাড়, বিকট দুর্গন্ধ। অচলাবস্থা ভাঙতে এখনই ডাক পড়বে। কোন মনীষীর জন্মশতবার্ষিকী, জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিতে হবে। এক জমজমাট নাট্যদলের রজত জয়ন্তী দিবস। সেখানে উপস্থিত থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উৎসাহ না দিলে চলে না। শুধু দেশের ঝামেলাই নয়, মাঝে মাঝে ডেলিগেট হিসেবে [illegible] যেতে হয় বিদেশে। নানা ধরনের সমস্যার সমাধানে ঝামেলা, ঝক্কি ও সময় কি কম যায়। ব্যক্তিগত অবসর বলতে কোন সময়ই আর হাতে থাকে না আজকাল।

যেমন আজকের রোজনামচার কথাই ধরা যাক। আজ সকালে একটি মেয়েদের স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব ছিল। ওখানে যেতেই হয়েছে। কারণ মেয়েদের স্কুলটির বর্তমান প্রধান শিক্ষয়িত্রী রমলা দেবী অরুণাংশুর সহপাঠিনী ছিল কলেজে। সেই সূত্রেই আমন্ত্রণ। সুতরাং বিচিত্র কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে নিতে হয়েছে। উনিই প্রধান অতিথি। সভাপতি ছিলেন শিক্ষা বিভাগের এক পদস্থ আমলা। সেই আমলাও ওর পূর্ব পরিচিত। কেনই না হবেন না। সভা-সমিতিতে যাঁরা সব সময় বক্তৃতা-টক্তৃতা করেন, তাঁরা অরুণাংশুকে চেনেন না, এ হতেই পারে না। সাক্ষাৎ না চিনলেও নামে চিনবেন নির্ঘাৎ, পত্রিকায় নাম-টাম তো প্রায়ই বেরোয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার ছবিতে মাল্যদান। তারপর সভাপতি ও প্রধান অতিথি বরণ। এক কিশোরী মেয়ে লাজনম্র ভঙ্গীতে ওদের দুজনের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অরুণাংশু অমায়িক ভঙ্গীতে মালাটা গলা থেকে খুলে রাখলেন টেবিলের ওপর। এর পর মেয়েদের সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীত। আজকাল গানটান শোনবার সময় বিশেষ হয় না। তাই কিশোরী কণ্ঠের গান বেশ ভাল লাগল। গান শুনতে শুনতে মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার স্কুলের দিনগুলির কথা। কী মধুর উজ্জ্বল ছিল সে সব দিন। নিশ্চিন্ত ভারহীন সেই সময়। আজ এই প্রৌঢ় বয়সে সকলের অলক্ষ্যে একবার দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

সভাপতির ভাষণের পর বলতে ওঠেন অরুণাংশু। বক্তৃতা করা ওর অতি প্রিয় বিষয়। অসংখ্য বক্তৃতা করেনও বছরভর। অন্তত দর্শকদের হাততালি থেকে তো তাই বলতে হয়। কখনও আবেগ, কখনও জীবন দর্শন, কখনও বা তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনা মিশিয়ে বক্তৃতা করেন। অথচ ওর মনে পড়ে, কলেজ জীবনে প্রথম মঞ্চে উঠে কী কাঁপুনিই না শুরু হয়েছিল। এখন বুকের ভেতরে আর কোন কাঁপুনি নেই, বরং মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে করতেই এক আশ্চর্য ক্ষমতায় বুঝতে পারেন শ্রোতাদের বুকের কাঁপুনি।

কৈশোরের স্মৃতিচারণ করে অরুণাংশু বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এসে মনে হচ্ছে, আমার বয়েস যেন কমে গিয়েছে অনেক। জীবন বড় জটিল। এই জটিল আর পিচ্ছিল জীবনের নানা আবিলতার মধ্যে থাকতে থাকতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি। আজ আবার যেন নিজেকে খুঁজে পেয়েছি।...'

সত্যিই যেন নিজেকে খুঁজে পাওয়া। এই স্কুলের পরিবেশ যেন ওর জীবনের প্রাত্যহিকতার এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ওর পরনে আজ দামী গরদের পাঞ্জাবি, মিহি শান্তিপুরী ধুতি কাঁধে কাজ-করা কাশ্মিরী শাল। এই পোষাকে আজ অরুণাংশুকে মানিয়েছে খুব ভালো। কথা বলার আবেগে চোখ প্রায় বোজা। শ্রোতারা ওর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ, রীতিমত রোমাঞ্চিত। শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুলের মেয়েরা: দুপাশে বিনুনী করা লাল পাড় শাড়ি, লাল ব্লাউজ। মাথায় লাল ফিতে। ছোট মেয়েদের পরনে ফ্রক। এছাড়া কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী কয়েকজন অভিভাবক অভিভাবিকা।

আজকের প্রতিষ্ঠা দিবসে আরো অনেকেই অনেক কিছু বলল। বক্তৃতার মাঝে মাঝে গান, আবৃত্তি। রমলাও অতীত স্মৃতিচারণ করল। অরুণাংশু রমলার কথা থেকে বুঝবার চেষ্টা করছিল, সেই প্রথম

যৌবনের কোন উত্তাপ ধরা পড়ে কিনা! অনুষ্ঠানের শেষে স্কুলের মেয়েরা ঘিরে ধরল ওকে,—অটোগ্রাফ দিতে হবে। নানা বয়সী মেয়ে, আট-নয় থেকে শুরু করে সুইট সিক্সটিন পর্যন্ত। এখন চারিদিকে বেশ ভিড়, ঠেলাঠেলি। মেয়েদের মধ্যে অলক্ষ্য প্রতিযোগিতা, কে ওর কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। এই বয়সেও ওকে নিয়ে মেয়েদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা, বেশ উপভোগ করছিলেন অরুণাংশু। হাসিমুখে একের পর এক খাতা নিচ্ছেন, আর সই করে দিচ্ছেন অবলীলায় সহজ ভঙ্গীতে। দূরে দাঁড়িয়ে রমলা, মুখে মৃদু হাসি। ওর হাসির মধ্যে কি খানিকটা তৃপ্তি নাকি বেদনা।

অরুণাংশুর মনে পড়ে, কলেজে ওদের ক্লাসের মধ্যে রমলাই ছিল সবচেয়ে সুন্দরী। সেদিন অমনি প্রতিযোগিতা ছিল, কে রমলার সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। অরুণাংশুও ছিলেন সেদিনের অন্যতম প্রতিযোগী। কিন্তু সেদিন তিনি পৌঁছতে পারেন নি সুন্দরী রমলার কাছে। ওদের ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র নিখিলেশের সঙ্গেই রমলার বিয়ে হলো। কিন্তু রমলার ভাগ্য খারাপ। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে প্লেন-ক্র্যাসে মারা গেল নিখিলেশ। তারপর থেকে স্বামীপুত্রহীন রমলা এই স্কুল নিয়েই আছে। রমলার সব খবর পেলেও তেমন যোগাযোগ হয়নি। অরুণাংশু তখন বিয়ে করে সংসারী। নতুন বৃত্তে আবর্তিত হচ্ছে জীবন। আজ অরুণাংশু সমাজের এক প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাবান ব্যক্তি। রমলাকে আসতে হয়েছে ওর কাছে। অবশ্য নিজের জন্য নয়। ওর স্কুলের জন্য সরকারী গ্রান্ট পাইয়ে দিতে হবে। স্কুলের কিশোরীদের ভিড়ের মধ্যে বসে থেকে দূর থেকে তাকান রমলার দিকে। সমুদ্রের মতো চঞ্চল সেদিনের রমলা আজ পুকুরের মত শান্ত, স্থির। বিদ্যুৎ-ঝিলিকের মতো একবার শুধু ওর মনে হয়, সেদিন যদি রমলা নিখিলেশের বদলে অরুণাংশুকে নির্বাচিত করত! তাহলে! ধীরে ধীরে কেমন একটা সমবেদনা নাকি করুণা সরীসৃপের মতো বুক বেয়ে উঠে আসে। কিন্তু তা নিতান্তই ক্ষণিকের জন্য। আবেগহীন বিষয়ান্তরে চলে যায় মন। অন্য আরো কাজ আছে। দিনের সমস্ত সময়গুলো পর্যায়ক্রমে রুটিনমাফিক ভাগ করা। একটার পর আর একটা। বিরতিহীন কর্মের যজ্ঞ চলে সারা দিন ধরে।

মনে পড়ে, একটু পরেই যেতে হবে কারখানায়। মালিপক্ষ আর শ্রমিকের মধ্যে সালিশীর দায়িত্ব। মাইনেপত্তর বোনাস, ছাঁটাই ইত্যাদি নিয়ে নানান ঝামেলা। আলোচনার মাধ্যমে দুপক্ষকে কাছাকাছি আনতে হবে। এই গুরু দায়িত্ব ওর কাঁধে।

মেয়েদের সকলের খাতায় তাই তাড়াতাড়ি সই করে, বিদায় নিলেন সমবেত সকলের কাছ থেকে। অবশ্য ওদের অনুরোধে কিছুটা মিষ্টিমুখও করতে হলো।

ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরে দেখেন, কারখানার শ্রমিকদের প্রতিনিধি অপেক্ষা করছেন। ওদের বসিয়ে রেখে চান সারলেন ভালো করে. খাওয়া-দাওয়া করে রেডি। এবার আর গরদের পাঞ্জাবি-ধুতি নয়, কারখানার উপযোগী আটপৌরে প্যান্ট শার্ট পরে নিলেন অরুণাংশু। কারখানার গাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি চেপে রওনা দিলেন কারখানার দিকে।

কারখানার গেটে অপেক্ষা করছে বিরাট জনতা। ওর ট্যাক্সি কারখানার গেট ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকতেই শ্লোগান উঠল। আমাদের দাবী মানতে হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ট্যাক্সির জনলা দিয়ে জোড়-করা হাত বের করলেন। মুখে অল্প হাসি। কয়েক শত মানুষ আবেগ এবং উৎসাহে উদ্বেল। হতাশ মুখে ফুটছে হাসি। উনি নামলেন ট্যাক্সি থেকে। মালিকপক্ষের লোকও হাজির ওকে স্বাগত জানাতে। করজোড়ে নমস্কার বিনিময় করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে ওর ভালো লাগে। নিচের থেকে ভেসে এলো কয়েকশো মানুষের উচ্ছ্বাসের কলরোল। নিচের ওরা অরুণাংশুর ওপর অনেক ভরসা রাখে।

পুরু লাল কারপেটে মোড়া হলঘর। বিরাট উপবৃত্তাকার টেবিল। নরম কুশন লাগনো চেয়ার। টেবিলের একপাশে ম্যানেজমেন্টের তরফে কোম্পানির মালিকের ছেলে মিঃ রবি টনটনিয়া, জেনারেল ম্যানেজার মিঃ মুখার্জি, পারসোনেল ম্যানেজার এবং অন্যপাশে ইউনিয়নের জনকয়েক প্রতিনিধি। এছাড়া আর একপাশে ফাইলপত্র আর ঝকঝকে টাইপমেশিন নিয়ে মিঃ রবি টনটনিয়ার পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট সুন্দরী মিস কাপুর।

টেবিলের দুপাশে যুদ্ধক্ষেত্রের দুই প্রতিপক্ষ। কিন্তু দেখে মনে হয় যেন পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। সুদৃশ্য ডেকোরেশনের দরজা ভেদ করে শ্রমিকদের উত্তেজিত উদ্দীপ্ত আওয়াজও ভেসে আসছে। মালিকের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। কিন্তু শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বন্ধুত্বপূর্ণ উষ্ণ আবহাওয়া। চা, কফি, কোল্ডড্রিংকস, পান দামী সিগারেট। মাঝে মাঝে রঙ্গ-পরিহাসও চলছে। মালিকপক্ষের সকলেই অরুণাংশুর চেনা-পরিচিত এবং একজন তো বেশ অন্তরঙ্গও। আবার শ্রমিকপক্ষের সকলেরও তিনি অতি প্রিয় দাদা।

আলোচনা শুরু হলো। কোন উত্তেজনা নয়। বিশেষ কথা কাটাকাটি নয়। লেবার প্রবলেম, ছাঁটাই, বোনাস, মাইনে বাড়ানো, ডিমান্ড সাপ্লাই, লোডশেডিং, কাঁচামালের ঘাটতি ইত্যাদি সব ব্যাপার নিয়েই বললেন সবাই। মাপা কথায় দুপক্ষই নিজের নিজের যুক্তি দেখালেন। ছোটখাট বক্তৃতা আর কি! লাভক্ষতির খতিয়ান হলো। অরুণাংশু দুপক্ষের কথাবার্তার সারাংশ নিয়ে নিজের অভিমত জানালেন। এরই মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস কথাবার্তা. কোল্ড ড্রিংকস চা কফি! শেষ পর্যন্ত মালিকপক্ষ মেনে নিল, জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, লিভিং ইনডেক্স ঊর্ধ্বমুখী। তবে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভালো নয়, সুতরাং এখন মাইনে বাড়ানো যাবে না। এমনকি একমাসের বোনাসও দেওয়া সম্ভব নয়।' তবে পনেরো দিনের বোনাস দিতে কোম্পানি রাজী। ছাঁটাই শ্রমিকদের ব্যাপারে পরে কথাবার্তা হতে পারে, এখন নয়।

কোম্পানির এই প্রস্তাব শুনে ইউনিয়নের তরফে নরেশ অরুণাংশুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো। গলার স্বর সামান্য উত্তেজিত।

'কিন্তু দাদা, ইউনিয়নের দাবী তো মিনিমাম এক মাসের বোনাস। তাছাড়া ছাঁটাই কর্মীদের ব্যাপারটা—। কী করে মুখ দেখাব!'

ওর কথায় অরুণাংশুর বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না. কেবল গলায় যেন মধু ঢাললেন, 'কিন্তু এদের দিকও তো দেখতে হবে। যা পাচ্ছ নিয়ে নাও। মালিক তো পালিয়ে যাচ্ছে না। পরে আবার দাবী তুললেই হবে। শুনছ তো কোম্পানির অবস্থা বিশেষ ভালো নয়—'

'কে বলল? গত বছর ওদের গ্রস প্রফিট এক কোটি টাকা। হিসেবের কারচুপি দেখিয়ে ক্ষতি দেখাচ্ছে—'

'আঃ, তুমি এত অবুঝ হলে কবে থেকে। সবকিছুই রয়েসয়ে পেতে হয়। তাছাড়া তোমার সেই প্রমোশনের কথাটা—' এবার যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল অরুণাংশুর। অরুণাংশুর শেষ কথায় প্রায় যেন চুপসে গেল নরেশ। জেনারেল ম্যানেজার মিঃ মুখার্জি ওপাশ থেকে পাইপের ধোঁয়া ছাড়লেন, 'এনি প্রবলেম!'

'ওঃ, নো। নাথিং অ্যাট অল।' আয়েস করে অরুণাংশু সিগারেট ধরালেন একটা।

মিটিংয়ের কাজকর্ম প্রায় শেষ। ম্যানেজমেন্ট থেকে মোটামুটি ড্রাফট এগ্রিমেন্ট তৈরিই ছিল। সামান্য দু' চার জায়গার অদলবদল। মিস কাপুর ম্যানিকিওর করা পেলব আঙ্গুলে ঝড় তুলে ড্রাফট এগ্রিমেন্ট টাইপ করে ফেলল।

তারপর মেয়েটি নিজেই একবার পড়ে শোনাল মেমসাহেবী উচ্চারণে।

'ওঃ, দ্যাটস ও-কে। এ আর পড়বার কী আছে।' ড্রাফট এগ্রিমেন্টে ইনিশিয়াল করলেন অরুণাংশু, মিঃ টনটনিয়া ও ইউনিয়নের একজন। ঠিক হলো, আগামী সপ্তাহে ফাইনাল এগ্রিমেন্টে নিয়মমাফিক সইটই হবে।

মিটিং শেষ। চেয়ার ছেড়ে সবাই ধীরে ধীরে উঠল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প। [illegible]

বিষয়...কারখানা থেকে রাজনীতি...তারপর দারিদ্র্য, বস্তি, সিনেমা, গ্রাম। রবি টনটনিয়া গল্প করতে করতে অরুণাংশুর একেবারে কাছে। রবি টনটনিয়া বয়স কম। লম্বা স্মার্ট চেহারা, মোটা জুলপি। বছর কয়েক আগে জার্মানী না কোথেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ফিরেছে। বাবার বদলে আজকাল কারখানার কাজ দেখাশোনা করছে।

মুখ থেকে দামী বিদেশী সিগারেট নামাল টনটনিয়া, তারপর গলার স্বর একটু নামিয়ে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আজ সন্ধ্যেবেলা ব্যস্ত আছেন?'

প্রশ্ন শুনে অরুণাংশু কী যেন ভাবলেন খানিকক্ষণ, যেন দিনের বাকী সব অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো মনে করবার চেষ্টা করছেন।

'নাঃ, আজ সন্ধ্যেবেলা মোটামুটি ফ্রি আছি।'

হুঁশিয়ার মাছ-শিকারী যেমনভাবে জলে চার ছাড়ে, অনেকটা সেভাবেই জিজ্ঞেস করে টনটনিয়া, 'তবে আজ সন্ধ্যাবেলা ডিনারে আসুন না। শাহী হোটেলে।'

ডিনারের কথায় ঝট করে চোখ চলে যায় মিস কাপুরের দিকে। বেল-বটস আর হলুদ গেঞ্জীতে ঢাকা মিস কাপুরের শরীর এখন খাজুরাহোর ভাস্কর্য।

মিস কাপুরের শরীরের ওপর অরুণাংশুবাবুর দৃষ্টি বার কয়েক পিছলে যায়, ঠিক আছে, আপনার অফার অ্যাকসেপ্ট করলাম।'

'ও-কে। আপনার বাড়িতে গাড়ি যাবেই এই ধরুন রাত আটটা নাগাদ। রাইট!

'ও-কে,' অরুণাংশু করমর্দন করলেন রবি টনটনিয়ার সঙ্গে। রবি টনটনিয়া এবার ফিরল হলুদ গেঞ্জীর দিকে, 'মিস কাপুর, য়ু আর কামিং টু ডিনার। ডু য়ু 'ও-কে—।' মিস কাপুরের চোখে বিদ্যুৎ ঝিলিক খেলে যায়।

'তুমি আর তাহলে এখন বাড়ি ফিরো না। ওয়েট অ্যাট মাই অফিস। গেট রিল্যাকসড। এখান থেকে একবারেই যাব। অসুবিধে হবে না, তো?'

ডাই করা বাদামী চুলে মিস কাপুরের মুখে এখন মোহিনীর হাসি। অপেক্ষা করতে ওর কোন অসুবিধে নেই। প্রয়োজন হলে হাজার বছরও অপেক্ষা করতে হবে। ওর চোখে রুপোলী ছায়া।

অরুণাংশু ওর দিকে আর একবার চোরা চাউনি ফেলেন।

রজা খুলে বেরোতেই সামনে কারখানার বিরাট চত্বর। সেখানে সকাল থেকে অপেক্ষারত শ্রমিকের দল। ক্ষুধার্ত বাঘের হৈ-চৈ করে উঠল। শ্লোগান উঠল।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ আমাদের দাবী মানতে হবে। বোনাস চাই...ইত্যাদি।

অরুণাংশু ও ইউনিয়ানের লোকজন আকাশে হাত তুলে জানালেন, ওদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য মালিকপক্ষ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বিরাট খুশির দমকা হাওয়া ছড়িয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে কারখানার চত্বরে কারা যেন বক্তৃতামঞ্চও বানিয়ে ফেলেছে একটা। ইউনিয়নের নেতারা উঠলেন মঞ্চের ওপর। মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ফলাফল নিয়ে বক্তৃতা। কিন্তু অরুণাংশু উঠলেন না। ওকে ফিরতে হবে এক্ষুনি আরো জরুরী কাজ আছে।

এবার কোম্পানীর গাড়িতেই বাড়ি ফিরলেন অরুণাংশু। বাড়ি ফিরেই আরাম-কেদারায় এলিয়ে দিলেন নিজেকে। বড় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত লাগছে নিজেকে। বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে।

রাতে শাহী হোটেলে ডিনার মিঃ টনটনিয়ার সঙ্গে। সঙ্গে মিস কাপুরও তো থাকছে। মিস কাপুরের শরীরের ছবি ওর মনে উঁকি দেয় ক্ষনিকের জন্য। সত্যিই মোহিনী হাসি মেয়েটির। না হলে প্রৌঢ় অরুণাংশুর কল্পনাকে উত্তেজিত করে কীভাবে। দামী সুস্বাদু খাবার, ড্রিংকস, ড্যান্স ও মিউজিকের মোহময় পরিবেশ। মনে মনে একবার হিসেব করেন মিস কাপুরের সঙ্গ টাকার হিসেবে কত?

অরুণাংশু অবশ্য বুঝতে পারেন, ওকে খুশি করবার জন্যই এই ছোট ডিনার পার্টি। তা এতে এমন কী আর দোষ। মানুষ তো মানুষকে খুশি করতেই চাইবে। বিনিময়ে উনিও হয়তো কিছু করবেন ওদের জন্য সাধ্যমত। এতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হলো। ওর ক্ষমতা রয়েছে তাই সবাই তোয়াজ করে ওকে। অবশ্য এজন্য অনেকে রীতিমত ঈর্ষান্বিত। যাক গে, ওসব কুচুটে লোকের কথা ভাবলে সমাজ রাষ্ট্র চলবে না।

আরাম-কেদারায় শুয়ে শুয়েই এবার খবরের কাগজটা টেনে নেন। সকালে শুধুমাত্র খবরের হেডিংগুলোর ওপর চোখ বুলিয়েছেন মাত্র, বিশদভাবে খবর পড়া হয় নি। খবরের কাগজ খুলেই বন্যার খবরের দিকে চোখ চলে যায়। পূর্ব ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন বন্যার কবলে। জনকয়েক মন্ত্রী হেলিকপ্টারে বন্যা-অঞ্চলের দুঃখ কষ্ট দেখে স্বচক্ষে দেখে শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। শীগগির সাহায্য পাঠানো হবে। মন্ত্রীদের নামগুলো খুঁটিয়ে পড়েন। নামগুলো পড়ে উত্তেজিত হন একটু। আরে ওই ব্যাটাও মন্ত্রী হয়ে গেছে। অথচ এককালে ওই গবেটটা তো অরুণাংশুর কাছেই তালিম নিয়েছে। মনটা একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তবু নিজেকে সামলে খবরের অন্য পাতায় চোখ রাখেন। একটি খবরে দেখলেন, পুরুলিয়ার কোন গ্রামে নাকি অনাহারে মারা গেছে একজন। দূর, মাত্র একজন! এ আবার একটা খবর। এসব খবর ছাপে কেন! বিরক্তিতে পাতা ওলটান অরুণাংশু। আরেকটি খবরে দেখলেন অরুণাংশু, ময়দান এলাকায় এক যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকাশ, মেয়েটিকে খুন করবার আগে নাকি ধর্ষণ করা হয়েছে।

'ওঃ, ডিসগাসটিং। কি ন্যক্কারজনক ব্যাপার! খুন করবি কর। খুনের আগে ধর্ষণ। নাঃ, দেশটা উচ্ছন্নে গেল একেবারে। বিরক্তিতে পত্রিকাটা ছুঁড়ে মারলেন ডিভানের ওপর। একটু পরে চা হাতে স্ত্রী ঢুকল ঘরে।

'কি ব্যাপার! ভুরু কুঁচকে বসে আছ?'

'আরে দেখ না,—' বলে শুরু করেই বুঝতে পারলেন, যুবতী ধর্ষণের কথা বললেই সাইকোলজিতে এম-এ পাশ স্ত্রী ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসবে। মদ-মাংস খাওয়া বন্ধ করতে বলবে। তারপর তর্ক, বিতর্ক, ঝগড়া। নাঃ, এ বয়সে আর পোষায় না। তাই প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ফেললেন চটপট।

'শোন, আজ রাত্তিরে ডিনারের নেমন্তন্ন আছে। রাত্রে আর খাব না।'

'আজও আবার ডিনার। ওঃ, তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না! তবে দোহাই, আজ আর তরল জলটি বেশি গিল না।'

'আরে না, না, এ বয়সে আর পোষায়!'

'রোজই তো এক কথা শুনি। কিন্তু পরে তো আর কিছু মনে থাকে না।'

মুচকি হেসে একটা সিগার ধরান অরুণাংশু। গাঢ় বাদামী রংয়ের মোটা চুরুট। ত্রিচিনোপল্লী থেকে আনা।

সন্ধ্যে নাগাদ দামী ইমপোর্টেড সাবান দিয়ে ভালো করে চান করেন তিনি। তারপর স্যুট পরে তৈরি। হাল্কা নীল রংয়ের স্যুট। ডিনার-পার্টিতে ধুতি-পাঞ্জাবী ঠিক মানায় না, তাই এসব জায়গায় যেতে হলে স্যুটই পছন্দ তার। এবার বাইরের ঘরে বসে কোমপানির গাড়ির জন্য প্রতীক্ষা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। একটু পরেই একটা গাড়ি এসে থামে ওর বাড়ির সামনে। গাড়ির শব্দে একটু নড়েচড়ে বসেন। শব্দ শুনতে পান, গাড়ি থেকে নেমে ওরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে ওপরে।

খোলা দরজার পরদা সরিয়ে ঘরে ঢোকে ওরা।

'আরে তোমরা! কী ব্যাপার!' অরুণাংশু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন। আগন্তুক জনাকয়েক কারখানার ইউনিয়নের লোক।

কই, কোম্পানীর গাড়ি তো এলো না। কী ব্যাপার! তবে কী টনটনিয়ার পার্টি হচ্ছে না আজ।

মনের বিরক্তি নিপুণভাবে চেপে

উপস্থিত লোকজনের দিকে তাকান। ধুলো মাখা চেহারা ওদের। সবাই বেশ উত্তেজিত। মনে হয়, গুরুতর কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই।

'জানেন দাদা, ওরা ফ্যাকটরি লক-আউট করে দিয়েছে।' ইউনিয়নের লোকটির কথায় যেন ঘরের মধ্যে অ্যাটম বোমা ফাটল।

'সে কি, কোন নোটিশ না দিয়েই—' প্রায় আঁতকে ওঠেন অরুণাংশু।

'হ্যাঁ অরুণাংশুদা। আপনি চলে যাবার পর উত্তেজনা বেড়ে গেল। আমাদের মিটিংয়ে একদল লোক হামলা করে ঢুকে পড়ে। ওরা চিৎকার করে বলছিল, আমরা নাকি মালিকদের দালাল, নরেশদা বক্তৃতা করতে উঠলে কারা যেন ইঁট-পাটকেল মারতে শুরু করে। নরেশদার কপাল ফেটে গেছে। তারপর দারুণ গণ্ডগোল, মারামারি। এসব কোম্পানির বদমায়েসি, ষড়যন্ত্র। একটা গোলমাল তৈরি করে লক-আউট করে দিল।

'নরেশ এখন কোথায়!' ভদ্রলোকের গলার স্বর গম্ভীর।

'হাসপাতালে! কারখানার আরো কয়েকজনের অবস্থাও বেশ খারাপ। ওরাও হাসপাতালে।'

'তাই নাকি। তবে তো বেশ গুরুতর ব্যাপার।' অরুণাংশুর কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে।

'হ্যাঁ। নরেশদার অবস্থা ভালো নয়।'

অরুণাংশু মনে মনে ভাবেন, নরেশ ভাবছিল অফিসে একার ওর প্রমোশন হবে। কিন্তু কোথায় প্রমোশন পায়, কে জানে!

'ঠিক আছে, তোমরা একটু বস। হাসপাতালে যেতে হবে। পোষাকটা একটু বদলে আসি।'

অরুণাংশুবাবু ভেতরে যান। মিনিট দশেক পরেই ফিরলেন। এখন পরনে ছেঁড়া ফাটা মলিন পাঞ্জাবী, পাজামা। পায়ে পুরনো চপ্পল। কিছুক্ষণ আগের চেহারার সঙ্গে কোন মিলই নেই। মনে হলো, যেন ভেতরের গ্রীন রুম থেকে পোষাক পাল্টে বিলকুল বদলে গেছেন। মনে হলো এ অন্য এক বিষণ্ণ অরুণাংশু, যিনি অন্যের দুঃখে সত্যিই দুঃখী। ✱

সত্যের অপলাপ হবে

১৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 'অমৃতে' 'গোপাল দফাদার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, মহারাণী স্বর্ণময়ী দিং' শিরোনামায় প্রকাশিত রচনার এক জায়গায় লেখক লিখেছেন, 'রাজা রাজড়ার গপ্পকে আজকের দিনে প্রতিক্রিয়াশীলতা দোষে ছোট করে ধরাই দস্তুর। তাও আবার আসল রাজা নয়, সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শোষণকারীর হাতিয়ার হিসেবে এ দেশীয় জমিদার শ্রেণী কাজ করে এসেছে তাদের ঘরোয়া কথা তো রীতিমতো টাবু।

সাধারণভাবে লেখকের অনুমান অমূলক নয়, যেখানে আবার উল্লিখিত শ্রেণীটিকে একটু তির্যক দৃষ্টিতে দেখার রেওয়াজ বর্তমানে প্রায় প্রথাসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু সাধারণের মধ্যেই তো অসাধারণের অস্তিত্ব আর বর্তমানের কণ্ঠেই তো অতীতের বর্ণমালা লুকিয়ে থাকে। তৎকালীন রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোয় অতীতের বহু রাজা-রাজড়া, জমিদার শ্রেণী ইংরেজের দালালি করতে বাধ্য হয়েছে—একথা যেমন ইতিহাস-সমর্থিত, তেমনি ওদের মধ্য থেকেই তো কিছু কিছু অসাধারণ উঁকি দিচ্ছে—যাঁরা শিক্ষা বিস্তার, বিজ্ঞান চর্চা এবং জনহিতকর কাজে এক কথায় সভ্যতা সংস্কৃতি অগ্রগতিতে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁদের অবদানকে অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে না কি? ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের নবচেতনার ইতিহাস পাঠ করলে কি দেখতে পাই আমরা? প্রগতির বাণীকে এদেশের মাটিতে প্রথম প্রতিষ্ঠা করতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবারুণকে আহ্বান করতে রাজা-জমিদার শ্রেণীর কিছু কিছু পরিবারই তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ঐ সময়ে এগিয়ে এসেছেন (ইংরেজ সাহচর্য স্বীকার করেও)। সুতরাং ইতিহাসকে স্বীকার করতে হলে এইসব অসাধারণ কিছু কিছু পরিবারের কথা জানতে যাওয়া অন্যায়ের কিছু তো হবেই না—পরন্তু প্রশংসার যোগ্য। কালের বুকে বেঁচে থাকার মতো কিছু ইতিহাস ঐসব 'পরিবার' তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে বলেই তো এখনো মানুষ তাঁদের লালন করছে সাগ্রহে। প্রতাপ, ঐশ্বর্য—সবই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, কিন্তু মানব হিতৈষণা কখনো মরে না। মরে না বলেই এখনো জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বার বার আমাদের ভাবিয়ে তোলে, বারে বারে নব-ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমাদের স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। ঐ একই সূত্রে কাশিমবাজারের রাজ পরিবার তথা আরো কিছু অনুরূপ পরিবারও আমাদের দৃষ্টি পথে আনাগোনা করে এবং ভবিষ্যতে করবেও। সুতরাং রাজা-রাজড়ার গপ্পটা সর্বদা প্রতিক্রিয়াশীলতার দোষে দুষ্ট হবে কেন?

মিলনেন্দু জানা
ইন্দা, খড়গপুর

ভুল থেকে গেছে

সাম্প্রতিক অমৃতে প্রকাশিত কঙ্কাবতী দত্তর 'একটি ঘাসের শীষে দুইটি রঙীন মাছি।' গল্পের এক পার্শ্ব চরিত্র মেডিকেল স্টুডেন্ট প্রসেনজিৎ বলছেন : 'থিওরি একদম পড়া হয়ে ওঠে না। তবে ফোর্থ ইয়ার তো, আজকাল হাউস সার্জন হিসেবে কয়েকটা কেস দেখতে হয়। সেগুলো ইন্টারেস্টিং। প্রসেনজিৎ কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্টুডেন্ট কিনা জানি না, তা যদি না হন অন্য কথা। তাহলে আমার কোনো বক্তব্য থাকছে না। তবে বিনীতভাবে জানাচ্ছি, বিশ্বের কোনো মেডিকেল ছাত্রই মনে হয় ফোর্থ ইয়ারে হাউস সার্জন হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন না। তার আগে পাঁচ বছরের (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রি-মেডিকেল কোর্স উঠে গেছে এম বি বি এস কোর্সটা পাশ করতে হয়। এক বছর ইন্টার্নি থাকতে হয়। তারপর আর হাসপাতালে পেসেন্ট দ্যাখা-ট্যাখা থার্ড ইয়ার থেকে শুরু হয়। তখনই বোধহয় এইসব হবু ডাক্তারদের হাউস সার্জনের সম্মান দেওয়া হয় না। শ্রীমতী দত্ত এ ব্যাপারে কোনো সত্যিকার মেডিকেল স্টুডেন্টের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন। কামাল হোসেন।

গল্প না কথোপকথন

২৫ মে তারিখের অমৃতে 'ভ্রাম্যমান' গল্পটি পড়ে হতাশ হলাম। অমৃত পত্রিকায় এই ধরনের গল্প প্রকাশ পেতে পারে তা কখনো আশা করি নি। গল্পটি পড়তে পড়তে মনে হয় এ যেন গল্প নয়, লেখকের কিছু হেঁয়ালি সহ কথোপকথন। আমি অমৃতের একজন পাঠক হিসেবে আশা করি অমৃত তার নিজস্ব সুনামে চলবে। যদিও অন্যান্য বিভাগের কোন তুলনা নেই—বিশেষ করে কবিতা বিভাগ। এই সংখ্যায় চন্ডী মণ্ডলের চিতা গল্পটিও প্রশংসার দাবি রাখে।

পাঁচুগোপাল হাজরা
হাবড়া, কল্যাণগড়, ২৪-পরগণা

গড়াপেটা খেলা—সর্ষের মধ্যে ভূত

অজয় বসু

গড়াপেটা খেলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশ নিবিড়। গত পঁচিশ বছর কি তারও বেশিকাল ধরে কলকাতার মাঠে লীগ প্রতিযোগিতা উপলক্ষে খেলার নামে এই নকল খেলা আমাদের দেখতে হচ্ছে। আমরা সাধারণ দর্শকেরা যেমন দেখছি, তেমনি দেখছেন কলকাতা ফুটবলের প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরাও। এই খেলা দেখার অভিজ্ঞতা তিক্ত, অস্বস্তিকর। দেখতে দেখতে খেলোয়াড় ও ক্লাবগুলির নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে হয়। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা জ্বালা ধরে যায়। অস্থিরতা বাড়ে। বাড়তে বাড়তে যখন তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে তখন হয়ত গ্যালারি থেকে আমরা খেলোয়াড়-অভিনেতাদের উদ্দেশ্যে টুকরো টুকরো মন্তব্য, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিই। ভাবি, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খোঁচায় অতিষ্ঠ হয়ে খেলোয়াড়েরা বুঝি নকল পথ ছেড়ে সাচ্চা খেলায় মেতে ওঠার তাগিদ অনুভব করবেন।

কিন্তু হায়, আশা বড়ই ছলনাময়ী! যে আশায় দর্শকেরা বুক বাঁধতে চান, সে আশা অপূর্ণই থেকে যায়। যাঁদের উদ্দেশ্যে গ্যালারি থেকে চোখা চোখা মন্তব্য ছোঁড়া হয় তাঁদের কানে কিন্তু জল ঢোকে না। চিঁড়ে কিছুতেই ভোলার নয়। তাঁরা নিজেদের মতলব মত চলেন, চারপাশের প্রতিবাদকে থোড়াই কেয়ার করে। তবু আমাদের সান্ত্বনা এই যে দর্শক হিসেবে আমরা অন্ততঃ নষ্টামীর প্রতিবাদ করতে ছাড়ি না। কিন্তু কর্তারা কী করেন? তাঁরাও চোখ চেয়ে সব-কিছু দেখেন, বোঝেন। তবে প্রতিবাদে রা-টি কাড়েন না। কর্তাদের এই নৈশব্দ ও নিষ্ক্রিয়তায় মতলববাজেরা পরোক্ষে উৎসাহিত হন এবং বছর বছর নকল খেলার দৃশ্যাভিনয়ে উদ্যমের জোয়ার বইয়ে দেন।

গড়াপেটা খেলা— বস্তুটি কি? কি যে তা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই জানেন। তবে যাঁরা মাঠে যান না তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি যে এই জাতীয় খেলার ফলাফল আগেভাগে গড়ে রাখা হয়। খেলার আগে টেবিলে মুখোমুখি বসে দুই প্রতিযোগী স্থির করে নেন যে আসন্ন খেলার ফলাফল কি হবে। দুপক্ষে হয় গোপন সমঝোতা। আর সেই সমঝোতাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে মাঠে নেমে দু দলের খেলোয়াড়েরা খেলা খেলা ভাব জাগিয়ে খেলার অভিনয় করে যান।

কেন এই অভিনয়, কেনই বা গড়াপেটা? বলছি।

লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কয়েকটি স্তর বা বিভাগে। ওপরের স্তরে সবাই থাকতে চায়। যাদের ক্রীড়াগত সামর্থ্যের পুঁজি নেই তারাও। তারা খেলে যদি প্রয়োজনীয় পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারে তাহলেই বাঁকা পথে পা বাড়ায়। তখন অশক্ত দুর্বল বিভিন্ন দলের মধ্যে গোপনে পয়েন্ট দেওয়া নেওয়ার অলিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই সমঝোতার পরিণামে যাদের ভাগ্যে কিছু পয়েন্ট জুটে যায় তারাই অবনমনের হাত থেকে রেহাই পায়। যারা সে সঙ্গতি জোটাতে পারে না তাদেরই ওপরতলা থেকে পদস্খলন ঘটে যায়।

যাদের ভাল খেলার সামর্থ্য নেই, প্রতিপক্ষকে হারিয়ে নিজের বাহুবলের জোরে পয়েন্ট সংগ্রহের সাধ্য নেই, অথচ ওপরতলায় থেকে যাওয়ার সাধ আছে, তারাই মূলতঃ অন্ধকারের কারবারের অংশীদার। তবে মাঝে তেমন দলও এই কারবারের সামিল হয়ে পড়ে যারা শক্তিশালী ও দক্ষ এবং লীগ বিজয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টিত। সময় সময় শক্তিশালী দলগুলির পয়েন্টের প্রয়োজন ঘটে, যখন তারা মানসিক চাপে ভোগে। সেই চাপ এড়াতে তারাও তখন খেলে বাজীমাৎ করার পরিকল্পনা ছেড়ে গোপন সমঝোতার মারফৎ নিজেদের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাওয়ার মতলব ভাঁজে। ওপরতলার ওপরের এবং নীচের, দু দিকের প্রতিযোগীরাই নকল খেলায় হাত পাকায়। কোনো পক্ষ প্রতিনিয়তই তা করে। কেউ বা কালেভদ্রে। ক্ষেত্র বিশেষে সবাই এক পথের পথিক। শুধু ধরা পড়ে যায় দুর্বল প্রতিযোগীরা। বাস্তবে কিন্তু শক্তিশালী প্রতিযোগীরাও একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা নয়।

গড়াপেটা খেলার অভিশাপ বয়ে বেড়ায় লীগ নামক প্রতিযোগিতাই। নক আউট প্রতিযোগিতা এই অভিশাপ থেকে মুক্ত। লীগ খেলার ফলাফল আগেভাগে গড়ে রেখে নকল প্রতিযোগিতার রূপরেখা আঁকার এই অপচেষ্টায় কলকাতার গড়ের মাঠে দুর্নীতির পাহাড় জমে উঠেছে। এই জঞ্জাল স্তূপ সাফ করায় দায়িত্বশীল পক্ষের কোনো উদ্যোগ আয়োজন নেই, এটাই সবচেয়ে আফশোষের কথা। জঞ্জালের স্তূপ জড়ো হওয়ার ফলে শুধু যে মাঠের আকৃতিই কলুষিত হচ্ছে তা নয়, এই সূত্রে বাড়ন্ত ছেলেদের চরিত্রও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ছেলেরা গড়ের মাঠে আসে মনের আনন্দে খেলতে। সহজাত তাগিদে খেলাধুলায় জড়িয়ে খেলার মাঠ থেকে জীবনের শিক্ষাও পেতে। কিন্তু গড়ের মাঠে এসে তারা আজ কী শিক্ষা পাচ্ছে? তারা শিখছে কি করে না খেলে পয়েন্ট সংগ্রহ করা যায়, কি করে না খেলে খেলা খেলা ভাবের আভাস জাগিয়ে অপরপক্ষের হাতে পয়েন্ট তুলে দেওয়া যায়। শাদা কথায়, ব্যাপারটা নিছক জোচ্চুরি। ছেলেরা গড়ের মাঠে এসে গড়ে ওঠার মুখেই এই জোচ্চুরিতে রপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাদের চরিত্র হনন করা হচ্ছে; জীবনপথে চলার শুরুতেই যারা এমন অপকর্মে হাত পাকাতে শিখল উত্তরপর্বে তারা সমাজের কোন্ কল্যাণে যে লাগবে তা ভাববার বিষয়। অপরের ফুসলানিতে তারা চৌর্যবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে বলেই ভয় হয় যে লীগ খেলার আসর কলকাতার গড়ের মাঠ আজ এক সামাজিক ব্যাধির নোংরা আখড়ায় পর্যবসিত হয়ে গেছে।

কলকাতার লীগ ফুটবল নিয়ে গোটা পশ্চিম বাংলা যতোই মাতামাতি করুক না কেন, লীগ খেলার আসরের আনাচে কানাচে যে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে সেই দুর্নীতিই আমাদের মূল্যবোধের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। এই দুর্নীতি এমনই সংক্রামক এবং এর প্রভাব এমনই ভয়াবহ যে, যারাই এর সংস্পর্শে আসে তারাই তাদের চরিত্র বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে। কথায় বলে যে খেলার মাঠে একটা জাতির চরিত্র গড়ে ওঠে। কিন্তু একবারও মর্যাদা কলকাতার লীগ ফুটবলের মাঠ ধরে রাখতে শেখে নি। তাই সাধ করে মেকী, নকল খেলা খেলতে খেলতে লীগের খেলোয়াড়েরাও নিজেদের পা বাড়িয়ে দিয়েছে ফাঁক ফাঁকির রাস্তায়।

এই নকল খেলা যেমন খেলোয়াড়দের চরিত্র শোধনের উপায় নয়, তেমনি নয় আমাদের মানোন্নয়নের সহায়ক। আজকাল প্রশিক্ষণের যুগ। ছোট ছোট ছেলেরা এখানে ওখানে ফুটবলের পঠনপাঠন সেরে তবে লীগের বড় আসরে খেলতে গড়ের মাঠে হাজির হয়। এসেই যদি তাদের সাচ্চা খেলার তাগিদ ভুলে পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির নকল খেলায় জড়িয়ে পড়ার নির্দেশ মান্য করতে হয় তাহলে এতোদিনের শিক্ষার সব ফসলই তাদের জলাঞ্জলি দিতে হয়। তাই দেওয়াও হচছে। অনুশীলন, ট্রেনিং শিক্ষণ সবই চলছে। কিন্তু কাজের বেলায় সেই শিক্ষাকে অস্বীকার, উপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। সমস্ত ব্যাপারটা লোক-দেখানো তামাশায় পরিণত হতে যাচছে। বিনা ক্ষুরধার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খেলার মানোন্নয়ন ঘটতে পারে না। কিন্তু খেলোয়াড়দের সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উজ্জীবিত করার সুযোগ লীগ ফুটবলের নেই। কাজেই এই আয়োজন যে আমাদের ফুটবলের মানোন্নয়নে বিন্দুমাত্র মদত যোগাতে পারছে না তা বলাই বাহুল্য মাত্র।

যে অনুষ্ঠান খেলার মানোন্নয়নে সহায়ক নয়, যে অনুষ্ঠান বাড়ন্ত ছেলেদের চরিত্র হননের চক্রান্তের নামান্তর, সেই অনুষ্ঠানের পাট চুকিয়ে ফেলাই কি কল্যাণকর নয়? লীগ অনেক দিনের পুরানো অনুষ্ঠান। সেটিকে বন্ধ করে দিতে হয়ত মায়া

হবে। কিন্তু বৃহত্তর মূল্যায়নে যা সার্বিক অকল্যাণেরই আয়োজন তার সংগে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলায় কুণ্ঠা জাগা সুস্থ মনের পরিচায়ক নয়। লীগের আসর গুটিয়ে নিয়ে পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে গুটিকয়েক নক আউট প্রতিযোগিতা সংগঠন করলে সাপ মরতে পারে। অথচ লাঠিগাছটাও ভাঙবে না। বিকল্প ব্যবস্থায় ছেলেরা সাচ্চা লড়াইয়ের মূল্য বুঝতে পারবে। এবং লড়তে লড়তে তাদের ধারে ইস্পাতের কাঠিন্য সঞ্চিত হবে। যে সংগতি তাদের চরিত্রকে দৃঢ় ও ঋজু করে গড়ে তুলতে নিশ্চিত অবদান যোগাতে পারবে বলেই বিশ্বাস করা যায়।

আজকাল দেশে দেশে পেশাদারী খেলার রেওয়াজ চালু হয়ে আছে। মাঠে ময়দানে পেশাদারী মনোভাব যতোই মাথা চাড়া দিচ্ছে ততোই প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে মাঠের ধারে দুর্নীতি ও অশুভ মনোভাবের অবক্ষয় জড়ো হচ্ছে। খেলাধুলায় আগুয়ান অন্য অনেক দেশেও খেলার ফলাফল গড়াপেটা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। তবে সে সব দেশের নিয়ামক সংস্থা সেইসব অভিযোগের তদন্ত করেন। অপরাধ ধরা পড়লে অপরাধীদের দন্ড দেওয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে সেই দন্ড নির্মমও। কিন্তু আমাদের এই ফুটবলের শহরে অপরাধের দন্ড দেওয়ার কোনো সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ করা হয়নি। হয়নি বলেই দুষ্কৃতকারীরা মনের সুখে তাদের কাজ করে চলেছে। নিয়ামক সংস্থার নিষ্ক্রিয়তাকে তারা পরোক্ষ প্ররোচনা বলেই ধরে নিয়েছে।

নিয়ামক সংস্থার এই নিষ্ক্রিয়তা হেতু কি? হেতু অবশ্যই আছে। নিয়ামক সংস্থার প্রশাসনিক কাঠামোয় কর্মকর্তা হিসেবে যাঁরা বিরাজমান তাঁদের প্রায় সকলেরই কোনো কোনো ক্লাব আছে। অবনমনের সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে তাঁদের ক্লাবগুলি যাতে নীচের মহলে ডুবে না যায় তার জন্যে কর্তাদের ছলাকলার অন্ত নেই। তাই তাঁরা গড়াপেটা খেলাগুলির ছিরি দেখেও দেখেন না। ভাবেন না অপরাধীদের দন্ড দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা। পরোক্ষে তাঁরা নিজেরাই অপরাধী। এক কথায়, আমাদের লীগ ফুটবলের মাঠে ভূত ঢুকে গেছে সর্ষের মধ্যেই। এই ভূত এড়ানো তো সহজ কথা নয়। ভূতের বোঝা নামাবার নাম করে লোক দেখাতে মুখে মুখে হয়তো প্রচার করা যেতে পারে। কিন্তু কাজের হাতটিকে ঠিক জায়গায় প্রসারিত করা যায় না। সে সদিচ্ছাও কারুর নেই। থাকলে গড়াপেটা খেলার ভূত ছাড়াতে গত বিশ বছর কি তারও বেশিকাল ধরে নিয়ামক সংস্থা এমন নিশ্চুপ হয়ে থাকতেন না নিশ্চয়ই।

বড় খেলা ও তারপর

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

উনআশি সালের লীগের লড়াই মাঝ মরশুম পেরিয়ে গেছে। ...চ্যাম্পিয়নশীপের লড়াই এখন আরো আকর্ষণীয়, আরো উত্তেজনাপূর্ণ। বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর লীগের খেলার আকর্ষণ অনেক বেড়ে গেছে। দুই প্রধানের কাছে এখন প্রতিটি খেলার গুরুত্ব অপরিসীম। সামান্য পদস্খলন তাদের লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার পথে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দু-দুটি খেলায় ড্র করলেও মহামেডান এখনো হাল ছাড়েনি। তাদের হাতেই এবার তুরুপের তাস। প্রথমে তারা খেলবে মোহনবাগানের সঙ্গে। তারপর আগস্টের গোড়ায় তাদের খেলা ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। দুই প্রধানের লড়াই অমীমাংসিত থেকে যাওয়ায় ঐ দুটি খেলার গুরুত্ব দারুণ বেড়ে গেছে। কারণ চ্যাম্পিয়নশীপের প্রশ্ন অন্তত খানিকটা করে নির্ভর করছে ঐ খেলা দুটির ওপর।

সাতই জুলাইয়ের খেলায় আমরা একটা জিনিস উপলব্ধি করতে পেরেছি যে একাধিক বহিরাগত খেলোয়াড়দের ভারে ভারাক্রান্ত ইস্টবেঙ্গল দল এতোদিনে সেট হতে চলেছে। সেদিন প্রথমার্ধের অন্তিম লগ্নে মোহনবাগান গোলটি শোধ করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল দারুণ খেলা খেলেছে। খেলাটিকে তখন উচ্চগ্রামে পৌঁছে দেবার প্রত্যাশা তাঁরা জাগিয়েছিলেন। এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের আগের খেলাগুলিতে যা দেখিনি, সেইদিন তাই দেখলাম। দেখলাম ডেভিড, মিহির, সাবিরের সঙ্গে দেবরাজের সুন্দর বোঝাবুঝি। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া-নেওয়া করে তাঁরা সত্যিকারের আক্রমণের মত আক্রমণ শানিয়েছিলেন। ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের কাছে এ এক মস্ত আশার কথা।

আরো বড় আশা জাগিয়েছেন নাইজেরিয়ার খেলোয়াড় ডেভিড উইলিয়ামস। ডেভিড যে সেদিন ঐ রকম খেলবেন তা কল্পনাও করতে পারি নি। আগের খেলাগুলিতেও ডেভিডকে দেখেছি, কিন্তু সাতই জুলাইয়ের ডেভিড যেন অন্য মানুষ। তাঁর গতি, দেওয়া-নেওয়া এবং প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের ধোঁকা দেওয়ার পারদর্শীতা তাঁকে সেদিন মোহনবাগান মাঠে অনন্য করে তুলেছিল। তাঁর চকিতে নেওয়া সটগুলি থেকে যে কোন মুহূর্তেই গোল হতে পারতো। ডেভিড উইলিয়ামস নাকি এক সময় কালো মানিক পেলের কাছে কিছুদিন খেলা শিখেছেন। সাত জুলাইয়ের আগে সে কথা যেন ঠিক বিশ্বাস হতে চাইতো না। কিন্তু সেদিন শনিবারের বারবেলায় সে-কথা অবিশ্বাস করার জো ছিল না কারো।

সেদিন মাঠে সিংহবিক্রমে খেলেছেন ইস্টবেঙ্গলের মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি শুধু নিজের কাজটুকুই সারেন নি, তাঁকে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল অপরের অরক্ষিত স্থানটি পর্যন্ত আগলাবার। এগিয়ে-পিছিয়ে নড়ে-চড়ে সরে খেলে তিনি একাই যেন মোহনবাগানের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের সামনে পাঁচিল তুলে দিয়েছিলেন। তাঁকে টপকে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের। মনোরঞ্জনের মতো খেলোয়াড় যে, যেকোন দলের সম্পদ তার প্রমাণ সেদিন নব্বই মিনিটের খেলার প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করেছেন দর্শকরা।

আর এক খেলোয়াড় দেবরাজ। এমন কর্মী খুব কমই চোখে পড়বে। তাঁর খেলায় কোন 'শো' নেই। কিন্তু যা আছে তার তুলনা হয় না। সত্যিকারের লিঙ্কম্যানের ভূমিকায় তিনি সেদিন মাঠে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ইস্টবেঙ্গলের প্রাধান্যের যুগে তিনি সমানে বল জুগিয়ে গেছেন আক্রমণভাগে। আবার প্রয়োজনের মুহূর্তে পিছিয়ে আসতে ইতস্তত করেন নি।

লীগের খেলায় এতোদিন আমরা দেখেছি সুরজিৎ-নির্ভর ইস্টবেঙ্গলকে। অর্থাৎ সুরজিৎ ভাল খেললে তবেই দল ভালো খেলেছে। গোল করেছে। তাই মোহনবাগানের পরিকল্পনা ছিল সুরজিৎকে অকেজো করে দেওয়ার, রুখে দেওয়ার। তা তারা পেরেছিল।

কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সত্যিকারের বড় খেলোয়াড় কে? চাপের মুখে, টেনশনের মুখে, এবং প্রতিপক্ষের সকল বাধার চ্যালেঞ্জকে যিনি উড়িয়ে দিয়ে নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেন। তাঁকে রোখার, তাঁকে বাধা দেবার সব প্রচেষ্টা তছনছ করে দিতে পারেন তিনিই তো বড় খেলোয়াড়। আমাদের দেশের সব চেয়ে বড় খেলা এই দুই প্রধানের লড়াইই। জাতীয় ফুটবলের ফাইনাল কিম্বা অন্য খেলার চেয়ে এই দুই দলের খেলার আকর্ষণ এবং উত্তেজনা অনেক বেশী। কিন্তু সেই খেলায় আজ পর্যন্ত সুরজিৎ কোন দিনই খেলতে পারেন নি। নিজেই স্বীকার করেছেন, ঐ খেলার টেনশনে তাঁর জ্বর হয়। তাহলে?

ও কথা থাক। সেদিনের খেলায় ইস্টবেঙ্গল গোড়ার দিকে অনা মেজাজে খেলেছিল। ভাগ্য তাদের বিরুদ্ধে না গেলে ঐ পর্বেই তারা অন্তত তিনটি গোল পেতো।

তারা যে তা পায় নি তার পুরো কৃতিত্ব মোহনবাগানের তরুণ গোলরক্ষক প্রতাপ ঘোষের। সেদিনই তিনি তাঁর জীবনের সব থেকে বড় ম্যাচটি খেলেছেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই কিছুটা ভয়, কিছুটা ভাবনা মোহনবাগান শিবিরে দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো তার ঠিক উল্টো চিত্রই। সেদিন মোহনবাগানের মান বাঁচিয়েছেন মানস কিন্তু খেলার মতো খেলেছেন ঐ প্রতাপ ঘোষ। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ও কর্মতৎপরতায় ভাস্বর প্রতাপ দু-হাত বাড়িয়ে সেদিন আগলে রেখেছিলেন মোহনবাগানের স্বার্থ। ভুল তিনি সারা খেলায় একবারই করেছেন। সে ঐ গোলটির ক্ষেত্রে। কিন্তু সেখানেও তাঁকে পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। তিনি ভেবেছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্য হেড দিয়ে বলটি বিপদসীমার বাইরে পাঠাতে পারবেন। তাই না এগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন গোল লাইনের ওপর। আর সেই দাঁড়িয়ে থাকাই কাল হল। সুব্রত হেড দিতে পারলেন না। বল সাবিরের মাথার পেছনে ও ঘাড়ের কাছটায় লেগে চলে গেলো গোলের মধ্যে।

মোহনবাগান যে গোলটি করেছে তার পেছনে আছে মানস ভট্টাচার্যের সুযোগ-সন্ধানী মনের পরিচয়। আর আছে চিন্ময় চ্যাটার্জির ছেলেমানুষী ব্যাক-পাস। কোন প্রয়োজন ছিল না তাঁর ব্যাক পাস করতে যাবার। আর করলেনই যখন তখন কেন আরো জোরে বলটি মারলেন না? মানস জানতেন চিন্ময়ের ঐ স্বভাবের কথা। তাই সুযোগের প্রত্যাশায় ছোঁক ছোঁক করছিলেন। আচম্বিতে মিলে গেল তা। চিন্ময়কে ব্যাক পাস করতে দেখেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। পরে মানস বলেছেন, 'এক লহমার জন্যে ভাস্কর আমার দিকে তাকিয়েছিল। তখনই বুঝলাম ও দেরী করে ফেলেছে। গোল আমি করবোই।' তাই করেছিলেন মানস। ভাস্করের আগে বল ধরে তাঁকে এড়িয়ে গোলে যখন তিনি বল ঠেললেন সত্যজিৎ মিত্র তখন ছুটে এসে প্রায় তাঁকে ধরে ফেলেছেন। কিন্তু ততক্ষণে বল চলে গেছে জালে। এবং প্রথমার্ধের খেলা শেষ হবার একটু আগে মোহনবাগান গোল শোধ করে কিছুটা স্বস্তি নিয়ে বিরতির সময় তাঁবুতে যেতে পেরেছিল।

খেলার দ্বিতীয়ার্ধের প্রাধান্য ছিল মোহনবাগানের। কিন্তু সত্যিকারের সুযোগ বলতে, 'পজিটিভ চান্স' বলতে যা বোঝায় তা তারা তৈরি করতে পারেনি।

আসলে দু দলই একটি করে গোল দেবার পর আর কেউই ঝুঁকি নিতে চায়নি। লীগের এখনো অনেক পথ বাকী। তাই অযথা ঝুঁকি নিতে গিয়ে পিছিয়ে পড়তে আর কে চায়! তাই দু দলই নিজেদের দুর্গ সুরক্ষিত রেখে গিয়ে খেলে গেছে। আর পয়েন্ট না হারালে তাদের তো আবার সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে হবে। সেই প্লে অফ খেলাটির কথা ভাবলে শিহরণ জাগে, বুকে কাঁপন ধরে। আর কেউ পয়েন্ট না হারালে সত্যিই আগস্ট মাসের শেষে রাম-রাবণের যুদ্ধ হবে।

খেলা

উইম্বলেডন টেনিস

১৯৭৯ সালের ৯৩তম উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন সুইডেনের বিয়রণ বর্গ এবং মেয়েদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন চেক তরুণী কুমারী মারটিনা নাভ্রাতিলোভা। এই নিয়ে বর্গ পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হলেন উপর্যুপরি চারবার (১৯৭৬-৭৯) এবং নাভ্রাতিলোভা মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন উপর্যুপরি দুবার (১৯৭৮-৭৯)। এখানে উল্লেখ্য, পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব উপর্যুপরি চারবার শেষ পেয়েছিলেন সুদূর ১৯১৩ সালে নিউজিল্যান্ডের এণ্টনি উইল্ডিং ১৯১৩ সালে নিউজিল্যান্ডের এণ্টনি উইল্ডিং (১৯১০-১৩)। সুতরাং বিয়রণ বর্গের উপর্যুপরি চারবার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয় উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি গৌরবময় অধ্যায়। আরও উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালের উইম্বলেডন টেনিস আসরে আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং মেয়েদের ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক ২০টি খেতাব জয়ের রেকর্ড করেন। শ্রীমতী কিংয়ের রেকর্ড সংখ্যক ২০টি খেতাব জয়ের মধ্যে আছে — সিঙ্গলস ৬টি, ডাবলস ১০টি এবং মিক্সড ডাবলস ৪টি। শ্রীমতী কিং ১৯৭৫ সালে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে আমেরিকার কুমারী এলিজাবেথ রায়ান প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক খেতাব জয়ের রেকর্ড (১৯টি) স্পর্শ করেন। এরপর শ্রীমতী কিং ১৯৭৬ সালে মেয়েদের ডাবলস ফাইনালে এবং ১৯৭৮ সালে মিক্সড ডাবলস ফাইনালে হেরে গেলে অল্পের জন্যে তাঁর সর্বাধিক ২০টি খেতাব জয়ের রেকর্ড করার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়। এবারের আসরে এক এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে। কুমারী এলিজাবেথ রায়াল যিনি ১৯টি খেতাব জয়ের সূত্রে উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে সর্বাধিক খেতাব জয়ের রেকর্ড করেছিলেন তিনি মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনাল খেলা দেখার পর খেলার আসরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তাঁর মৃত্যুর ২৪ ঘন্টা পর শ্রীমতী কিং তাঁর ২০টি খেতাব জয়ের রেকর্ড করেন। কুমারী এলিজাবেথ রায়ান ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে ১৯টি খেতাব (মেয়েদের ডাবলস ১২ এবং মিক্সড ডাবলস ৭) জয়ের সূত্রে উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক খেতাব জয়ের রেকর্ড করেছিলেন। সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠেছিলেন দুবার (১৯২১ ও ১৯৩০ সালে)। কিন্তু খেতাব জয় করতে সক্ষম হননি।

এবার পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন তিনজন বাছাই খেলোয়াড়। ১নং বাছাই বিয়রণ বর্গ (সুইডেন) ৬-২, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে ৫নং বাছাই জিমি কোনর্সকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন। অপর সেমিফাইনালে ৫নং বাছাই রস্কো ট্যানার (আমেরিকা) ৬-৩, ৫-৬ ও ৬-৩ গেমে বে-বাছাই খেলোয়াড় প্যাট ডুপ্লেকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন। সেমিফাইনালে চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে তিনজন ছিলেন আমেরিকার এবং একজন সুইডেনের। ২নং বাছাই জন ম্যাকেনরো (আমেরিকা) অপ্রত্যাশিতভাবে স্বদেশের, টিম গুলিকসনের কাছে [illegible] যান চতুর্থ রাউণ্ডে।

মেয়েদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন বাছাই তালিকার প্রথম চারজন খেলোয়াড়। ১নং বাছাই মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা (আমেরিকা) ৭-৫ ও ৬-১ গেমে ৫নং বাছাই ট্রেসি অস্টিনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন: অপর সেমি-ফাইনালে ২নং বাছাই ক্রিস ইভার্ট লয়েড (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-২ গেমে ৩নং বাছাই ইভন গুলাগং কলিককে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন। মেয়েদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন আমেরিকার তিনজন এবং অস্ট্রেলিয়ার একজন খেলোয়াড়।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : ১নং বাছাই বিয়রণ বর্গ (সুইডেন) ৬-৭, ৬-১, ৩-৬, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে ৫নং বাছাই রস্কো ট্যানারকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : ১নং বাছাই কুমারী মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা (আমেরিকা) ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে ২নং বাছাই শ্রীমতী ক্রিস ইভার্ট লয়েডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জন ম্যাকেনরো এবং পিটার ফ্লেমিং (আমেরিকা) ৪-৬, ৬-৪ ৬-২ ও ৬-২ গেমে রল র‍্যামিরেজ (মেক্সিকো) এবং ব্রায়ান গটফ্রিডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : ১নং বাছাই শ্রীমতী বিলি জিন কিং এবং কুমারী মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা (আমেরিকা) ৫-৭, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে ২নং বাছাই ওয়েন্ডি টার্নবুল (অস্ট্রেলিয়া) এবং বেটি স্টোভকে (নেদারল্যান্ডস) পরাজিত করেন।

দর্শক

হিমাংশু রায়

সুব্রতা গুপ্ত

আগেকার দিনের অনেকেরই বার, তেরোটি সন্তান হতো। —আমাদের মা বাবারও সেইরকমই বারো-তেরোটি সন্তান হয়েছিল। বাবা যখন বহরমপুরে কাশিমবাজার স্টেটে মহারাজার একজন বড় অফিসার ছিলেন, তখন আমাদের সাত বছরের ছোট ভাইটির অসুখ করল-—সিভিল সার্জন এসে বল্লেন-'ডিপথিরিয়া'। মায়েরা ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন —গলায় অপারেশন হলো—কিন্তু, ভাইটিকে বাঁচানো গেল না। বোনেদের মধ্যে আমি সকলের ছোট, আমার ওপরে 'সাগর', তার উপরে 'রেণুদি'। পরদিনই রেণুদির খুব জ্বর হলো, ডাক্তার বল্লেন—'এটা 'ওয়ার ইনফ্লুয়েঞ্জা'—একেও বাঁচানো কঠিন হবে—শিগগীরই আর দুটি বাচ্চাকে এখান থেকে সরান'। কলকাতায় এক কাকার বাড়ীতে (তিনি খুবই নামকরা ব্যারিস্টার—জে, এন, রায়) আমাদের এক মামা আমাদের নিয়ে গিয়ে রেখে এলেন। কয়েকদিন পরই মা বাবা এলেন—আমি দেখে অবাক যে, বাবার মাথার চুলগুলি ধপধপে সাদা—ভীষণ শোকেই এইরকম হয়েছে। একদিন ভোরবেলা কৌতূহলবশে আমি ছাদে গেলাম, কারণ রোজই মা বাবা ছাদে যান। কেন? গিয়ে দেখি পাশাপাশি বসে চোখ বন্ধ করে উপাসনা করছেন।

কিছুদিন পর বহরমপুরের ঐ বাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে, অন্য আরেকটা বাড়ী ভাড়া করে আমরা সকলে বহরমপুরে ফিরে গেলাম। তার কিছুদিন পর বাবা কাশিমবাজারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কটকে চলে এলেন—তখন স্বদেশী আমল—দেশের জিনিস দেশেই তৈরী হবে—এই ছিলো তখনকার মনোভাব। কটকে বাবার বিরাট বাড়ীর মস্তো বড় উঠোনে মোজা-গেঞ্জীর কারখানা বসালেন। চমৎকার সব মোজা-গেঞ্জী হতে লাগল—কলকাতার একজিবিশনে তার জন্য গোল্ড-মেডেল পেলেন। বাবার নাম শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায়। সেই দেখা-দেখি অনেক মোজা-গেঞ্জীর কারখানা হলো। তখন বাবার কাছে এর প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল। এবং কারখানা তুলে দিলেন। তিনি তো আর অর্থলাভের জন্য ব্যবসা করেন নি, দেশপ্রেমের ভাবের ধারায় করেছিলেন; কিছুদিন পর চাকরিও ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। মাকে বললেন, যা আছে তাই দিয়ে সংসার চালাও; আমি আমার প্রিয় বিজ্ঞান সাধনা করব। তাই করে গেছেন বাকী জীবন; সূক্ষ্ম বিজ্ঞান নিয়ে মেতে থাকতেন।

মার সংসার যেখানেই থাকতো আত্মীয়স্বজনে ভরা থাকতো। শ্বশুরে বাড়ীর, বাপের বাড়ীর এবং নিজের সন্তান। এই সকলকে নিয়ে, নানান অভাব অভিযোগের মধ্যে মা হাসি মুখে সংসার করতে লাগলেন।

একদিন মা বললেন,—কটকে অত যন্ত্রপাতি পড়ে আছে—ওগুলি বিক্রি করলেও কয়েক হাজার টাকা পাওয়া যায়। দাদা (হিমাংশু রায়) বললেন, তুমি কিছু ভেবনা মা—কটকে গিয়ে আমি সব বিক্রি করে দেব। দাদা কটকে যাবার কিছুদিন পর মাও কটকে গেলেন, আমিও সঙ্গে গেলাম। আমরা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে দাদার চাকরটি বললো—মা, কাল একটা কাণ্ড হয়েছে, দাদাবাবুর তো জ্বর, দুপুরবেলায় বার্লির বাটী নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি, একটা প্রকাণ্ড রাজসাপ দাদাবাবুর মাথার কাছে কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে মাথার ওপর ফণা ধরে রয়েছে। আমি তো ভয়ে নড়াচড়া করতে পারি না। দাদাবাবু তো জ্বরে অজ্ঞান। সাপটা আমাকে দেখে আস্তে আস্তে কুণ্ডলী খুলে ঐ চালের ওপর চলে গেল। ঠিক এইরকম আরেকটা ঘটনা দাদার জীবনে আরেকবার ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম ব্রহ্মচর্যাশ্রম খুললেন, তখন আমাদের পরিবার থেকে অনেক ছেলেমেয়েকে ভর্তি করা হলো। দাদাও গেলেন। তখন তার বয়স সাত।আট হবে। একদিন দাদার খুব জ্বর, চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন, একজন শিক্ষক দাদাকে দেখতে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। এক বিরাট গোখরো খাটের পায়ায় জড়িয়ে উঠে মাথার ওপর ফণা ধরে রয়েছে, সাপটা ওঁকে দেখতে পেয়ে আস্তে করে চলে গেল। দিদিমা বলতেন—এরকম যাদের হয় তারা নাকি রাজসম্মান পায়।

বহুদিন পর দাদার বয়স যখন আট-চল্লিশ এরকম হবে—বম্বের একটি নার্সিং-হোমে দাদা মারা যান, তখন ছোট বড় সমস্ত লোক দাদাকে কাঁধে করে করে (সোনার কাজ করা ছাতা মাথার উপর ধরে) কুড়ি মাইল পথ এসে ম্যালাডের শ্মশানে দাহ করলেন কারণ দাদার স্টুডিও ও বাড়ী ম্যালাডেই ছিল।

দাদা যখন বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়া ছেড়ে দিয়ে, থিয়েটার করা শুরু করলেন তখন দাদার খুব নাম খাতির হলো। বিপিন পালের ছেলে নিরঞ্জন পাল দাদার বন্ধু ছিলেন। তাঁর লেখা 'গডেস' গল্পটি নিয়ে থিয়েটার করলেন। থিয়েটারটার এত নাম হলো যে তখন ইংলণ্ডের রাজা 'গডেস' দেখতে এলেন এবং এত মুগ্ধ হলেন যে, তিনি দাদাকে 'বাকিংহাম প্যালেসে' ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন।

দাদা যখন বিলেতে যান তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। সেই ঘোর যুদ্ধের মধ্যেই আমাদের পরিবারের কয়েকজন ছেলে বিলেতে পাড়ি দিল। মণি কাকা, শচী দাদা, প্রমোদ দা, দাদা সব একে একে যাঁরা গেলেন তাঁদের কারোর কারোর কথা আত্মীয়স্বজনেরা জানতেন কিন্তু দাদার কথা কেউই জানতেন না শুধু মা ছাড়া। দাদা যে জাহাজে করে গিয়েছিলেন কিছুদিন পর খবর পাওয়া গেল যে, সেই জাহাজটা ডুবেছে। মা ভীষণ অস্থির হলেন। কিছুদিন বাদেই দাদা খবর পাঠালেন যে, উনি নিরাপদেই পৌঁচেছেন আর জাহাজটা ফিরবার মুখে ডুবেছে।

আবার আগের কথায় ফিরে যাই—দাদার যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা আসন্ন, তখন পরীক্ষা না দিয়ে উনি পুরী চলে গেলেন 'কালাপাহাড়' সাজতে। সেখানে তখন 'কালাপাহাড়' থিয়েটার হচ্ছিল, তাতে তিনি স্টেজের ওপরে ঘোড়া চালাতেন। আমাদের

যে সবার ছোট ভাইটি সেও খুব ঘোড়া চালাত আর বাবা তো ঘোড়ায় চড়েই মহলে মহলে ঘুরতেন। বাবার তিনটি 'ওয়েলার' ঘোড়া ছিল। বাবার যখন বয়স আট এরকম হবে তখন কাশিমবাজারের রাজার এক সেক্রেটারি এসে বাবাকে মহারাজার অমন্ত্রণ জানালেন—এই রাজা ছিলেন খুবই দানশীল —যার ফলে সমস্ত রাজ্য বাঁধা পড়েছে। গিলেণ্ডারস কোম্পানী সব ভার নিচ্ছেন কিন্তু তারা এমন একজন সজ্জন ব্যক্তি চান যিনি জমিদারির সবকিছু পুংখানুপুংখ পর্যালোচনা করে হিসাব নিকাশ করবেন। বাবা দু বছরের মধ্যেই সব ঠিক করে দিলেন। পরিবর্তে রাজা ও গিলেণ্ডারস এক এক লক্ষ টাকা করে দিলেন, সে-বছরই পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স পেলেন। ঈশ্বর দিয়েছেন প্রচুর, কিন্তু তাঁর কো কোন মায়া ছিল না।

যাই হোক কটকে থাকার সময়ে মা গরমকালে পুরী চলে যেতেন। গরুগুলো নিয়ে গোয়ালারা এবং আরও অন্যান্যরা হেঁটেই আগে চলে যেত। পুরীতে বাবার একটা হোটেল ছিল, নাম—'ভিকটোরিয়া ক্লাব'। যার কাছ থেকে কিনেছিলেন, তাঁরই দেওয়া নামটা আর বদলায়নি, শুধু একটা দেশী হোটেল হোক এই আশায় করে-ছিলেন। তখন শুধু বি, এন, আর হোটেল-টিই ছিল কিন্তু তাতে দেশীয় লোকদের ঢুকবার নিয়ম ছিল না। আমাদের হোটেলটি এত ভাল চলছিল যে, তার সম্বন্ধে লিখতে গেলে আরও পাঁচ পাতা বাড়বে। অবশ্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের অবিরাম আসা-যাওয়ারও কোন ছেদ ছিল না (অবশ্যই বিনি পয়সায়।)

মাঝে একজন সাধু প্রায়ই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে আসতেন। তাঁর জটা পা পর্যন্ত লম্বা, পিছনে অগুণতি মহিলা ভক্তর দল সারবেঁধে চলতো। মা ও অনেক মহিলা এতে আপত্তি করতেন। দাদা একদিন একটা গামছা নিয়ে গিয়ে সাধুর গলায় জড়িয়ে টেনে বসালেন—বল্লেন ফের যদি এরকম কর, তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব। যা করতে হয় বাড়ী বসে কর।

আর একদিন এক কুষ্ঠরুগীকে কোলে করে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন, বল্লেন মা, এই লোকটা পথের ধারে পড়ে কাঁদছে। মা তাকে সেবা-যত্ন করে, কুষ্ঠ-আশ্রমে দিয়ে এলেন

দাদার এখানে ম্যাট্রিক দেওয়া হয়নি। কিন্তু বিলেতে গিয়ে সেখানের এই স্টাণ্ডার্ডের পরীক্ষা খুব ভাল ভাবেই পাশ করলেন। তারপর ব্যারিস্টারী পড়তে লাগলেন, কিন্তু শেষ করলেন না।

দাদার বরাবরই থিয়েটারের ওপর ঝোঁক ছিল। বিলেতে গিয়ে প্রথম প্রথম পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনয় করতেন। তারপর নিজেই একটা দল গঠন করলেন। দাদা যখন ব্যারিস্টারী পড়া ছেড়ে দিয়ে থিয়েটার করতে লাগলেন, বাবা তখন রেগে গিয়ে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। অন্যান্য অনেক ছেলে-মেয়ের মতো দাদাও হোটেলে কাজ করে নিজের খরচ চালাতেন, কিন্তু প্রায়ই অর্থকষ্টে পড়তেন। মাকে জানালে—মা মাঝে মাঝে দেশে গিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা যোগাড় করে কয়েক হাজার টাকা পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু বিরাট সংসার ফেলে মার পক্ষে দেশে গিয়ে বেশীদিন থাকা সম্ভব হোত না। একদিন দাদা ও তাঁর এক বন্ধু ব্যাঙ্কে খোঁজ করতে গেলেন কোনও টাকা এসেছে কি না—না, কোনও টাকা আসেনি। ফিরবার সময়ে দাদা দেখলেন সিঁড়িতে একটা মাণিব্যাগ পরে আছে, হাতে তুলে দেখেন—কয়েক হাজার টাকা, কিন্তু কোনও নামধাম নেই। বন্ধুটি বল্লেন এ টাকা তোকে ভগবানই দিয়েছেন, দাদা অনেকক্ষণ হাতে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন—নিলেন না, তারপর ব্যাঙ্কে গিয়ে ফেরৎ দিলেন, বল্লেন—কীভাবে পেয়েছেন। দাদা সেই সময়ে তিনদিন শুধু জল খেয়ে আছেন —এইরকমই ছিলেন হিমাংশু রায়।

বাবা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায়ও ঐরকমই ছিলেন। শ্বারভাঙ্গায় স্টেটের যখন তিনি ম্যানেজার ছিলেন—প্রজারা ঘুষ দিতে এসে মার খেয়ে পালাতেন। একদিন বাবা খেতে বসে বল্লেন খুব সুন্দর চাল তো! ঘিয়ের গন্ধটাও চমৎকার—দিদিমা বল্লেন—অমুক প্রজা এসে দিয়ে গেছে। রেগে গিয়ে বল্লেন—কতোদিন বলছি এসব ঘুষ নবে না। এই বলে উঠে গিয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে দিলেন।

আবার দাদার কথায় ফিরে যাই—দাদা ষোলো বছর বিদেশে ছিলেন, শেষের দিকে মাঝে মাঝেই দেশে আসতেন। দাদা ও বৌদি যখন জারমানিতে ফিল্মের বিষয়ে নিরীক্ষা-পরীক্ষা করতেন, কাজ শিখতেন। তখন ওখানকার দলরা ওঁদের ছাড়তে চাননি। পরে বৌদির কাছে শুনেছি দাদা বলতেন না, আমরা দেশের সেবা করব। দেশেই ফিরে যাব। কলকাতায় এসে খুবই নামী এক হোটেলে উঠতেন। রোজ একবার করে আমাদের সঙ্গে দেখা করতন। এখানে 'গডেস'টা কিছুদিন করেছিলেন তখন সমস্ত যুবক সম্প্রদায় ও আমাদের ছেলেরাও তাতে যোগ দিয়ে মেতে উঠেছিলন। বিলেতে গিয়ে 'লাইট অব এশিয়া'টা থিয়েটার করলেন। তখন মধু বোসের ওপর স্টেজ সাজাবার ভার দিলেন, তিনি স্টেজের ওপর বিরাট এক বুদ্ধ মূর্তি এক পাশে রেখে-ছিলেন। এইটির আবার সিনেমা তুলবেন দাদা। এইটাই প্রথম, আর তখন তো 'টকি' আরম্ভ হয়নি, সাইলেণ্ট পিকচার-এর যুগ। এই বইতে দাদা বুদ্ধ সেজেছেন। কলকাতায় এসেছেন—কতকগুলি দৃশ্য তুলতে। কালীঘাটের কাছে যে 'নকুলেশ্বর' শিবলিঙ্গ আছে তার একপাশে কয়েকজন সাধু রয়েছেন, কেউ কাঁটার ওপর শুয়ে, কেউ পা উঁচু করে, এক একজন এক একরকম। বুদ্ধ তাঁদের কাছ থেকে ভিক্ষে নিচ্ছেন। এরকম দু-একটি দৃশ্য। আমরা মাথায় ঘোমটা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সেই দৃশ্য তোলা দেখতাম।

ওনার সম্বন্ধে সবাই খুবই উৎসাহিত ছিলেন। সাহায্য করার জন্য ব্যগ্র সবাই। কয়েকটি হাতির দরকার—জয়পুরের ওদিক-কার কোনও এক রাজা কয়েকটি হাতি পাঠিয়ে দিলেন। নারী চরিত্র দরকার—বর্ধমানের এক রাজকুমারী একটা ছবিতে নামতে স্বীকৃত হলেন।

পরে দাদা দেশে এসে বম্বেতে একটা 'ফিল্ম স্টুডিও' তৈরী করলেন। দেবিকার সঙ্গে বিলেতেই দাদার বিয়ে হয়। দাদারা খুবই সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন আর মা-বাবা, আমি জুহুর কাছে 'থার' নামে একটা সাবার্বে থাকতাম। আমাদের ফ্ল্যাট-টাও চমৎকার ছিল আর খুব সুন্দর করে দাদারা সাজিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী সব বন্দোবস্ত ছিল। বাবা বরাবর যেরকম ইজিচেয়ারে বসতে ভালবাসতেন সেরকমও একটি ছিল।

স্টুডিওটা আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে লাগল। দাদার এক বন্ধু ছিলেন—স্যার রিচার্ড টেম্পল। উনি খুবই নামকরা পরি-বারের ওনার ঠাকুর্দাদা ভারতবর্ষে গভর্নর ছিলেন। ওঁদের পরিবারের সঙ্গে বিলেতের রাজ-পরিবারের মধ্যে বিয়েও হতো।

আমরা ওঁকে 'ডিকি ড্যাডি' বলে ডাকতাম, উনি রোজ আমাদের বাড়ী এসে কার কি দরকার না দরকার সব বন্দোবস্ত করে দিতেন। আমার খেলনার শখ দেখে হঠাৎ একদিন একটি সাজাবার কাঁচের আলমারি এনে উপস্থিত করলেন।

মার তো তখন প্যারালিসিস। সেই পক্ষাঘাতে পড়ে রয়েছেন। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। অনেক চিকিৎসায় একটু ভাল হলেন। অনেক বালিশ চারিদিকে দিয়ে বসান হতো। মা বই পড়তেন—আয়া পাতা উল্টে উল্টে দিতো। আমি পাশে বসে ছবি আঁকতাম। মা বলতেন—গোলাপ এলে তাকে একটা গেলাসে করে মুশুরীর ডালের জলটা দিবি। যেদিনই সকালে আসতেন, আমি ঐরকমই দিতাম, দাদা মার সামনে দাঁড়িয়ে খেতেন—মুখের ভাবটা যেন অমৃত খাচ্ছেন। দাদা ও মা দুজনে দুজনকে এতো ভাল-বাসতেন যার তুলনা নেই। মাঝে মাঝেই শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু আসতেন, এসে মার পাশে বসে থাকতেন। কটকে থাকতে সরোজিনী নাইডুর মা-বাবার সাথে আমাদের মা-বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রায়ই আসতেন। মা আমাকে একদিন বললেন—ওঁদের তুই খেতে বল। মা আমাকে বলে দিলেন—আমি অনেক রকম রাঁধলাম। সবাই এলেন রাতে খেতে। প্রত্যেকেই প্রশংসা করলেন। শ্রীযুক্তা নাইডু—তাজমহল হোটেলেই যাঁর জীবন কাটে, তাঁর বাড়ির খাবার পেয়ে এতো ভাল লাগে [illegible] দিন [illegible]

মনো এক[illegible] শাড়ি নিয়ে এলেন—আমার খুব লজ্জা করতে লাগল।

একদিন এক ইটালীয়ান কনসাল ও তাঁর স্ত্রী আমাদের বাড়িতে চা খেতে এলেন। আমার আঁকা ছবি দেখে খুব খুশী হয়ে বললেন—তুমি যদি ইটালী গিয়ে ছবি আঁকা শিখতে চাও, আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। কিন্তু আমার সব বিষয়েই নিজের উপর ভরসা কম। আমি রাজি হলাম না। ইটালীর রাজার জন্মদিন উপলক্ষে কনসালের বাড়িতে দাদা, বৌদি, ডিকি-ড্যাডি ও আমার নিমন্ত্রণ হল সেই ককটেল পার্টিতে। চমৎকার হয়েছিল সেই পার্টি।

মা ছ' বছর বিছানায় ছিলেন—দাদা দেশে আসার আগে তিন বছর আর আসার পরে তিন বছর। প্রথম তিন বছর আমার সেজদি মা-র চিকিৎসার সব বন্দোবস্ত করতেন। সেজদির নাম শ্রীযুক্তা অঞ্জলি চৌধুরী। ও'রা মৈমনসিংহের তিন-আনির জমিদার ছিলেন। সেজদি মা-র জন্য যা করেছেন, সব সন্তানরা তা করে না। আমরা যখন বম্বেতে, আমার সব দিদি, ভগ্নী-পতিরাই আসা-যাওয়া করতেন। তখন দাদা একদিন সেজদিকে বললেন—আমি লিলুর (আমার নাম) কাছে সব শুনেছি, তোর ছেলেদের ভার কিন্তু আমি নেব। হায়! সেই দাদাই চলে গেলেন। অবশ্যই সেজদির পাঁচ ছেলেমেয়েই খুবই অবস্থাপন্ন। মার মাঝে মাঝে কোমা হতো। দুয়েক দিন পর আবার কেটে যেত। তিন বছর দাদার কোলে ছিলেন এই আমাদের সান্ত্বনা, কিন্তু দাদা এরকম হঠাৎ চলে যাওয়ার দুঃখ, আমাদের কোনও দিনও ঘুচবে না।

দাদার মৃত্যুর সময় আমরা কেউই কাছে ছিলাম না। বাবা দেশে, আমি মংপুতে শ্রীমতীর মৈত্রেয়ীর কাছে রবীন্দ্রনাথ মংপুতে মৈত্রেয়ীর বাড়িতে অনেকবার গিয়ে থেকেছেন। তখন মৈত্রেয়ী আমাকে ডেকে পাঠাতো। এ-বিষয়ে আমি একটা বইয়ে সব লিখেছি। একবার রবীন্দ্রনাথ মংপু থেকে কালিম্পং গেলেন, সেখানে প্রতিমাদি ও অন্যান্য ছিলেন। ও'দের কাছে মৈত্রেয়ীর ছোট্ট মেয়েটি ছিল। আমরা মংপু থেকে সিকিম চলে গেলাম। ফিরবার পথে কবিকে প্রণাম করে, ওর মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে মংপু এলাম। আমি তো এসেই বিছানার মধ্যে ঢুকলাম। যেসব চিঠি এসে জমেছে, সেগুলো ডক্টর সেন ও মৈত্রেয়ী দেখতে লাগল। আমারও কিছু চিঠি ছিল। দাদার পি এ-র লেখাও চিঠি ছিল। সেই রাত্রে ওরা আমায় কিছু বললো না। পরদিন ভোরবেলা আমায় বললে—চলো, কলকাতায় যাব। মামার খুব অসুখ। আমরা তখনি শিলিগুড়ি রওনা হলাম। তখনও দার্জিলিং মেল আসতে খানিক দেরি আছে। ও বললো—এই ফাঁকে আমরা বম্বেতে একটা ফোন করি। ডক্টর সেন, ফোন করলেন এবং একটু পরে এসে বললেন—আপনি নিজে গিয়ে ফোন ধরুন। আমি ধরে বললাম—কে কথা বলছেন? আমি মিসেস রায় বলছি। আমার দাদা, দাদা কেমন আছেন বলুন। ওদিক থেকে বললেন—আমি পেরেরা কথা বলছি। মিঃ রায় মারা গেছেন, আমরা এইমাত্র শ্মশান থেকে ফিরছি। আমি কাঁদলাম না—কী যেন হলো। সমস্ত জগৎ শূন্য হয়ে গেল—আমি কেমন পাথর হয়ে গেলাম, আমার মনের ভাব আমি বলতে পারি না। ওখান থেকে মংপু ফিরে গিয়ে তারপর দিন আমাকে ওরা কলকাতায় আমার সেজ কাকীমার বাড়িতে রেখলো। আমি কাঁদতাম না, চুপ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। চিত্রিতা এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে আসতো, আমার মুখে গুঁজে দিত। প্রমোদদা—আমার পিসতুতো ভাই আমায় এসে জড়িয়ে ধরে বললেন—গোলাপদা নেই কিন্তু আমি তো আছি। কিছুদিন বাদে মেজদিরা পুরী থেকে এলেন—মেজদি হচ্ছেন মৈত্রেয়ীদের মা। এবং আমিও কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বম্বেতে নিরঞ্জন পাল ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলাম। ও'রা সমস্ত খবরাখবর দিয়ে বড় বড় দুটি চিঠি লিখলেন যে, আমরা বাইরের লোক, ভিতরের খবর কিছুই জানি না। কী হয়েছিল ঠিক মিঃ রায়-এর তাও জানি না। দাদার এক পি এ. নাম পেরেরা, তিনি আমায় বার বার বম্বে যেতে লিখলেন কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজনেরা কিছুতেই আমাকে ছাড়লেন না। আরও কিছুদিন বাদে আমি এখানকার আর্ট স্কুলে ভর্তি হলাম। তখন আমি মেজদির কাছে থাকতাম। (দাদার কাছে যখন ছিলাম, তখন দাদা আমায় সেখানকার স্যার জে জে স্কুল অব আর্ট-এ ভর্তি করে দেন। সেখানে তিন বছর ছবি আঁকা শিখেছিলাম।)

আমাকে কাছে রাখতে পেরে দাদা যে কী খুশি হয়েছিলেন তা বলার নয়। দাদার দুর্দান্ত বাবুর্চি দেশী রান্না কিছুই জানে না। এদিকে দাদার দেশী রান্নাই বেশি পছন্দ। তাই প্রায়ই আমি এটা, ওটা করতাম কিন্তু সব থেকে বেশি ভালবাসতেন লুচি আর পায়েস এবং তাই এগুলো করতামও বেশি।

দাদার তৈরি অচ্ছুৎ-কন্যার গান সারা ভারতবর্ষের লোকের মুখে মুখে ফিরত। বনকে চিড়িয়াও বহুকাল ধরে চলেছে। দাদার স্টুডিও জমজমাট হয়ে উঠল। ওর প্রধান লেখক ছিলেন নিরঞ্জন পাল ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার লেখা গল্প, গান, কবিতাও দাদা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে নিতেন। যাক একদিন ডিকিড্যাডি বললেন—গভর্নরের সেক্রেটারি বলছিলেন—মিঃ বসু একদিনও কল করেন না। ডিকিড্যাডি প্রায়ই সেখানে যেতেন। দাদা বললেন—আমি একদম সময়ই পাই না, আচ্ছা এর মধ্যেই একদিন যাব। তাঁকে তারপর স্টুডিও দেখার নিমন্ত্রণ করে একদিন আনা হল। নেতাজী, জহরলাল এ'দের সাথে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। এ'রা বম্বে গেলেই প্রায়ই যেতেন দাদার ছবি দেখতে। স্কুলের ছুটিতে আমি মংপু, ও কলকাতায় এসে-ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। একদিন কবি বললেন—হিমাংশু আমার লেখা-টেখার বিষয়ে কিছু বলে? আমি বললাম—দাদার ইচ্ছাটা করবার ইচ্ছে আর গল্পগুচ্ছেও কিন্তু গল্পও। কবি শুনে খুব খুশি হলেন।

শরদিন্দুবাবু বলেছিলেন — স্টুডিও দেখার আগে আমি ভেবেছিলাম, না জানি কী হবে, কেমন হবে! কিন্তু বম্বে টকিজে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম, যেন একটি আশ্রম। দাদার কড়া হুকুম ছিল, কেউ মদ্যপান করে স্টুডিওতে ঢুকতে পারবে না। আর স্টুডিওর মধ্যে তো ওসব জিনিস ঢোকা একেবারেই বারণ ছিল। অবশ্যই ওখানকার প্রতিটি কর্মীই ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র।

মার কোমা হতো মাঝে মাঝে। দুয়েক দিন থেকে ভাল হয়ে যেতেন। একবার কোমা হয়ে আর ভাল হচ্ছিলেন না। প্রায় দশদিন চলল ধস্তাধস্তি আর দাদাকে দেখে মনে হতো মা-র জন্যে যেন জীবনও দিতে পারে।

কিন্তু মা মারা গেলেন। দাদা তখন স্থির। স্টুডিওর ছেলেদের নিয়ে দাদা কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গেলেন ফুলের চাদর দিয়ে ঢেকে।

ওখানে বেশি দিন আর থাকতে পারলাম না। অন্য বোনেদের সঙ্গে দিল্লি, কলকাতায় কিছুদিন করে থেকে আবার দাদার কাছে বম্বেতে ফিরে গেলাম।

১৯২৫-এ দাদা লাইট অব এশিয়ার কয়েকটি দৃশ্য তুলতে কলকাতায় এলেন, এ-কথা আমি আগেই লিখেছি। দাদার তখন সব কাজ হতো জার্মানির এমেলকা স্টুডিওতে এবং উফা স্টুডিওতে। এমেলকা ছিল মিউনিখে ও উফা ছিল বার্লিনে। ১৯২৬-এ লাইট অব এশিয়া লণ্ডনে রিলিজড হয়। এর আগে [illegible] যখন দেখানো হয়, তখন প্রথম রাত্রির ডিনারে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন ভনহিণ্ডেনবুর্গ, চার্লি চ্যাপলিন, পোলো নেগ্রী, এমিল জ্যানিংস ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

১৯২৮-এ থ্রো অব এ ডাইস তুলতে ভারতে আসেন। ১৯২৯-এ ছবিটি শেষ হয়।

বম্বে টকিজে সমস্ত ভারতীয় ছেলে-মেয়েরা কাজ করতেন। দাদা তাঁদের বলতেন—কাজ শিখে নাও। আর কয়েক বছর পর এইসব বিদেশীদের ছুটি দিয়ে দেবো, তখন তোমরাই সব কাজ করবে। এখন তাঁরাই সিনেমা জগতের এক-একজন কর্ণধার। নিশ্চয়ই দাদার পরলোকগত আত্মা এতে তৃপ্ত হয়েছে। বিদেশীদের মধ্যে ফ্রাঞ্জ অস্টিন ছিলেন দাদার সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু, সঙ্গী, ইনি ছিলেন ডিরেক-টার। ক্যামেরাম্যান ভিয়ের সিং ও কিয়ের মায়ারও ছিলেন পুরোনো দিনের।

১৯৩৯-এ দাদা পরলোকগমন করেন দাদাকে আমরা কেউ শেষ সময়ে দেখতে পেলাম না—এ-দুঃখ আমাদের চিরকালই থাকবে।

নৃপতি কি নিছক কমেডিয়ান?

রবি বসু

কিছুদিন আগে পাশাপাশি দুটো হাউসে পরপর দুটো ছবি দেখলাম। একটি চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে তোলা। নাম শহর থেকে দূরে। আর একটি সম্প্রতি তোলা। যত মত তত পথ। পুরনো ছবিতে অনেক দিন পর নবদ্বীপ হালদারকে দেখলাম। তাঁর সেই বিচিত্র শ্রুতিবিস্ময় কণ্ঠস্বর শুনলাম। পরের ছবিতে হুবহু সেই কণ্ঠস্বরই শুনলাম একজন নবীন শিল্পীর কণ্ঠে। এছাড়া ইদানীংকালের রেকর্ডে সুশীল চক্রবর্তীর কণ্ঠে সেই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি প্রায়শই শুনতে পাই। নবদ্বীপ হালদার ভাগ্যবান সন্দেহ নেই। তাঁর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করার লোক আছে, প্রবণতা আছে। তিনি ওঁদের মধ্যে দিয়ে অনেক দিন বেঁচে থাকবেন।

ঠিক তখনই আর একজনের কথা মনে পড়ল। তাঁকে অনুকরণ কিংবা অনুসরণ করবার কেউ নেই। বছর দুই আগে তিনি মারা যাবার পর অনেকের মনে পড়ল, আরে, তিনি তো ছিলেন! বেঁচে ছিলেন এতদিন! তাঁর নাম নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। বাংলা চলচ্চিত্রে এত বড় উপেক্ষিত মানুষ সম্ভবত আর একটিও নেই।

উপেক্ষার কারণও আছে। তিনি তো কারও কাছে ভূমিকা ভিক্ষা করতে যেতেন না। কাজের দরকার হলে তিনি হুকুম করতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন তিনি কখনও করতে চাইতেন না। একটি ছবিতে কাজ করলেন, কিছু টাকা পেলেন, বাড়িতে এসে শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত তুলে দিলেন এমন এক ব্যক্তির হাতে যার সঙ্গে তাঁর রক্তের কোন সম্পর্ক নেই। যে সম্পর্ক আছে সেটা রক্তের চেয়েও বেশি। কবে কোন অতীতে মেদিনীপুর থেকে একটি বাচ্চা ছেলে কলকাতায় এসেছিল কাজের সন্ধানে, কেমন করে জানি না নৃপতির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল, আর সেই থেকে এটাই তার ঘরবাড়ি। ওদের সম্পর্কটা কি প্রভু-ভৃত্যের না পিতা-পুত্রের, না দুই বন্ধুর তা আবিষ্কার করা খুবই কঠিন। তার পরিশ্রমের একটা মাইনে নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু সেটা আজ পর্যন্ত কখনো তার হাতে এসেছে বলে মনে পড়ে না। খুব ভোরে উঠে তার ডিউটি শুরু, ডিউটি শেষ কোন দিন রাত দুটোয়, কখনো বা তিনটেয়। হ্যাঁ, উপরি পাওনা কিছু আছে বৈকি! কোন রাত্রে নৃপতির মদমত্ত পদের লাথি আর কোন রাত্রে তার বুকে মুখ রেখে ছোট ছেলের মত নৃপতির হাউ-হাউ কান্না। প্রায় প্রতিদিনই একবার করে তার চাকরি যায় আবার প্রতিদিনই পুনর্নিয়োগ ঘটে। ওর তরফ থেকেও প্রায় প্রতি রাত্রেই একবার করে পদত্যাগের সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়, আবার অতি প্রত্যুষেই পদত্যাগ প্রত্যাহার করা হয়। এ যেন দুটি মানুষের দুটি চিরকালীন শিশুর এক আশ্চর্য খেলাঘর।

হ্যাঁ, নৃপতি তাঁর এই দেড়খানা ঘরের আস্তানাটির নামকরণ করেছেন 'খেলাঘর'। দরজার সামনে একটি মোরগের ছবি আঁকা। আস্তানাটি তার স্মৃতিতেই উৎসর্গ করা। ওই মোরগটিকে বাজার থেকে কিনে আনা হয়েছিল বেশ উপভোগ করে রান্না করে কারণ সহযোগে সেবন করার জন্য। ঘরের অপর বাসিন্দাটি একটু বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। রান্নায় আপত্তি নেই, কিন্তু স্বহস্তে নিধনে ঘোরতর আপত্তি। অতএব নিধনপর্বের ভার নৃপতিকেই নিতে হল। এক হাতে ছুরি, অপর হাত মোরগের কণ্ঠদেশে। হঠাৎ নৃপতি আবিষ্কার করল হস্তধৃত জীবটির রক্তাভ দুই চোখে সারা পৃথিবীর মায়া, কী করুণ আর কী নিষ্পাপ। ডান হাতের ছুরি আপনা-আপনি খসে পড়ল। মোরগকে সযত্নে কোলে বসিয়ে মনযোগ দিলেন কারণ সেবায়। মাঝে মাঝে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেতে লাগল মোরগটিও। সেই থেকে দীর্ঘকাল দুজনে দুজনের সান্ধ্য সঙ্গী। ঘরের অন্য লোকটিকেও মাঝে মাঝে সঙ্গী করতে চেয়েছে

নৃপতি. কিন্তু বিষ্ণুর ভোগে যা নিবেদন করা যায় না সেই বস্তু সেবনে তার প্রচণ্ড আপত্তি। নৃপতির ভাষায় তা অমৃত হলেও।

শেষ পর্যন্ত নৃপতির সঙ্গে মোরগের এক আশ্চর্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সন্ধ্যে হতে না হতেই মোরগটি ছটফট করতে থাকত কিসের এক তাড়নায়। সারা ঘরময় ছোটাছুটি ফেলে দিত। নৃপতি বোতল খুলে বসলেই মোরগটি ঝাঁপিয়ে উঠত তার কোলে। তার জন্য একটি আলাদা পাত্র ছিল। তাতে কিছুটা কারণবারি ঢেলে দিতে হবে। একটি চুমুক দিয়ে তবে তার তৃপ্তি। নৃপতি সস্নেহে বলত, ব্যাটা আমার চেয়েও বড় মালখোর। রাত একটু গভীর হলে উভয়ের কথোপকথন শুরু হত। নৃপতি তার নিজের ভাষায় প্রশ্ন করত, মোরগটি উত্তর দিত তার নিজের ভাষায়। কখনো বা মোরগের প্রশ্ন, নৃপতির উত্তর।

এমনি করে বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর মোরগটি একদিন দেহরক্ষা করল। দুঃখে শোকে জর্জর পুরো তিনটি দিন নৃপতি উঠল না, খেল না। চতুর্থ দিন সকালে উঠে বসে নিজের হাতে একটি মোরগের ছবি আঁকল, তার নিচে বড় বড় অক্ষরে লিখল 'খেলাঘর'। সেটিকে দরজার সমানে স্থাপন করে একটা বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নৃপতি। তারপর নিজের এক এবং অদ্বিতীয় পারজামা ও পাঞ্জাবিটি দেহে ধারণ করে বেরিয়ে পড়লেন স্টুডিওর উদ্দেশ্যে।

ঘটনাটি শুনে স্বর্গত দীপ্তেন্দ্র সান্যাল তাঁর একটি রচনায় লিখেছিলেন : 'গোল্ড রাশ ছবিতে চার্লি চ্যাপলিন ক্ষুধার আবেগে মানুষকে মোরগ কল্পনা করেছিলেন। আর আমাদের নৃপতি সুধার আবেশে মোরগকে কল্পনা করেছিলেন মানুষ। দুজনের চিন্তায় কত মিল, আবার কত অমিল। ওই ছবি করে চার্লি জগৎবিখ্যাত। আর আমাদের নৃপতি?'

না, বিখ্যাত হবার কোন বাসনা নৃপতির কোন দিনই ছিল না। ছায়াছবিতে কিংবা রঙ্গমঞ্চে বিখ্যাত হবার মত কোন ভূমিকা তিনি কখনো পান নি, চানও নি। কথায় কথায় বলতেন : আমি একটা কাটা সৈনিকের রোল পেলেই খুশি।

তা তাঁকে কাটা সৈনিকের রোল দেওয়াও কম বিপজ্জনক ছিল না। যে দৃশ্যে যতটুকুই তিনি থাকুন না কেন দর্শকের চোখ তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু, অন্য কাউকে দেখবেই না। তিনি বলতেন : আমার নাম নৃপতি, নৃপতি মানে রাজা, তা রাজা যেখানে উপস্থিত সেখানে দর্শক রাজাকেই দেখবে, পাত্র-মিত্রদের দিকে নজর দিতে যাবে কোন দুঃখে?

তেমন একটা ঘটনা ঘটে মিনার্ভা থিয়েটারে মিশরকুমারীর কম্বিনেশন নাইটে। তা-বড় তা-বড় অভিনেতৃ সমাবেশ। আবন—অহীন্দ্র চৌধুরী, সামন্দেশ—নির্মলেন্দু লাহিড়ী. থারেব—রবি রায়. রামেশিস—শিশির গাঙ্গুলী. নাহরিণ—সরযূবালা, বুলো—শান্তি গুপ্তা, এছাড়া আরও অনেকে। নৃপতি করছেন কাকাতুয়ার ভূমিকা। সেদিন অপরাহ্নে মিনার্ভায় আসার আগে নৃপতি কিঞ্চিৎ সেবন করেছিলেন। কাকাতুয়ার মেক-আপ নিতে নিতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, আচ্ছা, কাকাতুয়া তো একটা পাখির নাম। বুলো কাকাতুয়া বলে ডাক দিলেই সে উইংসের পাশ থেকে হেঁটে আসবে কেন! তার তো উড়ে আসা উচিত। যা ভাবা তাই কাজ। কাউকে কিছু না জানিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের ভাঙ্গা কাঠ-কাটরা বেয়ে তিনি উঠে গেলেন স্টেজের মাথায় প্রায় তিন তলা সমান উঁচুতে। যথাসময়ে তাঁর প্রবেশের মুহূর্তটি এলো। অহীনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে শান্তি গুপ্তা বাঁদিকের উইংসের দিকে তাকিয়ে মধুর কণ্ঠে ডাক দিলেন : কাকাতুয়া। কোন উত্তর নেই। এবার ডান দিকের উইংসের দিকে তাকিয়ে আবার ডাকলেন : কাকাতুয়া। এবারও কোন সাড়া নেই। তখন একটু বিরক্ত হয়ে বেশ উঁচু গলায় ডাকলেন : কাকাতুয়া! সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত করে কোথা থেকে যেন একটা ডাক শোনা গেল : ক-অ-অ-অ....! তারপরই ঝপ করে উপর থেকে কি যেন একটা পড়ল অহীন্দ্র চৌধুরী আর শান্তি গুপ্তার সামনে। ও'রা দুজনেই একটু চমকে তাকিয়ে দেখলেন ওঁদের সামনে পাখির ডানার মত দু'হাত বিস্তৃত করে দাঁড়িয়ে আছেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, আর তাঁর হাঁটুর নিচে থেকে খানিকটা জায়গার ছাল উঠে গিয়ে সেখান থেকে ঝরঝর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ওই রক্ত দেখে অহীনবাবু—নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী—যে আবনের ভূমিকায় তিনি কয়েকশো রাত্রি অভিনয় করেছেন—যার সংলাপ তিনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও নির্ভুল বলে দিতে পারেন—সেই সংলাপ গেলেন ভুলে। শান্তি গুপ্তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সেই দৃশ্যটি সেদিন রক্ষা পেয়েছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে দৃশ্য রক্ষাসূচক দু-একটি সংলাপ বলে ড্রপ ফেলার ইঙ্গিত করে দিলেন। ড্রপ পড়ার পরও তাঁরা শুনতে পাচ্ছেন কাকাতুয়া তখনো ডানা ঝাপটে চলেছে আর তার মুখ থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে ক-অ-অ-অ... ক-অ-অ-অ...

ওই ঘটনার পর যখনই কোন কম্বিনেশন নাইটের শিল্পীতালিকায় অহীনবাবু নৃপতির নাম দেখতে পেতেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতে সেটি কেটে দিয়ে বলতেন : আঃ. আবার ওটাকে কেন?

পরবর্তীকালে ওই ঘটনার উল্লেখ করলে নৃপতিবাবু বলতেন, ও কিছু নয়, ওটা একটা খেলা। এ পৃথিবীটা তো একটা খেলাঘর। তাই একটু আধটু খেলতে ইচ্ছে করে।

ওই রকম আর একটা খেলা খেলেছিলেন ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে। ছবিবাবুর সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা ছিল অদ্ভুত রকমের। ওঁদের সম্পর্কের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আমার নেই। ছবিবাবু পৃথিবীতে একটি মাত্র মানুষের কাছে মাথা নোয়াতেন। তাঁর নাম নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। নৃপতিবাবু পৃথিবীতে মাত্র একজনের কাছেই গলবস্ত্র হতেন। তাঁর নাম ছবি বিশ্বাস। ওঁদের সম্পর্ক নিয়ে এরপরও আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

সেই ছবিবাবুকে একবার ফ্যাসাদে ফেলেছিলেন নৃপতি। নৃপতিবাবুর ভাষায় ব্যাপারটার নাম 'টাইট'। সেটাও একটা কম্বিনেশন নাইট। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'। রংমহলে হয়েছিল। সেবারও বাঘা বাঘা শিল্পী সমাবেশ। উপীন—অহীন্দ্র চৌধুরী, বেহারী—নরেশ মিত্র, সতীশ—ছবি বিশ্বাস, দিবাকর—মিহির ভট্টাচার্য, কিরণময়ী—শান্তি গুপ্তা এবং সাবিত্রী—রানীবালা। নৃপতি করছেন ছোট্ট এক সিনের একটি মাতালের পার্ট। আগেভাগে এসে মেক-আপ নিয়ে গ্রীনরুমের বেঞ্চে বসে আছেন। এমন সময় রব উঠল ছবিবাবু আসছেন, ছবিবাবু আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তকতকে ঝকঝকে মেক-আপ রুমে আর একবার ঝাড়-পোঁছ শুরু হয়ে গেল। ছবিবাবু প্রবেশ করলেন সম্রাটের মত। গ্রীনরুমে তিনি বরাবরই গম্ভীর, রাশভারি; সর্বদা ভুরু উঁচিয়ে কথা বলেন। ব্যাপারটা বসে বসে দেখলেন নৃপতি। সঙ্গে সঙ্গে 'টাইট' দেবার পরিকল্পনাটা মাথায় এসে গেল। মেক-আপ রুমের দরজাটি খুলে আস্তে আস্তে ঢুকলেন ছবিবাবুর ঘরে। মেক-আপ নিতে নিতে আয়নায় প্রতিফলিত নৃপতির মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে ভুরু উঁচিয়ে তাকালেন ছবিবাবু। জিজ্ঞেস করলেন : কি ব্যাপার?

—একটা কথা ছিল।

—তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

—আমি তো এ নাটকে ছোট্ট একটা মাতালের রোল করছি।

—তা তো জানি।

—মাতাল সাজতে গেলে একটু মদ-টদ খেতে হবে না?

—তার মানে?

—দশটা টাকা চাই।

—কি হবে?

—মাল খাব।

প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে ঘুরে বসলেন ছবি বিশ্বাস। বললেন : না, যখন তখন মাল খাবার জন্যে দশটা টাকা চাইলেই ছবি বিশ্বাস দেয় না। বলে আবার ঘুরে বসে সতীশ সাজতে লাগলেন।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে নৃপতি আবার বললে : দিলে কিন্তু ভাল করতিস।

—তুই কি আমায় শাসাচ্ছিস?

—না তোর ভালর জন্যেই বলছিলাম।

—হুঁঃ আমার ভাল করবে নৃপতি চাটুজ্জে; আমার নাম ছবি বিশ্বাস—সেটা মনে আছে তো?

—মনে থাকবে বৈকি—নিশ্চয় মনে থাকবে!

এই বলে বেরিয়ে এলেন নৃপতি।

যথাসময়ে দৃশ্যটি এলো। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে নৃপতি আর একবার বললেনঃ টাকাটা দিলে কিন্তু ভাল করতিস ছবি।

ছবিবাবু কোন কথা না বলে ভুরুটা তুলে ঘাড়টা একবার ঝাঁকিয়ে মঞ্চে গিয়ে পজিশান নিলেন।

এবারে দৃশ্যটির একটু বর্ণনা দিয়ে নিই। তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে। নিষিদ্ধ পল্লীতে বিপিনবাবুর মাই-ফেলে উপস্থিত থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সতীশ সেখানে যায় নি। মেসে নিজের ঘরে বসে সাবিত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। সাবিত্রীকে বলে দিয়েছে বিপিনবাবুর ওখান থেকে কেউ খোঁজ করতে এলে যেন বলে দেয় যে বাবু বাড়ি নেই। ঠিক সেই সময়ে ঘরের বাইরে এক মাতালের জড়িত কন্ঠ শোনা গেল ঃ কোন ঘরটারে বাবা—এই ঘরটাই তো!

সঙ্গে সঙ্গে সতীশ বলে উঠল ঃ ওই ওরা এসে গেছে! বলে ফুঁ দিয়ে ঘরের আলোটি নিভিয়ে আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল সতীশ। ঘটনার আক-স্মিকতায় সাবিত্রী পাথরের মত বসে রইল।

বাইরে থেকে আবার জড়িত কন্ঠ শোনা গেল ঃ কিরে বাবা, ঘর যে অন্ধকার। তবে যে চাকরটা বললে বাবু তাঁর ঘরেই আছেন। বলতে বলতে মঞ্চে প্রবেশ করলেন নৃপতি। ফস করে দেশলাইটা জ্বালালেন। তারপর সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ওখানে কে বসে? ঝি। সতীশবাবু কোথায়?

সাবিত্রীরূপী রানীবালা ইঙ্গিতে আপাদমস্তক কম্বলে মুড়ি দেওয়া ছবি বিশ্বাসের দিকে দেখিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

এইবারে শুরু হল নৃপতির 'টাইট'-এর খেলা। সেদিন কলকাতায় প্রচন্ড গরম। একশো তিন কি চার ডিগ্রি হবে। দুলো ছিল এর পরই নৃপতি বিছানার দিকে এগোবেন, কম্বলটা তুলে ধরে বলবেন ঃ আরে সতীশবাবু, আপনি এখানে!

কিন্তু নৃপতি সে ধার দিয়েও গেলেন না। তিনি একেবারে মঞ্চের উল্টোদিকে চলে গেলেন। একটি বই তুলে ধরে ভাল করে ঝেড়েঝুড়ে দেখে নিয়ে বললেন ঃ কই, সতীশবাবু তো এখানে নেই।

ওদিকে কম্বল আবৃত হয়ে প্রচন্ড ঘামছেন ছবিবাবু। দম বন্ধ হয়ে আসছে তাঁর।

নৃপতি ততক্ষণে মঞ্চের আর একদিকে গিয়ে হাজির। একটি ফুলদানি তুলে নিয়ে তার নীচেটা ভাল করে নিরীক্ষণ করে বললেন ঃ কই, সতীশবাবু তো এখানেও নেই। গেল কোথায়!

দর্শকরা তখন দৃশ্যটি প্রচন্ডভাবে উপ-ভোগ করছেন, মাতালবেশী নৃপতির কান্ড-কারখানায় তাঁর চোখ-মুখ, অঙ্গভঙ্গি, কণ্ঠস্বর দর্শকের হাসিকে ক্রমশ উচ্চতর করছে। এদিকে ছবি বিশ্বাসের অবস্থা তখন প্রচন্ড কাহিল। নৃপতি এসে কম্বল না সরানো পর্যন্ত কিছুই করতে পারছেন না। কম্বলঢাকা অবস্থাতেই চাপাস্বরে বললেন ঃ এই নৃপতি, কি হচ্ছে কি!

নৃপতি তখন একটু কাছাকাছি হয়ে তেমনি চাপাস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ টাকাটা পাব?

কম্বলের মধ্যে থেকে চাপাস্বরের একটি গর্জন শোনা গেল ঃ হারামজাদাকে জুতো লাগাব—

সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে আবার মঞ্চের মাঝামাঝি চলে এলেন নৃপতি। রানীবালা যে আসনটিতে বসেছিলেন সেটি ঝেড়ে-ঝুড়ে দেখে নিয়ে বললেনঃ কই এখানেও তো সতীশবাবু নেই।

এবারে কম্বলের মধ্য থেকে চাপা আর্ত-কন্ঠ শোনা গেল ঃ তোর পায়ে পড়ছি, বাঁচা ভাই।

নৃপতির চাপা কন্ঠ ঃ টাকাটা প্রমিস কর।

ছবিবাবুর চাপা কন্ঠ ঃ মাইরি বলছি, মা কালীর দিব্যি—

সঙ্গে সঙ্গে খাটের কাছে ছুটে গিয়ে কম্বল সরিয়ে বলে উঠলেন নৃপতিঃ আরে এই তো সতীশবাবু—

এর পরে আরও অনেক কথা ছিল, কিন্তু একটি সংলাপও না বলে গট গট করে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন ছবি বিশ্বাস। আর নৃপতিও তাঁর পেছনে পেছনে ছুটলেন—আরে ও সতীশবাবু, ও সতীশ বাবু—করতে করতে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। দর্শকরাও বিপুল করতালিতে তাদের উপভোগ্যতা প্রকাশ করলেন।

মিনিট কয়েক পরে বেঞ্চে বসা নৃপতির সামনে একটি দশ টাকার নোট সবিনয়ে এগিয়ে দিয়ে ছবি বিশ্বাস বলেছিলেন ঃ উঃ হারামজাদা আমায় দম বন্ধ করে মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল হে!

নৃপতিবাবুর মতে এটাও একটা খেলা। এরকম খেলা আরও একবার খেলে-ছিলেন নৃপতি, আর সেটাই ছিল শেষ খেলা। উনি বুঝতে পারেননি হাসতে হাসতে যে খেলাটা শুরু করেছিলেন, এমন করে বুকফাটা চোখের জলে তার সমাপ্তি ঘটবে।

কিন্তু সে ঘটনা বলার আগে নৃপতির সঙ্গে আমার প্রথম ঘনিষ্ঠতার ইতিহাসটা একটু বলে নিতে চাই। সেটাও এক ভারি মজার ঘটনা। ও'র সঙ্গে মৌখিক পরিচয় অনেকদিন থেকেই ছিল। সেই যখন উনি ইন্দ্রাণী পার্কের বাড়িতে থাকতেন। তখন উনি আমার কাছে নিছক একটি কমেডিয়ান। ঘনিষ্ঠতা হল ষাটের দশকের গোড়ার দিকে এক শীতের সকালে তাজমহলের দেশে।

চিত্রপরিচালক অসীম ব্যানার্জি তখন 'হারানো প্রেম' ছবি করছিলেন। আউটডোর শুটিং ছিল আগ্রায়। প্রযোজক সুবোধ দাস আমায় অনুরোধ করলেন ও'দের আউট-ডোরে যেতে। তখনো আমি তাজমহল দেখিনি, তাই এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। ছবির শিল্পী তালিকাটি ছিল জমজমাট। ছবি বিশ্বাস, সুপ্রিয়া দেবী, নির্মলকুমার, বিশ্বজিৎ, নৃপতি প্রভৃতি। পরে অবশ্য ও'দের অনেককে বাদ দিয়ে ছবিটি আবার নতুন করে তোলা হয় এবং সেইটিই মুক্তি পায়। সেটা অন্য ঘটনা। আমি ওই প্রথম পর্বের শুটিং-এই গিয়েছিলাম।

আগ্রায় এম্প্রেস হোটেলে যে ঘরে আমার স্থান হল সে ঘরে আরও তিনজন ছিলেন। ক্যামেরাম্যান অজয় মিত্র, শব্দ-গ্রাহক অবনী চ্যাটার্জি এবং শিল্পী নৃপতি চ্যাটার্জি। আমাদের পাশের ঘরটিতে থাকতেন প্রযোজক সুবোধ দাস এবং পরি-চালক অসীম ব্যানার্জি। আমি যখন গিয়ে-ছিলাম তখন শুটিং পর্বের মাঝামাঝি। ছবি-বাবু দিন দুই আগে কলকাতা ফিরে গেছেন তাঁর কাজ শেষ করে। নির্মলবাবু, বিশ্বজিৎ এবং সুপ্রিয়া আছেন অল্প দূরে লরিস হোটেলে। নির্মলবাবু আমার পুরনো বন্ধু, কিন্তু বিশ্বজিৎ আমার চেয়ে অনেক ছোট এবং পরম স্নেহভাজন। সামনাসামনি হলে তখন সিগারেট লুকিয়ে ফেলত। আর সুপ্রিয়ার সঙ্গে তখনো আমার পরিচয়ই হয়নি। প্রযোজকপক্ষ যদিও আমার লরিস হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু ওই বিশ্বজিতের কথা ভেবেই আমি এম্প্রেস হোটেলে থাকা পছন্দ করেছিলাম। তাছাড়া আমার সঙ্গে তখন কলকাতা থেকে গিয়েছিল আমার আর এক স্নেহভাজন অজয়বিশ্বাস। ও তখনো পরিচালক হয়নি। অসিত সেনের সহকারিত্ব করে এবং উল্টো-রথে লেখে। আগ্রায় আমার দেখ-ভাল করার দায়িত্ব ছিল ওরই উপর। অনেক দিক চিন্তা করে আমি এম্প্রেস হোটেলেই থাকা পছন্দ করেছিলাম।

আমার ঘরের চারটি বিছানা মুখোমুখি ছিল। একদিকে আমি আর অজয়বাবু, উল্টোদিকে আমার মুখোমুখি নৃপতির বিছানা, তাঁর পাশে অবনীবাবু। আগ্রায় তখন প্রচন্ড শীত। তিনখানা করে কম্বল আমাদের গায়ে চাপানো থাকত, তাতেও শীত ভাঙত না। অজয়বাবু আবার ছিলেন দারুণ শীতকাতুরে। সারা রাত ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলত, তা সত্ত্বেও একটি হট-ওয়াটার ব্যাগ দরকার হত তাঁর। তিনি সেটিতে পা রেখে ঘুমোতেন। সকালে উঠে দেখা যেত পায়ের নীচে বড় বড় ফোস্কা। তাতেও দমতেন না, পরদিন শোবার আগে আবার হটওয়াটার ব্যাগের জন্যে চ্যাঁচা-মেচি ফেলে দিতেন।

ভোর চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে আমাদের বেড টি দিয়ে যেত। চা খাওয়ার পর আর ঘুম আসত না। আমরা বিছানায় আধ-শোওয়া অবস্থায় গল্পগুজব করতাম। বাইরে বেরোবার উপায় ছিল না। প্রচণ্ড ঠান্ডায় হাত-পা বেঁকে যেত। অতএব রোদ না ওঠা পর্যন্ত বিছানাতেই অধিষ্ঠান। ওরই মধ্যে দেখতাম ঘড়িতে ঠিক সাড়ে ছটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তড়াক করে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠতেন নৃপতি। কম্বল

গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে যেতেন বারান্দায়, সামনের উঠোনের দিকে তাকিয়ে এক-দুই করে গুনতে শুরু করতেন, ঠিক সতেরো পর্যন্ত গুনে নিজের মনেই বলে উঠতেন 'ঠিক আছে', তারপর আবার বিছানায় এসে আধ-শোওয়া হয়ে গল্পগুজবে যোগ দিতেন।

প্রথম দিন এই ঘটনায় আমার কোন কৌতূহল হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ঠিক সাড়ে ছটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে নৃপতি যখন বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন এবং আগের দিনের মত সতেরো পর্যন্ত গুনে 'ঠিক আছে' বলে ফিরে এলেন তখন আমার প্রচন্ড কৌতূহল পেয়ে বসেছে। অথচ কিছু জিজ্ঞেস করতেও সংকোচ বোধ হচ্ছে। সবে দু'দিনের ঘনিষ্ঠতা। তৃতীয় দিন আবার ওই কান্ড দেখে আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম : কি ব্যাপার বলুন তো! রোজই সাড়ে ছটা বাজলেই তড়াক করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠছেন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক থেকে সতেরো পর্যন্ত ধারাপাত পড়ছেন, তারপর 'ঠিক আছে' বলে আবার এসে শুয়ে পড়ছেন—কিছু রহস্য-টহস্যের সন্ধান পেয়েছেন নাকি?

নৃপতি লজ্জিত মুখে বলে উঠলেন : আরে না না, সেসব কিছু নয়। ও একটা সামান্য ব্যাপার।

বুঝলাম ভদ্রলোক কিছু প্রকাশ করতে রাজী নন। এই কথার পর আর কিছু জিজ্ঞেস করাও যায় না। অতএব চুপ করেই রইলাম। কিন্তু মনের কৌতূহলটা ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না।

সেদিন রাত্রে অসীমবাবু আমাদের ঘরে এসে জানালেন পরদিন সকালে শুটিং হবে ফতেপুর সিক্রিতে। আগ্রা থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। সকাল ছটায় গাড়ি ছাড়বে। আমরা যেন সাড়ে পাঁচটার মধ্যে রেডি হয়ে নিই।

শুনে নৃপতির মুখ যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দিশেহারার মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। তারপর আমতা আমতা করে অসীমবাবুকে বললেন : আচ্ছা অসীম, আমার একটু দেরি করে গেলে হয় না। এই সাতটা নাগাদ?

—না, না. তা হয় না। প্রথম শটেই তোমাকে দরকার। তাছাড়া যাবে কিভাবে? ওখানে বাস-টাস যায় কিনা জানি না। অনেক দূর এখান থেকে। আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার অসুবিধেটা কি?

—না. তেমন কিছু নয়—এই একটু দরকার ছিল আর কি!

—দরকারটা অন্যদিন সেরে নিও। কালকের প্রোগ্রাম সেট করা হয়ে গেছে। এখন আর বদলানো যাবে না।

আমার সেদিন বিকেল থেকে একটু জ্বর জ্বর মত হয়েছিল। বাংলাদেশের উষ্ণ শরীর উত্তরপ্রদেশের প্রচন্ড ঠান্ডায় একটু কাহিল হয়ে পড়েছে আর কি। ভাবলাম এই সুযোগ এক থেকে সতেরোর রহস্যভেদের এটাই একমাত্র সুযোগ। আমি অসীমবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম : ফতেপুর সিক্রিতে আপনার শিডিউল ক' দিনের?

অসীমবাবু উত্তর দিলেন : তিন দিনের। কেন বলুন তো?

আমি বললাম : আজ বিকেল থেকে শরীরটা ভালো নেই। জ্বর জ্বর মত। আমি কালকে না হয় নাই গেলাম। একটা দিন রেস্ট করি। পরশু যাব।

অসীমবাবু আমার কপালে হাত দিয়ে শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করে বললেন : হ্যাঁ, একটু টেম্পারেচার আছে দেখছি। ঠিক আছে, কালকের দিনটা রেস্ট নিন। ইম্পর্টান্ট সিনগুলো পরশুই নেব তাহলে। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে একটু সাবধানে থাকবেন রবিদা, ঠান্ডা লাগাবেন না যেন।

সেদিন রাতে আমি আর কিছু খেলাম না। একটু গরম দুধ খেলাম বাকি সবাই ডাইনিং রুমে খেতে চলে গেলেন। সবার আগে ফিরে এলেন নৃপতি। তিনি আমাকে বারান্দার একটা নিরিবিলি জায়গায় ডেকে নিয়ে গেলেন। একটা লম্বা মতন অ্যামেরিকান সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন : আপনি তো কাল আমাদের সঙ্গে লোকেশানে যাচ্ছেন না?

—না, কাল আর যাব না, পরশু যাব।

—কাল তো তাহলে হোটেলেই থাকছেন?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—আমার একটা কাজ করে দেবেন?

—কি কাজ?

—কাউকে বলবেন না যেন!

—কি কাজ বলুন না।

—এমন কিছু নয়। সকাল সাড়ে ছটার সময় এই সামনের উঠোনটায় হোটেলের কুকুরগুলোকে এরা খেতে দেয়। কটা কুকুর আছে, দয়া করে একটু গুনে রাখবেন?

—এ আর এমন কি শক্ত কাজ। কিন্তু কুকুর গুনে আপনার কি হবে?

—সে আছে একটা ব্যাপার। আপনাকে পরে সব বলব। আপনি শুধু দয়া করে গুণে রাখবেন কটা কুকুর কাল খেতে এসেছে। ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গোপনীয়।

বা বাবা! এ কদিন শুধু কৌতূহল ছিল, এখন আবার নিজেই তার মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম!

পরদিন সকালে বেড-টির পরই ওঁরা সবাই রেডি হয়ে নিলেন। ঠিক ছটায় গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়িতে ওঠার আগে আবার একটা অ্যামেরিকান সিগারেট এগিয়ে দিয়ে নৃপতি বললেন : দয়া করে আমার কাজটা একটু করে রাখবেন স্যার। আর আধ ঘন্টা বাকি, এখন যেন আবার ঘুমিয়ে-টুমিয়ে পড়বেন না।

বললাম : না না, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে যান।

ঠিক সাড়ে ছটার সময় একপাল কুকুর এসে জড়ো হল হোটেলের উঠোনে বিরাট বিরাট মানি-প্ল্যান্টগুলোর নীচে। এত বড় পাতাওয়ালা মানি-প্ল্যান্ট আমি আর কোথাও দেখিনি। হোটেলের দুটি চাকর প্রত্যেকটা কুকুরের সামনে একটা করে থালা এগিয়ে দিতে লাগল। তাতে কুকুরের উপযোগী রান্না করা খাবার। কুকুরের দল কোনরকম চিৎকার গন্ডগোল না করে যে যার নির্দিষ্ট পাত্র থেকে পরম সুখে তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল খাবারগুলি। আর আমিও গুণে চললাম এক দুই তিন করে। না, ষোলও নয়, আঠেরোও নয়, ঠিক সতেরোটি কুকুর। নিশ্চিত হবার জন্যে পর পর তিনবার গুণলাম। হ্যাঁ, সতেরোটিই। ও-এই তাহলে এক থেকে সতেরোর রহস্য! কিন্তু কেন? কুকুর গুণে নৃপতির কি লাভ? কৌতূহল গাঢ়তর হল।

বিকেলে হোটেলের সামনে শুটিং-ফেরত যাত্রীদের নিয়ে গাড়িটা এসে দাঁড়াতেই সবার আগে লাফিয়ে নামলেন নৃপতি চ্যাটার্জী। সটান দৌড়ে এলেন আমার কাছে। প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে জিজ্ঞেস বললেন : গুণেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কটা?

—সতেরো।

—ঠিক আছে।

পরম নিশ্চিন্তে পিছু ফিরলেন নৃপতি। এবার তাঁর পথ আটকালাম আমি।

—কি ব্যাপার বলুন তো মশাই!

—না না, তেমন কিছু নয়। ও একটা তুচ্ছ ব্যাপার।

—যত তুচ্ছই হোক, আমায় বলতেই হবে।

—না না, সে শুনলে আপনি হাসবেন।

—না, হাসব না. বলুন কি ব্যাপার! আপনাকে বলতেই হবে।

খুব কাচুমাচু করে নৃপতি বললেন, তিনি যখন প্রথম দিন এখানে আসেন তখন দেখেন হোটেলে দুবেলাই মাংস দিচ্ছে খাবারের সঙ্গে। ডাল সব্জির রকমফের হচ্ছে, কিন্তু মাংস বাঁধা। তাই পরদিন সকালে খাবার দেবার সময় উঠোনের কুকুরগুলো গুণে নিয়েছিলেন। পুরো সতেরোটা। সেই থেকে রোজই গুণে দেখেন। যদি কোনদিন ওই সংখ্যা ষোলয় এসে দাঁড়ায় সেদিন থেকে নৃপতি আর এই হোটেলের মাংস ছোঁবেন না। নিশ্চিত জেনে যাবেন সেদিন তাঁর পাতে যা দেওয়া হয়েছে তা ওই পালিত সারমেয়দেরই একজনের। তাই এই সতর্কতা। তাই এত গোণাগুণি।

এই হলেন নৃপতি চ্যাটার্জী। এই হল তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস।

ব্যক্তিগত জীবনে নৃপতি প্রচুর কথা বলতেন। অনর্গল কথা বলে যান। তাঁর সেইসব কথা শ্রোতাকে হাসায়, কাঁদায়, ভাবায়। কিন্তু ছবিতে তিনি কথা বলতেন কম। কত কম বলে কত বেশি বলা যায় সেটা তাঁর অভিনয়েই লক্ষ্য করা যায়। নৃপতির ভাবায় : তিনি তো কাটা সৈনিক, তাঁর কথা বলার সুযোগ কোথায়?

সত্যজিৎ রায়ের গুপী-গাইন ছবির সেই দৃশ্যটি ভাবুন তো। তিনি [illegible]

গায়ের প্রহরা, গুপী আর বাঘাকে পাহারা দিচ্ছেন। ওদের সামনে যখন প্রচুর খাদ্য তখন গরাদের ওপারে প্রহরীর দুটি ক্ষুধার্ত চোখ, ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে নেওয়া এবং করুণ মুখচ্ছবি যা অভিব্যক্ত করে তা কি কথায় ফুটিয়ে তোলা যায়?

কিংবা ধরুন বলাই সেনের সুরের পরশে ছবির কথা। নাচ-গানের আসর। এক কোণে নৃপতি বসে। গায়ে গিলেহাতা আদ্দির পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতিটি হাতে ফুল করে ধরা। অন্ধ অজয় গাঙ্গুলির মুখে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেলা কন্ঠের গান। সহযোগে সুমিতা সান্যালের চটুল চরণের নৃত্য। গানের একটি অংশে নৃপতির মুখে তারিফের এক বিশেষ ভঙ্গি। সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের সবকটি দর্শকের দৃষ্টি তাঁরই দিকে স্থানান্তরিত। এদিক থেকে আমাদের নৃপতি বিশ্ববন্দিত চার্লি চ্যাপলিনের সমগোত্রীয়। দেশজ শিল্পীর এই প্রশস্তি হয়তো কাউকে কাউকে বিদ্রূপস্পৃষ্ট করবে—কিন্তু কথাটা কি সত্যি নয়?

এমনি আরও অনেক ছবির কথা বলা যায়। যেমন দেবকী বসুর 'কবি' ছবিতে কবে ঘি খেয়েছিলাম কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ আঙুলগুলি তুলে নাকের উপর বুলিয়ে নিয়ে যাওয়া আজও আমার চোখের সামনে ভাসে। অথবা সুশীল মজুমদারের প্রথম জীবনের রিক্তা ছবিতে কাশীর গুন্ডার চরিত্রে কোন কথা নয়, শুধু একখানি ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটার ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে ওই চরিত্রের ভয়ঙ্কর দিকটি ফুটিয়ে তোলা একজন উঁচুদরের শিল্পীর কাজ। সত্যজিতের পোস্টমাস্টার ছবির সেই নির্বাক পাগলাটির কথাই কি মুছে ফেলা যায় স্মৃতি থেকে?

কিন্তু ওসব কথা থাক। অভিনেতা নৃপতির কথা বলতে বসিনি। মানুষ নৃপতিই আমার আলোচনার বস্তু। সেই মানুষটিই আমার স্মৃতিকে বার বার আলোড়িত করে, উদ্বেল করে, ভারাক্রান্ত করে।

এবার মঞ্চের উপর তাঁর শেষ খেলাটার কথা বলি—যে খেলাটা শুরু করেছিলেন হাসতে হাসতে, কিন্তু যার সমাপ্তি ঘটেছিল একটি মানুষের বুকভাঙা কান্নার মধ্যে দিয়ে।

অনেকদিন আগেকার কথা। তখনও পথের পাঁচালী ছবি করার স্বপ্নও দেখেননি সত্যজিৎ রায়। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মঞ্চে শিশির ভাদুড়ির কাছে কাজ করেন। অনেকগুলি ছবিও তিনি করেছেন। কিন্তু মন ভরছে না। তাঁর কাছে সবাই কমেডির ঢঙে অভিনয়ই চাইছেন। একটা সিরিয়াস চরিত্র তখন কানুবাবুর দিবারাত্রির স্বপ্ন। এমন সময় কানুবাবুর এক বন্ধু প্রস্তাব দিলেন একটি কম্বিনেশন নাইটের। বই হবে সাজাহান। কানুবাবুর একটিমাত্র শর্ত তিনি ঔরংজীবের চরিত্রে অভিনয় করবেন। এটা তাঁর অনেকদিনের আকাঙ্খা। বন্ধু রাজী হলেন। পোস্টার ছাপানো হয়ে গেল। সাজাহান—অহীন্দ্র চৌধুরী, জাহানারা—সরযূবালা, ঔরংজীব—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলদার—নির্মলেন্দু লাহিড়ী পিয়ারা—শান্তি গুপ্তা ইত্যাদি ইত্যাদি। নৃপতি চ্যাটার্জী পেয়েছেন একটি ছোট্ট অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা—জিহন আলী।

যথাদিনে যথাসময়ে মঞ্চে উপস্থিত হলেন নৃপতি। দেখলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ঔরংজীবের মেক-আপ নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদিক ওদিক। একে ধমকাচ্ছেন, ওকে তেড়ে মারতে যাচ্ছেন, কম্বিনেশন নাইটের সব দায়িত্ব মাথায় থাকলে যা হয় আর কি! নৃপতি সেদিন বিকেল থেকেই একটু রসসিক্ত ছিলেন। হঠাৎ মনে হল, কানু, আমাদের কানু, সে এত ফাঁটে ঘুরে বেড়াবে কেন? ঔরংজীবের পোশাক গায়ে পরেছে বলে? ও কি ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে গেছে নাকি? কেন, সাজাহান কি মরে গেছে? আচ্ছা ধরে নিলাম তিনি বৃদ্ধ, স্থবির, আগ্রা দুর্গে বন্দী। তা জিহন আলী তো এখনো বেঁচে আছে—না কি?

সঙ্গে সঙ্গে মাথার ঘুরঘুরে পোকাটি নড়ে উঠল নৃপতির। লম্বা লম্বা পা ফেলে কানুবাবুর সামনে গিয়ে হাজির।

—একটা কথা ছিল কানু।
—বল।
—দশটা টাকা চাই।
—কেন? তুমি তোমার পুরো টাকা পাওনি?
—পেয়েছি।
—তাহলে?
—আরও দশটা টাকা চাই।
—কেন।
—মাল খাব।

মুখের সামনে থেকে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে কানু বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন : তোমার ওসব বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই। আমি মরছি নিজের জ্বালায় আর উনি এলেন—

বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃপতি পেছন থেকে একটু গলা তুলে বললেন : টাকা দশটা দিলে ভালো করতিস কানু।

সে কথা যেন কানুবাবুর কানেই গেল না। তিনি ব্যস্ত হয়ে অন্যদিকে এগিয়ে গেলেন।

নৃপতি তখন গ্রীণরুমের দেওয়ালে মাল্যভূষিত রামকৃষ্ণের ফটোর উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বললেন : অপরাধ নিও না ঠাকুর, আমার কোন দোষ নেই। মাত্র দশটি টাকার জন্যে আমার মুখের সামনে মাছি তাড়িয়ে গেল—সেটা আপনি নিজের চোখে দেখলেন তো!

নাটক সেদিন দারুণ জমে গেল। কানুবাবু সেদিন ফাটিয়ে অভিনয় করেছেন। অবশেষে এলো সেই দৃশ্যটি। ঔরংজীবের মানসিক বিকারের মুহূর্ত। সারা প্রেক্ষাগৃহ থমথমে। দর্শকরা নিশ্বাসরুদ্ধ করে কানুবাবুর অভিনয় দেখছেন। শাড়ির আঁচল সরলেও আওয়াজ পাওয়া যাবে এমনই এমনই অবস্থা। সারা মুখে উজ্জ্বল স্পট নিয়ে বিকারগ্রস্ত ঔরংজীব তখন চিৎকার করছে : ওই-ওই দারার ছিন্নমুণ্ড—মোরাদের কবন্ধ—আঃ—আঃ—চাইনা—চাইনা আমি এই সিংহাসন—এই রাজমুকুট—আঃ—আঃ—কে নেবে —আরে দেব—কাকে দেব—

এই মুহূর্তে পাশে দাঁড়ানো জিহন আলীর কোন সংলাপ ছিল না, কিন্তু নৃপতি হঠাৎ দীর্ঘ বাহু দুটি প্রসারিত করে পিছিয়ে নাকিসুরে চেঁচিয়ে উঠলেন : আমায় দিন—আমায় দিন—আমায় দিন জাঁহাপনা—

সঙ্গে সঙ্গে সব গাম্ভীর্য ভেঙে সারা প্রেক্ষাগৃহে সে কি হাসির ফোয়ারা। কানুবাবু বিস্মিত, বিচলিত, হতভম্ব। তাঁর তখন মাথা ঘুরছে—সারা শরীর কাঁপছে—কানের মধ্যে কেবল বাজছে সারা প্রেক্ষাগৃহে তুমুল, তীব্র, মর্মান্তিক অট্টহাসির কম্পন। বেগতিক দেখে ড্রপ ফেলে দিলে শিফটার। যে দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটার কথা দু-ফোঁটা চোখের জল আর কয়েকশো দীর্ঘশ্বাসে—সেখানে সারা প্রেক্ষাগৃহে তখন হাসির তাণ্ডব।

গ্রীণরুমে যাবার পথে নৃপতির কানেএলো একটা বুক মোচড়ানো চাপা কান্নার আওয়াজ। চোখ তুলে দেখতে পেলেন সামনের সোফাটার উপর লুণ্ঠিত একটি দেহ আকুল কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে আর একটা তীব্র গোঙানি যেন নৃপতির কানের মধ্যে গরম সিসের স্রোতের মত বয়েই চলেছে—বয়েই চলেছে—বয়েই চলেছে!

হা ঈশ্বর! এ আমি কি করলাম! এ তো আমি চাইনি! আমি তো এ পৃথিবীতে সবাইকে হাসাতেই চেয়েছি। আমি তো এমন করে চোখের জলে কারও বুক ভাসাতে চাইনি। এ তবে আমি কি করলাম—কি করলাম!—বলতে বলতে গ্রীণরুমের দেওয়ালে নিজের মাথাটা ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত করে ফেলেছিলেন নৃপতি। আর সেই রক্ত ছুঁয়েই শপথ করেছিলেন এ খেলা আর নয়। কখনো নয়। জীবন থাকতে নয়।

সেদিনের ঘটনা বলতে বলতে দীর্ঘকাল পরেও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। রিজেন্ট পার্কের খেলাঘর-এর দেয়ালে দেয়ালে ধ্বনিত হয়ে ফিরেছিল সেই কান্না। একটি মানুষের কান্না। সত্যিকারের মানুষ।

সেই মানুষটি বছর দুই আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এঁদের নিয়ে ইতিহাস লেখা হবে না। এঁদের নামে কোন স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হবে না। এঁদের নামাঙ্কিত কোন সরণিও এই শহরে কোনদিন বিরাজ করবে না। এঁরা বেঁচে থাকবেন আমাদের মত কয়েকজন ব্যথিত মানুষের স্মৃতিতে। আজীবন। আমরণ।

চিত্রধ্বনি

জরিমানার বদলে উপহার

আমার তরুণ কবিবন্ধুদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে—রাখী গুলজার দামী জড়োয়া অলংকারের থেকে কবিতার বই পছন্দ করেন বেশী।

ঘটনাটা ঘটেছে ঋষিকেশ মুখার্জির 'জুর্মানা' ছবিতে। রাখী এখানে রমা শর্মা। এই ঘটনাটার আগে এবং পরে বহু ঘটনা থাকবে এটা বলা বাহুল্য।

প্রথম দৃশ্যে পর্দা জুড়ে ঝাড় লন্ঠন। ডিপ ক্লোজ আপ। একটা পার্টির দৃশ্য। সঙ্গে মিউজিক্যাল গেম। পপ ড্যান্স চলছে —এ হেন মুহূর্তে অমিতাভ বচ্চনের প্রবেশ এবং দর্শকবৃন্দের (সিনেমা হলের) হাততালি সিটি ইত্যাদি। অমিতাভ বড়লোক মামার হেফাজতে মানুষ। ধনীর দুলাল হলেও অমিতাভ যে মস্তানদের মস্তান এক সীনে (মাত্র এই একবারই উনি রণে অবতীর্ণ হয়েছিলেন) দেখিয়ে দিয়েছেন। বেস্ট ড্যান্সারের প্রেমিককে তার দলবল সমেত ঠেঙিয়েছেন।

এই গোলমালের সংবাদ মামার কাছে পৌঁছিয়েছে। মামা যেখানে তাঁর কনস্ট্রাকসনের কাজ হচ্ছে সেখানে যেতে বলেছেন। মূল কাহিনী সেখানেই। কাজেই অমিতাভ সেখানে যেছেন।

ওখানে রাখী থাকেন। তাঁর বাবা শ্রীরাম লাগু। শিক্ষক, চোখে হাই পাওয়ার চশমা। পরে অবশ্য অন্ধ হয়ে যান। অমিতাভর মাস্টারমশায় ছিলেন উনি। আর থাকেন বিনোদ মেহেরা। সঠিক কি করেন জানা যায় না। যায় যায় সাইকেল চাপেন, মাস্টারজী শ্রীরাম লাগুর সঙ্গে আলোচনা করেন আর মনে মনে রাখীকে ভালোবাসেন। রাখীর একা থাকার অসুবিধা হওয়ায় ঋষিকেশবাবু হাজির করেছেন ফরিদা জালালকে। ফরিদা রাখীর বান্ধবী বা প্রিয়সখী। ফরিদার বাবা ডাক্তার।

অমিতাভর সঙ্গে দেখা হয়েছে বিনোদের। পরে অমিতাভ আবিষ্কার করেছেন রাখী এবং ফরিদাকে। বিনোদ অমিতাভর বাড়িতে এসে দেখেছেন তার শয্যাসঙ্গিনীকে। বন্ধুর চারিত্রিক শুচিতায় বিনোদ কষ্ট পেয়েছেন।

অমিতাভ বিনোদের কাছে রাখী-ফরিদার সংবাদ জেনে বাজি ধরেছেন—রাখীকে তার শোবার ঘরে নিয়ে আসবেন। বাজি এক টাকা মাত্র।

অমিতাভ তার মাস্টারজীকে চার হাজার টাকা মূল্যের শাল উপহার দিয়েছেন। রাখীকে দিতে চেয়েছিলেন দামী জড়োয়া অলংকার। রাখীর জন্মদিনে। রাখী তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। শুধু ফিরিয়েই দেন নি —অমিতাভর সামনে বিনোদ মেহেরার দেওয়া কবিতার বই গ্রহণ করেছেন সানন্দে।

অমিতাভ লাইন বদলেছেন। রমা শর্মা বা রাখীর লেখা কবিতায় পান্ডুলিপি নিজের টাকায় ছাপিয়ে এনেছেন। চার দিনের মধ্যে। এবং জেনে আশ্চর্য হবেন—ট্রেডেল মেশিনে তা ছাপাও হয়ে গেছে। কভার, বাঁধানো ইত্যাদি সহ চার দিনে!

রাখী তার নিজের বই খুশী। কিছুটা অনুরক্ত হয়ত বা। তারপর এলাহাবাদে এক পন্ডিতজীর বাড়িতে যাবার নামে অমিতাভ তাকে মাঝপথে গিয়ে বলেছেন এলাহাবাদের ওই পন্ডিতজীর কথাটা তার বানানো। রাখী ক্ষুব্ধ হয়েছেন। পরে আবার গানও শুনিয়েছেন। বিনোদ মেহেরা দূরে থেকে এই দৃশ্য দেখেছেন।

এবং অবশেষে রাখী তার বাবাকে মিথ্যা কথা বলে অমিতাভর শোবার ঘরে এসেছেন —চায়ের নিমন্ত্রণে অবশ্য।

ঘটনাচক্রে সেই সময় অমিতাভর শয্যাসঙ্গিনী, বিনোদ এবং শ্রীরাম লাগু সেখানে উপস্থিত। পরিণাম রাখীর গৃহত্যাগ। তার বাবার অন্ধতা প্রাপ্তি।

ট্রেনে রাখীর ব্যাগ চুরি। একটা ছোট স্টেশনের স্টেশন মাস্টার আসরানি তাকে আশ্রয় দিয়েছে। ওই ট্রেনটা অ্যাকসিডেন্ট করায় যে ব্যাগ চুরি করেছিল সে মারা গেছে। ব্যাগে রমা শর্মার নাম থাকায় মৃতের তালিকায় তার নাম।

এদিকে রাখী আসরানি ভাই-বোন রূপে থাকাকালীন অমিতাভ সেখানে এসেছে —রাখীর খোঁজে।

কালক্রমে রাখী আসরানির মামার শিক্ষায় সঙ্গীত জগতের দিকপাল হয়ে উঠেছে—রেডিও, রেকর্ড ইত্যাদিতে তার নাম অবশ্য সুধা শর্মা।

শ্রীরাম লাগুকে জল পরিবর্তনের জন্য বিনোদ অমিতাভর বোম্বাই উপকণ্ঠের এক বাড়িতে এনে রেখেছেন। বাড়িটা যে অমিতাভর এটা শ্রীরাম লাগুকে জানানো হয়নি।

অমিতাভ রেডিওতে সুধার গান শুনে তা রবাড়িতে হাজির হয়েছেন। পাত্তা পান নি। পরে বিনোদ গিয়ে রাখী যখন সুধা তাকে নিয়ে এসেছেন তার বাবাকে দেখাতে।

রাখী তার বাবাকে গান শুনিয়েছেন। বাবা বুঝতে পারছেন তার মেয়ের কণ্ঠ। তবু তার চিনতে বাধা আছে।

সবশেষে অমিতাভই প্রকাশ করেছেন—রমা শর্মা এবং সুধা শর্মা একজনই। এবং অমিতাভ রাখী মিলন। পর্দা জুড়ে বিনোদ মেহেরার ক্লোজ আপের উপর 'দি এন্ড'।

জরিমানা কার বিনোদের না অমিতাভর? তবে যে সব দর্শক অমিতাভর কাছে মারদাঙ্গা আশা করেছিলেন তাদের নিঃসন্দেহে জরিমানা হয়েছে।

জুর্মানা সম্বন্ধে ছবি। বিমল দত্তর সংলাপ এবং চিত্রনাট্যর জন্য কখনোই খুব বেশী মনে আসেনি।

সঙ্গীত রাহুল দেব বর্মনের কৃতিত্ব নতুন করে বলার বাহুল্য। এবং গায়িকা যেহেতু লতা মুঙ্গেশকার সেহেতু বেশ ভাল গান শোনা গেছে। বিশেষতঃ 'তুম চলে আও' দীর্ঘ দিন মনে রাখার মতো।

ঋষিকেশ মুখার্জিকে ধন্যবাদ। জুর্মানা দেখে আমার জরিমানার বদলে কিঞ্চিৎ (উপহার) লাভই হয়েছে অন্যান্য হিন্দী ছবির থেকে আলাদা মেজাজের জন্য।

প্রভাত চৌধুরী

স্টুডিও খবর

মাথায় আধখানা চাঁদের মাপে টাক, জুলফি থেকে সরাসরি নেমে এসেছে দাড়ি। বেশ ঘন আর কালো। মাঝখানে ফরসা মুখ, উজ্জ্বল চোখের তারা। কথা বলার সময় হাত এসে ঠেকে গালে, কনুইয়ে ভর দিতে হয়। গলায় প্রত্যয়ের আভাস। বয়স আর কত হবে? বড়জোর পঁয়ত্রিশটা বসন্ত পার করেছেন।

নাম দুলাল রায়। থাকেন আসামের শান্তিপুরে। বিদ্যের জাহাজ না হয়ে পুণাতে গিয়েছিলেন ফিল্ম এডিটিং শিখতে। পাশ করেছেন সত্তরে।

তারপর থেকেই ফিল্ম লাইনের গোলকধাঁধায় ঘুরছেন। বম্বের নির্ভেজাল ব্যবসায়ী হাওয়া তার ভেজাল বুকে সহ্য হয়নি বেশি দিন। সৃষ্টি নামে এক গুবরে পোকা ঢুকেছিল মাথায়। সে জনাই সম্পাদকের কাঁচি ছেড়ে তিনি অসিম সেন (সফর) রাজিন্দর সিং বেদী (দস্তক), হৃষিকেশ মুখার্জির (আনন্দ ও বুঢ়া মিল গয়া) সঙ্গে কাজ করেছেন কয়েক বছর।

কিন্তু সৃষ্টি পোকাটি তো নিজের মাটি পায়ের তলায় না পেলে চলবে কি করে! তাই দুলাল রায় ছুটে গেলেন আসামে, নিজের জন্মের মাটিতে। গুবরে পোকা নড়ন স্পন্দন নামে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করলেন গোহাটিকে নিয়ে।

আর পেটের আগুনে জল ঢালবার জন্য নাম লেখালেন রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগে। নাট্য সম্পাদক তিনি। অসমিয়া সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের গোড়া ধরে দুলালবাবু নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। বিদেশী নাটককে আসামের মাটিতে রোপণ করলেন তিনি। গাঁও বুড়া সরকারী ইন্সপেক্টর-বুক্কর খোঁজ-আধে-অধুরে--আহার— এসব নাটকে তার গুবরে পোকার ছটফটানি বোঝা যায়।

আর এখন দুলাল রায় ব্যস্ত ছবি করতে। ডকুমেন্টারি বা ছোট ছবি নয়, একবারে ফিচার ফিল্ম। ছবির নাম আশ্রয়। একটা বাংলা গল্প নিয়ে চিত্রনাট্য লিখেছেন নিজেই। কিছুদিন আগে 'আশ্রয়'-এর কিছু টেকনিক্যাল কাজের জন্য তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। তখন জানতে চেয়েছিলাম ছবির বিষয় কি? বলেছিলেন এক কথায় কি বলি বলুন তো! নিজেদের অতীতটাকে একটু খুঁড়ে দেখার চেষ্টা করেছি। ছবিটার

মেকিংয়েরও নতুন ডায়মেনশন দেবার ইচ্ছে আছে।

ছবিটা না দেখিয়ে উনি কোন বক্তব্য বলতে চান না। জানালেন পরের বার কলকাতা এলে 'আশ্রয়' দেখাবেন এখানকার সাংবাদিকদের। অসমিয়া ছবির জগতে নতুন কোন নজির সৃষ্টি করবে কি ছবিটি প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দিলেন—সে কথা আমি নিজে কি করে বলি বলুন? সাধারণ অসমিয়া ছবি সম্পর্কে দুলাল রায়ের মন্তব্য—'কোয়ালিটি অনেক ভালো হয়েছে এখন।'

কলকাতার পরিচালকদের মধ্যে মৃণাল সেনের ছবির থীম আর সত্যজিৎ রায়ের ছবির ডিটেলসের কাজ তাঁর ভালো লাগে। নিয়মিত ওঁদের ছবি তিনি দেখেন। এখানে এলে বাংলা নাটক দেখতেও ভুল হয় না।

এখন তিনি 'আশ্রয়'কে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত।

*

না, ছুটি নয়। দিলীপ রায় শেষ পর্যন্ত 'দর্পচূর্ণ' শুরু করলেন। শরৎচন্দ্রের কাহিনী। প্রযোজকের অনুরোধ—কোনো আকর্ষণেই তিনি এড়াতে পারলেন না। 'ছুটি' আপাততঃ বন্ধ রইল।

গত মাসের দিন 'দর্পচূর্ণ' ছবির শুভ-মহরৎ হল টেকনিশিয়ানস স্টুডিওয়। ফিল্ম লাইনের এক ভিড় লোক উপস্থিত সেদিন। স্কোরিং ঘরে দাঁড়াবার জায়গাটুকুও নেই। মিউজিক ডিরেকটর কালীপদ সেন ব্যস্ত বিভিন্ন হ্যান্ডসের বাজনা নিয়ে।

কাঁচঘরে ঢুকে মান্না দে মনে মনে নজরুলের গানের কলিগুলো আউড়ে যাচ্ছেন। দিলীপ রায় রেকর্ডিং ঘরে সতোন বাবুর পাশে। সকাল দশটা নাগাদ আরম্ভ হল গান। নজরুলের দুটো গান রেকর্ডের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল 'দর্পচূর্ণ' ছবির কাজ। এখন বাকি শুটিং শুরু হওয়া। দিলীপবাবু জানালেন, এখুনি নয়, মাস খানেক বাদে শুটিং শুরু হবে। প্রধান চারটি চরিত্রে অভিনয় করবেন সৌমিত্র সন্ধ্যা দীপঙ্কর সুমিত্রা। দিলীপ রায়? না, অভিনেতা দিলীপ রায় এবারেও পরিচালকই থাকছেন। ক্যামেরার সামনে যাচ্ছেন না।

বিশ্বরূপার দেনাপাওনা

পটভূমি

কলকাতার ব্যবসায়িক থিয়েটারের চূড়ামণি বিশ্বরূপার এবারের প্রযোজনা দেনা-পাওনা। এর একটি নাট্যসামাজিক তাৎপর্য আছে। দুর্মর স্মৃতি বিজড়িত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনা আখ্যায়িকার সূত্র নীরজ বিস্তারে বিন্যস্ত। বর্তমান সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির সমস্যাচিত্র এই বিশাল কাহিনীতে নেই। আজকে এর গল্পকে প্রায় রূপকথা বলে মনে হয়। আমাদের প্রাচীন সমাজের একটি দলিলচিত্র হিসেবে একে গ্রহণ করলেও সার্থক নাটক হিসেবে ভাবা কষ্টকর। বর্তমান বিচারে এই কাহিনী ঘটনাবহুল হলেও এতে নাটকীয়তা কম। যেটুকু আছে তা চড়া সুরের মেলোড্রামা এবং সেন্টিমেন্ট। তবু বিগত যুগে এই নাটকের শিবরাম চক্রবর্তী কৃত 'ষোড়শী' নাট্যরূপ অসাধারণ মঞ্চসাফল্য এনেছিল। সেই সময় এখন চলে গেছে এবং কাহিনীটির সমস্যাও কালোত্তীর্ণ আধুনিক কিছু নয়। তবু দেশের এক গরিষ্ঠ জনসংখ্যাকে মেলোড্রামা আজও টানে এবং সম্ভবত তাদের সেই শুভেচ্ছার উপর ভরসা রেখেই ১৯৭৯তেও এই নাটক প্রযোজনার কথা ভেবেছেন শ্রীযুক্ত 'রাসবিহারী সরকার'। তবে এর বিশেষ নাট্য সামাজিক তাৎপর্য কোথায়? তাৎপর্য এই যে কলকাতায় তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ক্যাবারে অধ্যুষিত নাট্যরীতির প্রবর্তককে দেনা-পাওনার সহজ আবেদনে ফিরে আসতে হয়েছে। এর কৃতিত্ব পশ্চিমবঙ্গের দর্শকের রুচির, যে রুচির লালনে গ্রুপ থিয়েটারের আন্দোলনের ভূমিকা পরোক্ষ প্রচণ্ডতায় দীপ্যমান। আশা করা যায় বিশ্বরূপার ক্যাবারে সাফল্যের (?) অনুপ্রেরণায় উদ্দিপীত অন্যান্য ছোট প্রতিষ্ঠানগুলিও এই সত্য শীঘ্রবাৎ উপলব্ধি করতে পারবেন। অবশ্য প্রথম দৃশ্যেই চাষী মেয়েকে অসংবৃত অবস্থায় ঢোকানো হয়েছিল, তবে তা নিতান্তই নিরামিষ প্রদর্শনী। পক্ষান্তরে গাজন নৃত্যের পরিসরেও দৃষ্টিকটু কিছু করা হয়নি, যা প্রশংসনীয় নিশ্চয়ই।

দেনাপাওনা নাটকে শমিতা বিশ্বাস

অভিনয়

এই নাটক দর্শককে দেখাতে বাধ্য করতে হলে জোরালো অভিনয় একান্ত প্রয়োজন। 'জীবনানন্দ'র মন্থর ভূমিকায় 'বসন্ত চৌধুরী' অসম্ভব আয়াসে সে দায়িত্বের সিংহভাগ বহন করেছিলেন। তাঁর চলাফেরা ঈষৎ অপ্রতিভ ছিলো, কিন্তু কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গির আভিজাত্যও ল্যাম্পটা, সংযত অভিব্যক্তির নৈপুণ্যে দর্শককে অনেকটা পিছনে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাঁর বিপরীত প্রান্তে 'ষোড়শী' রূপে 'শমিতা বিশ্বাসও' স্বচ্ছন্দ ছিলেন। তবে সারাক্ষণ তাঁর হস্তধৃত ত্রিশূলটি মধ্যে মধ্যে অনাবশ্যক বাহুল্যে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল তাঁকে। তিনি একবার সংলাপে বেধে গিয়েছিলেন, শেষের দিকে তাঁকে পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল, তাঁর কণ্ঠস্বর সবসময় সুখশ্রাব্য নয় তবু তিনি চরিত্রটি এবং দর্শককে স্পর্শ করেন গভীর পরিণত অভিনয়ভঙ্গির জন্য। 'জীবনানন্দ'কে প্রথমবার তুমি বলে ফেলার দৃশ্যে' তিনি যে কোন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সমতুল্য।

অন্যান্যদের মধ্যে 'প্রেমাংশু বসু'র 'এককড়ি' বহু চেনা টাইপ। 'ফকির সাহেবে' রবীন মজুমদারেরও কিছু করবার ছিলো না। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রথমে 'শিরোমণি' চরিত্রে কিছুটা প্রাচীন আবহাওয়া আনতে পেরেছিলেন, কিন্তু ক্রমেই তিনি প্রাচীনতর হয়ে চাণক্যের অভিনয়ে ফিরে যান। গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়-এর 'তারাদাস', বকুল ধর-এর 'হৈম' বা পঙ্কজ ভট্টাচার্যর 'পুরোহিত' যথাযথ। নীলরতন ভট্টাচার্য 'বল্লভ ডাক্তার' হয়ে যেভাবে সারাক্ষণ শরীর কাঁপিয়েছেন তা কষ্টসাধ্য বটে, তবে প্রয়োজনীয় কি? একটি দৃশ্যের পরিসরে গীতা নাম-এর রায়গৃহিণী সুন্দর। আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার 'শঙ্কর ঘোষ'এর সাগর'। ইনি ভালো অভিনয় করেছেন এবং এঁর বিশেষ শারীরিক কাঠামো ভবিষ্যতে শম্ভু ভট্টাচার্যর স্থান পূরণে সমর্থ হবে বলে ভরসা করা যায়। 'সৈকত পাকড়াশী'র 'নির্মল' অবিশ্বাস্য খারাপ।

প্রয়োগ, আবহ, আলো, মঞ্চ ইত্যাদি

'রাসবিহারী সরকার'এর নাট্যরূপ মূল উপন্যাসকে অনুসরণ করে শ্লথ এবং সেইসঙ্গে শিথিল। তবু তাঁকে ধন্যবাদ 'দ্রুত-দর্শন' মঞ্চরীতির জন্য জিনিসপত্র সরানো, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়া এই আধুনিক রীতিতে দ্রুত অবাঞ্ছিত সময়ভার লাঘব করেছে। 'হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-এর

গানটি ঈষৎ ক্লান্তিকর হলেও চড়া দাগের থীম মিউজিক হিসেবে মেনে নেওয়া যায়। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বনশ্রী সেনগুপ্তও ভালো গেয়েছেন। তবে গান কমালে ক্ষতি ছিল না। তরুণ-বনশ্রীর গান ছাড়া অন্য সময়ে গান নাটকের গতিকে পিছনে টেনেছে। সুরেশ দত্তর মঞ্চ স্বাভাবিকতাকে অনুসরণ করে বিপুল ও বর্ণাঢ্য, তবে বৈচিত্র্যহীন। তাপস সেন-এর আলো সিনেমার মতো পর্দায় নৌকো চলাকে বিশ্বাস্য করাবার চেষ্টা করেছে। তাঁর আলোয় প্রথমে মঞ্চের এক-এক জায়গা দিয়ে কিছুটা ঝুপঝুপে বৃষ্টি পড়েছে এবং অবশেষে সারা মঞ্চ জুড়ে পড়েছে (বৃষ্টির আবহ-ধ্বনি দুর্বল ছিল) এবং মঞ্চে জ্বলন্ত বাড়ি দেখানোর সময় তাপসবাবুর আলো চূড়ান্ত হাসিয়েছে। বস্তুত এই নাটকে বাড়ি পোড়ার দৃশ্যের আলোর খেলাই একমাত্র সার্থক কমিক সীন।

উপসংহার

বাংলা থিয়েটারের দর্শকদের চরিত্র বহুমুখী। থিয়েটারের যজ্ঞে তাঁদের দেনা-পাওনার হিসাব ও অভিলাষ বহু বিচিত্র। বিভিন্ন কার্যকারণে বিশ্বরূপার দেনাপাওনা ঈষৎ ক্লান্তিকর হলেও দর্শক আকর্ষণে মোটামুটি সমর্থ হবে বলেই ধারনা। কিন্তু নাটকের উপসংহারে ষোড়শীর 'স্বামী' বলে চিৎকার কি থেকেই যাবে?

পাঠভবনের চতুর্দশ বর্ষ পূর্তি

কলকাতার পাঠভবন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সমস্ত শ্রেণীর নিয়ামকদের সম্মিলিত উদ্যোগে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে অভি-নীত হল 'হযবরল' এবং 'কালমৃগয়া'। অন্তরালে দু-একটি প্রবীণ মাথা থাকলেও মঞ্চের উপরের দস্তিরা সবাই শিশু থেকে বড়জোর কিশোর পর্যন্ত: ফলে অনুষ্ঠান উপভোগে সমালোচনার কাঁটা খুব একটা খচ-খচ করেনি।

যেহেতু কেবলমাত্র বাচ্চারাই পারে 'হযবরল'র দেশে অনায়াসে নিয়ে যেতে, অবলীলাক্রমে বড়দের নস্যাৎ করতে, বড়ো হয়ে যাওয়া মোটকা বুদ্ধি সিটের উপর ফেলে রেখেই তাই তাদের সঙ্গী হতে হয়। সেদিন সেই আজবদেশে দিন-দুপুরেই যাদের সঙ্গে রওনা হলাম তারা সব দুর্দান্ত সহচর। 'শেঃমিক নন্দী মজুমদার' (ছেলেটা) তার নিজের মতো অবাক করে রাখছিল আমাদের। 'শ্রীকুমার মল্লিক'এর আসল নাম কোনটা? হিজিবিজি না তকাই না আলুনার কোল? তার গল্প শুনে সেই যে পেটে খিল ধরেছে, এখনও রয়ে গেছে সেই ব্যথা। রাজশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আর অনিন্দ্য গঙ্গোপাধ্যায়-এর উদো-বুধোর লড়াই, নন্দিনী ভট্টাচার্যর (বেড়াল) ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচে হাসি, জয়তী দের (ন্যাড়া) মিশ-মাখা কালোয়াতি গান আর খুব নরম সুরে নৈনিতালের নতুন আলো'-এইসব এখনো জুড়িয়ে রেখেছে চোখ আর কান। আর দুটি অদ্ভুত মানানসই ব্যাঙ আর ছুঁচো, অমিতাভ সেনগুপ্ত এবং অমিতেশ রায়চৌধুরী। অমিতাভর স্যালুট করার সময় এক পা দিয়ে আরেক পা চুলকানো? কিংবা বাণীকুমার মল্লিক-এর (ব্যাকরণ সিং) মেজমামার অর্ধেকটার মরে যাওয়া। এতো সব গল্প, আবার এই ঝুনো বয়েসে এমন আশ্চর্য ফিরিয়ে দিল এরা, যে আলো এবং শব্দের ঈষৎ বাড়াবাড়ি, ব্যাঙের দীর্ঘসূত্রী পৌণ-পুণিক ম্যানারিজম এবং প্রবীণ পরিচালনার শেষ পুনরাবৃত্তির প্যাঁচের জন্য অন্তরাল বর্তী পাকা মস্তিষ্কের মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপর যেটুকু রাগ হতে পারতো, তাও আর তেমন করে হলো না। বড়রা তো ঐ রকমই।

'হযবরলের' পরে 'কালমৃগয়া' দেখতে গিয়ে আমার একটা পুরনো বিশ্বাস আবার ঝালাই করা গেলো। সুকুমার রায় সুকুমার-মতি বাচ্চাদের যেমন টানেন, রবীন্দ্রনাথ তেমন না। একথা উচ্চারণ করলে আমার নামে সাত দিনের ফাঁসির মামলা আনা হবে কিনা জানি না তবু বলি যে সুকুমার যখন বাচ্চাদের খেয়াল খোলা করে দিন, রবীন্দ্র-নাথে তারা তখন আড়ষ্ট থাকে। প্রমাণ আপনার আমার প্রত্যেকের ঘরের বাচ্চাদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে, কুমড়োপটাশ আর শান্তবুড়ি পাশাপাশি তাদের কানে আও-ড়ালে। তাছাড়া 'কালমৃগয়া' অত্যন্ত দুর্বল রচনা, অবশ্য পরিচালিকা সুপূর্ণা চৌধুরীর কৃতিত্বের উজ্জ্বল সাক্ষী হয়ে থাকবে 'ইন্দ্রনীল' আর 'ত্রিদিব'-এর সংগীত শিক্ষা। ইন্দ্রনীল সেন-এর অন্ধ বেশে সেই গান সমস্ত আসরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল সেদিন, একবারের জন্যও মনে হয়নি কোন স্কুলের ছাত্রের গান শুনছি।—

সুরজিৎ ঘোষ

মনোজ মিত্রর 'পরবাস'

ঢাকুরিয়া বরুণ সঙ্ঘের (নাজিরবাগান) মিলনোৎসব উপলক্ষ্যে সভ্যবৃন্দ আয়োজিত মনোজ মিত্রের 'পরবাস' নাটক গত ২২শে জুন বালীগঞ্জ শিক্ষাসদন মঞ্চে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। নাটকে দল-গত অভিনয় এত সুন্দর হয়েছিল যে তা সারাক্ষণ দর্শকদের এক অনাবিল আনন্দের মধ্যে মাতিয়ে রেখেছিল। দাদু, গজমাধব, করালী ও রতনের ভূমিকায় নিমাই দাস-গুপ্ত, প্রভাস বোস, সুভাষ বোস ও কমল দেবের অভিনয় অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়ে চরিত্রগুলিকে নিখুঁত ভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরায় প্রশংসা না করে থাকা যায় না। মন্দিরার ভূমিকায় কুমারী সীমা বোসের অভিনয় এক কথায় প্রাণবন্ত। পরাগ, ভুতু, পেয়াদা ও নিমাই চরিত্রে সুশান্ত দাস, সুকান্ত দাস, সন্দীপ ঘোষ ও অসীম মণ্ডল নিজ নিজ চরিত্র নিখুঁত-ভাবে তুলে ধরতে পেরেছে। ব্যবস্থাপনায় শেখর রায় ও আবহসঙ্গীতে দীপক ভট্টা-চার্য নতুনত্বের দাবী রাখে। ভূমেন ভট্টা-চার্যের পরিচ্ছন্ন পরিচালনা গুণেও শিল্পী-দের দলগত অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শ্রীমণীন্দ্র রায় ও সভাপতির আসন অলং-কৃত করেন শ্রীসন্তোষ মিত্র।

রফির বাঙলা গান

সুপরিচিত কণ্ঠশিল্পী মহম্মদ রফি সম্প্রতি চারটি বাংলা গান রেকর্ড করলেন বোম্বাইয়ের ওয়েস্টার্ণ আউটডোর রেকর্ডিং থিয়েটারে। মেগাফোন কোম্পানীর আগামী শারদীয় নিবেদনের অন্যতম আকর্ষণ হবে মহম্মদ রফির গাওয়া গানের এই ডিস্ক। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানে সুর দিয়েছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীরফির প্রতিটি গানের কথার নিখুঁত উচ্চারণ অনেককেই বিস্মিত করবে। সত্যিকারের সাধক শিল্পীর কাছে ভাষা কোন বাধা [illegible] —সেটাই একবার নতুন করে প্রমাণ করেছেন শিল্পী।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আবাসিক সংহতি পরিষদের উদ্যোগে হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে আবাসিক প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা পালিত হয়। কৃষ্ণ দাসের পরিচালনায় 'স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্র-নাথ' গীতিনাট্যে ইন্দ্রনীল রায়, স্বপ্না উপা-ধ্যায়, গীতা দাস ও পম্পা ব্যানার্জি এবং মন্টু দের পরিচালনায় 'দুই বিঘা জমি' নাটকে নির্মল চন্দ্র, নন্দন ঘোষ প্রশংসনীয়। আবৃত্তিতে সোমা বোস, কল্লোল ব্যানার্জি, মৌসুমী দত্ত। নৃত্যে তানিয়া দাস উল্লেখ্য। অনুষ্ঠানে মাউথ অরগ্যান বাজিয়ে শোনান কার্তিক রায়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩
পত্রিকা মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য
মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যান্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত

স্বাধীনতা\১৩৮৬

কোম্পানী বনাম নবাব সিরাজদৌলা
দুষ্প্রাপ্য ২৫ খানি চিঠি আর দু-পক্ষের সন্ধিপত্র থেকে পলাশি

রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি
নতুন আলোকপাত করেছেন
তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
সোমক দাশের গল্প

উচ্চবিত্তের এ-স্বাধীনতার প্রধান দালাল মধ্যবিত্ত
স্বাধীনতা প্রাপ্তির নবমূল্যায়ণ করেছেন বিমলানন্দ শাসমল

রামকিংকর বেইজ
শিল্পীর অন্তরঙ্গ আলেখ্য তুলে ধরেছেন সমীর চট্টোপাধ্যায়

পরিচয়ের আদি আড্ডা **শুক্রবারী**
লিখেছেন শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

গান্ধীজী বাঙালীর ক্ষতি করেছেন
গান্ধীজীকে নিয়ে একটি বিতর্কপ্রসূ আলোচনা

দাম তিন টাকা রেজিস্টি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা

আপনার কপির জন্য হকার বা এজেন্টকে এখুনি বলে রাখুন, অথবা লিখুন সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা-৩

অমৃত

১১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
২১ আষাঢ়, ১৩৮৬
6 July, 1979

রাজনীতির পটপরিবর্তন

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগ করেছেন। জনতা সরকারেরও পতন ঘটেছে সেই সঙ্গে। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধটি লেখার সময় পর্যন্ত নতুন কোনো সরকার শাসনভার গ্রহণ করেন নি। রাষ্ট্রপতির পরামর্শে মোরারজী দেশাই-ই অন্তর্বর্তীকালের জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন:

তিরিশ বছর একটানা কংগ্রেসী শাসনের পর জনতা দল শাসনভার গ্রহণ করে। লোকসভায় তাঁদের বিপুল গরিষ্ঠতা ছিল। সাধারণ মানুষের মনেও তাঁদের প্রতি শুভেচ্ছার অন্ত ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরো মেয়াদে দিল্লীর তক্তে অধিষ্ঠিত থাকতে পারলেন না মোরারজী সরকার। মাত্র ২৮ মাস পরেই বিদায় নিতে হল। এবং সারা দেশে কোনো দলই এমনকি বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর নিজের দলও সেজন্যে দুঃখিত হল না। প্রশাসনিক অযোগ্যতা তাঁদের এমন পর্যায়ে পোঁছেছিল যে, আজ না হোক কাল তাঁদের যেতেই হত।

অবিশ্যি জনতা দলের অন্য কোনো নেতা সরকার গঠন করতে পারবেন কিনা এখন পর্যন্ত তা স্পষ্ট নয়। এই নিবন্ধ প্রকাশিত হবার আগেই কেন্দ্রে নিশ্চয়ই নতুন সরকার শাসনভার গ্রহণ করবেন। কিন্তু যে দল বা দলগোষ্ঠীই সরকার গঠনে এগিয়ে আসুন, তাঁদের সম্মুখের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হবে না।

বিদায়ের আগে মোরারজী সরকার কতকগুলো গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল:

সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান বিপত্তি ঘটেছিল, দলের মধ্যে বহু মতের প্রাদুর্ভাব। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী এবং দুজন উপপ্রধানমন্ত্রী তো অনেক ব্যাপারে একমত ছিলেনই না, এমনকি তাঁদের অনুগামীরাও ছিলেন আত্মপ্রাধান্যের জন্যে উদ্‌গ্রীব। দলের এই আভ্যন্তরীণ কলহের ফলে প্রশাসনিক কাজেও শৈথিল্য দেখা দিতে শুরু করে। এবং কংগ্রেসী শাসনের যে ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই ছিল জনতা দলের ঘোষিত নীতি, মোরারজী দেশাই পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারও হয় তার সহজ শিকার। সারা দেশে নানারকম অশুভ শক্তি মাথা তুলতে শুরু করে। হরিজনদের প্রতি অত্যাচার ও সাম্প্রদায়িক অশান্তি সমাজজীবনকে বিপন্ন করে। দেশে ভালো ফসল ও বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যাহত হতে থাকে। মূল্যবৃদ্ধির দাপট থাকে অব্যাহত। এবং প্রশাসনিক অযোগ্যতা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে আধা-সামরিক বাহিনীর বিক্ষোভ দমনের জন্যে ব্যবহার করা হয় সেনাবাহিনীকে। ভারত রাষ্ট্রের সামনে ক্রমে এক গভীর সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

এই পটভূমিতে মোরারজী সরকারের বিদায় ভবিষ্যৎ সরকারের দায়িত্বকে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই। সমস্ত ভারতবাসীই চাইবেন, আগামী সরকার সফল হোন।

নিবেদন

অনিবার্য কারণে ১৩, ২০ এবং ২৭ জুলাইয়ের সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। পরবর্তী সংখ্যাই হবে ৩ আগস্টের কাগজ। এখন থেকে অমৃত নিয়মিত-ভাবে পাওয়া যাবে। পাঠকদের এত দিন যে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে সে জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। ৩ আগস্টের সংখ্যাটি আয়তনে বেড়ে ৮০ পৃষ্ঠার নির্বাচিত ভাল লেখা নিয়ে বেরোচ্ছে। ঘোষিত রচনাগুলি যথারীতি ছাপা হবে। ধন্যবাদ।

সারকুলেশন ম্যানেজার

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
লেক কালীবাড়ি
লিখেছেন সন্ধ্যা সেন

বাহারুদ্দিনের বিশেষ রচনা

গল্প লিখেছেন বিজয়কুমার দত্ত
কানাইলাল চক্রবর্তী, পম্পা পাল

জ্যোতির্ময় মৌলিকের
সুদীর্ঘ কাহিনী

সাহিত্য ইত্যাদি

লেখার অভ্যাস আর অভ্যাসের লেখা

আমার চেনাজানা বেশ কয়েকজন সাহিত্যিক রোজ লেখেন। আগেও অনেকে লিখতেন দেখেছি।

তারাশংকরবাবু নিয়ম করে লিখতে বসতেন। বেশির ভাগই সকালের দিকে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও রোজ বসতেন। প্রথম দিকে চাকরির চাপে লিখতে হত সন্ধ্যার পর। অবসর নেবার পর সকালেই বেশি লিখতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রকেও সকালে বসে বেশ একটু বেলা পর্যন্ত লেখার কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। অবিশ্যি গোটা সময়টা লিখতেনই, তা নয়। দু'একটা রেফারেন্স দরকার হলে বই ঘাটতেন। কিম্বা হঠাৎ কোনো একটা শব্দের সূত্রে অভিধান খুলে শব্দ থেকে চলে যেতেন শব্দান্তরে। খোলা প্যাডের ওপর কলমটি তখন শুষ্ক-মুখে অপেক্ষা করত তাঁর ফিরে আসার প্রত্যাশায়।

এ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কথা তুলছি না। কেননা তিনি ছিলেন সর্বসময়ের লেখক। সকালে বেশি লিখতেন বললে অনায়াসেই দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব যে বিকালেও যথেষ্ট লিখতেন। এবং বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ একটা গানের কলি মাথায় এসে যাওয়ায় সন্ধ্যাতেই বসে পুরো গানটি লিখে ফেলার কথাও কম শুনিনি আমরা। তাছাড়া তিনি ছিলেন এমনই এক-জন সিদ্ধ লেখক যাঁর ছোটোখাটো ব্যক্তিগত চিঠি বা অটোগ্রাফের দু'চার লাইনও হয়ে উঠত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য। অতএব রবীন্দ্রনাথের কথা থাক।

শরৎচন্দ্র খুব মেজাজী লেখক ছিলেন শোনা যায়। মর্জি না হলে তিনি লিখতে বসতেন না। এবং তাঁকে দিয়ে লেখানোর জন্যে দস্তুরমতো সাধ্যসাধনা করতে হত।

অন্তত সম্পাদক ও প্রকাশকরা সেই কথাই বলে গেছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি তিনি যা লিখতেন সবই ছিল পরের উপরোধে, নিজের তাগিদে নয়? হতেই পারে না তা। নিজের গরজে না লিখলে কোনো লেখাই তাঁর স্মরণীয় হত না, এবং নিজেও তিনি স্মরণীয় থাকতেন না এতদিন। লিখতেন তিনি নিজের ইচ্ছেতেই। তবে তা রোজ না হতে পারে। হয়তো কিছুদিন একটানা লিখে কিছুদিন চুপচাপ থাকতেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাসগুলোর কিস্তি-ভাগ দেখলে সেইরকমই মনে হয়। কিন্তু তাই বলে কি যে সময়টা লিখতেন না তখন লেখার চিন্তা তাকে তুলে রাখতেন? আমার তা মনে হয় না। কাগজে-কলমে না লিখলেও সেই সময়েও তিনি লেখা নিয়েই থাকতেন। চরিত্রগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতেন, তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবতেন। কোন পথে তারা মোড় নিতে পারে আন্দাজ করার চেষ্টা করতেন। এবং এই মোট ব্যাপারটি তাঁর আসল বক্তব্যের সঙ্গে কতোটা খাপ খাচ্ছে কিম্বা খাচ্ছে না, তাও বুঝে নেবার চেষ্টা করতেন। অর্থাৎ লেখক হিসেবে তিনি লেখা নিয়েই থাকতেন। তিনি আলস্যপ্রবণ, তিনি লেখার চেয়ে আড্ডা দিতে বেশে ভালোবাসেন এবং এই ধরনের বহুরকম মুখরোচক রটনা থাকলেও, (হয়তো এরকম রটনার ইন্ধনও তিনি নিজেই জুগিয়েছেন।) ভেতরের মানুষটি ছিলেন খুবই সীরিয়াস এবং একাগ্র-লক্ষ্য। অনেকটা সেই ছাত্রটির মতো যে পরীক্ষার আগে অন্য পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, কিন্তু রেজাল্ট বেরোবার পর দেখা যায় সে হয়েছে ফার্স্ট।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্বভাবধর্মে যিনি সাহিত্যিক, সাহিত্য হয়ে থাকে তাঁর নিয়মিত অভ্যাসের বস্তু। সাহিত্যরচনার ক্ষমতা নিয়ে জন্মানো অবিশ্যি গোড়ার ব্যাপার। জন্মগত এই ক্ষমতা বা প্রতিভা না থাকলে কেউ চেষ্টা করে সাহিত্যিক হতে পারেন না। কিন্তু ক্ষমতা থাকাও যথেষ্ট নয়। চেষ্টা দরকার। বরং চেষ্টাটাই প্রয়োজন বেশি। সত্যিকারের বড় সাহিত্যিকেরা কেউই এ ব্যাপারে উদাসীন থাকেন নি।

অভ্যাসের ব্যাপারটা অবিশ্যি প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করার দরকার নেই। অভ্যাস মানে দাগা বুলানো নয়। নামতা মুখস্থের মতো পুনরাবৃত্তিও নয়। অভ্যাস অনেকটা গলা-সাধার মতো, রিওয়াজ করার মতো। নিজেকে আরো নির্ভুলভাবে লক্ষ্যের দিকে চালিত করা, বিকশিত করে তোলা। অভ্যাস হল তারই সিঁড়ি। উত্তরণ ঘটানোই তার আসল কাজ। গোলকধাঁধায় ঘোরানো নয়।

এইদিক থেকে দেখলে মানতেই হবে, সমকালের লেখক অনেকেই যেন আসল কথাটি ভুলে যাচ্ছেন। [illegible] হয়তো লিখতে বসেন অনেকে। কিন্তু অনেক সময়েই তা হয় পাতা ভরানো ব্যাপার। যেন লিখতে হবে বলেই লেখা। না লিখলে টাকা পাওয়া যাবে না। টাকা না পেলে--

হ্যাঁ, লেখা এখন অর্থকরী ব্যাপার। কাজেই অনেক লেখাই লিখতে হয়, যাকে ইংরেজিতে বলে 'পট্ বয়লার', অর্থাৎ উনুনে যাতে হাঁড়ি চড়ে তার জন্যে লেখা। এ লেখা রোজ লিখতে হলে দাগা বুলানো ছাড়া উপায় কি!

বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে লিখে তিনি বিস্তর পয়সা রোজগার করেছেন। নিজের বই তিনি নিজে ছাপতেন এবং কমিশান দিয়ে দোকান থেকে বিক্রি করাতেন। কাজেই রয়ালটি ছাড়া প্রকাশকের লভ্যাংশও তাঁরই হাতে আসত। এবং বেশির ভাগ বইয়েরই যেহেতু তাঁর জীবিতকালেই একাধিক মুদ্রণ ঘটেছে, অর্থাগমও তাঁর ভালোই হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিতে পারেন নি।

চাকরি থেকে বিদায় নিয়ে প্রথম যিনি লেখার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে শুরু করেন তিনি শরৎচন্দ্র। কিন্তু অতবড় জনপ্রিয় লেখকও অনেকদিন ধরে দ্বিধার মধ্যে ছিলেন—চাকরিটা তিনি ছাড়বেন, কি ছাড়বেন না। ব্রহ্মদেশ থেকে কতোবার যে তিনি জানতে চেয়েছেন, লেখার ওপর নির্ভর করলে কলকাতায় তিনি গ্রাসাচ্ছাদন চালাতে পারবেন কিনা। একবার বোধহয় নিজেও এসেছিলেন তিনি প্রকৃত অবস্থা সরেজমিনে দেখে যাবার জন্যে। তারপর তিনি চাকরি ছাড়তে পেরেছেন।

একালে বোধহয় তারাশঙ্করই প্রথম লেখক যিনি লেখার টাকায় জীবিকা নির্বাহ শুরু করেন। বিভূতিভূষণ অতো নামী লেখক ছিলেন, কিন্তু তিনিও প্রথম দিকে জমিদারী সেরেস্তায় এবং পরে বেশ কিছু-কাল ইশকুলে কাজ করেছেন। মানিকবাবুও মাঝখানে 'বঙ্গশ্রী' সহ-সম্পাদকের চাকরি নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষজীবনে কিছুকাল 'যুগান্তরে' কাজ করা ছাড়া তারাশঙ্করবাবু ছিলেন সর্বসময়ের লেখক। 'পট্ বয়লার' জাতের লেখা তাঁকেও কিছু লিখতে হয়েছে। পড়লেই তা বোঝা যায়। কিন্তু প্রথম দিকে বছর বিশ-পঁচিশ তিনি ভালো থেকে আরো ভালো লেখা লিখেছেন। প্রতিদিন লিখতে বসে প্রতিদিনই তিনি সিঁড়ি ভেঙেছেন। আর তাই হতে পেরেছেন মহৎ লেখক।

সেই আদর্শ কিন্তু এখনকার লেখকদের সামনে প্রায়শই অনুপস্থিত। অভ্যাস এখন আর রিওয়াজ করা নয়, দাগা বুলানো। সকলের সবসময় নয়, তা অবিশ্যি ঠিক। কিন্তু অনেকেরই অনেক সময়।

মণীন্দ্র রায়

হারানো বই

মুরশিদাবাদে কোম্পানির পুণ্যাহ হল ১৭৬৭ সালের এপ্রিলে। মসনদে নবাব নজমুদ্দৌলা। তাঁর দক্ষিণে কোম্পানির সর্বময় কর্তা ক্লাইভ। সভায় এসেছেন আমীর ওমরাহ, জমিদারের দল। নজরানার ছড়াছড়ি, খেলাতের ফুলঝুরি। টাকাও আদায় হল অনেক। বিলেতে কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টারদের কাছে খবর গল, সে বছর আদায় হবে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা। কোম্পানির অংশীদাররা শতকরা সাড়ে বার টাকা লভ্যাংশ পাবেন। পার্লামেন্টে আইন পাশ হল বৃটিশ সরকারকে করস্বরূপ দিতে হবে চল্লিশ লক্ষ টাকা। অতিরিক্ত টাকা আদায়ে শিকার হল বাংলার কৃষক। তখন কোম্পানির প্রধান রাজস্ব সচিব রেজা খাঁ। তার বার্ষিক বেতন নয় লক্ষ টাকা।

মজার ঘটনা, কোম্পানির দেওয়ানী লাভের সময় বাংলাদেশের রাজস্বের পরিমাণ ছিল তিন কোটি টাকা। দিল্লীর নবাবের প্রাপ্য ২৬ লক্ষ টাকা আর মুরশিদাবাদের নবাবের প্রাপ্য ৫ লক্ষ টাকা বাদ দিলে কোম্পানির হাতে থাকত দু কোটি টাকার বেশী। অন্যান্য খরচ বাদ দিলে কোম্পানির নিট লাভ দু কোটি টাকা। তাছাড়া নবাবের বৃত্তি পরিমাণ কমতে থাকায় কোম্পানির লাভের অংকও বাড়তে থাকে।

কোম্পানির পুণ্যাহ বাংলার বুকে ডেকে আনে বিভীষিকা। ৬৮ সালে বৃষ্টি হল না। ফসল ফলল না। ৬৯ সালে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দিল। কোম্পানি খাজনা আদায়ে ছাড় দিল না। এ বছর আবার উত্তর বাংলায় অনা-বৃষ্টি আর দক্ষিণ বাংলায় ঘটল অতিবৃষ্টি। স্পষ্ট শোনা গেল দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। গভর্ণর ভেরেলেস্ট কোম্পানির ডিরেকটরদের কোন খবরই জানালেন না। এ বছর একশ টাকা কম আদায় হলেও পরের বছর তা পুরোপুরি তুলে নেওয়া হল। আর সে বছরই নেমে এল দুর্ভিক্ষের কালোছায়া! মহম্মদ রেজা খাঁ বলেন, ভয়ানক অনাবৃষ্টি, খাদ্যদ্রব্যের দুর্মূল্যতা, পরে অত্যন্ত অভাব। এই সকল থেকে দেশে যে কি কষ্ট হয়েছে, তার আর কি বর্ণনা করব? জলাশয় সব শুকিয়ে গিয়েছে, জল দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। এর উপর অনেক লোক গৃহদাহে সর্বস্বান্ত হয়েছে। দিনাজপুরে ও পূর্ণিয়া জেলার রাজগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যে শস্য সঞ্চিত ছিল তা পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ সকল সহ্য করেও প্রজা আশা করেছিল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হবে, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এক বিন্দু বারিপাত হল না। জমিতে লাঙল পড়ল না, বীজ বোনা হল না।' বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদের রিপোর্ট ছিল 'দেশে অনাবৃষ্টি, খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ, জমির ফসল শুকিয়ে গেছে এবং ক্ষেতে গরুকে খাওয়ান হচ্ছে। পুকুর সব জলশূন্য, অন্নকষ্টের সঙ্গে জলকষ্টও [illegible] যেন হয়েছে, বৃষ্টি না হলে তাও মরে যাবে। দলে দলে লোক গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে।' বিহারের ফৌজদার মহম্মদ আলি খাঁ রিপোর্ট করলেন : এমন একটা দিন যাচ্ছে না যেদিন ৩০।৪০ জন লোক না মরছে। ক্ষুধার জ্বালায় দলে দলে লোক মরেছে এবং মরছে, বীজের ধান, লাঙলের গরু, চাষের যন্ত্রপাতি লোকে বিক্রি করে ফেলেছে। শেষে সন্তান বিক্রী করছে; কিন্তু খরিদ্দার পাওয়া যাচ্ছে না।' আর ইংরেজ রেসিডেন্টের রিপোর্ট ছিল জীবিতেরা খাচ্ছে মৃতের মাংস। দেশের ছ আনা লোক মরে গেছে। এই শোচনীয় অবস্থায় পুরো খাজনা আদায় হয়েছে। প্রজার ঘরের সঞ্চিত শস্য জোর করে কেড়ে নিয়ে বিক্রী করে বেশী লাভ করেছে কোম্পানির কর্মচারী।
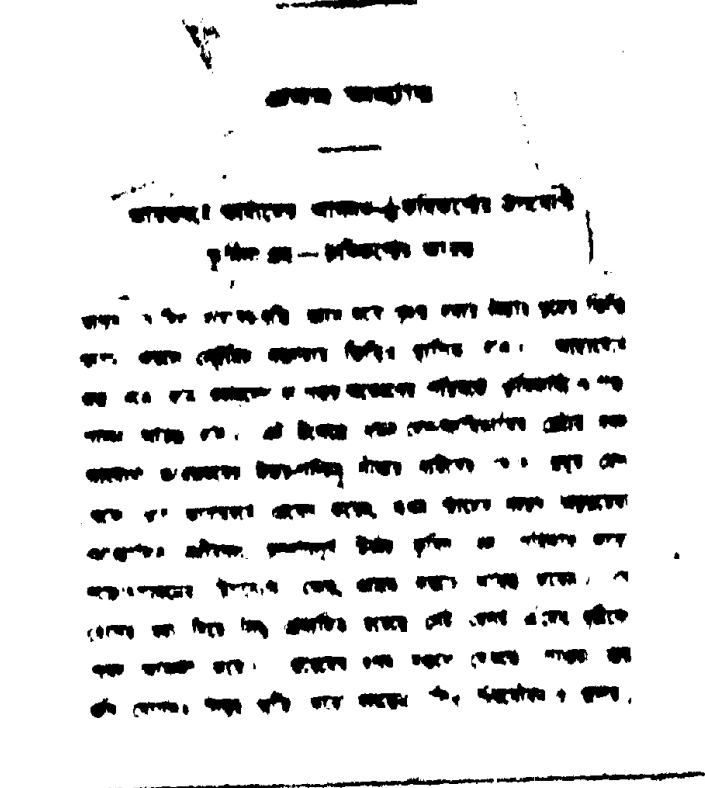
বাঙলার কৃষকের কথা

খবর পেয়ে কোম্পানির বিলেতি কর্তারা মাথা ঘামালেন। ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলেন বাংলায়। রাজস্ব আদায়ে ঠিকাদারী ব্যবস্থা চালু হলেও অল্প দিনে সে প্রথা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর হল পাঁচশালা বন্দোবস্ত। ১৭৮৯ পর্যন্ত এ ব্যবস্থা ছিল। হেস্টিংস রাজস্ব আদায় সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন করেন। কমিশনের সুপারিশে প্রাদেশিক রেভিনিউ কমিটি উঠিয়ে মেট্রো-পলিটান রেভিনিউ কমিটির সৃষ্টি। রাজস্ব আদায় ব্যাপারে বন্দোবস্ত হল জমিদারদের সঙ্গে। অরপর এলেন কর্ণওয়ালিশ। প্রথমেই চালু হল দশশালা ব্যবস্থা। ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ চালু হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জমিতে কৃষক বাদে জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্যদের অধিকার স্বীকৃত হল। জমিদাররা ইচ্ছামত খাজনা আদায় করতে লাগলেন। প্রজা নির্দিষ্ট সময়ে তার খাজনা না দিতে পারলেও জমিদারকে দিতে হত। দিতে না পারলে শারীরিক অত্যাচার ভোগ, কয়েদও হত। সম্পত্তি ক্রোক করা হত। ১৭৯৪ সালে এ প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। খাজনা বাকি পড়লে জমিদারী বিক্রয় ব্যবস্থা হল। ১৭৯৬ সালে ১৪,১৮,৭৫৬ টাকা এবং ১৭৯৭-৯৮ সালে ২২,[illegible] টাকা রাজস্বের জমিদারী রাজস্ব অনাদায়ের কারণে বিক্রী হয়ে যায়। দু বছরের মধ্যে নদীয়া, রাজসাহী, বিষ্ণুপুরে আর দিনাজপুরের অধিকাংশ জমিদারী বিক্রি হয়ে গেল। বীরভূম রাজ সর্বস্বান্ত হলেন। বর্ধমানের রাজার অবস্থা শোচনীয়। ছোট ছোট জমিদার হিসেবের বাইরে। অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার বাইশ বছরের মধ্যে বাংলার অর্ধেক ভূসম্পত্তি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। খাজনার গুরুভার কৃষকের পক্ষেও ছিল অসহনীয়। উৎপন্ন শস্য মূল্যেরঅর্ধেকের বেশী খাজনা দিতে হত কোথাও কোথাও। ডিগ্রী করে কৃষকের জোত জমা বিক্রি করা হত। কৃষক পরিণত হল দিনমজুরে। ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে এ রকম দিনমজুরের সংখ্যা :

১৮৯১ খৃঃ ১,৮৬,৭৩,২০৬
১৯০১ খৃঃ ৩,৩৫,২২,৬৮১
১৯১১ খৃঃ ৪,১২,৪৬,৩৩৫

কৃষকের দেয় খাজনার পরিমাণ কিন্তু কমে নি। ১৭৬৫ সালে কোম্পানির দেওয়ানী নেওয়ার সময় বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব ছিল তিন কোটি টাকা। ১৯০০ সালে বাংলার ভূমি রাজস্বের পরিমাণ (সরকারী হিসাবে)—

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী জমির	৩,২৩,২২,০১৭
অস্থায়ী বন্দোবস্তী জমির	৩৪,২৩,২৬৭
খাস মহলের	৪১,০৪,৭৫৩
মোট	৩,৯৮,৫০,৬৩৭

রেভিনিউ বোর্ডের ১৮৯৯-১৯০০ সালের সেস রিপোর্টে জানা যায় ঐ তিন প্রদেশে জমিদার প্রজার কাছ থেকে সাড়ে ১৬ কোটি খাজনা আদায় করে। তার মধ্যে সরকার পায় ৪ কোটি আর জমিদার সাড়ে ১২ কোটি। এটা জমিদারের কমিশন। চির-স্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হিসাব হয়েছিল আদায় করা খাজনার শতকরা ৯০ টাকা সরকার এবং ১০ টাকা জমিদার পাবে। অর্থাৎ জমিদারের পাওয়ার কথা ছিল যেখানে ৪০ লক্ষ সেখানে পেল সাড়ে ১২ কোটি টাকা। রাজাকে তার প্রাপ্যের ত্রিশ গুণ দিয়েছে গরীব প্রজা। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত দেড়শ বছরে এভাবে মোট তারা দিয়েছে ১৮শ কোটি টাকা।

'বাংলার কৃষকের কথা' বইয়ে বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এই তথ্যনির্ভর বিবরণ দিয়েছিলেন হৃষিকেশ সেন। ভারতে কৃষি ব্যবস্থার সূচনা থেকে মুসলমান ও ইংরেজ আমলের ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষিজীবীদের জীবন ধারার বিস্ময়কর তথ্য আছে বইটির পাতায় পাতায়। দুঃখের বিষয় বইটির টাইটেল পেজ নেই। ছেঁড়া। সূচীপত্র থেকে আরম্ভ। সে কারণে পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানান সম্ভব হল না। তবে ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে বইটির গুরুত্ব আজও কমে নি। লেখক কাশী থেকে বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন ১৩৩১ সালে।

কমল চৌধুরী

বুঝতে পারছি না, কিভাবে

[illegible] মুখোপাধ্যায়

বুঝতে পারছি না, কি ভাবে বললে সাড়া দেবে;
বুঝবে আমার বোবা শব্দের আর্তনাদ
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান কথা বলেছি,
সাড়া দিয়েছো হয়তো, কখনো দাওনি।
বুঝতে পেরেছি কোনখানে আমার অক্ষমতা
ছেলেবেলায় যে যাদুদণ্ডটি দিয়েছিলেন ফকির বাবা,
আমতলীর স্টিমার ঘাটের ছলাৎছল
ঢেউ এর মধ্যে তা ফেলে এসেছিলাম একদিন
এখন, খুব আঁটোসাঁটো পোষাক পরি, হাতে পোর্টফোলিও, সবসময়ের
ব্যস্ততা। ক্যানিং স্ট্রীটের রোয়া ওঠা বকুল গাছে
ডেকে চলেছে বসন্তের কোকিল---
একটানা আর বিরক্তিকর—
মাঝে মাঝে, হয়তো কোনো একদিন, আউটরামঘাটের
নির্জন জেটির ওপর
বসতে না বসতে দেখতে পাই
ফকিরবাবার মস্ত কালো জোব্বা ফুলে ফেঁপে উঠেছে
গঙ্গার বুকে, আর---
বাড়তে বাড়তে ঢেকে ফেলছে নদীর উপর থমকে থাকা
দরাজ নীলের শূন্যতা—
হাওয়া বইছে হিমজড়ানো, একটু পরেই ঝড়
আর, ঝড় যখন থামলো, তারা উঠলো ঝিকমিকিয়ে;
আকাশে কালো মস্ত
জোব্বাটা গেলো মিলিয়ে

এভাবে বললে সাড়া দেবে না তুমি;
উপমা আর স্বভাবোক্তির আড়াল দিলে
বিব্রত হয়, সাদামাঠা কথায় মন ভরে না
বুঝতে চাইলে আচ্ছন্ন, গোপন রাখো ইচ্ছে,—ওইখানেই কবিতা।

এইসব জেনেছি আমিও; শব্দের আড়ালে নিজেকে করেছি গোপন
সাড়া দিয়েছো তুমি। তবে, খুঁত খুঁতে তোমার স্বভাব,
বলেছে—'সব নয়,
সব কটি বুকের বোতাম দাও খুলে, দেখতে দাও স্পন্দন, অর্থাৎ—
কেমন ভাবে ভাঙছে, ফুঁসছে ঢেউ, কাঁদছো তুমি একলা।'

সাড়া দিয়েছি ওইভাবে; সাজপোষাকের অহং রেখেছি খুলে
ছেলেবেলার ধুলো থেকে যাদুদণ্ডটি নিয়েছি কুড়িয়ে,
অর্থাৎ ন্যাঙটা ফকির,
ঝোপঝাড়ার আড়াল থেকে ধুকপুকে বুক তুলে এনে
সাজিয়ে দিয়েছি থালায়,—খুশি হওনি তাতেও

বুঝতে পারছি না, কিভাবে বললে সাড়া দেবে, বুঝবে আমার
বোবা শব্দের আর্তনাদ

—

বসে-থাকা

আলোক সরকার

এমনিই একটা বসে-থাকা
যখন সেই খড়
মাটির উপর থেকে হাওয়ায় উড়লো
টললো এদিক ওদিক

একবার বাঁ দিকে আর তারপর
সাঁ করে উড়ে গেলো পশ্চিমে
উড়ে থামলো কিছুক্ষণ
ঠিক সেই মুহূর্তে

বাতাসে ভর-দেওয়া সেই একটি মুহূর্ত
শূন্যতা বিদীর্ণ হলো স্তব্ধ
খাঁ খাঁ করা শূন্যতা আর নিঃশব্দ স্থবির বিস্তীর্ণ
কেবল একটা লাল ফল

ক্রমশ স্ফীত আরো আরো স্ফীত
এমনিই একটা বসে-থাকা
আর লাল রক্তিম ফল অনভিযোজিত আত্মময় একা
অকূলস্পর্শ নিশীথিনী ঠিক সেই মুহূর্তে।

মোহগ্রস্তের কবিতা

সমীর চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নের ভেতরে দেখি পক্ষিরাজ ঘোড়া এসে জানালার কাছাকাছি
মুখ এনে বলে :
শূন্যে ভেসে যেতে পারি, মেঘের শাসন ভেঙে আমি
নিয়ে যেতে পারি অপ্সরার দেশে;
কিন্নর নারীর সাথে বিয়ে দিতে পারি
শিমুল গাছের ডালে পাখি হয়ে বসে ফের উড়ে যেতে পারি
চাঁদের শরীর ভেঙে কিছু গুঁড়ো চাঁদ নিয়ে আরেকটা চাঁদের দেশ
কক্ষপথে ছুঁড়ে দিতে জানি;

আমি গুঁড়ো গুঁড়ো চাঁদ আস্তিনে গোটাবো বলে মুঠো খুলে দেখি,
আদপে মুঠোই নেই, জিরাফ-উচ্চতা নিয়ে চেটে দিচ্ছি চাঁদের শরীর;
ওখানে বিছানা হবে, মাঝেসাঝে নিজের বিছানা
একান্ত নিজের ঘর ভীষণ জরুরী মনে হয়

এখন পকেটে কিছু থ্যাঁতলানো সিগারেট খুচরো পয়সা-টয়সা
খৈনিপাতা চুনস্বাদ, কিছু অপমান,
নাসারন্ধ্রে তেতো গন্ধ, একঘেয়ে চুম্বনের থুতু মাখামাখি ঠোঁটে,
চোখে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা,
আঙুল নোঙর হয়ে শিশিরের স্পর্শ পেতে চায়
স্নায়ুবায়ু হাবিজাবি কর্দাফাই হয়ে গেছে সেই কোন্ যুগে

নিজের জায়গা-জমি ছেড়ে দিয়ে যদি চাঁদ গড়াতে গড়াতে
নেমে আসে পথে আসে
কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না কখনো—
[illegible] না চুমো খাবো ঠোঁটে

এইভাবে, চিরস্থায়ী মস্তকে

দাউদ হায়দার

ভাঙো মৃদু বিপর্যয় এই সন্ধ্যায়, মেঘে মেঘে
দ্বিপ্রহরে খুলেছ স্বর্গ. চিরস্থায়ী মস্তকে কর্কটকান্তি।
দাক্ষিণ জড়ুলের কাছে সমান্তরাল চিহ্ন দেখে খণ্ডাও ভ্রান্তি
জীবনের; যেন স্তব্ধ মিনারে কেউ মাথা রেখে ঘুমোয় আবেগে।

ভাঙো মৃদু বিপর্যয় অতিরিক্ত ভালোবাসায়। রক্তে মাংসে দ্যাখো
গোধূলির প্রস্থান। ধুলো নেই। খিড়কি দুয়ারে ছায়া। অঞ্জলি
দাও গৃহে, উচ্ছ্বাসে যে যাবার গেছে বহুকাল: কেন তাকে ডাকো
ওই বর্মের শাসনে:—সারারাত ভিজেছে গোলাপ, কলি,
বকুলের সুশ্রী শুভ্রতা, অসমাপ্ত ঘুমে, বৃষ্টির জলমণ্ডলে।

আমার ভিতরে এক গোপন রহস্য আছে, উদ্দাম নদীজলে
তারে ভাসাই অবেলায়। মেঘে মেঘে সবই উদাসীন।
তুমি কেন অস্থির ব্যাকুল হও; নাও স্বর্ণমুদ্রা. উদ্ধত কুমারী
সে. বহির্জগতে এক উল্লাস কেঁদে ফেরে; যেন আঞ্চলিক বেদনায়
সারাদিন
জেগে থাকে নদীর শিয়রে,—আত্মার পতঙ্গ সে, বর্ণালী গিরিশিখরী।

শিরস্থান খুলেছি এইবার, প্রতিযোগিতায় প্রকৃত যোদ্ধাই হারে—
পরক্ষণে আবার ছুটে যাবো মাঠে, বণাঙ্গনে!
তুমি পরাও মুকুট স্বচ্ছন্দ বিজয়ীর মস্তকে! —অন্ধকারে
সে মুকুট জ্বলে জলেস্থলে, আকাশে. অরণ্যে।

—এইভাবে, ভাঙো মৃদু বিপর্যয় আমাতে-তোমাতে।

ধর্ম

শংকর দে

মাটি যা দেবতা নয়, অন্ন-ক্ষরা
ভিক্ষুকের শাসনে সম্মানে একরূপ?
ভাগ্য এই, মানুষের মুক্তি পরিত্রাণে
কে না জানে? সর্বভুক শাস্ত্রীয় বিধানে
দেহ এই. বৃক্ষ অস্থি মাটি।

মূর্তি যা আকারে নয়. আত্মহারা
অন্ধের স্মরণে তুমি গতি
তুমি পরম: তুমি জ্যোতি
নিরাকারে যুক্ত করো দেহী
হে অভিন্ন শান্ত-শব্দ. পাথরের প্রাণে
ধর্ম এই, দ্বৈত-চেতনার অন্তর্দাহ?

থেকে গেল বনভূমি এবং অলঙ্কার

প্রদীপ ঘোষ

সেই দেশে গেল দীর্ঘ বনভূমি এবং
 সুন্দরী নারীদের কিছু অলঙ্কার
বনভূমি স্তব্ধ হবে—এই আশা
অথবা
এই আশা ছিল বন্য সংরক্ষণে
 জন্ম নেবে তৃণ, বৃক্ষ, লতা।
সন্তপ্ত মানুষের তপোবনে কিংবা
 শহরের জনকোলাহলে
বিষাক্ত বুদ্ধি ক্রোধের আশ্রয়ের কথা ছিল।

নারীদের অলঙ্কার বিকৃত মস্তিষ্ক ঘিরে
নানান কল্পনায় খাদ্য বস্তু [illegible] [illegible]—
মরুভূমির জলীয় ভোজ্য।

মানুষের শেষ আশ্রম [illegible] তপোবন
জন্ম উঠেছিল
দুঃখ, বিদ্বেষ, জর্জরিত বিচারকের বেতক [illegible] [illegible]।
—নির্বাসনে দণ্ডিত নাগরিকগণ তাই
[illegible] [illegible] অতি [illegible] পালন [illegible]
[illegible] [illegible] ও
[illegible] [illegible] কিছু অলঙ্কার।

চিঠিপত্র

চোখে আঙুল দাদা

'চোখে আঙুল দাদা' বোধহয় তাদেরই বলে, যারা নিজেরা ভালো কিছু করতে পারেন না এবং কাউকে ভালো কিছু করতে দেখলেই তাকে বক্রবিদ্রুপের তোড়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। ১৮ মে-র 'অমৃত'-এর পাতায় শ্রীপ্রভাত চৌধুরীর 'কিতাব'-এর সমালোচনাটি পড়ে হঠাৎ ঐ দাদাদের কথাই মনে পড়ল। সমালোচনাটি পড়ে প্রথমেই সন্দেহ জাগে লেখক চিত্রটি মন দিয়ে দেখেছেন কিনা, অথবা দেখলেও কতটুকু বুঝেছেন? সমালোচক মহাশয় অন্যান্য হিন্দি ছবির মতো 'কিতাব'কে একই ফর্মুলায় ফেলে সমালোচনা করতে গিয়েই সব তাল গোল পাকিয়ে ফেলেছেন। চিত্রে কাহিনীর যৌক্তিকতাকে না বুঝে উত্তমকুমার স্বাভাবিক নিয়মে ভাল চাকরি করেন' বা 'স্ত্রী যেহেতু বিদ্যা সিনহা, সেহেতু বিদ্যা সিনহা মডেলিং-এর কাজে যুক্ত' এই ধরনের বাসি বস্তাপচা বিদ্রুপগুলি ব্যবহার করে প্রভাতবাবু নিম্নমানের সমালোচনাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। উনি বোধহয় এটা খেয়াল করেননি যে পরিচালক প্লট দেখে অভিনেতা ঠিক করেন, অভিনেতা দেখে প্লট নয়। অন্তত এক্ষেত্রে যে তা করা হয়নি তা হলফ করে বলা যায়।

সমালোচনাটির কোথাও একবারও উল্লেখ করা হয়নি 'উত্তমকুমার' না 'মাস্টার রাজু'র অভিনয় কত সাবলীল হয়েছে বা সারা চিত্রটিতে ক্যামেরার কাজ কত সুন্দর। ভালকে যদি মন খুলে ভালো না বলতে পারলাম তবে সমালোচনা কেন? সমালোচনা মানে কি শুধু খুঁত ছেটানো।

সমালোচনাটির এক জায়গায় লেখা হয়েছে 'বাবলি আবার বাড়ি ফেরে'। কিন্তু চিত্রটিতে কোথাও দেখানো হয়নি বাবলি আবার একা দিদির বাড়ি ফিরে এসেছে। ছবিটিতে বাবলির দিদির বাড়ি থেকে পালিয়ে মায়ের কাছে ফিরে আসার পথটিকে অনেকগুলি ফ্লাশব্যাকের কম্পোজিশানে দেখানো হয়েছে। ঘটনাগুলি এতো সুন্দরভাবে সাজানো যে খুব বেশী অমনোযোগী না হলে অনায়াসেই কাহিনীর মূল সুরটি ধরে রাখা যায়। সমালোচক মহাশয় যদি ছবিটি একবার দেখেই সমালোচনা লিখতে বসে থাকেন তো ওনাকে অনুরোধ করব ছবিটি আর একবার দেখুন।

রঞ্জন বসু
ডি২৪।৩ পান্ডে ঘাট
বাঙালীটোলা,
বারানসী

কি বোঝাতে চেয়েছেন?

১৮ মে-র অমৃততে প্রকাশিত কাজল মিত্রর লেখা 'মহারানীর পয়লা প্রজা' লেখাটির জন্যে অমৃতের এক সাধারণ পাঠক হিসাবে শ্রীমিত্রকে ধন্যবাদ জানাই।

২৫ মে-র সংখ্যায় প্রকাশিত 'গোপাল দফাদার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও মহারানী স্বর্ণময়ী রচনার জন্য গৌরীশংকরবাবুকেও ধন্যবাদ।

রমেন দাসের লেখা 'সাড়ে ছয় কোটি শিশু স্কুলে যায় না' সম্বন্ধে আমার প্রশ্ন সাড়ে ছয় কোটি শিশু কেন স্কুলে যেতে পারে না সে ব্যাপারে কোন তথ্যই তিনি দিতে পারেনি। আমরা শুধু শ্রীদাসের লেখায় জানতে পারলাম যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ীতে ডেভিড হেয়ার সাহেবের তৈরী করে দেওয়া একটা দেওয়াল ঘড়ি টং টং করে বাজছে। তার সঙ্গে জানলাম শিক্ষামন্ত্রীর বিরাট বাসভবনের ইতিহাস। ওখানে শিশুদের সমস্যার প্রবেশ নিষেধ।

শ্রীদাসকে অনুরোধ জানাই, দয়া করে যে ব্যাপারে লেখা শুরু করবেন তার সমস্যা এবং সুরাহা নিয়েই করুন।

বন্ধু মাধব সরকার
বার্নপুর, বর্ধমান

॥ ২ ॥

২৫ মে সংখ্যার 'অমৃত'তে রমেন দাস মহাশয়ের লেখা সাড়ে ছয় কোটি শিশু স্কুলে যায় না পড়লাম খুব আগ্রহ সহকারে। প্রথমেই যে প্রশ্নটা মাথায় এলো তা হচ্ছে—ঐ শিরোনামায় রমেনবাবুর আসল বক্তব্য কি?

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ থেকে লেখার শেষ অব্দি যা বলতে চেয়েছেন তার সঙ্গে 'সাড়ে ছয় কোটি শিশু স্কুলে যায় না'র কোন সম্পর্ক আছে কি? তিনি লিখেছেন—

(১) ডেভিড হেয়ার সাহেবের তৈরি ঘড়ি,

(২) শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রর ঐতিহাসিক বাসভবন সেখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সুভাষকে সঙ্গে নিয়ে বসেছিলেন,

(৩) দেশবন্ধুর আমলে মন্ত্রীর ভবনটি ছিল বাঙ্গালীর রাজনৈতিক তীর্থস্বরূপ।

(৪) পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীরের এগার ক্যানিংের শিক্ষানীতি,

(৫) মিউজিয়াম অব ম্যান গড়ার পরিকল্পনা,

(৬) রামায়ণ - মহাভারতের বিখ্যাত চরিত্র ও কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের সাদৃশ্য ও সঙ্গতি সম্বন্ধে সরকারের আগ্রহ,

(৭) লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর ঐতিহাসিক সম্পদ স্বদেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ, ইত্যাদি।

যে কেউ লেখাটি পড়লেই বুঝতে পারবেন 'সাড়ে ছয় কোটি শিশু স্কুলে যায় না' কোন প্রবন্ধ হয়ে ওঠেনি, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে রমেনবাবুর নিছক সাক্ষাৎকার হয়ে গেছে।

কেন্দ্র টাকা দিতে চাইছে আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা নিতে চাইছে না—এ ব্যাপারে আমি আমাদের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবে ফুটপাতে স্কুল কলকাতা ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও আছে বলে শুনিনি।

পরিশেষে বলি 'সাড়ে ছয় কোটি শিশু স্কুলে যায় না'-এ তথ্যটি রমেনবাবু কিভাবে পেলেন জানতে ইচ্ছে করছে।

অরুণ অরুণাচলম
৪।৭।৭৯, নিউ ট্র্যাফিক
খড়গপুর, মেদিনীপুর

আশুবাবুর তুলনা নেই

প্রথমেই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সোনার হরিণ নেই প্রকাশ করার জন্য। আমার কাছে আশুবাবুর লেখার থেকে বড় আকর্ষণ আর কিছু নেই। স্কুল-জীবনে আমি প্রথম অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস নগরপারে রূপনগর পড়ি এবং তারপর থেকেই আমি অমৃত ও আশুবাবুর লেখার নিয়মিত গ্রাহিকা ও পাঠিকা। নগরপারে রূপনগরের জ্যোতিরানী আমাকে প্রথম আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিল। সোনার হরিণ নেই-র গায়ত্রী রাই-এর মৃত্যুতে আমার মনে হয়েছিল, আমারই বুঝি কোন আপনজনকে হারালাম। ভয় হয়েছিল গায়ত্রী রাই নেই, আর কি তেমন ভাল লাগবে? কিন্তু আমার সেই খেদ মুছে গেছে। ভাল লাগছে উর্মিলাকে, বাপীকে, রেশমাকে, আবু-দুলারীকে; আর সবচেয়ে ভাল লাগছে মিষ্টিকে। উর্মিলা আর আবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, মিষ্টি যে কত মিষ্টি তা বোঝাতে পারব না। প্রতিটি সংখ্যার জন্য একবুক অপেক্ষা নিয়ে বসে থাকি। কিন্তু অতটুকু লেখায় যেন মন ভরে না। আরো চাই, আরো চাই ভাব থেকে যায়। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের আদি আছে, অন্ত নেই রচনাটিও ভাল লাগছে। এর আগে ভাল লেগেছে শ্যামল গাঙ্গুলীর হাওয়া গাড়ি, বর্তমানে

সোনার হরিণ নেই এবং **আদি আছে অন্ত নেই** রচনা দুটিই অমৃতের সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ। এই দুটি রচনাই অমৃত-কে সমৃদ্ধ করেছে। **—শিবাণী দাস;** কনক বোসেস নিউ বিল্ডিং, পোঃ হাবড়া, ২৪ পরগণা।

(২)

প্রথমে আমার নমস্কার নেবেন, নমস্কার জানাবেন **সোনার হরিণ নেই**-র লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে, বাস্তবিকভাবেই যেভাবে তিনি একের পর এক বাধা কাটিয়ে বাপিকে সোনার হরিণের সন্ধান দিলেন, তা সত্যই অভাবনীয়। নিত্য-নতুন স্বাদের গল্প উপন্যাস-এর আশায় অমৃতের দীর্ঘায়ু কামনা করি। **—প্রণব চট্টোপাধ্যায়;** কাকগাছি, ভাণ্ডারহাটি, হুগলী।

দ্বারকানাথ ঠাকুরকে কতটুকু জানি

১৮ই মে অমৃতে প্রকাশিত মহাশ্বেতার **পয়লা প্রজা দ্বারকানাথের ব্যবসা বাণিজ্য** শীর্ষক নিবন্ধে শ্রীকান্ত মিত্র আমাদের বুদ্ধিজীবি পাঠককে স্বীকার করতে বাধ্য করেছেন—দ্বারকানাথ ঠাকুরকে কতটুকু জানি। প্রচলিত ধারণা এই যে, তিনি বিরাট এক ঋণভার রেখে যান, এবং পুত্র দেবেন্দ্রনাথ সেটা শোধ করেন। যার সহজ মর্ম এই দাঁড়ায় যে, তিনি ছিলেন প্রচণ্ড রকমের অমিতব্যয়ী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর পিতামহের বহুমুখী কর্মধারা ও চিন্তা-প্রবাহ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি সুবিচার করা হতো। বিলম্বিত হলেও লেখকের পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সার্থক বলে মনে করছি আর সেটি প্রকাশের জন্য অমৃত ধন্যবাদার্হ। **—দিলীপ-নারায়ণ দে,** ৪৬।১০ বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪।

বিবেচনা করবেন

দিনের পর দিন আপনারা অমৃত পত্রিকার মাধ্যমে যেভাবে বিভিন্ন স্বাদের উপন্যাস ও গল্পে পাঠকদের উপহার দিচ্ছেন, তাতে অমৃতের অনেক পাঠকের মত আমিও আনন্দিত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে ক্ষোভ না জানিয়ে পারছি না —তা হল একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের **চলবে**-র পরের পাতায় আর একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের অংশ ছাপানো হচ্ছে।

বর্তমানে যেভাবে বই-এর দাম বাড়ছে, তাতে আমাদের মত পাঠকদের কাছে বই কেনা স্বপ্ন দেখার মত অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

আমি আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক উপন্যাসগুলি কেটে বাঁধিয়ে রাখি। কিন্তু উপন্যাসগুলি যদি গায়ে গায়ে লাগিয়ে ছাপানো হয়, তবে তা কেটে বাঁধিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কেননা, তাতে একটি উপন্যাসের সংখ্যা কাটতে গেলে তার সঙ্গে আর একটি উপন্যাসের পাতা চলে আসে।

মাস দুই আগে আমার মত একজন পাঠক এই ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি চিঠি দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনারা যে কোন ব্যবস্থাই নেননি পরবর্তী সংখ্যাগুলিই তার প্রমাণ দিচ্ছে। আশা করব, আমাদের কথা আপনারা বিবেচনা করবেন। **—সুবীর লাহিড়ী,** সেণ্ট্রাল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া, মেদিনীপুর।

সম্প্রীতির অভাব নেই

নৌশাদ মল্লিকের লেখা 'আমরা মুসলমানেরা কেমন আছি' শীর্ষক প্রবন্ধের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এ. এফ. কাসরুদ্দিন আহমদ ক্ষোভ এবং দুঃখের সঙ্গে লিখেছেন অন্যেরা বিশ্বাসই করতে চান না যে, তাঁর মাতৃভাষা বাঙলা। তিনি চিঠির এক জায়গায় বলেছেন 'মুসলমানদের মাতৃভাষা যে বাঙলা হতে পারে এটা যেন অবিশ্বাস্য। আর মুসলমানরা যে বাঙালী হতে পারে তাও অনেকের জানা নেই। এ প্রশ্নও শুনতে হয়। আমি ভেবেছিলাম আপনি বাঙালী আপনি তাহলে মুসলমান। তা আপনি বাঙলা শিখলেন কি করে।'

যে ভাবেই এ ধারণা এবং অভিজ্ঞতা হয়ে থাকুক, পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন এলাকা বিহার, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি প্রভৃতি জায়গার বাঙালীদের মধ্যে দীর্ঘদিন মেলামেশা করেও আমার এ ধরণের অভিজ্ঞতা আজ পর্যন্ত হয়নি। মনে হয় তিনি যে কথাগুলো বলেছেন তা সম্পূর্ণ মনগড়া।

মুসলমানদের পালা পার্বন আচার ব্যবহার ও সামাজিকসমস্যা নিয়ে বেশী করে পত্র-পত্রিকাতে আলোচনা হলেই সম্প্রীতি বাড়তে পারে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির এতটুকু অভাব নেই। সত্যিকার যে অভাব আছে তা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যোগ্যতার অভাব।

নিজেদের অযোগ্যতার বোঝা অন্য সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলে মূলত তা হবে সম্প্রীতির উপরই আঘাত করা।

পশ্চিম বাঙলায় অনগ্রসর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের যে মমতা প্রেম প্রীতি ভালোবাসা সহানুভূতি রয়ে গেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি ভারতের আর কোন রাজ্যে ভিন্ন দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে তা নেই।

চারিদিকে যখন অভাব অভিযোগ এবং নানান সমস্যা তখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে মধ্যে সুখ-দুঃখ আলাদা করে দেখার কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।
নজরুল ইসলাম, ধুলা সিমলা, হাওড়া।

মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি

রমেন দাশ

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর চেয়ে বিরোধী নেতা জ্যোতি বসু সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশী পরিচিত। কারণ, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। চল্লিশ দশকের শেষে এদেশে কংগ্রেস রাজের প্রতিষ্ঠা। তারপর থেকেই ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে নানা সংগ্রাম, নানা আন্দোলন শুরু। সেইসব আন্দোলনের স্রোত ক্রমে নানা পথে, নানা খাতে প্রবাহিত হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই সেইসব আন্দোলন-সংগ্রামের পীঠস্থান ছিল পশ্চিম বাংলা, বিশেষ করে কলকাতা মহানগর। খাদ্য আন্দোলন, উদ্বাস্তু আন্দোলন, এক-পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন, গোয়া আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন। আন্দোলনের পর আন্দোলন এ রাজ্যের রাজনীতিকে বিভিন্ন সময়ে উত্তাল করেছে। ফলে রাজ্যরাজনীতিতে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা আর চাঞ্চল্য। আর সেইসব ঐতিহাসিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্বে যাঁরা থেকেছেন, শ্রীজ্যোতি বসু ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

চল্লিশ দশকের শেষে যে ইতিহাসের শুরু সত্তর দশকের শেষে তার সারা। এই তিন দশকে দেশের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। একদা সংগ্রামী বামপন্থীরা হয়েছেন ক্ষমতাসীন, আর দক্ষিণপন্থী ক্ষমতাসীন দল হয়েছেন বামপন্থী-বিরোধীদল। সেই সুবাদে রাজ্যের অন্যতম বিরোধী দলনেতা শ্রীজ্যোতি বসু এখন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী- ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্ল সেন, শ্রীঅজয় মুখার্জি এবং শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের উত্তরসূরী।

এ রাজ্যের মানুষ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে বিভিন্ন আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানাভাবে দেখেছেন। কখনও তিনি পুলিশ-বেষ্টিত- কারারুদ্ধ—হতবাক। কখনও ক্ষিপ্ত-ক্ষুব্ধ-দৃঢ়অঙ্গীকারবদ্ধ। কখনও আবার বাস্তবধর্মী অথচ আবেগপ্রবণ বক্তা। কিন্তু স্বল্পবাক জনপ্রিয় এই নেতার মুখে হাসি দেখার সৌভাগ্য কবে কজনার হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক বর্তমান। প্রবীণ সাংবাদিকরাও আড়ালে আবডালে এ-নিয়ে হিসাব-নিকাশ করেন। তবে সম্প্রতি, বিশেষ করে ১৯৭৭-এর পর, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর মুখে চাপা হাসির স্পষ্ট রেখা অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে। রাজ্য সরকারের নেতৃত্বে আসীন হওয়ার পর তাঁর দায়দায়িত্ব এবং কর্তব্য অনেকগুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সদাব্যস্ত এই মুখ্যমন্ত্রীর মুখে মাঝে-মধ্যেই প্রশান্ত হাসির রেখা উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ে।

গো-হত্যা প্রসঙ্গে বিনোবা ভাবের আমরণ অনশন এবং সরকারের নীতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। গুরুত্বের এই প্রসঙ্গে আলোচনার মধ্যে হঠাৎ তিনি হালকা মেজাজে নিজের টেবিল থেকে একটি উড়ো চিঠি তুলে ধরলেন। জনৈক উত্তর-প্রদেশবাসীর লেখা ঐ চিঠিখানি তিনি পড়তে লাগলেন। তাতে তাঁকে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, গোহত্যা বন্ধ করে আপনি যদি বিনোবাজীর জীবন রক্ষার ব্যবস্থা না করেন, তবে আপনাকে জবাই করে কবর দেওয়া হবে! আপনি নিজেই আপনার কবর খুঁড়ছেন ইত্যাদি।....মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি পড়া শেষ হল। সরস ভঙ্গীতে তিনি বললেন, ওরা আমায় জবাই করবে করুক। কিন্তু কবর দেবে কেন? আমাকে তো কবর দেওয়া চলবে না, বরং পোড়াতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এবার একটু বাঁকাহাসির রেখা ফুটল। তার রেশ টেনে আবার সরব হলেন। বললেন, ভদ্রলোকের হাতের লেখা বেশ ভাল। ইংরাজিও আমার চেয়ে ভাল জানেন। তবে বোধহয় তাঁর জানা নেই যে গরুকে আমরা গোমাতা বলে গণ্য করি না!

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম মহাকরণে তাঁর সুবিস্তৃত সুবিন্যস্ত কক্ষে। হালকা হলুদ কার্পেটে মোড়া মেঝে। চারদিকের দেওয়ালেও ঐ একই রঙের ছোপ। তাঁর সামনে দীর্ঘ একটি টেবিল। বাঁ-পাশে বসানো পাঁচ 'প্রিয়দর্শিনী', অর্থাৎ আধুনিক মডেলের একরাশ সুদৃশ্য টেলিফোন। কোনটা হালকা হলুদ রঙের, কোনটা আবার জলপাই রঙের। তারই একটা হঠাৎ বেজে উঠল। সম্ভবত কোন সহকর্মীর। ইঙ্গিতে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর ফোনের কথা সেরেই সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা : কী জানতে চান, বলুন?

: আপনি তো সুদীর্ঘকাল নানা গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তার নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রায় দু বছর হতে চলল মন্ত্রিসভায়ও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। উভয় ক্ষেত্রেই আপনি অভিজ্ঞ। নেতৃত্ব এবং মন্ত্রিত্ব—এই দুয়ের মধ্যে কোনটা আপনার বেশী প্রিয়?

মুখ্যমন্ত্রী আমার আচমকা এই প্রশ্নে এতটুকুও দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না। বরং মনে হল, এই প্রশ্নের জন্যই তিনি অপেক্ষা করছিলেন। চটপট তাই তিনি উত্তর করলেন : নেতৃত্ব এবং মন্ত্রিত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নেতৃত্ব দিতে না পারলে কোন আন্দোলন সফল হয় না। আর সফল আন্দোলন ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলও সম্ভব নয়। সুস্থ সবল এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ সম্ভব। আর সেই ক্ষমতার ভিতর দিয়ে আসে মন্ত্রিত্বের সুযোগ।

আমরা নানা আন্দোলন ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ক্ষমতার

এসেছি। জনগণ আমাদের সঙ্গে আছেন। মন্ত্রিসভায় ঢুকেও আমরা নেতৃত্বের দায়দায়িত্বের, অথবা গণআন্দোলনের কথা ভুলিনি। মান্ত্রি করছি ঠিকই। কিন্তু আমাদের মন্ত্রিসভায় নীতি-নির্ধারণের আগে আমরা বামফ্রন্টের পরামর্শ-সুপারিশ গ্রহণ করি। অতএব, মন্ত্রিত্ব এবং নেতৃত্বের মধ্যে তেমন কোন ফারাক খুঁজে পাই না। বরং বলা চলে একে অপরের পরিপূরক।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার আগে কংগ্রেসের নানা আন্দোলনের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য হলেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিকবৃন্দ যুক্ত থেকেছেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তো কংগ্রেসের সভাপতিত্বও করেছেন। আপনাদের দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ১৯৬৪ সালে। গত চৌদ্দ বছরে ঐ স্তরের কোনও শিল্পী-সাহিত্যিক কি আপনাদের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন?

উত্তর : পশ্চিম বাংলায় শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের পাশাপাশি শক্তিশালী এবং জীবনমুখী এক সংস্কৃতি আন্দোলন তৈরি হয়েছে। সেইসব শিল্পী-সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতিমান। অন্যদের খ্যাতি বা পরিচিতি আজ তেমন বিস্তৃত না হলেও তাঁদের মূল্যবান আবেদনে পার্টি তথা গণ-আন্দোলনগুলি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

প্রশ্ন : পশ্চিম বাংলার উল্লেখযোগ্য তিন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে একজন চিকিৎসক। বাকী দুজন ব্যবহারজীবী। আপনিও তার একজন। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় ব্যবহারজীবীর প্রাধান্য ছিল। আপনার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায়ও তাই। এর কারণ কি?

উঃ আমি ব্যারিস্টারি পাশ করেছিলাম বটে তবে কোনদিন কোর্ট চাপিয়ে আদালতে যাইনি। অতএব আমাকে ব্যবহারজীবী বলা চলে কিনা সেটা আমি জানি না। আমার মন্ত্রিসভায় ব্যবহারজীবীর প্রাধান্য রয়েছে, একথা আদৌ ঠিক নয়।

প্রশ্ন : আপনি এবং প্রমোদবাবু দীর্ঘদিন সি পি আই (এম) দলের নেতৃত্বে রয়েছেন। আপনারা দুজনই ষাট-উত্তীর্ণ। একটি দলকে শক্তিশালী এবং চলমান রাখতে হলে নেতৃত্বে তরুণশক্তিও অপরিহার্য। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের দলে উঠতি নেতৃত্বের সুযোগ আছে কি? সেই ধরনের নেতৃত্ববোধ কাদের মধ্যে আছে বলে আপনি মনে করছেন?

উঃ আমাদের দলে নেতৃত্বের পদে ওঠার সুযোগ সকলের জন্যই রয়েছে। নেতৃত্ববোধও বিভিন্ন স্তরে ভালভাবেই আছে।

প্রশ্ন : কংগ্রেসের প্রিয়-প্রদীপ-সুব্রত এবং আপনাদের দলের সুভাষ-দীনেশ-বুদ্ধদেবের মধ্যে, আপনার দৃষ্টিতে, মিল কোথায় এবং কতখানি?

উঃ কংগ্রেস এবং সি পি আই (এম)-এর ভেতরে ঠিক যতখানি, ততখানিই।

প্রশ্ন : আপনার দল ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে বিভিন্ন আন্দোলন অথবা সংগ্রামের ডাক দিতে গিয়ে সরকারের আমলা নির্ভরতার নানা সমালোচনায় এক সময় আপনারা সোচ্চার ছিলেন। ক্ষমতায় আসবার পর আমলা এবং দলীয় দাবীর সঙ্গে কি আপনাদের আপোষ বা সমঝোতা করতে হয়নি?

উঃ সরকারের নীতি নির্ধারিত হয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীদের দ্বারা। সরকারী কাঠামোর বাইরে থেকে বামফ্রন্ট এই মন্ত্রিসভাকে পরামর্শ দেয়। যে কোন মন্ত্রিসভাকেই তার অফিসারদের পরামর্শ এবং সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। তাই তাদের সঙ্গে বিরোধ বা আপোষের প্রশ্ন আসে না।

প্রশ্ন : অপারেশন বর্গার ফলে অনেক চাষী পরিবার বিপর্যস্ত হচ্ছে বলে অনেকে অভিযোগ করছেন। এবিষয়ে আপনার বক্তব্য জানতে পারি কি?

উঃ অপারেশন বর্গার ফলে অনেক চাষী পরিবার বিপর্যস্ত হচ্ছেন, আমার কাছে এধরনের কোন খবর নেই। কিন্তু এখানে ওখানে এরকম দু'একটি ঘটনা ঘটতে পারে। তবে এধরনের কোন ঘটনা সরকারের নজরে আনলে তার প্রতিবিধান নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে করা হবে।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী বললেন, পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার গরীব কৃষক ক্ষেতমজুর ও বর্গাদারদের স্বার্থে ভূমি সংস্কার ও গ্রামোন্নয়নের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়ণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামে গ্রামে বর্গা অপারেশনের কাজ চলছে। প্রকৃত বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করা হচ্ছে। তাঁদের চাষের নিরাপত্তা এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। ক্ষেতমজুরদের স্বার্থরক্ষার কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। এই কাজ ঠিকমত হলে চাষ ও চাষের জমি সংক্রান্ত জটিলতা থেকে কৃষক সমাজ নিশ্চয়ই রক্ষা পাবেন। প্রকৃত ভূমি সংস্কারের জন্যই এই প্রাথমিক কাজ দ্রুত করা দরকার। গত পঁচিশ বছরে ক্ষমতাসীন দল একাজ করেননি।

১৯৬৭ সালের নয় মাস এবং ১৯৬৯ সালের তের মাস এরাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন ছিলেন। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেও তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার ছয় লক্ষেরও বেশী একর জমি গরীব কৃষকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকে ঐসব জমি জোতদার ও গ্রামের ভূস্বামীরা গরীব কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়েছে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের পর বামফ্রন্ট বিরাট শক্তি নিয়ে পশ্চিম বাংলায় ক্ষমতায় এসেছেন। তারপরই এই সরকার কৃষি সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়েছেন। পঞ্চায়েতসমূহ, কৃষকসভা এবং মেহনতী মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় রাজ্য সরকার কৃষকদের সমস্যা সমাধান ও গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচী রূপায়ণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অবশ্য একাজে বাধাও প্রচুর। জোতদার, গ্রামের কায়েমী স্বার্থবাদী ব্যক্তিরা একাজকে সুনজরে দেখতে পারে না। তারা বাধা সৃষ্টি করবেই। অবশ্য এটা ঠিকই যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমূল ভূমি সংস্কার করা সম্ভব নয়। কিন্তু সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও রাজ্য সরকার গরীব মানুষ, শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের স্বার্থে কাজ করতে পারেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা সরকার পরিচালনা করছি।

স্বল্পবাক মুখ্যমন্ত্রী কথার চেয়ে কাজে বেশী আস্থাশীল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, যে ক্ষমতা তাঁর সরকারের হাতে আছে, তা দিয়েও সাধারণ মানুষের অনেক উপকার করা সম্ভব। হাজার সমস্যার সাগরে ডুবে থাকা মুখ্যমন্ত্রীকে ফের প্রশ্ন করলাম : ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জমিদারী উচ্ছেদ করেছিলেন। আপনারা ক্ষমতায় আসবার পর মোট উদ্বৃত্ত জমির কত ভাগ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করেছেন?

তিনি বললেন, এই মুহূর্তে তার শতকরা ভাগের সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ডাঃ রায়ের আমল থেকে এপর্যন্ত প্রায় এগার লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশ সাতাত্তর একর জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এবং তার পর থেকে তার মধ্যে প্রায় ছয় লক্ষ বার হাজার পাঁচশ ছয় একরের মত খাস জমি বিলি করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট আমলেই ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বিলির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। এছাড়া প্রায় এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার একর জমি এখনও ইনজাংশনে আবদ্ধ। আমাদের হাতে এখনও বিলিযোগ্য করার যোগ্য প্রায় নয় লক্ষ সাতান্ন হাজার পঁচাশি একরের মত জমি ন্যস্ত আছে। তার মধ্যে তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ একরেরও কিছু বেশী জমি অবিলম্বে বিলি করা সম্ভব।

প্রশ্ন: আপনার সরকার এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃ-

ত্বাধীন সরকারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায় এবং কতখানি?

উঃ আমাদের সরকার এবং ডাঃ রায় পরিচালিত কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে মৌলিক তফাৎ হচ্ছে, আমরা জনগণের স্বার্থে সরকার পরিচালনা করি। কিন্তু ডাঃ রায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসী সরকার যে কোন কংগ্রেসী সরকারের মতই কায়েমী স্বার্থের বন্ধু ছিল এবং তা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত হত।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন, এ রাজ্য থেকে কংগ্রেস মুছে গেছে? আপনি এখন এ রাজ্যে আপনাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বলতে কাকে মনে করেন, জনতাদল, না কংগ্রেস?

উঃ এরাজ্য থেকে কংগ্রেস মুছে গেছে তা আমি মনে করিনা। আমরা বরং শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে স্বৈরতন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে বারবার হুঁশিয়ার দিয়েছি। এ রাজ্যে আমাদের মূল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বলতে আমরা কংগ্রেসকেই বুঝি। যদিও আমাদের একুশ মাসের অভিজ্ঞতা আছে যে, রাজ্যস্তরে জনতা পার্টির এক বৃহৎ অংশের কাজকর্ম ও আচরণের সঙ্গে কংগ্রেসীদের ভূমিকার খুব একটা পার্থক্য নেই।

প্রশ্নঃ দায়িত্বহীন বিরোধিতা আর দায়িত্বশীল সরকারের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। আপনি বর্তমান বিরোধীদের তা বুঝাতেও চেষ্টা করেছেন। আপনি যদি আবার কোনদিন বিরোধীদলের নেতৃত্ব দেন, তখন কি দলের এবং আপনার পূর্বতন- ভূমিকার পরিবর্তন করাবেন?

উঃ আমরা অতীতে কখনও দায়িত্বহীন বিরোধিতা করিনি। ভবিষ্যতেও যদি বিরোধী দলে থাকতে হয়, ঐ ভূমিকা পরিবর্তনের কোন কারণ নেই। কেন্দ্রীয় সংসদেও আমাদের দল কখনও বিরোধিতা করেনি বা করছে না।

প্রশ্নঃ এক বছর আগে ঘোষনা করেছিলেন, চলতি বছরের গোড়ায় সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামো পরিবর্তন করবেন। তজ্জন্য একটি বেতন কমিশনও গঠন করেছেন। পূর্ব ঘোষনা ও প্রতিশ্রুতি পালনে কতখানি এগিয়েছেন? জাতীয়স্তরে বেতন কাঠামো তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন কি?

উঃ পে-কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার আগে এবিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। এরাজ্যে পে-কমিশন গঠন করা হয়েছে, এরাজ্যের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে। অন্য কোন কারণে নয়। এখানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার উন্নতি হলে সারা ভারতে সরকারী কর্মচারী আন্দোলনে যদি উৎসাহের সৃষ্টি হয়, তা হলে তো সেটা আনন্দেরই কথা।

প্রশ্ন ঃ বহু নিন্দিত নিবর্তনমূলক আইন আবার চালু করে আইন শৃংখলার উন্নতির কথা ভাবছেন কি?

উঃ নিশ্চয়ই না। আমরা সব রকম নিবর্তনমূলক আইনের বিরোধী। বামফ্রন্ট সরকার কখনও এই ধরনের আইন প্রয়োগ করেনি, বা করবে না।

শিক্ষাক্ষেত্রের অরাজকতা অবস্থা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করতে হবে। শিক্ষার আরও প্রসার হোক। কিন্তু শিক্ষার ভিত যদি শক্ত না হয়, তবে শিক্ষাভাব নিরর্থক হতে বাধ্য। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শতকরা সত্তর-আশী ভাগ পরীক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ হয়, সেই শিক্ষায় স্বার্থকতা কোথায়? সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে আর তারপর শিক্ষা ব্যবস্থা পাল্টানো হবে, তা হতে পারে না। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের আশায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে অচল করে রাখা যায় না। এজন্য সকলকে একযোগে প্রয়াসী হতে হবে।

কয়েক বছর আগে বিভিন্ন পরীক্ষায় গণ টোকাটুকি চালু করার জন্য তদানীন্তন সরকার ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলির যোগসাজসে সুপরিকল্পিতভাবে গণ টোকাটুকি আমদানি করা হয়। সেটা কেবল এরাজ্যে নয়—গোটা দেশেই করা হয়েছিল। এখন অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হওয়ার আগেই এটা বন্ধ করা যায়। এব্যাপারে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। শিক্ষার্থী-শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গণ সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনাক্রমে বিষয়টির সমাধান করতে চাই।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে নৈরাজ্য চলে আসছে। অবস্থার পরিবর্তন হলেও, আমার কাছে খবর আসছে, ছাত্রছাত্রীরা কলেজে না গেলেও নাকি অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট নিয়ে পরীক্ষায় বসতে পারছে। কলেজে শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক উপস্থিতি থাকবে না, এটা কেমন কথা। অন্যদিকে ছাত্রদের অভিযোগ, অধ্যাপকরা ঠিকমত ক্লাশে আসেন না এবং সিলেবাসও শেষ হচ্ছে না। সিলেবাস সম্পূর্ণ না হলে ছাত্ররা পরীক্ষা দেবে কি করে? এছাড়া সিলেবাসের বোঝাও বেশী। ফলে ব্যাপক হারে ছাত্রছাত্রী ফেল করছে। এ অবস্থা বেশীদিন চলতে দেওয়া যায় না। এই অরাজক অবস্থা দূর করতে আমরা সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা চাই।

প্রশ্ন ঃ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যদি জনতা সরকারের বিভিন্ন নীতিকে জনবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যা দিয়ে কোন আন্দোলনে আপনাদের সহযোগিতা চান, আপনারা তাতে সাড়া দেবেন কি?

উঃ শ্রীমতী গান্ধী আপাতত যে সমস্ত কাজকর্ম করছেন, তাতে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার অবকাশ বা ক্ষেত্র নেই।

প্রশ্ন ঃ জনগণের ভোটে নির্বাচিত শ্রীমতী গান্ধীকে লোকসভা থেকে বহিস্কার করে জনতা সরকার কি প্রকারান্তরে জনমতকে অগ্রাহ্য করেননি? জনমত অগ্রাহ্যকারী সরকারকে আপনারা কতখানি গণতন্ত্রে আস্থাশীল বলে মনে করেন?

উঃ এসম্পর্কে আমাদের পার্টি আগেই সুস্পষ্টভাবে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ একদা ইন্দিরা সেবক বলে পরিচিত জনৈক সদস্য এখন আপনার মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী। আপনার দল ও সরকারের সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর রাজনৈতিক চিন্তা ও মানসিকতার সাদৃশ্য কতখানি?

উঃ আমার মন্ত্রিসভায় ইন্দিরার কোন সেবক নেই। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোক আছেন। কিন্তু ছত্রিশ দফা কর্মসূচীর প্রতি সকলেই অনুগত। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের দলের বা অন্য দলের কোন মন্ত্রীর সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে চিন্তার বা মানসিকতার কোন বিরোধ আমার চোখে পড়েনি।

প্রশ্ন ঃ আপনার মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রী অতি সম্প্রতি হালিশহরে আনন্দময়ী মা'র শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

সঙ্গে সরকারী গাড়ি এবং নিরাপত্তা পুলিশও ছিল। প্রভাবশালী বামপন্থী সরকারের নীতির সঙ্গে এই মন্ত্রীদের মানসিকতা ও কার্যকলাপের মিল কতখানি?

উঃ এই অভিযোগ এতই অনির্দিষ্ট যে, এর কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ সারা দেশে অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দল জনতা-রাজনীতিতে অস্থিরতা ক্রমবর্ধমান। কখনও যদি কেন্দ্রীয় সরকারের পতন ঘটে এবং রাষ্ট্রপতি শাসন এড়াতে জনতার একাংশ ও ইন্দিরা

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রশ্ন দেখা দেয়, তাতে আপনারা সাড়া দেবেন কি?

উঃ এই প্রশ্নটি একান্তই অনুমান সাপেক্ষ। কাজেই এর কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কোন অবস্থাতেই ইন্দিরা কংগ্রেসের সংগে কোন সহযোগিতার কথা আমরা ভাবছি না।

প্রশ্ন : জনতা নেতা এবং সংসদ সদস্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিম বাংলায় সন্ত্রাস এবং নৈরাজ্যের অভিযোগ তুলে জাতীয়তাবাদী এবং প্রগতিশীল শক্তি ও ব্যক্তিদের নিয়ে বামফ্রন্ট বিরোধী ফ্রন্ট করে আপনার সরকারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক তীব্র আন্দোলনের শপথ ঘোষণা করেছেন। এব্যাপারে তিনি অনেকখানি অগ্রসরও হয়েছেন। তাঁর এই আন্দোলনের মোকাবিলা আপনি কীভাবে করবেন, রাজনৈতিকভাবে, না প্রশাসনিক শক্তির সাহায্যে?

উঃ প্রফুল্লবাবু আমাদের বিরুদ্ধে কমন ফ্রন্ট করছেন করুন। আমাদেরও জনগণের ফ্রন্ট আছে। ওঁদের কথা ওঁরা বলবেন। আমাদের কথাও আমরা বলব। এটাই তো ডেমোক্রেসি।

জ্যোতিবাবু একটু আনমনা হলেন। তারপরই চটপট আবার উত্তর করলেন, আমরা রাজনৈতিকভাবেই তার মোকাবিলা করব। সে শক্তি ও সংগঠন আমাদের আছে। পুলিশ দিয়ে কোন আন্দোলন দমন করার নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই। সুতরাং প্রস্তাবিত ঐ আন্দোলন মোকাবিলা করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা এই মুহূর্তে ভাবছি না।

প্রশ্ন : ক্ষমতাসীন হয়ে আপনি বলেছিলেন, পূর্ববর্তী কংগ্রেসী সরকারের কাছ থেকে অন্যান্য বিষয়ের সংগে বিদ্যুৎ সংকটের বিষয়টিকেও আমাদের উত্তর দায় হিসাবে গ্রহণ করতে হয়েছে। দুই বছর আপনারা ক্ষমতার আসনে আসীন। আপনাদের আমলে বিদ্যুৎ সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এরপরও কি আপনি বলবেন, বিদ্যুৎ সংকটের এই দায়দায়িত্ব সবই সাবেকী সরকারের?

উঃ পূর্বসূরীদের মধ্যে দূরদৃষ্টির যে অভাব ছিল তার ফলেই পশ্চিম বাংলার চাহিদা মত বিদ্যুৎ উৎপাদন এখনও সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া ঐ আমলে দামী দামী সব প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণও পুংখানুপুংখ পরীক্ষার দিকটা নিদারুণভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল।

হ্যাঁ, আমাদেরও কিছুটা দুর্বলতা আছে বা ছিল। সেই ঢিলেঢালা ভাব কাটিয়ে সবরকম দুর্বলতা দূর করতে আমরা সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছি। নানা কার্যক্রমও গ্রহণ করেছি এবং করছি। বিদ্যুতের অভাবে রাজ্যের কৃষি-শিল্প-উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অর্থনীতিও দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু এই মুহূর্তেই তো এই সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা করছি, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি এই সমস্যা সমাধান করতে। এর জন্য সকলের সহযোগিতাই বাঞ্ছনীয়।

প্রঃ আপনি কি বিদ্যুৎ দপ্তরের জন্য কোনও রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগের কথা ভাবছেন?

উত্তর : মন্ত্রী নিয়োগ করলেই কি এই সংকট-সমস্যা দূর হয়ে যাবে? কেউ কেউ বলছেন, বিদ্যুতের জন্য আলাদা একজন মন্ত্রী দরকার, কেউ বলছেন শ্রমিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে, আবার অনেকের সুপারিশ, শ্রমিকদের সংগে বসে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর সূত্র বার করতে। অনেকেই অনেক কথা বলছেন। আমরাও বসে নেই। আলাপ-আলোচনা ভাবনা-চিন্তা চলছে। তবে মন্ত্রী নিয়োগ করলেই এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি মনে করি না।

প্রশ্ন করলাম, আপনাদের দল সি পি আই (এম)-এর শীর্ষ নেতৃত্ব পলিটব্যুরো। আপনি নিজেও পলিটব্যুরোর একজন সদস্য। পলিটব্যুরোর সর্বমোট সদস্য সংখ্যা কত?

উঃ পলিটব্যুরোর সদস্য সংখ্যা এগারো।

প্রশ্ন : আচ্ছা, ঐ এগারজন সদস্যের মধ্যে কতভাগ নিম্ন-বিত্ত, চাকুরীজীবী, কৃষক এবং শ্রমজীবী তা অনুগ্রহ করে জানাবেন কি?

মুখ্যমন্ত্রী এবার যেন একটু থমকে গেলেন। তারপর স্বভাবসুলভ ভংগীতে বললেন, এইতো আমি একজন পলিটব্যুরোর সদস্য। আমি নিজেও তো শ্রমিক কৃষক অথবা চাকুরীজীবী নই। আর কেউ আছেন বলেও আমার জানা নেই।

ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় ছটা। মুখ্যমন্ত্রী একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। বুঝলাম, তাঁর পরবর্তী কর্মসূচীর জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সবিনয়ে বললাম, অনুমতি করলে আজকের মত আমি আমার শেষ প্রশ্ন রাখতাম।

সংগে সংগে উত্তর বললেন আর কী জানতে চান?

বললাম : বিশ্ব ব্যাংকের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রতিবাদে আপনারা একদা রাজনৈতিক প্রচার করেছিলেন। বিশ্ব ব্যাংকের চেয়ারম্যান মিঃ ম্যাকনামারা কলকাতা সফরে এলে 'গো ব্যাক ম্যাকনামারা' শ্লোগানও তুলেছিলেন। অথচ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বিশ্ব ব্যাংকের সংগে আপনারা যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। আপনাদের আমলেও বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিরা পর পর কয়েকবার কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ সফর করে গেলেন। এখনও বিশ্ব ব্যাংক এ রাজ্যের উন্নয়নে অর্থ যোগান দিয়ে চলেছেন। এবং আপনার সরকার তা গ্রহণও করছেন। সেদিনের বিশ্ব ব্যাংক এবং আজকের বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যে কি কোনও মৌল পরিবর্তন দেখতে পেয়েছেন?

মুখ্যমন্ত্রী হয়তো এধরনের প্রশ্নবাণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। তারপর শান্তভাবে বলে চললেন, বিশ্ব ব্যাংকের কাছ থেকে এই টাকা আমরা সরাসরি নিই না। এদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমাদের সাবধান থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য নানা প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেইসব প্রকল্প পরিকল্পনারই এটা একটা অংশ স্বরূপ। কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ অনুদান এনে তা সারা দেশে ছড়িয়ে দেন। বিশ্ব ব্যাংকের টাকা ঐভাবেই আমরা পাচ্ছি।

মুখ্যমন্ত্রী একটু থামলেন। তারপরই একটু আনমনা। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার সরব হলেন। বললেন, হ্যাঁ, আমরা বিদেশী কোন রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহের ঢালাওভাবে কোন প্রতিবাদ জানাইনি। আমরা বারবার বলেছি, এবং আজও বলছি বিদেশী রাষ্ট্র বা বিদেশী কোন সংস্থার সাহায্য গ্রহণে রাজী আছি, যদি সেই সাহায্য এই রাজ্যের জনগণের স্বার্থের অনুকূল হয় এবং সেটা যদি হয় শর্ত বিমুক্ত।

দৃষ্টি

দীপঙ্কর দাস

হাসপাতালের গেটের সামনে এসে নলিনী দেখল বৌবাজারের মোড় থেকে এতটুকু রাস্তা হেঁটে আসতে সে একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছে। এবং এই শেষ ফেব্রুয়ারীর অন্তরঙ্গ বিকেলে যখন সবে মাত্র দিক-ফেরান বাতাস দক্ষিণ-সাগরের আর্দ্রতা নিয়ে বইতে শুরু করেছে শহরটার ওপর দিয়ে—তখন এইটুকু রাস্তা অনর্থক ঘোড়ার মত দৌড়ে সে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়ে ফেলেছে। 'এতটা অস্থিরতার পেছনে কোন যুক্তি নেই।'...নলিনী গেটের সামনে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। তারপর হাসপাতালের গেট ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকল।

আজ দিন-কতক ধরে নলিনী এইরকম অস্থিরতায় আক্রান্ত। ভেবে দেখেছে এসবের পেছনে সবটাই সম্পর্কের টান নয়। বুড়ো বাবা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আজ দিন বার হয়ে গেছে। তেমন কোন জটিল রোগটোগও নয় যে, 'বাঁচবে কি বাঁচবে না'-জনিত আতঙ্ক আর উদবেগের দোলায় সর্বক্ষণ দুলতে হবে। কেবল চোখের একটা সামান্য অপারেশন, এতদিনে অপারেশনটা হয়ত হয়ে যেত। এবং তার বাবাও হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে আসতেন। কেবল রক্তচাপে সামান্য গোলযোগ ঘটায় অপারেশান স্থগিত রাখতে হয়েছিল, আজ সকালেই অপারেশন হয়ে গেছে। ফলাফলটুকু জানা যায়নি, এই যা। তাই নলিনীর পক্ষে কোন মতে সম্ভব নয় যে সে দাবী করতে পারে তার এই দমচাপা ছটফটানির পেছনে কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ আছে। তবু নলিনী কদিন থেকে কিছুতে স্থির হতে পারছে না। এক ধরনের শিশুসুলভ কৌতূহল তাকে সব সময় গ্রাস করে রেখেছে। ঘরে, বাইরে এমন কি রাতের ঘুমের মধ্যেও হঠাৎ তার মনে হচ্ছে, কারা যেন তাকে একলা ফেলে কোথাও দারুণ উৎসবে কিংবা একান্ত শোকময় নিস্তব্ধতায় ডুবে যাচ্ছে। সে হাত বাড়িয়ে কাউকে কাছে-পিঠে খুঁজে পাচ্ছে না।

রেণুকেও যেন আজ কদিন থেকে ছুঁতে পারছে না নলিনী। আর তার চার বছরের ছেলে বাচ্চুকে ত' নলিনীর মনে হচ্ছে,—সে বুঝি অন্যকোন গ্রহ থেকে তার পাশে এসে শুয়ে পড়েছে। আর একটু পর তাকে একলা রেখে চলে যাবে। রেণু যদিও নলিনীর এই আকস্মিক পরিবর্তন খুব মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছে। তবু তেমন কোন পার্থিব অর্থ আবিষ্কার করতে না পেরে মনকে বুঝিয়েছে এই ভেবে যে যেহেতু শ্বশুরমশাই এখন হাসপাতালে এবং চোখের অপারেশন হবে, তাই নলিনী এখন একটু মন খারাপ করে আছে।—আহা নলিনীর বাবা অন্ত প্রাণ।

কিন্তু নলিনীর কাছে সমস্যাটা অন্য জায়গায়। নলিনীর বাবার চোখের দৃষ্টি আজ বেশ কিছুদিন থেকে ফিকে হয়ে গিয়েছিল। চোখে বলতে গেলে কিছুই দেখতেন না। তার ওপর সেবার যেদিন নলিনীর ছোটভাই কিশোরের মুণ্ডুবিহীন দেহটাকে আশ্চর্যজনকভাবে বোসপাড়ার পুকুরঘাটার জঙ্গল থেকে পুলিশ খুঁজে বের করে নলিনীদের বাড়ির দাওয়ায় নামিয়ে রেখে তার বাবাকে ধরে এনে জিজ্ঞেস করেছিল—'দেখুনতো' আপনার ছেলে কিনা!' —সেদিন সেই গনগনে দুপুরের রোদেও নলিনী শুনেছিল বাবার ভাবলেশহীন উত্তর, —'কৈ, কিছুত' দেখি না।'

হ্যাঁ, মনে আছে নলিনীর,—এরপর বাবার চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে বাবা ঘরেই বসে থাকেন। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটাচলা যদিও করেন কখন-সখন, তবু পা ফেলার মধ্যে বেশ বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। এবং নলিনী বুঝে উঠতে পারে না এই পদক্ষেপের ছন্দহীন অন্তরায় পেছনে কেবল চোখের দৃষ্টিহীনতাই একমাত্র কারণ কিনা। তবু চেষ্টা করেছে চিকিৎসার,—তার সীমিত সাধ্যের মধ্যেই।

হাসপাতালের আউটডোরে মাসের মধ্যে দুদিন বুড়ো বাপকে পাশে নিয়ে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর-দর্শনের মত বুক ঢিপ-ঢিপ করা উত্তেজনায় অপেক্ষা করেছে কখন ডাক্তারের ডাক পড়বে। ডাক পড়া মাত্রই নলিনীর গলা দিয়ে এমন এক অমানুষিক সুরে, 'বাবা চলে এস' কথাগুলি উৎসারিত হয়ে এসেছে যে সেই শব্দে কেবল ঐ ডাক্তার কিংবা তার সাকরেদ তরুণ ঘর্মাক্ত মুখের হাউস-স্টাফটিই নয়, স্বয়ং নলিনী পর্যন্ত ক্ষণিক বিব্রত হয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখে নিয়েছে চারপাশ। যেন ঐ আই-ওয়ার্ডের ঘরের কোন দুজ্ঞের কোণ থেকে কিংবা খোলা জানলা দিয়ে নিছক কৌতুক করার অভিলাষে যে এক খণ্ড প্রথম সকালের মন্থর আকাশটুকু উঁকি দিয়ে আছে,—তার বুকে কোথাও স্ফুরিত হয়ে উঠেছে ঐ শব্দ কটা—'বাবা চলে এস।'

লজ্জা পেয়েছে নলিনী। কারণ তার মনে হয়েছে কথাগুলি বড় অদ্ভুতভাবে দ্বিতীয় কোন ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।—'বাবা চলে এস।'—অর্থাৎ 'বাবা এখান থেকে চলে এস।' —যেন অনেকটা অন্য কোন গ্রহের ডাকের মত। অথচ নলিনী সামান্য সাদামাটা মানুষ। এতবড় ডাক দেয়াটা তার পক্ষে শোভন নয়। তাই লজ্জার অপ্রতিভ অবস্থা কাটিয়ে তোলার জন্য ডাক্তারের ঈষৎ বিব্রত মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে স্বচ্ছ হাসি হাসতে গিয়ে প্রায় কান্নার মত করে বলে ফেলেছে।—

—'চোখে দেখতে পায় না ত',
—'কে দেখতে পায় না, আপনি
—'নাহ্।'
—'বাবা।'

—'পেশেন্টকে আসতে বলুন।'

এরপর নলিনী দ্বিতীয়বার [illegible] পড়েছে। সত্যি ত' সবটাই হ্যাংলা[illegible] না। সে বাবাকে ডাক্তারের সামনে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

'দেখি এদিকে চোখ ফেরান।' অভিজ্ঞ ডাক্তার বাবার সাদা-কালো খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঢাকা রুক্ষ চিবুকে আঙুলের নিপুন টোকা দিয়ে গোটা মাথাটাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে খোলা দুই চোখের ওপর টর্চের আলো ফেলে গভীর মনযোগ নিয়ে কিসব দেখতে দেখতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছেন—'দেখুন ত' কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে নলিনীর কানে আবার ভেসে উঠেছে সেই ছ'বছর আগে কিশোরের মুণ্ডহীন দেহটা সামনে রেখে থানার দারোগাবাবুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর—'দেখুন ত' আপনার ছেলে কিনা?'

বাবা মৃদু স্বরে ঘাড় নেড়েছেন—'নাহ্, কিছুই দেখি না।'

—'একদম কিছু না?...সামান্য আলোর রশ্মিও না?' ডাক্তারের তীব্র প্রশ্নের মুখে নলিনীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। সে একগলা তৃষ্ণা নিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন একসময় শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে ফেলেছে।

বাবা তেমনি ধীর গলায় আবার বলেছেন—'নাহ্, কিছু না।'

ডাক্তার হতাশ হয়ে দম ছেড়ে বলেছেন, 'ঠিক আছে। আপনি বসুন গিয়ে।' এবং পরমুহূর্তে নলিনীর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, —'কবে থেকে?'

—'ঐ যেদিন ওরা কিশোরকে খুন করল।' নলিনী যন্ত্রচালিতের মত উচ্চারণ করেছে।

—'আমি আপনার ডাইরি লিখতে বসিনি।' ডাক্তারের গলায় বিরক্তির ঝাঁঝ লঙ্কা-বাটার মত নলিনীর বাড়ানো জিভে এসে জড়িয়ে গেছে,—'আপনি টাইম স্প্যানটা বলুন।'

—'ছ' বছর।'

—'এতদিন কি করছিলেন?'

নলিনী অসহায় দৃষ্টি তুলে ডাক্তারের গম্ভীর মুখ দেখেছে। ডাক্তার চোখ সরিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে গড় গড় করে বলেছেন,—'আশ্চর্য মানুষ আপনারা। সময় থাকতে কোন মেজার নেবেন না, খালি গড়িমসি।' এবং কথার অন্তে নলিনীর ভাবলেশহীন অস্তিত্বের দিকে দারুণ অবজ্ঞায় মুখভঙ্গি করে প্রেসক্রিপশনটা এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, —'একটা ড্রপ রইল। দিনে চারবার লাগাবেন —পনের দিন। তারপর আবার রিপোর্ট করবেন।'

পনের দিন পর নলিনী কিন্তু অনেকখানি ধাতস্থ হয়ে গেছে। আর কোন গ্রামীণ হ্যাংলামোপনা নয়। নিভাঁজ সপ্রতিভতা নিয়ে আউটডোরে হাজির হয়েছে। ডাক্তারের ডাক পড়তেই বাবাকে এগিয়ে দিয়েছে। ডাক্তার আবার বাবার খোলা চোখের ওপর টর্চ ফেলে পর্যবেক্ষণের কাজ সেরে নলিনীকে বলেছেন,—'রেটিনা কনজেশসন বুঝলেন? অপারেশন করলেও দৃষ্টি যে আবার ফিরে আসবে, কোন গ্যারান্টি নেই। ভেবে দেখুন কি করবেন।'

নলিনীর মনে হয়েছে, তার পায়ের তলার মাটি সামান্য ফাঁক হয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল। দোলাটুকু সামলে উঠে সে চোখ ফিরিয়েছে ডাক্তারের ঠিক মাথার ওপর ঘুরন্ত ফ্যানটার দিকে। আর তখনই নজরে পড়েছে সদ্য সমাপ্ত 'অন্ধতা নিবারণী সপ্তাহ' উপলক্ষে লিখিত সাদা সালুর ওপর ফেস্টুন,—ক্রিমসন রেডে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা—'অন্ধতা জাতির শত্রু।' নলিনী বিহ্বল হয়ে পড়েছে। সমস্ত ঘটনা ও পরিবেশের মধ্যে এখন এক দ্যোতনা আবিষ্কার করে ফেলেছে সে বিহ্বলতার রেশ কাটিয়ে উঠতে তার কিছুটা সময় লেগেছে। তারপর আবার অস্ফুট উচ্চারণে আহ্বান জানিয়েছেন,—বাবা চলে এস।'

শিয়ালদহ থেকে সোদপুর, বিদ্যুৎচালিত রাণাঘাট লোকাল বড় দ্রুত রাস্তাটা পেরিয়ে যায়। কোন কিছু ঠিকঠাক ভাবা যায় না। কেবল বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ট্রেনের জানলা দিয়ে মাঝদুপুরের জ্বলন্ত আকাশের গায়ে পাক খাওয়া চিল দেখতে দেখতে নলিনীর বুকের মধ্যে আশ্চর্য ট্রেন হুইশেল দিয়ে উঠেছিল,—অন্ধতা জাতির শত্রু।'

'কিশোর কেন খুন হল রে নলিনী? ...'কিশোর যে দেখতে চেয়েছিল বাবা।'.. চলন্ত ট্রেনের চাকার ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে নলিনী আধোঘুম, আধো-জাগরণের মধ্যে শরীর দোলাচ্ছিল। আর ভাবছিল-কিশোরের মত একজন তরুণের বেঁচেবর্তে থাকার রাস্তাটাকে চোখ খুলে দেখতে শেখার চেষ্টার সঙ্গে 'অন্ধতা জাতির শত্রু —এই শ্লোগানের সম্পর্ক কতখানি। এবং পরিণামে খুন হয়ে যাওয়াটা ঠিক ঠিক চিকিৎসা কিনা।

সে যাই হোক, সিদ্ধান্তটা নলিনীকেই নিতে হয়েছিল। এ যেন একরকম গোঁ। বাবার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার দায় যেন কেউ নলিনীর ঘাড়ে দিয়েছে। দীর্ঘ ছ' বছর যে মানুষটা দৃষ্টিহীন অবস্থায় কাটিয়ে এলেন এবং যে মানুষটা এত প্রতিকূল পৃথিবীতে আশ্চর্য কোন অলৌকিক পদ্ধতিতে গত অঘ্রানে সত্তর বছরের সময়সীমা অতিক্রম করে গেছেন,—তার চোখে আবার দৃষ্টি ফিরে আসা আর না আসায় বিশেষ যে কিছু তারতম্য ঘটবে না, এ-সত্য নলিনীর কাছে অজ্ঞাত না হলেও নলিনী দিন দিন একরোখা হয়ে উঠেছে। আগে থেকে চিকিৎসা করান হয়নি। ঠিক সময়ে সাবধানতা গ্রহণ করলে হয়ত এই বিপর্যয় এড়ান যেত। এবং বাবার বড়ছেলে হওয়ার দরুণ নলিনীর কিছু দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে। সেই দায়িত্ব যথাযথ পালন না করার অনুতাপও যথেষ্ট জেগেছে তার বুকের মধ্যে। কিন্তু সবটাই এদিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। নলিনীর এই একরোখা হয়ে ওঠাটা যেন তার চারপাশের বিরুদ্ধগামী সময় স্রোতের মুখোমুখি কোমর কষে দাঁড়িয়ে পড়া। বাবার চোখের দৃষ্টি যেন শারীরিক কারণেই যায়নি। ঐ দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে অন্য কেউ, অন্য কারা। নলিনী তাদের চিনতে না পারলে-ও এখনই থামতে চায় না।

রেণু বলেছিল,—'কেন আর বুড়ো মানুষটাকে কষ্ট দিচ্ছ। ডাক্তার যখন বলেছেন অপারেশন করলেও কোন লাভ নেই, তখন আর মিছিমিছি ঝুঁকি বাড়িও না।'

—'কোন লাভ নেই বলেনি। বলেছে কোন গ্যারান্টি নেই।' নলিনী ঝাঁঝ করে উত্তর দিয়েছে।

—'ঐ হল। ডাক্তাররা সোজা করে কথা বলে না, ঘুরিয়ে বলে।'

নলিনী উত্তর দেয়নি। এনিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ কথা বাড়াতে চায়নি।

'রেটিনা কনজেশসন'—চোখের এই অশ্রুত রোগটির গুরুত্ব কতখানি নলিনী ভেবে দেখতে চেয়েছে। এবং বলাইতো খেই হারিয়েছে। এই রেটিনা কি কেবল অক্ষি-গোলকের অভ্যন্তরে কোন জটিল কোণে স্থাপিত, নাকি অন্য কোথাও,—ঠিক বুকের মাঝখানে, যেখানে দুটি ফুসফুস এসে মিলেছে? আর ঐ রেটিনায় কনজেশসন ঘটে না কখনও?...প্রশ্ন আর প্রশ্ন। নলিনীর হাই ওঠে।

—'নারে নলিনী এই ত' বেশ আছি। তুই ত' কম করলি না। এখন আর কাটা-ছেঁড়ার কি দরকার?' অফিস-ফেরতা ক্লান্তি আর অবসাদ কাটিয়ে নলিনী বাবার ঘরে ঢুকেছে। আধো অন্ধকারময় ঘরের নিরুত্তাপ আবহাওয়ায় বাবা উদাস গলায় থেমে থেমে জানিয়েছেন তাঁর মতামত। বাবার সামনে নিচু মোড়ায় হাঁটু ভেঙে বসে থাকতে থাকতে নলিনীর মনে হয়েছে তার পিঠের ডান ধার দিয়ে বুঝি একটা তেলপোকা

সুড়-সুড় করে উঠে যাচ্ছে।—'বাবা কি তবে পালাতে চান? নলিনী ঈষৎ বিস্ফারিত চোখ জোড়া ক্ষণিকের জন্য তপ্ত করেই পরমুহূর্তে চোখের পাতা বুজিয়ে উত্তাপের স্নেহ-স্পর্শ উপভোগ করতে করতে বলেছে—'একবার দেখি না চেষ্টা করে?'

—মিহিমিহি কণ্ঠ। ধরচাপাতি,—তোর সংসারে ধাড়তি চাপ। তার চেয়ে ওসব ছেড়ে দে। অনেক ত' দেখলাম। এখন দেখা না দেখা দুই সমান।'

নলিনী বাবার মুখ দেখেছে ঘরের বাইরে উঠোন,—উঠোনের এক পাশে একশ দশ ফুট-এর টিউব-ওয়েল। শীত কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই জলে টান ধরেছে। রেণু সেই টিউবওয়েল টিপে জল তুলছিল। টিউবওয়েলের হাতল ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে রেণুর প্রায় এ্যানিমিয়াক ফ্যাকাসে শরীর ঝড়ে দোলখাওয়া কলাগাছের মত দুলছিল সমানে। সেই দিকে তাকিয়ে নলিনীর মনে হচ্ছিল বাবার কাছে এখন দেখা না দেখা দুই সমান হয়ে গেল কেমন করে? বাবা কি দেখতে পাচ্ছেন এখন ঐ রেণুকে? কলটেপার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় পাইপ ঠেলে পাতালের যতখানি জল উঠছে তার চেয়ে চোদ্দ-গুণ বেশি বুকের বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে রেণুর পায়রার মত বুকের খাঁচা ছেড়ে। এই ছবি কি বাবা দেখছেন? নাকি দেখতে চান না বলে এই অন্ধকার আশ্রয়ে আত্মগোপন করা? ঠিক এই সময় নলিনীর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে,—'তুমি আর কি দেখলে বাবা?'

বাবা চকিতে ঘাড় ফিরিয়েছেন। নলিনী অসতর্ক মুহূর্তে উচ্চারিত কথাটাকে ফিরিয়ে নেবার বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে গলার নিচে অস্ফুট অনুতাপের শব্দ তুলে স্থির হয়ে গেছে। ঘরের ভেতর অস্বস্তিকর আবহাওয়া নেমে এসে বাতাস ভারী করে তুলেছে। এবং নলিনীর মনে হয়েছে, এসময় বাচ্চুটা যদি গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠত তবে সে ছেলে শান্ত করার অছিলায় কত সহজে বাবার সামনে থেকে সরে যেতে পারত।

কিন্তু ছেলে কাঁদেনি। বরং বাবার গলার নিচে কান্না না হোলেও আর্দ্র বাতাস গুমরে উঠেছি। সেই বাতাসে শব্দ ভাসিয়ে বাবা ধীর গলায় বলেছেন,—'সত্তর বছর বয়স হল রে নলিনী।...চল্লিশ বছর ঐ পারে নারাণগঞ্জের মোক্তারপুরে আর তিরিশ বছর এই পারে কাটল।' বাবা থেমেছেন। নলিনী আবিষ্কার করেছে তার বুকের নিচে বাবা বুঝি একটা বড় টলগুলি গড়িয়ে দিলেন। সেই গুলি গড়ান শব্দের সঙ্গে বাবার গলার শব্দ শুনেছে সে।—'দেশ ভাগের সময় তোর বয়স বোধহয় সাত বছর। কিশোর তখন তোর মায়ের পেটে। বানে ভাসা মানুষের মত উঠে এসেছিলাম কুপার্স ক্যাম্পে। ওখানেই ত' তোর ছোট পিসি রক্তবমি করে মরল।' বুক ঠেলে শ্লেষ্মার দলা উঠে এসে বাবার শ্বাসনালি সঙ্কুচিত করে তুলেছে। বাবা যেন হাত বাড়িয়ে অপসৃত সময়ের স্পর্শ নিতে চাইছেন, এমন ঢঙে দু-হাত সামনে ছড়িয়ে দিয়ে আবার গুটিয়ে নিয়ে বলেছেন,—একদিন মাঝরাতে তোর ন'কাকার দুই মেয়েকে বাদামপুর রিলিফ সোসাইটির ক্যাম্পবাবুরা লরিতে চাপিয়ে কোথায় যেন নিয়ে গেল। আর ফিরিয়ে দিল না। তোর পল্টু মামা ক্যাম্পখাটের দড়ি খুলে গলায় বেঁধে দেবদারু গাছের ডালে ঝুলে পড়ল। সেসব কতদিনকার কথা। তবু তখনও দেখার ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছে ছিল দেখে শেখার। এর মধ্যেও সোজা থেকেছি। চোখ খোলা রেখেছি। এই কোঠাবাড়ি তুলেছি। তোকে দাঁড় করিয়েছি। বৌমাকে ঘরে এনেছি। আর কিশোরকে....। কি লাভ হল কি লাভ হল বল?'

নলিনী মন্ত্রাহত। ঠোঁট দুটো ঈষৎ উন্মুক্ত-যেন বুকের ভেতর জমা পড়া কিছু দম ঝরান বাতাস ঐ দুই ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। সে দেখছিল বাবাকে। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। বাঁকান চোয়াল, মেরুদণ্ডে বয়সের ঘুণ। পরিণামে শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এই উপমহাদেশের সত্তর বছরের বেআব্রু ইতিহাসের বর্ণমালা সাজিয়ে চোখের সামনে বসে আছেন তার বাবা। কুপার্স ক্যাম্প অভিশপ্ত রাত, মুনীর মাঠে দেবদারুর বয়স্ক ডালে দড়ি গলায় বেঁধে ঝুলে আছেন পল্টু-মামা, আর তার ন'কাকার দুই মেয়ে—রাণী আর সরস্বতী, বাদামপুর রিলিফ সোসাইটির লাল সালুর ফেস্টুনের নিচে দিয়ে গভীর এক সুড়ঙ্গের মধ্যে নেমে যাচ্ছে।

ক্ষণিকের জন্য বিভ্রম ঘটে যায় নলিনীর। বাবা কি কালের প্রত্নতাত্ত্বিক? সময়ের আবরণ ভেদ করে অনেক অভিজ্ঞান, অনেক ফলকচিহ্ন মুদ্রার আলপনা হাতে নিয়ে ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন? গলার নলি ডিঙিয়ে তির তির করে তরল লালা গড়িয়ে যাচ্ছিল। নলিনী ঢোক গিলে ফেলে। বাবা ঘাড় এলিয়ে দিয়ে অপসৃত সময়ের ক্ষীণ ছায়াটাকে হাত মেলে ধরতে ধরতে নলিনীকে ভারমুক্ত করে দিয়ে বললেন—'তবে তোর যখন এত ইচ্ছে, আমি আর বাধা দোব না।'

হাসপাতালে ভর্তি হলেন নলিনীর বাবা। আজ অপারেশনও হয়ে গেল।

কিন্তু বাবার চোখে দৃষ্টি ফিরে এল না। কদিন পর ডাক্তার শেষবারের মত বাবার মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে বললেন,—'একেবারে হোপলেস ইস্যু। ডেসপারেটলি হোপলেশ। কাল ডিসচার্জ করে দিচ্ছি, বাড়ি চলে যান।'

নলিনী বেলায় বেলায় বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

মস্তবড় পরাজয়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে নলিনীর দিন কাটল। বাবার চোখে দৃষ্টি ফিরল না। এত সাধ্য-সাধনার পরও, এ যেন নলিনীর হার। ডাক্তার যখন বাবার সাদা চোখের খোল উন্মুক্ত করে টর্চের আলো ফেলে দেখতে দেখতে বলেছিলেন—'একেবারে হোপলেশ ইস্যু। ডেসপারেটলি হোপলেশ।' তখন নলিনীর মনে হয়েছিল ডাক্তার যেন তাকেই শুনিয়ে শুনিয়ে তার সাইত্রিশ বছরের অর্থহীন অস্তিত্বটাকে নাড়া দিয়ে কিছু একটা বোঝাতে চাইছেন।

কটা দিন নলিনী যেন নিজের কাছেই আত্মগোপন করে রইল। তার ইচ্ছে করত কোথাও পালিয়ে যায়। রেণুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে না। চেনা পরিচিতদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলে। অফিসে হাজার ব্যস্ততার মধ্যে ডুবে থাকে। কেউ কখন তাকে বাবার চোখ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলে নলিনীর বুক কাঁপে। বাবার ঘরে ঢোকে না নলিনী। বাবা এখন আরো ধীর, আরো বেশি আত্মমগ্ন হয়ে গেছেন। হয়ত হাসপাতালের অনর্থক ধকল তাঁর শরীর দুর্বল করে দিয়েছে। তবু নলিনী কেন জানি বাবাকে এড়িয়ে গেছে। তার কেবলই মনে হয়েছে সে যদি এখন বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তবে বাবা এমনভাবে ঠোঁটের ফাঁকে হেসে উঠবেন যার অর্থ নলিনীর কাছে গোপন থাকবে না। ঐ হাসি হেসে বাবা যেন বলবেন,—'দৃষ্টি ফিরিয়ে দিবি, নারে নলিনী? তুই দিবি দৃষ্টি ফিরিয়ে।'

নলিনী অফিস ছুটির পর বাড়ি ফিরে বাচ্চুকে নিয়ে পাড়ার রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে রেল-লাইনের দিকে চলে যায়। সন্ধ্যার আকাশকে মাথায় রেখে ছেলেকে কাঁধে চড়িয়ে দিক নির্ণয় করান শেখায়। আর ভাবে এই পৃথিবীতেই নাকি তার বাবার আর কিছু দেখার নেই। তবে ত' দেখার নেই রেণুকেও! বাচ্চুকেও! এমনকি তাকেও! নলিনীর চোয়ালের নিচে ব্যথা টনটন করে। মনে হয় আসন্ন সন্ধ্যার অবনত আকাশের কোন টলটলে খণ্ডিত অংশ তার মাথায় ঢুকে পড়েছে। ছেলের হাত ধরে বাড়ি ফেরে নলিনী।

সেদিন আর পারল না নলিনী। অফিস থেকে ফিরে খানিক জিরিয়ে নিয়ে বাবার ঘরে ঢুকল। সন্ধ্যা পেরিয়ে প্রথম রাত নেমেছে। শেষ ফাল্গুনের বাতাসে এক ধরনের আত্মীয়তা ছড়িয়ে ছিল। নলিনী দেখল বাবা বিছানায় পা-মুড়ে দেয়ালে পিঠ এলিয়ে খোলা জানলার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বসে আছেন। বাবার ঐ বসে থাকার দৃশ্যের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা দেখে নলিনীর বুকের শিরায় হ্যাঁচকা টান ধরল। এখন বাবার কাছে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বসে থাকার কি অর্থ হতে পারে?

—'কেরে?' সামান্য নিশ্বাস পতনের শব্দে বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

—'আমি'। নামান গলায় সাড়া দিল নলিনী।

—'আয়, বোস।' বাবা ভাঁজ করা পা

বিছানার ওপর ছড়িয়ে দিলেন। খোলা জানলার দিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নিলেন। অল্প হাসি হেসে বললেন,—'বাইরেটা দেখছিলাম রে। বেশ লাগে।'

'বাইরেটা দেখছিলামরে!' নলিনী যেন একটা ধাক্কা খেল। এবার কি সে চেঁচিয়ে উঠবে? বলবে—'এ কি রকম খেলা তুমি আমার সঙ্গে খেলছ বাবা!' কিন্তু পারল না। কেবল মনে হল তার হৃদপিন্ডটা সামান্য স্থানচ্যুত হয়ে গলার দিকে ঠেলে উঠেছে। পায়ে পায়ে নলিনী বাবার বিছানার এক পাশে বসে পড়ল।

বাবার শরীর থেকে গন্ধ উঠে আসছিল। বেশ কদিন বাবার দাড়ি কামান হয় না। কামিয়ে দেবার মত সময় এবং উৎসাহ খুঁজে পায়নি নলিনী। গরম আসছে, এবার গরমে বাবার খুব কষ্ট হবে।

—'রেণু বলছিল তোমার বুকে নাকি একটা ব্যথা হচ্ছে কদিন।' নলিনী ঘরের নির্জন আর্দ্রতায় শব্দ ভাসিয়ে কথা বলল।

—'ও কিছু না। ঠান্ডা লেগেছে হয়ত।' বাবা হাত নেড়ে মুখের সামনে থেকে বাতাস কাটলেন।

—'আমার জন্যই তোমার এই দুর্ভোগ। তাও যদি দৃষ্টি ফিরে পেতে।'

—'দুর্ভোগ আর কি? তুই তো চেষ্টা করেছিলি।'

জানলা ডিঙিয়ে বরিশাল কলোনীর মাঠ ভেঙে বাতাস ঢুকছিল ঘরের ভেতর। দূরের স্টেশনে আটটা দশের শান্তিপুর লোকাল হুইশেল দিয়ে ছেড়ে গেল। শব্দটা হাল্কা তরঙ্গ তুলে মিলিয়ে গেল একসময়। বাবা পিঠটান করে সোজা হয়ে বসলেন।

—'আর দৃষ্টির কথা বলছিস....চোখের দৃষ্টিটাই কি সব?' নলিনীর মনে হল বাবার গলার নিচে বোধহয় অনেকদিন ধরে গভীর এক খাদের সৃষ্টি হয়েছে। বাবা ঐ খাদের নিচে শব্দ তুলে বললেন,—'দেখতে চাইলে চোখ ছাড়াও দেখা যায়রে!'

নলিনীর শরীরে কাঁটা দিল। উত্তেজিত হয়ে উঠল স্নায়ুগুলি। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল—'তুমি কি সত্যি সত্যি দেখতে পাও?'

—'বিশ্বাস হয় না বুঝি?' বাবার ভাঙ্গা চোয়াল জুড়ে কাঁচা-পাকা দাড়ির আড়াল সরিয়ে চামড়ার ভাজ নড়ে উঠল,—'সব দেখিরে, সব দেখি। তাইত' বলেছিলাম আর ছোটা-ছোটা করিস না।'

নলিনীর মাথার ভেতর আবার আকাশ ঢুকে পড়ে। আর সেই আকাশ জুড়ে অসংখ্য বেলুন উড়তে থাকে। যেন এই বেলুন ধরতে চাইছে নলিনী, এমনি ধারায় হাত বাড়িয়ে বাবার মুখের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল নলিনী। অস্থির গলায় বলল,—'বাবা, আমি তোমার বড় ছেলে। আমার কাছে কোন কিছু গোপন কর না। বল, তুমি কি দেখতে পাও, কেমন করে দেখতে পাও।'—এক নাগাড়ে কথাগুলি বলে ফেলে হাঁফাতে লাগল নলিনী। হাঁফাতে হাঁফাতে দেখল কখন যেন বেলুনগুলি তার মাথার ভেতর ঢুকে পড়া আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। লাল, নীল সবুজ, হলুদ,—নানান রঙা বেলুন ভাসতে থাকল নলিনীর চোখের সামনে। বাবার দুই কাঁধের ওপর হাত রাখল নলিনী। মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে রুক্ষ গলায় বলল,—'অমন চুপ করে থেক না বাবা। চঙফঙ আর আমার ভাল লাগে না। বল তুমি কি দেখ, কেমন করে দেখ।' জিভ বের করে শ্বাস টেনে নিল নলিনী। কপালের ঘাম গাল বেয়ে গড়িয়ে নেমেছে। সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই নলিনীর।—'জান তোমার বৌমার সেই চাঁদপানা মুখ এখন আর নেই। কুঁজো হয়ে গেছে রেণু। তোমার নলিনী এখন কিছুক্ষণ একজায়গায় বসে থাকলে সহজে উঠে দাঁড়াতে পারে না। মাজায় [illegible] খিল ধরে যায়।...তুমি কি এস[illegible] দেখতে পাও....দেখতে পাও কি[illegible]?'

—'নলিনী থাম তুই। [illegible] আমার কথা শোন।' বাবা নলিনীকে [illegible] করার জন্য দু-হাত সামনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। নলিনীকে হাতের নাগালে খুঁজে পেলেন না। নলিনী ততক্ষণে ঘরের অন্য কোণে চলে গেছে। ঘরময় ছড়ান বেলুনের মাঝখানে আটত্রিশ বছরের নলিনী বড় অবেলায় বিচিত্র এক খেলায় মেতে ওঠে। দম টেনে টেনে বলল নলিনী,—'আজ তোমাকে বলতেই হবে। বলতে-ই হবে।'

কথা শেষ করার আগেই এক ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল নলিনী। বেরুবার সময় পায়ে লেগে দরজার পাশে রাখা কুঁজোটা ভাঙল। জল গড়াল ঘরের মেঝেয়। দাওয়ায় এসে চিৎকার করল নলিনী—'রেণু, শিগগির বাচ্চুকে নিয়ে এস।'

রেণু তখন ছেলে-কোলে রান্নাঘরের কাজ সারতে ব্যস্ত। নলিনীর অমানুষিক কণ্ঠস্বর শুনে কাজ ফেলে একরকম জ্যা-মুক্ত তীরের মত দাওয়ায় উঠে এসে বলল—'কি হয়েছে গো। ....অমন করছ কেন?'

নলিনী রেণুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাকে একরকম টানতে টানতে বাবার সামনে এনে দাঁড় করাল।—'এই তোমার বৌমা। এই তোমার নাতি। এদের সামনে বল, তুমি কি দেখ, কেমন করে দেখ।'

বাচ্চু নলিনীর কান্ড আর মায়ের অস্ফুট আর্তনাদ শুনে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল। ছেলে শান্ত করার পরিবর্তে নিজেই কান্না জুড়ে দিল।—'ওগো, কথা বলছ না কেন, বাবার কি হয়েছে?'

রেণু কাঁদছে। বিছানার ওপর উপুড় হয়ে বাবার পায়ের কাছে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রেণু। ছেলেটা খাটের পায়া ধরে একবার দাদুর আর একবার মায়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে। তার কোমর থেকে দড়ি ছিঁড়ে ইজের খুলে পড়েছে। নাক বেয়ে সর্দি গড়াচ্ছে। আর নলিনী এবং বাবা দুই প্রান্তে দুজন স্তব্ধ, যেন যন্ত্রচালিত। অভাবিত নাটকীয় ঘটনার মূক সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা খন্ড যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল বুঝি। যুদ্ধান্তের অবসাদ আর শান্তিতে সারা ঘরটা ভরে আছে। রাত হয়েছে অনেক। বাচ্চু কাঁদতে কাঁদতে কখন যেন খাটের পায়ার কাছে মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে। নলিনীর মাথা নত, বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মত স্বাচ্ছন্দ্যটুকু আর নেই। বড় বেশি নাটক হয়ে গেল। এতটার জন্য যেন সে প্রস্তুত ছিল না। প্রস্তুত ছিলেন না বাবা-ও।

—'ওঠ বৌমা। দাদুভাইকে বিছানায় [illegible] শুইয়ে দাও।' বাবা রেণুর মাথায় [illegible] রাখলেন। নলিনীর দিকে ঘাড় ফেরালেন। [illegible]আন্দাজে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। তারপর ধীর গলায় প্রায় মন্ত্র [illegible] বললেন— আমি কিছু দেখতে পাই না রে। কিচ্ছু দেখতে পাই না। দেখতে যদি পেতাম, তবে তোদের এমন দশা হবে কেন

এটাই আশীর্বাদ

সুলেখা দাশগুপ্ত

অফিস থেকে ফিরে বসবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সোমেন। চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে দময়ন্তীর দিকে তাকাল, 'এ কার বাড়ি ঢুকলাম! আমার তো?'

দময়ন্তী ঠোঁটে চাপা হাসি নিয়ে উত্তর দিল, 'ঢুকতে যখন বাধা দিলাম না, তখন তোমার বাড়ি না হলেও চেনাজানা বাড়িই। নির্ভয়ে ঢুকতে পারো।'

যদিও সোমেন ঠাট্টা করল কিন্তু স্ত্রীর এই বাড়িঘর ফেলে সাজানোর আর দফায় দফায় পর্দা সোফার রং বদলাবার অভ্যাসে সে এখন অভ্যস্ত।

সোমেন বসবার ঘরটার উপর চোখ বুলিয়ে আনল।

দময়ন্তী উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'পর্দার প্রিন্ট আর রং-এর সেডটা বেশ নতুন রকম না?'

সোফায় বসে সার্টের বোতাম খুলতে খুলতে সোমেন মাথা নাড়ল, 'খুব নতুন রকম। কিন্তু এতো বার কেবল বদলের মন সে মনে আমি বদলহীন কেন?'

'মন মতো বর পাওয়ার মতো সোজা নাকি মন মতো মানুষ পাওয়া? সেখানে জিতে যাচ্ছ।'

সার্ট পরলে দময়ন্তীর কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলে জুতোর ফিতে খুলতে উপুড় হলো 'সোমেন—আমি না, সেখানে জিতে যাচ্ছে তোমাদের সংস্কার।'

ঘাড় কাত করল দময়ন্তী, তাই জিতুক। আমাদের সংস্কার সর্বগ্রাসী সব অপদেবতাকে পরাস্ত করে আমাদের সংসারকে জয়ী করে রাখুক।

পূর্ণ করে রাখুক—বলে হেসে উঠল দময়ন্তী।

এটা তো হাসির কথা নয়। এটা প্রার্থনা। তা হলে হেসে উঠল কেন দময়ন্তী? সোমেন জানে দময়ন্তী হেসে উঠল তার বুক ছিঁড়ে উঠে আসা দীর্ঘ শ্বাসটাকে হাসির শব্দের তলায় চেপে মারবার জন্য। খুব চেনা জিনিষ এটা সোমেনের। এমন কি এখন দময়ন্তীর চোখের পাতার তলায় যে জল জমে উঠেছে— সেটা পর্যন্ত। তার ছেড়ে ফেলা জামা জুতো মোজা নিয়ে দময়ন্তী যে চট করে চলে গেল রেখে আসতে তাও ঐ জলটাকে লুকোবার জন্যই।

সোমেন সিগারেট ধরালো।

ওরা নিঃসন্তান। পনেরো বছর হলো বিয়ে হয়েছে। ডাক্তারদের আশায় বাণীতে আশায় আশায় কেটে গেছে অনেক দিন। তারপর নিরাশার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছিল দময়ন্তীর ভেতর নিদারুণ এক মানসিক অস্থিরতা। সময়ে সেটাকেও কাটিয়ে উঠেছে সে। দীর্ঘশ্বাসটাকেও এনেছে প্রায় নির্জীব করে। কিন্তু একেবারে মেরে ফেলতে পারে নি। সুন্দর সংসারের পূর্ণতার মধ্যে সন্তানের হাসি মুখের ছবি এতো স্পষ্ট যে সেই হাসি মুখ বঞ্চিত নারীর বুকের সেই শূন্যস্থানে একবার পুরু হয়ে বাজতে উঠেছে।

সিগারেট হাতে নিয়ে সোমেন গিয়ে পেছনের বারান্দায় দাঁড়ালো। সামনেই একটা ছোট্ট পার্ক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছে, দৌড়োদৌড়ি করছে। স্কিপিং করছে নানা রংবেরং-এর ফ্রক পরে। পার্কটা যেন শিশুগুলোকে নিয়ে ফোটা ফুলের বাগান হয়ে উঠেছে। অন্য মনে তাকিয়ে ছিল সোমেন তাদের দিকে। সুন্দর লাগছিল। ভালো লাগছিল।...দময়ন্তী যে এ সময়টায় এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে তা কি এদের দেখবার জন্য? মনে হতেই কেন যেন সোমেন সে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। দময়ন্তীর মত চাপা নিঃশ্বাস তার বুকে নেই। কিন্তু পূর্ণতার ছবি অপূর্ণতার কথা মনে করিয়ে দেয়। হাতের শেষ হয়ে আসা সিগারেট ছাইদানে গুঁজে চলে গেল স্নানের ঘরে হাত মুখ ধুতে।

দময়ন্তী চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'চায়ের সঙ্গে কি খাবে?'

সোমেনও তেমনি গলা তুলে জবাব দিল 'কিছু না!

মিটিং ছিল। চা স্নেকস্ প্রচুর খেয়েছি। আর শোন—'

'কি বলছ?'

'তুমি তৈরী হয়ে নাও। বিজয়ার প্রণামপর্বটা সেরে আসব আজ—বুঝলে?'

দময়ন্তীর কাছ থেকে সে কথার জবাব এলো না।

সোমেন স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল দময়ন্তী খাটের উপর পা ফেলে বসে উল বুনছে। ভ্রূ কুঞ্চিত হলো তার। কণ্ঠেও বিরক্তি প্রকাশ পেল, 'তবে যাবে না জেঠা-মশাইদের প্রণাম করতে?'

উলের গোলায় এক লম্বা টান দিয়ে উল বের করে হাতের কাঁটা তড়িৎ গতিতে চালাতে চালাতে দময়ন্তী বলল, 'ওসব আজকাল উঠে গেছে।'

'ওঠালেই ওঠে। রাখলেই থাকে।'

প্রায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠল দময়ন্তী— 'থাক—আমাকে আর তোমার শেখাতে হবে না। সামাজিকতা তুমি আমাকে শিখিয়েছ, না আমি তোমাকে শিখিয়েছি?'

এবার হেসে সোমেন আলমারী খুলতে খুলতে বলল, 'তুমি আমায় শিখিয়েছ। তাল ছাত্র একবার শিখলে আর ভোলে না।'

অধর স্ফুরিত হলো দময়ন্তীর। উল বোনাতে তার কাঁটার দিকে চোখ রাখতে হয় না। সে তাকাল সোমেনের দিকে: 'গেলেই জেঠিমাদের একজন বলবেন যা এই গুরু-বাবার কাছে। এমন শেকড় দেবেন যা বেটে খেলেই ছেলে কোলে আসবে। আর একজন বলবেন আরেক গুরুবাবার নাম—ভালো লাগে না আমার।'

সোমেন চুপ করে গেল। দময়ন্তী ঠিক কথা বলছে না। আগে এমন [illegible] বলতেন। কিন্তু এখন আর বলেন না। [illegible]

দময়ন্তীকে আঘাত করছে বেশী। অর্থাৎ তারাও আশা ছেড়ে দিয়েছেন। মনস্তত্ত্বের খেলা বড় অদ্ভুত। যখন তাঁরা বলেছেন তখন দময়ন্তীর ভালো লাগত না। এখন যে বলছেন না তাও তাকে আঘাত করছে!

সোমেন এনিয়ে আর কথা বলল না। ধুতিপাঞ্জাবি বের করে খাটের ওপর ফেলে বলল, 'ঠিক আছে। তিনটার সময় মিটিং সেরেই চলে এসেছি এই কর্তব্যটুকু করার জন্য। আমার দুই জেঠা কাকা—আর তোমার মামা এই তো আছেন। এই তিন জোড়া মানুষের সেন্টিমেন্টটুকু আমিই রক্ষা করে আসি। তুমি গেলে ভালো দেখাতো—'

দময়ন্তী হাতের কাঁটা উল নামিয়ে রেখে ঝটকা মেরে শরীর তুলল খাট থেকে, ঠিক আছে। যাচ্ছি!

সোমেন ঘামে সেঁটে থাকা ধুতির ভাঁজ টেনে টেনে খুলছিল। হেসে বলল, আমি জানতাম তুমি যাবে।

ঠিক জানতে না!

তবে জানাটা ঠিক হল কি করে?'

তোমার জুলুমে।

কোথায় জুলুম করলাম। আমি একাই যাচ্ছিলাম।

বুদ্ধিমানের জুলুম এ রকমই হয়। বলে দময়ন্তী দড়াম শব্দে গডরেজ খুলল শাড়ি জামা বের করবার জন্য।

সস্নেহে তাকাল সোমেন দময়ন্তীর দিকে। অনুরাগরঞ্জিত মমতায় তার ভেতরটা মোচড় খেল। বেচারা। মা হতে না পারার বেদনায় নিরন্তর পিষ্ট হচ্ছে।

।। ২ ।।

পথে ট্যাকসি থামিয়ে তিন বাড়ির জন্য তিন বাকস মিষ্টি কিনল। দময়ন্তী সুন্দর একটি প্ল্যাস্টিকের থলে ব্যাগে ভরে নিয়েই বেরিয়েছিল। বাকস তিনটা তাতে ভরে বই-এর প্যাকেটের মত জড়িয়ে সোমেনের হাতে দিল।

নতুন ঢাকুরিয়া ব্রিজের কাছেই জেঠা-মশাইয়ের বাড়ি। একতলা ভাড়া দিয়েছেন। তিনি থাকেন দোতলায়। সিঁড়ির পরেই বেশ বড় একটা লবি গ্রিল আর কাঁচ দিয়ে ঘেরা। সেটাই বসবার ঘর। সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল। সরাসরি ঢুকে পড়ল ওরা। জেঠামশাই জেঠিমা সেখানে। ছিলেন কিন্তু তাঁরা দুজনেই বন্ধ কাঁচের জানলা ভেদ করে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে। ওদের দুজনের সিঁড়ি ভেঙে ওঠার শব্দ তাঁদের কানে পৌঁছায় নি। এখন একেবারে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াতে জেঠামশাই-জেঠিমা চমকে পেছন ফিরে তাকালেন। আর ওদের দেখে নিভে গেলেন! জেঠামশাই ফের তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন রাস্তার দিকে। জেঠাইমা নিষ্প্রাণ মৃত গলায় বললেন, বোস। বসলেন নিজেও।

বাড়ির আবহাওয়া থমথম করছে।

দময়ন্তী মিষ্টির বাকসটা আস্তে সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখল। তারপর প্রণাম করল তাঁদের। জেঠামশাই ওদের মাথায় হাত রাখলেন যেন রাখতে হয় বলেই। জেঠাইমা অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, সুখী হও। জেঠাইমা সহজ ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করলেন। অনুযোগ করলেন, তবু যে মনে পড়ল। জেঠা-জেঠি মরেছে না বেঁচে আছে তাও তো খোঁজ করিস না....ইত্যাদি। কিন্তু চালাতে পারলেন না। তিনিও যেন ছটফট করছেন রাস্তার দিকে তাকাবার জন্য। ভীষণ একটা উদ্বেগ ওদের যেন আছড়াচ্ছে।

শেষ সূর্যের এক টুকরো রক্তাভ রোদ এসে সেন্টার টেবিলের ওপর পড়েছিল। দময়ন্তী সে দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

সোমেন এ পরিবারেরই ছেলে। সে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের এত চিন্তিত লাগছে কেন? কি হয়েছে? কার অপেক্ষায় রাস্তার দিকে এমন তাকিয়ে রয়েছ

এবার জেঠাইমা গুমরে কেঁদে উঠলেন তবু যে বাড়ির ছেলের মত দুটো কথা বললি। তুই বড় ভাই না? দেখবি তো ছোট ভাইকে।....দীপু সেই সকালে বেরিয়েছে—এখনও ফেরে নি।

কোথায় গেছে?

নরকে। নইলে কি আর বাপ-মার এমন নরক যন্ত্রণা ভুগতে হয়।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

জেঠামশাই ফিরে দাঁড়ালেন। জেঠাইমা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সোমেন বলল, ঐ তো এসে গেছে। দাঁড়াও আমি আজ ওকে কান ধরে তোমার কাছে নিয়ে যাব—

কিন্তু দীপু নয়। এক বোঝা কাঠ মাথায় নিয়ে এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছে একটা কুলি। বলছে, মাইজী, কাঠ।

জেঠাইমা হতাশভাবে বসে পড়ে তিক্ত কণ্ঠে বললেন, কাঠ আমার নয়। যাও। তুমি ভুল বাড়িতে এসেছ।

ভুল করব কেন মাইজী। দীপুবাবু পাঠালো—

দীপু পাঠালো — জেঠাইমা উঠে তরিৎ পায় কাছে এগিয়ে গেলেন, কোথায় সে?

সে হামি জানে না। বলল খুব জরুরি দরকার। এক গাড়ি কাঠ এক্ষুনি পেঁৗছে দিয়ে এসো। হামি লিয়ে এলাম। বহুৎ শরাব পিয়া দাদাবাবু।

জেঠাইমার সর্বশরীর থরথর কাঁপছে—ওগো, ছাইভস্ম খেয়ে এক গাড়ি কাঠ পাঠাল কেন দীপু? পাঠিয়ে কোথায় গেল?

জেঠামশাইয়েরও পা কাঁপছে। তিনি বসে পড়েছেন। তাঁর চোয়াল বেঁকে উঠেছে।

সোমেন উঠে দাঁড়াল, তোমরা এমন অস্থির হবে না। আমি দেখছি। লোকটার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, বাবু কোন দিকে গেল সেটা বলতে পার?

কুলি হাত দিয়ে ঢাকুরিয়া ওভার ব্রিজ দেখিয়ে বলল, ঐ দিকে। একদম হুঁশ নেই দাদাবাবুর।

জেঠাইমা আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন, এক্ষুনি তো ওটার নীচ দিয়ে ট্রেন যাবে—একটা পুকুরও আছে....কাঠ পাঠিয়েছে।

সোমেন তখন কুলিকে বলছে, হুঁশ নেই এমন একজনের কথায় তোমার আসাই উচিত হয় নি। যাক কাঠ গাড়িতে রেখে তুমি আমার সঙ্গে এসো। বকশিশ পাবে। কুলিটাকে নিয়ে সোমেন চলে গেল।

দময়ন্তী এসে জেঠাইমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ভোলা নিজের বুদ্ধি খরচ করেই চার কাপ চা ট্রে করে নিয়ে আসছিল। জেঠাইমা রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, এগুলো গিলবে এখন কে? তুইযা ওদের সঙ্গে।

ভোলা চায়ের ট্রে ফেলে রেখে দৌড়াল।

ট্রেন ছুটে আসার গমগম শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সোমেনের মনে হল ওর হৃদপিণ্ডটা ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সময় নেই—এসে পড়ল গাড়িটা। ব্রীজের তলা দিয়ে দৌড়ে নেমে তিনজন এসে দাঁড়াল লাইনের পাশে। তিন জোড়া চোখ সামনা থেকে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে দেখল কিছু কিছু লোক এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রেন চলে যাবার অপেক্ষায়। কিন্তু তার মধ্যে দীপু নেই।

সোমেন হাঁফ ছাড়ল। ট্রেনের চাইতে পুকুর কম বিপদজনক। মুহূর্তে পিষে ফেলে না।

ওরা চলল এবার পুকুরের দিকে। কিছুটা গিয়েই ভোলা চেঁচিয়ে উঠল, ঐ তো দাদাবাবু হাঁটু জল নেমে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সোমেন ওদের কথা বলতে নিষেধ করে নিঃশব্দে পা ফেলে এসে পুকুর পাড়ে দাঁড়াল। সোমেন তার শান্তিপুরী ধুতির লোটান কোঁচা তুলে মালকোঁচা দিয়ে নিল। তারপর তিনজনে মিলে জলে নেমে একসঙ্গে ঝাপটে ধরল দীপুকে। শরীরের ঝটকায় নিজেকে ওদের কবল থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে দীপু দুই রক্তজবা চোখে সোমেনের দিকে তাকাল—ইউ... ব্লাডি সোয়াইন মেজদা....তুমি কোথা.... থেকে—এসে জুটলে....বলেই ভোলার হাত থেকে ঝটকা টানে হাত ছুটিয়ে এনে মারল সোমেনের চোখে মুখে এক ঘুষি। সোমেনের চশমা চোখ থেকে পড়ে গেল, নাকে আঘাত লাগল। তবু চশমাটা পুকুরে না পড়ে যে মাটিতে পড়েছে—এটাই রক্ষা। কুলিটা চশমা তুলে সোমেনের হাতে দিল। এক হাতে দীপুকে ধরে রেখে অন্য হাতে চশমাটা পরে নিল সোমেন। হাঁটু জল থেকে এই বয়সের একটা মস্ত জোয়ান ছেলেকে টেনে তুলে আনা সহজ ব্যাপার নয়। ভাগ্যিস বোঝা বওয়া শরীরের বলিষ্ঠ কুলিটা ছিল। তিনজনে মিলে ধস্তাধস্তি করে টেনে তাকে পাড়ে তুলল।

দিনের আলো তখনও রয়েছে। লোকজন জমা হয়ে দেখছে। [illegible] কেউ একজন সাহায্য করতেও এগিয়ে এসেছে। দীপু [illegible] বিকৃত [illegible] কেঁদে বলছে, এ জীবন [illegible] এ জীবন [illegible]।

সবাই সাহায্যে তেতলায় তুলে এনে দীপুকে বিছানায় শোয়ালে সোমেন বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগল। কপাল দিয়ে ঘাম পড়ছে। রুমাল বের করে মুছল। মাল-কোঁচা খুলে পাখার তলায় এসে বসল।

জেঠামশাই জেঠিমা এখন স্থির নিশ্চল হয়ে বসে। আতংক চলে গেছে। এখন তাদের মুখে যেন্না-ধরা কাঠিন্য। ছেলের মুখ দেখতেও বিতৃষ্ণা বোধ করছেন। কিন্তু কি আর্ত চোখেই না সারা দিন ধরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন?

দীপু প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত দিনের খাওয়া যার গেলা বস্তু উগরে ফেলতে লাগল। মদ-মাংস পেয়াজ রসুনের মিশ্রিত দুর্গন্ধে সারা আটা বাবি ভরে গেল।

দময়ন্তীর সমস্ত দিনের খাওয়া উঠে আসতে চাইল সেই দুর্গন্ধে। চাপতে গিয়ে মুখ নীল হয়ে উঠল তার।

জেঠামশাই জেঠিমা নড়ছেনও না।

যা করছে সব ভোলা।

জেঠিমা বললেন, দেখছিস তো কিসের মধ্যে রয়েছি?

উত্তর হয় না এ কথার।

উপায় কি করি বলত? আর তো পারছিনে।

এ কথার উত্তরও জানা নেই সোমেনের। তবু বলতে হয় কিছু বলেই বলল, আমি রবিবার আসব। দীপুকে বোঝাব।

বোঝাবি। জেঠাইমা কপালে করাঘাত করলেন।

।।৩।।

জেঠামশাই-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দময়ন্তী বলল, বাড়ি চল আমার শরীর খারাপ লাগছে। ব্যাগ খুলে সেন্টমাখা রুমাল বের করে নাকে চেপে ধরল। মদ-মাংসের পচা গন্ধ যেন নাকের নিঃশ্বাসে ঢুকে রয়েছে।

দু-পা হাঁটলেই কাকার বাড়ি। এত কাছে এসে না সেরে চলে যাওয়ার মানে হয়। যোধপুর পার্কের রাস্তার ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাঁটলেই দেখবে শরীর ঠিক হয়ে গেছে। কেমন সুন্দর হাওয়া ছেড়েছে দেখ।

দময়ন্তী আর জেদ তুলল না। করতে যেটা হবেই সেটা করে ফেলাই ভাল—ঠিক কথা ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরটাও যেন সুস্থ হয়ে এলো। যোধপুর পার্কের সুন্দর বাড়ি-গুলো দেখে বলল, কি সুন্দর জায়গাটা। বাড়িগুলোও। এ পাড়ায় আসা যায় না?

নিশ্চয় যায়। উচিত মূল্য দিতে পারলে কোথায় না যাওয়া যায়। পাঁচশ'-সাতশ' টাকা ভাড়া। আসবে?

তুমি আসলেই আসব।

দেখি তবে অন্য উপায়ের পথ খুঁজে পাই কিনা।

কথায় কথায় কাকার বাড়ি এসে গেল।

— উঠে কলিং বেল টিপল সোমেন। আস্তে টিপে ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় দফায় টিপ ছিল একটু দীর্ঘ সময় বেলে আঙুল রেখে। তবু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

তৃতীয় বার বেল টিপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। যতক্ষণ কেউ না আসবে ও টিপ ছাড়বে না। বেল একটানা বেজে চলল কিং ই....ই....।

দময়ন্তী বলল, করছটা কী। ছেড়ে দাও।

কেন ছেড়ে দেব? বাসায় রয়েছে। দরজা খুলবে না কেন? কিন্তু কোন সাড়া নেই।

সোমেনও হাত তুলবে না। ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে। গাড়ি নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দরজা খুলবে না—ইয়ার্কি নাকি।

আর না খোলা সম্ভব নয় বলেই যেন কেউ এল। বিরক্ত কণ্ঠে কে বলে পীন হোল দিয়ে দেখল। দেখেই দরজা খুলে দিয়ে রিনা মধুর কণ্ঠ হয়ে গেল, ওমা, সোমেনদা তোমরা। এস এস। নিজে একটু সরে দাঁড়িয়ে ওদের ঢোকার পথ করে দিল।

ব্যাপারটা কি? দরজা খুলছিলে না কেন?

বাবা-মার নির্দেশে।

কেন! বিস্মিত সোমেন।

এসে বসো। দেখতেই পাবে নিজের চোখে কারণটা।

সোমেন থামল। তবে চলে যাই।

আরে নিষেধ কি তোমাদের জন্য নাকি। বাবা বলছিলেন, কাল তোমার কাছে যাবেন।

এবার সোমেন বিনা দ্বিধায় করিডোর পার হতে হতে বলল, তুমি তো দেখছি দিব্যি তরুণী হয়ে উঠেছ রিনা।

রিনা আহ্লাদি ঢং-এ মাথা আর ববচুল দুলিয়ে নাকে কথা টেনে বলল, তোমাদের আসা তো। এবার এসে তরুণী দেখছ। এর পরের বার এসে বুড়ি দেখবে।

শুধু বড়ই হও নি—বেশ যুৎ মত কথা বলতেও শিখেছ দেখছি।

আজ্ঞে হাঁ। বলে হেসে ওদের হল-ঘরে পোঁছে দিয়েই হাওয়া হয়ে গেল রিনা। দময়ন্তীকে বলে গেল, এখানে হবে না। তোমার কাছে গিয়ে একদিন জমিয়ে আড্ডা দেব।

কাকা-কাকিমা ঘরে ছিলেন না। খবর পেয়ে এলেন। যথারীতি মিষ্টির বাকস সেন্টার টেবিলে মাথা, প্রণাম আশীর্বাদ, কাকীমার কথা, দময়ন্তী কিন্তু বড় রোগা হয়ে গেছ। সোমেনের উত্তর, রোগা হতেই তো চায়! দেখ না তোমার কথা শুনে মুখটা কেমন খুশি খুশি হয়ে উঠেছে। কাকার এটা-ওটা জিজ্ঞাসা সবই হতে লাগল—তবু ওদের মনে হল, ওরা যে এসেছে কাকা-কাকীমার যেন মাঝে মাঝেই সেটা খেয়াল থাকছে না।

সোমেন গলা ছেড়ে ডাক দিল, রিনা—পালালি কোথায়

উত্তর তেমনি জোরে এল, আমি এখন মেক-আপ রুমে সোমেনদা। সঙ্গে সঙ্গে জোর হাসির শব্দ। বোরস্ত হও না। একটু অপেক্ষা কর। এখনই এমন কাণ্ড আরম্ভ হবে, দেখবে তরতর করে সময় কোথা দিয়ে কেটে যাবে টেরও পাবে না।

কাকীমা মেয়ের ঘরের দিকে বিষ দৃষ্টি হানলেন, শয়তান মেয়ের একটুকু মায়া-মমতা নেই—

সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ উদ্ধত কণ্ঠ শোনা গেল রিনার, যা-তা কথা বলবে না সাবধান করে দিচ্ছি। সেক্ষে হাওয়া হয়ে যাব।

কাকা-কাকীমা পরস্পরের দিকে তাকালেন। দুজনের বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কাকা বললেন, বুঝলে সোমেন, এ এক তাজ্জব দিনকাল পড়েছে। আর কোথাও নয়, আজ-কালকার ছেলে-মেয়েরা যুদ্ধে নামে—যারা হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে দিতে পারে সেই মা-বাপের সঙ্গে। এমন অসম যুদ্ধে নিহত হয় মা-বাবারা। কিন্তু ওরাই কি বাঁচে? তাহলেও যে হাসতে হাসতে মরা যেত।

অকস্মাত কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল এক মর্মভেদী চিৎকার—যেন কেউ কারু বুকে হঠাৎ ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। এবং কাণ্ডটা ঘটেছে ওদেরই পাশের ঘরে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সোমেন কি হল—

বোস তুমি।

কাকার কথা শুনে বিমূঢ়ভাবে বসে পড়ল সোমেন। দময়ন্তীর বুক ধড়াস করে উঠেছিল। সেও বসে রইল বিমূঢ় হয়ে।

এতক্ষণ দেখে নি। এখন দেখল ঘরটায় দরজায় তালা দেওয়া। আরও গোটা কয় সেই বিভৎস চিৎকারের পর শুরু হল সেই বন্ধ দরজার উপর ঘুষির উপর ঘুষি—দরজা খোল—নইলে ভেঙে ফেলব—তোমাদের মাথা গুঁড়িয়ে দেব—গলায় ফাঁস লাগাব—

কাকা-কাকীমা ঘন ঘন দেয়াল ঘড়ি দেখছেন।

কাকার এই ছেলে কৌশিক আর কিশোর। ওদের দুজনের একজনের গলা। কিন্তু এত ভাঙা আর বিকৃত গলা যে, সোমেন ধরে উঠতে পারছে না কার গলা এটা। কৌশিক না কিশোরের।

খুব ছোট্ট করে কলিং বেল বাজল। কাকা-কাকীমা এই শব্দটুকুর জন্যই বোধহয় অস্থির অপেক্ষায় ঘড়ি দেখছিলেন। তাঁরা সোজা হয়ে বসলেন। ডাক্তার আর তার এ্যাসিসটেন্ট সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল রাম। একটু মাথা নেড়ে কাকা-কাকীমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে ডাক্তার সোজা বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে বললেন, শান্ত হলে তবেই দরজা খুলব। উৎফুল্ল উত্তর এল, আমি শান্ত হয়েছি। রাম তালা খুলে দিল। ডাক্তার তার এ্যাসিসটেন্টকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কিশোর হাত বাড়িয়ে দিল, দিন। আঙুল নেড়ে হাসি মুখে ডাক্তার বললেন, উঁহু, খেয়ে নেবে। তারপর দেব। অধৈর্য কিশোর —কথায়—কথায় খাবার? রাম প্রস্তুতে। তক্ষুনি স্টেনলেশ স্টিলের থালা ভরা লুচি তরকারী মিষ্টি রাখল টেবিলে। কিশোর চেয়ারে বসে পড়ে থাবা থাবা লুচি তরকারী মিষ্টি ডেলা পাকিয়ে গাল গলা ফুলিয়ে

গিলতে লাগল। দু চোখ পাকিয়ে বলল, মা-বাবা যেন ঘরে না ঢোকে। আই হেট দেম। বিষম খেল। ডাক্তার জলের গ্লাস হাতে দিলেন, কি ভাবে খাচ্ছ—কনুই গড়িয়ে ঝোল তরকারী পড়ছে। দাও তো নরেন তোয়ালে দিয়ে মুছে। এ্যাসিসটেন্টকে আদেশ করে ডাক্তার হাত পেছনে নিলেন। নরেন ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দিল, ডাক্তারের হাতে। তিনি চলে গেলেন কিশোরের পেছনে। নরেন তোয়ালে হাতে কিশোরের কাছে এসে তোয়ালে ফেলে দিয়ে তার দুই বাহু চেপে ধরল শক্ত করে। মুহূর্তে পেছন থেকে ডাক্তার সূচ ঢুকিয়ে দিলেন কিশোরের বাহুতে। দিয়েই সামনে এসে নরেনকে ধমকে উঠলেন, বললাম মুছে দিতে। তা তুই এমন চেপে ধরলি কেন। কিশোর সূঁই ফোটানোর জায়গাটা ঘষতে ঘষতে নরেনকে রক্ত চোখে গাল দিল, স্টুপিড। তারপর আরও দু-চার থাবা খেল কিশোর, কিন্তু তারপরই শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ল তার শরীর। রাম আর নরেন তাকে শুইয়ে ছিল বিছানায়। ডাক্তার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে দেখে তারপর বেরিয়ে এলেন।

ডাক্তার বেরিয়ে আসতেই শান্ত পায় ঘরে এসে ঢুকল কৌশিক। সে নিশ্চয়ই পর্দার আড়ালে থেকে অপেক্ষা করছিল ডাক্তারবাবুর বেরিয়ে আসার জন্য। মা-বাবার দিকে আড় হয়ে দাঁড়িয়ে সোমেন দময়ন্তীকে বলল, তোমরা এসেছ জানতাম। কিন্তু আই হেট দেম—বলে পেছনে উপবিষ্ট মা-বাবাকে দেখাল—তাই ঢুকি নি।

কৌশিকের কথা শুনে চমকে উঠল দময়ন্তী সোমেন। দু ভাইয়ের মুখে একই কথা বাবা-মা সম্বন্ধে। কিশোরকে দেখলেই বোঝা যায় সে স্বাভাবিক নয়। কিন্তু কৌশিককে তো তা লাগছে না। সদ্য পাট ভাঙ্গা ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি পরনে। ঘন মাথা ভরা চুল ব্যাকব্রাস করা। স্মার্ট বুদ্ধিমান চেহারা।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন সেই এক কথা, কৌশিক খেয়েছ?

হ্যাঁ। আপনি আগে খেয়ে নিতে বলেন, আজ আমি তাই আগেই খেয়ে নিয়েছি।

বেশ করেছ। তা ও'রা এসেছেন, একটু কথাবার্তা বলে নাও না।

ওরা থাকলে আমি এ ঘরে বসিনে।

কাকা-কাকীমা নীরবে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সোমেন বসল। সে ধৈর্য ধরছে বটে কিন্তু ভেতর চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

তোমার পড়াশুনা কেমন চলছে কৌশিক?

সোমেনের জিজ্ঞাসার জবাবে হাসির মত মুখ করে কৌশিক বলল, এই চলছে।

ডাক্তার বুঝলেন দেরী করে লাভ নেই। হঠাৎ ক্ষেপে উঠতে পারে। বললেন, চল, তোমার ঘরে চল কৌশিক। ওষুধটা খেয়ে তারপর এসে বস।

খুশি হয়ে উঠে পড়ল কৌশিক। পাঞ্জাবির হাত দুটো ঠেলে ওপর দিকে তুলতে তুলতে যাবার সময় বলে গেল, আসছি এক্ষুনি।

বাড়ি শান্ত।

কাকা-কাকীমা ফিরে এসে বসলেন।

মিনিট দশেক বাদে ফিরে এলেন ডাক্তারও। বললেন, কাল সকাল নটা-দশটা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। আমি তার মধ্যে এসে যাব। কাকা দরজা পর্যন্ত ডাক্তারকে এগিয়ে দিয়ে এসে বসলেন।

কাকীমা আর্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা ভাল হবে তো সোমেন?

সোমেন জানে না এ সব কেস কি দাঁড়ায়। তবু বলল, ভাল তো নিশ্চয়ই হবে—

কাকীমা সোমেনের হাত দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন, তুই জানিস ভাল হয়?

জানি। কিন্তু তোমরা করছিলেটা কি? আগেই ভয়, মমতা ঝেড়ে ফেলে রাক্ষুসী হয়ে উঠে বলতে পার নি, আর কেউ খাবার আগে আমিই খাব তোদের?

আগে? পরে ছাড়া আগে আমরা জানতে পারি?

রিনা হাওয়ায় উড়ে এসে ঘরে ঢুকল। স্যাম্পো করা বব চুল তার ফোলান ফাঁপান রমণীয়। দু থোকা ছোট চুল দু কানের পাশে উড়ছে। লম্বা থোকাগুলো ঘাড়ে পিঠে। চোখের উপরের পাতা নীলাভ। তলার পাতায় আইব্রো পেনসিলের টান চোখ ছাড়িয়ে চলে গেছে উড়ন্ত পাখির ডানার মত। রাঙ্গান ঠোঁটের ফাঁকে মুক্তোর মত সাজান দাঁত। পলিস্টার সিফনের তৈরী ম্যাকসি শরীরের খাপে খাপে আঁটা। রিনার দিকে তাকিয়ে দময়ন্তীর মনে হল ওর মেক-আপ রূমের প্রসাধন সামগ্রী নারীকে পরী বানাতে পারে।

রিনাকে বাইরে বেরুবার সাজে দেখে এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল কাকীমার—এই রাত করে কোথায় বেরুচ্ছিস? গর্জে উঠলেন কাকীমা।

'রাত!' ভ্রূতে ছিলা টানাই ছিল। তাতে আরো টান মারল রিনা—'ও মাই গড! ঘড়ি দেখতেও ভুলে গেছ নাকি! সবে তো ন'টা।' দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে অনুনাসিক সুরে বলল, 'দেখ তো বৌদি, হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে বেরুলাম, এখনও ওদের ইচ্ছায় পা ফেলতে হবে? হাউ রিডিকিউলাস! রোজ গোটা চার-পাঁচ করে কাগজ পড়েন। কাগজগুলো ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য কত করে, কত ভাবে বলেন—তবু ওরা তা বুঝতে শিখলেন না।' মার দিকে তাকাল, 'রাত যদি হয়েই থাকে—সো হোয়াট?'

একটু সপ্রতিভ হাসি মুখে টেনে এনে দময়ন্তী বলল, 'রিনা, ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোথায় আরম্ভ আর কোথায় তার শেষ—বলতে পারো?'

রিনা এ কাঁধ থেকে ও কাঁধ পর্যন্ত মাথা দুলিয়ে উত্তর দিল, 'হে, পারি। যতটা চলতে পারা যায় তার জন্য আবার স্বাধীনতার প্রশ্ন কি। সংসারে, সমাজে, রাজনীতিতে সে যেখানেই হোক, যেখানে চলার বাধা সৃষ্টি সেখানেই চাই স্বাধীনতা।'

'ভালো মন্দের প্রশ্ন নেই?'

'না। স্রেফ্ ব্যক্তির অভিরুচি আর মর্জি।'

'তা হলে স্রেফ্ ব্যক্তির অভিরুচি আর মর্জির উপর সমাজ সংসার রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার নাম ব্যক্তি স্বাধীনতা?

'ইয়েস ম্যাডাম। ব্যক্তি স্বাধীনতার কাছে মুক্তিকার স্বাধীনতা—ছোঃ, তাও ধিক্। ডু ইউ আন্ডারস্টান্ড ম্যাডাম?' বলে হেসে ফেলে রিনা পা বাড়াল দরজার দিকে।

মা রুখে মেয়ের দিকে অগ্নিবর্ষি দৃষ্টি ফেলে পথ বন্ধ করে দাঁড়ালেন, 'পারবিনে বেরুতে। এ সব চটকে কথা [illegible] মুখেও অনেক শুনেছি—ঐ তার পরিণতি।'

রিনা থমকেছিল—কিন্তু এক মুহূর্ত। তারপরই ঘাড় বাঁকিয়ে মাকে পাশ কেটে দ্রুত পায় বেরিয়ে গেল গট্-গট্ করে।

কাকা দাঁড়িয়ে পড়ে রিনার দিকে হাত বাড়িয়ে উন্মাত্তের মতো চিৎকার করে উঠলেন, 'ধর—ধর ওকে। ঘরে ফেলে তালা বন্ধ করো—যাও, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? ঐ যে সোমেন বলল, মা নয় রাক্ষসী হয়ে ওঠার কথা—তাই হও—'

কিছু করব না আমি। এবার নিজে বিষ খাবো।

রিনার শেষ সিঁড়ি নেমে যাবার শব্দ মিলিয়ে গেল।

কাকা থপ্ করে বসে পড়লেন। শূন্য চোখে কাকিমার দিকে তাকালেন, 'হ্যাঁ তাই ভালো। এ ছাড়া বাঁচার পথ নেই। তবে তুমি একা খাবে কেন, দুজনেই খাবো। সোফার পিঠে মাথাটা ফেলে চোখ বুঝলেন।

নিঝুম বাড়ি।

বাড়ির দামী পর্দা, আধুনিকতম ফ্যাসানের আসবাব, রেডিওগ্রাম, টেলি-ভিশনে চোখ বুলিয়ে এনে ঘর জোড়া বিছানো কার্পেটের লাল ফুলের উপর মাথা নিচু করে দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দময়ন্তী। তারপর চোখ তুলে তাকাল কোচের পিঠে মাথা ফেলে চোখ বুজে বসে থাকা কাকা-কাকিমার দিকে। দেখল কাকিমার চোখের জলের স্রোত। একাকার

বন্ধুদের জন্মক্ষণে তাঁদের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল—যাদের ছায়ায় বৃদ্ধ বয়সে বসার আশায় বসেছিলেন, তারা সন্ধ্যাবেলা অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। ঘরে। বন্ধ ঘর দুটোর দরজায় চোখ আটকে রইল। রিনার চলে যাওয়ার দৃশ্যটা লোপ হল। সে কখন ফিরবে কে জানে! দময়ন্তীর মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। বাইরের হাওয়া চাইল নিঃশ্বাস।

॥ ৪ ॥

সেখান থেকে বেরিয়ে খুব খারাপ লাগতে লাগল দময়ন্তীর। যা-তা রকম খারাপ। আর মামার ওখানে যাবার মন ছিল না। কিন্তু বলে লাভ নেই বলে চুপ করে রইল। অন্যমনস্কতা ছিল সোমেনের মধ্যেও। কিন্তু তারা প্রণাম-পর্ব সারতে বেরিয়েছে। সেরে যাবে।

বহু দিনের পুরানো চাকর বিশু দরজা খুলে দিল। দময়ন্তীকে দেখে খুশি হয়ে উঠল, 'দিদিমণি। এসো, এসো।' বিশু ওদের সাদরে ভেতরে নিয়ে এলো।

ঘরে ঘরে নিয়ন জ্বলছে। পাখা ঘুরছে। পর্দা উড়ছে। রেডিও বাজছে—দময়ন্তীর ক্লান্ত অবসন্ন দেহে একটু প্রাণশক্তি ফিরে এলো। বিশুর হাতে মিষ্টির বাকসটা দিয়ে বলল, 'বিশুদা খুব গরম চা খাওয়াও তো।

'এক্ষুনি আসছি দিদিমণি।'

বসার ঘরে কাউকে না দেখে পর্দা সরিয়ে মামার ঘরে গিয়ে ঢুকল দময়ন্তী। মামা আরাম কেদারায় বসে পা নাড়তে নাড়তে অনামনে গড়গড়া টানছিলেন। ওদের দেখে পা নাড়া থামিয়ে, মুখ থেকে গড়গড়ার নল নামিয়ে বললেন, 'আয় মা। ওরা তাঁকে প্রণাম করল। মামা হেসে বললেন—'শুভ বিজয়া।' মামীমার বসবার হেলানো বেতের চেয়ারটা দেখিয়ে সোমেনকে বললেন, 'বোস।'

সোমেন বসলো।

দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করল, 'মামীমা কোথায়?'

স্নান করছেন।'

'এই রাতে স্নান, বাতের শরীরে!'

'তাই তো দেখলাম। তোদের সাড়া পেয়েই গিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকে ঝপাঝপ্ জল ঢালছেন মাথায়। বোধহয় এলোমেলো ছিলেন। স্নান করে, প্রসাধন করে তবে আসবেন তোদের কাছে।'

হেসে ফেলল দময়ন্তী, 'তুমি সব সময় মামীমার পেছনে লাগো। নাও জামাই-এর সঙ্গে কথা বল। আমি তোমার পুত্রদের আর তাদের বধূ সুমতি কুমতির ঘরে চক্কর খেয়ে আসি।' বলে ঠোঁট টিপে হাসল। ছোট বধূর নাম কুমকুম। তাকে পছন্দ করে না দময়ন্তী। আড়ালে তাই ডাকে—কুমতি বলে। 'ওরা বাড়ি আছে তো?'

মামা বললেন, 'বোধহয়।'

সুমতি কুমতির ঘরে চক্কর খেতে গিয়ে দময়ন্তীর মাথাই চককর খেয়ে উঠল। ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে। পাখা ঘুরছে। পর্দা উড়ছে কিন্তু সব ঘর খালি! বোকার মতো ফিরে এসে বোকার মতোই জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা সবাই কোথায়?'

মামীমা স্নান সেরে তখন মোড়ায় বসে আছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে দময়ন্তীর মনে হলো, মামীমা স্নান করতে যান নি। গিয়েছিলেন শুধু মুখ নয় শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে রক্ত-ঝরা কান্না ধুয়ে আসতে।

বসবার ঘর থেকে একটা মোড়া নিয়ে এসে বসল দময়ন্তী।

মামা তেমনি হেসে বললেন, 'কাউকে দেখলি নে? আমি একবার দেখে আসি তো।' বলে কোল থেকে গড়গড়ার নল গড়গড়ার শরীরে জড়িয়ে উঠে গেলেন।

'মামীমা, ওরা কোথায়?

'চলে গেছে।' যে জল ধুয়ে এলেন এতো করে সেই জলই আবার ঝর-ঝর করে ঝরে পড়তে লাগল মামীমার দু চোখ থেকে।

'তোমাদের ছেড়ে? দু ভাই-ই?'

বিমলেন্দু তো অনেক আগেই গেছে। অমলেন্দু গেছে গত রবিবার।

মামা ফিরে এসে হেসে বললেন, 'সবই তো রয়েছে। পাখা চলছে—বাতি জ্বলছে—মনে জ্বলছে—নেই কিরে!'

'সে বুঝি। কিন্তু এগুলো জ্বালিয়ে রেখেছ কেন?'

'তোর মামা বাড়ি ভরা রাখছেন। আর মাঝে-মাঝেই গিয়ে ঘুরে আসছেন। মানুষগুলো নেই।...... যন্ত্র চললেই যেন বাড়ি ভরা— মামীমার ঠোঁট পাতার মতো কাঁপছে। মুখের মোটা নীল শিরাগুলো আরো স্ফীত হয়ে দাপাচছে।

'লাগল কি নিয়ে।'

দময়ন্তীর কথাবার্তা এতো বোকা বোকা লাগছিল সোমেনের কাছে যে, সে বিরক্ত বোধ করল। এবার তার চোখে ভৎর্সনা দেখা দিল। বলল, 'কি বোকার মতো কথা বলে চলেছ। থাকবে না তাই চলে গেছে। থাকার হলে লাগলেও থাকত।'

সোমেনের কথার সমর্থনে সেই বোকার মতই মাথা নাড়ল দময়ন্তী। তার কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করল—'তাই তো। থাকবে না তাই চলে গেছে। থাকার হলে লাগলেও থাকত। নইলে কত কিছু হয়ে মিটেও যায়। ছেড়ে চলে যাবে কেন।'

বিমলেন্দু অমলেন্দু আর দময়ন্তী ছিল সমবয়সের পর্যায়ে। তিনজনে ছিল বন্ধু। মামা-মামীর কাছে এসেছে। খেলেছে। তাদের শ্রদ্ধা করেছে ভালোবেসেছে। দময়ন্তী জানত ওরা তিনজন চিন্তায়, আচরণ, নানা ধর্মে এক। মা বাবাকে ফেলে চলে যেতে পারল অমলেন্দু বিমলেন্দু! ওদের এই নিষ্ঠুর নির্দয়তা দময়ন্তী সইতে পারছিল না। লণ্ডভণ্ড কাণ্ড সব বিকেল থেকে ওকে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছিল। এখন বিকল করে ফেলেছে।

মামা হাঁক দিলেন, 'বিশু তামাক দে।'

বিশু ট্রে করে গরম চা আর মিষ্টি টিপয়ের ওপর রেখে দৌড়োলো তামাক আনতে।

'মামীমা পারব না খেতে'—দু হাতে মুখ ঢেকে দময়ন্তী কেঁদে ফেলল। কিছু পরে নিজেকে সামলে সতেজে মাথা তুলল ফণিনীর মতো—যাক্ ওরা। তোমাদের টাকা আছে—'

'সুখ যে নিয়ে গেছে—' মামীমার চিবুক ভেংগেচুরে দুমড়ে এলো।

॥ ৫ ॥

বাড়ি ফিরে দময়ন্তী সোমেন দুজনেই অন্যমনস্ক ভাবে চুপচাপ বসে রইল। দময়ন্তী কি ভাবছিল সোমেন জানে না। সোমেন ভাবছিল—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ছোট হাঁর ভেতর বিশ্ব দেখিয়েছিল। একটা ছোট সন্ধ্যা যেন ওদের তেমনি একটা যুগকে দেখিয়ে দিল।

দময়ন্তী উঠে গেল। স্নান সেরে ভিজে খোলা চুল পিঠে ছড়িয়ে এসে বসল। হরিকে ডেকে বলল, 'হরি খু-ব গরম চা দে তো।'

অন্যমনস্ক সোমেন ঘরে ফিরে এলো। বলল, 'এই রাত দশটায় চা?'

মিটিং থেকে চা স্নেকস খেয়ে এসেছি। কিচ্ছু খাবো না। আমি যে চা-টুকুও খেলাম না—তা খেয়াল আছে।

'দুঃখিত। কিন্তু পুজোর চন্দেরী শাড়ি পরেছ? হঠাৎ এই ভাবান্তর?'

হঠাৎ অনেক কিছু হয়। দু হাত জোড় করে কপালে [illegible] কি শান্তি।

রাবণের চিতা

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

সীতানাথপুরের কাছে গাড়ি আসতেই অন্ধকারের মধ্যে আগুন দেখতে পেলো নন্দা। বিজ্ঞাপনের কাচা জামার মতো ঝকঝকে, পরিষ্কার। নন্দা সুগতর ঘামে ভেজা পিঠে হাত রাখল। অনেকটা পথ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসছে বেচারা। নন্দার বড় মায়া হোলো। সুগত'র পিঠে হাত রাখতেই সুগত মাথাটা এলিয়ে দিয়েছে। নন্দা আস্তে আস্তে বলল—'ও আগুনটা কিসের সুগত?'

—সীতানাথপুর স্টিল প্ল্যান্টের ফারনেস।

—কি সুন্দর না।

সুগত চুপ করে থাকে, কোনো উত্তর দেয় না। এ আগুন সুন্দর, বড় সুন্দর। চারধারের অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ মাথা উঁচু করে অন্ধকার ফারনেসটা আকাশের গায়ে শাদা পোস্টার কালার ছুঁড়ে মারে মুহূর্তে মুহূর্তে। কোনো মানুষের গায়ের রং ওরকম শাদা হলে তাকে কি বলতো সুগত? সুন্দর? না নিষ্ঠুর? সুগত রাস্তার একধারে গাড়ি থামায়, বড় রাস্তা ছেড়ে ঢালু জমির উপর। উল্টোদিকে হেড লাইট জ্বালিয়ে লোডেড ট্রাকগুলো আসছে। জি টি রোডের মাটি সেকেন্ডে সেকেন্ডে ভূমিকম্পের মতো কেঁপে ওঠে এই ট্রাকগুলোর জন্য। নন্দার কি ভালো লাগবে কলকাতার মায়া কাটিয়ে এখানে থাকতে। হেড লাইটের আলো হঠাৎ নন্দার মুখ ঘেঁষে ঘেঁষে আবার মিলিয়ে গেল। নন্দা এতটা সুন্দর কেন? সুগতর সব সময় অপরাধী অপরাধী লাগে নিজেকে। সুগত হঠাৎ মমতা মাখা গলায় নন্দাকে জিজ্ঞেস করে—'নন্দা, পারবে তো এখানে থাকতে?'

—কেন পারবোনা?

নন্দার গলার স্বরে একবিন্দু সংশয় নেই।

সুগত বললো—সারাদিন বড় কাজের চাপে ব্যস্ত থাকবো। তোমার দিকে ভালো করে তাকাতেই হয়তো পারবো না।

তুমি......তুমি

নন্দা সুগতর বুকের কাছে হাত রাখলো—দূর বোকারাম, তুমি কি এছাড়া আর অন্য কোনো কথা আজ আর বলবে না? ওই রংটা কত সুন্দর, তুমি তা নিয়ে কোনো কথা বললে না তো।

সুগতর গলায় কেমন দ্বিধার আভাস। কিছুতেই বলতে পারছে না যা বলতে চায়: নন্দা...বিশ্বাস করো আমি সুন্দরকে আজকাল আর বুঝতে পারি না। যা সুন্দর তার মধ্যেই কি এত সংশয়? আমি বুঝি না নন্দা মানুষ কেন সুন্দরের কাছে স্বাভাবিক থাকে না? হয় ছোট হয়ে কুঁকড়ে যায় নতুবা বড় হয়ে অত্যাচার করে...সুগত হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো নন্দার হাত ধরে দোলাতে লাগলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো 'নন্দা তোমার সেই উইন্ড মিলটার কথা মনে আছে? আর সেই বড় দীঘিটার কথা? ক্যাম্পাসের ওপারের সেই রেল লাইন?' নন্দার সব মনে আছে। ও যখন ফার্স্ট ইয়ার ইংরিজী পড়ছে যাদবপুরে, তখন থেকেই তো সুগতকে চেনে। মেকানিকাল এঞ্জিনীয়ারিং পড়তো। এই পাগল ছেলেটা, যে আজকে থার্মাল পাওয়ার কোম্পানীর টেকনিকাল এক্সিকিউটিভ হয়ে বউকে নিয়ে সীতারামপুরে এসেছে কোম্পানীর জীপ নিজে চালিয়ে সে তখন কতটুকু?... আমিই বা কি এমন বড় ছিলাম তখন? সুগতর থেকেও তো বছর তিনেকের ছোট—অথচ ওকে তো কখনোই আমার বড় লাগতো না। রোগা ছেলে, এক মাথা চুল, এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে এসেছে যাদবপুরে অথচ কবিতা লেখে। এবং নন্দার ইংরিজি অনার্সের শেক্সপীয়ার পড়া ছেলেগুলোর থেকেও অনেক ভালো লেখে। নন্দার সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো সুগতর পিসতুতো বোন রত্নার মারফৎ। রত্না ওরই সঙ্গে ইংরিজি অনার্স পড়তো আর মাঝে মাঝেই ওই পাগল দাদাটার অদ্ভুত কান্ডকারখানার গল্প করতো।...'বাংলা স্কুলে পড়া ছেলে অথচ কি দারুণ স্মার্ট না, আমাদের ক্লাসের এই বোকাগুলোকে দেখলেই আমার মনে হয় সতুদাদা যদি থাকতো এখানে...সতুদাদা কিন্তু আমাদের কলেজেই পড়ে...থার্ড ইয়ার মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ারিং...যাবি নন্দা আলাপ করতে?.. একদম প্রেমে পড়ে যাবি কিন্তু..' রত্না এসব কথা প্রায়ই তাকে বলতো। সতুদাদা নাকি গত বছর রত্নার সতেরো বছর বয়েসের জন্মদিনে সতেরোটা রঙিন পাখি দিয়েছিলো। বলেছিলো এগুলো নাকি পাখি নয়, আসলে এগুলো সতেরো বছর বয়েসের দুঃখ ভোলা গান। সতুদাদা মাঝে মাঝেই একলা একলা এখানে ওখানে চলে যায়। আজ শিমুলতলা কাল নেতারহাট। ফিরে আসার সময়ে সঙ্গে নিয়ে আসে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস—শুকনো পাইন কোন, ঝরা পাতা, সুবর্ণরেখার বালি নুড়ি পাথর। কখনো রাশি রাশি টেস্টে কিরি ক্যা উনিশ পয়সার মজার মজার বই। 'বসীকরণ' 'বন্যা' 'পিতার অভিশাপ,' 'সাত বছরে মাতৃত্ব' এসব। প্রথম আলাপেই নন্দার মনে গোলমাল হয়ে গেল। ছেলেটা এই হাসির জোয়ারে পৌঁছে দেয়, এই দুঃখের গহনে। নন্দার বাঁ হাতে একটা রুপোর তিল আছে। সারাক্ষণ সেদিন সেদিকে তাকিয়েছিল সুগত। রক্তের সঙ্গে তিল, তিলের সঙ্গে স্বপ্ন, স্বপ্নের সঙ্গে সুখের জোয়ার মিলিয়ে মিশিয়ে কবিতা বানালো মুখে মুখে। এলোমেলো হাওয়ায় দোলা উইন্ডমিল টাকে নিয়ে কতো ধরনের ছড়া বানালো ছেলেটা। সুগত সেদিন অনেকক্ষণ আটকে রেখেছিলো ওদের দুজনকে। চলে যাবার আগে উইন্ডমিলটার গায়ে পেনসিল দিয়ে কি সব যেন লিখে ওদের দুজনকে সেখানে সই করতে বলেছিলো পাগল ছেলেটা। সুগত লিখেছিলো 'দাঁড়াও পথিক বর... জন্ম যদি তব বঙ্গে তিষ্ঠ ক্ষণকাল...যেথায় লভিছে বিশ্রাম....সুমহান নির্বিরোধ আলোর আঁধার।

ক্যাম্পাসের ওপারে তখন দুপুর বেলার শূন্য ট্রেন ঘট ঘট ঘটাং ঘটাং করে তিন তাল চৌতালে চলে গেলো।

তবে সুগত একটানা হাসতে পারতো না কখনো। সবাইকে হাসিয়ে দেয়, সবাই যখন হাসতে থাকে তখন নিজে কিরকম যেন অবসাদে ডুবে যায়। নন্দা এটা বরাবর খেয়াল করেছে। দুজনে এক সঙ্গে শীত—সন্ধ্যার এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে বেহিসেবী। হঠাৎ সুগত বলে উঠেছিলো একদিন 'জানো নন্দা দাদা আর কখনো ফিরবে না।' নন্দার সঙ্গে তখনো সুগতর পরিবারের পরিচয় হয় নি, সে তখনো সুগত'র বাবা-মা ভাইবোন কারো কোনো খবরই রাখে না। কিছু না বলে ভাই যখন চুপ করে আছে সুগত তখন বলে উঠলো, 'জানো, আমার দাদা বছর দশেক হোলো ফ্রান্সে আছেন এখনো একবারও দেশে ফেরেন নি। বাবা প্রায়ই দাদার কথা বলেন। ছোটবেলায় দাদা মহাভারত থেকে শ্লোক মুখস্ত বলতো। হয়তো বাবা জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা বলতো রন্টু, সুখী কে? অমনি দাদা বলে দিতো 'পঞ্চমেহহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বেগৃহে...অনৃণী চা-প্রবাসী চ স বারি চর মোদতে...অঋণী এ অপ্রবাসী হয়ে, দিনের পঞ্চম বা ষষ্ঠভাগ যিনি স্বগৃহে শাকান্ন রন্ধন করেন, তিনিই সুখী'...

দাদা হয়তো সে সব কথা ভুলে গেছে। সবাই এরকম ভুলে যায়...জানো দাদার বউ মাদলীন আমাকে একবার একটা ফরাসী কবিতা ইংরিজীতে অনুবাদ করে পাঠিয়েছিল... আপোলিনেয়ারের লেখা- মিরাবো সেতুর তলা দিয়ে সেইন বয়ে যায় রাত্রি চলে যায়...প্রেমও চলে যায় বুকের ভিতরে দুঃখ ভারি হয়ে আসে নন্দা সুখের ভিতরে সব সময় এরকম দুঃখের ভার কেন বলতো? সব এরকম চলে যায় কেন বলোতো? ছেলে-বেলার খেলা দুপুর...গলির মোড়ে ইট সাজিয়ে ক্রিকেট খেলা হাতের মুঠোয় চুইংগামের প্যাকেট শাঁখ বাজানো সন্ধ্যে প্রতিদিনের বাড়িফেরা...হাত ধরাধরি করে পড়ন্ত বিকেলে দাদার সঙ্গে ছুটোছুটি... কোথায় যায় বলো তো এসব? নন্দা তুমিও চলে যাবে নাতো? প্রহর চলে যাবে নাতো ...রাত্রির মতো, নদীর মতো। দাদার পান্ডুয়ের বাড়ির ছাত থেকে ছেলেবেলার একলাখুশী চাঁদের আলো বুঝি পাওয়া যায় না?

না, নন্দা যায়নি। এখনো বসে আছে. ওই তো এই গাড়ির মধ্যে। সুগতর হাতে হাত রেখে। বাইরে ফারনেসের আগুনটা দাউ দাউ করছে, রাত বেড়ে যাচ্ছে। সুগত বললো, 'নন্দা চলো গৃহপ্রবেশ করবে।' নন্দা বললো. 'কেমন ধরনের গৃহপ্রবেশ? গৃহস্বামী নিজে একমাস থেকে গেলেন, খাটবিছানা চেয়ার টেবিল খাওয়ার বাসন সমস্ত মজুত, মায় চাকরবাকর পর্যন্ত. এদিকে গৃহপ্রবেশ হবে আজ, এ কেমন কথা?' সুব্রত হাসিখুশি গলায় গান গাবার মতো করে বলে উঠল গৃহিণী ছাড়া কি কখনো গৃহপ্রবেশ হয়? আমি এতদিন আশ্রিতের মতো এ বাড়ির একধারে পড়ে থাকতাম। এই আজ থেকে ঠিকঠাক নিজের বাড়ির মতো নিজের দাপটে চলে ফিরে বেড়াবো।'

সুগত আর নন্দা গাড়ি থেকে নেমে ওদের নতুন বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সামনে ঠিক রুমালের মতো চৌকোনো একটু বাগান। একফালি সবুজ। সুগত ধপ করে সেখানে বসে পড়লো। 'আজ আমরা এখানে থাকি না কেন?'— সুগত আবার ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। নন্দাও সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ওরা এখনো পুরোপুরি বিবাহিত লোকের মতো হতে চায় না। সাধারণত নতুন বিয়ের পরে ফাঁকাবাড়িতে মধ্যবিত্ত স্বামী-স্ত্রী যেমন শরীর শরীর করে উন্মাদ হয়ে পড়ে. ক্লান্ত হয় আবার উন্মাদ হয়, ওদের মধ্যে তার ছিটেফোঁটা নেই। সত্যি সত্যিই এই ঘাসের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে ওরা এক সময় আশ্চর্য স্বাভাবিক ঘামে এখনো তলিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে। নন্দা বললো, 'সুগত তুমি কিন্তু আমার একটা কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকছো এখনো?' সুগত দু ভুরু কুঁচকে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি সেটা? তুমি তো আমাকে তেমন কোনো প্রশ্ন এখনো করনি?' 'করেছি, এবং যতবার করেছি তুমি এড়িয়ে গেছো?' সুগত দেখলো চাঁদের আলো ঠোঁটে মুখে মেখে নরম হলুদ শাড়ি পরা এক চির জীবনের মেয়ে তার দিকে অভি-মানে তাকিয়ে আছে। দূরে ফারনেসে আগুনটা হঠাৎ একটু কেঁপে উঠে আরো জোরে আকাশের আরো ভিতরে উথলে উঠল। সুগত বললো 'হয়তো করিনি। হয়তো অন্যমনস্ক ছিলাম। তুমি আবার বলো। এখানে তো আমাদের হাতে ঘরের চাবি। এখন তো গল্প বলার সময়। এখন বলো, আর অন্যমনস্ক হবো না।

—'তুমি তো আমায় বললে না ওই শাদা রঙ তোমার কেমন লাগে?'

—নন্দা সোনা, জানো আমার একটা গল্প মনে পড়লো তোমার কথা শুনে। একজন শিল্পী একবার বালজাককে একটা দারুন সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ এঁকে দেখিয়ে-ছিলেন। বনানীর সবুজের সঙ্গে দিগন্তের সূর্য মিশে আছে। দূরে কয়েকটা কুটির, তার মাথা থেকে রান্নার ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

—বালজাকের নিশ্চয়ই ভালো লেগে-ছিলো সে ছবি?

—হাঁ মুগ্ধ হয়েছিলেন বালজাক।

শুধু মুহূর্তের জন্য। তারপর শিল্পীকে বালজাক জিজ্ঞেস করেছিলেন, ও কুটিরগুলোতে কারা থাকে? অতো নিরাবরণ নিরাভরণভাবে? এই অরণ্যের শীতের মধ্যে। নিশ্চয়ই ওদের খুব অভাব. তাই না? সমস্ত পৃথিবীর পাহাড়তলী, ঝর্ণা, মেঘমালা যেন হঠাৎ থেমে পড়লো। যেন শব্দহীনতা সারা পৃথিবী জুড়ে। সুগতর ছোট বাগানের নিস্তেজ আলোটা নন্দার চোখে-মুখে। বেদনার আলো। হলুদ চাঁদের চারধারে একটা চকোর ঘুর-পাক দিচ্ছে ক্রমাগত। যেন এইমাত্র নরম হলুদ শাড়ির ভাঁজ থেকে নীল দুঃখের পাখিটা উড়ে গেছে। চাঁদের বালিয়াড়িতে তার মৃত শরীর। নন্দা ফারনেসের শাদা আগুনটার দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রাণ গলায় বললো, 'আমাদের বিয়ের সময় যজ্ঞের আগুন জ্বালিয়ে পুরোহিত যে মন্ত্রটা উচ্চারণ করেছিলেন তা কি তোমার মনে আছে?'

—অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বি জম হোতারম্ রত্নধাতমম্।

—ঋত্বিক আগুন যজ্ঞের পুরোহিত, অথচ বনবাসে তপস্যায় ও আগুনই তো কুন্তীকে দগ্ধ করেছিলো, না সুগত?

—ওই শাদা আগুন সুন্দর নন্দা। আমি ওরকম শুভ্র রঙ কম দেখেছি। ওই আগুন কারা জ্বালায় নন্দা? সারারাত? কাদের ঘাম, কাদের রক্ত শ্রমশক্তি দিয়ে ওই চন্দনের আগুন জ্বালায় এখন? তুমি চেনো তাদের? আমি একজনকে দেখে-ছিলাম। সীতানাথপুর স্টিল প্ল্যান্টের একজন লেবারারকে। নাইট ডিউটি শেষ করে ঘামে ভেজা শরীরটাকে চায়ের দোকানে চাঙ্গা করতে এসেছিলো সে। আমারই সমবয়সী। হয়তো তোমার মতো একটি খানখুশি ছোট বউও তার ঘরে আছে। কোনো গ্রামের শস্যহারা মাঠের উজান পেরিয়ে, মহুয়ার গন্ধ গা থেকে মুছে ফেলে যেন এখন এখানে এসেছে। আমি তখন আরাম করে ভোরবেলায় মর্নিংওয়াকে বার হয়েছি। অকারণে ওদের চায়ের ঝুপড়িতে ঢুকে আমার অনিয়মী বেহিসেবী মনটার তারিফ করছি। ভাবছি আমি সব পারি। আমার মনে কোনো সংস্কার নেই। দিব্যি ওদের সঙ্গে একই দোকানে বসে চা খেতে পারি। আমার মতো মহান আর কে? ওরা কিন্তু আমাকে খেয়ালই করে নি। ওই ছেলেটাও নয়। চুপচাপ মুখে বিড়ি গুঁজে বসেছিল। ধরাবার আগুনটুকু অবধি নেই! চোখের মধ্যে দুটি চোখ। কি যে দেখে, কতোটা যে দেখে বুঝতে পারা যায় না। আমি আমার দেশলাইটা এগিয়ে দিলাম ওর দিকে। নির্বিকারভাবে বিড়ি ধরিয়ে ও দেশলাইটা আমায় ফেরত দিল। একটা ধন্যবাদ নয়, কৃতজ্ঞতা তো দূরের কথা। সেদিন রাত্তিরে ফারনেসটাকে আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিলাম। বালজাকের এই গল্পটা মনে পড়ছিলো বার বার।

বাগানের কোনাকুনি কারা যেন হেঁটে আসছে। দুটি জীবন্ত মানুষ। সুগতর কাছাকাছি এসে ওরা দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়লো।

মেমসাহেব সেলাম। সাহেব আপ এখনো ঘরে গেলেন না কেন। রাত তো অনেক হোলো।

—আরে রশীদ যে! আমি ভাবলাম তুমি বুঝি আজ আর এলেই না। এই নাও চাবি, গাড়ি খুব ভালো সারভিস দিয়েছে. পথে একটুও গন্ডগোল করেনি। গন্ডগোল করলে তোমাদের মেম সাহেবের কাছে খুব লজ্জা পেতাম। ও-হো, তোমায় তো আলাপই করিয়ে দিইনি নন্দা।—এ হোলো আমাদের কোম্পানীর ড্রাইভার আবদুল রশীদ আর...

রশীদ কথা শেষ করতে দেয় না। মাথা নিচু করে বলে, 'সেলাম, মেমসাব।' আজ আর বেশি রাত না করে শুয়ে পড়ুন। কাল বিকালে আমি আপনাকে স-ব চিনিয়ে দেবো। দুকান বাজার, সব। সাহাব তো হ্যামি আজ চলছি। ইয়ে লেড়কা, হামার বেটা আছে। সাইট মে শুনেছি লোক লাগবে কোম্পানীতে। আপনি একটু বলে দেখুন না...উসকা কোই নোকরি নেহি মিলতা...গেল সালে

শাদি হয়ে গেল..তো ফির বহু লিয়ে ইধার...

রশীদ এবার তার ছেলের কাঁধ ধরে একটা ঠ্যালা দেয়। যা না বেটা, সালাম কর। উসকা নাম করিম হ্যায় বাবুসাব।'

করিম ছেলেটা লাজুক। ফর্সা, দালিমের মতো গায়ের রঙ। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, থুতনির তলায় আঁশ আঁশ অল্প অল্প দাড়ি। ও সে খুব লজ্জা লজ্জা মুখ করে সুগতকে সেলাম ঠুকল। হাসিটা খুব মিষ্টি। নন্দা করিমের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। সুগতের মনে পড়লো সামনের মাসে সাইটে এয়ার পিউরিফায়ার বসানোর এবং চালু করার কাজে কোম্পানী হাত দেবে। কন্ট্রাকটর বোসবাবু নতুন লোক চাইছেন। ঠিকে কাজের লোক। সেপ্টেম্বর মাস অবধি কাজ চলবে। তা ততদিন অবধিতো কাজ থাকবে বেচারার! কিন্তু পারবে কি? কিই বা বয়েস, খুব জোর একুশ কি বাইশ। একটু ভেবে সুগত রশীদ কে বললো, 'কাল অফিসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। আমি বোসবাবুকে একটা চিঠি লিখে দেবো। হয়তো হয়ে যাবে! কিন্তু কাজটা কিন্তু খাটা খাটনির। ক্রেন থেকে মাল খালাশ করে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। ফাউন্ডেশনের কাজের কাজও আছে। খুব ঝকমারি। হয়তো রাত্রি বেলা বাড়িই ফিরতে পারবে না কোনো কোনো দিন।

—পারতে হোবে বাবু, না পারলে তো অ্যায়সাই নেহি চলেগা। জওয়ান লেডকা, খাটবে না তো খাবে কি করে?

ফারনেসের আগুনটা আবার বেড়ে উঠল। নরম লোহা তেতে পুড়ে শক্ত হয়ে যায়। হাঁড় কড়াই দরজা জানালা, যন্ত্রপাতি সব কিছুতেই কাজে লাগবে তখন।। পুড়তে পুড়তে একটা জায়গায় পৌঁছে যেতে হয়। তারপর লোহা সবার কাজে লাগে। সুগত বললে, ঠিক আছে করিম! তুমি কিন্তু তোমার নতুন বৌকে নিয়ে আর একবার আসবে এখানে। চাকরি পাবার পর। মেমসাব কিন্তু ভীষণ একা একা থাকবেন।

করিম মাথা নিচু করে কি বললো বোঝা গেল না। ওর হয়তো বউয়ের নামে লজ্জা হয়। সাঁওতালি গ্রামের শাল মহুয়ার জঙ্গল, থেকে উঠে আসা বুনো হাওয়ার মতো সুগন্ধী লজ্জা। চোখ মেললেই দূরের আকাশে ওই শাদা আগুন। স্বপ্ন তবু ঘুমের মতো মাঝে মাঝে এসব মুছে ফেলে। আকাশে তখন অন্য আর এক ছবি। বনপাহাড়ের ঢলনামা আচ্ছন্ন সবুজ মাঠের। পাহাড়ী নদীতে কারা যেন স্নান সেরে ঘর যায়। সূর্যাস্তের ঘন গেরুয়া ধুলোয় বুলবুলিরা এখানে ওখানে ফিড়িংফিড়িং করে। দাদা একবার ছোট-বেলায় সুগতকে একটা পাখি দেখিয়ে বলে-ছিলো 'এ পাখিটার নাম আলতাপরী। অনেক দূর থেকে শীতকালে উড়ে আসে। শীত ফুরোলে আবার চলে যায়।'...বনের ছায়ায় আধো ঘুমন্ত বেলায় করিম তার ছোটো লাজুক আলতাপরীর সঙ্গে শরীর শরীর খেলা করছে....এই লম্বা বেহদ লম্বা পুরোনো ফারনেস থেকে অনেক দূরে....

ইনজিনের স্টার্ট নেবার শব্দ। সুগত চোখ মেললো। ঘুমিয়ে পড়েছিলো নাকি? রশীদ তার ছেলেকে নিয়ে চলে গেলো এইমাত্র। ও নন্দা, ওঠো ওঠো, আজ তো গৃহপ্রবেশের দিন। ওঠো, ছোট মেয়ে! ঘরে যাবো।

খাবার টেবিলে কনুই দুটো রেখে গম্ভীর মুখ করে সুগত বসে আছে। সামনে ভাতের প্লেট। নন্দা রান্নাঘর থেকে তরকারী, মাছ, এটা-ওটা-সেটা গরম করে নিয়ে আসতে ব্যস্ত। সুগতকে সকাল বেলায় নন্দা ব্রেকফাস্ট করিয়ে অফিস পাঠায়। দুপুরবেলায় সুগত অফিস ফিরে স্নান খাওয়াদাওয়া করে আবার অফিস যায়। তখন নন্দার আর কোনো কাজ থাকে না। বাগানের ফুলগাছে জল দেওয়া, সবে বেড়ে-ওঠা চারাগাছটাকে আরো একটু রোদের পুষ্টি দেওয়া। বাড়ির লোককে চিঠি লেখা, গান শোনা। দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস নেই। প্রমাণ সাইজের বাংলা উপন্যাসে মাথা রেখে দিবানিদ্রা দেওয়াকে এখনো রপ্ত করতে শেখেনি। এখনো সারা দুপুর পলকা চাল এদিক ওদিক লাফিয়ে নেচে বেড়ায়। এই সামনের বারান্দায় বসে আকাশ দেখে, বাতাস শোঁকে, ওই সামনের গাছটার ওপর নিচ বেয়ে ওঠা নামা করা কাঠ বিড়ালীটার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা করে। নয়তো বাগানের ঘাস পাতা ফুল পাথর, ধারালো কাটা রোদ্দুরের টুকরোর দিকে আনমনা চেয়ে থাকে। এর মধ্যে একদিন শখ করে কোম্পানীর জীপে চেপে সুগতর অফিস দেখে এসেছে। ঘরের আধ ভেজানো দরজায় গলা বাড়িয়ে বলেছে 'মে আই কম ইন'। ফিরতি পথে রশীদের সঙ্গে (যে এখন প্রায় ওর গঙ্গা জল) কোম্পানীর সাইট দেখতে গেছে। ওই যে যেখানে রশীদ ছেলের কাজের চেষ্টা করছিল। করিমের কাজ হয়ে গেছে। বোসবাবু এক গাল হেসে সুগতকে জানিয়েছিলেন, 'নেবো স্যার, আলবাৎ নেবো। তাছাড়া রশীদের তো একটা লিগ্যাল ক্লেম আছে। ও তো আপনাদের কোম্পানীর ড্রাইভার'। নন্দাকে সাইট দেখানোর সময় এটা-ওটা-সেটা দেখানোর ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই রশীদ নিজের ছেলেকে দেখাচ্ছিল। ওই যে দেখছেন মেমসাব, ওই সিমেন্ট বাঁধানো বেদি আছে না, ওহি হ্যায় ও ফাউনডিশন। ওহি যে পুরিফার, ও। উধ্বার করিম কাম করবে। ফাউনডিশন অবশ্যই ফাউনডেশন এবং পুরি-ফার মানে এয়ার পিউরিফায়ার মেশিনটা। ওটার ওজন নাকি সাড়ে চার টন। আর ওহি যে দূরে মে দেখতা যাতা হ্যায় না ক্রেন, ওহি ক্রেন পর মাল উঠা নামা কোরে—ক্রেনটা নাকি পঁচিশ টন ক্যাপাসিটি। কে জানে পঁচিশ টন ইজ ইক্যুয়াল টু কটা নন্দা? একটা বাঁশ বাঁধা জায়গায় নিচে করিম হাতে প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রশীদ বললো করিম আজকাল সর্ব-ক্ষণ ব্যস্ত থাকে। এয়ার পিউরিফায়ার মেশিনটাকে ক্রেন থেকে ফাউনডেশনে নামিয়ে আনার ভার যে চারজন মিস্ত্রির উপরে পড়েছে করিম নাকি তাদের একজন। বাড়িতে ফিরেও সব সময় করিম বাড়ির লোককে কাজের গল্প শোনায়। সবাইকে। ওর বউ কিছুতেই শোনে না, খালি ভেংচি কাটে। ছোঁড়াটার আজকাল নাকি অন্য কোনো দিকে কোনো উৎসাহ নেই। নন্দা নকল গম্ভীর মুখে রশীদকে বলেছিলো 'হুঁশ, তো তোমার-ও এখন অন্য কোনো দিকে দেখছি না রশীদ! তোমার এত উৎসাহ কেন। ছেলের বউয়ের কাছে কে বেশি ভেংচি খায়?' তুমি? না করিম।' এসব গল্প নন্দা সুগতর কাছে করছিল। ওদের খাবার টেবিলটা খুব নিরালার, খুব নির্জনতার। কোনোদিন সুগত বকর-বকর করে কোনো-দিন নন্দা। বক্তা একজন, শ্রোতা অন্য জন। 'বোসবাবু বলছিলেন করিম নাকি ভারি কাজের....ও এখন ইরেকশন লেবার.... তোমাদের নতুন মেশিনটাকে ফাউনডেশনে লাগানোর সময় করিমকে নাকি মেশিন সমেত ক্রেন থেকে ফাউন্ডেশনে নেমে আসতে হবে। মেশিনকে ক্রেনের হুক থেকে খুলে দেবার জন্য। করিম নাকি আহ্লাদে আট-খানা....একেবারে 'দেওতার' মতো 'আসমান সে' নিচে নেমে আসতে হবে দুনে.... কিন্তু সুগত তুমি কিছু খাচ্ছনা কেন?। কি হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ? জ্বর? দেখি, দেখি'—বলে সুগতর কপালে নন্দা হাত দিতেই সুগত দু হাত দিয়ে নন্দার হাতটা সেখানে চেপে ধরলো। যেন খানিক-ক্ষণ এ হাতের মধ্যে কোনো ব্যথার কোনো অবসাদের কথা ভুলে থাকা যায়।

—'সুগত কি হয়েছে? কোনো দুঃ সংবাদ? বাড়ি থেকে কোনো খারাপ খবর আসেনি তো? লেটার বকসটা কি তুমি খুলেছো? আজ তোমার এতো দেরীই বা হোলো কেন? কারখানাতে কোনো ঝামেলা....? রশীদ তো আজ তোমায় পৌঁছে দিয়ে গেল না? রশীদের কি কোনো.... ?

—করিম মারা গেছে।

হ্যাঁ মারাই তো গেছে। মেশিন সমেত শূন্য থেকে মাটিতে ঠিকরে পড়েছে। ক্রেনের উপর দিকটাও চড়চড় করে ভেঙে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। সারা শরীর থেঁতলে.... হাসপাতাল অবধি যেতে হয়নি। তার আগেই সব শেষ। করিম মারা গেছে কথাটা উচচারণ করতে সুগতর একটুও গলা ধরে গেল নাতো। পথে লাঞ্চ আওয়ারের সময় কোম্পানীতে একটা বিরাট চিৎকার শুনেছিল। গুরুহা কার্নাল ওসকম [illegible] হয় বলে। তার সহকর্মী অন্যান্য ইঞ্জি-নীয়াররা কই কিছু [illegible]। লাঞ্চ-আওয়ার তো, [illegible] পথে জীপে রশীদের [illegible] অন্য [illegible] দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়। রশীদের কি রাস্তায় কোনো অ্যাকসিডেন্ট?, [illegible]

করতে ড্রাইভার বলেছিলো 'না'। একটা এক অক্ষরের উত্তর। তারপর সেও আর কোনো কথা বলেনি। গুম মেরে সমস্ত পথটা গাড়ি চালাচ্ছিল। সাইটের কাছাকাছি আসতেই....জীপ থেকে দেখতে পাওয়া গেল পুরো ব্যাপারটা। ক্রেনটা মাঝ বরাবর ভেঙে গেছে। সামনের আধখানা মাটিতে ঝুলে পড়েছে। কেনবাব, কোথায় ছিলেন কে জানে—এক দৌড়ে জীপের কাছে ছুটে এসে দাঁড়ালেন...করিমকে স্ট্রেচারে তোলার আগেই....রশিদের জ্ঞান নেই....ছেলের কাঁধটা জড়িয়ে ধরে....সারা মাঠটা জুড়ে শুধুই লোকারণ্য....পুলিশেরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে....হাসপাতাল থেকে বাড়ি একজন স্বর্গে....পনেরো কি বিশ মিনিট আগে...বড় সাহেবের বারণ ছিল কোম্পানীতে এত তাড়াতাড়ি খবরটা ছড়িয়ে পড়ুক। তাই....।

সুগত বললো, নন্দা, আমায় এখুনি চলে যেতে হবে। এয়ার পিউরিফায়ারটা বিদেশী মেশিন। যদি কোনো ক্ষতি হয়ে গিয়ে থাকে তো ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন.. অনেক টাকা লাগবে হয়তো বার হতে পারবো না....তোমার পথে একবার.... একবার....

নন্দা আস্তে আস্তে স্থির স্বরে বললো, তোমায় যেতে হবে না সুগত। আমি রশিদের কাছে যাবো। তুমি অফিসের জীপে আমায় একটু পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করো। অফিস ফেরৎ আমায় নিয়ে এসো ওখান থেকে।

সুগত কোনো রকমে বলতে পারলো, 'চলো।'

না, এয়ার পিউরিফায়ারের আপাতত কোনো ক্ষতি দেখা যাচ্ছে না। হয়তো প্যাক করা ছিল বলেই। সুরক্ষিত ছিল বলেই। অবশ্য এত অল্প সময়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। সেফ আন্দাজই ভরসা। তবে সুগতর ধারণা, মেশিনটা ঠিকই আছে। সাইট এঞ্জিনীয়াররাও তার সঙ্গে একমত। টেস্ট করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেশিনটাকে। অফিসে ইতিমধ্যে খবরটা রটে গেছে। সুগতর ঘরের সামনে একটা ছোট জটলা। সাইট এঞ্জিনীয়ার তথাগত রায় অফিসে এসেছেন রিপোর্ট করতে। জনা সাতেক জার্নালিস্ট তাকে ঘিরে ধরেছে।

—পঁচিশ টন ওজন ক্যারি করতে পারে ক্রেনটা, অথচ বলছেন মেশিনটা মাত্র সাড়ে চার টন।

—দ্য লোড ইজ নট রেসপনসেবল ফর দ্য এ্যাকসিডেন্ট।

—সেক্ষেত্রে ?

—ব্যাপারটা একটু স্ট্রেঞ্জ তবে এক্সট্র্যারি হচ্ছে....আমার ধারণা, ক্রেনের ওয়ারিং স্ল্যাকড হয়ে যায়...দ্য লোড দেন হ্যাং ফ্রম দ্য ক্রেন ওনলি বাই দ্য হুক.... ভারে পড়ে ক্রেনটার মাঝখানটায় চিড় ধরে ....মেশিনের বুম ফাউন্ডেশনের ওপর ক্র্যাশ করে মাত্র একটি লোক মারা গেছে

সাইট এঞ্জিনীয়ার একটু চুপ করেন। একটা সিগারেট ধরান। হিন্দুস্তান ডেইলি-র মাঝবয়সীটি জার্নালিস্টটি এবার সুগতর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন,

—আপনি কোম্পানীর টেকনিক্যাল এক্জিকিউটিভ, তাই নয় ?

সুগত ক্লান্ত গলায় সম্মতি জানান।
—হ্যাভ দেয়ার বীন মাচ ড্যামেজ টু দ্য এয়ার পিউরিফায়ার ?

—নট রিয়্যালি। পলিথিন শীট দিয়ে ঢাকা ছিল। বিশেষ ক্ষতি বাইরেটাতে অন্তত হয়নি।

—হোয়েন ইজ ইট গোয়িং টু বি চেকড ?

—দু-একদিনের মধ্যেই ... টেস্টিংয়ে অলরেডি চলে গেছে। তবে, উই আর প্রিটি শিওর ইটস ও-কে।

অন্য পৃথিবী (একটি বামপন্থী সাপ্তাহিক) পত্রিকার উদ্ধত যুবকটি প্রশ্ন করলো, আপনারা সবাই মেশিন-মেশিন করছেন কেন ? যে-লোকটি মারা গেছে, তার নাম কি ?

—আবদুল করিম।

—তার বয়স কত ?

—কদিন কাজ করছ এখানে ?

—সবে কাজে লেগেছিলো।

—হু ইজ মোর ইমপরট্যান্ট ? দ্য ম্যান অর দ্য মেশিন ?

দেখুন—মানুষ ইমপরট্যান্ট, না মেশিন সে-বিষয়ে আমার বিশেষ স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে মানুষ বড় বেশি ইনডেফিনিট-- মেশিন অতোটা নয়....ফ্রিজিডেয়ারে জল রাখুন—ঠাণ্ডা হবেই

—যদি না লোডশেডিং হয়। কিন্তু এটার জন্য দায়ী কে ? মানুষ, না মেশিন ? হিউম্যান নেগলিজেন্স, না মেকানিক্যাল ফল্ট ?

—ঠিক বলতে পারব না, আপনি সাইট এঞ্জিনীয়ারকে জিজ্ঞেস করুন।

বঙ্গ সমাচার পত্রিকার সপ্রতিভ চালাক-চতুর ছেলেটি তর্কের মোড় ঘোরাতে প্রশ্ন করলো, এই অ্যাকসিডেন্টের ফলে আপনাদের প্রজেক্ট কি ডিলেড হয়ে গেল ? সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কি শেষ করতে পারবেন আপনাদের নতুন পাওয়ার ইউনিট ?

—আমরা আমাদের কথা রাখতে পারবো আশা রাখি। সেপ্টেম্বরেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। দিস এ্যাকসিডেন্ট ওন্ট হিন্ডার দ্য প্রজেক্ট। দ্য মেশিন ইজ ও-কে।

—ধন্যবাদ, মিস্টার..... শুনেছি পাওয়ার ক্রাইসিসে এই ইউনিট একটা ইমিজিয়েট সলিউশন আনবে। দেরি হলে দেশের সবাই হতাশ হোতো।

—না, এই অ্যাকসিডেন্টের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মনীতির কোনো যোগ নেই।

শুনছো নন্দা, মানুষ-মেশিনের [illegible] আমি মেশিনকে জিতিয়ে দিয়েছি.... করিমের নামটা কেউ জানতো না--যে-লোকটা মারা গেছে, তার তো কোনো ভবিষ্যৎ থাকতে পারে না—মেশিন তো আবার চালু করা যাবে....পলিথিন শীট দিয়ে ঢাকা ছিল....করিমের সম্পর্কে কারো কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না....আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মনীতির সঙ্গে এ-মৃত্যুর কোনো যোগ নেই। রশিদ আজ আমায় নিতে আসেনি....কালও হয়তো আসবে না।.... পরশু দিন থেকে কোম্পানীর ইয়ুনিফর্ম পরে আবার গাড়ি চালাবে....এ-মৃত্যুতে কারো কারো হাত ছিল না.... আমি নিশ্চিত ....লোকক্ষয়কারী কাল আমাদের সবাইকে মেরে রেখেছে ..মিরাবো সেতুর নি[illegible]কে সেইন বয়ে যায়...রাত চলে যায়...[illegible] টেঁকে না....রাত্রি-দিন প্রেম-যৌবন....[illegible] একটা সেমিকোলনের মতো....জীবন এ[illegible] সেনটেন্স—নন্দা, তোমার হাতটা দাও —দেবে না—রাখবে না আমরা হাতে.... দ্য পারফিউমস অব অ্যারাবিয়া উইল সুইটেন দিস ভারটি হ্যান্ড....এই [illegible] রক্ত লেগে আছে ? অরণ্যে জ্যোৎ[illegible] তার পাপবোধ ঘাসের নিবিড়ে... আমি রক্ত ছুঁইনি কখনো নন্দা...কেবল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি, এইমাত্র...তুমি আমি আমরা সবাই...তুমি আমার দিকে ও-রকম চোখে তাকিও না...কলেজের উইন্ডমিলটার গল্প করো....এলোমেলো হাওয়া, উমনো ঝুমনো ডিসেম্বরের গল্প বলো...নন্দা... তোমার হাতটা দাও...আমাদের ভবিষ্যতের কর্মনীতির সঙ্গে...এ মৃত্যুর কোনো যোগ নেই ..নন্দা, দ্য লোড ইজ নট রেসপনসিবল......

রুমালের মতো চৌকো বাগানটাতে ওরা এখন বসে আছে। এখন সন্ধ্যেবেলা। 'থিরথিরিয়ে শিরশিরিয়ে বাঁশি বাজবার সময়। দূরে সীতানাথপুর স্টিল প্ল্যান্টের আগুন...শাদা... পক্ষপাতহীন... অনিবার্য... অদ্ভুত অন্ধকার এখন...চাঁদ ওঠে নি... ঋত্বিক আগুন সমস্ত যজ্ঞের পুরোহিত... খাণ্ডবদাহন ও তো যজ্ঞ...ও আগুন নন্দার চোখের জল মুছিয়ে দেবে। তারপর এক সময় ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যাবে ওরা। রশীদও ঘুমোবে। আগুন তবু সারা রাত জ্বলতে থাকবে। সারা দিন রাত।

স্বর্গে প্রবেশ প্রস্থান

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবলাম একবার পাশের ঘরে বুড়ী ঠাকুমাটার সঙ্গে দেখা করেই যাই। মাঝ রাতের প্লাইটের তখনও বেশ কয়েক ঘণ্টা বাকি। এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়ার গাড়ির জন্যে গলির মুখটায় দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ বুড়ির কথা মনে এসে গেল। নব্বুইয়ের ঘরে গোটা দুই চান্স দিয়ে বুড়িটা সেঞ্চুরির দিকে ছুঁতে চলেছে। আজ আছে কাল নেই, একবার দেখা করেই যাই। এসেই হয়তো দেখব বুড়ি আস্তানা পাল্টেছে। কে বলতে পারে কাল কী হবে! ভগবানের ইচ্ছের ওপরে তো আর হাত নেই! বুড়ি অন্তত এরকমটাই বিশ্বাস করে। বলে, আগেকার কালতো নেই। থাকলে এতদিন অন্তর্জলির টানে গঙ্গার কিনারায় বাসা নিতে হত। বুড়ীর কথা শুনে একদিন বলেছিলামও, 'দুঃখু কিসের ঠাকমা, ধরেই নাও না, অন্তর্জলিতেই রয়েছ। গঙ্গা তো র দূরে না। মিনিট কয়েকের পথ মাত্র। ইস্টিমারের ভোঁ তো দিন-রাতই শুনছ ঘরে বসে।

আজ রাতে তামাম উনিশ নম্বর বস্তির মেয়েপুরুষ একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে আমার দরজায়। আমার আস্তানার সামনে। আস্তানা বলতে তো সাড়ে চার বাই তিন-হাত দুখানা কুঠুরী। তার ভেতরে কাপালিক রাজত্বের খিদ্‌ঘুটে অন্ধকার আর চার্নকি জমানার স্যাঁতাপড়া গন্ধ। ওরা সেখানে এসেই দাঁড়িয়েছে। মেয়ে-পুরুষ ভিড় করেছে। ওদের জগতে এমন বিশাল ব্যাপার যে কখনও ঘটেনি। প্রেম করে বিয়ে আর এর মেয়ে ফুসলে ওর পালানো, এই নিয়েই এ-রাজ্যে তুলকালাম। মাঝে-মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর উত্তেজনা। দিন কয়েক আগে অবিশ্যি লটারীতে পাঁচু ঘোষের একরাশ টাকা পাওয়া নিয়ে উনিশ নম্বরে একটা অন্য টাইপের উত্তেজনা ছিল। পাঁচু ঘোষ বৈঠকখানার কোথায় যেন একজন বাইণ্ডারের হেফাজতে কাজ করে। মাস মাইনে ঘাট-ফাট হবে হয়তো। সেই পাঁচু ঘোষ কার পাল্লায় পড়ে যেন একখানা লটারির টিকিট কিনেছিল। তারপরে সাধারণত যেটা হয় না সেটাই কেমন করে ঘটে গিয়েছিল। একপাল আণ্ডা-বাচ্চার বাপ, হা-ঘরে হাড়হাভাতে টাইপের পাঁচু ঘোষই একখানা মোটা টাকার দাঁও মেরে দিয়েছিল লটারি কোম্পানির দৌলতে।

পাড়ায় সেদিন পাঁচু ঘোষ জিন্দাবাদ! উনিশ নম্বরের হিরো জিন্দাবাদ। পাঁচু সেদিন রীতিমত একটা ফিগার। সারা উনিশ নম্বরের স্টিরিও টাইপ জীবনের হাল-বদলের নায়ক তো সে-ই। একদিনের জন্যে হলেই বা! কানাইয়ের চায়ের দোকানে সেদিন চায়ের কাপে তুফানও পাঁচু ঘোষ। তামাম উনিশ নম্বর মানেই পাঁচু ঘোষ। পাঁচু ঘোষ নিয়েই সেদিন পাড়া উথাল-পাথাল। উনিশ নম্বরের মঙ্গল চিন্তায় জান ভিড়িয়ে দেওয়া একমাত্র সংস্থা 'যুব জাগরণ' পাঁচু ঘোষের খবর পেয়েই জরুরী মিটিং তলব করেছিল। পাড়ার এমন একটা মানুষের নসীব ফেরা মানে তো তামাম বস্তিটারই 'সুরত' ফিরে যাওয়া। অতএব পাঁচু ঘোষকে বস্তির নানা উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহিত করতে হবে। কে যেন বলেছিল, পাঁচু ঘোষ এখন এত টাকার মালিক হয়ে যদি এখানে আর না থাকতে চায়, যদি এখান থেকে চলে যায়। বেঁটে শিবু বক্তাকে মাঝপথে থামিয়েই বলেছিল, তুই ক্ষেপেছিস মদনা, পাঁচু কাকা আমাদের সে-টাইপের মানুষই নয়। এই বস্তির মাটি কাকার কাছে 'হেভেন'। সেই কী একটা সংস্কৃত ছড়া আছে না, 'জননী জন্মভূমি স্বর্গা...ধুস শালা, দু-নম্বরী কথাবার্তা ছাড়া মগজটা কিছু ধরেই রাখতে পারে না। এত ফাইন ছড়াটার লাইনগুলোই ভুলে গেছি। এরই মধ্যে বস্তির মরা বটগাছ-টার ডালে মাইকের চোঙ ঝোলানো হয়ে গিয়েছিল: সেখানে তখন, 'তেরে মনকে গঙ্গা'। সারা বস্তি সেদিন জয়েন্ট ফ্যামিলি।

আজ সারাদিন ফাইলপত্তর গোছগাছ করতেই কেটে গেছে। বস্তি উন্নয়নের কি কি প্রপোজাল রাখা হবে তা নিয়ে দফায় দফায় মিটিং হয়ে গেছে পরশুদিন। যুব জাগরণের ক্লাব ঘরটায় একটা টি ভি সেট লাগানোর কথাও রয়ে গেছে জাগরণ ক্লাবের সদস্যদের তরফে। তারা জানিয়েছে ক্লাব ঘরটায় সেটা বসালে সারা বস্তির মানুষই ইচ্ছে মতো সেখানে গিয়ে শুনতে পারবে। পাঁচু ঘোষের বক্তব্য বস্তির মধ্যেই যাতে কো-অপারেটিভ বেসিসে বাইণ্ডিংখানা খোলা যায় সে সম্পর্কে সেখানে একটু আলোচনা চালানো। দরকার হলে পাঁচুকাকা কিছু টাকাও ইনভেস্ট করবে। বস্তির একমাত্র সহজ কবি সরল লেখক কালীপদ মিত্র অবিশ্যি তদবির করতে বলেছেন বস্তিতে একটা লাইব্রেরী করে দেওয়ার জন্যে। রীতিমত প্রগ্রেসিভ টাইপের সাতকড়ি পাল বলেছেন, সব চেয়ে আগে দরকার অজ্ঞানতা দূর করা আর

শিশুদের সুস্থ মানসিক বিকাশ ঘটানো। তুমি তাই একটা বিনা মাইনের ইস্কুল আর খেলার জায়গার জন্যে তদ্বির কোরো। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। সেই তোমাদের রবিঠাকুর বলেছিলেন না, ইহাদের করো আশীর্বাদ...আরও কি কি সব যেন বলে-ছিলেন। মনে নেই সব এখন আর।

আমার লাভার নিত্য পালের মেয়ে অবিনাশ্য বলেছিল অন্য-এক প্রবলেমের কথা। তার তদ্বির ছিল বস্তির এজমালি কলের কাছে যাতে মেয়েদের চান করার একটা ঘেরা জায়গা করে দেওয়া যায়। তবে জাগরণের ছেলেগুলো সকাল থেকে যেভাবে ওখানে ভিড় করে। পাঁচুকাকার মা বস্তিতে আরও খান-কয়েক কল বাড়ানোর সাদামাটা তদ্বির রেখে গিয়ে-ছিলেন আজ সকালে। সে সবই ফাইল-বন্দী করেছি। সারা দিনই ফাইল গুছিয়েছি। আজ তৈরী হওয়ার আগেও একবার ফাইলগুলো 'চেক' করে নিয়েছি।

সব ঠিকঠাক করে একটু হাঁফ ছাড়তেই ঠাকুমার কথা মনে এল। ঢুকলাম ঠাকুমার ঘরে। আমার আশি ছুঁই ছুঁই ঠাকুমা তখন অন্ধকারে মুখ থুবড়ে ঘুমের মধ্যে। একটা কেরোসিন কুপীর ধোঁয়াটে আলোয় ঘরের মধ্যে ছায়াময় আবহ। সেই ভুতুড়ে আলো-আঁধারিতে ঠাকুমার শরীরের ছায়া পিছনে স্যাঁতাপড়া দেওয়ালে লেপটে। মাঝে মধ্যে কেঁপে উঠছে আলোর শিখার নড়াচড়ায়। এখন ঠাকুমার সারা শরীরটাই বেমালুম চাদর-বন্দী। শীত-মরশুমে কিছুকাল তার এই মতই রোজ-নামচা: সকালে তুলো চটকানো মান্ধাতা আমলের তেলচিটে লেপটা মুখ থেকে সরিয়েই শরীরটাকে চাদরে ঢেকে ফেলা। আর খানিক বাদেই চট বগলে প্রেস বাড়ির চাতালে রোদ খুঁজতে যাওয়া। সূর্য মাঝপথে যেতেই চাতালের রোদ গায়েব। ঠাকুমার ঘরে ফেরা। আবার শরীর ছুঁয়ে চাদরের ঘেরাটোপ। এমনিভাবেই দিনগত পাপক্ষয়। আপন মনেই নিজের ভাগ্য আর পোড়ার মুখো দেবতাকে শাপ-শাপন্ত। কানের কাছে অনর্গল কাটা রেকর্ডের মত বেজে যায় বস্তির মেয়ে মরদের খিস্তি-খেউড়। কলের লাইনে তুলকালামের শব্দ। হাতাহাতি থেকে রক্তাগঙ্গা।

বুড়ি মাঝে-মধ্যে ফুঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। সব কটা দেবতাকে বেমক্কা গাল দিয়ে বসে। মরা ছাগলের মত ঘোলাটে চোখ দুটোর সামনে হয়তো ভেসে ওঠে ছেলেটার মুখ। আমার বাবা ছিল যে মানুষটা। সেই সব ছবি হয়তো বুড়ির বুকের ভেতর মোচড় দেয়। শেষকালটায় বাবার ক্ষয়ে-যাওয়ার অসহ্য ছবি চোখের সামনে জ্যান্তো হয়ে ওঠে হয়তো। যন্ত্রণার শব্দগুলো এখনও বোধহয় বুড়ির কানের আশে পাশে। বুড়ি ভাবে তার ছেলেটাকে হয়তো বাঁচিয়ে তোলা যেত। এই অন্ধকার আস্তানাটাই যেন দিনে দিনে ক্ষইয়ে দিলে তার ছেলেটাকে। এই অন্ধ-কূপে অন্ধকারটায় চোখ রাখলেই আমারও মনে হয় যেন আলো হাওয়ার পথ জুড়ে এটা চিরকালের নো-এন্ট্রির নিশান।

আমার মা-ও তো সেই কবে কোমর ভেঙেছে নিজের শক্তিতে উঠে হেঁটে বেড়ানোর শক্তিও অনামুখো দেবতার কাছে আগাম জমা দিয়ে বিছানা নিয়েছে। বাদলার রাতে বস্তির এজমালি কল থেকে জল আনতে গিয়ে পিছলে পড়ে জন্মের মত বিছানায়। এক চোখো জুজুর মতো এক ঠেঙে যে বাতিটা টিম টিম করে জ্বলে উনিশ নম্বরের মাথায় আরও অন্ধ-কার টেনে আনে সেটাও সেদিন বেইমানী করেছিল মায়ের নসীবের সঙ্গে। এই বুড়ীটা এই অশরীরী অন্ধকারে বসে সেইসব কথাই ভাবে হয়তো।

ফিরে এলাম বুড়ীর ঘর থেকে। দেখা

কাছে গিয়েও দেখা করতে পারলাম না। ডাকাডাকি করলে হয়তো বুড়ি উঠতো ইচ্ছে করেই ডাকলাম না। বিদেশে উড়োজাহাজে করে মস্ত পাড়ি দিচ্ছি শুনেই বুড়ি হয়তো হাউ-মাউ করে উঠবে। খাবার নাম করে কাঁদবে খানিক। উড়োজাহাজের কথায় আমার প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কায় ডুকরে কেঁদে সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড বাধাবে। আর বাধাবেই বা না কেন? এই ছেলেটা ছাড়া যে দুনিয়ায় তাদের দেখার আর কেউ নেই। কোনমতেই বুড়ি রাজি হবে না আমাকে ছাড়তে। কিন্তু আমি তো থাকতে পারি না। এমন একটা সুযোগ কি হেলায় হারাবার! না হারাতে আছে! উনিশ নম্বর বস্তির এগারো ক্লাস-পড়া হারাধন চক্রবর্তীর জীবনে এমন সুযোগ কি বারবার আসবে? না আসতে পারে? বিশ্বব্যাঙ্কের দরবারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ! উড়ো-জাহাজে উড়ে ওয়াশিংটন। স্বয়ং ওয়র্ল্ড ব্যাঙ্ক কর্তার সঙ্গে মুখোমুখি বসে আলোচনা। আর সুযোগ বুঝে তাদের এই উনিশ নম্বর বস্তির ছবিটা একটু তুলে ধরা। সেবার কলকাতায় যখন এসেছিলেন ভদ্রলোক তখনই এই বস্তি নিয়ে একান্তে কিছু কথা বলার ইচ্ছে ছিল আমার। কলকাতার কিছু কিছু বস্তি যেমন তিনি ঘুরে ফিরে দেখেছেন উনিশ নম্বরকেও তেমনি করে দেখানোর ইচ্ছে ছিল। ঘুম চোখে একঘরলী কলের সামনে মস্তো লাইনটার ছবি একবার সরেজমিনে দেখানোর বড় বাসনা ছিল। আরও দেখানোর ইচ্ছে ছিল ক্ষুদিরাম চক্রবর্তীকে। জীবনে যে-ঘরে সূর্য ঢোকেনি, অভ্যাসের দাস হয়ে কেমন সেই অন্ধকারে সেঁধিয়ে চক্রবর্তী মশাই রোজ সকালে 'জবাকুসুম সংকাশং' বলেন। জবাকুসুম ব্যাপারটা হয়তো সাহেব বুঝতেন না। তবু এগারো ক্লাসের বিদ্যেতে যতটা সম্ভব আমি বোঝাবার চেষ্টা করতাম। এই রকম একটা দুরাশা নিয়েই আমি গিয়েছিলাম সেই সব বস্তিগুলোর ধারে-কাছে। যেখানে সাহেব বস্তির দুঃখ দেখতে এসেছিলেন। কোন রকমে একটা সুযোগ খুঁজে তাঁর সামনে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। হাজার হলেও কলকাতায় একসময় ছিলেন অনেকদিন সাহেব মানুষটা। সেই সুবাদে কলকাতার সঙ্গে তাঁর একটা রিলেশন তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত। বস্তিতো কলকাতায় একটা নয়। আর যে বস্তিগুলো তিনি দেখছেন সেগুলোই তো কলকাতার বস্তির টোটাল চেহারা তুলে ধরতে পারবে না। তাই আরও কিছু বস্তি দেখা দরকার। এই সব সাত-পাঁচ বলে ভদ্রলোককে ঠিক উনিশ নম্বরেও একবার আনতে পারব ভেবেছিলাম। কিন্তু সে আর হয়ে ওঠেনি। মস্তো মস্তো মাথাওয়ালা মানুষের যা ভীড় চারপাশে! কাছে এগোয় কার সাধ্যি?

হঠাৎ যেন সেই সুযোগ ভগবান পাইয়ে দিলেন। আর পাইয়ে দিলেন নেহাতই আচমকা। সরকারী সিলমোহর লাগানো চিঠি এলো একদিন। হলুদ বাটতে বাটতে উঠে গিয়ে ছোট বোনটা পিওনের কাছে সই দিয়ে সে চিঠি নিয়েছিল। সারা খামময় হলুদের দাগ। প্রতি সপ্তাহে লম্বা লেফাফায় সাদা কাগজে হাতে লিখে অথবা টাইপ করে, কামিং টু নো ফ্রম এ রিলায়েবল সোর্স অথবা নোরিং ফ্রম ইওর অ্যাডভারটাইজমেন্ট টাইপের ফরমা লিখে যে গাদা গাদা চিঠিগুলো পাঠাই প্রতি সপ্তাহে তার একটা দুটোর উত্তর আসেই। কোনটা ইনটারভ্যুর চিঠি, কোনটা রিগ্রেট। ছোট বোনটা সেই সবই ভেবে থাকবে। তাই খামটার সারা শরীরে হলুদ—যেন বিয়ের চিঠি। কিন্তু চিঠি খুলেই তো আমার চক্ষু চড়কগাছ! এযে জব্বর চিঠি। চিঠির ঘোর কাটতে না কাটতেই সরকারী তরফের মানুষজন এসে গেল উনিশ নম্বরের সরু গলিতে। আমি জানতে পারলাম বিশ্বব্যাঙ্কে পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধি দলে আমি একজন। কোথা নিয়ে যেন কী সব হয়ে গেছে। সাহেব মানুষটা কি তবে অন্তর্যামী ছিলেন। আমি তাঁর কাছাকাছি হতে চাইছিলাম—এটা কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তা না হলে আমার কাছেই বা কেন এই চিঠি! আমার তো কোন সরকারী যোগাযোগ নেই! তবে কি সেই সাহেবই এই কাণ্ড করেছেন! আমার নাম সুপারিশ করে গেছেন। এগারো ক্লাশ পাশ উনিশ নম্বর বস্তির স্বর্গত পূর্ণ চক্রবর্তীর ছেলে হারাণ চক্রবর্তীকে ওয়াশিংটন পাঠাতে বলেছেন। বলেছেন উনিশ নম্বর বস্তির অভাব অভিযোগ নিয়ে ফাইল রেডি করে ছোকরাকে পাঠিয়ে দেবেন। আলাপ আলোচনা করে একবার দেখি কি করা যায়!

আলো ঠিকরানো পথ মাড়িয়ে ঝলমলে ওয়াশিংটনের বুকের ভেতর সেঁধিয়ে গেলাম। এগারো ক্লাসের তিনটে কম্বিনেশন সাবজেকটের মধ্যে জিওগ্রাফি ছিল একটা। এ সাবজেকটটায় আমার কোনদিনই তেমন উৎসাহ ছিল না। বরং এটাকে এড়িয়ে থাকতেই চাইতাম। তবু বাবার কেন জানি না একটা সফট করনার ছিল পৃথিবীর ব্যাপারে। অন্ধকার উনিশ নম্বরে বসে কেমন করে মানুষটা পৃথিবীর শব্দ শুনতেন কে জানে? যাই হোক সেই 'ভারতভূমণ্ডল' নামের একখানা বই উল্টে-পাল্টে দেখতে হত পরীক্ষা সামাল দিতে। সেই বইতেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে পরিচয়। তারপর সশরীরে এই ওয়াশিংটনে।

টাইয়ের 'নট' ঠিক করতে করতে উনিশ নম্বর বস্তির এক হাবাগোবা এগারো ক্লাস-পড়া ছোকরা গিয়ে বসলাম ব্যাঙ্কের অফিসে। ফাইলটা কোলের ওপর রেখে আমার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার প্রথম দিনের মত নার্ভাস ফিল করছিলাম। মনে বারবার সন্দেহ—ঠিক ঠিক কথা বলতে পারবো তো? গলা খস খস করছে কাগজের মত। বুকের ভেতরটায় একটা ছোটখাট ধানকল চলছে যেন। নার্ভাস হয়ে যাওয়ার এক-নম্বরী সিমটমগুলো সবই ঘিরে ফেলেছে আমাকে। সাহস ফেরাতে খামোকাই একবার ফাইল খুলে কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করে নিলাম। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সেই প্রেসিডেন্ট ভদ্রলোক। দিন কয়েক আগে যিনি কলকাতায় উড়ে গিয়েছিলেন আমাদের মত বস্তির বাসিন্দাদের সাহায্য করবার জন্যে। মানুষটাকে দেখে আর কথাবার্তা শুনে বেশ খানিকটা নার্ভাস ভাব কাটলো। দরকারি কথাবার্তার পর সুযোগ বুঝে আমার উনিশ নম্বরের আর্জিগুলো গলা নামিয়ে ও'র কানের মধ্যে ফেলে দিলাম। চোখ বুজে বার কয়েক মাথা দুলিয়ে গম্ভীর হয়ে কথাগুলো শুনলেন ভদ্রলোক। তারপর কোটের ডান পকেট থেকে একটা বাহারী কলম বের করে সামনে রাখা ফাইলে খস খস করে লিখে নিলেন সব। তারপর আমার পিঠ চাপড়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন কথা রাখার। মনে হল কথাগুলো তিনি নিজের ভেতরে নিয়েছেন। কথাবার্তা শেষ হতেই খাবারের ট্রে সাজিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো ফিটফাট পোশাকের জনকয়েক মানুষ। গেলাস আর প্লেটে হরেক কিসিমের খাবার। হঠাৎ আমার পায়ের নিচটায় কি যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে। টাইয়ের নট-এ হাত বুলিয়ে বার-কয়েক ঢোক গিলে নিচের দিকে তাকাতেই দেখি আমাদের পাড়ার কুকুর লালু। পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করে লেজ নাড়ছে। ওর বরাদ্দ একটা লেড়ো বিস্কুট, এখনও দেওয়া হয়নি। তারই আর্জি জানাচ্ছে লালু। আমার সামনে সেদিনের খবরের কাগজ। বিশ্ব-ব্যাঙ্কে আলোচনার জন্য পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধি যাচ্ছে আগামী জুলাইয়ে। টেবিলের ওপর ডাঁটিভাঙা খালি চায়ের কাপ। তার মধ্যে একটা মাছি মরে তলানি চায়ের ওপর ভাসছে। ন'টার সাইরেন বাজলো। কালীবাবুর চায়ের দোকানের ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। তড়িঘড়ি করে না লাইন দিলে কারখানার হাজরে খাতায় লেট-মার্কা পড়বে। লালুকে তার বরাদ্দ বিস্কুটটা দিয়ে উঠলাম। রাস্তায় পা দিতেই দেখি একটা চিল মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে রাস্তায়। আকাশ থেকে কোন উড়োজাহাজ ঠুকরে ফেলে দিয়েছে হয়তো।

গ্রামীণ সাবালক হওয়ার গল্প

একরাম আলী

রেকিব বেঞ্চিতে বসেছিল। সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, 'সে কি, এখন যাবো কি করে? আড়াই মাইল রাস্তা এতো রেতে আমি হেঁটে যেতে পারবো না বাউলদা।'

মণিরুলের গরম লাগছিল বলে নতুন টেরিলিনের জামাটা সে খুলে সাবধানে কাঁধে নিয়েছে। ঘামে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। একেবারে মঙ্গলডিহি ঢোকার আগে গায়ে দেবে। দূরে দাঁড়িয়েছিল সে। কাক-চাঁদনিতে তার হাত-কাটা গেঞ্জির সাদা দেখা যাচ্ছিল। রুমাল ঘুরিয়ে হাওয়া করতে করতে সে বলল, 'যেতে পারি, কিন্তু বিয়ে শেষ করে ফিরতে সাড়ে বারোটা একটা বেজে যাবে। তখন?'

দোকানে তালাচাবি দিয়ে হ্যাজাকটা হাতে নিল বাউল। ছোট্ট হোটেল। আশ-পাশের দোকানদাররাই শুধু খায়। এ বছর একটা নতুন হোমিওপ্যাথির ডাক্তার এসেছে পাঁড়ুই-এ। কলকাতা থেকে এসেছে বলে খাতির বেশী। ভালো খদ্দের বলতে একমাত্র সেই ডাক্তারের নামটাই করা যায়। তরকারী কেউ খারাপ বললে বাউল বলে, 'কই ডাক্তারবাবু তো খেয়ে গেল, কিছু বলে নাই তো।'

হ্যাজাকটা পিচ রাস্তায় রেখে ঝাঁপ বন্ধ করল বাউল। ঝাঁপ বন্ধ করলে তার দোকানের সাইনবোর্ডটা দেখা যায়: তোবড়ানো টিনে বন্ধ ঝাঁপের পাশে লেখা আছে 'সন্ধ্যারাণী হিন্দু হোটেল।' পাঁড়ুই-এর একমাত্র হোটেল। বাউল বলল, 'তোরা বস, লাইটটা রেখে আসি।'

দোকানের পেছন দিকে একটা চালা ঘরে শুয়েছিল সন্ধ্যা। বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছিল কাত হয়ে। তার মাথার ওপর একটা শিকেয় ভাজা মাছ ঝোলানো। হোটেলের। কম পড়লেই লোকটা জ্যানাখ্যাচা করে ছাড়বে। লম্ফর আলোয় ঘরের দম বন্ধ ধোঁয়া পরি-বেশে শিকেটা একটু দুলে উঠল। সন্ধ্যা বাঁ-দিকে কাত হয়েছিল। ডান-হাতটা আলগা হয়ে উঠোনে বাচ্চার ওপর পড়ে আছে। সেটা তুলে 'হুট' বলে উঠতেই শিকের দড়িটা এক পাক ঘুরে গেল। ওপাশে মনিরামের হাঁড়ির ঢাকনাটা ঠং করে উঠল একবার। ফড়াৎ করে একটা ইঁদুর বেরিয়ে [illegible] দিয়ে সন্ধ্যার [illegible] পড়তেই আঁতকে [illegible] উঠে [illegible] করে। বাচ্চাটাও কঁকিয়ে উঠল।

হ্যাজাক হাতে [illegible] দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'কি হল? সাপ নাকি?'

পাশেই পুকুর। [illegible] পায়খানা [illegible]। পেছন দিকটা ফাঁকা বলে সন্ধ্যা পুকুর ঘাটের একমাত্র খদ্দের। নানা কাজে ঘাটেই সে অনেকটা সময় কাটায়। আবার সাপও যখন-তখন উঠে আসে তাদের ঘরে। সন্ধ্যা বাচ্চাকে হ্যাঁচকা মেরে কোলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। নিজের জিনিস নিজের কাছে রাখতে পারে না, আবার সাপের ভাবনা। ওসব হোটেলের মাল আমি ঘরে রাখতে পারবো না। বাবা যে মাথা, হাজার [illegible] দিলে। কিনা; সোহাগ করে শিকের মাছ রেখেছে। আর [illegible] আমি পারবো না।

বাউলের গায়ে জামা। ইস্ত্রি করা। চোখে একটু বাংলা মদের রঙ। মদন রিকসাওয়ালা কথা দিয়েও [illegible]। হ্যাজাকটা নামিয়ে বাউল ঘরের কোণ থেকে চটি দুটো হাতে তুলে নিয়ে [illegible] করে চলে এল।

সন্ধ্যা সেইদিকে চেয়ে রইল একটু। হ্যাজাকটা জ্বলছে অকারণে। সোঁ-সোঁ শব্দ হচ্ছে একটানা। বাচ্চাকে সামনে উপুড় করে হ্যাজাকের পাম্পটা খুলে দিল সে। রাত সাতে জংশন স্টেশন থেকে ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়ে ট্রেন যে রকম আবার অন্ধকার লাইনের ওপর গিয়ে পড়ে, সেই রকম চুপচাপ আর অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশটা। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। সন্ধ্যা ঘরে ঢুকে বসে রইল লম্ফর আলোয়। একটু আগে মনিরুলের গলা শোনা যাচ্ছিল। আজ আর এখানে আড্ডা হবে না। মঙ্গল-ডিহিতে প্রফুল্লর বিয়ের নেমন্তন্ন। পাশেই বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। কি ভেবে তার এক ফোঁটা নাকটা দু' আঙুলে টিপে সন্ধ্যা টেনে টেনে বলতে লাগল, 'পু-টু, পু-টু।' কেঁদে উঠল বাচ্চাটা। সন্ধ্যা ঝুঁকে পড়ে বাচ্চাটাকে জোরে বুকে চেপে ধরল।

সামনেই সাইকেল - রিকসাটা দাঁড়িয়ে-ছিল। মাস-চারেক কিনেছে বাউল। এখনো নতুন হয়ে আছে। রিকসার কাছে গিয়ে বাউল একবার এপাশ-ওপাশ দেখল। কেউ কোথাও নাই। মিস্টির দোকানের [illegible] নিশ্চয়ই আক্কাসের কাপড়ের দোকানে তাস খেলছে। ধরমতলার দিক থেকে [illegible] হল্লা ভেসে আসছে একটু একটু। রেকিবকে ইশারা করে বাউল বলল, '[illegible] ঐখানে [illegible] আছে। চ, আমিই নিয়ে যাই।'

রেকিব পিচ রাস্তার উল্টো দিকে প্রাইমারী স্কুলের গায়ে পেচ্ছাপ করছিল। বোতাম আটকাতে আটকাতে এগিয়ে এল

সে। 'বৌদি চেঁচাইছিলো ক্যানে বাউলদা?' বলতে বলতে হাসল রেকিব।

মণিরুল চুপচাপ। বাউলদা রিকসাটা শেষবারের মতো পরীক্ষা করতে করতে বলল, 'কিছু নয়, আজ ঘরে থাকবো না তো, তাই এতো রাগ। নাকি রে মণিরুল?'

মণিরুল একটু রাগ দেখাবার চেষ্টা করল, 'আমি কি করে জানবো? আমি কি তোমার ঘরের ব্যাপার দেখতে যাই নাকি?'

'না না, তা নয়। তু আমার ঘরের পর তো বটিস।' বলে হ্যা হ্যা করে হাসলো বাউল। যেন অনা বাতাস ছাড়ছে একটু। ছেড়ে, মজা পাচ্ছে বেশ।

একটু অপ্রস্তুত হবে নাকি মণিরুল? হয়ে, ব্যাপারটা গায়ে মেখে হাওয়া নেবে? বলল সে, 'তোমার বাউলদা, মুখে কিছু আটকায় না। চল রাত হচে।'

রেকিব রিকসায় উঠে সিগ্রেট ধরিয়েছেল। তুলনায় সে একটু রোগা। ডান পায়ের ওপর বাঁ পা তার দুলছিল একটু একটু। ফিরতে কত রাত হবে, বোঝা যাচ্ছে না। এখনই তো প্রায় ন'টা। চারিদিক সুমসাম। এখন তাদের হোস্টেলে অনেকে রুমে ফেরে নি। ইভনিং শো ভাঙলে-ও হেঁটে ফিরতে ন'টা পানেরো। হোস্টেলে রেকিব নতুন গেছে। ফাস্ট ইয়ারে বাড়ি থেকেই যাওয়া-আসা করতো। কষ্ট করে। কম্পাজরা জেলে ঢোকাব পর কলেজ কিছুটা শান্ত হল একাত্তরের শেষে। বাহাত্তরের মাঝামাঝিতে রেকিব হোস্টেলে গেছে। তখন সব রুম ফাঁকা। এক-দুই করে নতুন ছেলে এলো। ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়েছে দু-এক মাস। এখন অবশ্য সব পরিষ্কার। তাদের গুরের নিখোঁজ রাম মুখার্জির জন্যে তার বাবা এখন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেয়। রেকিব সিগ্রেটটা ফেলে দিয়ে বলল, 'আর পারছি না যাবে তো চলো। কাল সকালে উঠে হোস্টেলে যেতে হবে।'

বাউল রিক্সার হ্যান্ডেলে হাত রেখে খিঁচিয়ে উঠল, 'এ্যাঃ হোস্টেল দেখাইছিস। তু কি কলেজে ঢুকে আলাদা হয়ে গেলি রে! কাল না গেলে কি হয়?

মণিরুল রিকসায় উঠেছে। 'আমাদের তো ভাই কলেজ নাই, হোস্টেলও নাই। বাপের হোস্টেলে খাই আর কাজ করি। তুর মতন টাকা খরচ করে আর-একটো বাপ কিনতে পারবো ন। না কি বলো, বাউলদা? এতোটায় উঠতে হবে, এতোটায় ঘরে ফিরতে হবে এতোটায় কলেজে থাকতে হবে, এই এই পড়া করতে হবে—ধুশ, পরের কথা শুনবো ক্যানে রে? আমার বাপ নাই?' বলে হো হো করে হাসল মণিরুল। উঠে রিকসার হুড নামিয়ে দিতেই রিকসাটা একটু ডোঙার মতো দুলে উঠল। পরিষ্কার আকাশ। একটা উপগ্রহ তারার ছদ্মবেশে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে পুবদিকে। আশপাশের তারাগুলো বেকায়দায় পড়ে স্থির হয়ে আছে নিজের নিজের জায়গায়।

অন্ধকারে, হাওয়ায় রিকসাটা ভাসতে ভাসতে চলেছে। কেরোসিন বাতির ছটফটে আলো আগে আগে ছুটছে পিচের রাস্তায়। পাঁড়ুই থেকে মঙ্গলডিহির পাল্লা প্রায় আড়াই মাইল। দুদিকে ধানকাটা মাঠ, সাঁওতালপাড়া, ঈদগাহ, আখক্ষেতে সর্‌সর্‌ শব্দ। মাঝখানে সরু পিচরাস্তা। সব এখন কালো হয়ে আছে।

মাঠের ওপার থেকে অন্ধকার ভেঙে ভেঙে কয়েকটা কুকুরের ডাক ভেসে এল। মণিরুল বলল, 'রিকসা তো বিয়েবাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে না, বাউলদা।

'বাঃ তাহলে কে রিকসা চালিন নিয়ে এলো—শুধোবে না?'

বাউল হেসে বলল, 'তাই তো, খিটকেলের কথা হবে।'

ডানদিকে সাঁওতালপাড়া। গাছপালায় একেবারে ঝুপড়ির মতো দেখায়। ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট কুঁড়েঘর। যেন দু-হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে, চুপচাপ বসে আছে বাড়িগুলো। এলোমেলো পচা খড়, সরপাতা, আখপাতা দিয়ে ছাওয়া একেকটা মাথা। সাঁওতালপাড়াটা বাড়তে বাড়তে এখন একেবারে রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। রাস্তার যেদিকটাতে দিনের বেলায় চাটাই পেতে সেদ্ধ ধান শুকোয় সাঁওতাল মেয়েরা, সেইদিকে একটা সাঁওতাল চিৎ হয়ে ধুলোয় শুয়ে আছে। আর, তার মেয়েন দুহাতে দুটো বড়সড় খোলামকুচি নিয়ে সাঁওতালটার পেটের ওপর পেটাচ্ছে আস্তে আস্তে।

রেকিব বলল, এ্যাঃ, ব্যাটা নেশা করেছে। দেখেছ বাউলদা, কি অবস্থা?'

বাউল প্যাডেল করা থামিয়ে ঘুরে বলল, 'ধ্যাটার কপাল দ্যাখ্‌। কেমন বৌয়ের যত্ন দেখেছিস? এই হচে রাজার ছেলে।'

মণিরুল বলল, 'ও বাউলদা, হাবল বাগ্দির ঘরে রেখে দিলে কেমন হয়?'

বাউল প্যাডেল করতে লাগল। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐখানেই রাখবো। আজ নিজে মাছ দিতে আসে নাই। পাঁচুকে ব্যাটাকে পাঠিনছিলো। তা-ও কম। কাল সকালে কি করে খদ্দের বিদেয় করবো ঠিক নাই।'

হাবল বাগ্দির ঘর মঙ্গলডিহির একেবারে মুখে। ওরা যখন পৌঁছুলো, তখন ঘরে কেউ নেই। একটা ভাঙা থালুই পড়ে আছে উঠোনে। মণিরুল এসব ভালই চেনে। এ-মাঠে তাদের জমি আছে বিঘে সাতেক। বাগ্দিপাড়ার লোকজন দিয়ে তাকে চাষ করাতে হয়। গত বর্ষায় চাষ দেবার সময় একটা লাঙল ভেঙে গিয়েছিল হঠাৎ। ভাঙা লাঙলটা সেই থেকে বিভূতি বাগ্দির ঘরে পড়েই আছে। এবছর মেরামত করে নিতে হবে চাষের আগেই।

ওরা রিকসা থেকে নামতে নামতে হাবল বাগ্দির বৌ এসে গেল। হাতে কাঁচ-ভাঙা হ্যারিকেন। আর একটা ছোট লাঠি। 'কে?' বলে আলো তুলে ধরল সে। 'অ, বাদলের বাবা তো নাই। বিয়ে বাড়িতে।' বলতে বলতে বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে আলোটা নামিয়ে রাখল। 'বাদলও গেইছে বিয়েবাড়িতে।'

বাউল হাসল একবার, 'তাহলে তো বিপদ হল। আচ্ছা, রিকসাটো থাকুক এখানে। আমরা বিয়েবাড়ি থেকে ঘুরে আসি।' অনেকটা কাছে এগিয়ে গিয়েছিল সে, ফিসফিস করে বলল, 'ঘরে মাছের কিছু খানিক খানিক আছে নাকি? থাকলে রেখো, ঘুরে আসছি।'

ঘোমটা টানটান করে হাবল বাগ্দির বৌ বলল, 'এতো রেতে মাছ? আমার হাঁড়ি কি পুকুর নাকি যে, সব সময় মাছ থাকবে? উসব নাই।'

মণিরুল খ্যাশ করে সিগ্রেট ধরাল। লম্বা টান দিয়ে বলল, 'বাউলদা, মাছ বিয়েবাড়ি থেকে আনলেই হবে। চল।'

বাউল কান দিল না, 'পুকুর না হোক সাঁতা তো বটে। কাদর হলেও চলবে। খোলা জলের টানে এক-আধটো সরপুঁটি যদি উঠে আসে।'

হাবল বাগ্দির বৌ দুয়োর খুলতে খুলতে বলল, 'ঢং কর না। উ ছেলেটো কাদের?'

বাউল হ্যা-হ্যা করে হাসল, 'তাই বল। উ হচে রেকিব। আমাদের সাজ্জাদ মোড়লের ছেলে।'

দুয়োর খোলা হলে বৌয়ের হাতে কালি-পড়া হ্যারিকেনটা উঠে এল। 'তাই নাকি, মোড়লের ছেলে!'

শাড়িটা ময়লা, ছেঁড়া এবং অপর্যাপ্ত। অথচ, চারদিক গুছিয়ে শাড়িটাকে পরেছে হাবলের বৌ। হাতে একটা চট নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল, 'বস।'

বাউল ধুতিটা ঠিক করে নিচ্ছিল। রিকসা চালিয়ে এলোমেলো হয়েছিল একটু। গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, 'না, ঘুরে আসি। দেখি, প্রফুল্লর শ্বশুর কি খাওয়ায়। তারপরে তো এখানেই আছি।'

মণিরুল জামা-টামা পরে একেবারে নতুন ছোকরা সেজে দাঁড়িয়েছিল। এদের পেছন পেছন সে-ও হাঁটতে লাগল। বাগ্দিপাড়ার পর গোটা দুয়েক পুকুর, তার উঁচু উঁচু পাড়ের আড়াল পেরিয়ে বামুনপাড়া। বাঁদিকে রাসমঞ্চ, ডানদিকে শিবের আটচালা—এসবের পর চাষাপাড়া। চেঁচামেচি, হ্যাজাক ব্যান্ডপার্টি ও এতোটা রাতে-ও মেয়েদের হৈ-চৈ থেকে গোটা বিয়েবাড়িটা উঠে এল। সামনের ফাঁকা জায়গায় সামিয়ানা খাটিয়ে বরযাত্রীদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে। এক

হ্যাণ্ডোরি লুচি নিয়ে একটা লোক ভেতর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় গেল। ওরা ভেতরে ঢুকে পড়ল। বিয়ের আনুষ্ঠানিক ঝামেলা এইমাত্র চুকেছে। এই অত্যুজ্জ্বল ও টলটলে পরিবেশে প্রফুল্ল যতটা সম্ভব চুপ করে বসে আছে। চারিদিকে অচেনা কালী আর চেনা শালাদের মিছরির খোঁচা। রেকিব আর মণিরুলকে দেখে প্রফুল্ল চোখ বন্ধ করে ওদের ভাল ধরে ঝুলে পড়ল। 'এতো দেরি? সব শেষ তো এখন। বস বস। বাউলদা, এখানে বসবে?'

বাউল চারপাশটা চোখ বুলিয়ে বলল, 'না, তুরা বস্। তুদের দঙ্গে কি আর বসা চলে। আমি দেখি বাইরে যাই।'

বিয়েবাড়ি থেকে যখন ওরা ফিরল, তখন রাত সাড়ে এগারো। সারাদিনের ভ্যাপসা গরমের পর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হাওয়া বেরিয়ে আসছে। হাবল বাপির উঠোনে দাঁড়িয়ে 'বাদলার মা' বলে চেঁচাতেই দরজার গোড়া থেকে ধড়মড় করে উঠে বসলো বৌ। চারপহর গরমে খাবি খেতে খেতে জলের ওপর মরা মাছের মতো ঘুমিয়ে-ছিলো সে। উঠে চোখ কচলে 'বাদলা কই' বলে হাই তুলল।

'আসছে, লে, এগুলো ধর্।'

একটা তোবড়ানো শালপাতার মস্ত ঠোঙা হাতে ধরে হাবলের বৌ কি করবে বুঝতে পারছে না। মনিরুল গিয়ে রিকসায় উঠেছে। রেকিব ওদিকের পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে। বাউল বলল, 'তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর বৌদি, রাত হইছে অনেক।'

মনে উঠ, বার করি' বলাতেই মনিরুল লাফিয়ে রিকসা থেকে নেমে পড়ল। বাউল রিকসার সিট তুলে ভেতর থেকে দুটো বোতল টেনে আনল।

খোলা উঠোনে হ্যারিকেনের আলোয় গোল হয়ে বসেছে বাউল, হাবল আর মণি-রুল। বড় কাঁসার থালায় ফেঁপে উঠেছে বিয়েবাড়ির তাজা মাছের সুবাস। গেলাস-গুলো ভর্তি করে বাউল একটা বিড়ি ধরাল।

সব ব্যবস্থা করে দোরগোড়ায় বসেছিল হাবলের বৌ। বাউল বলল, 'বৌদি, এদিকে এস। পরের মতন দূরে গোল হয়ে বসলে কি চলে?'

'একটা ছোট্ট উত্তর এল, 'ঘুম পেছে আমার।'

'এখনই? হাবলদা, কত বয়েস হল তোমার? আমরাই শুধু বয়েস পেছি না হে।'

'বয়েস নিয়ে কি কর্যবি?'

'দরকার।' চকচক করে পুরো গেলাস ফাঁকা করে দুলে দুলে হাসল বাউল।

মণিরুল তেমন মুখ খুলছে না। ওপাশে, পেছনে পিচরাস্তা। সারাদিনে এক-খানা বাস চারবার সিউড়ি বাতিকার যাওয়া-আসা করে। আর দু-একটা মোটর-সাইকেল।

এছাড়া পিচরাস্তার আর কোনো উল্লেখ-যোগ্য ব্যবহার নেই। অথচ, পাঁড়ুই-এর রাস্তা সারাদিন প্যাঁক প্যাঁক করতেই থাকে। এতোক্ষণে, সন্ধ্যা অন্ততঃ দুবার দোকানের সামনে ঘুরে যেত। যেন বাচ্চাকে কোলে নিয়ে হাওয়া খাওয়াচ্ছে। খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে আবার চুপ করানোর চেষ্টায় গুনগুনে করত।

একদিন পেট ভরে মাল খেয়ে বাউলদা আর উঠতে পারে না। বেঞ্চিতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। রা-শব্দ নাই। সন্ধ্যা গাল-মন্দ দিতে দিতে মণিরুলকে বলেছিল, 'ঠাকুরপো, ধর তো। ঘরে নিয়ে যাই।' এরকম একটা কাদাভর্তি খেড়ে জোয়ান। গলির মধ্যে দুজনে হাঁচকা হেঁচকি করে নিয়ে গিয়ে ঘরে ফেলেছিল। মণিরুল পুকুরঘাট থেকে একবালতি জল এনে দেখে, বাউলদা তক্

শুরু করে সন্ধ্যার শাড়িতে বমি করেছে। সন্ধ্যার কোলেই মাথা ছিল ওর। আস্তে আস্তে মাথায় চাপড় মারছিল। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে 'এ্যাঃ' বলে মণিরুলের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। যেন বলতে চায়, 'কি কেলেঙ্কারি করল, দ্যাখো তো।'

বমি পরিষ্কার করে তক্ষুনি মণিরুলের সামনেই সন্ধ্যা শাড়ি খুলে ফেলেছিল। বাচ্চাটা বাউলদার পাশে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। বাউলদার কোনো চাড়া নাই। সায়া আর ব্লাউজ গায়ে দড়ি থেকে আর একটা শাড়ি পাড়ছিল সন্ধ্যা। মণিরুলের দুটো হাতই ভিজে। অনেকক্ষণ কাজ করে নেশার কিছুটা কেটেছে। তখন মণিরুলের মাথার কালো জল চিরে চিরে একটা শুকনো ওাঁশপাতা ছুটে যাচ্ছে কেবল।

ভিজে হাত দিয়েই পেছন থেকে সন্ধ্যার কাঁধ দুটো ধরে ঘুরিয়ে আনল মণিরুল। 'বৌদি' না-বলে বলেছিল, 'সন্ধ্যা, ঘরে আমি আছি। এতো রেতে তোমার সাহস তো কম নয়?'

ওদিকে দোকানে তখনো হ্যাজাকটা জ্বলছিল একা একা। ঘরে লম্ফর, ধোঁয়া।

'সাহস আবার কি?' সন্ধ্যা হাসল একটু। ঠোঁটের ডানদিকটা কুঁচকে একটু অন্ধকার ধরে রইল সে।

'তাতো, শাড়িটা পরে নি।' একটা ঢেউ দিল সন্ধ্যা।

'যদি বাচ্চাতে নষ্ট করত, এরকম সঙ্গে সঙ্গে শাড়ি ছাড়তে? আমি থাকলে-ও?'

সন্ধ্যা থমথমে হয়ে গেল। হাসি গুটিয়ে সে কেবল চোখ তুলে রইল মণিরুলের মুখে। একবার বাচ্চাটাকে দেখে নিল এক-পলক। মণিরুল তখন সমস্ত তাস নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এটাই সে চাইছিল। এবার প্রথম থেকে নিজের রাস্তায় শুরু করতে যাবে, এমন সময় বাউলদা নড়ে উঠেছিল।

বাউল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'এাই মনে, চুপচাপ এঁটে আছিস ক্যানে?'

'সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে, নয়?' তক্ষুনি বিড়িতে টান দিয়েছিল বাউল। জোরে হাসতে গিয়ে গলায় ধোঁয়া আটকে খক খক করে কাশতে লাগল।

উত্তর দিল না। দ্বিতীয় গেলাস শেষ করে বলল, রেকিব কোথা?

রিকসাটা উল্টোমুখে দাঁড়িয়েছিল বলে রেকিবকে চট করে এধার থেকে দেখা যাচ্ছিল না। সে চুপচাপ রিকসাতেই বসে-ছিল। রাত বাড়ছে। মদ খেয়ে উল্টোপাল্টা যদি করে তাহলেই বিপদ। রিকসা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে না আর। বাউলদা যে টানতে পারবে না, এটা সুনিশ্চিত। গাঁ থেকে ব্যান্ডপার্টির আওয়াজ আসছে। বিয়ে বাদের হতে ভোর। ওদের নিষেধ করে কোনো লাভ নাই। মাঝখান থেকে রেকিবকে নিয়েই ওরা টানাটানি করতে পারে। তার, চুপচাপ রিকসায় হুডের আড়ালে সে বসে-ছিল। ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরতে পারলে

হয়। সকালে হোস্টেলে ফিরে না হয় ঘুম দেবে।

বাউল বলল, 'বুঝলে হাবলদা, মনে ছোঁড়া আমার পেছু ছাড়বে না।'

মণিরুল হাসার চেষ্টা করল। বেচাল হয়ে যাচ্ছে। বলল, 'তোমার ঐ এক কথা। রেকিব শালা একা একা বসে আছে রিকসায়, তোমার খেয়াল নাই।'

'থাকুক।'

'থাকবে ক্যানে? একবারের পুরুক ফল চলবে না।'

হাবল বাপ্পি একটা মাছে কামড় বসিয়ে বলল, 'ডাকো না ক্যানে, খানিক খাক। ছেলেটা একা একা বসে রইছে। কথা নাই, কিছু নাই।'

মণিরুল হ্যারিকেনের পলতেটা একটু তুলে দিল। ধোঁয়ায় কাঁচ ভরে গেছে বলে ঠিকমতো আলো হচ্ছে না। বলল, 'ও কোনোদিন খাবে না, আর মজা দেখে যাবে? এসব চলবে না।'

বাউল বলল, 'তা বটে। এই রেকিব, এখানে আয়।'

মণিরুল একটা মাছ নিয়ে বেশ যত্ন করে খেতে লাগল। হাবলের বৌ দাওয়ায় শুয়ে পড়েছিল। বলল, উয়াকে নিয়ে ক্যানে টানা-টানি করছ। তুমরাই গিলছো, গিলো।'

বাউল উঠে পড়ল, 'না না, ওকে খেতে হবে আজ। ছাড়বো না। পুকুরের শালার কাছে সবার নাম করে মাছ নিয়ে এলাম। এখন খাবে না ক্যানে?'

অবস্থা খারাপ দেখে রেকিব রিকসা থেকে নেমে পড়েছিল। মাতাল আর পাগল দেখলেই তার ভয় ভয় করে। ছোটবেলা থেকেই। গায়ে ঝিনঝিনে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তখন সে সেভেনে পড়ে। গরমের ছুটিতে হোস্টেল থেকে বাড়ি এসেছে। গরমে ঘুম হয় না বলে আব্বা অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে আড্ডা দিত। অন্ততঃ মা এই কথা বলত তখন। সেদিন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত অনেক। কিসে যেন ঘুম ভেঙ্গে গেল রেকিবের। উঠে দেখল, পাশের ঘরে মা ঘুমোচ্ছে। হয়তো একটু আগেই চোখ লেগেছে। গরম বলে উঠোনে খাটিয়া পেতে শুয়েছে বুংলা। তাদের সাঁওতাল মান্দের। কিছু বুঝতে পারল না রেকিব। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে কিনা ভাবছে, এমন সময় আব্বার গলা শোনা গেল। 'রাশিদা, রাশিদা, ও রেকিবের মা, দুয়োর কই?'

মাকে ডাকল না রেকিব। হ্যারিকেন নিয়ে নিজেই গিয়ে বাইরের দরজা খুলে ভয় পেয়ে গেল। তার আব্বা ধুলোভর্তি রাস্তায় টলতে টলতে গোল হয়ে ঘুরছে আর চেঁচাচ্ছে, 'দুয়োর কই, পেচ্ছি না। রাশিদা, রাশিদা।'

দরজার দুই কপাটে তার দু-হাত। চোখ থেকে ঘুমের সমস্ত ঝাঁক উড়ে গেছে। রেকিব বুঝে পেল না। আব্বাকে এরকম অবস্থায় সে কোনো দিন দেখেনি। ছুটে পালিয়ে যাবে কিনা ভাবছে। এমন সময় আব্বা, দরজা খোলা দেখে ঘুরতে ঘুরতে

রেকিবকে চেপে জড়িয়ে ধরে, মনে পড়ে পড়তে গোঙালো, 'রাশিদা, আ...মি...।'

সারা শরীর ঝনঝন করে উঠেছিল রেকিবের। ধাক্কা খেয়ে পাশে-রাখা হ্যারি কেনটা দুলে উঠল। দুলে যেতেই, পে থেকে পলতের ওপর বেশী করে কেরোসি তেল উঠে গিয়ে দপদপ করে জ্বলে উঠে ছিল, হ্যারিকেনটা। ফটাস ফটাস ফ হচ্ছিল। গরম সহ্য করতে না পেরে কা ফেটে গিয়েছিল। তারপর দপ-দপ করতে করতে হ্যারিকেনটা নিভে যেতেই থরথর শুকনো কাঠের গলায় রেকিব অন্ধকারে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'মা-আ।'

বাউল কাছে এসেই ধরল রেকিবকে 'চল, খাবি না মানে? সাক্ষাৎ মোকদ্দমা ছেলে হয়েছে দেখ, হাবলদা।'

রেকিব সিঁটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, ভয় পেলে চলবে না। কা বাল-মাছ যেরকম মাথা আর লেজ এক দিকে ঠেকিয়ে কুঁকড়ে যায়, সেরকম কুঁকড়ে গিয়ে স্প্রিং-এর মতো টং করে আবার সোজা হয়ে উঠল। 'এই বাউলদা, কি হচ্ছে?' এক ঝটকায় সে বাউলের হাত সরিয়ে দিল, যদি জানে যে, গায়ের জোরে এদের সঙ্গে এঁটে উঠবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বাউল চেঁচিয়ে উঠল, 'এ্যাই মনে, বোতলটো নিয়ে আয় তো। বৌদি স্যাটার গরম। এ্যাঃ, ওস্তাদি হচে, নয়?'

হাবলের বৌ তখন উঠে বসেছে। 'হা গো, তুমাদের আক্কেল নাই? ছেলেটো খাবে না বলছে, আর জোর করছ!'

হাবল বসে বসে হাসছে। তার চু কপালে পড়ে কাঁচ লাউডগা হয়ে দুলছে মনিরুল শেষ বোতলটা নিয়ে টলতে টলতে উঠে গেল। 'লাও।'

'আছে আর?'

বোতল দুলিয়ে মনিরুল বলল 'যথেষ্ট।'

'বোতলটো দে। আর, ওর মাথাটো চেপে ধরতো। আমি ঢেলে দিই।' বাউলের তেল তেলে মুখে হাসি চিকচিক করছে।

বোতলটা দিয়ে মনিরুল চটি খুঁজতে খুঁজতে কার উদ্দেশ্যে বলল যেন, গো না। বলল সে, 'খুব মজা লাগছিল।' খুঁজতে খুঁজতে একটা ছাগল-বাঁধা খোঁজে হোঁচ খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

'এই মনে, ধর রেকিবকে। ওকে আজ খাওয়াবোই' বলে হাসতে হাসতে নিজেই রেকিবের ঘাড়ে ধরল বাউল। মনিরুল গিয়ে ধরবে, বাউল বোতলটা রেকিবের মুখের কাছে এনে ধরেছে—এরকম সময়ে এসে রেকিব সিঁটিয়ে গেল। বুঝতে পারল, তার আর রেহাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে বাউলের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে পিচ রাস্তার ওপর উঠে গেল। 'এই বাউলদা, আমি তো খাই না, এরকম করছ ক্যানে!'

মনিরুল এই প্রথম হি-হি করে হেসে উঠল। 'ধর, বাউলদা। শালা পালাইছে।'

'আয়' বলে মনিরুলকে ডেকে বাউল হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে রাস্তায় উঠল।

আকাশে চাঁদ নাই। তবু, পাতলা একটা

আলোয় সবকিছু, ছায়া ছায়া দেখা যায়। উঁচু রাস্তার উল্টোদিকে আর ঘরবাড়ি নাই। গোটা তিনেক পুকুর, পানাভর্তি। তার ওপাশে কয়েকটা গাছপালা। তারপর ধানক্ষেত মাইল দুয়েক। রাস্তাটা এখানে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। উত্তরদিকে গেলে পাড়ুই। এবড়ো-খেবড়ো পাথর বেরিয়ে-থাকা পিচ-রাস্তায় ওরা দুজন কিছুটা তফাৎ রেখে দাঁড়িয়েছিল। মনিরুল টাল সামলে আস্তে আস্তে উঠছিল রাস্তায়। হাবল বাগ্দির বৌ উঠোনে এসে দাঁড়াল। বাদলা এখনো এল না। বিয়েবাড়িতে কি করছে, কে জানে! বসে-থাকা হাবলের কাছে এসে সে খিঁচিয়ে উঠল, 'ইয়েরই লেগে ঘরে বসতে দি না। লাও, ইবার সামালও। বাবা গো বাবা, মাতাল-ছাগল নিয়ে আর পারি না।'

হাবল বাগ্দির মাথাটা গামছা ঝাড়ার মতো ঝাঁকিয়ে উঠল, 'এ্যাই চুপ। কানের কাছে ক্যান ক্যান করিস না তো।'

'ক্যানে, কি হল কি? ইঃ, ওরে আমার কে রে!'

'এ্যাই, চুপ করবি তো এইক্ষণে কর। উঠব? ওহে বাউল, বাউল...।'

কোনো মতে টানা-হেঁচড়া উঠে মণিরুল প্যান্টে হাতের ধুলো মুছল।

বাউলের হাতে সাদা বোতলটা। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রেকিব বলল, 'দেখ বাউলদা, বাড়ি যেতে হবে। রাত অনেক হল। আর এরকম কর না। মাইরী, জোড় হাত করে বলছি।'

বাউল ফ্যাক ফ্যাকিয়ে হাসল, 'দুধের ছেলে নাকি রে, এ্যাঁ? বলছি খানিক খা। বেশি খেতে হবে না।'

দু-পা পিছিয়ে আবার দাঁড়াল রেকিব, 'না। আমি কোনো দিন খাই না। আজ ইচ্ছা থাকলেও খেতে পারব না। বাড়ি ফিরতে হবে।'

'মনিরুল, আয় তো। বাহাদুরী হচে। যত বলছি, ততই লয়?'

বাউল খেদিয়ে গেল রেকিবের দিকে মনিরুল পিছু পিছু। জানে, সে বেশীদূর ছুটবে না। উত্তর দিকে রাস্তা অনেকটা সোজা চলে গেছে। আন্দাজে রেকিব ঐদিকেই ছুটতে শুরু করল। একদমে অনেকটা ছুটে একবার দাঁড়ায় সে। দম নেবার জন্যে। ঘুরে দেখল, বাউল আসছে তারদিকে।

ঠিক মতো পা পড়ছিল না। একটু গোলমাল হচ্ছে যেন কোথায়। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা ঢুকিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করে রেখেছে সে। যাতে একটুও পাড়ে না যায়। রেকিবের আবছায়া নজরে রেখে বাউল ছুটছিল পিছু পিছু। মাঝে মাঝেই হাসছিল সে। 'এ্যাই রেকিব, দাঁড়া। ওকে আজ ধরবই। চ' কুথা যাবি।'

ক্যানে এরকম করছ, বাউলদা।' বলতে বলতে বাউল অনেকটা চলে এসেছে দেখে রেকিব আবার ছুটতে সুরু করল। পেটে একপেট নেমন্তন্নর খাবার। লুচি মাংস, রাজভোগ, দই সব একসঙ্গে যোগসাজস করে গজগজ করছে। অনেক দিনের পচা গোবর-সারে পা দিলে যেমন বিজ বিজ শব্দ হয়, চারপাশ ফেঁপে ওঠে, রেকিবের পেটের অবস্থা সেইরকম।

মনিরুল প্রায় সেইখানেই দাঁড়িয়েছিল। যতদূরে দেখা যায়, দেখছিল। বেশ কিছুটা পেছনে হাবল বাগ্দির ঘর। হাবলের বৌ নিশ্চয়ই ঘরে এখন ফোঁস ফোঁস করছে। যাবে নাকি বিভূতির বড় মেয়েটার খোঁজে একবার। 'খভূতি যদি জেনে ফেলে, তাহলে এ-পাড়া ঢোকা তার একেবারেই বন্ধ।

বাউলের রাগ পর্দায় পর্দায় উঠছিল। অনেক পেছনে মঙ্গলডিহি। ডানদিকে উঁচু-নিচু খালঢিব মাঠ। রাস-পূর্ণিমায় মেলা বসে। সারা বছর গাদা গাদা ভাঙ্গা উনুনের চিহ্ন পড়ে থাকে সারা মাঠে। বাঁ-দিকে দীঘির মতো পুকুর। ছড়ানো পুকুরপাড়, গাছপালা। উত্তর-পূর্ব কোণে একটা উঁচু বেদী। রাস পূর্ণিমার রাতে শ্যামচাঁদকে স্নান করানো হয় এখানে। বাউল ছুটছিল আর বিড বিড় করে বকছিল, 'শালাকে যদি একবার পায়, ত্রিভুবন দেখাব।

রেকিব হড়বড় করে রাস্তা থেকে নেমে পুকুর পাড়ে উঠল। কোনো একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে হবে। নামার সময় আর একটু হলেই একটা নালায় পড়ে যেত সে। কোনো মতে সময় বুঝে লাফ দিয়েছিল। তবু টাল সামলাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছনে ঠিক ছুটে আসছে বাউলদা। থপাস থপাস করে ছুটছে তো ছুটছেই। আরো কিছুটা ছুটে চেঁচাল সে, বাউলদা, আর পারছি না। থামো, মাইরী। ঘর যেতে হবে।'

একটা আমগাছে ঠেস দিয়ে হাঁস-ফাঁস করছিল রেকিব। সাপ-খোপ থাকতেই পারে। তার মাথার ঠিক ছিল না। গা-বমি বমি করছে। এতো রাত! এই পুকুরের পাড়ে... ওঃ! একটু হুড়মুড় শব্দ হতেই আবার ছুটতে লাগল সে দক্ষিণ পাড় ধরে।

বাউল বুঝতে পারে নি। যে জায়গায় রেকিব নেমেছে, সেইখানেই নামল সে রাস্তা থেকে। অন্ধকারে, মদের খামখেয়ালিতে ঠিক-মত নামতে পারল না সে। হুড়মুড় করে নালায় পড়ে গেল। পরিষ্কার ধুতি-জামা জলে-কাদায় একেবারে ভয়ঙ্কার। ভাগ্যিস, বোতলটা আঙ্গুলে দিয়ে আটকানো ছিল। উঠে নিজের অবস্থা দেখে আরো রেগে গেল বাউল। জেদ চেপে বসল তার মাথায়। পেছনে মনিরুল আসছে—এরকম মনে করে হাত তুলে অন্ধকারে চেঁচাল সে, 'ছুটে আ—য়, ম-নে।'

দক্ষিণপাড়ে আর যাওয়া যায় না। এবার উত্তরমুখে ছুটতে হবে পশ্চিম পাড় ধরে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে আন্দাজে ছুট দিল রেকিব। জলে একটা টুপ করে শব্দ হল। বোধহয় মাছ। তার বুক ঢুই ঢুই করছিল। কাল সকালে হোস্টেল যাওয়ার কথা হঠাৎ মনে পড়ল। একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল টেনে টেনে। কোথায়? সে আরো জোরে ছুটতে লাগল। গাছের শিকড়ে আলতো করে হোঁচট খেল দুবার। পশ্চিমপাড় শেষ করে একটা বটগাছের আড়ালে দম নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর পারছিল না সে।

পড়ে গিয়ে বাউল বেশ সাবধানে ছুটছিল। ধুতি গুটিয়ে এনেছে অনেকটা। ভিজে জামা সটপট করছে। সারা মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। একবার ধরতে পেলে হয়, শালার আইবুড়োমি ঘোচাবো। এরকম করে সাবধানে ছোটার জন্য রেকিব কিছুই বুঝতে পারেনি। গাছপালার জন্যে পুকুর-পাড়টা একেবারে আমাবস্যের মতো অন্ধকার। পাতার ফাঁকে দু-চারটে তারা শুধুমাত্র উঁকি দিচ্ছিল। একেবারে কাছাকাছি হতে ভেবেই রেকিব ঠাহর পেল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগল উত্তরপাড় বরাবর, পুবমুখে। হাঁইফাঁই করছিল, ছুটছিল, আর বলছিল, 'আব্বা যদি শোনে, কি বলবে তোমাকে, ভেবেছ? বাউলদা, এবার থামো। মরে যাবো আমি।' নিঃশ্বাসের খেপে খেপে কথাগুলো ছাড়ছিল সে।

বাউল আর কোনো কথা বলছে না। গোঁ-ধরে ছুটছিল শুধু। পেছনে মনিরুল আসছে কিনা, তা-ও আর দেখছে না সে।

উত্তরপাড় শেষ করে রাস্তায় উঠবে, এমন সময় উঁচু বেদীটা তার চোখে পড়ল। সরু সরু ধাপের সিঁড়ি। একেবারে সামনেই। রেকিব কোনো কিছু না ভেবেই হাঁফাতে হাঁফাতে বেদীর একেবারে ওপরে উঠে গেল। উঠে, ধপ করে বসে পড়ল বেদীর ওপর। সারা শরীর ঘেমে কাদা-কাদা হয়ে গেছে। জামা-প্যান্ট চ্যাটচ্যাট করছে। পা-ছড়িয়ে বসে রেকিব হাঁফাচ্ছিল। রোগা বুকটা ঘন ঘন উঠছে আর নামছে। চারদিক ফাঁকা। চাঁদ উঠবে কখন? যা হবার হোক, আর পারছে না সে। তার দুটো হাত মরা সাপ হয়ে ঝুলছে দুদিকে।

হঠাৎ শব্দ শুনে তাকাল সে। সিঁড়ির একেবারে কাছে বাউলদা। রেকিব কিছু কবার আগেই বাউল তরতর করে উঠে এল। হাঁফাচ্ছিল সে-ও। 'এবার, শালা। খা বলছি, খা।'

বাউলদা জাপটে ধরে মাথাটা তুলল রেকিবের। আর ওঠার ক্ষমতা ছিল না তার। বাধা দেওয়ারও নয়। মাথাটা ওপরের দিকে তুলে একবার শুধু বলল রেকিব, 'ঢালো।'

বলেই ঠোঁট দুটো টিপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল সে। কঠিনভাবে চুপ করে।

বোতলের মুখ থেকে বুড়ো আঙ্গুলটা বের করে রেকিবের মুখের ওপর বাউল ভক-ভক করে ঢেলে দিল সব মদটা। বাউল তখন হাঁফাচ্ছিল, হাসছিল, আর বলছিল, 'খা, আর খানিক খা, আর খানিক...।'

দূরে বিয়ের বাজনা বাজছিল তখনও। মনিরুল কোথায়, কোনদিকে গেছে, বোঝা যাচ্ছে না। বাউল শুধু তার কৃতকার্যতার কথা ভাবছিল। আর অন্ধকারে রাসমঞ্চের ওপর বুজে-থাকা মুখে মদ ঢেলে যাচ্ছিল কেবলই। সেই ঝরে-যাওয়া মদের নিচে একটা উপুড়-করা শক্ত কলসী হয়ে রেকিব বসে। শীত করছিল একটু একটু।

তখন অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না কোনো কিছুই।

রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধচর্চা

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ-এর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার বর্ষ ৬৬ সংখ্যা ৩—৪ (শ্রাবণ ১৩৭১) একটি রবীন্দ্র সংখ্যা। এই সংখ্যায় দুটি পরস্পরবিরোধী রচনা আছে, একটি অমূল্যচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম', আর একটি শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম'। অমূল্যচন্দ্র বলেছেন রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব সঠিক অনুধাবন করেছিলেন, শশিভূষণ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করতে পারেন নি। এই বিরোধের কারণ, বৌদ্ধধর্মের নির্বাণতত্ত্ব, ব্রহ্মবিহার, মৈত্রী ও করুণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা। অমূল্যচরণ মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা বৌদ্ধধর্মের সার্থক ব্যাখ্যা, শশিভূষণ মনে করেন, এটা রবীন্দ্রনাথের মনগড়া ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিক বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে সংগত কারণেই নানা মত আছে। বুদ্ধের জীবৎকালে বুদ্ধের বাণী সংগৃহীত হয়নি, হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর শিষ্যদের কাছে থেকে এবং পরবর্তীকালে সেই বাণীর ব্যাখ্যার বৈচিত্র্যের জন্য নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের আলোচনার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ তার কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলেন এবং ঠিক ব্যাখ্যা নিয়েছিলেন কিনা, তা নয়, আমাদের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যায় তিনি স্বয়ং সর্বসময়ে একমত পোষণ করতেন কিনা। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধদেব সম্পর্কে রচনা গ্রথিত করে বিশ্বভারতী ১৩৬৩ সালে 'বুদ্ধদেব' সংকলন প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধদেব আলোচনার বহু অংশই এতে স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ প্রসঙ্গ সংকলন করেছেন সুধাংশুবিমল বড়ুয়া তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি'তে। এতেও সমস্ত রচনা উল্লেখিত হয়নি।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ যখন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর দেশের লোকেরা এমন কি তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমের সহগামীরাও যখন অসহযোগ আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন, তখন তিক্ত ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজকে যেসব পত্র লেখেন তাতে বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামত আমাদের পরিচিত বুদ্ধভক্ত রবীন্দ্রনাথ থেকে একেবারে আলাদা। ৫ মার্চ, ১৯২১ সালের চিঠিটা ধরা যাক।

'ব্রহ্মবিদ্যার লক্ষ্য হল মুক্তি। বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য নির্বাণ অর্থাৎ বিলুপ্তি। বলা যেতে পারে এ দুটো নামে ভিন্ন, তবে একই জিনিস। কিন্তু নামের মধ্য দিয়েই আমরা মনের বিভিন্ন ভঙ্গী ও সত্যের বিশেষ রূপের পরিচয় পাই। মুক্তি আমাদের মনকে আকর্ষণ করে সত্যের অস্তিত্বের দিকে আর নির্বাণ করে তার বিপরীত দিকে।

'ওঁ'— অর্থাৎ শাশ্বত হ্যাঁ—বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, শান্তিবাদের পথে। অস্তিত্বকে ধ্বংস করেই আমরা স্বাভাবিকভাবে সেই সত্যে পৌঁছন। সেইজন্য তাঁর দুঃখবাদ দুঃখনিবৃত্তির উপরই জোর দেয় কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা আনন্দকেই লাভ করতে চায়। অবশ্য তার পরিপূরক হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণের তপশ্চর্যারও প্রয়োজন আছে। ব্রহ্মসাধনায় ব্রহ্মের উপলব্ধি সতত অন্তরে জাগ্রত রাখতে হয়, কেবলমাত্র চরমপ্রাপ্তিতে নয়।

অতএব দেখতে পাই, বৌদ্ধযুগের জীবনচর্চার শিক্ষার পদ্ধতি ছিল বৈদিকযুগ থেকে স্বতন্ত্র। বৈদিকযুগের শিক্ষা ছিল জীবনের আনন্দকে পূতপবিত্র করে তোলা আর বৌদ্ধযুগের শিক্ষা ছিল আনন্দকেই সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করে দেওয়া। চিরকৌমার্যহরণ এবং আরো নানারকমে জীবনকে অঙ্গহানি করা বৌদ্ধধর্মের অস্বাভাবিক কঠোর তপশ্চর্যার ফলেই আসে। কিন্তু তপোবনের ব্রহ্মচারীর জীবন মানুষের সামাজিক জীবনের বিরোধী নয়, বরঞ্চ তার সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয়পূর্ণ। আমাদের দেশের তানপুরার মতো সঙ্গীতের মূল সুরগুলোকে সে ধরে রাখে, অসংগতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। তপোবনের আদর্শ আত্মার পূর্ণাঙ্গ সংগীতেই বিশ্বাস করে। তাই আত্মনিগ্রহ নয়, নির্দিষ্ট পথে চালিত করাই তার লক্ষ্য।

অসহযোগের ভাবটি হল রাজনৈতিক উগ্রতপস্যা। আমাদের ছাত্রেরা এই যে আত্মনিবেদন করছে সেটা কার কাছে? পূর্ণতর শিক্ষার কাছে তো নয়, বরং অশিক্ষার কাছে। এর পশ্চাতে আছে আত্মবিনাশের ভয়ংকর আনন্দ। এর মনোহর দিক হল সন্ন্যাসের দিক। আর এর কুৎসিত দিকটা আমরা দেখেছি গত যুদ্ধে এবং আরো কয়েকটি ভয়াবহ ব্যাপারে যেখানে মানুষ স্বাভাবিক জীবনের সত্যে বিশ্বাস হারিয়ে অনর্থক লুণ্ঠন এবং বিধ্বংসে অহেতুক আনন্দ বোধ করেছে। 'না' শব্দটি তার নিষ্ক্রিয়তার দিক থেকে বোঝায় ত্যাগের উগ্রতা আর সক্রিয়ভাবে বোঝায় হিংস্রতা। ঝড়ের সমুদ্রে যেমন মরুভূমিতেও তেমনি একই হিংসার আকার দেখতে পাই কারণ এরা উভয়ে প্রাণের বিরোধী।'

রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন এবং সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এই অসহযোগ আন্দোলনের তুলনা করা, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম এবং বুদ্ধদেব বিরোধিতাই সূচিত করে। অথচ, আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে নরোত্তম আখ্যা দিয়েছিলেন।

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর মৌখিক সাক্ষ্যে সুধাংশুবিমল বড়ুয়া তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯০৪ সালে বুদ্ধগয়া থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন। নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ কতটা অভিভূত হলে বুদ্ধমূর্তিকে প্রণাম করতে পারেন বা মাথা কামাতে পারেন, সহজেই অনুমেয়। অথচ জীবনের এক সংকটকালে, অসহযোগ আন্দোলনের সময়, তিনি বৌদ্ধধর্ম এবং বুদ্ধদেবের বাণী সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিরোধিতা জানাচ্ছেন।

সাকার উপাসনা বিরোধী রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৮ সালে সমালোচনা গ্রন্থে অনাবশ্যক প্রবন্ধে লিখেছিলেন ব্যঙ্গ করে আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যখন সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপরে বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে, তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই!

আবার এই রবীন্দ্রনাথই ১৩৪২-এর বৈশাখী পূর্ণিমায় (১৯৩৫) কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে বুদ্ধ জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ দে[illegible] তাতে বলেন, একদিন বুদ্ধগয়াতে [illegible] ছিলাম মন্দির দর্শনে সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল—যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি সেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করেছিলেন সেদিন কেন আমি জন্মাই নি। সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করিনি?

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘতম আলোচনা করেছিলেন ১৩১৮ পৌষের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে 'বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, বৌদ্ধধর্মের তিনটি মুখ—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ। তার ধর্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত হয়ে আছে। এই তিনের পরিপূর্ণ সম্মিলনে বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ আদর্শ। জ্ঞানবাদ (হীনযান) বা ভক্তিবাদ (মহাযান) কোনটিই পুরো সত্য নয়।

এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ জানালেন, বৌদ্ধধর্ম কী তা পুঁথি পড়ে বোঝা যাবে না, ধর্মকে চিনতে হবে জীবনের মধ্যে।

হীনযানের চাইতে মহাযানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি বেশি, একথা রবীন্দ্রনাথ কখনো গোপন করেননি। মহাযান সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ

করে, সেজন্য মানব-ইতিহাসের সৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর, একথা দাবী করলেন তিনি ইতিহাস গ্রন্থের ভারত-ইতিহাস চর্চা প্রবন্ধে (১৩২৬)। এই প্রবন্ধে তিনি জানালেন, শ্যাম, চীন, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাজান সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।'

আমরা অবশ্য জানি শ্যাম মহাযানপন্থী নয় হীনযানপন্থী, বস্তুত, হীনযানের তিনটি মুখ্য আধার শ্যাম, সিংহল এবং ব্রহ্মদেশ।

বলাই বাহুল্য, এই ভারত ইতিহাস চর্চা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ কেবল জাপানেই গিয়েছিলেন, চীনে যান এরপর (১৯২৪), শ্যাম এবং জাভাতে আরও পরে (১৯২৭)। অর্থাৎ তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে লিখছেন না, এবং তার পরোক্ষ জ্ঞানও ইতিহাস সমর্থিত হচ্ছে না।

পরবর্তীকালে তিনি যখন শ্যাম ও জাভাতে যান, তখন তিনি দুঃখবোধ করেছিলেন, যে এখানে শুধু বুদ্ধমন্দিরই আছে বুদ্ধচর্চা নেই। সিয়াম প্রথম দর্শনে এবং বোরোবুদুর কবিতায় ১৯২৭ সালে তিনি এই আক্ষেপই প্রকাশ করেছিলেন। চীন ও জাপানে তাঁর বিভিন্ন রচনাতে থেকেও এটাই প্রকাশ পেয়েছিল যে মৈত্রী ও করুণাঘন বুদ্ধ সেখানে জঙ্গী জাপানী ও চীনা জাতিতে অনুপস্থিত। সুতরাং এককালে যে বৌদ্ধধর্ম এই সব চীন, জাপান, শ্যাম, জাভাকে প্লাবিত করেছিল সেটা রবীন্দ্রনাথ জানেন পুঁথিরই মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মহাবোধি সোসাইটিতে তিনি (১৯৩৫) বৌদ্ধধর্মের বিস্তীর্ণ জয়যাত্রার প্রশস্তি করলেন। চীন ব্রহ্মদেশ জাপানে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রত্যক্ষ করেছেন শুধু শিল্পের মধ্যেই, জীবনযাত্রায় নয়। এই বক্তৃতায় অবশ্য রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন মানুষের মধ্যে বুদ্ধের প্রকাশ আজ অধিকাংশ লোকের মধ্যে আবৃত।

মহাবোধি সোসাইটির এই বক্তৃতায় এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'দেখলুম, দূর থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনো দুষ্কৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল নির্জন নিঃশব্দ মধ্য রাত্রিতে, সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল: আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। কত শত শতাব্দী হয়ে গেছে, একদা শাক্যরাজপুত্র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করবার সাধনায় রাজপ্রসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন। আর সেদিনকার সেই মধ্যরাত্রে জাপান থেকে এল তীর্থযাত্রী গভীর দুঃখে তাঁরই শরণ কামনা করে। সেদিন তিনি ঐ পাপপরিতপ্তের কাছে পৃথিবীর সকল বস্তুর চেয়ে প্রত্যক্ষতম, অন্তরতম, তাঁর জন্মদিন ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ঐ মুক্তিকামীর জীবনের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের এই বলার ভিত্তি নেহাৎই তাঁর অনুমান। মৎস্যজীবী জাপানীর সঙ্গে তাঁর মুহূর্তেরই পরিচয়, এবং এই পরিচয় থেকে মৎস্যজীবীটির চরিত্রে বুদ্ধের অবিনশ্বর ছাপের সন্ধান পাওয়া খুবই কষ্টকল্পনা, যেমন কষ্টকল্পনা পালা-পার্বণে হিন্দুদের মন্দিরে গঙ্গায় উপস্থিতি থেকে তাদের ধর্মপ্রাণতার অনুমান। মৎস্যজীবীটি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল সত্য, কিন্তু সেটা মৎস্যজীবীটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনেকবারই তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন, কিন্তু ধারণাগুলো সুসংবদ্ধ নয়। তিনটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

১৯০৪ সালে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এতে তিনি বললেন, ভারতবর্ষের ঐক্যের সাধনায় বৌদ্ধধর্ম একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, এশিয়াব্যাপী ধর্মপ্লাবনের সময় নানা জাতির আচার-ব্যবহার ক্রিয়াকর্ম ভেসে গিয়েছিল কিন্তু বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতবর্ষ নিজের ঐক্য গ্রথিত করে তুলেছিল। বৌদ্ধধর্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীদের সঙ্গে পরদেশীয়দের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে সমস্তকে একত্র করে ভারতবর্ষ আপনার সমাজ সুবিহিত করে গড়ে তুলেছিল।

১৯১১ সালে ওভারটন হলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা বক্তৃতা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই মত থেকে সামান্য সরে এলেন। তিনি বললেন, বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের চিরন্তন বাধা ও সংস্কার অতিক্রম করে, ভারতবর্ষকে সংস্কারজাল থেকে মুক্ত করতে গিয়ে নতুন সংস্কারজালে বদ্ধ করে দিল। ভারতবর্ষের জাতিবৈচিত্র্য যে ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে ঐক্যলাভের চেষ্টা করছিল বৌদ্ধ প্রভাবের বন্যায় সমাজের সমস্ত বেড়াজাল ভেঙে যাওয়ায়। সেই ব্যবস্থা ভূমিসাৎ হল, বৌদ্ধধর্ম ঐক্যের চেষ্টায় ঐক্য নষ্ট করল।

১৯১৭ সালে রামমোহন লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' বক্তৃতায় আর এক ধাপ এগিয়ে বললেন, 'ভারতের ক্রমে ঋষিদের যুগ অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল, ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে মহাসত্য পাইয়াছিল (অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে— ইত্যাদি ঋষিদের বাণী) তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তফাত করিয়া দিল। বলিল, সন্ন্যাসী হইলে তবেই মুক্তির সাধনা সম্ভবপর হয়। তার ফলে এদেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপস হইয়া গেছে।'

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গুরুবাদের তীব্র নিন্দা করেছেন, কিন্তু 'বৌদ্ধধর্ম ও ভক্তিবাদ প্রবন্ধে (১৯১১) তিনি বৌদ্ধদের গুরুবাদের প্রশংসা করেছিলেন এবং বৌদ্ধ ঐক্য প্রচেষ্টার সমর্থনে বলেছিলেন,

'একথা স্পষ্টই মনে হয়, ভারতবর্ষের চিত্ত হইতে জ্ঞানের ধারা এবং প্রেমের ধারাকে বুদ্ধদেব একত্রে আকর্ষণ করিয়া একদিন মিলাইয়াছিলেন। সেই মিলনের বন্যায় একদিন পৃথিবীর দেশ-বিদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে এসে বড়ো মিলনের একটি বিপুল শক্তি ভারতবর্ষ হইতে যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা নহে।'

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপান বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং জাপানীদের শিল্প নৈপুণ্য আর সৌন্দর্যবোধ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এই সংযম এবং মৈত্রী, এই সামঞ্জস্য এবং মিতাচার, এগুলো বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার ফল। 'এদের জীবনযাত্রায় এই রিক্ততা, বিরলতা, মিতাচার কেবলমাত্র যদি অভাবাত্মক হত তা হলে সেটাকে প্রশংসা করবার কোনো হেতু থাকত না। জাপানযাত্রীতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, কিন্তু এই তো দেখছি—এরা ঝগড়া করে না বটে কিন্তু প্রয়োজনের সময় প্রাণ দিতে, প্রাণ নিতে এরা পিছপাও হয় না। জিনিসপত্রের ব্যবহারে এদের সংযম, কিন্তু জিনিসপত্রের প্রতি প্রভুত্ব এদের তো কম নয়। একজন জাপানী রবীন্দ্রনাথকে জানালেন, 'এটা আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে পেয়েছি।

'শুনে আমার লজ্জা বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম তো আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রাকে তো এমন আশ্চর্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুলতে পারে নি। আমাদের কল্পনায় ও কাজে এমনতরো প্রভূত আতিশয্য ঔদাসীন্য, উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা থেকে এল।'

ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ যেটা অনুমান করতে পারতেন। কিন্তু করেননি, তা হলো, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জীবনের এই সামঞ্জস্য বা সৌন্দর্যপ্রিয়তার সম্বন্ধ নিতান্তই ক্ষীণ। বৌদ্ধধর্ম আরো অনেক দেশেই ব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে জাপানের ন্যায় মিতাচার বা সামঞ্জস্য বোধ নেই—অর্থাৎ ধর্মাচারের সঙ্গে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে এই সৌন্দর্যবোধের যোগাযোগ থাকতে পারে, তবে কার্যকারণ সম্পর্কে নয়। জাপান যাওয়ার পথে ব্রহ্মদেশ গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং সেখানকার মন্দির দেখে হতাশ হয়েছিলেন, যদিও ব্রহ্মদেশেও বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক পালিত হয়। জাপানযাত্রীতে হতাশ হয়েছিলেন, রেঙ্গুন শহর দেখে বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন, 'সমস্ত রেঙ্গুন শহরটা এর কাছে ছোটো হয়ে গেল, বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। মন্দিরে ঢোকার পর তাঁর মনোভাব:

'সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেখানে গেলুম সেখানে খোলা জায়গা, তারই নানা স্থানে নানারকমের মন্দির। সে মন্দিরে গাম্ভীর্য নেই, কারুকার্যের ঠেসাঠেসি ভিড়, সমস্ত যেন ছেলেমানুষের খেলনার মতো। এমন অদ্ভুত পাঁচমিশেলি ব্যাপার আর কোথাও

দেখা যায় না—এ যেন ছেলে-ভুলানো ছড়ার মতো, তার ছন্দটা একটানা বটে, কিন্তু তার মধ্যে যা-খুশি-তাই এসে পড়েছে। ভাবের পরস্পর সামঞ্জস্যের কোনো দরকার নেই। বহুকালের পুরাতন শিল্পের সঙ্গে এখানকার কালের নিতান্ত সস্তা দরের তুচ্ছতা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ভাবের অসংগতি বলে যে কোনো পদার্থ আছে। এরা তা যেন একেবারে জানেই না।

বুদ্ধদেবের তত্ত্ব শূন্যতার তত্ত্ব, নির্বাণের তত্ত্ব, অথচ বৌদ্ধ শিল্পের অজস্রতা, বর্ণাঢ্যতা এবং ঐশ্চর্য রবীন্দ্রনাথের কাছে বিস্ময়ের কারণ ছিল অবশ্যই। তবে এই আপাত পরস্পরবিরোধিতার ব্যাখ্যা তিনি একরকম করে দিয়েছিলেন। 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের 'হাহার পূর্বপত্র' প্রবন্ধে (১৯১২) তিনি বলেছেন:

বৌদ্ধধর্ম বিষয়শক্তির ধর্ম নহে। একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাবে এদেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তর হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

তাহর কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখন আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।

শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদির উপর ধর্মের প্রভাবকে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই মনে হয় জাপান, ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ শিল্প এবং মানুষের পরিমিতি সম্পর্কে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করে বিব্রত হয়েছেন।

বৌদ্ধ ধর্মের নঙর্থক দিক, তার শূন্যতাবাদ, তার নির্বাচনতত্ত্ব যে রবীন্দ্রনাথকে ভাবায় নি তা নয় বরং চিরকালই ভাবিয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় (১৯২০-২১) যেমন বৌদ্ধ ধর্মের নঙর্থক দিকটিই আসল বৌদ্ধ ধর্ম এ সন্দেহ তাঁর জেগেছিল, তেমনি বহু আগে ১৮৯৩ সালে কর্তব্যনীতি প্রবন্ধ লেখার সময়ও তাঁর এই সন্দেহ জেগেছিল।

'ভারতবর্ষ বলেন, সকলকেই অসংখ্য পূর্বজন্ম পরম্পরায় কর্মফল ভোগ করিতে হয়। বিশ্বনিয়মে কোথাও কর্মকারণ শৃঙ্খলের ছেদ নাই, সুখ দুঃখও সেই অনন্ত অমোঘ অবিচ্ছিন্ন নিয়মের বশবর্তী।

'হিন্দু শাস্ত্রমতে পরিবর্তমান বস্তু এবং মনঃপদার্থের অভ্যন্তরে একটি নিত্য সত্তা আছে। জগতের মধ্যবর্তী সেই নিত্যপদার্থের নাম ব্রহ্ম এবং জীবের অন্তরস্থিত সূক্ষ্মসত্তাকে আত্মা কহে। জীবাত্মা কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞান বুদ্ধি বাসনা প্রবৃত্তি দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম হইতে [illegible] [illegible] আছে। যাহারা অজ্ঞান তাহারা এই মায়াকেই সত্য বলিয়া জানে এবং সেই ভ্রমবশতই বাসনাপাশে বদ্ধ হইয়া দুঃখের কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া থাকে।

'এ মত গ্রহণ করিলে অস্তিত্ব হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। বিষয় বাসনা, সমাজ বন্ধন পারিবারিক স্নেহ প্রেম, এমনকি ক্ষুধাতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিও বিনাশ করিয়া এক প্রকার সংজ্ঞাহীন জড়ত্বকেই ব্রহ্ম সম্মিলনের লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়।

'বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণদিগের এই মত গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা আত্মা এবং ব্রহ্মের সত্তাও লোপ করিয়া দিলেন। কারণ, কোথাও কোনও অস্তিত্বের লেশমাত্রও স্বীকার করিলে পুনরায় তাহা হইতে দুঃখের অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মানিতে হয়। এমনকি হিন্দু শাস্ত্রের নির্গুণ ব্রহ্মের মতো এমন একটা শস্তিবাচক অস্তিত্ববোধ তাঁহারা কোথাও স্থান দিতে সাহস করিলেন না।

বুদ্ধ বলিলেন, বস্তুই বা কী আর মনই বা কী, কিছুর মধ্যেই নিত্যপদার্থ নাই, অনন্ত বিশ্ব মরীচিকা কেবল স্বপ্নপ্রবাহ মাত্র। স্বপ্ন দেখিবার বাসনা একবার ধ্বংস করিতে পারিলেই মানুষের মুক্তি এবং ব্রহ্ম ও আত্মা নামক কোনো নিত্যপদার্থ না থাকাতে নির্বাণ লাভ করিলে আর দ্বিতীয়বার অস্তিত্ব লাভের সম্ভাবনা মাত্র থাকে না।

সাধনা পত্রিকায় অধ্যাপক টমাস হাকসলির মত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এখানে যে বুদ্ধ-ব্যাখ্যা করলেন, পরে সেটা একেবারেই ত্যাগ করতে পারেননি, যদিও পরবর্তী বহু ক্ষেত্রেই বৌদ্ধ ধর্মের সদর্থক দিকটির উপর তিনি জোর দিয়েছেন। তার কারণ, পরবর্তী কালে তিনি নির্বাণের চাইতে বৌদ্ধ ধর্মের মৈত্রী ও করুণার ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। 'বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে। কিন্তু তিনি মঙ্গল সাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্ব চরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।' (মুক্তির পথ, শান্তিনিকেতন, ১৯০৯)। 'বুদ্ধদেবের আসল কথাটি কী সেটা দেখতে গেলে তার শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ সেদিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না—যে অংশ পজিটিভ সেইখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি দুঃখ দূরই চরম কথা হয় তাহলে বাসনা লোপের দ্বারা অস্তিত্ব লোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়—কিন্তু মৈত্রী ভাবনা কেন? মৃত্যুদণ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালোবাসা কেন, দয়া কেন?' (মৈত্রীসাধন, প্রবাসী মাঘ ১৩৩৮)।

পরবর্তীকালে ১৯৬৩ সালে শশিভূষণ দাশগুপ্ত যে-আপত্তি তুললেন, বুদ্ধদেবের মৈত্রী ভাবনা নির্বাণ লাভের সোপান মাত্র, মৈত্রী ভাবনাই চরম লক্ষ্য নয়, সেই আপত্তি [illegible] রবীন্দ্রনাথও অবহিত ছিলেন। ব্রহ্মবিহার প্রবন্ধে তিনি জোরের সঙ্গেই বললেন, ১৯০৮ সালে:

'যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধ ধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে, কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?

'যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছনো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে 'নয় নয় নয়' বলতে বলতে একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই, সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।

'কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে সে পথের ঠিক উল্টো পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে। মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।

'মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে। কোনো একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

'কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বড়ো। প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা। সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না। সে যে কেবলই দেওয়া।

'যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা। সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ তিনি নেন না।

স্পষ্টতই বুদ্ধবাণীর যে ভাষ্য রবীন্দ্রনাথ করেছেন তা বুদ্ধবাণীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে নয়। মৈত্রী ভাবনাই রবীন্দ্রধারণার অনুরূপ, তাই মৈত্রী ভাবনাকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এরই অনুপ্রেরণায় তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর 'কথা'র কবিতাগুলো: শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, মস্তক বিক্রয় (১৩০৪), পূজারিণী, অভিসার, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষ্মী (১৩০৬) ও তাঁর মালিনী (১৮৯৬), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), গুরু (১৯১৮), অরূপরতন (১৯২০), নটীর পূজা (১৯২৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৩), শ্যামা (১৯৩৯), বৌদ্ধ সাহিত্য অবলম্বনে তার এই সব নাটকের মূল প্রেরণা ব্রহ্মবিহার (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা)। পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর উৎসও বৌদ্ধধর্মের এই প্রেমভাবনা: প্রার্থনা, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী (১৯২৬), বোরোবুদুর, সিয়াম প্রথম দর্শনে, সিয়াম বিদায়কালে (১৯২৭), বুদ্ধদেবের প্রতি (১৯৩১), সকলকলুষতামসহর (১৯৩১), তেমনি বুদ্ধভক্তি (নবজাতক ১৯৩১), বা পত্রপুটের ১৭ নং কবিতা (১৯২৭) বা 'জন্মদিনের' ৩ আর ৬ নং কবিতায় বুদ্ধপ্রসঙ্গ।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বুদ্ধদেবের যে শূন্যতাবাদ রবীন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন, তাঁর জীবনের নানা সন্ধিক্ষণে, সেই শূন্যতাবাদই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার বুদ্ধভাষ্যে—[illegible] পরিচয় [illegible] আগেই পেয়েছি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

চুয়ান্ন

এই সকালের একটা সামান্য ব্যাপার মনে পড়ল বাপীর। গাড়ি চালাচ্ছিল। তখন ঝমঝম বৃষ্টি। জোর বাতাস। সামনের কাঁচের ওধারে ওয়াইপারটা উঠছে নামছে। তা সত্ত্বেও কাঁচটা থেকে থেকে ঝাপসা ধূসর হয়ে যাচ্ছিল। ফলে সামনের সবও ঝাপসা। বাপী এক-একবার হাত দিয়ে ভিমাভ কাঁচের খানিকটা ঘষে দিচ্ছিল। তক্ষুনি শুধু ওইটুকু জায়গার ভিতর দিয়ে সামনের যা কিছু সব তকতাকে পরিষ্কার।

সেই গোছেরই কিছু হয়ে গেল। ভিতরের কোনো খুব আবছা আর্দ্র জায়গায় হঠাৎ ঘষা পড়েছে। তার ওধারে ঝকঝকে তকতকে কারো অস্তিত্বের ঝিলিক। দু'চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো ছটা তার। কয়েক পলকের জন্য বাপীর মনে হল শক্ত হাতে জীবনের সব ঝড়-জল-জঞ্জাল ঘষে-মুছে দিতে পারলে তবেই সেখানে পৌঁছনো সম্ভব।

মিষ্টি বেশ একটা ধাক্কা খেয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। এ-জন্যে বাপীর এতটুকু উদ্বেগ নেই। মিষ্টির ঠাণ্ডা মাথার প্রতিক্রিয়া অন্য রকম হবার কথা। তাকে রেশমার কথা বলা হয়েছে। ঊর্মিলার কথা বলা হয়েছে। গৌরী বউদির কথাও বলল। সব বলার পিছনেই গোপনতার সুড়ঙ্গ-পথ থেকে আলোয় আসার তাগিদ। মিষ্টির সামনে কোনো মিথ্যের মুখোশ পরে থাকাটা যন্ত্রণার মতো।

ঠাণ্ডা মাথায় মিষ্টি সত্যি ভেবেছে। ভেবে হালকা হতে পেরেছে।...ওই লোকের প্রবৃত্তি ছকে বাঁধা হিসেবের শাসন জানে না, আবার নিজেই নিজেকে টেনে তোলে। এই জোর না থাকলে অমন বিচ্ছিরি সত্যি কথাও মুখের ওপর বলে দিত না। ও কিছু জানতেও পারত না।...আর, সত্যি কথাই বা কতটা সত্যি? তার থেকে মনের তলায় জমা পরিতাপটুকুই হয়তো বেশি সত্যি। কারণ, এত দিনের মধ্যে মিষ্টি কি কোনো জানোয়ারের অস্তিত্ব টের পেয়েছে? পুরুষের দুরন্ত ভোগ হয়তো দেখেছে। ভেসে যাওয়া দেখেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়াও দেখেছে। অনুভব করেছে। জানোয়ার স্বার্থপর। একলা ভোগী। জানোয়ার তার দোসরের মন নিয়ে মাথা ঘামায় না।

মিষ্টির মেজাজ উল্টে এত ভালো হয়ে গেছে যে রাতের প্রগলভ শয্যায় এই ভাবনার আভাসটুকু দিয়েই ফেলেছে। খুশিতে বুক বোঝাই বাপীর। কিন্তু আকাশ থেকে পড়া মুখ।—সে কি! আমার মধ্যে তুমি জানোয়ার দেখোনি?

মিষ্টি অনায়াসে মাথা নেড়েছে। দেখেনি।

—তোমার দশ বছর বয়সে বানারজুলির সেই জঙ্গলেও না? যার জন্য আজও আমায় পিঠে এই দাগ।

তার পিঠের তলায় একটা হাত গুঁজে দিয়ে সেই দাগে আঙুল ঘষতে ঘষতে মিষ্টি জবাব দিয়েছে, জঙ্গলের জীব-জন্তুদের ভালবাসা-বাসি দেখে দেখে তখন তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছল।

কিন্তু দিনের আলোয় মিষ্টির কাছে আসার রীতি এখন একটু অন্যরকম। এই থেকে কি ধরনের দুশ্চিন্তা ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে বাপী আঁচ করতে পারে। সময় সময় কৌতুকও বোধ করে। দামাল ছেলের ঝড়ের মুখে বুক পেতে দেবার স্বভাব হলে কাতে আগলে রাখতেই হয়। বেপরোয়ার মতো জ্বলন্ত আগুনে হাত বাড়ানোর স্বভাব হলে সে-হাত টেনে ধরতেই হয়। মিষ্টির এখন এই গোছের দায়। নিজের সহজ অথচ অনমনীয় ব্যক্তিত্বের ওপর আস্থা খুব। সেটা বড় করে তুলে এমন দুরূহ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা।

হিসেবের বাইরে অজস্র টাকা আসাটা ও কখনো ঝড় ভাবে, কখনো জ্বলন্ত আগুন ভাবে।

পরের পাঁচ ছ'মাসের মধ্যে বাপী কাজ উপলক্ষে আরো দু'বার বানারজুলি গেছে। সঙ্গে মিষ্টিও গেছে। আবু রব্বানীও বার-কতক কলকাতায় এসেছে। মিষ্টির চোখ-কান খোলা। বুদ্ধিও রাখে। টের না পাবার কারণ নেই। আরো কিছু গোপন ব্যবসার খবর তার জানা হয়ে গেছে। বানারজুলিতে মদের কারবার আর কলকাতায় মদ চোরাই-চালানের খবর। আর কলকাতারও বনজ নেশার জিনিসের বাড়তি চালান আসছে এখন, তাও বুঝেছে। বুঝবে না কেন। গোপন টাকা আমদানির পরিমাণ তার কাছে তো আর গোপন নেই। আবু রব্বানীকে মিষ্টি জেরার মুখে ফেলেছিল। সে মাথা চুলকে পালিয়ে বেঁচেছে। দোস্তকেও সতর্ক করেছে।

সেবারে বানারজুলি থেকে ফিরেই মিষ্টির সাফ কথা।—এসব চলবে না।

বাপী অজ্ঞতার ভান করেছে?—কি চলবে না?

—মদের চোরাই কারবার আর চোরাই-চালান। আর ওষুধের নামে নেশা জোগানো—

গুরুদায়িত্ব পালনের মুখখানা দেখে বাপীর মজা লাগছিল। নিজের মুখে নিরীহ বিস্ময়।—মদের কারবারে আমাকে পেলে কোথায়—ওসব তো আবু আর জিতের ব্যাপার!

—কার ব্যাপার আমি খুব ভালো করে জানি। বন্ধ করতে না পারো তোমার ক্যাপিট্যাল তুমি তুলে নাও।

—ও-বাব্বা! এও জেনে ফেলেছ?

—আমি ঠাট্টা করছি না। আমার খুব খারাপ লাগছে। আর ওষুধের নামে সব জায়গায় যা চলছে তাও বন্ধ করতে হবে।

আরো একটু উসকে দেবার লোভে বাপী বলল, তুমি চাইলেও লোকে নেশা বন্ধ করবে না। আমি বন্ধ করলে তক্ষুনি আর কেউ এসে শুরু করবে।

—যে করে করবে, তুমি করবে না। তুমি নিজেই বলেছিলে, আমার জন্যে সব যা করেছ আমার জন্যে করেছ—আমি বলছি আর দরকার নেই।

বাপী হাসছে মিটিমিটি।—সেই কশাইয়ের গল্প শুনেছ—যে সকাল-বিকেল মাংস কাটত অথচ তার কাছেই যোগীরা যোগের পাঠ নিতে যেত?

—শুনেছি। মাংস কাটা কশাইয়ের কাজ ছিল। তাতে চুরি ছিল না। আমি চুরি চাই না। সাদা ব্যবসা করো।

ভিতরে ভিতরে বাপীর এই প্রথম নাড়াচাড়া পড়ল এক-প্রস্থ। এতক্ষণের মজার বিপরীত টান ধরল। চেয়ে রইল খানিক।—আমার মধ্যে তুমি তাহলে মস্ত একটা চোর দেখছ...চোর ভালো করার জন্য ক্ষেপে উঠেছ?

মিষ্টি থমকালো।—সোজা কথাকে অমন বেঁকিয়ে দেখো না।

—আমি সব সোজা দেখি। ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর দুই নিজের বুকে ঠেকিয়ে বলল, ভেতরে দেখার চোখ থাকলে

তুমি এখানে সব সোজা দেখতে, সব সাদা দেখতে।

ক্ষুব্ধস্বরে মিন্টি জানান দিল, ওখানকার কথা বলছি না, আমি তোমার ব্যবসার কথা বলছি!

—ব্যবসাও আমিই! এবারে তুমি বলো, যে-করেই হোক, আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার বদলে তোমাদের সাদা রাস্তার কোনো চেলাঘরের বাপীকে দেখলে তোমার বাবা মা দাদা ফিরে চাইত, না তুমি আমাকে বুঝতে আসতে?

মিন্টিও তেতে উঠছে।—তোমার ক্ষমতাকে অস্বীকার করছে, কিন্তু আর কেন?

—আর নয় কেন? কালো রাস্তায় যা এসে গেছে তাই তো ভাবছ? না থামলে সব খোয়াবার ভয়?

ব্যক্তিত্বের এই ঠোকাঠুকির ফলে এই লোককে একেবারে জল করে দেবার সুযোগ ফসকালো মিন্টি। এ-কথার জবাবে তার অশান্তিটা সত্যিকারের কেন সেটা খোলাখুলি বলতে পারত। বলতে পারত, আমার সাদা কালো নিয়ে ভয় নয়, ঐশ্বর্য কমাবাড়া নিয়েও ভয় নয়—আমার ভয় শুধু তোমার জন্য, তোমার কখন বিপদ হয় সেই জন্য। তুমি যদি বিপদ আপদ এত তুচ্ছ না করতে, তাহলে আমারও তোমাকে নিয়ে অত ভয় থাকত না।

কিন্তু তার বদলে অপমানে মুখ লাল হয়েছে।—তুমি তাহলে আমাকে এত ছোট এত নীচ ভাবো?

—আমি মোটেই তা ভাবি না। আমি শুধু বলতে চাই আমার সম্পর্কে তোমার ভাবনা বা ধারণায় কিছু ভুল হচ্ছে। আমি অসিত চ্যাটার্জি না, আমাকে তুমি তার মতো করে চালাতে চেষ্টা করলে আরো ভুল হবে, আরো অসুবিধে হবে।

বাপী ঘর ছেড়ে চলে এলো। একটা বই টেনে নিয়ে বসল। এখন বই বলতে নিজের নিভৃতে চোখ যায় এমন কিছু বই। এ-ধরনের বইয়ের প্রতি আকর্ষণ বেড়েই চলেছে কেন নিজেই জানে না। পড়তে পাঁচ মিনিটও ভালো লাগল না। ঘাড়ের পিছনটা ব্যথা-ব্যথা করছে, শক্ত লাগছে। মনে হয় বাষ্পের মতো কিছু জমাট বাঁধছে ওখানে। ইদানীং মাঝে মাঝে এ-রকম হচ্ছে। এই মুহূর্তে নিজের ওপরেই সব থেকে বেশি অসহিষ্ণু। মিন্টিকে এমন সব কথা বলে এলো কেন? বিয়ের এই আড়াই বছর পরেও মিন্টি তো তেমনি মিন্টি। ও যা বলেছে না ভেবেছে শতেকে একশ জনই তো তাই বলবে, তাই ভাববে। জঙ্গলের রাজ্যে নীতির হিসেব কম। এগারো বছর ধরে বাপী না হয় তাইতেই অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু অন্য কেউ অভ্যস্ত না হলে তার এরকম আঁতে ঘা পড়বে কেন? আরো খারাপ লাগছে, ধৈর্য খুইয়ে অসিত চ্যাটার্জিকে এর মধ্যে টেনে আনার জন্যে। জীবনের সব থেকে বড় যে জুলটা মিন্টি মেনেই নিয়েছে, ইতরের মতো দেখাতেই না খুঁচিয়ে এলো! একটু আগে নিজের মুখে যে সাদা মনের বড়াই করে এলো, সত্যি ওটা কতটুকু সত্য?

ছটফটানি বাড়তে থাকল। উঠে বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে মাথায় জল দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা পুরনো কথা মনে পড়ল। এয়ারপোর্টের চাকরির সময় মিষ্টি বারকয়েক করে ঘাড়ে মাথায় মুখে জল চাপড়াতো। প্রথম দিনে হোটেলে বসে ওমনি জল চাপড়ে এসে নিজেই বলেছিল কথাটা। কিন্তু এখন আর জল দেবার দরকার হয় না। তার মানে তখন অশান্তি ছিল, এখন নেই। কিন্তু বাপীর কি অশান্তি! এখন সেই জল ওর নিজের মাথায় চাপড়াতে হয় কেন?

চোখ মুখ মুছে আবার মিন্টির কাছে এলো। মিন্টি চুপচাপ বিছানায় বসে। বাপী সামনে এসে দাঁড়াল।

—রাগ করেছ?

মিন্টি চোখ তুলে তাকাল। জবাব দিল না।

মাথার পিছনটা বেজায় ভারি লাগছে, শক্ত ঘাড়টা বাপী বার দুই জোরে এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধ পর্যন্ত ফিরিয়ে সোজা করল। —আমার আজ-কাল কি একটা গণ্ডগোল হচ্ছে, হঠাৎ-হঠাৎ রাগ হয়ে যায়, খানিক আগেও দেখেছ খুশি মনে ছিলাম...

মিন্টি আলতো মন্তব্য করল, রাজা-বাদশারা শুনেছি ঢালা ফুর্তির সময়েও পান থেকে চুন খসলে হঠাৎ রেগে গিয়ে গর্দান নিয়ে ফেলত।

উপমাটা বেশ লাগল বাপীর। হেসে জবাব দিল, যা-ই বলো এখন আর রাগাতে পারবে না...রাজা-বাদশা ছেড়ে মাঝে মাঝে নিজেকে ভিখিরির মতো মনে হয়, আরো কত পাওয়ার ছিল—পাচ্ছি না। না, না, টাকা পয়সার কথা বলছি না, আমি কি রকম যেন থেমে যাচ্ছি।

কথাগুলো মিন্টির দুর্বোধ্য লাগছে। বাপী বোঝাবে কি, যা বলল নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়।

আবার ঘাড় মাথা বার দুই সামনে পিছনে করল।

মিন্টি চেয়েই ছিল। হঠাৎ কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়ল।—ওরকম করছ কেন?

—কি রকম যন্ত্রণা হচ্ছে, ঘাড়টাও সেই থেকে শক্ত হয়ে আছে। আজ-কাল মাঝে-মাঝে এরকম হয়, তখন পাখার নিচে বসেও গরম লাগে। যাকগে, আমাকে তো চেনই, রাগ কোরো না।

মিন্টি উঠে কাছে এসে দাঁড়াল।—চোখ অত লাল কেন?

বাপী আয়নার দিকে ফিরে টান করে নিজের দু'চোখ দেখে নিল। বলল, জলের ঝাপটা দিয়ে এলাম বলে বোধহয়—

শুধু চোখ নয়, শ্যামবর্ণ মুখও কেমন লালচে মনে হল মিন্টির। হাত ধরে তাকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বলল, আমি একটুও রাগ করিনি, বোসো, আমি আসছি—

ঘর ছেড়ে চলে গেল। বাপীর এখন হালকা লাগছে একটু। গা ছেড়ে শুয়ে পড়ল। মিনিট চার পাঁচের মধ্যে মিন্টি ফিরল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, ফাঁক পেলে আজকাল তুমি ও-সব কি বই পড়ো বলো তো? আমি তো কিছু বুঝিই না—

বাপী হাসতে লাগল। জবাব দিল, বুঝতে চেষ্টা কোরো না, আমার মতো গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে যাবে। আমিও সব বুঝি না, অথচ নিজেকে যাচাই করার নেশায় পেয়ে বসে।

—কি যাচাই করার?

—নিজের ভিতরে কতসব অজানা অচেনা ভালো-মন্দ হিংসে লোভ স্বার্থপরতার ব্যাপার নাকি আছে...যত বাজে ব্যাপার সব।

মিনিট পনেরোর মধ্যে জিত্ সোজা ভিতরে চলে এলো, সঙ্গে একজন বয়স্ক ডাক্তার। জিতের হাতে তার মোটা ব্যাগ। বাপী অবাক। তক্ষুণি বুঝল, ফোনে জিতকে মিন্টি ডাক্তার নিয়ে আসতে হুকুম করেছে। ঘাড় মাথা ব্যথা আর চোখ লাল হবার কথাও নিশ্চয় বলেছে। কারণ, কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করে ডাক্তার চোখের কোল টেনে ধরে দেখল, পালস্ দেখল। তারপর ব্যাগ খুলে ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্র বার করল।

দেখা হতে যন্ত্র গোটাতে গোটাতে ডাক্তার জানতে চাইল, বরাবরই তার হাই-প্রেসার কিনা। বাপী জানালো, প্রেসার এই প্রথম দেখা হচ্ছে।

মিন্টি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, প্রেসার কত? রোগীর সামনে বলা ঠিক হবে না ভেবে ডাক্তার ইতস্তত করল একটু। মিন্টির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, ও'র বয়েস কত?

—বত্রিশ...

—তেত্রিশ। হালকা গলায় বাপী শুধরে দিল।—ছাব্বিশ সালের জানুয়ারিতে জন্ম, এটা আটান্নর আগস্ট।

আনুষঙ্গিক আরো কিছু পরীক্ষার পর ডাক্তার বাপীর পেশার খোঁজ নিয়ে উঠে দাঁড়াতে জিত্ তাকে বাইরের ঘরে বসালো। মিন্টিও এলো। ডাক্তারের কথা শুনে উতলা।

প্রেসার বেশ বেশি। ওপরেরটা একশ নব্বুই, নিচেরটা একশ। ব্যবসার টেনশনের দরুণ এরকম হতে পারে। কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। আজকের মধ্যেই ই সি জি করানোর নির্দেশ সহ ডাক্তার প্রেসকৃপশন আর ডায়েট চার্ট লিখে দিয়ে গেল। জিত্ তক্ষুনি ব্যবস্থা করতে ছুটল।

ঘরে ফিরেই মিন্টি ফতোয়া দিল, এখন টানা রেস্ট, আর কোনো কথা নেই। ব্যবসার কাজকর্ম সব এখন বন্ধ—নো টেনশন।

বাপী হেসে জবাব দিল ব্যবসার আমি কি পরোয়া করি যে টেনশনের মধ্যে থাকব?

মিন্টি চেয়ে রইল খানিক। পালকা ঠেসের সুরে মন্তব্য করল, পাঁশসা ছাড়াও সেই ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত তুমি টেনশনের মধ্যেই কাটিয়ে এসেছ।

বাপী হাসি মুখে সায় দিল, তা খানিকটা সত্যি বটে।

ই সি জির রিপোর্ট মোটামুটি ভালো। কিন্তু মোটামুটি শুনে মিন্টি একটুও খুশি নয়। হাই ব্লাড প্রেসার থেকে হঠাৎ হার্ট

অন্যটাকে বাপীর বাবার মারা যাবার ঘটনা অনেক আগেই শোনা ছিল। ফলে বেশ কিছু দিন মিন্টির কড়া নজর আর কড়া শাসনের মধ্যে থাকতে হল বাপীকে।

ভালো লেগেছে। জীবনের আবার একটা নতুন স্বাদ পেয়েছে।

ঊর্মিলা মা হয়েছে। মেয়ের মা:

টেলিগ্রামে খবর এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিন্টিও বিজয় মেহেরা আর ঊর্মিলার নামে গ্রিটিং টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছে। কিছুদিন আগে হলেও বাপী হাঁক-ডাক করে মিন্টিকে খবরটা দিত। আর যদি বলত, চলো, এবারে আমরা গিয়ে ওদের একবার দেখে আসি—তাহলেও মিন্টি অস্বাভাবিক কিছু ভাবত না। একবার ঘুরে যাবার জন্য ওরা কম ডাকাডাকি করছে না। কিন্তু বাপী কিছুই না বলে মিন্টিকে ডেকে সুখবরের টেলিগ্রামটা তার হাতে তুলে দিয়েছিল।

বাপী ইজিচেয়ারে বসে তখন খবরের কাগজ পড়ছিল। হাতের কাছে সে-রকম পড়ার কিছু না থাকলে সকালের দু-তিনটে খবরের কাগজ নিয়ে দেড় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি বা হোমরা-চোমরাদের নিয়ে কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। মানুষের খবর খুঁটিয়ে পড়ে। এমনি দুটো খবর মনে দাগ কেটে গেল: একটা বিদেশের ঘটনা। দুই শ্রমিক বন্ধু দশ আনা ছ'আনা ভাগে একখানা লটারির টিকিট কিনেছিল। সেই টিকিট প্রথম হয়েছে। আমাদের টাকার হিসেবে তিন লক্ষর ওপর প্রাপ্য তাদের। কিন্তু এক কপর্দকও ভোগে এলো না কারো। কারণ ছ'আনার গোঁ অর্ধেকের থেকে সে এক পয়সাও ছাড়বে না—টিকিটের গায়ে তো আর বখরার ভাগ লেখা নেই! ফলে ক্রোধে উন্মাদ দশ আনার হাতে ছ' আনা খুন। দ্বিতীয় ঘটনা এই কলকাতার। এক মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী তার দুই মেয়ে আর ছোট্ট ছেলে সাজগোজ করে বাড়ির কর্তার সঙ্গে রাতের আনন্দ উৎসবের আমন্ত্রণে যোগ দেবার জন্য তৈরি। কর্তা গেল লণ্ড্রিতে তার ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড় আনতে। আর ফেরেনি। বাস চাপা পড়ে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই সব শেষ।

খবরের কাগজ কোলের ওপরে ফেলে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বাপী ভাবছিল, জীবনের তাহলে ব্যাপারখানা কি।

আধ ঘণ্টা বাদে মিন্টি কাছে এসে বসল। বলল, একটা গ্রিটিং পাঠিয়ে দিয়ে এলাম।

মুখ না তুলে বাপী জবাব দিল, বেশ করেছ!

মিন্টি চেয়ে রইল একটু। ব্লাড প্রেসারের রকম-ফের হল কিনা বোঝার চেষ্টা। কিছুটা বুঝতে পারে। রক্তের চাপ সেই থেকে এখনো একটু বাড়তির দিকে, তবে স্থির, বেশি ওষুধ-টষুধ খাইয়ে ডাক্তার সেটা হুট করে টেনে নামাতে চায় না।

প্রেসার বেড়েছে মনে হল না। ফলে কৌতূহল বাড়লো। সাত মাস আগে ঊর্মিলার চিঠিতে শুধু সম্ভাবনার আভাস পেয়েই যে লোক খুশিতে আটখানা, তিন-চার দিনের মধ্যে সেই চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি বলে মিন্টিকে বকুনি পর্যন্ত খেতে হয়েছে—আজ এমন সুখবরের পরে তার এই নির্লিপ্ত ভাব মিন্টি প্রথমে অবাক, পরে সন্দিগ্ধ। তার কথা ভেবেই উচ্ছ্বাস চেপে আছে কিনা বোঝার চেষ্টা। তাও বোঝা গেল না।

—তোমার শরীর-টরীর খারাপ না তো?

বাপী সোজা হয়ে বসল। —না তো.... কেন?

—এত বড় একটা খুশির খবর পেয়েও এমন চুপচাপ যে?

বাপী হাসল।—এত বড় মানে কত বড়?

—খুব বড় নয়?

—তা অবশ্য...। তবে বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছে যখন, ছেলেপুলে আসবে এতো জানা কথাই।

নিজের অগোচরে মিন্টির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। খানিক চুপ করে থেকে সংযত মোলায়েম সুরে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কত দিন বিয়ে হয়েছে?

এবারে বাপী আত্মস্থ একটু। মনে মনে হিসেব করে জবাব দিল, দু'বছর আট মাস।...কেন?

—আমরা তাহলে এই জানা কথার বাইরে পড়ে আছি কেন?...ভেবেছ?

তার দিকে চেয়ে বাপী হাসছে অল্প অল্প।—ভেবে কি হবে। আমাদের ছেলে-পুলে হবে না এ-তো আমি তুমি ঘরে আসার অনেক আগেই একরকম জেনে বসে আছি।

অবিশ্বাস্য কাতর সুরে মিন্টি বলে উঠল, তুমি জানতে?

বাপী সাদাসিধে ভাবেই মাথা নাড়ল।—তোমার প্রথমবারের গণ্ডগোলের ব্যাপারটা দীপুদার মুখে শুনেছিলাম..।

—কিন্তু একেবারে হবেই না দাদা তো জানত না!

—তোমার দাদা না জানলেও সব শুনে আমার তাই মনে হয়েছিল।

মিন্টির ফর্সা মুখ তেতে উঠছে।—মনে হয়েছিল তাই তুমি নিশ্চিন্ত মনে বসে আছ? ভালো কাউকে দেখিয়ে চেষ্টাচরিত্র করার দরকার মনে করো নি?

হঠাৎ এরকম অভিযোগ কেন বাপী বুঝে উঠল না। বলল, চেষ্টা-চরিত্র যা করার তুমি নিজেই তো করেছ।...একজন ছেড়ে মায়ের সঙ্গে একে-একে তিনজন এক্সপার্টের সঙ্গে কনসাল্ট করেছ—এরপর আমার আর কি করার থাকতে পারে?

—ও...! অস্ফুট স্বরে মিন্টি বলল, তুমি এ-ও জেনে বসে আছ তাহলে। তোমার আর কিচ্ছু করার নেই? তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে পারতে না—বাইরে এক্সপার্ট দেখাতে পারতে না?

বাপী এই প্রথম মিন্টির দুঃখটা অনুভব করল। জবাব দিল, যেতে চাও চলো... কিন্তু আমার ধারণা এ-সব ব্যাপারে আমাদের স্পেশালিস্টরা একটুও পিছিয়ে নেই। মাঝ-খান থেকে আরো কষ্ট পাবে।

—তুমি ছেলে চাও না? তুমি কষ্ট পাচ্ছ না?

বাপী নির্দ্বিধায় মাথা নাড়ল।—আমি এ নিয়ে কিছু ভাবিই নি। আমি শুধু তোমাকে চেয়েছি—পেয়েছি। ব্যস।

—ব্যস নয়! মিন্টির গলার স্বর কঠিন। —সব জেনে তুমি উদার হয়ে বসে আছ—চুপ করে থেকে তুমি আমাকে দয়া করছ।

বাপী অবাক। আহত।—তার মানে?

—তা না হলে ঊর্মিলার মেয়ে হয়েছে শুনে তুমি আনন্দে লাফালাফি করতে—আমার মুখ চেয়ে চুপ করে আছ।

বাপী বুঝল। হাসিই পেল এবারে। তরল সুরে বলল, কোনো এক্সপার্ট দিয়ে আগে তোমার মাথাটা দেখাব ভাবছি। পরেই গলার স্বর গভীর একটু, গম্ভীরও। আমি ঠিক আগের মতো কেন নেই জানি না... ভেতরে কি হয় নিজেই বুঝি না, তোমাকে বোঝাব কি করে। যা-ই হোক আমাকে অবিশ্বাস কোরো না, আমি শুধু তোমাকেই চেয়েছি, তার বেশি আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাই নি।

মিন্টির লালচে মুখ। অপলক চেয়ে রইল। একটু বাদে উঠে গেল। এই লোককে অবিশ্বাস করে না। মিথ্যে যে বলে না, তার অনেক প্রমাণ [illegible]। তবু কোত্‌... কেড়ে ফেলতে পারলো না, যা বলল, দাতা হলে তাকে শুধু ভোগী ছাড়া আর কি বলবে? মিন্টি শুধু সেই ভোগের দোসর। ভোগের জেরে কবর

তার। মানুষটা আগের মতো নেই তা-ও ঠিক। নিজের ভিতরেই সময় সময় কোথায় তলিয়ে যায় মিষ্টি ঠাওর করে উঠতে পারে না। কিন্তু জেগে ওঠে যখন, আকণ্ঠ তৃষ্ণা। তখন মিষ্টিকেই সব থেকে বেশি দরকার। মিষ্টি তখন খুব মিষ্টি। মিষ্টি কোনো দিন মা হবে না সে-জন্যেও এই লোকের এতটুকু খেদ নেই। মিষ্টি কেবল তার ভোগের জগতের মিষ্টি।

কোভের মুখে খুব সুবিবেচনা করছে না মিষ্টি তা-ও বোঝে। মনের তলার ক্ষীণ আশাটুকুও নির্মূল। পরিপূর্ণতার এই অভাব বোধ যন্ত্রণার মতো। এ যন্ত্রণার ভাগীদার নেই। তাই ক্ষুব্ধ হয়। এই এ-রকম ভাবে। নইলে, এই লোকের ভালবাসার গভীরতাও যে সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করতে হয় তাই বা অস্বীকার করে কি করে?

ঊর্মিলা,

টেলিগ্রামের পর মিষ্টি তোমার চিঠিও পেয়েছে। এতদিনে তুমিও মিষ্টির চিঠি পেয়ে থাকবে। তোমার মেয়ে হয়েছে শোনার পর আমার মনের কথা তোমাকে জানানো হয়নি। ছেলে শুনলে আমি নিশ্চয় এত খুশি হতাম না। কালে দিনে মেয়েটা যেন তোমার থেকে ঢের বেশি দুষ্টু হয়। আর, তুমি তোমার মা-কে যত জ্বালিয়েছ, ও যেন তার মা-কে তার থেকে অনেক বেশি জ্বালায়। আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি মেয়ে দেখতেও তোমার থেকে সুন্দর হবে।

আমার শরীরের কথা ভেবে অত ঘটা করে উতলা হয়ো না। আসলে মিষ্টি তার নিজের উদ্বেগ খানিকটা তোমার ওপর চাপিয়েছে। ওই প্রেসার-টেসার হয়তো বরাবরই ছিল। আমার তেমন কিছুই অসুবিধে হচ্ছে না। আসল অন্য দিকে যা আমারও জানা ছিল না। বাচ্চা বয়েস থেকে আমার একমাত্র খোঁজার ধাত, খোঁজায় বরাত। যেমন ধরো সেই ছেলে-বেলা থেকে মিষ্টিকে খুঁজেছি। ভিখিরির খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে তাকে পাওয়া যাবে না বুঝে নিয়ে টাকা খুঁজেছি, ঐশ্বর্য খুঁজেছি। সে-দিকে এগোতে গেলে যা দরকার—অর্থাৎ তোমার মায়ের মনের ভাণ্ডারে ঢুকে পড়ার চাবিটি খুঁজেছি। তারপর একটু একটু করে সব পেয়েছি, মিষ্টির কাছেও পৌঁছে গেছি। কিন্তু তারপর? এই তারপরের গোলক-ধাঁধাঁর মধ্যে ঢুকে গেছি আমি। সেই ক্ষ্যাপার খোঁজার বাতিক যাবে কোথায়? কি খুঁজব? আরো টাকা আরো টাকা আরো টাকা? মিষ্টির মধ্যে আরো মিষ্টি আরো মিষ্টি আরো মিষ্টি? জীবন খোঁজার সেটাই শেষ কথা হলে ওই ক্ষ্যাপা থামে না কেন? অত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি কিসের?

যাক আর পাগলামি বাড়াব না। বিজয় তার কাজ নিয়ে সুখে থাকুক। তুমি তোমার মেয়ে নিয়ে সুখে থাকো। তোমাদের এই খাপছাড়া রোগে পেয়ে বসলে মেয়েটার সর্বনাশ। তার থেকে চোখ-কান বুজে তোমরা আপাতত ওই মেয়ের দিকে মন দাও।—বাপী'

চিঠিটা সামনের টেবিলের ওপর। মিষ্টি পাথরের মতো বসে আছে।

দুপুরে রোজ দু'আড়াই ঘন্টার জন্য নিজের অফিসে নেমে আসে। আজও তাই এসেছিল। বাপীর ব্লাড প্রেসার চড়ে থাকার পর থেকে মিষ্টিরই এই ব্যবস্থা। বাপীর চেম্বারে বসে তার নির্দেশ মতো কিছু কাজ-কর্ম সেরে রাখে। বাপী সকালের দিকে বসে। তেমন দরকার পড়লে বিকেলেও খানিকক্ষণের জন্য নামে।

প্যাডসুদ্ধু চিঠিটা ড্রয়ারে ছিল। ড্রয়ার খুলতেই মিষ্টির চোখে পড়েছে। নিজের হাতে চিঠি আর লেখেই না, চিঠির গোড়ার ঊর্মিলার নাম দেখে কৌতূহল স্বাভাবিক। প্যাডটা টেনে নিয়ে পড়ল। শেষ হতে আবারও পড়ল।

মিষ্টির মনে হচ্ছিল, হঠাৎ সে বড় কিছু পুঁজি খুইয়ে বসেছে। সেই যন্ত্রণায় বুকের ভিতরটা টনটন করছে। এরই মধ্যে সে এত সুলভ হয়ে গেছে যে তার মধ্যে ওই লোকের আর খোঁজার কিছু নেই, আর পাওয়ার কিছু নেই।...চোখ-কান বুজে বিজয় আর ঊর্মিলাকে তাদের মেয়ের দিকে মন দেবার উপদেশের ফাঁকে একটাই ইঙ্গিত স্পষ্ট মনে হল মিষ্টির। অর্থাৎ, ওই লোকের এটুকুও অবলম্বন নেই।

প্যাড থেকে লেখা পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে পরিষ্কার করে দু'ভাঁজ করল। সেটা হাতে করে নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এলো। পাশের চেম্বারে জিত বা ওদিকের হল-এর কেরানিরা কেউ টের পেল না।

ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে বাপী মোটা বই পড়ছিল একটা। মিষ্টি চুপচাপ সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা এত তন্ময় যে দু'মিনিটের মধ্যেও টের পেল না।

—ওটা কি পড়ছ?

মুখের কাছ থেকে বইয়ের আড়াল সরল। বাপী দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো। পৌনে চারটে। অর্থাৎ এরই মধ্যে উঠে আসবে ভাবে নি। বইটা ঘুরিয়ে মিষ্টির দিকে ধরল।

মিষ্টি জানে কি বই। শ্রীঅরবিন্দর লাইফ ডিভাইন্। জিগ্যেস করল, ওতে কি আছে?

হেসে জবাব দিল, কে জানে, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।

—তাহলে পড়ছ কেন?

রগড় করে বাপী জবাব দিল, আমি পড়ছি না, আমাকে ঘাড় ধরে কেউ পড়াচ্ছে।

—আমিই বোধহয়?

মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে এবারে খটকা লাগল বাপীর।—তার মানে?

—তার মানে তোমার টাকা আর টাকা আর টাকার মতো আমাকে নিয়েও তুমি তাহলে এখন খুব ক্লান্ত?

বাপী বিমূঢ় খানিক। মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ কি হল বোঝার চেষ্টা।

হাতের ভাঁজ করা চিঠিটা খুলে মিষ্টি সামনে ধরল।—এটা লিখে ডাকে না দিয়ে প্যাডেই রেখে দিয়েছিলে কেন—আমি পড়ব বলে?

এবারে বাপী হাসছে মিটিমিটি।—বাইরের টিকিট ছিল না বলে পাঠানো হয় নি। কিন্তু ওটা পড়ে শেষে কি তুমি এই বুঝলে নাকি?

ঊর্মিলা কি বুঝবে?

বাপী থমকে চেয়ে রইল। তারপর হাত বাড়ালো।—দাও ওটা।

মিষ্টি নড়ল না। চোখে চোখ।

—দেখছ কি? ছিঁড়ে ফেলব। ঊর্মিলারও যদি তোমার মতো বুদ্ধি বিবেচনা হয় তাহলে মুস্কিলের কথাই!

মিষ্টি ভিতরে ভিতরে অবাক একটু। অপ্রস্তুত হওয়া দূরে থাক, এই উক্ত ঝাঁঝেও ভেজাল নেই।—তোমার বুদ্ধি বিবেচনায় এই চিঠির কি অর্থ দাঁড়ায়?

বাপী আরো অসহিষ্ণু।—যা-ই দাঁড়াক এতে তোমাকে ছোট করার বা খাটো করার কোনো ব্যাপার নেই। তোমার নাম থাকলেও আমার এই ভাবনার মধ্যে তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই—বুঝলে?

মিষ্টির মুখ লাল। নিজের দাম জেনে খুশি হলাম।

হাল ছেড়ে বাপী হাতের বইটা পাশের ছোট টেবিলে ফেলে দিল। তারপর ক্লান্ত গলায় বলল, মিষ্টি অনেক লেখা-পড়া শিখেছ বলে বাতাস থেকে অশান্তি টেনে এনো না।

ইজিচেয়ারে আবার শরীর ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল।

চিঠি হাতে নিয়ে মিষ্টি চলে গেল। একটা দুর্বোধ্য অস্বস্তি ওকেও ছেঁকে ধরেছে এখন।

মাসখানেক বাদে ঊর্মিলার জবাব এলো। মিষ্টিকে লিখেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার করে লিখেছে, প্রেসার-ট্রেসার যা-ই থাক, সব থেকে আগে পত্রপাঠ বড় ডাক্তার ডেকে ফ্রেন্ডের মাথাখানা খুব ভাল করে দেখিয়ে নাও।

মিষ্টি চুপচাপ চিঠিটা বাপীর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। পড়ে বাপী হাসতে লাগল। বলল, সাদা গোল, ঊর্মিলা তবু রোগ কিছুটা বুঝেছে।

[—চলবে]
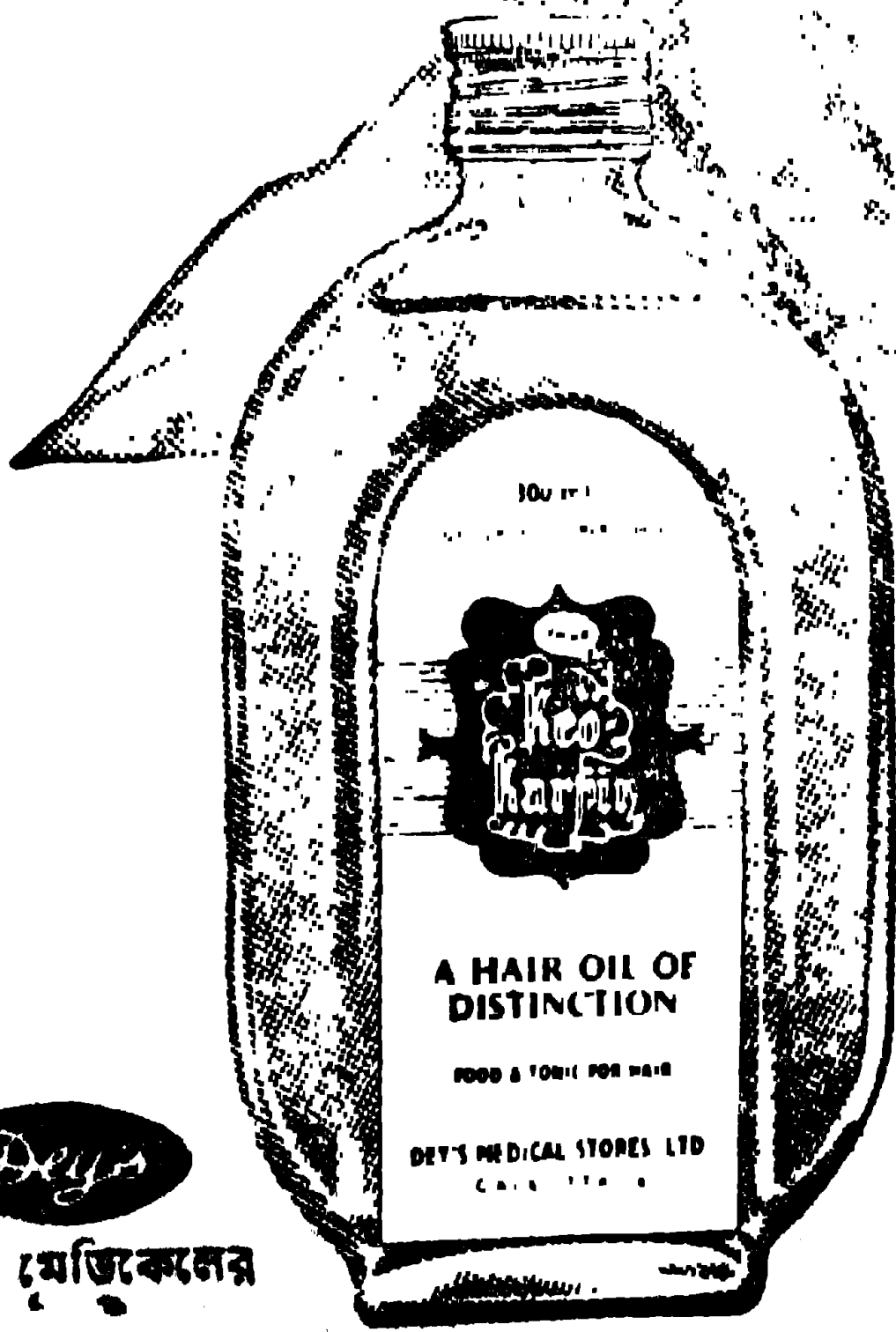
পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

সন্ধ্যে নামে নামে এমনি ভাব। রাজবাড়ির চুড়োয় চুড়োয় গাছের পাতায় পাতায় যে রোদ্দুর লেগেছিল জলের মত তা শুকিয়ে যায়। অন্ধকার আসে পায়ে পায়ে কলাবনির আকাশে, কলাবনির মাটিতে দূর পশ্চিমের শৈলচুড়োয়।

নির্মল মজুমদার মাঝখানে অসুখী করেছিল ডাক্তারকে। মজুমদার লাবণ্যর কাছ থেকে তাকে সরিয়ে নিচ্ছিল। লাবণ্য সরে যাচ্ছিল। নির্মল মজুমদার থাকত এই বাড়িতেই, সে তফাবনিতে। দেখা হত নির্মলের সঙ্গে লাবণ্যর বেশীর ভাগ সময়। নির্মল সেই সুযোগটা পেয়ে গিয়েছিল। মজুমদার বিবাহিত। স্ত্রীপুত্র নিয়ে ওর সংসার। স্ত্রীকে এনেছিল এখানে, কদিন পরেই দিয়ে এসেছিল শ্বশুরবাড়ি। স্ত্রী মুখরা। সারাক্ষণ খিটিমিটি লেগে থাকত। ডাক্তার দু একবার কল পেয়ে গেছিল মজুমদারের ঘরে। তখন তার স্ত্রী ছিল।

স্ত্রীর সঙ্গে মজুমদারের বনিবনা নেই। ভীষণ সন্দেহবাতিক চরিত্র নির্মল মজুমদারের স্ত্রী সুধার। দেহসর্বস্ব মহিলা। সারাক্ষণ স্বামী তার পায়ের কাছে পড়ে থাকুক এই চাইত। সেটা নির্মলের লাগত। শান্তি ছিল না মনে।

নির্মল মজুমদার অশান্তির রৌদ্রে ছায়া খুঁজছিল। লাবণ্য এলো সেই ছায়া হয়ে। লাবণ্যকে সহ্য করতে পারত না সুধা। এর কারণ লাবণ্যর রূপ। লাবণ্যর স্নিগ্ধতা। লাবণ্যর সঙ্গে গল্প করা, কথা বলায় সুধার সন্দেহ চরমে উঠে গেল। চলে গেল সে কলাবনি ছেড়ে সোজা বাপের বাড়ি। তখন মজুমদার একা। সুধার সন্দেহকে জবাব দিতে গিয়ে লাবণ্যর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল। মজুমদারের হাত পড়ল।

তখন ডাক্তারের এখানে এক বছর হয়ে গেছে। লাবণ্যকে অধিকার করে ফেলেছে সে। পারস্পরিক সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। পারিবারিক শুভানুধ্যায়ী, পারিবারিক সমস্যায় মতামত দিতে শুরু করেছে। অন্নদাশংকরের চিকিৎসার ভার নিয়েছে নিজ হাতে। কলকাতা থেকে স্পেশালিস্ট নিয়ে এসে দেখিয়েছে অন্নদাশংকরকে। লাবণ্য তার অনেক সমস্যার কথা বলতে শুরু করেছে ডাক্তারদাকে। ডাক্তার একদিন ওর কাছে গল্প বলা শুরু করে। প্রথম গল্পটা পুরো তৈরি করেছেন নিজের মনে। ঐরকম গল্প না হলে লাবণ্যর মনে ছায়া ফেলা কঠিন। কেননা, লাবণ্যকে চিনে ফেলেছে সে তত্তদিনে। তা সেই গল্পটা কিরকম।

খুব ছোটবেলায় আমার মা মারা গেছে লাবণ্য (এটা সত্যি বলেছিল ডাক্তার)। অবহেলায় মানুষ হয়েছি। বাবা আবার বিয়ে করলেন।

লাবণ্যর চোখ ছলছল করে। শূন্যদৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে সে চেয়ে থাকে।

আমার এই এতটা লেখাপড়া শেখা সব নিজে কষ্ট করে। এসব বলতে নেই লাবণ্য, পড়াশুনায় খুব খারাপ ছিলাম না, স্কুলে ফার্স্ট হতাম। মেডিকেলে চান্স পেয়ে গেলাম। স্কলারশিপ ছিল, ট্যুইশানি করতাম—

—আপনার বাবা দেখতেন না।

ডাক্তার বিষাদাশ্রিত মুখে হেসেছে, বাড়িতে ছিলাম কুকুর-বেড়ালের মত, সৎমা বাবাকে কুক্ষিগত করে ফেলেছিল।

—এখন তাঁরা কোথায়?

—বাবা গত বছর মারা গেছেন (এটাও সত্যি কথা)।

—মা?

—মা ভিলাইয়ে, আমার ভাই, তাঁর ছেলে ইঞ্জিনীয়ার।

লাবণ্যর মুখে মেঘের ছায়া পড়ে। সে ভেবেছিল সৎমায়ের একটা করুণ পরিণতির কথা। যেটা গল্প-উপন্যাসে দেখা যায়। সে ডাক্তারের উপর আরো সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। কেননা, এখানে খল চরিত্রের শাস্তি হয়নি।

—মা কোন খোঁজখবর করেন না ডাক্তারদা। লাবণ্যর হাত ডাক্তারের মাথায় উঠে এসেছে। স্নেহের ছোঁয়া।

—নাহ্।

এরপরে লাবণ্য শোনে আর এক কাহিনী। সে-কাহিনী আরো বিষাদের। ডাক্তারের প্রেম। সে এক দীর্ঘ গল্প, মূল ব্যাপারটা এইরকম, ডাক্তার একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। মেয়েটিকে ভালবাসত। মেয়েটি শেষমুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্যের সঙ্গে বিবাহে বসে।

লাবণ্য সহ্য করতে পারে না, চিৎকার করে ওঠে, ছি ছি, এমন হয়! ডাক্তার চুপ করে থাকে।

লাবণ্য ডাক্তারের কপালে হাত রেখে বলে, যা হয়েছে ভাল হয়েছে, ও-মেয়ে আপনাকে সুখী করতে পারত না।

—হ্যাঁ ঠিক বলেছো তুমি, এখন মনে হয় যা হওয়ার ভালর জন্যই হয়েছে। লাবণ্য জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয়ই।

জানো লাবণ্য, আমি যেখানে গিয়েছি, পেয়েছি শুধু অবহেলা। বিশ্বাস করেছি, বিশ্বাসে আঘাত পড়েছে। মানুষ আসলে ভাল নয়। মানুষকে বিশ্বাস করা বোধ'য় উচিত নয়।

লাবণ্য শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে ডাক্তারকে দেখেছে, তারপর তার মাথাটা কোলের কাছে টেনে এনেছে অজ্ঞাতে, তা কেন হবে, দু-একটা মানুষ দেখেই সবাইকে বিচার করেন কি করে, আপনিই জীবনে সুখী হবেন, বলছি।

লাবণ্য তার স্নেহময়ী হাত ডাক্তারের মাথায়, মাথা থেকে চোখের উপর রেখেছে। ডাক্তার সাকসেসফুল।

ডাক্তার বোসের অহঙ্কার আছে। তার অহঙ্কার সে যেখানে হাত দেবে তা সোনা হয়ে উঠবে। এই অহংকার মনের খুব গভীরে লুকিয়ে আছে। যেদিন লাবণ্য তার স্নেহময়ী হাত তুলেছিল ডাক্তারের কপালে, ডাক্তারের বুকে গুরু গুরু শব্দ উঠেছিল। অথচ সে স্পষ্ট বুঝতে পারেনি লাবণ্য তার দিকে ঝুঁকেছে অন্য মন নিয়ে। ডাক্তারের সারারাত ঘুম আসে না। সে ট্র্যাপে পড়ে গেছে। ট্র্যাপটা অদ্ভুত রকমের। সে লাবণ্যর সহানুভূতি আকর্ষণ করতে গিয়ে কিছু সত্যি কিছু মিথ্যে কথা নিপুণভাবে বলেছিল। সেই বলাতেই লাবণ্যর ভিতরে ঘা লেগেছে। সে তার করুণা নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

সারারাত নির্ঘুম কাটিয়ে পরদিন সকালে ডাক্তার হটফট করে কলাবনি আসার জন্য। মাপা মানুষ, ইমোশনকে অতি কষ্টে দমন করেছে। দুটো দিন যায়নি। তিনদিনের দিন গিয়ে অন্নদাশংকরের সঙ্গে নানা কথায় মত্ত হয়ে পড়েছে। লাবণ্য পাশে এসে বসেছে। ফেরার পথে ডাক্তারকে আটকেছে। বলেছে, খেয়ে যান।

ডাক্তার এড়াতে চেয়েছে। লাবণ্য গম্ভীর হয়ে গেছে, শেষে বলেছে, কেন বাবার জন্য? ডাক্তার চমকে উঠেছে। লাবণ্যর কোথায় আঘাত লেগেছে বুঝতে পারেনি সে। রাজী হয়ে গেছে, বলেছে, আমাকে এইরকম ভেবো না, আমি ডাক্তার, তোমাকে বলেছি তো এই অসুখ ছোঁয়াচে নয়।

লাবণ্যর মুখে হাসি ফুটেছে। সারা দুপুর লাবণ্যকে বই পড়িয়ে শুনিয়েছে

ডাক্তার। কপালকুণ্ডলা। লাবণ্যর চোখমুখে বিস্ময় ঝরে পড়েছে: কাহিনীর ভিতর সে ডুবে গেছে।

ডাক্তার হঠাৎ বই বন্ধ করে লাবণ্যকে বলেছে, তোমার কণ্ঠস্বর কিন্তু খুব ভাল, গান গাইলে হত।

লাবণ্য চুপ করে থেকেছে, তারপর আস্তে আস্তে বলেছে, বইটা শেষ করুন।

'তুমি এই অংশটা একটু পড়ে শোনাও তো।' ডাক্তার বইটা তুলে দিয়েছে লাবণ্যের হাতে। বার করে দিয়েছে সেই পরিচ্ছেদ-গুলি যেখানে বনপথে নবকুমার পথ হারিয়েছে, কপালকুণ্ডলার সঙ্গে দেখা।

লাবণ্য রাজী হয় নি, বলেছে 'আমার পড়া ভাল নয়।'

—ঠিক আছে, এইটুকু পড়, পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?

লাবণ্য মুখ টিপে হেসেছে তারপর আস্তে আস্তে উচ্চারণ করেছে, 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?'

—ওয়াণ্ডার ফুল! ডাক্তার বোস চিৎকার করে উঠেছে।

না এতটুকু দুর্বলতা প্রকাশ করে নি ডাক্তার। লাবণ্যও উচ্ছল হয়ে উঠেছে। সেদিন আর পড়া হয় নি। পরদিন শেষ হয়েছিল কপাল কুণ্ডলার সমুদ্রের ভিতর আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে। যখনই দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়েছে, তখনই ডাক্তার আত্মগোপন করেছে। সাহসে কুলোয় না। লাবণ্যকে অন্য কথা বলতে সাহস হয় না ডাক্তারের। অথচ তাকে বাদ দিয়ে এখন আর জীবন কাটানো সম্ভব নয় বলে মনে হয়। এই ট্র্যাপ সে নিজে তৈরী করে তার ভিতর আটকা পড়েছে।

এর পর নির্মল মজুমদারের ঘটনা। ডাক্তারের সঙ্গে লাবণ্যর ব্যবহারে কোন তারতম্য নেই। স্নেহ মমতা প্রকাশের একটা মানুষ পেয়েছে সে। কিন্তু মন তো অন্য কিছু চায়। নির্মল মজুমদারের স্ত্রী চলে যাওয়ার পর তার উপর লাবণ্য ঝুঁকে পড়েছে আস্তে আস্তে। এটা অস্বাভাবিক নয়। এই জীর্ণ রাজপুরী, বন্ধ দুয়ার, এখানে সর্বক্ষণ মনের ভিতরে মেঘ। সেই মেঘ কাটতে আরম্ভ করেছে ডাক্তার আসায়, কিন্তু ডাক্তার তার মনে রঙ ধরাতে পারে নি। তার কারণ কাহিনী লাবণ্যর মনে স্নেহ মমতার উদ্রেক করেছে।

নির্মল মজুমদার বুঝতে পেরেছিল লাবণ্যকে। বুঝতে পেরেছিল ডাক্তারের সঙ্গে তার গড়ে ওঠা সম্পর্কে কোন ভেজাল নেই। অন্তত লাবণ্যর মনে তো নেই-ই। ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে সে সঙ্গ দেয় লাবণ্যর। আস্তে আস্তে তা অন্য দিকে মোড় নেয়। এক দুপুরে সে লাবণ্যর কাছে তার দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলে। সেটা আষাঢ়ের দিন। এখনো সে ঘটনায় লাবণ্যের শরীর ছম ছম করে। ঘন মেঘ আকাশে ছেয়ে থাকায় দিন দুপুরে ঘরে আলো জ্বালাতে হয়েছিল। হেরিকেনের আলোয় ঘন ছায়ায় আলোয়। লাবণ্য তার খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। নির্মল দূরে।

নির্মলের চোখ মুখে অসহায়তা প্রবল হয়ে উঠেছিল। সে ভয় পাচ্ছিল যদি প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে আর কোথাও ছায়া নেই এ পৃথিবীতে। সুধা বাপের বাড়ি থাকুক। সে ডিভোর্সের জন্য অ্যাপীল করবে কোর্টে। তারপর লাবণ্যকে বিবাহ। এ-সব ঠিক করেই প্রস্তাব পেড়েছিল।

লাবণ্য নিশ্চুপ ছিল বহুক্ষণ, মজুমদার মুখ ঘুরিয়ে ছিল অন্ধকারের দিকে। কখন রাজকুমারী তার চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে বুঝতে পারে নি। যখন বুঝল তখন লাবণ্যর কোমল হাতের পাতা তার চোখের উপর।

লাবণ্য মোহে পড়ে গিয়েছিল নির্মলের। এতটা বয়সে কোন পুরুষ এইভাবে তার কাছে নত হয়ে আসে নি। সেই মুনিমটার তো চোখ মুখে কামনা ছাড়া কিছু ছিল না, পরে সে বুঝেছে! নির্মল মজুমদার ভালবাসার প্রত্যাশী। জীবনে চরম অসুখী। তার কাছে নত হয়েছে। তাকে, তার বক্তাকে সম্মান দিয়ে কথা বলেছে। লাবণ্যর জীবনে এ ঘটনা প্রথম।

এ-সব ডাক্তারের অগোচরে ঘটে যায়। কিন্তু বুঝতেও সময় লাগে না খুব বেশী দিন। ডাক্তার স্তম্ভিত হয়েছিল। গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। রাজবাড়িতে এসে অন্নদাশংকরের সামনে বসে কথা বলার সময় লাবণ্যর অনুপস্থিতি নজরে পড়ত। আস্তে আস্তে খোঁজ নিয়ে জানে, লাবণ্য নির্মল মজুমদারের সঙ্গে ছাতে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল নির্মল মজুমদারের ঘরে গিয়ে সব পরিপাটি করে গুছিয়ে দিচ্ছিল...এই রকম টুকরো টুকরো ঘটনা।

এক দুপুরে ডাক্তার হুট করে রাজ-বাড়িতে ঢুকে পড়ে, এমনিই এসেছিল, মনের কোণে লাবণ্যকে যাচাই করে নেওয়ার ইচ্ছেটা যে ছিল না তা নয়। বারান্দা দিয়ে এগোতেই সে থমকে যায়। কে যেন গম্ভীর স্বরে একটা বাক্য উচ্চারণ করছে পুরুষের কণ্ঠস্বর, সেই বাক্য ডাক্তারের খুবই পরিচিত।

—পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?

—হলো না। এই কণ্ঠস্বর লাবণ্যর।

—কিভাবে পড়বো তাহলে?

—বুঝতে পারছ না, এইভাবে, পথিক তুমি পথ .....

ডাক্তারের মাথায় ঘোর লাগে। পায়ের নিচের মাটি কাঁপতে থাকে। সে দ্রুত পিছনে ফেরে। দুদ্দাড় মহলের পর মহল পার হয়ে যায়। কি ভুল করেছে সে। আর সংশোধন হওয়ার নয়। লাবণ্য ছিটকে বেরিয়ে গেছে। এক্ষণে নবকুমার সত্যই বোধয় পথ হারাইল। সারা রাত ঘুম আসে না। তখন কলাবনির মানুষের অনেকের চোখেই ঘুম নেই। পীজাপী আনরেস্ট বেড়ে গেছে। নির্মল মজুমদার পাজলড্।

এখন কি সে যাওয়া আসা বন্ধ করবে। তা হয় না। তাহলে! ডাক্তার কোন স্টেপেই ভুল করে না। লাবণ্যর উপর স্নেহ মমতা এবং লাবণ্যকে ভালবাসার অধিকার যেন তার একার একথা বার বার মনে হতে থাকে। আকর্ষণ আরো তীব্র হয়ে পড়ে। সেটা সে কিভাবে এড়ায়। এত জড়িয়ে গেছে লাবণ্যর সঙ্গে যে সে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। সে মনে মনে নিজের রোলটা ঠিক করে নিল। লাবণ্যর উপর অভিভাবকত্ব ফলানোই এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পথ।

পরদিন সকালেই গিয়ে হাজির। লাবণ্য একা ছিল। ডাক্তার তার মনের ভাব এতটুকু প্রকাশ করে না। শুধু একটু কড়া চোখে [illegible] দিকে তাকিয়েছে, তাতেই অস্বস্তিতে পড়েছে লাবণ্য। ডাক্তার স্নেহে লাবণ্যর মাথায় হাত রেখেছে। বুঝতে পারছিল লাবণ্য অস্বস্তি বোধ করছে, কিন্তু ডাক্তার হাত সরায় নি। লাবণ্যকে এর পর নানান গল্প কথায় মত্ত রেখেছে। শোনাতে আরম্ভ করেছে একটি আধুনিক উপন্যাসের কাহিনী, যার মূল বিষয় খল-পুরুষের চরিত্র এবং তার হাতে পড়ে একটি অসহায় সরল মেয়ের জীবন কিভাবে নষ্ট হয়ে যায়। লাবণ্যর ভাল লাগছিল না, সে বন্ধ করতে বলে কাহিনী। ডাক্তার লাবণ্যর কথা শোনে।

এর পরই সেই শীতের কথা। যে শীত চলে গেছে সদ্য কিছুদিন আগে। কলাবনি অশান্ত। নির্মল মজুমদার বিভ্রান্ত। কাজে মন বসে না। লাবণ্যর সঙ্গে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। লাবণ্য সরল আত্ম বিশ্বাসে নিজেকে সমর্পণ করছে এই বয়স্ক মানুষটার কাছে। ডাক্তার বোঝে এখনই রাশ টেনে ধরার প্রয়োজন। নতুবা সব শেষ হয়ে যাবে।

এক দুপুরে সে লাবণ্যকে সরাসরি আঘাত করে, ডাক্তারের জিজ্ঞাসা খুব স্পষ্ট, লাবণ্য যা শুনছি তা সত্যি?

লাবণ্য ভয় পায়, গোপন ভালবাসার কথা ডাক্তারদাকে বলতেও সাহস পায় না।

—চার ধারে রটে যাচ্ছে, তুমি কোন বংশের মেয়ে সে কথা জান?

লাবণ্য চমকায়। চার ধারে রটে যাচ্ছে। কিভাবে রটে যায়! ডাক্তার পিথা নায়েককে আভাষ দিয়েছে গাজ্ঞার কথা প্রসঙ্গে। তারপরই সরে এসেছে। লাবণ্য জানল চার ধারে সব জেনে গেছে এ ঘটনা।

—কি? লাবণ্যর ঠোঁটে অস্পষ্ট শব্দ।

—ওই বিবাহিত লোকটার সঙ্গে...

লাবণ্য নিজেকে সামলাতে পারে না, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ডাক্তারের বুকে। ডাক্তার লাবণ্যর মুখটা তুলে ধরে, ভয় নেই, আমাকে বিশ্বাস করো।

তারপর দিনের পর দিন ডাক্তার বোস লাবণ্যকে নিয়ে বসেছে। লাবণ্য ছটফট করেছে উঠে যাওয়ার জন্য। ডাক্তার আটকেছে। অন্নদাশংকরের কানে গেছে ঘটনা। তিনি ডাক্তারের এই ভূমিকা প্রশংসার সঙ্গে দেখেছেন। লাবণ্যকে বোঝাতে আরম্ভ করে ডাক্তার।

দুপুর গড়িয়ে যায়। রোদ্দুর নেমে আসে। রোদ্দুর শেষ হয়ে যায়, সন্ধ্যা নামে। ডাক্তার নানান কথা বলতে থাকে। বলতে থাকে জীবনের সৎ দিকগুলির কথা। সৎ হতে হবে, চিত্তে আনতে হবে শুদ্ধতা। কারোর ক্ষতি করে জীবনে সুখী হওয়া যায় না। জীবনের পরিপূর্ণতা আসে কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। সংগ্রাম চিত্তে। সংগ্রাম মনের ভিতরে নানান দ্বন্দ্বকে ঘিরে। এই যে বৃদ্ধ রোগগ্রস্ত পিতা, একে আঘাত দেওয়ার মত পাপ কোথায়? তিনি তো এই ঘটনায় সুখী হবেন না। নির্মল মজুমদার বিবাহিত স্ত্রী আছে, পুত্র আছে। তার পরিবার ধ্বংস হবে, ধ্বংস হবে তোমার নিষ্পাপ জীবন। সে ভালবাসে কিনা তাতেও তো সন্দেহ আছে। একবার তার স্ত্রীকে ভালবেসেছে, পরে সামান্য মনোমালিন্যে স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করে তোমার দিকে এগিয়েছে। এ কি ভালবাসা না অন্য কিছু। মোহ কামনা সব জড়িয়ে আছে মজুমদারের ভিতর। তুমি তো বুঝবে না। পরে রিয়ালাইজ করবে সব। আর নির্মল মজুমদারের স্ত্রীর অবস্থাই বা কি হবে? তার জীবন তো নষ্ট হবে। একটা জীবন নষ্ট করে আর একটা জীবন গড়ে তোলা যায় না।

ডাকতার অসংখ্য উদাহরণ টানে। লাবণ্য নিশ্চুপ বসে থাকে। ডাকতার চলে গেলেই ছটফট করতে থাকে। কিন্তু তার তখন মহল পার হওয়া বারণ, লাবণ্য উদ্‌ভ্রান্তের মত বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়। যদি দেখা যায় মজুমদারকে। ডাকতার আবার আসে। লাবণ্যকে নিয়ে ডুবে যায় আশ্চর্য সব গল্প কাহিনীর ভিতর। ডাকতার তৈরী করতে পারে ভাল। আসতে আসতে লাবণ্য নিজেকে সামলে নেয়। এর জন্য সময় লাগে দিন কুড়ি। এ সবের কিছুই জানতে পারে না নির্মল মজুমদার। শুধু লাবণ্য আসা বন্ধ করেছে, আর ডাকতারের আনাগোনা বেড়েছে এটাই লক্ষ্য করেছে সে।

অন্নদাশংকরের সঙ্গে পরামর্শ করে লাবণ্যকে ভুবনেশ্বরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মাস খানেকের জন্য। ডাকতার নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসে। এক মাস বাইরে কাটিয়ে লাবণ্য মোটামুটি স্থির। কলা-ভবনিতে ফিসফাস কাজ হচ্ছিল রাজকুমারীকে ঘিরে। কোন মানুষটা। নির্মল মজুমদার না ডাকতার বোস, কার সঙ্গে লাবণ্যর গাঢ় সম্পর্ক। এটা ঠিক করতে না পেরে মানুষ চুপ করে যায়। তাছাড়া মানুষের তখন এসব নিয়ে ভাববার সময় কোথায়। জমি নিয়ে সকলে ব্যতিব্যস্ত।

লাবণ্য ফিরলো মানুয়ারির শেষে একেবারে অন্য মানুষ। নির্মল মজুমদার ওর মুখোমুখি দাঁড়ায়, লাবণ্য স্থির, মনের ভিতরের ছাপ বাইরে নেই হয়ত। কেননা ওর বাইরেটা তখন শান্ত, দীঘির মত।

—তুমি এড়িয়ে যাও কেন?

লাবণ্যর সেই ব্ল্যাংক লুকিং। সে চুপ করে থাকে।

—কি হল কথা বল না কেন?

—কি বলব?। লাবণ্যর নিস্পৃহ উত্তর।

লাবণ্য এড়িয়ে চলে যায়। আর আসে না। রাজপুরীর কোন অভ্যন্তরে যে রাজকুমারীকে লুকিয়ে ফেলা হল তা নির্মল মজুমদারের জানার কথা নয়। সে আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নেয়। ট্রান্সফার প্রে করে। চলে যাওয়ার সময় টুকুতে লাবণ্যর ভিতরটা মুচড়ে উঠেছিল। ভেবেছিল শেষ মুহূর্তে হয়ত মজুমদার থেকে যাবে। সে চেয়েছিল তাই। উদভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল ক-দিন। দেখা করতে চেষ্টা করেছে, ব্যর্থ হয়েছে।

ডাকতার বোসই লাবণ্যকে আবিস্কার করেছে। ওর মন বড় নরম। সহজেই ওই মনকে ইচ্ছেমত চালিত করা যায়। ওই মনের বিশ্বাস না আনতে পারলে কেউ লাবণ্যকে অধিকার করতে পারবে না এটা স্থির জেনে গেছে। নির্মল মজুমদারের ঘটনার পর ডাকতার আরো ঘনিষ্ট হয়ে পড়েছে রাজকুমারীর। তবে লাবণ্য এখনো মাঝে মধ্যে উদভ্রান্ত হয়ে যায়। নিজেকে নিশ্চুপ করে ফেলে।

মজুমদার এখান থেকে গিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিল লাবণ্যকে এটা জানে ডাকতার। সেই চিঠির জবাব দেয় নি লাবণ্য এটাও জানে। পোষ্ট মাষ্টারকে বলে রেখেছে ডাকতার। পোষ্ট মাষ্টারের এই গ্রহরাজ বংশের সঙ্গে লতায়পাতায় কি একটা সম্পর্ক আছে যেন।

মজুমদার সব সমেত তিনটে চিঠি লিখেছিল এখান থেকে গিয়ে। চিঠি লেখার সম্ভাবনার কথা প্রথমে ডাকতারের মনে আসেনি। প্রথম চিঠি লাবণ্য পাওয়ার পরই তা প্রকাশ করে দিয়েছে নিজের রাগ অভিমানের জন্য। যে চিঠিতে লাবণ্যর চরিত্র নিয়ে আঘাত করেছে নির্মল মজুমদার। লাবণ্যর মনে তা লেগেছে।

তাই একদিন দীপংকর চৌধুরীর সামনেই সেটা প্রকাশ করে ফেলেছিল, লাবণ্য ডাকতারকে বলেছিল, আপনি অন্য জায়গায় গিয়ে আমার গল্প করবেন তো! আমি খুব খারাপ।

ডাকতারের মুখ চোখে বিপন্নতা এসেছিল। দীপংকর চৌধুরী ওকে বার করে নিয়ে আসে। পরে সমস্ত ব্যাপারটা অ্যানালিসিস করে ডাকতার পোষ্ট মাষ্টারের কাছে গিয়ে তার মনোমত ব্যবস্থা করে। ছোট্ট পোষ্ট অফিস। সকালে দেড় ঘন্টা, দুপুরে দেড় ঘন্টা খোলা থাকে। সেখানে এটুকু ব্যবস্থা করা কোন অসুবিধে নয়।

তারপর ডাকতার ঐ বিষয় নিয়ে লাবণ্যকে তার কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আস্তে আস্তে সব কেটে যাবে এটা সে ধরেই নিয়েছে। নির্মল মজুমদার চলে যাওয়ার পরই লাবণ্য একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল, এখন সেটা কেটে গিয়ে আবার উজ্জ্বল।

ঐ ঘটনার পর এখন মাঝে মধ্যে ডাকতার ভয় পায়। যদি লাবণ্য ধরে ফেলে তাকে। কিন্তু যে ঘটনা সে তৈরী করেছে নিজে, তা থেকে আর মুক্তি নেই। মোহাচ্ছন্নের মত সে রাজগৃহে আসে। এখন যদি নির্মল মজুমদার নেমে যায় তো সে বেঁচে যায়। মজুমদার তাকে ধরতে পারে নি। সমস্ত দোষ চাপিয়েছে লাবণ্যর উপর। ডাকতারের ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি দেখা দেয়। নির্মল মজুমদার খুব চাপা, একটা কথাও বলে নি কাউকে।

লাবণ্যের কাছে যাচ্ছে ডাকতার। আজ ওকে মিল্টন পড়াবে সে। লাবণ্যর স্কুলের পাঠ নেই। যা পড়েছে বাড়িতে বসেই। অন্নদাশংকর ওকে অশিক্ষিত করে রাখেন নি। এখন ডাকতার হয়ে গেছে শিক্ষক। গল্প বলতে বলতে, কাহিনীর চরিত্র বোঝাতে বোঝাতে, সে কোন অলক্ষ্যে লাবণ্যর শিক্ষক হয়ে গেছে। এখন মাঝে মধ্যে এখান থেকে ফিরে লাবণ্য ওর চোখ মুখে জড়িয়ে থাকে। কি করবে ডাকতার। সে বুঝতে পারে প্রথম পদক্ষেপটা তার ভুল হয়ে গেছে। লাবণ্য তাকে দেখে স্নেহমমতার চোখে। ওই চোখে ভালবাসার আলো ফোটানো সহজ নয়। এখন বোধহয় আর সম্ভব নয়। তাহলে লাবণ্যর দরজা চিরদিনের মত তার কাছ থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। ডাকতার যে ভুল করেছে প্রথমে তার মাশুল দিতে দিতে দিন যাবে. কিন্তু লাবণ্যর কাছ থেকে সরে থাকা, না এখন আর সম্ভব নয় ডাকতার বোসের।

আজ দীপংকর চৌধুরীর চোখে অন্য রকম কিছু দেখেছে। সে ভয় পাচ্ছে। দীপংকর চৌধুরী কি তাকে ধরে ফেলছে। ডাকতার এগিয়ে যায় নিঃশব্দ চরণে. দীপংকর চৌধুরীকে সুযোগমত যাচাই করে নিতে হবে। অনেক সময় কেটে গেছে নাকি। এই দরজার সামনে সে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। ডাকতার আস্তে আস্তে

দরজায় চাপ দেয়। লাবণ্য উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে।

দুটো অপরূপ চোখের পাতা পড়ে গেছে। মুখের কোনে সামান্য হাসি। চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে খাটে। আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। পিঠটা খোলা মেলা হয়ে গেছে। ডাকতারের বুকের ভিতর পাহাড় ভাঙে। সে চুপ করে দেখতে থাকে লাবণ্যময়ীকে। বুকটা মুচড়ে ওঠে। ডাকতারের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কি করবে সে। খুব অস্পষ্ট উচ্চারণ করে। যেন নিদ্রিত রাজকুমারীর কানে না যায়। বড় অসহায় এই মুখ। ডাকতারের মাথা নত হয়ে যায়। কেন নির্মল মজুমদারকে সে সরিয়ে দিল। ডাকতার এগিয়ে যায়, চোখের পলক পড়েনা। কি বই। কপাল কুণ্ডলা। আধভাঁজ করা বইটা খাটের একপাশে পড়ে আছে। সে আস্তে আস্তে হাতের করতল লাবণ্যর মাথায় রাখতে যায়, কি মনে করে হাত সরিয়ে নেয়। তার কষ্ট হয়। ভালবাসা প্রবল হয়। ভালবাসা না স্নেহ ডাকতার বুঝতে পারেনা। আস্তে আস্তে লাবণ্যকে সে সত্যি স্নেহ মিশ্রিত ভালবাসায় ডুবিয়ে দিতে চায় কি? যা অন্য মানুষে জানে। ডাকতার নিজেই নিজেকে প্রতারণা করছে। সে আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। কানের কাছে বাজতে থাকে অদ্ভুত কণ্ঠস্বর লাবণ্য আবার কপাল কুণ্ডলা নিয়ে শুয়েছিল....। পথিক তুমি পথ।

ডাকতার দরজাটা টেনে দিয়ে ঠোক! মারতে থাকে। চিৎকার করে লাবণ্যকে ডাকে।

ডাক্তার ঢুকে পড়েছে হুট করে। লাবণ্য শশব্যস্ত হয়ে আঁচল সামলায়, শাড়িটা ঠিকঠাক করে উঠে পড়ে। এই ঘরে ডাক্তার বোসের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। এককালের সেই সব অন্তঃপুরের কড়া নিয়ম-কানুন এখন ধসে পড়েছে। লাবণ্য বাইরে চলে যায়, বলুন ডাক্তারদা, আমি আসছি।

ডাক্তার মাথা নামিয়ে বসে থাকে।

*

সন্ধ্যার পর সেই ঘরে দীপঙ্কর একা। চারদিক থমথম করছে। ঘরে হেরিকেনের আলো। দীপ্তি কম। ছায়া বেশী। সন্ধ্যার পরই যাবতীয় বিষাদ এসে চোখ-মুখে ভীড় করে। নির্মল মজুমদার যদি না যেত তাহলে বেশ থাকা যেত। একা একা অস্বস্তি লাগে। প্রত্যেক দিন আলো ফুরনোর সময় দীপঙ্কর নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় কেউ যেন আসবে এখানে। রাত হয়ে গেলে ভাবনাটা দৃঢ় হয়।

ঐ কংসাবতীর তীরে একটা মানুষকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। সে এখানে নতুন। আসবে এই ঘরে। কোন প্রিয়তম সুহৃদ। অনেক বনিয়াদ [illegible] দিয়ে [illegible] দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে অব্যক্তকণ্ঠে চেনাচ্ছে কলাবনিকে। আঙুল তুলে ইশারা করছে রাজগৃহের চূড়োর দিকে। সামনে যেন ক্লান্ত সাপ হয়ে নদীটা পড়ে আছে। সাদা বালির খাঁজে খাঁজে অন্ধকার ঢুকে পড়ছে। এরপর দেখা যায় দীর্ঘদেহী কটা মানুষ। মুখে জঙ্গলে মহুয়ার গন্ধ। পাহাড় প্রতিম শরীর। এসেছে শিখা নায়েক। তারা লোকটাকে পার করে নিয়ে আসছে নদীর দিকে। লোকটা আসবে রাজগৃহের এই ঘরে। দেউড়ির মুখে একটা প্রাচীন সাপ শুয়ে আছে। যক্ষি সাপ, রাজগৃহের গোপন সম্পত্তি পাহারা দেয়।

এখন রাজগৃহের সমস্ত মহল শান্ত। একলা ঘরে রাজকুমারী লাবণ্যময়ী বসে আছে। আচ্ছা লাবণ্য কি সরল ? নাকি লাবণ্য বুদ্ধিমতী। ডাক্তারের চোখকে লাবণ্য চিনতে পারে না? দীপঙ্কর তো পুরুষ হয়ে আজ ডাক্তারকে ধরে ফেলেছে। নাকি ডাক্তারকে লাবণ্য ভালবাসে। দীপঙ্কর কেঁপে ওঠে ভয়ে। তা কি করে হয়! তাহলে! দীপঙ্কর মাথাটা ঝাঁকাতে থাকে। এসব মনে হচ্ছে কেন? লাবন্যর মুখতো সারল্য প্রকাশ করে। লাবন্য ডাক্তারকে বিশ্বাস করে। ডাক্তার বোস লাবন্যকে কেমন ভাবে নেয় তা লাবন্যর কাছে অপ্রকাশিত। দীপঙ্কর মাথা নুয়ে বসে থাকে।

এখন যদি সত্যি সত্যি কাঁসাই পেরিয়ে একটা মানুষ আসত এই ঘরে। শিখা নায়েক তাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে। সে দীপঙ্করের আত্মীয় কোন মানুষ। কলাবনি চেনেনা, জানেনা, তাকে কলাবনিকে জানাতে হবে চেনাতে হবে। প্রতিটি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় এই রকম মনে হয়।

দূরে কোথায় পদশব্দ উঠেছে। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। দীপঙ্কর চঞ্চল হয়ে ওঠে। তা হলে! যা ভেবেছে তাই কি সত্য হয়ে উঠছে। আশ্চর্য লাগছে। হ্যাঁ ঐ তো শিখা নায়েকের কণ্ঠস্বর। কারোর জন্য তীব্র আশা করলে সে কি সত্যিই চলে আসে। মনের সঙ্গে তীব্র টান। কে আসছে.! লাবন্য। লাবন্য তো অচেনা নয়। লাবন্য তো শিখার সঙ্গে আসবে না। লাবন্যর কথা মনে হল কেন? তাহলে নির্মল মজুমদার! তা কি করে হয়, ডাক্তার বোস.! দীপঙ্কর বুঝতে পারছে না।

পায়ের শব্দ গভীর হয়ে উঠল। দরজার সামনে এসে থামল। দীপঙ্কর চঞ্চল হয়ে উঠে পড়ল। আলোটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল। ঘরের ছায়ারা সব উলোটপালোট হয়ে গেল।

—কে? দীপঙ্কর দরজার সামনে দাঁড়াল।

—মু শিখা।

—কি ব্যাপার? দীপঙ্কর উত্তেজনা সামলে নেয়।

—অন্দুর বন্ধু আসছে, আপনার সঙ্গে কথা বলিবে।

দীপঙ্কর আলোটা রেখে দিল মেঝেতে। তার মুখের হতাশা অন্ধকারে ডুবে গেল। কেউ দেখল না। এইসব অনুভূতিতে মানুষ বড় একা। প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরা বছর বত্রিশের একটা মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে।

দীপঙ্কর তাকে নীরবে আহ্বান করল। অম্বুজাক্ষ বারিক ঘরে ঢুকল।

॥ ১৪ ॥

অম্বুজাক্ষ ঘরে এসে বসে। শিখা নায়েক বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। শিখা আজ মদ খায়নি বলে মনে হয়। দীপঙ্কর শিখাকে ভিতরে ডাকে।

—না ও থাক, আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যই ওকে ডেকেছিলাম, তুই যা। অম্বুজাক্ষ শিখাকে যেতে বলে। কণ্ঠস্বর খুব মিহি, হঠাৎ শুনলে মহিলা বলে ভ্রম হয়।

কেন থাকুক না। দীপঙ্কর বলে।

—না ওর কাজ আছে, যা বলেছি তাই করবি বুঝলি।

শিখা ইতস্তত করে চলে যায়। দীপংকরের ভাল লাগে না। এই লোকটার কণ্ঠস্বর কেমন অস্বাভাবিক। দীপঙ্কর অম্বুজাক্ষকে দেখতে থাকে। চেহারাটা টান-টান, বসে বসে আছে, সেই চিহ্ন চোখ-মুখে। পায়ের উপর পা তুলে বসেছে চেয়ারে। সামনে হাঁটুচেয়ারে দীপঙ্কর। দুজনের মধ্যে আলোটা। দুজনে পরস্পরের বিশাল ছায়া দেখতে পাচ্ছে দেয়ালে।

আজ কলাবনির আর এক মানুষের সঙ্গে দেখা হল। দীপঙ্কর অম্বুজাক্ষকে দেখতে থাকে। গালটা নির্লিপ্ত করে কামানো, দু-চোখ কোটরগত, চোখের কোনে কালি পড়েছে। এই লোকটার কণ্ঠস্বরও অন্যান্য মানুষ থেকে অন্যরকম। সব কিছু অন্য-রকম করে তুলে অম্বুজাক্ষ বারিক কলাবনির মানুষের ভিতরে ইমপর্ট্যান্ট।

কলাবনি যেন একটা ছোটখাট ভারত-বর্ষ। এর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষই গরুর মত। তাদের দেহের উপর দিয়ে রক্ত-জল-বৃষ্টি সব বয়ে যায়। এত প্রতিবন্ধকতার ভিতরেও কলাবনির মানুষ বেঁচে থাকে। এইসব মানুষ বড় দুর্বিনীত, সরল। এদের পাপও সরলতায় ঢাকা, পুণ্য আত্মভোলা মহান।

এই ক্যানকেসে মহিলাসুলভ কণ্ঠস্বর-অলা মানুষটা সমস্ত গরীব মানুষকে ভীত করছে। কিভাবে হয় বোঝা যায় না। অম্বুজাক্ষ বারিক কলাবনির ডাক্তার। পাশ করেনি। দু বছর পাঠশালায় ছিল এক বড় ডাক্তারের চেম্বারে। কম্পাউণ্ডারি করত। তাতেই সব শিক্ষা। সোডিবাইকার্ব মিক্সচার আর [illegible] ট্যাবলেট দিয়ে এ তল্লাট অঞ্চলে প্রভূত বিস্তার করে ফেলেছে মহাজেই। কলাবনির হেলথ্ সেণ্টার বন্ধ হয়ে। পাশ

প্রতীক তো হবেই। আর সেই হেলথ সেণ্টারে কাঁতিমত মোটর চলাচল করে, সরকারী জিপ। ডাক্তারবাবু অতগুলো ঘরের কোথায় বসেন তা খুঁজে পাওয়া ভার। খুঁজতেই সময় যায়, সময় যায় অবাক চোখে ডাক্তারখানাকে দেখতে। কেমন রঙকরা বাড়ি, ওষুধের গন্ধে ম ম। এ যেন জলে ভাসে শিলা—এমনই মনে হয় কলাবনি আর তার আশপাশের গরীব মানুষের। সাঁওতাল মুন্ডা আর গরীব গুরুবোরা হেলথ্ সেণ্টারের ধার মাড়ায় না। অম্বুজ বাবু তাদের বড় আপন। বড় হাসপাতালে বিনা পয়সায় লাল ওষুধের শুনলেও অন্দুরে যেতে সাহসে কুলোয় না। অম্বুজাক্ষ ধারে ওষুধ দেয়, ধারে চিকিৎসা করে। রাত-বিরেতে বিপদ হলে তখখনি ছোটা যাবে না রোগী নিয়ে। তখখনির ডাক্তারবাবুও আসেন না। নির-মানুষের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করা তার এক্তিয়ারে নেই। আইন বারণ করেছে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে। তাই রাজবাড়িতে আসলেও তিনি সাধারণ মানুষের ঘরের ছায়া মাড়ান না আইন মোতাবেক।

সুতরাং অম্বুজাক্ষর পাথারে আয়তন বাড়তে থাকে। এবং এইভাবেই কলাবনি কেন তাবৎ ভারতবর্ষেই অম্বুজাক্ষ বারিকদের পক্ষে বিস্তার সহজ হয়ে উঠেছে। চিকিৎসা বিদ্যার জোরে অম্বুজাক্ষ মানুষের উপকারী বন্ধু। প্রয়োজনে বিনা পয়সায় ফোঁড়া কেটে দেয়, সুদে আসলে শোধ নেয় অন্যভাবে। সেটা গরীব মানুষ বোঝে না। তারা অম্বুজাক্ষকে পরম উপকারী নেতা ব'লে মনে করে। কেননা অম্বুজাক্ষ তাদের ঝাড়-গ্রাম চিনিয়েছে, চিনিয়েছে লালডাঙি। লাল-ডাঙি অর্থে ঝাড়গ্রাম কোর্ট। লাল অরণ্যে ঢাকা এই মনোরম শহরে অনেক মানুষের সর্বনাশ হয়ে গেছে। কোর্টকাছারি করতে করতে সর্বস্বান্ত হয়েছে অনেকে। অম্বুজাক্ষ উকিল চেনায়, মুহুরি চেনায়। সামান্য পুকুর নিয়ে গন্ডগোলে সে এক পক্ষকে ঝাড়গ্রাম কোর্টের পথ দেখায়। তাই অম্বুজাক্ষ বারিক ম্যাস--লিডার।

দীপঙ্কর অম্বুজাক্ষকে দেখছে। এই রকম জননেতা গ্রামাঞ্চলে দুর্লভ নয়। মানুষের চোখ তার মনের কথা বলে। দীপঙ্কর এই লোকটার সামনে অস্বস্তি বোধ করছে—কেন? অথচ মিহিস্বরে অম্বুজাক্ষর কথায় তো অমৃত।

—কি দরকার। দীপঙ্কর কেমন নিস্পৃহ।

—আমার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। অম্বুজ হাসে।

অম্বুজাক্ষ বারিক তো অম্বুজ নামেই এ অঞ্চলে অভিহিত। সুতরাং অম্বুজে আপত্তি দোষ নেই।

—সামান্য শুনেছি।

অম্বুজ মুহূর্তে নিষ্প্রভ হয়ে উঠেই আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সামান্য মানুষ, সামান্যই শুনবেন, তা কেমন লাগছে কলাবনি?

—ভালই, অরণ্য নদী এ-সব ভাল না লাগার তো কথা নয়।

—না, তা বলছি না, বলছি জমি-জমা নিয়ে......। অম্বুজ খুবই আগ্রহী।

—প্রবলেম তো আছেই, মিটবেও নিশ্চয়।

কথাটা ধরেই অম্বুজ বলে, 'সেটাই তো চাইছি, মানে সমস্যার সমাধানটা ক'রে দিন, আগের ভদ্রলোক তো পারলেন না, আপনি নিশ্চয়ই...... ।

--কি ক'রে বুঝলেন?

--না মানে এমনি, হ্যাঁ তা আপনার বাড়ি কোথায়?

—কলকাতা।

—এন্দুরে, গ্রাম, এসব ভাল লাগে?

—লাগাতেই হবে, উপায়টা কি? দীপংকর সিগারেট ধরায়, একটা বাড়িয়ে দেয় অম্বুজের দিকে। অম্বুজ দীপঙ্করের থেকে আগুন নেয়।

এই সিগারেটটা পাওয়ার পরই অম্বুজ স্বস্তি পায়। স্বস্তি পায় একারণে যে, তাকে ইম্পর্টান্ট মনে করেছে নিশ্চয়ই এই ভদ্রলোক না হলে সিগারেট দিত না, সরকারি অফিসার। অম্বুজের স্ট্যাটাস ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। এটা কলাবনির অ্যারোগ্যান্ট চাষীদের কল্যাণে। সে কায়দা করে বসে। পা নাচায়। দীপঙ্করের অস্বস্তি আবার বেড়ে যায়। দীপঙ্করের মনের খবর তো এই মানুষটা জানে না। সিগারেট দেওয়াটা তো ভদ্রতা, কিন্তু তার ফলে অম্বুজ বারিক অতিরিক্ত সম্মানিত হয়েছে মনে মনে।

—আপনাকে কিন্তু মিটিয়ে দিতেই হবে, এই গন্ডগোল। অম্বুজ বলে।

—আমি কি যেশাশ ক্রাইস্ট, হাতের ছোঁয়ায় কুষ্ঠরোগী ভাল হয়ে যাবে, গন্ডগোল তো গভীরে, আসল ঘটনাটা কি বলতে পারেন?

—কি ঘটনা? অম্বুজ যেন মিহি স্বর নিয়ে আকাশ থেকে পড়ে।

—এই পিজান্ট আনরেস্ট কেন?

—তারা সকলেই ভাগচাষী, দখলকার, তাই গন্ডগোল।

—এখনো চাষ করে?

—নিশ্চয়ই।

—আপনি ঠিক নেতার মতই কথা বললেন। টোটাল এনকোয়ারিতে তো সব ধোঁয়াশা, এত জটিল কেন, সকলে তো প্রমাণ করতেও পারছে না ব্যাপারটা।

—কেন সাক্ষীসাবুদ।

—রাখুন মশাই, সাক্ষীসাবুদও তেমন জোরালো নয়, ব্যাপারটা কি?

অম্বুজ এইবার রি-অ্যাক্ট করে, আপনি কি বুঝলেন?

—সব পরিস্কার হয়নি, কেউ সত্য কথা বলে না—

—দখল তো করে?

—চারদিকে রব উঠেছে জোর করে নিয়েছে, রবটা কি একেবারে মিথ্যে?

—হ্যাঁ। অম্বুজ দাঁতে দাঁত চেপে বলে।

দীপঙ্কর উঠে পায়চারি করতে থাকে। ওর সঙ্গে দেয়ালের ছায়া বদলাতে থাকে। হেরিকেনটা একই জায়গায় স্থির। হাতের মুষ্টি পাকিয়ে যায়, অসহ্য লাগছে সব। রহস্যটা যদি কেউ ফাঁস করে দিত, একটা ডিসিশনে আসা যেত। অথচ এতগুলো মারদাঙ্গা চাষী একত্রে একই কথা বলছে, জমিতে নিশ্চিত কোন রহস্য আছে। সেটার সূত্রটা কেউ ধরিয়ে দিচ্ছে না। রজনীকান্ত সাউ ইত্যাদিরা ভাল মানুষ নয়। স্বভাবটা এদের একেবারে এ অঞ্চলের জল হাওয়ার মত। খুবই চরম। ক্রোধে সব সময় আগুন। ভাঙবে তবু মচকাবে না। চাষীগুলো টেন্সড হয়ে গেছে। একটা সত্য চেপে যাচ্ছে মনে হয়, অথচ দাবীটা যৌক্তিক, একারণেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে আছে। জমি ছাড়ব না। ভাগচাষী কর, নতুবা দখল দেখ। কেউ কেউ বলছে জমি তাদের নামে করে দিতে। একেবারে রায়তিস্বত্ব। হাস্যকর ব্যাপার। আইন জানে না, গোঁ আছে: তাই বলছে। একের জমি অন্যের হয় কি করে!

বিমল জানে হয়ত। বলবে না। যে ঘটনার পর আর দেখা হয়নি। কাজে আটকে আছে। নিজের প্রয়োজন ছাড়া আসবে কি করে? অম্বুজ বারিক তো কলাবনির মানুষ। এতগুলো চাষীকে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে। অম্বুজ নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু বলছে না। অম্বুজ না জানলে এত চাষীকে বিনা কারণে লড়িয়ে দিতে পারত না। এখন ওর ব্যাপারটা এই রকম, জোর করে সকলের নাম ঐ জমিগুলোতে ভাগচাষী হিসেবে লিখিয়ে দেওয়া। তাহলেই তো কেল্লা ফতে। চাষীরা আইনের সাহায্যেই জমিতে নেমে যাবে। রজনীকান্ত সাউ হয়ে যাবে বিকল।

অম্বুজ পকেট থেকে প্যাকেট বার করে এগিয়ে দেয় দীপঙ্করের দিকে। দীপঙ্কর তখন চশমা খুলে চোখ ও নাকের মধ্যবর্তী অংশটুকু মুছে আবার চশমা চোখে তুলেছে, সে অনায়াস ভঙ্গীতে বলে, ধন্যবাদ, এক্ষুনি খেলাম তো:

অম্বুজ হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যায়, তারপরই সামলে নেয় নিজেকে, 'জমি জমা-গুলো খাস করা যাবে? সরকারে বর্তাবে?'

দীপঙ্কর হাসে, 'কেন সিলিং-এর বাইরের জমি?'

অম্বুজ চুপ করে থাকে, নখ খুঁটতে

থাকে, 'তাহলে বর্গাদার হওয়াই ভাল কি বলেন?'

অম্বুজের কথাই কন্ট্রাডিকটরি। সে যেন তেন প্রকারেন জমিগুলো বেহাত করার কথা ভাবছে, ভাগচাষী বা বর্গাদার রেকর্ড হলে জমিগুলো অংশত বেহাত করা যায়। কারণ কোথায় লুকিয়ে? জিজ্ঞাসায় লাভ নেই। জবাব পাওয়া যাবে না। আপাতত এই সূত্রই জানা হয়ে গেল। তা অম্বুজ বারিকের মোটিভ।

—আপনি কোথায় ছিলেন? দীপঙ্কর হঠাৎ ঘনিষ্টের মত জিজ্ঞাসা করে।

—কলকাতায়।

দীপঙ্কর আবার বসে, কি ব্যাপার; কেস টেস?'

—আর বলেন কেন, স্ত্রীর পেটে টিউমার। মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দিয়ে এলাম।

—দেখাশোনা?

—কলকাতায় আমার সম্বন্ধি থাকে. সেই দেখবে. যাব দিন সাতেক বাদে. এখন চেক আপে আছে, অপারেশন-এর দেরী আছে।

থাকার উপায় আছে মশাই. এদিকে সৈন রয়েছে, এতগুলো গরীব লোক, না দেখলে থাকতে পারি?

দীপঙ্কর চুপ করে থাকে। কি বলবে. বলার কিছু নেই ?

সামান্যক্ষণ স্তব্ধতা, দেয়ালের ছায়ারা স্থির।

—এখানকার চাষীরা ভীষণ ডিপ্রাইভড। অম্বুজ বলে।

—গোটা ভারতবর্ষেই তো? দীপঙ্কর উত্তর দেয়।

—এখানে ফার্টাইল ল্যান্ড কম, অথচ ল্যান্ডলেস পিজান্ট দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

—সর্বত্রই তো একই ব্যাপার. অবশ্য জমির ফার্টিলিটি অন্য অঞ্চলে বেশী. তবে ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে এটা ঠিক।

—এখানে ল্যান্ড হাঙ্গার খুব বেশী। অম্বুজ বলে।

দীপঙ্কর চুপ করে শোনে। সত্য কথাই তো। কিন্তু সেই ল্যান্ড হাঙ্গার মেটানো যাবে কি করে? অম্বুজ কি আবার সেই জমিগুলোর প্রসঙ্গে আসবে!

হ্যাঁ অম্বুজ ফিরে এল মূল কথায়. 'আপনি তো রিলিফ দিতে পারেন চাষীদের. ল্যান্ড হাঙ্গার কমবে. কলাবনির সমস্যার মীত হবে'

দীপঙ্করের হঠাৎ প্রবল অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হয়; জ্ঞানের কথা বলছে মিলযেটা. পিপলের ল্যান্ড হাঙ্গার দীপঙ্কর চৌধুরী মেটাতে পারে, কলাবনির সমস্যার মীত করতে পারে। কি করে হয়। সে তার মনের ব্যাপারটা প্রকাশ করে না। বরং শান্ত-দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করে, 'আমি মেটাতে পারি?'

—হ্যাঁ।

—কলাবনির যাবতীয় সমস্যা মিটে যাবে?

—সমস্যা তো মূলত ল্যান্ড ওরিয়েন্টেড. জমির সমস্যা মিটলে সব হয়ে যাবে।

দীপঙ্কর অম্বুজের আশা দেখে থ, কি করে মেটাই বলুন তো?'

—কেন ভাগচাষী হিসেবে সকলকে মেনে নিন।

--তাতেই হয়ে যাবে?

—হ্যাঁ।

—দীপঙ্কর দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'না. হয় না, তাহলে আর একটা নতুন সমস্যার উদয় হবে. কলাবনি আরো অশান্ত হয়ে যাবে, আপনি ও আপনার চাষীরা কেউ সুস্থভাবে থাকতে পারবে না। এটা তো আমি প্রতিষ্ঠা করে দিলাম একটা আপাত মিথ্যাকে। মিথ্যা কতদিন সত্য হয়ে থাকবে: রজনীকান্ত মেনে নেবে?'

অম্বুজ চুপ করে থাকে। কিছু বলতে পারে না। দীপঙ্কর বোঝে তার কথার প্রতিবাদ করতে পারল না লোকটা। তাহলে মিথ্যা শব্দটি সত্যই। অর্থাৎ চাষীগুলোর দখল জোর জোর করে এটা ঠিক। কিন্তু কেন? মাটির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে তো চাষীরা হাঙ্গামায় যায় না।

—এই পালঙ্কটা কিন্তু সুন্দর. রাজা রাণীর—। অম্বুজ স্পষ্টত কথা ঘোরায়।

—হ্যাঁ এখন আরশোলার সঙ্গে আমি।

দীপঙ্কর আবার উঠে দাঁড়ায়। পায়চারি করতে থাকে। হঠাৎ অম্বুজের দিকে তাকিয়ে বলে. কেন চাষীগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে আছে বলুন তো?

অম্বুজ তার গলাটা ঝেড়ে নিয়ে. মিহি স্বরটাকে চেষ্টায় মোটা করে বলতে আরম্ভ করতেই দীপঙ্কর থামিয়ে দেয়। অম্বুজ বলছিল দিনের দিন জমির মালিকদের শোষণ অত্যাচারের কাহিনী...। একেবারে ফর্মুলা মাফিক বকতৃতা। এসব শুনতে চায় না দীপঙ্কর চৌধুরী। এই আঠাশ বছর বয়সে একসপ্লয়টেশনের রূপ চিহ্নগুলো চিনে ফেলেছে, নতুন কি শেখাবে এই অম্বুজাক্ষ বারিক। অম্বুজাক্ষ বারিক যা বলছে সর্বত্রই বিদ্যমান কিন্তু কলাবনির মত রহস্যময় হয়ে ওঠে নি অন্য জায়গাগুলো। কলাবনির এই ঘটনার একটা কার্যকারণ সূত্র আছে। আছে ধুলো চাপা কোন কাহিনী-ইতিহাস। সেটাই জানার। অম্বুজ যদি জানে তাও বলে না বলার প্রয়োজন বোধ করে না বলতে ভয় পায়। সেটা জানলে মাটির সঙ্গে জড়িত দ্বন্দ্বগুলো মিটিয়ে ফেলা যেত।

দীপঙ্কর অম্বুজকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'আপনি আসল কারণটা জানেন কি?'

অম্বুজাক্ষ বারিক নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকে। মুখ চোখে কেমন অসহায়তার ভাব এসে গেছে। দীপঙ্কর সেটা লক্ষ্য করে।

—কি হল বলুন না যদি জানেন।

অম্বুজাক্ষ সেই রকম নিথর। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, হাত জোড় করে, চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে কোটরের ভিতরই, নমস্কার, আসি।

দীপঙ্কর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে থাকে। দূরে পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ চলে গেল লোকটা। কি হল। তাহলে কি এই মানুষটা জান?

*

লাবণ্য শাড়ি বদলে ঘরে এসেছিল। আবার চলে গেছে। চা খাবে বলেছে ডাক্তার। ডাক্তার আজ লাবণ্যকে দেখে ভয় পাচ্ছে। ভয় পাওয়ার কারণ দীপঙ্কর চৌধুরী। লাবণ্যকে যদি হারাতে হয়। না হলে দীপঙ্কর চৌধুরীর চোখে জ্বালা কেন? ডাক্তারকে ঐরকম কথা বললো কেন? লাবণ্যকে তো হারানো চলবে না। সম্পর্ক আরো গাঢ় করে আনতে হবে।

ডাক্তার মাথাটা ঝাঁকাতে থাকে। যে ভুল করেছে তা আর শুধরোবার নয়। ভুলের কারণ ভয়। যদি লাবণ্য প্রত্যাখ্যান করে! লাবণ্য ছাড়া তো বাঁচা যায় না। প্রথম দেখাতেই লাবণ্যকে মাথার ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েছে সে। এখন রাজকুমারী হয়ে গেছে নেশা। এই নেশা থেকে মুক্ত হওয়া বড় কঠিন।

লাবণ্য চা নিয়ে ঢুকল। টেবিলের উপর চা রেখে পালঙ্কে হাঁটু মুড়ে বসল।

সে চা খায় না। শুধু ডাক্তারের জন্য চা।

—কখন বেরিয়েছেন? লাবণ্যর জিজ্ঞাসা।

—বিকেলে।

—ভাল হল, একা একা ভাল লাগছিল না।

ডাক্তারের বুকের ভিতরটা ঝম ঝম করে উঠল। দেউড়িতে বোধয় বেজে উঠল ইমন-কল্যাণ। ডাক্তার মাথা নিচু করে। আজ হঠাৎ দুর্বলতা গভীর হয়েছে। চা খেতে গিয়ে জিভটা পুড়ল। একটু চা চলকে মাটিতে পড়ল, ছিটে লাগল প্যান্টে। ডাক্তার নিস্পৃহ থাকে এই ঘটনায়। তারপর আধ-খাওয়া কাপটা রেখে দেয় টেবিলে।

—কি হল খেলেন না। লাবণ্যর বিস্ময়।

—ভাল লাগছে না।

—কেন কি হল?

লাবণ্য ব্যস্ত হয়ে নেমে এল পালঙ্ক থেকে. একেবারে ডাক্তারের কাছাকাছি। আঁচল হয়ে গেছে অবাধ্য সেদিকে লক্ষ্য নেই। ওর বড় মমতা।

(চলবে)

আদি আছে অন্ত নেই

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুতরাং কোথাও আর যাওয়া হল না। কোনমতে ঘরে ঢুকে সেই নালার ধারের ঘুলঘুলি মতো জানলাটা খুলে দিয়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। জামাটা খোলারও আর কসরত নেই যেন। জানলা দিয়ে পচা গন্ধ আসছে, তা আসুক। তবু বাতাস আসছে একটু—আর সে এত জোর বা ঘনও নয়।

নিশীথবাবু তখন একটি ছাত্রকে পড়াচ্ছেন। একটা চ্যাটাইয়ের এক প্রান্তে বিছানাটা গুটনো, ওঁরা তার পাশে সেই চ্যাটাইয়ের ওপরই বসেছেন দুজনে। সামনা-সামনি নয়, পাশাপাশি, বোধহয় আলোর অসুবিধার জন্যেই।

রুক্ষ-রুখা গোছের চেহারা নিশীথবাবুর। ঠিক বেঁটে বলা যায় না—সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা হবেন হয়ত। পার্কাসটে চেহারার জন্যেই বয়স আন্দাজ করা শক্ত, চল্লিশও হতে পারে, পঞ্চাশ হওয়াও অসম্ভব নয়। দু-একগাছা চুলে পাক ধরেছে, সরু করে কামানো গোঁফের মধ্যেও লক্ষ্য করলে পাকা চুল দু-একটা দেখা যাবে। আদ্দির পাঞ্জাবী পরা, মাথায় সযত্নরচিত অ্যালবার্ট টেরি। অর্থাৎ তরুণ সাজবার চেষ্টা।

ও যখন ঘরে ঢুকল, নিশীথবাবু তখন ছাত্রটির পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে কি বোঝাচ্ছিলেন বা গল্প বলছিলেন কিছু। ওকে দেখে সরিয়ে নিলেন হাতটা। কিন্তু শুধু ভদ্রতার প্রয়োজনেই নিতান্ত অপ্রয়োজন প্রশ্ন করলেন, কী ঘুরে এলেন?

কিন্তু সংক্ষেপে জাস্তে হাঁ বলে ভদ্রতার কর্তব্য সেরে শুয়ে পড়ল।....

একটু পরে, ক্লান্তি ও অবসাদ এবং অসহ হতাশার একটা মানসিক যন্ত্রণা কিছুটা কমতে, অথবা জোর করেই তা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল। পরিবেশটা কোথায় ঔৎসুক্যে সমস্ত অবসাদ ছাড়িয়ে উঠবে এও স্বাভাবিক। অল্প বয়স, সমস্ত মানসিক দুঃখের মধ্যেও জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল মেতে চায় না।

দেখল—শুধু এ-ঘরই নয়, মোটামুটি মেসের ভিতরের চেহারাটাও এখান থেকে যতটা দেখা ও বোঝা যায়। সব ঘর থেকেই বেরোতে বা ঢুকতে হলে—অন্তত এই দোতালায়—দুহাত চওড়া বারান্দাটুকু ভরসা। সকলেই সামনে দিয়ে যাতায়াত করছে ওপরে একটা বাথরুম আছে—যাওয়া-আসা এ-সময় সেজন্যে আরও বেশি, তাদের কথা-বার্তা কানে যাচ্ছেই, তাতেই অনেকটা দেখা বা বোঝা হয়ে যায়।

ক্রমশ, আর একটু রাত হতে একে একে সবাই ফিরলেন। মাস্টারমশাইয়ের দল, আর যাঁরা দোকানে কাজ করেন—তাঁরা ফিরবেন রাত সাড়ে ন'টা-দশটায়। মাস্টারমশাইরা স্কুলের ছুটির পর কেউ দু-তিন দফা কোচিং ক্লাস করেন, কেউ দু-তিনটে টিউশানী। আপিসের পর বাবুরাও অনেকে টিউশানী করেন—তাঁদেরও এইটে ফেরার সময়। এই সময়টাস যেন রূপকথার ঘুমন্ত পুরী নতুন করে জাগল। হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব, খেলার ফলাফল আর রাজনৈতিক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রচণ্ড তর্ক—তার সঙ্গে খিস্তিখেউড় ইত্যাদিও।

এই সময় কিছু কিছু স্নানের পালাও দেখা গেল, কেউবা শুধুই গা ধুলেন কেউ অত রাত্রেই কাপড়ে সাবান দিতে বসলেন, সকালে তাঁদের সময় হয় না।

কেরোসিনের ধোঁয়া তো ছিলই, রান্নার তেলের ধোঁয়াটা একটু কমে এসেছিল এতক্ষণে, এখন অন্য ধোঁয়া যোগ হবে বাতাস দ্বিগুণ ভারি হয়ে উঠল। অসংখ্য বিড়ির ধোঁয়া। একজন আসবার সময় দু-আনার একভাগা ইলিশ মাছ এনেছিলেন, তাঁর ঘরে শিশিতে একটু তেল থাকেই—তিনি ঠাকুরকে খোশামোদ করে তা ভাজিয়ে নিচ্ছেন। ফলে সব মিলিয়ে একটা বিশ্রী গন্ধ।

ধোঁয়া আর কোলাহল। এঁদের সহজ (উচ্চরব বলাই উচিত) তর্ক-বিতর্ক আলোচনার মধ্যেই যে দু-চারটি ছাত্র আছে তারা চেঁচিয়ে পড়ছে। এটা অভিভাবক আসার সময়, সুতরাং ঘুম পেলে চলবে না, পড়তেই হবে। অনেক অভিভাবকের মেটা পড়াবারও সময়। চারিদিকের এই হট্টগোল এবং আদিরস ঘেঁষা ইয়ার্কির মধ্যে তাদের মাথায় বা মনে কি ঢুকছে কে জানে। এইসব হালকা আলোচনা ও সাধারণ আচরণের মধ্যেও কিছু কিছু নীচতা ও মন-কষাকষিও প্রকট হয়ে উঠছে। আর প্রথম দিন। কিন্তু এই সামান্য সময়ের মধ্যেই যা বুঝেছে অসুবিধে হল না।

আরও লক্ষ্য করার সুবিধা, কিছু অন্ধকারেই নিগূঢ়ভাবে দুরেছিল, অস্তিত্বই কারও টের পাবার কথা নয়। ও যখন এসেছে এঁরা তখন ছিলেন না, এখনও তার অস্তিত্ব গুজের গোড়ারে বাইরে। অবশ্য টের পেলেও যে কারও কিছু যেত আসত তা নয়। তেমন কোন বিবেচনা বা অন্যের সুবিধা-অসুবিধা ভাবার মতো দুর্বলতা থাকলে বোধহয় মেসে বাস করা যায় না।

অন্ধকারে শুয়েছিল তাই আর ও আসার পরই নিশীথবাবু গুজগুজ করে অনেকক্ষণ ছাত্রর সঙ্গে কি কথা বললেন, পড়াচ্ছেন কিনা তা ঠিক বোঝা গেল না—তারপরই যেন শুনো কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে অদৃশ্য বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে বললেন, এ-গোলমালে মা সরস্বতী নিজে প্রাণও পালাতেন। তাই ই বা কত রাত করার আর, আবার আমাকেই এগিয়ে দিতে যেতে হবে—চল, বরং ছাদে যাই—একটু মেরে দিই—

তারপর বিনয় সুবিধা বা অসুবিধা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করেই, ঘরের অদ্বিতীয় আলোটি নিয়ে চলে গেলেন ছাত্রর সঙ্গে। আপনি তো শুয়েই আছেন, আলো নিয়ে গেলে খুব অসুবিধে হবে না তো? এটুকু শুনলেই যথেষ্ট হত—কিন্তু আপত্তি করার কোন কারণ নেই, কিন্তু, নিশীথবাবুর সেটুকু ধৈর্য বা ভদ্রতা বোধও দেখা গেল না। নিশীথবাবুর ওর অস্তিত্বটাই যেন মনে পড়ল না। তবু এটাও স্পষ্ট যে, সেই অস্তিত্বের জন্য তাঁকে ছাদে যেতে হল।

তবু তখন কিন্তু ভেবেছিল হ্যারিকেনটা নিশীথবাবুর সম্পত্তি, পরে এক চাকর—বনমালী বলে—একদিন সব আলো সাফ করা ও তেল ভরার সময় বলেছিল, প্রতি ঘরে একটা করে আলো এ-মেসের এজমালি ব্যাপার, তার বেশি দরকার হলে বাবুরা মোমবাতি কেনেন।

তবু একটু একটু করে নিশীথবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়। একঘরে বাস যতই হোক, কথা না বলে তিনিও থাকতে পারেন না।

পূর্ববঙ্গে বাড়ি, বাবাও সেখানের এক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, এখনও কোন এক মাইনর স্কুলে পড়ান, বারো টাকা মাইনে। জমিজমাও আছে কিছু—তেমনি পরিবারও বড়। একান্নবর্তী সংসারে উপার্জনক্ষম প্রাণী নিশীথবাবুকে বাদ দিয়েও। তাতেই মনে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

নিশীথবাবু ফিরে এলেন, একটি সন্তানও হয়েছে কিন্তু তাদের যে বিশেষ

যান না সেটা তাঁর কথাবার্তা থেকেই কিছু কিছু বোঝা গেল। বনমালীও বলল অনেক কথা। বনমালী কে জানে কেন, দু'দিনেই বিনুর অনুরক্ত হয়ে উঠল খুব। শুধু সে কেন, ছোকরা ঠাকুরটিও। তার নাম পুরুষোত্তম, এদের সকলেরই কটক জেলায় বাড়ি, পুরুষোত্তম অপেক্ষাকৃত ছেলেমানুষ,. তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স হবে বড়জোর।

ঠাকুর-চাকরদের তার প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণ—এ-মেসের বড় একটা কেউ এদের মানুষ বলে মনে করেন না এরা চোর, এবং বদমাইশ ধরেই নিয়েছেন সকলে. সেইভাবেই কথা বলেন। কেউ কেউ অকারণেই তম্বী করেন মধ্যে মধ্যে, বলেন, এদের টিট রাখতে গেলে এটা দরকার, নইলে মাথায় উঠে বসে।

বিনুই বোধ করি প্রথম ব্যতিক্রম। সে সদয় আচরণ নয়—তার মধ্যেও একটু অমর্যাদার ব্যাপার আছে, আর সে-বিষয়ে এরা সচেতন—সহৃদয় আচরণ করত, সমানে সমানে কথা বলত, ঠাট্টা-তামাশা করত, ওদের সুখ-দুঃখের গল্প শুনত, দেশের কথা. তাঁদের সামাজিক নিয়ম-কানুন, প্রথা ও আচার, সংসারের হাল—প্রশ্ন করে করে জানত। দারিদ্র্য তো অপরিসীম, তবু এদের এখনও কিছু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট আছে, যা ঐ বাবুদের নেই।

বিনু পুরুষোত্তমের গায়ে হাত দিয়ে কথা কইত, হাত ধরে টেনে নিজের কম্বলে বসাত, ঘরে গল্প করতে এনে বনমালীকে ফরমাশ করত যথেষ্ট কুণ্ঠার সঙ্গে—কোথাও থেকে এক পয়সার বেগুনি কিনে আনতে পারো বনমালী? তুমি আমি দু জনেই খাই তাহলে?

তাতেই ঠাকুর চাকররা তিন-চারদিনের মধ্যে ওর আপনজন হয়ে উঠল। পুরুষোত্তমের হাতে ওর ভাত বেড়ে দেওয়ার পালা এলে ভাতের মধ্যে বা চচ্চড়ির সঙ্গে অতিরিক্ত একখানা মাছ-ভাজা গুঁজে দিত। বনমালী দু-তিন বাবুর চা আনলে তা থেকে ঠিক একটু বাঁচিয়ে ওকে দিয়ে যেত।

দুপুরবেলা স্নানাহারের আগে, বাবুদের পালা মিটলে বনমালীর একটু বিশ্রাম করে নেওয়ার অভ্যাস ছিল। কোথাও পা ছড়িয়ে বসে দু-হাতে নিজের পায়েই হাত বুলোতে বুলোতে খানিকটা বকতে পারলে ওর সকাল থেকে চরকির পাক ঘোরার কষ্ট খানিকটা লাঘব হত। সে-সময় বিনু ছাড়া অন্য কোন বোর্ডারই থাকতেন না। সুতরাং আড্ডাটা ওর ঘরেই জমত। বনমালী বক্তা; বিনু শ্রোতা। বিনুই তাকে জনমেজয় ও বৈশম্পায়নের কথাটা শুনিয়েছিল—মহাভারতের কথা সাধারণের মধ্যে কেমন করে প্রচার হল—সেই প্রসঙ্গে। তাতে বনমালীর আরও মজা লাগত এক এক সময় নিজের বক্তব্য বন্ধ রেখে বলত, কেমন আপনার সেই জন্মেজোধ না কি—তার মতো লাগছে?

এ-আড্ডায় বয়স্ক ঠাকুরটি—পুরুষোত্তমের কাকাও এসে বসত মাঝে মাঝে। তবে সে দৈবাৎ। পুরুষোত্তমই আসত বেশি। এদের কাছে প্রতিটি বোর্ডারেরই কিছু না কিছু গিটকেল্ল জমা আছে। ওদের তো বলবারই হচ্ছে—কাউকে দিতে না পারলে এমন মজাদার সঞ্চয় অর্থহীন হয়ে পড়ে। বোর্ডারদের মধ্যে এতদিন এ-রসের রসিক শ্রোতা পায়নি। এখন বিনুকে পেয়ে তাদের যে গল্পের ঝুলি খোলার উৎসাহ বেড়ে যায়। বিনুর তো জানার উৎসাহ আছেই। মানুষের গল্প শোনার কৌতূহল ওর আজীবন।

এদের সঙ্গে মিশে, এদের মুখে বাবুদের গল্প শুনে নতুন একটা জগৎ খুলে গেল ওর চোখের সামনে। এতদিন ওর দৃষ্টি আর অভিজ্ঞতা যেন বাঁধানো আয়নার মতো ঘরের আলমারির মধ্যে বন্ধ ছিল; মার বুক-কেসের বইগুলোর মতোই ধারণা কল্পনা ছিল সংকীর্ণ একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। এতদিনে সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ, আসল মানুষের সঙ্গে দেখা পেল যেন।

এদের কাছে এসব নির্দোষ কৌতুক মাত্র। বিনুর যে বিস্ময় তা তো ওদের নেই-ই—কোন ঈর্ষা বা অপমান বোধের জ্বালাও নেই। এসব বাতিক বা আধা-পাগলামি বলেই ধরে নিয়েছে ওরা। সহজ ও স্বাভাবিক হিসেবেই।

এই সঙ্গে একটা কথা এই প্রথম বুঝল বিনু—এইসব সেবক-শ্রেণীকে যারা মূর্খ বা নির্বোধ কি অন্ধ ভাবে—তারাই মূর্খ ও নির্বোধ।

বোধহয় নিজেদের চেয়েও এরা বেশি চেনে বাবুদের। তাঁদের সব দুর্বলতাই এদের কাছে ধরা পড়ে যায়। এই তথাকথিত 'বাবু' বা মনিবদের মনের অতি সংকীর্ণ গলি পথেও এদের অবাধ গতিবিধি।

এর অনেক বছর পরে—তখন প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পা দিয়েছে বিনু—এক ট্যাকসী ড্রাইভারের মুখে শুনেছিল এই কথাটাই। এই ধরনের কথা। হাসতে হাসতে বলেছিল, 'বাবুরা গাড়িতে বসে যেতে যেতে যে সব কথা বলেন আর যে সব কীর্তি

করেন—শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। আমরাও যে এক একটা রক্ত মাংসের মানুষ, আমাদের চোখ আছে, কান আছে—সেটা ওদের মনেই থাকে না।'

সেদিন সঙ্গে সঙ্গেই ওর এই বনমালী আর পুরুষোত্তমের কথাগুলি মনে পড়ে গিয়েছিল। 'কাছে আছে যারা' তাদের অস্তিত্বের কথা কত সহজে ভুলে যায় মানুষ—আর কী ভুলই করে।

নিশীথবাবুর স্বভাবও—যা বুঝল—অস্থিতের ধরনের। সেই জন্যই স্বতন্ত্র ঘর প্রয়োজন ওর, অথচ সেই কারণেই স্বতন্ত্র ঘরের জন্যে তিন টাকা অতিরিক্ত সীটরেন্ট দেবার সামর্থ্য নেই।

কথাটা শুনতে হেঁয়ালির মতো লাগলেও হেঁয়ালি নয়, অতি পরিষ্কার। নিশীথবাবু ছাত্রদের বেছে বেছে নেন, যাদের পছন্দ হয় তাদের—টাকা নিয়ে পড়ান খুব কম। টাকা দেবার ছাত্র যে জোটে না তা নয়—বড় ইস্কুলে কাজ করেন, ছাত্রের অভাব কি? কিন্তু টাকা নিয়ে পড়াতে গেলে বেশির ভাগই গবেট বা 'আনইন্টারেস্টিং' ছাত্রকে পড়াতে হয়। সে ওঁর ভাল লাগে না। (এই 'আনইন্টারেস্টিং' শব্দটা বনমালীর উচ্চারণ হয় না, অনেক চেষ্টা করে পুরুষোত্তম কথা কিছুটা বলেছিল, তা থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় তবু)।

ওর ছাত্ররা অধিকাংশই ওর কাছে এসে পড়ে যায়। সন্ধ্যার সময় যখন মেস নিরিবিলি থাকে অথবা ছুটির পর বিকেলে—তখন তো একেবারেই জনহীন বলতে গেলে—ঠাকুর চাকররা পালা করে একজন থাকে, বাকীরা বেড়াতে যায়—কিম্বা হঠাৎ কোন দিন আগে ছুটি হলে দুপুরেও নিয়ে আসেন। পড়ানোর জন্যে। এদের কাছ থেকে টাকা নেন না। কেউ কেউ হয়ত দু টাকা চার টাকা কবুল করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও দেয় কিনা সন্দেহ।

টাকা তো নেনই না, বরং ছাত্ররা পড়তে এলে দু পয়সা চার পয়সা খরচ করেন। লজেঞ্জস, বিস্কুট, চানাচুর কিম্বা গরমের দিন হলে গোলাপছড়ি। মানে যা দু-এক পয়সায় হয়। এর বেশী খরচ করা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। স্কুলে সব কেটেকুটে নিয়ে হাতে পান চল্লিশ বিয়াল্লিশের মতো। দেশে কিছু পাঠাতে হয়। স্ত্রী আছে, একটি মেয়েও আছে বোধ হয়। অন্যরা তো আছেনই। সেই জন্যে সকালে একটা টিউশানী করেন এই পাড়াতেই সেখানে কুড়ি টাকার মতো পান। তাতেই কোনমতে চলে যায়।

এতদিন এ ঘরে কোন বোর্ডার বিশেষ আসেনি। কেউ এলেও থাকতে পারেনি বেশি দিন। দুচার দিন পরে অন্য মেস ঠিক করে চলে গেছে। ফালিপানা সরু ঘর, ভেতরের দিকে যে থাকবে তাকে নিশীথবাবুর বিছানার পাশ দিয়ে অতিকষ্টে যাতায়াত করতে হবে, কখনও কখনও যে বিছানা মাড়িয়ে যাবে না এমন কথা বলা যায় না। মুক্তি বলতে ঐ গবাক্ষটুকু—তাও খুললেই নর্দমার পচা গন্ধ। কতদিন এ নর্দমা এইভাবে আছে, না হয় পরিষ্কার, না ঢোকে সূর্যের আলো কি বাতাস।

বনমালীদের সেই আশঙ্কা। এ বাবুও বেশীদিন টিকতে পারবে না। পুরুষোত্তম তো বলেই ফেলল, 'বাবুর যদি বেন্না না করে তো তাদের ঘরে গিয়ে থাকতে পারেন। একতলায় ঘর কিন্তু ঐ পচা গলির ধারে ওপরের ঘরের চেয়ে ঢের ভাল। তবু একটু আলো বাতাস খেলে। সীটরেন্ট লাগবে না। খাওয়ার খরচটুকু দিলেই হবে। ওঁর জন্যে পুরুষোত্তম তার চৌকীটাও ছেড়ে দিতে রাজী আছে।

বিনুও সত্যিই চলে গেল মেস ছেড়ে উনিশ দিনের মাথায়।

সে নিজের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় যায়নি। কারণ যত অসহ্যই হোক—তার উপায় ছিল না কোথাও যাবার। যেখানেই যাবে কিছু টাকা আগাম দিতে হবে, এখানের প্রাপ্য শোধ না করেও যাওয়া যাবে না। সে টাকা পাবে কোথায়? এইতেই ভাবতে ভাবতে পেটের ভাত চাল হতে যাচ্ছিল, আজ হোক কাল হোক ম্যানেজারবাবু বাকী টাকা চাইবেন, তখন কি জবাব দেবে? শেষ অবধি হয়ত পুরুষোত্তমের কাছেই হাত পাততে হবে—তিন চারটে টাকার জন্যে।

সে দুশ্চিন্তা ও সম্ভাব্য লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন নিশীথবাবুই।

নিশীথবাবু প্রথমটায় খুব রুষ্ট ও বিরক্ত হয়েছিলেন বিনুর ওপর। ভাগ্যক্রমে সেই সময়ই, পর পর দু-তিনটে বিভিন্ন কারণে—সেক্রেটারী ও ভাইস প্রেসিডেন্টের মৃত্যু, মুসলমানদের অতি সামান্য একটা উৎসবহেতু—এক পিরীয়ড পরেই ছুটি হয়ে গেল। ছাত্রদের এনে পড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু ঘরে বিনু প্রস্তরীভূতো বক্ষার মতো স্থানু হয়ে বসে, এ পড়ানোয় পরিশ্রমই সার হয়, চিত্তবিশ্রামপ্রাপ্তি ঘটে না।

ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহো, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রম'—উষ্ণ হয়ে থেকে। উত্ত্যক্ত করা ছাড়া ওকে বিতাড়নের কোন পথ দেখতে পাচ্ছেন না। যতদিকে সম্ভব ওর অসুবিধা সৃষ্টি করে বিনুকে বাঁকা বাঁকা কথাতে আঘাত দিতেও কম করেননি, কিন্তু যার কোন উপায় নেই তার সহ্য করা ছাড়া গতি কি।

তারপর—কয়েকদিন পরে বোধ হয় মাথাটা খুলল। হঠাৎ যেন ভোল পাল্টে গেল তাঁর। খুব স্নেহপরায়ণ ও হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠলেন।

এরআগে ওঁকে এবং অন্য যা দু-একজন শিক্ষক থাকেন মেসে তাঁদের কাছে টিউশানের কথা তুলেছিল বিনু। নিশীথবাবু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন, 'গ্রাজুয়েট মাস্টাররা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইউরিনালে ইউরিনালে বিজ্ঞাপন দেয়—ম্যাট্রিক পাস ছেলেকে কে টিউশানী দেবে বলুন।'

আর একজন বলেছিলেন, 'পেলে তো আমিই একটা করি আরও। পরকে দেব কেন বলুন।'

ইউরিনালে বা ইলেকট্রিক পোস্টের গায়ে বিজ্ঞাপন দেখে দু চার জায়গায় বিনুও যে চেষ্টা করেনি তা নয়—কিন্তু সে সব জায়গাতেই বি-এ এম-এ পাস শিক্ষকরা উমেদার, তার কথা কেউ ভেবে দেখতেও রাজী হয়নি।

সেই নিশীথবাবুই সেদিন রাতে খাওয়ার পর বিড়িটি ধরিয়ে ওরই কম্বলে এসে বসে গলায় অমায়িক অন্তরঙ্গতার সুর এনে বললেন, 'আমি একটা কথা ভাবছিলুম মিঃ মুখার্জি। আপনি তো এখনও কিছু পেলেন না। এত সহজে পাবেনও না। ধরা করার লোক না থাকলে আজকাল টিউশানীও পাওয়া যায় না। আপনার যা দেখছি, কেউই তো তেমন নেই। অথচ খরচা তো আছেই, আপনার অবশ্য নেশাটেশা তেমন নাই যা দেখি—তবু, কিছু না হোক মেসের খরচা, জলখাবার-টাবার নিয়ে মাসে পনেরো টাকা তো লাগবেই। তা ধরেন যদি এই খরচাটা আপনার বাঁচিয়ে দেবার একটা ব্যবস্থা করি?'

বিনু তখন যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

'কি রকম?' এই সামান্য প্রশ্নটাই গলায় আটকে যাচ্ছে।

অবশ্য প্রশ্ন করার প্রয়োজনও [illegible] না। নিশীথবাবু নিজেই নিজের [illegible]বের টীকা করলেন।

একটি ছেলে আর একটি মেয়ে—দু ভাই বোনকে পড়াতে হবে, ছেলেটি বছর দশেকের, মেয়েটি সাত। দুজনেই ইস্কুলে যায়, কাজেই খুব বেশী খাটতে হবে না। ওরা থাকার জায়গা দেবেন খেতে দেবেন কিন্তু নগদ টাকা কিছু দিতে পারবেন না। তবে সে যদি আপনি অন্য কোন কাজ কি টিউশানী করে রোজগার করে নেন—ওদের কোন আপত্তি থাকবে না। ভেবে দেখেন—করবেন এ কাজ?'

'সেধো ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়?' কথাটা শোনাই ছিল এতকাল—এতক্ষণ তার পূর্ণ অর্থটা বুঝল বিনু।

তবু, এতক্ষণে কিছুটা সামলে নিয়েছে খুব বেশী ব্যগ্রতা প্রকাশ করল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'জায়গাটা কোথায়? ভদ্রলোক কি করেন?'

'জায়গাটা এই হাতীবাগানের কাছেই, ভালুকবাগান বলে। ভদ্রলোক বেশ ভাল চাকরিই করেন, তবে পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ে—আর সম্প্রতি চার কাঠা জায়গা কিনে বড় বাড়ি ফেঁদে একটু টানাটানিতে পড়েছেন।

ত্রিই মাইনে দিয়ে লোক রাখতে পারছেন
না। বাড়ির উঠোনে—তৈরী হওয়ার আমলে
মালপত্র পাহারা দেবার লোটির জন্যে একটা
টিনের চালাঘর করা হয়েছিল, সেটা পড়েই
আছে, সেইখানেই একটু সাফসুৎরা করে
থাকতে দেবেন—আর ভাত হাঁড়ির ভাত।
-অত গায়ে লাগবে না। এই জন্যই বাড়িতে
রাখতে চান। বোঝেন না। তা সুযোগ তো
আপনারই—গার্জেন টিউটার হয়ে আছেন
বলতে পারবেন। দেখেন, ভেবে দেখেন।'

ভেবে দেখার কিছু নেই। এ প্রস্তাব
তখন ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতোই
শোনাচ্ছে। সেকথা স্বীকারই করল বিনু,
প্রসঙ্গে যে কারণেই চেষ্টা করুক—লোকটি
সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা বোধ না করেও উপায়
নেই, সে বলল, 'ভেবে আর কি দেখব
মাষ্টার মশাই, এটুকু না পেলে তো পথেই
দাঁড়াতে হবে। কোথাও একটা আশ্রয় আর
খাওয়া—এইটুকু পেলেই এখন বেঁচে যাই।'

তাইলে ভালই। কাল সকালেই বলেন
আপনাকে নিয়ে যাই। কথা আমার বলাই
আছে একরকম। তবে একেবারেই মালপত্র
নিয়ে গিয়ে ওঠা ভাল দেখায় না. একবার
আমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসেন আগে,
তারপর ম্যানেজারবাবুকে বলে মালপত্র—
মালই বা কি বিছানাটা তো শুধু—নিয়ে
চলে যাবেন।

আশায় আশঙ্কায় উত্তেজনায় অনেক
রাত পর্যন্ত ঘুম হল না বিনুর। একেবারে
শেষ রাত্রেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, নিশীথবাবু
অতীত সময়টুকু হাতে রাখার জন্য ভোর-
বেলাই উঠে ওকে তাগাদা লাগিয়ে তুললেন,
কোনমতে মুখটা ধুয়ে নিয়েই বেরিয়ে
পড়তে হল।

মির্জাপুর স্ট্রীট থেকে ভালুকবাগান—
মাইল দেড়েকের পথ তো হবেই—তবু
নিশীথবাবু যখন বললেন, 'এইটুকু তো
রাস্তা, চলেন হেঁটেই যাই। তিনটে পয়সা
খামোকা ট্রাম কোম্পানীকে দিয়ে লাভ কি?'
তখন বিনুও আর আপত্তির কারণ খুঁজে
পেল না।

সেখানে পৌঁছে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা
হল না। তিনি অত সকালেই কি কাজে
বেরিয়েছেন। স্ত্রী এসে কথা কইলেন।
বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়স, এককালে বেশ সুশ্রী
চেহারার ছিল তা বোঝা যায়—এখন তার
ভগ্নাবশেষে দাঁড়িয়েছে। শীর্ণ চেহারা ও
অপরিসীম ক্লান্ত—তাঁর দিকে চাইলে এই
কথাটাই প্রথম মনে আসে। কিন্তু কথা-
বার্তায় ও কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্বের ছাপ
সুপরিস্ফুট।

নিশীথবাবু পরিচয় করে দিয়ে বল-
লেন, 'ওমা, এ যে নেহাৎই ছেলেমানুষ।
তা ভালই হল—বাড়ির মধ্যে একটা বেশী
বয়সের ভারিক্কী ধরনের গম্ভীর মেজাজের
মানুষ চলাফেরা করলে অস্বোয়াস্তি
লাগে। তা তুমি—আপনি আর বল-
লুম না—এইটুকু তো ছেলে—পড়াতে
পারবে তো? না না, তোমায় লেখা-
পড়া শেখানোর কথা বলছি না—ছাত্তর-
ছাত্রীকে বাগ মানাতে পারবে তো? একটু
শাসন করা দরকার, তোমাকে দেখে যে ভয়
পাবে ওরা, তা তো মনে হয় না।

মহিলাটিকে দেখে বিনুর খুব ভাল
লেগেছে, একটু ভরসাও বেড়েছে, তবু সে
মাথা হেঁট করেই ছিল, সেইভাবেই হাসি-
হাসি মুখে বলল, শাসন, করা আমার
অব্যেস নেই, ও আমি পারব না—তবে
ভালবাসতে পারব। আরও তো পড়িয়েছি—
ছাত্ররা সাধারণত আমাকে ভালই বাসে।'

'ব্যাস, ব্যাস, তাহলেই হল। কবু, এই
কবু—ইদিকে আয়। শিগগির আর বলছি।
রমা—'

একটি বছর এগারোর ছেলে হাফ প্যান্ট
পরা, উঠোনে লাট্টু খেলছিল, সে ছুটে
এল—কী মা?'

ছেলেটির গায়ের রং শ্যামলা, কিন্তু
টিকলো নাক আর বড় বড় চোখের জন্যে
মুখখানা ভারী মিষ্টি দেখায়।

তার মা বললেন, 'ইনি তোমার নতুন
মাস্টারমশাই। আজ থেকেই পড়াবেন, এখানেই
থাকবেন। এঁর সব কথা শুনবে। ওঁকে প্রণাম
করো।'

ছেলেটি প্রণাম করার চেষ্টা করতেই
বিনু তাকে বুকের কাছে টেনে নিল, আর সে
ছেলেটি—কবুও কি বুঝল কে জানে,
এইটুকু প্রশ্রয়েই একেবারে ওকে জড়িয়ে
ধরল দু হাতে। বলল, কোন ঘরে থাকবেন
মা—মাস্টার মশাই?

মাস্টার মশাই কথাটা বড় লম্বা, তুই
দাদাই বলিস, দাদা বলার লোক তো তোর
নেই—একটা হল তবু। উনিই যে নিচের ঐ
ঘরটাতে থাকবেন। ঐখানেই ওঁর বিছানা করে
রাখব।'

আমি ওঁর কাছে থাকব মা। দুজনে
কুলোবে না? খুব কুলোবে!'

হেসে ফেললেন কবুর মা, বাঃ ইন্দু তো
দেখছি রীতিমতো বশ করার মন্তর জানে।
এর মধ্যেই কি মন্তর পড়লে! তারপর
ছেলেকে বললেন, আচ্ছা সে দেখা যাবে।
এখন ওকে ছাড়—জিনিসপত্র নিয়ে আসুক।
যাও বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি ওখানের পাট
চুকিয়ে চলে এসো। এখানেই খাবে এবেলা।'

।। ৩২ ।।

কবুর মা সুভদ্রা ছেলের ঐ প্রস্তাব
নিয়ে মাথা ঘামান নি। ছেলেমানুষের কথার
কথা—একটা ঝোঁক এসে গেছে মাথায়—
কথাটা বলেছে, এখনই। ভুলে যাবে।

তিনি তাই তাঁর আগের হিসেব মতোই
উঠোনের পাহারাদের জন্যে তৈরী পাঁচ ইঞ্চি
দেওয়াল টিনের চাল ছোট ঘরটিতে একটা
উদ্বৃত্ত তক্তপোষ এনে কাচা চাদর পেতে
ওরই মধ্যে বেশ ভদ্র বিছানা করে রেখে-
ছিলেন। বসবাসযোগ্য করে তোলার অন্য
আয়োজনও ভোলেন নি। দুটো তার বেঁধে
একটা আলনা, একখানা লোহার চেয়ার।
নড়বড়ে একটা আসকাঠের টেবিল, একটা
জলের কুঁজো আর গ্লাস—কিছুরই অভাব
রাখেন নি। যার একটা একপাতা ছোট
ক্যালেন্ডারও। ঘরটাতে সম্প্রতি চুণকাম
হয়েছে। গৌরী নিজে হাতে ফেন্তেনুয়ে
ঘরের মেঝে ধুয়ে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
করে রেখেছেন।

মেসের ঐ নরককুন্ড থেকে এসে বিনুর
ভালই লাগল। মনে হল এই কদিনের পর
এই প্রথম যেন নিঃশ্বাস ফেলল সে। বেশ
অনেকটা খোলা উঠোন—কলকাতার বাড়ির
তুলনায় অনেকখানি—এইটুকু ঘরে বড়
একটা জানলাও আছে, সবচেয়ে বড় কথা
তার মধ্যে দিয়ে আকাশের একটা কোনও দেখা
যায়। এত পরিচ্ছন্ন ছিমছাম তাদের বাড়িও
আজকাল রাখা সম্ভব হয় না সব সময়—
মা অত পেরে ওঠেন না।

সুভদ্রা নিজের হাতেই সব করেছে।
সেটা পরে জেনেছিল বিনু। ওদের একটি
তিন টাকা মাইনের ঠিকে ঝি মাত্র আছে— সে
বাসন মেজে কয়লা ভেঙে দিয়ে যায়—আর
কোন লোক নেই কাজ করার। কবুর বাবা
পিনাকীবাবু এর মধ্যে চাকরির ফাঁকে কী
একটা ব্যবসা ফেঁদে ছিলেন, তাতে কিছু
টাকা লোকসান গেছে—তার ওপর এই বাড়ি
ফেঁদে, একতলার সংকল্প নিয়ে কাজে হাত
দিয়ে দোতলাই করে ফেলেছেন, ফলে প্রচুর
ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। চাকর কি রাত-
দিনের ঝি রাখা সম্ভব নয়।

সুভদ্রার এত শীর্ণতা ও ক্লান্তির
কারণও এই

এই বয়সেই ছটি সন্তানের মা—তার
একটি গেছে—কিন্তু পাঁচটির ধকলই
যথেষ্ট। শেষেরটি প্রায় সদ্যোজাত। তার ওপর
এই খাটুনি—শরীর সারবার অবসর কোথায়।
স্বামীর উচ্চাশার দায় উনিই সম্পূর্ণ বহন
করছেন প্রায়। দোতলা বাড়ির ঝাড়ামোছা
পর্যন্ত করতে হয় ওঁকেই, সম্প্রতি রমা
একটু বড় হয়ে তবু অনেকটা হাতে হাতে
সেরে নেয়।

বিনুর সে কম্বলের বিছানা আর
খোলবার দরকার হল না। সে বাঁচে তাতে,
চাদরটা একদিন বনমালী জোর করে কেচে
দিয়েছিল—ক্ষারে ফুটিয়ে, তাতে ময়লা
গেলেও নীলের অভাবে লালচে ধরে গেছে,
তারপর কদিন শোওয়ার ফলে আরও ময়লা
দেখাচ্ছে। এই নতুন আশ্রয়ের ব্যবস্থাটা
এত অতর্কিতে হয়ে গেল—চাদরটা আর
একবার কেচে নেবার সময় হল না।

স্নান সেরেই এসেছিল। ম্যানেজারবাবু
বিশেষ পুরুষোত্তম ওকে এবেলা খেয়ে
আসতে বলেছিল, গৌরীর কথা ভেবে সে
রাজী হতে পারেনি, তিনি বিশেষ করে বলে-
দিয়েছেন যখন এখানে খাবার কথা—তখন সে
কথা রাখাই উচিত।

এখানে এসে বুঝল ভালই করেছে সে।

ওর আসতে আসতে বেলা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। এ'দের রান্না প্রস্তুত—ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে সকলে। পিনাকীবাবু আপিস গেছেন, রমা ইস্কুলে। কবুরও যাবার কথা, সে কিছুতে আজ যেতে রাজী হয় নি, দাদার সঙ্গে খাবে বলে জেদ ধরে থেকে গেছে। ইস্কুল কলেজের সময় ধরেই রান্না হয়—এরা বাদ দিয়ে যে দুটি শিশু খাবার মতো, তাদের জন্যে আর পৃথক ব্যবস্থা হয় না, তাদের ঐ সঙ্গেই খাইয়ে দেওয়া হয়। বাকী মা আর ছেলে—এবং বিনু।

আহারের আয়োজন সামান্য। ডাল, আলুভাতে একটা চচ্চড়ি এবং একটুকরো মাছ—তবু তাই খেতে খেতে যেন বিনুর চোখে জল এসে গেল। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে মার হাতের রান্নার স্বাদ পেল সে।

খেয়ে এসে আরাম করে নিজের কোটরে শুয়ে পড়েছে, আরামে চোখ বুজে এসেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—শ্রীমান কবু তার মাথার বালিশ নিয়ে এসে হাজির।

আমি আপনার কাছে যে শোব দাদা!'

এসো এসো, অগত্যাই বলতে হয় বিনুকে, একটু সরে জায়গা ছেড়েও দিতে হয়, কিন্তু আমার কাছে শুতে হলে আপনি বলা তো চলবে না, তুমি বলতে হবে। এই নিয়ম।'

দেখা গেল কবু আর যাই হোক বোকা নয়। সে বালিশ পেতে ঝুপ করে ওর পাশে শুয়ে পড়ে বলল, কে করেছে এ নিয়ম?'

বিনু বললে, 'আমি।'

ভাল করেছ। ওর হাতের খাঁজে মুখটা দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, কবু, আপনি বলতে আমারও ভাল লাগছিল না।'

শুভদ্রা প্রথমটা বুঝতে পারেন নি, রান্নাঘর ধুয়ে তালা দিয়ে ওপরে উঠে কবুর বিছানা শূন্য আর বালিশ অনুপস্থিত দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন।

তাড়াতাড়ি ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, ওমা, একী কাণ্ড! তুই সত্যি সত্যিই এখানে শুতে এলি! এইটুকু বিছানা, দুজনে শুলে দাদার যে কষ্ট হবে রে!

বিনু একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, সে অবসর না দিয়েই নিশ্চিন্ত-ভাবে কবু বলল, হোক গে। একটু কষ্ট হলে আর কি হয়েছে। তুমি যাও, আমি বেশ থাকবখন।'

দ্যাখো, ছেলের পাগলামি। আচ্ছা, এখন ত একটু ঘুমোতে দে ওকে, তারপর না হয় রাত্রে শুবি এখন।'

না, না, আমি বেশ আছি। দাদা ঘুমোক না, আমিও তো ঘুমোব।' কবু বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

তাহলে ইন্দু তুমিও চলো। ওর খাট বিছানাতো পড়েই আছে। মানে আমাদেরই বড় খাটটায় ও এখন শোয়। আমি খাটে শুতে পারি না। ছোট দুটো আর মেয়েটাকে নিয়ে শুই। উনি একটা ছোট খাটে মেজো ছেলেকে নিয়ে থাকেন। একা শোয় বলে দিনকতক মেজো কানুকেও দিয়েছিলুম, তা তিনি আবার বাপ-অন্ত প্রাণ, বাপের পাশে না হলে শোওয়া হয় না।....নাও, ওঠো, সব গুটিয়ে নিয়ে চলো। মিছিমিছি আর এখানে থেকে লাভ নেই। টিনটাও তাতে খুব অবিশ্যি, আর আমার ছেলের যা ঘাম, তোমাকে এমন-ভাবে জড়িয়ে ধরে থাকলে একটু পরে তোমারই মনে হবে, নেয়ে উঠলে।

অর্থাৎ, এককথায়—সেদিন এ বাড়ি ঢোকার দেড় ঘন্টার মধ্যে বিনুর ডবল প্রমোশন লাভ হল। বাইরে দারোয়ানের ঘর থেকে খোদ কর্তার খাটে চলে গেল।

পিনাকীবাবুর সঙ্গেও আলাপ হল। ত'ার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে (ও'রা কায়স্থ, বিনু ব্রাহ্মণ) মুখটা একটু প্রসন্ন হল—তবে মোটামুটি দু-একদিন যেতে না যেতে বুঝল বিনু—তিনি এ বন্দোবস্তে খুশী নন। একটা পর লোক বাড়ির মধ্যে ঢুকল, তাছাড়া—তার দুবেলা খাওয়া জল-খাবার—কি কম খরচার ব্যাপার! দশ টাকা মাইনে দিয়ে মাস্টার রাখলে দুজনকেই স্বচ্ছন্দে পড়াতে পারত। এদের আর কি এমন পড়া, ম্যাট্রিক পাস ছেলে যা পড়াতে পারছে, একজন ইস্কুল মাস্টার সে যদি নিচের ক্লাসের শিক্ষকও হয়—তা পড়াতে পারত না? ঢের ভাল পড়াত। ওদের মার মাথায় এক ভূত চাপল। এখনই তো মাস্টারের মাথায় চড়ে বসে আছে আদুরে ছেলে—তাকে বাগে আনতে পারবে এ মাস্টার?

পিনাকীবাবুর এ নীরব স্বগতোক্তি বুঝতে কোন অসুবিধে হল না বিনুর। হবার কোন কারণও নেই। ত'ার বক্তব্যে সামান্যই ছদ্ম আবরণ দিয়েছেন, স্ত্রীর সম্মানরক্ষার্থে যেটুকু দেওয়া দরকার বরং বিনুর মনে হল ত'ার বক্তব্য ও বুঝুক সেটাই তিনি চান।

এ ক্ষেত্রে তার উচিত হচ্ছে মানে মানে এখনই সরে পড়া।

অথচ সেইটেরই কোন উপায় নেই। আর, উপায় নেই বলেই সে বোকা সেজে রইল, স্পষ্ট ইঙ্গিতগুলোও বুঝতে চাইল না, নেলসনের কানা চোখে দূরবীণ লাগানোর মতো।

তবে, সে যে পিনাকীবাবুর মনোভাব বুঝেছে, সেটা সুভদ্রারও বুঝতে কোন অসুবিধে হল না।

তিনি জোরগলায় বললেন, কখনও না। আমার ছেলেকে আমি চিনি। ঐ এক ঘন্টা লক্ষ্মীপুজোর ফুল ফেলার মতো পড়িয়ে চলে গেলে ওদের কিছু হবে না। যে মাষ্টারকে ওর ভাল লাগবে না, তাঁর কাছে ও পড়বেই না। তোমাকে ভাল চোখে দেখেছে। তোমার কথা শুনবে, পড়বেও মন দিয়ে।ও'র কথায় তুমি কান দিও না, মন খারাপও করো না। মানুষটা খারাপ নন, তোমার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করবেন না। আসলে মানুষটা একটু দৃষ্টি কৃপণ স্বভাবের বুঝলে না! আপিসেও হিসেবের কাজ করেন। টাকা আনা পাইয়ের হিসেবের মধ্যে দিয়েই দুনিয়াটা দেখেন। ইংরিজীতে কি কথা আছে বুঝি, তুমি যদি পেনির যত্ন নিতে পারো, পেনি তোমার পাউণ্ডের ব্যবস্থা করবে। উনি সে কথাটা প্রায়ই বলেন, নিজেও তাই টাকা ফেলে কেবলই পাই সামলাতে ব্যস্ত থাকেন।

তারপর একটু থেমে বলেন, ঐ জন্যেই তো ব্যবসা চালাতে পারলেন না। গোড়া থেকেই অত হিসেব করে চললে ব্যবসা চালানো যায় না। প্রথম দিকে টাকার চার ছাড়লে তবে লাভের মাছ ওঠে। আমি ব্যবসাদারের মেয়ে, ব্যবসাদারের ভাগী—ওটা আমি বুঝি। যে কারবার উনি জমাতে পারলেন না সে কারবারে কত লোক লাখ-পতি হয়ে যাচ্ছে।'

আবার এক সময় বলেন, 'আসল কথাটা কি জানো, ও'র হিসেবটা শুধুই টাকা আনার পথ ধরে চলে, তার মধ্যে আমার কোন ঠাঁই নেই। উনি আপিস যান, ছেলে-মেয়ে—যে দুটো ওরই মধ্যে একটু মাথা ধরা হয়ে উঠেছে, তারা ইস্কুল চলে যায়—বাকী তিনটে তো গুয়ের গোবলা বলতে গেলে—আমি একা সারাদিন কি ভরসায় থাকি বলো তো! বড় ভয় করে। যদি একটা জা-ননদও থাকত, ঝগড়া হোক, ঝাঁটি হোক—তবু একটা মানুষ। আর সত্যি কথা বলতে কি ঝগড়াঝাঁটি একটু মধ্যে মধ্যে হওয়া ভাল। মনের গ্যাসটা বেরিয়ে যায় তবু। ধরো যদি আমি পিছলে পড়ে যাই, ওরা বাড়ি ফিরলে দোর পর্যন্ত খুলে দিতে পারব না। কেউ টেরই পাবে না আমার অমন অবস্থা হয়েছে। কি—ঈশ্বর না করুন - এদের কারও হঠাৎ অসুখ করল—ক[illegible] বসিয়ে ডাক্তার ডাকতে কি পাড়াঘরে [illegible] খবর দিতে যাবো বলো দিকি!...অ[illegible] তাই চেয়েছিলুম, একটা ভদ্দরলোকের ছেলে বাড়িতে থাক, উপকারই দেবে! ভাত হাঁড়ির ভাত খাবে—বাড়তি খরচা এমন কিছু লাগবে না।

পিনাকীবাবুকে বাদ দিলে বিনুর মন্দ কাটছিল না।

কবু তো এমন ন্যাওটো হয়ে উঠল—দাদাকে ছেড়ে সে কোথাও—এমন কি বিকেলে খেলতে যেতেও চায় না আজকাল। বিনু যদি বেড়াতে বেরোয় একটু, তাহলেই সে বেরোয়, সঙ্গে যায়।

সবচেয়ে চরম হল একদিন—পারিবারিক নিমন্ত্রণ, সবাই যাবে বলে তৈরী—কবু বেঁকে বসল, সে যাবে না, দাদার কাছে থাকবে।

ওর মা সুদ্ধু অবাক, 'কী খাবি? দাদার মতো তো শুধু খাবার করে রেখেছি।'

'ঐ যা আছে দুজনে ভাগ করে খাবো। একদিন একটু কম খেলে দাদা মরে যাবে না।'

নিশ্চিন্তভাবে উত্তর দেয় সে।

রাত্রে শোয় প্রত্যহ বিনুকে জড়িয়ে ধরে।

(চলবে)

বই

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে একদা লিখেছিলেন : শিল্প সৌন্দর্য যেখানে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে, সেখানে সকল কালের সকল দেশের মন মিলিত হচ্ছে। গ্রীসে রোমে চীনে ভারতে দক্ষিণ আমেরিকায় জাভায় জাপানে আদিম যুগের গুহা প্রাচীরে যে সব শিল্প সম্পদ দেখা দিয়েছে, তাদের দেশকাল ও জাতির পার্থক্য প্রভৃত, তাদের বাহ্যরূপও যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য, তবুও মানুষের আনন্দের সম্মতি এখানে বাধা পাচ্ছে না।...

কবির এই বক্তব্যে তাঁর শিল্পীসত্তা অনিবার্যভাবে প্রকাশিত। বিশ্ব কবির শিল্প চিন্তা মননশীল জগতে এক অভিনব প্রকাশ। অতএব কবির কাব্য কবিতা যেমন বিশ্বমানবের খ্যাতি কুড়িয়েছে, তেমনি তাঁর শিল্পকলা বা চিত্রকলাও কম প্রশংসা প্রাপ্ত করে নি। ১৯৩০ সালের শুরুতে কবি গেলেন দক্ষিণ ফ্রান্সে বেড়াতে। সেখানকার খ্যাতিমান একদল শিল্পী কবির আঁকা ছবি দেখে বিস্মিত, হতবাক। তাঁরা কবিকে অনুরোধ করে তাঁর চিত্রকলা নিয়ে প্যারিসের গ্যালারী পিগালে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। কবি সেখানে মহান শিল্পী হিসেবেও সমাদৃত হলেন। এই বছরই পর পর তাঁর চিত্রমালা নিয়ে লণ্ডন বার্মিংহাম, বার্লিন, মিউনিখ, ডেনমার্ক, জেনেভা, নিউইয়র্ক এবং মস্কোয় একের পর চিত্রপ্রদর্শনী হয়। উল্লেখ্য তার আগে পর্যন্ত এদেশে কবির চিত্রকলা নিয়ে কোন প্রকাশ্য প্রদর্শনী হয় নি।

রাশিয়ার চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এখানকার বিদ্যালয়ের মস্ত একটা গুণ এরা যা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি আঁকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে ছবির হাত পেকে যায়, আর পড়ার সঙ্গে রূপ সৃষ্টি করার আনন্দ মিলিত হয়।

মস্কোয় নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনী প্রসঙ্গে কবি পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, মস্কো শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ ছবিগুলো সৃষ্টি ছাড়া সে কথা বলা বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে তা কোন দেশীই নয়। কিন্তু লোকের ঠেলাঠেলি ভীড়। অল্প কয়দিনে পাঁচ হাজার লোক ছবি দেখেছে।...

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রদর্শনী 'বাস্তব সমাজবাদী দেশের মত আমেরিকায়ও কম সমাদর পায় নি। এক আমেরিকায় তাঁর জীবদ্দশায় চার বার চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন হয়। নিউইয়র্কের ব্রুকলিন ডেইলি ইগল কবির চিত্রপ্রদর্শনীর বিবরণী দিয়ে ২৭-১১-৩০ তারিখে লেখেন : কবি দার্শনিক শিক্ষাবিদ ও ধর্মবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলো সম্পূর্ণ নতুন দিক খুলে দিয়েছে। তাঁর কল্পনায় ও নতুন দৃষ্টিতে তিনি তাঁর স্বদেশীয় দৃশ্যাবলী অনুপমভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবির পাঁচটি ছবি বার্লিন ন্যাশনাল গ্যালারী কিনেছেন। ...

রবীন্দ্র চিত্রকলা দেশে দেশান্তরে কীভাবে কতখানি সমাদর পেয়েছে, বিদেশের কোথায় কোন শহরে কতবার তাঁর প্রদর্শনী হয়েছে, বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে বিশিষ্ট সাংবাদিক ডঃ মালাকার তা এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। ইউরোপে সাংবাদিক জীবন-যাপনের সুযোগে তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্য এ গ্রন্থে দিতে পেরেছেন।

রবীন্দ্র অনুরাগী, বিশেষ করে চিত্রশিল্পীদের কাছে, এ বইখানি বিশেষ সমাদর পাবে বলে আশা রাখি। আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথের নানা প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে ডঃ মালাকার যে আনুপার্বিক বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বিশ্বের বিভিন্ন শহরের মানুষের শিল্প বোধ ও আর্ট গ্যালারী সম্পর্কে বহু তথ্যও এদেশের শিল্পীদেরও নানাভাবে সাহায্য করবে।

রমেন দাশ

আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ : দিলীপ মালাকার, অনন্য প্রকাশন।। ৬৬, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩। দাম নয় টাকা।

অবিশ্বাস্য কলাম

সুশীল মুখোপাধ্যায়ের 'ইনি কিছু বলবেন' একটি অতি সুন্দর রস রচনার গ্রন্থ। এই ধরনের গ্রন্থ আজকাল আর বেরোয় না। বেরোয় না তার কারণ দুটি। এক, কেউ লিখতে পারেন না। দুই, লিখলেও প্রকাশক এমন বই প্রকাশের ঝুঁকি নেন না। যুগটা এখন উপন্যাসের—যার অপর নাম টানা লেখা। ভাল হোক মন্দ হোক ছোট হোক বড় হোক—যা হোক কিছু টানা লিখে যেতে পারলে বই বাজারে একটা হিল্লে হয়ে যায়। প্রকাশক গড়িমসি করেও পাণ্ডুলিপি রেখে যেতে বলতে পারেন।

কিন্তু এ কি? এ কেমন রচনা? এ তো গল্পও না—আবার রম্যরচনা বললেও মন ওঠে না—স্কেচ জাতীয় কিছু বললে আবার হয়তো ছোট করা হয়ে যায়। আবার কৌতুকময় রচনা বললেও আধুনিক পাঠকের মন উঠবে না। সন্দেহের চোখে তাকাবেন। তাই নাম দিলাম রস রচনা। অর্থাৎ যে খণ্ড রচনার মধ্যে অখণ্ড রসের একটি প্রবাহ সহজেই চোখে পড়ে এবং মনে ধরে কাজের সুবিধার জন্য তাকে রস-রচনা বললে আপত্তির কোন কারণ দেখি না।

ইনি কিছু বলবেন মূলতঃ হাসির রচনা। এই হাসি কোথাও নির্দোষ হাসি—কোথাও বা আহত সমাজ সচেতনতার হাসি—কোথাও বা সূক্ষ্ম বুদ্ধিগ্রাহ্য হাসি—কোথাও হাসির মধ্যদিয়ে আঘাতের প্রবণতা খুব স্পষ্ট। আবার হাসতে হাসতে ঐতিহ্য প্রীতির মমতায় চোখের জলের ধারা বয়ে গেছে অন্তত দুটি রচনায়।

প্রথম রচনাটিতে একটু মোটা দাগের রসিকতা থাকলেও—কলকাতায় সভাপতির বাজারে কিছু কিছু লোকের যে কেন দারুণ চাহিদা—তা দেখাতে গিয়ে সুশীলবাবু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে বেহেল্লাপনা ও ঐসব অনুষ্ঠানের সভাপতিদের মুখোস খুলে দিয়েছেন। সুশীলবাবুর ভাষায় যিনি সকাল নটায় কালিঘাটে নিখিল বঙ্গ গেঞ্জী ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি তিনিই অপরাহ্ণ তিনটায় কোন্নগর তরুণ সমিতির নিস্তারিণী চ্যালেঞ্জ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধক। সন্ধ্যায় সেই তিনি বরাকপুর হরিভক্তি বিতরণী সঙ্ঘের তিনদিনব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তনের শুভারম্ভ ঘটিয়ে সাড়ে ছটায় বাগবাজারে এসে রবীন্দ্র উৎসবে উপস্থিত হতে পারবেন না বলেই অক্ষমতা জানিয়েছেন। অন্য কোন কারণে নয়। ছেলেরা নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত ওঁকে আসতে হল। তবে সাড়ে ছটায় নয়। রাত্রি আটটায়। তারপর যে বক্তৃতা তা অনবদ্য। ভাবে ভাষায় অতি মনোহারী ছবি এঁকেছেন লেখক।

ফাঁকি রচনাটিতে একটি উচ্চস্তরের সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল। লেখক একেবারে ল্যাম্বীয় কায়দায় শুরু করেছিলেন। ফাঁকি ব্যাপারটা আমাদের একেবারে নিজস্ব ব্যাপার। এমনই নিজস্ব যে ইংরেজীতে বা অন্য কোন কাছে পিঠের ভাষায় সন্তবতঃ শব্দটার যথার্থ প্রতিশব্দ নেই। কারণ, ফাঁকি ব্যাপারটাই তাদের জীবনে নেই। যেমন

আমাদের আছে। ফাঁকি সর্বত্র। কলেজের ক্লাশে, অফিসে, আদালতে, সাহিত্যে। ফাঁকি নেই আমাদের জীবনে এমন কোনো জায়গা নেই। অথচ ফাঁকির মজাটা লেখক নিখুঁতভাবে ধরেছেন। ফাঁকিতে আমরা লজ্জিত নই। নিজে ফাঁকি পড়লে আমরা মর্মাহত—অথচ সেই ফাঁকিটাই নিজে দিতে পারলে মনে মনে খুব খুশী।

জনপ্রিয় কঙ্কাল রচনাটিতে আধুনিক ভোটে-জেতা রাজনৈতিক নেতার একটি সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। এই রাজনৈতিক নেতার চেহারা কথাবার্তা বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে বর্তমান সমাজের অনেক নেতার আশ্চর্য মিল। লেখক বলেছেন, ওকে কে না জানে বলুন? বাংলাদেশে ওঁকে চেনে না বা চোখে না দেখলেও ছবিতে ওঁকে দেখে নি বা ওর নাম শোনে নি এমন কেউ আছে কি? কাজেই লেখক আর নাম ফাঁস করে ফাসাদে পড়তে চান নি। লেখক কার সঙ্গে কঙ্কালের মিল দেখেছেন জানি না. আমরা কিন্তু অনেকেরই চলন্ত চিত্র চোখের সামনে দেখতে পেলাম।

কিন্তু শুধুই ব্যঙ্গ কৌতুক ও বিদ্রূপ বাণ নয়। মানব প্রীতির মন্ত্রও আছে সুশীলবাবুর লেখায় ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে যে কোথাও দাঁড়ানো যায় না সুশীলবাবুর তা ভালই জানা আছে। তাই পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বড়লোক ও বড়লোকীর কথা তাঁর মনে আসে নি। মদের আসর ঝাড় লন্ঠনের নীচে ঢপ কীর্তন বা কবির লড়াইয়ের কথা নয় বা লক্ষ টাকায় বেড়ালের বিয়ে বা নোটের টাকায় থুতু লাগিয়ে ঘুড়ি ওড়ানোর দিনগুলির কথা ভেবে লেখক বেসামাল হন নি। তিনি খুঁজেছেন. সকালে নতুন বৌ এলে বিকেলে পাড়ার গিন্নীরা যারা ভেঙ্গে পড়তো নতুন বৌ দেখতে তারা কোথায়? অথবা নতুন বৌ-এর সঙ্গে শ্বশুর বাড়িতে এসেছে ক্ষ্যান্ত-র মা নামে যে ঝিটি সে কোথায় গেল? স্মৃতি থেকে এরা উঠে এসেছে যেন জীবন্ত চিত্র দেখতে পাচ্ছি। খুঁজেছেন থিয়েটারের ঝিকে—যার ওপর বাড়ির মেয়েদের ভার দিয়ে কর্তা নীচে গ্যালারী পিট বা ড্রেস সার্কেলে এসে বসতেন। ওপর তলার মেয়েদের সব ভার থাকতো এই ঝিদের ওপর।

বাবু বলতেন—অ ঝি. মেয়েদের একটু ডেকে দেবে?

অমনি মেয়ে হাঁকতো—অ' বাগবাজারের বোসেদের বাড়ীর বড় গিন্নি! নেবে এসো গো, বাবু খাবার নে' দাঁড়িয়ে আছে।

খুঁজেছেন ঠানদিকে। যাঁকে পুরনো উপন্যাস ও নাটকের পাতায় ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। বর্ষীয়সী অনাত্মীয়া অথচ খুব আপন। পরিবারের কেউ না হয়েও পরিবারের সকল সুখ দুঃখ ও আনন্দবেদনার সঙ্গে জড়িত আপনজন।

'ন পুনরাগমনায়' রচনাটিতেও এই বেদনাই প্রধান। যারা গেছে তারা আর ফিরে আসবে না। অথচ কী সত্যই না তারা ছিল!

কালো ডাক্তার পাশকরা ডাক্তার নয়। কিন্তু তার আরক আর পুরিয়া ধন্বন্তরির মত কাজ করতো। টুইলের সার্টের ওপর একখন্ড পাতলা উড়ুনি। পায়ে চটি। ক্ষৌরকার্য হপ্তায় একদিনই যথেষ্ট। সময় কোথায়? ডাকলেই যে যেতে হবে।

কালো ডাক্তার গেছে। গেছে একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা এবং গিন্নীও। আর গেছে সেই মেয়েটি যে পাছাপাড় শাড়ি-পরা। চুপড়ি হাতে। নিয়মিত অন্দরমহলে যাতায়াত করে। গিন্নীর পায়ে আলতা পরিয়ে পায়ের ধুলো নিতে নিতেই হাঁক দিয়েছে—কৈ গো, সব বৌ-ঝিরা তাড়াতাড়ি এসো বাপু। আজ আবার আমার দুটো বিয়ে বাড়ি কামানো আছে।

এ হল বাঙালী বাড়ির একদা অপরিহার্য নাপিত বৌ বা নাপিতনী। সে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

অমল মুখোপাধ্যায়

ইনি কিন্তু বলবেন ঃ সুশীল মুখোপাধ্যায়। রেয়ার বুকস। ৪৩বি নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট। দাম ঃ পনের টাকা।

হিমালয়ের পথেপ্রান্তে

শুরুতে লেখক বলেছেন, 'এই গ্রন্থ রচনার মৌল উদ্দেশ্য অজানা পথিকের কাছে অদেখা পাঠকের কাছে আমার অভিজ্ঞতা এবং অনুভবকে তুলে ধরা যাতে পথ চলতে গিয়ে তারা আমার বা আমাদের মতো অসুবিধেয় না পড়েন. যাতে তাঁদের যাত্রাপথ সহজ হয়. সুগম হয় সুন্দর হয় তার জন্য সাহায্য করা।'

সুতরাং এই স্বীকারোক্তি থেকে একটা জিনিষ পরিষ্কার যে নিছক ভ্রমণকাহিনীর সূত্র ধরে এই গ্রন্থের উদ্ভব হয়নি। এই গ্রন্থের পিছনে নিরলস কাজ করেছে লেখকের ধীশক্তি ও পুরাতনের প্রতি বিচারকসুলভ সশ্রদ্ধ মনোভাব।

সরোজবাবুর গদ্যরীতির সঙ্গে আমরা আগেও যথেষ্ট পরিচিত ছিলাম। কেননা এই লেখকের প্রতিটি গ্রন্থই নিজস্ব মহিমা নিয়ে স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত।

যে আলোকে তিনি এই গ্রন্থকে আলোকিত করেছেন, তা স্বাতন্ত্র্যে নিবিড়। এবং নিবিড় স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে বলেই সরোজবাবুর রচনা পাঠককে আকর্ষণ করে। ওঁর বিশ্লেষণমূলক অনুসন্ধিৎসু নিষ্ঠা পাঠকের মনে উদ্রেক করে গভীর শ্রদ্ধা। এই গ্রন্থের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

উদ্দেশ্যের পথে চলতে গিয়ে লেখক যেসব অনির্ভরতা ও অব্যবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন—এই গ্রন্থ রচনার সময় আগামী দিনের পথিকের কথা ভেবে সেদিকে তিনি সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন।

মহাবিস্ময় হিমালয়ের পথে ও বিভিন্ন প্রান্তদেশে যে বিচিত্র বিস্ময়লীলা মানুষের জন্য যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করে রয়েছে—সরোজবাবুর লেখক মানসিকতা সেই লীলাকে সনাক্ত করেছে।

বহু তীর্থের জননী গঙ্গানদীর যৌবনে ধন্য হয়েছে সমভূমি। কিন্তু হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্ত ভিজে রয়েছে এই নদীর শৈশব ও কৈশোর রসে। এইভাবে গঙ্গা-বর্ণনা থেকে কেদার হরিদ্বার বর্ণনা—সব মিলিয়ে এক বর্ণাঢ্য ভ্রমণসাহিত্য রচনা করেছেন সরোজবাবু।

সংস্কার যেমন সত্যি. অভিজ্ঞতা তেমনি আরো বেশী সত্যি। ঠিক একইভাবে বলা যায়, বিশ্বাস যেমন সত্যি. বিচারবোধও তেমনি সত্যি। তবে ওরা সকলেই প্রায় পরস্পরবিরোধী। সংস্কার ও বিশ্বাসের ঘরানার সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও বিচারবোধের ঘরানার বন্ধুত্ব বিশেষ নেই। বরং কঠিন দ্বন্দ্ব আছে। সরোজবাবু এই দ্বন্দ্বের পর্দা সরিয়ে নিরবধি সত্যকে দেখতে চেয়েছেন।

অভীক রায়

হিমালয়ের পথেপ্রান্তে সরোজমোহন মিত্র। প্রকাশক ঃ বীথিকা মিত্র, ২৩৮, মানিকতলা মেইন রোড। কলিকাতা ৫৪। দাম ঃ আট টাকা।

ছড়ার বই

ছোটদের মনের মত করে ছড়া লেখা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বিষয়বস্তু, মিল, পরিপাটি ভাষা. এবং ছন্দের দোলা এসব গুণতো থাকা চাই-ই, তার সঙ্গে থাকা চাই ছোটদের রাজ্যে পৌঁছবার মত মন। সেই মন বা মানসিকতা যার নেই. ছন্দ-মিলের দোলায় মেলানোর চেষ্টা করেও সে সার্থক ছড়াকার হতে পারে কিনা সন্দেহ আছে।

প্রবীণ সাংবাদিক বিশ্বজিৎ রায় একটি বড় ইংরাজি দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত। দেশ-বিদেশ ঘোরা এই সাংবাদিক মানুষটির মনের গোপনে যে ছোটদের জন্য এমন দরদ আর অনুভূতি লুকিয়ে ছিল, এতদিন অনেকের কাছেই তা অজানা ছিল। টুকুলবাবুর জন্তুর বই তাঁর সেই অজানা পরিচয় প্রকাশ করল।

মোট ১৪টি ছড়া নিয়ে টুকুলবাবুর জন্তুর বই। বাঁদর থেকে শুরু করে জেবরা-ঘোড়া, সিংহ-বাঘ গন্ডার-হিপো. উট-হাতি-ভালুক ইত্যাদি কিছুই বাদ যায়নি। ছড়ার সঙ্গে শ্রীমতী জয়শ্রী রায়ের আঁকা ছবিগুলিও সুন্দর। রেখার লেখায় লোভনীয় এই বইখানি ছোটদের মন ভরাবে। শিল্পী বাদল দাসের প্রচ্ছদ অলঙ্করণও প্রশংসার দাবী রাখে।

রমেন দাস

টুকুলবাবুর জন্তুর বই—বিশ্বজিৎ রায় অনির্বাণ প্রকাশনী ৩এ গঙ্গাধরবাবু লেন, কলিকাতা-১২। দাম দু' টাকা

এক বৃন্তে দুটি ফুল

অজয় বসু

সেই শনিবারের বিকেল। লীগের বড় খেলা শেষ। হারজিৎ হ'ল না। বুঝি তাতেই মুখরক্ষা পেল দু তরফেরই।

মাঠ থেকে ফিরছি। পথের মাঝেই ছবিটি চোখের সামনে ভেসে উঠল। এক মিছিলের সামিল হয়ে এক ঝাঁক ছেলে রাজপথ দিয়ে হাঁটছে। মিছিলের যুগল নেতার হাতে লম্বা একটি দণ্ড। তারই ডগায় একটি নয়, দু-দুটি পতাকা। একটির রং সবুজ-মেরুণ, অন্যটির লাল হলুদ। একটিতে লাঞ্ছিত ভাসমান নৌকা। অন্যটিতে জ্বলন্ত মশাল। খুবই পরিচিত পতাকা। সুবিখ্যাত দুই ক্রীড়াসংস্থা মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রতীক।

দু দলের পারস্পরিক খেলা, সাফল্য, অসাফল্য ঘিরে গোটা বাংলার ছেলেমেয়েরা যখন দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে থাকতে চায়, ভালবাসে ঠাট্টা মসকরার লোভে পরস্পরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে। মেজাজ চড়ে গেলে সময় সময় তারা এমনও কিছু করে বসে যার প্রকৃতি তেমন মোলায়েমও নয়। ঠিক তখনই দু' দলের সমর্থকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটা একই দণ্ডে দুটি পতাকা জড়িয়ে সেটিকে উর্ধাকাশে তুলে ধরা, আড়াআড়ি ভুলে একই ভাবনায় একাত্ম হয়ে যাওয়ার এই দৃষ্টান্ত সত্যিই অভিনব। হঠাৎ দেখে মনে মনে হোঁচট খেয়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই নজিরটির অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে ওই ছেলেদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে চেয়েছি।

তখন বেলা পড়ে আসছে। সন্ধ্যা নামছে। পথে আলো নেই। আশপাশের অনেক কিছুই স্পষ্ট ঠাওরে আসছে না। কিন্তু যুগল পতাকায় শোভিত মূল ছবি-টির ফ্রেমের আড়ালে নব চিন্তার উন্মেষ যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে রেখেছিল, ঘনায়-মান সন্ধ্যার আঁধারকে তা আড়াল করে দিতে পারেনি।

মনে হ'ল, ও দুটি বুঝি নিছক পতাকাই নয়, এক বৃন্তে দুটি ফুল। কুঁড়ি থেকে সদ্য ফোটা। সমাজ, সংসারকে নতুন কিছু উপহার দেওয়ার জন্যে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে আশীর্বাদের মত।

ছবিটি দেখতে দেখতে আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে চিন্তার ক্ষেত্রে হয়ত বরফ গলতে আরম্ভ করেছে। নবীন বাংলা বুঝতে চাইছে যে আর গালাগালি নয়। এখন থেকে শুধু গলাগলি। বিকৃতমানসকে না উসকে এখন শুভবুদ্ধির আরাধনাই শ্রেয়। মোহন-বাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা যে ঘটি-বাঙালের লড়াই এই সত্যোপলব্ধির তীরে আমাদের উত্তরণ ঘটেছে। মিছিলের ছেলেরা যেন বলতে চাইল, আসুন, সবাই মিলে নতুন কালকে আমরা স্বাগত জানাই। বিশ্বাস করি, এ ডাকে সাড়া মিলবেই।

খেলা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে, এই বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের মধ্যে। কীর্তি কৃতিত্বের মূল্যায়ণে যে দুটি দল ভারতজোড়া স্বীকৃতি, খ্যাতির অধিকারী। এই খেলায় অন্য কোনো ভাবনা, আবেগ ও নিরর্থক সেন্টিমেন্ট আরোপ করার আর দরকার যে নেই একই দণ্ডে শোভিত যুগল পতাকাই তার প্রমাণ।
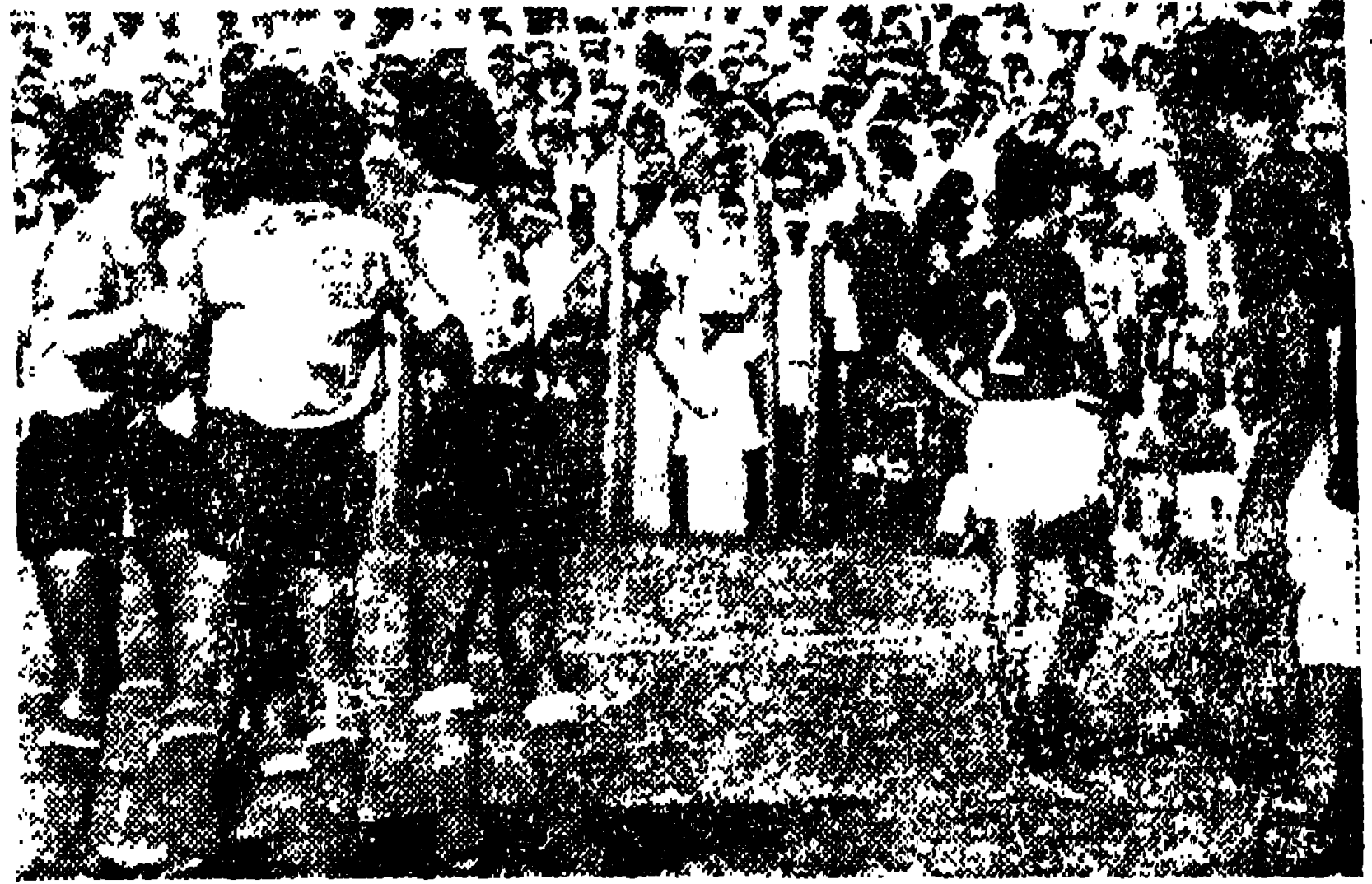
গোল করার আনন্দে ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়দের ডানদিকে বিষণ্ণ প্রতিপক্ষ
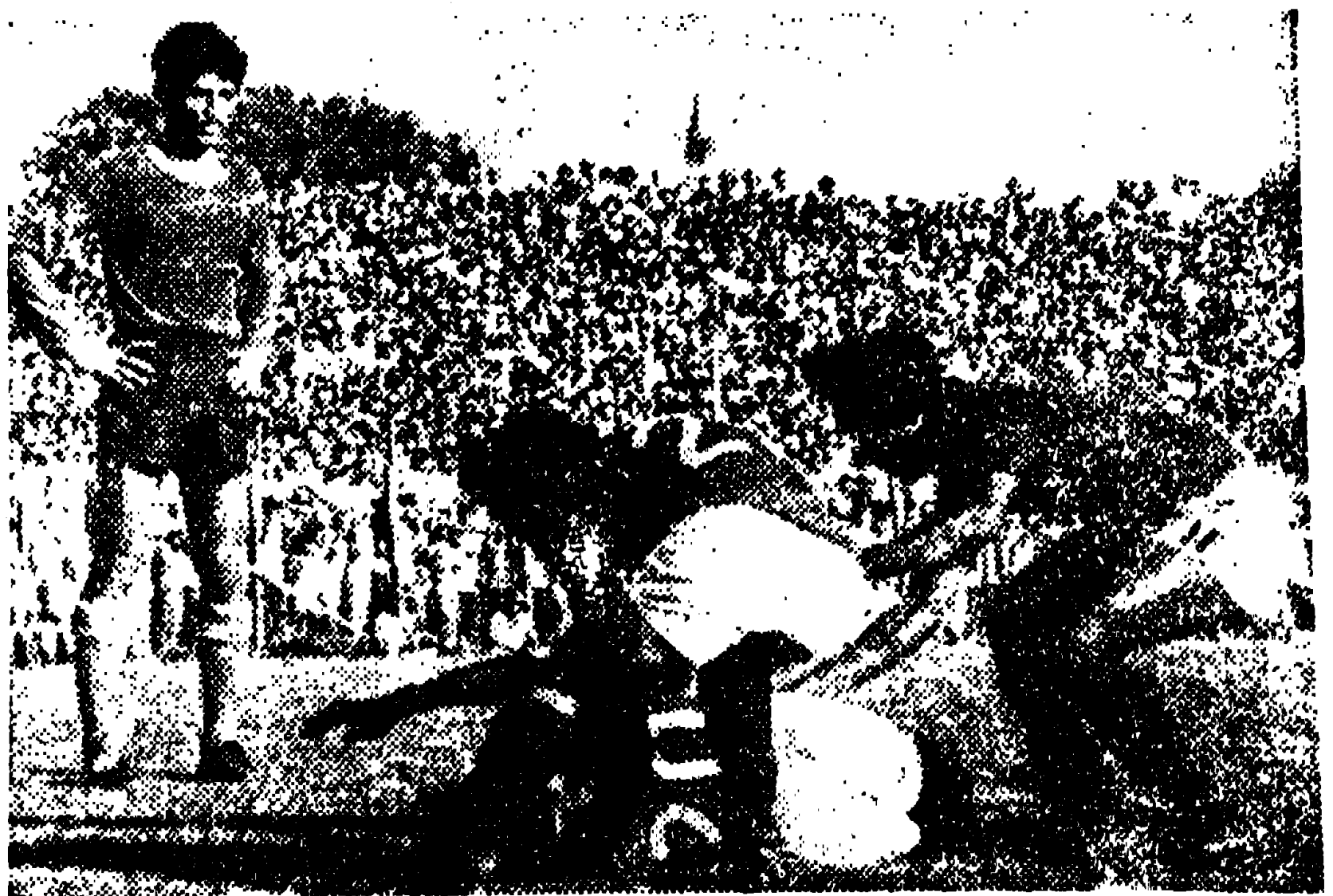
গোল শোধ। পরাজিত ভাস্কর স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে। গোলদাতা মানস মাটিতে। সতীর্থরা তাঁকে উঠতে সাহায্য করছেন।

ফটো : মনোজিৎ চন্দ।

নিরর্থক সেন্টিমেন্টের দায় মেটাতে গিয়ে গোটা দেশকে কালে কালান্তরে অনেক মূল্য ধরে দিতে হয়েছে। অনেক ঠেকে তবেই অনেক কিছু শিখতে হয়েছে। যে দেশে সামান্য এক চুরির ঘটনাকে ছুতো করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে ওঠার আশঙ্কা দেখা দেয়, সেই দেশে ফুটবল করে ঘটি-বাঙালের লড়াইয়ের প্রস্তাবকে উসকে দেওয়া সাজে না। ব্যাপারটার উৎস মুখে হয়ত ঠাট্টা-মসকরা করার প্রবণতা ছিল। কিন্তু বেশি কচলালে যা হয়, এ ক্ষেত্রেও তা ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। তাই ঘটি-বাঙালকে উহ্য রেখে মাথায় তুলে নেওয়া হোক আসল বস্তুটিকে—দুটি বড় দলের খেলাকে। মিছিলের ছেলেরা যেমন করে মেনে নিতে পেরেছে তেমনি করেই ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ও মেনে নিতে সমকাল ও উত্তরকালের সবাই বরং মনে মনে তৈরী হোন না।

দূর অতীতে দলের নামকরণ করার কালে যে ইচ্ছার তাগিদ বড় হয়ে উঠেছিল সে ইচ্ছা চাগিয়ে তুলে নিজেদের গলায় নিজেদের হাতে কাঁটা বেঁধাবার সাধ আজ আর সুস্থমনাদের নেই।

আর কিসের বাঙাল? আর কিসেই বা ঘটি দল?

ইস্টবেঙ্গলে যাঁরা খেলেন তাঁরা সবাই কি পূর্ববঙ্গীয় (একালের বাংলা দেশ) তরুণ? না, মোহনবাগানের সব খেলোয়াড়ের আদি-বাস এপার বাংলায়? শ্যামল ঘোষ, মিহির বসু, সবির আলি, দেবরাজ, ডেভিড উই-লিয়ামস, গুরুদেব সিংয়ের পারিবারিক সম্পর্ক কি পূর্ববাংলার সঙ্গে ছিল বা আছে নাকি?

যাঁদের ছিল যথা সুব্রত ভট্টাচার্য, মানস ভট্টাচার্য, গৌতম সরকার, তপন দাস, বিদেশ বসু, প্রসূন ব্যানার্জি, তাঁরা তো খেলেন মোহনবাগানে! শ্যাম থাপা, জেভিয়ার পায়াসের হাল সাকিন কলকাতা হলেও তাঁদের কেউই ঘটি নন। ১৯১১ সালে প্রথম ভারতীয় প্রতিযোগী হিসেবে শীল্ড পাওয়ার অনন্য কৃতিত্ব যে মোহনবাগানের সেই দলেও শুনেছি নজন এমন খেলোয়াড় ছিলেন যাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন পদ্মার ওপার থেকে।

কাজেই খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে দু দলের কেউই বাঙাল নয়, কেউই ঘটি নয়। ওসব কথা উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। মাথা খাটিয়ে অলস বিলাসের তাগিদ মেটাতে তুচ্ছ ও অকল্যাণকর সেন্টিমেন্টের অজুহাত পাড়া কোন কাজের কথা নয়। রাজপথে মিছিলকারী খেলা পাগল ছেলের দল বোধ-হয় সেই কথাই বলে গেল সেদিন।

সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে কথা পাড়তে গেলে কথা কাটাকাটি হতে পারে। শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিও। তারপর? তার-পর কি কেউ হিসেব করে দেখতে চাইবে যে কার মাথা কে কাটালো? নিজেদের না অন্য কারুর?

কি ভয়ঙ্কর খেলা ঘিরে অহেতুক টেন-শানে ভোগার? জীবনের নানা ক্ষেত্রেই আজ আমাদের টেনশানের দাম মেটাতে হচ্ছে। ইচ্ছে থাকলেও এড়িয়ে যাওয়ার পথ নেই। তার ওপর খেলা ঘিরে অগ্নিগর্ভ পরি-স্থিতির টেনশান গড়ে তুললে বস্তুটি কি বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে দাঁড়াবে না?

বোঝা হালকা করতে পারলেই আমাদের লাভ। কিন্তু কি করে হালকা করা যায়।

টেনশান হালকা হয় যদি আমরা ইস্ট-বেঙ্গল ও মোহনবাগান নামক দুটি ঝাঁঝালো পিল গলাধঃকরণ করতে না চাই। যদি পারি, দার্শনিকের মত বলতে, নামে কী আসে যায়?

নামমাহাত্ম্য ভুলে বড় দুটি দলের বড় খেলার আমেজে যদি মসগুল থাকতে পারি তাহলে খেলার মজা আরও সাচ্চা হয়ে ওঠে। ফুটবলে কি আমরা শুধু উত্তেজনাই পেতে চাই? মজা চাই না, খেলার মজা? যদি আন্তরিকভাবে মজা চাইতে পারি তা-হলে আমরাই পারব মহানগরীর মর্যাদা বাড়াতে। যেহেতু মহানগরীর পরিচিতি ফুটবলের শহর রূপে, কোনো দল বিশেষের শহর হিসেবে নয়।

সেদিন বিকেলে জোড়া পতাকার মিলনে একই দণ্ডে বিলীন হওয়ার দৃষ্টান্তে এই উপলব্ধিই যেন আরও সাচ্চা হয়ে উঠেছিল।

চিত্রধ্বনি

তারাশঙ্কর\তরুণ মজুমদার\গণদেবতা

রবি বসু

সাহিত্যে তারাশঙ্কর এবং চলচ্চিত্রে তরুণ মজুমদার—দুই একত্র হলে তার যোগফল একটা ভূমিকম্প হতে পারে, কিংবা একটা ঝড় অথবা একটা প্লাবন। কিন্তু গণদেবতার ক্ষেত্রে তেমন একটা কিছু ঘটল না। মাটি কাঁপল ঠিকই কিন্তু তা আমাদের চেতনায় কোন বড় রকমের কম্পন তুলতে পারল না। ঝড় উঠল বটে কিন্তু তা আমাদের হৃদয়ের মর্মমূলে তেমন করে আছড়ে পড়ল না। প্লাবন এলো ঠিকই কিন্তু তা আমাদের সর্বাংশে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। অথচ আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাই ছিল। কারণ শিল্পের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর এবং তরুণ মজুমদার প্রায় একই ঘরানার। বাংলার গ্রাম উভয়েরই প্রিয় পটভূমি যেখানে ওঁরা অবাধ এবং স্বচ্ছন্দ। বিশেষ করে বীরভূম। মানবমনের যে গভীর রহস্যের সমুদ্রে

তারাশঙ্কর

তারাশঙ্করের অবগাহন তরুণ মজুমদারের শিল্পের তরীটি সেই ঘাটেই বাঁধা। জীবনের যে নাটক তারাশঙ্করকে উদ্বেলিত করে সেটা সমভাবেই তরুণ মজুমদারকে করে আপ্লুত। অতএব খুব বড় কিছু প্রাপ্তির আশা দানা বেঁধে উঠেছিল গণদেবতাকে কেন্দ্র করে। ছবি দেখে নিরাশ হইনি ঠিকই, কিন্তু পেতে চেয়েছিলাম যে আরও আরও আরও অনেক বেশি।

ছবির জন্যে গণদেবতার চণ্ডীমণ্ডপ পর্বটি বেছে নেওয়া হয়েছে। পটভূমি বিরাট, চরিত্র অনেক। উপন্যাসের ন্যায়রত্ন মশাইয়ের প্রসঙ্গটি একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও ছবি ১৮ রিলে দাঁড়িয়েছে। শেষের দিকে অনেক ব্যাপার তড়িঘড়ি করে সারতে হয়েছে। অথচ এ ছবির শেষাংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, অন্যায় আর অত্যাচারের প্রতিবাদে একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে, অতি সাধারণ একটি মানুষ তার নিজের অজান্তেই নেতৃত্বের রশিটি নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে—এই অবস্থাটি পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে আরও সময় দেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু পরিচালকের হাতে তখন আর সময় কোথায়? তিনি তো সময়ের অনেকটাই পূর্বাহ্নে ব্যয় করে ফেলেছেন অনিরুদ্ধ আর দুর্গার পিছনে। কামারশালার হাপরের আগুন আর অনিরুদ্ধর মনের কামনার আগুন এক করে দেখানোর পরই তাঁর ওই পর্বের ইতি ঘটানো উচিত ছিল। দুর্গাকে কাঁধে নিয়ে অনিরুদ্ধর গানের প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে ওই সময়টি যদি পরিচালক প্রজা সমিতিকে দিতে পারতেন তবে বড় ভালো হত। জেল থেকে দেবু পণ্ডিত ফিরে আসার পর ব্যাপারগুলি এত দ্রুত ঘটতে আরম্ভ করেছে যে আন্দোলনের প্রস্তুতির ব্যাপারটা দানা বেঁধে উঠতে পারল না। [illegible]

ছিলুর মতো্টা কী দর্শকের কাছে আর কী দেবুর কাছে ভয়ংকর শোকাবহ কোন ঘটনা হয়ে উঠল না।

অথচ ছবির শুরু থেকে ঘটনা এত চমৎকারভাবে এগিয়েছে যে মন-প্রাণ ভরে যায়। এটা সুসংবদ্ধ চিত্রনাট্যেরই (রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার কৃত) গুণ। অতি সামান্য ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে এক-একটি চরিত্র তার সম্পূর্ণ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। টুকরো টুকরো ফ্ল্যাশ-ব্যাকে অতীতের আভাস দিয়ে যাওয়া চমৎকার পরিকল্পনা। আসলে অনিরুদ্ধ কামার আর গিরিশ ছুতারের বিচারের জন্যে চন্ডীমন্ডপে জমায়েত হবার মুহূর্তেই গোটা গ্রাম আর তার মানুষগুলির সঙ্গে দর্শকের পরিচয় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীর 'ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম--আপনাদিগে নমস্কার' ঐ সামান্য বাক্যটি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীর এবং তাঁর আসরে উপবেশনের ভঙ্গিটি এক মুহূর্তে চিনিয়ে দেয় উনি কত সম্মানিত জন। ছিরু পালের সদম্ভ পদক্ষেপে আসরে প্রবেশ এবং একেবারে মাঝখানে এসে বসার ভঙ্গিতে পরিস্ফুট হয়ে যায় তার ক্রুর ও নীচ চরিত্র এবং ক্ষমতা লাভের অভিলাষ। দেবু পন্ডিতের ধীর স্থির ভঙ্গি, সাদা কথাবার্তা এবং একটু আলাদা হয়ে বসার মধ্যে দিয়ে দর্শকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না এই মানুষটির স্বাতন্ত্র্য দৃঢ়তা এবং গভীরতা। আর অনিরুদ্ধর ষন্ডাং দেহি ভঙ্গিতে প্রবেশ এবং কথাবার্তা, একটু আগে সিগারেট (কিংবা বিড়ি) ধরিয়ে আসরের প্রায় সামনে এসে দেখিয়ে না দেখানোর ভাব করে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলি তার চরিত্রের ডোন্ট কেয়ার ভাবটিকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করে। আর ওই চন্ডীমন্ডপ, তার অর্ধভগ্ন অযত্নলালিত চেহারা, আধখানা ঝাঁটায় রাঙাদিদির চন্ডীমন্ডপ ঝাঁট দেওয়া পাথরের উপর উৎকীর্ণ 'যাবচ্চন্দ্রার্কমেদিনী' শব্দটি এই গ্রাম, তার অতীত, তার বর্তমান সব কিছু এক লহমাতেই বুঝিয়ে দেয়। এই হল বড় শিল্পীর কাজ। তার একটা আঁচড়েই অনেক-খানি। তরুণ মজুমদার নিঃসন্দেহে একজন বড় শিল্পী। স্বর্ণকমল পাবার অনেক আগেই সে পরিচয় আমরা পেয়েছি। সে প্রমাণ তার 'নিমন্ত্রণ' ছবিতে ছিল। আরও অনেক ছবিতেই ছিল।

ছবির পটভূমি ১৩২৯ সালের। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৫৭ বছর আগেকার। ছবিতে সেই কালের মেজাজটা এসেছে কি? সেকালের পুলিশের রূপসজ্জা নিখুঁত। কঙ্কনার জমিদারের সাজ-পোশাকও নিখুঁত। কিন্তু সেই কালের মেজাজটা এল কোথায়? সেই মেজাজ না আসার জন্য মুখ্য শিল্পীদের পরিচিত মুখগুলি হয়তো কিছুটা দায়ী। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিচালকের করবারও তো কিছু ছিল না। প্রায় চোদ্দ-পনেরো লক্ষ টাকা যে ছবির [illegible] খরচ

তরুণ মজুমদার

সে ছবির ব্যবসায়িক দিকটি তো উপেক্ষা করার নয়। এত বড় ছবিতে সম্পূর্ণ নতুন মুখ দেখার উদারতা ও মেজাজ আমাদের দর্শকদের আছে কি? ছবিটি যদিও পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে নির্মিত তবু টাকাটা ফেরত না এলে জনসাধারণ কি কৈফিয়ৎ তলবে মুখর হয়ে উঠতেন না। অথচ এ ছবিতে নতুন মুখের প্রয়োজন খুবই ছিল। ছবির বনেদ তাতে অনেক বেশি শক্ত হত, মেজাজটাও আসত। যে কটি ক্ষেত্রে নতুন অথবা অল্প পরিচিত শিল্পী নেওয়া হয়েছে, যেমন উচিচংড়ে (শ্রীমান কাঞ্চন), তারিণী (নীলকন্ঠ সেনগুপ্ত), ছোট দারোগা (নিমু ভৌমিক), জমিদার (অসীম চক্রবর্তী); রাঙাদিদি (পূর্ণিমা দেবী), ছিরুর মা (আলপনা গুপ্ত) এবং যাদের নাম জানি না সেই পাতুর মা, দ্বারকা চৌধুরী, গিরিশ এবং ডোমপাড়া ও মুসলমানপাড়ার আরও অনেক শিল্পী পরিবেশ রচনায় অনেক বেশি সক্ষম হয়েছেন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের চেয়ে। তার মানে এটা বলছি না যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা অভিনয় কেউ খারাপ করেছেন। কিন্তু তাঁদের অতি পরিচিত ভঙ্গিগুলি কোন কোন সময় কমিউনিকেশনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছবিতে দুর্গা একটু বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। দুর্গা অবশ্যই একটি অতি প্রয়োজনীয় চরিত্র, এবং অধিকাংশ বড় ঘটনার সঙ্গেই তার যোগাযোগ ছিল, তা সত্ত্বেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় দুর্গা পর্দা দখল করে রেখেছে। তার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ঘটনাই ছবিতে দেখানো হয়েছে যা বেশ নাটকীয় এবং লোমহর্ষক কিন্তু মূল বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই অপ্রয়োজনীয়। যেমন অনিরুদ্ধর সঙ্গে ময়ূরাক্ষীর চরে গান, গভীর রাতে কঙ্কনার বাবুদের বাড়ি থেকে ফেরা এবং গানের আসরে নিজের স্বামীকে আবার দেখা এবং সেই প্রসঙ্গে তার সতীত্ব হারানোর দৃশ্যাবলী। এগুলি আরও সংক্ষেপে সারা যেত এবং দেবু পন্ডিতের মানসিকতা বিশ্লেষণ এবং তার পারিবারিক ব্যাপারে আরও একটু বেশি নজর দেওয়া দরকার ছিল। এক মুহূর্তে দেবু পন্ডিত নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হল, কিন্তু জেল থেকে ফেরার পর তার নিজেকে তৈরী করার জন্য একটু সময়ের প্রয়োজনও যে ছিল। ধর্মঘট ব্যাপারটির প্রাচীনতা, পবিত্রতা এবং গুরুত্ব নিয়েও কিছু বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। এ ছবির প্রথম নায়ক সময়। দ্বিতীয় নায়ক দেবু পন্ডিত। তৃতীয় নায়ক সংঘবদ্ধ একটি আন্দোলনের প্রস্তুতি। এই তিনটি ব্যাপারেই একটু কম সময় দেওয়া হয়েছে। তবু ভালো যে পরিচালক ছবিতে ন্যায়রত্ন মশাইকে বাদ দিয়েছেন। নতুবা ওই চরিত্র এমনই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠত যে আর কাউকে খুঁজেই পাওয়া যেত না। পরি-চালকের এই সিদ্ধান্তকে আমি সর্বাংশে সমর্থন করি।

আগের ছবিগুলিতেও দেখেছি প্রকৃতি তরুণ মজুমদারকে বড় বেশি দোলা দেয়: এ ছবিতেও তাই। প্রকৃতি তার পূর্ণ মাধুর্য নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে। বড় সুন্দর করে, বড় ভয়ঙ্কর করে প্রকৃতিকে তিনি ছবিতে এনেছেন। সারা আকাশ কালো করে মেঘ, ঝড়ের দাপটে বসুন্ধরা ওলট-পালট সেই ভয়ঙ্করের মধ্য দিয়ে অনিরুদ্ধ ছুটে চলেছে আরও ভয়ংকর একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত। অপূর্ব! অপূর্ব! এমনটি আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জ্যোৎস্না রাতে গান গেয়ে চলেছে তরণী। পশ্চাৎপটে ময়ূরাক্ষীর বিস্তীর্ণ বালুচর কাশবনের ফাঁকে ফাঁকে গুঁড়ো গুঁড়ো জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে বালু-কণার উপর। ঠিক যেন স্বপ্নের পৃথিবী। রাতের অন্ধকারে অনিরুদ্ধর জমির কাঁচা ধান কেটে তছনছ করছে ছিরু পাল। সেই বীভৎস দৃশ্যের পশ্চাৎপটে নির্মল সুনীল আকাশ বাঁধের উপর জীবনের গান গেয়ে চলেছে স্বৈরিণী দুর্গা। এমন একটি দৃশ্যের তুলনা কোথায় পাই? কিংবা বাঁধের উপর সারি সারি তালগাছ নীল অকাশকে ছোঁবার আশায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। এক-একটি পাতা কাটার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের পটভূমি প্রসারিত হচ্ছে। সেও এক মনোরম দৃশ্য। এই সব দৃশ্যের জন্যে পরিচালক তরুণ মজুমদার এবং ক্যামেরাম্যান শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়কেই ধন্যবাদ জানাতে হয়। পাশাপাশি একটি অপ্রাপ্তির জন্যে মনটা হাহাকার করে ওঠে। কোথায় সেই শিশিরভেজা ঘাস, কোথায় তার বুকে সূর্যের লুটোপুটি, তার উপর দুর্গার ছন্দিত চরণের ছুটোছুটি অথবা উচিচংড়ের হুটোপুটি গ্রাম বাংলায় ওই দৃশ্যগুলি তো অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এ [illegible]যোগটুকু অবশ্য একান্তই আমার।

জীবনের নাটককে [illegible] মজুমদার তাঁর কোন ছবিতেই [illegible] চাননি। গণদেবতাতে সেই নাটক [illegible] কোথাও এমন তীব্র[illegible]

দর্শকের চোখ বার বার সিক্ত হয়ে ওঠে। যেমন দেবু পণ্ডিতের গ্রেপ্তার হবার দৃশ্যে। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন দেবু পণ্ডিত। একটি গাঁদা ফুলের মালা এনে পরিয়ে দিলেন জগন ডাক্তার। একটা আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে অকস্মাৎ উলুধ্বনি বেরিয়ে এল দুর্গার কণ্ঠ থেকে। সেটা ছড়িয়ে পড়ল পুরবালাদের কণ্ঠে। অনেক শঙ্খধ্বনির মধ্যে আচ্ছন্নের মত এগিয়ে চললেন দেবু পণ্ডিত। একজন অকৃত্রিম নেতার সেই জন্মমুহূর্তে চোখের জল রোখার সাধ্য কার?

কিংবা বুড়োশিবতলায় গানের আসরে তারিণী যখন দেবুকে কেন্দ্র করে স্বরচিত গান শেষ করে তার অন্তরের প্রণামটি নিবেদন করলেন দেবুকে তখনি বা চোখ শুখনো থাকে কই?

অথবা স্বামী অনিরুদ্ধর প্রতি অভিমানে ক্ষিপ্ত পদ্ম যখন উনুনের জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে সব কিছু পুড়িয়ে নিঃশেষ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই মুহূর্তে ক্ষুধার্ত উঁচিচংড়ের সেই করুণ কাতর আবেদন দর্শকের বুকটাকে কি তোড়পাড় করে দেয় না? কিংবা পদ্মর সামনে ছিরু পালের সেই রুগ্ন বউটির সন্তানের মঙ্গলের জন্য কাতর প্রার্থনা এবং নিঃসন্তান পদ্মর চাপা দীর্ঘশ্বাস—দর্শকের দীর্ঘশ্বাসও তখন তার সঙ্গে একাকার।

এমন অনেক অনেক দৃশ্য আছে ছবিতে যা অনেকদিন মনে রাখার মত। সেইখানেই তরুণ মজুমদার সার্থক।

আর একটি দৃশ্যের কথা না বললে আলোচনা অপূর্ণ থাকবে। সেটি ডোমপাড়ার অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য। আগুন বড় লোভনীয় বস্তু। পরিচালক আরও ভয়াবহ করে দৃশ্যটি আঁকতে পারতেন। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ডোমপাড়ার সামান্য কয়েকটি ছাউনি ভস্মীভূত করার জন্য ঠিক যতটুকু প্রয়োজন পরিচালক ততটুকুই দেখিয়েছেন। এই সংযত দেখানো বড় কম কথা নয়! তরুণবাবুকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ছবিতে নজরবন্দী যতীনের উপস্থিতি একটা আবির্ভাবের মত। একটি সততা, একটি আদর্শ কেমন করে মানুষের চরিত্র আমূল বদলে দেয় তার দৃষ্টান্ত যতীন। তার মা-মণি ডাকের মধ্যে দিয়ে নিঃসন্তান পদ্ম তার দুঃখ ভুলে অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বৈরিণী দুর্গা তার হাস্য-লাস্য বিসর্জন দিয়ে মানুষের প্রয়োজনে নিজেকে নিয়োগ করতে শিখেছে। কিন্তু কালীপুরের মানুষের চেতনা উন্মেষের প্রয়োজনে যতীনকে নিয়ে আরও কিছু দৃশ্যের প্রয়োজন ছিল। দেবুর মনের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্যও যতীনকে আর একটু দরকার ছিল। তবে ছিরু পালের চরিত্রের পরিবর্তন বেশ সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন পরিচালক। ছিরু পাল থেকে শ্রীহরি ঘোষের রূপান্তর বেশ বুদ্ধিদীপ্ত কাজ। যে [illegible] ছিল ক্রোধী, গোঁয়ার, ইতর সে

দুর্গা/সন্ধ্যা রায়

ক্রমশ মর্যাদাসম্পন্ন হচ্ছে, অথচ তারই মধ্যে একটি মুহূর্তে পদ্মর দেহটাকে উপভোগের কল্পনা, আবার মুহূর্তে ঘোষমশায়েতে ফিরে আসা, দুর্গার সঙ্গে তার পূর্বের এবং পরের ব্যবহারে পার্থক্য, দেবুর সম্পর্কে তার সম্মান ও বিতৃষ্ণা—এ সবই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছেন পরিচালক। অজিতেশ এ ছবিতে যেমন বীভৎস, তেমনই সুন্দর। আগেই বলেছি অভিনয় কারোরই খারাপ নয়। খুব চমৎকার অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দেবু পণ্ডিতের চরিত্রে। চরিত্রের সঙ্গে যাকে একাত্ম হয়ে যাওয়া যাকে বলে তিনি তাই হতে পেরেছেন। দেবদাসের সব আক্ষেপ আমার এই ছবিতে মিটে গেল। অনিরুদ্ধর চরিত্রে শমিত ভঞ্জ সর্বক্ষণ সোচ্চার। দর্শকদের কাছে তিনি বহু প্রশংসিত হবেন। আমার কিন্তু ভালো লেগেছে তাঁকে দুটি মুহূর্তে। এক কামারশালে দুর্গার সামনে। দুই দেবু পণ্ডিতের ত্যাগের মুহূর্তে যখন তিনি অভিভূত। নজরবন্দী যতীনের চরিত্রে দেবরাজ রায় সংযত ও মর্যাদাব্যঞ্জক অভিনয় করেছেন। গুলি খাওয়া বিপ্লবীর চরিত্রে সন্তু মুখার্জির অভিনয় ভালো কিন্তু আমার কাছে ওই চরিত্র এবং ঘটনা বাহুল্য মনে হয়েছে। সন্তোষ দত্ত অভিনীত জগন ডাক্তারের চরিত্রটি সু-অভিনীত, কিন্তু সুনির্বাচিত নয়। মহিলা চরিত্রে দুর্গার ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় প্রাণ ঢেলে অভিনয় করেছেন। যেমন সপ্রাণ তেমনি নিপুণ তাঁর অভিনয়। মত্ত অবস্থায় অনিরুদ্ধর প্রতি তাঁর একটি চাউনি তো কোনদিনই ভোলা যাবে না। আবার নিজেকে উপলব্ধির মুহূর্তে তাঁর অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনা তাঁর অভিনয়-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মাধবী [illegible] একটি আশ্চর্য চরিত্র-সৃষ্টি। মাধবী ছাড়া আর কেই বা পারেন এমন করে নিজেকে প্রকাশ করতে। সেই তুলনায় বিলুর চরিত্রে সুমিত্রা মুখার্জিকে কিছু ম্লান মনে হল। তেমন সুযোগও তিনি পাননি। তাছাড়া পরিবেশের তুলনায় তিনি একটু বেশি উজ্জ্বল। রবি ঘোষ, মনু মুখার্জি, মন্মথ মুখার্জি, অনামিকা সাহা বিমল দেব, তরুণ মিত্র প্রমুখ শিল্পীরা চরিত্রানুযায়ী ভালই অভিনয় করেছেন। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পীর নাম তো আগেই বলেছি। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ করার মত নাম নিমু ভৌমিক, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, শ্রীমান কাঞ্চন প্রভৃতি। নিমুর বোধহয় সবচেয়ে পরিণত কাজ এই ছবিতে। যুগপৎ বিস্মিত ও চমকিত করেছেন রাঙাদিদির চরিত্রে অতীতের নায়িকা পূর্ণিমা দেবী। এইসব শিল্পীদের আজকাল বেশি দেখতে পাই না কেন?

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত সঙ্গীতের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে এই ছবিতে। ক্যামেরায় শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা আগেই করেছি। ছবির সম্পাদনার কাজটিও উল্লেখ করার মত। কি কারণে জানি না, ছবির অনেক সংলাপই আমার কর্ণগোচর হয়নি। কলকাতার দুটি বড় হাউসেই একই অবস্থা। জানি না, ত্রুটিটা কার! শব্দগ্রহণের? হলের সাউণ্ড সিস্টেমের? কিংবা এই পঞ্চাশোর্ধ প্রতিবেদকের কর্ণকুহরের?

নুরি-বিষণ্ণতার প্রতিরূপ

পর্দায় প্রতিনিয়ত যাঁরা স্টার বা সুপার স্টার দেখতে চান—নুরী তাঁদের জন্য নয়।

পর্দায় নায়কের শৌর্যের এবং নায়িকার মহত্ত্বের ফলশ্রুতি স্বরূপ শেষ দৃশ্যে মিলন যাঁরা চান, নুরী তাঁদের কষ্ট দেবে।

পর্দায় টোকিও রোম ম্যানিলা প্রভৃতি স্বদেশ কিংবা বিদেশী ক্যাবারে যাঁরা চান নুরী তাঁদের হতাশ করবে।

যশ চোপড়া প্রযোজিত নুরী এই স[illegible] না থাকার কারণে অন্যরকম। এবং সৌভাগ[illegible] নুরী দর্শক দেখছে। হলের বাইরে হাউস ফুলের আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।

নুরী এক যুবতীর নাম। নুরীর বাব[illegible] গোলাম নবী। পটভূমি উত্তর ভারতের [illegible] গ্রাম। এবং বলে রাখা ভালো নুরী মূল[illegible] প্রেমকাহিনী।

প্রথম দৃশ্যে পাহাড়, শীতকাল এব[illegible] নুরীর স্মৃতি চারণা। গুহার ভেত[illegible] মৌলভী এবং তাঁর দুই সঙ্গী নুরী হারিয়ে যাওয়া বিষয়ে আলোচনারত। সে[illegible] সময় ইউসুফের প্রবেশ। ইউসুফ নুরী[illegible] প্রেমিক। প্রেমিকও খুঁজে বেড়াচ্ছে তা[illegible] প্রণয়ীকে।

ক্যামেরা ইউসুফকে অনুসরণ ক[illegible] এসে পৌঁছিয়েছে একটা বাড়ির সামনে বাড়িটা কাঠের। এই বাড়িতে নুরী থাকতো ইউসুফের বিষণ্ণতা—ফ্ল্যাশব্যাকে নুর[illegible] পাহাড়ী ঝর্ণায় জল আনতে যাচ্ছে। সম[illegible] [illegible]

নিয়ে নূরীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সময় একটা গান শোনা গেছে। এই গানটা আরো দুবার অন্য দুটো দৃশ্যে ফিরে এসেছে।

ইউসুফের স্মৃতি হয়ে ফিরে আসা নূরী—শুধু নূরী ইউসুফের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পরিচালক মনোমোহন কৃষ্ণ এর মাধ্যমেই অতীত ঘটনায় ক্যামেরা ঘুরিয়েছেন।

নূরী ইউসুফকে তার বাবাকে প্রেম বা বিবাহ বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলেছে।

নূরীর বাবা গোলাম নবী গ্রামের হাটে কাঠ বিক্রী করে। গোলাম নবীর বিশেষ বন্ধু লালাজী। লালাজী সুদের কারবারী, মহাজন। আমরা যে ধরনের মহাজনদের দেখতে অভ্যস্থ লালাজী তার উল্টো। অর্থাৎ লালাজী প্রথমে মানুষ, সে কারণে মানবিক।

ইউসুফ নূরীর বাবার কাছে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কিছু না বলেই বেরিয়ে যায়। বাবা নূরীর কথা থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। ইউসুফ পাত্র হিসেবে খারাপ নয়। সে বসির খাঁর কাঠগোলায় কাজ করে।

এখানে বসির খাঁর পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। বসির অত্যাচারী এবং অসৎ। এ ছবির খল চরিত্র। প্রথামত বসিরের চরিত্রে যাবতীয় খল-গুণ উপস্থিত। সে ঘোড়া জিপে চেপে শিকার করে। এবং নারী-ভোগী। কিছু সাংগপাংগও আছে।

লালাজী গোলাম নবীকে দু হাজার দেয় নূরীকে বিবাহের জন্য। এদিকে বসির গোলাম নবীকে প্রস্তাব দেয় নূরীকে বিয়ে করার। গোলাম নবী বসিরকে প্রায় অপমান করে।

বাবার অনুমতি পাবার পর নূরী ও ইউসুফের গানটা আবার শোনা গেছে। এবং বিয়ের প্রস্তুতিপর্বে আর একটা কাওয়ালি টাইপের গান। পাত্র ও পাত্রী পক্ষের ভেতর গানের লড়াই।

ইউসুফ নূরীর বাড়ি এসে বলেছে—গতকাল রাত্রে স্বপ্নে তোমাকে সম্পূর্ণ দেখতে পাইনি। তাই দেখতে এসেছি।

নূরীর সংলাপ অংশ বেশ সমৃদ্ধ। আর এক জায়গায় নূরী ইউসুফের কথাবার্তা বেশ ভালো লেগেছে।

এরপর গোলাম নবীকে গাছ চাপা দিয়ে মারা হয়েছে বসির খাঁর চক্রান্তে। তখন গোলাম নবীকে কবর দেওয়া হচ্ছে—নূরীর কুকুর আঁকড়ে ধরে থেকেছে গোলাম নবীকে। দৃশ্য পরিকল্পনা বেশ করুণ। এরপর থেকে কুকুরটার অভিনয় যা চলাফেরা উল্লেখযোগ্যভাবে দর্শককে টেনে রেখেছে।

বসির খাঁর মেহফিলের নাচ। বসিরের হাতে কখনো আঙুরের থোকা, কখনো তামাকের লম্বা নল, কখনো বা রূপোর পানপাত্র। সংগে নাচ এবং গান। দুটোই ভয়ংকর এবং নিষ্প্রভ।

[illegible]

করেছে ইউসুফ। একা তিন আক্রমণকারীকে ঘায়েল করেছে। গতিক বুঝে বসির বিশেষ কাজে ইউসুফকে বাইরে পাঠিয়েছে।

এবং এক বৃষ্টির রাতে নূরীকে বলপূর্বক ধর্ষণ করেছে। তখন কুকুরটা চেনে বাঁধা।

নূরী ধর্ষিতা হবার পর আত্মহত্যা ছাড়া অন্যপথ খুঁজে পায়নি। পাহাড়ী খরস্রোতা নদী টেনে নিয়ে গেছে তাকে।

ইউসুফ ফিরে এসেছে। বসির খাঁকে নূরীর কুকুর চিনতে পেরেছে। এক রাতে নূরীর কুকুরকে মারতে গিয়ে নিজের কুকুরকেই মেরে ফেলেছে। কিছু ঘটনা দ্রুত ঘটে যাবার পর একদিন শোনা গেছে নূরী ফিরে এসেছে। এবং জীবিত ফিরে আসায় ভয়ে বসির খাঁ পালাতে তৎপর। নূরীর কুকুর বসিরের গাড়িতে তাড়া করেছে। পরে ইউসুফ।

ইউসুফ এবং বসিরের লড়ায়ের শেষে ইউসুফ গুলিবিদ্ধ হয়েছে। কুকুর বসিরকে শেষ করেছে। অর্থাৎ তাড়া করে খরস্রোতা নদীর বুকে ফেলে দিয়ে।

নূরীর মৃত দেহের পাশে ফিরে এসেছে গুলিবিদ্ধ ইউসুফ।

মৃত্যুর পর যদি কোনো জায়গা থাকে সেখানে নূরী-ইউসুফের মিলন হতে পারে—এরকম বিশ্বাস থেকে নূরী একটি সার্থক বিয়োগান্তক ছবি। যা করার সাহস হিন্দী সিনেমাওয়ালাদের অনেকেরই নেই।

নূরী অভিনয় ছাড়াও অ্যাপিয়ারেন্স-এ পুনম—এই নবাগতা শিল্পীর উজ্জ্বলতা সমস্ত ছবিতে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মতোই আকর্ষণীয়। পুনম-এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। প্রভাত চৌধুরী

নাটক

উপন্যাসের নাট্যরূপ : বিষবৃক্ষ

থিয়েটার সেন্টার-এর নবীন নির্দেশক 'দেবরাজ রায়' সম্প্রতি একটি দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। দুঃসাহসিক কাজে যা চিরকাল সাধারণতঃ ঘটে থাকে, কিছু প্রশংসনীয় এবং কিছু নিন্দনীয় অংশ, তা তাঁর কাজেও পরিস্ফুট। কাজটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'কে নাট্যায়িত করা। বিশেষণ যেখানে সবিশেষ, সেখানে তার পুনঃপ্রয়োগ বাহুল্যমাত্র। 'বিষবৃক্ষ'র আগেও তাই কোন বিশেষণ যুক্ত করা হয়নি। কিন্তু পাঠকমাত্রেই জানেন এর তীব্র মানসিক চাপ এবং নিহিত নাটকযোগ্যতা। দেবরাজ-এর চেষ্টায় তা কতটুকু সফল হয়েছিলো?

প্রশংসা

ক) নাট্যরূপে দেবরাজ প্রায় সর্বত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করেছেন।

খ) সামান্য মঞ্চসজ্জা ও পোশাক আশাকেই আমাদের অনেকটা পুরনো যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

গ) 'ভাগ্যক্রমে মুখমন্ডলে রোমাবলীর চিহ্নমাত্র ছিল না। মুখ এবং গঠন কিশোর বয়স্কের ন্যায়। কান্তি পরম সুন্দর। এই যুবাপুরুষ দেবেন্দ্রবাবু।' —এই বর্ণনার ভিত্তিতে এবং নারীকন্ঠে দেবেন্দ্রর গান গাওয়ার ক্ষমতার কথা মনে রেখে তিনি 'দেবেন্দ্র' চরিত্র দীপান্বিতা রায়কে দিয়ে করাবার সাহস দেখিয়েছেন।

ঘ) অভিনয়ে 'দীপান্বিতা রায়'-এর দেবেন্দ্র নিপুণ ছিল। তাঁর বয়স 'পঞ্চবিংশ
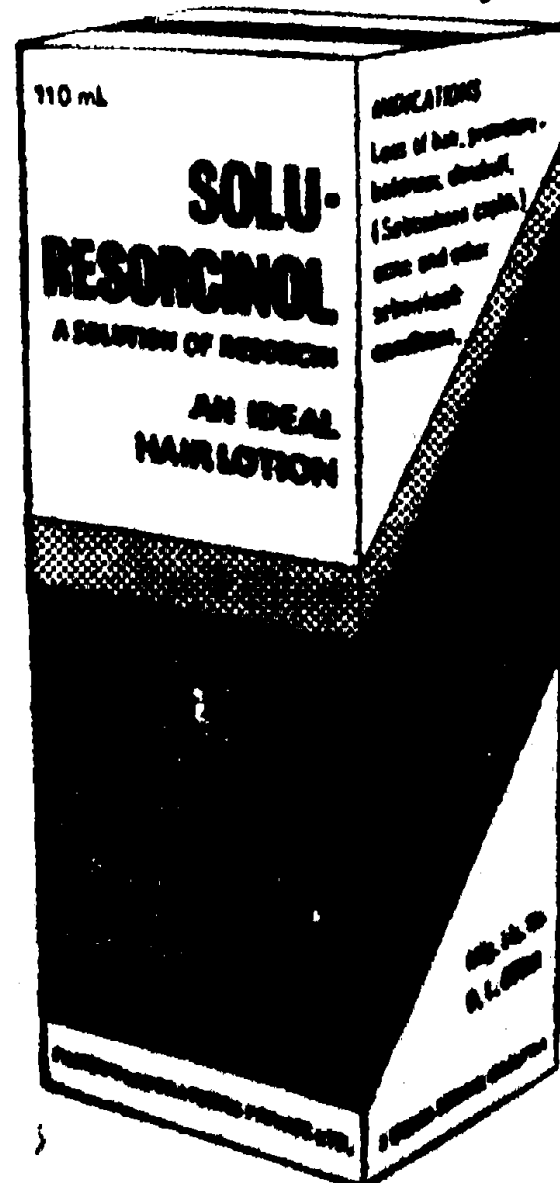
বিষবৃক্ষে গোতম বস্/তন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়

মনে না হলেও মুখমন্ডলে ভাবব্যঞ্জনায়, গুনগুনে গানে, হরিদাসী বৈষ্ণবীর গীত অংশে, কুন্দকে প্রথম তারাচরণের বাড়িতে দেখায়, হীরাকে পেত্নী সম্বোধনে এবং পরবর্তী রহস্য কুটিলতায় সারাক্ষণই তিনি বিশ্বাসযোগ্যভাবে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। 'নগেন্দ্র'র ভূমিকায় 'দেবরাজ'কে যতো সুন্দর দেখিয়েছে, তাঁর অভিনয়ও তেমনই সহজ ছিল। বস্তুত 'পূর্বগামিনী ছায়া' রূপে তিনি যখন প্রথম 'কুন্দ'র মানসচক্ষে প্রতিভাত হন, তখন থেকেই তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর দোলাচলচিত্ত, অনুতাপ বা প্রণয় সমস্ত অভিনয়ই মানিয়ে যায়। 'সূর্যমুখী' চরিত্রে কল্যাণী মন্ডল-এর মধুর প্রেমভাব পর্যন্ত প্রশংসার্হ।

অভিনয়প্রসঙ্গে আর দুটি চরিত্রের কথা না বললে অন্যায় হয়। 'কমলমণি' ও 'শ্রীশচন্দ্র'। এই দুই চরিত্রের অভিনয়ে তন্দ্রা চট্টোপাধ্যায় এবং গোতম বসু বঙ্কিমরচনার দুর্লভ স্বাদ অত্যন্ত সাবলীলভাবে ফিরিয়ে এনেছেন। বিশেষত তন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়-এর অভিনয় সহজ সপ্রতিভতায় আগাগোড়া সম্পন্ন। প্রয়োগগত অসুবিধার জন্য বাবু সতীশচন্দ্র এই প্রযোজনায় অনুপস্থিত, তবু কমলমণি এবং শ্রীশচন্দ্র যথাসাধ্য করেছেন।

নিন্দা

ক) সূত্রধার চরিত্রে দেবরাজ বঙ্কিমের নাটক-উদ্দেশী বা চরিত্র-উদ্দেশী কথা এবং ঘটনা বর্ণনা অংশ রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। সংকল্প সাধু। তবে 'সতীনাথ মুখোপাধ্যায়'-কে সাইড-ব্যাগ কাঁধে, বিষবৃক্ষ হাতে এবং ঘোষণা করে আধুনিক চরিত্র সাজানো নিরর্থক। কোন আধুনিক দর্শক নাটকে তার দায়টি বহন করতে চাইবে না, নগেন্দ্রকে ঐরকম প্রশ্নও করবে না।

খ) হীরা এবং দেবেন্দ্র-র পাপাভিলাষে মগ্ন হওয়ার দৃশ্যটি হাস্যকর। 'শিপ্রা ভার্মা' 'দীপান্বিতা রায়'-এর বাহুবন্ধনে পিছনে ছাটতে গিয়ে ল্যাজেগোবরে হয়েছেন। এমনিতেও দৃশ্যটির পরিকল্পনা রুচিসম্মত নয় এবং মঞ্চপ্রয়োগের দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ।

গ) শিপ্রা ভার্মার 'হীরা' কেবলই একটি আলাপ ন্যাকা ঝি হয়েছে, দেবেন্দ্র-র প্রণয়পাগলিনী হয়ে উঠতে পারেনি। দজ্জালভাবও তাঁর অভিনয়ে নৈপুণ্যহীন।

ঘ) কল্যাণী মন্ডল সূর্যমুখীর প্রেমের মাধুর্য ফুটিয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রেমের প্রচন্ড অহংকার ফোটাতেই পারেননি। যে অহংকার সূর্যমুখীর সমুদয় ক্লেশ।

ঙ) অনুরাধা রায়-এর মুখশ্রী সুন্দর বলে মঞ্চে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বৃন্দনন্দিনীকে চুপচাপ ভূমিকাহীন দেখেও বসে থাকা যায়, কিন্তু কুন্দ-র চাপল্যের দৃশ্যে তাঁর ছোটাছুটি এত অনভিজ্ঞ যে সেজন্য শিল্পী এবং নির্দেশক কাউকেই ক্ষমা করা যায় না। আর কুন্দ বিষ খাওয়ার পূর্বে নগেন্দ্রকে যে কথাগুলো বলে, তা অবশ্যই স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা, কিন্তু দর্শক কি সেকথা একটুও শুনতে পাবে না? অন্তত আমরা যেদিন এই নাটকের অভিনয় দেখেছি, সেদিন সেসব কথা কিছুই শুনতে পাইনি। ফলে কুন্দর মৃত্যুযন্ত্রণা আমাদের পক্ষেও কম যন্ত্রণার কারণ হয়নি।

চ) দেবকী বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গীত মনোরঞ্জক এবং সিচুয়েশন অনুযায়ী সুন্দর ব্যাখ্যাসম্বলিত। সঠিক মনে নেই, তবে এরকম পংক্তি আছে 'সূর্যমুখীর সূর্য বুঝি অকালে ডুবিল', অথবা শূন্যগৃহে নগেন্দ্রর দেয়াল হাতড়ানোর পটভূমিতে 'ঝড়ে নিভিল প্রদীপ' গোছের গান। তবে এই উপাদান 'বিষবৃক্ষ'-র চিত্ররূপ-এর জন্য তোলা থাকলেই বোধহয় ভালো।

ছ) নাটকের প্রধান চরিত্র ছাড়া সকলকেই কালো ছাতার কাপড় পরিয়ে মুখে সাদা চুন মাখিয়ে নামানো হয়েছে। ফলে তাদের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু বলা অসম্ভব। ঐ পুরু চুন ভেদ করে ব্যঞ্জনা আনতে গেলে চার্লি চ্যাপলিনের সমকক্ষ অভিনেতা হতে হবে। অবশ্য মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার তীব্র নাটকে অপ্রধান চরিত্রের ভাবব্যঞ্জনা অবান্তর এরকম কোন মনোভঙ্গি এই পরিকল্পনার পিছনে কাজ করলে সর্বনাশ। তাহলে থিয়েটারে প্রত্যেক সামান্য অস্তিত্বের সমগুরুত্ব, সমবেত শিল্পমাধ্যমের ভাবাদর্শকেই আঘাত করা হয়। গ্রুপ-থিয়েটার-এর কোন মানেই থাকে না তাতে। আর যদি মনে করা হয় যে এরা মৃত চরিত্র, তাই মৃতের রূপসজ্জা দেওয়া হয়েছে তাহলে বরং বলা উচিত নগেন্দ্র, কুন্দ, কমলমণি বা সূর্যমুখীরাই মৃত। সাধারণ মানুষের, অনির্দিষ্ট জনতার সকলেই প্রায় অনতিপরিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান।

প্রস্তাব

ক) সূত্রধারকে বঙ্কিমচন্দ্রের রূপসজ্জায় নামালে কেমন হয়? অবশ্য তাতে সতীনাথকে স্বোপার্জিত দাড়ির মায়া ত্যাগ করতে হবে।

খ) দেবেন্দ্র উপবিষ্ট অবস্থায় হীরাকে অঙ্কশায়িনী করে আলো নিভিয়ে দিলে প্রয়োগের দিক দিয়ে উপযুক্ত হবে।

গ) অনুরাধা রায় কেবল সুন্দর মুখশ্রীর উপর ভরসা না রেখে স্বরক্ষেপণ-এর কৌশল ও কণ্ঠস্বরের পরিণতির দিকে লক্ষ্য দিলে ভালো হয়। অবাঞ্ছিত মেদ ঝরিয়ে আর একটু সহজ সংস্করণ হতেই বা বাধা কি?

ঘ) সঙ্গীত অংশে সময় কাটানোর ব্যবহারিক অসুবিধা থাকলে বিভিন্ন ভাব ও সময় অনুযায়ী ভারতীয় রাগসঙ্গীতের তান বা আলাপ মৃদু গ্রামে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট

দেবরাজ রায়কে আবার দুটো কারণে প্রশংসা করা প্রয়োজন।

এক) তিনি 'তরুণ রায়'-এর পরিচালনা ও অভিনয়-পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন।

দুই) অনেককে (যেমন বর্তমান প্রতিবেদককেও) আবার 'বিষবৃক্ষ'র মতো সুন্দর উপন্যাস পড়তে বাধ্য করেছেন।

'অমৃত'-এর পাতায় বিষবৃক্ষের আলোচনা শেষ করলাম। ভরসা করি এতে মঞ্চে অমৃত ফলবে।

সুরজিৎ ঘোষ

রবীন্দ্রসংগীতের আসর

গত দেড় মাসব্যাপী রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে রবীন্দ্রসংগীতের আসরের সংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে আটটি। শিল্পী সংখ্যা ১৫৩। সীমিত পরিসরে আরও বেশী হতে পারে। এদের অনুষ্ঠানের ডিটেইলড আলোচনায় মধ্যে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যা শুনেছি এক ঝলক স্মরণের আলোপাতে সে অভিজ্ঞতা একটি কথাই বলে একেবারে শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের দোসর পরের যুগের শিল্পীদের মধ্যে পাওয়া কঠিন। কিন্তু তাঁদের দীর্ঘ-দিনের চিন্তা, সাধনা, মননশীলতা আবেগের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা জাত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের উন্নত ঐতিহ্যকে অনাহত রাখবার মত কেন কিছু সুকণ্ঠের অধিকারী শিক্ষিত শিল্পগোষ্ঠী পরের যুগের শিল্পীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সুচিত্রা মিত্রর 'রইলো বলে রাখলে কারে'র দৃপ্ত চ্যালেঞ্জ, কিংবা কণিকার 'পথ চেয়ে যে কেটে গেল' গানটির ঘোমটা পরা মিস্টিক সৌন্দর্যচেতনা মনের মধ্যে যে মুগ্ধ আবেশের মায়া রচনা করে সে ত সৃষ্টিধর্মী শিল্পের পর্যায়েই পড়ে। হেমন্তবাবুর গানের নিরলংকার স্বচ্ছ রূপ, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের আবেগভরা রোমান্টিক আবেদন কিংবা অশোকতরুর 'আমি নিশি-দিন কত'— সুরের গুঞ্জনে মনকে আনমনা করে তোলে। প্রসাদ সেন দ্বিজেন মুখো-পাধ্যায়, নীলিমা সেন, মায়া সেন, গীতা সেন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সুবিনয় রায় পাণ্ডিত্য বিদগ্ধতা সব মিলিয়ে নিজস্ব এমন একটি ঐতিহ্য রচনা করেছেন যার নকল-নবীশী সম্ভব নয়। নীলিমা সেনকে শুনলাম না কেন? এ আসরে দেবব্রত বিশ্বাসের গানও শোনা যায়নি যিনি একাই একটি প্রতিষ্ঠান। শোনা যায়নি শান্তিদেব ঘোষের গানও।

পরের যুগের পুরোভাগে রয়েছেন ঋতু গুহ, অর্ঘ্য সেন এবং এ'দেরই সমান্তরাল পঙক্তিতে সাগর সেন অরবিন্দ বিশ্বাস চিত্রলেখা চৌধুরী গীতা ঘটক, সুমিত্রা সেন, শান্তি গুপ্ত। বনানী ঘোষ পূরবী মুখোপাধ্যায় স্বপ্না ঘোষাল, বাণী ঠাকুর পূর্বা দাম, মানের তারতম্য সত্বেও সুখকারী।

এদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এ'দের অনেকের মধ্যেই গায়কী পূর্বসূরীদের প্রভাব সমৃদ্ধ কিন্তু এ'দের মাঝে ও আগে থাকে বলে ইনবিটুইন কিছু শিল্পী আছেন যাঁরা বহুদিন ধরে গাইছেন গান শুনলে ভালও লাগে কিন্তু যে মনোযোগ এ'দের প্রাপ্য তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। এ'দের মধ্যে আছেন সুপ্রীতি ঘোষ শৈলেন্দ্র [illegible]। [illegible]।

অবন মিস্ত্রি

বন্দনা সিংহ ও মঞ্জরীলালও তাঁদের গানে প্রশংসাযোগ্য মানের স্বাক্ষর রেখেছেন।

পরের যুগের তরুণের শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কয়েকজন শিল্পী আছেন যাঁদের গান মনের রীতিমত দাগ কেটেছে। এ'দের মধ্যে টপস্টার অবশ্যই রণো গুহঠাকুরতা। কণ্ঠের স্বপ্নময় আবেশ, গানের ভেতর তলিয়ে যাওয়া কণ্ঠের কারুকৃতি সব মিলিয়ে তিনি রীতিমত একটি পরিবেশ রচনা করতে পারেন। শিখা বসু শর্বানী সেনগুপ্ত, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য।

তিন কন্যার (গুহঠাকুরতা মিত্র ও সরকার) মধ্যে প্রথম দুজন ত প্রতিষ্ঠিত শিল্পীই। কিন্তু কম পরিচিত হলেও কৃষ্ণা সরকারের গাওয়া মেঘছায়ে সজল বায়ে ও 'ঝরঝর বরিষে' আমার মনকে আকর্ষণ করেছিল সুরভরা কণ্ঠ সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও গাইবার তন্ময় আন্তরিকতার জন্য। উদ্যোক্তাদের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল ইনি শৈলজারঞ্জন মজুমদারের শিষ্যা।

সংঘমিত্রা গুপ্তর গাওয়া অন্ধকারের উৎস থেকে ও এ পরবাসে রবে কে'—শুধু উঁচুমানের নয়। প্রতিশ্রুতিদীপ্তও। গীতা মাইতি, শ্রীনন্দা চৌধুরী বুলবুল সেন-গুপ্ত, শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্য মীরা গুপ্ত, ছন্দা দাশগুপ্ত, বনানী গোয়েংকা গান মন দিয়ে শোনবার মতই। প্রভাতকুমার পাল ও সুশান্ত সেনের গান আগেও শুনেছি। এবারে অনুশীলনে আরো উজ্জ্বল। বীথিন বন্দ্যো-পাধ্যায় সমীরণ মুন্সী চিত্তপ্রিয় মুখো-পাধ্যায় বরাবরের মত এবারেও শ্রুতিশোভন।

সত্রাজিৎ বসু এক প্রডিজি। বালকের কণ্ঠে 'চিরসখা হে ও এ কী সুন্দর শোভার অমন প্রাঞ্জল রূপায়ণ দুর্লভ অভিজ্ঞতা। এই প্রসংগেই মনে আসে বার বছরের বালিকা অর্পিতা সেনের কথা। এ আসরে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই কেন?

অরুন্ধতী হোমচৌধুরী যদিও একান্ত ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই শিল্পী নন কিন্তু মার্জিত মধুর কণ্ঠ আবেগ পরিবেশনার স্টাইল সব মিলিয়ে রীতিমত এক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

মহিলা তবলিয়া অবন মিস্ত্রি

সি মিভস ইন মিউজিক মুভস ইন মিউজিক এ্যান্ড হ্যাজ হার বিয়িং ইন মিউজিক—ভারতের একমাত্র এবং অপ্রতি-দ্বন্দ্বী মহিলা তবলিয়া শ্রীমতী অবন মিস্ত্রীর প্রায় দু ঘণ্টাব্যাপী তবলা লহরা অনুষ্ঠান শুনে উচ্ছসিত আবেগে বললেন, সেদিনের সভায় উপস্থিত হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি এবং রাইচাঁদ বড়াল প্রথম থেকে শেষ অবধি এ অনুষ্ঠান পরম আগ্রহে রীতিমত বিস্মিত ও আনন্দিত। কয়েকদিন আগে জে জে আত্মীয়া হাই স্কুল হলে মঞ্চস্থ এ আসরের উদ্যোক্তা দক্ষিণ কলকাতার অগ্রণী সংস্থা।

সেই তবলা লহরা অনুষ্ঠানের আলোচনা মূল উদ্দেশ্য হলেও সাংবাদিক হিসেবে এই প্রতিবেদিকার এই শিল্পী সম্বন্ধে দু-একটি তথ্য জানানো অবশ্য কর্তব্য। তাঁর সংগীত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সুবিস্তীর্ণ পটভূমিকা এবং বাজনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করবার জন্য।

শ্রীমতী অবন কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে দীর্ঘদিন ধরে তালিম নিয়েছেন যথাক্রমে পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণজী বোদাস ও পণ্ডিত কেকী জিজিনার কাছে। এছাড়া ইনি কথক নৃত্যও শিখেছেন। এরই ফাঁকে 'ইন্দিরা সংগীতে সাহিত্যরত্ন (এম-এ) সেতারে সংগীত অলংকার ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন।

লয় ও সুরের এই শিক্ষা ও অনুশীলন সঙ্গীত মানসকে এমন সমৃদ্ধ করেছে বলেই শিল্পী অল্পদিনের শিক্ষা ও রেওয়াজ তবলার ওপর তাঁর অনায়াস কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তবলা-নওয়াজ ওস্তাদ আমীর হোসেন তাঁর তবলার গুরু।

সেদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল পাঞ্জাব ঘরানার নকসায় পরিবেশিত পঞ্চম সওয়ারী দ্রুত একতালের পেশকার কায়দা, পরণ চক্রধার দিয়ে। প্রথমেই যে বস্তুটি নজরে এসেছিল সেটি হল মহিলা হয়েও হাতের পৌরুষ দীপ্তি যার পাঁচকে সওয়ারীর মত জটিল ছন্দের বিভিন্ন আঙ্গিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। শিল্পীর ভাল হাতের বোল আত্মবিশ্বাস ও দুঃসাহসের গৌরবে ধ্বনিত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর সদাসজাগ এস্থেটিক চেতনা মুহূর্তের জন্যও স্তিমিত হয়নি। কখনও চুপি চুপি কথা বলার মত মৃদু ধ্বনিতে অনুরণিত পরক্ষণেই সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের তটের বুকে আছড়ে পড়ার বিপুল উচ্ছ্বাসের মত

চক্রধারবাদ্যে আবর্তনের পর সমে ফেরার আনন্দ উচ্ছ্বল। সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে একটা সংগতিভরা ধ্বনিসাম্য। এই পর্যায়ে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল তাঁর কণ্ঠ-সংগীত শিক্ষা ও চর্চার অভিজ্ঞতার।

পরের পর্যায়ে এক স্বাদবৈচিত্র্য নিয়ে এল তবলার সুদীর্ঘ বোল। উচ্চারণ সৌকর্য ও সুরেলা আবৃত্তিতে এবং সেই বোল তবলায় অনুরণিত করবার উল্লাস তাঁর কথক নৃত্যে শিক্ষার ফলশ্রুতিই এখানে রসসৃষ্টিতে সহায়ক হয়ে ওঠে।

তবলার বোলবিস্তার এখানে সু-দক্ষ শিল্পীর কণ্ঠে ধ্রুপদ খেয়ালের সুর-বিস্তারের মতই আকর্ষণীয়। 'তাগিনা তেটে ধেটে'র তা - ধা'র স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ, এক বোল থেকে অন্য বোলে অনুধাবন, গানের সুরে এক শ্রুতি থেকে অন্য শ্রুতিতে যাওয়া-আসার দোলাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। শ্রীমতী অবনের লয় বিবর্তনে হাতের দাপট ও ধারণার সুস্পষ্টতার এক দুর্লভ সমন্বয়। অসমমাত্রার চক্রধারের ফাঁকে ফাঁকে তেহাই-এর বৈচিত্র্য বেশ চমকপ্রদতা সৃষ্টি করছিল।

সওয়ারী তালে যদি ধ্রুপদ অঙ্গের ভারী কাজ রূপ পেয়ে থাকে দ্রুত এক-তালের গত ও কায়দায় খেয়ালের সূক্ষ্ম কারুকার্যতার ওপর তাঁর মুন্সীয়ানাকে শ্রোতাদের মর্মগোচর করেছে। এবং এ-সবের পর নাচের ছন্দে বেজে-ওঠা ঝাঁপতাল, চৌতাল, ত্রিতাল, রূপক, একতাল, ধামারে তেহাই-এর গুচ্ছ তাঁর শিল্পীমনটি স্বাক্ষর ছিল।

ডানহাতের তুলনায় শিল্পীর বাঁ-হাত একটু কমজোরী। তবে তাঁর বাজনার সামগ্রিক জৌলুষ তাতে একটুও ব্যাহত হয়নি। শিল্পী এ বিষয়ে একটু সচেতন হলেই এ বাধা কাটতে দেরী হবে না।

বেনারস ঘরানার গণেশ পরণ দিয়ে শিল্পী তাঁর অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। হার্মোনিয়মে তাঁকে সহযোগিতা দিয়েছেন গুরু কেকী জিজিনা। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য 'দি এভোলিউশন অফ্ দি ইনস-ট্রুমেন্টস অফ্ তবলা ও পাখোয়াজ এ্যান্ড ভেরিয়াস স্কুলস ক্যারেকটারিসটিকস এ্যান্ড টেকনিক্স অফ সোলো এ্যান্ড একম্-প্যানিমেন্ট'— ওপর সম্পূর্ণ থিসিস তাঁর অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন।

সেদিনের আসরের সুরুতে 'বড়ে গোলাম আলি খাঁর নাতি, মুনাব্বর খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দশ বছরের বালক সাজ্জাদ আলি খাঁর ঠুংরী, দাদরা গেয়ে শোনান। স্বর্গত ওস্তাদের সেই ভাল জনপ্রিয় গান-- 'আ যা বালম' বা 'আয়ে ন বালম'-- অতীতের অনেক আনন্দমুখর মুহূর্তকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।— বাবা, কাকা, দাদাদের রেওয়াজ শুনে কিংবা কিছু তালিমে গড়ে-ওঠা এই সঙ্গীতবোধ তার পারিবারিক সম্পত্তির মতই। সাজ্জাদ খাঁ, সুকণ্ঠ, লয় ও তালে নি-খুঁত।

মীনা তালসিয়ান ও রীতেশ দাস

সম্প্রতি কড়েয়া রোডে নৃত্যভারতীর মুক্ত মঞ্চে গুরু প্রহ্লাদ দাস ও নীলিমা দাস কলারসিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সম্পূর্ণ অ-পরিচিত এবং নবাগত এক কিশোরী নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে। নবীন প্রতিভা পরিভাষাটির বহুল প্রচলনে ঐ কথাটির ধার ক্ষয়ে গেছে। তবু এ ক্ষেত্রে ঐ কথাটির যথাযথ প্রয়োগের লোভ সামলাতে পারছি না। শ্রীমতী মীনা তালসিয়ান,— ঐ পরিভাষার নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

বাঈ-কালচার, আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। ওদের অনেকেই আজ স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করে বৃহত্তর সমাজের অঙ্গীভূত কারণ জমানা বদ্‌ল গ্যায়া। কিন্তু অবশিষ্ট কিছু নৃত্য ও সঙ্গীতজীবীরূপে এখন যাঁরা এই শিল্পকলাকে আশ্রয় করে বাঁচতে চান এই রকমই এক পরিবারজাত নৃত্যশিল্পী মীনা, তাল, লয়, নৃত্যসুষমা যার মধ্যে বর্তেছে জন্মগত অধিকারের জোরেই। তাঁর প্রথম নৃত্যশিক্ষা পণ্ডিত রামনারায়ণ মিশ্রর কাছে। বর্তমানে ইনি গুরু বাচচালাল মিশ্রের শিষ্যা।

মীনা সেদিন দেখালেন কত্থক নৃত্যের কয়েকটি অঙ্গ। তাঁর মধ্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তুটি হল, মাধুর্য সৃষ্টির নৈপুণ্য। আরম্ভেই ঠাটের অঙ্গে পূর্বা-ভাসে কথক নৃত্যের রূপটি যেন ভঙ্গির আয়নায় স্বচ্ছ প্রতিফলন ঘটল। আমাদের পর্যায়ে থেকে তবলার ঠেকা ও তেহাই-এর আবর্তন শ্লথ গতির রেখাচিত্র হয়ে উঠে ছিল। কথকের সভা ভাবকে মীনা অনায়াস দক্ষতায় জমিয়ে তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তথ্য হল এই যে নৃত্যে দ্রুত লয়কে আশ্রয় করে বিদ্যুৎ গতির কেরামতি দেখিয়ে তাক লাগাবার প্রবণতা শিল্পীর একেবারেই ছিল না। বরং লয়জ্ঞান প্রবল বলেই ঢিমা এবং মধ্যলয়কে আশ্রয় করেই তিনি ভঙ্গি ও গতিছন্দের মধ্যে সুন্দর একটি সামঞ্জস্য বজায় রেখেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পণের মাত্রার অসম বিভাগ আড়ি অথবা অনাঘাত তালের নৃত্য পর্যায়ও কঠিন লয়ে গুণে গুণে পা ফেলার আড়ষ্টতা বা আয়াসসাধ্যতা মুহূর্তের জন্যও গতি প্রবাহের সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করেনি। কারণ নৃত্যমুখর মুহূর্তগুলি এসেছে নদীর ঢেউ-এর মতই স্বতঃস্ফূর্ত ধারায়। দুনী-লয়ের বোল, কিয়ং পাল্টা গত সব কিছুরই গীতিকাব্যিক রূপটির ওপরই শিল্পী বেশী জোর দিয়েছেন বলেই তৎকার অঙ্গে দ্রুত-লয়ী রোমাঞ্চের অভাব মনের মধ্যে তেমন কোনো হা-হুতাশ সৃষ্টি করেনি।

প্রহ্লাদ দাস মহাশয়ের তরুণ পুত্র সুপরিচিত কথক নৃত্যশিল্পী চিত্রেশ দাসের ভাই এবং শংকর ঘোষের শিষ্য রীতেশ দাস আগাগোড়া তবলা সঙ্গতে লয়ের ওপর প্রশংসাযোগ্য দখল এবং রেলার প্রয়োগকুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। হাতের আওয়াজ আর একটু ওজন এলে তাঁর বাজনায় খুঁত ধরা শক্ত হবে। হার্মোনিয়ম সঙ্গতে ছিলেন প্রঃ বাচচালাল মিত্র।

এ নৃত্যের আগে নৃত্য ভারতীর ছাত্র-ছাত্রীরা নৃত্য ও গীত ও বাদ্যযন্ত্রের এক বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। এ উৎসবের উদ্যোক্তা তরুণ শিল্পী সমবায়ে গঠিত বেহাগ প্রতিষ্ঠান।

সন্ধ্যা সেন

রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

'গোবরা ইয়ং অ্যাথলেটিক' ক্লাবের আলোচ্য অনুষ্ঠানে নজরুল-এর উপস্থিতিও ছিল রবীন্দ্রনাথের পাশে স্বমহিমায়। শিব-তলা ময়দানের এই আড়ম্বরহীন ছোট মণ্ডপ সেদিন গানে সুরে ঝমঝম করে উঠে-ছিল। সুস্থ সংস্কৃতিতে অংশ গ্রহণের অধিকার সকলেরই। আন্তরিকতাই বড় কথা, প্রাচুর্য নয়। সেদিন 'বেবী ভট্টাচার্য, দে[illegible] শিস গঙ্গোপাধ্যায়ের গানের সঙ্গে '[illegible]'-এর শিল্পীবৃন্দের একক ও সমবেত সঙ্গীতে এই আন্তরিকতাই ঝরে পড়েছিলো অকৃপণ, একক কণ্ঠে যাঁরা সেদিন সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছেন তাঁরা হলেন অঞ্জন মিত্র, কুনাল মাইতি, ঝর্ণা মান্না এবং অশোকতরু মুখোপাধ্যায়।

শ্যামা

সুর মহলের শ্যামা নৃত্যনাট্য ও নজরুলগীতি বাসুদেব মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নজরুলগীতি পরিবেশন করেন অজিত বিশ্বাস, লেখা ঘোষ এবং ভারতী গুহ। শ্যামা পরিচালনা করেন অতুপ বিশ্বাস। তবলা সঙ্গত করেন কল্যাণ দাশ। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যাচচু বিশ্বাস।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

অমৃত

১৯ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা
১৭ শ্রাবণ, ১৩৮৬
3 August, 1979

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী

স্বচ্ছল সংসার

লিখেছেন দীপংকর চক্রবর্তী

গল্প লিখেছেন অশেষ চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণ সেন

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর আলোচনা

পুতুল নাচ

একটি গাছ, একটি প্রাণ

বছরের এই সময়টিতে বন-মহোৎসব উপলক্ষে গাছপালা লাগান হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। উপরন্তু গাছের সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানোর জন্যে এ বছর কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে চমৎকার এক ঘোষণাবাণী প্রচারিত হয়েছে।—একটি গাছ, একটি প্রাণ। তাতে বাস্তব বোধেরও পরিচয় পাওয়া গেছে।

সকলেই জানেন, পাতাল রেলের কাজের জন্যে এবং যানবাহন চলাচলের সুবিধের জন্যে কয়েক বছর ধরে কলকাতায় গাছ কাটা হয়েছে অজস্র। পঁচিশ-ত্রিশ বছর এমন কি আর বেশি পুরনো গাছগুলো কাটতে দেখে অনেকেরই ভাল লাগেনি, লাগার কথাও নয়। শোভার কথা বাদ দিলেও ছায়ার প্রশ্ন এড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে পথচারীদের ক্ষেত্রে। কিন্তু তার চেয়েও জোরাল যুক্তি ছিল, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার দিক থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে নীরব থেকেছেন বৃহত্তর স্বার্থের মুখ চেয়ে। কলকাতার মত শহর, যার পরিকল্পনাহীন আয়তন বৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় তিনশ বছর ধরে, সেখানে আধুনিক কালের যান-বাহনের চাপ হাল্কা করার জন্যে রাস্তা চওড়া করা অপরিহার্যই বলতে হবে।

তাছাড়া তখন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, যত গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি গাছই তাঁরা লাগিয়ে দেবেন আবার। সেই আশ্বাসটি তখন কলকাতার অধিবাসীদের মনে আশার সঞ্চারও করেছিল যথেষ্ট। কিন্তু কার্যকালে দেখা যাচ্ছে সংকল্প ও বাস্তবে পার্থক্য ঘটছে। বিশেষ করে পথের পাশে গাছ লাগানোর ব্যাপারে তো বটেই।

অবিশ্যি সংখ্যার দিক দিয়ে হয়ত কাটা-গাছ আর লাগান-গাছে গরমিল ঘটছে না খুব একটা। এমন কি কেটে ফেলা গাছের চেয়ে বেশি গাছই হয়ত লাগান হচ্ছে। কিন্তু অতীত ও বর্তমানে পার্থক্য থেকে যাচ্ছে তবু। ৫০ বছরের ছায়াতরুর জায়গায় ৫ মাসের চারা গাছ চোখেই পড়ছে না। ছায়া বা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে ইকোলজি, কোন দিক থেকেই কাজে লাগছে না। বস্তুত নিয়মরক্ষা ছাড়া এই ধরনের বৃক্ষ রোপণে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হচ্ছে না।

একালের প্রযুক্তিবিদ্যা অনেক জটিল সমস্যারই সহজ সমাধানের উপায় বাতলে দিতে পারে বলে শোনা যায়। বিদেশে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে নতুন রাস্তা তৈরি করার সময় বহুতল ফ্ল্যাট-বাড়িকে রাতারাতি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে অন্য এলাকায়। সেই উপায়ে শিশুতরু না লাগিয়ে অন্যত্র থেকে তুলে এনে কিশোর গাছও তো পুঁতে দেওয়া যায় পথের পাশে এবং মাঠে-ময়দানে।

ধোঁয়ায় বিষে জর্জরিত কলকাতা তাহলে হয়ত একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারত।

সাহিত্য ইত্যাদি

যেতে যেতে একলা। শঙ্খ

প্রায়ই দেখা যায় কোনো একটা বিশেষ সময়ে লিখতে শুরু করে নাম করলেন কেউ, কিন্তু পরে তিনি খানিকটা চাপা পড়ে গেলেন। একটু ভাবলেই আমরা এ রকম লেখকের তালিকা তৈরি করতে পারি।

'কল্লোল' ছিল রবীন্দ্র-পরবর্তী নতুন লেখকদের নিজের কাগজ। অচিন্ত্যবাবু সে বিষয়ে অনেক কথা লিখে গেছেন। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। কল্লোলে সেকালে একজন কবির লেখা প্রায়ই চোখে পড়ত। তাঁর নাম হেমচন্দ্র বাগচী। কিন্তু এখন সে নাম ক'জনের মনে পড়ে?

হেমবাবুর কবিতা 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে স্থান পেয়েছে। 'কল্লোল'-এর পর যখন 'কবিতা' পত্রিকা বেরোতে শুরু করে তাতেও লিখতে শুরু করেন হেমবাবু। বুদ্ধদেববাবু তাঁকে বেশ সখ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করতেন, দেখেছি। একদিন হেমবাবু তাঁর ছেলেকে নিয়ে বুদ্ধদেববাবুর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। সেদিন বেশ সমারোহের সঙ্গেই তাঁকে আপ্যায়ন করেছিলেন বুদ্ধদেববাবু। হেমবাবু তখন বোধহয় শিক্ষকতা করতেন ভবানীপুরের পদ্মপুকুর ইশকুলে।

হেমবাবুর কবিতায় আধুনিকতা হয়তো খুব একটা ছিল না, কিন্তু কবিত্ব ছিল। তাঁর লেখায় আয়োজন থাকত কম, তবু সেই স্বল্প উপাচার দিয়েই তিনি বেশ শান্তির পরিমণ্ডল তৈরি করতে পারতেন। অন্তত আমি তাঁর যে-সব লেখা পড়েছি তাতে এই-রকমই মনে হয়েছে।

কিন্তু ঐ যে বলেছি, তাঁর কবিতা আধুনিক ছিল না খুব একটা। আধুনিকতার যা গোড়ার কথা সেই বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং টেনশান, কোনোটাই তার মধ্যে খুব একটা স্পষ্ট ছিল না। যা ছিল তাকে বলা যায়, অস্পষ্ট একটা মন-কেমন-করা, একটা নস্টালজিয়া। আর এসব তো যে-কোনো রোমান্টিক কবিতারই কুললক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ থেকে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সকলের কবিতাতেই এ বস্তু অল্পবিস্তর পাওয়া যাবে। এদিয়ে কেউ আধুনিকতার রাজ্যে ভিসা পাবেন না। হেম বাগচীও পান নি।

আধুনিক বাংলা কবিতা অ্যানথোলজিতে হেমবাবুর অনেকগুলো ছোটো ছোটো কবিতা স্থান পেয়েছিল সে সময়। সেটা আমার বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধদেববাবুকে বলতে, তিনি একমত হলেন না। বললেন 'না না, হেম একজন সিগনিফিক্যান্ট পোয়েট।

এবং আশ্চর্য এই যে, প্রেমেনবাবুকে যখন পরে এ প্রসঙ্গে বলি, তিনিও দেখেছি বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে একমত হয়েছেন। বলেছিলেন, যদ্দুর মনে পড়ে, 'হেমের অবিশ্যি অন্য একটা ইয়ে আছে।'

অবশ্যই আছে। হেম বাগচী অ-কবি নন, তুচ্ছ লেখকও নন। কিন্তু সংকলনে তাঁকে যতোটা জায়গা দেওয়া হয়েছিল, ততো বড় লেখক কি?

দশ পনের বছর পরেই বোঝা গিয়েছিল তিনি তা নন। এবং এখন বলতে গেলে তিনি প্রায় একেবারেই বিস্মৃত। এ নিষ্ঠুরতাও বাড়াবাড়িই হয়েছে। পরবর্তী কালের কাছে তিনি আরো একটু সদয় ব্যবহার পেতে পারতেন। সে সুকৃতি তাঁর ছিল।

হেমবাবুকে আরো একবার আমি দেখেছি। না দেখলেই বোধহয় ভালো হত। জীর্ণশীর্ণ উদ্‌ভ্রান্ত হেমবাবু। পরিচয় দেওয়া সত্ত্বে চিনতে পারলেন না আমাদের কাউকেই। পরিচয় করার মতো মানসিক অবস্থাতেই ছিলেন না তিনি। অনেকটা নজরুলের মতো আর কি। আমরা ক'জন সেদিন কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলাম তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। কিন্তু তিনি তখন এ সবের ঊর্ধ্বে। সারাক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন এক-দিকে। কিছুই বললেন না।

আমাদের বন্ধু কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও শেষের দিকে মনোবেদনার সঙ্গে দিন কাটিয়ে গেছেন। এককালে তাঁর নাম সমর সেনের সঙ্গে একযোগে উচ্চারিত হত। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় তিনি ছিলেন প্রতি-সংখ্যার লেখক। খ্যাতির পেয়েছেন তিনি সেকালের প্রধান কবিদের কাছে বড় কবির মতোই। কিন্তু তাঁর প্রকৃত কবি-জীবন বছর দশেকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। তারও পরে অবিশ্যি তিনি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু লিখেছেন। কবিতার সংখ্যা কমই, অনুবাদই বেশি। মনে পড়ে, তাঁর বন্ধু সমর সেন তাঁকে ঠাট্টা করে একবার বলেছিলেন, পুজো স্পেশাল পোয়েট।' শুনে তিনি হেসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কষ্টও পেয়েছিলেন। তাঁর সে বেদনা আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছি। কেননা আমার জানা ছিল, একদা তাঁর কবিতা ও গল্প ছিল পুজো সংখ্যাগুলোর উজ্জ্বল আকর্ষণ। আর তাঁর লেখা ছোটোদের গল্পগুলো ছিল হাসির ফুলঝুড়ি। যেমন স্মার্ট তার স্টাইল, তেমনি ঝকঝকে ভাষা। কোথায় গেল সে সব।

কামাক্ষীবাবু (এবং সমরবাবুও) আমার চেয়ে ছিলেন বছর তিনেকের বড়। কিন্তু লেখার দিক থেকে সিনিয়ার হবার জন্যেই হোক, কিম্বা বুদ্ধদেববাবুর কবিতাভবনে বয়স্ক কবিদের সঙ্গে সমানে-সমানে আড্ডা দেবার জন্যেই হোক, বেশ একটু মুরুব্বির চালে চলতেন সে সময়। অবিশ্যি তার মানে এ নয় যে, তিনি আড্ডা দিতেন না আমাদের সঙ্গে। খুবই দিতেন। তিনি এবং তাঁর ভাই দেবীপ্রসাদ দুজনেই রীতিমত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে মিশতেন। একবার তো মনে পড়ে কোনো এক দোলের উৎসবে সারা রাতও কাটিয়েছি তাঁর বাড়িতে। খাওয়া থাকা শোওয়ার ব্যাপারে কী যত্নই যে সেদিন করেছিলেন দু' ভাই কি বলব। রীতিমত খনেদী পরিবারের চাল-চলন। অথচ বাইরে তাঁরা ছিলেন ডাকসাইটে বোহেমিয়ান।

লেখা ছাড়াও ফোটোগ্রাফী এবং অভিনয়ের দিকেও ঝোঁক ছিল কামাক্ষীপ্রসাদের। রবীন্দ্রনাথের ছবিও তুলেছিলেন তিনি। তাছাড়া সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন—এঁদের তো অনেক ছবিই তুলেছিলেন একসময়। আর অভিনয়, হ্যাঁ, ইয়েটস-এর রেসারেকশন কাব্য-নাটিকাটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন সুধীন বাবু। 'পরিচয়ে' তা ছাপাও হয়েছিল। সেই নাটকটিরই অভিনয় করেছিলেন কামাক্ষীবাবুরা। যদ্দুর মনে পড়ে আশুতোষ কলেজের দোতলার হল-ঘরে হয়েছিল অভিনয়। '৪০-এর গোড়ার দিকেই বোধহয়। কামাক্ষীবাবু করেছিলেন গ্রীকের পার্ট। ফর্সা রঙের ছোটোখাটো মানুষটিকে চমৎকার মানিয়েছিল সেদিন। আর অভিনয়ও করেছিলেন ভালোই। কতো বছর আগের কথা। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

অথচ লেখক কামাক্ষীপ্রসাদ হয়ে যাচ্ছেন দূরের মানুষ!

সময়ের এই নির্মম চালুনীর কথা ভাবলে মন বাস্তবিকই বড় বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কী উদাসীন এই মহাকাল!

অরুণকুমার রায়

হারানো বই

দেবাদিদেব মহাদেব নিজের দুই ছেলেকে নিয়ে বিব্রত। দুটোর একটাও মানুষ হল না। নারায়ণকে দুঃখ করে বলছিলেন—কার্তিকটা তো ঘোর ইয়ার হয়ে উঠেছে, রাতদিন কেবল আয়না বুরুস নিয়েই আছে, আর ল্যাভেন্ডার ওডিকলন প্রভৃতি কি ছাই ভস্মগুলো মাথায় লেপছে। বেটা কালাপেড়ে সিমলার ধুতি না হলে পরেন না এবং পাঁচ টাকা দামের চীনেম্যানের বাড়ীর জুতো না হ'লে পায়ে দেন না। আমি পয়সা বাঁচিয়ে বাঘছালে লজ্জা নিবারণ করে বেড়াই —বেটা আমার সিল্কের পাঞ্জাবী পোরে তেড়ী কেটে বাবু সেজে বেড়ান।

আর গণেশ! বেটা প্রত্যহ আধমণ করে সিদ্ধি খায়। দুঃখের কথা বলবো কি,—আজকাল আবার নাম হয়েছে সিদ্ধিদাতা গণেশ।

ইন্দ্র, বরুণ, নারায়ণ, ব্রহ্মা গিয়েছিলেন শিব ঠাকুরের কাছে। ওরা মর্তের অবস্থা একবার সরেজমিনে তদন্ত সারতে চান। ব্রহ্মাকে ডাকতে গিয়ে দেখেন—তার মানস সরোবরে পানা ভর্তি। বছর কয়েক ভাল বৃষ্টি হয়নি। জলাভাবে মাছ মরে যাচ্ছে। পদ্মযোনি বাঁধাঘাটে বসে কাক তাড়াচ্ছে। মরা মাছ ভেসে উঠলেই তাকে তুলে এনে রাখছিল এক জায়গায়। তাহলেও চিল, মাছরাঙা আর শিকার পাখি মাছ নিয়ে পালাচ্ছিল। রেলিবাদারের ধোয়া থানপরে শিং তোলা কটকের জুতো পায়ে পিতামহ ব্রহ্মা বাগানে ঘুরছিলেন।

এমন সময় ইন্দ্র আর বরুণ গিয়ে ওঁকে পাকড়াও করলেন। একবার মর্তটা দেখে আসা দরকার। নানান অনাচার চলেছে। চুপ চুপ বসে থাকা যায় না। তারপর ইন্দ্র বরুণ গিয়ে নারায়ণকে পাকড়াও করে আনলেন। কিন্তু শিব ঠাকুর নিজের সংসারের দুয়ো দিয়ে ওদের সঙ্গ নিলেন না।

প্রথম এসে নামলেন হরিদ্বার। তখন শীতকাল। পাহাড়ে দেশ। শীতের ভয়ে দেবতারা সঙ্গে এনেছিলেন গরম জামা কাপড়। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রহ্মার কষ্টের শেষ ছিল না। খেপে গিয়ে বললেন—হরিদ্বার না যমের দ্বার। দেখ দেখি, আমার কটকের চটিতে বরফ উঠছে আর শীতে হাত পা পেটের মধ্যে প্রবেশ করছে। আগুন কর না হলে মরে যাই।

একটা কুড়ে ঘরে গিয়ে উঠলেন ও'রা। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সেরে ব্যাগ থেকে [illegible] সন্দেশ বের করে খেলেন। তারপর গেলেন কুশাবর্ত ঘাট দেখতে। কয়েকটি জায়গা ঘুরে, এক্কা চেপে ওরা এলেন সাহারাণপুর বাজারে। চারদিকের খাবারওয়ালা, দোকানদার [illegible]

দেবগণের মর্ত্যে আগমন

[illegible] বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত [illegible]

দুর্গাচরণ রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
[illegible]

এদিকে আসুন। দেবতারা পড়লেন মহা সমস্যায়। যাবেন কোথায়!

ইংরেজদের ডাকব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্র ঠিক করলেন, আমি স্বর্গে যাইয়া পোষ্ট অফিস স্থাপন করিব।

দিল্লীতে ওরা অনেককিছু দেখলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ নেই। এখানে যে দুর্গ ছিল, এখন তাকে চেনা কঠিন। যেখানে অর্জুনের কেল্লা ছিল, সেখানে তৈরি হয়েছে হুমায়ুনের মসজিদ। শের-শার প্রাসাদের ওখানেই পান্ডুপুত্ররা নারায়ণ আর মহর্ষি ব্যাসের সঙ্গে ছিলেন। যেখানে রাজসুয় যজ্ঞ হয়েছিল তার ওপরেই হয়েছে নতুন দিল্লী। বর্তমানে আগমযোড়ের ঘাটে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

কুতুব মিনার দেখতে গিয়ে ব্রহ্মার চোখ কপাল থেকে নামে না।

হুমায়ুন বাদশাহের কবর দেখে ব্রহ্মা অবাক। বরুণ বললেন, এটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল প্রায় পনের লক্ষ টাকা। ওখানে হুমায়ুনের প্রিয় বেগম হামিদা ভানুর ও দারার কবর আছে। জুমা মসজিদ প্রায় দুশ এক ফিট লম্বা, একশ কুড়ি ফিট চওড়া। মাথায় তিনটি গিলটে করা লাল ও কালো পাথরের সুসজ্জিত স্তম্ভ আছে। মন্দির তৈরিতে দশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল।

কানপুর ঘুরে লক্ষ্ণৌ এলেন। শোনা যায় লক্ষ্ণৌ বানিয়ে ছিলেন রামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ। জয়গাগ্র কেলবাগ ঘুরে দেখলেন ছত্র মসজিদ। সিপাহী যুদ্ধের স্মরণকর স্মৃতি চিহ্ন রেজিগার্ড দেখলেন। এলেন [illegible] [illegible] হাইদারের কবরে। নারায়ণ বললেন—বরুণ! চল ভাই বাই নাচ দেখে আসি। লক্ষ্ণৌ-এর বাই বড় বিখ্যাত। অতএব লক্ষ্ণৌ এসে বাই নাচ না দেখলে দেখলাম কি।

ওরা বাই নাচ দেখতে চললেন। তাদের রূপে আর স্বরে দেবতাদের মাথা ঘুরে গেল। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, 'অমরাবতীতে মেনকা প্রভৃতিকে অদ্বিতীয়া সুন্দরী ভাবিয়া আমরা গর্ব করিতাম কিন্তু মর্তেও দেখিতেছি তাহাদের ন্যায় সুন্দরী আছে।'

এবার ওরা এলেন কাশী। মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নান সেরে কুমারী ভোজন করালেন। তারপর শহর ঘুরতে বেরিয়ে দেখা শিব ঠাকুর আর অন্নপূর্ণার সঙ্গে। শিবঠাকুর তখন গাজা খেয়ে সন্ন্যাসীর দলে নাচছিলেন। কাশীর নানা জায়গা ঘুরে এলাহাবাদ মিরজাপুর, পাটনা, জামালপুর, মুঙ্গের ভাগলপুর, মুরশিদাবাদ, বর্ধমান, পান্ডুয়া, ত্রিবেণী, হুগলি চুঁচুড়া, চন্দননগর, বৈদ্যবাটী, তারকেশ্বর, শ্রীরামপুর, বারাকপুর বালি ঘুরে কলকাতা এসে হাজির।

বরুন প্রথমেই পিতামহকে জানিয়ে দিলেন—'চুরি জোচ্চুরি, মিথ্যা কথা এই তিন নিয়ে কলকাতা।' ওরা বড়বাজারে একটি ঘরভাড়া নিলেন। স্বপাক আহার সেরে চললেন শহর দেখতে। প্রথমেই দেখা কয়েকজন মাতাল আর গুলিখোরের সঙ্গে। তারপর এলেন সেলার হাউসে। সেখান থেকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে। ১৮০৯ সালে ৩ ষ্ট্রান্ড রোডে স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাঙ্কের ভিতরে থরে থরে সাজান টাকা দেখে দেবতারা অবাক। ওয়াল্টার গ্রানভিলের ডিজাইনে তৈরি ১৮৭২ সালের হাইকোর্ট দেখলেন। ইন্দ্রের ইচ্ছা হল স্বর্গে একটা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার।

পার্ক স্ট্রীটের শোভা দেখে দেবতারা মুগ্ধ। রাসমণির বাড়ি দেখে, এলেন ফোর্ট উইলিয়াম। অকেটারলনি মনুমেন্ট দেখলেন। প্রেসিডেন্সী জেল, ঘোড দৌড়ের মাঠ, টিপু সুলতানের মসজিদ দেখে হাজির কুক সাহেবের আস্তাবলে। এখন আর নেই। বেণ্টিক স্ট্রীটে পুরনো ভবনের ওষুধ বিক্রি হত ডি গুপ্তের দোকানে। দোতারা পার্কার কোম্পানীর নিলাম ঘরে ঢুকলেন। চিৎপুরে গিয়ে বেশ্যাপল্লীর কান্ডে ওরা হতবাক। এভাবে দেবতার দল সারা কলকাতা ঘুরলেন। কলকাতা পুরনো ইতিহাস স্মৃতি জড়িত মানুষদের কাহিনী শুনিয়েছেন। অবশেষে ওরা এলেন কালীঘাট। তারপর ফিরে চললেন স্বর্গে।

দুর্গাচরণ রায় দেবগণের মর্তে আগমন বাংলা সাহিত্যে এক অতুলনীয় [illegible] গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে বেরিয়েছিল। ৭৮২ পাতার বই। অসংখ্য ছবিতে ভরা। কেবল ঘুরে ফিরে দেখা নয়, বইটি ইতিহাসের উপাদানে ভরা।

[illegible]

চিঠিপত্র

গান্ধী প্রসঙ্গ\অশালীন

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিত মহাত্মা গান্ধী প্রবন্ধে তাঁহার ১৮টি বক্তব্যই যে সত্যের অপ্রকাশ মাত্র, তাহা আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি নানা ঐতিহাসিক তথ্য ও অকাট্য যুক্তিসহায়ে। রমেশবাবু যদি ঐতিহাসিক তথ্য ও যুক্তি লইয়া সরাসরি আমার প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতেন তবে সুখী হইতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার মত একজন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি বাঁকা পথ ধরিয়া অশালীন সন্দেহ প্রকাশের প্রতিবাদ এই শিরোনামায় এক চিঠি প্রকাশ করিয়া আমাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া আমার প্রতিবাদও যে থেলো বিষয় তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁহার নিজ দেশপ্রেম ত্যাগ ও প্রতিভা বলেই বড়, সেই জন্য জগৎ বরেণ্য মহাত্মা গান্ধীকে ছোট করিয়া দেখাইয়া সত্যের বিনাশ সাধন করিবার প্রয়োজন নাই।

রমেশবাবু লিখিয়াছেন ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে আমরা সুভাষচন্দ্রের নিকট বিশেষভাবে ঋণী—গান্ধীর নিকট নহে। এই উক্তির সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক সত্য উত্থাপন না করিয়া বা করিতে না পারিয়া রমেশবাবু শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় লিখিত ঘরোয়া মতামত সম্বলিত এক পত্রকে প্রমাণ স্বরূপ দাঁড় করাইয়াছেন। ঘরোয়া কথা বা মতামত যে প্রমাণ বা ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে গ্রহণীয় নহে তাহা রমেশবাবুর অজানা নাই। তথাপি দেখিতেছি রমেশবাবু একজন বিশিষ্ট লোকের নাম করিয়া ঐ পত্রখানাকেই প্রমাণরূপে প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলি—রমেশবাবুর এই নীতিবহির্ভূত প্রচেষ্টা কি অশালীন নহে?

ফণীভূষণবাবু লিখিত এবং রমেশবাবু প্রকাশিত পত্রে জানিতে পাই, ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে গান্ধীজীর অবদান কতটুকু তাহা জিজ্ঞাসিত হইয়া লর্ড এ্যাটলী উত্তর দিয়াছিলেন—মি-নি-মা-ম অর্থাৎ যৎসামান্য। পক্ষান্তরে আমরা শুনিতে পাই, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক টয়েনবি প্রমুখ অনেকানেক দেশী ও বিদেশী বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকের ন্যায় মিঃ এ্যাটলী ও বৃটিশ রাজের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র লুইস মাউন্টব্যাটন বলিতেছেন — ভারতের স্বাধীনতার স্থপতি—গান্ধী। (ফ্রিডম-এট-মিডনাইট) মিঃ এ্যাটলীও ঐ উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই। অতএব দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মত দেখিয়া স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে সন্দেহ জাগিল, ফণীভূষণবাবু মিঃ এ্যাটলীকে ভুল বুঝেন নাই তো? কেহ উর্দ্ধতন রাজকর্মচারী বা বিদ্বান বুদ্ধিমান হইলেই যে ভুল-ভ্রান্তির অতীত হইবেন তাহা হলফ করিয়া বলা চলে না। মিঃ এ্যাটলীর জীবিত কালে পত্রখানা প্রকাশিত হইলে আমরা জানিতে পারিতাম তিনি ঠিক কি বলিয়াছেন এবং কি অর্থে। এ্যাটলী এখন মৃত। সুতরাং ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের উপায় নাই। এই জন্যই আমি লিখিয়াছিলাম, এ্যাটলীর জীবিতকালে পত্রখানা প্রকাশিত হইলে তাহার মূল্য দেওয়া যাইত। এতদ্বারা ফণীভূষণবাবুর সততার প্রতি কোন সন্দেহ প্রকাশ করা হয় নাই। অশালীন সন্দেহ প্রকাশ তো নহেই।

ধীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
বি-২১, সি আই টির বাড়ি
ক্রিস্টোফার রোড, কলিকাতা-১৪

সমালোচনার সমালোচনা

'অমৃত'-এর ১৬ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ধীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের 'মহাত্মা গান্ধী প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার' শীর্ষক রচনা পড়লাম। শ্রীমজুমদারের রচনার একদেশদর্শিতার সমালোচনা করতে গিয়ে শ্রীচৌধুরীও এক ধরনের পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছেন। শ্রীচৌধুরী সমালোচনার মধ্যে অন্ধ গান্ধী-ভক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে প্রচুর তথ্যের সমাবেশ করেছেন সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে অহেতুক স্তাবক প্রবণতাও লেখাটির মধ্যে ফুটে উঠেছে। এই এক ধরনের স্তাবকতা মনোবৃত্তি পরায়ণ একশ্রেণীর লেখকের হাতেই ঐতিহাসিক তথ্য প্রায়শই কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। কোন একজন ব্যক্তির প্রকৃত মূল্যায়ণ করতে গিয়ে আংশিক কোন কোন উদ্ধৃতি বা তাঁর সম্বন্ধে কে কোথায় ভালো ভালো কথা বলল সেগুলি সংগ্রহ করলেই চলে না। সমসাময়িক দেশ কাল পাত্রের পরিবেশে সেই ব্যক্তিকে মিলিয়ে বিচার করলে এবং তৎকালীন অন্যান্য ব্যক্তিদের যাবতীয় উক্তির পক্ষে বিপক্ষে যাবতীয় মন্তব্য তৎসমুদয়কেও স্বীকার করলে ভাল। গান্ধীজী সম্পর্কে অনেকে অনেক প্রশংসাসূচক বাক্য বলেছেন বা লিখে গেছেন সত্য বটে, কিন্তু তাই বলে সেই বক্তব্যগুলিই তাঁর মূল্যায়ণে একমাত্র প্রমাণ বলে মনে করলে ঐতিহাসিক-এর নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না। অনেক জীবনীকার তথ্যসংগ্রহের কাজে নিজের দুর্বলতাকে ঢাকতে বা অন্য কোন বিশেষ

কারণে অহেতুক ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে ভাষার ছটায় কিছু ভালো ভালো কথা বলে ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসা করতে পারেন। কেননা বিরাট পুরুষ হলেই তার সব কিছু ভালো হবে এরকম প্রচ্ছন্ন একটা ধারণা থাকা স্বাভাবিক, বলা-বাহুল্য ঐতিহাসিকের কাছে তার কোন মূল্য নেই। গান্ধীজী নিজের কলমে নিজের জীবনীমূলক রচনাগুলি লেখার আগে কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক তাঁর জীবনী নিয়ে সম্পূর্ণ মূল্যায়ণ করেছিলেন কিনা আমার জানা নেই এবং তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা যাক।

বৃটিশ শক্তি যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখন তার পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তর আমাদের দেশীয় নেতাদের সম্বন্ধে গোপন রিপোর্ট সংগ্রহ করত এবং তা সবিস্তারে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত থাকত। বৃটিশ শক্তি চলে যাবার পর গান্ধীজী সম্বন্ধে তেমন কোন ফাইল নাকি পাওয়া যায়নি। এর কারণ কি সঠিক নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। আর এতোবড় একজন নেতা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ পক্ষ যে কোন রিপোর্ট রাখেনি এটাও বিশ্বাস করতে মন চায় না। সেরকম কোন ফাইল যদি পাওয়া যেত তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয় আন্দোলনে বিরুদ্ধ পক্ষের সংগে তার কিরূপ সম্পর্ক ছিল তার সম্বন্ধে অনেক অজানা কথা জানা যেত। আপোষবাদীতাই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। কাজেই বৃটিশ পক্ষের সংগে আপোষমূলক মনোভাব গান্ধীজীর জীবনের বহু কাজের মধ্যেই ফুটে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। আর যে দলের কর্মী হয়ে তিনি আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তার প্রতিষ্ঠা ও প্রথমদিকে বৃটিশ তোষণনীতিও সর্বজনস্বীকৃত। রাজশক্তির উদ্যোগেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, বিশেষ সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। প্রথম দিকে মহারাণীর জয়ধ্বনি দিয়ে কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হত, এতো সবারই জানা। এহেন কংগ্রেস যখন নীতিপদ্ধতি নিয়ে নরমপন্থী ও চরমপন্থীর কলহে মুখরিত, বিপ্লববাদ যখন ধাবতীয় আন্দোলনের সামনের সারিতে এসে গেছে ঠিক সেই সময় গান্ধীজীর মত একজন আপোষপরায়ণ ব্যক্তি সেই দলে নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে এগিয়ে এলেন। দলও তাই তাঁকে লুফে নিল। নরমপন্থীদের আজন্ম লালিত পরোক্ষ প্রতিরোধপরায়ণ মনোবৃত্তি গান্ধীজীর মত একজন ধর্মভীরু ও সৎ নিরীহ মানুষকে পেয়ে যেন বর্তে গেল।

এই পটভূমিকায় গান্ধী চরিত্র বিশ্লেষণ করলে বোধ হয় খুব একটা ঐতিহাসিক ভুল হবে না।

গান্ধীজীর চরিত্রে যে একটা অসাধারণ বৈপরীত্য ও রহস্যময়তা ছিল তা তৎকালীন সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন। জওহরলালের মত একজন প্রবীন নেতাও গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু বুঝতে পারেন নি। আচার্য কৃপালনীও গান্ধীজীর আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলনের কোন সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। বিদেশীরাও বলেছেন 'ছয়টি সাক্ষাৎকারেও তাঁকে (গান্ধীজীকে) ঠিক মত বোঝা যায় না। আলোচ্য রচনা পড়ে বোঝা যায় বিদেশী গবেষকদের রচনায় শ্রীচৌধুরীর অগাধ আস্থা। কিন্তু 'ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম বন্ধু' বলে বিদেশীদের কেউ কেউ যে গান্ধীজী সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন সেটা বোধহয় তাঁর আচ্ছন্ন দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। পার্লামেন্টের প্রাক্তন সদস্যা মিস এলেন উইলকিনসন ইণ্ডিয়া লীগের প্রতিনিধি দলের সদস্যা হিসাবে ১৯৩২ সালে তার ভারত ভ্রমণের পর গান্ধীজী সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—'ভারতে ইংরেজদের প্রহরীদের মধ্যে গান্ধী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ........।'

এবার শ্রীচৌধুরী মশাই-এর বক্তব্যগুলির দিকে তাকানো যাক। প্রথমেই তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-পরবর্তী সময়কার পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছেন। তার দৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী প্রভাব অত্যন্ত লঘু এবং তার পরেই নাকি এ দেশে একটা অন্ধকারময় যুগ নেমে আসে। এই মত প্রকাশের দ্বারা তিনি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সম্বন্ধে তার শোচনীয় অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারেন নি বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই কংগ্রেস তথা অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলি আয়েসী জল্পনা ছেড়ে প্রথম সক্রিয় প্রতিরোধের সামনাসামনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। শ্রীচৌধুরীর অজ্ঞতা সুস্পষ্ট যখন তিনি বলেছেন '....একদল দেশপ্রেমিক মরণ-বিজয়ী যুবক সন্ত্রাসবাদের আশ্রয়ে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের চেষ্টাই ব্যর্থ হইল প্রধানতঃ জন-সমর্থন বিশেষভাবে যুব সমর্থনের অভাবে...।' ইত্যাদি। জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে এমন হাস্যকর মন্তব্য কোন শিক্ষিত ভারতীয় কখনো করতে পেরেছেন কিনা আমাদের জানা নেই।

বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই বিপ্লববাদের সক্রিয়তা শুরু। কংগ্রেসের মত ও পথ নিয়ে নরম ও চরমপন্থী মতানৈক্যের শুরু। এই সময় থেকেই অহিংস অসহযোগ, আইন অমান্য, সত্যাগ্রহ এবং বিদেশীদের সর্বতোভাবে বর্জন করার নীতি জনপ্রিয় হতে থাকে। বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯০৬) কর্মীরা পুলিশের অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন কিন্তু প্রতিবাদ করেন নি (চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ঘটনা স্মরণীয়)। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি, 'বন্দেমাতরম'-এর উপর নিষেধাজ্ঞার আইন অমান্য এবং নানা স্থানে সভাসমিতি, পিকেটিং প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সত্যাগ্রহের প্রাথমিক পাঠ তখনই শুরু হয়েছিল। এমনকি '..গান্ধীজী যে চরকাকে বিদেশী শাসনের মূলোৎপাটনে অমোঘ অস্ত্র বলে বার বার ঘোষণা করেছেন, বাঙ্গালী বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘরে ঘরে চরকার গুঞ্জন ধ্বনি ফুটিয়ে তুলেছে ১৯০৫ সালেই...।' (পৃ: ১৩, পঃ বঃ প্রদেশ কংগ্রেস সম্মেলন স্মারক পত্রিকা, বারাসত, ১৯৫৩)।

বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনের পরই দেশে যদি অন্ধকারময় যুগ নেমে আসে তাহলে বিরোধীপক্ষ আন্দোলনকে দমন করার জন্য এতো তৎপর হলো কিরূপে? কেননা ১৯০৫ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যেই দেখি সরকারী দমননীতির হাতিয়াররূপে অসংখ্য আইন, রিপোর্ট প্রভৃতির উদ্যোগ। সরকার বিরোধী সভা নিবারণ আইন (১৯০৭), ভারতীয় দণ্ডবিধি সংশোধন ইত্যাদি দমনমূলক বিধি সিডিসন কমিটি (রাউলাট) এবং শেষ পর্যন্ত মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট (২২শে এপ্রিল ১৯১৮, সিমলা) এবং তারই পরিণতি ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইন। এমন সময় কংগ্রেসে নবাগত গান্ধীজীর কি ভূমিকা ছিল? মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে গভঃ অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট চালু হল। এই আইন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অ্যানি বেসান্ত বললেন—আনওয়ার্দি অফ ইংল্যাণ্ড টু অফার অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া টু অ্যাকসেপ্ট। মহামান্য তিলক এই আইন প্রবর্তনের দিনটিকে (২৪শে ডিসেম্বর ১৯১৯) সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করলেন 'এ সানলেস ডন'। গান্ধীজী কিন্তু এই আইনকে সমর্থন জানালেন, সপ্রশংস ভাষায় ৩১শে ডিসেম্বর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তিনি লিখলেন—এমনকি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরও ১৯১৯-এর পাঞ্জাব কংগ্রেসে গান্ধীজীর উদ্যোগেই ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট-এর সমর্থনে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল (ভারতের মুক্তি সংগ্রাম—সুভাষচন্দ্র।)

২) শ্রীচৌধুরীর দ্বিতীয় বক্তব্য ঐতিহাসিক বিকৃতিতে ভরপুর। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন সত্যাগ্রহ বা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তক গান্ধীজী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাঁর আগেও এইরূপ আন্দোলনের সফল প্রয়োগ হয়েছিল এমন প্রমাণও আছে (বাহুল্যবোধে বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন)। গান্ধীজীর মাথায় সত্যাগ্রহের ধারণা আসতে পারে এদেশের সরকার আগে এবং বিদেশে তিনি তা প্রয়োগ করতে বা তার সম্বন্ধে বই লিখতে পারেন। কিন্তু শুধু মাত্র ধারণা এলেই হয় না, বাস্তব প্রয়োগে কোন নীতির সার্থকতা প্রমাণিত হয়। অহিংস-অসহযোগ রূপ অস্ত্রকে ভারতে প্রয়োগ করতে তার যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। তাই মেদিনীপুরে যখন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে করবন্ধ, ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন প্রভৃতি আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল তখন গান্ধীজী তাতে মত দেন নি, এবং সবাকারই জানা অহিংস ও অসহযোগিতামূলক এই আন্দোলন সফল হয়েছিল। গান্ধীজী নানাদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে (এক বছরে স্বরাজ স্মরণীয়) বা তৎকালীন পরিস্থিতির চাপে পড়ে হয়তো পড়ে

অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য 'তাঁর মনে এইরূপ কোন প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা ছিল যে তিনি নিজে বা তাঁর অনুগামীগণ ছাড়া সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। (পরবর্তী কালে এই ইচ্ছা প্রকাশিতও হয়েছিল।)

নানা দিক দিয়ে গান্ধীজীর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে আরও কিছু তথ্য এই সঙ্গে মনে পড়ল। (আলোচনা থেকে কিছুটা সরে যাওয়ার জন্য পাঠক মাফ করবেন।) তাঁর শিক্ষানীতি যে কি শোচনীয় ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে যারা ওয়াকিবহাল তারা সকলেই জানেন। গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর শোচনীয় ব্যর্থতা সবাকারই মনে থাকবে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যে সুপরিকল্পিতভাবে গান্ধীজীকে গোলটেবিল বৈঠকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছিল ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। (মৎ প্রণীত স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৩)। গান্ধীজীর ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বোধহয় গান্ধী আরউইন চুক্তিরূপ প্রতারণায় গান্ধীজী নিজেও ঠকলেন, দেশবাসীকেও ঠকালেন। ১৯৩০-এর মার্চ মাসে সিমলায় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং স্থির হয় গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন তুলে নেবেন এবং তার বিনিময়ে বড়লাট কারাগার থেকে বন্দীদের সকলকে মুক্তি দেবেন। বন্দী বলতে ঠিক পরিষ্কার কি বলা হয়েছিল জানি না, কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা গেল গান্ধী-অনুগামীদেরই মুক্তি দেওয়া হয়। যদিও তিনি প্রথমে বলেছিলেন, 'এ চুক্তি সর্ববাদীসম্মতভাবে গৃহীত হলে অনেক সহিংস কাজের জন্য যাঁদের ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেছে তাঁরাও মুক্তি পাবেন বলে তিনি আশা করেন।'

আসলে কিন্তু তা হল না। কংগ্রেস কর্মীদের মুক্তি দিলেও কর্তৃপক্ষ বৈপ্লবিক দলের কাউকে মুক্তি দেয় নি। মুক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্র ও হেমচন্দ্র ঘোষ বোম্বেতে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন প্রাণ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর প্রাণ রক্ষা করতে। কিন্তু ওদের রক্ষা করা যায় নি। বড়লাট আর্ল অব হ্যালিফাকস তাঁর 'ফুলনেস অফ ডেজ' গ্রন্থে লিখেছেন—'মিঃ গান্ধী বললেন তিনি এসেছেন ভগৎ সিং নামে যে যুবকটি বিভিন্ন হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন তার প্রাণ রক্ষার জন্য আবেদন জানাতে। গান্ধী বললেন—এই যুবককে ফাঁসী দিলে তিনি জাতীয় বীরের মর্যাদা পাবেন। সেই সঙ্গে দেশের আবহাওয়া বৃটিশ শাসন ও কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবে। তাঁর আশংকা এ সম্বন্ধে কিছু করতে না পারলে এই চুক্তি ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে।'— (পৃঃ ১৪৯)

পাছে একজন বিপ্লবী জাতীয় বীরের মর্যাদা পান এবং বৃটিশ শাসন ও কংগ্রেসের পক্ষে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এই ভয়েই মাত্র গান্ধীজী সে সম্বন্ধে কিছু করতে চেয়েছিলেন একথা স্পষ্ট। এর ব্যাখ্যা শ্রীচৌধুরী কি করবেন?

এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বললে তৎকালীন গান্ধীজীর ভূমিকা আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। ১৯৩১এ কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে যাবার আগে কিছু অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। গান্ধীজী এই সময় বড়লাটের সঙ্গে সব কাজে পরামর্শ করতেন এবং প্রয়োজন মত তাঁদের নির্দেশাদি দিতেন। ১৯ মার্চ বড়লাটের নোট—'আলোচনার শেষে গান্ধীজী বললেন যে তিনি করাচির অধিবেশনে কোন বাধা পাবার আশা করেন না। যাবার আগে বললেন—'...শুনলাম ভগৎদের ফাঁসী হবে ২৪ তারিখে, ঐ দিনটা বেশ অসুবিধাজনক। কারণ ২৪ তারিখেই কংগ্রেস সভাপতি (সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল) করাচি পৌঁছাচ্ছেন। ফাঁসীর ব্যাপারে জনগণের মনে বেশী উত্তেজনা হতে পারে...।'

বিপ্লবীদের ফাঁসীর প্রতিবাদে ২০ মার্চ করাচি শহরে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ঐদিন ভারত সরকারের প্রধান সচিব সার হার্বার্ট ইমারসন গান্ধীজীকে লিখলেন—'...চীফ কমিশনার আমাকে জানিয়েছেন যে শহরে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে সুভাষচন্দ্র বসু বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এক প্রতিবাদ সভায় ভাষণ দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার অসুবিধার কথা আমি বুঝি এবং আপনিও নিশ্চয় সরকার পক্ষের অসুবিধার কথা বুঝতে পারছেন। এই সময় সরকার কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন, তবে অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি হলে তারা বাধ্য হবেন...। আজকের প্রতিবাদ সভায় যদি গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া হয়, তাহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হবে নিশ্চয়ই। আপনি যদি আমাদের সহায়তা দিতে চান, যদি এই অসুবিধাজনক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার উপায় নির্ধারণ করতে পারেন তাহলে সরকার খুশী হবেন...।'

ঐদিনই গান্ধীজীর উত্তর—'এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। সভার খবর আমিও পেয়েছি। সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থাই নিয়েছি যাতে কোন অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি না হয়। আমার মনে হয় ওখানে কোন পুলিশ না রাখাই ভাল। সভায় যেন কোন রকম হস্তক্ষেপ না ঘটে। উত্তেজনা ওখানে রয়েছে। সভার মধ্য দিয়ে সে উত্তেজনাকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া ভাল।

গান্ধীজী ও কর্তৃপক্ষের এই আদান-প্রদান ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই সময়-কার গান্ধীজী সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের স্পষ্ট বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এক সাক্ষাৎকারে গান্ধীজীকে তিনি বলেছিলেন—'প্রথমে আপনি ছিলেন একজন অসহযোগী, এখন কেবল সমাজ-সংস্কারক। এটা একটা বড় পতন নয়?'

এইসব ক্ষুদ্র ঘটনা থেকেই বুঝতে সুবিধা হবে সুভাষচন্দ্রের প্রতি কেন কংগ্রেসের মতান্তর ও তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করার জন্য গান্ধীজীর কেন এত ব্যগ্রতা।

শ্রীচৌধুরীর তিন নম্বর বক্তব্য অনেকাংশে যুক্তিগ্রাহ্য হলেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। গান্ধীজীকে অবশ্য সুস্পষ্টভাবে বাঙ্গালী বিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করা না গেলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে বাঙ্গালী নেতৃত্বের বিপরীত ভূমিকায় দেখা গেছে। বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার, তার বিরুদ্ধে সীতারামাইয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়ে পরাজিত হওয়ায় তার হতাশাব্যঞ্জক পরাজয় স্বীকার, সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তারবার্তাকে অগ্রাহ্য করা, ইত্যাদি বিষয়ে বাঙালীদের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব থাকতে পারে। বিশেষতঃ বাঙালী বিপ্লবীদের স্বমতে আনয়ন করতে পারার দৃঢ় ইচ্ছা ও আত্মবিশ্বাস ব্যর্থ হয়েছিল বলেই বিদ্বেষপরায়ণ একটি প্রচ্ছন্ন হৃদয় গড়ে উঠা হয়ত স্বাভাবিক ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে শুধুমাত্র গান্ধীজীরই যে মতদ্বৈধ ছিল তা তা নয়, দেশবন্ধু মাঝে মাঝে কংগ্রেস দলেরও কঠোর সমালোচনা করতেন এই জন্যই বোধহয় বাংলার নেতৃবৃন্দের মাথায় স্বরাজ্যদল' বা 'অগ্রগামীদল' (ফরওয়ার্ড ব্লক) ইত্যাদি বিকল্প সংগঠনের চিন্তা জেগেছিল। কেননা গান্ধীজীকে নিয়ে কংগ্রেসের অতিরিক্ত মাতামাতি বা কংগ্রেসে তাঁর একনায়কত্ব নানা সময়ে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করেছে। "গান্ধীজীর ভুল নেতৃত্বের জন্য কংগ্রেসকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল...।" মৌলানা আজাদের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে মনে পড়ল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র ও গান্ধীজীর নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং মাঝে মাঝে কঠোর সমালোচনা করতেন। বিপ্লবীদের স্বমতে আনয়নের চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন একথা আগেই বলেছি। এই ব্যাপারে গান্ধীজী যে সচেষ্ট হয়েছিলেন তারও প্রমাণ আছে। দেশবন্ধুর বাড়িতে বিপ্লবী পুলিন দাসের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার আলোচনার পূর্বে গান্ধীজী বলেছিলেন—"হয় আমি তোমাকে মত বদলাব না হলে তুমি আমাকে। কিন্তু তার কোন কথাই গান্ধীজী রক্ষা করেন নি। গান্ধীজী ব্যর্থ হলেন পুলিন দাসকেই কেন তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তারও কারণ আছে। এসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ভবতোষ রায়ের মন্তব্য—"...গান্ধীজীকে তৎকালে নররূপী নারায়ণ বা অবতার বলিয়াই লোকে ভাবিত এবং এই কর্তাভজার দেশে প্রতিবাদকারী উন্নত শির পুলিন দাস সবচাইতে [illegible] [illegible] [illegible]

করিলেন...।" ('বিপ্লবী পুলিন দাস' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।) এই গান্ধী ভজনা যে একেবারেই অসার তা গান্ধীজী নিজেও—বুঝতে পেরেছিলেন এবং বলেছিলেন—প্রত্যেকে আমার ফটোতে মালা দেয়। নমস্কার করে। কিন্তু আমাকে অনুসরণ করে না। এইটাই গান্ধী চরিত্রের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। এই সব কারণে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব থাকা স্বাভাবিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেই উষ্মা প্রকাশিতও হয়ে পড়েছে। বাংলার নেতৃবৃন্দও তখন জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে গান্ধীজীর উষ্মা প্রকাশ নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার রূপেই ধরে নিতে হবে।

চতুর্থতঃ গান্ধীজীর মুসলমান প্রীতি-রূপ স্পর্শ বিষয়টির সম্বন্ধে রমেশবাবুর বক্তব্যেরও সমালোচনা করেছেন শ্রীচৌধুরী। গান্ধীজীর উদ্যোগেই ধর্মীয় খিলাফৎ আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে এদেশে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়। এ সম্বন্ধে সমসাময়িক ব্যক্তিদের একাংশের মত হল 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মৃত জিন্নাকে পুনর্জীবিত করে গান্ধীজীর ভুলে নেতৃত্বই ভারত বিভাগে জিন্নাকে উৎসাহিত করেছিল...।' (মৌলানা আজাদ—ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম) সেই জিন্না পরবর্তীকালে গান্ধীজীর যে অবাধ্য হয়েছিলেন তাতে জিন্নাকে দোষ দেওয়া যায় না। বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন—'গান্ধীজী ভারত বিভাগ লইয়া বোম্বাইতে ২১ দিন পাকিস্তানের জন্মদাতা জিন্নার সহিত যুক্তি-তর্ক করেন। কায়েদ আজম উপাধি দেন. অখণ্ড ভারতের প্রেসিডেন্ট করিবেন বলেন' 'কিন্তু তাহার মত বদলাইতে পারিয়াছিলেন কি?' ('বিপ্লবী পুলিন দাস' গ্রন্থের ভূমিকা)।

গান্ধীজীর তৎকালীন কার্যকলাপ থেকেই বোঝা যায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য তার প্রচেষ্টা একটা কথার কথা মাত্র. বাহুল্য ভয়ে রচনাটি উদ্ধৃতি ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

লক্ষণীয় এই যে এক শ্রেণীর বিদেশী লেখক গান্ধীজীর প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ এবং শ্রীচৌধুরীর মত কিছু গান্ধী-প্রেমী মানুষ তাতেই অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট। তাই দেখি আলোচ্য রচনাটিতে বিদেশী লেখকদের উদ্ধৃতি যত বেশী ও যে পরিমাণ গুরুত্ব পেয়েছে তেমন ভারতীয় ঐতিহাসিক বা সমসাময়িক ব্যক্তিগণ পাননি। যদি গান্ধী চরিত্রের বিশ্লেষণের প্রধান ভিত্তি ভূমি হওয়া উচিত সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মতামত। পরবর্তীকালের গবেষক লেখকগণ কোন বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, নিজস্ব মতানুযায়ী কোন কোন বিশেষ বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ করতে পারেন বা ব্যক্তি বিশেষের নিন্দা প্রশংসা করতে পারেন, ইতিহাসের বিচারে সেগুলিই চূড়ান্ত হতে পারে না। আর ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইতিহাসের বিকৃতির উদাহরণেরও অভাব নেই। ঠিক যেমন করে বৃটিশ রাজশক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে গান্ধীর মত একজন ধর্মপ্রাণ মানুষকে সংগ্রামী ভারতের মাথায় চাপিয়ে দিতে সহায়তা করেছিল, তৎকালীন আপোষপ্রবণ কংগ্রেস দল যেমন সোৎসাহে ঐ রকম এক-জন সমাজ কর্মীর হাতে নেতৃত্বের আসন ছেড়ে দিতে উৎসাহী হয়েছিল তেমনই এক শ্রেণীর লেখক ঐতিহাসিক সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে গান্ধী চরিত্রকে বিরাট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আরোপের দ্বারা চিত্রিত করতে চান। ধর্মবিশ্বাস, সততা, অহিংসা, সত্যাগ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি মেশানো একটি সমাজকর্মী রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে (অবাঞ্ছিত পদক্ষেপই বলা যায়) প্রত্যাশিত গণ-সংগ্রামকেই দুর্বলতর করেছে। বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যেখানে, মদগর্বী, ক্রুর ও চণ্ডনীতিতে অভ্যস্ত সেখানে নীতি কথার প্রতিরোধের দেওয়াল যেমন ব্যর্থ তেমনই হাস্যকর। তার প্রমাণ গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সঙ্গে বৃটিশ পক্ষের একাধিক চুক্তি, কমিটি, কমিশন, মহাযুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্যের সিদ্ধান্ত, গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান ও উপহাসাস্পদ হওয়া, পাকিস্তান সৃষ্টির অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ইত্যাদি অজস্র বিষয় ভারতের ইতিহাসকে কলঙ্কাচ্ছন্ন করেছে।

অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যায়
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের
'আদি আছে অন্ত নেই' ছাপা হল না।
আগামী সংখ্যা থেকে আবার বেরোবে

এই জনাই পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী লেখক উইল ডুরাণ্ড বলেছেন—তিনি ভারতের ঐক্য বিধায়ক একজন রাজনীতিজ্ঞ হতে পারেননি। তিনি ঋষি পুরুষ। এই পৃথিবীতে সাধু-সন্তদের যেমন ব্যর্থতা বরণের সম্ভাবনা, গান্ধীজীও হয়তো তেমনি ব্যর্থ হবেন। কিন্তু সাফল্যের মাঝে এই রকম ব্যর্থতা মাঝে মাঝে দেখা না দিলে জীবনের সার্থকতা কোথায়?' রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীর ব্যর্থতা বিষয়ে ঐ শেষোক্ত বক্তব্যই যদি একমাত্র সান্ত্বনা হয় তাহলে আর বলার কিছু নেই।

শ্রীচৌধুরীর অন্যান্য বক্তব্যগুলির দফাওয়ারী আলোচনা করলে রচনাটি অত্যন্ত দীর্ঘ ও একঘেয়ে হতে পারে। কেননা ঐগুলিতে তিনি কেবলমাত্র কিছু ঐতিহাসিক তথ্যই তুলে ধরেছেন এবং সেগুলি সবই একদেশদর্শী। তাদের সম্বন্ধে কিছু পাল্টা বক্তব্যও থাকতে পারে সেটা সম্ভবত তিনি ভাবেননি। আগামী দিনের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের বিচার বিশ্লেষণে সেগুলি নিশ্চয়ই আরও আলোচিত ও পরীক্ষিত হবে। কেননা ইতিহাস সম্বন্ধে শেষ কথা বলার অধিকার কারও নেই। ভক্তির আতিশয্যের বশবর্তী হয়ে ইতিহাসকে দেখলে প্রকৃত সত্যকে স্বীকার করার উদারতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। গান্ধীজী মহাত্মা ঠিকই কিন্তু আত্মার রহস্যময়তার সর্বজনীন ধারণার মত তাঁর চরিত্রেও কিছু রহস্যময়তা ছিল। তাই তার কার্যাবলী ভালো-মন্দ মেশানো মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় পরিপূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই। একা গান্ধীজীই ভারতের স্বাধীনতা এনেছেন একথা বলার দুঃসাহস কোন ঐতিহাসিকের থাকা উচিত নয়, গান্ধীপ্রেমীর এই উক্তি ক্ষমার্হ।

প্রবাশংকর ভট্টাচার্য, ফতেসিংপুর মেদিনী-পুর।

লেক কালীবাড়ি

সন্ধ্যা সেন

ভারতকে ধরে রেখেছে তার ধর্ম ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা আর আধ্যাত্মিক চেতনা। কত ক্ষয়-ক্ষতি অভাবনীয় ভাগ্য পরিবর্তন দুর্ভাগ্যের চরম অভিশাপ এদেশের জীবন প্রবাহ প্রতিহত করেছে। কিন্তু আজও দুর্বার, অপ্রতিহত এ দেশের সাধকের তপস্যা, পরমাত্মার লক্ষ্যে আত্মার অভিসার। প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামের ব্যর্থতাই যেন তাকে ঠেলে দেয় অন্তর্মুখী চেতনার দিব্যালোকে। আর আমাদের সত্যিকারের শক্তি বোধহয় সেইখানেই।

ঠিক এই কথাটিই যেন আবার নতুন করে বুঝলাম মাত্র কদিন আগে যেদিন এই কলকাতাতেই ছোট্ট একটি ঘটনার মৃদু ধাক্কা অন্য একটা জগতের বিরাট দরজা আচমকাই খুলে দিল।

অনেকদিন নানা জায়গায় যাতায়াতের পথে নজরে এসেছিল বিড়লা একাডেমীর পাশের কালী মন্দিরের সামনে দাঁড়ানো হাজার হাজার মানুষের সারি শুনেছিলাম এ মন্দিরের পুরোহিত ভক্তসিদ্ধ সাধক। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দু-তিন দিন ইনি সবার প্রশ্নের উত্তর দেন, অনেক সমস্যার নাকি নিরসনও ঘটান।

বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছুই করিনি। শুধু ভেবেছি বঞ্চিত, ব্যর্থ মানুষের কাতর মনের আর্তি কত বিড়ম্বনার মধ্যেই না তাদের ঠেলে দেয়। নইলে কলকাতার আশে-পাশে এবং আরও কত দূর দেশের মানুষ এভাবে আহার নিদ্রা ভুলে রোদ বৃষ্টি মাথা করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কিসের আশায়? না দুরাশায়?

মন্ত্রবলে দুরারোগ্য ব্যাধি সারান আর দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করেন? বহুত খুব—হেসে বলেছিলাম তাঁরই এক ভক্তকে। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী, উদয়শংকরের প্রাক্তন সঙ্গীত পরিচালকদের একজন।

'কিছু না থাকলে এত দূর-দূরান্তের মানুষ শুধু শুধু আসে প্রচণ্ড রোদে, প্রবল বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কষ্ট করতে?'

আমি যদি আজ আমার বাড়ির সামনে হাতে লেখা একটা বোর্ড ঝুলিয়ে রাখি—প্রতি শনি মঙ্গলবার আপনার দুটি প্রশ্নের জবাব পাবেন। দুরারোগ্য ব্যাধিমুক্ত হবেন। প্রতি প্রশ্ন পিছু পাঁচ টাকা দক্ষিণা রেখে যাবেন—আমার বাড়ির সামনেও হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমাবে।'

—কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে তিনি কারো কাছে এক পয়সাও দক্ষিণা নেন না। দুঃস্থ দুঃখী মানুষের মুখে এতটুকু হাসি ফুটলেই উনি খুশি। ..আলাদা করে কারো সঙ্গে দেখাও করেন না। আমরা এক আধবার তাঁর কাছে আসার সুযোগ পেয়েছি বলেই বুঝেছি উনি খুব উচ্চস্তরের সাধক—রীতিমত জোরের সঙ্গে উত্তর দিলেন প্রবীণ শিল্পী।

...তিনি এবং তাঁরই বন্ধু শর্মাজীর সহায়তায় 'বাবা'র সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের দুর্লভ সুযোগ একবার ঘটেছিল। তখন আবার মানতে হল নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির এতটুকু মাপকাঠি দিয়ে সকলের বিচার করাটা অপরাধ। তবে এই কৌতূহলের দাক্ষিণ্যেই যথার্থ এক সাধকের দর্শন পেলাম। এজন্য আগেভাগেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখছি আমার সহৃদয় বন্ধু-যুগলকে।

...ও'রা বলেন 'বাবা'। ও'কে দেখলে ঐ একটি সম্বোধনই মুখে এসে যায় অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগেই।

বাঙ্গালীর মত করেই ধুতি পরা; খোলা গা। স্বাস্থ্যভরা দেহ। মুখে ঘন কালো দাড়ি। গম্ভীর সৌম্য কিন্তু স্নেহ কোমল মুখ। দেখলে আপনা থেকেই একটা ভক্তির ভাব জাগে। এমন দুর্লভ দর্শন কিন্তু কি সহজ আর আন্তরিক। মুহূর্তের দেখাতেই ও'কে বড় আপনার মনে হল: চোখ দুটি বুদ্ধিপ্রখর এবং অনুভব গভীর। সব মিলিয়ে মনে একটা প্রশান্তি বিছিয়ে দিয়েছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য।

'—সত্যি করে দুরারোগ্য রোগ আপনি সারিয়ে দিতে পারেন?'—আমি তাঁকে প্রশ্ন করি।

গম্ভীর মুখে মৃদু হাসি আলোর মত ফুটে উঠল আর মেঘানিবিড় কন্ঠে ধ্বনিত হল কটি কথা, 'মানুষের সেবা ও কষ্টের উপশম করাই আমি ভগবানের পূজা বলে মনে করি। আমি কোনো কাজের জন্য কারো কাছে অর্থ অথবা কোনো মূল্য গ্রহণ করি না। যতক্ষণ এ দেহে-মনে তাঁর দেওয়া শক্তির বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে তাঁরই কাজ করে যাব।'

আপনি এত সুন্দর বাংলা বলতে পারেন?' বিস্ময়ে আনন্দে আমি আত্মহারা।

আবার শোনা গেল সেই স্নিগ্ধ কন্ঠস্বর 'আমি ত মা বাঙ্গালীই। আমার আদি বাড়ী ছিল কলকাতার এই কালীঘাটে। দেশ অবশ্য সেই যশোরে। চোদ্দ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

'কেন?'

'সব সময় মনের অতলে একটা বিদ্রোহ গর্জে উঠত—পড়াশোনা করে লাভ কি? অন্যের জ্ঞানবুদ্ধির চর্বিত চর্বণ ছাড়া

ওটা ত কিছু নয়? কেন অন্যের উচ্ছিষ্ট আমি গ্রহণ করব? এই ধরাবাঁধা গতানুগতিক জীবনের বাইরে কি কিছু নেই, একান্তভাবে আমারই উপলব্ধি উদ্যম ও শুদ্ধি দিয়ে যাকে দেখতে পারি? এই রকম উল্টোপাল্টা চিন্তায় মনটা অস্থির হয়ে উঠত, আর বিতৃষ্ণা জাগত সকাল সন্ধে নিয়ম মাফিক বই নিয়ে পড়তে বসার ওপর।

...আমার ভাবগতিক দেখে বাড়ির সবাই খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। কারণ আমাদের পরিবারের সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং শিক্ষার আভিজাত্য সে বাড়ির রীতিমত একটা ঐতিহ্য হয়ে উঠেছিল।

আমারই শিক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য আমায় কলকাতায় নিয়ে আসা হল। কিন্তু আশান্বিত হবার মত কোনো লক্ষণ তাঁরা দেখতে পেলেন না। তখন আবার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এই আশায়, মনের মত পরিবেশ পেয়ে যদি পড়াশোনায় মন বসে। কিন্তু সেখানেও আমার হালচালের কোনো পরিবর্তন না দেখে অভিভাবকরা কঠোর এবং নির্দয় হয়ে উঠলেন। এবার আর দয়া মায়া আদর আহ্লাদ কিছু নয়। কলকাতায় নিয়ে এসে অত্যাচারী শাসনের মত পড়াশোনার চাপ দিতে সুরু করলেন। একটু এদিক-ওদিক হলেই প্রহার। সকলেরই ভয়াল রূপ এবং সেই কারণেই কাউকেই আপনার বলে ভাবতে পারতাম না। প্রতিটি দিন যেন অভিশাপ হয়ে উঠল আমার কাছে।

একদিন দাদার সাইকেল চড়তে গিয়ে একটা চাকা ভেঙ্গে ফেললাম। সেদিনের নির্মম নির্যাতন আজও ভুলিনি। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা ছাপিয়ে আমার ভেতর জাগল একটি বিস্মিত এবং ব্যথিত প্রশ্নঃ আমার চেয়ে এদের কাছে সাইকেলের দামটা বেশি হল? তবু এরাই আমার আপনার জন? এদের ভেতরে থেকেই এতবড় জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে? এতবড় অপমান সহ্য করে থাকার চেয়ে অজানা-অচেনা বনবাদাড় মরুভূমিতে থাকাও অনেক সম্মান ও শান্তির। কারণ সেখানে আমিই আমার কর্তা।...

পরদিন ভোরবেলা সবাই ঘুম থেকে ওঠার আগে বৌদির বালিশের তলা হাতড়ে তের টাকা ছ আনা পেলাম আর তাই নিয়েই পালালাম। কোনো পিছুটান, মায়া মমতার কণামাত্রও মনের কোনো কোণে অবশিষ্ট ছিল না। সঙ্গে ছিল একটি ছোট ধুতি ও শার্টের পুঁটলি।

স্টেশনে গিয়ে যে ট্রেন পেলাম তাতেই চড়ে বসলাম। কোথা যাব, সে চিন্তা ছিল না। সারা মন জুড়ে শুধু একটিই প্রতিজ্ঞা অটল হয়ে ছিল—কোথাও যেতে হবে। এখানে আর নয়। যাই হোক ট্রেন পৌঁছল পার্বতীপুর। সেখানে নেমে খুঁজে পেতে একটা নদী দেখে তার পাড়ে শার্ট আর ধুতিটা রেখে চান করতে নামলাম। উঠে দেখি শার্টটি চুরি গেছে সঙ্গে গেছে তার পকেটে রাখা তেরটি টাকাও। ট্যাঁকে ছিল মোট ছ আনা পয়সা। সেই সম্বল নিয়েই হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম পশ্চিম দিনাজপুর।

একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেয়ে বেঞ্চির ওপর বসে আছি। সারাদিন ঐভাবেই ছিলাম। সন্ধে গড়াল। রাতে দোকান বন্ধ করার আগে চাওলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলঃ সারাদিন এক জায়গায় একইভাবে বসে কি ভাবছ? থাক কোথা? বাড়ি ফিরবে না?

...তখন তাকেই বললাম, 'আমায় একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পার? আমি খুবই গরীব ঘরের ছেলে। কাজে খোঁজে বিদেশে এসেছি।'

—কাজের মানুষ একজন চাই ছিল বটে। আচ্ছা চল দেখি কি হয়।

...সেই মানুষটি নিয়ে গেল সেন্ট্রাল এক্সসাইজ বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে। গায়ের শার্ট ত আগেই চুরি গিয়েছিল। পরনের ছোট্ট কাপড়ের কোঁচাটা গায়ে জড়িয়ে তার সঙ্গে গেলাম।

আমার আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে বাড়ির কর্তা বললেন তোমার চেহারাটি ত বেশ নাদুসনুদুস। কি কাজ করবে? বাসন মাজা ঘর মোছা—এসব কাজ পারবে?'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই ঘাড় কাত করে বললাম—'পারব।'

—কখনও করেছ এসব কাজ?

অনেক বাবুর বাড়িতেই করেছি। তবে একটু ভুলচুক হলেই তাঁরা বড় গালমন্দ করতেন। সেসব সহ্য করা অভ্যেস নেই বলেই পালিয়ে এসেছি।

আমার কথাবার্তা চাল-চলন বোধহয় ও'দের পছন্দ হয়েছিল। বললেনঃ

খাওয়া-পরা ছাড়া কুড়ি টাকা মাইনে পাবে রাজী?'

রাজী না হয়ে উপায় ছিল? ট্যাঁকের ছ আনা তখন এক আনাতে এসে ঠেকেছে।

কিছুদিন কাজ করার পর আবার ভবঘুরে মনটার ছন্নছাড়া বৈরাগ্য চাড়া দিয়ে উঠল। এও ত সেই ছকে বাঁধা জীবন! সকালে উঠে নিয়ম-মাফিক কাজ কর বাসন মাজো, তাদের দেওয়া দুটো ভাত খাও আর ক্লান্ত হয়ে ঘুমোও।... যে জীবনকে খুঁজে নেবার তাগিদে পথে বার হলাম কোথায় তার দিশা? সে স্বপ্ন যদি হারিয়ে যায় তাহলে বাঁচব কি নিয়ে? কোনোরকমে দুবেলা দুটো অন্ন দিয়ে পেটের গর্ত বুজিয়ে বেঁচে থাকা ত মৃত্যুরই সামিল! এমন গ্লানির জীবনযাপনের দরকারটাই বা কি?

আবার অজানা পথে যাত্রার জন্য মনটা তৈরী করে ফেললাম। ওপরওলার ইচ্ছেতেই বোধহয় একটা সুযোগও জুটে গেল।

আমি কাজে যোগ দেবার এক মাস বাদেই আমার মনিব কিষণগঞ্জে বদলি হয়ে

গেলেন। মাইনের টাকাটা হাতে নিয়ে আমিও তার সঙ্গে গেলাম।... সেখানেই একদিন ও বাড়ির কুকুরটাকে মহানন্দাতে স্নান করাতে নিয়ে গিয়ে তার শেকলটি খুলে দিলাম ছেড়ে। আর আমিও পাড়ি দিলাম হিমালয়ের পথে। সাতদিন যেতে না যেতে কুড়ি টাকা শেষ। দারিদ্র্যের চরমে পৌঁছলাম। অনাহার অনিদ্রা ক্লান্তির সঙ্গে যোঝবার শক্তি নিঃশেষ হয়ে এল। পথে পথে ঘুরি। কেউ কিছু দিলে খাই যাকে বলে একেবারে রাস্তার ভিখারির মত অবস্থা মাঝে মাঝে জ্বরও আসত। চোখের সামনে যেন আসন্ন মৃত্যুকে দেখতে পেলাম।...

এইভাবেই একদিন সিকিমের বর্ডারের কাছাকাছি পৌঁছলাম। ওদের ভাষা আমি বুঝি না। আমার ভাষাও ওদের বোঝাতে পারি না। ইশারা করে খেতে চাইলে এমন সব জিনিস খেতে দেয় যা ছোঁবারও প্রবৃত্তি হয় না। দেখলাম ওদের মধ্যে অনেকেই গাছে বাস করে। কুকুর মেরে তার পেট চিরে ভাত পুরে মাটির ভেতর পুঁতে দেয়। একমাস পরে তাকে বার করে যখন সেই সব ভাত পোকা হয়ে যায়। সেই-ই ওদের কাছে পরম উপাদেয় খাদ্য মহা আনন্দে খায় আর মাদল বাজায়। সে যে কি বীভৎস ব্যাপার ভাবা যায় না।

জ্বরে শরীর অবশ। মরণাপন্ন হয়ে কিছুদিন গাছতলায় রাস্তায় পড়ে রইলাম। একটু ধাতস্থ হতে না হতেই আবার হাঁটতে শুরু করলাম। দুদিন, দু' রাত হাঁটার পর বিরাট একটা খাদ পেরিয়ে ওপারে পৌঁছলাম। তখন সন্ধ্যা নেমেছে। চারদিকে হিংস্র জানোয়ার ঘুরছে। বুঝলাম মাটিতে থাকলে বিপদ আছে। গাছের ওপরে উঠে থাকাটাই নিরাপদ। কিন্তু তখন আর গাছে ওঠার ক্ষমতা নেই। অনেক কষ্টে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর উঠে বসলাম। খানিক বাদেই কানে এল ওঁঙ্কার ধ্বনি। গম্ভীর গলার গমগমে আওয়াজ সারা পরিবেশকে হঠাৎ যেন স্তব্ধ করে দিল। জানোয়ারগুলোও নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সে যে কি ভাইব্রেটিং আর রোমাঞ্চকর বলে বোঝানো যায় না।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতই সে আওয়াজ অনুসরণ করে পূর্বদিকে এগোতে লাগলাম। কিছু দূর এগোনোর পর এক গুহার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তারই ভেতর থেকে উঠে আসা ওঙ্কার ধ্বনি সারা বনকে অমন ধ্বনিময় করে তুলেছিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর হঠাৎই দেখলাম গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক সন্ন্যাসী, বিরাট দেহ। সাহেবদের মত ধবধব করছে গায়ের রং। পেছন থেকে কম্বলের মত দীর্ঘায়িত ঘনজটা পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। পরণে শুধু কৌপিন। হাতে নারকেলের মালা। [illegible] গুহার মধ্যে

যেতে বললেন। তারপর ক্ষিপ্র গতিতে সামনের ঝর্ণায় হাত ধুতে চলে গেলেন।...

আমি তাঁর নির্দেশমত গুহায় ঢুকে দেখি অজস্র কঙ্কাল চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে শুধু মুণ্ডমালা। ভয়ে সারা শরীর হিম হয়ে গেল। মনে হল একেবারে খুন হয়ে যাব এবার।...

সাধুজী এসে যখন পরিচয় জানতে চাইবেন কি বলব? মনে মনে ওঁকে বলার মত মিথ্যে কথা বানাতে লাগলাম, দু-চার মিনিটের মধ্যেই উনি ফিরে এলেন এবং পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন—কোথা থেকে এসেছ? বাবার নাম কি? —বাবার নাম কালীপদ রায়। মা রমা দেবী। কিন্তু মা-বাবা ভাইবোন সবাই মারা গেছে। আমার কেউ নেই। তাই এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

'কেউ নেই না? তীব্র স্বরের ঘায়ে চমকে উঠে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। উজ্জ্বল দুটি চোখ যেন কৌতুকে হাসছে—

এত মিথ্যে কথা বলে? এবার শোনো আমি বলছি তোমার কথা। তোমার নাম হরিপদ চক্রবর্তী। মার নাম শংকরী দেবী। বাবা বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী আমি হতবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম তখনও উনি হাসিমুখে চেয়ে আছেন—

কি আরও জানতে চাও? তোমার ঠাকুর্দার নাম মদনমোহন চক্রবর্তী। বাড়ি কালীঘাট। দাদার সাইকেল ভেঙেছ বলে মার খেয়ে গৃহত্যাগী হয়েছো। তারপর দেখলাম আমার কথা উনি আমার চেয়ে ভাল জানেন। ওঁর বলা শেষ হতে আমি মাথা নিচু করলাম।

অত ভয় করার কিছু নেই। তোমাকে আমার খুব দরকার ছিল। আমি তোমারই জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

—আপনি জানতেন আমি আসব? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

—আমি জানতাম এই সময়, এই দিনে তোমাকে আমার কাছে আসতেই হবে তিনি হেসে উত্তর দিলেন।

ওঁরই আশ্রয় এবং শিক্ষায় সাত বছর আট মাস নিজেকে তৈরী করার প্রশস্ত অবকাশ পেলাম। জীবনে কোনোদিন কারো কাছে এমন স্নেহ আর আদর পাইনি। পরে জেনেছি সাধুজী ছিলেন বরোদার লোক। নাম ধূর্জটিনারায়ণ দীক্ষিত। সর্বভাষায় পারদর্শী। অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং এসবও অতিক্রম করা দিব্যদর্শন। কতদিন অনাহারের পর আহার জুটল ওঁর আশ্রয়ে। কন্দমূল, কতরকম সুস্বাদু ফল। সেসব খেয়ে পনের দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য ফিরে গেল।

ওঁরই কাছে শিখলাম যোগ, তন্ত্র, স্পিরিচুয়াল যোগাযোগ। হল দীক্ষা পুনশ্চারণ মন্ত্রসিদ্ধি। দেখতে দেখতে [illegible] বছর [illegible] হল। [illegible]

সুন্দর স্বাস্থ্য। একটু একটু দাড়িও রাখলাম মন সবসময় আনন্দে ভরপুর। বাড়ি-ঘর, মা-বাবা সবই ভুলেছি। এই সময়েই এল এমন এক নতুন সমস্যা যার ফলে জীবনের মোড় ঘুরে গেল। অমন শান্তি আনন্দের রাজ্যে কি বেশীদিন ঠাঁই পাওয়া যায়?

সন্ন্যাসী জীবনের নিয়ম হল মন্ত্রসিদ্ধ হবার পর জন্মভূমি প্রদক্ষিণ করা। গুরু একদিন বললেন, 'যাও বাবা, একবার বাড়ি ঘুরে এস। সন্ন্যাস গ্রহণের পর জন্মভূমি প্রদক্ষিণ করে আসতে হয়। তবে আমি জানি তুমি আর ফিরে আসতে পারবে না। ইচ্ছে ছিল আর ছ মাস বাদে তোমার সামনেই এ দেহ ছেড়ে যাব। কিন্তু মনে হচ্ছে সেটা আর হবে না। মেরা কাম তুম উঠা লেও। জনসেবামেই তোমহারা মোক্ষ মিল যায়েগা।'— এই ছিল আমার প্রতি ওঁর শেষ আদেশ ওঁকে প্রণাম করে করে চলে এলাম।

এদিকে বাড়িতে এসে দেখি আমার জন্য মা'র পাগল হয়ে যাবার মত অবস্থা। আমায় অত বছর বাদে পেয়ে সবসময় মহামূল্যবান রত্নের মত আগলে রাখতেন। রাত্রে ওঁর শাড়ির সঙ্গে আমার জামার খুঁটের গিঁট বেঁধে ঘুমোতেন। পাছে উনি ঘুমোলে আমি পালিয়ে যাই। আর ঘুমোতেনই বা কোথায়? সবসময় হারাই হারাই ভয়। তাছাড়া এমন মানসিক বিপর্যয়ের দরুণ খুব অসুস্থও হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ডাঃ অমল রায়চৌধুরী ওঁর চিকিৎসা করতেন। উনি আশঙ্কা করেছিলেন মা ছ মাসের বেশী বাঁচবেন না। আমি হিসেব করে দেখলাম যদি ছ মাসের মধ্যেই মার মৃত্যু ঘটে আমি গুরুদেবের দেহত্যাগের সময় উপস্থিত থাকতে পারব। কিন্তু ছ মাসের জায়গায় মা তের মাসের মাথায় দেহ রাখলেন। ফলে, আমার একূল ওকূল দুকূলই গেল।

আবার সেই সংসারের যন্ত্রণা। অভাব অনটন। কত জায়গায় চাকরি করতে হল প্রয়োজনের তাগিদে। টাটা এয়ার ক্লাব, এ্যালেন বেরী, উজ্জ্বলা সিনেমা। সব শেষে ১৯৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী ইনকাম ট্যাক্স অফিসে চাকরি নিলাম। মার পর বাবাও চলে গেলেন। বাড়ীতে অশান্তির সীমা নেই।

বাড়ি থেকে চলে এসে কিছুদিন পার্ক সার্কাসে এক বন্ধুর বাড়ি রইলাম। তারা কোনো মতেই খরচ নিতে রাজী নয়। নিজেকে বড্ড 'অবলাইজড' মনে হতে লাগল। তখনই চলে এলাম এই এরিয়ায় (বিড়লা একাডেমীর পাশে)। এখানে তখন লম্বা লাইনে ছিল সারি সারি উদ্বাস্তুদের ঘর। উদ্বাস্তু ক্যাম্পেরই আমার পরিচিত এক বন্ধুর আমন্ত্রণে এখানে চলে এলাম। রাত্রে কালীঘাট পার্কে শুতাম। কিন্তু দু চার দিন পর সেখানেও পুলিশের ঝামেলা শুরু হল। বন্ধু বললেন, চলে

এস এখানে। এত কিসের সঙ্কোচ? এলাম। কিন্তু এখানে এসে যে অভিজ্ঞতা হল—সেটা না হলেই ভাল ছিল। দেখলাম মানুষ কত নীচ, জঘন্য হীনমন্য হতে পারে। আর তেমনই হীন ওদের নৈতিক চরিত্র। প্রতি মুহূর্তে নিজের বিবেকের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করে ওদের সঙ্গে থাকাটা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠছিল।

আমার বিব্রত অবস্থা দেখে ক্যাম্প কমিটি থেকে আমায় একটা ঘর দেওয়া হল। সারাদিন সেই ঘরে থাকতাম। রাত্রিবেলা শহরতলীর সব শ্মশানে ঘুরতাম। কোনো শ্মশানই বাদ ছিল না। কিন্তু এ স্বস্তিও ভাগ্যে সইল না। ক্যাম্প কমিটির এক ভদ্রলোক হীন রাজনীতি সুরু করলেন। ওরই এক বন্ধুকে আমার ঘরে দখল দেবার উদ্দেশ্যেই তার জিনিসপত্র এক এক করে আমার ঘরে ঢোকাতে লাগলেন। আমিও আস্তে আস্তে কোণঠাসা হয়ে পড়লাম। তবে কোনো রকমে দিনটা কাটিয়ে দেবার কথা। তাই এ-সব অসুবিধাকে অগ্রাহ্য করে চলার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সেভাবেই বা থাকতে পারলাম কই? একদিন বাইরে থেকে এসে দেখি, আমার স্যুটকেশ, কথামৃত স্তোত্রের বই বাইরে পড়ে। আর আমার ঘরে ঝুলছে বিরাট তালা।

গুরু কৃপায় এ অবস্থাও আমায় ঘায়েল করতে পারল না। সেই সময় এখন যেখানে মন্দির তারই পাশে থাকত নিঃসন্তান শ্রীনাথ দে। আমাকে সে দেবতার মত ভক্তি করত। তারই ভাই ধীরেন দে আমার সব স্তোত্র বই, কথামৃত নিয়ে ঘরে রাখল। সে ও শ্রীনাথ মিলে আমায় একটি চালা ঘর তৈরী করে দিল। একখানা চৌকিও কিনলাম আট টাকা দিয়ে। এইভাবে এখনকার কালী মন্দিরের এলাকায় এসে পৌঁছলাম। কিন্তু ওপরওলার ইচ্ছে অন্য রকম। তাঁর কাজ না হওয়া অবধি আমায় কোথাও সুস্থির হতে দেবেন না। ধীরেন দে'কে আমি ইনকাম ট্যাক্স অফিসে একটা চাকরি করে দিলাম বলেই মৃদু হেসে বাবা বললেন—'উপার্জনক্ষম হওয়ার পরই বিবাহ করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অধ্যায়। হল তার বিবাহ। তারপরই দরকার ঘরের। আবার ঘর ছাড়তে হল। শ্রীনাথ আমায় একটা করে দিল। সেখানে থাকি, খাই শ্রীনাথের সঙ্গে। ওদিকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটি থেকে টালায় থাকবার বন্দোবস্ত হওয়ায় ধীরেন দে সেখানে আশ্রয় পেয়ে চলে গেল। তখন খালি-হওয়া ফাঁকা জমিতে আমি আর শ্রীনাথ লাউ কুমড়ো কচু এই রকম সব আনাজের চাষ করতে লাগলাম। খাওয়ার সমস্যার মোটামুটি একটা সমাধান হয়ে গেল। কারণ —— প্রয়োজন ছিল সামান্য।

সন্ধ্যায় সবাইকে নিয়ে বসে মার কথা হ'ত। সে সময়টা সকলের বড় আনন্দে কাটত। ওরাই তখন প্রস্তাব করল—এখানে একটা মন্দির করে মার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হ'ক এবং সে মন্দিরের পুজো ও দেবসেবার দায়িত্বভার আমি নিই।

কিন্তু ও-সব প্রস্তাব উঠতেই শিউরে উঠলাম। দিব্যি খাচ্ছি, দাচ্ছি, 'মা মা' করছি আনন্দে আছি। মন্দির, বিগ্রহ হলে আবার সকাল-সন্ধ্যা একটা পুজোর-আচচার আয়োজন কর। রাতে মন্দিরে তালা দাও। ধোওয়া-মোছা, রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব, ও-সব আনুষ্ঠানিক ঝামেলার মধ্যে কে যাবে? আমি ও সব পরিকল্পনায় কোনো আমল না দেওয়ায় ওরা সব খুব ক্ষুণ্ণ হল।

...ওরা চুপ করলেও মা চুপ করে রইলেন না। প্রতি রাত্রে নানা রকম স্বপ্ন দেখা সুরু হল। আমি চুপচাপ রইলাম। হার মেনে কোনো কিছুকে গ্রহণ করবার পাত্রই আমি নই।...

কিন্তু হ'ল না। আট দিনের দিন ঐ ঘরেই মার দিব্য দর্শন পেলাম। রাত একটা দেড়টার সময় ধ্যান-পুজো সমাপ্ত করে শুয়ে পড়েছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই অনুভব করলাম দিব্যগন্ধে সারা ঘর ভরা। ঘরের মধ্যে কোথা থেকে উজ্জ্বল নীলাভ আলো। ওঠবার চেষ্টা করতেই দেখি সারা গা এমন ভারী হয়ে গেছে যেন কে দশ মণ পাথর চাপিয়ে রেখেছে। জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। আস্তে আস্তে উঠে দেখি মাথার কাছে মা দাঁড়িয়ে। পরণে ঘোর লাল শাড়ী। সুন্দরী, শ্যামা মূর্তি। তবে চতুর্ভুজা নন দ্বি-ভুজা। জিভ মেলাও নন। ঠোঁটের কোণে মধুর হাসি।

আস্তে আস্তে উঠে বসে, ভাল করে চোখ রগড়ে দেখলাম মার চুল নড়ছে, চোখের পাতাও পড়ছে। তখন দুর্বলতা এল। প্রশ্ন করলাম, —'আমি সামান্য মাস মাইনের চাকরি করি। মন্দির, বিগ্রহ, পুজো এ-সবের খরচ চালাব কেমন করে?' মা বাঁ-হাত তুলে অভয় দিলেন। তারপরই একেবারে অদৃশ্য। আর দেখতে পেলাম না।

আমি চৌকী থেকে পড়ে গেলাম। শব্দ শুনে পাশের ঘর থেকে শ্রীনাথ এসে তুলল। তখন তার কাছে ব্যাপারটা চেপে গেলাম। কিন্তু সন্ধ্যেবেলার সভায় সবাইকে বললাম। বললাম বললে ভুল হবে—কে যেন আমায় বলিয়ে নিল। তখন ওরাই বিগ্রহ পুজোর আয়োজনে লেগে গেল। কোথা থেকে কেমন করে আপনা থেকেই সব জোগাড় হয়ে গেল। ১৯৫৫ সাল, ১৩ এপ্রিল ৩০ চৈত্র এইখানে পুজো বেদী প্রতিষ্ঠা করা হল। সুন্দর, সুশৃঙ্খলভাবে পুজো হল। পুজোর পর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হল। যার কাছ থেকে ঠাকুরের মাথার ওপরের ত্রিপল চেয়ে আনা হয়েছিল সে আর ফেরৎ নিল না। ওটা রয়ে গেল মার সম্পত্তির মত। পুজোবেদীর চার ধারে অনেক কুকুর আরামে শুয়ে থাকে।

আবার এল কার্তিক মাস। পুজো হল নির্বিঘ্নেই। বিসর্জনের জন্য মূর্তি তুলতে গিয়ে দেখা গেল অতজন মিলে ধরেও মাটির ছোট্ট মূর্তিটি তুলতে পারছে না। বোঝা গেল মায়ের যাবার ইচ্ছে নেই। বললাম—'থাক তবে। তোমার ব্যবস্থা তুমিই করবে। তাই করেছেন।'

কিভাবে যে সব ব্যবস্থা হল—ভাবলেও অবাক লাগে। যাদবপুর ইন্সট্রুমেন্ট ফ্যাকটরী থেকে এক ভদ্রলোক খড় দিলেন। শ্রীনাথ নিজে বয়ে নিয়ে এল। তারপর কেউ দিল সিমেন্ট, কেউ ইঁট, কেউ টালি। তখনও মায়ের পঞ্চমুণ্ডির আসন জোগাড় হয় নি। সে সময় যজ্ঞবাড়ী শ্মশানের ফণীভূষণ চক্রবর্তী ছিলেন যেমন তন্ত্রসিদ্ধ তেমনই মাতাল। তাঁর কাছে বহু মড়ার মাথার খুলি ছিল। অনেক তোয়াজ করে মদ-টদ খাইয়ে তাঁর কাছ থেকে খুলি জোগাড় করে পঞ্চমুণ্ডির আসন তৈরী হল। তখনও মন্দিরের মাথার ওপরটা ছাওয়ানো হয় নি। একদিন ডাঃ নৃপেন দাস কোথা থেকে আমার খবর পেয়ে তাঁর নিঃসন্তানা ভ্রাতৃবধূকে নিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—এর সন্তানসন্ততি হবার কোনো আশা আছে?

নিশ্চয়ই আছে—আমি বললাম।

কেমন করে হবে? আমি নিজে হাতে অপারেশন করেছি। সে থাকবে কোথায়? নৃপেনবাবুর হাসি থামতেই চায় না।

চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপরেও আর একটা শাস্ত্র আছে সেই শাস্ত্রের বিধানেই তার থাকার আশ্রয় মিলবে। সত্যিই যখন হল বিস্ময়ে আনন্দে তাঁর মুখ দিয়ে কথাই সরে না। তারপর অভিভূত হয়ে বললেন, মায়ের সেবায় আমি কিছু দিতে চাই।

উত্তম প্রস্তাব। মায়ের মাথার ওপরের ছাউনিটা করিয়ে দিন। এ্যাজবেস্টারে হলেও ক্ষতি নেই।

মার মন্দিরের মাথায় ছাউনি পড়ল। একদিন সরলা দেবী বিড়লা এসে মাকে দর্শন করলেন। উনি সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি মেয়েদের দাঁড়ানোর কষ্ট দেখে পাশে শেড করে দিলেন। আর এক সহৃদয় ভদ্রলোক ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা করলেন। এমনি করে একে একে মার সংসারের সব ব্যবস্থা মা-ই করে নিলেন। আমায় অনুগ্রহ করে তাঁর সেবার ভার দিয়েছেন তাতেই আমি ধন্য। প্রতিদিন দূর-দূরান্তর থেকে এত মানুষ আসে, দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের রোগ ও কষ্টের উপশম হয়—এ-ও তাঁর ইচ্ছেতেই। আমার দরিদ্র দেশের দরিদ্র দুর্ভাগা সন্তান এরা। যতদিন যতটুকু পারি এদের সেবা করে যেতে চাই। কারণ আমি জানি সেটা আমার মায়েরই সেবা। এ-সবের জন্য আমি কোনো দক্ষিণা নিই না।

চারদিকের ভীড়ের মেলা—আসতে আসতে হঠাৎ মনে হল এই কেক কালীবাড়িই একদিন তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

ফকিরের কেরামতি

বাহারুদ্দিন

ধান কাটা শেষ, ধান মাড়া শেষ, যাদের খেত-খামার আছে ধান তুলেছে ভাঁড়ারে যাদের জমি-জমা নেই তাদের বাড়িতেও এই মরশুমে জমা ধানের গন্ধ, রোজাকাম করে বিনিময়ে পয়সা অথবা ধান নিয়ে এসেছে। এখন এ অঞ্চলের মানুষের অঢেল অবসর, ধনী-গরীব প্রায় সবারই শাকসব্জি—আলু, কপি, মরিচ, পেঁয়াজ রসুনের কম-বেশী ছোট-বড় এক-আধটা বাগান আছে। বাগানের কাজে দিন-রাত লেগে থাকতে হয় না, সময় বিশেষে মাঝে মাঝে আলু-ডোবায় মাটি তুলে দিতে হয়, জল ছিটিয়ে দিতে হয়, তুলে ফেলতে হয় আগাছা ঘাস-টাস ঝামু কৃষকের কাঠ-মেনতের শরীর এসব তুচ্ছ, হাওয়ায় লাগে না, ধরলেই শেষ, সকাল-বিকেল ঘন্টাখানেক সময় দিতে পারলেই যথেষ্ট। রাত্রে এরা মশগুল থাকে গান বাজনায়, পুঁথি পড়ায়। পুঁথি পড়ে মুর্দারিছ। দাওয়ায় বসে সুর করে করে পড়ে যাচ্ছে—

এলাহি করহ মাফ তকছির আমার।
বান্দা তেরা গান্ধা আমি বড় গোনাহগারা

মুর্দারিছ আলী 'হাতেম-তাই' পুঁথি পড়ে, বলে যায় 'কাছছুল আম্বিয়ায়' (নবীদের গল্প) গল্প। গল্প বলে ভেলুয়া সুন্দরীর। তার গল্প বলার ঢং অপূর্ব। একটা বয়েত বলবে আর গল্প বলবে। গল্প বলতে বলতে রাত হয়। নিঝুম হয়ে আসে, একে একে শ্রোতা উঠে, বাতির কেরোসিন শেষ হয়ে আসার হলেই মুর্দারিছ মিঞাও উঠে পড়ে। না এখন উঠি রে, রাইত অনেক অইল।' মাঝ বয়সীরাই আসে পুঁথি শুনতে। চেংড়া ছেলেদের পুঁথি শোনার তত ঝোঁক নেই, তাদের ঝোঁক বাইস্কোপে, থিয়েটারে, যাত্রায়। শহরে কোন যাত্রা আসছে। কলিকাতার কোন থিয়েটার আগামী শনিবার মাঠে ভিত গাড়বে—এসব খবরাখবর নিয়েই তাদের দিন কাটে। দিন কাটে আড্ডায়। আড্ডা জমায় পীরের দোকানে। পীরের নাম রিয়াসত। পীর নামেই বিখ্যাত। একবার তার মাথা খারাপ হয়। সে মোহনপুরে জটআলা শার বাড়িতে মাসের পর মাস পড়ে থাকে, গান করে। আল্লা আল্লা করো তুমি আখেরি উম্মত,

ওরে যাও মুখে মুখে নবী ছিকত।

লোক বলল,

রিয়াসতের বুকে মাল ধরেছে। যেই সেই মানুষ নয়। এসব শুনে শুনে তার কেরামতি বেড়ে গেল। সে আর হাল ধরে না। কাজ-কর্ম করে না। দাড়ি রেখেছে লম্বা। মাথায় সুন্নতি চুল। লম্বা কোর্তা আর জোব্বা পরে চলাফেরা করে। লোকের সঙ্গে কথা বলে কম। আস্তে আস্তে বসে হাঁটে। তসবিহ জপে। এই থেকেই পীর বলে পরিচিত। রিয়াসতের বাবা মারা গেল। বড় ভাইরা বলল 'না ইলা চলবে না।' দোকান দিয়ে বসিয়ে রাখল। দোকানের নাম হল পীরের দোকান। ধীরে ধীরে দোকান জমে উঠল। পীরের পীরালি উবে গেল। পীর মন দিলেন দোকানে। বেচা কেনাই এখন আসল। দুনিয়াদারী গিলে ফেলল পীরের কেরামতিকে। প্রথমদিকে তাও মাঝে মাঝে মুরশিদ জটাআলা শার বাড়িতে মুরীদ যেতেন, পরে দোকানের ব্যস্ততায় তাও শেষ হয়ে এল। রাত হলেই খালের পার, বিলের পার, বিষ্ণুধর মীরার গ্রাম থেকে একে একে চেংড়া ছেলেরা ভিড় জমায়। গান সুরু হয়। দুতারা বাজায় আতাই গান করে বড় মিয়া। বড় মিয়া গানের সাগর। গান জানে অসংখ্য। দেহতত্ব, মারিফতী, শরিয়তী জারি সারী ভাটিয়ালি খাটো সবকিছুই মুখে সুর হয়ে ফোটে।

গানের সুরে দুতোরার আওয়াজ ডুগডুগি আর ডুপকির গুম-গুম শব্দ মিশে অদ্ভুত মেজাজ সৃষ্টি হয় বড় মিয়ার মেজাজ থাকে তুঙ্গে. বড় মিয়া গান ধরে—

হায়রে মন পাগলার মনা,
গনার দিন ফুরাইয়া গেলা,
দিন থাকিতে কররে মন বিচার ভাবনা গো।।

টান দিয়ে সুর তুলতেই চেংড়া ছেলেরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আসর জমায়। ডুগডুগি হাতে নেয় পেটুয়া। পেট বড় বলেই এই নাম। দারুণ রসিক, তেম্নি তার গলা। পেটুয়া সিনেমা-টিনেমা দেখে না। গানেই তার প্রাণ, সব সময় সঙ্গ দেয় বড় মিয়ার। বড় মিয়াকে ওস্তাদ বলে ডাকে। সম্মান করে। বড় মিয়ার সামনের সিগারেট ফুঁকে না অশ্লীল কথা বলে না। গানের মজলিসে অনেক রাত হয়। রোজদিন গান হয় না। গান বসে বৃহস্পতিবারে আর শুক্রবারে। শুক্রবারে হয় মারিফতী গান, বৃহস্পতিবারে বারো-মেশানি। ময়-মুরুব্বিরা ছেলে চেংড়াদের গান-বাজনায় হাসি তামসায় সায় পায় না। মহল্লার মোড়ল, পঞ্চায়েত মুখ-রাজরা অনেকবার পীরকে নিষেধ করে দিয়েছে। পীর কি করবে? 'আমার তো করার কিছু নাই. আমি দোকানদার আমি তো মাল বেচি চাচা।' রহিমুদ্দিন উত্তর পাড়ার সম্মানি মানুষ। পঞ্চায়েত। তার কাছে মসজিদে অভিযোগ গেছে এই ছেলে চেংড়াদের বিরুদ্ধে। তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন পীরকে। পীর নিরুপায় হয়ে বলল, জোয়ান মর্দ ছেগেড়াইল সামলানি আমার পক্ষে সম্ভব নয় চাচা। আপনে বিবেকআলা মানুষ, আপনে চিনেন জোয়ানকীর রক্ত।' রহিমুদ্দিন একদিন রাত্রে এসে বলে গেলেন 'হাসি তামসা আমরাও করছি। তোমরাও করো। মহল্লার ময় মুরুব্বীরে বদনামী কইরো না—' এই আমার আরজ।' ছেলেরা তাকে আশ্বাস দেয়। ছেলেদের গুণ আছে, গান-বাজনা করে হাসি তামশায়, হৈ-হুল্লড়ে লেগে থাকে, বদমাসি, খারাপ কাজ করে না বাপ-চাচার সম্মান রেখে চলে।। মাঝে মধ্যে ঝগড়া ফসাদ হয়ে যায় তাদের মধ্যের বয়স্করাই ফয়সালা করে ফেলে। তবুও ময়মুরুব্বিদের অভিযোগ লেগে থাকে কতবার নিজের নিজের ছেলেদের মানা করেছে, আটকাতে চেয়েছে, পারেনি এই পীরের দোকানের আড্ডার এক ভয়ানক যাদু। উঠতি বয়স হলেই এখানে এসে পা দেবে, সে ছাত্র হোকণ হালুয়া হোক আর বাগাল বা কারোর বাড়ির চাকর হোক সে বিকেলে একবার না একবার আসবেই। বড়রা বলে কলির কাল, আখেরি জমানার আলামত হচ্ছে এসব। এসবের শেষ নেই। আতাই হচ্ছে খান পাবের ছেলে। তার চাচা মুন্সী পরেতজন্মান। মাওলা মৌলবীদের দানিষ্ঠ। ভাতিজার গান গাওনা আর নিশা রাতের আড্ডা বরদাস্ত করতে পারে না। প্রায়ই আতার মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'দাদাজী কাঁদতেন আঘাটে ঘাট অইল, অপথে পথ অইব ছেলেরা মেয়ে অইব, মেয়েরা ছেলে-ছোকড়ার ঢং ধরব—কত আজগুবি ঘটনা অইব হারাম হালাল চিহ্ন থাকব না—কেয়ামতের আলামতে দুনিয়াডা ভরি যাইব।' আতাইর মা চুপ থাকে। চাচা আতাইকে এসব বলার সহস পায় না। আতাই রগচটা ছেলে। চাচাকে পরোয়া করে না। মা-বাবার কথা শুনে না। খেলা আড্ডা আর সিনেমা, যাত্রা থিয়েটার দেখে দেখেই মেট্রিক টেস্টে তিন তিনবার গোল খেল। এখন আর পড়াশুনোর নাম নেই। এখন সে প্লেয়ার। গ্রামের অনেক ছেলের গুরু। আতাই ভাই বলতে ছেলের পাগল। আতাই পীরের দোকানের একজন বাঘা খদ্দের, আতাই রাতের আড্ডার রসিক আতাই না হলে জমে উঠে না আতাই না হলে খেলার মাঠে ছেলে-ছোকরারাও বেসামাল।

গরীব বয়স্ক মানুষদের পীরের দোকানে আসা ছাড়া উপায় নেই। জমি জমা নেই ফসল ফলাবে। শরীরে শক্তি নেই মজুরী করবে। বাড়িতেও শান্তি নেই হাজার ঝামেলা। জোহরের নামাজ পড়েই এসে বসে থাকে। তখন চেংড়া ছেলেদের ভিড় থাকে না। সন্ধ্যার আগে আগে অথবা পরেই উঠে পড়ে যাবার আগে দশ-বিশ পয়সার বিড়ি চাই- পীর হাঁকিয়ে উঠে না আর বাকী অইব না, আগের পইস খালাস করো।' দু-একজন যারা দিতে পারে দিয়ে দেয়, রসাই মুদি আছাই শরাফ আলী—এরকম অসংখ্য মাথা চুলকে চুলকে বলে 'না ভাই একটু সবর করো আগামী মঙ্গলবারে বাজার করিবা আদায় করি দিমু।' মঙ্গলবার আসে না। আজাবী মানুষ দু চার টাকার চাল সুপারী বিকি করে যা পায় বাজার খরচ করে বেরিয়ে আসতে না আসতেই পকেট খালি হয়ে যায়। পীর প্রথমদিকে অনেক বাকী সিঁক দিয়েছে আজকাল চালাক হয়ে গেছে লোক বুঝে দেয়। দোকানে সামনে [illegible] বড় বড় অক্ষরে কাউকে নিয়ে লিখিয়ে রেখেছে আজ নগদ কাল বাকী

আদায় শর্তে কথা রাখি।

তবুও পীর বাকী সামলাতে পারে না। দিতেই হয়। বাকীতে ও তার লাভ। নগদেও তার লাভ। চার টাকার জিনিস পাঁচ টাকায় বিকি করে। বাকী হলে আরো বেশী! খদ্দেরদের সবাই বাকী দিকের কারবারী। বাকী না দিলে দোকান চলে না। বাকী দিলে উদ্ধার করা মুশকিল। চৈত-বৈশাখের দোহাই দিয়ে কার্তিক দিয়ে কড়াটা আদায় করে বাদ-বাকী আদায় হয় কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ধানে সুপোরীর মরশুমে।

একদিন বাজার থেকে আসার সময় আছাই আলো নাম আছাব আলীর সঙ্গে দেখা। বাকীর খাতায় হিসেব মত আছাব আলীর কাছে তার পাওনা দুশো টাকা। গত বছর কিছু আদায় করেছিল। আবার জমে জমে দুশ টাকা হয়ে গেছে। আছাব আলী দোকানে খুব কম আসে। আসলে নগদ দশ-বিশ পয়সা নিয়ে আসে। অনেকবার কথা দিয়েছে, গরু বিক্রি করে অথবা ছাগল বিক্রি করে বাকী খরচ সারবে। পারেনি। সেদিন দেখেই বলেছে, 'আছাই ভাই কাইল ভিয়ানে আমি আইমু, বাড়িতে থাইক হিসাব-নিকাশ করমু।' হিসাব-নিকাশ মানে গাছের সুপোরী নামিয়ে পীর বাকী আদায় করবে। সঙ্গে নিয়ে আসবে রোজধারী কলুমকে। আছাই বাড়িতে এসে বলে দিয়েছে—'কাইল রিয়াসত পীর আইব সুপোরী নিতে তোরা কই দিস আমি নাই, এক খবর পাইয়া নিতাইনগর গেছি।' কিন্তু আছাই মিয়ার ফন্দি টিকল না রিয়াসত পীর ধোকা খেয়ে খেয়ে চালাক হয়ে গেছে। সকালে আছাব আলী ঘুম থেকে ওঠার আগেই সে এসে হাজির হল। 'ও আছাই ভাই আছাই ভাই উঠো আমার অনেক কাম আর কত ঘুমাইতায় উঠো।' আছাই ভাবতেই পারেনি—এত ফজিরে পীর চলে আসবে। মুখ হাত ধুয়ে আসল। পীরের সঙ্গে এসেছে কলুম। কলুমের হাতে বাঁসের শলা আর চিনির খালি বস্তা। আছাই বলল 'কি সুপারীই বা নিবায়—এবার ফসলের অবস্থাও খারাপ। সুপারীও পাকছে না।' রিয়াসত আছাব অলীর কোন কথায় কান দিল না। কলুম রিয়াসতের ইঙ্গিত পেয়েই গাছ বেয়ে বেয়ে উঠে পড়ল। কলুমটাও পীরের মত কসাই। মায়া-দরদ নেই। গাছ বেয়ে উঠলেই হল, এক গাছ থেকে অন্য গাছে এরকম করে বাঁড়ে লয়ে বেড়ায়। কলুম দেখে দেখে টকটকে লাল ডাগর ডাগর সুপোরীর ছড়া ফেলছে একের পর এক আছাব আলী নিরোত্তর। কলুম ঘন ঘন সুপোরীর এক গাছ থেকে অন্য গাছে যেতে যেতে পুকুর পাড়ের দিকে যাওয়া করল। কলুম নামছে না। এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। পুকুর পাড়ের একটা গাছে হাত দিতে আছাব আলী বলল গাছটায় হাত দিস না কলুম আশা করছি ইবার হাট সুপারী দিয়া চেরা লাগাইমু।' কলুম কিছুই শুনেনি। বড় বড় সুপোরী ডুপ-ডুপ করে পড়তে লাগল আছাই হাউ-মাউ লাগাল। ধমক দিল। 'কথা কইলে কাণ শুনছ নে বাকী খাইছি করি পাপ করছি না কি—ও রিয়াসত ভাই, তোমার বিচার দেখলাম বিচের (বীজের) সুপারীটা পাড়িয়া লইয়া যারায় বাঘেও দোহাই মানে তোমরা মান না।' আছাব আলী কঠিন ও রুক্ষ স্বর। রাগ দেখাল। [illegible] এসব গায়ে মাখল না। রিয়াসত [illegible] আদায় করবে। সে পাওনা কি রকম আদায় করতে হয় ভালো জানে। এ সময় সে মাথা গরম করে না মেজাজ দেখায় না হাসতে হাসতে, [illegible] মাথায় কাজ হাসিল করে। দোকানদারী করে করে সে এখন পাকা কোন খাটনে কি ধান দিতে হয় সে ভালো জানে। এই

করে মরশুমেই নির্ভর করে সারা বছর। একবার সুপোরী, অন্যবার ধানে। ধানেতে তত লাভ হয় না। সুপোরীতে কড়ায় কড়ায় লাভ। কিন্তু তাতেও কি শেষ হয়। বকায়া টাকা পড়ে থাকে। জমা হয় খাতায়। তার ব্যবসা কেবল শুদ্দ দোকানদারীতেই নয়, ব্যবসার আসল পথ অন্য। গোপন। যখন থেকে তেল-ডাল আটা ময়দা চিনির কন্ট্রোল আরম্ভ হল, তখন থেকেই তার দোকানদারী ফুলে ফেঁপে উঠছে। অনেক ধরাধরি করে কন্ট্রোলের যোগাড় করেছে। পঞ্চায়েতকে ঘুষ দিতে হয়েছে। আজও ঘুষ দিতে হয়। চেকিং-এ আসে সাপ্লাই-এর লোক ডান হাত বাঁ-হাতের কারবার দেখে। চেপে যায়। আসে রিকসো করে। ফিরে যায় রিকসো চেপে। সেদিন রিয়াসত মিয়ার বাড়িতে মুরগী পোলাওয়ার আয়োজন হয়। খাতির যত্নের অভাব হয় না। শহর থেকে আগের দিন রিয়াসত মিয়া মিষ্টি, সিগারেট নিয়ে আসে, বউকে বলে, 'কালবু অনেক কাজ' সায়েব আইব', সকাল থেকেই বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করা হয়, সেদিন দোকানের অন্য ঝামেলা বন্ধ রাখে। ঠিকঠাক করে খাতা-পত্তর, টিপ সই।— রেশনের সময় চিনি যদি আসে এক বস্তা। রিয়াসত লোককে বলবে এসেছে মাত্র আধা বস্তা। বাকী চিনি সে লুকিয়ে লুকিয়ে বিক্রি করে। চাল আসে বর্ষার সময়। বর্ষাকালে কৃষকরা বড় অভাবী। সরকার চাল-আটা-ময়দার রেশন দেয়। রেশন থেকে অর্ধেক সরে দেয় পীর। গ্রামের, পাড়ার, অঞ্চলের অধিকাংশ লোক সহি করতে জানে না। টিপ সহি দিয়েই কারবার চালায়। পীর সহির পাশাপাশি একশো। চিনি দিলে হিসাবে আড়াই শো, আড়াই শো দিলে হিসাবে এক কেজি। মানুষেরা সরল। বুঝেও বুঝে না। যারা আপত্তি করার চুপ থাকে। যুবক ছেলেরা পীরের হাতে। পঞ্চায়েত পীরের হাতে। রহিমুদ্দিন সায়েবকে সে বশ করে রেখেছে। পীর বাইরের গ্রামের লোককে দেখায় সে রেশনিং-এ লাভ লোকসানের ধার ধারে না। বলে, 'খোদার নাম লইতে পারি না তার বান্দার খেদমত করতেছি।' গ্রামের কেউ কেউ বলে, আড়ালে 'এক নম্বর হারামি। নামাজ পড়ে পাঁচওয়াক্ত রোজা ধরে তিরিশটা, আবার পানী খায় ডোব দিয়া।' রিয়াসত দিনে দিনে দেখতে দেখতে আউল-মুজফী ছেড়ে দিল। পাক্কা ব্যবসায়ী হয়ে উঠল। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে বাড়িতে মিলাদ বসায়। জলসা বসায়। খতম পড়ায়। দোকানেও চেংড়া চামুংগাদের সামলাবার জন্যে আয়োজন করে গানের পালা। তিন-চার দিন ধরে গাজীর গান চলে মাইক বাজিয়ে। কেউ আপত্তি করলেই বলে আমি ইত্তাত নাই সবাকিছুই জোয়ান-ছোকড়াদের কারবার।' পয়সা জোগাড় করে সে গাজী পালার ওস্তাদের ভাড়া মিটায়। খোক খাওয়ার ব্যবস্থা করে সে। অন্য সময় দাওয়াত খাওয়ায় মোল্লা মন্ত্রীদের। পঞ্চায়েত মোড়লরা আসে। দাওয়াত খেয়ে সারা বছর মুখ বন্ধ রাখে। গরীব মানুষ বলে 'মুখেই মানুষ, না অইলে ফানুস। আমরা হালা মরছি তো মরম, আল্লায়ও মারে, বান্দায়ও মারে।' আটা-ময়দা-চিনি রেশনের। বড় ভাগ বসায় গ্রাম পঞ্চায়েত আর মেম্বার। তাদের মুখে সেলাই পড়ে। পেট ভরে।

চেংড়া চামুণ্ডা ছেলেরা আজকাল সিনেমা থিয়েটার পাগল। মোল্লা-মোলবীরা ফতোয়া দিল এসব হারাম। এসব নিষিদ্ধ। কে কার কথা শুনে। যে যাবার যাচ্ছে। লুকিয়ে প্রকাশ্যে সিনেমা দেখছে। সিনেমা দেখার তো পয়সা চাই। পয়সার যোগাড় হয় চুরি মারফত। চুরি করে নিজের বাড়ির ধান সুপোরী। দু-একজন আছে জাত চোর। রাত সন্ধ্যা হলেই অন্যের বাড়ির ভেতর ঢুকে নামিয়ে নিয়ে আসে সুপোরীর ছড়া। চোরাই মালের এক নম্বর খরিদদার পীর। দশ টাকার মাল তিন টাকায় খরিদ করে। গ্রামের বউ-ঝিদের বিড়ি খাবার পয়সার দরকার, এদেরও গোপন গোপন চাল সুপোরার খরিদ্দার রিয়াসত। চোরাই মালে লোকসান নেই। নগদ নগদ বিক্রি করে দিলেও লাভ আধাআধি। অভাবের সময় মুনাফার চেহারা তো একেবারে রসো রসো। ডান হাত বাঁ-হাত করে করে রিয়াসত বাড়ি বানাল জমি কিনল, পুকুর দিল, ছোট ভাইকে বিয়ে দিল। মাল সামানে দোকান ভর্তি। একদিন সে অভাবী ছিল, আজ তার টাকায় টাকায় তবুও অভাবী থেকে গেল। ইয়ার-দোস্তকে হা-হুতাশ করে বলে, টাকা পইসা তো আর কম হাতাইলাম না, ওজন মাপা আর ভাল্লাগে না, একেক সময় ভাবি ভাই-ভাতিজারে সব কিছু পছাই দিয়া একবার বিবিরে লইয়া হজ করিয়া আসি।' পীর এসব বলে। তার গঞ্জ যাওয়া হয় না। সকাল হলেই পাল্লা নিয়ে বসে। সারাদিনই কাজ। নিজের ছেলেমেয়ে নেই। বিয়ের পনেরো বছর হল। সন্তান-সন্ততী-হীন হয়ে পড়ে থাকল। দু-তিনবার দূর সম্পর্কের দু-দুটো ছেলেকে মানুষ করতে পারবে বলে নিয়ে এল, ওরা থাকল না, হাড়ে বদমাস ছেলে দুটো দু-তিন মাস থেকে উড়ে পালাল। বউ বলে, 'পরের পুত চোংগা ভরা মুত। তুমি আবার শাদী করো। মর্দ মানুষের দু-তিনবার শাদী করলে কিসসু অয় না। আল্লার নবীও এগারোবার বিয়া করছেন। কেতাব-কোরাণও বলে, চারবার শাদী করা জাইজে (শাস্ত্র সিদ্ধ) আছে। রিয়াসত বউকে ভালোবাসে, ঘরে বউয়ের সতীন নিয়ে এসে অশান্তি বাড়াতে চায় না। 'খোদার হুকুম অইলে অইব, না অইলে নাই। সবুর করমু।' সবুর করমু বলেও সবুর করা হয় না। পীর মোল্লা মুনসী ফকির দরবেশের কাছে যাওয়া-আসা লেগেই আছে। কোনো এক মোল্লা বলেছে, 'নিরাশ অইও না ভাই, ইবরাহিম নবীর বুড়া বয়সেও ছেলের জন্ম হল।' একবার ডাক্তার দেখাল। হাসপাতালে এল এক অসমীয়া ডাক্তার। অল্প দিনের মধ্যে চারদিকে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। রিয়াসতের শাশুড়ি ডাক্তার সাহেবের কথা বললেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনই সরকারী হাসপাতালে এসে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করল। ডাক্তার অসমীয়া। ডাক্তার বাংলা বলতে জানে না। কি এক ভাষা বলে কেরেং বেরেং করে। বাংলা বলে আবার কইলকাতার মানুষের মত। রিয়াসত টেনে-টুনে তার দুঃখ বলল। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখার কথা বলে। রিয়াসত ভয় পায়। পরে রাজী হয়। কিন্তু বউ তো আর রাজী হয় না। বলে 'না বাপ, লাগাক হারাম কাজ আমি করতে পারমু না।' অনেক কাকুতি-মিনতি করে বিবিকে রাজী করাল। ডাক্তার পরীক্ষা করল। বাড়ি ফিরে বিবি আল্লার কাছে মাফ মাঙে। তৌবা করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার তেমন কিছু বলেনি, নিরাশও করেনি। আশাও দেয়নি।

কয়েকদিন থেকে শোনা যাচ্ছে, জানকীর বাজারের কাছাকাছি শ্যামারগাঁয়ে কোথেকে এসে হাজির হয়েছেন একজন মজ্জুফ পীর, কথা বলেন কম, সব সময় খালি গায়ে থাকেন, নাম পড়েছে উধনা পীর, নামাজের ধার ধারেন না, খাওয়া-দাওয়ায় মন নেই, ওঁর বাড়িতে, মানে যার বাড়িতে আস্তানা গেড়েছেন, লোকের ভিড় ধরে না, সকাল-বিকেল যেন বাজার-হাটের ভাব, হিন্দু-মুছলিম, কুলি, পাড়ি (পাহাড়ি), মণিপুরী, সব ধরনের লোকই কেউ নিজের বিপদ নিয়ে, কেউ মনের খাহেস নিয়ে, কেউ বরকত পাবার আশায় কেউ পাবে নেকী এই উদ্দেশ্যে, আবার আশপাশ গ্রামের কেউ কেউ পীর দেখার প্রবল উৎসাহে চলে পড়েছে——কে কাকে মানা করে আর গেরহস্ত মানা করবেই বা কেন, পীর আসার পর থেকে তার বাড়ি, তার নামও পীরের যশের মত যশহুর হয়ে যাচ্ছে, লাভ বই তার কোন ক্ষয়ক্ষতি হবার নয়।——এই পীরের কথা গ্রাম, গঞ্জ, শহর-সদরের অসংখ্য মানুষের মত রিয়াসতও শুনেছে। তার ইচ্ছে একদিন বিবিকে নিয়ে দেখে আসে। দূর সম্পর্কের মামা কাছেম আলী এলেন তার বাড়িতে। পীরের প্রসঙ্গ উঠল। কাছেম আলীর গরু চুরি যায়। হালের দুটো দুটো সোমথ বলদ। কাছেম আলীর চিন্তার শেষ নেই। এদিক-ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজি হল, কোথাও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক ভাবলেন, নিরাশ হয়ে পড়লেন। এটা গত বর্ষার কথা। খেতের মরশুম। গরীব মানুষ টাকা নেই। আরো বলদ গরু কিনবেন। ঋণের টাকায় এমনিতেই 'পঠ বাঁকা। দোয়া দুরুদ কোরাণ পাঠ করছেন, আল্লার কাছে ফানা চাইচেন, এমন সময় একদিন স্বপ্নে দেখলেন, শ্যামার কোনার নবাগত পীর বলছেন আয় আমার ধারে আয়, তোর গরু তোর ঘরের কাছে পায়ের তলাত সোনা রাখিয়া ঘুরলে ফুরলে লাভ অর্থতে নায়,—তিনি স্বপ্ন দেখছেন একজন লোক দাড়িওয়ালা, আলখাল্লা পরনে

বসে বসে বলছে, [illegible] দিকে [illegible] [illegible], লোকে বলছে, ইনি হচ্ছেন শ্যামার-পাড়ার পীর—কাছেম আলী। পীরের দিকে এগিয়ে গেল, তাঁর পা ছুয়ে সালাম করার চেস্টা করতে পীর সরে গেলেন। কাছেম আলীর ঘুম ভাঙ্গল, পরদিন সকালেই ঘুম থেকে উঠে কাছেম আলী শ্যামারপাড়ার হাজির হলেন, পীর বসে আছেন, পীর নির্বিকার আশে-পাশে অনেক লোক, কাছেম আলী হাউমাউ করে নিজের স্বপ্নের কথা গোছর করলেন, পীর ঢিল ছুড়লেন উত্তর দিকে 'কান্দিস না, উত্তরে বাজার, দইখনে বাজার, কান্দিস না—পীর এরকম বিড়-বিড় করে উঠলেন, কাছেম আলী গরু খুজে পাবার মত আনন্দে সুখে 'বাবা আমার বাবা' বলে পীরের পা জড়িয়ে আরো ভেঙ্গে পড়লেন। 'সাচচা কথা, ভাইগনা, পীরের ভিতরে ধন আছে' কাছেম আলীর কাথা শুনে রিয়াসত উৎসাহ পায়, কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বউ জিগ্যেস করে, 'তারপর কি হইল বাবাজী'—'আর কি অইব, পীরের কেরামতির বরকতে দুই তিন বাজার বার বারেই একদিন, রবিবারে মোগলাই বাজারে গরু জোড়া ধরা পড়ল।' রিয়াসত অবাক হয়। তাকেও লোকে পীর বলে ডাকে, কিন্তু সে তো আর আসল পীর নয়। তার ভেতর ভেজাল সে ভালো জানে। তার বুকের ভেতর উথলে উঠে। বউকে বলে 'যাবি নাকি?' বউ সায় দেয় না। পীর মোল্লাদের চল-নল তার কাছে জল। অনেক পীর দেখেছে, মোল্লা দেখেছে। অবশ্য, মজুফ-আউলা পীর দেখেনি। আজ, তার বিয়ের পনেরো বছর, এখনো তার যৌবন ঢল ঢল মজবুত শরীরের কাঠি। শরীর দেখে মোল্লারাও বেসামাল। শয়তান উঁকি দেয় চোখ দিয়ে, শয়তান এগিয়ে আসে হাত দিয়ে। একবার বিয়ের চার-পাঁচ বছর পর, মায়ের সঙ্গে রতনপুরের হবিব মোল্লার বাড়িতে গেল। হবিব মোল্লা দেখে শুনেই মোল্লাকি করে। চার অঞ্চলে তার নাম-ডাক। যাদু টনায় সে আসাম বিখ্যাত। লোকে বলে, 'নবী কইল মোহাম্মদ কেতাব কইলে কোরাণ আর মোল্লা কইলে হবীব।' হবিব নাকি চোখ বন্ধ করে হাত তালি দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে নেমে আসে জড়ি, তাবেজ, ওষুধের বোতল। জিন ভুত তার তাবেদার। ডাকলেই এসে পড়ে, জিনিস দিয়ে যায়। বাড়িতে বসেই হবিবের মোল্লাগিরি সবসময় বাড়িতে হুঁসে বোধে থাকতে হয় জিনরা যেমন তার বশ, তেমনি তাকে সইতে পারে না, না—পাক (অপবিত্র) অবস্থায় পেলেই দুই উরু ছিঁড়ে ফেলবে—এই ভয়ে সে যেমন ভীত, তেমনি হর-হামেশা প্রস্তুত। হবিব মোল্লা আছিয়াকে দেখল, দেখেই বলল—'দোষ আছে— ভুতের দোষ।' জিগ্যেস করল বাড়ির দক্ষিণ দিকে কোন বড় [illegible] আছে? আছিয়া ভাবল।

গাছ তো অনেক। শিমুল গাছ। জারুল গাছ. গ্রামের বাড়ি, গাছপালার কি আর অভাব। ভেবে ভেবেই দেখল—একটা গাছ আছে সত্যিকারের বড় ও পুরোনো, তেঁতুল গাছ পুকুর পাড়ে। বলল, 'আছে পুকুইর পার তেঁতই গাছ।'—এই তেঁতই গাছই দোষ।' জোয়ান ভুতের বাস। জোয়ান ভুতের নজর পড়েছে। জোয়ান ভুত আশেক হয়েছে আছিয়ার রূপে। ঘটনা নতুন নয়। পুরানো। মস্ত বড় ভুত! সারানো সহজ নয়। খরচ লাগবে। কয়েক রাত মোল্লার বাড়ি থাকতে হবে। ভুত সরে গেলে আছিয়া গর্ভবতী হবে। মা-মেয়ে পয়সা খরচের ভয় পেল না। আছিয়া হাবিব মোল্লার চোখে আগুন দেখে, সে ইজ্জত যাবার ভয় পায় মোল্লার বাড়ি রাত থাকতে রাজী হল না। আপাতত একটা তাবেজ পাঁচ টাকা দামের কেরেং-বেরেং আরবী লেখা কাগজ নিয়েই মা-মেয়ে চলে আসে. আছিয়ার তাবিজে একিন আসে না, ফেলে দেয়। পুকুরে ছুড়তে ছুড়তে বলে. মোল্লা না দোয়াতী মোল্লা হারামির বাচচাই' তাবেজ এখানে সেখানে ছুড়ে ফেলতে ভয় হয়. জলে ফেলে। রিয়াসত, পীরের কথা তুলতেই আছিয়ার হাবিব মোল্লার কথা মনে পড়ে। মন থেকে সায় পায় না। পীর মজুফ, আউলা পীর দুনিয়াদারীতে নেই, পীর নিজে নিজেই মগ্ন, একথা ভাবতে উৎসাহ পায় 'কওয়া যায় না পীর ফকিরের কথা—হাজার অইলে ও মজুফ তো, আছিয়া মনে মনে ভাবে। আছিয়া দু-টানায় পড়ে, রিয়াসত চাপ দেয়। অবশেষে আছিয়া রাজী হয়, একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই স্বামী-স্ত্রী মাঠ কোণা-কুনি হেঁটে হেঁটে চার মাইল দূরে শ্যামার পাড়ায় পীরের বাড়ি পৌঁছোয়। পীরের বাড়িতে ভিড়. লোক আসছে আর যাচ্ছে. দূর দেশের চেনা-অচেনা কত লোক, লোকের ভিড় দেখে আছিয়া মাথার ঘোমটা আর গায়ের চাদর দিয়ে হাত-পা মুখ সর্বদিক ভালো করে ঢাকার চেষ্টা করে, আড়ষ্ট বোধ করে দিনকাল দেখে সে শুক্রবারই এসেছে, আজ জোম্মাবার, ভিড় তাই রমরমা। বাড়ি ঢোকার আগে রিয়াসত অজু করে, অজু শেষে দুরুদ পড়ে নবীর উপর নবীর পরিবারের উপর দুরুদ পড়তে পড়তে বউসহ এগিয়ে যায়. সে সব দিক থেকে মন পবিত্র রাখার চেষ্টা করে, সে এসেছে পীরের কাছে এসেছে দীর্ঘদিনের আরজি নিয়ে। পীর বাইরে ঘাটের উপর বসে আছেন, পীর নীরব। চারপাশে লোক। পীরের চেহারা সুন্দর নধর গালে গলে পড়ছে। পীর মাঝে মাঝে বিড়-বিড় করেন। আপন মনে। শরীর বস্ত্রহীন। কোমরের নিচে গামছা জড়ানো। গামছা সরে পড়ে, পাশের একজন প্রায়ই গামছা টেনে দিচ্ছে। পীর মাঝ বয়েসী। একজন বসে বসে পীরের পা টিপছে। লুঙ্গি পরা গেঞ্জি গায়ে আরো দুজন মাঝ বয়সী ও বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি লোক সরাতে ব্যস্ত। আরো একজন মেয়েমানুষ পীরকে চোষ পিঠা খাইয়ে দেবার চেষ্টা করছে পীরের খাওয়া-দাওয়ায় মন নেই, মেয়েমানুষটি বারবার মুখে তুলে দিচ্ছে, পীর মুখ থেকে ফেলে দিচ্ছে, তবুও বেচারীর চেষ্টার শেষ নেই, 'খাওরে মন খাও, একবার মুখ তোল।' ওর বিশ্বাস একবার পীরকে খাওয়াতে পারলেই ওর মকসুদ. ওর বাসনার পূর্ণ হবে। আরেক-জন নোংরা শাড়ি পরে পীরের পা ধরে ধরে বসে বসে কাঁদছে। কাকুতি-মিনতির শেষ নেই। বাছাধন. একবার মুখ খোলো. আমার পোয়া (ছেলে) টার খবর নেও।' পীর নিরোত্তর। পীর মগ্ন। পীর মাঝে মাঝে মাথা চুলকোচছেন। কখনো চোখ খোলা, কখনো চোখ বন্ধ। প্রায়ই নিম্ন-মুখী। হঠাৎ একবার চোখ তুললেন। রিয়াসতের দিকে তাকালেন। রিয়াসত বলল, আমি রিয়াসত জটাআলা শার মুরীদ ছাব আমার বাড়ি বোয়ানিপার, আমার দাদার নাম আসগর আলী।' সে এমনভাবে বলে গেল যেন পীর মন দিয়ে শুনবেন, কথা-গুলো পীরের ধারে কাছেও গেল না, পীর এদিক-ওদিক তাকিয়ে রিয়াসতের বউয়ের দিকেও তাকালেন, পীরের ঠোঁটে মুচকি হাসি, রিয়াসত যেন আশ্বাস পেল, সে পীরের আরো পাশ ঘেঁষে আসার চেষ্টা করে সুযোগ পেল না, সবাই নিজের তালে মত্ত। একবার, যে মেয়েটি পা টিপছিল, কাঁদছিল, সে সরে দাঁড়াল। রিয়াসত বউকে ইশারা করে বউ ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাবার পথে বাঁধা পেল। একটি ছোট্ট অসুস্থ বাচচার হাত ধরে একজন স্ত্রীলোক লোকের ফাঁক দিয়ে এগোতে এগোতে বলে, 'তুমি বইন (বোন) একলা আইছ, সবুর করো আমরা অনেক দূরের মানুষ'—বলেই সে পীরের পা ছুঁয়ে বলতে থাকে, 'আমার এক আরজি ছাব' আমার পোয়ার আর বেমার কমে না, বার মাস বেমার থাকে, আপনে একটু পানী পড়ি দেউকা।'— পীর যেমন ছিলেন, তেমনি বসে আছেন। স্ত্রীলোক সরে না। পা টিপে টিপে মিনতি জানায়। জলের বোতল এগিয়ে ধরে। পীরের হঠাৎ কি রকম খেয়াল হল। স্ত্রীলোকটির হাতের জলভরা বোতল তুলে ধরে জোরে আছাড় মেরে ছুঁড়ে ফেললেন। স্ত্রীলোক নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ভয় পেল। একজন মাঝ বয়েসী বলে উঠল, মা, শাল্লাহ (আল্লাহ যা চায়), তুমি যাওগো মাই মকসুদ হাসিল অইব। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোক উঠে পড়ে, অন্যরা সামনে পীরের হাতে টাকা গুঁজে দেবার চেষ্টা করে, টাকা সামলাবার জন্যে একজন বসে আছে, সে গুজে দেয়া টাকা সামনে রাখা 'পতলেস বাটিতে রেখে দেয়। রিয়াসত সুযোগ পেল। রিয়াসত পীরের হাত ধরে মোসারা (করমর্দন) করে, পীর চটে গিয়ে রিয়াসতের গালে ঠাস করে থাপ্পড় বসালেন থাপ্পড় খেয়ে সরাফতের গাল দিয়ে ধুয়ো বেরোনোর উপক্রম, সে হকচকিয়ে গেল, কষ্ট পেল, গালে হাত দিল না, পীরের নাজরানা পেয়ে নিয়ে আকাব জলের বোতল বাড়িয়ে ধরল, পীর একই নিয়মে জলের বোতল টেনে নিয়ে ছুড়ে দিলেন রিয়াসত ভাবল তারও মকসুদ হাসিল হবে, সে কোর্তার জেব থেকে দশ টাকা বের করল, পীরের হাতে গুজে ধরল, একজন, মুরীদ-টুরীদই হবে মাথায় লম্বা চুল, অপরিষ্কার নোংরা গোছের মানুষ—ইল মুরশিদ ইল মুরশিদ করতে করতে রিয়াসতের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে, ভাই ছাব আরো ছাড়ইন, মকসুদ পুরা অইব।' রিয়াসত ইতস্তত করে। বউ নিজের গিঁট খুলে পাঁচ টাকা পীরের দিকে বাড়িয়ে দেয়। টাকা যথা নিয়মে বাটির সামনে রাখা হয়। পীরের পা ছুঁয়ে ক… বুসি (কদম—অর্থ পা, বুসি—চুম্বন) করে স্বামী-স্ত্রী দুজনই চলে আসে। আস-সালামু আলাইকুম বলে বিদায় নিল রিয়াসত। অনেক দিন পর বুকের ভেতর একটুকরো উজ্জ্বল আশা আবার পাড়ে উঠল, সে চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে একটা শিশু কাঁদছে, একটা শিশু হাঁটি-হাঁটি করছে, একটা শিশু হাঁটা শিখছে, বড় হচ্ছে, কথা বলতে শিখছে, তাকে বাপ বাপ বলে ডাকছে। এস্ত হেঁটে স্বামী-স্ত্রী দুজন পীরের বরকত নিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আজ জোম্বাবার নামাজের আগেই পৌঁছোতে হবে, আজ দিনটা পবিত্র, আজ আর রিয়াসত দোকান খুলবে না, খোদার রহমত বুকের ভেতর ঢেউ তুলছে, বিয়ের প্রথমদিকের উত্তাল দিনগুলোর সরম জড়নো একটি রাত আবার ফিরে আসছে, আজ রিয়াসত বাড়িতেই থাকবে, বিবির কাছে।

ফাইভ পয়েন্ট ক্রসিং
রবি বসু

হরেনবাবু আর নরেনবাবু একই পাড়ার বাসিন্দা, একই অফিসে কাজ করেন, একই ট্রামে যাওয়া-আসা করেন, এবং একই বাজারে বাজার করেন। অফিস এক হলেও দুজনের সেকশন আলাদা। একই রুটের ট্রামে যাতায়াত করলেও একই ট্রামে ওঠার সৌভাগ্য দুজনের কদাচিৎ হয়। একই পাড়ার বাসিন্দা হলেও মাঝখানে ফাইভ পয়েন্ট ক্রসিং-এর ব্যবধান। হরেনবাবু থাকেন শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকে এক গলিতে আর নরেনবাবু থাকেন মণীন্দ্র কলেজের উল্টোদিকে আর এক গলিতে। দুজনের সংক্ষিপ্ত বাক্যবিনিময় কিংবা কুশল প্রশ্নাদির একমাত্র কমন প্লেস শ্যামবাজারের বাজার।

হরেনবাবুর ছোট্ট সংসার। স্বামী-স্ত্রী এবং একটি পুত্র ও একটি কন্যা। হরেনবাবু বিয়ে করেছেন একটু বেশি বয়সে। বিয়ের পর দাম্পত্যজীবন উপভোগের মানসে সন্তানদের একটু দেরি করেই পৃথিবীতে এনেছেন। তাঁর দুই সন্তানই এখনও স্কুলের গণ্ডিতে আবদ্ধ। নরেনবাবুর সংসার একটু বড়। তাঁর চারটি সন্তান এবং চারটিই পুত্র। বিয়ে হয়েছিল ভোটারস লিস্টে নাম ওঠার পরের বছরই। এবং বছর ঘুরতেই পুত্রের মুখ দেখেছেন। তাঁর বড় দুই ছেলে এখন চাকরি করে। তৃতীয় কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে এবং চতুর্থ স্কুল ফাইনাল দেবে। হরেনবাবুর তুলনায় নরেনবাবুর সংসারে স্বচ্ছলতা বেশি।

এ সংসারে কার কতটা স্বচ্ছলতা সেটা জানা যায় বাজারের থলের দিকে তাকালে। কার ঘরে কত আসবাব কিংবা স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ কত তা তো আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমীক্ষা করা যায় না। কিন্তু বাজারের থলে তো সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শিত না হয়ে উপায় নেই। যদিচ হরেনবাবুর বাজারের থলে বড় এবং কেনাকাটার পর বেশি স্ফীত দেখায় তথাপি সন্ধানী চোখ নরেনবাবুর থলের দিকে তাকিয়েই বুঝে নিতে পারে সেটা কতটা উত্তপ্ত। বাজারের মাছ থেকে সব্জির ব্যাপারীরা সবাই নরেনবাবুকে চিনে গেছে। নরেনবাবু এবং হরেনবাবুর পাশাপাশি হেঁটে বাজারে ঢুকলেও বিক্রেতাদের স্বাগত সম্ভাষণ নরেনবাবুর উদ্দেশেই বর্ষিত হয় সর্বাগ্রে।

একদিনের একটি দৃশ্য। ইংরিজি মাসের প্রথম রবিবার। ঘড়িতে তখন সকাল সাতটা বেজে ছাপ্পান্ন মিনিট। বাজারের পশ্চিম দিকের গেট দিয়ে ব্যাগ হস্তে হরেনবাবু ও নরেনবাবুর প্রবেশ।

নরেন ।। হরেনবাবু যে! নমস্কার। বাজার করতে বুঝি?

হরেন ।। নমস্কার নমস্কার। আপনিও তো তাই—

নরেন ।। আর বলেন কেন মশাই! ধাড়ি ধাড়ি ছেলেগুলো এত বেলা পর্যন্ত বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর কাপের পর কাপ চা ওড়াচ্ছে। যদি বলি এক-আধদিন কি তোদের বাজারের দিকে যেতে নেই, তা বলে কিনা তোমার মত গুছিয়ে বাজার কি আমরা করতে পারি, বাজারে ঢুকলে আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা মাথা খারাপ করলে চলবে কেন বাবু! যা দুর্দিন পড়েছে তাতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলাটাই তো হোল গিয়ে আসল কথা।

বলতে বলতে দুজনে আলুর বাজারে ঢুকে পড়েন। দুপাশের সিমেন্ট বাঁধানো রকের উপর ছোট ছোট আলুর পাহাড়। সোজা এগিয়ে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট দোকানের সামনে থামেন নরেনবাবু। নরেনবাবুকে দেখে আলুবিক্রেতা একদিকের পাল্লায় দু কেজি বাটখারা চাপায়, অন্য পাল্লাটা আলুর পাহাড়ে ঠেলে দেয়। হরেন বাবুর কোন নির্দিষ্ট দোকান নেই, নরেন বাবুকে থামতে দেখে তিনিও থামেন এবং একটি টুকরিতে আলু বাছতে শুরু করেন। নরেনবাবুর ব্যাগে আলু ভরে দিয়ে হরেনবাবুর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। হরেনবাবু গলা নামিয়ে বলেন: পাঁচশো।

নরেন ।। সে কি মশাই! মাত্র পাঁচশো! খুব পয়সা জমাচ্ছেন দেখছি। আরে মশাই খান, খান। পেটে খেলে পিঠে সইবে। আপনি না খেয়ে জমিয়ে যাবেন আর ছেলেরা মজা লুটবে! এ সংসারে কে কার মশাই। কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র—

বলতে বলতে নরেনবাবু এগোতে থাকেন। হরেনবাবু এক টুকরো বিচলিত হাসি মুখে ঝুলিয়ে তাঁর পিছু ধরেন।

এবার সব্জির বাজার। অনেক কণ্ঠের 'বাবু-বাবু' ডাক উপেক্ষা করে দুজনে এগিয়ে চলেন। নরেনবাবু এসে থামেন মাছের বাজারের লাগোয়া সব্জির দোকানটির সামনে। দোকানী একমুখ হেসে বড় বড় বেগুনের ডাঁই থেকে বেছে বেছে এক কিলো বেগুন ওজন করতে করতে বলে: আপনার জন্যে আজ পটল এনেছি বাবু, নতুন পটল।

নরেন ।। তাই নাকি, তা কি দামে দিচ্ছ হে?

দোকানদার ।। আপনার সঙ্গে কি আবার দরদাম করতে হবে নাকি বাবু! ভারি তো চার টাকা কিলোর পটল—

নরেন ।। বল কি হে! চার টাকা! তোমরা কি মানুষকে দুটি খেয়ে পরে বাঁচতে দেবে না নাকি!

দোকানদার ।। আপনার মুখেও এই কথা শুনতে হবে বাবু! যারা বাজারে এসে শাক-পাত দিয়ে ব্যাগ বোঝাই করে তারা বললে না হয় কথা ছিল। তা বলে আপনিও—

নরেনবাবুর মুখে পরিতৃপ্তির একটি হাসি ফুটে ওঠে। কথাটা হরেনবাবুর কানে গেল কি না যাচাই করবার জন্যে পিছু ফিরে দেখলেন তিনি আর একটি দোকানে পুঁইশাক নিয়ে দরাদরি করছেন।

নরেন ।। ও মশাই হরেনবাবু, কি অত দরদস্তুর করছেন! ওদের সঙ্গে দরাদরি করে পারবেন নাকি! মাথা খারাপ হয়ে যাবে। পয়সা কটা ফেলে দিয়ে চলুন মাছের বাজারে ঢুকি।

নরেনবাবু যে দিকটায় ইঙ্গিত করলেন মাছের বাজারের সে দিকটায় হরেনবাবুদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু নরেনবাবু যে তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করছেন। একরকে অনভিজ্ঞ

ফিরে নরেনবাবুর পিছু ধরলেন হরেনবাবু।

মাছের বাজার। ভিড় থিক থিক করছে। কাটা পোনার দিকটায় ভিড়টা হাল্কা। নরেনবাবু সোজা সেদিকেই এগোলেন। বাঁকের মুখে-বে লোকটি ইলিশ নিয়ে বসে ছিল সে বলে উঠল : ইদিকে একবার দেখে যাবেন নাকি বাবু!

হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করলেন হরেনবাবু। বললেন : এখন কি রে! সিজন আসুক, তবে তো—

কথাটা কাটাপোনাওলার কানে গিয়েছিল। খ্যাক খ্যাক করে একমুখ হেসে কাটা মাছে রক্ত মাখাতে মাখাতে ফ্যাসফেসে গলায় বলে উঠল : যা বলেছেন বাবু! আগে গঙ্গায় বিষ্টির ফোঁটা পড়ুক তবে তো বাবুরা উদিক মাড়াবে। ইদিকে আসুন বাবু, আপনার জন্যে দশ কেজি রুইয়ের পেটি রেখেছি। কড়ায় দিলে পাড়া মাত—

নরেন ।। কত করে দিচ্ছিস রে?

মাছওলা ।। আজ কুড়ির দর যাচ্ছে।

নরেন ।। বলিস কি রে! তোর ওই বঁটিটা মাছের গলায় না দিয়ে আমাদের গলায় বসিয়ে দে না—ল্যাঠা চুকে যাক।

পানে পানে কালচে পড়া জিবটা চার ইঞ্চি পরিমাণ বার করে মাছওলা বললে : আপনার মুখে একথা শুনলে আমার যে চোদ্দপুরুষ নরকাস্থ হবে বাবু। আজ তো তবু কুড়ি—কাল পরশু লগনসা আছে, চব্বিশ পঁচিশে উঠে যাবে।

শিউরে উঠে নরেনবাবু বললেন : বলিস কি রে! এবার একটা ফ্রিজ কিনতেই হচ্ছে। বেশি করে কিনে রেখে দিলে তোদের লগনসার ডাঁট ভাঙবে। আর এই হয়েছে এক লগনসা—এর জ্বালায় বাঙালী কি এক টুকরো মাছ মুখে ঠেকাতে পারবে না! যত্ত সব—

মাছওলা ।। যা বলেছেন বাবু! কত দেব? এক কিলো চাপাই—

নরেন ।। না না, মাত্র তো কটি লোক। সাড়ে সাতশো দে।

মাছওলা ।। পেটিটা আটশো হচ্ছে। এটা আর কাটা না। চার আনা কম দেবেন।

থলেটা এগিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে হরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে নরেনবাবু বললেন : মাছটা বেশ পাকা আছে মশাই! আপনিও নিয়ে নিন—

হরেনবাবুর তখন লোভাতুর চোখ, বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাসের ছুটোছুটি, পকেটের মধ্যে পয়সাগুলো বার বার মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে আর খুলছে। একটু শুকনো গলায় বললেন : আজ তো আমার আবার নিরামিষ। গিন্নির কি যেন ব্রত আছে। আজ হেঁসেলে মাছ তুলতে দেবেন না।

নরেন ।। ও'দের কথা আর বলবেন না মশাই। ও'দের তো বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাহলে আপনি আবার সব্জির দিকে যান, আমার হয়ে গেছে, দুটো পাতিলেবু কিনে বাড়িমুখো হই—

বলে দু পা এগিয়ে আবার ফিরে বললেন : হ্যাঁ মশাই, অফিসে শুনলাম পঁচিশ টাকা হিসেবে মাস চারেকের নাকি রেট্রোসপেকটিভ দেবে? আপনি কিছু শুনেছেন?

হরেন ।। তেমন তো শুনিনি কিছু। তা ছাড়া অর্ডার হলেও এত শিগ্গির কি হাতে আসবে?

নরেন ।। তা যা বলেছেন মশাই। যে যায় লংকায় সেই হয় রাবণ। ভোটের আগে কত লম্বা চওড়া কথা। লালবাড়িতে গিয়ে একবার ঢুকলে এয়ারকণ্ডিশন ঘর ছাড়া বসতে পারেন না, হেলিকপটার ছাড়া টুর করতে পারেন না। আমাদের দুঃখ আর কে বুঝছে বলুন।

*

বছর চারেক পরে আর এক রবিবারের সকাল। ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে ছাপ্পান্ন মিনিট।

[পাঠকদের কাছে দু মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি গত চার বছরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে নেবার জন্য। এর মধ্যে দেশে জরুরী অবস্থা জারী হয়েছে এবং প্রত্যাহৃত হয়েছে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একটি বিধ্বংসী বন্যা বয়ে গেছে। কলকাতায় পেলে ফুটবল খেলে গেছেন। তিনদিনের ব্যবধানে নরেনবাবুর দুই ছেলের বিয়ে হয়েছে এবং একই দিনে জোড়া বউভাত হয়েছে। হরেনবাবু পুত্র কন্যা নিয়ে সেই বউভাতে কব্জি ডুবিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছেন। তাঁর স্ত্রী যাননি, কারণ তাঁর বাইরে বেরনোর মত পর্যাপ্ত গহনার অভাব।]

অনেকদিন পরে হরেনবাবু আবার শ্যামবাজারের বাজারে বাজার করতে এলেন। পূর্বোক্ত ঘটনা ঘটার পর একটা হীনমন্যতা বোধে আক্রান্ত হয়েছিলেন হরেনবাবু। অতঃপর তিনি অফিস-ফেরত শেয়ালদা থেকে কাঁচা বাজার সেরে আসতেন। সপ্তাহে দুই কি তিনদিন মাছ কেনার জন্য যেতেন হাতীবাগানে। শ্যামবাজারে কদাপি নয়।

সেই রবিবার বাজারে ঢোকার মুখে দেখা হয়ে গেল নরেনবাবুর সঙ্গে। ভদ্রলোক যেন এই ক' বছরে বড্ড বুড়িয়ে গেছেন। চলাফেরায় সেই দম্ভ ও দৃঢ়তা কোনটাই নেই। হরেনবাবু ও'কে দেখতে পেয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন।

হরেন ।। আরে নরেনবাবু যে! কেমন আছেন মশাই।

ক্লান্ত চোখে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালেন নরেনবাবু। ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর বললেন—

নরেন ।। কে, হরেনবাবু নাকি! শরীরটা তেমন ভালো নেই। একটু হাঁটাচলা করলেই কেমন ক্লান্ত বোধ করি।

হরেন ।। এই শরীর নিয়ে এত বোদে বাজারে না এলেই পারতেন ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেই হতো।

নরেন ।। ছেলে! আমার ছেলে! কোন ছেলের কথা বলছেন বলুন তো!

হরেন ।। কেন, আপনার বড় আর মেজ ছেলে! সেই যাদের একসঙ্গে বিয়ে দিলেন অত ধুমধাম করে!

নরেন ।। হ্যাঁ, ধুমধাম করে বিয়ে দিয়েছিলাম। মাস ছয়েকও গেল না দুমদাম করে তারা বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। পাছে বাপ-মায়ের কোন উপকারে আসতে হয় তাই একজন বালিগঞ্জে আর একজন বেলঘরিয়ায় গিয়ে বাসা বেঁধেছে।

হরেন ।। সে কি মশায়! আর বাকি দুই ছেলে?

নরেন ।। তাঁরা দুজন অনুগ্রহ করে এখনও বাপের বাড়িতে আছেন। উপায় নেই তাই আছেন। একজন চাকরি বাকরি না পেয়ে পাড়ার রকে বসে বসে লাখ-দুলাখ টাকার ব্যবসা করবেন বলে বুদ্ধিতে শান দিচ্ছেন, আর একজন স্কুল পেরোতে তিনবার হোঁচট খেয়ে এখন নেতা হবার জন্যে লোকাল দাদাদের পিছনে পিছনে ঘুরছেন।

হরেন ।। তাইতো, বড় দুঃখের কথা। আপনার তো তাহলে—

নরেন ।। আমার কথা থাক। আপনার কি খবর বলুন ছেলে এখন কি করছে?

হরেন ।। আমার ছেলে তো এখানে থাকে না সে—

নরেন ।। সে কি মশায়! আপনারও আমারই মত অবস্থা।

হরেন ।। না না, সেরকম কিছু নয়। খোকা দুর্গাপুরে থাকে। শিবপুর থেকে পাস করে ওখানে অ্যাপ্রেন্টিস আছে। কিন্তু ওখানে ওর মন টিকছে না। চেষ্টা করছে কলকাতায় কোন কাজ নিয়ে চলে আসবার জন্যে। বাড়ি ছেড়ে থাকেনি তো কখনো—

নরেন ।। বা বা, আপনার ছেলেটি তো বড় ভাল। বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবী হোক। মেয়েটি কি পড়ছে এখনো?

হরেন ।। হ্যাঁ, এবারে পার্ট টু দেবে। এক জায়গায় বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে রেখেছি। পরীক্ষা হয়ে গেলেই বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেব।

নরেন ।। বাঃ, আপনি তো তাহলে সুখী লোক মশাই। কপাল করে এসেছিলেন বটে। আর আমার দেখুন—

বলতে বলতে হঠাৎ কথা থামিয়ে হন হন করে আলুর বাজারে ঢুকে পড়লেন নরেনবাবু। হরেনবাবু ওঁর পিছন পিছন বাজারে ঢুকে দেখলেন সেই নির্দিষ্ট দোকানটির সামনে দাঁড়িয়ে ছোট একটা টুকরিতে আলু বেছে তুলছেন নরেনবাবু। ওঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নরেনবাবু হেসে উঠলেন : একটু দেখুন, আমার দেখছি একদম মাথার ঠিক নেই। বাজারে এসেছি [illegible] ভুলে গেছি। আমি চট করে বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। আপনি ততক্ষণ বাজারটা সেরে ফেলুন।

এই বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে মোড়ের মাথায় নিজেকে একটু আড়াল করে দাঁড়ালেন হরেনবাবু। নরেনবাবু বাজার করে না ফেরা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। নরেনবাবুর হাতে শাক-পাতে বোঝাই বাজারের থলের সঙ্গে তাঁর অসহায় মুখের করুণ ছবিটা দেখতে বড় কষ্ট হবে হরেনবাবুর।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ফাইভ পয়েন্ট ক্রসিং-এ নেতাজীর অশ্বারোহী মূর্তিটার দিকে তাকাতে গিয়ে 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার'-এর ব্যানারটার দিকে নজর পড়ে গেল তাঁর। বাপ-মায়ের হাত ধরে উজ্জ্বল রোদে উজ্জ্বলতার দুটি শিশু যেন আনন্দে কলকল করতে করতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। আহা, ওরা যেন সুখী হয়। সবাই যেন সুখী হয়। কোঁচার খুঁটটা দিয়েই চোখের দুটো কোন মুছে নিলেন হরেনবাবু।

সর্প সন্ধানে

দিলীপ ঘোষ

প্রতিদিন রাত্রে খেয়ে উঠে, মুখ ধুয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার কোল-ঘেঁষে দাঁড়ায় সমীরণ। প্রত্যহ একভাবে, একটুও উনিশ-বিশ হয় না। সমস্ত মনটাকে গুছিয়ে-গাছিয়ে বাইরের দিকে নজর দিতেই সমীরণ স্মৃতিতাড়িত হয়। গত সপ্তায় ঠিক এই-দিনে ঘুম-ভাঙা থেকে এই সিগারেট ধরানো পর্যন্ত গোটা দিনটাকে ও পরিষ্কার করে দেখতে চায়। এটা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। একটুও নড়চড় হয় না। প্রায়শই, অভ্যাসবশতই বোধহয়, চটপট ওর সব মনে পড়ে যায়। এক-একদিন যায় না। যে দিন যায় না, সেদিন, মনে-না-পড়া পর্যন্ত ও বড় অস্বস্তি বোধ করে।

সমীরণের বয়স এখন চৌত্রিশ। বিশ বছর বয়স থেকে ও এই শহরে চরে বেড়াচ্ছে। ওর বাবা একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, জ্ঞানী-গুণী মহলে তাঁর নাম এবং সম্মান দুই-ই প্রভূত। বাবার জন্য এবং ওর নিজের জন্য তো বটেই, ওর পরিচিতির পরিধিটাও বেশ বড়। দেখতে সুন্দরও। চালচলন, কথা-বার্তায় এবং আদপ-কায়দায় সমীরণ অত্যন্ত স্মার্ট। দুনিয়ার প্রায় সব বিষয়েই ওর আগ্রহ আছে যেমন জ্ঞান-গম্যি, পড়াশুনোও আছে তেমনি। ভাল ছাত্র হিসেবে নাম ছিল এককালে। ওর দুই দাদা লণ্ডনে বড় বড় চাকরী করে, সেইখানেই তারা আস্তানা গেড়েছে স্থায়ীভাবে। এক বোন, বিয়ে হয়ে গেছে, থাকে আসানসোলে। ভগ্নিপোত ডাক্তার, জমানো পসার তার সেখানে। বাড়িতে [illegible] ও। বাবা অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে পড়াশুনো নিয়ে থাকেন, মা ঘর-গেরস্থালী দেখাশোনা করেন আর সমীরণ চরে বেড়ায়।

এম-এ পরীক্ষা দুবার না দিয়ে একটা ট্রাভলিং এজেন্ট আপিসে কাজে ঢুকেছিল। বছর দুই কাজ করে হুট করে কাজটা ছেড়ে দিয়ে মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভ-এর কাজ নিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরে সেটাও ছাড়ল একদিন। তারপর কিছুদিন শিশি-বোতলের ব্যবসা করে পোষাল না ওর। এখন প্রিন্টিং-এর অর্ডার সাপ্লাই করে। বে-থা করেনি, সংসারে কিছু দিতেও হয় না, ওর মত করে একরকম চালিয়ে নেয় দিন।

সমীরণের গুণের ঘাট নেই। এমন কোন অপকম্ম নেই এ দুনিয়ায় যা সমীরণ করে নি। পাঁচ-ছটি সুন্দরী মহিলা আছেন এই শহরে যাঁরা সদা-সর্বদা তার পথ চেয়ে বসে থাকেন। সমীরণের ধারণা অবশ্য অন্য, ওর মনে হয় সকলেই পথ চেয়ে বসে থাকার ভাণ করে। তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন তিনি ছাড়া সমীরণের দ্বিতীয় কোন বান্ধবী নেই। সমীরণের বন্ধু-বান্ধব সব অবাক হয়ে যায় ওর ম্যানেজ করার ক্ষমতা দেখে। এ বিষয়ে সমীরণ অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে মিথ্যে কথা বলে অনর্গল।

এমন কোন আঘাটা নেই যেখানকার জল সমীরণ চাকেনি। বে-পাড়ায় চার-পাঁচটি মেয়ের টেলিফোন নম্বর ওর মুখস্থ। দিন-দুপুরে মাল টেনে টালমাটাল হয়ে বাড়ি ফেরা অথবা অন্য কোথাও ওঠা—এসব উড়োনচণ্ডীপনা ওর চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছে।

সুপর্ণা একদিন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিল—আপনি চরিত্রহীন। সমীরণের উত্তর—কিন্তু সুপু একথা মনে রেখো, আমি হীন চরিত্রের নই।

এ হেন সমীরণ ঘোষ মাঝে মধ্যে কিন্তু একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। ওকে তখন আর একটুও চেনা যায় না। ওর স্মার্টনেস চলে যায়, চোখের দৃষ্টি উদাস হয়ে যায়। ওর মধ্যে মেঠো বাতাস ঢুকে পড়ে। ও হায়-হায় করে। তখন বাড়ি থেকে ওর নড়তে ইচ্ছে করে না, রান্নাঘরে মার সঙ্গে আগডুম বাগডুম গল্প করে কিম্বা এদিক সেদিক অহেতুক আনমনে ঘুরতে ফিরতে ভাল লাগে, কারুর কাছে যেতে অথবা মদ্যপান করতে মন চায় না। ও তখন হয়ত শুধু বই-ই পড়ে কিম্বা পড়ে না, শুয়ে থাকে আবার এমনও হয় কৃষ্ণা-অসী, সুপর্ণা-স্বাতী, অমলেশ-ডঃ সেন, সুজিত-ফণী—এদের শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছে করে। কখনও যায়, কখনও যায় না। মনে আছে ওর একবার খুব মন খারাপ হয়েছিল, দুপুর থেকে মাঝ-রাত পর্যন্ত বে-পাড়ায় মাধবীর ঘরে চিৎ হয়ে পড়ে ছিল। মাল টানে নি এক ফোঁটাও। কত যেন মাধবীর হাতে দিয়ে ওর খিলখিলে হাসিটা নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল রাত [illegible] সময়।

আজ শুক্রবার। খেয়েদেয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে সিগারেট ধরিয়ে জানলার ধারটায় দাঁড়ালো সমীরণ। খেয়াল গান কানে এল। ভাল করে শুনলো গলাটা কার। একটু শুনেই বুঝতে পারল আমীর খাঁর, বাগেশ্রী রাগের খেয়াল। রাত হয়েছে অনেক, রেডিও বন্ধ। তবে কি কেউ টেপ চালিয়েছে, নাকি গ্রামোফোন ডিস্ক? সমীরণ খেয়াল করতে পারল না খাঁ-সাহেবের বাগেশ্রীর খেয়াল বাজারে বেরিয়েছে কিনা। তারপর ওর মনে পড়ল আমীর খাঁ যেদিন মারা যান সেদিন অতসীর বাড়িতে বসে ছিল অনেকক্ষণ টাকা ধার করার জন্য। আড়াইশো টাকা চেয়েছিল, দিয়েছিল মাত্র পঁয়ষট্টি। মেয়েটা অত্যন্ত ঘোড়েল, মিথ্যুক। বলল—আর একটাও পয়সা নেই। বাজে কথা। এত সুন্দর নাম যার, যাকে দেখতে এত ভাল সে ঘোড়েল হয় কী করে?

জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়তেই ওর মনে পড়ল—আজ শুক্র-বার। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের সেই এক প্রশ্ন—গত শুক্রবার কী করেছিলুম? দূরে আমীর খাঁর গলা থেকে নিবেদনের আকুতি ভেসে ভেসে যাচ্ছে বাতাসে আর সমীরণের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে সেই এক অনুসন্ধান *—গত শুক্রবার কী করলুম সারা দিন?*

নিয়ম করে নিয়েছে একটা—প্রথমে সকাল, তারপর দুপুর, তারপর বিকেল, তারপর রাত্রি। ঠিক একসপ্তা আগের হারানো একটা দিনকে পরপর এইভাবে খুঁজতে থাকে ও।

প্রথমে সকাল। মনে করতে পারলো না গত শুক্রবারের ঘুমভাঙাটা। মা কি চা নিয়ে ডেকেছিল? না কি বাবার ডাকে ঘুম ভাঙলো? যখন ঘুমটা ভাঙলো তখন কোন পাশ ফিরে শুয়েছিলুম? হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল বৃহস্পতিবার মাঝ রাতে ঘুম ভেঙেছিল একবার—বৃষ্টির ছাটে। উঠে জানলাটা বন্ধ করতে দেখল বৃষ্টি থেমে গেছে। তারপরের শোয়াটা আর মনে নেই। না থাক। কিন্তু সকালে উঠলো কি করে?

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু বেলার দিকে মনটাকে নিয়ে গিয়ে আবার পেছনের দিকে টেনে এনেও কিছুতেই সকালের ঘুমভাঙার সময়টাকে ধরতে পারল না। খুব বিরক্ত হল সমীরণ। আর একটা সিগারেট ধরালো।

এবার পুরো সকালটা বাদ দিয়ে ও দুপুরটাকে ধরল। দুপুরে কখন ভাত খেয়ে-ছিলুম? মা কোন শাড়িটা পরে ভাত দিয়ে-ছিল? গতবার পুজোয় আসানসোল থেকে সানু যেটা ভি পি করে পাঠিয়েছিল? নাকি বাবা যেটা মার জন্মদিনে আমাকে দিয়ে কিনে আনিয়েছিল, হলুদ পাড়ের দুধারের বর্ডার দেওয়া, সেইটা? নাকি...? মনে পড়ল না। [illegible] ছবিটা হারিয়ে যেতে নিজের ওপর

[illegible] হল [illegible]। [illegible] রবিবার [illegible] দিকে [illegible] এই অবস্থায় থাকতে হবে। কি লাভ?

আবার ও সকালে ফিরে এল। গত শুক্রবার বাবাদের কি কোন চিঠি এসেছিল? পরিষ্কার মনে পড়ল—না। তারপরও ও কিছুক্ষণ মনে মনে লেটার বাক্সটার কাছে ঘুরে ঘুরে করল। কিন্তু সেখান থেকেও স্মৃতির একটা টুকরোও খুঁজে পাওয়া গেল না।

বিরক্ত হয়ে আবার একটা সিগারেট ধরাতে গেল। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট হাতে তুলে নিতেই নির্জন রাস্তা থেকে চলন্ত একটা রিকসার ঠুং ঠুং শব্দ কানে এল। তক্ষুনি ও পরিষ্কার দেখতে পেল এক হাঁটু জলের ভেতর দিয়ে একটা রিকসা চলেছে জল কেটে কেটে। পর্দা-ঢাকা রিকসার মধ্যে ও আর ওর মা। কদিন দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল মা, সেদিন ডাক্তারের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। মনে পড়ে গেল সমীরণের, সকালে বাদল নেমেছিল সেদিন একটানা। ঘুম ভেঙেছিল কুকার টেলিফোনে।

—কি ঘুমোচ্ছ এখনও? কী দারুণ বৃষ্টি পড়ছে দেখেছো?

—নাঃ। কটা বেজেছে?

—কটা বেজেছে—ন্যাকা! সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

—বল, কি দরকার।

—আজ আমাদের বাড়ি আসবে একবার?

—কেন?

—এসই না।

—কখন?

—বিকেলের দিকে।

—কেন?

—আহা, এসই না। এলে বুঝতে পারবে।

—কেন, আজ কি তোমার বিয়ে?

—হুর-ছাই, না আজ আমার শ্রাদ্ধ। আসছ তা হলে।

—মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।

—কেন, মাসিমার কি হয়েছে?

—দাঁতব্যথা।

—বেশ তো, ডাক্তার দেখিয়ে মাসিমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস।

—দেখি।

—দেখি না, আসতেই হবে।

—[illegible]।

—[illegible]।

—দেখি।

রিসিভার রেখে সমীরণ বাথরুমে গিয়েছিল। তারপর মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাবার ঘরে ঢুকেছিল। মনে পড়ছে পরিষ্কার, বাবা জানলার বাইরের দিকে চোখ রেখে বৃষ্টি দেখছিল।

—আজ খিচুড়ি খাবে?

ছেলের কথা শুনে, মুখ ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে বাবা বললেন—হলে মন্দ হত না। অনেক দিন খাই না। তোর মারও খেতে সুবিধে হবে। কিন্তু বাজার যাবি কি করে?

—কেন বাড়িতে যা আছে, তা দিয়ে হবে না?

—একটা ইলিশ আনতে পারলে ভাল হত। বাজারে কি আজকাল ভাল ইলিশ পাওয়া যায়?

—দাঁড়াও দেখি কি করা যায়। আর একটু চা খাবে নাকি?

—দিতে বল একটু।

তারপর আপন মনেই বাবা যেন বলেছিলেন—কাজকর্ম না থাকলে বর্ষাকালটা বেশ মজার।

ভিজতে ভিজতে জল ভেঙে বাজার গিয়েছিল সমীরণ। একেবারে গঙ্গার না হলেও মোটামুটি ভাল বড় সাইজের একটা ইলিশ মাছ কিনে ফিরছিল, রাস্তায় ফণীর সঙ্গে দেখা। ফণী ছাতা-মাথায় বেরিয়েছিল ওর মেয়ের জন্য ওষুধ কিনতে।

এতক্ষণ বাদে সমীরণ তার হাতের সেই সিগারেটটা ধরালো। ভাবল—ভালই আছি। বাচ্চা-ফাচ্চা নিয়ে আজকাল বড় ঝামেলা। দুনিয়ার সব কিছুই যেন কেমন শীর্ণ হয়ে গেছে। [illegible] পরনের [illegible]—সব [illegible] কেমন যেন [illegible] গেল। ঝক্কি-ঝামেলা আর ভাল লাগে না।

সমীরণের মনে পড়ল—ও আর ওর বাবা অনেকদিন বাদে একসঙ্গে বসে খেয়েছিল সেদিন। খেতে বসে বাবা সেদিন মাণিককাকার ইলিশ-খাওয়ার গল্প করেছিলেন। মাণিককাকা একাই নাকি মাঝারি সাইজের একটা ইলিশ খেতে পারতেন। যখন খেতে দিচ্ছিল, লাইট গ্রীন রঙের পাড়ের একটা শাড়ি পরেছিল মা।

বাড়ি থেকে বেরুতে ইচ্ছে করছিল না। তখনও বৃষ্টি থামে নি। মা বলেছিল—আজ না হয় থাক, ডাক্তারকে ফোন করে দে। কাল যাওয়া যাবে। সমীরণ নিজের গলা শুনতে পেল। —না, আজই যাব। রোজ রোজ কাল করে যাওয়া হচ্ছে না। আমি শুচ্ছি, চারটের সময় চা করে আমায় ডেকো।

ট্রাম রাস্তার ধারেই ওদের বাড়ি। ফুটপাথেও হাঁটুজল। একটা রিকসা ফুটপাথে তুলে মাকে চড়িয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল সমীরণ। মনে পড়ে না কতদিন পরে ও অতক্ষণ মার পাশে বসেছিল।

ডাঃ সেনের রেফারেন্সে ডাঃ রক্ষিতের কাছে গিয়েছিল। বড় ডাক্তার। ঝপাঝপ দুটো দাঁত তুলে দিলেন। আমার মার খুব সহ্যশক্তি। একটুও চীৎকার করেনি। চোখ দিয়ে অল্প অল্প জল পড়ছিল অবশ্য। কাঁদলে সুন্দর দেখায় আমার মাকে। মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরতেই বাবা বললেন—কুকা তোকে দুবার টেলিফোন করেছে।

আধ-ভেজা ট্রাউজার্স আর শার্টটা চেঞ্জ করতে করতে ভাবছিলুম—কুকা তো টাকা পাবে না, তবে কেন এত ছটফট করছে? কেন? হল কি মেয়েটার? হাউসহোল্ড প্রবলেম? নাকি কোন বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে দু-পাঁচ দিন বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসে কোন ঝঞ্ঝাট পাকিয়েছে?

নিচে নেমে দেখি রাস্তার জল থৈ-থৈ সেই একই অবস্থা। ট্যাকসি পাওয়া গেল না। আবার সেই রিকসা। রাস্তার মোড়ে রিকসাটা ছেড়ে দিলুম এক প্যাকেট সিগারেট কিনলুম। কৃষ্ণার বাড়ি কাছেই, কত দিন হেঁটেই গেছি, কিন্তু সেদিন ট্যাকসির জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম।

কৃষ্ণদের নিজেদের বাড়ি। একতলায় দু ঘর ভাড়াটে থাকে। ওরা থাকে দুতলা-তিনতলা মিলিয়ে। ওপরে ওঠার জন্যে ওদের আলাদা এনট্রান্স। ট্যাকসিটা বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে কলিং-বেল টিপলাম। ভেবেছিলাম কৃষ্ণা নেমে এলে বলব—কি ছেড়ে দেব ট্যাকসি? জবাবে যাই বলুক না কেন, ট্যাকসি করে যে এসেছি এটা তো জানিয়ে দেয়া যাবে কিন্তু অনেকক্ষণ কলিং-বেল টেপার পরও কৃষ্ণা নেমে এল না দেখে ভাবছিলুম—কি করি? ফিরে যাব, না কি ট্যাকসি ছেড়ে দিয়ে আবার চেষ্টা করব ওকে ডাকতে? দোনা-মোনা করে ট্যাকসির দিকে এগুতেই পেছন থেকে কৃষ্ণার হাসি শুনতে পেলুম। পেছন ফিরে তাকাতেই ও হাসি-হাসি মুখ করে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। চারদিক তাকিয়ে একবার দেখে নিলুম, ব্যাপারটা পাড়ার আর কারুর নজরে পড়েছে কিনা। দেখলুম উল্টো দিকের একটা বাড়ির দোতলা বারান্দা থেকে একজন মাঝ-বয়সী মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বুঝলাম সে কৃষ্ণার খেলাটাও দেখেছে। ট্যাকসি ভাড়া দিয়ে দরজাটা আলতো ঠেলতেই খুলে গেল।

অন্ধকারে উঠে গেলুম ওপরে। কেউ নেই। সিঁড়ির মুখের ঘরখানার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালুম; দু-তিনটে টান মারলুম, তবু কেউ নেই। পুরো সিগারেট টেনে শেষ করলুম, তখনও ওর সাড়াশব্দ নেই' বাড়ির অন্য কাউকেই দেখতে পেলুম না। অগত্যা ইচ্ছে করে দুবার কাশতেই দূরে থেকে কৃষ্ণার গলা এল।—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাশতে হবে না। আসছি। নিচের দরজাটা বন্ধ করে আমার ঘরে গিয়ে বসো।

নিচের সদর দরজাটা বন্ধ করে ওর ঘরে গিয়ে বসলুম। দু-একটা কাগজ-পত্তর উল্টাতে-পাল্টাতেই ও ঘরে এল। দেখে থ মেরে গেলুম। গা ধুয়েছে, সাবানের গন্ধ পেলুম। শুধু একটা ভিজে কাপড়ে গা জড়ান। আমি যে একটু থতমত খেয়েছিলুম তা আমার চোখে-মুখে ফুটেছিল বৈকি। হাসতে হাসতে বলল—ভয় নেই।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় জানলা দুটোর পর্দা উড়তে লাগল। শেষ-বিকেলের আলোতে এ ঘরের সব কিছু দেখা যাচ্ছিল বাইরে থেকে। চটপট জানলা দুটো বন্ধ করতে যাচ্ছি, খিলখিলিয়ে হেসে বলল—এই তুমি সমীরণ ঘোষ? এই তোমার সাহস? এই তোমার স্মার্টনেস? যাও ছোড়দার ঘরে গিয়ে বস। ও ঘরের জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। আমি আসছি।

সমীরণ আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভেবে পেল না এমন বোকা জীবনে আর কখনও সে হয়েছে কিনা। ঘড়ি দেখল—দুটো কুড়ি। বারান্দায় সুইচের শব্দ হল। বাবা বোধহয় বাথরুমে গেলেন কিংবা মা। হ্যাঁ তারপর?

শেষ বিকেলের আলো মরে আসছিল। অশ্রুর ঘরে ঢুকে ওর বিছানায় বসলুম। মনে আছে আকাশ দেখতে ভুলে গিয়েছিলুম। ঘর বদল করে আমার বোকা-বোকা ভাবটা কেটে গিয়েছিল। গলা চড়িয়ে চা চাইলুম। কোন উত্তর এল না।

খানিক বাদে চা নিয়ে ঘরে ঢুকল কৃষ্ণা। দু হাতে দুটো কাপ। পরণে একটা পা-জামা, বোধহয় অশ্রুর, গায়ে একটা শার্ট, কাঁঠালী-চাঁপা রঙের, সেটাও বোধহয় অশ্রুর। শার্টের গলা থেকে তিনটে বোতাম খোলা। হাতটা গোটান কনুই পর্যন্ত। হাত বাড়িয়ে চা এগিয়ে দিল। নিলাম। জিগ্যেস করলাম—এ আবার কি সাজ? আগেরটা তো অনেক ভাল ছিল। বিছানায় আমার পাশে বসে বলল—তাতেও তো ভয় পেলে, চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল। সত্যি সত্যিই ভয় পেয়েছিলুম। জিগ্যেস করলাম—মাসিমা মেসোমশাই কোথায়? চায়ে চুমুক দিয়ে ঠারে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—ভয় নেই, এসে পড়বে না। বড়দির খুব অসুখ, যায়-যায় অবস্থা। ট্রাংকল এসেছিল, রবিবার বাবা-মা চলে গেছে বড়দির কাছে। ছোড়দার হেফাজতে ছিলুম। বোম্বে থেকে হঠাৎ একটা ইন্টারভিউ এসেছে, গতকাল ছোড়দা বোম্বে চলে গেছে প্লেনে করে। যাবার সময় ছোড়দা সেজমামাকে এখানে থাকার জন্যে বলে গিয়েছিল। কাল তিনি ছিলেন এখানে। আজ ভোরে অাপিসের গাড়ি এসে নিয়ে গেছে তাঁকে বাঁকুড়ার কোথায়। আর বোধহয় ফিরবে না। চায়ের কাপটা ওর হাতে দিয়ে বললুম—তোমার দিদির কি হয়েছে? দু হাতে দুটো খালি-কাপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—গলব্লাডার অপারেশন হয়েছিল, তারপর সেপটিক হয়ে এখন খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থা।

চলে গেল ঘর থেকে। ফিরে এসে বলল—রাত্তিরে কি খাবে?

বললাম—তার মানে?

—তার মানে রাত্তিরে কি খাবে?

হঠাৎ মুখে এসে গেল—এক্ষুনি চলে যাব। কি দরকার বল।

একটা বালিশ বগলের তলায় চেপে পা ছড়িয়ে শুয়েছিলুম। কাছে এসে আমার নাকটা টিপে ধরে বলল—যাও দেখি চলে, কি রকম যেতে পার দেখি।

সকালে টেলিফোন করলে কেন?

বিছানায় বুকের কাছে বসে বলল—সেজো মামা চলে যাবার পর তোমার কথা ভীষণ মনে পড়ল। তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমার মনে হয়েছে সমীরণ, তুমি অনেক কিছু বুঝতে পেরেছ। ভালবাসা, প্রেম, স্নেহ, আবেগ, অর্থ—তা ঠিক কিনা?

বললাম—ঠিক।

—এগুলো মানুষই তো মানুষকে দেবে। তাই আজ ঠিক করলাম, একেবারে ফাঁকা বাড়িতে তোমাকে ডাকি। চাকরটাকে পাঠিয়ে দিয়েছি সোদপুরে তার দাদার কাছে। কদিন থেকে ঘ্যান-ঘ্যান করে খালি খালি করছিল।

উঠে বসে বালিশটা কোলে রেখে জিগ্যেস করলুম—এমন সুযোগ পেলে, আর কাকে কাকে ডাকবে?

হাসতে হাসতে বলল—আবার কাকে ডাকব? তোমার মত এত বড় ভিখিরী আর কে আছে এ দুনিয়ায়।

বললাম—তা ঠিক, আমি একটা এ গ্রেড ভিখিরী।

—আর একটু চা খাবে? মদও খেতে পার। সেজো মামার আধ-খাওয়া একটা বোতল আছে।

—তারপর ফিরে এসে যখন দেখবে—

—কেরোসিন ভরে রাখব। বাঁকুড়ায় তেল না পেলে বোতলে তো পাবে?

তারপর কি ভেবে বলল—আচ্ছা সমীরণ, আমার জন্যে তুমি কি করতে পার?

মানে?

—মানে, আমি যদি বলি, একজনকে খুন করতে পারবে?

—প্রতিশোধ?

—না, প্রতিশোধ না, পানিশমেন্ট।

—খুন করলে আর পানিশমেন্টের কি হল? পানিশমেন্ট দিতে হলে থেকে-থেকে যন্ত্রণা দিতে হয়, অল্প অল্প করে পোড়াতে হয়—

—পারবে সেই রকম করে একজনকে পুড়িয়ে মারতে?

—না। আমি কোন মহৎ কাজের মধ্যে নেই। আমি বড়জোর তোমার বিয়ের কার্ড কিম্বা বিয়ের পাকা-টাকা যে-পাত্রায় ছাপিয়ে দিতে পারি।

—আমার শ্রাদ্ধের কার্ডও ছাপিয়ে দিতে পার।

—হ্যাঁ, সে তো খুব ভালভাবেই পারি, খরচ কম।

—বুঝেছি, তোমার মুরদ। বল এখন রাত্রে খাবে কি।

—তার মানে?

—আসেটা মিথ্যুক। যদ্দুর এখানে থাকবে তুমি।

—তার মানে?

—আবার মানে। বলছি থাকবে?

—কিন্তু তোমার সমাজ? তোমার সংস্কার?

চুপ করে রইল জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জিগ্যেস করল—তোমার সমাজ নেই? সংস্কার নেই?

বললাম—আমি তো অসামাজিক, তোমরা সকলেই জান। আমার জীবনের কোন নিয়ম নেই, অই নিয়ম ভাঙারও কোন ভয় নেই। সে সব ভয় তোমাদের।

কাছে এসে বলল—আমিও কোন ভয় করি না, এই সমাজের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।—এই কথাগুলো ও কী রকম যেন আলাদা করে উচ্চারণ করল। ওর গলায় ক্লান্তি ফুটে উঠল স্পষ্ট।

—দাঁড়াও আসছি। ও-ঘরে চলে গেল। ফিরে এল মদের দুটো গেলাস হাতে নিয়ে। একটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আর একটা গেলাস এক চুমুকে শেষ করে বলল—ধর।

গেলাসটা ধরে বললাম — ভালই অভ্যেস করেছ মনে হচ্ছে।

—অ করেছি।

বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই তার চাল-চলন কথাবার্তায় একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছিলাম, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কী হয়েছে ওর। হাত ধরে কাছে টেনে জিগ্যেস করলাম—ঠিক করে বলত আমায়, কী হয়েছে তোমার।

তখন ওর মাথায় ঘোর লেগেছে। মদের গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে আবার হাসতে হাসতে বলল—কী আবার হবে? কিচ্ছু না। কিচ্ছু হয় নি আমার সমীরণ। কথা ওর জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। কাছে টেনে এনে বিছানায় বসালাম আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। জিগ্যেস করল—মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ নাকি?

—না ছাড়ি নি। এখন খাব না। তোমার কি হয়েছে বল।

চুপ করেছিলাম মুখে কথা আসছিল না।

চোখ-মুখের চেহারা ওর আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছিল। আমার ভয় করছিল। ভীষণ ভয়।

আমি নড়তে পারছিলাম না বাইরের আকাশের দিকে তাকালাম—কোথাও এক-টুকু আলো নেই। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল—আমাকে তো তুমি এই রকম করেই চেয়েছিলে। দাও, আমাকে নিয়ে তোমার যা খুশী তাই কর। [illegible] দেখতে দেখতে সকাল হয়ে যাবে। বাড়িতে লোক এসে পড়বে হুড় হুড় করে।

বুকের ওপর মাথা রেখে কেলামান কেঁদে উঠল।

জিগ্যেস করলাম—কি হয়েছে কৃষ্ণা, আমাকে বল।

—তোমাকে বলে কি হবে? তুমি তো বলেছে—মহৎ কাজ তুমি করতে পারবে না। কিছু হয় নি। সামান্য ঘটনা। আমার চুয়াল্লিশ বছরের ইয়ং সেক্রে মামা কাল সারা রাত ধরে মদ খেয়েছে আর তার সঙ্গে আমাকে খেয়েছে আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম আমার ঘরে। লোভী মাতালের কাছে শক্তিতে হেরে গেছি সমীরণ। তখন তোমার কথা খুব মনে হচ্ছিল। অত রাতে তোমায় ডাকতে পারি নি। সকালে উঠে দেখলাম একটা চিঠি। লিখে গেছে বাঁকুড়ায় যাচ্ছে। ফিরবে না। সত্যি মিথ্যে জানি না সকালে উঠে তোমায় ফোন করলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম তক্ষুনি আসতে বলব পরে ভাবলাম—না থাক। বিকেলেই আসতে বলি। আসলে মাথায় সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে। আমি কি পাগল হয়ে যাব? আমার বড্ড ভয় করছে সমীরণ মাসিমাকে টেলিফোন করে দাও। অশ্রু না আসা পর্যন্ত তুমি এখান থেকে যেও না।

জিগেস করলাম—অশ্রু আসবে কবে?

—গিয়েই যদি টিকিট পায় কাল ফিরবে।

—যাও ও ঘরে গিয়ে এসব ছেড়ে শাড়ি পরে এসো।

ড্যাব ড্যাব করে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—কেন?

এসব তোমায় মানায় না। যাও। সারাদিন নিশ্চয় কিছু খাও নি।

—না। তুমি কি করে বুঝলে?

—আমি মন্তর জানি। আমি কিছু খাবার কিনে আনি।

ও ঘরে যেতে যেতে বলল—না, তুমি কোথাও যেও না। ফ্রিজে মাংস আছে। মাংস আর রুটি করে নেব। যেতে গিয়ে দরজায় একটা ঠোক্কর খেল। পা টলছিল তখনও।

জামা-কাপড় ছেড়ে ফিরে আসতেই বললাম—রান্না করতে হবে না। একটা কাজ করা যাক। আমার বাড়ি চল। অশ্রু আসুক, তারপর এখানে এস।

—কিন্তু,

—কিন্তু কি?

—বাড়ি খালি পড়ে থাকবে?

—কিছু হবে না। নিচে তো ভাড়াটেরা আছে। তালা দিয়ে চল।

হাসতে হাসতে বলল—আমার সঙ্গে থাকতে কি তোমার ভয় করছে?

বললাম—ভয় নয়, অস্বস্তি লাগছে। আমি অন্য কিছু ভয় করি না, নিজেকেই আমার বড় ভয়।

জেগে উঠেছিল। —তাহলে তুমি চলে যাও, আমি একাই থাকব।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা কাঁদল। আমি চুপ করে বসেছিলাম। কোনভাবেই আমি ওকে কিছু বোঝাতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ পরে বলল—বেশ চল। কিন্তু সকালেই তো চাকরটা ফিরে আসবে।

বললাম ভোরেই ফিরে এসো।

—কিন্তু ছোড়দা যদি কালকে না আসে?

—তখন ভেবে চিন্তে একটা পথ বার করা যাবে।

জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জিগেস করল—আচ্ছা সমীরণ, আমার এখন কি করা উচিত?

আমি কোন উত্তর দিতে পারি নি। লেখা-পড়া জ্ঞান-গম্যি, শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা থেকে আমি কৃষ্ণার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। শুধু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দু'দিন কৃষ্ণাকে আমাদের বাড়িতে রেখেছিলুম। তারপর অশ্রু এসে নিয়ে গিয়েছিল। জানি না, কৃষ্ণার এই সাংঘাতিক ব্যাপারটা অন্য কেউ জেনেছে কিনা।

পাখি ডাকল, চারদিক ফর্সা হয়ে শনিবারের ভোর এল। গত শুক্রবারের পুরো দিনটাকে স্পষ্ট মনে করতে পেরে সমীরণ অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে শুতে গেল। বিছানার শুয়ে একবার শুধু মনে হল—একটা পরিচিত মেয়ের জীবনে এক সপ্তা আগে এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে, অথচ আমার এ সপ্তাটা কেটে গেছে নির্বিবাদে। প্রশ্ন এল মনে—কৃষ্ণা, এত সব বন্ধু-বান্ধবী থাকতে আমাকেই বা ডেকেছিল কেন? এ্যাকচুয়ালী ও আমার কাছে কি চেয়েছিল? ঘুম পেয়েছিল, এসব প্রশ্নের উত্তর ওর মাথায় আসছিল না। একবার শুধু মনে হল—কি হবে এসব ভেবে। আমার কিই বা করার আছে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল সমীরণ।

যখন একা

চম্পা পাল

স্পষ্ট হয়ে আসা ভোরের অনেক আগেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। অন্য কোন দিন এত ভোরে আমার ঘুম ভাঙে না। সাতটার সাইরেন বেজে যাবার পরেও আমি বিছানা ছাড়ি না। বৌদি অথবা টুকু অথবা গোপাল এসে এসে দরজায় ধাক্কা দেয়, আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে যায় আর দেরী করলে দশটা-পঞ্চাশের ক্লাসটাও নিতে পারব না। ওদের উৎপাতে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে জোর করে যখন চোখ খুলি তখন জানলা দিয়ে ঘর। আমার ঘরে কোন পুবমুখো জানলা নেই—তবু পরিষ্কার বুঝতে পারি বাইরের রোদের রং ধুলোয় ধোঁয়ায় মলিন হয়ে গেছে। আমার সমস্ত শরীরে যেন অনন্তকালের অবসাদ নোংরা ন্যাকড়ার মত জড়িয়ে থাকে। মুখের ভেতর বিস্বাদ অনুভূতি। নিয়মমাফিক সিগারেট ধরাই, ঝিমিয়ে পড়া স্নায়ু-গুলোকে নিকোটিন দিয়ে উত্তেজিত করতে করতে টলমলে পায়ে আমি বাথরুমে ঢুকে যাই।

আজ কিন্তু কিছুই বাঁধা পরিচিত ছকের সঙ্গে মিলছে না। ঘুম যখন ভাঙল তখনও অন্ধকার কাটেনি। গাঢ় কুয়াশার আড়াল থেকে, নখদর্পণে ধরে রাখা এতদিনের চেনা পাড়াটাও কেমন অপরিচিতের মত লাগছিল। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি অনেকক্ষণ। আস্তে আস্তে আমার চার-পাশের বাড়ি-ঘর, দোকানপাট, মানুষের ঘুম ভাঙছিল। সবচেয়ে আগে উঠল সামনের মেয়ে-স্কুলের দারোয়ান মিতন। মিতনের আওয়াজে শিক্ষিত বেকার যুবক কর্তৃক পরিচালিত চায়ের দোকানের [illegible] নিভন্ত আঁচে নতুন করে কয়লা [illegible] আবার। আর মিতনের [illegible] বজরঙবালীর স্তুতিগান শেষ হবার [illegible] ফিরে ফিরে বেল বাজিয়ে কাগজ এসে গেল। হকারদের টিপ কখনো ফসকায় না। খুব নির্ভুল লক্ষ্যে স্মার্ট ছেলেটি আমার পায়ের নীচে কাগজখানা পাঠিয়ে দিল। কুয়াশার আস্তর কেটে তার সাইকেলখানা দূরে সরে যাচ্ছিল, অল্পবয়সী ছেলেটির গায়ে সরষের তেল রঙের সোয়েটার, একটু ঝুঁকে পড়ে সে প্যাডেল করছিল। দেখতে দেখতে কেমন যেন লাগছিল আমার। প্রথম কলেজে ঢোকার পর এক-খানা সাইকেলের জন্য ভারি গোপন একটা ইচ্ছে ছিল। এখন ভাবতে গেলে কেমন হাসি পায়, এক একটা বয়সের ধাপ পেরিয়ে আসতে গিয়ে মানুষ এক একটা অনুভূতিকে কেমন করে স্বেচ্ছায় পেছনে ফেলে আসে।

নতুন ভাঁজ-ভাঙা কাগজের গন্ধ কেমন, বহুকাল আমি ভুলে গেছি। সকালে কাগজ দেখার মত সময় হয় না। কাগজ হাতে আসে কোনদিন দুপুরে—অফ পিরিয়ডে সময় কাটাতে। অথবা কোন সন্ধ্যায়, যখন আর কিছু করার খুঁজে না পেয়ে নাইট শো-এ সিনেমা দেখার প্রয়োজন বোধ করি। লোভী বাচ্চা ছেলে যেমন করে নতুন বইয়ের গন্ধ নেয় তেমন করে কাগজখানাকে আমি অনেকক্ষণ ধরে শুঁকে দেখলাম। পড়তে ইচ্ছে করল না। হঠাৎ করে পেয়ে যাওয়া এমন একটা অচেনা ভোরবেলা নিশ্চয়ই কাগজ পড়ে নষ্ট করবার জন্য নয়।

এর মধ্যে আকাশের গায়ে কেমন লালচে রঙ ধরেছে। যেটুকু পাতলা কুয়াশার পর্দা ছিল তাও আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। মেঘের পরতে পরতে এক এক জায়গায় এক এক রকম রং। ডিমের কুসুমের লালচে আভা একটু ওপর দিকের মেঘের গায়ে লেগে কমলালেবুর তীব্র হলুদ রং ধরেছে। দেখতে দেখতে স্কুল-বাড়ির মাথা টপকে উজ্জ্বল আগুনের গোলার মত সূর্য উঠে পড়ল। সতেজ আর অমল সূর্য। তার আলোকরেখাগুলি ঝকঝকে শিরস্ত্রাণ পরা একদল নিখুঁত সৈন্যের মত নির্ভুল লক্ষ্যে ধোঁয়া আর কুয়াশার বুকে বিঁধে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতাটা নিঃসন্দেহে নতুন। শেষ কবে এমন সূর্য ওঠা দেখেছি আমার মনেই পড়ে না। তবে বছর পাঁচ-ছয়েকের মধ্যে নিশ্চয়ই নয়। তিন-দিনের না-কামানো দাড়ির জঙ্গলে হাত বোলাতে বোলাতে আমি নিজেই নিজেকে শুধোলাম—কি হে কেমন বুঝছ? নিজেকে বেশ পবিত্র পাপীর মত লাগছে কি না?

—এ কি ছোড়দা, তুমি আজ এত ভোরে উঠেছ? শরীর ভাল আছে তো?

পেছন ফিরে আমি টুকুকে দেখলাম। আমার এই মা-মরা চিররুগ্ন বোনটার রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে এমন একটা মায়া জড়ানো আছে যে, আমি কখনো ওকে আঘাত দিয়ে কোন কথা বলতে পারি না। আমি জানি টুকু সত্যি-সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়েছে, জবাব এড়িয়ে গেলে ও ভয় পাবে। ভোরের নরম আলোয় টুকুকে আরও বিবর্ণ আর ম্লান দেখাচ্ছিল। কালো এক-গুচ্ছ রুক্ষ এলোমেলো কোঁকড়া চুলের মধ্যে শীতের হিমে কিন্তুট [illegible] মত মুখখানা জেগে আছে। আমি ওর মাথায় হাত রাখি
—টুকু, তুই কেমন আছিস?

আমি ভাল আছি ছোড়দা, এবারে শীতটা পড়ে পর্যন্ত আর ওষুধ খেতে হয় না। তোমার কিছু হয়নি তো?

আমার হাসি দেখে আশ্বস্ত হয়ে ও চলে গেল। আমি জানি এ বাড়িতে টুকুর মত করে আমার জন্য কেউ ভাবে না। সামনের বৈশাখে টুকুর বিয়ে...... তারপর মেয়েটা চলে যাবে। অথচ....একই ছাদের নীচে থেকেও গত দুতিন মাসে টুকুর সঙ্গে আমার বোধহয় একটা কথাও হয় নি।

এ বাড়িতে আমার ভূমিকাটা অনেকটা নিজ বাসভূমে পরবাসীর মত। দাদা, বৌদি, এমনকি টুকুও জানে আমি ওদের একজন হয়েও ওদের নই। সকালে কোন-রকমে নাকে মুখে গুঁজে আমি বাড়ি ছাড়ি। ফিরে আসি যখন, তখন ওদের মধ্য-রাত্রি। রবিবারেও এই একই রুটিন। রাত করে ফেরার জন্য আমার কাছে কেউ কখনো কৈফিয়ৎ চায় না। অবশ্য সে প্রশ্নই ওঠে না। তেত্রিশ বছরের একটা পুরুষ মানুষ তো সদ্য গোঁফদাড়ি-গজানো বাচ্চা ছেলে না! তাই.... প্রশ্ন তো কেউ করেই না, এমনকি উদ্বিগ্নও হয় না। ওরা ধরেই নিয়েছে আমি ওদের নই....আমাকে ওদের ছকে ফেলা যাবে না।

অথচ এমনও একদিন গেছে, যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাকে দাদার কাছে, বাবার কাছে এমনকি বৌদির কাছেও অপরাধী সেজে দাঁড়াতে হয়েছে, সম্ভব-অসম্ভব সব অন্যায় কাজ করার জন্য। কখনো কখনো চোরের মারও হজম করেছি নির্বিবাদে আমার যখন দশ বছর বয়স, টুকুকে জন্ম দিতে গিয়ে মা মারা যান। মা-মরা ছেলে বা ভাই যাতে কুসঙ্গে পড়ে বখে না যায় তার জন্য দাদা-বাবার চেষ্টার কিছু কমতি ছিল না। মনে আছে—প্রথম যেদিন আমার পকেট থেকে পোড়া সিগারেট বেরোল, বাবা পুরো একদিন, একরাত্রি না খেয়ে ছিলেন। আর সেই আমি, মুখুজ্যে বংশের সেই কুলাঙ্গার, আজকাল যখন মাঝে মাঝে ভরপেট মদ্যপান করে এসে, টলায়মান অবস্থায় ট্যাকসীর বিল মেটাই, ঠোঁট সরু করে শিস্ দিতে দিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠি, কেউ কোন মন্তব্য খুঁজে পায় না। দেওয়ালের গা থেকে আমার পিতাঠাকুর ঈশ্বর যুগলকিশোর মুখুজ্জেমশাই পর্যন্ত ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে থাকেন।

মাঝে মাঝে ভাবি কিসে এমন হল? কি করে কি ঘটল যে, পাশার দান একে-বারে উল্টে গেল! চারপাশের চেনা জগৎটা থেকে আমি কী ভীষণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। দাদা-বৌদি-টুকু, আমার বন্ধুবান্ধব, স্থায়ী প্রেমিকাটি অথবা অস্থায়ী প্রেমিকাগুলি—সকলের মাঝখানে থেকেও আমি কী নিদারুণ একা। [illegible]

শামুকের মত কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, নিজের খোলসটাকেই দিনে দিনে শক্ত করে তুলছি।

এইতো, বছর কয়েক আগেও আমি একটা গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসমান নাথিং ছিলাম। প্রাইভেট কলেজের কর্তৃপক্ষ মাসান্তে যে দক্ষিণা হাতে ধরিয়ে দিত তাতে আর যাই হোক ভদ্রভাবে বাঁচা যায় না। অবশ্য, তাতে করে এ প্রশ্নের কিছুই সমাধান হয় না যে, ওর চেয়ে বেশি পাবার যোগ্যতা আমার আদৌ ছিল কি না। সে যা হোক—আমার সেই অযোগ্যতার দিনগুলিতে অনেক কিছুই আস্তে আস্তে আমার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

যেমন আমার প্রথম প্রেম নামক বোকা এবং ভোঁতা ভোঁতা ব্যাপারটি। য়ুনিভার্সিটির সেই রমরমা দিনগুলোতে যখন চুল ফাঁপিয়ে, খদ্দরের ঝোলা কাঁধে, অগুনতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের হর্তা-কর্তাবিধাতা সেজে কলেজ পাড়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছি সেই তখনই করবীর সঙ্গে আলাপ। সেটা সেই বয়স, যখন তরুণী মেয়েরা চোখ তুলে তাকালে বুকের নীচে উথাল-পাথাল জোয়ার ডেকে যেত। করবীর আজীবন অপেক্ষা করে থাকার প্রতিশ্রুতিতে তাই আকাশ-ভুবন যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। সমস্ত চৈতন্য জুড়ে সে কি আলোড়ন আমার!

আহা! আলোড়ন! সাংস্কৃতিক ব্যাপার স্যাপার শেষ করে যখন পরীক্ষার হলে বসলাম, ততক্ষণে বারোটা যা বাজার বেজেই গেছে। রেজাল্ট যা হল তাতে বেসরকারী কলেজের চাকরীও অমৃতফল। করবী আশা করেছিল দারুন একটা রেজাল্ট করে, স্কলারশিপ বাগিয়ে আমি বিদেশ যাবো। সে গুড়ে বালি পড়তে তার বাহানা শুরু হল অন্য দিক থেকে। আমাকে আই-এ-এস করার জন্য সে উঠে পড়ে লাগল। যেন এখনই ফরেন সার্ভিস তার মুঠোর মধ্যে ঢুকে পড়েছে!

তবে একটা দিক থেকে করবী সাধুবাদ পাবার মত মেয়ে! বৃথা ভান-ভঙ্গি তার স্বভাবে নেই। যখন বুঝল হাজার চেষ্টা-করলেও আমি মাসান্তিক দুশো চল্লিশ টাকাকে দু-হাজার করার জন্য কিছুতেই উঠে পড়ে লাগব না তখন সে কথা না বাড়িয়ে কেটে পড়ল। বলে গেল, আমাকে বিয়ে করার চেয়ে ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কের বয়-বেয়ারা জাতীয় কিছু একটাকে মালা দেওয়াও ঢের ভাল। তাদেরও নাকি উন্নতির আশা আছে—তারা কেউ আমার মত বৃষ্ণ জরদগব নয়।

বেচারী করবী। এখন হয়তো হাত কামড়াচ্ছে নিজের। সেই বা কি করে জানবে মাঝে মাঝে অঘটনও ঘটে যায়। করবী চলে যাবার পর ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণাতেই বোধহয় (বয়েসটা আরেকটু কাঁচা ছিল তো।) ইনিয়ে বিনিয়ে এক গল্প লিখে পাঠালাম নামকরা কোন সাপ্তাহিকের ঠিকানায়। আহা। কি আশ্চর্য। আমি যেন হিন্দী ফিল্মের দিলীপকুমার কি রাজেন্দ্র খান্না। হেলাফেলায় ছোঁড়া ঢিল চাঁদমারীর একেবারে মাঝখানের গর্তে বিঁধে গেল। গল্প ছাপা তো হলই, চেকের সঙ্গে এল সম্পাদকের ব্যক্তিগত চিঠি। আরও লেখা পাঠাবার অনুরোধ।

এই শুরু। এখন তো আমি বাংলা দেশের টপ গ্রেডের সাহিত্যরথীদের শিরোমণি, এক গেলাসের ইয়ার। গোটা কয়েক পুরস্কার-টুরস্কারও কপালে জুটেছে। আমার লেখা ছাড়া নামী-দামী পত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা বেরোয় না। আমার গল্পের সিনেমা হলে ছবি কখনো ফ্লপ করে না। আমি এখন বুদ্ধিজীবী, এবং নামকরা বুদ্ধিজীবী। তাকিয়ার খোলের মত ঢলঢলে প্যান্ট আর কান-ঢাকা জুলপীতে সেজে কফি হাউসে কালো কফি খাই, বুলি কপচাই। অবশ্যই বাঁধা বুলি!

বছর আট-দশ আগেও আমার বাড়ি ফিরতে রাত হলে দাদা বারান্দায় জেগে বসে থাকতো। গরগরে গলায় ভাববাচ্যে প্রশ্ন শুধোত—'কোন রাজকার্যে যাওয়া হয়েছিল, ফিরতে দেরী হবে সেকথা বাড়িতে বলে যাওয়া হয়েছিল কি? মুখুজ্জে বাড়ির মুখে চুনকালি আর কতভাবে পড়বে?'...ইত্যাদি ইত্যাদি. তখনও ছুটির দিনের দুপুরবেলা আমি আর দাদা পাশাপাশি পিঁড়িতে বসে কপির তরকারি অথবা আলু-পটলের দম দিয়ে মেখে ভাত খেতাম, টুকু আমার তক্তপোশের ওপর বসে দু বেণী দুলিয়ে স্কুলের ইতিহাস পড়া মুখস্থ করত। সন্ধ্যেবেলা সেজে-গুজে বেরোবার মুখে বৌদি ঠোঁট টিপে বলত—'আর কেন, ছন্নছাড়ার মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে না বেড়িয়ে, করবীকে এবার বাড়ি নিয়ে এলেই হয়?' বৌদি করবীর কথা জানত। বৌদির ইচ্ছে ছিল আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক, দরকার হলে করবীও নাহয় চাকরি করবে।

এখন দাদা আর খোঁজই নেয় না, আমি কত রাতে বাড়ি ফিরলাম অথবা আদৌ ফিরলাম কিনা। বৌদির সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে কেমন আড়ষ্ট, সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মাইনে করা আয়ার মত বৌদি এখন আমার পরিচর্যা করে—সকালবেলা বাথরুমে আমার সাবান পাটভাঙ্গা তোয়ালে গুছিয়ে রাখে আমি জাগার আগেই। তারপরে বাটি দিয়ে আমার ভাতের থালা সাজায়, খেতে বসলে ঠায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। টুকু আমার লেখার টেবিল ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে, তিনটে কলমে লাল, নীল, সবুজ তিন রকমের কালি ভরে রাখে, আমি লিখতে বসলে টুম্পা আর বুবাইকে গোলমাল না করতে শাসায়। মাঝে মাঝে দাদা এসে অপরাধীর মত ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকে নীচু-গলায় বলে 'শ-তিনেক টাকার বড় দরকার ছিল, চেকটা যদি একটু সই করে দাও...'

অথচ...এমনটা হবে আমিও ভাবিনি। চোখের পলকে আমি একদিন সাহিত্য সম্রাট বা সাহিত্য যুবরাজ বনে যাব আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাই আমাকে সেলাম জানাবে, আমার বোন, আমার বৌদি আমার মাইনে করা বাঁদীর মত কুর্নিশ করবে—এ আমার স্বপ্নেও ছিল না। আমিও তাই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। সবাই আমাকে যেমন দেখতে চায় আমি ঠিক তেমনটিই সেজেছি।

সামনের স্কুলের মেয়েগুলো একে একে অথবা ছোট ছোট দলে আসতে শুরু করেছে। ওদের স্কুলটায় বোধহয় য়ুনিফর্মের বালাই নেই। একঝাঁক রঙীন পাখির মত ওরা নতুন রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কচি একটি সদ্য বেড়ে-ওঠা কিশোরীর নরম নরম শান্ত মুখশ্রী এবং রঙীন শাড়ি সোয়েটারের আবরণের ভিতর দিয়ে তার শরীরের নতুন জাগা বাঁকগুলিকে ভারী চমৎকার লাগছে দেখতে।

ওদের দেখতে দেখতে আমার খুব অনিবার্যভাবেই অর্পিতার কথা মনে হল। অর্পিতা অবশ্য ওদের মত নওলকিশোরী নয়। তার ঈষৎ লম্বাটে ছাঁদের মুখ, বিশাল দুটি ভাসা-ভাসা চোখ, মাজা মসৃণ ত্বক, মেদহীন অথচ পরিপুষ্ট শরীর, দীর্ঘ গলার নীচে দুটি উপচীয়মান সোনার কলস—এই সব কিছু নিয়ে আশ্চর্যভাবে একটি গন্ধস্পর্শময় যুবতী। অর্পিতা দু-

বেণী করে চুল বাঁধে না, যখন-তখন আঁচল লুটিয়ে ফেলে আবার তা তুলে নেবার মত চাঞ্চল্যের বয়স সে অনেক দিন পেছনে ফেলে এসেছে। অর্পিতাকে দেখলে শুধু মায়া জাগে না কৌতূহলই জন্মায় না— সম্ভ্রমও আসে।

অর্পিতা আমার বন্ধু। অবশ্য বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে, সমবয়সে। অর্পিতা আমার চেয়ে বছর দশেকের ছোট তো হবেই। তবু...আমার নিঃসঙ্গ দ্বীপের মত জীবনে অর্পিতাই বোধহয় একমাত্র বন্ধু। অর্পিতা আমার—না, ভক্ত পাঠিকা নয়, বাংলা উপন্যাসের নিয়মমত ছাত্রীও নয়— সম্পর্কে সে আমার কিরকম লতায়-পাতায় আত্মীয়। বৌদির ছোট ভাইয়ের শালী বা ঐ জাতীয় কিছু একটা। অর্পিতার বাড়িতে কেউ নিশ্চয়ই জানে না যে মাঝে মাঝেই সে য়ুনিভার্সিটি পালিয়ে আমার সঙ্গে আড্ডা মারতে কফিহাউসে চলে আসে, বিদেশী ছবি এলে দুম করে টিকিট কেটে ফেলে, শীতের রোদ আর বর্ষার জল গায়ে-মাথায় নিয়ে, আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে সারা কোলকাতার অলি-গলি বড় রাস্তা চষে বেড়ায়। জানলে তারা মেয়েকে সাবধান করত। নামকরা সাহিত্যিক হতে পারলেও, চরিত্র রক্ষায় আমি যে তেমন নাম করতে পারিনি তা আত্মীয়কুলে সব যুবতী এবং অনূঢ়া কন্যার অভিভাবকেরাই হাড়ে হাড়ে জানেন।

জানেনা, আমার শ্রীরাধা এবং ললিতা-বিশাখা - চন্দ্রাবতীরাও। এমনিতেই তারা আমাকে পারলে পরে তাদের হ্যান্ডব্যাগে ভরে ফেলে—তার ওপর অর্পিতার মত এমন ভরাট যৌবনের মেয়ে আমার সঙ্গে দুপুর-বিকেল সন্ধ্যে কাটাচ্ছে জানতে পারলে শ্রীমতীদের তো দশম দশা উপস্থিত হবে; মোট কথা আমাদের এই লুকোচুরি খেলাটা জমেছে বড় ভাল। আমার নায়িকারা জানলে পরে স্মেলিং সল্ট নেবে ঠিক কথা—কিন্তু কি করব, আমি নিরুপায়। ওদের বোঝালেও বুঝবে না যে অর্পিতা অর্পিতাই—তার সঙ্গে কারো কোন তুলনা চলে না। শুধু শরীর দিয়েই কি একটি মেয়ে মেয়ে হতে পারে? না অর্পিতা হতে পারে!

অর্পিতার কথা ভাবতে ভাবতে কখন অনেক সময় কেটে গেছে বুঝতে পারি নি। মেয়েদের স্কুলে এবার প্রার্থনা শুরু হয়েছে। উজ্জ্বল হলুদ রঙের রোদের পাখিগুলি ইতস্ততঃ পথের ওপর ছড়িয়ে, ছিটিয়ে গেছে। আমার বেশ ভাল লাগছিল। ছোট-বেলায় পুজোর ছুটি পড়বার আগে সকালের রোদ দেখে যেমন ভাল লাগত ঠিক তেমনি। অনেকক্ষণ আমি এলোমেলো পায়ে বারান্দায় ঘুরে বেড়ালাম, টুম্পা আর বুবাইকে ঘাড়ে পিঠে তুললাম, টুকুকে ডেকে চা খেলাম আরো এককাপ! বাড়ির সবাই চমকাল, অবশ্য সঙ্গত কারণেই, কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন করল না। লক্ষ্য করলাম টুকুটার দু-চোখ অনাবিল আনন্দ খেলা করে যাচ্ছে, বৌদি যেন কেমন চঞ্চল, দাদার চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে সংশয়।

এ-সবই কিন্তু এই হঠাৎ পেয়ে-যাওয়া রোদ-ওঠা সকালটির দৌলতে। আজকাল আমি সহজে খুশী হই না, আনন্দ খুঁজে পাই না, রোদ দেখে চঞ্চল হবার বয়স তো প্রায় শেষ! তবু কি জানি বড় ভাল লাগছে। অকারণেই মনে হচ্ছে এই আলো, এই আকাশ—আমারই জন্য। মনে মনে একটু বিব্রত বোধ করছি নিজেকে নিয়ে। জন্ম-রোমান্টিক বাঙালীর ছেলে—যেদিকেই যাই, ট্র্যাডিশন এড়াই কেমন করে!

নিত্যকর্ম সেরে, কলেজ রওনা হওয়ার মুখেও কিন্তু এই ঝিম-ধরানো ভালো-লাগার নেশাটা কাটল না আমার। রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে যেতে খুব ভাল লাগছিল। কলেজ করতে একদম ইচ্ছে করছে না (অবশ্য, এরকম ইচ্ছে আমার প্রায়ই করে না।) অনেকদূর কোথাও পালাতে পারলে বেশ হত! পায়ে পায়ে এরই মধ্যে শ্যামবাজারের মোড়ে পৌঁছে গেছি। রাস্তার দু পাশে কত রং, কত পশরা, কত রোদ, চারপাশ দিয়ে উজ্জ্বল এবং সুখী চেহারার মেয়ে পুরুষেরা আমাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিল। লক্ষ্যহীনভাবে তাদের ওপর চোখ ফেলতে ফেলতে আমি এক জায়গায় থমকে গেলাম।

এসপ্ল্যানেড থেকে গ্যালিফ স্ট্রীটের দিকে ফিরতিমুখো ট্রামের দরজায় অর্পিতা। নামার জন্য তৈরী। সবুজ রঙের তাঁতের শাড়িতে হাল্কা বুটি তোলা। মুখের ওপরে দু-চারগাছি কুঁচো চুল। পিঠজুড়ে অব-হেলায় ফেলে রাখা বিরাট বেণী। সমস্ত শ্যামবাজার আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অজস্র রঙ রেখা এবং সৌরভের মাঝখান দিয়ে, পায়ে পায়ে অহঙ্কার বাজিয়ে সাম্রাজ্ঞীর মত অর্পিতা হেঁটে যাচ্ছে! এই মুহূর্তে ওকে ধরা ছাড়া আর কোন কাজ নেই আমার। আমি ছুটলাম।

—'অর্পিতা!'

চমকে চোখ তুলে তাকাল সে—আরে! কি ব্যাপার!

—কোথায় যাচ্ছ?

—কোথাও না। য়ুনিভার্সিটি থেকে ফিরছি। ডিপার্টমেন্টে একজন মারা গেছেন, আজ ক্লাস হবে না।

—অর্পিতা চলো না, কোথাও যাই?

অর্পিতা একটু অবাক হল—সেকি, আপনার কলেজ নেই?

—আছে, আছে। অধৈর্য বালকের মত আমি ঘাড় বাঁকালাম। কলেজ করব না। তুমি যাবে কি না বলো ;

নিঃশব্দে হাসল অর্পিতা—আপনি না... কি [illegible]! একেবারে [illegible] [illegible] কওয়া নেই—

—অর্পিতা তুমি বড় অহঙ্কারী। তুমি জানো, আমি এরকম অফার দিলে কত মেয়ে ছুটে আসে?

অর্পিতা কেমন এক কৌতুকমাখা চোখে আমায় দেখল—তাই বুঝি; তা, এরকম মেয়েদের কাউকে এখন পাওয়া যায় না?

—উঃ, অর্পিতা প্লিজ!

অর্পিতা হাতের ঘড়ি দেখল, বইখাতা দেখল। আমার দিকে চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে হাসল। হাল ছেড়ে দেওয়া গলায় বলল—চলুন তবে। কিন্তু যাবেন কোথায় শুনি?

—তুমি পাশে থাকলে গন্তব্য জানতে চাই না।

অর্পিতা শব্দ করে হাসল এবার। দোহাই অনিমেষদা, আপনার কোন নায়িকার মুখে ডায়লগটা বসাবেন না, বিক্রি কমে যাবে।

...ওখান থেকে ট্যাক্সি নিলাম। সোজা এসপ্ল্যানেড। মাঘ মাসের দুপুর, রোদে রঙে ঝকঝক করছে। অর্পিতার পাশে পাশে হাঁটছি আমি। শুকনো উত্তুরে হাওয়ায় ভেসে আসা ঝরাপাতার গন্ধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অর্পিতার চুলের গন্ধ, শাড়ীর ভাঁজে লুকিয়ে থাকা হাল্কা আতরের গন্ধ, অর্পিতার শরীরের আশ্চর্য বন্য সুবাস।

আমি সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেলাম গুটি-কয়েক চেনা মুখকে। মেট্রোর নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন অর্পিতার মেজমামা বা ঐ জাতীয় কোন একজন ভদ্রলোক। অর্পিতা টুক করে আঁচল তুলে দিল মাথায়। ভীষণ ভাল লাগছিল আমার। ছোটবেলার কথা, আমার বুন্দন, শীর্ণ ছোট্টখাট্টো মা-টার কথা এখন প্রায় মনেই পড়ে না। কেন জানি না এ মুহূর্তে সে সব কথাই ভিড় জমাচ্ছে বেশি করে। এমনি শীতের দুপুরে, উত্তুরে হাওয়ার দিনে আমার মা—আমি যাকে বলতাম মামনি, বসতো রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে। সারাদিনের কাজের পরও তার হাতে থাকত চট আর পাড়ের সুতো—আসন বোনার সরঞ্জাম। অনেক দূরের আকাশে উড়ন্ত একলা চিল। গোলা পায়রাগুলো পরিতৃপ্ত গলায় বকবকম করে যেত। মায়ের পিঠে ঠেস দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে আমি খুব আরামে ঘুমিয়ে পড়তাম।

......অনিমেষদা, চলুন ফুচকা খাই। মাঝে মাঝে এমন ছেলেমানুষ হয়ে যায় অর্পিতা, যে ওর পাল্লায় পড়লে বয়স না ভুলে উপায় নেই। আমরা দুজনে বেঞ্চিতে বসে উস্ আস্ করে কাঁচালংকা ধনেপাতা দিয়ে ফুচকা খেলাম, প্লোবের পেছনদিকে গিয়ে অর্পিতা খুঁজে বার করল তার প্রিয়

ভেলপুরীওয়ালাকে। কাল লেগে যেতে আবার কিনতে হল চিপস আর জেমস্।

অর্পিতা হাসছে, কথা বলছে। তার ছন্দোময় দীঘল শরীর, পিঠে ছড়িয়ে যাওয়া বেণী, তিরতিরিয়ে কাঁপা চুলের গুচ্ছ—যেদিকে চোখ ফেরাই দেখে আর আশ মেটে না। সমস্ত চৈতন্য জুড়ে ভালো লাগার ঘোর! আজকের সকালের প্রতি কৃতজ্ঞতা আর ফুরোর না আমার।

—অর্পিতা, চলো, মাঠে রোদে বসি, যাবে? অর্পিতা ভীষণ দুষ্টু দুষ্টু মুখে হাসল—তারপর, ছাত্র-ছাত্রী, ফ্যানেরা দেখে ফেললে?

—ভারি বয়ে গেল। চলো তো!

অর্পিতা ঘড়ি দেখল। অনিমেষদা, এখন বারোটা বেজেছে। আমাকে কিন্তু সাড়ে বারোটার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে।

তার মানে? আজ সারাদিন তোমার আমার সঙ্গে প্রোগ্রাম। আমরা এখন রোদে বসব, গল্প করব, ম্যাটিনীতে সিনেমা দেখে...

উঁহু উঁহু উঁহু। আজ আমি কিছুতেই পারবো না। লক্ষীটি অনিমেষদা, আজ না গিয়ে আমার কোন উপায় নেই।

আমি জানি অর্পিতা গম্ভীর ভঙ্গিতে দুষ্টুমী করছে। আলতো হাতে ওর বেণী টেনে ধরি।

যাবে কোথায়? প্রেম-ট্রেম করছ নাকি? বলেই দু-পা সরে যাই। নিশ্চয় জানি অর্পিতা এবার ওর একরাশ বইপত্তর আমার পিঠের ওপর উঁচু করবেই। কিন্তু কই! তার বদলে অর্পিতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কৌতুকে আর খুশিতে শাণিত, এতদিনের পরিচিত চোখদুটি যেন কেমন মায়াবী হয়ে উঠেছে। সারা মুখে চাপা সিঁদুরের রঙ। আঁচলটা অকারণেই বুকের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে ও বলল—আজ আমার একটার সময় একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা। আমি না গিয়ে পারবো না।

বুঝতে পারছি আমার গলা সমস্ত কৌতুকের আবরণ সরিয়ে অপ্রত্যাশিত এক বিস্ময় আর হতাশায় হিংস্র হয়ে উঠতে চাইছে। তবু সামলে নিলাম। হেসে বললাম—কে সে? নবীন প্রেমিক?

অর্পিতা কাঁপা গলায় বলল—আমরা একসঙ্গে পড়ি। আমি ওকে ভালোবাসি। আপনিও দেখেছেন। গত শনিবার এলিটে সিনেমা দেখতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল।

এবার মনে পড়ল। সাধারণতঃ অর্পিতার পাশে কমবয়সী স্বাস্থ্যবান ছেলে দেখলে কেমন এক অজানা ভয় আর হিংস্রতায় আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ওই ছেলেটাকে দেখে কিন্তু মনে মনে করুণাই বোধ করেছিলাম। শীর্ণ, নিরন্ত চেহারা। মুর্গীর মত সরু গলা। চশমার মোটা কাঁচের আড়ালে চোখ দুটো প্রায় অদৃশ্য। অর্পিতার এই নাবালক অনুরাগীটি বেশ কিছুক্ষণ আমার হাসির খোরাক হয়েছিল তাও মনে আছে।

আমরা থেমে গিয়েছিলাম। অর্পিতা একটু বিব্রত গলায় আমাকে ডাকল—কই, হাঁটবেন না?

আমি অপলক চোখে অর্পিতাকে দেখলাম। কিছু না ভেবেই মানুষ যেমন হাতের মুঠো থেকে পাখি উড়িয়ে দেয় তেমনিভাবে বললাম—নাঃ, তোমার তো সময় হয়ে এল। চল, আস্তে আস্তে বাসস্টপে যাই। তোমাকে তুলে দিয়ে আসি।

অর্পিতা এবার সহজ হল। আমাকে অকারণ লজ্জার অস্বাচ্ছন্দ্য কেটে গেছে তার। আবার সতেজ পায়ে রাজহংসীর মত টান হয়ে সে হাঁটতে শুরু করল। ওকে বাসে তুলে দিলাম। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই। বাস থেকে শাঁখের মত হাতখানি বাড়িয়ে অর্পিতা ক্রমশঃ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জনারণ্যে মিশে গেল।

এখন আমি একা হাঁটছি। চারপাশে শীতের দুপুর চনমনে চৌরঙ্গীর ব্যস্ততা, কোলাহল, জনতা। এই প্রথম আমার মনে পড়ল আমার অনেকগুলো জরুরী কাজ ছিল। বিকেলে কফিহাউসে এক নবীনা লেখিকা আমার সঙ্গে দেখা করবেন। সন্ধ্যায় একটা কবিসম্মেলনে উপস্থিত থাকতেই হবে।

চেনা জগৎ, কেজো জগৎ আবার জেঁকে ধরল। নির্জন নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক দুঃখী বালকের মত আমার মনে হল এখন আর আমার পৃথিবীর সূর্যোদয় সূর্যাস্তে কোন অধিকার নেই।

অমৃতে উদীয়মানদের

১৮ যের অমৃতে শ্রী মনোজিৎ মিত্রেরআর একবার শীর্ষক গল্পটি পড়ে মনে হল এমন একটি সাবলীল রচনা সাম্প্রতিককালের মধ্যে চোখে পড়ে নি। একালের উচ্চবিত্ত বাঙালী মানসিকতার একটি নিখুঁত ছবি তিনি এঁকেছেন। সেই সঙ্গে বর্তমান অর্থনৈতিক ও আত্মকেন্দ্রিক যুগে করুণা, মমতা, ভালবাসা জাতীয় মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে আপাতঃ দৃষ্টিতে সুখী এবং প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যক্তিত্বের মানসিক দ্বন্দ্ব তিনি একজন সার্থক মনোবিদের মত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর গল্পে 'স্মিতা সান্যাল' 'লছমী' ও 'অপরিচিত যুবকের' চরিত্রগুলি লেখকের চরিত্রচিত্রণের গুণে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ব্যাভিচার, লালসা আর বিকৃত যৌন জীবনের অশালীন বর্ণনায় পরিপূর্ণ তথাকথিত প্রগতিশীলতার ধ্বজাধারী আধুনিক গল্প-উপন্যাসগুলি যেখানে বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করে চলেছে, সেখানে রুচিশীল পাঠক সমাজ শ্রীমিত্রের মত উদীয়মান সাহিত্যিকদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবে একথা তাঁর রচনার একজন বিমুগ্ধ পাঠক হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি। পরিশেষে 'অমৃত' সম্পাদক মহাশয়কেও অজস্র ধন্যবাদ। দু-একটি 'প্রখ্যাত', 'বহুল প্রচারিত' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি যে কেবলমাত্র নিজস্ব - গোষ্ঠীভুক্ত-লেখকদের রচনা প্রকাশের মত পক্ষপাতমূলক নীতি গ্রহণ না করে মনোজিৎবাবুদের মত তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিচিত এবং সাহিত্যের অঙ্গনে নবাগত অথচ বিপুল সম্ভাবনাময় উদীয়মান লেখকদের অগ্রাধিকার দিচ্ছেন সে জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য বলে মনে করি।

সুপ্রতীক বাগচী
১০কে, কার্ল রোড,
কলিকাতা-৭০০০৩৯

হিমশৈল

বিজয়কুমার দত্ত

'কাল ছিল আমার জীবনের স্মরণীয় দিন। গত একমাস ধরে একটা অনির্দেশ্য অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলেছিলাম, প্রায় অন্ধের মত, দুটি ব্যগ্র হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে—এখন মনে হচ্ছে চোখে একটু একটু করে আলো দেখতে পাচ্ছি, বুকের ফাটলে অনুভব করতে পারছি সে আলোর উষ্ণ ও নরম উত্তাপ।

কাল সারাদিন ছিল প্রচণ্ড গুমোট—সন্ধ্যের সময় সারা আকাশ লাল হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় ঝড়ের পূর্বাভাষ ঘনিয়ে উঠছিল। রাত্রি আটটার পর নামল প্রবল বৃষ্টি। আমি যে ঘরে বসেছিলাম, সে ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম।

তখনো জানতাম না, কি এক অভাবিত অজানিত অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। জীবনের নাটকীয়তা সত্যিই, উপন্যাসের চেয়ে অনেক বেশী বিস্ময়কর।'

এই পর্যন্ত লিখে, থামলেন ইন্দ্র রায়। ইদানীং ডায়েরী লেখার নেশা তাকে পেয়ে বসেছে—শুধু তাই নয়, অবসর সময় তিনি মাঝে মাঝে গল্পও লেখেন।

অথচ পেশায় তিনি চিত্রকর। ব্যবসায়িক ছবির বাজারের দিকে যেমন তাকে চোখ রাখতে হয়, তেমনি নিজের অন্তরের তাগিদে সূক্ষ্মতর শিল্পের প্রতিও অনুরাগ জাগিয়ে তুলতে হয় কঠোর অভিনিবেশে।

কিন্তু ইদানীং তিনি দ্বিতীয় ধরনের ছবি আঁকার জন্য কোন তাগিদ অনুভব করেন না। বয়সের ছাপ পড়েছে তার চোখে-মুখে, শরীরের সর্বত্র। ঘোরাঘুরি করে কাজের মত কাজ পান না বলে, সিনেমা ও ফ্যাশান পত্রিকায় নানা রকমের ছবি আঁকার কাজ নিতে বাধ্য হয়েছেন।

এই রকমের একটি পত্রিকায় একটি মহিলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল কয়েক মাস আগে। তিনি অবশ্য পত্র-পত্রিকায় লিখে নাম করেছেন। পরিচয় ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে পৌঁছয়নি, তবে তার মেয়েকে আঁকা শেখানোর একটা বাড়তি কাজ জুটেছিল ইন্দ্র রায়ের।

এই লেখিকার নাম শুনে ইন্দ্র একটু উৎসুক হয়েছিলেন প্রথম পরিচয়ে, সেই ঔৎসুক্য প্রায় আকর্ষণে পরিণত হয়েছিল লেখিকার ব্যবহারে। ইন্দ্র রায় অবাক হয়ে ভেবেছিলেন যার নাম অভ্রু, তিনি কি করে চোখে-মুখে-কথায় এমন গাম্ভীর্য, আত্ম-স্বাতন্ত্র্য এবং অহমিকা মেখে ধরতে পারেন! তার বাড়ীতে যখন ইন্দ্র যাতায়াত শুরু করলেন গৃহশিক্ষকরূপে, তখনো তার শোভন দূরত্ব বজায় রাখার কোন ব্যতিক্রম দেখতে পান নি। আশ্চর্য! লেখিকারা কি এইরকমই হন? কে জানে?

তবে আগের দিন সন্ধ্যের সময় শিল্পী ইন্দ্র রায় একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলেছিলেন, —অভ্রু সেন তাঁর সামনেই সেদিন কিছুক্ষণ বসেছিলেন, বিপরীত দিকে—একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন।

প্রায় অনন্ত মুহূর্তের ধ্যানে মগ্ন হয়ে সেই অল্পক্ষণেই ইন্দ্র তার একটা শাণিত ও সপ্রতিভ স্কেচ এঁকে ফেলেছিলেন।

ছাত্রী উঠে যাবার পর, ইন্দ্র ইতস্ততঃ ভঙ্গীতে বললেন,—যদি কিছু মনে না করেন, আপনার অজান্তে একটা অপরাধ করেছি, ক্ষমা করবেন।

অভ্রু সেন তার গম্ভীর ও ধারালো মুখ তুলে তাকালেন ইন্দ্রের দিকে। ইন্দ্র হাত বাড়িয়ে, স্কেচটি এগিয়ে দিলেন।

অভ্রু সেন কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন আত্ম-প্রতিকৃতির দিকে। তারপর ইন্দ্রকে হতভম্ব করে বললেন—একি আমার জন্য?

ইন্দ্র একটু ধাক্কা খেলেন, বললেন—আপনার জন্য তো বটেই। আমি আর কি করব?

—কেন আমার মুখের এই পোর্ট্রেট কি আপনার আঁকা ছবির প্রদর্শনীতে স্থান পেতে পারে না?

চল্লিশোত্তর ইন্দ্র রায় সারা শরীরে অকারণ রোমাঞ্চ অনুভব করলেন। তিনি যন্ত্রচালিতের মত অভ্রুর হাত থেকে স্কেচটি নিয়ে বিদায় নিলেন। রাস্তায় নেমে তিনি ভাবলেন সাহিত্যিক মানুষদের কত রকমই না খেয়াল হয়! বাড়ী এসে তিনি রাত্রে ঘুমোতে পারছিলেন না।

সেদিন প্রায় মধ্যরাত্রি জেগে ওই স্কেচের ভিত্তিতে তিনি চারটি আলাদা ভঙ্গীর ছবি আঁকলেন নানা রঙের বাহারে। স্মৃতির ঘোর থেকে ফিরে এসে ডায়েরীটা আবার তিনি পড়লেন। পড়তে পড়তে তিনি নিজের লেখার মধ্যে আরো একটা দৃষ্টির উন্মেষ, সম্পূর্ণ নতুন মাধ্যম খুঁজে পেলেন। তিনি এই মুহূর্তে উপলব্ধি করলেন রং-তুলি-ক্যানভাস দিয়ে তিনি নিজের দৃষ্টির জোয়ার এমন করে খুঁজে পান নি, যা শব্দের জগতে পেয়েছেন। হয়তো তিনি অতবড় চিত্রকর হতে পারবেন না, যার দ্বারা বুকের মধ্যে জমে থাকা, কাঙালপণা, অফুরান আর্তি এবং হাহাকারকে আলো-ছায়ার রঙীনতায় রূপ দেওয়া যায়।

ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন ইন্দ্র রায়, আর একটু একটু করে গল্পের জগতে, গল্প-লেখার জগতে ডুবে গেলেন।

প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হত তার। ভেবে ঠিক করতে পারতেন না কি নিয়ে গল্প লিখবেন? এতকাল তার চোখ ছিল রূপের দিকে—প্রকৃতির অজস্রতায়, পাহাড়ে সমুদ্রে—সূর্যাস্তে, আর সেই পরমা-প্রকৃতি রমণীর চিরকালীন রূপে।

এবার কি রূপের জগৎ ছেড়ে তিনি বস্তুর জগতে, স্থূলতার জগতে পা বাড়াবেন?

মাঝে মাঝে তার রাত্রে ঘুম হত না। তাঁর স্ত্রী রেখা বেশ কিছুদিন থেকেই তার অস্থিরতা লক্ষ্য করে সেদিন রাত্রে বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, 'কি হয়েছে তোমার?'

ইন্দ্র এবার একটু শান্ত হলেন, কিন্তু চোখ বুজে শুয়ে থাকলেও তার ঘুম এল না।

ভোর রাত্রে তার তন্দ্রা এল। ঘুম ভাঙল প্রায় সকাল আটটার সময়।

রেখা চা নিয়ে এসে বললেন, 'এবার কি ছবি আঁকা ছেড়ে গল্পের মোহে পড়েছ?'

'মোহ?'

ইন্দ্র বিষম খেলেন—একটু চা কাপ থেকে মাটিতে পড়ল।

'তাই তো দেখছি—দুটি পত্রিকায় তোমার গল্প ছাপা হয়েছে, তার বিষয়বস্তু সেই একই, দুটি নারী, একটি পুরুষ।'

জেরার মুখে ইন্দ্র রায় একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। তবে কি তেমন করে তিনি নিজের কথা বলতে পারেন নি?'

হঠাৎ মনে পড়ল অভ্রু সেনের কথা—আমরা নিজের কথা বলি না, বলি অন্য লোকের কথা; ভাষা ও ভঙ্গীটাই শুধু আমাদের। বাকিটা যাদের তাদেরই তো খুঁজে বেড়াই সারাজীবন।

কথাগুলোর মানে তখন তিনি বুঝতে পারেন নি, এখন একটু একটু করে সমস্যাটা স্বচ্ছ হয়ে আসছে।

'কি ব্যাপার? তুমি স্বপ্ন ভাবের জগতে ডুবে রইলে? আজ কি বাজার-হাট করতে হবে না?'

ইন্দ্র উঠলেন, জামা-কাপড় পরলেন যন্ত্রের মত; বাজারের থলি নিয়ে রাস্তায় নামলেন।

বাজারে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন মানুষদের দিকে, বেচাকেনায় দু-প্রান্তে দু' ধরনের মানুষের। একটু নৈর্ব্যক্তিক হবার চেষ্টা করলেন, হঠাৎ পিছন থেকে একজন বলে উঠলেন, 'দাদার কি পকেট মার গেছে?' পিছন ফিরে চাইলেন ইন্দ্র রায়, প্রতিবেশী ভদ্রলোক—অবস্থাপন্ন, পাড়ায় মুখ চেনা আছে এই পর্যন্ত।

'কার পকেট মার গেল?' কয়েকজন উদ্বিগ্ন স্বরে এগিয়ে আসতেই ইন্দ্রর চারপাশে ছোটখাট ভীড় জমে গেল।

ইন্দ্র রায় ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এলেন—তিনি চকিতে বুকে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'না মারা যায় নি, তবে যেতে পারত।' একটু দ্রুতগতিতে বাজারের ভীড়ে তিনি মিশে গেলেন।

বাড়ি ফিরতে বেশ দেরী হল তার। রেখা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। বেলা দশটায় যখন তিনি অফিসে বেরিয়ে গেলেন, তখনো দেখলেন ইন্দ্রর আনমনা ভাব।

সারাদিন ইন্দ্র শুয়ে বসে ঠিক করতে পারছিলেন না, গল্প লেখার জন্য প্রস্তুতি ঠিক পথে চলছে কিনা। তিনি কি চোরাবালির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন? ছবি এঁকে আগে কিছু রোজগার হচ্ছিল, গল্প লিখে কতদূরে এগোনো যাবে?

অশ্রু সেনের মেয়েকে আঁকা শেখানোর টিউশনীটা তো একমাত্র ভরসা। তাও তিনি গত দু সপ্তাহ যেতে পারেন নি।

সন্ধ্যেবেলা রেখা প্রায় ফেটে পড়লেন—সারা দিন শুয়ে বসে থাকলে দিন চলবে? বাড়ীভাড়া বাকী পড়েছে দু-মাস, ছেলের স্কুলে আর বোর্ডিংয়েও মাইনে বাকী রয়েছে তিন মাস—কতকাল ধার-দেনা করে চালাব? গল্প লিখে হবেটা কি? অফিস-কারখানায় বেয়ারার কাজও তোমার জোটে না?'

পায়ে পায়ে বাড়ী থেকে ইন্দ্র রায় বেরোলেন। ছাত্রীর বাড়ী এসে পৌঁছলেন প্রায় আটটার সময়।

অশ্রু সেন বাইরের ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলেন, ইন্দ্রকে দেখে বললেন, 'আরে! আসুন। এতদিন আসেন নি—অসুখ করেছিল নাকি?'

না, অসুখ করেনি—তবে—'

ইন্দ্রকে হঠাৎ থেমে যেতে অশ্রু একটু অবাক হলেন, তিনি ভাবলেন, হয়তো তার মেয়েকে আঁকা শেখানোর জন্য ভদ্রলোকের সময় হচ্ছে না: তাই কথাটা বলতে তিনি ইতস্ততঃ করছেন।

ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অশ্রু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আপনি বসুন—দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

ইন্দ্র বসলেন, এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'আপনার মেয়েকে দেখছি না।'

অশ্রু সেন মুখে একটু হাসি ফোটালেন, বললেন, 'তবু ভালো, ছাত্রীকে তাহলে মনে পড়েছে। আমি ভাবছিলাম, আপনার বোধ হয়, এ কাজে অসুবিধা হচ্ছে।'

ইন্দ্র চকিত হয়ে উঠলেন এক মুহূর্তে—'না-না তা নয়, আমি এবার থেকে ঠিকই আসব। একটা কথা বলছিলাম।

'বলুন'—অশ্রুর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না।

'আপনি তো নানা বিষয়ে পড়াশোনা করেন; শিল্পতত্ত্ব, ছবি,—এসব সম্পর্কে কিছু ভালো বই আছে আমার সন্ধানে। আপনি যদি কিনতে চান—'

অশ্রু তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাপ করবেন, বইগুলো কি আপনার?'

ইন্দ্র কোন জবাব দিলেন না, তিনি চশমা খুলে, রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে, একটা সিগারেট ধরালেন। ঘরের মধ্যে নেমে এল কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা।

ইন্দ্র এই নীরবতা ভেঙ্গে বললেন, 'আর আপনি যদি না নিতে চান, তাহলে অন্য কোথাও দেখতে হবে, বইগুলোর কিছু গতি করা যায় কিনা।'

'ঠিক আছে বইগুলো আনবেন। কত দাম হবে?'

অশ্রুর কথায় ইন্দ্র যেন অনেক ভরসা পেলেন, একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'আপনার পছন্দ হলে দামের জন্য আটকাবে না। আর তাছাড়া ছবি আঁকা আমি তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, এবার থেকে আপনাদের লাইনে শিক্ষানবিসী করছি আর কি

অশ্রু সেন হাসলেন, সে হাসি করুণার না প্রশ্রয়ের, তা ঠিক বুঝতে পারলেন না ইন্দ্র। হয়তো এই বয়সে কোন রমণীর হাসির আসল মানে বোঝার ধার থাকে না।

অশ্রু নীরবতা ভেঙ্গে বললেন, 'তা আমার মেয়ের জন্য সময় দিতে পারবেন তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমার আর কাজ কি আছে? কমার্শিয়াল ছবি এঁকে এতদিন যা হোক করে চলছিল, কিন্ত কিছু করে উঠতে পারছিলাম না: আপনি, আমার ছবির প্রদর্শনীর কথা বলছিলেন! আমার মতন নগণ্য চিত্রশিল্পীর পক্ষে সে সব অবাস্তব কল্পনা মাত্র।'

কয়েক মুহূর্ত [illegible] ইন্দ্র, তারপর পকেট থেকে বার করলেন বাদামী কাগজে মোড়া অশ্রু সেনের মুখের সেই রঙীন ছবিগুলি তাঁর হাতে মেলে ধরে বললেন, 'প্রদর্শনীতে না যাক, আপনার ভালো লাগলেই আমি কৃতার্থ।'

ছবিগুলি নিয়ে অশ্রু মর্মভেদী দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকালেন ইন্দ্রর দিকে। প্রায় অনন্ত মুহূর্তের চোখাচোখি হল দুজনের মধ্যে।

ইন্দ্র সেই দৃষ্টি বিনিময়ের সম্মোহনে স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে যেন আত্মবিস্মৃত হলেন—মনে হল জীবনে কোথায় যেন কিছু একটা তিনি পান নি, সেই অপ্রাপ্তির পেছনে ছুটে চলেছেন।

অশ্রু সেন এই বিরল মুহূর্ত-সমষ্টির জাদু হঠাৎ ছিন্ন ভিন্ন করে বললেন, 'কিছু বলবেন?' ইন্দ্র দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'নাঃ, কিছু না—আজ আসি।'

অশ্রুকে প্রায় স্তব্ধ ও রোমাঞ্চিত করে ইন্দ্র পায়ে পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন রাস্তার ভীড়ে।

দু-তিন দিন তিনি কয়েকটা গল্প লেখার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এই নতুন কাজে কিছুতেই তিনি তৃপ্তি পেলেন না।

রেখা মাঝে মাঝে উষ্মা প্রকাশ করে তার অস্থির চিত্তে একটু বেশী পরিমাণ আলোড়ন আনার ফলে, ইন্দ্রের জীবনে যেন একটা সঙ্কট ঘনিয়ে উঠল।

একদিন সন্ধ্যেবেলা দুজনের মধ্যে ঠান্ডা-যুদ্ধ তীব্র হয়ে উঠল। রেখা একটু চড়া স্বরেই বললেন, 'টাকার কিছু জোগাড় হল? বাড়ীওলা উঠে যাবার নোটিশ দেবে বলেছে নীচের ভাড়াটেকে—সেই সঙ্গে আমাদেরও। আমি আর ধার করতে পারব না।'

ইন্দ্র চুপ করে রইলেন। হঠাৎ রেখার কণ্ঠ শাণিত হয়ে উঠল,—

'কি হল? কিছু একটা বলবে তো?'

ইন্দ্র হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলেন, তিনি আর্তস্বরে বললেন, 'দু-এক দিনের মধ্যেই টাকার জোগাড় করছি।'

'ছাই করবে তুমি। কত ক্ষমতা তোমার, তা আমার জানা আছে! অপদার্থ! বসে বসে গল্প লিখছেন। তবু যদি তাতে দুটো পয়সা আসত।'

ইন্দ্রর মাথায় যেন আগুন জ্বলছিল। তিনি জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন, ভাবলেন, এই কি জীবন? অস্তিত্বের এই কি অর্থ?

প্রায় সারারাত ঘুমোতে পারলেন না শিল্পী তথা লেখক ইন্দ্র রায়। ভোরের দিকে তন্দ্রা এল।

অনেক বেলায় তিনি ঘুম ভেঙ্গে উঠলেন, একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর সারা মুখে ছড়িয়ে ছিল। তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন একটা

শোয়ের বাড়ীর বিরাট দালানে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন উদ্‌ভ্রান্তের মত, দালান থেকে বাইরে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। চীৎকার করে কাকে যেন ডাকবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোন সাড়া পাচ্ছেন না। শুধু নিজের আর্তকণ্ঠের প্রতিধ্বনি কানে একটা ভৌতিক কম্পনের সৃষ্টি করছে—এমন সময় হঠাৎ সমস্ত জানলাটা ভেঙ্গে নীচে পড়ে গেল প্রচণ্ড শব্দে...

ঠিক এই সময় ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন সকাল ন'টা। ভাবলেশহীন মুখে রেখা তখন অফিস যাবার উদ্যোগ করছিলেন। চলে যাবার সময় ঘরের সামনে কয়েক মুহূর্ত তিনি দাঁড়ালেন। ইন্দ্র তখন বিছানায় উঠে বসেছেন, স্বপ্নের ঘোর চোখে-মুখে ছড়িয়ে রয়েছে। দুজনের মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হল।

ইন্দ্র কিছু একটা বলার জন্য এগিয়ে গেলেন, রেখা ততক্ষণে ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

কিছুক্ষণের জন্য ইন্দ্র জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ঘরের চারপাশ দেখলেন। আলমারী-ট্রাঙ্ক-র‍্যাক সবকিছু ঘেঁটে কয়েকটি সুদৃশ্য বই বার করলেন, তার মধ্যে দু-তিনটি আর্টপেপারে ছাপা ছবির বই। একটি পুরনো এবং অব্যবহৃত রেক্সিনের ব্যাগে সে বইগুলো ভরে নিয়ে তিনি সোজা অশ্রু সেনের কাছে হাজির হলেন।

সকালবেলা এমন উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় ইন্দ্রকে আসতে দেখে অশ্রু একটু অবাক হলেন। তবু মনের বিচলিত ভাব চেপে তিনি হাসিমুখে বললেন, কি হল—বইগুলো সত্যিই তাহলে আনলেন?'

'হ্যাঁ, দেখুন, আপনার পছন্দ হয় কি না।'

অশ্রু বইগুলো কৌতূহল ভরে পাতা-উলটে দেখলেন। কয়েকটি বইয়ের ছবি বেশ মন দিয়ে দেখে কয়েক মুহূর্ত ইন্দ্র রায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'এত ভালো বইগুলো বিক্রি করে দেবেন?'

ইন্দ্র রায় একটু উদাসীন ভঙ্গীতে বললেন, 'কি লাভ এসব রেখে?'

'কত দাম?'

'যা আপনি দেবেন।'

অশ্রু সেদিনের মত আবার সম্মোহিত দৃষ্টিতে ইন্দ্রর দিকে তাকালেন, বললেন, 'আপনি কি বাড়ীতে ঝগড়া করে এসেছেন?'

'কেন?'

'আপনাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। যাকগে, একটু বসুন, আমি আসছি।'

কিছুক্ষণ পরে তিনি ইন্দ্রর হাতে তিনটি একশো টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'আপাতত এই টাকা দিচ্ছি। ভবিষ্যতে সুযোগ হলে আরো কিছু দিতে পারব।'

ইন্দ্র দাঁড়িয়ে উঠলেন।

'একি! চলে যাচ্ছেন? বসুন, চা খান।'

প্রায় যন্ত্রচালিতের মত তিনি আবার বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তিনি বললেন, 'আপনার মেয়েকে ঠিকমতই আমি শেখাব—তবে এ ধরনের আরো দু-একটি কাজ যদি অনুগ্রহ করে জোগাড় করে দেন—'

অশ্রু হাসলেন, বললেন, 'আপনার গল্প লেখার কি হল?'

'চেষ্টা করছি। কিছু হচ্ছে কিনা জানি না।'

'আপনার মত ভাবনা আমারও প্রথম প্রথম হয়েছিল—কিন্তু আপনি এত অস্থির মন নিয়ে কিভাবে লিখবেন?'

'জানি না, লিখছি এইমাত্র।'

অশ্রু আবার হাসলেন, 'আপনার কৌতূহল বড় কম। এমন ঔদাসীন্য নিয়ে কি গল্প লেখা যায়। দুদিন এলেন এখানে। কই ছাত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন না তো। আমাকে এতদিন দেখলেন—একলা থাকি মেয়েকে নিয়ে, আমার সম্বন্ধে আপনার কোন কৌতুহল দেখলাম না তো। আমার স্বামী কোথায় আছেন, কি করেন এসব কথা মনে হয়নি কখনো আপনার? বাস্তবিক আপনি ভারি অদ্ভুত।

ইন্দ্র হঠাৎ যেন সচকিত হলেন, মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'আমি জানি, আপনি নিজেই একথা বলবেন, তখনই শুনব'। তাছাড়া কোন কোন স্পর্শকাতর বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করা অশোভন।'

অশ্রু সেন ঝর্ণাস্রোতের শব্দে হেসে উঠলেন। বয়স্ক এবং অন্যমনস্ক ইন্দ্র রায়ের ভিতরের শিল্পীসত্তা আবার যেন জেগে উঠল। হাসির কাঁপনে এবং উচ্ছ্বাসের সজীবতায়, অশ্রুর শরীরে—ইন্দ্র দেখলেন এক অদ্ভুত রমণীপ্রতিমা।

হ্যাঁ, প্রতিমা বলেই মনে হল অশ্রুকে। এই দুর্লভ মুহূর্তে একাধারে শিল্পী ও পূজারীর দ্বৈত ভূমিকায় নিজেকে আবিষ্কার করলেন ইন্দ্র। এতদিন সেই অদ্ভুত দৃষ্টি তাঁর ছিল না—এখন তিনি দেখলেন অশ্রুর মুখ শুধু যে ধারালো, তা নয়, তার আয়ত চোখে রহস্য এবং বরাভয়ের নির্দেশ যেন ঝরে পড়ছে।

শরীরের বিভিন্ন বাঁক যে বিচিত্র জ্যামিতি রচনা করেছে, তার রমণীয় রেখা, কুশলী শিল্পীর চোখে আবিষ্কারের সৌন্দর্য এনে দেয়, আর তার শরীরের সহজ ও স্বাভাবিক লাবণ্য অদ্ভুত মর্যাদা পেয়েছে ব্রোঞ্জ-প্রতিম উজ্জ্বলতায়, এবং সেই নরম-নড়ম ধাতুমূর্তির রমণীনতায়ও বটে।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তিনি তাকিয়েছিলেন। সেই স্থির দৃষ্টির সামনে অশ্রু সেন আত্ম-আবিষ্কারের মুগ্ধতায় লাল হয়ে উঠে বললেন, 'এমন করে কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা কি শোভন?'

তার নিজের কথা ব্যুমেরাং-এর মত ইন্দ্রর বুকে এসে লাগল। তিনি চোখ নামিয়ে বললেন, 'আমি যে ছবির জগৎ থেকে এখন নির্বাসিত হয়ে আছি, একথা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা বলব?'

'বলুন।'

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে দুস্তর সমুদ্রে নির্জন দ্বীপের মত—তার চারপাশে বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ছে তারাভরা আকাশের নীচে। আর আমার নিজেকে মনে হচ্ছে সেই উৎক্ষিপ্ত ঢেউয়ের একটি তুচ্ছ জলকণার মত।'

'চমৎকার।' অশ্রু এবার হাততালি দিয়ে উঠলেন।

ইন্দ্র যেন হঠাৎ দমে গেলেন। তিনি আর দাঁড়ালেন না। একটু দ্রুতপদে রাস্তায় নেমে এলেন।

রাত্রে যখন রেখাকে এই টাকা দিলেন, রেখা সমস্ত টাকাগুলো মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে ফেটে পড়লেন, 'এই টাকায় দু' মাসের গাড়ী ভাড়া হবে? তোমার ছেলের বোর্ডিং-এর খরচ, কাপড়ের দোকানের ধার মিটবে?'

নিজেকে অসহায়ের মত মনে হল সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ শিল্পী তথা লেখক ইন্দ্র রায়ের। আর কি করতে পারেন তিনি? তিনি কি নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারেন?

প্রত্যেক মানুষেরই নাকি একটা দাম থাকে। তার জীবনের দাম কত? কিন্তু তার নীরবতাকে ছিন্নভিন্ন করে রুষ্ট এবং মরীয়া রেখা বললেন, 'আমি এভাবে আর থাকতে পারব না। তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। তুমি নিজের পথ দেখে নিতে পার, আমাকে আমার পথ চিনে নিতে দাও।'

ইন্দ্র রায় এই অকারণ বিস্ফোরণ আর সহ্য করতে পারছিলেন না। সংসারে অভাব ছিল এতকাল, দারিদ্র্যও ছিল, কিন্তু চাকরীতে ঢোকার পর দু-তিন বছরের মধ্যেই রেখা ভীষণ বদলে গেছে সাজপোশাকে, আড়ম্বরে, বন্ধু-বান্ধবদের আদর-আপ্যায়নে। এসব না করলে, তার নাকি মান-সম্মান থাকে না।

ভোরবেলা রেখা খুব ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, 'আমি আজই চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'তা তোমার জানার দরকার নেই। ছেলে আছে বোর্ডিংএ। তার মা-ও কোন বোর্ডিং খুঁজে নেবে।'

সত্যিই সেদিন রেখা চলে গেলেন। কোন দৃশ্যের অবতারণা করে নয়, কোন রাগ বা ক্ষোভ তার চোখেমুখে ছিল না। যেন এমনভাবে চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। একসঙ্গে এতদিন থাকাটাই ছিল আশ্চর্যের। উদ্‌ভ্রান্তের মত কয়েক দিন ঘুরে বেড়ালেন

ইন্দ্র রায়। কোন রমণীকে বেঁধে রাখার ক্ষমতা তার নেই, সম্ভবতঃ আকর্ষণ করারও শক্তি তার ছিল না।—এই কথা তিনি নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। দিন-দশেক পরে, একদিন গভীর রাত্রে তিনি তার ডায়েরী নিয়ে বসলেন।

'...সেদিন ছিল আমার জীবনের স্মরণীয় দিন। আজ, বোধহয় আমার জীবনের স্মরণীয়তম দিন।

আজ সকাল থেকেই মেঘে মেঘে আকাশ হয়েছিল কালো। সূর্যের আলো ভোরের দিকে একবার দেখা দিয়েছিল মাত্র। একটা অসমাপ্ত গল্প শেষ করবার চেষ্টা করছিলাম। গল্পটা শেষ হল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে অপূর্ণতার রেশ রয়ে গেল।

দুপুরবেলা রাস্তায় বেরোলাম। সারা সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ার ফলে রাস্তায় বেশ জল জমে ছিল। সেই জল ঠেলে কিছুটা বিপর্যস্ত অবস্থায় অশ্রু সেনের বাড়ীতে পেঁৗছলাম। কেন গেলাম ঠিক জানি না।

দরজা খুলে আমাকে দেখে তিনি অবাক হলেন, বললেন, 'আপনার ছাত্রী তো নেই আজ। তাছাড়া আপনার বোধহয় একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'তাহলে আমি চলি।'

'না না, সে কি কথা! এসেছেন যখন একটু বসুন না।'

আমি বসলাম। উনি কিছুক্ষণ পরে দু-কাপ কফি নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'বলুন, কেমন গল্প লিখছেন।'

আমি বললাম, আমার গল্পের কথা বাদ দিন—আপনার কথা বলুন। আপনার নিজের গল্প বলুন।'

'আমার গল্প তো পড়েছেন, নাকি পড়েননি এতদিন।'

আমি কফির কাপ শূন্য করে বললাম, 'সে গল্প তো আসল-নকলে মেশানো। আমি রক্ত-মাংসের গল্প শুনতে চাই।'

কয়েক মুহূর্ত উনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সেই অদ্ভুত মাদকতাময় সম্মোহনে, আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল।

হঠাৎ তাঁর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে উঠে ক্রমশ উদাস হয়ে উঠল. তিনি উঠে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'আপনাকে একটা গল্পের প্লট দিচ্ছি, গল্প হলেও তা সত্যি। লেখিকা হবার কোন বাসনা আমার ছিল না। আমি গান শিখতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হয়ে উঠল না বলে আমি যার প্রেমে পড়ে, শেষে তাকে বিয়ে করলাম, তার অন্যতম গুণপনা ছিল গান, এবং তা শোনার মত গান। বিয়ের পর আমি চোখ বুজে তার গান শুনে ধ্যানস্থ হতাম, নতুন করে গানকে শিল্প হিসেবে ভালোবাসতে শিখলাম। কিন্তু গান ছিল তার শখের সামগ্রী—পড়াশোনাই ছিল ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের আবেগে আমি তার সেই ধ্যানের কথা গ্রাহ্য করিনি। গানকেই ধ্রুব বলে ভেবেছিলাম। জেনে শুনেও ভুল ভাঙাতে আমার অনেক দেরী হয়েছিল। মাঝে মাঝে নিজেই বেসুরো গলায় গান গাইতে গিয়ে তার কাছে ধরা পড়তেম, তিনি হাসতেন, বলতেন—ভালো করে গান শেখোনা কেন? আমি যখন বলতাম, আমি তার কাছেই শিখতে চাই, তখন তিনি বিরক্তি চেপে বলতেন, আমার সময় কোথায়, দেখছো তো রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত আছি।

আমি সেদিন থেকে বইয়ের জগতে ডুব দিলাম, হয়তো অচেতন মনে তাকে তুষ্ট করতে জ্ঞানের নির্বিন্ধ সীমানায় পা বাড়াতে শুরু করলাম।

কিন্তু তিনি দেখেও দেখলেন না। তার রিসার্চ শেষ হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী পেলেন বিজ্ঞানে। শুনলাম, আরো গবেষণার জন্য দিল্লীতে চলে যাবেন—তার সঙ্গে প্রায়ই একটি মেয়েকে দেখতাম, শুনতাম সে ছিল রিসার্চ এসিস্টান্ট। সম্ভবত তার জীবনে আমার অ্যাসিস্টান্স তখন ফুরিয়েছে। এখন ভাবি, তখন কি আমার মধ্যে ঈর্ষা ছিল? হয়তো ছিল, কে জানে!'

এই পর্যন্ত বলে অশ্রু সেন থামলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যাচ্ছিলাম,—বললাম, 'তারপর?'

তিনি হাসলেন খুব ম্লানভাবে, তারপর শুরু করলেন, 'তখন আমার মেয়ের চার-পাঁচ বছর বয়েস হয়েছে। একটা প্রহেলিকার মত সমস্ত কিছু লাগছিল। মনে মনে ওই তরুণী মেয়েটির সঙ্গে আমার স্বামীর কথাবার্তা, আচরণ, স্নিগ্ধ ও নরম ব্যবহার লক্ষ্য করতাম। বিশ্লেষণ করতাম। সেই হল আমার নিয়তি, মানে লেখকজীবনের পরিণতির দিকে যাবার শুরু।

আমি ওদের নিয়ে লিখতে লিখতে চারপাশের মানুষদের নিয়েও লিখতে শুরু করলাম। আমার এ কাজ স্বামী হয়তো তেমন পছন্দ করেন নি—কিন্তু নামী ও দামী পত্রিকায় একদিন আমার লেখা ছাপা হল। সে লেখা পড়ে ও'র ধারণা হল, দাম্পত্য-জীবনের জটিলতা আমি হাটের মাঝখানে নিয়ে গেছি। আমার তখন উঠতি লেখকের অসহিষ্ণুতা। আমি বাঁকা হাসি হেসে ওর কথাকে এড়িয়ে গেলাম। উনি ভিতরে ভিতরে কঠিন হলেন। দিল্লীতে চলে গেলেন গবেষণার সেই সহকারিণীকে নিয়ে। সেখান থেকে কানাডায়। কাল চিঠি এসেছে, উনি আর ফিরবেন না।'

অশ্রু সেন থামলেন। আমি সেই প্রথম দেখলাম অশ্রু সেনের চোখে অশ্রু। আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমার কি কথা বলা উচিত।

তখন বৃষ্টিধোয়া বিকেলের ম্লান আলো আকাশ থেকে নেমে এসেছে দূরের স্কাই-স্ক্রেপারের মাথায়। উনি তখনো জানলার ধারেই দাঁড়িয়ে, মাথাটা ঈষৎ নোয়ানো, ওষ্ঠাধর কিছুটা স্ফুরিত। মুখশ্রীতে যে লাবণ্য আমার চোখে পড়ল, তা যেন বড় বেশী আর্ত ও অসহায় বলে মনে হল।

আমি ওর পাশাপাশি এসে দাঁড়ালাম খুব ঘনিষ্ঠ ভঙ্গীতে। ওর মুখশ্রী তুলে ধরে দেখলাম সমস্ত মুখ জলে ভরা। সেই মুহূর্তে আমার আত্মবিস্মৃতি ঘটল। আমি অশ্রুকে বুকে টেনে নিলাম, ওর ওষ্ঠাধরে কপোলে কপালে মাথার চুলে অবিশ্রান্ত চুম্বন করলাম। কিছুটা নির্লিপ্ত নিবেদনে অশ্রু সেন নিশ্চল হয়ে রইলেন, কিন্তু আলিঙ্গনের ঘনিষ্ঠতায় তিনি নিজেকে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলেন, তারপর জানলা থেকে সরে এসে চেয়ারে বসলেন। আমি কিছুটা নির্বোধের মত তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। অনন্ত মুহূর্তের মত কয়েকটা সময়ের একক কেটে গেল—ঘরের মধ্যে আলো-ছায়ার দ্বৈত পরিবেশ ক্রমশ ভারী হয়ে উঠল।

আমি মার্জনার ভঙ্গীতে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু উনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিজের জীবনে অকারণে নাটক করবেন না, কোন শিল্পীর পক্ষে ওটা গৌরবের নয়—বাহাদুরীর ব্যাপার হতে পারে। আমরা কেউই আমাদের জীবন-এর ব্যর্থতা জৈব অনুভবে ভরাতে পারব না। ওটা অল্প বয়সের উত্তেজনা মাত্র। আমরা সে বয়স পেরিয়ে এসেছি।'

আমি পায়ে পায়ে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। তিনি একটু চকিত হয়ে উঠে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে, আমার একটা হাত চেপে ধরলেন। কণ্ঠে তার মিনতি ছিল, আমাকে বললেন, 'আমার মত সামান্য রমণীর জন্য আপনার শিল্পের রমণীয়তাকে বিসর্জন দেবেন না। আপনি শিল্পী—বিশেষ মুহূর্তের ভালোলাগাকে নির্বিশেষ চিরকালীন রূপ দেওয়াই তো আপনার সাধনা।'

আমি বিচলিত হলাম তার করস্পর্শে নয়, তার আন্তরিকতায়। সেই মুহূর্তে তার সুন্দর কথার সজ্জায় আমি ভুলে ছিলাম—আজ রাত্রে, এখন আমি বুঝতে পারছি, তার চোখের জাদুতে সেই সম্মোহন ছিল, যার মাদকতায় আত্মদানে উন্মুখ রমণী তার নিরাবরণ আদিমতাকে প্রকাশ করে। আমি নির্বোধ পুরুষ, বুঝিনি। তিনি তো দেহ-বিনিময়ের সেই দুর্লভ মুহূর্ত সৃষ্টি করেছিলেন, আমি তার ছন্দ-পতন ঘটিয়ে চলে এসেছিলাম।

ঘরে ফিরে ঠিক সন্ধ্যেবেলায় লেটার বকসে একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটা রেখার। সে জানিয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য সে কোর্টের শরণাপন্ন হচ্ছে—আমি যেন তাকে সহযোগিতা করি।

আমাদের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম বোধহয়, আমার স্ত্রী সহযোগিতা চেয়ে আমাকে ধন্য করেছে।...'

ডায়েরী লেখা শেষ করে ইন্দ্র রায় যখন ক্লান্তিতে চেয়ারে হেলান দিলেন তখন ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রসন্নতা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে।

জয়া

চণ্ডী মণ্ডল

আজ মণিদীপার সঙ্গে দেখা হল।

আমি যে তাকে দেখেছি দেখাতে চাই নি। সেও হয়তো তাই চেয়েছিল, দেখাতে চায়নি যে আমাকে দেখেছে। কিন্তু কেন কে জানে আমরা কেউই চোখ ফেরাতে পারলাম না। দুজনেই একটু করে এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

মণিদীপা বলল—কেমন আছেন—। আমি শুনলাম, সে যেন বলল, সেই অসুখটা এখন কেমন।

আমি কী বলব। শুধু দেখেছি। সে

কটি সন্তানের জননী হয়েছে, তার কত বেশী সুখ—সেসব কিছুই দেখিনি, তাকেই দেখেছি। সেই মণিদীপা।

কত বছর পরে দেখা। দশ বছর-বারো বছর—। তাকে শেষবার দেখেছি কবে। তারপর এই দেখা। ব্যবধান কত দিনের—শৈশব থেকে যৌবনের, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের—এক জন্ম থেকে আর এক জন্মের।

আমি অনুভব করলাম আমার বুকের মধ্যে একজনের হাহাকার। তবে আজ আর কোন ভয়ের কারণ নেই। অনেক অভিজ্ঞতা সে পেরিয়ে এসেছে। অনেক অভাব তার পূর্ণ হয়ে গেছে। শরীরটা যদিও সেই রোগাই রয়ে গেছে, ভেতরটা রুগ্ন।

আমার নিজের মনে পড়ে না, মায়ের কাছে অনেকবার শুনেছি, ছোটবেলায়, তখন আমার ছ' বছর বয়েস সেই সময় আমার এক জটিল অসুখ হয়। তিন, চার জ্বর উঠত। বারবার ঠাণ্ডা জলে আমার মাথা ধুইয়ে দিতে হত, তাছাড়া সব সময় কপালে জলপটি দিয়ে রাখতে হত। দিনের মধ্যে অনেকবার আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম। নাড়ির গতি খুব ক্ষীণ হয়ে যেত, শরীর হঠাৎ ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করত। বাড়ীতে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যেত। সেই অবস্থা এক সময় কেটে যেত। জ্ঞান ফিরে আসত, আমি চোখ মেলে চাইতাম, ঠোঁট দুটো শুধু নড়ত। কিছু ধরার জন্যে হাত বাড়াতাম, হাতটা ভীষণ কাঁপত।

আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে কলকাতা। এক ক্রোশ পথ হেঁটে খেয়াঘাটে পৌঁছে নদী পার হয়ে গঞ্জের রেল স্টেশন। এক নদী বিশ ক্রোশ। নটার গাড়ী ছেড়ে গেলে সেই দুপুর বারোটার গাড়ী—সন্ধ্যের মুখে কলকাতা। কলকাতার পাশ-করা ডাক্তার তখন কোথায় গ্রামে। গ্রামের কবিরাজের জলপড়া—ভোরবেলা উঠে কচু-পাতায় করে পুকুরের জল নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হত কবিরাজের বাড়ীর উঠোনে, কবিরাজ সেই জল হাতে নিয়ে ফুঁ দিতে দিতে মন্ত্র পড়ত। আর ছিল গ্রামের পাঠ-শালার পণ্ডিত মশায়ের মকরধ্বজ, তুলসী-পাতার রসে মেড়ে খেতে হত, তাতেই সাধারণ জ্বরজারি সেরে যেত। বেশী দিনের জ্বর, বাড়াবাড়ি অসুখ-বিসুখের জন্যে ছিল মধুপুরের হাটের ক্ষ্যামানন্দ ডাক্তার। তাঁর টালির চাল ইঁটের দেয়াল বড় ডিসপেনসারি। দু আলমারি বোঝাই ওষুধ। একজন কম্পাউণ্ডারও ছিল। সারা অঞ্চলে ক্ষ্যামা-নন্দ ডাক্তারের খ্যাতি ছিল খুব। লোকে বলত ধন্বন্তরি। হাটে গিয়ে রোগী দেখাতে ফী লাগত আট আনা। তারপর যেমন অসুখ তার তেমন ওষুধ, তার তেমন দাম। ডাক্তারকে বাড়ীতে ডাকলে ভিজিট লাগত দু'টাকা থেকে চার টাকা পর্যন্ত। যাদের অবস্থা একটু ভালো তারাই ক্ষ্যামানন্দ ডাক্তারকে বাড়ীতে ডাকতে পারত। অসুখ যদি দশ দিনের মধ্যে না সারত আর রোগী যদি বিছানা ছেড়ে উঠতে না পারত তবেই মধুপুরের ক্ষ্যামানন্দ ডাক্তারকে লোকে ডাকত। সেই ডাক্তার আমার ছোটবেলার সেই অসুখ সারিয়েছিলেন। ডাক্তারবাবুকে আমার মনে আছে, অসুখের আগে তাঁকে দু-একবার দেখেছি, পরে অনেকবার দেখেছি। অসুখ থেকে সেরে ওঠার পরে ছ' মাস কী এক বছর কী দু'বছর তার পরেও, আজ থেকে বারো বছর আগে গ্রাম ছেড়ে চলে আসার আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে অনেকবার পথে দেখা হয়েছে, তিনি কোথাও রোগী দেখতে যাচ্ছেন বা রোগী দেখে ফিরছেন, এক হাতে ওষুধের ব্যাগ আর এক হাতে ছাতা, খুব জোরে হাঁটছেন। আমাকে দেখেই দাঁড়াতেন। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখতেন। তারপর প্রত্যেকবারই একটা কথা বলতেন—কীরে এখন কেমন আছিস? [illegible] [illegible]

আগে আমি কোন বাড়াবাড়ি অসুখ থেকে উঠেছি। ডাক্তারবাবু মনে হয় সেই ছোটবেলার আমার অসুখটার কথা মনে করেই বলতেন। আমার কিন্তু কোন স্মৃতিই ছিল না সেই অসুখের। একটা মাস প্রায় সব সময় আমি অজ্ঞান হয়ে থাকতাম, যখন জ্ঞান ফিরত সেও এক জটিল ঘোরের অবস্থা—সেই অসুখের কিছুই স্মরণ করতে পারি না, পরে মায়ের মুখে শুনে কিছুটা কল্পনা করতে পারি। আমার শৈশবের অসুখের কোন স্মৃতি আমার নেই।

স্মৃতি না রাখলেও সেই অসুখ কিন্তু আমাকে নিষ্কৃতি দেয় নি।

আমি তো নিজেকে নিজের চোখে দেখিনি—তখন কতটুকু বা আমার চোখ ফুটেছিল, কিছু আমার মায়ের মুখে শুনেছি, অনেক আত্মীয়ের মুখে কিছু কিছু শুনেছি, ছোটবেলায় আমার নাকি খুব সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল। ছোটবেলার সুন্দর স্বাস্থ্য বলতে যা বোঝায়—হৃষ্টপুষ্ট সবল, তাই-ই ছিলাম আমি। আর খুব দুরন্ত ছিলাম নাকি। সেই অসুখটার পরেই আমার শরীর ভেঙে গেল- আমি খুব রোগা রুগ্ন হয়ে গেলাম। আমার আগের সেই দুরন্ত স্বভাব কোথায় গেল, দেখা গেল আমি অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেছি। সকলেরই চোখে পড়ল আমার চোখে মুখে একটা বিষাদের ছায়া ঘনিয়েছে। সবাই ভেবেছিল ওটা আমি একটু বড় হলেই মিলিয়ে যাবে। কিন্তু গেল না। যত দিন যেতে লাগল আমার বিষণ্ণতা বাড়তেই থাকল। কৈশোরে দেখা গেল আমি তেমনিই বিষাদগ্রস্ত রুগ্ন। আমি কেন এত রোগা আত্মীয়দের কাছে এই অভিযোগ আমি চিরদিন শুনে এসেছি। কোন উত্তর দিতে পারিনি। আমি তো জানি আমার রুগ্নতা ঘোচানো আমার অসাধ্য, আমার মনের বিষাদ মোচন করা আমার সাধ্যের অতীত। আমার দুর্বলতা আমার বিষণ্ণতা আমার গভীরে সহস্র শিকড়ে আমার রক্তে ছড়িয়ে আছে। কাউকে বলতে পারি না [illegible] আমার খুব মনে হত—সেই যে [illegible] তখন আমি সবে জাগতে [illegible] তাকিয়ে চোখ মেলিনি চারপাশে আধো আলো আধো অন্ধকার, আমাকে ঘিরে একটা গভীর মায়া- সেই ভোরে এসে [illegible] আমাকে ছেনে কে আমাকে অন্য রকম করে দিয়ে গেছে। আমি এক রকম ফুটে উঠতে উঠতে অন্য একরকম হয়ে গেছি। আমি কি রকম হতে পারতাম সে সম্পর্কে কোন ধারণা আমার নেই। এই যে আমি, রুগ্ন, বাইরে যতটা দুর্বল ভেতরে তারো বেশী দুর্বল নির্জনতা ভালোবাসি, মানুষের ভীড় সহ্য করতে পারি না—অনেকের মাঝখানেও একা [illegible] থাকি নিজের মনে [illegible] নিজেকে লুকিয়ে রাখি—চিরকাল এই আমি। আমি এই রকমভাবে বেঁচে আছি। [illegible] কোন রকম উত্তেজনা [illegible] নিজেকে পাথর [illegible] আমি সহ্য করতে পারি না, জীবনের উদ্দাম আনন্দ কী জিনিস আমি জানি না, জানার আমার কোন আগ্রহ নেই, জগতের খুব কম বিষয়ে আমার আগ্রহ, আমার কৌতূহল খুবই সীমিত। জীবনের বিশাল ব্যাপ্তিতে আমার বিশ্বাস নেই। খুব ছোট পরিসরে, শান্ত আর সরল জীবন আমি ভালোবাসি। আমার দুর্বলতা, অক্ষমতা সবই আমি জানি। আমার মধ্যে যে অক্ষম অসহায় মানুষটা আছে তার ওপর আমার গভীর মমতা। তার সব দোষ ত্রুটি মেনে নিয়ে তার ইচ্ছে অনিচ্ছার সঙ্গে একমত হয়ে আমি নিজের মতো করে বেঁচে আছি। সাধারণত বাইরের কোন দৃশ্য বা ঘটনার দিকে চোখ ফেরাই না, যদি কখনো বাইরে তাকাই তখন আসলে নিজের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি। বাইরের কোন সামান্য ঘটনা আমার মধ্যে অসামান্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, একটু উত্তেজনার কারণে আমি অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে পড়ি। সাধারণ সুখের বা দুঃখের কারণে আমি গভীর ভাবে আন্দোলিত হই। একটু আনন্দেই আমি আবেগের খরস্রোতে ভেসে যাই। নিজের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যাই। সব সময় আমার মধ্যে ভেসে যাওয়ার ভয়। মনে হয় আমার পায়ের নীচে পথের ওপর একটা চোরা স্রোত বহে যাচ্ছে। একবার অনেক দূরে চলে গেলে সেখান থেকে আবার নিজেকে ফিরিয়ে আনতে নিজেকে ফিরে পেতে আমাকে অনেক কষ্টের পথ পেরোতে হয়। কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না। তাই আমার কষ্ট প্রতি পদক্ষেপে। খুব বেশী স্পর্শকাতর আমি। যেখানে আমার স্নেহভালোবাসা সহানুভূতি পাওয়ার কথা, পেতে চাই, যদি না পাই বা অনেক পেয়েও যদি তৃপ্তি না পাই, মনে হয় যদি যে কিছুই পাইনি, তবে অকারণ অভিমানে আমার বুক ভেঙে যায়। আবার এমনও হয়, সামান্য স্নেহে ভালোবাসায় গভীর আনন্দে আমার হৃদয় ভরে যায়।

আমার যে বন্ধু সে আবার কারো বন্ধু হবে এ কথা আমি ভাবতে পারি না। যদি সত্যি তেমন কোন ঘটনা ঘটে তবে তার কষ্ট সবটুকু আমাকেই পেতে হয়। কোনদিনই আমার বেশী বন্ধু নেই। আমার বয়েসী ছেলেদের বরাবরই আমি এড়িয়ে চলি। ছেলেদের আমি ঠিক সহ্য করতে পারি না। তাদের বন্ধু বলে ভাবতে পারি না— তারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। আরো অনেক কারণে ছেলেদের আমার পছন্দ নয়। তাদের রাগ, রুক্ষতা, কঠোরতা, তাদের প্রখর পুরুষালি আচরণ কোনদিনই আমার ভালোলাগে না। কোমলতা, স্নিগ্ধতা, মাধুর্য্য, মায়া, মমতা আমাকে অনেক বেশী টানে। মেয়েরাই আমাকে মুগ্ধ করে। কৈশোর থেকেই কোন সুন্দরী মেয়েকে আমি সুন্দর বলে চিনতে পারি। মেয়েদের সৌন্দর্যের ওপর কৈশোরের শুরু থেকেই আমার দুর্বলতা।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই আমি কোন সুন্দরী মেয়ের কাছে গিয়ে তার ঘনিষ্ঠ হতে পারি না। সাধারণ আলাপ করতেও নিজেকে যতটুকু সক্রিয় হতে হয় তা হতেও কীসের বাধা আছে আমার মধ্যে। ছোটবেলা থেকেই আমার বয়েসী ছেলেদের বন্ধুত্বের চেয়ে মেয়েদের সান্নিধ্য আমি মনে প্রাণে কামনা করেছি। কৈশোর কেটে গেছে বৃথা, সে আশা আমার মেটে নি। আমার ব্যর্থতার পথে আমি নিজেই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি বার বার। কী বিষম লজ্জা, দারুণ এক সঙ্কোচ আমার। আমি চিরকাল মুখচোরা। মনের কথা মুখফুটে বলতে পারি না মরে গেলেও। কোন কোন কষ্ট আছে বোধ হয় মৃত্যুর চেয়ে কষ্টকর, সেই কষ্ট আমাকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে।

এমনি আমি অভিমানী, নিজের অক্ষমতার ওপর আমার এত মমতা যে সুন্দরের ওপরেই আমার অভিমান হয়। ভাবি, সংসারে আমাকে ঘিরে এক চক্রান্ত চলছে। সুন্দর আমাকে অবহেলা করে, আমার চারপাশে এত সুন্দরী মেয়ে আছে সকলেই আমাকে অবজ্ঞা করে। আমি যেমন চাই তেমন ভাবে কেউই আমার আপন হয় না। সকলেই অন্যের আর কারো, আমার নয় কেউ। না হলে কেন কেউ একটু বেশী মনোযোগ দেয় না আমার প্রতি, আমার মনের কথা জানতে, আমার সংকোচ মোচন করতে কেউ কেন নিজের থেকে সক্রিয় হয় না।

আমার কৈশোরের পৃথিবীর সুন্দরী কিশোরীরা তাদের উদাসীনতা দিয়ে আমাকে যে অপরিসীম দুঃখ দিয়েছে তারা তা কিছুই জানে না। আমার সমস্ত দুঃখের সাক্ষী ছিল অঘ্রাণের শূন্য মাঠ, নির্জন মাঠ, নদীর পাড়, সন্ধ্যার দু-একটা তারা-ফোটা আকাশ, ঘরে ফেরার পথ—নিঃসঙ্গ কোন গাছ, একটা দলছুট শালিখ।

কৈশোরের দিন শেষ হয়ে যায়। আমার মধ্যে যা ছিল অঙ্কুর, সংকোচে এতদিন আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি, দু-একটা পাপড়ি কেবল মেলেছে, তীব্র ব্যাকুলতায় নিষ্ফল দিন কাটিয়েছে—যৌবনের প্রথম ফাল্গুনেই আত্মপ্রকাশের আগুন আকাঙ্খায় তার জন্মান্তর ঘটে যায়।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করে সে কলকাতায় পাড়ি দেয়।

সেদিন সন্ধ্যারাতে সে প্রথম দেখল কলকাতার মুখ।

অজানা অচেনা মহানগরীর মাঝখানে সেই তরুণ আরো একা হয়ে যায়। কিন্তু হাজার জিজ্ঞাসা তাকে অস্থির করে তোলে। দু" দণ্ড কোথাও সে স্থির থাকতে পারে না। এক নবীন নির্ঝর যেন, এক দুরন্ত টানে অবিরাম ছুটে চলে। উত্তেজনার আগুনে অহরহ দগ্ধ হয়, শরীরের দিকে ফিরেও তাকায় না। রাতের ঘুম নেই, তার ক্লান্তি নেই—সুখ নেই শান্তি নেই, এক অন্ধ উন্মাদনায় ছুটে বেড়ায়। ইট কাঠ পাথরের মধ্যে রসের নাগাল পায়। সেই রস সে আকণ্ঠ পান করে আশ্চর্য আনন্দে টৈটম্বুর হয়ে যায়। তার চোখের মধ্যে যে

চোখ সেই চোখে সে দেখে কলকাতার রূপ। কলকাতার সমস্ত রূপের, রহস্যের, সৌন্দর্যের নির্যাস দেখে নারীদের মুখে।
নারীর শরীর দেখার সময় হয়নি তখনো—নারীর মুখে সে দেখে সম্পূর্ণ নারীকে।

একটা সস্তা মেসে তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। একটা ছোট তক্তপোষ সে পেয়েছে নিজের, তার ওপর তার বিছানা, বইপত্র, জীবনযাপনের যাবতীয় টুকিটাকি—তার সকাল সন্ধ্যের পড়াশোনা, রাতের ঘুম। ঘুমুতে ইচ্ছা করে না একটুও. স্বেচ্ছায় সে ঘুমোয় না, ঘুমও আসে না—রাতভোর সে পড়াশোনা করে বা পড়াশোনার কথা ভাবে তা নয়, অনেক সময় সে জানে না কী ভাবে। তার শুধু ভাবতে ইচ্ছা করে—সে অবলায় স্রোতে ভেসে চলে। মেসের চার দেয়ালে আটক থাকতে তার খুব কষ্ট। বিকেলের পর সন্ধ্যে হয়, সন্ধ্যের পর রাত্রি আসে, রাত গভীর হয়—এসব তার মোটেই মনঃপূত নয়। রাতে এক সময় তাকে বাসায় ফিরতেই হয়—বাসা তো বন্দীর! বিকেল সাড়ে চারটের ক্লাস শেষ হওয়ার পর সে পথে নামে, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়—সমস্ত সময় পথেই থাকতে চায়। তার দেখার তৃষ্ণা অনন্ত।

কিছুদিন পর তার ইচ্ছাটা আর এক রূপ নেয়। সারাক্ষণ বাইরেই থাকতে সে চায়, তবে পথে পথে আর নয়, সমস্ত সময় সে কলেজেই থাকতে চায়। দশটা থেকে সাড়ে চারটে শুধু এই সময়টুকুর জন্যে কলেজে থাকে এটা সে চায় না। তার মন চায় কলেজের ক্লাস শুরু হবে কিন্তু কখনোই আর শেষ হবে না একটার পর একটা ক্লাস চলবে, চলতেই থাকবে—। বা একটাই ক্লাস, ক্লাসটা শুরু হবে, শেষ হবে না—চলতেই থাকবে—। সেটা একটা অনার্সের ক্লাস। তার বারোটি ছেলের মধ্যে একজন সে। এক সময় বারোজনের এগারজন থাকবে অথচ থাকবে না—এগারজন অলীক হয়ে যাবে. শুধু সে থাকবে। একা তাকেই চোখে পড়বে। ঠিক এই রকম ভাবেই সাতটি মেয়ের মধ্যে একজন শুধু থাকবে।
যে ভাবেই হোক ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত সেই রকমই হয়। প্রত্যেকটা ক্লাসে সে এবং আর একজন শুধু থাকে। সেই একজনের দিকে চেয়ে. তারই কথা ভাবতে ভাবতে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটে।

একটা দিনের পর আর একটা দিন। দিনের পর দিন। দশটা থেকে সাড়ে চারটে। দশটা থেকে সাড়ে চারটে। সাড়ে চারটের পর থেকে দশটার আগে পর্যন্ত সময় সে যখন তার চোখের সামনে থাকে না তখনো সে তাকেই দেখে তারই কথা ভাবে। যখন সে তার দিকে চেয়ে থাকে না তখনো আসলে তার দিকেই সে চেয়ে থাকে। যখন সে তার কথা ভাবে না তখনো আসলে তার কথাই সে ভাবে। এইভাবে তিনটে মাস কাটে। তাকে বাইরে থেকে দেখলে কেউ বুঝতে পারে না, সে নিজেও কতটা বুঝতে পেরে-ছিল কে জানে; তার ভিতরে একটা বিস্ফোরণের প্রস্তুতি চলেছে, ধীর পায়ে, নিখুঁত সুন্দর লয়ে।

একুশ বছরে সে কিছু কম সুন্দর মুখ দেখে নি। সুন্দরের প্রতি তার টান একেবারে শুরু থেকেই। সুন্দর দেখলেই সে বিচলিত হয়। কাজের কথা ভুলে গিয়ে পথের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে যায়। একবার দেখে দেখার সাধ মেটে না. ফিরে ফিরে দেখে। বার বার ফিরে ফিরে আসে সেই আগের দেখা সুন্দরের কাছে। দেখেছে কয়েকবার দেখার পর সেই অত্যন্ত সুন্দর অতি সাধারণ হয়ে যায়।

এই প্রথম তার অন্য অভিজ্ঞতা হল। মণিদীপাকে যতবার দেখে প্রতিবারই তাকে সুন্দরতর দেখায়। তাকে যতই দেখে তাকে দেখার বাসনা ততোই বাড়ে। সে তেমন সাবধানী নয়, হয় সে ধরা পড়ে যেতে পারে যে কোন সময়। মণিদীপা এখনই জেনে যায় সে তা চায় না। তার মধ্যে অনেক সংশয়। মণিদীপার যদি ভালো না লাগে ঘটনাটা। কে বলতে পারে; সে ততো বোকা নয়, কিছু কিছু জিনিস বুঝতে পারে, জানে যে মণিদীপার মতো মেয়ের ইচ্ছায় যে কোন অসম্ভব সম্ভব হয়। মণিদীপা যদি চায় তবে মরুভূমি ইডেন হয়ে যাবে। মণিদীপার মতো মেয়ের মহিমা জানার পর তার মুখের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া তার আর কীই বা করার আছে।
আরো দুটো মাস কেটে যায়। গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলেছে। আবার দশটা সাড়ে চারটে ক্লাস শুরু হয়েছে। এই ক'মাসে ক্লাসের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেছে। গ্রীষ্মের ছুটির দু-একদিন আগে থেকেই দেখা গিয়েছিল অনেকেই অনেকের বাড়ীর ঠিকানা লিখে নিচ্ছে। ছুটির মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকের মধ্যে চিঠি বিনিময় হয়েছে, কারো কারো দেখাসাক্ষাৎও হয়ে থাকতে পারে। ছুটির পর থেকেই বিশেষ করে ব্যাপারটা চোখে পড়ছে যে অনেকেই, ছেলেরা মেয়েরা উভয়েরাই একজন আর একজনকে নাম ধরে ডাকে. তুমি, বেশীরভাগ সময়েই তুই সম্বোধন করে। ক্লাস শুরু হওয়ার আগে বা পরে ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি বসা, ঘনিষ্ঠ হয়ে গল্প করা এসব তো আগে থেকেই আছে আগের চেয়ে বেড়েছে। চোখে পড়ার মতো আর একটা জিনিস. দু-তিনটে দল কখন কেমন করে গড়ে উঠেছে। চারজনকে নিয়ে এক একটা দল। প্রত্যেক দলেই সমান সমান সংখ্যক ছেলে-মেয়ে। অফ পিরিয়ডে তারা দলে দলে বেরিয়ে যায়। পরের ক্লাসে একটা গোটা দলই হয়তো অনুপস্থিত। ধারে কাছে কোন রেস্টুরেন্টে বসে আড্ডা দেয় কখনো ম্যাটিনী শোয় সিনেমা দেখতেই চলে যায়। সেদিন সারাদিন তাদের দেখা পাওয়া যায় না। এদের পরস্পরের সম্পর্কটা সহজেই সে বুঝতে পারে। তার ঈর্ষা হয় এদের ওপর, কেমন করে এরা এত সহজভাবে মেলামেশা করতে পারে—সে কেন পারে না! তার খুব জানতে ইচ্ছা করে, কেমন করে এমন সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে একজনের সঙ্গে একজনের। যে কারো সঙ্গে যে কারো এমন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে? দিনের পর দিন পরস্পরের দেখা হলে, একটা জায়গায় সারা-দিনের প্রায় অর্ধেক সময় এক সঙ্গে কাটালেই এমন হয়—তা মোটেই নয় নিশ্চয়ই অন্য আর কোন কারণ আছে। নাহলে তার বেলায় অন্যরকম কেন হয়। তাকে সকলেই আপনি বলে—মেয়েরা তো বটেই। সেও সকলকে আপনিই বলে থাকে। কিন্তু অন্যেরা যদি তাকে তুমি বা তুই বলতে শুরু করে দিত, সে কি নিজেকে দূরে দূরে রাখত। ছেলেরা কেউ কেউ তাকে তুমি বলে, কথা বলে, আলাপের চেষ্টা করে। মেয়েরা কোন প্রসঙ্গে কখনো তার দিকে চেয়ে হাসেও না। যদি এমন হয় যে তাকে কেউ বিশেষ পছন্দ করে না—এটা সে মানতে রাজী নয়, তার বিশ্বাস যে পছন্দ হওয়ার মতো কিছু গুণ তার আছে। তবে একটা কথা, সে নিজের এই সমস্ত গুণ সম্পর্কে এত বেশী সচেতন কোনদিন এই কথাটা তার মনেই হয় না তার গুণগুলো বাইরে কতটা প্রকাশ পায় কতটা প্রকাশ পায় না—সে ভুলেও ভাবে না বাইরের মানুষের তাকে কতদূর চোখে পড়ে। তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণেই তো তার ভিতরে, তার গভীরে। সেও বিশ্বাস করে ভিতরের গুণেই তার প্রকৃত পরিচয়। বাইরে থেকে তার ভিতর কতদূর দেখা যায় এটা সে কখনো ভেবে দেখে নি। সে শুধু স্থির বিশ্বাসে জানে তার একটা বড় পরিচয় আছে, মহত্ত্বর একটা পরিচয়—সাধারণের মাঝখানে সে একজন অসাধারণ। কিন্তু তার সেই মহিমা চারপাশের মানুষের মনে কতটুকু দাগ কাটছে; নিজের মহিমার মায়ায় সে এমন আচ্ছন্ন, তার আচরণের সূক্ষ্মতা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যা-লোচনা করলেই তবে বোঝা যাবে যে প্রকৃতই স্বমহিমায় সে সব সময় প্রকাশিত। কিন্তু কে আর তেমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখছে! কজনেরই বা আছে চোখ!
এবং সাধারণ মানুষের ভাবনা চিন্তা চরিত্র সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তার নিজের বৈশিষ্ট্য হল যে খুব সাধারণ বিষয় সম্পর্কে সে উদাসীন। তার সঙ্গে সহজ-ভাবে মিশতে কেউই এগিয়ে আসে না সে স্বীকার করে এটা তার নিজেরই অক্ষমতা। এরই জন্যে সকলের কাছাকাছি থেকেও সকলের সঙ্গে তার দুস্তর দূরত্ব।
নিজের এই অক্ষমতায় সে অদ্ভুত এক আত্মপ্রসাদ পায়।

ঐএটা তো ঘটনা যে তার বয়েসী তরুণ তরুণীরা যেসব বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা তর্কবিতর্ক করে. বিষয়গুলো এমন হাস্যকররকম তুচ্ছ, তাদের আলোচনার ভঙ্গিটাও তেমনি লঘু—চোখ এবং কানের পক্ষে পীড়াদায়ক। তার তো নিজেরই লজ্জা করে। আলোচনায় অংশ নিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ অনুভব তো করেই না, আলোচনা তাকে স্পর্শও যাতে করতে না পারে তাই

[illegible] সে তাদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে। ফলে অনেকেই আড়ালে তাকে বলে অহংকারী।

সে কি অহংকারী—হতে পারে। না, ঠিক অহংকারী নয় সে। কিছুটা, কিছুটা নয়—অনেকটা অনেকখানি, খুব বেশী আত্মকেন্দ্রিক। সে জানে। এবং জানে এর জন্যে সে নিজে যতটা দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী তার চারপাশের পরিবেশ। যে গোটা পরিবেশটা দখল করে আছে তারা, যারা তাকে না জেনে না বুঝে অহংকারী বলে আর তাকে ক্রমেই দূরে আরো দূরে থাকতে বাধ্য করে।

তার এক এক সময় মনে হয় এটা একটা ষড়যন্ত্র—তাকে একা করে রাখবার একটা চক্রান্ত চলছে। এটা শুরু হয়েছে অনেকদিন আগেই। আগে রহস্যটা সে সম্পূর্ণ বোঝে নি, এখন পরিষ্কার বুঝতে পারে।

চক্রান্তটা কার—। যারই হোক, কিছু যায় আসে না। সে এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নেয়। সে যদি একা তবে অনন্য কেন নয়। কেন সে হবে না অনন্যসাধারণ। সে যখন কারো ঘনিষ্ঠ হতে পারে না, সে চেষ্টা করবে সকলের কাছে আরো অস্পষ্ট হতে। কেমন করে নিজের চারপাশে গাঢ় কুয়াশা রচনা করতে হয় সে ভালোই জানে। কোন বিষয়ে তার যতই কৌতূহল হোক, কিছুতেই সে মুখ ফুটে তা বলবে না—চোখমুখে তার কোন চিহ্নই সে ফোটাবে না। তার এই উদাসীনতাই সকলকে তার প্রতি অনেক বেশী কৌতূহলী করে তুলবে। সে সহজে ধরা দেবে না। খেলা যখন শুরু হয়েছে, খেলা চলবে।

খেলা তো তার আর কারো সঙ্গে নয়। মণিদীপা, এতদিনে তার প্রতি কতটা কৌতূহল জন্ম নিল মণিদীপার মনে। তার এত আয়োজন সবই তো তারই জন্যে, যার সঙ্গে আর কারো তুলনাই চলে না। আর সব মেয়েদের মতো সে কখনোই অকারণে হেসে ওঠে না, কখনো শব্দ করে হাসে না, উচ্চ কণ্ঠে কথা বলে না, কথা বলার সময় উচ্ছ্বাসে আত্মবিস্মৃত হয় না—কখনোই তার শাড়ির আঁচল বুক থেকে সরে যায় না। সুন্দর শাড়ি সে পরে শুধু তার শরীরকে সুন্দর করে সাজানোর জন্যে নয়। পোশাকে এবং প্রসাধনে সে সৌন্দর্য এবং নৈতিকতাকে সমান মূল্য দেয়। তার সৌন্দর্যে যে গাম্ভীর্য আছে তা জানে বলেই সে কখনো কোন লঘু আচরণ করে না। তাকে সে সাধারণের ভিড়ে মানায় না তাও সে জানে। ছলছুতোয় সে চমৎকারভাবে সকলকে এড়িয়ে চলে। তার আত্মমর্যাদাবোধ দেখে মুগ্ধ হবে না এমন কে আছে।

তাকে যা আশা করা গিয়েছিল সে ঠিক তাই-ই। তাতেই আমার সংশয় অনেকটা কেটে গেছে। সে আমাকে আত্মবিশ্বাস দান করেছে। নতুন অধ্যায় এবার শুরু করতে হবে—তার আয়োজন আমাকেই করতে হবে। আমি এতদিনে মণিদীপাকে পুরো বুঝেছি, এবার সময় হয়েছে আমার তাকে উপলব্ধি করার।

তাকে উপমার মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করব—কী দোষ উপমা তার। যে কোন উপমার চেয়ে সে তো অনেক বেশী সত্য।

সে তো আলোর মত, উজ্জ্বল আপন দীপ্তিতে। প্রদীপের শিখার মত তার দীপ্তি। যে শিখা আছে আড়ালে অদৃশ্য তারই দীপ্তি তার মুখে। সোনার প্রদীপ যদি হয় মণিদীপার মুখ, সেই দীপাধার, পিলসুজের কথাই মনে আসে। আমার শৈশবে, কৈশোরে পিলসুজ উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে আছে। পিলসুজের মতোই লম্বা, ঋজু, কঠিন—শরীরের প্রতিটি খাঁজ তীক্ষ্ণ স্পষ্ট। রক্তমাংসের শরীর যেন এক শিল্পের নিদর্শন। গভীর তার ব্যঞ্জনা। আর তার লাবণ্য। তার আলো আমার ভিতরকে আলোকিত করেছে। আমার মধ্যে অনেক জিজ্ঞাসার জন্ম হয়েছে।—কেন এই জীবন, কেন জন্ম—আমি কী উদ্দেশ্যে বেঁচে আছি। আমি জানতে শুরু করেছি—আমার ক্লান্তি আছে, উদ্বেগ আছে, সমস্যা আছে। এবং দারিদ্র্য-টাকা পয়সার অভাব। মাসের পয়লায় মেসের খরচ বাবদ টাকাটা, আর সারা মাসের আমার হাত খরচের কয়েকটা টাকা—সব মিলিয়ে শ' খানেকের মত টাকা। প্রথম চার পাঁচ মাস বাড়ী থেকে টাকা পাওয়া যাবে তারপর থেকে আমার কলকাতায় থাকার খরচ আমাকেই জোগাড় করতে হবে, এইরকমই কথা ছিল। এক বছর হতে চলল। একটা টিউশানী জোগাড় হয়েছে। আমার মেসের এক ভদ্রলোক তাঁর পরিচিত এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের বাড়ীতে মাসে পঞ্চাশ টাকার সংস্থান করে দিয়েছেন। ইংরাজী স্কুলে পড়ে খুব সুন্দর দেখতে এক বালককে সোম থেকে শনিবার ছ'দিন সন্ধ্যেয় দু ঘন্টা করে পড়াতে হয়। ছাত্রটি ভালো, আমাকে তার ভালোই লাগে মনে হয়, ক্লাস ফাইভে পড়ে—টিউশানীটা আগামী দু-তিনটে বছর থাকবে আশা করি। সকালে একটা টিউশানী পেয়ে গেলে আমার কোনরকমে চলে যাবে। আমার চাহিদা তো বেশী নয়, বিলাসিতাও কিছু নেই। শুধু টিকে থাকা, তার বেশী আপাতত আমি কিছু চাইছি না। আমি চেষ্টা করছি। আমি একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি বর্তমানে। আমার মধ্যে একটা গভীর উদ্বেগ। আশ্চর্য যে আমাকে দেখলে এখনো তেমন কিছু বোঝা যায় না। কেউ জানে না মণিদীপাও জানে না, সে আছে তাই আমি অনেক সময় আমার সমস্ত অনিশ্চয়তাও ভুলে থাকতে পারি। তার কথা মনে পড়লে আমার অনেক উদ্বেগ দূর হয়। সে আমার অলক্ষ্যে থেকেও অভাব উদ্বেগ, অনিশ্চয়তার মধ্যে আমার বাঁচার আশ্বাস। মণিদীপাও জানে না এইসব কথা।

অবশ্য আমার দারিদ্র্যের কথা আমি কাউকে বলি না। আমার দুর্বলতার কথা অন্যকে বলে কেন আমি অন্যের করুণার পাত্র হব। আমি চেষ্টা করি আমার অসম্পূর্ণতার কথা কেউ যাতে জানতে না পারে। আর যেই জানুক, মণিদীপা যেন না জানে। এটুকু আমার দুর্বলতা। অবশ্য একদিন মণিদীপা সবই জেনে যেতে পারে। সে যদি চায় তবে একদিন আমার ত্রুটি, দুর্বলতাগুলো কিছুই তার অজানা থাকবে না। আমার যে প্রধান দুর্বলতা দারিদ্র্য, তাতে আমার তো কোন দায়িত্ব নেই, কিছুটা আমার দুর্ভাগ্য বলা যায়। একদিন এই দুর্ভাগ্য আমি নিশ্চয়ই জয় করব। এখনই আমার পরিচয় তো পূর্ণ হয়নি। আমার আজকের অপূর্ণতাগুলো একদিন পূর্ণতা পেতেই পারে। তাছাড়া মানুষের দারিদ্র্য, অভাব-অনটন তার আসল পরিচয় নয়, অন্ততঃ আমার তো নয়ই। মণিদীপা এতদিনেও কি তা জানে না।

আমি তো জানি, দেখেছি, তাকে প্রথম দেখার পর থেকেই দেখছি, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কেমন করে মণিদীপার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভালোবাসার এটাই কি অলৌকিক শক্তি, অলক্ষ্যে, কাজ করে যায়। কখনোই আমার ইচ্ছার অবাধ্য হয় না মণিদীপা। সে কখনোই সাধারণ মেয়েদের মত স্থূল আচরণ করে না, লঘু আনন্দে, লঘু উচ্ছ্বাসে অসার আবেগে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। আমার এই-ই প্রার্থনা ছিল, মণিদীপা তার মহিমার কথা জানে যেন। তার মহিমান্বিত রূপের দাবি সম্বন্ধে সচেতন থাকে যেন। আমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই, মণিদীপা সম্পূর্ণ আত্মসচেতন।

তবু একটা দুশ্চিন্তা যায় না—তার দংশন ঠেকানো যায় না কিছুতেই। মণিদীপার চারদিকে চতুর নারীমাংসলোভীদের ভিড়, তাদের স্তুতি প্রলোভনে দৈবাৎ দুর্বল হয়ে যদি কোন ভুল করে মণিদীপা। একবার যদি ভুল করে, ভুলের মাশুল দিতে হবে তাকে সারাজীবন। ক্ষতি যা হয়ে যাবে তা পূরণ হবে না কোনদিন। আমারও তো অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। সেই অসীম ক্ষতির আগেই আমাকে একটা কিছু করতে হবে।

আমি কী করতে পারি—। কিছু একটা করতে হবে—যত তাড়াতাড়ি করা যায়। তাতে মণিদীপার মঙ্গল—আমার মঙ্গল। কিন্তু কেমন করে তাকে বলি। এক বছরের একশ'রও বেশি দিনের ক'দিন তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে—কথা তাও তো সাধারণ মৌখিক আলাপের বেশি কিছু নয়। সেই সূত্রে মণিদীপা কতটুকু জেনেছে আমাকে। হয়তো এটুকু জেনেছে যে, আমি ক্লাসের সকলের থেকে আলাদা। সে যখন আমার দিকে তাকায়, তার চোখ দেখে বুঝতে পারি অন্য সকলকে সে যে-চোখে দেখে, আমাকে তার চেয়ে অন্য চোখে দেখে। কিন্তু তার চোখের কথা কি তার মনের কথা। তার মনের কথা কতটুকু আমি জানি। যা জানি বলে জানি, তা সবই তো কল্পনায় জানা। আমার কল্পনার মণিদীপার সঙ্গে যদি প্রকৃত মণিদীপা না মেলে। একটা বড় রকমের ঝুঁকির মধ্যে যেতে হচ্ছে। একটা বিরাট অনিশ্চয়তার দিকে এগোতে হবে।

এত দূর এগিয়ে আমার আর পিছনে ফেরার উপায় নেই। ফেরার কোন ইচ্ছাও আমার নেই। একটা মরীয়াসা হয়ে থাক। আমি তাই চাই। দিনের পর দিন ভালোবেসে যাওয়ার এই গুরুত্ব আমাকে আবদ্ধ করে দিয়েছে। আমার শরীর ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মাত্র এক বছরে একজন তরুণ এমন কি বদলায় যে, এক বছর আগে তাকে প্রায়ই দেখত এমন একজন, এক বছর পরে সে তাকে দেখে চিনতে পারে না। তাকে দেখে অবাক হয়ে বলে—তুই এত রোগা হয়ে গেছিস—চেনা যায় না।

অনেকেরই আজকাল তাকে চিনতে অসুবিধা হয়। বলে—তোমার কি অসুখ?

তার অসুখ—সে তো জানে না। না, কোন অসুখ করেনি তার।

কিন্তু কেন তবে লোকে বলে কথাটা, আর কি কোন অসুখ করেছে। কথাটা শুনলে তার খুব রাগ হয়। কথাটা যে বলে তার ওপরও রাগ হয়। তার সঙ্গে তারপর সহজভাবে আর কথা বলতে পারে না।

লোকটা এক সময় চলে যায় কিন্তু তার জিজ্ঞাসাটা বিঁধিয়ে দিয়ে যায় তার মধ্যে। সে শুনতে পায়—তার কি অসুখ—তার কি অসুখ—কী অসুখ—। শুনতে শুনতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। চারপাশের সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে অসুখ— অসুখ— অসুখ—। চারদিকের সমস্ত দৃশ্য ছাপিয়ে যত অমঙ্গলের চিহ্ন—। সে খুব বিপন্ন বোধ করে। নিজেকে বোঝায়, প্রবোধ দেয়, কোন অসুখ করেনি। আমি এখনো মোটামুটি সুস্থ। উদ্বেগ যায় না। জিজ্ঞাসা মরে না—কী অসুখ।

সে জানে, বুঝতে পারে সে তেমন ভালো নেই। দিন দিন আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে—। খুব রোগা হয়ে গেছে। গালদুটো ভেঙে গেছে, হাতদুটো শীর্ণ, আঙুলগুলো সরু সরু হাড়। শরীরের এখানে-ওখানে হাড় ঠেলে উঠছে। সে টের পায়, একটু একটু করে সে কী রকম হয়ে যাচ্ছে। ক'দিন আগের ঘটনা মনে করতে পারে না। হঠাৎ হয়তো মনে পড়ে যায় কিন্তু ঘটনাটা কবে ঘটেছিল কিছুতেই মনে করতে পারে না। তার খুব চেনা কারো মুখ সে মনে করতে পারে না। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু কিছুতেই মুখটা মনে আসে না। এমনও হয় কারো মুখ মনে পড়ল, তার নাম মনে পড়ে না। একটা তীব্র অস্বস্তি, ক্রমে উদ্বেগ, ভয়। কী ভয়, কীসের ভয় জানে না, শুধু ভীষণ ভয় হয়। মাথাটা অসম্ভব ভারি মনে হয়, মনে হয় যেন অন্য কার মাথা। সে যেন অন্য কেউ।

রোজ রাতে তাকে ঘুমের বড়ি খেতে হয়।

শেষ রাতের দু-তিন ঘণ্টা গাঢ় ঘুমের পর সকালে ভালো লাগে। মণিদীপার কথা মনে পড়ে। মন্ত্রের কাজ হয়। আমার সমস্ত অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ, ক্লান্তি, কষ্ট সুদূরে লুপ্ত হয়ে যায়, তারা আমাকে আর ছুঁতে পারে না। আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে গেছি। আগের মতোই আবার আমি সুন্দর। আমার সমস্ত সম্ভাবনা এখনো সজীব। সমস্ত হৃদয়ভরে আমি এক গভীর প্রেরণা অনুভব করি।

সারা সকাল আমি মণিদীপার কথা ভাবি। মণিদীপার সঙ্গে কথা বলি। একদিন তাকে আমার জরুরি কথাটা বলব। কথাটা বলা খুব কি কঠিন

ক্লাসের কোন মেয়েকে আমি যদি মুখ ফুটে বলি—আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে, আমি জানি, সেই মেয়েটি নিজেকে ধন্য মনে করবে, তার মুখে রক্তিম আভা ফুটে উঠবে, লজ্জায় আনন্দে একটা অসম্ভব সম্ভাবনার কল্পনায় সে এতই বিহ্বল হয়ে পড়বে যে, তার মনের কথাটাকে সে মুখে বলতে পারবে না, তার দুটো চোখ দুটো ঠোঁট বলবে তার কথা—আমি নিশ্চিত জানি। ক্লাসের অন্য মেয়েদের মনের কথা আমি জানি কিন্তু যাকে জানি না, যার মনের কথা আমি জানি না, আমার কথা তারই সঙ্গে।

সে কি আমাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবে। অন্তত ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দর ছেলেটি কী বলতে চায়—সাধারণ কৌতূহলও কি তার হবে না। এতদিনেও কি আমি তার চোখে একটুও অ-সাধারণ হয়ে উঠিনি। আমি আমার আত্মীয়স্বজন, আপনজনদের কথা ভুলে যাচ্ছি, সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ ঘটছে আমার, বাড়িঘর ছেড়ে আমি এই গভীর অনিশ্চয়তা আশ্রয় করে আছি—সবই তো তার জন্যে। আমি স্মৃতি-বিস্মৃতির মাঝখানে খুব সংকীর্ণ পিছল পথে হেঁটে চলেছি। যেকোন সময় বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে পারি। আমি আমার হাত ধরে হাঁটছি—। দুটো হাতই তো রুগ্ন। আমার এত কষ্ট কিছুই কি তাকে স্পর্শ করে না।

সে কি কোনদিন আমার কোন কথা শোনার কথা ভাবেনি—। একদিন তো কথাটা তাকে শুনতে হবে। আমাকে বলতেই হবে।

সেদিন প্রথম পিরিয়ড থেকেই একটা সুযোগের জন্যে তৈরি করে নিতে হতে পারে আমাকেই। মণিদীপার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে, এই কথাটা বলার সামান্য সুযোগ। প্রকাশ্যে, সকলের সামনেই বলা যায়, কিন্তু তাতে আসল কথাটার গুরুত্ব অনেকটা কমে যাবে, মণিদীপা হয়ত বুঝবে যে-কথাটা আমি বলতে চাই, সেটা সত্যি খুব জরুরি নয়। সেটা যে খুবই জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা তার ইঙ্গিত দিতেই সকলের আড়ালে প্রস্তাবটা করতে হবে। আর একটা কথা, মণিদীপা যদি সরাসরি বলে তার সময় নেই বা তার কোন আগ্রহ নেই—আমার বিশ্বাস তেমন কিছুই সে করবে না যাতে আমাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান বোঝায়। তবু অনিশ্চয়তার প্রশ্ন থেকে যায়, কিন্তু কে না জানে জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাফল্যের শুরুতে কিছু অনিশ্চয়তা থাকেই, আর সম্ভাবনার কল্পনা করেই যে-কোন কঠিন কাজ শুরু করতে হয়। বিশ্বাস করি—তবু কে বলতে পারে—।

একটা ক্লাস শেষ হলেই ছেলেমেয়েরা দ্রুত ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। কে আগে বেরোবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় ক্লাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আমি ইচ্ছা করেই বসে থাকি। একেবারে বসে থাকলে কে কী ভাববে তাই ধীরে ধীরে উঠি। ততক্ষণে দলবলের সঙ্গে মণিদীপাও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমাকে সে লক্ষ্যই করে না। প্রথম, দ্বিতীয় দুটো ক্লাসেই ব্যর্থ হলাম। আমি কী করতে পারি, কোন সংকেত দিতে পারি। প্রতিদিনের চেয়ে আরো বেশি করে, আরো কিছুটা বেশি সময় ধরে মণিদীপার দিকে তাকাতে শুরু। আমার ইচ্ছা আজ তার মনে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এখনো আমি হতাশ হইনি। উত্তেজনা উত্তরোত্তর বাড়ছে, হাতের তালু বার বার ভিজে উঠছে।

পরের ক্লাসে—ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজল এক সময়। অধ্যাপক চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, সবাই উঠে দাঁড়াল—আমি উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসলাম। অন্যরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরোবার জন্যে ভিড় করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এবারে মণিদীপা ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল না। কী কারণে অনেকটা পিছিয়ে পড়ল। তারপর এগিয়ে যেতে যেতে পিছনে ফিরে তাকাল—আমাকে দেখল। দরজা পেরিয়ে যাওয়ার আগে ও আবার পিছনে ফিরে তাকাবে—তাকাতে বাধ্য। বলতে বলতে সে মুখ ফেরাল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল, না। সেই সময় আমি প্রায় বলতে উদ্যত হয়েছিলাম কিন্তু মণিদীপা ততক্ষণে অনেকটা দূরে চলে গেছে, এবং আমি নিজেকে নিরস্ত করেছি। মণিদীপা নিশ্চয়ই কিছু বুঝেছে। সে যখন দ্বিতীয়বার আমার দিকে ফিরে চেয়েছিল, সেই সময় আমি যে কিছু বলতে চেয়েছিলাম—যেতে যেতে যে ফিরে ফিরে তাকায়, তার এটা না বোঝার কথা নয়।

পরের ক্লাসেই সেটা বোঝা যাবে। আমি একটা জরুরী বাজি ধরেছি। মণিদীপা যদি সত্যি কিছু বুঝে থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই বেশি করে আমাকে লক্ষ্য করবে। সে যখনই আমার দিকে তাকাবে, যদি দেখে আমি তার দিকে চেয়ে আছি, এবং আমি যখনই তার দিকে তাকাব, যদি দেখি সে আমার দিকে চেয়ে আছে—যদি এমনটিই হয়, তাহলে বুঝব—বুঝব আমি যা চাই তা-ই হবে।

পরের ক্লাস শুরু হওয়ার দু' মিনিটের মধ্যেই বাজিতে আমার জয়ের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয়ে উঠল। এবং মণিদীপা আমাকে এবং আমি মণিদীপাকে, দুজনে দুজনকে দেখতে লাগলাম এবং দুজনেই বারবার দুজনের চোখে ধরা পড়ে যেতে লাগলাম। আমাদের মনেও পড়ল না আমাদের সাবধান হওয়া উচিত কিনা,—আমাদের ঘটনাটা কেউ লক্ষ্য করছে কিনা। ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ল এক সময়। অধ্যাপক চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। সবাই উঠে দাঁড়াল—দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মাত্র এক মিনিটের মত সময় দরজার কাছে জটলাটা ছিল, আমি আমার জায়গাতে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম মনোযোগে খাতা গুছ

পড়ছিলাম। আবার যখন মুখ তুললাম দেখি ঘর থেকে যাদের বেরিয়ে যাওয়ার কথা তারা সবাই চলে গেছে। মনিদীপা তার জায়গায় বসে কী লিখছে, খাতা থেকে মুখ তুলছে না। ও কিছুই যে লিখছে না, খাতার দিকেও চেয়ে নেই, আমি জানি। সময় চলে যাচ্ছে, একটু পরেই অন্য ক্যাসের ছেলে-মেয়েরা এসে যাবে। আমি এগিয়ে গেলাম। মনিদীপা একবার মুখ তুলে আমাকে দেখল, আবার মুখ নামিয়ে লেখায় মন দিল। তার মুখের রঙ অনেক বদলে গেছে ততক্ষণে।

আমি ডাকলাম—শুনুন—।

মনিদীপা মুখ তুলল। সে তো ফর্সা—লজ্জা, লজ্জা ছাড়া আরো যা কিছু, কিছুই সে লুকোতে পারল না। আমার দিকে তাকাতে পারছে না চেয়ে থাকবে কি। আমার অবস্থাটা দেখবার কথাও তার মনে হল না। আমি অনেকটা সহজভাবে তাই বলতে পারলাম— আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে—।

মনিদীপা ধীরে ধীরে খাতা বন্ধ করল। মুখ তুলল না, বলল—কী কথা বলুন—।

ছুটির পর আসবেন ?

এবার সে মুখ তুলল।—কোথায় ?

বললাম একটা জায়গার কথা যেখানে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব। কলেজ থেকে বেরিয়ে একটু গেলেই বড় রাস্তা—রাস্তা দিয়ে পূর্বদিকে একটু এগিয়ে গেলে বাঁদিকে রাস্তার ধারে একটা ডাকবাক্স। চারটে তিরিশ-এর পর থেকে ডাক বাক্সটার কাছাকাছি আমাকে দেখা যাবে।

মনিদীপা মুখে কোন কথা বলল না, তার সুন্দর গ্রীবা নেড়ে বলল আচ্ছা।

তারপর অনেকক্ষণ আমি কিছুই জানি না। কতক্ষণ পরে কলেজের বাইরে, ছোট রাস্তাটা ছাড়িয়ে সেই রাজপথের ওপর আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম। সে তখন অন্য একজন। তার মন অদ্ভুত আনন্দে তোলপাড়। পৃথিবীতে এরচেয়ে আশ্চর্য আর কী আছে, একটি সুন্দরী নারী একজন যুবকের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে। সংবাদটা নিশ্চয়ই কলকাতার কারো জানতে বাকী নেই। তার মনে হয় সকলে তার দিকে চেয়ে আছে—সে কারো মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

মনিদীপার মতো মেয়ের কাছে ভালোবাসার প্রস্তাব করার সুযোগ পাওয়া আর তার ভালোবাসা পাওয়া দুয়ের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু সে জানে না, তার মনে হয় সে যা পেয়েছে তাতেই তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেছে। মনিদীপার সঙ্গে আর দেখা না হলেও তার তেমন ক্ষতি নেই। তার কাছে আর তার চাইবার কিছু নেই।

আর একটু পরেই মনিদীপা রাস্তার ধারে সংকেতের স্থানে এসে দাঁড়াবে—কেমন করে কীভাবে সে সম্ভাষণ করবে মনিদীপার সঙ্গে। সময় নেই আর, এখনো সে কোন প্রস্তুতি গড়তে পারছে না। কোন কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারছে না। একবার মনে হয়, [illegible]

ভালো। মনিদীপা তাকে ভালোবাসবে চলেছে —ভালোবাসা বলতে যা বোঝায় সেই ঘটনা সত্যিই ঘটতে চলেছে—। পৃথিবীতে এমন ঘটনা কি সত্যিই ঘটে যে একটি সুন্দরী নারী একজন যুবকের ভালোবাসা স্বীকার করে তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। না, এমন আশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে প্রথম ঘটতে চলেছে। একটি নারী তার আশ্চর্য সুন্দর শরীর এবং সমস্ত অনুভূতি নিয়ে পৃথিবীর আর কারো কথা নয় শুধু তারই কথা ভাবতে ভাবতে তারই উদ্দেশে আসছে।

সে ডাকবাক্সটার কাছে এসে দাঁড়ায়। মনিদীপার আশা পথ-এ চেয়ে থাকে। এক সময় সে মনিদীপাকে দেখতে পায়। মনিদীপা তাকে দেখেছে, দূরে থেকে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। তার মধ্যে গভীর সাড়া পড়ে যায়। হৃদয়ে আবার তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। নতুন করে আর কিছু ভাবতে পারে না। দেখতে দেখতে মনিদীপা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তার মুখের দিকে একবার চেয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছে।

মনিদীপা সত্যিই এসেছে—তারই জন্যে। তার সমস্ত স্বপ্ন দূরে হয়ে গেছে। সে আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছে। : কোথায় যাওয়া যায়— আপনি জানেন— ?

মণিদীপার দুটো ঠোঁটে সুন্দর হাসি ফুটে উঠল। তারপর হাসিটা ঠোঁটের বঙ্কিমতা নিয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে গেল।

আমাকেই কোন জায়গা খুঁজে নিতে হবে—এমন কোন নির্জনে যেখানে সবচেয়ে নিবিড় করে মণিদীপাকে পাওয়া যাবে। যেতে যেতে পেয়ে যাব নিশ্চয়ই। শুরু হল চলা।

মনিদীপা কখনো একটু পিছিয়ে কখনো আমার পাশাপাশি চলে। যেতে যেতে সে যদি আমার দিকে মুখ ফেরায় দেখে আমার মুখ তারই দিকে ফেরানো, তখন সে আর মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। আমরা পরস্পরের হৃদয়ের দিকে চেয়ে থাকি। কারো মুখে কোন কথা নেই। শব্দ তো অন্তঃসারশূন্য, শব্দের কি শক্তি আছে, হৃদয়ের কথা কখনো সঠিক প্রকাশ করতে পারে। শিল্পীরা, যারা চিত্রাঙ্কনা আঁকে, যা কিছুতেই বলা যায় না, তাও বলে দেয় ব্যঞ্জনায়। শিল্পের মহিমা শিল্পীরা ছাড়া সাধারণ মানুষ কতটুকু বোঝে। সাধারণের মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকারা ব্যতিক্রম, মুখের কথা ছাড়িয়েও তারা পরস্পরের কথা বুঝতে পারে।

শিল্প আর জীবনের মধ্যে কি কিছু দূরত্ব আছে। জীবনে শব্দের প্রয়োজন অপরিহার্য। জানি, শব্দ কখনো কখনো কত ব্যর্থ, হৃদয়ের কথা বলতে হৃদয় শুধু ক্ষত-বিক্ষত হয়। তবু মুখের কথার ওপর অদ্ভুত দুর্বলতা মানুষের। বিশেষতঃ প্রেমিক-প্রেমিকার। নতুন স্বামী-স্ত্রীর। নতুন সম্পর্ক যাদের। কত রাত ভোর হয়ে যায় কথার কথার অনুপূরে [illegible] হয়ে যায়। এত কী কথা থাকে—। প্রেমটাই তো কথা—[illegible]—এই [illegible]

বলতে সহস্র কথা বলতে হয়—[illegible] বলা হয় না। সমস্ত কথার শেষে সংশয়।

আমি তো শুরুই করতে পারি নি।

মনিদীপা বোধহয় বুঝতে পারে। আমাকে প্রশ্ন করে না—কেন আমি কথা বলছি না। মনিদীপা হয়তো আমারই মতো অসহায়, নিজেও জানে না কী বলবে। কী কথা বলার আছে নিশ্চয়ই সে জানে—। আমরা এতদূরে এসেছি কেন, তা কি এখনো তার অজানা আছে। কথাটা জানার পর মনিদীপা কী ভাবছে এখন আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছা করছে। অথচ জিজ্ঞাসা করি সে সাধ্য নেই।

সেই সময় আমাদের উপযোগী একটা জায়গার খোঁজ পাওয়া গেল। সেটা একটা অভিজাত মিষ্টির দোকান। নির্জনে বসবার জন্যে কয়েকটা কেবিন আছে। পর্দার পরিবর্তে কাঠের দরজা। কেবিনের মধ্যে অনেকটা জায়গা। টেবিলের দুদিকে দুটো করে চেয়ার। ভিতরটা পরিপাটি সুন্দর। দেয়ালে সুন্দর শেড-এ ঢাকা আলো। একটা কীসের সুগন্ধ—মনিদীপার প্রসাধনের—। বাইরে এতক্ষণ টের পাইনি, এই নির্জনে নিবিড় করে পেলাম।

একটি ছোট ছেলে কাঠের পাল্লা ঠেলে ভিতরে এল। এই দোকানের মিষ্টি বিখ্যাত—।

একটু পরে খুব সুদৃশ্য কাঁচের গ্লাসে জল এল। খুব সুন্দর সাদা কাঁচের প্লেটে মিষ্টি।

মনিদীপাই প্রথম কথা বলল। —এত খাবার নেওয়ার কোন দরকার ছিল না—আপনি খাবেন সব—। মনিদীপা সুন্দর সোনার রঙের আঙুল দিয়ে তার দিকের খাবারের প্লেটটা আমার দিকে ঠেলে এগিয়ে দেয়।

এই সুবর্ণ সুযোগটাকেও ব্যবহার করতে পারলাম না। আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না।

মনিদীপাই আবার কথা বলল। —গরমকালটা এত খারাপ—বিশ্রী লাগে—। একটা রুমাল তার হাতে। হালকা সবুজ রঙের ভাঁজ করা রুমাল। সে কপালের ঘাম মোছে সযত্নে, সাবধানে—কপালের সবুজ রঙের টিপটাকে বাঁচিয়ে। তার সোনালী চিবুকে ঘামের গুঁড়ো। এত কাছে থেকে মনিদীপার মুখের দিকে চেয়ে থাকা কঠিন। তার সুন্দর গ্রীবার নীচে সরু সোনার চেন, তার লকেটে একটা উজ্জ্বল সবুজ পাথর—কী যেন নাম—পান্না।

এই মুহূর্তে একটা কথা আমি বলতে পারি—বলব, মনিদীপা আপনি সুন্দর। আরো অনেকক্ষণ এই নির্জনে তার সামনে থাকার জন্য কথাটা এখনই আমি বলব না। অন্য কথা বলি—আজ কাগজে আবহাওয়ার খবরে লিখেছে বর্ষা আসতে এখনো একমাস—।

এ—ক—মা—স। আমি নিশ্চয়ই মরে যাব—।

তার আগেই নিশ্চয়ই বর্ষা এসে যাবে। —বৃষ্টি এত ভালোবাসেন ?

এই বিশ্রী গরমটা থেকে না হলে,

মনিদীপা বলে, না হলে সারাদিন বৃষ্টি ভালো লাগে না—বাড়ী থেকে বেরোনো যায় না—।

আমি ভাবি, বর্ষা শুরু হলে, যেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি হবে সেদিন মনিদীপাকে দেখতে পাব না। —কেন বৃষ্টিতে তো বাড়ীর বাইরে থাকতে মজা।

মেয়েদের একটুও মজা নয়।

মেয়েরাই বৃষ্টিতে ভিজতে বেশী ভালোবাসে।

সে বাড়ীর ছাদে—।

আপনাদের খুব সুন্দর ছাদ আছে?

না—ভাড়া বাড়ীতে ছাদ থাকে!

কোনদিন ছাদে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভেজেন নি?

কতবার—। আমার মামার বাড়ী হুগলীতে, মামাদের খুব সুন্দর ছাদ—।

দৃশ্যটাও সুন্দর—ছাদে বৃষ্টির মধ্যে মনিদীপা। —আচ্ছা, হুগলীতে কি গরমে সেই বাড়ী যায় ছাদে—।

মনিদীপা হাসে। এমন হাসলে তার রূপের আড়ালে থাকে যে অপরূপ তা ফুটে ওঠে তার মুখে। —হ্যাঁ গরম—কেন বলুন তো

কী রকম গরম?

কেন, গরম যেমন হয়।

কেমন বলুন না।

বলতে পারব না। যদি আপনার মতো কবি হতাম বলতে পারতাম—।

আমি কবি কে বলল?

সকলেই বলে।

সকলে বলে তাই আপনিও বললেন?

বুঝতে পারছি না আপনার কথা—।

কেন খুব সহজ কথা তো, বলছি—সবাই বলে আপনিও বলেন।

মনিদীপা বলল—আমার বলায় কী আসে যায়—আমি কবিতা বুঝিই না।

আমি কবিতা লিখিও না।

কবিতা লেখেন না—তাহলে গল্প লেখেন?

গল্পও লিখি না।

তাহলে কী লেখেন?

কিছুই লিখি না!

সত্যি লেখেন না—তাহলে ছবি আঁকেন?

আমি কখনো ছবি আঁকিনি—।

আপনি সত্যি বলছেন না।

আচ্ছা, আপনার কেন এসব মনে হচ্ছে—?

আপনাকে দেখলে মনে হয়।

কী মনে হয়—আমি কবি—শিল্পী?

আপনি খুব চিন্তা করেন।

তাই? —আমি তো জানি না।—আগে কেউ কোনদিন আমাকে কথাটা বলেনি।

মণিদীপা লজ্জা পায়—তার মুখ দেখে আমার তাই মনে হয়। বললাম—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, আপনি [illegible] সম্বন্ধে ভাবেন?

আমার প্রশ্ন মণিদীপা বুঝতে পারল কিনা—কী বুঝল, তার মুখের দিকে চেয়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি যতটুকু জানতে চেয়েছি, তার বেশীটাই সে বুঝেছে। মণিদীপা বলল—ভাবি—কী ভাবব, জানি না—আমি বলতে পারব না—আমি কি আপনার মতো কবি।

আমি খুব সহজভাবে বলতে চাইলাম, মণিদীপা, আপনি আমাকে কতদূর ভাবেন আমার জানা দরকার, খুব জরুরী।

মণিদীপার মুখের প্রচ্ছন্ন হাসিটুকুও এবার মিলিয়ে গেল, আমার জিজ্ঞাসার গুরুত্ব অনুযায়ী গাম্ভীর্য ফুটে উঠল তার মুখে। মণিদীপা বলল—আপনার কথা আমি ভালো বুঝতে পারি না।

আমিও তো বুঝতে পারি না, মণিদীপার মুখের কথা কি তার মনের কথা। না, একটু আগে আমি যা বলেছি, সে যা শুনেছে—সত্যিই আমি তাই-ই বলেছি কিনা, আর একবার আমার মুখ থেকে কথাটা শুনে সে নিশ্চিন্ত হতে চায়। না, সমস্ত জানার পরেও সে নিজের কথা কিছুই বলতে চায় না। না কি আমি যা বলতে চাইছি, তা শোনার জন্যে সে প্রস্তুত নয়—

মণিদীপা চিন্তার গভীরে ডুবে আছে। তাকে চোখের সামনে সুস্পষ্ট দেখেও দেখি সে অনেক দূরে। সেই সুদূরে তার কাছে আমার কোন কথা পৌঁছবে কি! আমার গলার স্বর ভেঙে গেছে। আমি বললাম—এত কী ভাবছেন—কেন ভাবছেন?

মণিদীপা মুখ তুলল। অন্য মণিদীপা। তার মুখে হাসি—সে-হাসি আগে কোনদিন দেখিনি। বললাম—আমি আপনাকে খুব কষ্টের মধ্যে ফেলে দিলাম।

মণিদীপা এবারও হাসল। কষ্টের হাসির মতো। বলল—না, কষ্ট কেন—।

আমার মন বলছে একটা প্রশ্ন করে আমি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। কাজটা ভালো করিনি এখন বুঝতে পারছি।

মণিদীপা বলল—কেন আপনি ও-কথা বলছেন—আমি কিছুই ভাবছি না। সে আবার ভাবনার অতলে ডুবে যায়।

অতল অন্তর থেকে মণিদীপা কী কথা তুলে আনবে আমার জন্যে—। তারই জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কী করার আছে! যত সময় যাচ্ছে, আমি সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। আমার হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে। আবার আমার শরীর খারাপ লাগছে।

দোকানের সেই ছেলেটি এই সময় কেবিনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। আমাদের আর কোন খাবার চাই কিনা জানতে এসেছিল, একটু অবাক হয়ে দেখল টেবিলের ওপর অনেকক্ষণ আগে দেওয়া খাবার যেমন দেওয়া হয়েছিল, তেমনিই আছে। ছেলেটি একবার মণিদীপার, একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে চলে গেল।

খান—খেয়ে নিন—।

মণিদীপা আমার মুখের দিকে তাকালো। বলল—আপনি খান—।

আপনি?

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

কেন—?

এমনি—।

এ[illegible] —।

আপনি খান।

আপনি সত্যি খাবেন না?

আমি মিষ্টি খাই না।

একটা খেলে কিছু হয় না।

আমার একটুও খেতে ইচ্ছে করছে না—আপনি খান।

আপনি খান—।

আপনি ভীষণ জেদী—বলছি আমার ভালো লাগছে না—কেউ জোর করলে আমার ভালো লাগে না।

আর জোর করব না।—জোর তো করিনি—।

তা বলিনি—বিশ্বাস করুন, তা বলতে চাইনি। মণিদীপার কণ্ঠস্বর করুণ শোনায়। তার মুখে গভীর বেদনার ছায়া।

আমি বুঝতে পারিনি কখন এমন বেদনা ঘনিয়েছে তার মধ্যে। আমিই এর জন্যে দায়ী। বললাম—আমি আপনাকে কোন আঘাত দিয়েছি?

না—। মণিদীপা আহত হয়ে বলল—আমি কি তাই বলেছি—।

না আপনি বলেননি—।

তবে ও-কথা আপনি কেন বললেন?

আপনার কী হয়েছে আগে বলুন।

আমার কিছু তো হয়নি—।

হয়েছে—। কী হয়েছে বলুন—।

কী বলব—। ভারি আশ্চর্য তো—আমার কী হবে—কিছুই হয়নি।

হয়েছে।

কেমন করে বুঝলেন—আমি নিজেই জানি না!

অনেক সময় নিজের কথা নিজে জানা যায় না।

মণিদীপা বলল—আমি আপনার কথা বুঝতে পারি না।

অনেক সময় নিজের কথা অন্যের মুখে বোঝা যায়।

বেশ তো, আপনি বলুন—।

মণিদীপা, আপনি কি কাউকে ভালোবাসেন?

মুহূর্তে মণিদীপার মুখের রঙ বদলে গেল। কোন কথাই সে বলতে পারল না। গভীর উচ্ছ্বাসে তার হৃদয়ের সবটুকু রক্ত মুখে উঠে এল—তার মুখ লাল পদ্ম হয়ে উঠল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, জানলাম সে আমার জন্যে নয়।

আমি তখন কী করি—। তারপর কেমন করে মুখ তুলি—মণিদীপার মুখের দিকে তাকাই।

মুখ তুলতে হবে—কথাও বলতে হবে। আরো কিছুক্ষণ আমাকে মণিদীপার চোখের সামনে থাকতে হবে। এখান থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ তার পাশে হাঁটতে হবে—। কিন্তু আমি ভাবতে পারি না কাল থেকে আবার আমি কেমন করে তার সামনে দাঁড়াব—তার মুখোমুখি হবো।

তা হতে হয়নি আমাকে।

পরের দিন সকালে হঠাৎ আমার কাঁপিয়ে জ্বর এলো। তারপরের দিন থেকেই এক জটিল অসুখের লক্ষণ দেখা দিল।

তারপর সেই অসুখে আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি।
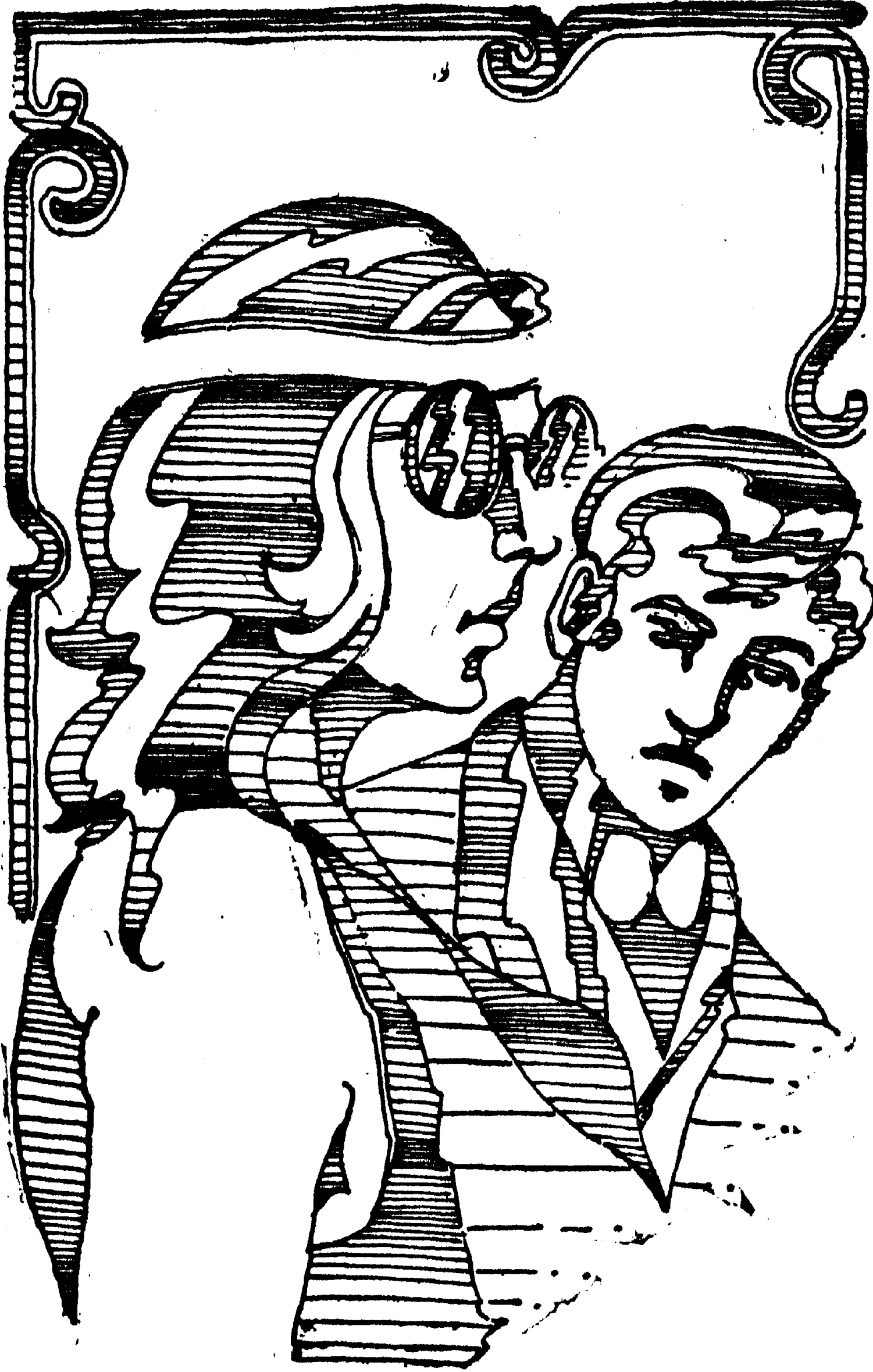
বন্ধু হে পরবাসী

জ্যোতির্ময় মৌলিক

নিবেদিতা গান্ধারী ওর আসল নাম নয়। কয়েক বছর আগে একদিন ও নিজেই নিজের এই নতুন নামাকরণ করে এলো আদালতে এফিডেভিট দিয়ে। ওর পরিবারের দেওয়া নাম সেদিন থেকে জন্মের মত চাপা দিয়ে ওর বন্ধুবান্ধব মহলে, আত্মীয়-পরিজনের কাছে, এমনকি করদোবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে—যেখানে ও তখন ভারততত্ত্ব নিয়ে পড়তো—সেখানকার শিক্ষকদেরও বলেছে, আমার এঞ্জেলা আর্তিজ নামটা এখন থেকে বাতিল। আজ থেকে আপনারা আমাকে নিবেদিতা গান্ধারী বলেই জানবেন।

দু-একজন এ খবর শুনে বলেছে, তা নয় জানলাম, কিন্তু নাম বদলাবার হঠাৎ এমন কি কারণ ঘটলো?

এঞ্জেলা হেসে উত্তর দিয়েছে, কোন কারণ নেই। পুরনো নামটা আর ভালো লাগছে না তাই একটা নতুন নাম রাখলাম।

এঞ্জেলার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার অনেক-দিন পর এ প্রসঙ্গে ও আমাকে বলেছিল, আমার এই নামবদলের ব্যাপারটা সবাই নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করেছিল কেবল আমার মা ছাড়া। তিনি এই সামান্য ব্যাপারকে শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি যে তা পারবেন না তা আমি জানতাম। আমার কোন আচরণই মা প্রীতির চোখে দেখতেন না। আমার খাওয়াদাওয়া, চলা-ফেরা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা, পড়াশুনো সবকিছু নিয়ে তিনি এমন সন্দিগ্ধমনা আর অসন্তুষ্টির ভাব দেখাতেন যাতে আমি মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলতাম। নামবদলের ব্যাপার শুনে আমার মা-ও রেগে আগুন।

বাবার কাছে গিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, শুনছো, তোমার মেয়ে আবার কি এক কান্ড বাধিয়ে বসে আছে দেখ।

বাবা শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আবার কি হলো? মা তেমনি রাগতভাবে বললেন, কি আবার হবে। তোমার বড় মেয়ের আমাদের দেওয়া নামে অরুচি ধরে গেছে। তাই আদালতে গিয়ে নতুন নামকরণ করে এসেছেন, নিবেদিতা গান্ধারী। আর নামের কি ছিরি। সারা খৃস্টান জগতে এমন অর্থহীন আর একটি নাম তুমি খুঁজে পাবে না।

এঞ্জেলা আমাকে এর পর বললো, আমার বাবা মার মুখে এই ব্যাপারটা শুনে শুধু বললেন, এঞ্জেলা বাড়ী এলে ওকে জিজ্ঞেস করবো।

আমার মা তেমনি ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, তা তোমার যা ইচ্ছে তা তুমি করো। কিন্তু আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে রাখছি তোমার আস্কারা পেয়ে পেয়ে তোমার ঐ মেয়ে কিন্তু গোল্লায় যেতে বসেছে। এ মেয়ে আমাদের হাতের নাগালের বাইরে যেতে আর কিন্তু বেশী দেরী নেই। তবে ভরাডুবি যখন হবে তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিও না। তুমি দেখে নিও ঐ মেয়ে একদিন আমাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দেবে। এ কথার যদি অন্যথা হয় তবে আমার নামে তুমি একটা গাধা পুষো।

এরপর একটু দম নিয়ে আমার মা বললেন, এই ত এখনও বছর পেরোয়নি তোমার মেয়ে কি এক কান্ড করে বসলো। আমাদের মত নিষ্ঠাবান রোমান ক্যাথলিকের বাড়ীতে যে ঘরে আমি মেরীমাতা আর ক্রাইস্টের ছবি রেখেছি, সেই ঘরে তোমার ঐ বড় মেয়ে অজানা অচেনা একটা লোকের পেল্লাই এক অয়েলপেন্টিং এনে ঝুলিয়ে দিল। ঐ দেখে আমি ত অবাক। মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম, এঞ্জেলা, এ তোমার কিরকম আচরণ? ঠাকুরদেবতার ঘরে মিডলইস্টের পাগড়ীওলা এক তেল সদাগরের ছবি এনে লটকালে কেন? জান, আমার কথা শুনে মেয়ে ত আমার হেসে খুন; ও আমাকে কি বললে জান? বললে, মা, উনি তেল সদাগর নন আর উনি মিডল-ইস্টের লোকও নন। উনি সর্বকালের এক মহামানব। ইনিই স্বামী বিবেকানন্দ। বর্তমান ইন্ডিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ যোগী আর মানবপ্রেমিক।

এঞ্জেলা আমাকে বললো, আমার কথা শুনে আমার মা একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে বললো, এঞ্জেলা তোর নিশ্চয়ই মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এই রেড ইন্ডিয়ানগুলো আবার মানুষ নাকি। তা সে মানুষই হোক আর যেই হোক সেগুলো ত কবেই আমাদের লাতিন আমেরিকা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যে'কটা এখনও কোন-[illegible]

ভদ্রলোকই চোখে পড়ে না ত তাদের মধ্যে একজন সেইন্ট জন্মাবেন কি করে ?।

এঞ্জেলা আমাকে বললো, মার কথা শুনে আমিও না হেসে থাকতে পারলাম না। শান্তভাবে মাকে বুঝিয়ে বললাম, ইনি রেডইন্ডিয়ান নন। এশিয়া মহাদেশে এক বিরাট সুসভ্য দেশ আছে, যার নাম ইন্ডিয়া। ইনি সেই দেশে জন্মেছিলেন। এই মহাপুরুষ বা ইন্ডিয়া সম্পর্কে তুমি ত কিছু জান না। সে এক মহা গৌরবময় দেশ।

এঞ্জেলা তার বক্তব্য বন্ধ করে আমার দিকে মুখ করে বললো, আমার মা ভারতবর্ষ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না। আমার মুখে ভারত সম্পর্কে কিছু কিছু কথা তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে একটা সভ্য দেশ তা তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে চাইতেন না। নানারকম আজগুবী তথ্য তিনি ভারত সম্পর্কে সংগ্রহ করেছিলেন, তাই আজ ইচ্ছে করেই মাকে খোঁচা মেরে কথাটা বলেছিলাম।

এঞ্জেলা আগের কথায় ফিরে গিয়ে বললো, আমার মন্তব্য শুনে তিনি রাগতস্বরে বললেন, জানি জানি, ইন্ডিয়া সম্পর্কে তোকে আর জ্ঞান দিতে হবে না।

এঞ্জেলা বললো, আমি মার হাত চেপে ধরে বললাম, বল ভারত সম্পর্কে তুমি কি জান। না বললে তোমাকে ছাড়বো না। আমার মা রেগেই ছিল। আরো রেগে গিয়ে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, তা বেশী কিছু জানবার আর আছে কি? শুনেছি সেখানে কতকগুলো কালো কালো লোক বাস করে। লোকগুলো সাপ খেলা আর নানা ভেলকি দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে। তারপর ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তারা মরে। যতদিন বেঁচে থাকে সাপ, বাঘ, খুনোশুয়োর আর বিষাক্ত কীটপতঙ্গ নিয়ে তারা ঘর করে।

এঞ্জেলা বললো, মা, এবার কিন্তু হাসবার পালা আমার। যাই হোক ভারতবর্ষ সম্পর্কে তোমার ধ্যানধারণাগুলো কিন্তু চমৎকার, তবে তোমার এ হেন জ্ঞানের বহর বাইরের কোন লোকের কাছে যেন বলো না। এই বলে আমি ঘর থেকে সেদিন বেরিয়ে এলাম।

এঞ্জেলা বলতে লাগলো, ভারত সম্পর্কে যার ধারণা এতটা বিকৃত, তার মেয়ে যখন ক্রিশ্চিয়ান নাম বদলে নিজের একটা হিন্দু নাম রাখলো (আমার মা পরে জেনেছিলেন যে নামটা হিন্দুস্তানী) তখন তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন, সন্ধ্যার পর আমি বাড়ী ফিরতেই রোষকশায়িত চোখে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এঞ্জেলা, তুই নাকি নিজের নাম বদলে কি একটা হিন্দু নামে পরিচিত হবার চেষ্টা করছিস। আমি বললাম, হ্যাঁ, **এখন থেকে আমার নাম নিবেদিতা গান্ধারী,**

এঞ্জেলা আর্তিজ নয়, মা জিজ্ঞেস করলো— তার মানে?

আমি শান্তগলায় উত্তর দিলাম, মানে অতি সহজ। আমার পূর্বপুরুষেরা ভারতীয় ছিলেন। তাঁদের রক্ত এখনও আমার দেহের শিরায় উপশিরায় বয়ে চলেছে। কাজেই একটি হিন্দু রমণীর একটা হিন্দু-নাম থাকা কিছু একটা অগৌরবের ব্যাপার নয়।

এঞ্জেলা বললো, আমার একথা শুনে মা ভুরু কুঁচকে জিভে শ্লেষ টেনে বললো, তোর পক্ষে কোন কাজই অগৌরবের নয়, তবে এও তোকে আমি বলে রাখছি এখন থেকে তুই তোর ভারতীয় পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মাদের নিয়ে থাক জ্যান্ত বাপমাকে ভুলে যা। এই বলে তিনি মেঝেতে দুমদাম পা ফেলে ঘর থেকে চলে গেলেন।

করদোবার হোটেলে বসে ঠিক এই কথাই আমি এঞ্জেলা আর্তিজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

উত্তরে এঞ্জেলা আমাকে বলেছিল, আপনি বিশ্বাস করুন আমার প্রমাতামহ গান্ধার থেকে আমাদের প্রাচীন আবাসভূমি স্পেনের আন্দালুসিয়ায় আসেন। সেখানে আমার প্রমাতামহীকে বিয়ে করে ভাগ্যান্বেষণে আর্জেন্টিনায় আসেন। আমার মা-র জন্ম হয় এখানকার মেন্দোসা প্রদেশে।

এঞ্জেলাকে বাধা দিয়ে বললাম, তুমি যা জান, তা তোমার মায়েরও জানার কথা। তিনি কি একথাটা কখনও অস্বীকার করেছেন ? এঞ্জেলা বললো, তিনি এ সত্যটা ভাল করেই জানেন। কিন্তু মরে গেলেও তিনি তা কখনও স্বীকার করবেন না। বললাম, তার কারণ, আমার ত মনে হয় বংশপরিচয় নিয়ে সাধারণত লোকে গৌরব বোধ করে যদি তার মধ্যে কলঙ্কের ছাপ না থাকে।

এঞ্জেলা বিমর্ষভাবে বললো—তার কারণ আমার মা মনে করেন যে, ভারতবর্ষ এক অসভ্য দেশ। সভ্যতার আলো সেখানে এখনও পৌঁছয়নি। সেখানকার এক বর্বর অধিবাসী তার প্রমাতামহ এ সত্য তিনি মরে গেলেও স্বীকার করবেন না। আরো একটা কারণ এই যে রেডইন্ডিয়ানের সঙ্গে ইন্ডিয়া শব্দটা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান বলতে এ দেশে রেড ইন্ডিয়ানদের বুঝায়। তাই আমার মা তাঁর প্রমাতামহকে এই ইন্ডিয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্বীকার করতে চান না। পাছে এদেশের লোক মনে করে যে আমার মার দেহে রেডইন্ডিয়ানের রক্ত আছে।

হেসে বললাম, তাতে দোষের কি হলো, রেড ইন্ডিয়ানরা ত আমাদের মতই রক্তমাংসে গড়া মানুষ।

এঞ্জেলা একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ **করে বললো, মানুষ তারা ঠিকই, তবে এই দুই আমেরিকায় সাদা চামড়ার লোকজনের কাছে নয়।**

এই প্রসঙ্গের এখানেই ইতি ঘটাতে এঞ্জেলাকে বললাম, তোমার এই নিবেদিতা নামটি আমার খুব ভাল লাগে। এই নামটি উচ্চারিত হলেই ভারতপ্রেমিক বিদেশী এক মহীয়সী তপস্বিনীর স্মৃতি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু তুমি ত আর্তিজের বদলে তোমার পদবী লাগিয়েছো গান্ধারী। আর তুমি নিজেই বলেছো যে তোমার প্রমাতামহ গান্ধার মানে বর্তমান কান্দাহারের অধিবাসী ছিলেন। তাই যদি হয় তবে আমি বলবো এ ক্ষেত্রে তোমার একটু ভুল হচ্ছে। কারণ প্রাচীন গান্ধার কিংবা বর্তমান কান্দাহার—এ দুটোর একটাও ভারতের ভৌগলিক সীমারেখার ভেতরে নয়। ওটা আফগানিস্তানের একটি শহর। তবে তুমি ভারতীয় হলে কি করে?

এঞ্জেলা অসিহষ্ণু কণ্ঠে জবাব দিল, আমি জানি এ প্রশ্ন আপনি তুলবেন। আমার দিক থেকে আমার বক্তব্য এই যে বর্তমান কান্দাহার ভারতের অংশ না হলেও প্রাচীন গান্ধার বৃহত্তর ভারতের অংগ ছিল। আপনি ত জানেন, মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারীকে ভারতীয় আর্যকন্যা নামেই পরিচিত করিয়েছিলেন যদিও তিনি গান্ধারের রাজকন্যা ছিলেন। তার কারণ তখনকার দিনে গোটা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গান্ধার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজ কান্দাহার ভারতের ভৌগলিক সীমার বাইরে—একথা সত্যি। কিন্তু আফগানিস্তান একদিন ভারতের জ্ঞানচিন্তা অধ্যাত্মচিন্তা আর সমাজচিন্তার শরিক হয়েছিল। হিন্দুধর্মের প্রভাব ছাড়াও বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে সমস্ত এশিয়া যখন ভেসে গেল সেই বন্যায় আফগানিস্তানও প্লাবিত হয়েছিল। এক অপূর্ব ভাস্কর্যের অভ্যুত্থান হয়েছিল গান্ধারে ঐ যুগে। বর্তমান আফগানিস্তান ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলেও ভারতীয় সনাতন সভ্যতার প্রভাব সেদেশে এখনও বিদ্যমান।

এঞ্জেলার যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য তা জানি না। তবে এ-নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাইলাম না। কারো ঐকান্তিক বিশ্বাসে ঘা দিয়ে কি হবে? ওকে খুসি করার জন্যে বললাম, তোমার কথা সবই মেনে নিলাম। এখন থেকে তোমাকে নিবেদিতা বলেই ডাকবো।

নিবেদিতা যেন আনন্দে অধৈর্য হয়ে বললো, তাহলে আমাকে আপনি আপনারই দেশের একটি মেয়ে বলে স্বীকার করে নিলেন।

আমি কপট বিনয়ের সঙ্গে ঘাড় কাৎ করে বললাম, নিলাম।

কি করে, কখন এবং কিভাবে নিবেদিতা ওর প্রমাতামহের জন্মভূমি আবিস্কার করেছিল তা আমি ওকে আর জিজ্ঞাসা করলাম না। তবে সংশয়ের একটা কাঁটা মাঝে মাঝে

আমাকে খোঁচা দিত। নিবেদিতার দৈহিক গঠন থেকেও স্পষ্ট কিছু বুঝা যেত না। একদিকে ওর হরিদ্রাভ গায়ের রং দীর্ঘ-পক্ষ্মবিশিষ্ট আয়ত দুটি কালো চোখ, কলমের সূক্ষ্ম আঁচড়ের মত বাঁকা ভ্রূযুগল আর বাঙ্গালী মেয়েদের মত কোমর ছোঁয়া ঘন-কৃষ্ণ কেশদাম, আর অন্যদিকে গ্রীক-ভাস্কর্যের নিদর্শনের মত লীলায়িত বঙ্কিম গ্রীবা, উন্নত নাসিকা, রক্তাভ কর্ণমূল, যার সব মিলিয়ে এক অপরূপ মুখশ্রী আমাকে মতামতের কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে দেয়নি।

নিবেদিতার সঙ্গে আমার পরিচয়টা আকস্মিক। করদোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে 'হেরিটেজ অব এশিয়া' সম্পর্কে সপ্তাহব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্যে আহূত হয়েছিলাম। আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম যেদিন সেদিন সন্ধ্যায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একটি মেয়ে অপূর্ব জীপসীনাচ দেখালো। এই ভবঘুরেদের জীবনের যা-কিছু সুখ, আনন্দ, জীবন যৌবনের বাধা-বন্ধনহীন উচ্ছলতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর বিষাদময়তা এই মেয়েটির নাচের মধ্য দিয়ে যেন কথা বলে উঠলো। কি অপরূপ লীলায়িত দেহ ভঙ্গিমা কি বলিষ্ঠ উদ্দাম হস্তপদ সঞ্চারণ, কি সকরুণ চোখের সজল দৃষ্টি আমাকে যেন এক মোহাচ্ছন্ন জগত থেকে অন্য এক আচ্ছন্নতার রসে ডুবিয়ে দিল। এক সময় মেয়েটির নাচ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আমি যেন এক অব্যক্ত আবেশে অনেকক্ষণ দর্শকের আসনে বসে রইলাম।

পরদিন সকালে করদোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দোলজির অধ্যাপক তাঁর দুটি ছাত্রী নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। অধ্যাপক আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি পোলিশ পিতামাতার সন্তান আর মেয়ে দুটিকে দেখিয়ে বললেন, এর নাম নিবেদিতা গান্ধারী আর অপরটির নাম রোমারিও মালভেরদা।

অধ্যাপকের মুখে প্রথম মেয়েটির ভারতীয় নাম শুনে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। মনে মনে বললাম, ভারতীয় মেয়ের কি এত রূপ হয়? নিবেদিতার পরনে হালকা গোলাপী রংয়ের স্কার্ট, গায়ে ঘন-নীল ব্লাউজ। জরির ফিতে দিয়ে জড়ানো বিলম্বিত দীর্ঘবেণী, হাতে সরুতারের সোনার বালা, প্রসাধনবিহীন উজ্জ্বল মুখে অতসীফুলের বর্ণাভা।

সংশয়াক্রান্ত কণ্ঠে নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ভারতীয়? কই, এখানে মানে এই শহরে ভারতীয় বলে কেউ আছে বলে ত' আমার জানা নেই।

নিবেদিতা হেসে হেসে বললো, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমি ভারতীয় নই, আমি জিপসী।

কৌতূহল এবার সংশয়ের জায়গা দখল করলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি জীপসী?

নিবেদিতা আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, হ্যাঁ, জীপসী। কেন, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। কাল রাতে একটি মেয়ের জীপসী নাচ দেখেননি? বলুন ত সেই মেয়েটি কে?

আমি বললাম, তুমিই সেই মেয়ে? আমি গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করছি তোমার নাচ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। জীপসী নাচ এই আমি প্রথম দেখলাম।

কৌতুক করার ইচ্ছায় এবার মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যদি জীপসী হও তবে নিশ্চয়ই হাত দেখতে জানো।

নিবেদিতা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, বিলক্ষণ জানি। কই, দেখি আপনার হাত। এই বলে নিবেদিতা ওর হাত বাড়িয়ে দিল।

ওর আহ্বানে আমি অবশ্য সাড়া দিলাম না। একজন বিদেশী সম্মানিত অধ্যাপকের সামনে তারই ছাত্রীর ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

আমি বললাম, আমার হাত দেখে আর কি হবে। ভাগ্যে যা হবার ছিল তাত হয়েই গেছে। ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহ আমার আর নেই। তবে এ বিষয়ে তোমার অধ্যাপকের হয়ত কৌতূহল আছে। ইচ্ছে হলে তাঁর হাত দেখ।

অধ্যাপক হেসে বললেন, না। তার আজ প্রয়োজন হবে না। তবে একথা আমি বলতে বাধ্য যে নিবেদিতা খুব ভালো পামিস্ট। ইজিপসিয়ান আর ভারতীয় সামুদ্রিক বিদ্যা ও মন্দ শেখেনি।

জিজ্ঞাসা করলাম, ভারতে না গিয়ে?

অধ্যাপক বললেন, নিবেদিতা ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্যে খুব ব্যস্ত। ও এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষ দেখেনি।

নিবেদিতার প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার অধ্যাপকের আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার কারণ জানতে চাইলাম; তিনি জানালেন যে ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভারত ভ্রমণের জন্যে আমন্ত্রণ করেছেন। এই ভ্রমণ সম্পর্কে তিনি কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চান। তিনি আমার কাছ থেকে জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিয়ে বিদায় নিলেন।

অধ্যাপক চলে যাওয়ার পর মেয়েদুটিকে জিজ্ঞাসা করলাম এবার তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য বল।

নিবেদিতা বললো, উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে তবে আজ তা আপনাকে বলতে চাই না। যথা সময়ে আপনাকে তা জানাবো। আর আমার বন্ধু রোমারিওর বোধ করি কিছু প্রয়োজন নেই। ও শুধু আমার সঙ্গে এসেছে আপনাকে দেখতে। আপনার বক্তৃতা ওর খুব ভালো লেগেছে।

আমি বললাম, সে আমার সৌভাগ্য।

এর পর যুগপৎ কৌতূহল আর সংশয় নিবৃত্তির আশায় নিবেদিতাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি সত্যই ভারতীয়?

আমার প্রশ্ন শুনে নিবেদিতা একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

তারপর বললো, হ্যাঁ, আমি ভারতকন্যা।

জিজ্ঞেস করতে হলো, তোমার বাবামা কোথায়? তাঁরা কি ভারতবর্ষে থাকেন?

নিবেদিতা বললো, না, তাঁরা এখানেই থাকেন।

আমার অজ্ঞতার জন্যে লজ্জিত হয়ে বললাম, দেখ তোমরা একঘর ভারতীয় পরিবার এখানে আছো, অথচ আমি তা জানিনা। তুমি যদি তোমার বাবার নাম আর তোমাদের বাড়ীর টেলিফোন নম্বর আমাকে বল তবে এখুনি আমি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করে নেব।

আমার ইচ্ছায় কোনরকম উৎসাহ না দেখিয়ে নিবেদিতা শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললো, আমার বাবা মা ভারতীয় কিনা তা আমি জানিনা। তবে এটুকু জেনে রাখুন যে, আমি আপনাদের দেশেরই মেয়ে।

নিবেদিতার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কোথাও কিছু একটা গোলমাল জট পাকিয়ে আছে মনে করে নিবেদিতাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

কিছুক্ষণ পর মেয়ে দুটি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সেদিন রাতে আমি ও বুয়োনাস আইরেসে ফিরে এলাম। ট্রেনে আসতে আসতে নিবেদিতা গান্ধারীর কথা ভাবছিলাম। নিজের নাম বদলে ভারতীয় নাম রাখা, একটা ক্ষীণ সূত্রকে আঁকড়ে ধরে নিজেকে ভারতকন্যা বলে পরিচয় দেওয়ার মধ্যে কতটা প্রত্যয় আর কতটা অর্থহীন রোমান্টিকতা তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। মেয়েটিকে যেন বেশ রহস্যময়ী মনে হল।

এক সপ্তাহ বোধকরি পেরোয়নি নিবেদিতার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে এক দীর্ঘ পত্র পেলাম। চিঠির শেষের দিকে আমার সম্পর্কে একটা উদ্বেগের উল্লেখে আমি একটু বিস্মিত হলাম। ও লিখেছে সেদিন আমি আপনার হাতের রেখা দেখতে চেয়েছিলাম। ছেলেমানুষী করছি বলে আপনি হাতটা আমাকে দেখালেন না। আমি জীপসী নই, কিন্তু এখানকার জীপসীদের কাছ থেকে ওদের জ্যোতিষবিদ্যা কিছুটা আয়ত্ত করেছিলাম। আমি কপালের রেখা বিচার করতে পারি। সেদিন আপনার কপাল দেখে আমি বুঝেছিলাম আপনি এক মানসিক উৎকণ্ঠা রোগে ভুগছেন। অথচ আপনার উৎকণ্ঠার কোন কারণ আমি খুঁজে পাইনি। এর পর আমাকে রোগমুক্তির নানা উপদেশ।

এক বিদেশিনীর এই অকারণ উদ্বেগের আমি কি উত্তর দেব। চিঠিটা একটা সাদামাঠা উত্তর দিয়ে কর্তব্য পালন করলাম।

কয়েক মাস পর আবার করদোবা যেতে হল। নিবেদিতাকে প্রথম [illegible]

একরকম ছুটতে ছুটতে এসেছেন ওদের হাজির। ওর হন্তদন্ত ভাব দেখে বললাম, এত তাড়াহুড়ো করে এখনিই আসবার কি দরকার ছিল। আমি ত আজই পালাচ্ছি না, ধীরে সুস্থে এলেই পারতে।

নিবেদিতা বললো, বিশ্বাস করুন কদিন থেকে আপনাকে দেখবার জন্যে ছটফট করছিলাম।

নিবেদিতার কথা শুনে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর হেসে বললাম, সে কি তুমি আমাকে দেখবার জন্যে ছটফট করছিলে? এটা কিন্তু বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

নিবেদিতাও হেসে ফেললো, বললো, না, না, আমি আপনার প্রেমে পড়িনি। ছটফটানি সেজন্যে নয়। জানেন, কদিন থেকে আমার কেবলি মনে হচ্ছিল যে, আপনার একটা কিছু বিপদ ঘটেছে। আমি ঈশ্বরের কাছে বারবার প্রার্থনা জানিয়েছি, তিনি যেন সমূহ দুর্বিপাক থেকে আপনাকে রক্ষা করেন।

আমি বললাম, মানুষের বিপদ আপদ ত তাকে অনুক্ষণ ছায়ার মত অনুসরণ করছে, সেজন্যে অতটা উতলা হলে কি চলে। তাছাড়া নিজের এবং নিকটতম আত্মীয়বন্ধুদের শুভাশুভ চিন্তা নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকি। আমিত বলতে গেলে তোমার কাছে এখনও একজন আগন্তুক। আমাদের এই স্বল্প পরিচয়ে আমার ভালো-মন্দ ভেবে তুমি উৎকণ্ঠিত হবে এটা বিশ্বাস করা একটু কঠিন নয় নাকি? যাই হোক, বিপদ আমার কিছু হয়নি, ভালোই আছি। তবে পেটের পীড়ায় কিছুদিন থেকে একটু কষ্ট পাচ্ছি। আলসার হয়েছে বলে ডাক্তার সন্দেহ করছেন।

নিবেদিতা একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে বললো, তবেই দেখুন, আমি যা ভেবেছি ঠিক তাই হয়েছে। আপনার কপালের রেখা দেখেই সেদিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনার একটা কিছু হবে।

আমি বললাম, এসব নিয়ে ভেবে কিছু লাভ নেই। এ যুগের মানুষের আলসার টালসার একটা কিছু হবেই। তার জন্যে জ্যোতিষের সাহায্য নেবার দরকার হয় না। জানত একজন আমেরিকান ঔপন্যাসিক বলেছেন যে, মানুষ যদি এই জটিল পৃথিবীতে দেহের এবং মনের সুস্থতা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় তবে তাকে একটা মেশিন হতে হবে। কারণ মেশিনের আলসার হয় না, হার্ট এ্যাটাকও হয় না। তাই আমরা যতদিন না হৃদয়হীন, অনুভূতিহীন, প্রেম-ভালোবাসাহীন মেশিনে পরিণত হচ্ছি, ততদিন আধিভৌতিক রোগগুলো আমাদের হবেই। ও নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই নিবেদিতা।

নিবেদিতা আমার কথাগুলো বোধকরি মেনে নিতে পারলো না। চট করে বলে উঠলো, আপনার কথাগুলো আমি মেনে নিতে পারলাম না। কারণ মনের প্রশান্তির জন্যে আর নিরোগ দেহের জন্য মানুষকে নির্জীব পদার্থে পরিণত হওয়ার প্রয়োজন নেই যদি আমরা ভাগবত গীতার নির্দেশ মেনে চলি।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ভাগবত গীতা পড়েছো।

সলজ্জকণ্ঠে নিবেদিতা বললে, মূল সংস্কৃতে পড়িনি। ক্রিস্টোফার ঈশারউডের গীতার ইংরেজি অনুবাদ 'দি সং অব গড' পড়েছি।

জিজ্ঞেস করলাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশগুলো তুমি মান?

নিবেদিতা সহজ গলায় বললো, তাঁর সব কথা ত আমি ঠিক বুঝতে পারি না, তবে তাঁর উপদেশাবলীর সিকি ভাগও আমরা মেনে চলতে পারতাম, তবে এই উন্মত্ত পৃথিবীর আত্মহননের 'র‍্যাট রেস' বোধকরি বন্ধ হয়ে যেত। জীবনের জ্ঞানসূর্য হয়ত বা মানুষের বর্বরতার কালিমায় এমন নিস্প্রভ হয়ে থাকতো না। জীবনে কিছুটা আনন্দের সন্ধান হয়ত বা আমরা পেতাম। যাক সে কথা। এবার এখানে আপনার কর্মসূচী কি তা বলুন।

আমি বললাম, এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু কিছু বই উপহার দিতে হবে। আর এই প্রদেশের এখানে ওখানে যে কজন ভারতবাসী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের একটু খোঁজখবর করতে হবে। তারপর বুয়েনাস আইরেসে ফিরবার পথে বিশ্ববিশ্রুত লা পাম্পার বিস্তৃত তৃণভূমি দেখে যাবার ইচ্ছে আছে।

নিবেদিতা লাফিয়ে উঠে অধৈর্যের সঙ্গে বলে উঠলো, যাবেন আপনি লা পাম্পা দেখতে? সে এক অতি রমণীয় স্থান। আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।

আমি সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

নিবেদিতা অসঙ্কোচে বললো, বিশ্বাস করলেন নাত? আমি সত্যি বলছি আপনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমি নিশ্চয়ই যাবো। এখন বলুন আপনি নিয়ে যাবেন কিনা?

নিবেদিতার ব্যস্তভাব দেখে আমি হেসে ফেললাম। কিন্তু হাসি থামিয়ে কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললাম, তুমি ত এখনও ভালো করে আমাকে চেননা, জাননা। আমার সঙ্গে একত্র ভ্রমণ করতে, এক হোটেলে পাশাপাশি কামরায় থাকতে তোমার ভয় করবে না?

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, আপনি ভাবছেন আপনাকে আমি জানিনা। আপনাকে আমি ভালো করেই জেনেছি। জিপসী বিদ্যা ত এমনি এমনি শিখিনি। আর ভয়ের কথা কি যেন বললেন না! ঐ ভয়টয়গুলো আমার আর বড় নেই। আর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, আপনাকে আমি জানিনা, অন্ততপক্ষে নিজেকে ত জানি। এ ছাড়া আরো একটা কথা আপনাকে আমি বলতে চাই। এই এক্কুশ বছর বয়েস পর্যন্ত এই দেহটাকে কেউ কলুষিত করতে পারেনি। এতদিন অনেকের লোভের দাঁত আর থাবা থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছি। তবে চিরকাল যে পারবো না তাও জানি।

নিবেদিতা কথা বন্ধ করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, কই দেখি আপনার আঙুলগুলো। নখগুলোর ধার কতটা তীক্ষ্ন একবার দেখিনি।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, ও দেখে আর কি হবে, আমি এখন গলিত নখনয়ন জরদ্গব। তবে কি জানো আগুন নিয়ে খেলা বিপজ্জনক। যে কোন মুহূর্তে অগ্নিকান্ডের সম্ভাবনা। আমাদের দেশের অনেক মুনি ঋষি ক্ষণিকের মোহে অতি বড় লোভের শিকার হয়েছে। আমি ত একটা সাধারণ মানুষ।

নিবেদিতা বললো, দেখুন, ক্ষণিকের অসাবধানতায় অনেক বিপর্যয় ঘটে একথা সত্যি। কিন্তু সারা দুনিয়া জুড়ে আপনি আজ কি দেখছেন। কয়েকটা মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এই সুদূর আর্জেন্টিনায় এসেছেন। ইয়োরোপ, আফ্রিকাও আপনার দেখা হয়েছে। তাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আপনার নিশ্চয়ই আছে। আপনিত জানেন 'লিবারেসন অব সেকস' আর পারমিসিভ সোসাইটির দৌলতে নরনারীর দাম্পত্য আর পারিবারিক জীবনে কি ভয়ানক দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। কতশত পরিবারে প্রতিদিন কি দুঃখজনক বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হচ্ছে আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে শুধু যে কতকগুলো জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই নয়, সমাজের ভিত পর্যন্ত আজ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। প্রেমপ্রীতি রসহীন মানবচিত্ত আজ নরনারীর মধ্যে কেবল একটি সম্পর্কেই স্বীকার করে, আর তা হল যৌনসম্পর্ক। আমাদের সমাজ একে মেনে নিয়েছে এক বৈজ্ঞানিক সত্য বলে। কিন্তু এই যৌথ স্বাধীনতার দাপটে মানুষের ব্যক্তিগত সুখশান্তি যদি জলাঞ্জলী দিতে হয় এবং ব্যাভিচার আর বেহায়াপনা যদি বুমেরাং-এর মতন ফিরে ফিরে এসে সেই যৌবনকেই লাঞ্ছিত করে তবে মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তির নীড় কথাটা কি শুধু মাত্র একটা সুখস্বপ্ন হয়েই থাকবে?

নিবেদিতা তার বিষণ্ণ চোখ দুটি আমার মুখের উপর ন্যস্ত করে বললো, আমার এই অল্পবয়সেই আমার চারিদিকে শত শত ভগ্নহৃদয় আর নষ্টনীড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখে দেখে আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছি। কি করে এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাবো, কি করে এক বলিষ্ঠ হৃদয় পুরুষের কাছে আমার ইহকাল আর পরকাল সঁপে দিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে এই পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়াবো তাই আমি অহোরাত্র চিন্তা করছি। মাঝে মাঝে পথের নিশানা যেন মনের মধ্যে একটা ঝলক দিয়ে যায় কিন্তু পরক্ষণেই আলোকের সেই রশ্মিটুকু সূচিভেদ্য অন্ধকারে মিলিয়ে

যায়। বলতে পারেন কোথায় আমায় পথ আর কে তা আমায় দেখিয়ে দেবে।

আমি বললাম, আমি ত জানিনা তোমার পথ কি। তবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে পারি 'পথ আমাকে পথ দেখাবে'। আর সেই পথ ত তোমার নিজেকেই তৈরী করে নিতে হবে, নির্বেদিতা।

আমার কথা নির্বেদিতার কানে গেল কিনা বুঝলাম না। খানিকটা স্বগতোক্তির মত ও বললো, পথ জানি আর নাই জানি, কিন্তু পথে আমাকে বেরুতে হবেই। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আমি মরতে চাই না। যে সমাজ যার সব কিছুর মূল্যবোধ হারিয়েছে তা থেকে আমাকে মুক্তি পেতে হবে।

এ কথাগুলো বলে নির্বেদিতা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। তারপর সে তার বিশাল চোখ দুটি আমার মুখের উপর ন্যস্ত করে বললো, যে ইচ্ছাটা এতদিন ছিল কিছুটা এলোমেলো, কিছুটা অসচ্ছ, সকল আবরণ সরে গিয়ে একটি আলোক বিন্দু আমি আজ যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই আলোক বিন্দুটিতে লক্ষ্যস্থির রেখে আমাকে পথ চলতে হবে, এর মধ্যে আর কোন দ্বিধা দ্বন্দ্বকে আজ আর মাথা তুলতে দেব না।

নির্বেদিতার কথাগুলো আমি যেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। তাই দ্বিধাভরে নির্বেদিতাকে প্রশ্ন করলাম, তোমার ধ্যান-ধারণার মধ্যে হিপিদর্শনের কোন মিল আসে কি?

আমার বোধশক্তির উপর যেন একটা নির্মম কটাক্ষ হেনে নির্বেদিতা বললো, হা আমার পোড়াকপাল। আমার কথার মধ্যে হিপিদের মত ছাড়ার যুক্তি আপনি কোথায় পেলেন? বুঝতে পারছিলাম আমার চিন্তা-ধারাটা একটু বেলাইনে গিয়ে পড়ছে। তবুও আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা শেষ চেষ্টা করে বললাম, কেন নয়? তোমার মত হিপিরাও বর্তমান সভ্যতা আর সমাজব্যবস্থা মানুষের ভবিষ্যতের উপর সকল আস্থা হারিয়ে পথে বেরিয়ে এসেছে। আর সেই সভ্যতার সকল মূল্যবোধকে দু পায়ে দলে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে বেছে নিয়েছে মেকি দারিদ্র আর কিছু কিছু কদাচার।

নির্বেদিতা হেসে ফেললো। বললো, এই দেখুন আপনার কথাতেই আপনি ধরা পড়ে গেলেন। আমি দারিদ্র্যের ভেক পরতেও রাজী নই যার কদাচারী হয়ে জীবনে কি সুখ পাবো বলুন? ওরা এক কদর্যতাকে এড়াতে গিয়ে আর এক কদর্যতাকে বেছে নিল বুদ্ধির এত বড় অপপ্রয়োগ আর কি হতে পারে। বলুন, ওদের চোখে এই ধ্বংসাত্মক ভুলটা আজ ধরা পড়ছে না বটে কিন্তু মোহমুক্তি ওদের একদিন হবেই, আর সেদিন ওদের একূল ওকূল দুকূলই অন্ধকার হয়ে যাবে। কিন্তু আমার ত সে পথ নয়। আমি এমন এক জায়গায় আমার ঘর বাঁধতে চাই যেখানে আমার সন্তানদের [illegible] মত বাপমার জারজ সন্তান বলে সমাজ কিংবা স্টেটের কাছে পরিচয় দিতে হবে না। এ যে কতবড় লজ্জা আর কত বড় ঘৃণা তা আপনি বুঝতে পারবেন না। এই বলে নির্বেদিতা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

নির্বেদিতার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মৃদুকণ্ঠে বললাম, এ তুমি কি বলছো, নির্বেদিতা? তোমার মা বাবার কি আইনসঙ্গত বিয়ে হয়নি।

কান্না থামিয়ে নির্বেদিতা বললো, না হয়নি। স্বামীস্ত্রী হিসেবে তাঁরা একই গৃহে বসবাস করলেও আইনের চোখে তাঁরা স্বামীস্ত্রী নন। আমি আর আমার ছোটবোন আজ সকল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। যতদিন না আমাদের বিয়ে হয় আমরা সে অধিকার পাবো না।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাবা মার যে বিয়ে হয়নি তা তুমি জানলে কি করে?

নির্বেদিতা বললো, অনেকদিন পর্যন্ত আমি কিছুই জানতাম না। বছর দু-এক হল জেনেছি। এখানকার এক কালচারাল ট্রুপ উত্তর আমেরিকা পর্যটনে যাচ্ছিল। ত্রীপসী নাচের জন্য আমিও ঐ দলভুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু আমার পাশপোর্ট হলো না। বিদেশ মন্ত্রক আমার পাশপোর্টের আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করে দিল এ কারণে যে, আমি এ দেশের আইনানুগ নাগরিক নই।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাবা কিংবা মাকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করনি?

মাথা নিচু করে নির্বেদিতা বললো, না করিনি। বাপমার কলঙ্কের কথা সন্তানের নিজের কানে শোনা কি উচিত? আর রুচিবোধ বলে একটা বস্তুত পৃথিবী থেকে এখনও লোপ পায়নি। তাই চুপ করেই আছি। তা ছাড়া আমি আমার বাবাকে খুব ভালোবাসি, কোন কারণেই তাঁর মনে আমি কোন আঘাত দিতে চাই না।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর এক সময় নির্বেদিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করলে এ দেশে তুমি তোমার নাগরিক অধিকার পেতে পারো?

নির্বেদিতা বললো, পূর্ণ নাগরিক অধিকারপ্রাপ্ত এ দেশের কোন লোককে বিয়ে করলেই তা সম্ভব।

বললাম, সেত খুব কঠিন ব্যাপার নয়। তোমার আয়ত্তের মধ্যেই রয়েছে।

নির্বেদিতা বললো, সে কথা ঠিক, তবে এদেশে আমার বিয়ে হবে না।

জিজ্ঞেস করলা, কোথায় হবে তা হলে?

নির্বেদিতা হেসে বললো, তা আমিও জানি না। তবে এ দেশে যে নয় তা আপনাকে নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি। তা বিয়ের কথা এখন থাক। একটু আগেই আপনাকে বলেছিলাম যে, আমার মনকে ত আমি জানি। আর তা জানি বলেই আপনাকে আমি বলতে পারি যে, আমার অনাগত ভবিষ্যতই বলুন কিংবা আমার নিয়তিই বলুন আমাকে যেন এখান থেকে কেউ যেন সবলে অন্য কোথাও টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যেতে চাও তুমি।

নির্বেদিতা তার ডান হাতের আঙুল-গুলো বাঁ হাতের চেটোর মধ্যে চেপে ধরে বললো, যাবার মত দেশত একটিই আছে।

বুঝতে পারছিলাম নির্বেদিতা কি বলতে চায়। তবু প্রশ্ন করলাম, কোন সে দেশ?

নির্বেদিতার গলা ভারী হয়ে উঠলো। গম্ভীরভাবে বললো, আমার মাতৃভূমিতেই আমি যেতে চাই।

জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়, কান্দাহারে?

একটা কটাক্ষ হেনে ও বললো, না কান্দাহারে নয়, ভারতবর্ষে

জিজ্ঞেস করলাম, সেখানে গিয়ে তুমি কি পাবে?

নির্বেদিতা হাসতে হাসতে বললো, সেখানে গিয়ে সত্যিকার যদি কিছু পাই তবে তার সংবাদটা আপনার কাছে গোপন করবো না।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলো। তারপর কেমন একটা অসহায় মিনতির সুরে বললো, দিন না ভারতবর্ষে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে।

আমি বললাম, এ দেশ থেকে বাইরে যাওয়ার ছাড়পত্রই যদি না পাও ত আমার দেশে যাবে কেমন করে?

কণ্ঠে একটা দাবীর সুর মিশিয়ে নির্বেদিতা বললো, আমার যাওয়ার ব্যবস্থা যদি করে দিতে পারেন ত পাশপোর্ট যাতে পাই সে ব্যবস্থাও আপনাকেই করতে হবে।

আমি বললাম, তা কি করে সম্ভব। তুমি ভিন্ন দেশের নাগরিক, তোমার পাশ-পোর্ট পাওয়ার জন্যে তোমার জন্যে ওকালতি করলে বিদেশ মন্ত্রকের কর্তাব্যক্তিরা তা ভাল মনে নাও নিতে পারেন।

নির্বেদিতা বললো, অতশত আমি বুঝি না। একটা কিছু না করলে যে চলবে না, তাত বুঝতেই পারছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কত দিনের জন্যে তুমি ভারতবর্ষে যেতে চাও। আর গিয়েই বা কি করবে তার কিছু ঠিক করেছ?

দেখলাম ওর প্ল্যান প্রোগ্রাম ইতিপূর্বেই প্রস্তুত হয়ে আছে। ও বললো, আমি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বো আর কোন নামজাদা শিক্ষকের কাছে কথকনাচ শিখবো।

নির্বেদিতাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম যে তার ভারতবর্ষে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রত্যক্ষ কোন হাত নেই। তবে ওকে একথা বললাম যে তোমার ইচ্ছের কথা আমার মনে থাকবে।

নির্বেদিতা শান্তকণ্ঠে বললো, আপনার

কাছে আমি কোন প্রতিশ্রুতি চাইনে। আপনি যদি আমার এই ঐকান্তিক বাসনার কথাটা মনে রাখেন তবেই নিজেকে ধন্য মনে করবো।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি সত্যিই আমার সঙ্গে লা পাম্পা দেখতে যাবে?

নিবেদিতা একটু চিন্তা করে বললো, না, থাক, অন্য কোন সময়ে সুযোগ-সুবিধে হলে হয়ত যেতে পারবো।

এ প্রসঙ্গ আর দীর্ঘ করলাম না। নিবেদিতা আমাকে তাদের বাড়িতে নৈশাহারের নিমন্ত্রণ জানিয়ে চলে গেল।

নিবেদিতা চলে যাওয়ার পর ওর পিতামাতার সম্পর্কের কথাটা আমাকে কাঁটার মত বিঁধতে লাগলো। নিবেদিতা তার পিতামাতার জারজ সন্তান। মনে হল নিবেদিতা তার জন্মের এই গ্লানিকর অধ্যায়টাকে ভুলে যাওয়ার জন্যেই চিরদিনের মত দেশত্যাগী হতে চায়। অথচ এই ভেবে একটু আশ্চর্য হলাম যে পিতামাতার বিরুদ্ধে ওর কোন নালিশ নেই। কিন্তু কি জানি কেন আমি ওর বাপ-মার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম। বিবাহবন্ধনে নিজেদের দাম্পত্যজীবনকে শুচিময় করে তুলতে ওদের কি বাধা ছিল? কেন তারা তাদের পিতৃমাতৃপরিবার থেকে নিজেদের সন্তানদের বঞ্চিত করলো। কেন তাদের নিষ্পাপ কন্যা জীবনে সামাজিক মর্যাদা পেল না। কেন তারা জন্ম থেকেই সমাজের উপহাসের পাত্র হয়ে রইলো। কেন তারা আজীবন তাদের পিতামাতার ব্যাভিচারের অভিশাপ বয়ে বেড়াবে। ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে নিবেদিতার বাপমাকে এ সকল প্রশ্ন করি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল নিবেদিতা যদি জারজ সন্তান হয়, তাতে আমার কি? সংসারে নিবেদিতা একমাত্র অবৈধ সন্তান নয়। তাদের নিয়ে ত' আমার কোন মাথাব্যথা নেই। তবে নিবেদিতার অদৃষ্ট নিয়ে আমার দুঃশ্চিন্তার প্রয়োজন কি? কাজেই এসব চিন্তা আপাতত স্থগিত রেখে বাইরের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যার পর নিবেদিতার বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। এক প্রৌঢ় সুশ্রী ভদ্রলোক আর এক সুলাঙ্গী মহিলা আমাকে স্বাগত জানালেন। এদের পরিচয় দিয়ে নিবেদিতা বললো, আমার বাবা-মা। বারো তেরো বছরের একটি কিশোরীকে দেখতে পেলাম। নিবেদিতা বললো, আমার বোন তিয়ারা।

আমরা সকলে ওদের সিটিংরুমে এসে বসলাম। নিবেদিতার বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আর্জেন্টিনায় কতদিন আছেন। এদেশ আপনার কেমন লাগছে। স্পানীশভাষা বলতে পারেন কি? আমি বললাম, আপানদের দেশ সত্যিই অপূর্ব। এ যেন প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া তার লীলাক্ষেত্র। এ দেশের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে আকাশচুম্বী আন্ডেস পর্বতমালা কি অপরূপ উপত্যকা সৃষ্টি করেছে, আর এর পূর্বাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের বিস্তৃত শ্যামল প্রান্তর সবুজের সুষমায় সবকিছু ঢেকে রেখেছে। এর দক্ষিণ ভূখণ্ডের পাটাগোনিয়া অঞ্চলে চিরতুষারের শুভ্রাম্বর ধারণ করে প্রকৃতি যেন মহাবৈরাগীর মত তপোমগ্ন হয়ে আছে। ফলে জলে শস্যে এ এক অপূর্ব সমৃদ্ধ দেশ। এর বিস্তৃত গোচারণ ভূমি। মেষপালনের জন্যে অবারিত উদার তৃণাঞ্চল, এর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে বহুযোজন বিস্তৃত মিষ্টি ফলের বাগান, আর অপেক্ষাকৃত উষ্ণাঞ্চলে নানাবিধ ফসলের প্রাচুর্য এই দেশকে যেন লক্ষ্মীর চিরস্থায়ী আসন করে রেখেছে। আর ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশ থেকে যুগে যুগে স্থায়ীবসবাসকামী মানুষ এসে এই দেশকে বহুধর্মবিচিত্র এক মিশ্র সংস্কৃতির ইমারত গড়েছে।

নিবেদিতার বাবা আমার মুখে তার দেশের প্রশস্তি শুনে বোধকরি খুশী হলেন। বললেন, এজেলার মুখে শুনেছি আপনার দেশও নাকি সুন্দর আর তার সভ্যতাও বহু প্রাচীন।

আমাদের আলাপচারীর সময় নিবেদিতাকে দেখতে পেলাম না। কিছুক্ষণ পর তিয়ারা এসে বললো, দিদি আপনাদের ঐ পাশের ঘরে যেতে বললেন।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখলাম নিবেদিতা জীপসী নাচের পোষাক পরে প্রস্তুত হয়ে আছে। আমরা সকলে বসতেই রেকর্ডে জীপসী নৃত্যসঙ্গীত বেজে উঠলো আর নিবেদিতা তার নৃত্যানুষ্ঠান শুরু করলো।

এ সেই নাচ, যা দেখলে দেহের শিরা উপশিরায় রক্তস্রোত টগবগ করে ফুটতে থাকে। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট সেই উদ্দাম নৃত্য দেখলাম। নিবেদিতা ক্লান্ত হয়ে একটা শোফার উপর বসে পড়লো। আমরা সকলে ওর নৃত্য কুশলতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলাম। নিবেদিতা সলজ্জ ভঙ্গিমায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ঘর ছেড়ে চলে গেল। এরপর আহার সমাধা করে নিমন্ত্রণের জন্য নিবেদিতার বাবা আর মাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম নিবেদিতাও আমার সঙ্গে এলো।

পথে যেতে যেতে বললাম, তোমার জীপসীনাচ সত্যিই অপূর্ব। আমি যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি।

নিবেদিতা বিনয়ের কণ্ঠে বললো, আপনি আমার নাচ দেখতে ভালোবাসেন তাই নাচলাম। নতুবা বাড়িতে আমি বড়একটা নাচি না।

আমি বললাম, শুধু তোমার নাচ নয়, আমার ক এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তোমাকেও যেন একটু একটু করে ভালোবাসতে শুরু করেছি।

নিবেদিতা হো হো করে হেসে উঠলো। বললো, তাই নাকি ভারি আশ্চর্য ত!

আমি বললাম, নিবেদিতা, এখন তুমি আমার জন্যে কি করবে?

নিবেদিতা তেমনি হাসতে হাসতে উত্তর দিল, আপাতত কিছুই করবো না। অল্প জ্বরে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। রোগ যদি বৃদ্ধি পায় ত তখন বিবেচনা করা যাবে।

বললাম, অসুখ বাড়লে তুমি বুঝবে কি করে?

নিবেদিতা বললো, সেজন্যে আপনার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। পুরুষের ঐ রোগটা আমরা মেয়েরা চট করে ধরে ফেলতে পারি।

হেসে বললাম, তোমার কথায় আশ্চর্য হলাম। তবে আমার এই অনুরোধটুকু মনে রেখো। রোগ যদি সত্যিই সিরিয়াস হয়ে দাঁড়ায় তবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগে যাহয় একটা কিছু করো।

নিবেদিতা কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললো, আপনার অনুরোধ আমার মনে থাকবে।

দুজনেই হেসে উঠলাম। নিবেদিতার কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন বুয়েনাস আইরেস অভিমুখে যাত্রা করলাম।

পাঁচ-ছ'দিন অনুপস্থিতির পর দূতাবাসে আসতেই রাষ্ট্রদূত ডেকে পাঠালেন। রাষ্ট্রদূতের বহুবিধ গুণের মধ্যে একটি যে তিনি খুবই পরিহাসপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। সবকথা অকপটে তাঁকে বলা যেত। তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, আচ্ছা তুমি এত ঘন ঘন করদোবায় কেন যাও বলোত?

আমি বললাম, স্যার, ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে বলবো।

তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, নির্ভয়েই বল।

আমি বললাম, আমি যেজন্যে যাচ্ছি তা যদি জানতেন তবে আমার মনে হয় আমি যা করছি, আপনিও তাই করতেন।

রাষ্ট্রদূত বললেন, বটে! তবে কারণটি ব্যক্ত করে ফেল।

আমি বললাম, আমার মুখে শুনলে আপনার হয়ত বিশ্বাস হবে না। আপনি করদোবায় গিয়ে নিজেই দেখে আসুন।

রাষ্ট্রদূত বললেন, তা নয় গেলাম। কিন্তু কি দেখতেযাবো তা বলবে ত!

আমি সঙ্কোচের ভাণ করে বললাম, কারণটা এখনই আপনাকে বলতে পারবো না। তবে করদোবা টুর যদি করতে চান ত' তার আয়োজন করি।

তিনি বললেন, আচ্ছা চিন্তা করে দেখি।

মাসখানেক পর একদিন রাষ্ট্রদূত আমাকে বললেন, পরশু আমি করদোবায় যাবো। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

করদোবায় এসে নিবেদিতাকে টেলি-

ফোনে বললাম, আজ বিকেল পাঁচটায় ভিক্টোরিয়া প্লাজা হোটেলে এসো। আমাদের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো। তোমার জন্যে যদি কেউ কিছু করতে পারেন ত তিনিই পারবেন।

ভয়চকিত গলায় নিবেদিতা বললো, তাঁর সামনে যেতে আমার কিন্তু খুব ভয় হচ্ছে।

আমি বললাম, ভয়ের কি আছে। তিনি ত' আর বাঘ ভালুক নন যে তোমাকে গিলে খাবে।

নিবেদিতা বললো, না তা নয়। তবে তাঁর সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হবে এই ভেবে—

আমি বললাম, ভয়ের কিছু নেই। তিনি অত্যন্ত অমায়িক লোক। দেখা হলেই বুঝতে পারবে।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্রদূতের ঘরে এসে তাঁকে বললাম, আজ বিকেলে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। যদি অনুমতি দেন ত' সে-কথা মেয়েটিকে জানিয়ে দিই।

রাষ্ট্রদূত বললেন, উদ্দেশ্য কি?

আমি বললাম উদ্দেশ্য একটা আছে। তবে তা সেই মেয়েটির ততটা নয়, যতটা আমার। মেয়েটির সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার পর আপনাকে তা বলবো।

রাষ্ট্রদূত একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞেস করলেন, কি হে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যেন অনেকদূর গড়িয়েছে।

কপট গাম্ভীর্য দেখিয়ে বললাম, আপনার অনুমান সত্য। তবে সেটা আমার নয়। ঐ মেয়েটির।

রাষ্ট্রদূত বললেন, বুঝেছি। তা মেয়েটি কখন আসতে চায়।

বললাম, বিকেল পাঁচটায়।

নির্ধারিত সময়ে নিবেদিতাকে রাষ্ট্রদূতের ঘরে নিয়ে গেলাম। নিবেদিতাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। প্রায় আধঘন্টা পর তিনি আমাকে ডেকে বললেন, তুমি আর নিবেদিতা আজ রাত্রে আমার সঙ্গে ডিনার খাবে। মনে মনে বললাম, 'দাই প্লেসার ইজ মাই কমান্ড'।

নিবেদিতার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, তুমি আটটার মধ্যে এসো।

নিবেদিতা চলে যেতেই রাষ্ট্রদূত আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই কন্যা-রত্নটিকে আবিষ্কার করলে কেমন করে?

আমি বললাম, আমি ওকে আবিষ্কার করিনি তিনিই আমাকে আবিষ্কার করেছেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি রকম?

এর উত্তর নিবেদিতার আদ্যোপান্ত কাহিনী রাষ্ট্রদূতকে জানালাম। ধৈর্য ধরে তিনি আমার সব কথা শুনলেন। সব শুনে তিনি বললেন, এত বড়ই আশ্চর্য। একটি সুস্থমস্তিষ্কের মেয়ে কি করে এতটা ভাবপ্রবণ হতে পারে তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এই মেয়েটির মধ্যে ভারতীয়ত্ব বলতে কিছুই নেই। অথচ ওর নিজের একটা উদ্ভট কল্পনাকে বিনা দ্বিধায় প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। একে অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কি বলা যায়।

আমি বললাম, স্যার, আমার মনে হয় ওর মা-বাপের সম্পর্কটা ওর জীবনের ভিত পাকা হতে দেয়নি। তা থেকেই বোধকরি এই জটিল মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রদূত বললেন, তোমার অনুমান সত্যি হলেও হতে পারে।

তারপর তিনি মুখ ঘুরিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ মেয়েটি কি সত্যিই ভারতবর্ষে গিয়ে পড়াশোনা করতে চায়?

আমি বললাম, ওটাই ওর ইচ্ছা।

রাষ্ট্রদূত বললেন, বেশ। এদেশের সঙ্গে আমাদের কালচারাল একসচেঞ্জ প্রোগ্রামের একটা চুক্তি আছে। ওরই আওতায় মেয়েটিকে একটা স্কলারশিপের জন্যে আবেদন করতে বল। আমি রেকমেণ্ড করে দেব।

এই বলে রাষ্ট্রদূত চুপ করে বসে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালা দিয়ে বাইরের আলোকোজ্জ্বল নগরীর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, আশা করি ভারতবর্ষে গিয়ে এই মেয়ে তার নিজের দায় নিজেই বইতে পারবে।

পরদিন সকালে টেলিফোনে নিবেদিতাকে বললাম, স্কলারশিপ নিয়ে ভারতে গিয়ে তোমার পড়াশোনার বিষয় রাষ্ট্রদূতকে আমি বলেছি। তিনি তোমাকে বিধিবদ্ধভাবে আবেদন করতে বললেন আর এও বলেছেন যে তোমার জন্যে তিনি সুপারিশ করবেন।

নিবেদিতা উৎফুল্লকণ্ঠে বললো, আমার

কি সৌভাগ্য! ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি ছুটে গিয়ে তোমাকে হাজারটা চুমু খাই।

বললাম, তা তুমি করতে পার তবে ওর সব কটাই অপাত্রে পড়বে। বরংচ এ-বিষয়ে আমার রাষ্ট্রদূতের দিকে মুখ বাড়াবে কিনা ভেবে দেখো।

নিবেদিতা কপট ক্রোধ প্রকাশ করে বললো, যাও, কিযে বল তার ঠিক নেই।

নিবেদিতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদনপত্র পাঠাতে বললাম আর সেই রাত্রেই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বুয়েনাস আইরেসে ফিরে এলাম।

পাঁচসাতদিন পর নিবেদিতার আবেদনপত্র পেলাম। রাষ্ট্রদূত যথাযোগ্য সুপারিশ করে দিলেন। আবেদনপত্র দিল্লি চলে গেল।

ইতিমধ্যে অনেক মাস পার হয়ে গেছে। একদিন অফিসে বসে কাজ করছি, রাষ্ট্রদূত ডেকে পাঠালেন। তাঁর অফিসে যেতেই তিনি বললেন, শোন, লা পাম্পার একটি ছোট শহরে ব্রিডিংবুলের একটি প্রদর্শনী হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সংগঠকগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমার এখন যাওয়া হবে না। হাতে জরুরী কাজ রয়েছে। আমার হয়ে তুমি এদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এসো।

আমি বললাম, আপনার অসুবিধে থাকলে আমিই যাবো। মনে মনে ভাবলাম লা পাম্পার বিখ্যাত গোচারণভূমি দেখবার সুযোগ এতদিনে এল।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। দুপুরের কিছু পরে ঐ শহরটিতে পৌঁছান গেল। ছোট একটি মোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরদিন ব্রিডিংবুলের প্রদর্শনী দেখতে গেলাম। দেখলাম প্রায় তিনশ ষাঁড়ের সমাগম হয়েছে। প্রত্যেকটি ষাঁড় অতি বিশালকায় এবং একটিরও দৈহিক ওজন পাঁচ-ছ'মণের কম নয়। শুনলাম প্রদর্শনীর পর এই জন্তুগুলো নিলামে বিক্রয় করা হবে। আর এক-একটি ষাঁড়ের বিক্রয় মূল্য আড়াই থেকে তিনলাখ টাকা।

প্রদর্শনী থেকে মোটেলে ফিরে এসে দ্বিপ্রাহরিক আহার সমাধানের পর স্থানীয় একজন গাইড নিয়ে লা পাম্পার তৃণক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

বুয়েনাস আইরেস প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল আর রিওনেগ্রো প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রায় দু হাজার বর্গমাইল জুড়ে এই সমতল তৃণভূমি। ডাইনে বাঁয়ে সমুখে পশ্চাতে—যে দিকেই দৃষ্টি প্রসারিত হোক শুধু দেখতে পাওয়া যাবে অসীম অনন্ত এক সবুজের সমুদ্র। লাপাম্পার এই তৃণভূমির বুক জুড়ে আছে ধানজাতীয় চিরহরিৎ এক তৃণমণ্ডল। শীতে গ্রীষ্মে খরায় বাদলে এই তৃণসম্পদ অক্ষয় অমর হয়ে আবহমানকাল ধরে বেঁচে আছে। আর্জেন্টিনার সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ তার গোধন। এই গোপালনের জন্যে চাই বিরাট গোচারণভূমি। লাপাম্পার তৃণাঞ্চলে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ গরু চড়ে বেড়ায়। এক-একটি পালে দু-তিনশ গরু থাকে এবং এই গরুর পালকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে পালে আগে এবং পিছে দুজন অশ্বারোহী রাখাল প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। স্প্যানীশ ভাষায় এই রাখালদের বলা হয় 'গাউচো'।

এই গাউচোদের জীবনযাত্রা উত্তর আমেরিকার 'কাউবয়' কিংবা ভারতবর্ষের রাখালদের থেকে অনেক ভিন্ন। উত্তর আমেরিকার কাউবয়রা সাহসী, ঘোর পরিশ্রমী অত্যন্ত কলহপ্রিয়, উগ্রমেজাজী এবং অত্যাচারী। পান থেকে চুন খসলেই নিজেদের মধ্যে অবাধ গোলাগুলী বিনিময়। বিগত শতবর্ষের মধ্যে আমেরিকার সমাজ এবং ব্যক্তিগতজীবনে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। কাউবয়দের জীবনেও সেই পরি

ধর্ষনের ঢেউ এসে লেগেছে। এর ফলে তারা আজ অনেক সংযত, অনেক সহনশীল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তারা সামান্য কারণেই ধৈর্য হারিয়ে অনেক অনর্থ বাধিয়ে বসে। অনেক শোচনীয় ঘটনা এক নিমেষেই ঘটিয়ে দেয়।

আমাদের দেশের রাখালদের প্রকৃতি কাউবয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভোর হলে গরুবাছুর নিয়ে তারা মাঠে যায়। গরু ছেড়ে দিয়ে মাঠের মাঝে কিংবা গ্রামপ্রান্তে কোন এক বট কিংবা অশ্বত্থগাছের নিচে বসে হয় খেলা করে নয়ত গল্পগুজব করে সময় কাটায়। এদের চরিত্রে কোথাও কোন হিংস্রতা নেই, কোন রেষারেষি নেই, কাড়াকাড়ি করে জীবনকে ভোগ করার খ্যাপামি নেই। তার পরিবর্তে আছে গভীর মানসিক প্রশান্তি আর মাঠঘাট বৃক্ষলতার সঙ্গে আত্মিক-মিতালী। আর আছে সঙ্গীতের প্রতি সহজাত অনুরাগ। আজ ভারতের রাখাল-বালক গরু চরাতে গিয়ে বাঁশী বাজিয়ে নিজের কিংবা তার সঙ্গীদের চিত্ত বিনোদন করে কিনা তা জানি না। তবে সেই যে কোন অশ্রুত যুগে যমুনা পুলিনে আর বৃন্দাবনের বিজন বিপিনে বাঁশী বেজে উঠেছিল তার সুরলহরী আজো যেন আমরা প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে শুনতে পাই। স্বর্গের দেবতা রাখালের বেশে ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে বাঁশীর সুরে অমৃতলোকের যে সুর শুনিয়ে গেলেন, আমাদের চিত্তের বেদিমূলে প্রেমের যে বিগ্রহরূপে তিনি যেদিন অধিষ্ঠিত হলেন সেদিন থেকে চিরকালের মত আমরা বৈকুণ্ঠলোকের পথের পথিক হয়ে গেলাম।

আবার গাউচোদের জীবনযাত্রায় দেখতে পাই অন্য একটি সুর। তাঁদের হাতে বাঁশী নেই, কোমরের বেল্টে খাটো করে বাঁধা পিস্তল নেই। তারা শান্ত সমাহিত আর বিষাদময়। লা পাম্পার জনমানবহীন প্রান্তরে এদের যৌবনের স্বপ্নভরা রঙ্গীন দিনগুলো ফুলের পাপড়ির মত একটির এর একটি ঝরে যায়। জীর্ণকুটিরে নিদ্রাহীন গাউচোর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে লা পাম্পার অমানিশার রাত্রির বাতাস যখন হাহাকার করে উঠে তখন সেই সঙ্গপরশহারা বিভাবরী যেন প্রণয়নীর বিরহব্যাকুল গাউচোর ললাটে চিবুকে গন্ডে স্নিগ্ধ-করুণ করস্পর্শ দিয়ে বলে উঠে, দীর্ঘশ্বাস ফেলো না, আমিও তোমার মত নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ। এসো আমরা একে অপরের সাথী হই। তোমার আমার মধ্যে বিচ্ছেদ কেউ ঘটাতে পারবে না।

যুগ যুগ ধরে রাখাল বালক পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকসাহিত্যে এক বিরাট জায়গা জুড়ে আছে। কবি সাহিত্যিক গল্পে গাঁথায় আর সঙ্গীতে রাখালের জীবনের বিভিন্ন মুদ্রাকে প্রতিফলিত করেছেন। আর্জেন্টিনার লোকসাহিত্যেও গাউচোর জীবন নিয়ে অনেক গান, অনেক ব্যালাডের সৃষ্টি হয়েছে বিরহবিধুর গাউচো দয়িতার আহ্বানে সমস্ত প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে ঘোর রাত্রির অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে প্রিয়া মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ছুটে চলেছে। তার যতিহীন পদক্ষেপের মুহূর্তগুলোকে সঙ্গীতময় করতে আর্জেন্টিনার কবি গেয়ে উঠলেন—

ভুই কামিনান্দো মিলভান্দো ই এন
ভোনান্দোঃ
উনা কার্নসিয়ন দে সোলেদাদ
বাকোলা মুভিয়া ট্রক্সলা ই কেরেনা
কে কায়ে মি সোমা ই সে ভুয়েলবে
আ সোমার

লা লুচে মুই যিমতে মুই ত্রিমতে
ই সিরেনতো উনা টৌরিবলে সেনসানিয়ন
সেনীতিমেন্তাল
ভুই কামিনান্দো আসি, মিলডানদো
উনা কার্নসিয়ন

বাকোলা জুভিয়া ভেনট্রো দি সে কোরাসন

কবিতাটির মর্মার্থ আমি এক নিঃসঙ্গ পথিক, এই ঘোর রজনীর ঝড়-জলের মধ্যে ছুটে চলেছি। আমার পদক্ষেপ চঞ্চল বাইরের বাতাস অশান্ত কিন্তু আমার মনে এক গভীর প্রশান্তি কেননা প্রিয়া মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আজ আমি সব কিছু উপেক্ষা করেছি। এখন বাতাস আর্দ্র বনভূমি আর্দ্র, ধরণীর বুক আর্দ্র আর মাথার উপরে ঐ আকাশ থেকে গলে পড়া বৃষ্টির মত আমার হৃদয়েও বাদল নেমেছে, কিন্তু তবুও আমার যাত্রা অব্যাহত।

লা পাম্পার সফর শেষ করে বুয়েনোস আইরেসে ফিরে এলাম। কয়েকটা মাস গতানুগতিক জীবনযাত্রার মধ্যে পার হয়ে এলাম।

দেখতে দেখতে বসন্তকালের আবির্ভাব হল। সারা শহর যার শহরতলী জুড়ে কমলালেবু ফুলের মন মাতানো গন্ধ আর নীলজাকরন্দা ফুলের রেণু বাতাসে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আর্জেন্টিনার প্রখ্যাত বসন্তোৎসব কার্নাভালিতো'র বিচিত্র অনুষ্ঠানে সারা শহর তোলপাড় বুয়েনোস আইরেস শহরের বিভিন্ন অংশে সারা রাত ধরে চললো সঙ্গীত আর নৃত্যানুষ্ঠান। সকালের দিকে উৎসবের স্রোতে কিছুক্ষণের জন্যে একটু ভাটার টান লাগে, আবার দুপুর গড়িয়ে যেতেই কার্ণাভালের মুক্তাঙ্গন মণ্ডপগুলোতে উৎসবের জোয়ার বইতে থাকে। রাস্তা দিয়ে যেতে আসতে মাঝে মাঝে দু-একটা গানের কলি বাতাসে ভেসে আসে। গ্রাম্য যুবক গানের মধ্য দিয়ে বলছে—

রিকোনসই পবস্ত্রে ন সই
তেঙ্গো মিচোল চান্দুলোত্তুন
বাইলা দে মি কাহা।

আমি ধনী নই, কিন্তু দীন-দরিদ্রও নই সাদামাঠা জীবনযাত্রার সব সামগ্রী আমার আছে বিলাস বহুল জীবনে আমার আকাঙ্খা নেই নৃত্য আর সঙ্গীতই আমার জীবনের আনন্দস্বরূপ।

বসন্তকালের এমনি একটি [illegible] অফিসে বসে কাজ করছি রাষ্ট্রদূত [illegible] বললেন, তোমার বন্ধুর [illegible] হয়েছে। সরকার ওর স্কলারশিপের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। তুমি ওকে খবরটা জানিয়ে দিতে পার।

নিজের ঘরে এসে নিবেদিতাকে টেলিফোন করলাম। আমার মুখে এই সুখবর শুনে ও কি যে বললো ঠিক বুঝতে পারলাম না পরক্ষণে একটা চাপা কান্না শুনতে পেলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম এমন একটা ভালো খবর শুনে তোমার কান্নায় কি কারণ ঘটলো তাত বুঝতে পারছি না। আমাদের দেশের জ্ঞানী-গুণীরা ঠিকই বলেছেন, আমাদের মত সাধারণ মানুষদের তোমাদের মনের হদিস পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

কান্না থামিয়ে ধরা গলায় নিবেদিতা বললো, আমার এই আনন্দের দিনে কান্নায় আমার কন্ঠরোধ কেন হচ্ছে তাত তোমার অজানা থাকার কথা নয়। আমি পাসপোর্ট পাবো কি করে? ভারতবর্ষে আমার যাওয়া হবে না।

আমি উৎসাহ দিয়ে বললাম হবে। নিশ্চয়ই হবে। পাসপোর্টের জন্যে তুমি আজই দরখাস্ত করে দাও। তোমাদের ফরেন অফিসে আমার গুটি কয়েক বন্ধু আছে। তাদের বলে কয়ে যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।

আমার কথা শুনে নিবেদিতা পুরো-পুরি আশ্বস্ত কিনা জানি না তবে গলার স্বর অনেকটা স্বাভাবিক করে বললো, দেখ যদি কিছু করতে পার।

কি করে জানি না খুব সহজেই নিবেদিতা পাসপোর্ট পেয়ে গেল। প্রায় একমাস পর একদিন অপরাহ্নে ও আমাদের দূতাবাসে এল। ওকে জিজ্ঞেস করলাম যাত্রার সব আয়োজন শেষ হয়েছে?

নিবেদিতা বললো, হয়েছে। কাল সকাল দশটায় লন্ডন ফ্লাইট ধরতে হবে!

স্বদিনের ভারতকে একটু মনন করে দেখে বললাম, এ যে মহাদেশ অভিজ্ঞ কি হয়েছো নিশ্চ? হয়েছো কি সুখী।

নিবেদিতার মুখ ম্লান হয়ে এলো।

বললো, সুখী নিশ্চয়ই, কিন্তু বাবাকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবে আমার আজ কেবলই কান্না পাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাবা কোথায়?

নিবেদিতা বললো তাঁর সঙ্গেই ত এলাম। কাল আমার রওনা হয়ে যাবার পর তিনিও করদোবায় ফিরে যাবেন।

একটু ইতস্তত করে নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি আর কখনও আর্জেন্টিনায় ফিরে আসবে না?

ম্লান মুখে নিবেদিতা বললো, আমার স্মৃতি যদি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে তবে আসবো।

এই প্রসঙ্গ আর দীর্ঘ করতে চাইলাম না। বললাম, চল রাষ্ট্রদূতের কাছে বিদায় নেবে।

রাষ্ট্রদূত বললেন, আমি আশা করবো তোমার ভারতবর্ষে যাওয়ার উদ্দেশ্য সফল হবে।

পরদিন বেলা দশটায় নিবেদিতার লণ্ডনগামী বিমান বুয়েনোস আইরেস ত্যাগ করলো।

বিমানে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে নিবেদিতা আমার দুটো হাত চেপে ধরে বললো। তা হলে আসি। ভারতবর্ষে তোমার সঙ্গে আশা করি দেখা হবে।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই হবে।

ইতিমধ্যে দুটি বছর চলে গেছে। নিবেদিতার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। আমিও অনেকদিন হল বুয়েনোস আইরেস ছেড়ে চলে এসেছি। তখন আমি পশ্চিম আফ্রিকার একটি শহরে আছি। নিবেদিতার দিল্লী প্রবাসের প্রথম বছরে ওর কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি পেয়েছি। ভারতের জনগণ তার ভৌগলিক বৈচিত্র্য আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি সঙ্গীত এবং ললিতকলা আর আমাদের সাদামাঠা অনাড়ম্বর জীবন-

যাত্রা সবই যেন নিবেদিতার প্রশংসার আর প্রীতিপ্রদ মনে হত।

তারপর নিবেদিতার আর কোন সংবাদ নেই। মাঝে মাঝে ওর কথা মনে হত আর ভাবতাম ভারতের জনারণ্যে কোথায় হারিয়ে গেল এই মেয়েটি। একটু চেষ্টা করলেই হয়ত ওর খোঁজ পাওয়া যেত। কিন্তু কি জানি কেন তেমন কোন তাগিদ অনুভব করিনি। কারণ ভেবেছি যে ও হয়ত ভালোই আছে আর ভারতবর্ষে এসে ওর জীবনের স্বপ্ন সফল হয়েছে।

নিবেদিতার কথা যখন একরকম ভুলেই গেছি সেই সময়ে ওর একখানা দীর্ঘ চিঠি ওর কথা আমার মনে করিয়ে দিল। লিখেছে বুয়েনোস আইরেস থেকে। ও লিখছে, এতদিন পর আমার চিঠি পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবে। দীর্ঘদিন আমার কোন সংবাদ না পেয়ে তুমি হয়ত ভেবেছিলে যে নিবেদিতা মরেছে। মরেছি আমি ঠিকই। আজ যে নিবেদিতা তোমাকে চিঠি লিখছে দু বছর আগে দেখা সে নিবেদিতা এ নয়। ভেবেছিলাম আমার কোন কথাই তোমাকে জানাবো না। দু বছর ভারত বাসের ইতিহাস আমার মনের অন্ধকার গুহার মধ্যেই লুকোনো থাকবে। বাইরের আর কেউ কখনো তা জানতে পরবে না। কিন্তু আবার ভাবলাম আমার এই ইতিহাসটা যদি কেবল একটা একটানা বেদনার ইতিহাসই হত, যা হারিয়েছি তার বিনিময়ে আর কোন কিছু না পেতাম তবে আমার কাহিনী তোমাকে জানিয়ে অকারণে তোমাকে দুঃখ দিতাম না। যেদিন তোমার সঙ্গে করদোবায় আমার প্রথম দেখা হল সেদিন আমি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে এটা বিশ্বাস করতাম যে আমি ভারতের একটি মেয়ে। দৈবচক্রে আর্জেন্টিনায় এসে জন্মেছি। কিন্তু সেদিন আমি বুঝিনি যে যে যা নয়, একটা সৌখীন চিন্তার আশ্রয় নিয়ে সে তা হতে পারে না। সেদিন আমি ভেবেছিলাম যে পরিবেশে যে সমাজে আমি জন্মেছি, বড় হয়ে উঠেছি সেখানে গার্হস্থ্যজীবনে শুচিতা নেই, দাম্পত্য জীবনে কল্যাণবোধ নেই, সমাজের সর্বাঙ্গে দুরারোগ্য ক্ষত। মনে হয়েছিল এখানে এই পরিবেশে চিরকাল থাকতে হলে আমি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরবো। ভেবেছিলাম ভারতের বাতাসে আমি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবো। কেবল তাই নয় নারী হয়ে যখন জন্মেছি তখন সেই নারীত্বের কিছুটা বিকাশ হয়ত ঐ দেশের মাটিতেই সুন্দর হবে। ধর্মাচরণে সেবায়, স্নেহে মমতায় আর ত্যাগের মধ্য দিয়ে জীবনের খানিকটা সার্থকতা হয়ত বা লাভ করতে পারবো। কিন্তু সেদিন একথাটা আমি বুঝিনি যে আকাঙ্ক্ষা আমার যত মহৎই হোক না কেন কোন কিছুকে এড়িয়ে তা সফল করা বোধকরি সম্ভব নয়। সাগরের জলে ছোট মাছ বড় মাছের ভয়ে শঙ্কিত

হলে ও জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে সে বাঁচতে পারে না। বলতে দ্বিধা নেই ভারত কথা বলে নিজেকে পরিচয় দিতে আজ আমার সাহস কিংবা অহঙ্কার কোনোটাই নেই। কারণ একটা চরম সংকটের মুখে আমি ত কোন আদর্শ ভারত নারীর মত আচরণ করতে পারিনি। আমি একথাটা সেদিন কেন ভুলে গিয়েছিলাম যে বেদনায় আগুনে পুড়ে পুড়ে সীতা নিখাদ সোনা হয়ে অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেই আগুন ত আমাকেও স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তার উত্তাপ আমি সইতে পারলাম না কেন? কেন সেই অগ্নিজ্বালা নিবারণ করতে একটা ভুল পথ বেছে নিলাম? কেন আমি নিজের গায়ে নিজেই অবিশ্বাসের ধুলো-বালি ছড়িয়ে দিলাম। আমার দৃষ্টি হল অন্ধ, পথের রেখা গেল মুছে, একটা আত্মঘাতী দমকা হাওয়া আমাকে আছড়ে ফেলে দিল মাটিতে। কেমন করে সেখান থেকে আবার আমি উঠে দাঁড়ালাম সেই কাহিনীটাই এবার সংক্ষেপে তোমাকে লিখলাম।

আমার দিল্লী প্রবাসের ছ মাস পার হয়ে গেছে। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। কথক নাচের অনুশীলন করছি। মেয়েদের হস্টেলে ভাল জায়গা পেয়েছি। পড়াশোনার অন্যান্য কাজে, গালগল্পে দিনগুলো ভালই কেটে যাচ্ছিল। দু-তিনটি সহপাঠীর সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গতা হয়েছে।

তখন হেমন্তের শেষ। দিল্লীর আকাশে বাতাসে শীতের আমেজ। তখন ইউনিভার্সিটি বন্ধ, কাজেই আমাদেরও ছুটি। এই অবকাশে আমি আর আমার দুই বান্ধবী শর্মিষ্ঠা আর কন্যাকুমারী খাজুরাহোর বিশ্ববিশ্রুত মন্দিরগুলো দেখতে গেলাম। তিন দিন ধরে মন্দিরগুলোর অপরূপ ভাস্কর্য দেখলাম। একটা অনির্বাচনীয় সৌন্দর্যানুভূতিতে মন ভরে গেল। খাজুরাহো পর্যটন শেষ করে আমরা এলাহাবাদ থেকে দিল্লীগামী ট্রেনে উঠলাম।

ভোরবেলা ট্রেন ছাড়লো। আমার শরীর বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু এলাহাবাদ থেকে ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টাখানেক পর আমার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে ভেদ বমি। কয়েকবার বাথরুমে যাওয়ার পরেই আমি প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লাম। আমার বান্ধবীরা আমার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কে বিমূঢ়। কন্যাকুমারী হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে কন্যাকুমারী শর্মিষ্ঠাকে লক্ষ্য করে বললো শর্মিষ্ঠা, নিবেদিতার নিশ্চয়ই কলেরা হয়েছে। অবিলম্বে ডাক্তারের সাহায্য না পেলে ওকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। এর পর আমি আর কিছুই জানি না। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখলাম হাসপাতালের একটি বিছানায় আমি শুয়ে আছি। আমার পাশে বসে আছে শর্মিষ্ঠা ভ্রূয় অদূরে

অপরিচিত সুদর্শন এক যুবক। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল, নিজেকে অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম। ডাক্তার এলেন। আমাকে দেখে বললেন, ভয় নেই বিপদ কেটে গেছে।

শর্মিষ্ঠা আমাকে বললো, নিবেদিতা, তুমি সেদিন কি ভয়ই না আমাদের পাইয়ে দিয়েছিলে। তারপর ঐ অপরিচিত যুবকটির দিকে আঙুল নির্দেশ করে শর্মিষ্ঠা বললো, এই ভদ্রলোক আর ওর বাবা সেদিন গাড়ীতে না থাকলে তোমাকে কিছুতেই বাঁচানো যেত না। সেদিন তোমার অবস্থা দেখে আমি আর কন্যা-কুমারী যখন একেবারে দিশেহারা, সেই মুহূর্তে ইনি আর এর বাবা মিস্টার শর্মা তোমার সাহায্যে এগিয়ে এলেন। মিস্টার শর্মা বললেন, তোমরা ভয় পেও না। সামনেই নৈনী জংশন। ট্রেন ওখানে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দেব। আমার ছেলে প্রদীপ আর আমার সঙ্গের পরিচারিকাটিকেও রেখে যাবো তোমাদের বন্ধুর শুশ্রূষার জন্য।

এরপর একটু থেমে মিস্টার শর্মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের এই বান্ধবীটি ভারতীয় না বিদেশিনী।

শর্মিষ্ঠা বললো, নিবেদিতা দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসিনী। দিল্লীতে পড়াশুনো করতে এসেছে। আমরা তিন বন্ধু-মিলে খাজুরাহো দেখতে গিয়েছিলাম, ফেরার পথে এই বিপদ।

মিস্টার শর্মা বললেন, তোমার বন্ধু কোন বিষাক্ত খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অমার মনে হয় ওর কলেরা হয়নি। যাইহোক, আমি প্রদীপকে নৈনীতে রেখে যাচ্ছি। ও সব বন্দোবস্ত করে দেবে। তারপর শর্মিষ্ঠা বলতে লাগলো, নৈনী ষ্টেশনে ট্রেন থামতেই মিষ্টার শর্মা আর প্রদীপবাবু ছুটে গাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রায় দশ মিনিট পরে ষ্ট্রেচার এলো, সঙ্গে একজন ডাক্তার। ধরাধরি করে তোমাকে ষ্টেচারে শুইয়ে তখুনি এ্যাম্বু-লেন্সে করে নৈনীর রেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তোমাকে ইনটেনসিব কেয়ার ইউনিটে ভর্ত্তি করিয়ে মিস্টার শর্মা দিল্লী ফিরে গেলেন। কন্যাকুমারী ও তার সঙ্গে দিল্লী চলে গেল। আমি আর প্রদীপ-বাবু তোমার কাছে রইলাম।

এর পর নিবদিতা ওর চিঠিতে লিখছে, আমি মনে মনে মিস্টার শর্মার উদ্দেশে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানালাম আর একটা সলজ্জ কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে প্রদীপবাবুর দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করে বললাম, আপনাদের ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারবো না।

প্রদীপবাবু প্রতিনমস্কার করে বিনয়ের সুরে বললেন, আপনাকে কিছুই করতে হবে না। বিপদে আপদে অপরকে সাহায্য করা ত প্রত্যেক মানুষের অতি সাধারণ কর্ত্তব্য। আমরা শুধু আমাদের কর্তব্যটুকু পালন করেছি। ভগবানের অসীম দয়া যে আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

মুগ্ধদৃষ্টিতে প্রদীপবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

শর্মিষ্ঠা বললো, জানো নিবেদিতা, মিস্টার শর্মা একজন শিল্পপতি ত ছাড়া এদের বিদেশের সঙ্গে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা আছে। প্রদীপবাবু বলছিলেন উনি আইন পাশ করার পর পৈতৃক ব্যবসায়ে যোগদান করেছেন। নতুন দিল্লীতে ফ্রেন্ডস কলোনীতে ওরা থাকেন।

আরো দিনতিনেক নৈনীর হাসপাতালে থেকে আমরা সবাই দিল্লীতে ফিরে এলাম। তখনও দুর্বলতা যথেষ্ট ছিল তাই প্রায় শুয়ে শুয়ে সারা পথটা কাটিয়ে দিলাম। দিল্লী স্টেশনে প্রদীপ-বাবুদের গাড়ীতে আমাকে আর শর্মিষ্ঠাকে হস্টেলে পৌঁছে দিলেন প্রদীপবাবু।

এর মধ্যে তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আর নাচের স্কুলে নিয়মিত-ভাবে যাতায়াত করছি। একদিন দুপুরের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমনরুমে বসে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছি, বেয়ারা এসে বললো কে যেন আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চান। ছুটে গিয়ে রিসিভারটা কানে লাগাতেই অপর প্রান্ত থেকে প্রদীপবাবু নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, মিস গান্ধারী আপনি কেমন আছেন। আমাকে চিনতে পারছেন।

আমি বললাম, আপনি কি আমাকে এতই অকৃতজ্ঞ মনে করেন যে, আপনাকে ভুলে যাবো। প্রয়োজন হলে তখন দেখে নেবেন যে হাজার লোকের মধ্যে আপনাকে ঠিক চিনে নেব।

প্রদীপবাবু বললেন, আপনার কথা শুনে খুশী হলাম। আপনি কেমন আছেন। আশা করি আপনার দুর্বলতা সেরে গেছে।

বললাম, ভালই আছি। শরীর নিয়ে কোন অভিযোগ নেই। এরপর প্রদীপ বললো, আপনাকে একটু দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাল কি একবার দেখা হতে পারে?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই পারে। তবে বিকেল পাঁচটার আগে নয়। আপনি পাঁচটার পর হস্টেলে আসবেন।

ইউনিভারসিটি থেকে বেরিয়ে পথে আসতে ভাবছিলাম এই পিতাপুত্রের কাছে আমার ঋণ কি অপরিসীম। এদের ঋণ আমি কোন দিন শুধতে পারবো না।

পরদিন নিজেই গাড়ী চালিয়ে প্রদীপ-বাবু হস্টেলে এলেন। আমি হস্টেলের লাউঞ্জে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তিনি ভেতরে ঢুকতেই আমি দাঁড়িয়ে উঠে তাকে অভ্যর্থনা করলাম।

প্রদীপবাবু আমাকে নমস্কার করে বললেন, অনেক আগেই আপনার খোঁজ নেওয়া আমার উচিত ছিল। কিন্তু হাতে জরুরী কাজ থাকায় সময় করে উঠতে পারিনি। এ জন্যে আমি খুবই দুঃখিত।

আমি বললাম, আপনার দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং আমারই আপনাদের বাড়ী গিয়ে আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসা উচিত ছিল। কিন্তু আপনাদের বাড়ী আমি ঠিক চিনি না। তাই একটু অসুবিধেয় পড়েছিলাম।

প্রদীপ একটু উৎসাহিত হয়ে বললো, যাবেন আমাদের বাড়ী। বাবা আপনাকে দেখে খুব খুশী হবেন। ইচ্ছে হলে আজই যেতে পারেন। বাবা আজ বাড়িতেই আছেন।

আমি বললাম, তাই চলুন আপনার বাবার সঙ্গে আজই দেখা করে আসি।

আমি আর প্রদীপ দুজনে পাশাপাশি গাড়ীতে এসে বসলাম। প্রায় আধ ঘন্টা পর ফ্রেন্ডস কলোনীর একটা বড় বাড়ীর ড্রাইভ ওয়েতে গাড়ী প্রবেশ করলো। প্রদীপ গাড়ী থেকে নেমে বাঁদিকের দরজা খুলে দিয়ে বললো, আসুন।

গাড়ী বারান্দা পার হয়ে প্রদীপবাবু-দের বিরাট হলঘরটায় এসে বসলাম। বস-বার ঘরটি খুবই পরিপাটি করে সাজানো। দেখলাম দুটো বিরাট আলসেশিয়ান কুকুর মেঝের কার্পেটের উপর মুখগুজে পাশাপাশি শুয়ে আছে। আমাকে দেখেই ওর মধ্যে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। আমার সন্ত্রস্ত ভাব দেখে প্রদীপবাবু হেসে ফেললো, বললো, ভয় পাবেন না। ওরা কোন ক্ষতি করবে না। আপনাকে শুধু একটিবার শুঁকেই ওরা চলে যাবে। কুকুর দুটো তাদের কর্তব্য পালন করে অন্য ঘরে চলে গেল। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে স্থির হয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর প্রদীপ-বাবুর বাবা মিঃ হরদয়াল শর্মা নিচে নেমে এলেন। আমাকে দেখে একটু হেসে বললেন, এই যে মিস গান্ধারী আপনি ভালো আছেন ত?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললাম, আমি এখন ভালোই আছি। আপনি কেমন আছেন।

তিনি বললেন, ভালোই আছি বলতে পারেন।

আমি বললাম, মিঃ শর্মা, আপনি আমার বাবার বয়সী। আপনি আমাকে আমার নামধরেই ডাকবেন।

আর ক্রিয়াপদের ঐ 'ন' কথাটি ব্যব-হার করবেন না—এই আমার অনুরোধ।

তিনি একগাল হেসে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। এখন থেকে তোমাকে নিবেদিতা বলেই ডাকবো।

সেদিন প্রায় ঘন্টাদুই মিঃ শর্মা আর প্রদীপবাবুর সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং আর্জে-ন্টিনার জীবনযাত্রার নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করে হস্টেলে ফিরে এলাম। প্রদীপবাবুই পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আমার কাছে বিদায় নেবার সময় প্রদীপবাবু বললেন, মিস গান্ধারী, ভবিষ্যতে যদি আপনার

সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করি তবে কি আপনি রুষ্ট হবেন?

আমি বললাম, রুষ্ট হবো কেন? আপনি আপনার সুযোগ-সুবিধে মত নিশ্চয়ই এখানে আসবেন।

এর প্রায় মাসখানেক পর প্রদীপবাবু আবার এলেন।

বললেন, চলুন মিস গান্ধারী, আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীটা একবার ঘুরে আসি।

আমি বললাম, চলুন।

সেদিন অনেকরাত্রি পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে প্রায় সবকটা প্যাভেলিয়ন দেখলাম। বলাবাহুল্য আর্জেন্টিনার কোন প্যাভেলিয়ন সেখানে ছিল না।

প্রদীপবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের প্রধান প্রধান শিল্প কি?

আমি বললাম, আর্জেন্টিনায় মোটামুটি সকল পণ্যদ্রব্যই উৎপন্ন হয়। তবে আর্জেন্টিনা এখনো ইউরোপের দেশগুলোর মত শিল্পোন্নত নয়। তবে আর্জেন্টিনার কৃষিকার্য খুবই উন্নত। আর ঐ বিরাট দেশের জনবসতি খুবই বিরল বলে দরিদ্র বলতে কিছু নেই।

কথা বলতে বলতে আমি আর প্রদীপবাবু একটা রেস্তোরায় এসে ঢুকলাম। ওখানেই নৈশাহার শেষ করে প্রদীপবাবু আমাকে হস্টেলে পৌছে দিয়ে গেলেন।

এরপর প্রদীপ প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। দুজনে এখানে-ওখানে বেড়াতে যেতাম। একদিন দুজনে সিনেমা দেখতে গেলাম। দুজনে পাশাপাশি বসে আছি। মগ্ন হয়ে সিনেমা দেখছি, অনুভব করলাম প্রদীপবাবু আমার হাতখানা তার হাতের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলেন। কি জানি কেন আমি আমার হাতখানা তার মুঠোর থেকে মুক্ত করতে পারলাম না। সিনেমা শেষ হবার পর দুজনে গাড়ীতে এসে বসলাম। প্রদীপ গম্ভীর কণ্ঠে বললো, নিবেদিতা একটা কথা তোমাকে আজ অকপটে বলতে চাই। আমি আজ নিশ্চিতভাবে নিজে অনুভব করছি যে আমি তোমাকে ভালবাসতে শুরু করেছি। নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিত না হলে আজো তোমাকে আমার মনের কথা বলতাম না। আর তোমার অঙ্গস্পর্শও করতাম না। দিনের পর দিন তোমার প্রতি আমার ক্রমবর্দ্ধমান আকর্ষণটা আজ এমন একটা স্তরে এসে পৌঁচেছে যে সেখান থেকে আমার আর ফেরার পথ নেই। আমার সম্বন্ধে তোমার কি মনোভাব তা আমি জানি না তবে আমাকে দেখে তোমার ঐ কালোকাজল চোখদুটিতে যদি বিজুলীর ঝলক কখনও খেলে যায় তবে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করবো।

কথা বলতে বলতে প্রদীপ তার ডানহাতটি আমার কাঁধের উপর রাখলো। তারপর একটু যেন সম্মোহিতভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি নিজেকে প্রদীপের [illegible]

প্রদীপ, দামিনীর বিদ্যুৎঝলকের মধ্যে কিন্তু অশণির প্রলয় সংকেত থাকে তা জানো ত? প্রদীপ গম্ভীর হয়ে বললো তোমার প্রেম যদি কেবল আগুনই ছড়ায়, বারিধারা সিঞ্চনে তৃষিত প্রাণ সে যদি স্নিগ্ধ না করে, তাতেও আমার ক্ষতি নেই। সেই আগুনেই না হয় পুড়ে মরবো।

আমি এবারেও হেসে ফেললাম। বললাম, তোমার ভয় নেই। তোমাকে পুড়ে মরতে হবে না। কারণ আমার মধ্যে জলও নেই, বিদ্যুৎও নেই। আমাকে ভালোবেসে আমার কাছ থেকে কিছুই পাবে না।

প্রদীপ খুবই আবেগভরা কণ্ঠে বললো, আমি ত তোমার কাছে কিছুই চাই না নিবেদিতা। আমি ত শুধু তোমাকেই চাই।

জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে নিয়ে কি করবে?

প্রদীপ বললো, নারীকে জীবনের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিতে পুরুষে যা করে।

আমি বললাম, আর তাতে যদি আমি সম্মত না হই। প্রদীপ বললো সে তোমার ইচ্ছা। তবে তুমি সম্মত না হলেও আমার কোন ক্ষতি নেই। আমার প্রথম প্রেমের অদৃশ্য ফাঁস তোমার গলায় পরিয়ে তোমাকে চিরদিন বেঁধে রাখবো।

আমি বললাম, এ বাঁধন যদি কখনও শিথিল হয়।

প্রদীপ বললো, যদি তাই হয় তবে তুমিই আবার বাঁধনটাকে শক্ত করে দিও।

আমি বললাম, প্রদীপ, আমি তোমার দেশের মেয়ে নই। সীতা সাবিত্রী কিংবা দময়ন্তী হওয়ার শিক্ষাদীক্ষা আমার কোনোটাই নেই। যা নিতান্তই অসম্ভব তা আমি সম্ভব করবো কেমন করে?

প্রদীপ বললো, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছিল বলেই ত সীতা সাবিত্রী আজো আদর্শ রমণী হয়ে আছে। প্রয়োজন যদি কখনও হয় তখন না হয় তোমার শক্তি-পরীক্ষা করো।

আমি বললাম, সেই ভালো, বাইরের দিকে তাকিয়ে বললাম, হস্টেল আর কতদূর।

প্রদীপ বললো এই ত প্রায় এসে গেছি।

হস্টেলের সামনে আমাকে নামিয়ে দিয়ে প্রদীপ জিজ্ঞাসা করলো, কাল কি তোমার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে।

আমি বললাম, কাল ত আমার সময় হবে না। তুমি তিনচারদিন পরে এসো।

আচ্ছা বলে প্রদীপ চলে গেল।

হোস্টেলে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা গুমোট ভাব। তাই তাড়াতাড়ি ঘরের সবকটা জানালা খুলে দিলাম। তারপর বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন চিন্তার অতলে ডুবে গেলাম। মনে হল আজ আমার সম্মুখে এক ভীষন কঠিন পরীক্ষা। যে স্বপ্ন নিয়ে সুদূর আর্জেন্টিনা থেকে সবকিছু পিছনে ফেলে ভারতবর্ষে ছুটে এসেছি এবং যে [illegible]

দিইনি আজ প্রদীপকে ঘিরে সেই স্বপ্ন কি সফল হবে? প্রদীপ পরোপকারী, প্রদীপ বন্ধুবৎসল, শিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি সবই ঠিক। প্রদীপ আমাকে ভালোবাসে—এ কথাও নয় মেনে নিলাম। কিন্তু সমস্যাও তাকে নিয়ে ততটা নয়, যতটা নিজেকে নিয়ে। আমি নিজেই যে নিজের এক মস্ত সমস্যা। আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে দুটো নারী যেন বেরিয়ে এসে আমার পাশে বসলো। একটি আঞ্জেলা অর্তিজ আর অপরটি নিবেদিতা গান্ধারী। একটি পিতামাতার জারজ সন্তান, কিন্তু আমার জন্মলগ্নের কলংক বাদ দিয়েও একথা বলতে পারি যে আমি শিক্ষায়দীক্ষায় ধ্যানধারণায় আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুগামী আর অপরটি আমারই হৃদয়সাগর থেকে ভিনাসের মত শুন্ধশুচিরূপ নিয়ে উদ্ভূতা। তার পশ্চাতের বন্ধন নেই, সম্মুখের আকর্ষণ নেই, আছে শুধু একটি স্বপ্ন আর তা হল নিজের পূর্ণ বিকশিতরূপ নিজের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা। আমার সেই বিকাশতীর্থে পৌঁছুতে পথের সাথী হিসেবে প্রদীপ আমার কতটা যোগ্য সহচর তা আমি জানি না। আর আমার আর প্রদীপের জীবনের লক্ষ্য ত কখনই এক হতে পারে না। আমার মত প্রদীপও জীবনের এক পথিক। তারও পথ আছে। পথের শেষে পৌঁছুবার বাসনা আছে। তার সেই পথযাত্রায় আমি তার সঙ্গিনী যদি হতে না পারি তবে দুজনেই পথভ্রষ্ট হয়ে কোথায় হারিয়ে যাবো। দুটি জীবনেরই অহেতুক অপমৃত্যু ঘটবে। আমার মন বারবার একটি কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল, ভেবে দেখো তুমি ভারতকন্যা—তোমার এই প্রত্যয়ের ভিত কতটা পাকা। তোমার এই বিশ্বাস যদি একটা অন্তঃসারহীন স্বপ্নবিলাস হয় তবে কোন ভারতীয় সন্তানের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িও না। তাতে অকল্যাণ ডেকে আনবে দুজনারই। আর যদি মনে কর যে তোমার বিশ্বাসের ভিতে কোনদিন ফাটল ধরবে না, শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও সেই ভিত চিড় খাবে না তবে দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাও। নিজের মনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না। তার ফল বিষময় হবে। কে যেন আমার মনের মধ্যে বসে বারবার একথাগুলো বলতে লাগলো। প্রদীপের সঙ্গে তোমার প্রেম যদি একটা হঠাৎ দেখা প্রেমের আখ্যান হত আর সেই প্রেম যদি দেশকাল পাত্রের গন্ডী ছাড়িয়ে নারী পুরুষের চিরন্তন আকর্ষণের ফলশ্রুতি হত তবে তুমি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রদীপকে গ্রহণ করতে পারতে। কিন্তু তুমি ভারতে এসেছো অন্য এক মনোভাব নিয়ে। প্রদীপের সঙ্গে আন্তরিকতার মূলেও সেই একই মনোভাব সক্রিয় কিনা তাই ভেবে দেখো তা যদি দৃঢ়তায় অনমনীয় হয়, সত্যনিষ্ঠায় তা যদি নির্মল হয়ে থাকে তবেই প্রদীপের সঙ্গে তোমার মিলন সার্থক হবে, আর এতদিন নিজেকে আবিষ্কার করার যে অন্বেষণ অব্যাহত রেখেছো তাও সফল হবে।

[illegible]

কাশীনাথ চক্রবর্তী

অজ্ঞাত ক্ষত

মানিকদা জন্ম থেকেই অন্ধ। চোখের ঢেলা দুটো চামড়ার নিচে এদিক ওদিক শুধু ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু মানিকদার বুঝি কোনো দুঃখ নেই সেজন্য। যা সে কোনোদিন দ্যাখেনি তার চেহারাও সে জানে না। যা কিছুর অস্তিত্ব সে শোনে তার চেহারাও সে তার নিজের মতো করে কল্পনা করে নেয়। মানুষ এই রকম। এমনি করে পা দিয়ে সামনের দিকে হাঁটে। হাত দিয়ে কাজ করে। ফুল এই রকম। এমনি করে গাছে ফুটে থাকে। এমনি করে বাতাসে দোল খায়। এছাড়া অন্যরকম করে ভাববার দরকার হয় না তার। হাসির কথা শুনলে সে-ও হেসে ওঠে। দুঃখের কথাতেও মুখখানা তার কালো হয়ে যায়। মানিকদা যে অন্ধ, তার মুখ দেখে তখন তা ভাবাই যায় না।

মানিকদার সঙ্গে পরিচয় অল্প দিনের। আমাদের একেবারে লাগা বাড়িটায় রেজিস্ট্রেশন-অফিস টিউশনি নিয়ে আছি। এ গ্রামের ছোটো একটা ইস্কুলে মাস্টারি পেয়েছি। দুদিনেই মানিকদা আমাকে খুব পছন্দ করে ফেলেছে। আমার সঙ্গে সে যেমন মন খুলে কথা বলে, তেমনি করে আর কারো সঙ্গেই পারে না। কে-ই বা কথা বলবে ওর সঙ্গে। সকলের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, ঘৃণা-অবজ্ঞা নিয়েই তো বেঁচে আছে।

সারা দিন বাইরে একটা বেঞ্চিতে বসে থাকে। সামনে দিয়ে গ্রামের পথ। চেনা-মানুষের গলা শুনলে ডেকে আলাপ করে। আমার ইস্কুলে যাবার সময় হলে সীমানার বেড়াটুকু হাত দিয়ে ফেলে ফেলে এসে দাঁড়ায় আমার দরজায়। বলে,—ইস্কুলে যাচ্ছো নাকি মাস্টার?

—হ্যাঁ মানিকদা। ও বেলা এসো, কেমন?

—আসব বই কি।

আমার ছাত্র ক-টা পেয়ারা রেখে গিয়েছিল আমার জন্যে। ওবেলা খাব বলে রেখে দিয়েছিলাম। তা থেকে একটা পেয়ারা এনে মানিকদার হাতে দিলাম। মানিকদা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে বলল, পেয়ারা:

—হ্যাঁ, খাও। তুমি তো পেয়ারা খেতে ভালোবাসো।

খুব খুশি হয়েই খেতে লাগল মানিকদা। চিবোতে চিবোতে বলল, এ রকম ডাঁসা পেয়ারা খেতে কার না ভালো লাগে বলো।

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলাম।

খেতে খেতে আবার বলল —কিন্তু যার দাঁত নেই, তার কী দুঃখ বলো তো মাস্টার। এ রকম ডাঁশা পেয়ারার স্বাদ সে কি পায় কখনও?

অবাক হলাম ওর কথা শুনে। যার দাঁত নেই তার দুঃখ বোঝো। অথচ নিজের চোখ না থাকার দুঃখ তো বলে না কখনও।

ছুটির পরে বাড়ি এলে মানিকদা বুঝতে পারে। অমনি তার চেনা পথটুকু হাত দিয়ে দেখে দেখে আমার দরজায় এসে দাঁড়ায়। আমি হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসি। তারপর হাতমুখ ধোবার জন্য একটুক্ষণের ছুটি চাইলে বলে—হ্যাঁ - হ্যাঁ, যাও। আমি বুঝি একটু আগেই এসে পড়েছি। বলেই আবার বলে —কী করব মাস্টার, সারাটা দুপুর ভূতের মতো একা একা আর কাটে না।

হাতমুখ ধুয়ে এসে খবরের কাগজ পড়ব। মানিকদা শুনবে। দেশ-বিদেশের খবর শুনতে ওর ভারি আগ্রহ। দুর্ভিক্ষের খবর কিম্বা রেল দুর্ঘটনার বীভৎস খবর শুনলে মানিকা প্রায় লাফিয়ে ওঠে। বলে —ইস! কী সাংঘাতিক।

একদিন ... পড়ছি, ... মনোযোগ দিয়ে শুনছে। এক ভিখারী দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইতেই মানিকদা বলে উঠল — আঃ, চুপ করো—

—আমি অন্ধ বাবা—

—অন্ধ তা কী করব? আগে যাও।

খুব বিরক্ত হয়ে বলল মানিকদা।

তাড়াতাড়ি আবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে এনে বলল তারপর? তারপর কী হল মাস্টার? পড়ো তো-পড়ো তো—

আমি আবার পড়তে লাগলাম।

পাড়ার ছেলেমেয়েরা মানিকদাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করত, আমার সামনে হলে বারণ করতাম। কাজ কী ওর মনে ব্যথা দিয়ে। যেটুকু নিয়ে ওর তৃপ্তি সেটুকু নিয়েই থাক না নিজের মনে।

ক-দিন থেকে একটা ভালো বই চলছিল সিনেমায়। ভাবলাম, দেখে আসব। শুনে মানিকদাও সঙ্গী হতে চাইল। বলল, কোনো দিন সিনেমা দেখিনি মাস্টার। কেউ নিয়ে যায় না আমাকে।

ওর আগ্রহ দেখে না করতে পারলাম না। বললাম,—বেশ, চলো।

খুব খুশি হল মানিকদা। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে এল। তৈরি মানে—তার ভালো কাপড়টুকু, পাড় ওঠা। আর খাটো ... জামা। কোঁচাটি হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়ে বার বার পাট করতে করতে বলল, খুব রাত হবে নাকি মাস্টার?

—না। ফার্স্ট শো-তেই তো যাচ্ছি—

মাথায় উসকো-খুসকো চুল হাত দিয়ে পাট করতে করতে আবার বলল—আমার টিকিট লাগবে না?

—আমি কেটে নেব। চলো।

—চলো। বলে তার লাঠিটুকু ঠুক ঠুক করতে করতে আমার পেছন পেছন চলতে লাগল। আমি তার হাত ধরে আছি।

রমেন বাবুর সঙ্গে দেখা। মানিকদাকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছি শুনে মুখ টিপে একটুখানি হাসলেন। পাছে কিছু বলে বসেন সেই ভয়ে ইশারায় বারণ করলাম তাঁকে।

ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট নেই। সেকেন্ড ক্লাসের ... ...

সবাই ফিরে ফিরে চাইছিল মানিকদার মুখে। তাদের দৃষ্টিতে কৌতূহল।

একটু পরে ঘণ্টা বাজতেই মানিকদা বলল—এই বুঝি, আরম্ভ হবে ?

—হ্যাঁ, শোনো।

শো আরম্ভ হল।

শুনে শুনে 'বাঃ, বেশ' বলে ভালো সমঝদারের মতো মাঝে মাঝে তারিফ করতে লাগল মানিকদা।

সামনের সিটের লোকগুলো মানিকদার দিকে চেয়ে চেয়ে খুব হাসছিল মুখ চেপে।

দেখে খুব অস্বস্তি লাগছিল আমার। কিন্তু কিছু বলতে পারছিলাম না কাউকে।

একটা দৃশ্য দেখে সবাই হাত তালি দিয়ে উঠল। মানিকদাও অমনি শব্দ করে হাত তালি দিল তাদের সঙ্গে।

সামনের সিটের লোকগুলো এবার হো হো করে হেসে উঠল।

হলের ওধার থেকে একজন বিরক্ত হয়ে রেগে বলে উঠল—কী হচ্ছে ওখানে। অত গোলমাল কিসের। হাসবার কী আছে এখানটায় ?

যারা হাসছিল তাদেরই একজন হাসতে হাসতেই উত্তর দিল—ওখানে না থাক, এখানে যে আছে। দেখে যান না একবার—

কথাটা শেষ হতেই মানিকদা বলল,—কী মাস্টার, কী বলছেন ও'রা ?

—কিছু না। তুমি শোনো।

কিশোর-বয়সী একটি ছেলে মানিকদার দিকে একবার তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

মানিকদা তাকেই জিজ্ঞেস করল—কী ভাই, হাসছো কেন ? কী হয়েছে বলো তো ?

—কিছু না। তুমি শোনো।

কিশোর-বয়সী একটি ছেলে মানিকদার দিকে একবার তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

মানিকদা ওকেই জিজ্ঞাসা করল—কী ভাই হাসছো কেন ?

ছেলেটি হাসতে হাসতেই বলল, না—এই এমনিই—মানিকদার মন মানল না। বলল, আমাকে দেখেই বুঝি ওরা হাসছে—

—ও কিছু না। তুমি শোনো।

মানিকদা চুপ করে বসে রইল। আমি লক্ষ করছিলাম, ওর মুখে আর খুশির চিহ্ন নেই। কেমন বিশ্রী দেখাচ্ছিল ওকে।

একটু পরে মানিকদা জিজ্ঞেস করল—[illegible]

—এই ঘণ্টা খানেক। কেন, ভালো লাগছে না ?

—তা, মন্দ কী। একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল মানিকদা।

বললাম, বাইরে যাবে মানিকদা ?

—শেষ না হলে কি যাওয়া যায় ?

—কেন যাবে না। চল না, একটু ঘুরে আসি।

—তবে চলো। বলেই উঠে পড়ল।

যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল।

বাইরে গিয়েও মুখের চেহারা বদলাল না মানিকদার। চুপ করেই ঘুরতে লাগল আমার সঙ্গে। একটু পরে বললাম, চলো, আবার বসি গে।

—তুমি যাও মাস্টার। আমি এখানেই একটু বসি। ভেতরটা বড়ো গরম।

একাই ঢুকতে হল আমাকে। কিন্তু আমারও আর ভালো লাগছিল না। মানিকদার কথা মনে পড়তে লাগল বার বার। একটু পরেই আবার বে[illegible] এলাম। কিন্তু মানিকদা তো সেখানে নেই। ব্যস্ত হয়ে অনেক খুঁজতে লাগলাম।

একটু দূরে রাস্তার ধারে বসে এক অন্ধ ভিখারি গান গাইছিল—

অন্ধ হয়ে ভাই
কত কষ্ট পাই
কাহারে জানাব
জানেন ভগবান

এগিয়ে গিয়ে দেখি, মানিকদা তার কাছে বসে তন্ময় হয়ে গান শুনছে। মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, গানের এ সুরটি তার হৃদয়ের তারটিতে যেন শতগুণ শব্দে আজ ঝংকার তুলে দিয়েছে। এমনি করেই সেটি এতদিন বাঁধা ছিল। কিন্তু মানিকদা তা টের পেল আজ।

ধীরে ধীরে মানিকদার কাছে গিয়ে হাত ধরে বললাম, চলো মানিকদা বাড়ি যাই।

একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মানিকদা উঠে এল। দেহটা টেনে তুলতে যেন তার কত কষ্ট হল আজ।

মাস্টারমশায় রবীন্দ্রনাথ

গৌরচন্দ্র সাহা

কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবীকে কৌতুক করে কবি এক সময় লিখেছিলেন— ছেলেবেলায় যখন ছাত্র ছিলুম তখন মাস্টারকে এড়িয়ে চলাই আমার একমাত্র কাজ ছিল—আজকাল তারি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে ইস্কুল মাস্টারি করতে বসে গেছি। ছেলেদের নিয়ে বেশ আছিও ভালো।'

আরও পরিণত বয়সে তাঁর এক অন্তরঙ্গ সুহৃদকে কবি লিখছেন যে বাল্যকালে বিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি বিশেষ কোনো সম্পর্ক রাখেন নি। তাই পরবর্তীকালে তাঁকে দিয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়ে মা সরস্বতী সেদিনের সেই অবহেলার প্রতিশোধ নিয়েছেন।

প্রায়শ্চিত্ত বা প্রতিশোধ যাই হোক না কেন শিক্ষক হিসেবে কবি এক আশ্চর্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। পড়াতে তাঁর ভালোই লাগত। আর সে পড়াবার পদ্ধতি ছিল তাঁর একান্তই নিজের। অন্যান্য বিষয়ের মতো এদিকেও বাঁধাধরা পথে চলতে তিনি নারাজ ছিলেন। কবির লক্ষ্য ছিল তাঁর ছাত্রদের আনন্দের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে কর্তব্যবোধে ও দায়িত্ববোধে প্রদীপ্ত করে তোলা। কবির কাছে পড়বার, তাঁকে কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল এমন অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের স্মৃতিতে তাঁদের মাস্টার মশায় রবীন্দ্রনাথ আজও উজ্জ্বল, প্রেরণার পাথেয়। সেই প্রেরণার কথা তাঁদের মুখেই শুনি।

অমিতা সেন

হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের কাছে আমি পড়েছি। সেদিক দিয়ে দেখলে তিনি আমার মাস্টারমশাই বই কি। আমার বাবা ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক—কবির নানা দুঃখ সুখের সমভাগী। তাঁর মেয়ে হিসেবে কবির কাছ থেকে যে স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি এবং যত সহজে পেয়েছি—আজ মনে হয় তা যেন প্রাপ্যের থেকেও বেশি।

জ্ঞান হবার পর থেকেই কবিকে দেখেছি। আমার পড়াশুনার আরম্ভও শান্তিনিকেতনে। যখন চতুর্থ কি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি আমাদের পাঠ্যতালিকায় ছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়ের ছেলেদের মহাভারত। কবি স্বয়ং বইখানি আমাদের পড়াতেন। কবির পড়াবার ধরণটা ছিল তাঁর একেবারে নিজের। বইয়ের যে অংশ পড়াতেন সেই অংশের শব্দ ধরেই ব্যাকরণ। শব্দ প্রয়োগ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সব কিছু করিয়ে নিতেন ছাত্রদের দিয়ে। বাড়িতে গিয়ে সে জিনিসটা আর আলাদা করে শিখতে হত না। যখন একটু বড় হয়েছি তখন কবি আমাদের বাংলা কবিতা পড়িয়েছেন। সে সময় তিনি চেষ্টা করতেন যাতে কবিতার সঠিক ভাবটা আমরা ধরতে পারি—বুঝতে পারি। ব্যাকরণ আর সন্ধি সমাসের নিয়ম শেখানোয় তখন জোর পড়ত না বেশি।

সন্তোষ মজুমদার মশায় আমাদের যেমন খানিকটা বাংলা পড়াতেন, তেমনি ইংরেজি পড়াতেন ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা ধীমুদা। পা অবধি লম্বা জোব্বা পরে রবীন্দ্রনাথ কখনও শালবীথি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়তেন আমাদের ক্লাসে। আস্তে করে বসতেন অধ্যাপকের পাশে। কিছুক্ষণ চুপ করে দেখতেন অধ্যাপক কেমন করে পড়াচ্ছেন। তারপর এক সময় বইখানি চেয়ে নিয়ে নিজেই পড়াতে আরম্ভ করতেন। তখন, যিনি ক্লাস নিচ্ছিলেন—গুরুদেবের সামনে কিছুক্ষণের জন্য প্রায় আমাদেরই মতো ছাত্র হয়ে যেতেন। কত ধৈর্য্য দিয়ে পড়াতেন কবি। তাঁর গলা ছিল ভারী মিস্টি আর দরাজ—না নীচু না চড়া। একটা জিনিস অবশ্য তিনি ছাত্রদের কাছে চাইতেন তা হল অখন্ড মনোযোগ তা সে ক্লাসের পড়াই হোক আর অভিনয়ের মহড়াই হোক। অভিনয়কে কবি শিক্ষার একটা বিশেষ অংগ বলেই উল্লেখ করতেন। তিনি তাই চাইতেন ছেলেমেয়েরা যেমন পড়াশুনা করবে তেমনি নাচে গানে অভিনয়ে অংশ নেবে। প্রতিটি নাটকের মহড়ার সময় দেখেছি কবি প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে পার্ট বুঝিয়ে দিচ্ছেন—একবার নয়— বহুবার। কারো উচ্চারণে একটুও দোষ থাকলে ছাড়তেন না, নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত ছুটি নেই। মনে পড়ে মালতী চৌধুরী (উড়িষ্যার নবকৃষ্ণ চৌধুরীর স্ত্রী) একবার নটীর পূজার অভিনয়ে রাণী লোকেশ্বরী সেজেছিলেন। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের মেয়ে। অনেক সময়ই তাঁর র এবং ড়-এর উচ্চারণে কোনো প্রভেদ থাকত না। কবি পরিহাস করে তাকে বলতেন বাঙাল বলেই কোনোদিন তুই র আর ড়-এর তফাৎ বুঝলি না।'

আমি একবার নটীর পূজায় মল্লিকা সেজেছিলাম। শাপমোচনে প্রথমবার পেয়েছিলাম রাণীর পার্ট। এগুলির সব নাচ এব অভিনয় গুরুদেব নিজে প্রায় হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন। শাপমোচনটা লেখাই হয়ে ছিল আমাদের জন্য। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি।

১৯৩১ সালের কথা। রবীন্দ্রনাথে ৭০ পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতায় যে কবি সম্বর্ধনার আয়োজন হয় তাতে একটি দিন ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে কবিকে অভিনন্দন জানাবার আয়োজন হয়। ত উদ্যোক্তা ছিলেন প্রতুল গুপ্ত (এ রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য), অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ে জামাতা) এবং ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন প্রমুখ কয়েকজন যুবক। এই অনুষ্ঠানে জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ নাটিকাটি লিখে দেন কবি।

কবির স্নেহ ভালবাসা এত পেয়েছি যে সেকথা বলবার নয়। নানা সময়ে না উপহারও পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। খ ছোটো বেলায় পেয়েছি কাঠের খেলনা মাটির পুতুল। একবার জাপান খে নিয়ে এলেন একরাশ সিল্কের পোশাক [illegible]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ

ফকে। সেটি অনেকদিন ব্যবহারের পর এখন ছোট হয়ে গেল মাপে তখনও কি তাকে ছাড়ি। গুরুদেবের দেওয়া যে, খাবার সময় হাজির থাকলে তাঁর খাবারেরও ভাগ পেতাম। একবার আমি খুব অসুখে পড়েছিলাম—গুরুদেব বাইওকেমিক ওষুধ পাঠাতেন রোজ—দেখতেও আসতেন। অসুখ যখন আর কিছুতেই ভালো হয় না তখন বাধ্য হয়েই ডাকতে হল এ্যালপ্যাথ ডাক্তারকে অবশ্য কবিকে না জানিয়ে। এর মধ্যে কবির জন্মদিন এসে গেল। আম্রকুঞ্জেও অনুষ্ঠান। সবাই গেছেন—আমিও গেছি। মহিলাদের তরফ থেকে একটা বড় থালায় যে অর্ঘ ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল সেটি কবির সামনে দেবার ভার পড়ল আমারই উপরে। ভারী থালাটা নিয়ে কবির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কবি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলেন—এত-বড় থালাটা কেন বয়ে আনলি তুই?

অনুষ্ঠান শেষ হল। কবির পাশে পাশে আম্রকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসছি,—কবি আস্তে আস্তে বললেন—এ্যালপ্যাথ ধরেছিস? তবে তো মরেছিস।

শান্তিদেব ঘোষ

আমার যখন ১৫ কিম্বা ১৬ বৎসর বয়স তখন একবার—প্রায় মাস খানেকের মত, গুরুদেব আমাদের ইংরেজি কাব্য ও তাঁর নিজের কবিতা পড়িয়েছিলেন। সংখ্যায় ৮।৯ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এ ক্লাশটি হোতো। বিকেলে, উত্তরায়ণের কোনার্ক বাড়িতে আমরা খাতা ও বইপত্র নিয়ে তাঁর কাছে পড়তে যেতাম। আমাদের মাস্টার মশায়েরা, আশ্রমের অতিথি এবং মহিলারাও এ সময়ে এসে চুপ করে বসে গুরুদেবের পড়ানোর পদ্ধতি ও আলোচনা শুনতেন। এইরকম নিয়মিত ক্লাস গুরুদেবের কাছে আমরা এর আগে আর পাই নি। আমার বিদ্যালয় জীবনের প্রথম দিকে, আম্রকুঞ্জে বা শালবীথিতে যখন ক্লাস হোতো তখন গুরুদেবকে সেই পথে যেতে দেখলেই মাস্টারমশায় ও আমরা, তাঁর কাছে গিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতাম। কোনো কোনো দিন তিনি নিজে এসে ক্লাসে বসতেন এবং মাস্টার মশায়ের অনুরোধে আমাদের যে পড়াতেন। কেবল এটুকুই মনে পড়ে। তিনি কি পড়াতেন বা কি ভাবে পড়াতেন তা আর এখন মনে নেই।

কবি যখন দেহলি বাড়ির দোতলায় থাকতেন, তখন আমরা থাকতাম ঠিক তার গায়ে-লাগা পশ্চিমের নতুন বাড়ির একটি অংশে। আমি শিশু-বয়েস থেকেই ছিলাম গান-পাগলা। এই নতুন বাটীর দক্ষিণে এখন যেখানে মেয়েদের জন্য কতকগুলি হোস্টেলে হয়েছে, তখন সেখানে ছিল একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। এরই উত্তর পশ্চিম কোণে ছিল একটি মোটা শিরীষ গাছ। এর একটি ডালে বিদ্যালয়ের বড়

বিশ্বরূপ বসু

ছাত্রেরা একটি দোলনা বেঁধেছিলেন। এক দিন বিকেলে আমি একলা ওই দোলনায় দুলে আপনমনে গলা খুলে ওগো দক্ষিণ হাওয়া গানটি গাইছিলাম দক্ষিণ মুখো হয়ে। বেশ কিছুক্ষণ পরে পিছনে তাকিয়ে দেখি দেহলি বাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে গুরুদেব আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভয়ে এবং লজ্জায় সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ। দোলনা থেকে লাফিয়ে পড়ে এক দৌড়ে বাড়িতে। পরে বাবার কাছে এবং দিনুবাবুর কাছে শুনেছিলাম আমার প্রাণ-খোলা গান তিনি খুশী মনেই শুনেছিলেন।

আমার ৫।৬ বৎসর বয়স থেকে শান্তিনিকেতনের যাবতীয় অনুষ্ঠানের গানের দলে আমি স্থান পেতাম। তখন থেকেই নিয়মিত যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠানের গান শিখেছি এবং গান গেয়েও এসেছি। গুরুদেবের জীবনের শেষ দশকের কতকগুলি নাটকের অভিনয়ের সময়ে, মন্দিরে উপাসনায় এবং জলসায় তাঁর নির্দেশমত একলা গানও গেয়েছি। কিন্তু আমার গান তাঁর ভাল লাগতো কি না, তা নিয়ে কখনো তাঁর কাছে কোনো প্রশ্ন তুলতাম না, তিনি তা বলতেনও না। একলা বসে তাঁকে গান শুনিয়েছি তাঁর ঘরে, তাঁরই নির্দেশমত। নতুন রচিত গান শিখে, তাঁকে প্রতিটি গানই ভাল করে গেয়ে শোনাতে হোতো, তবে তিনি আমাকে রেহাই দিতেন।

ভালভাবে গান গাইবার জন্য বা অভিনয়ের জন্য খুসি হয়ে গুরুদেব আমাকে কোনো পুরস্কার দিয়েছিলেন কি না তা বলতে পারি না। কিন্তু উপহার হিসেবে তাঁরই হাতে লেখা সম্পূর্ণ নাটক, শতাধিক গানের পাণ্ডুলিপি এবং ছবি পেয়েছি, বহুবার। আমি জানতাম, তিনি যখন যা দিতেন, আমাকে তা স্নেহবশেই দিতেন। এ-রকম উপহার তাঁর স্নেহভাজন আরো অনেকেই তাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন বলে জানি। তবে এটা ঠিক যে আমি নিজে থেকে গুরুদেবের কাছে কোনো দিন কোনো উপহার চাই নি।

গুরুদেবের কাছে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ইচ্ছা যখনি প্রকাশ করেছি, তিনি কখনও আমাকে নিরুৎসাহ করতেন না। খুবই উৎসাহ পেতাম তাঁর কথাবার্তায়। বরঞ্চ বিশ্বভারতীর তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তেমন উৎসাহ পেতাম না। ইন্দোনেশিয়ায় যাবার আগে গুরুদেব নিজে জাভার সুরকর্তার সুলতানকে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠি পেয়ে সুলতান আমার সেখানকার গান, বাজনা ও নাচ শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা এবং সে দেশে থাকা খাওয়ার খরচের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ছাত্রদের নাচের ব্যাপারে গুরুদেবের আগ্রহ ছিল বরাবর। এবিষয়ে আমার আগ্রহ দেখে তিনি নাচের চর্চার জন্য খুবই উৎসাহ দিতেন আমাকে। ১৯২৯ সালের পর থেকেই তাঁরই উৎসাহে এবং তাঁরই নির্দেশিত পথে আমার নৃত্যজীবন পরিচালিত হয়েছিল।

গান ও নাচ নিয়ে গুরুদেবের মুখে অনেক মজার মজার কথা শুনেছি। তবে এতো বছর পরে সেসব কথা নিভুলভাবে মনে করে, বলা সম্ভব নয়। বলতে গিয়ে অনেক কিছু বানিয়ে বলবার ভয়ে তা বলতেও চাই না। তবু একটা প্রসঙ্গের উল্লেখ করি। যেহেতু আমি একাধারে গান, নাচ ও অভিনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম এবং এসবের শিক্ষকতাও করতাম, সেই কারণে গুরুদেব সর্বসমক্ষে প্রায়ই আমাকে "নটরাজ" বলে ডাকতেন। তাঁর একটি চিঠিতে আমার কথা বলতে গিয়ে তিনি "নটরাজ" শব্দটি ব্যবহারও করেছিলেন। যাঁকে তিনি চিঠিটি লিখেছিলেন তিনি জানতেন ওই শব্দটি প্রকৃতপক্ষে কার কথা ভেবে গুরুদেব ব্যবহার করেছেন।

গুরুদেবের কাছে বকুনিও খেয়েছি। কিন্তু তা আমার নিজকৃত কর্তব্যের অবহেলাজনিত নয়। কারণ ছিল তাঁর সৃষ্টিমূলক কাজের সঙ্গে সমান তালে আমার চলার অক্ষমতা। তিনি যেরকম দ্রুততার সঙ্গে তাঁর কাজ শেষ করতেন তার সঙ্গে তাল রেখে, সকলকে তা শিখিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত করা কখনো কখনো আমার পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ত। গুরুদেব মনে করতেন কাজে হয়তো তেমন মন দিই নি। আমি কিন্তু ফাঁকি দিই নি। তাঁর কথা ভেবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও দু একবার অকৃতকার্য হতে হয়েছে। তিনি তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেও আমি মন খারাপ করতাম না। জানতাম, একটু পরেই তিনি বুঝবেন এবং

আমার প্রতি সম্পূর্ণ ভিন্নস্বরে কথা বলবেন। এবং প্রতিবারই তা হোতো।

কখনো-বা তিনি "ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো"-র রীতি গ্রহণ করতেন। তখনও আমি তার প্রতিবাদ করতাম না। যিনি বকুনির মূল কারণ তাঁর সামনেই গুরুদেব ক্ষোভ প্রকাশ করতেন এবং তিনিও তা বুঝতে পারতেন। আমি তখন সেখানে সম্পূর্ণ উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু আমার বন্ধুরো তা বুঝতে না পেরে আমাকেই ভৎসনা করতেন, প্রতিবাদ করতাম না দেখে। এ সময়ে আমি আমার মুখের গাম্ভীর্য বাড়িয়ে সকলকে বোঝাতে চাইতাম, যেন আমি খুবই দুঃখিত। মনে মনে ঘটনাটিকে খুবই উপভোগ করতাম, কিন্তু কাউকে সে কথা বলতাম না। এইভাবে গুরুদেবের সঙ্গে আমার এক অভিনয় চলতো। তবে, বকুনির পর গুরুদেবের কাছ থেকে প্রতিবারই আমি কিছু না কিছু স্নেহোপহার লাভ করেছি। এছাড়া, কোনো কোনো দিন, যখন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর রাত্রির খাবার খেতে যেতেন, তখন আমাকে খবর দিয়ে এনে পাশে বসিয়ে স্নেহভরে খাওয়াতেন, নানা রকমের খাবার। তখন নানা রকম গল্পে সময়টা খুবই আনন্দে কাটতো।

আমি খুসি। এইভাবে তাঁর আনন্দময় বিচিত্র কর্মজীবনের এক প্রান্তে তিনি আমার মত এক অভাজনকে স্নেহভরে একটু স্থান দিয়েছিলেন বলে আমার নিজের ভাগ্যকে আজ ধন্যবাদ দিই।

ভিন্নরূপে গুরু

প্রচলিত অর্থে মাস্টারমশাই বলতে যা বোঝায় আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠিক তা ছিলেন না। তাঁর কাছে পড়বার, তাঁর উপদেশ শুনবার সুযোগ আমি বহুবার বহুভাবে পেয়েছি। কিন্তু সেটা তো ঠিক মাস্টারের মাস্টারি নয়।

বেশ মনে পড়ে,—আমাদের ছেলেবেলায়—যখন কলাভবনের নিজস্ব বাড়িঘর গড়ে ওঠে নি তখন ক্লাস হোতো 'দ্বারিক' বাড়িতে। এই বাড়ির দু-তলার কবি প্রায় নিয়ম করে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাতেন সবাইকে। তার মধ্যে আশ্রমের অন্যেরা যেমন আসতেন আমিও তেমনি আসতাম। সে 'দ্বারিক' আজ আর নেই, কিন্তু সুখস্মৃতিটুকু আছে।

যখন উঁচু ক্লাসে পড়েছি, আশ্রমের প্রায় সব শিক্ষকের কাছেই ক্লাস করেছি। শাল-বীথি ধরে বেড়াতে বেড়াতে যে কোনো একটা ক্লাসে প্রায়ই ঢুকে পড়তেন কবি। ইচ্ছে হলে কিছু পড়াতেনও। ঘন্টা পড়লে—আমরা প্রণাম করে দাঁড়ালে একটু হেসে বলতেন 'মন দিয়ে পড়াশুনা করবি—কেমন?'

স্কুল শেষ করে এক সময় পুরোপুরি কলাভবনে চলে এলাম। তখনও গুরুদেবের সঙ্গে যোগাযোগে কোনো ছেদ পড়ে নি। এখন যেমন—তখনও বারো মাস ধরে উৎসব, অনুষ্ঠান, অভিনয় আর গানে শান্তি-নিকেতন মুখরিত হয়ে থাকত। মাঝে মধ্যে নাচগানের দলবল নিয়ে কলকাতা, দিল্লি এমন কি সিংহল পর্যন্ত সফরে বের হতেন কবি। কয়েকবার আমিও সঙ্গে ছিলাম। আমার উপর বিশেষ ভার থাকত অভিনয়ের উপযুক্ত পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থাপনার। অভিনয়ের জন্য পোশাক-পত্রের পরিকল্পনাও করতে হত আমাকে। কবিও এসব ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন। খুব চড়া রং বা জমকালো পোশাকপত্র উনি অবশ্য পছন্দ করতেন না—কিন্তু আমাদের স্বাধীনতায় হাতও দিতেন না সহজে।

১৯২৩ সালে কলকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন'-এর অভিনয় হল। ৬২ বছর বয়েসের কবি সাজালেন জয়সিংহ। এমন সুন্দর মেক-আপ আর এমন চমৎকার অভিনয় করেছিলেন গুরুদেব যে তাঁকে একেবারে যুবক বলে মনে হচ্ছিল। ওই বয়সেও গলা কি ভরাট এবং দরাজ। মাইক ছাড়াও কোনো অসুবিধা হয় নি। আরও পরে যখন 'ঋতুরঙ্গ' বা 'তপতী'র অভিনয় হয় তখনও আমি ছিলাম দলের সঙ্গে। বারবার দেখেছি একটা অভিনয়ের সমস্ত ব্যবস্থাপনার একটু কোনো খুঁতও কবির চোখ এড়াতে পারত না।

একেবারে শেষ দিকে—যখন কবি ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, শরীর ভেঙে আসছে তখন তাঁর সেবক হিসেবে আরও দীর্ঘ সময় ধরে কাছে থাকবার সুযোগ পেয়েছি। স্নেহ? কবির কাছে যে ব্যক্তিগত স্নেহ পেয়েছি তা কি বলবার? —না বললে কেউ বিশ্বাস করবে সবটা? কবির পেছনে এসে বসে থাকলেও তিনি বুঝে ফেলতেন আমি এসেছি। গন্ধ পেতেন যেন। কারো সেবা তো নিয়ে চাইতে না বড় একটা। কেবল আমাকেই দেখতাম যা একটু কম সংকোচ করেন। রাতের পর রাত জেগে তাঁর সেবা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। মাঝরাতে কোনো কারণে তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে খুঁজতেন আমি কোথায়। বলতেন—'আমার কাছে বসে থাক।' কবির যত কিছু আবদার আমাকেই মেটাতে হত তাই তিনি আমার আর এক নাম দিয়েছিলেন 'প্রাণকর্তা'।

কি সুন্দর চুল ছিল গুরুদেবের। যেমন গায়ের রং, যেমন প্রসন্ন মুখশ্রী তেমনি চুল রেশমের মতো কোমল নরম চুল। শেষবারে অসুখের সময় সেই চুল কেটে দিতে হ ডাক্তারদের পরামর্শে। আমিই কাঁচি দি কেটে দিয়েছিলাম। চুল কাটার পর শ্যাম্প দিয়ে মাথা পরিষ্কার করে চুল শুকোব মেসিন চালিয়ে তাঁর চুল ঝরঝরে ক দিলাম। আয়নায় দেখে কবি ভারি খুসি বললেন, 'দেখ আমাকে কেমন বাবা মশায়ের মত দেখাচ্ছে!' —বাবা মশায় মানে দেবেন্দ্র ঠাকুর।

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত :

কৃষি বিজ্ঞানী ও মানুষ

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন)

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

এ দেশে কৃষি বিজ্ঞানের পথিকৃৎ ও স্বদেশ প্রেমিক রাজেশ্বর দাশগুপ্ত। বাংলা ভাষায় 'কৃষিকথা' নামে মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন ও ইংরেজি ভাষায় 'ক্যাট্‌ল ওয়েল্থ' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বাংলা ভাষায় 'কৃষিবিজ্ঞান' নামে তিন খণ্ডে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাই তাঁর অক্ষয় কীর্তি। এই গ্রন্থ প্রণয়ন করতে গিয়ে তাঁকে অনেক নতুন পরিভাষারও সৃষ্টি করতে হয়েছে। এতে নিঃসংশয়ে বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'কৃষি বিজ্ঞানের' অবতরণিকায় বিদগ্ধ লেখক প্রাচীন ভারতের কৃষিবিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহ ঋগ্বেদ, অথর্ব বেদ, বাজসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা, যুক্তিকল্পতরু, মহামুণি পরাশর-কৃত 'কৃষি সংগ্রহ' বরাহমিহির-কৃত বৃহৎ সংহিতা'র অন্তর্গত 'বৃক্ষায়ুর্বেদ,, কশ্যপ-কৃত স্বৃক্ষায়ুর্বেদ', 'সুভাষিত শাঙ্গবর' গ্রন্থের অন্তর্গত 'উপবন বিনোদ' অধ্যায় প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞানে যে ভাবে উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে, সে সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। উদ্ভিদের প্রাণবত্তা ও ইন্দ্রিয়চেষ্টা সম্পর্কেও যে ভারতের ঋষিরা নিঃসংশয় ছিলেন, উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহকারে তিনি তা প্রমাণ করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে ভগবান মনুর একটি বচনও উল্লেখযোগ্য। 'তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্মহেতু না। অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেত সুখ-দুঃখ সমন্বিতা।।' রাজেশ্বর বাবুর সচিত্র 'কৃষিবিজ্ঞান' রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলার জনসাধারণের মধ্যে সুশিক্ষার বিস্তার। এই গ্রন্থে তিনি কৃষি বিজ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের (যেমন উদ্ভিদ-প্রজনন-প্রণালী, সার, জীবাণু, কৃষিকার্যে অর্থনীতি প্রভৃতি) কৃষিকার্যে জরীপ পরিমিতি ও ক্ষেত্রের আয়তনপাত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে ফসল, সব্জী ও ফল। তৃতীয় খণ্ডে গো-পালন ও গো-প্রজনন সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

কৃষিবিজ্ঞানী ও কৃষিজীবিদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্যে রাজেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয় ডিমনষ্ট্রেটারের পদ সৃষ্টি করেন। দীর্ঘকাল পূর্বেই তিনি উপলব্ধি করে-ছিলেন যে যে দেশে যৌথ কৃষিব্যবস্থার প্রচলন নেই, সে দেশে ট্রাক্টরের ব্যবহার চলতে পারে না। তাই তিনি এদেশের কৃষিকর্মের উপযোগী হাল্কা লাঙ্গল তৈরি করেন, তাহা রাজেশ্বর লাঙ্গল বা (রাজেশ প্লাউ) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

কৃষিকর্মের উন্নতির জন্যে তিনি [illegible] নলকূপের নক্সা তৈরি করেন। যখন পাটের দর ও চাহিদা কমে যায় ও পাটচাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে, তখন রাজেশ্বর-বাবুই তাঁর দেশবাসীকে শিখিয়েছিলেন, কিভাবে পাটের দ্বারা চট কাপড় তৈরি করা যেতে পারে। বস্তুত কিভাবে এদেশে কৃষি-কর্মের উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমা-ধান করা যায়, তাই ছিল রাজেশ্বরবাবুর ধ্যানজ্ঞান, তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী ও তামেয়াত্মা পুরুষ। ইংরেজিতে একটি কথা আছে—'ম্যান লিভস্ ইন ডিডস্, নট ইন ইয়ারস্' মহাভারতে মনস্বিনী বিদুলাও বলেছেন—'চিরদিন ধূমায়িত হয়ে থাকার চাইতে মুহূর্তকাল জ্বলে ওঠা ভালো।' (মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ঃ ন তু ধূমায়িতং চিরম।) অনলস কর্ম-যোগী, স্বদেশপ্রেমিক, উদারচরিত রাজেশ্বর-বাবুর অকালপ্রয়াণের মধ্য দিয়ে এইসব কথারই সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। রাজে-শ্বরবাবুর জন্ম হয় ১৮৭৮ খৃঃ-এ ও মৃত্যু ঘটে ১৯২৬ খৃঃ এ ২২শে নভেম্বর, সুতরাং তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র আট-চল্লিশ বৎসর।

রাজেশ্বরবাবু অল্প বয়স থেকেই কঠোর বিরূপতার সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বলিষ্ঠ আত্ম-প্রত্যয় ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যখন তিনি কৃষিবিজ্ঞানীরূপে যশস্বী হয়ে-ছিলেন, তখনো তাঁর গৃহদ্বার তথা হৃদয়-দ্বার দরিদ্র, আর্ত উৎপীড়িতের জন্যে সর্বদা অবারিত ছিল। কত দরিদ্র ছাত্র, কত আত্ম-জন, কত ভাগ্যবিড়ম্বিত ও দৈন্যক্লিষ্ট নরনারী, কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে তিনি যথাশক্তি সাহায্য করেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। তাঁর মতো অমায়িক ও নিরহঙ্কার মানুষ সকল যুগেই দুর্লভ। কর্তব্যসাধনে তিনি ছিলেন বজ্রের চাইতেও কঠোর, অথচ তাঁর অন্তর ছিল কুসুমের চাইতেও কোমল। সুতরাং ভবভূতির ভাষায় তাঁকে লোকো-ত্তর পুরুষ বলা চলে। আবার তাঁর ভেতর বলিষ্ঠ আশাবাদ (রোবাস্ট অপটিমিজম্) উচ্চ আদর্শবাদ (আইডিয়ালিজম্) ও প্রখর কাণ্ডজ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।

মনস্বী রাজেশ্বর দাশগুপ্ত শুধু এক-জন কৃষিবিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যরসিক। ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীর। আবার সঙ্গীত-চর্চায় ও অভিনয়েও তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল প্রচুর। সাধক-কবি শ্রীরামপ্রসাদের গান তাঁকে মুগ্ধ ও ভাবতন্ময় কোরে তুলতো। সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েও তিনি চারণকবি মুকুন্দদাসের গভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বজাত্যবোধ এবং প্রবল ব্যক্তিত্ব তাঁকে অভিভূত কোরতো। সাহিত্যরসিক অধ্যাপক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গেও তাঁর সৌহার্দ্য ছিল নিবিড়। আমাদের দুর্ভাগ্য, রাজেশ্বরবাবু তাঁর স্বল্প-পরিসর জীবনে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সম্যক পরিচয় দিতে পারেননি।

১৯২০ খৃঃ-এ তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি-স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। এর ছ' বছর পরে রাজকীয় কৃষি কমিশন বঙ্গদেশে পরিদর্শনে আসেন। এই সময় রাজেশ্বরবাবুর ওপর লিয়াজোঁ অফিসারের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এই গুরু-দায়িত্ব বহন করেন। এই সময়, একদিকে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অন্যদিকে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতার ফলে তিনি সহসা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

আজ আমরা রাজেশ্বরবাবুর জন্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। আমরা আজ এই কথাটি স্মরণ করি যে কৃষিবিজ্ঞানী রাজেশ্বরবাবু ছিলেন কর্মযোগী ও জ্ঞান-তাপস, কিন্তু মানুষ রাজেশ্বরবাবু ছিলেন তার চাইতেও বড়ো। আজ আমরা 'মানুষ চাহি তোমার মতো, আর স্মরণ করি মহা-কবি কালিদাসের একটি অমর বাণী। মহা-কবি বলেছেন—যেখানে পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজায় ব্যতিক্রম হয়, সেখানে আমাদেরই অকল্যাণ ঘটে, স্বর্গত মহাপুরুষদের এতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

বাউল বদলাচ্ছে

মানস রায়

কানের কাছে ফিসফিস করে আশানন্দন বাবু বললেন : ওনার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে ? উনি একজন নামকরা বাউল, জাতে নেপালী।

আশানন্দন বাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আর সকলের সঙ্গে বাউলের আখড়ায় বসে আলাপ করছিলাম। ফিসফিস করে কথা বলার কোন দরকার ছিল না। এতক্ষণের আলোচনায় স্বরের যে পর্দা ছিল তাতেই বেশ শোনা যেত। এই ক'ঘণ্টার পরিচয়ে জেনেছি স্বাভাবিক কথা বলার সময় তাঁর স্বর অযথা উত্তেজিত হয়ে পড়ে, দেহের রক্ত মুখে এসে জড়ো হয়, গলার স্বর ঝুলে যায় লম্বালম্বি। কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হলে বা সেরকম দরকারী কিছু, অন্ততঃ তাঁর কাছে, এরকম কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলেন। অর্থাৎ ফিসফিসিয়ে যাবতীয় কথা তাঁর মুখ থেকে শোনা গেলে ধরে নিতে হবে ব্যাপারটায় তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

তাকালাম বাউলটির দিকে। গুরুত্ব দেবার মতো ব্যাপার বই কি! পরণে টেরিকটের পাঞ্জাবী, পাতলা [illegible] ধুতি, পাশে শোয়ানো অ্যাটাচি। গৌরবর্ণ সৌম্য মুখে মাঝবয়সী স্থিরতা—দেখলে কোথাও মনে হবে না বাউল বা নেপালী কিংবা পার্বত্য অঞ্চলের দুঃখী অধিবাসী। উনি কথা বলছিলেন পাশের বাউলটির সঙ্গে। মুখে আলতো হাসি, শব্দগুলো চাপা চাপা অনুচ্চ অনেকটা শীতের দিনে আয়েসী চায়ের কাপের ধোঁয়ার মতো চিবুকের চারিদিকে জড়িয়ে আছে। চট করে দেখলে মনে হবে না যে উনি কথা বলছেন, মনে হবে শান্ত সফল গৃহীর এক স্থির চিত্র।

আশানন্দনবাবুর দিকে ফিরে তাকালাম। বোধ হয় বুঝে থাকবেন, বললেন : অবাক হচ্ছেন তো, ইনি গৃহী বাউল।

গৃহী বাউল। বাউল গৃহী হয় জানা ছিল না। এতদিনের ধারণায় জেনেছি বাউলের একমাত্র সঙ্গী পথ। সে পথভোলা পথিক। তার মাথায় আশ্রয় থাকবে না, পরণে থাকবে না জমকালো উচ্চবিত্ত পোষাক, থাকবে না পার্থিব আপনজন। নিখিল-জোড়া তার ব্যাপ্তি। পথে পথে গেরুয়া মনে গান গেয়ে ঘুরবে দিনরাত। তার জন্ম-জন্মান্তর কেটে যাবে দয়াল হরির প্রেমে...

দয়াল গৌর, দিন কাটে মোর
তোমার নামে গানে—
কখন তোমায় দেখতে পাব
মাও বলে কানে কানে....

বাউল তো ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকার কথা নয়। তার প্রাঙ্গণ চরাচর-জোড়া। কোন মানব-মানবীর কাছে সে সমর্পিত নয়, তার আ[illegible] হরিত্ত শ্রীচরণে। তাই তো বাউলের [illegible]রক ধসন, জৈবিক রসনায় অতৃপ্তি। পথে পথে ক্ষ্যাপার মতো ঘোরা, উদাসী হয়ে যাওয়া।

তাহলে চোখের সামনে যাঁকে দেখছি ইনি কেমনতর বাউল ? আশানন্দনবাবু তো বললেন গৃহী বাউল, তবে কি ইনি গৃহের চৌহদ্দির মধ্যে নিখিলের সন্ধানে ফেরেন ? ভারি কৌতূহল হল, এগিয়ে গেলাম।

ভদ্রলোকের নাম কৃষ্ণবাহাদুর থাপা, নিবাস বর্ধমান জেলা, বয়স ছেচল্লিশ। এপিক নথিক-ফোল্ড বিহীন চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন : একটি ছেলে দুই মেয়ে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সংসার। বড় মেয়ে ক্লাশ ফোরে পড়ে, অন্যগুলি ছোট ছোট। নিজে ইণ্টারমিডিয়েট অবধি পড়েছেন। তবু চাকরির চেষ্টা না করে নিজের জমির চাষবাস দেখাশোনা করেন। কত বিঘে জমি আছে ? হাসিতে শালীনতা রেখে বললেন : ভগবৎ প্রেমে বিভোর আছি। কোন রকমে মুখে অন্ন জুটে যাচ্ছে—আর কি। ছোটবেলা থেকে গানবাজনার শখ—ভীষণভাবে বাংলার লোক-সঙ্গীত টানে আমায়। তারপর একদিন

তারাপীঠে [illegible] এ প্রধান দেখলাম—বাউল-দলের দু'পক্ষ হয়ে গেলাম। এখন মাঝে মাঝে এই চরকার সংসারবন্ধন বিরক্তিকর লাগে, কিসের যেন অভাব সেই অন্তরে, মনে হয় তিনি বলছেন—

> খ্যাপা-মন ফুরায় যে দিন,
> হয় আয়ু ক্ষীণ—
> বল্ গুরুকে ডাকবি করে....

একছত্র গাওয়ার পর হঠাতই চুপ করে গেলেন। একটু আনমনা, কি যেন ভাবলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন : উপায় নেই, আমি চলে গেলে সব অথৈ জলে পড়বে। ঘরের মধ্যে বসেই তাঁর সেবা করি, নামগান নিয়ে থাকি, আর মাঝে মাঝে মন মানে না, বেরিয়ে পড়ি, মেলায় মেলায় ঘুরি, তারাপীঠে যাই।

মন মানে না, মেলায় মেলায় ঘুরি। মন যদি না মানে তো কেবলমাত্র মেলায় মেলায় ঘোরা কেন? প্রশস্ত পথ রয়েছে পড়ে, অনন্ত তার বিস্তৃতি। কত মানুষের অভিজ্ঞতা, কত আনন্দ মিলে আছে পথের ধুলোয়—সে ধুলোর সঙ্গে ফাগ খেলে নিজেকে ধন্য মনে করি না কেন?

ভদ্রলোক অ্যাটাচী কেস খুলে ইস্ত্রি-করা গেরুয়া পাঞ্জাবী আর লুঙ্গিও বের করলেন। সম্ভবতঃ পোশাক বদলাবেন। একটু আগে কোন-একটি সংবাদ সংস্থার পক্ষ থেকে লোক এসে অনুরোধ করে গেছে, ছবি তুলবে। ভদ্রলোক একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাক্সটা খোলা রইল। যাত্রার নামী অভিনেতার ফাউনডেশন সেটের মতো হরেক রকম প্রসাধন সামগ্রী বাক্স ভর্তি।

আবার তাকালাম তাঁর দিকে। স্মিত-হাস্যে চেয়ে রয়েছেন, দৃষ্টি সরল, খানিকটা ভাবুক-ভাবুক—এক চোখে দেখলে মনে হবে বুঝি ক্যামেরায় পোজ দিচ্ছেন। একটি অল্পবয়সী ছেলে ভদ্রলোকের চুল বেঁধে দিচ্ছে বাউল ঢঙে। ছেলেটিও বাউল, নাম পবন দাস। ভারি মিষ্টি এবং ভদ্র। থাকে বর্ধমানের এক গ্রামে। পথে কৃষ্ণ বাউলের সঙ্গে আলাপ। সেই থেকেই সঙ্গী। বাড়ীতে বাবা-মা, ছোট ছোট ভাইবোন আছে, তবে যোগাযোগ নেই। দীক্ষা নেবার পর থেকেই আশ্রমে আশ্রমে, পথে পথে। ওইটুকু ছেলে, কিন্তু হাতে-পায়ে চোখেমুখে যেন কত যুগযুগান্তরের ছাপ।

বস্তুতঃ বীরভূমের আজকালকার মেলাগুলিতে এই ধরণের গৃহী অবস্থাপন্ন বাউলের পাশাপাশি নিঃস্ব পথ-সঙ্গী বাউল দেখতে পাওয়া যায়। এই সঙ্গে আরেক রকমের বাউল যা চোখে পড়ে তাহল গরীব সংসারী বাউল। এদের স্ত্রী-পুত্র, বাবা-মা আছে, এরা জমি চাষ করে না, আশ্রমেই থাকে, মাঝে মাঝে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে যান।

নিঃস্ব পথ-সঙ্গী বাউলদের সঙ্গে এদের পার্থক্য হল একজনের তবু যাও বা ঘর-বাড়ী সংসার আছে, আরেকজনার তাও নেই। তবে দুজনেই রিক্ত, পথে পথে ভিক্ষে করে, গান গেয়ে পেট চালাতে হয়। আর মাঝে মাঝে কখনও বা এরকম মেলা হয়, বাবুরা আসেন, ফটো তোলেন, গান টেপ করেন পয়সা দিয়ে যান।

সেদিক থেকে সাহেববাবু বা মেম-দিদিমণিরা আরো ভাল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাতভোর মাথা নাড়ে—কখনো চোখ বুজে, কখনো খুলে ভরা পেটে শীতের রোদ উপভোগ করার মতো গান শোনে। তারপর সব শেষ হয়ে গেলে সুগন্ধি সিগারেট বা মিষ্টি কিংবা চকচকে নোট দেয়। ভাঙা বাংলায় বলে খু-ব-ভা-লো।

কি সবহারানো পথ ভোলা, কি গরীব দুঃখী সংসারী, কি অবস্থাপন্ন—সব রকমের বাউলরাই এই সব বিদেশী অতিথি-দের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। আর এই ধরনের তিতিক্ষায় থাকে টিভি বা সিনেমা কোম্পানীর লোকেদের দিকে। সাধারণতঃ যারা অবস্থাপন্ন তাদের স্বাভাবিক ভাবেই পেটের তাগিদ থাকে না, তারা শীত-কালভোর মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়ায় একটা ভাল কনট্রাকট পাওয়ার আশায়। তারা দুচারদিনের জন্য মেলায় আসে, সঙ্গে আনে এ্যাটাচি বা সুটকেশ, জামা বদল করে, বাউল সাজে, গান গায়। তারপর ভাঙা-মেলায় সংসারের দরকারী কিছু জিনিস কিনে বাড়ী ফেরে। অনেক লোকের সামনে গান গাওয়া যায়, খুচরো তারিফ পাওয়া যায় আর খুব ভাগ্য ভাল হলে সিনেমা টিভি বা এই সব বিদেশীদের দেশে ডাক আসে। অর্থাৎ রথ দেখা এবং কলা বেচা, যুগপৎ চেষ্টায় খানিক সাজ বদল আর কি।

তবে সত্যিই এগুলি উপলক্ষ্য আছে আশীর্বাদ দুই দলেরই বাউলদের। কারও একটা নিয়ম, বন্ধনহীন, তবু দুবেলা অন্ততঃ দু মুঠো পেট ভরার সামগ্রীর প্রয়োজন। কিন্তু কোথায়?

আজকের বাংলার বাউলদের এই একটা সমস্যা। তাদের প্রতিদিন কাটে পরবর্তী দিনে স্বাদভোগ নেওয়ার আশায়। এতদিন একরকম ছিল, কিন্তু সমস্যা বেড়েছে অবস্থা অবস্থাপন্ন বাউলদের অনুপ্রবেশে। সারা বছর তো ফুল্লরার বারমাস্যা আছেই, কিন্তু বৎসরান্তে এইসব মেলাগুলিতে দুঃখী মানুষগুলির কম-বেশী আশা থাকে যাতে টেপ করে ফটো তুলে বা দুচারটে কনট্রাক্ট পেয়ে দু পাঁচ পয়সার সংস্থান করা যায়। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও যাতে পেটের জ্বালা খানিকটা সামলানো যায়। কিন্তু অবস্থাপন্ন মানুষগুলি এসে ভীড় জমায়, প্রভাব খাটায়। এবং তাই দুনিয়ার নিয়মে এইসব মেলায় তারাই জিতে যায়, পড়ে থাকে বাংলার বাউল।

কথায় কথায় খানিকটা বা উত্তেজিত হয়ে আশানন্দবাবু বললেন : আপনি দেখবেন, যত দিন গড়াবে বাংলার বাউলদের সেই ঐতিহ্য আর থাকবে না। এইসব লোকেরা শুধুমাত্র এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে তাই নয় বাউল গানেরও বিকৃতি ঘটাচ্ছে।

বস্তুতঃ বাউল সঙ্গীতের বিষয়বস্তু দেহতত্ত্ব, ভাবতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব কিংবা স্থানমাহাত্ম্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এবং পদ রচনাতেও একটা বিশেষ ছন্দ থাকে। যেমন—

> হের ওই ললাটেশ্বরী মা'রে,
> 'নলহাটি এসে'।
> যবে ঘুরে ক্লান্ত হবে ও মন,"
> রাঙা ধুলোর এই দেশেয়
> পাহাড়ের কোলে পীঠস্থান,
> যেথা ডাকে আলোর বান।
> সেথা সতীর দেহ কাঁধে ভোলা,
> ঘুরেছেন পাঠান বেশে—
> হের ওই ললাটেশ্বরী মায়ে,
> নলহাটি এসে।....
>
> অথবা,
> দেশবিদেশের মানুষ গো যাও,
> এ বীরভূম ঘুরে।
> যেথা বৈরাগী আকাশের তলে,
> মনমাতে বাউল সুরে॥
> হেথা কেন্দুবিল্ব আর সেই মানুর,
> জয়দেবকবি চণ্ডীদাসের ধাম।
> আছে নলহাটি, ললাটেশ্বরী,
> তারাপীঠ বামাক্ষ্যাপার নাম॥
> আর বক্রেশ্বর কঙ্কালীতলা,
> সাথ ফুল্লরামা লাভপুরে—
> দেশবিদেশের মানুষ গো যাও,
> এ বীরভূম ঘুরে।....

কিন্তু বাউলসঙ্গীতে এখন আধুনিকতার ছোঁয়া অনুভব করা যাচ্ছে। এবং গানের কথায় প্রকাশ্যে

[illegible] এই পরিবর্তন তার জন্য বৃহত্তরভাবে বর্তমান সমাজ দায়ী কোন সন্দেহ নেই, তবে এটা ঠিক, অবস্থাপন্ন শিক্ষিত বাউলদের অনুপ্রবেশ এই ব্যাপারটিকে আরো ত্বরান্বিত করছে।

এদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আছে, আছে শিক্ষা এবং মানসিকতার সবল স্ফুরণ। এরা বর্তমানের শ্রোতাদের চাহিদা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে—গান লেখে, সুরের সাজবদল করায়, শ্রুতিমধুর করার জন্য দেশবিদেশের যন্ত্র আমদানি করে। বীরভূমের কি জয়দেব-কেন্দুলী, কি পৌষমেলায় তাই একতারা, প্রেমজুড়ি, ডুগির পাশে দেখা যায় হারমোনিয়াম, বাঁশি, শাঁখ, মন্দিরা, খঞ্জনী ইত্যাদি। এবং সেই সঙ্গে লালনফকির, হাউরীলাল বা হরিপদ গোঁসাইয়ের গানের সঙ্গে পরিবেশিত হয় রং-বাউল বা সস্তা প্রেমের বাউল গান।

মোটকথা, এদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অর্জন করা। এরা জানে গ্রাম-বাংলার মেলাগুলিই হল প্রধান মাধ্যম। এখানে দেশীবিদেশী প্রভাবশালী লোকেদের যেমন ভিড় হয় তেমনি ভিড় বিভিন্ন প্রচার সংস্থার সারা বছর পথে পথে ঘুরে গায়ে খড়ি তুলেও বৎসরান্তে এই মেলাগুলিতে ভ্রমণ অনেক লাভজনক নয়? অনেক সুখের নয়? এরা তাই নিজেদের বিদ্যেবুদ্ধি এবং খানিকটা-বা দূরদর্শিতা প্রয়োগ করে সুরের কথায়, বাদ্যযন্ত্রে বা নাচের মুদ্রায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে যাতে সামগ্রিক প্রকাশ শ্রুতিমধুর হয়, আকর্ষক হয়।

যদি এইসব মানুষদের বাউলীকরণ খুব একটা বেশী নয় তবু এদের উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে এদের সৃষ্ট পরিবর্তনের হাওয়া গরীবগৃহী অথবা নিঃস্ব বাউলদেরও পালে লেগেছে। আর তাই যখন বাউলদের মধ্যে রং-বাউল গাওয়ার অপছন্দ-পছন্দের প্রশ্ন তুলি তখন দেখতে পাই শতকরা সত্তর শতাংশ বাউলই এধরনের গানে আগ্রহী। এই সত্তর শতাংশের মধ্যে আবার পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বাউলের সংখ্যা বেশী। তারপরে ছত্রিশ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন অপেক্ষাকৃত কম।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে বয়স্ক এবং যথাযথ প্রৌঢ় বাউলদের নিস্পৃহ আচরণ এব্যাপারে লক্ষ্যণীয়। এই বয়সের বাউলেরা সাধারণত সাবেকী গায়কী রীতি অনুসরণে অভ্যস্ত। তারা গুরুর কাছে যা শিখেছে তাই-ই গায়, একই রকম নাচের-মুদ্রা স্থানকালপাত্র ভেদে ব্যবহার করে। তাদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যেও সেই একতারা, গাব-গুপী, প্রেমজুড়ি বা ডুগি দেখতে পাওয়া যায়। এদিক দিয়ে মহিলা বাউলদেরও সমর্থন পাওয়া যায়। তবে যেটুকু পার্থক্য দেখা যায় তাহল এদের [illegible] শতাংশ লীলাতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্বের গান গাওয়া পছন্দ করে। দেহতত্ত্বের গান বা রং-বাউল গাইতে কেউই খুব একটা চায় না।

এটা ঠিক যে, সারা বছর পথে পথে পায়ের চিহ্ন এঁকে দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়, মনের খিদে মেটে, কিন্তু পেটের খিদে? ওটিকে তো উপেক্ষা করা যায় না। আজকাল গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। হাটেমাঠেঘাটে তার আনন্দাশ্রু পড়ে শুকিয়ে বাষ্প হয়ে যায়। শুধু খর রোদ চেয়ে থাকে, বেলা বাড়ে, দিন যায়।

তাই এরা সাগ্রহে বচ্ছরকার মেলাগুলির জন্য প্রতীক্ষা করে। এখানে এসে তারা অবস্থাপন্ন এবং প্রভাবশালী তথাকথিত বাউলদের সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করে। তাদের সেবা করে, পা টিপে দেয়, খোশামোদ করে। যে গেরুয়া বাস তাদের আজন্মের বসনভূষণ তা তাদের পরিয়ে নিজেদের অশ্রু গোপন করে। জন্ম-জন্মান্তরে যেখানে আনন্দ, বিভিন্ন যোনি অতিক্রম করে এসে যখন তার সেবা করা—সেই শুভলগ্নটি তখন পরের হাতে সঁপে দেয়।

কেননা অনেক দূরে যে তারা অপেক্ষা করছে। মাত্র ছ'জনায় ছ'রিপু সেজে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ আগলে আছে, দু'হাত বাড়িয়েই আছে—যখন অনেক রাতে বড়-সড় চাঁদ ওঠে, চরাচর জোড়া খোয়াইয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ে, দু'চারটে রাত-চরা পাখি ডেকে যায়, পৃথিবী নিঃঝুম হয়ে পড়ে—তখনও; আবার দুপুরের রোদ বিবর্ণ হয়ে গেলে, রাখাল ছেলের বাঁশির সুর করুণ হয়ে গেলে—তখনও।

অতএব সমর্পণ।

এই সমর্পণ এখনকার বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনীতির জন্ম দিচ্ছে। এবং তা হচ্ছে অবস্থাপন্ন বা প্রথিতযশা ব্যক্তি বাউলকে কেন্দ্র করে।

সারা বছর একরকম, তত বোঝা যায় না, কিন্তু বৎসরান্তের মেলাগুলিতে এটা প্রকট হয়। বীরভূমের যেকোন মেলায় গেলে একই ছাউনির তলায় অথবা পাশাপাশি ছাউনিতে এরকম একাধিক রাজনৈতিক গোষ্ঠী দেখা যাবে। এবং গোষ্ঠীগুলি কোন্ বিশেষ রাজনৈতিক মতাবলম্বী হবে তা নির্ভর করবে যাকে কেন্দ্র করে এক একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর।

বাস্তুবিক গ্রাম-বাংলার মেলাগুলি যদিও কোথাও কোন নিঃসঙ্গ কবির স্বপ্নসাধকে কেন্দ্র করে, কোথাও আবার দেবদেবীকে, তবু এটা ঠিক, এইসব মেলার কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয়ে একটা রাজনৈতিক তকমা থাকে বর্তমানের দেশজোড়া রাজনৈতিক সচেতনতার ফসল। আর তাই মেলায় আমন্ত্রিত হওয়া, আখড়ার স্থায়ীত্ব স্টেজে ওঠা, গান গাওয়ার সময় নির্ধারিত হওয়া বা বিভিন্ন প্রচার সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সুযোগ পাওয়া সবই সম্ভব হয় যদি সেই বিশেষ রাজনৈতিক মতাবলম্বী হওয়া যায়। এতে শখেরও তৃপ্তি, আবার 'ক্ষুধা' নামক যে জিনিসটা দিবারাত্র কুরে কুরে খায়—তারও নিরসন।

এবং এইভাবে এক শ্রেণীর বাউলের শখ ও যশের কাঙালপনা এবং অন্যদিকে অন্যদের অভাব-অনটন, বুভুক্ষা—দুইয়ে মিলে অধুনা বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবর্তন আনছে। সমস্যা বাড়াচ্ছে।

বাংলার বাউলের একতারা, গুপী, প্রেমজুড়ি পড়ে থাকে। খোলা আকাশের নীচে ঝুরঝুরে সোনা রোদে উদাস-হওয়া গানে আর বাতাস-বিলীন হয় না। সে হোঁচট খায়? তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করে? বেলা বাড়ে, দিন যায়, সময় তরতর করে এগিয়ে চলে।

এবং তাই একদিন হয়তো দেখা যাবে: কোন এক জবুথবু শীতের সন্ধ্যায় ভুবনডাঙ্গার মাঠে মেলা বসেছে। লোকে লোকারণ্য। নিয়ন মারকারীয় আলোর ঝালরের তলায় কাঁটা-চামচের ঠুংঠাং শব্দ, বড় বড় অতলকালো চোখের ভাষার পাতলা রঙিন ঠোঁটে অস্পষ্ট ছেঁড়া ছেঁড়া দার্শ[illegible]ক প্রকাশ, নাগরদোলার অসহিষ্ণু [illegible]চকোঁচ শব্দ—সব মিলিয়ে এক ধরনের ককটেল শব্দসমষ্টি মাঠ পেরিয়ে, খোয়াইয়ের এক বুক আঁধার ঠেলে চরাচরে কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। এরই কোন প্রান্তে সুবেশ মঞ্চে সুবেশ বাউল গান গাইছে দাঁড়িয়ে।

তার পরনে টেরিকটের নিভাঁজ গেরুয়া পাঞ্জাবী এবং লুঙ্গী, মাথায় পরিপাটি করে শঙ্খচুল বাঁধা, পায়ে ঘুঙুর, হাতে একতারা। পেছনে কনসার্ট পার্টি—জ্যাজ, স্যাক্সোফোন, বঙ্গো, অরগ্যান। শব্দ সুর হয়ে গান হয়ে বিদ্যুতের তারে তারে ছড়িয়ে পড়ছে...

সখীরে কেমনে যাইব অভিসারে—
মালা গাঁথা আছে বাকী,
সে নাগর জানে না কি,
তবু কেন ডাকে বারে বারে?
সখীরে কেমনে যাইব অভিসারে......

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। পঞ্চান্ন ।।

'আগে বাঢ়্। মিল জায়গা!'

ভুটান জঙ্গলের উদোম ফকিরের গমগমে গলার স্বর আর কথাগুলো বাপীর প্রায়ই মনে পড়ে। সেদিনের মানসিকতায় শব্দ চারটে রোমাঞ্চকর কাণ্ড ঘটিয়েছিল। বুকের তলায় ঝংকার তুলেছিল। বিঘ্ন ঠেলে সামনে এগনোর সাদা মন্ত্র কেউ কানে জপে দিয়ে গেছল। কিন্তু এখন কি? জপের মতো কথাগুলো এখনো কানে বাজে কেন? স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাড়া জাগে কেন!

বাপীর তন্ময় হতে সময় লাগে না। প্রকাণ্ড দেবদারু গাছের নিচে ভস্মমাখা উলঙ্গ ফকির বসে। ওর দিকেই চেয়ে আছে। তার দু চোখে হাসি ঠিকরোচ্ছে কি আলো, বাপী জানে না।

'আগে বাঢ়। মিল জায়গা!'

...ত্রিশূল হাতে উঠে দাঁড়াল। পলকে গভীর জঙ্গলে সেঁধিয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় গেল? সামনে এগলো? কিছু পাওয়ার আশা না থাকলে সে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? দুর্নিরীক্ষ মহাশূন্যে বসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে এমন কোনো মহাশক্তিধরের কাছে পৌঁছনোর আশা? খুব ছেলেবেলায় বাপী ভাবত আকাশের ওপারে ঈশ্বরের রাজ্য। ও-রকম কোনো অলৌকিক অস্তিত্বে বিশ্বাস এখন নিজের কাছেই হাস্যকর।

'চলা পৃথিবী স্থিরভূমি'। দেড় হাজার বছর আগে ভারতীয় বিজ্ঞানী আর্যভট্টের ঘোষণা বাপী বইয়ে পড়েছে। সে বলে গেছে, সূর্য নয়, স্থিরভূমি এই পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে পাক খাচ্ছে। এই জ্ঞান কোনো ঈশ্বর মহাশূন্য থেকে তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল? গত দেড় বছর যাবৎ মানুষের তৈরি উপগ্রহ মহাকাশের রহস্যের আবরণ সরিয়ে চলেছে। স্পুৎনিক আর একসপ্লোরারের জয়-জয়কার। মানুষ খুব শিগগীরই ওই মহাকাশের গ্রহ-উপগ্রহ জয় করবে এমন বিশ্বাস বাপীরও আছে। কিন্তু সব-কিছুর আড়ালে বসে বিচ্ছিন্ন কোনো অলৌকিক পুরুষ এই শক্তির যোগানদারি করছে, বাপী ভাবে না।

অথচ শক্তিটুকু অস্বীকার করার উপায় নেই। এই শক্তির উৎস কোথাও আছেই। সেটা কোথায়, কত বড়, তার সম্পূর্ণ অস্তিত্বই বা কেমন? উলঙ্গ ফকির সম্পর্কেও বাপীর সেই গোড়ারই বিস্ময়। হাড়গুঁড়নো রক্তজমানো সেই প্রচণ্ড শীতে লোকটার গায়ে একটা সুতো নেই। শীততাপের অমোঘ প্রাকৃতিক বিধান থেকে নিজেকে সে এমন অনায়াসে তফাতে সরিয়ে রাখতে পারে কোন শক্তির জোরে? লজ্জা ভয়ই বা তার কাছে ঘেঁষে না কেন?

নিজের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে এক-একসময় দম বন্ধ হয়ে আসে বাপীর। ধড়ফড় করে ওঠে। নিজেকে টেনে তোলে। ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বাস্তব ভূমির ওপর পা ফেলে চলতে চেষ্টা করে। কাজ-কর্মে মন দেয়। কিন্তু সেই মন আর সেই উৎসাহে ভাটা পড়ছে তাও অনুভব করে।

তা হলেও ব্যবসা যেখানে দাঁড়িয়ে, টাকা আপনি আসছে। আসছেই। অনেকটা খেয়ালের বশেই বাপী, নিঃশব্দে মাঝে মাঝে এই বোঝা কিছু কিছু হালকা করে ফেলে। দেশের প্রায় সর্বত্র খরা বন্যা দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বছর বছর পোকা-মাকড়ের মতো মরে যায়। তাছাড়া অন্ধ আতুর বা আর্তের সেবা প্রতিষ্ঠান বা এ-দেশের মতো এত আর কোথায় আছে। গোটা দেশটাই যেন দাও-দাও রব তুলে হাত পেতে বসে আছে।

বাপীর নিঃশব্দে দিয়ে যাওয়ার অঙ্কটা ক্রমশ বড় হচ্ছে সেটা একমাত্র মিষ্টি লক্ষ্য করেছে। বাপ ওকেও বলে না। কিন্তু সমস্ত চেক বই পাশবই আর কাঁচা টাকা বোঝাই সিন্দুকের চাবি তার হেপাজতে। লক্ষ্য বা চোখ রাখলে তার না জানার কারণ নেই। এমন সংগোপন দানের বহর দেখেও মিষ্টি অস্বস্তি বোধ করে। ঐশ্বর্যের সবটা সাদা রাস্তায় আসছে না বলেই এভাবে বিবেক পরিষ্কার রাখার চেষ্টা কিনা বোঝে না।

ঠাট্টার সুরেই একদিন বলে ফেলল, দান করলেও লোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু প্রচার চায়—তুমি যেন খুব চুপি চুপি মস্ত মস্ত এক-একটা দানের পর্ব সেরে ফেলছ?

তার মুখের দিকে চেয়ে বাপী বেশ একটু কৌতুকের খোরাক পেল। ঠোঁটে হাসি। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তুমি দক্ষিণেশ্বরে গেছ কখনো?

প্রশ্ন শুনে মিষ্টি অবাক। —মায়ের সঙ্গে দুই একবার গেছি। কেন?

—আমি একবারও যাইনি। তোমার কথা শুনে সেখানকার জ্যান্ত ঠাকুরটির একটা কথা মনে পড়ল। বলেছিল, সেবা করতে পারিস, দান করার কে রে শালা তুই?

মিষ্টির ভালো লাগল। হেসে বলল, তুমি তাহলে সেবা করছ?

—আমি কিছুই করছি না। নিজেকে যাচাই করছি।

না বুঝে মিষ্টি চেয়ে রইল।

বাপী বলল, দিতে ইচ্ছে করে না। তখন আরো বেশি করে দিয়ে ফেলে দেখি কেমন লাগে। মানে, দেখি কতটা টাকার গোলাম হয়ে বসে আছি। ছাড়তে না পারার গোলামি বরদাস্ত করতে না চাইলেও ওটা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়।

মিষ্টির দু-চোখ বড় বড়। —শেষে কি, আমার ওপর দিয়েও এরকম একসপেরিমেন্ট চলবে নাকি!

বাপী হাসছে। —ঘুরে ফিরে একই ব্যাপার কিন্তু...সেই আঁকড়ে ধরে থাকার গোলামি।

মিষ্টি আর কিছু বলল না। এই জবাব আশাও করেনি, ভালও লাগেনি।

দিন গড়াতে গড়াতে উনসাট সালের আগস্ট পেরিয়ে সেপ্টেম্বরে পা ফেলল। মাসের প্রথম দিনে বাপীর জীবনের এই গতিও আচমকা বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়াল।

গত জুন মাস থেকে পশ্চিম বাংলার খাদ্য পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে উঠছিল। চালের দর হু-হু করে বাড়ছে। বাজারের চাল উধাও হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে প্রতি দিন তিন চার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ কলকাতায় আসছে খাবার খুঁজতে। মুখ্য-মন্ত্রী বিধান রায় খাদ্য নীতির ব্যর্থতার দায় খাদ্যমন্ত্রীর ওপর না চাপিয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি খারাপের দিকেই গড়াতে থাকল।

এই ব্যর্থতা সামনে রেখে প্রবল আক্রমণে নেমে গেছে বিরোধী দল। সরকারকে

উল্টে দেবার হুমকি দিয়ে আসরে নেমেছে তারা। তাদের অসন্তোষ মুখ্যমন্ত্রীর ওপর যত না, তার থেকে ঢের বেশি খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের ওপর। পরের দু-তিন মাসে চালের দর মণ পিছু আরো পাঁচ টাকার ওপর বেড়ে গেছে। মূল্যবৃদ্ধি আর দুর্ভিক্ষপ্রতিরোধ কমিটি কোমর বেঁধে গণ-আন্দোলনে নেমেছে। তারা চালের মজুতদারির বিরুদ্ধে যুঝবে, আইন অমান্য করবে, অবস্থান ধর্মঘট করবে, পিকেটিং করবে। অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠতে লাগল, কারণ খিদের জ্বালায় তারাও ক্ষিপ্ত। জঠরে আগুন জ্বললে মানুষ কান শুনতে ধান শোনে। রাজনীতি বুঝুক না বুঝুক, দুর্দিন ঘোচানোর যুদ্ধে তারাও ছুটে আসবে, হাত মেলাবে।

ধর-পাকড় শুরু হয়ে গেল। শাসনযন্ত্র গণবিক্ষোভের ষাট পঁয়ষট্টি জন নেতাকে ছেঁকে তুলে আগে-ভাগে গ্রেপ্তার করল। কেউ কেউ আবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে গা-ঢাকা দিল। কিন্তু বিদ্রোহের আগুন তখন অনেক ছড়িয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণ নেবার হুমকি পর্যন্ত শোনা গেল। আগস্ট-এর শেষ দিনে গতকাল সেই রক্তাক্ত গণ-বিক্ষোভের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। দুই তরপই প্রস্তুত ছিল। শহরের মানুষ, গ্রামের মানুষ স্ত্রীলোক, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সহ পঁচিশ হাজারের এক মিছিল ময়দানের সভার পর এগিয়ে এলো রাজভবনের দিকে।

পথ আগলে সশস্ত্র পুলিশও প্রস্তুত। রাত সাড়ে সাতটায় সেখানে পুলিশ আর জনতার খণ্ডযুদ্ধ। বেটন লাঠি-চার্জ টিয়ার গ্যাস। সেখান থেকে অশান্তির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শহরে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। স্টেটবাস আর দুধের বুথ পোড়ানোর হিড়িক পড়ে গেল।

এই দিনে গ্রেপ্তারের সংখ্যা তিনশ'র ওপর। আহতদের ভিড়ে হাসপাতাল বোঝাই।

বাইরে বাপী এই মানুষগুলোর থেকে অনেক দূরে, অনেক বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বিপুল ঐশ্বর্য সত্ত্বেও ভিতরের মনটা আজও এদেরই দিকে। ব্যক্তিবিশেষে বিধান রায় বাপীর চোখে শুধু পুরুষ নয়, পুরুষ সিংহ। চিকিৎসায় ধন্বন্তরি নাম। শক্ত দুই হাতে এই বাংলার শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা সংস্কৃতি পথ পরিবহণ স্বাস্থ্য—সব কিছুর শ্রী ফেরানোর হাল ধরে বসে আছেন। বাপীর মানসিক বিরোধ তাঁর সঙ্গে নয়। স্বাধীনতার বারো বছরের মধ্যেও যে-শাসন-যন্ত্র ক্ষুধার মুখে অন্ন জোগাতে পারল না, বিরোধ তার সঙ্গে। আন্দোলনও শেষ পর্যন্ত রাজনীতির খেলাই। অজ্ঞ ক্ষুধার্ত-জনেরাই বেশির ভাগ এই রাজনীতির প্রথম সারির বলি।

পরদিন অর্থাৎ আজ। পয়লা সেপ্টেম্বর। সকাল থেকে অশান্তির খবর কানে আসছে। আন্দোলনের অনেকখানি দখল চলে গেছে সমাজবিরোধীদের হাতে। বিকেলের মধ্যে পাঁচটা থানা আক্রমণ করে লুটপাট করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এলাকায় তুমুল হামলা। বড় বড় রাস্তাগুলো ব্যারিকেড করে দেবার ফলে পুলিশ পেট্রল ব্যাহত। টিয়ার গ্যাস বা লাঠিচার্জে কুলালো না আর। গুলি চলল। সরকারি হিসেবে পঁয়ষট্টি জন গুলিতে আহত আর চারজন নিহত। এ হিসেব কতটা সত্যি সকলেই জানে।

মিষ্টির বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন খবর পেয়েছিল। গত কাল বিকেলে দুজনে তাঁকে দেখতে যাবে ঠিক করেছিল। গণ্ডগোলের দরুণ আর বাড়ি থেকে বেরোয়নি। আজও বিকেল পর্যন্ত বাড়ি বসে থেকে বাপীর একটুও ভালো লাগছিল না। গণ্ডগোল বেশি ঘোট পাকিয়েছে উত্তর কলকাতার দিকে। দক্ষিণ দিকের তেমন বড় কিছু ঘটনা বা দুর্ঘটনার খবর কানে আসেনি। বাপী মিষ্টিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে। বা গণ্ডগোল দেখলে এগোবেই না।

চলেছে। বাপীর গাড়িও ইদানীং ড্রাইভার চালায়। নিজে ড্রাইভ করা ছেড়েছে। রাস্তায় ট্রাম বাস ট্যাক্সি এমন কি আর প্রাইভেট গাড়িও চোখে পড়ছে না। এলগিন রোডের কাছাকাছি আসতে বোঝা গেল ব্যাপার এদিকেও সুবিধের নয়। রাস্তা জুড়ে ভাঙা কাচ ডাবের খোলা ইঁট-পাথর জুতো আর ভাঙা কাঠের তক্তার ছড়াছড়ি। ছোট বড় গলির মুখে এক-একটা জটলা। বন্দুক উঁচনো পুলিশের পেট্রল গাড়ি দেখলেই তারা ছুটছাট হাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

পরিস্থিতি আর একটু ভালো করে বোঝার জন্যে বাপী গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড় করাতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে পাঁচ-সাত জন মারমুখী ছেলে ছুটে এসে গাড়িটা ঘিরে ফেলল।—এই দিনে আপনারা গাড়ি চেপে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন!

কেন বেরিয়েছে বাপী তাদের বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু সেই ফাঁকে একজন পিছনের একটা টায়ারের ভাল্ব খুলে দিয়েছে। সশব্দে বাতাস বেরিয়ে টায়ারটা চুপসে গেল। বেরুনোর কারণ শুনে হোক বা মিষ্টিকে দেখে হোক, তাদের মাতব্বর টায়ারটা যে ফাঁসিয়েছে তাকে ধমকে উঠল। তারপর বাপীকে বলল, বাড়তি টায়ার থাকে তো এক্ষুনি লাগিয়ে ফিরে যান—সামনে এগোতে পারবেন না—আরো বিপদে পড়বেন।

দূরে পুলিশের পেট্রল গাড়ি চোখে পড়া মাত্র দলটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

মিষ্টিও গাড়ি থেকে নেমে এলো। পেট্রলগাড়িটা ঝড়ের বেগে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভার পিছনের ক্যারিয়ার থেকে সাজ-সরঞ্জাম বার করে স্টেপনি লাগানোর কাজে লেগে গেল। মিষ্টি আর বাপী নির্বাক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

—তুই আমার হাড় মাস সব খাক করে দিলি! তোকে আমি এবার থেকে ঘরে তালা দিয়ে আটকে রেখে দেব—তুই কতবড় হারাম-জাদা আমি এবার দেখে নেব!

তার-স্বরের ক্ষিপ্ত কথাগুলো কানে আসতে বাপী ফিরে তাকালো। আর সেই মুহূর্তে মাথার ঠিক মাঝখানে কেউ বুঝি প্রচণ্ড মুগুরের ঘা বসিয়ে দিল একটা।

কথাগুলো কানে যেতে মিষ্টিও ফিরে তাকিয়েছিল।

...আধ-হাত পাকা দাড়ি বোঝাই একটা লোক বছর এগারোর হাফপ্যান্ট হাফশার্ট-পরা ঢ্যাঙা মতো এক ছেলের ডানা ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে রাগে ফোঁস ফোঁস করে ওই কথা বলছে। লোকটার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে মেটে সিঁদুরের চওড়া তিলক।

মিষ্টিকে নয়, বাপীকে দেখেই লোকটা থমকে দাঁড়ালো একটু। আবার এগোতে গিয়েও পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকেই গেল বুঝি। দুই চোখ বিস্ফারিত। সামনে যাকে দেখছে, ঠিক দেখছে কিনা ভেবে পাচ্ছে না।

—বিপুলবাবু আপনি! আপনি আমাদের সেই বিপুলবাবু না?

বাপী নিস্পন্দ। নির্বাক।

—আপনি আমাকে চিনতেও পারছেন না বিপুলবাবু! আমি রতন! রতন বণিক! আমাকে...আমার বউ কমলাকে মনেও পড়ছে না আপনার?

মাথার মধ্যে ঝড়। যেভাবে হোক এই ঝড় না থামালে কোথায় ভেসে যাবে বাপী জানে না। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে টেনে তুলল। ওর শক্ত হাতে ধরা ছেলেটার দিকে না তাকাতে চেষ্টা করছে।

—চিনেছি। চিনে তোমার মতোই অবাক হয়ে গেছলাম।

রতন বণিক খুশিতে আটখানা। —আপনি না চিনে পারেন! এমন সুন্দর চেহারা হয়েছে এখন আপনার! এ আপনার গাড়ি? ইনি আপনার পরিবার? ছেলের হাত ছেড়ে দিয়ে বিগলিত মুখে মিষ্টির সামনে মাথা নোয়ালো। —পেন্নাম হই গো মালক্ষ্মী—এই বিপুলবাবু আমাদের কতখানি ছিলেন আপনি জানেন না! উনি আমার বস্তির খুপরি ঘরে থাকতে আমি বলে দিয়েছিলাম, এই দিন থাকবে না—উনি রাজা হবেন! হ্যাঁ বিপুলবাবু, আপনি কলকাতায়—আর আমি জানিও না!

মাথার ভিতরে যা হচ্ছে—হচ্ছে। পিঠে চাবুক পড়ল একটা। মিষ্টি ভাবছে, একটু আগের বিভ্রাটের দরুণ মানুষটা এই লোকের আনন্দে বা কথায় তেমন সাড় দিতে পারছে না।

রতন বণিক হঠাৎ ছেলেটার কাঁধ ধরে বাপীর দিকে ঠেলে দিল।—এই ছোঁড়া

পোষাম কর শিগগীর। কাকে দেখছিস জানিসও না। আজ ঘরে ফিরে তোর হাড় গ‍ুঁড়ো করে দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোর জন্যেই বিপ্লববাবুর সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে গেল—তাই বেঁচে গেলি।

ছেলেটা দ‍ুজনকেই প্রণাম সেরে উঠতে রতনের একমুখ হাসি।—আমার ছেলে বিপ্লববাবু, ওর নাম মদন। তখুনি আবার রাগের মুখ।—এতবড় পাজী ছেলে আর হয় না—ব‍ুঝলেন। খেয়ে দেয়ে বেলা বারোটায় আমার চোখে ধ‍ুলো দিয়ে মারামারি গোলা-গ‍ুলির মধ্যে বেরিয়েছে—আমি পাঁচ ঘন্টা ধরে পাগলের মতো খ‍ুঁজতে খ‍ুঁজতে এই-খানে এসে ওকে ধরেছি—এইটুকু বিচ্ছু আমাকে একেবারে শেষ করে ছাড়ল।

বাপীর চোখ দ‍ুটো এবারে কেউ যেন টেনে ছেলেটার মুখের ওপর বসিয়ে দিল।

দেখছে মিষ্টিও। লম্বা গড়ন। রোগা কালোও নয় ফর্সাও নয়। বাপ যত দুষ্টু বলছে মুখ দেখলে ততো দুষ্টু মনে হয় না। চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় দুষ্টুমিতে ছাওয়া। কিন্তু সব মিলিয়ে ছেলেটা দেখতে বেশ। এত বুড়োর এই ছেলে কেউ ভাবছে না, নাতি-টাতি ভাববে।

সহজভাবেই মিষ্টি বলল, মায়ের কথা শোনে না বুঝি...

বলে অপ্রস্তুত। রতন বণিক ফোঁস করে বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। বিড়বিড় করে বলল, মা তো নয়, শত্তুর।...ছেলে ছেলে করে পাগল হয়েছিল। আমি বলেছিলাম ছেলে হবে—হল। আর দ‍ুটো বছর না যেতে সেই ছেলে রেখে আমাকে একবার ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল!

বাপী কাঠ। রতনের ছল-ছল দ‍ু চোখ তার মুখের ওপর।—আপনি তো এ খবরও জানেন না বিপ্লববাবু। এমন বউকে শত্তুর ছাড়া আর কি বলব? ভরা শীতেও দ‍ুবার করে চান করা চাই—কার নিষেধ কে শোনে। বুকে সর্দি বসিয়ে সাত দিনের জ্বরে সব শেষ! যাবার দিন সকালে আপনাকে মনে পড়েছিল...কিছু বলেও গেছল...

গাড়ি রেডি। বাপীর হঠাৎ ফেরার তাড়া। রতনকে বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলে মিষ্টিকে তাড়া দিয়ে গাড়িতে উঠল। রতনকে বলল, গণ্ডগোলের মধ্যে আর বাইরে থেকো না—ঘরে চলে যাও।

বিকেলের আলো আর নেইই প্রায়। গাড়ির ভিতরটা আবছা। বাপী পিছনে মাথা রেখে নিশ্চল বসে আছে। দ‍ু চোখ বোজা।

মিষ্টির মনে পড়ছে কিছু।—কলকাতায় সেই প্রথম দেখা হতে তুমি বলেছিলে, অফিসের চাকরি যাবার পর সেখানকার কোন পিওন আর তার বউ আদর করে তাদের বস্তিঘরে তোমাকে রেখেছিল...এ সেই পিওন নাকি?

জবাব না দিয়ে বাপী শুধু মাথা নাড়ল। সে-ই।

—ওদের কাছে কত দিন ছিলে?

—দ‍ুমাস।

এবারে মিষ্টিও অবাক একটু।—সামান্য লোক হলেও তোমার জন্য এত করেছে, আর এত বছরের মধ্যে তুমি তাদের একটা খবরও নাওনি?

বাপী জবাব দিল না। মাথা পিছনে তেমনি ঠেস দেওয়া। দ‍ুচোখ বোজা।

মিষ্টি এবারে ভালো করে লক্ষ্য করল। উতলা একটু।—শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

এবারেও বাপী সামান্য মাথা নাড়ল কি নাড়ল না।

মিষ্টি ভাবল, ছেলেগ‍ুলো হঠাৎ ওভাবে হামলা করার দরুণ স্নায়ুর ওপর দিয়ে ধকল গেছে। এর থেকে বেশি বিপত্তিও হতে পারত।

রাত্রি। দেড় হাত ফারাকে মিষ্টি ঘুমোচ্ছে। বাপী নিঃশব্দে উঠে বসল। শরীরের রোমে রোমে আগুনের কণা। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে লাগছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। বাপী জানে এই দ‍ুঃসহ যন্ত্রণার শেষে এই মুহূর্তে হয়ে যেতে পারে। যদি সে মিষ্টিকে ডেকে তুলতে পারে। তুলে যদি ওকে বলতে পারে, কথা ছিল তোমার আমার মধ্যে গোপন কিছু থাকবে না—তাই এবারে শেষ কিছু শোনো—শুনে আমাকে দেখো, চেনো।

বাপীর গলায় কুলুপ আঁটা। ডাকা যাবে না। বলা যাবে না। শরীর জ্বলছে। যন্ত্রণা বাড়ছে। শব্দ না করে খাট থেকে নামল। পা দ‍ুটো পাথরের মতো ভারি। ঝিনঝিন করছে। অন্ধকারে ঘর সংলগ্ন বাথরুমে এলো। কানে মাথায় জলের ঝাপটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কি-যে হতে লাগল বুঝছে না। পায়ের নিচে ভূমিকম্প। সব-কিছু বিষম দ‍ুলছে, উল্টে যাচ্ছে। প্রাণপণে বেসিনটা দ‍ু-হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল একটু। দেয়াল হাতড়ে ঘরে এলো। বিছানাটা কদ্দূর? বাপী কি আর নাগাল পাবে?

পেল। তারপর আর মনে নেই।

(আগামীবারে শেষ)

ভাল লাগছে

শুধুমাত্র অমৃতের নিয়মিত পাঠক হিসাবেই নয়, অমৃতের যে দিন দিন উৎকর্ষতা বেড়েই চলেছে তা প্রত্যেক পাঠকবর্গকে স্বীকার করতেই হবে।

অমৃত দিন দিন আমাদের কাছে অতি আদরণীয় ও লোভনীয় হয়ে সত্যি-কারের অমৃতের মতো হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। এর জন্য সত্যিই আমরা গর্ববোধ করছি। কথাসাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সোনার হরিণ নেই' উপন্যাসটিতে আমি সোনা যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছি।

সব শেষ আর একটি কথা উল্লেখ না করলে অমৃতকে অপমান করা হবে, আমার বাবা যতীন্দ্রমোহন বাগচী—কবি কন্যা ঊর্মি সান্যালের রচনায় জানতে পারা যায়, অতীতের স্মরণীয়, বরণীয় ব্যক্তিদের জীবনীকে কিভাবে জনসাধারণের কাছে অন্ধকারময় করে রাখবার চক্রান্ত চলে। এই সাধু উদ্যোগের জন্য শত শত বার ধন্যবাদ অমৃতকে।

মহঃ রমজান আলি

বনগ্রাম, ২৪-পরগণা

পাহাড়ের মত মানুষ

অমর মিত্র

—লাবণ্য! ডাক্তার ফিস ফিস করে নাম উচ্চারণ করে রাজকুমারীর নাম।

লাবণ্যর চোখে বিস্ময়। ডাক্তারদা এমন করে কেন?

ডাক্তারের গলার কাছে এসে শব্দটা জট পাকিয়ে গেছে। 'ভালবাসি' এই শব্দটির উচ্চারণের উপরই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। লাবণ্যর ভয় হচ্ছিল বুকে। চোখের সামনে ভেসে উঠছিল অন্য দৃশ্য... নির্মল মজুমদার বসে আছে এখানে, তারপর! আবহে বেহালার তীব্র টান। লাবণ্য ভেঙে যাচ্ছে। সে ডাক্তারের পিছনে দাঁড়িয়ে।

ভয় আবার ভীড় করে আসে ডাক্তারের মাথায়। যদি লাবণ্য ফিরিয়ে দেয়! তাহলে! লাবণ্যকে না দেখে থাকবে কি করে সে! ডাক্তার মাথা নত করে।

লাবণ্য সরে দাঁড়ায়। প্রত্যেকটা পুরুষ এক রকম। শেষ পর্যন্ত এই মানুষটাও। একে তো অন্য চোখে দেখা যায় না। কি বলবে একে লাবণ্য। নিজের উপর ঘৃণা হচ্ছে। সে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন নির্মল মজুমদারের হাত থেকে বাঁচাতে তার প্রথম প্রেমে মেঘ নামাতে এই মানুষটা এগিয়ে এসেছিল সেই সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে লাবণ্যর।

ডাক্তার সামলে নেয় নিজেকে। ভিতরে ভিতরে নিজেকে শক্ত করে নিয়েছে। না লাবণ্যকে বুকের কথা জানানোর সাহস নেই। দেউড়িতে বেজে ওঠা সুর সে থামিয়ে দিয়েছে।

—লাবণ্য তুমি আমার মা হবে? তোমার মুখের সঙ্গে আমার মায়ের মুখের অনেকটা ...।

লাবণ্য চমকে ওঠে। তারপর প্রবল আবেগে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে যায়। কি লজ্জা। সে কি ভুল কোন মানুষটাকে নিয়ে করতে যাচ্ছিল। এমন শুদ্ধ চিত্তের মানুষ।

—আজ মার কথা ভীষণ মনে পড়ে যাচ্ছে।

লাবণ্য ডাক্তারকে ঘন করে টেনে নেয়, ভীষণ মমতা করুণা জমা হয়েছে তার মনের ভিতর। লজ্জা হচ্ছে নিজের মনের সংকীর্ণতার কথা ভেবে। সে ডাক্তারের মাথায় হাত রাখে সামনে হাঁটু মুড়ে বসে। কপাল চোখ মুখে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। বড় দুঃখী এই মানুষটা। তার কষ্ট প্রবল হয়। আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দেয় ডাক্তারের।

—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মা হলাম।

—বাহ।

ডাক্তারের বুকের ভিতরে ভূকম্পন হচ্ছিল লাবণ্যর কোমল স্পর্শে। লাবণ্যর মনের ঠিক জায়গায় আঘাত করেছে সে। লাবণ্যর চোখ মুখে করুণার প্রকাশ।

—আমি তাহলে ছেলে।

—হ্যাঁ।

—তুমি হলে মা।

—হ্যাঁ।

—আমাকে আর আপনি বলবে না।

—না-না-না। লাবণ্য ডাক্তারের চোখের উপর হাত রেখে বলে।

ডাক্তার উঠে দাঁড়ায়। ভীষণ ফ্রেশ লাগছে। লাবণ্য সরে দাঁড়ায়। এতক্ষণ নিজের দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে সশব্যস্ত হয়ে শাড়ি ঠিক করে, বুকের উপর আঁচল টেনে দেয়। লজ্জাই বা কিসের। সে তো মা হয়েছে এই দুঃখী ছেলেটার।

ডাক্তার টান টান চোখে লাবণ্যকে দেখতে থাকে। সুন্দর লাগছে। আবেগে এখনো মেয়েটা ফুলে ফুলে উঠছে। সে আর পারে না। আবহে কোন শব্দ নেই।

—এবার তাহলে যাই মা।

—এসো ছেলে। লাবণ্য ডাক্তারের পিঠে একটা আলতো চড় মারে।

ডাক্তার বেরিয়ে যায়। আর লাবণ্যর সামনে দাঁড়াতে পারছিল না। কি করে পারবে। নিজেকে ধ্বংস করে দিয়ে এসেছে সে। আবার ভুল করল। মাথা ভার হয়ে গেছে। চোখ মুখে এখনো লাবণ্যর ছোঁয়া লেগে আছে। অন্ধকারে টর্চ জ্বলন্ত চক্ষু মেলে। একের পর এক মহল পার হয়ে ডাক্তার যখন থমকে দাঁড়ায় তখন দেখে সামনে দীপঙ্কর চৌধুরীর ঘর। দরজা ভেজান।

এখানে এল কেন সে। বুঝতে পারে না। ডাক্তার মাথা চাপে। বুকের ভিতরে কান্না জমে যাচ্ছে। আজ সে সত্যিই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে লাবণ্যর কাছে। ওই সম্পর্ক পাতাতে দৌড়ে এসেছে মেয়েটা। ঐ রকমই চায় ও। অন্য রকম হতে চায় না।

লাবণ্য ওই রাজগৃহের বাইরের মাটিতে পা রেখেছে কম। এখনো তার মাঝে মধ্যে মনে হয় এই বাড়ি নতুন করে সেজে উঠবে. লোক লস্কর হাতি ঘোড়া যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে কলাবনি দুশো বছর পিছিয়ে যাবে। কল্পিত স্বর্গে বাস করতে তার ভীষণ ভাল লাগে। সেই রাজত্বের কথা শৌর্য-বীর্যের কথা সে চোখে দেখে নি। কিছু শুনেছে। কিছু ইতিহাস কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। এসব নিয়ে সে অসুখী।

লাবণ্যর মন এই রাজ পরিবারে অস্বাভাবিক। কি করে হয়। তার মনের কোমলতা-করুণার প্রকাশ চরম। কল্পনার রাজ্যে তার সারাক্ষণ বিচরণ। ডাক্তার এটা বুঝে ফেলেছে ঠিক। লাবণ্য ডাক্তারকে বোঝে নি। সরল বিশ্বাসে তার সঙ্গে পবিত্র সম্পর্ক পাতাতে এসেছে। ডাক্তার ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে ঘা মেরেছে।

ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দীপংকর চৌধুরীর ঘরের দরজার সামনে। ঢুকবে কি ঢুকবে না। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ডাক্তার চোখ মুখের স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়ে আনে। তারপর টোকা মারে। দরজা খুলে যায়।

—কে?

—আমি ডাক্তার বোস।

—আরে আসুন আসুন কি ব্যাপার।

—না কিছু না. এমনি ঘুরে গেলাম।

ডাক্তার ঢুকে বসে পড়ল ইজিচেয়ারে। দীপংকর ডাক্তারকে কেমন অস্বাভাবিক দেখছে। ডাক্তার কেমন নার্ভাস হয়ে গেছে। কি হয়েছে!

—কি ব্যাপার বোস?

—আজ একটা জিনিস পেয়েছি। ডাক্তার জড়িয়ে জড়িয়ে বলে।

—কি পেলেন আপনি ভাগ্যবান ব্যক্তি।

—ম্ ম্ মা. .আ। ডাক্তারের গলার কাছে শব্দটি জট পাকিয়ে যায়।

—কি পেয়েছেন? বিরক্তি দীপংকরের কণ্ঠস্বরে।

—মা।

—কোথায়? দীপঙ্কর হাসে।

—এই বাড়িতে। আমার মা নেই জানেন তো।

হ্যাঁ. তাতে কি হয়েছে?

—লাবণ্যর সঙ্গে আমি মা-ছেলে পাতিয়েছি।

দীপঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে যায়. 'কি. কি বলছেন?'

ডাক্তার দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'লাবণ্য আমার মা হয়েছে ?'

—তার মানে ?

ডাক্তার হাসে, কেন এই রিলেশন হয় না ?'

—হবে না কেন হয় ? আচ্ছা ডাক্তার...

—কি বলছেন ?

—আপনি এই বাড়িতে কতদিন আসছেন ?

—বছর দেড়েক তো হবেই।

—কলাবনির পুরোন কোন কথা জানেন ?

—কি কথা ?

—কলাবনির ইতিহাস, জমি-জমা নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি মশায়...

—না, আপনার কাছে ঐ ছাড়া কথা নেই। ডাক্তার হতাশ হয়েছে স্পষ্ট।

—ঠিক আছে আপনার লাবণ্যর কথা বলুন।

মুহূর্তে ডাক্তারের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, নড়ে বসে।

—লাবণ্য তো আমার মা।

দীপঙ্করের গা হাত পা চিড়বিড় করছে ডাক্তারের মুখ দেখে। সে স্বপ্নের পড়ে গেছে। সত্যি হতেও তো পারে। ডাক্তার লাবণ্যকে মায়ের আসনে বসিয়েছে।

—সিগারেট নিন। দীপঙ্কর হাত বাড়িয়ে দেয় প্যাকেট সমেত। ডাক্তার কালেভদ্রে সিগারেট খায়। নেশা নেই। চট করে সিগারেটটা নিয়ে ধরিয়ে, দু-এক টান দিয়ে কাশতে থাকে। আজ লাবণ্যর কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে হঠাৎ। আজ লাবণ্যকে নিয়ে অনেক কিছু কল্পনা করার ইচ্ছে হচ্ছে। সবই কল্পনা, তবুও ভাল লাগে। লাবণ্য তার কাছে আর অন্য রকম হবে না। ডাক্তার ভিতরে কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু তার প্রকাশ নেই চোখ মুখে।

—সত্যি মা পাতিয়ে বসেছেন নাকি মশায় ? দীপঙ্কর বিস্মিত হয়।

—হ্যাঁ।

—লাবণ্যর সঙ্গে ?

—হ্যাঁ।

—লাবণ্য মেনে নিল।

—হ্যাঁ ও আমাকে বড় ভালবাসে, মানে...

—বুঝেছি। দীপঙ্কর ঘরের ভিতর পায়চারি করতে থাকে হঠাৎ।

অম্বুজাক্ষ বারিক চলে যাওয়ার পর দীপঙ্কর ঘরে একা ছিল। লাবণ্যর কথা মনে পড়ছিল। তারপর ভেবেছে ডাক্তার আছে ওখানে। ডাক্তার থাকলে কি হয়েছে। দীপঙ্কর নিজে নিজের ভিতরে চমকে উঠেছে। স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিল। মাথার ভিতরে একরাশ চিন্তা জমা হয়েছে। কি ভয়ানক। কলাবনি দুরন্ত, কলাবনি বাইরের মানুষকে মোহের ভিতরে ফেলে দেয়। এসব তাড়াতে হবে মন থেকে। এই সময় আবার ডাক্তার ঢুকে পড়েছে এই ঘরে। আশ্চর্য কথা শোনাচ্ছে।

দীপঙ্কর দেখে ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়েছে। এরই ভিতর উঠে দাঁড়াল। তাহলে আসা কেন ? ঐ খবরটা দিতে ? দীপঙ্কর ডাক্তারের চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। চোখ জ্বলছে। দু'জনে নিঃশব্দে দরজার সামনে এগিয়ে যায়। ডাক্তার কথা বলে না। দীপঙ্কর নিশ্চুপ। দু'জনে দু'জনকে কি জেনে গেছে গোপনে ? দীপঙ্কর দরজার সামনে অন্ধকারে নৈঃশব্দ্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার বেরিয়ে গেছে।

।। ১৫ ।।

দুটো চোখ চেয়ে আছে। চোখের কোন ভাষা নেই। কেউ কেউ বলে এটা ব্ল্যাঙ্ক লুকিং। এই চোখের কারণেই লাবণ্যকে যাবতীয় মোহ। দুটো চোখ পলকহীন চেয়ে আছে দেয়ালের দিকে। দেয়ালে অস্পষ্ট অন্ধকার। আলো অপ্রতুল।

লাবণ্যর চোখের সামনে ভেসে উঠছে আরো দুটো চোখ। রাত বদলে যাচ্ছে। রাত বদল হয়ে ফুটে উঠছে এক মেঘের দুপুর। যাবও মেঘ। ইজিচেয়ারে শায়িত একটা মানুষ। বয়স হয়েছে। চোখে তার বিপন্নতা, মুখে আকুতি। সেই দুটো চোখ চাইছে ছায়া। ঘোর তপ্ত দুপুরে প্রান্তরের ভিতর সে একা পড়ে গেছে। অসহনীয় রৌদ্র থেকে মুক্ত হতে চায় মানুষটা। তাই বোধহয় সেদিন কলাবনির আকাশেও মেঘ উড়ে এসেছিল দূরের পাহাড় থেকে। মানুষটার বুকের ভিতর থেকে হাসফাস করতে করতে কথারা উঠে এসেছিল। নির্মল মজুমদার ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করেছিল মমতাময়ী লাবণ্যর নাম।

লাবণ্যর শোনা কি ভুল ? তার চোখ কী ভুল দেখে। একটু আগে কী হয়ে গেল। ডাক্তারদার কণ্ঠস্বর তার কানের কাছে এখনো ভেসে আছে। সেই একই রকম স্বর। যেভাবে নির্মল মজুমদার তাকে ডেকেছিল—! কিন্তু তার পরের ঘটনা যে কিছুই মেলে না। যখনই ডাক্তার তাকে ডাকল লাবণ্য ভয় পেয়েছিল। পরক্ষণেই সেটা কেটে গিয়ে মনের পাপের ভারে নত হয়ে গিয়েছে। পাপ ছাড়া কি ? লোকটা তো তাকে অন্য চোখে নিয়েছে।

অন্য চোখ ! লাবণ্যর সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। সে মা হয়ে গেল। কী করে হয় !

এই রাজ্যের রাজার রাজত্ব নেই। সময় নামে এক দৈত্য সব কেড়ে নিয়ে রাজাকে পাথর করে রেখেছে। সমস্ত দেহে ছড়িয়ে দিয়েছে দুরারোগ্য ব্যাধি। রাজকন্যা বন্দী হয়ে গেছে। রাজপুত্তুর আসবে। সব শাপ মুক্ত হবে। তোরণে বেজে উঠবে শানাই। তাকে বিয়ে করে রাজপুত্তুর তার পিতার রাজ্যে ফিরে যাবে। মনের সুখে ঘর সংসার করবে রাজকুমারী। সোনার চাঁদ ছেলে হবে, সংসার উথলে উঠবে সুখের ভারে। প্রজারা বাড়িয়ে দেবে আশীর্বাদের হাত।

সে সব কিছুই হলো না। হওয়ার মধ্যে হলো—রাজকন্যে পুত্র পেল। গল্প কথার মাঝখানের পাতাগুলো পোকায় খেয়েছে। শেষের পাতাও নেই। ফলে অনেক কিছুই বাদ গেছে। বাদ গেছে রাজপুত্তুর স্বামী পাওয়ার কথা, সুখের সংসারের কথা। শুধু রয়ে গেছে—রাজকুমারী মা হলো।

সত্যি কি তাই হয়ে গেল। লাবণ্যর মন বলছে তো তাই-ই হলো। কিন্তু মন যে সত্যি ভাবনার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ডাক্তার যখন তাকে মা হতে বলল, তার আগের মুহূর্তে লাবণ্য অন্য চিন্তায় ব্যস্ত হয়েছিল। কণ্ঠস্বরে মিল খুঁজে পেয়েছিল,

মিল খুঁজে পেয়েছে অভিব্যক্তিতে। কিন্তু ডাক্তার তো অন্যদিকে নিয়ে নেল তাকে যার সঙ্গে জড়িত করুণা মায়া মমতা। সরল বিশ্বাসে লাবণ্য এগিয়ে গেল ! মা নেই মানুষটার, মাতৃস্নেহ পায়নি। পেয়েছে বিমাতার করুণাহীন ব্যবহার। মানুষটা চিকিৎসক হয়েও যেন রুগ্ন। শোকার্ত। ডাক্তারদা তার শোকতপ্ত হৃদয়ে মমতা চায় হয়ত, তাই শুদ্ধচিত্তে তাকে মা বলে ডেকেছে। লাবণ্যর ভিতরে মমতা তখন উথলে উঠেছে, উপলব্ধির চেয়ে সেই মুহূর্তের সত্যতা বিশাল হয়ে দাঁড়াল। এখন যেন মনের ভিতরে দ্বিধা এসে ঢুকেছে।

ডাক্তারের চোখের সঙ্গে নির্মল মজুমদারের চোখের যেন বড় মিল। ডাক্তারের কণ্ঠস্বর নির্মলদাকে স্মরণ করায়। তাহলে ! লাবণ্য আঁতকে ওঠে ভয়ে। এই মানুষটাকে তো অন্য চোখে দেখেনি সে। কিছু কিছু পুরুষ আছে যাদের দেখার সময় চোখ যায় বদলে। মায়া হয়। মমতা হয়। তাদের ভালবাসতে ইচ্ছে হয়, সে ভালবাসা স্নেহ আর করুণায় মেশানো। সে ভালবাসা আর প্রেম এক নয়। ডাক্তারকে তো তেমনভাবেই দেখে সে।

ডাক্তারও প্রকাশ করেছে নিজেকে সেইভাবে। লাবণ্য নিশ্চিন্ত হয়েছে। কিন্তু চোখের ভিতরে যে অন্য ছবি ঢুকে পড়েছে। এই চোখ বড় বিশ্বাসহীনতার কাজ করে। এই চোখ না থাকলে ভয় থাকত না। এখন যে ভয় এসে ঢুকল মনের ভিতর।

লাবণ্য থম মেরে বসে আছে। ডাক্তার চলে গেছে। রাজপুরী স্তব্ধ। মঙ্গলা এসে দাঁড়ায়। বয়স অনেক হল বুড়ির। তার মায়ের খাস পরিচারিকা ছিল এক সময়। মায়ের মৃত্যুর সময় রাজবংশের প্রদীপ নিভু নিভু। জোলুসে মরচে ধরেছে। লাবণ্য

তখন বছর পাঁচেকের। এখন বড় হয়েছে ঢেকে। মাকে মনে পড়ে না।

মায়ের মৃত্যুর পর কত বছর কেটে গেল। মঙ্গলা তার মায়ের মত হয়ে উঠেছে। লাবণ্য উঠে বসে, মনের কষ্ট যেন মনেই থাকে, বাইরে প্রকাশ চায় না রাজকুমারী। প্রকাশ পেলে বড় লজ্জা। মনের দীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সে মানুষের কর্তৃত্ব বোঝে, অন্তর হয়ত সত্যিই স্নেহ চায়।

—কি বলছিল? লাবণ্য মঙ্গলার দিকে তাকায়।

—ইকেলা বসি আছ যে বড়।

—এমনি। লাবণ্য এড়াতে চায়।

—বাবুর নিকট যাও।

—এক্ষুনি। বাবুজীর খাওয়ার সময় হল?

—হবেনি, রাইত কত হল নজর রাখ?

লাবণ্য ত্রস্ত হয়ে খাট থেকে নেমে পড়ে। কটা বাজল? এইতো একটু আগে তার ছেলেটা চলে গেল। ডাক্তারদা তার ছেলে হয়েছে। এরই ভিতর বাবুজীর খাওয়ার সময় হয়ে গেল? সে কতক্ষণ এইভাবে উপুড় হয়ে পড়েছিল!

টেবিল ক্লকটার দিকে তাকিয়ে লাবণ্য চমকে ওঠে। দশটা বেজে গেছে। তাহলে বাবুজী একা নিশ্চয়ই খেয়ে নিয়েছেন। একা খেতে অন্নদাশংকরের কষ্ট হয়, তবু লাবণ্যর অনুপস্থিতিতে তিনি অন্য কাউকে ডাকেন না। লাবণ্য তা জানে।

—তোর খাওয়া হয়েছে মঙ্গলী?

—তুমি খাও নাই, মু খাই কি করি?

বুড়ি পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে। গায়ের কাপড় ফেলে দেয়। বড় আয়েশি এই বসা।

—তুই খেয়ে নে, আমি খাব না, বাবুজীকে দেখে আসি।

লাবণ্য এগিয়ে খাওয়ার তোড়জোড় করে। বুড়ির চোখ ড্যাবডেবিয়ে তাকে গিলছে। মঙ্গলা ঝট করে উঠে দাঁড়ায়, 'বসতি দিবানি, হইছে কি তুমার?'

—হবে কি, কিছু না। লাবণ্য নিস্পৃহ জবাব দেয়।

—কিছু লয় তো খাবেনি কিনো?

—খিদে নেই, আমি বাবুজীর কাছ থেকে ঘুরে আসি।

মঙ্গলা লাবণ্যর সামনে এসে দাঁড়ায়। চোখে চোখ রাখে। হাতটা ধরে ফেলে।

—প্যাটে ধরি নাই, লেকিন ইত বড়টি করিছি, কুছু হইছে, আঁখি তো তাই বলে।

লাবণ্য ঝট করে হাত সরিয়ে নেয়। মেয়েটা কি? সে কল্পনায় এসব শুরু করেছে। শক্ত করতে করতে মনকে পাথর করে ফেলতে হবে। ওই মানুষটাকে তো চিত্তের ভিতরে নিজের পুরুষের মত গ্রহণ করা যায় না। সেভাবে তো দেখেনি ও। দেড় বছরের উপর হয়ে গেল ডাক্তারদা এখানে আসছে। সেভাবে দেখলে এতদিনে বিস্ফোরণ হয়ে যেত নিজের ভিতরে। ওকে ছেড়ে ওই বিবাহিত মানুষ নির্মল মজুমদারের দিকে চোখ যেত না লাবণ্যর। আর নির্মল মজুমদারও তো মনের ভিতর থেকে মুছে যাচ্ছে ক্রমশঃ। বুকের ভিতরে পলি পড়ছে, পলি পড়ে সব চাপা হয়ে যাচ্ছে। এখন আর নির্মলের মুখ স্পষ্ট হয়ে মনের ভিতরে জাগে না, নির্মলের কথায় ভেবে দেহ মনে শিহরণ হয় না। সে অধ্যায় সমাপ্ত।

লাবণ্য হঠাৎ উচ্ছল হয়ে ওঠে। মঙ্গলার গলা জড়িয়ে ধরে। গলা জড়িয়ে পাক খায় রাজকুমারী। বুড়ির চোখে বিস্ময় আর ধরে না, এমন তো করে না এ মেয়ে। এ মেয়ে প্রথম দেখাতে গম্ভীর, বিষাদী, মমতাময়ী।

—জানিস মঙ্গলী...

মঙ্গলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়, কী বলতে চায় লাবণ্য!

—জানিস মঙ্গলী আজ একটা জিনিস পেয়েছি।

—কি পাইছ?

—বলবোও না, তুই বল তো।

মঙ্গলা চুপ করে থাকে, ভাবে, শেষে প্রশ্ন করে, 'রুপিয়া পাইছ?'

—ধুস, টাকা পেলে কি কেউ এমন করে, রুপিয়ার কি অভাব?

টাকার অভাব হবে কেন রাজকুমারীর। মঙ্গলা তা জানে। কিন্তু এই গোপন পাওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে যে না পাওয়ার সে তার গোপন ইচ্ছার কথা বলে ফেলেছে। এরকমই তো হয়। টাকার জন্যই তো এতকাল এই রাজগৃহে তার দিন কেটে গেল। টাকাই তো জীবনে সর্বসুখ আনতে পারে, মঙ্গলীর তাই তো মনে হয়।

চর দখল করতে গিয়ে কাঁসাই বরাবর পশ্চিমে বিশ মাইল ওধারে তার বর লাঠির ঘায়ে মরেছিল একদিন। তখন তো কলাবনির রাজার সুখের সময়। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে, রাজা রাজার সম্মানে থাকেন। মঙ্গলীর বিয়ের বছরও ঘোরেনি। সেই লেঠেল বরটাকে মনেও পড়ে না। আবছা পাহাড়ের মত শরীরটা এই বয়স্ক চোখে কখনো সখনো উঁকি মারে। তাছাড়া তো সব জলের দাগের মত মুছে গেছে। সেই বেলপাহাড়ী পেরিয়ে ছোট পাহাড়ের কোলের গ্রাম। ঘোর জঙ্গল। বাপ-মা—সব ধুসর হয়ে গেছে। সময় সব খেয়ে ফেলেছে নিষ্ঠুরভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে। মুছতে পারেনি টুকরো টুকরো ছবি। কানাই শোরে মাথায় একটা মানুষ উঠেছিল। বড় পাহাড় কানাইশোরই বৎসরান্তে আষাঢ়ের দিনে তার পুজো। পুজো আর পাহাড়তলীতে মেলা। এই কলাবনি থেকে হেঁটে গিয়েছিল পুরুষটা। গিয়েছিল একা, ফিরে এল তাকে নিয়ে।

একেবারে বুনো জন্তুর মত মানুষ। পাহাড়ের কোলে সন্ধ্যার সময় তার হাত ধরল। তিনতিরে খুঁটি গ্রাহ্য করে না, গ্রাহ্য করে না সমাজ সংসার আর দশটা মানুষকে। লাঙল ধরত না হাতে। লাঠিই হল তার জীবিকা। লেঠেলের সঙ্গে কলাবনিতে এল মঙ্গলী। এসে চোখ জুড়িয়ে যায়, মাথা নুয়ে আসে। রাজার দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

আষাঢ়ে এল কলাবনিতে, অঘ্রানে চরের ধান রক্ষে করতে গিয়ে মরল মানুষটা। পেটে তখন বাচ্চা এসে গেছে লেঠেলের বউএর। বাপের ঘর থেকে চলে এসে আর সেখানে ফেরা যায় না। মঙ্গলা এসে দাঁড়াল রাজবাড়ির সামনে।

পেটের বাচ্চা আলো দেখল না পৃথিবীর। রাজবাড়িতে পোয়াতি মেয়েমানুষের স্থান হবে না। বাচ্চা নিয়ে রাজবাড়িতে থাকায় রাজাবাবুর মত হবে না। রাজাবাবু তাকে দেখেছিল। রাজাবাবুর চোখে পড়েছিল মরা লেঠেলের বউ। রাজাবাবু চান নিঃঝাড়ন্ত হয়ে মেয়েটা তার সেবা করুক। রাজার সেবায় পুণ্য। এখানকার লেঠেল পল্লীর মানুষের মনের তাই তো বিশ্বাস। রাজাবাবু লেঠেলদের এনেছেন পাহাড়ের কোল থেকে, অরণ্যের ভিতর থেকে। তারা দুর্দমনীয়। বন্য মেয়েমানুষ তাদের ভোগ্য হেনা। রাজা হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের সবায় যদি ঘরের বউ একরাত্তির অনাদ [illegible] পাপ কোথায়? বুকের ভিতরে [illegible] ভাব তৈরি হয়ে যায় সে সময়ে [illegible] ঠিকই, তবে তার ওষুধ আছে মুদ্রা এবং মদ। সকালে মেয়েমানুষটা সোনার হার নিয়ে ফিরবে। তিনদিন খাবে না, পুরুষটাও তিনদিন নেশায় ডুবে থাকবে, কোন কোন সময় পাপ জেগে উঠবে মনের ভিতর। লাঠি বসিয়ে দিতে ইচ্ছে হবে রাজবাড়ির চুড়োয়। তারপর আস্তে আস্তে সে শান্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক ধরে নেবে। বউটাকে নজর রাখবে, যেন গলায় রশি বেঁধে ঝুলে না পড়ে। বউটাও এক সময় শান্ত হয়ে যাবে তখন লাঠি নিয়ে বেরোবে পুরুষটা। ভিন গাঁয়ে কোন চাষার মেয়ে বড় হয়েছে, খবর আছে। রাজাবাবু তলব করেছেন।

মঙ্গলার মনে খেদ ছিল। পেটেরটা নষ্ট করলে কি মন ঠিক থাকে। মন শক্ত করতে হয়। আস্তে আস্তে নিজেকে অহঙ্কারী করে তুলতে হয়। রাজার চোখে মেয়েমানুষ হবে সে। কলাবনির বুকে বড় পা ফেলে হাঁটবে। পেটেরটা নষ্ট করে অস্বলতে হয়। [illegible] সংসারে কত নিয়মের বাত্যয় [illegible] এটা তো একটা বাচ্চার পৃথিবীর আলো

া। এসব জেনে নিয়েই পৃথিবীতে বাস তে হয়।

প্রথম রাতেই রাজাবাবুর কাছ থেকে নার হার পেয়েছিল মঙ্গলার শক্তসমর্থ ীর। জানত রাজাবাবু তার দেহকে উপ- া দেন, জেনেও মন বসে গিয়েছিল রাজার র। টাকার জন্য এসে মন দিয়ে দিল ুষটাকে।

—ভাবছিস কি? লাবণ্য জড়িয়ে ধরে ড়িকে।

বুড়ি মলিন হাসে, কি পাইছ?

—তুই বলতো।

—হীরামানিক, ধনরত্ন?

—তার কি অভাব?

লাবণ্য বলেই চোক গেলে, হ্যাঁ, সে-সবের ভাব আছে। সেসব স্বপ্নের ব্যাপার। বুও সে-সবের আকাঙ্ক্ষা তো নেই তেমন। পেয়েছে তা তো মঙ্গলা বলতে পারেনি।

—হয়নি হয়নি হয়নি। লাবণ্য সোহাগে ঙ্গলার গালে গাল ঘষে।

—উঃ! কি কর, লাগে যে। মঙ্গলা খের ভিতর ভাসে। এতবড় বাড়ির মেয়ে কে একেবারে আপন ভাবে, এর চেয়ে সুখ থায়!

—তুই বল কি পেয়েছি? লাবণ্য উজ্জ্বল য় হাসছে।

মঙ্গলার চোখ এড়ায় না। মেয়ে আজ ড় সুখে ভাসছে। কিসের সুখ! বোঝা য় না, তবু। মঙ্গলা চমকে যায়। বিশ্বাস য় না। হ্যাঁ লাবণ্যর চোখমুখে আজ গাঢ় খের অহঙ্কার। অহঙ্কারই তো। ডাক্তারদার খ চিনতে সে ভুল করেনি। তাই হঙ্কার ফুটে বেরোচ্ছে চোখমুখে। ক্তারদাকে বুঝতে দেবে না কোনদিন যে বণ্য তাকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। এই শ বছরের জীবনে আজ বড় অহঙ্কারে হঙ্কারী হয়েছে রাজকুমারী। ভয়ে মনের থা বলতে পারেনি পুরুষটা। গোপনে লবাসে নিশ্চয়ই। ভালবাসুক। তার তো মতা হয় মানুষটার জন্য। করুণা হয়। র বেশী কিছু নয়। লোকটাকে আঘাত বে না সে। অন্যের ভালবাসা জীবন খের হয়। গোপন ভালবাসায় সহস্র অভি- প ধুয়ে যায়।

—চুপ করে আছিস কেন মঙ্গলী?

—বুঝিনি কুচ্ছু।

—কিছুই বুঝিস নি?

—ডর লাগে।

লাবণ্য ছিটকে সরে যায়। মঙ্গলা তাহলে ঝে ফেলেছে। নাহলে বলতে ভয় পায় কন? কী বুঝেছে মঙ্গলা। বুঝতে দিলে তা হবে না। কেউ বুঝবে না। সব ঢাকা াকবে। রহস্যের চিহ্নই বোঝা যাবে না, অথচ পুরোটাই রহস্য। ডাক্তার তাকে জানবে না যে লাবণ্য সব আবিষ্কার করে ফেলেছে। সে ডাক্তারকে দেখবে।

লাবণ্য হঠাৎ গলায় কাঠিন্য নিয়ে আসে, 'তুই ভুল বুঝেছিস মঙ্গলী।

বুড়ি নিশ্চুপ চেয়ে থাকে। দু চোখের পাতা তির তির করে কাঁপতে থাকে।

—মু তো বুঝিনি কুচ্ছু। মঙ্গলা স্বাভাবিক দীনতায় ভয় পায়।

—তাহলে ভয় পাস কেন?

কিছুক্ষণ নৈঃশব্দ্যে ডোবে চারপাশ, তারপর বুড়ি আস্তে আস্তে বলে, 'বাবুজীর নিদ যাবার সুময় হলো।'

লাবণ্য কথা বলে না। একথা এখন তার ভিতরে রেখাপাত করে না। এই রাজগৃহ থমথমে। প্রাচীন ধ্বংসস্তূপে বোহিসাবী হাওয়া আসে না কখনো। এই ঘরে রাজ-কুমারী সারাটা দিন যথার্থ নৈঃশব্দ নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। সেই নৈঃশব্দে পায়ে পায়ে এসেছিল নির্মল মজুমদার। পায়ের শব্দ শুনেছিল রাজকুমারী তন্দ্রার ভিতর। সে-শব্দ মিলিয়ে গেছে। আজ আবার দমকা বাতাস উড়ে এসেছে পাহাড় থেকে। লাবণ্য অকারণে হাসছে, গম্ভীর হচ্ছে।

—অমন কর কিনো? মঙ্গলা আবার সাহসী হয়েছে।

—কেন বলতো? লাবণ্য আবার উচ্ছল হয়ে জড়িয়ে ধরেছে মঙ্গলাকে।

—রাজপুত্তুর আসল? মঙ্গলার ভয় গেছে, ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করেছে।

—ধ্যাৎ।

লাবণ্য মনের উচ্ছ্বাস চেপে রাখে। ও তো রাজপুত্তুর হতে পারে না। ও তার অহঙ্কার। তাকে উদ্ধত করেছে ঐ পুরুষটা। রাজপুত্তুর তো তাকে অহঙ্কারী করবে না। মাথা লজ্জাবনত হয়ে যাবে রাজপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে, রক্তিম ছোপ পড়বে মুখ-মণ্ডলে, চোখে নামবে নিবিড় আবিলতা, মন হয়ে যাবে সমর্পিত।

মঙ্গলা নিরাশ হয়। পাগল হল নাকি মেয়েটা! না হলে এমন করে কেন? বয়স-কালে বিয়ে দিতে হয় মেয়েদের। না হলে মন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, বাছবিচারের শক্তি কমে যায়। ঘোরের মাথায় মাটি ভেবে পাঁকের ভিতরে পা ফেলে। যেমন ফেলেছিল আর বচ্ছর, সেই বিয়ে করা পুরুষটার সঙ্গে। কেউ না বুঝুক মঙ্গলা বুঝে ফেলেছিল।

—জানিস মঙ্গলী...

লাবণ্য চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কথা অর্ধেক হয়ে যায়। আবার বলতে আরম্ভ করে, 'জানিস মঙ্গলী একটা ছেলে পেয়েছি!

মঙ্গলা কেঁপে ওঠে ভয়ে। কি সর্বনাশ! কি কথা বলে মেয়েটা। ছেলে পেয়েছে? কি হলো। মঙ্গলা লাবণ্যর আপাদমস্তক দেখে, কই কোন চিহ্ন তো ধরা পড়ে না। তাহলে! কি বলছে মেয়েটা। ছেলে পেয়েছে! মাথার ঠিক আছে তো! এই কুমারী বয়সে তো সকলে মনের মানুষ পেয়ে আহ্লাদ করে, ভেবে ভেবে শরীর মন খরিয়ে দেয়, এই মেয়েটা কি রকম! এত আনন্দ তো অন্য কারণে হয় এই বয়সে, ধরে পাচ্ছে না মঙ্গলা। তার ভিতরে ভিতরে বিস্ফোরণ হয়।

একটা সন্তান যদি পাওয়া যেত! এত বয়স পার করিয়ে, জীবন অন্যের পায়ের নিচে রেখেও মঙ্গলা সন্তান পায়নি। এখন রাত বিরেতে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়। কষ্টে বুক ফাটে। মঙ্গলা বসে পড়ে মেঝেতে। এখন সব বুঝতে পারে। বুঝতে পারে নিজের পাপের কথা। মোহের ঘোরে সে লেঠেল পুরুষটার চিহ্ন খসিয়ে ঢুকে পড়েছিল রাজবাড়িতে। এই পুরীতে না ঢুকলে তো সন্তান থাকত। জগতে এত মানুষ এত কষ্ট করে বাঁচে, সেও বাঁচত। রাজবাড়ি তার সন্তানকে খেয়েছিল। রাজা-বাবুকে সব দিয়েছিল লেঠেলের যুবতী বউ। তখন এসব পাপ বলে মনে হয়নি। রাজ-পুরীতে এসে মঙ্গলা পেটে বাঁচল। তার পেটের কেউ বাঁচল না। তারপর তিন তিনবার বাচ্চা ধরেছিল পেটে, সব চলে গিয়েছিল রাজবাড়ির বাইরের অন্ধকারে। মন সমর্পণ করল বিলাসী পুরুষটার কাছে।

সময় সব খেয়ে নেয়। একদিন শরীর ভাঙলো। রাজাবাবুর মন গেল তার কাছ থেকে অন্যদিকে। মঙ্গলা এ পুরী ছাড়ল না। নেশায় নেশায় থেকে গেল। নিজে পৌঁছে দিল অন্য মেয়ে মানুষকে রাজাবাবুর ঘরে। কিন্তু এ মেয়ে কি বলছে?

—কি পাইছ? মঙ্গলা লাবণ্যর চোখে চোখ রাখে।

—ছেলে।

—মাথার ঠিক আছে?

—হ্যাঁ, কে আমার ছেলে হল বলতো?

—মাথার ঠিক আছে?

মঙ্গলা লাবণ্যকে ধরে, কপালে চোখে মুখে হাত ছোঁয়ায়, স্নেহের হাত। সব ধোঁয়াশা লাগছে তার। এ মেয়ের মন বোঝা দায়। রাজরক্ত এর শরীরে।

ডাক্তারদার মা হয়েছি আমি। লাবণ্য অনায়াসে বলে। তার মনে কোন দ্বিধা নেই। মমতাময়ীর মুখ অল্প আলোয় উজ্জ্বল।

—কী। মঙ্গলার বুক থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে আসে।

লাবণ্য ক্রুদ্ধ হয়। কেন একথা বিশ্বাস করা যায় না! তার মনের ভিতরে আবার মমতার মেঘ গাঢ় হয়। সত্যি লোকটা বড় দুঃখী! অসুখী! অসুখ থেকে অসুখী।

ডাক্তার হয়ে ও নিজের সুখ আনতে পারে না। মমতা পায়নি কোনদিন কোন মমতাময়ী নারীর ছায়ায় আসেনি। তাই সমর্পণ করেছে নিজেকে। লাবণ্যর প্রেম কখনো নিবেদিত হবে না তার উপর, কিন্তু প্রেম ছাড়াও নারীর অন্য অলঙ্কার আছে। মমতা, করুণা। তার জন্য মানুষটা রোজ অতদূর থেকে এখানে আসে। একা থাকতে পারে না। তাকে ফেরাবে কেন? লোকটা ভীরু। নিজকে প্রকাশ করতে ভয় পায়। তাই জটিল রাস্তায় পা বাড়িয়েছে। ডাক্তারদা নিজেকে প্রকাশ করেনি ভাল করেছে। প্রকাশ করলে লাবণ্য পারত না। ফিরিয়ে দিতে হত। মানুষটা কষ্ট পেত।

কারো কষ্ট দেখলে লাবণ্যর কষ্ট হয়। তাই বুঝেও মানুষটাকে সে প্রশ্রয় দেবে। তাকে গোপনে একজন ভালবাসে। একথা বুঝে ফেলে যে কি সুখ! লাবণ্য সুখের ভিতরে ভাসছে।

মঙ্গলা লাবণ্যর চোখ দেখে ভয় পায়। রাজকুমারীর মনে ক্রোধ জন্মেছে। সে এস্ত পদে ঘর ছেড়ে বারান্দার অন্ধকারে ডুবে যায়। লাবণ্য আয়নার সামনে দাঁড়ায়। আঁচলটা ফেলে আবার ঘুরিয়ে জড়িয়ে নেয় শরীরে। মাথার সিঁথির দুপাশের অবাধ্য চুলকে আঙুল দিয়ে শাসন করে। চোখের নিচের অংশে হাতের বুড়ো আঙুল রেখে অহেতুক টেনে চোখের মনির সাদা অংশটা আয়নায় প্রতিবিম্বিত করে। ভাল দেখা যায় না। হেরিকেন জ্বলছে আয়নার ভিতর। চোখটা আবার স্বাভাবিক করে ফেলে। এরপর আয়নায় অস্পষ্ট দেখা যায় মুক্তোর মত অপরূপ হাসি। লাবণ্য ঘুরে ঘুরে দাঁড়ায়। নিজেকে এত ভাল লাগছে আজকে! সে যেন পরশ হয়ে গেছে। পরাগের মাধ্যতা নিয়ে নিজেকে দেখছে। আঁচল উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে ঘরের ভেতর। উদ্দাম হয়ে উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে। তার মন অদৃশ্য মেঘের সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে। লাবণ্য হাসতে হাসতে ফুলে যাচ্ছে। মানুষটা ভীরু না অন্যরকম! লাবণ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। অন্যরকম চোখ নয়ত মানুষটার। সে চোখ কি রকম? লাবণ্য বোঝে না।

রাজকুমারী আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়। তারপর ঘর ছাড়ে। হাতে লন্ঠনটা নিয়ে বারান্দা দিয়ে এগোয়। বিদখুটে এক ছায়া তার সঙ্গে চলে। বাবুজীর ওষুধও দেয়া হয়নি। খাওয়া হয়েছে কিনা কে জানে। একা একা তিনি কি খেয়েছেন?

লাবণ্য ঘরে ঢুকে দেখে মানুষটা বড় ডেক চেয়ারে শায়িত। দুচোখ নিমীলিত। পাশের টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া। ঘরের আলোর শিখাটা কমানো। থালে হাঁসফাস করছে। লাবণ্যর হাতের লন্ঠন আলো বাড়িয়ে দেয়।

—বাবুজী!

লাবণ্য জবাব পায় না। চাদরের ভিতর মানুষটা সামান্য নড়ে উঠল মনে হয়।

—বাবুজী! লাবণ্য অন্নদাশঙ্করের মাথায় হাত রাখে।

বাবুজী ঘুমোয়নি বোঝা যাচ্ছে। জবাব আসছে না। লাবণ্য ধাক্কা খায়। থমথমে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারছে অন্নদাশঙ্কর জেগে থেকেও তার কথার জবাব দিচ্ছেন না। বারান্দার দেয়াল ঘড়ির কারণে মুহূর্তে রাজপুরী শব্দময় হয়ে উঠল। এগারোটা বাজল। লাবণ্য স্থির হয়ে, প্রতিটি ঘন্টার শব্দ গ্রহণ করে। অতঃপর সব কঠোর নৈঃশব্দ্যে ডোবে।

সে আস্তে আস্তে টেবিলের উপরের ঢাকা দেওয়া খাবারটি দেখে। ঢাকা খোলে। লুচিগুলো ঠান্ডা নির্জীব হয়ে আছে। বাটির ক্ষীর ঠান্ডা হয়ে জমে গেছে। রাতে অন্নদাশঙ্করের বরাদ্দ এটুকু।

লাবণ্য অন্নদাশঙ্করের মাথায় হাত দিয়ে ঝাঁকিয়ে দেয়, বাবুজী!

অন্নদাশঙ্কর এক কাত হয়ে যান। লাবণ্যর মুখে স্মিতমিত হাসি দেখা যায়। বোঝে মানুষটার অভিমান হয়েছে। খাওয়ার সময় লাবণ্যকে থাকতে হয়। খাইয়ে দিতে হয়। একান্ত অসুবিধে না হলে তিনি নিজে হাতে খান না। ডান হাতের তিনটে আঙুলের বারো আনা অংশ খসে গেছে। দু আঙুলে অসুবিধে হয়। আজ সময় অনেকটা পেরিয়ে গেছে। লাবণ্য বুঝে ফেলে কারণটা। এখন সাধ্যসাধনা করতে হবে। সে ঝুঁকে পড়ে অন্নদাশঙ্করের দিকে। হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে। চাদরের ভিতরে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয়, বুকের উপর হাত রাখে। হাত বুলোতে থাকে।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবুজী!

অন্নদাশঙ্কর শরীর ঝাঁকিয়ে দেন। লাবণ্যকে এড়াতে চাইছেন। রাজরক্তে অভিমান প্রবল। লাবণ্য বোঝে, ছাড়ে না, 'খাওয়া হয়নি, রাগ করেছ?'

অন্নদাশঙ্কর আস্তে আস্তে চোখ খোলেন। নরম দৃষ্টিতে তাকান। আধো অন্ধকারে চোখ মুক্তোর মত জ্বল জ্বল করছে।

—রাগ হয়েছে! লাবণ্য কপট চোখ পাকায়। তারপর উঠে গিয়ে টেবিলের সামনে চেয়ারটা টেনে দেয়। হেরিকেনটা টেবিলের উপর রেখে দেয়।

—খাবে এসো বাবুজী, আমি কি ইচ্ছে করে দেরী করেছি। লাবণ্য পিতাকে কম্যান্ড করে, ইচ্ছে করে চোখমুখে রাগের ভাব নিয়ে আসে, বিড় বিড় করতে থাকে, 'বাব্বাঃ, আমি কি ইচ্ছে করে ঘুমিয়েছি, বই পড়তে পড়তে ঠিক আছে—।'

অন্নদাশঙ্কর উঠে দাঁড়ান। ভয় লাগছে। একমাত্র ভয় ওই মেয়েকে। নিশ্চুপ চেয়ারে গিয়ে বসেন। লাবণ্যর দিকে তাকা-চুকা

চোখে চেয়ে থাকেন। হঠাৎ কষ্ট প্রবল হয়ে ওঠে লাবণ্যর মনে, সে তার বাবুজীর মাথায় হাত দেয়, চুলে বিলি কাটতে থাকে বাম হাত দিয়ে। ডান হাতে লুচি ক্ষীরে ডুবিয়ে নেয়।

অন্নদাশঙ্করকে খাওয়াতে খাওয়াতে লাবণ্য আপন মনে কথা বলতে থাকে, এই-বার বাবুজীকে সে নিয়ে যাবে রাঁচিতে। সেখানে এক আশ্রমে এই রোগের ওষুধ আছে। খবর পেয়েছে লাবণ্য। হিমালয়-ফেরা এক সিদ্ধপুরুষের হাতে সমস্ত রোগের নিরাময় হচ্ছে। এ-রোগ সেরে যাবে নিশ্চয়ই। তবে হ্যাঁ, বাবুজীকে সব কথা শুনতে হবে, ওষুধটাও যে-মানুষ খেতে চায় না, তার উপর রাগ হয় না! লাবণ্য না থাকলে কি খাওয়া হবে না, যদি আজ তার ঘুম না ভাঙত, তাহলে বাবুজী কি এইভাবে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিত। মশায় খেয়ে ফেলত। ওষুধ খাওয়া হত না, রাতের খাবার তো পড়েই থাকত। এরকম তিন বছুরে বাচ্চার মত করলে কি করে হয়। এখন এই গরমে রাঁচিতে যাওয়া যাবে না, বর্ষাটা নামুক, ঝাড়গ্রাম গিয়ে ট্রেনে চেপে সকালে দুজনে। ডাক্তারদাকে নিয়ে যাবে। ডাক্তারদা অবশ্য এসব ব্যাপার বিশ্বাস করে না, তবুও তাকে নিয়ে যাবে জোর করে। একা একা দুজনে অতদূরে যাওয়া একটা রিস্ক। বাবুজীকে তো তাকেই দেখতে হবে। এই রোগ সেরে যাবে ঐ সিদ্ধ পুরুষের হাতের ছোঁয়া পেলে। সে এতদিনে মনে একটু শান্তি পেয়েছে।

অন্নদাশংকর নির্বিকার খেয়ে যান। খাওয়া শেষ হতে জল খান। তারপর আস্তে আস্তে পালংকের দিকে এগোন। পুরনো রাজকীয় পালংক। লাবণ্য মশারী ফেলে দিয়ে আলমারি খোলে। ট্যাবলেটগুলো [illegible] করে, জল নিয়ে তার বাবুজীর কাছে যায়। হাত ঢুকিয়ে দেয় মশারীর ভিতর। অন্নদা-শংকর নীরবে গ্রহণ করেন। লাবণ্য মনে মনে আহত হয়। বাবুজী এত কথার কোনটাতেও উৎসাহ দেখালো না। বিশ্বাস করছে না। ঘরের আলো কমিয়ে দিয়ে লাবণ্য এগিয়ে যেতে গিয়ে থেমে যায়, অন্নদা-শংকর ডেকেছেন।

—কি বলছ?

—এইবার তোর বিয়েটার জন্য....

লাবণ্য মনে মনে হাসে। বাবুজী তার কৌশল ধরেছে। মানুষে তাকে করুণা করে বিবাহ করবে এ সহ্য হবে না মেয়ের। আর চেয়ে....। কই উচ্চবংশের কেউ তো এগিয়ে আসে না। অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি নেই, কিন্তু এ-বিবাহ তো তার উপরে দয়া দেখানো। বিবাহের সম্ভাবনা কম, তবু বাবুজীর মুখে এ-কথা কখনোসখনো শোনা যায়। লাবণ্যকে উৎসাহিত করার জন্য, যেভাবে সেই সিদ্ধপুরুষের কথা গজালো। লাবণ্য স্থিরদৃষ্টিতে [illegible] ভিতর বসে থাকা মানুষটাকে [illegible] থাকে। অন্নদা-শংকরও মেয়েকে দেখছেন। পরস্পর পরস্পরকে চিনে ফেলেছেন, তাই চোখ [illegible] [illegible]

॥ ১৬ ॥

অম্বুজবাবু ফেরার দিন তিনেক বাদে পিথা নায়েক এল রাজবাড়িতে। সকাল অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। রোদ চড়া হতে আরম্ভ করেছে। পিথা স্বাভাবিক, অম্বুজ-বাবু কলকাতা থেকে ওর জন্য একটা লাল পাঞ্জাবী এনেছে, পুরোন একটা লুঙ্গি দিয়েছে। চেক-কাটা, সবুজের উপর সাদা ডোরা। সেই লুঙ্গির উপর পাঞ্জাবীটা চাপিয়েছে, পাট পাট করে চুল আঁচড়েছে। যাবে অফিসবাবুর কাছে। অম্বুজবাবুর বুদ্ধি আছে।

রাজবাড়িতে ঢুকতেই ডানদিকের মন্দিরের দিকে নজর যায়। পিথা মাটিতে উবু হয়ে সেখান থেকেই মন্দিরকে প্রণাম করে। মাথা তুলতেই দেখে রাজকুমারী। তার চোখ আর ফেরে না। হতভম্ব হয়ে গেছে। রাজকুমারী বেরোচ্ছে মন্দির থেকে। তাহলে প্রণামটা যেন রাজকুমারীর পায়েই হল। পিথা লজ্জা জিভ কাটে। লাবণ্যর থেকে চোখ সরাতে পারে না।

রাজকুমারী চুল এলিয়ে দিয়েছে, লাল টকটকে শাড়ি গৌরবর্ণের দেহকে প্রস্ফুটিত করেছে, পিথার শরীরটা কেঁপে ওঠে। একদৃষ্টিতে রাজকুমারী তার দিকে চেয়ে আছে। সদ্যস্নাতা কন্যা। লাল আঁচল দিয়ে সমস্ত দেহটা ঢেকে রেখেছে। এমন-ভাবে চেয়ে আছে কেন! পিথা বুঝতে পারে না। হাত-পা ঝিমঝিম করতে থাকে।

—কেমন আছিস? লাবণ্য জিজ্ঞেস করে।

পিথা জবাব দিতে পারে না, গলার ভিতর বাক্যরা লুটোপুটি খায়।

—মানিয়েছে বেশ; জামাটা ভাল হয়েছে। লাবণ্য হাসে পিথার দিকে চেয়ে।

পিথা নিজের পোষাকের দিকে তাকায়। মুখে বিগলিত কৃতার্থ হওয়ার হাসি।

—যাচ্ছিস কোথায়?

—অফিসারবাবুর নিকট। পিথা কোন-ক্রমে জবাব দিয়ে রক্ষা পায়।

লাবণ্য মন্দিরে প্রবেশপথের বারান্দায় বসে। পায়ের পাতা আলোয় মেলে ধরেছে। আলতা-পরা পা লক্ষ্মীর পা-এর মত হয়ে যায়। পিথার চোখ সরে না। লাবণ্য বসে বসে ফুলের সাজি থেকে ফুল বাছতে থাকে মাথা নিচু করে। পিথাকে আর আমল দেয় না। পিথার মাথা নত হয়ে যায়, সে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। দেহমনে শিহরণ লেগে আছে। সে এগোতে এগোতে আর একবার পিছনে ফেরে। পিছনে ফিরেই চমকে ওঠে। রাজকুমারী শূন্যদৃষ্টি মেলে দিয়েছে তার দিকে। আশ্চর্য। সে তাকালেও চোখ সরায় না মেয়েটা। পিথা ঘুরে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে, কুছু কহিবে রাজকনিয়া?

লাবণ্য মাথা নাড়ায় খুব আস্তে আস্তে। না কিছু বলবে না। পিথা দ্রুত চলে যায়। বলবে না তো অমনভাবে চেয়ে দেখছিল কেন তাকে। পিথা গেলে তার এই ভূত মাথার ভিতরে ঢুকে পড়ল। চোখ-মুখ আর অপরূপ শরীর নিয়ে রাজকুমারী আজ সারাদিন তাকে জ্বালাবে। এরকম তো কোন-দিন হয়নি। রাজবাড়িতে তো অনেক দিন এসেছে। রাজকন্যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, যেমন হয় মনিব-ভৃত্যে। কিন্তু আজ বুকের ভিতরটা ছমছম করে উঠল কেন? ভয় ভয় ভাব। রাজকুমারীও তো কোনদিন তাকে এইভাবে দেখেনি। দেখেছে কি! মনে পড়ে না।

বারান্দায় ফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতে লাবণ্য ভাবে, এই পিথা নায়েক লোকটা যেন একটা পাহাড়। সেজেগুজে এসেছে। কালো মিশমিশে রঙ, তার উপর লাল টকটকে পাঞ্জাবী, চেককাটা লুঙ্গি। কিম্ভূত সাজ! কিন্তু খারাপ লাগছিল না তো লাবণ্যর। দেখতে দেখতে ইচ্ছে করছিল পাহাড়ের মত মানুষটা নুয়ে পড়েছিল তার কাছে। তা তো পড়বেই, হাজার হোক সে রাজকন্যা। এই রাজবাড়ি একদিন কলাবনি আর তার আশপাশের শ-তিনেক মৌজা শাসন করেছে। এরা ছিল তাদের প্রজা। সে-কথা ওরা ভুলে যায় কি করে। কোথায় গেল মানুষটা। বেশ লাগছিল দেখতে। লম্বায় কত। বুক-ফুটের উপর তো হবেই, সেই অনুপাতে হাত-পা-বুক। চোখ দুটো গোল গোল, জগতের সবকিছু যেন চোখ দিয়ে গিলে খাবে। লাবণ্যর শরীরটা ছমছম করে ওঠে। সে অন্যমনস্কভাবে গায়ের কাপড়টা টেনে দেয় ভালভাবে। তারপর চিৎকার করে মঙ্গলাকে ডাকে। মঙ্গলা মন্দিরের ভিতর থেকে এগিয়ে আসে।

—কি বলছ?

—আর মালা গাঁথবো না।

—কেনো? হল কি?

—ভাল লাগছে না।

—রাখি দাও বাপু।

মঙ্গলা মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। দেখে রক্তিম ছোপ পড়েছে গালে। কি জ্বালা। কেউ তো নেই ধারেকাছে। কার কথা ভাবছিল। রাজারকুঁয়ে যে কত ভাবনা আসে। মঙ্গলা ফুলের সাজিটা নিয়ে ভিতরে চলে যায়, কথা বলে না।

লাবণ্য ওঠে। পা বাড়ায়। না, মন্দিরে যাবে না। ঘরের দিকে যাবে। খুব আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে। ক্লান্ত লাগছে। শরীর নুয়ে পড়ছে। এক-একটা স্টেপ ফেলতে কষ্ট ভীষণ, লাবণ্যর মাথায় হঠাৎ রোদ পড়ে। পিছলে যায়। সে সিঁড়ির অন্ধকারে ঢুকে যায়। এই পিথা নায়েকের ভাইটার নাম ছিল [illegible]। সাপের কামড়ে মরেছে। [illegible] নরকে। সে ঘটনা পিথা জানে। পিথা সব জানে। লাবণ্য ঘরে এসে পালংকে শুয়ে পড়ে উপুড় হয়ে। বারান্দার বাইরের শূন্যতা খাঁ খাঁ নৈঃশব্দে একটা কাক ডেকে [illegible]। লাবণ্য কেমন গন্ধ পাচ্ছে। অদ্ভুত [illegible] কোত্থেকে আসে। কাঁঠালী চাঁপার গন্ধ! আস্তে আস্তে হাল্কা। গন্ধটা তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। অপরূপ সুগন্ধ। এই গন্ধের ভিতরে ডুবে রাজকুমারী নিথর হয়ে যায়।

(চলবে)

হিসেবে ভুল

অজিতকুমার চক্রবর্তী কলকাতায় উড়াল ট্রাম চাই প্রবন্ধে (অমৃত ১ জুন ১৯৭৯) একটু তথ্যগত ভুল আছে। তিনি ১২ পৃষ্ঠায় এক জায়গায় লিখেছেন যে 'ময়দানে......ব্যাস হবে প্রায় ৯ কিলোমিটার।' কিন্তু ঐ পৃষ্ঠায় আর এক জায়গায় লিখেছেন 'খরচের দিক......৯ কিলোমিটার কংক্রিটের উড়াল পুল......টাকা। চক্রাকার এই উড়াল ট্রামের ব্যাস-ই যদি ৯ কিঃ মিঃ হয় তাহলে কংক্রেটের উড়াল পুল করতে হবে ২৮ কিলোমিটারেরও বেশী। ৯ কিলোমিটার নয়।

মানিক পাল
কৃষ্ণপল্লী,
[illegible]

বিচিত্রা

বই

বিন্দুতে সিন্ধু

এক কথায় বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন! গোটা পৃথিবীর শিল্প ইতিহাসের আদি ও মধ্য পর্বের যে সমস্ত অবিস্মরণীয় অধ্যায়, যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরণি, তার ওপর কিছুটা আলোকপাত করাই বইটির উদ্দেশ্য। মহৎ উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। কারণ কাজটা শ্রমসাধ্য, এবং নিছক পরিশ্রমই নয়, এই ধরণের কাজ হাতে নিলে লেখককে যেমন একদিকে শিল্প বিষয়ের বিষয়ী হতে হয়, তেমনি অন্যদিকে ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার নির্মম শর্তটিও অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। যদিও বলে রাখা ভালো, বইটি বিশ্ব শিল্পের অখন্ড ইতিহাস নয়, অর্থাৎ আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত নন্দনকলার সর্ব শাখার পারম্পরিক ও পর্যায়ক্রমিক ইতিবৃত্ত নয়, এবং সেইহেতু ঐতিহাসিকের নিক্তিতে ওজন করা মন্তব্য ও নির্লিপ্ত হবার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যান, তবুও একথা স্বীকার করতেই হয়, তরুণ লেখকটি— যিনি না প্রতিষ্ঠিত শিল্প তাত্ত্বিক না ঐতিহাসিক, বহুলাংশে তাঁর কাজে সফল হয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে যাঁরা ইংরেজী ভাষার পাঠক এবং যাঁরা শিল্পের ইতিহাস নিয়মিত চর্চা করেন, তাঁদের কাছে মূল্যবান ইংরেজী কেতাবের অভাব নেই। প্রিমিটিভ আর্ট, হেলেনিস্টিক, ইজিপশিয়ান, বাইজান্টাইন, রেনেশাঁ, গথিক, রোমানেস্ক, বারোক থেকে শুরু করে চোল-চালুক্য-অজন্তা-মোঘল সব বিষয়ের ওপরই অগুনতি ও মহামূল্যবান বই সব তুরন্ত মিলে যায়। কিন্তু 'আমরি বাংলা ভাষা'য় এ ধরনের বই নেই বললেই চলে। নন্দবাবু, অবন ঠাকুর, মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত এবং আমাদের সবে ধন নীলমণি রবীন্দ্রনাথও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে বেশ কিছুটা এগিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের পর সেই ধারাটা প্রায় শুকিয়ে যেতে এসেছিলো। হালে আবার মজা নদীতে তিরতির করে জল বইতে শুরু করেছে দেখছি। সরসীকুমার সরস্বতী পাল যুগের চিত্রকলার ওপর মূল্যবান বই লিখেছেন। বিষ্ণু দে যামিনী রায়-এর ওপর লিখেছেন। সাম্প্রতিক চিত্রকরকে বাদ দিলেও বিনোদবিহারীর গোটা দুই শিল্পবিষয়ক বই আমি পড়েছি। এতদ্ব্যতীত আরও কিছু কিছু বই এদিক সেদিক চোখে পড়ছে। কিন্তু এ সবের অধিকাংশই শিল্পীবিষয়ক বই। শিল্পের ইতিহাস নয়, যা পড়ে শিল্পকলা বিষয়ে উৎসাহী পাঠক এবং ইংরেজী না-জানা [illegible] কোন দেশে, কখন, কি ধরণের শিল্প আন্দোলন দানা বেঁধেছিলো, কোন দেশের শিল্পকলার কী বৈশিষ্ট্য। বাইজান্টাইন-এর সঙ্গে গ্রীসীয় আর্টের তফাৎ কোথায়? মৌর্য শিল্পের সাথে মৌর্য পরবর্তী শিল্পধারার ব্যবধান কতটুকু? অথবা ইত্যাকার অনেক জ্ঞাতব্য জিনিস। 'বিশ্ব শিল্পের রূপরেখা' এই অভাবটা অনেকাংশে পূরণ করবে বলে আমার বিশ্বাস। বহু তথ্যে পূর্ণ ও অজস্র মূল্যবান অলংকরণ ও ছবিতে সমৃদ্ধ এই বইটি সাধারণের উপযোগী করেই লেখা হয়েছে। ভাষা যদি কোথাও কোথাও মাত্রাতিরিক্ত গম্ভীর বা আড়ষ্ট হয়ে থাকে, সে দোষ পুরোপুরি লেখক নামক নন্দ ঘোষটির ঘাড়ে চাপানো উচিত হবে না। দোষের ছায়া রয়ে গেছে কিছুটা বিষয়ের মধ্যেও। নন্দন বিষয়ক আলোচনা কজন আর সহজ সরলভাবে করতে পারেন? টিকি নাড়া পন্ডিতের সংখ্যাই বেশী। রামকৃষ্ণ আর কজন হন?

ঊর্ধ্বাংশের মূর্তি [illegible]

গোটা বইটি এগারোটা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে এক একটি দেশ বা স্বতন্ত্র এক একটি শিল্প পরম্পরা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আদিম শিল্প ছাড়াও মেসোপটেমিয়া, মিশর, ইরান, ভারতবর্ষ, ইজিয়ান, গ্রীক ও হেলেনিস্টিক শিল্প, ইতালী, প্রাচীন খৃষ্টান শিল্প, বাইজান্টাইন, রোমানেস্ক ও গথিক শিল্পের ওপর আলোচনা ঠাঁই পেয়েছে। শিল্পের মধ্যে আবার মাধ্যমকে লেখক বেছে নিয়েছেন। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। চিত্রকলা বাদ পড়েছে এবং তা 'গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যয়ের কথা চিন্তা করেই।'

বইটিকে বিশেষ দুটি কারণে মূল্যবান মনে হয়েছে আমার কাছে। প্রথমতঃ শিল্প নিছক সৌন্দর্যের আধার নয়। শিল্পে, শিল্প ছাড়াও অতিরিক্ত অন্য কিছুর অস্তিত্বও টের পাওয়া যায়। নৃবিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকেরা সে কথা স্বীকার করেন। আমার মতে শিল্প সমাজের দর্পন। এতে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক— এক কথায় জীবনে যা প্রয়োজনীয় ও জীবনের সাথে যুক্ত এমন সবকিছুই আভাসিত। কখনো ইঙ্গিতে। কখনো ভঙ্গীতে। কখনো অকপট উচ্চারণে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় আদিম শিল্পের কথা। আফ্রিকা, এসিয়া-নিয়া, অস্ট্রেলিয়া, পলিনেশিয়া বা উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের তৈরী যে সব শিল্পবস্তু আমাদের হাতে পৌঁচেছে তার মধ্যে আমরা দেখেছি কিভাবে প্রোথিত রয়েছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, ভয়, আনন্দ, বিস্ময় ও সামাজিক বিধিনিষেধ। লেখক বিভিন্ন সূত্র থেকে [অধিকাংশই ইংরেজী বই] এই সমস্ত তথ্য আহরণ করে সাজিয়ে দিয়েছেন তাঁর বইতে। এবং এইগুলি পড়তে সাধারণের তো বটেই, বিশেষজ্ঞদেরও ভালো লাগবে।

যেমন ধরা যাক, আফ্রিকার 'গুপ্ত সমিতি'গুলোর কথা। 'গুপ্ত সমিতির ভূমিকা আফ্রিকার কতকগুলি গোষ্ঠীর সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। কোথাও [illegible] সাহায্যে [illegible] নিজ [illegible], কোথাও বা আইনশৃংখলা

পালন করা হয়। বয়ঃসন্ধিক্ষণ এলে বালক-বালিকাকে নতুন জীবনে ব্রতী করার উদ্দেশ্যে কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। একে ইনিসিয়েশন সেরিমনি বলে। বালককে লোকালয় থেকে দূরে নিয়ে বনে বা পাহাড়ে কিছুকাল কষ্টকরভাবে জীবনযাপন করতে হয়। ক্ল্যানের উপাখ্যান, ধর্ম এবং নিজের কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। গুপ্ত সমিতিগুলি এরূপ আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। পুরুষদের সমিতিগুলোকে পোরো এবং নারীদের সমিতিকে বুন্দু বলে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। আবার তো গুপ্ত সমিতিগুলোর কথা পড়তে পড়তে নারায়ণ সান্যালের (বিকর্ণ) 'দণ্ডক শবরী'তে বর্ণিত প্রায় অনুরূপ সংগঠনগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো। আমাদের আদিবাসীদের সাথে নিগ্রোটো-দের যে মিলের কথা শুনি সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় এই সমস্ত তথ্যের সমর্থনে। গবেষকরা এই সূত্র ধরে কাজ করলে জ্ঞানের ভাণ্ডারে আরও মতুন নতুন মাল-মশলা জমা পড়বে। আবার ধরা যাক, টোটেমের একই ক্ল্যানদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিলো। সেটাও কি আমাদের চিরা-চরিত গোত্রীয় বিধিনিষেধের অনুষঙ্গ মনে আনেনা?

দ্বিতীয়তঃ যদিও এই বইটিতে ভারতীয় শিল্পধারার ওপর আলোচনা অত্যন্ত নগণ্য—কিছুটা যাঁড়-ছোঁয়ের গোছের—তবুও মস্ত লাভ এই, ভারতীয় শিল্পের পাশাপাশি পেয়ে যাই গ্রীস বা মিশরের শিল্পাখ্যান। ফলে এদের সাথে অন্য পরম্পরাকে মিলিয়ে নিয়ে পড়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই তুলনামূলক পাঠই অধ্যয়নের যথার্থ পথ। সেই হিসেবেও বইটি ভালো। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষের টীকাগুলিও মূল্যবান।

বইটি ভালো করে পড়লে অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যের অসংগতি চোখে পড়ে। কোনো কোনা জায়গায় আবার নিজের মতামতকে সর্বজনীন বলে চালাবার চেষ্টাও দেখি। যেমন ধরা যাক, প্রথম অধ্যায়েই এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন—সকল প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষ সৌন্দর্যকে উপভোগ করার চেষ্টা করে। কথাটা কেবল সাধারণভাবে সত্য। আজকের বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন মনুষ্যেতর পশুদের মধ্যেও সৌন্দর্যবোধ তো রয়েইছে, তাদের মধ্যে মানুষের মত না হলেও উপভোগের শক্তি ও ইচ্ছা দুই রয়েছে।

আবার ধরা যাক মেসোপটেমিয়ার ওপর আলোচনাকালে লেখক বলেছেন ৬০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের আগে মৃৎপাত্রের ব্যবহার মিশর ও মধ্য প্রাচ্যে শুরু হয়নি। কিন্তু ঐ একই জায়গায় আবার (পৃষ্ঠা ১৭) বলেছেন প্যালেস্টাইনের জেরিকো নামক স্থানের অধিবাসীরা প্রায় ৮,০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সূর্যপক্ক ইঁট দিয়ে বাড়ী তৈরী করত। বাসগৃহ তৈরী করা হত অথচ সেখানকার বাসিন্দারা মাটির পাত্র তৈরী করা জানতো না এটা বিশ্বাস করা কি শক্ত-নয়?

স্বরাজ মজুমদার

বিশ্বশিল্পের রূপরেখা : অলোক মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক - কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩, মূল্য-৭৫-০০।

মানুষের দিকে.প্রণবেন্দু

কোনো কোনো কবি পাঠকের কাছে অনুশীলন পর্বের ইতিহাস না রেখেই প্রায় হঠাৎ দেখা দিয়ে চমকে দেন, দ্রুত কিন্তু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়ে বিশ্রাম নেন, আবার কেউ কেউ তাঁদের গ্রহণ, বর্জন, ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার প্রতিটি বাঁকের ইতিহাস রেখে যেতে থাকেন পাঠকের সামনে। এদের পরিণতির দিকে যাত্রার একটা দীর্ঘকাল অনুসৃত ইতিহাস আমরা দেখতে পাই। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ এর উজ্জ্বল উদাহরণ, পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় এর নিদর্শনের অভাব নেই।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণী-ভুক্ত কবি, কারণ এই কবি আবির্ভাব মাত্রেই আমাদের চমকে দেননি, আবার কিছু স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে হঠাৎ নিঃশেষ হয়েও নিভে যেতে দেখি না একে। ইনি খুব ধীরে ধীরে মেলে ধরেছেন নিজেকে, গোপনে আর সতর্কভাবে। খুব ঝুঁকি নিয়ে কোনো উচ্চারণ যেমনি দেখিনা প্রণবেন্দু দাশ-গুপ্তের কবিতায়, তেমনি দেখিনা অতি-সরলীকৃত সাংবাদিকতা। মাঝখানের একটি সামঞ্জস্যে দাঁড়িয়ে থাকেন, চলতে থাকেন। স্পষ্ট করে বলেন না 'আমাকে দেখো,' বরং আগ্রহী পাঠক তাকে উপেক্ষা করতে না পেরে নিজের গরজেই ঘুরে দাঁড়ান, শুনতে চান কান পেতে, কি বলছেন এই কবি, কতো সহজে আর কতো নিবিড় উপলব্ধির। বেদনাকাতর সেই স্বর।

এই, আস্তে কথা বলা, আর খুব সহজ, কখনো কখনো প্রায় কবিতার পক্ষে জরুরী বলে কথিত তাবৎ অলংকার বর্জন করে—এটা প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের চরিত্র। এই চরিত্র তাঁর ব্যক্তি স্বভাবের সঙ্গে মেলে, কোনো কৃত্রিমতা এখানে নেই। যদিও আজকের সবরকমের টেনশানের মধ্যে এরকম মৃদুতা সবার কাছে সহনীয় না-ও হতে পারে। কিন্তু কবির তাতে মনোযোগ দিলে চরিত্রের বিরুদ্ধতা করা হয়।

নতুন বইটির নাম 'মানুষের দিকে'। নামটি তাৎপর্যপূর্ণ অন্তত আমাদের কাছে যারা এতাবৎ এই কবির রচনায় এরকম সরা-সরি মানবীয় উপস্থিতি ঘটাননি। বরং অন্যান্য কবিতাগ্রন্থের কবিতায় নিসর্গ, অনুত্তেজক প্রেম ও ব্যক্তিগত অভিমুদ্দ অনুভূতির অনায়াস উপস্থিতি লুক্ষ্য করেছেন। বলা যায়, খুব দায়িত্ব অনুভব করছেন যেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, প্রত্যক্ষ সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিবেশী মানুষের জন্যেও কিছু বলা দরকার। সুখের বিষয়, 'বলা দরকার' বলেই লেখেন নি, এর অনেক কবিতার পেছনেই উষ্ণ আবেগের চাপ রয়েছে, আর কবিতা নামক কলাশৈলীর তাবৎ শর্তই মান্য করা হয়েছে।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতার জগৎ বিষণ্ণ, হারানো শৈশব, ফেলে আসা দিনের স্মৃতি খুঁড়ে নতুন করে তুলে আনার স্বাদে সুন্দর। যেমন :

মানুষ বুঝতে পারে, তার
দুঃখের ভেতরে/দুটো পাখি ক্রমাগত দানা
খুঁটে নেয়,/তার সুখের
খুঁটে নেয়,/তার সুখের ভেতরে
/একফালি

কাঁচ আম গন্ধ নিয়ে আজো জেগে আছে।/
(ভোর)

একটা বিষণ্ণ পাতা তার পৃথিবীর দিকে
ধাওয়া করে আসে— (সে)
আর কিছু নয়, শুধু পরিণামহীন ভালো-
বাসা/আমাদের সমস্ত জীবন ঘিরে থাকে।

এছাড়া জীবনের নশ্বরতা ক্ষণিকত্ব প্রণবেন্দুকে বিমর্ষ করে—

করেকটি মুহূর্ত শুধু ভালো লাগে,
করেকটি প্রহর বড়োজোর,/তার পর ঘুরে
ঘুরে পাতা ঝরে উঠোনের ঘাসের ওপরে
(প্রেম অপ্রেম)

এখন দুঃখের ডানা ভারি হয়ে আসে।
এখন দুঃখের ডানা ক্রমশই ভারি হয়ে আসে।।

এইসব উদ্ধৃত পংক্তি প্রণবেন্দু দাশ-গুপ্তের আনুপূর্বিক কবিস্বভাবকে ধরে আছে। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি জানো এখন, এই মধ্যবয়সে এসে অনুভব করছেন, বিষণ্ণতা বা বিষাদ মানুষের জন্মসঙ্গী, কিন্তু এইসব অনুভূতিকে মাঝে মাঝে মানুষের মাঝখানে বসে দেখা দরকার, কিংবা সাময়িকভাবে ভুলে যাওয়া চাই। না হলে ইচ্ছা ও কাজের ক্ষমতা নষ্ট হতে থাকে।

একা একা কিছুদূর যাওয়া যায়।
তারপর খুব ক্লান্ত লাগে।
মনে হয়, পাশে কেউ থাকলে ভালো হতো।
... ...
একা মানুষের দুঃখ
রাস্তার কুকুর শুধু বুঝতে পেরে, শব্দ
করে ওঠে।।

একাকীত্ব থেকে বের হবার ইচ্ছে কবির আন্তরিক, শুধুই কথার কথা নয়। 'মানুষের দিকে' বইটি থেকে প্রণবেন্দুর কবিতা অন্য পথে চলতে শুরু করেছে, এর আগে তাঁকে এমন মানুষের জন্য উষ্ণ আতিথেয় আয়োজন করতে দেখিনি। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের নিজের শুভ পাঠক জানে

রাখবেন, কেননা তিনি ব্যস্ততার সঙ্গে শর্ট্‌ ভাঙেন না; ধীরে ধীরে ভাবনাশ্রিত হতে হতে একটু একটু করে পথ ভাঙেন। আর ক্রমশই কবিতা থেকে অনাবশ্যক অলংকার খুলে ফেলবার সাহসও তিনি দেখাচ্ছেন। সারাজীবন ধরে একটি সার্থক চিত্রকল্প সৃষ্টি, বা উপমাই কবিত্ব। প্রভৃতি আপ্তবাক্যও যথেষ্ট পুরনো হয়েছে, বাতিল হবারও সময় হয়েছে। কবিতা নিয়ে নতুন করে ভাবনা চলছে. প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর এই বইটিতে তার পরিচয় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের মধ্যে চিহ্নিত—এসব শব্দ ইতিমধ্যেই হাস্যকর হতে বসেছে। যিনি কবি, তিনিই সবসময়ের জন্যেই কবি: প্রণবেন্দু এই 'কবি' হয়ে উঠেছেন, এটাই বড়ো কথা।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মানুষের দিকে। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

পত্র পত্রিকা

এই মুহূর্তে বাংলাদেশে প্রকাশিত অসংখ্য জলো পত্রপত্রিকার মধ্যে 'প্রমা' তার দ্বিতীয় সংখ্যায়ও বেশ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে।

কি কি খাদ্য খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, বাঙালীর তা বেশ ভালই জানা আছে। খুব বেশী প্রোটিন বাঙালীর পেটে (রবিবার বাদে) অনেকদিন ধরে সয়না। সওয়াতে চেষ্টা করলে হয় পেটের গণ্ডগোল দেখা দেবে নতুবা অতিরিক্ত রক্তের চাপ সৃষ্টির ফলে—অকালে বিপদপাং দেখা দেবে। তাই বেশীরভাগ সাময়িক পত্রিকাতেই ঝালঝোল অম্বলের সমাবেশ অলক্ষ্য নয়।

'প্রমা' স্বাতন্ত্র্য রেখে চলার চেষ্টা করছে। পত্রিকাটি খুললেই প্রথমে পাওয়া যাবে বাদল সরকারের বাংলায় রূপান্তরিত একটি নাটক। নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট্‌। নাটকের নাম দ্য ককেশিয়ান চক সার্কল। বলা বাহুল্য রূপান্তরিত অনুবাদের মধ্যে বাদল সরকার ব্রেশ্‌ট্‌-এর 'মজাটা' আনতে পেরেছেন।

দ্বিতীয় রচনা একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধের নাম, হবসন ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। লেখক সৌরীন ভট্টাচার্য। একটি অত্যন্ত বুদ্ধিপ্রধান রচনা। অর্থনীতির লোকেরা রচনাটি বুঝবেন ভাল। ঠিক সমালোচনাও তারাই করতে পারবেন। তবে সাধারণ পাঠক হিসেবে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে হবসনের (১৮৫৮-১৯৪০) অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে মৌলিকতা ও বিস্ফোরক পদার্থ দুইই আছে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার তাঁর মত একজন অর্থনীতিবিদ যে অপাংক্তেয় হয়েই থাকবেন তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

তৃতীয় রচনাও একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির লেখক নিত্যপ্রিয় ঘোষ। প্রবন্ধের বিষয়, বিপিনচন্দ্র পালের রবীন্দ্র এ্যাসেসমেন্ট এবং তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া। নিত্যপ্রিয় ঘোষ ইতিমধ্যে বাংলা সমালোচনামূলক রচনায় বুদ্ধি প্রধান ও নির্মোহ আলোচনার সূত্রপাত করে সুনাম ও দুর্নাম দুইই অর্জন করেছেন। তাঁর সমস্ত রচনাই তথ্য-ভিত্তিক। মতামত যুক্তিনির্ভর। তিনি বর্তমান প্রবন্ধে একদিকে বিপিনচন্দ্র পালের মত রাজনৈতিক জগতে সুপরিচিত ব্যক্তির প্রখর সাহিত্য বুদ্ধির যেমন উদ্ঘাটন করেছেন, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে বিপিনচন্দ্রের যে নির্মোহ ও যুক্তিসহ বোধ ও বুদ্ধির ব্যবহারের মৌলিকতা তা যে শুধু-মাত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতির রবীন্দ্র বিরোধিতার দ্বারা প্রণোদিত নয়—তার মধ্যে মননশীলতা ও সূক্ষ্মবিচার প্রবণতার পরিচয় আছে—তা সুপ্রকাশ হয়েছে। প্রবন্ধটি সযত্ন পাঠের দাবী রাখতে পারে।

চতুর্থ রচনাটি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হলেও আসলে এটি ঐতিহাসিক দিক থেকে বর্তমান ফরাসী উপন্যাসের গতি ও প্রকৃতি দেখানোর চেষ্টা। প্রবন্ধকার অরুণ মিত্র। এই ধরণের রচনা প্রকৃতপক্ষে কাদের সাহায্য করে আমি জানিনা। যাঁরা ফরাসী জানেন, বলা বাহুল্য তাঁরা মূলে ফরাসী ভাষায় নিশ্চয়ই অনেক ভাল বই পড়ে নিতে পারেন। যাঁরা ফরাসী জানেন না, তাদের এই ধরণের রচনা যা দিতে পারে তা নিতান্তই পল্লবগ্রাহিতার অনুপ্রেরণা। পবিত্র সরকারের ধারাবাহিক রচনা, বাংলা ভাষা পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ—বর্ত-মান সংখ্যায়ও বড় আকারে আছে। গবেষণামূলক এই রচনাটির বিচ্ছিন্ন আলোচনার অসুবিধা আছে। তবু বর্ত-মান সংখ্যায় শ্রীসরকার যেটা দেখবার চেষ্টা করেছেন সেটা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং। তিনি দেখিয়েছেন, হিন্দু ও মুসলমানের বাংলা ভাষা নিয়ে যে বিরোধ সেটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল সাহিত্যিক ভাষায়। কিন্তু নগরবাসী মুসলমান নেতৃত্ব 'মাতৃ ভাষা'র সমস্যাটাকে কৃত্রিমভাবে বিস্ফারিত করে দেখিয়েছেন শিক্ষিত মুসলমানের কাছে কিন্তু অচিরেই ধরা পড়ে যায় যে, মাতৃ-ভাষার সমস্যাটি আসলে একটি ভুয়ো-সমস্যা। আসল সংকট হল, মুসলমান নেতৃত্ব চাইছিলো, নিজস্ব সাম্প্রদায়িক তাগিদ অনুযায়ী ভাষা উন্নয়ন। অর্থাৎ হিন্দু লেখকের হাতে সাহিত্যের ভাষায় যে স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেসন ঘটেছে তা তাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। কারণ, তাতে প্রচলিত আরবি ফারসি শব্দের বর্জন এবং অকারণে তাদের বদলি হিসাবে অপ্রচলিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ। অলংকারে ও উপমানা উল্লেখে পৌত্তলিক অনুষঙ্গ। বিষয়বস্তুতে মুসল-মান বাঙালীর অভিজ্ঞতা ও মানসিকতার প্রায় অনুপস্থিতি।

সমস্তটা মিলিয়ে, 'প্রমা' পত্রিকাটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। বুদ্ধি প্রধান ও মননশীল রচনা পাঠে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের খাদ্য এতে আছে। এমন কি পুস্তক সমালোচনা ও তর্কবিতর্কের অংশেও।

অঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রমা। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। জানুয়ারী উনআশি। সম্পাদক—সুরজিৎ ঘোষ। ৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ। কলকাতা-১৭। দাম—চার টাকা।

সুমিত্রা বসু

গানের অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে সুর ও ভাবের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটিয়ে যে শিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করার কায়দাটি আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতভক্তদের কাছে একদিন সমাদৃত হবেনই।

ইদানিং রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে গেলেও সত্যিকারের গুণী শিল্পী খুবই কম।

শ্রীমতী সুমিত্রা বসু নিঃসন্দেহে একজন গুণী শিল্পী। তাঁর জন্ম ১৯৪২ সালের ২৪ আগস্ট কলকাতায়। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রবীন্দ্রসংগীত' বিষয়ে সিনিয়র ডিপ্লোমা এবং রবিতীর্থ থেকে ঐ একই বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং এ দুটি পরীক্ষাতেই সুমিত্রা দেবী প্রথম স্থানের অধিকারিণী। এ ছাড়া ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত, কীর্তন, ও অতুলপ্রসাদী গানের তালিম পেয়েছেন যথাক্রমে রমেশ বন্দ্যো-পাধ্যায়, রথীন ঘোষ, পূরবী দত্ত, সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর গুরু সুচিত্রা মিত্র।

১৯৬০ থেকে বেতারে, ১৯৬৮ থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডে এবং ১৯৭৭ এ টেলি-ভিশনে গান গেয়েছেন।

সুমিত্রা বসু সেজাতের গাইয়ে, যাঁর গান শুনে শ্রোতারা শুধু তৃপ্তই হন না, তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, শিল্পীর কণ্ঠে যে রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তার ফলে তিনি অন্যান্য শিল্পীদের থেকে নিঃসন্দেহে অনন্যা।

বর্গ—ইতিহাসের নতুন অধ্যায়

অজয় বসু

একালের সেরা টেনিস খেলোয়াড় কে? বর্ন বর্গ? না জিমি কোনরস? অথবা বিশ বছর বয়স্ক ছটফটে মার্কিণ তরুণ জন ম্যাকেনরো? কদিন আগেও এই সব প্রশ্ন ঘিরে টেনিসের বিশেষজ্ঞ মহলে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ, বাদানুবাদ চলল। আজ সে তর্ক-বিতর্ক থেমে গেছে। যেন টেনিসের তীর্থভূমি উইম্বলেডনে নিজের বাহুবল ও ক্রীড়াশৈলীর অবিমিশ্র পরিচয় রেখে সুইডিশ তরুণ বর্ন বর্গ সমালোচকদের মুখে চাবিকাঠি এঁটে দিয়েছেন। গোঁড়া সন্দেহবাতিকদের পর্যন্ত আজ এই সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সমকালীন টেনিসে তেইশ বছরের তরুণ বর্ন বর্গের কোন জুড়ি নেই।

সমকালীন শব্দটি ব্যবহার করলে বোধ-হয় বর্গের ক্রীড়া প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হয়। সুবিচার করতে হলে বলতে হয় যে, সর্বকালের নিরিখে বর্ন অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। বিল টিলডেন, ডোনাল্ড বাজ, প্যাঞ্চো গনজালেস, জ্যাক ক্রেমার, রড লেভার প্রমুখ সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের যৌবনে কোর্টের উল্টো ধারে বর্গ যদি তাঁদের মুখোমুখি হতেন তাহলে দ্বৈরথের মীমাংসা হত কিভাবে তার ঠিকানা জানতেই এখন পণ্ডিত মহলকে আবার নতুন করে আলোচনায় বসতে হবে। ইতিমধ্যেই পণ্ডিতেরা বলতে আরম্ভ করেছেন যে, সর্ব-কালের সেরা পর্যায়ের খেলোয়াড়দের মুখো-মুখি মোকাবিলায় বর্গ যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়তেন না, একথা জোর গলাতেই বলা যায়। এই সার্টিফিকেটের দাম নেহাৎ কম নয়। যেহেতু স্বীকৃতিটি কালজয়ী।

সত্তরের দশকে তিন-তিনজন উঠতি তরুণের আবির্ভাবে আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে নতুন করে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল সুইডিশ বর্গ, মার্কিন জিমি কোনরস উত্তরপর্বে সেই পটভূমিকায় মানানসই ভূমিকা নিতে পেরেছেন। শুধু পিছিয়ে পড়েছেন সেদিনের উঠতি ভারতীয় বিজয় অমৃতরাজ। বিজয় বিক্ষিপ্ত ভাবে টেনিস কোর্টের রুই কাতলাদের বধ করলেও বিশ্বের একেবারে সামনের সারির প্রতি-যোগিতায় শীর্ষ সম্মান পাওয়া তার ভাগ্যে ঘটে ওঠে নি।

কিন্তু [illegible] [illegible] নিজেদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জিমি কোনরস ও বর্ন বর্গ কদিন আগে পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে চুলোচুলি সংগ্রাম করেছেন। পরস্পর পরস্পরকে হারিয়েছেন। দেশের মাটিতে প্রায় অপরাজেয় পর্যাপ্ত সঞ্চয়েও সফল হয়েছেন জিমি কোনরস। কিন্তু টেনিসের বৃহত্তম আসর উইম্বলেডনে এসে বর্গ বার বার পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দয় হাতে। এবারের সেমিফাইনালে সরাসরি তিন সেটে জয়লাভ করার পর বর্গের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। কোনরস পিছু হটেছেন। ভবিষ্যতে কোনরসের স্বদেশবাসী জন ম্যাকেনরো বর্গকে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে তাল ঠুকতে পারেন কিনা, সেইটিই হবে লক্ষ্যণীয়। ম্যাকেনরোও এক প্রতিভাবান। অনেকেই তাঁকে এবারের উইম্বলেডনে সম্ভাব্য বিজয়ী বলে অভিহিত করতে চেয়ে-ছিলেন। কিন্তু বর্গের মুখোমুখি হওয়ার আগেই ম্যাকেনরোকে নতমস্তকে উইম্বলেডন থেকে বিদায় নিতে হয়।

কোনরসের মোকাবিলায় বর্ন বর্গ একদিন রীতিমত অস্থির ও সময় সময় অনিশ্চিত হয়ে পড়তেন। অধুনা সেই অনিশ্চয়তা তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। সাম্প্রতিক নিশ্চয়তার হেতু কি? বর্গের নিজের স্বীকারোক্তি এখন আমি ইতিবাচক খেলার দিকেই ঝুঁকেছি। জিমি কখন ভুল করবেন তার প্রতীক্ষায় না থেকে নিরন্তর চাপে তাঁকে ভুল করাতে বাধ্য করানো। হচ্ছে আমার ক্রীড়ারীতির একমাত্র লক্ষ্য। এক কথায়, বর্গের ক্রীড়াধারার আমূল পরি-বর্তন ঘটে গেছে। এখন খেলা নিয়ন্ত্রণের ভার তিনি নিজের হাতেই রাখতে চান, অপরের হাতে তা দিয়ে রেখে অতি হিসেবীর মত সময় কাটানোতে তাঁর আর মন নেই। এখন তিনি পুরোপুরি আক্রমণাত্মক প্রতিযোগী। আক্রমণই আত্মরক্ষার যে শ্রেষ্ঠ উপায়, এই আপ্তবাক্যে তিনি পরম শ্রদ্ধাশীল।

তেইশ পূর্ণ হওয়ার ফাঁকেই বর্ন বর্গ বার চারেক ফরাসী টেনিস, বারদুয়েক ইতালীয় টেনিস, একবার পেশাদারদের নিজস্ব প্রতিযোগিতা ওয়ার্ল্ড সার্কিট টেনিস জয় করেছেন এবং টানা চার বছর উইম্বলেডনে শীর্ষ সম্মান পেয়েছেন। একালের উইম্বলেডনে তাঁর সাফল্য অভূতপূর্ব। এই অনন্য কীর্তির দৌলতেই তিনি আন্তর্জাতিক টেনিসের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় জুড়ে দিতে পেরেছেন।

আধুনিক কালের উইম্বলেডন টেনিসে বর্ন ছাড়া আর কেউই পর পর চারবার চ্যাম্পিয়ান আখ্যা অর্জন করতে পারেন নি। তিরিশের দশকে ইংলণ্ডের ফ্রেড পেরি একাদি-ক্রমে তিন বার উইম্বলেডন জয় (১৯৩৪—৩৬) করে যে নজির গড়েছিলেন, বর্গ এবার সেই নজিরই ডিঙিয়ে গেছেন। উইম্বলেডন আরম্ভের আগে বর্ন বলেছিলেন পর পর চার বার উইম্বলেডন জয় করতে পারব না কেন? আমার তো মনে হয় যে, না পারার [illegible] [illegible] হেতু নেই। [illegible] [illegible]

প্রত্যপ্রজয়ী বর্গ তাঁর পূর্বতনদের অক্ষয় [illegible] করে দিয়েছেন।

বর্গ বর্গের আগে টানা চার বারে কিংবা ততোধিক বার উইম্বলেডন জয় করেছিলেন উইলিয়ম রেনশ (১৮৮১—৮৬), এ এফ ডোহার্টি (১৯০২—১৯০৬), আর এইচ ডোহার্টি (১৮৯৭—১৯০০) ও এ এফ উইলডিং (১৯১০—১৯১৩)। তবে উইম্বলেডনের আদিকালে পর পর বিজয়ী সম্মান পাওয়া ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। যেহেতু সেকেলে নিয়মানুসারে পূর্বতন চ্যাম্পিয়ানদের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে নামমাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হতে হত। সেই একজনকে হারাতে পারলেই চ্যাম্পিয়ান আখ্যা অক্ষুণ্ণ থেকে যেত। কিন্তু ১৯২২ সাল থেকে খেলার নিয়ম বদলে যাওয়ায় আধুনিক উইম্বলেডনে চ্যাম্পিয়ানদের প্রথম রাউন্ড থেকে খেলে এগিয়ে যেতে হয়; ফলে আধুনিক উইম্বলেডন আসরে চ্যাম্পিয়ানদের অল্পকালের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করতে হয়। ওই লগ্নে তাকে থাকতে হয় শারীরিক সক্ষমতার তুঙ্গাসীন হয়ে। শরীর ও মনের প্রস্তুতিতে সামান্য টান পড়লে বা কোন দিন সংকট ঘনিয়ে আসতে পারে। রেনশ, ডোহার্টিদের আমলে চ্যাম্পিয়ানদের পরীক্ষার কষ্টিপাথরে এমনভাবে প্রতিনিয়ত ঘষেমেজে যাচাই করে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই তাঁদের কাজ ছিল অপেক্ষাকৃত হাল্কা। তাই সেকালের অনুপাতে একালে পর পর উইম্বলেডন জয় করার মূল্য ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত চার বছরে উইম্বলেডন টেনিসে খেলতে এসে বর্ণ বর্গ একাদিক্রমে ২৮টি সিঙ্গলস ম্যাচে জিতেছেন। উইম্বলেডনে পর পর সিঙ্গলস ম্যাচ জেতার রেকর্ড আছে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ান রড লেভারের। তিনি জিতেছিলেন ৩১টি খেলায়। কে বলতে পারে যে আগামী বছরে বর্ণ বর্গ রড লেভারের এই রেকর্ডটিও হাতিয়ে নিতে পারবেন না? কারণ বর্গের এখনও বয়স আছে। এবং তা আছে বলেই আগামী কয়েক বছরে তিনি আরও কি করেন তা জানায় রসিক মহল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন।

বর্ণ বর্গ খেলোয়াড় হিসেবে কত বড়? এই প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপলব্ধি যাচাই করে নেওয়াই সবচেয়ে ভাল। এবারের উইম্বলেডন ফাইনালে পাঁচ সেটে চুলোচুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বর্গের কাছে হেরেছেন মার্কিন তরুণ রস্কো ট্যানার। ট্যানারের মত জোরাল সার্ভিস করার ক্ষমতা আর কারুর নেই। ট্যানারের সার্ভিসের পর বলের গতি গিয়ে পৌঁছয় ঘণ্টায় দেড়শ মাইলেরও ওপরে। ফাইনালের পর ওই ট্যানারই অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছেন, আমি ভালই খেলেছি। কিন্তু বর্গ খেলেছেন তার চেয়েও ভাল। আমি যাই করি না কেন, তার যোগ্য জবাব দেবার মত সঙ্গতি বর্ণের ছিল।

সিঙ্গলসের প্রাথমিক পর্বে বিজয় অমৃতরাজ বর্ণ বর্গকে চড়া চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। এক সময় দর্শকদের ধারণা হয়েছিল যে, বিজয় বুঝি এই ম্যাচ জিতেই যাবেন। [illegible] বিজয় সেদিন তাঁর খেলোয়াড় জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় রেখেছিলেন উইম্বলেডনের এক নম্বর কোর্টে। তবু বিজয়কে হারতে এবং হারের পর মুক্ত কণ্ঠে স্বীকারও করতে হয় যে, বর্গ হচ্ছেন প্রতিভার বরপুত্র। উইম্বলেডনের আগে ওয়েম্বলিতে ব্রেটনের জন লয়েড বর্গের হাতে হেরে যাওয়ার পর বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, বর্গের মারগুলি অবিশ্বাস্য ও বিপ্লবাত্মক। আগামী শতকে টেনিসের সুপারস্টারেরা কি ধরনের খেলা খেলবেন এই শতাব্দীর শেষাংশে বর্গও তা দেখিয়ে গেলেন।

বর্ণ বর্গের কোচ ও অভিভাবক হলেন সুইডেনের জাতীয় দলের প্রাক্তন খেলোয়াড় লেনার্ট বার্জেলিন। তাঁরও ধারণা, বর্ণ এমন সব মার মারেন প্রয়োগ নৈপুণ্যে যা অবিশ্বাস্য। বার্জেলিন হলেন বর্ণের ছায়াসঙ্গী। ভূগোলপথে তিনি যেখানেই যান না কেন, বার্জেলিন তাঁর সঙ্গে থাকবেনই থাকবেন। দুজনের মধ্যে সমঝোতা আদর্শ। অধুনা আরও একজন বর্গের ছায়াসঙ্গিনী হয়ে পড়েছেন। তিনি রুমানীয় বান্ধবী মারিয়ানা সিমিনেসকু। আগামী বছর জুলাইয়ে মারিয়ানা বর্গের জীবন সঙ্গিনী হওয়ার শপথ নেবেন নিজেকে বর্গের সঙ্গে সাতপাকে জড়িয়ে।

গত ক বছরে টেনিস খেলে টি-ভি ও বেতারে এবং প্রচার কার্যক্রমে অংশ নিয়ে বর্ণ বর্গ লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। সেই টাকার অংশ বিশেষ মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করে বর্ণ বাড়ি-গাড়ি কিনেছেন, সম্পত্তি বাড়িয়েছেন, ক্রীড়া সরঞ্জামের দোকান দিয়েছেন। প্রাচুর্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন রাজার হালে। তবু তাঁর অখ্যাতি যে পয়সা-কড়ির বিষয়ে তিনি যেন কিছুটা কৃপণ স্বভাবের। অন্য তারকারা থাকেন সবচেয়ে নামী হোটেলে। বর্ণ দিন কাটান অপেক্ষাকৃত সস্তার হোটেলে। ভিড়, হট্টগোলের বাইরে।

খেলোয়াড় বর্গ নাকি কখনই স্নায়ুর চাপে ভোগেন না। খেলতে খেলতে তাঁকে বড় একটা হাসতেও দেখা যায় না। কোর্টে থাকার সময় তিনি যেন নিজের জগতেই থেকে যেতে চান। চার পাশে কি ঘটছে সেদিকে নজর নেই একটুকু। তাঁর এই নির্বিকার ও সংক্ষিপ্ত ও আপনভোলা চালচলন দেখে দর্শকেরা তাঁর নামকরণ করেছেন আইসবার্গার হিসেবে। এক বিরাট বরফ খণ্ডের মত শীতল। আবার চলতে শুরু করলে বরফের সেই চাঁইটি সামনে যা পায় তাই ঠেলে ধ্বসিয়ে নিয়ে যায় নির্দয় হাতে, নির্মম মেজাজে!

তবে সত্যিই কি বর্ণ অভিমানবের মত স্নায়ুর চাপ থেকে একেবারেই মুক্ত? বোধহয় না। অন্তত তাঁর স্বীকারোক্তি থেকেই সেকথা আমরা জানতে পেরেছি। উইম্বলেডন ফাইনালে ট্যানারকে হারাবার পরক্ষণেই প্রকাশ্যে বলেছিলেন শেষ দিকে এমনই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম যে, র‍্যাকেটটিকে ধরে রাখার সামর্থ্যও ছিল না। দু হাত কাঁপছিল থর থর করে। নিজের দুর্বলতা [illegible] করে বর্ণ জানিয়ে দিয়েছেন যে, লোকে যাই বলে বলুক, আসলে তিনিও এই মর্ত্যের মানুষ। অগ্নিপরীক্ষার লগ্নে স্নায়ুর চাপে তাঁকেও অস্বস্তিতে পড়তে হয়। তবে চাপ সহ্য করার, শিথিল করে নেওয়ার কৌশল তাঁর জানা আছে বলেই প্রতিযোগী হিসেবে অনন্য সাধারণ।

বর্ণ বর্গের ছেলেবেলায় সাধ ছিল তুষার হকি খেলোয়াড় হওয়ার। কৈশোরে হকি নিয়েও মেতে উঠেছিলেন। তারপর হঠাৎ যেন ঝুঁকে পড়েন টেনিস কোর্টে। বর্গের বাবা এক দিন স্থানীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় একখানি টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে বাড়ি ফিরলে ন বছরের ছেলে বাবার হাত থেকে সেই টেনিস র‍্যাকেটটি ছিনিয়ে নেয়, তেইশে পা দিয়েও সেটিকে আর হাত ছাড়া করেন নি। এখন তাঁর ডজন ডজন র‍্যাকেট। কাঠের-তাঁতের র‍্যাকেট বর্ণের হাতে পড়ে এখন সোনায় বাঁধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আর তারই সাহায্যে স্বর্ণ বর্গ স্বর্ণাভ শিল্পকর্মের নমুনা এঁকে গোটা দুনিয়াকে অবাক করে তুলেছেন। সত্যিই বর্ণ বর্গ টেনিসে এক বিস্ময়—ইতিহাসের নতুন অধ্যায়।

চিত্রধ্বনী

হত্যাকারী মহাপুরুষ হলেন

পর্দা জুড়ে ভারতের জাতীয় পতাকা উড়ছে। পুলিশ পদক দেওয়ার অনুষ্ঠান। পুলিশের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের বক্তৃতা। পদক পেলেন বিনোদ খান্না। যেহেতু প্রাপক বিনোদ খান্না, সে কারণে পদক গ্রহণ কালে তাঁর চোখে রোদ-চশমা থাকতেই পারে। এসব ছোটখাটো ব্যাপারে হিন্দী ছবির দর্শকের চোখ এনগেজড করা ভালো দেখায় না। তার চোখ আরো মহৎ (!) কিছু দেখার জন্য প্রস্তুত থাকে। বিনোদ পদক পাওয়ার পর তাঁর পিতামহ প্রাণকে প্রণাম করছেন। এই সময় প্রাণ যথেষ্ট বৃদ্ধ।

পদক প্রদান অনুষ্ঠান হঠাৎ-ই [illegible] হওয়ার পর দেখা গেছে প্রাণের যৌবনকাল। প্রাণ তলোয়ারে আঙুল চিরে মা কালীর (এখানে তিনি মা ভবানী) সামনে রক্তদান করে ডাকাতি করতে চলে যান। প্রাণ এখানে দৌলত সিং—বিখ্যাত ডাকু। এবং তিনিই হত্যারা বা হত্যাকারী।

পরের দৃশ্যে নিরুপা রায়ের স্বামী তাঁদের ছেলেকে নীতি শিক্ষা দিচ্ছে। এরকম দৃশ্যভাগ কিছুটা নাটাঞ্জলী। এই ছেলে বড় হয়ে হয়েছে প্রকাশ বা রাকেশ রোশন।

দৌলত সিং-এর দল ঢুকে পড়েছে গ্রামে। ঘোড়া, মশাল এবং বন্দুকের আওয়াজ [illegible]

দৌলতের গুলিতে নিরুপা রায়ের স্বামী অর্থাৎ প্রকাশের বাবা খুন হয়েছে। শিশু প্রকাশ ডেকে এনেছে দৌলতকে। দৌলত ডাকাত হলেও মানুষ এটা এই দৃশ্যে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে। এবং পরবর্তীকালে দৌলত শুধু মানুষ নন, মহামানব বা মহাপুরুষ তাও প্রমাণ করা হয়েছে। পরের কথা পরে। এখন শিশু প্রকাশ তার বাবার জীবন ফিরে চেয়েছে। দৌলত বলেছে জীবন ঈশ্বরের হাতে। তখন শিশু প্রকাশ বলেছে—যে জীবন দেবার ক্ষমতা তোমার নেই—সেই জীবন তুমি নিলে কেন?

হত্যারা দৌলত সিং-এর চিত্তচাঞ্চল্য দেখা গেছে—তারও পুত্র-কন্যা আছে। দৌলত দেখেছে মৃত দৌলতের বুকে গুলি—তার শিশু পুত্রের কান্না। প্রকাশের বাবার মৃতদেহ এবং দৌলতের মৃতদেহ অতি দ্রুত শট ডিভিশন বা জাম্প কাট পদ্ধতিতে ঘুরে এসেছে বার কয়েক। দৌলত কোনো উত্তর দিতে পারেনি। ফিরে গেছে তার ডেরায়।

দৌলত মা ভবানীর সামনে অস্ত্র সমর্পণ করেছে। বেদীতলে জমা রেখেছে বন্দুক এবং কার্তুজের বেল্ট। দলপতির শিরোপা দান করেছে তার সহযোগীকে। তারপর আত্মসমর্পণ পালা। দৌলতের কয়েদ বাস। বা প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছে। আত্মার শুদ্ধির জন্য নাকি সুরেন্দ্রমোহন পরিচালিত 'হত্যারা'তে হত্যারা দৌলত সিংকে মহাপুরুষ রূপে চিহ্নিত করার জন্য—এ প্রশ্ন অবান্তর। তাই এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। দলপতির শিরোপা ত্যাগ পর্বে বাতি বা আলো কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা বেশ প্রামাণিক সে কারণে মনে দানা কাটে। এবং পরিচালক ডিটেলের ব্যাপারে যত্নবান এটুকু বোঝা গেছে।

দৌলতের কয়েদ বাস এবং দৌলতের ছেলেমেয়ে বড় হওয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে।

দৌলতের ছেলে বড় হবার পর হয়েছে বিজয় সিং (বিনোদ খান্না)—ফরেস্ট অফিসার। বিনোদের প্রেমিকা মৌসুমী বা গৌরী এক ভূস্বামীর কন্যা। এই যুগলের প্রণয় দৃশ্য খুব দীর্ঘ নয়। কারণ বিনোদ খান্না সর্বদাই তার চারিত্রিক গুণে প্রেম অপেক্ষা মারদাঙ্গাকেই পছন্দ করেন বেশী। মারপিঠেই তিনি সিদ্ধহস্ত।

বিজয়ের বন্ধু প্রকাশও ঘটনা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছে পুলিশ অফিসার রূপে। এখন প্রকাশ রাকেশ রোশন। প্রকাশ বিজয়ের বোনের গুণ মুগ্ধ। বা প্রণয় প্রার্থী।

দৌলত সিং-এর কয়েদ বাসের সীমা হ্রাস পেয়েছে তার সৎ ব্যবহারের জন্য। দৌলত ফিরে এসেছে বিজয়ের সংসারে। গ্রামের পঞ্চায়েত দৌলতকে শিরোপা দিয়েছে কেননা বিজয়ের বাবাকে ডাকু দৌলত সিং না ভেবে বা বুঝতে না পেরে শ্রীঠাকুর দৌলত সিং মনে করেছে।

ইতিমধ্যে বিজয় বা বিনোদ বসে থাকেনি। মদের দোকানে এক মাস্তানকে রীতিমত ঠেঙিয়েছে। এবং ওই গ্রামের এক বদ ভূস্বামিকে কুপোকাত করেছে এক বাইজীর শরম রক্ষা করার জন্য। এসবই বিনোদের হাতযশ।

বিনোদ মৌসুমী বিবাহ প্রায় পাকা। এমন সময় এক কাওয়ালী আসরে রাকেশ না নিরুপা রায়কে নিয়ে হাজির হয়েছে। নিরুপা রায় দৌলত সিংকে ডাকু দৌলত সিং রূপে চিহ্নিত করেছে। গোটা গ্রাম দৌলত সিং-এর পরিবারকে পরিত্যাগ করেছে।

দৌলত, তার স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা—এই চারজনকে ক্রেন শট অর্থাৎ উঁচু থেকে ক্যামেরায় ধরা হয়েছে—ফাঁকা এবং পরিত্যাক্ত কাওয়ালী আসরে। এই পরিকল্পনা প্রশংসার যোগ্য। দৌলতের মুক্তি বা কয়েদবাস শেষ হবার সময় পায়রার ঝাঁক উড়ে যাওয়ার দৃশ্যও হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে অপ্রচলিত।

মৌসুমী বা গৌরীর বাবা ডাকু দৌলত সিং-এর পুত্র বিজয় সিং-এর সঙ্গে তার মেয়ের বিবাহ বাতিল করেছে।

এর পরের ঘটনা প্রবাহ অতি দ্রুত। বিজয়ের সঙ্গে অন্য ডাকাত দলের বারবার সংঘর্ষ। এবং ফরেস্ট অফিসার বিজয় সিং পরিণত হয়েছে ডাকু বিজয় সিং-এ। এবং এবং জঘন্য সমাজের জন্যই যে বিজয় ডাকু হয়ে গেল তাও বক্তৃতায় জানানো হয়েছে।

বিজয় সিং তার বাবা দৌলত সিং-এর পরিত্যাক্ত বা মা ভবানীর বেদীতলে সমর্পিত বন্দুক এবং কার্তুজের বেল্ট তুলে নিয়েছে। দলপতির শিরোপাও পেয়েছে বিজয়।

ডাকু বিজয় সিং পিতা হয়েছে। তার আগে গৌরীর সঙ্গে বিবাহও হয়েছিল। বিজয়-গৌরীর ছেলে হবার পর ডাকাতের আস্তানায় হিজড়েদের আগমন এবং হিজড়ে নাচ বেশ কুরুচিপূর্ণ। হিজড়ে রূপে মেহমুদের অঙ্গভঙ্গি দেখা বা দেখানোর অযোগ্য। এই অংশটা অনায়াসে বাদ দেওয়া যেত।

পরের অংশ ডাকাতে ডাকাতে সংঘর্ষ। পুলিশ অফিসার প্রকাশকে মুক্ত করেছে বন্দী বিজয়। বিজয় যেহেতু বিনোদ সে কারণে নিজে বন্দী হলেও বন্দী মুক্তিতে তার ভূমিকা থাকবে না—এটা ভাবাও যায় না।

প্রতিপক্ষ ডাকাত সর্দারকে বিজয় শেষ করার পর বিজয় এবং প্রকাশ মুখোমুখি। প্রকাশ কানুন বা দেশে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বিজয়ের হাতে বন্দুক প্রকাশের রিভলভার। পাহাড়ের ওপরে দৌলত সিং—তার হাতেও বন্দুক।

দৌলত সিং অবশ্য তার ছেলেকে প্রতিপক্ষ ডাকাত দল থেকে একবার উদ্ধার করেছে।

বিজয় এবং প্রকাশ যখন সামনা সামনি এগিয়ে আসছে—ঠিক সেই মুহূর্তে দৌলত সিং-এর গুলি এসে লেগেছে বিজয়ের বুকে।

হত্যারা দৌলত সিং নিজ হাতে তার পুত্রকে হত্যা করে প্রমাণ করেছে—সে মহাপুরুষ। গৌরী তার ছেলেকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বিজয় গৌরীর ছেলেকে কোলে তুলে নিয়েছে ঠাকুর দৌলত সিং।

এই শিশু পুত্রই বড় হয়ে পুলিশ পদক পায়। যা ছবির শুরুতে অর্থাৎ প্রথম দৃশ্যে দেখানো হয়েছিল।

কল্যাণজী আনন্দজীর মিউজিক তাদের সুনাম রক্ষা করেছে। বিনোদও তার চারিত্রিক শুচিতা (!) বজায় রেখেছেন। মৌসুমীকে মানিয়েছে বেশ। এ ছবির সম্পদ দৌলত সিং বা প্রাণের অভিনয়।

প্রভাত চৌধুরী
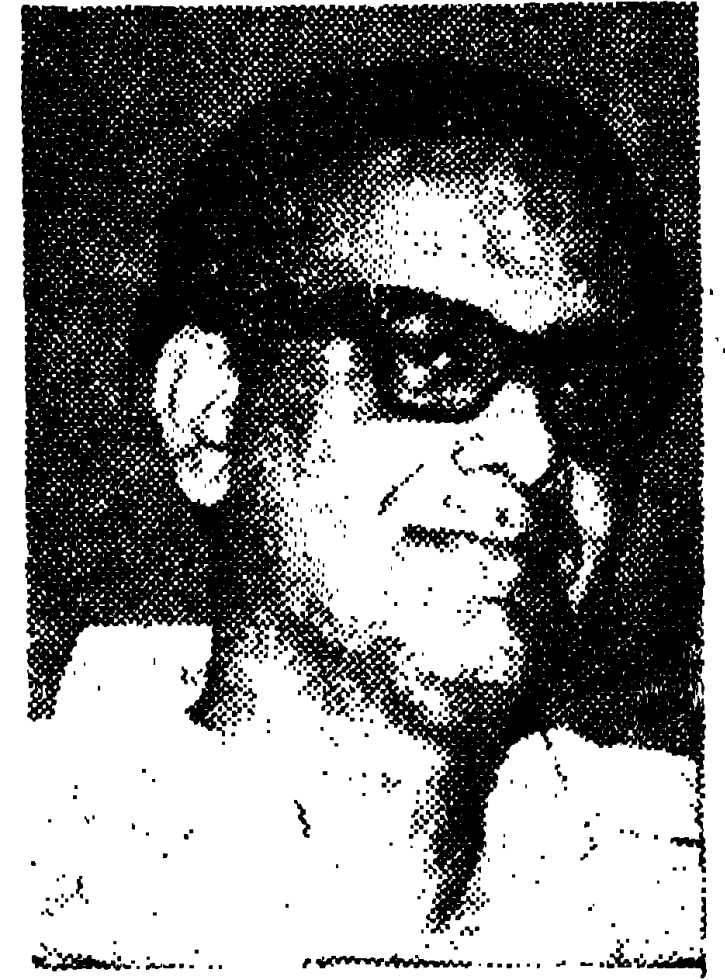
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

ভালো ছবির ভালো গান

অনেক সময় খারাপ ছবির গান ভালো হয়ে যায়। একথা হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় নিজের সুর দেওয়া ছায়া ছবির গান সম্পর্কে আমাকে একবার বলেছিলেন। আবার ভালো ছায়াছবির গান অনেক সময় খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু তরুণ মজুমদারের ভালো ছবি গণদেবতার গানও খুব ভালো হয়েছে। নির্দেশক তরুণবাবু এবং সুরকার হেমন্তবাবু এই জুটি কয়েকবার বাঙালী দর্শকের মন ভরিয়ে দিয়েছে।

'গণদেবতায়' সুরকার হেমন্তকুমার খুব সরল ও স্নিগ্ধ এবং একই সঙ্গে হৃদয়-অধিকারী। আবহ সঙ্গীত খুব সুন্দর। ঝড়, আগুন, ন্যাড়া মাঠ সব কিছুর সঙ্গে

...ত্র হয়ে সুরকার আবহ সঙ্গীত ও ...নের সুর স্থির করেছেন।

গানের কথা ও কণ্ঠ আমাদের বিশেষ-...বে নাড়া দিয়েছে। গঙ্গাচরণের 'ভোর ... জগৎ জাগিল' গানটি মান্না দে'র ...য় দিনের প্রথম আলো ফোটার মত ...কে আনন্দিত করে। পুলক বন্দ্যো-...াধ্যায়ের কথা ও আরতির গলায় 'সব্বনেশে ...স যে নাগর' সন্ধ্যা রায় ও শমিত ভঞ্জের ...ভিনয়ের মধ্যে মিশে গেছে। 'ভালো ...লো শিশুবেলা' গানটিতেও বিপদের ...ভতর দিয়ে একটি সত্যের সামনে দাঁড় ...রিয়ে দেয়। স্বয়ং তারাশঙ্করের 'সাত ...টা ...তার সাতান্ত' পুরোপুরি দেশজ। ...কার, কথাকার ও যাঁরা কণ্ঠ দিয়েছেন ...দের কাছে আমরা অনেক দিন পরে ভাল ...নিস পেয়ে কৃতজ্ঞ।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

ছবির খবর

যদিও সরকারীভাবে এখনও লিস্ট ...শ পায়নি, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল ...্য সরকার দ্বিতীয় বছরের অনুদান ...াইয়েদের টাকা শিগগির দেবার বন্দোবস্ত ...রছেন। নিয়মমাফিক আরও আগে দেওয়া ...চিত ছিল. যাই হোক দেওয়া হচ্ছে ...টাই এখন সংবাদ।

প্রথম বছরে যে দশজনকে অনুদান ...ওয়া হয়েছিল তাঁদের কারও ছবিই এখনও ...ম্পূর্ণ নয়, কেউ সবেমাত্র শুরু করেছেন, ...উ কিছু কাজ করেছেন। উপরন্তু ...ুরোপুরি সরকারী পয়সায় যে দুটো ...বি (মৃণাল সেনের 'পরশরাম' ও উৎপল ...ত্তের 'ঝড়') তৈরী হয়ে পড়ে আছে তার ...ভবিষ্যৎ এখনও নির্ধারিত হয়নি। পরি-...শনার দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে তাই-ই ...নিশ্চত।

এ বছর আবার শোনা যাচ্ছে—হয়ত ...শজন নয়. আরও বেশি কয়েকজনকে ...নুদান দেবার কথা চিন্তা করা হয়েছে। ...য কটি নাম জানা গেছে তাঁদের ক্ষমতা, ...যোগ্যতার সমালোচনা এই মুহূর্তে করছি ...না, কারণ প্রত্যেকেই স্বখ্যাত ও সুস্থ ...রুচির ছবি করার প্রত্যাশাতেই সরকারী ...নুদান পাবেন। এ পর্যন্ত যে সব ছবি ...দের কাছ থেকে পেয়েছি তার সবগুলোই ... শিল্পগুণান্বিত মহৎ সৃষ্টি কিংবা ...ব্যবসায়িক সফল তা নয়। অনেক ছবিই ...য়ত ছিল চর্বিত চর্বন।

কিন্তু এবার সরকারী অনুদান যখন ...াঁরা পাচ্ছেন, তখন তাঁদের ওপর বাড়তি ...কিছু দায়িত্ব বর্তাচ্ছে। দর্শক চিরদিনই সুস্থ-সৎ ছবির পৃষ্ঠপোষক-এ সত্য মানতে অরাজি নই। দর্শকের রুচি বিকৃতির যে ধুয়ো তোলা হয়, সেটা ব্যবসায়ীদেরই অপকীর্তি।

রাজ্য সরকারের এই বছর বছর অনু-দান দেবার অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল ভালো ছবির আন্দোলনকে জোরদার করা। দর্শকের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো। সেকথা মনে রেখেই যেন অনুদানপ্রাপ্ত ছবি করিয়েরা ছবি করেন।

তরুণ মজুমদার শুরু করেছেন 'দাদার কীর্তি'র' কাজ। প্রায় নিয়মিতই শুটিং হচ্ছে। কদিন আগে টেকনিশিয়ান স্টুডিওর দু নম্বর ফ্লোরে সেট পড়েছিল একটা অস্থায়ী মঞ্চের। সেখানে থিয়েটার হবে। তরুণবাবু শুটিং করলেন ঐ অস্থায়ী মঞ্চের গ্রীনরুমে। শিল্পী ছিলেন দুজন। নতুন মুখ তাপস পাল আর চিরযুবক চিরতরুণ অনুপকুমার। সম্ভবত প্রেমের ফাঁদে পড়ে তখন তাপস পালের অবস্থা ভিজে ন্যাটিংয়ের মত। অনুপকুমার উদ্ধার-কর্তার ভূমিকায় হাজির। কাটা কাটা কয়েকটি শটে দৃশ্যটিকে ক্যামেরায় ধরে রাখলেন শক্তি ব্যানার্জি।

ইতিমধ্যে তরুণবাবু চলে গেছেন শিমুলতলায় ছবির লোকেশন দেখতে। আগস্টে কদিন ইনডরের পর তিনি বিরাট ইউনিট নিয়ে যাবেন শিমুলতলায়।

*

ঝটিতি সফরে শ্যাম বেনিগাল এসে-ছিলেন কলকাতায়। ছিলেন মাত্র চল্লিশ ঘন্টা। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হল চলে যাবার ঠিক কয়েক মিনিট আগে। নীচে তখন গাড়ি রেডি। শ্যাম চলে গেলেন দুর্গাপুরে।

রাজ্য সরকারের প্রযোজনায় তাঁর একটি ছবি করার কথা অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। ভেবেছিলাম সে ব্যাপারেই পাকা কথা বলতে এসেছেন কলকাতায়। শ্যাম জানালেন—'না, সে ব্যাপারে আমি আসিনি। আসব মাস দুয়েক বাদে। এখন এসেছি একটা ডকুমেন্টারি ছবির শুটিং করতে। দুর্গাপুর-কুলটি বার্ণপুর বোকারোয় শুটিং করে ফিরব বোম্বাই।'

ঃনতুন ছবির খবর আছে কিছু?

—আছে। এখনও চিত্রনাট্য লেখা শেষ হয়নি। সুতরাং ডিটেলস বলতে পারছি না।

ঃহিন্দী, না অন্য ভাষায়?

—হিন্দী।

ঃকবে শুরু করছেন?

—নভেম্বর নাগাদ ইচ্ছে আছে।

ঃতাহলে আমাদের রাজ্য সরকারের ছবি কবে করবেন?

—তারপর।

ঃআপনার 'কোন্ডুরা' ছবির কলকাতায় রিলিজের ব্যাপারে কি হল?

—এখনও ফাইনাল হয়নি। চেষ্টা করছি।

নির্মল ধর

জাপানী শিল্পী মিস মারিকাওয়া

জাপানে 'অন্তর্ঘাত'

এই প্রথম জাপানে বাংলা ছবির শুটিং হল। ছবির নাম 'অন্তর্ঘাত।' প্রযোজক বিশ্বনাথ ঘোষ ও জীবানন্দ ঘোষ। টোকিও শহর ও আশপাশের বিভিন্ন মনোহারী লোকেশনে প্রায় পনের দিন ধরে শুটিং করলেন পরিচালক দিলীপ ব্যানার্জি। রঙিন এই ফিল্মের ক্যামেরা চালিয়েছেন শক্তি ব্যানার্জি. পরিচালক জানিয়েছেন দু দেশের একদল সমাজবিরোধী চোরাচালান-কারীদের কাণ্ড-কারখানা নিয়ে ছবির গল্প। শুধু ভারতীয় শিল্পী নয় একাধিক জাপানী শিল্পীরাও কাজ করেছেন ছবিটিতে ভারতীয় শিল্পী দলে ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী, প্রেম চোপরা, যোগিতা-বলী, দিলজিৎ কাউর, অনিল চ্যাটার্জি এবং বিদেশ শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মার্শাল আর্ট বিশেষজ্ঞ কানাজাওয়া ও মিস মাকিলো মিস মারিকাওয়া, মিঃ নেলসন প্রমুখ। ছবিটির সুরকার সলিল চৌধুরী।

মিঠুন চক্রবর্তী

কণিকা—অশোকতরু

রবীন্দ্রসংগীতের দুই বিশিষ্ট শিল্পী কণিকা ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম আসর সম্প্রতিকালের এক উল্লেখ যোগ্য সাংগীতিক ঘটনা একাধিক কারণে। প্রথমতঃ উভয়ের মধ্যে উত্তর ও পূর্বসূরীর ব্যবধানগত পার্থক্য সত্ত্বেও একই গুরুর কাছে (শৈলজারঞ্জনবাবু) শিক্ষার পটভূমিকা তাঁদের পরিবেশনায় এমন একটা ভাবের ঐক্য রচনা করেছিল যেটা রসসৃষ্টির সহায়ক। রবীন্দ্রসংগীতে এখনকার যুগে দুটি গায়কীই প্রবল। একটি শৈলজারঞ্জন মজুমদারের। অপরটি শান্তিদেব ঘোষের। এবং এই দুটি গায়কীর পুরোধা স্থানীয় শিল্পী হলেন যথাক্রমে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্র।

অশোকতরু পরের যুগের। তাঁর সংগীতিক অভিজ্ঞতাও সমৃদ্ধ। পূর্ববর্তী শিল্পীদের গান শুনে, তাঁদের সংগে হার্মোনিয়ম সংগত করে এবং বিদগ্ধ চিত্তের অভিনিবেশ দিয়ে সংগীতের গতি-প্রকৃতি অধ্যয়ন করে—তিনি নিজস্ব এক গায়নশৈলী করে নিয়েছেন তার মধ্যে তাঁর হৃদয়াবেগের তাগিদও যথেষ্ট।

এই দুইয়ের সমন্বয় এ আসরের বৈশিষ্ট্য। এছাড়া শিল্পী যুগলের ভক্ত-মণ্ডলীর কাছে তাঁদের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ত ছিলই।

অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা 'শ্রুতি' সংস্থা। এই প্রসংগেই স্মরণীয় একটি তথ্য হল এই যে সাধারণ মঞ্চে প্রতিটি গানের আগে সেই গান রচনার পরিবেশ, রচয়িতার সেই সময়ের মানসিকতা ইত্যাদি নিয়ে ভাষ্য পাঠের অবতারণা প্রথম অশোকতরুই শুরু করেন। তার অনেক আগে শুনেছি অশোক-বাবুর গুরু শৈলজারঞ্জন মজুমদার এই-ভাবে কবির গান ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশন করিয়েছেন ঘরোয়া আসরে। এই ধরণের পরিবেশনা রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তাকে নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত করেছে। কারণ শিক্ষা মূল্য ছাড়াও গানের রস গ্রহণের জন্য শ্রোতাদের প্রস্তুত করার ব্যাপারেও এই ভাষ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আসরের প্রথমার্ধে ছিল হিন্দুস্থানী রাগসংগীতকে আশ্রয় করে রচিত রবীন্দ্রসংগীত।

পূরবী রাগে 'বহুর বাজাও বংশী' ভিত্তিক 'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা' ধ্বনিত হল যুগ্মকণ্ঠে। অশোকতরুর পৌরুষ গম্ভীর কণ্ঠ ও কণিকার ললিত মধুর কণ্ঠের মিলনে ভক্তিভাবের পরিবেশ ঘনিয়ে উঠতে দেরী হয়নি। গান্ধারের উদাস ব্যাপ্তির মুহূর্তে দুটি কণ্ঠের সুর এক হয়ে উঠল।

এরপর 'জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে' অশোকতরুর কণ্ঠে যদি বেজে থাকে এক শিল্পে ... গম্ভীর সুরে ... আকুতির নিবেদন। কণিকার কণ্ঠে আড়া রাগের পথ বেয়ে 'মধ্বী ... ধায়' হ উঠেছে সন্ধানী চিত্তের ব্যাকুল অন্বে ধার আকাশচারী অগতি আশ্রয় নিয়ে ভক্তহৃদয়ের শান্তিতে। একটি মন্দ্র ধ্বনি ধ্যান। অপরটি তার সপ্তকের আকুতি দুটি মিলিয়ে পেলাম এক পরিপূর্ণ ধ্যানে ছবি।

ঐ আড়ানা রাগেই ধ্রুপদাঙ্গে 'ধা তব ধায়'-এর পরে খেয়াল অংগে 'মন্দি মম কে' গেয়ে কণিকা দেখালেন সু সহজ সরল সংযত রূপ থেকে মীড় অলংকরণের রংবাহারী আবর্তন অফুরন্ত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে প ভক্তিভাবের উৎসকে নিথাদ রেখেও। পর্যায়ে আশোকতরুর 'তব প্রেমসুধার কণিকার কণ্ঠালটোর আবেগকে ব্যাসোর আত্মগত ভাবপরিক্রময় এসেছে।

এই রকম সব বিচিত্র অধ্যায়ের আব বিবর্তনের পরে যখন তাঁরা ভাব রূপের জগতে পৌঁছলেন তখন পা গেল কবিচিত্তের সকল অভিজ্ঞতাকে ম করে খোঁজা এক অপরূপ সত্তা পবিত্র নির্যাস। কাব্য ও গানের সন্ধি ভৈরবীর অশ্রু জলে গড়া 'আজি যে নাথ' ও 'আমি নিশি নিশি কত' দুটি দুই শিল্পীর কণ্ঠের সুরে আশ্চর্য অনুভূতিলোক সৃষ্টি করেছি

এই পর্যায়েই কোন সে ঝড়ের ভু গানে ছন্দের দোলাতেও অশোকতরু সংবেদনশীলতা এনেছেন, সেই ভাবী বিষাদ গম্ভীর দর্শনচেতনায় দিয়েছেন কণিকা তাঁর ... 'দিনান্ত বেলায়' গানটিতে।

উভয়ের পরস্পর বিরোধী প্রকাশভংগী সত্ত্বেও একটা একাত্মে নির্বিরোধী প্রশান্তির উত্তরণে পৌঁছানোর কারণ বোধহয় একই কাছে শিক্ষার ফলশ্রুতি।

সবশেষে দ্বৈতকণ্ঠে ধ্বনিত কিশোর আজি'—যেন বসন্তের চিরন্ত উচ্ছলতায় সারা প্রেক্ষাগৃহ নেচে অনেকদিন বুকের কাছে বুঝি থমকে রসের স্রোতে সব কটি চিত্তই ভেসে

সামগ্রিক কৃতিত্বের পশ্চা ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন দীপে নির্মল বিশ্বাস, জহর দে (সংগতে) ঘোষ ও গৌরী ঘোষ (ভাষ্যপাঠ) সজ্জায় পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য। প্র ছিলেন প্রবাসস্মৃতি ঘোষ ও বন্দ্যোপাধ্যায়।

শঙ্খ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন্, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ বিমানযোগে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা॥ ভারতের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৪০ পয়সা॥